পূর্ব-পশ্চিম
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৫ থেকে ষষ্ঠ মুদ্রণ মাঘ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৩৯৭০০
সপ্তম মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০৩ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০০

ISBN 81-7066-123-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কিম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

Rs- 200

॥ ১ ॥

একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকা হয়েছে। লোকজন আর মালপত্র তো কম নয়, এক গাড়িতে আঁটানো মুশকিল। বেডিংটাই তো বিরাট। সতরঞ্চি মুড়ে সেটাকে বাঁধাবার সময় প্রতাপ আর কানু দু'দিক দিয়ে দড়ি টেনেছে আর পিক্‌লু বসে থেকেছে তার ওপর, তবু আয়তন বিশেষ কমেনি। এ ছাড়া একটা সুটকেস, একটা ট্রাংক আর বইপত্রের একটা মস্ত বড় পুঁটুলি। দুই টিফিন কেরিয়ার ভর্তি পরোটা আর আলুর দম।

মালপত্র সব চাপানো হলো ঘোড়ার গাড়ির ছাদে। বাবলুর ইচ্ছে সেও ছাদে বসে যাবে, কিন্তু প্রতাপ সে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। মালপত্র সামলাবার জন্য একজনকে ওপরে থাকতে হবে ঠিকই, সে দায়িত্ব দেওয়া হলো কানুকে। এত বড় বেডিংটা প্রতাপ, কানু আর গাড়ির কোচওয়ান মিলে ওপরে তুলতেই হিমসিম খেয়ে গেল।

রাত সাড়ে নটায় ট্রেন, সন্ধ্যে ছটা থেকেই প্রতাপ বেরিয়ে পড়বার জন্য তাড়া দিচ্ছেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে ঘণ্টা দেড়েক লাগবে, আগে ভাগে গিয়ে ট্রেনে জায়গা দখল করতে হবে। কিন্তু মমতার আর খুঁটিনাটি কিছুতেই শেষ হয় না। রান্নাঘরের জানলাটা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না, সেটা তো আর খোলা রেখে যাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত কানু একটা নারকোল দড়ি দিয়ে জানলার পাল্লা দুটো বেঁধে দিল লোহার সিকের সঙ্গে। টেনে বাঁধতে গিয়ে হাত ছড়ে গেল কানুর, তবু সে হাসিমুখে বললো, বৌদি, তোমার আর কী সমস্যা আছে বলো!

মমতা বাবলুকে বললেন, তুই টিয়া পাখির খাঁচাটা ওপরে রাধুর কাছে দিয়ে আয়। আর এই আটআনা পয়সা দিবি, ও ছোলা কিনে দেবে।

বাবলু পখির খাঁচাটা নিয়ে উঠে গেল তিনতলায়। টিয়া পাখিটা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাবলুর দিকে। এ যেন অভিযোগ করছে, আমায় তোমরা ফেলে চলে যাচ্ছো, বাঃ, বেশ! বাবলুর অবশ্য পাখিটার ওপর কোনো মায়া নেই। অতি পাজি পাখি! একদিন বাবলুর আঙুল কামড়ে দিয়েছিল।

রাধু এখন নেই, ওপরের মাসিমা বললেন, তোদের যাওয়ার সময় হয়ে গেল; আমার জন্য কী আনবি রে, বাবলু? তোর মাকে আমার নামে পুজো দিতে বলেছি, মনে করিয়ে দিস, অ্যাঁ? যা, খাঁচাটা বারান্দায় টাঙিয়ে দিয়ে যা। আমি চান করে এসেছি, আমি এখন ছোঁবো না!

ওপরের মাসিমাদের অনেকগুলো পাখি। একপাশে বাবলু তার খাঁচাটা ঝুলিয়ে দিল। তারপর উঁকি দিয়ে দেখলো নিচের দিকে। মালপত্র সব তোলা হয়ে গেছে, এখন বাঁধাবাঁধি চলছে। ঘোড়াটার মুখে একটা কাপড়ের থলি, তার মধ্যেই ঘাস রয়েছে, মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সে ঘাস খাচ্ছে। চেকলুঙ্গি আর গেঞ্জি-পরা কোচওয়ানটি খুব রোগা, এত রোগা যে পিঠটা কুঁজো হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আছে একটা বাচ্চা ছেলে, বাবলুর থেকেও ছোট, সে গাড়ির পেছনে দাঁড়ায়। ঐ জায়গাটার প্রতি বাবলুর বরাবর লোভ। আজ সে ওখানে দু'বার তিনবার বসে নিয়েছে। এটা তাদের নিজেদের ভাড়া করা গাড়ি, সে যতবার খুশী বসতে পারে। তাদের পাড়ার লালু প্রায়ই চলন্ত ঘোড়ার গাড়ির পেছনে বসে অনেকখানি যায়। তার দেখাদেখি বাবলু একদিন বসতে গিয়েছিল আর সেই গাড়ির কোচোয়ান পেছন দিকে ছপটি মেরেছিল।

গাড়ির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পিক্‌লু ডাকছে, মা এসো। সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। বাবলুটা আবার গেলে কোথায়?

পিক্‌লু ফুল প্যান্ট পরেছে, তার ওপরে একটা চেন লাগানো গেঞ্জি। পিক্‌লু হঠাৎ লম্বা হতে শুরু করেছে, কিছুদিন আগেও সে আর বাবলু প্রায় সমান সমান ছিল। একদিন চুল উল্টে আঁচড়েছিল পিক্‌লু, তা দেখে মমতা বলেছিলেন, ছিঃ, ওকী করেছিস, একদম বখাটে ছেলেদের মতন দেখাচ্ছে! তোর বাবা দেখলে মাথা ন্যাড়া করে দেবে!

যাত্রা শুরু হলো পৌনে সাতটায় মগবাজার থেকে মণীন্দ্র কলেজের পাশ দিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ। মমতার পাশে বাবলু আর মমতার কোলে মুন্নি। উল্টোদিকে প্রতাপ আর পিক্‌লু। বাবলু ছটফটে ছেলে, এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে পারে না, বারবার সে বাইরে উঁকিঝুঁকি মারছে। মাড়োয়ারিদের একটা বিয়ের মিছিল যাচ্ছে, প্রচুর আলো আর বাজনা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে জরির পোশাক পরা বর, তার কোমরে তলোয়ার, বাবলু অনেকখানি মুখ ঝুঁকিয়ে দিতেই মমতা সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, এই, কী করছিস, মাথায় ধাক্কা খাবি তবে বুঝবি! দ্যাখ তো, দাদা কেমন চুপ করে বসে

আছে।

পিকলু বললো, বাবলু, তুই আমার জায়গায় আসবি? এখানে বসে ভালো দেখা যাচ্ছে।

বাবলু তাতে রাজি নয়। মায়ের পাশ ছেড়ে সে বাবার পাশে যেতে চায় না। সেইজন্যই তো সে আগে থেকে গাড়িতে উঠে এই জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে।

প্রতাপ কোনো কথা বলছেন না, থুতনিটা উঁচু করে আছে সতার মুখখানি গম্ভীর, বিষণ্ন। যদিও সপরিবারে তিনি বেড়াতে যাচ্ছেন, তবু তার এখন মনে পড়ছে অন্য কথা।

প্রতাপ সজাগ হলেন হাওড়া ব্রিজের ওপর এসে। সাংঘাতিক ট্র্যাফিক জ্যাম। দশ মিনিটে এ গাড়ির ঘোড়া এক পা-ও এগোলো না। ওপর থেকে কানু বললো, সেজদা সামনে একেবারে সলিড হয়ে আছে। কিছুই নড়ছে না।

প্রতাপ পাঞ্জাবির ঘড়ি-পকেট থেকে গোল ঘড়ি বার করে দেখলেন। যথেষ্ট সময় আছে এখনো। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। এত মালপত্র নিয়ে তো গাড়ি ছেড়ে হাঁটা যাবে না! তিনি বললেন, কানু, তুই আর পিকলু বরং আগে চলে যা। ট্রেন ইন করলে উঠে জায়গা রাখবি।

পিকলু তড়াক করে নেমে পড়তেই বাবলু বললো; বাবা, আমিও যাবো!

প্রতাপ মাথা নেড়ে বললেন, না!

পিকলু আর কানু টিকিট আর দু-একটা ছোটখাটো মালপত্র নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। একটু পরেই বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো বাবলুর। যদি তারা শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে না পারে? দাদা আর কাকা চলে যাবে, না ফিরে আসবে? ওরা টিকিট নিয়ে গেছে, ওরা নিশ্চয়ই ট্রেন থেকে আ নামবে না।

প্রতাপ শান্ত ভাব বজায় রেখে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন, কিন্তু মমতা একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তাঁর ফর্সা মুখখানিতে সবরকম অভিব্যক্তি স্পষ্ট বোঝা যায়। বরং কখনো যেন বেশি বেশিই লাগে। একটা সিল্কের লাল পাড় শাড়ি পরেছেন মমতা, ঘোমটা নেমে গেছে, মুখের ওপর কয়েকটা চূর্ণ অলক। ব্রিজের ওপর নানারকম গাড়ি ঘোড়ার ভেঁপু ও মানুষের চিৎকারে একটা বিচিত্র কলরোল।

মমতা আতঙ্কিতভাবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হবে? আমরা এইরকম চুপ করে বসে থাকবো?

প্রতাপ বললেন, কী করবো? এত মোটঘাট নিয়ে অতবড় বেডিং নিতে আমি বারণ করেছিলাম না?

মমতা বললেন, শীতের জায়গায় যাচ্ছি, লেপ নিতে হবে না? তুমি কুলি ডাকো।

শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো। জ্যাম গলবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কুলিরা মওকা বুঝে স্টেশন ছেড়ে ব্রিজের ওপর এসে সব গাড়িতে মাথা গলাচ্ছে। আট আনা রেট, এখন তারা দেড় টাকার কমে যাবে না। তিনটি কুলির মাথায় চাঁপানো হলো সব কিছু। ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানটি কোনো দরাদরি করলো না, প্রতাপ তাকে একটি পাঁচ টাকার নোট দিতে সে লম্বা সেলাম দিয়ে বললো, যান বাবু, ভালো করে ঘুরে আসুন। কাশ্মীর গাড়ি তো, পেয়ে যাবেন, চিন্তা নেই।

বাবলু ছুট লাগপাত যাচ্ছিল , প্রতাপ তাকে ধমক দিয়ে হাত চেপে ধরলেন। অতি দুরন্ত ছেলে, ভিড়ের মধ্যে একবার হারিয়ে গেলেই হয়েছে আর কি! কুলিদের ওপরেও নজর রাখতে হবে, ওরা মাথায় মোট নিয়েই বড্ড জোরে দৌড়োয়।

শীতের সময়টায় অনেকেই পশ্চিমে বেড়াতে যায়, তাই হাওড়া স্টেশনে প্রচুর জনসমাগম। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মে লেগে গেছে, কিন্তু চতুর্দিকে এত মানুষের মাথা যে কানু বা পিকলুকে দেখা যাচ্ছে না। কোন কামরায় উঠলো ওরা? ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস, থার্ড ক্লাস। এর মধ্যে থার্ড ক্লাসের কোনো আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই, তার ফলে কুমড়ো গাদাগাদি অবস্থা। কোনো দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবার উপায় নেই প্রত্যেকটা থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের কাছে গিয়ে প্রতাপ বেশ জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন, কানু! পিকলু!

শেষ পর্যন্ত একটা কামরার জানলা দিয়ে বেরিয়ে এলো পিকলুর হাত। সেটা যে-কোনো কিশোরের হাত হতে পারতো, কিন্তু মমতা দেখেই চিনলেন। নানারকম উৎকণ্ঠার মধ্যেও বাবলুর একটু ক্ষোভ হলো। দাদাটা বড়দের দলে চলে যাচ্ছে। তাকে ফেলে। এরপর কানুকাকার মতন দাদাও সিগারেট খেতে শিখবে।

বাবলু আর মুন্নিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো জানলা দিয়ে। তারপর শুরু হলো কুলিদের দাপট, দরজার কাছে এক তিল জায়গা নেই মনে হয়েছিল, তবু একটার পর একটা মালপত্র ঢুকে যেতে

লাগলো, প্রকাণ্ড বেডিং-এর ধাক্কাতেই অনেকখানি ফাঁকা হয়ে যেতে প্রতাপ আর মমতা উঠে পড়লেন সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে।

কানু ওপরের একটি বাঙ্কে শুয়ে পড়েছে, আর নিচের বেঞ্চে এক কোনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে পিকলু। তার অধিকৃত জায়গা সঙ্কুচিত হয়ে আসছে ক্রমশ। কোনোরকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে বাবলু বললো, আমি ওপরে ছাড়া কিছুতেই বসবে না! আমি ওপরে যাবো!

সে চলে গেল ওপরে। মমতার নিজস্ব ছোট বাক্সটি রাখা হলো কানুর হেফাজতে। নিচের জায়গাটুকুতে মমতা আর প্রতাপ বসলেন কোনোক্রমে। এই নভেম্বর মাসেও কপালে ঘাম জমে গেছে। সামনে মানুষের দেয়াল, বিকিরিত হচ্ছে মানুষের শরীরের উত্তাপ। গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে এখনও।

প্রতাপের ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি দেহাতী স্ত্রীলোক, বুকের কাছে একটি বাচ্চা। বছর খানেক বয়েস হবে বাচ্চাটির, বেশ মোটকা সোটকা। স্ত্রীলোকটির শাড়ীটি মাটি বর্ণ, খুব সম্ভবত কলকাতা শহরে এরা মাটি বিক্রি করতে আসে। এই শ্রেণীর যাত্রীরা কখনো ট্রেনের টিকিট কাটে না। দৈবাৎ চেকার এলে এক টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দেয়।

প্রতাপ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সেই স্ত্রীলোকটিকে বললো, আপনি বসুন।

মমতা অবাক হলেও কিছু বললেন না। তিনি জানেন, তাঁর স্বামীর এই ধরনের উটকো ইচ্ছের প্রতিবাদ জানিয়ে কোনো লাভ নেই। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের দাঁড়িয়ে যাওয়ার অভ্যেস আছে। সারা রাত ঠায় দাঁড়িয়ে যেতে প্রতাপেরই কষ্ট হবে খুব।

স্ত্রীলোকটিও ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়েই রইলো। প্রতাপ আবার আদেশের সুরে গম্ভীরভাবে বললেন, আপ বৈঠিয়ে!

মমতার পাশের লোকটি এই সুযোগে কয়েক ইঞ্চি সরে আসছিল, প্রতাপ চোখ গরম করে তাকালেন তার দিকে।

দেহাতী স্ত্রীলোকটি তাতেও বসছিল না, মমতাকেই তখন তাঁর স্বামীর ইচ্ছা পূরণে সাহায্য করতে হলো। তিনি ঐ স্ত্রীলোকটির হাত ধরে টেনে নরম করে বললেন, তুমি বৈঠো, বাবু ছোড় দিয়া, তুমারা সাথমে বাচ্চা হ্যায়।

পিকলু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বাবা, আপনি এখানে আসুন!

প্রতাপ উদাসীনভাবে বললেন, না, তুই বোস।

মমতা পিকলুকে চোখের ইঙ্গিতে বসতে বলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রতাপের মনের অবস্থাটা তিনি অনেকটা বুঝতে পারছেন। পাঁচ-সাত বছর আগেও প্রতাপ ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া ট্রেনে চাপতেন না। গত পুজোর আগের পুজোয় খুলনা যাওয়া হয়েছিল সেকেণ্ড ক্লাসে। এবারেই প্রথম সপরিবারে তাঁর থার্ড ক্লাসে ওঠার অভিজ্ঞতা। এবারে দেওঘর যাওয়ার প্রস্তাব উঠতেই মমতা বলেছিলেন, থার্ড ক্লাসে যেতে তাঁর একটুও কষ্ট হবে না। ছেলে মেয়েদের কষ্ট? ওদেরও তো সব রকম অবস্থা সইয়ে নিতে হবে। এখন থেকেই শিখুক, তা হলে ভবিষ্যতে সব কিছু সহ্য করতে পারবে। ভবিষ্যৎটা যেন ক্রমশ পাতালের দিকেই নেমে যাচ্ছে।

প্রতাপের আত্মাভিমান প্রবল। তিনি বিলাসী নন, কষ্টসহিষ্ণু। প্রবল রোদের মধ্যেও তিনি মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারেন। নুন দেওয়া ফেন ভাত আর আলু সেদ্ধ খেলেও তাঁর তৃপ্তি হয়। কিন্তু নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে তিনি তেমন আরাম-সম্ভোগ দিতে পারছেন না, যেমন তিনি নিজের বাবা-মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, এই চিন্তা তাঁকে পীড়া দেয়। মমতাও সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছেন, তাঁর কৃচ্ছ্রতার পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই, তবু তিনি বেশ মানিয়ে নিতে পারছেন। প্রতাপ অসহিষ্ণু।

জসিডি পৌঁছোতে রাত ভোর হয়ে যাবে। প্রতাপ দাঁড়িয়ে থাকলে মমতার চোখেও ঘুম আসবে না।

বাবাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে বাবলুও অবাক হয়ে গেছে। তার এখন যা বয়েস তাতে আরও দাও, আরও চাই, এই ভাবটাই বেশি থাকে, কারু জন্য কিছু ছেড়ে দেবার কথা মানে আসে না। সে ফিস ফিস করে কানুকে জিজ্ঞেস করলো, ছোটকা, বাবা কি ওপরে আসবে?

কানুও তার সেজদাকে খানিকটা চেনে। সে জানে যে এখন কিছু বলতে গেলেই ধমক খাবে। ঐ বিহারী মেয়েলোকটির কোলে যে বাচ্চাটা, তার একটা পা ঝুলছিল, সেই পা বোধ হয় ওপর তো রাগ করতে পারে না। কানুর শুধু একটাই মুশকিল হলো, সেজদা দাঁড়িয়ে থেকে ওপরটা দেখতে পাচ্ছে। এই অবস্থায় সে সিগারেট টানতে পারবে না।

কানু প্রতাপের বৈমাত্রেয় ভাই। অনেকদিন পর্যন্ত সে তার মামাদের কাছেই ছিল। বড় মামার মৃত্যু হবার পর তাকে প্রতাপের কাছেই আশ্রয় নিতে হয়েছে। আই এ পরীক্ষায় একবার ফেল করার পর তার আর পড়াশুনো হয়নি, তারপর থেকে সে একটানা চাকরি খুঁজে যাচ্ছিল। পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলেও কানুর এক ধরনের বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ। সে জানে, বেশিদিন বেকার থাকলে তার পথের কুকুরের মতন অবস্থা হবে। স্বাধীনতার পর শুধু ছাঁটাই আর ছাঁটাইয়ের রবই শোনা গেছে, নতুন চাকরি একটাও তৈরি হয় নি। তার পাড়ার বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে, শ্মশান ঘাটে গিয়ে বসে থাক, দ্যাখ রিটায়ার করার আগে কে কে মলো। সেই সেই অফিসে ছুটে যাবি। কানু নিজস্ব উপায় বার করে মাঝে মাঝেই পঁচিশ-তিরিশ টাকা উপার্জন করে আনতে লাগলো। লম্বা, পাতলা চেহারা তার, চোখ দুটি ঝকঝকে। প্রতাপের মতন তার মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ নেই, তাতে তার সুবিধেই হয়েছে, সে অনায়াসে ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকতে পারে।

উপার্জনের টাকাটা সে প্রতাপ কিংবা মমতার হাতে দিতে সাহস পায় না। সংসারের সুরাহার জন্য সে মাঝে মাঝে কয়লা, আটা কিংবা মাছ কিনে আনে। প্রতাপ অনেকদিন পর্যন্ত তার এই ছোট ভাইটির উপার্জনের ব্যাপারটা টের পাননি, একদিন জানতে পেরে চেপে ধরলেন। চাকরি করে না, টিউশানি করে না, তবু কানু টাকা পায় কোথা থেকে? চুরি বা জোচ্চুরি ছাড়া তো কলকাতা শহরে এমনি এমনি টাকা পাওয়া যায় না।

কানুর উপার্জনের পথটি পুরোপুরি অবৈধ নয়। বরং বলা যেতে পারে এক ধরনের ব্যবসায়ের উদ্যোগ। সে কন্ট্রোলের শাড়ী কিনে এনে বাজারের সামনের ফুটপাথের দোকানে বেচে দেয়। কানুর সময়ের অভাব নেই। কন্ট্রোলের শাড়ীর দোকানের সামনে লম্বা লম্বা লাইন পড়ে, কানু সারা দিন সেই লাইনে দাঁড়ায়। প্রতি শাড়ীতে দু'টাকা তিন টাকা মুনাফা।

শাড়ী যখন সহজে পাওয়া যেতে লাগলো, তখন কানু চলে এলো কয়লায়। কয়লারও রেশন। এখন দেশে প্রায়ই কোনো না কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। সরকার তখন সেগুলো কন্ট্রোল দরে দেবার চেষ্টা করে। সেটা একটা নিয়ম রক্ষা মাত্র, অতি অল্প লোকেই তা পায়। যারা পায়, তাদের মধ্যেও আবার কানুর মতন মানুষই বেশি।

প্রতাপ এই বৃত্তান্তটি শুনে তার বাইশ বছর বয়েসী ভাইয়ের গালে ঠাস ঠাস করে দুটি থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন, হারামজাদা, তোর লজ্জা করে না? তুই কোন বংশের ছেলে তা তোর খেয়াল নেই? ফের যদি এরকম নোংরা কথা শুনি তা হলে আমার বাড়িতে তোর স্থান হবে না। বস্তিতে গিয়ে থাকবি!

সেই ঘটনাটা মনে পড়ে যাওয়ায় কানু নিজের গালে একবার হাত বোলালো। দাদার ওপর তার রাগ নেই, বরং একটা করুণার ভাব আছে। সেজদা সব সময় সততার গর্ব করে, অশেষ দুঃখ আছে সেজদার কপালে। এই যুগটাই যে অন্যরকম।

গত বছরের গোড়ার দিকে প্রতাপ অবশ্য বহু চেষ্টা করে কানুর জন্য একটা চাকরি জোগাড় করে দিয়েছেন। সাধারণ চাকরি, তবু যা হোক, সরকারি, বাঁধা মাইনে। চাকরিটা কানুর খুব পছন্দ। কারণ এরই মধ্যে সে ঐ সাধারণ চাকরির দেয়াল ফুটো করে উপরে রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছে।

চলতে শুরু করেছে ট্রেন। বাতাস চলাচল করতেই আর আগের মতন অত ভিড় বোধ হয় না। চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে কিছুটা জায়গা বেরিয়ে আসে। দাঁড়ানো মানুষগুলো কেউ কেউ এদিক সেদিকে একটুখানি করে নিতম্ব ছোঁয়ানোর ব্যবস্থা করে নেয়।

প্রতাপ দাঁড়িয়েই রইলেন। তাঁর মুখখানি বিমর্ষ, তিনি কারু দিকে চেয়ে নেই, শূন্য দৃষ্টি। তার হাতে একটি সিগারেট, কিন্তু আগুন জ্বালানো হয় নি, সেটাই মাঝে মাঝে ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছেন।

বাবলু এখনও বুঝতে পারছে না, বাঙ্কের ওপরে বসা আর নীচে বসার মধ্যে কোনটা বেশী ভালো। সে ভেবেছিল, ওপরে বসার মধ্যে একটা বড় বড় ভাব আছে। তা ছাড়া বাবা যখন তখন বকুনি দেন বলে সে বাবার কাছাকাছি থাকতে চায় নি। কিন্তু দাদাটা মায়ের পাশে বসেছে জানলা দিয়ে বাইরের কত কিছু দেখছে। ওপর থেকে শুধু মানুষ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ট্রেন ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝিমোতে শুরু করেছে অনেকে।

কানু ফিসফিস করে বললো, দেখছিস বাবলু, তোর বাবার খুব মন খারাপ। আমরা এত কষ্ট করে ট্রেনে জায়গা করলুম, তবু জায়গা ছেড়ে দিলেন। কেন বল তো?

বাবলু মন খারাপ-টারাপ তেমন বোঝে না। সে শেষ প্রশ্নটির জের টেনে পাল্টা প্রশ্ন করলো, কেন? কিসের জন্য মন খারাপ!

কানু মুচকি হেসে বললো, আমরা উল্টো দিকে যাচ্ছি যে!

বাবলু তবু বুঝতে পারলো না। তবে কি তারা দেওঘরে ঠাম্মার কাছে যাচ্ছে না, রেলগাড়িটা ভুল দিকে ছুটে যাচ্ছে?

কানু আবার বললো, এই দিকে তো আমাদের দেশ নয়। আমাদের দেশ ছিল অন্যদিকে।

দরজার কাছে দু'চারজন ছাড়া কামরার মধ্যে প্রতাপ ছাড়া প্রায় আর কেউই দাঁড়িয়ে নেই। এখন কিছুটা চাপাচাপি করে প্রতাপ কোনোক্রমে বসতে পারেন, কিন্তু মমতার দু'তিনবার অনুরোধেও প্রতাপ রাজি হননি। অচেনা মানুষদের সঙ্গে গায়ে গা সেঁটে ঘাম বিনিময় করতে তাঁর ঘৃণা হয়। প্রতাপ অবশ্য একদিকের দেয়ালে হেলান দেবার সুযোগ পেয়েছেন, হাত দু'খানি বিবেকানন্দের ভঙ্গিতে বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা। তাঁর মতন একজন বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় মানুষকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে অন্যদের অসস্তি হচ্ছে, সাধারণত এই ধরনের মানুষরাই অনেকখানি জায়গা অধিকার করে বসে। অন্যদের বিস্মিত দৃষ্টি এড়াবার জন্য প্রতাপ চোখ বুজে রইলেন। কিন্তু তাঁর মুখের অভিমানের রেখা গোপন করতে পারলেন না।

॥ ২ ॥

বৈদ্যনাথধাম স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বনাথ গুহ। গুণ গুণ করে আশাবরী রাগে সুর ভাঁজছেন। ভালো করে এখনো ভোর হয়নি, এখানে-সেখানে ঝুলছে অন্ধকার। এরই মধ্যে প্ল্যাটফর্মে অনেক মানুষ জন, অধিকাংশই পাণ্ডা ও মুটে, আরও কেউ কেউ ভোরের দিকে স্টেশনে বেড়াতে আসে, নতুন মুখ দেখবার জন্য।

সদ্য শীত পড়তে শুরু করেছে, বিশ্বনাথের গায়ে একটা নস্যি রঙের চাদর, ধুতিটা মোটা খদ্দরের, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি! মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় বাবড়ি চুল, হাতে মোটা চুরুট। রাত্রে শোবার সময় তিনি যে চুরুটটা নিভিয়ে রাখেন, ঘুম থেকে উঠেই তাঁর প্রথম কাজ সেই চুরুটটাকে ধরানো। অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় কেউ তাঁকে চুরুট ছাড়া দেখেনি।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি আপন মনে গুণগুনিয়ে যেতে পারেন, অন্য কোনোদিকে তাঁর খেয়াল থাকে না; তিনি তখন টোড়ি-তে চলে গেছেন।

—রাম রাম গুহাজী! এত বিহানে চলে এসেছেন! কেউ আসবে নাকি?

গান থামিয়ে বিশ্বনাথ রেল-বাবুটির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেই। তারপর যেন সহসা চিনতে পেরে বললেন, রাম রাম মিশ্রজী! আপনার কথা মনেই ছিল না। তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে আপনার ঘরে চা খেতে যেতাম।

মিশ্রজী বললেন, চলেন তো, এখন চলেন, চায়ের ব্যবস্থা হোয়ে যাবে। কিংবা, এখানেই খান না?

অদূরে এক চা-গারাম্ ছোকরাকে দেখতে পেয়ে মিশ্রজী হাঁকলেন, আরে এ লেড়কে, ইধার চায়ে লা!

চা-ওয়ালাটি এর আগে বিশ্বনাথের আশপাশ দিয়ে দু'তিনবার হেঁকে গেছে, বিশ্বনাথের হুঁসই হয়নি, অথচ তাঁর চায়ের তেষ্ট পেয়েছে বেশ।

ভাঁড়ের চায়ের চুমুক দিয়ে বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করলেন, গাড়ি লেট আছে নাকি?

—না, জসিডি পঁহুছে গেছে। এই তো এই মাহিনা থেকে চেঞ্জারদের ভিড় শুরু হলো, সব জিনিসপত্তর মাংগা হোবে। দুধ তো মিলবেই না।

—মন্দিরের কাছে আপনার শালার প্যাঁড়ার দোকান আছে না? চেঞ্জাররা এলে তারও তো বিক্রি বাড়বে? সব দোকান এই সময়টার জন্যই হাঁ করে থাকে।

—আমার শালার নাফা হবে, তাতে আমার কী? সে শালা কী আমাকে ভাগ দিবে? আপনার কেউ আসছে নাকি?

—হ্যাঁ। আসছে, শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

—তবে তো গুহাজী আপনার বেশ গাঁট গচ্চা যাবে! ভালো চাউল এখন পন্দরো টাকা মন, আউর বাড়বে!

বিশ্বনাথ চুরুটে টান দিতে লাগলেন। সকালবেলাতেই টাকা পয়সার কথা তাঁর একেবারে পছন্দ হয় না। টাকা যখন থাকে না; তখনই তো টাকার চিন্তা করা দরকার। অথচ, আশ্চর্য দুনিয়ায় যাদের টাকা আছে, তারাই টাকা পয়সা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়।

দূরে ট্রেনের শব্দ পাওয়া যেতেই মিশ্রজী বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে আরও কয়েকটি চেনা মুখ চোখে পড়লো বিশ্বনাথের। তিনি আবার স-র-গ-ম ধরলেন। ট্রেনের হুইশ্‌লে ঠিক যেন কড়ি মধ্যম লাগে।

কয়লার ধোঁয়ায় প্ল্যাটফর্মটি ভরিয়ে দিয়ে ইঞ্জিনটি এসে থামলো ঠিক বিশ্বনাথের সামনেই। পাণ্ডা আর মুটেরা হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। বিশ্বনাথ ব্যস্ত হলেন না, একটু দূরে সরে গেলেন, পাণ্ডদের গায়ে বড় গন্ধ হয়!

প্রথমে নামলো কানু, সে এদিক ওদিক তাকিয়ে বিশ্বনাথকে একবার দেখেও চিনতে পারলো না। কয়েকজন পাণ্ডা তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, পিতার নাম কী? পিতামহর নাম কী? আদি নিবাস কোথায়?

পিকলুই প্রথম চেঁচিয়ে উঠলো, পিসেমশাই! তারপর সে দৌড়ে এসে বিশ্বনাথকে প্রণাম করলো।

বিশ্বনাথ তার থুতনি ছুঁয়ে আদর করে বললেন, কত বড় হয়ে গেছিস রে! গোঁফ উঠে গেছে দেখছি! হ্যাঁরে রাস্তায় কোনো কষ্ট হয়নি তো?

কানু মালপত্রের তদারকি করতে লাগলো, প্রতাপ এগিয়ে এসে বললেন, ওস্তাদজী! আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি আপনাকে। দাড়ি রাখলেন কবে থেকে?

শালা এবং জামাইবাবু কেউ কারুর নাম ধরে ডাকেন না। প্রতাপ যেমন ওস্তাদজী বলেন, বিশ্বনাথও তেমনি প্রতাপকে বলেন ব্রাদার। দু'জনের বয়েসের তফাৎ প্রায় দশ বছর। বিশ্বনাথের চুল কালো হলেও দাড়িতে বেশ পাক ধরেছে।

পুজোর পরে দেখা, তাই আগে কোলাকুলি সেরে নেওয়া হলো। বিশ্বনাথ বললেন, পিকলু কিন্তু এক নজর দেখেই আমাকে চিনেছে। মেরিটোরিয়াস ছেলে। হ্যাঁ, গতকাল থেকে দাড়ি রাখছি, জীবনে আর কোনোদিন দাড়ি কামাবো না ঠিক করেছি। একটা অকারণ পরিশ্রম বাদ গেল, বুঝলে না!

মমতাকে দেখে বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত রোগা হয়েছো কেন, মুমি? এখানে কিছুদিন থাকো, তোমার শরীর একেবারে নবদুর্গার মতন করে ছাড়বো। আর সব কই? বড়দিরা এলেন না?

প্রতাপ নিচু গলায় বললেন, না, ওঁদের আসা হলো না। বড় জামাইবাবুর অসুখ।

—কী অসুখ? খবর পাইনি তো কিছু! প্রতাপ কথা ঘুরিয়ে নিলেন। বড় জামাইবাবুর অসুখ সাজান। আসল ব্যাপার হলো, হঠাৎ তাঁর চাকরি গেছে। পরিবারের সকলের ট্রেন ভাড়া সংগ্রহ করে তাঁর পক্ষে বেড়াতে আসা সম্ভব নয়। প্রতাপ অবশ্য ওঁদের টিকিট কাটতে চেয়েছিলেন, বড় জামাইবাবু রাজি হননি।

কয়েকটি নাছোড়বান্দা পাণ্ডা তখনও ওদের ঘিরে চিলুবিলু করছে বিশ্বনাথ দু'হাততুলে তাদের বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দেখিয়ে জী, ম্যায় তো খুদ-ই এক পাণ্ডা হ্যায়। ইয়ে সব লোক হামার যজমান।

কানু মুটেদের মাথায় মালপত্র চাপাচ্ছে, মমতা হঠাৎ আর্ত স্বরে বললেন, বাবলু কোথায়?

প্ল্যাটফর্ম অনেকখানিক ফাঁকা হয়ে এসেছে, চতুর্দিকে চেয়ে বাবলুর চিহ্নমাত্র চোখে পড়লো না। তাকে কেউ ট্রেন থেকে নামতেও দেখেনি। কানু আর পিকলু বাবলুর নাম ধরে ডেকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

ছোট্ট মেয়ে মুন্নি এখনও সুযোগ পেলেই মুখে আঙুল পুরে দেয়। মমতা দেখতে পেলেই বার করে দেন, বকুনি দিয়ে বলেন, তুই কি খেতে পাস না যে সবসময় নিজের আঙুল খাস! চার বছরের মুন্নি বেশ চটাস চটাস কথা বলে। পিকলুকে সে দাদা বললেও বাবলুকে সে নাম ধরে ডাকবেই। সে মুখ থেকে লালসিক্ত আঙুল বার করে গেটের দিকে দেখিয়ে বললো, বাবলুটা ভীষণ পাজি! ঐদিক দিয়ে একা একা চলে গেল!

কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি, দেওঘরে টাঙ্গা। স্টেশনের বাইরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। টিকিট চেকারের পাশ দিয়ে গলে বেরিয়ে এসে বাবলু একটা টাঙ্গার একেবারে ওপরে উঠে বসে আছে গাড়োয়ানের পাশে। নীল রঙের হাফ প্যান্ট আর নীল হাফ শার্ট গায়। তার বেশ শীত করছে। ট্রেন ঘুমিয়ে পড়ার পর মা তার গায়ে একটা চাদর চাপা দিয়েছিল, সেটা সে ট্রেনেই রেখে এসেছে। কলকাতায় শীত নেই, অথচ এখানে ঠান্ডা। বাবলুর ভারি আশ্চর্য লাগে। ইস্কুলের ভূগোল বইয়ের জ্ঞান তার মনে পড়ে না। কাল ছিল গরম দেশে, আজ চলে এলো শীতের দেশে।

গাড়োয়ানকে সে তাড়া দিয়ে বললো, চলো, যাবে না? আমাদের বাড়ি চলো? আমি আগে আগে

যাবো। ঠাকুমা পয়সা দিয়ে দেবে!

সদলবলে বাইরে এসে প্রতাপ বাবলুকে ঐ অবস্থায় আবিষ্কার করে ক্রুদ্ধ হলেন। আঙুল তুলে তিনি পিকলুকে আদেশ করলেন, যা তো, পাজীটার কান ধরে টেনে নিয়ে আয় এখানে।

পিকলু একপলক মায়ের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেল।

মমতার বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। বাবলু যা ছেলে, মাঝরাত্তিরে কোনো স্টেশনে নেমে যাওয়া তার পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়। ভোর রাতে অনেকক্ষণ জসিডিতে ট্রেন থেমেছিল তখন ঘুমে চোখ টেনে এসেছিল মমতার। তারপর থেকে তিনি আর বাবলুকে দেখেন নি। এখন বাবলুকে দেখতে পেয়ে তিনি একটা স্নিগ্ধ শিহরণ বোধ করলেন। দেওঘরের বাতাস তাঁকে শান্তি দিল।

অন্য লোকজনের সামনে মমতা তাঁর স্বামীর কথার প্রতিবাদ করেন না। আবার প্রতাপের সব মতামত তিনি মেনেও নেন না। প্রতাপের চোখে চোখ রেখে তিনি নিঃশব্দে জানিয়ে দিলেন, এখন বাবলুকে কোনো শাস্তি দেবার দরকার নেই।

পিকলু অতি শান্ত ও নম্র ছেলে। সদ্য সে স্কুল ফাইনালে চতুর্থ স্থান অধিকার করে জলপানি পেয়েছে। সে তার ছোট ভাইয়ের ঠিক বিপরীত। বাবলু যেমন পড়াশুনোয় অমনোযোগী, সেইরকমই কথার অবাধ্য। সব সময় তার মাথার দুষ্টুবুদ্ধি ঘোরে। এই জন্য শাস্তিও পায় যথেষ্ট, তবু তার গ্রাহ্য নেই। পিকলু ছোটভাইকে আড়াল করার চেষ্টা করে যথাসাধ্য।

পিকলু বুঝতে পারলো, নতুন জায়গায় বেড়াতে এসেই বাবলু মার খাবে বাবার হাতে। প্রতাপ জেদ করে সারা রাত প্রায় দাঁড়িয়ে এসেছেন, তা ছাড়া অন্য কারণেও তাঁর মেজাজ ভালো নেই। তিনি প্রত্যেক বছর পুজোর সময় দেশের বাড়িতে যেতে ভালোবাসতেন। গত দু'বছর যাওয়া হয়নি।

পিকলু কাছে এসে কিছু বলবার আগেই বাবলু বললো, দাদা, পাহাড় কোথায় রে? পাহাড় তো দেখতে পাচ্ছি না?

—বাবলু, নেমে আয়।

—না, আমি এইখানে বসবো!

পিকলু ওপরে উঠে এসে ফিসফিস করে বললো, বাবার কাছে মার খাবি তুই। শিগগির গিয়ে পিসেমশাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়া। পিসেমশাই বাঁচিয়ে দেবেন।

বাবলু তবু গোঁজ হয়ে বসে রইলো।

সেই টাঙ্গার গাড়োয়ান সুযোগ বুঝে তড়াক করে নেমে গিয়ে মালপত্র ধরে টানাটানি করতে লাগলো। অর্থাৎ তার টাঙ্গা তো ঠিক হয়ে গেছেই, দরদামের আর প্রশ্ন নেই।

বাবলু জেদ ছাড়েনি, ওপর থেকে নামলোই না কিছুতেই। বিশ্বনাথ বললেন, বাঃ, বেশ মানিয়েছে, বাবলু, তোকে ঠিক গাড়োয়ানের অ্যাসিস্টেন্টের মতন দেখাচ্ছে।

প্রতাপ এমনভাবে তাকালেন, যার অর্থ, আচ্ছা, পরে তোমার হবে।

বিশ্বনাথ আবার বললেন, আমি টাঙ্গা চালাতে পারি। জানো, ব্রাদার, আগ্রায় থাকতে আমি বেশ কিছুদিন টাঙ্গা চালিয়ে রুজি রোজগার করেছি। কী, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না সত্যিই।

বিশ্বনাথ সম্পর্কে কিছুই অবিশ্বাস নয়। জীবনের অনেকগুলি বছর তিনি বাউণ্ডুলেপনা করে কাটিয়েছেন। গ্রাম থেকে কলকাতার কলেজে পড়তে এসে তাঁর গানের নেশা চাপে। পাথুরেঘাটার ঘোষ বাড়িতে টিউশানি করতেন, সেই সূত্রে অনেক বড় বড় ওস্তাদ-কলাকারদের সামনাসামনি দেখার সুযোগ পান। ক্রমে তাঁর ঝোঁক চাপলো তিনি মার্গ সঙ্গীতের সম্রাট, ফৈয়াজ খাঁর কাছে নাড়া বাঁধাবেন। বি এ পরীক্ষা না দিয়ে, অভিভাবকদের কিছু না জানিয়ে চলে গেলেন আগ্রায়। ফৈয়াজ খাঁ প্রথমে তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহন করতে রাজি হননি। বলেছিলেন, বেটা দু'ঠোঁটের মাঝখানে একটা সুচ বসিয়ে তিন বচ্ছর শুধু সা সেধে যা, তারপর কাছে আসবি!

তাতেও দমে যাননি বিশ্বনাথ, বাড়ি ফিরে আসেননি, বাড়ি থেকে টাকা পয়সাও চাননি। ঐ সব অঞ্চলেই ঘুরঘুর করেছেন। পরে প্রতাপ যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঐ সময় আপনার চলতো কী করে, ওস্তাদজী? উত্তরে বিশ্বনাথ হাসতে হাসতে শঙ্করাচার্যের মোহমুদগর থেকে আবৃত্তি করতেন একটি স্তোত্র:

সুরমন্দির তরুমূল-নিবাসঃ
শয্যা ভূতলমজি নং বাসঃ।
সর্ব পরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ

কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥

আগ্রা, পুণা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একসময় মায়ের অসুখের খবর শুনে বিশ্বনাথ দেশের বাড়িতে ফেরেন। যাকে তিনি ভালোবাসতেন অনেকটা অন্ধের মতন, শিশুর মতন, সাধকের মতন। প্রায় মৃত্যু শয্যাশায়ী মায়ের অনুরোধে তিনি বিয়ে করলেন, সংসারী হবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর অবশ্য সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায় আর রইলো না, আবার শুরু হলো ছন্নছাড়া জীবন।

প্রতাপের দুই দিদি, তার মধ্যে শান্তি আর তিনি প্রায় পিঠোপিঠি। এই শান্তির সঙ্গে যখন বিশ্বনাথের বিয়ে হয়, তখন প্রতাপ তাঁর এই জামাইবাবুটিকে বেশ পছন্দ করেছিলেন। রূপবান, হাসিখুশী, দিলদরিয়া মানুষ, স্বভাবে কোনো মালিন্য নেই। বিয়ের পর মাত্র কিছুদিন বিশ্বনাথ ব্যবসায়ে নেমে উপার্জন করতে চেয়েছিলেন, রঙের কারবার, ছ'সাত মাসের মধ্যেই সে কারবার লাটে ওঠে। আবার বিবাগী।

বিশ্বনাথ গান শিখতে গিয়েছিলেন শেখার আনন্দেই, গানকে পেশা করতে পারেননি। এরকম মানুষ থাকে, যারা নিজেদের চারপাশটা গুছিয়ে নিতে জানে ন। কোনো কিছু জমিয়ে রাখার চেয়ে বিলিয়ে দিতেই যাদের বেশি আনন্দ। বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দটাই তো সবচেয়ে বড়। যে যাতে আনন্দ পায়।

বিশ্বনাথের গান শুনে তারিফ করে কেউ কেউ যখন জিজ্ঞেস করতো, আপনি কোনো জলসায় গান করেন না? রেকর্ড করান না কেন? উত্তরে বিশ্বনাথ বরাবর বলে এসেছেন, আমার গুরুর নিষেধ আছে। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ কিছুদিন তালিম দেবার পর নাকি এই বাঙালী শিষ্যটিকে বলেছিলেন, বেটা, তোকে আমি যা জিনিস দিচ্ছি, তুই গলায় তুলে যা, কিন্তু আমি হুকুমনামা দিলে তুই কোনোদিন পাবলিক ফাংশানে গান করবি না! ব্যস, এরপর খাঁ সাহেব বিশ্বনাথকে হুকুমনামা দিতে ভুলে গেছেন, বিশ্বনাথও কোনোদিন নিজে থেকে মুখ ফুটে অনুমতি চাননি। তারপর তো ফৈয়াজ খাঁ মারই গেলেন, বিশ্বনাথেরও পাদপ্রদীপের সামনে যাওয়া হলো না।

কে জানে একথাটা সত্যি কি না! তবে বিশ্বনাথ খুব সন্তোষের সঙ্গেই এই কাহিনীটা বলতে ভালোবাসেন।

বেশ দিন কাটছিল, মাঝে মাঝে বিশ্বনাথ দেশে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আবার উধাও হয়ে যেতেন। তাঁর বিপদ ঘটলো ভারত স্বাধীন হবার পর। স্বাধীনতা মানেই দেশ ভাগ। কানপুরে বসে বিশ্বনাথ শুনলেন বরিশাল জেলায় তাঁর পৈতৃক বাড়িটি এখন অন্য দেশ হয়ে গেছে। তাঁকে ঠিক করতে হবে, তিনি এখন কোন্ দেশের নাগরিক হবেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো না, কেউ তাঁর মতামত নিল না, অথচ তাঁর বাড়িটা অন্যদেশে চলে গেল? বিশ্বনাথ মাথা ঘামালেন না, ফিরলেন না, কালক্রমে বে-দখল হয়ে গেল সেই বাড়ি।

অল্প কিছুদিন মাত্র শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন শান্তি, তারপর থেকে নিজের মায়ের কাছেই। বিক্রমপুরের মালখানগরে প্রতাপদের পরিবার বেশ সচ্ছল ছিল। মেয়ের বিয়ের পর সেই মেয়ের বাপের বাড়িতেই থেকে যাওয়াটা পূর্ববঙ্গে তেমন কিছু অস্বাভাবিক ছিল না।

প্রতাপের বাবা ভবদেরব মজুমদার ঘোরতর বিষয়ী এবং আশাবাদী মানুষ ছিলেন। দেশ বিভাগ তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি।

হিন্দুস্থান-পাকিস্তান তাঁর কাছে অবাস্তব মনে হতো। এতকালের সব চেনা মানুষ কখনো হঠাৎ শত্রু হয়ে যেতে পারে? পিতৃপুরুষের ভূমি কেউ ছেড়ে চলে যায়? তিনি শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ নাকি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, দশ বছরের মধ্যেই দুই খণ্ড আবার মিলিত হয়ে যাবে। ১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৫৭-তে সিপাহী যুদ্ধ, ১৯৫৭-তে ভারত-পাকিস্তান এক হয়ে শুরু হবে নতুন ইতিহাস। ভবদেব সরকারও এই তত্ত্বে প্রবলভাবে বিশ্বাসী।

মালখানগর ছেড়ে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীরা সবাই চলে আসছেন পশ্চিমবাংলায়। প্রতাপ কলকাতা থেকে বারবার চিঠি লিখছেন বাবা-মাকে চলে আসবার জন্য, কিন্তু ভবদেব সরকার অটল। তিনি বরং একটি অদ্ভুদ কাজ করতে লাগলেন। যে-সব হিন্দুরা বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে আসছে, তিনি তাদের সম্পত্তি কিনে রাখতে লাগলেন জলের দামে। সবাইকে আশ্বাস দিলেন, ১৯৫৭-র তারা যদি ফিরে আসে, তিনি ঐ দামেই তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবেন।

ভবদেব মজুমদারের হিসেবে একটি ভুল ছিল। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি নিজে বাঁচবেন কি না সে কথা চিন্তা করেননি। ওদেশে তিনি কোনো শত্রুতার সম্মুখীন হননি বটে কিন্তু অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগ তাকে হরণ করে নিয়ে গেল। দরদালান, আমবাগান, কয়েকটি দীঘি, ধানজমি এইসবের ওপর দিয়ে উড়ে গেল অতৃপ্ত ভবদের সরকারের শেষ নিশ্বাস। মৃত্যুকালে শান্তি ছাড়া অন্য সন্তানদের মুখ-দর্শনও হলো না।

পিতৃশ্রাদ্ধ করতে প্রতাপ শেষবার গিয়েছিলেন মালখানগরে। প্রতাপ শক্ত চরিত্রের মানুষ, সবাই তাকে তেজস্বী পরুষ হিসেবে মানে, কিন্তু সেবার তিনি খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল, মাটি থেকে উপড়ে তোলা হলো এক বর্ধিষ্ণু বৃক্ষের শিকড়। পূর্ববাংলার এই নদীময় প্রান্তর, এই মিষ্টি বাতাস, খেজুর রসের স্বাদের মতন ভোর, ঠাকুমার গল্পের আমেজমাখা সন্ধ্যা, এসব আর দেখা হবে না। এরপর থেকে কলকাতায় ভাড়াটে বাড়ির অন্ধকার ঘুপচি ঘরে চির নির্বাসন।

দেশ বিবাগের পরেও প্রত্যেক বছর পুজোর সময় একমাস সপরিবারে প্রতাপ কাটিয়ে যেতেন মালখানগরে। সেই একমাসেই যেন তিনি সারা বছরের এনার্জি সঞ্চয় করে নিতেন। নিজেদের পুকুরের মাছের স্বাদই আলাদা। বাড়ির গরু, বাড়ির কলাগাছ, এমনকি চিঁড়ে-মুড়কিও নিজেদের খেতের। তা ছাড়া যে-মাটিতে পিতৃপুরুষেরা পদস্পর্শ রেখে গেছেন, সেই মাটি। পুজোর সময় প্রতাপ কাশ্মীর-গোয়ায় ভ্রমণের আহ্বান পেলেও প্রত্যাখান করতেন।

ভবদেব প্রত্যেকবারই প্রতাপকে বলতেন, তোকে না হয় কলকাতায় চাকরি করতেই হবে, তুই আর বৌমা কলকাতায় থাক, ছেলে মেয়েদের এখানে রেখে যা! ওরা খাঁটি দুধ-ঘি খেয়ে শরীরটা মজবুত করুক। কলকাতায় কি ওসব পাওয়া যায়? কলকাতায় না আছে খেলার মাঠ, না আছে বাগান না আছে পুকুর!

প্রতাপ বলতেন, তা কি হয়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া আছে না?

ভবদেব বলতেন, কেন, এখানে লেখাপড়া হয় না? ভালো ইস্কুল আছে। তোরা তো এই ইস্কুলেই লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছিস। এই ইস্কুলের কত ছেলে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে!

তবু দিনকাল যে বদলে গেছে তা বাবাকে বোঝানো যায় না। দাঙ্গা-হাঙ্গামা না থাকলেও সবসময় একটা টেনশান রয়েছে, এইরকম অবস্থায় পূর্ব-পশ্চিমবাংলায় বিভক্ত পরিবার মানসিক শান্তিতে থাকতে পারে না।

বড় নাতি পিকলু ছিল ভবদেবের সবচেয়ে প্রিয়। একবার তো তিনি পিকলুকে প্রায় জোর করেই ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। সেবার পিকলু শরীরটা সারিয়ে নিক। একটা বছর না হয় ওর পড়াশুনো বন্ধ থাক। প্রতাপ রাজি হতে পারেন নি। পিকলু প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়, সে একটা বছর নষ্ট করবে কেন? সহপাঠীদের তুলনায় পিছিয়ে গিয়ে পিকলু তো পরে বাবা-মায়ের ওপরেই দোষ দেবে।

বাবলুকে নিয়ে প্রত্যেকবারই বেশ সমস্যা হতো। তার তো পড়াশুনোয় মন নেই। কলকাতার তুলনায় দেশের বাড়িই তার বেশি পছন্দ। প্রায় সারাদিনই তো সে পড়ে থাকতো আমবাগানে। ওখানে বকুনি দেবার কেউ নেই, ঠাকুমা আর পিসিদের অগাধ প্রশ্রয় আর আদর, ঐসব ছেড়ে সে আসতে চাইবে কেন? প্রতিবছরই ফেরার দিন বাবলুকে খুঁজে পাওয়া যেত না। শেষ বছরে তাকে টেনে হিঁচড়ে আনা হয় গোয়ালঘরের পেছনের আদাড় থেকে, যেখানে দিনের বেলাতেও কেউ ভয়ে যায় না। বাবলুর সেকি হেঁচকি তুলে কান্না!

পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে প্রতাপ বুঝতে পেরেছিলেন, এবার চিরকালের মতন মালখানগরের পাট তুলতে হবে। আর কোনো পুরুষ মানুষ নেই, মা আর শান্তিকে এখানে রেখে যাওয়া যায় না। বিষয় সম্পত্তি সবই এমনি এমনি পড়ে রইলো। ভবদেব সরকার যে-সব নতুন নতুন বাড়ি জমি কিনেছিলেন সে-সব তো ছাড়তে হলোই, তাঁদের নিজস্ব বসতবাড়ি ও পুকুর-বাগানের জন্যও খদ্দের পাওয়া গেল না। যা কিছুদিন পর এমনিই পাওয়া যাবে তা আর কে সাধ করে পয়সা দিয়ে কিনতে চাইবে! চাচাস্থানীয় কয়েকজন প্রবীণ মুসলমান প্রতিবেশী প্রতাপকে পরামর্শ দিলেন, একেবারে খালি বাড়ি ফেলে যেও না, একজন কারুকে অন্তর রেখে যাও! প্রতাপ হতাশভাবে মাথা নেড়েছিলেন। কে থাকবে? গ্রামের একটি ছেলের ওপর দেখাশুনোর ভার দিয়ে প্রতাপ চলে এলেন এবং কিছুদিন পরেই খবর পেলেন যে তাঁদের বাড়িটি সরকার অধিগ্রহণ করে কী একটা অফিস বসিয়েছে।

বিশ্বনাথ গুহও প্রতাপের সঙ্গে গিয়েছিলেন শ্বশুরের শ্রাদ্ধে। সেবারে তিনি বুঝলেন, তাঁকে চাপিয়ে

দিতে পারেন না। ভবদেব সরকার মাসে মাসে বেশ কিছু টাকা হুণ্ডি মারফৎ কলকাতায় পাঠাতেন ছেলের কাছে। এবার থেকে তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতাপ বেশ অসুবিধেয় পড়বেন, শুধু মাইনের টাকায় তিনি এতবড় সংসার মাসে মাসে বেশ কিছু টাকা হুণ্ডি মারফৎ কলকাতায় পাঠাতেন ছেলের কাছে। এবার থেকে তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতাপ বেশ অসুবিধেয় পড়বেন, শুধু মাইনের টাকায় তিনি এতবড় সংসার চালাবেন কী করে?

বিশ্বনাথের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, এই বয়েসে তিনি নতুন করে চাকরি খোঁজাখুঁজি করতে পারবেন না, অন্য কোনো যোগ্যতাও নেই, তাই তিনি স্ত্রী-কন্যাকে সঙ্গে এনে দেওঘরে একটা গানের ইস্কুল খুলেছেন।

কাশী-আগ্রা-লক্ষ্ণৌ-পুনার মতন দেওঘরের সঙ্গীত-কেন্দ্র হিসেবে কোনো খ্যাতি নেই। তবু এখানে আসতে হলো একটিই কারণে। ভবদেব সরকার অনেকদিন আগে দেওঘরে একটি ছোট একতলা বাড়ি কিনে রেখেছিলেন স্ত্রীর নামে। একসময়ে পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে যাওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল। পরিপূর্ণ সুখের দিনে ভবদেব সরকারও তাঁর সমগ্র পরিবারে নিয়ে দু'তিনবার এসেছেন দেওঘরের এই বাড়িতেই। তারপর বছর দশেক আর কেউ আসেনি, এমনি এমনি তালাবন্ধ পড়ে ছিল। মাথা গোঁজার একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় তো অন্তর পাওয়া যাবে, এই হিসেবে সেই বাড়ি সাফ-সুতরো করে বিশ্বনাথ সংসার পাতলেন।

প্রতাপের মা দিনকতক রইলেন কলকাতায় ছেলের বাড়িতে। কিন্তু কলকাতয় তাঁর মন টেকে না, তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। স্বামীর মৃত্যু তিনি অনেকটা সহ্য করে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু উন্মুক্ত প্রকৃতি থেকে বিচ্যুতি তিনি মানতে পারলেন না। তিনিও দেওঘরে এসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। শান্তি আর তিনি অনেকদিন একসঙ্গে ছিলেন, শান্তির মেয়েটি তাঁরই কোলে শুয়ে বড় হয়েছে, ওদের ছেড়ে থাকতেও তাঁর কষ্ট হচ্ছিল।

বিধবা মা ছেলের কাছেই থাকবেন, মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে আশ্রয় নিলে দেশাচারে বাধে, নিন্দে হয়। কিন্তু সুহাসিনী তো মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে যাচ্ছেন না, দেওঘরের বাড়িটি তাঁর নিজের নামে, তিনি নিজের বাড়িতে থাকবেন, এতে কোনো দোষ নেই।

প্রতাপদের টাঙ্গা সেই সুহাসিনীধামের সামনে এসে থামলো।

॥ ৩ ॥

ভবদেব মজুমদারের আমলে আত্মীয়-কুটুম, দাস-দাসী, আশ্রিতজন সবাইকেই পুজোর সময় নতুন শাড়ি-ধুতি-জামা দেওয়া হতো। ভবদেব যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁর আয় ছিল ছোটখাটো জমিদারের মতন, তিনি পারতেন। প্রতি বছর তিনি প্রতাপকে ফর্দ আর টাকা পাঠাতেন, ভবদেবের নজর ছিল উঁচু তিনি সেরা জিনিস ছাড়া কারুকে কিছু দিতেন না, প্রতাপ বড়বাজার থেকে সেই সব কিনে নিয়ে যেতেন দেশের বাড়িতে।

ভবদেব নেই, সেই দেশও নেই, বাড়িও নেই, তবু প্রতাপ এখন পরিবারের প্রধান। সময় বদলেছে, পরিবেশ বদলেছে, তা হলেও পারিবারিক প্রথা হঠাৎ ভেঙে দেওয়া যায় না। শুধুমাত্র চাকরির আয় সম্বল, তা সত্ত্বেও প্রতাপকে এ বছরেও সবাইকে ঠিক ঠাক সব দিতে হয়েছে। প্রতাপের পিসিরা থাকেন ভবানীপুরে বড়দিবা বরানগরে। কানুর মামাদের বাড়ি সোদপুর, মমতার দাদা থাকেন তালতলায়, এই সব জায়গায় প্রতাপ নিজে যাননি, কানু আর পিকলুর হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন জিনিসপত্র। তাঁর বাবা লোককে দিয়ে সুখ পেতেন, প্রতাপ অন্তরে অন্তরে গজরেছেন। সারা বছর যাদের সঙ্গে দেখা নেই, অন্য কোনো রকম সম্পর্ক নেই, তাদেরও বছরে একবার ধুতি-শাড়ি দিতে হবে কেন?

বাবার সঙ্গে প্রতাপের অনেক বিষয়েই অমিল। বাবা ছিলেন অনেকটা গোষ্ঠি অধিপতির মতন, এই গোষ্ঠির সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে ছিল তার ঝোঁক। ভবদেব দুটি বিবাহ করেছিলেন, দুটি শ্বশুরবাড়ি, তা ছাড়াও যৌবনে তিনি ঘুরে ঘুরে দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। মজুমদার পরিবারের একটি শাখা বিচ্ছিন্ন হয়ে বরিশালে বসতি স্থাপন করেছিল, অনেকদিন তাঁদের সঙ্গে কোনো চিঠিপত্রের লেনদেনও ছিল না। এক সময় ভবদেব লোকমুখে শুনলেন যে তাঁর সেই ঠাকুরদার ভাইয়ের বংশ নাকি হঠাৎ দুরবস্থায় পড়েছে, অমনি ভবদেব বরিশালে ছুটলেন তাঁদের উদ্ধার করতে। বরিশালের সেই মজুমদাররা এর পরে অনেক দিন খুব জ্বালাতন করেছিল। অভয়পদ নামে চোয়াড়ে চেহারার এক কাকা প্রায়ই আসতো টাকা চাইতে। প্রত্যেকবারেই এক একটি চমকপ্রদ

অজুহাত। পুকুরের সব মাছ মরে যাচ্ছে, জল সেঁচে ফেলতে হবে। তার ছেলে ইস্কুল বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ভুল করে, তার ক্ষতিপূরন দিতে হবে, ইত্যাদি। আসলে লোকটি নাকি জুয়াড়ি। ভবদেব প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু দিতেন। প্রতাপ বাবার মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে সাহস পেতেন না, তবু তাঁর মনে হতো বাবা অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

এই তো কিছুদিন আগে, ঠনঠনে কালী বাড়ির সামনে সেই অভয়পদকে প্রতাপ দেখতে পেয়েছিলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে, চটি খুলে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে চোখ বুজে প্রণাম করছিল। মুখে কিন্তু একটুও ভক্তি ভাব নেই, সেই পুরোনো জুয়াড়ির ভাব। তার ময়লা পাঞ্জাবির পকেট থেকে যে ছোট বইটি উঁকি মারছে, সেটি রেসের বই। অভয়পদ চোখ খোলার আগেই প্রতাপ দ্রুত সরে গিয়েছিলেন অন্য ফুটপথে। দেখতে পেলেই বাড়ি ধাওয়া করতো নিশ্চিত। শুধু মাত্র ক্ষীণ রক্তের সম্পর্ক বা পারিবারিক যোগসূত্র আছে বলেই কারুর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে হবে, প্রতাপ এতে বিশ্বাস করেন না। প্রতাপ তাঁর আপন মামাকেই পছন্দ করেন না, পারতপক্ষে কথা বলেন না, কারণ তিনি মিথ্যেবাদী।

দেওঘরে আসার সময়েও নতুন ধুতি-শাড়ির বাণ্ডিল আনতে হয়েছে। প্রত্যেকের জন্য তো বটেই, তা ছাড়া অতিরিক্ত আধ ডজন। সুহাসিনী চিঠি লিখে আনতে বলেছিলেন। মা কোনোদিনই টাকা পয়সার ব্যাপারটা বোঝেন না। অবস্থা যে অনেক পাল্টে গেছে সে ব্যাপারেও তাঁর কোনো বোধ নেই। দেশের বাড়িতে তাঁর অনেক পুষ্যি ছিল, এখানেও ইতিমধ্যে কিছু পুষ্যি জুটেছে নাকি। প্রতাপ কোনোদিনই টাকা পয়সার ব্যাপারে হিসেবী নন, তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ।

দেওঘরে আসার প্রস্তুতির সময় থেকেই প্রতাপকে টাকা পয়সার চিন্তা করতে হচ্ছে। বড়বাজারের এক সাহাদের দোকানে তাঁর বাবার আমলের সাড়ে তিন হাজার টাকা পাওনা আছে, সে টাকা এখন তারা দিতে চাইছে না। প্রতাপের নিজস্ব সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছে। পিকলু কলেজে ভর্তি হয়েছে, এবার থেকে তার জন্য একটা বড় খরচ আছে। দেওঘরে গানের স্কুল খুলে বিশ্বনাথ গুহর উপার্জন যৎসামান্য, তাঁর কাছে প্রতাপ সপরিবারে গিয়ে উঠবেন, খরচপত্র সব প্রতাপেরই করা উচিত।

বিশ্বনাথ কিন্তু আয়োজন করে রেখেছেন তাঁর সাধ্যর চেয়ে অনেক বেশি।

বাড়িটি ছোট হলেও সংলগ্ন জমি আছে বেশ খানিকটা। এককালে বাগান ছিল, তার বিশেষ চিহ্ন এখন না থাকলেও কয়েকটি বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ ও আতা গাছ আছে। এক কোণে কেয়ার টেকার ভজন সিং-এর ঘর। এই ভজন সিংহের দুই বউ, তারা একই সঙ্গে থাকে। তার মধ্যে একটি বউ আবার নেপালী, সে বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার ও মধ্যবয়েসী। ভজন সিং কী করে যে এই নেপালী স্ত্রীটি জোগাড় করলো তা কেন জানে। দুই পক্ষের দুটি করে ছেলেমেয়ে। ভবদেবের আমলে ভজন সিং-এর মাইনে ছিল আঠোরো টাকা, এখন তা বেড়ে পঁচিশ হয়েছে। এই টাকায় সে কী করে সংসার চালায় তা এক রীতিমতন রহস্য। অথচ খেয়ে-পরে তো বেশ আছে, ছেলেপুলেদের স্বাস্থ্যও খারাপ নয়। এ বাড়ি যতদিন খালি পড়েছিল ততদিন ভজন সিং মালিকের অনুমতি ছাড়াই প্রায়ই চেঞ্জারদের ভাড়া দিত, সে খবর প্রতাপের কানে গেছে। কিন্তু মাঝখানের কয়েকটি বছর কলকাতার-ঢাকার ব্যাপার নিয়ে প্রতাপ এমন ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে এদিকে মনোযোগ দিতে পারেন নি।

বাগানের একদিকে ভজন সিং-এর কোয়ার্টার চ্যাচার বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে গোটা দশেক ডাগর চেহারার মোরগ ঘুরছে। ঐগুলি বিশ্বনাথের সম্পত্তি। প্রতাপদের দেশের বাড়িতে মুর্গী ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল, এখানেও সুহাসিনী এসে পড়ায় সেই নিয়ম স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বনাথ অনেকগুলি বছর পশ্চিমে কাটিয়েছেন, মুসলমান ওস্তাদদের সংস্পর্শে থেকেছেন, তাই তাঁর খাদ্য রুচি অন্যরকম। গরু-ভেড়া মুর্গী সবই চলে। প্রতাপ অবশ্য গো-মাংশ কোনো দিন স্পর্শ করেননি, তবে কুক্কুট মাংসে তাঁর আপত্তি নেই। বিশ্বনাথ তা জেনেই আগে থেকে অতগুলি মোরগ কিনে রেখেছেন। মোরগ আর মুরগীর মধ্যে বিশ্বনাথ নিজে আবার মুরগী পছন্দ করেন নি।

এ ছাড়া বিশ্বনাথ সঞ্চয় করে রেখেছেন পাঁচ সের অতি উৎকৃষ্ট ঘি, এক মণ দাদখানি চাল, মটর-মুসুরি-সোনামুগ ইত্যাদি নানা রকম ডাল, আধ মন করে আলু পেঁয়াজ, এক বস্তা চিড়ে অনেকগুলো পাটালি গুড়, আরও কত কী। তাঁর শ্যালক যাতে বাজার খরচা করতে না পারে সেই জন্যই বিশ্বনাথের এই বন্দোবস্ত। প্রথমদিন এসে এসব দেখেই প্রতাপ বুঝতে পারলেন তাঁর ছোড়দির দু'একখানি গয়না নিশ্চিত জলাঞ্জলি গেছে। বিশ্বনাথ যেমন পাগল, শান্তি আবার ততটাই নরম। বিয়ের পর থেকেই প্রায় মায়ের কাছে থেকেছেন বলে তাঁর সংসারবুদ্ধি হয়নি। বিশ্বনাথ আগেও তাঁর স্ত্রীর গয়না ভেঙেছেন,

প্রতাপ জানেন। ভবিষ্যৎটা যে কী করে চলবে তা এরা দু'জনেই বোঝে না। প্রতাপ মনে মনে ঠিক করে রাখলেন, ওস্তাদজীর সঙ্গে পরে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

একতলায় চারখানি কামরা, ছাদে একটি চিলে-কোঠা আছে, সেখানে সুহাসিনী ঠাকুর-ঘর করেছেন। দেশ ছেড়ে আসবার সময় নারায়ণ শিলা সঙ্গে এনেছেন সুহাসিনী, এখানে নিত্য তার পূজোর ব্যবস্থা হয়েছে। এক দুরেজী এসে দু'বেলা ফুল ছিটিয়ে যায়, তার মাস মাইনে আড়াই টাকা। বছর সাতেক আগে সুহাসিনী কাঠিয়াবাবার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, সকাল সন্ধ্যায় তাকে বেশ কিছুক্ষণ ঠাকুরের সামনে চুপ করে বসে থাকতে হয়। এরকম বসে থাকাটা সুহাসিনীর পক্ষে সত্যিই খুব কষ্টকর। যত ছোটবেলা থেকে প্রতাপ মায়ের চেহারাটা মনে করতে পারেন, তাতে মনে পড়ে সুহাসিনীর স্বভাবটি দারুণ চঞ্চল। এক জায়গায় স্থির হয়ে পাঁচ মিনিটও বসেত পারেন না। কেউ হয়তো সুহাসিনীকে কোনো কথা বুঝিয়ে বলছে, তার মাঝখানেও সুহাসিনীর অন্য কথা মনে পড়ে যায়, অমনি তিনি উঠে চলে যান। এ জন্য তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে কতবার বকুনি খেয়েছেন। এত বয়সেও তাঁর সেই স্বভাবটি যায়নি। এই রকম মানুষের পক্ষে ঠাকুরের সামনে চোখ বুজে বসে থাকা তো একটা শাস্তি। তা হলে কী দরকার ছিল মন্ত্র নেবার? একটা বয়েসে সব মহিলাই এ রকম মন্ত্র নেন, তাই সুহাসিনীও নিয়েছেন।

চুপ করে তিনি থাকতে পারেন না অবশ্য। প্রথম তো দু'পাঁচ মিনিট পরেই ভুল করে উঠে পড়তেন, এখন চোখ বুজে বসে থাকলেও মুখ চলে। মাঝে মাঝেই বলে ওঠেন, ও শান্তি ছাদে বড়ি শুকোতে দিয়েছি, দ্যাখ তো কাকে মুখ দিল নাকি? ওরে টুনি কোথায় গেল দ্যাখ, তার গলা শুনছি না কেন? ওরে বিশ্বনাথ বাজার যাচ্ছে নাকি, ওকে বর সন্ধব লবণ আনতে। এই সবই হলো সুহাসিনীর মন্ত্র।

সুহাসিনীর স্বভাবটি যেমন চপলতায় ভরা, তাঁর চোখে তাঁর ছেলে-মেয়েরাও এখনও যেন ছেলেমানুষ। প্রতাপের ডাক নাম খোকন। তিনি এখন লম্বা-চওড়া জোয়ান পুরুষ, তিন ছেলেমেয়ের বাবা তবু সুহাসিনী প্রায়ই তাঁকে বলেন, ও খুকন, তুই আমার সামনে আইস্যা বয় তো একটু তোর মাথায় হাত বুলাইয়া দেই। এত কাজ করস, কত রকম ভাবনা-চিন্তা, মাথা গরম হইয়া যায় না?

মা মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেনই, প্রতাপের অস্বস্তি লাগে, তাই দেখে পিকলু-বাবলুরা হাসে। বিশ্বনাথ রঙ্গ করে বলেন, মা, আপনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন না কেন? আমার বুঝি মাথা গরম হয় না?

সুহাসিনী সরল ভাবে উত্তর দেন, তুমি তো কাজ করো না, তুমি গান গাও!

সুহাসিনীর কথা শুনে সবাই হেসে গড়াগড়ি যায়।

এবারে কলকাতা থেকে এসে পৌঁছোবার পর সুহাসিনী প্রতাপকেই প্রথমে বলেছিলেন, আহা রে, সারা রাইত ট্রেনে কইরা আইছস। বড় কষ্ট হইছে নারে?

বিশ্বনাথ বললেন, বাঃ, বেশ তো মা। আপনার ছেলের বউ এলো, নাতি-নতিনীরা এলো। তাদের কোনো কষ্ট হলো না, শুধু আপনার ছেলেরই একা কষ্ট হয়েছে!

সুহাসিনী বললেন, অগো তো মুখ শুকনা দেখি না, ভালোই তো দেখি, কুকনেরই তো দেখি চক্ষের নিচে কালি!

মমতা বললেন, মা, আপনার ছেলে যে শখ করে সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসেছে। এক ফোঁটা ঘুমো নি!

এ কথা শুনে সুহাসিনী একেবারে আর্ত হয়ে পড়লেন। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। তাঁর সন্তান এক রাত্রি ঘুমোয় নি এরকম একটা মহা দুঃসংবাদ শোনার জন্য তাঁকে বেঁচে থাকতে হলো? তিনি বললেন, কও কি, বৌমা, তোমরা আরে ঘুমাইতে দাও নাই? এমনিতেই মাথায় কত চিন্তা, কত কাম করে,...ওরে শান্তি, খুকনের জন্য চিনির সরবৎ কইরা দে? অ্যাখনি দে!

প্রতাপ দু'হাত ছুঁড়ে বললেন, আঃ মা, তুম কী যে কারো! হঠাৎ আমি চিনির সরবৎ খেতে যাবো কেন? একটু চুপ করে বসো, অনেক কথা আছে।

সুহাসিনী তখন কোনো কথা শুনতে আগ্রহী নন, তিনি প্রতাপের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, খা, আগে একটু সরবৎ খাইয়া ল, তাতে মাথা ঠান্ডা হয়!

প্রতাপ বললেন, দিদি-জামাইবাবু আসেন নি, তুমি তাঁদের কথা একবারও জিজ্ঞেস করলে না?

শান্তি বললেন, খোকনরে দ্যাখলে মা আমাগো কথা ভুইল্যা যায়।

সুহাসিনী বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই শান্তিডা বড় হিংসা-হিংসি করে। ছুটবেলা থাইক্যাই ও খুকনের লগে...

বিশ্বনাথ বললেন, তা তো একটু হিংসে করতেই পারে। আপনি আপনার ছেলেকে এত ভালোবাসেন যে আমারও হিংসে হয়।

মায়ের বিধবা বেশ প্রতাপের চোখে এমনও অভ্যস্ত হয়নি। নীল রঙের শাড়ীর দিকে সুহাসিনীর বেশী ঝোঁক ছিল। প্রতাপের চোখে এখনও তাঁর মাতৃমূর্তি নীলবসনা। সুহাসিনী এখন পরে আছেন সাদা থান, তাঁর কপাল ও সিঁথি বড় বেশি সাদা। এই বয়েসেও সুহাসিনীর চুল পিঠ ছাড়িয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর সুহাসিনী ন্যাড়া হতে চেয়েছিল, প্রতাপ তীব্র আপত্তি করে তা আটকেছেন। প্রতাপ তাঁর ঠাকুমা ও বড় পিসিমার মাথায় কোনো দিন মেয়েলি চুল দেখেন নি। আগেকার কালে বিধবার মাথা ন্যাড়া করতেন, তারপর আর চুল বাড়তে দিতেন না। কিন্তু প্রতাপ নারীদের মাথায় কদম ছাঁট চুল সহ্য করতে পারেন না।

মমতাকে এবং স্টেশান থেকে আসবার পথে বিশ্বনাথকেও শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মায়ের কাছে দিদি জামাইবাবুর না-আসার কারণটা যথা সম্ভব সামলে সুমলে বলতে হবে। বড় জামাইবাবুর চাকরি নেই শুনলে মা উতলা হয়ে পড়বেন। তিনি নিশ্চিত চাইবেন তাঁর বড় মেয়ে আর জামাইকে দেওঘরে নিজের কাছে এনে রাখতে। সেটা সম্ভব নয়। তাতে সংকট বাড়বে ছাড়া কমবে না। ছোট জামাইবাবুর ম্যালেরিয়া এবং সামনেই তুতুলের পরীক্ষা, এই দুটিই ওদের না আসার কারণ হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। ওঁরা জানুয়ারী মাসে আসবেন।

বড় জামাইবাবুকে নিয়ে প্রতাপের একটা গোপন দুশ্চিন্তা চলছে। ওঁর যে শুধু চাকরি গেছে তাই-ই নয়, বিপদটা তার চেয়েও বড়, ওঁর মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। এখানে আসবার দিন দশেক আগে সুপ্রীতি একদিন প্রতাপকে আলাদা ডেকে এই কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলেন। বাইরে থেকে এখনও বিশেষ কিছু বোঝা না গেলেও সুপ্রীতি ঠিকই বুঝেছেন যে তাঁর স্বামী আর আগের মতন নেই। তাঁর অস্তিত্বের কেন্দ্রটা নড়ে গেছে কোনো ভাবে। প্রতাপও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, কিছুদিন ধরেই অসিতদা খুব কম কথা বলেন, প্রায় সর্বক্ষণ গুম হয়ে থাকেন, কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেও সহজে উত্তর দিতে চান না। অথচ কী হাসি খুশী, প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন অসিতদা।

সুহাসিনী বেশ স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিয়েছেন তাঁর বড় মেয়ে জামাইয়ের না-আসার কারণটা। শান্তি আর সুপ্রীতির চরিত্রের অনেক তফাত আছে, সুপ্রীতি খুবই বুদ্ধি ধরেন, মাথা ঠাণ্ডা, সব দিকে বিবেচনা আছে, সেই জন্যই সুপ্রীতির সংসার নিয়ে তাঁর মা বিশেষ দুশ্চিন্তা করেন না।

বেশ হৈ চৈ করে এখানে দিন কাটতে লাগলো। দু'বছর পর পারিবারিক মিলন। দেশের বাড়িতে সেই প্রতি বছর পুজোর সময়ের যে আনন্দ তা তো আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তবু দেওঘরের পরিবেশটি বেশ মনোরম।

সকালবেলাতে বিশ্বনাথের গানের স্কুল বসে। বছরের অন্য সময়ের তুলনায় এই সময়টাতেই বিশ্বনাথের ছাত্র ছাত্রী জোটে একটু বেশি। খানিকটা শীত পড়লেই যক্ষ্মা রুগীরা হাওয়া বদলের জন্য দু'তিন মাস বাড়ি ভাড়া করে এখানে সপরিবারের থাকে। তাদের ছেলে মেয়েরা জুটে যায় বিশ্বনাথের ইস্কুলে। বিশ্বনাথের আফশোস তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত জানেন না। ইদানীং ঐ গানের খুব চাহিদা। গার্জেনরা এসে বলেন, মাস্টারজী, দু'তিন খানা রবীন্দ্র সঙ্গীত তুলিয়ে দিতে পারেন না? মেয়ের বিয়ের সময় আজকাল যে পাত্রপক্ষ রবীন্দ্র সঙ্গীত চায়!

বাইরের টানা বারান্দায় শুরু হয় ক্লাস। এখন ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা এগারো জন, মাইনে প্রত্যেকের পাঁচ টাকা। শান্তি বলছিলেন, কেউ কেউ মাইনে না দিলেও বিশ্বনাথ কিছুতেই চাইবেন না। টাকা নিয়ে গান শেখাতে হচ্ছে বলে বিশ্বনাথের মনে এমনিতেই গ্লানি রয়ে গেছে।

মমতা জোর করে পিকলু, বাবলু, মুন্নিকেও জুড়ে দিয়েছেন গানের ক্লাসে। পিকলু তবু কথা শোনে, কিন্তু বাবলু-মুন্নি কিছুতেই বসতে চায় না, মমতা দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দেন। সবাই এক টানা গান ধরে :

এ রি মইকা সব সুখ দিও
দুধ পুত আওর ধন, জন লছমী

একবার এ পর্যন্ত হলেই বিশ্বনাথ চেঁচিয়ে বলেন, আবার ধরো, এ রি মইকা...।

সুরটা প্রতাপের কানে লাগে। প্রথম দিন তিনি বিশ্বনাথকে বলেছিলেন, ওস্তাদজী, আপনি

সক্কালবেলাতেই পূবী সুর গাওয়ান কেন ওদের? আশাবরী বা বামকেলি ধরালে হতো না?

বিশ্বনাথ হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, আরে শিশুদের আর সকাল-সন্ধ্যে কী? ওদের তো যতক্ষণ জেগে থাকা, সেই সব সময়টাই উৎসব! তাই না? তাছাড়া তুমি লক্ষ্য করবে, ব্রাদার, অবরোহণের সুর বাচ্চাদের গলায় সহজে আসে, ভালো আসে।

ইস্কুল-পর্ব শেষ হলে ভজন সিং-এর কোয়ার্টারে মোরগ কাটা শুরু হয়। বিশ্বনাথ চুরুট টানতে টানতে নির্দেশ দেন। কাজটি সহজ নয়। প্রত্যেকদিনই কাটা শুরু হয়। বিশ্বনাথ চুরুট টানতে টানতে নির্দেশ দেন। কাজটি সহজ নয়। প্রত্যেকদিনই একটা না একটা মোরগ বেড়া ডিঙ্গিয়ে পালায়। যে মোরগটিকে কাটা হবে সেই কি টের পায়, নাকি যে পালায় তারই ওপর মৃত্যুদণ্ড পড়ে! ভজন সিং-এর ছেলেমেয়েরা আর পিকলু বাবলুরা সেই মোরগ ধরে আনার জন্য ছোটে। এই কাজটি বাবলু বেশ ভালো পারে, প্রায়ই তারই হাতে ধরা পড়ে মোরগটি।

কাটার কাজটি নেয় ভজন সিং-এর নেপালী বউটি। রান্নাও সেই করে, বেশ ভালো রান্নার হাত, তবে অসম্ভব ঝাল দেয়। প্রতাপের তাতে আপত্তি নেই, বিশ্বনাথেরও না, কিন্তু মমতা একটুও ঝাল মুখে ছোঁয়াতে পারেন না। ছেলেমেয়েদেরও ঝাল খেতে দিতে চান না মমতা, তাই নিয়ে রোজ এক কাণ্ড। নেপালী বউটি কিছুতেই ঝাল কমাবে না, আর ছেলেমেয়েরা মুর্গীর মাংস খাবেই। এই মাংসে একটা নিষিদ্ধ ব্যাপারের স্বাদ আছে, এ মাংস বাড়ির মধ্যে ঢুকবে না, বাগানে বসে খেতে হবে। প্রত্যেকদিনই পিকনিক। পিকলু-বাবলু খাওয়ার মাঝপথে উস-আস শব্দ করে, চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে, তবু খাওয়া ছাড়ে না।

একদিন মোরগ কাটা চলছে, এমন সময় সামনের গেট ঠেলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা প্রবেশ করলো। পুরুষটির ধুতি পাঞ্জাবি পরা মান্যগণ্য করার মত চেহারা, মহিলাটির একজন অকাল-পৌঢ়া, অন্যজন পরিণত যুবতী। অভ্যেসবশত প্রতাপ মহিলা দুটিকেই আগে ভালো করে লক্ষ্য করলেন। টুকটুকে লাল শাল জড়ানো যুবতীটির দিকে দু'এক পলক বেশি তাকিয়ে প্রতাপের ওষ্ঠে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠলো।

বিশ্বনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, ঐ তো, সত্যেনরা এসেছে। ব্রাদার, তুমি ওদের চেনো নাকি?

প্রতাপ বললেন, মনে হচ্ছে ওঁদের মধ্যে একজনকে চিনি।

মেঘহীন আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে নির্মল রোদ, প্রতাপের চোখেরও কোনো দোষ নেই, তবু কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন চতুর্দিকে ঝপসা অন্ধকার মনে হলো প্রতাপের। কেন যেন একটা প্রবল ঝড়ের দৃশ্য মনে পড়ে গেল। সে রকম ঝড় প্রতাপ সারাজীবনে আর দেখেন নি। অনেকদিন আগেকার কথা, তবু প্রতাপের স্পষ্ট মনে আছে, সেই ঝড় শেষের দিবাগত রাত্তেই বুলার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়েছিল।

॥ ৪ ॥

বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে তুতুলকে ইস্কুলে পাঠিয়ে সুপ্রীতি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন গেটের সামনে। চৌদ্দ বছর বয়েস হয়েছে তুতুলের, এখনো সে ফ্রক পরেই স্কুলে যায়। ঠিক এই বয়েসেই সুপ্রীতির বিয়ে হয়েছিল, অথচ তখন সুপ্রীতি তুতুলের মতন এত ছোট ছিলেন না। সব কিছু বোঝার মতন জ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

সুপ্রীতির বয়েস এখন চুয়াল্লিশ, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য নিভাঁজ। তাঁর মনে প্রসন্নতা আছে, তাই অধিকাংশ সময়েই তিনি সহাস্য থাকেন। তবে আজ সকাল থেকেই তিনি উদ্বিগ্ন, মুখে বার বার একটা ছায়া এসে পড়ছে।

তুতুল পথের বাঁকে মিলিয়ে যাবার পর সুপ্রীতি গেট বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে এলেন। সামনে ঢাকা বারান্দা, তারপর বসবার ঘর। এ ঘরের সোফা-সেটগুলোর স্প্রিং নষ্ট হয়ে গেছে, ঢাকনাগুলি বিবর্ণ, কোনোটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ছোবড়া। মেঝের কার্পেটটা শতচ্ছিন্ন, ওটাকে রাখার আর কোনো মানেই হয় না। কিন্তু এ ঘরের কোনো কিছুই পরিবর্তনের অধিকাংশ সুপ্রীতির নেই।

ঘরের এক কোণে নোংরা জামা-কাপড়ের স্তূপ সেদিকে তাকিয়ে সুপ্রীতি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ডাকলেন, মানদা, মানদা!

ভেতরের উঠোনের খোলা কলতলায় মানদা বাসনপত্তর ধুচ্ছিল, ডাক শুনে সে জল-হাতে এসে দাঁড়ালো। সুপ্রীতি কাপড়ের স্তূপটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, এগুলো এখানে কে রেখেছে?

মানদা বললো, আমি রাখিনি তো ভূষণের মা ফেলে গেছে নির্ঘাৎ!

সুপ্রীতি বললেন, তাকে ডাকো!

ভূষণের মাকে ডেকে আনতে একটুক্ষণ দেরি হলো, সুপ্রীতি সেখানেই অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। আজ ভোরবেলাই একটা খারাপ খবর এসেছে। তাঁদের কাশীপুরের বাগানবাড়িটা বিক্রির জন্য সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, কাল মাঝ রাত্রে এক দল রিফিউজি ঢুকে পড়েছে সেখানে। সে বাড়ির দারোয়ানকে নাকি তারা আম গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল, কোনোক্রমে ছাড়া পেয়ে সে ছুটতে ছুটতে ভোরে এসে দুঃসংবাদ জানিয়েছে। এ বাড়ির বয়স্ক পুরুষরা সবাই গেছেন কাশীপুরে। কী হবে কে জানে! এদিকে তুতুলের সঙ্গে আজ বাড়ির কোনো একজনকে পাঠানো উচিত ছিল। কাল স্কুল থেকে ফিরে তুতুল তাঁকে একটা চিঠি দেখিয়েছিল, একটা ছেলে রাস্তায় তুতুলের হাতে ঐ চিঠি গুঁজে দিয়েছে ভুল বানান, খারাপ চিঠি। এ পাড়াটাও দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুতুলের পরীক্ষা চলছে, আর দু'দিন মাত্র বাকি আছে। তাকে স্কুলে না পাঠাবারও উপায় নেই।

ভূষণের মা এসে বললো, কী বলছো, বউদি?

সুপ্রীতি বললেন, এইসব জামা-কাপড় এখানে কে রেখেছে? তুমি?

ভূষণের মা কোনো জরুরী কাজ করছিল, এত সামান্য কারণে তাকে ডাকা হয়েছে বলে সে বেশ অবাক হয়ে বললো, ওগুনো তো কাচতে যাবে, ধোপা আসবে বলে আমি রেখিচি!

সুপ্রীতি বললেন, কাচতে যাবে, ভেতরের বারান্দায় রাখতে পারোনি? বসবার ঘরে নোংরা কাপড় কেউ রাখে? বাইরের লোকজন যদি আসে?

ভূষণের মা বললো, বারান্দায় রাখলে আবার কার সঙ্গে মিশে যাবে, সব গুণে-গেঁথে রাখা আচে—

তার কথা মাঝপথে থামিয়ে সুপ্রীতি জোর দিয়ে বললেন, বাইরে নিয়ে যাও ওগুলো, আর কোনোদিন এখানে রাখবে না!

সুপ্রীতির বকুনিতে ঝাঁঝ নেই কিন্তু নিশ্চিত আদেশ আছে। ভূষণের মা অন্য তরফের ঝি হলেও সুপ্রীতির কথা অগ্রাহ্য করতে পারে না। এ বাড়িতে ঝি-চাকরদের তুই-তুকারি করাই প্রথা। একমাত্র সুপ্রীতিই তার ব্যতিক্রম।

ইদানীং এই বসবার ঘর ব্যবহারই হয় খুব কম। এই বাড়ির সমস্ত পুরনো সৌষ্ঠবই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আদব কায়দা বদলে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, তবু সুপ্রীতি যথাসাধ্য সব বজায় রাখতে চান। কার্পেট বদলাতে না হয় খরচ অনেক, তা বলে ঝি-চাকররাও সহবৎ ভুলে যাবে?

তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন তিনতলায়। দোতলায় দুই নারী কণ্ঠের ঝগড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, সুপ্রীতি সেদিকে কান দিলেন না। পুরুষরা বাড়িতে না থাকলেই মেয়েদের সময় কাটবার প্রধান খেলা, জিভের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। সুপ্রীতি প্রথম প্রথম অবাক হতেন। এখন আর গ্রাহ্য করেন না। অনেক সময় তাঁর উদ্দেশেও দূর থেকে শর বর্ষণ হয়। কিন্তু কেউ সামনা-সামনি কিছু না বললে উত্তর দেন না সুপ্রীতি, সেই জন্য তাঁর আড়ালের ডাক নাম হয়েছে দেমাকী।

কাশীপুরে এতক্ষণ কী ঘটছে কে জানে! তাঁর স্বামী অসিতবরণকে সেখানে পাঠাবার ইচ্ছে ছিল না সুপ্রীতির, কিন্তু খুড়শ্বশুর জোর করে নিয়ে গেলেন। ব্যাপার অতি গুরুতর। এই বনেদী যৌথ পরিবারটি এখন নানান ঋণভারে জর্জর। শরিকে শরিকে মামলা শুরু হয়ে গেছে। বসত বাড়িটির মেরামত প্রসাধন হয়নি অনেকদিন। কাশীপুরের সেভেন ট্যাঙ্কস লেনের ভাগাভাগি করে নেবার প্রস্তাবে মতের মিল হয়েছিল। এখন যদি সেখানে রিফিউজি বসে যায়, তাহলে তো আর সেটা বিক্রি করবে না! এক পাঞ্জাবী, কার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরির মালিক, ঐ জমি পুকুরসমেত বাড়িটি কিনতে চেয়েছিল, এখন সে পিছিয়ে যাবে।

এক পুরুষ যদি আশাতিরিক্ত উপার্জন করে, তাহলে পরবর্তী দু'তিন পুরুষ তা ওড়ায়। পরিশ্রমের সম্পদ আলস্যে মিলিয়ে যায়। অসিতবরণের ঠাকুর্দার বাবা জানকীবল্লভ সরকার সাহেবদের বেনিয়ানগিরি করে কলকাতা শহরে বাড়ি-জমি কিনেছিলেন। ছোটখাটো পাতলা চেহারার মানুষ ছিলেন তিনি, সারা জীবন কৃচ্ছ্রতা সাধন করে গেছেন, সামান্য সুতলি-দড়িটুকুও কখনো ফেলতেন না, পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে জমিয়ে রাখতেন। অর্থলোভ তাঁকে অর্থপিশাচ করে তুলেছিল। কেন এবং কার জন্য, কিসের জন্য যে তিনি বহু লোককে বঞ্চিত করে এই বিপুল সঞ্চয় রেখে যাচ্ছেন সে ব্যাপারে তাঁর মনে কখনো কোনো প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে সব সময় বোধহয় একটা বিপরীত শক্তি কাজ করে। শেষে জীবনে, জানকীবল্লব সরকার যখন পক্ষাঘাতে পঙ্গু, তখন তাঁর

নাকের ডগার ওপর দিয়েই তাঁর গুণধর পুত্র বাঈজী নাচ, পায়রা ওড়ানো, মোসাহেব পোষার প্রতিযোগিতা দিয়ে টাকা উড়িয়েছে। পিতার বিলাস-ব্যসনে অনাসক্তি সুদে-আসলেউসুল করে নিয়েছে তাঁর ছেলেরা।

জানকীবল্লভ চা ও পাটের দালালির ফার্ম খুলে গিয়েছিলেন, এক পুরুষেই তা উঠে যায়। তারপর থেকেই এই পরিবারটির প্রধান আয় সম্পত্তি বিক্রি করা। খাস কলকাতায় তিনটি বাড়ি, ঢাকুরিয়ার জমি, বারাকপুরের জমি, রাঁচীর জমে, বৈঠকখানা বাজারের অংশ, সব একে একে বিক্রি হয়ে যেতে লাগলো। এ তো বড় আরামের পেশা, পরিশ্রম নেই, অফিস যাওয়া নেই। মাথা ঘামানো নেই। শুধু কয়েকটি দলিলে উকিলের নির্দেশ মতন সই করলেই টাকা আসে।

অসিতবরণের বাবার আমল পর্যন্ত এই রকমভাবেই চলে এসেছে, কোনো কিছুই আটকায়নি। সম্পত্তি বিক্রি করা ছাড়াও তখনও পর্যন্ত বেশ কিছু কোম্পানির কাগজের সুদ আসতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেই সব কিছু কোম্পানি ফেল পড়ে। ছোট ছোট ব্যাংকগুলির মড়ক শুরু হয়ে যায়।

কাশীপুরের বাগানবাড়িটিই ছিল এ পরিবারের শেষ ভরসা। ঐ প্রমোদ ভবনটি ছিল অসিতবরণের জ্যাঠামশাই বরদাকান্তর অতি প্রিয়। দেশ স্বাধীন হয়েছে, উনবিংশ শতাব্দীর রীতিনীতি যে এখন আর চলে না তা তিনি মানতে চাইতেন না, পঞ্চ ম-কার নিয়ে মচ্ছব তিনি তখনো চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গান্ধীজী যেদিন দিল্লিতে গুলি খেয়ে মারা গেলেন সেদিন সন্ধেবেলা সেই খবর পেয়ে বরদাকান্ত ঐ কাশীপুরের বাগানবাড়িতে একটি বিশাল পার্টি দিলেন। ঐ নেংটি পরা, রোগা টিং টিং -এ জাতির পিতাটিকে তিনি ঘোরতরভাবে অপছন্দ করতেন, গেঁধো, ঐ ব্যাটা মুদির ছেলে ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতেন। অবশ্য কেন যে তাঁর এই বিরাগ তা বোঝা যেত না। সেদিনই মাঝরাতে মত্ত অবস্থায় দুটি বাজারে বারাঙ্গনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে হঠাৎ পুকুরে পড়ে তিনি মারা যান।

বরদাকান্তর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই সরকার পরিবারে পুরনো যুগের সমাপ্তি। তারপর আর হাত খাঁটি ঘি-এর গন্ধও রইলো না, সবাই ডালডা জোটাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ঐ কাশীপুরের বাগানবাড়ি আর কেউ ব্যবহার করেনি, অপয়া বিবেচনায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। এদিকে জমির দাম কম বলে বিক্রির কথাও আগে মনে আসেনি। ইদানীং পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্তরা কলকাতার প্রান্তসীমাগুলিতে উইপোকার মতন ঢিবি গড়ে তুলছে। তাই জমির দামও তেজী হচ্ছে। পাঞ্জাবী কর্ডবোর্ড ফ্যাক্টরির মালিকটি নিজের থেকেই খোঁজ-খবর করে ঐ বাড়িটি কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল মাস দু'এক আগে।

কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্তদের চেয়েও যে অনেক গুণ বেশি সংখ্যক নিঃস্ব উদ্বাস্তুরা আসছে, তারা যেখানে সেখানে তাঁবু গাড়ছে পতিত জমি, বুড়ো বাড়িগুলিতে তো বটেই, ধনীদের সাজানো-গোছানো প্রমোদ ভবনেও ঢুকে পড়ছে পঙ্গপালের মতন, সে সংবাদ প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে বের হয়, তবু কর্তাদের হুঁস হয়নি। ঐ বাড়িতে ভালো পাহারার ব্যবস্থা করেননি। একটা মাত্র রোগা-পটকা ধূর্ত, ঠগ দারোয়ানের ওপর সব ছেড়ে রাখা ছিল। দারোয়ানটি মাঝে মাঝে কয়েক কাঁদি ডাব আর মৌসুমী আম-লিচু দিয়ে যেত। তাতেই খুশী ছিলেন সবাই।

সকালবেলা খবরটা শোনার পর সুপ্রীতি বুঝেছিলেন, ঝাপটাটা তাঁর ওপরেই পড়বে বেশি। দোতলার মহিলাদের বাক্যবাণ তাঁর প্রতি আরও বেশি করে বর্ষিত হবে। তিরিশ বছর আগে বিয়ে হলেও এখনো কেউ ভুলতে পারে নি যে, সুপ্রীতি বাঙালে বাড়ির মেয়ে। ঐ জবরদখলকারী, হাড়-হাভাতে, বদমাইশ রিফিউজিগুলো তো সুপ্রীতিরই জাত ভাই!

মালখানগরের সচ্ছল, গোষ্ঠী-অধিপতি ভবদেব মজুমদার তাঁর বড় মেয়ে সুপ্রীতির বিয়ে দিয়েছিলেন এক পশ্চিমবঙ্গী পরিবারে। প্রায় অভূতপূর্ব ঘটনা বলা যেতে পারে। সেই সময় ব্রাহ্ম বা বৃহৎ ধনী বংশ ছাড়া, সাধারণ হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বিবাহ খুব একটা সহজ স্বাভাবিক ছিল না। বাঙাল-ঘটি ভেদাভেদ ছিল। হাসিঠাট্টার চেয়েও অনেক গভীরে। প্রায় দ্বিজাতিগত বিভেদের মতন। দেশ বিভাগের পরই বরং পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুরা প্রাথমিক তিক্ততা কাটিয়ে ওঠবার পর বুঝতে পারলো, প্রতিবেশী মুসলমানদের সঙ্গে তাদের ব্যবহারিক অমিল ছিল যৎসামান্য, মিলই বেশি, প্রায় আত্মীয়ের মতন। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গীয়দের সঙ্গে তাদের মানসিক ব্যবধান অনেকখানি। দেশ বিভাগ হলো ধর্মের ভিত্তিতেও, কিন্তু দেখা গেল ধর্ম কোনো বাধা নয়, আবার শুধু ধর্ম মানুষের মধ্যে মিলন ঘটাতেও পারে না।

অসিতবরণের বাবা উমাপতি সরকারের সঙ্গে ভবদেব সরকারের সঙ্গে ভবদেব মজুমদারের পরিচয় হয় শিলং পাহাড়ে। দু'জনেই সপরিবারে একই হোটেলে উঠেছিলেন। উমাপতি একদিন

দেখলেন যে, ভবদেব একা লাউঞ্জে বসে দাবা খেলছেন। উমাপতিরও সাঙ্ঘাতিক দাবার নেশা, বিনা আলাপেই তিনি উল্টোদিকে বসে পড়লেন, শুরু হয়ে গেল খেলা, তারপর টানা চারদিন ধরে সেই খেলা চললো, কেউই আর মাতই হয় না, খেলা শেষ হবে কী করে? দাবার খেলার যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে দু'জনেই দু'জনকেকে বেশ পছন্দ করে ফেললেন। অন্তরঙ্গতা এত দূর গড়ালো যে, ভবদেব প্রায় জোর করে উমাপতি সরকারের পরিবারের সকলকে নিয়ে এলেন মালখানগরে। উমাপতির সেই প্রথম পূর্ববঙ্গে আগমন। পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে তাঁর ভুল ধারণা ছিল, ভয়ের ভাব ছিল, তিনি জানতেন যে, ওসব হলো বিশ্রী জল-কাদা ভরা জায়গা, আঁশটে গন্ধ, অধিবাসীদের মুখের ভাষা বর্বরসুলভ। ওখানকার লোকেরা কলকাতায় এসে সভ্য হয়। তিনি নিজে ওখানে গিয়ে দেখলেন দিব্যি পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি, চতুর্দিকে অজস্র ফল-পাকুড়, মানুষগুলি অতিথিপরায়ণ এবং নিজেদের মধ্যে এরা দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বললেও বাইরের লোকের সঙ্গে মোটামুটি সাধারণ বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে জানে।

বিয়ের প্রস্তাবটা উমাপতিই দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁদের পরিবার যেমন পড়তির দিকে, ভবদেবের অবস্থা তেমনই এখন বর্ধিষ্ণু। এ বাড়িতে লেখাপড়ার চল আছে, এমন কি স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত বই পড়ে। তাঁর ছেলে অসিতবরণের বয়েস তখন উনিশ, গৌরবর্ণ, লম্বা-চওড়া যুবক, পারিবারিক রীতি অনুযায়ী সদ্য বখামিতে দীক্ষা নিয়েছে, এক কাকার প্ররোচনায় ইতিমধ্যেই একটি সোনার হাতঘড়ি গোপনে বিক্রি করেছে। উমাপতির নিজের চরিত্রও এমন কিছু গঙ্গাজলে ধোয়া পূত পবিত্র নয়, বউবাজারে তাঁর একটি রক্ষিতা আছে সবাই জানে। তবু তিনি অনুভব করেছিলেন, নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে তাঁর ছেলেটিকে অন্য পথে চালনা করতে হবে। তাঁর এই একমাত্র বংশধরকে সংশোধন করার উপায় হলো বরানগরের বিষাক্ত পরিবেশ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা।

তিনি অসিতবরণকে ভর্তি করে দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভবদেবকে বললেন, ভাই, তোমার বড় কন্যাটিকে আমায় দাও!

লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না, এক্ষেত্রেও আলাপ-আলোচনা ও চিঠিপত্র চলেছিল প্রায় বছরখানেক ধরে। ইতিমধ্যে অসিতবরণ ঢাকার হস্টেল থেকে মাঝে মাঝেই চলে আসে মালখানগরে। যতই পড়ন্ত হোক তবু বনেদিবাড়ির ছেলেদের সাজ-পোশাকের একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, কথাবার্তা ও ব্যবহারে অন্য ধরনের মার্জিত ভাব থাকে, অসিতবরণেরও সেসব ছিল, তাছাড়া সে ছিল স্বভাব-লাজুক। এই রূপবান নম্র যুবকটিকে সুহাসিনীর খুব পছন্দ হয়ে গেল। ভবদেব অভিজ্ঞ, বিষয়ী মানুষ, তিনি কলকাতায় এসে বরানগরের সরকার বাড়ির অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন, তখনও ও বাড়ির বাইরের ঠাট অনেকটা বজায় থাকলেও অন্তঃসারশূন্যতা ভবদেব ঠিকই টের পেয়ে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর আপত্তি ছিল, কিন্তু সুহাসিনীর উৎসাহে সেই আপত্তি ভেসে গেল।

সুহাসিনী আর ভবদেব দু'জনেই চান সবাইকে কাছাকাছি রাখতে। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে পরের বাড়ি পাঠানোতে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না, জাত কুল মিলিয়ে সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট। অসিতবরণও প্রায় ঘর-জামাই হয়েই রইলেন বছর পাঁচেক। দু'বারের চেষ্টায় বি-এ পরীক্ষাতেও পাস করলেন ঢাকা থেকে। তারপর উমাপতির অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাঁকে বরানগরে চলে আসতে হলো সম্পত্তির ভাগ নেবার জন্য। কিন্তু পুরনো সম্পত্তির ভাগ নেওয়াও সহজ কথা নয়, অধিকার রক্ষার জন্য সর্বক্ষণ জাঁকিয়ে বসে থাকতে হয়। তাই বসত বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকার আর উপায় রইলো না।

স্বামীর সংসারে এসে সুপ্রীতি প্রথম দিকে পদে পদে অবাক হয়েছেন। বিরাট যৌথ পরিবার, অসিতবরণের কাকা-জ্যাঠা পিসিরা সবাই একই বাড়ির বিভিন্ন অংশে থাকেন, কিন্তু সবাই যেন সবার শত্রু। সামনাসামনি কলহ নেই কিন্তু আড়ালে প্রত্যেক অপরের নামে নিন্দে করে। এবং সে নিন্দের মধ্যে ফুটে ওঠে নির্দয়তা। সুপ্রীতি এ রকম কখনো দেখেননি। তিনি আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে স্নেহ পেতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

সুপ্রীতি আরও দেখলেন, এ বাড়িতে পড়াশুনোয় কোনো গুরুত্ব নেই। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়, তাদের জন্য মাস্টারও রাখা হয়, কিন্তু তারা কী শিখছে, পাস করছে না ফেল করছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পট পট করে খারাপ ভাষা ব্যবহার করে, কেউ নিষেধ করে না তাদের। বড় ননদের ছেলে, যার বয়েস মাত্র এগারো, সে বাড়ির একটি ঝি-কে মাগী বলে সম্বোধন করছে অথচ তার মা নির্বিকার, এই দেখে-শুনে সুপ্রীতি শিউরে উঠেছিলেন!

বিয়ের পরই সুপ্রীতি একদিন তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার নামটা কে রেখেছিল?

অসিতবরন বলেছিলেন, আমার দাদু। কেন, আমার নামটা খারাপ?

সুপ্রীতি বলেছিলেন, তোমার চেহারার সঙ্গে তো তোমার নামের কোনো মিলই নেই। অসিত মানে তো কালো। তুমি কি ছোটবেলায় কালো ছিলে?

অসিতবরণের গায়ের রং কাশ্মীরীদের মতন গৌর। কোনো কালো রঙের বালক পরবর্তী জীবনে এ রকম টকটকে ফর্সা হতে পারে না।

অসিতবরণ দারুণ অবাক হয়ে বলেছিলেন, অসিত মানে কালো? কে বললে তোমাকে?

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, অসিতবরণ নিজে তো তার নামের অর্থ জানতোই না, এমনকি তাঁরা বাবা-কাকা জ্যাঠাদের কারুরই কখনো মনে আসেনি যে, এই ছেলের ভুল অর্থে নাম রাখা হয়েছে।

এখানে এসে সুপ্রীতি বিশেষ যত্ন করে কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর কথার বাঙাল ভাষার টান মুছে ফেলেছিলেন। অবশ্য, গেসলুম, বলেছিলিস, করগে যা, মরগে যা এই ধরনের ভাষা শিখতে তাঁর দীর্ঘকাল লেগে গেছে। সামনে কুচি দিয়ে শাড়ী পরতে তিনি আগেই শিখে এসেছিলেন, চিনি দিয়ে রান্না ডাল আর ঝালবিহীন মাছের ঝোল খেতে তিনি অতি দ্রুত রপ্ত হয়ে গেলেন, তুব বাঙাল বাড়ির মেয়ে, এই নাম তাঁর ঘোচেনি।

সুপ্রীতির প্রথম সন্তান হয়েছে বিয়ের দীর্ঘকাল পরে। এক সময় ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর ছেলে-মেয়ে হবে না, তাঁর ভাসুর অসিতবরণের আবার একটি বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে কিছুদিন মন কষাকষিতে সুপ্রীতি চলে গিয়েছিলেন বাবা-মায়ের কাছে। টানা আট মাস মালখানগরে থাকা সময় সেখানেই তুতুলের জন্ম হলো। অসিতবরণ গিয়েছিলেন স্ত্রী-কন্যাকে ফিরিয়ে আনতে।

সুপ্রীতি যে বাঁজা নন তা প্রমাণিত হলো বটে কিন্তু তুতুলকে এ বাড়িতে কেউ সানন্দে বরণ করে নেয়নি। অনেকেই প্রায় প্রকাশ্যে মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, আবার মেয়ে! এ বাড়িতে মেয়েদের বড় অবহেলা। মেয়েরাও মেয়েদের অপছন্দ করে, বরং তারাই বেশি অপছন্দ করে। অসিতবরণের কাকা-জ্যাঠাদেরও কোনো পুত্র সন্তান হয়নি, সকলেরই দু'তিনটি করে মেয়ে। অথচ তাঁর পিসিদের ও এক বিধবা বোনের সব মিলিয়ে সাতটি ছেলে। সরকার পরিবারের এখন বংশ রক্ষা করাই দায়।

সুপ্রীতির দ্বিতীয় সন্তানটি সাত দিনের বেশি বাঁচেনি। সেও মেয়ে ছিল, তাই তার অকালমৃত্যুতে কেউ শোক করেনি। রাগে-দুঃখে সেই সময়েই সুপ্রীতি চেয়েছিলেন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে।

সুপ্রীতি অনেকবার অসিতবরণকে বুঝিয়েছেন, এ বাড়িতে তোমার অংশ বিক্রি করে দিয়ে চলো আমরা কোনো ভাড়া বাড়িতে থাকি!

অসিতবরণ ততদিনে চাকরি নিয়েছেন অনেকটা স্বাবলম্বী। তাঁর কর্মস্থল বেশ দূরে, বরানগর ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকতে তিনি খুব একটা অরাজি নন, কিন্তু বাড়ি নিয়ে মামলাই যে মিটতে চায় না, তার আগে তাঁর অংশ বিক্রি হবে কী করে? একবার ছেড়ে চলে গেলে কিছুই পাওয়া যাবে না।

সুপ্রীতি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি শূন্য। কাশীপুরের বাগানবাড়ি উদ্ধার করতে গিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। অসিতবরণের সেজো কাকা ঐসব ব্যাপারে খুব দক্ষ। কিন্তু অসিতবরণ যদি জড়িয়ে পড়েন, তিনি সামলাতে পারবেন না। কয়েক মাস হলো অসিতবরণ হঠাৎ বদলে গেছেন, তাঁর কথা ও ব্যবহার অসংলগ্ন। এই সময় প্রতাপ থাকলে তার সাহায্য নেওয়া যেত, কিন্তু অসিতবরন যদি জড়িয়ে পড়েন, তিনি সামলাতে পারবেন না। কয়েক মাস হলো অসিতবরণ হঠাৎ বদলে গেছেন, তাঁর কথা ও ব্যবহার অসংলগ্ন। এই সময় প্রতাপ থাকলে তার সাহায্য নেওয়া যেত, কিন্তু প্রতাপ তো চলে গেছে দেওঘরে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। সুপ্রীতির যাওয়া হলো না...।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে স্বামীর চেয়ে মেয়ের জন্যই সুপ্রীতি বেশি চিন্তা করতে লাগলেন। তুতুল দেখতেই বড় হয়েছে, কিন্তু তার মনটা এখনো অতি সরল। এ বাড়ির অন্য ছেলে-মেয়েদের সংস্পর্শ থেকে তুতুলকে তিনি যত দূর সম্ভব আড়াল করে রেখেছেন। কাল তুতুল বাড়ি ফিরে চিঠিখানা সুপ্রীতিকে দিয়ে বলেছিলে, মা, আমাকে এইসব কথা লিখেছে কেন? আজ দারোয়ানকে বলে দেওয়া হয়েছে, সর্বক্ষণ সামনে বসে থাকে। দারোয়ানটা আবার যা বোকা, তার ওপর আফিংখোর।

বিরলে ছাড়া সুপ্রীতি কখনো কাঁদেন না। আজ তাঁর চোখে চল। সম্ভব হলে সুপ্রীতি নিজেই আজ তুতুলের সঙ্গে গিয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু এ বাড়ির বউদের তা করবার উপায় নেই। হাত জোড় করে

কপালে ঠেকিয়ে সুপ্রীতি বললেন, ঠাকুর, মেয়েটা যেন ভালোয় ভালোয় আজ পরীক্ষা দিয়ে ফিরে আসে। ঠাকুর, রক্ষা করো, আমার যে এখন দেখার আর কেউ নেই!

॥ ৫ ॥

দেশ বিভাগের পর দুটি নতুন দেশেরই কর্ণধারা হয়েছেন দুই বিলেতে শিক্ষিত ব্যারিস্টার। দু'জনেই পাক্কা সাহেব। সাহেব হবার পরীক্ষা শুধু সঠিক উচ্চারণে ইংরেজী ভাষণেই নয়, এক ধরনের আলাদ হাসিও রপ্ত করতে হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবিগুলি তুলনা করলেই বোঝা যায় যে নেহেরু ও জিন্না বেশ কিছুদিন সেই বিলিতি হাসির প্রতিযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলেন। জিন্না অবশ্য নতুন রাষ্ট্রটির কর্তৃত্ব সুখ বেশিদিন ভোগ করতে পারলেন না, অকালে চলে গেলেন, নেহেরু রয়ে গেলেন শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব করার জন্যই নয়, একজন বিশ্বনেতা হিসেবে স্বীকৃত পাবার আকাঙ্ক্ষায়।

বিলিতি ওয়েস্ট কোটের সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে, ওপরে সট কলার লাগিয়ে জওহরলাল নেহরু একটি নতুন পোশাকের প্রবর্তন করলেন, যার নাম জওহর কোট। ঐ পোযাকটিই হলো নতুন ভারতের শাসন ব্যবস্থার প্রতীক। নামে স্বদেশী, বাকি সবটাই বিদেশের অনুকরণ। এ দেশের আশি ভাগ লোক নিরক্ষর, নিরন্ন, ভাগ্য-তাড়িত, কিন্তু সরকার চলতে লাগালো প্রাক্তন ইংরেজী-পদ্ধতিতে।

লাড়ই করেছিল অনেকেই কিন্তু কংগ্রেসই ভারতের স্বাধীনতা এনেছে, এরকম বিদিত হয়ে গেল। গান্ধীজী দু-চারবার ক্ষীণভাবে বলেছিলেন, দেশের স্বাধীনতা আসার পর আর কংগ্রেস পার্টির অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই, ওটা তো ছিল সংগ্রামের জন্য একটি মিলিত প্ল্যাটফর্ম, এখন ঐ দলটি ভেঙে দেওয়া হোক, গড়ে উঠুক আলাদা রাজনৈতিক দল। গান্ধীজীর অন্যান্য আরও উচিত মন্ত্রণার মতন, এ-প্রস্তাবেও কেউ কর্ণপাত করেনি। যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা একখানা সারা দেশব্যাপী তৈরি দল, হাজার শাখা, কার্যালয়, আসবাবপত্তর ও টাকা পয়সার সুযোগ ছেড়ে দিতে চায়নি। গান্ধীজীর পরামর্শকে তারা বার্ধক্যের এলোমেলোমি বলে উড়িয়ে দিল। এমনকি কংগ্রেস দলের পতাকা ও জাতীয় পতাকার প্রায় হুবহু মিলের যে সুফল আছে অনেকখানি তা টের পাওয়া গেল প্রথম সাধারণ নির্বাচনে। দেশের মানুষ কংগ্রেসকেই চেনে, বিরোধীপক্ষ তো কিছু নেই-ই বলতে গেলে।

পূর্ব ভারতের উদীয়মান কংগ্রেসী নেতা অতুল্য ঘোষ একদিন পার্টির কর্মীদের কাছে উদারভাবে বললেন, আরে বাবা, তোমরা কমুনিষ্ট পার্টি ব্যান করার কথা কেন বলছো? সে তো ইচ্ছে করলেই করা যায়। ওরা থাক না! আ অপোজিশান না থাকলে কী খেলা জমে?

রাজার চার পাশে যেমন মোসাহেবরা ঘিরে থাকে সেই রকমই কংগ্রেসী শাসকদের সঙ্গে জুটতে লাগলো ধনী, সুযোগ-সন্ধানী ও অর্থলোভীর দল। পণ্ডিত নেহরুর এটা পছন্দ নয় কিন্তু তিনি এদের ঝেড়ে ফেলতেও পারছেন না। যৌবনে তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন, এক সময় ঘোষণা করেছিলেন যে সময় এলেই তিনি কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবেন। সময় যখন এলো, কালোবাজার যখন সমস্ত আলো-বাজারকে গ্রাস করে নিল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন ল্যাম্প পোস্টগুলো বোধহয় যথেষ্ট মজবুত নয়। ওদিকে আগে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

পণ্ডিত নেহরু গরিবদের সমব্যথী। হ্যাঁ, গরিব তো আছেই, তারাই দেশ জুড়ে, তাদের কথা চিন্তা করতে হবে, তাদের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা বানাতে হবে, জনসভায় তাদের কথা বলতে হবে, সে সব ঠিক আছে, কিন্তু সে সব শুধু দিনের বেলা। কিন্তু সন্ধ্যের পরও গরিবদের চিন্তায় সময় কাটানো কি সম্ভবপর? তখন দু-একটা পার্টি, একটু নাচ, কিছু ফষ্টিনষ্টি, দু-এক পেগ শেরি পান, বা পারিবারিক পরিবেশে সংস্কৃতি চর্চা, ঘুমোবার আগে বিখ্যাত কবির দু-চার লাইন কবিতা পাঠ, এসব না হলে স্নায়ু ঠিক থাকবে কী করে?

এত বড় দেশ, এখানে এক বছর খরা, অন্য বছর বন্যা। কিংবা যে-বছর অনাবৃষ্টি বা অতি বৃষ্টির ভয় থাকে না, সে বছরও এক অঞ্চলের তুলনায় অন্য অঞ্চল মার খায়। দু-চার লাখ চাষীর ফসল নষ্ট হওয়া নতুন কিছু ঘটনা নয়, বরং তা একঘেয়েমির পর্যায়ে চলে গেছে। প্রত্যেকবার এই সব চাষীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার বদল পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা অনেক বেশি জরুরি। একদা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহানুভূতি সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে। আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমা বানাচ্ছে জেনে তিনি খুবই বিক্ষুব্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন দেশ বৃহত্তম খুনী হিসেবে জয়লাভ করেছে। এখন, শান্তির সময়েও কি তারা সারা পৃথিবীটাকে ধ্বংস করার কথা ভাবছে? পণ্ডিত নেহরু তার জোরালো প্রতিবাদ জানালেন, এই নিয়ে ভারতের সংসদে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটলো। চার মাস বাদেই অবশ্য সংবাদ এলো.রাশিয়ায় প্রথম আণবিক বোমার পরীক্ষায়। সেই

বিস্ফোরণে কারাকোরাম মরুভূমির একটা পাহাড় উড়ে গেল। দুঃখিত উদ্‌ভ্রান্ত জওহরলাল চুপ করে রইলেন।

অবিরাম উদ্বাস্তু আগমন নেহেরুর বিবেকে আর একটি কাঁটা। দেশ বিভাগের আলোচনার সময় তিনি দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেননি। একদিকে সব মুসলমান আর একদিকে হিন্দু, এ আবার হয় নাকি? এই বিংশ শতাব্দীতে! নেহেরু প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি অ্যাগনস্টিক, তিনি ঈশ্বর-উদাসীন। সেটাই তো বিশ্ব-নাগরিকের আধুনিকতা। সামান্য নেটিভদের মতন তিনি পুজো-ফুজো, নামাজ-আরাধনায় ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসী নন। কিন্তু পুরোনো ব্রিটিশ শাসকদের নীতি অনুসরণ করে তিনিও কোনো ধর্মীয় সংস্কার বা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচারের ব্যাপারে মাথা ঘামালেন না। যে দেশে শতকরা নব্বই ভাগ লোক কুসংস্কার-তাড়িত, সামান্য বাইরের প্ররোচনাতেই ধর্মের নামে হাতিয়ার তুলে নেয়, কথায় কথায় রক্তের স্রোত বয়ে যায়, যারা ধর্মের কিছুই বোঝে না অথচ তারাই মারে অথবা মরে, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে রইলেন এমন একজন যিনি ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মচর্যাকে অরুচিকর বিবেচনায় আত্মশ্লাঘা বোধ করেন।

উদ্বাস্তু আগমনের ব্যাপারটাতেও পণ্ডিতজী বড় তিতিবিরক্ত হয়ে আছেন। পঞ্জাবের দিকটায় প্রথম প্রথম কাটাকাটি, খুনোখুনি যা হবার তা হয়ে গেছে। মাউন্টব্যাটেনের আমলেই ওদিক থেকে যারা চলে আসবার এসেছে, এদিক থেকে যারা যাবার, গেছে। কিন্তু বাংলার দিকে যে আগমন নির্গমন কিছুতেই থামেনা। পশ্চিম বাংলার ডাক্তারবাবু মুখ্যমন্ত্রী অনবরত বেশি টাকা চাইছেন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ছুতো করে।

এই বাঙালীরা সব সময়েই শিরঃপীড়া। তবু বড় বাঁচোয়া এই যে সুভাষবাবু বিমানের আগুনে পুড়ে মরেছেন কিংবা কোথাও নিরুদ্দেশে গেছেন, তাঁর পরে বাংলায় আর কোনো বড় জননেতা নেই। অগ্নিযুগের বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তা ভুলে গিয়ে এখন ফরাসী সাধন-সঙ্গিনী নিয়ে পরমার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত, যাক নিশ্চিত। সুভাষবাবু বেঁচে থাকলে অথবা চালু থাকলে এই সময় বড় ঝঞ্ঝাট করতেন। আটচল্লিশ সালের পর গান্ধীজী-বিহীন কংগ্রেসে সুভাষবাবু নিশ্চিত হতেন এক মূর্তিমান উপদ্রব। কে জানে, বাহান্ন সালের নির্বাচনের সময় সুভাষবাবু হঠাৎ নিশ্চিত উপস্থিত হলে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে হতো কি না। পাঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারত সুভাষবাবুর বেশ ভক্ত।

এ বছরের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের নির্বাচনে ফজলুল হকের বিরাট জয়ের সংবাদে খণ্ডিত ভারতেও অনেকখানিক আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। প্রাচীন বিশ্বাসযোগ্য এই মানুষটি আর যাই হোক সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি দেবেন না। ফজলুল হক মুসলিম লীগের সংস্পর্শে থাকতে চাননি, বরং মুসলিমলিগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সহায়তায় সংযুক্ত বাংলায় মন্ত্রিসভা গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সহায়তায় সংযুক্তি বাংলায় মন্ত্রিসভায় গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখন দিল্লির সিংহাসন নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, বাংলা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। ফজলুল হককে সমর্থন না জানিয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। বিস্ময় বিমূঢ় ফজলুল হক আইরিশ নেতা পারনেলের মতন আহত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, ইউ হ্যাভ থ্রোন মি টু দ্য উল্‌ভস! তারই ফলাফল, ছেচল্লিশ সালে কলকাতার পথে পথে রক্ত-স্রোত।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ফাটল ধরেছে, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ধূমায়িত হচ্ছে অসন্তোষ। পশ্চিমের জঙ্গী মনোভাব পূর্বের সংস্কৃতি মনস্ক শিক্ষিত মানুষ মেনে নিতে পারে না। নির্বাচনে জয়লাভ করে ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানে অ-মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। দেশভাগের নামে বাঙালী জাতির মধ্যেও বিভেদ-রেখা টানায় তাঁর ঘোরতর আপত্তি। ওপারে মুসলমান আর এপারের হিন্দুরা কেন পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাবে! ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, তিনি ভিসা ব্যবস্থা তুলে দেবেন। দুদিকের আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে অবাধ সাক্ষাৎ মোলাকাতের আর কোন অন্তরায় থাকবে না।

কিন্তু মাত্র এক মাস কাটতে না কাটতেই পকিস্তানের গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টায় আবার খড়্গাঘাত হলো। গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ ক্রুদ্ধ হয়ে জানালেন ফজলুল হক দেশের শত্রু, ঐ লোকটা স্বায়ত্ব শাসনের কথা উচ্চারণ করেছে! ভেঙে দেওয়া হলো পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা, ফজলুল হক গৃহবন্দী হলেন। শেখ মুজিবর রহমান নামে এক তরুণ অগ্নিবর্ষী নেতা নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। সেনাপতি ইস্কান্দার মির্জার হাতে তুলে দেওয়া হলো সর্বময় কর্তৃত্ব।

বাঙালীর মিলন আরও সুদূর পরাহত হলো। ফজলুল হকের আশ্বাসে যে সাময়িক নিশ্চিন্ততার ভাব এসেছিল তা ঘুচে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লো আতঙ্ক। পূর্ব থেকে পশ্চিম আবার প্রবাহিত হলো উদ্বাস্তুদের স্রোত।

এই লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধের মাথা গোঁজার জায়গা কোথায়? সবাই ধেয়ে আসে কলকাতার দিকে। লণ্ডনের অনুকরণে গড়া প্রাক্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই দ্বিতীয় নগরী, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্পন্ন; এর গায়ে আঘাত করতে লাগলো অবাঞ্ছিত অতিথিদের নোংরা হাত। শিয়ালদা স্টেশনের কোনো প্লাটফর্মে পা ফেলার জায়গা নেই। শুয়ে আছে মানুষ ফুটপাথগুলি হাঁটার অযোগ্য হয়ে উঠলো, সেখানে গড়ে উঠছে মানুষের আস্তানা। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় কলকাতা শহর নোংরা হতে শুরু করেছিল, এখন থেকে নোংরামিটাই হলো তার প্রধান চরিত্র। নগর কোতোয়াল বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণ কেউ এ ব্যাপারে মাথা ঘামালেন না।

রুশ বিপ্লবের পর ধনীদের প্রাসাদগুলি দখল করে নিয়েছিল প্রলেতারিয়েতরা, এ দেশে বিপ্লব হয়নি। বিপ্লবপন্থী কয়েকটি রাজনৈতিক দল আছে বটে কিন্তু তারাও হঠাৎ এত লক্ষ লক্ষ প্রলেতারিয়েতদের কোন কাজে লাগাবে তা বুঝে উঠতে পারলো না। জেলখাটা, আদর্শবাদী তরুণেরা এই অরাজকতার মধ্যেই একটা খণ্ড প্রলয় বাধিয়ে দিতে উৎসাহী, কিন্তু প্রবীণ পোড়াখাওয়া নেতাদের দৃষ্টি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের দিকে। এই লক্ষ লক্ষ মানুষই একদিন ভোটদাতা হবে। তখন এদের কাজে লাগবে। সুতরাং ওদের সুদূর আন্দামান বা দণ্ডকারণ্যে পাঠানো সমর্থন করা যায় না।

গত শতাব্দীর বেনিয়ান মুৎসুদ্দী ও উটকো জমিদারেরা হঠাৎ ধনী হয়ে আড়ম্বর বিলাসিতার অঙ্গ হিসেবে কলকাতার চতুর্দিকে অনেক বাগান বাড়ি নির্মাণ করেছিল। সেইসব প্রমোদ উদ্যানে যেমন ছিল বিলিতি কায়দায় অর্কিড হাউজ, ফার্ণ-গ্রেগ্রভ আবার তেমনই ছিল ঝাড়-লণ্ঠন সজ্জিত নাচঘর। সেইসব অনেক বাগান-বাড়িরই এখন জীর্ণ দশা, যথার্থভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা মালিকদের নেই, অধিকাংশ বাড়িই শূন্য পড়ে থাকে। প্রকৃতিই শূন্যতা পছন্দ করে না, মানুষ কী করে পারবে। অরক্ষিত বাড়িগুলিতে নিরাশ্রয় মানুষেরা দল বেঁধে ঢুকে পড়তে শুরু করলো। সবক্ষেত্রে নিজেদের সাহসে কুলোয় নি, রুশ বিপ্লবের ভক্তদের ব্যক্তিগত প্ররোচনা ছিল কোথাও কোথাও।

যে-সব মালিক এখনো প্রভাবশালী ও তৎপর তারা স্থানীয় এম এল এ-দের হাত করে, পুলিশী সাহায্য নিয়ে ঝটিতি ঐ সব জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করে অন্য কোনো পতিত জমি বা মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ঠেলে দিয়ে এসেছে। কিন্তু বরানগরের সরকারদের সে সামর্থও নেই।

অসিতবরণ তাঁর কাকাদের সঙ্গে যখন কাশীপুরের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছোলেন তখন সেখানে রক্তপাত শুরু হয়ে গেছে।

প্রায় পাঁচ-সাত বছর এ বাড়ির কোনো ব্যবহার ছিল না, কর্তারা কেউ আসতেন না, সরকার বাড়ির ছেলেপুলেরা দু-একবার শুধু পিকনিক করে গেছে। কর্তাদের এই ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে এ বাড়ির দারোয়ান ভেতরের নাচ ঘরটি অন্যদের বাড়া দিতে শুরু করেছিল। শৌখিন ফুলবাবুরা চাঁদনী রাতে আসতো সুরা ও স্বাকীদের সঙ্গে নিয়ে। দারোয়ানকে পাঁচ দশ টাকা বখশিস দিতে তাদের কার্পণ্য হবে কেন? একজন পুলিশ অফিসারও আসতেন মাঝে মাঝে। এ রকম আরও অনেকে।

বাহারী গ্রীল লাগানো, শক্ত তারের জাল দিয়ে ঘেরা অর্কিড হাইজে অনেকদিনই একটিও অর্কিড নেই, সেখানে খড়ের ছাউনী বিছিয়ে একটা বেশ ব্যবহারযোগ্য বড় ঘর করা হয়েছে, সাত আটজন অবিবাহিত কারখানার মজদুর সেখানে থাকে, তারা নিয়মিত বাড়া দেয়, সেখানে রান্না করে খায়, অনেকটা মেসবাড়ির মতন। তারা সে ভাড়া দেয় তা বাড়ির মালিক পায় কি পায় না তা তাদের জানবার কথা নয়, এই ঘরের ওপর তাদের একটা অধিকার বর্তে গেছে।

গতকাল মাঝ রাত্রে হৈ হৈ করে যখন উদ্বাস্তুরা এই বাগানে ঢুকে পড়লো তখন ঐ মজদুরদের জনা চারেক গিয়েছিল নাইট ডিউটিতে। জনা চারেক গাঁজা খেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। প্রথমে তারা ভেবেছিল বুঝি ডাকাত পড়েছে।

জবর দখলকারীরা হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে তাদের শরীরের ওপরেই দাপাদাপি করতে লাগলো। তাতেই শুরু হলো সংঘর্ষ।

উদ্বাস্তুদের একজন নিজস্ব নেতা তৈরী হয়েছে, তার নাম হারীত মণ্ডল। এই রকম বাগানবাড়ি দখলে তার বেশ অভিজ্ঞতা জন্মে গেছে, সে-ই আগে থেকে গোপনে সন্ধান নিয়ে এক একটি দলকে

ডেকে আনে।

রোগা, লম্বা চেহারার হারীত মণ্ডল, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, হাতে একটা বেঁটে লাঠি নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে আর নাচতে নাচতে চ্যাচাতে লাগলো, জাগা ছাড়বি না! জাগা ছাড়বি না! সব মাটিতে শুইয়া পড়! যে-যেখানে শুবি তার সেই জাগা।

অর্কিড হাউজের বাসিন্দা শ্রমিকরাও সহজে তাদের দখল ছাড়তে চায়নি, তাদের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হতে দেখে তারাও রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের ঐ উদ্দাম স্রোতের বিরুদ্ধে তাঁরা কতক্ষণ পারবে।

সেই চারজনকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে বাইরের রাস্তায়, দু'জন গুরুতরভাবে আহত। একজনের বাঁ হাতটা উড়ে গেছে কোনো অস্ত্রের কোপে।

অসিতবরণরা এসে পৌছোবার আগেই অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে এখানে। শ্রমিকরা অবাঙালী, তাদের নির্যাতনের সংবাদ শুনে স্থানীয় একটি কারখানা থেকে ছুটে এসেছে অন্য অবাঙালী, তাদের নির্যাতনের সংবাদ শুনে স্থানীয় একটি করখানা থেকে ছুটে এসেছে অন্য অবাঙালী শ্রমিকেরা। তারা সবাই ষণ্ডা পালোয়ান। এদিকে হাড় জিরজিরে, বুভুক্ষু মরীয়া উদ্বাস্তুরাও লাঠি-সোঁটা, খন্তা-শাবল যে যা পেয়েছে হাতে নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। একটা বড় রকমের দাঙ্গা বাধবার উপক্রম।

থানা বেশি দূরে নয়, পুলিশকে তাড়াতাড়ি আসতে হয়েছে বাধ্য হয়েই। বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা। এর গুরুত্ব অন্যরকম। স্থানীয় এম এল এ-ও এসেছেন, কারণ এ তো সাধারণ জবর দখলের ব্যাপার নয়। তিনি দু-পক্ষকেই বোঝাতে চাইছেন, কিন্তু চিৎকার হল্লায় কান পাতা দায়। উদ্বাস্তুরা বাঙাল ভাষায় কত রকম যে গালাগালি দিচ্ছে তা অনেকে বুঝতেই পারছে না।

বেলা বাড়ার আগে কাছাকাছি আর কয়েকটি জবর দখল বাগান বাড়ির বাসিন্দারা ধেয়ে এলো এই উদ্বাস্তুদের সমর্থনে। আবার হাতা-হাতি, ইঁট ছোঁড়াছুঁড়ি হলো এক পর্ব, পুলিশ দুটি টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটালো।

অসিতবরণের সেজো কাকা জলদবরণ বদরাগী ধরনের মানুষ। তাঁরা মাথায় বাবরি, গালের জুলপি ও গোঁফ পশ্চিমীদের ধরনে গালপাট্টা করা। জ্যাঠতুতো বোনের বর লক্ষ্মীকান্তও গোঁয়ার ধরনের। কাশীপুরের বাড়িটি বিক্রি করার সম্ভাবনায় তারা কয়েকদিন বেশ উৎফুল্ল ছিল, অকস্মাৎ একি উৎপাত। আসবার পথেই তাঁরা বরানগর থেকে কয়েকজন ষণ্ডামার্কা বাজারের গুণ্ডা সঙ্গে এনেছেন। এখানে এসে দেখলেন সেভাবে কিছু সুবিধে হবে না।

জলদবরণ কংগ্রেসী নেতাটিকে ডেকে নিজেদের পরিচয় দিলেন। মধ্যবয়স্ক, ছোটখাটো চেহারা। নেতাটি ভোর রাত থেকে এই ঝঞ্ঝাট সামলাতে সামলাতে নাজেহাল হয়েছেন। তিনি খুবই ক্লান্ত ও বিরক্ত। পুলিশ হুট করে গুলি চালিয়ে দিলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনেক অবনতি হবে। এই মনে করেই তিনি স্থানত্যাগ করতে পারছেন না।

জলদবরণের দলটিকে দেখে চোখ কপালে তুলে তিনি বললেন, আপনারা আবার এর মধ্যে এসে পড়েছেন কেন? চলে যান, চলে যান!

এমনভাবে কারুর আদেশ শোনায় অভ্যস্ত নন জলদবরণ। কোনোদিন তিনি সকাল দশটার আগে ঘুম থেকে ওঠেন না। আজ তাঁকে সাড়ে সাতটার সময় ডেকে তোলা হয়েছে বলে তখন থেকেই মেজাজ খারাপ। গত রাত্রির নেশা এখনো সম্পূর্ণ কাটেনি, চক্ষু রক্তাভ। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, সে কি মোয়াই, আমাদের নিজেদে বাড়ি, বাপ-পিতেমো কষ্ট করে বানিয়ে গ্যাচেন, সেখানে আমরা আসতে পারবো না? ঐ ভূতগুলো এসে দখল নেবে আর আমরা নো-হোয়্যার হয়ে যাবো?

কংগ্রেসী নেতাটি তাঁর বাহু ধরে টেনে পুলিশ ভ্যানের আড়ালে এসে দাঁড়ালেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, আপনাদের পরিচয় জানতে পারলে আরও হল্লা হবে। থানায় ডায়েরী করুন, তারপর কোর্টে কেস করুন, এখানে জোর খাটাবার চেষ্ট করবেন না।

সব জননেতার পাশেই অন্তত দু'তিনজন দেহরক্ষী থাকে। তাদের একজন বললো, আজকাল এদিকটাতে রিফিউজিদের ওপর হেভি সেন্টিমেন্ট। জোর করে হটাতে গেলে লাশ পড়ে যাবে। আপনাদের ওপরে ফার্স্টে অ্যাটাক হবে।

জলদবরণ বললেন, তা হলে আপনারা আছেন কী করতে? ভোটের সময় ভোট ভিক্ষে করতে আসেন, এদিকে ভিকিরির পাল জোর করে এসে বাড়ি দখল করবে, এ কি মগের মুল্লুক পেয়েচে নাকি?

তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগলো কিছুক্ষণ। অন্য এক কাকা চেষ্টা করতে লাগলো পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায় কি না। বাড়ির দুই জামাই সঙ্গে এসেছে। তাদের অভিমত এই যে, যা কিছু করার আজই করতে হবে। একবার ওদরে গেড়ে বসতে দিলে আর সরানো যাবে না।

অসিতবরণ প্রথম থেকেই একটাও কথা বলেননি। গম্ভীর, উদাসীন মুখ। আদ্দির পাঞ্জাবী ও কোঁচানো ধুতি পরা অসিতবরণকে দেখলে অনেকেই চলচ্চিত্র অভিনেতা ছবি বিশ্বাস বলে ভুল করে, শরীরের গড়নে ও মুখের আদলে কিছুটা মিল আছে। অসিতবরণ কিছুদিন আগেও বেশ আমুদে, হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন, মাস ছয়েক ধরে কথাবার্তা প্রায় একেবারে বন্ধ করেছেন। তাঁকে আনা হয়েছে একজন প্রধান শরিক হিসেবে, যে-কোনো সিদ্ধান্তে তাঁর মতামতের একটা মূল্য আছে। অথচ অসিতবরণ কোনো মন্তব্যই করেননি এ পর্যন্ত।

জলদবরণ কথা বলতে বলতে গলা চড়িয়ে ফেলতেই বেশ কিছু লোক এদিকে আকৃষ্ট হলো। নতুন গণ্ডগোলের সম্ভাবনায় পুলিশ নেমে পড়লো লাঠি হাতে। কংগ্রেসী নেতাটি হাতজোড় করে জলদবরণকে বললেন, আপনারা আর এখানে দাঁড়াবেন না, প্লীজ, অনুরোধ করছি, আরও গোলমাল পাকাবেন না। আপনারা আর এখানে দাঁড়াবেন না, প্লী, অনুরোধ করছি,আরও গোলমাল পাকাবেন না। আপনারা বরং বিধানবাবুর কাছে যান।

একটা ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি শুরু হতেই জলদবরণকে সদলবলে পশ্চাৎ অপসারণ করতে হলোই। তখুনি তাঁরা যাত্রা করলেন উকিল বাড়ির দিকে। অসিতবরণ যে সঙ্গে আসেননি তা তাদের খেয়ালই হলো না।

অসিতবরণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তার ঘাড়টা একটু কাৎ হয়ে গেছে, চোখের প্রায় পলক পড়ছে না।

এত রকম মানুষের কণ্ঠস্বর, এত উত্তেজনা কিছুটা যেন টের পাচ্ছেন না তিনি, শুধু এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন বাড়িটির দিকে।

॥ ৬ ॥

ছাত্র বয়েসে প্রতাপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল মামুন। প্রতাপের মতন সে-ও পড়তে এসেছিল কলকাতায়। ঢাকা অনেক কাছে হলেও উচ্চশিক্ষার অন্য সচ্ছল পরিবারের ছেলেদের কলকাতায় পাঠানোই রেওয়াজ ছিল তখন। অনেকটা বিলেত পাঠাবার আগের ধাপের মতন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে প্রতাপ এসে ভর্তি হয়েছিল শিয়ালদার কাছে রিপন কলেজে। প্রতাপের ইচ্ছে ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার, কিন্তু তাতে ভবদেব মজুমদারের সম্মতি ছিল না। ওঁদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি ছিল ঐ রিপন কলেজের গায়েই, সেখানেই প্রতাপের থাকার ব্যবস্থা। কলকাতার রাস্তায় কত রকম বিপদ-আপদ, যখন তখন ট্রাম-বাস ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে এসে পড়তে পারে। সুতরাং বাড়ির পাশে কলেজ পাওয়া তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।

প্রেসিডেন্সি কলেজে না পড়তে পারার দুঃখটা প্রতাপের মনের মধ্যে অনেকদিন রয়েগিয়েছিল। শিয়ালদা থেকে দুরত্ব অতি সামান্য। প্রতাপ তো পরে কতবার হেঁটে হেঁটেই কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছে। তাছাড়া যে আত্মীয়ের বাড়িতে প্রথম ওঠা হয়েছিল, তিন মাসের বেশি সেখানে টেকা যায়নি। ওরা সকাল-বিকালে জলখাবার দিত না। এক বিধবা মহিলা ছিলেন যেমন শুচিবায়ুগ্রস্তা তেমনি ঝগড়াটি, বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি পালা করে সারা দিন ধরে ঝগড়া চালিয়ে যেতেন। তাঁর গলার আওয়াজ শুনেই প্রতাপ 'কাংস-বিনিন্দিত কণ্ঠ' কথাটার মানে বুঝেছিল। অতিষ্ঠ হয়ে প্রতাপ সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক মেস বাড়িতে। কিন্তু তখন আর প্রেসিডেন্সি কলেজে ট্রান্সফার নেবার সময় ছিল না।

সেকেণ্ড ইয়ারে এসে মামুনের সঙ্গে সৌহার্দ্য হয় প্রতাপের। শ্যামলা রঙের বড় সড়ো চেহারা, মুখখানা চৌকো মতন, সেই বয়েসেই যথেষ্ট দাড়ি-গোঁফ উঠেছে। আপাতত মামুনকে রুক্ষ স্বভাবের মনে হয়, তার মুখের ভাব কঠিন ও গম্ভীর, কিন্তু আসলে সে অতিমাত্রায় লাজুক। ক্লাসে এসে একেবারে লাস্ট বেঞ্চিতে বসে, প্রফেসারদের বক্তৃতার সময় সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সামনের দিকে, সহপাঠীদের সঙ্গে একটিও কথা বলে না। কমন রুমে কিংবা কলেজের সামনের ফুটপাথের আড্ডায় তাকে দেখতে পাওয়া যায় না কখনো। ক্লাস শেষ হলেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্লাসের ছেলেরা আড়ালে তার নাম দিয়েছিল মোল্লা।

প্রতাপ প্রথম থেকেই জনপ্রিয়। সহজাত ব্যক্তিত্বের জন্য সে-কোনো ছোট-খাটো দলের নেতার

ভূমিকা পেয়ে যায়। বিশেষ কোনো চেষ্টা না করেই সে ম্যাগাজিন সাব কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে, কলেজের ফুটবল টিমেও সে স্থান পেয়েছে। তার বন্ধু-বান্ধব অনেক।

ক্লাসে পাঁচজন মুসলমান সহপাঠী, তাদের মধ্যে দু'জনকে পোশাক দিয়েই চেনা যায়। তারা পরে চাপা পায়জামা ও কলিদার পাঞ্জাবি, মাথায় সাদা রঙের টুপী, থুতনিতে নূর। তারা বাংলা বলে না। সবচেয়ে চাকচিক্যময় চরিত্র লুৎফর রহমানের, তাকে দেখতে পাক্কা সাহেবের মতন, তীক্ষ্ণ ধারালো মুখ সে থ্রি পীস সুট পরে এবং বাড়ির শোফার-চালিত অস্টিন গাড়িতে চেপে কলেজে আসে। পার্ক সার্কাসের এক বনেদী ধনী পরিবারের সন্তান সে, কথাবার্তায় দারুণ তুখোড়, ডিবেট কমপিটিশানে তার সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারে না। এই ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র পরেশ মুখার্জিকে লুৎফর রহমানের তুলনায় অনেক ম্লান মনে হয়।

লুৎফরকে ক্লাসের সবাই চেনে কিন্তু তার সঙ্গে কারুর ঠিক বন্ধুত্ব হয় না। সহপাঠীদের সে যেন একটু অবজ্ঞার চোখে দেখে, কেউ ঠিক তার ঘনিষ্ঠতার যোগ্য নয়, রূপে-গুণে সে অন্যদের মতন; মাঝে মাঝে সে কায়দা করে বাঁ হাতটা ঘুরিয়ে মুখের সামনে এনে কব্জী-বাঁধা ঘড়ি দেখে বলে, আজ নেক্স্ট ক্লাসটা অ্যাটেণ্ড করতে পারছি না, আমাকে চলে যেতে হবে। আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

ধনীর দুলাল লুৎফর পার্ক সার্কাস থেকে এত দূরের রিপন কলেজে পড়তে এসেছে কেন তার কারণ সে নিজেই জানিয়েছিল একদিন। এই কলেজে আছেন প্রফেসার বি ডি আইচ, তাঁর মতন ইংরেজী আর কেউ পড়াতে পারেন না, তাঁর কাছ থেকে খাঁটি ইংলিশ অ্যাকসেন্ট শেখবার জন্যই লুৎফর এত দূরে রিপন কলেজে এসেছে।

প্রফেসার বি ডি আইচের পড়ানো শুনলে প্রতাপের কিন্তু হাসি পেত। মানুষটি মধ্যবয়স্ক, চশমার লেন্স এত পুরু যে চোখ দেখা যায় না, মাথার চুল কাঁচা-পাকা ও অবিন্যস্ত, দাঁতে হলদে ছোপ। সারা বছরই তিনি কালোর রঙের কোট প্যান্ট পরে আসেন, সে দুটির অবস্থাও জরাজীর্ণ। তিনি নাকি অক্সফোর্ডের ভালো ছাত্র ছিলেন, বিলেতে বহু বছর কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেহারা ও পোশাক দেখলে ফুটপাতের ম্যাজিশিয়ান মিঃ ফক্সের কথা মনে পড়ে। ক্লাসে তিনি পারতপক্ষে বাংলা শব্দ উচ্চারণ করেন না, তাঁর ইংরেজী শব্দগুলো শুনলে মনে হয় তিনি সাহেবদের ক্যারিকেচার করছেন। তাঁর ভাবভঙ্গিও অনেকটা নাটকীয়, রোলকলের খাতাটা হাতে নিয়ে তিনি 'বয়েজ' বলে প্রথমেই একটা হুংকার দেন, তারপর প্রায় এক মিনিট চুপ করে তাকিয়ে থাকেন সবার মুখের দিকে।

প্রথম দিনেই তিনি প্রতাপকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। রোলকলের সময় প্রতাপ 'ইয়েস স্যার' বলতেই তিনি প্রতাপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চিবোনো ইংরেজীতে বলেছিলেন, বৎস, তোমার দেশ কোথায় পদ্মার ওপারে? অমন বীভৎস উচ্চারণে ইংরেজী ভাষার ক্ষতি করো না। বলো, ঈয়াস সা— । এইরকম পাঁচ ছ'বার চললো প্রতাপ বুঝতেই পারলো না, তার কোথায় ভুল হচ্ছে।

আর একদিন তিনি পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে গোটা ক্লাসকে ইংরেজী full শব্দটির উচ্চারণ শিখিয়ে ছিলেন। বাংলা 'ফুল' আর ইংরেজী full এক নয়। ইংরেজী full বলতে গেলে দাঁতের সামনে দিয়ে অনেকখানি হাওয়া ছেড়ে দিতে হয়। সবাইকে তিনি একসঙ্গে বলাতে লাগলেন, ফু-ল! ফু-ল! দাঁতের সামনে দিয়ে হাওয়া ছাড়ো! উহুঁ ঠিক হচ্ছে না। আরও হাওয়া ছাড়ো! না, না, ফু-ল-ল্-ল নয়, ফু-ল! শেষ পর্যন্ত তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, সকলেই বড়জোর fool পর্যন্ত বলতে পারে, একমাত্র লুৎফর রহমানই full মার্কস পাওয়ার যোগ্য।

এই বি ডি স্যার একদিন মামুনকে ক্লাসে থেকে বার করে দিয়েছিলেন, কারণ মামুন কিছুতেই অতি সাধারণ Gate শব্দটি উচ্চারণ করতে পারছিল না, সে বারবার বলছিল গ্যাট। মামুন তারপর থেকে আর কোনোদিন বি ডি স্যারের ক্লাসে আসেনি।

অনেকদিন পর প্রতাপ জেনেছিল যে বি ডি স্যারের পুরো নাম বামনদাস আইচ, তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ে ও অনেকগুলি পুষ্যি নিয়ে খুব অভাবের সংসার। তিনি লুৎফর রহমানের প্রাইভেট টিউটর। লুৎফরকে খুশী করবার জন্য তিনি প্রায়ই পরেশ আর বৈদ্যনাথ নামে দুটি ভালো ছাত্রকে হেনস্থা করতেন।

মামুনের আসল নাম সৈয়দ মোজাম্মেল হক। তার অন্য নামটি অনেকদিন পর্যন্ত জানা যায়নি। ম্যাগাজিন প্রকাশ করার সময় যখন ছাত্রদের কাছ থেকে রচনা আহ্বান করা হয় তখন একটি দীর্ঘ কবিতা পাওয়া গেল যার তলায় কবির স্বাক্ষরের বদলে শুধু লেখা, মামুন, দ্বিতীয় বর্ষ বিজ্ঞান। ঐ

নামের কোনো ছাত্রকে কেউ চেনে না। একদিন ক্লাস শেষ হবার পর প্রতাপ অধ্যাপকের ডায়াসে উঠে জিজ্ঞেস করলো, সবাই শোনো, এই কবিতা কে পাঠিয়েছে। মামুন কে? কোনো উত্তর না পেয়ে সে কবিতাটি পড়তে শুরু করে দিল :

ভাঙিল না ঘুম ঘোর, পোহালো না রাতি
অজ্ঞান তিমিরে পড়ি আজও বঙ্গজাতি
জননীর খুন ধারা অশ্রু হয়ে ঝরে
দুঃখীর আজান কেহ শুনে না অন্তরে।...

যদিও করুণ রসের কবিতা, তবু কৌতুক-প্রবণ যুবকেরা তা শুনে অট্টহাস্য শুরু করে দিল, প্রতাপের আর শেষ পর্যন্ত পড়াই হলো না। কেউ সেই রচনার পিতৃত্ব দাবিও করলো না।

প্রতাপ যদিও ম্যাগাজিন কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু সে সাহিত্যের বিশেষ ধার ধারে না। তার ঝোঁক খেলাধুলোর দিকে। সে কবিতার ভালো-মন্দ বোঝে না, সে শুধু চেয়েছিল কবিকে খুঁজে বার করে দীর্ঘ কবিতাটিকে ছেঁটে এক পাতার মতন করে দিতে অনুরোধ জানাবে।

বৈদ্যনাথ নামে আর একটি চালু ছাত্র বললো, দেখি, দেখি হাতের লেখাটা চেনা যায় কি না।

কাগজটা নিয়ে পড়ার পর সে বললো, হ্যাঁ, চিনি, এ তো মোল্লার হাতের লেখা! সে-ও কবি নাকি? হেঃ! কাজী নজরুল আজকাল সব মোসলমান ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে! সবাই কবি হতে চায়। কবি না কপি, ছিঁড়ে ফেলে দে!

সেদিন সন্ধ্যেবেলা প্রতাপ বৈঠকখানা বাজার থেকে পাটালি গুড় আর মাখন কিনে ফিরছে, মুসলমান পাড়া লেনের কাছে সে মামুনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। এতদিন মামুনের সঙ্গে তার একটিও কথা হয় নি। এবারে মামুন নিজে থেকেই এগিয়ে এসে বললো, ভাই মজুমদার, তোমাকে একটা অনুরোধ করি। আমার ভুল হয়েছে। ও লেখা আমি সওগাত-এ পাঠাবো।

প্রতাপের বুকটা কেঁপে উঠেছিল। বৈদ্যনাথ যে তার কাছ থেকে লেখাটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে, এখন সে ফেরৎ দেবে কী করে? এই ছেলেটি বলছে, কপি রাখেনি। ছিঁড়ে ফেলাটা অন্যায় হয়েছে।

সে দোষ কাটাবার জন্য বললো, কেন ফেরৎ নেবে? ও কবিতা আমরাই ছাপাবো। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম যে কে লিখেছে!

মামুন বললো, না, না, তার দরকার নাই। ও কবিতা তোমাদের ভালো লাগবে না, তোমরা ঠাট্টা করছিলে...।

হঠাৎ মামুন মুখটা ফিরিয়ে নিল, প্রতাপ অত্যাশ্চর্য হয়ে দেখলো যে মামুনের চোখে জল এসে গেছে।

প্রতাপ নিজে কবিতা লেখে না, একটা কবিতা ছাপানো বা না-ছাপানোয় একজন কবির কী যে আনন্দ বা মর্মবেদনা তা সে বুঝবে না। সামান্য একটা কবিতার ব্যাপার নিয়ে যে সৈয়দ মোজাম্মেল হক-এর মতন একজন বলবান যুবক কেঁদে ফেলতে পারে তা সে কল্পনাই করতে পারে নি।

সে মামুনের কাঁধে হাত রেখে জোর দিয়ে বললো, আরে, তুমি এমন ভেঙে পড়ছো কেন? তোমার কবিতা আলবাৎ ছাপা হবে। আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট...তবে ঐ কবিতাটা বড় লম্বা, চার পাতা লেগে যাবে, তুমি যদি দেড়/দু'পাতার মধ্যে আর একটা দিতে পারো— ।

সেই থেকে মামুনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। মামুন কুমিল্লার ছেলে, এখানে তার বন্ধু-সাথী বিশেষ কেউ নেই। লোকজনের মাঝখানে সে চুপচাপ থাকলেও প্রতাপের কাছে সে অনেক কথা বলে। তার অনেক স্বপ্ন আছে।

মামুনের কবি-পরিচিতি রটে যাওয়ায় এরপরে ক্লাসে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল তাকে। বিজ্ঞানের ছাত্রদের কবিতা লেখাটা যেন একটা অপরাধ! যদিও তাদের ইংরেজী বাংলা পড়তে হয়, কিন্তু ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকসই তাদের আসল সাবজেক্ট। আর্টসের ছাত্রদের সঙ্গে অনেক সময় তাদের ইংরেজী বাংলা কমবাইণ্ড ক্লাশ করতে হয়, তখন আর্টসের ছাত্ররা তাদের ইংরেজী বাংলা জ্ঞান নিয়ে ব্যঙ্গ করে। আর্টসের ছাত্রদের মধ্যে তিন চারজন গল্প কবিতা লেখে। সুবিমল নামে একটি ছেলে তো বেশ বিখ্যাত, তার তিনটি কবিতা ছাপা হয়েছে কল্লোল পত্রিকায়। এই সুবিমল আবার নজরুলের খুব ভক্ত। তার আর একজন আরাধ্য দেবতা হলো বুদ্ধদেব বসু নামে একজন তরুণ লেখক। সে প্রায়ই বলে, রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ, এখন আধুনিকদের যুগ এসেছে!

সেই সুবিমল মামুনের কবিতার লাইন তুলে তুলে ছন্দের ভুল দেখায়। মামুনকে করুণার পাত্র

মনে করে সে উপদেশ দিয়ে বলে, ওহে, নজরুলের কবিতা আগে ভালো করে বুঝতে শেখো! কত বড় একখানা হৃদয় তাঁর। নজরুল শুধু হিন্দুর নয়, শুধু মুসলমানের নয়, তিনি এই নব্য বাংলার প্রধান মুখপাত্র। তিনি আমাদের যৌবনের ভাষা দিয়েছেন, বুঝলে? কিন্তু তাকে অনুকরণ করতে গেলেই তুমি ডুববে! তুমি মুসলমান বলেই যে নজরুলের অনুকরণ করবে তার কি কোনো মানে আছে? নজরুল রক্তের বদলে খুন শব্দটা ব্যবহার করেছেন বলে তোমাকেও করতে হবে?

এই সব তর্কের সময় প্রতাপ বিশেষ কিছু না বুঝেও মামুনের পক্ষ নেয়। তার কারণ সুবিমলের হামবড়া ভাবটা তার ভালো লাগে না। সুবিমলের চাঁছাছোলা উচ্চারণের কথাবার্তাও অনেকটা দূরত্ব এনে দেয়, সেই তুলনায় লাজুক স্বভাবের মামুনকে তার আপন মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত এমন হলো যে একটুক্ষণের জন্যও দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কলেজের পরেও দু'জনে একসঙ্গে ঘোরে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় বা থিয়েটার-বাইস্কোপ দেখতে যায়, অথবা পার্কে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকে। কী সুন্দর ছিল তখন কলকাতা শহর। রাস্তাগুলি ঝকঝকে তকতকে, দু'বেলা করপোরেশানের লোক সব রাস্তা ধুয়ে দিয়ে যায়। কোনো বাড়ির রং নষ্ট হয়ে গেলে বা অনেকদিন মেরামত না হলে বাড়ির মালিককে করপোরেশান নোটিশ দেয়। ট্রামগুলি ছোট ছোট স্টিমারের মতন, যেন জল কেটে এগিয়ে আসে। দুপুরের দিকে ফাঁকা ট্রামে ঘুরে বেড়ানোটাই একটা আনন্দের। দু'পাশের দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই জুড়িয়ে যায় চোখ।

একদিন ওরা দু'জনে মিলে 'ধ্রুব' নামে একটা বাইস্কোপ দেখতে গেল। তখন টকি চালু হয়ে গেছে, বাইস্কোপের পাত্র-পাত্রীরা কথা বলে, গান গায়। ধুতি পরা নারদমুনি যে-ই গান গাইতে গাইতে ঢুকলো অমনি মামুন উত্তেজিত ভাবে বললো, নারদ কে সেজেছেন জানিস? উনি কাজী নজরুল ইসলাম!

প্রতাপ অবাক। কবি নজরুল যে বাইস্কোপেও পার্ট করেন তা তার জানা ছিল না, এর আগে সে নজরুলের গান শুনেছে বটে। 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল', এই গানখানি তো সকলের মুখে মুখে।

মামুন পর পর তিনবার দেখলো ঐ ধ্রুব বাইস্কোপ, তবু তার আশ মেটে না। সে বললো, প্রতাপ, একদিন নজরুলকে দেখতে যাবি, উনি তো এখন কলকাতাতেই আছেন শুনেছি। যাবি? আমার একা যেতে সাহস হয় না"

খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে কবি নজরুল এখন আছেন উনচল্লিশ নম্বর সীতারাম রোডে, তা ছাড়া তিনি 'কলগীতি' নামে একটি রেকর্ডের দোকানও খুলেছেন। ভেবে চিন্তে দোকানে দেখা করাই ঠিক হলো। কিন্তু পর পর চারদিন সেই দোকানে গিয়েও কোনো সুবিধে হলো না। দোকানে অন্য কর্মচারী বসে, কবি রোজ আসেন না। পঞ্চম দিনে আকস্মিক ভাবে সাক্ষাৎ। ওরা দু'জনে 'কলগীতি' থেকে রেকর্ড দেখে বেরিয়ে আসছে, এমন সময় বাইরে থামলো একটি বিরাট ক্রাইসলার গাড়ি, তার থেকে যিনি নামলেন তাঁকে দেখা মাত্র ওদের চিনতে ভুল হলো না।

হাবিলদার কবি এতদিনে বেশ মোটাসোটা, নাদুস-নুদুস হয়েছেন, মাথায় বাবড়ি চুল, চোখ দুটি টানা টানা, মনে হয় সুর্মা লাগানো, মুখ ভর্তি পান। তাঁর পাঞ্জাবিটি কমলা রঙের, সেই রঙেরই একটা উড়নি কাঁধের ওপর ফেলা। কবি এই দুটি যুবককে দেখতে পেলেন না, দোকানে ঢুকে গেলেন।

প্রতাপ মামুনকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বললো, যা, কথা বল!

কিন্তু মামুনকে এখন রাজ্যের লজ্জা পেয়ে বসেছে, সে এগোতে পারছে না, সে বললো, প্রতাপ, তুই আগে কথা বল।

প্রতাপ কী কথা বলবে? সে তো কবিতা বিষয়ে কিছু জানে না। সে ঠেলতে লাগলো মামুনকে, মামুনও কিছুতেই যাবে না। এই রকম যখন চলছে তখন নজরুল আবার বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে।

এবারে দু'জনে বসে পড়ে ঝুপঝুপ করে প্রণাম করলো তাঁর পায়ে হাত দিয়ে। কবি একটু যেন অন্যমনস্ক, তিনি প্রতাপের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে, মোতাহারের ব্যাটা না?

প্রতাপ বললো, আজ্ঞে না।

নজরুল উদাসীন ভাবে বললেন ও। ভালো থাকো। ভালো থাকো।

তারপর উঠে গেলেন গাড়িতে।

প্রতাপ বললো, মামুন, তুই কী রে, এত কাছে পেয়েও কথা বললি না?

মামুন তখনও যেন উত্তেজনায় কাঁপছে। সে বাষ্পাচ্ছন্ন গলায় বললো, প্রণাম করতে পেরেছি, এই তো ঢের!

খানিকদূর যাবার পর মামুন আবার বললো, প্রতাপ, এমন ভাবে একদিন কবিগুরুকে প্রণাম করে আসতে পারি না? সুবিমলরা যাই বলুক, রবীন্দ্রনাথই এখন আমাদের কবি সম্রাট। জোড়াসাঁকো কত দূরে রে?

এর পরের কয়েকদিনে জোড়াসাঁকো যাওয়ার পথের সন্ধানও জেনে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কবিগুরুর দর্শন লাভের জন্য আর যাওয়া হলো না। ঝপ করে পুজোর ছুটি পড়ে গেল।

সুহাসিনী শপথ করে নিয়েছিলেন, প্রতাপ প্রতি সপ্তাহে একখানি করে চিঠি লিখবে আর বছরে অন্তত তিনবার দেশের বাড়িতে যাবে। প্রতাপকে কলকাতায় পড়তে পাঠানোতে সুহাসিনীর আপত্তি ছিল। তাঁর একমাত্র পুত্র, তাকে ছেড়ে তিনি বেশিদিন থাকতে পারেন না। প্রতাপেরও দেশের বাড়ির জন্য মন ছটফট করে। কিন্তু এবারে পূজাবকাশের দীর্ঘ এক মাস মামুনকে ছেড়ে থাকতে হবে, এই চিন্তাটাও বড় কষ্টকর। শেশ পর্যন্ত একটা রফা হলো।

ছাত্র আন্দোলনের জন্য এবার সাতদিন আগেই পুজোর ছুটি দেওয়া থাকতে পারে। আবার ছুটি শেষ হবার সাতদিন আগে মামুন চলে আসতে পারে প্রতাপদের বাড়ি মালখানগরে।

শিয়ালদা থেকে প্রতাপ আর মামুন এক সঙ্গেই ট্রেনে চেপে বসলো। কুমিল্লায় দাউদ কান্দি থেকে মাইল পাঁচেক দূরে মামুনদের গ্রাম।

সময় তো দর্পণের মতন থেমে থাকে না, সময় নদীর স্রোতের মতন বয়ে চলে। তবু দর্পণের প্রতিবিম্বের মতন এক একটি ছবি সময়ের স্রোতের মধ্যেও স্থির হয়ে থাকে।

॥ ৭ ॥

মেঘনা নদী পার হয়ে দাউদ কান্দি ফেরীঘাট থেকে হাঁটা পথ। প্রতীপের মনে আছে, কী সাংঘাতিক মেঘ ছিল সেদিন। আকাশ ও জল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নদীতে সমুদ্রের মতন ঢেউ, গয়না নৌকোর মাঝিরা গাজী গাজী রব তুলেছিল। প্রকৃত ঝড় শুরু হলো ফেরীঘাটের পৌছোবার পর।

তখন দুপুর তিনটে, কিন্তু ঝড় এলো যেন এক রেলগাড়ি ভর্তি অন্ধকার নিয়ে। চৈত্র-বৈশাখ মাস হলেও কথা ছিল, আশ্বিনে এমন ঝড় যেন অবিশ্বাস্য! প্রতাপ আর মামুন দাঁড়ালো না, ছুলো বাড়ির দিকে। মামুনের হাতে গোলাপ ফুল আঁকা টিনের সুটকেশ, প্রতাপের হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ। প্রতাপ তার বাকি জিনিসপত্র স্টিমারের এক সহযাত্রীর হাত দিয়ে ঢাকায় এক আত্মীয়দের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেই দিনটির অভিজ্ঞতা কোনোদিন ভোলার নয়। ঝড় যে মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, তা বিশ্বাস করা সহজ নয়, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল তা অসম্ভব নয় মোটেই। মাঠের মধ্যে এসে প্রতাপ আর মামুন ঝড়ের ধাক্কায় পড়ে যাচ্ছিল বারবার। আকাশের মেঘের ডাক যেন মহাকালের গর্জন, আর বাতাস যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির হাত, ওদের চুলের মুঠো ধরে টানছে। প্রতাপ সত্যিকারের মৃত্যু ভয় পেয়েছিল সেদিন, বিশেষত সেই মুহূর্তটায়, যখন কিছু যেন একটা জীবন্ত জিনিস প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারলো তার মাথায়। সেটা ছিল একটা শঙ্খচিল, ঝড়ের দাপটে সে একটা গুলির মতন ছিটকে এসেছিল।

গাছতলায় দাঁড়াবার উপায় নেই, মড় মড় করে ভেঙে পড়ছে গাছ, ডালপালা উড়ে যাচ্ছে ওপর দিয়ে। বজ্রপাত হলে উঁচু গাছের ওপরই পড়বে তাই ওরা ফাঁকা মাঠের দিকে চলে যেতে চায়। আউস ধান কাটা হয়ে গেছে শুকনো খড়ের গোড়া পায়ে বেঁধে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কায় ওরা দু'জনে দু'জনের হাত শক্ত করে ধরে আছে, তবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। বসে পড়লেও ঝড় ওদের ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়। সুটকেস আর ব্যাগ আগেই ফেলে দিতে হয়েছে, মাটিতে গড়াগড়ি-খেতে খেতেও ওরা পরস্পরকে ছাড়লো না।

তারপর এক সময় বৃষ্টি নামলো।

দু'জনেই শক্ত-সমর্থ যুবক, তবু সেই ঝড় যেন ওদের প্রাণশক্তি অনেকখানি নিঙড়ে বার করে নিয়েছিল। বৃষ্টিতে পুনর্জীবন প্রাপ্তির আনন্দ।

বাড়ি পৌঁছোলো জল-কাদা মেখে ভূত হয়ে। বৃষ্টি থামার পর ওরা ব্যাগ ও সুটকেস উদ্ধার করেছে, ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি বিশেষ; প্রতাপের ঘাড়ের কাছটা চিলের আঁচড়ে ছড়ে গেছে, মামুনের বাঁ পাটা একটু মচকেছে।

পুকুরঘাটে পা ধুতে ধুতে মামুন বললো, তোকে আগে বলিনি, আমার বাবা একটু কড়া ধরনের মানুষ, কথায় কোনো মিষ্টতা নেই। তুই যেন কিছু মনে করিস না। তবে আমার আম্মুকে তোর খুব ভালো লাগবে। আমাদের বাড়িতে গোরু-গোস্ত ঢোকে না, সেদিক দিয়ে তোর চিন্তা নেই।

প্রতাপ বললো, তোদের বাড়িটা তো ভারি সুন্দর রে? ঠিক ছবির মতন।

মামুন বললো, অনেকগুলো ঘর আছে, তোকে যে ঘরটা দেবো, তাতে কী চমৎকার চাঁদের আলো আসে দেখিস। কাল তো পূর্ণিমা...ও হ্যাঁ, প্রতাপ, তুই আমার বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিস না।

- কেন? আমি যে কাজী নজরুলকে-

- কবিদের কোনো জাত নাই। কিন্তু আমার বাবা খুব কট্টর, উনি হিন্দুদের ছোঁয়া সহ্য করেন না।

একটু হেসে মামুন আবার বললো, আমার সৈয়দের বংশ তো, আমরা হিন্দুদের ছোট জাত মনে করি!

ঝড়ে এ বাড়ির একটি জাম্বুরা গাছ উপড়ে পড়ে গেছে। গাছটি ফলে ভর্তি। কতকগুলি শিশু ফলগুলি ছেঁড়ার জন্য দাপাদাপি করছে সেখানে। প্রতাপদের বাড়িতেও অনেকগুলি ঐ গাছ আছে। অত ফল কে খাবে! প্রতাপের মনে পড়লো, শৈশবে সে বড় বড় বাতাবি লেবু গাছ থেকে পেড়ে ফুটবল খেলতো।

মামুনদের বাড়িটি সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো। একটি বেশ বড় চৌকো উঠোনের তিন দিকে সারি সারি ঘর। অন্য একটি খোলা, তার পাশেই আর আর একটি দীঘি। উঠোনের এক পাশে দুটি ধানের গোলা। ঘরগুলির মধ্যে দুটি মাত্র পাকা দালান, সামনে চওড়া বারান্দা, অন্য ঘরগুলি মাটি ও টিনের।

বারান্দাটিতে একজন শীর্ণ, দীর্ঘকায় মানুষ নামাজ পড়ছিলেন, মামুন আর প্রতাপ কাছাকাছি আসতেই তাঁর নামাজ শেষ হলো, তিনি ঘাড় ফিরিয়ে দু'জনকে দেখে প্রতাপের দিকেই কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

মামুন এগিয়ে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে কদমবুসি করে বললো, আব্বা, এ আমার সহপাঠী, কলেজে আমাকে অনেক সাহায্য করে, আমাদের গ্রাম দেখতে এসেছে।

সৈয়দ আবদুল হাকিমকে দেখলেই বোঝা যায় তাঁর আলাদা ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে। তাঁর চেহারায় বৈশিষ্ট্য নেই, তাঁর পোশাক ও প্রায় সর্বক্ষণের জন্যই লুঙ্গি ও ফতুয়া, শুকনো মুখখানিতে বার্ধক্যের ছাপ পড়ে গেছে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব তাঁর চোখে। তাঁর চোখের মণি দুটি ঠিক কালো নয়, ধূসর বর্ণের, তিনি অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রখর এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

মামুনের কথা শুনে তিনি প্রসন্নভাবে বললেন, গ্রাম দ্যাখতে আইছো। আমাগো গ্রামে আর কী দ্যাখবা, চাইর দিকেই তো শুধু পানি...আসো, বসো। হিন্দুবাড়ির ছাওয়াল মনে হয়? শাকিন কোথায়?

প্রতাপ বললো, আজ্ঞে, আমাদের বাড়ি বিক্রমপুরে, মালখানগরে।

একটুক্ষণ ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে চিন্তা করে হাকিম সাহেব বললেন, মালখানগর? তুমি জাতিতে কায়স্থ? মালখানগর তো আরও সুন্দর জায়গা, আমি গেছে।

মামুন আর প্রতাপ যে এই প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এসে পৌঁছোলো সেজন্য তিনি কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতাপের বাড়ির খবর নিতে লাগলেন। প্রতাপের বাবার পরিচয়, পেশা, কত বিঘে ধান জমি এসবও তিনি জানতে চাইলেন। এদিকে প্রতাপ আর মামুনের গায়ে ভিজে পোশাক, এখন ঠান্ডা হাওয়ায় ওদের শীত লাগছে।

এক সময় মামুন বললো, আব্বা, আমার কুর্তা বদলিয়ে আসি?

হাকিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বন্ধুটি থাকবে কোথায়?

মামুন বললো, পশ্চিমের শেষের ঘরখানায় শোবে। ঐ ঘরখানা ভালো, রাত্তিরে বাতাস আসে।

থুতনিতে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে সৈয়দ আবদুল হাকিম তাঁর ছেলের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তুই ভিতরে যা। ও আমার ঘরে পোশাক বদল করে নিক। এসো বাবা, এসো—।

তিনি প্রতাপকে নিয়ে এলেন পার্শ্ববর্তী পাকা ঘরটিতে। নিজে প্রতাপের ক্যাম্বিসের ব্যাগটি বয়ে এনে বললেন, দরজা বন্ধ করে লও, গামছা আছে তো সঙ্গে, না দেবো? আছে, তো মাথা মুছে লও

ভালো করে, যা প্রয়োজন হবে চাইবে, কোনো সঙ্কোচ করো না...।

ঘরটিতে একটি পুরোনো আমলের পালঙ্ক, একটি মর্চে পরা লোহার সিন্দুক রয়েছে। সেই সিন্দুকের ওপর অনেকগুলি 'মোহাম্মদী' পত্রিকার কপি। এটি মামুনের বাবার নিজের শয়নকক্ষ, উনি কি প্রতাপকে এই ঘরে রাখতে চান? প্রতাপ ঠিক করলো, তাতে সে ঘোরতর আপত্তি জানাবে। ইঁটের দেয়ালের ঘরে থাকার তার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই, কলকাতায় তো সেরকম কিছুটা কাঁচা, বাল্যকাল থেকেই সে তার এক পিসীমার সঙ্গে একটা কাঁচা ঘরেই শুয়েছে।

তাড়াতাড়ি ভিজে পোশাক পরিবর্তন করে প্রতাপ বাইরে বেরিয়ে এলো। ততক্ষণে বারান্দায় কয়েকটি জলচৌকি পাতা হয়েছে, মামুনের বাবা একটি জলচৌকিতে বসে হুঁকো টানছেন, প্রতাপকে দেখে বললেন, বসো বাবা, বসো, মামুন আসতেছে।

বেশ কিছুক্ষণ তিনি নীরবে হুঁকো টেনে চললেন। নেমে এসেছে অকাল সন্ধে, এ বাড়িতে এখনো বাতি জ্বলেনি, দূরের একটা ঘর শোনা যাচ্ছে বাচ্চাদের কলকণ্ঠ, একজন কেউ কয়েকটি গরু ও বাছুর নিয়ে চলে গেল গোয়ালঘরের দিকে। প্রতাপদের বাড়িতে নতুন কেউ এলে বাড়ির অনেকেই এক সঙ্গে ভিড় করে তার কাছে বসে। এ বাড়িতে সেরকম প্রথা নেই দেখা যাচ্ছে।

একটু পরে একটি বালক এক কাঁসার বাটি ভর্তি মুড়ি, দুটি সবরি কলা ও গরম দুধ এনে রাখলো প্রতাপের সামনে। ক্ষণিকের জন্য হুঁকো টানা থামিয়ে হাকিম সাহেব বললেন, খাও বাবা, খাও, ক্ষুধা পেয়েছে নিশ্চয়, কত দূর থেকে এসেছো।

খিদে সত্যিই পেয়েছে, প্রতাপ লজ্জা করলো না, খেতে শুরু করে দিল। দুধে তার অভক্তি, বাড়িতে মা অনেক জোর করলেও সে দুধ খেতে চায় না, কিন্তু এখানে মামুনের বাবার সামনে সে আপত্তি জানাতে সাহস পেল না। ওঁকে সে কী বলে সম্বোধন করবে সেটা ভেবে পাচ্ছে না। চাচা বলা যায় না, কারণ, উনি প্রতাপের বাবার চেয়ে বয়েসে ঢের বড়। মামুন বলেছিল, তারা আট ভাই-বোন, সে-ই সর্বকনিষ্ঠ। জ্যাঠামশাইকে এরা যেন কী বলে?

একটু পরে মামুনও একটা মুড়ির বাটি হাতে নিয়ে এলো, তার মুখ গম্ভীর, প্রতাপের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ফিরিয়ে নিল মুখ।

হুঁকোটা নামিয়ে রেখে সৈয়দ আবদুল হাকিম দু'বার কাশলেন। পাশে রাখা একটা ঘটি তুলে আলগোছে কয়েক ঢোক জল খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছলেন। তারপর প্রতাপের দিকে চাইতেই প্রতাপ বললো, জ্যাঠামশাই, আপনার ঘর...

প্রতাপকে থামিয়ে দিয়ে হাকিম সাহেব বললেন, শোনো, বাবা, তুমি আমার বাড়িতে মেহমান হয়ে এসেছো, তোমাকে একটা কথা বলতে আমার বড় কষ্ট লাগছে, তবু বলতেই হবে। আমার বাড়িতে কোনো হিন্দুরে আমি স্থান দিতে পারি না। আমার পিতার নিষেধ আছে। মামুনটা ও বৃত্তান্ত জানে না তাই তোমারে নিয়ে এসেছে। আমার যেমন কোনো হিন্দু বাড়ির ত্রিসীমানায় রাত্রবাস করি না, সেই রকম আমাদের বাড়িতেও...

মামুন বললো, আব্বা!

হাকিম সাহেব বললেন, তুমি থামো! শোনো বাবা, প্রতাপ, তুমি মামুনের সহপাঠী, তুমি এখানে এসে পড়েছো, বাড়িতে অতিথি এলে ফিরিয়ে দেওয়াটা বড় খারাপ, কিন্তু পারিবারিক প্রথা তো অমান্য করতে পারি না। তা বলে তুমি পানিতে তো পড়োনি, তোমার ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই। পাশের গ্রামের সত্যসাধন চক্রবর্তী আছেন, অতি সজ্জন, আমার এক সাথে জেলা ইস্কুলে পড়েছি, উনি দু'ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। তাঁর বাড়িতে তুমি ভালোই থাকবে। আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাবো...

রাগে-অভিমানে প্রতাপের বুক উদ্বেল হয়ে উঠলো। সে মামুনের সঙ্গে থাকবে বলে এতদূর এসেছে, তার বদলে কোন এক অচেনা লোকের বাড়িতে তাকে আশ্রয় নিতে হবে? কেন, সে কি ভিখিরি নাকি? এতক্ষণে নিজের বাড়ি পৌঁছোলে তাকে ঘিরে হইচই পড়ে যেত। তার মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জোর করে কতরকম খাবার খাওয়াতেন, দিদিরা এসে জিজ্ঞেস করতো কলকাতার খবর, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকতো। প্রত্যেকবার তার বাড়ি ফেরাই একটা উৎসবের মতন। আর এখানে...।

প্রতাপ দপ করে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললো, আমি ফিরে যাচ্ছি।

মামুন সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরলো তার হাত। কাতরভাবে শুধু বললো, প্রতাপ, প্রতাপ!

প্রতাপ ঝটকা দিয়ে তাকে ঠেলে ফেরে দেবার চেষ্টা করলো। মাত্র দু'এক ঘণ্টা আগে তারা দু'জনে ঝড়ের মুখে আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে ছিল।

প্রতাপ রুক্ষভাবে বললো, ছাড় মামুন, আমি বাড়ি ফিরে যাবো!

মামুন বললো, এখন ফেরি বন্ধ হয়ে গেছে, এখন যাওয়া যাবে না।

প্রতাপ বললো, অন্য নৌকো দেখবো, যত টাকা লাগে লাগুক, না পেরে সাঁতরে যাবো। আমি ভয় পাই নাকি!

হাকিম সাহেব শান্তভাবে তামাক টানছেন। এবারে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, শোনো বাবা, রাগ করো না, বুঝে দেখো। তোমাদের বাড়িতে হঠাৎ অন্য জাতের কোনো অতিথি এলে তোমার পিতা-মহাশয়ও হয়তো অসুবিধায় পড়তেন।

প্রতাপ জ্বলন্ত চোখে হাকিম সাহেবের দিকে তাকালো। সে প্রায় বলতে যাচ্ছিল, আমার বাবা মোটেই সংস্কারগ্রস্ত নন, সুলেমন চাচা নিয়মিত আমাদের বাড়িতে দাবা খেলতে আসেন, আজিজ চাচা একবার টানা সাতদিন ছিলেন আমাদের বাড়িতে...। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিল। পিতৃস্থানীয় কারুর মুখে মুখে কথা বলা স্বভাব নয় তার।

সে আবার জোর দিয়ে বললো, আমি ফিরে যাবো!

হাকিম সাহেব বললেন, না, না, তুমি ফিরে গেলে বড় দুঃখ পাবো! তোমার থাকার ভালো ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, সে বাড়ি মোটেই দূর নয়। সারাদিন তুমি এখানেই কাটাবে মামুনের সাথে, রাত্তিরটা শুধু শুতে যাবে সেখানে। ওরে, একটা হ্যারিকেন আন্।

প্রতাপ বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা দৌড় লাগালো। মামুনও ছুটলো তার পিছু পিছু। মামুনের বড় এক ভাই আনিসুল আড়ালে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, সে-ও এবার বেরিয়ে এলো। মামুন আর আনিসুল একটা দূরেই দু'দিক থেকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলো প্রতাপকে।

মামুন বললো, প্রতাপ, আমি ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা চাইছি, তোর পায়ে ধরছি।

আনিসুল বললো, ভাই, আমার আব্বা বড় জেদী, তাঁর ওপরে আমরা কথা বলতে সাহস পাই না। তুমি এমনভাবে যদি চলে যাও, তা হলে আমাদের দুঃখের শেষ থাকবে না। মামুনকে তো তুমি চেনো। ও বড় নরম, ও যে কী করবে তার ঠিক নাই। আজ রত্তিরটা অন্তত চক্রবর্তীদের ওখানে থাকো, তারপর কাল যদি যেতে চাও আমি নিজে গিয়ে তোমারে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

হাতে একটি হ্যারিকেন নিয়ে হাকম সাহেবও সেখানে এসে গেলেন। ধীর স্বরে বললেন, বাবা প্রতাপ, তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি, তাতে আমরাও দুঃখ হয়েছে। কিন্তু পিতার আজ্ঞা তো অগ্রাহ্য করতে পারি না। তোমার পিতা যদি কোনো নির্দেশ দেন, তুমি কি তা অমান্য করতে পারো?

প্রতাপ মনে মনে ফুঁসতে ফুঁসতে বললো, আমার বাবা কোনো নির্দেশ দিলে তা আমি কোনোদিনই মানবো না!

মামুন আর আনিসুল তার দু'হাত ধরে একপ্রকার টেনেই নিয়ে চললো তাকে। বাকি রাস্তা কেউ কোনো কথা বললো না। বৃষ্টির পর পথ একেবারে পিচ্ছিল। মেঘলা রাত, অদূরের কিছুই দেখা যায় না। কু-উক, কু-উ-ক শব্দে কী একটা অদৃশ্য রাত-পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে শুধু।

চক্রবর্তীদের বাড়ি বেশি দূর নয় ঠিকই। মিনিট পনেরো মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া গেল। বাড়ির মধ্যে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। বাইরে থেকে হাকিম সাহেব ডাকলেন, সত্যদা, সত্যদা!

কে? বলে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক পৌঢ় ব্রাহ্মণ। ফর্সা, মাঝারি ধরনের উচ্চতা, শুধু ধুতি পরা, বুকে পেতে। খড়ম খটখটিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে রে? হাকিম নাকি রে?

হাকিম সাহেব বললেন, হ্যাঁ, সত্যদা। আপনার পূজো-আচ্চা সারা হয়ে গেছে? ব্যাঘার্ত করলাম না তো?

সত্যসাধন বললেন, না, না, আয়, ওপরে উঠে আয়। মামুন ফিরেছে বুঝি? সঙ্গে ওটি কে? ওরে ভোলা, একটা মাদুর নিয়ে আয়।

হাকম সাহেব বললেন, আপনার বাড়িতে একজন অতিথি এনেছি।

সত্যসাধন চক্রবর্তীরও পাকা দালান। উঠোনে তুলসীর মঞ্চ, এক কোণে দেব-দেউল। তাঁর প্রসন্ন মুখখানিতে আর্থিক সাচ্ছলতার ছাপ।

সামনের বাঁধানো চাতালে মাদুর পেতে বসা হলো। হাকিম সাহেব সংক্ষেপে প্রতাপের পরিচয়

জানালেন। প্রতাপের মনের মধ্যে এখনো রাগ রয়ে গেছে বলে সে সত্যসাধন চক্রবর্তীকে প্রণাম করতে ভুলে গেল। সে তখনো চিন্তা করে যাচ্ছে যে আজ রাতটা কোনো মতে কাটিয়ে কালই সে মালখানগরে ফিরে যাবে।

হাকিম সাহেবের সঙ্গে সত্যসাধনের বেশ সৌহার্দ্য, হালকা তামাসার সুরে কথা বলতে লাগলেন দু'জনে। সত্যসাধন প্রতাপকে দেখে খুশী হয়েছেন। তিনি বললেন, বড় ভালো করেছিস হাকম, ওকে এনেছিস, বাড়িতে আর দ্বিতীয় পুরুষ মানুষ নেই। তবু কথা বলার একজন লোক পাওয়া যাবে।

একটু পরেই হাকিম সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ অনেক ধকল গেছে, ওরা ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে এসেছে, এবার বিশ্রাম করুক। চলরে মামুন, আমরা যাই!

ওদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসার পর সত্যসাধন প্রতাপকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কথা কম কও বুঝি?

প্রতাপ নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। সে চেষ্টা করে ফ্যাকাসেভাবে হেসে বললো, আজ্ঞে না, এমন ঝড়ের মুখে পড়েছিলাম যে সারা শরীর ব্যথা হয়ে গেছে।

সত্যসাধন বললেন, খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। শোনো, তোমারে আগেই একটা কথা বলে দেই। আমাদের বাড়িতে অতিথি আসা নতুন কিছু নয়। অতিথি আসলে আমরা খুশী হই। তুমি নিজের বাড়ি মনে করে থাকবে এখানে। ছাদে একখানা ঘর আছে, সেখানে তুমি থাকবে, যদি পড়াশুনা করতে চাও, ব্যাঘাত হবে না।

এ বাড়িতে আর দ্বিতীয় কোনো পুরুষ মানুষ নেই, কথাটা একেবারে সঠিক নয়। সত্যসাধনের পিতা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁর বয়েস প্রায় নব্বই, তিনি শয্যার সঙ্গে সাঁটা এবং প্রায় বাক্-রহিত। সত্যসাধনের ছোট দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন বরিশালের বি এম কলেজের অধ্যাপক। আর একজন মুঙ্গেরে সরকারি কর্মচারি। সত্যসাধনের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে তিন মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে। এক পুত্র বিলেতের ম্যানচেষ্টারে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাঠরত, আর এক পুত্র জেলে। এই ছেলেটির নাম হিতব্রত, সে চট্টগ্রামে পড়াশুনা করতে গিয়ে সূর্য সেনের দলে ভিড়ে যায়। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। জালালাবাদ পাহাড়ে সে ধরা পড়ে আহত অবস্থায়। এখন সে সুস্থ শরীরে কারাদণ্ড ভোগ করছে।

প্রতাপের বাড়ির খবর জানার ফাঁকে ফাঁকে সত্যসাধন নিজের পারিবারিক ইতিহাসও জানিয়ে দিলেন। তাঁর ছেলে হিতব্রত যে স্বদেশী করতে গিয়ে জেল খাটছে, সেজন্য খুব একটা উদ্বিগ্ন বা শোকার্ত মনে হলো না তাঁকে।

এ বাড়িতে পর্দা প্রথা নেই। সত্যসাধন প্রতাপকে নিয়ে এলেন অন্দরমহলে। তাঁর স্ত্রী প্রতাপকে মুহূর্তে আপন করে নিলেন। সুরবালার কণ্ঠস্বরটি এমন কোমল যে মনে হয় তাঁর বুকে ক্রোধ-হিংসা জাতীয় উগ্র অনুভূতিগুলির বিন্দুমাত্র নেই। প্রতাপের মুখের সঙ্গে নাকি তাঁর ছেলে হিতুর খুব মিল আছে। সে কথা বলতে বলতে তিনি একবার চোখে আঁচল চাপা দিয়ে পরমুহূর্তেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, প্রতাপের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।

পূজোর ছুটিতে সত্যসাধনের প্রবাসী দুই ভাই-ই বাড়িতে আসবে। যে-ভাই মুঙ্গেরে থাকে, তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা বলে আগে থেকেই এখানে এসে রয়েছেন। তাঁর তিনটি ছেলেমেয়ে।

খাওয়ার সময় দেখা হলো সকলের সঙ্গে। চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটি কিশোরী মেয়ে ওদের পরিবেশন করছিল। সত্যসাধন পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এটি আমার সেজো ভায়ের মেয়ে, ওর নাম বুলা। ভালো গান করে। রবিবাবুর গান, কাজী সাহেবের গান বেশ শিখেছে। কাল সকালে বুলা তোমাকে গান শুনাবে।

বুলা মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। সে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কলকাতার কোথায় থাকেন? আমি দু'বার কলকাতায় গেছি। কলকাতা ভালো চিনি।

প্রতাপ আমহার্স্ট স্ট্রিটে থাকে শুনে বুলা আবার বললো, আপনি রোজ গঙ্গায় স্নান করেন? আপনার বাড়ির কাছেই তো!

প্রতাপ ঠাট্টার সুরে বললেন, হ্যাঁ, পাশেই গঙ্গা। জানলা দিয়ে দেখা যায়!

বুলা বললো, বাবা বলেছেন, আমিও কলকাতার কলেজে পড়বো।

খাওয়া-দাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ গল্প হলো। তারপর প্রতাপকে যখন ওপরের ঘরে পাঠানো হবে তখন বুলা বললো, আপনি ছাদের ঘরে একা থাকবেন, ভূতের ভয় পাবেন না তো? আমাদের

ছাদে কিন্তু ভূত আছে।

সত্যসাধন বললেন, ওরে, আমিই তো সেই ভূত!

ভূতের জন্য নয়। এমনিতেই প্রতাপের সারা রাত ভালো করে ঘুম হলো না। তার মস্তিষ্ক উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে আছে। মাঝে মাঝেই তন্দ্রা ভেঙে যায় আর মনে পড়ে মামুনের বাবার কথাগুলো। তার জীবনে এরকম অপমানের অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। কত সাধ করে সে মামুনের সঙ্গে এসেছিল, মামুনের সঙ্গে একঘরে, শুয়ে শুয়ে গল্প করবে...মামুনের বাবা তাকে বাড়িতে স্থান দিলেন না?

প্রতাপের ঘুম ভাঙলো মামুনের ডাকে। মামুন একেবারে ছাদের ঘরে উঠে এসেছে। প্রতাপের পায়ে ঠ্যালা দিয়ে ঘুম ভাঙালো। তারপর বিছানায় বসে পড়ে প্রতাপের পিঠে হাত রেখে বললো, তুই এখনো রাগ করে আছিস, প্রতাপ? আমার আম্মা কাল কত রাত্তির পর্যন্ত কেঁদেছেন তোর জন্য। সেই কান্না দেখলে তুই-ও চোখের পানি আটকাতে পারতিস না।

প্রতাপের বুকে এখনো অভিমান জমে আছে। সে মামুনের সঙ্গে তখনই কথা বলতে পারলো না। উঠে বসে চোখ রগড়াতে লাগলো। ভোর রাতে ঠাণ্ডা বাতাসে তার শীত শীত লাগছিল, সেই জন্য শরীর ভারী হয়েছে।

মামুন বললো, তোকে এখনো চা দেয়নি? আমি সাত-সকালে চলে এলাম, কারণ আমাদের বাড়িতে চায়ের পাট নেই, এ বাড়িতে চা হয়। আমিও একটু চা খাবো।

প্রতাপ এবারে জিজ্ঞেস করলো, মামুন, তোদের বাড়িতে যে কোনো হিন্দু থাকতে পারে না, তা তুই আগে জানতি না, না?

- সত্যি জানতুম না, বিশ্বাসকর।

- এখন জেনেছিস নিশ্চয়, তার করণটা?

- হ্যাঁ জেনেছি। আম্মার কাছে কাল রাতে শুনেছি।

- কী?

- তা তোর শোনার দরকার নাই।

- আমি শুনতে চাই।

- আমার দাদা, মানে আমার বাবার বাবা একবার সিলেটে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে খুব অপমানিত হয়েছিলেন। সেই বামুনবাড়ির বৈঠকখানায় তিনি বসেছিলেন বলে বামুন রেগে চ্যাঁচামেচি করে তাঁকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বলেন। সে বাড়ির সব পানি ফেলে দেওয়া হয়, পানির কলসী পর্যন্ত ভেঙে ফেলে। সেই থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন...

- কবে কোন্ এক ব্রাহ্মণ তোর ঠাকুর্দাকে অপমান করেছে, তার ফলভোগ করতে হবে আমাকে?

- ওঁরা সব প্রাচীনপন্থী। আমার আব্বা কিন্তু তোকে পছন্দ করেছেন।

- অনেক বামুন তো কায়স্থদের হাতের ছোঁওয়াও খায় না! বামুনদের দোষের জন্য আমি কেন দায়ী হবো?

- প্রতাপ, তুই এখনো রেগে আছিস! এসব তো আমাদের ব্যাপার নয়!

- নবাব বাদশাদের আমলে কত বামুন-কায়েতকে জোর করে গোরুর মাংস খাইয়ে জাত মেরে দেওয়া হয়েছে। সেই সব আমরা মনে রাখবো? একজনের পাপে আর একজন শাস্তি পাবে?

প্রতাপের কণ্ঠস্বর ক্রমশ উচ্চগ্রামে চড়ছিল, এমন সময় বাইরে বুলার গলা শোনা গেল। সে চা চাই? চা? বলে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। তার এক হাতে দুটি কাপ, অন্য হাতে একটি চিনেমাটির চা-পাত্র। একটা গোলাপি ডুরে শাড়ী গাছ-কোমর করে পরা। এই সকালেই স্নান হয়ে গেছে বুলার, মাথার চুল ভিজে। চোখের পাতা গাঢ় কৃষ্ণ, গ্রামের গণ্ডি ছেড়ে সে বাইরের জগৎ অনেকখানি দেখেছে, তাই তার মুখে ভীতু-ভীতু লজ্জার ভাবটা নেই।

মামুনকে সে আগেই আসতে দেখেছে নিশ্চয়ই, তাই দুটি কাপ এনেছে। চা ঢালতে ঢালতে সে বললো, সকালবেলাতেই দুই বন্ধুতে কিসের তর্ক হচ্ছে? কাল রাত্তিরে ভূত দেখেছিলেন!

মামুন নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলো বুলার দিকে।

প্রতাপ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মেজাজ শান্ত করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, চা কে বানিয়েছে, তুমি?

বুলা বললো, আমি আর আমার মা ছাড়া এ-বাড়িতে কেউ চা বানাতে জানেই না। কলকাতার

চায়ের মতন হয়েছে?

প্রতাপ বললো, মন্দ না।

- আপনি ভূত দেখেছেন কি না, বলুন না। আমি কাল রাত্রিরেও ছাদের স্বপ্ন দেখিছি!

প্রতাপ বললো, ভূত-পেত্নী কেউ তো এলো না। মামুন, এই মেয়েটির নাম বুলা। পশ্চিমা মেয়ে, খুব টর টর করে কথা বলে।

বুলা বললো, আমার ভালো নাম গায়ত্রী চক্রবর্তী। মোটেই পশ্চিমা মেয়ে নই। মাত্র দু'বছর আগে মুঙ্গেরে গেছি!

মামুন বললো, অনেক ছোটবেলা দেখেছি ওকে, এখন চিনতেই পারিনি। তখন অন্য রকম ছিল। যেন শুঁয়োপোকা, থেকে প্রজাপতি বেরিয়ে এসেছে!

বুলা তীক্ষ্ণ স্বরে হেসেন উঠলো। তারপর বললো, আপনি কী মজার কথা বলেন! আমি প্রজাপতি! ডানা মেলে উড়ে যাবো?

ছাদের পাশেই একটি পেয়ারা গাছ, এ দেশে পেয়ারাকে বলে গোইয়া। সেই গাছের বেশ কয়েকটি ডালপালা ঝুলে আছে ছাদের ওপর, তাতে পেয়ারা ফলেও আছে। হাত বাড়িয়েই পাওয়া যায়। পটাপট কয়েকটা পেয়ারা ছিড়ে এনে বুলা বললো, নিন, এই দিয়ে ব্রেক ফাস্ট শুরু করুন।

মামুন একটা পেয়ারায় কামড় দিয়ে বললো, বাঃ, বেশ মিষ্টি তো। তোমাদের বাড়িতে গোইয়ার খুব সুনাম আছে।

প্রতাপ অবাক হলো। আকারে মোটামুটি বড় হলেও বেশ শক্ত, কষা কষা, এখনও ভালো করে স্বাদই আসে নি। এই পেয়ারাকে মামুন মিষ্টি বলছে? প্রতাপ নিজেরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, ধুৎ, এ খাওয়া যায় না। তুমি আমাদের আর এক কাপ করে চা খাওয়াবে?

বুলা আবার চা আনতে চলে গেল।

মামুন বললো, প্রতাপ, তুই আমাদের বাড়িতে আর একবার যাবি না? আমার আম্মা মাথায় কিরে দিয়েছেন, তুই যদি একবার দেখা না করিস, খুব কষ্ট পাবেন।

প্রতাপ চুপ করে রইলো। নিজেকে সে ধর্ম-নিরপেক্ষ মনে করে বটে, তবু তার মনের মধ্যে কোথাও একটা হিন্দু-গরিমা আছে, সেখানে আঘাত লেগেছে। বাল্যকাল থেকেই সে দেখেছে যে মুসলমানরা হিন্দুদের কাছে বিনীত থাকে, উদার হিন্দুদেরও কথার সুরে ফুটে ওঠে একটা পিঠ-চাপড়ানির ভাব। এই প্রথম সে শুনলো যে কোনো মুসলমানের বাড়িতে হিন্দুর ও কথার সুরে ফুটে ওঠে একটা পিঠ-চাপড়ানির ভাব। এই প্রথম সে শুনলো যে কোনো মুসলমানের বাড়িতে হিন্দুর স্থান নেই। কাল রাত সে অন্তত পঁচিশ তিরিশবার মনে মনে বলেছে, সে জীবনে আর কখনো কোনো মুসলমানের বাড়িতে পা দেবে না! কিন্তু মামুন তো শুধু মুসলমান নয়, মামুন তার বন্ধু!

মামুন বললো, বুলাকেও নিয়ে যাবো তোর সাথে, সত্যজ্যাঠা আমাদের ওখানে প্রায়ই যান!

একটু পরেই বুলা আবার চা নিয়ে ফিরে এলো। দুটি কাপে চা ঢালার পর সে প্রতাপের দিকে চোখ পাকিয়ে বললো, আপনি আমাদের গাছের পেয়ারা ফেলে দিলেন? দাঁড়ান, আপনাকে আর একটা দিচ্ছি, গাছপাকা, ঐ যে উপরের ডালে, খেয়ে দেখবেন, একেবার গুড়।

আচলটা কোমরে জড়িয়ে বুলা একটা ডাল বেয়ে উঠতে যেতেই সেই ডালটা এমন দুলে উঠলো যে প্রতাপ ভয় পেয়ে গেল। এই দস্যি মেয়েটা পড়ে যাবে নাকি! ওপরের ডালটা বেশ সরু। প্রতাপ দৌড়ে এসে বুলার হাত চেপে ধরে বললো, এই, এই, নামো, তোমাকে উঠতে হবে না। আমি পেয়ারা খাবো না!

ইচ্ছে করে গাছের ডালটা আরও দোলাতে দোলাতে বুলা হেসে বললো, এই এই করছেন কেন? বললাম না, আমার নাম গায়ত্রী। আমি এর থেকে কত উঁচু আম গাছে উঠতে পারি।

সেই প্রথম প্রতাপ এক অনাত্মীয়া কিশোরীর শরীর স্পর্শ করেছিল।

মোট আট দিন সেইখানে থেকে গেল প্রতাপ। তারপর তাকে মালখানগরে ফিরতেই হবে। এর মধ্যে সত্যসাধনদের পরিবার এবং হাকিম সাহেবের পরিবারের সকলের সঙ্গে তার গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। দু'জায়গাতেই তাকে প্রতজিজ্ঞা করে যেতে হলো যে সে আবার আসবে।

মামুনের মা তাকে মাতৃস্নেহেরও অধিক কিছু দিয়ে একেবারে আপন নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত হাকিম সাহেবকেও খারাপ লাগে নি প্রতাপের। তিনি কট্টর লীগপন্থী, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সে সব কিছু আনেন না। প্রতাপ আরও লক্ষ করেছিল, হাকম সাহেব হিন্দুদের আচার-আচরণ, ধর্ম ও

বেদ-পুরান সম্পর্কে যতখানি জানেন, অনেক শিক্ষিত হিন্দুই মুসলমানদের ধর্ম, রীতি-নীতি, কোরান-হাদিস সম্পর্কে তার সিকিভাগও খবর রাখে না।

দাউক কান্দিতে নৌকোয় তুলে দিতে এসে একেবারে শেষ মুহূর্তে মামুন তার পাঞ্জাবির পকেটে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে বললো, একটা কবিতা...বাড়িতে গিয়ে পড়িস।

॥ ৮ ॥

মালখানগরে প্রতাপদের বাড়িতে সামনে ও পিছনে ছিল দুটি পুষ্করিণী। সামনেরটি বেশ বড় এবং বারোয়ারি, পিছনেরটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং নিজস্ব। এই পুকুরটি চতুষ্কোণ, চারদিকে চারটি বাঁধানো ঘাট। একদিকে ধোপা ও নাপিতদের কয়েকটি ঘর, তারা মজুমদারদেরই প্রজা। পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটি লৌহদণ্ড পোঁতা, তার মাথায় একটি হাত-জোড়া করা গরুড় মূর্তি। বর্ষার সময় জল অনেক বড় গেলেও ঐ মূর্তিটি ডোবে না। কেন যে পুকুরের মাঝখানে ঐ রকম একটা মূর্তি বসানো হয়েছিল তা আজ আর কেউ বলতে পারে না।

সেই পুকুরের একদিকে ঘন গাছপালার সারি। শৈশবে প্রতাপের মনে হতো, ঐ দিকটায় রয়েছে নিবিড় বন, ঘোর রহস্যময়। আসলে ওটি একটি ফল-পাকুড়ের বাগান, তেমন সুসজ্জিত নয়, অনেক গাছই অযত্ন-বর্ধিত, প্রায় সাতবিঘে জমিতে ছড়ানো। আগাছা-পরগাছা পরিষ্কার করা হয়না বলে সে বাগানের কিছু কিছু অংশ বেশ দুর্গম। জাম-জামরুল পাখিতে খায়। মাটিতে পড়ে থাকে, মানুষ আসে না।

কৈশোরে অজানা-অচেনা সব কিছু সম্পর্কেই রোমাঞ্চবোধ থাকে। আবার সমস্ত অজানাকে জানার ইচ্ছেটাও জাগে। গা ছম ছম করলেও এগিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। গোঁফের রেখা ওঠার পর প্রতাপ একটা দা হাতে নিয়ে ঐ জঙ্গল-প্রতিম বাগানের মধ্যে অনেকবার গেছে, একবার দিনদুপুরে দুটি শেয়াল ও একটি গোসাপ দেখেও নিরস্ত হয়নি। ক্রমে ঐ বাগানের মধ্যে প্রতাপের একটা নিজস্ব, নিভৃত কুঞ্জ রচিত হয়েছে। আলোক লতায় সর্বাঙ্গ ছাওয়া একটি বড় ঝুপসি আম-গাছের নিচটা পরিষ্কার করে প্রতাপ মাঝে মাঝেই সতরঞ্চি আর বই খাতা নিয়ে এসে সেখানে একলা সময় কাটাতো।

সেই বাগানের মধ্যে একটা সরু খালও আছে। কিছু দূরের কোনো নদী থেকে সেই খালের মধ্যেদিয়ে জল এসে পুকুরে পড়ে। প্রতাপ সেই খালটিকে ঝরনা বলে ভাবতে ভালোবাসে। বাগানের মধ্যে কোনো একটা স্থান একটু উঁচু বলে সেখানে জল-পতনের উচ্ছ্বাস শোনা যায়। সম্প্রতি দু-একদিন খুব বৃষ্টি হওয়ায় জল বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দাউদকান্দি থেকে ফেরবার দু'দিন পর প্রতাপ তার সেই বাগানের নিরালা জায়গাটিতে গেল দুপুরবেলা। তার কল্পিত ঝরনাটির পাশে দাঁড়িয়ে জলের শব্দ শুনতে শুনতে তার মনে পড়লো গায়ত্রীর কথা।

প্রতাপের বয়স তখন উনিশ। এর আগে অনাত্মীয়া কোনো রমণীর-সঙ্গে তার মেলামেশা হয়নি। নারী-জাতি সম্পর্কে তার আলাদা কোনো কৌতূহলও জাগ্রত হয়নি। যদিও প্রায় এই বয়েসেই তখন অনেক ছেলের বিবাহ হয়ে যেত, বিশেষত বামুন বাড়ি ও মুসলমান বাড়ির ছেলেদের। মালখানগরে প্রতাপের যারা বাল্য খেলার সঙ্গী, তাদের মধ্যে কেউ কেউ চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়েস থেকে নানাপ্রকার অসভ্য কথা শিখেছিল। লালসিক্ত কণ্ঠে তারা স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলে প্রতাপ তাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে। সে ঐ আলোচনা রস পায় না। তার চেয়ে খেলাধুলোর কথা তার অনেক বেশি পছন্দ। খেলাধুলোর কথার মধ্যে যারা হঠাৎ মেয়েদের প্রসঙ্গ টেনে আনে তাদের গাড়ল মনে হয় প্রতাপের। এইজন্য নগেন নামে এক বন্ধুকে একদিন সে থাপ্পড় মেরেছিল পর্যন্ত।

বুলা অর্থাৎ গায়ত্রীর সঙ্গে টানা আটদিন কাটিয়ে আসার পর প্রতাপ যেন নারী জাতিকে নতুন করে চিনলো। মা নয়, দিদি নয়, এ যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের প্রাণী, যারা কথাবার্তা একেবারে অন্যরকম।

বুলাকে প্রথমে ঠিক পছন্দ করেনি প্রতাপ। বেশ ফাজিল ধরনের মেয়েটি। প্রতাপকে সে ভূতের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল প্রথম দিন থেকেই। এক রাত্তিরে সে সাদা কাপড় মুড়ে দিয়ে প্রতাপের ঘরের জানলায় উঁকি মেরে নাকি সুরে বলেছিল, এই প্রতাপ...। সত্যসাধন বলেছিলেন, এই মাইয়াটা আগের জন্মে নির্ঘাৎ জলদস্যু আছিল!

লাজুকতার লেশমাত্র নেই বুলার চরিত্রে, কথার মারপ্যাচে প্রায়ই সে প্রতাপ আর মামুনকে

অস্বস্তিতে ফেলে দিত। মুঙ্গের আড়াই বছর কাটিয়েই সে এত সাবলীল, পশ্চিমের মেয়েরা বুঝি এই রকম হয়। বয়েসে বছর চারেকের ছোট হয়েও সে সব বিষয়ে প্রতাপ আর মামুনের সমান সমান হতে চাইতো।

খালের জলের কলকল, ছলছল শব্দে প্রতাপ যেন গায়ত্রীর হাসির শব্দ শুনতে পেল। প্রতাপের মন-কেমন করে উঠলো। গায়ত্রীরা মুঙ্গেরে ফিরে যাবে, আর কি কোনোদিন দেখা হবে?

আমগাছ তলায় সতরঞ্চি বিছিয়ে বসার পর বই খুলেও প্রতাপ মনঃসংযোগ করতে পারলো না। বারবার গায়ত্রীর কথা মনে পড়ছে। দুষ্টু মেয়েটা কথায় কথায় হাসে। খোঁচা দিয়ে কথা বলে। তবু সে এত আপন হয়ে গেল কী করে?

গায়ত্রীর শাড়ী পরার ধরনটা আলুথালু ধরনের। সে নিজেই বলেছিল, মুঙ্গেরে সে এখনো ফ্রক পরে, বাড়িতে ঠাকুমার আপত্তি বলেই তাকে শাড়ী পরতে হয়। কিন্তু এখনো সেটা ঠিক আয়ত্ত হয়নি। শক্ত করে কোমরে আঁচল জড়িয়ে বাঁধলেও এক সময় আবার আলগা হয়ে যায়। এখন, এতদূর থেকে গায়ত্রীর কথা চিন্তা করে প্রতাপের মনে হলো, গায়ত্রীর শাড়ী যেন সমুদ্রের ঢেউ-এর মতন।

বাড়িতে দুর্গা পুজোর আয়োজন শুরু হয়ে গেছে, আত্মীয়-স্বজনরা আসতে শুরু করেছে, অন্যান্য বছর প্রতাপ নানা কাজে, হৈ-চৈতে মেতে থাকে। এবার কী যে হলো তার, সে ফাঁক পেলেই বাগানে চলে যায়, গায়ত্রীর কথা ভাবে, তার সারা শরীরে উষ্ণতা জেগে ওঠে। মাঝে মাঝে সে উচ্চারণ করে, বুলা, বুলা! গায়ত্রী, গায়ত্রী! তার বুলা নামটাই বেশি পছন্দ হয়।

প্রতাপ ঠিক রোমান্টিক বা আত্মমগ্ন ধরনের ছেলে নয়। তখনও পর্যন্ত তার কোনো গোপন জগৎ ছিল না। বুলার জন্য তার এই যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে, একথা কারুকে বলার জন্য সে ছটফট করতে লাগলো। কিন্তু কাকে বলবে? মালখানগরের কোনো ছেলের সঙ্গেই তার খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নেই। কলকাতায় পড়তে যাবার পর একমাত্র মামুনের সঙ্গেই তার অন্তরঙ্গতা হয়েছে। মামুনকে বলা যায়, ছুটির শেষ দিকে মামুন এখানে আসবে কথা আছে, কিন্তু সে তো অনেক দেরি।

দুই দিদির মধ্যে সুপ্রীতির সঙ্গেই তার বেশি ভাব। পুজো উপলক্ষে সুপ্রীতি আর অসিতবরণও কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সুপ্রীতির কোনো ছেলে-মেয়ে হয়নি, তাই এখনো তাকে কিশোরীর মতন দেখায়। কিন্তু দারুণ কাজের মেয়ে সে। সুহাসিনী এই পরিবারের কর্ত্রী হলেও চারদিক সামলাতে পারেন না, সুপ্রীতি এসে মায়ের কাছ থেকে সব ভার নিয়ে নেয়। বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর সুপ্রীতি আর অসিতবরণ এখানেই ছিলেন, দিদি, আমার সঙ্গে দেখার জন্য অসিতবরণকে বরানগরে থেকে যেতে হচ্ছে।

একদিন দুপুরে সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর প্রতাপ সুপ্রীতিকে বললো, দিদি, আমার সঙ্গে ওপারের বাগানে যাবি? ওখানে আমি একটা সুন্দর জায়গা তৈরি করেছি।

সুপ্রীতি বললো, চল। দাঁড়া, আগে একটা পান খেয়ে আসি!

প্রতাপের পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। সুপ্রীতি পরে আছে একটা লালডুরে শাড়ী আর ঘটি হাতা ব্লাউজ। গ্রামের মেয়েদের মতন সে এখন আর সেমিজ পরে না। তার ঈষৎ কোঁকড়া ঘন কালো চুল পিঠ ছেয়ে আছে। খালি পায়ে দুই ভাই বোন পুষ্করিণীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগলো।

সুপ্রীতি বললো, স্নান করার সময় বললি না কেন? অনেকদিন সাঁতার কেটে এ পারে আসিনি।

প্রতাপ বললো, এ পারের ঘাট দিয়ে ওঠা যায় না। বড় পিছল!

সুপ্রীতি বললো, খোকন, তোর মনে আছে?

প্রতাপ ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ!

অনেক দিন আগে, প্রতাপের তখন বছর দশেক বয়েস হবে, একটা ঘটনা ঘটেছিল। সন্ধ্যেবেলা দেখা গিয়েছিল, পুকুরের এই পারের ঘাটলায় নীল শাড়ী পরা একজন স্ত্রীলোক বসে আছে। কে সে? প্রতাপদের বাড়ির কেউ নয়। ধোপা-নাপিতদের পাড়ার কেউ হতে পারে, কিন্তু তাদের তো নিজস্ব ঘাট আছে। সন্ধ্যেবেলা কোনো স্ত্রীলোক ওখানে একা বসে থাকবে কেন? এপার থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কে ওখানে? ওগো তুমি কাদের বাড়ির বউ? কোনো উত্তর আসেনি। অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া পাওয়া যায়নি, অথচ বউটি ঘোমটা টেনে চুপ করে বসে ছিল। শেষ পর্যন্ত বাড়ির কয়েকজন পুরুষ ওপারে গেল খোঁজ করতে, তার মধ্যেই সে মিলিয়ে গেল। কেউ বলে সে জলে নেমে গিয়েছিল, কেউ বলে সে ছুটে চলে গিয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে। বাড়ির সকলের চোখের সামনে ঘটেছিল ঘটনাটি। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কে এবং কোথায় সে মিলিয়ে গেল, তা একটা রহস্যই রয়ে

গেল শেষ পর্যন্ত। কোনো লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর থেকেই কেউ আর সাঁতার কেটে এই ঘাটে আসে না।

সুপ্রীতি বললো, খোকন, তুই একা একা এই জঙ্গলের মধ্যে পড়তে আসিস, তোর ভয় করে না!

প্রতাপ তখন তার সেই নিজস্ব ঝরনার কাছে উপস্থিত হয়েছে। তার বুক মুচড়ে উঠলো, সে সুপ্রীতির হাত চেপে ধরে বললো দিদি, আমার একটা অসুখ হয়েছে।

সুপ্রীতি তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো প্রতাপের মুখের দিকে। সে খুবই বুদ্ধিমতী। কিছু একটা আঁচ করতে তার দেরি হলো না। সে বললো, এইখানে বোস। দাউদ কান্দিতে কী কী হয়েছে সব খুলে বল তো।

প্রতাপ ঠিক গুছিয়ে বর্ণনা করতে পারে না। মামুনদের গ্রামে সে থাকতে গিয়েছিল, কিন্তু মামুনদের বাড়িতে তার স্থান হয়নি, পাকেচক্রে সত্যসাধন চক্রবর্তীর বাড়িতে তাকে অতিথি হতে হলো। সেইখানে বুলার সঙ্গে পরিচয়। সে বড় অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, তার প্রত্যেকটি কথা ফিরে ফিরে আসছে। এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকলেও মনে হয় হঠাৎ যেন বুলা কোনো গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারবে।

শুনতে শুনতে সুপ্রীতি মুচকি মচুকি হাসতে লাগলো। তার মায়ের ভয় ছিল প্রতাপ কলকাতায় পড়াশুনো করতে গিয়ে কোনো থিয়েটারের মেয়ের পাল্লায় না পড়ে। সুহাসিনীর এক দূর সম্পর্কের মামা কলকাতায় এক থিয়েটারের অভিনেত্রী তথা বেশ্যার অন্নদাস হয়ে পড়েছিলেন নাকি! সেই থেকে সুহাসিনীর ধারণা কলকাতার রাস্তায় থিয়েটার মেয়েরা ডাকিনী-যোগিনীর মতন ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রতাপের সে রকম কিছুই হলো না, সে বাঁধা পড়লো কুমিল্লার এক গ্রামের মেয়ের আঁচলে!

সুপ্রীতি বললো, খোকন, তুই যে দেখি মরেছিস একেবারে! ঠিক আছে, বাবাকে বলি সম্বন্ধ করতে। কী নাম বললি? চক্রবর্তী? ওমা, ছি ছি, কী কাণ্ড করেছিস তুই, খোকন? ওরা যে ব্রাহ্মণ? ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে না, জানিস না?

প্রতাপ বললো, না দিদি, আমি বিয়ের কথা বলছি না। আমি এখন বিয়ে করতে চাই না।

সুপ্রীতি বললো, বিয়ে করতে চাস না, তা হলে তুই একটা অবিবাহিত মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে গেছিল কোন আক্কেলে? ছিঃ!

প্রতাপ অসহায়ভাবে বললো, আমি ইচ্ছে করে ভাব করিনি, সে নিজে থেকে কথা বলেছে।

- কথা বলেছে তো কী হয়েছে? তা বলে ভাব করতে হবে?

- সে আমাকে গান শুনিয়েছে। রবিবাবুর গান, ভালো গায়।

- বেশ মানলুম, গান শুনিয়েছে। গান শুনে মাথা নাড়বি। তা বলে বামুনবাড়ির মেয়ের সঙ্গে তুই ভাব করতে গেলি কেন? তুই তাকে ভাবের কথা বলেছিস কিছু?

- ওখানে থাকতে ওকে কিছুই বলিনি। কিন্তু এখন সব সময় মনে পড়ে ওর কথা। দিদি, আমি এখন কী করি?

- ও মা, অমন মুখ চোখ করছিস কেন? পাগল হয়েছিস নাকি? ওসব কথা মনে রাখতে নেই। ঐ গ্রামে আর যাস না কোনোদিন।

- বুলার ঠাকুমা, তাঁকে আমি জেঠিমা বলেছি, বড় সুন্দর মানুষ, তাঁর কাছে যে কথা দিয়েছি আবার যাবো?

- ঐ মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাক। তারপর যাবি। তুই আমাদের বাড়ির একমাত্র ছেলে, তুই যদি একটা কিছু অন্যায় করে ফেলিস, তা হলে মা-বাবা কত দুঃখ পাবেন বল তো?

এরপর দু'ঘণ্টা ধরে সুপ্রীতির সঙ্গে এই একই বিষয় নিয়ে বারবার কথা হতে লাগলো। প্রতাপ বুঝতে পেরেছে যে তার একটা ভুল হয়েছে, এক ব্রাহ্মণ কুমারীকে পছন্দ করা তার পক্ষে অসমীচীন কাজ। কিন্তু মন যে মানতে চায় না!

পরের দিন মা তাকে একটা কাগজ দিলেন তার জামার পকেটে ছিল, কাচতে যাবার সময় পাওয়া গেছে, কাগজটা ভিজে গেছে খানিকটা। প্রতাপের মনে পড়লো, এটা মামুনের সেই কবিতা, সে ভুলেই গিয়েছিল এর কথা।

ভিজে গেলেও অক্ষরগুলো পড়া যায়। কবিতাটি প্রজাপতি বিষয়ে। প্রতাপ কাব্যরসের তেমন মর্ম বোঝেনা, তবু কবিতাটির প্রেরণা কোথা থেকে এসেছে তা বুঝতে তার অসুবিধে হলো না। জলের

শব্দ শুনে প্রতাপের যার কথা মনে পড়ে, মামুনের কবিতার প্রজাপতিও সে।

কবিতাটি পড়ে প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বুলাকে মামুনেরও খুব পছন্দ হয়েছে এবং সেই কথা জানাবার জন্যই সে প্রতাপের পকেটে শেষ মুহূর্তে কবিতাটা গুঁজে দিয়েছিল। এইবার প্রতাপের পক্ষে বুলাকে ভুলে যাওয়া সহজ হবে।

ছুটির শেষে মামুন মালখানগরে এলো না, চিঠি লিখে জানালো তার অসুবিধে আছে। প্রতাপ কলকাতায় এসেও বেশ কয়েকদিন মামুনকে দেখতে পেল না। মামুন যখন ফিরলো, তখন তার চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। বেশ রোগা হয়ে গেছে সে, পোশাক ময়লা, মাথার চুল বড় বড়, চোখ দুটি যেন জ্বলজ্বল করছে।

মামুনের জীবনে সত্যিই একটা বিপর্যয় ঘটেছে। মামুনের বাবা তাকে কিছু না জানিয়ে তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলেন, মামুন কিছুতেই সে বিয়েতে রাজি হয়নি। ও বাড়িতে মামুনের বাবার ইচ্ছে বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারে না। মামুনের মা ছেলের পক্ষ নিলেও সুবিধে হয়নি। মামুনের বাবা সৈয়দ হাকিম সাহেব স্রেফ জানিয়ে দিয়েছেন যে মামুন তার কথার অবাধ্য হলে তিনি আর ছেলের পড়ার খরচ চালাবেন না। মামুনের কলকাতায় পড়াশুনোই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, তবু সে জেদ করে চলে এসেছে। একটি পত্রিকা অফিসে সে প্রুফ রীডারের চাকরি সংগ্রহ করেছে, তাতেই অতিকষ্টে তাকে চালাতে হবে।

উত্তরটা প্রায় জানা থাকলেও প্রতাপ মামুনকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই বিয়ে করতে রাজি হলি না কেন?

প্রতাপের চোখের দিকে একদৃষ্টে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো মামুন। তারপর বললো, তুই-ই বল প্রতাপ, গায়ত্রীর মতন কোনো নারীকে দেখলে আর কোনো স্ত্রীলোককেও জীবনসঙ্গিনী করতে ইচ্ছে হয়? জানি, আমি গায়ত্রীকে কোনোদিন পাবো না। কিন্তু গায়ত্রী যতদিন না অন্যের ঘরে চলে যায়, ততদিন আমি বিয়ে-শাদী করতে পারবো না।

মামুন এ পর্যন্ত সাতান্নটি কবিতা লিখেছে গায়ত্রীকে নিয়ে। সেই সব কবিতাবলী নিয়ে সে "আশমানের প্রজাপতি" নামে পুস্তক ছাপতে চায়। প্রতাপ চলে আসার পর সে গায়ত্রীদের বাড়ির দু'দিন মাত্র গিয়েছিল, তারপর আর ভয়ে যায়নি। গায়ত্রীকে না দেখতে পেলেও সে দূর থেকে তার উদ্দেশ্যে স্তুতি গাথা রচনা করে যাবে।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলো, কেন, ভয়ে দেখা করতে যাসনি কেন? সত্য জ্যাঠা কিছু আপত্তি করেছেন? তিনি তো সে রকম মানুষ নন!

মামুন বললো, না, না সত্য জ্যাঠা দেবতুল্য মানুষ।

ওঁদের পরিবারের সকলেই মামুনকে পছন্দ করে। কিন্তু ঐ পল্লীর দুটি ছেলে একদিন মামুনের প্রতি ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলেছিল।

প্রতাপ বললো, তাতেই তুই ভয় পেয়ে গেলি!

মামুন বললো, তুই জানিস না, ঢাকায় নজরুল ইসলাম প্রতিভা সোম নামে এক তরুণীকে গান শেখাতে যেতেন? কয়েকদিন খুব ঘন ঘন যেতে শুরু করেছিলেন, এক সন্ধ্যেবেলা বনগাঁ-র হিন্দু ছেলেরা কবিকে ঘিরে ধরে মারতে গিয়েছিল।

একটু থেমে মামুন আবার বললো, আমি তো গান শেখাতে যেতাম না, আমি যেতাম গান শুনতে। আহা, কী মাধুক্ষরা কণ্ঠস্বর!

কয়েকদিন পর বুলার একটা চিঠি এলো প্রতাপের নামে। সে চিঠিতে প্রেমের কথা নেই, আছে অভিযোগ। প্রতাপ এবং মামুন কেন তাকে চিঠি লেখেনি? কলেজে পড়ে বলে বুঝি তাদের খুব অহংকার?

প্রতাপ সে চিঠির কোনো উত্তর না দিয়ে মামুনের কয়েকটি কবিতা খামে ভরে পাঠিয়ে দিয়েছিল বুলার নামে। তারপর আর কোনো চিঠি আসেনি।

বছর আড়াই পরে বুলার স্মৃতি যখন কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে, তখন বুলার সঙ্গে আবার আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল।

প্রতাপ তখন ল কলেজের ছাত্র। বরানগরে দিদির বাড়িতে এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। সুপ্রীতি তখন পাকাপাকিভাবে শ্বশুরবাড়িতে এসে রয়েছে। প্রতাপকে সেখানে সপ্তাহে দু'বার অন্তত আসতে হয়। অসিতদা শখ করে একটি মটোর গাড়ি কিনেছেন। এক একদিন তিনি নিজেই গাড়ি নিয়ে

উপস্থিত হন প্রতাপের মেসে। প্রতাপের সামনে থেকে বই সরিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ওহে সম্বন্ধী, অত আইন পড়ে তুমি কি প্রিভি-কাউনসিলের যাবে নাকি? চলো, মেঘলা দিন পড়েছে, ক্যানিং টাউন ঘুরে আসি।

বরনগরের বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেরার পথে, বাগবাজারে বাস বদল করার সময় প্রতাপ হঠাৎ এক বালক কণ্ঠের ডাক শুনতে পেল, প্রতাপদা!

প্রতাপ মুখ ফিরিয়ে দেখলো, দেখামাত্র চিনতে পারলো বুলার ছোট ভাই রতনকে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বুলা, তাঁর পাশের পৌঢ় ব্যক্তিটি খুব সম্ভবত বুলার বাবা। রতন সোল্লাসে বললো, প্রতাপদা, আমরা এখন কলকাতায় থাকি!

বুলা নিজে থেকে প্রথমে কোনো কথা বলেনি। এখন আর তার শাড়ী আগোছালো নয়, চোখের দৃষ্টিতেও পূর্বেকার সেই চাঞ্চল্যমাখা দুষ্টুমি নেই। সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে প্রতাপের দিকে।

রতন পরিচয় করিয়ে দিয়েই বুলার বাবা সত্যব্রত চক্রবর্তী বললেন, হ্যাঁ, তোমরা কথা শুনেছি। সেবারে আমি পৌঁছোবার আগেই তুমি চলে গিয়েছিলে।

প্রতাপের প্রথমেই মনে পড়লো, বুলার দাদার কথা, যাঁকে সে চোখে দেখেনি। সে প্রথমে জিজ্ঞেস করলো, আপনার যে ভাইপো জেলে ছিলেন, হিতব্রত, তিনি কেমন আছেন?

মাটির দিকে চোখ করে সত্যব্রত বললেন, সে মারা গেছে। জেল থেকে পালাতে গিয়েছিল...আমার মা বলেছিলেন তোমার সঙ্গে হিতুর মুখের মিল আছে, তা খানিকটা আছে বটে—

এইবার বুলা বললো, আপনি ঠাকুমার কাছে কথা দিয়েছিলেন, প্রত্যেক বছর একবার করে যাবেন, কথা রাখেন। কলকাতার লোকেরা এই রকম মিথ্যুক হয়।

সত্যব্রত বললেন, আহা, সব সময় কী যাওয়া সুবিধে থাকে। এখন পড়াশুনোর চাপ।

প্রতাপ অনুতপ্ত বোধ করে চুপ করে রইলো।

সত্যব্রত একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে প্রতাপকে তুললেন জোর করে। ওঁরা যাবেন ভবানীপুর। পথে বৌবাজারে প্রতাপকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। গাড়িতে কিন্তু বিশেষ কথা হলো না। হিতব্রতর মৃত্যু-সংবাদ প্রতাপকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। হঠাৎ হিতব্রতর কথাই বা তার মনে এলো কেন? সত্যসাধন তার একই বিপ্লবী পুত্র সম্পর্কে বেশ গর্বিতই ছিলেন, এখন তাঁর মনের ভাব কী রকম? ভেঙে পড়েছেন খুব? আর সুরবালা? প্রতাপের সত্যিই ইচ্ছে করলো একবার সুরবালার সঙ্গে দেখা করতে। যদি তার মুখখানা সুরবালাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারে।

এর দিন সাতেক পরে বুলা একলা চলে এলো প্রতাপের মেসে। সত্যি সাহস আছে বুলার। কয়েকদিন ধরে মাত্র বিক্ষোভ চলেছে, পথঘাট নিরাপদ নয়। প্রতাপদের মেসে স্ত্রীলোকেরা সাধারণত আসে না। সে রকম কোনো বিধিনিষেধ নেই অবশ্য। তবু বাড়িটিতে চিনে গেছে। সোজা উঠে এলো দোতালায়। প্রতাপ খালি গায়ে বসে পড়াশুনো করছিল, তাড়াতাড়ি উঠে জামা পরে নিল। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ!

বুলা ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। সে উত্তেজনার বশে চলে এসেছে। এখন দুর্বল বোধ করেছে।

একটু পরে মুখ তুলে সে জিজ্ঞেস করলো, আমি এসেছি বলে আপনি রাগ করেছেন?

প্রতাপ বললো, না, না!

সে ভাবলো, মামুন থাকলে কত খুশী হতো। মামুন এখনও গায়ত্রীর উদ্দেশে অনেক পদ্য লিখে যাচ্ছে। সে বুলা নামটা পছন্দ করে না। সে গায়ত্রী বলে। বাবার সঙ্গে অনেকটা মিটমাট হয়ে গেছে মামুনের, দেশের বাড়িতেও ফিরে গেছে দু-একবার। অবশ্য গায়ত্রীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

মামুন এখানে নেই, সে মেদিনীপুরে কী একটা সাহিত্য সম্মেলনের যোগ দিতে গেছে।

বুলা কথা বলতে পারছে না দেখে প্রতাপ বললো, জানো বুলা, মামুন প্রায়ই তোমার কথা বলে। তুমি কি ওর "আশমানের প্রজাপতি" বইটি পড়েছো?

বুলার সেই ঝলমলে ভাবটা আজ নেই। সে ম্লান মুখে মাথা নাড়লো দু'দিকে।

প্রতাপ উঠে মামুনের কবিতা-পুস্তকটি খুঁজে এনে বুলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, পড়ে দ্যাখো, অনেক কিছু চেনা চেনা লাগবে। তোমাদের গ্রামের কথা আছে, তোমার কথাও আছে।

বুলা নিঃস্পৃহভাবে দু'একটি পাতা ওল্টালো, তারপর বইটি পাশে রেখে বললো, প্রতাপদা, আমি আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?

প্রতাপ হালকা গলায় বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সাহায্য করবো। তুমি হঠাৎ আপনি আজ্ঞে করে কথা বলছো কেন, সেবারে তো তুমি তুমি বলতে আমাকে! তোমার কী হয়েছে, বলো?

- আপনি আমার চিঠির উত্তর দেননি!

- চিঠি, মানে, আমার ঠিক চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না, বাড়িতেও বিশেষ লিখি না।

- আপনি আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, তাই না?

- না, না, তোমার কথা কি ভোলা যায়? মামুনের সঙ্গে প্রায়ই তোমার বিষয়ে কথা হয়। তুমি যে একটা গান খুব গাইতে, 'হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাবে...', মামুন এখনও সেই গানটা প্রায়ই গুণগুণ করে।

বুলা মুখ নীচু করে বসে রইলো। মামুনের প্রসঙ্গে সে কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছে না। সে একবারও মামুনের কোনো খবর জিজ্ঞেস করেনি। বুলার গালের এক পাশে রোদ এসে পড়েছে। তার হলুদ রঙের শাড়ীটি রোদ্দুরে সঙ্গে মিলে যায়।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী দরকার, সেটা বললে না?

- প্রতাপদা, আমি কলেজে পড়তে চাই!

- তুমি ম্যাট্রিক পাশ করে গেছো বুঝি? ওমা, এই কথাটাই এতক্ষণ বলোনি? এ তো দারুণ সুখবর। কেমন রেজাল্ট হলো?

- তেমন ভালো নয়। একটুর জন্য ফার্স্ট ডিভিশন পাইনি।

- তাতে কী হয়েছে? এ বছর ফার্স্ট ডিভিশান খুব কম, মেয়েদের মধ্যে সেকেন্ড ডিভিশানই বা ক'জন পায়? তুমি কলেজে পড়বে...ভর্তি হতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

হঠাৎ টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো বুলার চোখ দিয়ে। সে আর কোনো কথা বললো না।

প্রতাপ ঘাবড়ে গেল। এর মধ্যে আবার কাঁদবার কী আছে?

বারান্দা দিয়ে অন্য লোকজন যাচ্ছে, তারা যদি দেখে যে প্রতাপের সামনে বসেএকটি তরুণী চোখের জল ফেলছে, তা হলে পরে তারা টিটকিরি দেবে।

খানিকটা অধৈর্যের সঙ্গে প্রতাপ বললো, কী হয়েছে, বুলা? এখানে তুমি এমন করলে তো মুশকিল। তুমি কলেজে পড়তে চাও তাতে যদি আমি কোনো সাহায্য করতে পারে...

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বুলা বললো, আমার বাবা আমাকে আর পড়াতে চান না, আমার বিয়ে ঠিক করেছেন এক জায়গায়।

এবারে প্রতাপের চুপ করে থাকার পালা। বুলার বাড়িতে পড়াশুনোর ব্যাপারে আপত্তি থাকলে প্রতাপ আর কী করে সাহায্য করবে?

বুলার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, এ বিয়ে আমি করতে চাই না! কিছুতেই চানই না! আমি কলেজে পড়তে চাই! প্রতাপদা, তুমি আমার বাবাকে গিয়ে বলবে?

প্রতাপের বুকে গুড়গুড় শব্দ হতে লাগলো। এই প্রশ্নের মধ্যে কী যেন একটা ভয়ংকর ইঙ্গিত আছে।

সে বুলাকে ভালো করে দেখলো। আগের চেয়েও যেন অনেক বেশি সুশ্রী হয়েছে সে, চোখ দুটি গভীর। সে গুণবতী মেয়ে, ওদের বংশ ভালো, খুব ভালো পাত্রের সঙ্গেই তার বিয়ে হবার কথা।

শুকনো গলায় প্রতাপ বললো, আমি তোমার বাবাকে বলতে যাবো...তিনি আমার কথা শুনবে কেন? তোমার অনেক আত্মীয়স্বজন...আমি তো...

প্রতাপের চোখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বুলা জিজ্ঞেস করলো, তুমি বলবে না? তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাও না?

সেদিন প্রতাপ বুলাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর বুলাকে বাসস্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে প্রতাপ বলেছিল, সে আগামীকালই বুলার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

কিন্তু প্রতাপ যায়নি। বুলার বাবাকে গিয়ে তার পক্ষ থেকে এই বিয়ে বন্ধ করতে বলার একটাই অর্থ হয়। যে যুবক নিজে একজন পাণিপ্রার্থী, সে-ই এরকম কথা বলতে পারে। এ রকম প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া কী হবে তা প্রতাপ জানতেও চায় না। কলকাতা শহরে সেই তিরিশের দশকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে বিবাহ এমন কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়।

প্রতাপের পরিবার থেকে প্রবল আপত্তি হতো ঠিকই, তবু প্রতাপ তা অগ্রাহ্য করতে পারতো। কিন্তু আসল বাধা অন্য জাগায় প্রতাপ জানতো, মামুন বুলাকে তীব্র ভাবে ভালোবাসে। বুলার কথা

বলতে গেলেই মামুনের কণ্ঠস্বর গদগদ হয়ে যায়। যদিও মামুন বুলাকে কোনোদিনই পাবে না। ততখানি সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর সাহস মামুনের নেই। তা ছাড়া মামুনের ভালোবাস একতরফ, বুলার দিক থেকে মামুনের প্রতি সে ধরনের কোনো দুর্বলতা জন্মায়নি। মামুন প্রায়ই বলে, ব্রাহ্মণ কন্যা গায়ত্রী যত দিন না বিয়ে করে পরের ঘরে চলে যায়, ততদিন আমিও অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না।

সেই পরের ঘর মানে কি প্রতাপের সংসার হতে পারে? মামুন তাতে আরও বেশী আঘাত পাবে। একটি মেয়ের জন্য প্রতাপ কিছুতেই তার বন্ধুর মনে আঘাত দিতে পারবে না।

কাপুরুষের মতন মেস ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রতাপ প্রায় দিন পনেরো বরানগরে দিদির বাড়িতে গিয়ে রইলো।

সুপ্রীতি এবং অসিতবরণ প্রায়ই প্রতাপকে সেবাড়ি থেকে ছাড়িয়ে এনে বরানগরের নিজের কাছে রাখবার জন্য পেড়াপিড়ি করেছেন আগে। প্রতাপ রাজি হয় নি। এখন প্রতাপ নিজে থেকেই এসে দিনের পর দিন থেকে যাচ্ছে দেখে সুপ্রীতি অবাক হয়েছিলেন, গোপনে গোপনে। প্রতাপও প্রথম কয়েকদিন দিদিকে কিছু বলেনি। কিন্তু তার অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল তখন। সেই কষ্ট দুটি কারণে। নিজের কাপুরুষতার জন্য তার সর্ব অঙ্গে আলপিন দংশন হচ্ছিল। অল্প বয়েস থেকেই প্রতাপ মিথ্যে কথা বলাটাকে ঘৃণা করে। বুলাকে সে মিথ্যে বলেছে। অথচ সেদিন ক্রন্দনশীলা বুলাকে আর কী বলেই বা বাড়িতে ফেরানো যেত?

তা ছাড়া প্রতাপ ভেবেছিল, বুলা নিজে কিছু না জানুক তবু সে মামুনের মনোনীত, সেই জন্য প্রতাপ বুলা সম্পর্কে নিজের দুর্বলতা মুছে ফেলেছে। কিন্তু এখন তার বুকটা সে ফিরিয়ে দিল? বুলা একজন অন্য পুরুষের কাছে চলে যাবে? অথচ প্রতাপের সমস্ত শরীর-মন বুলার জন্য হাহাকার করছে। সে একবার মুখ ফুটে চাইলেই বুলা তার হতো, অথচ সে মুখ ফুটে চাইতে পারলো না, এই চিন্তাটাই তার পৌরুষে চাবুক কষাচ্ছে অনবরত। এক একবার ইচ্ছে করছে ছুটে যেতে বুলাদের বাড়িতে।

সুপ্রীতি শেষ পর্যন্ত জানতে পারলেন। সব কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বলেছিলেন, তুই ঠিকই করেছিস রে, খোকন। বুলাকে তুই বিয়ে করলে সে বিয়ে সুখের হতো না। দুই পক্ষের বাবা-মায়ের মানসিক কষ্টের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু তোর বন্ধু মামুনকে তো তুই ছাড়তে পারতি না! মামুন তোর বাড়িতে এসে বুলার দিকে চেয়ে গোপনে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। তুই যা করেছিস, ঠিকই করেছিস। বুলার সাথে আর কোনো দিন দেখা করিস না। সময় সব ভুলিয়ে দেয়। বুলাও একদিন এসব কথা ভুলে যাবে, নিজের সংসার নিয়ে সুখে থাকবে!

কিন্তু বুলার সঙ্গে তার নিয়তির কোনো যোগাযোগ আছে। এরপরেও বুলার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে কয়েকবার। একবার দেশে ফেরার পথে স্টিমারে। বুলার সঙ্গে তার স্বামীও ছিলেন। তিনি বিলেত-ফেরত। সুপুরুষ ও ধনী। বুলাকে বেশ খুশী মনে হয়েছিল। যদিও প্রতাপকে দূর থেকে দেখে সে কোনো কথা বলেনি। তারপর আরেকবার, প্রতাপেরও তখন বিয়ে হয়ে গেছে মমতার সঙ্গে, উত্তর কলকাতায় নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে নতুন সংসার পেতেছে। পিকলু জন্মাবার আগে মমতা যখন বাপের বাড়ি গেছে, সেই সময় প্রতাপ একদিন দেখলো যে কাছেরই একটি বাড়ি থেকে বুলা অন্য দুটি সুসজ্জিতা মহিলার সঙ্গে বেরুচ্ছে। এত কাছে যে বুলার সঙ্গে স্পষ্ট চোখাচোখি হলো, বুলা থমকে দাঁড়ালো, বোধহয় কিছু বলতেও চেয়েছিল। কিন্তু বলা হয়নি। প্রতাপ সেখানে দাঁড়ায়নি।

সেই বাড়িটি কোনো অভিজাত পরিবারের। সেটাই বুলার শ্বশুরবাড়ি না স্বামী পক্ষের কোনো আত্মীয়ের, তা প্রতাপ ঠিক বুঝতে পারেনি। আরও দু'চারবার সেই বাড়িটির সামনে দিয়ে হেঁটেছে, কিন্তু বুলাকে আর দেখতে পায়নি। কিছুদিন পরেই প্রতাপকে অন্য কারণে বাড়ি বদল করে সে পাড়া থেকে চলে যেতে হয়।

এতদিন পরে বুলার সঙ্গে আবার দেখা, এই দেওঘরে। অন্য দু'জন নারী-পুরুষের সঙ্গে বুলা এসেছে তাদেরই বাড়িতে। বুলা কি এখনো রাগ করে আছে?

॥ ৯ ॥

সত্যেন ভাদুড়ীর গায়ের পাঞ্জাবীটি গিলে করা, ধুতিটি কোঁচানো, কাঁধের শালটির পাড় প্রায় এক বিঘৎ চওড়া এবং মুখে হরতনের গোলামের মতন পাকানো গোঁফ, হাতে একপি রুপো বাঁধানো ছড়ি। এই সবই তাঁর বনেদীআনার সূচক। দেশবিভাগে তাঁরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হননি, জমি-জমা অনেক গেছে বটে, কিন্তু নারায়ণগঞ্জে তাঁদের যে বিশাল বাড়ি ছিল সেটি আইন সঙ্গতভাবে বদল করে

কলকাতার উপকণ্ঠে টালিগঞ্জের দিকে এক মুসলমানের একটি বেশ বড় বাড়ি পেয়েছেন। পূর্ববঙ্গে তাঁদের পাটের ব্যবসা ছিল, সেই অভিজ্ঞতায় পশ্চিমবঙ্গেও একটিপ চটকলের অংশীদার হয়েছেন, মূধনও যথেষ্ট সরাতে পেরেছিলেন। বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপায় এদিকে এসে বরং তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

সত্যেন ভাদুড়ীর গান বাজনার শখ আছে, সেই সূত্রে বিশ্বনাথ গুহের সঙ্গে পরিচয়। নন্দন পাহাড়ের কাছে এঁরা একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে হাওয়া পরিবর্তনে এসেছেন। বাজারে যাওয়া-আসার পথে মাঝে মাঝেই তিনি বিশ্বনাথের কাছে আসেন গল্প-গুজব করতে।

দু'জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এ বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢুকে আজ বেশি মানুষজন দেখে থমকে গেলেন। বিশ্বনাথ এগিয়ে এসে বললেন, আসুন, আসুন, ক'দিন দেখিনি যে?

সত্যেন ভাদুড়ী বললেন, একটু গিরিডি ঘুরে এলাম। শুনেছিলাম ওখানকার জল খুব ভালো, তা সত্যিই কিন্তু, খাবার হজম হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। আপনার বাড়িতে অতিথি এসেছে বুঝি? আমরা অসময়ে এসে পড়লাম...

বিশ্বনাথ বললেন, আরে কী যে বলেন! আমার বাড়িতে কোনো সময়ই অসময় নয়।

প্রতাপকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিয়ে সহাস্যে বললেন, এই দুনিয়াটাই শ্যালকে ভর্তি, তবে এটি আমার একমাত্র আপন শ্যালক। কলকাতায় জজিয়তি করেন।

সত্যেন ভাদুড়ী প্রতাপকে নমস্কার করে বললেন, আপনাদের মালখানগড়ে বাড়ি ছিল না? আমি গেছি সেখানে, নামকরা জায়গা!

দেশ-বিভাগ এখনো যেন বাস্তব হয়ে ওঠেনি। তাই ফেলে-আসা গ্রাম-শহরের কথাও খুব আপন আপন সুরে উচ্চারিত হয়, অন্যকথার আগে "দেশের" কথা চলে কিছুক্ষণ।

মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার প্রথা নেই। দুই নারী একটু পাশ ফিরে বাগানের গাছপালা নিরীক্ষণ করছেন। প্রতাপ আড়চোখে দেখতে লাগলেন গায়ত্রীকে। নিজের বয়েস বাড়ার কথা মানুষের মনে থাকে না, প্রতাপ গায়ত্রীর বয়েস বাড়াটাই লক্ষ্য করলেন। মাঝখানে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান, গায়ত্রীর অনেক বদল হয়েছে, কিন্তু মুখের আদলটা একই রকম, চিনতে কোনো অসুবিধে হয় না।

গায়ত্রী একবার একটু মুখ ফেরাতেই প্রতাপ বললেন, কেমন আছো, বুলা?

গায়ত্রী প্রতাপের চোখের দিকে স্থিরভাবে দৃষ্টিপাত করে রইলো। সে দৃষ্টির মর্ম বোঝা বড় শক্ত। সে কোনো উত্তর দিল না।

কথা থামিয়ে অবাকভাবে সত্যেন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ওকে চেনেন?

প্রতাপ সহাস্যে বললেন, হ্যাঁ। ছাত্র বয়েসে ওদের বাড়িতে গিয়ে ছিলাম একবার। ওর মা-বাবা এত যত্ন করেছিলেন, তা কোনোদিন ভুলবো না। তবে আপনার শ্যালিকাটি বোধহয় আমায় এখন চিনতে পারছে না।

সত্যেন বললেন, আমার শালিকা নয়।

প্রতাপ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল হয়েছে। গায়ত্রী তো কোনো দিদি বা বোন ছিল না।

সত্যেন বললেন, ইনি সম্পর্কে আমার বৌদি, যদিও আমার স্ত্রীর চেয়ে বয়েসে ছোট। আমার খুড়তুতো ভাই নরেন আর আমি তাকে দাদা বলিনি অবশ্য। সেই নরেনের স্ত্রী।

একটু থেমে তিনি আর একটি তথ্য যোগ করলেন, নরেন এখন বিলেতে আছে।

বিশ্বনাথ বললেন, বারান্দায় উঠে আসুন। এই বাবলু, তোর শান্তিপিসিকে ডাক তো!

শান্তি এসে সত্যেনের স্ত্রী বিভাবতী আর গায়ত্রীকে নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে। পুরুষরা বারান্দায় চেয়ারে বসে রোদ্দুরে পা দিয়ে গল্প করতে লাগলেন। চা-ও পাঁপড় ভাজা এলো। সত্যেন যে টাঙ্গায় এসেছেন, সেটা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেপুলেরা ছুটোপাটি করছে বাগানে। অলস ভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে বেলা।

সত্যেন ভাদুড়ী আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা সবাইকে নেমন্তন্ন করে গেলেন তাঁর বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা হবে।

দুপুরবেলা প্রতাপ যখন ঘরে এসে দিবানিদ্রার উদ্যোগ করছেন তখন পান খাওয়া ঠোঁটে হাসি টিপে মমতা জিজ্ঞেস করলেন, এই তোমার সেই বুলা?

প্রতাপ স্ত্রী কাছে বুলা-বৃত্তান্ত গোপন করেন নি। অনেক সময় মৃদু দাম্পত্য কলহে প্রতাপ রঙ্গ করে বলেছেন, আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল! যেমন তার রূপ, তেমন ছিল তার গুণ!

মমতাও অনেক সময় ঠাট্টা করে বলেছেন, তুমি সব সময় আমার ওপর এত মেজাজ দেখাও।

সেই মামুনের মেয়েকে বিয়ে করলে জব্দ হতে। সে শুনেছি একে সুন্দরী, তার ওপরে ভালো গান গায়, সে এত কিছু সহ্য করতো না!

মমতার খুব ইচ্ছে ছিল গায়ত্রী নাম্নী সেই মেয়েটিকে একবার দেখবার।

প্রতাপও হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলে? আমি কি বাড়িয়ে বলেছি কিছু?

মমতা একটা পাট করা শাড়ী অকারণে খুলে আবার পাট করতে করতে বললেন, তোমার বুলা তো কথাই বলতে চায় না। স্বামী বিলেতে থাকে বলে বুঝি খুব অহংকার? আমার ছোট কাকাও তো বিলেতে থাকেন। তার জন্য আমার ছোট কাকীর তো কোনোদিন অহংকার দেখিনি!

প্রতাপ বললেন, অনেকদিন পর দেখা তো, বুলা বোধহয় আমাকে ঠিক চিনতে পারে নি।

মমতা ঝংকার দিয়ে বললেন,ঠিকই চিনেছে। তুমি সব সময় তার কথা ধ্যান করো, আর সে তোমাকে ভুলে যাবে? আমার দিকে কীরকম রাগ রাগ ভাব করে তাকাচ্ছিল!

প্রতাপ হা-হা করে হেসে উঠলেন।

একটু পরে তিনি ঘুমের ভান করে পাশবালিশটা জড়িয়ে নিলেন বটে, কিন্তু ঘুম এলো না। বুলার কথাই মনে পড়ছে। সেই প্রথম যৌবনের চমৎকার দিনগুলির স্মৃতি। সত্যেনের কাছে তিনি জেনেছেন যে সত্যসাধন আর সুরবালা এপারে চলে আসেন নি, তাঁরা রয়ে গেছেন কুমিল্লায় সেই বাড়িতেই। আর কেউ নেই, শুধু বুড়ো-বুড়ি। মরতে হয় তাঁরা ওখানেই মরবেন। সুরবালা অত করে বলে ছিলেন তবু আর কোনোদিন যাওয়া হলো না প্রতাপের।

মামুনের সঙ্গেও অনেকদিন যোগাযোগ নেই। মামুন পূর্ব পাকিস্তানে বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় গুলি চালনায় চারজনের মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে পড়ে প্রতাপ শিউড়ে উঠেছিলেন। পরে নিহতদের নাম প্রকাশিত হলো কিন্তু সব আহতদের নাম জানা যায়নি। প্রতাপ একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন মামুনের নামে তারও উত্তর আসেনি। কানাঘুষোয় শুনেছিলেন মামুন কারাবন্দী। এ বছর ফজলুল হক যে স্বল্প সময়ের জন্যে ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন তো মামুনের ছাড়া পাওয়ার কথা।

বাইরে একটা ঘুঘু ডাকছে। কলকাতার তুলনায় এই সব স্থান অনেক নির্জন, দুপুরবেলা গাড়ি ঘোড়াও চলে না। ঘুঘুর ডাকটি স্পষ্ট! মনে পড়ে যায় মালখানগরের দুপুরগুলোর কথা। শৈশব, কৈশোর। ঘুঘুর ডাকের মধ্যে ফুটে ওঠে একটা কথা ঠাকুর গোপাল, ওঠো, ওঠো, ওঠো! ছেলেবেলায় এই রকম মনে হতো, এখনও সেই রকম শুনতে লাগে।

একটা সিগারেট ধরাবার জন্য পাশ ফিরতেই প্রতাপ দেখলেন মমতা এসে বসে আছেন জানলার ধারে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি শোবে না একটু?

মমতা বললেন, তোমার ঐ বুলা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেও আমি রাগ করি নি। বরং আমার দুঃখই হলো ওর জন্য। ওর একটা খারাপ খবর শুনেছো?

- কী?

- ওরা স্বামী ওকে নেয় না।

মেয়েরা তাড়াতাড়ি অনেক কিছু জেনে যায়। সত্যেন ভাদুড়ীর সঙ্গে অতক্ষণ গল্প হলো, তিনি বুলা সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

প্রতাপ উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার কাছে শুনলে?

মমতা বললেন, খেতে বসে ছোট ঠাকুরঝি বললেন সব কথা। বুলার বর বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার, তুমি জানতে?

- হ্যাঁ জানতুম। একবার দেখেছিও তাকে। খুলনা থেকে যাওয়ার পথে স্টিমারে। বুলাকে তখন তো খুব খুশী মনে হয়েছিল। ওর স্বামীটিকে দেখতে একেবারে সাহেবদের মতন।

- সাহেব না ছাই! আসলে একটি বিলিতি লাল মুলো! এখানে নাকি একদম প্র্যাকটিস জমাতে পারেনি, বাড়িতে বসে পায়ের ওপর পা দিয়ে আলস্য করতো। এদিকে গুণধরটি যে বিলেতে আগে একটি বিয়ে করে এসেছে সে কথা কারুকে জানায়নি। একদিন সেই মেম বউ এসে হাজির। সে একটা চাকরানী না ম্যাথরানী কিছু একটা হবে। আমার ছোটকাকা বলেছিলেন, বিলেতে গিয়ে আর তো কারুর সঙ্গে মেশার সুযোগ পায় না, ঐ চাকরানী-ম্যাথরানী দেখলেই অনেক ছেলের মাথা ঘুরে যায়। আর টপ টপ বিয়ে করে ফ্যালে!

- ছোড়দি এসব কথা কার কাছে শুনেছে?

- ঐ সত্যেনবাবুর বউই বলেছে। উনিও নাকি বুলাকে তেমন একটা পছন্দ করেন না।

- মেম বউ এসে কী করলো?

- চ্যাচামেচি, ঝগড়া-ঝাঁটি, চুলোচুলি, শেষ পর্যন্ত কোর্ট কাছারি অবধি গড়িয়েছিল। সে বউ-এর নাকি দুটি বাচ্চা আছে। তার বিয়েটাই আগে, আর খ্রীষ্টান মতে বিয়ে হয়েছিল, সে ছাড়বে কেন? নাকে দড়ি দিয়ে নরেন ভাদুড়ীকে সে টানতে টানতে আবার বিলেতে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে নরেন ভাদুড়ী আর কোনোও চিঠিপত্রও লেখে না।

- এটা কতদিন আগেকার ঘটনা?

- দশ এগারো বছর আগেকার। বুলার একটা ছেলে আছে শুনলাম। মেয়েটা এখন না বিধবা-সধবা। সেই জ্যান্তগদানী মেম না মরলে নাকি নরেন ভাদুড়ীর দেশে ফেরার উপায় নেই।

- কেন ফিরতে পারবে না? দেশে এখন স্বাধীন হয়েছে, এখন তো আমাদের ওপর ব্রিটিশ আইন খাটবে না। হিন্দু মতে দুটি বিয়ে অসিদ্ধ নয়।

- কী জানি!

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন দু'জনেই। তারপর মমতা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার খুব খারাপ লাগছে, না?

প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, খারাপ লাগবে না? একটি মেয়েকে ছোটবেলায় চিনতাম, মেয়েটার অনেক গুণ ছিল, তার একটা সুন্দর জীবন প্রাপ্য ছিল। একটা তঞ্চক তার জীবনটার সর্বনাশ করে দিল।

- তুমি যদি ওকে বিয়ে করতে তা হলে ওর এসব কিছুই হতো না। একটু সুন্দর জীবন পেত, তুমিও সুখী হতে।

- আরে যাঃ! আমার সঙ্গে বিয়ের তো কোনো প্রশ্নই ওঠেনি।

- অসুবিধে ছিল বলেই তুমি ওকে বিয়ে করতে পারোনি। জাতের অমিল না থাকলে তুমি ওকেই বিয়ে করতে। আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় যে তুমি সুখী হয়েছো, সে কথা একবারও বলো না।

প্রতাপ উঠে এসে জানলা দিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেললেন, তারপর মমতার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, পাগল! আমি এখন তিন ছেলেমেয়ের বাবা, এখনও এইসব কথা! তুমি নাটক-নভেল পড়তে ভালোবাসো, নাটক-নভেলে কে কাকে বিয়ে করলো না তাই নিয়ে হা-হুতাশ থাকে। আমি তো ওসব পড়ি না! আমার মনের মধ্যেও ওসব নেই। বুলাকে বিয়ে করার কথা আমি কোনোদিনই ভাবি নি। ওকে আমি পছন্দ করতাম ঠিকই। ছোট বোনের মতন দেখতাম বললে ভুল হবে, একটু অন্যরকমের ভালোলাগা। ব্যস সেইটুকুই, আর কিছু না। বাবা-মায়ের অমতে বিয়ে করা, একটা গোলমাল পাকানো, আলাদা থাকা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা যা করে, ওসব চিন্তা আমার মাথায় কোনোদিন আসেনি। ...আরে তুমি?

প্রতাপ মমতার থুতনি ধরে মুখটা উঁচু করে বললেন, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নম্!

প্রতাপ সচরাচর সত্য কথা বলেন। এসবই তাঁর মনের কথা। কিন্তু মানুষের মন তো কোনো অনড় পাথর নয়, তা বাষ্পময় বস্তুর মতন, ক্ষণে ক্ষণে তার তার বদল হতে পারে। পরদিন রাতেই প্রতাপের ভাবান্তর হলো।

ঠিক হয়েছিল যে সত্যেন ভাদুড়ীদের বাড়ির নেমন্তন্নতে বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া হবে না, ওরা বাড়িতেই থাকবে। কিন্তু পরদিন সন্ধেবেলা ও বাড়ি থেকে দু'খানা টাঙ্গা এসে উপস্থিত, সত্যেন ভাদুড়ী চিঠি পাঠিয়েছেন যে নিমন্ত্রণ সকলের। ছেলেমেয়েদের তো বটেই, এমনকি প্রতাপের মাকেও নিয়ে যেতে হবে। রাত্রে ফেরার ব্যবস্থাও তিনি করবেন।

চিঠি পড়ে বিশ্বনাথ বললেন, বড়লোকদের কায়দাই অন্য রকম। নেমন্তন্ন করলে যাওয়া-আসার ব্যবস্থাও ওদের। তা হলে কে কে যাবে?

কানু-পিকলু-বাবলুর বেশ আপত্তি। ওরা নিজেরা খেলাধুলো নিয়ে থাকে, অচেনা বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে ওদের ইচ্ছে নেই। মমতা দু'একবার বলায় পিকলু রাজি হয়ে গেল, বাবলু মুখ গোঁজ করে রইলো, আর কানু পালিয়ে পালিয়ে রইলো দূরে।

প্রতাপের মা সুহাসিনীর কিন্তু বেশ যাবার ইচ্ছে। তিনি বললেন, ওরে ছেলেরা, তোরা যেতে চাস না কেন? চল। ওরা নারায়ণগঞ্জ লোক, খুব ভালো খাওয়াবে-দাওয়াবে। সুহাসিনী ঠাকুরঘরে গিয়ে

ঝটপট মন্ত্র পড়ে এসে একখানা গরদের শাড়ি পরে তৈরি হয়ে নিলেন। তাঁর তাড়নাতেই ছেলেরা বাধ্যহয়ে রাজি হলো যেতে।

নন্দন পাহাড়ের দিকটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। খানিকটা করে ব্যবধানের এক একটি বেশ বড় বাড়ি, সঙ্গে অনেকখানি বাগান। আজ সন্ধ্যেবেলাতেই চাঁদ উঠেছে, এদিককার আকাশ অনেক বেশি নক্ষত্রময়, পাতলা ঝিরঝিরে শীতের বাতাস বইছে। এখানে আসার পর একদিনও সন্ধ্যের পর বেড়াতে বেরুনো হয়নি, তাই ভালো লাগছে সকলেরই।

সত্যেন ভাদুড়ী কোনো জমিদারের বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, সামনের দিকে এত বড়বড় গাছপালা যে ভেতরের বাড়িটি রাস্তা থেকে দেখাই যায় না। মস্ত বড় লোহার গেট, তারপর লাল সুরকির টানা পথ। ভেতরের পোর্টিকোতে একটি পাঁচ শো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। সত্যেন নিজে বেরিয়ে এসে অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন। সুহাসিনীকে তিনি ভুল করে প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন, সুহাসিনী তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে বললেন, আরে করো কী, করো কী, তোমরা তো ব্রাহ্মণ।

সত্যেন হাত জোড় করে বললেন, মা, আপনি এসেছেন তাতে আমি যে কী খুশী হয়েছি। আমি অতি অল্প বয়েসে মাকে হারিয়েছি, মায়ের স্মৃতিই নেই, আপনাকে প্রথম দিন দেখার পরই আমার নিজের মায়ের মতন মনে হয়।

সুহাসিনী আশীর্বাদ করে বললেন, শতায়ু হও বাবা। ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক। এ বাড়িখানি তো বড় সুন্দর। তোমার নিজের নাকি?

সত্যেন বললেন, না। তবে, বাড়িটি আমাদেরও খুব পছন্দ হয়েছে। ভাবছি যদি কিনে রাখা যায়। আসুন, ভেতরে আসুন!

সামনের দিকে একটি বেশ বড় হল ঘর, তাতে ঝাড় লণ্ঠন বসানো। প্রতাপ আর বিশ্বনাথ সেই ঘরে বসলেন, অন্যরা অন্দর মহলে চলে গেল। এই ঘরটিতে কার্পেটের ওপর তাকিয়ে ছড়ানো, মাঝখানে একটি হারমোনিয়াম ও এস্রাজ। এক কোণে একজন তবলচি আড়ষ্টভাবে বসে আছে।

বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করলেন, হারমোনিয়াম জোগাড় করলেন কোথা থেকে? আগেরবার তো দেখিনি?

সত্যেন মুচকি হেসে বললেন, ইচ্ছে করলে সবই পাওয়া যায়। ভাড়া করার চেষ্টা করেছিলাম, না পেয়ে কিনেই ফেললাম ওটা।

বিশ্বনাথ বসে পড়ে হারমোনিয়মটা বাজিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, কেনার আগে আমাকে একবার দেখালেই পারতেন। এটা বেশ বেসুরো।

সত্যেন বিস্মিতভাবে বললেন, সে কি! লোকটা যে বললো কলকাতা থেকে কোন্ মুসলমান গায়ক এসে এটাই ব্যবহার করেছিল?

বিশ্বনাথ বললেন, সে কবে করেছিল কে জানে! যাই হোক, কাজ চলে যাবে।

সত্যেন বললেন, মেয়েদের আর বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। আমরা একটু বেশিক্ষণ থাকবো, কী বলেন?

বিশ্বনাথ বললেন, সারা রাত হলেও আপত্তি নেই, কী বলো ব্রাদার?

গান বাজনা শুরু হবার আগে সত্যেন একটি সাদা ঘোড়া মার্কা স্কচের বোতলও গেলাশ আনালেন। গেলাসের সংখ্যা তিন। সত্যেন প্রতাপের মুখের দিকে তাকাতেই বিশ্বনাথ বললেন, আমার ব্রাদারটি আবার ও রসে বঞ্চিত। উনি সুর পছন্দ করেন, তার সঙ্গে আকার যোগ করলেই মুখ ফিরিয়ে নেন।

সত্যেন বললেন, আমরা...আমরা যদি খাই, তাতে আপত্তি নেই তো?

প্রতাপ দু'দিকে মাথা নাড়লেন। বিশ্বনাথ যে মাঝে মাঝে সুরা সেবন করেন তা তিনি আগেই জানেন। যারা গান বাজনার চর্চা করে তাদের বোধহয় ওসব লাগে। প্রতাপের কোনোদিন মদ স্পর্শ করার প্রবৃত্তি হয়নি। মুনসেফগিরি করার জন্য তাঁকে অনেক মফস্বলে ঘুরতে হয়েছে। কোনো কোনো জায়গা এমন সৃষ্টিছাড়া যে সন্ধ্যের পর আর কিছুই করার থাকে না, এমনকি ব্যাডমিন্টন-টেনিস খেলারও ব্যবস্থা নেই, সেখানে তিনি তার সহকর্মী বা উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারদের মধ্যে মদ্যপানের চল দেখেছেন। প্রতাপ কখনো তাঁদের সঙ্গ পরিহার করেন নি। আবার অন্যদের শত অনুরোধও গেলাস ধরেন নি।

মাঝে মাঝে বাড়ির ভেতর থেকে টুকটাক খাবার আসছে। এ বাড়িতে মনে হয় একটা প্রথা

আছে, চাকর-বাকরদের হাতে খাবার পাঠানো হয় না। খাবারের প্লেটগুলি নিয়ে আসছেন কখনো সত্যেনের স্ত্রী, কখনো বুলা।

প্রতাপ ঠিক করেছেন, বুলা নিজে থেকে কথা না বললে তিনি আর কিছু বলবেন না। সেটা ভালো দেখায় না।

আসর যখন বেশ জমে উঠেছে, সেই সময় বুলা একবার এলো কিছু মাছ ভাজা নিয়ে। একটি প্লেট সে প্রতাপের সামনে রাখলো। প্রতাপ বুলার মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলেন সেখানে কোনো বিষাদের চিহ্ন আছে কি না!

সত্যেন খপ করে বুলার হাত ধরে বললেন, বড় গিন্নি, এখানে একটু বসো না! গান শোনো!

তারপর মুখ তুলে তিনি বললেন, আমার বৌদিটি প্রায় আমার বড় গিন্নি, বুঝলেন! উনি কিন্তু ভালো গান করেন! আপনারা শুনলে মোহিত হয়ে যাবেন। শোনাও না তোমার একটা গান, ঐ যে সেই গানটা, রবি ঠাকুরের, মরি হায়, চলে যায়...

কথাগুলো শোনার সময় প্রতাপের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি। তিনি শুধু বুলার মুখটাই দেখছিলেন। বুলা অবশ্য গান শোনালো না, সেখানে দু'মিনিটের বেশি থাকলোও না।

একটু পরে, বিশ্বনাথ বিভোর হয়ে গান গেয়ে চলেছেন, সত্যেন বাজাচ্ছেন এস্রাজ, তখন সত্যেনকে তিনি পছন্দ করতে পরতেন না কিছুতেই। বুকটা ঈর্ষায় জ্বলছে। এই চালিয়াৎ ধনী ব্যক্তিটি বুলার হাত ধরলো কেন? কেন বললো বড় গিন্নি! ও কি সেই রকমই ব্যবহার করে বুলার সঙ্গে?

বুলা তাঁর কেউ নয়, বুলার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই, তবু প্রতাপের মনে হলো বুলার ওপর তাঁর একটা অধিকার আছে।

॥ ১০ ॥

দুটো সাইকেল ভাড়া করা হয়েছে, কানু আর পিকলু ত্রিকূট পাহাড়ে বেড়াতে যাবে। এ বিষয়ে বিশ্বনাথের সঙ্গে তাদের একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে আগেই। প্রতাপকে জানানো হবে না। কারণ প্রতাপ শুধু ওদের দু'জনকে অতদূর যেতে দিতে আপত্তি করতে পারেন, আর বাবলুকেও সঙ্গে নেওয়া হবে না, কারণ সে সাইকেল চালাতে জানে না।

বিশ্বনাথ খুব তাল দিয়েছেন ওদের। চোখ পাকিয়ে ফিস ফিস করে বলেছেন, তোরা খুব ভোরে উঠে চলে যাবি, বুঝলি। কাক-পক্ষীতেও যেন টের না পায়। পিকলু, তোর বাবাকে আমি পরে ঠিক ম্যানেজ করে দেবো। সে বেশি রাগারাগি করলে আমার হাতে একটা মোক্ষম যুক্তি আছে।

ক'দিন ধরেই বাড়ির সকলে মিলে টাঙ্গা ভাড়াকরে ত্রিকূট আর তপোবন বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব উঠছিল, কিন্তু মমতার শরীরটা ভালো নেই বলে যাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু ছেলেদের অত ধৈর্য নেই, পাহাড়ের নাম শুনে তারা উতলা হয়ে উঠেছে।

বিশ্বনাথ শেষ রাতে অন্ধকার থাকতে থাকতেই ডেকে দিলেন কানু আর পিকলুকে। ওরা তৈরি হয়ে নিল চটপট। বিশ্বনাথ একটা ছোট চুবড়িতে পাউরুটি, মাখন, কলা আর গোটা দশেক প্যাঁড়া সাজিয়ে দিলেন, বয়েস কালের ছেলে, ওদের যখন-তখন খিদে পাবে।

যাত্রার ঠিক আগে বাবলু বাইরে বেরিয়ে এলো। ঘুম চোখেও সে ব্যাপারটা বুঝে নিল এক মুহূর্তের, দৌড়ে গিয়ে সে একটা সাইকেল চেপে ধরে রইলো শক্তভাবে। তাকে আর কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। বেশি জোর করতে গেলে সে তীক্ষ্ণ স্বপে চেঁচিয়ে উঠলো না, আমি যাবো! আমি যাবো!

বিশ্বনাথ বললেন, এই রে, এবার তো সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। এই বিচ্ছুটা ছাড়বে না। কানু, তুই ডাবল ক্যারি করতে পারবি না?

কানুর ভুরু কুঁচকে গেছে। অনেকখানি রাস্তা। তার তো প্রত্যেকদিন সাইকেল চালানো অভ্যেস নেই। কিন্তু বাবলুটা যে জেদী ছেলে তাকে এড়ানো যে সম্ভব হবে না, তাও কানু বুঝে গেছে। সে ধমকের সুরে বললো, যা, সোয়েটার নিয়ে আয়।

পিকলু বললো, জুতোর সঙ্গেমোজা পারবি। না হলে তোকে নেবো না!

অন্যসময় বাবলু গরম জামা পড়তে চায় না, আর জুতোর সঙ্গে কিছুতেই মোজা পরতে রাজি হয় না। এখন সব কিছুতেই রাজি। বিশ্বনাথ ওদের গেটের বাইরে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে এলেন।

সকালে চা খাওয়ার সময় প্রতাপ ছেলেদের অনুপস্থিতি লক্ষ করলেন না। দু'দিন ধরে বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। বাগানের চেয়ার পেতে রোদ্দুরে বসে দু'তিন কাপ চা খেয়েও আশ মেটে না। তারপর প্রতাপ বাজার করতে বেরিয়ে পড়েন। রোজ রোজ মুর্গীর মাংস তাঁর রোচে না, একটু মাছ না

হলে যেন ভাত খাওয়ার আনন্দটাই মাটি। প্রতাপ আবিষ্কার করেছেন যে কম্পাস টাউনে এক জায়গায় টাটকা মাছ বিক্রি হয়, তবে যেতে হয় সকাল নটার মধ্যে।

একটা বেশ ভালো কাতলা মাছ পেয়ে প্রতাপ প্রসন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু একটু পরেই তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল। ফেরার পথে তিনি দশ পয়সা দিয়ে একটি আনন্দবাজার কাগজ কিনলেন। আগের দিনের ডাক সংস্করণ। প্রথম পৃষ্ঠায় অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নিষ্ঠুর হাসি-মাখা মুখের ছবি। রাশিয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি কটূক্তি বর্ষণ করেছেন। এক বছর আগে স্টালিন সাহেবের মৃত্যুর পর আইসেনহাওয়ার-চার্চিলের ধারণা হয়েছে যে এবার রাশিয়াকে বাগে পাওয়া গেছে। ঠান্ডা-লড়াইটা এবার বুঝি গরম হয়ে উঠবে।

মূল খবরের চেয়েও পাতার নিচের দিকের কয়েকটি সংবাদে প্রতাপ বেশী আকৃষ্ট হলেন। ধানবাদের কাছে একটি ছোটপ জায়গায় বাঙালীদের সঙ্গে বিহারীদের মারামারি হয়েছে। বিহারে বাঙালী-বিরোধী মনোভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার পাশের খবরটিই পূর্ব পাকিস্তানের, সেটাও দাঙ্গার খবর। ফজলুল হক মন্ত্রী সভাপতনের পর ওদিকে ছোটখাটো দাঙ্গা লেগেই থাকছে, দলে দলে হিন্দুরা সীমান্ত পার হয়ে চলে আসছে ভারতে। আর একটি ছোট খবর, কলকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে একটি বাগানবাড়ি উদ্বাস্তুরা জবরদখল করতে গেলে হাঙ্গামা হয়, পুলিশ উদ্বাস্তুদের ওপর গুলি চালিয়েছে।

প্রতাপের চোয়াল কঠিন হয়ে গেল, তিনি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

বাড়ি ফিরে তিনি দেখলেন বিশ্বনাথ প্রবল উৎসাহে গানের ইস্কুল চালাচ্ছেন। প্রত্যেকদিন একই গান শুনতে প্রতাপের ভালো লাগে না, তিনি উঠে গেলেন ছাদে। খানিকক্ষণ গল্প করলেন মায়ের সঙ্গে।

বেলা বাড়ার পর প্রতাপ নিচে এসে দেখলেন বিশ্বনাথ আর মমতা ঠিক যেন একটি নাটকের দৃশ্য অভিনয় করছেন। মমতার মুখখানিতে দারুণ উদ্বেগ মাখা আর বিশ্বনাথের মুখে খানিকটা উদাসীনতা, খানিকটা কৌতুক। বিশ্বনাথের এক হাতে জ্বলন্ত চুরুট, অন্য হাত দিয়ে তিনি দাড়ি মুচড়োচ্ছেন।

মমতা স্বামীকে দেখে আর্তভাব বললেন, বাবলু-পিকলুরা কোথায় গেল? সকাল থেকে দুধ খায় নি, কিছু খাবার খায় নি!

বিশ্বনাথ হাসিমুখে বললেন, গেছে কোথাও খেলতে। ওরা কি সর্বক্ষণ বাড়িতে বসে থাকতে পারে?

মমতা বললেন, তা বলে এতক্ষণ? ঘুম থেকে উঠে আমি তো ওদের দেখিইনি! বাবলুটা দুধ না খেয়ে থাকতেই পারে না!

বিশ্বনাথ উত্তর না দিয়ে চুরুট ফুঁকতে লাগলেন। প্রতাপের মনের মধ্যে খানিকটা উদ্বেগের সৃষ্টি হলেও তিনি স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে কোনো কথা বললেন না। তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললেন, আসবে, ওরা এসে পড়বে, তুমি ততক্ষণ আমাদের আর একটু চা খাওয়াতে পারো?

একটু পরে মমতা শান্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। শান্তি কী করে যেন জেনে ফেলেছেন যে ছেলেরা বেরিয়েছে ভাড়া করা সাইকেলে এবং বিশ্বনাথই তাদের উস্কানিদাতা।

ঘটনাটি ফাঁসহয়ে যাওয়াতে একটুও বিচলিত না হয়ে বিশ্বনাথ উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, আরে, এই ওরা একটু ত্রিকূট পাহাড়ের দিকে গেছে, কোনো চিন্তা নেই, সঙ্গে অনেক খাবার-দাবার নিয়ে গেছে!

দুই নারী এবারে বিশ্বনাথের উদ্দেশে প্রভূত অনুযোগ ও গঞ্জনা বর্ষণ করতে লাগলেন। বিশ্বনাথ মৃদু মৃদু হাসিমুখে প্রথমে কিছুক্ষণ শুনলেন, তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন, এই চুপ! মা শুনতে পেলে একটা হুলুস্থুলু বাঁধাবেন, তোমরা কি তাই চাও? ওদের বলে দিয়েছি বিকেল পাঁচটার মধ্যে ফিরবে, ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকো না!

এই কথায় কাজ হলো। একথা ঠিক যে সুহাসিনী জানতে পারলে এমনই হা-হুতাশ শুরু করবেন, যে মনে হবে যেন ছেলে তিনটি মরেই গেছে। তখন সুহাসিনীকে সামলানোই এক বিরাট সমস্যা হবে। মমতা ও শান্তি আরও একটুক্ষণ গুঞ্জন করে চলে গেলেন ভেতরে।

প্রতাপ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন, জেগে উঠলেন সহসা। তাঁর দুই ছেলে সকাল থেকে নিরুদ্দেশ, তবু তিনি এতক্ষণ ভাবছিলেন বুলার কথা। এখানে এসে এ পর্যন্ত বুলার সঙ্গে তাঁর একটিও বাক্য বিনিময় হয় নি, তবু যেন বুলার সঙ্গে তাঁর মনে মনে একটা সংলাপ চলছে, বুলা ঠিকই বুঝতে পারছে, প্রয়োজনের সময় বুলা প্রতাপের কাছে ডাক পাঠাবেন। প্রতাপকে দেখলেই যেন বুলার নাক

[illegible]ের ডগা লাল হয়ে ওঠে।

প্রতাপ এবার বিশ্বনাথকে বললেন, ওস্তাদজী, আপনি ছেলেগুলোকে অতদূর পাঠিয়ে দিলেন? আজকের কাগজ পড়ছেন?

বিশ্বনাথ বললেন, না, পড়িনি। কী আছে?

- বিহারে বাঙালীদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। বাঙালীরা যখন তখন মার খচ্ছে!

বিশ্বনাথ হা-হা করে হেসে বললেন, আরে দূর! ওরকম কত কী লেখে খবরের কাগজে আমাদের দেওঘরে ওসব কিছু হবে না!

প্রতাপ নিজের বাঁ দিকের জুলপি টানতে টানতে বললেন, কাগজে কিন্তু এরকম খবর প্রায়ই দেখছি। বিহারীরা বাঙালীদের সহ্য করতে পারছে না।

- শোনো, ব্রাদার, বাঙালী এখন কাদায় পড়েছে, সবাই তাকে লাথি মারবে! ঐ বঙ্গ-ভঙ্গটাই মেনে নেওয়া তোমাদের একটা গুরুতর ভুল হয়েছে। তখন এদিকটা চিন্তা করো নি?

- আরে, বঙ্গ বঙ্গর জন্য কি আমি দায়ী নাকি! আমি মেনে নিয়েছি কে বললো?

- কথার কথা বলছি। এত লাখ উদ্বাস্তু, এর ভার কি পশ্চিমবঙ্গ একা নিতে পারবে? বিহার, আসাম, উড়িষ্যা এইসব প্রভিন্সে কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়বেই। তাই নিয়ে খানিকটা গণ্ডগোল তো শুরু হবেই এইসব জায়গায়। গণ্ডগোল, গণ্ডগোল, বুঝলে ব্রাদার, এখন গণ্ডগোলই চলবে! পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের ভাগাবার চেষ্টা করেও কি সেখানকার বাঙালী মুসলমানরা সুখে আছে? ভাবগতিক দেখে তো মনে হচ্ছে, ওটাও একটা কলোনি, রাজ্যপাট যা কিছু চালাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা!

- এ বাংলার ও বেশ কিছু মুসলমান রিফিউজি গেছে ওদিকে। তাদের তো ওরা দূর ছাই করে না! আমাদের এদিকে, কাশীপুরে রিফিউজিদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। এই অসহায় মানুষগুলোকে থাকবার জায়গা দিতে পারছে না সরকার, তার ওপর আবার গুলি চালাবে। ভাবলেই আমার রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে!

বিশ্বনাথ বেশিক্ষণ রাজনৈতিক আলোচনা বা তিক্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন না। তিনি গুণগুন করে গান ধরলেন। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রতাপ বললেন, ওস্তাদজী, ছেলেগুলোকে অত দূর পাঠানো বোধ হয় ঠিক হয় নি। বাবলুটা ভীষণ দুরন্ত...

গান থামিয়ে বিশ্বনাথ প্রতাপের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, তুমি ঘোর সংসারী হয়ে পড়েছো!

প্রতাপ বললেন, স্বেচ্ছায় নয়। সংসারটা আমার কাঁধের ওপর চেপে বসেছে, বাবা চলে গেলেন, দেশের বাড়িটা চলে গেল...

- শোনো ব্রাদার, দেওঘরের এই বাড়িটা যখন কেনা হয়,তখন তোমার বয়েস কত ছিল? এই পিকলুরই বয়েসী হবে! সবাই মিলে এক সঙ্গে আসা হয়েছিল। এক দিন তুমি আর আমি সাইকেলে ত্রিকূট পাহাড় বেড়াতে গেলাম মনে নেই? তোমার বাবাকে কিছু না জানিয়ে—

প্রতাপ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল!

- দিনকাল তো নিজের নিয়মে বদলাবেই। সময় কি থেমে থাকে? কিন্তু যে বয়েসের যা, তা তো চলবেই। ওরা একটু অ্যাডভেঞ্চার করতে গেছে, অত ঘাবড়াচ্ছো কেন?

বাবলুকে নিয়ে কানু একবার আছাড় খেয়েছে। আগে সে বাবলুকে পেছনের ক্যারিয়ারে নিয়েছিল, এবারে সামনের রডের ওপর বসালো, তাতে সুবিধে হয়। বাবুল অবিরাম বক বক করে যাচ্ছে।

কানু তার জন্ম থেকেই মামার বাড়িতে থাকতো বলে তাকে পিকলু-বাবলুরা ছোটবেলায় দেখেনি বিশেষ। কানু তাদের কাছে নতুন মানুষ। ছিপছিপে চেহারা কানুর, বয়স্কদের সামনে সে প্রায় কোনো কথাই বলে না, বিনীত ভাব করে থাকে, আসলে সে বয়স্কদের শাসনের অধিকার একবারেই অগ্রাহ্য করে মনে মনে।

বাবলু একবার জিজ্ঞেস করলো, কানু কাকা, তুমি তো আমার বাবার ভাই, তা হলে আমার ঠাকুমা তোমার মা নয় কেন?

কানু বললো, তোর ঠাকুমা আমার বড় মা। আমার নিজের মা ছোট মা।

- তোমার নিজের মা কোথায়?

- স্বর্গে গেছেন।

বাবলু একবার আকাশের দিকে তাকালো। শীতের নির্মেঘ, নীল আকাশ। সেই আকাশের এক

প্রান্তে হেলান দিয়ে আছে দূরের গম্ভীর পাহাড়। বহু উঁচু দিয়ে দুটি চিল ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুৎ বেগে।

- কানুকাকা, তোমার মাকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

- নাঃ।

বাবলু বেশ অবাক হয়ে যায়। কানুকাকার থেকে বাবা কত বড়, অথচ বাবার নিজের মা আছে। কানুকাকার নেই। কিন্তু বাবা একদিন কানুকাকাকে মেরেছিল, তখন কানুকাকা চেঁচিয়ে [illegible] দছিল; ও মা, মা গো, তুমি আমায় কেন ফেলে রেখে গেলে!

- কানুকাকা, তোমার স্বর্গে যেতে ইচ্ছে করে না?

- এক থাপ্পড় খাবি এবার। কেন রে আমি এত তাড়াতাড়ি সেখানে যাবো?

- আমি একটু নামবো। আমার হিসি পেয়েছে।

- এই জন্য তোকে নিয়ে আসতে চাই নি!

পিকলু এগিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে থামালো কানু। তারপর একটা গাছতলায় নেমে [illegible]গারেট ধরালো। কয়েকটা টান দিয়ে সেটা পিকলুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নে।

বাবলু বড় বড় চোখ করে দাদার দিকে তাকালো। পিকলু লজ্জিতভাবে ঘাড় নেড়ে বললো, না।

কানু বললো, নে না। এই ঠান্ডার মধ্যে ভালো লাগবে। এখন তুই কলেজে উঠেছিস, লজ্জা কী?

পিকলুর ফর্সা মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে। প্রতুল নামে তার এক সহপাঠীর প্ররোচনায় এর মধ্যেই সে দু'একবার সিগারেট টেনে দেখেছে, তার খারাপ লাগে নি। কিন্তু বাবলু জানে না। বাবলু নির্ঘাত মাকে বলে দেবে। সে কানুর কাছ থেকে সিগারেট নিল না।

পিকলু সামনের মেঘবর্ণ পাহাড়ে দিকে তাকিয়ে রইলো। কয়েকটা বক উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের বুক লক্ষ করে। দূর থেকে কয়েকজন আদিবাসী রমণী হেঁটে আসছে, মাথায় মাটির হাঁড়ি নিয়ে। একটি কুকুর ছুটছে তাদের তাদের সামনে। হঠাৎ সব কিছু মিলিয়ে পিকলুর দারুণ ভালো লাগলো। এ রকম ভালো লাগার মুহূর্তে তার বুকটা একটু ব্যথা ব্যথা করে। সে আপন মনে বলে উঠলো, সুন্দর তুমি এসেছিলে এই প্রাতে/অরুণ-বরুণ পারিজাত লয়ে হাতে।

কানু জিজ্ঞেস করলো, পদ্যটা তুই নিজে বানালি?

পিকলু দু'দিকে মাথা নাড়লো। কানুকাকাটা কিছু বোঝে না।

বাবলু বললো, দাদা সব সময় চয়নিকা বলে একটা পদ্যর বই পড়ে। এখানেও নিয়ে এসেছে সেই বইটা।

পিকলু বললো, তোকেও তো কতবার পড়তে বলি।

বাবলু বললো, এঃ! আমার ইস্কুলের পড়ার বই আছে, তার ওপরে আবার পদ্যর বই পড়বো কেন?

ওরা ত্রিকূট পাহাড়ের গোড়ায় এসে একটা ঝর্ণা দেখতে পেয়ে খাবার দাবার খুলে বসেছে, তার একটু পরেই সেখানে একটি জিপ গাড়ি এসে থামলো। তার থেকে প্রথমে নামলেন, সত্যেন, তারপর তাঁর বাড়ির অন্য অনেকে।

পিকলুদের দেখতে পেয়ে সত্যেন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আর সবাই কোথায়?

পিকলু বললো, আর কেউ আসে নি।

ওরা তিনজনে মিলে দুটি সাইকেলে চেপে এসেছে শুনে সত্যেন এতখানি ভুরু তুললেন যেন ওটা একটা মহা বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি নিজের স্ত্রী ও বুলাকে ডেকে বললেন, শোনো, শোনো, পিকলুরা এতখানি রাস্তা সাইকেলে এসেছে! কম দূর নাকি?

বুলা প্রথমে ওদের দেখেও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, এবারে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, পিকলু, তোমার মা আসেননি?

পিকলুর বদলে কানু উত্তর দিল, বৌদির জ্বর হয়েছে।

সত্যেন বললেন, তা হলে তো আর গাইডের দরকার নেই। তোমরা খানিকটা ওপরে যাবে তো ওদের সঙ্গেই ঘুরে এসো। আমি বাপু ওপরে উঠছি না!

বিভাবতী বললেন, এই [illegible] এখান থেকেই বেশ পাহাড় দেখা যায়। আর ওপরে ওঠার দরকার কী!

ওঁদের সঙ্গে নীনা আর কাজরী নামে দুটি কিশোরী আর মলয় নামে পিকলুর বয়েসী একটি ছেলে রয়েছে, তারা প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলো, না, না, আমরা ওপরে উঠবো, টপে যাবো!

দ্বিতীয় দলটির সঙ্গে অনেক ভালো ভালো খাবার আছে। জিলিপি, ডিম সেদ্ধ, লুচি-আলুর দম। সেই খাবারের ভাগ দেওয়া হলো পিকলুদের। কিছু খাবার টিফিন কেরিয়ারে সঙ্গে নেওয়া হলো, পাহাড়ের চূড়ায় বসে খাওয়া হবে।

বুলা পিকলুকে বললেন, আমি কিন্তু উপরে উঠতে চাই। আমাকে তোমরা নেবে তো?

পিকলু বললো, নিশ্চয়ই। আমি আপনার পাশে পাশে থাকবো।

কানু একটা ভোজালি এনেছে। সেটা দিয়ে সে একটা গাছের ডাল কেটে নিয়ে লাঠি বানালো। তারপর সেই লাঠি দিয়ে সামনের ঝোপঝাড়ের ওপর বাড়ি মারতে মারতে বললো, সবাই আমার পেছন পেছন চলে এসো।

বাবলু এই দ্বিতীয় দলটিকে গোড়া থেকেই অপছন্দ করেছে। তার সমবয়েসী কেউ নেই, সে জন্য তার সঙ্গে কেউ বিশেষ কথা বলছে না, আর মেয়েরা রয়েছে বলে ভালো করে পাহাড়ে চূড়াও হবে না। নীনা আর কাজরী মাঝে মাঝেই কানে কানে কী সব বলছে আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে যেন। ঐ রকম করলে কী পাহাড়ে ওঠা যায়! কাজরী তো একবার পড়েই যাচ্ছিল পা পিছলে, এমন জোর উঃ করে চেঁচিয়ে উঠলো যে সবাই ভাবলো বুঝি অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে। কানু খানিকটা নেমে এসে কাজরীর হাত চেপে ধরে বললো, তুমি আমার সঙ্গে থাকো। মলয়, তুমি হাত ধরে থাকো নীনার।

ওরা কোনো বাঁধা পথ ধরেনি, তাই এক একটা পাথর ডিঙিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে বেশ। বুলা কিন্তু এখনো বেশ সাবলীল, তাঁর কোনো সাহায্যের দরকার হয় না। একবার একটা উঁচু পাথরের সামনে তিনি থমকে দাঁড়ালে পিকলু তাঁকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি হেসে বললেন, না, না, আমায় ধরতে হবে না। আমি চটি দুটো এখানে খুলে রেখে যাই বরং।

চটি খোলার সময় বুলার কালো রঙের শায়া দেখতে পাওয়া গেল একটুখানি। তারপর তিনি বড় পাথরটায় ওঠবার জন্য পা তুললেন, তাঁর ফর্সা পায়ের গোড়ালির ওপর আরও খানিকটা বেরিয়ে পড়লো। [illegible] দিক থেকে চট করে চোখ ফিরিয়ে নিল পিকলু। তার মাথা ঝিম ঝিম করছে।

বুলা[illegible] দিকে এমনিতেই ভালো করে তাকাতে পারে না পিকলু। বুলার প্রায় তার মায়ের বয়েসী [illegible]ন্তু বুলাকে মা বা মাসিদের মতন একটুও মনে হয় না তার। বুলাকে সে বুলা মাসি বলেও ডাকে না, [illegible]রতপক্ষে কিছুই ডাকে না। বুলা তার সঙ্গে সস্নেহ মিষ্টি ব্যবহার করেন কিন্তু পিকলুর বুকটা ছমছম করে।

বুলা ওপরের পাথরটায় উঠে এসে বললেন, বাব্বাঃ! হাঁপিয়ে গেছি, পিকলু একটু দাঁড়াও!

তারপর মুখ তুলে চারদিক দেখে বললেন, কী সুন্দর, না? দ্যাখো, নিচের দিকে দ্যাখো, আমরা অনেকটা উঠে এসেছি।

কানুরা আরও উঁচুতে উঠে গেছে, তাদের গলায় আওয়াজে টের পাওয়া যাচ্ছে। কাজরীর হাসির আওয়াজটা অনেকটা টিয়া পাখির ডাকের মতন। পিকলু শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি আর ওপরে উঠবেন?

বুলা বললেন, হ্যাঁ। এর মধ্যেই নামবো নাকি! এখানকার বাতাসে কী চমৎকার গন্ধ। জানো, পিকলু, এক জায়গায় দেখলুম কয়েকটা আমলকী গাছ। মাটিতে আমলকী পড়ে আছে। আমাদের দেশের বাড়িতে দুটো আমলকী গাছ ছিল।

আবার খানিকটা ওঠার পর বুলা দম নেবার জন্য পিকলুর কাঁধে হাত রাখলেন। পিকলুর দু'খানের নিচের জায়গায় জ্বালা করতে লাগলো। শুধু তাই নয়, তার পুরুষাঙ্গ নড়াচড়া করতে শুরু করেছে। প্রথম যখন বুলা মাসি পাহাড়ে ওঠার কথা বললেন, তখনও এই রকম হয়েছিল। নীনা বা কাজরীকে দেখে তো এ রকম হয় না। পিকলু তখন মনে মনে চাইছিল বুলা মাসিই যেন তার সঙ্গে আসেন। এ রকম পরিপূর্ণ নারী সে আগে কখনো দেখেনি।

নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছে পিকলুর, খানিকটা ভয় ভয়ও করছে, যদি কেউ টের পেয়ে যায়, যদি বুলা মাসি বুঝতে পারেন যে পিকলুর মনটা খুব খারাপ। সে প্রায়ভূতগ্রস্তের মতন বিহ্বল মুখে বুলার দিকে তাকালো, বুলা অন্য দিকে চেয়ে আছেন, চোখাচোখি হলো না। পিকলুর ইচ্ছে করলো বুলা মাসিকে ছেড়ে দৌড়ে কোথাও চলে যেতে।

ওপর থেকে কানু ডাকলো, এই পিকলু, তোরা কোথায় গেলি রে? আমরা টপে উঠে এসেছি!

দূর থেকে মনে হয় একটিই পাহাড়, কিন্তু খানিকটা ওপরে এলে বোঝা যায় সমুদ্রের তরঙ্গের মতন, পাহাড়ের পর পাহাড়ের গুচ্ছ। একটা চূড়ায় উঠলেও দেখা যায় সামনে দেয়ালের মতন অন্য

পাহাড় উঠে গেছে, আকাশ ছোঁয়া চূড়াগুলো অনেক দূরে।

বুলাকে নিয়ে পিকলু, ওপরে উঠে আসা মাত্র কানু জিজ্ঞেস করলো, বাবলু কোথায়?

মলয় আর নীনা বললো, খানিকটা আগে দেখলাম দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে!

তিনজন পুরুষ তিনজন নারীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, বাবলুর কথা কেউ খেয়াল করেনি, বাবলু কারু সঙ্গে আসেওনি। কানু পিকলুকে বললো, আমি তো ভাবছি, বাবলু তোর সঙ্গেই আছে।

পিকলুও ভেবেছিল বাবলু আছে কানুকাকার সঙ্গে। তার সাঙ্ঘাতিক অপরাধ বোধ হলো। কী হবে? বাবলু যদি হারিয়ে যায়? যে-রকম দুরন্ত ছেলে! সে চিৎকার করে ডেকে উঠলো, বাবলু! বাবলু!

সবাই মিলে এক সঙ্গে ডকাডাকি করেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দুশ্চিন্তায় বুলার মুখও শুকিয়ে গেছে। এত বড় পাহাড়ে বাবলুকে কোথায় খোঁজা হবে? পা পিছলে যদি কোনো খাদে পড়ে গিয়ে থাকে?

পিকলুর ক্ষীণ ধারণা, বাবলুটা দুষ্টুমি করে কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে, ইচ্ছে করে সাড়া দিচ্ছে না। সে এবারে চেঁচিয়ে বললো বাবলু, আমরা ফিরে যাচ্ছি কিন্তু। সবাই চলে যাচ্ছি। এ পাহাড়ে ভাল্লুক আছে।

তাও কোনো সাড়া নেই।

কাজরী হঠাৎ আঙুল তুলে বললো, অই যে! ওখানে অই যে যাচ্ছে, কে? বাবলু না?

সেদিকে তাকিয়ে পিকলুর বুক হিম হয়ে গেছে। পাশের পাহাড়টার গা বেয়ে বাঁদরের মতন তরতর করে কেউ একজন উঠে যাচ্ছে। বাবলু বলে এমনিতে চেনার উপায় ছিল না, কিন্তু তার হলুদ সোয়েটারটা চকচক করছে রোদে।

সবাই এক সঙ্গে ডেকে উঠলো বাবলুর নাম ধরে। কিন্তু বাবলু এত দূর আর উঁচুতে যে এই ডাক বোধ হয় সেখানে পৌঁছোবে না। এদের এত চিৎকারেও বাবলু একবারও পেছন ফিরে তাকালো না।

একটু পরে সে গাছপালায় আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো রুদ্ধশ্বাসে। বুলার চোখে জল ছল ছল করছে। এখান থেকে কারু পক্ষে দৌড়ে গিয়ে বাবলুকে ধরা ও উপায় নেই।

এক সময় দেখা গেল, সেই দ্বিতীয় পাহাড়ের চূড়ায় একটা ছোট্ট স্প্রিংয়ের পুতুলের মতন বাবলু লাফাচ্ছে। বাবলু নিশ্চিত ওদের দেখতে পাচ্ছে না। সে নাচছে একা একা, মনের আনন্দে।

॥ ১১ ॥

দুপুরবেলা নানা গল্পের মধ্যে কার কোন্ কারণে কলকাতা শহরটা ভালো লাগে এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল, সুহাসিনী হঠাৎ বলে উঠলেন, কলকাতায় একটা খুব ভালো জিনিস পাওয়া যায়, বোতলের সোডার জল। ছিপি খুললেই ভুসভুস করে ওঠে, বড় উপকারী!

সবাই হেসে উঠেছিল। কলকাতার দই-রাবড়ি নয়, চিড়িয়াখানা-ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নয়, থিয়েটার-বাইস্কোপ-রেডিও নয়, সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো সোডার বোতল?

সুহাসিনী অবাকভাবে ভুরু তুলে বলেছিলেন, তোরা হাসছিস? মালখানগরে থাকতে আমি বায়ুর চাপে মাঝে মাঝে বড় কষ্ট পেতাম। কোনো ওষুধেই উপশম হয় না। একবার কলকাতায় এসে তোদের বাবা আমাকে এক বোতল সোডার জল খাওয়ালেন, ওমা, তারপর আর এক মাস আমার পেটে একটুও বায়ু হয়নি। গতবারেও তো কলকাতায় গিয়ে আমি পিকলুকে দিয়ে সোডার বোতল আনিয়েছি।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, দেওঘরে সোডা ওয়াটার পাওয়া যায় না?

বিশ্বনাথ বললেন, না, আমি খোঁজ করেছি। এখানে এসব জিনিসের চল নেই।

মমতা বললেন, আপনি এখন তো বায়ুতে কষ্ট পান। আমাদের লেখেননি কেন মা, আমরা কলকাতা থেকে কয়েকটা বোতল নিয়ে আসতাম?

প্রতাপ বললেন, বড় বড় রেল স্টেশনে পাওয়া যায়। দেওঘরে না থাকলেও জসিডিতে থাকতে পারে, ওটাতো একটা জংশন।

বিকেলবেলা প্রতাপ তাঁর মায়ের এই সামান্য সাধটুকু মেটাবার জন্য গেলেন জসিডি। রেলের রেস্তোরায় খোঁজ করে ঠিক পাওয়াও গেল, মোট তিনটি বোতল ছিল, প্রতাপ তিনটিই কিনে নিলেন! স্টেশনের বাইরে এসে আরও কিছু টুকটাক বাজার করলেন তিনি। এখানে বেশ ভালো সাইজের ফুল কপি পাওয়া যাচ্ছে, কলকাতার তুলনায় তো বটেই, দেওঘরের থেকেও দাম সস্তা। বড় বড় আতা আর পেয়ারাও উঠেছে।

জিনিসপত্র দরদাম করতে করতে হঠাৎ এক সময় তিনি দেখতে পেলেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বনাথ। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কী ওস্তাদজী, আপনি আবার শুধু শুধু এলেন কেন? আমি বেশি কিছু কিনছি না তো।

বিশ্বনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। বাড়িতে ঠিক বলা যাবে না, তাই এখানে চলে এলাম।

প্রতাপ ভেতরে ভেতরে বেশ চমকে উঠলেন। মানুষ এই ভাবে কথা বলে টাকা ধার চাইবার সময়। কিন্তু বিশ্বনাথের আত্মসম্মানবোধ অতি তীব্র। প্রতাপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও খুব পরিষ্কার, কোনোরকম গোপনীয়তার স্থান নেই।

প্রতাপ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলতেই বিশ্বনাথ বললেন, এই বাজারের মধ্যে তো বলা যাবে না, চলো, একটু নিরিবিলিতে যাই। হেঁটে ফিরবে নাকি?

জসিডি থেকে দেওঘরের দূরত্ব বেশি নয়, অনায়াসেই হাঁটতে হাঁটতে ফেরা যেত, সন্ধ্যাটিও মনোরম; কিন্তু প্রতাপ এক ঝুড়ি আতা কিনে ফেলেছেন, তা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং একটা টাঙ্গা ডাকতে হলো।

টাঙ্গাতে উঠেও বিশ্বনাথ কোনো কথা বললেন না, আপন মনে চুরুট টানতে লাগলেন। প্রতাপ বেশ বিচলিত বোধ করছেন। কী এমন জরুরি কথা যা বিশ্বনাথ বলতে ইতস্তত করছেন? নিশ্চয়ই পারিবারিক কিছু। মা এখানে এসে রয়েছেন, তার জন্য কোনো জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে? ছোড়দির কোনো শক্ত রোগ হয়েছে? কিংবা বুলা, বুলার ব্যাপার কিছু বলেছে সতোন? কী-ইবা বলার থাকতে পারে, বুলার সঙ্গে তো প্রতাপের একটা কথাও হয় না।

দারোয়া নদীর সেতুর ওপর এসে বিশ্বনাথ বললেন, এখানে একটু নামা যাক।

টাঙ্গাওয়ালাকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে বিশ্বনাথ জলের দিকে এগিয়ে গেলেন। সূর্য অস্ত যাবার পরও একটা চাপা আলো এখনও রয়ে গেছে আকাশে। দূরে ডিগরিয়া পাহাড়ের রেখা এখন কিছুটা অস্পষ্ট, শোনা যাচ্ছে একটা রেলের ইঞ্জিনের শব্দ।

নদীতে জল কম, কিন্তু এত পরিচ্ছন্ন যে আঁজলা তুলে পান করার যায়। নদীর ঠিক মাঝখানে জেগে থাকা একটা পাথরে কেউ বাংলায় তার প্রেয়সী বা মানসীর নাম লিখে রেখে গেছে।

বিশ্বনাথ চটি খুলে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বালি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, এই নদীটাও ফলগু নদীর মতন, জল শুকিয়ে গেলেও বালি খুঁড়লে জল পাওয়া যায়।

প্রতাপ বললেন, ওস্তাদজী, আমি আপনার জরুরি কথাটা শুনতে চাইছি।

বিশ্বনাথ প্রতাপের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, সব কথা কি যে-কোনো পরিবেশে, যে-কোনো সময়ে বলা যায়? তাই আমি সময় নিচ্ছি। প্রতাপ, একটা খুব খারাপ আছে। তুমি শোনার জন্য তৈরি?

প্রতাপের মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল। ঝট করে তাঁর মনে হলো, বাবলু? পিকলু বা মুন্নি? বাবলুটাই বেশি দুরন্ত।

- কী হয়েছে? কী হয়েছে, বলুন!

বিশ্বনাথ প্রতাপের কাঁধে হাত রেখে বললেন, মনটাকে শক্ত করো,...তোমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল...অসিতদা মারা গেছেন!

- অ্যাঁ?

- তুমি চলে আসার একটু পরেই টেলিগ্রাম এলো, ...আমি গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলুম...বাড়ির আর কেউ জানে না...তোমাকে আগে জানাবার জন্য...

বিশ্বনাথ পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বার করে দিলেন। টেলিগ্রামটা প্রতাপের নামে, পাঠিয়েছেন অসিতবরণের দাদা জলদবরণ। অতি সংক্ষিপ্ত বার্তা, অসিতবরণ মার্ডারড, কাম অ্যাটওয়ান্স!

প্রতাপ চিৎকার করে উঠলেন, মার্ডারড?

বেশ কিছুক্ষণ দু'জনে আর পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না।

প্রতাপ এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চলুন, আমাকে এক্ষুনি কলকাতায় যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশ্বনাথ বললেন, ভোর সাড়ে চারটার সময় একটা ট্রেন আছে, জসিডিতে এসে ধরতে হবে, তার আগে কলকাতায় যাওয়ার আর কোনো ব্যবস্থা নেই। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

প্রতাপের বুকটা ভারি হয়ে গেছে। অসিতবরণকে তিনি পছন্দ করতেন কিন্তু এখন শুধু মনে পড়ছে দিদির মুখখানা। তিনি জানেন, শ্বশুরবাড়ির প্রতিকূল পরিবেশে এই বিপদের সময় দিদিকে সাহায্য করবে কে? বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মকদ্দমা চলছে, এর মধ্যে আবার অসিতদার চাকরি চলে গেছে, তবু অসিতদার বেঁচে থাকা না-থাকার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। এক্ষুনি দিদির পাশে গিয়ে প্রতাপের দাঁড়ানো দরকার।

বিশ্বনাথ বললেন, অসিতদা নিরীহ ভালো মানুষ, তাকে কে খুন করবে, প্রতাপ?

প্রতাপ রাগতভাবে বললেন, নিরীহ ভালো মানুষরা বুঝি খুন হয় না? অসিতদাকে তার নিজের বাড়ির লোক, এমনকি ওঁর দাদা, যে এই টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছে, সে তো একটা দুশ্চরিত্র বদমাস, এরাই খুন করতে পারে সম্পত্তির জন্য। ওঁর অফিসের লোকজনরাও খুন করতে পারে!

- অফিসের লোক?

- অসিতদার চাকরি গেছে কেন জানেন? উনি সৎ ছিলেন বলে! উনি সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, সেখানে তো ঘুষের রাজত্ব। অসিতদা একটা ঘুষের র‍্যাকেট ধরে ফেলেছিলেন, ফুড মিনিস্টার প্রফুল্ল সেনের কাছে নোট পাঠাতে যাচ্ছিলেন। সেইসব ঘুষখোর কর্মচারীরা তাদের মধ্যে দু'জন আবার জেলখাটা স্বদেশী, একটু আগে জানতে পেরে অসিতদার কাছ থেকে ফাইল কেড়ে নেয়। উল্টে তারা অসিতদার নামেই মিথ্যে অভিযোগ চাপিয়ে দেয়। কথায় কথায় অসিতদাকে প্রাণের ভয় দেখাতো, বাধ্য হয়ে অসিতদাকে চাকরি ছাড়তে হয়। আমি অসিতদাকে বলেছিলুম মামলা করতে, উনি সাহস পেলেননা, তারপর থেকেই তো ওঁর মাথায় গোলমাল দেখা দিল!

এতক্ষণ একটানা বলে গিয়ে প্রতাপ একটু থামলেন, তারপর আবার জোর দিয়ে বললেন, আমি জানি, অসিতদা কখনো ঘুষের টাকা ছুঁতেন না শরীরে বনেদী বাড়ির রক্ত আছে তো!

বিশ্বনাথ বললেন, মাথার গোলমাল...

- একদম কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অফিসের সেই দুষ্টচক্র ওঁকে শাসিয়েছিল, উনি চাকরি ছাড়ার পরেও মুখ খুললে ওরা দেখে নেবে! তাই উনি দিদি সঙ্গেও কথা বলতেন না। ওস্তাদজী, এখন দিদির কী হবে?

- চলো, আমরা কলকাতায় যাই।

বাড়ি ফিরে আসল খবরটা কারুকে জানানো হলো না। অসিতবরণের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর এসেছে, তাই প্রতাপকে যেতে হবে। প্রতাপ সকলকেই নিয়ে ফিরবেন কিনা সেই সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো। এক মাসের জন্য বেড়াতে আসা, সবেমাত্র এগারোদিন কেটেছে, তা ছাড়া মমতার বেশ জ্বর। বিশ্বনাথও চলে গেলে এদিকে সকলকে সামলে রাখা মুশকিল হবে, তাই ঠিক হলো প্রতাপ একাই যাবেন।

বরানগরে দিদির শ্বশুরবাড়ির কথাই প্রতাপের মন জুড়ে আছে, সেখানে এতক্ষণ কী চলছে কে জানে? বনেদী বাড়িগুলিতে যখন পচন ধরে তখন মাটির তলা থেকে যেন অসংখ্য কদাকার, কুৎসিত জিনিস ফুটে বেরোয়। ক্ষীয়মাণ বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ির সময় ভাই ভাইয়ের সঙ্গে, ভাইপো খুড়োর সঙ্গে, এমনকি ছেলে মায়ের সঙ্গে পরম শত্রুর মতন ব্যবহার করে, প্রতাপ তাঁর নিজের আদালতেই এরকম অনেক মামলা দেখেছেন।

মানুষের মন বড় বিচিত্র। এরকম অবস্থার মধ্যেও প্রতাপের মাঝে মাঝে মনে পড়তে লাগলো বুলার কথা। যাবার আগে বুলার সঙ্গে একবার দেখা হবে না? বুলাও অসহায় অবস্থার মধ্যেআছে, সে স্বামী পরিত্যক্তা, তার দেওরটি সুবিধের মানুষ নয়, এই সময় প্রতাপ তাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না? বুলা কোনো কথা বলেনি বটে, কিন্তু তার দৃষ্টির মধ্যে যেন সেরকম প্রত্যাশা ছিল।

প্রতাপের একবার তীব্র ইচ্ছে হলো, এই রাত্রেই একবার সত্যেনের বাড়ি গিয়ে বুলাকে তাঁর হঠাৎ কলকাতায় চলে যাওয়ার কারণটা জানিয়ে যেতে। বুলা যেন আবার ভুল না বোঝে। কিন্তু কোন ছুতোয় এখন সে-বাড়িতে যাবেন প্রতাপ? সত্যেনের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি, ঠিক ঘোষিত না হলেও দু'জনেই দু'জনকে অপছন্দ করেছেন।

প্রতাপের যাওয়া হলো না সেখানে।

প্রতাপ যখন বরানগরের পৌঁছোলেন, ততক্ষণে অসিতবরণের শব দাহ হয়ে গেছে। সুপ্রীতি তাঁর মেয়েকে নিয়ে নিজের শয়নকক্ষে চুপ করে বসেছিলেন, তাঁর চোখে জল নেই, প্রতাপকে দেখেই তিনি উঠে এসে তাঁর হাতধরে আবেগহীন কণ্ঠে বললেন, খোকন, এ বাড়িতে আমরা আর এক দণ্ড টিকতে

পারবো না। তুই আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।

প্রতাপ বললেন, দিদি, আগে বসো। সব শুনি। কী হয়েছিল বলো তো?

সুপ্রীতি বললেন, মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে আমাদের। রিফিউজিরা তো জামাইবাবুকে মেরে ফেলেছে।

অসিতবরণের ঠিক কী ভাবে মৃত্যু ঘটেছে, তার সঠিক কারণটা সুপ্রীতিও জানেন না, হয়তো কোনোদিনই আর জানা যাবে না। কাশীপুরে এদের বাগান বাড়িটি জবরদখল এবং তার উচ্ছেদের চেষ্টা নিয়ে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে।

প্রথম দিন অসিতবরণের অন্যান্য ভাইরা যখন সেই ঘটনাস্থল থেকে পশ্চাৎ অপসারণ করেন, তখন মনোরোগী অসিতবরণ সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। ভিড়ের মধ্যে অনেকক্ষণ তাঁকে কেউ লক্ষ্যই করেনি।

তারপর অসিতবরণ উদ্বাস্তুদের প্রহরা ভেদ করে কী করে যে ভেতরে ঢুকে পড়লেন, সেটা একটা রহস্য। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ সুপুরুষ তিনি, খেতে না পাওয়া উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তাঁর চেহারার কোনো মিলই নেই, সুতরাং উদ্বাস্তুরা তাঁকে কেন নিজেদের লোক মনে করবে? তবুও, যে-ভাবেই হোক গোলমাল, ঠ্যালাঠেলির মধ্যে অসিতবরণ কোনো এক সময়ে ঢুকে পড়েছিলেন ভেতরে। সোজা চলে এসেছিলেন পাকা হলঘরে, যেটা এক সময় নাচঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

চৌকো চৌকো সাদা ও কালো মার্বেল বসানো সেই নাচঘর। খুব অল্প বয়েসে অসিতবরণ যখন এ বাড়িতে পিকনিক করতে আসতেন, তখন ঐ চৌখুপ্পি কাটা নাচঘরে তিনি ভাইবোনদের সঙ্গে এক্কা দোক্কা খেলতেন। হঠাৎ অসিতবরণ যেন ফিরে গিয়েছিলেন সেই বালক বেলায়, তিনি পকেট থেকে একটা এক আনি বার করে এক পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে এক্কা দোক্কা খেলতে শুরু করেন।

জবরদখলকারীরা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে প্রথমে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, তারপর তাকে মালিকপক্ষের একজন বলে চিনতে পারে।

এর পরের ঘটনা সম্পর্কে নানারকম মত আছে। কেউ বলে যে জবরদখলকারীরা তাঁকে বাঁশ দিয়ে পেটাতে শুরু করে। কেউ বলে যে, ঐ সুদর্শন, নিরীহ মতন মানুষটিকে দেখে কারুর মনেই হিংস্রতা জাগেনি, বরং বয়স্ক ব্যক্তিরা অসিতবরণের সামনে হাত জোড় কর বলেছিলেন, আপনি বাইরে চলে যান। আপনাকে অনুরোধ করছি, নইলে বিপদ হতে পারে। উদ্বাস্তুদের স্থানীয় নেতা হারীত মণ্ডলের বিবৃতি একটু অন্যরকম, তিনি বলেছেন যে, তিনি নিজে সেই সময়ে ওখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সব দেখেছেন। সেখানে কয়েকজন একটু ধাক্কাধাক্কি করেছিল ঠিকই, কিন্তু কেউ কোনো অস্ত্র দিয়ে মারেনি, অসিতবরণের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ঐটুকু ধাক্কাতে কোনো মানুষ মরে না, নিশ্চয়ই ওনার হার্টে গোলমাল ছিল। একটু ধাক্কা খেয়েই উনি মাটিতে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলেন। তারপর ওঁর চোখ উল্টে গেল। জবরদখলকারীরা তখন অনেকে ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এসে ওঁর চোখমুখে ছিটিয়েছে, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে, উনি আর কোনো সাড়াশব্দ করেননি। ওঁর হাতে যে দুটি সোনার আংটি ছিল তা পর্যন্ত কেউ খুলে নেয়নি।

অসিতবরণের কাকা-ভাইপো-রা অবশ্য এসব কিছু বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, অসিতবরণকে মালিকপক্ষের একজন হিসেবে চিনতে পেরে বাঙাল রিফিউজিরা তাঁকে টেনে হিঁচড়ে ভেতরে নিয়ে যায়, তারপর সেখানে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। এই কাহিনী যতটা ভয়াবহ করা যায়, ততই জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। যে-কোনো প্রকারে বাড়িটা উদ্ধার করতেই হবে। পরদিন বরানগর থেকে বড় একটা দল গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে রিফিউজিদের ওপর, প্রচণ্ড মারামারি শুরু হয়ে যাবার পর পুলিশ এসে গুলি চালায়। একটি সাত বছরের বাচ্চা সমেত তিনজন উদ্বাস্তু সেই গুলিতে প্রাণ দিয়েছে।

বাড়িটা অবশ্য মুক্ত করা যায়নি। গুলি চালনার প্রতিবাদে বামপন্থী দলগুলি রিফিউজিদের পক্ষ নিয়েছে, গতকাল কাশীপুরে হরতাল হয়ে গেছে, বিধানসভাতেও এই প্রসঙ্গ নিয়ে ঝড় উঠেছে।

দিদির মুখ থেকে কিছুটা শুনে আর খবরের কাগজের বিবরণগুলো পড়ে প্রতাপ গুম হয়ে বসে রইলেন। আসল ঘটনা যাই হোক, উদ্বাস্তুদের কারণেই অসিতবরণের প্রাণটা চলে গেছে। এর দায় তো প্রতাপদের ওপরেও খানিকটা বর্তাবেই।

প্রতাপ ক্ষীণভাবে জিজ্ঞেস করলেন, অসিতদার হার্টের অসুখ ছিল?

সুপ্রীতি বললেন, জানি না। কখনো তো কিছু বলেনি।

জানলার কাছে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুতুল। একটা হলদে রঙের ফ্রক পরা, মাথার চুল এলোমেলো, চোখদুটি দেখলে মনে হয়, একটু আগে সে কান্না থামিয়েছে। প্রতাপের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে আবার ফুঁপিয়ে উঠলো।

আইনজ্ঞ হিসেবে প্রতাপের জানতে ইচ্ছে হলো যে অসিতবরণের দেহ পোস্ট মর্টেম করা হয়েছিল কিনা। কিন্তু খবরের কাগজগুলিতে সে কথার উল্লেখ নেই, দিদির কাছে এখন এই প্রশ্নটা করা ঠিক হবে না।

সুপ্রীতি একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাইরে একটা হুংকার শোনা গেল, কোথায়? সে এসেছে শুনলম, কোথায় সে?

প্রতাপ তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন।

ধুতির ওপর একটা বেনিয়ান পরা, হাতে রুপো বাঁধানো ছড়ি, এই সন্ধ্যেবেলাতেই জলদবরণের চক্ষুদুটি নেশায় রক্তিম, ক্রূরভাবে তিনি প্রতাপের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অন্য সময় প্রতাপ হলদবরণকে গ্রাহ্যই করেন না। এ বাড়ির অন্য কারুর সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ নেই, কিন্তু এখন জলদবরণের দৃষ্টির সামনে তিনি যে কুঁকড়ে গেলেন। তিনি নিজেকে অকারণেই যেন অপরাধী বোধ করেছেন।

জলদবরণ জিজ্ঞেস করলেন, এই যে, এসেচো তা হলে, সব শুনেচো?

প্রতাপ মুখ নিচু করে মাথা নাড়লেন।

জলদবরণ তাঁর বাজখাই গলায় আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী শুনেচো? হার্টের অসুখ? আমাদের বংশের কারুর কোনো দিন হার্টের অসুখ হয়নি। তোমার দিদি আমাদের নাম কান ভাঙাচি দিয়েচে তো? বলেনি যে আমরা ইচ্ছে করে ওকে ফেলে পালিয়ে এসেছিলুম!

প্রতাপ মৃদুভাবে বললেন, আজ্ঞে না!

- আলবাৎ বলেচে। বাড়ির সব্বাই শুনেচে। মায়ের পেটের ভাইপো, আমি তার আপন নয়, বউ আপন? আমি তাকে ঐ শেয়ালগুলোর মুখে ফেলে আসবো? আমাদের সামনে থেকে ওকে জোরে টেনে নিয়ে গ্যাচে, আমি বলিনি এই কথা! কী? আমি বলচি, আমার মুখের ওপর কেউ কথা বলতে পারবে?

প্রতাপ বললো, আজ্ঞে ওসব কথা এখন থাক বরং।

জলদবরণ মুখটা একটু অন্যদের দিকে ফিরিয়ে, যেন অনুপস্থিত দর্শকদের শোনাবার জন্য আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন, তোমরাই তো আমার ভাইপোকে মেরে ফেল্লে! সব শালা রিফিউজি এক জাত! বাঞ্চোৎ, গুখেকোর ব্যাটাগুলোকে পোঁদে লাথি মেরে পদ্মার পার করে দেবো! বেরোও, আমার বাড়ি থেকে বেরোও, দূর হয়ে যাও—।

হাতের ছড়িখানা তিনি ঘোরাতে লাগলেন শূন্যে।

॥ ১২ ॥

জেল থেকে ফেরার পর মামুন কিছুদিনের জন্য নিরিবিলিতে পারিবারিক জীবন কাটাবেন ঠিক করলেন। ঢাকার বাসা ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে চলে এলেন মাদারিপুরের নিকটবর্তী এক গ্রামে। এখানে তিনি তাঁর এক চাচার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন।

মামুন কখনো দাড়ি রাখেননি, কিন্তু মাথায় বাবরি চুল। চেহারাও পোশাকেতিনি নজরুল ইসলামের অনুকরণ করেছেন বরাবর, যদিও সে রকম কিছু কবি খ্যাতি তাঁর হয়নি। ছাত্রজীবনের শেষে কবিতা রচনার চেয়ে রাজনীতিতেই তিনি মেতে উঠেছিলেন বেশি। সেই সময়ে কলকাতা শহরে যে-কোনো শিক্ষিত মুসলমান যুবকের কাছে রাজনীতি ছিল এক অবধারিত আকর্ষণ। সেই রাজনীতি উপলক্ষ করেই প্রতাপের সঙ্গে তঁর খানিকটা বিচ্ছেদ ঘটতে থাকে তার আগে দু'জনে ছিলেন একেবারে হরিহর আত্মা, রিপন কলেজের ছেলেরা ঐ দুই বন্ধুকে ঠাট্টা করে বলতো তাল-বেতাল। প্রতাপ ল কলেজে ভর্তি হলে মামুনও ল পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হলো, পড়াশুনো ছেড়ে তিনি কৃষক-মজদুর প্রজা পার্টিতে যোগ দিয়ে পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজনীতিতে।

মাদারীপুরে গ্রামের বাড়িতে বসে মামুনের মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা। মাঝখানের পনেরো-কুড়ি বছরে কত রকম উত্থান-পতন ঘটে গেল।

মামুনের বয়েস এখন চল্লিশ, তাঁকে ঐ নামে ডাকবার আর বিশেষ কেউ নেই। তাঁর পিতার ইন্তেকাল হয়েছে অনেক আগেই। তাঁর বড় ভাইয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতান্তর হয় বলে তিনি দাউদ

কান্দির সম্পত্তির ভাগ ছেড়ে দিয়ে মাদারীপুরে তাঁর অপুত্রক চাচার এই সম্পত্তিটি গ্রহণ করেছেন। এখানে তিনি অনেকটা অপরিচিত, এখানকার মানুষ তাঁকে চেনে সৈয়দ মোজাম্মল হক নামে এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের একজন মাঝারি নেতা হিসেবে সমীহ করে। তিনি বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যও মজবুত, গায়ের রং অনেকটা কালোর দিকে। ঢাকায় একটা ঠাট্টা প্রচলিত আছে যে সৈয়দদের মধ্যে অনেক ভেজাল ঢুকে পড়েছে, যাদের গায়ের রং ফর্সা নয়, তাদের কোনো আরব রক্ত সম্পর্ক নেই, তারা এফিডেবিট করা সৈয়দ। হিন্দুদের মধ্যেও যেমন বেঁটে বামুন আর কটা শুদ্দুর সন্দেহজনক। মামুন নিজেও এ ব্যাপার নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক মস্করা করেছেন। গ্রামদেশে অবশ্য এসব বৃত্তান্তের প্রচলন নেই, তারা মামুনকে দূর থেকে দেখলেই সালাম জানায়, অনেকেই পারিবারিক সমস্যায় পরামর্শ নিতে আসে তাঁর কাছে।

মামুনের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়েছে বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই, তারপর তিনি ফিরোজাকে বিবাহ করেন। এই ফিরোজা ছিলেন তাঁরই এক বন্ধুর স্ত্রী, এই বন্ধুটি ছেচল্লিশের দাঙ্গায় নোয়াখালিতে নিহত হয়েছেন। অসহায় বন্ধুপত্নীকে আশ্রয় দিতে গিয়ে বিপত্নীক মামুন বুঝতে পারেন যে তাঁকে বিবাহ করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ফিরোজা তখন নিঃসন্তান ছিলেন। সহজেই রাজি হয়ে যান। গৃহিণী হিসেবে ফিরোজা এই ধরিত্রীর মতনই সর্বংসহা, তাঁর রান্নার হাত চমৎকার, রান্না ঘরে তিনি দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতে ভালোবাসেন। মামুনের আগের পক্ষের একটি পুত্র সন্তান আছে, এ পক্ষের দুটি কন্যা, ফিরোজা তিনজনকেই সমান চোখে দেখেন, সেইজন্য সংসারের ব্যাপারে মামুন পুরোপুরি ভারমুক্ত।

বিকেলের দিকে মামুন হাঁটতে হাঁটতে আড়িয়েল খাঁ নদীর তীর চলে আসেন। নদী নয়, নদী, এর প্রকৃতি অতি দুর্দান্ত। কার নামে এই নদীর নাম হয়েছিল কে জানে, হয়তো কোনা পীর বা ফকিরের নামে, কিন্তু কেমন যেন দস্যু দস্যু ধ্বনি আছে। এই নদী যখন তীর ভূমির ওপর দস্যুতা করে। হঠাৎ গেল গেল রব পড়ে যায়, ঝুপ ঝাপ শব্দ হয়, কিনারা থেকে অনেকখানি দূরে ফাটল ধরে, প্রায় চোখের নিমেষে সেখানে জলের ছলছল খেলা শুরু হয়ে যায়।

স্থানীয় লোকেরা নদীর এই চরিত্র জানে, তাই তারা নদীর ধারে খুব প্রয়োজন ছাড়া বেশি সময় কাটায় না, বিশেষত বর্ষাকালে। খরস্রোতের জিহ্বা ভূমির সঙ্গে মানুষকেও টেনে নিয়েছে এমন অনেক নজীর আছে। অন্যদের কাছে সাবধাবাণী শুনেও মামুন গ্রাহ্য করেন না, তিনি নদী প্রান্তে একটি বটগাছের তলায় এসে বসেন। খানিকটা বিপদের ঝুঁকি তাঁর ভালো লাগে। বটগাছটি খুবই প্রাচীন, এই গাছটি বহু ঘটনার সাক্ষী, অন্তত শ খানেক বছর সে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে। দুর্দান্ত আড়িয়েল খাঁ নদ এতদিন তাকে উদরসাৎ করতে পারেনি, সুতরাং ভয়ের কী আছে!

এখন ভরা বর্ষা, এই সময় নদী-নদীগুলি দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। জলের কী চমৎকার স্বাস্থ্য। জলের কী বাসলীল খেলা। ইলিশ মাছ ধরা নৌকোগুলি এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওরা যেন জলস্রোতেরই অঙ্গ! মাঝে মঝে যখন ওরা জাল তোলে তখন ইলিশের চকচকে রূপালি ঝিলিক চোখে পড়ে।

সন্ধ্যের দিকে জেলে নৌকোগুলো ঘাটের কাছে এসে ভেড়ে, কেউ কেউ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, মাছ নিবেন নাকি, কত্তা? মামুন দু'দিকে মাথা নাড়েন। হাতে মাছ ঝুলিয়ে দু'মাইল হেঁটে বাড়ি ফেরার দৃশ্যটাই তাঁর ঘোর অপছন্দ। বস্তুত খাদ্যদ্রব্যের ওপর কোনো আসক্তিই তাঁর নেই। খিদে পেলে বাড়ির লোক খেতে দেবে, কী খাবার দেবে তা বাড়ির লোকের চিন্তা, তাঁর নয়। মামুন বেশ কয়েকটি বছর গ্রামে গ্রামে কাটিয়েছেন, দু'বার জেল খেটেছেন, খাদ্যের বাছ-বিচার নেই বলেই সে রকম কষ্ট পাননি।

মামুনের সামনে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা-সঙ্কুল আবর্তে এতগুলো বছর কাটলো। এর পর কী? নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে মামুন নিজের জীবনের কথা ভাবেন। নদী যায় সমুদ্রের দিকে, মানুষের জীবন মৃত্যুর দিকে। চল্লিশ বছরে পা দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে মামুন এখন মৃত্যুর কথা ভাবেন। সে মৃত্যু কত দূরে তিনি জানেন না। তাঁর আব্বা-চাচারা কেউই ষাট-বাষট্টির বেশি বাঁচেননি, মামুনেরও যদি সেইরকম আয়ু হয় তা হলে মাঝখানের বছরগুলি তিনি কীভাবে কাটাবেন? রাজনীতি আর তাঁর মন টানছে না। তিনি তো আর ব্যক্তিগত স্বার্থে, ক্ষমতার লোভে রাজনীতির অন্দর মহলে প্রবেশ করেননি। উদ্দেশ্য ছিল অন্য। আবার, সাধারণ মামুলি মানুষের মতন বিনা উদ্দেশ্যে জীবন কাটানোও তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়!

নদীর ধারে বুড়ো বটগাছতলায় একা বসে থাকা সৈয়দ মোজাম্মেল হক ওরফে মামুনকে দেখে

কেউ বুঝতে পারবে না, মানুষটি এখন কী গভীর সংকটের মধ্যে রয়েছেন। তাঁর দুঃখের অবধি নেই। এখন, এমনকি তিনি কবিতা রচনা করতেও অক্ষম। মাঝখানের কয়েক বছরের অনভ্যাসে কবিতার ভাষা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন বাকরুদ্ধ, পশ্চিম বাংলায় রবীন্দ্রোত্তর কবিতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, পূর্ব বাংলাতেও বাচ্চা কবিরা অন্য রকম ভাষায় লেখা। ঢাকাতে একদিন তো মোতাহার ভাই বলেছিলেন, আরে সৈয়দ হইলোডা কী কও তো! এখনকার পোলাপানরা যা ল্যাখে তার কিছুই বুঝ না! বাংলা কবিতার এখন কোনো অবিভ্রভাবক নাই!

বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের এক ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন জে দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে বরিশালের থাকবার সময় মামুনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। লাজুক, খামখেয়ালী ধরনের মানুষটি, জাতে ব্রাহ্ম, চেহারাটি অনেকটা খেয়া নৌকের মাঝির মতন, মামুনের সঙ্গে গৃহ-নক্ষত্র বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি যে একজন কবি তা মামুন বুঝতেই পারেননি। পার্টিশানের পর ভদ্রলোক ভারতে চলে যান, শোনা যায় সেখানে তিনি নাকি অর্থনৈতিক অসুবিধের মধ্যে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনিই যে প্রসিদ্ধ কবি জীবনানন্দ দাশ তা জানতে মামুনের অনেক দিন লেগে গিয়েছিল।

মামুন ঐ কবির দুটি কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করে পড়েছিলেন। 'ঝরা পালক' বইয়ের একটি কবিতার নাম হিন্দু-মুসলমান, তার প্রথম লাইনগুলি এই রকম ঃ

মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে-পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘন্টা মিশিছে হরষে নমাজের সুরে সুরে!
আহ্নিক যেথা সুর হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে,
মুয়াজ্জেনদের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে;
জপে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা-উষায় বেদবাণী যায় মিশে কোরানের স্বরে;
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা,—মিশে গেছে হেথা মশজিদ, মন্দির!

কবিতাটি পড়তে পড়তে মামুন চোখের জল সামলাতে পারেননি। তখন সাম্প্রদায়িকতা দিনে দিনে কালকেতুর মতন বাড়ছে, মামুন নিজেও তাতে সচেতনভাবে খানিকটা কণ্ঠ মিলিয়ে ছিলেন হঠাৎ এই কবিতা তাঁর বুকে একটা ধাক্কা মারে। এমেন মিলনের কথা আগে তো ও কউ বলে নি। মামুন ততদিনে লাহোর কনফারেন্সে ঘোষিত পৃথক পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন এবং প্রচারে নেমেছিলেন। এই সময়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তবে কি সব ভুল? হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশে থাকতে পারে না? কেন পারবে না? মামুনের অনুতাপ বোধ হয়েছিল।

জীবনানন্দ দাশের ঐ কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের 'ভারত তীর্থ' কবিতার একটি অক্ষম অনুকরণ তা মামুনের মনে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি গভীর ভাবের বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ নয়, মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। খেয়া পারাপারের মাঝির মতন চেহারার এই কবি হিন্দু-মুসলমানকে সার্থক ভাবে চিনেছেন, তাই তিনি লিখতে পেরেছেন :

এ ভারত ভূমি নহেক' তোমার, নহেক' আমার একা
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছায়া,—মুসলমানের রেখা,...
...'কাফের' 'যবন' টুটিয়া গিয়াছে,—ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা,
মোস্‌লেম বিনা ভারত বিকল, বিফল হিন্দু বিনা...

মামুন অভিনন্দন জানিয়ে ঐ জীবনানন্দ দাশকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, এবং তাঁর ওপর একটি প্রবন্ধ লিখবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। জীবনানন্দের পরবর্তী কাব্য পুস্তকটি পড়ে তিনি হতবাক। এ কি একই লোকেরা লেখা? এর যে মাথা মুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না? অমন একজন অসাম্প্রদায়িক, মানবতা প্রেমিক কবি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেলেন নাকি? 'সাতটি তারার তিমির', যেমন বইয়ের নাম, তেমনই সব প্রলাপ! বইটিতে হিন্দু-মুসলমান বিষয়ে একটি কবিতাও নেই! মাঝে মাঝে যে-সব মানুষের কথা বলা আছে, তারা কারা? কিছুই চেনা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে

মেধাবিনী,...

যূথ কথাটা হাতিদের সম্পর্কে প্রযোজ্য, নারীরা কী করে যূথচারী হবে? ব্যাকরণের কী মা-বাপ নেই? মোতাহার ভাই ঠিকই বলেছিলেন যে বাংলা কবিতার কোনো অভিভাবক নাই এখন। আগে কেউ একটি ভুল শব্দ প্রয়োগ করলে প্রধান প্রধান কবিরা আপত্তি জানাতেন। নিজস্ব মতামত দিতেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি আর সংস্কৃতি এই দুটি শব্দ নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য জানাননি? এই যে জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, 'চোখ আর চুলের সংকেতে মেধাবিনী', এর অর্থ কী? এ তো উন্মাদের বাক্যচ্ছটা! রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এরকম যথেচ্ছাচার প্রশ্রয় পেত? 'বিচিত্রা' ভবনে মিটিং বসতো না? মামুন ঐ জীবনানন্দের কবিতা পড়া বন্ধ করে দিলেন, ঢাকায় একবার যুবলীগের একটি সভায় মোহম্মদ তোয়াহা, আলি আহাদের সামনে কোনো প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের উল্লেখ শুনে তিনি বলেছিলেন, ঐ কবির কথা বাদ দাও, নিজেদের কারুর কথা বলো,পশ্চিম বাংলার এ কবি পলায়নবাদী। তাই শুনে একদল ছাত্র হৈ হৈ করে বলে উঠেছিল, মামুন ভাই, আপনি চুপ করুন, চুপ করুন! আপনারা ব্যাকডেটেড, আপনাদের যুগ শেষ! জীবনানন্দ শুধু পশ্চিম বাংলা বা পূর্ব বাংলার নন, তিনি আবহমানকালের বাংলার।

সেই সবায়, মামুন মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন। তিনি ব্যাকডেটেড? সব কটি প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত, যে কোনো রকম বিপজ্জনক পদক্ষেপেই তিনি পিছ-পা হন না, তবু তাঁকে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা, যাঁদের আজকাল 'ছাত্র সমাজ' বলে অভিহিত করা হয়, তারা ব্যাকডেটেড বলে দিল? তারপর থেকে মামুনের কলমে আর কবিতা আসে না। কবিতা হচ্ছে অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, শুধু স্মৃতির চর্বিত চর্বন তো নয়, এটুকু মামুন জানেন।

রাজনীতি আর নয়, কবিতাও নয়, তা হলে বাকি রইলো কী? মামুন উটপাখির মতন এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সময়ে সংসারে মুখ গুঁজতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও স্বস্তি পাচ্ছেন না। ফিরোজার অনেক গুণ আছে বটে, তবু তিনি বিরক্তিকর, পারতপক্ষে মামুন তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তা এড়িয়ে চলেন। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, কিন্তু গৃহিণীর সঙ্গেই যদি সময় কাটাতে ভালো না লাগে, তা হলে আর সংসারে থাকার কোনো তাৎপর্য রইলো কী?

ফিরোজার প্রথম বিবাহের সময় নাম ছিল নাদেরা, মামুন সেই নাম বদল করে দেন। ফিরোজার অন্য অনেক গুণ থাকলেও তিনি বড় বেশি ধর্ম ধর্ম করেন, অনেকটা ব্যতিকগ্রস্তের মতন। কয়েকদিন আগে ঈদ উৎসব প্রতিপালিত হয়েছে, তার আগে ফিরোজার নির্বন্ধে মামুনকে প্রতিদিন রোজা রাখতে হয়েছে। মামুন নিষ্ঠার সঙ্গে সব কিছু করেছেন বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রতিবাদ ছিল। নামাজে বসার সময়েও মন যদি বিক্ষিপ্ত থাকে, তাহলে সে প্রার্থনার মূল্য কতটুকু? মামুনের পিতা মরহুম সৈয়দ আবদুল হাকিম শেষ জীবনে কট্টর ধর্মপন্থী হয়েছিলেন বলে মামুনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার ঠিক বিপরীত। মামুন ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হতে হতে প্রায় নাস্তিকতার প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। ছাত্র জীবনে অধিকাংশ বন্ধুই ছিল হিন্দু, তাদের প্রভাবও অনেকটা কাজ করেছিল। হিন্দু যুবকেরা তখন বোলশেভিজম-এর দিকে ঝুঁকেছে। নাস্তিক হওয়াই তাদের মধ্যে ফ্যাসান।

কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে মামুনের ঘোর ভাঙে। তখন তিনি বুঝেছিলেন যে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে নাস্তিকতার কোনো স্থান নেই। একজন গোঁড়া মুসলমান একজন গোঁড়া হিন্দুকে পছন্দ করতে পারেন, কিন্তু একজন নাস্তিক এঁদের চোখে ধ্বংসযোগ্য। নাস্তিকতা হলো বিশ্বাসের প্রতি অপমান! ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তার মধ্যে একজন নাস্তিকতা সমর্থকের স্থান থাকতে পারে না। গ্রামে ঘোরার সময় তিনি কোরান-হাদিস পাঠ। করতে লাগলেন মন দিয়ে, বক্তৃতার সময় কায়দা মাফিক উদ্ধৃতিও দিতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মনে গভীরে আর কোনো দিনই ধর্ম বিশ্বাস প্রোথিত হয়নি।

ফিরোজার আর একটি দোষ তিনি গান-বাজনা একেবারে পছন্দ করেন না, বাড়িতে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজালেও তাঁর আপত্তি। হায়, মামুন বড় সাধ করে নাদেরার নাম বদল করে ফিরোজা রাখলেন, সেই ফিরোজাই কিনা সঙ্গীতের শত্রু। বিয়ের প্রথম দু'এক বছর সে রকম কিছু বোঝা যায়নি, পুরো সংসারের কর্ত্রী হবার পর তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে ইদানীং তাঁর শরীরে যত মেদ লাগছে, তত তাঁর মতামত সুদৃঢ় হচ্ছে। ঈষৎ স্থূলকায়া হলেও ফিরোজা বেশ রূপসী। চাঁপা ফুলের মতন গায়ের রং টিকোলো নাকটি সোনার নাকছাবিতে বড় সুন্দর মানায়। ফিরোজার মেয়ে দুটিও হয়েছে ফুটফুটে, বাচ্চা হুরী পরীর মতন।

কবিতা রচনা বন্ধ হয়ে গেলেও মামুনের সঙ্গীত-প্রীতি এখনো তীব্র। তাঁর নিজের গলাতেও সুর আছে, গাইতে পারেন ভালোই। 'যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে', এই গানটি কোথাও শুনলে বা মামুন নিজে গাইলে অমনি মনে পড়ে যায় বুলা অর্থাৎ গায়ত্রীর কথা। দাউদ কান্দিতে সত্যসাধন চক্রবর্তীর বাড়িতে সেই কিশোরীর কণ্ঠে প্রথম এই গানটি শুনেছিলেন, আজও সেই কণ্ঠস্বর কানে বাজে। এতগুলি বছর কেটে গেল তবু বুলার স্মৃতি অম্লান রয়ে গেছে। সেই স্মৃতির মধ্যে দুঃখ জ্বালা নেই বরং তা মধুর। বুলার বিয়ে হয়েছিল গ্রামের বাড়িতে, মামুনও সেই সময় গ্রামে উপস্থিত ছিলেন এবং নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নববধূর সাজে কী যে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল বুলাকে, চন্দনের ফোঁটা দেওয়া তার লজ্জারুণ মুখখানি যেন একটা স্বর্গীয় কুসুমের মতন। তার স্বামীটিও খুব রূপবান, দু'জনে যেন একেবারে রাজযোটক। বুলার হাতে মামুন যখন তার উপহারটি তুলে দিতে গিয়েছিল, তখন বুলা মুখ তুলে বলেছিল, এসেছেন মামুনদা!

কলকাতায় ফিরে মামুন প্রতাপের কাছে বুলার বিবাহের সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। শুনতে শুনতে প্রতাপ জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোর খুব কষ্ট হয়েছে, না রে মামুন? তুই কোন আক্কেলে ওর বিয়ে দেখতে গেলি?

মামুন অবাক হয়ে বলেছিলেন, কষ্ট? কেন একথা বললি? না তো; আমার বেশ আনন্দ হয়েছে। বুলার অমন ভালো বিয়ে হয়েছে। সেটা তো আনন্দের কথা!

প্রতাপ বলেছিলেন, তুই বুলাকে ভালোবেসেছিলি। তুই ওকে নিয়ে কবিতা লিখেছিস।

- আমি তো তাজমহল নিয়েও কবিতা লিখেছি। তা বলে কি তাজমহলে আমার বেড-রুম বানাতে চাই? সুন্দরকে একটু দূরে রেখেই বন্দনা করা ভালো।

প্রতাপ কথাটা বোধহয় ঠিক ধরতে পারেননি। প্রতাপ কবিতার মর্ম বোঝেন না। তিনি মুখটা অন্যপাশে ফিরিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

বুলারা এখন কোথায় আছে কে জানে! সুখে আছে নিশ্চয়ই।

স্মৃতির মুখচ্ছবিতে কালের মালিন্য লাগে না। বিয়ের পরেও বুলাকে মামুন আর একবার দেখেছিলেন। তখন বুলার বয়েস উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। বুলার সেই বয়েসের চেহারাই তাঁর মনশ্চক্ষে ভাসে। পশ্চিম বাংলার পত্র-পত্রিকা দেখলে মামুন আগ্রহের সঙ্গে খুঁজে দেখেন তাতে বুলার কোনো উল্লেখ আছে কি না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল গায়িকা হিসেবে বুলা একদিন বিখ্যাত হবেই। হয়তো বিয়ের পর সে আর গানের চর্চা রাখেনি, কিংবা স্বামীর সঙ্গে বোধহয় থাকে পশ্চিমবাংলা ছাড়িয়ে আরও দূরে কোথাও! প্রতাপের সঙ্গে বেশ কিছুদিন মামুনের চিঠি পত্রে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু প্রতাপ কোনো চিঠিতে বুলার উল্লেখ করেননি।

তুলনামূলক বিচারে বুলার চেয়ে ফিরোজার সৌন্দর্য কোনো অংশে কম নয়। রূপ-উপাসক মামুন এক রূপবতীকেই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেয়েছেন, কিন্তু সেই জীবনসঙ্গিনী তাঁর মর্ম-সহচরী হতে পারলো না। এ দুঃখ কারুকে জানাবার নয়। ফিরোজা একেবারেই ঘরোয়া, সংসারের চৌহদ্দির বাইরে তাঁর চোখ যায় না। এই সংসারের মধ্যে মামুন এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছেন। কিন্তু এর পর কোন পথে যাবেন?

অন্ধকার হয়ে গেছে পাতার ফাঁকে ফাঁকে উড়ছে জোনাকি। বাতাসে একটা বৃষ্টি বৃষ্টি সোঁদা গন্ধ। এক নৌকোর মাঝি হেঁকে হেঁকে ডাকছে যেন কাকে।

মামুন গুন গুন করে গান ধরলেন, 'দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো...'।

॥ ১৩ ॥

বাগানের নতুন গোলাপ চারা পোঁতবার জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটা সাপ বেরিয়েছে। মালি ও দারোয়ানেরা সাপটাকে পিটিয়ে মেরেছে সঙ্গে সঙ্গে, বাড়ির সবাই সেটাকে দেখতে এসে দাঁড়িয়েছে নিচের বড় বারান্দাটায়।

বেশ লম্বা একটা দাঁড়াস সাপ, শীতকালে ওরা এমনিতেই নেতিয়ে থাকে, একটা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, তাও বেচারি নিস্তার পেল না। ওকে মারবার জন্য বেশি বীরত্বেরও প্রয়োজন হয়নি। মালির কোনো ঘেন্নাপিত্তি নেই, সে মৃত সাপটাকে হাতে ধরে তুলে দেখাচ্ছে সেটা কত বড়।

সত্যেন বুলার দিকে ফিরে বললেন, আমাদের নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে একটা এই রকম বাস্তুসাপ ছিল, তোমার মনে আছে?

নারায়ণগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতে বুলা বেশি দিন থাকেন নি, ছুটিতে সময় কয়েকবার গিয়েছেন মাত্র,

সেখানকার বিশেষ কিছু স্মৃতি নেই তাঁর। বিয়ের পর তাঁর স্বামী নরেন কলকাতাতেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। বুলা মুখটা ফিরিয়ে নিলেন, তাঁর গা শিরশির করছে ঐ মড়া সাপটাকে দেখে। না দেখাই উচিত ছিল।

বিভাবতী বললেন, এটা তো পুরুষ সাপ, এর নিশ্চিয়ই জোড়াটা রয়ে গেছে। ওরে বাবা, সেটা তো এখন রেগে থাকবে। ছেলে-মেয়েরা বাগানে খেলা করে—

সত্যেন বললেন, এখন শীতকাল, ভয়ের কিছু নেই।

মালি-দারোয়ানদের দিকে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বললেন, অন্য সাপটা খুঁজে বার করো। যে পাবে তাকে আমি আরও দশ টাকা দেবো প্যাঁড়া খাবার জন্য!

তিনি যে ভয় পান না সেটা বোঝাবার জন্য সত্যেন নিজেই নেমে এলেন বাগানে এবং হাতের ছড়িটা দিয়ে পেটাতে লাগলেন ঝোপঝাড়। কলকাতায় বিভাবতীর শরীর সারছে না বলে তারা এখানে তিন মাসের জন্য থাকতে এসেছেন। অযত্নে পড়ে থাকা বাড়িটিকে সাজাচ্ছেন নিজেদের পছন্দ মতন। এই বাড়িটা একেবারে কিনে ফেলার চিন্তাও সত্যেনের মাথায় ঘুরছে। বিভাবতীকে তাহলে এখানেই রাখা যায় তিনিও মাঝে মাঝে এসে থেকে যাবেন। পাবনার এক প্রাক্তন জমিদার-পরিবার এ বাড়ির মালিক, তাদের অবস্থা এখন খুব পতনশীল, এত বড় বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতাই নেই তাদের। হাজার তিরিশেক টাকা দর দিলেই তারা লুফে নেবে মনে হয়।

মানুষের জীবনে সব দিক থেকে সুখ আসে না। পশ্চিম বাংলায় এসে স্থায়ী হবার পর সত্যেনের আর্থিক সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি হয়েছে যথেষ্ট, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, টালিগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির চেয়ারম্যান, অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের একজন পেট্রন, ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার, কলকাতার উঁচু সমাজের মানুষেরা তাঁকে চেনে জানে; এই সবই তাঁর অহমিকায় সুখ-প্রলেপ দেয়, কিন্তু তাঁর দাম্পত্য প্রসন্ন নেই। গত দশ বছর ধরে তাঁর স্ত্রী হাজার রকম রোগে ভুগছেন, সেই জন্য মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে উঠছে। গান-বাজনার আসর কিংবা পার্টিতে যাওয়ার কোনো উৎসাহই নেই বিভাবতীর। স্ত্রী প্রতি অবহেলা করেন নি সত্যেন, চিকিৎসার চূড়ান্ত করেছেন, তবু তাঁর ঠিক যে কী অসুখ তা বোঝা যায় না, চেহারাটা যেমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, সেই রকমই সব সময় মন-মরা ভাব।

সত্যেন পেছনে ফিরে বুলার দিকে হাতছানি দিয়ে বললেন, এদিকে শোনো। একটা জিনিস দেখবে এসো।

বুলা আড়চোখে বিভাবতীর দিকে তাকালেন। সত্যেন ইদানীং এ রকম ব্যবহার শুরু করেছেন, স্ত্রীকে বাদ দিয়ে বুলাকে আলাদা করে প্রায়ই ডাকেন। সম্পর্কে দেওর, একটু ফাজলামি-মস্করা করা অধিকার তাঁর আছে ঠিকই, কিন্তু বিভাবতী যে এটা পছন্দ করেন না, তা বুলা বুঝতে পারেন।

বুলা বললেন, চলো দেখে আসি, ওখানে আবার কী!

বিভাবতী বললেন, তোমায় ডাকছে, তুমি যাও, আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।

বুলা বললেন, আমিও এখন স্নান করতে যাবো।

সেই কথাটা সত্যেনকে জানিয়ে বুলা পিছন ফিরতে গিয়ে দেখলেন সুরকি-ঢালা পথ দিয়ে হেঁটে আসছে পিকলু আর বাবলু। বিভাবতীর বোনপো মলয়ের সঙ্গে ওদের বেশ ভাব হয়েছে, এ বাড়িতে ওরা প্রায়ই আসে। বেশ সুন্দর ছেলে দুটি। ওদের দেখামাত্র বুলার নিজের ছেলের কথা মনে পড়লো। তাঁর ছেলের ডাকনাম বাপ্পা, আর তার ভালো নাম জ্যোতির্ময়। তার বয়েস এই বাবলু আর পিকলুর মাঝামাঝি, ক্লাস নাইনে পড়ে। সে কিছুতেই দেওঘরে এলো না। জ্যোতির্ময় বয়েজ স্কাউটের মেম্বার, তাদের স্কুলের স্কাউট টিম এই সময়ে দার্জিলিং-এ এক্সকারশানে যাচ্ছে, জ্যোতির্ময় জেদ ধরে সেখানেই গেল।

জ্যোতির্ময়ের বাবা নেই বলে বাড়ির সবাই তাকে অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয় দেয়। বাচ্চা বয়েস থেকেই সে বুঝে গেছে যে, সে যা চাইবে তাতে কেউ না বলবে না। সেই জন্য সে যখন তখন আবদার করে, ইচ্ছে করে জিনিসপত্র ভাঙে, বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তবু কোনো শাস্তি পায় না। বুলা বুঝেছিলেন, তাঁর ছেলের শিক্ষা ঠিক হচ্ছে না, তিনি নিজে একটু কঠোর হয়ে ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে ফল হলো উল্টো, ছেলে আর মায়ের কাছ ঘেঁষতে চায় না।

নরেন যখন বিলেতে ফিরে যান মেমস্ত্রীর কাছে, তখন জ্যোতির্ময়ের বয়েস আড়াই বছর। বাবাকে তার তেমন মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু সে জানে তার বাবা কোথায় আছেন। প্রায়ই সে বলে,

স্কুল ফাইনাল পাশ করেই সে বিলেতে বাবার কাছে চলে যাবে। বুলা বুঝতে পেরেছেন, ছেলেকে আটকানো যাবে না। ঐ দেশটা বেড়াল-চোখো মেয়েতে গিস্‌গিস করে। ওখান থেকে কি ছেলে আর ফিরে আসতে পারবে? বাবার কাছেই বা সে কী রকম ব্যবহার পাবে কে জানে! বিদেশিনী সৎ মা কি ওকে বাড়িতে স্থান দেবে? এই সব কথা ভাবলেই বুলার বুকের মধ্যে গুড় গুড় শব্দ হয়। সমস্ত দুনিয়াটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

বুলা হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, বাবলু, শোনো—

বাবলুর সাপ দেখাতেই বেশি আগ্রহ, সে সেখানে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললো, যাচ্ছি বুলামাসি।

পিকলু সাপটার দিকে এক নজর দেখে এগিয়ে এলো বুলার দিকে।

এই ছেলেটি বড়বেশি লাজুক, বুলা লক্ষ করেছেন যে, পিকলু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না, চোখ নিচু করে থাকে।

পিকলু বুলার পায় হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তিনি বললেন, আরে আরে, রোজ রোজ দেখা হলেই প্রণাম করতে হবে নাকি!

পিকলু তবু বুলার পা স্পর্শ করলো।

পিকলুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বুলা জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়ির সব খবর ভালো তো!

তাদের বাড়ির অবস্থা এখন খুবই খারাপ, অসিতবরণের মৃত্যু সংবাদ কোনোক্রমে সুহাসিনীর কানে পৌঁছে গেছে, তারপর থেকে তিনি এত কান্নাকাটি করছেন যে, প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠেছেন, তাঁকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না, কিন্তু এই সব কথা বুলাকে জানাতে ইচ্ছে করলো না পিকলুর। দুঃখের খবর, খারাপ খবর কারুর কারুর সামনে এলে খুব অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। বুলার পা ছুঁয়েই পিকলুর সারা শরীরে শিহরণ এসেছে। গরম হতে শুরু করেছে তার সব কটা আঙুলের ডগা।

সে ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

বাবা এখানে নেই বলে পিকলু-বাবলুর স্বাধীনতা অনেক বেড়ে গেছে। আজ ভোরে দুই ভাই এসেছিল নন্দন পাহাড়ে, রাস্তা তাদের মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে। তখনও সূর্য ওঠেনি, আধো-অন্ধকারের মধ্যে দু'জনে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে উঠেছিল ওপরে। তবপর সেখানে দাঁড়িয়ে তারা সূর্যোদয় দেখলো। ঠান্ডা, নীল আলোর মধ্য থেকে যখন রক্তিম গোলকটি উঠে এলো, তখন হঠাৎ বুলা মাসির কথা মনে পড়েছিল পিকলুর। এই দৃশ্যটির সঙ্গে বুলা মাসির মুখের খুব মিল আছে। এ রকম মনে হওয়ায় পিকলু নিজেও খুব অবাক হয়েছিল। অন্য কেউ তো এই মিলটা দেখতে পাবে না, অথচ সে স্পষ্ট দেখছে।

পিকলু সাহস করে এখন বুলা মাসির মুখের দিকে তাকালো। হ্যাঁ মিল আছে, ভোরের ঠান্ডা নীল আলোর সঙ্গে, প্রথম সূর্য ওঠার সঙ্গে। এই কথাটা বুলা মাসিকে জানাতে খুব ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু কেউ যেন তার জিভ টেনে ধরেছে।

একটা কিছু তো বলতে হবে, তাই সে বললো, আমরা নন্দন পাহাড়ে সানরাইজ দেখতে গিয়েছিলাম। আপনি দেখেছেন কখনো?

বুলা ছেলেমানুষের মতন উৎসাহিত হয়ে বললেন, ওমা, কই না তো! তোমার গেলে, যাবার সময় আমাদের ডেকে নিয়ে গেলে না কেন?

- আপনি যাবে? কাল যদি আবার যাই?

- হ্যাঁ। ঠিক আসবে তো, আমি তা হলে তৈরি হয়ে থাকবো। তোমরা সেই সকালে বেরিয়েছো, তারপর আর বাড়ি ফেরোনি? নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে তোমাদের, ভেতরে এসে বসো।

ওদিকে বাগানের মধ্যে একটি অতসীগাছে সত্যেন একটা বেশ বড় মতন টিপ পোকা দেখতে পেয়েছেন, চকচকে সবুজ ধাতুর মতন তার গা, তার ওপরে নানা রঙের ফোঁটা। সেটা তিনি বুলাকে দেখাতে চান। তিনি আবার বুলাকে ডাকলেন।

বুলা এবার আর উপেক্ষা করতে না পেরে নেমে এলেন বাগানে। ততক্ষণে টিপ-পোকাটা উড়ে গেছে। সত্যেন বললেন, যাঃ, তুমি দেরি করলে...।

তারপর কণ্ঠস্বর একটু নিচু করে বললেন, আমার জরুরি কাজ পড়েছে, দু'এক দিনের মধ্যে কলকাতায় যেতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে ফিরবে?

বুলা জিজ্ঞেস করলেন, আর বিভা?

সত্যেন বললেন, ও তো বেশ কিছুদিন থাকবে। এখানকার জল খেয়ে উপকার হচ্ছে যখন।

বুলা বললেন, আমিও এখানেই থাকবো।

- তুমি আমার সঙ্গে চলো না কলকাতায়!

- না, আমার এখানেই ভালো লাগছে।

সত্যেন স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন বুলার দিকে। বুলা চোখ সরিয়ে নিলেন। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সত্যেনের কণ্ঠস্বর ইঙ্গিতময়। বুলা বুঝতে পারছেন যে, সত্যেন তাঁর জীবনে অশান্তি ডেকে আনছেন। তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

পিকলুর মনে হলো, আজকের সকালটি তার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান। কালকের সকালটি আরও ভালো হবে। কাল বুলা মাসি তার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছেন। কাল সে বাবলুকে আনবে না, একা আসবে। ঠান্ডা নীল আলোর মধ্যে রক্তিম সূর্যোদয় দেখে বুলা মাসি কি চিনতে পারবেন নিজেকে? সেটা জানার জন্যই তার তীব্র কৌতূহল। সে তৃষ্ণার্তের মতন তাকিয়ে রইলো বুলা মাসির দিকে।

বুলা বারান্দায় উঠে বললেন, তুমি একটু বসো পিকলু, ছোট ভাইকে ডাকো, আমি মলয়কে পাঠিয়ে দিচ্ছি!

ভেতরে চলে যেতে যেতে বুলার মনে হলো, তাঁর নিজের ছেলেটা যদি এই পিকলুর মতন হতো! কী নম্র আর বিনয়ী, গুরুজনদের দিকে চোখ তুলে কথা বলে না। পড়াশুনোতেও কত ভালো! তাঁর ছেলে জ্যোতির এই বয়েসেই কথার মধ্যে একটা চ্যাটাং চ্যাটাং ভাব আছে।

দোতলায় উঠে এসে বুলা মিনার হাত দিয়ে ছেলেদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আর নিচে নামলেন না। মনটা ক্রমেই বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে। সকালবেলাতেই একটা মরা সাপ দেখার কোনো মানে হয়?

মন খারাপের সময় বাথরুমটাই শ্রেষ্ঠ জায়গা। গরম জলে স্নান করা তাঁর অভ্যেস, এখন জল গরম করতে সময় লেগে যাবে, তিনি ঠান্ডা জলেই স্নান সেরে নেবার জন্য ঢুকে পড়লেন।

প্রথমে খানিকক্ষণ কাঁদলেন নিঃশব্দে। ঠিক যে দুঃখে তা নয়, অপমানবোধে। সত্যেন ও রকম ফিসফিসিয়ে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে তাঁকে কলকাতায় যাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?

অনেকদিন পর তাঁর স্বামী নরেনের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ঐ মুখ বুলা মনে রাখতে চান না, তবু ফিরে ফিরে আসে। সুশ্রী প্রফুল্ল মুখচ্ছবি তাতে কোনা পাপের রেখা নেই। নরেনের সঙ্গে চার বছর বিবাহিত জীবনে একদিনের জন্যও বুলা স্বামীকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেননি। আশ্চর্য, কোনো মানুষ এমনবাবে তার জীবনের একটা অংশ গোপন রাখতে পারে? বুলার সঙ্গে তাঁর কত গল্প হয়েছে, প্রবাস জীবনের কত মজার মজার কাহিনী শুনিয়েছেন কিন্তু কখনো ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় নি যে বিলেতে নরেনের আর একটা স্ত্রী রয়েছে। ও পক্ষের দুটি ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের কথাও কি নরেনের মনে পড়তো না? তিনি কি ভেবেছিলেন যে, ইংরেজ স্ত্রী ঠকিয়ে নিজের দুটি সন্তানকেও তিনি চিরকালের মতন বিস্মৃত হতে পারবেন?

নরেনকে বুলার বাপের বাড়ির সবারই খুব পছন্দ হয়েছিল। তাঁর স্বভাবে বেশ একটা মিষ্টত্ব ছিল। দোষের মধ্যে ছিল তাঁর আলস্য। শুয়ে গড়িয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন, জীবিকা অর্জনের কোনো আগ্রহ ছিল না। অবশ্য পারিবারিক আয় ছিল যথেষ্ট সংসারে কখনো টাকার টান পড়েনি। ডিটেকটিভ বই পড়তে পড়তে শেষ হলো না বলে সেদিন কোর্টে যাওয়া হলো না, এ রকম কোনো ব্যারিস্টারের কথা কেউ কখনো শুনেছে।

সেই মেম বউ এসে পড়ে যখন ঝঞ্ঝাট বাধায় তখন বুলা বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। অনেকে বলে, সেটাই নাকি বুলার ভুল হয়েছিল, স্বামীর পাশাটি আঁকড়ে থাকা উচিত ছিল, কিছুতেই স্বামীকে ছাড়া ঠিক হয়নি। কিন্তু তখন বিশ্বাসভঙ্গের আঘাত এমন সাঙ্ঘাতিক তীব্রভাবে লেগেছিল যে বুলা যে-কোনো মুহূর্তে আত্মহত্যা করে ফেলতে পারতেন। কলেজে পড়ার ইচ্ছে ছিল বলে বুলা প্রথমে বিয়ে করতে চান নি সে সময়, কিন্তু যখন বিয়ে হলোই, তখন তিনি স্বামীকে সমস্ত মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিনে, অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছেন নিজেকে স্বামীর যোগ্য করে তোলার। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষয়িত্রী রেখে ইংরেজী উচ্চারণ শিখেছেন, কাঁটা চামচে খাওয়া অভ্যেস করেছেন। মন যদি ভেঙে যায় তবে স্বামীকে জোর করে আটকে রেখেই বা কী লাভ! নরেন যখন চলে যান, বুলার সঙ্গে একবার দেখাও করে যাননি, ওদেশে গিয়ে একটাও চিঠি লেখেননি। মাঝে মাঝে শুধু সত্যেনকে চিঠি লেখেন

নিজের অংশের টাকা চেয়ে।

এগারো বছর হয়ে গেল, আর কেউ নরেনের আসার আশা করেন না। এর পর ফিরে এলেও কি বুলা তাঁকে গ্রহণ করতে পারবেন? যে ফিরে আসবে সে তো অন্য মানুষ, এগারো বছর আগে সে বুলার সমস্ত সাধ-স্বপ্ন ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।

বুলা সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া বন্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর মায়ের প্রবল আপত্তি। বুলা অবশ্য বলেছে আর এক বছর কেটে গেলে সে আর কিছুতেই মানবে না, শাস্ত্র অনুসারেই তো দ্বাদশ বর্ষ নিরুদ্দিষ্টকে মৃত বলে গণ্য করা উচিত।

বুলার বাবার অকাল মৃত্যু হয়েছে, মা থাকেন ছোট ভাইয়ের সংসারে। অল্প বয়েসেই চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে বলে বুলার ছোট ভাই বিমান বেশি লেখাপড়া শিখতে পারেনি, তার চাকরিটাও ছোট। তার বাড়িতে গিয়ে বুলা দু-একদিনের বেশি থাকতে চান না। টালিগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতেই কিছুটা ভাগ পেয়েছেন, সে বাড়িতে সত্যেন ছাড়া আরও তিনজন ভাসুর-দেওরের পরিবার আছে, দূর সম্পর্কে আশ্রিত ও বেশ কয়েকজন। পারিবারিক এস্টেট থেকে বুলা ও তার সন্তানের ভরণ-পোষণের খরচ দেওয়া হয়, বুলা নিজস্বভাবে তাঁর জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এদেশে পুরুষ-রক্ষী ছাড়া কোনো যুবতীকে কেউ নিরালায় থাকতে দেয় না।

সত্যেনের অন্য রকম মতিগতি দেখা যাচ্ছে অতি সম্প্রতি, এর আগে সত্যেন ব্যবসাপত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতেন, বুলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতো খুব কম। বুলার জীবনে প্রথমে উপদ্রব ঘটাতে আসেন নরেনেরই এক বন্ধু ত্রিদিব, কলকাতার তিনি একজন অ্যাডভোকেট। নরেন যখন উত্তর কলকাতায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন, তখন সেখানে ত্রিদিব প্রায়ই আসতেন। বেশ রগুড়ে ধরনের মানুষ, খাদ্রদ্রব্যের ব্যাপারে খুব শৌখিন, প্রায়ই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে খাবারের প্যাকেট নিয়ে আসতেন বন্ধুর বাড়িতে। ত্রিদিব বিবাহিত কিন্তু তার স্ত্রীকে কোনোদিন দেখা যায়নি, তাঁদের বাড়িতে পর্দা প্রথা। এক একদিন আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতেন রাত এগারোটার পর। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, কলকাতা শহর প্রায় ফাঁকা, লাস্ট ট্রামে দু'তিন জনের বেশি যাত্রী থাকে না, ত্রিদিব তাতেও ভয় পেতেন না।

নরেন বিলেতে প্রথমা স্ত্রীর কাছে ফিরে যাওয়ায় ত্রিদিব মর্মাহত হয়েছিলেন। বুলাকে তিনি বোঝাতে লাগলেন যে, নরেনকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাকে শাস্তি দিতে হবে। অন্তত বিলিতি আইন অনুযায়ী তাকে খোরপোশ হবে। বুলা যে এসব কিছুতেই আগ্রহী নন ত্রিদিব তা শুনবেন না। ত্রিদিব নাছোড়বান্দা। এমন কি বুলাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিলেত যাবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

প্রথম দু'তিন বছর বুলা যখন বাবা-মায়ের কাছে থাকতেন, তখন ত্রিদিব সেখানে যেতেন মাঝে মাঝে। তারপর বুলা যখন টালিগঞ্জের বাড়িতে চলে এলেন, সেখানে ত্রিদির আসতে লাগলেন রবিবার ছাড়া আর প্রত্যেকদিন। বুলার ছেলের জন্য তিনি আনেন নিত্য নতুন উপহার আর বুলার জন্য রাশি রাশি খাবার। সন্ধ্যেবেলা এসে তিনি অনেকক্ষণ বসে থাকেন, প্রত্যেকদিন প্রায় একই ধরনের কথা। বুলাকে গান গাইবার জন্য ঝুলোঝুলি অনুরোধ। ক্রমে তাঁর আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে বুলাকে তিনি রক্ষিতা হিসেবে পেতে চান। জানবাজারে তাদের একটি বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে, সেখানে বুলা অনেক আরামে থাকতে পারবেন, সেখানে গান-বাজনা চর্চারও কোনো অসুবিধে হবে না। ত্রিদিব যে-ধরনের পরিবারের মানুষ সেখানে বাড়ির বউকে ঘরে বন্দী রেখে বাইরে একটি মেয়েমানুষ পোষা অস্বাভিকি কিছু নয়।

বুলা প্রথম প্রথম বুঝতে পারেন নি। ত্রিদিবের পীড়াপীড়িতে একদিন দু'দিন গান শুনিয়েছেন মাত্র, অন্যদিন ভদ্রতা রক্ষা করেছেন শুধু। তার মধ্যেই তাঁর নামে কুৎসা রটে যায়। স্বামী চলে গেলেও বুলার শরীর ভাঙেনি, কোনো রকম একটানা রোগ হয়নি, এটা যেন তাঁর অপরাধ। নারীর শরীরে যৌবন থাকলেই তা পুরুষের খাদ্য হবে, এটাই যে নিয়ম।

ত্রিদিব একদিনই মাত্র বুলার কোমরে হাত রেখেছিলেন। এতগুলি বছরে বুলার সেইটুকুই মাত্র পরপুরুষ স্পর্শ। ত্রিদিবের মত আরও অনেক লোভী এসেছে, বুলা প্রত্যেককেই নিজের শরীরের থেকে অন্তত এক হাত দূরত্ব থাকতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কঠোরভাবে সংযম পালন করে চলেছেন, যদিও তাঁর বিশেষ কোনো ব্রত নেই। কোনো অহংকারও নেই, সংযমের জন্যই যেন সংযম। কেউ তাঁর শরীরটাকে লোভের সামগ্রী মনে করছে, এটা বুঝতে পারলেই বুলার বড় অপমান হয়।

সত্যেনের সঙ্গে এতদিন বেশ পরিষ্কার সম্পর্ক ছিল। বড় গিন্নি সম্বোধন করে মাঝে মাঝে কৌতুক

করতেন, কিন্তু কখনো শালীনতার সীমারেখাটি লঙ্ঘন করেন নি। দেওঘরে সত্যেন প্রায় জোর করেই নিয়ে এসেছেন বুলাকে। এসে বেশ ভালোই লাগছে তাঁর। কিন্তু এখানে এসে সত্যেন বারই বুলার কান্না পায়। বিভাবতী যে বুলার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠছেন দিন দিন, সে জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। মেয়েরা সব বুঝতে পারে।

দেওঘরে এসে প্রতাপদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কতদিন পর। প্রতাপদার ওপর কোনো রাগ বা অভিমান নেই বুলার। পরে বুলা চিন্তা করে বুঝতে পেরেছেন, প্রতাপদা সেদিন ঠিকই করেছিলেন কলেজে পড়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বুলা সে সময় বিয়েটা ভাঙতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন প্রতাপদার পক্ষে তাঁর বাবাকে এসে সে বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। দুই পরিবারেই তা হলে অনেক গন্ডগোল হতো।

রাগ নেই, অভিমান নেই তবু প্রতাপদার সঙ্গে কেন সহজ হতে পারছেন না তা বুলা নিজেই বুঝতে পারেন না। তাঁর মনে হয়, প্রতাপদার সঙ্গে খানিকটা দূরত্ব রেখে দেওয়াই ভালো, বেশি কাছে এলে প্রতাপদাও যদি ত্রিদিব বা অন্যদের মতন হয়ে যান!

বাথরুমের জানলা দিয়ে দূরের একটা সবুজ মাঠ দেখা যায়। ওটা বাড়ির পেছন দিকে। ওদিকে কোনোদিন যাওয়া হয়নি। এই জানলা দিয়ে ঐ জায়গাটা সবুজ মখমল পাতা স্বর্গীয় উদ্যানের মতন মনে হয়। অনেক প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছে, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে এ রকম তিনটি ছাগলছানা লাফালাফি করছে সেখানে। অশ্রুসজল চোখে বুলা সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। ওখানে তিনি কোনো দিন যাবেন না ঠিক করলেন। এ রকম কিছু কিছু জায়গা দূরে থাকা ভালো।

॥ ১৪ ॥

ওপরতলায় নিজেদের অংশটায় তালা বন্ধ করে মেয়ের হাত ধরে সুপ্রীতি নেমে এলেন নিচে। তাঁর শরীর সাংঘাতিক দুর্বল, তিনি গত কয়েকদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শরীর অশক্ত হলেও তাঁর মন শক্ত আছে, তাঁর চোখে জল নেই। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিয়েছেন। এক পা এক পা করে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, একবারও ফিরে তাকালেন না।

কেউ তাঁকে বিদায় জানাতে এলো না, তিনিও কারুর কাছে যাননি। বাড়ির সব মানুষ যে-যার ঘওরে দুরজা বন্ধ করে রয়েছে, গোটা বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ, এমনকি যে কাচ্চাবাচ্চাগুলো সর্বক্ষণ হৈ চৈ করে তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। যদিও সবাই জানে যে সেজো তরফের গিন্নি আজ বিদায় নিচ্ছেন।

নিচের দালানে এ বাড়ির ঝি-চাকরেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কারুর কারুর চক্ষু ছলছলে, এরা সুপ্রীতিকে ভক্তি করে। এরা এক এক করে মাটিতে ছুঁইয়ে গড় করলো, সুপ্রীতি তাদের দুটি করে টাকা দিলেন, কোনো কথা বলতে পারলেন না।

বৈঠকখানা পেরিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে সুপ্রীতি একটু থমকে দাঁড়ালেন, কিছু যেন চিন্তা করলেন। তারপর ঈষৎ ধরা গলায় তিনি মেয়েকে বললেন, আমি হয়তো এ বাড়িতে আর কোনোদিন ফিরে আসবো না, কিন্তু এটা তোর বাবার বাড়ি, তুই আসবি।

তুতুলের মুখখানি এতদিন পর্যন্ত ছিল গোলগাল, গত কয়েকদিন ধরে সেই মুখ হয়ে গেছে ধারালো ও কৌণিক। তার শরীর ও মন ছিল নরম তুলতুলে, সেই জন্য তুতুল নামটি খুব মানানসই ছিল, ছোটবেলা থেকেই সবাই তার গাল টিপে আদর করে বলতো, মেয়েটা যেন ঠিক মোমের পুতুল। গত কয়েকদিন তার মনোজগতে যে দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে, তার কারণ শুধু তার বাবার মৃত্যু ঘটনাই নয়। এতদিন পর্যন্ত সে ছিল একটা গল্পের বইয়ের জগতে, হঠাৎ যেন এক ফুৎকারে সমস্ত রঙিন বুদবুদ উড়ে গেল, সে দেখতে পেল কদর্য, নিষ্ঠুর, খলতাপূর্ণ এমন সব দৃশ্য, যার নাম বাস্তব। তুতুলের বয়েস সবে চৌদ্দ পেরিয়েছে, তার বয়েসী অন্য ছেলে-মেয়েদের তুলনায় এই বাস্তব সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ছিল খুবই কম, তার মা তাকে পক্ষী মাতার মতন দুই ডানা মেলে সর্বক্ষণ আগলে রেখেছিলেন। এখন সে দেখতে পেল তার নিকট আত্মীয়দের লোভ, হিংসা, শঠতা, কানে শুনলো স্নেহ-মমতাহীন নিষ্ঠুর ভাষা।

মায়র হাত শক্ত করে চেপে ধরে সে বেরিয়ে এলো গেটের বাইরে। বুড়ো দারোয়ানটি শুধু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো তাকে দেখে।

প্রতাপ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেননি, তাঁর আর্দালি দয়ারামকে ভেতরে পাঠিয়েছিলেন মাল-পত্র

শর্ষ বুঝে আনবার জন্য। অসিতবরণের কাকা জলদবরণ ও ওঁদের এক জামাই প্রিয়লাল কুৎসিত ভাষায় তাঁকে অপমান করেছে, তারপরেও প্রতাপকে ও বাড়িতে ঢুকতে হলে লাঠালাঠি করতে হতো। ও বাড়ির সদর থেকে একটু দূরে একটা ট্যাক্সি ডেকে প্রতাপ বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, দিদিকে দেখে তিনি একবার চক্ষু বুজলেন, দিদির বৈধব্যবেশ তিনি এখনো সহ্য করতে পারছেন না, তারপর চোখ মেলে তিনি ট্যাক্সির দরজা খুলে দিলেন।

সুপ্রীতির হাতে একটি কাপড়ের ব্যাগে দুটি চওড়া ভেলভেটের বাক্স, তার মধ্যে রয়েছে তাঁর যাবতীয় গয়না ও কোম্পানির কাগজপত্র। ট্যাক্সি চলতে শুরু করার পর সুপ্রীতি সেই ব্যাগটি প্রতাপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, খোকন, তোর কাছে এগুলো রাখ।

ঠিক শোক-দুঃখ নয়, প্রতাপের মন একটা অন্যরকম চিন্তায় আক্রান্ত। অনেকসময় আনন্দ-বেদনা, উপভোগ-অনাসক্তির চেয়েও এই বিচারটাই বড় হয়ে ওঠে, ঠিক না ভুল? প্রতাপের মনে হচ্ছে তিনি একটা ভুলকে সায় দিয়ে নিজেও একটা বড় ভুল করতে যাচ্ছেন। অসিতবরণের মৃত্যুর পর সুপ্রীতির পক্ষে ও বাড়িতে টিকে থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছিল, অন্য শরিকরা সুপ্রীতিকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর কারণ তাতেই তাদের লাভ। ঐ রকম হিংস্র প্রতিকূলতার মধ্যে মেয়েকে নিয়ে সুপ্রীতি কখনো স্বস্তি বোধ করতে পারতেন না, তবু প্রতাপ অনুভব করছেন, দিদির এভাবে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসাটা ভুল হচ্ছে।

সারা পথ কোনো কথা হলো না।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামতেই প্রতাপের বাড়িওয়ালার স্ত্রী অতসী তিন তলা থেকে নেমে এসে সুপ্রীতির হাত ধরে বললেন, আসুন দিদি। তারপর তিনি তুতুলের থুতনিতে হাত ছুঁইয়ে চুমু খেয়ে বললেন, এসো মা, এসো।

অতসীর কাছে প্রতাপ কৃতজ্ঞ। দেওঘর থেকে প্রতাপ একা ফিরে আসার পর তিনি অনেক যত্ন করছেন। রোজ সকালে তিনি প্রতাপের জন্য চা-জলখাবার পাঠান, রাত্তিরেও রুটি-তরকারি পাঠিয়ে দেন। বাড়িওয়ালা জয়গোপাল দে-র সঙ্গে প্রতাপদের বরাবরই সদ্ভাব রয়েছে। জয়গোপাল দে-রা সুবর্ণ বণিক, ওঁরা কলকাতার আদি বাসিন্দা। জয়গোপাল কাপড়ের ব্যবসা করেন, প্রত্যেক বছর পুজোর সময় মমতাকে তিনি বিনা মূল্যে একটা শাড়ী পাঠাবেনই পাঠাবেন। বাড়িওয়ালা কর্তৃক কোনো ভাড়াটেকে এরকম উপহার প্রদানের ঘটনা নিশ্চিত দুর্লভ।

অতসী ও জয়গোপাল প্রতাপের কাছ থেকে তাঁর দিদির বাড়ির সব ব্যাপার শুনেছে। অতসী দু'গেলাস লেবু চিনির সরবৎ বানিয়ে রেখেছিলেন, দোতলায় এসে অতসী একটি গেলাস সুপ্রীতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নিন দিদি, এটা এক চুমুকে খেয়ে নিন তো আগে। শুনলুম আপনি নাকি কিছুই খাচ্ছেন না? অমন করলে কী চলে! শরীরটা রাখতে হবে তো। নিজের মেয়ের কথা ভাববেন নাকো? যারা যায় তারা তো চলেই যায়, যারা থাকে তাদের কথাই বেশি করে ভাবতে হয়!

অতসীর মুখখানা বড্ড ভালোমানুষীতে মাখা। সুপ্রীতির সঙ্গে তিনি এমন সুরে কথা বলছেন যেন অনেককালের চেনা। কিছু কিছু মানুষ পারে অন্যাকে এত সহজে আপন করে নিতে। বেশ কয়েকদিন পর একজন অনাত্মীয়ের মুখে এরকম কোমল কথা শুনে তুতুল তার মায়ের পিঠে মুখ ঘুজে হু-হু করে কেঁদে উঠলো।

বিকেলে এলেন প্রতাপের বন্ধু বিমানবিহারী তাঁর দুই ছোট ছোট মেয়ে অলি আর বুলিকে সঙ্গে নিয়ে। সুপ্রীতিকে বিমানবিহারীও দিদি বলেন, দু-একবার তিনি প্রতাপের সঙ্গে গেছেন বরানগরের বাড়িতে। অসিতবরণদের সঙ্গে বিমানবিহারীর একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও বেরিয়ে গিয়েছিল, তাঁর মায়ের দিক দিয়ে, কিন্তু বিমানবিহারী সে সম্পর্কের বিশেষ গুরুত্ব দেননি। বিমানবিহারী শৌখিন ধরনের মানুষ। প্রতাপেরই মতন তিনি বেছে বেছে লোকদের সঙ্গে মেশেন।

প্রতাপ তিনি কথা বললেন তুতুলের সঙ্গে। তুতুলের ভালো নাম বহ্নিশিখা, তিনি ওকে ঐ নামেই ডাকেন।

তিনি বললেন, শোনো বহ্নিশিখা, আমার বাবা যখন মারা যান, তখন আমার বয়েস চৌদ্দ, ঠিক তোমারই বয়েসী ছিলুম। আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল তার দু'বছর আগে। তোমার বাবা ভারি সুন্দর মানুষ ছিলেন, তাঁর চলে যাওয়াটা একটা মস্ত বড় শূন্যতা, কিন্তু তোমার মা তো রয়েছেন!

এ বেলা তুতুলের চোখ মুখ অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। স্নান করে সে একটা শাড়ী পরেছে আজ। সে স্থির দৃষ্টিতে বিমানবিহারীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

বিমানবিহারী আবার বললেন, বড় কোনো শোক পেলে মানুষের বয়েস বেড়ে যায়। তুমিও এখন থেকে আর ছোট রইলে না, বড় হয়ে গেলে। আমার বেলাতেও তাই হয়েছিল। প্রায় এক লাফে আমি অ্যাডাল্ট হয়ে গেসলুম।

অলি আর বুলি বাবার দু'পাশে লক্ষ্মী মেয়ের মতন বাবু হয়ে বসে আছে আর অবাক অবাক চোখ মেলে তুতুলকে দেখছে। বিমানবিহারী মেয়েদের বললেন, তোমরা এই দিদির সঙ্গে ভাব করো, আমি একটু পাশের ঘরে যাচ্ছি।

বিমানবিহারী সুপ্রীতির কাছে এসে মেঝেতে বসলেন। তাঁর ধুতি ও পাঞ্জাবি সব সময় ধপধপে ফর্সা থাকে, তাঁর পায়ের তলাতেও একটু দাগ থাকে না। তিনি কথা বলেন সুস্পষ্ট উচ্চারণে।

তিনি বললেন, দিদি, আমার স্ত্রী আসতে পারলেন না, কাল থেকে খুব জ্বর, বড্ড ফ্লু হচ্ছে এখন কলকাতায়।

সুপ্রীতি বললেন, না, না, তাতে কী হয়েছে!

- দিদি, আপনাকে আমি কোনো সান্ত্বনার কথা জানাবো না। আপনার যথেষ্ট মনের জোর আমি জানি। কিন্তু আপনি ও বাড়ি ছেড়ে একেবারে চলে এলেন? এটা বোধহয় ঠিক করলেন না।

তিনি তাকালেন প্রতাপের দিকে। প্রতাপ জানতেন যে বিমানবিহারীও এই কথাই বলবেন। তাঁদের মনের গড়ন একরকম।

সুপ্রীতি বললেন, ও বাড়িতে আমি আর নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না।

- তবু যদি একটু কটা দিন দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে থাকতেন, তা হলে আবার বোধহয় ঠিক হয়ে যেত। বুঝলেন না। পজেশানই হচ্ছে মালিকানার পনেরো আনা। একবার বাড়ি ছেড়ে এলে ওরা কি আর বিষয়-সম্পত্তির ভাগ দেবে?

- না দেয় না দেবে। আমি চাই না ওদের টাকা পয়সা!

বিমানবিহারী আলতো ভাবে হেসে বললেন, অনেকেই এই কথা বলে। অনেকেই ভাবে টাকা পয়সা যেন একটা অপবিত্র জিনিস। কিন্তু দিদি, এ যুগে টাকা-পয়সাই হচ্ছে মানুষের জীবনের অশ্বশক্তি। এর অভাবে জীবনটা অচল হয়ে যেতে চায়।

সুপ্রীতি এবারে দৃঢ় ভাবে বললেন, বিমান, আমি হুট করে চলে আসি নি। ভেবে-চিন্তেই এসেছি। উনি চলে গেছেন, সেটা আমি মেনে নিয়েছি, আগে থেকেই এর জন্য একটু একটু তৈরি হয়ে ছিলাম। কিন্তু উনি নেই, তার পরেও ও বাড়িতে থাকা...তুমি জানো না ওখানকার পরিবেশ কী রকম! আমার বাবা পূর্ববঙ্গের। তাই ওরা কোনোদিনই আমাকে মেনে নিতে পারে নি। বিয়ের আগেই উনি আমাদের বাড়ি যেতেন বলে ওরা ভাবে যে আমার মা-বাবা জোর করে।

- আমাদের বাড়িতেও তো পূর্ববঙ্গের মেয়ে এসেছে বউ হয়ে।

- সব বাড়ি তো এক রকম নয়। উনি রিফিউজিদের হাতে মারা গেলেন, ওঁদের বাড়ি উদ্ধার করা গেল না, সেই রাগে ওরা আমার ওপরে...। ওদের চোখে সব পূর্ববঙ্গের লোকই সমান...কী খারাপ ভাষা যে ব্যবহার করতো তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! ঐ পরিবেশে আমার মেয়ে মানুষ হোক, তা আমি কিছুতেই চাই না। এর জন্য যদি না খেয়েও থাকতে হয়, তাও ভালো!

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আমি খোকনের ঘাড়ের ওপর ভর করে চিরকাল থাকবো না। অন্য একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

প্রতাপ বললেন, দিদি। তুমি কি ভাবছো...

সুপ্রীতি প্রতাপের বাহু ছুঁয়ে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ব্যাকুল ভাবে বললেন, না রে, খোকন, আমি সে রকম কিছু ভাবি নি। আমি আর তুতুল তো তোর কাছেই থাকবো। বাবা বেঁচে থাকলে তিনি আমাদের আশ্রয় দিতেন না? বাবা নেই। তুই আছিস। দরকার হয় আমরা একবেলা খাবো। তবু ঐ অপমান সহ্য করে ওখানে থাকতে পারতাম না। আমি জানি। মমতা কোনোদিন আমাদের ফেলে দেবে না!

ওঠবার সময় বিমানবিহারী জিজ্ঞেস করলেন, প্রতাপ, তুমি তা হলে আবার বৈদ্যনাথধাম যাচ্ছো?

প্রতাপ বললেন, হ্যাঁ, সম্ভব হলে কালই। ফিরে এসে তোমায় খবর দেবো।

দেওঘর থেকে বিশ্বনাথ গুহ চিঠি পাঠিয়েছেন যে সুপ্রীতি আর তাঁর মেয়েকে যেন অবিলম্বে একবার সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সুহাসিনীকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। তিনি একেবারে পাগলের মতন হয়ে উঠেছেন। তিনি যখন তখন কলকাতায় চলে আসতেন চান সুপ্রীতিকে দেখবার জন্য।

দিদি আর তুতুলকে দেওঘরে নিয়ে যেতে হবে ঠিকই, তবে সে ব্যাপারে প্রতাপের মনের মধ্যে একটা বাধা আছে। ট্রেনের টিকিট কাটতে প্রতাপ দু'দিন অহেতুক দেরি করলেন। দিদির সঙ্গে মায়ের যখন প্রথম দেখা হবে, তখনকার দৃশ্যটা কল্পনা করলেই প্রতাপের শরীর মন আড়ষ্ট হয়ে যায়। প্রতাপ কান্নাকাটির দৃশ্য সহ্য করতে পারেন না। মা সম্পর্কে প্রতাপের মনে একটা স্নেহের ভাব আছে, মা যেন একটা ছোট্ট মেয়ে, অবুঝ। মায়ের কোনো কষ্ট দেখলে তাঁর বুক মুচড়ে ওঠে।

তবু প্রতাপকে টিকিট কাটতেই হলো। এবং বৈদ্যনাথ ধাম স্টেশনে নামবার একটু আগে তিনি সুপ্রীতিকে বললেন, দিদি, তোমাকে কিন্তু এবারে শক্ত হতে হবে। তুমি তো মাকে জানো...।

সুপ্রীতি বললেন, তুই তো দেখেছিস, আমি ভেঙে পড়ি নি। আমি মাকে দেখবো। খোকন, আমি ভাবছি, তুতুলের তো পরীক্ষা দেওয়া শেষ হলো না এবার, নতুন স্কুলে ভর্তি হতে হবে। তার আগে দু'এক মাস এখানে মায়ের কাছে থেকে গেলে কেমন হয়?

- তা থাকতে পারো।

- বিশ্বনাথের অসুবিধে হবে না? ওঁকে কি কিছু টাকা পয়সা দিলে ও নেবে?

- সে নিয়ে তুমি এখন চিন্তা করো না, দিদি।

- না রে, সেদিন বিমান বললো...টাকা পয়সার মূল্য আমিও বুঝি! দেখলাম তো, ঐ একটা জিনিসের জন্য মানুষে মানুষে সম্পর্ক কত খারাপ হয়ে যায়!

- তুমি ওস্তাদজীকে সে রকম ভেবো না। তুমি তো ওঁকে বেশি দেখো নি। আমি দেখেছি। উনি টাকা পয়সার কোনো চিন্তাই করেন না!

স্টেশনে নেমে তুতুলকে দেখে প্রতাপ অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। স্থান পরিবর্তনের একটা বিশেষ প্রভাব আছেই। এই কদিন তুতুল একেবারে গুম হয়ে থাকতো। এখানে এসেছিলুম, স্টেশনটা ঠিক সেই রকমই আছে!

প্রতাপরা কোন ট্রেনে আসছেন তা বিশ্বনাথকে জানানো হয়নি, তাই স্টেশনে কেউ নেই। প্রতাপ বাইরে এসে একটা টাঙ্গা নিলেন। সুপ্রীতি বসেছেন একদিকে, আর একদিকে প্রতাপের পাশে তুতুল। তুতুল কী যেন বলছে, প্রতাপ মন দিয়ে শুনছেন না। সুপ্রীতি মুখ নিচু করে আছেন। হঠাৎ সুপ্রীতি ডান হাতটা বাড়িয়ে প্রতাপের বুকের ওপর রাখলেন। অদ্ভুত ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, মার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি! কতদিন পর আমরা সব ভাই-বোন এক সঙ্গে...

প্রতাপের হৃদয় ঠিক একই সুরে বেজে উঠলো। দু'জনের একই রকম স্মৃতি। অনেকদিন পর পারিবারিক মিলন। শেষ এরকম মিলন ঘটেছিল চার বছর আগে, মালখানগরে, আগে যা প্রতি বছরই ঘটতো পুজোর সময়। আকাশে সাদা সাদা মেঘ, শিউলি ঝরা সকাল, বাতাসে হালকা হালকা ভাব, নতুন পোশাকের স্পর্শ, মাঠে পাকা আউস ধানের গন্ধ। শেষের কয়েকটা বছর অসিতদা ব্যবস্থা করে রাখতেন, তিনি দিদিদের আর ছেলেপুলে সমেত মমতাদের নিয়ে চলে যেতেন কিছু আগে, প্রতাপ পুজোর কেনাকাটি করে যেতেন পরে। পুজোটা একটা উপলক্ষ মাত্র, প্রতাপ বা অসিতদা বা ওস্তাদজী কেউই পুজোর ধার ধারতেন না, পুজো মণ্ডপের ধারেও ঘেঁষতেন না বিশেষ, বিজয়া দশমীর দিন শান্তিজল নিতে যেতেন মাত্র। কিন্তু এই কটা দিন ধরে চলতো অবিচ্ছিন্ন আমোদ-প্রমোদ আর হৈ-হল্লা। কত হাসি, কত গান। একবার কালী পুজোর সময় সিদ্ধি খেয়ে অসিতদার তো অজ্ঞান হয়ে যাবার মতন অবস্থা, কিন্তু তাই দেখে অন্য সকলে হেসে একেবারে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। বাবা ছিলেন রাশভারি মানুষ, তিনি যাতে কিছু জানতে না পারেন, সেদিকে সকলের নজর থাকতো, কিন্তু সেবারে বাবাও টের পেয়ে গেলেন। অত হাসির শব্দ শুনে খড়ম খটখটিয়ে এসে ভবদেব মজুমদার জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী ব্যাপার? কী ব্যাপার? কেউ কোনো উত্তর দেয় না, আবার সিদ্ধির ঝোঁকে হাসিও সামলাতে পারে না! মেজো বোন শান্তি বলছিল, বাবা দ্যাখো না, জামাইবাবু হি-হি-হি-হি। হাসি অনেক সময় সংক্রামক হয়, ভবদেব মজুমদার নিজেও এক সময় হাসতে শুরু কর দিয়েছিলেন।

র‍্যাডক্লিফ রোঁয়েদাদে সেই সব আনন্দের দিনের ওপর যবনিকা পড়ে গেছে!

আবার এতদিন বাদে ভিন্ন দেশে, ভিন্ন পরিবেশে পারিবেশে পারিবারিক মিলন। বাবা নেই, অসিতদা নেই, পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি জড়িত সেই বাড়ি, সেই পুকুর, আমবাগান কিছুই নেই। সেই ঢাকের আওয়াজ, সেই ধানের গন্ধ, সেই গ্রামীণ প্রতিবেশীদের পরিচিত মুখ, কিছুই নেই। আকাশ অবশ্য একই রকম।

সুহাসিনী ভবনের গেটের কাছে গাড়ি থামবার পর প্রতাপ তখনই ভেতরে গেলেন না। তিনি

মায়ের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন। প্রথম শোক-প্রবাহটা কেটে যাক, তারপর তিনি ভেতরে যাবেন, তিনি সেইজন্য বিশ্বনাথের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। টাঙ্গাটাকে ছাড়া হয়নি। কিন্তু সুহসিনী তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে না দেখে থাকতে পারবেন কেন? ভেতর থেকে সুহাসিনী প্রতাপের নাম ধরে জোরে জোরে ডাকছেন শুনে তিনি তাড়াতাড়ি আবার টাঙ্গায় চড়ে বসে বললেন, ওস্তাদজী, আপনি মা-কে গিয়ে বলুন, কয়েকটা জরুরি কেনাকাটি আছে, আমি বাজার থেকে ঘুরে আসছি।

সুহাসিনীর সঙ্গে প্রতাপের দেখা হলো দুপুরবেলা। তিনি তখন কান্নাকাটি বন্ধ করেছেন। বরং তিনি অস্বাভাবিক রকমের শান্ত। একখানা কম্বলের আসনে বসে আছেন তিনি, তাঁকে ঘিরে। রয়েছে বাড়ির আর সকলে।

প্রতাপকে দেখে তিনি খুব কাজের কথার ভঙ্গিতে বললেন, অ খুকন, বুড়ি তো শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, এখন ও থাকবে কোথায়? এখানে তো সকলে মিলে থাকা যাবে না, চলবেই বা কী করে? অ্যাঁ? তুই বল!

প্রতাপ বললেন, মা, তুমি ও নিয়ে চিন্তা করো না। দিদি কলকাতায় আমাদের সঙ্গে থাকবে, সে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

মমতা বললেন, হ্যাঁ, মা, দিদি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

সুহাসিনী বললেন, না, না, ওসব মোটেই কাজের কথা নয়। তোমরা কত দিক সামলাবা? কলকাতায় কী রকম খরচ আমি জানি না? খুকন, তুই ব্যবস্থা করে দে, আমরা দেশের বাড়িতে চলে যাই। সেখানে আমরা আমাগো জমির ধান পাবো, গাছে ফল পাকুড় আছে, পুকুরে মাছ আছে, খেজুর গাছ কতগুলান, সেই রস বিক্রি করা যায়, আমাগো ভালো ভাবে চলে যাবে।

প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মা আবার আগের যুগে ফিরে গেছেন। প্রতাপ মালখানগরের বাড়ি বিক্রি করেন নি বটে,কিন্তু সেখানে আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। ভবদেব মজুমদার বেঁচে থাকতে তবু কিছু লোক তাঁকে ভয় বা সমীহ করতো। তাঁর মৃত্যুর পর মালখানগরের ঐ বাড়িতে দু'দুবার ডাকাতি হয়েছিল। মুখে রুমাল বাঁধা ছেলেদের গলার আওয়াজ শুনে তখন চিনতেও পারা গিয়েছিল বেশ। জিনিসপত্র সব নিয়ে যাবার সময় তারা বলেছিল, পরের বার এলে জানে মেরে দেবে। থানায় খবর দিয়ে কোনো ফল হয়নি। থানার ওসে বিদ্রূপের সুরে বলেছিলেন, আপনাগো ইন্ডিয়ায় বুঝি ডাকাতি হয় না? তবে চলে যান না সেখানে! পাকিস্তান সরকার তখন হিন্দু বিতাড়নে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিচ্ছে। বিহার ও পাঞ্জাব থেকে আসা মুসলিম শরণার্থীদের জায়গা দিতে হবে তো। সুতরাং হিন্দুরা চলে যাক না পশ্চিম বাংলায়। মুসলিম লীগের প্ররোচনায় এক শ্রেণীর স্থানীয় মুসলমানও হিন্দুদের সম্পত্তি গ্রাস করার এই খেলায় বেশ মেতে উঠেছে।

প্রতাপ বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে অনুনয় করে বললেন, ওস্তাদজী, আপনি একটু মা-কে বুঝিয়ে বলুন।

বিশ্বনাথ বললেন, আমি তো অনেক বলেছি, উনি যদি শোনেন তো তোমার কথাই শুনবেন। তুমিই বলো।

প্রতাপ বললেন, মা, ওখান থেকে ওরা আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। ওখানে আর ফেরা যাবে না। তুমি মালখানগরের কথা ভুলে যাও!

॥ ১৫ ॥

ওমা, ঐ ছেলেটা মুসলমান বুঝি? আমি তো ভেবেছিলুম ও বাঙালী!

জীবনে এই কথাটা অনেকবারই অনেক জায়গায় শুনতে হয়েছে মামুনকে, কিন্তু বিনয়েন্দ্রর মা যখন আচমকা বলে উঠেছিলেন, তখন বাক্যটি শেলের মতন মামুনের বুকে বিঁধেছিল। আজও সেই ক্ষত পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি।

আজ সকালে মাদারিপুর টাউন থেকে তিনটি নবীন যুবক এসেছিল মামুনের সঙ্গে দেখা করতে। তরতাজা, উৎসাহে ভরপুর মুখ, স্বপ্নমাখা চোখ। ওদের নাম সামসুল হুদা মণি, আবু সাদেক বাচ্চু আর হাশমী মোস্তাফা কামাল। ওরা 'নদী মাতৃক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে, সেই পত্রিকার একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যার জন্য ওরা মামুনের সাক্ষাৎকার চাপতে চায়। তিন বছর আগে ভাষা আন্দোলন ও বিক্ষোভের সঙ্গে মামুন যে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন ঢাকায় সেই ভয়ঙ্কর, উত্তাল একুশে ফেব্রুয়ারির গুলি চালনার সময় তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী, এসব কী করে যেন ওরা জেনে ফেলেছে।

প্রায় ঘন্টা দু'এক ওদের সঙ্গে কাটালেন মামুন। নিজের জীবনের কথা বলার চেয়ে তিনি ওদের

জীবনের কথা জানতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। চমৎকার ছেলে তিনটি, মণি আর বাচ্চু সদ্য বি এ পাস করেছে, আর কামাল একটি স্কুলে শিক্ষকতা করে। ওদের চিন্তা খুব পরিচ্ছন্ন, এরাই তো নতুন দেশ গড়বে।

ওরা চলে যাবার পর হঠাৎই বিনয়েন্দ্রর মায়ের ঐ উক্তিটা মনে পড়লো। সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার ছাত্রজীবনের কথা।

বিনয়েন্দ্র সান্যালের সঙ্গে এক সময় বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল, ওদের বাড়িতে মামুন, প্রতাপ আরও অনেকে যেতেন আড্ডা দিতে। তিন তলার একটি ঘরে খুব ক্যারাম খেলা হতো। অনেক রকম খাবার-দাবার আসতো, বিনয়েন্দ্রদের বর্ধমানের দেশের বাড়ি থেকে আসতো নানা রকম ফল, বিনয়েন্দ্রর মা ছেলের বন্ধুদের পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। প্রতাপ মামুনরা মেসে-হোস্টেলে থাকতেন, এরকম একটা বাড়ি-বাড়ি পরিবেশের জন্য তাঁদের মধ্যে আকুলতা ছিল। মামুনের চেহারা, পোশাক, ভাষা এমনকি ডাক নামটা শুনেও বিনয়েন্দ্রর মা বুঝতে পারেন নি যে ঐ ছেলেটি মুসলমান। একদিন মামুন এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে গিয়ে বিনয়েন্দ্রকে বলেছিল, তোর মা-কে বল সবাইকে ভাগ করে দিতে, কাল আমাদের শবে-বরাত পরব ছিল...। তাই শুনেই বিনয়েন্দ্রর মা তাঁর দেবীপ্রতিমার মতন সুন্দর মুখখানিতে সুগভীর বিস্ময় ফুটিয়ে বলেছিলেন, ওমা, ঐ ছেলেটা মুসলমান নাকি, আমি তো ভেবেছিলুম ও বাঙালী।

কথাটা শোনা মাত্র বিনয়েন্দ্রর মায়ের মুখখানাকে মনে হয়েছিল কালিমাচ্ছন্ন, বীভৎস। চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে মামুন তিক্ততার সঙ্গে মনে মনে বলেছিলেন, মুসলমানরা বাঙালী নয়, তা হলে বাঙালী কে? মুসলমানরা তা হলে ভারতীয়ও নয়, তারা শুধু মুসলমান!

বিনয়েন্দ্রর বাবা সুরেশ্বর সান্যাল ছিলেন কংগ্রেসের একজন মাঝারিগোছের নেতা। তাঁর বাড়িতেও এই রকম মনোভাব। সুতরাং সেই সময়ে জিন্না-নাজিমুদ্দিনেরা যে তারস্বরে বলছিলেন, কয়েকটি মুশলিম লেজুড় থাকলেও, ভারতীয় কংগ্রেস হচ্ছে আসলে হিন্দুদের পার্টি, সে কথা মামুন পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন নি।

বিনয়েন্দ্রর মা অবশ্য মামুনের ধর্ম-পরিচয় জানবার পর তাঁর জন্য চায়ের কাপ আলাদা করে দেননি। ব্যবহারে কোনো বৈষম্যও ঘটাননি। সেরকম অভিজ্ঞতা মামুনের হয়েছে অন্যত্র।

একবার উত্তর কলকাতায় একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন শুনতে গিয়ে সারা রাত জাগার পর মামুন আর প্রতাপ গিয়েছিলেন একটা কচুরি-সন্দেশের দোকানে নাস্তা করতে। দোকানে ঢুকেই বাঁ দিকের টেবিলে বসে থাকা মালিককে মামুন হালকাভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি মুসলমান, আমায় এখানে খেতে দেবেন তো? মালিকের কপালে চন্দনের তিলক, মাথায় একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট টিকি, মুখখানা আজও মনে আছে মামুনের, সেই মালিক ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বলেছিল, হ্যাঁ, ঠোঙায় খাবার দিচ্ছি, তবে জলের গেলাসে হাত দিও না ভাই, ভাইরে দাঁড়াও, আমি তোমায় হাতে জল ঢেলে দেবো।

অত সকালে কাছাকাছি আর কোনো দোকান খোলে নি, খিদেও পেয়েছিল খুব। খাবারের ঠোঙা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে প্রতাপ আর মামুন রাস্তায় করপোরেশনের কলে জল খেয়েছিলেন। প্রতাপ জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুই নিজে থেকে ঐ কথা বলতে গেলি কেন? মামুন বলেছিলেন, আত্মপরিচয় গোপন করা কি সম্মানজনক?

আর একবার ঐ উত্তর কলকাতাতেই একটা খাবারের দোকানের সামনে ঝোলানো একটা বাঁধানো ফটো আর তার নিচে লেখা কিছু সগর্ব ঘোষণা দেখে মামুনের খটকা লেগেছিল। ফটোটি কিরানা ঘরানায় বিখ্যাত শিল্পী ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ-র। ছবির তলায় লেখা, "সঙ্গীত সম্রাট আবদুল করিম খাঁ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া আমাদের দোকানে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং আমাদের সকল প্রকার খাদ্য আস্বাদন করিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।" সেই লেখা দেখে মামুনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, ওরা কি খাঁ সাহেবকে পানির গেলাস দিয়েছিল, না দেয় নি?

মামুনের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া প্রতাপ পছন্দ করেন নি। সত্য এবং মিথ্যা সম্পর্কে প্রতাপের মনোভাব কঠোর। প্রতাপ ঘৃণার সঙ্গে নাক কুঁচকে বলেছিলেন, এঃ, রাজনীতির লোকগুলো যখন তখন মিথ্যে কথা বলে। আমার তো ওদের ধার-কাছ মাড়াতে ইচ্ছে করে না। মামুন স্বীকার করেছিলেন যে রাজনীতির লোকদের মাঝে মধ্যে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয় বটে, কিন্তু তা ঠিক মিথ্যে নয়, কূটনীতি।

উত্তরকালে লীগ মিনিস্ট্রির আমলে যখন বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছিল, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দুদের বঞ্চিত করে মুসলমানদের এক তরফাভাবে সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল তখন

একদিন তীব্র কথা কাটাকাটি হয়েছিল প্রতাপের সঙ্গে মামুনের। কলকাতার উপকণ্ঠে একটি সরকারি কলেজে অধ্যাপক নিয়োগের অদ্ভুত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তর্ক শুরু হয়েছিল। সেই অধ্যাপক পদে প্রার্থী ছিল এম এ তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া একজন হিন্দু যুবক, তাকে সেই চাকরি না দিয়ে দেওয়া হলো থার্ড ক্লাস পাওয়া একজন মুসলমানকে। তা নিয়ে কাগজে-কাগজে খুব হই-চই, কাউনসিলেও প্রশ্ন উঠেছিল। উত্তরে ঢাকার নবাব বংশের সন্তান খাজা নাজিমুদ্দিন বলেছিলেন, হ্যাঁ, জেনে শুনেই এটা করা হয়েছে। ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে একজন মুশ্লিমকেই ঐ পোস্ট দিতে হবে, ফার্স্ট ক্লাস বা সেকেন্ড ক্লাস পেলে তো ভালো কথা, নালে থার্ড ক্লাসও চলবে।

প্রতাপ মামুনকে বলেছিলেন, তুই এইসব নোংরামিকেও সমর্থন করবি? এই সবের সঙ্গে তোর নাম যুক্ত রাখতে চাস?

মামুন বলেছিলেন, দ্যাখ প্রতাপ, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে, চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুরা অনেক কাল ধরে, অনেক রকম সুযোগ-সুবিধে পেয়েছে, এটা তো স্বীকার করবি? মুসলমানরা এতদিন কী পেয়েছে, বল? হিন্দু-মুসলমান সব রকম যোগ্যতায় সমান সমান না হলে মিলে মিশে থাকতে পারবে না। তোরা এখন ধৈর্য ধরে মুসলমানদের খানিকটা এগিয়ে যেতে দে। এই রকম সময়ে দু'চারটে বাড়াবাড়ির ঘটনা তো ঘটবেই।

প্রতাপ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, আমি যে হিন্দু সে কথা আমার মনেই থাকে না, তোরাই এখন বারবার সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছিস!

তর্ক থামিয়ে প্রতাপের পিঠে চাপড় মেরে মামুন বলেছিলেন, তুই অত রেগে যাচ্ছিস কেন? দে, একটা সিগারেট দে!

প্রতাপের ওপরেও যে তখন সরকারিভাবে অবিচার করা হয়েছে, তা মামুন সে সময়ে ঘুণাক্ষরেও জানতেন না, জেনেছিলেন অনেক পরে। প্রতাপ তখন মুনসেফের চাকরি করছেন, প্রতাপের চেয়ে অনেক জুনিয়র একজন মুসলমান মুনসেফকে ভালো পোস্টিং দিয়ে প্রতাপকে ট্রান্সফার করা হয়েছে দূর মফস্বলে, জায়গাটা সবাই শাস্তির ট্রান্সফার হিসেবে গণ্য করে। প্রতাপ নিজের প্রসঙ্গ একবারও মামুনের কাছে উত্থাপন করেননি। মামুন তখন জানতে পারলে সরকারি উঁচু মহলে ধরাধরি করে নিশ্চয়ই প্রতাপের জন্য একটা ভালো পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। খোদ ফজলুল হকের সঙ্গেই মামুনের ভালো সম্পর্ক ছিল।

উনিশ শো সাঁইত্রিশ সালে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। এসেছিল নতুন আশা ও উদ্দীপনার জোয়ার। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে জেগে উঠলো একটা অধিকার বোধ। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হলো নির্বাচন।

নতুন ধাঁচে গড়া বাংলার বিধানসভায় মোট সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হলো ২৫০ জন। তার মধ্যে মুসলমান সদস্য থাকতে ১১৭, ইংরেজ বাসিন্দা ১১, ব্যবসায়ী ১৯ (এর মধ্যেও আবার পনেরো-ষোলোটিই ইংরেজ), অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ৩, ভারতীয় খৃষ্টান ২, জমিদার শ্রেণী ৫, শ্রমিক ৮, বিশ্ববিদ্যালয় ২, নারী প্রতিনিধি ৫, এবং সাধারণ ৮২। এই সাধারণের মধ্যে রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পারসী ও ইহুদী, আবার এই সাধারণের মধ্যেও ৩০টি আসন সংরক্ষিত রইলো সিডিউল্ড কাস্টদের জন্য। অর্থাৎ বাঙালী বর্ণহিন্দুদের অধিকার সীমাবদ্ধ রইলো মোটামুটি ৫২টি আসনের মধ্যে।

ইংরেজ পরিকল্পিত এই কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড যে বাংলার বর্ণ হিন্দুদের জব্দ করার জন্যই তৈরি হয়েছিল তা অত্যন্ত নগ্নভাবে স্পষ্ট। এমন ব্যবস্থা পাকা করা হলো যাতে ঐ হিন্দুরা কোনো ক্রমেই শাসন ক্ষমতায় আসতে না পারে। এই হিন্দুরাই প্রথম পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। তারপর রাজনীতিতে দীক্ষিত হয়েছে, এরাই তুলেছে স্বাধীনতার দাবি। এদের মধ্যে থেকেই এসেছে বিপ্লবীরা, বোমা-পিস্তলে সাহেবদের ঘায়েল করতে পিছু পা হয়নি। সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে এদেরই মুখ্য ভূমিকা। সাহিত্যে, সঙ্গীতে এরা অনবরত ছড়াচ্ছে স্বদেশী চেতনা, ওদের টিট করতে ইংরেজ সরকার বদ্ধ পরিকর।

এই কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধে পেয়ে মুসলমান সমাজ খুশী মনে চুপ করে গেল। শিক্ষিত, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরও ধারণা হলো যে অবহেলিত মুসলমান সমাজকে এগিয়ে আনার জন্য এখন এইরকম কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা পাওয়ার প্রয়োজন আছে। ক্রুদ্ধ হিন্দুরা তুললো বিক্ষোভের ঝড়। টাউন হলের সভায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসে এই অন্যায্য ভাগাভাগির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানালেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আমল থেকে শিক্ষিত হিন্দু

বাঙালীর ধারণা ছিল বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হবে না কখনো, হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ইংরেজের মুখোমুখি হবে।

কিন্তু হাওয়া এখন অনেক বদলে গেছে। মুসলিম লীগের হয়ে জিন্না সাহেব প্রায় একাই লড়ে যাচ্ছেন কংগ্রেসের সঙ্গে। তিনি তাঁর চৌদ্দ দফা দাবির মধ্যে জানালেন যে হিন্দুদের ওসব চ্যাঁচামেচি চলবে না, সাম্প্রদায়িক বরাদ্দ যে-রকম দেওয়া হয়েছে সেরকমই মেনে নিতে হবে, আর কোনো দরাদরির প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিধাগ্রস্ত কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতৃত্ব না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি নিয়ে নীরব।

হয়ে গেল সাঁইত্রিশ সালের নির্বাচন।

বাংলার মুসলমান কিন্তু তখনো পুরোপুরি লীগ-সমর্থক হয়নি। তারা তাদের বাঙালী-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চায়। মুশলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জনাব ফজলুল হক জিন্নার সঙ্গে মতবিরোধে তখন লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তিনি গড়েছেন কৃষক প্রজা দল, অসাধারণ তাঁর জনপ্রিয়তা। মুশলিম লীগের সঙ্গে নয়, কংগ্রেসের সঙ্গেই তিনি হাত মেলাতে উৎসাহী। অন্যান্য অনেক মুসলমানও তখন মুশলিম লীগের বাইরে নানা উপদলের সঙ্গে যুক্ত।

ভোটের ফলাফলে দেখা গেল, কংগ্রেস ৪৮টি সাধারণ আসনে প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে ৪৩টি, তপশিলি ও শ্রমিক আসন থেকে আরও কিছু পেয়ে মোট ৫৪টি আসন। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি পেয়েছে ৪৪টি আসন, মুশলিম লীগও প্রায় সমান সমান, অন্যান্য মুসলমানেরা এসেছেন নির্দল বা ছোট ছোট উপদলের সদস্য হয়ে।

কংগ্রেসের পক্ষে একা সরকার গড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোয়ালিশান গড়ার জন্য ফজলুল হক কংগ্রেসকে আহ্বান জানালেন। শরৎ বোসকে তিনি বললেন, লীগকে হঠিয়ে রাখার জন্য আসুন আমরা মিলে মিশে সরকার চালাই।

কিন্তু সর্বভারতীয় কংগ্রেস থেকে নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, যে-যে রাজ্যে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় নি, সেই সেই রাজ্যে কংগ্রেস অন্য কোনো দলের সঙ্গে আঁতাত করে শাসন-ক্ষমতা নেবে না। তার ফলে ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলিতেই শুধু কংগ্রেসী শাসন প্রবর্তিত হলো। বাংলা-পাঞ্জাব-আসাম-সিন্ধু প্রদেশ সম্পর্কে যেন কেন্দ্রীয় নেতাদের কোনো মাথাব্যথাই নেই। মুসলমানদের মধ্যে আবার এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে কংগ্রেস আসলে হিন্দু পার্টি।

একাধিক বৈঠকের পরেও ব্যর্থ হলো শরৎ বোস-ফজলুল হকের আলোচনা। আহত চিত্তে ফজলুল হককে শেষ পর্যন্ত মুখ ফেরাতে হলো মুশলিম লীগের দিকে।

পটুয়াখালির এক নির্বাচনী সভায় ফজলুল হক নাজিমুদ্দিনের মুখের ওপর বলেছিলেন, তিনি কোনোদিন মিরজাফর আর ক্লাইভের বংশধরদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না। কিন্তু এখন বাধ্যহয়েই বাড়ালেন, শুধু হাত নয়, মুণ্ডুটাও। ফজলুল হক আগে থেকেই অবশ্য একজন উমিচাঁদকে পুষে রেখেছিলেন। মুসলমানদের দুটি কৃষক প্রজা পার্টি এবং এবং মুশলিম লীগের গলা জড়াজড়ি করিয়ে দেবার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন একজন হিন্দু। এই যুগের এই উমিচাঁদ হলেন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী এবং রাজনীতির পাশা খেলোয়াড় নলিনীরঞ্জন সরকার।

মামুনের মনে আছে সেই রাত্রিটার কথা। সার্কুলার রোডে নলিনীরঞ্জন সরকারের "রঞ্জনী" নামে প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে সেদিন সন্ধে থেকেই সাংবাদিক ও উৎসুক জনতার কি ভিড়! মামুন ও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বাড়ির মধ্যে নলিনীবাবুর মধ্যস্থতায় লীগের নেতাদের সঙ্গে হক সাহেবের বৈঠক চলছে। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যায়, তখনও কী হয় কী হয় ভাব। সুযোগ বুঝে মুশলিম লীগ নিজেদের কোলে ঝোল টানবার জন্য প্যাঁচ কষছে।

একসময় দেখা গেল সহাস্য মুখে নেমে আসছেন লীগ পক্ষের খাজা নাজিমউদ্দীন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং গৃহস্বামীর সঙ্গে এক সাহেব। ঘোষণা করা হলো যে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে, কৃষক প্রজা দল ও মুশলিম লীগ মোর্চায়, ইওরোপিয়ানদের সমর্থনে গঠিত হচ্ছে নতুন সরকার।

কিন্তু বাংলার প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? সেই আসনটা কী মুশলিম লীগ নিয়ে নিল? সেটা জানার জন্যই তো মামুনরা অতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। আবার ঘোষণা করা হলো, এই সংযুক্ত মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন আবুল কাসেম ফজলুল হক।

উল্লাসের জয়ধ্বনি ও নাচানাচি শুরু হয়ে গেল বাইরে। মান্নান নামে একজন সহর্মী মামুনকে সামনে পেয়ে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, এইবার আমাদের দিন এসে গেছে! মুসলমানরা বাঙালী নয়? এইবার দ্যাখ শালার, কারা আসল বাঙালী! কারা বাংলা দেশটা চালাবে!

সেই দিন সেই মুহূর্তে মান্নানের ঐরকম উচ্ছ্বাসে মামুন কোনো দোষ খুঁজে পান নি, বরং তার ভালোই লেগেছিল! আনন্দের আতিশয্যে সারা রাত তাঁদের ঘুম হয় নি।

নতুন বিধানসভায় কংগ্রেসীরা হলো বিরোধী দল অর্থাৎ বামপন্থী, সে দলের সদস্যরা বসলেন স্পীকারের বাঁ দিকে। কংগ্রেসীরা অনেকেই রাজনীতিতে পুরোনো এবং পরিচিত মুখ। কিন্তু সভার চেহারা খুলে দিলেন নতুন মুসলমান সদস্যরা।

'নদীমাতৃক' পত্রিকার জন্য ছেলেদের কাছে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মামুন একটা কথা বলতে ভুলে গেছেন। এখন মনে পড়লো। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালী মুসলমানরা বাহান্ন সালেই প্রথম আন্দোলন করেন নি, আটচল্লিশ সালে জিন্না সাহেবের মিটিং-এর ঘটনাও প্রথম নয়, তারও অনেক আগে, সেই সাঁইত্রিশ সালেই বাঙালী মুসলমানরা এই দাবি তুলেছিলেন।

সেই অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় নব নির্বাচিত মুসলমান সদস্যরাই ছিল প্রথম খাঁটি বাঙালী। এর আগে রাজনীতিতে আসতেন শুধু বড় বড় জমিদার, উকিল-ব্যারিস্টার বা রায় বাহাদুর, খান বাহাদুররা। তাঁদের পোশাক হয় সাহেবী অথবা চোগা চাপকান। মুখের ভাষা সব সময়েই ইংরেজী। কিন্তু গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিরা বিধান পরিষদে নিয়ে এলেন বাংলা ভাষা। লুঙ্গির ওপর পাঞ্জাবি পরে আসতেও তাদের দ্বিধা নেই। পশ্চিম বাংলার দিকের মুসলমানরা তো ধুতিও পরেন নিয়মিত। তাঁরা তাঁদের বক্তব্য বাংলা ভাষায় পেশ করতে লাগলেন। তখন নিয়ম ছিল কোনো সদস্য বাংলায় বক্তৃতা করলে তা রেকর্ড করা হতো না, বক্তব্যের সারাংশ ইংরেজীতে তর্জমা করে দিতে হতো। তাই সই, তবু তাঁরা বাংলায় বলবেনই।

বাঙালী হিন্দু নেতারা ততদিনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ধরেছেন বটে কিন্তু বক্তৃতার সময় ইংরেজীর ফোয়ারা ছোটান। কে কী বললেন, সেটা যেন বড় কথা নয়, কে কত জোরালো ইংরেজীর তুবড়ি ছোটাতে পারেন সেটাই যেন গর্বের বিষয়। হিন্দু নেতাদের মধ্যে এরকম একটা হীনমন্যতা ছিল যে সর্বসমক্ষে বাংলা বললে লোকে যদি ভাবে যে লোকটা ইংরেজী জানে না! শিক্ষিত মুসলমানদের ও বালাই নেই, যাঁরা ইংরেজীতে ভালো বলতে পারেন, যেমন খুলনার সদস্য জালালুদ্দিন হাসেমী ইংরেজী-বাংলা দু'ভাষাতেই সমান ভালো বক্তা, তাঁরাও ইংরেজী ছেড়ে প্রায়ই শুরু করতেন বাংলায়। স্বয়ং ফজলুল হক ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকের চেয়েই উঁচুতে, তিনি মাঝে মাঝেই ইংরেজীর বদলে শুধু বাংলা নয়, একেবারে কাঁটি বরিশালী বাঙাল ভাষায় কথা বলতেও দ্বিধা করতেন না।

মাতৃভাষার সঙ্গে আত্মসম্মানের যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক সে কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার জানাবার চেষ্টা করলেও অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীই বোঝে নি। কিন্তু বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি সুরক্ষার টান তখন থেকেই জেগে উঠেছে।

আটচল্লিশ সালে ঢাকায় জিন্না সাহেবের সেই উর্দু চাপানো বক্তৃতার অনেক আগের একটা ঘটনা মামুনের মনে পড়ে। এটা বোধহয় এখানকার ছেলেমেয়েরা অনেকেই জানে না। সেবারে বহরমপুরে মুশলিম কাউনসিলের প্রাদেশিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করতে এসেছিলেন জিন্না। গ্রাম বাংলা থেকে হাজার হাজার মুসলমান এসেছে কায়েদ-ই আজম জিন্না সাহেবকে দেখবার জন্য। পোশাক-পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দায় খাঁটি সাহেব তিনি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কঠোর ভাবলেশহীন মুখ। সভাপতি হিসেবে তিনি সভার অনুষ্ঠানসূচী হাতে তুলে নিলেন। প্রথমেই রয়েছে উদ্বোধনী সঙ্গীত, গাইবেন আব্বাসউদ্দীন। জিন্না নির্দেশ দিলেন নো মিউজিক!

বিস্ময়ের ঘোর কাটাবার জন্য কয়েক মুহূর্ত সবাই স্তব্ধ হয়ে ছিল। তারপরেই শুরু হলো হই হট্টগোল। আব্বাসউদ্দীনের গান হবে না। এ আবার কী রকম কথা? তা হলে সভা চলতেই দেওয়া হবে না। জিন্না বুঝতেই পারেন নি যে আব্বাসউদ্দীন নামে কে একটা লোক বাংলার মানুষের কাছে এতখানি জনপ্রিয়। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি রাজি হলেন। সভা শুরু হবার আগে আব্বাসউদ্দীন শোনালেন পর পর তিনখানা গান।

বাংলা মুশলিম লীগের দুই প্রধান নেতা নাজিম উদ্দীন এবং সোহরাওয়ার্দী অবশ্য ভালো করে বাংলায় কথাই বলতে পারেন না। সাহেবসুবো এবং অবাঙালী ব্যবসায়ী শ্রেণীদের সঙ্গেই তাঁদের দহরম মহরম। সাহেবরাই তখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুশলিম লীগকে খেলাচ্ছে। বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখে পাঞ্জাব ও সিন্ধু থেকে বড় বড় মুসলিম ব্যবসায়ীরা এসে ঘাঁটি গাড়ছে কলকাতায়, তাদের ব্যবসা ছাড়িয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশে। জিন্না সাহেবও কলকাতায় এসে ইস্পাহানি, আদমজী হাজি দাউদ প্রমুখ অবাঙালী মুশলিম ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই ওঠা-বসা করতেন। শক্তিশালী

অবাঙালী মুসলমান গোষ্ঠি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরিকল্পনা তখন থেকেই আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে।

মামুন সেই সময় ইচ্ছে করলেই নির্বাচনে দাঁড়াবার টিকিট পেতেন, ফজলুল হকের খুব প্রিয় ছিলেন তিনি, কিন্তু কখনো তাঁর ক্ষমতা রাজনীতিতে প্রবশ_করার ইচ্ছে হয় নি। ফজলুল হকও তাঁকে অন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

ঝাউতলার বাড়িতে বসে একদিন স্মৃতি রোমান্থন করতে করতে ফজলুল হক সাহেব মামুনকে বলেছিলেন, জানোস তো, এন্ট্রাস পরীক্ষায় আমি জেলার মধ্যে ফার্স্ট হইছিলাম? কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েতে এসে দেখি একটাও মুসলমান সহপাঠী নাই, সব হিন্দু। গ্রামের ইস্কুলে মুসলমান ছিল কয়টা? আমাগো বাড়ি বরিশালের চাখার গ্রামে, সেখানকার কোনো ছেলে তখন ইস্কুলে যায় না। অথচ উল্টা দিকের গ্রাম বলসেখোলা, সেখানে সবাই হিন্দু, সব বাড়ির পোরাপানেরা ইস্কুলে যায়। এরকম আর কতদিন চলবে? বুঝলি মামুন, মুসলমানের মধ্যে তুই একদিন স্যার সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল বা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতন মানুষও হয়তো খুঁজে পাবি, কিন্তু আমাদের মধ্যে সবচয়ে বেশি দরকার একজন বিদ্যাসাগর। যিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে ইস্কুল খুলাবেন, ছেলেমেয়েদের ডেকে ডেকে আনবেন। বিদ্যাসাগরের আমলে মুসলমান সমাজ কিছু সাড়া দেয় নাই, কিন্তু সেই ভুল সংশোধন করতে হবো তো! এখন বিদ্যাসাগরের মতন অত বড় মানুষ হয়তো চট করে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তোদের মতন শিক্ষিত ছেলেরা, তোরা গ্রামে যা, গ্রামে যা!

॥ ১৬ ॥

বন্যা হবার দরকার হয় না, এমনিই প্রতি বছর এদিককার মাঠ-ঘাট জলে-জলাকার হয়ে যায়। বাড়ির উঠোনেও এক কোমর জল। রান্না ঘরে যেতে হয় জল ভেঙে। এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যেতে হয় নৌকোয়, ধান খেতের উপর দিয়েও নৌকো চলে।

মামুন একাই একটা ডিঙ্গি নৌকো নিয়ে চলেছেন পাশের গ্রামে। ছেলেবেলায় বেশ ভালোই পারতেন, তারপর অনেকদিন তাঁর নৌকো যাওয়ার অভ্যেস নেই অবশ্য, অনেকদিন পর নৌকো চালাতে মামুন বেশ কৌতুক বোধ করছেন।

আদিগন্ত জল-দৃশ্য দেখে মনে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি আসে। জল মামুনের প্রিয়। ধানগাছগুলো জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লম্বা হয়ে উঠেছে, এই সব অঞ্চলে পাট গাছও খুব লম্বা হয়। জলের ওপর জেগে থাকা ধান গাছের ডগায় লাফালাফি করছে মসৃণ সবুজ রঙের কয়া (ঘাস-ফড়িং), ছোটবেলায় মামুনের এই কয়া ধরার খুব শখ ছিল। এক একটা কয়া বেশ বড় হয়। প্রায় এক আঙুলের সমান, অদ্ভুত বিস্ময়ভরা তাদের চোখ। এই কয়াগুলো শালিকের প্রিয় খাদ্য, তাই কিছু শালিকও ওড়াউড়ি করছে।

ধান খেতের জল বেশস্বচ্ছ, নিচের দিকে তাকালে মাঝে মাঝেই পুঁটি মাছের রূপোলি ঝিলিক চোখে পড়ে। একবার চোখে পড়লো এক ঝাঁক চাপিলা মাছ। এই সময় পুকুরগুলো ভেস যায় বলে ধান ক্ষেতের জলেও কই মাছ, শোল মাছ দেখতে পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। মেঘের ডাক শুনলে কই মাছ ডাঙায় উঠে আসে, কানকো দিয়ে হাঁটে। অন্য সব মাছেদের মধ্যে শুধু কই মাছেরই যে কোন এই স্বভাব তা কে জানে। পরশু দিনও তো মামুনের মেয়েরা বৃষ্টির মধ্যে তিনটে কই মাছ কুড়িয়ে এনেছে পুকুর ধারের বাগান থেকে।

উল্টো দিক থেকে একটা নৌকো আসছে, তাতে দু'জন যুবক বসে আছে। মামুন ঠিক চিনতে পারলেন না, চশমা না পারলে তিনি দূরের জিনিস ভালো দেখতে পান না। সেই নৌকো থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো, মামুনভাই চল্লেন কোথায়?

মামুন উত্তর দিলেন, যাবো মহেশপুর। সিদ্দিকী সাহেবের জানাজায়।

কাছে আসতে মামুন চিনতে পারলেন। ছেলে দুটির নাম বাদল আর ফিরোজ। এই গ্রামেরই ছেলে, দুরন্তপনার জন্য ওদের নাম আছে। জাল নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছে। মামুনকে খালুই তুলে দেখালো, কুচো মাছ পেয়েছে অনেক, দুই-তিন সের তো হবেই।

বাদল বললো, ফিরতে ফিরতে আপনের সন্ধ্যা হয়ে যাবে যে। আকাশের অবস্থা দ্যাখছেন? পানি আরও বাড়বে।

মামুন আকাশের দিকে তাকালেন। ঈষাণ কোণ থেকে কালো মেঘ জমাট বেঁধে এগিয়ে আসছে। মামুন ছাতা আনেননি, জানাজায় উপস্থিত থাকবেন বলে পরিষ্কার পা-জামা ও ভালো পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। তবু তাঁরা কোনো আশঙ্কা হলো না। আসুক না বৃষ্টি, তাতে কী হবে।

ফিরোজ বললো, মামুন ভাই, মাছ নেবেন? আমাগো তো এতখানি লাগবো না। ন্যান, নৌকাটা লাগান একটু।

মামুন বললো, আরে না, না, আমি এখন মাছ-মোছ নিয়ে কী করবো? তোমরা ধরছো, তোমরা খাও?

ফিরোজ তবু জোর করেই মামুনের নৌকোর খোলের মধ্যে কিছু মাছ দিয়ে দিল। ছোট ছোট ইচা মাছগুলো (চিংড়া) এখনো জ্যান্ত, ছটছট করে লাফাচ্ছে।

বাদলের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, মামুনকে দেখেও ফেলে দেয়নি। মামুন অবশ্য তাতে কিছু মনে করেন না। আঠারো বছর বয়েস হবার পর ছেলেরা বয়স্কদের সঙ্গে সমান সমান ব্যবহার করবে এটাই তো স্বাভাবিক। তবু তাঁর একটু চোখে লাগে। কিছুদিন আগেও এটা ছিল না। তাঁদের ছোটবেলায় তো গ্রামের গুরুজনদের সামনে এরকম ব্যবহার কল্পনাই করা যেত না।

বাদল জিজ্ঞেস করলো, মামুনভাই, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে আপনার তো খুব দোস্তি, যদি একটা কাজের কথা কইয়া দ্যান আমাগো জইন্য।

মামুন অবাক ভাবে ভুরু কোঁচকালেন। এখানকার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান কে? তিনি মাত্র কয়েক মাস হলো এসেছেন ফরিদপুরে, তিনি ওসব খোঁজও রাখেন না।

মামুন সে প্রশ্ন করতেই বাদল জানালো যে কয়েকদিন আগেই মাদারিপুরে লঞ্চ ঘাটার সামেন তারা নুরুল হুদা সাহেবের সঙ্গে মামুনভাইকে গল্প করতে দেখেছে। উনিই তো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান।

নুরুল হুদার সঙ্গে মামুনের ছাত্র বয়েসে কিছুটা আলাপ ছিল, দীর্ঘদিন পরে আবার দেখা। নুরুল হুদাই মামুনাক ডেকে কথা বলেছিলেন। তিনি যে এখন উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি তা মামুন বোঝেননি। অবশ্য নুরুল হুদার কথাবার্তার মধ্যে একটা ভারিক্কী চাল তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

মামুন বাদলকে জিজ্ঞেস করলেন, নুরুল হুদা সাহেবকে কী বলতে হবে?

বাদল বললো, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড লোক নেবে। যদি আমাদের চাকরির জন্য একটু বলে দ্যান। আমরা দু'জনেই তো মেট্রিক পাস করে তিন বছর বসে আছি, কোনো কাজ পাই না।

ফিরোজ বললো, মামনুভাই, শহরের ছেলেরা সব চাকরি নিয়ে নেয়, গ্রামের ছেলেদের কেউ চাকরি দেয় না। আমাদের কথা কি কেউ ভাববে না?

মামুনের হঠাৎ একটা নতুন উপলব্ধি হলো। এই দিকটা তিনি আগে চিন্তাই করেননি।

ওদের দু'চারটি মামুলি স্তোক কথা শুনিয়ে তিনি আবার জলে বৈঠা ফেললেন।

এই জন্যই সেধে সেধে মাছ দেওয়া, চাকরির আমেদারি? ম্যাট্রিক পাস করে তিন বছর বসে আছে, গ্রামের মধ্যে দুরন্তপাত্ত ও বৌ-ঝিদের জ্বালানো একঘেয়ে লাগছে, ওরা এখন কাজ চায়।

ফজলুল হকের নির্দেশে মামুন গ্রামে গ্রামে ইস্কুল খুলতে গিয়েছিলেন। এমনিতেও ইস্কুল খোলা হয়েছে অনেক। হিন্দুরা চলে যাবার পর মুসলমান ছাত্রই বেশি। সাধরণত মুসলমান পরিবারও শিক্ষার বেশ চল হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে সেই শিক্ষার পরিণতি। গ্রামে গ্রামেও তৈরি হচ্ছে বেকারের দল।

এই যে ফিরোজ আর বাদল, ওদের খাওয়া-পরার যে তেমন কষ্ট আছে, তা বোধ হয় নয়। পরিবারের কিছু জমিজমা আছে, তা থেকে সম্বৎসরের খোরাকি ধানটা আসে, বাড়িতে হাঁস-মুগী পালে, দরকার হলে নিজেরাই খাল বিল থেকে মাছ ধরে আনে, তাতে চলে যায়। ওরা চাকরি চাইছে সমাজে একটা প্রতিষ্ঠার জন্য। চাকরিই যদি না পাবে তা হলে লেখাপড়া শিখলো কেন? এরকম ক্ষোভ ওদের মনে জাগতেই পারে। এ দেশে লেখাপড়া শেখে তো সবাই চাকরির জন্য। কেউ কি কখনো বলেছে যে, যে মানুষ মাঠে ধান চাষ করবে, যে মানুষ নদীতে মাছ ধরবে, যে মানুষ খেজুরের রস জাল দিয়ে পাটালি গুড় বানাবে, তারও যে লেখা পড়া শেখার প্রয়োজন আছে, নিজের গণ্ডিটা ছাড়িয়ে গোটা দেশকে জানার প্রয়োজন যে তারও আছে, সে কথা তো কেউ বলে না! বরং চাষীর ছেলে, তাঁতীর ছেলে লেখা পড়া শিখলে আর বাপ-পিতেমো'র পেশা নিতে চাইবে না, তারা শহরে এসে বাঁধা মাইনের চাকরির জন্য গুঁতোগুঁতি করবে।

চাকরি পাবেই বা তারা কী করে? সাহেবরা চলে গেছে, হিন্দুরাও অনেকে চলে গেছে, কিন্তু সেই সব চাকরি বা তারা কী করে? বড় বড় কাজ সবই তো নিয়ে নিচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা। কিছুদনি আগে মামুন একটি পত্রিকায় পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনামূলক আলোচনা পড়েছিলেন। সে এক হাস্যকর ব্যাপার। হিসেবটা উনিশ শো একান্ন সালের। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে

৪২ জনই পশ্চিম পাকিস্তানী, পূর্ব বাংলার একজনও নেই, জয়েন্ট সেক্রেটারি ওদের ২২ জন, পূর্ব বাংলার মাত্র ৮ জন, সেকশান অফিসার ওদের ৩২৫, এখানকার মাত্র জন। নির্লজ্জতার চূড়ান্ত! সেনাবাহিনীতে বাঙালী প্রায় নেই-ই বলতে গেলে।

আজকের এই মেঘ-মেদুর অপরাহ্নে মামুনের আর ঐ সব কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

জলের ওপর নৌকো চলার সর সর শব্দ হচ্ছে। শব্দটি বড় মধুর লাগে। এখানে ওখানে শাপলা ফুল ফুটেছে। হলদে-কালো ডোরা কাটা একটা বড় জল ঢোঁড়া সাপ হঠাৎ ডান দিকে বেসে উঠলো। মামুন ইচ্ছে করলে সেটার মাথায় বৈঠার ঘা বসাতে পারতেন, কিন্তু মামুন মারলেন না। বিষ নেই, মানুষের ক্ষতি করে না, মেরে কী হবে! লম্বা শীতঘুম দেওয়ার আগে ওরা সময়টায় পেট ভরে খেয়ে নেয়। মাছ, সাপ, শামুক, সব মিলিয়ে একটা জল-জগৎ। এখন দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না যে শীতকালে এই জায়গাটা শুকনো মাঠ হয়ে যাবে, এখানে ছেলেপুলেরা খেলা করে।

ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে, বৃষ্টি নামার আর দেরি নেই। মেঘ ডাকছে, তবে বজ্র গর্জনে নয়, গুরু গুরু রবে, যেন মেঘেরা নিজেদের মধ্য কথা বলাবলি করছে।

মহেশপুরের গাছপালা যেন কুয়াশার মধ্যে জেগে উঠলো। বড় বড় কয়েকটি তাল গাছ দেখে গ্রামটি চেনা যায় দূর থেকে।

ঘাটে এসে ডিঙি বেঁধে মামুন ভালো করে পা ধুয়ে নিলেন। এখানে বর্ষাকালে জুতো পরার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মহেশপুর জায়গায় একটু উঁচু, এখানে বাড়ির মধ্যে পানি যায় না।

বাবুল সিদ্দিকীর মৃত্যুটা তেমন দুঃখজনক নয়, তার জীবনটাই ছিল অভিশপ্ত। গত কয়েক বছর বাবুল সিদ্দিকী খুবই কষ্ট পাচ্ছিল, তার দুটি পায়েই গ্যাংগ্রিন ধরে গিয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত মৃত্যুই সব দিক থেকে শান্তির ব্যাপার। বাবুল সিদ্দিকীর সঙ্গে মামুনের কোনো হৃদ্যতা ছিল না, তার পারলৌকিক কাজে মামুন যোগ দিতে এসেছেন দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার খাতিরে।

বাবুল সিদ্দিকী অল্প বয়েসে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ইস্কুলের বদলে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল মাদ্রাসায়, সেই পড়াশুনো তার সহ্য হয়নি। বিনা টিকেটে স্টিমারে চেপে সে পৌঁছোয় খুলনায়। তার শরীরে তাগৎ ছিল, নিঃসম্বল অবস্থাতেও সে ভিক্ষে করার পাত্র নয়। খুলনায় একটা মুদি দোকানে সে একটা চাকরি জুটিয়ে ছিল, ক্রমে সেখানেই সে বিয়ে শাদী করে সংসার পাতে এবং বছর পাঁচেকের মধ্যে নিজেই সে দোকানটির মালিক হয়ে যায়। একবার হাঁটা পথে খুলনা থেকে বাগেরহাট যাওয়ার সময় সে সস্ত্রীক ডাকাতের পাল্লায় পড়ে। তার স্ত্রীর আর সন্ধানই পাওয়া যায়নি, বাবুলও ডাকাতদের হাতে এমন প্রহৃত হয় যে তার বাঁ চক্ষুটি নষ্ট হয়ে যায়। খুলনায় তার পরিচিতরা তার প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিল বটে, সেই সঙ্গে তার নতুন নাম দিয়েছিল কানা বাবুল।

খুলনা থেকে বাবুল ভাগ্যান্বেষণে চলে গিয়েছিল কলকাতায়। সেখানে এন্টালি বাজারে সে একটা মুর্গীর দোকান খুলেছিল। কলকাতায় বাবুলের বেশ সমৃদ্ধি ঘটেছিল। বেলেঘাটায় সে একটি কাঠের বাড়ি বানায় এবং সেই সময়েই সে অনেককাল বাদে মাদারিপুরে দেশের বাড়িতে ফিরে অনেক খরচ পত্তর করে কলকাত্তাই আমীরী দেখিয়ে যায়। পার্টিশানের পরেও বাবুল কলকাতা ছাড়েনি, তার দোকান খোলার কথা ভাবছে। এন্টালি-মৌলালি-রাজাবাজরে তো তার মতন অনেকই রয়ে গেছে। কলকাতায় দ্বিতীয়বার শাদী করেছিল বাবুল।

কিন্তু পঞ্চাশের দাঙ্গায় সে সর্বস্বান্ত হলো। তার বেলেঘাটার বাড়ি ও এন্টালির দোকান দুই-ই গেল। বাড়িটোতে যখন আগুন জ্বলছে, তখন কিছু জিনিপত্র বাঁচাতে গিয়ে বাবুল কাঠের সিঁড়ি ভেঙে পড়ে যায়। তার দুটি পা-ই সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধ হয়।

ইসলামিয়া হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসার পর বাবুল সিদ্দিকী সপরিবারে কলকাতা ছেড়ে চলে আসে পূর্ব পাকিস্তানে। আসার পথে স্টিমারে বাবুলের তিনটি সন্তানের মধ্যে একটির মৃত্যু হয় কলেরায়। মাদারিপুরের যে বাড়ি ছেড়ে বাবুল একদিন পালিয়ে গিয়েছিল সেখানে বাধ্য হয়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় সে ফিরে এলো তিক্ততার প্রতিমূর্তি হয়ে। অনেক চিকিৎসাতেও তার পা দুটি সারে নি, পচন ধরে গেছে, ক্রাচে ভর দিয়ে কোনো মতে যাতায়াত করতো।

দুভার্গ্যের মতন বাবুলের চেহারাটাও ভয়াবহ হয়ে গিয়েছিল। একটা চোখ নেই, মুখে অযত্ন-বর্ধিত দাড়ি, বুকের খাঁচা প্রকট হয়ে উঠেছে, পা দুটিতে দুর্গন্ধ ক্ষত। সবাইকে সে বলতো, কলকাতার মানুষ তার এই অবস্থা করেছে। হিন্দুরা সবাই দুশমন। চোখের সামনে সে যেন সর্বক্ষণ দেখতে পায় হিন্দু গুণ্ডারা তারা দোকান লুট পাট করছে। তার বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, তার স্ত্রী-সন্তানদের খুন করতে

আসছে।

বাবুল সিদ্দিকী প্রতিশোধ হিসেবে চাইতো পূর্ব বাংলা থেকে সমস্ত হিন্দুদের বিতাড়িত করতে। সে হিন্দু বলতো না, বলতো মালাউন। সে চিৎকার করে বলতো, মালাউনগো খেদাও। সব কটার ঘেটি ধেরে পানিতে চুবাও!

মাদারিপুর অঞ্চলে এখনো বেশ কিছু হিন্দু রয়ে গেছে! বাবুল সিদ্দিকীর এরকম অনলবর্ষী ঘৃণার ফল সাঙ্ঘাতিক হতে পারে। মামুন প্রতিবাদ করতে গিয়েও সুবিধে করতে পারেননি। বাবুলের ভাষা অতি তীব্র, তার সমর্থকও জুটে গিয়েছিল বেশ। হিন্দুস্থানের হিন্দুদের দুশমনির জলজ্যান্ত উদাহরণ রয়েছে তাদের চোখের সামনে, সেই জন্য অনেকেরই আবেগ তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই আবেগের সামনে মামুনের শান্ত কণ্ঠে যুক্তি ফুৎকারে উড়ে যায়।

কলকাতার এন্টালি বাজারে বাবুল সিদ্দিকীর মুর্গীর দোকানে মামুন একবারই গিয়েছিলেন। তখন বাবুল একজন পরিতৃপ্ত সংসারী মানুষ, বেশ তেল-চুকচুকে চেহারা, বেলেঘাটার বাড়িটা তখন সবে তৈরি হচ্ছে। মামুনকে এক জোড়া বেশ ডাগর চেহারার মুর্গী বেছে দিয়ে কিছুতেই দাম নেয়নি বাবুল। সেই মানুষটার অমন পরিণতি, তাকে কোনো সান্ত্বনা কি দেওয়া যায়?

দাঙ্গায় অনেক মুসলমান পরিবার ধ্বংস হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে। পার্টিশানের পর ওপার থেকে চলে এসেছে দলে দলে মুসলমান, কেউ কেউ জমি বিক্রি করতে পেরেছে, কেউ বিনিময় করেছে হিন্দুদের সঙ্গে, আবার অনেক সে রকম সুযোগই পায়নি, সব কিছু ছেড়ে তড়িঘড়ি চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। যার যার দুঃখটা তারই সবচেয়ে বেশি। এই সহসা বিপর্যয়ের জন্য তারা তো হিন্দুদের দায়ী করবেই। কেউ তাদের আসল কারণটা বোঝাতে সাহস করে না।

মামুন নিজে কলকাতা ছেড়ে চলে আসনে ছেচল্লিশ সালের গোড়ার দিকে। তাই ডাইরেক্ট অ্যাকশানের ফলাফল হিসেবে কলকাতার পথে পথে রক্ত গঙ্গা আর মৃত মানুষের স্তূপ তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে হয়নি। কিন্তু পঞ্চাশের দাঙ্গার সময় তিনি ছিলেন বরিশালের গ্রামাঞ্চলে। দাঙ্গার ভয়ংকর রূপ সেবারে তিনি খানিকটা দেখেছিলেন। গ্রাম থেকে তিনি নিজেও ভয় পেয়ে চলে আসেন শহরে। বরিশালের সেই দাঙ্গায় হিন্দুরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছিল। একটা স্টিমারের দৃশ্য মামুনের চোখের সামনে এখনো জ্বলজ্বল করে। এক স্টিমার ভর্তি হিন্দু নারী পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইণ্ডিয়ায়। তারা সকলে হাত-পা ছুঁড়ে আকুলি-বিকুলি হয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই মা কিংবা বাবা, ভাই বা বোনকে কিংবা সবাইকেই হারিয়েছে দাঙ্গায়, তারা চিরকালের মতন ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে তাদের ভিটে মাটি, তাদের পিতৃপুরুষের দেশ। কার দোষে? তাদের নিজেদের কোনো দোষ ছিল?

বুক-ভাঙা কান্না-ভর্তি একটা জাহাজ ছেড়ে চলে গেল বন্দর।

আর একবার মামুন বরিশাল থেকে স্টিমারে ঢাকা আসছিলেন। ডেকে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন পাশের লোকদের কথাবার্তা। দু'জন মোল্লা বেশ উচ্চকণ্ঠে মালাউনদের মুণ্ডপাত করছিল। এক সময় নদীর মাঝখানে দ্বীপের মতন একটা গ্রামের দিকে আঙুল দেখিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল, ঐ যে ঐ গ্রামটা, ঐ গ্রামে আর মাত্র তিন তিন ঘর হিন্দু আছে। তারা চলে গেলেই আপদের শান্ত!

স্টিমার থেকেও দেখা যাচ্ছিল সেই গ্রামের মাঝখানে একটি মন্দিরের উঁচু চূড়া।

সেদিন মামুন বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভেবেছিলেন, এই জন্যই কি পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল? বাংলার মানচিত্রের মাঝখানে সীমা রেখা টেনে দিলেও বাঙালী জাতটাকে দু'ভাগ করে দেবার উদ্দেশ্য ছিল কী? এবং এই দু'ভাগ হয়ে গেল পরস্পরের শত্রু!

হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার ছিল, অনেক রকম সামাজিক বৈষম্য ছিল ঠিকই। আবার অনেক রকম মিলও তো ছিল। দীর্ঘকাল হিন্দু মুসলমান পাশিপাশি থেকেছে, কোনো বিবাদ হয়নি, এমন দৃষ্টান্তও তো অনেক। মুসলমানের ছেলে হিন্দুর বাড়িতে সারাদিন কাটাচ্ছে। হিন্দুর ছেলে মুসলমান রমণীকে মা বলে ডাকছে, এরকম তো মামুন নিজেই দেখেছেন!

পাকিস্তানের জন্য যেন একটা স্বপ্ন হঠাৎ বাস্তব হয়ে ওঠার মতন অবিশ্বাস্য। উনিশ শো চল্লিশ সালের লাহোর ঘোষণার সময় কেউ কি সত্যি সত্যি কল্পনাও করেছিল যে মাত্র সাত বছরের মধ্যে ভারতকে কেটে মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা দেশ পাওয়া যাবে? সেই সাত বছরের মধ্যে অসম্ভব দ্রুততায় ঘটে গেল সব আকস্মিক ঘটনা। সেই জন্যই পাকিস্তানের সঠিক রূপটি কী হবে তা চিন্তা করার সময় ও পাওয়া যায়নি। যে পাকিস্তান পাওয়া গেল তা কি সমস্ত মুসলমানদের পছন্দ হয়েছে?

এমনকি জিন্না সাহেবেরও পছন্দ হয়নি, তিনি প্রবল আক্ষেপ ও বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলেন, এই পোকায়-কাটা পাকিস্তান নিয়ে আমি কী করবো? জিন্না কি পাকিস্তানকে পুরোপুরি ঐশ্লামিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন? আবার ইণ্ডিয়াতে রয়ে গেল যে কোটি মুসলমান, যারা পাকিস্তান দাবির জন্য কণ্ঠ মিলিয়েছিল, তারা মনে করেনি যে তাদের মুসলমান ভাইরাই তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! তাদের তো সেই হিন্দুদের তাঁবেই থাকতে হবে।

পাকিস্তানের জন্য বাঙালী মুসলমানদের দাবিই ছিল সবচেয়ে জোরালো। পাকিস্তানের সমর্থনে বাংলার মুসলমানরা দিয়েছিল শতকরা ছিয়ানব্বইটি ভোট, পাঞ্জাবীরা দিয়েছিল মাত্র ঊনপঞ্চাশটি। কিন্তু সেটা কোন্ পাকিস্তান? বাংলা বিভাগের মতন প্রস্তাব মামুনের মতন বুদ্ধিজীবী পাকিস্তান সমর্থকরা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি আগে। ছেচল্লিশ সালে যখন বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ড করার কথা প্রথম শোনা গেল তখন মামুনের মতন অনেকেরই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। কলকাতার মতন সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থানের ওপর বাঙালী মুসলমানদের অধিকার থাকবে না? বর্ধমানের শস্য ভাণ্ডার, বীরভূমে রবীন্দ্রনাথের শান্তি, নিকেতন, চব্বিশ পরগনার ফুরফুরা শরীফ, মুর্শিদাবাদের নবাবী ঐতিহ্য, এই সব কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হবে? অখণ্ড বাংলাদেশকে বজায় রাখার জন্য তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেননি?

যাই হোক, তাড়াহুড়ো কর তো পাকিস্তানের পত্তন হয়ে গেল। পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এই পাঁচটি অঞ্চল নিয়ে গড়া হলো যে পাকিস্তান, তাতে বাঙালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, বাংলা ভাষাই গরিষ্ঠ সংখ্যকের ভাষা। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ায় সর্বোচ্চ দাবিদার। কিংবা পাঁচটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হতে পারে। কিন্তু বিনা বিতর্কে রাজধানী হলো করাচি, পাকিস্তানের বড় কর্তারা সবাই প্রায় উর্দুভাষী এবং কোনোরকম যুক্তি ছাড়াই তাঁরা ধরে ধরে নিলেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। আট চল্লিশ সালে ঢাকার এক সভায় জিন্না সাহেব সেই কথা স্বাভাবিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে গিয়ে যখন না, না, ধ্বনি শুনলেন, তখন তিনি নিশ্চিত বিস্মিত হয়েছিলেন।

জিন্না সাহেব আর যাই হোক সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। ওটা তাঁর রুচিতে বাধে। সোহরাওয়ার্দি ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে কলকাতায় বীভৎস হত্যাকাণ্ডের সূচনা করেছিলেন বলে ঐ লোকটি জিন্না পছন্দ করেননি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মদিনে জিন্না বলেছিলেন, আজ থেকে রাজনীতিতে মুসলমান আর মুসলমান নয়, হিন্দু আর হিন্দু নয়। সবাই মিলে এক মহান জাতি। পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য, জিন্না বেশিদিন বাঁচলেন না।

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং ভারত বিদ্বেষ ছড়াতে শুরু করলেন উজিরে আজম লিয়াকত আলী। ক্ষমতায় টিকে থাকতে গেলে দেশবাসীর সামনে সব সময় একটা জিগির তুলে রাখতে হয়, লিয়াকত আলী সেই জিগির তুললেন, ইসলাম বিপন্ন, এস্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে চাই সব মুসলমানের ঐক্য।

বিনয়েন্দ্রর মা মামুনকে যে কথাটি বলে অপমান করেছিলেন, অনেকদিন পর মামুন সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনলেন পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তাদের মুখে। বাংলা তো হিন্দুদের ভাষা। তুমি যদি খাঁটি বাঙালী হতে চাও তা হলে তুমি আর খাঁটি মুসলমান থাকবে না। শত শত মামুন স্বজাতির নেতাদের মুখে এই রকম কথা শুনে আবার অপমানে কুঁকড়ে গেলেন।

অনেকেই অবশ্য প্রথম প্রথম ইসলাম বিপন্ন, ঐশ্লামিক রাষ্ট্র গঠনের জিগির বেশ পছন্দ করেছিল। আঙালীত্ব ছেড়ে শুধু মুসলমান হতে তাদের আপত্তি ছিল না, উর্দু কালচারের গুপ্ত হতে পারে না। নিজেদের সংস্কৃতি ছেড়ে এক জগাখিচুড়ি সংস্কৃতি নিয়ে তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের চোখে উপহাসের পাত্র হলো।

বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রকাশ্য রাজপথে বাংলা ভাষার দাবি মিছিলে যেদিন ছাত্রও জনসাধারণের ওপর গুলি চলে, সেদিন মামুনের শেষ মোহটুকু ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি বুঝেছিলেন, শুধু ধর্মবন্ধনই এ যুগে একটি জাতির একাত্ম হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মুসলমানও মুসলমানকে মারে। মুসলমানও মুসলমানকে শোষণ করে। হিন্দু আধিপত্যের আওতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পাকিস্তানের জন্ম, কিন্তু এখানও দ্রুত তৈরি হয়েছে শোষক শ্রেণী, এখানেও রয়েছে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত। আসলে শোষক ও অত্যাচারীদের কোনো জাত বা ধর্ম নেই, ওরা সব দেশেই এক।

বাঙালী মুসলমানদের ওপর গুলি চালিয়েছে পূর্ব বাংলার পুতুল সরকার। ক্ষমতা সবই

পশ্চিমীদের দখলে। গুলির আঘাতের চেয়েও মর্মান্তিক ওদের শোষণ। পূর্ব বাংলায় যদি ওরা এক টাকা খরচ করে তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করে দশ টাকা। এখানে একজন চাকরি পায়, ওখানে প্রায় দশ জন। রপ্তানী হয় পূর্ববাংলা থেকে, আমদানী হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।

প্রতাপ ঠাট্টা করে বলেছিলেন, হাত মে বিড়ি মু'মে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, এই শ্লোগান তো দিচ্ছে অবাঙালী বিড়িওয়ালারা। মামুন, তোরাও এদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিস? মামুন তখন বলেছিলেন, পাকিস্তান হওয়ার সত্যিই দরকার আছে রে। গরিব মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্যই সেটা দরকার। দেখিস, পাকিস্তান হয়ে যদি যায়, তাহলে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক অনেক ভালো হয়ে যাবে।

বাহান্ন সালে মামুনের প্রথম মনে হয়েছিল, এই কি সেই পাকিস্তান? এই বৈষম্যভরা পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কী? পূর্ব আর পশ্চিমে সৌহার্দ্য কী কোনোদিন সম্ভব?

এতটা কান্নার রোল শুনে মামুন দ্রুত পা চালালেন।

বাবুল সিদ্দিকীর বাড়িতে গিয়ে শুনলেন শব যাত্রীরা একটু আগে রওনা হয়ে গেছে। আকাশে কালো মেঘ জমতে দেখে তারা আর দেরি করেনি। মহিলাদের কবর স্থানে যাওয়ার নিয়ম নেই, তাই তারা কান্নাকাটি করছে।

বাবুল সিদ্দিকীর মেয়ে দুটিকে চিনতে পারলেন মামুন। ওদের দেখে তাঁর নিজের মেয়েদের কথা মনে পড়লো। কে জানে কখন এক হ্যাঁচকা টানে তাঁকেও পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। তখন কী গতি হবে তাঁর মেয়ে দুটির? এই মেয়ে দুটিরই বা কী হবে? ওদের দিকে তাকিয়ে মামুন বাৎসল্যের ব্যথা অনুভব করলেন।

দেরি করার উপায় নেই, মামুন ছুটলেন কবর স্থানের দিকে। একেবারে মেঘের দিকে তিনি ধরে ফেললেন শবযাত্রীদের। ঘাসে ভরা একটা পরিষ্কার জায়গায় উত্তর মুখ করে নামানো হলো লাশ। জেদ কর ক্রাচে ভর দিয়ে নৌকোয় উঠতে গিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে বাবুল সিদ্দিকীর। তার মুখখানি আরও বিবৃত হয়েছে কিনা তা দেখার উপায় নেই, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাফনে মোড়া।

শবযাত্রীদের পাশ দাঁড়িয়ে পশ্চিম মুখ করে মামুন জানাজা পড়তে শুরু করলেন। তাঁর চোখে জল এসে গেল। শত সহস্র বাবুল সিদ্দিকী আর বরিশালে দেখা সেই জাহাজ ভর্তি ক্রন্দনরত হিন্দু উদ্বাস্তুদের কথা কি চিন্তা করেছিল পাকিস্তানের প্রবক্তারা? ভারতের নেতারাই বা কী করেছিল? লক্ষ লক্ষ নির্দোষ নিরীহ মানুষের অন্ন, ভূমি ইজ্জৎ আর প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে খেলতে গড়ে উঠেছে ভারত আর পাকিস্তান, এই রকম অভিশপ্ত দুটি দেশের কি কোনো দিন মঙ্গল হতে পারে?

নামাজের মন্ত্র পড়তে পড়তেও মামুন মনে মনে বাংলায় বলতে লাগলেন, বাবুল সিদ্দিকীর বিক্ষুব্ধ আত্মা যেন একদিন শান্ত পায়। কেয়ামতের পর ফেরেস্তারা যেন ওকে দয়া করেন।

॥ ১৭ ॥

কলকাতার তালতলা অঞ্চলটি বেশ প্রাচীন, এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দারা কয়েক পুরুষ ধরেই এই শহরের নাগরিক। অনেকে বলে খাঁটি কলকাতার ভাষা এখনো শুধু তালতলাতেই শুনতে পাওয়া যায়। অন্যান্য জায়গায় ভেজাল ঢুকে গেছে, বাঙালদের উপদ্রবে। তালতলার লোকের ট্রামে বাসে 'এই যে দাদা'র বদলে 'এই যে দাদু' সম্বোধন শুনলে বিরক্তিতে নাক কুঁকোয়। তারা এখনো নচি, নংকা ও নেবু, এই ধরনের উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ রেখেছে, 'আদেখ্‌লের ঘটি হলো, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল', কিংবা 'অবিয়ত্তীর ঠুনকো ব্যথা' কিংবা 'শা বিইয়ে কানায়ের মা' এই ধরনের বর্ণাঢ্য প্রবাদ কথায় কথায় ব্যবহার করে।

শহরের পুরনো পল্লীর যা যা অনুষঙ্গ, অর্থাৎ বেশ্যালয়, মদের আখড়া, গুণ্ডা চক্র তাও রয়েছে কাছাকাছি। অবশ্য পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বসত বাড়িটিও অদূরে। তাঁর বাড়ির বিপরীত দিকে পরিচ্ছন্ন, সুরম্য ওয়েলিংটন স্কোয়ার উদ্যানটি সবরকম বিক্ষোভের পীঠস্থান। প্রায় প্রত্যেকদিন সেখানে ভিড়, গুড়োহুড়ি, ঠ্যালাঠেলি লেগেই আছে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও কিংবদন্তিতুল্য খ্যাতিমান চিকিৎসক বিধানবাবু সকালবেলা বিনা ভিজিটে রুগী দেখেন, সেইজন্য ভোর থেকেই এসে ভিড় জমায় দূর-দূরান্তের রুগীরা, আবার ঐ ডাক্তারবাবুর কাছেই অন্য সময়ে অনেকে আসে স্বেচ্ছায় আহত বা নিহত হতে। একটু বেলা বাড়লেই শুরু হয়, ছাত্র সমাবেশ, শ্রমিক সমাবেশ ও বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলির মিছিল।

স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয়বাদী উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এসেছে, দেশকে এখন আর

কেউ জননী মনে করে না, দেশ নিছক গ্রাসাচ্ছাদনের পটভূমি। স্বাধীনতার পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ছাঁটাই ও নতুন চাকরির অভাব এবং ভোগ্যপণ্যের অনটনের জন্য ছাত্র ও যুব সমাজ জাতীয়তাবাদ ছেড়ে ইদানীং মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকেছে, ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টির ছাত্র ও যুব শাখা এখন বেশ শক্তিশালী। এইসব মিছিল সমাবেশের ওপর প্রায়ই লাঠি-গুলি ও টিয়ার গ্যাস চলে। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে বর্তমান সরকার মাথায় রেখেছে বটে কিন্তু পুলিশ বাহিনীকে অহিংস হতে বলেনি,. অন্যান্য অনেক কিছুর মতনই পুলিশ বাহিনীও চলছে পুরনো ব্রিটিশ কায়দায়। এই তো দু'এক বছর আগে ব্রিটিশ মালিকানাধীন ট্রাম কম্পানির ট্রামের ভাড়া মাত্র এক পয়সা বৃদ্ধির প্রতিবাদে এখানে কী তুমুল দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। টিয়ার গ্যাসের জ্বালায় স্থানীয় অধিবাসীরা দরজা-জানলা বন্ধ করেও নিষ্কৃতি পায়নি, অকারণে তাদের কাঁদতে হয়েছে। বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় এ পাড়ায় লোকদের বড় অশান্তি।

এই তালতলাতেই মমতার বাপের বাড়ি। মমতার বাবা-ঠাকুর্দারা খাঁটি পশ্চিমবঙ্গেরও নয়, পূর্ববঙ্গেরও নয়। যশোরে সাতক্ষিরার কাছে এককালে তাঁদের ছোটোখাটো একটি জমিদারি ছিল, মমতার ঠাকুদা এক পার্শী ভদ্রলোকের কাছ থেকে তালতলার একটি দোতলা বাড়ি কেনেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। ক্রমে জমিদারিটি হাতছাড়া হয়েগেলেও সাতক্ষিরা শহরে তাঁদের একটি বাড়ি রয়ে গিয়েছিল এবং সেখানেও যাতায়াতে ছেদ পড়েনি।

এই বংশের ছেলেমেয়েরা গোড়া থেকেই কলকাতার স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখেছে, ছুটি কাটাতে গেছে সাতক্ষিরার বাড়িতে। তারা কথাবার্তা বলে কলকাতার ভাষায় কিন্তু বিয়ের সময় তাদের পাত্রী ও পাত্র বেছে বেছে আনা হয়েছে পূর্ববঙ্গীয় ভালো বংশ থেকে। ফুটবল খেলার সময় তারা ইস্টবেঙ্গলক্লাবের সমর্থক কিন্তু ইলিশের চেয়ে চিংড়ি মাছই তাদের বেশ পছন্দ। বোয়াল মাছ তাদের বাড়িতে ঢোকে না। দেশবিভাগের ফলে এই পরিবারটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি মূল্যবান জিনিসপত্র সবই সরিয়ে আনার সময় পাওয়া গিয়েছিল। সাতক্ষিরার বাড়িটিও এক আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সীমান্ত থেকে সাতক্ষিরা শহরটি বেশি দূরে নয়, বিনা পাসপোর্টেই ইছামতি নদী দিয়ে দু'দিকের অনেক মানুষ যাওয়া আসা করে, নানারকম দ্রব্যও আসে-যায়।

মমতার বাবা-ঠাকুর্দারা অবশ্য কেউ এখন বেঁচে নেই। তাঁর দাদা ত্রিদিবই সংসারের কর্তা। সংসারটিও ছোট হয়ে এসেছে।

ত্রিদিবের স্ত্রী সুলেখা যাকে বলে ডাকসাইটে সুন্দরী। এ দেশে সুন্দরী বললে প্রথমেই ফর্সা রং বোঝায়। কিন্তু সুলেখার গাত্রবর্ণ পদপতার মতন। সুলেখার নাক, চোখ, ওষ্ঠরেখা কোনোটিই যে আলাদাভাবে নিখুঁত তা বলা যায় না। কিন্তু সুলেখার রূপের মধ্যে এমন একটা গভীর সুষমা আছে যেজন্য তার দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। এ যেন শিল্পের মতন। একটা কবিতা বা ছবি বা সঙ্গীত যে কেন ভালো বা রসোত্তীর্ণ তা কিছুতেই বুঝিয়ে বলা যায় না। নিখুঁত ব্যাকরণ বা নিখুঁত প্রয়োগ হলেও তো ঐ সব সবসময় মনোহরণ করে না। তার জন্য আলাদা কিছু লাগে।

বিয়ের আগে পর্যন্ত ত্রিদিব ছিলেন খুব পড় য়া মানুষ। সব পরীক্ষায় তিনি ফার্স্ট হয়েছেন। যথাকালে তিনি তাঁর যোগ্য চাকরি পেয়েছেন, তবু পড়াশুনোর নেশা তাঁর ঘোচে নি। তিনি বিয়ে করেছেন অনেক দেরিতে। সুলেখার সঙ্গে বিয়ে হবার পর তিনি অনুভব করেন যে এতগুলি বছর তিনি শুধু বইয়ের পাতাতেই মুখ গুঁজে থেকেছেন, পৃথিবীর আর কোনো কিছু ভালোভাবে জানা হয়নি। সুন্দরের সংস্পর্শে এসে অন্যান্য সুন্দরের প্রতি তাঁর আকুতি জন্মায়। তিনি সঙ্গীত ও শিল্প-সাহিত্যের জন্য তৃষ্ণা বোধ করেন। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি প্রায় প্রতিদিনই কোনো সিনেমা, থিয়েটার বা গান বাজনার অনুষ্ঠানে যান।

বিয়ের সাত বছর পরেও ত্রিদিবের এই টান একটুও কমে নি। সুলেখার সাহচর্যেই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সময় কাটে, সুলেখা কোনোদিন যেতে না পারলে তিনি সিনেমা বা থিয়েটারের আগে থেকে কেটে রাখা টিকিট ছিঁড়ে ফেলে দেন।

সুলেখার এখনো কোনো সন্তানাদি হয় নি। জননী রূপের চেয়ে প্রেমিকা রূপটিই যেন তাঁকে বেশি মানায়। পুরুষের চোখে কোনো কোনো নারী চিরন্তন প্রেমিকা হয়েই থাকে। যেমন মহাভারতের দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর অবশ্য বেশ কয়েকটি ছেলেপুলে হয়েছিল কিন্তু তাদের উল্লেখ প্রায় উহ্যই রয়ে গেছে। অত্যন্ত সুকৌশলে মহাভারতের কাহিনীকার দ্রৌপদীর প্রেমিকা রূপটিই উজ্জ্বল করে এঁকেছেন আগাগোড়া, এমনকি মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। সুলেখার মতন দ্রৌপদীও ফর্সা ছিলেন না।

ত্রিদিব নম্র ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ, ছোটখাটো চেহারা। সেই তুলনায় সুলেখা বেশ দীর্ঘকায়া,

ত্রিদিবকে একটু ছাড়িয়ে যান। সুলেখা কিন্তু তাঁর রূপ সম্পর্কে অনবহিতা, তাঁর মনটি ঝর্ণার জলের মতন। সেই মনের স্পর্শ ত্রিদিব ছাড়া আর কেউ পায়নি।

সুন্দরী স্ত্রীর জন্য ত্রিদিবকে প্রায়ই কিছু কিছু বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। মধু-সম্ভাবনাময় প্রস্ফুটিত ফুলের চারপাশে মৌমাছি, ভ্রমর, প্রজাপতি, ফড়িং, গুবরে পোকার মতন সুলেখার জন্যও বাড়িতে নানান লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। আত্মীয়, স্বজন, ক্ষীণ সূত্রের বন্ধুবান্ধব। ত্রিদিবের বিয়ের আগে তারা এ বাড়িতে আসতো না, এখন আসে, এবং অনেকক্ষণ বসে থাকে। সুলেখা লেখাপড়া জানা মেয়ে, সে পর্দানশীনা নয়, বাইরের লোকজনের সামনে তার ব্যবহার খুবই সাবলীল। সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন ত্রিদিব ঠিকই বুঝতে পারেন যে এইসব লোকেরা চায় যতক্ষণ বেশি সম্ভব সুলেখার আঁচলের বাতাসে নিশ্বাস নিতে। অথচ ত্রিদিব কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারে না। কারুকে চলে যেতে বলার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ত্রিদিব জানেন যে তাঁর ভগ্নীপতি প্রতাপও সন্ধ্যের দিকে মাঝে মাঝে আসেন ঐ একই কারণে। প্রতাপ সুলেখাকে বিশেষ পছন্দ করেন এবং সেকথা তিনি নিজের মুখে অনেকবার স্বীকার করেছেন। প্রতাপ এখন বসেন শিয়ালদা কোর্টে, সেখান থেকে প্রায়ই তিনি শেষ-বিকেলের দিকে আসেন শ্বশুর বাড়িতে চা খেতে। ত্রিদিবের বিয়ের আগে তিনি আসতেন কদাচিৎ। প্রতাপ আর ত্রিদিব সমবয়সী হলেও সম্পর্কের সূত্রে প্রতাপ ত্রিদিবকে দাদা বলে ডাকেন। সুখোকে অবশ্য নাম ধরেই ডাকেন প্রতাপ। প্রতাপের আসার সময় আর ত্রিদিবের অফিস থেকে ফেরার সময় প্রায় সমসময়। মাঝে মাঝেই দরজার কাছে দেখা হয়ে যায়, তখন প্রতাপ কৃত্রিম আফসোসের সুরে বলেন, ইস, দাদা, আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন? ভাবলাম কিছুক্ষণ সুলেখাকে একলা পাবো, ওর রূপসুধা উপভোগ করবো! সারাদিন খাটনির পর সুলেখার এক ঝলক হাসি দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।

ত্রিদিব তখন বলেন, মজুমদার সাহেব, আমার বোনটিকে অবজ্ঞা করবেন না। আমার বোনও যথেষ্ট সুন্দরী। আমি তো মনে করি আমার বউ-এর চেয়ে আমার বোন আরও বেশি সুন্দর।

প্রতাপ উত্তর দেন, কী যে বলেন! আপনার বোনকে অবজ্ঞা করি এমন বুকের পাটা কি আমার আছে? তবে, বউ তো হাতের পাঁচ। সেই যে রবি ঠাকুর কোন্ বইতে যেন লিখেছেন না, নিজের বউ হলো আসল টাকা, আর শ্যালিকারা হলো সুদ। তা আমার একটি মাত্র শ্যালিকা, সেই বিনতাকে আপনি বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ধান্দারা গোবিন্দপুরে! সেইজন্যই, মধুর অভাবে গুড়ের মতন আমি শ্যালিকার বদলে শালাজ-এর কাছে সুদ নিতে আসি।

এই বলে প্রতাপ হেসে ওঠেন হা-হা শব্দে। সে হাসিতে কোনো মালিন্য নেই।

প্রতাপ অবশ্য ইদানীং অনেকদিন আসছেন না। প্রতাপ বাড়ির সবাইকে নিয়ে দেওঘর গিয়েছিলেন এবং তারপর প্রতাপদের পরিবারে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে সে সব ত্রিদিব জানেন।

প্রতাপ এলে ত্রিদিবের ভালো লাগে, বেশ আড্ডা জমে। মুশকিল হচ্ছে অন্যান্য অনেককে নিয়ে, যারা আসে অকারণে বা মিথ্যে ছুতোয়। ত্রিদিবের সঙ্গে অবান্তর কথা বলতে বলতেও যারা আড়চোখে সুলেখার দিকে চেয়ে থাকে। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ত্রিদিবের আপন মামা। এই বীরেশ্বর মামা একসময় সেনাবাহিনীতে লিউটেনান্ট কর্নেল ছিলেন, রিটায়ার করেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। ইনি চিরকুমার এবং চেহারাটি এখনো ছিপছিপে সুদর্শন। প্রৌঢ় অবিবাহিত পুরুষরা মনে করে পরস্ত্রীদের সঙ্গে মেলামেলায় তাদের একটা বিশেষ অধিকার বা দাবী আছে।

বীরেশ্বরে মামা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আটালিতে ছিলেন বলে সাহেবী হাবভাব দেখান খুব। কথায় কথায় তিনি সুলেখাকে জড়িয়ে ধরেন, লোকজনের সামনেই সুলেখার গালটিপে দেন, হঠাৎ দুপুরবেলা এসে উপস্থিত হন। সুলেখা এই নিয়ে স্বামীর কাছে অনুযোগ করেন। বীরেশ্বর মামা কী যেন করেন, আমার ভালো লাগে না যে তুমি যখন তখন আমাদের বাড়িতে এসে না কিংবা আমার বউয়ের গায় হাত দিও না!

মাঝে মাঝে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে সন্ধ্যেবেলা সুলেখাকে অসুস্থতার ভান করে শুয়ে থাকতে হয়, বসবার ঘরে ত্রিদিব অনাহূত অতিথিদের আপ্যায়ন করেন, যারা কেউই ত্রিদিবের সঙ্গে গলা করার জন্য আসেনি।

সেদিন ত্রিদিব বিকেলবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন, ধর্মতলা স্ট্রিটে তাঁদের গাড়ি জ্যামে আটকে গেল। ওয়েলিংটন মোড়ের কাছে পুলিশ জনতায় খণ্ডযুদ্ধ চলছে। এমনই অবস্থা যে গাড়িটা

পেছন দিকে ঘুরিয়ে নেবারও উপায় নেই। গাড়িতে ত্রিদিবের আরও তিনজন সহকর্মী রয়েছে, অফিসের গাড়ি প্রত্যেককে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়। অসহ্য গুমট গরম, গাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগলো না, ত্রিদিব নেমে পড়লেন। এখান থেকে তিনি হেঁটেই যেতে পারবেন। ত্রিদিব ছাত্র বয়েসে শুধু পড়াশুনোই করেছেন, কোনোরকম আন্দোলন-টান্দোলনে যোগ দেন নি, মিছিলে যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। কিন্তু এ পাড়ার মানুষ হিসেবে তিনি এই রকম গন্ডগোল দেখতে অভ্যস্ত, তাই ভয় পান না। একদিকে পুলিশ লাঠি চালালেও অন্য দিক দিয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটে চলে যাওয়া যায়।

ওয়েলিংটনের মোড়টা পার হবার পর ত্রিদিব বুঝতে পারলেন আজকের হাঙ্গামাটা বেশ ব্যাপক। পুলিশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাড়া করছে আন্দোলনকারীদের, ওরাও ছুঁড়ছে ইট-পাটকেল।

ত্রিদিব ঠিক করলেন ক্রীক রো দিয়ে শর্ট কাট করবেন। খানিকটা যাওয়ার পর দেখলেন পেছন দিক থেকে একদল লোক ছুটে আসছে পুলিশের তাড়া খেয়ে। আবার উল্টো দিক থেকেও এদিকে আসছে একটা দল। এরা নতুন আক্রমণকারী না পলাতক তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লোকজনের চিৎকারের মধ্যে প্রবল ভয় আছে। ফট ফট করে দুটো শব্দ হলো, গুলি না টিয়ারগ্যাস বোঝা গেল না। অবস্থা সুবিধের নয়, ত্রিদিব তৎক্ষণাৎ মন ঠিক করে একটুখানি দৌড়ে গিয়ে ডান দিকের একটি বাড়ির সদর দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজাটা ভেজানো ছিল, খুলে যেতেই ত্রিদিব ঢুকে পড়লেন ভেতরে, ত্রিদিবের দেখাদেখি আরও তিন-চারজন লোক চলে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলা থেকে ক্রুদ্ধ গলায় একজন বলে উঠলো, কে রে? কে রে? কানাই বুঝি দরজাটা বন্ধ করেনি? আঃ, আর পারা যায় না, উটকো লোক ঢুকে পড়েছে। যাও, বেরিয়ে যাও, নইলে আমি পুলিশ ডাকবো।

ত্রিদিবের বুকটা ধড়ফড় করছে, কয়েক মুহূর্তের জন মনে হয়েছিল সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যাবে। বাড়ি ফেরার ব্যস্ততায় এই রকমভাব এগিয়ে আসা ঠিক হয় নি। গাড়ির মধ্যে বসে থাকাটাই নিরাপদ ছিল। গাড়ি-চড়া লোকদের পুলিশ মারে না।

ধুতিটাকে লুঙ্গি করে পরা, খালি-গা একজন প্রৌঢ় দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আদেশ দিল, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও সব, আমি দরজা বন্ধ করবে!

এ বাড়িটা ত্রিদিবের পিসতুতো বোন ইলার শ্বশুরবাড়ি। এক পাড়ার মধ্যে হলেও কুটুম্বদের বাড়িতে ত্রিদিবের বিশেষ যাতায়াত নেই। আজ এসেছেন বাধ্য হয়ে। লজ্জিতভাবে ত্রিদিব ইলার ভাসুরকে বললেন, হরেনদা, আমিও এসে পড়েছি, রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ।

ত্রিদিবকে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর বদল করে হরেনবাবু বললেন, আরে ত্রিদিব! তুমিও আজকাল পলিটিকস করছো নাকি? এসো, এসো, ওপরে উঠে এসো! আজ তো দুপুর থেকেই গণ্ডগোল।

অন্যদের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, এই যে ভাই, বলছি না বেরিয়ে যেতে! আমার বাড়িতে এসব চলবে না!

একজন লোক দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখে বললো, যাবো কী করে? বাইরে লাঠি চার্জ হচ্ছে।

হরেনবাবু বলেন, ওসব আমি জানি না! পুলিশের দিকে ইট মারার সময় মনে ছিল না? ওপর থেকে দেখছি তো সব!

একজন লোক মাথায় দু'হাত চেপে বসে পড়েছে। তার কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

রক্ত-দর্শনে ত্রিদিবের মাথা ঝিম ঝিম করে। মানুষ যে মানুষকে মারে, এই তথ্যটা এখনো তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। তিনি ফিসফিস করে বললেন, হরেনদা, ঐ লোকটার মাথা ফেটে গেছে! একটু জল...

হরেনবাবু বললেন, না, না, আমার এখানে আমি এসব ঝামেলা রাখবো না। পুলিশ এলে আমাকেই তখন জবাবদিহি করতে হবে। এদের জানো না তুমি, কমুনিস্টরা এদের ক্ষ্যাপাচ্ছে! আমরা তিন পুরুষ ধরে কংগ্রেসের সাঁপোর্টার।

আজকের বিক্ষোভ যে কিসের দাবিতে ত্রিদিব সেটাই জানেন না এখনো। তিনি দেখলেন, আহত লোকটি অবস্থা ভালো নয়, মুখখানা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আছে, কিন্তু কোনো শব্দ করছে না। অন্য লোকগুলি বোধহয় এর পরিচিত নয়, কারণ কোনো কথা বলছে না, প্রত্যেকই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

হরেনবাবু তর্জন গর্জন করলেও লোকগুলোকে ঠেলে বার করে দিতে পারবেন না তিনি জানেন। সবাই ক্ষেপে আছে। তিনি ত্রিদিবকে বললেন, চলো, ওপরে চলো, কানাইকে বলছি দরজা বন্ধ করে

দেবে।

ত্রিদিব তবু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

একজন লোক দরজাটা একটু খুলে মুখ বাড়িয়ে বললো, পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে তারা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেল। আহত লোকটি উঠে দাঁড়ালো আস্তে আস্তে। ত্রিদিব বললেন, আজ আর ওপরে যাবো না, আমিও যাই।

হরেনবাবু বললেন, আরে না, না, চলো, চা-টা খেয়ে যাবে। একটু বিশ্রাম কর যাও, তারপর তোমার সঙ্গে আমি একজন লোক দিয়ে পাঠাবো!

ত্রিদিব বললেন, তার দরকার হবে না। এই তো এখান থেকে এইটুকু। ফিরতে দেরি করলে বাড়ির সবাই চিন্তা করবে।

প্রায় জোর করেই বেরিয়ে এলেন ত্রিদিব। রাস্তাটা অদ্ভুত রকমের ফাঁকা হয়ে গেছে, একজনও লোক দেখা যাচ্ছে না। শুধু ছড়িয়ে আছে অনেক ছেঁড়া জুতো, ইট-পাটকেল, টিয়ার গ্যাসের সেল। দূরে চিৎকার ও বোমার শব্দ শোনা যাচ্ছে, অর্থাৎ হাঙ্গামা এখনও থামে নি, গড়িয়ে গেছে অন্যদিকে, খুব সম্ভবত গণেশ এভিনিউ-এর মোড়টায়।

দ্রুত পা-চালাতে গিয়েও ত্রিদিব থমকে দাঁড়ালেন। আহত লোকটি একটু একটু হাঁটছে আবার থেমে গিয়ে টলছে। এই অবস্থায়ও কোনো হাসপাতালে কি পৌঁছোতে পারবে আবার যদি জনতা-পুলিশের যুদ্ধটা এদিকে চলে আসে তখনও পালানোই বা কী করে? এখন আর কোনো বাড়ির দরজা খুলবে না।

ত্রিদিবরে মনে হলো তাঁর কিছু করা উচিত। কিন্তু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। নিজের ঘেরা গণ্ডির বাইরের মানুষের সঙ্গে মেশেন নি তিনি, অপরিচিত কারুর সঙ্গে প্রথম কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন, মিছিলের লোকদের চরিত্র তিনি জানেন না।

একবার ভাবলেন, দরকার নেই এসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। আবার খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলেন, লোকটি এক জায়গায় বসে পড়েছে।

দৌড়ে ফিরে গিয়ে ত্রিদিব লোকটির একটি হাত ধরে বললেন, উঠুন, হাঁটতে পারবেন তো? আমার সঙ্গে আসুন, কাছেই আমার বাড়ি!

লোকটির কণ্ঠস্বর রুক্ষ ধরনের। লম্বাটে চেহারা, চোয়াড়ে মুখ, তাতে তিন-চার দিনের ছিটেছিটে দাড়ি। তার মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে একটা চোখ প্রায় বুজে যাচ্ছে, হাত দিয়ে মুছে মুছেও সে রক্ত থামানো যাচ্ছে না।

ত্রিদিব জোর দিয়ে বললেন, এক্ষুনি আপনার রক্ত বন্ধ করা দরকার। চলুন, আসুন!

লোকটি আবার বললো, আমার জন্য ভাবতে হবে না। আপনে যান!

গণ্ডগোলের স্রোতটা আবার এই রাস্তার মুখে, পার্কের পাশে চলে এলো। এখন এখানে থাকা নিরাপদ নয়। ত্রিদিব লোকটির কাঁধ ধরে টেনে বললেন, শিগগির উঠুন!

এবারে লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে ত্রিদিবের পাশে পাশে ছুটতে লাগলো। ডান দিকের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে আরও খানিকটা গিয়ে ত্রিদিব অবিলম্বে বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেলেন, লোকটির হাতে ধরে বললেন, ভেতরে আসুন চটপট।

দুপুর থেকেই এ পাড়ায় উৎপাত হচ্ছে বলে আজ বাড়িতে কোনো অতিথি আসেনি। ড্রয়িং রুমের পাখা খুলে দিয়ে লোকটিকে সোফায় বসিয়ে ত্রিদিব বাড়ির ঝিকে বললেন, ওপর থেকে বৌদিকে ডেকে আনো তো তাড়াতাড়ি।

লোকটি প্রথম ঝোঁকে সোফায় বসে পড়লেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো মেঝেতে। তারপর বললো, আমার রক্তে আপনের ঘর-বাড়ি অপবিত্র হইয়া যাবে। আমি ছোট্ট লোক!

ত্রিদিব বললেন, না, না, ওসব কী কথা? আপনি ওঠে বসুন!

লোকটি বললো, আমি শুইয়া পড়ি।

সুলেখা উৎকণ্ঠিত হয়েই ছিলেন। খবর পেয়ে নেমে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। ত্রিদিব তাঁকে সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটি জানাতেই সুলেখা নিপুণভাবে দায়িত্ব নিয়ে নিলেন সব কিছুর। তুলো আর গরম জল আনিয়ে প্রথমে লোকটির মাথার ক্ষত পরিষ্কার কর দিলেন ভালোভাবে, তারপর ডেটল ঢেলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন। এক কাপ গরম দুধ লোকটির মুখের কাছে নিয়ে বললেন, নিন, এটা খেয়ে নিন তো!

ত্রিদিবকে তিনি বললেন, আমার মনে হয় মাথায় স্টিচ্ করানো দরকার। এতে রক্ত বন্ধ হবে না।

লোকটি এক চুমুকে দুধটা খেয়ে নিয়ে বললো, নাঃ, আর কিছুছু লাগবো না। এখন ঠিক আছি। আমাগো খুব কড়া জান, বোঝলেন।

লোকটা উঠবার চেষ্টা করতেই ত্রিদিব বললেন, আরে, এত হুড়োহুড়ি করছেন কেন? বসুন, আমার চেনা একজন ডাক্তারকে খবর পাঠাচ্ছি, সে এসে দেখে দেবে!

লোকটি ত্রিদিবের চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো, আপনেরা আমার জন্য এত সব করবেন কেন? কইলাম না, আমি ছোট লোক, অতি ঘৃণ্য!

সুলেখা সরল বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছোটলোক...তার মানে কী নিচু জাত?

লোকটি বললো, নিচুস্য নিচু। একেবারে পায়ের তলায় থাকার মতন। আমরা হইলাম রিফুউজি। উদ্বাস্তু।

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করলেন, আজকের মিছিলটা বুঝি রেফিউজিদের ছিল?

লোকটি বললো, হ, সরকার আমাগো আন্দামানে যাবজ্জীবন নির্বাসনে পাঠাইতে চায়, কিংবা দণ্ডকারণ্যে রাইক্ষসদের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড। আমরা তো বাংগালী না, পূর্ব বাঙলার থিকা আমরা সাধ কইরা পলাইয়া আইছি তো, তাই পশ্চিম বাঙলায় আমাগো ঠাঁই নাই। তাই আমরা একটু চ্যাচেমেচি করতে আইছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। পুলিশ সেইজন্য ডাণ্ডা মারলো আমার মাথায়, দুই একজনের বোধহয় গুলিতেও পেট ফুটা করছে।

ত্রিদিব বললেন, কিন্তু অনেক স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরও দেখলাম এর মধ্যে রয়েছে!

লোকটি বললো, বামপন্থী পার্টিগুলা আমাগো সাপোর্ট করতাছে। ক্যান যে করতাছে তা জানি না। আপনেরাও বামপন্থী নাকি?

ত্রিদিব বললেন, আমরা কোনো পার্টিতে নাই।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কী?

লোকটি এতক্ষণ ভালো করে তাকায় নি সুলেখার দিকে। এবারে সে মুখ তুলে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো। তার তিক্ত-কর্কশ কণ্ঠস্বরটি নরম করে অভিবুতের মতন বললো, আপনি দেবী, সাক্ষাৎ ভগবতী, আমার মতন একজন নগণ্য মানুষকে আপনে দয়া করছেন, আপনের কাছে মিথ্যা কমু না। আমার নাম হারীত মণ্ডল। হতভাইগ্য রিফুইজিদের আমি অপদার্থ নেতা।

নামটা একটু চেনা চেনা লাগলো ত্রিদিবের। আগে কোথাও শুনেছেন বা ছাপা দেখেছেন। খবরের কাগজে কী?

হারীত মণ্ডল সুলেখার পায়ে হাত দিয়ে বললো, আপনে আমার মা। আপনে ইচ্ছা করলে আমাকে পুলেশে ধরাইয়া দিতে পারেন।

সঙ্কুচিতভাবে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে সুলেখা বললেন, আরে, ছি, ছি, ওসব কী বলছেন? আমরা আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে যাবো কেন?

হারীত মণ্ডল বললো, অন্য লোকের কাছে আমি আমার আসল নাম কই না। অনেকের ধারণা আমি একজন খুনী। কাশীপুরের যে জবর দখল বাড়িতে আমরা রইছি এখন, সেই বাড়ির মালিকদের একজন ঐখানে মারা গেছেন হঠাৎ। অন্য মালিকরা রটাইয়া দিচ্ছে যে আমিই তারে খুন করছি।

ত্রিদিব আর সুলেখা পরস্পরের দিকে বাজায় রেখে চোখে তাকালেন।

॥ ১৮ ॥

বিমানবিহারীদের আদি বাড়ি কৃষ্ণনগর। মস্ত বড় বংশ। এই বংশের অনেকে ছড়িয়ে আছেন সারা ভারতবর্ষে, কৃতিত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে উচ্চপদে আসীন। দু'জন আই সি এস, একজন রাষ্ট্রপতির চিকিৎসক, একজন সেনাবাহিনীর মেজর। ঠাকুরবাড়ির জামাই এবং সুসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গেও বিমানবিহারীদের আত্মীয়তা আছে।

বিমানবিহারীর ঠাকুর্দা কলকাতায় এসে ওকালতি করে প্রচুর অর্থ অর্জন করেন। ভবানীপুরের বাড়িটি তাঁর আমলেই কেনা। বিমানবিহারীর বাবার আমলে অবশ্য অবস্থা বেশ পড়ে যায়, কারণ তিনি উপার্জনের বদলে অর্থ ব্যয়েই বেশি আমোদ পেতেন এবং শিশির ভাদুড়ীর দলে ভিড়ে থিয়েটারের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিছুদিন একটা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে থিয়েটারের ব্যবসা করতে গিয়ে ভরাডুবি হচ্ছিলেন প্রায়, তাঁর অকালমৃত্যুই পরিবারটিকে বাঁচিয়ে দেয়।

প্রতাপের মতন আইন পাস করে বিমানবিহারীও কিছুদিন চাকরিতে ঢুকেছিলেন, তারপর তা

ছেড়ে আদালতে প্র্যাকটিস করতে যান, সেটাও তাঁর পছন্দ হলো না, ঠিক মন বসলো না। পশারহীন উকিল সকলেরই করুণার পাত্র, বিমানবিহারীর যখন সেইরকম অবস্থা, তখন তাঁকে পথ দেখালেন তাঁর অন্য এক বন্ধু।

কোর্টের কাছেই ডি জে কিমার অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে একটি বিলিতি প্রচার প্রতিষ্ঠানের অফিস, সেখানে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আছেন বিমানবিহারীর এক বন্ধু দিলীপকুমার গুপ্ত। আদালত ছেড়ে বিমানবিহারী প্রায়ই যেতেই সেই বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে। অফিসের কাজকর্ম ছাড়াও দিলীপকুমার তখন অন্য একটি কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। তিনি তাঁর বিদুষী শাশুড়ির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সিগনেট প্রেস নামে বাংলা বইয়ের একটি প্রকাশনালয় চালাচ্ছেন। অল্প দিনেই প্রকাশনালয়টির দারুন সুনাম হয়েছে। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিৎ রায় নতুন ধরনের চমৎকার সব মলাট আঁকছেন বইগুলির। সে ডি জে কিমার অ্যাণ্ড কম্পানিতেই দিলীপকুমারের সহকর্মী সত্যজিৎ। দিলীপকুমারের কামরায় ঐ দীর্ঘকায় তরুণ যুবকটিকে বিমানবিহারী দেখেছেন কয়েকবার।

দিলীপকুমারের সংস্পর্শে কিছুদিন থেকে বিমানবিহারী বই ছাপার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হলেন। দু'জনের বাড়িও কাছাকাছি, দিলীপকুমার থাকেন এলগিন রোডে, এক একদিন বিকেলে দু'জনে একই সঙ্গে বাড়ি ফেরেন। প্রেস, টাইপ, কাগজ, লে-আউট, বাঁধাই এই সব বিষয়ে কথা বলায় দিলীপকুমারের অনন্ত উৎসাহ। সেই উৎসাহ বিমানবিহারীর মধ্যেও সঞ্চারিত হলো, তিনিও বই ছাপার ব্যবসায়ে নামলেন।

তবে বিমানবিহারী বন্ধুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা গেলেন না।

সিগনেট প্রেস থেকে গোড়ার দিকে জওহরলাল নেহরুর ইংরেজী রচনা প্রকাশিত হলেও পরের দিকে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের বাছা বাছা বই ছাপতেই মনোনিবেশ করেন। বিমানবিহারী প্রকাশ করতে লাগলেন শুধু ইংরেজী টেকনিক্যাল বই। ওকালতি বিষয়ে তাঁর ঠাকুর্দার লেখা একটি বই ছিল, অনেকদিনই সেটা আউট অফ প্রিন্ট, বিমানবিহারী প্রথমে সেই বইটির পুনর্মুদ্রণ করলেন। তারপর ক্রমশ ডাক্তারি, গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বই। সাফল্য এলো দ্রুত, বি চৌধুরী পাবলিকেশনস-এর বই শুধু সারা ভারতবর্ষে নয়, মিশর, ইন্দোচীনেও রপ্তানি হতে লাগলো। ইনঅরগানিক কেমিষ্ট্রির একটি বই পাঠ্য হলো পাঁচটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সারা বাড়িতে বই-বই গন্ধ। তিনতলা বাড়ি, প্রচুর জায়গা, একতলার ঘরগুলি সবই বই-এর গুদাম। মাঝে মাঝে মিল থেকে কাগজ কিনেও স্টক করে রাখতে হয়। দোতলায় বিমানবিহারীর সেখানেই ধুনোন। সেই ঘরেই টেলিফোন। কোনো কোনো রাতে দেড়টা-দুটোর সময়েও টেলিফোন বাজে। সে রকম টেলিফোন হঠাৎ বাজলেও ভয়ের কিছু নেই, ধরে নিতে হবে দিলীপকুমার ডাকছেন। ঐ মানুষটি নিশাচর। অদম্য তাঁর কর্মশক্তি। কোনোদিনই নাকি রাত আড়াইটে তিনটের আগে ঘুমোতে যান না।

এমন বই পাগল মানুষ দেখা যায় না। মধ্যরাত্রির পর, চতুর্দিক যখন নিস্তব্ধ, তখনই তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠ, কপি সংশোধন, প্রুফ সংশোধন বা ফরম্যাট সাজানোর চিন্তার প্রকৃষ্ট সময়। কোনো ভালো লেখা পড়লে বা ভালো বই দেখলে তিনি তখনই উৎসাহিত হয়ে বিমানবিহারীকে জানাতে চান। তা যত রাত্তিরই হোক না। একদিন মাঝরাত্তিরে টেলিফোনে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, বিমান, বলো তো, নির্জনতার রং কী?

বিমানবিহারী এরকম প্রশ্ন শুনলে উত্তর দেন না, কারণ তিনি জানেন, প্রশ্নকারী নিজেই উত্তর দেবেন। তিনি শুধু মৃদু কৌতূহল প্রকাশ করেন।

দিলীপকুমার বললেন, এটা বলতে পারলে না? শোনো, ভগবান শুধু চুল আঁচড়াবার জন্যই কাঁধের ওপর মাথাটা দেননি, ওটার একটা অন্য রকম ব্যবহারও আছে। মাঝে মাঝে মাথার সেই ব্যবহারটাও করো। নির্জনতার রং নীল, আবার কী?

বিমানবিহারী বললেন, যথার্থ। ঠিক বলেছো! আমার মাথায় খেলেনি।

- তাহলে দুপুরের রং কী হবে?

- ইয়ে, সাদা বোধহয়!

- সাদা আবার রং নাকি? সাদাই যদি হতো, তাহলে কি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম? কোনোদিন কি তুমি দুপুর দ্যাখোনি? নাকি তুমি সব সময় সান গ্লাস পরে থাকো? এই একটা বাজে জিনিস, সান গ্লাস চোখ ঢেকে পৃথিবীটাকে অন্যরঙে দেখা।

- দিলীপ, আমি সান-গ্লাস খুব কম পরি। তুমি অন্য দিকে চলে যাচ্ছো। দুপুরের রং কী? আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

- হলুদ। তাছাড়া আর কী? আমি 'নীল নির্জন' আর 'দুরন্ত দুপুর' নামে দুটি কবিতার বই ছাপছি। তুমি হলে-এই দুটো বইয়ের মলাটে কী রং দিতে?

- আমি ছাপবো কবিতার বই? তোমার ভয়ে তো আমি বাংলা বই-ই ছাপি না! তুমি নাকি এক একটা বই-এর মলাটা মলাট পাঁচ-ছ'বার করে আঁকাও? আমি যা বই ছাপি তার জন্য মলাট আঁকতেই হয় না!

আর একবার, বছর দু'এক আগে রাত দেড়টায় সময় দিলীপকুমার টেলিফোন এক চমকপ্রদ খবর দিয়েছিলেন। সেদিন বিমানবিহারী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ফোনের ঝনঝন ধ্বনিতে ঘুম ভাঙে।

গলার আওয়াজ শুনেই দিলীপকুমার ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তাই প্রথমেই বললেন, বিমান, ঘুমোচ্ছিলে বুঝি? মৃত্যুর পরে যখন চিত্রগুপ্তর কাছে যাবে, তখন তিনি বলবেন, তোমার মহাপাপ হচ্ছে এই যে তুমি অর্ধেকটা জীবন ঘুমিয়েই কাটিয়েছো। অতই যদি ঘুম ভালোবাসো, তা হলে মানুষের বদলে পক্ষি হলেই তো পারত!

- আজ আবার তোমার মাথায় নতুন কোন্ চিন্তার উদয় হলো?

- তুমি মনিকের ছবিটা দেখেছো?

ঘুম চোখে বিমানবিহারী বুঝতেই পারলেন না, কে মানিক, কিসের ছবি!

তিনি আলগাভাবে উত্তর দিলেন, বোধহয় দেখিনি!

দিলীপকুমার যেন সেই উত্তর শুনে শারীরিকভাবে আহত হয়ে আর্তস্বরে বললেন, বোধহয়? তার মানে কী? হয় দেখেছো, অথবা দেখোনি। আর ঐ ছবি দেখার পরেও তুমি যদি বোধহয় বলো, তাহলে আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি কি মানুষ? না পুরোপুরি পাথর?

এই সবই দিলীপকুমারের কৌতুক। তিনি গম্ভীর, ধমকের সুরে মস্করা করতে ভালোবাসেন।

বিমানবিহারী বললেন, দিলীপ, ঠিক ধরতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে বলো। কিসের ছবি?

তখনই তিনি জানালেন, যে সত্যজিৎ নামে বিজ্ঞাপন অফিসের সেই তরুণ শিল্পীটিরই ডাক নাম মানিক এবং সে পথের পাঁচলি নামে একটি ফিল্ম তুলেছে অনেক ঝকমারির পর সদ্য রিলিজ করেছে ফিল্মটি।

বিমানবিহারীর সিনেমা-থিয়েটারের প্রতি কোনো আগ্রহই নেই। অল্প বয়েসে নিউ থিয়েটার্সের দু'চারখানা ছবি দেখেছেন মাত্র। তা চেনাশুনো কেউ যদি একটা ফিল্ম বানিয়ে থাকে সেটা কোনো এক সময় দেখে নিলেই চলবে। এত ব্যস্ততা কিসের? সেই রকম একটা দায়সারা উত্তর দিতেই দিলীপকুমার আবার বললেন, কোনো এক সময়! তুমি বুঝতে পারছো না আমি কোন্ ছবির কথা বলছি? পথের পাঁচলি! এদেশে কেন, সারা পৃথিবীতে এরকম ফিল্ম আগে তৈরি হয়নি। দেরী করো না। শিগগির যাও, যাও,দেখে এসো!

বন্ধুর কথায় সেরকম গুরুত্ব না দিয়ে বিমানবিহারী হাসতে লাগলেন। রাত দেড়টার সময় তিনি কোথায় সিনেমা দেখতে যাবেন? দিলীপের যা কাণ্ড!

বিমানবিহারী অবশ্য পরের দিন বা পরের সপ্তাহেও ফিল্মটি দেখতে যাননি। গড়িমসি করতে লাগলেন, উপরোধে ঢেঁকি গিলতে গেলে যে-রকম হয়। দিলীপের কম্পানির একজন একটা শখের ফিল্ম তুলেছে, সেটা দেখার জন্য তিনি ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে তাঁর দ্বিধা হয়। তিনি কাজের মানুষ।

এর মধ্যে তাঁর বাড়ির লোকেরা দেখে এসেছে। দিলীপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে ছবিটি না-দেখার কৈফিয়ত দিতে হবে বলেই বিমানবিহারী এক শনিবার সন্ধেবেলা গেলেন খুব কাছের একটি হলে। একা। দর্শক বেশি নেই, টিকিট রয়েছে অঢেল। ছবিটি যখন শেষ হয়ে গেল, অন্য দর্শকরা উঠে পড়েছে, তখনও তিনি বসে বসে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। এ অশ্রু শুধু কাহিনীর করুণ রসের জন্যই নয়। একটি মহৎ শিল্প প্রত্যক্ষ করার কারণে। বেশ কিছু বছর ধরে বাংলা দেশে শুধু দাঙ্গা-হাঙ্গামা, স্বার্থান্বেষীদের ঝগড়া, রাজনৈতিক রেষারেষি এই সবই চলছিল। চতুর্দিকে ক্ষুদ্রতা আর অধঃপতনের সূচনা। বাঙালীর নিজস্ব কোনো কিছু নিয়েই গর্ব করার কিছু ছিল না। এতদিনে এই একটি হলো।

বিমানবিহারী কোনো রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে না থাকলেও দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। শুধু নিজের বা নিজের পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধিতেই তিনি সন্তুষ্ট নন। তাঁর প্রকাশনা ব্যবসা একটু দাঁড়িয়ে

যাবার পর থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদের বিনা মূল্যে বই দেন, প্রতি বছর দু'জন রিসার্চ স্কলারকে জলপানি দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর প্রচুর ছোটখাটো দান আছে, সেকথা বাইরের কেউ জানে না। কেউ নতুন ধরনের কোনো যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের কথা বলে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি বিনা দ্বিধায় টাকা পয়সা দিয়ে দেন। এ ব্যাপারে প্রতারিতও হয়েছেন অনেকবার।

বিমানবিহারী বিয়ে করেছেন বেশ দেরিতে। তাঁর পুত্রসন্তান নেই, আছে দুটি কন্যা। তাঁর মা বেঁচে আছেন, তাছাড়া রয়েছেন এক পিসিমা, তিনি ছেলেমেয়ে নিয়ে। কৃষ্ণনগর থেকেও কেউ কেউ এসে থেকে যায়। ছেলেমেয়েদের জন্য একজন গৃহশিক্ষক আছেন, তিনি আক্ষরিক অর্থেই গৃহশিক্ষক, থাকেন এ বাড়িতেই। বাল্যকাল থেকেই বিমানবিহারী লোকজনে জমজমাট বাড়ি দেখতে অভ্যস্ত।

একদিন রাত পৌনে একটায় বাজলো টেলিফোন। সেদিন বিমানবিহারীর সামান্য জ্বর হয়েছে। তিনি সেদিন শুয়েছেন তিনতলায় তাঁর স্ত্রীর ঘরে। ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। চাকর ওপরে এসে খবর দিতেই কল্যাণী বললেন, দিলীপদাবুকে বলে দাও যে বাবুর আজ অসুখ হয়েছে।

কিন্তু এর মধ্যে ঘুম ভেঙে গেছে বিমানবিহারীর। তিনি বললেন, না, না, ধরতে বলো। আমার এমন কিছু হয়নি, আমি আসছি।

নিচে এসে রিসিভার তুলে তিনি অবাক হলেন। দিলীপকুমারের পরিচিত রঙ্গমাখা কণ্ঠ নয়। অপারেটর বললো, মিঃ বি চৌধুরী? হোল্ড দ্য লাইন... ট্রাঙ্ক কল ফর ইউ, ফ্রম লণ্ডন।

বিমানবিহারীর বুক কেঁপে উঠলো। নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ!

ভালো করে শোনা যাচ্ছে না, কয়েকবার হ্যালো হ্যালো ও নানারকম বিচিত্র শব্দের পর একজন বললো, দাদা, আমি মানু বলছি। মানু! সারাদিন ধরে তোমায় ধরার চেষ্টা করছি।

বিমানবিহারী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। লণ্ডন শুনেই তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল। তাঁর এই প্রবাসী ভাইটি সম্পর্কে তাঁকে গোপন দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয়। পারিবারিকভাবে তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও তবু তো নিজেরই ভাই।

বঙ্কুবিহারী পড়াশুনোয় ভালো ছাত্র ছিল, তাই উচ্চশিক্ষার্থে যখন সে বিলেতে যেতে চেয়েছিল, তার দাদা আপত্তি করেননি। কত ছেলেই তো বিলেত থেকে ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয় ফিরে আসে, এখানকার সমাজের চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বঙ্কুবিহারী লণ্ডনে যাবার দেড়বছরের মধ্যে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করে ফেললো এবং তার পড়াশুনো গোল্লায় গেল।

ছোট ছেলের ঐ রকম বিয়ের খবর শুনে মা শয্যাশায়ী হলেন। বউ নাকি থিয়েটারে কাজ করে। থিয়েটারের জগৎ সম্পর্কেই মায়ের প্রবল ঘৃণা আছে। তিনি বিমানবিহারীকে ডেকে বললেন, বীরু, তুই মানুকে লিখে দে, ও যদি ঐ বউকে ছেড়ে দিয়ে এক্ষুনি না ফিরে আসে, তাহলে আমি কোনোদিন আর ওর মুখ দেখতে চাই না।

কিন্তু বঙ্কুবিহারী তার বউকে ত্যাগ করেনি, সঙ্গে সঙ্গে ফিরেও আসেনি। সে সস্ত্রীক এসেছিল বছর চারেক আগে। সরাসরি বাড়িতে না এসে সে উঠেছিল গ্র্যাণ্ড হোটেলে।

মানুর বিদেশিনী বিয়ে করার ব্যাপারে বিমানবিহারীর নিজের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু তিনি মর্মাহত হলেন ছোট ভাই-এর স্বভাবের পরিবর্তন দেখে।

তাঁদের চৌধুরী পরিবারে বিলেত যাওয়াটা নতুন কিছু নয়। মেমবউও আগে দেখেছেন। বিমানবিহারীর এক মেম-কাকিমা ছিলেন, তিনি অতি মধুর স্বভাবের মহিলা। তাঁর কাকাও ছিলেন পুরোপুরি বাঙালী। কিন্তু মানু ফিরলো সাহেবদের একটি ক্যারিকেচার হয়ে, ইংরেজী ছাড়া কথা বলে না, সকলের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব। ওদিকে সে আবার বউ-এর ভয়ে সবসময় অস্থির। বউ যা বলে, সে সেই কথাটাই চারবার হ্যাঁ হ্যাঁ করে। স্বামী নয়, সে যেন বউয়ের মোসাহেব। আসল সাহেবরা কি এরকম বউয়ের আঁচল ধরা হয়? অবশ্য ইংরেজীতে হেন-পেক্‌ড হ্যাজব্যাণ্ড বলে একটা কথা আছে।

বঙ্কুবিহারী যখন বউকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল তখন তাঁর মেম-বউয়ের মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। বিদেশিনীরা অনেকে পুরুষদের মতনই সিগারেট খায়, তা সবাই জানে। অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু বঙ্কু কি তার স্ত্রীকে বোঝাতে পারতো না যে এ দেশে মায়েদের কাছে পুত্রবধূরা ঐভাবে যায় না? সে সাহসই তার নেই।

মা ছেলে বা বউয়ের সঙ্গে একটিও কথা বললেন না, একবার তাকালেন না পর্যন্ত। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বড় ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বীরু, মামুনকে বলে দে, ওরা যেমন হোটেলে উঠেছে

সেখানেই যেন থাকে। এ বাড়িতে তাদের জায়গা হবে না।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত তিক্ততায় পর্যবসিত হলো। মানু তার দাদার কাছে সম্পত্তির অংশ দাবি করে বসলো এবং শাসানি দিল মামলা-মোকদ্দমার। সে চায় ভবানীপুরের বাড়িটা বিক্রি করে অর্ধেক টাকা দেওয়া হোক তাকে। আগে সে সমীহ করতো দাদাকে, চোখ তুলে কথা বলতো না, এখন তার চক্ষুলজ্জার বালাই নেই।

নানা জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে টাকা সংগ্রহ করে বাড়িটাকে বাঁচিয়েছিলেন বিমানবিহারী। বাজার দর অনুযায়ী অর্ধেক টাকা পেয়েও মানু সন্তুষ্ট নয়, যেন শয়তান ভর করেছিল তার মাথায়, সে এই পরিবারটিকে ধ্বংস করে দিতে চায়। বিমানবিহারী যে বই-এর ব্যবসা করছেন তাও নিশ্চয়ই শুরু হয়েছিল পৈতৃক টাকায়, সুতরাং এব্যবসায়েরও অংশ দিতে হবে মানুকে। তা ছাড়া কৃষ্ণনগরের সম্পত্তি আছে। তার আরও অনেক টাকা চাই।

শেষ পর্যন্ত হয়তো চরম কিছু ঘটে যেতে পারতো, কিন্তু তার আগে হঠাৎ মানুর স্ত্রীর টাইফয়েড হয়ে গেল। এ দেশের কোনো ডাক্তারের ওপর তার ভরসা নেই, সেই জন্য হুড়োহুড়ি করে তারা ফিরে গেল ইংল্যাণ্ড।

তারপর মানু আর কোনো চিঠিপত্রও দেয়নি। এতদিন পর গভীর রাতে টেলিফোন।

বিমানবিহারী বললেন, কী খবর, মানু? কেমন আছিস?

মানুর কণ্ঠস্বর বদলে গেছে, ঔদ্ধত্যের ভাব নেই, ইংরেজী বলছে না। সে যেন আগেকার মানু। সে বললো, দাদা, আমরা ভালো আছি। এখন আমরা আয়ার্ল্যাণ্ডে থাকি। নতুন কাজ নিয়েছি, ব্যস্ত ছিলাম, তাই তোমাদের খবর নিতে পারিনি অনেকদিন। মা আছে? মা কেমন আছে?

- মা ভালো আছেন।
- বৌদি? ছেলেমেয়েরা? দাদা, তোমার ব্যবসা কেমন চলছে?
- সবই ঠিক আছে। তোর খবর বল।
- দাদা, আমি কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরতে চাই। আমার স্ত্রী খুব ভারতবর্ষ দেখার ইচ্ছে। তোমার মত আছে?
- তুই দেশে ফিরবি, তাতে আমার অমত থাকবে কেন? নিশ্চয়ই আসবি। কবে আসছিস?
- জাহাজের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। বোম্বেতে নামবো। তাই আগে জানতে চাইলাম, তোমাদের কোনো অমত আছে কি না, তা হলে আর কলকাতায় যাবে না, কাশ্মীরের দিকে চলে যাবে।
- কেন কলকাতায় আসবি না? নিশ্চয়ই আসবি।
- একবার মাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে।
- মায়ের বয়েস গেছে, এখন অনেক সময় নরম হয়েছেন, আমি বুঝিয়ে বলবো।

টেলিফোন ছাড়ার পর বিমানবিহারীর মনে একটা অশুভ চিন্তা এলো। আগেরবার মানুকে তিনি টাকা পয়সা দিয়েছিলেন, তার জন্য কোনো পাকা দলিল লিখিয়ে নেননি। সেই সময় পাওয়া যায়নি। টাকার একটা রশিদ সে দিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে এই বাড়ির ওপর তার অধিকার খারিজ হয়ে যায় না। মানু কি আবার টাকা আদায়ের মতলবে আসছে?

বিমানবিহারী এই চিন্তাটাকে আপাতত উড়িয়ে দিতে চাইলেন। হয়তো মানু সত্যিই আবার বদলে গেছে। তার কণ্ঠস্বরে কাতরতা ফুটে উঠছিল। রক্তের সম্পর্ক মানুষ সহজে অস্বীকার করতে পারে?

মানু যদি এ বাড়িতেই এসে উঠতে চায় সেই জন্য বিমানবিহারী দোতলার দুটি ঘর পরিষ্কার করিয়ে রাখলেন, বাথরুম সারিয়ে, রং করালেন। কল্যাণীকে সব জানালেন, মা-কে কিছু বললেন না আপাতত।

দেড় মাস বাদে বউকে নিয়ে উপস্থিত হলো বঙ্কুবিহারী, ট্যাক্সিতে মালপত্র। বউ দেখে সবাই অবাক। এ তো আগের বউ জুডিথ নয়, অন্য একজন। এ বউও মেমসাহেব বটে, কিন্তু এর পরনে সিল্কের শাড়ি, কপালে লাল টিপ, পায়ে চটি। বঙ্কুবিহারী পরে আছে ধুতি-পাঞ্জাবি।

গাড়ি থেকে নেমে বিমানবিহারীর দিকে হাত দেখিয়ে বঙ্কুবিহারী বললো, লিজ ইনি আমার দাদা।

হাত জোড় করে নম্র গলায়, ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে বাংলায় মেম বউ বললো, নমস্কার। ভালো আছেন?

॥ ১৯ ॥

আগে পিকলু আর বাবলু এক স্কুলে পড়তো, তাতে সুবিধে ছিল, দুই ভাই ফিরতো একসঙ্গে। এখন পিকলু কলেজে যায়, তাই বাবলুর জন্য মমতার প্রতিদিন দুশ্চিন্তা। সেন্ট্রাল এভিনিউ পার হয়ে আসতে হয়। অত বড় রাস্তা, এক মুহূর্তও গাড়ির বিরাম নেই। কিন্তু কে আনতে যাবে বাবলুটা অসম্ভব দুরন্ত বলেই তো বেশি ভয়।

এ পাড়ারই সরকারদের বাড়ির একটি ছেলে শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে পড়তে যায়। সে-বাড়ির একজন চাকর যায় ছেলেটাকে আনতে, তাই মমতা একদিন যেচে সেই ছেলেটির মায়ের সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন। ভদ্রমহিলা বেশ ভালো, তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুখীরাম তো যায়ই, ও আমার ছেলের সঙ্গে আপনার ছেলেকেও নিয়ে আসবে। এতে আর কী আছে!

কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও সুফল পাওয়া গেল না। বাবলু ক্লাস এইটে পড়ে। তার আত্মসম্মান জ্ঞান টনটনে হয়ে উঠছে, সে অন্য বাড়ির চাকরের হাত ধরে বাড়ি ফিরবে কেন? দু'দিন পরেই বাবলু সরকার বাড়ির ছেলেটির সঙ্গে ঝগড়া করলো, তারপর তাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

স্কুল ছুটির পর বাবলু খানিকটা হেঁটে এসেসে সেন্ট্রাল এভিনিউ পেরিয়ে শ্যাম পার্কে ঢুকে পড়ে। এখানে বিভিন্ন ক্লাবের ছেলেরা খেল, বাবলুকে তো তারা খেলতে নেবে না, তাই বাবলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখে আর মাঝে মাঝে দৌড়ে গিয়ে বল কুড়িয়ে এনে দেয়।

প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফেরে বাবলু। খিদে-পেটে অন্য কিছু খেতে পাওয়ার আগে বকুনি খায়। কিন্তু বকুনি বা মারও সে গ্রাহ্য করে না। একমাত্র সে ভয় পায় বাবাকে।

আদালত থেকে ফিরতে ফিরতে প্রতাপের সন্ধে হয়ে যায়। বাবলু ঠিক তার আগে ফিরে আসে। মমতা বা বাড়ির অন্য কেউ প্রতাপের কাছে বাবলুর নামে নালিশ করতে সাহস পান না। বাড়িতে প্রতাপ বড় কড়া হাকিম, তা ছাড়া এখানে আসামী পক্ষের উকিল নেই। তাই শাস্তি বড় গুরুতর হয়। এই বছরেই বাবলু বাবার কাছে দু'বার মার খেয়েছে।

আড়াইখানা মাত্র ঘর, এখন আর জায়গায় কুলোয় না, প্রতাপ নতুন বাড়ি খুঁজতে শুরু করেছেন। এখানে পঁচিশ টাকা ভাড়া দিতে হয়। বাড়ি ভাড়া ইদানীং যে-ভাবে হু-হু করে বাড়ছে তাতে নতুন বাড়িতে নিয়ে গেলেই অন্তত দ্বিগুণ টাকা দিতে হবে। এখন প্রতি পদে পদে টাকার চিন্তা।

একটা ঘর প্রতাপ-মমতার, আর একটা ঘরে সুপ্রীতি থাকেন তুতুলকে নিয়ে, ছোট ঘরটাতে কানু-পিকলু-বাবলুর ঢালা বিছানা। বাইরের লোকজন এলে বসার জায়গা দেওয়া যায় না। কোনো কোনো দিন সকালে প্রতাপের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে তাঁকে ছেলেদের ঘরেই বসতে হয়, ছেলেরা তখন পড়া ছেড়ে উঠে যায়।

পিকলু আর তুতুল দু'জনেই পড়াশুনায় খুব ভালো, সকলের মুখেই তাদের প্রশংসা। বাবলুর পড়াশুনোয় মন নেই, সব সময় তার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি ঘুরছে। দাদা আর ফুলদির থেকে আলাদা হবার জন্যই যেন সে ইচ্ছে করে পরীক্ষায় ফেল করতে চায়। এবারেই অঙ্কে সে পেয়েছে আঠাশ আর ইংরেজীতে বত্রিশ, সেই জন্য তার প্রমোশন আটকে যাচ্ছিল, পিকলু হেড মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে বাবলুকে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু বাবার হাতে বাবলুর মার খাওয়া সে আটকাতে পারে নি।

পিকলু খুব চেষ্টা করে ছোট ভাইটার পড়াশুনোর দিকে মন ফেরাতে। ছুটির দিনে সে বাবলুকে হোম টাস্ক দেয়। কিন্তু বাবলু দাদাকে ভয় পায় না, হঠাৎ হঠাৎ উঠে চলে যায়। পিকলুর খেয়াল হতেই নিজের পড়া ছেড়ে উঠে পড়তে হয় বাবলুকে খুঁজতে, জোরে ডাকাডাকি করতে পারে না, বাবা শুনে ফেললে তিনি নিজেই জানতে চাইবেন বাবলু কোথায়। বাড়ির মধ্যে কোথাও দেখা যায় না বাবলুকে, বাড়ির সামনে রাস্তাতেও সে নেই, একটু এগিয়ে এসে পাশের বস্তির সামনে সে দেখতে পায় যে বাবলু ওখানকার ছেলেদের সঙ্গে ডাং-গুলি খেলছে।

মহা বিস্ময়ের সঙ্গে পিকলু ডাকে, বাবলু! তুই...

তার উত্তরে বাবলু হাসে।

রাত্তিরে আলোনিবিয়ে দেওয়ার পর পাশাপাশি শুয়েওদের তিনজনের নানারকম গল্প হয়। কানু শোনায় তার অফিসের গল্প। সম্প্রতি আগের চাকরি ছেড়ে সে একটা ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছে। যদিও তার চাকরিটা ক্লারিকাল, ক্যাশ-ঘরে ঢোকার কথা নয় তার, কিন্তু রোমহর্ষক কাহিনী বানাতে সে ওস্তাদ। শোভাবাজার রাজবাড়ির এক রানী একদিন নাকি এক ঘড়া মোহর নিয়ে এসেছেন ব্যাঙ্কে

ভাঙাবার জন্য। কানুর ওপর সেই মোহর গুনবার ভার দিলেন ম্যানেজারবাবু। সেই মোহর গুনতে গুনতে কানু দেখতে পেল এক একটা মোহরের গায়ে লেগে আছে রক্তের দাগ। সোনার ঘড়াটার গায়েও ছিটে ছিটে রক্ত শুকিয়ে আছে। মোহর-ভর্তি সোনার ঘড়া মাটিতে পুঁতে রাখার সময় একটা ছোট ছেলেকে মেরে তার দেহটাও একসঙ্গে পুঁতে রাখতো তো ওরা, যখ হয়ে পাহারা দেবার জন্য...।

এই কাহিনী শুনে পিকলু আর বাবলুর মনে দু'রকম প্রতক্রিয়া হয়।

রাজবাড়ির রানীর চেহারাটা কল্পনা করতে চায় পিকলু। চাঁপাফুলের মতন গায়ের রং, নীল রেশমী শাড়ী পরা, মুখে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব, উদাসীনভাবে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। মুখখানা কার মতন? কার মতন? অনেকটা বুলা মাসির মতন নয়!

আর বাবলু ভাবে, শোভাবাজার রাজবাড়িটা একদিন সে দেখেছে। গেটের বাইরে দুটো সিংহ মূর্তি। তাদের স্কুল থেকে বেশি দূর নয়। একদিন সে দেখেছ। গেটের বাইরে দুটো সিংহ মূর্তি। তাদের স্কুল থেকে দূর নয়। একদিন টপ করে ঢুকে পড়তে হবে ঐ বাড়ির মধ্যে। নিশ্চয়ই ওখানে এখনো গুপ্তধন আছে।

পিকলু স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ে। প্রত্যেকদিন সে আট আনা হাত খরচ পায়। তাছাড়া, কোনো কোনোদিন যদি সে মমতাকে বলে, মা, আজ বসন্ত কেবিনে বন্ধুদের সিঙ্গাড়া খাওয়াতে হবে, কাল একটা বাজিতে হেরে গেছি, দুটো টাকা দাও, তাতে মমতা আপত্তি করেন না। বাবলুর হাত খরচ দু'আনা মাত্র। তা দিয়ে সে ঘুড়ি কিনবে না আলু কাবলি খাবে? এখন আলু কাবলি চার পয়সা পাতা হয়ে গেছে। বাবলু এই জন্য দারুণ হিংসে করে দাদাকে। ইস্কুলের শেষ দুটো বছর যেন সে আর সহ্য করতে পারছে না। সে এখনই এক লাফে কলেজে গিয়ে স্বাধীন হতে চায়।

একদিন এক ক্লাস-ফ্রেণ্ডের দিদির বিয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গেল পিকলু, বলেই গিয়েছিল যে তার ফিরতে দেরি হবে, সে ফিরলো রাত সাড়ে দশটায়। ঘুম এসে গেলেও জোর করে চোখ ফিরবে। এ এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। মা-বাবা-পিসিমা মুখে কোনো উদ্বেগ না দেখালেও গল্প করছেন পাশের ঘরে, পিকলু না ফেরা পর্যন্ত তাঁরা শুতে যাবেন না।

পিকলু অত রাতে ফিরলেও কেউ বকুনি দিলেন না। মা প্রায় হাসি মুখেই জিজ্ঞেস করলেন। হ্যারে পিকলু, এত রাত হলো? কার সঙ্গে ফিরলি!

পিকলু বললো, অনেক দূরে যে। আমি ফার্স্ট ব্যাচেই খেয়ে নিয়েছি, তারপর বাসে আসতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। আমার আর এক বন্ধু বঙ্গে ছিল, সে নেমে গেল বিডন স্ট্রিটে।

- সেও তো অনেক দূর। তারপর থেকে একলা এলি?

- মা, বাসে তো আরও অনেক লোক ছিল। একলা কী করে আসবো?

পিকলু জামা-প্যান্ট বদলে শুয়ে পড়ার পর বাবলু তার দাদার মুখে সিগারেটের গন্ধ পেল। ঠোঁট লাল। পানও খেয়েছে। সব বড়দের মতন। বাড়িতে সাহস পায় না, কিন্তু পিকলু বাইরে সিগারেট খায়, তা বাবলু জানে। কানু সিগারেট টানার জন্য ছাদে উটে যায়।

কানু জিজ্ঞেস করলো, বিয়ে বাড়িতে গেলি, গোল্ড ফ্লেকের টিন আনিসনি!

পিকলু বললো, না তো! কী করে আনবো?

কানু বললো, আমি কোনেরা বিয়ে বাড়িতে গেলেই একটা পুরো টিন পকেটে ভরে ফেলি। অনেকগুলো থাকে তো, কেউ লক্ষ করে না।

পিকলু বললো, কত দূর গিয়েছিলুম জানো? সেই বালিগঞ্জ! কী সুন্দর জায়গা!

কানু অভিজ্ঞের ভাব দেখিয়ে বললো, আমি চিনি বালিগঞ্জ। বালিগঞ্জের কোথায় তোর বন্ধুর বাড়ি?

- রাসবিহারী এভিনিউ। কী চমৎকার রাস্তা! দু'পাশে গাছ। ট্রাম চলে মাঝখান দিয়ে। রাস্তাটা পরিষ্কার তেল চকচকে, আর কত বড় বড় দোকান, কাচের শো-কেস দিয়ে ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। আর একটা কী জিনিস দেখলুম জানো, কানুদাদা, মেয়েরা চেন-বাঁধা কুকুর নিয়ে ওখানে একলা একলা বেড়াতে বেরোয়।

- হ্যাঁ, পাড়াটা ভালো। সেজদা তো বাড়ি বদলাবার কথা ভাবছে, বল না, ও পাড়ায় একটা বাড়ি নিতে।

- ওটা তো বড়লোকদের পাড়া। একটাও খালি গায়ে কিংবা নোংরা জামা পরা লোক দেখিনি।

বাবলু নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে। যেন কোনো রূপকথার জগতের কাহিনী। সে একবার মা-বাবার

সঙ্গে কালীঘাটে একটা নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল, অনেকদিন আগে, ভালো করে মনে নেই, তাছাড়া ফেরার পথে সে ঘুমিয়ে পড়িছিল। বালিগঞ্জ কি তা থেকেও দূরে?

সে তখনই ঠিক করে ফেললো, একদিন সে একা একা বালিগঞ্জে বেড়াতে যাবে। বড় হওয়া পর্যন্ত সে আর ধৈর্য রাখতে পারবে না। মেয়েরা চেনা-বাঁধা কুকুর নিয়ে একলা একলা বেড়াতে বেরোয়? কী রকম কুকুর, তাকে দেখতেই হবে।

ক'দিনের টিফিনের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে সে এক টাকা করলো। তরপর একদিন কার জন্মদিনের জন্য যেন হাফ-হলিডে হতেই ভালো সুযোগ এসে গেল তার। বাড়ির কেউ তো জানে না যে আজ ছুটি হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে সে চলে এলো শ্যামবাজার। এখানে সে বালিগঞ্জ লেখা দোতলা বাস দেখেছে।

সেরকম একটা বাসে উঠে পড়লো বাবলু। ওপর তলায় উঠে একেবারে সামনে গিয়ে বসলো। হু-হু করে হাওয়া দেয় এখানে। রাস্তার ধারের গাছের ডাল জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সামনের রাস্তাটা কত দূর পর্যন্ত দেখা যায়, যেন তেপান্তরের মাঠে চলে গেছে।

এক সময় কণ্ডাক্টর এসে বললো, খোকা, তোমার সঙ্গে কে আছে!

বাবলুর বুক কেঁপে উঠলো। এরা বুঝি তার মতন বয়েসি ছেলেদের একা যেতে দেয় না? সে রকম নিয়ম নেই? এখন তাকে নামিয়ে দেবে বাস থেকে?

বাবুল কোনো উত্তর না দিয়ে শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলো।

কণ্ডাক্টর আবার জিজ্ঞেস করলো, তোমার টিকিট কে কাটবে?

এবারে বাবলু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললো, আমি! বালিগঞ্জ যাবো।

সে সব কটা খুচরো পয়সা এগিয়ে দিতে কণ্ডাক্টর তার থেকে তুলে নিল একটা সিকি।

বাবলুর পাশে বেশ হোমরা-চোমরা ধরনের বয়স্ক লোক বসেছেন। তিনি বাবলুর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, খোকা, তোমার নাম কী?

- শ্রীঅতীন মজুমদার।

- ইস্কুল থেকে ফিরছো, তুমি বালিগঞ্জ থেকে এতদূর পড়তে আসো? কেন, ওখানেও তো ভালো ভালো ইস্কুল আছে!

বাবলু চুপ করে রইলো।

- বালিগঞ্জে কোথায় থাকো?

- রাসবিহারী এভিনিউ।

- হ্যাঁ, রাসবিহারী এভিনিউ এর কোন জায়গায়-ওটা তো অনেক বড় রাস্তা! দেশপ্রিয় পার্ক? ট্রায়ঙ্গুলার পার্ক?

বাবলু দ্বিতীয়টিতে মাথা নেড়ে দিল বিনা দ্বিধায়।

কথাবার্তা আর বেশি দূর এগোলো না! ভদ্রলোক সামনের দিকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, এ কী। আজ আবার কোন্ হাঙ্গামা শুরু হলো?

বাবলু দেখলো, রাস্তার মাঝখানে অনেক লোক দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাসটাতে থামাতে চাইছে। ড্রাইভার কিন্তু বাসটা থামালো না, পাশ কাটিয়ে এগোবার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড একটা হইচই উঠলো, বাসের গায়ে দুম দাম কিসের আঘাত পড়তে লাগলো। বাসটা তবু বেরিয়ে গেল খুব টেনে।

বাবলুর পাশের ভদ্রলোক বললেন, যাক, খুব বাঁচোয়া! রোজ একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। আর পারা যায় না। এই গভর্ণমেন্টও হয়েছে অপদার্থ।

বাসের সব যাত্রী এক সঙ্গে যোগ দিল রাজনৈতিক আলোচনায়।

বাবলু সে সব কিছু শুনছে না। সে চোখ ভরে দেখছে এসপ্লানেডের অপরূপ দৃশ্য। এ যেন সত্যিকারের সেই তেপান্তরের মাঠ। সবুজ ঘাসে ভরা। যত দূর চোখ যায়, আর কিছু নেই। এক পাশে কী সব প্রকাণ্ড বাড়ি। আর ঐ তো মনুমেন্ট!

এক একটা জিনিস চিনতে পারছে আর বাবলুর বুকটা ধক ধক করছে। কলম্বাস, ম্যাগেলান, ডঃ লিভিংস্টোনের মতন আবিষ্কারকদের তুলনায় বাবলুর রোমাঞ্চকর উত্তেজনা এখন কিছু মাত্র কম নয়। একটি সাড়ে তের বছর বয়স্ক কিশোরের চোখের সামেন খুলে যাচ্ছে অচেনা জগৎ।

বাসটা আর বেশি দূর যেতে পারলো না। এলগিন রোডের কাছে ক্রুদ্ধ জনতা রাস্তার ওপর ব্যারিকেড বানিয়েছে। ট্রাম ভাড়া আন্দোলনের সময় কয়েকটি ট্রাম পোড়াবার পর এখন যে-কোনো

আন্দোলনেই বিক্ষোভকারীরা ট্রাম-বাস পোড়াবার খেলায় মেতে ওঠে।

ওপরের সব লোক দুদ্দাড় করে কেন নেমে গেল, তা বুঝতে পারলো না বাবলু। কেউ তাকে ডাকলোও না। বাবলু বসেই রইলো। নিচে তুমুল গোলমাল হচ্ছে, এসব তার একটুও ভালো লাগছে না। এখনো নিশ্চয়ই বালিগঞ্জ আসেনি, একটিও মেয়েকে চেন-বাঁধা কুকুর নিয়ে বেড়াতে দেখেনি সে।

বুম বুম করে দুটি বোমা ফাটার আওয়াজ ও বাসের গায়ে আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠতেই বাবলু বিপদের গন্ধ পেয়ে গেল। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে সে দেখলো শুধু ধোঁয়া। কিন্তু সে ভয় পেল না। গোঁয়ারের মতন সেই ধোঁয়ার মধ্য দিয়েই সে লাফিয়ে চলে এলো। তার গায়ে সামান্য আঁচ লেগেছে, আর বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি।

জ্বলন্ত বাস থেকে একটা ছেলেকে বেরিয়ে আসতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো অনেকে। কেউ বললো, এই খোকা, আর কে আছে? আর কেউ আছে? কেউ বললো, পালা, শিগগির পালা। তোকে পুলিশে ধরবে।

খানিকটা ছুটে আসবার পর তার খেয়াল হলো, যে তার স্কুলের সব বই খাতা ফেলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ফিরলো। এইবারে তার সত্যিকারের ভয় করছে। বই-খাতা না-নিয়ে সে বাড়ি যাবি কী করে?

জ্বলন্ত বাসটার কাছে বাবলু আর পৌঁছোতে পারলো না, এক পলায়নপর জনতার ঢেউ তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল অন্য দিকে। শোনা যাচ্ছে দমকলের ঘণ্টাধ্বনি, এক গাড়ি পুলিশও এসে পড়েছে।

একটা ঢেউ তাকে নিয়ে গেল পাশের রাস্তায়। তারপর আর একটা রাস্তায়। তারপর সে হয়ে গেল হারিয়ে যাওয়া ছেলে। ট্রাম-বাস-গাড়ি-ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে গেছে, এক একটা রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ চলছে পুলিশ-জনতায়, কী করে বাড়ি ফিরতে পারা যায় এখান থেকে, তা বাবলু জানে দূর, আজ আর সেখানে যাবে কী করে?

বাবলু তবু হার স্বীকার করে না মারামারির জায়গা থেকে সে অন্য দিকে ছুটে যায়, আবার রাস্তা হারিয়ে ফেলে, আবার রাস্তা খোঁজে। এক বেলাতেই সে যেন অনেক বড় হয়ে গেছে।

রাত প্রায় পৌনে আটটায় সময় বাবলু বাড়ি পৌঁছোলো। স্কুলের বই খাতা নেই, পায়ের চটি খুলে গেছে কোন্ সময়, জামার খানিকটা অংশ পোড়া, কিন্তু তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। অচেনা বিপদসঙ্কুল জায়গা থেকে সে একলা একলা ফিরে আসতে পেরেছে, এই জয়ের আনন্দ তার চোখে।

শহরের নানা অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে গোলমাল হয়েছে শুনে প্রতাপ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছেন, সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। তখনো বাবলু ফেরেনি। পাড়ার সরকার বাড়ির ছেলেটির কাছ থেকে খবর নিয়ে জানা গেল, স্কুলে সেদিন হাফ-ছুটি হয়েছে। অর্থাৎ বেলা দুটো থেকে বাবলুর পাত্তা নেই। অথচ শ্যামবাজার বাগবাজার পাড়ায় তো কোন গোলমাল হয়নি! তাহলে কী সাঙ্ঘাতিক দুশ্চিন্তার কথা!

কানু আর পিকলু হাসপাতাল আর থানায় গিয়ে খবর নিয়েছে। প্রতাপ রাস্তায় মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন অনেকক্ষণ। তারপর স্কুল থেকে বাবলুর যে-পথ দিয়ে বাড়ি ফেরার কথা, সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছেন স্কুল পর্যন্ত, মাঝে মাঝে পাড়ার ছেলেদের জিজ্ঞেস করেছেন, সেদিন বাবলুর বয়েসী কোনো ছেলের অ্যাকসিডেন্টের খবর তারা জানে কি না।

বাবলু যখন ফিরলো তখনো কানু আর পিকলু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিল। ছোট ভাইকে ফিরতে দেখে পিকলু খুশী হবার বদলে শিউরে উঠলো।

বাবলুকে বাড়িতে ফিরলো কানু আর পিকলু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিল। ছোট ভাইকে ফিরতে দেখে পিকলু খুশী হবার বদলে শিউরে উঠলো।

বাবলুকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর মমতা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। সুপ্রীতি বললেন, ওকে হাত-মুখ ধুইয়ে আগে কিছু খেতে দাও। দেখেছো চোখ মুখের অবস্থা!

প্রতাপ বললেন, দাঁড়াও, আমি আগে ওর সঙ্গে কথা বলবো।

প্রতাপ বাবলুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে যেতেই সুপ্রীতি বললেন, ওকি, দরজা বন্ধ করছিস কেন?

প্রতাপ বললেন, দিদি, এ ছেলে কুসঙ্গে পড়ে একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। তুমি আর মমতা আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওর সর্বনাশ করছো। আমাকে এখন বাধা দিও না।

সুপ্রীতি তবু দৃঢ়ভাবে বললেন, না, দরজা বন্ধ করতে পারবি না। আমি আর মমতাও থাকবো;

আমরাও শুনবো!

দূরে দাঁড়িয়ে পিকলু সুপ্রীতির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলো। আজ মায়ের কথাও বাবা শুনতেন না। বাবলু যা কাণ্ড করেছে, এরকম আগে আর কখনো হয়নি। আজ বাবা রাগের চোটে যে কী করবেন তার ঠিক নেই। কলেজের বন্ধুরা বলে, বাঙালদের রাগ বেশী হয়!

বাবলুকে টেনে এনে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলি? বল, সত্যি করে বল্!

সুপ্রীতি বললেন, খোকন, এখন থাক না। ছেলেটা আগে একটু জিরিয়ে নিক। নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছিল। ফিরে যে এসেছে এই-ই তো ভাগ্য!

প্রতাপ এবারে গর্জন করে বললেন, দিদি! এখন আমার ওপর কোনো কথা বলো না। একটু সরে দাঁড়াও! বাবলু, বল কোথায় গিয়েছিলি?

বাবলু মুখ গোঁজ করে নিরুত্তর রইলো। বাবার রাগ দেখেও তার ঠিক ভয় হচ্ছে না। বরং অভিমানে বুক ভরে যাচ্ছে। সে যে কী-ভাবে বাড়ি ফিরে এসেছে, তা কেন কেউ আগে জানতে চাইছে না! তার চেয়ে মরে গেলে বেশ হতো!

প্রতাপের আরও তিনবার জিজ্ঞাসার উত্তরে বাবলু বললো, এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম।

- কেন না বলে বন্ধু বাড়িতে গিয়েছিলি? কোথায় সেই বন্ধুর বাড়ি? বাবলু একদিকে হাত দেখিয়ে বললো, ঐদিকে।

- ঐদিকে মানে? কত দূরে? সে জায়গার নাম কী?

- জানি না।

- বইপত্তর কোথায় গেল। বল্! সত্যি কথা বল!

- হাত থেকে পড়ে গেছে।

- হারামজাদা ছেলে, হাত থেকে এমনি এমনি বইখাতা পড়ে যায়?

প্রতাপ প্রথম থাপ্পড়টা এত জোরে কষালেন যে বাবলুর মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। তারপর প্রতাপ লাফিয়ে এসে বাবলুর চুলের মুঠি চেপে ধরে হিংস্রভাবে বললেন, এরকম কুলাঙ্গার ছেলে থাকার চেয়ে না-থাকা ভালো। আজ আমি একে শেষ করে দেবো।

সুপ্রীতি ও মমতা দু'দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নেবার আগেই প্রতাপ মারতে মারতে বাবলুকে প্রায় আধমরা করে ফেললেন। মমতা এক সময় সরে গিয়ে বললেন, মারো, যত ইচ্ছে মারো, মেরে ফেলো ছেলেটাকে! সুপ্রীতি হাল ছাড়লেন না, বাবলুকে মারার জন্য প্রতাপ একটা ছড়ি তুলতে সুপ্রীতি বললেন, ওটা দিয়ে তুই আগে আমাকে মার।

সুপ্রীতি বাবলুকে নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তোয়ালে ভিজিয়ে গা-মুখ মুছে দিতে লাগলেন। বাবলুর হেঁচকি উঠছে অনবরত, চোখে এক ফোঁটা জল নেই, চোখ বোজা। কিন্তু পিকলু তার নিজের চোখের জল সামলাতে পারছে না। তুতুলও কাঁদছে। তুতুলের ধারণা, এত মার খেলে কেউ বাঁচে না।

সুপ্রীতি এক গেলাস দুধ বাবলুকে খাওয়াতে যেতেই সে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল। সে খাবে না। খাবে না তো কিছুতেই খাবে না। মা, পিসি, দাদা, দিদির হাজার কাকুতি-মিনতিতেও সে এক দানা খাদ্যও মুখে তুললো না। এমন জেদী ছেলে, দাঁতে দাঁত চেপে রইলো।

সে রাতে সুপ্রীতির ঘরেই শুইয়ে রাখা হলো বাবলুকে। নিজেদের ঘরের বিছানায় পিকলু ছটফট করছে, তার ঘুম আসছে না। বাবলুর কি হাড়-গোড় কিছু ভেঙে গেছে? ওর কি খুব কষ্ট হচ্ছে? মায়ের ওপরেই যেন তার বেশি রাগ। মমতা কিছু দিতে এসে সে দু'হাত ছুঁড়ে বাধা দেয়।

অনেক রাত, বোধ হয় সাড়ে বারোটা-একটা হবে, মমতা নিজের ঘরে থেকে উঠে এসে সুপ্রীতির ঘরের দরজাটা ঠেলে খুললেন। বাবলুর বিছানার পাশে বসে পড়ে বললেন, বাবলু, তুই আমার কাছে আসবি না? তুই আমার কাছে আর কোনোদিন আসবি না?

মা বলে একটা আর্ত চিৎকার করে বাবলু উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো মমতার বুকে। তারপর ফোঁপাতে লাগলো।

পাশের ঘর থেকে পিকলু সব শুনছে পাচ্ছে। কানুও জেগে আছে। সে হাসতে হাসতে এই সময় বললো, কাল বাড়িতে মাংস আসবে। বাবলুটাকে কোনোদিন মারলেই সেজদা পরের দিন অনেক পয়সা খরচ করে। আমায় মারলে কিন্তু কিছু করে না!

পিকলু কাতরভাবে কানুর দিকে তাকালো। কানুকাকাটা কী নিষ্ঠুর। এই সময় ঐ কথাটা না বললে চলতো না?

পরদিন বাবলুকে স্কুলে পাঠানো হল না, তার সারা গায়ে ব্যথা। প্রতাপও আদালতে গেলেন না, শুয়ে শুয়ে শুধু খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন, যেন কতদিনের পুরোনো সব কাগজ তাঁর পড়া বাকি ছিল।

বিকেল চারটের সময় তিনি পোশাক পরে প্রস্তুত হয়ে বাবলুকে ডেকে বললেন, বাবলু, তুই চল আমার সঙ্গে!

মমতা অমনি শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ওকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে...?

প্রতাপ গম্ভীরভাবে বললেন, তোমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাচ্ছি বলে তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি? আমি কি ওকে মেরে ফেলবো?

বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বড় রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি ধরলেন। ড্রাইভারকে বললেন, চলো গড়ের মাঠ।

অনেকক্ষণ পিতাপুত্রে একটিও কথা নেই। দু'জনে তাকিয়ে আছে দু'দিকে।

তারপর ট্যাক্সি ময়দানের কাছাকাছি আসবার পর প্রতাপ বললেন, বাবলু, কাল কোথায় গিয়েছিলি? বল আমাকে! তুই যতক্ষণ না বলবি ততক্ষণ আমার খুব কষ্ট হবে। আমি আমার বাবার কাছে কোনোদিন মিথ্যে কথা বলিনি! তুই কোথায় গিয়েছিলি, বল, বাবলু! বল, কোথায় গিয়েছিলি, বাবলু, বল্ বল্।

বাবলু তবু কোনো কথা বললো না। বাবার সঙ্গে সে সারাজীবন আর কথা বলবে না ঠিক করেছে। বাবা তাকে মেরে ফেললেও সে মুখ খুলবে না!

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে প্রতাপ বাবলুর হাত শক্ত করে ধরে গম্ভীর ভাবে বললেন, চল আমার সঙ্গে!

যেন তিনি আদি বাইবেলের কোনো চরিত্রের মতন সন্তানকে পাহাড় শিখরে নিয়ে যাচ্ছেন বলি দেবার জন্য। আকাশে জমাট কালো মেঘ, অসময়ে নেমে আসছে অন্ধকার। ঘাসের ওপর দিয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটবার পর প্রতাপ একটা রেইনট্রি গাছের নীচে দাঁড়ালেন। বেশ কয়েক মুহূর্ত তীব্র ভাবে চেয়ে রইলেন ছেলের মুখের দিকে। অকস্মাৎ ধরা গলায় তিনি বললেন, বাবলু, তুই কি ভাবিস, তোকে মারলে আমার ভালো লাগে? বাবা-মায়ের কত কষ্ট হয়, বড় হয়ে এক সময় বুঝবি! জানিস তো আমি মিথ্যে কথা সহ্য করতে পারি না, সত্যি কথা বললে রাগ করবো না, আমাকে সব সময় সত্যি কথা বলবি...কাল কী হয়েছিল, ঠিক করে বল...

বাবাকে হঠাৎ এ রকম নরম হয়ে যেতে দেখে বাবলু যেন খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল! বাবার এ রকম গলার আওয়াজ সে আগে কক্ষনো শোনে নি। সেও খুব দুর্বল হয়ে পড়লো, ফোঁপাতে ফোঁপাতে কাঁপ কাঁপা গলায় বললো, দাদা একা একা বালিগঞ্জে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল...তাই আমি বালিগঞ্জ দেখবার জন্য...বাসে আগুন লেগে গেল...

সন্তানের প্রতি দুর্বলতা প্রতাপ মমতা-সুপ্রীতিকে দেখাতে চান না বলেই বোধহয় প্রতাপ বাবলুকে নিয়ে এসেছেন এত দূরের ময়দানে। এখন এই নিরালায় কান্না সামলাতে সামলাতে তিনি পুত্রকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করতে লাগলেন।

॥ ২০ ॥

তুতুল বাগবাজারের একটি স্কুলে ক্লাস টেন-এ ভর্তি হয়েছে। বাড়ি থেকে স্কুল বেশি দূরে নয়, সহজ রাস্তা, সে একাই যায়-আসে। স্কুল থেকে ফেরার পথে সে এক একদিন আড়চোখে তাকায়। পেছনে পেছনে অনেকটা পথ আসে। এরা বরানগরের ছেলে, তুতুল ওদের মুখ চেনে, ওদের মধ্যে যে বেশি লম্বা, ঠোঁটে সব সময় সিগারেট ঝুলে থাকে, সে একদিন বরানগরের স্কুল থেকে ফেরার সময় তুতুলের হাতে জোরে করে একটা চিঠি গুঁজে দিয়েছিল।

ছেলেদুটিকে দেখলেই তুতুলের ভয় ভয় করে। কিন্তু বাড়িতে এসে মা-কে আর কিছু বলে না।

পড়াশুনো করতে তার ভালো লাগে, ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া সর্বক্ষণ তার হাতে বই। পিকলু বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরির মেম্বার হয়েছে, সে দু'খানা করে বই আনে, তুতুল সেই বই পিকলুর কাছ থেকে কাড়াকাড়ি করে পড়ে। স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকেও সে পত্র-পত্রিকা পায়। বরানগরের বাড়িতে থাকার সময় কিছুদিন তার জন্য একজন বৃদ্ধ গানের মাস্টার রাখা হয়েছিল; দেওঘরে বিশ্বনাথ কয়েকদিন তুতুলকে সাধাতে গিয়ে বলেছিলেন, এ মেয়ের কিন্তু গান হবে। চর্চা করলে নাম হবে।

কিন্তু এখন তুতুলের গানের পাট চুকে গেছে। বরানগরের বাড়ি ছাড়ার সময় হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসা হয় নি, এখানে তুতুল বাথরুমে মাঝে মাঝে গুন গুন করে শুধু।

শোবার ঘরেই জানলার পাশে একটা ছোট টেবিল, সেখানে বসে পড়াশুনো করে তুতুল। পাশের ঘরে পিকলু আর বাবলু প্রায়ই চ্যাঁচামেচি করে, তাছাড়া মাঝে মাঝেই চলে আসে বাইরের লোক, তাই তুতুলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা।

এই ঘরের সামনে গলি, উল্টোদিকেই একটি ছোট একতলা বাড়ি। সেই বাড়ির উঠোনে একটি আমগাছ আছে, গাছটির শাখা-প্রশাখা ঢেকে দিয়েছে অর্ধেক ছাদ।

গলি দিয়ে কতরকম ফেরিওয়ালা হেঁকে যায়, কে কখন আসবে তা তুতুলের মুখস্থ হয়ে গেছে। সকালের দিকে আসে, মুড়ির চাক, চিঁড়ের চাক, ছোলার চাক চাই! তিলকুটো, চন্দ্রপুলি, শোন-পা,-প-ড়ি! মাখন চাই, মাখন যে বলে তার গলা অনেকটা কীর্তন গায়ক কানাকেষ্টর মতন। দুপুরে আসে বাসনওয়ালীরা, তাদের এক একজনের গলায় এক এক রকম সুর, তাদের মধ্যে একটি লাল-ফুল ছাপ শাড়ী পরা বাসনওয়ালীকে কি সুন্দর দেখতে। একজন পুরুষ বাসনওয়ালাও আসে, সে খুব গেরেমভারি, তার পেছনে একটি মুটের মাথায় থাকে পেতল-কাঁসার বাসনপত্র, আর সে নিজে একটা কাঁসি বাজাতে বাজাতে আসে। চুড়িওয়ালা ও শিল কাটাবে—এরাও দুপুরেই আসে। সন্ধের পর পকৌড়ি, মালাই-বরফ, আর বেলফুল চাই, বেল ফুল!

বরানগরে মস্ত বড় বাড়ি ছিল, সেখান থেকে রাস্তার প্রবাহিত জীবনের শব্দ-গন্ধ এমন পাওয়া যেত না।

সামনের একতলা বাড়িটার ছাদের ওপর ছাতার মতন মেলে থাকা আমগাছটায় কত রকম পাখি এসে বসে। আসে ঝাঁক ঝাঁক টিয়া পাখি। শালিক-চড় ই-পায়রা তো আছেই। একদিন একটা বেশ বড় মতন খয়েরি-সাদা মেশানো ল্যাজ-ঝোলা পাখি এসে বসেছিল, তুতুল সে পাখির নাম জানে না। আমগাছটার ডগার দিকে ডালে প্রায় আটকে থাকে একটা না একটা ঘুড়ি। বৃষ্টির সময় গাছের ডালগুলো যেন প্রবল খুশীতে মাথা ঝাঁকাতে থাকে।

ঐ ছাদে, আমগাছের ছায়ায় প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকে একটি যুবক। পা-জামার ওপর গেঞ্জি পরা, মাথায় বড় বড় চুল, জুলফি দুটো কানের লতি পর্যন্ত নামানো। সে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তুতুলের জানলার দিকে। তুতুলের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে হাতছানি দিয়ে কী যেন বলতে চায়। তুতুল সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। ঐ যুবকটির কথাও তুতুল মাকে বলেনি কিন্তু সুপ্রীতির ঠিক নজরে পড়ে গেল একদিন। সুপ্রীতি নিজে অনেকক্ষণ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাতেও সেই যুবকটি সরে গেল না, তার চক্ষুলজ্জা নেই, নিজেদের বাড়ির ছাদে সে ঘুরবে। তাতে কার কী বলার আছে?

সুপ্রীতির নির্দেশে এখন সেই জানলা বন্ধ রাখতে হয় তুতুলকে। এজন্য তার কান্না পেয়ে যায় মাঝে মাঝে। একটা জানলা আছে, তবু খোলা যাবে না। দিনের বেলা আলো জ্বেলে বই পড়তে হবে। যদি পিকলু এই টেবিলে বসে পড়াশুনো করতো, তাহলে কি জানলা বন্ধ রাখতে হতো?

তিনতলায় বাড়িওয়ালাদের কাছে অনেকগুলো বাঁধানো প্রবাসী পত্রিকা আছে, আর আছে বসুমতী সিরিজের কয়েকটা গ্রন্থাবলী। গল্পের বই-এর অনটন হলে তুতুল ওপর থেকে ঐ বই আনতে যায়। বাড়িওয়ালার স্ত্রী প্রথম দিন থেকেই ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন, তাঁর সঙ্গে গল্প করতেও ভাল লাগে।

কিন্তু সেখানেও একটা উপদ্রব আছে। অতসীর এক মামাতো ভাই হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে, প্রায়ই সে দুপুরের দিকে চলে আসে দিদির কাছে। তুতুল যেদিনই ওপরে যায় সেদিনই সে ঐ ছেলেটিকে অতসীর ঘরে শুয়ে থাকতে দেখে। ছেলেটি হস্টেলের জীবন সম্পর্কে নানা রকম মজার মজার গল্প বলে, খাট থেকে নেমে সে নানান অঙ্গভঙ্গি করে হস্টেল-সুপারের চরিত্র বোঝায়। শুনতে বেশ মজাই লাগে।

একদিন ঐ রকম গল্প হচ্ছে, হঠাৎ অতসী বললেন, এই রে, উনুনে দুধ চাপিয়ে এসেছি, তোর গল্প শুনতে শুনতে সব গেল বুঝি রে! বলেই তিনি দৌড়ে চলে গেলেন রান্না ঘরে।

আর সঙ্গে সঙ্গে মামাতো ভাইটি তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে বললো, দেখি তো তুতুল, তুমি কতটা লম্বা! সে তুতুলের কাঁধে হাত দিয়ে তার পাশে দাঁড় করাবার ছলে ইচ্ছে করে তুতুলের বুক ছুঁয়ে দিল।

তারপর থেকে আর তুতুল তিনতলায় যায় না।

এই সব কারণে, মাঝে মাঝেই মেয়ে হয়ে জন্মাবার জন্য তুতুলের ভীষণ রাগ হয়! সে ভাবে, ভগবান কেন এত স্বার্থপর? ভগবান নিজে পুরুষ বলেই মানুষের মধ্যে পুরুষদের অনেক বেশি সুবিধে দিয়ে মেয়েদের অনেক ব্যাপারে বঞ্চিত করেছেন। পিকলু তার থেকে মাত্র দেড় বছরের বড়, অথচ তার তুলনায় পিকলু কত স্বাধীন! তুতুল যতই মন দিয়ে পড়াশুনো করুক, তবু তাকে যত ব্যাঘাত সহ্য করতে হয়, পিকলুকে তো সে সব কিছুই সহ্য করতে হয় না!

বইতে মন বসাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে তুতুলের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে তুতুল বরানগরের সেই ছেলেদুটির সঙ্গে তার পিসতুতো দাদা শিবেনকে দেখতে পেল। বোস পাড়া লেনের মুখটায় দাঁড়িয়ে সে অন্য দু'জনের সঙ্গে সিগারেট টানতে টানতে গল্প করছে। তার চেহারা ও পোশাক ঠিকই বোঝা যায় সে বনেদী বংশের ছেলে।

তুতুলের জন্য সে প্রতীক্ষা করছিল, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তুতুলকে দেখে এগিয়ে এসে সে অবাক হবার ভাণ করে বললো, আরে, তুতুল, তোরা এখেনে থাকিস নাকি? বরানগর থেকে চলে এলি, তারপর তো কোনো পাত্তাই নেই! মাইমা কেমন আছেন? তুই এত রোগা হয়ে গেলি কী করে র‍্যা?

উত্তরের অপেক্ষা না করে শিবেন নিজেই অনেক কথা বলে যায়। তারপর একবার জিজ্ঞেস করলো, তোরা কোন্ বাড়িতে থাকিস? চল, মাইমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

তার পরনে গিলে করা পাঞ্জাবি, গলায় পাউডার ও একটি সোনার চেইন, ধুতির কোঁচার ফুলটি রাস্তার ধুলো ঝাড় দিতে দিতে চলে। বাড়িতে এসে সে সুপ্রীতির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললো, মাইমা, হঠাৎ চলে এলেন, আমাদের একটা খপরও পর্যন্ত দিলেন না। আমরা কি আপনার পর?

ছেলেটিকে দেখে খুশী হননি সুপ্রীতি। বরানগরের বাড়িতেও এই শিবেন যখন তখন এসে বসে থাকতো বিনা কারণে। এর মুখে শুধু কথার ফুলঝুরি। তবু আপন ননদের ছেলে, একেবারে হেলা-তুচ্ছ করা যায় না। তিনি বাবলুকে দিয়ে পাশের দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে তাকে খেতে দিলেন, তার বাড়ির সবার খোঁজ-খবর নিলেন।

শিবেন বললো, এই বাড়িতে এসে রয়েছেন, মাইমা? স্যাঁতস্যাঁতে, ঘরে আলো ঢোকে না। বরোনগরের বাড়িতে আপনার মহালটা এখনো খালি পড়ে রয়েছে, ফিরে চলুন না। মা বলছিলেন, আমাদের বংশে কেউ কোনোদিন ভাড়া বাড়িতে থাকেনিতো।

সুপ্রীতি বললেন, না, এখানেই বেশ আছি।

এক ঘন্টা পরে সে উঠলো এবং পরদিন আবার এলো। এ বাড়িতে জায়গা কম, ঘরের মধ্যে একজন লোক বসে থাকলে বড় অসুবিধে হয়। তাছাড়া শিবেনের বাচালতা ধৈর্য ধরে শুনবে কে? সুপ্রীতি ওকে মিষ্টি আনিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে চলে যান, তুতুলকেই বসে থাকতে হয়।

তৃতীয় দিনে এসে বললো, মাইমা, তুতুলকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবো?

সুপ্রীতি অবাক হয়ে বলেন, তুতুলকে তুমি নিয়ে যাবে? কোথায়?

শিবেন বললো, বেশি দূরে নয়, এই ঘন্টাখানেক, মানে আমাদের বাড়িতেই, মা বলছিলেন, তুতুলকে অনেকদিন দেখিনি, একবার নিয়ে আয় না!

সুপ্রীতি তুতুলের দিকে তাকালেন। তার মুখ ঘোঁচ হয়ে গেছে। সে শিবেনদার সঙ্গে কোথাও যেতে চায় না।

সুপ্রীতি বললেন, তোমার মা-কেই একদিন এখানে নিয়ে এসো বরং। আমিও তোমার মা-কে অনেকদিন দেখিনি।

ক্রমে শিবেন একটি শিরঃপীড়া হয়ে দাঁড়ালো। সে কেন আসে, তা বোঝা যাচ্ছে না। অথচ সে আসে, বসে থাকে, পিকলু-বাবলুর সঙ্গেও ভাব জমাবার চেষ্টা করে। পিকলু অতি ভদ্র ছেলে, সে শান্ত ভাবে জমাবার চেষ্টা করে। পিকলু অতি ভদ্র ছেলে সে শান্ত ভাবে শিবেনের সব কথা শোনে। কিন্তু তার মনোজগৎ শিবেনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আর বাবলু শিবেনের দু'একটা কথায় হুঁ-হাঁ করে পালিয়ে যায়, তার এখন ঘুড়ি ওড়াবার নেশা।

একদিন শিবেন এসে সুপ্রীতিকে বললো, মাইমা, আপনার সঙ্গে আমার একটা আর্জেন্ট কথা আছে। তুতুল, তুই একটু বাইরে যা তো!

শিবেন এসে তুতুলের পড়ার টেবিলের চেয়ারটায় বসে। নিজেই বন্ধ জানালাটা খুলে দেয়।

তারপর একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলে দোলাতে থাকে। তার পায়ের পাতা বেশ ফর্সা, খুব যত্ন নিয়ে সে রোজ দেহশুদ্ধি করে বোঝা যায়।

সুপ্রীতি উৎসুক ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

শিবেন বললো, মাইমা, তুতুলের বিয়ে দেবেন? আমার চেনা খুব ভালো পাত্র আছে। নাম ডাকওয়ালা ফ্যামিলি, মাছের ভেড়ির মালিক, ছেলেটি দেখতেও সুন্দর। তুতুলের সঙ্গে মানাবে। ছেলেটি আমার বিশেষ বন্ধু।

এক হিসেবে সুপ্রীতি এই কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলেন। এতদিনে শিবেনের আগমনের কারণ জানা গেল। সে তার এক বন্ধুর বিয়ের ঘটকালি করতে চায়। তুতুলের জন্য যে এখন এরকম প্রস্তাব মাঝে মাঝে আসতে থাকবে, সে জন্য সুপ্রীতি মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছেন। তুতুলের শরীরের গড়ন তার বাবার মতন, এখনই তাকে তার বয়েসের তুলনায় অনেক বড় দেখায়।

সুপ্রীতি খানিকটা আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, ছেলেটি কী করে?

শিবেন বললো, ঐ যে বললুম ওদের ভেড়ির বিজনেস, ও তাই-ই দেখে। ও লাইনে আজকাল ভালো পয়সা। আমিও তো ঐ লাইনে যাবো ভাবচি। অলরেডি শুরু করে দিয়েছি।

- তোমার বন্ধু কতদূর পড়াশুনো করেছে?

- মাইমা, আপনারা...মানে...ইয়ে...আপনারা সব সময় বড্ড লেখাপড়া লেখাপড়া করেন! আজকালকার দিনে বি-এ এম-এ পাশ করে কী হয়? বড় জোর একশো টাকার কেরানিগিরি জোটে। অনেক বি-এ পাশ ছেলে ইদানীং রিক্সা চালায়, বুঝলেন? আই হ্যাভ সীন ইন মাই ওউন আইজ! টাকা পয়সা রোজগার করাটাই আসল। ওরা এখনও তিন পুরুষ বসে বসে খেতে পারবে!

- ছেলে লেখাপড়া শেখে নি তাহলে!

- শিখবে না কেন, যথেষ্ট শিখেছে, ইংলিশে কথা বলতে পারে।

- শোনো শিবেন, তুমি যখন বলছো, তখন ছেলেটি নিশ্চয়ই ভালো। আর তুমি যে তুতুলের বিয়ের জন্য চিন্তা করেছো...

- বাঃ, করবো না, আমার আপন মামাতো বোন!

- সেই কথাই তো বলছি, তুমি যে ওর জন্য চিন্তা করেছো, তাতেই খুব ভালো লাগলো। কিন্তু আমি এখন তুতুলের বিয়ের কথা ভাবছি না। আগে অন্তত বি এ পাশটা করুক।

- মাইমা, ভুল করছেন, এরকম সুযোগ ছাড়বেন না। পাত্রপক্ষের কোনো দাবি-দাওয়া নেই, তুতুলকে দেখেই ওদের পছন্দ হয়ে গ্যাছে খুব, সেইজন্যই...

- দেখে পছন্দ হয়েছে, মানে? তুতুলকে ওরা দেখলো কোথায়?

- দেখেছে, দেখেছে, মানে, যখন ও বাড়িতে ছিলেন, সেইসময়ে।

- ওদের বলে দিও, তুতুলের এখনও বিয়ের বয়েস হয়নি।

- মাইমা, ডাগর মেয়েকে বেশিদিন বাড়িতে রাখতে নেই। এমন সুযোগ আর পাবেন না। ওরা তুতুলকে গয়নায় মুড়ে রাখবে।

- শিবেন, এ নিয়ে আর আমি কথা বলতে চাই না।

তারপর থেকে শিবেন এ বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল বটে কিন্তু সুপ্রীতি সন্ত্রস্ত হয়ে রইলেন। শিবেনের কথাবার্তার ভঙ্গি তার একদম ভালো লাগে নি। প্রতাপকে তিনি কিছু জানালেন না কিন্তু তুতুলকে বারবার সাবধান করে দিলেন, শিবেন যদি বলে, তুই ওর সঙ্গে কক্ষনো কোথাও যাবি না। ওদের বাড়িতেও যাবি না!

তুতুল বুঝতে পারে যে তাকে ঘিরে একটা অশান্তি ঘনিয়ে আসছে। তার শরীর যেমন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তেমনি তার হৃদয়ে উন্মেষ হয়েছে প্রেমের। একজন নয়, বেশ কয়েকজন পুরুষকে সে ভালোবাসে। তারা কেউ-ই জীবন্ত নয়, কয়েকটি উপন্যাসের চরিত্র এবং দু-তিনজন লেখক। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি সে সাত-আটবার পড়েছে, তার নায়ক অন্তুকে সে স্বপ্নেও দেখেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে দু'জন আধুনিক লেখককে সে চিঠি লেখার কথা ভাবে। পিকলুদের কলেজে একদিন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন শুনে তার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করেছিল। ঐ সব লেখকদের রক্ত-মাংসের চেহারায় সত্যি সত্যি দেখা যায়?

তুতুল চায় তার নিজের ঘর, পড়ার টেবিল, ইস্কুল আর গল্পের বইয়ের মধ্যে সব সময় মগ্ন হয়ে

থাকতে, তাকে যেন আর কোনো বিষয়ে কেউ বিরক্ত না করে। এমন কি কোথাও বেড়াতে যেতে বা থিয়েটার বাইস্কোপ দেখতেও তার বিশেষ উৎসাহ নেই।

সুপ্রীতি যা আশাঙ্কা করেছিলেন, একদিন তাই-ই ঘটলো।

স্কুলের রাস্তায় বেশ কয়েকদিন বরানগরের সেই ছেলে দুটিকে বা শিবেনকে দেখত পাওয়া যায় নি। একদিন খুব বৃষ্টি, দুপুরবেলায় আকস্মিক ঝমঝমানো বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে গেছে এক হাঁটু, এইরকম জল ভেঙে হাঁটার অভ্যেস নেই বলে তুতুল ছুটির পর বেরিয়ে একটা রিকশা নিল। একটু দূর যেতে না যেতেই হঠাৎ শিবেন কোথা থেকে উদয় হয়ে বললো, এই রিকশাওয়ালা, রোকো। তুতুল, তোর সঙ্গে আমি যাবো!

ওপরে উঠে বসেই সে রিক্সাওয়ালাকে হুকুম দিল, এই, ডাহিনে যাও!

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, ওদিকে কোথায় যাবে? আমি বাড়ি যাচ্ছি!

শিবেন বললো, হ্যাঁ, বাড়িতে তো যাবিই। আমি কি তোকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি নাকি? একটুখানি শুধু ঘুরে যাবো।

তুতুল বিরক্ত-দুঃখিত ভাবে শিবেনের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বললো, দেরি হলে মা চিন্তা করবেন।

শিবেন বললো, বাদলার দিনে একটু দেরি হয়ই। আমি তোকে পৌঁছে দেবো। তোর চিন্তা কী?

আপন পিসতুতো দাদা রিক্সায় চড়ে বসলে কোনো মেয়ে তো চিৎকার করে রাস্তার লোক ডাকে না। তুতুলের ক্ষেত্রে সেই প্রশ্নই নেই, সে মরে যাবে, তবু চিৎকার করতে পারবে না। বৃষ্টির মধ্যে সে একটা চমৎকার কথা ভাবতে ভাবতে আসছিল, শিবেনদা সব নষ্ট করে দিল।

রিক্সা এসে থামলো বৃন্দাবন পাল লেনের একটা বাগানওয়ালা বাড়ির গেটের সামনে। টিপি টিপি করে এখনো বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তার এখানটায় জল নেই, বৃষ্টির জন্যে পথে মানুষজন কম। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বরানগরের সেই ছেলে দুটি।

রিক্সা থেকে শিবেন তাদের মধ্যে একজনের দিকে হাত দেখিয়ে বললো, এ আমার বন্ধু সুদর্শন, তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

দুটি ছেলের মধ্যে যেটি গত বছর বরানগরে তুতুলের হাতে জোর করে চিঠি গুঁজে দিয়েছিল, সে চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে। সুদর্শন নামে যার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো, অল্প বয়েসে সে নিশ্চয়ই সুদর্শন বালক ছিল, বেশ লম্বা চেহারা, ফর্সা রং, মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল, সমুন্নত কপাল ও তীক্ষ্ণ নাক। কিন্তু এখন তার মুখে একটা চোয়াড়ে ভাব, চোখ দুটি কুঁচকোনো, সামনের একটা দাঁত ক্ষয়ে গেছে। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তুতুলের দিকে।

শিবেন বললো, দেখলি, নিয়ে আসতে পারলুম কি না। আমার বোন খুব ভালো মেয়ে, আমার কথা শোনে। চল, কোথাও বসে চা-টা খাওয়া যাক।

সুদর্শন চোখ না সরিয়ে বললো, চিত্রা সিনেমার কাছে আমার চেনা একটা দোকান আছে। ভালো ফিস ফ্রাই বানায়।

শিবেন বললো, চল, সেখানে চল। আর একটা রিকশা ডাকলেই হবে।

তুতুল বললো, আমি তো কোথাও যাবো না। আমি বাড়ি যাবো।

শিবেন বললো, আরে, বলেছি না, আমি তোকে নিজে পৌঁছে দেবো। আমি মাইমাকে বলে দেবো, তোর কোনো চিন্তা করতে হবে না। সুদর্শন অনেকদিন ধরে তোর সঙ্গে আলাপ করতে আর দুটো কথা বলতে চাইছে।

সুদর্শনকে সে বললো, এই, তুই তুতুলের সঙ্গে এটাতে উঠে পড়ে এগিয়ে যা। আমি আর হরে অন্য একটাতে যাচ্ছি।

তুতুল বললো, আমি যাবো না!

সে রিক্সা থেকে নেমে পড়তে যেতেই শিবেন তার হাত চেপে ধরে বললো, বোস চুপ করে।

ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াতো তার ঠিক নেই, কিন্তু এই সময় হঠাৎ পিকলু এসে পড়লো সেখানে। সে তার এক বন্ধুর সঙ্গে ঐ রাস্তা দিয়েই ফিরছে কলেজ থেকে।

সে শিবেনকে দেখে নিরীহভাবে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী খবর, শিবেনদা?

তুতুলকে রিক্সায় বই-খাতা নিয়ে বসে থাকতে দেখে সে একটু বিস্মিত হলেও কোনো মন্তব্য করলো না।

শিবেনের সঙ্গে সুদর্শন ও হরির চোখে চোখে কিছু কথা হয়ে গেল। শিবেন সূক্ষ্ম ভাবে চোখের পলক ফেলে ও সামান্য মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিল জোর-জবরদস্তির লাইনে যাওয়া ঠিক হবে না।

সে হাসি মুখে পিকলুকে বললো, তুই এই রাস্তা দিয়ে কলেজ থেকে রোজ ফিরিস বুঝি? তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, আমার দুই বন্ধু, হরি আর সুদর্শন। এই সুদর্শনদের মাছের ভেড়ির ব্যবসা আছে। আমিও ওদের সঙ্গে ঐ ব্যবসায় নামছি, বুঝলি?

পিকলু কিছুই বুঝলো না। সে জানে যে খালি গায়ে, নেংটি পরা জেলেরা পুকুর নদী থেকে মাছ ধরে, সেই মাছ শহরের বাজারে আসে, বাহুতে রূপোর তাবিজ বাঁধা মাছওয়ালারা সেই মাছ বিক্রি করে। ভালো ভালো জামা-কাপড় পরা ভদ্র বাড়ির ছেলেদের যে সেই ব্যবসার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে, সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

সে শুকনো হেসে বললো, ও আচ্ছা!

পিকলুর সঙ্গের বন্ধুটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সে হাত নেড়ে বললো, আমি যাই রে!

শিবেন বললো, এঃ পিকলু, তুই যে বৃষ্টিতে একদম ভিজে গিয়েছিস। সর্দি লেগে যাবে যে! চল, কোথাও বসে গরম গরম চা খাই!

পিকলু এবারে তুতুলের দিকে তাকালো। পড়ে নিল তার চোখের ভাষা। সে বললো, না, আজ থাক, বাড়ি গিয়ে জামা-কাপড় ছাড়তে হবে।

শিবেন পিকলুর পিঠে হাত দিয়ে বললো, একটু এদিক পানে শোন। একটা প্রাইভেট কথা আছে।

পিকলুকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে সে বললো, শোন পিকলু, আমার ফ্রেন্ড এই যে সুদর্শন, খুব ভালো ফ্যামিলির ছেলে বুঝলি, ওর বাবা-মা চাইছেন ওর একটা বিয়ে না দিয়ে ব্যবসার পুরোপুরি ভার ওর হাতে দেবেন না। এখন মুশকিল হচ্ছে, কোনো মেয়েকেই সুদর্শনের পছন্দ হয় না। একমাত্র তুতুলকে দেখেই ওর খুব মনে ধরেছে। এখন এই বিয়েটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তুই ভালো ছেলে, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তুই ঠিক বুঝবি।

মাছের ভেড়ির ব্যবসার মতনই বিয়ে সম্পর্কেও পিকলুর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। বিয়ে তো বয়স্ক নারী-পুরুষদের ব্যাপার।

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেই সে বললো, যাঃ! তুতুলের বিয়ে এখন কী! এখনো ইস্কুলে পড়ছে। আগে লেখাপড়া শেষ করুক!

শিবেন অস্ফুটভাবে বললো, বাঙালের মরণ! খালি লেখাপড়া আর লেখাপড়া! ও মেয়ে হয়ে বি এ এম এ পাশ করে কী করবে, ডিগ্রি ধুয়ে জল খাবে? না আমাদের ফ্যামিলির মেয়ে চাকরি করতে যাবে?

পিকলু অসহায়ভাবে বললো, কিন্তু তুতুল তো এখনো বাচ্চা!

- ঐ বয়েসের মেয়ে দু'ছেলের মা হয়ে যায়। শোন পিকলু, তুই হচ্ছিস ওর মামাতো দাদা আর আমি হচ্ছি পিসতুতো দাদা। কোন সম্পর্কটা বেশি? আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা হলো গে রক্তের সম্পর্ক। ঠিক কি না!'

- তা তো বটেই!

- আমরা বলবো, তাই-ই হবে। সেই কথাটাই আজ বাড়ি গিয়ে মাইমাকে বুঝিয়ে বলবি!

সুদর্শন তুতুলের মুখ ও শরীর থেকে একবারও দৃষ্টি সরায় নি। কিন্তু আজ তাকে বিফল হয়ে ফিরতে হলো শিবেনের পরামর্শে। তুতুলকে ছেড়ে দেওয়া হলো পিকলুর সঙ্গে।

পিকলু সেই রিক্সায় উঠে বসে খানিকটা যাবার পর জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার রে তুতুল? তুই এখানে এলি কী করে? ঐ দুদর্শন বলে ছেলেটাকে তুই আগে চিনতিস।

তুতুল এবার পিকলুর কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে উঠলো।

পিকলু বললো, অ্যাই, বোকার মতন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদবি না তো! কী হয়েছে বল্

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ তুলে সে বললো, বলছি। কিন্তু পিকলুদা, তুমি কথা দাও, মাকে কিংবা মামাকে কিছু বলবে না! ওঁদের এমনিতেই কত চিন্তা, আমি চাই না আমার জন ওঁদের চিন্তা বাড়ুক।

॥ ২১ ॥

সরকারি কর্মচারির চাকরি চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি। অফিসের ডিউটি আট ঘণ্টা হলেও বাকি সময়টায় অন্য কোনো বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত থাকা যায় না। প্রতাপ এই নিয়মটা অক্ষরে অক্ষরে

মানেন। সন্ধ্যের পর দু'একটি পার্ট টাইম চাকরির প্রস্তাব পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। অথচ প্রতাপের এখন টাকার টানাটানি চলছে।

প্রতাপদের সার্ভিসেই একজন খ্যাতনামা লোক আছেন, তাঁর নাম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রতাপের থেকে অনেক সিনিয়র তিনি। প্রতাপ একদিন এক চায়ের নিমন্ত্রণের আসরে অচিন্ত্যবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্যার, আপনি যে এত সব লেখেন-টেখেন, তাতে টাকা পান নিশ্চয়ই, এতে গভর্নমেন্টের অবজেকশান নেই?

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এককালে অশ্লীল গল্প-উপন্যাস লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, ইদানীং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক রসে ভরা জীবনী লিখছেন। তাঁর চোখে পুরু লেন্সের চশমা, কণ্ঠস্বর গমগমে। প্রতাপের প্রশ্ন শুনে তিনি ঈষৎ হাস্যে বললেন, আমার সহকর্মীরা আমার কোনো গল্প-উপন্যাস নিয়ে কিছু বলেন না, লিখে আমি কত টাকা পাই তা নিয়েই সকলের কৌতূহল!

প্রতাপ লজ্জা পেয়ে গেলেন। নভেল-নাটক পড়ার অভ্যেস নেই তাঁর। অচিন্ত্যবাবুর বিশেষ কোনো লেখা তিনি পড়েননি। একজন লেখকের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য রচনা সম্পর্কে আলোচনা করার বদলে শুধু টাকা পয়সা নিয়ে প্রশ্ন করা যে রুচিহীনতার পরিচায়ক তা তিনি সেই মুহূর্তে বুঝলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থী চোখে তাকালেন।

অচিন্ত্যকুমার বললেন, সরকারি কর্মচারির পক্ষে কোনো ক্রিয়েটিভ কাজে, যেমন গান গাওয়া, ছবি আঁকা বা সাহিত্য রচনা করার নিষেধ নেই। তবে পারমিশান নিতে হয়। এর থেকে টাকা রোজগার করলে ব্রিটিশ আমলে ফিফটি পারসেন্ট সরকারকে দিয়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল। অবশ্য অ্যাপিল করলে এক্সজেম্পশানও পাওয়া যেত। অন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? তিনি তো আমাদের থেকেও অনেক বড় সরকারি কর্মচারি, আই সি এস, তাঁকেও পারমিশান নিতে হয়েছে বোধহয়!

প্রতাপ একটু হতাশ হয়েছিলেন। সে-রকম কোনো ক্রিয়েটিভ ফ্যাকল্টি তাঁর নেই, সুতরাং চাকরির মাইনে ছাড়া আনইসঙ্গতভাবে উপার্জন বাড়াবার ক্ষমতাও নেই। এদিকে দেশের সম্পত্তি সব গেছে। উপরন্তু সংসারের বোঝা বেড়েছে।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি একটা উপায় বার করলেন। তাঁর বন্ধু বিমানবিহারী একটি পুস্তক প্রকাশনালয়ের মালিক। সেখান থেকে বিজ্ঞান, আইন, ডাক্তারি শাস্ত্রের বই-এর বাংলা অনুবাদ বেরুচ্ছে নিয়মিত। প্রতাপ নিজে বই লিখতে পারবেন না। কিন্তু ঐ সব বই-এর অনুবাদের কাজ করতে পারেন অনায়াসে। তিনি ইংরেজীটা ভালো জানেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিলেন। বাংলা লিখতে পারেন নির্ভুল বানানে। বিমানবিহারী এই প্রস্তাব শোনা মাত্র মহাবিস্ময়ের ভাণ করে বলেছিলেন, তুমি কী করে আমার মনের কথাটা জানলে? কদিন ধরে আমি এই কথাই ভাবছিলুম। ব্যবসা বড় হয়ে যাচ্ছে। সব দিক আমি সামলাতে পারছি না। তুমি সন্ধ্যের দিকে একে এসে আমার অফিসের কাজকর্ম দেখে দাও!

প্রতাপ বলেছিলেন, নয় ভাই, সে কাজ নিতে পারবো না,সেটা বে-আইনি,তবে বই অনুবাদ করতে পারি।

যথারীতি বিভাগীয় অনুমতি নিয়ে প্রতাপ শুরু করলেন অনুবাদের কাজ। প্রথম প্রথম উৎসাহের চোটে লিখে ফেললেন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা, তারপর আর মন বসে না। অল্প বয়েস থেকেই যাদের লেখার ঝোঁক নেই, তাদের পক্ষে পরিণত বয়েসে যে-কোনো কিছুই পাতার পর পাতা লিখে যাওয়া একটা ভীতিকর ব্যাপার! অনেক সময় সামান্য চিঠিপত্র লিখতেই কলম সরে না, আলস্য লাগে। প্রতাপের অবশ্য আদালতের মামলার রায় লেখার অভ্যেস আছে। কিন্তু অধিকাংশ রায়ের বয়ানই ছক বাঁধা, তাছাড়া সেই রায় লেখা তো চাকরির অঙ্গ। অচিন্ত্যবাবু দীর্ঘকাল হাকিমী করেও কী করে অতগুলি বই লিখেছেন তা ভেবে প্রতাপ এখন হতবাক্ হয়ে যান।

বিকেলের দিকে আদালতের কাজ শেষ হবার সময়টাতেই প্রতাপের গায়ে যেন জ্বর আসে। বাড়ি ফিরেই অনুবাদ-কর্ম নিয়ে বসতে হবে। নিজেই এই কাজ নিয়েছেন, সুতরাং ছুটি নেবার উপায় নেই। তবু তিনি মাঝে মাঝে দেরি করে বাড়ি ফেরেন, নিজের কাছেই ফাঁকি মারার অছিলা খোঁজেন।

একদিন শিয়ালদা থেকে বেরিয়ে তিনি ভাবলেন, অনেকদিন সত্যেনদের খবর নেওয়া হয়নি, তালতলা ঘুরে আসা যাক। ফাইলপত্র দিয়ে আদালিকে তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। নিজে হাঁটতে শুরু করলেন মৌলালির দিকে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, প্রতাপের সঙ্গে ছাতা নেই, কিন্তু তাঁর ভালোই

লাগছে। মনে বেশ একটা হালকা হালকা ভাব। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি এক প্যাকেট প্লেয়ার্স নাম্বার থ্রি কিনে ফেললেন দুম করে। ইদানীং খরচ কমাবার জন্য তিনি মেপোল ধরেছেন। কিন্তু ভালো সিগারেট খাওয়া তাঁর এক বিলাসিতা। ছাত্র বয়েসে তিনি প্রথম সিগারেট টানা শেখার সময় প্লেয়ার্স নাম্বার থ্রি কিনতেন, তখন তিনি ছিলেন মালখানগরের এক সচ্ছল পরিবারের সন্তান। মালখানগরের বোসেদের বাড়ির একটি ছেলেই তাঁকে প্রথম সিগারেট ধরায়।

সাদা রঙের চৌকো প্যাকেট, খোলার পর প্রতাপ প্রথমে ঘ্রাণ নিলেন। হ্যাঁ বেশ টাটকা, এর গন্ধেই একটা মাদকতা আছে। একটা সিগারেট বার করে ধরাতেই প্রতাপ যেন ফিরে গেলেন ছাত্র বয়েসে।

বসবার ঘরে পাঁচ ছ'জন লোক, সেখানে বসে আছেন ত্রিদিব। সুলেখা নেই। লোকগুলি প্রতাপের অপরিচিত। তাই প্রতাপ একটু দ্বিধান্বিতভাবে দাঁড়ালেন দরজার কাছে।

ত্রিদিব বললেন, সুলেখার একটু জ্বর হয়েছে, আপনি যান, ওপরে যান। আমি একটু পরে আসছি।

প্রতাপ এ বাড়ির জামাই, সুতরাং বসবার ঘরে তাঁর বসবার কথা নয়। সুলেখার জ্বর হয়েছে শুনে তিনি যেন একটু অবাক হলেন। সুলেখার মতন নারীদের সঙ্গে যেন অসুখ-বিসুখের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে প্রতাপ নতুন রঙের গন্ধ পেলেন। দেয়ালগুলিতে সদ্য কলি ফেরানো হয়েছে। জানলা-দরজায় নতুন রঙ। প্রতাপ অনেকদিন এ বাড়িতে আসেননি।

এ বাড়িতে কয়েকজন আশ্রিত -পরিজন রয়েছে, তারা সবাই থাকে নিচের তলায়। দোতলাটি বলতে গেলে ফাঁকা। কয়েকটি ঘর তালাবন্ধ, তার মধ্যে একটি ঘর মমতার, সেখানে মমতার কুমারী জীবনের কিছু কিছু জিনিসপত্র এখনো রয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় প্রতাপ কিছুদিন এসে এখানে ছিলেন, তাঁর মেয়ে মুন্নির জন্মও হয়েছিল এখানে। শুধু মুন্নি কেন, পিকলুর জন্মের সময়েও তো মমতা এসে বাড়িতে ছিলেন, তখন মমতার মা বেঁচে। একমাত্র বাবলুর জন্ম হয়েছিল মালখানগরে। দোতলায় এসে প্রতাপ একটা ঘরের সামনে এসে ডাকলেন, সুলেখা! সুলেখা!

একজন দাসী বেরিয়ে এসে বললো, ও জাঁইবাবু? অ বৌদি, বড়জাঁইবাবু এসেছেন!

প্রতাপ বললেন, হ্যাঁ। যান না!

প্রতাপ ভেতরে ঢুকবার আগেই সুলেখা দরজার কাছে এসে জোড়া ভুরু তুলে ক্লাসিক্যাল বিস্ময়ের ছবি হয়ে বললেন, ও, প্রতাপদা! কী আশ্চর্য! পথ ভুলে নাকি?

প্রতাপ চুপ করে কয়েক মুহূর্ত অপলক ভাবে চেয়ে রইলেন। তিনি গান গাইতে পারেন না। ছবি আঁকেন না। কবিতা রচনা করতে পারেন না, তবু সৌন্দর্যের তরঙ্গ তাঁর হৃদয়ে একটা আলোড়ন তোলে। সুলেখা কোনোরকম সাজগোজ করেননি। একটা গোলাপি ডুরে শাড়ি পরা, চুল খোলা পিঠের ওপর। চোখ দুটো ঈষৎ ছলছলে। তাঁর অস্তিত্বের মধ্যেই একটা মাধুর্য আছে।

প্রতাপ আস্তে আস্তে বললেন, তোমার জ্বর?

- সেই খবর পেয়েই এলেন নাকি?

এই সব ক্ষেত্রে মিথ্যেটাই নির্দোষ মধুর। প্রতাপ মাথা নেড়ে বললেন, কী করে যেন টের পেয়ে গেলাম!

এগিয়ে এসে তিনি সুলেখার কপালে হাত দিয়ে বললেন, কই, টেম্পারেচার নেই তো!

ঝনঝন করে হেসে সুলেখা বললেন, আপনি এলেন তো, অমনি কমে গেল বোধ হয়! আসুন, ভেতরে আসুন! আপনার দিদি কেমন আছেন? বাচ্চারা?

সবে মাত্র দেয়াল রং করা শেষ হয়েছে বলে ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র সব অগোছালো ভাবে ডাঁই করা। একটা হাতলওয়ালা চেয়ারের মিহি ধুলো ঝাড়ন দিয়ে পরিষ্কার করে সুলেখা বললেন, বসুন, এখানে বসুন! সত্যিই কাল আমার জ্বর এসেছিল। বোধ হয় এই ধুলোর জন্যই!

প্রতাপ বললেন, এত সব ধুলোবালি তোমার সহ্য হবে কেন? গোটা বাড়িটাই রং করা হলো বুঝি?

সুলেখা বললেন, হ্যাঁ। অনেকদিন হয়নি তো।

তাছাড়া বিনতারা আসছে জানেন তো? এখানেই থাকবে!

প্রতাপের ছোট শ্যালিকা বিনতা বিয়ের পর থেকেই ইন্দোরে আছে, অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা

হয়নি। তার আসার খবরে প্রতাপ উৎফুল্ল হলেও পরের মুহূর্তেই যেন মনের মধ্যে একটা কাঁটা বোধ করলেন। বিনতার স্বামী খুব বড় চাকরি করে, তাছাড়া তাদের বর্ধমানে সম্পত্তি আছে। ত্রিদিবের অবস্থা বেশ ভালো, সেই তুলনায় প্রতাপেরই এখন টানাটানির সংসার। কয়েক বছর আগেও প্রতাপ যে-কোনো পারিবারিক সম্মিলনে অন্যদের একটা পয়সাও খরচ করতে দেননি। কিন্তু এখন তাঁর সে সামর্থ্য নেই। বিনতারা আসবে, তাদের জন্য নেমন্তন্ন, বেড়ানো, উপহার...। প্রতাপ জোর করে মন থেকে এই চিন্তাটা মুছে দিলেন। আজ সন্ধ্যেবেলা এসব কথা থাক।

সুলেখা বললেন, বিনতারা আসছে, আপনারাও ক'দিন এসে এখানে থাকুন! বেশ মজা হবে!

প্রতাপ হাসলেন। শ্বশুরবাড়িতে এসে থাকার কি আর বয়েস আছে তাঁর? ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মমতাকে কয়েকদিনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

- তুমি বসো, সুলেখা। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি! তোমার কর্তাকে তো দেখলাম খুব ব্যস্ত!

সুলেখা খাটের ওপর বসে পড়ে বললেন, আপনারা দেওঘরে গিসলেন, সেই গল্পই তো শোনা হলো না। অবশ্য পিকলু এসেছিল পরশুদিন...

প্রতাপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, পিকলু এসেছিল?

- হ্যাঁ। ও তো আসে মাঝে মাঝে। ওর মামার লাইব্রেরি ঘর থেকে বই নিয়ে যায়। ঠিক মামার মতনই ওর বই পড়ার নেশা হয়েছে।

- আমি তো জানি না যে পিকলু আসে এখানে।

- জানবেন কী করে? ছেলের সঙ্গে কথা বলার সময় পান? শুনলুম, খুব নাকি ব্যস্ত আপনি আজকাল? পিকলু আসবে না কেন? বড় হয়েছে, ট্রাম-বাসে একা একা চলাফেরা করতে পারে! আপনি কী খাবেন?

- কিছু না!

- বা, কোর্ট থেকে আসছেন তো, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। বসুন, আমি আসছি!

- না, এখন যেও না! একটু বসো।

প্রতাপ পকেট থেকে প্যাকেটটি বার করে আর একটি সিগারেট ধরালেন। সুলেখার সঙ্গে যে বিশেষ কিছু কথা আছে তাঁর, তা নয়। এই সিগারেটটাই হচ্ছে ভালো মুডের প্রতীক, সুলেখার সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ ভালো সময় কাটাতে চান।

দাসীকে ডেকে সুলেখা চা-জলখাবার আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা প্রতাপদা, আমি যদি চাকরি করি, তাতে আপনার আপত্তি আছে?

- চাকরি, কী চাকরি?

- বেথুন কলেজে, ইংরেজীর লেকচারার।

আজ প্রতাপের মনে পড়লো, সুলেখা ইংরেজীতে খুব ভালো ছাত্রী ছিল। এম এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, বিয়ের আগে তার বিলেতে গিয়ে আরও পড়বার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে আর যায়নি। রূপ ও গুণের এমন সমন্বয় দেখা যায় না।

এদেশে মেয়েরা আজকাল লেখাপড়া শিখছে হঠাৎ বিধবা হলে বিপদে না পড়ার জন্য। স্বাভাবিক, সুখী বিবাহিত জীবন হলে লেখাপড়ার আর কোনো মূল্য নেই।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চাকরি করবে...সে রকম দরকার তো কিছু নেই চাকরি করতে তোমার কষ্ট হবে না?

- কষ্ট আবার কী? ওয়েলিংটন থেকে এক ট্রামে যাবো। এক ট্রামে ফিরবো।

- তবু প্রত্যেকদিন যাওয়া-

- শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে সেটা ভালো নয়?

- ত্রিদিবদাকে এখনো জিজ্ঞেস করোনি?

- বললুম না, আজই চিঠি এসেছে। আপনি বলুন না, আপনার কী মত? আপনার আপত্তি আছে?

- আমার কেন আপত্তি থাকবে? আমার মত জিজ্ঞেস করলে আমি হ্যাঁ-ই বলবো, কলেজের চাকরি, হালকা কাজ, প্রায়ই ছুটিছাটা থাকে!

সুলেখার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খাট থেকে নেমে এসে প্রতাপের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি ঠিক যা ভাবি, আপনি সেইরকম। এই যে আপনি হাঁ বললেন, এতে আমার সব দোনামোনা কেটে গেল। এবার ওকে বুঝিয়ে বলা মোটেই শক্ত হবে না।

প্রতাপ সুলেখার একটা হাত ধরে বললেন, ইস, আমার ইচ্ছে করছে তোমার ছাত্র হতে!

প্রতাপের মনটা খুশীতে ভরে গেছে। সুলেখা যে তাঁর মতামতকে এতখানি গুরুত্ব দিয়েছে, এতে তাঁর পৌরুষ উদ্দীপিত হয়। আজ তাঁর এখানে এসে পড়া আকস্মিক। কিন্তু প্রতাপের মনে হলো, নিয়তি নির্ধারিত। সুলেখার চাকরি নেওয়া একটা বড় ঘটনা—এতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হলো।

চা-জলখাবার খেতে খেতে ঐ চাকরি বিষয়ে আরও খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন প্রতাপ। তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কোনো নারী এখনো চাকরি করে না। সুলেখা চাকরি করতে যাচ্ছে প্রয়োজনে নয় শখে, তবু এর মধ্যে যে একটা রীতি ভাঙার ব্যাপার আছে, সেটাই প্রতাপের পছন্দ হলো।

একটু বাদে বাইরে থকে কে যেন একজন নাটকীয়ভাবে ডাকলেন, এ কী? আজ আবার এসব কী নিয়ে এসেছেন?

একটু বাদে বাইরে থেকে কে যেন একজন নাটকীয়ভাবে ডাকলো, মাগো, মা জননী!

প্রতাপ ভুরু কোঁচকালেন। সুলেখা উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, এ কী? আজ আবার এসব কী নিয়ে এসেছেন

প্রতাপ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, একজন রুখু দাড়িওয়ালা, লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা চেহারার লোক হাতে এক ছড়া কলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা কী ফেরিওয়ালা? তা হলে সরাসরি ওপরে আসবে কী করে?

সুলেখা পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি হারীত মণ্ডল।

সেই নাম শুনে তৎক্ষণাৎ প্রতাপের মনে কোনো রেখাপাত করলো না। এই ফেরিওয়ালা শ্রেণীর লোকটি ঠিক এই মুহূর্তে বিঘ্ন ঘটাতে এসেছে বলে তিনি অপ্রসন্ন হলেন।

সুলেখা আবার বললেন, কী যে করেন আপনি, এতগুলো কলা নিয়ে এসেছেন কেন?

হারীত মণ্ডল বললো, মা জননী, আমরা গরিব হইতে পারি, কিন্তু ভিখারী তো না? আমাগোও তো মাঝে মাঝে কিছু দিতে ইচ্ছা করে?

এই উটকো লোকটির মা জননী ডাক প্রতাপ খুবই অপছন্দ করলেন। সুলেখার প্রতি ঐ সম্বোধন যেন একেবারেই বে-মানান। কিন্তু তিনি আপত্তি করতে পারলেন না, কারণ তাঁর মনে হলো, ঐ লোকটির প্রতি সুলেখার বেশ প্রশ্রয় আছে! এই উপদ্রব থেকে এখন সরে পড়াই ভালো।

প্রতাপ উঠে পড়ে বললেন, সুলেখা, আমি এখন চলি, বাড়িতে কাজ আছে। নিচে ত্রিদিবদার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি!

হারীত মণ্ডলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে প্রতাপ নেমে গেলেন নিচে।

বাড়ি ফিরে পোশাক বদলেই প্রতাপ বই-খাতা কলম খুলে বসলেন, তাঁর কাজে নতুন উৎসাহ এসেছে। সুলেখাই আজকের প্রেরণা। ঐ যে সুলেখা ওর জীবনের একটা বড় ব্যাপার প্রতাপের মতামতকে একটা মূল্য দিয়েছেন, তাতেই প্রতাপের অহমিকা অনেক চাঙ্গা হয়ে গেছে। মমতাকে তিনি সংক্ষেপে বিনতা আসার খবর জানিয়েছেন, বাকি কথা রাত্তিরে বিছানায় হবে। বিনতা আসছে বলেই প্রথম অনুবাদের কাজটা তাঁর তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার।

লিখতে লিখতে একটা ইংরেজী শব্দতে আটকে গেলেন প্রতাপ। অভিধান দেখা দরকার। তিনি উঠে এলেন পাশের ঘরে।

বাবলু আর পিকলুর সঙ্গে আজ মুন্নিও বসেছে, একটা টেবিলের তিন পাশে তারা পড়ছে তিন রকম পড়া। বাবলু বাবাকে দেখেই একটা বই লুকিয়ে ফেললো। মুন্নি খাতায় ছবি আঁকছিল। খাতা বন্ধ করলো। আর পিকলু মন দিয়ে অঙ্ক কষছিল। কষেই যেতে লাগলো, খেয়াল করলো না বাবার উপস্থিতি।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, ইংলিশ ডিকশনারিটা কোথায় রে, পিকলু?

পিকলু মাথা তুলে বাবাকে দেখলো। যেন তার ঘোর কাটাতে সময় লাগলো খানিকটা। তারপর সে অভিধানটা খুঁজে বাবাকে দেবার আগে বললো, তুমি কোন্ ওয়ার্ড খুঁজছো বাবা?

প্রতাপ বললেন, সোলেসিজম!

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, বানানটি বলো, আমি দেখে দিচ্ছি।

প্রতাপ হাতের কাগজ দেখে বললেন, এস ও এল ই সি আই এস এম!

পিকলু অভিধানের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এস আসবার আগেই বললো, ও, সোলেইসিজ্‌ম? ওর

মানে হচ্ছে ব্যাকরণের ভুল। বা উল্টোপাল্টা ব্যবহার। এটা গ্রীক শব্দ, বাবা। সোলি বলে একটা জায়গা ছিল, সেখানে ভুল গ্রীক বলা হতো!

প্রতাপ চমৎকৃত হলেন পিকলুর দ্বিধাহীনভাব দেখে। একটা ইংরেজী শব্দের মানে তিনি জানেন না, তাঁর ছেলে জানে, এ তো হতেই পারে। কিন্তু অভিধান হাতে নিয়েও ঠিক পাতাটা খোলার আগে পিকলু কী রকম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বললো?

প্রতাপ অভিধানটা নিয়ে তবু মিলিয়ে দেখলেন, পিকলু ঠিকই বলেছে। পিকলু বিজ্ঞানের ছাত্র, তবু সে ইংরেজী ভাষা সম্পর্কেও এত জানে?

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, তুই এটা জানলি কী করে রে, পিকলু?

পিকলু বললো, আমি মাঝে মাঝেই এনসাইক্লোপিডিয়া পড়ি। আমার খুব ভালো লাগে।

প্রতাপ উচ্ছ্বাসপ্রবণ নন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে বাড়াবাড়ি করেন না কখনো। তবু আজ তিনি ভাবলেন, এ ছেলেটা জিনিয়াস! ভবিষ্যতে পিকলু সাঙ্ঘাতিক বড় একটা কিছু করবে!

॥ ২২ ॥

বঙ্কুবিহারীর স্ত্রী এলিজাবেথ হাটনেট, সংক্ষেপে লিজ, একজন ভারত-প্রেমিকা। এই আইরিশ মেয়েটির পরিবার অনেক দিন থেকেই আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। লিজ-এর এক পিতৃব্য প্রখ্যাত বিপ্লবী ডি ভ্যালেরার সঙ্গে জেল খেটেছিলেন, জেল ভেঙে পলায়নকালে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। আয়ার্ল্যান্ডের জাতীয়তাবাদীরা অনেকেই উগ্র ইংরেজ-বিরোধিতার কারণে ভারতের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন।

কবি ইয়েটস-এরও খুব ভক্ত লিজ। ইংরেজী ভাষার এই প্রধান কবি কেলটিক পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনেও নেতৃত্ব নিয়েছিলেন এবং আইরিশদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অহংকার দিয়েছেন। ইয়েটস-এর সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে আইরিশদের পরিচয় হয় এবং লিজ রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে এমনই মুগ্ধ হয় যে সে নিজের চেষ্টায় বাংলা শিখতে শুরু করে।

বঙ্কুবিহারীর সঙ্গে লিজ-এর পরিচয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিবাহের প্রধান কারণ এই যে বঙ্কুবিহারী একজন ভারতীয় এবং বাঙালী। এর আগে লিজ কোনো ভারতীয়কে চাক্ষুষ দেখেনি। ভারত তার কাছে এক স্বপ্নের দেশ এবং ভারতীয় মাত্রই পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতার ধারক।

বঙ্কুবিহারী অবশ্য স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইতে রবীন্দ্রনাথের দু'একটি কবিতা ছাড়া আর কিছুই পড়েনি। বেদ-উপনিষদ আর গ্রীক ভাষা তার কাছে একই। অল্প বয়েসে বিলেতে যাবার পর থেকেই সে নিজের গা থেকে ভারতীয়ত্ব মুছে ফেলে প্রাণপণে ইংরেজদের অনুকরণ করতে চেয়েছে। কতরকম ভাষায় দৈনিক আবহাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে হয় তা সে জানে কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী জানে না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিষয়েও প্রায় কিছুই জানে না বলতে গেলে।

বঙ্কুবিহারীর চেহারাটি সুন্দর, বনেদী বংশের ছাপ আছে। তার প্রথমা স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায় কারন বঙ্কু তার বিলাসবাসনে পুরোপুরি তাল দিতে পারছিল না; তারপর সে বেশ কিছুদিন এদিক ওদিক ভাসতে ভাসতে একটা চাকরিসূত্রে ডাবলিনে গিয়ে পৌছোয়। প্রথম আলাপেই লিজ-এর উচ্ছ্বাস দেখে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল বেশ। লিজ তাকে দেখেছে মোহের অঞ্জন মাখা চোখে। ওদেশে বঙ্কুবিহারী থেকে তার ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল হ্যারি, তাড়াতাড়ি সে আবার বঙ্কু হয়ে গেল, লিজ শুনে বলেছিল কী সুইট স্যানসক্রিট নাম! যদিও লিজ সেই নামটি শেক্সপীয়ারের একটি চরিত্রের মতন ব্যাঙ্কো উচ্চারণ করে।

লিজ-এরও আগে একটি বিবাহ ছিল। সে ক্যাথলিক, তাদের সমাজে ডিভোর্স চালু নেই, তার আগের স্বামী সুবিধেমতন সময়ে মারা গেছে। লিজ বঙ্কুর চেয়ে এক বছরের বড়। বঙ্কু অবশ্য লিজকে শুধুমাত্র তার ভারত-প্রীতির জন্যই বিয়ে করতে রাজি হয় নি। লিজ-এর বাবা একজন সম্পন্ন আলু-চাষী, তাঁর পুত্র সন্তান নেই, তিনটি কন্যা। লিজ পিতৃ-সম্পত্তির ভাগ পাবে, মৃত স্বামীর জমি-জমাও সে পেয়েছে। সুতরাং বঙ্কুর চোখে পত্নী হিসেবে লিজ বেশ শাঁস লো। তবে বঙ্কুর বন্ধুরা তাকে উপদেশ দিয়েছে, সব সময় বউ-এর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে যাবি, দেখিস সাবধান, একটু যেন এদিক ওদিক না হয়। আইরিশ মেয়েরা এমনিতে যতই নরম হোক আর সংস্কৃতি-চর্চা করুক, কখন যে দপ্ করে জ্বলে উঠবে তার ঠিক নেই। আইরিশ মেজাজ বলে কথা!

বঙ্কু তার পত্নীকে মুগ্ধ করার জন্য নানারকম ভড়ং শিখেছে। সে সকাল-বিকেল ঘণ্টাখানেক ধরে

আহ্নিক করে, সপ্তাহে একদিন নিরামিষ খায়, বিলেতে থাকতে শিব-দুর্গা বা কোনো হিন্দু ঠাকুর দেবতার ছবি জোগাড় করতে পারে নি কিন্তু গৌতম বুদ্ধের একটি ছবি পেয়ে সেটিকেই লকেটে পুরে গলায় ধারণ করে।

প্রথম দিন এসেই সে বিমানবিহারীকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল, দাদা, তুমি গীতা পড়েছো?

ছোট ভাই আবারে বিলেত থেকে বোম্বাইতে নেমে ধুতি-পাঞ্জাবী কিনে তা পরে কলকাতায় এসেছে বটে কিন্তু তার কাছ থেকে গীতা সম্পর্কে আগ্রহের কথা শুনবেন, এমনটি বিমানবিহারী কল্পনাও করেন নি।

তিনি আমতা আমতা ভাবে বললেন, না, সেরকমভাবে পড়িনি, পড়লেও বুঝি নি।

বঙ্কু বললো, আমার বউ, বুঝলে গীতা-টিতা সম্পর্কে খুব ইন্টারেস্টেড! আমাকে প্রায়ই নানা কথা জিজ্ঞেস করে। আমি তো ওসব জানি না ছাই! একটা বামুন পণ্ডিত জোগাড় করো, মোটামুটি আমাকে বুঝিয়ে দেবে। আর হ্যাঁ, রামায়ণ মহাভারতের ইংলিশ ট্রানস্লেশন পাওয়া যায়? ও দুটোও পড়ে নিতে হবে আমাকে। শ্রীকৃষ্ণকে আমি অর্জুনের মামা বলেছিলুম, ও ঠিক ধরে ফেলেছে। ও বলে, শ্রীকৃষ্ণ নাকি অর্জুনের শালা?

বিমানবিহারী হাসতে লাগলেন। বউ-এর ঠেলায় পড়ে কাবু হয়ে গেছে তাঁর ভাই। কোনোদিন যে-সব বই সে ছুঁয়েও দেখে নি, এখন সেই রামায়ণ-মহাভারত পড়ে বউয়ের কাছে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে।

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্বটি মোটামুটি নির্বিঘ্নেই উৎরে গেছে। মায়ের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ লিজ-এরই বেশি ছিল। বিমানবিহারী আগে থেকেই মা-কে বুঝিয়ে এসেছিলেন যে এই নতুন বউ কিছু কিছু বাংলা জানে, স্বভাব মোটেই উগ্র নয়, অতি লক্ষ্মী মেয়ে ইত্যাদি। মা এখন প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকেন, হাঁপানিতে কাবু করে ফেলেছে, আগের মতন আর তেজ নেই।

বঙ্কু স্ত্রীকে নিয়ে মায়ের ঘরে এলো বাইরে জুতো খুলে রেখে, লিজ-এর ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট থাকার প্রশ্নই নেই কারণ সে একেবারেই সিগারেট খায় না। শাড়ি পরা মেম বউমার দিকে মা বিস্ফরিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। লিজ বাংলাতেই বললো, মা আপনার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে এসেছি। কিন্তু তার উচ্চারণের জন্য মা সে ভাষা একবর্ণও বুঝতে পারলেন না। লিজ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই মা আঁতকে উঠে বললেন, না, না, ওরে বারণ কর, আমাকে ছুঁতে বারণ কর!

মাকে পা গুটিয়ে দেখে নিতে লিজ হতভম্বভাবে স্বামীর দিকে তাকাতেই বঙ্কু বললো, আম মাম্মার স্কিন ডিজিজ আছে, সেই জন্য টাচ্ করতে বারণ করছেন, তোমার ভালোর জন্যই। তুমি একটু ডিসটেন্স থেকে নমস্কার করো।

এরপর লিজ হাত জোড় করে নমস্কার জানাতে মা-ও প্রতি-নমস্কার জানলেন। উপহার হিসেবে লিজ কয়েকটি চকলেট বার এবং এক জোড়া দুল বার করতেই ফিক করে হেসে ফেললেন মা। তিনি ভাবলেন, ও দেশের বুড়ো ধাড়ী শাশুড়িরাও বুঝি চকলেট খায়? বিধবারা কানে দুল পরে? মায়ের সেই হাসিতেই পরিবেশ অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেল।

পরে মা বিমানবিহারীকে বলেছিলেন, ওরা এ বাড়িতে থাকতে চায় থাকুক, কিন্তু ঐ বউয়ের হাতের ছোঁয়া আমি খেতে পারবো না। ও যেন নিরিমিষ রান্নাঘরে না যায়। ওরা এঁটোকাঁটা মানে না...

বিমানবিহারী বলেছিলেন, মা, এ বউ কিন্তু আমাদের আচার অনুষ্ঠান অনেক কিছু জানে।

মা উত্তর দিয়েছিলেন, দ্যাখ বীরু, আমরা আর ক'দিন? আমাদের মতন পুরোনোরা সব মরেঝরে গেলে, তারপর তোরা সব মেনে নিস।

প্রথমে প্রথমে এ দেশের সব কিছুই লিজ-এর পছন্দ। ভালো লাগাবার মতন মন নিয়েই সে এসেছে। পথঘাটের আবর্জনা, হিসির দুর্গন্ধ, মানুষের সরাসরি কৌতূহলী দৃষ্টি, ট্রাম-বাসের অমানুষিক ভিড়, অনাবশ্যক কোলাহল, এসব কিছুই তাকে দমিয়ে দিতে পারে না। যা কিছু সে দেখে সবই হাউ সুইট, কী চুড়োর, কী ভালো! একমাত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে সে নাক সিঁটকে বললো, এঃ এটা কী? হোয়াট সনস্টসিটি। পাথরের বিপুল অপচয়। আমি এটা দেখতে চাই না, আমি কালীঘাটের মন্দির দেখবো।

ইংরেজ চলে যাবার পরেও সারা ভারত জুড়ে ইংরেজ-ভক্তির প্রাবল্য দেখে লিজ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়। তাদের আয়ার্ল্যান্ডে তো এরকম নেই। কুচক্রী ইংরেজী ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করে দিয়ে গেছে, আয়ার্ল্যান্ডেও ঠিক তাই। ইংরেজের সেই ভেদ-নীতির কথা মনে পড়লেই আইরিশ রক্ত গরম হয়ে

ওঠে। ১৯৪৮ সালেই স্বাধীন আয়ার্ল্যান্ড কমনওয়েলথের জয়গান করেন।

ভারতীয়রা দার্শনিক বা উদাসীন বা ক্ষমাপরায়ণ, সেটা বুঝতে পারে লিজ, কিন্তু ইংরেজ-চাটুকারিতার কারণ সে খুঁজে পায় না। এখানকার শিক্ষিত মানুষদের ভাব ভঙ্গি ইংরেজদের মতন। লিজ নিজে ভাঙা ভাঙা বাংলা বলার চেষ্টা করে কিন্তু তার সঙ্গে সবাই কথা বলে ইংরেজীতে। সে শ্বেতাঙ্গিনী বলেই যে তাকে বেশি খাতির করা হচ্ছে এটা সে টের পায়। যে-কোনো বাড়ির অন্দর মহলে গেলেই সে বাড়ির মেয়েরা তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলাবলি করে, কী ফর্সা! অথচ ভারতীয় মেয়েদের জলপাই-রঙের গাত্রবর্ণ লিজের অনেক বেশি সুন্দর মনে হয়।

লিজ নিজেকে বারবার আইরিশ বলে পরিচয় দিলেও সবাই তাকে ইংরেজ বলেই ধরে নেয়। আয়ার্ল্যান্ড সম্পর্কে এখানকার অনেকেরই প্রায় কিছুই ধারণা নেই, ইউনাইটেড কিংডম ও আয়ার্ল্যান্ড যে দুটি আলাদা স্বাধীন দেশ, তা এরা জানে না। কেউ কেউ অবশ্য জর্জ বার্নাড শ এর সিস্টার নিবেদিতার নাম বলে, ঐ দুটি মাত্র আইরিশ নাম এ দেশে পরিচিত।

সিস্টার নিবেদিতা অর্থাৎ মিস মার্গারেট নোবেল-এর নাম লিজ আগে শোনে নি। এই মহিলাটির কোনো পরিচিতিই নেই তাঁর নিজের দেশে। এঁর জীবনী পড়েলিখ অবাক হয়। অতদিন আগে তার দেশের একটি মেয়ে এত দূর দেশে এসে কত সব কাজ করে গেছে! নিবেদিতার কাহিনী জানার পর লিজ একদিন দেখতে গেল বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে সে যেন আবহমান কালের ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করে। সেই তুলনায় কলকাতা-নগরী যেন ব্রিটিশের পরিত্যক্ত এক আর্জনার স্তূপ। কেউ সম্মার্জনী ধরে পুরোনো ক্লেদ ঝেঁটিয়ে ফেলে তাকে ভারতীয় রূপ দেবার চেষ্টা করে না।

লিজ একদিন তার স্বামীকে বললো, সে রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান দেখতে যাবে।

এসব ব্যাপারে বঙ্কুর জ্ঞান ভাসা-ভাসা। সে বললো, টেগোরের জন্মস্থান, সে তো শান্তিনিকেতন, সেখানে খুব গরম। চলো ডার্লিং, তোমাকে দার্জিলিং নিয়ে যাবো। সেখানে ভালো ঠান্ডা পাবে।

বঙ্কুর থেকে লিজ অনেক কিছু বেশি জানে। এ দেশে আসার পর থেকে সে স্বামীকে আস্তে আস্তে চিনতে শিখেছে। সে বললো, ঠান্ডা ভোগ করার জন্য কি আমি এ দেশে এসেছি? ডাবলিনে ঠান্ডা কিছু কম আছে? শান্তিনিকেতন তো কবির আশ্রম ছিল, কিন্তু কবি জন্মেছিলেন এই কলকাতা শহরেই। আমি সেই বাড়িটা দেখেতে যেতে চাই।

বঙ্কু তখন তার দাদাকে জিজ্ঞেস করলো, রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান কোথায়। বিমানবিহারী বললেন, জোড়াসাঁকোতে, সেটা নর্থ ক্যালকাটায়, তিনি নিজেও সেখানে কোনোদিন যান নি। বঙ্কু বললো, তাহলে কী করে সেখানে যাওয়া যায়? ট্যাক্সিওয়ালার কি চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে? বিমানবিহারী বললেন, তাতে সন্দেহ আছে, কলকাতায় ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রায় সবাই পাঞ্জাবী বা বিহারী।

এই সব আলোচনা শুনে লিজ আরও অবাক হয়। অত বড় একজন কবি, এসিয়ার প্রথম নোবেল লরিয়েট, এই শহরে তিনি জন্মেছেন, অথচ এখানকার শিক্ষিত লোকেরা তাঁর বাড়ি কোথায় জানে না? বিয়ের পর লিজ বঙ্কুর সঙ্গে মাস ছয়েক লন্ডনে এসে ছিল। সেখানে বঙ্কুর যে-সব ভারতীয় বন্ধুদের সে দেখেছে, তারা তো প্রত্যেকেই একবার না একবার স্ট্র্যাটফোর্ড অন আভন্‌-এ শেক্সপীয়ারের বাস্তুভিটে দেখতে ছুটেছে।

শেষ পর্যন্ত বিমানবিহারী প্রকাশনালয়ের এক কর্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে পাঠানো হলো। চিৎপুরের কদর্য রাস্তা, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ঢোকার মুখে সরু গলিতে সারি সারি তোলা উনুনের ধোঁয়া, সামনের চত্বরে শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে দুটি ষাঁড়, এসব দেখে লিজ-এর মনটা বিমর্ষ হয়ে যায়। অতি মনোহর প্রাচীন বাড়িটির গায়ে কোথাও কোথাও দগদগে ঘায়ের মতন নতুন প্লাস্টার ও ক্যাটকেটের রং করা। সেই বিশেষ দিনটিতে আরও চারজন বিদেশী এসেছে সেই ঐতিহাসিক ভবনটি দেখতে কিন্তু ভারতীয় দর্শক আর একজনও নেই। কয়েকটি খালি-গায়ে বাচ্চা ছেলে তাদের ঘিরে ধরে ভিক্ষে চাইছে।

অলি আর বুলি সেদিন গিয়েছিল লিজ-এর সঙ্গে। এই দুটি মেয়েকে লিজ-এর খুব পছন্দ। প্রথম প্রথম লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে ওরা মেম-কাকিমার সঙ্গে মিলতে পারত না, কিন্তু এখন বেশ সাবলীল। মেম-কাকিমার সঙ্গে ইংরেজী বলতে হয় না, বরং তার মজার বাংলা কথা শুনে ওরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। এখন ওদের কাছেই লিজ বাংলা উচ্চারণ শেখে।

অলির বয়েস মাত্র এগারো হলেও রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা সে পড়েছে। ঠাকুরবাড়ির

দোতলায় যে-ঘরটিতে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা সে পড়ছে। ঠাকুরবাড়ির দোতলায় যে-ঘরটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন, সেই ঘরটিতে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ বলে ওঠে ঃ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়ে উঠল প্রাণ...

লিজ ছাড়া অন্য বিদেশীরাও মুগ্ধ হয়ে শুনলো সেই আবৃত্তি। তারপর অলি চুপ করতেই লিজ তাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভিজিয়ে দিল তার গাল।

বঙ্কু সঙ্গে আসেনি, অফিসের কর্মচারিটি অপেক্ষা করছে ভাড়া-করা ট্যাক্সিতে। নিচে নেমে এসে লিজ অলিকে বললো, চলো, আরও কোথাও যাই।

কোথায় যাওয়া যায় বলো তো?

অলি বললো, বাবলুদাদাদের বাড়ি যাবে?

- কে বাবলুদাদা?

- বাবলুদাদা আমার বন্ধু। আর ও বাড়িতে মুন্নি আছে, সে বুলির বন্ধু।

- তোমাদের দু'জনেরই বন্ধু আছে যখন, তখন সেখানে তো যেতেই হয় একবার। কিন্তু এই দুপুরবেলা গেলে তোমাদের বন্ধুদের মা-বাবা কিছু মনের করবেন না তো?

বুলি বললো, না, কাকিমা সব সময়ে হাসে।

খানিক বাদে বাগবাজারে বাবলুদের বাড়ির সামনে থামলো ট্যাক্সি। সেই ট্যাক্সি থেকে লিজকে নামতে দেখেই ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল। হোক না শাড়ি পরা, তবু তো খাঁটি মেম। এ পাড়াতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানও চোখে পড়ে না।

গ্রীষ্মের ছুটি তাই বাবলু, পিকলু, তুতুল সবাই বাড়িতে আছে। প্রতাপ কলকাতার বাইরে গেছেন কী একটা কাজে। মমতা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেও খুব একটা ঘাবড়ালেন না, অল্পবয়েসে তিনি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটি স্কুলে খাঁটি ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়েছেন। তাঁর বাপের বাড়িতে একটা ইংরেজী আবহাওয়া ছিল, এখনো তিনি ইংরেজীতে কথা বলার কাজ চালিয়ে দিতে পারেন।

সুপ্রীতি গ্রামে লেখাপড়া করেছিলেন, তিনি ইংরেজী জানেন না, তিনি মেমকে আসতে দেখেই এস্তে রান্নাঘরে আশ্রয় নিলেন এবং সেখান থেকে মেমের মুখে বাংলা কথা শুনে তিনি ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হতে লাগলেন।

বাবলু-পিকলুদের ঘরটা এমনই লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে যে সেখানে কোনো বিশিষ্ট অতিথিকে বসানো যায় না। লিজকে আনা হলো মমতাদের শোবার ঘরে। মমতা অলি আর বুলির দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোরা আসবি, আগে থেকে খবর দিস নি কেন?

লিজ বললো, আমরা আপনাডেরকে চোম্‌কে ডিটে এশেসি!

মমতা লজ্জা পেয়ে বললেন, বেশ করেছেন, বেশ করেছেন, খুব খুশী হয়েছি। ইউ আর ওয়েলকাম। মোস্ট ওয়েলকাম। আমরা খুব খুশী হয়েছি।

মুশকিল এই যে এ মেয়ের সামনে বাংলায় কোনো গোপন কথা বলারও উপায় নেই। অলি-বুলিদের যে একজন মেম-কাকিমা এসেছে, সে খবরই জানতেন না মমতা। তিনি ওদের জন্য মিষ্টি কিনে আনতে পাঠালেন বাবলুকে।

লিজ যে-কোনো বাড়িতে গেলেই সে পরিবারের প্রত্যেকের সম্পর্কে প্রশ্ন করে। কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, কে কোন্ কাজ করে বা কতদূর লেখাপড়া জানে। এই সব জানতেই তার কৌতূহল। তুতুলকে দেখার পর তার মাকেও ডেকে আনা হলো প্রায় জোর করে। সুপ্রীতিকেই কেন যেন বেশি পছন্দ হলো লিজ-এর। সুপ্রীতির সঙ্গে নাকি তার মায়ের মুখের মুখ মিল।

এতটুকু একটা অ্যাপার্টমেন্ট-এ যে একটা যৌথ পরিবার থাকতে পারে, সেটাই লিজ-এর কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। চারটি ছেলেমেয়ের কেউ হস্টেলে থাকে না, বাড়িতে থেকে পড়ে। আর্থিক অনটন আছে তা বুঝতেই পারা যায়। কিন্তু এদের মধ্যে যে একটি চাপা সম্ভ্রমবোধ আছে লিজ সেটাও টের পেল, কথায় বার্তায় কোনো হীনমন্যতা নেই। লিজ জানে তার নিজের দেশের দরিদ্ররা কত রুক্ষ ও

তাদের কথাবার্তা কী রকম অমার্জিত হয়। মনে মনে সে এই তুলনাটি করে নিল।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পিকলু। তার মুখে সদ্য দাড়ি-গোঁফের রোম রেখা উঠেছে, ঠিক পলিমাটির ওপরে নবীন তৃণের মতন। সে একাগ্রভাবে দেখছে লিজকে। তার যা বয়েস তাতে সে কোনো অপরিচিতা নারীর সঙ্গে চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না, দৃষ্টিটা শরীরের নানা অংশে ঘোরে।

লিজ একবার পিকলুর দিকে মনোযোগ দিয়ে বললো, এবারে আমি এই যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে চাই। সব বাংলায় বলতে পারবো না, তোমার সঙ্গে আমি ইংরেজীতে কথা বলতে পারি?

পিকলু মাথা নেড়ে বললো, ইয়েস, ইউ ক্যান।

লিজ বললো, নবীন যুবক, এর পর তোমরাই তো ইন্ডিয়া নামে দেশটা চালাবে। তোমার কী মত, এই দেশটা পাশ্চাত্যের অনুকরণে যান্ত্রিক সভ্যতাকে বরণ করে নেবে না খাঁটি প্রাচ্য দেশীয় হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে?

পিকলু মাটির দিকে চোখ রেখে একটু চিন্তা করে ইংরেজীতে বললো, আমার তো মনে হয় এ দেশে সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি বর্জন করে মেষপালকদের যুগে ফিরে যাওয়া উচিত।

- মেষপালকদের যুগ? তার মানে?

- এ দেশে এত মানুষ। একজন মেষপালকই ভালো জানবে কী করে এতজনকে একসঙ্গে চালাতে হয়।

লিজ হাসতে গিয়েও থেমে গেল। ভুরু কুঁচকে বললো, এটা খুব একটা উজ্জ্বল চিন্তা নয়।

পিকলু বললো, আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, এ দেশের বড় বড় কলকারখানার দরকার নেই। মোটর গাড়ি কিংবা সেলাইকলের দরকার নেই। তার বদলে সারা দেশের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে অসংখ্য টিউবওয়েল পুঁতে দেওয়া হোক, তাতে সব মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবে, সেই জল দিয়ে চাষ করতে পারবে। প্রত্যেক গ্রামে তাঁত বসানো হোক, তাতেই প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় পাওয়া যাবে।

- তাতে তোমার দেশটা সারা পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার পিছিয়ে যাবে না?

- আমাদের এই সদ্য স্বাধীন দরিদ্র দেশ পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার নামতে গেলে এমনিতেই পারবে না, হোঁচট খেয়ে পড়বে। তার চেয়ে আলাদা হবার চেষ্টা করাই ভালো।

- তুমি বুঝি একজন কবি?

- না, না, সে সব কিছু না। এমনিই বললুম!

বেলা প্রায় পৌনে একটা বাজে, এবারে উঠতে হয়। ভবানীপুরের বাড়িতে ওঁরা চিন্তা করবেন। অলি আর বুলিকে নিয়ে লিজ উঠে পড়লো, মমতা আর সুপ্রীতিকে অনেক ধন্যবাদ জানালো।

দরজার বাইরে বাবলুকে দেখে লিজ বললো, এই বুঝি ওলির বয়ফ্রেণ্ড? তুমি আমাদের সঙ্গে একটাও কথা বললে না কেন?

অলি বললো, এই বাবলুদা, তুমি কথা বললে না, কেন কাকিমার সঙ্গে? জানো কাকিমা, বাবলুদাটা বড্ড রাগী!

লিজা বললো, তাই নাকি?

হাত বাড়িয়ে সে বাবলুর একটা হাত ধরে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কেমন আছো?

বাবলু গড় গড় করে বললো, অল রাইট, ভেরি গুড! হাউ আর ইউ!

লিজা হেসে ফেলে বললো, কী মিষ্টি গলা! ওলি, তোমার ছেলে-বন্ধুকে যদি আমি একটু চুমু খাই তুমি কি তাতে রাগ করবে?

বলেই সে ফটাফট করে বাবলুর দু'গালে দুটি চুম্বন এঁকে দিল। লজ্জায় কান লাল হয়ে গেল বাবলুর।

বাড়িতে একটি জলজ্যান্ত মেম আসা বেশ বড় একটা ঘটনা। দিনের পর দিন সেই আলোচনা চলে। তার হাসি, তার শাড়ি পরার ধরন, তার বাংলা উচ্চারণ, তার দু'আঙুলে চিমটের মতন সন্দেশ তুলে খাওয়া। বাবলুর গালে সেই মেম চুমু খেয়েছে বলে তুতুল, পিকলু আর মুন্নি রোজ তাকে রাগায়। কানুও সেই সঙ্গে জুটেছে। কানু বলে মেমের খুব পছন্দ হয়েছে বাবলুকে, সে তাকে বিলেতে ধরে নিয়ে যাবে! বাবলু তাই শুনে সবাইকে মারতে যায়।

লিজ-এর সঙ্গে তর্ক করে পিকলুরও খুব উৎসাহ হয়েছে মেমের সঙ্গে আবার কথা বলার। প্রতাপ ফিরে আসার পর একদিন গেলেন ভবানীপুরের বাড়িতে, পিকলু গেল তার সঙ্গে। বাবলুর সেদিন জ্বর,

তার যাওয়া হলো না। তার বিষম রাগ হলো জ্বরের ওপর।

পিকলু ফিরে এসে রাত্তিরবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফিসফিস করে জানালো, বঙ্কুকাকার সঙ্গেমেম-কাকিমার খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। তিনি একা একা তাজমহল দেখতে চলে গেছেন আজ সকালেই। এখানে আর ফিরবেন না।

বাবলু পাশ ফিরে শুয়ে একটিও কথা বললো না। জ্বরের ঘোরে তার খুব দুঃখ হলো, সারা জীবনে তার আর কোনো মেম দেখা হবে না।

॥ ২৩ ॥

একটা মোটরবাইক চেপে হাজির হলো আলতাফ। মাদারিপুর থেকে সে খোঁজ করতে করতে আসছে। মোটরবাইকের তেজী আওয়াজ কাঁপিয়ে দিচ্ছে দিগন্ত পর্যন্ত, একপাল কাচ্চাবাচ্চা ছুটে আসছে পেছন পেছন। শীতকাল বলেই গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছোবার রাস্তা পেয়েছে। তাও ঠেলে ঠেলে আনতে হয়েছে দু'জায়গায়।

মামুনের বাড়ির উঠোনের কাছে শিশুবাহিনী সমেত মোটরবাইক এসে থামলো। আধুনিক যুদ্ধের সেনাপতির মতন চেহারা আলতাফের। ফর্সা রং, দাড়ি নেই, গোঁফ আছে, মাথা ব্যাক ব্রাশ করা চুল। চোখে সান গ্লাস, গায়ে একটা চামড়ার কোট, দু'হাতে দস্তানা।

মোটরবাইকের গর্জন থামিয়ে, হাত থেকে দস্তানা খুলে সে হাঁক দিল, মামুন ভাই! মামুন ভাই!

মামুন আগেই জানলা দিয়ে দেখেছেন এই অদ্ভুত আগন্তুককে। তিনি ঠিক আন্দাজ করতে পারছেন না যে লোকটি কিসের দূত। অবশ্য অশুভ আশঙ্কাটাই প্রথম মনে জাগে। দিনকাল ভালো নয়। কে কার নামে কখন কোথায় লাগিয়ে দেবে তার ঠিক নেই। কয়েকদিন আগেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নুরুল হুদা সাহেব বলছিলেন, মামুন, তুমি যে এখনো এত বেশি কলকাতার গল্প করো, সেটা কিন্তু অনেকে ভালো চোখে দেখবে না। কেউ কেউ ভাবতে পারে, এখনো তোমার মন পড়ে আছে ভারতে! কিংবা তুমি ভারতে দালাল!

স্বাধীন ভারতও পাকিস্তানের জন্মলগ্নের প্রায় পরে পরেই কাশ্মীর নিয়ে একটা বখেরার সৃষ্টি হয়ে আছে। তিক্ততা বাড়ছে ক্রমশই। যুদ্ধ উপলক্ষে সকলেরই দেশাত্মবোধ তীব্র হয়ে ওঠে। দেশাত্মবোধের অপর নাম ঘৃণা। ভাই-ভাই ঝগড়া করে বাড়ির মাঝখানে বেড়া তুললে তারা শত্রুর চেয়েও বেশি শত্রু হয়।

ডাক শুনে মামুন বেরিয়ে এলেন এবং যুবকটিকে একেবারেই চিনতে পারলেন না।

যুবকটি সাড়ম্বরে কৃত্রিম গলায় বললো, সেলাম আলেকুম মামুনভাই, শরীর-গতিক সব ভালো তো?

মামুন অনেকটা যান্ত্রিকভাবে উত্তর দিলেন, আলাইকুম আসসেলাম! হ্যাঁ ভালো আছি। আপনি?

চোখ থেকে সান গ্লাস খুলে যুবকটি বললো, আমায় চিনতে পারলেন না? আমি আলতাফ। আলতাফ হোসেন!

অন্তত দু'জন আলতাফ হোসেনকে চেনেন মামুন। তার মধ্যে একজন আলতাফ তো খুবই প্রতিপত্তিশালী। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলায় নাজিমুদ্দিনের আমলে সরকারের প্রচার সচিব। এমনিতে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষ, কিন্তু শরীরের প্রতিটি গাঁটে গাঁটে যেন সাম্প্রদায়িকতার বিষ জমে ছিল। সেই উদ্দেশ্যে তিনি যে কোনো ঘটনাকেই ইচ্ছে মতন রূপ দিতে পারতেন। মামুন একবার সেই আলতাফ হোসেনকে বলেছিলেন...

নাঃ, আবার কলকাতার কথা মনে এসে যাচ্ছে। সে যাই হোক, এই মোটর-বাইক-আরোহী আলতাফকে তিনি আগে কখনো দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। লোকটি এমন অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলছে, যেমন অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলতে পারে হয় কোনো পুলিশের গোয়েন্দা অথবা কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

মামুন বললেন, আসেন, আসেন, ভিতরে আসেন!

আলতাফ প্রথমে তার যানটিতে চাবি লাগালো। তারপর বললো, মনে তো হচ্ছে আপনি এখনো আমারে চিনতে পারেন নাই? আমার আব্বা রফিক আহমদ সরকারকে মনে আছে তো? দাউদ কান্দিতে আপনাদের একেবারে প্রতিবেশী ছিলেন?

মামুন এবারে একেবারে পরিষ্কার বুঝে গেলেন। দাউদ কান্দিতে ঐনামের কেউ ছিল না, প্রতিবেশী হলে মামুনের নিশ্চিত মনে থাকতো। এই লোকটি অন্য কোনো মতলোবে এসেছে।

বাড়ির দাওয়া-তে মোড়া পেতে তিনি বসতে দিলেন আলতাফকে। এখন শেষ বিকেল, চা খাওয়ার সময়। অন্দরমহলে চায়ের কথা জানিয়ে দিয়ে মামুন জিজ্ঞেস করলেন, এখন আপনি কোথা থেকে আসছেন? রাত্তিরটা এই গরিবের বাড়িতেই থাকেন।

আলতাফ বললো, আরে মামুন ভাই আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন! আমি কত ছোট, আপনার পোলার মতন। ভাবী কোথায়?

- আসছেন, চা বানিয়ে নিয়ে আসছেন।

- অনেকদিন আপনি ঢাকায় যাননি, তাই না মামুন ভাই? ঢাকায় আপনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল শেষবার মাক্কুশা মাজারের কাছে। সেখানকার ক্যাপিটাল প্রিন্টিং প্রেসে আপনি আড্ডা দিতে যেতেন না? আবদুল গণি হাজারী, সরদার জয়েনউদ্দীন এঁরা সব থাকতেন, আমিও ছিলাম। আপনি আমার সাথে কথাও বলেছেন!

- ও তাই নাকি? আমার তো মনে নাই!

মামুনের মনে হলো, এই লোকটি নানারকম কথা বার করতে চাইছে। এর কাছে যে-কোনো মন্তব্যই বিপজ্জনক। তবু, ভালো ব্যবহার করতেই হবে।

আলতাফ পকেট থেকে একটি পাঁচশো পঞ্চাশ নম্বর সিগারেটের প্যাকেট বার করে মামুনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ন্যান।

মামুন বললেন, আমার চলে না।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, বিদেশী দামী সিগারেট, ওর সান গ্লাস, চামড়ার কোট, দস্তানা, ঐ মোটরবাইক, সবই বিদেশী! এই সবই বর্তমান পাকিস্তানী যুবকদের ভোগ্যবস্তু।

সিগারেটে টান দিয়ে আলতাফ বললো, এই গ্রামের ইস্কুলে আপনি পড়াচ্ছেন নাকি, মামুনভাই?

- নাঃ!

- তা হলে ঢাকা শহর ছেড়ে এখানে বসে আছেন কেন?

- এমনিই চুপচাপ বসে আছি।

- আপনার সন্ধান কী করে পাইলাম জানেন? নদীমাতৃক নামে একটি পত্রিকায় আপনে সাক্ষাৎকার দিছেন না? সেইটা পড়লাম।

- ও।

- আপনি কয়েকটা বেশ ভালো কথা বলেছেন। আপনার সাথে আমার খুব প্রয়োজন। আপনাকে একবার টাঙ্গাইল যেতে হবে। আমার সাথেই চলেন।

- আমি টাঙ্গাইল যাবো? কেন?

- আগে আমার পরিচয়টা দিয়া লই। বায়ান্নর ছাত্র আন্দোলনে আমি ভালোই জুটছিলাম, অল্পের জন্য জেল খাটি নাই। তারপর বি এ পাশ করছি। কিন্তু চাকরি-বাকরিতে মন বসে না। ঢাকা শহরের আড্ডাই আমারে খাইছে। বাড়ি থেকে টাকা পয়সা পেতাম, বুঝলেন। আমার আব্বা একটু মাঝে মধ্যে বকাবকি করলেও আমার মায় আমারে খুব ভালোবাসে। চলছিল বেশ ভালোই। কিন্তু মা এখন একটা বায়না ধরেছেন। সেইজন্যই আপনার সাহায্য চাইতে ছুটে এসেছি।

মামুন মুখভঙ্গিতে যথাসাধ্য ভদ্রতার ভাব বজায় রাখবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই প্রগলভ যুবকটির কাহিনী কেন তিনি শুনতে বাধ্য তা কে জানে! এর গল্পের মাথা-মুণ্ডু তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

তিনি শুষ্কভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী সাহায্য করবো আমি?

- আমার মা এখন বলছেন, ওরে বকু, (বকু আমার ডাক নাম, বুঝলেন, শুধু আমার মা আমারে এই নামে ডাকে) মা বললেন, তুই শুধু শুধু আজরাইলডার মতন ঘুইরা বেড়াস, তুই বিয়া-শাদী না করলে তোরে আমি আর টাকা দিমু না!

যেন একটা হাসির কথা, আলতাফ প্রচণ্ড জোরে বাড়ি কাঁপিয়ে হেসে উঠলো হা-হা শব্দে।

মামুনও কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বললেন, কিন্তু আমার তো কোনো বিবাহযোগ্য কন্যা নাই, আমি তোমাকে কী ভাবে সাহায্য করবো বলো তো? আমার মেয়েরা নেহাতই ছোট ছোট।

- সে জানি, সে জানি! তাছাড়া, আপনার বিবাহযোগ্য কন্যা থাকলেও কোনো লাভ ছিল না। বিয়ে করলে আমি একটি মাত্র মেয়েকেই বিয়ে করবো। মনে মনে তাকে ঠিক করা আছে। সেই ব্যাপারেই আপনার সাহায্য চাই।

- আর একটু বুঝিয়ে বলো!

- টাঙ্গাইলের উকিল সুকুমার বক্সী আপনার বন্ধু না? তিনি প্রায়ই আপনার কথা বলেন। সেই বক্সী বাড়ির মেয়ে পারুলকে আমি বিয়ে করতে চাই। আপনাকে গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

মামুন চুপ করে গেলেন। সুকুমার বক্সীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে বটে কিন্তু তা ঠিক বন্ধুত্বের পর্যায়ে পড়ে না। টাঙ্গাইলে ঐ বাড়িতে তিনি দু'একবার গেছেন। সুকুমার বক্সী মানুষটি ভারি নিরস, মেপে মেপে হিসেব করে কথা বলে।

আলতাফ বললো, মামুনভাইও তা হলে যাচ্ছেন তো আমার সঙ্গে?

- তুমি এই জন্য এতদূরে আমার কাছে এসেছো? আমার পক্ষে এখন টাঙ্গাইল যাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া আমার অনুরোধেই বা তাঁরা শুনবেন কেন! আজকাল ভিন্ন জাতের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাব-ভালোবাসার বিয়ে হচ্ছে, তা জানি। কিন্তু কোনো হিন্দু সম্বন্ধ করে কোনো মুসলমান ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবে, এতটা বোধহয় এখনো হয় নি!

আলতাফ চোখ নাচিয়ে গূঢ় ইঙ্গিত করে বললো, ভাব ভালোবাসা আছে, ভাব ভালোবাসা আছে! পারুলের মত আছে। কিন্তু ঐ গোঁয়ার উকিলটাই রাজি নয়। আমি ইচ্ছে করলে ঐ মেয়েকে বক্সীবাড়ি থেকে একদিন উঠিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারি, কিন্তু তখন আপনাদের মতন সিবারালরাই বলবেন, হিন্দুদের ওপর জবরদস্তি করা হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে! ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটে যাওয়াই ঠিক কি না?

- তুমি আমায় ঘটকালি করতে বলছো?

- অগত্যা, আর উপায় কী?

- আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

- আপনি একবার টাঙ্গাইল চলুন, আপনি একটু বুঝিয়ে বললেই হবে। ঐ বক্সী-উকিল আপনাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে!

- বললাম তো, আমার পক্ষে এটা সম্ভব না।

বাড়ির ভেতর থেকে একটি বাচ্চা মেয়ে চা নিয়ে এলো। সঙ্গে দুটি ডিম ভাজা।

আলতাফ বললো, ভাবী কোথায়? ভাবী এলেন না?

ফিরোজা বাইরের লোকের সামনে সচরাচর আসেন না। কিন্তু এই আগন্তুক সম্পর্কে তার কৌতূহল হয়েছে, তিনি ঘরের মধ্যে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। আলতাফের হাঁক-ডাকের চোটে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হলো।

আলতাফ যেন তাঁকে কতকাল ধরে চেনে। সে বললো, এই যে ভাবী, মামুনভাইকে একটু ছেড়ে দিতে হবে কয়েকটা দিনের জন্য। উনি আমার সঙ্গে টাঙ্গাইল যাবেন।

ফিরোজ আলতাফের প্রস্তাব সবই শুনেছেন। এরকম বিবাহ তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। তিনি বললেন, উনি তো এখন যেতে পারবেন না। এদিকে কাজ আছে।

আলতাফ ফিরোজার কঠিন কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব না দিয়ে বললো, কী আর এমন কাজ! চলেন চলেন, আপনিও সাথে চলেন, কটা দিন বেড়িয়ে আসবেন। টাঙ্গাইলে আমাদের একখানা বাড়ি আছে, সেখানে থাকবেন।

ফিরোজা বললেন, ধন্যবাদ। যখন আমাদের টাঙ্গাইল যাবার প্রয়োজন হবে, তখন আপনাকে নিশ্চয় জানাবো। এখন আমাদের যাওয়া হবে না।

আলতাফ ঘাড় ঘুরিয়ে উঠোনের দিকে দেখলো। কয়েকটা বাচ্চা এখনো তার মোটরবাইকটার গায়ে হাত বুলোচ্ছে। উল্টোদিকের ঘরগুলির জানলায় কয়েকটি উৎসুক মুখ। বিকেল প্রায় শেষ, লাল হয়ে এসেছে আকাশ। একপাল মুরগী ছুটোছুটি করছে এদিক সেদিক।

আলতাফ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মামুনভাই, একটু ঘরের মধ্যে চলেন তো, আপনার সাথে একটা প্রাইভেট কথা আছে।

মামুন ভাবলেন, এইবারই এসেছে চরম মুহূর্ত। এতক্ষণ আলতাফের কোনো কথাতেই সত্যের ধ্বনি ছিল না। সবই কেমন আলগা আলগা। এই প্রাইভেট কথাটাই খাঁটি শোনালো। এবারে সে গেফতারি পরোয়ানা বার করবে নিশ্চিত। কিংবা রিভলভার দেখাবে। কিন্তু কী দোষ করেছেন তিনি? ঐ ছোট্ট একটি পত্রিকায় ভাষা আন্দোলনের সম্পর্কে কথা বলাটাই অন্যায় হয়েছে?

ঘরের মধ্যে এসে আলতাফ গোপন কথার ভঙ্গিতে বললো, মামুন ভাই, আপনাকে টাঙ্গাইল

যেতেই হবে। না বলবেন না!

বিপদ এলেও মামুন আত্ম-সম্ভ্রম হারাতে রাজি নন। তাঁকে এরা ভয় দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। জোর করে নিয়ে যেতে চায় তো যাক। মুসলিম লীগের কর্মীদের রাগ আছে তাঁর ওপর। এই ছেলেটিকেও মনে হচ্ছে সেই দলের।

তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, আমার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব নয়।

- আপনাকে মৌলানা ভাসানী ডেকে পাঠিয়েছেন।

নামটা শুনে চমকে উঠলেও মামুন ভাবান্তর দেখালেন না। এটা একটা টোপ মনে হচ্ছে।

- কেন, মৌলানা কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন হিন্দু মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়েতে ঘটকালি করতে?

- এই দেখুন তোয়াহা ভাই-এর একটা চিঠি।

চিঠিটা খুলে মামুন অবাক না হয়ে পারলেন না। ঘরের মধ্যে আলো কম, তিনি জানলার কাছে এসে চিঠিখানা পরীক্ষা করে দেখলেন। যুব লীগের প্যাড, হাতের লেখাও তাঁর চেনা।

আলতাফ বললো, মামুন ভাই, যুব লীগের একজন কর্মী। আপনি আমাকে আগে দেখেছেন, এখন হয়তো মনে করতে পরছেন না। টাঙ্গাইলে আমার সবাই যাচ্ছি, মৌলানা ভাসানী আপনাকেও যেতে বলেছেন।

মামুন ভুরু কুঁচকে বললেন, আমি একজন সামান্য মানুষ, মৌলানার মতন অত বড় একজন নেতা আমাকে ডাকবেন কেন?

- মৌলানা চাইছেন সব ছোট ছোট দলগুলিকে এক করে ভবিষ্যতে একটা কর্ম পদ্ধতি ঠিক করতে। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আপনার মতন বেশ বড় একটা ফ্যাকশান বেরিয়ে এসেছে, উনি তাদের সবাইকে আবার ডাকতে চান। আপনি শোনেন নি যে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেবার প্রস্তাব উঠেছে?

- কই না, শুনিনি তো!

- আপনি গ্রামে বসে বসে ভেজিটেট করছেন, এসব জানবেন কী করে? 'চলো যাই কাজে, মানব সমাজে'! চলুন, চলুন, বেরিয়ে পড়তে হবে।

- তা হলে তোমার ঐ বিয়ের ব্যাপারটা কী বলছিলে?

আলতাফ আবার জোরে হেসে উঠলো মাথা দুলিয়ে। তারপর বললো, আমি একটু উল্টাপাল্টা কথা বলি। আপনাকে একটু টেস্ট করছিলাম মামুনভাই, আপনি কিন্তু হেরে গেছেন!

- এখনো বুঝলাম না!

- নদীমাতৃক পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অন্তর্বিবাহ চালু হওয়া উচিত। এরকম বিয়ে যত বেশি হবে ততই মঙ্গল। তা না হলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ কোনোদিন ঘুচবে না। বলেন নি একথা?

মামুন চুপ করে রইলেন।

- অথচ আমি যখন আপনাকে এইরকম একটা বিয়েতে ঘটকালি করতে বললাম, তখন আপনি পিছিয়ে গেলেন। অর্থাৎ কথা ও কাজে মিল নাই। মামুনভাই, মুখে আমরা যা প্রচার করবো, নিজের জীবনেও তো তা প্র্যাকটিস করতে হবে! তাই না?

মামুন কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। এই ছেলেটা তাকে একেবারে জব্দ করে দিয়েছে। প্রথম থেকেই একটা ভুল ধারণা করেছিলেন বলে এই ছেলেটি সম্পর্কে তাঁর মনে একটা প্রতিরোধের ভাব গড়ে উঠেছিল।

আলতাফ আবার বললো, আপনাকে প্রথমে মিথ্যা বলেছিলাম। আমাদের বাড়ি দাউদ কান্দি নয়, টাঙ্গাইল। আপনি শুনে খুশি হবেন, আপনার বন্ধু সুকুমার বক্সীর বাড়ির আমি জামাই। পারুলের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে গত বৎসর।

মামুনের চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। এখন এই ছেলেটির সব কিছুই প্রশংসনীয় মনে হলো তাঁর কাছে। কী সুন্দর স্বাস্থ্য ছেলেটির, কী রকম সরল-তেজী মুখ, উৎসাহে-ভরপুর কণ্ঠস্বর।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এতক্ষণ একথা বলোনি কেন? বক্সীবাবু আপত্তি করেন নাই?

- মোটেই না। ও বাড়িতে আমার প্রত্যেকদিন জামাই-আদর।

- তোমার বাড়িতে?

- আমার মা কান্নাকাটি করেছিলেন, আমাকে দিব্য দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বড় ছেলে তো. মাকে ভয় দেখালাম, তাহলে আমি করাচী চলে যাবো! এখন দুই ফ্যামিলিতে খুব ভাব।

- বাঃ, তুমি তো কামাল করেছো, আলতাফ।

- তা হলে আপনি যাচ্ছেন তো? মামুন ভাই!

- তুমি আমার খোঁজে এতদূর এসেছো, আমি এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি ভেবেছিলাম, সারা পৃথিবী আমাকে ভুলে গেছে।

- এরকম সেল্‌ফ-পিটি আপনাকে মানায় না, মামুন ভাই। আপনার কত বেশী অভিজ্ঞতা, আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করি।

এবার আর মামুন আবেগ দমন করতে পরলেন না, তিনি আলতাফকে জড়িয়ে ধরলেন।

আফতাফ তাঁর বাড়িতে রাত কাটাতে রাজি হলো না। মাদারীপুরে তার এক বন্ধু আছে, তার বাড়িতে ফিরে যাবার রাত কাটাতে রাজি হলো না। মাদারীপুরে তার এক বন্ধু আছে, তার বাড়িতে ফিরে যাবার কথা দিয়ে এসেছে। পুরোপুরি অন্ধকার হবার আগেই সে মোটরবাইকে গর্জন তুলে ফিরে গেল।

রাত্রে আহারাদির পর মামুন কথাটা পাড়লেন ফিরোজার কাছে। তিনি দু-একদিনের মধ্যেই ঢাকা যেতে চান। সেখান থেকে টাঙ্গাইল যাবেন।

ফিরোজা বললেন, আপনি ঐ লোকের কথা শুনে টাঙ্গাইলে হিন্দু মেয়ের বিয়ে দিতে যাবেন?

মামুন হেসে বললেন, ও ছেলে আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকে নি। আগেই কাজ সেরে ফেলেছে।

ফিরোজা তাতেও খুশী হলেন না। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না, তবু আপনার ওসবের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। ও লোকের মুখ দেখেই মনে হয়, ওরা শুধু গোলমাল পাকাতে জানে।

- আমার কিন্তু মনে হলো, এই সব ছেলেরাই নতুন ভাবে দেশ গড়বে। একেবারে টগবগ করছে। প্রাণ খুলে হাসতে জানে। সে যাই হোক, আমি তো ওর জন্যে যাচ্ছি না, আমাকে মৌলানা ভাসানী ডেকে পাঠিয়েছেন।

ভাসানীর মতন অত বড় একজন নেতা তাঁকে স্মরণ করেছেন বলে মামুনের মনে বেশ একটু গর্বই হয়েছে কিন্তু ঐ নাম শুনে ফিরোজা বিচলিত হলেন না। তিনি রাগ রাগ ভাবে বললেন, তেনার আবার আপনেরে কী দরকার? আপনে আবার পট্টি করতে যাবেন নাকি?

মামুন মাথা দোলালেন। আলতাফ কী বলে গেল? ভেজিটেট! ঠিকই বলেছে, এখানে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে তাঁর যেন শিকড় গজিয়ে গেছে।

মামুন মনস্থির করে ফেলেছেন। ফিরোজাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে হবে। এখনই রাগিয়ে দিয়ে লাভ নেই। তিনি কথা ঘুরিয়ে ফিরোজার প্রশংসা শুরু করলেন হঠাৎ। তারপর তাঁকে আদর করতে করতে অনেকদিন বাদে মিলিত হলেন খুব উৎসাহের সঙ্গে। এই শীতের রাতেও ঘাম ঝরলো।

ফিরোজা ঘুমিয়ে পড়ায় মামুন গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে চলে এলেন বাইরে। সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। শীতকালের পরিষ্কার আকাশ। শহরের একজন এসে তাঁকে ডেকে গেল, তাতেই তিনি নতুন করে কর্মচাঞ্চল্য অনুভব করছেন। যেন ফিরে এসেছে পৌরুষ। গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

এমনকি একটা কবিতার লাইনও মনে পড়ে গেল। বহুকাল পরে, আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকের মতন। লাইনটা বিড়বিড় করতে লাগলেন তিনি। এখনই লিখে না রাখলে হারিয়ে যেতে পারে। আবার তিনি কবিতা লিখবেন? আলতাফের মতন ছেলেরা সেই কবিতা পছন্দ করবে তো?

॥ ২৪ ॥

হারীত মণ্ডলকে নিয়ে ত্রিদিবকে ইদানীং বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে। সুলেখার প্রশ্রয় পেয়ে সে বাড়িতে যখন তখন এসে উপস্থিত হয়, সম-অসময় মানে না, দরজা খোলা থাকলে ওপরে উঠে যায় সরাসরি। কথা বলায় কোনো শ্রান্তি নেই। রাজনীতি বিষয়ে সে অনর্গল উগ্র মন্তব্য করে অন্যদের চমকে দিতে ভালোবাসে।

পূর্ব বাংলার সঙ্গে ত্রিদিবদের সম্পর্কে অতি ক্ষীণ হলেও রিফিউজিদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে। তা হলেও একজন রিফিউজি নেতা যখন তখন বাড়িতে এসে উপদ্রব করলে তা সহ্য করা

শক্ত।

ত্রিদিব অবশ্য অতিশয় ভদ্র। কোনোদিনই সে মুখ ফুটে হারীত মণ্ডলকে নিষেধ করতে পারবে না। হারীত এমনিতে আসা-যাওয়া করলে ত্রিদিবের কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অন্যান্য অতিথি-অভ্যাসগতদের সঙ্গে কথা বলার সময়েও হারীত এসে সেখানে বসে, আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, এবং এমন সব অদ্ভুত মতামত প্রকাশ করে যাতে কেউ কেউ অপমানিত বোধ করতে পারে। হারীতের চেহারা ও পোশাক ও কথা বলার ধরন অন্যান্য অতিথিদের চেয়ে এতই আলাদা যে তাঁরা অবাক হয়ে ত্রিদিবের দিকে তাকান।

তা ছাড়া ত্রিদিব জানতে পেরেছেন যে হারীত কাশীপুরের যে জবরদখল বাড়িটিতে থাকে, সে বাড়ির মালিক ছিলেন প্রতপের দিদির স্বামী অসিতবরণ এবং সেই বাড়ি দখলের হাঙ্গামাতেই অসিতবরণ সেখানে মারা যান। প্রতাপ হারীতকে চিনতে পারলে নিশ্চিত মর্মাহত হবেন। যে ব্যক্তি তাঁর ভগ্নীপতির মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে দায়ী, সেই ব্যক্তিকে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে খাতির যত্ন পেতে দেখলে তঁর পক্ষে ক্ষব্ধ হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

এই সমস্যার কথা বলতেই সুলেখা ব্যথিত বিস্ময়ের সঙ্গে বলে ওঠেন, ইস, ছি ছি ছি, অসিতদা কী ভালো লোক ছিলেন...এখন কী করা যায়?

ত্রিদিব বললেন, ঐ হারীত তোমাকে মা জননী, মা জননী বলে ডাকে।

- শুনলে আমার হাসি পায়।

- তুমি ওকে বারণ করতে পারবে? যাতে এ বাড়িতে আর না আসে?

- আমি? না, না তুমি বলে দাও, আমি যখন বাড়িতে থাকবো না।

শেষ পর্যন্ত আর বলা হয়ে ওঠে না। এঁরা দু'জনেই ভদ্রতার-শিকার!

ত্রিদিব মনে মনে ঠিক করে রাখলেন, এর পর প্রতাপ এলে তিনি তাঁর কাছে হারীত মণ্ডলের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে দেবেন। তারপর প্রতাপ যা ভালো বুঝবেন করবেন। কিন্তু প্রতাপ কয়েক সপ্তাহ হলো আর আসছেন না এদিকে।

এক সন্ধ্যেবেলা নিচের বৈঠকখানা ঘরে ত্রিদিব গল্প করছেন কয়েকজনের সঙ্গে, চা পরিবেশন করছেন সুখেলা। এই সময় হারীত এসে ঢুকলো সেখানে। এক কোণে নিজের স্থান করে নিল।

ইংল্যাণ্ড থেকে একটি থিয়েটার দল এসেছে কলকাতায়, তাদের তিনটি শেখ্‌সপীয়ারের নাটক দেখতে ভিড় একেবারে আছড়ে পড়েছিল। এখানে আলোচনা হচ্ছে সেই নাটকগুলির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিষয়ে। হারীত মণ্ডলের এই সব বিষয় একেবারেই বোধগম্য হবার কথা নয়, তবু সে মন দিয়ে শোনে। তার কৌতূহলের শারীরিক লক্ষণ ফুটে ওঠে, মুখটা খানিকটা হাঁ হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টি স্থির, কানদুটি খরগোশের মতন বেশি লম্বা মনে হয়।

ত্রিদিব বললেন, রিচার্ড দা থার্ড আমাদের দেখা হলো না। শুনেছি ঐটাই সবচেয়ে ভালো—

সুলেখা বললেন, আমার খুব দেখার ইচ্ছে ছিল, তুমি তো টিকিট জোগাড় করতে পারলে না।

ত্রিদিব বললেন, কী করবো বলো, যা লম্বা লাইন!

ত্রিদিবের এক বন্ধু বললেন, আমায় বললে পারতে, আমি ব্রিটিশ কাউনসিল থেকে ব্যবস্থা করে দিতে পারতুম। অবশ্য আমি লণ্ডনে লরেন্স অলিভিয়ারের প্রোডাকশন দেখে এসেছি, এটা ততটা ভালো নয়!

আর একজন বললেন, আশ্চার্য শহর এই কলকাতা! ক'দিন ধরে পাউরুটি পাওয়া যাচ্ছে না জানো তো, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে বিরাট লাইন দেখে এলুম। এই শহরের মানুষ পাউরুটির জন্যও লাইন দেয়া আবার শেক্‌সপীয়ারের নাটকের জন্যেও লাইন দেয়!

অন্যরা হেসে উঠতেই সেই সুযোগ নিয়ে হারীত বললো, সত্যিই আইশ্চর্য শহর। শিয়ালদহ ইস্টিশানে রিফিউজি থিকথিক করত্যাছে, তারই মধ্য দিয়া হৈ হৈ করতে করতে বন-ভোজন পার্টি যায়।

এরকম একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ এসে পড়ায় সবাই চুপ করে গেলেন। বস্তুত আলোচনার বিষয় হিসেবে রিফিউজিদের সাবজেক্টটা এখন তেতো হয়ে গেছে। প্রথম দিকের খানিকটা সমভ্রাতৃত্ববোধ, খানিকটা বেদনা, খানিকটা উদাসীনতা কেটে গিয়ে এখন অনেককেই বিরক্তভাবে অনুভব করতে শুরু করেছে যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর অধ্যাসে সর্বনাশ হতে বসেছে কলকাতা শহরটার।

হারীত বললো, স্যার, আপনারা গুণী-জ্ঞানী মানুষ, আপনাগো কাছে জানতে চাই, এই যে

আমাদের মতন রিফিউজিদের জোর করে দণ্ডকের জঙ্গলে পাঠাইত্যাছে, এটা কী ঠিক হইত্যাছে?

ত্রিদিবের পাশে বসা তাঁর এক সুরশ, সুপরুষ বন্ধু এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমার তো মনে হয়, এটাই খুব ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। রিফিউজিদের দায়িত্ব শুধু পশ্চিমবাংলা নিতে যাবে কেন, এটা সারা ইন্ডিয়ার লায়াবিলিটি! পশ্চিমবাংলা এমনিতেই ওভার পপুলেটেড, তার ওপরে যদি লাভ লাখ রিফিউজি এখানে বসে গাদাগাদা করে তাতে লাভ কী হবে? চাকরি-বাকরি, জমি-জমার ভাগ নিয়ে মারামারি শুরু হবে, গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইকোনমিটাই ধ্বংস হয়ে যাবে! তার চেয়ে ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ওদের ছড়িয়ে দিলে সেখানে সেখানে বেঙ্গলি পকেট হবে, তাতে আমরাই লাভবান হবো!

অন্যরাও এই যুক্তিতে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

হারীত সেই সুবেশ ব্যক্তিটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, আপনি যখন এই কথা কইলেন, তখন আপনারে একটা কোশ্চেন করি। মনে করেন, আপনে কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে বিপদে পড়ে সাহায্য চাইতে গ্যালেন, সেই আত্মীয় যদি বলে, আমার বাড়িতে তো জায়গা হবে না, আমার বাড়ির পিছনের বাগানেও নেপালী আর বিহারীগো থাকতে দিছি, তুমি বাপু জঙ্গলে গিয়া বাঘ-সিংহের সাথে লড়াই কইর‍্যা ঘর-বাড়ি বানায়া লও! তখন সেই কথা শুনে আপনের ক্যামন লাগতো?

বন্ধুটি বললেন, আপনার এই প্রশ্নটি বড্ড বেশি হাইপথেটিক্যাল। আমর এরকম ভাবে কারুর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কখনো কোনো কারণ ঘটে নি। সুতরাং এর রি-অ্যাকশানও আমি বুঝতে পারবো না। তবে, দণ্ডকারণ্যে গিয়ে আপনাদের বাঘ-সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে হবে কেন? সরকার আপনাদের জন্য নতুন টাউনশীপ বানাবে। দেখুন না, পাঞ্জাবীরা...

- শোনেন স্যার, আর একটা কথা শোনেন। আমার একখান নিজস্ব বাড়ি আছিল, টিনের চালা, তিনখান কামরা। রান্না ঘর, গোয়াল ঘরও আছিল। এছাড়া, একটা ছোট পুকুর, আর একখানা বড় শরিকী পুষ্করিণীর ভাগ পাইতাম, তেরো বিঘা খান জমি, সম্বৎসরের মাছ-ভাতের কোনো চিন্তা ছিল না। এইসব কিছু বিনা দোষে পরিত্যাগ কইরা আমি চইলা আসতে বাধ্য হইলাম ক্যান? আপনাগো মতন শিক্ষিত মানুষদের জন্যই তো!

- আমাদের জন্য?

- আলবৎ! আপনি তো মোছলমান। আপনারাই তো পার্টিশান চাইছিলেন।

ত্রিদিবের এই বন্ধুটির নাম শাহজাহান চৌধুরী। অত্যন্ত মার্জিত ও রুচিশীল স্বভাবের মানুষ। ওঁদের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা আছে, তা ছাড়া জলপাইগুড়ি জেলায় নিজস্ব চা-বাগান আছে, বেশ কয়েক পুরুষের ধনী। শাজাহান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খুব ভক্ত, গুলাম আলি খাঁ, বিলায়েৎ খাঁর মতন ভারতবিখ্যাত কলাকারেরা তাঁদের বাড়িতে এসে ওঠেন মাঝে মাঝে। ত্রিদিব তাঁর এই প্রাক্তন কলেজ-সহপাঠীর প্রভাবেই ইদানীং ঐসব গান-বাজনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। সুলেখাও খুব অপছন্দ করেন শাজাহানকে।

হারীত মণ্ডলের আকস্মিক কটুক্তিতে শাজাহানের গৌরবর্ণ মুখখানি আরক্তিম হয়ে গেল।

ত্রিদিব তাড়াতাড়ি বললেন, এসব আপনি কী বলছেন, হারীতবাবু? সব মুসলমানরাই পার্টিশানের জন্য দায়ী নাকি? এরকমভাবে আপনারা কথা বলা উচিত নয়।

হারীত উদ্ধতভাবে বললো, সব মোছলমান দায়ী, সে কথা তো আমি বলি নাই! আমাগো আশপাশের গ্রামে যেসব গরিব মোছলমান আছিল, তারা তো অনেকেই বোঝে নাই পাকিস্তান কী বস্তু! তাগো সাথে আমাগো কোনো ঝগড়া-কাজিয়া ছিল না। আমরা চইল্যা আসার সময় তাগো মইধ্যে কেউ কেউ কান্দছে। আমি কইছি শিক্ষিত মোছলমানগো কথা। তারাই তো পলিটিক্স কইরা দেশটার সর্বনাশ করলো। তারা পার্টিশান করাইলো আবার তাগো মইধ্যেই অনেকে ভারতে রইয়া দিব্যি গাড়ি হাঁকায়।

প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়ে শাজাহান চৌধুরী কঠোরভাবে বললেন, আপনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বা অধ্যাপক হুমায়ন কবিরের নাম শুনেছেন কি না জানি না। এঁরা সেই পার্টিশান বা পাকিস্তান আইডিয়া সমর্থন করেননি। আপনি যদি—

হারীত মণ্ডল উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত ছুঁড়ে বললেন, ঐসব পুতুলগো কথা বাদ দ্যান। আপনি নিরেজ সে সময় কী করছিলেন? আপনি প্রটেস্ট করছিলেন? আপনি থাকবেন কলকাতা শহরে আর আমাগো যাইতে হবে দণ্ডকারণ্যে? ক্যান?

সুলেখা মাঝখানে চলে এসে বললেন, ছি ছি ছি, হারীতবাবু, এসব কী বলছেন! আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? চলুন, আপনি ওপরে চলুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

সুলেখা কারুর অঙ্গ স্পর্শ করেন না, এখন তিনি হারীতের একটা হাত ধরে বললেন, চলুন!

অন্য কেউ এই তর্কস্থান থেকে হারীতকে সহজে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো না, কিন্তু সুলেখার ধমকে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটুক্ষণ আড়ষ্ট নীরবতার পর ত্রিদিব লজ্জিতভাবে বললেন, ওর খানিকটা মাথার গোলমাল আছে। তুমি কিছু মনে করো না, শাজাহান!

ত্রিদিবের আর এক বন্ধু অমিত ভাবলেন, ওরা নিজস্ব বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, এখানেও কুকুর-বেড়ালের মতন তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, তাতে যদি কারুর মাথার গোলমাল হয়ে যায়, সেটা অস্বাভাবিক কিছু না!

শাজাহান চৌধুরীর মুখখানি পাথরের মূর্তির মতন স্থির।

ত্রিদিব অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছেন। তার বাড়িতে এসে তাঁর কোনো বন্ধু অপমানিত হলো। এরকম আগে কখনো ঘটেনি। এখনই চ্যাঁচামেচি করে হারীতকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে হয়তো শাজাহানকে খানিকটা তৃপ্ত করা যায়। কিন্তু চ্যাঁচামেচি করাটাই যে ত্রিদিবের স্বভাবে নেই। তিনি ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হতে লাগলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘোর ভেঙে শাজাহান আপন মনে বললেন, টু নেশান থিয়োরি! ইণ্ডিয়ার লীডাররা যতই তা অস্বীকার করুক, সাধারণ মানুষের চামড়া কেটে একেবারে ভেতরে গেঁথে গেছে এই থিয়োরি। ভারতীয় হিন্দুরা আর কোনোদিন ভারতীয় মুসলমানদের বিশ্বাস করবে না!

ত্রিদিব বললেন, না, না, না, এটা তুমি কী বলছো? রেফিউজিরা হাই স্ট্রাং হয়ে আছে। ওদের মতামত উগ্র হতেই পারে এখন। কিন্তু আমাদের পুরো ব্যাপারটা হিস্টোরিক্যাল পারস্পেকটিভে দেখতে হবে!

শাজাহান বললেন, রেফিউজিরা প্রত্যক্ষ সাফারার, তারা রাগে-দুঃখে নানারকম কথা বলতে পারে তা জানি। কিন্তু অন্যদেরও মনের কথা তাই। অমিতাভও তো এইমাত্র ওদেরই সমর্থন করে বললো।

অমিতাভ ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, না, না, আমি সে সেন্সে বলিনি। আমি বলতে চাইছিলুম, ওরা অসহায় অবস্থায় পড়েছে বলেই—

শাজাহান বললেন, আমি লক্ষ করেছি, যেখানে শুধু হিন্দুরা থাকে, সেখানে আমি হঠাৎ গিয়ে পড়লে তারা থেমে যায়। যেন তারা যে আলোচনা করছিল, সেটা আমার শোনা উচিত নয়। অপ্রস্তুত হয়ে তারা প্রসঙ্গ পাল্টায়। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই এরকম দেখেছি!

অমিতাভ বললেন, এটা তোমার একটা কমপ্লেক্স, ভাই! আমরা এমন কোনো কথা বলি না—

শাজাহান হাত তুলে বললেন, ওয়েট, ওয়েট। আমার কথা শেষ হয়নি। এর অন্যদিকও আছে। আমাদের মুসলিম সমাজে প্রায়ই পাকিস্তানের প্রসঙ্গ ওঠে। প্রত্যেকেই মনে মনে পাকিস্তানের সাপোর্টার। অনেকেই ইস্ট পাকিস্তানে কিছু সম্পত্তি কিনে রাখার কথা ভাবে। কিন্তু কোনো হিন্দু সেখানে এসে পড়লে তারা এইসব কথা উচ্চারণও করবে না। সেই জন্যই বলছিলাম, টু নেশান থিয়োরি...

এই সময় সুলেখা হারীত মণ্ডলকে নিয়ে ঢুকলো। হারীত এগিয়ে এসে শাজাহান চৌধুরীর হাত জড়িয়ে ধরে নাটকীয়ভাবে বললো, আমারে ক্ষমা করেন, স্যার। আমি অন্যায় করছি। আমার মাথা গরম, পাগল-ছাগল মানুষ, কখন কীকই তার ঠিক নাই। আপনাগো কোনো দোষ নাই, আমরা রিফিউজি হইছি, সেটা আমাগো ভাগ্যের দোষ!

ব্যাপারটা সেদিনকার মতন মিটে গেলেও তার রেশ রয়ে গেল।

এর দু'দিন বাদেই ত্রিদিব সস্ত্রীক গেলেন শাজাহানের বাড়িতে। প্রায় তিন ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে এলেন। এবং পরের শনিবারের জন্য তিনি শাজাহান-পরিবারকেও নেমন্তন্ন করে এলেন তাঁর বাড়িতে সন্ধ্যা আহারের জন্য।

এর মধ্যে প্রতাপ একদিন এসেছিলেন। ত্রিদিব আর সুলেখা হারীত মণ্ডলের সব ব্যাপারটা খুলে বলতে প্রতাপের মনে বিশেষ কিছু প্রতিক্রিয়া হলো না। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, লোকটাকে একদিন এখানে দেখেছিলাম বটে, তখন চিনতে পারিনি। তা সে যদি এ বাড়িতে আসে, আমি আপত্তি করবো কেন?

ত্রিদিব বললেন, মজুমদার সাহেব, আমরা চাই, আপনি লোকটাকে একটু ধমকে দিন। যাতে সে এ-বাড়িতে আসা বন্ধ করে। আপনার জামাইবাবুর সম্পত্তি ওরা দখল করেছে—

প্রতাপ বললেন, শুনুন, আপনাদের সঙ্গে আমার একটা বেসিক তফাত আছে। আপনারা ছিন্নমূল নন, কলকাতা শহরে অনেকদিন থেকেই আপনাদের শিকড় ছিল। কিন্তু আমি তো উদ্বাস্তু! নিজেদের সম্পত্তি ফেলে এসে এখানে ভাড়া বাড়িতে মাথা গুঁজে আছি। আবার ঐ রিফিউজিদের জন্যই আমার দিদি বিধবা হয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। দিদির শ্বশুরবাড়ির আপত্তি ওরা গ্রাস করেছে। তা হলেও কি আমি রিফিউজিদের বিরুদ্ধে যেতে পারি?

- ঐ হারীত মণ্ডলের নামে যদি একটি মামলা আসতো আপনার এজলাসে, আপনি কী করতেন?

- আমি আদালত থেকে লম্বা ছুটি নিতাম। আমার পক্ষে এখানে ন্যায় বিচার করা অসম্ভব।

চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটলো পরের শনিবার।

সেদিন বিকেল থেকেই হারীত মণ্ডল হাজির। সে এ-বাড়িতে এসে কোনো রকম সাহায্য চায় না, টাকা-পয়সা সাহায্যের সামান্য ইঙ্গিত করলেও জিভ কেটে প্রত্যাখান করে। খাদ্যদ্রব্যের প্রতিও তার আসক্তি নেই। অশোক বনে সীতার সামনে হাত জোড় করা হনুমানের ছবির মতন সে শুধু সুলেখার সামনে মেঝের ওপর বসে নানারকম গল্প শোনাতে ভালোবাসে। দারিদ্র, অবিচার, অত্যাচার, বুকের মধ্যে জমে থাকা ক্রোধ, এইসব কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে সে যেন এ বাড়িতে সুস্থ জীবনের, জীবন-সৌন্দর্যের খানিকটা জাপটা নিতে আসে।

এই শনিবার এসে সে প্রথম একটা দাবি জানালো। সে সুলেখাকে বললো, মা জননী, আজ রাত্তিরটা আপনাগো বাড়িতে আমারে থাকতে দেবেন? আজ কাশীপুরে যাওয়ার একটু অসুবিধা আছে আমার।

সুলেখা আমতা আমতা করে বললেন, আজ বাড়িতে কিছু লোকজন আসবে নেমন্তন্ন খেতে...

হারীত বললো, আমি চাকরদের ঘরে শুইয়া থাকবো। তাতে আমার কোনো অসুবিধা নাই!

এর পর আর না বলা যায় না। একজন মানুষ বাড়িতে আশ্রয় চাইছে। অবস্থা বিপাকে হারীত মণ্ডল এখন অতি দরিদ্র হলেও তার একটা ব্যক্তিত্ব আছে। যে-কোনো মানুষের চোখের দিকে সরাসরি চেয়ে কথা বলতে পারে। তাকে হেলা-ফেলা করা সহজ নয়।

সুলেখা বললেন, শাজাহান সাহেবরা আসছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করবে। না!

কথায় কথায় জিভ কাটা স্বভাব হারীতের। সেই রকম ভঙ্গি করে সে বললো, আ না, না! মাপ চাইছি তো সেদিন। যদি চান তো আমি চৌধুরী সাহেবের পা টিপ্যা দিতে পারি।

সন্ধ্যের পর একে একে আসতে লাগলেন অতিথিরা। শাজাহান চৌধুরী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এলেন সাড়ে সাতটায়। তাঁর স্ত্রী চলে গেলেন ওপরে, পুরুষরা বৈঠকখানায় বসে গল্প-গুজব করতে লাগলেন। হারীত মাঝে মাঝে শাজাহান সাহেবকে অ্যাসট্রে এগিয়ে দেয় কিংবা অনুরোধ করে, আপনি মাঝখানটায় এসেবসুন, এখানে বেশি বাতাস পাবেন। আইজ যা গরম পড়ছে!

আড্ডা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় দুয়ারে করাঘাত। এ ডাক অন্যরকম, ঠিক অতিথিদের মতন নয়। ত্রিদিবের গৃহভৃত্য দু'জন অবাঞ্ছিত অতিথিকে দরজা খুলে বৈঠকখানায় নিয়ে এলো। দু'জন পুলিশ অফিসার।

একজন অপিসার বললেন, ত্রিদিববাবু কার নাম? আপনার এখানে হারীত মণ্ডল নামে কেউ—

তারপর হারীতের দিকে চোখ পড়তেই তিনি বললেন, ও এই তো! একেবারে জলজ্যান্ত হারীত মণ্ডল! চলুন!

ত্রিদিব বললেন, এই চিড়িয়াটিকে আমরা অনেকদিন ধরে খুঁজছি। একে আমরা অ্যারেস্ট করতে এসেছি।

হারীত মণ্ডল খুব একটা অবাক হয়েছে বলে মনে হয় না। মুখে ভয়ের চিহ্নও নেই। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

সে পুলিশ অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করলো, আমারে আপনারা একদিন না একদিন ধরবেন, তা জানতাম। কিন্তু কী করে জানলেন যে আইজ আমি এইখানে থাকবো?

পুলিশ অফিসারটি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ওহে, আমরাই লোককে প্রশ্ন করি। অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেবার অভ্যেস আমাদের নেই। এবার চলো। চক্রবর্তী, ওর হাতে গয়না পরিয়ে দাও!

অন্য অফিসারটি হারীতের হাতে হাত-কড়া লাগালো। হারীত মুখ ফিরিয়ে শাজাহানের দিকে তাকিয়ে বললো, স্যার, আপনে আমারে ধরায় দিলেন? আর দুই চারটা দিন যদি সময় পাইতাম!

শাজাহানের মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমি ধরিয়ে দিয়েছি? ফর গডস্ সেক...

হারীতকে নিয়ে বেরিয়ে গেল পুলিশদ্বয়।

শাজাহান ত্রিদিবের হাত চেপে ধরে বললেন, তুমি বিশ্বাস করো! আমি এর বিন্দু-বিসর্গও জানি না।

ত্রিদিব বললেন, আমি জানি! আমি জানি! সে প্রশ্নই ওঠে না!

শাজাহান আবার বললেন, পুলিশের সঙ্গে আমার কোনো কানেকশানই নেই...তা ছাড়া আমি জানতুমই না যে ও আজ এখানে...ত্রিদিব, তুমি ওয়ারেন্ট দেখতে চাইলে না কেন?

ত্রিদিব বললেন, ডোন্ট গেট আপসেট। পরে ভেবে-চিন্তে একটা ব্যবস্থা করা যাবে, শাজাহান, প্লীজ তুমি ওর কথায় গুরুত্ব দিও না!

সুলেখা খবর পেয়ে গাড়িতে তুলছে। খালি পায়েই রাস্তায় চলে এসে সুলেখা প্রায় হাহাকার করে বললেন, একী, ওকে নিয়ে যাচ্ছেন? আমাদের বাড়ি থেকে...ও কিছু খায়নি, একটু দাঁড়ান, একটু সময় দিন...

বড় পুলিশ অপিসারটি মাথা থেকে টুপী খুলে নরম গলায় বললো, আমরা দুঃখিত, ম্যাডাম, আমাদের কিছু করার নেই। এর নামে ক্রিমিন্যাল কেস আছে।

সুলেখা অন্য দিকে মুখ ফেরালেন, তাঁর দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এলো। সেই দৃশ্য দেখে পুলিশ দু'জনও অনড় হয়ে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

হারীত মণ্ডল ধরা গলায় বললো, আপনি আমার মতন একটা নগইন্য মানুষের জন্য চক্ষের জল ফ্যালালেন? মা জননী, আমি ধন্য হইলাম। পুলিশে আর আমার কী করবে, বড় জোর ফাঁসী দেবে!

॥ ২৫ ॥

বাড়িতে অসময়ে কোনো অতিথি এসে পড়লে বাবলুকেই পাঠানো হয় পাড়ার দোকান থেকে মিষ্টি কিনে আনতে। এই দায়িত্বটা পেলেই খুব খুশী হয় বাবলু। কাজটা বেশ অর্থকরী। এক টাকার রসগোল্লা কিনলেই ষোলটার বদলে দেওয়া হয় সতেরোটা। অথবা ষোলটা দিয়ে এক আনা দস্তুরী। সেটা সাধারণত চাকর-বাকররাই পায়। বাবলু মিষ্টির দোকানের কাচের আলমারির ওপর টাকাটা রেখে বলে, ষোলোটা রসগোল্লা দেবেন! এইভাবে তার কিছু পয়সা জমে। তাকে অনেক টাকা জমাতে হবে তো, নইলে বড় হয়ে সে ঘুড়িয়ে দোকান খুলবে কী করে?

দু'পয়সায় একখানা ঘুড়ি, সেগুলো আধতে। একতে কিংবা দেড়তে ঘুরি বাবলু এখনো ঠিক সামলাতে পারে না, টানের সময় তার আঙুল কেটে যায়। বিশ্বকর্মা পুজোর আগে পাড়ার ছেলেরা যখন রাস্তার এক ল্যাম্পপোস্ট থেকে আর এক ল্যাম্পপোস্ট পর্যন্ত সুতোয় মাঞ্জা দেয়, তখন বাবলু জুটে যায় তাদের সঙ্গে। কিছুকাজ করে দিলে সে-ও খানিকটা মাঞ্জা পাবে। যে-হেতু তার পয়সা নেই, সেই জন্য তাকে দেওয়া হয় সবচেয়ে বাজে কাজটি, হামান দিস্তেয় কাচ-গুঁড়ো করা। কাচও তাকেই জোগাড় করতে হবে। ভাঙা কাচ না পেলে বাবলু বাড়ি তেকে চুপি চুপি দুটি আস্ত কাচের গেলাস নিয়ে এসে অবলীলাক্রমে হামানদিস্তায় ফেলে দেয়।

পাড়ার চেলেদের যে মোড়ল সেই পরেশদা এসে মাঝে মাঝে কাচের মিহিনত্ব পরীক্ষা করে, ঠিক মনোমতন না হলে সে বলে, এই বাবলে ফাঁকি মারা হচ্ছে? বার্লি খাস নাকি, হাতে জোর নেই! এই বলেই সে একটি চাঁটি কষায় বাবলুর মাথায়।

পরেশদা অন্যান্য ছেলেদের যখন তখন চাঁটি মারতে ভালোবাসে, সেইজন্যই সে মোড়ল।

ঘুড়ি ওড়ানোতে বাবলু এখনো দক্ষ হতে পারে নি। খানিকটা দূরেই বোসদের বাড়ি। তাদের প্রকাণ্ড ছাত, সেখানে অনেকগুলো ভাই এক সঙ্গে হৈ হৈ করে ঘুড়ি ওড়ায়। বাবলু তার ঘুড়ি নিয়ে বাড়তে না বাড়তেই বোসদের টকটকে লাল রঙের দেড়তে ঘুড়ি ডাকাতের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাবলু লাট খেলবার সুযোগই পায় না, বোসদের ঘুড়ি গোঁত মারার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুড়ি কুচ করে কেটে যায়। রাগে-দুঃখে আফসোসে বাবলুর তখন হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে, চোখে জল এসে যায়, ওদিকে বোসদের ছাদে তখন ভোম মারা বলে বিকট জয়োল্লাস!

বোসদের উপদ্রবেই পরেশদা-রা পাড়া ছেড়ে ঘুড়ি ওড়াতে যায় শ্যাম পার্কে। বাবলুর সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই।

দিনে একখানার বেশি ঘুড়ি কেনার ক্ষমতা নেই বাবলুর। সেখানা কেটে যাবার পর সে ম্লান মুখে বসে থাকে ছাদে। যতক্ষণ অন্ধকার না হয়, তার নিচে যেতেই ইচ্ছে করে না। বড় হয়ে সে ঘুড়ির দোকান খুলবে, তখন তার বাড়ি ঘুড়ির অভাব থাকবে না, লাটাই ভর্তি ভর্তি মাঞ্জা, নাজির সাহেবের দোকান থেকে সে সব মাঞ্জা কিনে আনবে। তখন কে পারবে তার সঙ্গে? তার নিজস্ব নাম লেখা ঘুড়ি থাকবে, এক এক করে অন্য সমস্ত ঘুড়ি কেটে সে ফাঁকা করে দেবে আকাশ। আর কেউ থাকেব না, সে শুধু হবে আকাশের রাজা। দূর থেকে সবাই বলবে, ঐ যে উড়ছে অতীন মজুমদারের ঘুড়ি। বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লোকেরা বললে, হ্যাঁ, কলকাতা শহরের আকাশটা এখন অতীন মজুমদারের!

সেই দিনটা আসতে কত দেরি? বাবলুর আর ধৈর্য থাকে না। এখন তাকে ঘুড়ির অভাবে প্রায় বিকেলেই বসে থাকতে হয়। মাঝখানে সে একটা আঁকশি বানিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ছুটে ঘুড়ি ধরা শুরু করছিল। আঁকশিটা হাতে নিয়ে ওপরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়। প্যাঁচের খেলা দেখতে দেখতে একটা ঘুড়ি কেটে গেলেই সেটাকে লক্ষ্য করে ছুটে কাজে অবশ্য প্রতিযোগিতা আছে খুব, পাশের বস্তির ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে ছোটে, তাদের অভিজ্ঞতা বেশি, বাবলুর চেয়ে ঢ্যাঙা ছেলেদের সুবিধেও বেশি। তবু মাঝে মাঝে তাতে দু'একটা ঘুড়ি বাবলু পেয়ে যেত। একদিন বাবার চোখে পড়ে যাওয়াও তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। প্রতাপ কান মুচড়েধরে বলেছিলেন, ফের যদি তোকে রাস্তায় ঘুড়ির পেছনে ছুটতে দেখি, তা হলে তোকে বস্তিতেই থাকতে হবে, বাড়িতে ঢুকতে পারবি না!

ঘুড়ির পেছনে তাড়া করতে করতে বাবলু একদিন ঢুকে পড়েছিল একটা অচেনা বাড়িতে।

সে বাড়িতে পেছনটায় একটা পাঁচিল ঘেরা অব্যবহৃত ছোট মাঠ, নানান রকম আগাছায় ভর্তি। অনেক ঘুড়িগিয়ে সেই মাঠটাতেই পড়ে। সে বাড়িতে বাবলুদের বয়েসী কোনো ছেলে নেই, ঘুড়ি সম্পর্কে কারুর কোনো আগ্রহ নেই, তবু ঘুড়িগুলো ওখানেই যায় কেন? ঐ মাঠটা যেন ঘুড়ির কবরখানা!

একটা কালো অপূর্ব সুন্দর চাঁদিয়াল ঘুড়িকে সেই মাঠটায় পড়তে দেখে একদিন বাবলু আর লোভ সামলাতে পারেনি।

ঐ বাড়িটাতে কুকুর আছে, তিনতলায় মাঝে মাঝে ডাক শোনা যায়। সদর দরজাটা খোলা। বাবলুর ভয় ভয় করে, কিন্তু কালো চাঁদিওয়ালটা যেআকে জাদু করেছে। কড়ি টানা, তেল চকচকে গা, ওরকম একটা ঘুড়ি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলেও ঘর আলো হয়ে যায়।

বাবলু ভাবলো, এক ছুটে ভেতরে গিয়েই নিয়ে আসবে, কেউ দেখবে না। দরজা দিয়ে ঢুকে বাবলু প্রথমে চোরের মতন দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। কুকুরটার কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, মানুষজনও কেউ নেই। একতলায় বোধহয় কেউ থাকে না।

ভেতরে একটা চাতাল, তারপর পেছন দিকের মাঠটায় যাওয়ার একটা দরজা, সেই দরজায় তালা লাগানো, অনেক দিনের মর্চে পরা তালা। কিন্তু তার প্রায় পাশেই দেয়ালে ইট ভেঙে ভেঙে মানুষ প্রমাণ গর্ত। অর্থাৎ জমিটির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক আছে, তাই দরজা তালা দিয়ে বন্ধ থাকে, গোপনে ব্যবহার হয়। বাবলুর কাছে এটা একটা মজার ব্যাপার মনে হলো, সে ঢুকে পড়লো সেই গর্ত দিয়ে।

মাঠটিতে বড় বড় ঘাস গজিয়ে গেছে, এখানে সেখানে রয়েছে কচু গাছ আর শ্যাওড়া, একটা দুটো পেয়ারা গাছও রয়েছে। ছেঁড়া জুতো, রক্তমাখা তুলো, ভাঙা পুতুল, সিগারেটের খালি প্যাকেট আর কত কী যে সেখানে রয়েছে তার ঠিক নেই।

মাঠটায় শেষ প্রান্তে একটা পেয়ারা গাছে লটকানো কালো চাঁদিয়ালটাকে দেখতে পাচ্ছে বাবলু, তার বুক ধক ধক করছে, এতদিনে তার হাতে আসবে এই দুর্লভ উপহার। যাতে শব্দ না হয় সেইভাবে পা টিপে টিপে আগোচ্ছে, আর কোনো দিকে তার মনোযোগ নেই।

পেয়ারা গাছের ডাল পর্যন্ত বাবলুর হাত যায় না, গুঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে, বাবলু চটিজুতো খুলে সবে পা দিয়েছে, এমন সময় যেন কোনো চুম্বক তার চোখের দৃষ্টি-ডান পাশে ফেরালো, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো।

সেখানে সেই ঘাস জঙ্গলের মধ্যে ছেঁড়া মাদুরের ওপর বসে আছে একটি স্ত্রীলোক, মধ্যবয়সী, কালো শাড়ি পরা, তার হাতে তাস। স্ত্রীলোকটি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাবলুর দিকে।

দুপুর শেষ হয়ে এখনো বিকেল হয়নি, রোদ্দুরের রং গাঢ়, তার মধ্যে সেই অদ্ভুত রকম অবস্থায় বসে থাকা রমণীটিকে দেখে বাবলুর গলা শুকিয়ে গেল, বুকের মধ্যে জয়ঢাক পেটার শব্দ হতে লাগলো। সে মনে মনে বলতে লাগলো, রাম, রাম, রাম, রাম...

বেশ কয়েক মুহূর্ত সেখানে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর বাবলু আস্তে আস্তে বললো, আর করবো না, আর কোনোদিন করবো না!

রমণীটি কোনো কথা বললো না, শুধু চেয়ে রইলো।

পেয়ারা গাছের ডাল থেকে আপনা-আপনিই খসে পড়লো ঘুড়িটা। সেইটুকু শব্দেই বাবলু ভয় পেয়ে দারুণ চমকে উঠলো। ঘাড় ফিরিয়ে ঘুড়িটাকে দেখে বাবলুর লোভটা ফিরে এলেও সেটাকে তুলে নেবার সাহস পেল না।

সে এক পা এক পা করে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই স্ত্রীলোকটি কর্কশ গলায় বললো, এই! এদিকে আয়!

বাবলু হাত জোড় করে বললো, আমি আর কোনো দিন আসবো না, আর কোনোদিন এরকম করবো না।

স্ত্রীলোকটি হাত থেকে তাসগুলো ফেলে দিয়ে বললো, এই, আয়, এদিকে আয় বলছি!

আগাছার জঙ্গলে একা বসে থাকা একটি স্ত্রীলোককে বাবলু কিছুতেই রক্তমাংসের মানুষ বলে ধরে নিতে পারে না। কিন্তু এখনো তার বুক কাঁপতে থাকলেও প্রাথমিক ভয়টা ভেঙে গেছে, ডাক শুনে সে কাছে গেল না, এক ছুটে পালালোও না, খানিকটা দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালো।

স্ত্রীলোকটি আবার বললো, এই খোকা, আয়, আমার কাছে আয়, তোকে একটা জিনিস দেবো! তুই কাদের বাড়ির ছেলে রে?

এইবার বাবলু লক্ষ করলো, মহিলাটির মুখখানা প্রায় ফর্সা হলেও তার গলায় কাছটা মিশমিশে কালো,তার বাহুতে কালো পোড়া ছাপ, তার চোখের মণি দুটি স্থির। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে তার বুক দুটি উঠছে আর নামছে।

বাবলু আর দাঁড়াতে পারলো না। উল্টো দিকে ফিরে বন্য প্রাণীর মতন একটা দৌড় লাগালো। পাঁচিলের গর্ত দিয়ে চলে এসে, চাতালটা পেরিয়ে, বাইরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় সে ধাক্কা খেল একজন লোকের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, আমি কিছু করিনি। আমি...

লোকটি ভৃত্য শ্রেণীর, তার দু'হাত ভর্তি জিনিসপত্র, নইলে সে বাবলুকে জড়িয়ে ধরতো। বাবলু মুহূর্তের মধ্যে সেটা বুঝতে পেরে, আবার দৌড় মারলো।

তারপর থেকে সে আর ঐ বাড়িটি র পাশের রাস্তাটাতেই নিজে থেকে যায় না কখনো। দৈবাৎ বাবা-দাদার সঙ্গে যেতে হলেও সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে এবং বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ শব্দটা নিজের কানে শুনতে পায়।

কিন্তু ঐ আগাছার জঙ্গলে বসে থাকা স্ত্রলোকটির কথা তার প্রায়ই মনে পড়ে। সে কি সত্যিই মানুষ ছিল? কেউ কি ঐ রকম জায়গায় বসে একা একা তাস খেলে? সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে সেই নারীর মর্মভেদী দৃষ্টি। কেন সে আয় আয় বলে ডেকেছিল?

বাবলুর গোপনে পয়সা জমানোটা পিকলু একদিন জেনে ফেললো। তার ফলে বাবলুকে বিপদে পড়তে হয় একদিন।

পাড়ার কচুরি-রাধাবল্লভির দোকানে লেখা আছে, চিল হইতে সাবধান! বাবলু ঐ লেখার কোনো গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু একদিন আকাশের চিল তাকে দারুণ জব্দ করে দিল।

বাড়ি থেকে বাবলুকে পাঠানো হয়েছে দু'টাকার রাধাবল্লভি কিনে আনতে। মস্ত বড় একটা শালপাতার ঠোঙ হয়েছে, তার তলার দিকে আলুর তরকারি, সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঝোল গড়িয়ে পড়ছে বলে বাবলু এক হাতে টিপে আছে সেই জায়গাটা। ওপরে ঘুড়ির আওয়াজ হলেই তার চোখ সে দিকে চলে যায়।

বোসদের বাড়ির লাল ঘুড়ি একটা পেটকাটাকে কাটবার জন্য পড়পড় শব্দে নেমে আসছে। ফলাফল দেখবার জন্য বাবলু সেদিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে, হঠাৎ রাস্তার অনেক লোক এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, এই, এই এই! গেল, গেল, গেল!

বাবলু কিছু বোঝবার আগেই রাধাবল্লভির ঠোঙাটা তার হাতছাড়া হয়ে গেছে, একটা চিল ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছে। সেই ঠোঙ থেকে টুপ টাপ করে রাধাবল্লভি খসে পড়ছে শূন্য থেকে, অন্য দুটি চিল সেগুলো লুফে নেবার চেষ্টা করছে, কোথা এসে গেছে এক ঝাঁক কাক।

কয়েকদিন আগেই বাবলু একটা শিকারের গল্পে পড়েছিল যে, বন্দুক তুলে রাখা সত্ত্বেও চোখের সামনে একটি খরগোশকে পট করে তুলে নিয়ে একটা চিতাবাঘ লাফিয়ে পালিয়ে যেতেই শিকারী

রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের 'রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়িতে ইচ্ছে হইয়াছিল'। বাবলুর এখন ঠিক সেই রকম অবস্থা। এখন তার নিজের মাথার চুল ছিঁড়েই শাস্তি পাওয়া উচিত! সে কাল্পনিক বন্দুক তুলে চিলগুলোকে ঠিক, টিপ করে পর পর তিনটি গুলিতে খতম করে দিল। সত্যি সত্যি সে একদিন বন্দুক কিনে কলকাতার আকাশ থেকে সব চিল নিশ্চিহ্ন করে দেবে। যখন এখানে একলা শুধু তার ঘুড়ি উড়বে, তখন একটা চিলকেও থাকতে দেওয়া হবে না।

কিন্তু বাড়িতে এসে তো বলতেই হবে। সামান্য চিলের কাছে এরকম পরাজয়ে তার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে, অথচ উপায়ও তো নেই। মমতা এই দুর্ঘটনার কথা শুনে বাবলুকে বকলেন না, শুধু বললেন, থাক, আর তোকে যেতে হবে না, কানুকে পাঠাচ্ছি!

পিকলু এই ঘটনা শুনে কেমন কেমন চোখে যেন বাবলুর দিকে তাকালো।

সন্ধেবেলা পড়ার টেবিলে বসে পিকলু এক সময় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলে, বাবলু, তোর বইয়ের সুটকেসে একটা জর্দার কৌটো ঝনঝন করে কেন রে? তুই পয়সা কোথায় পেলি!

বাবলু চমকে মুখ তুলে বললো, তুমি আমার সুটকেসে হাত দিয়েছো কেন?

পিকলু বললো, একটা স্কেল খুঁজছিলাম। পয়সা পেলি কোথায়, সেটা বল!

- আমি জমিয়েছি!
- কোথায় থেকে জমালি, অত পয়সা!
- যেখান থেকেই জমাই না কেন, তোমার তাতে কী?
- আজ বিকেলে সত্যি দু'টকার রাধাবল্লভি চিলে নিয়ে গেছে! ঠিক করে বল তো?

কয়েক মুহূর্তের জন্য বাবলুর সমস্ত রোমকূপ খাড়া হয়ে গেল। দাদা কি ভেবেছে যে সে চিলের গল্প বানিয়ে বলে টাকাটা নিজে নিয়ে নিয়েছে? এ রকম কোনো কথা তো তার মাথাতেই আসেনি!

দাদা যদি এই কথাটা বলে দেয়, তাহলে মা-বাবা সবাই দাদার কথা বিশ্বাস করবে। দাদা ভালো ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, দাদা মিথ্যে কথা বলে না! মা আর পিসিমা যখন গঙ্গা স্নান করতে যায়, তখন দাদা সঙ্গে যায়, বাবলুকে নিয়ে যেতে সাহস পায় না, কারণ বাবলুর দায়িত্বজ্ঞান নেই। দাদাকেই সব্বাই ভালোবাসে, বাবলুকে কেউ ভালোভাসে না।

উঠি গিয়ে সুটকেস খুলে জর্দার কৌটোটা নিয়ে সে পিকলুর কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, তোমার যা ইচ্ছে গিয়ে বলো!

পিকলু হাসতে শুরু কর। ছোট ভাইয়ের নাম নালিশ করার কথা সে একবারও ভাবেনি।

সে বললো, কত জমিয়েছিস দেখি তো! মাঝে মাঝে আমাকে ধার দিস!

শীতকালে ঘুড়ি ওড়াবার পাট নেই। পাড়ার ছেলেরা তখন ডাংগুলি খেলে কিংবা ক্যাম্বিসের বলকে ফুটবল বানিয়ে পেটায়। ওরই মধ্য দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া চলে। কিছুদিন আগেই সামনের বড় রাস্তায় একটি বাচ্চা মেয়ে লরি-চাপা পড়েছে বলে বাবলুর রাস্তায় খেলা নিষেধ।

কিন্তু ঘরের মেধ্য কিছুতেই বেশিক্ষণ বাবলুর মন টেকে না। পিকলু কিংবা তুতুলের মতন সর্বক্ষণ পড়ার বই কিংবা গল্পের বই মুখে করে বসে থাকার মতন ধৈর্য তার নেই। আর মুন্নিটা বড্ডই ছোট। বাবলুর খেলার কোনো সঙ্গী নেই।

নিষেধাজ্ঞা না মেনে সুড় ৎ সুড়াৎ করে বেরিয়ে যায় বাবলু। একটা জিনিস সে আবিষ্কার করেছে। ঠিক বাড়ির সামনের রাস্তায় না খেলে সে যদি পাশের বস্তিটায় খেলতে যায়, তাহলে বাড়ির কেউ দেখতে পারে না। বস্তির ছেলেরা পয়সা দিয়ে নির্দিষ্ট কড়িটাকে দূর থেকে বাটখাড়া দিয়ে মাতে হবে। লাগলে জিৎ না লাগলে হার। যার কড়ি ফুরিয়ে যায়, সে অন্যের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে কেনে।

বাবলুর বেশ নেশা লেগে গেল। সে মাঝে মাঝেই দু'আনা, চার আনা জেতে। বস্তির ছেলেদের কাছ থেকে নতুন নতুন ভাষাও সে শিখছে।

একদিন বস্তির মধ্যে কী একটা মারামারি লাগতেই সব কড়ি-খেলুড়েরা দুদ্দাড় করে ছুটে পালালো। বাবলু বাড়ির দিকে দৌড়ে আসতে গিয়ে পড়ে গেল একেবারে প্রতাপের মুখোমুখি। তার এক হাতের মুঠোয় কড়ি, অন্য হাতে পয়সা।

প্রতাপ বাবলুর ঘাড় চেপে ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এলেন ওপরে। হঠাৎ রাগ এসে গেলে তিনি নিজেকে দমন করতে পারেন না।

শয়ন ঘরে এসে প্রতাপ বাবলুর চুলের মুঠি ধরে প্রথম গর্জন করতে যাবেন, এমন সময় মমতা দৃঢ়ভাবে বললেন, দাঁড়াও!

খাটের ওপর বসে মমতা বাবলুরই একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করছিলেন, সে সব রেখে নেমে এসে বললেন, ছেড়ে দাও ওকে! তুমি যখন তখন ছেলেটাকে বকবে আর মারবে? ওর সব সময় দোষ? আর কারুর দোষ নেই? ওর খেলতে ইচ্ছে করে, খেলবে কোথায়? এইটুকখানা ফ্ল্যাটের মধ্যে এতগুলো মানুষ। তুমি আমাদের এখানে বন্দী করে রেখেছো। সারা জীবনই কি এরকমভাবে কেটে যাবে?

বাবলুকে ছেড়ে দিয়ে প্রতাপ হতবাক্ হয়ে মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মমতার মুখখানি গনগনে লাল। এ যেন সর্বংসহা ধরিত্রীর সহসা অগ্নি-উদগীরণ! মমতা কখনো কোনো অভিযোগ জানান না। এখন বোঝা গেল, তার মনের মধ্যে অনেক তিক্ততা জন্মেছে!

॥ ২৬ ॥

একবার প্রতাপ সিগারট খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, জ্বলন্ত সিগারেট আস্তে আস্তে তোশকের তুলোর মধ্যে ঢুকে গিয়ে প্রায় দক্ষযজ্ঞ হতে যাচ্ছিল। মুন্নি ছিল পাশেই শুয়ে, আঁচ লাগতে সে চেঁচিয়ে উঠতেই মমতা ছুটে এসছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত বড় কোনো বিপদ হয়নি। তারপর থেকে প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া কন্নার পর শেষ। সিগারেটটি তিনি হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে খাবেন।

এ বাড়িতে একটা বারান্দাও নেই, তাই ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে হয়। মমতার রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে আসতে সময় লাগে। অফিসের দিনে এই সময়টা ছাড়া মমতার সঙ্গে ভালো করে কথা বলার সুযোগই ঘটে না।

আজ সন্ধ্যে থেকেই মুখ গম্ভীর, প্রতাপের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছেন মমতা। প্রতাপ সেইজন্য অস্বস্তিতে আছেন। ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এবং জেদী পুরুষ হলেও স্ত্রীকে খানিকটা ভয় পান প্রতাপ। মমতা খুব কম চ্যাঁচামেচি করেন বলেই এই ভয়। মমতার অভিমান এতই চাপা যে প্রতাপ অধিকাংশ সময় তা টেরই পান না। বিশেষ কোনো কারণ না ঘটলে বাইরে ফুটে ওঠে না মমতার রাগ।

পুরুষ সম্মুখ যুদ্ধে বিশ্বাস করে কিন্তু স্ত্রী জাতির রণনীতি সম্পূর্ণ পরোক্ষ। এতদিনের বিবাহিত জীবনে প্রতাপ এটা বুঝেছে । মমতার মুখ ভার দেখে প্রতাপ চিন্তা করবেন, আজ বা দু-একদিনের মধ্যে তিনি কোন্ ভুল বা অন্যায় করে ফেলেছেন। কিন্তু মমতা শুরু করবেন হয়তো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঁচ বছর আগের কোনো ঘটনা দিয়ে।

মমতা ইচ্ছে করে বেশি দেরি করছেন আজ। প্রতাপ এখন ঘুমিয়ে পড়লে সেটা আরও একটা অপরাধ হবে। সিগারেট বেড়ে যাচ্ছে। প্রতাপ দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন, একটু লুকিয়ে। রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে মমতা সুপ্রীতির সঙ্গে কী একটা গল্পে মেতে আছেন। দু'জনেই হাসছেন খুব। প্রতাপ কি ইচ্ছে করলে বেরিয়ে ওদের গল্পে যোগ দিতে পারেন না? প্রতাপ জানেন, তিনি ওখানে গিয়ে দাঁড়লেই আজ মমতার গল্প থেমে যাবে।

মমতা যখন শয়ন ঘরে এলেন, প্রতাপ তখন বসে আছেন খাটে পা ঝুলিয়ে।

মমতা প্রতাপের দিকে তাকালেন না, কোনো কথা বললেন, না খাটের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে মুন্নির গায়ের চাদর টেনে দিলেন। এই শীতের মধ্যেও মুন্নি গায়ে চাপা রাখতে চায় না, ঠান্ডা লেগেছে তার, ক'দিন ধরে খুব কাশছে ঘুমের মধ্যে।

এই যে প্রতাপ এতক্ষণ জেগে থেকেও মুন্নির গায়ে চাপা আছে কি না সেটা লক্ষ করেন নি, মমতা প্রথমে এসে সেটাই বুঝিয়ে দিলেন।

তারপর মমতা ড্রেসিং টেবিলের সামনে ফিরে এসে চিরুনি বসালেন চুলে।

তিনটি সন্তানের জননী হলেও মমতার শরীরটি এখনো তন্বী। তাঁর রূপের মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা আছে। তাঁর দৃষ্টি ও ওষ্ঠরেখায় রয়েছে সততার নির্ভুল চিহ্ন। ঘন কালো চুল কোমর ছাড়িয়ে যায়।

মমতা এমন ভাবে প্রসাধন করছেন যেন ঘরে তিনি একা।

কিছুক্ষণ মমতার টুকিটাকি কাজকর্ম লক্ষ করার পর প্রতাপ আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কী হয়েছে বলো তো?

উত্তরটাও প্রতাপের জানাই ছিল।

মমতা মুখ না ফিরিয়েই বললেন, কী আবার হবে, কিছু হয় নি তো?

সরাসরি সমরে তো মেয়েরা আসবে না, তাদের আক্রমণ হবে অতর্কিতে।

- আমি কি কিছু গুরুতর দোষ করে ফেলেছি?

- না, তুমি কি দোষ করবে? তুমি তো কখনো দোষ করো না!

সম্পর্কে প্রতাপেরও বিশেষ দ্বিমত নেই। তাঁর অহমিকা বেশি, তিনি নিজের দোষ দেখতে পান না। কিংবা অন্য কেউ বললেও স্বীকার করতে চান না। তাঁর ধারণা, রাগের মাথায় তিনি কখনো কখনো কটু কথা বলে ফেলেন বটে, কিন্তু তাঁর মতন সব দিকে বিবেচনা আর ক'জনের আছে?

- তা হলে আমি শুয়ে পড়ি?

- হ্যাঁ, শোও, তোমাকে তো আমি জেগে থাকতে বলিনি!

প্রতাপের সত্যি ঘুম এসে গেছে, আজকের মতন কোর্ট অ্যাডর্জোন করে তিনি বালিশে মাথা রাখলেন। আলোটা ঠিক একেবারে সামনেই, তিনি হাত চাপা দিলেন চোখে।

একটুক্ষণের জন্য তন্দ্রা এলেও আবার ভেঙে গেল। মনের মধ্যে কী যেন একটা খচখচ করছে। মমতাকে সত্যি ভালোবাসেন প্রতাপ, কিন্তু সিনেমার নায়কদের মতন মুখে সেই কথা বারবার বলে তিনি আদিখ্যেতা করতে পারেন না। কিন্তু কোনো কারণে মমতার মধ্যে অশান্তি দেখলে তিনি নিজেও স্বস্তি বোধ করেন না।

কিন্তু মমতার এই কথা-না-বলা প্রতিরক্ষা ব্যূহ তিনি ভাঙবেন কী করে? মমতা কোনো অভিযোগ জানালে তিনি উত্তর দিতে পারতেন।

হঠাৎ প্রতাপের একটা কথা মনে পড়ে গেল। তিনি উঠে বসে ব্যস্ত ভাবে বললেন, দিদি আজ যে বালাদুটো দিয়েছে, তুমি আলমারিতে তুলে রেখেছো? ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ারে ছিল!

প্রতাপ যে নিজেই মমতার হাতে একটা মারাত্মক অস্ত্র তুলে দিলেন তা তিনি বুঝলেন না। অথবা, মমতার নীরবতাই কি তাঁর মুখ দিয়ে এই সময়ে এই কথাটা বের করে আনলো?

এবারে মুখ ফিরিয়ে মমতা বললেন, তুমি দিদির গয়না হাত পেতে নিলে? ফিরিয়ে দিলে না কেন?

- পরে এক সময় দিয়ে দিলেই চলবে।

- তুমি এখন দিদির গয়না বিক্রি করে সংসার চালাবে? ছিঃ!

- তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? আমি দিদির গয়না বিক্রি করতে যাবো?

- তবে কেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিলে না ?

-দিদি জোর করতে লাগলো। দিদি কী বলতে চায়, তুমি তো জানোই। তাই দিদি যাতে অন্যরকম কিছু না ভাবে—

সুপ্রীতি মেয়েকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন প্রায় এক বছর হয়ে গেল। অসিতবরণের সম্পত্তির ভাগ নিয়ে সবে মাত্র মামলা শুরু হয়েছে। বরানগরের বাড়িত দিদির অংশটা দখল হয়ে গেছে, ওখানে আর ফিরে যাবার পথ নেই, দিদির সে ইচ্ছেও নেই একটুও। সম্পত্তির ভাগ তাঁর আইনত প্রাপ্য ঠিকই। কিন্তু মামলা কত বছর চলবে তার ঠিক নেই।

ভাইয়ের সংসারে এসে থাকতে সুপ্রীতির সম্মানে লাগবারই কথা। তাঁর কিছু জমানো টাকা ছিল, এতদিন খরচ করেছেন মাঝে মাঝে। এখন নগদ ফুরেয়ে যাওয়ায় গয়নায় হাত পড়েছে। সুপ্রীতি অবশ্য সোজাসুজি গয়না বিক্রি করে টাকা দেওয়ার কথা বলেননি। পুরোনো ধাঁচের দু'খানি বালার একটিতে ফাটল ধরেছে, তাই ও দুটি বিক্রি করে তিনি তুতুলের জন্য নতুন গয়না করিয়ে দিতে চান। তবে, এখনই নয়, সোনার দাম একটু কমলে। এখন সোনার দামবেশ উঠেছে, এই সময় ঐ অকেজো বালা দুটি বিক্রি করে দেওয়াই ভালো।

সুপ্রীতি মুখে যা-ই বলুন, উদ্দেশ্যটা প্রতাপের কাছে স্পষ্ট। প্রস্তাবটা একেবারে প্রত্যাখ্যান করলে সুপ্রীতি জোর করতেন, তাই প্রতাপ আপাতত কিছুদিনের জন্য বালাদুটো নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছেন। দু'চারদিন বাদে ফেরত দিলেই হবে।

মমতা বললেন, প্রথম থেকেই তোমার উচিত ছিল, তোমার মাইনের টাকা দিদির হাতে তুলে দেওয়া। দিদিকেই সংসার চালাতে বলতে পারতে।

কথাটা প্রতাপের বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হলো। দিদিই এ সংসারে বড়। সংসার চালাবার বুদ্ধিও যথেষ্ট, দিদিকেই এই সংসারের কর্তৃত্ব ভার দিলে ঠিক হতো। মমতা মাঝে মাঝে অবুঝের মতন বেশি খরচ করে ফেলেন। এই ব্যবস্থাটা প্রতাপের মাথায় আগে আসেনি কেন?

তিনি বললেন, তুমিও তো এ কথা আগে আমায় বলোনি।

- সামনের মাস থেকে তাই করো। দিদি বুঝেসুঝে চালাবেন!

এটা তো যুদ্ধ নয়, এ তো শান্তির সময় সীমান্ত আলোচনা। মমতা স্বেচ্ছায় অনেকখানি অংশ ছেড়ে দিতে চাইছেন। প্রতাপ এবার হৃষ্ট ভাবে পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, ঠিক আছে, সেই রকমই করা যাবে!

আলো নিবিয়ে মমতা এসে মুন্নর ওপাশে শুয়ে পড়ার পর প্রতাপ হাত বাড়িয়ে তাঁর গালটা ছুঁলেন। মমতা আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, আমি দাদার কাছে কয়েকদিন গিয়ে থাকবো ভাবছি।

প্রতাপ বললেন, গত মাসে যখন বিনতা এসেছিল, তখনই তো গিয়ে থেকে এলে ক'দিন। আবার যাবে?

- হ্যাঁ।

প্রতাপ উদারভাবে বললেন, তা যেতে পারো। ছেলে-মেয়েদের এখন ছুটি আছে। ক'দিন থাকবে।

- সে আমি বুঝবো। আমার এখানে থাকার দরকার তো কিছু নেই, দিদিই সংসার দেখবেন।

প্রতাপের মাথায় সব কিছু গুলিয়ে গেল। খুব ধারালো অস্ত্রের আঘাতটা টের পেতে খানিকটা সময় লেগে যায়। এতক্ষণ তবে মমতা যা বলছিলেন, তার কোনোটাই শান্তি প্রস্তাব নয়?

প্রতাপ আহতভাবে বললেন, তুমি এ কথা কেন বলছো, মমো?

মমতা চুপ!

প্রতাপ আবার হাত বাড়িয়ে মমতার গাল ছুঁতে গেলেন। স্পর্শের ভাষা দিয়ে তিনি মমতাকে তাঁর আন্তরিকতা বোঝাতে চান।

মমতার গাল থেকে গড়িয়ে নামছে উষ্ণ অশ্রু।

- তোমার কী হয়েছে? আমায় বলো!

- কিছু হয়নি!

এইবার প্রতাপ একটু একটু বুঝলেন। এই সংসারটা মমতার নিজস্ব ছিল। স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে-দুঃখে তিনি এটা এতদিন ধরে গড়ে তুলেছেন, এখন সেই সংসারের ভার চলে যাবে দিদির হাতে।

কিন্তু মমতা নিজেই তো এই প্রস্তাবটা দিলেন। মেয়েরা এক এক সময় মুখে যা বলে, মনের কথাটা হয় হয় তার ঠিক উল্টো। এসব সব সময় পুরুষের বোঝার অসাধ্য!

প্রতাপ চটপট এ সংকটের মীমাংসা করে দিলেন।

তিনি বললেন, তোমার সংসার তোমারই থাকবে। আমার মাইনের টাকা এত কাল বাদে দিদির হাতে তুলে দিতে যাওয়ার কোনা মানেই হয় না! যেমন চলছে সেই রকমই চলুক!

- মাইনের টাকাটা তুলে দেওয়াই বুঝি বড় কথা! তা না দিলেও তো ...

- তার মানে?

- আমাকে সব সময় দিদির মতামত নিয়ে চলতে হয় না? ছেলেমেয়েরা সকালে কী খাবে না খাবে, সেটাও তো উনি ঠিক করে দেন।

আর একটা কঠিন অস্ত্রের আঘাত। প্রতাপ বেশ কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারলেন না।

দিদির উপস্থিতিটাও মমতার কাছে কষ্টকর? সেইজন্যই মমতা মাঝে মাঝেই বলছেন, এইটুকু ছোট ফ্ল্যাটে এতগুলো মানুষকে প্রতাপ বন্দী করে রেখেছেন। কয়েকদিন আগে বাবলুর খেলাধুলোর প্রসঙ্গেও বলেছিলেন।

দিদি তো গুরুজনের মতন পায়ের ওপর পা উঠিয়ে ভাইয়ের বউ-এর সেবার প্রত্যাশী নন। দিদি এই সংসারের জন্য অনেক খাটেন। বামুন দিদি অসুস্থ হলে রান্নার ভারও নিজেই নিয়ে নেন সুপ্রীতি। সেদিক থেকে বলবার কিছু নেই। কিন্তু সুপ্রীতির ব্যক্তিত্ব প্রবল, সেখানে

মমতাকে সংকুচিত হয়ে থাকতে হয়, সব ব্যাপারে দিদির মতামত মমতা নিজে থেকেই জানতে চান, অথচ ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হন!

এই খানিক আগেই তো দিদির সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছিলেন মমতা। অথচ দিদিকে তাঁর এত অপছন্দ! তুতুলকেও তো মমতা নিজের ছেলেমেয়ের মতনই ভালোবাসেন। তা হলে?

সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, মমো, তুমি কী বলতে চাও?

মমতা বললেন, আমি তো তোমায় কিছু বলতে চাইনি?

প্রতাপের ইচ্ছে হলো তিনি চমৎকার করে বলে ওঠেন, ওঃ। তোমরা কি কিছুতেই মন খুলে কথা বলতে পারো না?

তিনি চাপা রাগের সঙ্গে বললেন, মমো,তুমি এমন ব্যবহার করছো...দিদি,তুতুল, এরা যাবে কোথায়?

-চুপ করো, আস্তে কথা বলো!

-মমো, লক্ষ্মীটি এ রকম করো না! যে-রকম চলছে, সেই রকমই চলতে দাও! এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

-হ্যাঁ, যে-রকম চলছে, সেই রকমই চলুক। তাতেই তোমার সুবিধে। বাড়িতে কী ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে বুলার কথা ধ্যান করতে পারবে।

প্রতাপ এবারে হাসবেন না রাগ করবেন তাও বুঝতে পারলেন না। বুলো? এ রকম অবাস্তব অভিযোগের কোনো মানে আছে? সেই দেওঘরে দেখা হয়েছিল অনেক দিন বাদে, তারপর আর বুলার কোনো খবর নেওয়া হয়নি। দু'একবার ক্ষীণ ইচ্ছে হয়েছিল টালিগঞ্জে বুলার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে একবার দেখা করার, কিন্তু বলার বর্বর ধরনের দেওরটির কথা মনে পড়তেই তিনি গুটিয়ে গেছেন।

তবু যা হোক বুলা সম্পর্কে মমতার ঈর্ষা তিনি কোনো না কোনো সময়ে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবেন, কিন্তু দিদির ব্যাপারটা অনেক গুরুতর। দিদিকে প্রতাপ নিজে নিয়ে এসেছেন এ বাড়িতে। তাছাড়া দিদি কোথায়ই বা যেতে পারতেন? তুতুলকে নিয়ে সুপ্রীতি আলাদা কোথাও বাড়ি ভাড়া করে থাকবেন, তা কি সম্ভব?

দিদি কি মমতার সঙ্গে সম্প্রতি কোনো খারাপ ব্যবহার করেছেন? না, তা তা হতেই পারে না। দিদির মধ্যে কেনো রকম ক্ষুদ্রতা নেই। তবু এক সংসারে দুই নারী। তাদের সম্পর্ক যাই-ই হোত না কেন, পাশাপাশি কিছুদিন থাকলে সংঘর্ষ বাঁধবেই। এই সংঘর্ষে বিজয়িনী কে হয়?

মমতাকে খুশী করবার জন্য প্রতাপ সুপ্রীতিকে কী বলবেন?

প্রতাপ একটা অবর্ণনীয় কষ্ট বোধ করতে লাগলেন। তাঁর নিজের দিদি, সেই ছোটবেলা থেকে দিদি তাঁর বন্ধুর মতন, তারপর ছাত্র অবস্থায় কলকাতায় পড়তে এসে বরানগরে দিদি-জামাইবাবুর কাছে কত খাতির-যত্ন ভোগ করেছেন প্রতাপ। এখন দিদি অসহায় অবস্থায় পড়েছেন...।

প্রতাপ মমতার হাত জড়িয়ে ধরে কাতর ভাবে বললেন, মমো, তুমি যদি অবুঝ হও...আচ্ছা আমি চেষ্টা করছি, শিগগিরই অন্য একটা বাড়ি ভাড়া করতে। অন্ত আর একখানা বেশি ঘর...

মমতা বললেন; বাড়ি ভাড়া আরও বাড়লে, তুমি দিদির গয়না বিক্রি করবে।

-না, সে কথা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি যেমন করে পারি চালাবো!

-আমার মাথার দিব্যি রইলো, দিদির গয়না বিক্রি করার আগে তুমি যদি আমার সব গয়না বিক্রি না করো, তা হলে অমি সব ছুঁড়ে ফেলে দেবো!

-কোনো গয়নাই বিক্রি করতে হবে না।

-সারাদিন খেটেখুটে এসে তুমি আবার রাত জেগে বই অনুবাদ করবে? আমি তাই চোখের সামনে দেখবো?

-তা হলে তুমি কী চাও? আঃ। আমি আর পারছি না! পারছি না!

প্রতাপ উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে দিলেন। তারপর আর কোনো কথা হলো না।

-অনেক্ষণ বাদে প্রতাপ সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ার পর মমতা মুন্নিকে ডিঙ্গিয়ে এসে শুলেন প্রতাপের পাশে। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন স্বামীর মাথায়।

একবার ঘুম ভেঙে মুখ ফিরিয়ে ঘোর লাগা চোখে প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, কী?

মমতা বললেন, কিচ্ছু না। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। যেমন চলছে, সেই রকমই চলুক।

॥২৭॥

ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেল প্রতাপের। তিনি বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসলেন। একটি নিষ্ঠুর দুঃস্বপ্ন দেখেছেন তিনি, তার রেশ এখনো লেগে আছে চোখে-মুখে।

সমুদ্র থেকে উত্থিত মহাসর্পের মতন প্রতাপ ক্রূর নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। পাশে শুয়ে আছেন মমতা, মুন্নির বিছানাটা একটুখানি আলাদা, সে কখন যেন উঠে এসে মায়ের বুকের কাছে জায়গা করে নিয়েছে। প্রতাপের নিঃশ্বাস যেন জননী ও কন্যাকে একসঙ্গে দগ্ধ করে দেবে।

কত সাধে, কত মমতায় মানুষ একটা নিজস্ব সংসার গড়ে তোলে। অজস্রের মধ্য থেকে সে নির্বাচন করে নেয় তার সঙ্গিনীকে, সর্বস্ব দেওয়া-নেওয়ার অঙ্গীকার হয়ে যায় মনে মনে। এক এক

করে পুত্র-কন্যারা আসে, ছড়িয়ে যায় মায়াজাল, শীতের রোদ্দুরে পা দিয়ে আরাম করার মতন পুরুষ উপভোগ করে বন্দীত্বের সুখ।

আবার এক এক সময়, বাইরের কোনো আঘাতে নয়, সব চেয়ে আপন দুটি নারী-পুরুষের পারস্পারিক অবিশ্বাসে জ্বলে ওঠে আগুন। যেন পাশাপাশি দুটি গাছ সুপবনে মাথা দোলাচ্ছিল, বিনিময় করছিল সুখ-দুঃখের কথা, হঠাৎ তাদের সংঘর্ষ ফুলকি দিয়ে উঠলো দাবানল। তখন সব স্মৃতিই তুচ্ছ হয়ে যায়, সব কিছুই বিষবৎ মনে হয়।

প্রতাপ কিছুক্ষণ মমতা ও মুন্নির দিকে তাকিয়ে রইলেন, সে দৃষ্টিতে ভালোবাসা নেই, স্নেহ নেই।

বাঙালী মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়, কিন্তু মধ্য-তিরিশেও মমতার যৌবন অটুট। তাঁর যে বড় বড় তিনটি সন্তান রয়েছে তা তাঁর শরীর দেখলে বোঝাবার উপায় নেই। তিনি রোগা নন, আবার স্থুলত্বও তাঁকে স্পর্শ করে নি, নাকের দু'পাশে ভাঁজ এখনো চোখে পড়ে না। এই ঘুমন্ত নারী আজও দর্শনীয়া। কিন্তু প্রতাপ সে চোখে মমতাকে দেখলেন না, দুঃস্বপ্নের প্রভাবে তাঁর চোখ রাগে জ্বলছে।

বিছানা থেকে উঠে তিনি আলনা থেকে তাঁর পাঞ্জাবিটি তুলে নিয়ে মাথায় গলালেন, তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

ভালো করে আলো ফোটেনি, তবু পথে কিছু কিছু মানুষজন বেরিয়েছে। এ পাড়ার অনেকেই গঙ্গাস্নানে যায়, ব্রাহ্ম মুহূর্তে জলে দাঁড়িয়ে সূর্য-প্রণাম করে। জলখাবারের দোকানগুলিতেও উনুনে আগুন ধরানো শুরু হয়েছে, স্নান-ফেরত লোকেরা গরম সিঙ্গাড়া-খিচুড়ি কিনে নিয়ে যায় বাড়িতে। করপোরেশনের ধাঙড়রাও এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়।

প্রতাপ হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন গঙ্গার ধারে। চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁর মস্তিষ্ক জুড়োলো না, নদীর শোভা তাঁর মনকে হরণ করলো না। চরম অসুখী, উদ্‌ভ্রান্তের মতন তিনি চলতে লাগলেন অনির্দিষ্টের দিকে।

গ্রামের অভ্যেস অনুযায়ী প্রতাপ ছাত্র বয়েসে লুঙ্গি পরতেন। বিয়ের পরও কিছুদিন চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু মমতার লুঙ্গি পছন্দ নয়। মমতার বাপের বাড়ির কেউ কোনো দিন লুঙ্গি পরে না, তাই প্রতাপকেও তিনি লুঙ্গি ছাড়িয়ে পা-জামা ধরিয়েছেন। পা-জামাটা বাড়ির পোশাক, ধুতি না পরে প্রতাপ কখনো রাস্তায় বেরোন না, কিন্তু আজ তাঁর হুঁস নেই। চুলে চিরুনি দেননি, চোখের নিচে অসমাপ্ত ঘুমের কালো ছাপ।

চা খাওয়ার আগে প্রতাপ দিনের প্রথম সিগারেটটা ধরান না। অজ তিনি চলতে চলতে এক সময় পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজলেন। পেলেন না। রাত্তিবেলা সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই থাকে বেড-সাইড টেবলে। পকেটে অবশ্য টাকা রয়েছে কুড়ি পঁচিশটা।

শ্মাশানের ধারে পান-বিড়ির দোকান প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই খোলা থাকে। চিতার আগুনের মতন ঐ দোকানদারদেরও ছুটি নেই। প্রতাপ হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছেন নিমতলার কাছে। এত ভোরেও এখানে বেশ ব্যস্ততা রয়েছে। একটি দোকানে দাঁড়িয়ে প্রতাপ সিগারেট কিনলেন। তারপর সিগারেটে কয়েকটা টান দেবার পর তাঁর মস্তিষ্ক সচল হল। সেই মুহূর্তে তিনি নির্বাসন দণ্ড দিলেন মমতাকে।

বিচিত্র এই দণ্ড। মমতাকে বনবাসে যেতে হবে না, এক চুলও স্থানচ্যুত হলে না। বিছানা জানলার পর্দা, টবের ফুলগাছ, রান্নাঘর, পুত্র-কন্যা নিয়ে মমতা ঐখানেই থাকবেন, কিন্তু প্রতাপ আর ফিরবেন না। প্রতাপের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। কী করে সংসার চলবে, কোথা থেকে টাকা আসবে, তা মমতা বুঝুক। পৃথিবীতে কিছুই থেমে থাকে না। আকস্মিক হৃদরোগে প্রতাপের মৃত্যু হলে মমতাকেই তো সব বুঝেসুঝে চালাতে হতো!

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবার পর প্রতাপের কপালের কুঞ্চন রেখা মুছে গেল। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সেইটুকু বাতাসে যেন উড়ে গেল তাঁর পশ্চাৎ-জীবন।

আদালতের হাকিমকে চলতে হয় লিখিত অইনের ছক বাঁধা পথে। কিন্তু প্রতাপের ব্যক্তিগত জীবন বে-আইনী, তিনি প্রায়ই যুক্তিহীন, জেদ-তাড়িত পথে যেতে চান। আর্থিক অনটন চিন্তার জগতে একপ্রকার ক্ষুদ্রতা এনে দেয়, সেটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। অথচ এই অবস্থা তাঁকে ইদানীং তাঁকে মেনে নিতে হচ্ছে। বাজারে মাছ কিনতে গেলে মাছ পছন্দ করার চেয়েও টাকার হিসেবে করাটাই প্রধান হয়ে ওঠে, প্রতাপের তখন খুব ছোট মনে হয় নিজেকে। তাঁর ছেলে পিকলু কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে যেতে চেয়েছিল, জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রতাপের বড় প্রিয়, তবু প্রতাপ পিকলুকে যেতে দিতে পারেননি। শুধু তাই নয়, পিকলুর কাছে তাঁকে সামান্য মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে, এ জন্য প্রতাপ মরমে মরে গেছেন।

প্রতাপের থেকে আরও কত গরিব লোক তো আছে। দেশ বিভাগের ফলে কত শত-সহস্র পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে, শিয়ালদা স্টেশানে শুয়ে আছে কত জন, কত সাধারণ গৃহস্থ এপার বাংলায় এসে পথে পথে ভিক্ষে করে। কিন্তু প্রতাপকে এসব বোঝানো যাবে না। তাঁর স্বভাবের মধ্যেই গেঁথে অছে এক ধরনের আত্মম্ভরিতা, তিনি দাতা হবেন, কখনোই গ্রহীতা হতে পারবেন না। অন্য কেউ তাঁর প্রতি সামান্য অনুকম্পা দেখালেই তাঁর গাত্রদাহ হয়।

মমতাকে তিনি যথার্থ ভালোবাসেন এবং তিনি মনে করেন সেই ভালোবাসাটাই যথেষ্ট। মমতার আর কোনো মতামত দেওয়ার অধিকার নেই, কেননা, প্রতাপ যা কিছু করবেন, সবই তো মমতার ভালোর জন্যই করবেন। মমতার শাড়ী কিংবা জানলার পর্দার রং অবশ্য মমতাই পছন্দ করবেন, কারণ প্রতাপ ওসব বোঝেন না, কিন্তু পিকলুকে পুরী পাঠাবার বদলে একটা খাট তৈরি করা যে বেশি প্রয়োজনীয়, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার মমতাকে কে দিয়েছে?

কাল রাত্তিরে সুপ্রীতির প্রসঙ্গ তুলে মমতা একেবারে মর্মাহত করে দিয়েছেন প্রতাপকে। ঘুমের মধ্যেও, দুঃস্বপ্নে, প্রতাপ যেন এক ভয়ংকর কালো রঙের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তাঁর দিদির সঙ্গে মমতা একসঙ্গে থাকতে চান না! তুতুলকে নিয়ে কোথায় চলে যাবেন দিদি? প্রতাপের শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতে কি তিনি তাঁর দিদিকে ঐ রকম কোনো কথা সামান্য ইঙ্গিতেও বলতে পারবেন?

মমতা যে এত বুদ্ধিমতী তা প্রতাপ আগে কোনোদিন টের পাননি। দিদির প্রসঙ্গ তুলে খানিকক্ষণ অভিমানের ফোঁসফোঁসানির পর মমতা অবার নিজে থেকেই প্রতাপের গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছেন যে থাক, কিছুই বদলাতে হবে না, মমতা এখনকার অবস্থাই মেনে নেবেন। অর্থাৎ, এখন থেকে, দিদির জন্য প্রতাপকে সব সময় মমতার দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে। প্রতাপকে প্রতি মুহূর্তে তোয়াজ করে বলতে হবে, মমো, তুমি আমার দিদির মনে দুঃখ দিও না, দিদি যেন কিছু টের না পায়।

সব চুলোয় যাক, দিদি আর তুতুলের যা-হয় হোক। মমতা তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যেমন করে পারুক সংসার চালাক। প্রতাপের আর কোনো দায়িত্ব নেই।

হন হন করে প্রতাপ হাঁটতে লাগলেন হাওড়া স্টেশানের দিকে। স্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে লরি চলাচল শুরু হয়ে গেছে। পাট গুদামগুলির পাশের সরু রাস্তাটা ধরলেন প্রতাপ। গঙ্গার ওপর পাতলা কুয়াশা ছড়িয়ে আছে। শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কোনো কোনো পুণ্যার্থীর কম্পিত গলার গান। সারা গায়ে জবজবে সর্ষের তেল মেখে কুস্তি করছে কয়েকজন। ব্রীজের নিচে বসে গেছে ফলের বাজার।

হাওড়া স্টেশানে এসে প্রতাপকে টিকিট ঘরে খোলার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল।

প্রথমে তিনি ঠিক করলেন কাশীর টিকিট কাটবেন। যা সামান্য টাকা আছে তাতে আর বেশি দূর যাওয়া যায় না। কাশীতে অবশ্য প্রতাপের চেনা কেউ নেই। সেখানে গিয়ে কী করবে তা জানেন না, তবু যেতে হবে।

পর পর দু' ভাঁড়া চা ও আরও একটি সিগারেট খাবার পর প্রতাপের মাথা পরিষ্কার হল। স্টেশানের ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজে। বাড়িতে কেউ এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। মমতা ছ'টার আগে জাগেন না। প্রতাপ এখন বাড়ি ফিরে গেলে টেরই পাবেন না কেউ কিছু। কিন্তু প্রতাপের গোয়াতুমি এত সামান্য সময়ে কমে না। মমতাকে কিছু শিক্ষা দেবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

যথা সময়ে কাশীর টিকিট কেটে তিনি প্ল্যাটফর্মে ঢুকে একটি বেঞ্চিতে বসলেন। সকালে কাশীর কোনো ট্রেন নেই, অন্য একটি ট্রেন মোগলসরাই-এর ওপর দিয়ে যাবে, তারও দেরি আছে।

চা খাওয়ার পর বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। স্টেশানের বাথরুমের যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, মনে পড়লেই গা ঘিনঘিন করে ও ওঠে। শরীর কতগুলো আরামে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, আবার মনের বিকার হলে সেই সব অভ্যেসও পরাস্ত হয়ে যায়। বেঞ্চে বসে প্রতাপ একটার পর একটা সিগারেট পোড়াতে লাগলেন।

পাশে যে আর একজন লোক এসে বসেছে, প্রতাপ বেশ কিছুক্ষণ তা খেয়ালই করেন নি। লোকটি প্রতাপের চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়, খাকি প্যান্ট ও নীল রঙের জামা পরা, রোদে-পোড়া তামাটে মুখ, মাথায় অল্প টাক, পায়ের কাছে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আর একটি লাঠি।

প্রতাপের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই লোকটি বললো, নমস্কার, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার দেশলাইটি একবার দেবেন?

দেশলাই নিয়ে লোকটি একটি বিড়ি ধরালো। দু'হাতের তালুর মধ্যে বিড়িটি লুকিয়ে জ্বালাবার একটি বিশেষ কায়দা আছে। কয়েকবার ধোঁয়া ছাড়ার পর দেশলাইটি ফেরত দিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, মশায়ের কোথায় যাওয়া হবে? মেদিনীপুরের দিকে নাকি?

প্যান্ট-শার্ট পরিহিত হলেও লোকটির কথা বলার ভঙ্গি পুরোনো ঢঙের। অপরিচিত মানুষকে স্টাডি করা প্রতাপের একটি শখ হলেও এখন তিনি গল্প করার মেজাজে নেই। তিনি সংক্ষেপে বললেন, না।

কিন্তু ঐ লোকটি যেন কথা বলার কোনো সঙ্গী খুঁজছে। প্রতাপ অন্য দিকে মুখ ফেরালেও লোকটি বললো, মশায় কি মাঝে মাঝেই ট্রেনে যাতায়াত করেন? তা হলে আপনি টের পাবেন না। রেল ইস্টিশানের একটা কুচ্ছিৎ গন্ধ আছে। এই গন্ধের জ্বালায় সারা রাত ঘুমোতে পারিনি।

প্রতাপের কৌতূহল এবারে উসকে উঠলো। সারা রাত? শিয়ালদা স্টেশানের তুলনায় হাওড়া অনেক পরিষ্কার। এখানে রিফিউজিদের আস্তানা হয়নি। কুলি-কামিন ছাড়া এই স্টেশানে তো রাত্রে কেউ শোয় না।

লোকটি আবার বললো, কাল পশ্চিম থেকে ফিরলুম তো। লাস্ট ট্রেন এখানে এসে ভিড়লো রাত এগারোটার পর। তখন আর কোথায় যাই? কলকাতা শহরের কারুকে চিনি না। রাস্তাঘাটও ভালো মনে নেই, তাই শুয়ে রইলুম এখানেই।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, পশ্চিমের কোথায় থাকতেন?

লোকটি সে কথার উত্তর না দিয়ে হাসলো। বিড়িতে আবার টান দিয়ে বললো, কেউ একথা জিজ্ঞেস করলে কী যে বলবো ভেবে পাই না। ওদিকে তো আমার ঘর-বাসা বলতে কিছু ছিল না, সর্বক্ষণ ঠাঁই-নাড়া। আজ এখানে তো কাল সেখানে। কানপুরে ট্রেনে চেপেছি, তাই বললুম যে আসছি পশ্চিম থেকে।

- কাজের জন্য ঘুরতে হত বুঝি?

- কাজ? আমি মশায় একেবারে অকাজের কাজী। সারা জীবন কোনো কাজই করলুম না। গায়ে ফুঁ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। কাপসি তুলোর বীজ দেখেছেন? ঠিক সেই রকম। আমার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম হল মনোহর মাইতি, কিন্তু আমি নিজেই নিজের আর একটা নাম নিয়েছি! মুক্তানন্দ! কেমন নাম? হে-হে-হে!

প্রতাপ সকৌতূহলে চেয়ে রইলেন লোকটির মুখের দিকে।

মনোহর মাইতি ওরফে মুক্তানন্দ নিজের গালে হাত বুলোতে লাগলো। যেন নিজেকে আদর করছে সে।

- বুঝলেন মশায়, মুখ ভর্তি দাড়ি ছিল আমার, আঠারো বছর দাড়ি কাটিনি। গত পশুদিনকে সব সাফ করলুম। আঠারো বছর পরে বাড়ি ফিরছি, অত দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল দেখলে কেউ আমাকে চিনতেই পারবে না। এমনিতেই পারবে কি না সন্দেহ। আচ্ছা, এ দেশে চালের দাম এখন কত? ট্রেনে আসতে আসতে শুনলাম, বাঙালীরা নাকি পাথর-মেশানো চাল কেনে আর ভাত খেতে খেতে দাঁত ভেঙে যায়!

প্রতাপ মনে মনে হিসেব করলেন। আঠারো বছর মানে যুদ্ধের আগেকার কথা। এর মধ্যে বাঙালীর জীবনে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে, এই লোকটি তা কিছুই দেখেনি। সাধু-সন্ন্যাসী নাকি?

খানিকক্ষণ কথা বলার পর বোঝা গেল, সে সব কিছু নয়। লোকটির মধ্যে ধর্মভাব প্রবল নয়। এই মনোহর মাইতিকে যৌবন বয়েসে হিমালয় পাহাড় ডেকেছিল। সেই ডাক শুনে বাড়িঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ে। বিয়ে-থা করেনি অবশ্য। প্রথম কিছুদিন এক বন্ধু ছিল সঙ্গে। সেই বন্ধু মাস ছয়েক পর ফিরে আসে, কিন্তু মনোহর আর ফেরে নি।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাজ-কর্ম কিছুই করেননি, আপনার আহার জুটতো কী করে?

লোকটি বললো, বিশ্বাস করুন মশায়, এই আঠারো বছরে একটা পয়সা রোজগার করিনি, চেষ্টাও করিনি। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি, একথা যে সত্যি পাহাড়-পর্বতে গেলে বোঝা যায়। দেখুন না, বেঁচে তো আছি। আমি যে-সব পাহাড়ে গেছি, তার কোনো কোনো জায়গায় পাহাড়ীরা এখনো পয়সার মুখ দেখেনি, তবু তারাও তো বেঁচে থাকে।

- কিন্তু তারা কাজ করে নিশ্চয়ই। খেতে ফসল ফলায়, পশু পালন করে।

- অনেকে আবার তাও করে না। প্রকৃতি তাদের দেয়। ধওলাগিরিতে একটা ঝোরা আছে, বুঝলেন, তার জল খেলে খিদেও মেটে, তেষ্টাও মেটে। বিশ্বাস করুন আমার কথা। তারপর ধরুন, ব্রহ্মকমল ফুলের নাম শুনেছেন? সে ফুলের দিকে একবার তাকালে সারা দিন খাওয়া-দাওয়ার কথা একবারও মনেও পড়ে না। ওখানে বাতাসে কিছু একটা আছে, বুঝলেন।

- আপনার দাড়ি-টাড়ি ছিল, সরল পাহাড়ীরা আপনাকে সাধু মনে করে ভিক্ষে দিত, এটাই আসল

কথা। না খেয়ে মানুষ বাঁচে না!

- হা-হা-হা! আপনি বিশ্বাস না করলে আমি কি করি বলুন? হ্যাঁ, দিয়েছে, পাহাড়ীরা খাবার দিয়েছে, ভিক্ষে নয়, ভালোবাসার দান। কখনো কিছু চাইনি। এই যে প্যান্টুলুন আর জামা দেখছেন, এক সাহেব দিয়েছে। এমনিই! আবার অনেক সময় নেংটি পরে থেকেছি, শীত লাগেনি। একবার টানা এক পক্ষকাল কিছু পাইনি, শুধু জল, তাতেও শরীর শুকিয়ে যায়নি। বেশ মজাসে ছিলুম।

- এত মজা ছেড়ে তা হলে ফিরে এলেন কেন এই নরককুণ্ডে! দেশটার অবস্থা কী হয়েছে তা তো জানেন না!

- মায়া, বুঝলেন, সবই মায়া। ফিরে এলুম মায়ার টানে। গাধার গায়ে সিংহের চামড়া জড়ালেই কি আর সে সিংহ হয়? সাধু সেজেছিলুম, কিন্তু প্রকৃত সাধু হতে পারলুম কই? এতকাল পরে হঠাৎ মায়ের জন্য মন টানলো। সে বুড়ি বেঁচে আছে কি না জানি না। তবু একবার তাকে দেখতে ইচ্ছে হলো। আপনি দেশটাকে নরককুণ্ড বললেন কেন?

- ক' দিন থাকুন, তারপর বুঝবেন!

- হয়তো আপনি ঠিকই বলছেন। পাহাড় থেকে নিচে নামা ইস্তক গরমে চিটপিট করছে গা। খিদেও পাচ্ছে যখন-তখন। কাল রাতে এক পেট খেয়েছি, আজ এর মধ্যেই আবার পেট চনমনাচ্ছে! নরকের লোকদেরই কখনো খিদে মেটে না!

আরও একটু পরে লোকটি একটি অবাস্তব প্রস্তাব দিল।

মেদিনীপুরের ট্রেন এসে দাঁড়াতে লোকটি প্রতাপের দিকে কাতরভাবে চেয়ে বললো, আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। যেখানে যাচ্ছেন, ক'দিন পরে যাবেন। একা এতদিন পরে বাড়ি ফিরতে আমার ভয় ভয় করছে।

অচেনা একজন মানুষের সঙ্গে গিয়ে তার বাড়িতে আশ্রয় নেবার ব্যাপারটা প্রতাপ উড়িয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। এসব তাঁর ধাতুতে নেই। লোকটিকে তিনি তুলে দিলেন মেদিনীপুরের কামরায়।

প্রতাপের ট্রেন আর একটু পরে আসবে। আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসলেন লোকটিকে তাঁর বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। এই দুনিয়ায় কত রকম মানুষ আছে। সবাই জীবনের প্রতিযোগিতায় নামে না। কেউ কেউ দান ছেড়ে দেয়। সংসার থেকে যারা বিবাগী হয়ে যায়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ফিরেও আসে।

আঠারো বছর বাদে মেদিনীপুরের এক গ্রামে ফিরে গিয়ে লোকটি কী দেখবে? তবু তো ওর ফিরে যাবার একটা জায়গা আছে।

লোকটির দুটি কথা প্রতাপের মনের মধ্যে অনেক্ষণ ঘুরতে লাগলো। হিমালয়ে গেলে সত্যি খিদে দমন করা যায়? খিদের জন্যই তো সব! অন্তত এখানে তাই মনে হয়। হিমালয় থেকে কত নিচে এই বাংলা, তাই এখানে সর্বক্ষণ নরকবাসীদের মতন খিদের হাহাকার! পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে কে না এখানে নরক দেখেছে! এখনই বা সেই অবস্থা কতটা পাল্টেছে? প্রতাপকে পালাতে হলে এখান থেকে অনেক দূরে পালাতে হবে।

পাহাড়ে পাহাড়ে অনির্বচনীয় সুখ পেয়েও লোকটা এতদিন পর ফিরে এলো মাকে দেখবার জন্য। মাতৃ-টান! কথাটা শোনার পর থেকে প্রতাপের মনে পড়ছে নিজের মায়ের কথা। মা যেন একটি শিশু। প্রতাপ সম্পর্কে কোনো দুঃসংবাদ শুনলে সুহাসিনী যে কী করবেন তার কোনো ঠিক নেই।

কাশী নয়, প্রতাপকে আগে যেতে হবে দেওঘর।

॥ ২৮ ॥

কলকাতার ভদ্রলোকদের বাড়িতে ঝি-চাকররা আসে বস্তি থেকে। আগে প্রত্যেক যৌথ পরিবারেই একজন-দু'জন স্থায়ী রাঁধুনী বা দাস-দাসী থাকতো। অনেকে দেশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতো কাজের লোক। এখন যৌথ পরিবারগুলো ভাঙছে, ভাড়া বাড়ির দু'আড়াইখানা ঘরের ছোট সংসারে ঝি-চাকরদের শোওয়ার জায়গা দেওয়া যায় না, খাই খরচও অনেক পড়ে যায়, তাই এখন ঠিকে লোক রাখাই সুবিধেজনক। এই ঠিকে লোকদের চাহিদা মেটাতে আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে শহরের বস্তিগুলো। নগরপালকদের সেদিকে হুঁস নেই।

সম্প্রতি অবশ্য রিফিউজি কলোনিগুলি থেকেও ঝি-চাকরের যোগান হচ্ছে বেশ। এই রিফিউজিরা এক সময় নানারকম বৃত্তিতে নিযুক্ত স্বাধীন সংসারী ছিল, দেশান্তরী হয়ে ভিক্ষুক বা ঝি-চাকর হতে প্রথম প্রথম তাদের আত্মসম্মানে বেঁধেছে। কিন্তু খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। আস্তে আস্তে তাদের নামতে হলো পথে। যে-কোনো কাজ, যত কম মজুরিতেই হোক, তা আঁকড়ে ধরার জন্য এগিয়ে গেল শত-

সহস্র হাত। পূজারী-বামুনের ছেলে মোট বইতে লাগলো বাজারে, চাষীর বউ হোটেলে বাসন মাজতে যায়। যুবতীয় মেয়েরা কেউ কেউ নার্সের কাজ করার নামে দুপুরে কলোনি থেকে বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাতে।

কলকাতার উত্তরে আর দক্ষিণে এখন শত শত জবরদখল কলোনি। তারা সকলে মিলে সংঘবদ্ধ হলে একটা বড় রকমের শক্তিতে পরিণত হতে পারতো, কিন্তু সেরকম নেতৃত্ব দেবার কেউ নেই।

হারীত মন্ডল পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পর তার স্ত্রী পারুলবালাকে বাধ্য হয়ে কাজ নিতে হলো এক বাড়িতে। ঠিক ঝি-গিরি নয়, তিনটি বাচ্চাকে দেখাশুনো করা, এ দেশে বলে আয়ার কাজ। গৃহকর্ত্রী বেশ সহৃদয়া, তিনি প্রায়ই হাঁপানিতে ভোগেন, শরীর খুবই দুর্বল, কিন্তু মুখের কথা খুব মিষ্টি। যখন তাঁর হাঁপানির টান কম থাকে তখন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পারুলবালার জীবনকাহিনী জানতে চান। শুধু কৌতূহল নয়, আন্তরিক সমবেদনার সুরও ফুটে ওঠে তাঁর কথায়। গৃহকর্ত্রীর নাম প্রীতিলতা, তিনি কখনো পূর্ববঙ্গ দেখেননি।

পূর্বজন্মের স্মৃতির মতন পারুলবালা শুধু ফেলে আসা দেশের গল্পই শোনায়। জবর-দখল কলোনির কথা শুনতে এদেশের অনেকেই পছন্দ করে না। তাছাড়া পারুলবালার স্বামী খুনের অভিযোগে জেল খাটছে, এ খবর জানাজানি হলে চাকরি থাকবে না হয়তো!

হারীত মণ্ডলের ছেলে-মেয়ে তিনটি। তার মধ্যে বড় ছেলে সুচরিতের মাথা খুব পরিষ্কার। খুব বাচ্চা বয়স থেকেই সে মুখে মুখে বেশ শক্ত শক্ত অঙ্ক কষে দিতে পারতো। কাশীপুরের একটি স্কুলে তাকে ভর্তি করানো হয়েছে এবং অ্যানুয়াল পরীক্ষায় সে থার্ড হয়েছে।

কিন্তু স্কুলটি জুনিয়ার হাইস্কুল, ক্লাস এইটের বেশি নেই। সুচরিতকে এবারে বড় ইস্কুলে যেতে হবে। হারীত মন্ডল পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পর পাড়ার একজন নেতাগোছের ব্যক্তি পারুলবালার কাছে সমবেদনা জানিয়ে সুচরিতকে নিজের বাড়িতে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল। অর্থাৎ বিনা মাইনেতে চাকরের কাজ। সুচরিত কিছুতেই যেতে চায়নি, সে আরও পড়তে চায়। কিন্তু নতুন ইস্কুলে যাওয়া মানেই ভর্তির টাকা, মাইনে বইপত্র কেনার খরচ। রিফিউজি ছাত্রদের জন্য সরকার কিছু কিছু বৃত্তির কথা ঘোষণা করেছেন বটে, কিন্তু চিঠিপত্র লিখে সেসব জোগাড় করা ঝঞ্ঝাটের কম কাজ নয়। জবরদখল কলোনির অনেকে এখানো বৈধ রিফিউজি সার্টিফিকেটের কাগজই পায়নি!

স্কুলে যেতে পারছে না বলে সুচরিত কান্নাকাটি করে, সেই জন্য পারুলবালা একদিন সঙ্কুচিতভাবে তার মনিবপত্নীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানালো। প্রীতিলতার বয়েস কম হলেও পারুলবালা বৌদি বলে ডাকে।

প্রীতিলতার স্বামী অসমঞ্জ রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক। কয়েকটি বাজার-চলতি স্কুল-কলেজের নোট বই লিখে তিনি বেশ টাকা-কড়ি করেছেন। নানান সভা-সমিতির সঙ্গেও যোগ আছে, বেশ ব্যস্ত মানুষ।

প্রীতিলতার কাছে প্রস্তাবটি শুনে অসমঞ্জ রায় বললেন, দ্যাখো, রিফিউজদের জন্য আমাদের পক্ষে যার যতটা সম্ভব সাহায্য করা উচিত, এটা আমি মানি। আমি সেরকম চেষ্টাও করেছি কয়েকবার। কিন্তু ওরা বড্ড ঝামেলা করে। নির্মল বলে সেই ছেলেটাকে তো তুমিই জুটিয়েছিলে, মনে নেই।

প্রীতিলতা বললেন, হ্যাঁ, তার কী হয়েছে? সে তো চাকরি-বাকরি পেয়ে ভালোই আছে শুনেছি?

অসমঞ্জ রায় বিরক্ত ভাবে বললেন, হ্যাঁ, সে তো ভালোই আছে। কিন্তু আমাদের বিজয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত! বিজয় আমাকে বলে, তুমি আমার গলায় এমন কাঁটা গেলালে-

-কী করেছে নির্মল?

-খেতে পাচ্ছে না বলে তোমার পায়ে কেঁদে পড়েছিল। ছেলেটি দেখতে শুনতে ভালো, তুমি অমনি দয়ায় গলে জল হয়ে গেলে। কিন্তু ছেলেটি যে জাতে বামুন, তুমি তা জানতে?

-হ্যাঁ, জানতুম তো। বামুন হওয়ার দোষ কী হয়েছে?

-তুমি জানলেও সে কথা আমাকে বলোনি। ছেলেটি যে-কোনো একটা কাজ চেয়েছিল। লেখাপড়া তো ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। আমি বিজয়কে বলে ওর অফিসে ঢুকিয়ে দিলুম। মার্চেন্ট অফিস, মাইনে খারাপ নয়, পার্মানেন্ট হলে বোনাস পাবে....

-ও তো পার্মানেন্ট হবার পর আমাদের এক বাক্স সন্দেশ দিয়ে গিয়েছিল।

-হ্যাঁ, পার্মানেন্ট হবার আগে পর্যন্ত গো-বেচারা সেজে ছিল, তারপরেই কুলোপানা-চক্কর বার করেছে! এখন সব সময় ফোঁসফোঁসিয়ে ভয় দেখায়।

-তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে?

-আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে কেন? আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক? আমাকে দেখলে বিগলিতভাবে হাসে। কিন্তু বিজয়ের হাড় জ্বালাচ্ছে। ক্লাস সিক্স অবধি বিদ্যে, ও আর কী চাকরি পাবে, বিজয় ওকে বেয়ারার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। অফিসের বেয়ারারা কী করে, কাজ খুব হালকা। বসেই তো থাকে বেশিরভাগ সময়। মাঝে মাঝে ফাইলপত্তর আনতে হয়, বাবুদের জল-দেওয়া, টিফিন আনা, এই তো! তা তোমার ঐ নির্মল এখন বলে যে, ও বাবুদের এঁটো জলের গেলাস ধুতে পারবে না, কারণ ও ব্রাহ্মণ! বাবুদের জন্য টিফিন এনে দেবে। কিন্তু টেবিল থেকে এঁটো শালপাতা তুলবে না, চা এনে কিন্তু খালি কাপ নিয়ে যাবে না, কী আবদার বলো তো!

প্রীতিলতার ব্রাহ্মণদের বিষয়ে সংস্কার আছে। সহসা কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর বাপের বাড়িতে তিনি ব্রাহ্মণ অতিথিদের পা ধুইয়ে দিতে দেখেছেন ছেলেবেলায়। তাঁর মা এক বাচ্চা পুরুতের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন।

অসমঞ্জ রায় বললেন, ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল এক সময়ে লেখাপড়ার চর্চা করা। যে লেখাপড়া শেখেনি, সে আবার বামুন কিসে?

প্রীতিলতা বললেন, অফিসের লোকরাই বা কেমন! নিজেদের এঁটো গেলাস বা কাপ-ডিস নিজেরা ধুয়ে নিতে পারে না?

-দ্যাখো, এতকাল ধরে একটা ব্যবস্থা চলে আসছে, অফিসের বেয়ারাই এসব কাজ করে। এখন এই সার্ভিস না পেলে কেরানিবাবুরা বিরক্ত হবেই। তারা বিজয়ের কাছে নালিশ করে।

-বিজয়বাবু তো নির্মলকে অন্য একটা কাজ দিলেই পারেন!

-কী কাজ দেবে? ঐ নির্মল আবার নাকি ইউনিয়ানের পাণ্ডা হয়েছে, কমুনিস্টদের মতন কথাবার্তা বলে। একদিকে বামুন আর এক দিকে কমুনিস্ট, বোঝো ঠ্যালা! বিজয়ের হাড় ভাজাভাজা করে তুলেছে! আর কারুর জন্য আমি চাকরি জোগাড় করতে পারবো না। বিজয় বলেছে, এর পর থেকে ওর অফিসে আর বাঙালীই নেবে না।

-কিন্তু পারুলের ছেলেতো চাকরি চায় না, পড়াশুনো করতে চায়।

অসমঞ্জ রায় ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। যদিও ছুটির দিন তবু দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরই তাঁর বেরুবার কথা আছে। রেড ক্রসের মিটিং, তিনি আঞ্চলিক শাখার সভাপতি।

-পড়াশুনো করতে চায় তো করুক। তার জন্য আমি কী করবো? সে কি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চায় নাকি?

-না, ইস্কুলের ছাত্র।

-টাকা চায়?

-না, ক্লাস নাইনে ভর্তি হবে, তোমার তো অনেক চেনাশুনো, তুমি যদি ফ্রি করে দিতে পারো, আর রিফিউজিদের জন্য কী সব টাকা পাওয়া যায়, যদি ব্যবস্থা করে দাও....

চোখ থেকে চশমাটা খুলে অসমঞ্জ রায় মুখ মুছলেন। তারপর বললেন, দ্যাখো, আমি লেখাপড়ার লাইনের মানুষ। কেউ যদি সত্যি সত্যি পড়াশুনো করতে চায়, আমি তাকে সবরকম সাহায্য করতে পারি। কিন্তু রিফিউজি কলোনিতে থেকে কতদূর লেখাপড়া হবে? আসলে ওরা কী চায়? ভালো করে বুঝে দ্যাখো। মনে তো হচ্ছে, ছেলেটিকে গছাতে চায় আমাদের বাড়িতে। কিন্তু আমি বাড়িতে পুরুষ চাকরও রাখতে চাই না।

অসমঞ্জ রায়ের এই কথা বলার কারণ আছে। পুরুষ চাকর সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা খুবই মন্দ। একবার একজন এ বাড়ি থেকে ঘড়ি-রেডিও সব চুরি করে পালিয়েছে। আর একবার একজন জোয়ান ভৃত্যের সঙ্গে তাঁর বিধবা বোনের একটা অসৎ সম্পর্কের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। সেই বিধবা বোন এখনও এ বাড়িতেই থাকে, তার মাথায় ঈষৎ গণ্ডগোলো আছে।

তবু প্রীতিলতার অনুরোধে তিনি পরদিন পারুলের ছেলের সঙ্গে একবার অন্তত কথা বলতে সম্মত হলেন।

সকালবেলা চা-জলখাবারের পর বসবার ঘরে শুরু হলো ইন্টারভিউ। পারুলবালা সুচরিতের হাত ধরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অসমঞ্জ রায় এই প্রথম তাঁর ছেলেমেয়ের আয়াকে দেখলেন ভালো করে। পারুলবালার শরীরে বা মুখে কোনো দৈন্যের ছাপ নেই, নিচু ঘরের স্ত্রীলোক মনে হয় না, তার দৃ[illegible] আত্মসম্মানবোধের ছাপ। পরনের শাড়িখানা দু'এক জায়গায় সেলাই করা হলেও পরিষ্কার।

অসমঞ্জ রায় যেন ঠিক এরকম ভাবেননি। সুচরিতের স্বাস্থ্য ভালো নয়, সে রোগা ও লম্বাটে, দেখলেই বোঝা যায় লাজুক স্বভাবের।

অসমঞ্জ রায় দু'জনকেই একটুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি পারুলবালাকে বললেন, ঠিক আছে, বাছা, তুমি ভেতরে কাজে যাও, আমি শুধু তোমার ছেলের সঙ্গে কথা বলবো।

তারপর তিনি সুচরিতের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐ কোণে ঐ যে টেবিল-চেয়ার আছে, ওখানে বসো। দ্যাখো, ওখানে কাগজ-পেন্সিল আছে। আমি ডিকটেশন দিচ্ছি লেখো?

তিনি হাতের স্টেটসম্যান পত্রিকাটি খুলে প্রথম সম্পাদকীয়র অর্ধেকটা শ্রুতি লিখন দিলেন। তারপর বললেন, এটা ভালো করে পড়ে, বুঝে বাংলা অনুবাদ করে আমাকে দেখাও। কুড়ি মিনিট সময়।

ঠিক কুড়ি মিনিট বাদে তিনি খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, কই দেখি!

সুচরিত তখনও কাটাকুটি করে লিখে যাচ্ছিল, তিনি উঠে এসে বললেন, যা হয়েছে সেটাই দেখাও!

স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পদকীয়-লেখগণ যদি একটি ক্লাস এইটের রিফিউজি বালকের পক্ষে সুবোধ্য ইংরেজি লেখে, তা হলে তাদের চাকরি যাবার কথা। অসমঞ্জ রায় ইচ্ছে করেই কঠিন পরীক্ষা নিচ্ছেন।

সুচরিত কোনো সাংঘাতিক প্রতিভাবান কিশোর নয়। ইংরেজির বদলে অঙ্কের পরীক্ষা নিলে সে বেশি স্বস্তি বোধ করতো। তার লেখায় অনেকগুলি বানান ভুল, বেশ কয়েকটি ইংরেজি শব্দের সে মানে বুঝতে পারেনি, তবু সে মোটামুটি একটা বাংলা অনুবাদ খাড়া করেছে।

অসমঞ্জ রায় চশমার ফাঁক দেখলেই তিনি অনেকটা বুঝতে পারেন।

তিনি বললেন, ঠিক আছে, এতেই হবে। শোনো, তুমি যদি মন দিয়ে লেখাপড়া করতে চাও, আমার কাছ থেকে সবরকম সাহায্যই পাবে। একেবারে এমন এ পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা করে দেবো। আর যদি ফাঁকি মারো, তা হলে আমার কাছে কোনো দয়া নেই। এ দেশে ঢের ঢের অপগণ্ড ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁদের দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না। বুঝলে? মুখ নিচু করে আছো কেন? তাকাও আমার দিকে। রিফিউজি ছেলেদের বাঁচার একমাত্র উপায় এখানকার ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়ায় কমপিট করা -।

অসমঞ্জ রায়ের বক্তৃতার মাঝ পথে কয়েকজন বাইরের লোকে এসে পড়লো। দু'জন পুরুষ, একজন মহিলা। তাদের দেখে অসমঞ্জ রায় স্পষ্টত খুশি হয়ে উঠলেন, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বললেন, আরে, এসো, এসো!

অতিথিদের তিনি পাশের সোফা-সেটটিতে বসিয়ে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। যুবতীটি হাতের একটি ফাইল খুলে বললো, আমরা দুটো নতুন প্রজেক্ট নিয়েছি, সেই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই....।

পুরুষ দু'জন প্যান্ট-শার্ট পরা, তাদের তুলনায় যুবতীটি বেশি সপ্রতিভ। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, সে-ই কথা বলছে বেশি, পুরুষ দু'জন হ্যাঁ হ্যাঁ করে যাচ্ছে। এরা স্থানীয় একটি সেবার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, আন্তর্জাতিক দু'একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরে হাতের কাজ শিক্ষা, তাঁত চালানো ইত্যাদি পরিকল্পনা চালু করতে চায়।

অসমঞ্জ রায় অবশ্য অন্য দুটি পুরুষের মতন এই উজ্জ্বল আননা যুবতীটির সব কথা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেন না, তবে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, হ্যাঁ, ভেবে দেখতে হবে, সব দিক ভেবে দেখতে হবে, ওভারহেড খরচ কত হবে, সেটা ঠিক করতে হবে আগে, তারও আগে একবার সাইটে যেতে হবে।

যুবতীটি বললো, চলুন, আজই চলুন, এখনই বেরিয়ে পড়া যেতে পারে, আমাদের সঙ্গে জিপ আছে।

হুট করে কারুর কোনো কথায় রাজি হওয়া বোধ হয় অসমঞ্জ রায়ের স্বভাবে নেই। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আজ হবে না। তারপর চোখ বুজে একটু চিন্তা করে বললেন, পরশু হতে পারে।

অন্য যুবকদের একজন বললো, উইক ডেইজের মধ্যে গেলে আমাদের একটু অসুবিধে আছে।

যুবতীটি বললো, আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমি ফ্রি আছি।

অসমঞ্জ রায় বললেন, তা হলে চন্দ্রা, তুমি আর আমিই পরশু গিয়ে একবার দেখে আসি। ওরা না হয় পরে যাবে।

ঢ্যাঙা বালকটি দাঁড়িয়ে আছে ঘরের এক কোণে। সুচরিতকে কেউ চলে যেতে বলেনি। তাকে কেউ লক্ষও করছে না। কিন্তু সুচরিত প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। চন্দ্রানাম্নী যুবতীটির মতন কোনো নারী'কে সে আগে দেখেনি। চন্দ্রার পরনে একটা হালকা হলুদ শাড়ি, সেই রঙেরই ব্লাউজ, ব্লাউজের হাতায় জরির কাজ। সেই জরি যেন তার ফর্সা বাহু পোশাক থেকে খানিকটা উপচে বেরিয়ে আসে, চন্দ্রারও সেরকম। চন্দ্রার ঠোঁটে রং, সে সিগারেট খায়!

সুচরিত এ পর্যন্ত দেখে এসেছে যে পুরুষরা বড়, মেয়েরা ছোট। পুরুষরা দরকারি কথা বলে, মেয়েরা শোনে। মেয়েরা মাঝে মাঝেই ঝগড়া করে বটে, কিন্তু পুরুষদের মতন হুকুমের সুরে রায়ের মতন ইংরেজি জানা মানুষকেও সে মাঝে মাঝে আঙুল তুলে বোঝাচ্ছে কোনো কোনো কথা। ইংরেজি বলছে ফরফর করে। একবার সে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করতেই মনোজগতে এ এক সম্পূর্ণ নতুন চরিত্রের আবির্ভাব।

এক সময় অসমঞ্জ রায় তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, এই, ইয়ে, তোমার কী নাম যেন, ভেতরে গিয়ে বলো তো চার কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।

সুচরিত বাড়ির মধ্যে ঢুকে তার মাকে খুঁজে সেই কথা জানালো, তারপর আবার ঐ ঘরে ফিরে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলো দেয়াল ঘেঁষে। সে সব কিছু দেখতে ও শুনতে চায়।

চা-পান ও অন্যান্য কথাবার্তা শেষ করার পর ঐ তিনজন যখন বিদায় নিচ্ছে, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে অসমঞ্জ রায় বললেন, চন্দ্রা, একটু শোনো, ফাইলগুলো আমার কাছেই রেখে যাও, আমি এর মধ্যে ভালো করে পড়ে রাখব।

যুবক দু'জন বাইরে, চন্দ্রা আবার ঘরের মধ্যে এসে ফাইলগুলো খুলে কী সব বোঝালো।

অসমঞ্জ রায় চন্দ্রার কাঁধে হাত রেখে গাঢ় গলায় বললেন, তা হলে, পরশু?

চন্দ্রা মুখ তুলে, তার হাসিতে অনেকখানি কিরণ ছড়িয়ে বললো, হ্যাঁ, ঠিক রইলো...

এই সময় চন্দ্রা এক পলক দেখলো সুচরিতকে। গ্রাহ্য করলো না। বালক হলেও সুচরিত বুঝতে পারলো, সমাজ সেবা ছাড়াও এই দু'জন নারী-পুরুষের মধ্যে অন্য কোনো বন্ধন আছে।

ওরা চলে যাবার পর অসমঞ্জ রায় ফিরে এসে সোফায় বসে এক মনে সিগারেট টানতে লাগেলেন। তিনি কোনো গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সুচরিতের কথা তাঁর মনে নেই। সুচরিতও নিজে থেকে কিছু বলতে পারছে না।

খানিকবাদে একটা কিছু শব্দ পেয়ে অসমঞ্জ রায় মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, এই তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোর সঙ্গে তো কথা হয়ে গেছে?

সুচরিত ভয়ে ভয়ে বললো, আমি কোন ইস্কুলে পড়বো?

-ভর্তি করে দেবো, এ পাড়ায় যেটা ভালো স্কুল...

-কবে ভর্তি হবো?

-তোরা থাকিস কোথায়

-কাশীপুরে, সেভেন ট্যাঙ্কস লেনের কাছে

-ঠিক আছে, ওর কাছাকাছি কোনো স্কুল দেখতে হবে। তোর বাবা...বাবা আছে তো? সুচরিত মাথা নাড়লো।

-কাল তোর বাবাকে পাঠিয়ে দিস। আমি সব লিখেটিখে দেবো! সুচরিত কয়েক মুহূর্ত মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

-বললুম তো, তোর বাবাকে পাঠিয়ে দিস। এখন যা।

-বাবা আসতে পারবে না। বাবা এখানে নেই।

-তোর বাবা কোথায়? দেশেই থেকে গেছে?

-আমাকে যদি লিখে দ্যান, আমি নিজেই ভর্তি হতে পারবো!

-তোর বাবা কোথায়?

এবারে মুখ তুলে সে অসমঞ্জ রায়ের দিকে সোজাসুজি তাকালো। তারপর বললো, আমার আবার নাম হারীত মন্ডল। সে এখন জেলে।

রিফিউজি কলোনিগুলি বাইরে হারীত মন্ডল কোনো বিখ্যাত লোক নয়। সুচরিতের ধারণা, তার বাবার নাম খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, তকাই সবাই নাম শুনেই চিনতে পারবে। কিন্তু অসমঞ্জ রায়ের মনে কোনো দাগ কাটলো না।

তিনি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে তারপর বললেন, তুই ভেতরে যা। তোর মাকে পাঠিয়ে দে।

পারুলবালাকে নিয়ে সুচরিত আবার ফিরে এলো। অসমঞ্জ রায় এবারে খানিকটা ধমক দিয়ে বললেন, শুধু তোর মাকে আসতে বলেছি! তুই যা, গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়া!

অসমঞ্জ রায়ের পত্নী অনেকদিন ধরে রুগ্না বলে তিনি যে-কোনো স্বাস্থ্যবতী রমণীর সর্বাঙ্গ চোখ বুলিয়ে দেখতে ভালোবাসেন। সেইভাবে পারুলবালাকে আবার দেখে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, শোনো বাছা, তোমার স্বামী যে জেল-খাটা আসামী তা অমরা জানতুমন না। তোমার ছেলে যে এক কথায় তা স্বীকার করেছে, লুকোবার চেষ্টা করেনি, তাতে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু ছেলের মুখে তার বাপের পাপের কথা আমি শুনতে চাই না। তুমিই বলো, কী করেছে তোমার স্বামী? চুরি, ডাকাতি?

পারুলবেলা কোনো উত্তর দিতে পারলো না। হঠাৎ কান্না এসে বুজিয়ে দিল তার কণ্ঠস্বর। কিন্তু অন্যের সামনে কাঁদাও তার স্বভাব নয়। সে মুখটা ফিরিয়ে নিল একপাশে, তার শরীর কাঁপতে লাগলো।

॥ ২৯ ॥

প্রীতিলতার হাঁপানির টান বেড়েছে, ঘুমের ওষুধ খেয়েও রাত্তিরে তাঁর ঘুম আসছে না। অধ্যাপক অসমঞ্জ রায়ও রাত জেগে পড়াশুনো করছেন। ছেলেমেয়েরা অন্য ঘরে শোয়, অনেক রাত, এখন তারা কেউ জেগে নেই। মস্ত বড় পালঙ্কটার এক কোণে কুঁকড়ে রয়েছে প্রীতিলতার ছোট্ট শরীরটা, তাঁর পাশে বিরাট শূণ্যতা!

শোওয়ার ঘরে একটা ছোট-টেবিল রয়েছে। প্রীতিলতার যাতে চোখে আলো না পড়ে সেই জন্য একটা টেবল ল্যাম্প জ্বেলে নিয়েছেন অসমঞ্জ রায়। ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে এ বছর, সেই অনুযায়ী অসমঞ্জ রায়কেও তাঁর নোট বই পাল্টাতে হবে, সীজন শুরু হতে আর দেরি নেই, তাই তাঁকে রাত জেগে কাজ করতে হচ্ছে। প্রকাশক তাড়া দিচ্ছে রোজ।

লিখতে লিখতে একবার তিনি তাকালেন স্ত্রীর দিকে। সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে প্রীতিলতার বুকে। পৃথিবীতে এত বাতাস তবু প্রীতলতার নিঃশ্বাস নিতে এত কষ্ট। অনেক চিকিৎসা করেও কোনোই সুফল হয় নি, ইদানীং সাধু-ফকিরদের শেকড়-বাকড়ের পরীক্ষা চলছে।

প্রীতিলতার গলা দিয়ে একটা কান্নার মতন শব্দ হতেই অসমঞ্জ রায় উঠে এসে দাঁড়ালেন মাথার কাছে। প্রীতিলতার চোখ দুটি বোজা, অল্প অল্প শীতেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অসমঞ্জ রায় ভাবলেন, প্রীতি বোধহয় স্বপ্ন দেখেছে।

একটুক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। যেন অনেকদিন পর নিজেকে স্ত্রীকে দেখছেন। শুকিয়ে কতটুকু হয়ে গেছে শরীরটা, যেন চেনাই যায় না। বিয়ের সময় যারা প্রীতিলতাকে দেখেছে...যেমন স্বাস্থ্য, তেমনই প্রাণ-প্রাচুর্য...অসমঞ্জ রায়ের চোখেও সেই ছবিটাই লেগে আছে, তিনি প্রীতিকে সেইভাবেই মনে রাখতে চান। হঠাৎ তিনি গভীর মমতাবোধ করলেন স্ত্রীর জন্য। তিনি তাঁর ডান হাতটা আস্তে আস্তে রাখলেন প্রীতির কপালে।

প্রীতিলতা চোখ তুলে তাকাতেই তিনি নরমভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কষ্ট হচ্ছে, প্রীতি, কোনো ওষুধ দেবো?

প্রীতিলতা নিঃশব্দে নাড়লেন দু'দিকে।

হাঁপানির চিকিৎসা বড় বড় ডাক্তাররাই করতে পারে না, স্বামীর হাতের ছোঁয়ায় আর কী এমন উপকার হবে! তবু কাজ অসমাপ্ত রেখে অসমঞ্জ রায় বিছানার ধার ঘেঁষে বসলেন। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে সারাদিনে প্রীতির সঙ্গে ভালো করে একটা দুটো কথা বলারও সময় পাওয়া যায় না। অথচ প্রীতিলতার সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকেই অসমঞ্জ রায়ের সৌভাগ্য ফিরেছে। আগে তিনি ছিলেন শহরতলীর কলেজের সামান্য একজন লেকচারার, প্রীর ববাই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সুযোগ করে দেন। প্রীতির বাবা ছিলেন কন্ট্রোলার। নোট বই-এর প্রথম প্রকাশকের সঙ্গেও যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই। তাছাড়া, প্রীতির কাছ থেকে পেয়েছেন সব ব্যাপারে উৎসাহ।

-ঘুম আসছে না? তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো, প্রীতি?
প্রীতিলতা কোনো কথা না বলে স্থির ভাবে চেয়ে রইলেন।

একটু বাদে দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে চোখ গেল, অসমঞ্জ রায় ভাবলেন, বারো মিনিট বসা হয়েছে, এবারে বোধহয় উঠে পড়া যায়। কত কাজ, আজ রাত্তিরের মধ্যে একটা পীস শেষ করতেই হবে। তিনি প্রীতির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

তিনি ওঠবার আগেই প্রীতি হাত তুলে তাঁর হাত থামিয়ে দিয়ে অস্ফুট ভাবে বললেন, এবারে তুমি শুয়ে পড়ো!

অসমঞ্জ রায় ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললেন, ওরে বাবা, খাটতে খাটতে কাঁধ ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। দেখি যদি আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শেষ করা যায়!

প্রীতিলতা আস্তে আস্তে বললেন, আমি যদি তুমি হতাম, তা হলে বোধহয় এই রকমই করতাম।

অসমঞ্জ রায় কথাটা ঠিক শুনতে বা বুঝতে পারলেন না। টান বেশি বাড়লে প্রীতির গলার আওয়াজটা ফ্যাসফেসে হয়ে যায়। একটা কীরকম যেন মেশিন চলার মতন শব্দ বেরোয়। তিনি মাথাটা ঝুঁকির প্রীতির মুখের কাছে এন জিজ্ঞেস করলেন, কী বললে?

প্রীতিলতা ঠিক ঐ কথাটাই বললেন আবার। এবারে অসমাঞ্জ রায় শুনতে পেলেও বুঝতে পারলেন না। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। কিন্তু কৌতুকের হাসি ফুটে উঠলো প্রীতিলতার ঠোঁটে।

-তুমি কী বললে? এই রকম মানের কী রকম?

-আমি তোমার মতন একজন ব্যস্ত পুরুষ মানুষ হলে অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন না।

অসমঞ্জ রায় সঙ্গে সঙ্গে তীব্রভাবে আহত বোধ করলেন। আজই তিনি জরুরি কাজের মাঝখানে উঠে এসে প্রীতির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, প্রীতিকে একটু সেবা করতে চাইলেন, আর আজই প্রীতির মুখে এই কথা? প্রীতি না ডাকতেই তো তিন এসেছিলেন।

অভিমানের সঙ্গে তিনি বললেন, আমি বুঝি তোমায় খুক অযত্ন ক..? আমাকে নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বটে..

প্রীতিলতা তাঁর স্বামীর বাহু ছুঁয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, না, না, তুমি আর কী করবে? তুমি তো যথেষ্ট করেছো। আমি পুরুষ মানুষ মানুষ হলে বোধহয় এতটাও পারতাম না।

-এখন আর কথা বলো না। ঘুমোও। কথা বললে তোমার কষ্ট হবে।

-কথা না বললেও আমার একইরকম কষ্ট হয়।

-আমি তো তোমার চিকিৎসার কোনোরকম ত্রুটি করিনি!

-তা তো জানিই। আমার এ রোগ সারবে না। বোধহয় কোনো পাপ-টাপ করেছিলাম।

-ধ্যাৎ! ওসব বাজে কথা। একেবারে না সারলেও যদি খুব নিয়মে থাকো তাহলে কষ্টা কম হবে। ঘুমই হচ্ছে এই রোগের অসল ওষুধ!

অসমঞ্জ রায় দাঁড়াতেই প্রীলিলতা কাতরভাবে বললেন, এই, শোনো! আর একটুখানি বসবে। তোমার কাজের খুব ক্ষতি হবে?

অসমঞ্জ রায় আবার বসে পড়ে, মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, ক্ষতি আবার কী, আজ না হয় কাল হবে। জগৎ হারামজাদা বড্ড তাড়া দিচ্ছে।

কথা থামিয়ে তিনি ঝুঁকে পড়ে অনেকদিন বাদে প্রীতিলতাকে একটা চুম্বন দিলেন। প্রীতিলতার ঠোঁট ঠান্ডা। তাতেও নিরস্ত না হয়ে অসমঞ্জ রায় প্রীতিলতার বুকে এক হাত রেখে আর এক হাতে ব্লাউজের বোতাম খুলতে গেলেন। তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে কালি লেগে আছে। এই অবস্থাতেও তাঁর খেয়াল হলো যে তার পেনটা লিক করছে। ওটা বদলাতে হবে। নতুন দেশি ফাউন্টেন পেন উঠেছে, একেবারে অপদার্থ!

প্রীতিলতা বললেন, আজ শুয়ে শুয়ে যতসব অদ্ভুত কথা ভাবছিলাম। ধরো, আমি যদি পুরুষ মানুষ হতাম, আর তুমি একটা হাঁপানির রুগী, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিনই বিছানায় শুয়ে থাকো আর ঘ্যান ঘ্যান করো, তা হলে আমি তোমায় শুধু মিষ্টি কথা বলে সান্ত্বনা দিয়ে তারপর অন্য মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতাম। অন্য কোনো মেয়েকে বেশি কাছে পেতে চাইতাম!

অসমঞ্জ রায়ের যথেষ্ট ব্যাক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও এই সময় বিবর্ণ হয়ে গেল তাঁর মুখ। একটু আগে ছিল অভিমান, এখন জ্বলে উঠলো রাগ। প্রীতি এমন ঘরিয়ে কথা বলতে শিখলো কবে থেকে? টিরানি অব দা উইক! দুর্বলের নিষ্ঠুর অত্যাচার। মেয়েরা অতি দুর্বল হলেও জহ্লাদিনী হতে পারে। প্রীতি জান যে অসমঞ্জ রায় এখন বেশি রেগে তাকে কঠোর কথা বলতে পারবেন না, হঠাৎ একটা থাপ্পড় কষাতে পারবে না!

-আমি বুঝি অন্য মেয়েদের সঙ্গে...আমি কি তোমার জন্য যতদূর সাধ্য...

-না, না, না, তুমি সেরকম কিছু করেছো, তা বলছি না। কিন্তু আমি বোধহয় করতাম। তুমি ভালো, আমি অতটা ভালো নেই!

-প্রীতি, তুমি ঠিক কী বলতে চাও, খুলে বলো তো! এইসব কথা কেন তোমার মনে আসছে?

-বলবো? না, থাক, আজ থাক!

-কেন, বলবে না কেন? যদি কিছু সত্যি সন্দেহ হয়ে থাকে তোমার তাহলে খুলে বলো।

-না, সন্দেহ আমার হয়নি। শুধু একটা ব্যাপার আমার মনে লেগেছে। তুমি চন্দ্রাকে

ওঃ, চন্দ্রা? তাই বলো!

অসমঞ্জ রায় কৃত্রিম ভাবে এমন জোরে হেসে উঠলেন যে পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা জেগে থাকলে শুনতে পেত! তখনো প্রীতিলতার ঘুমন্ত তাঁর হাত।

হাসতে হাসতে অসমঞ্জ রায় বললেন, চন্দ্রাকে নিয়ে তোমার সন্দেহ? ওকে তো আমি মাত্র কয়েকদিন ধরে চিনি, এখানো দু'মাসও হয়নি। ওরা একটা চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশান খুলেছে, তাতে জোর করে প্রেসিডেন্ট করেছে আমাকে। আমি হতে চাইনি, কিন্তু ওরা একবারে নাছোড়াবান্দা।

-চন্দ্রা মেয়েটি আমাদের বাড়িতে আসে, আমার সঙ্গে তা আলাপ করিয়ে দাওনি একাবারও।

-ও মেয়েটা তো পাগলের মতন। ঝড়ের বেগে আসে, হুড় হুড় করে কথা বলে যায়, নিজেই বেশি বলে, তারপর কাজের কথা শেষ হলেই চলে যায় সঙ্গে সঙ্গে!

-যারা কাজ করে, তারা বুঝি অন্য কথা বলে না? আমি তো একদিন জানতাম, বাড়িতে কোনো মেয়ে এলে তারা ভেতরে এসে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে।

-ঐ চন্দ্রা তো অন্যরকম। ঠিক বাঙালীদের মতন নয়। আপ-কান্ট্রিতে কোথায় নাকি ছিল, আমি ঠিক জানি না, মানে, বাঙালি আদপ কায়দা জানে না।

-চন্দ্রা সিগারেট খায়!

-সে আজকাল হাই সোসাইটির অনেকেই...মানে বাঙালীদের চেয়ে আবাঙালীরা আরও এক কাঠি এগিয়ে আছে। গত বছর বোম্বেতে যে কনফারেন্সে গেলুম, তাতে দেখি যে বেশ কয়েকজন মহিলা ফুক ফুক করে সিগারেট টানছে সবার সামনে। একজন তো আমাদের ভাইস চ্যান্সেলারের মুখের ওপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে...

প্রীতিলতা এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন স্বামীর দিকে। মনে হয় তিনি কিছু শুনছেন না। তাঁর মুখখানা লালচে হয়ে গেছে। একটা কাশির দমক চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। মাঝে মাঝে নিশ্বাস নিচ্ছেন হ্যাঁ করে। প্রীলিতলার স্বভাব অত্যন্ত নরম, পৃথিবীকে তিন খারাপ চোখে দেখেন না।

-চন্দ্রা মেয়েটি ভালো। তুমি ওর সঙ্গে মিশতে পারো।

কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন অসমঞ্জ রায়। আজ প্রীতির ব্যবহারের তিন শুধু আহত নন, বিস্মিতও হচ্ছেন যথেষ্ট। আজ কী ভর করেছে প্রীতির ওপর?

-ও, তোমার বুঝি নিজস্ব স্পাই আছে। তুমি এর মধ্যেই চন্দ্রা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছো?

-বাঃ, বাড়িতে একটা মেয়ে আসছে, তার সম্পর্কে কৌতূহল হবে না? শুনলাম তো, মেয়েটা গরিবদের জন্য সত্যিই অনেক কিছু করে!

-তা অবশ্য তুমি ঠিকই শুনেছো। ঐসব নিয়েই মেতে আছে। বিয়ের দু'বছর পরেই বিয়ে ভেঙে গেছে, বাচ্চাকাচ্চা কিছু হয় নি, কিন্তু আর পাঁচটা মেয়ের মতন ঘরে বন্দী না থেকে ও কাজ নিয়ে সব কিছু ভুলে থাকতে চায়।

প্রীতি মাথাটা একটু উঁচু করে সরল ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, যে-সব মেয়েরা সেবা করে, তারা কি সিগারেট খায়? হাত-কাটা ব্লাউজ পরে? ঠোঁটে লিপস্টিক মাখে?

অসমঞ্জ রায় কপাল কোঁচ করে বললেন, ওসব তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবো? চন্দ্রার সঙ্গে আমার অত্যন্ত ফর্মাল সম্পর্ক, শুধু কাজের কথা হয়, আমাকে দিয়ে ফাইলপত্তর সই করাতে আসে। তবে যারা দেশের কাজ করবে তাদের যে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকতে হবে, তারই বা কী মানে আছে! বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ছবি দেখো নি? নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা, তাকে আমি একবার সামনাসামনি দেখেছি, সে অবশ্য লিপিস্টিক মাখে না, কিন্তু শাড়ীটা...

-তোমাকে চন্দ্রাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করলো কেন? তোমার সঙ্গে আগে থেকে চেনা ছিল?

-আমি আগে চন্দ্রাকে দেখিইনি কোনোদিন! ওরা নিজেরাই এসে বললো...আমি রেড ক্রসের সঙ্গে যুক্ত আছি বলেই বোধহয়...তাছাড়া আমি দাঙ্গার সময় রিলিফের অনেক কাজ করেছি।

-অমি চন্দ্রাকে একটা চিঠি লিখবো ভাবছি।

অসমঞ্জ রায়ের মাথায় আচমকা যেন একটা কোনো ভারি বস্তুর আঘাত লাগলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য দিশেহারা হয়ে গেলেন। রোগা, দুর্বল, অসহায় প্রীতিলতা আজ এ সাঙ্ঘাতিক খেলা শুরু করেছে?

-তুমি চন্দ্রাকে চিঠি লিখবে? কেন? প্রীতি, তোমার মাথায় কী ঢুকেছে বলো তো ঘটনাটা শুনলে চন্দ্রার মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়! তোমার সম্পর্কে ওর ভক্তি বাড়বে, না কমবে!

-আজকের ঘটনা? তার মনে! কোন ঘটনা?

-তুমি পারুলের ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলে। পারুলকেও চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে এককথায়। ছেলেটা পড়াশুনা করতে চেয়েছিল।

-আঃ, তোমাকে তো তখন বললুম, এ ছেলেটার বাপটা একটা খুনী! হারীত মণ্ডলের কেসটা আমিও কাগজে পড়েছি। এখন জেলে আছে। তোমাকে ওরা সে কথা আগে জানিয়েছিল?

-বাপ খুনী হলে ছেলে বুঝি আর লেখাপড়া করতে পারবে না? সেরকম নিয়ম আছে কোনো? তোমাদেরই ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ে তাদের সবারই বাবা কে কী করে না করে তোমরা যাচাই করে নাও?

-তুমি বড্ড অবুঝের মতন কথা বলছো, প্রীতি! শুধু সে জন্য নয়। ঐ হারীত মন্ডল কাকে খুন করেছে জানো? আমাদের সমুর খুড় শ্বশুরকে!

-সমুর খুড় শ্বশুর?

-আমার মামাতো, ভাই সমু বরানগরে সরকার বাড়ির মেয়ে বিয়ে করেছে তুমি জানো না? সমুর বউ ফুলটুসীর আপন কাকা অসিতবরণ সরকার খুন হয়েছেন তাঁদের কাশীপুরের বাগানবাড়িতে। তাই নিয়ে কত কাণ্ড হলো।

প্রীতিলতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ফেরালেন। কী যেন চিন্তা করলেন একটু। তারপর আপন মনে বললেন, খুনীর ছেলে! কী জানি! আমার তো বেশ পছন্দ হয়েছিল ছেলেটিকে..সমুর শ্বশুরবাড়িতে কী হয়েছে না হয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? আমার কী সাতজন্মে সে বাড়িতে যাই?

-এ তুমি অদ্ভুত কথা বলছো, প্রীতি। সমুর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, আমার নিজের মামার সঙ্গে তো সম্পর্ক রাখতে হবে! মামার কুটুমকে যে খুন করেছে...

অসমঞ্জ রায় ঝপ করে উঠে দাঁড়ালেন। রাগে তাঁর মুখ গনগন করছে। এনাফ ইজ এনাফ! এবারে তাঁকে স্বামী হিসেবে, সংসারের অধিপতি হিসেবে চরম অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করতে গেলে কখনো শেষ হয় না।

টেবিলের কাছে এসে তিনি গম্ভীরগলায় বললেন, কোনো খুনীর বউকে আমি বাড়িতে স্থান দিতে পারবো না, এই আমার শেষ কথা! রিফিউজিদের মধ্যে কত ক্রিমিনাল তৈরি হচ্ছে তুমি জানো না! রিফিউজি বলেই যে দয়ায় গলে গিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে, সেটা একটা ইডিয়েটিক ধারণা!

প্রীতিলতা তবু মিনমিন করে বললেন, আমাকে না জিজ্ঞেস করেই তুমি পারুলকে ছাড়িয়ে দিলে, আমার ছেলেমেয়েদের এখন কে দেখবে?

-কালই আমি অন্য আয়া জোগাড় করে আনবো। এখন ঘুমোও, কিংবা চুপ করে থাকো। আমাকে কাজ করতে দাও!

সিগারেট ধরিয়ে অসমঞ্জ রায় কলম হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু মাথা গরম হয়ে গেছে, লেখা আসবে না। এক দৃষ্টে তিনি তাকিয়ে আছেন কাগজের দিকে। প্রীতির বাবার সঙ্গে কালই দেখা করতে হবে। এক দৃষ্টে তিনি তাকিয়ে আছেন অসমঞ্জ রায় তাঁকে সব কিছু বুঝিয়ে বলবেন। প্রীতির বাবাকে তিনি এখনো ভয় পান। প্রীতির বাবা একবার বলেছিলেন, প্রীতিকে নিয়ে পুরী কিংবা গোপালপুর যেতে। প্রীতির ভাই-বোনেরা যদি কেউ নিয়ে যায়, অসমঞ্জ রায় সব খরচ দিতে রাজি আছেন।

দেওয়াল-ঘড়ির শব্দতেই শুধু টের পাওয়া যাচ্ছে রাত্রির নিস্তব্ধতা। এই লেখা আজ আর শেষ হবে না। মুখ ফিরিয়ে তিনি একবার দেখলেন প্রীতিলতাকে। চোখ বোজা থাকলেও ঘুমোয় নি, বোঝা যায়। বাতাসের তরঙ্গে টের পাওয়া যায়। শয্যাশায়িনী হলেও সব ব্যাপারে প্রীতির স্পষ্ট রাখবো না। ওদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পোষ্ট থেকে আমি রেজিগনেশান দেবো। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর অত সময় বা উৎসাহও আমার নেই!

প্রীতি কোনো সাড়া শব্দ করলেন না।

সে রাতে ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেললেও পরদিনই অসমঞ্জ রায় মত বদল করলেন। চন্দ্রার সঙ্গে তাঁর বাইরে যাবার কথা আছে। সেই কথা রাখতেই হবে।

চন্দ্রাদের বাড়ির নিজস্ব গাড়ি আছে। সেই গাড়িতেই যাওয়া হলো ধুবুলিয়ার দিকে। সামনে ড্রাইভার, পেছনে শুধু চন্দ্রা আর অসমঞ্জ রায়। চন্দ্রার পরনে আজ একটা নীল-ডুরে তাঁতের শাড়ি, চোখে সানগ্লাস। গাড়িতে ওঠার পর থেকেই অসমঞ্জ রায়ের বুক ধক ধক করছে। পঁয়তাল্লিশ বছরে অভিজ্ঞ পুরুষ তিনি, কিন্তু এরকম আগে কখনো হয়নি চন্দ্রার শরীরটি যেন আয়স্কান্ত মণি দিয়ে গড়া। চন্দ্রার মুখের দিকে তিনি চোখ ফেরাতে পারছেন না। কপালে যা থাকে থাক, চন্দ্রার কাছ থেকে তিনি

কিছুতেই দূরে সরে যেতে পারবেন না।

চন্দ্রা আজ প্রায় কোনো কথাই বলছে না। মুখখানি রেখাহীন। অসমঞ্জ রায়ের প্রশ্নে শুধু হুঁ না করে যাচ্ছে। চন্দ্রা একবার একটা সিগারেট প্যাকেট বার করতেই অসমঞ্জ দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে চন্দ্রার গাল ছুঁয়ে দিলেন ইচ্ছে করে। তারপর উঠতি যুবার মতন কাঁপা গলায় বললেন, চন্দ্রা, আজকের দিনটা কী সুন্দর!

চন্দ্রা মুখটা একটু সরিয়ে নিয়ে পাশ ফিরে বললো, মিঃ রায়, আপনাকে একটা কথা বলবো বলবো করছিলুম। আপনার স্ত্রী আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

অসমঞ্জ রায় সেই মুহূর্তে এমনই অসহায় হয়ে গেলেন যে কোনো কথাই বলতে পারলেন না।

চন্দ্রা আবার বললো, তিনি কী লিখেছেন, আপনি জানেন নিশ্চয়ই! আমি কাশীপুর কলোনিতে গিয়ে ছেলেটিকে খুঁজে বার করেছি। হি ইজ এ এ ব্রিলিয়েন্ট বয়। আপনি তাকে কোনো সাহায্য না করে তাড়িয়ে দিলেন কী করে? আপনি আপনার স্ত্রীর কোনো মতামতেরও মূল্য দেন না? আই এগ্রি উইথ হার যে আপনি এটা খুব অন্যায় কাজ করেছেন।

-কিন্তু চন্দ্রা, তুমি . জানো না, ঐ ছেলেটার বাবা একজন খুনী!

-হ্যাঁ জানি। সব শুনেছি! তাতে কী হয়েছে। খুন করেছে, বেশ করেছে! ওরা অসহায়, ওদের কেউ জায়গা দেবে না, ওরা জোর করে কেড়ে নেবে, এটাই স্বাভাবিক! এরকম অরও অনেক খুন করতে হবে, আগুন জ্বালাতে হবে! বাগানবাড়ি জবর দখল করা কোনো অপরাধ? অন্য দেশ হলে ঐ হারীত মণ্ডল বীরে সম্মান পেত!

চোখ থেকে রোদ-চশমা খুলে চন্দ্রা তীব্র চোখে তাকালো অসমঞ্জ রায়ের দিকে।

॥ ৩০ ॥

ট্রেনে আসবার সময়েই প্রতাপেরে ক্ষোভ-উষ্মা অনেকটা কমে গেছে, আস্তে আস্তে জেগে উঠেছে লজ্জা ও আত্ম-ধিক্কার। কিছু না জানিয়ে ভোর বেলা গত ত্যাগ করাটা তার পক্ষে খুবই ছেলেমানুষীর কাজ হয়েছে, এটা তাঁকে মানায় না। বুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্যর মতন তাঁর মনে তো সংসার সম্পর্কে মায়া-জ্ঞান জন্মায়নি। প্রতাপের মনে একছিটেও ধর্মভাব বা অধ্যাত্ম আকর্ষণ নেই, বরং যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে অহংকার আছে। কিন্তু বউয়ের ওপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে পালানোটা কোন্ যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায়?

প্রতাপ একবার ভেবেছিলেন বর্ধমানে নেমে পড়ে বাড়ি ফিরে যাবেন। আদালতে দু'দিন ছুটি আছে, সেদিনকে অসুবিধে নেইইফরতে ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে, মমতাকে কারণটা ব্যাখ্যা করতে হবে। কী বলবেন মমতাকে? তার উত্তর খুজতে খুঁতে বর্ধমান পেরিয়ে গেল।

সব মানুষের মধ্যেই একটি একচক্ষু হরিণ আছে। জীবনে মাঝে মাঝে এমন এক একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন সেদিকে কানা চোখটি ফিরিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। প্রতাপ নিজেকে বোঝালেন যে মাকে যখন দেখার ইচ্ছে হয়েছে, তখন দু'এক দিনের জন্য দেওঘর ঘুরে আসাটাই যুক্তিসংগত। খবর না পেয়ে মমতা দুশ্চিন্তা করবে, তা করুক, বুঝুক যে প্রতাপ না থাকলে সংসারের কী অবস্থা হয়!

কিন্তু প্রতাপ অনেকদিন বাদে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন অথচ সঙ্গে কোনো জিনিসপত্র নেই, এরই বা কী ব্যখ্যা দেবেন? প্রত্যেকবার দেওঘরে যাওয়ার সময় প্রতাপ অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কাপড়-চোপড়, কলকাতার দই, আমের আচার, হিং-এর বড়ি কাসুন্দি ইত্যাদি নিয়ে যান। স্টেশন থেকে কিছু কিনে নেবেন? ফেরার ভাড়া বিশ্বনাথের কাছ থেকে চাইতে হবে। প্রতাপ একবার ভাবলেন, কয়েকটা সোডার বোতল কিনে নিয়ে যাবেন, মা সোডা খেতে ভালোবাসেন। কিন্তু হাতে আর কিছু নেই। বেডিং না, সুটকেস না, শুধু কয়েকটা সোডার বোতল, এই অবস্থায় দেওঘরে উপস্থিত হওয়া, দৃশ্যটা ভাবতে প্রতাপের নিজেরই হাসি পেয়ে গেল। ওস্তাদজী খুব ক্ষেপাবেন এই জন্য!

সারা রাস্তা প্রতাপ শুধু চা খেয়ে কাটালেন।

দেওঘরে এসে পৌঁছোলেন সন্ধের পর, সুহাসিনী ধাম তখন নিঝুম। বাড়িতে কেউ নেই। বিশ্বনাথ গুহ গেছেন গানের টিউশানি করতে। ভজন সিং জানালো যে মাইজীরা সব গেছেন সৎসঙ্গের আশ্রমে গান শুনতে। প্রতাপ এক হিসেবে খুশীই হলেন। তাঁর অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা দেবার ব্যাপারটা যত দেরিতে হয় ততই যেন সুবিধের।

বারান্দায় বসে তিনি ভজন সিং-এর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

সম্প্রতি সুহাসিনী ধামে কিছু মেরামতের কাজ হয়েছে, সামনের ভাঙা গেইটি বদলে গেছে,

বাগানটির শ্রী ফিরেছে। তাতে খানিকটা বিস্মিত বোধ করলেন প্রতাপ। মায়ের জন্য মাসে মাসে পঁচাত্তর টাকা করে পাঠান প্রতাপ, তবু তাঁর আশঙ্কা ছিল গানের ইস্কুল চালিয়ে বিশ্বনাথ গুহর যা সামান্য রোজগার, তাতে তিনি এ সংসার বেশিদিন চালাতে পারবেন না। কিন্তু চলছে তো ঠিকই। বাড়ি মেরামত হওয়া মানে সচ্ছলতার লক্ষণ। ওস্তাদজী তো তা হলে বেশ তালেবর মানুষ।

গেটের সামনে একটা টাঙ্গা এসে থামলো। প্রতাপ ভাবলেন, মা ফিরে এসেছেন। মাকে দেখে প্রথম কী কথাটা বলবেন তা প্রতাপ এখানো ঠিক করতে পারেননি। 'মা, হঠাৎ তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হলো, তাই ছুটে এলাম?' এ রকম আবেগময় বাক্য প্রতাপের চরিত্রে একেবারে মানায় না। "মা, স্বপ্ন দেখলাম, তুমি খুব অসুস্থ, তাই দেখতে এলাম তোমাকে?' মিথ্যে কথা প্রতাপের মুখে একবারেই আসে না। তার চেয়ে মুচকি হেসে "হঠাৎ এসে পড়লাম" বলাই অনেক ভালো। মা তো প্রতাপকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেনই, বেশি কিছু জানতে চাইবেন না।

গেটটা খোলাই ছিল, আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে এলেন একজন মহিলা সঙ্গে একটি বালক। কাছাকাছি আসতেই প্রতাপের বুকটা ধক করে উঠলো। বুলা! প্রতাপ যেন সহসা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। বুলা এখানো দেওঘরে? আবার এসেছে?

এ যেন অবিশ্বাস্য এক কাহিনীর মতন। প্রতাপের দেওঘরে আসার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না এসময়ে, হঠাৎ এসে পড়েছেন, বাড়িতে কেউ নেই, প্রথমেই দেখা হলো বুলার সঙ্গে?

বুলাকে দেখে প্রতাপ পুলকিত হলেন না, রোমাঞ্চ বোধ করলেন না। বরং যেন ভয় ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সর্বাঙ্গে। হ্যাঁ, ভয় ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যায়। ভয় এবং অপরাধবোধ একদিন না একদিন মমতা এই ঘটনা ঠিকই জানতে পারবেন। বুলা সম্পর্কে মমতার মনে একটা ঈর্ষার কাঁটা গভীর ভাবে বিঁধে আছে। অকারণ ঈর্ষা। এই ঘটনা শুনলে মমতা নিশ্চিত ভাববেন যে বুলার জন্যই প্রতাপ হঠাৎ কলকাতা থেকে ছুটে এসেছেন দেওঘরে। নির্জন বাড়িতে বুলার সঙ্গে সময়-যাপন।

তেজস্বী পুরুষ হিসেবে পরিচিত প্রতাপ মজুমদার যেন কুঁকড়ে খানিকটা ছোট হয়ে গেলেন সেই মুহূর্তে।

বুলার হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, এ বাড়িতে সে প্রায়ই আসে। যখন তখন। বুলা পরে আছে একটা নীল রঙের শাড়ি তার চোখে এখন চশমা, হাতে একটা ছোট্ট মাটির হাঁড়ি। প্রতাপকে বিশ্বনাথ হিসেবে ধরে নিয়ে বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বুলা বললো, ওস্তাদজী, সারা বাড়ি এত চুপচাপ কেন? ভজন সিং! সামনের আলো জ্বালোনি?

প্রতাপ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

ভজন সিং উত্তর দিল, কলকত্তাসে বড় দাদাবাবু এসেছেন!

আগেরবার বুলা তাঁর সঙ্গে একটাও কথা বলেননি, সে কথা প্রতাপ ভুলবেন কী করে? তিনি নিজে থেকে আর বুলাকে কিছু বলবেন না। বুলার জীবনে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। এইটাই সত্য। প্রতাপ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধরালেন।

মাটির হাঁড়িটা ভজন সিং-এর হাতে দিয়ে বুলা বললো, এটা ভেতরে রাখো। মাইজী কোথায়? নেই? তুমি আলো জ্বেলে দাও।

প্রতাপ মনে মনে ভাবলেন, বুলা তাঁর মায়ের জন্য মিষ্টি-ফিষ্টি কিছু একটা নিয়ে এসেছে। মা নেই জেনে সে এখন অনায়াসে ফিরে যেতে পারে। তাঁর কিছু বলার নেই।

ভজন সিং হাঁড়িটা নিয়ে ভেতরে চলে যাবার পরেও বুলা স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ। তারপর খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো, প্রতাপদা?

সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের মনে পড়লো, এই বাড়িতে অনেকদিন পর প্রথম বুলার সঙ্গে দেখা হলে তিনিও ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলেন বুলাকে। বুলা কোনো উত্তর দেয়নি।

প্রতাপও কোনো উত্তর না দিয়ে চোখ তুলে তাকালেন বুলার দিকে। অনেকদিন পর চার চক্ষের সোজাসুজি মিলন হলো।

বুলা আবার বললো, তোমার আসার কথা ছিল আজ, কিছু শুনিনি তো?

প্রতাপ বললেন, জানলে তুমি এই সময় নিশ্চয়ই আসতে না এ বাড়িতে। তুমি আমাকে সহ্য করতে পারো না, আমি জানি!

একটু কড়া ভাবে এই কথাগুলি বলে ফেলে প্রতাপ নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। কোনো প্রস্তুতি ছিল না। যেন তাঁর ওষ্ঠ দিয়ে এই কথা অন্য কেউ বলালো। এখন আর ফেরানো যায় না।

কথাগুলি শুনে বুলা চমকে গেল না, আহত হলো না, হাসলো। একটু সরে গিয়ে বারান্দায় রেলিং-

এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ ট্রেনে এলে?

আগেরবারের তুলনায় বুলার ব্যবহার অনেক সহজ। তার কারণ কি, বাড়িতে আর কেউ নেই বলে? প্রতাপের এখনো মনে হচ্ছে, বুলা চলে গেলেই ভালো হয়। ওস্তাদজী এসে পড়লে এই প্রসঙ্গ নিয়ে পরে কত কী রসিকতা করবেন তার ঠিক নেই। মমতার কানে পৌঁওছোবেই। অকারণ জটিলতা।

প্রতাপ এটাও বুঝলেন যে একটি নারীর প্রশ্নের উত্তরে চুপ করে বসে থাকা যায় না। মেয়েরা এরকম পারে। পুরুষরা পারে না। যদিও অনেক প্রশ্ন, অনেক উত্তরই অর্থহীন। তুমি কেমন আছো? এই পশ্নের কি কোনো উত্তর দেওয়া যায় এক কথা? এখানে মাত্র দুটো-তিনটে ট্রেনই আসে, প্রতাপ কোন ট্রেনে এসেছেন তা অবান্তর। তিন বুলার সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি করতে চাইলেন। যেন এই দেওঘরে দেখার আগে বুলার পূর্ব পরিচয় কিছু নেই। প্রবাসে সদ্য চেনা এক মহিলা, তার সঙ্গে টুককটাকা মামুলি দু'চারটে কথা তো সহজ ভাবে বলা যেতে পারে অনায়াসেই।

প্রতাপ বললেন, তুমি দেওঘরেই থাকো নাকি?

বুলা বললো, হ্যাঁ। তুমি যে গত এপ্রিল মাসে এখানে এসেছিলে, তখনও অমি ছিলাম এখানে।

এপ্রিল মাসে বিশ্বনাথ গুহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে প্রতাপ এসেছিলেন মাত্র দু'দিনের জন্য। অতি ব্যস্ততায় সময় কেটে গেছে। বুলার প্রসঙ্গ তখন এ বাড়িতে কেউ তোলেনি। বুলা জানতো প্রতাপের আসার খবর? ইচ্ছে করেই সে ঐ দু'দিন আসেনি এ বাড়িতে?

-তুমি কি এখানেই থেকে যাবে?

বুলার সঙ্গে যে ভৃত্যটি এসেছে তার দিকে ফিরে বুলা বললো, এই, তুই টাঙ্গায় বোস, দ্যাখ, ও আবার চলে না যায়। আমি এক্ষুনি আসছি!

তারপর প্রতাপের দিকে ফিরে বললো, তুমি ট্রেন জার্নি করে এসেছো, খাওয়-দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই। আমি প্যাঁড়া এনেছি, তার থেকে খাবে দুটো? খেয়ে দ্যাখো, খুব বেশি মিষ্টি নয়। জিভের স্বাদ যাবে না!

এই যে খুব বেশি মিষ্টি নয় বললো, এর মধ্যেই ঝলসে উঠলো পূর্ব পরিচয়ের স্মৃতি। প্রতাপ যে মিষ্টি পছন্দ করেন না বুলা তা মনে রেখেছে। কত কাল আগেকার কথা। সেই দায়দকান্দিতে, বুলার মা প্রতাপকে লেডিকেনি খাওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করেছিলেন, প্রতাপ একটার বেশি খাননি, হাত নেড়ে নেড়ে বলেছিলেন, বেশি মিষ্টি আমি খেতে পারি না, মিষ্টি খেলে আমার জিভ অসাড় হয়ে যায়!

প্রতাপ বললেন পরে খাবো, এখন আমার খিদে নেই।

-তুমি আমাকে একাবার বসতেও বললে না, প্রতাপদা?

এর মধ্যে কী এমন ঘটেছে যার জন্য বুলার এতখানি পরিবর্তন? শুধু সহজ, সাবলীল নয়, বুলা যেন খানিকটা প্রগলভা হয়ে উঠেছে আজ। তার ঠোঁটে চাপা হাসি।

প্রতাপের পাশে আর একটি বেতের চেয়ার। সেটাকে খানিকটা দূরে ঠেলে দিয়ে তিনি বললেন, বসো!

-নাঃ, আমি এখন যাই!

-বসো!

বুলা সে কথা শুনলো না। সিঁড়ি নেমে গিয়ে ঘুরে তাকিয়ে বললো, তোমার মা আমায় খুব ভালোবাসেন...মাসিমার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে...

আর একটুখানি এগিয়ে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে সে বললো, বৌদি, তোমার ছেলেমেয়েরা সবাই ভালো আছে নিশ্চয়ই! আমি যাই।

প্রতাপ বুলার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমে তিনি চাইছিলেন, বুলা তাড়াতাড়ি চলে গেলেই ভালো হয়। তারপর তিন যখন বুলাকে বসতে বললেন, তখন বুলা তাড়াতাড়ি চলে গেলেই ভালো হয়। তারপর তিনি যখন বুলাকে বসতে বললেন, তখন বুলা সে কথা শুনলো না।

বুলার টাঙ্গার আওয়াজটা মিলিয়ে যাবার পর একটা অদ্ভুত কঠিন নিস্তব্ধতা প্রতাপকে আঘাত করতে লাগলো। প্রতাপ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তিনি যেন আর একটুক্ষণও এখানে বসে থাকতে পারবেন না। এক্ষুণি স্টেশানে গিয়ে একটা ফেরার ট্রেন ধরলে কেমন হয়?

প্রতাপ উঠে দাঁড়াবার পর খেয়াল করলেন, তাঁর কাছে যথেষ্ট পয়সা নেই। পয়সা থাকলেই বা কী হতো, এই ভাবে এসে আবার চলে যাওয়া, এ তো প্রায় পাগলামির লক্ষণ। কিংবা, যে কেউ

শুনলেই ভাববে, তিনি যেন শুধু বুলার সঙ্গে দেখা করার জন্যই এসেছিলেন। নিভৃতে বুলার সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে তা কেউ জানবে না।

নিজে থেকেই কথা বলা শুরু করে আবার হঠাৎ কেন চলে গেল বুলা? নাঃ এসব কিছুতেই বোঝা যাবে না।

একটু পরেই এসে পৌঁছোলেন বিশ্বনাথ। সাইকেল থেকে নেমেই তিনি গান ধরলেন, 'পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না, এ পৃথিবী ভালোবাসিতে জানে না, যেথা আছে শুধু ভালো বাসাবাসি, সেথা যেতে প্রাণ চায় না!'

প্রতাপ বারান্দা থেকে নেমে এসে ডাকলেন, ওস্তাদজী!

বিশ্বনাথ প্রতাপকে দেখে খুব যেন বিস্মিত হলেন না। গান থামিয়ে মুহূর্তে অপলক চেয়ে থেকে তারপর এক মুখ হেসে বললেন, এই যে, ব্রাদার! তোমাকেই খুব দরকার ছিল এখন। তুমি না এসে পড়লে আমিই দু'চারদিনের মধ্যে কলকাতায় যেতাম!

প্রতাপই অবাক হয়ে বললেন, কেন? কী ব্যাপার?

বিশ্বনাথ বললেন, তেমন কিছু নয়। পরে শুনবে। আরে এসব আছেই। সংসার করতে গেলে কত কী-ই না সহ্য করতে হয়। সেই যে গান আছে না, 'লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়! শুনবে গানটা? মিশ্র সাহানায় আছে।

বিশ্বনাথ আবার গান ধরতেই প্রতাপ বুঝতে পারলেন, ওস্তাদজী বেশ খানিকটা নেশা করে এসেছেন। বাড়ির বাইরে এখানে সেখানে বিশ্বনাথ মাঝে মাঝে মদ্য পান করেন, তা জানেন প্রতাপ। কিন্তু এখন তিনি এই অবস্থায় বাড়িতেও ফিরছেন? মা আছেন জেনেও!

গান শেষ করার পর ওস্তাদজী বললেন, এরা সব ফেরেনি এখনো? তুমি কতক্ষণ বাইরে বসে আছো?

প্রতাপ বললেন, তাতে অসুবিধে কিছু হয়নি।

-সবাই আশ্রমে গেছেন। পাবনার অনুকূল ঠাকুর এখানে মস্ত বড় আশ্রম করেছেন, তোমার মা তোমার বোনকে নিয়ে প্রায়ই যান সেখানে।

-আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? গানের টিউশানি করছেন সন্ধেবেলা?

বিশ্বনাথ অট্টহাসি করে উঠে বললেন, টিউশানি? না হে, তার চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার। কোর্ট সিঙ্গার হয়েছি! বিদূষকও বলতে পারো!

-তার মানে?

-জসিডিতে সেই যে মস্ত বড় গোলাপ বাগানওয়ালা বাড়িটি দেখেছিলেন গতবার, মনে আছে? সেটা ঘোষেদের বাড়ি। ঐ ঘোষরা জমিদার। তা সেই জমিদারবাবুর টি বি হলে কী হয়। জমিদার বলে কথা! রোজ পরিষদ নিয়ে সভা সাজিয়ে বসেন। দু'খানা মেয়েছেলে এনেছেন কলকাতার সোনাগাছি থেকে। তারা খ্যামটা নাচে, অমি গান গাই! নতুন নতুন গান শিখেছি। রসের গান। শুনবে?

-ছিঃ। ওস্তাদজী!

-আরে তুমি ছি ছি করলে কী হবে, পয়সা ভালো দেয়। মুড হলে হাত থেকে আংটি খুলে দেয়! এখন ব্যাটা বেশি দিন বাঁচলে হয়। যদি শিগগিরই টেঁসে যায় তা হলেই দুধের বদলে চোনা। হে-হে-হে!

হাতের চুরুটটা নিবে গেছে, তবু সেটাই মাঝে মাঝে ঠোঁটে দিয়ে টানছেন বিশ্বনাথ। এই ক'মাসেই তাঁর চুল-দাড়িতে পাক ধরেছে বেশ। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো।

ঝপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে তিনি বললেন, কী অদ্ভুত ব্যাপার দ্যাখো! বড় লোকদের হয় টি বি! ওটা তো ইস্কুলে মাস্টার আর ব্যর্থ প্রেমিকদের অসুখ ছিল এতদিন তাই না? এখন আমি এদকিকার বড় বড় বাড়িগুলোতে লোকজন এলেই খোঁজ নিই টি বি রুগী এসেছে কি না! এদিকে আমি দালাল লাগিয়ে রটিয়ে দিয়েছি যে গান-বাজনা শুনলে টি বি রোগের উপকার হয়। তাই শাঁসালো মক্কেল এলেই আমার ডাক পড়ে। অনেকেই দেখছি সঙ্গে করে বাজারের মেয়েছেলে আনে।

প্রতাপের দুই ভুরু যুক্ত হয়ে গেছে। খানিক আগের দুর্বল ভাবটা কেটে গেছে একেবারে। বিশ্বনাথ সম্পর্কে ও বয়েসে তাঁর থেকে বড় হলেও প্রতাপ ধমকের সুরে বললেন, এসব কী বলছেন, ওস্তাদজী? আপনি ...আপনার গানকে এত নিচে নামিয়ে এনছেন? আপনিই না বলেছিলেন যে আপনার গুরুজীর আদেশ আছে, আপনি গান কোনোদিন বিক্রি করবেন না? ছোট ছেলেমেয়েদের গান

শেখান...সে আলাদা কথা! কিন্তু বড়লোকদের বাড়িতে গিয়ে...সেখানে নষ্ট মেয়েমানুষেরা থাকে...সেখানে আপনি...আমি এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না!

বিশ্বনাথ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে প্রতাপের কথা শুনলেন। তারপর সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বসলেন, ধুর! ওসব কথা ছাড়ো!

প্রতাপ তবু চাপ দিয়ে বললেন, ওস্তাদজী, আপনি কেন এইসব বললেন আমাকে? সত্যিই এই রকম করছেন?

-সংসার চালাতে গেলে মানুষকে প্রয়োজনে ওটাং-এর মতন চার হাত-পায়ে ছুটতে হয়, হয় না?

-আপনি কী বলেছিলাম তা ধরে রাখলে চলে? আগেকার কত কিছু বদলে গেল না? কোথায় গেল তোমাদের মালখানগর? রূপকথা হয়ে গেছে, তাই না?

-তবু আমাদের অবস্থা এমন হয়নি যে এত নীচে নামতে হবে! নষ্ট মেয়ে মানুষরা নাচবে আর আপনি সেখানে গান গাইবেন? আপনার এই অধঃপতন আমি সহ্য করতে পারবো না। এই সন্ধ্যেবেলা আপনি নেশা করে এসেছেন..

পর পর দুটি হেঁচকি তুলে বিশ্বনাথ একটুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, তুমি যাদের নষ্ট মেয়েছেলে বললে, তাদের দু'একজনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, তাদের তুলে আনা হয়েছে রিফিউজি কলোনি থেকে। তারা যে-কারণে নষ্ট হয়েছে আমিও সেই কারণেই নষ্ট কিংবা ভ্রষ্ট যা-ই বলো। দারিদ্র্যের সবচেয়ে বড় দোষ কী জানো, দারিদ্র্যে মানুষের নৈতিক পরিক্রটাও পচে যায়। পভার্টি ডিজেনারেটস! ঐ নজরুল লিখেছেন, হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছো মহান।' ওটা অতি বেঠিক কথা! বাকোয়াস!

কথা শেষ করে বিশ্বনাথ উঠে গেলেন ভেতরে। বাথরুমে জল পড়ার শব্দ হতে লাগলো। প্রতাপ গুম হয়ে বসে রইলেন খানিক্ষণ। তাঁকেও এখন প্রায়ই অর্থ সংকটের কথা চিন্তা করতে হয়, তবু দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ তিনি সহ্য করতে পারেন না।

একটু পরে তাঁর বুলার কথা মনে ফিরে এলো। বুলা অনেক বদলে গেছে, সে যেন কিছু বলতে চেয়েছিল। তবু সে চলে গেল নিজে থেকে।

বুলা যে এসেছিল সে কথা কি বিশ্বনাথকে জানাবার প্রয়োজন আছে? অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা, এটার উল্লেখ না করলে কি তা মিথ্যে ভাষণের পর্যায়ে পড়ে? কিছু না বলাটা কী করে মিথ্যে হয়? বুলা নিশ্চয়ই পরে অবার দেখা করতে আসবে মায়ের সঙ্গে। কিন্তু ঐ প্যাঁড়ার হাঁড়িটা? প্রতাপ ছাড়া আর কেউ যখন ছিল না, তখন বুলা এসেছিল, এটা গোপন করা যাবে না। এটা গোপন করার মতন এমন কী-ই বা ব্যাপার?

সুহাসিনীরা ফিরলেন একটু পরেই। পায়ে হেঁটে প্রতাপ প্রথমেই সেটা লক্ষ করলেন। বুলা টাঙ্গাতে আসে যায়, টাঙ্গা দাঁড় করিয়ে রাখে, কিন্তু প্রতাপের পঁচাত্তর টাকা করে হাত খরচ পাঠান প্রতাপ, খুব একটা কম টাকা নয়, তাতে মায়ের কুলোয় না? টাকাটা আরও বাড়ানো দরকার?

প্রতাপকে দেখে বালিকার মতন দৌড়ে এলেন সুহাসিনী। ব্যাকুল ভাবে বলতে লাগলেন, ও খুকন, কখন এলি, কতক্ষণ বসে আছিস, এ রাম রাম, কেন আমি গ্যালাম আজ আশ্রমে, ইস রে ছেলেটা কত কষ্ট কইরা আইছে...

প্রতাপের মাথাটা সুহাসিনী চেপে ধরলেন বুকে। অন্য সময় প্রতাপ প্রবল অস্বস্তিতে মাথাটা সরিয়ে নেন সঙ্গে সঙ্গে, আজ নিলেন না। মায়ের বুকে যেন তিনি পেলেন বাল্যকালে সৌরভ, মালখানগরের সেই আম-জাম-নারকেল গাছের বাতাস বিধৌত বাড়িতে কৈশোর বয়েসের সব রকম সুখ। প্রতাপ ভাবলেন, ঐ বয়েসটায় যদি ফিরে যাওয়া যেত, যখন টাকা পয়সার চিন্তা থাকে না...দিদির গয়না...মমতার দুঃখ ...ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর চিন্তা..ওস্তাদজীর গান...মায়ের টাঙ্গার ভাড়া...। আঃ, যদি ফিরে যাওয়া যেত!

॥ ৩১ ॥

স্বাধীনতার কয়েক বছর পর ভারতের রাজ্যগুলির আলাদা সীমানা যখন নতুন করে নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হলো, তখন একটা চমকপ্রদ প্রস্তাব এলো দিল্লি থেকে। পশ্চিম বাংলা নামে খণ্ডিত রাজ্যটির আর সীমানা চিহ্নিত করার দরকার নেই, পশ্চিম বাংলাকে মিশিয়ে দেওয়া হোক বিহারের সঙ্গে।

এই অভিনব প্রস্তাবটি যারই উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত হোক, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এর সমর্থক, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ এর প্রবল প্রবক্তা এবং বাংলা ও বিহারের দুই মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ আহ্লাদের সঙ্গে এই প্রস্তাবে লুফে নিলেন। পশ্চিমবাংলা আর বিহার মিলামিশে গেলে কত সুবিধে:, দুটিতে মিলে একটি বেশ বড় আর শক্তিশালী রাজ্য হবে; বিহারে আছে খনিজ সম্পদ আর কাঁচামাল, পশ্চিম বাংলায় আছে কল-কারখানা আর বন্দর, একবারে রাজযোটক! তা ছাড়া পাকিস্তান থেকে অনবরত উদ্বাস্তুর স্রোত আসছে, পঞ্চাশের দশকে সেই স্রোত হঠাৎ বেড়ে গেল প্রতি মাসেই আসছে কুড়ি-পঁচিশ হাজার, সরকারি হিসেবে পঞ্চান্ন সালের মধ্যেই এদিকে চলে এসেছে ২৮ লক্ষেরও বেশি বাঙালি উদ্বাস্তু। এই বিপুল সংখ্যক অবাঞ্ছিত অতিথির গুরুভার পশ্চিবাংলা একা সামালাবে কি করে? বিহার-বাংলা এক হলে সেই রাজ্যে উদ্বাস্তুদের স্থান করে দেওয়া সহজ হবে।

পশ্চিম বাংলার মানুষ কিন্তু এই প্রস্তাব শুনে হতবাক হয়ে গেল। প্রথমে বিস্ময়, তারপর ক্ষোভ, তারপর ক্রোধ। শহরের রাস্তায় ট্রামে-বাসে, চায়ের চায়ের দোকানে সর্বত্র এক আলোচনা, বেঙ্গল-বিহার মার্জার! ক্রমে শহর ছাড়িয়ে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়লো এই ক্ষোভ আর ক্রোধ। বাঙালিরা ভাবলো, তাদের বাঙালীত্ব মুছে দেবার জন্য এ এক কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্র! বিহার আয়তনে বড়, সেখানকার জনসংখ্যাও পশ্চিম বাংলার চেয়ে বেশি, বিহারের সঙ্গে মিশে গেলে বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যাবে।

পাকিস্তানে যেমন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে, তেমনি ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিশবে চালাবার প্রয়াসও অব্যাহত। গোটা দক্ষিণ ভারত হিন্দিকে একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে মেন নেবার বিরোধী, উন্নাসিক বাঙালিরা নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এতই গর্বিত যে অন্য কোনো ভাষাকে তারা গ্রাহ্যই করে না। হিন্দিভাষী বিহারের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলে বাঙালিদের নাকটা ভোঁতা করা যাবে।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী হলেও এই সময়ে পথেঘাটে লোকে প্রকাশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগলো, পশ্চিম বাংলাটা কি বিধান রায়ের বাপের সম্পত্তি?

চিকিৎসক হিসেবে প্রবাদতুল্য খ্যাতি পেয়েছেন বিধানচন্দ্র, রাজনীতিতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলায় বক্তৃতা দিতে গেলে তাঁর কথা আটকে যায়, অনবরত ইংরেজি শব্দ চলে আসে। তাঁর বাংলা জ্ঞান সম্পর্কে নানা রকম গুজব প্রচলিত আছে। শোনা যায় প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি একবার তারাদাস চ্যাটার্জি বলে সম্বোধন করেছিলেন, এবং তাঁকে তাঁর "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আর একবার, বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে তরুণ পরিচালক সত্যজিৎ রায় যখন অর্থাভাবে বিপদে পড়ে শুভার্থীদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছিলেন, তখন কোন দফতর থেকে টাকা দেওয়া যায় এই চিন্তা করতে করতে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, তাহলে রোড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট থেকে কিছু বরাদ্দ করে দাও।

আর একটি কাহিনী আরও কৌতুকপ্রদ। একবার তিনি দিল্লি থেকে বিমানে ফিরছেন কলকাতায়। নামবার সময় বিমানটি যখন কলকাতা নগরীর উপর দিয়ে ঘুরছে, তখন তিনি জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে তার দলবলকে বললেন, ওহে লোকে যতই কলকাতার বদনাম করুক, কিন্তু দ্যাখো, এখনো শহরটা কত সুন্দর। সেই যে মাইকেল লিখে গেছেন না, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে..."

একজন অফিসার মিনমিন করে বললেন, স্যার ওটা মাইকেলের লেখা নয়, রবীন্দ্রনাথের...

বিধানবাবু অমনি চটে গিয়ে বললেন, সবাই রবীন্দ্রনাথের? কেন, মাইকেল কি কিছু লেখেন নি?

হয়তো এ সবই নিছক গুজব, বিরোধীপক্ষের দুষ্টুমি-মেশানো রটনা, কিন্তু রসিকতার স্বাদ পেলে তা জনসাধারণের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়।

শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, শুধু বুদ্ধিজীবীরা নয়, শুধু শিক্ষক-ছাত্রমহল নয়, পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষও বাংলা-বিহার একীকরণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চলে গেল। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো সরকারি-বিরোধী বিক্ষোভ। যে-সব পত্রপত্রিকা কংগ্রেসের সমর্থক ছিল, তারাও এই ব্যাপারে সরকারকে সমর্থন জানালো না। দিকে দিকে শুরু হয়ে গেল প্রতিবাদ আন্দোলন। চলতে লাগলো ধর-পাকড়।

এদিকে যখন এই সব চলছে, ওদিকে পাকিস্তানে তখন রচিত হচ্ছে শাসনতন্ত্র। এতদিন পাকিস্তানের বড় অংশটির নাম ছিল পূর্ব বাংলা, নতুন শাসনতন্ত্রে এই নাম মুছে দিয়ে নাম দেওয়া হলো পূর্ব পাকিস্তান। অর্থাৎ বাঙালি রইলো না, তারা হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানী। নতুন শাসনতন্ত্রে

পাকিস্তানকে ঘোষণা করা হলো ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে, সেখানে প্রযোজ্য হবে শরিয়তের আইন, মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানরা সেখানে হয়ে গেল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

পূর্ব বাংলা নামটা বিলুপ্ত হওয়াতেও সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা বা বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ কেউ আপত্তি জানালেন না। একালের তেজস্বী নেতা ফজলুল হক সাহেব এখন পাকিস্তানের গভর্নর, তিনি এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের এই নতুন পরিচয় নিঃশর্তে গ্রহণ করার আর একটি কারণ তারা এই উপলক্ষে একটি বড় উপহার পেয়েছে। বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন, শহীদের রক্তদান, প্রাণপণে উর্দু-বিরোধিতার সুফল পাওয়া গেছে, প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী ঘোষণা করেছেন যে নতুন সংবিধানে বাংলা ও উর্দু, এই দুটিই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই উপহারে বিনিময়ে অবশ্য স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি মুলতুবি রইলো।

পূর্ব বাংলা ভাষার দাবি আদায় করল ঠিকই, কিন্তু তাদের বাঙালিত্ব হারালো। বাঙালী শব্দটা মধ্যেই বড় হিন্দু গন্ধ! পশ্চিম পাকিস্তানীরা অন্তত তাই-ই মনে করে।

এদিকে পশ্চিম বাংলাকেও যদি বিহারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে পৃথিবী থেকে বাঙালি জাতটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত। বাংলাভাষা হয়তো আরও কিছুদিন টিকে থাকতো কিন্তু বাঙালি বলে কেউ আর নিজের পরিচয় দিতে পারতো না। দেশের নামেই তো মানুষের পরিচয়!

কিন্তু পশ্চিম বাংলা টিকে গেল কোনোক্রমে। মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরি! হাজার রকম সমস্যা-কণ্টকিত পশ্চিম বাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারে সদুপদেশ কিংবা বিধান রায়ের নির্দেশ মানতে রাজি হলো না। বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা দেখে সরকার পক্ষও পিছিয়ে গেলেন খানিকটা। বাঙালিদের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অনেক দিনের, জোর করে তাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। এই সময় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা যেন নিজের মৃত্যু দিয়ে সমাধানের পথ করে দিয়ে গেলেন। মেঘনাদ সাহা লোকসভার সদস্য ছিলেন, তাঁর শূন্য আসনে উপনির্বাচন হবে। নির্বাচনের ইস্যু হলো বেঙ্গল-বিহার মার্জার। প্রবল পরাক্রমশালী কংগ্রেস দল সেই নির্বাচনে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হবার ফলে একেবারে ধামা চাপা পড়ে গেল ঐ প্রস্তাব। পশ্চিম বংলার বাঙালিদের বাঙালিত্ব আপতত অটুট রইলো এবং ধীরে ধীরে বাড়তে লাগওলো কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব।

বাংলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ায় তার প্রভাব পড়লো লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য, অসহায়, মানুষের ওপর। যারা উদ্বাস্তু! রক্তবীজের ঝাড়ের মতন তাদের সংখ্যা অনবরত বাড়ছে। গঠাৎ এই সময়েই কেন নতুন করে আবার দলে হিন্দু-বৌদ্ধরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসছে ভারতে, তার কোনো কারণ বোঝা যাচ্ছে না। ভারতীয় শাসনকর্তারা দারুণ উদ্বিগ্ন, পাকিস্তানের কোনো কোনো নেতা বলছে, হিন্দুরা চলে যাচ্ছে ভাবাবেগের তাড়ানায়। পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন নেতা হিন্দুদের নিরাপত্তার মৌখিক আশ্বাস দিয়ে বলছেন, তোমরা যেও না, তোমরা থাকো। তবু তারা আসছে। পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে। নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে, জীবিকা ছেড়ে কোন তাড়নায় তারা চলে আসছে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে, তা তারাই জানে। নতুন দেশে তাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই, কেউ তাদের দিকে স্বাগতম বলে হাত বাড়িয়ে দেয় না, তারা এসে আশ্রয় নিচ্ছে রেল স্টেশনে, পথের ধারে, খয়রাতি তাঁবুতে, অর্ধাহার ও রোগ ভোগে ধুঁকছে; তবু তারা আসছে, দাবানলে তাড়া খাওয়া জন্তু-জানোয়ারের মতন নয়, পঙ্গপালের মতনও নয়, পরিত্যক্ত বাড়ির দেয়াল বেয়ে নেমে আসা পিঁপড়ের সারির মতন। ওরা ভূমিকম্পের কথা আগে থেকেই টের পায়।

এত উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় গাদাগাদি করে থাকবে কী করে? ওরা বাঙালি হলেও পশ্চিম বাংলার মানুষ ওদের উপদ্রবে তিতিবিরক্ত। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য নতুন করে জায়গা খোঁজাখুঁজি হতে লাগলো বিহারের চম্পারণে ও পূর্ণিয়ায়, উড়িষ্যা ও বিন্ধ্যপ্রদেশে। ওদের আর বাঙালি থাকবার দরকার নেই। ওরা কোনোক্রমে বাঁচুক।

"মহারাজা" নামে জাহাজে চাপিয়ে এক ব্যাচ উদ্বাস্তুকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কালাপানি পেরিয়ে আন্দামানের দ্বীপে।

এই রকম সময়ে জেল থেকে খালাস পেয়ে গেল হারীটর মন্ডল। তার নামে খুনের মামলা আদালতে টেকেনি। কিন্তু পুলিস তাকে পুরোপুরি ছাড়লো না। জেল গেট থেকে বেরুবার পরই পুলিস তাকে আবার ধরে নিয়ে এল লালবাজারে। কোনো একজন মন্ত্রীর নির্দেশে পুলিসের একজন বড় কর্তা তাকে একটি নিভৃত ঘরে বসিয়ে বললো, শোনো হে, তোমার বিরুদ্ধে কেস তুলে নেওয়া হয়েছে তোমার পরিবারের লোকজনের কথা বিবেচনা করে। তোমাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে শর্তে , সেটাও

তোমার ভালর জন্যই। পনেরো দিনের মধ্যে তোমাকে এ রাজ্য ছেড়ে সপরিবারে চলে যেতে হবে। মধ্যপ্রদেশের ক্যাম্পে যাবে না আন্দামানে যাবে সেটা তুমি ছেড়ে সপরিবারে চলে যেতে হবে। মধ্যপ্রদেশের ক্যাম্পে যাবে না আন্দামানে যাবে সেটা তুমি নিজে বেছে নাও। তুমি যে রিফিউজিদের খেপিয়েছো তারা যেন পশ্চিম বাংলা ছেড়ে বাইরে না যায়, তাতে তুমি তাদেরই ক্ষতি করছো। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যা সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে তার সুযোগ না নেওয়া যে কতবড় বোকামি তা বোঝা না? মনে থাকে যেন, ঠিক পনেরো দিন সময় দেওয়া হলো তোমাকে, এর মধ্যে তুমি কোথাও কোনো মিটিং করতে পারবে না। যদি করো-

কথা থামিয়ে পুলিসের কর্তাটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো হারীত মন্ডলের চোখের দিকে।

হারীত মন্ডল নির্বোধ নয় মোটেই। পুলিসের কর্তার ঐ অসমাপ্ত বাক্য ও স্থির দৃষ্টির মধ্যে যে হুমকি আছে তা বুঝতে তার এক মুহূর্তও দেরি হলো না। খুনের মামলা চাপিয়ে পুলিস তাকে জব্দ করতে পারেনি বটে কিন্তু অন্য অনেক ভাবে পুলিস তার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। এরার কোনো মিছিলে বা সভায় সামান্য গণ্ডগোলের ছুতোয় পুলিস সোজাসুজি তার মাথায় গুলি চালিয়ে খতম করে দেবে। সেজন্য পুলিসকে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

কিন্তু হারীত মণ্ডলের মাথার গড়নটাই এমন যে কারুর ধমক শুনে সে চট করে ভয় পায় না। এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনেও সে মিটিমিটি হাসতে লাগলে।

গত মাস জেলখানায় তার সঙ্গে ধোপা নাপিতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এখন তার মুখভর্তি দাড়ি মাথার চুলে জট, তাতে আবার উকুন হয়েছে। উকুনগুলো মাথা বেয়ে দাড়িতেও নেমে আসে। ঘ্যাস ঘ্যাস করে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে সে বললো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো স্যার? আপনেগো বাড়ি কি যশোরে ছিল?

জাঁদরেল পুলিস কর্তাটি এই আকস্মিক প্রশ্ন শুনে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

হারীত মন্ডল বললো, আপনার কথায় একটু যেন যশোরের টান আছে। ঠিক কিনা কন? তা যশোরে লোক হইলে আপনেও তো রিফুজি, স্যার? আপনেও রিফুজি, আমিও রিফুজি। আপনেরা কলকাতায় থাকবেন, অর আমরা কেন বিদেশে যামু?

পুলিশের কর্তাটি এবারে অনেকটা সমলে উঠে বললেন, তোমার কি এখানে কোনো থাকার জায়গা আছে? তুমি পরের বাড়ি জবর দখল করে আছো, সেটা বে-আইনী। সেইজন্যই সরকার তোমাদের অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন!

ও , তাইলে আমাগো মতন যারা গবির, যারা নিচু জাত, যাগো এদশে কোন আত্মীয়স্বজন নাই তাগোই আপনেরা বিদেশে পাঠাবেন। বোঝলাম। কিন্তু সে দেশে গিয়ে আমরা খাবো কী?

সরকার তোমাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করবেন। তোমাদের যার যা পেশা ছিল সেগুলো আবার কাজে লাগবে!

হারীত মন্ডল আবার হেসে ফেললো। যেন বেশ একটা মজার কথা শুনেছে। পাল্টা একটা রসিকতা করার ঝোঁকে সে বললো, স্যার, আমার পেশা ছিল-

পুলিসের কর্তাটি তার কথা শেষ করতে না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, যা বলেছি, বুঝেছো আশা করি। মনে থাকে যেন, পনেরো দিন।

হ্যাঁ স্যার, মনে থাকবে, পেনেরো দিন।

পুলিসের গাড়ি হারীত মন্ডলকে পৌঁওছে দিল কাশীপুর।

কলোনির সব লোকজন তাকে দেখে ভিড় করে এলে সে দু'হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে বলতে লাগলো, না, না, এখন কোনো কথা না, এখন সবাই যাও, এখন দুইদিন আমি শুধু খাবো আর ঘুমাবো।

সত্যি সত্যি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে রইলো সে। তাকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পুলিসের হুমকি যে ফাঁকা নয় তা সে জানে। এখন তাকে ঘিরে এই কলোনিতে কোনো উত্তেজনা ছড়ালে সেই সুযোগে পুলিস তার ওপর প্রতিশোধ নেবে। পুলিসের সাজানো মামলা জজ সাহেবরা নামঞ্জুর করে দিলে পুলিস তা সহ্য করে না, একথা সে জেলখানাতেই অন্য আসামীদের কাছে শুনেছে।

পারুলবালার কাছে যে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলো। মুখে হাসি এনে সে বললো, জেলেল খিচুরি খাইয়া প্যাটে চড়া পইড়া গ্যাছে। ছোট বউ, একটু মাছের ঝোল আর গরম ভাত খাওয়াইতে পারবি? পুঁটি মাছ, খইলসা মাছ যা হয়!

নিজের সংসারের খোঁজখবর নিল সে। এই সাতমাস নানারকম দুর্যোগের মধ্য দিয়ে কাটলেও

শেষের দিকে একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে। তার ছেলে সুচরিত লেখাপড়ার সব সব ভার নিয়ে নিয়েছেন এবং পারুলকেও একটি ভদ্রমতন কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন। আপাতত তাদের সংসার চালাবার দুশ্চিন্তা নেই।

হারীতের আবার হাসি পেল। সংসার! এই অস্থায়ী আস্তানাও আবার গোটাতে হবে। পারুলের চাকরি, ছেলের লেখাপড়া এ সব কিছুই আর কিছু না, নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে তাকে। হারীত ভাবলো, জেল থেকে ছাড়া না পেলেই বরং ভাল ছিল, সে জেল খাটতো, কিন্তু পারুল তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে থেকে যেতে পারতো এখানে।

ভাত রান্না হবার আগেই সে পারুলকে একবার কাছে ডেকে একটানে তুলে আনলো বিছানায়। পায়ের ধাক্কায় বন্ধ করে দিল দরজা। তার ভাবগতিকে দেখে পারুল ভয় পেয়ে গেলেও হারীত তাকে ছাড়ালো না। তাদের চাঁচার বেড়ার ঘর, পাশ দিয়ে লোকজন গেলে টের পাওয়া যায়, ঘোর দুপুরবেলা, যে-কেউ হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে, তবু হারীত বুভুক্ষুর মতন খেতে লাগলো পারুলের শরীর।

তারপর সে ঘুমোতে লাগলো পড়ে পড়ে। যেন অনেক দিনের জমা ঘুম সে পুষিয়ে নিচ্ছে। রান্না হয়ে গেছে , ভাত বাড়ার পরেও অনেক ঠ্যালাঠেলিতে সে আর উঠতে চায় না।

পরদিন হারীত তাদের কলোনির দু'জন লোককে ডেকে পাঠিয়ে গোপন শলাপরামর্শ করলো অনেকক্ষণ। হলধর আর ভূষণ নামে এই লোক দুটি হারীতের খুব অনুগত। হারীত তাদের বললো, শোন, আমার ফাঁসী হয়নি বটে, কিন্তু আমি দাগী হয়ে গেছি। তোরা এখন ধরে নে যে আমি আর নই। আমি কিছু করতে গেলে আর প্রাণে বাঁচবো না। তোদেরও সামনে খুব বিপদ। উদ্বাস্তুদের বাইরে পাঠানো শুরু হয়ে গেছে, এখন এইসব বাড়ির মালিকেরা সুযোগ নেবে, তোদের এখান থেকে উচ্ছেদ করে বনে-জঙ্গলে পাঠিয়ে দেবে। সুতরাং, তোদের এককাট্টা হয়ে থাকতে হবে সব সময়। তবু তোরা নিজেরা পারবি না। স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টি আর ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ কর, তারা কংগ্রেস সরকারে এই পলিসির বিরুদ্ধে কথা বলে, তারা তোদের সাহায্য করতে পারবে।

হলধর আর ভূষণ হারীতের জাত চেপে ধরে বললো, কিন্তু হারীতদা, তুমি চলে যাবে কেন? আমরা থাকলে তুমিও থাকবে। তুমিই আমাদের এই সুন্দর জায়গার ব্যবস্থা করে দিয়েছো। আমাদের প্রাণ থাকতে যেতে দেবো না।

হারীত বললো, আমি না থাকলে তবু তোদের টিকে থাকার আশা আছে। আমি থাকলে তোদের বিপদ আরও বাড়বে। নানান ছুতোয় পুলিস যখন তখন হামলা করবে। আমাকে যেতেই হবে!

পুলিসের কর্তার কাছে হারীত যে রসিকতা করতে গিয়েছিল, সেটা নিজের পেশা সম্পর্কে। তাকে আন্দামান কিংবা মধ্য প্রদেশের জঙ্গল বেছে নিতে বলা হয়েছে। পূর্ব বাংলায় হারীতের পেশা ছিল মূর্তি বানানো। জাতে তারা কুমোর। হারীত নিজে অবশ্য হাঁড়ি-কলসি বানায়নি কখনো, সে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মূর্তি গড়তো। আন্দামানের দ্বীপে কিংবা মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে সে তার এই পুরনো পেশা কী করে কাজে লাগাবে? কে তাকে পয়সা দেবে?

সমুদ্রের অভিজ্ঞতা নেই হারীতের, সে জঙ্গলেই যাওয়া ঠিক করলো।

এখান থেকে চলে যেতে হবে শুনে কান্নকাটি শুরু করে দিল পারুলবালা। সে ধরে নিল, এটা তার স্বামীর আর একটা পাগলামি। জঙ্গলে গিয়ে সে নেতাগিরি করতে চায়। হারীত হাসতে হাসতে নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ওরে ছোট বৌ, এখানে থাকলে আমার মাথাটাই থাকবে না। বিধবা হইয়া থাকতে রাজি আছোস তো ক। আবার আমি লাফালাফি শুরু করি!

হারীতের এ রকম লঘু ভঙ্গির জন্য তার কথা বিশ্বাস করে না পারুল। সে আরও কাঁদে। এর মধ্যে এক বিকেল তাদের অন্ধকার ঘরে চন্দ্রাদয় হলো। সুচরিতের কাছ থেকে চন্দ্রা এসেছে হারীতের সঙ্গে দেখা করতে। চন্দ্রা পরে এসেছে একটা গোলাপী সিল্কের শাড়ী, তার ওষ্ঠাধর রক্তিম, তার শরীরের বিলিতি সুবাসে ভরে গেল ঘর।

হারীত খাটে শুয়ে ছিল , তাড়াতাড়ি উঠে বসে সে বলতে লাগলো, কী অশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ রকম কখনো করে। আমাকে ডেকে পাঠালেই তো আমি ডেকে পাঠালেই তো আমি যেতাম। আপনি এই নোংরা কাদার মধ্যে-

চন্দ্রার সঙ্গে অসমঞ্জ রায় এবং একজন মহিলাও এসেছে। চন্দ্রা হারীতের খাটের এক কোণে বসে পড়ে কোনোরকম ভূমিকা না করেই বললো, আপনি নাকি চলে যেতে চাইছেন? আপনি পাগল হয়েছেন নাকি? না, না, কেনো মতেই আপনার যাওয়া চলবে না।

হারীত কোনো কথা না বলে চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক পলক। তার মনে পড়ে গেল সুলেখার কথা। এর আগেও সুলেখার কথা তার অনেকবার মনে পড়েছে, কিন্তু সুলেখার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া হয়নি। তার ধারণা, এই কলোনি থেকে বেরুলেই তার পেছনে পুলিস লাগবে। হারীত ও বাড়িতে আবার যাওয়া-আসা করলে ত্রিদিব-সুলেখা ঝামেলায় পড়তে পারেন। জেলে থাকার সময় ত্রিদিব দু'বার দেখা করতে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে, উকিলের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু সুলেখার সঙ্গে দেখা হয়নি।

সুলেখার সঙ্গে চন্দ্রার অনেক অমিল। সুলেখা এ রকম উগ্র নন। সুলেখা না হাসলেও তাঁর মুখে যেন সব সময় স্নিগ্ধ হাসি ছড়ানো থাকে। সুলেখা খুব কম কথা বলেন, আর এই মহিলাকে দেখেই মনে হচ্ছে ইনি অন্যদের কথা বলতে দেবেন না।

অসমঞ্জ রায় বললেন, আপনার ছেলে ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে, পড়াশুনো ভালোই করছে, তাছাড়া আপ নি তো নির্দোষ হিসেবে ছাড়া পেয়ে গেছেন, আপনি এখন চলে যাবেন কেন?

হারীত বললো, সরকার আমাদের এই সব বাড়ি ছেড়ে দিতে বলছেন, আমাদের অন্য জায়গায় জায়গা দেবেন...

চন্দ্রা বললো, অন্য জায়গা মানে ধান্ধারা গোবিন্দপুরে? সেখানে আপনারা খাবেন কী? সরকারের কাছ থেকে ভিক্ষে নেবেন? না, না, বরং এই রকম বাড়ি বাব জামি এদিকে আর যত আছে, সব দখল করে নিতে হবে। আপনারা দাবি ছাড়বেন না।

হারীত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার মনে পড়লো, পুলিস সাহেবের সেই তীব্র দৃষ্টি। তিনি পনেরো দিন সময় দিয়েছেন। নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখছেন হারীতের ওপর। ন'দিন কেটে গেছে!

দ্বিতীয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারীত বললো, না, দিদিমনি, আমার আর উপায় নাই, আমারে চলে যেতেই হবে!

চন্দ্রা বললো, কেন? কে বলেছে আপনি নিরুপায়। আমরা আছি না? আপনি কিসের ভয়ে চলে যাবেন?

পুলিসের ভয়ে।

পুলিস? পুলিস কী করবে? আমরা অ্যাসেম্বলি অভিযান করবো। এদেশে কি ডেমোক্রেসি নেই? পুলিস তো জনতার চাকর! আমরা আপনাকে প্রটেকশান দেবো, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?

অসমঞ্জ রায় বললেন, আপনার নামে তো অর কেস নেই!

হারীত বললো, পুলিশ আমাকে ছাড়বে না। আপনারা ভদ্দরলোক, আপনারা বড়লোক, পুলিশ আপনাদের ভয় পেতে পারে। কিন্তু আমরা মারা পড়বো, পুলিশ আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে। বাঁচতে হলে আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে।

চন্দ্রা বললো, ঠিক আছে, আপনি কিছুদিন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকুন, আপনার ফ্যামিলি নিয়ে। আপনাকে কোনো কিছু চিন্তা করতে হবে না। আমরা দরকার হলে দিল্লিতে গিয়ে..

যখন-তখন হারীতে হাসি পেয়ে যায়। এই সব ভাল ভাল ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা তাকে এখন সাহায্য করতে চাইছেন, এতে তার হাসি পাবে না? যদি এক বছর আগে আসতেন..থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে পাগলা কুকুরের মতন পিটিয়েছে, একজন পুলিসের দারোগা তার পেটে এমন লাথি মেরেছিল যে হারীতের কাপড় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল...। এখন বড় দেরি হয়ে গেছে। বড়লোকদের বাড়ির এই মা-লক্ষ্মীট হতভাগা রিফিউজিদের জন্য কেন এত দরদ দেখাচ্ছেন, তাই বা কে জানে!

ঘরের দরজার কাছে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। সুচরিত দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে ভর দিয়ে। হারীত তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলো। তারপর সুচরিতের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে সে বললো, ভুল, তুই এখানে একা থাকতে পারবি? তুই থাক, লেখাপড়া শেখ, যদি কপালে থাকে আবার দেখা হবে।

তারপর চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে চোখ তুলে বললো, আপনারা তো সবাইকে রাখতে পারবেন না। সরকার উদ্বাস্তুদের বাইরে পাঠাতে শুরু করেছেন, অনেকেই যেতে হবে। তারা সেখানে কী করে থাকবে, কী খেয়ে বাঁচবে, তা কে দেখবে বলুন? আমি ওদের মধ্যে গিয়েই থাকতে চাই।

॥ ৩২ ॥

ঢাকার সেগুনবাগানে মামুনের এক দিদির বাড়ি। তাঁর দুলাভাই শামসুল আলম একজন সম্পন্ন উকিল। আলম সাহেব যেমন দিলদার তেমনই মজলিশী, তাঁর বাড়িতে গান-বাজনা আর দিদির বাড়িতে। সঙ্গে তার সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে হেনাকে নিয়ে এসেছেন, এই মেয়েটি তাঁর বড়

আদরের। ফিরোজাও প্রায় জোর করে হেনাকে স্বামীর সঙ্গে পাঠিয়েছেন। তিনি বুঝেছেন যে মামুন আবার রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠতে, অথবা জেল খাটতে যাচ্ছেন। সঙ্গে মেয়েটা থাকলে তবু হয়তো খানিকটা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করবেন।

মামুনের দিদি মালিহার মোট এগারোটি সন্তান, তাদের মধ্যে দু'জন অকালে প্রাণ হারিয়েছে। বাড়িটি যেন একটি বড় গাছ, যেখানে সব সময় শোনা যায় পাখিদের কলরব। শিশুদের সংসর্গ মামুনের ভালো লাগে, ওদের সঙ্গে কৌতুকে মেতে উঠলে মনের মেঘ কেটে যায়।

প্রথম কিছুদিন মামুন বাড়িতে বসেই কাটালেন। আলতাফের পীড়াপিড়িতেও তিনি পার্টি মিটিং-এ যেতে চাইলেন না, আগে অবস্থাটা বুঝে নিতে চান। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পর প্রায় বছর চারেক তিনি রাজনীতি থেকে বিযুক্ত ছিলেন। রাজনীতি এমনই এক ব্যাপার যে একবার দূরে সরে গেলে ফাঁক ভরাট হয়ে যায়, ফিরে এসে নিজের জায়গাটা খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়। একসময় মামুন প্রথম সারিতে চেয়ার পেতেন, এখন তিনি তৃতীয় বা চতুর্থ সারিতে স্থান পাবেন কিনা তাও জানেন না।

এ বাড়িতে প্রায়ই গান-বাজানার আসর বসে, সঙ্গীত-প্রিয় মামুন এখানে দিন দিন যেন চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগলেন। ফিরোজার আপত্তির জন্য তাঁর নিজের বাড়িতে গানবাজনার চর্চা একেবারে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অনেক গণ্যমান্য মানুষও আসেন এখানে, যাঁদের সাহচর্য মামুনকে প্রেরণা দেয়। আসেন কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোবিন্দচন্দ্র দেব-এর মতন পণ্ডিতেরা।

মোতাহার ভাই-এর সঙ্গে মামুনের অনেক দিনের পরিচয়। তিনি এলেই কাজী নজরুলের গল্প শুরু হয়ে যায়। নজরুল যখন সৃষ্টিশীল, প্রাণবন্ত ছিলেন তখন এই মোতাহার হোসেনের বাড়িতে উঠেছেন একাধিকবার। নজরুল খুব ভালবাসতেন এঁকে। আদর করে ডাকতেন মোতিহার।

নজরুল এখন জড়, বাক্যহীন বলেই তাঁর আগেকার কাহিনী শুনতে বেশি ভালো লাগে। কথায় কথায় মামুন একবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মোতাহার ভাই, কবি নজরুল ঠিক কবে, কোন জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেটা একটু বলেন তো! নানা লোকে নানা কথা বলে, কিন্তু আপনিই সবচেয়ে ভালো জানবেন!

মোতাহার সাহেব বললেন, সে সময়ে অবশ্য আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম না, তবে সবিস্তারে শুনেছি। ওঁর এক ছেলে, বুলবুল, সে মারা যাবার পর উনি কী রকম আঘাত পেয়েছিলেন জানো তো! সেই আঘাত উনি আর সামলাতে পারেননি।

মামুন বললেন, সে তো অনেক আগের কথা। তারপর উনি বহু বছর সুস্থ ছিলেন, সারা দেশে ঝটিকা সফর দিয়েছেন, কত গান লিখেছেন..

মোতাহার সাহেব বললেন, হ্যাঁ, তার পরেও দশ বারো বছর সুস্থ ছিলেন, কিন্তু সেই সময় আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠির বয়ান আমার স্পষ্ট মনে আছে। উনি লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বলতেন, দেখ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মত, কীট্‌স-এর মত খুব বড় একটা ট্রাজেডি আছে, তুই প্রস্তুত হ।"

-রবীন্দ্রনাথ কি কারুকে তুই বলতেন?

-কবিগুরু ঠিক ঐ ভাষায় বলেন নাই হয়তো। তিনি ঠিক কী ভেবে ঐ কথা বলেছিলেন, তাও জানি না, কিন্তু নজরুলের মনের মধ্যে একটা ট্রাজেডির আশঙ্কা সেই সময় থেকেই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। প্রায়ই বলতেন এরকম কথা। তারপর কবিগুরু মারা গেলেন উনিশশো একচল্লিশ সনের অগাস্টে আর পরের বছর জুলাই মাসে নির্বাক হয়ে গেলেন নজরুল।

-রেডিও স্টেশনে টক দিতে গিয়ে নাকি-

-আমি নৃপেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে সে দিনের বর্ণনা শুনেছি।

-নৃপেন্দ্রবাবু, মানে কোন্ নৃপেন্দবাবু?

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। কবির খুব বন্ধু ছিলেন তিনি। তিনি তখন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেন। আর নজরুল তখন ফজলুল হক সাহেবের 'নবযুগ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। সেই নবযুগে নজরুল একটা লেখা লিখেছিলেন, আমার সুন্দর! কী অপরূপ লেখা! যদিও গদ্য, তবু সব লাইন আমার মনে আছে। " আমার সুন্দর প্রথমে এলেন গদ্য হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে...। আমার সুন্দর এলেন কবিতা হয়ে। শোকসুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এলো নিবিড় স্নেহ-সুন্দর হয়ে...।" দ্যাখো, এই লেখাতে এতদিন পরেও

সেই ছেলের কথা। ছেলের জন্য শোক!

-এই লেখাটার সঙ্গে তাঁর রোগের-

-এত সুন্দর একটা লেখা, এতেও নিন্দুকের গাত্রদাহ হয়? ঐ লেখাটাকে কুৎসিত কদর্য বিদ্রুপ করে সাপ্তাহিক 'কৃষক' পত্রিকারয় একটা লেখা ছাপা হলো, তার নাম 'সুন্দরম'। নজরুল আগে লেখাটি দেখেন নি। জুলাই মাসের নয় তারিখে তিনি তার কেন্দ্রে গেছেন। সেদিন ছোটদের আসরে তাঁর একটা গল্প শুনবার কথা। অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে একটু দেরি আছে, তিনি অপেক্ষা করছেন, সেখানে পড়েছিল ঐ কৃষক' পত্রিকাটা। সময় কাটানোর জন্য পাতা উল্টাতে উল্টাতে ঐ কুৎসিত লেখাটা তাঁর চোখে পড়লো। এটা পড়েই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর টক দিতে গিয়ে দুচার কথা বলার পরেই তাঁর বাকরোধ হয়ে গেল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে গেলেন তাঁকে...।

এই কাহিনী শুনতে শুনতে মামুনেরও যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। অতি কষ্টে আবেগ দমন করে তিনি ঝাঁঝালো গলায় বললেন, অত বড় একজন কবিকে কত অন্যায় আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে। কত নিন্দা, কত কুৎসা! ছি ছি ছি! কবিদের মন স্পর্শকাতর হয়, অন্যায় অপবাদ তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। আমাদের নিজের জাতের লোকেরাও তো তাঁকে কম দুঃখ দেয় নি!

মোতাহার সাহেব বললেন, আরে, প্রথম দিকে আমাদের নিজেদের জাতের লোকেরাই তো কবিকে আক্রমণ করেছে বেশি! মোসলেনম দর্পণ কাগজে তাঁকে বলা হয়েছিল, "ইসলাম-বৈরী" মুসলমান কবি'। ইসলাম-দর্শন পত্রিকায় এক মুন্সী মোহাম্মদ লিখেছিল, " লোকটা মুসলমান না শয়তান?" তারপর "মোহাম্মদী" "সওগাত" কাগজের ঝগড়ার কথা তো তোমরা জানো না। তখন তোমরা ছেলেমানুষ ছিলে। "মোহাম্মদী" তে আকরম খাঁ নজরুলকে কত গালিই না দিয়েছেন। সেই জন্য আমরা ওঁকে বলতাম আক্রমণ খাঁ। নজরুল বলতেন, আক্রমিয়া মিঞা। সওগাত ছিল প্রগতিশীলদের কাগজ, নজরুল সেখানে 'চানাচুর' নামে একটা বিভাগ লিখতেন, কত মজা করে উত্তর দিতেন।

মামুন বললেন, আমি পুরোনো মোহম্মদী ও সওগাতের ফাইল দেখেছি। মোতাহার ভাই, আপনি লক্ষ করেছেন, সেই সময় যারা নজরুলকে হীন আক্রমণ করেছিল, এখন দেখি, পূর্ব বাংলায় তারাই অনেকে নজরুলের জয়গান করে। নজরুলের জন্য তাদের কত দরদ। যত সব ভণ্ডামি!

মোতাহার সাহেব মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ জানি। দেখছি তো সব!

মামুন উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, এরাই এখন আবার নজরুলকে পাকিস্তানী কবি বানাতে চায়। নজরুলের কবিতায় মহাশ্মশান কেটে কবরস্থান বা গোরস্থান বসিয়ে দিচ্ছে। এটা আপনি সমর্থন করেন? আমাদের পূর্ব বাংলা পূর্ব বাংলায় এখন ভাষার ওপর যে যথেচ্ছাচার হচ্ছে!

শামসুল আলম এক্পাশে বসে চুপচাপ শুনছিলেন সব। এবারে তিনি বললেন, আরে, মামুন মিঞা, তুমি বারবার পূর্ব বাংলা পূর্ব বাংলা কইত্যাছো ক্যান? পূর্ব বাংলা তো আর নাই। পূর্ব পাকিস্তান, এই বৎসর থিকা আমরা পূর্ব পাকিস্তানী। আর হিপোক্রিসিই তো আমাগো ন্যাশনাল প্যাস্টাইম!

মামুন তাঁর জামাইবাবুর দিকে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, পূর্ব বাংলা না, পূর্ব পাকিস্তান। ঠিক! তবে এটা রপ্ত করতে আমার একটু সময় লাগবে!

কথা ঘুরে যায় অন্যদিকে, অবধারিত ভাবে রাজনীতি এসে পড়ে।

ডঃশহীদুল্লাহ সাহেব এলে অবশ্য রঙ্গরসের কথাই বেশি হয়। ছোট্টখাট্টো চেহারার মানুষটি দেখলে বোঝাই যায় না, উনি অমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। আরবী, ফারসী যেমন জানেন তেমনই আবার সংস্কৃত অগাধ জ্ঞান। ছেলেবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল সদানন্দ। এখনো সেই সদানন্দই আছেন।

শামসুল আলম-এর বড় মেয়ে বিলকিস, ডাকনাম মঞ্জু, সবে মাত্র সতেরো বছর বয়সে পূর্ণ হয়েছে। মেয়েটি ভারি সুশ্রী। এমন কোমলতামাখা মুখ যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাকে দেখলেই শহীদুল্লাহ সাহেব বলেন, ও শামসুল, এ মেয়ে যে প্রায় অরক্ষণীয়া হতে চললো, এর বিয়ে দেবে না?

আলম সাহেব বলেন, আমার আর ওর মায়েরও তো তাই ইচ্ছে, কিন্তু ও যে আরও লেখাপড়া করতে চায়!

শহীদুল্লাহ সাহেব ভুরু নাচিয়ে বললেন, মেয়েদের কিঞ্চিৎ লিখনং পড়নং বিবাহেরি কারনং। বুঝলে না? অ্যা?

মঞ্জু বেশ চটপট কথা বলতে পারে। সে শহীদুল্লাহ সাহেবকে মৃদু ভৎসনা করে বললো, নানা, ঈদের নামাজে ইমাম হন, আবার কথায় কথায় সংস্কৃত বলেন কেন?

শহীদুল্লাহ্ সাহেব উঁচু গলায় হেসে বললেন, আমার কথা জানো না? অনেকে যে আমার নামটাই একসময় বদলে দিতে চেয়েছিল। বলিনারায়ণ! কী করে হলো জানো? শহীদ মানে বলি, আর আল্লাত-নারায়ণ। সন্ধি করে হলো বলিনারায়ণ! তা থাক, আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছো কেন? তোমার জন্য পাত্র দেখি, অ্যাঁ?

মামুন বললেন মঞ্জু যদি পড়তে চায়, তাহলে পড়ান না কেন ওকে দুলাভাই!

আলম বললেন, পড়াতে তো আপত্তি নাই। কিন্তু মেয়ে বায়না ধরেছে যে সে কলকাতার কলেজে পড়বে।

কেন, কলকাতায় কেন? আমাদের ঢাকায় কি মেয়েদের কলেজ নাই? ভালো কলেজ আছে!

সে কথা বুঝায় কে বলো! তুমি প্যারো তো বুঝাও! কার কাছ থেকে যেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের নাম শুনেছে। সেইখানে ও ভর্তি হতে চায়। আমার এক ভাই তো থাকে কলকাতায়, পার্ক সার্কাসে বাড়ি আছে, সেইখানে থাকবে।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, মঞ্জু, তোর এক কলকাতায় গিয়ে পড়ার শখ কেন?

মঞ্জু সংক্ষেপে বললো, আমার ইচ্ছা করে।

মামুন বললেন, আমার মতে ঢাকায় পড়াই ভালো।

শহীদুল্লাহ সাহেব বললেন, কলকাতার কলেজগুলি কি আর আগের মত আছে?

আলম সাহেব বললেন, মেয়ের কথা শুনলে আপনারা তাজ্জব হয়ে যাবেন। ওরে আমি কলকাতায় নিয়ে গেছিলাম চুয়াল্লিশ সালে, তখন ওর বয়েস কত হবে, বড় জোর পাঁচ বছর। অথচ সেই সময়কার কথা নাকি ওর সব মনে আছে। পার্ক সার্কাসে রাস্তার দুই ধারে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে, তাও তার মনে আছে। এ কখনো হয়!

মামুন বললেন, সে কলকাতা আর আগের মত নাই! শুনতে তো পাই খুব অপরিষ্কার মানুষ এত বেড়েছে...। আচ্ছা মঞ্জু, কলকাতায় তুই পড়তে গেলে, কোনো হিন্দুর ছেলে যদি তোকে বিয়ে করতে চায়?

আলম সাহেব সোৎসাহে হাসিমুখে বললেন, আমিও তো সেই কথা বলি! আমার মেয়ের এমন রূপ ওকে দেখেই হিন্দু ছেলেদের মাথা ঘুরে যাবে। কেউ না কেউ ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে বিয়ে করে ফেলবেই, কী বলেন? তারপর, মঞ্জু, তুই চুলে সিন্দুর দিবি, হাতে লোহার চুড়ি পড়বি। রোজ সন্ধ্যাবেলা শঙ্খতে ফুঁ দিতে হবে, গঙ্গায় স্নান করতে করতে মন্ত্র পড়তে হবে, মন্ত্র পড়ায় ভুল হইলেই মুখঝামটা খাবি শাশুড়ি ঠাকরুণের কাছে। তারপর কালীপূজার সময় মন্দিরের মধ্য নিয়ে গিয়ে...

মঞ্জু ত্রস্তে বলে উঠলো, না না!

তার মুখে আতঙ্কের ছাপ। তা দেখে সবাই হেসে উঠতেই মঞ্জু ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

আলম সাহেব বললেন, ঐ কালী ঠাকুরে কথা শুনলেই মেয়ে ভয় পেয়ে যায়। মোতাহার ভাই এমন একখানা গল্প শুনিয়েছিলেন কালী মন্দির সম্পর্কে।

মামুন বললেন, কী গল্প, শুনি, শুনি!

মোতাহার সাহেব সেদিন উপস্থি নেই, আলম সাহেবই শোনালেন কাহিনীটি।

মোতাহার হোসেন একসময় কলেজের প্রক্টর ছিলেন। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি গিয়ে তাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছিল তাঁর ডিউটির অন্তর্গত। সেই ব্যাপারেই একবার হয়েছিল তাঁর এক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। এসব পার্টিশনের অনেক আগেকার কথা। তাঁর একটি ছাত্র প্রায়ই বিনীত ভাবে প্রশ্ন করে, স্যার, একবার আমাদের ওখানে আসবেন না? 'ওখানে' মানে রমনার কালীবাড়ি, ছাত্রটির বাবা সেখানকার পুরোহিত। স্বাভাবিক কারণেই প্রক্টরের সেখানে কখনো পদার্পণ ঘটেনি। ছাত্রটি গলবস্ত্র হয়ে অনুনয় করে, স্যার একদিন চলুন, গুরুমাকে, বাড়ির বাচ্চাদের নিয়ে আসুন, দেখে যাবেন।

মোতাহার সাহেব ছাত্রটিকে বললেন, তোমাদের মন্দিরে কি আমরা যেতে পারি? আমরা যে মুসলমান!

ছেলেটি জিভ কেটে বলেছিল, স্যার, আপনি আমার শিক্ষক, গুরুদেব। আমি নিজে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো, কোনো অসুবিধে হবে না!

মোহাতার হোসেনের এই সব ব্যাপারে খুব উৎসাহ। বাল্যকাল থেকেই তিনি হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। তার নিজের কোনো সংস্কার নেই। তাঁর স্ত্রী যেতে চান না, তিনি বললেন, চলো, চলো। বাচ্চাদের নিয়ে চলো!

রেসকোর্সের মাঠে রমনা কালীবাড়িটি অনেক দিনের পুরোনো। অনেকে বলে, একসময়ে সেখানে নরবলি হতো। মুসলমান ছেলেমেয়েরা সে কালীবাড়ীর ধার -কাছ দিয়েও যায় না, দিনের বেলাতেই তাদের গা ছমছম করে। মোতাহার সাহেবের স্ত্রী তাঁর দুটি বাচ্চা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চললেন দুরুদুরু বুকে। মোতাহার সাহেব এবং তাঁর ছাত্রটি গল্প করতে করতে যাচ্ছে আগে আগে।

কালীবাড়ির কাছে পৌঁছে মোতাহার সাহেব রইলেন বাইরে, পুরুষদের সঙ্গে। তাঁর স্ত্রীকে বাচ্চাদেরকে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ভেতরে। মন্দিররের ভেতরটা অন্ধকার, সেখানে জ্বলছে একটা প্রদীপ। ওঁরা অবশ্য মন্দিরের মধ্যে গেলেন না, পাশের অন্দরমহলে দোতলায় পাত পেড়ে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, তার পাশ দিয়ে তাঁদের এনে বসানো হলো একটা খালি ঘরে। একটু পরে এক বিশলা কায় মহিলা এলেন ওঁদের সঙ্গে আলাপ করতে। তাঁর পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ী, কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর লেপা, মুখখানা হাসি হাসি। প্রথমে তিনি বাচ্চা মেয়ে দুটিকে আদর করলেন, তারপর মোতাহার সাহেবের স্ত্রীর হাত ধরে সস্নেহে এ-কথা সে-কথা বরতে বলতে একময় জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, মা তোমরা কী জাত? ব্রাহ্মণ না কায়স্থ?

যেই শুনলেন মুসলমান, অমনি তাঁর চোখ কপালে উঠে গেল। সেই বিশালবপু নিয়ে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে লাগলেন, ওরে কী সর্বনাশ হলো! ম্লেশ এনে ঢুকিয়েছে মন্দিরে। হায়, হায়, কী হবে! মহাপাপে সবাই যে নির্বংশ হবো! সবাই পুকুরে স্নান করে আয়!

তারপর শুরু হয়ে গেল মহাগণ্ডগোল। একদল দুদ্দাড় করে নিচে নেমে যাচ্ছে, অন্য দল উঠে আসছে ওপরে। এরই মাঝখানে এক অসহায় মহিলা তাঁর তাঁর দুটি বাচ্চাকে নিয়ে বেরবার পথ পাচ্ছেন না। মেয়ে দুটি ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

মামুন সর্বাঙ্গে কাঁটা হয়ে শুনছিলেন, এই পর্যন্ত শোনবার পর তিনি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর? ওদের কি মারধর করলো?

আলম সাহেব বললেন, না, সে সব কিছু হয়নি। সেই ছাত্রটিও শেষ পর্যন্ত ওদের বার করে নিয়ে আসে এবং বিবিঘ্নে পৌঁওছ দেয় বাড়িতে। সে বারবার ক্ষমা চেয়েছিল গলবস্ত্র হয়ে। সে আগে থেকে সবাইকে জানিয়ে রাখলে বোধহয় এতটা হতো না। কিন্তু ঐ বাচ্চা মেয়ে দুটির কী অভিজ্ঞতা হলো বলো তো! কতদিন কেটে গেছে, এখানো সেই কথা ভাবলে তাদের গায়ে কাঁটা দেয়!

মামুন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। ঠিক এতটা না হলেও এর কাছাকাছি অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁরও আছে। আবার উল্টো অভিজ্ঞতাও হয়েছে; কিন্তু অল্প বয়েসের অপমানের কথাই সারাজীবনের মত দাগ কেটে যায়।

এ-বাড়ির জানলা দিয়ে পাশাপাশি দুটি জনশূন্য বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। দরজা-জানলা ভাঙা। ও বাড়ির মানুষরা এদেশ ছেড়ে চলে গেছে। যেতে বাধ হয়েছে। হয়তো ওদের কোনো দোষ ছিল না, আবার একেবারে চলে গেছে। যেতে বাধ হয়েছে। হয়তো ওদের কোনো দোষ ছিল না, আবার একেবারে যে ছিল না তাও জোর দিয়ে বলা যায় না।

মাঝে মাঝে মামুন একা একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসেন। ঢাকা শহরের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। তাঁর যৌবনে দেখা ঢাকা শহর ছিল ছিমছাম, সুন্দর। এই সব এলাকাগুলো ছিল শান্ত, নির্জন। তখন কত পুকুর ছিল, ফাঁকা মাঠ ছিল, অবস্থা পন্ন লোকদের বাড়ির সামনে বড় বড় বাগান ছিল। পার্টিশানের পর অনেক হিন্দু ঢাকা শহর ছেড়ে সীমান্তের ওপারে চলে গেছে, তার বদলে নতুন লোক এসছে পাঁচ গুণ বা তারও বেশি। কলকাতা থেকে এসেছে অনেকে, বিহার থেকে, আসাম থেকে এসেছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও দলে দলে আসছে। কিছু বাড়ি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, কিছু বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে, আর পুকুর-মাঠ নিশ্চিহ্ন করে নিত্য নতুন বাড়ি উঠছে সব দিকে।

প্রেস ক্লাবের বাড়িটাতে ছিলেন অধ্যাপক সত্যেন বোস। হাতির পুলের কাছেই বাড়িতে থাকতেন মোহিতলাল মজুমদার। ঐ বাড়িতে ডঃ সুশোভন সরকার। পুরোনো স্মৃতি ছায়াছবির মতন ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

একদিন কবি জসিমুদ্দিনের বাড়িতে সারা সন্ধ্যে আড্ডা দিয়ে ফেরবার পথে মামুন একটা ভাঙা বাড়ির সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। এর আগেও এই বাড়ির পাশ দিয়ে বেশ কয়েকবার গেছেন, তখন কিছু খেয়াল হয়নি, আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

এটাই রাজেন সর্বাধিকারীর বাড়ি নয়?

দেয়ালে পোড়া পোড়া দাগ, আগুন লেগেছিল, কোনো এক সময় আগুন লাগানো হয়েছিল নিশ্চয়ই। বাড়িটার চেহারাই তাই পাল্টে গেছে। সদর দরজার দিকটাই ছিল অন্যরকম, সামনে ছিল

অতসী ফুলগাছের ঝাড়। মোটাসোটা চেহারার ডাক্তারবাবু ধুতি আর ফতুয়া পরে ঐ বাগানে জল দিতে দিতেই অনেক সময় রুগীদের অসুখের বিবরণ শুনে নিদান দিতেন। রাজেন ডাক্তারের এক ছেলের নাম ছিল বিকু, ব্যাডমিন্টনে কোর্ট, সাদা প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা ছিপছিপে ঝকঝকে চেহারার বিকু সেখানে ছোট ছোট ছেলেদের ট্রেনিং দিত, এ বাড়ির মেয়েরাও ব্যাডমিন্টন খেলতো নিয়মিত, তাদের খেলা দেখতে ভিড় জমে যেত এখানে। একটি মেয়ের নাম ছিল মল্লিকা, সে ছিল লক্ষ্মী ট্যারা, সে মামুনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি হতো খুব। সব মনে পড়ে যাচ্ছে...।

রাজেন ডাক্তার কি এখানেই মারা যান? বিকু, মল্লিকা....তাদের দীর্ঘশ্বাস কি এ বাড়ির আনাচে কানাচে রয়ে গেছে? বাড়িটা পুরোপুরি অন্ধকার নয়, ভেতরে কোথাও যেন মিটমিট করে জ্বলছে একটা প্রদীপ বা মোমবাতি। এখানো কেউ থাকে এখানে? মামুনের ইচ্ছে হলো সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখেন। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি তাঁর চেনা। কিন্তু মামুনের ভয় করলো।

এরপর বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা হারিয়ে ফেললেন মামুন। সব রাস্তাই যেন অন্ধকার অন্ধকার লাগে। যেন পুরো শহরটাই অতীতে ডুবে গেছে। রাস্তায় দু'একটি লোক চরাচল করছে, তাদের জিজ্ঞেস করবেন সেগুনবাগিচা কোন দিকে? মামুনের লজ্জা হলো, ঢাকা শহরটা তাঁর এত চেনা, অথচ তিন পথ চিনতে পারছেন না? এক সময় টানা আড়াই বছর তিনি চাকরি করছেন ঢাকায়।

শেষ পর্যন্ত কারুকে জিজ্ঞেস না করেই, অনেক পথ ঘুরে তিনি পৌঁছে গেলেন সেগুনবাগানে। দোতলায় হারমোনিয়ামের সুর আর গান শোনা যাচ্ছে। ওপরে এসে দেখলেন আজ বাইরের কোনো গায়ক বা আড্ডাধারী আসেনি, দুলাভাইও নেই সেখানে, আজ বসেছে অল্প বয়েসীদের আসর। মঞ্জু গান গাইছে হারমোনিয়াম বাজিয়ে, তার সামনে বসে আছে তারই কাছাকাছি বয়েসী আর তিনটি ছেলেমেয়ে।

দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মামুন একটুক্ষণ শুনলেন। মঞ্জু শুধু দেখতেই সুন্দর হয় নি, বেশি মিষ্টি গানের গলা তো! সে গাইছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে!"

মামুনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। দিনকাল কত তাড়াতাড়ি পাল্টে যাচ্ছে। বছর কুড়ি আগেও ঢাকায় এইসব পরিবার কত রক্ষণশীল ছিল! বয়েসী কোনো মেয়ে বেনী দুলিয়ে প্রেমের গান গাইছে, সামনে দুটি অপরিচিত যুবক, এ দৃশ্য তখন কল্পনাও করা যেত না। শিক্ষিত হিন্দুদের বাড়িতে, বিশেষত ব্রাহ্মদের বাড়িতে অবশ্য এসবের চল ছিল। তারা এখন নেই, নতুন কালের ছেলেমেয়েরা সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে। অচেনা একটি ছেলে মাঝে মাঝে গলা মেলাচ্ছে মঞ্জুর সঙ্গে।

ওরা হয়তো মামুনকে দেখে অস্বস্তিবোধ করবে, তবু মামুনের চলে যেতে পা সরলো না। একবার তার সঙ্গে মঞ্জুর চোখাচোখি হতেই মামুন অপ্রস্তুতের হাসি দিয়ে বললেন, আমি তোদের মধ্যে এসে বসতে পারি?

মঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে মামুনের হাত ধরে টেনে বললো, আসেন, আসেন। আপনিও তো গান জানেন, আপনি আমাদের গান শোনাবেন।

এই যৌবনের সাহচর্যে মামুনের মন হালকা হয়ে গেল। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, অকারণ হাসি, এসব শুধু যৌবনেই সম্ভব।

অনেক গান হলো, মামুনও গাইলেন কয়েকখানা। অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে দু'জন শামসুল আলমের আত্মীয়। একজন তাঁর খুড়তুতো ভাইয়ের মেয়ে, আর একজন পিসিমার ছেলে। ওদের নাম নাজমা আর রশীদ। আর একটি ছেলের নাম পলাশ, সে রশীদের বন্ধু। ওরা সবাই এসেছে কলকাতা থেকে, কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মামুন বুঝে গেলেন মঞ্জুর কেন কলকাতার কলেজ গিয়ে পড়ার আগ্রহ। তিনি কবি মানুষ, মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক চর্চ করে টের পেয়ে যান। মঞ্জুর সঙ্গে রশীদের সেইরকম একটা সম্পর্ক। স্থাপিত হয়ে গেছে, দু'জনে দু'জনের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকায়।

মামুন ভাবলেন, আহা রে, ওরা যেন কষ্ট না পায়। এই বয়েসের কষ্টে বুক ভেঙে যায় একবারে!

পলাশ নামের ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে কথায় কথায় পুরোনো পরিচয়ের সূত্র বেরিয়ে পড়লো। পলাশের বাবার নাম সুরঞ্জন ভাদুড়ী, তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন মামুন। নাজিমুদ্দিন রোডে কাজী আবুদুল ওদুদের জোহরা মঞ্জিলের পাশেই ছিল ওঁদের বাড়ি। সে বাড়ির নাম ছিল শান্তিকুটির। কী গমগমে গানের গলা ছিল সুরঞ্জনবাবুর, একেবারে পঙ্কজ মল্লিককেও হার মানিয়ে দিতেন। এই

বাড়িতেও তিনি আসতেন নিয়মিত।

খোঁজখবর নিয়ে জানলেন যে সুরঞ্জন ভাদুড়ীদের কোনো ট্রাজেডির শিকার হতে হয়নি, সময় মতন বাড়ি বদল করে চলে গেছেন। তাঁরা পেয়েছেন কলককাতার পার্ক সার্কাসের একটি ভালো বাড়ি, রশীদদের বাড়ির কাছেই। সেই জন্যই রশীদের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব। রশীদরা ঢাকায় আসছেন শুনে সুরঞ্জন ভাদুড়ী তাঁর ছেলেকে বলেছেন, যা, তুইও ঘুরে আয়। নিজের জন্মভূমিটা একবার দেখবি না?

পলাশ তাদের প্রাক্তন বাড়িতে রশীদের সঙ্গে গিয়েছিল এর মধ্যে। সে বাড়ির বর্তমান মালিক তাকে খুব খুব খাতির যত্ন করেছেন, একেবারে অন্দর মহলে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন সব কিছু। খাইয়েছেন খুব। বর্তমান মালিকও তো একসময় কলকাতার লোক ছিলেন, তাই পলাশদের পেয়ে তিনি মেতে উঠেছিলেন পুরোনো গল্পে।

এসব কথা শুনে মামুনের খুব ভালো লাগলো। সুরঞ্জন ভাদুড়ী তাঁর প্রিয় গায়ক ছিলেন, এখন তিনি কলকাতা বাংলা সিনেমায় সুর দেন। ছেলেটিরও গানেওর গলা বেশ।

একসময় মালিহা বেগম এসে খাওয়ার তাড়া দিলেন সকলকে। রশীদরা উঠেছে তাদের অন্য এক আত্মীয়ের বাড়িতে, আজ রাতে এখানে খেয়ে যাবে। একসঙ্গে খেতে বসলো সকলে। মামুনে দিদি নিজে রান্না করেছেন, তাঁর রান্নার হাত অপূর্ব।

প্রথমে বিরিয়ানি পাতে পড়তেই মামুন সংকীর্ণ চেখে পলাশের দিকে তাকালেন। এই বিরিয়ানির মধ্যে রয়েছে বড় গোস্ত। তাঁর হঠাৎ পুরোনো একদিনের কথা মনে পড়লো।

তিন বললেন, আপা, পলাশকে বিরিয়ানি দিও না। ওর জন্য অন্য কিছু করো নি?

মালিহা হাতা দিয়ে বিরিয়ানি তুলতে গিয়েও অপ্রস্তুত হলেন।

রশীদ বললো, না, না, ঠিক আছে। ও খায়!

পলাশ বলল, ঠিক বলছেন তো? আমি বিফ খাই। রশীদদের বাড়িতে কতবার খেয়েছি।

মামুন তাঁর দিদির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপা, তোমার মনে আছে?

মালিহা চোখ দিয়ে একটা ইসারা করলেন, যাতে মামুন ঐ সব প্রসঙ্গ এখন তোলেন।

মামুন কিছু বললেন না, কিন্তু মনে পড়া তো আটকানো যায় না। এই পলাশের বাবা সুরঞ্জন ভাদুড়ী এ বাড়িতে কত এসেছেন, কত গান গেয়েছেন, ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু এ বাড়িতে কোনোদিন তাঁকে কোনো খাবার খাওয়ানো যায় নি। গোরুর মাংস তো দূরের কথা, সামান্য কোনো মিষ্টি বা এ গেলাস পানিও মুখে তোলেন কি কখনো। অন্যরা খাচ্ছে, সেই সময় তাঁকে কিছু খাওয়াবার প্রস্তাব দিলেই হাত জোড় করে বলতেন, এ টা মাপ করবেন। বামুনের ছেলে, আর কিছু না মানি, শুধু এইটুকু মানি, অন্যের বাড়িতে কিছু খাই না।

প্রত্যেকবার এই কথাটা শোনা মাত্র তাঁর গানের সুরের রেশ কেটে যেত!

মামুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, মাত্র একটা জেনারেশন। আর এক জেনারেশন আগে যদি এরকম মেলামেশা থাকতো, যদি খাদ্যের বাছবিচার কিংবা ছোঁওয়াছিনির ব্যাপার না থাকতো, তা হলে সুরঞ্জন ভাদুড়ীর মতন মানুষদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হতো না।

কারণটা খুব সামান্য মনে হয়, কিন্তু এই সব অনেক সামান্য কত বীজ থেকেই তো বিষবৃক্ষ জন্মায়। আস্তে আস্তে বাড়ে। অবিশ্বাস আর ভুল বোঝাবঝির সার-পানি পেয়ে তা একদিন মহীরুহ হয়।

হাত গুটিয়ে, খাওয়া বন্ধ করে মামুন চেয়ে রইলেন এই নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের দিকে।

॥ ৩৩ ॥

বেশ তাড়াতাড়িই শীত পড়ে গেছে এবার। সকালের রোদ্দুর বড় মধুর লাগে। এ বাড়িতে কানুল নামে একটা ছোকরা চাকর আছে, সে কোথা থেকে যেন প্রত্যেক ভোরবেলা জোগাড়ে করে আনে এক কলসী খেজুরের রস। কী ঠাণ্ডা আর সুস্বাদু সেই রস, এর তুলনায় কোথায় লাগে বোতলের মিষ্টি পানি!

কিন্তু মানুষের দিদির ছেলেমেয়েরা অনেকেই এই রস খেতে চায় না। তাদের নাকি কী রকম গন্ধ লাগে। মামুন শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়! ছেলেমেয়েগুলো একেবারে শহুরে হয়ে গেল। ওরা কোকা কোলার খুব ভক্ত। এই মার্কিন পানীয় একেবারে দেশ ছুয়ে ফেলেছে। প্রথম প্রথম যখন আসে, তখন লোকে কত রকম ভাবেই না উচ্চারণ করতো এই নাম, খোকা কোলে, চোচা চুলা কোচা খোলা, চোকা চোলা আরও কত কী! মামুন নিজে দু'এক বার খেয়ে দেখেছেন এমন কিছু আহা মরি স্বাদ পান নি।

মার্কিন জিনিসপত্র ছেয়ে যাচ্ছে দেশ। মার্কিনী সিনেমার প্রভাবে মার্কিনী ধাঁচে পোশাক-আসাক পরতে শুরু করেছে যুবক-যুবতীরা। গ্রামের নব্বই ভাগ মানুষ এখনো দু'বেলা খেতে পায় না, শহরের

মানুষ বিদেশ থেকে আমদানি করা বিস্কুট দিয়ে চা খায়।

মামুনের মেয়ে হেনা অবশ্য রস ভালোবাসে। ফুটফুটে সুন্দর মুখখানির তার, সে মায়ের রং পেয়েছে, সবাই তার গাল টিপে আদর করে বলে, ঠিক পুতুলের মতন! এই কথাটা বারবার শুনতে শুনতে মামুন ভাবেন, বেশির ভাগ মানুষেরই কল্পনা শক্তি কত কম। সবাই 'পতুলের মতন' বলে কেন, মানুষকে পতুলের মতন দেখতে হলে কী সুন্দর বোঝায়?

এ বাড়িতে হেনার কাছাকাছি বয়েসের আরও ছেলেমেয়ে থাকলেও সে বেশির ভাগ সময় বাবার কাছ ঘেঁষে থাকে। রাত্তিরে বাবার সঙ্গেই শোয়। দিনের বেলা মামুন বাইরের ঘরে অন্যদের সঙ্গে গল্প করার সময়েও হেনা বারেবারেই একটা পড়ার বই নিয়ে ছুটে আসে, বলে আব্বু, এই কথাটার মানে বলে দেন!

সকালবেলায় মামুন হেনা আর সমবয়েসী বাবলিকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন। হাঁটতে হাঁটতে চলে যান বেশ অনেকটা দূরে, ফেরেন রিকশাতে। ঢাকা শহরটাকে যেন তিনি নতুন করে চিনছেন।

একদিন সকালে মঞ্জু বললো, মামু, আমি একটু যাবো আপনার সাথে?

মামুন বললো,. হ্যাঁ, চল না!

মঞ্জু বললো, আপনি তাহলে একটু আম্মুকে বলেন। আমি চাইলে আম্মু মত দেবে না।

মামুন দিদিকে জানিয়ে মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন। একটা আকাশী নীল শাড়ী পরেছে মঞ্জু, সেই রঙের ব্লাউজ, চোখে সূক্ষ্ম সূর্মা টানা, কপালে একটা লাল টিপ। প্রাতঃভ্রমণের পক্ষে একটু বেশিই সাজগোজ মনে হয়। মামুন মনে মনে হাসলেন। মঞ্জুর নিশ্চয়ই একটা কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। মামুনের দিদির বাড়ি অনেক ব্যাপারে প্রগতিশীল হলেও বাড়ির মেয়েদের এখনো একা রাস্তায় বেরুবার অনুমতি দেওয়া হয় না। কলকাতার রাস্তায় যেমন মেয়েদের হাঁটতে দেখা যায়, ঢাকায় এখনো সে রকম নয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মামুন ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোন দিকে যাবো, বিলকিসবানু?

মঞ্জু কিছু বলার আগেই হেনা বললো, আব্বু নদীর দিকে চলেন।

বুড়ি গঙ্গার ঘাটে অনেক নৌকা বাঁধা থাকে, বড় বড় স্টিমার ভোঁ ছাড়ে, একদিন সেইসব দেখে হেনার খুব পছন্দ হয়েছিল।

মঞ্জু বললো, না, না, ওদিকে না, ধানমণ্ডির দিকে যাবো, ওদিকে সুন্দর সুন্দর বাগান আছে।

মামুন আবার মুচকি হাসলেন। তিনি ঠিকই ধরেছেন। শহীদ পলাশরা ঐ ধানমণ্ডিতেই এক বাড়িতে উঠেছে। গত তিন-চারদিন শহীদরা এদিকে আসে নি, এর মধ্যেই কিছু ঘটেছে নাকি? কাল সারাদিন দিদির মুখখানা ভার ভার দেখাচ্ছিল। কলকাতার ছেলেরা আবার বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলে নি তো?

মামুন মঞ্জুকে তবু বললেন, কেন, চল না, নদীর দিকেই যাই!

মঞ্জু করুণ মুখ করে বললো, না মামু, ধানমণ্ডির দিকে গেলেই ভালো লাগবে, চলেন না, দেখবেন কত নতুন বাড়ি উঠেছে।

-অতদূর হেঁটে যেতে পারবি, না রিক্‌শা লাগবে?

-হেঁটেই যাবো!

মঞ্জু একা কখনো রাস্তায় না বেরুলেও সে রাস্তা চেনে। সে-ই পথ দেখিয়ে আগে আগে চললো।

এক সময় ঢাকায় ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা ছিল প্রচুর। টাঙ্গাচালক কুট্টিরা ছিল এক চতুর প্রজাতি। কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ছিল তাদের, অবশ্য তাদের অনেক রসিকতাও ফিরতো লোকের মুখে মুখে। স্বাধীনতার পর সেই কুট্টিরা দ্রুত অপসৃত হয়ে গেল, তাদের জায়গায় এসেছে সাইকেল রিকশা। রাস্তা একেবারে ভরে গেছে সাইকেল রিকশায়। এদের জন্য সহজে রাস্তা পার হওয়া যায় না। তবু কলকাতার মানুষ-টানা রিকশার চেয়ে এই রিকশা অনেক ভালো। মামুনের মনে আছে, তাঁর ছাত্র বয়েসে কলকাতার অধিকাংশ রিকশা টানতো বিহারী মুসলমানরা। মামুন কক্ষনো কলকাতায় রিকশা চাপতেন না!

মঞ্জু বেশি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে, সে তার ধৈর্য ধরতে পারছে না বোধহয়, মামুন এগিয়ে তার পাশে গেলেন। মঞ্জুর সরল মুখখানিতে ব্যগ্রতা আর অস্থিরতা মাখানো। তার চোখ দুটি ছুটন্ত হরিণীর মতন। ছুটন্ত হরিণীর চোখ কেমন হয় মামুন কখনো দেখেন নি, তবু এই উপমাটাই মনে পড়লো তাঁর। মঞ্জুর মুখের সঙ্গে হরিণীর মুখের একটু মিল আছে ঠিকই।

-কি রে, মঞ্জু, তুই এখনো কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়ার বায়না ধরে আছিস নাকি? মঞ্জু তার

টলটলে চোখ দুটি মামুনের দিকে ফিরিয়ে বললো, জী!

-তুই তো বড় জেদী মাইয়া দেখি! কেন, কলকাতার ওপরে তোর এত টান কেন?

-আমার ইচ্ছা করে।

মঞ্জুর ওপর মামুনের যথেষ্ট স্নেহ থাকলেও তিনি তার এই ইচ্ছেটা সমর্থন করতে পারছেন না। দেশ স্বাধীন হয়েছে, মুসলমানরা তাদের দাবি মতন পাকিস্তান পেয়েছে, এখন এখানকার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে বিদেশে যাবে কেন? এ দেশে কি ইস্কুল কলেজ নেই। উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে হয় তো সে আলাদা কথা! তবু এ দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ছেলেমেয়েদের সামান্য স্কুল-কলেজের লেখাপড়ার জন্যই পাঠাচ্ছে বিলেত-আমেরিকায়। ফরেন এক্সচেঞ্জের শ্রাদ্ধ হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানী বড়লোকেরা তো পাঠাচ্ছেই, বাঙালীদেরও উৎসাহের কমতি নেই। মুখে বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য কত দরদ, কিন্তু নিজের সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবার জন্য একেবারে পাগল! যাদের বিলেত-আমেরিকায় পাঠাবার সামর্থ নেই, তারা ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছে ইণ্ডিয়ার পাবলিক স্কুলে, দার্জিলিং-এ আজমীরে। মামুনের পরিচিত, আওয়ামি লীগের প্রথম সারির নেতা আতাউর রহমান খানই তো তাঁর দুই ছেলেকে পাঠিয়েছেন শিলং-এ।

মামুন গলায় অভিভাবকসুলভ গাম্ভীর্য এনে বললেন, না মামনি, যদি পড়তে চাও, তোমাকে ঢাকাতেই পড়তে হবে।

মঞ্জু বললো, আমি আরও কেন ঢাকায় পড়তে চাই না জানেন? এখানে থাকলে আমার পড়াই হবে না।

-কেন, ঢাকায় কি অন্য মেয়েরা পড়ছে না? কত মেয়ে এখান থেকে দুর্দান্ত রেজাল্ট করে বেরিয়েছে।

-আপনি আমাদের বাড়ির মানুষদের চেনেন না। যেদিন থেকে আমি শাড়ী পরতে শুরু করেছি, সেদিন থেকে আমার নানা-নানীর আর্জির...

বলতে বলতে থেমে গেল মঞ্জু। লজ্জায় তার গালদুটিতে অরুণাভা এলো; আবার চোখের কোণেও যেন অশ্রু চিক চিক করলো।

মামুন তার মাথায় হাত রেখে বললেন, সবাই বিয়ের কথা বলেন তো? বিয়ের পরেও তো তুই লেখাপড়া করতে পারিস!

মঞ্জু মুখ ফিরিয়ে বললো, না!

মামুন একটু অবাক হয়ে গেলেন। মঞ্জু বিয়ে করতে চায় না? সতেরো বছর বয়েসে হয়েছে, এই বয়সে থেকেই তো মেয়েরা বিয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। শহীদ বলে ছেলেটার সম্পর্কে ওর যে টান হয়েছে, সেটা কি অন্য কিছু?

পর মুহূর্তেই মামুন আত্মসমালোচনা করলেন। তিনিই বা কেন মঞ্জুর এক্ষুনি বিয়ে দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা সমর্থন করছেন? তিনি কি মনে বুড়োটে হয়ে গেছেন! এই বয়েসী মেয়ের তো আরও কত রকম স্বপ্ন থাকতে পারে! মঞ্জুর নানা-নানীর দলের পক্ষ নেওয়া তো তাঁকে মানায় না।

ধানমণ্ডিতে এসে মঞ্জু ঠিক স্থির লক্ষ্যেই চললো। সোজা একটি বাড়ির সামনে এসে থেমে বললো, মামু, একটা হোসেনচাচার বাড়ি। আপনি হোসেনচাচারে চেনেন না?

মামুন তাঁর জামাইবাবুর আত্মীয় শাখাওয়াতে হোসেনকে একটু-আধটু চেনেন। মঞ্জুর কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, এখন এই বাড়ির মধ্যে যাওয়াই তাঁর কর্তব্য।

বাড়ির দরজার কাছে যাবার আগেই সে-বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে একটি যুবক চেঁচিয়ে বললো, মঞ্জু এসো, এসো!

মামুনের বুকটা একবার ধক করে উঠলো। ছেলেটি শহীদ নয়, পলাশ। এত সকালে সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে কি জানতো যে মঞ্জু আজ সকালে আসবে? আগে থেকে ওদের মধ্যে কথা হয়ে ছিল! শহী কোথায়? তিনি ভেবেছিলেন, শহীদের সঙ্গেই মঞ্জুর মনের আদান প্রদান হয়েছে! তা হলে কি মঞ্জুর মনের মানুষ শহীদ নয়, পলাশ? এই ছেলেটির গানের গলা ভালো। এ সেদিন মঞ্জুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইছিল। মঞ্জু যদি এরকম একটা সাংঘাতিক ভুল করে বসে, তা হলে তার পরিণতি কী হবে?

আবার মামুন আত্মসমালোচনা করলেন। সত্যিই কি তিনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন? এতকাল তিনি নিজেকে মানবতাবাদী মনে করতেন, তাহলে তিনি শহীদ আর পলাশের মধ্যে তফাত করছেন কেন? দুজনেই যুবক, দু'জনেই মঞ্জুর প্রেমিক হবার যোগ্যতা আছে, তবু তিনি পলাশকে অপছন্দ করছেন,

সে হিন্দু বলে?

মামুন নিজেই এর উত্তর তৈরি করে মনকে বোঝালেন, আমার পছন্দ-অপছন্দ তো কিছু আসে যায় না! মঞ্জুর মনের মানুষ যদি শহীদের বদলে পলাশ হয়, তা হলে দু'পক্ষেই অনেক গোলমালের সৃষ্টি হবে! মঞ্জু তা সহ্য করতে পারবে তো?

দরজা খুলে দিল পলাশ, কিন্তু সে একা নয়, শহীদকেও ডেকে এনেছে। যুবক দুটি মঞ্জুর দিকে নজর না দিয়ে মামুনকেই বেশি খাতির করে বললো, আসুন,মামুনমামা, আসুন।

মামুন তবু অস্বস্তি বোধ করলেন। শাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যৎসামান্য বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এরকম হুট করে তাঁর বাড়িতে এসে পড়া মানুনকে মানায় না। বিশেষত এত সকালে। এখন এঁরা নিশ্চয়ই নাস্তা করে যেতে বলবেন। এই বয়েসে তিনি কি প্রেমের দূতিয়ালির ভূমিকা নিচ্ছেন?

শহীদ বললো, মামুনমামা, আমরা গোয়ালন্দ গিয়েছিলুম। দারুণ লাগলো।

পলাশ বললো, স্টিমারে করে রিভারর্জানি, একেবারে ফ্যান্টাস্টিক! আমরা তো এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স আগে কোনোদিন হয় নি। মঞ্জুকে কত করে বললুম আমাদের সঙ্গে যেতে!

মামুন আড় চোখে তাকালেন মঞ্জুর দিকে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকিয়ে আছে শহীদের দিকে। একেবারে নিষ্পলক দৃষ্টি।

মামুনের আবার খটকা লাগলো। তবে কি একটু আগে তিনি ভুল বুঝেছিলেন? পলাশ যে-ভাবে দোতলার বারান্দা থেকে মঞ্জু বলে চেঁচিয়ে উঠলো, এদিককার কোনো ছেলে কোনো অনাত্মীয় মেয়েকে ওরকমভাবে ডাকে না। পলাশের ঐ অতি-আগ্রহ, তা কি নিজের জন্য নয়, বন্ধুর জন্য?

মামুনকে বাইরের বসার ঘরে বসিয়ে মঞ্জু চলে গেল আন্দরমহলে। দু'চার কথা বলে পলাশ' আর শহীদও সরে পড়লো। হেনা আর বাবলি বসে রইলো মামুনের গা সেঁটে।

মামুনকে বাইরের বসবার ঘরে বসিয়ে মঞ্জু চলে গেল অন্দরমহলে। দু'চার কথা বলে পলাশ আর শহীদও সরে পড়লো। হেনা আর বাবলি বসে রইলো মামুনে গা সেঁটে।

মামুন ওদের বললেন যা ভিতর যা দিদির সঙ্গে যা!

হেনা আর বাবলি যেতে চায় না। ওরা শিশু হলেও বুঝেছে যে মঞ্জু আপা এখন ওদের দিকে মনোযোগ দেবে না। অচেনা বাড়িতে ওরা আর কার কাছে যাবে?

একটু পরেই চটি ফটফটিয়ে শাখাওয়াত হোসেন এলেন সেই ঘরে। এককালে রোগা পাতলা ছিলেন, এখন বিরাট হৃদপুষ্ট চেহারা। পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর একটা বেশি দামি শাল। হোটেলের ব্যবসায় তিনি রাতারাতি ধনী হয়েছেন, এতবড় বাড়ির মালিক হয়েছেন মাত্র দু'বছরের মধ্যে, জাপানী গাড়ি কিনেছেন।

মামুনকে সাদর সম্ভাষণ করে তিনি বললে, কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য, আপনার মতন মানুষ পায়ের ধূলি দিয়েছেন আমার বাড়িতে! কী সংবাদ কেন? আপনার কোন সেবায় লাগতে পারি?

সত্যিকারের অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়লেন মামুন। অসময়ে কারুর বাড়িতে এলে এটা ভাবাই তো স্বাভাবিক যে কোনো জরুরি কথা আছে। ওঁর সঙ্গে মামুনের এমন কিছু বন্ধুত্বও নেই যে বলবেন, এমনিই আপনার খবর নিতে এলাম। মঞ্জু তাঁকে সত্যি বিপদে ফেলে দিয়েছে।

আমরাত আমতা করে মামুন বললেন, অনেকদিন পরে দেখা হলো। আপনার শরীর কেমন? আপনি কেমন?

মামুন বললেন, আমার ব্লাড পেশার কিছুটা হাই। তবে ওষুধপত্তর কিছু খাই না। থানকুনি পাতার রস খাই আপনিও খেয়ে দেখতে পারেন, ওতে ওগারও কমে।

হোসেন সাহেব সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন। এই সকালবেলা বাড়ি বয়ে মামুন কি এইসব আলোচনা করার জন্য এসেছেন?

মামুনও বুঝতে পারলেন, তাঁর বোকামি হচ্ছে। কিন্তু তিন কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা নাম মনে পড়লো। আলতাফ! আলতাফের সঙ্গে এঁর কী যেন একটা পারিবারিক সম্পর্ক আছে। এঁকে আলাতাফ হোটেলওয়ালা হোসেন বলে উল্লেখ করেছিল।

মামুন এবারে খানিকটা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আলতাফের কাছে আপনার অনেক কথা শুনেছি।

কিন্তু এর ফল হলো বিপরীত। হোসেন সাহেবের ভুরু আরও কুঁচকে গেল। তিনি নীরস গলায় বললেন, আলাতাফ মানে, আমার ভাইয়ের ব্যাটা আলাতাফ? তারে আপনি চেনলেন ক্যামনে?

-সে মাদারিপুরে আমার বাড়িতে গিয়েছিলন। খুব ভালো ছেলে।

-সেভারে তো আমি দুই চক্ষে দ্যাখতে পারি না। সে কী কইছে আমার সম্পর্কে?

-আপনার অনেক প্রশংসা করছিল।

-কিন্তু তার সাথে তো আমি কোনো সম্পর্ক নরাখি না। আমার বাড়িতেও তারে আসতে মানা করছি।

-সে কি? কেন? আমার তো ছেলেটিকে বেশ পছন্দ হয়েছে।

-আপনি তা হলে ওদের ভালো করে চেনেন না। ওরা পাকিস্তানে দুশমন। ঐ সব মতিচ্ছন্ন ছেলেদের জেলে ভরে রাখা উচিত।

-কিন্তু আপনি ওদের পার্টি ফাণ্ডে মোটা চাঁদা দিয়েছেন শুনেছি। মাঝে মাঝেই দ্যান।

-তা দেই, সে অন্য কথা। ব্যবসা করে খেতে হয়, তাই চান্দা দিতে হয়। আপনিও ওদের দলে আছেন নাকি? ওরা তো কমুনিস্ট!

মামুন দুর্বল ভাবে হেসে বললেন, না, এটা বোধহয় আপনি ঠিক বলছেন না। ওরা তো যুব লীগ করে।

হোসেন সাহেব জোর দিয়ে বললেন, শোনেন, আপনারে আমি বুঝায়ে বলি। বরিশালে কমুনিস্টদের স্থানীয় জনসাধারণ পিট্টি দিয়েছিল, সে কথা জানেন তো? এখন কমুনিস্টগুলো আণ্ডার গ্রাউণ্ডে গেছে। ওদের মধ্যে অনেক হিন্দু আছে, তারাই আলতাফের মতন বলদগুলোর ক্ষ্যাপায়। এখন ওরা তলে সব আওয়ামীলীগের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওদের জন্যই তো আয়ামি মুসলিম লীগ থেকে থেকে কথাটা বাদ হয়ে গেল!

মামুন এবারেও ক্ষীণ আপত্তি করে বললেন, মৌলানা ভাসানী নিজেই তো ঐ প্রস্তাব করেছেন। আসলে ব্যাপারে কী জানেন, মুসলিম লীগের সঙ্গেই তো আমাদের লড়তে হবে, তাই আওয়ামি দলেও মুসলিম নামটা থাকলে কনফিউশান হয়।

-শুধু এই জন্য?

-তাছাড়া দলটার একটা অসাম্প্রাদায়িক চেহারা হলে সংখ্যালঘুদেরও দলে পাওয়া যাবে। দল আরও শক্তিশালী হবে।

-আমি আপনাকে বলি শুনে রাখেন ঐ বুড়ো ভাসানীও একটা কমুনিস্ট!

মামুন এককথায় হেসে উঠলেন। হোসেন সাহেবের মুখখানি কিন্তু অতি কঠোর হয়ে আছে। তিনি হাসির উত্তর না দিয়ে বললেন, ওদের হাতে পাওয়ার গেলে পাকিস্তানের সর্বনাশ হবে। যারা এখানে বসে কেকুলারিজমের কথা বলে তারা পাকিস্তানের দুশমন। পার্টিশন হইল ক্যান? আবার কি আপনারা ইণ্ডিয়ার সাথে মার্জ করতে চান? সত্য করে বলেন তো!

-না, মোটেই তা চাই না! সে প্রশ্নই ওঠে না।

-তবে! তাইলে এইসব কথা ওঠে কী ভাবে? আপনার বাঙালী বাঙালীর রব তোলেন, শুনে আমার গা জ্বলে যায়। বাঙালী হয়ে এতকাল তো আমরা হিন্দুদের হাতে কচুপোড়া খেয়েছি। এখন আমাদের হতে প্রকৃত পাকিস্তানী।

মামুন এমন তর্কের মধ্যে যেতে চান না। আলতাফের প্রসঙ্গ তুলে তো আরও বিপদ হলো! হোসেন সাহেবের মতন মানুষ তিনি আরও দেখেছেন। নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য হাত পেয়ে যারা হঠাৎ বড়লোক হয়েছে, তারা এখন মুসলিম লীগের কট্টর সমর্থক।

কথা ঘোরাবার জন্য তিনি বললেন, আপনার বাড়িতে ইণ্ডিয়া থেকে গেস্ট এসেছে দেখলাম।

হোসেন সাহেব বললেন, হ্যাঁ। কলকাতায় আমার কিছু প্রপার্টি আছে, ওরা দেখাশুনা করে।

-কলকাতায় গেছেন নাকি এর মধ্যে?

-গেছি দুই তিন বার।

-আমি স্বাধীনতার পর আর কলকাতায় যাই নাই। কেমন দেখলেন কলকাতার অবস্থা?

-খুব খারাপ। তারচেয়ে আমাদের ঢাকা শহর অনেক ভালো। দেখবেন, আর কিছুদিনের মধ্যে কলকাতা একেবারে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে, আমাদের ঢাকার আরও উন্নতি হবে।

এরপর আমার মামুন কথা খুঁজে পেলেন না। কী ভাবে আলাপ চালিয়ে যাবেন বুঝতে পারছেন না।

হোসেন সাহেব কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি মানুষ, সুতরাং তিনি ধরেই নিয়েছেন যে মানুনও কোনো কাজের কথা বলার জন্যই এসেছেন।

তিনি মামুনের চোখে চোখ ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর বলেন?

মামুন ভাবলেন, এবারে আত্মসমর্পন করাই ভালো। সত্যি কথাটা বলে ফেললেই অস্বস্তিমুক্ত হওয়া যায়।

তিনি বললেন, ভোরবেলা বেড়াতে বেড়াতে এইদিকে এসেছিলাম। আপনাদের এদিকে সুন্দর সুন্দর নতুন বাড়ি উঠেছে। আমার আপার মেয়ে মঞ্জু, তাকে চেনেন তো, সে বললো, একবার আপনার বাড়িতে কার সঙ্গে একটু দেখা করে যাবে, তাই আমিই..

হোসেন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে কাঠিন্যের আবরণটা সরিয়ে ফেলে বললেন, এ তো আমার সৌভাগ্য! আপনি নিজে থেকে এসেছেন...কী খাবেন বলেন।

মামুন বললেন, এখন কিছু খাবো না, এক কাপ চা।

-সে কি, গরিবের বাড়িতে এসেছেন, সামান্য কিছু নাস্তা করবেন আমাদের সঙ্গে। এই ছোট মেয়েদুটিরে এখানে বসায়ে রেখেছেন কেন? ওদের দেখি মুখ শুকায়ে গেছে। এই আবদুল-

এরপর তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আপ্যায়নের জন্য। শুরু করে দিলেন হাঁক ডাক। হোসেন সাহেব ব্যস্ত মানুষ, একটু পরেই তাঁর বেরুবার কথা ছিল। কিন্তু অতিথি সৎকারের জন্য তিনি খানিকটা সময় নষ্ট করতেও দ্বিধা করলেন না।

প্রথমে একবার চা এলো। তারপর হোসেন সাহেব মামুনের সামনেই নামাজ পড়তে বসলেন। বিশেষ বিশেষ উৎসব ছাড়া মামুন প্রতিদিন নামাজ পড়তে বসে গেলেন।

নাস্তা শেষ করার পর মঞ্জু এসে বললো মামু ওরা গাড়ি করে সোনার গাঁওয়ে যাচ্ছে। আমাকেও যেতে বলছে সাথে। আমি যাবো?

মামুন চমকে উঠলেন। মঞ্জু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছে না? এখন সোনার গাঁও গেলে ফিরতে অনেক দেরি হবে। দিদি যদি রাগ করেন? দিদির বাড়িতে কী নিয়ম তিনি জানেন না ঠিক। তিনি মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, দায়িত্ব তাঁর।

তিনি বললেন, না মামণি, এখন বাড়ি চলো। অন্যদিন যেও!

মঞ্জুর মুখখানা ম্লান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শহীদ বললো, কেন মামা, ও চলুক না আমাদের সঙ্গে। দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসবো।

মামুন জিজ্ঞেস করলে, হঠাৎ সোনার গাঁও যাবে কেন?

-এমনিই বেড়াতে যাবো। কাদের ভাই বলছেন, গাড়িটা পাওয়া যাবে। মঞ্জুকে আমরা বাড়ি পৌঁছে দেবো।

-আর কে যাবে?

-আমরা সবাই যাবো। নাদেরা যাবে, মনিরা যাবে...।

হোসেন সাহেব ওপরে উঠে গেছেন, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা মামুনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। মামুন মঞ্জুকে দেখলেন।

তিনি একটু দৃঢ় হয়ে বললেন, না, বাড়িতে বলে আসা হয় নাই, মঞ্জুর না যাওয়াই ভালো।

পলাশ খুব সহজ সমাধানের ভঙ্গিতে বললো, আপনি তো বাড়িতে ফিরছেন। আপনি বাড়িতে জানিয়ে দেবেন। আমাদের গাড়িতে মঞ্জুর জায়গা হয়ে যাবে!

ব্যাপারটা তো এত সহজ নয়। তাঁর দিদি-জামাইবাবু কী ভাবে গ্রহণ করবেন, তা মামুন জানেন না।

মামুনের মনটা দু'ভাগ হয়ে গেল। একদিকে তিনি মঞ্জুর গুরুজনশ্রেণীর এবং অভিভাবক। অন্যদিক তিনি কবি মামুন। কয়েকটি অল্প ছেলেমেয়ে এই চমৎকার শীতের সকালে গাড়ি চেপে হইচই করে বেড়াতে যাবে, কবি মামুন হিসেবে এতে তার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কী দোষ আছে এতে? খানিকটা বেহিসেবী এতে তার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কী দোষ আছে এতে? খনিকটা বেহিসেবী উচ্ছলতাই তো যৌবনের স্বভাবধর্ম। আবার অভিভাবক হিসেবে তাঁর মনে হচ্ছে, বিবাহযোগ্য মেয়েকে এরকম যখন তখন ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।

শহীদ আর পলাশরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলো বারবার। শেষ পর্যন্ত মামুন সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে যা। দিদিকে আমি বুঝিয়ে বলবো। হেনা আর বাবলিকেও সঙ্গে নিয়ে নে!

মঞ্জুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শহীদ আর পলাশ একসঙ্গে বলে উঠলো, হু-রে-রে! মঞ্জুর খুশী মুখ দেখে মামুন ভাবলেন, তিনি রাজি না হলে মেয়েটা সারা দিন মন-মরা হয়ে

থাকতো!

হেনা আর বাবলিকে সঙ্গে নিতে ওরা রাজি, কিন্তু হেনা তার বাবাকে ছেড়ে যেতে চায় না। বাবলি যাবে।

মেয়েকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন মামুন। হোসেন সাহেবের বাড়ির সামনে দুটি গাড়ি দাঁড়িয়ে। দুটিই হোসেন সাহেবের নাকি? হোটেলের ব্যবসায় খুব লাভ হয়। বর্তমান অবস্থায় হোসেন সাহেব অতি দ্রুত ধনাঢ্য হচ্ছেন, সুতরাং তিনি দেশের বর্তমান অবস্থাটাই বজায় রাখতে চাইবেন, এতে আর আশ্চর্য কী! তিনি কথায় কথায় জানিয়েছেন, খুব শিগগির তিনি করাচীতেও একটি হোটেল খুলবেন। পশ্চিম পাকিস্তানী অনেক সরকারী কর্মচারীকে সঙ্গে তাঁর বেশ দহরম-মহরম আছে।

একটু দূরে এসে মামুন সাইকেল রিকশা ধরার জন্য দাঁড়ালেন। এখন অধিকাংশ রিকশাতেই সওয়ারি।

একবার তিনি পেছন ফিরে দেখলেন, হোসেন সাহেবের বাড়ির সামনে একটা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে গল্প করছে মঞ্জু আর পলাশ। শহীদ কাছাকাছি নেই। পলাশের কী একটা কথায় মঞ্জু হাসতে হাসতে সারা শরীরটা দোলাতে লাগলো।

শহীদ না পলাশ, কার দিকে বেশি ঝুঁকেছে মঞ্জু? সে কোনো বিপজ্জনক পথে পা বাড়াচ্ছে না তো! কলকাতায় যাওয়ার চিন্তাটা তার মাথা থেকে একেবারে ঘচিয়ে দিতে হবে। ওরা এরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে হেসে হেসে গল্প করার বদলে গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসুক না।

শহীদের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ের প্রস্তাব দিলে কেমন হয়? শহীদ ছেলেটি বেশ। হ্যাঁ। বাড়ি ফিরেই দিদিকে বলতে হবে এই কথাটা। তা হলেই সব ব্যাপারটা সুষ্ঠু হবে। শহীদদের ব্যবসা আছে কলকাতায়, ইচ্ছে করলে সে এদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে এখানেও ব্যবসা শুরু করতে পারে।

সাইকেল রিকশা ডেকে উঠতে গিয়ে মামুন আবার হাসলেন আপন মনে। নিজের সম্পর্কেই খানিকটা বিদ্রুপের হাসি। হঠাৎ বিয়ের ঘটকালি করার জন্য তাঁর এত ঝোঁক হলো কেন তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না।

॥ ৩৪ ॥

দেওঘরে প্রতাপকে থেকে যেতে হলো পাঁচ দিন। পরদিন সকালেই অবশ্য টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মমতাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অবস্থানের কথা।

এবারে প্রতাপে এখানে চলে এসেছেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পার হবার পরেই তাঁর মনে হলো, নিয়তিই যেন টেনে এনেছে তাঁকে। তিনি যদি কিছু না জানতে পারতেন তা হলে আর কিছুদিনের মধ্যেই একটা বড় রকম বিপর্যয় ঘটে যেত।

প্রথম রাতেই বিশ্বনাথ গুহ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রতাপের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ যে একবার উঠে গিয়েছিলেন, আর শয়নঘর থেকে বেরুলেন না, খাওয়ার সময়েও এলেন না।

মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে শুতে চলে এসছিলেন প্রতাপ। মায়ের সব গল্পই পুরোনো কালের। সেই মালখানগরের বাড়ি, সেখানকার বর্ষা, শীত; সে বাড়ির বাগান, পুকুর, গোরুর বাচ্চা হওয়ার সময় একটা গোখরাসাপের সেই গোরুর বাট থেকে দুধ খাওয়া লক্ষ্মী পুজোর রাতে লক্ষ্মী প্যাঁচার আগমন, এই সবই প্রতাপ শুনেছেন অনেকবার, তবু মায়ের মুখে শুনতে ভালো লাগে। তবে মালখানগরের কুমড়ো যে এত বিখ্যাত তা প্রতাপ জানতেন না। দেওঘরে বেশ টাটকা তরিতরকারি পাওয়া যায়, কিন্তু কোনোটাতেই মা ঠিক মতন স্বাদ পান না। মালখানগরে বাড়ির গোয়ালঘর আর রান্নাঘরের খড়ের চালে কুমড়ো-লতা থাকতো প্রতি বছর, মালখানগরের বাড়ির কুমড়োর কথা তাঁর মনে নেই।

এ বাড়ির একখানা ঘর রাখা আছে প্রতাপের জন্য। মমতা এ ঘরে কিছু কিছু জিনিস রেখে গেছেন, বছরে একবার তো আসাই হয়। মা নাতি-নাতনীদের দেখতে চান। আগে এ বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না, এবারেই এসে প্রতাপ দেখছেন ঘরে ঘরে আলো, এমনকি মায়ের ঘরে একখানা পাখাও দেওয়া হয়েছে।

প্রতাপ সবেমাত্র শুয়েছেন, এমন সময় শান্তি এসে বললো, তোর ঘরে মশারি টানিয়ে দেয়নি, খোকন? মশার জালায় যে শতচ্ছিদ্র হয়ে যাবি। একটু ওঠ, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

শান্তি প্রতাপের চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়। ছোড়দি বলে ডাকলেও প্রতাপ তাঁকে ছোট বোনের মতনই গণ্য করেন। দেশে থাকার সময় সুপ্রীতির সঙ্গেই বেশি ভাব ছিল প্রতাপের। শান্তি ছিল বড় বেশি মায়ের ন্যাওটা, সর্বক্ষণই প্রায় মায়ের ছায়া।

প্রতাপ আজ লক্ষ করলেন, শান্তির চেহারায় হঠাৎ যেন বয়েসের ছাপ পড়ে গেছে। মুখখানা ফ্যাকাসে, শরীরটা ঝরা ঝরা, শীতকালের পত্রমোচি গাছের মতন, কিন্তু মানুষের শরীরে তো প্রতি বছর শীত-বসন্তের বিবর্তন হয় না। শান্তির তুলনায় সুপ্রীতির শরীর অনেক দৃঢ় আছে। এমনকি মাকেও এখনো বুড়ি মনে হয় না।

মশারি টানানো হয়ে যাবার পর শান্তি প্রতাপের দিকে ফিরে বললেন, সারাদিন ট্রেনে এসেছিস, অনেক ধকল গেছে, তোর ঘুম পেয়েছে নারে খোকন?

প্রতাপ বললেন, তোকে, ইয়ে, এমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

শান্তি একটা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে বললেন, না, আমার কিছু হয়নি। তুই ভালো আছিস তো? তারা সব ভালো আছিস তো?

প্রতাপ মাথা নাড়লেন।

-তোর যদি ঘুম না পেয়ে থাকে, তুই একবার আয় না আমাদের ঘরে।

প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। ওস্তাদজী কেমন আছেন একবার দেখে আসা উচিত ছিল, মায়ের সঙ্গে কথায় কথায় আর খেয়াল ছিল না।

দরজা পর্যন্ত গিয়েও প্রতাপ ফিরে এসে বেড সাইড টেবিল থেকে সিগারেট দেশলাই তুলে নিলেন। বাইরে এলেই তাঁর সিগারেট খাওয়া বেড়ে যায়।

শান্তির ঘরে আলো নেবানো ছিল, শান্তি সুইচ টিপে জ্বালালো। একটা বেশ বড় খাটের একপাশে কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন বিশ্বনাথ গুহ। যে পা-জামা পাঞ্জাবি পরে তিনি সন্ধেবেলা বাইরে থেকে এসেছিলেলেন, সেগুলোই পরে আছেন। নেখভানো চরুটটা বিছানার ওপরেই রাখা। নাক দিয়ে ফিঁচ ফিঁচ শব্দ হচ্ছে। ঠোঁটের পাশে একটুখানি লালার দাগ।

শান্তির মেয়ে টুনটুনির বয়েস হয়েছে, এগারো,. সে দিদিমার সঙ্গে ঘুমোয়। বেশির ভাগ সময়ই সে দিদিমার কাছে থাকে। এ ঘরে তার জামাকাপড় বা বইপত্র কোনো কিছুরই চিহ্ন নেই। এটা একেবারেই স্বামী-স্ত্রীর ঘর। সব কিছুই এলোমেলো। দেওয়ালের এক কোণে দাঁড় করানো রয়েছে একটা তানপুরা তার মাথায় অতি বেমানান ভাবে ঝুলছে একটা ল্যাঙোট। প্রতাপ সেদিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

শান্তি বললেন, খোকন, তুই ওকে ডাক।

প্রতাপ বললেন, ঘুমাচ্ছেন যখন, থাক না!

প্রতাপ এগিয়ে গিয়ে বিশ্বনাথের কপালে হাত রাখলেন। মানুষের বড় বড় অসুখের সঙ্গে জ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই, তবু শরীর খারাপের কথা শুনলে সবাই কপালে হাত দিয়ে দেখে।

বিশ্বনাথের কপাল ঠিক স্বাভাবিক ঠাণ্ডা নয়, সামান্য একটু ছ্যাঁকছেকে ভাব। সেটা এমন কিছু না। কিন্তু বিশ্বনাথের মুখের কাছাকাছি আসতেই প্রতাপ একটা দুর্গন্ধ পেলেন। প্রতাপ নিজে মদ না খেলেও মদের গন্ধ চেনে, কিন্তু এ যেন অন্যরকম।

প্রতাপ সোজা হয়ে দাঁড়াতেই শান্তি বললেন, খোকন, তুই ওকে ডেকে তোল, তোর সামেন আমি ওকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

প্রতাপ তাঁর ছোড়দিকে এক ধমক দিয়ে বললেন, মানুষটা ঘুমোচ্ছে। এখন ডেকে কী হবে? আমি তো কাল সকালে আছিই, তখন কথা হবে।

প্রতাপ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কলকাতায় প্রতাপ মাতালদের সংস্পর্শ বিশেষ করেন না, কদাচিৎ কখনো রাস্তায়ঘাটে অচেনা মাতাল দেখতে পান। কিন্তু চাকরি জীবনে টানা বারো বছর যখন বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে বদলি হয়েছেন তখন নিজেরই সব-পর্যায়ের কিছু কিছু অফিসারকে বিভিন্ন সময়ে মাতলামি করতে দেখেছেন। একবার এক এস ডি পি ও তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁধের ওপর বমি করে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনাটো মনে পড়লেই প্রতাপ নিজের গায়ে বমির গন্ধ পান। তিনি বুঝতে পারলেন, ওস্তাদজীর আজকের শরীর খারাপ মাতালের শরীর খারাপ, গন্ধ পান। তিনি বুঝতে পারলেন, ওস্তাদজীর আজকের শরীর খারাপ তাঁর ঘুম মাতালের ঘুম।

বাইরের বারান্দায় এসে প্রতাপ একটা সিগারেট ধরালেন। শান্তি তাঁর পেছন পেছন এসে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে।

একটু বাদে শান্তি বললেন, দ্যাখ খোকন, এখানকার চাঁদটা কত সাদা! আর কত বড়! মালখানগরে আমরা কি কোনোদিন এত পরিষ্কার চাঁদ দেখেছি?

প্রতাপ এই কথায় বেশ বিস্মিত হলেন। শান্তির রুগ্ন চেহারা আর বিরস মুখ দেখে তিনি আশঙ্কা

করছিলেন, ছোড়দি তাঁকে নানা রকম অনুযোগ শোনাবেন! জীবন যাদের কাছে আর উপভোগ্য নয়, তারা অন্যের জীবন-উপভোগও পছন্দ করে না। শান্তির মুখে চাঁদ সম্পর্কে কথা খুবই অপ্রত্যাশিত।

এখানে বেশ শীত পড়েছে। কলখারখানা নেই বলে এদিককার আকাশ অমলিন, শীতকালে আরও বেশি ঝকঝকে থাকে। এত তারা, যেন আকাশে দেওয়ালি, কিংবা তার চেয়েও বেশি, আলোর বিকিরণে ছেয়ে আছে আকাশ, তার মাঝখানটা চাঁদ একটা রূপোর থালা, জার্মান সিলভার বললে আরও উপযুক্ত হয়।

প্রতাপ সচরাচর চাঁদ দেখেন না, এখন এগিয়ে এসে দেখলেন। অনেকদিন পরর দুই ভাইবোন পাশাপাশি। শান্তি বরাবরই প্রতাপকে খোকন বলে ডাকেন, কিন্তু শান্তির কোনো ডাক নাম নেই।

প্রতাপ বললেন, জানিস ছোড়দি, মমতা মাঝে মাঝেই ছাদে উঠে যায় রাত্তিরে, একা একা।

শান্তি বললেন, মমতা বড় ভালো মেয়ে। তুই ওকে কষ্ট দিস না। তুই মমতাকে সঙ্গে আনলি না কেন এবার? ঝগড়া হয়েছে?

প্রতাপ উত্তর দেবার আগেই শান্তি বললেন, খোকন, চুপ করে শোন! কিছু শুনতে পাচ্ছিস?

শ্রবণেন্দ্রিয় তো মনকেই অনুসরণ করে। একবার চাঁদ, একবার মমতার প্রসঙ্গ উঠতে প্রতাপের মন দূরে চলে গিয়েছিল, কাছাকাছি কোনো ব্যাপারে খেয়াল ছিল না। তিনি কিছু শুনতে পাননি। এবারে কান খাড়া করে প্রথমে তিনি শুনতে পেলেন একটি টাঙ্গার চলে যাওয়ার শব্দ তারপর একজন মানুষের গলার দমকা কাশি। দ্বিতীয় শব্দটি খুব কাছেই।

শান্তি বললেন, খোকন, তুই আর একবার আমার ঘরে আয়!

সেখানে ফিরে গিয়ে প্রতাপ দেখলেন, ঘুমের মধ্যেই কেশে চলেছেন বিশ্বনাথ, তাঁর মুখ দিয়ে লালা বা থুতু গড়াচ্ছে। সেই থুতুর মধ্যে থকথকে রক্ত।

প্রতাপ ভয় পেয়ে শান্তির দিকে ঘুরে তাকালেন, কিন্তু শান্তির মুখে কোনো রকম ভয় বা অভিমানের চিহ্ন নেই। নিরুত্তাপ গলায় শান্তি বললেন, ওর আর বেশিদিন নেই, বুঝলি খোকন, ওর এবার যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে!

প্রতাপ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে, ছোড়দি? তুই একথা বলছিস কেন?

-ও তো আর থাকতে চায় না! যাক, যেতে চায় যাক। আমি অর শুধু শুধু ওকে কেন আটকাবো?

মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে দেখলে শুধু একটা রোগের কথাই মনে পড়ে। প্রতাপ ভয় পেলেন। বিশ্বনাথ এখানে ধনী টি টিব রুগীদের বাড়িতে নিয়মিত গান শোনাতে যান, সেটাই তাঁর জীবিকা। সেই সংস্পর্শে তাঁরও ঐ রোগ ধরা খুবই সম্ভব। এ তো রাজরোগ, এর চিকিৎসায় অনেক খরচ!

শান্তির হাবভাব দেখেও প্রতাপ অবাক হয়ে গেলেন। শান্তি বরাবরই ভীতু ধরনের, সামান্য কারণেই বিচলিত হয়ে ওঠেন। এখন এমন ঠান্ডা গলায় কথা বলছেন কী করে?

-কতদিন ধরে এরকম হয়েছে? ডাক্তার দেখাসনি?

শান্তি একটা কাঠের আলমারির পাল্লা খুলে বললেন, দ্যাখ, এই ওর ওষুধ।

প্রতাপের ভুরু কুঁচকে গেল আলমারির একটা তাক ভর্তি কতকগুলো বড় বড় নোংরা নোংরা বোতল। প্রথমে হলো কেরোসিনের বোতল কিন্তু আলমারিতে কেউ কেরোসিনের বোতল সাজিয়ে রাখে না, প্রতাপ বুঝতে পারলেন এগুলো দেশি মদের।

শান্তি বললেন, এইগুলোই ওর ওষুধ, বাইরে থেকে খেয়ে আসে, আবার রাত্তিরে ঘরে বসে বসেও খায়।

-তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে, ছোড়দি? তুই এসব ওকে খেতে দিচ্ছিস? এখন ওর পক্ষে এ তো বিষ!

-আমি কী করবো বল?

-তুই কী করবি মানে? তুই আটকাতে পারিস না?

-তুই বুঝতে পারছিস না, খোকন, ও সব নিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে।

বিশ্বনাথের মুখ দিয়ে আর একবার কাশির দমক উঠতেই প্রতাপ কাছে গিয়ে তাঁর বুকে হাত দিয়ে ডাকলেন, ওস্তাদজী! ওস্তাদজী!

কয়েকবার ডাকডাকরি পর বিশ্বনাথ জড়িত গলায় বললেন, অ্যাঁ? কেন বিরক্ত করছো?

তারপর ঘোলাটে চোখ মেলে বললেন, চতুর্দিকে মাছি উড়ছে ভনভন করে। সব পচা জিনিস! মানুষের শরীরও পচে গেছে!

প্রতাপ বুঝলেন এখন কথা বলে লাভ নেই, বিশ্বনাথ পুরোপুরি নেশাগ্রস্থ।

শান্তিকে তিনি আদেশ দিলেন, মুখটা মুছিয়ে দে! কাল সকালে আমি দেখছি!

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে প্রতাপ আবার মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মা জানে? শান্তি বললো, মা সবাই জানে!

বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ বদলায় ঠিকই, কিন্তু তাঁর মায়ের স্বভাবের এতখানি পরিবর্তন একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হলো প্রতাপের। সুহাসিনী বরাবরই শিশুর মতন, সব সময় উতলা হয়ে থাকেন, তাঁর নিজের পারিবারিক গণ্ডির প্রত্যেকের ভালোমন্দের প্রতি সব সময় তাঁর মনোযোগ যেন সেটাই তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্যে। সুহাসিনীর মাথায় বুদ্ধির বদলে সবটাই আবেগ এরকমই প্রতাপ দেখে এসেছেন বরাবর। মা বিচলিত হয়ে পড়বেন বলে তাঁর কাছে অনেক ছোটখাটো দুর্যোগের কথা লুকিয়ে যান।

সেই সুহাসিনী তাঁর জামাইয়ের এমন অবস্থার কথা জেনেও একবারও তা উল্লেখ করলেন না প্রতাপের কাছে? বরং আগের তুলনায় আজ যেন তিনি বড় বেশি শান্ত হয়ে ছিলেন। অতীতের কথা, পূর্ব বাংলার সেই সুখের দিনগুলির কথা বলতে তিনি একেবারে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর চোখ বুজে এসেছিল। যেন তিনি পুরোপুরি অতীতে ফিরে গেছেন, বর্তমানটা তার কাছে একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে। তাই কোনো অভিযোগ নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই এরকম হয়? প্রতাপ ধাঁধায় পড়ে গেলেন।

সে রাতে তাঁর ঘুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে লাগলো বার বার।

সেইজন্যই পরদিন তাঁর ঘুম ভাঙতে দেরি হলো। বিশ্বনাথ বেরিয়ে গেছেন তার মধ্যে। প্রতাপ বাজারে গেলেন তাঁর তাঁকে খুঁজতে। দেখা পেলেন না। রেলস্টেশনেও নেইউ চারটি বাঙালি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করেও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। বিশ্বনাথ গুহকে এখানে অনেকেই চেনে, কিন্তু কেউ তাঁকে দেখেনি।

সন্ধের পর বিশ্বনাথ ফিরলেন পুরোপুরি মাতাল হয়ে। রাস্তা থেকেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইতে গাইতে ঢুকলেন গেট ঠেলে, তাঁর ধুতিটা আলগা হয়ে গেছে, কোমরের কাছে ধারে আছেন মুঠো করে, মুখে চুরুটের বদলে অদিবাসীদের লম্বা বিড়ি, কাঁচা তোমাকে মাঝে মাঝে পট পট শব্দ হচ্ছে আর আগুনের ফুলকি উড়ে এসে পড়ছে তাঁর লম্বা দাড়িতে।

প্রতাপ এগিয়ে এসে বিশ্বনাথের হাত ধরে কাটোরভাবে বললেন, এসব কী হচ্ছে ওস্তাদজী সারাদিন কোথায় ছিলেন?

ঝটকা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে বিশ্বানাথ কর্কশ চিৎকার করে উঠলেন, চোপ শালা! তুই আমার হাত ধরবার কে রে?

সুহাসিনী আর শান্তি বসেছিলেন বরান্দায়, তাঁরা উঠে চলে গেলেন ভেতরে।

প্রতাপ নিথরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি খুব জোর আঘাত পেয়েছেন। খারাপ কত বর্বরদের মতন ভাষা তিন সহ্য করতে পারেন না। বিশ্বনাথ গুহ বরাবরই মার্জিত স্বভাবের মানুষ। তাঁর কথাবার্তা সব সময়ই উঁচু তারে বাঁধা থাকে।

ধুতিটা সম্পূর্ণভাবে খুলে আবার পরলেন বিশ্বনাথ। তারপর টলতে টলতে গিয়ে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে ফিকফিকিয়ে হাসতে লাগলেন প্রতাপের দিকে চেয়ে।

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে তিনি প্রতাপকে বললেন, কী ব্রাদার, রাগ করলে নাকি? অন্য কারুকে তো শালা বলিনি, তুমি আমার একমাত্র অরিজিন্যাল শালা, তোমাকে শালা বলেছি, তাতে রাগের কী আছে?

এক মুহূর্ত আগে প্রতাপ ঠিক করেছিলেন যে বিশ্বনাথের সঙ্গে তিনি জীবনে আর কখনো বাক্যলাপ করবেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে মত পাল্টাত তাঁকে মত পাল্টাতে হলো, মায়ের জন্য ছোড়দির জন্য।

বিশ্বনাথ আবার বললেন, এসো ব্রাদার, আমার পাশে এসে বসো। কী বকুনি দেবে দাও।

প্রতাপ কাছে এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বললেন, আপনি কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন?

বিশ্বনাথ চোখ বুজে মাথা নাড়লেন দু'দিকে। তারপর কাশলের কয়েকবার। তারপর বললেন, কী হবে ডাক্তার দেখিয়ে? ডাক্তার যা বলবে তা তো জানা কথা!

-ডাক্তার না দেখালে অসুখের চিকিৎসা হবে কী করে?

-চিকিৎসা তো আমি নিজেই করছি। আমার চুরুট ফুরিয়ে গেছে, তোমার একটা সিগারেট দাও তো!

-আপনার এত কাশি, এই সময় সিগারেট খাওয়া উচিত নয়।

বিশ্বনাথ এবার জোরে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, গম্ভীর গলায় বড়বাবু বড়বাবু ভাব করে কথা বলার অভ্যেসটা আর তোমার গেল না! সব সময় যেন ভারডিক্ট দিচ্ছো। আরে, এটা তোমার আদালত না কি? আমি তোমার আসামী?

-ওস্তাদজী, আমি জীবন নিয়ে কী করবো, জীবনই আমায় নিয়ে খেলাচ্ছে। তবে, এ খেলা বোধহয় আর বেশিদিন...ঠিক কতদিন জানতে পারলে সুবিধে হতো।

-কাশির অসুখ, চিকিৎসা করলেই সারিয়ে ফেলা যায়।

-টি বি কথাটা উচ্চারণ করতে লজ্জা পাচ্ছো? প্রত্যেক দিন ঘুষঘুষে জ্বর, কাশি, তার সঙ্গে রক্ত লক্ষণ সব মিলে যাচ্ছে। কী বলো? এর চিকিৎসা কী তাও সবাই জানে। ইঞ্জেকশান ফিঞ্জেকশান তো আছেই, তাছাড়া ভালো খাওয়া-দাওয়া, পরিপূর্ণ বিশ্রাম, হা-হা-হা-হা!

এই সময় মা আর ছোড়দি!

শান্তি কাছেই ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন বারান্দায়।

বিশ্বনাথ মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রীকে দেখে সুর করে বললেন, এইবারে প্রধান সাক্ষী হাজির! কিন্তু আসামী ভাগলবা!

বিশ্বনাথ চট করে ওঠার চেষ্টা করে ঘুরে পড়ে গেলেন। কিন্তু কারুকে ধরে তোলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই আবার উঠে দৌড়ে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

শান্তি আর প্রতাপ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর প্রতাপ বললেন, কাল ওঁকে বেরুতে দিস না। আমাকে ডাকিস। আমি কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো।

পরদিন সকালে বিশ্বনাথ পালালেন না। ভোর থেকে গলা সাধতে লাগলেন। নিজের ঘর থেকে শুনে প্রতাপ বুঝতে পারলেন, ওস্তাদজীর গলা অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তারসপ্তাকে ঠিক পর্দা লাগছে না, মীড়ের কাজ করতে গেলেই কেশে ফেলছেন।

প্রতাপ তৈরি হয়ে নিলেন। কিন্তু ডাক্তার দেখাতে হলে টাকা লাগবে। প্রতাপের কাছে কিছু নেই। বাড়ি থেকে আসার সময় কেন বেশকিছু টাকা সঙ্গে আনেননি, সেকথা ভেবে প্রতাপের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো। ওস্তাদজীর এখন এই অবস্থা, তাঁর কাছ থেকে এখন কিছুতেই টাকা চাইতে পারবেন না প্রতাপ।

মাকে খুঁজতে খুঁজতে প্রতাপ ওপরের ঠাকুর ঘরে চলে এলেন। সুহাসিনী জপে বসেছেন। পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অন্য সময়ে ছেলের উপস্থিতি টের পেলেই সুহাসিনী জপের মন্ত্র-টন্ত্র ভুলে গিয়ে কথা বলতে শুরু করতেন। আজ তিনি নিমগ্ন।

সুহাসিনী মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম সারার পর প্রতাপ বললেন, মা, জামাইবাবুকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবো ... আমি এবার সঙ্গে টাকা আনতে ভুলে গেছি ... তোমার কাছে কিছু জমানো টাকা আছে? আমি কলকাতায় ফিরেই পাঠিয়ে দেবো।

সুহাসিনী মুখে কিছু বললেন না। ঠাকুরের মূর্তির পাশ থেকে কড়ি বসানো লাল রঙের লক্ষীর ঝাঁপিটি তুলে এনে দিলেন প্রতাপের হাতে।

প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন, এটাই গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সুহাসিনীর খরচার হাত। কোনোদিন টাকা জমানো স্বভাব নয় তাঁর। মাঝে মাঝে এই লক্ষীর ঝাঁপিতে আট আনা একটাকা ফেলে রাখেন। সব মুদ্রাগুলিতেই সিঁদুর মাখানো। লক্ষীর ঝাঁপিটি উপুড় করে প্রতাপ মুদ্রাগুলো গুণলেন। সব মিলিয়ে একশো তেইশ টাকা, এর মধ্যে টাক মাথা পঞ্চম জর্জের মুখ আঁকা রূপের মুদ্রাও রয়েছে কয়েকটা।

প্রতাপ মায়ের দিকে তাকালেন। সুহাসিনী বললেন, যা ঘুরে আয়।

হঠাৎ প্রতাপের কান্না পেয়ে গেল। তাঁর মায়ের এই শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন ভাব তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। একটি দুরন্ত শিশু সব খেলাধুলো ভুলে গিয়ে মাটিতে চুপ করে শুয়ে আছে-এই দৃশ্য দেখলে যেমন লাগে! মা কি আর কোনোদিনও আগের মতন হবেন না?

মুখ ফিরিয়ে প্রতাপ দ্রুত নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে।

বিশ্বনাথ প্রতাপের সঙ্গে বেরুতে আপত্তি করলেন না। পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি পরলেন। তাঁর হাতে চুরুট নেই। সিগারেটও চাইলেন না প্রতাপের কাছে। টাঙ্গায় উঠে বললেন, বম্পাস টাউনে ডাক্তার দূরের কাছে চলো, তার সঙ্গে আমার চেনা আছে। ভালো ডাক্তার।

খানিক দূর যাবার পর বিশ্বনাথ বললেন, ব্রাদার, ডাক্তারের কাছে যাবার আগে চলো কোথাও বসে ভালো করে চা খাই। বাড়িতে বসে তো সব কথা বলা যায় না, তোমাকে আমার প্ল্যান-প্রোগ্রামটা

জানানো দরকার।

প্রতাপ বললেন, আগে ডাক্তারের কাছে ঘুরে আসি। তারপর আপনার কথা শোনা যাবে।

বিশ্বনাথ প্রতাপের পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, খুব রেগে আছো, আমার ওপর, তাই না? আমরা সবাই মিলে তোমার কাঁধে যদি ভূত হয়ে চাপি, তখন সহ্য করতে পারবে? আজকাল কাঁধে ভূত চাপার চেয়েও আত্মীয়-স্বজন চাপা অনেক বেশি ডেঞ্জারাস! ধরো, ডাক্তার স্পষ্ট রায় দিল যে আমার আর কোনো কাজ-কর্ম করা চলবে না। তখন আমার সংসারটাকে খাওয়াবে কে? তুমি? তোমার কাঁধ কতখানি চওড়া? সামান্য মাইনের টাকা তো ভরসা!

প্রতাপ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

বিশ্বনাথ আবার বললেন, যৌবনকালটা গান-বাজনার চর্চা করে কাটিয়েছি, জীবিকা অর্জনের জন্য কিছু শিখিনি। গান-বাজনাকে কমার্শিয়ালাইজড করতে গেলেও টেকনিক লাগে, সে যোগ্যতা আমার নেই, এই বয়েসে আর পেরে উঠবো না। আমরা ছিলাম ল্যান্ডেড জেন্ট্রি, হঠাৎ ডিক্লাসড হয়ে গেছি, তার মূল্য দিতে হবে না? নিজস্ব বাড়ি ছিল। জমি-জায়গা ছিল, তার থেকে আয় ছিল, সেই ভরসাতেই জীবনটাকে গঠন করতে চেয়েছিলাম যৌবন কালে। সব মানুষ কী আর জীবিকার ধান্ধায় ঘুরবে, কিছু কিছু মানুষ তো উৎকট খেয়াল নিয়েও থাকবে! এখন সেসব নেই, হঠাৎ সব খুইয়ে জীবন যুদ্ধে নেমে পড়লে পারবো কেন? আমাদের কিছু কিছু মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে! এটাকে নিয়তি বলতে পারো।

প্রতাপ বললেন, তা বলে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে না?

বিশ্বনাথ মৃদু হেসে বললেন, শুধু বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয়, বাঁচার একটা ডিগনিটি থাকা দরকার তো। আমি অশক্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবো, তুমি আমার ওষুধ কিনে দেবে আমার বউ-মেয়েকে তুমি খাওয়াবে, পরাবে, এরকম একটা অপমানের অবস্থার মধ্যে তুমি আমাকে ফেলতে চাও? আমি কী প্ল্যান করেছি, সেটা শোনো। এখন আমি প্রাণপণে রোজগার বাড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছি, সে যেমন করেই হোক। বাড়িটাতে আরও দুখানা ঘর বাড়াবো। আমি হঠাৎ মরে গেলে, ঐ বাড়ির একটা পোরশান ভাড়া দিয়েও তোমার মা আর ছোড়দির কোনোক্রমে চলে যাবে। আমার মেয়েটা বড় হলে তুমি ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দিও। আর যে-কটা দিন বাঁচি আমাকে নিজের মতন বাঁচতে দাও।

-নিজের মতন বাঁচা মানে প্রত্যেকদিন মাতাল হওয়া?

-মদ খেলে শরীরটা কিছুক্ষণ চাঙ্গা থাকে। ধরে নাও, ওটাই আমার ওষুধ। তাছাড়া নেশা করলে আজেবাজে কাজকর্ম করার গ্লানি ধুয়ে যায়। আমি যা করছি, ভেবেচিন্তেই করছি।

প্রতাপ একটুক্ষণ চুপ করে থাকতে বিশ্বনাথ বললেন, তা হলেই বুঝলে ডাক্তারখানায় গিয়ে কোনো লাভ নেই। টাঙ্গাটাকে অন্যদিকে যেতে বলি?

প্রতাপ এবার দৃঢ় গলায় বললেন, না, আমি আপনার যুক্তি মানি না। এরকম ভাবে হাল ছেড়ে দেওয়া কাপুরুষতা। দরকার হলে ঐ বাড়ি বিক্রি করেও আপনার চিকিৎসা করাতে হবে। আমরা যদি গুরুতর কোনো অসুখ হতো, আপনি সব দিয়ে আমাকে সাহায্য করতেন না?

ডাক্তারের কাছে গিয়ে যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তার চেয়েও খারাপ কথা শোনা গেল। ডাক্তার দুবে টি বি বিশেষজ্ঞ, এ তল্লাটে অনেক টি বি রোগী আসে, তিনি মুখ দেখে রোগীর অবস্থা বলে দিতে পারেন। থুতু, রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে এসব করাতে হবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশ্বনাথকে দেখেই তিনি ধমক দিয়ে বললেন, এত দেরি করে এসেছেন?'

ডাক্তারখানা থেকে বেরুবার পর বিশ্বনাথই প্রতাপকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কী ব্রাদার, মন খারাপ করছো কেন? আমি সহজে যাচ্ছি না, আরও দু-এক বছর ফাইট করতে পারবো মনে হয়। চলো, যেখানে গেলে তোমার মন ভালো হবে সেখানে যাই। বুলার সঙ্গে দেখা করবে না।

প্রতাপ একটু জোরে বলে উঠলেন, বুলা?

-হ্যাঁ, সে তো এখানেই আছে।

-জানি। তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু এখন আমি বুলার বাড়িতে যেতে চাই না। বাজারে চলুন, আপনার ওষুধ-পত্তরগুলো কিনতে হবে।

-আরে ওষুধ পরে কিনলেও হবে। জানি, তোমার টাকা দিয়ে আমার জন্য কিছু ওষুধপত্তর কিনে না দিলে তোমার শান্তি হবে না। ঠিক আছে, সেইসব ওষুধ খাবো। কিন্তু এখন চলো। বুলার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা যাক। তাকে আমার রোগের বিষয়ে যেন কিছু বলো না!

বিশ্বনাথ প্রায় জোর করেই প্রতাপকে নিয়ে গেলেন বুলাদের বাড়িতে।

॥ ৩৫ ॥

মোহনবাগান লেনে চন্দ্রাদের বাড়ির উঠোনে একটি চাঁপা ফুলের গাছ আছে। বারোমাসই সে গাছে ফুল ফোটে। চন্দ্রা বলে, এই গাছটার নাম উর্বশী-চাঁপা। গেট দিয়ে ঢুকে সেই গাছটার তলা দিয়ে যাবার সময় কয়েক মুহূর্ত থেমে যান অসমঞ্জ রায়। তাঁর নাকে আসে একটা অন্যরকম জীবনের ঘ্রাণ।

এই বাড়ির খুব কাছেই, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের পুতু-দারোয়ন সাজানো দত্তদের বাড়িতে একটি ইংরেজি অনার্সের ছাত্রকে সপ্তাহে দুদিন পড়াতে আসেন তিনি। সাড়ে আটটার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি বাড়ি ফিরতে পারেন না, চন্দ্রাদের বাড়ি তাঁকে চুম্বকের মতন টানে।

কোনো অনাত্মীয় মহিলার বাড়িতে রাত সাড়ে আটটার সময় যাওয়ার কথা তিনি আগে ভাবতেই পারতেন না। তাঁর এতদিনকার পরিমণ্ডলে এটা ছিল অস্বাভাবিক। কিন্তু চন্দ্রাদের বাড়িটা আলাদা ধরনের, ওখানে যেতে কোনো বাধা নেই।

চন্দ্রার বাবা বহুদিন ছিলেন দেরাদুনে, ভারত সরকারের জরিপ বিভাগে উচ্চ চাকরি করতেন। চন্দ্রার জন্ম সেখানে। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর চন্দ্রার বাবা আনন্দমোহন চক্রবর্তী দেরাদুনেই একটি ব্যবসা শুরু করে পুরোপুরি প্রবাসী বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। চন্দ্রা আর তার দিদি অলকা এই দু'জনেরই বিয়ে হয় এলাহাবাদে। চন্দ্রার দাদা আদিত্য থাকে অমৃতসরে, তার শ্বশুর বাড়ি এবং চাকুরিস্থল দুটোই সেখানে। তবু কোনো কারণে আনন্দমোহন হঠাৎ দেরাদুনের পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় মোহনবাগান লেনের এই পুরোনো বাড়িটি কিনেছেন। অবশ্য কলকাতায়, তিনি নিছক অবসর জীবন যাপন করতে আসেন নি, শ্যামবাজারের মোড়ে একটি বড় ওষুধের দোকান চালু করে দু' বছরের মধ্যেই সেটিকে স্বর্ণপ্রবসী করে তুলতে পেরেছেন।

চন্দ্রা কেন এলাহাবাদে তার স্বামীর কাছে থাকে না, তা অসমঞ্জ রায় এখনো জানেন না। চন্দ্রার জীবনের ঐ অংশটা রহস্যাবৃত, খোলাখুলি কোনোদিন জিজ্ঞেসও করতে পারেন নি। তিনি। একদিন তাঁদের সমিতির একটি ছেলে বলেছিল, এলাহাবাদে কোন বাড়িতে আপনার বিয়ে হয়েছে চন্দ্রাদি? এলাহাবাদে আমার বাড়ি, আমি ছোট বেলা অনেক দিন থেকেছি সেখানে। কোনো উত্তর না দিয়ে চন্দ্রা সেই ছেলেটির চোখের দিকে সরাসরি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলেছিল, এলাহাবাদের কথা থাক, এখানকার কাজের কথা বলো।

চন্দ্রাদের বাড়ির অনেকের কথাতেই এখনো প্রবাসী টান রয়ে গেছে। বাক্যের শেষে একটা করে হচ্ছে বা হচ্ছেন যোগ করে দেয়। যেমন, উনি আমার পিসেমশাই হচ্ছেন। লেখাপড়াকে এরা বলে পড়ালেখা। চন্দ্রার বাবা যখন-তখন বলেন, কোনো কথা নেই! অর্থাৎ বুঝতে হবে তিনি বলতে চান, কোই বাৎ নেহি! চন্দ্রার মা ঝি-চাকরদের বকঝকা করার সময় বে-শরম, বেহুঁস, বেহুদা-এই সব শব্দগুলো অনর্গল ব্যবহার করে যান।

কিন্তু চন্দ্রার কথায় কোনো টান নেই, কোনো মুদ্রাদোষও নেই। প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, দু এক বছরের মধ্যেই এখানকার ভাষা রপ্ত করে নিয়েছে। আগে সে নাকি ভালো করে বাংলা পড়তেই পারতো না, এখন বাংলায় চমৎকার চিঠি লেখে।

চন্দ্রাদের বাড়িটি পুরোনো, ঘরের সংখ্যা অনেক। কোনো ঘরে এখনো কোনো আসবাব নেই। প্রবাস থেকে এই পরিবারের চেনাজানা মানুষরা কোনো কাজে কলকাতায় এলে এখন আর হোটেলে ওঠে না, এ বাড়িতেই এসে থাকে। অসমঞ্জ রায় তাই এ বাড়িতে প্রায়ই নতুন নতুন মানুষ দেখতে পান।

ব্যাডমিন্টন খেলার খুব শখ চন্দ্রারম, এখন শীতকাল শুরু হয়েছে, এখন প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা সে মানিকতলার একটি ক্লাবে খেলতে যায়। দু একটি কমপিটিশানেও সে ট্রফি পেয়েছে। এক সময় নাকি চন্দ্রা ভালো নাচতেও পারতো, অনেক জায়গায় মঞ্চে নেচেছে, দৈবাৎ সে রকম একটি ছবি দেখে ফেলেছিলেন অসমঞ্জ, কিন্তু চন্দ্রা এখন আর নাচের উল্লেখ পছন্দ করে না। তার শরীরের গড়নটি এখনো নতর্কীর মতন। এই রকম একটি মেয়েকে সমাজ সেবার কাজ নিয়ে বেশি মাতামাতি করতে দেখলে বিস্ময়েই জাগে। অসমঞ্জ এখনো চন্দ্রার চরিত্রটি বুঝতে পারেন না।

হারীত মণ্ডলের ছেলে সুচরিতকে নিজের বাড়িতেই আশ্রয় দিয়েছে চন্দ্রা। কাছাকাছি টাউন স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। সে একটা নিজস্ব ঘর পেয়েছে। হারীত মণ্ডল তার স্ত্রী ও অন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেছে বাংলার বাইরে। তাকে আটকে রাখা যায় নি।

চাঁপা ফুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে অসমঞ্জ তাকালেন দোতলায় দক্ষিণের ঘরটির দিকে। ঐ-টি

চন্দ্রার নিজস্ব ঘর। সেখানে আলো জ্বলছে। তা হলে চন্দ্রা নিশ্চয়ই ব্যাডমিন্টন খেলা শেষ করে ফিরছে। চাকর-বাকরদের ডেকে খবর দেবার কোনো প্রথা নেই এখানে, অসমঞ্জ সোজা উঠে এলেন দোতলায়। চন্দ্রার ঘরের দরজার একটা পাল্লা ভেজানো। সেখানে দাঁড়িয়ে অসমঞ্জ সোজা উঠে এলেন দোতলায়। চন্দ্রার ঘরের দরজার একটা পাল্লা ভোজানো। সেখানে দাঁড়িয়ে অসমঞ্জ দেখলেন একটা টেবিলের দু'পাশে বসে আছে চন্দ্রা আর একজন যুবক। দু'জনের মাথা খুব কাছাকাছি, বিবিড় মনোযোগ দিয়ে তারা দেখছে টেবিলের ওপর বিছানো একটা বড় কাগজ।

অসমঞ্জের বুকটা মুচড়ে উঠলো এই দৃশ্যে দেখে। ঐ যুবকটি চন্দ্রার কাছে প্রায়ই আসে। ওর নাম অপূর্ব বর্মন, ভালো ব্যাডমিন্টন খেলে, মিক্সড ডাবলসে চন্দ্রার পার্টনার হয়। অসমঞ্জ বরাবরই পড় য়া মানুষ, খেলাধুলো প্রায কিছুই করেন নি জীবনে। খেলোয়াড় জাতীয় মানুষদের সম্পর্কে তাঁর মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে। তাঁর ধারণা, যারা বেশি শরীর চর্চা করে তাদের মাথা মোটা হয়। চন্দ্রা শখ করে ব্যাডমিন্টন খেলে, সেটা ঠিক আছে, সে সময়ে সে যে-কোনো একজনকে পার্টনার হিসেবে বেছে নিতে পারে, কিন্তু ঐ সব খোলোয়াড়দের বাড়িতে ডেকে এনে নিভৃতে গল্প করার কোনো মালে হয় না। চন্দ্রার বুদ্ধির স্তর অনেক উঁচু, ওদের সঙ্গে চন্দ্রা কী বিষয়ে কথা বলবে?

অসমঞ্জ বললেন, আসতে পারি?

চন্দ্রা চোখ তুলে অসমঞ্জকে দেখা মাত্র যেন তার মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সে বললো, আসুন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলুম। আপনাকে আমার খুব দরকার।

এই হাসি, এরকম কথা শোনার জন্যই তো এ বাড়িতে আসা। অসমঞ্জ বুকের জ্বালা অনেকটা মিলিয়ে গেল।

অপূর্ব বর্মণের সঙ্গে এর আগে দুবার আলাপ করিয়ে দিয়েছে চন্দ্রা, কিন্তু সে কথা তার মনে নেই। আজ আবার বললো, আলাপ আছে? আমার বন্ধু অপূর্ব বর্মণ, আর ইনি ডক্টর অসমঞ্জ রায়, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ইংলিশের লেকচারার, আমাদের সমিতির প্রেসিডেন্ট।

অপূর্ব বমণ বললো, আমার বোনের কাছে আপনার কথা শুনেছি। আমাব বোন ইংলিশ নিয়ে এম-এ পড়ছে, আপনার ছাত্রী।

চন্দ্রা উঠে আর একটা চেয়ার টেনে এনে বললো, বসুন, এই প্ল্যানটা দেখুন।

টেবিলের ওপর নীল রঙের কাগজটি কোনো বাড়ির নকশা। অসমঞ্জ তার ওপর একবার দৃষ্টি দিলেন। এই সব বিষয়ে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই।

চন্দ্রা বললো,. ডেস্টিটিউট মেয়েদের জন্য আমরা যে হোম তৈরি করতে যাচ্ছি, এটা সেই বাড়ির প্ল্যান। অপূর্ব এটা তৈরি করে দিয়েছে। অপূর্ব এটা তৈরি করে দিয়েছে। অপূর্ব দেখলেন। এই লোকটা খেলোয়াড় আবার আর্কিটেক্টও? আর্কিটেক্ট হতে গেলে তো বুদ্ধি লাদে! এমন হতে পারে যে ওদের ফার্ম আছে, সেখানকার অন্য কেউ নকশাটা করে দিয়েছে।

চন্দ্রা নক্সাটার ওপর আঙুল বুলিয়ে বললো, এই দেখুন, এই হলগুলো হবে ডমিটিরি টাইপ, এটা কিচেন, এই দুটো ওয়ার্কশপ...

কাগজের গায়ে কয়েকটি রেখা দেখে একটা বাড়ি কল্পনা করা অসমঞ্জ রায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু তিনি আঙুল ফেলে বললেন, আর এই জায়গাটা! এটা কী?

চন্দ্রার আঙুলে সঙ্গে অসমঞ্জ নিজের আঙুল ছুঁয়ে দিলেন ইচ্ছে করে। এতে তাঁর শরীরের মধ্যে ঝনঝন শব্দ হয়, তাঁর বয়েস কমতে থাকে। চন্দ্রা কিন্তু আঙুল সরিয়ে নেয় না, তার শরীরের ঝনঝন শব্দ হয় কি না বোঝবার কোনো উপায় নেই, সে মন দিয়ে কথা বলে যায়।

নকশাটি সম্পর্কে আরও উৎসাহী হয়ে অসমঞ্জ তার মুখখানি এগিয়ে আনেন অনেকটা। চন্দ্রার গালের সঙ্গে তাঁর গালের আধ ইঞ্চি ফাঁক। একবার কি ছুঁযে যাবে, না যাবে না? ইচ্ছে করে ছুঁয়ে দিলে চন্দ্রা বুঝতে পারবে? বুঝতে পারলেও কি বিরক্ত হবে?

টেবিলের ওপর থেকে একটা পেন্সিল পড়ে গেল, অপূর্ব নিচু হয়ে সেটা তুলতে যেতেই অসমঞ্জ অতি সূক্ষ্মভাবে চন্দ্রার গালটা ছুঁয়ে দিলেন। তাঁর বয়েস অনেকখানি কমে গেল।

চন্দ্রা মুখটা সরিয়ে নিয়ে অসমর দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে রইলো কয়েক পলক। অসমঞ্জর বুক কাঁপছে, চন্দ্রা রাগ করে নি, বিরক্ত হয় নি, তার ঠোঁটে হাসি।

চন্দ্রা বললো, অপূর্ব এই প্ল্যানটা বিনা পয়সায় করে দিয়েছে!

চন্দ্রার মুখের হাসির সঙ্গে এই কথাটার কোনো মিল নেই বলে অসমঞ্জ আবার একটু ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি নীরসভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ক[illegible] এস্টিমেট?

অপূর্ব বললো, জমি বাদ দিয়ে এক লাখ পঁয়ত্রিরিশ হাজার।

-এত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?

চন্দ্রা বললো, ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। পাতিপুকুরে জমি তো পাওয়াই যাচ্ছে!

অসমঞ্জ বললোন, পাওয়া যাচ্ছে মানে এখনো তো রেজিসিস্ট্রি হয়নি। শুধু মুখের কথা।

চন্দ্রা দুষ্টু-দুষ্টু ভাব করে বললো, ও আমি যোগেন দত্তর মাথায় হাত বুলিযে ঠিক আদায় করে ফেলবো।

চন্দ্রা হাতের এমন একটা ভঙ্গি করলো যেন সে আক্ষরিক অর্থেই সেই ঝানু ব্যবসায়ীটির মাথায় হাত বুলোবে।

অপূর্ব বললো, সেন্ট্রান গভর্নমেন্ট এই সব কাজে ভালো গ্র্যান্ট দেয়। আমি দিল্লি যাচ্ছি আপনারা যদি আমার হাতে একটা অ্যাপ্লিকেশন দেন, আমি খানিকটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে আসতে পারি।

চন্দ্রা বললো, শুধু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক নয়, তোমাকে আরও অনেক কিছু করতে হবে। আপনার এই পাড়ায় টিউশানি ছিল তাই এসেছেন। কেন, অন্যদিন বুঝি শুধু আমার বাড়িতেই আসতে পারেন না?

অসমঞ্জ বললেন, তুমি তুমি চাইলে প্রত্যেক দিন।

চন্দ্রা একটু চিন্তা করে বললো, সুচরিত ছেলেটা কী রকম লেখাপড়া করচে সে খবরও তোমাকে নেন না। আমি কয়েদিন নিয়ে বসেছি, দেখলুম যে ও ইংরেজিতে কাঁচা। অপনি মাঝে মাঝে এসে ওকে ইংরেজিটা পড়িয়ে দিন!

চন্দ্রা তাঁকে ঘন ঘন এ বাড়িতে আসতে বলায় অসমঞ্জ যেমন খুশী হয়ে উঠেছিলেন, তার পরের কথাটায় মনটা আবার বিগড়ে গেল।

তবু সুচরিতকে তিনি পড়াতে রাজি হলেন। একদিন সুচরিত আর তার মাকে তিনি নিজের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে সে জন্য তার মনে কোনো গ্লানি হলো না। তিনি ওরকম করেছিলেন বলেই তো ছেলেটা এখনর রাজার হালে আছে। ফ্রি খাওয়া-দাওয়া, আর এরকম একখানা ঘর। সচরিতকে পড়াবার বিনিময়ে অসমঞ্জ কোনো টাকা পাবেন না বটে, কিন্তু প্রত্যেকদিন চন্দ্রাকে একবার অন্তত ছোঁয়া তো যাবে! কথা বলতে বলতে চন্দ্রার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলে ও সরে যায় না।

যোগেন দত্তর সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অসমঞ্জই। বড়বাজারের এই ব্যবসায়ীটির মেয়েকে তিন চার বছর পড়িয়েছেন। যোগেন দত্তর অনেক টাকা, একবার তিনি একটি খুনের মামলায় পড়েছিলেন, টাকার জোরেই মুক্তি পেয়েছিলেন সেবার। সম্প্রতি তাঁর মনে কিছুটা বৈরাগ্য ভাব এসেছে, পুণ্য অর্জনের জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে তাঁর পাতিপুকুরের জল জমিটা দান করতে চান। সে খবর শোনা মাত্র চন্দ্রা লোকটির ওপর ঝাঁপিয়েঃ পড়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনকে সাহায্য করার অনেক লোক আছে। ঐ খবর শোনা মাত্র চন্দ্রা লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনকে সাহায্য করার অনেক লোক আছে। ঐ জমিটা তার প্রজেক্টের জন্য চাই।

রিডন স্ট্রিটের মোড়ের কাছটায় যেখানে ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যান্ড, সেখানে চাপা কলের সামনে একটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ পাগলিনীকে দেখে চোখ বুজে ফেলেছিল চন্দ্রা। কলকাতার রাস্তায় এই দৃশ্য এমন কিছু অভিনব নয়।

বড় বড় বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে অনেক ভিখিরি পরিবারে আশ্রয় নিয়ে থাকে। সেখানেই তাদের আহার-নিদ্রা-মৈথুন আর জন্ম -মৃত্যুর চক্র আবর্তিত হয়। দিনের বেলায় তারা তবু একটু আব্রু রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু পাগলদের তো সে হুঁসও থাকবার কথা নয়। পাগল তো অনেক আছেই, ইদানীং যেন পাগলিনীর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন মুখ চোখে পড়ে। অসমঞ্জও পাগলিনীর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন মুখ চোখে পড়ে। অসমঞ্জও পাগলিনীদের এই সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ করেছেন। খুব সম্ভবত, এরা সবাই ধর্ষিতা নারী। প্রতিদিন যে উদ্বাস্তুদের স্রোত আসছে, তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু যুবতী মেয়ে তো ধর্ষিতা হবেই। পাগল ক্যাম্পেও এদের জায়গা হয় না।

অসমঞ্জ রায় আর চন্দ্রা তখন একটা ট্যাক্সিতে বসে ছিলেন, সামনের রাস্তায় জ্যাম। উলঙ্গ নারীকে দেখে চোখ বুজে চন্দ্রা প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, রাস্তা দিয়ে এত লোকজন যাচ্ছে, স্কটিশ চার্চ কলেজ, বেথুন কলেজের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে, তাদের কারুর কোনো হুঁস নেই, এই মেয়েটির জন্য কেউ কিছু করতে পারে না? নারীত্বের এতখানি অপামান...

সেই দিন থেকেই চন্দ্রা রাস্তার মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে সুষ্ঠু জীবন ফিরিয়ে দেবার জন্য

পরিকল্পনা করতে শুরু করে। তারই প্রথম পদক্ষেপ এই মহিলা-আবাস স্থাপন।

যোগেন দত্ত জমিটা দিতে এখনো খানিকটা তা-না-না-না করছেন তার কারণ তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, এই রকম কাজে জমি দিলে পুণ্য হয় কিনা। রামকৃষ্ণ মিশনকে জমি দিলে পুণ্য একেবারে বাঁধা। চন্দ্রা তবু নাছোড়বান্দা, ইদানীং কয়েকটা দিন সে যোগেন দত্তর সঙ্গে সব সময় লেগে

চন্দ্রাকে এক কথায় না-ও বলতে পারছেন না আর আবার চন্দ্রা সম্পর্কে পুরোপুরি মনস্থিরও করতে পারছেন না যোগেন দত্ত। চন্দ্রার মুখে কোনো ধর্মের কথা নেই, ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাবও নেই। রাস্তা থেকে পাগল ছাগল তুলে এনে রাখবার জন্য একটা বাড়ি বানাতে চায় মেয়েটা, যোগেন দত্তর মতে, এটাও ঐ মেয়েটার একটা পাগলামি। তবে চন্দ্রাকে তাঁর পছন্দ হয়েছে।

একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে বিকেলে বাড়ি ফিরে অসমঞ্জ দেখলেন, তাঁর শয়নকক্ষে প্রীতিলতার বিছানার পাশে একটি চেয়ারে বসে আছে চন্দ্রা। দুজনের হাতেই চায়েরক কাপ, এমনভাবে হেসে হেসে গল্প করছে যেন দুজনের কতদিনের চেনা।

অসমঞ্জ শুধু চমকে গেলেন না, ভয় পেয়ে গেলেন। প্রীতি আজকাল অদ্ভুতভাবে কথা বলে। তার মন যে কোন বিচিত্র গতিতে চলে তা অসমঞ্জ বুঝতে পারছেন না। চন্দ্রা সম্পর্কে প্রীতির মনে প্রবল ঈর্ষা আছে, অথচ কখনো কোনো প্রসঙ্গে চন্দ্রার নাম উঠলেই প্রীতি তার দারুণ প্রশংসা করে। চন্দ্রার মতন এমন মেয়ে নাকি সে আর দেখেনি। তবু নিজের স্বামীর সঙ্গে চন্দ্রার বেশি ঘনিষ্ঠতা কি সে মেনে নেবে? চন্দ্রাকে সে একবার চিঠি লিখেছিল।

চন্দ্রার সামনে জামাটা খোলা ঠিক হবে না ভেবে তিনি জামাটা খুলতে গিয়েও খুললেন না। উদাসীন ভাব দেখিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, কী খবর, চন্দ্রা, ভালো তো?

চন্দ্রা সব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয় না। তার ঠোঁটে চায়ের কাপ।

প্রীতির দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আজ কেমন আছো?

প্রীতিলতাও উত্তর না দিয়ে হাসলেন। যেন কোনো একটা বিশেষ আলোচনার মধ্যে অসমঞ্জ এসে পড়ায় ওরা দুজনেই কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে অসমঞ্জ সুখের চেয়েও স্বস্তি বোধ করলেন বেশি। চন্দ্রার বাড়িতে যে তিনি প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা যান তা প্রীতি জানেন না। চন্দ্রাও নিশ্চয়ই সে কথা জানিয়ে দেয় নি। চন্দ্রার বাড়িতে তিনি গতকালও গিয়েছিলেন। আজ চন্দ্রা তাঁর সঙ্গে জরুরি কথা বলার জন্য বসে আছে, সুতরাং প্রীতি নিশ্চয়ই ধরে নেবে যে চন্দ্রার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি অনেক দিন।

তিনি চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার তো সব খবরই জরুরি। এটা কী!

চন্দ্রা তার চোখ-মুখে রং মশাল জ্বেলে বললো, যোগেন দত্ত রাজি হয়েছে! আজ সকালেই রাজি করিয়েছি! ইজনট ইট সামথিং?

অসমঞ্জ ঔদাসীন্যের ভাবটা বজায় রেখে বললেন, ও রকম তো সে মুখে আগেও বলেছে। হ্যাজ হি সাইনড দা ডীড?

চন্দ্রা বললো, কাল সই করবে। আমাকে দুটো শর্ত দিয়েছে। পুরুত ডেকে জমিতে পুজো করে তারপর দলিলটা তুলে দেবে আমাদের হাতে। আর দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানটি হবে ওঁর মায়ের নামে। এতে আমাদের আপত্তি করার কী আছে? আমাদের কাজ হলেই হলো।

- হ্যাঁ, এতে আপত্তি করার কিছু নেই।

-কাল সকালে জমি-পুজো হবে। সেই সময় আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

অসমঞ্জ ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, কাল? কাল তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার অন্য কাজ আছে।

-সে কি, আপনি না গেলে চলবে কেন? আপনি প্রেসিডেন্ট, আপনি তো দলিলটা নেবেন আমাদের পক্ষ থেকে।

-সে তুমি নিলেও চলবে। কিংবা, অন্য কোনো দিন করতে বলো!

-আবার অন্যদিন হলে যদি বুড়ো মত বদলে ফেলে? পুরুতকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে, কাল নাকি ভালো দিন।

-কিন্তু কাল যে আমার বিশেষ কাজ আছে, কাল যাই কী করে?

চন্দ্রা জোর দিয়ে বললো, যতই কাজ থাক, অপনাকে যেতেই হবে। সকল এগারোটায়।

প্রীতি জিজ্ঞেস করলেন, কাল তোমার কী কাজ?

-বাঃ, কাল তোমাদের সঙ্গে চন্দননগরে যাবার কথা নয়?

প্রীতি হাঁফ ছেড়ে বললেন, ও তোমার না গেলেও চলবে। মেজমামাকে সকালে খবর পাঠিয়ে দেবো। তার থেকে এটা অনেক বেশি জরুরি। চন্দ্রার কাছ থেকে শুনছিলুম কত কষ্টে ও বুড়োটাকে রাজি করিয়েছে।

অসমঞ্জ এবারে একটা যথার্থ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রীতি বুঝুক যে চন্দ্রার যে-কোনো প্রস্তাবেই তিনি সঙ্গে রাজি হন না। কাল তিনি চন্দ্রার সঙ্গে যাবেন প্রীতিরই অনুরোধে।

চন্দ্রা আজ একটা গোলাপি রঙের শাড়ি পরেছে। এই রংটা চন্দ্রার বেশি পছন্দ। চন্দ্রার মুখেও একটা গোলাপি আভা। সিঁথিতে সে সিঁদুর দেয় না, তার কপালে একটা লাল টিপ।

চন্দ্রার মুখটা দেখেই তাকে এক্ষুণি একবার ছুঁতে ইচ্ছে হলো অসমঞ্জর। চন্দ্রা উঠে দাঁড়িয়েছে। তাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে অন্ত দুবার ছুঁতে চান অসমঞ্জ।

কিন্তু প্রীতিলতাও নেমে পড়লেন খাট থেকে।

অসমঞ্জ হা-হা করে উঠে বললেন, তুমি নামছো কেন? তুমি শুয়ে থাকো। আমি ওকে পৌঁছে দিচ্ছি।

প্রীতি বললেন আমি আজ বেশ ভালো আছি। আমি একটু নিচে যাবো।

অসমঞ্জর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাহলে আর তার যাবার দরকার নেইত, তবু তিনি চন্দ্রার শরীরের গন্ধ পাবার জন্য ওদের সঙ্গে নামলেন সিঁড়ি দিয়ে, একটু দূরত্ব রেখে।

চন্দ্রা চলে যাবার পর তিনি বসবার ঘরে এসে একটা পত্রিকা খুলে মন বসবার চেষ্টা করলেন। এক্ষুনি তিনি প্রীতির সঙ্গে কোনো কথা বলতে চান না, তা হলে তাঁর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার প্রকাশ পেতে পারে। পত্রিকাটিতে মুখ আড়াল করে তিনি আত্মসমালোচনা করতে লাগলেন, কেন চন্দ্রাকে শুধু স্পর্শ করার জন্য তাঁর এই ব্যাকুলতা? এ যেন নিছক পাগলামির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। আগে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে লেখাপড়ার কাজ করতেন, এখন প্রায় প্রত্যেকটির সন্ধ্যে চন্দ্রার বাড়িতে কাটে, শুধু তাকে দেখবার জন্য, তাকে একটু ছোঁয়ার জন্য। উদ্বাস্তু ত্রাণ, অনাথ আশ্রম স্থাপন এই সব বিষয়ে তাঁর সত্যিকারের কোনো উৎসাহ নেই, তিনি তো ইলেকশানে দাঁড়াতে চান না! শুধু চন্দ্রার জন্যই তিনি এসব নিয়ে মেতেছেন এবং ক্রমশই বেশি করে জড়িয়ে পড়ছেন।

অসমঞ্জ ঠিক করলেন, এবারে একটু সাবধান হতে হবে। চন্দ্রার মতন মেয়ে সমাজসেবা নিয়ে কেন এত মাতামাতি করছে তা বোঝা দুঃসাধ্য। এরকম অ্যাকমাপ্লিসড মহিলার তো হাই সোসাইটিতে ঘোরাফেরা করে। চন্দ্রা রূপসী তো বটেই, তা ছাড়া বাড়ির অবস্থা বেশ ভালো, ইংরেজিও বলে চমৎকার। সে কেন গরিব-দুঃখী আর পাগলদের জন্য জীবনটা খরচ করবে? কয়েক বছর আগে পরিচালক দেবকী বসু তাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ফিলমটি তৈরি করার সময় চন্দ্রাকে নাকি পার্ট দিতে চেয়েছিলেন, এ কথা অসমঞ্জ চন্দ্রার বাবার মুখথেকে শুনেছেন। চন্দ্রা রাজি হয়নি। চন্দ্রার বাবাও তো অদ্ভুত, তাঁর মেয়ে স্বামীর ঘর করে না, এখানে ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়ায়, তবু তিনি কোনো বাধা দেন না!

এরা অন্য রকম মানুষ, অসমঞ্জর সঙ্গে মিলবে না।

পরদিন সকালে চন্দ্রা তাদের বাড়ির গাড়ি নিয়ে এলো অসমঞ্জকে তুলে নিতে। পেছনের সীটে বসেই তিনি চন্দ্রার ডান হাতটা নিজের দু'হাতে তুলে নিলেন। এতটা সাহস তিনি আগে কোনো দিন দেখান নি। চন্দ্রা কোনো আপত্তি করলো না, হাত ছাড়িয়ে নিল না। উত্তেজনায় সে ছটফট করছে। অসঞ্জের দিকে ঘুরে বসে সে বললো, আজই জমিটা আমাদরে হয়ে যাচ্ছে দারুণ না! আপনি অবিশ্বাস করেছিলেন। দেখুন না, এর পরে সব টাকাই আমি তুলে ফেলবো। ঐ বুড়োর মায়ের নাম দিয়ে আরও টাকা আদায় করবো ওর কাছে থেকে।

অসমঞ্জ কোনো কথা মন দিয়ে শুনছেন না, চন্দ্রার হাতটা জোর করে চেপে ধরে আছেন, তাঁর শরীরের মধ্যে ঝনঝন শব্দ হয়েই চলছে।

গাড়ি চললো আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে। সেখান থেকে যোগেন দত্তকে তুলে নিতে হবে। যোগেন দত্তর নিজস্ব গাড়ি আছে একাধিক, তবু তিনি চন্দ্রার গাড়িতে গিয়ে পয়সা বাঁচাতে চান। চন্দ্রাও তাঁকে চোখের আড়াল করতে চায় না যেন।

বাড়ির সামনেই তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যোগেন দত্ত। বিশাল তাঁর বপু। আজ জমি পুজোর ব্যাপার আছে বলেই বোধ হয় একটা গরদের পাঞ্জাবি পরেছেন, ঘাড়ে মুগার চাদর।

কপালে চন্দনের ফোঁটা। এক গাল হাঁসি দিয়ে তিনি দুজনকে অভ্যর্থনা করলেন, তারপর অসমঞ্জকে বললেন, এই যে মাস্টারবাবু, কী মেয়ে একটি জুটিয়েছেন, একেবারে ছিনে জোঁক। শেষ

পর্যন্ত জমিটা আদায় করে ছাড়লো।

অসমঞ্জ বললেন, সৎ কাজেই তো লাগবে! আপনার অনেক আছে।

যোগেন দত্ত বললেন, আমি সামনের সীটে বসতে পারি না, আমার গন্ধ লাগে!

পেছনের সীটে তিনজন বসাই স্বাভাবিক, কিন্তু যোগেন দত্তর শরীরের আয়তনের জন্য আঁটাআঁটি হবে। চন্দ্রা অসমঞ্জকে বললো, আপনি সামনে গিয়ে বসুন।

অসমঞ্জর মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। এখন চন্দ্রার পাশ থেকে উঠে যেতে ইচ্ছে করছে না তাঁর। তবু তিনি নামলেন।

গাড়ি ছাড়বার পর যোগেন দত্ত চন্দ্রাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তা থেকে তুমি যে পাগলদের ধরে এনে রাখবে, তাদের সামলাবে কে?

চন্দ্রা বললো, আপনাকেও আসতে হবে মাঝে মাঝে। আপনার মায়ের নামে প্রতিষ্ঠান হচ্ছে।

-ওরে বাবা, পাগলদের আমি বড্ড ভয় পাই!

-মেসোমশাই, আমাদের বাড়ির প্ল্যানটা দেখবেন?

যোগেন দত্ত অট্টহাসি করে বললেন, মেসোমশাই! অ্যাঁ? তুমি মাসি পেলে কোথায়? আমার তো পত্নী বিয়োগ হয়েছে পাঁচ বছর আগে!

-তা হলে কী বলে ডাকবো আপনাকে? মিঃ দত্ত বলতে আমার ভালো লাগে না!

-তা হলে দাদা বলো! বড়বাজারে সবাই আমায় দাদা বলেই ডাকে।

-দেখবেন প্ল্যানটা?

-দেখি।

চন্দ্রা তার কোলের ওপর নকশাটা বিছিয়ে ধরলো, কাছ ঘেঁষে এগিয়ে এলো যোগেন দত্ত। অসমঞ্জ পেছন দিকে ঘুরে বসলেন। কিন্তু তাঁর দিকে ওরা মনোযোগ দিচ্ছে না, চন্দ্রা আর যোগেন দত্ত কথা বলে যাচ্ছে।

হঠাৎ অসমঞ্জ লক্ষ করলেন, যোগেন দত্ত একেবারে চন্দ্রার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তার একটা হাত চন্দ্রার উরুতে। চন্দ্রা সরে বসছে না? সে যেন টেরই পাচ্ছে না! কিন্তু কোনো মেয়ে কি টের না পেয়ে পারে? এক টুকরো জলা জমির জন্য চন্দ্রা এই খুনে, কালোবাজারি লম্পটটার স্পর্শ সহ্য করছে? এ কোথায় নেমে যাচ্ছে চন্দ্রা?

অসমঞ্জর মাথায় আগুন জ্বলতে লাগলো।

॥ ৩৬ ॥

মোটর বাইকের গর্জনে পাড়া কাঁপিয়ে সকালবেলা উপস্থিত হলো আলতাফ। দরজার সামনে সে গলা খুলে ডাকলো, মামুন ভাই! মামুন ভাই!

সদলে কলিং বেল আছে, আলতাফের তা মনে থাকে না, প্রত্যেকবারই এসে সে ঐ রকম হাঁক পাড়ে। একটুক্ষণও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা তার স্বভাবে নেই, সব সময়েই সে জীবনী শক্তিতে টগবগ করছে। আলতাফ এলেই আশপাশের বাড়ির জানলা খুলে যায়, অন্তঃপুরিকারা লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখে। দেখবার মতনই চেহারা তার। ছ' ফুটের মতন লম্বা মাথায় বাবড়ি চুল, এমন চওড়া কাঁধ ও শক্ত কবজীওয়ালা পুরুষ বাঙালীদের মধ্যে বেশি দেখা যায় না। গায়ের রংও পরিষ্কার। তার পোশাকের আড়ম্বর আছে, ঢাকার শীত এমন কিছু বেশি নয়, তবু সে পরেছে একটা জমকালো উইন্ডচিটার। তাকে যেন মিলিটারির সেনাপতি হিসেবেই মানাতো। অবশ্য তার চোখে-মুখে এখনো যেন রয়ে গেছে কৈশোরের সারল্য।

সকালবেলা এ বাড়ির আবহাওয়া বড় গুমোট ছিল, আলতাফ এসে পড়ায় মামুন খুশীই হলেন। শহীদ, পলাশ, নাদেরারা আজ ভোরেই এসে বিদায় নিয়ে গেছে, ওরা ফিরে যাচ্ছে কলকাতায়। তারপর থেকেই মঞ্জুর কী কান্না। তাকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। অবুঝের মতন সে বারবার বলছে যে সেও কলকাতায় যাবে।

আলম সাহেব আর মালিহা বেগম দু'জনেই বেশ বিরক্ত হয়েছেন মঞ্জুর ওপর। মেয়েকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন, কিন্তু মেয়ের এ কী বেহায়াপনা। প্রথমে সস্নেহ ভর্ৎসনা, তারপর মৃদু তিরস্কার, তারপর রীতিমতন বকুনি বর্ষিত হচ্ছে মঞ্জুর ওপর। খোসমেজাজী আলম সাহেব পর্যন্ত একসময় কটুভাবে বলে ফেললেন লাই দিলেই মাথায় ওঠে। এইজন্যেই বাপ-দাদারা মাইয়া মানুষেদের কড়া শাসনে রাখতেন।

মামুন দু'দিকেই সামলাবার চেষ্টা করছিলেন। মঞ্জুর কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনোর জন্য বায়না

ধরা তাঁরও পছন্দ হয়নি, কিন্তু মঞ্জুর তরুণী হৃদয় অন্য যে-কারণে উদ্বেল হয়ে উঠেছে সেটা তিনি বোঝেন। এ দেশের মেয়েদের সারা জীবনই কাঁদতে হয়। তবে কোনো কোনো বিশেষ কারণের জন্য কান্না লুকিয়ে রাখতে হয় অন্যদের কাছ থেকে, সে দুঃখ শুধু নিজের,-চোখে জল আসে বিরলে, নিরালায়। মঞ্জু এখনও বড় ছেলেমানুষ রয়ে গেছে, কান্না লুকোতে শেখেনি।

শহীদের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ের প্রস্তাব সরাসরি উত্থাপন না করা হলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। শহীদ বুদ্ধিমান ছেলে, সে বুঝতে পেরেও উৎসাহ দেখায়নি। কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় এসে থাকার তার একটুও ইচ্ছে নেই। কলকাতায় তাদের বড় ব্যবসা, উত্তর বাংলায় জলপাইগুড়ি জেলায় তাদের চা-বাগানের সম্পত্তি আছে, সেসব ছেড়ে আসার প্রশ্নই ওঠে না। ঢাকা শহরটি সুন্দর হলেও কলকাতার তুলনায় মফঃস্বল মনে হয় তার কাছে। অবশ্য মঞ্জু যদি কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনো করতে চায়, তাহলে সে সবরকম সাহায্য করতে রাজি আছে।

মালিহা বেগম আগে থেকেই জেদ ধরে আছেন যে মেয়ের বিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে আর কোথাও দেবেন না, এমকি লন্ডনের পাত্র পেলেও না।

সুতরাং বিয়ের প্রসঙ্গ চাপ পড়ে গেছে। একা একা এত বড় মেয়েকে কলকাতায় পড়তে পাঠাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ওরা যখন বিদায় নেয়, তখন মঞ্জু শহীদের বদলে পলাশের সামনে দাঁড়িয়েই প্রথম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। পলাশেরও ছলছল করে উঠেছিল চোখ। মামুন সে দৃশ্য দেখেছেন, কিন্তু তার কোনো অন্য অর্থ তিনি মাথায় আনতে চান না।

একসময় মঞ্জুর মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বলেছিলেন, তুই কাঁদিস না, মামণি, তোরে আমি কলকাতায় বেড়াতে নিয়ে যাবো। আমি কথা দিতেছি।

মঞ্জু তাতেও প্রবোধ মানেনি।

আলতাফ এসে যখন বৈঠকখানায় ঢুকলো, তখনও মঞ্জু হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদছে। আলতাফকে দেখে সে ঝড়ের মতন ছুটে বেরিয়ে গেল।

আলতাফ ঘাড় ঘুরিয়ে বিস্মিত চোখে মঞ্জুকে দেখলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, ঐ মেয়েটির চক্ষু লাল, কেউ বকেছে বুঝি? কী হয়েছে?

মামুন বললেন, এমন কিছু হয় নাই। মেয়েলি ব্যাপার, তুমি বুঝবে না।

আলতাফ তবু ভুরু কুঁচকে রইলো একটুক্ষণ। আপন মনেই বললো, মানুষ যে অন্যাকে কেন কাঁদায়? অন্যকে কষ্ট দিয়ে কী যে আনন্দ পায় মানুষ।

মামুন বললেন, বসো আলতাফ। তারপর খবর-টবর কী?

আলতাফ ঝপাস করে একটা চেয়ারে বসে বললো, আমার একটা মত কী জানেন মামুন-ভাই, যে-সব বাপ-মায়েরা ছেলেমেয়েদের বেশি বকাবকি করে সরকারের উচিত তাদের ফাইন করা।

মামুন কাষ্ঠহাসি দিয়ে বললেন, এদেশের সরকার তো আমাদের জান মালের সব ক্ষমতাই নিয়ে রেখেছে, এরপর কি চাও, সরকার আমাদের পরিবারের মধ্যে এসেও মাথা গলাবে।

আলতাফের গায়ে যেন বিছুটি লেগেছে, এইভাবে ছটফটিয়ে উঠে সে বললো, না না, না, এই সরকার না, এই সরকার না। ভবিষ্যতে যখন আমাদের নিজেদের আদর্শ সরকার গড়া হবে, তখনকার কথা বলছি। তা এই মেয়েটি কাঁদছিল কেন বলেন না! কী হয়েছে?

-আরে তোমার এত কৌতূহল কেন? ওর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে কিনা। তুমি তো আগেই বিয়ে করে বসে আছো, নইলে তোমার মতন পাত্র পেলে আমরা এক্ষুনি বিয়ে দিতাম!

আলতাফ লজ্জা পেয়ে বললো, হায় আল্লা, আমি ছাড়া কি আর পাত্র নাই? আমার ছোট ভাইটাই তো রয়েছে, সে ল্যাখাপড়ায় আমার থেকে চার গুণ ভালো! যদি বলেন তো সম্বন্ধ করতে পারি।

-এখন কয়েকটা দিন যাক। পরে আমি দুলাভাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করবো। এখন কাজের কথা বলো।

-আপনি তৈরি তো মামুনভাই? আজ দুপুরেই আমরা টাঙ্গাইলে রওনা হবো।

-আজ দুপুরেই? এত তাড়াতাড়ি কিসের?

-পর্শু থেকে কনফারেন্স আরম্ভ! আপনি আমার সঙ্গে মোটর সাইকেলে যাবেন!

-মোটর সাইকেলে? না বাপু, সে আমি পারবো না।

-চিন্তা করবেন না, মামুন ভাই। দেখবেন, একেবার পক্ষীরাজের মতন উড়ায়ে নিয়ে যাবো আপনাকে।

-কিন্তু আমার মেয়েটাও যে আমার সঙ্গে যাবে!

-তাকেও নিয়ে নেবো সামনে বসিয়ে। অসুবিধা কিছু নাই।

মামুন তবু রাজি হলেন না। মোটর সাইকেলে যেতে যে তিনি ভয় পান তা নয়। তাঁর সঙ্গে যারা একসঙ্গে রাজনীতিতে নেমেছিল, তারা অনেকেই এখন মাঝারি শ্রেণীর নেতা হয়ে পার্টির জিপ গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। অনেকের নিজস্ব গাড়ি হয়েছে। মামুনের সেসবের প্রতি লোভ নেই বটে, কিন্তু তাহলেও একজন সাধারণ পার্টি-কর্মীর মোটর সাইকেলের পেছনে চেপে তিনি যেতে পারবেন না। তিনি নিজের পয়সায় বাসে চেপে যাবেন। আজ নয়, আগামীকাল।

আলতাফ বেশ নিরাশ হলো মামুনের কথা শুনে। সে মামুনকে নিয়ে যাবার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে চলে এসেছে।

মামুন বললেন, মাওলানা ভাসানী তো মস্ত বড় সম্মেলন করছেন শুনতে পেলাম। ইত্তেফাক কাগজে খুব লেখালেখি হচ্ছে। দেশে এখন দুর্ভিক্ষ চলছে। কতমানুষ মরচে অনাহোরে, এই সময় এত জাঁকজমক করা কি ভালো?

আলতাফ বললো, প্রয়েঅজন আছে। প্রয়োজন আছে। আপনি গেলেই বুঝবেন। আমাদের দলের যে কতখানি শক্তি তা পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাটাদের দেখানো দরকার!

মামুন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আলতাফ, তুমি যে বললে ভবিষ্যতে তোমাদের নিজেদের সরকার গড়া হবে, কেন, এখনই তো তোমাদের দল পাওয়ারে এসেছে।

আলতাফ অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, ফুঃ! নির্বাচন হলো না, প্রেসিডেন্টের ধামাধরা সরকার গড়া হলো, ওরা...মাফ করবেন মামুনভাই, একটা খারাপ কথা মুখে এসে যাচ্ছিল!

মামুন ঈষৎ ব্যাঙ্গের সঙ্গে বললেন, তোমার মনের ভাবটা তো বুঝতে পারছি না। তুমি আওয়ামীলীগের জন্য এত খাটছো, এখন তো তোমার আহ্লাদে থাকার কথা। তোমাদের নেতা সোহরাওয়ার্দি সাহেব এখন কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মন্ত্রিত্ব করছে, ফজলুল হক সাহেব গভর্নর। সেও নাকি বাঙালীদের তো এখন জয়জয়কার। এমনকি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা, সেও নাকি বাঙালী, এতদিন সেকথা জানতাম না, হক সাহেব তাকে বাঙালী বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ওঁর শরীরে নাকি রয়েল ব্লাড আছে!

-ব্যাটা মীরজাফরের বংশধর! শোনেন মুন ভাই, এই জোড়াতালি দেওয়া সরকার নিয়ে কোনো কাজের কাজ হয় না। প্রেসিডেন্টের বদখেয়াল হলে একটা লাথথি মেরে এই সরকার উল্টে দেবে। আমরা কি স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার এখনো পেয়েছি?

-আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সম্মেলন ডেকে কোন মুখে এখন সরকারের সমালোচনা করবেন? নিজেদেরই তো

-সরকার আর পার্টি কি এক? শেখ মুজিবর রহমান তাড়াহুড়ো করে এই সরকর মেনে নিলেন। আমি আপনাকে বলে রাখছি, মিলিয়ে নেবেন, এ সরকারে আয়ু আর বেশি দিন নাই!

মামুন এক দৃষ্টিতে আলতাফের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর বললেন, কয়েকদিন আগে তোমার এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছিলাম, ঐ যিনি হোটেলের ব্যবসা করেন। তোমার ওপর তাঁর খুব রাগ দেখলাম। তাঁর ধারণা, তুমি কমুনিস্ট। এখন মনে হচ্ছে, তাঁর ধারণাটা বোধহয় খুব ভুল নয়।

আলতাফ সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে হেসে উঠে বললো, আরে ওর কথা বাদ দেন। ও শুধু টাকা দিয়ে মানুষকে চেনে।

মামুন বললেন, বামপন্থীরা এখন মওলানা ভাসানীর চার পাশে এসে ভিড়ছে, এ তো আমিও বুঝতে পারছি। কেন বলো তো?

প্রয়োজনে প্রগতিশীল কিংবা বামপন্থীদেরও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়। এটা তো খুব স্বাভাবিক তাই না? মুসলিম লী, জামাতে ইসলামী এইসব প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে এখন আমাদের এককাট্টা হয়ে লড়তে হবে। এটাই তো সঠিক স্ট্রাটেজি!

হঠাৎ কিছু যেন কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আলতাফ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি তাহলে আজ যাচ্ছেন না? আমি এখন চলি। কাল সকালে বাস স্ট্যান্ডে দেখা হবে। আপনাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে আমি রওনা হবো!

পরদিনও আলতাফ এক অদ্ভুত কাণ্ড করলো। মামুনদের বাসে তুলে দিল বটে কিন্তু সঙ্গ ছাড়লো না। মোটর সাইকেলে সে অনেক আগেই পৌঁছে যেতে পারতো কিন্তু সে প্রায় চলতে লাগলো বাসের

সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মাঝে সে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার হঠাৎ সে চলন্ত বাসের পাশাপাশি চলে এসে হাত নাড়ে। যেন সে মামুনের বডি গার্ড।

মামুনের মেয়ে হেনা এতে বেশ মজা পাচ্ছে। জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে সে আলতাফকে দেখার চেষ্টা করে, দেখতে পেলেই হেসে ওঠে খলখলিয়ে। বাচ্চাদের সঙ্গে বেশ সহজে ভাব জমাতে পারে আলতাফ, হেনাকে আনন্দ দেবার জন্য নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করছে সে।

মঞ্জুকেও সঙ্গে এনেছেন মামুন। বাড়িতে থাকলে সে মা-বাবার কাছে আরও বকুনি খেত, কয়েকদিন বাইরে ঘুরে এলে তার মন ভাল হতে পারে। অসুবিধের কিছু নেই, টাঙ্গাইল শহরে আলম সাহেবের নিজের বাড়ি আছে, তাঁর এক চাচা সপরিবারে থাকেন সেখানে।

প্রথম প্রথম মঞ্জু মুখ ভার করেছিল। আলতাফের কাণ্ডকারখানা দেখে সেও না হেসে পারলো না। আলতাফের মাথায় আজ একটা টুপি, তাতে সে একটা কচুরিপানার ফুল গুঁজেছে।

মাঝপথে ধামরাইতে বাস থামাতেই আলতাফ বললো, নেমে আসেন মামুনভাই, এখানে একটু চা খাওয়া যাক।

মঞ্জু বসে রইলো নিজের সীটে। মামুন হেনাকে নিয়ে নামলেন। আলতাফ আগে থেকেই চায়ের অর্ডার দিয়ে রেখেছে। এক কাপ চা ও দুটি বিস্কুট নিয়ে আলতাফ বাসের জানলার কাছে গিয়ে মঞ্জুকে বললো, এই নাও! তুমি কাঁদছিলে কেন গতকাল?

মঞ্জু কোনো উত্তর দিল না। আলতাফ বললো, মেয়েরা কি শুধু কাঁদতে জানে, আর কিছু পারে না? তুমি নেমে এসো, তোমার সাথে আমার কথা আছে!

আলতাফের ব্যবহারে আর একবার মুগ্ধ হলেন মামুন। এই বয়েসী কোনো যুবককে কোনো অচেনা সদ্য যুবতীর সঙ্গে এমন সহজ সাবলীল ভাবে কথা বলতে তিনি আগে দেখেননি।

তিনি বললেন, বাস এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে, তুই নেমে আয় মঞ্জু।

মঞ্জু আস্তে আস্তে নেমে এসে মুখ নিচু করে দাঁড়ালো। সে পরে আছে একটা আকাশী নীল শাড়ী। তার ওপর একটি লাল কলকা দেওয়া সাদা শাল। ঈষৎ বিষাদচ্ছন্ন মুখখানি তার এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

আলতাফ জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কী?

মঞ্জু নিচু করেই নীরব রইলো মামুন বললেন, ওর ভালো বিলকিস ডাক নাম মঞ্জু।

আলতাফ বললো, ও বুঝি শুধু কাঁদতে জানে কথা বলতে পারে না?

তারপর সে হেনার গাল টিপে বললো, কী রে হেনা তোর এই আপাটা বুঝি বোবা?

হেনা বললো, না, বাবা না, ভাল গান করে!

-কথা বলে না শুধু গান করে?

আলতাফ নাছোড়বান্দা, মঞ্জুকে শেষ পর্যন্ত কথা বলতেই হলো। চাও খেল।

আলতাফ বললো, তুমি গান করো, তুমি এই কনফারেন্সের সংস্কৃতি উৎসবে গান গাইবে? অনেক জায়গা থেকে আর্টিস্ট আসছে, কলকাতা থেকেও আসছে। বলো, তা হলে ব্যবস্থা করে দিই!

মঞ্জু মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না, না, না, আমি গান গাইতে পারবো না।

-তুমি তা হলে ভলান্টিয়ার হও। আমাদের মেয়ে ভলান্টিয়ার দরকার।

-আমি যে ওসব কিছুই জানি না।

-তোমাকে শিখিয়ে দেওয়া হবে।

মামুন বললেন, হ্যাঁ, ওকে নিয়ে যাবো কনফারেন্সে। ও গান-বাজনা ভালবাসে, সেসব তো শুনতে পারবে।

বাসের ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে, আবার উঠে পড়লেন মামুনেরা।

টাঙ্গাইলে পৌঁছে মামুনকে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো। হেনাকে আর মঞ্জুকে তিনি পৌঁছে দিলেন আলম সাহেবের বাড়িতে, তারপর আলতাফের সঙ্গে তিনি চলে এলেন পার্টি অফিসে।

সমস্ত জেলা থেকে এসেছে ডেলিগেট, মামুকে অনেক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কনফারেন্সের সাফল্য নিয়ে সকলের মধ্যেই একটা উত্তেজনার ভাব। মওলানা যে সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছেন তার প্রধান আলোচ্য বিষয় দুটি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন।

দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে কোনো দ্বিমত নতুন সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবির স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এই দাবি আদায়ের জন্য জোরদার আন্দোলন দরকার ঠিকই। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি বদলের প্রসঙ্গ এখানে তোলা কি সমীচীন হবে? মার্কিন সামরিক জোটের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে পাকিস্তান, মওলানা

ভাসানী এর ঘোর বিরোধী। তিনি চান পাকিস্তান ঐ সামরিক জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসুক, আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল কর্মীরা তাঁকে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু এই আওয়ামী লীগেরই নেতা শহীদ সোরাওয়ার্দি এখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তিনি যে মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন, সেই মঞ্চ থেকেই সরকারি পররাষ্ট্র নীতির বিরোধিতা করা যায় কী?

বিভিন্ন অঞ্চলের নেতা ও ডেলিগেটদের সঙ্গে কথা বলে মামুন বুঝতে পারলেন, এর মধ্যেই এই দুটি বিষয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা দিয়েছে। তর্কাতর্কিতে মাঝে মাঝেই কণ্ঠস্বর উঠে যাচ্ছে উচ্চগ্রামে।

ইত্তেফাক পত্রিকার বিশালদেহী সম্পাদক মানিক মিঞা বাইরের পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কয়েকজন সঙ্গে। মানিক মিঞা যখন দেশ বিভাগের আগে কলকাতায় মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারি ছিলেন, সেই সময়ে থেকে মামুন তাঁকে চেনেন। তাঁর মতন অনেকেই এখন মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। মানিক মিঞার সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্য মামুন এগিয়ে যেতেই তাঁর বরিশালের বন্ধু বদ্রু শেখ তাঁর হাতে ধরে টেনে বললেন, আরে মামুন যে! এতদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে?

এই কয়েক বছরে মামুনের চেহারা বিশেষ পরিবর্তন না হলেও বদ্রু শেখের বপু অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে তাঁর মুখে ছিল দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, এখন পরিষ্কার করে কামানো। আগে তার পোশাক ছিল কুর্তা পাজামা, এখন প্যান্ট-কোট। চিনতে মামুনেরই অসুবিধে হলো প্রথমে।

কুশল বিনিময়ের পর পরস্পরের বর্তমান অবস্থার খবরাখবর জানাজানি হলো। মামুন কিছুই করেন না শুনে আশ্চর্য হলেন বদ্রু শেখ। তিনি এক সময় হোল টাইম রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। এখন ব্যবসা করছেন। তাঁর হাসি খুশী ভাব দেখে মনে হলো, ব্যবসা বেশ ভালই চলছে!

দুই বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে এসে বসলেন আদালতে প্রাঙ্গণে এক চায়ের দোকানে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, শীত পড়ছে জাঁকিয়ে। আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। পথে পথে সেরকমই অচেনা মানুষের স্রোত। এই ছোট শহরটিতে হঠাৎ বিপুল জনসাগম হয়েছে।

খানিকক্ষণ পুরোনো কালের সুখ দুঃখের গল্প হলো। পটুয়াখালিতে বদ্রুদের বাড়িতে বেশ কয়েক মাস কাটিয়েছেন মামুন, বদ্রুর মা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর হাতে তৈরি পাটিসাপ্টা পিঠের স্বাদ এখনো যেন মুখে লেগে আছে। বদ্রুদের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না, তবু তারই মধ্যে সব দিক গুছিয়ে কী সুন্দর রান্না করে খাওয়াতেন তিনি।

এক সময় বদ্রু শেখ জিজ্ঞেস করলেন, কী মামুন, এখানে এসে কী রকম বুঝছো?

মামুন বললেন, আমি তো ভাই একটু হকচকিয়ে গেছি। শুনেছিলাম তো সবাইকে একসঙ্গে মেলাবার জন্য ডাকা হয়েছে এই সম্মেলন। কিন্তু এস দেখছি অনেক দলাদলি। কেউ বলছে এক্ষুনি নির্বাচন চাই। কেউ বলছে, এখন আওয়ামী লীগে হাতে ক্ষমতা এখন নির্বাচনের দরকার কী?

বদ্রু বললো, দেখোই না আরও কত কী হয়! পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নেই ফাটাফাটি হবে। সোহরাওয়ার্দি মার্কিন জোট ছাড়তে চান না, মওলানা ভাসানী তাঁকে যতই ধমকান তাতে কোনো কাজ হবে না।

-আমিও তো তাই বুঝছি!

তুমি আর একটা কথা শোনোনি? প্রধানমন্ত্রী হবার পরই সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলতে শুরু করছেন যে আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের দাবিও তো আটানব্বই ভাগই মেনে নেওয়া হয়েছে।

-সে কি? আমরা কী পেয়েছি?

হে হে হে হে! ক্ষমতায় গেলে সবারই সুর পালটে যায়। সোহরাওয়ার্দি সাহেব প্রাদেশিক রাজনীতির উর্ধ্বে গিয়ে সর্ব পাকিস্তান রাজনীতির চূড়ায় উঠতে চেয়েছিলেন। এখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি ভাবলেন সব পাওয়া হয়ে গেল। এখন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতের পুতুল হয়ে নাচছেন। ওদের সুরে সুরে মিলিয়ে গাইছেন। শতকরা আটানব্বই ভাগ পাওয়া হয়ে গেছে, আর কী চাই!

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বদ্রু। এই সম্মেলনে তা হলে কী প্রস্তাব নেবো আমরা?

আমার তো ধারণা, কাল একটা মস্তবড় নাটকীয় কিছু ঘটবে। বুড়ো ভাসানী ভেলকি দেখাবে!

তুমি শেখ মুজিবকে চেনো?

ভাষা আন্দোলনের সময় পরিচয় হয়েছিল। সে তো স্বায়ত্ত শাসনের একজন জোরালো দাবিদার ছিল।

দেখো, এখন সেও সুর পালটাবে। সেও ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে তো, তাই সে সোরাওয়ার্দির

দিকেই বেশি ঝুঁকছে।

আমি তো জানতাম সে মওলানা ভাসানীর ভাবশিষ্য। তাঁর কাছ থেকেই সে রাজনীতি শিখেছে।

সে তো মাঠে-ঘাটের রাজনীতি। এখন উনি শ্রেণী বদল করছেন। একটু হেসে বদ্রু শেখ বললেন, আমিও অবশ্য সোহরাওয়ার্দি সাহেবের পক্ষেই এখন। কেন জানো? করাচির তখতে বসে উনি ব্যবসায়ী শ্রেণীতে মদত দিচ্ছেন, আমারাও তো তার ছিটেফোটা কিছু পাবো!

এই সময় আলতাফ সঙ্গে অন্য একটি ছেলেকে নিয়ে হাজির হলো সেখানে। সে বললো, মামুন ভাই, আপনি কখন গায়েব হয়ে গেলেন? অমি খুঁজে খুঁজে মরছি আপনাকে। ভারত থেকে অনেক কবি সাহিত্যিক এসেছেন কালচারাল ডেলিগেশানে। তাদের সঙ্গে অলাপ করবেন না?

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, কে কে এসেছেন?

আলতাফ বললো, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবোধ সান্যাল আরও জানি কে কে। সবার নাম জানি না। আপনি নিশ্চয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনেন, আমার সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন?

তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি কখনো। তবে আমাদের কমন বন্ধু আছে। তোমাদের প্রিয় কবি জীবনান্দ দাশ আসেন নি? তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল একবার।

জীবনান্দ দাশ মারা গেছেন আপনি জানেন না? এক বছর হয়ে গেল।

সে কি! শুনিনি তো! বেশি বয়েস তো হয় নাই তাঁর।

কলকাতায় ট্রামে চাপা পড়েছেন। আপনারা কলকাতর শহরটা কী, একজন কবিকে ট্রাম চাপা দিয়ে মেরে ফেললো?

-আমার কলকাতা শহর, হুঃ!

বদ্রু শেখ বললেন, পার্টিশানের সময় কলকাতা শহরটা আমরা পাবো না শুনে তুমি খুব মুষড়ে পড়েছিলে! কলকাতার জন্য আমারও মন-কেমন করে এক সময়!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মামুন আলতাফের পাশের ছেলেটির দিকে তাকালেন। ছেলেটিকে লাজুক বলে মনে হয়, কিন্তু মুখে একটা প্রতিভার দীপ্তি আছে। এক নজর দেখলেই বোঝা যায়, এ ছেলেটি সাধারণের চেয়ে অন্যরকম।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলেটি কে?

আলতাফ বললো, এই আমার ছোট ভাই, যার কথা কাল আপনাকে বলেছিলাম, এর নাম বাবুল। সারা দিন রাত দৈত্যের মতন অঙ্ক কষে!

মামুন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা সবাই চলো, আমি যে বাসায় উঠেছি, সেখানে চলো!

পরদদিন সকালে মামুন হাঁটা পথেই যাত্রা করলেন কাগমারির দিকে। টাঙ্গাইল শহর থেকে দু মাইল দূরে কাগমারি। সেখানে সন্তোষের রাজাদের বিশাল পরিত্যক্ত প্রাসাদে মাওলানা ভাসানী সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। অনেক দূর থেকেই স্থাপন করা হয়েছে একটির পর একটি তোরণ। সেগুলি চমৎকার ভাবে সাজানো।

ফেব্রুয়ারি মাসের সকাল। ঝকঝকে রোদ উঠলেও ফিনফিন করে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, পথে অফুরন্ত মানুষ। শুধু পার্টি সদস্যরাই নয়, গ্রাম গ্রামান্তর থেকে দলে দলে মানুষ যাচ্ছে, যেন একটা মেলা দেখতে।

হেনা আর মঞ্জুকে দু'পাশে নিয়েছেন মামুন। আলতাফ কাল রাতেই এখানে চলে এসেছে। তার ভাই বাবুলকে তিনি চোখ দিয়ে খুঁজতে লাগলেন ভিড়ের মধ্যে। কাল অল্প কিছুক্ষণের পরিচয়েই ছেলেটিকে দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে তাঁর।

মঞ্জুর মুখের ম্লান ভাবটা আজ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। সে উৎসাহের সঙ্গে একটি তোরণ দেখে দেখে নাম পড়ছে। বিশ্বের কত বিখ্যাত মানুষের নামে যে তোরণ আর ফেস্টুন সাজানো হয়েছে তার যেন ইয়ত্তা নেই। কায়েদ এ আজম, ইকবাল, গান্ধী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ফজলুল হক, রবীন্দ্রনাথ, লেনিন, লিঙ্কন, শেক্সপীয়ার, নেতাজী সুভাষ, সূর্য সেন...। কাগমারিসম্মেলনে যেন অওয়ামি লীগ শুধু অসাম্প্রদায়িক নয়, বিশ্বমানবিক ভাব প্রচার করতে চাইছে।

একটু আগে আগে মানিক মিঞা যাচ্ছেন সদলবলে। মামুন এগিয়ে গেলেন তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। মানিক মিঞার সঙ্গে সম্প্রতি কোনো ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর মনান্তর হয়েছে। তিনি ভুরু তুলে অনেকখানি বিস্ময়ের সঙ্গে খানিকখাটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ মিশিয়ে বললেন, কী এলাহী কাণ্ড কারখানা দেখেছেন? কী আলিশান আয়োজন!

মহারাজার বাড়ির কাছাকাছি এক জায়গায় একটা ভাঙা সাইনবোর্ড পড়ে আছে, তাতে লেখা 'বিধানচন্দ্র গেট'। মামুন জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী ব্যাপার?

মানিক মিঞা বললেন, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের নামেও একটা গেট করা হয়েছিল, পরে পার্টি ওয়ার্কারদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে।

সম্মেলনের রাজনৈতিক অধিবেশন শুরু হবার পরই মামুন বুঝতে পারলেন, বেসুরো বাজছে। বড় বড় নেতাদের বক্তৃতায় কোনো মিল নেই। ভাসানীপন্থীরা চরম কটোর ভাষায় আক্রমণ করছেন পাকিস্তানী সরকারি নীতির। আবার সোহরাওয়ার্দির পক্ষ সমর্থন করছেন সরকারি নীতির।

বিরোধ তুঙ্গে পৌঁছালো স্বয়ং মওলানা ভাসানীর বক্তৃতায়। তিনি মেঠো ভাষায় দারুণ কঠিন কঠিন কথা শোনাতে পারেন। অনেক অঙ্গভঙ্গিও করেন।

মার্কিন সমরজোট সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি সোহরাওয়ার্দির দিকে আঙুল দেখিয়ে শোনালেন, ওরা আমাদের ছেলেদের বোমার আঘাতে গুঁড়িয়ে দেবে, তা আমি হতে দেবো না। আমি জানি দিয়ে যুদ্ধজোটের বিরোধিতা করবো। কেউ যদি আমাকে দিয়ে জোর করে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি মানিয়ে নিতে চান, তাহলে আমি কবরে এক পা দিয়ে চিৎকার করে বলবো, না, না , না আমি ঐ সর্বনাশা যুদ্ধজোটকে সমর্থন করি না!

অনেক চিৎকার করে সমর্থন জানালেও, মামুনের পাশে বসা একজন আপন মনে বলে উঠলো, কমুনিস্ট! ভারতের দালাল!

বক্তৃতায় শেষের অংশ আরও সাংঘাতিক; স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন তুলে তিনি সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিদেশী শোষকদের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বললেন, যদি পূর্ব বাংলায় তোমরা তোমাদের শোষণ চালিয়ে যাও, যদি পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তা হলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, তোমরা আমাদের কাছ থেকে একটা কথাই শুনে রাখো, 'আচ্ছালাম আলায়কুম' -তুমি তোমার পথে যাও, আমরা আমাদের পথে যাবো!

আলতাফ লাফিয়ে উঠে পাগলের মতন চিৎকার করতে লাগলো, মার হাব্বা! মার হাব্বা এই তো চাই! এই তো চাই!

ঘুরে সে মামুনের হাত চেপে ধরে পাগলের মতন জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বললো, শুনলেন মামুন ভাই, শুনলেন? ফাইন্যাল কথা!

মামুন কিন্তু শিউড়ে উঠেছেন এই সব কথা শুনে। মওলানার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এ তো বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির! এতো কষ্টের, এতো সাধের, এতো রক্ত-অশ্রু বর্ষণ করে পাওয়া গেছে যে পাকিস্তান মওলানা তো ভেঙে দিতে চান? মাত্র দশ বছর বয়েস হয়েছে এই নতুন রাষ্ট্রে অনেক ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু তাকে ভেঙে ফেলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

না, মামুন কিছুতেই মওলানার এই চরম পন্থা মেনে নিতে পারবেন না! তিনি আলতাফের কাছ থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

॥ ৩৭॥

তিনতলায় বাড়িওয়ালাদের একটি অল ওয়েভ রেডিও আছে। এক বাড়িতে রেডিও থাকলে তা সারা পাড়ার লোক শোনে। গাড়ি, বাড়ি, রেডিও, টেলিফোন, এই চারটে জিনিস যাদের আছে তাদের কলকাতার মানুষ বড়লোক হিসেবে গণ্য করে। দোতলার ভাড়াটেদের এর কোনোটাই নেই, তারা নিম্ন মধ্যবিত্ত, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে নিম্ন মধ্যবিত্তের মানসিকতা এখনও তারা আয়ত্ত করে নিতে পারেনি। পূর্ব স্মৃতি এখনও জ্বল জ্বল করে, তাতে দুঃখ বাড়ে।

মালখানগরে প্রতাপদের যে বাড়ি ও জমি-জমা ছিল, দেশ বিভাগ না হলে, স্বাভাবিক অবস্থায় সেই সব বিক্রি করে তাঁরা কলকাতায় বাগানবাড়ি কিনতে পারতেন। প্রতাপের বাবা এক সময় একটি স্টিমার কিনেছিলেন। সুপ্রীতিরও স্বামীর গাড়ি ছিল এক সময়ে, বরানগরের বিশাল বাড়ি ছেড়ে তাঁরা চলে এসেছেন বেশীদিন আগে নয়। এখন সবাই মিলে ভাড়া করা একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে গাদাগাদি করে রয়েছেন বটে কিন্তু চোখ মুখ থেকে আভিজাত্যের ছাপ মিলিয়ে যায়নি। এই জন্য পাড়ার লোকেরা তাঁদের অহংকারী মনে করে, আড়ালে টিটকিরি দেয়।

প্রতাপদের রেডিও নেই। এখন সব দিকে খরচ সঙ্কোচের প্রয়াস চলছে, এর মধ্যে কোনোরকম বিলাসিতার প্রশ্ন ওঠে না। মমতা একবার রেডিও কেনার মৃদু দাবি তুলেছিলেন কিন্তু ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতি হবে অজুহাতে প্রতাপ সে দাবি নাকচ করে দিয়েছেন।

যে বাড়িতে রেডিও আছে সে বাড়িতে প্রতি শুক্রবার নাটক শোনার জন্য পাড়ার মেয়েরা ভিড়

করে আসে। বাড়িওয়ালার বউ অতসী দু'একবার মমতা আর সুপ্রতিকে ডেকেছেন, কিন্তু তুচ্ছ ছুতোনাতা দেখিয়ে ওঁরা যাননি। অন্যের বাড়িতে রেডিও শুনতে যাওয়া ওঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, এই-ই ওঁদের অহংকার। অন্য বাড়ির গৃহিণীরা ওঁদের নাম করে মুখ বেঁকিয়ে হাসেন।

পিকলু-বাবলু-তুতুলরাও ওপরে রেডিও শুনতে যায় না, কিন্তু নিচ থেকেই শুনে শুনে ওদের সব প্রোগ্রাম মুখস্থ। ঘড়ি দেখার দরকার হয় না, সকালবেলার অনুষ্ঠান শেষের বাজনা বাজলেই ওরা স্কুল -কলেজে যাবার প্রস্তুতি শুরু করে দেয়, একজন অন্যদের আগে স্নানের ঘরে দিকে দৌড় মারে।

অন্যের রেডিও শোনার কষ্ট অনেক। রুচি পার্থক্য যখন-তখন বুকে ধাক্কা দেয়।

অতসী ফুল ভল্যুমে রেডিও চালান, দোতলা থেকে শুনতে কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর অতসীর বড় রাগ। তাঁর মতে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে শুধু প্যানপানানি কিংবা ঘুমিয়ে পড়া গান। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু হলেই তিনি দুম করে বন্ধ করে দ্যান। দোতলা থেকে তুতুলের মনে হয় যেন রেডিওটা কঁকিয়ে উঠে, দুঃখের আর্তনাদ করে থেমে গেল!

ইদানীং তুতুল রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে তার মনোজগৎ আবিষ্কার করতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে তার মনোজগৎ আবিষ্কার করতে শুরু করেছে। এক একটা নতুন নতুন গান শোনে আর তার মনে হয়, এ তো অবিকল তার মনের কথা। একদিন সুচিত্রা মিত্র গাইছেন, "কী সুর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে। কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কী ধন মাগি- তাকাই কেন পথের পানে..." এ গান তুতুল আগে কোনোদিন শোনেনি। সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে সে প্রত্যেকটা লাইন যেন এক অলৌকিক উপহারের মতন শরীর ভরে নিচ্ছে। এত ভালো লাগা, যেন কান্নায় কান্নায় পূর্ণ হয়ে উঠছে হৃদয়।

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল রেডিও। আর কোনোদিন মনে হয়নি, কিন্তু আজ তুতুলের ইচ্ছে করলো দৌড়ে ওপরে গিয়ে অতসীকে মিনতি করে বলে, কাকীমা, রেডিওটা আবার খুলুন, এই গানটা শেষ অবধি শুনতে দিন! কাকীমা, আপনার পায়ে পড়ি-

কিন্তু তুতুল মনে মনেই শুধু বললো এ কথা। ওপরে গেল না। ইদানীং সে ওপরে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। অতসীর ভাই রূপেন হোস্টেল ছেড়ে এখন এ বাড়িতে থাকে। তুতুলকে দেখলেই কিছু না কিছু অসভ্যতা করার চেষ্টা করে সে। রূপেনের কথাবার্তা বেশ মজার হলেও স্বভাব ভালো নয়।

গানটির বাকি অংশ শোনা হলো না বলে যন্ত্রণায় তুতুলের মনটা কুঁকড়ে যেতে লাগলো। সুচিত্রা মিত্র এখনও গানটি গেয়ে যাচ্ছেন, শুধু ওপরের রেডিও যন্ত্রটা বন্ধ বলে তুতুল সেই গান শোনা থেকে বঞ্চিত হলো।

পিকলু কাছে এসে তুতুলের কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, এই কী হয়েছে তা সে নিজেই জানে না। সে পিকলুর কথায় উত্তর দিতে পারলো না।

পিকলু কাছে এসে তুতুলের কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, এই কী হয়েছে রে তার?

তুতুল ঘুরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা রাখলো পিকলুর বুকে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই আবার সে দৌড়ে ফ্ল্যাটের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো বাথরুমে।

পিকলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তুতুলের জন্য তার কষ্ট হয়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তুতুলের জন্য তার কষ্ট হয়। কিন্তু ও মেয়ে হয়ে জন্মেছে, কীই বা করা যাবে! ভেতরে এসে পিকলু কারুকে জিজ্ঞেস করলো না তুতুল কেন কাঁদছিল। অবশ্য বেশিক্ষণ তুতুলের কথা তার মাথাতেও রইলো না, তার অন্য অনেক চিন্তা আছে।

শিবেন আর তার দলবদলের উপদ্রবে তুতুলের ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা তুতুলকে রাস্তায় রোজ বিরক্ত করা শুরু করেছিল। এমন কি একদিন তুতুলকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বরানগরে। অবশ্য ওরা তুতুলের ওপর কোনো শারীরিক অত্যাচার করেনি, কারণ শিবেনের বন্ধু সুদর্শন তুতুলকে বিয়ে করতে চায়, নিছক ফুর্তি করতে চায়নি। এমন কি ওদের দলের একজন তুতুলের হাত চেপে ধরেছিল বলে সুদর্শন নাকি এক থাপ্পড় কষিয়ে ছিল সেই বন্ধুকে। সেই ঘটনাটি প্রতাপের কানে গিয়েছিল তো বটেই, এমন কি থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করলেও টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছে তুতুল। পরীক্ষার সময় পিকলু রোজ তার সঙ্গে গেছে এবং সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এখন সে বাড়িতে বন্দিনী।

বাড়ি বদলাবার জন্য খোঁজাখুঁজি চলছে চতুর্দিকে।

বিয়ের পর প্রতাপ যখন প্রথম বাসা ভাড়া নিয়ে সংসার পাতেন, তখন কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায়

বহু বাড়িতে 'টু লেট' সাইনবোর্ড ঝুলতো। বাড়িওয়ালার হবু-ভাড়াটের খাতির করতো, দু'পাঁচ টাকা ভাড়া কমিয়ে দিত এক কথায়। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। শহরের কোনো বাড়িই খালি থাকে না। বাড়িওয়ালারা ভাড়াটের ইন্টারভিউ নেয়, ভাড়া কমাবার প্রস্তাব শুনলে ঠোঁট উল্টে বলে, আপনি বস্তিতে চেষ্টা করুন, ও ভাড়ায় পাকা বাড়িতে থাকা যায় না। ভাড়াটে যদি পূর্ববঙ্গের লোক হয়, তা হলে বাড়িওয়ালারা ব্যঙ্গ করে বলে, আপনারা ওখানে জমিদার ছিলেন নিশ্চয়ই? বাঙালীরা সবাই নাকি জমিদার? হে-হে-হে-হে! তা জমিদার হয়ে কি আমাদের এই কুঁড়ে ঘরে আপনাদের মন টিকবে?

প্রতাপদের অবশ্য বর্তমান বাড়িওয়লার দিক থেকে কোনো সমস্যাই নেই। অতসী আর তাঁর স্বামী দুজনেই খুব ভালো মানুষ। গত বছর প্রতাপ নিজে থেকেই দশ টাকা ভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব দিলে অতসীর স্বামী জিভ কেটে বলেছিলেন, ছি ছি ছি ,আমি কি কোনোদিন আপনাদের ভাড়া নিয়ে কোনো কথা বলিছি! আপনারা বিশিষ্ট সজ্জন, আমাদের বাড়িতে আছেন, এই তো আমাদের কত ভাগ্যি!

এ বাড়ি ছাড়তে গেলে মমতাদের বেশ কষ্টই হবে। বাজার-হাট কাছেই, অনেকগুলো ট্রাম-বাসের রুট। মমতা আর সুপ্রীতির গঙ্গা-স্নানের অভ্যেস হয়ে গেছে, প্রায়ই যান বাগবাজারে ঘাটে, অন্য পাড়ায় চলে গেলে এই সুবিধেগুলো পাওয়া যাবে না।

তবু বাড়ি বদলাতে হবে এই পাড়াটার জন্যই। বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ছিনতাই, গুণ্ডামি বদমায়েসি। একটু রাত হলেই শোনা যায় হুল্লোড়-চিৎকার। পচে যাওয়া বনেদী বাড়িগুলোর অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেরা ছোট ছোট মাস্তানি দল গড়ে পরস্পরের সঙ্গে স্পর্ধা করে।

তুতুলের ষোল বছর বয়েসেই মনে হয় পূর্ণ যৌবন এসেছে, এমন তার শরীর। কিন্তু তার মনে এখনো পুরোপুরি কৈশোরের সারল্য। সে এখনো পৃথিবীর অনেক কিছু জানে না কিন্তু দু'একটা ব্যাপার বাধ্য হয়েই বুঝেছে। হরিণীর প্রধান শত্রু যে তার নিজেরই শরীরের মাংস তা যেমন হরিণীরা ঠিকই বুঝে যায়। তুতুল বাড়ি থেকে বাইরে বেরোয় না, এমন কি ছাদেও যায় না। এখন তার একমাত্র বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।

গল্প উপন্যাসের চেয়ে সে কবিতা পড়তেই বেশি ভালোবাসে। গল্প উপন্যাসের বই বেশি পাওয়া যায় না, গল্প-উপন্যাস বার বার পড়াও যায় না। কিন্তু কবিতা তাকে পাগল করে দেয়। এই বন্দী-জীবনে রবীন্দ্রনাথ যেন তাকে দু'খানি ডানা জুড়ে দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ যেন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান এক অজ্ঞাতপূর্ব আনন্দময় জগতের দিকে।

কিছুদিন আগেও তুতুল পিকলুর পাশাপাশি বসে এক সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তো। পিকলুই তার টিউশানির টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছে সঞ্চয়িতা। পিকলু চমৎকার আবৃত্তি করে, তার স্মৃতিশক্তিও দারুণ। একদিন সে তুতুলকে বলেছিল, তুই আমাকে যে-কোনো কথা বল, কিংবা প্রশ্ন কর, আমি উত্তর দেবো রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সারা জীবনের জন্য ভাষা দিয়ে দিয়েছেন। তুতুল পরীক্ষা করে দেখেছিল, পিকলু সত্যি বলতে পারে। এমন কি একদিন মমতা বলেছিলেন, ওরে তোরা সব খেতে আয়! তৎক্ষণাৎ উত্তরে পিকলু বলেছিল, "কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি, আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি!" তুতুলেরসন্দেহ হয়েছিল, এই লাইন দুটো রবীন্দ্রনাথের নয়, পিকলু সেই মুহূর্তে নিজে নিজে বানালো। কিন্তু পিকলু বই খুলে দেখিয়ে দিল, সত্যি, ঐ লাইন দুটো আছে 'কালমৃগায়' গীতি নাট্যে।

কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর পিকলু বদলাতে শুরু করে। আগে তার বিশেষ বন্ধু ছিল না। বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকতো। এখন কলেজের ছুটির পরেও সে বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে অনেক্ষণ সময় কাটায়।

একদিন পিকলুর মুখে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য শুনে তুতুল শিউরে উঠেছিল। এর থেকে পিকলু তার গালে ঠাস করে একটা চড় কষালেও সে বেশি আহত বোধ করতো না। সেদিন তুতুল সদ্য একটা নতুন গান শুনে আনন্দে উচ্ছল হয়ে বলতে এসেছিল, পিকলদা, এই গানটা জানো, "খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে...?" পিকলু মন দিয়ে কী সব লিখছিল খাতায়, হঠাৎ মুখ তুলে প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলেছিল, দূর দূর, ঐ সব লাইন শুনলে আমার গা জ্বলে যায়! বাহির আর ভিতর, আলো আর কালো, রূপ আর অ-রূপ ভাঙা আর গড়া কূল আর অকূল, ঐ দাড়িওয়ালা বুড়োর কবিতায় এর একটা থাকলে বাকিটা থাকবেই। খালি কন্ট্রাস্ট! এতে কখনো কবিতা হয়? দুই আর দুয়ে চারের মতন!

শুনে তুতুলের গায়ে যেন আগুনের ছ্যাকা লেগেছিল। পিকলুর মুখে এমন পাষণ্ডের মতন কথা,

যে-পিকলু কিছুদিন আগেও সারা সকাল অনর্গল রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্ত বলে যেত!

এরপর থেকে প্রায়ই তুতুলের সঙ্গে পিকলুর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তর্ক লাগে। পিকলুই গলার জোরে জিতে যায়।

পিকলুর গুরু এখন জীবনান্দ দাশ। তুতুল ওঁর কবিতা বুঝতে পারে না। কয়েকবার সে পিকলুকে অনুরো ধ করেছে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ে বুঝিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু পিকলুর সময় নেই। পিকলু তার হাত খরচের পয়সা জমিয়ে 'কবিতা' , 'কৃত্তিবাস', 'শতভিষা' এই সব নামের ছোট ছোট পত্রিকাগুলো পড়বার চেষ্টা করেও কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি, সে একা একা আবার ফিরে গেছে রবীন্দ্রনাথের কাছে।

আজকাল পিকলুর দু'একজন বন্ধু বাড়িতেও আসে। প্রতাপ যখন থাকেন না। ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে সিগারেট খায়, তুমুল সব শুনতে পায়। সে বুঝতে পারে যে পিকলু তাদের কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে।

প্রথম প্রথম পিকলু তার বন্ধুদের সঙ্গে তুতুলের আলাপ করিয়ে দিয়ে তাকেও বসতে বলতো। তিনজন বন্ধুই বেশি আসে। সুকেশ চক্রবর্তী, আলমগীর রহমান আর বিকাশ দাশগুপ্ত। এদের মধ্যে সুকেশ আর আলমগীরে যখন তখন জওহরলাল নেহরুর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে, তাদের মতে ভারতের সব দুরবস্থার জন্য নেহরু পরিবারই দায়ী, সেই সঙ্গে গান্ধী। ওরা দুজন চীনের কোন এক নেতার খুব ভক্ত, চীনের পথ অনুসরণ করলে ভারতে নাকি আর এমন গরিব থাকতো না। বরুণ একটু চুপচাপ স্বভাবের, সে কবিতা লেখে।

প্রথম দু'একদিন তুতুল ঐ ঘরে বসেছিল ওদের সঙ্গে, এখন তাকে ডাকলেও সে যা যায় না। পিকলু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, এই তুই কি পর্দানশীল নাকি? আমার বন্ধুরা এলে তুই আসিস না কেন?

তুতুল বলেছিল, আমার ওদের ভালো লাগে না!

পিকলু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুদের নিয়ে সে এখন মত্ত। তার ধারণা তার বন্ধুদের মতন উজ্জ্বল যুবক কলকতা শহরে আর নেই। তাদেরও পছন্দ হয় না তুতুলের? এ মেয়েটা কী, বোকা না জড়ভত? পিকলু ঠোঁট উল্টে বলেছিল, তোর কিস্যু হবে না! ঐ শিবেনদার বন্ধুর সঙ্গেই তোর বিয়ে দিতে বলবো পিসিমণিকে। মাছের ভেড়ির মালিকের ঘর করবি, সারা গা দিয়ে মাছ মাছ গন্ধ বেরুবে!

তুতুল কিছু কৃত্রিম কথা বলেনি। পিকলুর বন্ধুরা দেখতে শুনতে কেউ খারাপ নয়। পড়াশুনোতেও ভালো নিশ্চয়ই, নইলে পিকলুর বন্ধ হবে কেন, তা ছাড়া তাদের কথাবার্তা শুনেও বোঝা যায়। তবু তুতুলের মনে হয়, ওদের থেকে পিকলুর বন্ধু হবে কেন, তা ছাড়া তাদের কথাবার্তা শুনেও বোঝা যায়। তবু তুতুলের মনে হয়, ওদের থেকে পিকলু অনেকখানি আলাদা। পিকলু অনেক উঁচুতে উঠে বসে আছে। তার মুখে যেন ফুটে থাকে একটা জ্যোতি, তার প্রতিটি কথার সঙ্গে লেগে থাকে প্রবল আত্মবিশ্বাস, কোনো বিষয়েই পুরোপুরি না জেনে সে কিছু বলে না, এমনই তার চরিত্রের সারল্য যে সে কখনো খোঁচা মারে না কারুকে। তর্ক বিভিন্ন দিকে বাঁক নিলে এক এক সময় সে বলে ওঠে, ভাই, এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না, কিছু মন্তব্যও করতে পারবো। তখন মনে হয়, তার মতন সত্যবাদী ও জ্ঞানী আর কেউ নেই।

অন্যদের মাঝখানে পিকলুকে দেখলেই তুতুল তার দাদার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারে। সে তখন মুগ্ধভাবে চেয়ে থাকে পিকলুর দিকে। রবীন্দ্রনাথ বসয়ে পিকলুর মতামতে আহত হলেও তুতুল জানে, পিকলুর সঙ্গে আর কারুর তুলনা চলে না। দিন দিন এই ধারণাটা তার মধ্যে বদ্ধমূল হচ্ছে।

ইস্কুলে যেতে হয় না, বাড়ির বাইরে যাওয়া হয় না বলে তুতুল তার সাজ পোশাকেরও কোনো যত্ন নেয় না। ফ্রক পরা সে ছেড়ে দিয়েছে, বাড়িতে কোনোরকমে একটা শাড়ী গায়ে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু পিকলুর বন্ধুরা এল সে শাড়ী ঠিকঠাক করে নেয়, চুল আঁচড়ায়। পিকলুদের ঘরে সে যাবে না, তবুও। পাশের ঘরে তিন-চারটি যুবক রয়েছে এই সচেতনতাই যেন তার যুবতী সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। দুপুরবেলা মমতা ও সুপ্রীতি দুজনেই একটু ঘুমিয়ে নেন। বন্ধুদের বসিয়ে রেখে পিকলু এক একদিন এ ঘরে ফিসফিস করে বলে, এই তুতুল, আমাদের একটু চা করে দিতে পারবি?

তুতুল প্রথমে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়।

পিকলু তখন তার পিঠে হাত রেখে অনুনয় করে বলে, প্লীজ, দে একটু। বাইরের দোকান থেকে চা আনলে খারাপ দেখাবে!

ঐ যে পিঠের ওপর হাত রাখা, ঐ টুকুর জন্যই সারা শরীর দিয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে তুতুল।

তার অস্তিত্বে একটা আনন্দের কোলাহল পড়ে যায়। পিকলু তার দাদা, তা হোক, তবু পিকলুর স্পর্শে সে এমন কিছু পায় যা সে এ পর্যন্ত আর অন্য কিছুতে পায়নি। ওপরতলায় অতসী-কাকীমার ভাই রূপেন যখন কোনো কোনো দিন জোর করে তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেছে, তখন তুতুল যেন অশুচি স্পর্শ পেয়েছে। পিকলুর বন্ধু সুকেশও কেমন যেন অদ্ভুত চোখে দু'একবার তাকিয়েছে তুতুলের মুখের দিকে, তাতে তুতুলের একটু ভালো লাগেনি। কিন্তু পিকলু যখন কোনো অনুরোধ জানাবার জন্য তার পিঠে হাত দেয়, তখন আবেশে তুতুলের চোখ বুঁজে আসে।

তুতুল চা বানিয়ে দেয় বটে কিন্তু মুন্নিকে ডেকে চায়ের ট্রে তার হাতে পাঠায়। মাত্র আট বছর বয়েস হলেও মুন্নি এসব কাজ বেশ ভালো পারে। দাদার বন্ধুরা আদর করে মুন্নির গাল টিপে দেয়।

পিকলু তাকে পর্দানশীল বলে ঠাট্টা করলেও তুতুল ও ঘরে যেতে পারে না। পিকলু যদি বন্ধুদের সামনে কোনো কারণে তার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে তাও সে সইতে পারবে না।

পিকলুর সব ভালো, শুধু কেন সে রবীন্দ্রনাথের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? তুতুলের খুব ইচ্ছে করে ওকে আবার ফিরিয়ে আনতে। তুতুলের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি, সুপ্রীতি যখন তখন বলেন, তুই পিকলুর কাছ থেকে পড়া বুঝে নে না! কিন্তু তুতুল তাতে গা করে না। তার পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কারুর কাছ থেকে সাহায্য নেবার দরকার নেই। কিন্তু পিকলু যদি আগেকার মতন তার পাশে বসে একে বই থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তো, তাতেই তার মন এমন ভালো হয়ে যেত যে পরীক্ষার পড়ার উৎসাহ আসতো অনেক বেশি। কিন্তু পিকলু আজকাল রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেই বলে, ডেটেড! ডেটেড! বৈষ্ণব পদাবলী, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ওসব বুড়োবুড়িদের জন্য! আমাদের দেশেরে মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়, তুই -ও ঘোলো প্লাসেই..!

একদিন পিকলু স্নান করছে বাথরুমে, তুতুল টিনের দরজায় দুম দুম করে ঘা মারতে লাগলো।

সুপ্রীতি তা দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, ও কী করছিস? তোর এত তাড়া কিসের? দাঁড়া, ছেলেটাকে স্নান শেষ করতে দে!

তুতুল অভিমানের ঝাঁঝ মেশানো গলায় বললো, ও কেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে?

সুপ্রীতি ভেতরে ব্যাপারটা জানেন না। পিকলুর গানের গলা ভালো। বাথরুমে সে প্রায়ই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গায়। ইদানীং সে আই পি টি এ-র গানই বেশি করে। আজ সে গাইছে, "হে নিরুপমা মেয়েকে বললেন, ছেলেটা তো এইমাত্র ঢুকলো, তুই যা, একটু পড়াশুনো করে আয়।

তুতুল স্নান করতে আসেনি, পড়ার টেবিল থেকেই উঠে এসেছে, হাতে তার বই। সে খানিকটা পাগলাটে গলায় বললো, না, ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত পারবে না! কেন গাইবে!

আবার সে ধাক্কা মারতে লাগলে দরজায়।

খালি গায়ে, শুধু একটা তোয়ালে পরা অবস্থায় পিকলু দরজা খুলে ভুরু তুলে বললো, কী হয়েছে? তার মুখভর্তি সাবানের ফেনা, সবে দাড়ি কামাতে শুরু করেছিল।

তুতুল বললো, তুমি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বললো, ও পিসিমনি, দ্যাখো, রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন তোমার মেয়ের একার সম্পত্তি! আমরা গাইলেও দোষ!

তুতুল বিস্ফোরিতভাবে কয়েক পলক চেয়ে রইলো পিকলুর দিকে, তারপর দৌড়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

ছোট ফ্ল্যাট, পিকলু -বাবলুরা অধিকাংশ সময়েই খালি গায়ে থাকে, তুতুল কতবার ওদের সেই অবস্থায় দেখেছে। কিন্তু আজ, বাথরুমের বন্ধ দরজা খুলে পিকলু যে শুধু তোয়ালে পরে বেরিয়ে এলো, তা দেখে অদ্ভুত এক শিহরন হলো তুতুলের শরীরে। বন্ধ বাথরুম মানেই গোপনীয়তা, হঠাৎ সেই দরজা খুলে যেন দেখা গেল একজন অচেনা পুরুষ মানুষকে। এ যেন তার ভাই নয়। অন্য কেউ! তুতুলের সারা শরীর এখনো কাঁপছে! কী যে হচ্ছে তার তা অন্য কারুকে বলে বোঝানো যাবে না।

স্নান সেরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পিকলু তুতুলের পড়ার টেবিলের কাছে এসে বললো, এই, তুই যাবি তো যা! আমার হয়ে গেছে।!

রাজ্যের লজ্জা এসে এখন জুড়ে বসেছে তুতুলের পড়ার টেবিলের কাছে এসে বললো, এই, সে মুখ নিচু করে রইলো।

-কী রে যাবি না! আমার হয়েছিলুম!

-কেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া কী অপরাধ?

-কেন, তুমিই তো বলো, রবীন্দ্রনাথের লেখা শুধু বুড়ো-বুড়ি আর আমাদের মতন বোকাদের জন্য। নিরুপমা নামে কোনো মেয়ের সঙ্গে বুঝি চেনা হয়েছে?

পিকলু অট্টহাস্য করে উঠলো।

দু'দিন বাদে পিকলু কলেজ থেকে ফিরে এসে তুতুলকে বললো, এই, মহাজাতি সদনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা কনফারেন্স আছে, তুই শুনতে যাবি? আমি দুটো কার্ড পেয়েছি। তুই দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকিস, এটা মোটেও ভালো নয়। এতে পড়াশুনা মাথায় ঢোকে না।

তুতুলের পরীক্ষার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। এই সময়ে কি গান শুনে একটা সন্ধে নষ্ট করা চলে? এ জন্য সুপ্রীতি-মমতা তো বটেই, প্রতাপের কাছ থেকেও অনুমতি নেবার প্রয়োজন আছে।

কেউ-ই আপত্তি করলেন না। পিকলু এ বাড়ির হীরের টুকরো ছেলে। যেমন তার পড়াশুনোয় মেধা, তেমনই তার সবদিকে সুবিবেচনা। সবাই জানে, আর কয়েক বছরের মধ্যে পিকলু এম এ পাশ করার পরই এ সংসারের ভাগ্য ফিরে যাবে। খুব বড় কোনো চাকরি তার জন্য বাঁধা। পরীক্ষার আগে আগে গানের জলসা শুনতে যাওয়া উচিত কিনা তা পিকলুই তো ভালো বুঝবে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ওরা যখন বেরুতে যাবে তখন একটা কাণ্ড ঘটলো। পাড়ায় ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে ফেললো বাবলু। প্রতাপ তখনও ফেরেননি। পিকলুকেই যেতে হলো ছোট ভাইকে নিয়ে ডাক্তারখানায়, তিনটে স্টিচ হলো বাবলুর মাথায়। এক ঘন্টা কেটে গেল এই সব করতেই। এরপর আর জলসায় যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

মমতা তবু বললেন, মেয়েটা সেজে-গুজে মন খারাপ করে বসে আছে, তুই ওকে নিয়ে যা পিকলু! এখনো গেলে অদ্ধেকটা শুনে তপারবি।

এত দেরির জন্য হেমন্ত আর কণিকার গান শোনা হলো না। সুচিত্রা মিত্র গাইছেন তখন। একটা গান শেষ করে আর একটি গান সদ্য ধরেছেন তিনি, সেই সময় ঢুকলো পিকলু আর তুতুল। সুচিত্রা মিত্রের গান শোনা মাত্র সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হলো তুতুলের। এই গান, "কি সুর বাজে, আমার প্রাণে, আমিই জানি, মনই জানে..." এই গান কয়েক লাইন শোনার পর রেডিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই গান পুরোটা না শুনলে তার জীবনটাই অসমাপ্ত থাকতো!

তুতুলের মনে হলো, পিকলু কি দৈবজ্ঞ? এই বিশেষ গানটা শোনার জন্যই কি সে তুতুলকে নিয়ে এসেছে? কিংবা, সুচিত্রা মিত্র কি ইচ্ছে করেই এই মুহূর্তে ঐ গানটি শোনার জন্য কতটা কাতর হয়ে ছিল?

পিকলু কিন্তু তুতুলের পাশে বসলো না। এই জলসার উদ্যোক্তারা তার পরিচিত। সাধারণত উদ্যোক্তরা নিজেরা কিছু দেখে না, শোনে না, তারা বাইরে দাঁড়িয়ে চা-সিগারেট খায়, গল্প করে। পিকলু চলে গেল সেদিকে! তুতুল সতৃষ্ণ চোখে বার বার খুঁজতে লাগলো পিকলুকে। পিকলু তার পাশে থাকলে সে অনেক বেশি উপভোগ করতে পারতো।

শেষের দিকে নাচের অনুষ্ঠান আছে, তার আগে পাঁচ মিনিট বিরতি। সেই সময়ে পিকলু এসে বললো, তুতুল, এবারে বাড়ি চল। চান দেখে কী করবি! শেষ হতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

তুতুল বিনা প্রতিবাদে উঠে এলো। মহাজাতি সদন থেকে বেরিয়ে যখন তারা রাস্তা পেরিয়ে বাস স্টপের দিকে যাচ্ছে তখন তুতুল পিকলুর হাত ধরে যাচ্ছে তখন তুতুল পিকলুর হাত ধরে কাতরভাবে বললো, আমি আমার এখন বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না।

গভীরভাবে অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে পিকলু বললো, বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না মানে? কোথায় যাবে?

দু'দিকে মাথা নেড়ে তুতুল বললো, জানি না! কতদিন বাদে বেরিয়েছি। তুমি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো।

পিকলুর বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। তুতুলের এরকম গলার আওয়াজ সে যেন আগে শোনেনি। এই মুহূর্তে তার খেয়াল হলো। তুতুল যেন হঠাৎ কিশোরীর বদলে যুবতী হয়ে উঠেছে। এমন গাঢ় স্বরে তুতুল আগে কথা বলতো না তার সঙ্গে।

সে একটু দিশাহারা হয়ে বললে, বাড়ি যাবো না, তা হলে কোথায় যাবো এখন?

॥ ৩৮ ॥

কানু যে-ব্যাঙ্কে কাজ করে, হঠাৎ একদিন সকালে সেই ব্যাঙ্কের বন্ধ দরজা আর খুললো না। সাড়ে দশটা বেজে গেছে, কর্মচারিরা, গ্রাহকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে, কিন্তু ম্যানেজারের দেখা নেই। মালিক পক্ষের এক ছেলে এই শাখাটির ম্যানেজার। বড় লোকের ছেলের ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছে একথা কারুর মনে আসে না। বরং প্রথম থেকেই যে অশুভ সন্দেহটি মনে জাগে, একটু বেলা বাড়তেই তা সমর্থিত হয়। খবর এসে পৌঁছোয় যে সেই ব্যাঙ্কের আরও দুটি শাখারও ঐ একই অবস্থা

অর্থাৎ ব্যাঙ্কটির গণেশ উল্টেছে , মালিকপক্ষ পলাতক।

অনেক লোক সামনের ফুটপাথে বসে পড়লো মাথায় হাত দিয়ে। একজন বৃদ্ধ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলতে লাগলেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল, আমার সর্বস্ব চলে গেল, পরশু আমার মেয়ের বিয়ে। ওরে বাবা , এখন আমি কী করি! আমি ট্রাম লাইনে গলা দেবো! তিনি সত্যিই ছুটে গিয়ে ট্রাম লাইনে শুয়ে পড়তেই কয়েকজন জোর করে তুলে আনলো তাঁকে , আর কয়েকজন চেষ্টা করলো ব্যাঙ্কের লোহার কোলাপসিবল গেট ভেঙে ফেলার, তার মধ্যেই এসে পড়লো পুলিশ।

স্বাধীনতার পর পরই ছোটছোটো ব্যাঙ্কগুলিতে মড়ক লেগে যায় যেন। পারিবারিক মালিকানার এই সব ব্যাঙ্ক কোন রহস্যময় কারণে যে যখন তখন লালবাতি জ্বলে তা আর জানা যায় না শেষ পর্যন্ত। বাজারে গুজব ছড়ায় নানারকম, কেউ বলে সাধারণ মানুষের জমানো টাকায় মালিকরা ফাটকা খেলে, কেউ কেউ নাকি স্বচক্ষে দেখেছে ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভেঙে মালিকের কোনো বখাটে ছেলেকে রেসের মাঠে কাপ্তেনি করতে, কোনো সিনেমার অভিনেত্রী নাকি বিনা অ্যাকাউন্টে যখন তখন টাকা তুলে নিয়ে যায়, ইত্যাদি। সাধারণ মধ্যবিত্তের কল্পনা এর চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত পৌঁছোয় না। অন্তরালের কাহিনী হয়তো এর চেয়ে অনেক বেশি জটিল। ব্যাঙ্কগুলির ওপর সরকারি খবরদারিও শিথিলতার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। এক একটা ব্যাঙ্কের পতন হয় আর অমনি তিন চারটি আত্মহত্যার ঘটনা বেরোয় খবরের কাগজে। তারা কেউ সদ্য অবসরপ্রাপ্ত স্কুল মাষ্টার, কেউ ছোট কারখানার মালিক, কেউ বা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। কে কোথায় বসে কিসের কলকাঠি নাড়ছে তা কিছুই না জেনে এই অস্বাৎ-রিক্তমানুষগুলো প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে।

কানুর চাকরিটি গেল। প্রতি মাসে মাইনে পেয়ে সে পুরো টাকাটাই তুলে দিত তার দাদার হাতে, প্রতাপ তার থেকে অর্ধেক টাকা ফিরিয়ে দিতেন কানুর হাত খরচের জন্য।

শোনা যায়, বিপদ কখনো একলা আসে না, সব সময় তার একটি বা দুটি সঙ্গী থাকে কানুর ব্যাঙ্কেই প্রতাপের অ্যাকাউন্ট ছিল, তাতে বেশি টাকা ছিল না অবশ্য, মাত্র সাড়ে চার শো টাকা। সেটা তো গেলই, কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার ঐ ব্যাঙ্কেই প্রতাপ তাঁর দিদি সুপ্রীতির গয়নাগুলো জমা রেখেছিলেন ।

সংসার খরচের জন্য সুপ্রীতি মাসে মাসেই একটি দুটি গয়না দিতেন প্রতাপকে। এ সম্পর্কে তাঁর মুখের ওপর কোনো কথাই চলতো না। প্রতাপ সে গয়না একটাও বিক্রি করেননি, নানাভাবে বাড়িয়ে ও খরচ কমিয়ে তিনি সংসার চালাচ্ছিলেন, যথাসময়ে সুপ্রীতিকে তাঁর গয়নাগুলি ফেরত দেবার কথা ভেবে রেখেছিলেন। সেই গয়নাগুলিও যে মারা যাবে তা প্রতাপ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ হতে পারে, ভুল লগ্নীতে সব টাকা জলে যেতে পারে, কিন্তু গ্রাহকদের নিজস্ব লকার-এ রাখা গয়নাগাঁটি বা শেয়ারের কাগজপত্র লোপাট হবে কী করে ? আদালত থেকে প্রতিনিধি বসানো হয়েছে , একদিন না একদিন লকার খুলে যার যার জিনিসপত্র ফেরত দেওয়া হবে নিশ্চিত।

নিজের কোনো ব্যাপারে প্রতাপ অন্য কারুকে ধরাধরি করা পছন্দ করেন না। কিন্তু এবারে বাধ্য হয়েই তাঁকে তাঁর বন্ধু বিমানবিহারীদের শরণাপন্ন হতে হলো। বিমানবিহারীরা কলকাতায় কয়েক পুরুষের অধিবাসী, তেমন ধনী বা বনেদী না হলেও সভ্রান্ত । প্রতাপরা বহিরাগত, তাঁদের তুলনায় বিমানবিহারীদের কয়েকটি অতিরিক্ত সুবিধে আছে, এদিককার ওপর মহলের অনেকের সঙ্গেই তাঁদের মুখ চেনা বা লতায় পাতায় সম্পর্ক আছে। যেমন একদিন স্যার পি এল মিটার সম্পর্কে কী কথা উঠতেই বিমানবিহারী বলেছিলেন, হ্যাঁ ওঁদের চিনি, ওঁর স্ত্রী তো ভুলি মাসি, আমার ছোট মাসির সঙ্গে পড়তো ! সেইরকমই পশ্চিমবাংলার বর্তমান এক ক্ষমতাশালী মন্ত্রী বিমানবিহারীর কাছে জটাদা, মেম্বার বোর্ড অফ রেভিনিউ হচ্ছেন বিমানবিহারীর রাঙাকাকা, ইত্যাদি ।

সব শুনে বিমানবিহারী গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর বন্ধু প্রতাপকে মিথ্যে স্তোক দিতে পারেন না। তিনি জানেন, একটা ব্যাঙ্ক উল্টে দেবার আগে তার মালিকরা, অন্যদের ঠকাবার জন্যই হোক বা নিজেদের বাঁচাবার জন্যই হোক, কোনো পন্থা তিনেই দ্বিধা করে না। অর্থনৈতিকতার মূল্য নেই। লকার খুলে সব কিছু সাফ করে দেবার ঘেটনা ঘটেছে তা তিনি জানেন।

তবু তিনি ছোটাছুটি করলেন অনেক। আদালত থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধির সঙ্গে একটা যোগাযোগের সূত্র খুঁজে বার করে তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়ে কথা বললেন একদিন। কিছুই লাভ হলো না। অফিসের চেয়ার টেবিল ছাড়া আর প্রায় কোনো সম্পত্তিই নেই ব্যাঙ্কের। নতুন বাংলা ব্যাঙ্কের মালিক সব দোষ স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করেছেন আদালতে। তাঁর খুব বেশি শাস্তি হলে দশ-বারো

বছরের জেল হবে। জালিয়াতি-জোচ্চুরির জন্য ফাঁসী হয় না কারুর। অন্যের দোষে সর্বস্বান্ত হয়ে যে তিন চারজন আত্মহত্যা করে, সেই পাপের জন্য কেউ কিছু দণ্ড পায় না কোনো ধর্মাধিকরণে।

বিমানবাহারী বললেন, প্রতাপ, তোমার ঐ ব্যাঙ্কের মালিক কিন্তু তোমার দেশেরই লোক!

প্রতাপ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তার মানে, তুমি কী বলতে চাও? দেশ ভাগের আগে গোটা বাংলা দেশটা তোমারও দেশ ছিল না? দশ বছর কেটে গেছে, এখনো তোমরা আমাদের ওপারের লোক বলে মনে করো!

বিমানবিহারী প্রসঙ্গটা লঘু করতে চেয়েছিলেন, প্রতাপের যে এরকম তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে তা তিনি কল্পনাও করেননি। পূর্ব বাংলা থেকে যারা এসেছে তারা যে এখনো তাদের আলাদা আইডেনটি বজায় রাখতে চায়, তা তো প্রত্যেকদিনই দেখা যাচ্ছে পথেঘাটে। এখন তারা ভারতের নাগরিক হলেও যে-কোনো কথা প্রসঙ্গে বলে, আমাদের বাড়ি ঢাকা জেলায় বা ফরিদপুর বা চট্টগ্রামে। এমনকি তারা অতীত ক্রিয়াপদও ব্যবহার করে না। প্রতাপ এর ব্যতিক্রম নন। এখন প্রতাপ বেশি স্পর্শকাতর হয়ে আছেন। কয়েকখানা গয়না হারাবার আঘাতে যে প্রতাপ এতখানি আহত হয়ে পড়বেন তা বিমানবিহারী বুঝতে পারেননি। অবশ্য, যার যায় সে-ই ঠিক বোঝে।

প্রতাপ এতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছেন তার কারণ, গয়নাগুলো তাঁর দিদির, তাঁর স্ত্রীর নয়। মমতার অধিকাংশ গয়নাই রাখা আছে তাঁর বাপের বাড়ির সিন্দুকে। বারবার ভাড়া বাড়িতে বাসা বদল, তাই মমতা নিজের কাছে দামি কিছু রাখেন না। দিদির গয়নাগুলি যে প্রতাপ সত্যিই বিক্রি করেননি, এখন তা তিনি কী করে বোঝাবেন? দিদিকে সব কথা খুলে বললে কি তিনি বিশ্বাস করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু বলা কি সহজ? যে ব্যর্থতার জন্য প্রতাপ নিজে দায়ি নন, সেকথা বলার মধ্যে যে কতখানি গ্লানি, তা কি অন্য কেউ বুঝবে? অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতাপের হাত এক একবার মুষ্টিবদ্ধ হয়, আবার তাঁর নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে।

চাকরি যাওয়ার জন্য কানুকে বিশেষ বিচলিত দেখা গেল না। ইদানীং সে বাড়ির বাইরেরই বেশির ভাগ সময় কাটায়। পিকলু-বাবলুর সঙ্গে এক ঘরে শুতে হয় তাকে, ওদের এখন পড়াশুনোর খুব চাপ, তাই কানু রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরে না। প্রতাপকে সে ভয় পায়, তাই পারতপক্ষে দাদার মুখোমুখি আসতে চায় না। প্রতাপও আজকাল নানা ব্যাপারে খুব ব্যস্ত।

পরের মাসের পয়লা তারিখে কানু প্রতাপের ঘরে এলো। প্রতাপ তখন বই অনুবাদে নিমগ্ন, কানু তাঁর পায়ের কাছে দুটি একশো টাকার নোট রেখে বললো, দাদা, এই টাকাটা রইলো।

প্রতাপ অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তুই টাকা কোথায় পেলি?

কানু অবনত মস্তকে সলজ্জভাবে বললো, আমি কিছু টাকা জমিয়েছিলাম।

প্রতাপ কানুকে আপাদমস্তক দেখলেন। সাজসজ্জার বেশ বাহার হয়েছে তার। আগে সে মোটা ধুতির ওপর হাফ শার্ট পরতো, এখন মলমলের পাঞ্জাবি, ফাইন ধুতিটা বোধহয় ফিনলে কম্পানির। চুলে সিঁথি কাটেনি, উল্টো আঁচড়েছে। বাঁ হাতে একটি পলা বসানো আংটি। কটা টাকাই বা মাইনে পেত কানু, তার অর্দ্ধেক দিয়ে পোশাকের বাবুগিরি, যাতায়াত ভাড়া, হাতখরচ করেও টাকা জমিয়েছে? তাহলে তো বেশ গোছানো স্বভাব হয়েছে বলতে হবে।

প্রতাপ বললেন, ও টাকা দিতে হবে না, তোর কাছেই রাখ।

কানু তবু বললো, না, আমার কাছে আরও আছে।

প্রতাপ বললেন, বলছি তো, তোর কাছেই রাখ। এমপ্লয়েন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছিস? সামনের রবিবার তোকে একজনের কাছে যেতে হবে, মার্টিন বার্ণ কম্পানিতে একটা চাকরির কথা বলেছে-

কানু টাকাটা তুলে নিয়ে বিনীত ভাবে বললো, সেজদা, অমি ব্যবসা করবো ভাবছি!

ভদ্রলোক শ্রেণীর বাঙালীরা ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা ধরেই নিয়েছে ওটা অন্য প্রদেশীয়দের ব্যাপার। এদেশে ব্যবসা শব্দটির সঙ্গে ইদানীং ঘুষ, কালোবাজার, ধারাধারি, মিথ্যেকথা, লোক ঠকানো ইত্যাদি ব্যাপারগুলো জড়িয়ে গেছে, সুতরাং ভদ্রলোকেরা এসবের থেকে নাক কুঁচকে দূরে থাকতে চায়।

ভাইয়ের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে প্রতাপ বললেন, ব্যবসা করবি! ব্যবসা করা সোজা নাকি, ক্যাপিটাল পাবি কোথায়?

আমার একজন চেনা লোক, সে দেবে বলেছে। আমাকে শুধু খাটতে হবে।

ওরকম অনেকেই বলে! মার্টিন বার্নের চাকরিটা হয়ে যেতে পারে, আমি চিঠি লিখে দেবো, তুই কেষ্টবাবুর সঙ্গে দেখা করবি এই রবিবারে। কিংবা আমিই তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

তারপর প্রতাপ আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

কেষ্টবাবু নামের ব্যক্তিটি শিয়ালদা কোর্টের এক পেশকারের জ্যাঠাতুতো দাদা। পেশকারবাবুটি নিজ থেকেই প্রতাপকে বলেছিলেন, স্যার, আপনার ভাইয়ের চাকরি গেছে শুনলুম। আমার এক দাদা মার্টিন বার্নে আনে, তাঁর সঙ্গে একাবার দেখা করলে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার দাদা অনেককে চাকরি দিয়েছেন। অমি বলে রাখবো, আপনি যদি একটা চিঠি দিয়ে আপনার ভাইকে দেন...

কেষ্টবাবুর বাড়ি তিনতলায়। ঠিকানা খুঁজে বার করতে বেশ বেগ পেতে হলো কানুকে। দোতলা বাড়ি, তার মধ্যে একতলাটি বেশ পুরনো, তার ছাদে বেখাপ্পা ভাবে দুটি নতুন ঘর তোলা হয়েছে। তার একদিকের দেয়াল থেকে বেরিয়ে আছে লোহার শিক, অর্থাৎ ওদিকে আরও বাড়াবার পরিকল্পনা আছে। বাড়ির পাশে একটা বড় গাছ ছিল, আজই কেটে ফেলা হয়েছে সেটাকে। একজন কাঠুরো টুকরো করছে সেই গাছের গুঁড়িটাকে, একরাশ লোক ভিড় করে দেখছে সেই দৃশ্য।

কেষ্টবাবু খুব রোগা আর লম্বা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে একটা নস্যি রঙের ব্যাপার জড়ানো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনি গাছ কাটার তদারকি করছিলেন, কানুর কাছে থেকে চিঠি নিয়ে পড়ে তিনি বললেন, একটু দাঁড়াও বাবা, আগে এই কাজটা সেরে নিই।

একতলার একটি ঘরে কয়েকটি মেয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে একসঙ্গে গান গাইছে, সেখানে রয়েছে গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা একজন নির্দেশক, বোধহয় প্রস্তুতি চলছে কোনো ফাংশনের। কানুর বিশেষ লজ্জা টজ্জা নেই, সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলো। মেয়ে তিনটির বয়েস ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে, চেহারায় তেমন চাকচিক্য নেই, কানুর পছন্দ হল না। আজকাল কানুর এই একটা অভ্যেস হয়েছে, রাস্তাঘাটে অচেনা মেয়েদের দেখলেই মনে মনে ভেবে নেয়, চলতে কি চলবে না। দু'একজনকে সে মনে মনে নিজের পাশে দাঁড় করায়।

একটু পরে কেষ্টবাবু এসে বললেন, চলো।

তিনি তাকেনিয়ে এলেন দোতালার ছাদে। নতুন ঘরগুলোর পাশে এক জায়গায় সিমেন্ট-সুরকি জমা আছে, তারই একধারে রয়েছে দুটি টিনের চেয়ার। সেখানে বসলো দু'জনে।

শীত এখনো ফুরিয়ে যায়নি একেবারে। সকালের রোদ মন্দ লাগে না। বাড়িটার পাশেই একটা পানা পুকুর,মাথার ওপরে অনেকগুলো কাক ওড়াউড়ি করে কা কা করছে রাগত ভাবে। খুব সম্ভবত ভূপাতিত গাছটিতে তাদের বাসা ছিল।

কেষ্টবাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হাকিমবাবু ভাই? কী নাম?

কানু বললো, জয়দেব সরকার।

লেখাপড়া কদ্দুর?

আই-এ প্লাকড।

টাইপ, শর্টহ্যান্ড জানা আছে?

টাইপ জানি।

স্পীড কত?

কানুর একটু মজা লাগলো। মার্টিন বার্ন কম্পানির ইন্টারভিউ হচ্ছে এই ছাদে বসে, সিমেন্ট-সরুকির পাশে? এই বিড়ি-ফোঁকা, সিড়িঙ্গ চেহারার লোকটা ঐ কম্পানির অফিসার নাকি?

রোগা চেহারা হলেও কেষ্টবাবুর বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে, কানুকে তিনি দেখছেন তীক্ষ্ণ নজরে। কানুর যোগ্যতা সম্পর্কে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করে তিনি সন্তুষ্ট হলেন মনে হলো, হাঁটু নাচাতে নাচাতে বললেন, ঠিক আছে, ওতেই চলবে। হয়ে যাবে, একটা পোস্ট খালি হবে সামনের মাসে, মাইনে সব মিলিয়ে দুশো টাকা। ঠিক আছে?

কানু মাথা নেড়ে বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কত টাকা এনেছো সঙ্গে?

কানু এ প্রশ্নের মানে বুঝতে পারলো না। প্রতাপ টাকার কথা তো কিছু বলেননি। চাকরির দরখাস্তের সঙ্গে অনেক জায়গায় পোস্টাল অর্ডার দিতে হয়। কানুর কাছে পনেরো ষোলো টাকা আছে, তাতে হয়ে যাওয়া উচিত।

কানু পকেট থেকে সেই টাকা বার করতেই কেষ্টবাবু গলা ঝুঁকিয়ে দেখে একগাল হাসলেন। তারপর বললেন, আমি শনিপুজোর চাঁদা চাইছি না। আমার ভাই বলে দেয়নি কিছু?

কানু দু'দিকে মাথা নাড়লো।

এ বাজারে কিছু খর্চা না করলে চাকরি হয়? বারো দু'গুণে চব্বিশ শো আর বারো দশকে একশো

কুড়ি, ইয়ে মোট আড়াই হাজারই ধরো। ঐ টাকাটা জমা দিতে হবে আগে।

কোথায়ে জমা দেবো?

আমাকেই দেবে। তা বলে ভেবো না, পুরোটাই আমি একা নেবো, আরও পাঁচজন দেবতার মাথায় সিন্নি চগড়াতে হয়। তোমাদের বাড়ি কোথায় ছিল?

একটুও দ্বিধা না করে কানু বললো, মুর্শিদাবাদ।

কানু আজকাল চালাক হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছে, সব জায়গায় নিজেদের বাঙাল পরিচয়টা জানিয়ে দিলে সুবিদে হয় না। কেষ্টবাবুর কথা শুনেই সে বুঝেছে, উনি এদিককার লোক।

কেষ্টবাবু বললেন, আমি মেদিনীপুরের ছেলেদের একটু ফেবার করি। ব্রিটিশ আমলে মেদিনীপুরে কত অত্যাচার হয়েছে, এখন আমি এই শালা ব্রিটিশ কোম্পানিতে যত পারি মেদিনীপুরের ছেলে ঢোকাই! তা ঠিক আছে, তুমি হাকিম সাহেবের ভাই, তোমারও দু'হাজার দিলেই চলবে। সাত দিনের ব্যবস্থা করো, দেরি হলে মুশকিল, আরও অনেক ক্যান্ডিডেট ঘোরাঘুরি করছে।

একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে এসে কেষ্টবাবুকে এক গেলাস চা দিয়ে পাশেই এক্কা-দোক্কা খেলতে লাগলো আপন মনে। কেষ্টবাবু চায়ে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস কররেলন, তাহলে ঐ কথাই রইলো?

অর্থাৎ ইন্টারভিউ শেষ। কানু উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, দরখাস্তটা কি রেখে যাবে?

কেষ্টবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, না, না শুধু দরখাস্ত নিয়ে আমি কী করবো? সামনের রোববারের মধ্যে টাকাটা আর ওটা নিয়ে এসো একসঙ্গে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কানু ভাবলো, সেজদা নিজেইস কানুকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসবার কথা বলেছিলেন একবার। সকালে বাড়িতে লোক এসে পড়ায় তিনি বেরুতে পারেননি। সেজদা এলে বেশ মজা হতো, টাকার কথাটা শুনলে সেজদার মুখের চেহারাটা নিশ্চয়ই হতো দেখবার মতন। তিনি এই সিঁড়িঙ্গে লোকটার সঙ্গে মারামারি শুরু করে দিতেন কি না কে জানে! ন্যায়-নীতি নিয়ে সেজদার বাড়াবাড়ির শেষ নেই। লুটেপুটে খাওয়ার যুগ এসেছে, এখন যে ওসব শুধু বইয়ের পাতায় লেখা থাকে, তা সেজদা কিছুতেই বুঝবে না!

কানু এটুখানি এগোতেই উল্টো দিক থেকে আসা তারই বয়েসী একটি যুবক এক টুকরো কাগজ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, দাদা, এই ঠিকানাটা কোন্ দিকে হবে বলতে পারেন।

কানু দেখলো সেটা কেষ্টবাবুরই নাম-ঠিকানা। সে মনে মনে হাসলো। আর একজন এসে গেছে এর মধ্যেই। এ ছেলেটার বাড়ি মেদিনীপুরে নাকি, তাহলে এরই বেশি।

বাড়ি ফিরে টাকার অঙ্কটা আর কমালো না কানু, পুরো আড়াই হাজারের কাহিনীটাই শোনালো প্রতাপকে। প্রতাপ কয়েক মুহূর্ত যেন হতবাক হয়ে গেলেন। অসহায়, বেকার ছেলেদের চাকরি দেবার বিনিময়ে কেউ মোটা টাকা ঘুষ চাইতে পারে, এরকম ব্যাপারে যেন তাঁর কল্পনার অতীত।

রাগের চোটে প্রতাপ চিৎকার করে বলে উঠলেন, ঐ লোকটাকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেবো। আমার পেশকার....সেও কিছু বলেনি...তার এত সাহস....।

কানু মনে মনে ভাবলো, সেজদা কোন্ যুগে পড়ে আছে? ঘরে বসে গলাবাজি করলে কেউ পুঁছবে? মফস্বল শহরে তবু সাব জজদের খানিকটা খাতির আছে, কলকাতায় কেউ পাত্তাও দেবে না। ঐ পেশকারের রোজগারেই বোধহয় সেজদার চেয়ে বেশি।

চ্যাঁচামেচি শুনে সুপ্রীতি এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

কানুর কাছে সব কথা শুনে সুপ্রীতি বললেন, আড়াই হাজার টাকা, সে তো অনেক টাকা, কিছু কম করবে না? ঐ কম্পানির চাকরি তো ভালো শুনেছি।

প্রতাপ বললো, কক্ষনো না, আমি এক পয়সা দেবো না। ঐ লোকটাকে আমি জেলের ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়বো।

কানু তক্ষুনি ঠিক করে ফেললো, সেজদা যদি আর কারুর কাছে চাকরির জন্য চিঠি দিয়ে পাঠায়, তাহলে সে আর যাবে না, চিঠি ছিঁড়ে ফেলে একই গল্প শোনাবে।

কয়েকদিন পর দুপুরবেলা খেতে বসে থালার পাশে মাংসের বাটি দেখে প্রতাপ ভুরু কোঁচকালেন। সপ্তাহের মাঝখানে একটা ছুটির দিন। মাসে একদিন মাত্র মাংস হয়, প্রথম রবিবার।

প্রতাপ খুশি হলেন না। কানুর ধরন-ধারণ তাঁর ঠিক পছন্দ নয়। সব সময় কিছু যেন একটা গোপন করে যাওয়ার ভাব আছে ওর মধ্যে। ও পয়সা পাচ্ছে কোথা থেকে? প্রতাপ সংকল্প করলেন, এরপর থেকে তিনি কানুর ওপর নজর রাখবেন।

কানু আগেই খেয়ে বেরিয়ে গেছে, পিকলু আর বাবলু খেতে বসেছে প্রতাপের সঙ্গে। ওরা মাংস ভালোবাসে। বাবলু বললো, পিসিমনি, তুমি দাদাকে নলি হাড় দিয়েছো, আমাকে দাওনি। আমায় আর একটা মাংসের আলু দাও!

প্রতাপ খাওয়া থামিয়ে চেয়ে রইলেন সন্তানদের দিকে। তাঁর হঠাৎ বুক ব্যথা করতে লাগলো। সামান্য মাংসও তিনি নিয়মিত খাওয়াতে পারেন না। ছেলেমেয়েদের। তাঁদের বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রতিদিন জোড়া পাঁঠা বলি হতো। তা ছাড়াও ভবদেব মজুমদার মাঝে মাঝেই বাড়িতে পাঁঠা কাটিয়ে সেই মাংস বিলি করতেন গ্রামের চেনাশুনো পরিবারে।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে প্রতাপ দেখলেন দরজার পাশেই পাকা জায়গাটুকুতে কয়েকটা বড় বড় বাণ্ডিল। দেখে মনে হয় কাপড়ের। এগুলো এলো কোত্থেকে?

মমতা বললেন, ওগুলো কানুর ব্যবসার জিনিস। সে নাকি এরকম বাণ্ডিল প্রায়ই আনে। ঘরের মধ্যে আরও অনেকগুলো আছে, সব ধরেনি বাইরে কয়েকটা রেখেছে, কাল সকালেই সরিয়ে নেবে।

কানু তখন বাড়িতে নেই, তাই তার সঙ্গে কথা বলা গেল না। মমতার কাছেই শুনলেন যে কানু রীতিমতন ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে, ভালই চলছে নিশ্চয়ই, সে যখন তখন বেশ পয়সা খরচ করে। বাবলু আর পিকলুকে দুটো জামা কিনে দিয়েছে। মমতা আর সুপ্রীতিকেও শাড়ি দিতে চেয়েছিল, ওরা নেননি, কানুর ব্যবসার আর একটু উন্নতি হলে নেবেন বলেছেন।

কাপড়ের ব্যবসা শুনলেই মনে পড়ে কাপড়ের দোকান। প্রতাপ ভাবলেন, তাঁর ভাই কাপড়ের দোকান খুলেছে? দোকান খুলতে অনেক টাকা লাগে, কাপড়ের ফিরিওয়ালা হয়েছে নাকি কানু?

প্রতাপ নিজের কাজে মন দিলেন। তাঁর বেশি রাত করে খাওয়া অভ্যেস। তখন খোঁজ নিয়ে জানলেন, কানু এর মধ্যে এসে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাথরুমে আঁচাতে এসে প্রতাপ দেখলেন একটা নতুন তাক তৈরি হয়েছে সেখানে, তার ওপরে একটা পাউডারের কৌটা, দু' একটা স্নো-পমেটমের শিশি, দাড়ি কামানোর সাবান। এসব আবার কোথা থেকে এলো? নিশ্চয়ই কানুই এসব কিনে এনেছে।

রাত জেগে প্রতাপ বই পড়তে লাগলেন, কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁর মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো। বাড়িতে এতগুলো কাপড়ের বাণ্ডিল, এ সম্পর্কে কিছুতেই তিনি মন থেকে খটকা দূর করতে পারলেন না।

এক সময় তিনি বই মুড়ে রেখে বাইরে এসে একটা কাপড়ের বাণ্ডিল খুলে ফেললেন। সবই শাড়ি, দামি নয়। সাদা খোল, সরু লাল বা হলদে পাড়। আর একটা বাণ্ডিল খুললেন, তাতেও ঠিক একই শাড়ি।

প্রতাপ এগিয়ে এসে ছেলেদের ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললেন। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেখলেন, দুটো দেয়ালের পাশে একই রকম অনেকগুলো বাণ্ডিল রয়েছে। এক ঘরে তিনজন থাকে, এমনিতেই ঠাসাঠাসি হয়, এর মধ্যে আবার এত মালপত্র এনে ভরার আগে কানু একবার তাঁর অনুমতি নেবার প্রয়োজনও বোধ করেনি?

কানুকে ডাকবার আগে সে চোখ মেলে তাকালো।

আঙুলের ইসারায় প্রতাপ ডাকলেন, এই, একবার উঠে আয় তো!

যে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়েছিল, সেটাই জড়িয়ে উঠে এলো কানু। প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, এসব কী?

কানু বললো, কাপড়। আমি ব্যবসা করছি, আমাদের ওখানে রাখার জায়গা নেই।

ওখানে মানে? দোকান খুলেছিস?

না, আমাদের গোডাউন।

আমাদের মানে কী?

আমার পার্টনার আছে একজন। সে অনেকদিন ধরে কাপড়ের লাইনে আছে। আমরা মিল থেকে কাপড় ডেলিভারি নিয়ে দোকানে দোকানে সাপ্লাই দিই!

এগুলো সরকারি কন্ট্রোলের শাড়ি, তাই না?

এবারেও কানু সঙ্গে সঙ্গে বললো, কোথায় দেখি সেই পারমিট?

আমার কাছে নেই, আমার পার্টনারের কাছে আছে।

তোর কাছে একটা কপিও রাখিসনি? আজ রাতে যদি পুলিশ এসে বলে এই কাপড়ের পারমিট কোথায় দেখাও? তাহলে?

কানু এবারে কোন উত্তর খুঁজে পেল না।

প্রতাপ খপ করে কানুর একটা কান ধরে বললেন, হারামজাদা, এই জন্যই তুই এই ব্যবসার কথা আমাকে আগে বলিসনি, তাই না? চুরির ব্যবসা ধরেছিস? জুতিয়ে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেবো!

বাপ-ঠাকুর্দাদের মতনই প্রতাপ উত্তেজিত হয়ে গেল গলার আওয়াজ নিচু রাখতে পারেন না। রাত্রি কি দিন তা খেয়াল থাকে। কানু এর পরেও কোনো কথা বললো না, তাতে প্রতাপের রাগ আরও চড়ে গেল। কানটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, আমি সরকারি চাকরি করি, তুই আমার মুখে চুনকালি দিতে চাস? এত তোর টাকার লাভ!

ছেলেরা তো জেগে উঠেছেই, মমতা আর সুপ্রীতিও বাইরে চলে এসেছেন। সুপ্রীতি কাছে এগিয়ে এসে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, ও কী করছিস, খোকন? এত বড় ছেলের কান ধরতে আছে? ছেড়ে দে!

রাগের সময় প্রতাপ স্ত্রী বা দিদিকেও গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু আজ সুপ্রীতি তাঁর হাত ধরতেই তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। গয়নাগুলো নষ্ট হবার পর প্রতাপ দিদির সামনে একটু কাচুমাচু হয়ে থাকেন। মমতার কাছেও তিনি একটু অপরাধী হয়ে আছেন। সেই যে একদিন রাগ করে ভোরবেলা গৃহত্যাগ করে তিনি দেওঘর চলে গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে মমতা এখনও কোনো খোঁটা দেননি, নিশ্চিত জমা রেখেছেন ভবিষ্যতের জন্য।

সুপ্রীতি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে, কানু?

কানু এবারে ভালোমানুষ সেজে নিরীহভাবে বললো, বলছি যে এই কাপড়ের জন্য পারমিট আছে আমার পার্টনার গুপীবাবুর কাছে, সেজদা সেকথা বিশ্বাস করছে না। কাল সকালেই এনে দিতে পারি।

প্রতাপ গর্জন করে উঠে বললেন, মিথ্যে কথা!

সুপ্রীতি বললেন, তুই সব না জেনেশুনেই এরকম রাগারাগি করছিস কেন, খোকন? কাল সকালেই তো কাগজ এনে দেবে বলছে। ছেলেটা চাকরি বাকরি কিছুই তো পেল না, ব্যবসা করে যদি দুটো পয়সা রোজগার করে তাতে দোষের কী আছে?

দিদি, তোমরা বুঝতে পারবে না! এটা চুরির ব্যবসা। এই সব কাপড় গরিবদের কাছে কম দামে বিক্রির জন্য। তাই নিয়ে অনেকে কালোবাজারি করে। একবার একজনের নামে মামলাও হয়ে গেছে।

কানু মিষ্টি গলায় বললো, আমাদের পুলিশ কিছু করতে পারবে না। আমাদের কাগজপত্র সব ঠিকঠাক করা আছে।

তাহলে এ বাড়িতে এগুলো এনে লুকিয়ে রেখেছিস কেন?

কাল সকালেই নিয়ে যাবো।

সুপ্রীতি বললেন, খোকন, তুই বড্ড মাথা গরম করছিস! এখন শুতে যা! ওর জন্য একটা চাকরি তো জোগাড় করে দিতে পারলি না!

প্রতাপের ইচ্ছে করছিল লাথি মেরে মেরে কাপড়ের বাণ্ডিলগুলো বাড়ির বাইরে ফেলে দিতে। তিনি বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন। সবাই মিলে যেন তাঁকে অসহায় করে দিচ্ছে।

পরদিন প্রতাপ জাগবার আগেই কানু সব মালপত্র সরিয়ে ফেললো কিন্তু কাগজপত্র এনে দাদাকে দেখালো না। প্রতাপের সামনে থেকে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। প্রতাপ মমতাকে হুকুম দিয়ে দিলেন, কানুর কাছ থেকে সংসার খরচের জন্য যেন একটা টাকাও না নেওয়া হয়। পিকলু-বাবলুর জন্য সে কোনো জিনিস কিনে দিলে ফেরত দিতে হবে তৎক্ষণাৎ! আর বাথরুমে স্নো পাউডার কার জন্য! এ বাড়িতে থেকে কানুর ওসব বাবুগিরি চলবে না!

দু'দিন বাদেই কানু এসে জানালো, মির্জাপুর স্ট্রিটে সে একখানা ঘর ভাড়া করেছে। তার কাজের সুবিধের জন্য এখন থেকে সে সেখানেই থাকবে। এখনেও তো তার জন্য পিকলু-বাবলুদের অনেক অসুবিধে হয়!

প্রতাপ হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বললেন না, গুম হয়ে বসে রইলেন অনেক্ষণ।

॥ ৩৯ ॥

কলেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেই পিকলু দেখলো হেদো পার্কের রেলিং এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার দুই ভাই-বোন। পিকলু শুধু চমকে গেল না, অস্বস্তি বোধ করলো। তার এখন বন্ধুদের সঙ্গে বসন্ত কেবিনে গিয়ে আড্ডা মারার কথা। বসন্ত কেবিনের একেবারে কোণের দিকের একটা টেবিল তাদের জন্য নির্দিষ্ট, সেখানে তাদের সাহিত্য-বাসর হয়।

বাড়ির জগৎ আর বাইরে সম্পূর্ণ আলাদা। কলেজে কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গে থাকার সময় হঠাৎ বাড়ির কেউ এসে পড়লে কেমন যেন অবান্তর লাগে। প্রতাপ একদিন এই কলেজে ইংরেজির

অধ্যাপক মহীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্লাস রুমের বাইরে, সেদিন বাবাকেও খুব সাধারণ মনে হচ্ছিল পিকলুর। আজও বাবুলু আর তুতুলকে দেখে প্রথমেই ভাবলো, এরা এখানে বেমানান। এরা কেন এসেছে? তার পরেই তার বুকটা কেঁপে উঠলো। বাড়িতে কারুর কোনো বিপদ ঘটেনি তো? ওরা তাকে খবর দেবার জন্য ছুটে এসেছে?

বাবলুর সদ্য গলা ভাঙতে শুরু করেছে। সে খসখসে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, দাদা!

পিকলু তার বন্ধুদের বললো, তোরা যা, অমি একটু পরে আসছি! সে প্রায় ছুটে এলো রাস্তার অন্য দিকে।

না, বাড়িতে কোনো বিপদ ঘটেনি। দুই ভাইবোন এসেছে দাদাকে চমকে দিতে। বুদ্ধিটা অবশ্য তুতুলেরই। তার পরীক্ষা হয়ে গেছে, বাড়িতে একটাও বই নেই পড়ার মতন। কিছুতেই তার সময় কাটে না। বাবলুরও আজ স্কুল ছুটি। মমতা আর সুপ্রীতি ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেকতে গেছেন, ছবি বিশ্বাসের কোনো ফিল্ম এলে সুপ্রীতির দেখা চাই-ই। তুতুলকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তুতুল রাজি হয়নি। ওঁরা রিকশা ছাড়া যাওয়া আসা করেন না, ওদের সঙ্গে গেলে তুতুলকে মা কিংবা মামিমার কোলে বসতে হয়, সেটাই তার বিচ্ছিরি লাগে। ওরা সিনেমায় চলে যাবার পর বাবুলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তুতুল।

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, তোরা কী করে জানলি, আমার কখন ছুটি হবে?

তুতুল উত্তর না দিয়ে হাসলো। বাবলু বললো, দিদিটা কিছু জানে না, আমরা এক ঘণ্টা ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

পিকলু ভুরু কুঁচকে বললো, হঠাৎ তোদের এই উটকো বুদ্ধি চাপলো কেন? আমি তো এখন বাড়ি ফিরতে পারবো না। আমার কাজ আছে। চল, তোদের বাসে তুলে দিই!'

তুতুল আবদারের সুরে বললো, হঠাৎ তোদের এই উটকো বুদ্ধি চাপলো কেন? আমি তো এখন বাড়ি ফিরতে পারবো না। আমার কাজ আছে। চল, তোদরে বাসে তুরে দিই!

তুতুল আবদারের সুরে বললো, না, আমরা এখন যাবো না!

বাবলু বললো, দাদা, তোমাদের কলেজের ভেতরে আমাদের নিয়ে চলো একটু! আমি দেখবো!

পিকলু বললো, বাচ্চাদের কলেজের ভেতরে যেতে দেয় না!

তুতুল-বললা, আহা, বাচ্চা মানে কী? আমার রেজাল্ট বেরুলে আমিও তো এই কলেজে ভর্তি হবো!

বাবলু বললো, আহা, বাচ্চা মানে কী? আমার রেজাল্ট বেরুলে অমিও তো এই এই কলেজে ভর্তি হবো!

বাবলু বললো, আমিও এখানে পড়বো!

বাবলুর থুতনিটা ধরে নেড়ে দিয়ে পিকলু বললো, তোর যা পড়াশুনা ছিরি, তোকে আর কলেজ পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে না। দ্যাখ, স্কুলটাই টপকাতে পারিস কি না!

তারপর সে তুতুলকে বললো, তুই পাশ করলে তোকে ভর্তি করে নেবো বেথুন কলেজে।

তুতুল জোর দিয়ে বললো, না, আমি এখানে পড়বো!

পিকলু বললো, আমি আর স্টটিশে থাকছি, থার্ড ইয়ারে প্রেসিডেন্সিতে চলে যাচ্ছি।

তুতুল বললো, আমিও বুঝি প্রেসিডেন্সিতে যেতে পারি না?

বাবলু জিজ্ঞেস করলো, আমাদের তুমি কলেজের ভেতরটা দেখাবে না

তুতুল পরে এসেছেন হলুদ রঙের শাড়ি। খোলা চুল সন্ধ্যেবেলার জলপ্রপাতের মতন ছড়িয়ে আছে পিঠে। ফার্স্ট ইয়ারে মেয়েদের তুলনায় তাকে তাঁকে বড়ই দেখায়। বাবলু ক্লাস নাইনে পড়লেও তার চেহারাও তেমন ছোটখাটো নয়।

গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে হাসি ফুটলো। সে খপ করে ছোট ভাইয়ের হাত চেপে ধরে বললো, হ্যাঁ আছে, আমাদের প্রিন্সিপালই তো সাহেব। চল, তোকে নিয়ে যাচ্ছি, তোকে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে!

বাবলুর মুখ শুকিয়ে গেছে। সে বললো, থাক, আমি কলেজ দেখবো না।

পিকলু বললো, কেন? এই যে বললি, চল, আগে তো প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছ থেকে পারামিশান নিতে হবে!

তুতুল একা একাই এগিয়ে গেছে অনেকটা। স্কুল ফ্যাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর স্কুলের বালিকা নেই। তার চলায় একটা ছান্দ এসেছে। পিকলু ওদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো

কমনরুম, লাইব্রেরি, কেমিস্ট লেবরেটরি। বাবলু চুপ হয়ে গেছে। কেন যে তার এত সাহেব ভীত, তা বোঝা যায় না। কটা সাহেবই বা সে দেখেছে? বাবার কাছে পরাধীন আমলের গলা শুনেছে কিছু কিছু।

কলেজের বাড়িটা কত বড়, কত ঘর, তবু এর মাঝখান দিয়ে সচ্ছন্দে, সাবলীল ভাবে ঘুরছে পিকলু। যেন এটা তার নিজের জায়গা। এটাই বেশি আশ্চর্য করলো বাবলুকে। নিজেদের বাড়ি ছাড়া অন্য কোনো বাড়িতে গেলে সবাই একটু আড়ষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কলেজটা আপন করে নেওয়া যায়? বাইরের এই বড় জগৎটা একবার হাতছানি দিল বাবলুকে। কিন্তু মুশকিল এই, এখানে আসতে গেলে বড্ড বেশি বই পড়তে হয়। সেটাই যে তার ভাল লাগে না।

কলেজ সফর সাঙ্গ হবার পর বাইরে এসে তুতুল বললো, তুমি বলেছিলে হেদোতে ভালো ঘুগনি পাওয়া যায়? আমাদের খাওয়াও!

পিকলু বললো, আমার বন্ধুরা আমার জন্যে ওয়েট করে আছে, জরুরী কথা আছে ওদের সঙ্গে!

বসন্ত কেবিনে? তাহলে সেখানেই আমরা যাই?

বন্ধুদের কাছে ভাই-বোনদের নিয়ে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু একা তুতুল থাকলে তবু কথা ছিল, বাবলুকে তো নেওয়া চলেই না। অগত্যা পিকলু ওদের নিয়ে গেল ঘুগনি খাওয়াতে।

হেদোর জলে সাঁতার কাটছে অনেকে। একদিকে মেয়েদের সাঁতারে রকমটিটিশান হচ্ছে, সেখানে প্রচুর দর্শকের ভিড়। ওরাও দাঁড়িয়ে দেখলো খানিক্ষণ। ততুল আর বাবলু সাঁতার জান না। পিকলু ছেলেবেলায় গ্রামে গিয়ে একটু সাঁতার শিখেছিল, তারপর অনেক বছর প্র্যাকটিস নেই। মা আর পিসিমা মাঝে মাঝে গঙ্গা স্নান করতে যান, পিকলুকে যেতে হয় সঙ্গে। মেয়েদের ঘাট আর পুরুষদের ঘাট আলাদা, পিকলুর একা একা জলে নামতে ইচ্ছে করে না। প্রতাপ মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেন, তাঁর ছেলেমেয়েরা কেউ সাঁতার শিখলো না।

বিকেলের রোদ পড়ে ঝকঝক করছে জল। কিশোরী মেয়েদের দাপদাপিতে এই জলাশয়টি যেন খুশী হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতাদের উৎসাহ দেবার জন্য চিৎকার করছে লোকেরা। দৃশ্যটি তুতুলের বড় সুন্দর লাগলো। বাড়ির জীবনের এই প্রাণোচ্ছলতা তো সে বিশেষ দেখার সুযোগ পায় না।

সে লাজুক ভাবে বললো, আমাদের বাড়ির কাছে যদি এরকম একটা পুকুর থাকতো, তাহলে আমিও সাঁতার শিখতাম।

পিকলু বললো, আমাদের দেশের বাড়িটা থাকলে আমরা সবাই এমনি এমনিই সাঁতার শিখে যেতমো। ওখানে পাঁচ বছরের বাচ্চাও সাঁতার জানে।

দেশের বাড়ির কথা তুতুলের ক্ষীণ মনে থাকলেও বাবলুর একটুও মনে নেই। সে বললো, আমি গঙ্গায় সাঁতার কাটবো!

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, পিকলুদা, মামাবাড়ির বড় উটোনটায় একদিন একজন একটা মস্ত বড় সাপ গেঁথে রেখেছিল, তোমার মনে আছে?

পিকলু ভরু কুঁচকে বললো, সাপ দেঁথে রেখেছিল? তার মনে?

তুতুল বললো, সেই যে একজন মাঠ থেকে একটা বড় সাপ ধরে এনেছিল দেখাবার জন্য? উঠোনের মাঝখানে সেটাকে বর্শা দিয়ে গেঁথে দেয়। সাপটা বেঁচে, ফোঁস ফোঁস করছিল অনেক্ষণ!

পিকলু এবারে এসে বললো, তোর মনে আছে বুঝি? দেখেছিলি?

তুতুল বললো, হ্যাঁ। স্পষ্ট মনে আছে

তুই তা হলে জাতিস্মর!

কেন, তোমার মনে নেই? বাড়িতে গিয়ে মামিমাকে জিজ্ঞেস করে দেখো!

পিকলু তবু হাসতে লাগলো। ঘটনাটা বাবলু-তুতুলের জন্মের আগে। পিকলুরই তখন মাত্র দেড় বছর বয়েস। প্রথম বাচ্চা নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর মমতার সেই প্রথম সাপ দেখার অভিজ্ঞতা হল। মালখানগরের বাড়ির মাঝি মৈনুদ্দিন রান্নাঘরের পেছনের ছাইগাদায় একটা বিরাট শঙ্খচূড় সাপ দেখতে পেয়ে ল্যাজায় গেঁথে এনে ছিল শহুরে বউদিকে দেখাবার জন্য। সেই অবস্থাতেও সাপটা ফনা তুলে মাথা দোলাতে লাগলো। তা দেখে মায়া হয়েছিল মমতার, তিনি বলেছিলেন, আহা, ওকে ছেড়ে দাও। মমতার কাছেই সেই গল্প শুনেছে ছেলেমেয়েরা। অদূর অতীত কালের গল্প কয়েকবার শুনতে শুনতে মনের মধ্যে তালিয়ে যায়, তারপর একসময় মনে হয়, আমি নিজেই সেটা দেখেছি।

পিকলুর হাসি দেখে তুতুল রেগে গেছে, সে হাঁটতে লাগলো উল্টো দিকে।

পিকলু কাছে এসে বললো, এবার তোরা যা! পাঁচটা প্রায় বাজে!

তুতুল দু'দিকে মাথা নেড়ে দৃঢ়ভাবে বললো, না, আমি বাড়ি যাবো না!

বাবলু এতে মজা পাচ্ছে। সে প্রায় রোজই কোনো না কোনো কারণে বকুনি খায়। আজ তার শান্ত-শিষ্ট দিদিটি দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্য বকুনি খাবে। সে ষড়যন্ত্রের সুরে ফিসফিস করে বললো, দিদিটি দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্য বকুনি খাবে। সে ষড়যন্ত্রের সুরে ফিসফিস করে বললো, দিদি, কানুকাকার বাড়ি যাবে?

তুতুল উৎসাহিত হয়ে বললোম, হ্যাঁ, তাই চল, পিকলুদা, চলো!

মীর্জাপুরে কানু যে ঘরটি ভাড়া নিয়েছে সেই জায়গাটি ওদের বেশ পছন্দ হয়েছে। কানু নতুন সংসার পাতবজার পর মমতা আর সুপ্রীতি দু'তিনদিন গিয়ে তার ঘর গুছিয়ে দিয়ে এসেছেন। কানু সঙ্গে কিছু নিয়ে যেতে চায়নি, মমতা জোর করে তাকে দিয়েছেন তোশক, বালিশ, কম্বল, সুজনি। এবং রান্নার জিনিসপত্র। কানু একটা খাট কিনে ফেলেছে। জানালায় নতুন পর্দা লাগিয়েছে। একটা চারতলা বাড়ির চিলে কোটাটা ভাড়া দিয়েছে কানু, সামনে ছাদ। সেই ছাদ থেকে কলকাতার অনেকখানি দেখা যায়, হাওড়া ব্রীজ তো স্পষ্ট! সামনে রাস্তাটা দিয়ে অজস্র মানুষ যায় আর নানারকম শব্দ। একতলায় একটা দফতরিখানায় বই বাঁধাই হয়, ডাই করা থাকে কত বই। মুটেরা ঝাঁকায় ভর্তি করে সেই বই নিয়ে যায়। আর এক পাশে একটা বড় মুদির দোকান। প্রায়ই বিকেলের দিকে একটি বিরাট মোটা ষাঁড় এসে দাঁড়িয়ে সেই দোকানের সামনে। অতবড় হাতির মতন ষাঁড়টার কিন্তু একটা পা খোঁড়া, সে পা টেনে টেনে হাঁটে। ষাঁড়টি এসে দাঁড়ালেই মুদিখানার মালিক নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে কর্মচারিদের হুকুম করেন, অ্যাই এক পো ছোলা দে! ষাঁড়টি নিচু হয়ে ছোলা খায় আর মুদিখানার মালিক তার গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দেন।

এই সব দৃশ্যই বাবলু-তুতুলদের কাছে নতুন।

সেই ভবানীপুরে বিমান বিহারীদের বাড়িতে ন'মাসে ছ'মাসে একবার-যাওয়া হলো। কানু বাগবাজারের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে বলে ওদের একটুও দুঃখ হয়নি।

পিকলু বললো, কানুকার বাড়ি। আবার উল্টোদিকে বাসের ভাড়া লাগবে.....আমার কাছে অত পয়সা নেই।

বাবলু বললো, আমরা হেঁটে যাবো!

পিকলু আরও কিছু আপত্তি করতে যাচ্ছিল, তুতুল গাঢ় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পিকলু এইরকম দৃষ্টি দেখলে অস্বস্তি বোধ করে। এরকম দৃষ্টির মধ্যে তুতুলের যেন অনেক কিছু দাবি থাকে।

হেদোর একপাশ দিয়ে বেরিয়ে শর্টকাটে বিবেকানন্দ রোড। সেখান থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিট। দু'পাশে লোহা-লক্কড়ের দোকান। ফুটপাথের ওপর ছড়ানো রয়েছে লোহার শিক। বাবলু-পিকলু কোনোদিন এ পথে আসেনি।

পিকলু বললো, এই রাস্তাটা এখন এরকম দেখছিস, এককালে এখানে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর থাকতেন। ঘোড়ার গাড়ি চেপে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন।

তুতুল বললো, তুমি তো ওঁদের দেখেছো, তাই না? এমন ভাবে বলছো?

পিকলু বললো, দাদা, তুমি আমাদের ফুচকা খাওয়াও। ঐ দ্যাখো ফুচকাওয়ালা!

পিকলু বললো, যদি না পারি, তুমি আমাদের ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে যাবে।

বাবলু বললো, দাদা, তুমি আমাদের ফুচকা খাওয়াও। ঐ দ্যাখো ফুচকাওয়ালা!

পিকলু পকেটে হাত দিল। মাসের শেষ, টিউশনি থেকে তার হাত খরচের টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ভাই-বোনকে নিয়ে সে বেড়াতে বেরিয়েছে, সামান্য ঘুগনি ছাড়া আর কিছু খাওয়াতে পারেনি। মানিকতলায় ভাল কচুড়ি-জিলিপি পাওয়া যায়, চোখের সামনে দিয়ে খালি ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে!

শুধু ফুচকা নয়, বাবলু দইবড়া, রসবড়াও খেল। তার যেন একেবারে রাক্ষুসে খিদে। পকেটের সব খুচরো পয়সা শেষ করে ফেললো পিকলু। ঝালে তার ঠোঁট জ্বলে যাচ্ছে। বাবলুটা ঠিক বাবার মতন ঝাল খেতে পারে, পিকলুর সহ্য হয় না।

তুতুল সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। সরল রাস্তাটির অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, দু'পাশের বাড়িগুলো যেন উদগ্রীব হয়ে আছে। কী যেন একটা টানছে তুতুলকে।

একটা গেটওয়ালা বড় বাড়ি দেখে পিকলু বললো, এইটা অনেকটা তোদের বরানগরের বাড়ির মতন না? তুতুল, ঐ বাড়িটার জন্য তোর মন কেমন করে?

তুতুল মুখে কোনো উত্তর দিল না, দু'দিকে মাথা নাড়লো। খুব ভালো লাগার অনুভূতি যখন হয়, তখন তার কথা বলতে ইচ্ছা করে না।

সিটি কলেজ, সেন্ট পলস কলেজ ছাড়িয়ে এসে পিকলু বললো, বাবা এইখানে কোনো এ মেস বাড়িতে থাকতেন, কলেজে পড়ার সময়। তখন বাবার বয়েস আমারই মতন বয়েস!

মা তখন কোথাও ছিল না?

মা তখন মামা-বাড়িতে তুতুলের চেয়েও একটা ছোট মেয়ে হয়ে ছিল! তখন তো আমাদের মা হতোই না!

বাবলু একটু চিন্তা করে বললো, আর মা যদি অন্য একজনকে বিয়ে করতো, তাহলে আমাদের অন্য বাব হতো?

সশব্দে পিকলু আর তুতুল হেসে উঠলো একসঙ্গে। বিবাহ ও জন্মরহস্য এরা দু'জনে অনেকটা জেনে ফেলেছে, বাবলু এখনো জ্ঞানের সেই সীমায় পৌঁছায় নি। এই বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার হলেই তার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায়। মেয়েরা বুকের জামা খুলে ফেললে তখন সেদিকে ছেলেদের তাকাতে নেই, তাকালে মেয়েরা বলে, অসভ্য! অলি একদিন বলেছিল তাকে। কী যে দোষ হয়েছিল, তা বাবলু বুঝতে পারেনি।

ওদের হাসি শুনে লজ্জিত হয়ে কথা ঘোরাবার জন্য বাবলু জিজ্ঞেস করলো,, বাবা কোন বাড়িটাতে থাকতো?

পিকলু বললো, তা জানি না। বাবার কাছে শুনেছি, অমহার্স্ট স্ট্রিটের একটা মেস বাড়ি...এই তো এখানে দুতিনটের রয়েছে, এর যে-কোনো একটা হতে পারে।

তারপর তুতুলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, কী রকম অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? এক সময় বাবা আমার বয়েসী, এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, তখন আমরা কোথাও ছিলুম না, আমরা নাও জন্মাতে পারতুম, এখন আমরা এই পথে হাঁটছি।

তুতুল তার বাঁ হাতটা একবার রাখলো নিজের বুকের মাঝখানে।

এভাবে কথা বলতে এগিয়ে যেতে লাগলো ওরা তিনজনে। তিনটি নবীন হৃদয়, সব কিছুতেই ওদের বিস্ময়, ওদের ওদের সামনে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা জীবন।

কানুর বাড়িতে গিয়ে ওরা তাকে পেল না। ঘর তালাবন্ধ। সে একা মানুষ, চাবি সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। তাতে কিন্তু একটুও দুঃখিত হলো না ওরা। এই যে বেড়াতে বেড়াতে এতখানি আসা হলো, এটাই তো আনন্দের।

পিকলু বললো, ভালোই হলো, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, কানুকাকা থাকলে আরও দেরি হয়ে যেত। এতক্ষণে সিনেমা থেকে মা আর পিসিমণি বাড়ি ফিরে এসেছে!

ফেরার সময় ওরা বাস ধরায় জন্য এলো কলেজে স্ট্রিটে। গোলদিঘির ভেতর দিয়ে এসে, সিনেট হলের লম্বা থামগুলো দেখিয়ে পিকলু বললো, এইটা ইউনিভার্সিটি, জানিস তো?

তুতুল আর পিকলু দু'জনেই মাথা নাড়লে, এই পথটা তাদের অচেনা নয়, বাবা-মাদের সঙ্গে এই পথ দিয়ে কয়েকবার যাতায়াত করেছে তারা।

পিকলু হঠাৎ আঙুল তুলে বললো, একদিন আমি এই ইউনিভার্সিটিটা জয় করবো!

তুতুল বললো, তার মনে?

পিকলু বললো, আমি ঠিক করেছি, আমি অন্য চাকরি করবো না। আমি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার হবো। তারপর আমাদের দেশের এডুকেশন পলিসিটাই বদলে দেবো!

পরের রবিবার বিকেল বেলায় তুতুলকে নিয়ে পিকলু এলো তালতলায় মামার বাড়িতে। বাবুলকেও আনতে চেয়েছিল, কিন্তু বাবলু ঘুড়ি ওড়ানো ছেড়ে আসতে চায়নি।

ত্রিদিবের নিজস্ব লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা প্রচুর। পিকলু প্রায়ই সেখানে পড়তে আসে পিকলুর পড়ার আগ্রহ দেখে ত্রিদিব তাকে তাঁর লাইব্রেরি ব্যবহার করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

সুলেখা খুব খুশী হলেন দু'জনকে দেখে। তুতুলের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, ইস এই মেয়েটা দেখতে কী সুন্দর হয়েছে!

তুতুল খুব লজ্জা পেয়ে গেল। তার চোখে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বলতে সুলেখাই।' অন্য যে-কোনো নারীকে কখনো ভালো লাগলে তার সঙ্গে সে মনে সুলেখার তুলনা করে। নিজেকে সে একটুও সুন্দর মনে করে না।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন কলেজে পড়বে, তুতুল? বেথুনে এসোনো। আমাদের আর্টস ডিপার্টমেন্ট খুব ভালো।

পিকলু হাসতে হাসতে বললো, আগে কী রকম রেজাল্ট করে দেখুন।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন কলেজে পড়বে, তুতুল? বেথুনে এসোনো। আমাদের আর্টস ডিপার্টমেন্ট খুব ভালো।

পিকলু হাসতে হাসতে বললো, আগে কী রকম রেজাল্ট করে দেখুন!

সুলেখা বললেন, তোর যে বড্ড গর্ব হয়েছে রে পিকলু!

বাড়িটি বেশ নিস্তব্ধ। ছুটির দিনের বিকেলে এ বাড়িতে এলে পিকলু বসবার ঘর ভর্তি দেখেছে, আজ একেবারে শুনশান। ত্রিদিবও বাড়িতে নেই।

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, মামাবাবু কোথায়?

সুলেখা একটু রক্তিম ভাবে হাসলেন। আজ তাঁদের বিবাহ-বার্ষিকী, এই দিনটিতে তাঁরা কোনো অনুষ্ঠান করেন না, কলকাতার বাইরে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যান দু'জনে। কিন্তু এবারে তাদের বন্ধু শাজাহান সাহেব কী করে যেন তারিখটা জেনে ফেলেছেন কিছুদিন আগে। গাড়িটার সেলফে একটু গোলমাল করছে, ত্রিদিব সেটা ঠিক করিয়ে আনতে গেছেন। ত্রিদিব এসে পড়লেই সুলেখাকে বেরুতে হবে। এদিকে পিকলুর সঙ্গে তুতুল এসেছে, এই মেয়েটি এর আগে কোনোদিন এ বাড়িতে আসেনি। আজ ওদের ফেলে চলে যাওয়াটাই ভাল দেখায় না, অথচ যেতেই হবে, শাজাহান সাহেব অভিমানী ধরনের মানুষ।

তুতুলকে দেখে হঠাৎ হারীত মন্ডলের কথা মনে পড়লো সুলেখার।

তিনি অপ্রস্তুত অবস্থাটা লুকোতে পারলেন না, ওদের বসিয়ে রেখে জল খাবারের ব্যবস্থা করতে উঠে গেলেন। ত্রিদিবের গাড়ির শব্দ শোনা গেল একটু বাদেই।

সুলেখা ফিরে এসে বললেন, পিকলু, তুই পড়াশুনো কর, আমরা তুতুলকে নিয়ে যাই, ঘণ্টা দু'একের মধ্যেই ফিরে আসবো!

তুতুল জলে-পড়া মানুষের মতন মুখ করে বললো, আমি কোথায় যাবো?

আমাদের এক বন্ধুর বাড়ি। চলো না, তোমার ভাল লাগবে!

তুতুল অসহায় ভাবে পিকলুর দিকে তাকিয়ে বললো, আমি যাবো না, আমি এখানেই থাকবো।

অচেনা বাড়িতে যেতে তুতুলের ভালো লাগবে না, এটা পিকলুও বোঝে। সে বললো, ও থাক এখানে। গল্পের বই-টই পড়বে। তোমাদের ফিরতে দেরি হবে?

ওরা দু'জনে চলে এলো লাইব্রেরির ঘরে। একটু পরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন সুলেখা। আজ তিনি কিছুটা সাজাগোজ করেছেন। একটা লাল সিল্কের শাড়ি, গলা থেকে ঝুলছে একটা লম্বা সোনার হার। দুটি তরুণ-তরুণীরই মনে হলো, সুলেখা মানবী নয়, দেবী। তাঁর মুখের মধুর হাসিটির কোনো তুলনা নেই।

একটা চাবি দেখিয়ে সুলেখা বললেন, এটা রেখে যাচ্ছি। সিঁড়ির গেটটা টানা রইলো। যদি আমাদের ফিরতে দেরি হয়, কিংবা তোরা ততক্ষণ না থাকিস, তাহলে ঐ গেটে তালা দিয়ে চাবিটা লেটার বক্সে দিয়ে যাস, কেমন?

পিকলু বললো, আচ্ছা!

সুলেখা আবার লজ্জিত ভাবে বললেন, আমাদের চলে যেতে হচ্ছে, চা-টা যদি খেতে চাস, লজ্জা করবি না, নিচে ঠাকুর আছে? তাকে বলিস!

লাইব্রেরি ঘরটি প্রকাণ্ড। সমস্ত দেয়াল-জোড়া বইয়ের র‍্যাক। একটা ছোট মই আছে, তা দিয়ে ওপরের দিকটার বই পাড়তে হয়। একদিকের দেয়ালে একটি রবি বর্মার আঁকা রাবণ কর্তৃক জটায়ু বধের ছবি।

ঘরের মাঝখানে একটি বড় টেবিলে ও গোটা চারেক চেয়ার। সাদা কাগজের প্যাড ও কয়েক রকমের কলম-পেন্সিল সাজানো আছে টেবিলের ওপর। পিকলু এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার দুটি ভল্যুম নামিয়ে এনে একটা চেয়ারে বসলো। সে বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও তার জ্ঞানের তৃষ্ণা অসীম। সে সব বিষয়ে জানতে চায়।

প্রথমেই বই না খুলে সে তুতুলের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হেসে বললো, বাড়িতে কেউ নেই, এখন অনায়াসে সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। তুতুল, একটা জানলা খুলে দেতো!

সিগারেট টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে বললো, কত বই দেখেছিস?

তুতুল কোনো কথা বললো না, শুধু মাথা নাড়লো।

আমি এখানে এলেই বিখ্যাত সব মনীষীদের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। বই মানে কি জানিস? বই হচ্ছে অভিজ্ঞতা। এতকাল ধরে মানুষের জ্ঞানে জ্ঞানের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা বইয়ের পাতায়

লিখে রাখা হয়েছে আমাদের জন্য। ভবিষ্যতেও যারা আসবে, তাদের জন্য আমাদেরও কিছু রেখে যেতে হবে।

তুতুল জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

এই পাড়াটা এমনিতেই নির্জন, তাদের বাগবাজারের মতন গমগমে নয়। বাড়িটাতেও কোনো শব্দ নেই। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে প্রায়। খানিক বাদে ফিরিয়ে তুতুল দেখলো পিকলু গভীর অধ্যয়নে ডুবে আছে। মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে কাগজে। সে যেন এখন এই ঘরের মধ্যে উপস্থিত নেই।

গভীর কষ্টে বুকটা মুচড়ে উঠছে তুতুলের। দারুণ অপরাধবোধে সে যেন মরমে মরে যাচ্ছে। পিকলু তার দাদা, অথচ পিকলু বইপত্র রেখে শুধু তার সঙ্গে কথা বলুক, তার পিঠে হাত দিয়ে আদর করুক। এখানে এখন দেখতে আসার কেউ নেই, এখানে পিকলু তাকে একেবারে আপন করে নিতে পারতো!

এই চিন্তাটাও অন্যায় তা তুতুল জানে। পিকলু কত ভালো, তার এসব কথা মনে আসে না। মনটা ফেরাবার জন্য তুতুল একটা ছবির বই খুলে দেখতে লাগলো। তার আলো কম লাগছে। পিকলু এত কম আলোতে পড়ছে কী করে? ওখানে একটা টেবিল ল্যাম্প আছে সেটা জ্বালার কথাও মনে পড়েনি বাবুর।

টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে তুতুল জ্বেলে দিল আলোটা।

যেন ঘোর ভেঙে মুখ তুলে পিকলু বলল, অ্যাঁ? ও, থ্যাঙ্ক ইউ!

হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো তুতুল।

পিকলু অবাক হয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তুতুলের হাত ধরে বললো, এই, তো রকী হলো? কাঁদছিস কেন? খারাপ লাগছে?

তুতুল মাথা নেড়ে বললো, না। তারপর পিকলুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, না। তারপর পিকলুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, কিছু হয়নি। চোখ মুছে সে দূরে সরে গেল।

॥ ৪০ ॥

কোনো খবর না দিয়েই দেওঘরে এসে উপস্থিত হলেন সত্যেন। মার্চ মাস ফুরোতে না ফুরোতেই হঠাৎ কিটকিটে গরম পড়ে গেছে। আকাশে শ্লেট রঙের মেঘ, তাদের কোনো নড়া-চড়া নেই। শীতের ফুলগুলি ঝরে গেছে, বসন্তের ফুল ভালো করে ফুটলো না।

গেটের সামনে ঘোড়ার গাড়ি থামার শব্দ শুনে দোতলার জানলা দিয়ে বুলা দেখলেন গাড়ি থেকে সত্যেনের সঙ্গে নামছে তাঁর ছেলে বাপ্পা। এই গরমের মধ্যেও সে পরে আছে নীল রঙের কোট-প্যান্ট, গলায় ডেকে উঠলো, মা!

বুলা দৌড়ে নিচে চলে এলেন।

সত্যেন যখনই আসেন একরাশ জিনিসপত্র আনেন সঙ্গে। দেওঘরে এই বাড়িটি কেনার পর থেকে তিনি এটিকে নতুনভাবে সাজাচ্ছেন। একজন গোমস্তা রেখেছেন এখানে, এ বাড়ির পেছন দিকের জমিটাও কেনার ইচ্ছে আছে তাঁর। নারায়ণগঞ্জের সম্পত্তি হারিয়ে তিনি এখানে নতুন করে সম্পত্তি তৈরি করতে চান।

গাড়ি থেকে আর একটি অল্পবয়সী রমণীও নামলো, তার পরনে সাদা শাড়ী। সত্যেন তার পিঠে হাত দিয়ে নিয়ে এলেন ভেতরে।

বাপ্পা বললো, মা, সিনিয়ার কেমব্রিজের রেজাল্ট বেরিয়েছে, তুমি শুনেছো?

বুলার বুকের মধ্যে একবার ধক করে উঠলো। উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, বেরিয়েছে?

বাপ্পা মুচকি হেসে বললো, আমার কী রেজাল্ট হয়েছে বলো তো? আমি ফেল করেছি!

বুলার চোখে জল এসে যাচ্ছিল প্রায়। তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন।

এই সব পরিবারের ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষা পাশের খবর জানিয়ে বাবা-মাকে প্রণাম করে। বাপ্পাকে তা শেখানো হয়নি, সে কোটের পকেট থেকে একটা চিউইংগাম বের করে মুখে পুরে দিল।

ছেলে বড় হয়েছে, আগের মতন আর তাকে যখন তখন বুকে জড়িয়ে ধরা যায় না, তবু বুলা এখন বাপ্পার মাথাটা টেনে নিয়ে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, সত্যি বলছিস, বাপ্পা? আমার কী দারুণ ভয় হয়েছিল!

বাপ্পা মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বললো, এবারে তুমি আমার কী দেবে বলো? আমি যা চাইবে তাই-দেবে?

বুলা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, তুই কী চাস বল?

বাপ্পা বললো, প্রমিস?

বুলা বললেন, হ্যাঁ, তুই যা চাস!

বাপ্প এবারে সগর্বে বললো, আই ওয়ান্ট টু গো টু ইউ কে, ফর ফারদার স্টাডিজ!

সত্যেন বললেন, আরে ওসব কথা পরে হবে! বাপ্পা, আগে সব জিনিসপত্র নামাবার ব্যবস্থা কর।

তারপর বুলার দিকে তাকিয়ে পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, একে বোধ হয় তুমি চেনো না। বিভার খুড়তুতো বোন নিরু, ওকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। নিরু, ইনি আমার বৌদি, প্রণাম করো!

মেয়েটি বিধবা, বয়েস চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়, গায়ের রং মাজা, চোখ মুখে শহরের পারিশ পড়েনি। বিভার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। বুলা তাকে নিয়ে এলেন ভেতরে।

সত্যেন এলেই বাড়ি সরগরম হয়ে যায়। সত্যেন হাঁক-ডাক দিয়ে লোক খাটাতে ভালোবাসেন। বাউন্ডারি ওয়াল কোথায় একটু ভেঙেছে, বাগান কোথায় আগাছা জন্মেছে কোন গাছের যত্ন নেওয়া হয়নি এই সব তিনি তদন্ত করতে লাগলেন আর গোমস্তা, মালি, দারোয়ানরা তটস্থ হয়ে ঘুরতে লাগলো তাঁর পেছনে পেছনে।

নিরুর জন্য একটা ঘর ঠিক করে দিয়ে বাপ্পাকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন বুলা। তারপর বললেন, এই গরমের মধ্যে কোটটাই কী করে পরে আছিস রে, বাপ্পা? খুলে ফেল!

বাপ্পার মুখে বিনবিনে ঘাম ফুটে উঠেছে, তবু সে কোট খুললো না। কায়দা করে হাতটা ঘুরিয়ে একবার ঘড়ি দেখলো, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের গিঁটে হাত দিয়ে বললো, এই স্যুটটা মহম্মদ আলির দোকান থেকে করালুম, তোমার পছন্দ হয়েছে মা?

ছেলের চেহারায় অবিকল তাঁর স্বামীর আদল। বাপ্পা হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেছে। স্যুট কলালুম' এরকম বড়রাই বলে। গত এক বছর হোস্টেলে থেকে করলুম, তোমার পছন্দ হয়েছে, মা?

ছেলের চেহারায় অবিকল তাঁর স্বামীর আদল। বাপ্পা হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেছে। স্যুট করালুম' এরকম বড়রাই বলে। গত এক বছর হোস্টেলে থেকে তার ব্যবহার বদলে গেছে অনেকটা, অনেক উন্নতিও হয়েছে, না হলে পরীক্ষায় ভালো ফল করলো কী করে?

-হ্যাঁরে, বাপ্পা, তোর কবে রেজাল্ট বেরুলো? আমাকে টেলিগ্রাম করিস নি কেন?

-রেজাল্ট তো বেরিয়েছে পর্শু। কাকামণি বললেন, এখানে আসবেন, তাই আমিও চলে এলুম।

-কোটটা অন্তত খোল বাপ্পা, তোকে দেখে আমারই গরম লাগছে।

-মা, তুমি সত্যি বিলেত যাবি নাকি? যাঃ! তুই যে বলেছিলি খড়গপুরে পড়বি?

-ম্যানচেস্টারে পড়বো। মা, আই রোট আ লেটার টু ড্যাড। অ্যান্ড হি রিপ্লায়েড। তুমি দেখবে চিঠিখানা?

বুলা স্থিরভাবে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাপ্পা তার কোটের অন্দর-পকেট থেকে সাবধানে বার করলো একটি খাম। তার মধ্যে পাতলা কাগজে টাইপ করা চিঠি। প্রবাসী পিতা তাঁর পিতা পুত্রকে চিঠি লিখেছেন ইংরেজীতে।

বুলা চিঠিখানা হাতে নিয়ে চলে এলেন জানলার ধারে। শুধু আলোর জন্যই নয়, ছেলের কাছ থেকে তিনি মুখটা আড়াল করতে চান। বাপ্পার চিঠির উত্তরে নরেন জানিয়েছেন যে বাপ্পার বিলেতে আসার ব্যাপারে তাঁর কোনো আপত্তি নেই, তিনি কলেজে ভর্তি করে দেবার ব্যবস্থা করবেন। কলেজে যাবার আগে সে কিছুদিন বাবার কাছেই থাকতে পারে। বিলেতে আসার প্রস্তুতি হিসেবে কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, হাতঘড়ি পরা অভ্যেস করতে হবে। বিলেতে সব কাজ চলে ঘড়ির কাঁটায়। প্রত্যেকটা মিনিটের দাম আছে সেখানে। ঘুম কমাতে হবে। দিনের বেলা ঘুমোনো ভারতীয়দের বিচ্ছিরি অভ্যেস, এখানে তা একেবারেই চলবে না। চটিপরা চলবে না, সব সময় মোজা ও ফিতে লাগানো জুতো পরতে হবে...

চিঠিটা দু' পৃষ্ঠার। তার মধ্যে নরেন বিষয় সম্পত্তির কথাও কিছু লিখেছেন। সত্যেনের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা আনাতে হবে কোন্ কোন্ খাতে, তারও উল্লেখ আছে। রয়েছে বিভিন্ন জাহাজ কম্পানির নাম, তার মধ্যে ইটালিয়ান লাইনারের খাবার-দাবার ভালো ইত্যাদি।

একবারও বুলার নামের উল্লেখ নেই কোথাও।

কিন্তু বুলার চোখে জল এলো না, হাত কাঁপলো না, শুধু ছেলের কথাই তাঁর মন জুড়ে রইলো। বাপ্পা চলে যাবে। কলকাতায় টালিগঞ্জের বাড়িতে বিভার সঙ্গে মানিয়ে থাকতে পারছিলেন না বলে বুলা দেওঘরের বাড়িটাতে এসে রয়েছেন। এখানে তাঁর ভালোই লাগে, কখনো খুব একা-একা বোধ হয়নি, কিন্তু এখন যেন বুকটা ভীষণ খালি খালি লাগতে লাগলো।

বাপ্পা বললো, প্যাসেজ মানি কাকামণি দিয়ে দেবে বলেছে। কস্টিশান্ হলো তোমার কনসেন্ট। তুমি তো কনসেন্ট দিয়েই দিয়েছো।

বুলা নিঃশব্দে ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। একটা মাত্র ছেলে, সেও যেন তাঁর আপন নয়।

বাপ্পা প্যান্ট-কোট বা জুতো-মোজা কিছুই ছাড়লো না, চলে গেল নিচে। বুলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন একই জায়গায়।

নরেনের চিঠিখানা টেবিল থেকে উড়ে গিয়ে পড়লো মেঝেতে। বুলা তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। স্বামীর সম্পর্কে তাঁর রাগ বা দুঃখ কিছুই হলো না। নরেন যে চিঠিতে একবারও বুলার নাম উল্লেখ করেননি, তাতে বোঝা যায় লোকটির এখনো কিছুটা চক্ষুলজ্জা আছে। বাপ্পা বিলেত যাবেই, সেই বিদেশ-বিভুঁইতে ছেলেটা একা গিয়ে পড়বে না, তার বাবা তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন, তাতে তো বুলার খুশী হবার কথা।

এক সময় বুলার মনে পড়লো, বাড়িতে একটি নতুন মেয়ে এসেছে, তার দেখাশুনো করা উচিত।

নিরুকে দেখেই বুলার একটু খটকা লেগেছিল। মেয়েটির চোখ মুখে, পোশাকে, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু আছে, যাতে বোঝা যায় সে এই পরিমণ্ডলের বাইরের মানুষ। সত্যেনের স্ত্রী বিভাবতী বেশ ধনী পরিবার থেকে এসেছে, তার কোনো খুড়তুতো বোন এরকম হওয়া যেন মানায় না। হয়তো আপন নয়, দূর সম্পর্কের, কিন্তু সেরকম কোনো বোনকে সত্যেনের সঙ্গে দেওঘরে পাঠানোও তো অস্বাভাবিক।

মেয়েটি বিধবা। নারায়ণগঞ্জের সাম্প্রতিক দাঙ্গায় তাদের ঘর পুড়েছে, এক ভাসুরের সঙ্গে এসে উঠেছিল খড়দায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে, তাদের অবস্থা মোটেই ভালো নয়, সেখান থেকে বিভাতীকে একখানা চিঠি লেখা হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জের লোকের কোনো বিপদের কথা শুনলেই সত্যেন উদারভাবে সাহায্য করেন। নিরুর ভাসুরকে তিনি পাটকেল একটি চাকরি করে দিয়েছেন, নিরুকে এনে রেখেছেন নিজেদের বাড়িতে। বিভাবতীই সত্যেনের পরিচর্যার জন্য তাকে পাঠিয়েছেন এখানে।

মেয়েটির প্রতি মমতা হলো বুলার। নদীর ধারের পলিমাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ পড়বার আগে যে একরকম মসৃণতা থাকে, ওর মুখে সেইরকম ভাব। চোখ দুটিতে ভয়মাখানো সারল্য। দেশে ওদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, খড়দায় যে কয়েক মাস ছিল, খুবই লাঞ্ছনার মধ্যে কেটেছে, তারপর এক ধনী পরিবারে আশ্রয় পেয়ে অনেকটা ভ্যাবচ্যাকা হয়ে গেছে। কেউ একটু ভালো ব্যবহার করলেই ধন্য বোধ করে!

মানুষকে তার নিজের পরিবেশ থেকে উপড়ে নিয়ে এলে তার জীবনটা মলিন হয়ে যায়। হরিয়ে ফেলে স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল ভাব। নারায়ণগঞ্জের সামান্য বাড়ির উঠোনেও এই মেয়েটি নিশ্চয়ই ছুটে ছুটে বেড়াতো, এর বয়েস তো বেশি নয়, কিন্তু এখানে মেয়েটি প্রথম থেকেই জড়োসড়ো হয়ে আছে, মুখখানি আড়ষ্ট, বুলোকে সে যেন খানিকটা সন্দেহের চোখে দেখছে।

দোতালায় একটি মাত্র স্নানের ঘর, বুলা নিজে সেটা ব্যবহার করেন, নিরুকে তিনি সেখানেই স্নান করে নিতে বললেন। তাকে দিলেন নিজের একটি শাড়ী ও সাবান। তারপর তাকে তাকে সারা বাড়ি ঘুরিয়ে ওপরের ছাদে এনে দেখালেন দূরের ডিগরিয়া পাহাড়। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আগে পাহাড় দেখেছো?

নিরু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, না।

বুলা বললেন, এই জায়গাটা খুব সুন্দর। তুমি আর কলকাতায় গিয়ে কী করবে এখানেই থাকো!

পাহাড় সম্পর্কে নিরুর খুব একটা আগ্রহ দেখা গেল না। সে জিজ্ঞেস করবে, এই বাড়িখানা বুঝি আপনার? এত বড় দালানকোঠা, আর কোনো মানুষ থাকে না?

বুলা বললেন, বাড়িখানা তোমার জামাইবাবুর। তবে বেশির ভাগ সময় আমি একাই এখানে থাকি।

এই সময় নিচ থেকে সত্যেন ডাকলেন, নিরু, নিরু!

ওরা দু'জনে নেমে এলো নিচে। সত্যেন একতলায় উঠোনে একটা জলচৌকি পেতে বসেছেন, খালি গা, ধুতিটা উরু পর্যন্ত তোলা। এখানে এলে সত্যেন উঠোনে বসে তোলা জলে স্নান করেন। বাড়ির কোনো চাকর প্রথমে তেল মাখিয়ে তারপর জল ঢেলে দেয়। কলকাতায় এসব চলে না। কলকাতায় থাকার সময় সত্যেন অতি ছিমছাম ভদ্রলোক, কিন্তু দেওঘরে এসে তিনি প্রাক্তন নারায়ণগঞ্জের বাড়ির প্রথা চালাতে চান।

আজ সত্যেন উদারভাবে বললেন, নিরু, আমায় গায়ে তেল মাখিয়ে দাও তো!

পুরুষদের স্নানের দৃশ্য বুলার পছন্দ হয় না, তিনি উপরে উঠে যাচ্ছিলেন, সত্যেন বললেন, বড়গিন্নি, দাঁড়াও না, তোমার সঙ্গে তো ভালো করে কথাই হলো না!

বুলা বললেন, না, যাই, দেখি বাপ্পাটা চান করলো কিনা। ও তো সহজে চান করতেই চায় না!

দোতলায় এসে বলা দেখলেন, বারান্দায় একটা আয়না টানিয়ে বাপ্পা একটা শেভিংসেট খুলে দাড়ি কামাতে শুরু করেছে। গায়ের কোটটা খুলেছে অবশ্য, কিন্তু জুতো-মোজা এখনো ছাড়েনি।

হঠাৎ বুলার হাসি পেল। বাপ্পাকে তিনি আগে কখনো দাড়ি কামাতে দেখেননি। কবে ওর দাড়ি হলো? বছর চারেক আগেও তিনি বাপ্পাকে জোর করে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে দিয়েছেন। সাবান মাখতে ওর খুব আপত্তি, বুলা ওর মুখে সাবান দিলেই চেঁচিয়ে উঠতো, চোখ জ্বালা করছে, চোখ জ্বালা করছে। মা, ছেড়ে দাও!

সেই ছেলে এখন দাড়ি কামাচ্ছে নিজে নিজে। পাশ থেকে ওকে অবিকল নরেনের মতন দেখায়।

বুলা জিজ্ঞেস করলেন, তুই কবে থেকে শুরু করলি রে, বাপ্পা? কে তোকে শেখালো?

বাপ্পা মুখ ফিরিয়ে বললো, তুই কবে থেকে শুরু করলি রে, বাপ্পা? কে তোকে ওরকম খালিগায়ে চান করে কেন?

-তোদের বিলেতের লোকেরা বুঝি জামা-কাপড় পরে চান করে?

-আই মিন, হোয়াট ডাজনট হি ইউজ দা বাথরুম!

-তুই বুঝি আমার সঙ্গেও ইংরেজি বলা প্র্যাকটিস করছিস?

-মা, তুমি ম্যাট্রিকুলেশনে পাশ করেছিলে, তোমার ইংরেজি বোঝা উচিত।

-সে কবেকার কথা, এখন কি আর মনে আছে? তাছাড়া, বুঝি বা না বুঝি, বাবা-মায়ের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে নেই।

-বাবা, আমার কি বাংলা বুঝতে পারে?

-বিলেতে গিয়ে তুই-ও বুঝি বাংলা ভুলে যাবি? আমাকেও ভুলে যাবি?

-ড্যাট! পড়াশুনো শেষ করার পর হোয়েন আই উইল গেট আ জব, তখন আমি তোমাকেও নিয়ে যাবো ইংল্যান্ডে।

একটা তোয়ালে নিয়ে বাপ্পার মুখটা মুছে দিতে দিতে বুলা বললেন, আমি মরতে ও দেশে গেছি আর কি! লেখাপড়া শেষ হলেই তুমি ফিরে আসবি এ দেশে। সেই কথা না দিলে আমি তোকে যেতেই দেবো না!

বাপ্পা দৃঢ়ভাবে বললো, অফ কোর্স আমি ফিরে আসবো। তুমি কি ভেবেছো, আমি ও-দেশে সেটল করবো? কক্ষনো না!

-এই তো লক্ষী ছেলে, চল বাপ্পা, এইবার চান করে নিবি!

সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পা তিন-চার বছর আগেকার কিশোর হয়ে গিয়ে কাকুতিভরা গলায় বললো, মা, প্লীজ, আজ চান করবো না। আজ ছেড়ে দাও!

-ও কি, এতখানি রেলের রাস্তা এলি, চান করবি না? তোর গায়ের গন্ধে যে ভূত পালাবে?

-এখন না, তা হলে বিকেলবেলা।

আগেকার দিনের মতন বুলা ছেলেকে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বাথরুমে।

দুপুরবেলা খাওয়া -দাওয়ার পর বুলা জোর করে টানতে নিয়ে গেলেন বাথরুমে।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বুলা একটুখানি শুয়েছেন, বাপ্পা গেছে কোথায় টো-টো করে ঘুরতে, নিরু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ম্লান গলায় বললো, একটা পান!

বুলা বললেন, তুমি পান খাবে? সাজতে জানো তো? ঐ যে মীটসেফের মধ্যে পানের বাটা আছে, তুমি সেজে নাও।

-মীটসেফ।

-সেটা কী?

এই তারের জাল ও কাঠের তৈরি জিনিসগুলি অতি সাধারণ, প্রত্যেক বাড়িতেই থাকে, নিরু সেটাও চেনে না! বুলা উঠে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ ছোট আলমারির মতন দেখছো, ওটা খোলো, নিজে সেজে নাও।

নিরু বললো, আমার জন্য নয়, উনি পান চেয়েছেন!

বুলার এবার মনে পড়লো যে খাওয়ার পর সত্যেনকে একটি পান সেজে দেওয়া তাঁর নিজের দায়িত্বের মধ্যেই ছিল। সত্যেন কলকাতা থেকে আসবার সময় প্রত্যেকবার ভালো পান দিয়ে আসেন

বুলা নিজের হাতে পান সেজে দেন।

এবারে বুলা সেটা ভুলে গেছেন। সত্যেনর ঐভাবে খালি গায়ে উঠোনে বসে নিরুকে দিয়ে তেল মাখানোর ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হয়নি। সত্যেন আগে এরকম ছিলেন না, দিন দিন তাঁর স্বভাবে কিছু কিছু কর্কশ দিক ফুটে বেরুচ্ছে।

নিরুর হাতের সাজা পান হয়তো সত্যেনের মনোমতন হবে না, তাই বুলা নিজেই খাট থেকে নেমে এসে দুটি পান সেজে দিলেন।

একটু পরেই নিরু ফিরে এসে বললেন, উনি আমার হাতের পান খাবেন না। আপনেরে দিতে বললেন।

বুলা আবার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। হাতে করে পান পাঠানোটা ঠিক হয়নি। কাঁসার রেকাবিতে সাজিয়ে, সঙ্গে কিছু মশলা, চুন আর বোঁটা দিয়ে পরিপাটি করে দেওয়া উচিত ছিল।

বুলা এবারে সেরকমভাবেই সাজিয়ে বললেন, এবার নিয়ে যাও!

নিরু ম্লানভাবে বললেন, আপনাদের যেতে বলছেন। রাগ করতেছেন আমার ওপর।

বুলা একটু বিরক্ত হলেন। সত্যেনের কোনোরকম বিসদৃশ অভিপ্রায় মানতে তিনি বাধ্য নন, এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন অনেকবার। পান পাঠাবার যখন লোক আছে, তখন বুলাকে যেতে হবে কেন?

কিন্তু নিরুর সামনে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, চলো!

সত্যেন তাঁর নিজের ঘরের খাটে তাকিয়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বুলাকে নিজের দেখে একগাল হেসে বললেন, ভাত খাওয়ার পর তোমার হাতের সাজা পান পাইনি, তাই সিগারেটও স্বাদ পাচ্ছি না। এসো বড়গিন্নি, একটুখানি বসো এখানে!

এই বড়গিন্নি ডাকটাও স্বাদ পাচ্ছি না! এসো বড়গিন্নি, একটু বসো এখানে!

এই বড়গিন্নি ডাকটাও বুলার কাছে অরুচিকর লাগে, কিন্তু সত্যেন কিছুতেই তাঁকে বৌদি বলবেন না। বুলার নাম ধরে ডাকলেও বুলার আপত্তি ছিল না।

বুলা বললেন, এখন বসবো না। ট্রেন জার্নি করে এসেছেন, ঘুমিয়ে নিন, বিকেলবেলা কথা হবে।

-বসো না। আমার ঘুম পায়নি। বাপ্পার সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে না?

নিরু দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠের ওপারে, সত্যেন তার দিকে ভুরুর ইসারা করে বললেন, তুমি এখন যাও!

নিরু চলে যাবার পর সত্যেন সকৌতুকে মুখ ভঙ্গি করে বললেন, স্পাই! বুঝলে বড়গিন্নি, বিভা ওকে স্পাই হিসেবে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছে।

বুলা ভুরু কুঁচকে বললেন, ছিঃ, বিভা তোমাকে সন্দেহ করে। আমি এখানে এলেই বিভা মনে করে আমি তোমার সঙ্গে ইয়ে করতে আসছি!

অকারণে হা-হা করে হেসে উঠলেন সত্যেন।

সত্যেনের কথাটা হয়তো একবারে মিথ্যে নয়। বুলা সম্পর্কে বিভার বিদ্বেষ দিন দিন বাড়ছে। তার স্পষ্ট কোনো কারণ নেই। বুলা অনেক চেষ্টা করছেন বিভার মন পাবার কিছু কাজ হয়নি। বিভার চোখের আড়ালে থাকবার জন্যই তো বুলা চলে এসেছেন এখানে।

হাসি থামিয়ে সত্যেন বললেন, হায় রে, তুমি যে আমাকে পাত্তাই দাও না, তা বিভা কিছুতেই বুঝবে না। তোমায় আমি কত তোয়ামর্করি, তবু তোমার মন পাই না।

বুলা বললেন, আমার বোধ হয় মন বলে কিছু নেই।

-আছে, আছে, বড়গিন্নি, আমি সব টের পাই। তোমার মন বাঁধা আছে অন্য জায়গায়। আমি যখন এখানে থাকি না, তখন প্রতাপ মজুমদার নামে সেই লোকটা প্রায়ই দেখা করতে আসে তোমার কাছে।

-তার মানে?

-আমি কীরকম খবর রাখি বলো?

হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলো ক্রোধ। সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল তার শিখা। এমন রাগ বুলার বহু দিন হয়নি। বুলা মুখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে যেন কিছু খুঁজতে লাগলেন। কোনো ভারি জিনিস দিয়ে তিনি যেন সত্যেনের মুখে আঘাত করে চিরকালে রমতন তার বাকশক্তি শেষ করে দিতে চান।

সত্যেনের অনুপস্থিতিতে প্রতাপদা একবারই মাত্র এসছিলেন এ বাড়িতে, মাস তিনেক আগে, বিশ্বনাথ গুহর সঙ্গে। বিশেষ কিছুই কথা হয়নি। প্রতাপদা সম্পর্কে অনেক কিছু কথা জমে আছে তাঁর বুকের মধ্যে, কিন্তু দেখা হলেই কীরকম যেন জিভ আটকে যায়। কিছুতেই কিছু বলা হয় না।

প্রতাপদাও চুপ করে থাকেন। সেদিন এসে বিশ্বনাথ গুহই বকবক করেছেন প্রতাপদা বসেছিলেন শুকনো মুখে। প্রতাপদার শরীর খারাপ কি না সে কথা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে পারেননি বুলা। সারা জীবনে হয়তো কোনোদিনই আর প্রতাপদার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যাবে না।

সেই প্রতাপদা সম্পর্কে এরকম অপবাদ?

বুলা তাঁর ক্রোধের দাহ শুধু নিজের শরীরেই রেখে বললেন, ছিঃ!

বুলা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সত্যেন বলে উঠলেন, আচ্ছা, পরে আবার কথা হবে। তুমি একটু নিরুকে পাঠিয়ে দাও তো, বড়গিন্নি। গা-হাত-পায় বড় ব্যথা হয়েছে, নিরু একটু টিপে দেবে!

॥ ৪১॥

পাতিপুকুরের বাড়ির ভিত তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে, রোজ সকালে চন্দ্রার সেখানে যাওয়া চাই। যদিও তার করার কিছুই নেই। যোগেন দত্তর চেনা কন্ট্রাক্টর বাড়ি তৈরির ভার নিয়েছে, সেই লোকটিই জোগাড়ে মিস্তিরিদের খাটাচ্ছে, তবু চন্দ্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটি কাটা দেখতে দারুণ উত্তেজনা বোধ করে। বাড়ি নয়, যেন ওখানে তার স্বপ্ন তৈরি হচ্ছে।

জলা জমিটার জল সেঁচে ফেলা হয়েছে, মাটি কেটে দুরমুশের কাজ চলছে। চন্দ্রা অতি উৎসাহে নিজেই একবার মাটি কাটার সময় হাত লাগাতে গিয়েছিল। কন্ট্রাকক্টর বাবুটি তাকে বাধা দিয়ে বলেছে, অমন করবেন না, ওতে কাজের চেয়ে অকাশ বেশি হবে। এখানে ভিড় জমে যাবে, আমার মিস্তিরিরা হাসবে।

চন্দ্রা ঐ লোকটির যুক্তি ঠিক ধরতে পারেনি, কিন্তু নিরস্ত হয়েছে। কন্ট্রাকক্টরবাবুটি নিজে ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। চন্দ্রা দাঁড়িয়ে থাকে রোদে। দু'জনে মিলে মাটি সরাবার কাজে খানিকটা সাহায্য করলে তো কাজ তাড়াতাড়ি হতে পারে।

যেদিন প্রথম ইঁটের গাঁথনির কাজ শুরু হলো সেদিন চন্দ্রা দ্বারিক ঘোষের মিষ্টির দোকান থেকে মস্ত বড় এক হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে নিয়ে এলো মিস্তিরি মজুরদের জন্য। সেদিন কন্ট্রাক্টর সুখেন দাস চটে গেল রীতিমতন। চন্দ্রাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেশ ধমকের সুরে বললো, আপনি আমার লোকজনের কাজ নষ্ট করে দিচ্ছেন। আপনার রোজ রোজ আসবার দরকারটাই বা কী?

কারুর বকুনি শুনে সহজে মেনে নেবার পাত্রী নয় চন্দ্রা। সে বললো, আমার বাড়ি তৈরি হচ্ছে, আমি আসবো না মানে? কীরকম কাজ হচ্ছে, তা দেখবো না?

সুখেন দাস বললো, কী দেখবেন? আপনি এ কাজ কিছু বোঝেন? পাঁচ ইঞ্চি আর দশ ইঞ্চি দেওয়ালের তফাৎ ধরতে পারবেন! তাও একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় দেখুন, কিন্তু মিস্তিরিদের সঙ্গে কথা বলা, তাদের রসগোল্লা খাওয়ানো, এসব কী?

লোকটির ব্যবহারে উত্তরোত্তর বিস্মিত হয়ে চন্দ্রা বললো, কেন, একদিন ওদের মিষ্টি খাওয়ালে দোষের কী আছে?

সুখেনদাস বললো, এর পর অন্য যেখানে কাজ করতে যাবো, প্রথম যেদিন সিমেন্ট মেশাবে সেদিনই ওরা মিষ্টি খেতে চাইবে। তখন আপনি খাওয়াবেন? তাছাড়া, আপনার বুঝবেন না, ওরা ছাতুখাওয়া মানুষ, একদিন আপনি রসগোল্লা খাওয়ালে সারাদিন ধরে সেই গন্ধ শুঁকবে। এরকম করলে কাজ ঢিলে হবে বলে দিচ্ছি।

চন্দ্রার সঙ্গে রতন নামে তাদের সমিতির আর একটি ছেলেও এসেছে সেদিন। রতন বললো, উনি ঠিকই বলছেন চন্দ্রাদি, মিস্তিরিদের লাই দিলেই ফাঁকি মারে। ওদের সব সময় টাইটের ওপর রাখতে হয়।

রতনের হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি। তার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে মিষ্টিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। বাড়ি তৈরির কাজে দেরি হয়ে যাবে শুনেই চন্দ্রা একটু দমে গেছে। সে অসহায় ভাবে বললো, ওদের নাম করে এনেছি, এখন না দেওয়াটা....

সুখেনস দাস বললো, ঠিক আছে, এনেছেন যখন, দিয়ে দিন আজকের মতন। ওরাও দেখে ফেলেছে। কিন্তু এমনটি আর করবেন না। আপনার এদিক পানে এখন আর আসবার দরকার নেই, আমার বড্ড ডিসটার্ব হচ্ছে। সামনের মাসে ছাদ ঢালাইয়ের পর না হয় দেখতে আসবেন!

কৈশোরে আসার পর চন্দ্রা প্রায় এরকম কোনো পুরুষমানুষকে দেখেইনি, যে তার সঙ্গ পছন্দ করে না। এই লোকটা তাকে আসতে বারণ করছে? মাল-মশলা কিছু ভেজাল দিয়ে টাকা মারার মতলব আছে নাকি? অবশ্য টাকা দিচ্ছে যোগেন দত্ত, সে অতি ঝানু লোক, সে ঠিক বুঝে নেবে। এই কন্ট্রাক্টরকে যোগেন দত্তই তো নিয়োগ করেছে। এরা এখানে কিছু এদিক-ওদিক করলেও চন্দ্রা তা

ধরতে পারবে না। কাজ যে চলছে, সেটা দেখতেই তার ভালো লাগে, সেই জন্যই এখানে আসা।

সুখেন দাসের গোলগাল, নিরীহ চেহারা। এই ক'দিনের মধ্যে একবারও সে সরাসরি তো দূরে থাক চোরাচোখেও চন্দ্রার রূপ লাবণ্য দেখার চেষ্টা করেনি। চন্দ্রার সঙ্গে সে কথা বলে চাঁছাছোলা ভাষায়। সামান্য একটু গদগদ ভাবও কখনো ফুটে ওঠেনি। এরকম মানুষও তা হলে আছে? সুখেন দাস সম্পর্কে চন্দ্রা বেশ কৌতূহল বোধ করে। এই কাজটা হয়ে যাক, তারপর চন্দ্রা একদিন সুখেন দাসের বাড়ি যাবে।

মিষ্টি সুখেন দাসের হাত দিয়েই বিলি করা হলো। সে নিজে একটাও খেল না, চন্দ্রা ও রতনের অনেক অনুরোধও না। তার ডায়াবেটিস নেই, মিষ্টি খাওয়াতে কোনো আপত্তি নেই, শুধু রসগোল্লাটাই সে গত বছর পুরীতে জগন্নাথের কাছে উৎসর্গ করে এসেছে।

চন্দ্রার বিস্ময়ের আর কোনো সীমা থাকে না। পুরীতে সে যায়নি কখনো। শুনেছে যে সেখানকার মন্দিরের জগন্নাথ মূর্তিটি কাঠের তৈরি, তার দুটো হাতই নেই। ইট-লোহা-সিমেন্ট নিয়ে যার কারবার, সেইরকম একটি মানুষ ঐ হস্তহীন দারুমূর্তির কাছে সারা জীবনের মতন রসগোল্লা উৎসর্গ করে আসে কিসের তাগিদে? মানুষ কত বিচিত্র! মাত্র পনেরো টাকা দিয়ে এক হাঁড়ি রসগোল্লা উৎসর্গ করে আসে কিসের তাগিদে? মানুষ কত বিচিত্র! মাত্র পনেরো টাকা দিয়ে এক হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে কত কী জানা যায়। যারা ছাত্র খায়, তাদের একদিন রসগোল্লা খাওয়ালে কাজের ক্ষতি হয়!

রতনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চন্দ্রা চলে এলো বাস রাস্তায়। এই যশোর রোডের দু'ধারে এক সময় ধনীদের বাগানবাড়ি ছিল। নিশ্চয়ই রাস্তাটাও সুন্দর ছিল এক সময়। এখন সবদিকে নোংরা ভাব। রাস্তার পাশের নালা থেকে পাঁক তুলে রাস্তার ওপরেই রাখা হয়েছে, কোনো গাড়ি এসে ঐ পাঁক পরিষ্কার করে নিয়ে যাবে না, বৃষ্টির জলে ধুয়ে আবার নালাতেই জমা হবে। সেই দুর্গন্ধ পাঁকের পাশেই বসে একজন লোক বিক্রি করছে তেলেভাজা বেগুনি-ফুলুরি। ভন ভন করে উড়ছে নীল ডুমো ডুমো মাছি।

কলকাতার মানুষদের এখন এই দৃশ্য গা-সহা। চন্দ্রা বহুদিন প্রবাসে কাটিয়েছে বলে এই নোংরামি দেখতে এখনো পর্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তার কষ্ট হয়।

জীবনের প্রথম সাতাশটি বছর চন্দ্রা অন্যান্য অনেক মেয়ের মতনই ছিল আত্মকেন্দ্রিক। নিজের লেখাপড়া, রূপচর্চা, পুরুষের স্তুতি, খেলা, গান-বাজনা এইসব নিয়েই কাটিয়েছে। নিজের পারিবারিক গণ্ডি ও চেনাশুনো মানুষদের ছোট্ট জগৎটিতে সে ছিল সুখী। বিয়ের পর প্রথম দুটি বছর যেন কেটে গেছে চোখের এক নিমেষে। তৃতীয় বছরটি হঠাৎ অহেতুক লম্বা হয়ে যায়। চন্দ্রার জীবনে এতদিন পর্যন্ত কোনো কাঁটা বা কাঁকর ছিল না, তাই সে বাইরের জগৎটার দিকেও তেমন ভাবে চায়নি। তার বিয়ের চতুর্থ বছরটা আর কোনোক্রমেই কাটতে চাইলো না, তার আগেই সে বেরিয়ে এলো।

হয়তো নিজের জীবনের অসংশোধনীয় কোনো ব্যথাকে চাপা দেবার জন্যই চন্দ্রা অন্যদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য এত মেতে উঠেছে। কিন্তু তার সব কিছুই অন্যদের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের জীবনে কোনোরকম নাটকীয়তা পছন্দ করে না। চোখের সামনে বড়র কম অন্যায় ঘটতে দেখলেও তারা পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। নিজের স্বার্থে সরাসরি আঘাত না লাগলে কেউ মুখ খুলতে চায় না। সেইজন্যই চন্দ্রার অনেক ব্যবহার তাদের দৃষ্টিকটু লাগে। রাস্তার কোনো নগ্ন পাগলিনীকে দেখে চন্দ্রা যখন চলন্ত গাড়ি থামিয়ে, পাশের দোকান থেকে একটা শাড়ি কিনে সেই পাগলিনীকে দিতে যায়, তখন তার সঙ্গীদের মনে হয়, এটা যেন সিনেমা ব্যাপার, যেন চন্দ্রার দ্যাখানেপনা। কেউ কেউ বলেছে, ওকে ঐ কাপড়টা দিয়ে কী লাভ হলো? একটু বাদেই তো আর একজন কেউ কেড়ে নেবে!

অন্যদের যুক্তি চন্দ্রা ঠিক বুঝতে পারে না, সে অনেকখানিই ইম্‌পালসিভ। চোখের সামনে একটা কিছু দেখলেই সেই মুহূর্তেই তার একটা কিছু করা চাই। চন্দ্রার বাবা চন্দ্রার সব ব্যাপারেই প্রশ্রয় দেন; তিনিও দু-একটি ব্যাপারের পর চন্দ্রাকে বলেছেন, একটু দেখে শুনে চলিস, দু দিনেই তো সব মানুষের মন পাল্টে দেওয়া যায় না। হুট করে সমাজটাকেও বদলে দেওয়া যায় না।

অন্যদের মতামত চন্দ্রা বিশেষ গ্রাহ্য না করলেও সে তার বাবাকে মানে। বাবার কথা শুনেই সে আজকাল একটু থমকে যায়। নইলে, তার স্বপ্নের প্রমিলা আশ্রমের যে বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেজন্য সে নিজে মাটি কাটা থেকে সবরকম শ্রমদান করবে ঠিক করেছিল, ঐ কন্ট্রাক্টর সুখেন দাসের কথায় কি সে নিবৃত্ত হতো? কিন্তু সে নিজে মাটি কাটা শুরু করলে নাকি সেখানে রাস্তায় লোকের ভিড় জমে যাবে, তাতে কাজের ক্ষতি হবে, এই যুক্তি শুনেই সে থমকে গেছে। আজকে মজুরদের রসগোল্লা

খাওয়ানোর ব্যাপারেও আপত্তি ওঠায় সে বেশ দুঃখ পেয়েছে মনে। লোকগুলো অত খাটছে, ওদের একটু উৎসাহ দেবার দরকার নেই?

দুর্গন্ধ পাঁকের পাশে বসে যে লোকটি তোলা উনুনে কড়াই চাপিয়ে বেগুনি ফুলুরি ভাজছে তার দিকে একটুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রা। তারপর সে রতনকে কাতরভাবে বললো, আচ্ছা, ঐ লোকটা কি একটু দূরে সরে বসতে পারে না?

রতন ঐ লোকটিকে লক্ষই করেনি; সে বাসের জন্য তাকিয়েছিল। সে বললো, কোন লোকটা?

চন্দ্রা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললো, ঐ লোকটাকে যদি আমি গিয়ে তুমি অন্তত এই ফুটপাথে এসে বসো, সেটা কি...থাক, আমার বলার দরকার নেই; রতন, তুমি গিয়ে বলো!

রতন এরকম অনুরোধ কখনো শোনেনি। রাস্তার ফেরিওয়ালা হকাররা পুলিসদেরই গ্রাহ্য করে না, সাধারণ মানুষের কথা শুনবে কেন? শ্যামবাজার বাজারের কাছে অত ব্যস্ত রাস্তায় খুচরো সবজিওয়ালারা বাজার ছেড়ে, ফুটপাথ ছাপিয়ে, রাস্তার অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে, কেউ কিছু বলে না।

রতন চন্দ্রার কথাটা একটু বিবেচনা করে তারপর বললো, আপনি বা আমি বললেও ঐ লোকটা শুনবে না। কেন জানেন, চন্দ্রাদি? ঐ খানে বাস স্টপ তো, অনেক লোক এসে দাঁড়ায়, তা ছাড়া গলির মোড়, ওখানে খদ্দের বেশি পাবে।

চন্দ্রা কাতরভাবে বললো, কিন্তু নর্দমা থেকে মাছি উড়ে উড়ে বসছে ওর খাবারে...এটুকুও কেউ বোঝে না!

রতন হেসে বললো, সব সহ্য হয়ে গেছে, বুঝলেন! ঐ খাবার খেয়েও আমাদের দেশের লোক বেঁচে থাকে।

-বেঁচে থাকে, কিন্তু কী ভাবে বেঁচে থাকে? ঐ যে কটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে, ওদরে দ্যাখো। পেট মোটা, হাত পা সরু সরু...

একটা বাস এসে গেছে। রতন বললো, উঠে পড় ন, উঠে পড় ন!

এই রাস্তায় কয়েকটি প্রাইভেট বাস চলে। সব সময় ভিড়। মাঝপথে উঠলে বসবার জায়গা পাবার কোনো প্রশ্নই নেই। মেয়েদের জন্য দুটি আলাদা সিট থাকে গেটের কাছেই, মেয়েদের ওঠা-নামা সুবিধের জন্য। কিন্তু পুরুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে ওখানেই, ভেতরে জায়গা থাকলেও। একটি লোক খুব সূক্ষ্মভাবে এক পা ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে ওখানেই,. ভেতরে জায়গা থাকলেও। একটি লোক খুব সূক্ষ্মভাবে এক পা এক পা সরে এসে চন্দ্রার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তার মুখটা অন্যদিকে কিন্তু হাত দিয়ে সে চন্দ্রের শরীরে একটু একটু চাপ দিচ্ছে।

এসব তো চন্দ্রাকে প্রতিদিনই সহ্য করতে হয়। বাড়ির গাড়ির নিয়ে সে বিশেষ বেরোয় না, তার বাবার কাজে লাগে, চন্দ্রা বাসে-ট্রামে ঘোরা ফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন দু'জন লোক দু'দিক থেকে চেপে ধরে, একটু নড়াচড়াও করা যায় না, গোপন অঙ্গ ছুঁতে চায়!।

রতন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। চন্দ্রা পাশের লোকটিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা মাঝারি বয়েসী ভদ্রলোক। বেশ হৃষ্ট ধরনের মুখ, দেখলে মনে হয় বিবাহিত এবং সংসারী। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে লোকটি তার একটি হাত চন্দ্রার নিতম্বে রেখেছে।

চন্দ্রার ঠিক রাগ হচ্ছে না, বরং কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। আজকাল সব মানুষেরই ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে করে। এই লোকটি নিজের বাড়িতে কী রকম? স্ত্রীর সঙ্গে ভাব আছে না রোজ খিটিমিটি হয়? এই লোকটি কি অফিসে ঘুষ নেয়? নিজের ছেলেমেয়েদের আদর করে? অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে,. কিংবা সোনাগাছিতে যায়? এর বাড়িতে গিয়ে এর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে খুব সাধ হলো চন্দ্রার। কিংবা, এখন যদি লোকটাকে বলা যায় চলুন, আমরা একসঙ্গে নামি, কোনো পার্কে গিয়ে প্রেম করি, তাহলে সেটাকে কি খুব নাটকীয় মনে হবে?

লোকটি তার হাতটা একটু একটু করে এগিয়ে আনছে চন্দ্রার কোমরের দিকে। চন্দ্রা লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, একটু সরুন, এবারে আমাকে নামতে হবে। আপনিও নামবেন?

রমণীজাতির প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ভঙ্গিতে লোকটি তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বিনীতভাবে বললো, হ্যাঁ, এই তো, যান।

নেমে গিয়ে চন্দ্রা একটু অপেক্ষা করলো, সেই লোকটিও নামে কিনা দেখবার জন্য। লোকটি মুখ ঝুঁকিয়ে জানলা দিয়ে চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে আছে।

রতনের বাড়ি কাছেই, সে ডান দিকে বেকে যাবে। বিদায় নেবার আগে সে বললো, চন্দ্রাদি, আমাদের ফাণ্ডে যা টাকা আছে, তাতে বড়জোর ছাদ ঢালাই পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু তারপর জানলা-দরজা বসানো, প্লাস্টারিং এই সবের জন্য আরও তো অনেক লাগবে।

চন্দ্রা বললো, তা তো লাগবেই।

-অসমঞ্জদা বলছিলেন, আর একটা সিনেমার চ্যারিটি শো যদি অ্যারেঞ্জ করা যায়। চন্দ্রা বললো, আবার সিনেমা শো?

এই প্রমীলা আশ্রম তৈরির জন্য বহু জায়গা থেকে চাঁদা তোলা হয়েছে। শ্রী সিনেমা হলের মালিকের সঙ্গে অসমঞ্জ রায়ের ভাব আছে, তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ওখানে একটি চ্যারিটি শো-এর। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে চন্দ্রাকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। পুরোনো একটা বাংলা ফিলম, তার টিকিট বিক্রি হতে চায় না, চেনাশুনো লোকদের কাছে গিয়ে গছাতে হয়। কেউ কেউ চন্দ্রাকে বলেছে, সকালবেলা সিনেমা দেখতে যাওয়ার আমাদের সময় কোথায়? টিকিটের দাম কত বলো, আমরা এমনি দিয়ে দিচ্ছি। সে কথা শুনে চন্দ্রার অপমান লেগেছে।

সে বললো, না, আর সিনেমা নয়, একবারে অন্য কোনো উপায় ভাবতে হবে।

বাড়ি ফিরেই চন্দ্রার আবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

দোতলার বারান্দায় একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সুচরিত, তাতে একটা ঝুল ঝাড়ু। চন্দ্রার মা তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। বাড়িটা পুরোনো আমলের, সিলিং অনেক উঁচু, কাঠের কড়ি-বরগা। ওপরের দিকে কোণে কোণে মাকড়সার জাল জমেছে।

চন্দ্রা দপ করে জ্বলে উঠে বললো, মা, তুমি ছেলেটাকে দিয়ে এই সব কাজ করাচ্ছো? ও কি এ বাড়ির চাকর?

চন্দ্রার মা একটু থতোমতো খেয়ে বললেন, আমার অতদূরে হাত যায় না, তাই আমি ওকে ডেকে-

-কেন, এ বাড়িতে আর কাজের লোক নেই? ও পড়াশুনো ছেড়ে এই কাজ করবে?

-কতক্ষণই বা লাগবে? ও স্নান করতে যাচ্ছিল, তাই আমি বললুম। বাড়িটা কীরকম নোংরা হয়ে আছে।

-ওর দু'দিন বাদে পরীক্ষা... এই সুচরিত্র, নাম, তুই নাম ওখান থেকে! তুই খবরদার এসব কাজ করবি না! পরীক্ষায় যদি ভালো রেজাল্ট করতে না পারিস, তা হলে কী হবে মনে আছে তো?

দ্রুত পায়ে চন্দ্রা চলে এলো নিজের ঘরে। হ্যাণ্ড ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল খাটের ওপর, তারপর বাথরুমে বেসিনের কাছে গিয়ে জল দিতে লাগলো চোখে মুখে।

সেখান থেকে বাইরে এসে দেখলো মা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। চন্দ্রাকে দেখে তিনি দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

চন্দ্রার মা হিমানীর বয়েস ষাট পেরিয়ে গেলেও শরীরের বাঁধুনি ঠিক আছে। মাথার চুল পাকেনি খুব বেশি, অতিরিক্ত সিঁদুর ব্যবহারে সিঁথিটা চওড়া হয়ে গেছে অনেকানি। চন্দ্রার সঙ্গে তার মুখের মিল নেই, হিমানীর মুখখানি গোল ধরনের ও ভরাট।

অল্প বয়েস থেকেই চন্দ্রা তার বাবার বেশি আদরের, মায়ের পক্ষপাতিত্ব দাঁদাদের ওপর বেশি। ইদানীং মায়ের সঙ্গে তার প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। মায়ের ভাবভঙ্গি দেখে চন্দ্রা যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো।

মা খাটের ওপর বসে চন্দ্রার দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, সামনের মাসে শিবানীর বিয়ে, তুই শুনেছিস?

চন্দ্রা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছিল, তোয়ালেটা না সরিয়েই বললো, তাই নাকি? শুনিনি তো। তুমি কী করে জানলে?

হিমানী বললেন আমাকে চিঠি লিখেছে শিবানী। তোকেও লিখেছে তা মধ্যে। মুখ থেকে তোয়ালেটা সরা!

চন্দ্রা খুব স্বাভাবিত হবার চেষ্টা করে বললো, কাকে বিয়ে করছে শিবানী?

-সে কথা লেখেনি। শোন সোমনে মাসের বারো তারিখ, সেই সময় তুই আবার কোনো কাজ টাজ রাখিস না। আমরা সবাই এলাহাবাদ যাব ঠিক করেছি।

-কিন্তু এখন যে আমাদের প্রমীলা সমিতির বাড়ি উঠছে, এখন আমাকে এখানে না থাকলে তো চলবে না!

-বাড়ি উঠছে তো কী হয়েছে। তুই না থাকলে কি বাড়ি তৈরি বন্দ হয়ে যাবে?

-টাকা পয়সা জোগাড় করতে হচ্ছে।

-তা বলে শিবানীর বিয়েতে তুই যাবি না? বলছিস কি ছোটু? তুই না গেলে শিবানী...তোর কী হয়েছে বল তো? তুই ঘরের খেয়ে বনের ভাইস তাড়াবি আর বাড়িতে এসে অমাদের ওপর বকাবকি করবি?

চন্দ্রা এবার বুঝতে পারলো, মা কোনদিক থেকে তাকে প্যাঁচে ফেলতে চাইছেন। শিবানী চন্দ্রার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ওরা একসঙ্গে পড়াশুনো করেছে, শিবানী চন্দ্রাদের দেরাদুনের বাড়িতে এসে থেকে গেছে অনেকদিন। শিবানীর সূত্রেই বিমানের সঙ্গে হিমানীদের পরিচয়। চন্দ্রা নিজেই পছন্দ করে বিমানকে বিয়ে করেছিল। তারপর কেন বিমানের সঙ্গে চন্দ্রার তীব্র মনো মালিন্য হলো, কেন চন্দ্রা ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে এলো তা চন্দ্রার বাবা-মা এখনো ভালো করে জানেন না। আনন্দমোহন চন্দ্রাকে জোর করে ফেরৎ পাঠাবার কথা উচ্চারণ করেননি একবারও। কিন্তু এবার? বিমানের সঙ্গে যাই-ই হোক না কেন, শিবানীর সঙ্গে তা ঝগড়া হয়নি চন্দ্রার। এখন শিবানীর বিয়েতে সে যাবে না কেন?

চন্দ্রা একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মায়ের দিকে।

হিমানী আবার বললেন, শিবানী আর ওর দিদি-জামাইবাবা এ মাসের পঁচিশ তারিখে কলকাতায় আসছে বিয়ের বাজার করতে। আমি লিখেদিচ্ছি, ওরা এই বাড়িতেই থাকবে। কী বলিস?

চন্দ্রা দুদিকে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ সেই তো ভালো।

-তোকেও যেতে হবে এলাহবাদ। দেখিস, শিবানী তোকে ছাড়বে না। এখান থেকেই সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবে।

-ঠিক আছে, ওরা আসুক।

-তোদের সমিতির বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তা আর কেউ দেখবার নেই? তুই একাই সব কিছু করছিস নাকি?

-মা, তুমি যে বললে আমি ঘরে খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি, তার মানে, আমি কিছু রোজগার করি না, তোমাদের টাকা খরচ করি।

-আমি রোজগারের কথা বলিনি মোটেই! তোর বাবা তো ওষুধের দোকটানটায় তোর নামেও শেয়ার রেখেছেন।

-কিন্তু সেটাও তো আমার রোজগার নয়। ঠিক আছে, আমি এবারে একটা কাজটাজ খুঁজছি।

-তুই সব কথায় একটা ব্যাকার্‍্যাকা মানে করিস কেন বল তো ছোটু? এটা মনে রাখবি, তুই নিজেই যে সব কিছু ভালো বুঝিস তা নয়। তুই যে এক্ষুনি ঐ একটা বাইরের ছেলের সামনে আমায় ওরকম মুখ ঝামটা দিলি, সেটা কি ঠিক হলো? একটা অজাতে -বোজাতের ছেলেকে একেবারে দোতালায় এনে তুলেছিস।

-মা, তুমি, তুমি আমাকে জাতের কথা বলছো? বাবা আমাদের কোনোদিন এসব শেখাননি। তুমি যদি এরকম বলো, তা হলে আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো! ও নিচু জাত বলেই তুমি ওকে চাকরের মতন খাটাচ্ছো!

-শোনো মেয়ের কথা! আমার কথা শেষ পর্যন্ত না শুনেই.....আমি বলছিলুম, অজাত-বেজাতের ছেলেকে তুই দোতলায় এনে তুললেও আমি কি কোনো আপত্তি করেছি? বাড়ির ছেলের মতনই দেখি। তোর দাদা বুঝি কোনদিন বাড়ির ঝুল ঝাড়েনি? তোর বাবাকেও তো কতদিন বলেছি। আর ওকে বললেই দোষ?

-ওর এখন পরীক্ষা!

-পরীক্ষা বলেই কি সারাক্ষণ বই মুখে করে রাখবে? নাবে-খাবে না? ও কাজটা করতে কতক্ষণই বা লাগতো? তুই কিন্তু ছেলেটাকে বড় বেশি আস্কারা দিচ্ছিস। এ জগতে কারুকেই এমনি এমনি কিছু দিতে নেই। বিনিময়ে কিছু নিতে হয়, তাহলে সম্পর্কটা ভালো থাকে। ও ছেলে কেমন বিগড়ে গেছে, তুই তো কিছু খবর রাখিস না? একদিন দেখি দারোয়ানদের সঙ্গে বসে বিড়ি খাচ্ছে!

-কে, সুচরিত?

-হ্যাঁ, তোর ঐ পুষ্যিপুত্তুর। কাল তো আরও এক কাণ্ড হয়েছে। দারোয়ানের হাতে ও এক চড় খেয়েছে। দারোয়ানের কোনো দোষ তো আমি দেখি না। চাঁপা গাছটার কাছে একটা মই আছে না, দারোয়ান ঐ সুচরিতকে বলেছিল, মইটা মধ্যে নিয়ে যেতে। তা শুনে বাবুর কী চোটপাট! সে দারোয়ানকে বললো, আমি কেন নিয়ে যাবো, আমি কি চাকর? বোঝো! তুই আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়েছিস! ওকে খেতে পরতে দেওয়া হয়েছে, ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে, তার বদলে ও কি বাড়ির কোনো কাজই করবে না? তুই বল!

মায়ের কাছে যুক্তিবাণে হেরে গিয়ে চন্দ্রার মুখ লাল হয়ে গেল। মায়ের এইসব কথায় সে প্রতিবাদ করতে পারছে না। তবু একটা প্রতিবাদ জানানোর জন্য সে ফস করে একটা সিগারেট ধরালো।

॥ ৪২॥

কানুর বাড়ির ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিকলু। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। নিজের বাড়িতে সিগারেট খাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। বসন্ত কেবিন বা বন্ধুদের আড্ডায় প্রচুর ধোঁয়া ওড়ে বটে কিন্তু রাস্তা দিয়ে একলা হাঁটার সময় পিকলু সিগারেট ধরাতে লজ্জা পায়। হঠাৎ বাড়ির কেউ দেখে ফেলবে সেই আশঙ্কায় নয়, যে-কোনো অচেনা বয়স্ক লোকের সামনেও সে সঙ্কোচ বোধ করে। কানুর ঘরটা সারা দুপুর খালি পড়ে থাকে, এখানে মাঝে মাঝে এসে শুয়ে থাকে পিকলু।

এখন কানুর সঙ্গে দু'জন লোক দেখা করতে এসেছে, কী সব দরকারি কাজের কথা হচ্ছে ওদের, পিকলু তাই অপেক্ষা করছে বাইরে। নিচের রাস্তায় অবিশ্রান্ত গোলমাল, গাড়ির হর্ন, রিকশার হর্ন, ফেরিওয়ালাদের চ্যাঁচামেচি, পিকলু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আকাশ। বিকেলের দিকে প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে কয়েকদিন। আজও আকাশ মেঘে মেঘে প্রায় কালো। মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে একটু নীল দেখা যাচ্ছে যেন এখনও, পিকলু সেই মেঘের আকার নিয়ে খেলা খেলছে মনে মনে। কোথাও দুর্গ, কোথাও পাহাড়, কোথাও সমুদ্রের ঢেউ। মেঘ জমলে আকাশ নিচু হয়ে আসে। নীলাকাশের বিপুল সুদূরে কথা কখন মনে আসে না, মনে হয় যেন মাথার ওপর আর একটা পৃথিবী।

এই আকাশের কোথাও কি আছে স্বর্গ? পিকলু কিছুদিন আগেও ঠাকুর দেবতাদের মূর্তি বা ছবি দেখলে প্রণাম করতো, কলেজে বিজ্ঞান পড়তে এসে সে যুক্তিবাদী ও নাস্তিক হয়েছে। কিন্তু সমস্ত বিশ্ব ভুবনে মানুষ একেবারে নিঃসঙ্গ এ কথা মানতে চায় না তার মন। মানুষ যা দেখেনি তা কল্পনা করতে পারে না। তা হলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আকাশনিবাসী দেব-দেবী বা এঞ্জেল বা ফেরেস্তা, এই সব কল্পনা এলো কী করে? এককালে হয়তো অন্য গ্রহের মানুষ মাঝে মাঝে দেবদূত হয়ে নেমে আসতো পৃথিবীতে, এখন তারা পথ ভুলে গেছে?

কানুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো লোক দুটি। ধুতির ওপর হাফ শার্ট পরা, দু'জনেরই মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, লোক দুটির ভাবভঙ্গি পিকলুর ঠিক পছন্দ হয় না, কানুকাকা এতক্ষণ ধরে কী এত কথা বলে এদের সঙ্গে!

লোক দুটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার পর পিকলু জিজ্ঞেস করলো, কানুকাকা, এরা কারা?

কানু বললো, আমার বিজনেসের এজেন্ট। আয় ঘরে মধ্যে আয়।

খাটের ওপর নতুন একটা সুজনি পাতা। ছোট একটা টেবিল আর দুটো চেয়ারও কিনেছে কানু। টেবিলের ওপর একটা বেশ দামি চেহারার রেডিও। রেডিওটা দেখেই পিকলুর চোখ আনন্দ আর বিস্ময়ে চকচক করে উঠলো। কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কবে কিনলে, কানুকাকা?

কানু উৎফুল্ল ভাবে বললো, আজই দুপুরে নিয়ে এলাম। অল-ওয়েভ, বুঝলি? পৃথিবীর যে-কোনো দেশ পাওয়া যায়, বিলেত, আমেরিকা...এই হাত দিস না!

পিকলু তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললো, একটু চালাও, শুনি।

দাঁড়া, আগে এরিয়াল টাঙাতে হবে। ঘরে প্লাগ পয়েন্ট করতে হবে, আমার এক বন্ধু সব করে দেবে বলেছে। দু'দিন পরে এসে শুনবি....তুতুলকে নিয়ে আসিস, ওর তো খুব রেডিও শোনার শখ।

-তুমি হোল্ডার, তার-টার কিনে আনো, আমি প্লাগ পয়েন্ট করে দিচ্ছি।

-না, না ইলেকট্রিকের জিনিসে না জেনেশুনে হাত দিতে নেই। আমি ইলেকট্রিশিয়ান নিয়ে আসবো। তুই চা খাবি, পিকলু?

পিকলু মাথা হেলালো।

কানু দু বেলাই হোটেলে খায়। শিয়ালদার দিকে একটু এগোলেই অনেক হোটেল আছে। চায়ের

জন্য ছাদ থেকেই হাঁক দিলে রাস্তার উল্টোদিকের দোকান থেকে এটা ছোকরা চা দিয়ে যায়, প্রথম প্রথম সেই ব্যবস্থাই ছিল, এখন কানু ঘরেই চায়ের সরঞ্জাম রেখেছে।

খাটের তলা থেকে কানু টেনে বার করলো একটা স্পিরিট স্টোভ, একটা কণ্ডেসড মিল্কের কৌটো, আর দুটো গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের টিনের কৌটায় চা আর চিনি, একটা সসপ্যান। কুঁজো থেকে খানিকটা জল সসপ্যানে ঢেলে কানু জিজ্ঞেস করলো, তুই স্টোভ জ্বালাতে জানিস?

পিকলু হেসে বললো, না। আমাদের বাড়িতে তো স্টোভ নেই!

-শিখে নে। সবই শিখে রাখতে হয়। ভগবান না করুন, আমার মতন তোকেও যদি কোনোদিন একলা থাকতে হয়...

পিকলু সেই দৃষ্টির মর্ম বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সুর পাল্টে বললো, না, না, তোর বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তা বলছি না। আমি চলে এসেছি আমার ব্যবসার সুবিধে হবে বলে।

-কানুকাকা, মা কালকেও বলছিল কানুর এখানে খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট। রোজ হোটেলে খাওয়া মোটেই ভালো নয়। কানু রোজ দু' বেলা এখানে এসে খেয়ে গেলেই তো পারে। তুই ওকে বলবি....

-সে কথা হচ্ছে না। খেতে তো যাবোই মাঝে মাঝে। আমি জানি, অমি সারা জীবন বেকার থাকলেও সেজদা আমাকে কোনোদিন তাড়িয়ে দিত না। আমি জানি, আমি সারা জীবন বেকার থাকলেও সেজদা আমাকে কোনোদিন তাড়িয়ে দিত না। আমি বলছিলাম, কখন কী অবস্থা হয়, বলা হয়, বলা তো যায় না। ধর, যদি তোকে কখনো বাইরে পড়াশুনো করতে গিয়ে মেসে-হোস্টেলে থাকতে হয়!

স্টোভটা পাম্প করে তারপর দেশলাই জ্বালাতেই শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগলো। নীল রঙের আগুন। সসপ্যানটা চাপিয়ে দিয়ে কানু বললো, এই দ্যাখ না, আমার কাছে যখন তখন ব্যবসার কাজে বাইরের লোক আসে, ও বাড়িতে থাকলে অসুবিধে হতো না! তোদেরই পড়াশুনোর ক্ষতি হবো। তবে এই একখানা ঘরেও আমার কুলোবে না। শিগরিই দু'কামরার একটা ফ্ল্যাট নিতে হবে। সেখানে রান্নার ব্যবস্থাও রাখবো। বড়দি সেখানে মাঝে মাঝে এসে থাকতেও পারবে, বড়দির কাছে থেকে রান্নাটা শিখে নেবো।

-পিসিমণির কাছ থেকে তুমি রান্না শিখলে আমরাও মাঝে মাঝে তোমার রান্না খেতে আসবো। পিসিমণি কী দারুণ রাঁধে।

- তোর মা-ও ভালো রাঁধে।

-মার থেকেও পিসিমণির রান্না ভালো। এক সময় আমার দুঃখ হয়, পিসিমণিরা বিরাট বাড়িতে থাকতেন, আমরা মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম বেশ, এখন পিসিমণিকে কত কষ্ট করে থাকতে হয়, হতুল বেচারি ইচ্ছে মতন বাড়ি থেকে বেরুতে পারে না....

মালখানগরে আমাদেরও বিরাট বাড়ি ছিল, পিকলু। তোর নিশ্চয়ই মনে নেই। বাড়ি ভাড়া লোকজন, আমরা কোনদিন নিজের হাত এক গেলাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খাইনি।

-হ্যাঁ, আমার মনে আছে একটু একটু। উঠোনটাই তো মস্ত বড় ছিল।

-আমি বুঝতে পারি, সেজদার কেন মেজাজটা প্রায়ই খিচড়ে থাকে। এত কষ্ট করে থাকেনি তো কখনো। হ্যাঁ রে, সেজাদ এর মধ্যে বাবলুকে আবার মেরেছে? এখন আমি নেই, এখন রাগের কোপটা বেশি পড়বে বাবলুর ওপর। তুই তো সেজদার ফেভারিট ছেলে, তোর গায়ে সেজদা কোনোদিন হাত তুলবে না।

-সত্যি, বাবার ঐ একটা দোষ, রাগলে জ্ঞান থ্যকে না।

-তা বলে ভাবিস না, সেজদা যে আমায় মারতো, তার জন্য আমি মনে কোনো ঝাঁঝ পুষে রেখেছি। সেজদার মনটা যে ভালো তা তো অমি জানিই। তবে কি, এই সব মানুষ নিজেরাই বেশি দুঃখ পায়। আমি বাবা ঠিক করে ফেলেছি, যেমন ভাবেই হোক, অনেক টাকা পয়সা অমাকে রোজগার করতেই হবে। বড়লোক আমি হবোই। এই যে রিফিউজে বলে সবাই আমাদের দূর দূর ছাই ছাই করে, এটা আমার সহ্য হয় না। এদেশের লোক কথায় কথায় আমাদের ঠাট্টা করে বলে, কী, ইস্ট বেঙ্গলে তোমার বাপের কত বড় জমিদারি ছিল? ফেলে এলে কেন? তোকে তোর কলেজের বন্ধুরা বাঙাল বলে ঠোঁট ওল্টায় না?

-নাঃ, সেরকম কেউ করে না, তবে, দু' একজন আছে...

-তুই পাস-টাস করে দাঁড়ালে সেজদার কাঁধের বোঝা অনেকটা কমবে। তুই মন দিয়ে পড়াশুনো কর, পিকলু। তুই নাকি টিউশানি করছিস? ওটা ছেড়ে দে, তোর যা হাত খরচ লাগে আমি দেবো। তোর ওপার আমাদের অনেক ভরসা।

জল গরম হয়ে গেছে, তাতে চা ফেলে দিয়ে ঢাকনা চাপা দিল কানু। কাপ নেই, গেলাসে খেতে হবে, চিনির কৌটাটো খুলে দেখা গেল তার মধ্যে থিক থিক করছে পিঁপড়ে। কৌটোটা মাটিতে ঠুকে ঠুকে কিছু পিঁপড়ে তাড়ানো হলেও তবু সব যায় না।

কানু চামচে করে দু'চারটে পিঁপড়ে শুদ্ধু চিনি তুলে বললো, ওতে কিছু হবে না। পিঁড়ে খাওয়া ভালো, সাঁতার শেখা যায়। তোরা তো সাঁতার-ফাতার শিখলি না। আমার গরম লাগলে আমি রাত্তিরের দিকে কলেজ স্কোয়ারে নেমে এক পাক সাঁতার কেটে আসি। মালিকদের মাঝে মাঝে দু'চার আনা ঘুষ দিই, কিছু বলে না।

কানুর এই রকম জীবনযাপন বেশ পছন্দ হয় পিকলুর। কানুকাকা সম্পূর্ণ স্বাধীন, যা খুশী করতে পারে। মা-বাবাকে পিকলু খুব ভালোবাসলেও সম্পূর্ণ একলা জীবন কাটাবার এই ছবি তাকে মুগ্ধ করে।

চায়ের স্বাদটাও অপূর্ব লাগলো। একটু ধোঁয়া গন্ধ আছে বটে এমন চা যেন পিকলু কোনোদিন খায়নি আগে।

গেলাস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কানু বললো, তোর গরম লাগছে না? এবার একটা পাখা কিনতে হবে। চল, বাইরে দাঁড়িয়ে চা-টা খাই।

কানুকাকা রেডিও কিনেছে, এই বাড়ি ছেড়ে অন্য বড় ফ্ল্যাটে উঠে যাবার কথা ভাবছে, গরম লাগলেই ফ্যান কেনার কথা ভাবে। প্রত্যেকবার এখানে এলেই একটা না একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ে। ব্যবসা করলে এত তাড়াতাড়ি টাকা রোজগার করা যায়? পিকলু ব্যবসার ব্যাপারটা তেমন বোঝে না, তবে এটা সে বোঝে যে যে-কোনো কাজেই উন্নতি করতে গেলে বুদ্ধি লাগে, কানুকাকার তো তা হলে বেশ বুদ্ধি আছে। কানুকাকা লেখাপড়া ভালো ছিল না, তা হলে দেখা যাচ্ছে লেখাপড়ার সঙ্গে বুদ্ধির সব সময় সম্পর্ক নাও করতে পারে।

আকাশে মেঘ অনেক গাঢ় হয়ে এসেছে। এর পর যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। অদ্ভুত একটা নরম আলো হয়েছে এখন।

কার্নিসের প্যাশে-এসে কানু বললো, পিকলু, ঐ হলদে রঙের বাড়িটার ছাদের দিকে দ্যাখ। ঐ যে, যে-বাড়ির পাঁচলি দুটো কাপড় শুকোচ্ছে। দেখতে পাচ্ছিস?

সেদিকে তাকিয়ে পিকলু শুধু লজ্জা পেল না, একটু শঙ্কিত ও বোধ করলো। মীর্জাপুরের এই বাড়িতে এসে কানুকাকার চরিত্রে একটা নতুন জিনিস যোগ হয়েছে, প্রায়ই বেশ অসত্য কথা বলে। জিভে কোনো আড় নেই, অবলীলাক্রমে বলে যায়। তা হলে নিশ্চয়ই নতুন শেখেনি, আগেও বাড়ির বাইরে বলতো। পিকলু খারাপ কথা, অদিরসের শ্ল্যাং একেবারে সহ্য করতে পারে না। তার বন্ধুদের ছোট গোষ্ঠীর মধ্যেও এ ব্যাপারে বিয়ে দেখিয়ে দেবো, এই সব বলতো। পিকলু খারাপ কথা, অদিরসের শ্ল্যাং একেবারে সহ্য করতে পারে না। তার বন্ধুদের ছোট গোষ্ঠীর মধ্যেও এ ব্যাপারে কড়া নিয়ম আছে। বন্ধুদের মধ্যে একজনই শুধু কথায় কথায় বাপ্কেৎ, মাজাকি, বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবো, এই সব বলতো। এখন রুল জারি করা হয়েছে যে সে ঐ রকম কিছু একটা বলে ফেললেই তাকে এক কাপ চায়ের দাম ফাইন দিতে হবে। বাবলু পাশের বস্তির ছেলেদের কাছে শিখে বাড়িতে একদিন শালা বলেছিল বলে পিকলু তার কান মুলে দিয়েছিল। কিন্তু কানুকাকাকে তো সেরকম ভাবে শাসন করা যায় না।

কানু আঙুল তুলে বললো, দুটো মেয়ে ঘুরছে, একজন ফ্রক পরা, আর একজন নীল শাড়ি, ঐ দ্যাখ দ্যাখ, এদিকেই তাকিয়েছে, ওদের মধ্যে কোন্‌জন বেশি সুন্দরী বল তো?

পিকলুর মনে হলো, দুটি মেয়েকেই দেখতে তুতুলের মতন। তুতুলের কথা মনে পড়া মাত্র সে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বললো, জানি না।

কানু বললো, দু'জনের প্রায় কাছাকাছি বয়েস হলেও ওরা কিন্তু দুই বোন নয়। ঐ ফ্রক পরা মেয়েটা হচ্ছে শাড়ি পরা মেয়েটির মাসি। হে-হে-হে! সত্যি বলছি! বিকেলবেলা ছাদে দাঁড়ালেই ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। তুই হিড়িক দেওয়া কাকে বলে জানিস? ভেবেছিলুম, মেয়ে দুটোর সঙ্গে

কিছুদিন একটু হিড়িক দেবো। কিন্তু ওমা, তার আগেই একটা কাণ্ড হয়ে মেয়ে দুটোর সঙ্গে কিছুদিন একটু হিড়িক দেবো। কিন্তু ওমা, তার আগেই একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

চায়ের গেলাসটা নামিয়ে রেখে কানু পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললো, তুই চার্মিনার খাস কেন, ওতে ঠোঁট কালো হয়ে যায়। দেখবি, পরে মেয়েরা তোকে পাত্তা দেবে না। ভালো সিগারেট খাবি, এই নে, প্যাকেটটা তোর কাছেই রাখ।

দু'জনে দুটি সিগরারেট ধরাবার পর কানু বললো, একদিন এই পাড়ার এক ভদ্রলোক নিজে যেচে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলো। এ কথা সে কথার পর বুঝলুম, ভদ্রলোক ঐ নীল শাড়ি পরা মেয়েটির বাপ। ভদ্রলোকের মোট পাঁচ মেয়ে, এর আগে চার-চারটির মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রায় ফৌত হয়ে গেছে, এখন ঐ পাঁচ নম্বর মেয়েটিকে ঘাড় থেকে নামাতে চায়। আমার সম্পর্কে সেই জন্য ইন্টারেস্টেড। আমি ঘাড়টি হেলালেই বিয়ের শানাই বাজাতে পারে, বুঝলি?

-মেয়েটি লেখাপড়া করে না?

কানু দরাজ গলায় হেসে উঠে বললো, জানতুম, তুই ঠিক এই কথাটা জিজ্ঞেস করবি। কোন বংশের ছেলে তা দেখতে হবে তো! আরে, আমি নিজে আই এ ফেল। আমি কি আর এম, এ, বি এ পাস মেয়ে বিয়ে করতে পারবো? ঐ মেয়েটা ক্লাস্ নাইন পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে, ও যথেষ্ট।

-কানুকাকা, তুমি এর মধ্যেই বিয়ে করবে?

-এর মধ্যে কী বলছিস, আমার বয়েস প্রায় থার্টি হতে চললো। হ্যাঁ, আমি বিয়ে করবো ঠিক করে ফেলেছি, সেটা আজ হোক বা ছ' মাস বাদেই হোক। একা থাকতে আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আমি আমার বংশের ধারা মেইনটেইন করতে চাই। হুট করে অন্যের কথায় নেচে উঠে একটা বেজাতের মেয়েকে বিয়ে করা, ওসব আমার দ্বারা হবে না। আমার মাথার ওপর দাদা-বৌদি আছে, বড় দিদি আছে, বড় দিদি আছে তাদের মত না পেলে কিছু হবে না সে কথা আমি বলে দিয়েছি ভদ্রলোককে। এ ছাড়া আমি খোঁজ নিয়েছি, ওরা ঘটি, সেটা একদিক থেকে ভালোই, আমি ঘটিদের সমাজে ঢুকতে চাই। আমি মনে মনে ঠিক করেই রেখেছি, ঘটিদের বাড়ির কোনো মেয়েকে বিয়ে করবো, করিচি, খেয়েচি, খেয়চি, এলুম গেনলুম এই রকম কথা বলবো, কোনো শালা যাতে আমাকে আর বাঙাল বলে হ্যাটা না করতে পারে।

কানুকে আজ কথায় পেয়েছে, সে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। পিকলু আবার হলুদ বাড়িটার দিকে আড় চোখে তাকালো। মেয়ে দুটি বোধ হয় ভেতরের কথা জানে, তারাও ঘুরতে ঘুরতে এদিকে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। পিকলুর এখনো মনে হচ্ছে মেয়ে দুটিকেই দেখতে তুতুলের মতন।

কানু বললো, এখন কোশ্চেন হচ্ছে, কোন মেয়েটিকে? আমার ওই ফ্রক পরা মেয়েটিকেই বেশি পছন্দ। ফ্রক পরা বলে ভাবিস না বাচ্চা, মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। ভদ্রলোক চায় তার নিজের মেয়েকে আগে পার করতে।

পিকলু দুঃখিত স্বরে বললো, কানুকাকা-

-কী রে, কী বলেছিস?

মেয়েরা কি বিড়ালের বাচ্চা যে তুমি পার করার কথা বলছো?

-ওঃ হো-হো, তুই তো আবার ...এই রকমই হয়, আর একটু বড় হলে বুঝবি। থাক, আমি আপাতত সেটল করেছি, শাড়ি পরা মেয়েটি হলেও আপত্তি নেই, ওর ফ্রক পরা মাসি তো ঐ বাড়িতেই থাকবে, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে হিড়িক মারা যাবে। গাছেরও খাবো, তলারও কুড়োবো। হে-হে-হে-হে।

হুড়মুড়িগয়ে বৃষ্টি আসায় ওরা চলে এলো ঘরের মধ্যে। পিকলু জুতো-মোজা খুলে রেখেছিল, সেগুলো পরে নিয়ে বললো, কানুকাকা, এবারে আমি চলে। অলরেডি দেরি হয়ে গেছে।

-এই বৃষ্টির মধ্যে যাবি কী করে? একটু বসে যা। শোন পিকলু, সেজদার নয়নের মণি? যাকগে, তুই যদি সরাসরি না বলতে পারিস তোর মায়ের থ্রু দিয়ে বল। আমি মাস ছয়েকের মধ্যেই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতে চাই। ওরা সোনাদানা মোটামুটি দেবে, বিয়ের খরচপাতিও দেবে।

-তা হলে শিগগিরই আমাদের একটা কাকিমা হচ্ছে?

-শুধু কাকিমা কেন রে, দু চার বছরের মধ্যেই দেখবি খুড়তুতো ভাই-বোন। আমি ঠিক করে রেখেছি, বিয়ের পরে পরেই দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে। বাস্, তার বেশি আর চাই না।

বৃষ্টি পুরোপুরি থামবার আগেই পিকলু বেরিয়ে পড়লো সেখানে থেকে। এতক্ষণ ধরে কানুকাকার বিয়ে সম্পর্কে কথাবার্তা তার মনকে বেশ নাড়া দিয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো নারীকেই সে শূন্যের ওপর একটা সিংহাসনে বসিয়ে দেখতে চায়। কোনো রমণীর একটুখানি হাসি, একবার পাশ ফিরে তাকানো, হঠাৎ কথা বলতে থেমে যাওয়া, এই সবই যেন দারুণ দুর্লভ কিছু পাওয়ার মতন। আর কানুকাকার কাছে মেয়েরা যেন জল-ভাতের মতন অতি সাধারণ। এখনো বিয়ের কোনো ঠিকই নেই, এর মধ্যেই দুই তিনটি ছেলেমেয়ের কথা ভাবছে। শেষের এই কথাটাতেই পিকলু যেন প্রায় শারীরিকভাবে ব্যথা পেয়েছে।

শিবেনের সেই বন্ধু এখনো তুতুলকে বিয়ে করার আশা ছাড়েনি। থানায় খবর দেবার পর ওদের উপদ্রব খানিকটা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু দূর থেকে এখনো ওদের উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা যায়। তুতুলকে একলা বেরুতে দেওয়া হয় না বাড়ি থেকে। তুতুল কলেজে ভর্তি হবার আগে ঐ বাড়ি বদল করতেই হবে।

সারা রাস্তা তুতুলের কথাই ভাবতে ভাবতে এলো পিকলু।

বাড়ি ফিরে সে মমতাকে ডেকে বললো, মা, কানুকাকা আজ তোমাদের একটা কথা বলতে বলেছে।

মমতা বাধা দিয়ে বললেন, তুই কানুর কাছে বুঝি রোজই যাওয়া শুরু করেছিস? তোর বাবা শুনে একদিন রাগ করছিল। কানুর কোনো জিনিস-টিনিস দিলে নিবি না।

-আহা, শোনোই না কথাটা। কানুকাকা বিয়ে করতে চায়।

-অ্যাঁ? এর মধ্যেই বিয়ে করবে? সবে তো ব্যবসা শুরু করেছে, দু'চার বছর না গেলে কি ব্যবসার কিছু বোঝা যায়? কোথায় বিয়ে করছে?

-ও বাড়ির, কাছেই....মেয়ের বাবা এসে কানুকাকার কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন।

মমতা তাড়াতাড়ি ডেকে আনলেন সুপ্রীতিকে। সুপ্রীতি কিন্তু সব শুনে খুশীই হলেন। তিনি বললেন, তা হলে তো বলতে হবে ছেলেটার সুবুদ্ধি হয়েছে। বয়েস কালের ছেলে, ওরকম একলা একলা থাকা মোটেই ভালো নয়। মতিচ্ছন্ন হতে তো আর দেরি লাগে না। মেয়েটির বয়েস কত, বাড়ির অবস্থা কী রকম? মেয়ে একবস্ত্রে আসছে না তো?

কানুর মুখ থেকে পিকলু যা শুনেছে সবই খুলে বললো, শুধু সে যে ছাদ থেকে মেয়েটিকে দেখেছে তা জানাতে তার লজ্জা করলো। সুপ্রীতি বললেন, তা হলে তো খোকনকে আজই জানাতে হয়। এ সব কাজে দেরি না করাই ভালো।

পিকলু এই সন্ধ্যেবেলাতে একবার স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢুকে গেল। এই রকমভাবে বিয়ের আলোচনা করায় তার কেমন যেন নোংরা নোংরা লাগছে। বাথরুমের কল খুলে দিয়ে সে আবার কল্পনায় দেখতে পেল শূন্যে সিংহাসন আরূঢ়া এক দেবীকে, মুখখানি ঈষৎ ফিরিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে, সেই মুখ কিন্তু তুতুলের নয়, অচেনা রহস্যমাখা, সেই মুখ তার সমস্ত নারী জাতির প্রতীক।

প্রতাপ বাড়ি ফেরার পর মমতা আর সুপ্রীতির ডেলিগেশন গেল তাঁর কাছে। প্রতাপ চুপ করে সব শুনলেন, তারপর উদাসীন ভাবে বললেন, সে বিয়ে করতে চায়, ভালো কথা। করুক। আমাদের মতামতে কী আসে যায়? সে তো এখন স্বাধীন।

-সুপ্রীতি বললেন, না রে খোকন, কানু ছেলে খারাপ নয়। আমাদের খুব মানে। সে কন্যেপক্ষকে বলেছে, আমার দাদা-বৌদি আছে, বড় দিদি আছে, তাদের মতামত ছাড়া কিছু হবে না। পিকলুকে ডাকবো, সব শুনবি?

প্রতাপ তুলে বললেন, না, ওকে ডাকার দরকার নেই। কানু পিকলুর সঙ্গে এই সব বিষয়ে আলোচনা করে, তাও আমার পছন্দ নয়। কেন, সে নিজে এসে বলতে পারলো না?

-আসবে, দু' একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আসবে। ও তো মাঝে মাঝেই দুপুরের দিকে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যায়।

-কানুর মামারই তো আছে, তাদের কাছে গেলেই পারে। তারাই ব্যবস্থা করবে।

-এ তুই কী বলছিস, খোকন? বিয়ের চিঠিতে তো তোর নাম থাকবে! মামাদের নামে কখনো বিয়ে হয়? তা হলে কানুকে খবর পাঠাই, পাত্রীর বাবা এসে একদিন তোর সঙ্গে দেখা করুক?

শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিলেন প্রতাপ।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে তিনি মমতাকে বললেন, কানুর মামাদের তোমার মনে আছে!

মমতা বললেন, সেই কবে শিউলির বিয়েতে একবার গিয়েছিলাম। তারপর তো আর....মা কলকাতায় এলেও তো ওঁরা কেউ দেখা করতে আসেন না।

প্রতাপ বললেন, আমি গত সপ্তাহে নিজেই একবার মেজোমামার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওঁর হাঁটুতে খুব বাত, হাঁটা চলা করতে পারেন না প্রায়। উনি বললেন, কানু ওঁদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখে না। আমি কানুর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েছিলুম, ওঁরা কোনো আগ্রহ দেখালেন না। ওঁরা কোনো দায়িত্ব নিতে চান না। কানু তো কোনোদিনই মামাদের তেমন পছন্দ করে না। ঐ মেজোমামার বউ নাকি এক সময় কানুকে খুব কষ্ট দিয়েছে।

-তবু ওঁরা কানুর নিজের মামা। কানু আমার কোনো কথা গ্রাহ্য করে না, ইচ্ছে মতন যা খুশী করছে, তা হলে আমি ওর বিয়ের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবো কেন?

-কানু আলাদা হয়ে গেছে বলে তুমি এত রাগ করছো কেন? ও যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেটাই তো ভালো। ওর বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসারী করা তোমারই দায়িত্ব।

-দায়িত্ব, হুঁ।

প্রতাপ উঠে বসে আর একটা সিগারেট ধরাতে গেলেন। মমতা বললেন, তুমি আজকাল বড়বেশি সিগারেট খাচ্ছো। একটু কমাও। রাত্রে তোমার কাশি হয়।

প্রতাপ তবু সিগারেট ধরালেন। তারপর গোঁফ মুখে বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যখন দায়িত্বের কথা বললো, তখন ওর বিয়ের ব্যপারে আমার যেটুকু সাধ্য তা আমি করবো। কিন্তু একটা কথা তোমাদের আগে থেকেই বলে রাখছি। কানুকে যদি হঠাৎ কখনো পুলিসে ধরে তখন কিন্তু আমি ওকে ছাড়াতে যাবো না। তখন তোমরা আমাকে অনুরোধ করো না।

॥ ৪৩ ॥

পাড়ার কয়েকটি ছেলে ধরাধরি করে সুচরিতকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। স্কুল থেকে টিফিনে বেরিয়ে সে সিকদার বাগানের ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতে শুরু করেছিল। ঐ পাড়ার কিছু ড্যাঙা ড্যাঙা ছেলে এখানো স্কুলে পড়ে, তারা নিয়মিত দাড়ি গোঁফ কামায় ফেল করে এক ক্লাসে দু'বছর থাকে। অন্য ছেলেরা ভয়ে তাদের কাছ ঘেঁষে না, সুচরিত তাদের সঙ্গে পারবে কেন? তাছাড়া, সুচরিত নাকি ফস করে পকেট থেকে একটা ছুরি বার করেছিল। তাই দেখে তিন-চারটি ছেলে একসঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, হাত মুচড়ে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে বেধড়ক পেটায়। ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়নি, সুচরিত ঐ ছেলেগুলোর হত থেকে কোনক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দিগবিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে গাড়ি পালাতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়েছে।

চন্দ্রা বাড়িতে নেই। তাঁর বাবা আনন্দমোহন তক্ষুনি নিজের গাড়িতে সুচরিতকে নিয়ে গেলেন আর জি কর হাসপাতালে। তিনি একটি বড় ওষুধের দোকানের মালিক বলে অনেক ডাক্তারই তাঁকে চেনে, এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে তিনি বিশেষ খাতির পেলেন। সুচরিতের আঘাত সেরকম গুরুতর নয়, সারা-শরীর কেটে ছিঁড়ে গেছে, দুটি দাঁত ভেঙেছে আর বাঁ পায়ের গোড়ালির হাড়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে। উৎকণ্ঠিত আনন্দমোহন অনেক্ষণ পর সহজ নিঃশ্বাস ফেললেন। সুচরিতের অবস্থা দেখে তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। অন্যের ছেলেকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, হঠাৎ যদি চরম কিছু হয়ে যেত, তা হলে ওর বাবা-মায়ের কাছে কী করে জানানো হতো সেই খবর।

সুচরিত অবশ্য একবারও জ্ঞান হারায় নি, যন্ত্রণায় গুঙিয়েছে একটু একটু, কিন্তু আনন্দমোহন বা ডাক্তার-নার্সদের কোনো জিজ্ঞাসারই উত্তর দেয় নি। একজন হাউস সার্জন তো বলেই উঠলো একবার, ওফ, ছেলে বটে একখানা! সেই কালু গুণ্ডাকে দেখেছিলুম, পেটের নাড়িভুঁড়ি হাতে চেপে ধরেছিল, আর এই দেখছি!

হাসপাতালে রেখে লাভ নেই, ড্রেসিং ও ব্যাণ্ডেজের পর আনন্দোমোহন সুচরিতকে বাড়িতেই নিয়ে এলন সন্ধ্যেবেলা। ফেরার সময় সুচরিতকে আর শুইয়ে আনতে হলো না, সে বসে রইলো প্যাট প্যাট করে চোখ মেলে তাকিয়ে। আনন্দমোহন সামান্য রসিকতা করে বললেন, এবার থেকে তোকে আমি কালুগুণ্ডা বলে ডাকবো! পকেটে ছুরি রেখেছিলি কেন, অ্যাঁ?

সুচরিত কোনো উত্তর দিল না।

আনন্দমোহন আবার বললেন, আর যদি এক ইঞ্চি বেশি চলে যেতিস গাড়ির তলায় তাহলে

তোকে এতক্ষণে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়োওয়ার বদলে শ্মশানে নিয়ে যেতে হতো।

সুচরিত এবারও কিছু না বলে চোখ নিচু করলো।

চন্দ্রা এখনো ফেরে নি। আনন্দমোহন আজ আর দোকানে গেলেন না। তাঁর নিজেরও শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। হাসপাতালের পরিবেশ তাঁর সহ্য হয় না। চন্দ্রার মা গজগজ করছেন, মেয়ের সব রকম পাগলামিতে বাপের প্রশ্রয়ের জন্য কথা শোনাচ্ছেন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে, আনন্দমোহনের মুখে যে একটা রুগ্ণ ছাপ পড়েছে তা তিনি এখন লক্ষ করছেন না। বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে আনন্দমোহন ভাবলেন, এবারে একটা উইল করাতে হবে, আর দেরি করা বোধ হয় ঠিক নয়।

চন্দ্রা কোনদিন কখন ফেরে তার ঠিক নেই। আনন্দমোহনের ঝিমুনি আসছে, তবু তিনি বিছানার ধারের জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই জানলা দিয়ে সদর পর্যন্ত দেখা যায়।

প্রায় সাড়ে নটায় সময় গেটের সামনে একটি ট্যাক্সি থামলো। কেউ চন্দ্রাকে পৌঁছে দিতে এসেছে, ট্যাক্সি থেকে নেমেও চন্দ্রাকথা বললো একটুক্ষণ। আনন্দমোহন স্ত্রীকে বললেন, মেয়েটাকে আগেই কিছু বলতে যেও না, আগে এসে হাত মুখ ধুক, জামা-কাপড় ছাড় ক, তারপর যা বলার আমিই বলবো।

চন্দ্রার মা জানলার দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐ দ্যাখো!

চন্দ্রা দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলছে। তারপরই সে ছুটে এলো বাড়ির দিকে। দারোয়ানই যা বলার বলে দিয়েছে।

আনন্দমোহন খাট থেকে নেমে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন। চন্দ্রার চোখ মুখের অবস্থা এমনই যে সে যেন মৃত্যুশয্যায় সুচরিতকে শেষ দেখা দেখতে পারে কি না এই অনিশ্চয়তা নিয়ে আসছে। তার পরনে একটা পাতলা ফিনফিনে সিল্কের শাড়ি, বিশেষ সাজগোজ করে সে আজ কোথাও গিয়েছিল।

আনন্দমোহন বললেন, তুই বেশি ব্যস্ত হসনি, খুকী। সুচরিত ভালো আছে। আমি নিজে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলুম।

- বাবা, ও বাঁচবে তো?

- আমি তো বলছি, ও ভালো আছে। পার্মানেন্ট ড্যামেজ কিছু হয়নি। এখন ঘুমোচ্ছে।

চন্দ্রা তার বাবাকে বিশ্বাস করে। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সুচরিতের ঘরের দিকে একবার তাকালো। তারপর বললো, ওকে পাড়ার ছেলেরা সাংঘাতিক মেরেছে, তোমরা পুলিসে খবর দাও নি?

চন্দ্রার মা বললেন, পুলিসে খবর দিলে পুলিস তো আমাদেরই এসে হয়রান করবে। তোর ঐ গুণধরই তো ছুরি দিয়ে অন্যদের মারতে গিয়েছিল। দিন দিন গুণ্ডা হচ্ছে, তুই কিছু দেখিস না।

চন্দ্রা অস্ফুট গলায় বললো, ছুরি? তারপর সে বাবার দিকে তাকালো। আনন্দমোহন তাঁর স্ত্রীর কথায় কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

চন্দ্রা হঠাৎ কেঁদে ফেললো। সে সুচরিতকে আর দেখতে গেল না, দৌড়ে চলে গেল নিজের ঘরে। বিছানায় আছড়ে পড়ে সে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। চন্দ্রার ভাবপ্রবণতা ইদানীং প্রায়ই অতিরিক্ত হয়ে উঠছে। সে যেন সব সময়ই কিছু না কিছুর সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে এবং কোনোটাতেই সে হার সহ্য করতে পারেন না। আজ এক্ষুনি যেন তার বড় রকমের একটা হার হয়েছে।

রিফিউজি কলোনি থেকে সে সুচরিতকে নিজের বাড়িতে এনে আশ্রয় দিয়েছিল প্রায় জেদ করে। হারীতে মণ্ডল তার স্ত্রী ও অন্য পুত্র-কন্যাদের নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে বাংলার বাইরে উদ্বাস্তু ক্যাম্প। সুচরিত পড়াশুনো করতে চেয়েছিল। সে ছিল শান্ত, লাজুক স্বভাবের ছেলে, সে যেন কখনো কারুর সঙ্গে মারামারি করতে পারে ভাবাই যায় নি। তার পকেটে ছুরি?

এখন সবাই এসে চন্দ্রাকে বলবে, দেখলে, দেখলে, আমরা আগেই বলেছিলুম না।

কেউ বলবে, খুনীর ছেলে কখনো লেখাপড়া শিখতে পারে? কেউ বলবে, জলবিছুটির চারা গোলাপ বাগানে এনে পুঁতলে কি তাতে গোলাপ ফোটে? অসমঞ্জ রায় শ্লেষের সঙ্গে বলবেন, আমি সেই জন্যই তো প্রথম থেকেই পাত্তা দিইনি, তুমি তখন আমার কথা শুনতে চাইলে না, এখন বুঝলে তো?

সবাই বলবে, চন্দ্রা, তুমি হেরে গেছো, তোমার সিদ্ধান্ত ভুল।

খানিক বাদে দরজাটা সামান্য ঠেলে আনন্দমোহন বাইরে থেকে ডাকলেন, খুকী!

চন্দ্রা উঠে বসে চোখ মুছলো। তার মনে পড়লো অন্য কথা। কয়েক দিন ধরে তার মা-বাবা তার

সম্পর্কে বেশি উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছেন। দু তিনদিনের মধ্যেই এলাহাবাদ থেকে এসে পড়ছে তার শ্বশুড়বাড়ির লোকজন। তার ব্যাপারে সবাই খুব উৎসাহী। এদিকে চন্দ্রার আর একটা লড়াই ঘনিয়ে এসেছে। এতদিন বাবা কিছুই বলেন নি, এখন বাবাও চলে গেছেন অন্যদিকে?

আনন্দমোহন বললেন, তুই ছেলেটাকে একবার দেখতে গেলি না? নিজের চোখে দেখলে বুঝতি ওর তেমন সীরিয়াস কিছু হয় নি।

চন্দ্রা তীব্র চোখে চেয়ে বললো, বাবা, ও সত্যিই পাড়ার ছেলেদের ছুরি মারতে গিয়েছিল?

আনন্দমোহন বললেন, তাই তো শুনলুম। বোধ হয় পেন্সিল-কাটা ছুরি!

-বাবা, আমি আর ওর মুখ দেখতে চাই না! তোমরা ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও, যা খুশী করো!

আনন্দমোহন ক্ষীণ হেসে বললেন, পাগল! ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা উঠছে কিসে? কেউ কিছু বলেছে?

-না, আমি ওকে রাখতে চাই না। ওকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও।

-কী বলছিস পাগলের মতন! ওকে কোথায় তাড়িয়ে দেবো? ওর কি কোনো যাবার জায়গা আছে? ওর বাবা-মা যে কোথায় গেল, কোন ক্যাম্পে আছে তা কিছুই জানা গেল না। একটা চিঠিও দেয় নি এতদিনে।

-ও সব কিছু জানি না আমি। ও যেখানে খুশী চলে যাক।

-এই তো তোর পাগলামি। সব কিছুই ঝোঁকের মাথায় করিস। ছেলেটাকে যখন হুট করে নিয়ে এলি তখনও সব দিক ভেবে দেখিস নি। এখন আবার বলছিস ওকে চলে যেতে। মানুষের জীবন নিয়ে কি এরকম ছিনিমিনি খেলা যায়?

-বাবা, ওকে এনে আমি কি ভুল করেছিলুম? তখন তুমি কিছু বলো নি তো? চেয়েছিস, তাতে আমি আপত্তি করবো কেন? এ বাড়িতে জায়গার অভাব নেই, একটা ছেলে থাকবে-খাবে, এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু ও আগে বাবা-মাকে ছেড়ে কখনো থাকেনি, এ বাড়িতে ওর বয়েসী কেউ নেই, ওর দিকে কারুর তো একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার। তুই বেশির ভাগ সময়ই বাড়িতে থাকিস না, আমিও সময় পাই না। কদিন আগে দেখি ছাদের সিঁড়িতে বসে আছে, মুখখানা যেন ছাই-মাখা, বাবা-মায়েদের কোনো খবর পায় না তো!

-ওসব ছিচকাঁদুনেপনা আমি দু'চক্ষে সহ্য করতে পারি না। ওর মতন বয়েসের অনেক ছেলেকে আরও কত কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হয়, অনেক বেশি স্ট্রাগল করতে হয়। ওর বাবা কাওয়ার্ড, তাকে আমি এখানে জোর করে থেকে যেতে বলেছিলুম, থাকে নি!

-ওরকম বললে কী হয়। তাদের ভালো-মন্দ তারা নিজেরাই বেশি বুঝবে। তুই চাস, সারা পৃথিবীটাই তোর মত অনুসারে চলুক। খুকী, তুই লেখাপড়া শিখেছিস, এখনো বুঝতে শিখলি না যে সংসারটা চলে পারস্পারিক দেওয়া-নেওয়ার ওপর।

-সংসার মানে? মা তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে, তুমি আমাকে বলতে এসেছো যে আমার উচিত স্বামীর সংসারে ফিরে যাওয়া। তার সঙ্গে আমার মনের মিল থাক বা নাই-ই থাক আমাকে সব মেনে নিতে হবে। কারণ আমি পুরুষ নই, মেয়ে!

আনন্দমোহন এবার জোরে হেসে বললেন, না, আমি সে কথা বলতে অসি নি। তোর মা আমাকে অনেক কিছুই শেখাতে চায় কিন্তু আমি সব শিখতে পারি না যে! আমি বলতে এসেছে, তুই ছেলেটাকে একবার দেখে আয়। এ বাড়িতে তোকেই তো ও সব থেকে আপন বলে জানে। ও জেগে আছে, বোধ হয় তুই ওকে কিছু বলবি সেই জন্যই।

চন্দ্রা চোখ বুজলো। তার মুখ কুঁকড়ে গেল অভিমানের যন্ত্রণায়। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না, আমি আর ওকে দেখতে চাই না!

আনন্দমোহন তার পিঠে মৃদু ঠেলা মেরে বললেন, ছেলেমানুষী করিস না! যা ওঠ তো! বাড়িতে একটা ছেলে পা ভেঙে পড়ে আছে-

চন্দ্রাকে যেতেই হলো। আন্দমোহন চন্দ্রাকে সুচরিতের ঘর পর্যন্ত নিয়ে এলেন কিন্তু নিজে ভেতরে ঢুকলেন না।

সুচরিত জেগে আছে ঠিকই। সে চেয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে।

চন্দ্রা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখলো। সুচরিতের সারা শরীরই প্রায় আয়োডিনের দাগ, কয়েক জায়গায় স্টিকিং প্লাস্টার, বাঁ পায়ে ব্যাণ্ডেজ। মুখের রং যেন নীলচে হয়ে গেছে।

একটা চেয়ার টেনে তার মাথার কাছে এসে বসে চন্দ্রা প্রথমেই বললো, তোর পকেটে ছুরি ছিল? এটা সত্যি না মিথ্যে? বল্, আগে বল। ছুরি ছিল কি না?

চন্দ্রার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে সুচরিত বললো, হ্যাঁ, ছিল।

-কোথায় পেলি ছুরি? কে দিয়েছে?

-আমি কিনেছি।

-তুই কিনেছিস? কে তোকে পয়সা দিল?

-কেউ দেয়নি, আমি রাস্তায় পনেরো টাকা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

-রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পেয়ে তুই ছরি কিনেছিস? কেন? লোককে মারবি বলে?

-হ্যাঁ। ঐ সিকদারবাগানের তিনটে ছেলে আমায় রোজ মারে।

-তোকে রোজ মারে? তুই সে কথা আমাদের আগে বলিস নি কেন? তুই ওদের পাড়ায় যাস কেন?

-ওরা আমাদের ইস্কুলে পড়ে।

-ইস্কুলে পড়ে, তবু তোকে রোজ মারে? কেন, তোকে মারবে কেন?

-ওরা দেখলেই আমার মাথায় চাঁটি মারে। আমার বাপ তুলে গালাগলি দেয়।

-তুই কিছু করিস না, তোকে এমনি এমনি মারে আর গালাগাল দেয়?

-আমি একদিন হাসছিলাম, আমার বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলাম, ওদের একজন এসে আমার গারে এক চড় মেরে খারাপ খারাপ কথা বলতে লাগলো।

-কী বললো?

সুচরিতের মুখের দুটো কাঁচা দাঁত আজ ভেঙে গেছে, রক্তপাত এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বিছানার পাশে খানিকটা তুলো রাখা আছে, তাই দিয়ে সে মাঝে মাঝে কষ মুছছে। এখন সে আরেকবার রক্ত মুছলো।

চন্দ্রা সেই রক্তের দৃশ্য গ্রাহ্য না করে মাথাটা ঝুঁকিয়ে এনে আবার জিজ্ঞেস করলো, কী খারাপ কথা বলে? বল্! আমি শুনতে চাই।

সুচরিত মুখখানা বিকৃত করে বললো, শালা, বাঙালের বাচ্চা, দাঁত কেলিয়ে হাসছিস যে বড়? পোঁদে লাথি মেরে বাপের নাম খগেন করে দেবো। খাল খিঁচে বৃন্দাবন করে দেবো!

এই সব গালি গালাজের মর্ম বোঝার মতন বাংলা জ্ঞান নেই চন্দ্রার। শুধু বাঙাল শব্দটা কানে লাগলো তার। সে একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, শুধু বাঙাল বলে তোকে মারে? তোদের ক্লাসে, তোদের ইস্কুলে কি আর কোনো পূর্ববঙ্গের ছেলে পড়ে না?

-হ্যাঁ, অনেক পড়ে। আমাদের ক্লাসেই দশ-বারোজন পড়ে।

-তাদেরও ওরা মারে?

-না।

-তোকে মারলে অন্য পূর্ববঙ্গের ছেলেরা প্রতিবাদ করে না? তোকে সাহায্য করে না?

-না।

-সাহায্য করে না? তাহলে ঐ বদ ছেলেরা বেছে তোকেই শুধু মারে কেন?

-আমি একদিন ওদের সঙ্গে বাটখাড়া খেলে সাড়ে চার টাকা জিতেছিলুম।

-বাটখাড়া খেলা আবার কী খেলা?

-চৌকো ঘর কেটে তার মধ্যে খুচরো পয়সা রেখে দূর থেকে বাটখাড়া দিয়ে মারতে হয়।

পয়সা দিয়ে খেলা?

-হ্যাঁ।

-স্কুলের ছেলে....স্কুলের মধ্যে পয়সা দিয়ে এই সব খেলা হয়?

-স্কুলের মধ্যে নয়। পাশের বস্তির সামনে যে মাঠটা...

-তুই সেই খেলা খেলতে যাস?

-মোট তিনদিন খেলেছি। প্রথম দুদিন হেরেছিলাম, পর দিন জিতে আমার পয়সা উসুল করে

আর খেলিনি। ওরা আমাকে পয়সা ফেরত দিতে বলেছিল। জেতা কেন আমি ফেরত দেবো?

চন্দ্রা সোজা হয়ে বসে আঁচল দিয়ে মুখ মুছলো। তার মুখে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির চিহ্ন নেই। রাগের আঁচ ফুটে বেরুচ্ছে তার চামড়ার তলা থেকে

সে বললো, তোকে মেরেছে, বেশ করেছে! তুই পয়সা নিয়ে জুয়া খেলতে যাস বখাটে ছেলেদের সঙ্গে। তোকে দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। তোকে এই জন্য আমি এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিলুম? জঙ্গলে গিয়ে জংলি হয়ে থাকাই তোর উচিত ছিল। গাধা, কেউ যদি দল বেঁধে তোর ওপর অত্যাচার করতে আসে, তুই মারামারি করে তাদের সঙ্গে জিততে পারবি? একটা পচা ছুরি দিয়ে কেউ...উফ, তুই যে এত বোকা তা আমি ধারণাই করি নি। জিততে হয় বুদ্ধি দিয়ে। লেখাপড়া শিখে তুই যদি ওদের ছাড়িয়ে যেতে পারিস, সেটাই হবে আসল জেতা!

সুচরিত দৃঢ়ভাবে বললো, আমি আর লেখাপড়া করবো না।

-বাঃ বাঃ, বেশ, বেশ! একদিন অসমঞ্জ রায়ের কাছে গিয়ে লেখাপড়া শেখার জন্য কাঁদাকাটি করেছিলি না? এর মধ্যেই সে শখ মিটে গেছে?

-আমি ঐ ইস্কুলে আর কোনোদিন যাবো না। ওরা আমার নাম বদলে দিয়েছে। ওরা আমাকে বলে সুচরিত চাঁড়াল। আমি চাঁড়ালের ছেলে। ওরা বলে আমার বাবা মানুষ খুন হয়েছিল, তাই গভর্ণমেন্ট আবার বাবাকে এখান থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

-এসব কথা ওরা জনালো কী করে?

-আমার বাবা কোনো মানুষ খুন করে নি। আমরা চাঁড়াল নই, আমরা মণ্ডল। আমি ঐ শালাদের দেখে নেবো।

আবার সুচরিতের মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো, সে তুলো দিয়ে মুছলো।

আনন্দমোহন বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন সবই, তিনি এবারে ঢুকে এলেন ভেতরে। কাছে এসে বললেন, চন্দ্রা, আজ আর থাক, ছেলেটাকে আর বেশি কথা বলাস নি। স্কুলের ছেলে, তারও কী রকম নিষ্ঠুর হয়! বেঙ্গলের কী অবস্থা হলো! এখনো স্কুলের ছেলেরা বাঙাল, চাঁড়াল এই সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে?

চন্দ্রা মুখ তুলে আস্তে আস্তে বললো, বাবা, চাঁড়াল কী?

আনন্দমোহন বললেন, ওসব কথা এখন থাক। ছেলেটাকে একন ঘুমোতে দে। ওকে খানিকটা সিডেটিভ দেওয়া হয়েছে, তবু এখনো যে ঘুমোয় নি, সেটাই আশ্চর্য!

সুচরিতকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খুব ব্যথা করছে নাকি?

সুচরিত কোনো উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরলো। কেন সে চন্দ্রা ছাড়া আর কারুর কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবে না।

আনন্দোমোহন চন্দ্রাকে বাইরে নিয়ে এসে বললেন, ছেলেটার অত্মসম্মান জ্ঞান আছে, এই বয়েসে , সেটা কিন্তু কম কথা নয়। ক'টা দিন যাক, ওর রাগটা একটু কমুক, শরীরটা একটু সুস্থ হোক, তারপর ওকে অন্য কোনো স্কুলে ট্রান্সফার করিয়ে দিলেই হবে।

চন্দ্রা বললো, বাবা, আমার আর কিছু ভালো লাগছে না।

আনন্দমোহন বললেন, আমার আর কিছু ভালো লাগছে না।

আনন্দমোহন বললেন, বাবা, আমার আর কিছু ভালো লাগছে না।

আনন্দমোহন বললেন, এবারে তুইও কটা দিন বিশ্রাম নে। তোদের সেই আশ্রমের বাড়ি তৈরির জন্য তো হন্যে হয়ে ছুটছিস ক'দিন ধরে।

-সে বাড়ি তৈরির কাজ এখন বন্ধ আছে।

-কেন?

-টাকা নেই। যোগেন দত্ত টাকা দেবে বলেছিল, এখন আর দিচ্ছে না। আচ্ছা বলো তো, একটা লোক, সমাজে বাস করে, সংসার চালায়, ব্যবসাট্যাবসা করে, অথচ কথা দিয়ে কথা রাখে না? এটা সহ্য করা যায়?

-এরকম আছে অনেক লোক। তুই আর একা কত করবি? চ্যারিটেবল কাজে মাঝে মাঝে একটু-আধটু বাধা পড়েই। কেউই এত তাড়াতাড়ি একটা বাড়ি উঠিয়ে ফেলতে পারে না। ক'টা দিন যাক না, একটু বৃষ্টিতে ভিজুক, তাতে ভিত শক্ত হয়।

-ঐ যোগেন দত্তকে আমি ছাড়বো না। ওর কাছ থেকে আমি টাকা আদায় করবোই।

এরপর দুদিন চন্দ্রা বাড়ি থেকে বেরুলো না একবারও। সে কোনো কঠিন সঙ্কটের মধ্যে থাকে। এর মধ্যে এক সময় গেট দিয়ে অসমঞ্জ রায়কে আসতে দেখে সে ঝি-কে দিয়ে বলে পাঠালো যে তার মাথা ধরেছে, সে কারুর সঙ্গে দেখা করবে না।

চন্দ্রা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না, বাইরের লোকদেরও প্রশ্রয় দিচ্ছে না দেখে খুশী হলেন তার মা। মেয়ে তাঁর সঙ্গে খুলে কথা বলতে চায় না, তবু তিনি তিনি মেয়ের মনের গড়নটি খানিকটা বোঝেন। চন্দ্রা কোনো শক্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার আগে এরকম একা একা সময় কাটায়। এরকম তিনি আগেও কয়েকবার দেখেছেন। শিবানীর বিয়েতে চন্দ্রাকে এলাহাবাদ যেতে হবে, সেখানে গিয়ে অন্য কোনো বাড়িতে থাকার প্রশ্নই ওঠে না, তাকে উঠতেই হবে শ্বশুরবাড়িতে। তার স্বামীর সঙ্গে কী নিয়ে তার ঝগড়া হয়েছিল তা কেউ জানে না, কিন্তু তার স্বামীকে কেউ খারাপ ছেলে বলতে পারবে না। মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকলে ভুল-বোঝাবুঝি বাড়ে। এবারে চন্দ্রা তার স্বামীর কত কাছাকাছি যাচ্ছে অনেকদিন বাদে, এবারে ওদের মনের জট খুলে যাওয়া খুবই সম্ভব।

শনিবার এলাহাবাদ থেকে শিবানী আর তার দিদি-জামাইবাবু আসছেন কলকাতায়। হাওড়া স্টেশান থেকে তাঁদের নিয়ে আসার কথা। চন্দ্রার মা সেই জন্য আনন্দমোহনের কাছ থেকে বাড়ির গাড়ি চেয়ে রেখেছেন।

দুপুরবেলা তিনি চন্দ্রাকে বললেন, খুকী তৈরি হয়ে নে। হাওড়া স্টেশানে যাবি তো!

চন্দ্রা বললো, অমি আমি তো যেতে পারবো না, মা। আমার আজ বিকেলে জরুরি কাজ আছে।

মা অবাক হয়ে বললেন, যোগেন দত্তর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ডায়মন্ডহারবার যেতে হবে।

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, ডায়মণ্ডহারবার? সে তো অনেক দূর? শিবানী তোকে দেখতে না পেলে কী ভাববে বল্ তো? না, না, ওখানে আজ যেতে হবে না। বাদ দে তো! চল, হাওড়ায় চল আমার সঙ্গে।

চন্দ্রা তবু বলল, শিবানীর সঙ্গে দেখা তো হবেই। আমার কাজটা খুব জরুরি; অন্যদিন গেলে হবে না। আমার যদি বেশি রাত হয় ফিরতে, শিবানীকে শুয়ে পড়তে বলো। তোমারও জেগে থাকার দরকার নেই।

মা এবার কঠোরভাবে বললেন, তুই ঐ যোগন দত্ত নামের লোকটার সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার যাবি, সেখানে আবার কী কাজ?

এরকমভাবে যাওয়া, লোকে শুনলে কী বলবে? এই সময় শিবানীরা আসছে, এখন অন্তত...

মাকে থামিয়ে দিয়ে চন্দ্রা বললো, আমি করছি, তা আমি ভালো করেই বুঝি, মা। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

॥ ৪৪ ॥

আমার্নিটোলার পিকচার প্যালেস থেকে মামুন ফিরে এলেন ভাঙা মন দিয়ে। যা সব ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে তিনি কিছুতেই নিজেকে মেলাতে পারছেন না।

মাদারিপুর থেকে চলে আসার পর মামুন এই কয়েকমাস ঢাকাতেই আছেন। তিনি আলাদা একটা বাসা ভাড়া করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর যদি কিছুতেই তাতে রাজি হননি। সেগুনবাগিচার বাড়িটা মস্ত বড়, বেশ কয়েকটা ঘর খালিই পড়ে থাকে, তবু তাঁর ভাই পয়সা খরচ করে আলাদা বাসায় থাকবে একথা মালিহা বেগম কানেই নতুন চান না।

মামুন এখন পরিপূর্ণ বেকারও নন। টাঙ্গাইলে সেই সম্মেলনের সময় মানিক মিঞার সঙ্গে পুরোনো আলাপটা ঝালিয়ে নেবার পর তিনি মানিক মিঞার কাছ থেকে ইত্তেফাক পত্রিকায় যোগ দেবার প্রস্তাব পান। মামুন অবশ্য চাকরি নিতে সম্মত হননি, তবে প্রতি সপ্তাহে একটি করে কলাম লিখেছেন, প্রায় প্রতি সন্ধেবেলাতেই তিনি ইত্তেফাক অফিসে আড্ডা দিতে যান। তাঁর আর একজন পুরনো দোস্ত জনাব আবুল মনসুর আহমদের প্রভাবে তিনি আওয়ামী লীগ কাউন্সিলেরও সদস্য হয়েছেন।

তাঁর মেয়ে হেনা এমনই বাবার ভক্ত যে সে-ও ফিরে যেতে চায় নি দেশের বাড়িতে, মামুন তাকে ভর্তি করে দিয়েছেন ঢাকার একটি স্কুলে। মাঝে অবশ্য দুবার মামুন ঘুরে এসেছেন মাদারিপুর, তাঁর

মন চাইছে না। পাকিস্তানের এখন একটা সন্ধিক্ষণ চলছে বলা যায়। এই সময়ে তিনি ঘটনার কেন্দ্র থেকে দূরে থাকতে চান না। ফিরোজা বেগম নিজে ঢাকায় আসতে চান না, বড় শহর তাঁর পছন্দ নয়, নিজের সংসার অতিথি হয়ে থাকা তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না। তাঁর বাগান করার শখ, নিজের তত্ত্বাবধানে পোঁতা বেগুন, টমাটো ও শশাগাছগুলির ফলাফল না দেখে তিনি কোথাও নড়তে চান না। তা ছাড়া, মামুন জানেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দিদির কোনো দিন বনিবনা হয়নি। মামুনও মনে মনে কিছুদিনের জন্য সাংসারিক জীবন থেকে অব্যাহত চাইছিলেন।

সেগুনবাগিচার এই বাড়িটিতে মামুনের প্রধান আনন্দের উৎস হলো মঞ্জু। মামুনের স্ত্রী গান-বাজনা পছন্দ করেন না, আর এ বাড়িতে সব সময়ই যেন আবহাওয়াতে সুর ভাসছে। তাঁর ভগ্নীপতি আলম সাহেব মজলিসি মানুষ, বাইরে থেকে গায়ক-বাজনাদারদের তিনি প্রায়ই ডেকে আনেন, তা ছাড়া নিজের সন্তানদের গান-বাজনা শেখার ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট উদার। মঞ্জু মেয়েটার যেন সত্তায় মিশে আছে সঙ্গীত। যখন তখন সে গান গেয়ে ওঠে। অনেক সময় সে অন্যের কথার উত্তর দেয় গানের লাইন দিয়ে।

মামুন তাঁর নিজের জীবন বা সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো চিন্তা করেন না। যা হবার তা তো হবেই,-এইরকম একটা দার্শনিকসুলভ মনোভাব আছে তাঁর। অবশ্য তাঁর খাওয়া-পরার সমস্যা নেই, জমি -জমা থেকে বৎসরের ভবিষ্যৎ। দেশের ভবিষ্যৎ গড়তে হয়। এই ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য স্বপ্ন দেখতে হয়, সকলে স্বপ্ন এক হয় না, তাই নিয়েই যত বিপত্তি।

বাইরের জগতের ব্যাপার-স্যাপার দেখে যখন মামুনের খুব খারাপ লাগে তখন তিনি দুতিনদিন আর বাড়ি থেকে বেরোন না। তখন তিনি মঞ্জুকে অনবরত অনুরোধ করেন, গান শোনা, মামণি গান শোনা আমাকে।

মঞ্জুকে দেখে, মঞ্জুর গান শুনে মামুনের অনেক দিন বাদে কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয়েছে। লিখেছেনও দুতিনটে, কোথাও ছাপতে দেননি। মঞ্জুকে দেখে তাঁর ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে যায় ছাত্র বয়েসে তাঁর প্রেরণাদাত্রী, দাযুদকান্দির সেই গায়ত্রী ওরফে বুলার কথা। বুলার বন্দনা স্তোত্রেই তাঁর আশমানী প্রজাপতি নামে প্রথম কাব্যপুস্তকটি ভরা। সে কথা বোধহয় আর কেউ জানে না, এমনকি বুলাও জানে না। বুলাকে তিনি তার বিয়ের পর একবারও দেখেন নি, সেইজন্যই বুলার অষ্টাদশী তরুণী মূর্তিটি তাঁর চোখে জেগে আছে। বুলা এখন কোথায় আছে কে জানে। মামুনের সেই সময়কার বন্ধু প্রতাপের সঙ্গেও আর যোগাযোগ নেই।

বুলার সঙ্গে মঞ্জুর অবশ্য তুলনা চলে না। মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও বুলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ছিল প্রেমের। কোনোরকম প্রতিদানের আশা না করেও মামুন বুলাকে ভালোবেসেছিলেন। আর মঞ্জু তাঁর দিদির মেয়ে, তাঁর কন্যাসমা। তবু মঞ্জুর যৌবন-চাঞ্চল্য, তার সারল্যের সৌন্দর্য, গান গাওয়ার সময় তার আত্মনিবেদনের রূপ, এসব যখন মামুন দেখেন, তখন তিনি মঞ্জুর গুরুজন থাকেন না, সব গোপনের চেয়েও অতি গোপন।

শহীদ আর পলাশ নামে কলকাতার দুটি ছোকরা এসে মঞ্জুর জীবনে একটা ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। ওরা চলে যাবার পর মঞ্জু যখন তখন কান্নায় ভেঙে পড়তো। বাবা-মায়ের কাছে তখন খুব বকুনি খেয়েছে মঞ্জু। মামুন তখন অতিশয় স্নেহে ও যত্নে মঞ্জুর হৃদয়ের শুশ্রূষা করেছেন। এখন সে অনেকটা সামলে উঠেছে। প্রথম কয়েকমাস তো কলকাতায় যাবার জন্য খুব বায়না ধরেছিল, এখন আর সে কথাও বলে না। মামুন অবশ্য কোনো এক সময় ওকে কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন।

এ বাড়ির তিনতলায় একটি মাত্র ঘর, বাদবাকি ছাদ। সেই ঘরে মামুনের আস্তানা। সম্প্রতি তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই বয়েসে আর নতুন কিছু করা যায় না। কিন্তু ইত্তেফাক কাগজে লেখা শুরু করা ও আওয়ামী লীগ সক্রিয় অংশগ্রহণ করার পর তিনি যেন আবার নতুন করে কর্মচাঞ্চল্য অনুভব করছেন।

মামুনের অগোছালো স্বভাবের জন্য মঞ্জু প্রায়ই এসে তাঁকে বকুনি দেয়। মামুন তাতে মজা পান। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বকুনি দেবার লোক কমে আসছে। এক সময় মামুন তাঁর বাবাকে খুব ভয় পেতেন। তাঁর বাবার ইন্তেকাল হয়েছে অনেকদিন। কলকাতায় থাকার সময় মামুন ভয় ও ভক্তি সম্ভ্রম করতেন ফজলুল হককে। সেই ফজলুল হক এখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর, তাঁর আগেকার ব্যাঘ্রবিক্রম

আর নেই। বয়েসের ভারে পীড়িত, কেমন যেন জরদগব অবস্থা। মামুন একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। ফজলুল হক মামুনকে ঠিক যেন চিনতেই পারলেন না। অথচ এই ফজলুল হকের কথাতেই মামুন নিজের কেরিয়ার নষ্ট করে পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে ইস্কুল খোলার কাজ নিয়ে জীবনের মূল্যবান কয়েকটি বৎসর ব্যয় করেছেন। আর মামুন ভয় পেতেন তাঁর এক পিসিমাকে. তিনিও আর বেঁচে নেই। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মামুনের ঠিক মনের মিল না হলেও তাঁকে তিনি ভয় পান না। ফিরোজা বেগম বকাবকি করেন না, যেদিন যেদিন অসদ্ভাব হয়, সেদিন সেদিন তিনি কথা বন্ধ করে দেন, মামুন তাতে স্বস্তি বোধ করেন।

এখন বয়েস হচ্ছে, মামুন বুঝতে পারেন, এখন থেকে ছোটরাই তাঁকে বকুনি দেবে।

মঞ্জু যখন তখন তিনতলার ঘরে এসে বলবে, মামু, তোমাকে নিয়ে পারি না! আবার তুমি মাটিতে সিগারেটের টুকরো ফেলেছো! তোমাকে তিন তিনখানা ছাইদান দিয়েছি!

মামুন মঞ্জুকে দিয়ে কাজ করাতে ভালোবাসেন। তিনি হেসে বলেন, কাল রাতে ঘুমাতে পারি নাই, তোরা তো খোঁজও রাখিস না। ঐ দ্যাখ, দরজার ধারের পেরেকটা খসে গেছে, কাল মশারি টাঙাতে পারি নাই!

মঞ্জু কলকণ্ঠে বলে ওঠে, তুমি বিনা-মশারিতে শুয়ে রইলে? হায় আল্লা, তুমি যে কী, একটা পেরেক ঠুকতেও জানো না। তুমি শুধু কাগজের ওপর কলম ঘষতে জানো!

পেরেক ঠোকার জন্য মঞ্জু একটা হাতুড়ি বা ইঁট খোঁজে, তা না পেয়ে সে তার দাদীর পান ছেঁচার হামান দিস্তা নিয়ে আসে। পুরোনো গর্তে পেরেকটি ঠিকঠাক বসাবার জন্য সে মনপ্রাণ একাগ্র করে ফেলে। কৃত্রিম বিরক্তিতে মামুন দু'কানে হাত চাপা দিয়ে বলে ওঠেন, উঃ, আর না, আর না! কর্কশ শব্দ আমি সহ্য করতে পারি না। দিলি তো মুডটা মাটি করে। নে, হয়েছে, এবার একটা শোনা তো!

কাজ সাঙ্গ করার পর মঞ্জু বলে, মামু, তোমার মতন গান-পাগল আমি আর দেখি নাই। আমার জানা সব কয়টা গানই তো আমার পঞ্চাশবার শোনা হয়ে গেছে!

মামুন বলেন, ওরে, ভালো গান পঞ্চাশ কেন, একশোবার শুনলেও পুরনো হয় না। তুই ঐ গানটা কর তো, পুরোনো সেই দিনের কথা সেও কি ভোলা যায়....

মঞ্জু কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মামুনের দিকে। তার মুখে মৌসুমী মেঘের মতন অকস্মাৎ একটা ছায়া পড়ে। সে আস্তে আস্তে বলে, জানো মামু, আমার কলেজের কয়েকটা মেয়ে বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গাইলে নাকি গুনাহ হয়। উনি ইন্ডিয়ার কবি, বিধর্মী।

-আমি অতশত বুঝি না। আমার ভালো লাগে।

-শোন, কবিতা, গান এসব হলো অন্তরের জিনিস। এ সবের ওপর কোনো ফতোয়া জারি করা যায় না। যার যেটা ভালো লাগে সে তা-ই করবে। তুই ধর তো গানটা।

মঞ্জুকে বেশি সাধাসাধি করতে হয় না। সে সারা ঘর ঘুরতে গানটা গাইতে থাকে। চক্ষু দুটি বোজা, শরীরটা একটু একটু দোলে। দুটি হাত বুকের কাছে জোড় করা। তার পরনে একটা জাফরানি রঙের শাড়ি, তার অঙ্গটি বেতসলতার মতন, বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে তার চুল। মামুন শ্রাবণ ও দর্শন সমান সমান করে চেয়ে রইলেন তার দিকে। প্রকৃতির কী অপার রহস্য, এই মেয়েটাকে তিনি প্রায় জন্মাতে দেখেছেন বলা যায়, হামাগুড়ির বয়েসে বড় ছিচ-কাঁদুনে ছিল, দেখতেও ভালো ছিল না, সবাই বলতো বাপের মতন মুখ হয়েছে, তারপর ধীরে ধীরে বড় হলো, আর পাঁচটা মেয়ের মতনই ফ্রক পরে ইস্কুলে যেত, আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। হঠাৎ যৌবনে পা দিয়ে তার কী অসাধরণ পরিবর্তন। সর্বক্ষণ ঝলমল করে তার হাসি সুন্দর, তার কথা বলার ভঙ্গি সুন্দর, তার হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত কী সুন্দর! সে যখন ঘরে ঢোকে, এক ঝলক বসন্ত বাতাস নিয়ে আসে।

এই মেয়েটিকে বেশ খোলামেলা, তবে এখনো সে নিজস্ব স্টাইলটি খুঁজে পায় নি। এখন সে পশ্চিম বাংলার শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের অনুকরণ করছে কিছুটা। উচ্চারণ পরিষ্কার, প্রতিটা শব্দের ওপর আলাদা ঝোঁক। কলিম শরাফীর কাছে কিছুদিন তালিম নিলে এ মেয়ে উঁচুদরের শিল্পী হতে পারবে।

গানটি শেষ হওয়া মাত্র মামুন অন্যমনস্ক ভাবে তাঁর খাতাটা খুলে লিখলেন, 'অতীব সুন্দর কিছু দেখি যদি বক্ষে ব্যাথা জাগে...'। এই লাইনটা লেখার পর তিনি দ্বিতীয় লাইনটির চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেলেন। মঞ্জুকে যে তার গান শুনে কিছু একটা বলা উচিত, সে কথা মনেই রইলো না। মঞ্জু একটুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, মামু, কী লিখেছো?

সঙ্গে সঙ্গে ঘোর ভেঙে গেল, মামুন লজ্জা পেয়ে গেলেন। খাতাটা বন্ধ করে বললেন, কিছু না। এই লাইনটা যে তিনি মঞ্জুকে দেখেই লিখছেন তা নয়, হঠাৎ এরকম এক একটা অনুভূতি আসে, গানটা শুনতে শুনতে তাঁর বুকে একটা ব্যথার ভাব জেগেছিল। কিন্তু এরকম একটা লাইন যেন নিজের ভাগ্নীকে দেখানো যায় না, তিনি আবার বললেন, কিছু না।

মঞ্জু তাঁর পাশে বসে পড়ে বললো, তবু আমি দেখবো। তুমি মধ্যে মধ্যেই কী সব লেখো? গান লেখো বুঝি?

মামুন খাতাটা পেছনে লুকিয়ে বললেন, আরে না রে, ওতে সব প্রাইভেট কথা লিখে রাখি, ছোটদের দেখতে নাই।

-ইস্ আমি বুঝি ছোট?

কথা ঘোরাবার জন্য মামুন জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, বাবুল আর এসেছিল? তোরে অঙ্ক দেখায় দেবার কথা বলেছিলাম না ওকে?

মঞ্জু মাথা নেড়ে বললো, মোটেই আমি তার কাছে অঙ্ক শিখবো না। সে মোটে কথাই বলতে পারে না!

আলতাফের ভাই বাবুলকে মামুনের খুব পছন্দ। ছেলেটি খুব লাজুক ঠিকই। কিন্তু পড়াশুনোয় খুব মাথা, একেবারে হীরের টুকরো ছেলে। মঞ্জুর সঙ্গে ভালো মানাবে।

তিনি মঞ্জুর চুলে হাত দিয়ে বললেন, বাবুলের সঙ্গে তোর ভাব নাই! চমৎকার ছেলে!

মঞ্জুর চুলে হাত দিয়ে দিয়ে বললেন, বাবুলের সঙ্গে তার ভাব হয় নাই! চমৎকার ছেলে!

মঞ্জু বললো, সে মোটে কথাই বলে না। তার সাথে আমার ভাব করতে বয়ে গেছে!

মামুন হাসতে হাসতে মঞ্জুর পিঠে একটা চাপড় মেরে বললেন, অ্যাঁ, কী বললি, বয়ে গেছে'? তুই যে শহীদ-পলাশদের সঙ্গে কয়েকদিন মিশেই কলকাত্তাইয়াদের মতন কথা বলতে শিখেছিস!

নিচতলা থেকে কে মঞ্জুর নাম ধরে ডাকলো, মঞ্জু চলে গেল।

মামুন ভাবতে লাগলেন বাবুল আর আলতাফের কথা। আলতাফই তাঁকে স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে টেনে এনেছে, আলতাফের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আলতাফ আজকাল তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। আলতাফ যথেষ্ট প্রগতিশীল মনে করে না। একদিন আলতাফ তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিল, কী মামুন ভাই, আপনি আওয়ামী লীগের মুরুব্বিদের ধরে মন্ত্রিত্বের গদি চান নাকি?

আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙন আসন্ন। সেদিন পিকচার প্যালেসের অধিবেশনের শেষেই মামুন সেটা বুঝে গেছেন। মওলানা ভাসানী পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে একেবারে জিদ ধরে আছেন। আওয়ামী লীগের নেতা সোহরাওয়ার্দি এখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তিনি আমেরিকার সঙ্গে গাঁটছড়া বাধার নীতি সমর্থন করবেনই, অথচ সেই আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ভাসানী সাহেব প্রকাশ্যেই এই নীতির নিন্দা করছেন। ভাসানী সাহেবের মনোভাবটা সব সময় সরকার বিরোধী, এখন তাঁর নিজের দল সরকার হতে পেয়েছে, তবু তিনি সরকার-বিরোধিতা ছাড়তে পারছেন না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। আগামী নির্বাচনের কথা ভেবে আওয়ামীলীগের এখন সরকারে থাকাই উচিত, মামুনও এটা মনে করেন, কিন্তু মওলানা ও তাঁর সমর্থকরা এটা কিছুতেই বুঝবেন না। দু'পক্ষে নিন্দা-মন্দ কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেছে। সেদিন পিকচার প্যালেসের ভোটাভুটিতে মওলানার হার হলো, তবু মওলানা সেই ভোটের ফলাফলকে মিথ্যা বললেন।

আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকাটাও মামুন ঠিক বুঝতে পারছেন না। এই তরুণ নেতাটি সংগঠনের কাজ ভালো জানে, খাঁটি দেশপ্রেমিক যে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু বড্ড গরম। নিজের মতটাই চেঁচিয়ে জাহির করে, অন্যের কথা শুনতে চায় না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সঙ্গে তার স্পষ্ট মনোমালিন্য সবাই টের পেয়ে গেছে। ভাসানীপন্থীদের আর ভাসাপন্থীদেরও অনেককে সে খেপিয়ে রেখেছে। সে তো চেষ্টা করতে পারতো সোহরওয়ার্দী আর ভাসানীর মধ্যে একটা আপস সমঝোতার ব্যবস্থা করতে, তা নয়, সে যেন ভাসানীকে ঠেলে দিচ্ছে আরও দূরে।

মামুন যা ভেবেছিলেন, কয়েকদিন পর তাই-ই হলো। মওলানা ভাসানী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন। রূপমহল সিনেমা হলে তিনি আলাদা একটি সম্মেলন ডাকলেন।

মামুন ভাসানীর দলে গেলেন না। তিনি আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী দল হিসেবে টিকিয়ে রাখায় পক্ষপাতী। কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের ওপর আস্থা রাখে।

তবু মামুন ভাসানী সাহেবের বক্তব্য শোনার জন্য গেলেন রূপমহল সিনেমা হলে।

ভাসানী সাহেব সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের ওপর আস্থা রাখে।

তবু মামুন ভাসানী সাহেবের বক্তব্য শোনার জন্য গেলেন রূপমহল সিনেমা হলে।

ভাসানী সাহেব সমস্ত প্রগতিশীল দলগুলিকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির সমর্থকদের ডাক দিয়েছেন। ভিড় মন্দ হয়নি। বামপন্থীরা সবাই এসে জুটেছে। মামুন এঁদের অনেককেই একটু একটু চেনেন। ফজল আলী মন্টু নামে একজন লোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। কথাগুলো মামুন শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু তিনি জানেন, ঐ লোকটি সোহরাওয়ার্দি সাহেবকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। কাগমারি সম্মেলনের পর ঐ লোকটি অভিযোগ করেছিল, ছাপ্পান্নর সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি আটানব্বই ভাগ মেনে নেওয়া হয়েছে, এই কথা ঘোষণা করে সোহরাওয়ার্দি বাঙালী জাতির প্রতি শত্রুতা করেছেন।

মামুন এদিক ওদিক তাকিয়ে আলতাফ আর তার ভাই বাবুলকে খুঁজতে লাগলেন। মতের অমিল হলেও ও এই দুটি ছেলের ওপর তাঁর বড় টান জন্মে গেছে। তিনি ওদের দেখতে পেলেন না।

সিনেমা হলের বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বহু লোক। এরা ভেতরে যেতে চায় না, এরা বোধহয় মজা দেখতে এসেছে। এত বড় শক্তিশালী আওয়ামীলীগ দলটা ভেঙে দু টুকরো হয়ে যাচ্ছে, এতে মুসলিম লীগের সমর্থকরা, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা তো মজা পাবেই। মওলানা ভাসানীর দল কতটা ভারি হয় তার ওপর নির্ভর করছে কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দি সরকারের পতন হবে কি না।

বেশ কিছু পুলিশও দাঁড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। গেটের দিকে এগোতে মামুন টের পেলেন, কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। যেন হঠাৎ একটা কিছু ঘটবে। ইস, এখানে কী মওলানা ভাসানীকে বোঝানো যায় না, দল ভাঙবেন না, দল ভাঙিবেন না! আলাপ-আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলুন!

মামুন একবার ভাবলেন, তাঁর কী রূপমহল সিনেমার মধ্যে ঢোকা ঠিক হবে? যদি কেউ ভাবে তিনি এই নতুন দলে যোগ দিতে এসেছেন? যদি অত্যুৎসাহী ছেলে-ছোকরারা তাঁকে চিনতে পেরে টানাটানি করে মঞ্চে উঠিয়ে দেয়? না, তিনি এই বিভেদের রাজনীতিতে নিজেকে জড়াতে চান না। যদিও তাঁর কষ্ট হচ্ছে খুব।

তিনি বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। মাইক দেওয়া হয়েছে, এখান থেকেই বক্তৃতা শোনা যাবে।

তিনি আগেই জেনেছেন যে এই নতুন দলের নাম হবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, সংক্ষেপে ন্যাপ। এই দল নতুন কী কী প্রোগ্রাম নেয় সেটাই তাঁর জানার কৌতূহল।

সিনেমা হলের মধ্যে সভার কাজ শুরু হতে না হতেই হঠাৎ বাইরে একটা তুমুল সোরগোল উঠলো। কয়েকখানা ট্রাক হুড়মুড়িয়ে এসে থামালো, সেগুলি থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামলো তরুণ ছেলের দল, হাতে লাঠি। ট্রাকগুলির পেছনেও দৌড়ে আসছে অনেক লোক। দৌড়োতে দৌড়োতে তারা বড় বড় ইট ছুঁড়ছে।

প্রায় চোখের নিমেষেই স্থানটি রণক্ষেত্র হয়ে গেল। মাথা বাঁচাবার জন্য মামুন দৌড় লাগালেন। কারা এই মিটিং ভাঙতে এলো? মুসলিম লীগের সাপোর্টাররা? তাদের এখনো হয় ছাত্র, ছাত্রদের মধ্যে ওদের এত জনপ্রিয়তা?

কিছু দূরে গিয়ে মামুন থামালেন। ইট ছোঁড়া সমান ভাবে চলছে। লাঠি দিয়ে পেটাবার দমাদম শব্দ হচ্ছে। মামুন কান পেতে শ্লোগানগুলো শোনার চেষ্টা করলেন। চিৎকার-চ্যাচামেচিতে কিছুই প্রায় বোঝা যাচ্ছে না, তবু মামুনের খটকা লাগলো। পুলিশ নিষ্ক্রিয় কেন? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন পুলিশ দিব্যি হাত গুটিয়ে রয়েছে। তাহলে কি তাদের ওপর নির্দেশ আছে আক্রমণকারীদের বাধা না দেবার? কেন্দ্রে এবং রাজ্যে এখন আওয়ামী লীগ সরকার!

মামুন দেখতে পেলেন একটা ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে তাঁর বরিশালের বন্ধু বদ্রু শেখ। এবারে তিনি আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগের যুবককর্মীকে চিনতে পারলেন।

মামুন আবার ফিরে এগোতে লাগলেন সেই ট্রাকের দিকে। কোনোরকমে অন্যদের ঠেলেঠুলে তিনি উঠে পড়লেন ট্রাকের ওপর, বদ্রুর হাত চেপে ধরে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, এসব কী হচ্ছে

পাগলামি! এই বদ্রু, বদ্রু!

বদ্রু শেখ সত্যিই পাগলের মতন গলা ফুরিয়ে চিৎকার করতে করতে লাফাচ্ছিল, মামুনের। ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গিয়ে বললো, তুমিও এসেছো? বেশ করেছো, মারো শালাদের!

রাগে জ্বলে উঠে মামুন বললেন, তুই এইসব ছেলেগুলোরে ক্ষেপিয়েছিস? মাত্র কয়দিন আগে যারা ছিল আমাগো ভাই ও বন্ধু, তাদের মারতে এসেছিস?

বদ্রা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, বাদ দে, ওসব কথা বাদ দে! ভাই-বন্ধু না চাই! ওরা বিশ্বাসঘাতক! ওরা রাষ্ট্রের শত্রু! ওদের এই পার্টি ফর্ম করতে আমরা দিমু না-কিছুতেই দিমু না!

মামুন বদ্রুকে ঠেলতে ঠেলতে এক কোণায় নিয়ে গিয়ে বললেন, তোকে এই ফোপর দালালি করতে কে বলেছে? আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে কী এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে? আমি কাউন্সিলের মেম্বার, তুই কে? আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক পার্টি, আমরা গুণ্ডামির প্রশ্রয় দিই না।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে-কোনো মানুষকে অন্যদের চোখে হেয় কিংবা ঘৃণ্য করতে গেলে তিনটি বিশেষণই যথেষ্ট। সেই তিনি বিশেষণ হচ্ছে, ইসলামের শত্রু, পাকিস্তানের শত্রু এবং ভারতের দালাল! মাত্র কিছুদিন আগেও যিনি ছিলেন তাঁদের পার্টির শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট, সেই মাওলানা ভাসানী সম্পর্কে বদ্রু শেখ অবিকল সেই তিনটি বিশেষণই প্রয়োগ করলো।

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলেন মামুন। তাঁর অবস্থা দেখে হেসে উঠলো বদ্রু শেখ। তারপর মামুনের কাঁধ চাপড়ে বললো, তুমি ঠাণ্ডা ধাতের মানুষ, তুমি এসবে মাথা গলাইয়ো না। বাড়ি গিয়া ঘুমাও!

তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে মামুন বললেন, তোমার এত উৎসাহ কেন? সোহরাওয়ার্দি মিনিস্ট্রি ফল করলে তোমার মতন ব্যবসায়ীদের মুশাকল হবে, তাই যেমন করে হোক টিকিয়ে রাখতে চাও!

বদ্রু শেখ জোর দিয়ে বললো, আলবৎ! আমাদের লীডার এখন পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার, শিল্প মন্ত্রী আবুল মনসুর আমাদের নিজস্ব লোক, আমরা এখন নতুন নতুন লাইসেন্স পাইতে আছি, এখন যদি কেউ দুশমনি করতে আসে-

-ব্যবসায়ীদের স্বার্থ আর দেশের মানুষের স্বার্থ তাইলে এক? তার জন্য গণতন্ত্ররে যদি বলি দিতে হয়-

-গণতন্ত্ররে কে বলি দিচ্ছে?

-এই যে পুলিশ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর গুণ্ডামি করে একটা পার্টি কনভেনশন ভাঙা হচ্ছে?

মামুর লরি থেকে নামতে উদ্যত হয়ে বললেন, তোমাদের এসব বাঁদারামো আমি সহ্য করবো না। আমাদের পার্টির একটা ইমেজ আছে। আমি সেক্রেটারি শেখ মুজিবর রহমানকে এখনি টেলিফোন করতেছি....

বদ্রু শেখ মামুনের হাত ধরে টেনে বললো, দাঁড়াও, আগে সব শুইন্যা লও! আরে শেখ মুজিবই তো আমাগো পাঠাইছে। আমি নিজের দুই দুইটা ট্রাক দিছি তাঁর কথায়। তিনিই তো ইউনিভার্সিটি আর ছাত্র ডরমিটারিগুলো থেকে ছাত্রদের জুটাইতে কইছেন।

মামুনের মুখখানা মুহূর্তে যেন কালিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি আর কথা বলতে পারলেন না।

বদ্রু শেখ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললো, কাম ফতে! দ্যাখো, অরা পলাইতে আছে। কাল পল্টন ময়দানে অরা প্রকাশ্য সম্মেলন করবে, সেখানে আরও জোর পিট্টি দেবো! মামুন ভাই, এয়ারে কয় রাজনীতি!

মামুন এবারে দূরে দেখতে পেলেন আলতাফকে। সে একটি আহত ছেলেকে পাঁজা কোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির কপালে রক্ত, কে ও, বাবুল নাকি? আলতাফ একবার তাকালো এদিকে। সে কি মামুনকে দেখতে পেয়েছে, এই পাথর-ছোঁড়া, হামলাকারীদের ট্রাকে?

মামুন দু'হাতে নিজের মুখ চাপা দিলেন।

॥ ৪৫ ॥

পাড়াটির নাম বাগবাজার হলেও দৈনিক বাজারের জন্য যেতে হয় শ্যামবাজারে। ছুটিছাটার দিন হলে প্রতাপ আর একটু উজিয়ে চলে যান হাতিবাগানে। ওখানে মাছ ভালো পাওয়া যায়, বিশেষত জ্যান্ত মাছ।

মাছের বাজারে প্রতাপ বেশ কিছুক্ষণ ঘুরতে ভালোবাসেন। কেনার চেয়েও দেখাতেই বেশি আনন্দ। জ্যান্ত ট্যাংরা, ছটফট করে লাফানো চিংড়ি, কাৎলা মাছের মুখ খোলা আর বন্ধ হওয়া ...মাছের দেশের মানুষদের এ দৃশ্য তো প্রিয় হবেই। মালখানা গরে নিজেদের বাড়ির পুকুরে প্রতাপ বড়শী দিয়ে অনেক মাছ ধরেছেন একসময়ে। কাৎলা নয়, প্রতাপদের পুকুর যে-মাছটা বেশি ছিল তার নাম কালবোস। ভারি মিষ্টি স্বাদ। আর সোনালি রঙের ট্যাংরা। এদেশে যার নামপোনা মাছ, ওদেশে তার নাম নলা। একবার সিরাজগঞ্জে গিয়ে প্রতাপ যে রুই মাছ খেয়েছিলেন সে রকম রুইমাছের স্বাদ আর বহুদিন পাননি। আর একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, এদিককার চিংড়ি মাছের স্বাদ অনেক ভালো। সেইজন্যই এদিকে অনেকে এখনো বলে, 'বাঙাল, চিংড়ি মাছের কাঙাল।'

প্রতাপ নিজে থেকে মাছের দর জিজ্ঞেস করেন না আগে। অন্য খদ্দেরদের পাশে দাঁড়িয়ে মাছওয়ালার সঙ্গে দরাদরি শোনেন। একটু ভালো মাছ হলেই প্রতাপদের মতন ক্রেতাদের সাধের বাইরে চলে যায়। প্রতাপ প্রাণে ধরে দেওয়া মাছ কিনতে পারেন না। অল্প-স্বল্পও কিনতে পারেন না। কেউ কেউ অনায়াসে আধ পো বা এক পো মাছ দিতে বলে। ঢাকার কোনো মাছওয়ালা হলে শুনিয়ে দিত, বাবুর বাড়িতে আইজ যজ্ঞ নাকি?

মাছের দাম দিন দিনই বাড়ছে। গত সপ্তাহে ছিল তিন টাকা সের, এ সপ্তাহে সাড়ে তিন। আজ ছুটির দিন বলে বড় সাইজের জ্যান্ত ট্যাংরা চাইচে চার টাকা! অবিশ্বাস্য ব্যাপার! চার টাকা দিয়ে কে মাছ কিনে খাবে? কালো কালো ট্যাংরাগুলো, দেখলেই বোঝা যায় ডিম ভর্তি টে, এই মাছ প্রতাপের খুব প্রিয়। কিন্তু প্রতাপের বাজারের বাজেটই তিন টাকা। সুপ্রীতিকে বাদ দিয়ে প্রতাপের বাড়িতে মাছ খাবার লোক ছ'জন, ঐ মাছ অন্তত এক সের কেনা উচিত। এখন সব দিক হিসেব করে চালাতে হচ্ছে, প্রতাপের বাজেট বাড়াবার উপায় নেই।

মাছের বাজারে এরকম আগুন লাগার কারণ পাকিস্তান থেকে হঠাৎ মাছ আসা বন্ধ হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলায় নদী-খাল-বিল কম, মাছও কম। বিহার-উড়িষ্যা থেকে মাছ এনেও কলকাতার মৎস্য ক্ষুধা মেটানো যাচ্ছে না। কলকাতায় শুধু যে জনসংখ্যা বেড়েছে তাই-ই নয়। মাছ-খোর বাঙালের সংখ্যা অনেক গুণ বেড়েছে। পূর্ব বাংলা থেকে যত মানুষ চলে এসেছে, তাদের কথা ভেবেই তো পূর্বপাকিস্তান থেকে রোজ কিছু মাছ পাঠানো উচিত। অথচ প্রতাপ খবরের কাগজে পড়েছেন, বরফের অভাবে খুলনায় অনেক মণ ইলিশ মাছ পচে যাচ্ছে, কোনো কোনো দিন চার পয়সা, ছ' পয়সা সেরে ইলিশ বিক্রি হচ্ছে সেখানে। বঞ্চিত হচ্ছে সেখানকার জেলে সম্প্রদায়।

কলকাতার বাজারে মাছের তুলনায় মাংস সস্তা। পাঁঠার মাংস এখনো তিন টাকা। কিন্তু মাংস তো মাছের মতন এক দু'টুকরো খাওয়া যায় না। প্রতাপদের যৌবন বড় জামাবাটি ভর্তি মাংস দেওয়া হতো এক একজনকে, কবজি ডুবিয়ে খাওয়া হতো। তাঁর ছেলেমেয়েদের এখন উঠতি বয়েস, তারা দু'টুকরো মাংস খাওয়ার পর থালা চাটবে, এ দৃশ্য প্রতাপ সহ্য করতে পারেন না।

একজনের কাছে একটা বোয়াল মাছ রয়েছে। গায়ের চকচকে ভাবটা দেখেই বোঝা যায় মাছটা টাটকা, ওজন হবে সের খানেক। বোয়ালেরদামও সস্তা। এক টাকা বারো আনা করে চাইছে, একটু চেপে ধরলে দেড়টাকায় দেবে। কিন্তু মমতা বোয়াল মাছ খান না। সেই দেখাদেখি ছোট মেয়েটাও খায় না। ওদের নাকি বোয়াল নয়, মমতা বেলে মাছ, শোল মাছ, চিতল মাছ এসব খান না। বান মাছ দেখলে তো তাঁর ঘেন্না হয়, ওগুলো নাকি সাপের মতন।

প্রতাপের পকেটে একটা দশ টাকার নোট আছে বটে কিন্তু খরচ না বাড়াতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বোয়াল মাছের কাছ থেকে সরে গিয়ে, ডডমভরা টাংরা মাছগুলোর দিকে কয়েকবার তারিফ করা চোখে তাকিয়ে তিনি পার্শে মাছ কেনাই ঠিক করলেন। সবে মাত্র তিনি সেই মাছওয়ালার সামনে দাঁড়িয়েছেন, পেছন থেকে একজন বললো, মজুমদারদা, কেমন আছেন?

প্রতাপ মুখ ফিরিয়ে দেখলেন ধুতির ওপর গিলে করা পাঞ্জাবিপরা একজন বেঁটে খাটো মোটাসোটা মানুষ তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। প্রতাপ প্রথমে চিনতে পারলেন না। লোকটির মুখটি হাসিমাখা, বেশ পরিতৃপ্ত ধরনের মুখ, চেহারায় অর্থিক সাচ্ছল্যের ছাপ আছে। লোকটি বাজার করতে এসেছে ঠিকই। কিন্তু হাতে কোনো থলি বা চুবড়ি নেই, তার পেছনে ভৃত্যশ্রেণীর একজন লোক একটা ধামা মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতায় পুরোনো লোকদের এরকম চাকর সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে আসাই প্রথা।

লোকটির একটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, তাই দেখেই প্রতাপের মনে পড়ে গেল। বিমানবিহারীর বাড়িতে লোকটিকে দু'একবার দেখেছেন, প্রতাপের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। কিসের যেন ব্যবসা আছে।

প্রতাপও হাসির উত্তর দিয়ে বললেন, কী খবর? আপনি এদিকেই থাকেন নাকি?

লোকটি বললো, আমার বাড়ি তো এই গ্রে স্ট্রিটে। আপনি তো দাদা থাকেন বাগবাজারে, তাই না? হঠাৎ এদিকে?

প্রতাপ বললেন, এলাম আপনাদের বাজারে, যদি ভালো মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু যা দাম!

এবারে প্রতাপের মনে পড়লো, লোকটির নাম জগৎপতি দত্ত। হ্যাঁ, ঠিক জগৎপতিই বটে, ঐ নাম নিয়ে বিমানবাবিহারী কী যেন একটা রসিকতাও করেছিলেন। জগৎপতি দত্তদের কয়েক পুরুষের কাগজের ব্যবসা।

প্রতাপের কথা শুনে জগৎপতি মহা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আর বলবেন না! ব্যাটারা গলা কাটবে একেবারে! পাকা রুই বলে কি না চার টাকা চার আনা? কেউ কখনো শুনেছে এরকম? এরপর আর বাঙালীকে মাছ খেতে হবে না, আঁশ ধোয়া জল খেয়েই সাধ মেটাতে হবে, বুঝলেন?

মাছওয়ালাটি এই আলোচনা শুনতে পেয়েছে। তার এখন অন্য খদ্দের নেই! সেইজন্য সে আলোচনায় যোগ দেবার জন্য বললো, শুধু আমাদের দোষ দিচ্ছেন? আলুর দাম কত উঠেছে বলুন? না' আনা সের আলু! আর পটল, অন্য বছরে এই সময় ছাগলও খেতে চায় না, সেই পটল দশ আনা? চারে মন ধাঁ ধাঁ করে সাতাশ টাকায় চড়ে বসলো। আমাদেরও পেটে খেয়ে বাঁচাতে হবে তো!

জগৎপতি মাছওয়ালাটির দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ্গের সুরে বললো, তোদেরই তো এখন পোয়া বারো। চেহারায় কী রকম চেকনাই হয়েছে। হাতে তিনখানা আংটি! একদিকে ওজনে মারবি, আবার দামও হাঁকবি যাচ্ছেতাই।

জগৎপতিরা এই সব মাছওয়ালা শ্রেণীর লোকদের অনায়াসে তুই বলে সম্বোধন করেন। প্রতাপ এমন পারেন না। নিজের পরিবারের বাইরে তিনি যাচ্ছে তাই।

জগৎপতি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই পার্শে মাছ কিনছেন নাকি? এ ব্যাটা কত করে চাইছে?

মাছওয়ালা বললো, মোট তিন পোয়া আছে। সব ল্যান তো আড়াই টাকা দরে দিয়ে দেবো!

জগৎপতি এক ধমক দিয়ে বললেন, মাছি বসছে, এর দর আড়াই টাকা? মজুমদারদাদা, কিনবেন না, এগুলো কিনবেন না। ওদিকটায় একজনের কাছে ভালো পাবদা আছে, সাড়ে তিন করে দিচ্ছে, চলুন আমি কিনিয়ে দিচ্ছি। এ বাজারে তো সব ব্যাটা মাছওলা আমার চেনা!

প্রতাপের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জগৎপতি তাঁকে অন্য জায়গায় নিয়ে এক সের পাবদা মাছ কেনালেন। প্রতাপের বাজেট ছাড়িয়ে গেল। চক্ষুলজ্জায় তিনি আপত্তি করতে পারলেন না। তাছাড়া পাবদা মাছ তাঁর মাটি লাগে। এ মাছগুলো দেখতে নরম-সরম হলেও ওজন আছে বেশ। এক সেরে উঠলো মোটে আটটা। তা ছাড়া, পাবদা মাছ প্রতাপের পছন্দের মাছ নয়। এই একটা মাছ যাতে মাছের গন্ধ নেই।

জগৎপতি জিজ্ঞেস করলেন, দাদা, আপনি এই ফিফটিনথ আগস্ট কী করছেন? খুব ব্যস্ত, অনেক মিটিং-এ যেতে হবে?

প্রতাপ হেসে বললেন, না না, আমার আবার মিটিং কিসের?

- আপনারা হাকিম মানুষ, আপনাদের কত লোক ডাকে!

প্রতাপ আবার হাসলেন। মফস্বলে যখন পোস্টিং ছিল, তখন অনেকে মানতো ঠিকই। স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলনের জন্য তাঁকেই ডাকা হতো। কিন্তু কলকাতায় কেউ গ্রাহ্য করে না।

জগৎপতি বললো, আপনি ঐ দিন ফ্রি আছেন? তবে আমাদের সঙ্গে চলুন না। বিমানদাও যাচ্ছেন।

- কোথায়?

- বারুইপুরে এই গরিবের একখানা ছোট বাড়ি আছে, ছুটির দিনটায় দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে যাবো ঠিক করিছি। চলুন না, খারাপ লাগবে না, পুকুরের মাছ খাওয়াতে পারবো আশা করি।

প্রতাপ এড়িয়ে যাবার জন্য বললেন, ঠিক আছে, আমি বিমানের সঙ্গে কথা বলবো।

জগৎপতি একগাল হেসে বললেন, কথা বলার আর কী আছে? মাঝখানে তো আর তিনটে মাত্র দিন। আপনি সকাল সাড়ে আটটায় শেয়ালদা সাউথ স্টেশনে চলে আসুন।

প্রতাপ বললেন, আচ্ছা দেখি!

- আর দেখাদেখির কিছু নেই। আপনাকে কিন্তু কাউন্ট করছি। আমি বিমানদাদাকে আগেই আপনাকে ইনক্লুড করার কথা বলেছিলুম, বিশ্বাস করুন। আটটা পঞ্চাশের ট্রেন, ফেইল না হয়!

জগৎপতি বিদায় নেবার পর প্রতাপ বাকি বাজার সারতে লাগলেন। ইচ্ছে মতন মাছ কিনতে পারেননি বলে তাঁর মুখখানা গোমড়া হয়ে গেছে। একজন তরকারিওয়ালার সঙ্গে তিনি প্রায় ঝগড়া করে ফেলছিলেন। একেই তো সব জিনিসের দাম বেশি, তার ওপর খুচরো পয়সা দেবার সময়েও ওরা ঠকাচ্ছে। কয়েক মাস আগে নয়া-পয়সা চালু হয়েছে। টাকা-আনা-পাইয়ের বদলে একশো নয়া পয়সায় একটাকা। এখনো আনি দুয়ানি চলছে, নয়া পয়সাও চলছে। পুরনো পয়সার বদলে নতুন খুচরো দিতে গিয়ে সব দোকানদারই কম দেয়।

মেজাজ গরম করতে গিয়ে প্রতাপ শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। সামান্য দু' একটা পয়সার জন্য বকাবকি করা কি তাঁর মানায়? তিনি এত নীচে নেমে যাচ্ছেন? প্রতাপ নিজেকেই ধমক দিলেন। তারপর আলুওয়ালার কাছ থেকে খুচরো পয়সা ফেরৎ না নিয়েই হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বাজার থেকে।

পরদিন বিমানবিহারীর একজন কর্মচারী একখানা চিঠি নিয়ে এলো। ১৫ আগস্ট জগৎপতি দত্তের বারুইপুরের বাড়িতে পিকনিকে যাওয়ার জন্য তিনি প্রতাপকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী পুত্র-কন্যাদেরও নেমন্তন্ন।

মমতার ক'দিন ধরে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, তিনি যেতে রাজি হলেন না। পিকলু আর বাবলু দু'জনেই পাড়ার ক্লাবের ফাংকশনের সঙ্গে জড়িত। তুতুল আর মুন্নিকে অন্তত নিয়ে যেতে চাইলেন প্রতাপ, তুতুলও অনিচ্ছা প্রকাশ করলো।

১৫ই আগাস্ট খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল সকলের। প্রভাত ফেরী বেরিয়েছে বিভিন্ন ক্লাব থেকে। শুধু গান নয়, তার সঙ্গে আছে বিউগ্‌ল ও কেটল ড্রাম। একটার পর একটা মিছিল আসছে।

প্রতাপ তৈরি হয়ে নিয়ে মুন্নির হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন সাতটার মধ্যে। ট্রাম-বাসে যাওয়া অনিশ্চিত, আজ শিয়ালদা পর্যন্ত হেঁটেই যেতে হবে। মুন্নি একটা লাল রঙের ফ্রক পরেছে, তার পিসিমনি এটা বানিয়ে দিয়েছেন। সুপ্রীতির শেলাই ফোঁড়াইয়ের যথেষ্ট জ্ঞান আছে। প্রতাপকেও নিজের হাতে একটা পাঞ্জাবি বানিয়ে দিয়েছেন এবারের জন্মদিনে।

মুন্নি এখন স্কুলে যাচ্ছে, কিন্তু তার মুখে আঙুর দেওয়া রোগটি এখনো যায়নি। মমতা আজ বারবার বলে দিয়েছেন বাইরের লোকজনদের মাঝখানে সে যেন ওরকম অসভ্যতা না করে। প্রতাপকেও তা সর্বক্ষণ নজর রাখতে হবে।

রাস্তার মোড়ে বানানো হয়েছে, তোরণ। চতুর্দিকে ঝুলছে কাগজের মালা। অনেক বাড়ির ছাদে ওড়ানো হয়েছে জাতীয় পাতাকা, প্রতাপের বাড়িওয়ালাও বাদ যায়নি। এ বছরের উৎসবের জাঁকজমক অনেক বেশি। শুধু স্বাধীনতার দশম বৎসর তো নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের একশো বছর পূর্তি। ১৭৫৭-তে পলাশী যুদ্ধে বাংলার পতন, ১৮৫৭-তে সিপাহী বিদ্রোহ, তারপর এই ১৯৫৭; অনেকে ভেবেছিল এ বছরও সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটবে। এ পর্যন্ত তো কিছুই দেখা গেল না। অবশ্য গুজব ছড়িয়েছে নানারকম। অনেকেই বলাবলি, করছিল, নেতাজী সুভাষ বোস তিব্বতে তাঁবু গেড়ে আছেন, এই বছরই তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবার ভারতে ঢুকবেন, তারপর হিন্দুস্থান-পাকিস্তান এক করে দেবেন। তাঁকে সবাই মানবে।

প্রতাপ অবশ্য এ গুজব একটুও বিশ্বাস করেননি। সুভাষ বোস যদি বেঁচেও থাকেন, তাহলে তিনি সৈন্যবাহিনী পাবেন কোথায়? আই এন এ-র সবাই তো আত্মসমর্পণ করেছিল। যুদ্ধ চলার সময় জওহরলাল বলেছিলেন, সুভাস বোস যদি বিদেশী সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতে পা দেন তাহলে তিনি নিজে তলোয়ার নিয়ে তাঁর মোকাবিলা করবেন। এখন যদি সুভাষবাবু সত্যিই কোনো সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসেন তাহলে কী বলবেন জওহরলাল? তিনি কি সহ্য করতে পারবেন তাঁর এই প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে?

বহু বাড়ির ছাদ ও বারান্দায় তো জাতীয় পতাকা উড়ছেই, রাস্তায় অনেক লোক হাতে একটা করে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে ঘুরছে। মুন্নি বললে, বাবা আমাকে একটা ফ্ল্যাগ কিনে দাও!

প্রতাপকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হলো না, শ্যামবাজারের মোড়ে আসবার আগেই একদল ছেলে তাঁর আর মুন্নির জামায় আলপিন দিয়ে দুটি পতাকা আঁকা ব্যাজ লাগিয়ে দিয়ে বললো, একটা টাকা

দিন স্যার!

ব্যাজগুলোর দাম দু'আনার বেশি নয়। এই সুযোগে কেউ কেউ ব্যবসাও শুরু করে দিয়েছে। বিনা আপত্তিতে প্রতাপ টাকাটা দিয়ে দিলেন। আর এক টাকা দিয়ে মুন্নির জন্য একটা পাতাকা আঁকা গ্যাস বেলুনও কিনলেন। বেলুনের সুতোটা বেঁধে দিলেন মুন্নির বাঁ হাতে। স্বাধীনতা না উড়ে চলে যায়!

স্বাধীনতা! প্রতাপদের যৌবনের স্বপ্নের স্বাধীনতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি যখন বোঝা গিয়েছিল ইংরেজ জিতুক বা হারুক, এবারে সত্যিই ভারতের স্বাধীনতা আসবে। তখন কী সাংঘাতিক উত্তেজনায় দিন গেছে। স্বাধীনতা শব্দটি শুনলেই রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠতো। যেন স্বাধীনতা এদেশে সোনার দিন এনে দেবে।

স্বাধীনতার পর অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়, তা সবাই জানে। দেশের মানুষ অনেক রকম ত্যাগ স্বীকার না করলে একটা নতুন দেশের স্বাধীনতা মজবুত হয় না। কিন্তু ত্যাগ স্বীকার করছে কারা? শুধু গরিবরা। যারা ধনী, তারা অনেকেই আরও ধনী হচ্ছে, রাজনীতির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তৈরি হচ্ছে একদল নতুন ধনী সম্প্রদায়। একটা উটকো দালাল শ্রেণী, তাদের ধরন ধারণই অসহ্য। এই দশ বছর ধরে পণ্ডিত নেহেরু ভাবতে টিকিয়ে রেখেছেন গণতন্ত্র। এই তাঁর গর্ব। শুধু ভোটের গণতন্ত্র! সারা দেশ জুড়ে অভাব-অনটন। চতুর্দিকে ধর্মঘটের হুমকি। এই মাসেই তো সর্বভারতীয় সরকারি কর্মচারী ধর্মঘটের প্রায় নেমেই পড়েছিল, তোষামোদ করে থামানো হয়েছে। এদের বেলায় তোষামোদ, কিন্তু দিল্লীতে ঝাড় দারদের ধর্মঘটে নেহরুর নাকের ডগার ওপর দিয়েই গুলি চালালো পুলিশ। সরকারী হিসেবেই মারা গেছে দু'জন, বে-সরকারী হিসেবে কতজন কে জানে? যেখানে গান্ধীজী নিহত হয়েছিলেন সেখানেই আবার গুলি খেয়ে মরলো তাঁর প্রিয় হরিজনরা!

- বাবা, এটা কী ঠাকুর?

মুন্নির কথা শুনে প্রতাপ ধাতস্থ হলেন। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আজ এই সব তিক্তকথা মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই ভালো।

একটা বেশ বড় ক্লাবের মিছিল বেরিয়েছে। সাদা পোশাক পরা নানা বয়েসী ছেলে-মেয়েরা ধীরতালে হাঁটছে দুসারিতে, গান গাইতে গাইতে। অবশ্য ড্রাম-বিউগলের ধুন্ধুমারে গান শোনাই যাচ্ছে না। কিন্তু ফুটফুটে মুখগুলি দেখতে ভালো লাগে। কার্ডবোর্ড কেটে গান্ধীজীর একটা বড় মূর্তি বানিয়ে মাঝখান দিয়ে নিয়ে চলেছে একটা ঠেলা গাড়িতে চাপিয়ে। মুন্নি ওটাকেই ঠাকুর ভেবেছে। হ্যাঁ ঠাকুরই বটে, গান্ধী ঠাকুর, জাতির পিতা! প্রত্যেক সরকারী অফিসে, স্কুল-কলেজে গান্ধীজীর রং করা ছবি ঝোলে। এমনকি আদালতে, বাররুমেও। কিন্তু গান্ধীজীকে ভুলে গেছে সবাই, তার নীতিটিতি সব গোল্লায় গেছে। অহিংসার কথা শুনলেই সবাই হাসে। গান্ধী টুপি পরা মন্ত্রীরা প্রথম প্রথম সব বক্তৃতাতেই একবার করে গদগদ স্বরে গান্ধীজীর নাম উচ্চারণ করতেন, এখন তাও বন্ধ। পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে জেদাজেদি করে সমরাস্ত্র বাড়িয়ে চলেছেন।

- ঠাকুর না রে, উনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

- নামো করবো?

প্রতাপ একটু দ্বিধা করলেন। মেয়েকে তিনি কী শেখাবেন? গান্ধীজীর মূর্তিকে প্রণাম করবার তিনি কোনো যুক্তি খুঁজে পান না। কিন্তু বাচ্চা মেয়ে, ওদের জগৎটা অন্যরকম।

এরপর যে মিছিলটা এলো, তাতে গান্ধীজীর মূর্তি নেই, কিন্তু ছেলেমেয়েরা অনেকগুলি বড় বড় ছবি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই ফরোয়ার্ড ব্লকের। ছবিগুলি সুভাষ বোস, ধীলন, শা-নওয়াজ খান, লছমী বাঈ এই সব আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের। এই মিছিল দেখে রাস্তার দুপাশের লোক হাততালি দিয়ে উঠলো। বাঙালীরা কোনোদিন যুদ্ধ করেনি, কিন্তু যুদ্ধের গল্প ভালোবাসে। আজকাল সুভাষবাবুর ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছবি দেখাই যায় না। সবই মিলিটারি পোশাক পরা চেহারা। সুভাষবাবু সম্পর্কে মাঝে মাঝেই যেসব গুজব ছড়ায়, তার কোনোটাতেই তাঁর একা ফিরে আসার কথা নেই। তিনি আসবেন সামরিকবাহিনীর প্রধান হয়ে!

মানিকতলা পর্যন্ত হেঁটে আসার পর প্রতাপ বুঝতে পারলেন মুন্নি ক্লান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সে বাবার কোলেও চড়বে না। বাস দেখা যাচ্ছে না একটাও কিন্তু ট্রাম বেরিয়েছে, কচ্ছপ গতিতে চলছে। প্রতাপ একটা ট্রামে চেপে বসলেন। হাতে অনেক সময় আছে।

মুন্নি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মিছিল দেখতে দেখতে বললো, বাবা, স্বাধীনতা দিবসে গাড়িতে চড়লে কি পাপ হয়? সবাই যে হেঁটে যাচ্ছে!

প্রতাপ বললেন, না রে! ওরা তো মিছিল করে যাচ্ছে, আমরা অন্য জায়গায় যাচ্ছি।

মুন্নি আবার জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বাবা, ওরা হাঁটতে হাঁটতে কত দূরে যাবে? স্বাধীনতা কোথায় আছে?

প্রতাপের পাশে একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন, এইবার মোশাই আপনার মেয়ে একখানা সুকঠিন প্রশ্ন করেছে। উত্তর দিন!

প্রতাপও হাসলেন।

বৃদ্ধটি মুন্নির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, ভারী মিষ্টি মেয়ে। মা, সারা জীবন ধরেই স্বাধীনতা খুঁজতে হয়। সহজে তো পাওয়া যায় না।

শিয়ালদায় নেমে প্রতাপ দেখলেন প্রধান গেটের কাছেই জগৎপতি দাঁড়িয়ে আছেন একটি ছোট দল নিয়ে। প্রতাপকে দেখে উনি হৈ হৈ করে স্বাগত জানালেন। তারপর বললেন, ঐখেনে ছায়াতে গিয়ে দাঁড়ান, বিমানদারাও এসে গেছেন।

বিমানবিহারীর সঙ্গে এসেছে অলি আর বুলি। মুন্নি ওদের দেখে ছুটে গেল। অলি জিজ্ঞেস করলো, পিকলুদা-বাবলুদা আসেনি? কেন? এমা, ভাল্লাগে না, আমরা তো ওখানে আর কারুকে চিনি না!

বিমানবিহারী আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, মেঘ মেঘ করেছে, বৃষ্টি হলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে!

প্রতাপ বললেন, এ বছর তো বৃষ্টি হলোই না ভালো করে। হোক, বৃষ্টি হোক।

বিমানবিহারী হেসে বললেন, তা বলে আজকের দিনটাতেই হতে হবে কেন? আজ সব ছেলে-মেয়েরা উৎসব করছে, আমরা পিকনিক যাচ্ছি ...

একটি চা-ওয়ালা সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, চা খাবে নাকি? ওহে, দাও তো-

বিমানবিহারী সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, আমি না, আমি না, ওরে বাবা, এই চা! গুড় দিয়েছে, কতক্ষণ ধরে ফুটিয়েছে, ঠিক নেই, জিভের স্বাদ নষ্ট করে দেবে!

প্রতাপ বললেন, আমার জিভ পুরু, আমার এতেই চলবে!

মাটির খুরিতে পেতলের কলসী থেকে ঢালা চা দু'বার নিলেন প্রতাপ। তারপর সিগারেট ধরিয়ে গল্প করতে লাগলেন বন্ধুর সঙ্গে।

কিন্তু এখানে এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়াবার উপায় আছে? অসম্ভব ভিখিরির উপদ্রব। বুড়ো, বুড়ি, বাচ্চা ভিখিরী। নাছোড়বান্দা সব। বিমানবিহারীদের মাঝে মাঝেই সরে দাঁড়াতে হয়। স্টেশন চত্বরটাতে যেমন নোংরা, তেমন দুর্গন্ধ। ভেতরের সব প্ল্যাটফর্মে উদ্বাস্তুদের স্থায়ী আস্তানা, এখন অনেকে বাইরেও উপচে এসেছে। এদিকে ওদিকে ছেঁড়া চটের তাঁবু। তার মধ্যেই চলেছে মানুষের সংসার।

বিমানবিহারী ছাপাখানার গল্প শুরু করেছেন। পূজোর আগেই তাঁর পাঁচখানা বই প্রকাশ করার কথা, কিন্তু তাঁর প্রেসের কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছে। অকটোবর-নভেম্বরের মধ্যে বই বাজারে ছাড়তে না পারলে তিনি টেক্সট বুক সিলেকশন কমিটিতে ধরাতে পারবেন না, সেইজন্য তিনি উদ্বিগ্ন। এই রকম মেঘলা দিনে ছাপা ভালো হয়। তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার গুপ্ত বলেন, কবিরা যেমন আকাশের মেঘ দেখে কবিতা লেখে, সেইরকম কবিতার বই ছাপার জন্যও আকাশে মেঘের অপেক্ষা করতে হয়।

একটি বুড়ি ভিখিরী অনেকক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছে। প্রতাপ এক সময় চমকে উঠলেন। কালুর মা নয়? মালখানগরে কালুর মা ছিল অনেকগুলি বাড়ির বাঁধা ধাইমা। প্রতাপও কালুর মা'র হাতে জন্মেছেন। সেই কালুর মা এখানে ভিক্ষে করছে? পরক্ষণেই প্রতাপ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। কালুর মায়ের এতদিন বেঁচে থাকার কথা নয়। তবু তিনি বুড়িকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি কোথায় ছিল।

ঘোলাটে চোখ তুলে বুড়ি বললো, বাড়ির কথা আর জিগাইও না বাবা! কুনোদিন যে আমাগো বাড়ি আছিল, তা যেন নিজেরই আর বিশ্বাস হয় না।

প্রতাপ একটা দশ নয়া দিলেন। এ সে নয়, তবু এই বুড়ির চেহারা অবিকল কানুর মায়ের মতন।

বিমানবিহারী এখনো ছাপাখানার কথা বলে যাচ্ছেন, প্রতাপ সে দিকে মন দিতে পারছেন না। তিনি দেখছেন রিফিউজিদের তাঁবু। তাঁর আর বিমানবিহারীর দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ হবেই। কলকাতার মানুষদের রিফিউজি দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে। সহানুভূতি শুকিয়ে গেছে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। একটানা দশ বছর ধরে সহানুভূতি টিকিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু প্রতাপ এখনো এদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন।

তিনি অস্ফুটভাবে বললেন, দেশ বিভাগের দশ বছর পূর্ণ হয়ে গেল, এখনো রিফিউজিদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারলো না দেশের সরকার। এই স্বাধীনতার মূল্য কী?

বিমানবিহারী এবারে এদিকে মনোযোগ ফিরিয়ে বললেন, দশ বছরের স্বাধীনতা তো নিতান্ত শিশু, এর মধ্যে কতটুকুই বা করা সম্ভব বলো। সমস্যা তো হাজারটা।

তারপর আশপাশের তাঁবুগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, এরা সবাই কিন্তু ইস্ট পাকিস্তানের রিফিউজি নয়, বুঝলে। শুনেছি, সুন্দরবন অঞ্চলে এ বছর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলছে ... সেখানকার মানুষ হাজারে হাজারে কলকাতায় চলে আসছে। এরপর রাস্তাঘাট সব ভরে যাবে।

প্রতাপ বললেন, সুন্দরবান থেকে যারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে কলকাতায় আশ্রয় নিতে আসে, তারাও রিফিউজি।

ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, কুড়ি-বাইশ জনের একটি দল ট্রেনে উঠলো। বারুইপুরে পৌঁছে দেখা গেল জগৎপতি দত্ত অতি বিনয় করেছিলেন। এখানে তাঁর প্রচুর সম্পত্তি। একটি বেশ ছড়ানো পাকা বাড়ি, দুদিকে ঘেরা বারান্দা, সামনে চওড়া উঠোন, তারপর বাগান, একধারে এমন জলখাবার দেওয়া হলো যে দুপুরের খাওয়াটা কী পরিমাণ হচে তা অনায়াসে বোঝা যায়।

ছেলেমেয়েদের খুব মজা, এতখানি ফাঁকা জায়গা তো কলকাতায় পাওয়া যায় না। উঠোনের এক কোণে একটা সবেদা গাছ, মুন্নি ঐ গাছ আগে দেখেনি। সে জিজ্ঞেস করলো, বাবা, ক্যাম্বিসের বলের মতোন ঐগুলো কী? উঠোনের আর এক কোণে বড় বড় বঁটিতে কাটা হচ্ছে পুকুর থেকে ধরা রুই-কাৎলা, একটা প্রায় চার-পাঁচ সের ওজনের রুই এখনো লাফাচ্ছে, অত বড় মাছও মুন্নি দেখে নি কখনো, সে ভয় পেয়ে বাবার হাত চেপে ধরলো।

পুকুরঘাটে একটা নৌকো বাঁধা আছে। অলি-বুলি বায়না ধরলো সেই নৌকো চাপবে। সবাই এক সঙ্গে না না করে উঠলো। জগৎপতির ছেলে করুণাসিন্ধু বললো, আমাদের হারান থাকলে তবু নিয়ে যেতে পারতো ওদের, সে ভালো নৌকো চালায়, কিন্তু হারানের জ্বর।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, বৈঠা আছে? তা হলে মাঝির দরকার নেই, আমিই চালাতে পারবো।

করুণাসিন্ধু জিজ্ঞেস করলো, আপনি বুঝি রোয়িং জানেন?

প্রতাপ হেসে বললেন, না, আমি কোনো সুইমিং ক্লাবে রোয়িং শিখিনি, তবে নদী-নালার দেশের মানুষ তো। নৌকো চালাতে জানি।

বৈঠা নিয়ে তিনি নৌকোয় উঠে বাচ্চাদের ডেকে বললেন, আয়, তোদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

বিমানবিহারীর মুখ শুকিয়ে গেছে। আদালতের একজন হাকিম নৌকো চালাবেন, একথা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রতাপ বিমানবিহারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয় নেই, বাচ্চাদের দায়িত্ব আমার। তুমিও আসবে নাকি।

বিমানবিহারী সাঁতার জানেন না, তিনি নৌকোয় উঠতে রাজি হলেন না।

প্রতাপ মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, যুদ্ধের পরের বছর দেশে গিয়ে তিনি শেষবার নৌকো চালিয়েছিলেন। এগারো বছর আগে। বৈঠা জলে ফেলে তিনি বুঝতে পারলেন, কিছুই ভোলেন নি। তিনি অনায়াসে চলে এলেন মাঝপুকুরে। বেশ স্বচ্ছ জল, এদিকে ওদিকে ফুটকাটা দেখে মনে হয় অনেক মাছ আছে। প্রতাপদের বাড়ির দীঘিটাও এইরকম সাইজই হবে। তবে তার একদিকে ঘন জঙ্গল ছিল, এখানে বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে, প্রতাপদের দীঘির পাড়ে সেই ঘন জঙ্গল কি এখনো আছে?

অলি-বুলিরা একটুও ভয় পায়নি, তারা হাসছে খলখলিয়ে। প্রতাপ ফিরতে চাইলেও তারা রাজি নয়। তারা সমস্বরে বলছে, আর একটু, আর একটু। দূরে ঘাটের কাছে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অনেক দর্শক।

দুপুরের খাওয়ার আয়োজন দেখে সত্যি চক্ষু চড়কগাছ হবার উপক্রম। প্রত্যেকের জন্য বড়

কাঁসার থালা, সেই থালা ঘিরে সাতখানা বাটি। এত বাসনপত্র আছে এদের? এত খাওয়া কি মানুষে খেতে পারে? জগৎপতি খাওয়াতে খুব ভালোবাসেন, মাঝে মাঝেই নাকি কলকাতা থেকে এরকম বন্ধুবান্ধবের দল নিয়ে আসেন।

বিমানবিহারী স্বল্পাহারী মানুষ, তিনি প্রায় কিছুই খাচ্ছেন না, জগৎপতি জোর করছেন তাঁকে। সামনে বসে বলছেন, দাদা, খান, খান, একদিন তো, কলকাতায় খেয়ে কিছু সুখ আছে? সবই তো বাসি কিংবা ভেজাল। এরকম টাটকা জিনিস পাবেন কোথায়? জানেন দাদা, যা যা খাচ্ছেন, তার একটা জিনিসও কেনা নয়। সব আমার নিজের বাড়ির। আমার নিজের খেতের চাল, বাড়ির গরুর দুধের ঘি, আলু-পটল-বেগুন সবই আমার বাগানে হয়, নিজের পুকুরের মাছ ...

তারপর তিনি প্রতাপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দাদা, খাচ্ছেন তো?

প্রতাপ উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর গলা হঠাৎ আটকে গেছে, চোখ জ্বালা করছে। নিজেকে তিনি সামলাবার চেষ্টা করছেন অতি কষ্টে। এ কী ছেলেমানুষী করছেন তিনি, বাস্তবকে মেনে নিতে পারছেন না? ইতিহাসকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হয়। এত লোকের সামনে তিনি কেঁদে ফেলবেন নাকি?

কথা না বলে প্রতাপ শুধু দু'বার মাথা নাড়লেন। তারপর জগৎপতি কী যে বলে যেতে লাগলেন, তিনি আর তা শুনতে পেলেন না। তাঁর মনে পড়ছে মায়ের কথা। দেওঘরে মা একেবারে নিষ্প্রাণ, শীতল হয়ে গেছেন। অথচ মাত্র এক দশক আগে, তাঁর মা এইরকমভাবে সবাইকে কত উৎসাহ করে খাওয়াতেন, অবিকল এইরকম একটি বাড়ি, নিজেদের খেতের চাল, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ, বাড়িতে তৈরি ঘি ...

আজ স্বাধীনতার দিনে জগৎপতি দত্ত বন্ধু-বান্ধবকে খাইয়ে আনন্দ করছেন। স্বাধীনতার মূল্য এক একজনের কাছে এক এক রকম!

॥ ৪৬ ॥

একটা নড়বড়ে কাঠের টেবিল, তার ওপরে সাজানো নানা রঙের ওষুধের শিশি। হাতলহীন চেয়ারে-বাস মধ্যবয়স্ক ডাক্তারবাবুটির কপালে চন্দনের তিলক, বিরল-কেশ মাথায় একটি টিকি, গায়ের খদ্দরের পাঞ্জাবি। ডাক্তারবাবুটিকে পুজুরী বামুন হিসেবেই যেন বেশি মানাতো। তাঁর সামনে রুগীদের লম্বা লাইন।

টেবিলের একপাশে একটি প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে আছে হারীত মণ্ডল। একটা ঠেঙো ধুতি পরা, খালি গা, বুকে কাঁচা-পাকা চুল, গালে খরখরে দাড়ি। তার ঠোঁটের মিটিমিটি হাসিটি ঠিক আছে, সে একটা বিড়ি টানছে বেশ আরাম করে।

প্রত্যেক রুগীরই প্রায় একই রকম ঘ্যানঘেনে অভিযোগ, ডাক্তারবাবুটি মন দিয়ে শুনছেন না কিছুই, কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, শিশি কিংবা বোতল এনেছো তো? যারা শিশি বা বোতল সঙ্গে এনেছে, তারা বিনা পয়সায় ওষুধ পাবে। যারা আনেনি, তাদের চার আনা দিয়ে শিশি কিনতে হবে। সমস্ত রুগীরা এই দুভাগে ভাগ করা। যাদের শিশি নেই, তাদের অনেকের কাছে চার আনা পয়সাও নেই, সুতরাং তাদের অসুখের বিবরণ শুনেও কোনো লাভ নেই। বিনা পয়সার ওষুধ গুলেও ডাক্তারবাবু তো রুগীদের গলায় তা ঢেলে ঢেলে দিতে পারেন না।

কম্পাউন্ডার একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে। এই কলোনি চালাক চতুর বলে তাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। অসুখ অনুযায়ী ডাক্তারবাবু তাকে বলেন, লাল সে বড় বোতল থেকে ঠিক মাপ করে লাল ওষুধ ঢেলে দেয় রোগীর শিশিতে।

শেষ রোগীটি একটি শিশু, বছর চারেক বয়স, জ্বরে মুখখানা নীল হয়ে গেছে, তার মা কাঁদছে হাউ হাউ করে। কারণ সেই স্ত্রীলোকটির শিশিও নেই, চার আনা পয়সাও নেই। এই চ্যাঁচার বেড়া দেওয়া ঘরখানির বাইরেই একটি লোক ঝুড়ি ভর্তি খালি শিশি-বোতল নিয়ে বিক্রির জন্য বসে আছে, সে এবার উঠি-উঠি করছে।

স্ত্রীলোকটি অবুঝের মতন শুধুই কাঁদছে, যেতে চাইছে না কিছুতে। ডাক্তারবাবু বিরক্তি-হতাশায় দু'হাতে ছুঁড়ে বললেন, শিশি না থাকলে আমি কিসে ওষুধ দেবো?

হারীত মণ্ডল বললো, আপনার ঐ বড় শিশি তো দুই একটা খালি হইছে, তারই একটা দিয়ে

দ্যান না!

ডাক্তারবাবু চোখ গরম করে হারীত মন্ডলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার স্টক থেকে খালি বোতল দেবো? ওতে আবার কাল নতুন মিক্সচার ভরতে হবে না? তা ছাড়া একজনকে দিলে আর রক্ষে আছে? কাল আর পাঁচজন এসে আবার কেঁদে পড়বে না? বলবে, অরে দিছেন, আমারে ক্যান দেবেন না?

ডাক্তারবাবু শেষ কথাটি এমন মুখভঙ্গি করে বললেন যে, হারীত মন্ডল না হেসে পারলো না। সে বললো, তা ঠিক। পাকিস্তান থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসার সময় বুদ্ধি করে অন্তত দু দেশটা খালি শিশি-বোতল আনা উচিত ছিল।

তারপর সে স্ত্রীলোকটিকে বললো, ও নিমাইয়ের মা, শুধু শুধু কেন্দে কী হবে? দ্যাখতে আছো তো ডাক্তারবাবুর কোনো উপায় নাই! বরং এস্টেশানের কাছে দিয়া ভিক্ষা মাইগা দ্যাখো ঢাইর আনা পয়সা পাও কি না!

হারীত মন্ডলের কথা শুনে স্ত্রীলোকটি কান্না থামালো। হারীত মন্ডলকে শোনাবার জন্যই সে সম্ভবত বেশি করে কাঁদছিল। হারীত মন্ডল তাদের নেতা, সে ভরসা না দিলে আর কোন উপায় নেই।

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল, ডাক্তারবাবু এবার তাকে ডেকে বললেন, দাঁড়াও বাছা! এত জ্বর বাছাটার-

পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি সিকি বার করে দিয়ে রাগতভাবে বললেন, এই নাও, শিশি কিনে আনো। এ কথা যেন আর কারুকে বলো না। তা হলে আমি ফতুর হয়ে যাবো!

তারপর তিনি তাঁর কম্পাউন্ডারের দিকে ফিরে বললেন, হলুদ!

স্ত্রীলোকটি বিদায় নেবার পর ডাক্তারবাবু একটি কাঁচি সিগারেটের প্যাকেট বার করে হারীত মন্ডলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, চলবে?

হারীত মন্ডল মাথা নেড়ে বললো, না, ওয়াতে আমি স্বাদ পাই না। আমার বিড়িই ভালো।

আর একটি বিড়ি ধরিয়ে সে গল্প করার ভঙ্গিতে বললো, আগে দেখতাম, ডাক্তারবাবুরা রুগী পরীক্ষা করে তারপর পেরেসক্রিপশন ল্যাখতেন। এই দেশে আপনারা বুঝি পেরেসক্রিপশান ল্যাখেন না? নিয়ম পাল্টাইয়া গ্যাছে?

ডাক্তারটির নাম হরিসাধন চক্রবর্তী, লোকে বলে হরি ডাক্তার। এই অঞ্চলেরই মানুষ। তাঁর বাবা ছিলেন কবিরাজ, ইনি এল এম এফ। তাঁর মুখে সবসময় একটা রাগ রাগ ভাব, জোর দিয়ে, বকুনির সুরে কথা বলেন কিন্তু মানুষটি কঠোর নন।

হারীত মন্ডলের কথা শুনে তিনি চোখ সরু করে তাকালেন। এই লোকটিকে তিনি যতই দেখছেন ততই অবাক হচ্ছেন। এই লোকটি স্থানীয় রিফিউজ কলোনির নেতা কিন্তু কখনো একে তিনি জঙ্গিভাব নিয়ে লাফ-ঝাঁপ, চ্যাঁচামেচি করতে দেখেননি। হাসি হাসি মুখে এমনভাবে অন্তর টিপ্পনি দিয়ে কথা বলে যাতে বোঝা যায় লোকটি অনেক কিছু জানে। কিন্তু এই ধরনের মানুষ কলোনির মধ্যে এত কষ্ট সহ্য করে থাকবে কেন, এরা তো অনায়াসেই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা জীবন যাপন করতে পারে।

ডাক্তার বললেন, প্রেসক্রিপশান লিখে কী হাতি ঘোড়া হবে? শুধু শুধু কাগজ নষ্ট। বাইরে থেকে ওষুধ কেনার কোনো ক্ষমতা আছে এদের?

হারীত মন্ডল সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মেনে নিয়ে বললো, তা ঠিক। তারপর সে ওষুধের বোতলগুরোর দিকে তাকিয়ে বললো, লাল ওষুধ হইলো প্যাট ব্যাথার, হইল্দা ওষুধ জ্বরের, সবুজ ওষুধটা মাথা ঘোড়া আর গায়ে বেদনা-কাটাকুটির, আর ঐ খয়েরি রঙের ওষুধটা আমাশা-পাতলা পায়খানা ....ঠিক হয় নাই? দ্যাখেন, বসে বসে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তবে দুই একবার দ্যাখলাম, আপনি মাথা ঘোরা কিংবা পেট ব্যথার রুগীরও লাল ওষুধ দিলেন।

-তা হতেই পারে না!

-লাল ওষুধটা বেশি আছে, তাই ওটাই বেশি দিতেছিলেন! ডাক্তারবাবু, আমি একটু আপনের ওষুধ খেয়ে দেখবো?

-আপনি ওষুধ খাবেন কেন, আপনার আবার কী হয়েছে?

-কী জানি ভিতরে ভিতরে কত কী হয়ে বসে আছে। ওষুধ যখন আছে, তখন একটু খেয়ে লই।

তারপর হারীত কম্পাউন্ডার ছেলেটির দিকে আঙুল তুলে বললো, এই ছ্যামরা, দে তো, একটু লাল ওষুধ আমার গায়ে ঢেলে দে।

ছেলেটি হারীত মন্ডলের হুকুম তামিল করলো সঙ্গে সঙ্গে। হারীত জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললো, বাঃ, বেশ স্বোয়াদ আছে। জোরালো ওষুধ! এবারে সবুজটা একটু দে তো!

ডাক্তারবাবু হা-হা করে উঠে বললেন, এ কী করছেন? আর দরকার নেই। ওতেই যথেষ্ট হয়েছে!

হারীত একগাল হেসে বললো, খাই না, আর একটু খাই। আমাদের পন্ডিতমশাই বলতেন, অধিকন্তু ন দোষায়। আপনে শোনেননি কথাটা। এই ছ্যামরা দে!

এক এক করে প্রত্যেকটি বোতলেরই ওষুধ চেখে দেখলো হারীত। ডাক্তারবাবু এতক্ষণে বুঝে গেছেন ওর মতলোব। লোকটির যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

হারীত মন্ডল চোখ টিপে বললো, সব কটারই স্বোয়াদ এক। কোনো ব্যবাস-কম নাই!

ডাক্তারবাবু বললেন, আমি কী করবো? আমার যা বাজেট সেই অনুযায়ীই তো চালাতে হবে! সরকার আপনাদের জন্য পয়সা খরচ করতে যদি না চায়-

-তা বলে আপনি ডাক্তার হয়ে জেনেশুনে এই বোকা আর গরিব মানুষগুলো ধোঁকা দিচ্ছেন।

-আমার যতদূর সাধ্য তা আমি করছি। এটা একটা জেনারাল মিক্সচার, সবরকম অসুখেই কিছু কিছু কাজ হয়। ওদের বিশ্বাস জন্মাবার জন্য আমি আলাদ আলাদা রঙ করে দিয়েছি। এতে উপকার যে-টুকু হবার তা হবে, কিন্তু ক্ষতি কিছু হবে না!

-আপনি মানুষ খারাপ না, আপনারে আমি দোষ দিই না। কিন্তু এইরকমভাবে কতদিন চলবে? প্রত্যেক সপ্তাহে দুই তিনজন মারা যাইত্যাছে। আমাগো ঘরগুলো দ্যাখছেন? গরু-ছাগলেও অত খারাপ জাগায় থাকে না!

-দেখে আর কী করবো বলুন! এই দেখুন না, আমার এই ডিসপেনসারির চাল ফুটো হয়ে গেছে। বৃষ্টির সময় জল পড়ে। রিলিফ ডিপার্টমেন্ট চিঠি লিকেও কোনো উত্তর পাই না। শুনুন হারীতবাবু, আপনাকে একটা স্পষ্ট কথা বলি। এই ক্যাম্পের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সরকার এই ক্যাম্পের জন্য আর কিছু করবে না! আপনারা বাংলার বাইরে যেতে রাজি হচ্ছেন না কেন?

-কে বললো রাজি হই নাই?

ডাক্তারবাবু তাঁর টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা খবরের কাগজ বার করলেন। প্রথম পৃষ্ঠায়ই একটা হেডলাইনের ওপর আঙুল রেখে বললেন, এই দেখুন, পার্লামেন্টে প্রায় প্রত্যেকদিনই আপনাদের ব্যাপারে ফাটাফাটি হচ্ছে। পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ-আসাম-ত্রিপুরা ওভার স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, এখানে আর রিফিউজিদের ঠাঁই দেওয়া অসম্ভব।

হারীত বললো, তার মানে? ঐ যে ওভার কী কইলেন?

-ওর মানে, ইয়ে, টায় টায় ভর্তি, মানে জনসংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে, এখন রিফিউজিদের বাইরে সেটল করাতে হবে।

-তা বেশ তো!

-কিন্তু বিরোধীরা আপত্তি তুলেছে। কমুনিস্ট পার্টির নেতা সাধন গুপ্ত দাবি তুলেছেন, উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গেই থাকতে চায়। সুন্দরবন আঞ্চল ডেভেলাপ করে সেখানে তাদের থাকতে দিতে হবে।

-ঐ সাধনগুপ্ত বাবু নিজে কি একজন রিফিউজি!

-তা জানি না।

-ঐ মেহেরচাঁদ খান্না বাবু কোন্ জাত?

-জাত মানে? বামুন-কায়স্থ... আমি ঐ সব নিয়ে মাথা ঘামাই না।

-সে কথা কইতেছি না। খান্না তো বাঙালী হয় না। উনি কি তাহলে পাঞ্জাবী? দ্যাখেন, রিফিউজিদের মধ্যেও তো অনেক জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান আছে। বাঙালী আর পাঞ্জাবীদেরই সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ হইছে। রিফিউজিরাই রিফিউজিদের দুঃখ বেশি বুঝবে। তাই আমি কইতে চাই, কোনো বাঙালী বা পাঞ্জাবী জ্ঞানী গুণী রিফিউজিরেই পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত করা উচিত কি না?

-তা কেন হবে? কংগ্রেস দলের যে-কেউ ...মানে, রিফিউজিরা গোটা ইন্ডিয়ারই লায়াবিলিটি!

-মানে? ঐ লায়া কী কইলেন?

-লায়াবিলিটি...মানে...দায়িত্ব। তাদের পুনর্বাসন করা আমাদের কর্তব্য!

খবরের কগাজখানা হাতে নিয়ে হারীত মন্ডল অন্যান্য পড়া হইয়া গ্যাছে? আমি নিতে পারি?

ডাক্তারবাবু বললেন, হ্যাঁ নিন না।

হারীত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, মুখ্যু মানুষ, অনেক কিছুই জানি না। আপনি তেকা অনেক কিছু জানেন। একটা জিনিস কইতে পারেন? অনেক মুসলমানও তো ইন্ডিয়া থেকে পাকিস্তানে চলে গেছে, তাই না? সেখানেও কি তারা রিফিউজি? এইরকম ক্যাম্পে থাকে? সবাই দূরছাই করে?

ডাক্তারবাবু বললেন, তা আমি জামি জানি না। সেরকম কোনো খবর আমি দেখিনি।

-খবর নাই মানেই ঘটে নাই। অরা মুসলমানগো জন্যে পাকিস্তান বানাইছে। সুতরাং মুসলমানরা আশ্রয় নিতে গেলে তাদের থাকতে দেবে। এ তো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু ইন্ডিয়া তো হিন্দুদের জন্য বানানো হয় নাই। লাখ লাখ হিন্দু রিফিউজি আইলে তাদের নিয়া কী করা হবে পার্টিশনের সময় সে কথাও আপনারা ভাবেন নাই।

ওসব পুরোনো কথা বাদ দিন তো। বাংলাদেশের অর্ধেকরও বেশি পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছে। এইটুকু পশ্চিমবাংলার মধ্যে সবাই গাদাগাদি করে থাকলে সবাইকেই কষ্ট সহ্য করতে হবে। এখন আমাদের সীমানা বাড়ানো দরকার। বাংলার বাইরে যদি বাঙালীদের জন্য আলাদা জায়গা পাওয়া যায়, তাতে আমাদের সকলেরই তো লাভ। এতে আপনারা আপত্তি করেন কেন?

-কোনো আপত্তি নাই। অনেকেই এই কথা বলে, আমিও এই যুক্তি সমর্থন করি। কোথায় আমাগো পাঠাবেন, ব্যবস্থা করেন।

-জানেন, দন্ডকারণ্য জায়গাটার এলাকা পশ্চিমবাংলার চেয়েও বড়। প্লেন থেকে সার্ভে করে দেখা হয়েছে!

-কেন, এরোপ্লেন কেন? সার্ভের লোকজন বুঝি মাটিতে নামতে ভয় পায়? সাপ-বিছা-টিছা আছে?

-আহা-হা, আপনি সবসময় একটা অন্য ফ্যাকড়া তোলেন। আগে প্লেন থেকে সার্ভে করতে হয়, তারপর রাস্তাটাস্তা বানিয়ে ...এতবড় একটা জায়গা পেলে আপনাদের অবস্থা পাল্টে যাবে। জমি-জমা পাবেন, চাষবাস করতে পারবেন...এখানে শুধু শুধু সরকারের হাত-তোলা ভিখিরি হয়ে পড়ে আছেন।

-আমি তো দুই পায়ে খাড়া। পাঠাইয়া দ্যান না আমারে জঙ্গলে। আমি নিজের হাতে জঙ্গল কেটে বসতি বানাবো!

ডাক্তারবাবু একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এবার চলি। সব রুগীকে যে একই ওষুধ দিই, একথা আবার যেন বলে দেবেন না সবাইকে। এর একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট আছে।

হারীত মন্ডলও উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুর হাত ধরে মিনতি করে বললো, দয়া করে আর একটু বসুন। আমি তারে নিয়ে আসতেছি!

হারীত মন্ডল বেরিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগলো। তার বিড়ি ফুরিয়ে গেছে, প্রথমে সে কিনলো এক আনার বিড়ি। তারপর গেল নিজের বাড়ির দিকে।

বাড়ি মানে একটি লম্বা গুদাম ঘর। রানাঘাটের কাছে এই ফাঁকা জায়গাটিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনী অনেকগুলি গাদামঘর বানিয়েছিল। এখন সেখানে ছাব্বিশ হাজার উদ্বাস্তু এনে ভরে রাখা হয়েছে। এর নাম কুপার্স ক্যাম্প।

পুলিশের দাবড়ানি খেয়ে হারীত মন্ডল সপরিবারে কাশীপুরের সেই কলোনি ছেড়ে চলে এসেছিল, তার ধারণা ছিল তাকে পাঠানো হবে অনেক দূরে। কিন্তু দন্ডকারণ্যের সেটেলমেন্ট এখনো পরিকল্পনার পর্যায়ে আছে, তাই তাকে এই কুপার্স ক্যাম্পে এনে তোলা হয়েছে। এখনো পুলিশের নজর আছে তার ওপর। স্থানীয় থানায় তাকে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়। সে কোনো প্রকাশ্য মিটিং করতে সাহস পায় না।

বড় বড় গুদামঘরগুলিতে একসঙ্গে অনেকগুলো করে রিফিউজি পরিবার থাকে। প্রথম প্রথম তারা চট, হোগলা বা ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে আলাদা আব্রু রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাচ্চাদের হুটোপাটিতে তা যখন-তখন খুলে পড়ে যায়, ছিঁড়ে যায়, ছিঁড়ে যায়। এখন চক্ষুলজ্জা ঘুচে গেছে। বিনা আব্রুতেই বিভিন্ন পরিবার তাদের সংসারধর্ম পালন করে চলেছে।

এই ক্যাম্প ছাড়াও কাছাকাছি একটি মহিলা শিবির, আর একটি রূপশ্রী পল্লী শিবির। মহিলা শিবিরে রাখা হয় যে সব নারীর অন্য কোন আত্মীয়স্বজন নেই বা পথে মারা গেছে, কিংবা যে-সব ধর্ষিতা নারী তাদের পরিবার কর্তৃক পরিত্যাক্তা হয়েছে, তাদের। সম্প্রতি এই মহিলা শিবিরেও ওপর

নানারকম হামলা চলছে। এককালে এখানে টিনের বেড়া দেওয়া ছিল। সেইসব টিন খুলে খুলে নিয়ে গেছে চোরেরা। তাদের চেয়েও বড় চোরেরা প্রকাশ্যেই ভেতরে ঢুকে বাছাই করা মেয়েদের নিয়ে যেতে চায়। একটা বেশ ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। এমনকি এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তুদের মধ্যেই দলাদলি, মারামারি শুর হয়ে গেছে।

হারীত মন্ডল জানে যে উদ্বাস্তুদের একতা নষ্ট হলে তারা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যারা তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে চায় তারা এখনো ভয় পায় উদ্বাস্তুদের প্রবল জনসংখ্যাকে। হারীত ওদের প্রাণপণে তা-ই বোঝাবার চেষ্টা করে।

হারীত যে এখান এসে রয়েছে তা সে কলকাতায় কারুকে জানায়নি। তার স্ত্রী কতবার তাকে অনুরোধ করেছে একটা অন্তত পোষ্টকার্ড লিখে তাদের ছেলে সুচরিতের খবরখাবর নিতে। হারীত তাতে রাজি নয়। তাদের একটা ছেলে অন্তত লেখাপড়া শিখুক, বড় হোক। সচরিত ভালো হাতে পড়েছে, সে বেঁচে যাবে। তাকে আর কোনোক্রমেই হারীত এই দুর্দশার মধ্যে টেনে আনতে চায় না। অদৃষ্টে যদি থাকে তাহলে আবার কোন না কোনদিন ছেলের সঙ্গে দেখা হবে।

নিজেদের গুদাম ঘরটিতে ঢুকে হারীত তার বিছানার কাছে গেল। এখানে রয়েছে কয়েকটি কাঠের পুতুল। কুমোরবাড়রি ছেলে হারীত অল্প বয়েস থেকেই নানারকম মূর্তি গড়তে শিখেছিল। এখানকার মাটি ভালো নয়, তাতে ভালো মূর্তি হয় না। কিন্তু এখানে পেয়ারা গাছ আছে প্রচুর, সে গাছের কাঠ দিয়ে সে পতুল বানায়, হাটবারে নিজের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে সেই পুতুল বিক্রি করে। বিক্রি হয় মোটামুটি, এর থেকে তার দু'চার পয়সা রোজগার হয়।

একটি বেশ বড় পুতুল বেছে নিল হারীত। তারপর গুদামঘরের এককোণে শুয়ে থাকা একটি মেয়েকে ডেকে বললো, এই গোলাপী, গোলাপী ওঠ!

এইগরমের মধ্যেও মেয়েটি কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। হারীত একটানে কাঁথাটা সরিয়ে দেখলো মেয়েটি উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। মেয়েটির বয়স আঠারো-উনিশের বেশি নয়, পিঠের ওপর এক রাশ চুল, পরেন একটা শতচ্ছিল লাল-ডুরে শাড়ি। ছেঁড়া হলেও শাড়িটি পরিষ্কার।

দুঃখী মানুষের কান্না হারীত হারীত অনেক দেখেছে। কান্না দেখতে দেখতে মানুষের বক পাথর হয়ে যায়। এই মেয়েটির কান্না দেখেও হারীতের কন্টস্বর একটুও কোমল হল না। সে ধমক দিয়ে বললো, এই এই ছেমরী, ওঠ্ তো! সময় নাই বেশি।

জোর করে হাত ধরে টেনে সে অনিচ্ছুক মেয়েটিরকে দাঁড় করালো, আবার বকুনি দিয়ে বললো, মুখখানা মোছ! এঃ যেন একেবারে শ্মাশানকালী!

মেয়েটির গায়ের রং কালো, কিন্তু তার মুখে একটা উজ্জ্বল শ্রী আছে। চোখ দুটি গভীর। তার ঘাড়ের ওপর একটা বড় কাটা দাগ, কোনো ধারালো অস্ত্রের কোপ পড়েছিল সেখানে, এখনো ভালো করে শুকোয়নি।

গুদামঘরের এখানে ওখানে আরও অনেকে শুয়ে আছে। এরা দিনের বেলাতেও শুয়ে থাকে। কারুর কোনো কাজ নেই। সরকারি ডোলে কোনোরকমে খাওয়াটা জুটে যায়। হারীতের কথাবার্তা শুনে কেউ কোনো মন্তব্য করলো না, হারীতের স্ত্রী ঘরের মধ্যে নেই। গোলাপীকে নিয়ে হারীত চলে এলো বাইরে, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেও হারীত গোলাপীর হাত ধরে নিয়ে চললো। একবার গোলাপী থেমে যেতেই হারীত তাকে একটা মৃদু চড় কষিয়ে বললো, আবার? ডাক্তারবাবু চইলা যাবেন দেরি হইলে।

ডিসপেনসারির মধ্যে ঢুকে হারীত দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ডাক্তাবাবুকে বললো, এর নাম গোলাপী। নাম শুনেছেন আশা করি।

ডাক্তারবাবু বিস্ফোরিত চোখে তাকালেন। হ্যাঁ, তিনি নাম শুনেছেন। গত মাসে উদ্বাস্তুদের নিজেদের মধ্যেই একটা খন্ডযুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, গোলাপী নামের একটি মেয়ে ছিল তার নায়িকা। দু'একটি পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছিল।

হারীত তার হাতের পুতুলটা এগিয়ে দিয়ে বললো, ডাক্তারবাবু, আপনারে তো আমি ফি দিতে পারবো না। এই পুতুলটা এগিয়ে দিয়ে বললো, ডাক্তারবাবু, আপনারে তো অমি ফি দিতে পারবো না। এই পুতুলটা ন্যান, আপনার ঘর সাজাবেন।

ডাক্তার পুতুলটি দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। একেবারে পাকা হাতের কাজ। তাঁর খানিকটা

শিল্পের বোধ আছে, তিনি দেখেই বুঝলেন, গ্রাম্য হাট-বাজারে যে-সব পুতুল দেখা যায়, সেগুলির সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলে না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কে বানিয়েছে? আপনি?

হারীত গা মুচড়ে বললো, এই আর কী, কিছু তো কাজ-কাম নাই, তাই একটু টুকটাক যা পারি-

ডাক্তারবাবু পুতুলটাকে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। একটি মেয়ের পূর্ণবয়ব মূর্তি মুখখানিতে ভারি সারল্য মাখা।

হারীত বললো, দ্যাখেন তো, ঐ পুতুলের মুখের সাথে এই মেয়েটির মুখের কোনো মিল পান কি না। আর দেখেই বানাইছিলাম।

ডাক্তারবাবুর চোখ তুলে গোলাপীকে দেখলেন। গোলাপীর কান্না-মাখা মুখের সঙ্গে এই পুতুলের কোনো মিল খুঁজে পেলেন না।

হারীত বললো, এ আমার মেয়ে। আপন নয় অবশ্য। ওর বাবারে আমি চিনতাম, সে কলেরায় মরেছে। ওর মায়ের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই, সেই দ্যাশ ছাড়ার সময় থেকেই, বুঝলেন। অন্যথা মেয়ে বলে যাতে ওরে মহিলা শিবিরে ভরে না দেয়, তাই আমি ওরে আমার কন্যা পরিচয় দিয়ে নিজের কাছে রেখেছি।

গোলাপীর সর্বাঙ্গে নজর বুলিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, বাকিটা আর বলতে হবে না, বুঝেছি। কিন্তু মন্ডলমশাই, এর চিকিৎসা করার ক্ষমতা আমার নেই।

হারীত বললো, না, শোনেন, বাকিটা শোনেন। আপনি তো জানেন, আমাগো গুদামঘরগুলিতে সকলে মিলে কী রকমভাবে থাকি। ছেলেমেয়েগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে, তারা পাশাপাশি শোয়। পাটখড়ি আর আগুন কাছাকাছি আনলে কী রকম পট পট চড়চড় শব্দ হয় শোনেন নাই? উঠতি বয়সের পোলা-মাইয়ারা সেইরকম আগুন আর পাটখড়ি। ভাবলাম কোনোরকমে নমো নমো করে মেয়েটার বিয়া দিয়ে দিই। তিন নম্বরওয়ার্ডের একটি ছেলের কোনরকমে রাজি করাইছিলাম। তার পরেই হইলো কী, রূপশ্রী কলোনির একটি ছেলেরও খুব পছন্দ নাকি গোলাপীকে। সে কথা আগে বলে নাই। এই নিয়েই তো তিন নম্বর ওয়ার্ড আর রূপশ্রী কলোনির ছেলেগো মধ্যে কাজিয়া। রাগের চোটে একজন এই গোলাপীর কাঙ্কে কোপ মেরেছিল, এই দ্যাখেন!

ডাক্তারবাবুটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, এখন মেয়েটির এই অবস্থা করলো কে?

হারীত বললো, জানি না। আমি আরে জিজ্ঞাসাও করি নাই। কাকে দোষ দেবো বলেন? ওর পোয়াতী হবার জন্য আসল দায়ী কে জানেন? দায়ী হলো শনি, উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে যে শনি আমাগো উপর ভর করেছে।

-এখন এই অবস্থায় ওর তো আর বিয়ে হবে না। কে বিয়ে করবে?

-কেউ না সব বীরপুরুষের এবারে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। আর অন্য সকলে এই মেয়েটারে আর ওর পেটের টারে মেরে ফেলাতে চাইবে। তাই... । এখন ডাক্তারবাবু, আপনার দ্বারস্থ হয়েছি, এখন দেখেন আপনি বাঁচাইতে পারেন কি না!

গোলাপী মাটির দিকে মুখ করে আছে, হাত দুটি বুকের কাছে মুঠি করা, তার দণ্ডায়মান মূর্তিটিকে নিষ্প্রাণ মনে করা যেত, যদি না তার দু'চোখ দিয়ে জলে ধারা গড়াতো।

ডাক্তারবাবুও মুখ নিচু করে বললেন, আমি আর কী করি বলুন! আমার কতটুকু সাধ্য আছে?

হারীত চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, তা হলে ওকে পাঠিয়ে দেবো মহিলা শিবিরে? মেয়েটা দ্যাখতে শুনতে খারাপ না, খুব শিগগিরি চালান হয়ে যাবে কইলকাতায়। তারপর বিক্রি হয়ে যাবে মাংসের বাজারে।

ডাক্তারবাবু উষ্ণ হয়ে বললেন, আরে না, না, ছি ছি, আপনি জেনেশুনে একাজ করবেন? আপনি না ওদের নেতা?

হারীতও গলা চড়িয়ে বললো, আর না হলে কী করবো কন? আমি ওকে নিজের মেয়ের মতন দেখি, আমি তো অরে বিয়া করতে পারি না। তবে অরে আপনি কিছু বিষ দ্যান, যাতে বিনা যন্ত্রণায় মরত পারে! তবে অরে আপনি কিছু বিষ দ্যান, যাতে বিনা যন্ত্রণায় মরতে পারে!

দু'জন পুরুষ পরস্পরের দিকে তীব্র চোখে তাকালো। যেন পরস্পরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দু'জনই অসহায়, তাই এত ক্রোধ। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এক আর্ত নারী, যাকে উদ্ধার করতে চায় দু'জনেই, কিন্তু সামর্থ্য নেই।

ডাক্তারবাবুই আগে চোখ পাকিয়ে বললেন, আপনি এক কাজ করুন। এই মেয়েটিকে নিয়ে, আপনার পরিবার নিয়ে চরবেতিয়া চলে যান। উড়িষ্যার চরবেতিয়ার ক্যাম্প আছে। আমি রেকমেন্ড করে দিলে কাল-পরশুই আপনারা চলে যেতে পারবেন। উড়িষ্যার মানুষজন ভালো, ভদ্র, নম্র। সেখানে মেয়েটির যা হোক একটা পরিচয় দেবেন। নতুন জায়গা, কোনো অসুবিধে হবে না আশা করি। বলুন, যাবেন?

হারীত মন্ডল এতক্ষণ বাদে আবার হাসলো, পকেট থেকে বিড়ি বার করে বললো, চরতেতিয়া, হ্যাঁ নাম শুনেছি, তা মন্দ কী! নতুন জায়গায় গিয়েই দ্যাখা যাক। আমাদের পন্ডিতমশাই বলতেন, চরৈবেতি, চরৈবেতি! সে কথাটার মানে মনে নাই, বোধহয় চরবেতিয়ায় আমার নিয়তি আমার নিয়ে যাবে, সে কথাই তিনি আগে থেকে টের পেয়ে গেছিলেন, তাই না?

॥ ৪৭ ॥

আগের দিনই খবর দিয়ে রেখেছিলেন, বেলা একটার সময় ত্রিদিব নিয়ে এসে তুলে নিলেন মমতাদের। এক গাড়িতে আটজন, তাও তো সুপ্রীতি কিছুতেই আসতে চাইলেন না; ত্রিদিবি অবশ্য বারবার সুপ্রীতিকে বলেছিলেন, ওর মধ্যেই কোনো রকমে জায়গা হয়ে যাবে। প্রতাপও শেষ মুহূর্তে থেকে যেতে চাইছিলেন, ত্রিদিব প্রায় জোর করেই প্রতাপকে নিজের পাশে বসালেন। মুন্নিকে বসত হলো মায়ের কোলে, বাবলু বাবলু কিছুতেই কারুর কোলে বসবে না, উপরন্তু তাকে জানালার ধার ছেড়ে দিতে হবে। ইডেন গার্ডেনে বিরাট মেলা ও প্রদর্শনী হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী উপলক্ষে, ত্রিদিব সবাইকে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে।

গাড়ি চলার পর দেখা গেল, খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না, সবাই মোটামুটি সেট করে গেছে, তখন প্রতাপ বললেন, তা হলে দিদিকেও নিয়ে গেলে হত না? আর একজনও ঠিক এঁটে যাবে। দিদি একলা একলা বাড়িতে পড়ে থাকবে?

ত্রিদিব বললেন, হ্যাঁ, জায়গা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু উনি যে আসতে চাইছেন না।

প্রতাপ সুলেখাকে বললেন, সুলেখা তুমি গিয়ে একটু বলো। তোমার কথা দিদি ঠেলতে পারবেন না।

আবার গাড়ি ব্যক করে আনা হলো। সুলেখার সঙ্গে মমতাও উঠে গেলেন ওপরে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুপ্রীতিকে নিয়ে এলেন। সুপ্রীতি লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললেন, আমি বুড়ি হয়ে গেছি, আমার কী আর ওসব দেখার বয়েস আছে! আমায় নিয়ে টানাটানি কেন।

ত্রিদিব বললেন, দিদি, আপনি মোটেই বুড়ি হননি। আপনি না গেলে আমাদের সবারই খুব খারাপ লাগতো।

সুপ্রীতি ওঠার ফলে তুতুলের পাশে বসা পিকলুকে সে জায়গা ছেড়ে নেমে গিয়ে বসতে হলো সামনের সীটে।

প্রতাপ ঘাড় ঘুরিয়ে সুলেখাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করে দিদিকে এত তাড়াতাড়ি রাজি করালে?

সুলেখা মিষ্টি হেসে বললেন, খুব সোজা। গিয়ে বললুম, আপনি না গেলে আমরা দুজনেও যাবো না!

সুপ্রীতি সঙ্কুচিত হয়ে যতদূর কম জায়গা নিয়ে বসার চেষ্টা করতে করতে বললেন, একসঙ্গে এত লোক একটা গাড়িতে উঠলে পুলিসে ধরে না?

ছেলেমেয়েরা সবাই হেসে উঠলো।

প্রতাপ বললেন, দিদি, তোমার মনে নেই, একবার অসিতদার গাড়িতে আমরা কতজন মিলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম? বাবা-মা এসেছিলেন সেবার...

ছেলেমেয়েরা পুরানো কথায় আগ্রহী নয়। বাবলু জিজ্ঞেস করলো, দাদা, ইডেন গার্ডেন মানে স্বর্গের বাগান, তাই না?

পিকলু বললোদ হ্যাঁ, সেখানে আদম আর ইভ থাকতোএসখানে শয়তান ইভকে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইয়েছিল।

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, শয়তান স্বর্গের বাগানে গেল কী করে? শয়তানের তো নরকে থাকার কথা।

পিকলু বললো, জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইয়ে শয়তান তো ভালোই করেছিল। না হলে মেয়েরা চিরকাল বোকা থেকে যেত!

মুন্নি বললো, আমি ঐখানে গিয়ে গেয়ান বিরিক্ষের ফল খাবো!

এবারে বড়রাও হেসে উঠলো, বাবলু তার ছোট বোনের মাথায় আলতো চাঁটি মেরে বললো, দূর পাগলি! এই ইডেন সেই ইডেন নয়? আমরা কি স্বর্গে যাচ্ছি নাকি?

প্রতাপ বললেন, আমাদের ছেলেবেলায় ইডেন গার্ডেন খুব সুন্দর, সাজানো জায়গা ছিল। কত সাহেব-মেম যেত, প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা গোরাদের ব্যাণ্ড বাজতো। বর্মা থেকে একটা আস্তো প্যাগোডা তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে। এরখন কী অবস্থা কে জানে, অনেকদিন তো যাই নি!

ত্রিদিব বললেন, এখনও বেশ ভালো আছে। মজুমদার সাহেব, সিগারেট আছে নাকি, দিন তো একটা খাই।

ত্রিদিব স্টিয়ারিং-এর ওপর এক হাত রেখে সিগারেট ধরালেন। বাবলু মুগ্ধভাবে চেয়ে রইলো সেদিকে। তার মামাবাবু এক হাতে গাড়ি চালাতে পারেন! সে নিজে দু'হাতে ছেড়ে সাইকেল চালাতে শিখেছে, বড় হয়ে সে দু' হাত ছেড়ে মটরগাড়ি চালাবে!

সেন্ট্রাল এভিনিউতে কিসের যেন একটা মিছিল, দারুণ জ্যাম হয়ে আছে, গাড়ি এগোতেই চাইছে না। ছোটদের আর ধৈর্য থাকছে না। সুলেখার কথা মতন ত্রিদিবি ডান দিকে গিরীশ পার্কের পাশ দিয়ে বেঁকে মশলাপট্টি ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে এসে পড়লেন। অদূরে হাওড়া ব্রীজ দেখেই বাবলুর বুকটা ধক করে উঠলো। দুপুরের হাতছানি।

মহিলা তিনজন গঙ্গনদী দেখে প্রণাম করলেন হাত তুলে। সুপ্রীতি বললেন, এইবার একবার দেওঘর যাবো, কতদিন মাকে দেখি না। আমরা এই যে মেলা দেখতে যাচ্ছি, মা এই সব দেখলে কত খুশী হয়, একেবারে ছেলেমানুষের মতন এটা কিনতে চায়, ওটা কিনতে চায়...

মা যে ইদানীং কত বদলে গেছেন, তা সুপ্রীতি বা মতারা জানেন না। প্রতাপ কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন।

মমতা বললেন, আমরা বাড়ি বদলাবার পর মাকে কিছুদিন কলকাতায় এনে রাখতে হবে।

স্ট্রান্ড রোড ধরে বড় বড় লরি ও ঠ্যালা গাড়ির পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে ত্রিদিবের গাড়ি এক সময়ে এসে থামলো ইডেন গার্ডেনের সামনে। টিকিট কেটে ভেতরে ঢোকার পর বাচ্চারা তো বটেই, মমতা সুপ্রীতিরাও বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন খানিকটা। এত বিশাল মেলা বা প্রদর্শনী ওঁরাও আগে কখনো দেখেননি। কতগুলি মণ্ডপ,কত রকমারি দোকান, কত জিনিসপত্র, কত খাবার, কত রং। এর মধ্যে তো মানুষ দিশাহারা হয়ে যাবে। মানুষের ভিড়ও প্রচুর,খোনে কেউ হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর হবে।

দলটির নেতৃত্বে নিলেন প্রতাপ। সবাই একসঙ্গে কাছাকাছি থেকে এগোতে লাগলেন। কোনো দোকানের সামনে থামা হলেও মিনিট পাঁচকে বাদেই তিনি হাঁক দিচ্ছেন, এবারে চলো। এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়ালে চলবে না, অনেক কিছু দেখার আছে! বাবলু দু'একবার এদিক ওদিক দৌড় মারবার চেষ্টা করলেও প্রতাপ তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন তার ওপরে, পিকলুকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠাচ্ছেন তাকে ধরে আনতে।

মাঝে মাঝেই জল। তাতে ভাসছে ছোটো ছোটা রঙিন নৌকো। বড় বড় গাছের নিচে অনেক বেলুন ঝুলিয়ে এয়ার গান দিয়ে চাঁদামারির খেলা চলছে। ঠিক মাঝখানের বেলুনটি ফাটাতে পারলে একটা বড় টর্চলাইট পুরস্কার। বাবলু-পিকলুরা সেখানে দশটা পয়সা নষ্ট করলো, বাবলু আরও পয়সা চাইলে প্রতাপ গম্ভীর ভাবে বললেন, আর নয়!

এক জায়গায় জলের ওপর একটা রেস্টুরেন্ট, নাম স্বপনপুরী। নানা রঙের আলো দিয়ে সেটি সাজানো। সেটি আবার একটু একটু ঘুরছে। একে ভাসমান দোকান, তায় আবার নিজে নিজে ঘুরন্ত, তা দেখে ওদের মুগ্ধতার সীমা থাকে না। সুপ্রীতি দু'তিনবার জিজ্ঞেস করলেন, কী করে করলো, কী করে করলো, অ্যাঁ? পিকলু তার বিজ্ঞান-পড়া বুদ্ধি দিয়ে বোঝাতে লাগলো।

সুলেখা ত্রিদিবকে বললেন, তুমি আমাদের ওখানে খাওয়াবে?

ত্রিদিব বললেন, হ্যাঁ খাওয়াতে পারি। কিন্তু এখন তো কারুর খিদে পায়নি, সব দেখে টেখে ফেরার সময় খাবো বরং।

এই সব সময়ে প্রতাপরই সমস্ত খরচ করা অভ্যেস। এই সব হোটেল-টোটেল এতজন মিলে খেতে কত টাকা লাগবে কে জানে! অনেকদিন প্রতাপ হোটেল-রেস্টুরেন্ট ঢোকেন নি। তিনি আজ সঙ্গে বেশি টাকা আনেননি, মমতার কাছে কিছু আছে কী? তিনি মমতার দিকে তাকালেন। মমতা ঠিক বুঝতে পেরেছেন, তিনি সামান্য হেসে মাথাটা অতি সূক্ষ্মভাবে নাড়লেন, তারপরই আবার গল্প করতে লাগলেন সুলেখার সঙ্গে।

ত্রিদিব বললেন, পিকলুরা বরং আলাদা ঘুরে ঘুরে দেখুক। সব সময় বড়দের সঙ্গে থাকতে ওদের ভালো লাগবে কেন?

পিকলু এই কথাটা শোনা মাত্র ত্রিদিবের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করলো। মনে মনে সে এটাই চাইছিল, কিন্তু বাবার সামনে বলার সাহস পাচ্ছিল না।

প্রতাপ বললেন, ওরা আলাদা যাবে, কিন্তু বাবুলটা যে অবাধ্য, ওকে সামলাবে কে?

মমতা ত্রিদিবককে সমর্থন করে বললেন, না আলাদাই যাক। ওরা ওদের মতন দেখুক। বাবলু যদি হারিয়ে যায় তা হলে আমরা আর ওকে খুঁজবো না, ও বাড়িতে ফিরতেও পারবে না। ও এখানে কোনো চায়ের দোকানে বেয়ারার কাজ করবে, সেই বেশ হবে!

বাবলু বললো, হ্যাঁ, আমি ঠিক রাস্তা চিনে বাড়ি যেতে পারবো।

সুপ্রীতি বাবলুর চুলো হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, এই দস্যিটা সব পারে! কিন্তু তুই যদি আজ হারিয়ে যাস, তাহলে আমিও আজ আর বাড়ি যাবো না। আমাকেও আর কেউ খুঁজে পাবে না।

ঠিক হলো যে, দু'ঘণ্টা বাদে পিকলু-বাবলুরা সেই স্বপনপুরীর কাছে ফিরে আসবে। ত্রিদিব নিজের ঘড়িটা খুলে পরিয়ে দিলেন পিকলুর হাতে।

মুন্নিকে তার আপত্তি সত্ত্বেও নিজের কাছে রাখলেন মমতা। প্রতাপ পিকলুর হাতে পাঁচটা টাকা দিলেন ওদের খরচের জন্য। পরের মুহূর্তেই পিকলু হাতে।

প্রতাপ সুলেখাকে বললেন, এবারে তুমি যাতে হারিয়ে না যাও, সেটার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে আমাকে। বাবলুর পরেই তোমাকে নিয়ে আমাদের বেশি ভয়।

সুলেখা ভ্রুভঙ্গিরে হেসে বললেন, আ-হা-হা-হা!

একধারও ঠিক কাছাকাছি মানুষজনেরা সুলেখাকে বার বার ঘুরে ঘুরে দেখছে। সুলেখার রূপ শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও চোখ টানে। সুপ্রীতি বা মমতাও মোটেই অসুন্দর নন, মমতাকে দেখে বোঝাই যায় না তাঁর পিকলুর মতন বড় ছেলে আছে, কিন্তু সুলেখার রূপে ধরটাই অন্যরকম। অথচ সুলেখা কিছুই সাজগোজ করননি, মাথার চুল শ্যাম্পু করা, একটা খোঁপাও বাঁধেননি আজ।

সুলেখার প্রতি অন্য লোকদের এই আকর্ষণ ত্রিদিব গ্রাহ্য করছেন না, তার গা-সহা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রতাপ ঈর্ষা বোধ করছেন। পাশ দিয়ে যাবার সময় কেউ যাতে ইচ্ছে করে সুলেখার শরীর ছুঁয়ে না যায় সেইজন্য প্রতাপ সুলেখাকে প্রায় পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছেন, ভিড় এড়িয়ে তিনি তাঁর দলটিকে নিয়ে চলেছেন জলের ধার দিয়ে।

মমতা বললেন, আমাকে একটা বঁটি কিনতে হবে। এখানে পাওয়া যাবে না?

সুপ্রীতি বললেন, হ্যাঁ আমাদের বঁটিটার একেবারে ধার নষ্ট হয়ে গেছে।

সুলেখা বললেন, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি, এখান থেকে কোনো কাজের জিনিস কেনা মানায় না! তুমি একটা বঁটি হাতে নিয়ে ঘুরবে নাকি?

প্রতাপ ব্যঙ্গ করে বললেন, শুধু বঁটি? কেন, ঝাঁটা কিনতে হবে না?

মমতা স্বামীর দিকে তাকালেন। বিবাহিত পুরুষরা অন্য সুন্দরী মেয়েদের সামনে নিজের স্ত্রীকে ছোটখাটো খোঁটা দিয়ে আনন্দ পায়।

মমতা বললেন, আসলে আমার কী কেনার ইচ্ছে শুনলে তোমরা কেউ বিশ্বাস করবে না। হাসবে!

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করলেন, কী?

সামনের একটা দোকানের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে মমতা বললেন, একটা কার্পেট। বেশ পুরু হবে, ডিজাইন করা থাকবে। একটা কার্পেট-পাতা ঘরে থাকার খুব শখ আমার।

সবাই কয়েক মুহূর্ত চুপ হয়ে গেলেন। একটা সাধারণ ভাড়া বাড়িতে যে থাকে, তার কার্পেটের শখ সত্যিই অবিশ্বাস্য। সুপ্রীতি স্বেচ্ছায় যে-বাড়ি ছেড়ে এসেছেন, তাঁর শ্বশুরবাড়িতে নিজের ঘরে লাল কার্পেট পাতা ছিল।

মমতা আবার বললেন, একদিন আমি আমার দু একটা গয়না বিক্রি করেও একখানা কার্পেট কিনবো।

বিষয়টা লঘু করার জন্য সুলেখা বললেন, তখন তো তোমার ঘরে ঢুকতেই আমাদের ভয় করবে। যেসব বাড়িতে কার্পেট পাতা থাকে, সেসব বাড়ির লোকেরা এমন করে যেন পা দিয়ে খুব অন্যায় করে ফেলেছি। জুতো খুলতে ভুলে গেলে তো আর রক্ষা নেই!

এই সময় একজন লোক কোথা থেকে এসে বললো, আরে ত্রিদিবদা, আপনারা কখন এলেন? দূর থেকে আপনাদের দেখলুম।

লোকটি কথা বলছে ত্রিদিবের সঙ্গে কিন্তু চেয়ে আছে সুলেখার দিকে। লোকটির সামান্য মুখ চেনা, ত্রিদিবিব তার নাম করতে পারলেন না বলে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারলেন না। লোকটি কিন্তু ওঁদের সঙ্গে সেঁটে রইলো এবং অনর্গল কথা বলতে লাগলো। প্রতাপ স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন, কিন্তু ত্রিদিবের চেনা লোককে তো তিনি ধমক দিয়ে চলে যেতে বলতে পারেন না?

সুলেখা একটি চানাচুর কুব নাম করা। কিনবে?

সবার জন্য এক এক ঠোঙা চানাচুর কেনা হলো। সঙ্গের সেউ উটকো লোকটা দাম দেবার চেষ্টা করতেই সুযোগ পেয়ে প্রতাপ রূঢ় ভাবে তাকে বললেন, আপনি পয়সা বার করছেন কেন?

লোকটির কাছ থেকে আলাদা হবার জন্য একটু পরে সুলেখা, মমতা আর সুপ্রীতি উঠে বসলেন নাগরদোলায়। পুরুষদের কেউ চাপবেন না। তিন নারী যেন বালিকা বয়েসে ফিরে গিয়ে খানিকটা ভয়-মেশানো খুশিতে হাসতে লাগলেন খুব।

পিকলু-বাবলু-তুতুল ঘুরে ঘুরে দেখছে একটার পর একটা মণ্ডপ। পিকলু বিজ্ঞানের ছাত্র তলোয়ার, বন্দুক রাখা আছে, সেই মণ্ডপে ঢুকে সে তার ভাই বোনকে শোনাতে লাগলো পলাশী যুদ্ধের কলঙ্ক কাহিনী। তুতুল মুগ্ধ হয়ে শোনে, কিন্তু বাবলুর অত ইতিহাস -জ্ঞান সঞ্চয়নের ধৈর্য নেই, সে এটা সেটা হাত দিয়ে দেখতে চায় আর রক্ষকদের বকুনি খায়। সিরাজউদ্দৌলার বর্শাটা ছুঁয়ে সে বললো, উরিব্বাস, কত লম্বা! দাদা, সিরাজ নবাব কত লম্বা ছিল, এত বড় বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করতে পারতো!

পিকলু বললো, এই বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করতো না, এটা অনেকটা ডেকরেটিভ, বুঝলি, হয়তো সিংহাসনের পাশে সাজানো থাকতো, জুতোর দোকানে দেখিস না, এক একটা কী রকম পেল্লায় পেল্লায় জুতো থাকে! ভবিষ্যতের কেউ তোর মতন হয়তো সেই একখানা জুতো দেখে ভাববে, এখনকার কালে অত বড় পা-ওয়ালা মানুষ ছিল!

তুতুল বললো, এই কামানটা কিন্তু বেশ ছোট। এর থেকে অনেক বড় কামান দেখলাম অন্য জায়গায়।

পিকলু বললো, এটা ইংরেজদের কামান। নবাবী কামান ঢাউস ঢাউস ছিল, কিন্তু ইংরেজদের কামান ছোট হলেও বেশি এফেক্টিভ। চট করে মুখ ঘোরাতে পারতো, ক্যারি করার সুবিধে ছিল। সিরাজউদ্দৌল্লা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ জয় করে এই রকম কয়েকটা কামান কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তুতুল বললো, পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করতো-

পিকলু বললো, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো! এক একটা সামান্য সামান্য ঘটনায় ইতিহাসের নিয়তি বদলে যায়।

ইদানীং নির্মলেন্দু লাহিড়ীর রেকর্ড করা সিরাজউদ্দৌল্লা নাটকটি খুব জনপ্রিয়। রেডিওতে প্রায়ই বাজে। সরস্বতী পূজো, দুর্গা পুজোয় মাইকে বাজে। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর কাঁপা কাঁপা গলায় সংলাপ শুনতে শুনতে অনেকের মুখস্থ। বাবলু সেই নাটকেরই সংলাপ চেঁচিয়ে বলে উঠলো, বাংলা বিহার উড়িষ্যার হে মহান অধিপতি, তোমায় তো ভুলিনি জনাব? তারই পুরুষ্কার কি এই কণ্টক মুকুট? তারই পুরুস্কার কি এই ছিন্ন পাদুকা!

বাবলুর রিনরিনে কণ্ঠস্বর শুনে অনেকে ঘুরে তাকালো, কেউ বললেন, বাঃ খোকা, আর একটু বলো তো!

পিকলু লজ্জা পেয়ে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

আর একটি মণ্ডপে রয়েছে নন্দকুমার ও রামমোহন রায়ের পাগড়ি, চোগা-চাপকান। তা ছাড়া রয়েছে রামমোহনের চুল, পৈতে ও নিজের হাতে লেখা চিঠি। পিকলু রামমোহনের খুব ভক্ত, সে প্রায়ই বলে রামমোহন হচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ, তাঁর জন্যই আমরা পশ্চিম দুনিয়াকে চিনতে শিখেছি, একালের জ্ঞান-বিজ্ঞান ...

বাবলু দৌড়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়, একবার সে আইসক্রিম কেনার জন্য দাদার কাছ থেকে পয়সা চাইতে আসে, আর একবার সে বাদাম কিনে এনে দাদা আর দিদিকে দেয়। খানিকবাদে এসে দেখে যে পিকলু তখনও মন দিয়ে রামমোহনের একটা পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করছে, সে পিকলুর হাত ধরে টানাটানি করে বলে, দাদা, চলো, অন্য কথাও চলো।

পিকলু ঐ রকমই আর একটি মণ্ডপে ঢোকে, যেখানে রয়েছে বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। বিদ্যাসাগরের দুধ খাওয়ার বাটি, দোয়াতদানি। রামকৃষ্ণের ছাতা, একটা খড়্গ।

এটাও বাবলুর পছন্দ হয় না। সে বললো, দাদা, ঐ দিকে চলো না, ওখানে রানা প্রতাপের সব জিনিস আছে।

পিকলু বললো, দাঁড়া, একটু পরে যাবো।

বাবলুর এই সব বাজে বাজে জিনিস দেখার ধৈর্য নেই। সে একাই চলে গেল রানা প্রতাপের মণ্ডপে। বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণকে সে ভালো করে চেনে না। কিন্তু ইস্কুলের বইতে পড়া রানা প্রতাপের কাহিনী তাকে চঞ্চল করে। বইতে একটা ছবি আছে, রানা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ দূর থেকে ডাকছে, হো নীল ঘোড়াকা সওয়ার!

রানা প্রতাপের বর্ম, তলোয়ার, পাগড়ির দিকে মুগ্ধ ভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে বাবলু মনে মনে একটি নীল ঘোড়ার সওয়ার হয়ে যায়। সে যেন সত্যিই শুনতে পায় টগবগ টগবগ ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ।

অন্য মণ্ডপে তুল পিকলুকে জিজ্ঞেস করে, রামকৃষ্ণ এই খাঁড়াটা নিয়ে কী করতেন?

পিকলু বললো, তুই সেই গল্পটা জানিস না? রামকৃষ্ণ মা কালীকে স্বচক্ষে দেখার জন্য ডেকে ডেকে পাগল হচ্ছিলেন। দেখা দাও, দেখা দাও বলে আর্তনাদ করতেন। তারপর সত্যিই বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, এরকম টেম্পোরারি ইনস্যানিটি হতে পারে। কিছুতেই যখন দেখা পাচ্ছেন না, তখন মা কালীর হাত থেকে খাঁড়াটা খুলে নিয়ে বলেছিলেন, মা, দেখা দিবি না, তা হলে আমি তোর সামনেই আত্মঘাতী হবো। নিজের গলাটা যখন কাটতে গেলেন, তখন মা কালী নাকি সশরীরে এসে তাঁর হাত চেপে ধরেছিলেন।

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, সত্যি মা কালী এসেছিলেন?

পিকলু অবজ্ঞার সঙ্গে হেসে বললো, সত্যি সত্যি মাকালী বলে কিছু আছে নাকি? তুই-ও যেমন! নিশ্চয়ই হ্যালুসিনেশান জাতীয় কিছু ব্যাপার? আর এদিকে দ্যাখ কী কন্ট্রাস্ট। বিদ্যাসাগরও রামকৃষ্ণের সমসাময়িক, তিনিও তো গ্রাম্য মানুষের ছেলে, কিন্তু তিনি বলতেন ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার সময় নেই, আমার অনেক কাজ। তিনি তখন গ্রামে গ্রামে ছেলেমেয়েদের জন্য ইস্কুল খোলা, বিধবা বিবাহ এইসব নিয়ে ব্যস্ত। বাঙালী মেয়েরা যে আজ লেখাপড়া শিখতে পারছে তা বিদ্যাসাগরের জন্যই। কিন্তু এখনকার বাঙালী মেয়েরা রামকৃষ্ণেরই পুজো করে, তাই ক'জনের বাড়িতে বিদ্যাসাগরের ছবি বাঁধানো দেখেছিস?

একটু পরে বাবলু এসে আবদার ধরলো, সে সার্কাস দেখবে।

সার্কাস মানে মাঝারি আকারের একটা তাঁবু, তার বাইরে সব লোমহর্ষক ছবি আঁকা বিজ্ঞাপন। কাটা মুণ্ড কথা বলে, তলার দিকটা মাছের মতন-ওপরের দিকে একটি সুন্দরী মেয়ে, মটর সাইকেল আরোহীর মরণকূপে ঝাঁপ ইত্যাদি। আট আনা করে টিকিট। পিকলু পয়সা হিসেব করে দেখলো যাওয়া যেতে পারে।

তুতুল কাতরভাবে বললো, আমার ওসব দেখতে ইচ্ছে করছে না।

কিন্তু বাবলুর জিদ সে দেখবেই দেখবে। তখন একটা টিকিট কেটে বাবলুকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ভেতরে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের শো, ভাঙার পর বাবলু দাঁড়িয়ে থাকবে গেটের কাছে।

তুতুল বললো, অনেকটা তো সময়। চলো, আমরা ততক্ষণ একটু ঘুরে আসি।

দু'জনে হাটতে লাগলো মন্থর ভাবে। আর একটি মণ্ডপ দেখে পিকলু জিজ্ঞেস করলো, এটার মধ্যে যাবি?

তুতুল বললো, বাইরেই ভালো লাগছে। একটু হাঁটি।

পিকলু আবার খানিকটা বাদাম কিনলো, তারপর বাদাম ভাঙতে ভাঙতে হাঁটতে লাগলো, দুজনেই নিঃশব্দ। অন্য বহু লোক কথা বলছে, মাইকে নানারকম আওয়াজ, হারানো নাম ঘোষণা, এর মধ্যে ওদের কথা বলার দরকার নেই। তুতুল আজ পরে এসেছে গোলাপি রঙের একটা শাড়ি, গলায় একটা কাচের মালা। কপালে টিপ। পিকলু পরে আছে সাদা জামা, সাদা প্যান্ট। সে জামার বুকের বোতাম লাগায় না। তার মাথার চুল এলোমেলো।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে এলো একটা নির্জন জায়গায়। এত ভিড়ের কাছাকাছিই যে এমন নির্জন জায়গা থাকতে পারে, যেন বিশ্বাসই করা যায় না। কয়েকটা পাশাপাশি বড় গাছ তারপরে খানিকটা জমি সবুজ মখমলের মতন ঘাসে ডাকা। কয়েকটা তাঁবুর পেছন দিক, তাই এদিকে কেউ আসছে না।

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, এখানে ঘাসের ওপর একটু বসবে?

পিকলু বসে পড়ে বাদামের ঠোঙাটা ঘাসের ওপর রাখলো। তারপর বললো, জায়গাটা এত পরিষ্কার, ওঠার সময় বাদামের খোলাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাবো।

দু'জনে শেষ করতে লাগলো বাদাম। পিকলু দু'বার ঘড়ি দেখলো। হাতে নুতন ঘড়ি উঠলে সব সময় সেই দিকেই মন থাকে।

তুতুল বললো, এত ঘড়ি দেখছো কেন? এখনো অনেক সময় বাকি আছে।

পিকলু বললো, বাবলুটাকে তো বিশ্বাস নেই। যদি একটু আগে শেষ হয়ে যায়, অমনি কোথায় যে চলে যাবে!

- পিকলুদা, আমি একটা কথা বলবো?

- বল্!

কিন্তু তুতুল আর কিছু বললো না। হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে চেয়ে রইলো মাটির দিকে।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে পিকলু জিজ্ঞেস করলো, কী বলবি, বল।

তুতুল মুখ তুললো। বড় বড় পল্লব মেলে প্রগাঢ় ভাবে তাকিয়ে রইলো পিকলুর দিকে। তার দু' চোখের কোণে সামান্য জল চিকচিক করছে। সে বললো, আমি তোমাকে কী বলতে চাই, তুমি তা জানো না? তুমি বুঝতে পারো না!

পিকলু মুখটা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বললো, হ্যাঁ, পারি।

- কী বলো তো!

- তা মুখে বলার দরকার নেই।

- আমার কী হয়েছে জানি না। আমি আজকাল সর্বক্ষণ তোমার কথা ভাবি। তোমাকে খানিকক্ষণ না দেখলেই আমার মন ছটফট করে। আমি কাছে আছি, অথচ তুমি যদি ন্যদের সঙ্গে বেশি কথা বলো, তা হলে খুব কষ্ট হয় আমার। কেন রকম হচ্ছে। আমি নিজেকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি ...

পিকলু চুপ করে রইলো।

- তুমি আমাকে খারাপ মেয়ে মনে করো, তাই না? আমি তোমাকে ভালোবাসি। এটা অন্যায় আমি জানি ...।

পিকলু তুতুলের একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের মুঠোয় রাখলো, তারপর নরম ভাবে বললো, না, ভালোবাসা অন্যায় নয়। আমিও তোকে ভালোবাসি। কিন্তু একজন নারী একজন পুরুষকে কিংবা একজন পুরুষ একজন নারীকে যে-ভাবে ভালোবাসে, এ ভালোবাসা সেরকম নয়।

- তুমি ... তুমি অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসো?

- না ঃ

- তুমি কবিতা লেখো, আমি দেখেছি।

- কী করে দেখলি?

- টেবিলের ওপর তোমার খাতা পড়ে থাকে ... একটা পত্রিকায় দেখলাম তোমার একটা কবিতা ছাপাও হয়েছে, মনে হলো কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলা -

- ওসব কাল্পনিক। নারী নয়, নারীত্বের প্রতি ...

- আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

- কী বললি, কিসের অপেক্ষা?

- আমি তোমার কাছে এখন কিছু চাইবো না। আমি তোমাকে একটুও জ্বালাতন করবো না। তুমি যতদিন বলবে, আমি ততদিন অপেক্ষা করবো। কিন্তু তুমি শুধু আমার থাকবে, তুমি অন্য কারুর কাছে চলে যাবে না। তুমি কথা দাও।

পিকলু তুতুলের হাতটা ছেড়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। বেশ কয়েক মুহূর্ত। তারপর পরিষ্কার গলায় বললো, এসব কথা আমাকে বলিস না। আমি কোনো বন্ধন সহ্য করতে পারি না। তাছাড়া, তুতুল, আমি তোকে ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি, সেই ভালোবাসার মধ্যে স্নেহ, মমতা, এই সব মিশে আছে। কিন্তু প্রেম নয়। আমি তোর প্রেমিক হতে পারবো না। সেরকম চিন্তা আমার মাথাতেই আসে না।

তুতুল মাথা ঝুঁকিয়ে ব্যাকুল ভাবে বলতে গেল, কিন্তু পিকলুদা, আমি যে-

পিকলু তার মুখে নিজের হাত চাপা দিয়ে বললো, চুপ, ঐসব কথা আর নয়!

তারপর ওরা চুপ করেই বসে রইলো। তুতুলের কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়লো সবুজ ঘাসগুলিকে সারবান করার জন্য। পিকলু একটা সিগারেট পোড়ালো। বাদামের খোলাগুলো সে তুলতে লাগলো যত্ন করে।

বাতাসে খসে পড়লো কয়েকটি গাছের পাতা।

॥ ৪৮ ॥

অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত নতুন বাড়ি ঠিক হলো কালীঘাটে। শহরের একেবারে উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণে। ছোট একটি বাড়ি, খুবই পুরোনো যদিও, কিন্তু আর কোনো ভাড়াটে নেই, এটা একটা মস্ত বড় সুবিধে। বাড়ির মালিক একজন অবসরপ্রাপ্ত উকিল, বিমানবিহারীর পরিচিত, তিনিও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই বাজারে ভাড়াও বেশ সস্তাই বলতে হবে, দুশো পনেরো টাকা। বাগবাজারের ফ্ল্যাটটির ভাড়া ছিল অবশ্য পঁচিশ টাকা, আড়াই গুণ বেড়ে গেল, কিন্তু এখন বাড়ি বদল করতে হলে এই গচ্চা দিতেই হবে। সুপ্রীতি ও মমতার বাড়ি পছন্দ হয়েছে। বাড়ির মালিক অবসরপ্রাপ্ত উকিল বলেই প্রতাপ এ বাড়ি নিতে সম্মত হয়েছেন, আদালতের হাকিম হিসেবে কোনো প্র্যাকটিসসিং উকিলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তিনি নীতিসঙ্গত মনে করেন না।

দু'মাসের ভাড়া অগ্রিম জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চৈত্র মাসে বাড়ি বদল করতে নেই বলে এখনও একটা মস বাগবাজারেই থাকতে হবে। কিছু কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওখানে। পিকলু-বাবলুদের খুব মজা, এখন তাদের দুটো বাড়ি। মাঝে মাঝে বাসে চেপে ওরা কালীঘাটের বাড়িতে চলে আসে, দুপুর-বিকেল কাটিয়ে ফিরে আসে সন্ধের সময়। এখান থেকে বিমানবিহারীদের বাড়ি বেশি দূর নয়, অলি-বুলিরাও খেলা করতে আসে তাদের সঙ্গে। বাড়িটি খুব পুরনো হলেও দেয়ালগুলি সদ্য চুনকাম করা হয়েছে বলে নতুন নতুন গন্ধ। বাবলু অবশ্য দেখে রেখেছে, পাশের একটা পাঁচিলের ওপর উঠে তারপর রেইন পাইপ বেয়ে ওঠা যায় ছাদে। এ পাড়ায় অনেক ঘুঁড়ি ওড়ে, তাদের ছাদে কোনো কাটা ঘুঁড়ি এসে পড়লে সে কি এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?

শিবনে এবং তার দলবলের সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়া হচ্ছে বলে সুপ্রীতি বেশ খুশী। ভাসুরের সঙ্গে তাঁর মামলা চলছে সম্পত্তির ভাগ নিয়ে। বরানগরের বাড়ির খানিকটা কাশীপুরের যে বাগান বাড়িটা উদ্বাস্তুরা জবরদখল করে আছে তার জন্যও সরকারের কাছ থেকে কমপেনসেশান পাওয়া যাবে শোনা যাচ্ছে, সেই টাকার ভাগও যাতে তিনি পান তার চেষ্টা চলছে। প্রতাপকে এখন তিনি নিয়মিত সংসার খরচ হিসেবে কিছু দিতে পারবেন।

কালীঘাট জায়গাটা আগে যতখানি সুদূর মনে হতো, এখনবাগবাজার থেকে কয়েকবার বাসে যাওয়া-আসার পর ততটা দূর মনে হয় না। দোতলা বাসে চড়ে চমৎকার ভ্রমণ, তারপর একটা ফাঁকা বাড়ি, বাথরুম শুকনো খটখটে, রান্নাঘরে উনুন নেই, কেমন যেন অদ্ভুত লাগে বাবলুর। খালি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে মুখের পাশে দু হাত দিয়ে টার্জনের মতন আ-ও-ও বলে চিৎকার করে প্রতিধ্বনি শোনার চেষ্টা করে।

পিকলুর ইচ্ছে ছিল সে একা ঐ বাড়িটাতে থাকবে এই চৈত্র মাসটা। সামনেই তার একটা পরীক্ষা আছে, ওখানে পড়াশুনোর সুবিধে হবে। কিন্তু প্রতাপ রাজি হননি। ওখানে সে খাওয়াদাওয়া করবে কোথায়? বার বার যাতায়াত করতে শুধু শুধু বাস ভাড়া খরচ হবে। একদিন তো এই বাড়িতেই পড়াশুনো হচ্ছিল, আর এখন এই কটা দিনের জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে? চৈত্র মাসে বাড়ির ছেলে বাইরে থাকবে, এটা সুপ্রীতিরও ইচ্ছে নয়।

পিকলুর সত্যিই পড়াশুনোয় মন বসছে না। একবার যাবার নাম উঠে বলে এ বাড়িতে সব সময়েই কেমন যেন একটা চঞ্চলতা। যেন রেলের প্ল্যাটফর্মের ওয়েটিং রুম। একদিন একজন চেনা লোকের একটা ভ্যান পাওয়া গিয়েছিল বলে প্রতাপ একটা কাঠের আলমারি আর দুটো খাট পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেয়াল থেকে নামানো হয়ে গেছে ছবিগুলো। কী রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

পিকলুর মন বসে না, সে পড়ার টেবিল ছেড়ে বার বার উঠে উঠে যায়। কখনো ফিজিক্সের অঙ্ক কষার বদলে সে সেই খাতাতেই কবিতা লিখতে শুরু করে। বাড়ি বদলের মতন তার মনের মধ্যেও যেন বড় রকমের একটা বদল আসছে। এরকম ছটফটানি তার আগে কখনো ছিল না। ফিজিক্স কেমিস্ট্রির প্রতি তার সত্যিকারের ভালোবাসা আছে, সে শুধু পেলবার জন্য পড়ার বই পড়ে না, আবিষ্কারের মতন ভেতরে ঢুকে যায়। কিন্তু এখন পরীক্ষার আগে তার মাথায় শুধু কবিতার লাইন আসছে কেন?

বুদ্ধদেব বসু তার একটা কবিতা মনোনীত করে চিঠি দিয়েছেন। আর একটি কবিতায় তিনি সবুজ কালি দিয়ে কিছু কাটাকুটি করে মন্তব্য লিখেছেন যে শব্দ ব্যবহার সঠিক হয়নি, নিজের অনুভূতি থেকে শব্দগুলো আসেনি। অথচ দ্বিতীয় কবিতাটাই পিকলুর বেশি পছন্দ ছিল। 'কবিতা' পত্রিকায় তার প্রথম লেখা ছাপা হবে বলে সব সময় ভেতরে ভেতরে যেমন একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু পছন্দ করেননি বলে তার খানিকটা ক্ষোভ এবং সংশয়ও বাষ্পের মতন ঘোরাফেরা করছে বুকের মধ্যে।

দুপুরবেলা সুপ্রীতিরা বাজারে বেরুলেন কানুর সঙ্গে। নতুন বাড়ি সাজাবার জন্য কিছু কেনাকাটি করা দরকার। যেমন সব কটা দরজার জন্য পাপোষ, উনুন পাতার শিক, জানলার পদগুলো ছিঁড়ে গেছে, নতুন পর্দার কাপড় চাই। এ বাড়ির তোবড়ানো বাথরুমের মগটা নতুন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায় না। এতদিন বেশ চলে যাচ্ছিল, তবু বাড় বদল করতে হলেই কিছু জিনিস ফেলে দিতে হয়, কিছু নতুন আনতে হয়।

প্রতাপকে নিয়ে বাজার করতে যাওয়া এক বিড়ম্বনা। প্রতাপের ধৈর্য নেই, একটু বাদেই তাড়া দিতে শুরু করেন, তাতে পছন্দ মতন কিছুই কেনা যায় না। আজ কানুকে পাওয়া গেছে, সুবিধে হয়েছে। বাড়ি বদলের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করছে কানু। তার বিয়েও ঠিক হয়ে গেছে, কালীঘাটের নতুন বাড়িতে গিয়ে ওখানেই তার বিয়ে হবে।

সুপ্রীতি-মমতার সঙ্গে তুতুলও এসেছে। মোড়ের মাথায় এসে সবাই দাঁড়ালো, কানু তাদের ট্যাক্সি করে বড়বাজারে নিয়ে যাবে। হঠাৎ সুপ্রীতি বললেন, এই যাঃ, আমরা সবাই চলে এলাম, মুন্নি-বাবলু ইস্কুল থেকে ফিরলে ওদের খাবার দেবে কে? বাবলুটা তো খাবার না পেলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে!

মমতা লজ্জা পেয়ে গেলেন। এই কথাটা তাঁর আগে মনে পড়েনি। সত্যিই তো, এভাবে যাওয়া চলে না। তিনি বললেন, দিদি, আমি তা হলে থাকি, আপনিই গিয়ে কিনে আনুন!

সুপ্রীতি বললেন, তা হয় নাকি? তুমি না গেলে সব জিনিস পছন্দ করবে কে? তোমরা ঘুরে এসো কানুর সঙ্গে, আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি।

এ প্রস্তাবটাও [illegible] করা যায় না। মমতা একা বাজার করে আনলে সুপ্রীতি নিশ্চিত কিছু খুঁত ধরবেন।

দু'জনেই তাকালেন তুতুলে দিকে। মমতা জিজ্ঞেস করলেন, তুতুল তুই যাবি? সুপ্রীতি বললেন, হ্যাঁ, তুতুল তুই থাক, তুই বাজারে ঘুরে কী করবি?

যদিও সামান্যই দূরত্ব তবু কানু গিয়ে তুতুলকে পৌঁছে দিয়ে এলো বাড়ি পর্যন্ত। পাড়ার কিছু ছেলে রকে আড্ডা দিচ্ছে, ওদের নজর ভালো না।

দোতলায় উঠে এসে তুতুল দরজা ঠক ঠক করলো। একটু পরে দরজা খুলেদিল পিকলু। তার

এক হাতে একটা কলম। সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী রে, তুই ফিরে এলি?

উত্তরটা শোনার জন্য অপেক্ষা না করেই অন্যমনস্কের মতন পিকলু আবার দ্রুত ফিরে গেল পড়ার টেবিলে।

তুতুল নিজেদের ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে খুব গরম, তবু পাখা খোলবার কথা তার মনে পড়লো না। তার চোখ দুটি স্থির। বাড়িতে পিকলুদা ছাড়া আর কেউ নেই, সেজন্য বাতাস যেন ভারি লাগছে।

সেদিন সেই ইডেন গার্ডেনের স্বদেশী মেলা দেখতে যাওয়ার পর সে আর পিকলুর দিকে ভালো করে তাকাতে পারে না। পিকলু তার বুক ভেঙে দিয়েছে, একা থাকলেই তার এখন কান্না পায়। আজ মায়েদের সঙ্গে বড়বাজারে যাওয়া তার পক্ষে অনেক ভালো ছিল!

পিকলু অবশ্য তার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারের চেষ্টা করে। যেন সেদিন ইডেন গার্ডেনে কিছুই হয়নি। পিকলু যেন এক ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে তুতুলের একটা স্বপ্ন। সে পৃথিবীর অনেক বড় বড় ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করে, সামান্য একটি পিসতুতো বোনের হৃদয় দৌর্বল্য নিয়ে মাথা ঘামাবার তার সময় নেই।

তুতুল বিছানায় শুয়ে পড়লো না, বই নিয়ে বসলো না, সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ঐ এক জায়গায়। ঘরের মাঝখানে। তার মনে পড়ছে শুধু একটাই কথা। পাশের ঘরে রয়েছে পিকলুদা, সে আর কিছুতেই আগের মতন পিকলুদার পাশে বসে পড়ে গল্প করতে পারবে না। যে তার সবচেয়ে আপন, সে-ই আজ সবচেয়ে দূরে সরে গেছে।

পাশের ঘরটা নিস্তব্ধ, পিকলুর সামান্য নড়াচড়ার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। গলি দিয়ে ঠন ঠন করে কাঁসার বাটি বাজিয়ে হেঁকে যাচ্ছে একজন বাসনওয়ালা। পাশের বাড়ির রেডিওর এরিয়ালে বসে ডাকছে, একটা চিল।

কত ক্ষণ, বোধ হয় এক ঘন্টা কেটে গেছে, তুতুল এখনো বসেনি,তবে ঘরের মাঝখান থেকে সরে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে। তার চোখ দুটি স্থির। পিকলুদার সঙ্গে সে আর কোনোদিন স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারবে না? পিকলুদা তাকে খারাপ মেয়ে ভেবেছে, তাকে উপদেশ দেবার ছলে ধমকেছে। এর পরেও আর এক বাড়িতে থাকা যায়? এর চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো নয়?

তুতুল একবার ঘরের ছাদের কড়িবর্গার দিকে তাকালো। পাখা টাঙাবার হুকের মতন আর একটা হুক খালি আছে, একপাশে ঝুলছে। চেয়ারের ওপরে দাঁড়ালে ওটায় হাত পাওয়া যায়। কিংবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে, যেদিকে দু চোখ যায়.....যদি কোনো দুষ্ট লোক ধরে, কী আর হবে, মেরে ফেলবে বড় জোর!

পিকলু এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো, জিজ্ঞেস করলো, কী করছিস রে তুতুল?

পিকলু পরে আছে ধুতি আর হাতকাটা গেঞ্জি। মাথার বড় বড় চুলগুলো অবিন্যস্ত। বাড়ি থেকে বেরুতে না হলে সে প্রায়ই স্নান করেও চুল আঁচড়ায় না। তার মুখের রঙ তামাটে হলেও তার কাঁধ ও বাহু বেশ ফর্সা। তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

পিকলুকে দেখে তুতুল কেঁপে উঠলেও কোনো উত্তর দিল না।

পিকলু এগিয়ে এসে বললো, তুই ওরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

মুখ নিচু করে তুতুল বললো, চা করে দেবো?

পিকলু বললো, না। তারপর সে একেবারে তুতুলের মুখোমুখি দাঁড়ালো। ডান হাতের একটা আঙুল দিয়ে তুতুলের থুতনিটা উঁচু করে তুলে বললো, মানুষের জীবনে সবচেয়ে শক্ত কী জানিস? অন্য মানুষদের ঠিক মতন চেনা। দ্যাখ না, তুই আর আমি কত কাছাকাছি, অথচ দুজনে দুজনকে চিনি না।

পিকলু এবারে তুতুলের গালে নরম করে হাত বুলিয়ে বললো, তুই কী সুন্দর, তুতুল। তোর মতন সুন্দর মেয়ে আমি আর কারুকেই দেখিনি। ছোটবেলায় এক সময় বুলা মাসিকে আমার খুব ভালো লেগেছিল....

হঠাৎ থেমে গিয়ে সে একটুক্ষণ তুতুলের মুখে দিকে চেয়ে রইলো। তারপর কণ্ঠস্বর বদলে বললো, তোর সঙ্গে আমার খুব দরকার আছে। সেদিন ইডেন গার্ডেনে তুই যা বলেছিলি, সব ভুলে যা। ওসব মনে রাখতে নেই। মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে প্রেম, সে ভারি গোলমেলে ব্যাপার।

তাছাড়া তোকে আমি সেইভাবে দেখি না। তুই আমি ভাই-বোন হলেও আমরা বন্ধু হতে পারি। রাইট? তুই বুদ্ধিমতী মেয়ে, তুই ঠিক বুঝবি। বন্ধুরা যদি কখনো বিপদ হয়, কিংবা হঠাৎ কোনো কিছুর খুব দরকার হয়, তাহলে অন্য বন্ধুর সাহায্য করে, ঠিক কি না? তোর যে-কোনো দরকারে আমি সাহায্য করবো। আমার কাছে কখনো কিছু লুকাবি না।

তুতুল এখনও নির্বাক।

-আমি এখন তোর কাছে একটা সাহায্য চাই, তুতুল।

পিকলু ঘরটার চারদিকে দ্রুত চোখ বোলালো। সুপ্রীতি একটা সেলাই মিশিন কিনেছেন, সেলাই করার জন্য তিনি একটা অনুচ্চ জলচৌকিতে বসেন। তুতুল পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে জলচৌকিটা নিয়ে এলো দেয়ালের কাছে। তারপর হাত ধরে বললো, তুই এর ওপর উঠে দাঁড়া।

তুতুল পরেছে একটা নীল রঙের ব্লাউজ, তার শাড়িটাও নীল-সাদা ডুরে। খোলা চুলে একটা রিবন বাঁধা। ঠোঁটে একটু ক্রিম মাখা ছাড়া তুতুল আর কোনো প্রসাধন করে না।

পিকলু বললো, মনে কর, এই একটা বেদীর ওপর তুই দাঁড়িয়ে আছিস। খোলা চুলে একটা রিবন বাঁধা। ঠোঁটে একটু ক্রিম মাখা ছাড়া তুতুল আর কোনো প্রসাধন করে না।

পিকলু কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধভাবে চেয়ে রইলো তার দিকে।

তুতুলের যেন নিজস্ব কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই। সে পা তুললো জলচৌকিটার ওপর।

পিকলু কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধভাবে চেয়ে রইলো তার দিকে।

তুতুল পরেছে একটা নীল রঙের ব্লাউজ, তার শাড়িটাও নীল -সাদা ডুরেএখালা চুলে একটা রিবন বাঁধা। ঠোঁটে একটু ক্রিম মাখা ছাড়া তুতুল আর কোনো প্রসাধন করে না।

পিকলু বললো, মনে কর, এই একটা বেদীর ওপর তুই দাঁড়িয়ে আছিস। পৃথিবীর একমাত্র নারী। আর কেউ নেই। আমিও কেউ না। পাহাড়, গাছপালা, নদী, কাঠবেড়ালী এরা যে-চোখে নারীকে দেখে, আমি সেইভাবে তোকে দেখবো।

পিকলু তুতুলের শাড়ির আঁচলটা ধরে বুক থেকে নামিয়ে দিতে যেতেই তুতুল মাঝপথে সেটা ধরে ফেলে বললো, এ কী!

তুতুলের গলায় এক পৃথিবী ভরা বিসময়।

পিকলু একটু দুর্বলভাবে হেসে বললো, ঐ যে বললুম, বুঝতে পারলি না? আমি তোকে দেখতে চাই। তুই জামাকাপড় খুলে ফেলবি, আমি শুধু দেখবো একবার।

তুতুল এক পৃথিবী ভরা বিস্ময়।

পিকলু একটু দুর্বলভাবে হেসে বললো, ঐ যে বললুম, বুঝতে পারলি না? আমি তোকে দেখতে চাই। তুই জামাকাপড় খুলে ফেলবি, আমি শুধু দেখবো একবার।

তুতুল এক পৃথিবী-ভরা ঘৃণা নিয়ে বললো, ছিঃ!

পিকলু বললো আমি এখনো কোনো বাস্তব জীবনের নারীকে চিনি না, তার শারীরিক রূপের অভিজ্ঞতা আমার নেই, সেইজন্যই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন যে আমার শব্দ ব্যবহার ঠিক হয় না। নারীর বর্ণনার সময় আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে লিখি না; অন্যদের লেখা থেকে শব্দ ধার করি....আমার চোখে তুই-ই সবচেয়ে কাছের, আমি তোকে আজ পুরোপুরি একবার দেখবো, মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ পর্যন্ত....

দু'হাতে কান চাপা দিয়ে তুতুল বলে উঠলো, চুপ করো, প্লিজ, চুপ করো

এবার পিকলু অবাক হলো। সে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক কথাটা আর তুতুল তা বুঝতে পারছে না! আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য সে বললো, আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা নই, দ্যাটস সেটলড! আমরা এখন ভাইবোনও নই। আমরা বন্ধু। একজন বন্ধু আর একজন বন্ধুর কাছে সাহায্য চাইছে। আমি কোনোদিন কোনো নারীকে দেখিনি। আই মীন, ছবি দেখেছি, অ্যানাটমিক্যালিও জানি, তবু রক্তমাংসের কোনো নারীকে পরিপূর্ণবাবে দেখা, তার যে অনুভূতি, সেটা আমার নেই বলেই আমি ঠিক লিখতে পারি না। শব্দগুলো আমার উপলব্ধি থেকে আসে না....প্লীজ,তুতুল, একবার মাত্র দু'মিনিটের জন্য...

বিস্ময় আর ঘৃণার সঙ্গে মিশে গেল ব্যথা। তুতুল বললো, ছিঃ পিকলুদা,তুমি আমাকে এই কথা বলতে পারলে?

পিকলু সরলভাবে আহত হয়ে বললো, তুই আমাকে ভুল বুঝছিস না কি? এর মধ্যে খারাপ তো কিছু নেই। বলছি তো, প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপার নয়-

-প্লিজ, পিকলুদা, তুমি চুপ করো!

-প্লিজ, পিকলুদা, তুমি তো চুপ করো!

-শোন আমি দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। আমি তোকে ছোঁব না। আই প্রমিজ। তা হলে তো দোষের কিছু নেই? শুধু একবার তোর শরীরের সম্পূর্ণ রূপ দেখবো...

পিকলু পিছিয়ে গেল কয়েক পা। আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়ালো তুতুল। তার চোখে এখন ঝকঝক করছে একরকম দীপ্তি। নরম হাতের আঙুল তুলে সে দৃঢ় গলায় বললো, পিকলুদা, যাও, তোমার ঘরে যাও, পড়তে বসো!

পিকলু আরও কিছু বলতে গেলে তুতুল আবার বললো, যাও! ও ঘরে যাও!

ইডেন গার্ডেনে কিছু বলতে গেলে তুতুল আবার বললো, যাও! ও ঘরে যাও!

ইডেন গার্ডেন পিকলু যেভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছির তার থেকে তুতুলের প্রত্যাখ্যান হলো অনেক বেশি কঠোর। পিকলু চলে যাবার পর সে উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগলো।

একটু পরেই সে জলচৌকি থেকে নেমে খাটে বসে পড়ে দুই জানুর মধ্যে মুখ নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো

মিনিট দশেক বাদেই ফিরে এলো পিকলু। তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ উদভ্রান্ত। চোখ দুটি জ্বলজ্বলে করছে, গেঞ্জি ভিজে গেছে ঘামে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে খসখসে গলায় বললো, তুতুল, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। আই বীহেভড লাইক এ ক্যাড, লাইক এ ব্লাডি ফুল....

তুতুল মুখ তুলো না।

পিকলু আবার বললো, তুতুল, আমি অন্যায় করেছি। আমি ক্ষমা চাইছি তোর কাছে।

তুতুল তবুও কিছু বললো না, পিকলু ফিরে গেল নিজের ঘরে।

দু'তিন মিনিট পরেই আবার ফিরে এলো সে। কিন্তু দরজার কাছেই দাঁড়ানো, ঢুকলো না ঘরের মধ্যে। এবারে তার কণ্ঠস্বর ফেটে ফেটে গেছে। সে বললো, তুতুল, সত্যিই আমি খুব অন্যায় করেছি। তোকে অপমান করেছি। আর কোনোদিন এরকম হবে না।

তুতুল তবু মুখ তুললো না।

পিকলু এবারে ব্যাকুলভাবে মিনি করে বললো, তুতুল কি কিছু বলবি না?

তুতুল মুখ না তুলেই বললো, এখন আমার কথা বলতে ইচ্ছে করতে না। প্লিজ, তুমি পড়তে যাওআ নষ্ট করো না!

পিকলু নিজের টেবিলে ফিরে এলেও পড়ার বইয়ের দিকে তাকালোই না। প্রবলভাবে নাচাতে লাগলো দু'হাটু। তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, কিন্তু সে তো কাঁদতে পারবে না তুতুলের মতন।

আবার কয়েক মিনিট বাদে সে তুতুলকে কিছু বলবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই বাইরের দরজায় দুম দুম শব্দ হলো। বাবলু-মুন্নিরা এসে গেছে।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পরদিন কিন্তু অনেকটা হালকা হয়ে গেল তুতুলের মন। পিকলুর ওপর তার ঘৃণা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র রাগও নেই। পিকলুর মাথায় হঠাৎ একটা পাগলামি চেপেছিল, কিন্তু কত ভালো ছেলে সে, একবারও তো তুতুলের ওপর জোর করতে আসেনি। দু'জনেই দু'জনকে দু'রকমভাবে প্রত্যাখ্যাত করায় যেন সব সমান সমান হয়ে গেছে। তুতুল আবার পিকলুর সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারবে। সে আবার তার আগেকার পিকলুদা হবে। এখন কয়েকদিন পিকলুর আড়ষ্ট থাকার পালা, নতুন বাড়িতে গিয়ে তুতুল নিজে থেকেই ওর সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করে নেবে।

ভালো দিন দেখা হয়েছে, পরশুই পাকাপাকি ছেড়ে দেওয়া হবে এই বাগবাজারের বাড়ি। দুপুরের দিকে সুপ্রীতি বললেন, শেষবারের মতন একবার গঙ্গাস্নান করে আসা হবে না? গঙ্গার ধার থেকে চলে যেতে হলে স্নান সেরে নিতে হয়।

কালীঘাটের বাড়ির কাছেও আদিগঙ্গা আছে বটে, কিন্তু সেই শীর্ণ, মুমূর্ষ নদী দেখলে স্নান করার ভক্তি হয় না।

মমতাও রাজি। কিন্তু কে নিয়ে যাবে? পিকলুই বরাবর নিয়ে যায়। পিকলুর সামনেই পরীক্ষা, সে সর্বক্ষণ পড়ার টেবিলে থাকে, তার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বাবলু-মুন্নির এখানকার স্কুলের ইতি

হয়ে গেছে। শেষ কয়েকদিন বাবলু প্রাণপণে ঘুড়ি ওড়াবার সাধ মিটিয়ে নিচ্ছে। সকাল নেই, দুপুর নেই, বিকেল নেই, সর্বক্ষণ সে ছাদে। গায়ের রঙ পুড়ে গেছে, চোখ দুটো পাকা করমচার মতন লাল।

কোনোক্রমে বাবলুকে ধরে মমতা বললেন, বাবলু, আমাদের সঙ্গে একটু গঙ্গার ঘাটে যাবি?

বাবলু চেঁচিয়ে উঠে বললো, ওরে বাবা রে, আমার এখন সময় নেই। কেন, দাদা যাক না!

মমতা ফিসফিস করে বললেন, দাদার এখন পরীক্ষা না? সেই জন্যই তো তোকে বলেছি!

আমি পারবো না, বলেই বাবলু দৌড়ে ছাদে চলে গেল। তা হলে আর যাওয়া হয় না। মমতা-সুপ্রীতি এখনো একলা কোথাও বেরোন না!

শেষ চেষ্টা করার জন্য সুপ্রীতি এবার বাবলুকে ডাকিয়ে আনলেন। বাবলু তাঁর কথা শোনে। ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে সুপ্রীতি বললেন, বাবলু, তুই একটু চল আমাদের সঙ্গে। একবার গঙ্গায় যাওয়ার মানত করে তারপর না গেলে পাপ হয়। তুই চল, তোকে ঘুড়ি কেনার জন্য একটা সিকি দেবো!

বাবলু বললো, আমার পয়সা চাই না। আমার অনেক ঘুড়ি আছে। আগে তো সব সময় দাদাকে নিয়ে যেতে!

পড়ার টেবিল থেকে পিকলু সব শুনতে পাচ্ছে। সে উঠে এসে বললো, চলো, আমি নিয়ে যাচ্ছি। চটপট তৈরি হয়ে নাও!

সুপ্রীতি অপ্রস্তুতভাবে বললেন, তুই পড়া নষ্ট করে যাবি কেন? তা হলে থাক বরং, আমরা যাবো না।

পিকলু বললো, আমি সঙ্গে বই নিচ্ছি, ওখানে বসে পড়বো। চলো, আর দেরি কোরো না।

মমতা বাবলুর দিকে রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, অসভ্য ছেলে দাদা পড়াশুনো ফেলে যেতে চাইছে; আর তোর ঘুড়ি ওড়ানোটাই বড় হলো? এরপর কিছু চেয়ে দেখিস, তোকে কিছু দেবো না।

বাবলু এই ভর্ৎসনা গায়েই মাখলো না, সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

গঙ্গার ঘাটে যেমন পুণ্য -সঞ্চয়ের জন্য অনেক মানুষ আসে, তেমনি যারা পুণ্যের পরোয়া করে না, সেইসব বহু ছিচকে চোর ও ফেরেববাজারও ঘুরঘুর করে। ওপরে জামাকাপড়, জুতো, তোয়ালে-গামছা রেখে গেলেই যখন তখন উধাও হয়ে যায়। সেই জন্যও সঙ্গে একজনকে আনা দরকার।

বাগবাজার ঘাটে একটা বটগারেছর গোড়ায় মা আর পিসির শাড়ি-গামছা পাহারা দিতে বসে রইলো পিকলু। সঙ্গে সে একটা বই এনেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা পরীক্ষার পড়ার বই নয়। সেটি একটি চটি কবিতার বই, নাম, 'সাতটি তারার তিমির।' পরীক্ষার আগে পিকলুর কখনো টেনশন হয় না। এবং পরীক্ষার দু' একদিন আগে সে টেক্সট বই পড়া কমিয়ে কবিতার বই পড়ে, গান শোনে। তাতে তার মাতা পরিষ্কার হয়। এবারে অবশ্য তার মথা উত্তেজনার বাষ্পে ভরা, তুতুলের কাছে সে অন্যায় করেছে, তাতে তাকে অপমান করেছে, একথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কোনো মেয়েকে ভালো না বাসলে কি শুধু তার শরীর দেখতে চাওয়া যায়? পিকলুর এরকম ভুল হলো কী করে? মানিক বন্দোপাধ্যায়ের চতুষ্কোণ নামে একটা ছোট উপন্যাস সে পড়েছিল। তাতেও তো এই কথাই আছে।

মাথার ওপর গনগন করছে বৈশাখের রোদ, বটগাছের ছত্রছায়া ভেদ করেও তা জাফরি কাটার নতন নিচে এসে পড়েছে। গঙ্গার ঘাটে আজ বেশ ভিড়। বড্ড চ্যাঁচামেচি হচ্ছে চারদিকে। বড় বড় পাটের নৌকো এসেছে আজ। বাগবাজারের খালের মুখ খুলে দেওয়া হয়েছে, আরও নৌকো আসছে। কালো-কেলো, রোগা-রোগা ছেলেরা জল দাপাচ্ছে একটা বয়া-কে ঘিরে।

পিকলু এই সবের দিকে একবার অলস দৃষ্টি বুলিয়ে বইটা খুলে বসলো। একটি কবিতার নাম ঘোড়া। আমরা যাইনি মরে আজো-তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম/মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জোৎস্নার প্রান্তরে; প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন-এখনও ঘাসের লোভে চরে/ পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।....

পিকলু প্রতিটি শব্দ মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলো। প্রথম লাইনে তবু কথাটা কেন? আমরা যাইনি মরে' তার সঙ্গে কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়' এর তো কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তবে কি যাইনি মরে-র সঙ্গে দৃশ্যের জন্মের কনট্রাস্ট? মহীনের ঘোড়াগুলি...মহীন কে? কারুর নাম? কোনো ঐতিহাসকি রেফারেন্স আছে? চেক করতে হবে! ধ্বনি হিসেবে অবশ্য অদ্ভুত ভালো। পৃথিবীর সঙ্গে ডাইনামোর উপমা, এটা একেবারে অপূর্ব! একেবারে অরিজিনাল। পৃথিবীর পেটের মধ্যেও অনেক নাড়িভুড়ি আছে। কত তার, যন্ত্রপাতি, খনি, ধাতু, লাভা....তাছাড়া পৃথিবী ঘোরে!

বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে...'। পিকলু চোখ বুজে ভাবে, এরকম লাইন লিখতে পারলে যে কোনো মানুষ ধন্য হয়ে যেত! বিষণ্ণ খড়ের শব্দ- তুতুল একদিন বলেছিল, পিকলুদা, তুমি

আমাকে জীবনান্দ দাশের কবিতা বুঝিয়ে দেবে? আমি বুঝতে পারি না...। আর কোনোদিন কি তুতুল এ কথা বলবে? মেয়েটার মনে বড় দুঃখ দেওয়া হয়েছে। এমন সরল, পবিত্র মন মেয়েটার....

হঠাৎ 'দাদা' ডাক শুনে পিকলু দারুণ চমকে উঠলো।

তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বাবলু। ধুলোমাখা খালি পা, সারা গা ঘামে ভিজে জবজবে। দেখলেই বোঝা যায় সারা পথ দৌড়ে দৌড়ে এসেছে।

এই দুরন্ত ছোট ভাইটার ওপর পিকলু কখনো রাগ করতে পারে না। পিকলু নিজে ছেলেবেলা থেকেই বহিরঙ্গে শান্ত, তার যত কিছু উদ্দামতা সবই নিভৃত কল্পনায়। বাবলুর সব রকম দুষ্টুমি, একগুয়েমি সে সমর্থন করে কারণ তারও মনের মধ্যে ঐরকম একটা রূপ আছে, কিন্তু বাইরে নেই।

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, কি রে, তুই ?

বাবলু বললো, তুমি এবার বাড়ি যাও। আমি মা-পিসিমণির জামাকাপড় দেখছি।

পিকলু হেসে বললো, হঠাৎ তোর এরকম সুমতি হলো? বৃষ্টি নামেনি তো, ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ হয়ে গেল কেন?

বাবলু তার পাশে বসে পড়ে বললো, তুমি যাও না। তোমার পরীক্ষা! আমি এবার দেখছি।

- তুই একলা একলা এলি কী করে?

- আমি বুঝি আসতে পারি না? আমি সব রাস্তা চিনি। তোমরা যখন থাকো না, দুপুরবেলা আমি একা একা কত নতুন নতুন রাস্তায় যাই।

- বাবলু, ওরকম দুপুরে টো টো করে ঘুরিস না। ছেলেধরা একদিন ধরে নিয়ে যাবে, তখন বুঝবি!

- ছেলেধরারা ধরে নিয়ে গিয়ে কী করে?

- চোখ অন্ধ করে দেয়। তখন আর বাড়ি চিনতে পারবি না। ওরা তোকে দিয়ে ভিক্ষে করাবে। রাস্তায় কত অন্ধ ভিখিরি থাকে দেখিস না?

-ইস, আমাকে ধরা অত সহজ নয়। দাদা, আমাকে একদিন ডায়মণ্ড হারবার নিয়ে যাবে? অলি-বুলিরা গিয়েছিল, সব সময় সেই গল্প করে।

- আচ্ছা, পরীক্ষার পর নিয়ে যাবো একদিন। তুতুল আর মুন্নিও সঙ্গে যেতে পারে। ট্রেনে করে যাবো। ওখানে অনেকে পিকনিক করতে যায়।

- আচ্ছা দাদা, তুমি কবে চাকরি করবে?

- কেন রে, হঠাৎ চাকরির কথা? আমি চাকরি করলে তোর কী লাভ হবে?

- মা একদিন বাবাকে বলছিল, তুমি তো আমায় কিছু দিলে না? পিকলু যখন চাকরি করবে, তখন সে নিশ্চয়ই আমাকে একটা অলওয়েভ রেডিও কিনে দেবে। কত লোক রেডিওর নাটক শোনে ...

- আমার চাকরি করতে এখনও ঢের দেরি আছে। তবে ছোটখাটো একটা রেডিও কিনে ফেলা যায়, দেখি, পরীক্ষার পরে একটা ভালো টিউশানি পাবার কথা আছে।

- তোমার পরীক্ষা, তুমি পড়তে যাও, পড়তে যাও। সেইজন্যই তো আমি এলাম।

- ভ্যাট! মা-পিসিমণি তো একটু বাদেই উঠে আসবে। একসঙ্গে ফিরবো।

বাবলু পিকলুর খোলা বইটাতে একবার উঁকি মেরেই মুখ সরিয়ে নিল। কবিতা দেখলেই তার অভক্তি হয়। বোধহয় দাদার পরীক্ষাতে এগুলোও লাগে।

সে চঞ্চলভাবে মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে বললো, দাদা, তুমি সিগ্রেট খাচ্ছো না?

পিকলু দু'দিকে মাথা নাড়লো।

বাবলু ঝকঝকে কচি দাঁতে হেসে বললো, তোমার কাছে নেই বুঝি? পয়সা দাও, আমি কিনে এনে দিচ্ছি!

পিকলু বললো, এক চাঁটি খাবি। তোর মতন ছোট ছেলে কিনতে গেলে দোকানদার দেবেই না!

বাবলু জোর দিয়ে বললো, হ্যাঁ দেবে! পয়সা দাও!

পিকলু বললো, কেন রে, তোর এত শখ কেন? তুই খেতে চাস নাকি?

বাবলু এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকার পাত্র নয়। সে কিছু একটা করতে চায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মা আর পিসিমনি কোন ঘাটে গেছে?

পিকলু উত্তর দিল না। সাতটি তারার তিমির' তার চোখ টানছে। সে আবার ফিরে গেল কবিতায়। বাবলু ছুটে গেল কোনো একটা দিকে।

খানিকবাদে গেল-গেল, ধর-ধর, ডুবে মলো-ডুবে মলো ইত্যাকার চিৎকারে পিকলুর ঘোর

ভাঙলো। ঘাটশুদ্ধ লোকজন শোরগোল করছে, কেউ একজন ডুবে যাচ্ছে। পিকলুর প্রথমেই মনে পড়লো বাবলুর কথা। তার ভাইটার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। বাবলু সাঁতার জানে না। হাতের বইটা নামিয়ে রেখে পিকলু ছুটে গেল জলের দিকে।

কয়েক মিনিট বাদেই সুপ্রীতি আর মমতা মেয়েদের ঘাট থেকে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে উঠে এলেন ওপরে। কিসের যেন চিৎকার-চেঁচামেচি হচ্ছে, ওরা কান দেননি। মেয়েদের ঘাটের পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিলে পিকলু এসে শুকনো কাপড়-গামছা দিয়ে যায়, ওঁরা ভেতরেই শাড়ি পাল্টে নেন, বরাবরের নিয়ম এই। আজ ওঁরা পিকলুকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু পিকলু যেখানে বসে ছিল সেখানে তাঁদের শাড়ি পড়ে আছে।

একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রতিদিন এই ঘাটে আসে এবং নিজের মনে মনে জোরে জোরে কথা বলে, সকলেই চেনে তাকে। সেই বৃদ্ধাটি ওদের পাশ দিয়ে বলতে বলতে গেল, আ মাগো মা, কী অলুক্ষুনে কথা! দু দুটো ছেলে এক সঙ্গে ডুবে মলো। মা গঙ্গার এ কী আক্কেল! ঘোর কলি, ঘোর কলি, না হলে এমন হয়?

সুপ্রীতি-মমতা ঐ বৃদ্ধার কথা গায়ে মাখলেন না। দুটি ছেলে জলে ডুবেছে শুনে ওঁরা কিছুটা ব্যথিত বোধ করলেন, কিন্তু কিছু পাড়ার ছেলে জলে দাপাদাপি করে বিরক্তি উৎপাদন করে প্রায়ই, তাদেরই কেউ হবে ভাবলেন ওঁরা।

সুপ্রীতি জিজ্ঞেস করলেন, পিকলু গেল কোথায়?

মমতা বললেন, কী যেন হয়েছে ও দিকে, বোধহয় তাই দেখতে গেছে!

যেহেতু সুপ্রীতি বয়েসে বড় এবং বিধবা তাই শরীর সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা কম থাকার কথা। শাড়ি-গামছাগুলো দেখা যাচ্ছে, রাস্তাটা পেরিয়ে অনায়াসে নিয়ে আসা যায়। সুপ্রীতি বুকের কাছে দুহাত জোড় করে প্রায় দৌড়ে সেগুলো নিয়ে এলেন।

মমতার সঙ্গে তিনি মেয়েদের ঘাটে আবার ফিরে যাবেন, এমন সময় একটা রোগা-লম্বা ছেলে দৌড়ে হাঁফাতে এসে বললো, ও মাসিমা, শিগগির আসুন! আপনাদের দুটো ছেলে জলে ডুবে গেছে! আসুন, আসুন!

সুপ্রীতি ভুরু কুঁচকে মমতার দিকে তাকালেন। এই ছেলেটিকে তাঁরা চেনেন না। এ কাদের কথা বলছে? দুটো ছেলে মানে কাদের না কাদের ছেলে। তাঁদের সঙ্গে এসেছে একা পিকলু, সে অতি শান্ত ছেলে, সে জলে নামেই না। যদি বা নামে, পিকলু সাঁতার জানে।

ছেলেটি তবু হিস্টিরিয়া রোগীর মতন চ্যাঁচাতে লাগলো, শিগগির আসুন! পিকলু আর বাবলু, আমি চিঁ, আমি ও পাড়ার, ওরা আপনাদেরই বাড়ির ছেলে তো, শিগগির দেখবেন আসুন!

নাম দুটি বিদ্যুৎ তরঙ্গের কাজ করলো। ভিজে শাড়ি গায়েই সমস্ত লাজলজ্জা ভুলে সুপ্রীতি আর মমতা সেই ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন।

সমস্ত ভিড় দু'ফাঁক হয়ে গেল। যেন সবাই জানে। গোলমাল স্তব্ধ হয়ে গেল এ মুহূর্তে। ওঁরা দু'জনে ঘাটের প্রান্তে এসে দেখলেন, এক পলক দেখেই চিনলেন, পাশাপাশি শোয়ানো রয়েছে পিকলু আর বাবলুকে। দু'জনেরই চক্ষু বোজা।

সুপ্রীতির মাথাটা ঘুরে গেল। তবু প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে তিনি দেখলেন, মমতা হাঁটু দুমড়ে পড়ে যাচ্ছেন মাটিতে। সুপ্রীতি তাঁকে ধরবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ধরলেন শুধু শূণ্যতা। তারপর নিজেকে খাড়া রাখবার জন্য পাশে যাকে পেলেন তাকেই জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। যাকে ধরলেন, সে মানুষ না গাছ সে বোধও তাঁর নেই। তিনি পাগলের মতন বলতে লাগলেন, না, না, না...।

নদী বয়ে চলেছে আপন মনে, স্টিমার যাচ্ছে ভেঁপু বাজিয়ে, গরম বাতাস ছুটোছুটি করছে গাছের মাথায়। পৃথিবীতে কোথাও কিছু থেমে নেই।

॥ সূচনা পর্ব সমাপ্ত ॥

যৌবন

॥ ১ ॥

টানা তিন দিন বৃষ্টির পর আজ আকাশ সবে মাত্র পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। এখনো সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু দুপুরের আলো প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। পাতলা পাতলা মেঘ ঈশান কোণ ছেড়ে যাচ্ছে নৈঋতে। বাতাস এখন সংযত।

এই ক'দিন বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইছিল প্রায় সারাক্ষণ। ঝড়ের সময়, যখন গাছ পালার চূড়াগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে ডালপালাগুলো অসহায় ভাবে নাচতে থাকে, তখন পাখিরা কোথায় যায় কে জানে। কিংবা কী খায়? এখন বেরিয়ে এসেছে ঝাঁক ঝাঁক পাখি, গাঙশালিক, ছাতারে, চিল, চড়ুই, কাক, কিন্তু তাদের ডাক শুনে মনে হয় না তারা ক্ষুধার্ত। এই বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতিতে এখন মনে হয় সব কিছুই নির্মল, সকলেই সুখী।

নৌকোর ছই-এর বাইরে বসে আছে তরুণ অধ্যাপক বাবলু চৌধুরী। তার পরনে কুর্তা-পায়জামা হাতে একটি ছোট বায়নোকুলার। নদীর ধারে ঝোপ ঝাড় দেখলেই সে চোখে বায় নোকুলাররটি লাগিয়ে নতুন কোনো পখি আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। অবশ্য তার বায়নোকুলারটি প্রায় খেলনাজাতীয়। ফিক্সড ফোকাস, তবু পডাখি দেখায় তার অদম্য উৎসাহ। একটা তিতির বা ডাহুক দেখতে পেলেই সে চেঁচিয়ে ওঠে, মঞ্জু, মঞ্জু দেখে যাও।

নদীটির নাম ইছামতী, বহরে বেশি বড় না হলেও খরস্রোতা। এই বর্ষায় সে একেবারে রঙ্গিনী হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ভাঙ্গা গাছের ডাল কিংবা কোনো বাড়ির ছাউনির গুচ্ছ গুচ্ছ খড়, তাতেই বোঝা যায়, অনেক কিছু ভাঙতে জানে এই নদী।

স্টিমার সার্ভিস থাকলেও নৌকো-যাত্রাই বাবুল চৌধুরীর পছন্দ। ধীরে-সুস্থে দেখতে দেখতে যাওয়া হবে। তাড়া তো কিছু নেই, তার কলেজ অনির্দিষ্ট ছিল, সৌভাগ্যবশথ যথাসময়ে বৃষ্টি থামলো। নৌকাতেই রান্নার ব্যবস্থা আছে, একটু আগেই খিচুড়ি আর ডিম ভাজা খাওয়া হয়েছে। ইচ্ছে করলে অবশ্য কোনো গঞ্জে-বাজারে থামিয়েও খেয়ে নেওয়া যায়।

বায়নোকুলার ধুরিয়ে পাখি দেখার চেষ্টা করতে করতে বাবুল চৌধুরী হঠাৎ একটা শুশুক দেখতে পেল। মাঝ নদীতে একবার হুস করে মাথা তুলেই আবার ডুবে গেল পরমুহূর্তে। বাবুল চৌধুরী এ রকমভাবে আগে কখনো শুশুক দেখেনি। তার ধারণা ছিল, শুমুদ দেখতে সিমেন্টের বস্তার মতন। এখন যেন মনে হলো মানুষের মুখের আদল। সে চেঁচিয়ে উঠলো, মঞ্জু, দেখবে এসো মঞ্জু! মঞ্জু!

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ছই-এর দু'পাশে পর্দা ঝুলিয়েং আব্রু রক্ষা করায় হয়েছে। বাবুল চৌধুরী সরে এসে এক পাশের পর্দা তুলে মুখ বাড়ালো ভেতরে। মঞ্জু ওরফে বিলকিস বেগম তখন তার ছ'মাসের শিশু সন্তানকে স্তন্য পান করাচ্ছে, বাবলুকে দেখে সলজ্জ ভ্রুভঙ্গি করলো, শরীরটা মুচড়ে আড়াল করলো তার খোলা বুক।

বাবুল চৌধুরী মুগ্ধভাবে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললো, ম্যাডোনা! ইস, আমি যদি ছবি আঁকতে পারতাম।

শিশুটি বেশ স্বাস্থ্যবান, গোল গোল হাত, তার পানাহারের মধ্যে বিঘ্ন ঘটায় সে আপত্তিসূচক উঁউঁ শব্দ করলো।

বাবুল বললো, নদীতে একটা শুশুক দেখলাম। তুমি ওকে নিয়ে বাইরে এসো না!

মঞ্জু মাথা নেড়ে বললো, আমি অনেক শুশুক দেখেছি! আপনি দ্যাখেন গিয়া।

বাবুল এখনও পিতৃত্বে অভ্যস্ত হয়নি। ছ'মাসের বাচ্চা সামলানোতে অনেক ঝঞ্ঝাট। তার মতে বাচ্চাকে যত বেশি ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়, ততই মঙ্গল। নিজের সন্তানের হাসি মুখ দেখতে তার ভালো লাগে, কিন্তু কান্না শুনলেই পালাতে ইচ্ছে করে। তার তরুণী বধূর মাতৃত্বের রূপটি তার কাছে একেবারে নতুন, ছেলেকে কোলে নিলেই মঞ্জুর মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যায়, সেই মুখশ্রী উপভোগ করতে করতে বাবুলের আশ মেটে না।

প্রকৃতি দেখা ছেড়ে বাবুল তার স্ত্রীর পাশ ঘেঁষে এসে বসলো।

ছই-য়ের ভেতরটি আধো-অন্ধকার। একটি ছোট জানালা আছে, তা দিয়ে শুধু জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, আর শোনা যায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

একটা নীল রঙের শাড়ী পরে আছে মঞ্জু, তার কপালে একটা লাল টিপ। তার মুখমণ্ডলে একটা পাতলা বিষণ্ণতার ছায়া।

একটু পরেই শিশুটির চোখ জড়িয়ে এলো ঘুমে। মঞ্জু তাকে সাবধানে শুইয়ে দিল অয়েল ক্লথ পাতা বিছানায়। তারপর ব্লাউজের বোতাম টিপে আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে বললো, আপনে একটু শুইয়া লবেন? ঘুম পাইছে?

বাবুল তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বললো, পাগল, এমন সুন্দর দুপুরটা ঘুমিয়ে নষ্ট করবো? জলো বাইরে গিয়ে বসি।

বলতে বলতেই সে মঞ্জুর ডান কানের লতির নিচে মৃদু চুম্বন দিল।

মঞ্জু কৃত্রিম কোপে বললো, বাইরে মাঝিগুলার সামনে আপনে এই রকম দুষ্টামি করবেন?

বাবুল বললো, না, না কিছু করবো না। শুধু গল্প করবো। কী সুন্দর ছাওা ঠাণ্ডা আলো হয়েছে, দেখে চক্ষু একেবারে জুড়িয়ে যায়।

মঞ্জু বললো, আপনি যান, আমি একটু পরে আসতেছি।

বাবুল আরও দু'তিন জায়গায় চুম্বন দিয়ে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

নৌকো চলছে নদীর এক ধার ঘেঁষে। উজান ঠেলে যাওয়া, একজন মাঝি হাল ধরে আছে, আর একজন তীর দিয়ে গুণ টেনে চলেছে।

হালের মাঝিটির মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি, মধ্যবয়স্ক, শরীরটি বেশ মজবুত। মুখখানি দেখলেই মনে হয়, মাঝি হবার জন্যই যেন সে জন্মেছে। যখনই কেউ নৌকোর মাঝির ছবি আঁকে, ঠিক এই রকম একটা চেহারাই আঁকে। তার গায়ের রং ঠিক কালো নয়, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে তার চামড়া এমন একটা বর্ণ নিয়েছে যার কোনো নাম নেই।

মাঝিটির নাম তাহেরউদ্দিন, সে স্বল্পভাষী। বাবুল তার সঙ্গে দু'একবার আলাপ জমাবার চেষ্টা করেও বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। নৌকো এখন যেখান দিয়ে চলছে, তার ডান পাশেই একটি বেশ বর্ধিষ্ণু জনপদ। অনেক বড় বড় পাকাবাড়ি চোখে পড়ে।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, তাহের ভাই, এই জায়গাটার নাম কী?

মাঝি উত্তর দিল, কলাকোপা।

-অনেক দালান-কোঠা দেখতাছি। হিন্দুগো গ্রাম বুঝি?

-হ।

-এই সব ব্যাড়িতে এখনও মানুষজন থাকে?

-কী জানি, হে আমি কইতে পারবো না।

-এদিকে সাহাবাবুরা খুব ধনী আছিল, তারাই বানাইছে বুঝি?

-আমি জানি না, কত্তা।

এইরকম ভাবে আর কথাবার্তা চালানো যায় না। বাবুল তাকিয়ে দেখলো কলাকোপার দু'তলা, তিনতলা বাড়িগুলির অধিকাংশই জানলা-দরজা বন্ধ। একটি বাড়ির সামনের বাগান থেকে বাঁধানো ঘাট নেমে এসেছে নদীতে, ঘাটের সিঁড়ির দু'পাশে বেশ চওড়া বসবার জায়গা। বাড়ির মালিক শৌখিন ছিল বোঝা যায়। ঘাটটি এখন জনশূণ্য।

বাবুল আবার তাহেরুদ্দিনের দিকে ফিরে তাকালো। এই লোকটি এত কম কথা বলে কেন? বাবুল লক্ষ করেছে, আজকাল কেউই যেন প্রকাশ্যে কোনোরকম আলোচনাই চালাতে চায় না। উনিশশো আটান্ন সালের সাতই অক্টোবরের পর থেকে সমস্ত জাতির যেন কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। জেনারেল আইয়ুবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা সারা পাকিস্তানে গণতন্ত্র বাতিল করে দিয়ে সামরিক আইন জারি করলো, তার কুড়িদিন পর ইস্কান্দর মীর্জাও বিতাড়িত হলো দেশ থেকে। আইয়ুব খানই এখন সর্বেসর্বা। এই চার পাঁচ বছরে শুধু ধড়পাকড়ের রাজত্ব চলছে, কে কখন কোথায় গ্রেফতার হবে তার ঠিক নেই। সমস্ত রাজনৈতিক দল এখন নিষিদ্ধ। নেতারা কারারুদ্ধ। ছোটখাটো সরকারী কর্মচারিরাই এখন হম্বিতম্বি করে, কারুর ওপর ব্যক্তিগত রাগ থাকলে তাকে দেশদ্রোহী কিংবা চোরাকারবারি আখ্যা দিয়ে জেলে ভরে দেয়। মতলোববাজারও এই সুযোগে এর ওর নামে লাগায়, নিরীহ মানুষেরা মুখে কুলুপ বন্ধ করে থাকে।

বাবুল ভাবলো, এই যে মাঝিটি, স্বৈরতন্ত্র বা সামরিক শাসনের প্রভাব কি এরও ওপর পড়েছে? চাষী, মাঝি, জেলে জোলা যারা সমাজের দরবারে নিম্নস্তরের মানুষ, রাজা বদল বা রাজনীতি বদলে কি তাদের কিছু আসে যায়? শুধু লুঙ্গি পরা, খালি-গায়ে এই যে তাহেরুদ্দিনের চেহারা, ব্রিটিশ আমলে

বা তারও আগেকার মোগল আমলে এখানকার একজন নৌকোর মাঝির চেহারা তো ঠিক একই রকম ছিল, কিছুই বদলায়নি। এর আগেকার চোদ্দ পুরুষ যেমন লেখাপড়া শেখেনি, তাহেরুদ্দিনেরও তেমনি অক্ষর জ্ঞান নেই, খবরের কাগজে কী লেখা হয় সে জানে না। আগেকার প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সঙ্গে এখনকার গভর্ণর মোনেম খানের শাসনের যে কী তফাৎ, তা কি ও বোঝে? ওর জীবনযাত্রার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়েছে? আগেও ছির দিনের পর দিন শুধু অন্নচিন্তা, এখনও তাই।

পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে মঞ্জু হাতছানি দিয়ে বাবুলকে ডাকলো কাছে। বাবুল মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিতে সে ফিসফিস করে বললো, চলেন, ঐ ধারে গিয়ে বসি!

দু'জনে নৌকোর অন্য দিকটার গলুই-এর কাছে বসলো, এখানে এখন কোনো মাঝি নেই। গুণটানা নৌকোর গতি অতি ধীর। আর কিছুক্ষণ পর বুড়িগঙ্গায় পড়লে পালে বাতাস লাগবে।

বাবুলের ঠোঁটে অল্প অল্প হাসি। পুরুষ মানুষ হিসেবে বাবুল বেশি ফর্সা। তার ওষ্ঠাধর লালচে রঙের। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি রং লাগিয়েছে। বাবুলের কথা বলার ভঙ্গিও খুব মৃদু ও নম্র, কারুর কারুর মনে হতে পারে মেয়েলি।

অবশ্য যারা তাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনে, শুধু তারাই জানে যে যখন কোনো বিষয়ে জেদ ধরে তখন এই নরম-সরল যুবকটিই কী সাঙ্ঘাতিক কঠিন হতে পারে। যেমন, বাবুল পড়াশোনায় দারুণ ভালো ছাত্র ছিল, কোনো পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়নি, তার ঘনিষ্ঠ জনেরা সবাই আশা করেছিল, সে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যাবে। পূর্ব পাকিস্তানের মেধাবী ছেলেদের পক্ষে এখন অনেক সুযোগ উন্মুক্ত রয়েছে হয়েছে, ঐ চাকরি নিলে পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে আর চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু বাবুল সেদিকে গেল না।

সে বিদেশে চলে যেতে পারতো। তার বাপ মায়ের পয়সা আছে। তা ছাড়া স্কলারশীপ সে পেতেই, তার তুলনায় অনেক নিরেশ ছাত্র হুড়হুড় করে ইংল্যান্ড আমেরিকায় চলে যাচ্ছে, বাবুল যেতে রাজি হলো না। বিদেশে না যাক সে ঢাকায় বসেও রিসার্চ করতে পারতো, কিংবা চাকরি করার ইচ্ছে হলেও ঢাকাতে তার চাকরির অভাব হতো না। সকলকে অবাক করে সে মফঃস্বলের একটা কলেজে অধ্যাপনা করতে চলে গেল। মঞ্জুকে বিয়ে করার পর সে সংসার পেতেছে এক গ্রামে। মঞ্জুর বাবা-মা এবং বাবুলের বাবা-মা দু'পক্ষই দারুণ হতাশ। ঐ দু'পক্ষের আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ বাবুল কর্ণপাত করেনি। মঞ্জু আপত্তি করেনি, এইটাই ছিল তার প্রধান জোর।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, আপনে হাসতেছেন কেন?

বাবুল বললো, আমার মাঝে মধ্যে এক একটা বড় মজার ব্যাপার চোখে পড়ে। এই যে আমাগো মাঝি তাহিরুদ্দিন, তোমার কি মনে হয় না, আমাদের বাপ-দাদাদের আমলে ঐ মানুষটাই নৌকা চালিয়েছিল? আমার ঠাকুর্দার বাবা নাকি ঢাকায় এসেছিলেন পাবনা থেকে। তেনাকেও এনেছিল ঐ লোকটাই। তোমারও ওর নৌকায় চাপো নাই?

মঞ্জু বললো, কী অদ্ভুদ কথা! ও কি ভূত-প্রেত নাকি?

বাবুল বললো, তা নয়। ও হলো, চিরকালের মাঝি। তবে আমাদের অল্প বয়েসে দেখেছি, মাঝিরা আমাদের সঙ্গে কত রকম গল্প করেছে, কত কেচ্ছা শুনিয়েছে, কিন্তু এখন ও যেন বোবা সেজে আছে!

-সকলের কি আর সব দিন কথা বলার মতস মেজাজ-মর্জি থাকে?

-তিন দিন ঝড়-বৃষ্টির পর আজ রোদ উঠলো, তবু ওর মুখে হাসি ফুটলো না?

-তিন তিনটা দিন যে ওদের নষ্ট হয়ে গেল? সেই ক্ষতির কথাই ভাবতেছে বোধ হয়।

-অধিকাংশ মানুষই পুরনো দিনের কথা বেশি ভাবে, সামনের দিকটার কথা ভাবে না। তাই না?

-কী জানি!

-মঞ্জু, তুমিও পুরনো দিনের কথা বেশি ভাবো?

-আমি? কই না তো। ছেলের জন্য আমি কোনো কথা ভাবার সময় পাই? আপনি খোকার নাম ঠিক করলেন না?

-তোমার আব্বা-আম্মা তো দু'তিনটা নাম রেখেছেন।

-আপনের আব্বা আম্মাও চার-পাঁচটা নাম লিখে পাঠিয়েছেন। এতগুলো নামের মধ্যে কোনটা রাখা হবে আপনে ঠিক করে দ্যান।

-ওর কোনোটাই রাখা হবে না।

-বারে বা, ছেলের কোনো নাম থাকবে না?

-কেন, এত এত তাড়াতাড়ির কী আছে? তোমার ছেলে কি আইজ-কালের মধ্যে ইস্কুলে ভর্তি হবে নাকি?

মঞ্জু হঠাৎ কান খাড়া করে ছই-এর দিকে তাকালো। বাচ্চা জেগে উঠলো নাকি, কান্নার শব্দ আসছে? না, সেরকম কিছুই না, শুধু শোনা যাচ্ছে জলের সরসর শব্দ।

পাশ দিয়ে একটা নৌকো চলে গেল, সেটা মানুষজন ভর্তি। খেয়ার নৌকো বোধ হয়। পুরুষরা সবাই চক্ষু দিয়ে লেহন করতে লাগলো মঞ্জুর শরীর। শুধু সুন্দর বলে নয়, তার মুখ চোখে, তার কাপড় পরার ধরনে একটা শহুরে আছে। যে জন্য গ্রামের মানুষ বারবার তাকায়।

এই রকম দৃষ্টির সামনে মঞ্জু এখনো সহজ হতে পারে না। তার লজ্জা লাগে। মানুষ ভরা আরও একটা নৌকো আসছে। মঞ্জু তার স্বামীর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে বললো, আমি ভিতরে যাই, আপনে বসেন!

বাবুল ঠিকই বুঝলো মঞ্জু কেন ভেতরে চলে যেতে চায়। সে ঝুঁকে পড়ে খপ করে মঞ্জুর হাত চেপে ধরে বললো, না না বসো, বসো।

বাইরের লোকজনের দৃষ্টির সামনে স্বামী তার হাত চেপে ধরেছে, এই শরমে মঞ্জু ঠিক যেন একটা ধরা পড়ে যাওয়া অপরার মতন ছটফটিয়ে বললো, ছাড়েন, ছাড়েন, কী করেন কী?

বাবুল বায়নোকুলারটি মঞ্জুর চোখের সামনে এনে বললো, ঐ দ্যাখো, এক ঝাঁক বক যাচ্ছে, ভালো করে দ্যাখো। মানুষ দেখার চেয়ে বক দেখা অনেক ভালো।

পাশের নৌকোটির কৌতূহলী মানুষদের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে রইলো বাবুল। তারপর সেই নৌকোটি অপসৃত হলে সে বললো, মঞ্জু তুমি একটা বিপ্লব করবে?

সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে বায়নাকুলারটি নামিয়ে নিল মঞ্জু। তার দৃষ্টিতে ঘনিয়ে এলো শঙ্কা। বিপ্লব কথাটার এখন নানা রকম অর্থ। আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করলো, তখন সব খবরের কাগজে লেখা হলো এটাই একটা বিপ্লব। রাজনৈতিক নেতারা দলাদলি আর স্বজনপোষণ আর দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে দেশটাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছিল, প্রধান সেনাপতি এসে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দেশটাকে বাঁচালেন। কিন্তু অনেকেই তখন বাড়িতে দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকতো। আবার বিয়ের পর পর কিছু দিন মঞ্জুর যখন ঢাকায় ছিল, তখন বাবুলের বন্ধুরা এসে প্রায়ই আড্ডার শেষ দিকে বলতো, চীনের ধাঁচের একটা বিপ্লব না ঘটালে এ দেশের মুক্তি নেই। বাবুলের মাথার চুলের মধ্যে একটা কাটা দাগ আছে, কোথায় জানি পলিটিকস করতে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছিল। সেটা নাকি বিপ্লবের প্রস্তুতি। বাবুল গ্রামের কলেজে চাকরি নেওয়ায় খুশী হয়েছিল মঞ্জু। ঐ সব বন্ধুদের থেকে তা দূরে থাকা যাবে!

মঞ্জু ত্রাসের সঙ্গে বললো, কী কইলেন? ঐ মতলোবেই বুঝি আপনি আবার ঢাকায় ফিরতে চাইলেন?

বাবুল হা-হা করে হেসে উঠে বললো, তুমি ভয় পাইলা নাকি? একটা একটা ঘরোয়া বিপ্লব। তোমার মা তোমার বাবার সাথে আপনি আইজ্ঞে করে কথা বলেন, ঠিক তো? আমার মা-ও আমার বাবাকে আপনি আইজ্ঞে করেন। তুমি এই রীতিটা ভেঙে দাও, তুমি এখন থেকে আমাকে তুমি বলবে!

মঞ্জু লজ্জায় মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল।

বাবুল তার থুতনি ধরে গাঢ় ধরে গাঢ় স্বরে বললো, শুধু শুধু বিছানায় না, শুধু বন্ধ ঘরের মইধ্যে না, সক্কলের সামনে। বাবা-মায়ের সামনে। নাও, এখন থেকেই শুরু করো, স্টার্ট। বলো, ওগো প্রাণনাথ...

বাবুলের কৌতুক ও উজ্জ্বলতার সঙ্গে সুর মেলাতে পারলো না মঞ্জু। সে হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে খানিকটা বিষাদাচ্ছন্ন গলায় বললো, আমরা তো স্বরূপনগরে বেশ ছিলাম, আপনে ঢাকায় ফেরার জন্য এত ব্যস্ত হইলেন কেন?

-আবার আপনি? তুমি বলো?

-আমরা কেন ঢাকায় যাচ্ছি?

- আরে, মাসের পর মাস কলেজ বন্ধ, ওখানে বসে থাকে কী করবো?

-ঢাকায় গিয়েই বা কী করবেন?

-বাঃ, ঢাকায় কত চেনাজানা মানুষ, তোমার আব্বা-আম্মা, এদের দেখা করতে ইচ্ছা করে না তোমার? মামুন মামাও জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন খবর পেয়েছি, তাঁর সঙ্গেও দেখা হবে।

-আমি স্বরূপ নগরেই ভালো ছিলাম।

-কিন্তু কলেজের মায়না না পেলে খাওয়া-পরা চলবে কী করে?

-আপনে কথা দ্যান যে ঢাকায় গিয়ে আবার ঐ সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়াবেন না?

-ঝঞ্ঝাট আবার কী? পাকিস্তানের পলিটিক্স শেষ হয়ে গেছে। মাছ কেন মরে জানো? বড়শির টোপ দেখে মুখ খোলে বলে। এদেশে এখন মুখ খুললেই মরণ।

নদীতীর এখন নির্জন। কেউ মাছ ধরছে না, কেউ স্নান করছে না। দু'পাশে ঝোপঝাড়। বিকেলের সূর্য যেন অনেকদিন পর কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে এসে সৌজন্যের হাসি হাসছেন। কাছেই একটা মাছরাঙা পাখি তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠলো।

বাবুল হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নিবিড় কণ্ঠে বললো, মঞ্জু, আমার হাতটা ধরো।

কেউ দেখবার নেই বলেই মঞ্জু নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে স্বামীর ডান হাতের আঙুল ছুঁলো।

বাবুল বললো, এবারে বলো, কথা দাও। বলো, এই কথাটা বলো, 'কথা দাও।

মঞ্জু বললো, কথা দাও।

বাবুল উৎফুল্লভাবে বললো, একটা ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখা উচিত ছিল। একটা ঐতিহাসিক দৃশ্য। জানো মঞ্জু, আমার বড় ভাই আলতাফ ভাই হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে, তুমি তো দেখেছো ভাবীকে, সেই ভাবীও আলতাফ ভাইকে আপনি-আপনি করে কথা বলে। সুতরাং আমাদের ফ্যামিলিতে তুমিই প্রথম।

মঞ্জু বললো, কিন্তু তোমার পা ছুঁয়ে বললো তুমি সত্যিই কথা দিলে তো?

বাবুল দু'চোখে ঝিলিক দিয়ে বললো, কথা দিতে পারি, যদি তুমি এখন আমাকে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুতে দাও।

মঞ্জু ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াববার চেষ্টা করতেই বাবুল তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললো, বসো, যেও না। জানি অতখানি একদিনে সহ্য হবে না।

নৌকোর পাটাতনের ওপর এমনিই গা এলিয়ে দিয়ে বাবুল বললো, দ্যাখো দুদিকে কত সবুজের সারি। কত রকম গাছপালা, নামও জানি না। নদীর দু'ধারে মাঝে মাঝে মানুষজন দেখা যাচ্ছে, তাদের দেখে কী মনে হয় তারা খুব অসুখী? .নে হয় না, জীবন চলছে জীবনের নিয়মে। মার্শাল ল, প্রেসিডেন্ট হ্যানত্যান হাবিজাবি। এসব কিছুরই যেন এই নদীর ধারে কোনো মূল্য নাই। এই যে নৌকাটা শান্তভাবে পানির ওপর দিয়ে চলেছে, আমাদের দেশটাও যদি এইভাবে চলতো?

মঞ্জু বললো, তোমরা দেশ নিয়ে এত চিন্তা করো, সব কথার মধ্যে দেশের কথা টেনে আনো কেন?

বাবুল বেশ তারিফ করা চোখে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললো, এটা তুমি খব দামি কথা বলেছো মঞ্জু। যে-সব দেশ বেশ সলিড, একটা পাকাপোক্ত গভর্নিং সিস্টেম আছে, সে সব দেশে লোকেরা দেশ নিয়ে সব সময় এত মাথা ঘামায় না। আমরা ইউরোপ-আমেরিকার যেসব গল্প-উপন্যাস পড়ি তার মধ্যে থাকে শুধু মানুষের কথা। দেশ কোথায়? এমন কি ইন্ডিয়া থেকে, পশ্চিম বাঙলা থেকে যে সব বইপত্র আসে, মাঝে মাঝে তো পড়ে দেখি, প্রেম-ভালোবাসার গল্পই বেশী দেখি, দেশ নিয়ে তো মাথা ব্যথা চোখে পড়ে না। শুধু আমরাই কেন সব সময়ে দেশের কথা টেনে আনি?

-আপনেরা এই নিয়ে তর্ক করতে ভালোবাসেন।

-আপনি নয়, তুমি! ঠিক বলেছো, আমরা এই নিয়ে তর্ক করতে ভালোবাসি। কাজের কাজে কিছুই করি না। আসলে, ব্যাপার কী জানো, আমাদের দেশটা তো নতুন। হঠাৎ লটারির টাকা পাওয়ার মতন আমরা পাকিস্তান পেয়ে গেছি। তাই সর্বক্ষণ সেই কথাটা আমাদের মনে জুড়ে আছে। জানো তো, কোনো পরিবারে হঠাৎ লটারির টাকা এসে গেলে ভাইয়ে ভাইয়ে কাজিয়া লেগে যায়, আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা। ঃ

মঞ্জু বায়নোকুলারটা তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে বললো, কই, আপনি আমাকে শুশুক দেখালেন না?

-তুমি আবার আপনি বলছো বলে সব শুশুক ডুব মেরে আছে। বিলকিস বেগম, তোমারে একটা

কথা জিজ্ঞাসা করি? তোমার মুখে হাসি নাই কেন?

-এমনি এমনি হাসবো নাকি?

বাবুল এবারে সুর করে গেয়ে উঠলো;

বিরহিনী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল
কলজেতে ফুটেছে কাঁটা পঞ্চবানের হুল! ...

মঞ্জু ভালো গান জানে, আর বাবুলের গলায় একেবারেই সুর নেই। বাবুলের গান গাওয়ার চেষ্টা দেখে সে না হেসে পারলো না। বাবুলের মুখে সে আগে কখনো গান শোনেনি।

-এ আবার কী গানের ছিরি। এই গান আপনে...তুমি কোথায় শিখলে?

-আমাদের বাড়িতে আবদুল নামে একজন চাকর ছিল, অনেক দিন আগে। সে আমাদের অনেক গান শুনাতো। আরও কয়েকটা লাইন মনে আছে, শুনবে?

সায়েরে গিয়েছে স্বামী হাবলি আঁধার করে
পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।
ও মানিকপির....
মুখ ঘামেছে বুক ঘামেছে বিবির ভেসে যাচ্ছে হিয়ে
খসম যদি থাকতো কাছে রে পুঁচত নুমাল দিয়ে।

হাসির তরঙ্গে মঞ্জুর সারা শরীর দুলতে লাগলো। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও সে হাসি থামাতে না। হাত তুলে সে বাবুলকে চুপ করতে ইঙ্গিত জানালো, ও দিকের মাঝি শুনতে পেলে কী ভাববে?

নিজের বেসুরো সঙ্গীত থামিয়ে বাবুলকে চুপ করতে ইঙ্গিত জানালো, ও দিকের মাঝি শুনতে পেলে কী ভাববে?

নিজের বেসুরো সঙ্গীত থামিয়ে বাবুল বললো, এইবারে তুমি একটা গান করো!

মঞ্জু প্রবলভাবে মাথা নাড়লো। বিকেলবেলা নৌকোর ওপর বসে বে-শরমের মতন গান গাইবার কথা সে চিন্তাই করতে পারে না। পাশ দিয়ে আবার যখন তখন যাত্রী-বোঝাই নৌকো যাচ্ছে। নদীর একদিকের তীরে দেখা যাচ্ছে মানুষজন। একটা অশথ গাছ তলায় উবু হয়ে গোল হয়ে বসে আছে কিছু মানুষ। নদীতে কলসী ভাসিয়ে সাঁতার কাটছে দুটি বালিকা। দূরে থেকে ভেসে আসছে মগরেবের আজানের সুমিষ্টি ধ্বনি, পাখিরা ঝাঁক বেঁধে বেঁধে কুলায় ফিরছে।

বাবুল হেলান দেওয়া অবস্থায় থেকে মঞ্জুর উরুতে হাত রেখে মিনতি করে বললো, বড় ভালো লাগছে, শুনাও একটা গান।

মঞ্জু তার স্বামীর হাতের ওপর হাত রেখে বললো, যাঃ কী যে বলেন। এখন আমি গান গাইতে পারবো না। আমার লজ্জা করে।

বাবুল বললো, তুমি আমার দিকে একটা গান ধরো। শুধু আমি শুনবো নদী শুনবে।

মঞ্জু বড় বড় চোখ মেলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো স্বামীর দিকে। তারপর বললো, গান গাইতে পারি . তুমি সত্যি কথা দাও, ঢাকায় গিয়ে তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে মেতে উঠবে না?

মিটিং করতে গিয়ে মাথা ফাটাবে না?

বাবুল বললো, না, আমি আর কোথাও যাব না। তোমাকে নিয়ে আর খোকাকে নিয়েই মেতে থাকবো। তুমিই এখন আমার পৃথিবী। আঃ, দ্যাখো, আকাশের রং কী সুন্দর হয়েছে। নদীর দু'ধার কী শান্ত আমেজ মাখা। এখন কি মনে হয় কোথাও কোনো দুঃখ আছে? নদীর ওপর নৌকায় করে যাওয়ার মতন যদি জীবনটা হতো! আঃ জীবনটা যদি এরকম হতো!

ঝুঁকে নদী থেকে এক আঁজল জল তুলে সে বললো, দ্যাখো, কী পরিষ্কার পানি। আকাশের ছায়া পড়েছে। সত্যি মঞ্জু, জীবনটা যদি এরকম হতো!

॥ ২ ॥

দ্বার ভাঙ্গা বিল্ডিনিং-এ শেষ পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা। অতীনের হাতের কলম সময়ের চেয়েও দ্রুত দৌড়াচ্ছে। মাথাতুলে সে একবার দেখে নিল, দু'একজন খাতা জমা দেবার জন্য উঠে পড়েছে, এইবার বুঝি ঘণ্টা বাজবে। হলঘরে কোনো ঘড়ি নেই, তবু কোথাও যেন অদৃশ্য টিক টিক টিক টিক শব্দ হচ্ছে। অতীনের একটা প্রশ্নের এখনো প্রায় অর্ধেকটা বাকি, মুখ চোখ তার রাগে কঠিন হয়ে এলো, তারপর তার সম্পূর্ণ আত্মা যেন ভর করলো ডান হাতের আঙুলের ডগায়।

ঘণ্টা বাজবার পরও অতীন লিখে যাচ্ছিল, ইনভিজিলেটার এসে পাশে দাঁড়াতেই সে খাতাটা মুড়ে তার হাতে তুলে দিল বিনা প্রতিবাদে, মুখ তুললো না। ইনভিজিলেটার চলে যাবার পরেও সে কয়েক মুহূর্ত বসে রইলো স্থির হয়ে, তারপর বিচারক যেমন কারুকে ফাঁসিরদণ্ড দেবার পর তাঁর কলমের নিবটা ভোঁতা করে দেন, অতীনও তার কলমটা মুঠোয় চেপে ধরে ঠিক ছুরি মতন ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল হাই বেঞ্চে।

তার পাশের ছেলেটি চোখ বড় বড় করে বললো, এ কী রে, কলমের ওপর রাগ করছিস কেন? সব লিখতে পারলি না?

অতীন বললো, ধ্যাৎতেরিকা!

এই কলমটা থেকে ঠিক মতন কালি বেরুচ্ছিল না, লিখতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল অতীনের।

হল থেকে বেরিয়ে আসবার পর সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করলো, কী রে, কেমন দিলি?

অতীন ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বললো, ফার্স্ট ক্লাস পাবো ঠিকই, সে আর এমন বেশি কথা কী আছে।

সিদ্ধার্থ হেসে উঠলো। অতীনের কথা বলার ধরনই এই রকম। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া যেন কিছুই না, রাস্তা থেকে একটা খোলাম কুচি কুড়িয়ে নেবার মতন।

ওদের আর দু'জন বন্ধু, কৌশিক আর রবি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন পত্র হাতে নিয়ে পরস্পরের উত্তর মেলাচ্ছিল, অতীনকে দেখে ওদের একজন বললো, এই অতীন শোন, তুই পাঁচ নম্বরটা...

অতীন বাঁ হাত নেড়ে ধমক দিয়ে বললো, রাখ, রাখ, হয়ে গেছে, এখন আবার ও নিয়ে মাথা ঘামানো!"

নিজের প্রশ্নপত্রটা সে অপ্রয়োজনীয় দাদের মলমের হ্যান্ডবিলের মতন গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। তারপর তরতর করে নেমে গেল নিচে।

রাস্তায় বৃষ্টি পড়ছে ছোট ছোট ফোঁটায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই বৃষ্টি পড়ছে নিশ্চয়ই, কেননা রাস্তার রং এখন কালো, পদাতিকের সংখ্যা বেশ কম। গত তিন ঘণ্টায় অতীন একবারও জানলার বাইরে কী ঘটছে লক্ষ করেনি।

অতীনের চোখ দুটি ঢুকে গেছে কোটরে, নাকটা যেন বেশি খাড়া দেখাচ্ছে, মুখমণ্ডলে রাত্রি জাগরণের অবসাদের ময়লা ছাপ। মাথার চুলে নাপিতের কাঁচি পড়েনি অনেকদিন। তার জামার বুকের বোতাম খোলা, গ্রীষ্মকালে সে গেঞ্জি পরে না, দেখা যাচ্ছে আর পাঁজরার হাড়। সারা বছরের ফাঁকিবাজ অতীন ঠিক পরীক্ষার আগের দেড় মাস পাগলের মতন পড়াশুনো করে স্বাস্থ্য ক্ষয় করেছে।

সিদ্ধার্থ তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুই কি এখন বাড়ি ফিরে যাবি নাকি?

অতীন বললো, নাঃ! চল, খেলা দেখতে যাই, মোহনবাগান-মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলা আছে।

সিদ্ধার্থ বললো, ধ্যাৎ, সে খেলা এতক্ষণে অদ্ধেক হয়ে গেছে। তাছাড়া টিকিট পাবি কী করে! চল, সিনেমা দেখতে যাই, মেট্রোতে লরেন্স অলিভিয়ারের হ্যামলেট এসেছে।

-সোর্ড ফাইটিং আছে?

-কী জানি, গল্পটা আমি জানি না, আমার দাদা বলেছে খুব ভালো ছবি।

-তোর দাদা বলেছে, ভালো? তা হলে আমার ভালো লাগবে না। তোর দাদা তো হেভি ইনটেলেকচুয়াল! বড় বড় রাইটারদের গল্প নিয়ে সিনেমা খুব বোরিং হয়। নিউ এমপায়ারে গ্যারি কুপারের কী একটা ওয়েস্টার্ন এসেছে না? চল, সেটা দেখি!

-আমি গ্যারি কুপারের উচ্চারণ বুঝতে পারি না রে, অতীন!

পেছন থেকে কৌশিক এসে অতীনের কাঁধে হাত রেখে বললো, এই, সিনেমা দেখতে যাবি? আমি দেখবো?

-কোনটায় যাচ্ছিস।

-হ্যামলেট! অনেকদিন পর লরেন্স অলিভিয়ারের ছবিটা আবার এসেছে।

অতীন বললো, হ্যামলেটের দেখছি হেভি ডিমান্ড! তুই গল্পটা জানিস।

কৌশিক বললো, টু বী আর নট টু বী, দ্যাট ইজ দা কোয়েশ্চন? এই শুনিসনি কখনো আগে? কিংবা, দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ, হোরেশিও, দ্যান আর ড্রেমপট অফ ইন ইয়োর ফিলসফি....

অতীন কৌশিকের থুতনিটা ধরে বললো মাত্তু, মাত্তু! তুই আর্টস পড়লি না কেন রে? সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করলো, কোন্ ক্লাসে উঠবো? অতীন বললো, সেকেন্ড ক্লাস!

একটু দূরেই ট্রাম স্ট, তবু ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লো।

মেট্রো সিনেমার পেছনের দিকের রাস্তাটার ডাক নাম মেট্রো গলি। ফ্রন্ট স্টলের সবচেয়ে কম দামি টিকিটের জন্য এখানে লাইন পড়ে। কিছুকাল আগেও এই টিকিটের দাম ছিল সাড়ে ছ' আনা, তারপর হলো দশ আনা। নয় পয়সার আমলে দু' এক বছরের মধ্যেই বেড়ে গিয়ে হয়েছে এক টাকা কুড়ি পয়সা। আজ এই লাইনে বেশ ভিড়। বৃষ্টির মধ্যেও এত লোক জুটেছে।

অন্যরা লাইনে দাঁড়ালো, অতীন সামনের তেলেভাজার দোকানটা থেকে আট আনার আলুর বড় কিনলো আর দারুন খিদে পেয়েছে। কৌশিক টিকিট কাটার পয়সা দেবে, সুতরাং অতীনের আট আনা খরচ করতে কোনো অসুবিধে নেই। এরকম সুস্বাদু আলুর বড় সারা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। এত ছোট ছোট আলু এরা কোথা থেকে জোগাড় করে?

শাল পাতার ঠোঙাটা নিয়ে অতীন ফিরে এলো বন্ধুদের কাছে। কাউন্টার খুলে গেছে, ময়লা সাপের মতন লাইনটা আস্তে আস্তে আগোচ্ছে!

রবি বললো, এই মাইরি, যত টিকিট তার চেয়ে লোক বেশি। আমরা টিকিট পাবো না!

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করলো, তুই কী বুঝলি?

রবি বললো, আমি জানি, এই রেলিংটার পেছনে দাঁড়ালে আর কাউন্টার পর্যন্ত পৌঁছানো যায় না। ঐ দ্যাখ, মনীশ, সুজয় ওরা আগে থেকে দাঁড়িয়েছে।

ওদের ব্যাচের অনেক ছেলেই এসেছে হ্যামলেট দেখতে। কয়েকজন অতীনের মুখ চেনা। সে হাত নেড়ে দু'একজনকে সম্বোধনও জানিয়েছে।

কৌশিক বললো, আমি দেখাবো বলেছি, চল, মেইন গেটে যাই, বেশি দামের টিকিট কাটবো।

অতীন কৌশিকের দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর একটা মুখভঙ্গি করলো। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বললো, বাঞ্চোৎ, তোর বেশি বেশি পয়সা, তাই না? ইয়ে ফুট ফুট কুট কুট করছে? দ্যাখ, কী করে এখানে টিকিট ম্যানেজ করি!

অতীন প্যান্টের পকেট থেকে একটা নীল রুমাল বার করে গলায় বাঁধলো। অমনি তাকে দেখতে লাগলো বেলেঘাটার গুণ্ডাদের মতন। সে বললো, আমাদের আজ পরীক্ষা শেষ হয়েছে, আজ আমাদের সিনেমা দেখার ফার্স্ট প্রেফারেন্স। এত ফালতু লোক ভিড় করেছে কেন?

অতীন সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই রবি বললো, ও শালা ঠিক ম্যানেজ করবে!

সিদ্ধার্থ বললো, অতীনটা একটা চিজ। শালা ভগবান একটার বেশি দুটো গড়েনি!

কৌশিক ভীত ভীতু গলায় বললো, ও মারামারি করবে নাকি?

রবি বললো, দ্যাখ না কী হয়!

অতীন লাইনের একেবারে ডগায় পৌঁছে চেঁচিয়ে উঠলো, এ কী, এ কী, ডাবল্ লাইন কেন? এই যে দাদা, আপনি কোথায় ঢুকছেন? এ কী নেমন্তন্ন বাড়ি নাকি যে পরে এসেও আগে বসবে? আমরা কী ঘাসে মুখ দেবার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি? সিঙ্গল লাইন, সিঙ্গল লাইন!

অতীনের রোগা চেহারা হলেও কণ্ঠস্বরটি জোরালো, আত্মপ্রত্যয়ে সুগোল। সে তার চেয়ে বড় সড়ো চেহারার দু'চারটি ছেলেকে জোর করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

একটু পরেই দেখা গেল কাউন্টারের সামনে শুরু হয়ে গেছে ঠ্যালাঠেলি, চিৎকার, হট্টগোল। তারপর চড়-চাপটি, ঘুঁষোঘুঁষি, জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি। অতনি কিন্তু সেই মারামারির মধ্যে নেই। সে পিছিয়ে বন্ধুদের কাছে এসে বললো, এবারে রাশ কর! সবাই মিলে একসঙ্গে ওয়ান, টু থ্রি...।

অতীনের পদ্ধতিটা কার্যকর হলো, ওরা চার বন্ধুই টিকিট পেয়ে জালের খাঁচায় ঢুকল।

অতীন কৌশিককে বললো, দেখলি, তোর কত পয়সা বাঁচিয়ে দিলুম!

কৌশিক বললো, আমার বেশি পয়সা খর্চা করতে আপত্তি ছিল না। এটা ভালো ছবি, ভালোভাবে দেখা যেত!

অতীন বললো, তোর সেই পয়সায় আমাদের আইসক্রিম খাওয়াবি!

সিদ্ধার্থ বললো আইসক্রিম না, ইন্টারভ্যালে মাটন প্যাটিজ খাবো। তুই আলুর বড় খাইয়ে খিদেটা আরও বাড়িয়ে দিলিরে, অতীন!

রবি বললো, মাটিন প্যাটিজ কী বলছিস, যা খিদে পেয়েছে, মনে হচ্ছে আমি এখন একটা আস্তো দোতলা বাড়ি খেয়ে ফেলতে পারি।

অতীন বলো, সিনেমটা যদি খারাপ হয় তা হলে আমি কৌশিককেই খেয়ে ফেলবো!

কৌশিক চোখ বড় বড় করে বললো, তুই কী বলছিস, অতীন? শেক্সপীয়ারের বেস্ট লেখা, হ্যামলেট; অ্যাকটিং করছেন লরেন্স অলিভিয়ার, জিন সিমন্‌স...

অতীন অসীম বিরক্তির সঙ্গে বললো, সেকসপীয়ার মারাচ্ছিস কেন রে তখন থেকে?

জিজ্ঞেস করছি না, সিনেমাটা কেমন?

সিদ্ধার্থ বললো, আমি পোস্টার দেখলুম, সোর্ড ফাইটিং আছে।

কৌশিক তার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে এমন একটা ভাব করলো যেন সে হঠাৎ অচেনা কোনো দেশে ঘোর অরণ্যের মধ্যে একলা এসে পড়েছে তার মুখে অল্প দাড়ি, চোখে সোনালি ফ্রেমের গোল চশমা। অন্যরা প্যান্ট পরা, সে পরেছে ধুতি আর হাফ শার্ট। অন্যদের তুলনায় ফ্রেমের গোল চশমা। অন্যরা প্যান্ট পরা, সে পরেছে ধুতি আর হাফ শার্ট। অন্যদের তুলনায় তার মুখে এখনও সারল্য বেশি, সে পৃথিবীটা কম চেনে, যে-টুকু চেনে তাও বইয়ের পৃষ্ঠায়।

ফ্রন্ট স্টলে সীট নাম্বার নেই, কিছুক্ষণ সবাইকে খাঁচায় আটকে রাখার পর ছবি আরম্ভ হবার একটু আগে দরজা খুলে দেয়, সবাই হুড়মুড়িয়ে ছুটে ভালো জায়গা দখল করতে যায়। ফ্রন্ট স্টলে মেয়েদের তো টিকিট দেওয়াই হয় না, বুড়ো লোকরাও আসতে ভয় পায়।

কয়েকটি আগামী ছবির ট্রেইলার দেখাবার পর মুল ছবি শুরু হলো। রবি বললো, এই রে ভূতের গল্প নাকি? সিদ্ধার্থ বললো, হিস্টরিক্যাল , কস্টিম দেখছিস না?

কৌশিক বললো, তুই কী রে, সিদ্ধার্থ? শেকসপীয়ার জারশো বছর আগে যা লিখেছেন তা সবই তো হিস্টোরিক্যাল হবে!

তৃতীয় দৃশ্যে ওফেলিয়াকে দেখা যেতেই অতীন তার জিভের তলায় দু আঙুল দিয়ে হ-ই-ই শব্দে প্রচণ্ড জোরে একটা সিটি দিল। যে-কোনো ইংরেজি ছবিতে সুন্দরী নায়িকার আবির্ভাব সে এইভাবে অভ্যর্থনা জানায়। তার ধ্বনি শুনে কাছাকাছি আরও কয়েকজন সিটি দিয়ে উঠলো।

কৌশিক কাতরভাবে অতীনের একটা হাত চেপে ধরে বললো, ওরকম করিস না, প্লীজ। মন দিয়ে ডায়ালগুলো শোন, তোর ভারো লাগবে!

অতীন বললো, ধুস! ডায়ালগ কে শোনে। আই লাভ অ্যাকশান! ডুয়েল...

-একটু ধৈর্য ধর, অনেক অ্যাকশান আছে।

খানিক বাদে ধৈর্য ধর, অনেক অ্যাকশান আছে।

খানিক বাদে বিরতির আলো জ্বলে উঠতেই রবি উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালো। এই সময়ে উঁচু ক্লাসের দর্শকদের মধ্য থেকে ভালো ভালো মেয়েদের দেখে নিতে হয়। চোখ বুলিয়ে নিয়ে রবি বললো, চল, সিগারেট খেয়ে আসি।

সে কৌশিকের হাত ধরে টানতেই কৌশিক বললো, আমি সিগারেট খাই না।

- আজকে একটা খাবি চল।

- না, আমি সিগারেট খাবো না। তুই যা না।

সে কৌশিকের হাত ধরে টানাটানি করতে অতীন বাধা দিয়ে বললো, এই ওকে জোর করিস না। এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে।

অতীন নিজেও সিগারেট খেতে গেল না দেখে কৌশিক অবাক হলো। তার ধারণা সব ব্যাপারেই অতীন তার সব বন্ধুদের গুরু।

অতীন হেঁকে বললো, এই রবি, বাদাম কিনে আনিস।

তারপর সে কৌশিকের দিকে ফিরে চোখ পাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, হ্যাঁরে হ্যাঁরে, তুই নাকি কাল, সাদাকে বলেছিলি লাল?

কৌশিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো, অ্যাঁ? কী? আমি কী বলেছি?

অতীন একই ভঙ্গিতে আবার বললো, আর, তোদের পাড়ার বেড়ালগুলো, শুনছি নাকি বেজায় গুলো?

পাশ থে সিদ্ধার্থ হেসে উঠলো হো হো করে। কৌশিকের মুখখানা হাবাচ্যাকা হয়ে গেছে।

অতীন কৌশিকের জুলপি ধরে টেনে বললো, শালা, তুই তখন থেকে আমাদের ইংরিজির জ্ঞান দিচ্ছিস, বাংলা কিছু জানিস না?

কৌশিক বললো, ছাড়, লাগছে! আমরা তো জামসেদপুরে থাকতুম, তাই বেশি বাংলা বই পড়িনি!

- তোদের জামসেদপুরে বুঝি শেক্সপীয়ারের চাষ হয়? ওটা শিখলি কী করে?

- তোর মেজাজটা আজ এত খারাপ কেন রে, অতীন? পরীক্ষা খারাপ হয়েছে?

- আমি কোনোদিন পরীক্ষা খারাপ দিই না।

- তোদের হ্যামলেটের গল্পটা সংক্ষেপে বলে, দেবো, তা হলে বুঝতে সুবিধে হবে।

অতীন বিচিত্রভাবে হাসলো। তারপর আবৃত্তি করলো, 'সো টেল হিম উইথ দা অকারেন্টস, মোর অ্যাণ্ড লেস, হুইচ হ্যাভ সলিসিটেড।'

বুকে দুটো হাত রেখে নাটকীয় ভঙ্গিতে এরপর 'দা রেস্ট ইজ সাইলেন্স' উচ্চারণ করেই সে মৃত্যুর ভান করে ঢলে পড়লো।

কৌশিক স্তম্ভিতভাবে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। সে এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

- তুই জানিস? তুই পড়েছিস?

অতীন উদাসীনভাবে বললো, না, পড়িনি, শুনে শুনে শিখেছি। আমার দাদা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তো! শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি করে সবাই মরে যাবে, আমার এরকম গপ্পো ভালো লাগে না।

সিদ্ধার্থ বললো, তুই শালা জেনেশুনে এতক্ষণ মাজাকি করছিলি আমাদের সঙ্গে?

অতীন তাকে এক ধমক দিয়ে বললো, চুপ রে!

তারপর সে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো, তুই একটা জিনিস নিবি?

- কী ?

- হাতটা দে।

কৌশিকের ডান হাতের পাঞ্জাটা নিয়ে বাচ্চাদের কান্না থামাবার জন্য মা ঠাকুমারা যেমন দুধ দেবো, ভাত দেবো, নাড়ু দেবো বলেন, সেইভাবে কাল্পনিক কিছু দিল তিনবার। তারপর বললো, নে, এবারে হাত মুঠো কর। তোকে দিয়ে দিলাম।

- কী দিচ্ছিস কী, অতীন?

- আমার থেকে ভালো রেজাল্ট। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আমি হবো না, তুই হতে পারিস, যদি দীপংকর তোকে বীট না করে। তুই আমার থেকে পাঁচ-ছ নম্বর বেশি পেয়ে যাবি।

- অতীন, তুই জানিস, তোর সঙ্গে আমার কোনো কমপিটিশান নেই। আমি বলছি, আমার থেকে তুই ভালো রেজাল্ট করবি।

- বলছি তো, তুই আমার থেকে পাঁচ-ছ নম্বর বেশি পাবি। আমি লাস্ট কোয়েশ্চেনটা শেষত করতে পারিনি। কেন জানিস, আমার কলমটার জন্য। মাঝে মাঝে কালি বেরুচ্ছিল না, লিখতে দেরি হয়ে গেল।

কৌশিক ভুরু কপালে তুলে বললো, কলমের জন্য? আমার কাছে তিন তিনটে কলম, তুই চাইলি না কেন?

সিদ্ধার্থ বললো, আমার কাছেও স্পেয়ারেবল কলম ছিল!

অতীন চুপ করে গিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

- তুই কলম চাইলি না কেন, অতীন?

- কলমটা আমাকে একটা মেয়ে দিয়েছে। সে রিকোয়েস্ট করেছিল যেন তার কলমেই আমি পরীক্ষা দিই।

- তুই এত সেন্টিমেন্টাল? একটা মেয়ে তোকে একটা বাজে কলম দিয়েছে বলে তুই পরীক্ষা খারাপ করবি?

- আসলে ঠিক তা নয়। তোদের কাছ থেকে কলম চাইবার কথা আমার মনেই পড়ে নি! এমন রাগ হচ্ছিল মেয়েটার ওপর!

সিদ্ধার্থ বললো, অতীনটা মাইরি একেবারে পিকিউলিয়ার! মেয়েটা কে রে? আমি দেখেছি?

সঙ্গে সঙ্গে মুড পাল্টে অতীন বললো, হ্যাঁ, দেখবি না কেন? তোর নিজের মাসি রে, ঐ শম্পা।

সিদ্ধার্থ বললো, ভ্যাট, গুল মারবার আর জায়গা পাসনি? আমার মাসি তোর থেকে পাঁচ বছরের বড়।

অতীন আপন মনে হাসতে লাগলো।

রবি ফিরে এলো দু' ঠোঙা বাদাম ভাজা নিয়ে। ফিস ফিস করে বললো, বাইরে গোলমাল হচ্ছে। কটা ছেলে এসে বলছে তাদের জোর করে লাইন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তার দেখে নেবে! অতীন, তোকে ওরা চিনে রাখেনি তো?

অতীন অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, চিনে রাখলেও বয়ে গেল। আমার গায়ে হাত দেবার সাহস করবে, এমন কোন শুয়োরের বাচ্চা আছে, দেখবো!

সিদ্ধার্থ বললো, আমাদের কেমিস্ট্রির অনেক ছেলে আছে এখানে। দরকার হলে সবাইকে ডাকবো।

এরপর সিনেমা শুরু হতে সবাই চুপ হয়ে গেল।

শেষ দৃশ্যে লিয়ারটিস ও হ্যামলেটের দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় রবি হঠাৎ উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, কে হায়রে?

কৌশিক বললো, দু'জনেই।

অতীন আবার বললো, দা রেস্ট ইজ সাইলেন্স!

হল ছেড়ে বেরুবার মুখে সিদ্ধার্থ বললো, ভালো ছবি, তবে আজকের দিনে এরকম একটা দুঃখের ছবি কোনো মানে হয় না। কৌশিকটার জন্যই তো। এর চেয়ে নিউ এম্পায়ারের ছবিটা ...

কৌশিকের চোখ ছলছল করছে এখনো। মধ্যে কয়েকবার সে রুমাল ব্যবহার করেছে। সে বললো, ট্র্যাজেডি হলেও মহৎ ট্র্যাজেডি দেখলে আপনি মনটা ভালো হয়ে যায়।

রবি বললো, তুই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছিলিস শেষ দিকটায়?

- কান্নাতে তো মনটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়। আমার ভালো লাগে।

অতীন চুপ করে হাঁটছিল, এক সময় সে কৌশিকের কাঁধে হাত রেখে বললো, তুই সে বললি, দু'জনেই হেরে গেছে, তুই ভুল বলেছিস। আসলে জিতেছে হ্যামলেট। কেউ কেউ মরে গিয়েও জিতে যায়।

যারা টিকিট পায়নি, সেই বিক্ষুব্ধ ছেলেরা কেউ নেই বাইরে, আড়াই ঘন্টা অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকে না তাদের।

রবি বললো, এখন কী করবি, বাড়ি যাবি? মোটে সাড়ে আটটা বাজে।

সিদ্ধার্থ বললো, মোটে কী রে? আর বেশি দেরি হলে বকুনি খাবো।

রবি বললো, বড্ড খিদে পেয়েছে কৌশিক, তোর তো অনেক পয়সা বেঁচে গেল, অন্যদির মোগলাই পরোটা খাওয়াবি?

কৌশিক মাথা নাড়লো। কিন্তু সিদ্ধার্থ আর থাকতে পারবে না। সে দৌড়ে উঠে পড়লো একটা দোতলা বাসে।

বৃষ্টি এখনো থামেনি, ছিপ ছিপ শব্দ হচ্ছে রাস্তায়। প্রায় বর্ষা এসে গেল। কিন্তু চৌরঙ্গি জনবিরল নয়। অনেক ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। রাত্তিরের দিকে এ পাড়ায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারী-পুরুষ অনেক চোখে পড়ে। দু'একটি সুন্দরী রমণী সম্পর্কে মন্তব্য করতে করতে ওরা এসে ঢুকলো রেস্তোরায়।

খাবারের অর্ডার দেবার পর রবি জিজ্ঞেস করলো, কাল কী করা হবে?

কৌশকি বললো তোরা আমাদের বাড়িতে চলে আয়।

কৌশিকদের বাড়িটা বড়, তার আলাদা ঘর, সঙ্গে মস্ত বারান্দা। কৌশিকদের বাড়িতেই আড্ডা মারার সুবিধে।

রবি বললো, কোথাও বাইরে বেড়াতে গেলে হয়, মধুপুরে আমাদের একটা বাড়ি আছে, যাবি?

রবি বললো, গেলে হয়! এই অতীন, তুই অতীন, তুই চুপ করে আছিস কেন? চল, মধুপুরে যাই।

অতীন বললো, আমি এখন বলতে পারছি না। আমার টিউশানি আছে না?

কৌশিক বললো, পরীক্ষা খারাপ হয়েছে বলে তোর এখনো মন খারাপ লাগছে?

অতীন ঝাঁকিয়ে উঠে বললো, কে বললো, পরীক্ষা খারাপ হয়েছে? ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া নিয়ে কথা কেউ আটকাতে পারবে না। পরীক্ষা চুকে গেছে, খবর্দার আমার সামনে আর ও কথা উচ্চারণ করবি না!

রবি বললো, বাপ রে! বাবুর মেজাজ বোঝা শক্ত! তুই এম এস সি পড়বি না অন্য লাইনে যাবি?

-কিচ্ছু ঠিক নেই!

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বেরুবার পর অতীনের ইচ্ছে ছিল আরও খানিকটা ঘুরে বেড়ানোর। কিন্তু এবারে কৌশিক আর রবিও রাজি নয়। পরীক্ষা হয়ে গেলেও দশটার পর বাড়ি ফেরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া বৃষ্টি পড়ছে, এর মধ্যে কোথাই বা ঘোরা যাবে।

একাই বাসে চেপে অতীনই আগে নামলো কালীঘাটে। এখন বৃষ্টি বেশ জোরে জোরে পড়ছে তবু হাঁটতে লাগালো আস্তে আস্তে। তার মুখখানা বিষণ্ণ। আজ পরীক্ষা দিতে দিতে সর্বক্ষণ মনে পড়েছিল তার দাদার কথা। দাদা বি এস-সি পরীক্ষা দিতে পারেনি।

বেছে বেছে এমন একটা সিনেমায় যাওয়া হলো, সেখানেও নতুন করে দাদার কথাই মনে পড়তে লাগলো। হ্যামলেটের চরিত্রের সঙ্গে তার দাদার যেন দারুণ মিল। এমনকি লরেন্স অলিভিয়ের-এর মুখখানিও যেন ঠিক তার দাদার মতন।

দূর থেকে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, তবু অতীনের বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। প্রায় দিনই এরকম হয়। সপ্তাহে তিন দিন সে টিউশানি সেরে বাড়ি ফেরে রাত ন'টার পর। কাছাকাছি এসে তার আর পা চলতে চায় না। বাড়িতে ঢুকলেই তার কাঁধে যেন একটা বোঝা চেপে বসে।

সিনেমা হল থেকে বেরুবার সময় সে কৌশিককে যা বলেছিল, সেটাই অতীন এখন মনে মনে আবার বললো, কেউ কেউ মরে গেলেও জিতে যায়।

তার সঙ্গে সে এখন যোগ করলো, যেমন আমার দাদা!

॥ ৩॥

দুপুরবেলা প্রবল ঝড় হয়ে গেছে, তারপর বাতাসের বেগ কমলে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। অশ্রান্ত, একটানা। আস্তে আস্তে জল জমছে রাস্তায়। অলি জানলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে অনেকক্ষণ ধরে। খুব জোর ছাঁট, ভেতরে জল আসছে। ভিজে যাচ্ছে অলির শাড়ি, তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। বৃষ্টির সময় ঘরের সব জানলা বন্ধ করে রাখতে তার ভালো লাগে না। এমনকি কাচের পাল্লার মধ্য দিয়েও বাইরের বৃষ্টি দেখলে সাধ মেটে না। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ, গায়ে তার স্পর্শ পাওয়া চাই।

অলির ঠোঁট নড়ছে না, গুণগুণ স্বরও শোনা যাচ্ছে না। শুধু তার মাথাটা দুলছে। অর্থাৎ তার শরীরের মধ্যে ঘুরছে একটা গান। গত দু'বছরে হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠেছে সে। আগে শাড়ি পরতেই চাইতো না। এখন মায়ের বকুনিতে শাড়ি পরতেই হয়। আজ বিকেলে সে চুল বাঁধেনি, তার নীলরঙের শাড়ির আঁচলটা কাঁধের কাছে মাঝে মাঝে উড়ছে, যেন সেটা জীবন্ত।

রাস্তায় মানুষজন খুবই কম, যারা বাধ্য হয়ে বেরিয়েছে, তারা ছাতা চেপে ধরে গোড়ালি-ডোবা জলে পা ফেলছে শালিকের মতন। মোড়ের মাথায় একটা ষাঁড় অনেকক্ষণ থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ভিজছে। সাইকেল চেপে গায়ে বর্ষাতি জড়ানো একজন মানুষ মোড় দিয়ে বেঁকে আসতে লাগলো এই বাড়ির দিকে। অলির মাথার দুলুনি বন্ধ হয়ে গেল। মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু অলি চিনতে পেরেছে।

সাইকেলটা তাদের গেটের সামনে থামতেই অলি সরে এলো জানলার কাছ থেকে।

অলি-বুলির গানের মাস্টারমশাই গগন ঘোষ ঝড়-বৃষ্টি-ভূমিকম্প হলেও একদিনও কামাই করেন না। গেটের ভেতরে ঢুকে সাইকেলে তালা লাগিয়ে তিনি বর্ষাতিটা গা থেকে খুলে ভাঁজ করলেন। তারপর উঠে এলেন দোতলায়। লাইব্রেরি ঘরের পাশের ঘরটি এখন মেয়েদের পড়বার ঘর। সিঁড়িতে বিমানবিহারীর নিজস্ব ভৃত্য জগদীশ তাঁকে দেখতে পেয়ে সে-ঘরের দরজা খুলে দিল। তিনতলার দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে বললো, ও দিদিমুনি, তোমাদের ম্যাস্টারবাবু এয়েচেন।

লাইব্রেরি ঘরে বিমানবিহারী একটি আইনের বই-এর পাণ্ডুলিপি সংশোধন করছিলেন জগদীশের গলা শুনে তিনি ভুরু কোঁচকালেন। কতবার তিনি জগদীশকে বলেছেন, এভাবে চ্যাচামেচি না করে ওপরে গিয়ে খবর দিতে, তা ও কিছুতে মনে রাখবে না। জগদীশ আর একবার গলা ছাড়তেই তিনি ধম দিলেন, অ্যাই জগদীশ!

অলির ঘরের দরজা বন্ধ। সে ঠোঁট কামড়ে ধরে মনের জোর আনতে চাইছে। বাইরে থেকে জগদীশ ডাকতে সে বলে উঠলো, আজ আমি শিখবো না। আমার শরীর ভালো নেই, তুই

মাস্টারমশাইকে বলে দে!

বলে ফেলেই সে অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করলো। একবার যখন বলা হয়ে গেছে, তখন এটাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে। কয়েক সপ্তাহ ধরেই সে একথা ভাবছিল, বাবার ভয়ে বলতে পারেনি।

জগদীশ তবু দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললো, নেকাপড়ার ম্যাস্টার নয় গো, গানের ম্যাস্টার এয়েচে।

-হ্যাঁ বুঝেছি। তুই গিয়ে বল, আজ আমি যাবো না।

-তা হলে ছোটদিদিমুনি?

-মায়ের ঘরে গিয়ে দ্যাখ!

জগদীশ চলে গেলেও অলি জানে, এবার তার মা আসবেন। আজ অলির মন ভালো নেই। কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। এমনকি মায়ের সঙ্গেও না।

দরজার খিলটা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

এই ঘরটা তার নিজস্ব। এই ঘরটা তার বড় প্রিয়। কিছুদিন আগেও তার ছোট বোন বুলি এই ঘরে তার সঙ্গে শুতো, এখন বুলিরও আলাদা ঘর হয়েছে। পড়ার টেবিলটা ঘরের এক কোণে। আগে বারান্দার দিকে জানলার পাশে ছিল। কিন্তু তাতে যখন তখন হাওয়ায় বই-পত্র উড়ে যায়। এ ঘরে জামাকাপড় রাখা হয় না। সেসব মায়ের ঘরে। এ-ঘরে একটা আলনাও নেই। সব কটা দেওয়ালে অনেক রকম ছবি, সবই প্রাকৃতিক দৃশ্য। বিলিতি ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে কেটে নিয়ে সেলো টেপ দিয়ে আটা। নতুন একটা ভালো ছবি পেলেই অলি পুরোনো ছবি বদলে দেয়।

একটু পরেই বুলি এসে বললো, এই দিদি, গানের স্যার এসেছেন, তুই যাবি না?

বুলি এখনো লম্বা হবার বয়েসটায় পৌঁছায়নি। এখনো তার চেহারাটা ফর্সা, গোলগাল পুতুলের মতন। মাথার চুল কোঁকড়া।

অলি মুখ তুলে বললো, না। আমি গান শিখবো না। আর কোনোদিন গান শিখবো না।

বুলি অনেকখানি চোখ মেলে বললো, আর গান শিখবিই না! কেন?

এতক্ষণে মনে পড়েনি। এইমাত্র অলির একটি কথা মনে এসে গেল। চমৎকার যুক্তি। এর পর আর বাবা-মাও আপত্তি করতে পারবেন না।

-আমার গান হবে না। আমি সেতার শিখবো।

-এই মাস্টার মশাই কি সেতার জানেন?

-অন্য মাস্টার মশায়ের কাছে শিখবো।

বুলি একটু চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। দিদি কি তার চেয়ে বেশি বেশি কিছু পেয়ে যাচ্ছে? গান ভালো না সেতার ভালো? দিদি যখন চাইছে, তখন সেতারই নিশ্চয়ই ভালো। সুতরাং সে ঘোষণা করলো, আমিও সেতার শিখবো!

-তুই তা হলে বাবাকে বল সে কথা।

-এই মাস্টার মশাই-এর কী হবে?

-জগদীশকে দিয়ে চা-বিস্কুট পাঠিয়ে দে!

একটা কিছু নতুনত্ব হবে এই ভেবে বুলি দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অলির আবার ইচ্ছে হলো, উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে। সে এখন শুধু বৃষ্টির শব্দ শুনবে।

কিন্তু মনে মনে সে জানে, এত সহজে গগন ঘোষকে বিদায় করা যাবে না। এরকম দুর্যোগের মধ্যেও তিনি এসেছেন। শুধু এই কারণেই তিনি বিমানবিহারীর কাছ থেকে সহানুভূতি আদায় করে নেবেন।

গানের মাস্টারটিকে অলির পছন্দ হয়নি। কেন যে তার অপছন্দ তার কোনো কারণ সে নিজেকেই বোঝাতে পারে না। কিছুদিন আগে একজন প্রাইভেট টিউটর অলিকে ইংরেজি পড়াতেন, তিনি নস্যি নিতেন। তাঁর আঙুলের সব সময় নস্যি লেগে থাকতো, নস্যির গন্ধ নাকে এলেই অলির গা গুলিয়ে উঠতো। গগন ঘোষ নস্যি নেন না। গগন ঘোষের চেহারাও খারাপ নয়। গরমকালেও তিনি সিল্কের জামা পরেন। গান শেখান খুব মন দিয়ে, অলি বা বুলি বারবার ভুল করলেও তিনি রাগ করেন না। হারমোনিয়াম বাজান খুব ভালো। বাবার অফিসের কভার ডিজাইনার সুকুমারবাবুর মতন গগন ঘোষ কোনোদিন অলির কাঁধ ধরে স্নেহ, দেখাবার ছলে বুকের কাছে টেনে আনার চেষ্টা করেননি। সেরকম কোনো দোষই নেই, তবু অলির কিছুতেই ইচ্ছে করে না এই গানের স্যারের কাছে গান শিখতে। এঁর

সামনে বসে থাকতেই তার ভালো লাগে না। তবে কি গগন ঘোষের চোখের দৃষ্টিতে কোনো দোষ আছে?

অলির এরকম হয়। এক একজন মানুষকে সে হঠাৎ অপছন্দ করতে শুরু করে। কোনো যুক্তি সে দেখাতে পারবে না। স্রেফ তার শরীরের মধ্যে একটা অস্বস্তি হতে শুরু করে।

বৃষ্টির শব্দ যেন সেতারের ঝালার বাজনা। এখন চুপ করে শুয়ে শুয়ে যদি সেই শব্দ শোনা যেত!

একটু বাদেই বুলি ফিরে এসে বললো, দিদি, ওঠ, তোকে বাবা ডাকছে নিচে।

বাবাকে মেয়েরা ঠিক ভয় পায় না। বিমানবিহারী সন্তানদের উগ্রভাবে কখনো বকেন না। বাইরের লোকদের কাছে রাসভারি হলেও বিমানবিহারী বাড়িতে পারিবারিক গল্পের সময়, কিংবা খাওয়ার টেবিলে অনেক রকম ঠাট্টা ইয়ার্কি করেন। বাবার কাছে মেয়েরা সরাসরি আব্দার জানাতেও পারে।

কিন্তু বাবা ডেকে পাঠালে না-যাওয়া চলে না। অলির যে এখন কিছুতেই যেতে ইচ্ছে করছে না? এখন দোতলায় নামতে ইচ্ছে করছে না। গগন ঘোষের সামনে যেতে ইচ্ছে করছে না।

তার এই অনিচ্ছেগুলোর কেউ মূল্য দেবে না? এখন অলি নিচে গিয়ে ঐ সব কাজগুলো করলে সারা সন্ধে তার মন খারাপ থাকবে।

অলি উঠে দাঁড়িয়ে শাড়িটা গুছিয়ে নিল গায়ে। চুলে চিরুনি বুলিয়ে নিয়ে বললো, চল।

যেন সে একটা খুব নোংরা জল ভরা পুকুরে নামতে যাচ্ছে এইভাবে অলি নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে।

বাবা কী বলবেন তা অলি আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারছে। বাবা বলবেন আজ যখন মাস্টারমশাই এস পড়েছেন, আজ তোরা গান শেখ, এর পরে আমি ওঁর সঙ্গে সেতার বিষয়ে আলোচনা করবো।

পাশের ঘরে গগন ঘোষ হারমোনিয়াম খুলে প্যাঁ পোঁ শুরু করে দিয়েছেন। অলি প্রথমে গেল লাইব্রেরি ঘরে। বাবার কাছে।

বিমানবিহারী মুখ তুলে অলিকে দেখলেন, এক লহমায় তিনি বুঝে গেলেন মেয়ের আজ মেজাজটি ঠিক নেই। তিনি হালকা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই নাকি গানের বদলে সেতার শিখবি বলেছিস?

অলি দৃঢ়ভাবে বললো, হ্যাঁ। গান আমার হবে না।

-বেশ তো। সেতারই শুরু কর তা হলে। শোন, তাই এখন কোনো কাজ করছিস?

-না।

-তুই আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি? এই ম্যানসক্রিপটা বসে বসে পড়। অনেন বানান ভুল আছে। দ্যাখ সেগুলো ঠিক করতে পারিস কি না! আমার আজ কাজ করতে ভালো লাগছে না। আমি গগনবাবুর কাছে একটা গান তুলে নিই বরং।

অলি প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। বাবা গান শিখবে? বাবাকে সে আগে কখনো গুনগুন করতে শুনেছে বটে, কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের কাছে গিয়ে বাবা গান তুলবে? এই বৃষ্টি বাদলার মধ্যে গগন ঘোষ এসেছেন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া ভালো দেখায় না, শুধু এই জন্য?

বিমানবিহারী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুই আমার জায়গাটায় বোস। আস্তে আস্তে তোকেও তো কাজ শিখতে হবে। যে বানানটা সন্দেহ হবে, ডিকশানারি দেখে নিবি!

সবেমাত্র আই-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে অলি সাতষট্টি পারসেন্ট নম্বর পেয়েছে। ইংরেজিতে সে খুবই ভালো। পাণ্ডুলিপির বানান সংশোধন করার যোগ্যতা সে অর্জন করেছে।

গগন ঘোষের সামনে যাওয়ার চেয়ে এই কাজটা তার ঢের বেশি পছন্দ হলো। কিন্তু বাবা গান শিখতে বসবেন ভেবেই হেসে ফেললো সে।

বিমানবিহারীও মুচকি হেসে বললেন, দ্যাখ না, এরপর তোর মাকে কী রকম চমকে দেবো।

বিমানবিহারী পাশের ঘরে চলে গেলেন, একটু পরে অলি সত্যিই শুনতে পেল গগন ঘোষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাবা গাইছেন, জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ!

অলি পাণ্ডুলিপি পাঠে মন দিল। তার মন-খারাপ ভাবটা যেন একটা কালো বাদুড়ের মতন বুকের মধ্যে ঘাপটি মেরে ছিল। হঠাৎ উড়ে গেল ঝটপটিয়ে।

বিমানবিহারীর টেবিলের ওপর একটা বেল আছে। জগদীশকে ডাকবার জন্য তিনি ঐ বেল বাজান। অলি যখন তার বাবার টেবিলে বসেছে, সে-ও ঐ বেল ব্যবহার করবে।

জগদীশ আসতেই অলি পাণ্ডুলিপি থেকে চোখ না সরিয়ে বললো, আমার জন্য এককাপ কফি নিয়ে আয়!

জগদীশ অবাক হয়ে বললো, কফি? বিকেল হয়েছে, এখন তো দুধ খাবে তুমি!

অলি ধমক দিয়ে বললো, না দুধ খাবো না। তোকে কফি আনতে বলছি না।

তখনই অলি ঠিক করলো, এখন থেকে সে আর কোনোদিনই বিকেলে দুধ খাবে না।

এ ঘরের সব জানালা বন্ধ। চতুর্দিকে বইয়ের আলমারি, তা ছাড়া মেঝেতেও এখানে সেখানে অনেক বই স্তূপ করা আছে। বৃষ্টির ছাঁট এলে বই নষ্ট হয়ে যাবে। তবু অলির ইচ্ছে করলো একটা জানলা খুলতে। সে উঠে দাঁড়াতেই দরজার কাছ থেকে প্রশ্ন এলো, এই, কাকাবাবু কোথায়?

অলি ফিরে তাকিয়ে দেখলো, সর্বাঙ্গ জবজবে অবস্থায় ভিজে এসে দাঁড়িয়েছে অতীন। তার মুখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। গেঞ্জির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে একটা খবরের কাগজে মোড়া বড় প্যাকেট বার করলো। কয়েক পরত ভিজে কাগজ ছাড়িয়ে দেখে নিল ভেতরের মোড়কটি শুকনোই রয়েছে।

শুধু ভিজে পায়ের ছাপ নয়, ঘরের মধ্যে একটা জলরেখা টেনে এগিয়ে এলো অতীন। অলি তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বললো, এই, কী হচ্ছে। সব ভিজে যাবে না? যাও, বাথরুমে যাও। মাথা মুছে এসো।

এই ঘর-সংলগ্ন একটা ছোট বাথরুম আছে। অতীন হাতের প্যাকেটটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল সেখানে।

অলির মুখে পাতলা হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। এরকম বৃষ্টি -ভেজা মানুষ দেখতে তার ভালো লাগে। যারা ছাতা কিংবা রেইন কোটও ব্যবহার করে না। গত বর্ষায় কৃষ্ণনগরে গিয়ে অলির এই রকম প্রাণ ভরে ভিজেছিল। তাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ির পেছনে বাগান রয়েছে একটা। ছোট পুকুরও আছে। সেখানে যা খুশী করা যায়। কলকাতায় এই রকম বৃষ্টির মধ্যে সে রাস্তায় বেরুবার অনুমতি পাবে না। এমনকি ছাদে উঠে যে ভিজবে তারও উপায় নেই। তাদের বাড়ির পাশেই আর একটা উঁচু বাড়ি উঠেছে। সে বাড়ি থেকে তাদের ছাদটা একেবারে নগ্নভাবে দেখা যায়।

অতীন যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানকার জমা জলটুকুর দিকে সে তাকিয়ে রইলো। সে বাইরে যায়নি। বৃষ্টিই যেন সশরীরে চলে এসেছে ঘরের মধ্যে।

বাথরুমে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে অতীন তার জামাটাও খুলে নিঙড়ে নিল। তারপর জামাটা টাঙিয়ে দিল দরজার ছিটকানিতে। গেঞ্জিটা চলনসই অবস্থায় আছে। প্যান্টটা খোলবার তো কোনো উপায় নেই। সেই অবস্থায় বেরিয়ে এসে সে বললো, এই অলি, এক কাপ চা খাওয়াতে পারবি? পাশের ঘরে গাঁক গাঁক করে কে চ্যাচাচ্ছে রে?

অলি বললো, চুপ, চুপ!

-কেন, কী হয়েছে?

-ওরকম অসভ্যের মতন কথা বলো না। বাবা গান শিখছে।

অতীন অট্টহাস্য করে উঠলো। তারপর মাথার ওপর একটা আঙুল ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাকাবাবু গান শিখেছেন? হেড অফিসে গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?

-চুপ করো বলছি না!

টেবিলের ওপর রাখা প্যাকেটটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অতীন বললো, বাবা ঐটা পাঠিয়েছে। কাকাবাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিলো, কতক্ষণ ঐ রকম চ্যাচামেচি চলবে?

অলি চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে বললো, কী দরকার আমাকে বলতে পারো। আমি এখন বাবার হয়ে অফিশিয়েট করছি।

অতীন একথা শুনে বিস্ময় বা অবজ্ঞা না দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললো, ঠিক আছে। সাতশো পঞ্চাশ টাকার একটা ভাউচার পেমেন্ট বাকি আছে। সেটা দিয়ে দে!

টাকার কথা শুনে অলি একটু ঘাবড়ে গেলেও হার মানলো না। গলার আওয়াজ এক রকম রেগে বললো, সে টাকা তো তোমাকে দেওয়া যাবে না। প্রতাপকাকার সই লাগবে। তাছাড়া তোমাকে টাকা দিলে তুমি হারিয়ে ফেলবে।

জগদীশ এই সময় কফি নিয়ে ঢুকতেই অলি বলল, ওটা বাবলুদাকে দে। আমার জন্যে আর এক

কাপ কফি নিয়ে আয়।

জগদীশ ঝাঁঝালো আপত্তি জানিয়ে বললো, একসঙ্গে বলো না কেন? আবার জল গরম করতে হবে।

অতীন কাপটা তুলে নিয়ে বললো, তোদের বাড়িতে বুঝি শুধু চা-কফি দেওয়া হয়? বিস্কুট-ফিস্কুট রাখিস না?

অলি হুকুমের সুরে বললো, জগদীশ, আর এক কাপ কফি নিয়ে আয়, বিস্কুট নিয়ে আয়। বাবলুদা ওমলেট খাবে?

অতীন চোখ বড় বড় করে বললো, তোদের বাড়ির ওমলেট? জগদীশ তা হলে এখন জগুবাবুর বাজারে গিয়ে হাঁস কিনবে, সেই হাঁস ডিম পাড়বে, তারপর সেই ডিমে ওমলেট ভাজা হবে। এসেই এক কাপ গরম কফি পেয়ে গেছি, এই আমার বাপের ভাগ্যি।

জগদীস বললো, বাড়িতে ডিম নেই, মামলেট হবেনিকো!

অতীন মাথা হেলিয়ে বললো, দেখলি তো? আজব বাড়ি তাই তোদের! একদিন এসে দেখি সদর দরজা খোলা, সেখানে কেউ নেই। দোতলায় এসে দেখি কেউ নেই, তিনতলায় উঠে ডাকাডাকি করলুম। তাও কারুর সাড়া শব্দ পাই না। চোরেরা এসে তোদের সব কিছু চুরি করে নিয়ে যায় না কেন?

জগদীশ দাঁত বার করে বললো, গত হপ্তাতেই তো একদিন চুরি হয়ে গেল। একতলার গুদাম থেকে ছাপা ফর্মা....

অলি বললো, বাবাকে বলবো, এবারে কৃষ্ণনগরে গেলে জগদীশটাকে রেখে আসতে। এই গাঁইয়াটাকে দিয়ে কোনো কাজই হয় না! তুই কফি আনবি আমার জন্য। না দাঁড়িয়ে থাকবি?

অতীন ধোঁয়া-ওঠা কফি শেষ করে দিল কয়েক চুমুকে। তার শরীর শির শির করছে। অনেকখানি রাস্তা দৌড়ে এসেছে সে। বাবা তাকে পাঠিয়েছিলেন সকালবেলা। এক বন্ধুর বাড়িতে সে কাটিয়ে এসেছে সারা দুপুর। কাপটা নামিয়ে রেখেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলি! ওটা দিয়ে দিস কাকাবাবুকে।

-তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

-কোনো দরকার নেই। উনি দেখলেই বুঝবেন।

-তুমি এই বৃষ্টির মধ্যে আবার যাচ্ছো? গেঞ্জি পরেই চলে যাবে নাকি?

-কেন, গেঞ্জি পরে রাস্তায় বেরুতে অসুবিধের কী আছে?

-কী তোমার এমন জরুরি কাজ যে এক্ষুনি যেতেই হবে?

অতীন ঘুরে অলির দিকে তাকালো। সত্যিই তার এমন কিছু ব্যস্ততা নেই। কিন্তু পাশের ঘরের হারমোনিয়ামের আওয়াজ ও পুরুষ কণ্ঠ তার কানকে পীড়া দিচ্ছে। কাকাবাবুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তার বাবা এই রকম চেঁচিয়ে গান গাইছে, এটা অতীন কল্পনাই করতে পারে না।

-ঐ গানের মাস্টারটা তোকে আজ ছেড়ে দিয়েছে যে? তুই গান শিখছিস না?

-না, আমি আর ওঁর কাছে কোনোদিন গান শিখবো না!

অতীন খুশী হয়ে হাসলো। ঐ গানের মাস্টারটাকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। অলি এতদিনে তা বুঝেছে?

অলি বললো, আমার বাবার একটা জামা দেবো? তোমার গায়ে লেগে যেতে পারে।

-চল, অলি তোর ওপরের ঘরটায় যাই। এই ঘরে বই-এর ভ্যাপসা গন্ধ আমার বিচ্ছিরি লাগে। সব সময় চোখের সামনে বই দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

-ঠিক আছে, চলো, ওপরে চলো।

অলির ঘরে খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো অতীন। খুব নরম হয়ে এসেছে বিকেলে আলো। জমা-জলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বলে রাস্তার গাড়িগুলির আওয়াজও বেশ মন্থর। কিন্তু অতীনের মাথার মধ্যে ছটফট করছে একটা গোপন বাসনা।

অলি একটা জামা নিয়ে এলো তার বাবার।

অতীন সেটা হাতে নিয়েই বললো, খুব পুরোনো, ছেঁড়া। খোঁড়া একটা জামা এনেছিস, তাই না? দোল খেলার জন্য তুলে রাখা হয়েছিল?

অলি বললো, কী অসভ্য! মোটেই ছেঁড়া নয়। আলমারি খুলে সামনে যেটা পেয়েছি, সেটাই নিয়ে এসেছি।

-তোর বাবার জামা আমি পারবো না। তোর কাছ থেকে আর কিছু আমি নেবো না।

অতীন আবার দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই অলি তার হাত চেপে ধরে বললো, কেন কী হয়েছে? আমি কী দোষ করলুম।

অতীন রাগ রাগ চোখে তাকালো অলির দিকে। অলি শরীরে ও স্বভাবে যে স্নিগ্ধতা ও সারল্য আছে এখন সে তা ভাঙতে চাইছে। এরকম ইচ্ছে তার আগে কখনো হয়নি।

সে বললো, তুই কী ক্ষতি করেছিস জানিস? আমাকে একটা কলম দিয়েছিলি, একটা বিচ্ছিরি কলম কালি বেরোয় না, সেটা দিয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়ে...

বিস্ময়ে, ব্যথায়, অপমানে অলির মুখখানা নীল হয়ে গেল। একটা কলম সে অতীনকে দিয়েছিল ঠিকই, তবে নিজে থেকে দিতে চায়নি। অতীনই জোর করে নিয়েছিল বলতে গেলে!

অলি একদিন অতীনকে দুটি জিনিস দেখিয়েছিল। একটি কলম আর একটা হাতঘড়ি। কমলটা দিয়েছিলেন তার বাবা আর ঘড়িটা ব্যাঙ্গালোর থেকে তার এক মামা এনেছিলেন। অতীনকে সেই ঘড়ি আর কলমটা দেখিয়ে গর্বের সঙ্গে অলি বলেছিল, দ্যাখো বাবলুদা, আমাদের দেশে এখন কত ভালো ভালো জিনিস তৈরি হচ্ছে। এই ঘড়িটাও দিশি, কলমটাও দিশি! বিলিতি ঘড়ির চেয়ে এই ঘড়িটা কোনো কাগজে ঘষতে ঘষতে বলেছিল, মন্দ না। আমি একটা জাপানি কলম কিনবো ভাবছিলাম, আটার দাম কত রে?

অলি বলেছিল, তুমি এটা নিয়ে কয়েকদিন লিখে দেখতে পারো।

অতীন অমনি কলমটা পকেটে ভরে বলেছিল, তুই আমাকে দিয়ে দিলি? তা হলে এটা দিয়েই আমি পরীক্ষা দেবো!

অলি এখন চরম দুঃখিত স্বরে বললো, আমার জন্য তোমার পরীক্ষা খারাপ হয়েছে?

অতীন হুংকার দিয়ে বললো, হ্যাঁ।

তারপরেই এরকম ধমকের সঙ্গে কোনো রকম মিল না রেখে সে অলিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, আমি তোকে খেয়ে ফেলবো! আমি তোকে একদম খেয়ে ফেলবো আজ!

অলি প্রথমে দারুণ অবাক হয়ে গেল। বাবুরদা তো এরকম কক্ষণো করেনি আগে। বরং বাবলুদা দু'চারটে চড়-চাপড় মারে মাঝে মাঝে, মাথার চুল টেনে এলো করে দেয়, আরদ তো করে না। বি এস-সি পরীক্ষা দিয়েই বদলে গেল?

বিস্ময়ের সঙ্গে মিশে থাকে লজ্জা। হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লো ভয়। বাবলুদা তাকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছে। না, না, না, এ ভাবে নয়, এ ভাবে হতে পারে না। জীবনের প্রথম চুম্বনের কথা অলি কল্পনা করেছে মাঝে মাঝে। নদীর ধারে, জ্যোৎস্না রাতে, কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথা থেমে যাবে, বাবলুদা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে অনেক্ষণ, তারপর....। তার বদলে এই রকম?

দারুণ ভয় পেয়ে অলি কান্না গলায় বললো, এ কী বাবলুদা, না, না, আমায় ছেড়ে দাও, একটা কথা শোনো-

অতীন বললো, চুপ, কোনো কথা নয়!

অলি প্রাণপণে তার ঠোঁট সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, ছাড়ো, ছাড়ো, কী হচ্ছে। কী পাগলামি করছো, দরজা খোলা আছে, এক্ষুনি জগদীশ কফি নিয়ে আসবে...

অতীনের বুকের ভেতরটা খুশীতে হা-হা করে উঠলো। দরজা খোলা, শুধু এই জন্যই অলির আপত্তি? কেউ আসবে না, কেউ আসবে না, পৃথিবীতে কারুর সাহস নেই এখন তাকে বাধা দেওয়ার।

সে অলিকে দেওয়ালের কাছে টেনে এনে তার নরম, তুলোর মতন ওষ্ঠ নিয়ে মাতামাতি করতে লাগলো। তার একটা হাত ঘুরতে লাগলো ঘুঘু পাখির মতন অলির বুকে। অলির তীব্র, কান্নমেশানো না, না, সে শুনতে পাচ্ছে না। এক সময় সে দু হাতে অলির কোমর জড়িয়ে উঁচুতি তুলে তার নগ্ন নাভিতে চেপে ধরলো তার গরম জিভ।

সে ভাঙছে। সে অলির স্নিগ্ধতা ও সারল্য ভাঙছে, সে চাইছে ঝড় ও অগ্নিবৃষ্টি।

॥ ৪ ॥

বাড়ির সামনে যে গেট ছিল সেটি আর নেই। কবে ভেঙে গেছে, তারপর আর মেরামতের প্রশ্ন

ওঠেনি। ভজন সিংকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, দুটি বউ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে ফিরে গেছে গাঁয়ের বাড়িতে। এখনো মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে। সুহাসিনীর জন্য খানিকটা ঘি কিংবা কিছু আতা-পেয়ারা উপহার আনে।

একতলা এখন পুরোপুরিই ভাড়া, দুটি রেল-পরিবার থাকে সেখানে। তাদের মধ্যে সর্বক্ষণ জল নিয়ে, ময়লা ফেলা নিয়ে, ছেলেমেয়েদের অবাধ্যতা নিয়ে ঝগড়া চলে। ওপর তলায় পাঁচ ইঞ্চি দেয়াল গেথে দুটি ঘর বানানো হয়েছে কোনোক্রমে, সেই দুটি ঘরে দুটি ঘরে বিশ্বনাথ গুহ তাঁর স্ত্রী-কন্যা-শাশুড়িকে নিয়ে থাকেন।

বিশ্বনাথ এত রোগা হয়ে গেছেন যে তথ্যাকে হঠাৎ দেখে চেনাই শক্ত। ক্ষয় রোগ তাঁকে ছাড়েনি। তবু তিনি বেঁচে আছেন, বলতে গেলে, সম্পূর্ণ মনের জোরে। মাঝে মাঝে জোড়াতালি দিয়ে চিকিৎসা হয়েছে, কিন্তু এই রোগে ওষুধ পাত্রের চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয় হলো পরিপূর্ণ বিশ্রাম এবং নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু বিশ্বনাথ গুড যেসব কিছু মানেননি, খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে তাঁর বাছ-বিচার নেই, আর বিছানায় শুয়ে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। সর্বক্ষণ টো টো করে ঘুরে বেড়ান। শুধু বাড়ি ভাড়ার টাকার সংসার খরচ কুলোয় না, তাঁকে অন্য রোজগারের ধান্দায় থাকতে হয়।

তবে, গায়ক বিশ্বনাথ গুহর কণ্ঠ থেকে গান চির বিদায় নিয়েছে। গানের ইস্কুলটি তিনি তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন, কারন তাঁর গলায় এখন সুব তো দূরে কথা, তাঁর কথাই এখন ভালো করে বোঝা যায় না। কাশির প্রকোপে তাঁর কণ্ঠস্বর ফ্যাসফেসে হয়ে গেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁরা তেজ নষ্ট হয়নি, রসিকতা-জ্ঞানটি অক্ষুণ্ণ আছে। হেসে ওঠেন যখন-তখন।

ট্রেনের সময় অনুযায়ী স্টেশানে বসে থাকাই এখন বিশ্বনাথের প্রধান কাজ। মুখের দাড়ি অধিকাংশই পেকে গেছে, মাথার চুলও প্রায় সাদা, গায়ের মোটা পাঞ্জাবিটা বিশেষ সাবানের ছোঁয়া পায় না। ইদানীং টায়ার কাটা অতি শস্তায় চটি বেরিয়েছে, সেই চটিই পায় দেন। স্টেশানের অনেকেই তাঁকে চেনে, তবে আগের মতন আর কেউ খাতির করে না। খাতির করার মতন চেহারা বা পোশাকেও তাঁর নেই, শুধু একজন বুড়ো চাওয়ালা তাঁকে অর্ধেক দামে চা দেয়।

সত্যিই বিশ্বনাথকে দেখে আর বোঝবার উপায় নেই যে এককালে এই মানুষটিই কলেজের পড়াশুনো ছেড়ে গান-বাজনা শেখার ঝোঁকে লক্ষ্ণৌ-আগ্রা ঘুরে বেড়িয়েছেন। টানা সাত-আট বছর তালিম নিয়েছেন সঙ্গীত-সম্রাট স্বয়ং ফৈয়াজ খানের কাছ থেকে। মোটামুটি বেশ সমৃদ্ধ পরিবারের সন্তান ছিলে... বিশ্বনাথ, জীবনের অনেকগুলি বছর অর্থচিন্তা করতে হয়নি। এক ধরনের মানুষ থাকে, যারা নিজের জন্য কক্ষনো কিছু চায় না, অন্যদের সবসময় কিছু দিতে চায়, অনেক সময় সাধ্যের অতিরিক্তও, বিশ্বনাথ ছিলেন সেই দলের। এখন অবস্থাটা উল্টে গেছে।

আমাদের দেশের সব মানুষ এখনো আপনি, তুমি, তুই-তে ভাগ করা। অচেনা মানুষকেও অনায়াসে তুমি বা তুই বলা চলে তার পোশাকের দৈন্য কিংবা খালি পা দেখে। বিশ্বনাথকে অনেকেই আজকাল তুমি শ্রেণীর মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। ট্রেনের যাত্রীরা তাঁকে দীন উমেদার বলে গণ্য করলে তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। বিশ্বনাথ এই জন্য মাঝে মাঝেই কথার মধ্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন। এই লোকটা ভালো ওষুধ আছে। ইংরিজি শুনলেই সবাই আবার আপনি বলতে শুরু করে।

ইদানীং দেওঘরে যাত্রির সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছেে শহরের স্থায়ী বাসিন্দাও বেড়েছে। ভ্রমণ-বিলাসী বা স্বাস্থ্য-উদ্ধারকারীরা আগে শুধু দুর্গা পুজোর মরশুমে এবং শীতকালেই আসতো। এখন গ্রীষ্ম-বর্ষাতেও যাত্রীর বিরাম নেই। সেই তুলনায় খালি বাড়ির সংখ্যা কমেছে, ধর্মশালাগুলিতে জায়গা হয় না।

আগে শুধু বিশ্বনাথের মন্দিরে পুজো দেবার জন্য তীর্থযাত্রীরা আসতো, এখন সৎসঙ্গর আশ্রমের শিষ্যরাও আসে। আসে মোহনান্দ মহারাজের শিষ্যরা। এক সময় শুধু বৈদ্যনাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের একাধিপত্য ছিল এই শহরে, এখন তাদের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে, সেই জন্য পাণ্ডা সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ। তাদের সঙ্গে সৎসঙ্গীদের সংঘর্ষও হয়ে গেছে কয়েকবার।

বিশ্বনাথ খুব সতর্কতাভাবে পাণ্ডা সম্প্রদায় ও সৎসঙ্গীদের থেকে সমান দূরত্ব বাজায় রাখেন। ঐ দুই দলেই কেউ কখনো তাঁকে ধমক ধামক দিতে এলে তিন একেবারে বিনয়ের অবতার হয়ে যান, প্রয়োজনে তাদের পা ধরতেও দ্বিধা করেন না। আত্মরক্ষার তাগিদেই তিনি এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যান না, তিনি জানেন, এদের মার তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

কয়েকটি বড় বড় বাড়ির দারোয়ান ও মালিকের সঙ্গে বিশ্বনাথের গোপন চুক্তি আছে। বাড়ির মালিকরা বছরে একবার দু'বার আসে, অন্য সময়ে বাড়ি খালি পড়ে থাকে। অনেক মালিক ভাড়া দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। টি বি রুগীরা এসে বাড়ি বিষাক্ত করে দিয়ে যাবে, এইটাই প্রধান ভয়। কেয়ার টেকার বা দারোয়ানরা এই সব বাড়ি খুব গোপনে ভাড়া দেয়। সেই ব্যাপারে তারা বিশ্বনাথের ওপরে নির্ভর করে। বিশ্বনাথ এমন ভাড়াটে জোগাড় করে আনবেন যারা সাত দিন-দশ দিনের বেশি থাকবে না। তাছাড়া বিশ্বনাথ এই সব কটি বাড়ির মালিকদের ও পরিবারের প্রধান লোকজনের মুখ চেনেন। তারা হঠাৎ কেউ এসে পড়ল কি না তাও বিশ্বনাথ স্টেশানে বসে বুঝতে পারবেন। এই কাজের জন্য তাঁর আধা-আধি বখরা।

বিশ্বনাথ ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। যাদের দেখে মনে হয় তীর্থযাত্রী কিংবা সৎসঙ্গের শিষ্য, তাদের প্রতি তিনি লোভ করেন ন্যুব দম্পতি কিংবা কলেজের ছাত্রদের দলই তাঁর বেশি পছন্দ। আজকাল ছাত্ররা প্রায়ই দল বেঁধে আসে।

পছন্দসই পার্টি দেখলে বিশ্বনাথ পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বার করে মেলে ধরেন বুকের কাছে। তাতে মোটামোটা অক্ষরে লেখা থাকে, উত্তম বাড়ি ভাড়া, সব রকম আরামের ব্যবস্থা আছে, দৈনিক বা সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত। কাগজের উল্টোপিঠে ঐ বক্তব্যই ইংরেজিতে লেখা। ঐ কাগজ দেখে কেউ কেউ এগিয়ে আসে, দরাদরি হয়, বিশ্বনাথ তাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তারপরেও প্রতিদিন তাদের খোঁজ খবর করেন। মাসে এরকম দু'তিনবার খদ্দের জোটে, আয় নেহাত মন্দ হয় না।

চার পাঁচজন ছাত্রের একটি দল বিশ্বনাথের বুকের ঐ কাগজ দেখে থমকে দাঁড়ালো। একজন অন্যদের বললে, ধর্মশালায় যাবার আগে এটা ট্রাই করবি নাকি?

ওদের একজন বললো, না, না! বইরে চল আগে! স্টেশানের টাউটের পাল্লায় পড়লে অনেক পয়সা খসাবে।

বিশ্বনাথ তাঁর কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে ঐ দলের একজনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তিনি বুঝে গেছেন যে জালে শিকার পড়েছে।

একজন যুবক বন্ধুদের বললো, কথা বলে দেখাই যাক না! ধর্মশালা পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই তো কিছু!

সে এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলো, কোঠী-ভাড়া হ্যায়? কিত্না ভাড়া?

প্রতিদিন ট্রেনের যাত্রীদের দেখে দেখে বিশ্বনাথ অভিজ্ঞ হয়ে গেছেন, দেখেই চিনতে পারেন, তারা কোথাকার লোক, কোন ভাষাভাষী। অবশ্য এইশহরে বাঙালী ভ্রমণকারীর সংখ্যাই বেশি।

তিনি বললেন, প্রাইভেট হাউস। ভেরি রিজনেবল রেন্ট, আপনাদের পছন্দ হবে।

বিশ্বনাথ মুখে ইংরেজি ও বাঙলা দু'রকম শব্দ শুনে যুবকটির মুখের চেহারা একটু বদলালো। বন্ধুদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কত দূরে বাড়ি?...

বিশ্বনাথ হেসে বললেন, বেশ দূর আছে। শহরের ঘিঞ্জি থেকে অনেকটা দূরে। নিরিবিলি জায়গায়, সঙ্গে বাগান আছে, চমৎকার ভিউ পারেন...

-কত ভাড়া?

-আপনারা ক'দিন থাকবেন?

-এই তিন-চার দিন। আমাদের দু'টো ঘর চাই।

-তাহলে পার রুম তিরিশ টাকা করে পড়বে পার ডে!

যুবকদের দলের অন্য একজন চেঁচিয়ে বলে উঠলো, ওরে বাপরে, একেবারে গলাকাটা! চ, চ, ধর্মশারাতে ঠিক ব্যবস্থা করে নেবো!

আর একজন বললো, আমি শুনিছি, এখানে হোটেলের ঘর ভাড়াও দশ-বারো টাকার বেশি না!

বিশ্বনাথ সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলিয়ে বললেন, তা ঠিকই শুনেছেন। দশ টাকা ভাড়ায় হোটেলের ঘর পেতে পারেন এখানে। যদি খালি থাকে। কোনো না কোনো ধর্মশালাতেও জায়গা পেয়ে যাবেন। খুব ভিড় নেই এখন।

এই পদ্ধতিটা খুব কার্যকর। খদ্দেরের কাছে কাকুতি-মিনতি না করে এমন ভাব বজায় রাখা সে তোমরা আমার খদ্দের হবার যোগ্য নও!

চলে যেতে উদ্যত হয়েও যুবক দলটি থমকে দাঁড়ালো। লালচে রঙের গেঞ্জি পরা তাদের মুখপাত্রটি রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করলো, হোটেলের ঘর ভাড়া যদি দশ টাকা হয় তাহলে আপনার ঘরের রেট এত বেশি কেন?

- হোটেলের ঘর এই অ্যাত্তটুকু, পায়রার খোপের মতন। বাজারের পাশে, সব সময় হৈ হট্টগোল। আর ধর্মশালার বাথরুম অতি নোংরা, সেখানে মাছ-মাংস খেতে পারবেন না।

- তা বলে থার্টি রুপিজ পার ডে, এটা টু মাচ !

- তাহলে হোটেলেই যান। স্টেশান থেকে বেরিয়ে একটু বা দিকে গেলেই হোটেল দেখতে পারেন। যদি ওপর তলার ঘর পান, খুব খারাপ হবে না। বেরুবার সময় দরজার সব সময় তালা লাগাতে ভুলবেন না। নিজস্ব তালা থাকলে ভালো হয়।

বিশ্বনাথ এগিয়ে যান অন্যদিকে। যুবকের দল পরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে। নতুন জায়গায় এসে একজন বাঙালীকে হাত ছাড়া করতে চায় না তারা।

মুখপাত্রটি চেঁচিয়ে ডাকলো। এই যে দাদা শুনুন।

বিশ্বনাথ উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন, তিনি জানতেন যে ওরা ডাকবেই। মানব চরিত্র তাঁর চেনা হয়ে গেছে ভালো করে।

ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, কী!

- চলুন, আপনার বাড়িটা দেখে আসি আগে।

- বাড়ি দেখরে আপনাদের পছন্দ হবে ঠিকই, সে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। তবে আপনাদের বাজেট যদি কম থাকে, তা হলে হোটেলেই থাকুন। সব কিছু কাছাকাছির মধ্যে পেয়ে যাবেন।

- আমরা দু'চারদিনের জন্য বেড়াতে এসেছি, ভালো জায়গাতেই থাকতে চাই। কিন্তু আপনি ভাড়াটা বেশি চাইছেন।

- সাতদিনের জন্য নিন, অনেক রেট কমে যাবে। এক সপ্তাহ দেড়শো টাকা।

- উইকলি দেড়শো আর ডেইলি তিরিশ টাকা? এটা কোন্‌হিসেবে হলো?

-কম দিনের জন্য নিলে আমাদেরই ক্ষতি। মনে করুন, আপনি দু'তিন দিনের জন্য ভাড়া নিলেন। কালই একটা পার্টি এসে বললো, আমার সাত দিন, আপনি দু'তিন দিনের জন্য ভাড়া নিলেন। কালই একটা পার্টি এসে বললো, আমার সাত দিন, কি দশদিনের জন্য চাই। তখন তো তাকে দিতে পারবো না। ফিরিয়ে দিতে হবে!

-শুনুন দাদা, আমাদের দু'খানা ঘর চাই। মোট তিনদিন থাকবো। সব মিলিয়ে টোটাল একশো টাকা দেবো। রাজি থাকেন তো বলুন!

বিস্মিত যুবকটির দিকে সোজা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চেহারায় কিছুই অবশিষ্ট নেই, কণ্ঠস্বর ভাঙা, পোশাকে দৈন্য প্রকট, তবু শুধু চোখের দৃষ্টিতে যতটা ব্যক্তিত্ব আনা যায়, ততটা প্রয়োগ করে তিনি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন না। আমি দরাদরি করি না!

অন্য একজন বললো, আমরা গোটা বাড়িটা পাবো। অন্য কেউ ডিস্টার্ব করবে না?

-ফাঁকা বাড়ি, মস্ত বড় বাগান, ডিসটার্ব করার কেউ নেই।

-তা হলে আমরা এক শো কুড়ি পর্যন্ত দিতে পারি।

বিশ্বনাথ ভেতরে ভেতরে কাঁপছিলেন। এক শো কুড়ি কেন। তিনি শুধু পঞ্চাশ টাকাতেই রাজি ছিলেন। দারোয়ানদের সঙ্গে সেইরকমই চুক্তি আছে, যেদিন যা পাওয়া যায়! তবু তিনি এই কায়দাটা সব সময় পরীক্ষা করে দেখতে চান। নিজে থেকে দাম কমান না, খদ্দেরকে দিয়েই বলাতে চান, তাতে তারা ছোট হয়ে যায়। দু'চার বার এই কায়দাটা ব্যর্থ হয়। যারা প্রকৃত কৃপণ কিংবা ভালো বাড়িতে থাকতে অভ্যস্ত নয়, তারা মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাটে।

উদারতার ভাব দেখিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, ঠিক আছে, চলুন! বাঙালীর ছেলে, হঠাৎ এসে পড়েছেন.... আপনাদের উচিত ছিল আগে থেকে জায়গা ঠিক করে আসা...অনেক সময় কোনো জায়গাই খালি পাওয়া যায় না।

আজকের দিনে ষাট টাকার রোজগার হলো এজন্য বিশ্বনাথ বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন গত আট দশদিন একটাও পার্টি পাওয়া যায়নি। আজ ভালো টাকা পাওয়া গেছে। ষাট টাকা, কম নয়!

এককালের গায়ক বিশ্বনাথ গুহ। যিনি কোনোদিন গানের বিনিময়ে পয়সা নেবেন না ঠিক

করেছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ভাড়ার দালালিতে এতটা দক্ষতা অর্জন করে পুলকিত।

স্টেশানের বাইরে এসে বিশ্বনাথ দু'খানা টাঙ্গা ভাড়া করলেন। সব টাঙ্গাওয়ালা তাঁর পরিচিত। এদের সঙ্গেও তাঁর কমিশনের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকের কাছ থেকে তিনি আট আনা করে পাবেন।

লাল গেঞ্জি পরা দলপতিটির সঙ্গে টাঙ্গায় উঠলেন বিশ্বনাথ। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়লো এরা ঠিক সাধারণ ছাত্র নয়, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়ছে, আর্টিকেল ক্লার্ক হিসেবে একটি ফার্মের সঙ্গে যুক্ত আছে। সুতরাং অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল।

লাল গেঞ্জি পরা যুবকটির নাম অজয়। সে দেওঘরে জিনিস পত্রের দাম বিষয়ে কিছু জেনে নেবার পর জিজ্ঞেস করলো, আমরা ওখানে খাবো কোথায়? রান্না করে দেবার লোক পাওয়া যাবে?

–হ্যাঁ, মালি তার বৌ নিয়ে থাকে। তাকে জিনিসপত্র কিনে দিয়ে রান্না করে দেবে। ভালো রাঁধে।

–কী রকম চুরি করবে?

–আপনাদের ঘর খোলা রেখে যাবেন, রেডিও, ঘড়ি এসব থাকলেও কেউ ছোঁবে না। ওরা এসব চুরি করতে জানে না। তবে যদি মুরগি রান্না করতে দ্যান, তার দু'এক টুকরো কি ছেলেমেয়েকে খাওয়াবে না?

–সে কথা বলছি না। বাজার করতে দিলে মারবে না? জানেন, গত বছর আমরা ঘাটশিলায় গেসলুম। এক ব্যাটা মালি ছিল, তাকে দশ টাকার নোট দিয়ে সিগারেট কিনতে পাঠালে কক্ষনো পয়সা ফেরৎ দিত না।

–আপনারা দু'চারদিনের জন্য আমোদ করতে এসেছেন, আপনারা একটু বেশি বেশি খর্চ করবেন, সেটা স্বাভাবিক। এখানকার গরিব লোকেরা তো তার থেকে দু'চারপয়সা মারবেই।

–দু'চার পয়সা কী বলছেন মশাই! পাঁচ-দশ টাকা তো বখসিসই দিই। তবু এ যে পুকুর চুরি।

–আপনাদের একটা টিপস্ দিয়ে দিচ্ছি। মালিকে চাল-ডাল, মুর্গি-টুর্গি কিনে দিয়ে রান্না করতে বলার সময় বলবেন, বেশি করে চাল নিও, তোমরাও আমাদের সঙ্গে খাবে! দেখবে, ওরা তাতে কত খুশী হয়। আপনারা নিজে থেকেই দিলে ওরা আর চুরি করবে না।

–সে না হয় খাবে আমদের সঙ্গে, ঠিক আছে। এখানে মুর্গি কোথায় সস্তায় পাওয়া যায়? বাজার থেকে নিয়ে যাবো?

–মালির কাছেই মুর্গি আছে, আজকের মতন চলে যাবে। তারপর গাঁয়ের দিকে ঘুরতে যাবেন তো, ওখানে শস্তায় ভালো জিনিস পাবেন। দশ টাকা-বারো টাকা জোড়া।

বাড়ি দেখে যুবকদলের পছন্দ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিশ্বনাথ কিছুই বাড়িয়ে বলেননি। এটা লাহাদের বাড়ি, কলকাতায় তাদের রঙের বড় কারবার। বাড়িটি সাজাতে তারা কার্পণ্য করেনি। সামনে পিছনে বাগান, সবটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাগানে বসলে ডিগরিয়া পাহাড়ের চুড়া দেখতে পাওয়া যায়।

মালিকে ডেকে বিশ্বনাথ সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন। এই সব বাড়ির মালিরাই নিজেদের কাছে চা-চিনি, ডিম, চাল-ডাল ইত্যাদি স্টকে রাখে। বাইরে থেকে এসেই সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে, তক্ষুনি চা ও খাবার টাবার চায়, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে ওগলে খুশী হয়। প্রথম দিন অনেকে বাজারে যেতে চায়না।

বাথরুমে জল তুলিয়ে দেবার ব্যবস্থাও সম্পন্ন হবার পর বিশ্বনাথ বললেন, এবারে আমি চলি? সব ঠিক আছে তো?

–দেশি না বিলিতি?

–বীয়ার, আপাতত কয়েক বোতল বীয়ার, যা গরম দেখছি এখানে...

–হ্যাঁ, বীয়ার পাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়। আসবার সময় যদি বলতেন...যেখানে একবার টাঙ্গা থামিয়ে সিগারেট কিনলেন, তার খুব কাছে। গেলেই দেখতে পাবেন।

অজয় অন্যদিকে ফিরে গলা তুলে বললো, এই হেমেন, পাওয়া যাবে বলছে, চল তোতে আমাতে যাই।

হেমেন নামক যুবকটি ততক্ষণে জামা-প্যান্ট ছেড়ে শুধু একটি জাঙ্গিয়া পরে বাগানে একটি মর্মর নারী মূর্তির কাছে শুয়ে আছে। সে চেঁচিয়ে বললো, আমার এখন বেরুতে ইচ্ছে করছে না। ঐ বুড়োটাকেই বল না এনে দেবে!

অজয় বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বললো, আপনি ..মানে..মালিটাকে পাঠলে

এনে দিতে পারবে না?

বিশ্বনাথ বললেন, মালি তো এখন জল তুলবে। দিন, আমকেই টাকা দিন, আমি এনে দিচ্ছি।

মালির কাছ থেকে একটা থলি আর সাইকেলধার নিলেন বিশ্বনাথ। মদ কিনে আনার প্রস্তাবে তিনি অসন্তুষ্ট হননি। মদের দোকানের সঙ্গে তার কমিশনের ব্যবস্থা। এক শো টাকায়দু' টাকা। পাশাপাশি দুটি মদের দোকানের একটির প্রতি বিশ্বনাথের পক্ষপাতিত্ব। এরা বারো বোতল বীয়ারের অর্ডার দিয়েছে, বিশ্বনাথের এক বোতল ফ্রি হয়ে যাবে।

দুপুর বারোটায় চড়া রোদ। শরীরের এই অবস্থায় বিশ্বনাথের সাইকেল চালানো নিষেধ। কিন্তু গাড়ি ভাড়ার জন্য কিছু খরচ করতে বিশ্বনাথের সব সময় গায়ে লাগে। বিশ্বনাথের দৃঢ় ধারণা, তিনি সহজে মরবেন না। মেয়েটা বড় হচ্ছে, তার বিয়ে দিতে হবে। সুপুর্ণার একটা বিয়ে দিতে পারলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তারপর তিনি পৃথিবী ছাড়লেও তাঁর বউ ও শাশুড়ী, এই দুই বিধবার চলে যাবে ঐ বাড়ি ভাড়ার টাকায়। অবশ্য যদি ঠিক মতন আদায় হয়।

এরা তো তবু তাঁকে দিয়ে মদ আনাচ্ছে। কোনো কোনো পার্টি এসে মেয়েছেলে জোগাড় করে দেবারও ইঙ্গিত দেয়। বিশ্বনাথ অবশ্য এখনো অতটা নিচে নামেননি। তা-না-না-না-করে সরে পড়েন। সেইজন্যই তিন পরতপক্ষে সন্ধের পর এই সব লোকদের কাছে আসেন না। অন্ধকার হলেই এদের মধ্যে ঐ প্রবৃত্তি জাগে।

ঘামে ভিজে গেল বিশ্বনাতের জামা। মদের দোকানে পৌঁছেই তিনি চলে গেলেন কাউন্টারের পেছনে। একটা বীয়ারে বোতল চেয়ে নিয়ে ছিপি খুলে দারুণ তৃষ্ণার্তের মতন পান করতে লাগলেন ঢক ঢক করে। দোকানের মালিক সিংজীকে বললেন, ভালো পার্টি এসেছে। আরও অনেক বোতলযাবে। বালুরাম মালি যে-মাল নিতে আসবে, তার কমিশান কিন্তু আমার নামে হবে!

বোতলগুলো থলেতে ভরে তিনি সাইকেলে জোলালেন। তিনি কখনো ক্যাশ মেমো নিতে ভোলেন না। দোকানের মালিক ক্যাশ মেমোতেই দাম বাড়িয়ে লিখে দেয়। ফেরার পথে বিশ্বনাথ খানিকটা বরফও নিয়ে নিলেন।

বোতলগুলো পৌঁছে দেবার পর বিশ্বনাথ অজয়কে বললেন, এবারে সব ঠিক আছে তো? তা হলে আমি যাই?

বিশ্বনাথ বুদ্ধি করে বরফও এনেছেন দেখে অজয় প্রকৃতই খুশী হয়েছে। ব্যবস্থাপনা চমৎকার। মানি ব্যাগ খুলে সে একটা পাঁচ টাকার নোট খুলে বললো, আপনি এটা নিন! বখশিস টখশিস ওরই প্রাপ্য। কিন্তু পাঁচ টাকার লোভ সামলানো যায় না। তিনি ভাবলেন, নাচতে নেমে আর ঘোমটা টেনে কী হবে?

হাত বাড়িয়ে টাকটা নিয়ে তিনি বললেন, থ্যাংক ইউ!

বাড়ি ফেরার সময় বিশ্বনাথ একা বেশ বড় দেখে লাউ কিনলেন। সুহাসিনী লাউ ভালোবাসেন। মেথি ফোঁড়ন দিয়ে একটা লাউ-সুক্তো তিনি রাঁধেনও চমৎকার।

আজকাল অবশ্য সুহাসিনী রান্না করতে চান না একেবারেই। শান্তিই সব কিছু করে। সুহাসিনী গত কয়েক বছর ধরে একেবারে পাথর হয়ে গেছেন, মুখ দিয়ে কথা বেরুতেই চায় না। অমন ছটফটে মানুষ ছিলেন, এখন ঠাকুর ঘরে বসে থাকেন ঘন্টার পর ঘণ্টা। বিশ্বনাথ লক্ষ্য করে দেখেছেন, তাঁর চোখ দিয়ে জলও গড়ায় না, চোখ শুকনো।

বিশ্বনাথ বাড়ি পৌঁছোতে হাঁফিয়ে গেলেন। কাশি এলো দু'একবার। এই সময় কাশির দমক এলে দু'তিন দিন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না। যে-করেই হোক চাঙ্গা থাকতেই হবে, এই ছেলেগুলোর কাছ থেকে আরও কিছু পয়সা পাওয়া যাবে।

তেল মেখে স্নান করতে হবে ভালো করে। গরম তেল বুকে মালিশ করলে আরাম হয়। তাঁর মেয়ে তেল মাখিয়ে দেয়।

ওপরে এস বিশ্বনাথ একবার উঁকি দিলেন ঠাকুর ঘরে। সুহাসিনী যথারীতি সেখানে বসা। এখন তাঁর হাতে লাউটা তুলে দেওয়া যাবে না। রান্না ঘরে ঢুকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খুকী কোথায়?

শান্তি বললেন, কী জানি। এক ঘন্টা আগে তো হঠাৎ বেরিয়ে গেল! আজকাল আমার কোনো কথা শোনে না!

সুপূর্ণা কোনো ক্রমে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে! তারপর আর তার পড়াশুনো হলো না। সে

যে ছাত্র অতি উত্তম সরকার ভক্তি দেখাবে সে এক হাজার টাকা পর্যন্ত জলপানি পাবে। সুতরাং এই নতুন ছাত্র পার্টিতে সদস্য কম হলো না।

জেল থেকে বেরিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন সোহরাওয়াদি এক নতুন চাল চাললেন আইয়ুবের ওপর। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, শরীর অশক্ত,তবু মনোবল প্রচণ্ড। আইয়ুব রাজনৈতিক দলগুলিকে পুনর্জীবন দিতে আগ্রহী। সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব দিলেন, কোনো রাজনৈতিক দলেরই আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন নেই।

আওয়ামি লীগ থেকে মৌলানা ভাসানী তাঁর দলবল সমেত বেরিয়ে গিয়েন্যাপ নামে পার্টি গঠন করায় আওয়ামি লীগ দুর্বল হয়ে গেছে। বস্তুত ন্যাপের জন্যই কেন্দ্রে সোহরাওয়াদি এখন মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে এবং সামরিক শাসক আইয়ুবের ক্ষমতায় আসার পথ সুগম হয়েছে। এখন আওয়ামি লীগ একা আইয়ুবের শক্তির সঙ্গে বুঝতে পারবে না। মৌলনা ভাসানীর দলকেও বেশি শক্তিশালী হতে দেওয়া যায় না।

ভাসানীর দলও অবশ্য তেমন শক্তিশালী নেই, কারণ বামপন্থীদের মধ্যেও ভাঙন এসেছে চীন ও ভাতের সীমান্ত সংঘর্ষ হঠাৎ যুদ্ধের রূপ নেবার পর সারা পৃথিবীতেই বামপন্থী দক্ষিণপন্থী চিন্তায় একটা রদবদল শুরু হয়ে যায়। প্রাক্তন ভারতবর্ষ ভেঙে দুটি রাষ্ট্র তৈরি হবার ফলে আমেরিকা গটিছড়া বাঁধে পাকিস্তানের সঙ্গে, আর ইণ্ডিয়ার সএেসাভিয়েত দেশ ও চীনেরগলায় গলায় বন্ধুত্ব। জোট-নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করলেও ভারতের মাথাটা হেলে থাকে সমাজবাদী ব্লকের দিকে। হিন্দী-চীনী ভাই ভাই রব আকাশে-বাতাসে মুখরিত হয়েছে,চৌ-এন-লাই ভারতবর্ষে এসে নিজেও ঐ ধ্বনি তুলেছেন। তারপরে এক সময় হঠাৎ ম্যাকমোহন লাইনের ব্যাখ্যা নিয়ে একেবারে যুদ্ধ বেঁধে গেল, অপ্রস্তুত, হঠকারী ভারত মেনে নিল অসম্মানজনক পরাজয়। চীনা সৈন্য ভারতের অভ্যন্তরে অনেক খানি ঢুকে পড়ে যেন বলতে চাইলো, দ্যাখ তোদের গালে থাপ্পড় মারতে পারি কি না! তারপর সত্যি সত্যি থাপ্পড় না মেরে শুধু একটু চুন কালি মাকিয়ে সেই সৈন্যবাহিনী আবার স্বেচ্ছায় ফিরে গেল নিজেদের নির্ধারিত সীমান্তের ওপারে।

শত্রুর যে শত্রু, সে আমার বন্ধু, এই প্রতিষ্ঠিত নীতিতে বিশ্বাস করে পাকিস্তান এই সময় মার্কিন বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে ঝুঁকলো চীনের দিকে। আমেরিকাও চীন ভারত যুদ্ধে বারতকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে, ভবিষ্যৎ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এখন সে ভারতকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সসজ্জিত কতেচায়। ওদিকে সোভিয়েত দেশ আর চীনের মধ্যে আদর্শগত ফাটল ধরেছে, তাই চীন-ভারত যুদ্ধে সোভিযেত দেশ ভারতের প্রতি সমথৃনপ্রত্যাহার করেনি। ভারতের এখন বেশ আদুরে ছেলের মতন অবস্থা,আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই মহাশক্তির কাছ থেকেই গরম গরম উপহার পাচ্ছে। সুতরাং চীন এই অবস্থায় পাকিস্তানের বন্ধুত্বের হাতকে স্বাগত জানালো। থাক না পাকিস্তানে স্বৈরাচারী সামরিক শাসন, তবু চীনের একটা বন্ধু তো চাই। তাছাড়া, চীনের এখন বাসনা পাকিস্তানের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

পাকিস্তান সরকার ও চীনের বন্ধুত্বের সূচনায় পাকিস্তানের উগ্র বামপন্থীরা উল্লসিত হলো। তারা চীনের সমর্থক, এতকাল তারা পাকিস্তানের সামরিক শাসনের তীব্র বিরোধীতা করলেও এখন তারা হয়ে পড়লো সরকার সমর্থক। চীনের সঙ্গে ার ভাব, সে তো চীনাপন্থীদের শত্রু হতে পারেনা। এই সব বামপন্থীরা মৌলানা ভাসানীর ন্যাপের ছত্রছায়াতেই সমবেত হয়েছিল, এবারে তাদের মধ্যেও দেখা দিল দুটি ভাগ।

কোন একটি দল এককভাবে আইয়ুব খানের সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিততে পারবে না বলেই সোহরাওয়ার্দি সব দলের পৃথক অস্তিত্ব বিলোপ করে যুক্তফ্রন্ট গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। অনেক দল থাকলেই অনেক নেতা। একটি মাত্র দলহলে তার সর্বাধিনায়ক একজনই হবে, সেই সর্বাধিনায়ক তিনি ছাড়া আর কে? একথাও তো ঠিক, পাকিস্তানের দুই অংশেই তাঁর পরিচিতি সবচেয়ে বেশি, তিনি পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছেও তিনি গ্রহণযোগ্য। আইয়ুবের বদলে যদি কেন্দ্রের ক্ষমতার শিখরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আর কারুকে বসাতে হয়, তাহলে সোহরাওয়ারি চেয়ে যোগ্যতর আর কেউ নেই। পূর্ব পাকিস্তানের আরে কোনো নেতাকে পশ্চিমীরা মানবে না।

এই যুক্তফ্রন্ট গড়ার প্রস্তাবে মৌলানা ভাসানী মন থেকে সায় দিতে পারলেন না। তিনি

পোড়খাওয়া, অভিজ্ঞ রাজনীতিক,তিনি সোহরাওয়ার্দির আসল চালটা বুঝতে পেরেছেন। এটা তাঁকে ছাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দির অনে উঁচুতে উঠে যাওয়ার প্রয়াস। কিন্তু সর্বদলের সমন্বয় ব্যাপারটা আদর্শ হিসেবে শুনতে খুব ভালে, চুয়ান্ন সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফন্ট বিপুল ভোটে জিতেছিল, মাত্র ন' বছর আগেকার কথা, দেশবাসীর নিশ্চিত মনে আছে। এখন এই যুক্ত দল গঠনের বিরোধীতা করলে অনেকেই তাঁকে ক্ষুদ্র স্বার্থের কারবারি মনে করবে, তাই মৌলানা ভাসানী গররাজি হয়েও প্রস্তাবটি মেনে নিলেন।

আওয়ামি লীগকে পুনর্জীবিত না করে যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শেখ মুজিবর রহমানেরও মনঃপূত নয়। আওয়ামী লীগই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তাছাড়া যুক্তফ্রন্ট গড়তে গেলে নুরুলআমীন, নাজিমুদ্দিনের মতন মানুষদের সঙ্গেও হাত মেলাতে হয়। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময়ে এই নুরুল আমীনের আদেশেই ছাত্রদের ওপর গুলি চলেছিল। আর নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতার তো শেষ নেই। বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকলেও শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রস্তাব একেবারে নস্যাৎ করে দিতে পারলেন না, কারণ মৌলানা ভাসানী পৃথক দল গড়ার পরে সোহরাওয়াদিকেই তিনি লীডার বলে মানেন। তাছাড়া আওয়ামী লীগের আর প্রধান দুই নেতা আতউর রহমান খান এবং আবুল মনসুর আহমদ, এঁরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে, এরা সোহরাওয়ার্দির নীতির প্রবল সমর্থক। ইত্তেফাকের সম্পাদক মানিক মিঞাও ঐ পক্ষে। শেখ মুজিবও নিমরাজি হলেন, গড়া হলো দলহীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। কিন্তু কাজের কাজ বিশেষ এগোল না, যখন তখন মতবিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মওলানা ভাসানী কাকে যেন বললেন, ঐডা হইল নাথিং ডুয়িং ফ্রন্ট।

এই দলের সমর্থনে পাকিস্তানের দু'দিকেই দিনের পর দিন প্রচার অভিযান চালাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন সোহরাওয়ার্দি। রাজশাহীতে সভা শেষ করেই রাত্রি দশটায় আত্রাই, সেখান থেকে গাড়িতে করে শান্তাহারে রাত একটায় মিটিং, তারপর ভোর চারটেয় আবার পার্বতীপুর। এর পর তিনি একটু বিশ্রাম নিতে গেলেন। বাইরে তখনও গোলমাল চলছে, একজন কেউ হেঁকে বললো, ওহে, নেতা এই মাত্র শুয়েছেন, একটু ঘুমাতে দাও, তোমরাও ঘুমায়ে নাও! জানলার বাইরে থেকে একজন বললো, না আর ঘুমাবো না। একবার ঘুমায়েই সব হারিয়েছি। গণতন্ত্র ফিরায়ে না আনা পর্যন্ত ঘুমাবো না!

কথাটা শুনেই সোহরাওয়ার্দি উঠে পড়ে জানলা দিয়ে মুখ বার করে বললেন, ঠিক বলেছো। এই উঠে পড়লাম, আর ঘুমাবো না!

কিন্তু সোহরাওয়ার্দির বয়েস সত্তর পেরিয়ে গেছে। এতটা ধকল সইবে কেন। অসুস্থ হয়ে পড়ে তিনি চিকিৎসার জন্য কিছুদিনের জন্য চলে গেলেন বিদেশে। যাবার আগে তিনি তাঁর দলের সেক্রেটারিকে ডেকে বলে গেলেন, মাথা গরম করে কিছু করে বসো না। আমি ফিরে আসি, তারপর যদি অন্য কিছু করতে হয় তো ভেবে দেখা যাবে!

সোহরাওয়ার্দি আর ফিরলেন না। ডিসেম্বরের শীতে আচম্বিতে দুঃসংবাদ এলো, বেইরুতের এক হোটেলে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে।

সোহরাওয়ার্দির অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজনই থাকে করাচি ও লাহোরে, যারা অনেকে বাংলা বলতেই পারে না। সেই হিসেবে তিনি হয়তো পুরোপুরি বাঙালী ছিলেন না, যদিও বাংলার মাটির সঙ্গে তাঁর যোগ অবিচ্ছেদ্য। সোহরাওয়ার্দি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম স্রষ্টা। অবশ্য তিনি চেয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তান হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারা জীবন লড়াই করে গেলেন। পারিবারিক অধিকারে তাঁর আত্মীয়েরা চাইলো পশ্চিম পাকিস্তানেই তাঁকে দাফন করা হোক। কিন্তু ভালোবাসার দাবি অনেক বড়। সেই দাবিতে তাঁর লাশ আনা হলো ঢাকায়। এক বিশাল জনসমুদ্র চোখের জলের ধারায় তাঁর প্রাণশূন্য দেহকে অভ্যর্থনা জানালো বিমানবন্দরে। তারপর ঘোড় দৌড় ময়দানে পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশে হলো তাঁর জানাজা।

তাঁর কবরের জায়গা নিয়ে হঠাৎ শুরু হয়ে গেল মতবিরোধ। কিছুদিন আগে শের-এ বাংলা ফজলুল হকের দেহান্ত হয়েছে, তাঁর কবরের পাশেই সোহরাওয়ার্দির কবর থাকা সবদিক থেকেই সমীচীন। কিন্তু একজন আপত্তি তুললো, ফজলুল হকের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দির কোনোদিন মতের মিল হয়নি, তা হলে এন দু'জনে কাছাকাছি থাকবেন কী করে? দু'জনের আত্মাই যদি অশান্ত হয়ে ওঠে? শান্ত, গম্ভীর, শোকের পরিবেশ লোকজনের চ্যাঁচামেচিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে মুরুব্বিরা ঠিক করলেন,তাহলে কিছুটা দূরত্ব রাখা হোক। ফিতে দিয়ে মেপে ফজলুল হকের কবরের থেকে প্রায়

একশো হাত দূরত্বে ভূগর্ভে নামিয়ে দেওয়া হলো সোহরাওয়ার্দির মরদেহ।

মৃত্যুর পরেও দুই নেতা যদি পাশাপাশি না থাকতে পারেন তাহলে জীবিত অবস্থায় অন্যান্য নেতারা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবেন কী করে? মরহুম সোহরাওয়ার্দির শোক কাল কাটতে না কাটতেই তাঁর স্বপ্নের যুক্ত দল ভাঙতে শুরু করে দিল। তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে বলেছিলেন, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন আলাদা আলাদা ভাবে রাজনৈতিক দলগুলিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা না হয়। তিনি ফিরে না আসুন, তাঁর লাশ তো এসেছে। শেখ মুজিবুর রহমান তড়িঘড়ি নিজের বাসভবনে প্রাক্তন আওয়ামি লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডাকলেন। এবারে তিনি আতউর রহমান বা আবুল মনসুরের প্রতিবাদ বা নির্লিপ্ততার তোয়াক্কা করলেন না, তাঁরা উপস্থিত না হলেও ক্ষতি নেই। প্রথমে সোহরাওয়ার্দি রুহের মাগফেরাত প্রার্থনা করা হলো। তারপরেই সোহরাওয়ার্দির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। যুক্ত দল থাকুক বা না থাকুক আওয়ামী লীগকে পুনর্জীবিত হবে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ পৃথকভাবে চালানো হবে, কারণ একটি সুসংগঠিত দল ছাড়া কোনো আন্দোলন চালানো যায় না। তুমুল হর্ষধ্বনির ও জিন্দাবাদ পুকারে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। এবারে শেখ মুজিবুর রহমান হলেন আওয়ামি লীগের একচ্ছত্র নেতা।

মৌলানা ভাসানীও তক্কে তক্কে ছিলেন। তিনি যুক্তদল ভাঙার অপবাদের বোঝাটা পুরোপুরি নিজের কাঁধে নিতে চাননি। শেখ মুজিবকে তিনি ভালোভাবেই চেনেন, তিনি অপেক্ষা করছিলেন। আওয়ামীলীগ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার পরেই তিনি ন্যাপকে চাঙ্গা করে তুললেন।

এখন এঁরা নিজের নিজের পার্টিকে সংগঠিত করে তোলার কাজে ব্যস্ত। এখন খণ্ড প্রলয়ে বিপর্যস্ত মানুষের সাহায্য ও ত্রাণে এগিয়ে আসার সময় কোথায় তাঁদের? বছরখানেক আগেই নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেছে। এরকম একতরফা, নৃশংস দাঙ্গা পাকিস্তানেও আগে কখনো হয়নি, সেই সময় বড় বড় নেতারা শান্তি কমিটি গড়েছেন, রিলিফের ব্যবস্থা করেছেন যথাসাধ্য। প্রত্যেক বছর এরকম কী করে করা যায়? মানুষ তো মরবেই, এদেশে অকাল মৃত্যুই অধিকাংশ মানুষের নিয়তি।

অবশ্য, বেশি উদারতা দেখিয়ে আইয়ুব যদি হঠাৎ জনপ্রিয়তা আদায় করে ফেলেন তবে তা রোখার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেদিকেও রাজনৈতিক নেতারা চোখ রেখেছেন। এ বছর না হোক, তার পরের বছর, কিংবা তারও পরের বছর নির্বাচন তো হবেই, তখন এই সব প্রশ্ন উঠবে। তাই একটি দুটি রিলিফের জন্য মিছিল বেরুতে লাগানো রাস্তায়।

আলতাফ অনেকদিন দেশছাড়া, সে অনেক কিছুই জানে না। সকালবেলা বাবুল তার বড় ভাইকে এই সব বৃত্তান্ত শোনাচ্ছিল।

আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাপ গড়ার সময় যে হাঙ্গামা হয় তাতে গ্রেফতার হয়েছিল আলতাফ। ছাড়া পেয়েছিল অবশ্য আড়াই মাসের মধ্যেই। কিন্তু জেলে জীবন আলতাফের একেবারেই সহ্য হয়নি। সে কাপুরুষ নয় মোটেই, কিন্তু আরাম পরায়ণ। সে সারাদিন যুদ্ধ করতে রাজি আছে, যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতেও সে পিছু পা নয়, তবে বেঁচে থাকলে সে সন্ধেবেলা ভালো সিগারেট টানতে চায়, রাত্তিরে সে নরম বিছানায় ঘুমোতে চায়। জেলের খাবার খেয়ে সে রক্ত আমাশায় প্রায় মরতে বসেছিল। সুতরাং আটান্ন সালে যখন আইয়ুব সামরিক শাসন জারি করেন তখনই সে আবার গ্রেফতার হবার ভয়ে দেশত্যাগী হয়। সবচেয়ে সহজ পালিয়ে যাবার জায়গা হলো পশ্চিম জার্মানি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সে দেশের শুধু বয়স্ক পুরুষরাই নয়, কিশোররা পর্যন্ত নিহত হয়েছে অসংখ্য, তাই এখন জার্মানিতে মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা ঢের কম। কাজের লোকের কম খুব অভাব। আলতাফের মতন একজন সুস্বাস্থ্যবান যুবককে পেলে তারা লুফে নেবে এ তো জানা কথা। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আলতাফের মতন হাজারে হাজারে যুবক কাজের সন্ধানে ছুটে গেছে জার্মানিতে।

এই ক'বছরে বেশ পরিবর্তন হয়েছে আলতাফের। আগে সে ছিল দারুণ ছটফটে, যখন তখনহেসে উঠতো খুব জোরে। তার কথাবার্তায় এমন একটা জেদী ভাব ছিল যে এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত সে আর অন্য কিছু চিন্তা করতে চায় না। এখন সে অনেক শান্ত হয়েছে, অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে সে এখন বেশি মগ্ন। তার চেহারাও আগের মতন সুন্দর নেই, কোমরটি স্ফীত হয়েছে অনেকখানি, জার্মান গোরুর উত্তম মাংস ও অঢেল বীয়ার তাকে উপহার দিয়েছে মেদ।

আলতাফ ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলো, তুই এখন্ পার্টি করস? এখনও মুজাফ্ফর সাহেবের

সাথে লেগে আছিস নাকি?

বাবুল দু'হাত তুলে লঘু কণ্ঠে বললো, আমি এখন আর কোনো পার্টি পুট্টির মধ্যে নাই। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। বিয়ে করেছি, একটা বাচ্চা হয়েছে।

আলতাফ বললো, হ্যাঁ, তোর এখন কিছুদিন মন দিয়ে সংসার ধর্ম পালন করাই উচিত। মঞ্জু তো এখনো ভালো করে সামলায়ে উঠতে পারে নাই। সেদিন যখন এলি মেয়েটার মুখের অবস্থা দেখে আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম। বড় বাঁচা বেঁচে গেছিস! খোকাটার যে কিছু হয় নাই।

–মঞ্জুর খুব মনের জোর। দেখতে নরম সরম হইলে কী হয়।

–কত টাকার গয়না ছিল সঙ্গে?

– কথা বাদ দাও। যা গেছে তা তো গেছেই। আমার বিবিও তা নিয়ে কান্নাকাটি করেনি। সব গয়নার চেয়েও ছেলেটার জীবনের দাম বেশি।

–বাবুল, তুই কি ঐ গ্রামের কলেজেই মাস্টারি করবি নাকি?

–তাছাড়া আর কী করি! শহরে থাকলেই বিপদ, পুরানো বন্ধুরা টানাটানি করবে। মঞ্জুও ঢাকায় থাকতে চায় না।

–তুই জার্মানিতে চলে আয়। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। তুই ভালো কাজ পেয়ে যাবি।

প্রস্তাবটা একেবারে উড়িয়ে দিয়েহেসে উঠে বাবুল বললো, আমি বিদেশে যাবো? কী যে বলো? আমি হইলাম অকর্মার ঢেঁকি। ছেলে-পড়ানো ছাড়া আর কিছুই পারি না। বিদেশে সব সময় জুতা-মুজা পরে থাকতে হয়, মুজা পরলেই আমার পায়ে ফোস্কা পড়ে।

আলতাফ তার কাঁধে চাপড় মেরে বললো, আরে দূর, কী পোলাপানের মতন কথা বলিস। ওসব অভ্যাস হয়ে যায়। শোন, বিদেশে গেলে চক্ষু খুলে যায় অনেকখানি। বিদেশে থেকে দেশের কাজ করা যায় ভালো করে। আমি তো সেখানে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছি, এখান থেকে পাটের ব্যাগ নিয়ে যাবো, এখানকারলোকেরা বালো পয়সা পাবে...।

বাবুল বললো, ব্যবসা? ওরে বাপ রে, ওসব আমার মাথাতেই ঢোকে না! ভাইয়া, আমার পক্ষে মাস্টারিই ভালো!

আলতাফ ঈষৎ ধিক্কারের সুরে বললো, ব্যবসা ছাড়া বাঙ্গালীর উন্নতির আর কোনো পথ নাই। বাঙ্গালী শুধু পলিটিক্স আর মাস্টারি করতেই জানে। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা সব ব্যবসা কব্জা করে নিয়ে আমাগো পোঙা মেরে দিচ্ছে। আমি তোরে কই, শুনে রাখ বাবুল, এখন ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়াই হবে তোর আমার মতন বাঙালীর বেস্ট পলিটিক্স্।

একটা রিলিফের মিছিল ওদের বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। দুর্গতদের জন্য চাঁদা ও পুরোনো কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করা হচ্ছে। দুই ভাই কথা থামিয়ে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। টাকা পয়সার ব্যাপারে আলতাফ বরাবরই উদার। এখন বিদেশে থেকে তার অবস্থা অনেক সচ্ছল হয়েছে। কুর্তার পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে গুনে গুনে তিনশো টাকা বার করে, তার থেকে আবার একশো টাকা কমিয়ে দুশো টাকা দিয়ে দিল রিলিফ ফাণ্ডে।

ওপর তলায় একটি শিশুকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো বাবুল। তার ছেলে কাঁদছে। মঞ্জু কি কাছে নেই? সে দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। তার ছেলে তে এমন তীব্রভাবে চেঁচিয়ে কাঁদে না!

দূরে কোথায় দশ-বিশ হাজার লোক মরেছে তার থেকেও নিজের সন্তানের বিপদ আপদের চিন্তা অনেক বড় হয়ে ওঠে। বাবুল এখন দেশের অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। রাজনীতিতে ঢুকতে চায় না, সে চায় মঞ্জুকে নিয়ে, তার সন্তানকে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকতে। মঞ্জু যদি দুঃখ পায়, মঞ্জু যদি কাঁদে তা হলে গোটা দুনিয়াটাই বাবুলের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। সে মঞ্জুকে সুখী করবে, সে তার সন্তানকে দুধে-ভাতে রাখবে। পৃথিবী এখন তার সংসারের বাইরে অপেক্ষা করুক।

॥ ৬ ॥

অনেকক্ষণ ধরে খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছেন প্রতাপ। কিংবা পড়া শেষ হয়ে গেছে, তবু চেয়ে আছেন কাগজের দিকে। আনন্দবাজারে ব্যানার হেড লাইনঃ পূর্ব পাকিস্তানে খণ্ড প্রলয়। তার নিচে গেট গোটা অক্ষরে বিভিন্ন জেলায় মৃত্যু ও ক্ষয় ক্ষতির বর্ণনা। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, খুলনা

এই সব নামগুলি শুনলে বা ছাপার অক্ষরে দেখলে প্রতাপের মনে এখনও রোমাঞ্চ জাগে, ছবি ভেসে ওঠে। কতদিন হয়ে গেল, প্রায় বছর পনেরো, তবু ছবিগুলি মোছেনা, বরং যেন গাঢ়তর হয়ে উঠছে দিন দিন।

তাঁর ছেলে মেয়েদের মনে এই সব নাম একটুও দাগ কাটে না। বাবলু, মুন্নিরাও সকালে কাগজ পড়েছে, এ বিষয়ে একটা কথাও বলেনি, তুতুলের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। অবশ্য ওরা কতটুকুই বা দেখেছে নিজের দেশ, ওদের কিছুই মনে থাকবার কথা নয়। ওদের তুলনায় পিলু বরং বেশি দেখেছিল,সে প্রায়ই বলতো..।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতাপ জানলার দিকে তাকালেন। অসহ্য গ্রীষ্মের দুপুর, তবু রাস্তায় লোক চলাচলের বিরাম নেই। রাত্তিরে ঘন্টা তিনচার বাদ দিলে এ শহরের রাস্তায় সব সময়ই মানুষ জানলার পর্দাটা গুটিয়ে গেছে এক পাশে, বাইরে লোক ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে যাচ্ছে। পর্দাটা ঠিক করে দেবার জন্য প্রতাপ উঠলেন, চেয়ার ছেড়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন জানলার কাছে।

সাকলে তিনি কালীঘাট বাজারে গিয়েছিলেন, কয়েকজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলো, কই কেউ তো একবারও বললো না ঝড়ের কথা? সব কাগজেই আজ এটাই প্রধান খবর। সবাই ভুলে যাচ্ছে? পনেরো-ষোলো বছর আগে হলে কলকাতায় একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যেত, অনেকেই শিয়ালদায় ছুটতো দেশের বাড়ি ঘর ও আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নেবার জন্য। একটা রাজনৈতিক সীমারেখা টানায় এতখানি মানবিক তফাৎ হয়ে গেল? বাংলার ওপাশে হাজার হাজার মানুষ মরলেও এপাশে আমরা নির্বিকার থাকবো, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার একটু পরিবর্তন হবে না? ওদিকের ওরাও কি এ পাশের বাঙালীদের জন্য মাথা ঘামায় না?

গেরুয়া আলখাল্লা পরা একটি সাধু প্রতাপকে দেখে থমকে দাঁড়ালো, শিরাওঠা হাত তুলে বললে, জয় হোক বাবা!

লোকটির মাথায় একটি বেশ দর্শনীয় জট। তৈরি হতে অনেকদিন সময় লেগেছে। প্রতাপ বললেন নমস্কার!

সাধু গম্ভীর ভাবে বললো, তুমি যা নিয়ে চিন্তা করছো, তার সমাধান হয়ে যাবে। একটু সময় লাগবে, এক মাস কি দেড়মাস। শুধু শুধু চিন্তা করে শরীর খারাপ করো না। দ্যাখো,কালস্রোত কারুর জন্য থেমে থাকে না।

প্রতাপ হাসলেন। লোকটি বয়েসে হয়তো তার চেয়ে ছোটই হবে, বড় জোর সমবয়েসী, গায়ে একটা আলখাল্লা চাপিয়েই সে প্রতাপকে তুমি বলে সম্বোধন করার অধিকার পেয়ে গেছে?

প্রতাপ মোটামুটি ভদ্রভাবেই বললেন, আপনি অযাচিত ভাবে আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। আমি আপনাকে কোনো পয়সা দেবো না।

সাধুটি বললো, আমি তো বাবা পয়সার জন্য তোমাকে দেখে থামিনি। তোমার কপালে একটা অমঙ্গল চিহ্ন দেখলাম..

–সে জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা দরকার? কিংবা আপনি তাবিজ বা মাদুলি বেচবেন?

–না,না, সেসব কিছু না। আমি মানুষের মঙ্গলের জন্য একটা মহাযজ্ঞ করবো, তুমি যদি খানিকটা ঘি দাও, তোমার পুণ্য হবে। কুগ্রহ কেটে যাবে।

প্রতাপ হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার করে বললেন, তুমি দুর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। যত সব আপদ! সমাজের পরগাছা! সরে যাও এখান থেকে! নইলে...

সেই চিৎকার শুনে মমতা ছুটে এলেন পাশের ঘর থেকে।

ধমক খেয়ে সাধুটি দমবার পাত্র নয়। সে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলে যাচ্ছে। মমতাকে দেখে বলে উঠলো, মা আমি মানুষের ভালো ছাড়া মন্দ করি না। দেখলাম কপালে অমঙ্গল চিহ্ন!

প্রতাপ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মমতা জোর করে টেনে আনলেন তাঁকে। তারপর জানলা বন্ধ করে দিলেন।

রাগের চোটে প্রতাপ হাঁপাচ্ছেন। তখনও বলে চলেছেন, এত সাহস, আমাকে ভয় দেখিয়ে আদায় করতে চায়? লোকে খাবার পাতে ঘি পায় না, আর ওর যজ্ঞের জন্য...

মমতা বললেন, তা বলে এ রকম মাথা গরম করতে হবে। তোমার নিশ্চয়ই প্রেসার আবার

বেড়েছে।

–না, আমার প্রেসার ঠিক আছে। এ রকম অন্যায় কথা শুনলে কার না রক্ত গরম হয়ে যায়?

–মাপ করুন, আমরা কিছু দেবো না, বলে জানলা বন্ধ করে দিলেই হতো!

–কেন এই গরমের মধ্যে জানলা বন্ধ করবো। তুমি জানলা খুলে দাও!

–করপোরেশনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে উনিও যা খুশী বলতে পারেন, তা তুমি আটকাতে পারো না।

–না, লোকের বাড়ির জানলার দিকে তাকিয়ে যা খুশী বলার অধিকার কারুর নেই। এ জন্য প্রসিকিউট করা যায়।

–একটা কথা সত্যি করে বলো তো! আসলে কার ওপরে তোমার রাগ হয়েছে? বরাবর দেখেছি, একজনের ওপরে রাগ হলে তুমি অন্য কারুর ওপরে চোটপাট করো।

–ওর কথা শুনেই আমার মাথা গরম হয়ে গেল।

মমতা নরম করে হাসলেন। তারপর প্রতাপের চোখেচোখ রেখে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, উহুঁ। আজকাল তুমি সব সময়ই রেগে থাকো। আজ কার ওপর রাগ হয়েছে, আমার ওপর।

প্রতাপ সংযত হয়ে বললেন, না, তোমার ওপর রাগ করবো কেন?

পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ভরে তিনি সিগরেটের প্যাকেট-দেশলাই বার করলেন। দেশলাই-এর কাঠি রয়েছে মাত্র একটি সেটাও জ্বালতে গিয়ে ভেঙে গেল। মুখ তুলে তিনি বললেন, মমো, একটা দেশলাই এনে দেবে?

মমতা বললেন, তুমি ওঘরে চলো না। তুমি কি বাইরের ঘরেই বসে থাকবে নাকি সারা দুপুর?

এই ঘরখানায় পিকলুর থাকার কথা ছিল। কালিঘাটে বাড়ি দেখার সময় পিকলু বসে থাকবে নাকি সারা দুপুর?

এই ঘরখানায় পিকলুর থাকার কথা ছিল। কালীঘাটে বাড়ি দেখার সময় পিকলু নিজে পছন্দ করে এই ঘরখানা চেয়েছিল। সে অবশ্য এখানে এক রাত্রিও বাস করে যেতে পারেনি। এখন এটাকে বাইরের ঘরে বা বৈঠকখানা করা হয়েছে। কিছুদিন এঘরে দেয়ালে পিকলুর একটা ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, প্রতাপ নিজেই একদিন ছবিটা খুলে নিয়েছেন।

তুতুল আর মুন্নি একঘরে থাকে, ওদের ঘরে রেডিওতে কী যেন একটা নাটক হচ্ছে। বাবলু বাড়ি নেই, পরীক্ষা হয়ে গেছে এখন খাওয়া আর ঘুমোবার সময় ছাড়া তাকে এক মিনিটও বাড়িতে দেখা যায় না। অবশ্য দুবেলা সে দুটি টিউশানিও করে।

শোওয়ার ঘরে এসে একটা সিগারেট টানতে প্রতাপের মনটা আবার উধাও হয়ে গেল। ...চোখের পাতায় এলো তন্দ্রা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পটুয়াখালি...দায়দকান্দি ... এইসব জায়গাগুলি যেন ধু ধু জলময়, একটাও মানুষ নেই, ফিনফিনে বাতাস বইছে জলের ওপর দিয়ে...সব বাড়ি-ঘরই কি তুফানে উড়ে গেছে। ঢাকা জেলার কিছু হয়েছে কি না কাগজে লেখেনি...মালখালিতে প্রতাপদের বাড়িটা ছিল বেশ উঁচুতে, কোনদিন উঠোন পর্যন্ত জল আসতো না...পটুয়াখালিতে ছিল প্রতাপের মামাবাড়ি..বাবা মায়ের সঙ্গে সেখানে যাওয়ার স্মৃতি...বরিশাল শহরে একটা হোটেলে ভাত খাওয়া, তারপর নৌকায় পটুয়াখালির দিকে..কী সুন্দর জায়গা পটুয়াখালি ...মানুষজনের ব্যবহার কত আন্তরিক ... আবু তালের নামে একজন ইস্কুল মাষ্টার বাবাকে কত খাতির করলেন..সেই পটুয়াখালি কি ঝড়-বৃষ্টিতে নিশ্চিত হয়ে গেছে? প্রতাপের ইচ্ছে হলো এক্ষুনি একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসতে...

-কী ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? আঙুল পুড়ে যাবে যে!

মমতার হাতে একটা লম্বা কাচের গ্লাস কাচের গ্লাস ভর্তি ঘোলাটে পানীয়। প্রতাপ সিগরেটের শেষ অংশটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে বললেন, ওটা কী?

মমতা বললেন, মিছরি দিয়ে আম পোড়ার সরবৎ দ্যাখো তো কেমন হয়েছে?

প্রতাপ গেলাসটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আজ এত খাতির যে?

–এমনি আজ বানাতে ইচ্ছে হলো। যা গরম পড়েছে ক'দিন।

প্রতাপ এক চুমুক দিয়ে বললেন, মিষ্টির বদলে নোনতা হলে বেশি ভালো লাগতো। কাঁচা আমের সঙ্গে মিষ্টিটা ঠিক যায় না।

–মিছরি দিয়ে খেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। এক চুমুকে খেয়ে নাও!

–এই গরমে আমরা কাঁচা আম মাখা খেতাম। আমপোড়া সরবতের চল ছিল না আমাদের

ওদিকে। কাঁচা আম মাখা হতো কী করে জানো? আমের খোসা ছোলা হতো ঝিনুক দিয়ে। ঐ ঝিনুক পাওয়া যেত আমাদের পুকুরেই। ঝিনুকে খোলার মাঝখানটা ঘষে নিলে যে ফুটো হতো, সেটা দারুণ ধার। সেই ঝিনুক দিয়ে আমের চোকলা ছাড়িয়ে সরু সরু করে কেটে নুন মেখে রাখা হতো খানিকক্ষণ। তারপর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মেখে...এই দ্যাখো, বলতে বলতে এখনো আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে।

–আচ্ছা, ঐ রকম আম মাখা করে দেবো একদিন। ঝিনুক দিয়ে হবে না, বঁটি দিয়ে...

–সে আম মাখা তো আমরা বাড়িতে বসে খেতাম না। বাগানে, গাছের ছায়ায় বসে।

–এখন ঐ রকম আম মাখা খেতে গেলে তোমার দাঁত টকে যাবে!

–কী জানি! আমাদের ছেলে মেয়েরা কেউ ঐ সব স্বাদই পেল না। ওরা কেউ কাঁচা আম খায় না, না?

–গ্রামের খাবার আর শহরের খাবার এক হয়? ওরা তো ঝড়ের সময় গাছ থেকে টপ টপ করে আম খসে পড়তে দেখেনি।

–তুমিও তো দ্যাখোনি, মমো? তুমি আর কতদিনই বা ওদিকে ছিলে। আজ কাগজে দেখেছো, ঝড় বৃষ্টিতে কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়েছে ওদিকে?

–দেখলাম তো! কাল রেডিওতেও বলেছে। আহারে, কত মানুষের সংসার তছনছ হয়ে গেল। আচ্ছা, এখান থেকে যদি কেউ সাহায্য করার জন্য জিনিসপত্তর নিয়ে ওদিকে যেতে চায় এখন, ওরা কি যেতে দেবে?

–থাক, ওসব কথা।

–শোনো, একটু কথা বলবো? তুমি কিছুদিনের জন্য বাইরে কোনো জায়গা থেকে ঘুরে এসো। চার পাঁচ বছর কোথাও যাওয়া হয়নি। তুমি সব সময় গম্ভীর গম্ভীর হয়ে থাকো, যখন তখন রেগে ওঠো, আমার এটা ভালো লাগে না। তোমার একটু চেইঞ্জ দরকার।

–আগে প্রত্যেক বছর সবাইকে নিয়ে বাইরে যেতাম একবার করে।

–সবাইকে নিয়ে যেতে অনেক খরচ। তুমি একা ঘুরে এসো। দেওঘরে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসবে? অবশ্য ওখানে যা গরম এখন।

–কাল ওস্তাদজীর চিঠি এসেছে, তুমি পড়েছো?

–হ্যাঁ পড়লুম তো। লিখেছেন তো সবাই খুব ভালো আছেন। মা রোজ মাহনানন্দ মহরাজের আশ্রমে ভজন গান শুনতে যাচ্ছেন। রোজ বাড়ি থেকে বেরোন যখন, তার মানে শরীর ভালো আছে। ওস্তাদজীও নাকি এই শীতে বাড়ির বাগানে পেঁয়াজকলির চাষ করেছিলেন, অনেক লাভ হয়েছে, এবারে কাঁচা লঙ্কার চাষ করবেন। ঐ শরীর নিয়ে এসব করা কী ভালো? তবে আমার মনে হয়, ওনার টি বি হয়নি। তুমি কী বলো।

–কী জানি।

–ব্রঙ্কাইটিস হলেও কাশির সঙ্গে রক্ত পড়তে পারে। টি-তে কি এতদিন...তবে ঐ শরীর নিয়ে বাগানের কাজ টাজ করা কি ঠিক হচ্ছে?

–নিজের ভালো উনি কি নিজে বুঝবেন না? এ নিয়েই আনন্দে আছেন যখন।

–মাকে কিছুদিন কলকাতায় নিয়ে এসে রাখবে।

–লিখেছিলাম তো, মা আসতে চাননি।

–তুমি বরং একটু পুরীতে ঘুরে এসো। কিংবা, দীঘায় নাকি আজকাল থাকার জায়গা হয়েছে। অনেকেই যাচ্ছে।

–হঠাৎ ওসব জায়গায় যেতে যাবো কেন একলা একলা? তোমর বুঝি যেতে ইচ্ছে হয়েছে?

–না। আমি গেলে বাড়িসুদ্ধ সবাইকেই নিয়ে যেতে হয়।

মমতা কাছে এসে প্রতাপের চুলের মধ্যে হাত রেখে বললেন, তুমি এবারে একটু ঘুমিয়ে নাও। ছুটির দিনে একটু বিশ্রাম নিলে...

দরজাটা ভেজানো। এখন হঠাৎ কেউ এঘরে ঢুকবে না। মুন্নি বড় হয়ে গেছে, সেও এখন দরজা ভেজানো দেখলে বাইরে থেকে মা বলে ডাকে।

প্রতাপ মমতার কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে গাঢ় স্বরে বললেন, মমো।

মমতা অমনি কান্নায় ভেঙে পড়ে লুটিয়ে পড়লেন প্রতাপের বুকে।

পিকলুর মৃত্যুর পর মমতাই সব চেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছিলেন। হয়তো কার্য কারণের কোনো সম্পর্ক নেই, সেই সময়েই মমতা সাঙ্ঘাতিক বিকোলাই রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন প্রায় এক বছর। তাঁর চিকিৎসার জন্য জলের মতন টাকা খরচ হয়েছে ভাঙতে হয়েছে মমতার অনেকগুলি গয়না।

পিকলু প্রতাপের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, কিন্তু প্রতাপ তেমন ভাবে ভাঙেননি। এটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, তবে এ জন্য তো কারুকে দায়ী করা যায় না। সে যদি রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়তো, তা হলেও গাড়ির চালককে দোষ দেওয়া যেতে পারতো, কিন্তু গঙ্গানদীর নামে তো অভিযোগ আনা যায় না।

মমতা অবশ্য শোকের তীব্রতার প্রথম দিকে বাবলুর নামে দোষারোপ করেছিলেন। এমনকি একদিন মমতা বাবলুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথা দেয়ালে ঠুকে দিতে দিতে পাগলাটে গলায় বলেছিলেন, শয়তান, এই ছেলেটা শয়তান,এর জন্যেই আমার পিকলু চলে গেল। মা গঙ্গা তোকে নিল না কেন, তোকে নিলে আমি বাঁচতাম।

মায়েরাই ঝোঁকের মাথায় এ রকম কথা বলতে পারে। মায়ের অভিশাপ সন্তানের গায়ে লাগে না। ঐ রকম বলার কিছু পরেই মমতা আবার বাবলুকে এত আদর করেছিলেন, এত আদিখ্যেতা করেছিলেন তাকে নিয়ে যে বাবলু অস্বস্তিতে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই রাত্রেই প্রতাপ দেখেছিলেন, বাবলু তার মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলছে।

প্রতাপ অবশ্য কোনোদিন বাবলুর ওপর দোষারোপ করেননি। দুরন্ত ছেলে বাবলু, সে সাঁতার জানে না, তবু জলে নেমেছিল। পিকলু মোটামুটি সাঁতার জানতো, সে ভাইকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল, কিন্তু একটা বয়ায় মাথায় ধাক্কা লেগে তার প্রাণটা চলে যায়। কী বলা যাবে একে। নিয়তি ছাড়া? যা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাই-ই নিয়তি বলে চালানো যায়।

সেই শোক প্রতাপ আর মমতাকে অনেক কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। পিকলুকে অনেকেই ভালোবাসতো, অনেকেই খুব আঘাত পেয়েছে, কিন্তু এই শোক যেন প্রতাপ আর মমতার মধ্যে একটা অদৃশ্য সেতু নির্মাণ করে দিয়েছে। তা এতই ব্যক্তিগত যে অন্য কেউ বুঝবে না। মুখে কিছু বলার দরকার নেই, অনেক লোকের মাঝখানে হয়তো অন্য কথাবার্তা চলছে, শুধু প্রতাপ বা মমতা পরস্পরের দিকে একবার তাকালেই শুধু ঐ দু'জনই জানবেন যে তাঁদের বুকের মধ্যে হু-হু কান্না, এবং দু'জনেই দু'জনকে নিঃশব্দে বলছেন, শান্ত হও,শান্ত হও।

প্রতাপের জীবন ধারা বদলে গেছে অনেকটা। আগে তিনি আদলত থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সুলেখা -ত্রিদিবদের সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা করতেন। এখন প্রতিদিন সোজা বাড়ি ফিরে আসেন। বুলার কথা আগে যখন তখন মনে পড়তো, বুলার জন্য এমন এক গোপন জ্বালা অনুভব করতেন যা মমতাকে বলা যায় না। এখনো বুলার কথা চকিতে দু'একবার মনে পড়ে বটে, কিন্তু বুলার মুখটা তিনি আর মনে করতে পারেন না। বহুকাল আগে দেখা বুলা জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমার মুখ মনে আছে, এমনকি বুলার দেওর ঐ দুশ্চরিত্র সত্যেনটার মুখও তিনি স্পষ্ট দেখতে পান, অথচ বুলার মুখঝাপসা হয়ে গেছে। পিকলুর মৃত্যুর সঙ্গে বুলার মুখ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার যে কী সম্পর্ক কে জানে।

অনেকদিন বাদে প্রতাপ মমতার কান্না ভেজা মুখখানি তুলে তার ওষ্ঠে চুম্বন করলেন।

শরীরের গুপ্ত আগুন যে কখন দপ্ করে জ্বলে ওঠে তার ঠিক নেই। মমতা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে এলেন। মধ্যবয়স্ক গৃহস্থের মতন দুপুরবেলার শয্যায় নিয়ম মাফিক আধো-উত্তাপময় মিলনের বদলে প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে মমতাকে পাঁজকোলা করে কোলে তুলে নিলেন। তিনি দীর্ঘকায় শক্তিশালী পুরুষ, সেই তুলনায় মমতা কোমল, হালকা। মমতাকে নিয়ে দোলাতে দোলাতে প্রতাপ বললেন মমো, তোমার মনে আছে, সেই যুদ্ধের সময়, কলকাতায় যখন বোমা পড়ে?

–আগে বলো, তোমার মনে আছে কি না?

–না মনে নেই। কী হয়েছিল সে সময়ে!

–সত্যি, তোমার মনে নেই?

–তুমি বলো।

–আমরা সেই সময় উত্তর কলকাতায় নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে থাকতুম। সাইরেন বাজলো, এরকম

তো প্রায়ই বাজতো, কিন্তু জাপানীরা সত্যি কলকাতায়বোমা ফেলবে কেউ তো ভাবেনি। সেদিন কিন্তু সত্যিই বোমা পড়লো। খিদিরপুরে, হাতিবাগানে...আমাদের বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা দুম দুম করে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলো, আমাদের একতলায় থাকার জন্য বলতে এসেছিল, কিন্তু আমরা দরজা খুলতে পারিনি... তখন আমরা কী করছিলুম?

–জানি না যাও!

–উই ওয়্যার মেকিং লাভ! যুদ্ধ টুদ্ধ, বোমা টোমা কিচ্ছু আসে যায়না, আমরা তখন.....

–এই ছাড়ো, ছাড়ো, প্লীজ।

–তারপর আর একবার, সেটা ফটি সিক্স না ফটি-সেভেন আমরা স্টিমারে যাচ্ছিলাম ঢাকা... তখনও তো আমি অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে, আমরা ক্যাবিন প্যাসেঞ্জার ছিলাম, কিন্তু আরও একটা লোক ছিল সেই ক্যাবিনে, সে ব্যাটা কিছুতেই বাইরে যায় না, কত রকম ইঙ্গিত করি, সে আবার তোমার দিকে হ্যাংলার মতন তাকাচ্ছিল, তারপর মাদারিপুরে সে ইলিশমাছের নৌকো দেখতে যেই একবার বাইরে গেল আমি আমরা দরজার ছিটকিনি তুলে দিলাম।

–তুমি লোকটার সঙ্গে বড্ড খারাপ ব্যবহার করেছিলেন।

–মনে আছে, মনে আছে।

মমতার শরীরের চামড়া ফেটে ফেটে বেরিয়ে আসছে আগুন। প্রতাপ তাঁকে এবার খাটে শুইয়ে দিয়ে বললেন, কতদিন হয়ে গেল। মমো, আমি তোমাকে এখনো ঠিক সেই রকম ভালোবাসি। আমি তোমারকে এখনো সেইভাবে চাই।

তফাত শুধু এই যে প্রতাপ যে সময়ের কথা বলছেন, তখন প্রতাপ নিজে খুলে দিতেন মমতার শাড়ি। অতিরিক্ত ব্রীড়ায় মমতা নিজের ব্লাউজও খুলতে চাইতেন না। এখন বহু-ব্যবহারে ওসব রোমাঞ্চ চরে গেছে। মমতা নিজেই পটপট করে ব্লাউজের ক্লিপ খুললেন। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন নিজের বুকের দিকে। তাঁর স্তন দুটি এখনও পীনোন্নত বলা যায়। চোখ তুলে দেখলেন। প্রতাপ চেয়ে আছেন তাঁর চোখে চোখ মিলিয়ে। শাড়িটি ভাঁজ করে রাখলেন খাটের মাথায়। তারপর প্রতাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, পাখাটা একটু জোর করে দাও না।

পাখার রেগুলেটার খুঁজতে গিয়ে প্রতাপ অন্ধ হয়ে গেলেন। দিনের বেলা, দরজা-জানালা বন্ধ করা সত্ত্বেও ঘরের মধ্যে যথেষ্ট আলো আছে, তবু প্রতাপ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। যেন একটা অন্ধকার অরণ্যে তিনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন।

এ অনুভূতি কয়েক মুহূর্তের মাত্র। তারপরেই তিনি তার পাঞ্জাবি ও পাজামা খুলে ফেলে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। প্রায় দৌড়ে গিয়ে বসে পড়লেন ঘরের এক কোণে।

মমতা জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো তোমার?

প্রতাপ অদ্ভুত পাগলটে গলায় বললেন, মমো, এদিকে এসো, শিগগির এদিকে এসো–

মমতা খাট থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী?

প্রতাপ বললেন, আজ খাটে শুয়ে নয়। মেঝেতে, মনে করো, এটা ঘর নয়, এটা একটা নদীর ধার, আমরা শুয়ে আছি কাদামাটির মধ্যে, মাথার ওপরে খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা কিছুই গ্রাহ্য করছি না।

নারীর শরীরে একবার জ্বাল উঠলে আর দেরি সয় না। মমতা শুয়ে পড়লেন প্রতাপের পাশে। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

ব্যাপাটা চুকে যাবার পর দু'জনে কয়েক মিনিট নীরবে শুয়ে রইলেন পাশাপাশি। তারপর মমতা উঠে সায়া, শাড়ী, ব্লাউজ পরে নিয়ে দরজা খুলে চলে গেলেন বাথরুমে। প্রতাপের এখন আর একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু উঠে গিয়ে আনতে ইচ্ছে করছে না। তিন ঘরের দেয়াল দেখতে লাগলেন। এই বাড়িটা ভালো নয়... সব ঘরে ড্যাম্প, দেয়ালে প্লাস্টার ফুলে গেছে কোথাও কোথাও। বাড়ি পাল্টালে ভালো হয়, কিন্তু প্রতাপের আর উদ্যম নেই। যা চলছে চলুক। কে আর বাড়ি খোঁজাখুঁজি করে।

মমতা জল-মাখা মুখে ফিরে এসে বললেন, এই, তুমি উঠবে না?

প্রতাপ হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, মমো, এসো আজ দুপুরটা আমরা মেঝেতেই শুয়ে থাকি।

মমতা ভ্রুভঙ্গি করে বললেন, বয়েস হচ্ছে, খেয়াল থাকে না বুঝি?

প্রতাপ হেসে বললেন, সত্যিই খেয়াল থাকে না। বয়েস হচ্ছে তাই না? এখন এসব মানায় না। মমো, আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক আগের মতন ভালোবাসি।

–হঠাৎ আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো? ভালোবাসার কথা তো আগে কখনো মুখে বলতে না?

–আমি মুখে বললে তোমার খারাপ লাগে?

–মুখে ওসব কথা বলার দরকার নেই। আমি সব বুঝি। যাদের মনে মনে ভয় আছে, তারাই ঐ সব কথা মুখে শুনতে চায় বারবার।

–আমিই ভুল করি, মমো। তুমি আমার থেকে অনেক সলিড।

–এবারে ওঠো, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

–তুমি আগে আমাকে একা ভিজে তোয়ালে এনে দাও। আর সিগারেট দেশলাইটা এগিয়ে দাও। আর একটুক্ষণ থাকি। এখান থেকে উঠলেই ভালো লাগাটুকু শেষ হয়ে যাবে।

–পাখাটা কী রকম শব্দ করছে দেখেছো? স্পীড বাড়ালেই এরকম হয়। এবার অয়েলিং করাতে হবে। এই, তুমি দেওঘরে তোমার মারে জন্য একটা পাখা কিনে দেবে বলেছিলে না?

–কেন, ওস্তাদজী মাকে একটা পাখা কিনে দিতে পারে না? পুরো বাড়িটা ভোগ করছে। একতলায় ভাড়া পাচ্ছে।

–ওরকম ভাবে বলো না। কতইবা বাড়ি ভাড়া পান? তাছাড়া একজন ভাড়াটে নাকি ছ'মাস ধরে কিছু দেয় না। শান্তি ঠাকুরঝি একবার লিখেছিল মনে নেই?

–তা আমি কী করবো, আমার হাতে এখন আর টাকা নেই। বিমানবিহারীর কাছে অনেক ধার রয়ে গেছে।

–তা বললে তো চলবে না। আমাদের এই পাখাটাও বোধ হয় বদলানো দরকার, এই গরমে...আমার একটা বালা ভেঙে গেছে, ওটা আমি কোনোদিন পরবো না। ওটা বিক্রি করে দাও। তোমার দিদির গয়না তুমি না ভাঙতে পারো। আমার গয়া বিক্রি করতে তো দোষ নেই।

প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন। এখন আর নদীর ধার নয়, এটা ঘোর সংসার। একটু আগেকার চরম ভালো লাগার পরেই এই ধরনের কথাবার্তা তাঁর সহ্য হলো না। এখন বিছানায় উঠে ঘুমিয়ে পড়াই ভালো।

দু'জনের মনেই হঠাৎ পিকলুর স্মৃতি দপ করে জ্বলে উঠেছিল। সেই জ্বালা, সেই শোক ভোলবার জন্যই এত সব। অন্য কিছু, অন্য কথা।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে পাশ ফিরতেই আবার পিকলুর মুখখানা ফিরে এলো। বয়ায় যখন মাথাটা ধাক্কা লাগে, তখনকত কষ্ট পেয়েছিল ছেলেটা তবু সে নিজর ছোট ভাই ধরে ছিল উঁচু করে, তাকে ডুবতে দেয়নি..।

পাতিপুকুর স্টপে বাস থেকে নেমে অসমঞ্জ রায় রাস্তা পার হবার আগে একবার থমকে দাঁড়ালেন। একটা কথা তাঁর আগেই মনে পড়া উচিত ছিল। প্রমীলা আশ্রমে খালি হাতে যাওয়া ভালো দেখায় না। এদিকে মিষ্টির দোকান কোথায় পাওয়া যাবে? আগে মনে পড়লে তিনি শ্যামবাজার থেকে ভালো মিষ্টি নিয়ে আসতে পারতেন।

খানিকটা হেঁটে একটা ছোট দোকান পেলেন, সে দোকানে মোট বাইশটা কড়া পাকের সন্দেশ রয়েছে, সবগুলিই কিনে ফেললেন তিনি। এক হাতে সেই বাক্স, অন্য হাতে কোঁচাটা তুলে ধরে হাঁটতে লাগলেন, রাস্তায় চিটচিটে কাদা রয়েছে।

মেঘলা আকাশে সন্ধে নেমে এসেছে আগে আগে। প্রমীলা আশ্রমের গেটের আলোটা দূর থেকে দেখা যায়। নিয়নবাতি দিয়ে আশ্রমের নাম লেখা হয়েছে গত মাসে। আশ্রমের বেশ উন্নতি হচ্ছে দিন দিন। নেপালী দারোয়ান রাখা হয়েছে দু'জন। গ্লোব নার্সারি বিনা পয়সায় দেবদারু গাছ লাগিয়ে দিয়েছে কয়েক সারি।

যোগেন দত্তর মায়ের নামে এই আশ্রমের নাম রাখার শর্ত ছিল, তাই-ই হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যোগেন দত্তর মায়ের নাম প্রমীললা। সুতরাং অর্থের অসঙ্গতি হয়নি, বরং নামটি বেশ মানানসই হয়েছে।

রাস্তা থেকে পাগলিনীদের ধরে আনার ইচ্ছেটা পরিত্যাগ করতে হয়েছে চন্দ্রাকে। তাতে আইনের

বাঁধা আছে। উন্মাদ আশ্রম বা লুনাটিক অ্যাসাইলাম খুলতে হলে সরকারের অনেক নিয়ম কানুন মানতে হয়। কে পাগল আর কে পাগল নয়, তা প্রমাণ সাপেক্ষ। যাকে তাকে পাগল বলে ধরে রাখা যায় না, এমনকি যে-নারী রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে ঘোরে, তাকেও না।

আপাতত দুঃস্থ, সহায় অসহায় মেয়েদের আশ্রয় দেওয়া হয় এখানে।

এক সময় এই অঞ্চলটা ছিল জন বিরল, এখন উপনিবেশ গড়ে উঠছে দ্রুত। ধনীদের বাগান বাড়ি গুলো টুকরো টুকরো প্লটে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কাদের যেন একটা বেশ বড় বাড়ির গেটের মাথায় ছিল একটি নহবৎখানা, সেখানেও আশ্রয় নিয়েছে একটি পরিবার, ছেঁড়া কাঁথা ঝোলে, প্রায় শানাইয়ের মতনই তীব্র স্বরে শোনা যায় দু'একটি শিশুর গরায় কান্না। নহবৎখানার নিচটায় হয়েছে মটোর গাড়ি সারানোর খুদে কারখানা। যে-যেখানে পারে বাড়ি তুলছে, কলকাতা শহর ডাল-পালা মেলে এগিয়ে আসছে।

প্রমীলা আশ্রমের গেট দিয়ে ঢুকলেই সামনে একটি বাঁধানো চাতাল ও মন্দির। সেই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেত পাথরের মূর্তি। মাত্র পচাত্তর আমি বছর আগেও যে মানুষটি জীবিত ছিলেন, এখন তাকে পুজো করা হচ্ছে দেবতাজ্ঞানে। প্রতি সন্ধেবেলা আরতি হয়, ভক্ত আসে প্রচুর, শুধু স্থানীয় নয়, দূর দূর থেকেও।

জুতো খুলে রেখে, চাতালে উপবিষ্ট নর-নারীদের এক পাশ দিয়ে এগিয়ে অসমঞ্জ মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে মূর্তির পায়ের কাছে সান্দেশের বাক্সটি রাখলেন। একবার তাকিয়ে দেখলেন চন্দ্রার দিকে। সিল্কের গেরুয়া পরা চন্দ্রা চোখ বুঁজে আছে, যেন ধ্যানবিভোর। অসমঞ্জ ভাবলেন, তিনি যে পয়সা খরচ করে মিষ্টি আনলেন সেটা চন্দ্রা জানবো না? তা হলে আনার কী মানে হয়? এখানে আরও অনেকে ভোগ দিয়েছে তার মধ্যে অসমঞ্জর বাক্সটা মিশে যাবে চন্দ্রাকে এখন ডাকার উপায় নেই, তাই তিনি ডান পাশে বসা আর একটি নারীকে উদ্দেশ্য করে বেশজোরে বললেন, এটা এখানে রাখি? বাক্সর মুখটা খুলে দিতে হবে?

মেয়েটি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল যে তার দরকার নেই।

সেখান থেকে নেমে অসমঞ্জ চাতালের ভক্তদের মধ্যে ফিরে গেলেন না, বা দিকের অফিস ঘরে একটা চেয়ারে বসলেন। তিনি এই আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি, তাঁর আসন আলাদা জায়গায়। তবে তিনিও হাত জোড়া করে চোখ বুজে কীর্তন গানের তালে তালে দোলাতে লাগলেন মাথা। এখানে ধূমপান নিষেধ, সন্ধ্যারতির সময় খা বলাও চলে না,ই অফিস ঘর থেকে মন্দিরের অভ্যন্তর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অসমঞ্জ চন্দ্রাকে দেখতে পাচ্ছেন না, মাঝখানে একজনমোটা সোটা মহিলা দাঁড়িয়ে আড়াল করে আছেন। উনি এই আশ্রমের সুপার, ওঁর নাম কুমুদিনী, কিন্তু এই আশ্রমের সকলেই যে আড়ালে ওঁকে বাঘিনী বলে ডাকে তা অসমঞ্জও জানেন। প্রকৃতি ওঁকে পুরুষ হিসেবে গড়তে গিও মুহূর্তের ভুলেনারী করে পাঠিয়েছেন। একদিন উনি নাকি এ পাড়ার দুটি রসস্থ ছোকরাকে তেড়ে গিয়েছিলেন লাঠি হাতে নিয়ে।

অসমঞ্জ মাঝে মাঝে চোখ পিটপিট করে চন্দ্রাকে দেখতে চাইছেন। কিন্তু ঐ পাহাড়টি না সরলে কোনো লাভ নেই। কতক্ষণ বলবে? অসমঞ্জ মন দিয়ে গানটা শোনার চেষ্টা করলেন। শেষ গানটি তিনি চেনেন, সেটি হলো, "কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন। তাঁর রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যাঁর হাতে মরণ বাচান।" এখন অন্য গান হচ্ছে।

চন্দ্রাকে সঙ্গে প্রথম আলাপের দু'এক বছরের মধ্যে অসমঞ্জ কোনোদিন তার গলায় গান শোনেন নি। এখন সে এইসব কীর্তন টির্তন দিব্যি গায়। সত্যি কি অলৌকিক কিছু ভর করেছে তার ওপর? অসমঞ্জ পুরোপুরি নাস্তিক নন, নিজে জীবনে ধর্মচর্চা না করলেও অবিশ্বাস করতে ভয় পান। চন্দ্রার কথা বলার ধরন চোখের দৃষ্টি এমন ভাবে বদলে গেছে যে মাঝে মাঝে চন্দ্রাকেও তাঁর ভয় হয়। আবার এক এক সময় মনে হয়, চন্দ্রা যেন ইচ্ছে করে কোনো উদ্দেশ্যে এই ছদ্মবেশ ধরে আছে। যোগেন দত্তর সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবারে বেড়াতে গিয়েছিল চন্দ্রা। কী ঘটেছিল সেখানে? ডায়মণ্ড হারবার যাবার কথা অসমঞ্জ আগে থেকে কিছুই জানতেন না, শোনার পর তাঁর মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। আপত দৃষ্টিতে নিরীহ অধ্যাপক হলেও অসমঞ্জ রায়ের মতন মানুষও বোধহয় কখনো কখনো খুন করতে পারে। ক্রাইম অফ প্যাশান। অন্য কেউ চন্দ্রার গায়ে হাত ছুঁইয়েছে এরকম চিন্তা করলেই অসমঞ্জ প্রায় পাগলের মত হয়ে ওঠেন।

ডায়মণ্ড হারবার থেকে চন্দ্রা ফিরে এসেছিল রাত পৌনে দুটোয়এবং সে যোগেন দত্তর নামে কোনো অভিযোগ করে নি। কোনো মানসিক বিপর্যয়ও লক্ষ করা যায় নি। কিন্তু সেই ঘটনার সাতদিনের মধ্যেই সে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মাঠে গিয়ে নিয়ে সন্ন্যাসিনী হতে চেয়েছিল।

কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিলেই সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হওয়া যায় না কিংবা গেরুয়া ধারণ করার অনুমতি পাওয়া যায় না, তার আগে কয়েকটা স্তর পেরিয়ে আসতে হয়। চন্দ্রার অত ধৈর্য নেই। দু'দিন পরে সে বেলঘরিয়ায় শিবানন্দ স্বামীর কাছে আবার দীক্ষা নিয়ে স্বেচ্ছায় গেরুয়া ধারণ করেছে। মাথার চুল ছেঁটে ফেলেছে ছোট ছোট করে। বেলঘরিয়ার সেই আশ্রমে সে থেকে এসেছে তিন মাস।

চন্দ্রার বাবার সঙ্গে অসমঞ্জর আলোচনা হয়েছিল এ ব্যাপারে।

আনন্দমোহন বলেছিলেন, চন্দ্রার তো এলাহাবাদে যাবার কথা ছিল শিবানীর বিয়েতে, এইভাবে এলাহাবাদে যাওয়াটা এড়িয়ে গেল।

চন্দ্রার এলাহাবাদ পর্বটাও অসমঞ্জ প্রায় কিছুই জানেন না। কী যেন একটা রহস্য আছে। এলাবাদের প্রসঙ্গ উঠলেই চন্দ্রা চটে উঠতো।

আনন্দমোহনকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, চন্দ্রা যেতে চায় না কেন এলাহাবাদ? আনন্দমোহনও সরাসরি উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, যেতে ও চায় না, সে জন্য আমি ওকে জোর করি না। কিন্তু ওর মা জোর করে পাঠাতে চায়। আমার এই মেয়েটা ছেলেবেলা থেকেই বড্ড জেদী।

–তা বলেমন্ত্র নেওয়া, গেরুয়া পরা, এসব নিয়ে ছেলেমানুষী করা কি ঠিক?

–আমি বাবা বলেই কি ফতোয়া দিতে পারি, ওর জীবনের কোনটা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক। অ্যাডাল্ট ছেলেমেয়ে, শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছে, ওরাই ঠিক কর নেবে কী ভাবে জীবনটা কাটাবে। কেন, আপনার কী মনে হয়, একবার গেরুয়া ধারণ করে তারপর কিছুদিন বদে ফের গেরয়া ছেড়ে বেনারসী শাড়ী পরা অন্যায়?

অসমঞ্জ অবাক হন। তিনি লেখাপড়া জানা মানুষ। আধুনিক যুক্তিবাদ তাঁর অজানা নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের কোনো বাবা শ্রেণীর মানুষে মুখে এরকম কথা শুনবেন, তিনি আশা করেন নি। তাও নিজের মেয়ে সম্পর্কে? অন্যদের ব্যাপারে ভাসা ভাসা আদর্শবাদের কথা বলা সহজ, কিন্তু নিজের ছেলে মেয়েদের বেলায়..

অসমঞ্জ আধুনিক যুক্তিবাদে কথা বইয়ের পৃষ্ঠায় পড়লেও তাঁর নিজের জীবন চর্যায় অনেক সংস্কার রয়ে গেছে। ছেলেখেলার মতন একবার গেরুয়া ধারণ, করে সন্ন্যাসিনী হয়ে আবার কয়েক মাস বাদে সিল্কের শাড়ী পরে টেনিস খেলতে যাওয়া এবং সিগারেট টানতে টানতে পরপুরুষের গায়ে ঢলে পড়া, তাঁর মতে এটা ধর্মীয় ব্যাভিচার, এটা পাপ। তাঁর ধারণা, চন্দ্রা ঠিক এই ব্যাপারটাই করবে।

আনন্দমোহনকে তিনি খানিকটা মাস্টারি ধরনে বলেছিলেন, আপনি আপনার মেয়েকে বড় বেশি আদর দিয়েছেন। কিছু কিছু ভ্যালুজ তো মানতেই হয়।

আনন্দমোহনকে যতটা সরল ও আপন ভোলা মনে হয়, তিনি আসলে ততটা নন নিশ্চয়ই। তা হলে আর শ্রামবাজারের মতন পাড়ায় অতবড় ওষুধের দোকান চালাচ্ছেন কী করে?

অসমঞ্জর ঐ কথা শুনে আনন্দমোহন বলেছিলেন, হ্যাঁ বাড়ির সবচেয়ে ছোট মেয়ে। আদরটা বেশিই পেয়েছে। তাতে ক্ষতি কিছু হয়েছে কী? চন্দ্রা কোনোদিন নিন্দনীয় কিছু কাজ করেনি। সেইজন্যই তো রাত ন'টাতেও ওর কোনো পুরুষ বন্ধু দেখা করতে এলে আমরা কিছু মনে করি না। আমার মেয়েকে তো আমি চিনি।

অসমঞ্জর মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। মিষ্টি মিষ্টি সুরে আনন্দমহোন তাকেই ঘুরিয়ে থাপ্পড় মারলেন। অসমঞ্জই তো প্রায়ই টিউশানি সেরে রাত ন'টার পর চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন।

টাকার অভাবে প্রমীলা সমিতিরি বাড়ি তৈরির কাজ কিছুদিন বন্ধ ছিল। তিন মাস পরে চন্দ্রা বেলঘরিয়ার আশ্রম থেকে ফিরে পুরোপুরি আবার সেইকাজে লাগলো। বাবার বাড়ি ছেড়ে সে ঠাঁই নিল প্রমীলা আশ্রমের সেই অসমাপ্ত বাড়িতে, তার নাম হলো চন্দ্রমা, তার কথার লব্‌জ হলো, তিনি রবি, আমি চন্দ্র, তিনি আলো, আমি মুকুর, তিনি সাগর, আমি নদী, তিনি স্রষ্টা, আমি সৃষ্টি, তিনি বিভু আমি ভূ।

অতিশয় সরল ও বহু ব্যবহৃত এই সব থাই অধ্যাত্ম দর্শন নামে এখনো চলে। চন্দ্রামার চেলা জুটতে দেরি হলো না। সে এক রূপসী যোগিনী, এর অতিরিক্ত আকর্ষণ তো আছেই, শুধু পুরুষরা

নয়, মহিলারাও সুন্দরী সন্ন্যাসিনী দেখে আকৃষ্ট হয়। সেই যোগেন দত্তই আবার ফিরে দিতে লাগলো টাকা। আরও দাতা জুটিয়ে আনলো সে, সেই টাকায় সম্পূর্ণ হলো আশ্রম বাড়ি। তৈরি হলো মন্দির। এ দেশে মন্দির মশজিদ গড়ার জন্য কখনো টাকার অভাব হয়না। যোগেন দত্তরমায়ের নামেই সংস্থার নাম হয়েছে কিন্তু অনেকেরই মুখে মুখে এর নাম শুধু চন্দ্রামার আশ্রম। চন্দ্রার অনুরোধেই যোগেন দত্ত এই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হয়েছে। অসমঞ্জ ভাবেন, তা হলে কি ডায়মণ্ড হারবারে যোগেন দত্ত চন্দ্রার প্রতি কোনো অসমীচীন আচরণ করে নি? তবে চন্দ্রা ডায়মণ্ড হারবার বেড়াতে গেল কেন ওর সঙ্গে, গভীর রাতে ফিরে এসে কদিন পরই সে কেন ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী হতে চাইলো?

অসমঞ্জ ধরেই রেখেছিলেন, চন্দ্রার এই হুজুগ বেশিদিন টিকবে না। চন্দ্রা খেলাধুলা করতে, নাচতে, বেড়াতে ভালোবাসে, আগে সে সিগারেট খেত খুব বীয়ার কিংবা জিন পানে আসিক্তছিল সমাজ সেবা বা নিরাশ্রয় মেয়েদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা তার একটা শখ মাত্র সে শুধু ঐ শখের জন্য তার ব্যক্তিগত জীন উপভোগ বাদ দিতে পারবে না।

তাছাড়া আর একটা ব্যাপারও অসমঞ্জর সন্দেহ হয়েছিল। অপূর্ব বর্মণ নামেএকজন আর্কিটেক্টের সঙ্গে চন্দ্রার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে ছোকরা সময়ে অসময়ে ঘুরঘুর করতো চন্দ্রার আশেপাশে। সে অতি সুপুরুষ এবং কাজকর্মের ব্যাপারেও সার্থক। সন্ন্যাসিনী হবার পরেও কিছু পায় নি, তবু সে প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে গেছে এখানে। চন্দ্রা না হয় সন্ন্যাসী হয়েছে অপূর্ববর্মণ তো সাধু হয়নি, তা হলে তার কিসের টান? শুধু ঐ অপূর্ব বর্মণের ওপর নজর রাখবার জন্যই অসমঞ্জ নিজের প্রচুর কাজ নষ্ট করে এখানে এসে পড়ে থাকতেন। না এতদিনেও তিনি ওদের মধ্যে কোনো গোপন লীলাখেলা আবিষ্কার করতে পারেন নি।

ঐ অপূর্ব বর্মণ লোকটি, ইংরেজিতে যাকে বলে একটি এনিগা। ওর কোনো দোষ ধরতে পারেন নি অসমঞ্জ, তবু ওকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। ও যে এ পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনো অন্যায় করেনি, সেটাই যেন একটা প্রচন্ড অন্যায়। একটা সুস্থ, সবল, যুবক, সে কী চায়? সে কিছুই চায় না, তবু আসে? অপূর্ব বর্মণ যেন একেবারে ভদ্রতার প্রতিমূর্তি তার মুখের বাঁধানো হাসিটি দেখলেই অসমঞ্জর শরীর রি-রি করে। সে কোনোদিন অসমঞ্জর সঙ্কে খারাপ ব্যবহার করেনি, সেটাও তার একটা অপরাধ, সে এতবড় শয়তান যে অসমঞ্জকে খারাপ ব্যবহারের উত্তর দেবার সুযোগ পর্যন্ত দিচ্ছে না।

এই পাতিপুকুর আশ্রমে চন্দ্রার জনপ্রিয়তা হঠাৎ বাড়িয়ে দেন চন্দ্রার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আস, সেই সময় একদিন বিকেলে প্রার্থনা সভায় দেখা গেলআনন্দমোহন বসে আছেন চাতালের ভক্তদের মধ্যে। সেই দিনটি ছিলশনিবার, চন্দ্রায় উপদেশ দেবার দিন। আনন্দমোহন এসে পরিচয় দেন নি চন্দ্রার বাবা হিসেবে, চন্দ্রাও নিশ্চয়ই বাবাকে দেখতে পেয়েছিল, তবু তাঁর প্রতি কিছু আলাদা মনোযোগ দেয়নি বা পিতৃ সম্বোধনও করেনি। তাহলেও বিদ্যুতের মতন কথাটা রটে গিয়েছিল। চন্দ্রামার বাবা এসেছেন মেয়ের উপদেশ শুনতে! চন্দ্রা মা'র কী অলৌকিক শক্তি, তিনি নিজের পিতাকেও ভক্ত বানিয়েছেন।

সেদিন অসমঞ্জ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু ঘটনাটা শুনেই তাঁর মনে হয়েছিল, এটা একটা পাবলিসিটি স্টান্ট। বাবা আর মেয়ের ষড়যন্ত্র । অসমঞ্জ রীতিমতন বিরক্ত হয়েছিলেন। ওষুধের দোকান থেকে তো যথেষ্ট লাভ হয়,আনন্দমোহন কি তবে প্রমীলা আশ্রম থেকেও কিছু বাগাবার তালে আছেন নাকি?

শ্যামবাজারের দোকানে ওষুধ কেনার ছলে একদিন গিয়ে অসমঞ্জ আনন্দমোহনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শুনলাম নাকি আপনি নিজেই এখন আপনার মেয়ের ভক্ত হয়েছেন?

মাথা ভর্তি পাকাচুল সমেত সেই বৃদ্ধ সরল বিস্ময়ে বুরু তুলে বলেছিলেন, ও আর আমার মেয়ে নয় অসমঞ্জবাবু। ওর ওপর কিছু ভর করেছে। আমি নিছক পরীক্ষা করবার জন্য গিয়ে ছিলাম একদিন, বুঝালেন। ভেবেছিলা, মুনি না ও লোকদের কী বলে। শুনতে গিয়ে আমি তো কী বলবো আপনাকে, একেবারে অভিবুত। এসব ও কোথায় শিখলো? চন্দ্রা তে কোনোদিন দর্শন পড়ে নি। কত সাধারণ কথা ও কত গভীরভাবে বলে। তারপর থেকে ইচ্ছে করে রোজ শুনতে যাই।

–আপনার তা হলে ধারণা যে আপনার মেয়ে সত্যি সন্ন্যাসিনী হয়ে গেল, আর ফিরবে না।

–আপনার কি ধারণা, অসমঞ্জবাবু?

–সত্যি কথা বলবো, আমি মনে করি, এই সব ভড়ং আপনার মেয়ে বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে

পারবে না। ও মেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া।

আনন্দমোহন দুঃখিত স্বরে, পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে শুনিয়েছিলেন, আপনিই একদিন আমায় বলেছিলেন, একবার গেরুয়া ধারণ করে তারপর আবার ছেড়ে আসা পাপ। আমার মেয়ে তা হলে পাপীয়সী হবে? কী জানি কী আছে ভবিতব্য।

অসমঞ্জ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন ঠিক উত্তর দিতে পারেন নি। হ্যাঁ তিনি মনে করেন, গেরুয়া ধারণ করে আবার তা ছেড়ে দেওয়াটা পাপ। অথচ তিনি চান চন্দ্রা ঐ সব ভড়ং ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক।

অসমঞ্জ প্রমিলা আশ্রমের সঙ্গে সব সংশ্রব চুকিয়ে দিতে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা অধিকাংশই বামপন্থার দিকে ঝুঁকেছেন। কংগ্রেস শাসনের প্রতি সারা পশ্চিম বাংলা বীতশ্রদ্ধ। বিধান রায় তবু শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন এখন প্রফুল্ল সেনের আমলে দিন দিন বিশৃঙ্খলা বাড়ছে। ওদিকে কেন্দ্রেওচীনের সঙ্গে হঠকারীর মতন যুদ্ধ বাধিয়ে তারপর শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের পর ম্লান হয়ে গেছেন জওহরলাল নেহরু, তার স্বাস্থ্যও ভালো নয়। বামপন্থীরা চীন-ভারত যুদ্ধসূচনার পুরো দায়িত্বটা চাপিয়ে দিয়েছে ভারত সরকারের কাঁধে। অসমঞ্জ রায় মনেপ্রাণে পুরোপুরি বামপন্থী নন, তবে তিনি সবসময়ই হাওয়ার স্রোতের অনুকূলে তাই তিনি গলা মিলিয়েছেন বামপন্থীদের সঙ্গে, ওদরে সমর্থন পেয়ে তিনি সিন্ডিকেটের নির্বাচনে জিতেছেন। এখন তাঁর পক্ষে কোনো ধর্মীয় সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রাখা সমুচিত নয়।

কিন্তু অসমঞ্জ অসহায়। চন্দ্রাকে ছেড়ে দূরে চলে যাবার সাধ্য তার নেই। দু'তিনদিন চন্দ্রাকে না দেখলেই জীবনটা বিস্বাদ মনে হয়। চন্দ্রা তাকে অবহেলা করলেও তাঁর উপায় নেই। সন্ন্যাসি হবার আগে বরং কিছুদিন অসমঞ্জর প্রতি চন্দ্রা বেশ বিরাগ দেখিয়ে ছিল। অসমহে চেয়েও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ছিল চন্দ্রার বেশি ভাব। কিন্তু একবার গেরুয়া ধারণ করার পর চন্দ্রার ব্যবহার আবার বদলে গেছে, চন্দ্রাই তো বারবর অনুরোধ করেছে অসমঞ্জকে এই প্রমিলা আশ্রমট্রাস্টের সদস্য হতে। আশ্রম চালাবার ব্যাপারে চন্দ্রা তাঁর পরামর্শ চায় যখন তখন।

চন্দ্রা কি জানে না অসমঞ্জ কী চান চন্দ্রার কাছ থেকে, না জানার তো কথা নয়। অসমঞ্জ চান চন্দ্রার সম্পর্শ। তিনি চান ওকে বুকে জড়াতে। কল্পনায় যখন তিনি সেই দৃশ্যটা ভাবেন, তখন তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। চন্দ্রাকে পাওয়ার বিনিময়ে তিনি নিজের স্ত্রী পুত্র সংসার, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি, সামাজিক প্রতিপত্তি সব কিছু পরিত্যাগ করতে রাজি আছেন। দিন দিন তাঁর এই আকাঙ্খাটা বাড়ছে।

আগে যে-কোনো ছুতোয় অসমঞ্জ চন্দ্রাকে একটু আধটু ছুঁয়ে দিতেন। এখন তাঁকে সব সময় একটু দূরত্ব রাখতে হয়। সন্ন্যাসিনীকে স্পর্শ করার সাহস তাঁর নেই। চন্দ্রা কারুকে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করারও অনুমতি দেয় না। অথচ দিনের পর দিন কী সুন্দর হচ্ছে চন্দ্রা।

অসমঞ্জ মাঝে মাঝেই ভাবেন বোমা মেরে যদি এইসব আশ্রম টাশ্রম একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া যেত। এদেশে সংসার পরিত্যক্ত হাজার হাজার মেয়ে পথে পথে ঘুরছে তার মধ্যেমাত্র পনেরো-ষোলোটি মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে সমাজের কী উন্নতি হবে? এসব হচ্ছে দেশোদ্ধারে বিলাসিতা।

অসমঞ্জ মনে মনে সর্বক্ষণ বলতে চান, ফিরে এসো, চন্দ্রা, ফিরে এসো, তোমার আগেকার জীবনে এসো, আমরা একসঙ্গে আবার গাড়ি চেপে রিফিউজি কলোনিতে যাবো, তোমার সঙ্গে আমি তাল মেলাবো, দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের জন্য ইস্কুল খোলার জন্য আমি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে আমার প্রভাব কাটাবো, কিন্তু আশ্রম-টাশ্রম এসব কী?

অসমঞ্জ হঠাৎ খেয়াল করলেন, এবার কালো মেয়ের পারে তলায়....গান হচ্ছে কুমুদিনী সরে দাঁড়ানোতে চন্দ্রাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চন্দ্রার চক্ষু দুটি এখনও বোঁজ আস্তে আস্তে দুলছে তার মাথাটা। অসমঞ্জের দৃষ্টি পথ থেকে আর সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল, আর কারুকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিও না, তিনি শুধু দেখছেন চন্দ্রার মুখমণ্ডল। তাঁর হৃদয় কাতরভাবে বলে উঠলো ফিরে এসো, চন্দ্রা ফিরে এসো।

প্রার্থনা শেষ হবার পরেও প্রসাদ বিলি করতে খানিকক্ষণ সময় লাগবে। অসমঞ্জ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে হাতছানি দিয়ে এক রমণীকে ডাকলেন। এর নাম কিরণ, খুবই শুকনো ও বিমর্ষ চেহারা একে তুলে আনা হয়েছিল শিয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে। এর বেশমাথা খারাপ ছিল। আশ্রমের

অন্যতম ট্রাস্টি একজন নাম করা ডাক্তার, তাঁর নাম বিজন ব্যানার্জি তিনি সপ্তাহে দু'দিন এখানে চিকিৎসা করেন। ডঃ বিজন ব্যানার্জির চেষ্টায় কিরণ অনেক খানি সুস্থ হলেও পুরোপুরি সারেনি, সে প্রায় কারুর সঙ্গেই কথাবার্তা বলতে চায় না, তার অতীতের কথাও জানায় না। তবে কিরণ রান্না করে ভালো, তার ওপর রান্নাঘরের ভার দেওয়া হয়েছে সেটা সে বেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করে।

কিরণ কাছে আসতেই অসমঞ্জ বললেন, কেমন আছো কিরণ? এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে?

কিরণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়াতেই অসমঞ্জর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাজারে চিনি পাওয়া যাচ্ছে। এখন যে কোনো বাড়িতে গেলেই চিনির আলোচনা। সাকা লোক দেখানো ভাবে ১৫জন চিনির কালোবাজারিকে গ্রেফতার করেছে, তাতে কিছুই সুরাহা হয় নি। গোপন বাজার থেকে যদি বা একটু চিনি সংগ্রহ করা যায় তার দামও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। প্রতি কিলো দেড় টাকা। ট্রামে বাসে লোকজন বলাবলি করে, প্রফুল্ল সেন এবারে বাঙালীর চা-খাওয়ার অভ্যেস ছাড়াবে। আরে ধুর ধুর গুড় দিয়ে কী চা খাওয়া যায়?

অসমঞ্জ আবার কিরণকে ডেকে বললেন, শোনো, কিরণ, চা খাওয়াবে তো বললে তোমাদের চিনি আছে?

কিরণ দু'দিকে মাথা নাড়ালো।

–তা হলে যে চা আনতে যাচ্ছিলে?

কিরণ নির্বাক ভাবে গোল গোল চোখ মেলে অসমঞ্জের দিকে তাকিয়ে রইলো।

–গুড়ের চা খাওয়াতে চাইছিলে নাকি?

আর একটি মেয়ে এদিকে এসে বললো, আমরা তো এখানে গুড়ের চা-ই খাই।

অসমঞ্জ বললেন, থাক আমার জন্য চা আনতে হবে না।

তাঁর মাথায় একটা চিন্তা এলো। যোগেন দত্তর বড়বাজারে অনেক প্রতিপত্তি, সে আশ্রমের জন্য চিনি জোগাড় করে দিতে পারে না? অসমঞ্জর কিন্তু একটা সোর্স আছে। ফুড ডিপার্টমেন্টের এক কর্তার ছেলে তাঁর ছাত্র, সে দশ কিলো চিনি ভেট পাঠিয়েছে অসমঞ্জর বাড়িতে। সেই ছেলেটির বাবাকে ধরে এই আশ্রমের জন্য কিছু চিনি বরাদ্দ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে ন্যায়সঙ্গতভাবেই।

এ প্রসঙ্গ কিরণদের সঙ্গে আলোচনা করার কোনো মানে হয় না। চন্দ্রাকে বলতে হবে চন্দ্রা নিশ্চয়ই খুশী হবে। সন্ন্যাসিনী হয়েও চন্দ্রা চা-খাওয়া ছাড়েনি, এটা অসমঞ্জ লক্ষ করেছেন।

কিরণের পাশে এখন যে-মেয়েটি দাঁড়িয়ে তার নাম সুধা। সে যেন কিরণের ইন্টারপ্রটার। কোনো প্রশ্ন শুনেও কিরণ চুপ করে থাকলে সে উত্তর জুগিয়ে দেয়। সুধা মেয়েটি বেশ চটপটে তার ওপর প্রতিদিনে বাজার খরচের হিসেব রাখার ভার। অসমঞ্জ তার সঙ্গে দৈনন্দিন কাঁচা বাজার বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি নিজে কক্ষণো বাজারে যান না, তাঁর নিজের সংসারে কোনদিন কতটা আলুপটল মাছ আসে সে খবরও তিনি রাখেন না, কিন্তু ট্রাস্টি হিসেবে এখানকার খরচপত্তরের তত্ত্বধান করতে হয় তাকে। দৈনন্দিন যে টাকা এখানে বরাদ্দ তা দিয়ে আর কুলোচ্ছে না। বাজারে এখন আগুন লেগেছে। সামান্য যে আলু তাও এখন বেয়াল্লিশ পয়সা কিলো। মানুষ খাবে কী?

সুধা বললো, দাদা আমাদের এখানে কলার পাতায় খাওয়ার ব্যবস্তা তুলে দিন। টিনেরবা অ্যালুমুনিয়ামে থালা কিনে দিন বরং তাতে পয়সার সাশ্রয় হবে।

অসমঞ্জ বললেন, কেন? কলার পাতায় খাওয়াই তো ভালো বাসনপত্র মাজা ঘষার ঝামেলা নেই।

–আপনি ব্যবস্থা করুন, প্রত্যেকে যার যার বাসন মেজে নেবে। এখন এক বান্ডিল কলাপাতার জন্য রোজ কুড়ি নয়া করে লাগছে।

–কলপাতার বান্ডিল কুড়ি নয় করে?

–বিয়ের দিন থাকলে পঁচিশ নয়া নেয়। বলেন এইটা একটা বাজে খরচ না? অসমঞ্জ মাথা নাড়লেন। এর পরের মিটিং এ এই কথাটা তুলতে হবে।

একটু বাদে ভেতরে এলো চন্দ্রা। তার গেরুয়া বসনের আঁচল গলায় জড়ানো। কপালে একটা বড় লাল টিপ। ঠোঁটে মধুমাখা স্মিত হাসি। তার শরীরে কোনো অলংকার নেই তবু সে যেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী। ডান হাতে ঝুলছে একটা রুদ্রাক্ষের মালা।

–কেমন আছো, অসমঞ্জ? তুমি গত শনিবার এল না?

–হ্যাঁ, আসতে পারিনি। চন্দ্রা, তোমার সঙ্গে আমার দু'একটা কথা আছে।

এসো। দালানে গিয়ে বসি।

অসমঞ্জ কেঁপে উঠলেন ভেতরে ভেতরে। চন্দ্রা এর আগে কোনোদিন তাঁকে তুমি বলে সম্বোধন করেন নি।

চন্দ্রা বললো, আজ আমার আবার চোখ খুলে গেল। সব মানুষই নারায়ণ। তবু মানুষে আর নারায়ণে ভেদ রাখি কেন? অসমঞ্জ আজ আমি তোমার মধ্যেও নারায়ণকে দেখতে পেলাম।

অসমঞ্জ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন, চন্দ্রার গায়ে গেরুয়া নেই, কপালে ঐ বিশ্রী লাল টিপটা নেই, আগেকার মতন চন্দ্রার পরনে একটা হালকা নীল শাড়ী তার গলায় চন্দ্রাহার, হাতে সিগারেট, সে যেন দু'হাত বাড়িয়ে অসমঞ্জকে নিজের বুকে নেবার জন্য ডাকছে, এসো এসো।

॥ ৮ ॥

কোথা থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করেছে আলতাফ। সে সাইকেল রিকশা চাপে না, তার বিশ্রী লাগে। নতুন ঝকমকে টয়োটা গাড়ি, সঙ্গে উর্দি পরা ড্রাইভার। বাবুলও বেরুচ্ছিল আলতাফ বললো চল কোথায় যাবি তোরে নামায়ে দেবো।

এই গরমেও আলতাফের পরনে থ্রী পিস্ সুট, গলায় চওড়া টাই চোখে সান গ্লাস। সে ওয়েস্টকোটের পকেটে দু'আঙুল রেখে কায়দা করে কথা বলে। তার পায়ের জুতো জোড়া দেখলেই বোঝা যায় ঐ জুতোর দামে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো চাষী পরিবারের ছ'মাসের সংসার খরচ চলে যেতে পারে। বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট খুলে সে উদার ভাবে বিলোয়, নিজের সিগারেটটা আধখানা ফুরোবার আগেই সে ফেলে দেয় অবহেলায়। আগেও সে শৌখিন প্রকৃতির ছিল, এখন জার্মানি প্রবাসী হয়ে, উপার্জনের সচ্ছলতায় অমিতব্যয়ী বিলাসী হয়েছে।

দুই ভাইয়ের চেহারা ও স্বভাবে অনেক অমিল। আলতাফ ইদানিং হৃষ্টপুষ্টের চেয়েও কিছু বেশি বাবুল রোগা পাতলা। আলতাফ প্রগলভ বাবুল লাজুক ও মিতভাষী, আলতাফ সম্ভোগ পরায়ণ, বাবুল ব্যক্তিগত সাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে উদাসীন।

গাড়িতে উঠে আলতাফ বললো, উরে ব্বাইশ রে, কী গরমডা পড়ছে রে। তারপর সে সাহেবী কায়দায় টাইয়ের গিঁটে একবার অন্যমনস্ক ভাবে হাত ছোঁয়ালো। ছোট ভাইয়ের দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলে বললো, আমি মিজান্ ভাইয়ের বাড়িতে বীয়ার খেতে যাবো, তুই আসবি নাকি আমার সাথে?

বাবুল যে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে একথা আলতাফকে সে অন্তত চারবার জানিয়েছে, কিন্তু আলতাফের তা মনে থাকে না। সে ঘাড় নেড়ে বললো, না আমার অন্য জায়গায় কাজ আছে।

বাকি রাস্তা আলতাফ নিজের মনে অনেক কথা বলে গেল,বাবুল নীরব শ্রোতা। এলিফ্যান্ট রোডের মোড়ে নেমে পড়তে চাইল বাবুল।

আলতাফ জিজ্ঞেস করলো, এখানে কার বাসায় যাবি?

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বাবুল বললো, আছে একজন তুমি চেনো না।

নেমে পড়ে বাবুল একটা কাঁসার বাসনের শো-রুমের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের জিনিসপত্র দেখতে লাগলো অলসভাবে। যেন তার কোথাও যাবার তাড়া নেই। ঠিক অবিশ্বাস নয়, সে তার বড় ভাইকে এড়িয়ে চলতে চায়। আলতাফের ভোগবাদী দর্শন তার বড় স্থূল মনে হয়।

একটু পরে রাস্তার কয়েক বাঁক ঘুরে সে একটি বাড়ির কলিং বেল-এ ডান হাতের অনামিকা ছোঁয়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটা কুকুরের হিংস্র ঘেউ ঘেউ ডাক ভেসে এলো।

বাবুল হাসলো ঠোঁট টিপে। ট্যাটার্নি ঠিক মিলে যাচ্ছে। উনিশ শো আটান্নোর সেই সামরিক আইন জারি, কয়েকদিন পরেই ইস্কান্দার মির্জার নির্বাচন, তারপর সবাই ভেবেছিল এদেশে আর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কোনো আশা নেই। যাদের রাজনীতির সঙ্গে কিছুমাত্র সংশ্রব ছিল তারা যখন তখন গ্রেফতারের ভয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালাবার ব্যবস্থা রেখেছে এবং বাড়িতে কুকুর পুষে সম্মুখ দরজায় বসিয়েছে। ইদানিং ঢাকা শহরে কুকুরের ডাক আগের তুলনায় অনেক বেশি শোনা যায়।

কেউ একজন প্রথমে কুকুরটাকে বাঁধালো কোনো উপায়ে দরজার বাইরের আগন্তুককে দেখে

নিয়ে তারপর দরজা খুললো।

পায়জামা ও গেঞ্জি পরা এখন ত্রিশোর্ধ যুবক অনেক খানি ভুরু তুলে নাটকীয় ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, আরে বাবুল মিঞা কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ যেন মেঘ না চাইতে পানি। তুমি বিশ্বাস করবা না, আমরা এতক্ষণ তোমার কথাই বলতেছিলাম।

বাবুল সামান্য হেসে বললো, কী খবর পল্টনভাই? সব ঠিকঠাক আছে?

যুবকটি বাবুলের কাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, বাবুল আমার বাবুল রে। তোরে পাইলে যাইতাম আমি কাবুল রে। এতদিন কোথায় ছিলি? বিয়ে শাদী করে শালা একেবারে ভাগলবা। আমরা কি তোর কেউ না?

বাতাসে গন্ধ পেয়েবুল ঐ পল্টন নামের লোকটির এতখানি উচ্ছাস ও আতিশয্যের কারণ বুঝতে পারলো। পরিষ্কার জিনের গন্ধ। বেলা বারোটা এখনও বাজেনি, এর মধ্যেই পল্টন মাতাল হয়ে গেছে।

পল্টন তাকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল।

পল্টন ওরফে আবুল হোসেনদের বাড়ি ছিল পশ্চিম বাংলায়। ওর বাবা সরকারি চাকরি করতেন বর্ধমানে, পার্টিশানের সময় অপশান দিয়ে তিনি সপরিবারে ঢাকা চলে আসেন। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তিনি একটা বইয়ের দোকান ও প্রেস খোলেন বাংলা বাজারে, আবুল হোসেন এখন সেই ব্যবসা চালায়। এই দোকানের পেছনের একটা ছোট ঘরে প্রতিদিন বিকেল থেকে জমতো এক প্রচণ্ড আড্ডা, ছাত্র জীবনের শেষে বাবুলও তাতে যোগ দিয়েছিল। বন্ধু বান্ধবরা সবাই আবুল হোসেনকেপল্টন নামেই ডাকে। ঐ নাম তার বাপ-মায়ের দেওয়া নয়, রোগা লম্বা চেহারা জন্য আগে তাকে বলা হতো তালপাতার সেপাই, তখন তাদের বাড়ি ছিল পুরানা পল্টনে, সেই থেকে পল্টন। বন্ধু-বান্ধবদের আদর আপ্যায়নে পল্টন অত্যন্ত উদার।

বইয়ের দোকানের সেই আড্ডাখানায় অবধারিত ভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল রাজনীতি, এক সময় কয়েকজন আড্ডাধারী রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তার ফলে পল্টন ছ'মাসের জন্য জেল খেটে এসেছে।

আজ ছুটির দিন ছিল, তাই আড্ডা বসেছে বাড়িতে। সামনের দিকের দু'তিনখানা ঘর পেরিয়ে একেবারে শয়ন কক্ষে। মস্ত বড় পালঙ্কের ওপর পুরু গদির বিছানা পাতা, তার কোণে কোণে বসেছে পাঁচ ছ'জন মাঝখানে ছড়ানো তাস, তিন চারটে অ্যাশট্রে ভর্তি সিগারেটের টুকরো, পাশের একটা টুলের ওপর রাখা কয়েকটি বীয়ার ও একটি লন্ডন ড্রাইজিনের বোতল, প্রত্যেকের হাতে হাতে গ্লাস।

বাবুল দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালো। দৃশ্যটি তার পরিচিত, শুধু ঢাকা শহর নয়, মফঃস্বলেও অনেক বাড়িতে ইদানিং এ দৃশ্য দেখা যায়।

সাত-আট বছর আগে পল্টনের দোকানে বা বাড়ির আড্ডায় মদ ছিল না, তাস ছিল না। কাপের পর কাপ চা আসতো, সঙ্গে পেঁয়াজি ও কাবাব আর সিগারেট ছিল অফুরন্ত। তখন কথা বলাটাই ছিল প্রধান নেশা।

আটান্ন সালে সমস্ত রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ হবার পর এবং যখন তখন জেলে যাওয়ার আশঙ্কায় যখন অনেকের মন আচ্ছন্ন, তখন সময় কাটাবার উপায় হিসেবে আসে সুরা। ঢাকা শহরে এখন হাত বাড়ালেই মদ পাওয়া যায়, গরিব লোকেরাও কেরোসিন আনতে যায় বিলিতি মদের বোতলে।

পুলিসের নজর এড়াবার জন্য বাবুল যেমন মফঃস্বলে চাকরি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তেমনি যারা ঢাকা শহরে রয়ে গেল, তারা অনেকেই আত্মগোপন করলো মদের নেশায় ও তাস খেলায়, সহজে কেউ রাজনীতির আলোচনা করে না, কেন না, দেয়ালেরও কান আছে। প্রচুর লোক এখন ইনফমার হয়েছে কে যে শত্রু আর কে যে বন্ধু বোঝা দায়।

ছ'জন তাসের জুয়াড়ীদের মধ্যে বাবুল চারজনকেই চেনে আগে থেকে। জহির, বাচ্চু, মণিলাল, বসির। খেলার নেশায় সবাই গম্ভীর। অপরিচিত দু'জনের মধ্যে একজনের মুখে জঙ্গলের মতন দাড়ি, মাথায় টুপি।

পল্টন বললো, দ্যাখো দ্যাখো কে এসেছে দ্যাখো। আর একটা পুরানো পাপী। সবাই মুখ তুলে তাকালো। মণিলাল হাত তুলে বললো, আরে বাবুল চৌধুরী যে, আদাব, আদাব।

তারপর সে অন্যদের বললো বাবুল চৌধুরী আইয়া পড়ছে, এখন খেলা ছাড়ান দাও, ওর খবর

শুনি।

বসির বললো, দাঁড়া, এই রাউণ্ডটা শেষ করো। আমি ভাই প্রচুর হারছি। বাবুল খেলবি নাকি?

বাবুল স্মিত হেসে মাথা নাড়ালো, সে কোনো রকম তাস খেলাই জানে না।

পল্টন একটা খালি গেলাস তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী খাবি, জিন না বীয়ার?

বাবুল মদ্যপানও করে না কিন্তু সে কথা প্রথমেই বললে এরা হই হই করে উঠবে তাই বললো আগে শুধু পানি খাবো যা গরম।

মণিলাল নিজের পাশের জায়গাটা চাপড়ে বললো আসো বাবুল এইখানে বসো।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো মণিদা তোমার ব্যবসাপত্তর কেমন চলছে?

মণিলাল বললো ভালো। আমার তাসটা একটু ছুঁইয়া দাও তো, যদি লাক ফেরে। ঐ জহিরটা ডাকাইতের মতন জেততে আছে।

দাড়িওয়ালা টুপি মাথায় লোকটি মুখ তুলে বললো কী রে বাবুল ঢাকায় ফিরলি কবে?

কণ্ঠস্বর শুনে বাবুল চমকে উঠে বললো, আরে কামাল? কী সাজ করেছিস? আমি তো চিনতেই পারিনি। ভাবলাম বুঝি কোন্ এক মোল্লার পো এসে বসেছে।

কামাল বললো হ্যাঁ মোল্লাই সেজেছি। কোন্ পাড়ায় আছি জানিস না তো। আমার বাসার লোকেরা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে।

–কেন, কী হয়েছে?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কামাল তার পাশের লোকটিকে দেখিয়ে বললো, তুই বোধহয় এরে চিনিস না। ইনি ইউসুফ সাহেব মীরপুরে থাকেন।

ইউসুফ বেশ গোলগাল, গৌরবর্ণ পুরুষ মাথায় চুল লালচে রঙের চোখে ঈষৎ রঙীন চশমা। সে হাত তুলে বললো, আস্সালাম আলাইকুম।

পল্টন বললো, ইউসুফ সাহেব আমারই মতন এক মোহাজের। ওঁর বাড়ি ছিল বিহারের ভাগলপুর জেলায়।

বসির বললো মোহাজেরকী রে ব্যাটা। বল্ রিফিউজি। ঐ কথাটা বুঝি বলতে খারাপ লাগে?

বাবুল ইউসুফের দিকে তাকিয়ে আলাইকুম আস্সালাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপ কব্ আয়া?

দু'তিনজন সমস্বরে বললো, আরে এ বাংলা জানে, বাংলা জানে।

ইউসুফ বললো আমি এসেছি গত বছর। কাশ্মীরে হজরত বাল চুরি হবার পর যে দাঙ্গা হলো, তখন আর থাকা গেল না।

কামাল বললো, কাশ্মীরের রসুলুল্লাহের পবিত্র কেশ সেখানে ছিল? সত্যি কেউ চুরি করেছিল? তাও তো কেউ জানে না। শুধু একটা গুজবের জন্য ইন্ডিয়ায় মরলো কত নিরীহ লোক।

পল্টন বললো, আর এখানে কী হয়েছিল? ঢাকায়, নারায়ণগঞ্জে? এখানে যা হয়েছে সেটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও নয়, একতরফা খুন। আমি নিজের চোখে কত দেখেছি ভাবলেও এখনো বমি আসে। গড় অঞ্চলের আদিবাসীরা, সেবেচারিরা কাশ্মীরের নামও শোনেনি।

জহির মণিলালের পিঠে এক চাপড় মেরে হাসতে হাসতে বললো, এই মণিটা গত বছর বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। ব্যাটার কাছে আমার অনেক টাকা ধার। আমি ওরে হাতের কাছে পাইলে সেই সুযোগে বিসমিল্লাহ্ আল্লাহ আকবর বলে কোরবানি করে দিতাম।

মণিলাল হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, ভাই ওসব কথা বাদ দাও। খ্যালতে চাও তো খ্যালো, না হয় অইন্য কথা কও।

কামাল বললো ঐ কাশ্মীর হইলো ইন্ডিয়া পাকিস্তান দুই দেশেরই গলার কাটা।

মণিলাল রাগের সঙ্গে বললো আবার ঐসব কথা।

পল্টন ঘরের সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর বাবুলকে জিজ্ঞেস করলো, তুই গত বছর সেই সময় কোথায় ছিলি?

বাবুল উত্তর দিল বরিশালে। সেখানে বিশেষ কিছু হয়নি। হাওয়া গরম হয়েছিল বটে খানিকটা স্থানীয় লোকেরা আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন ছড়াতে দেয়নি।

পল্টন বললো, তুমি বোধ হয় জানিসনা, জহির সেই সময় অনেক কাজ করেছে। ওর চেষ্টায়

বেঁচে গেছে শত শত মানুষ। মণিলাল ওর বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল এক মাস।

জহির বললো, আরে ধ্যাৎ আমার বাসায় কে কইলো তোরে, আমার এক মামার বাসায়। সেখানে আমি যাওয়ার চান্স পাই নাই। নইলে সত্যিই সেই মওকায় আমার সব ধার কাটান কুটিন করে ফেলতাম। এই শালার সাথে তাসখেলতে বসলেই আমি হারি।

মণিলাল বললো আজ তুই জেতছোস।

জহির বললো ঐ জন্যই তো তুই তখন থেকে খেলা ভণ্ডুল করার সুযোগ খুঁজছিস। শালা কায়স্থর কুটিল বুদ্ধি।

পল্টন বললো, গেলাস খালি কেন, গেলাস খালি কেন?

এর পর কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ রেখে ব্যক্তিগত খবরাখবর বিনিময় হলো। বাবুলকে দেখে সবাই খুশী। বাবুল কম কথা বলে, কিন্তু এক একজনের উপস্থিতির মধ্যেই একটা মনোরঞ্জনের ব্যাপার থাকে, ববুলকে সেই কারণে সবাই ভালোবাসে।

এক সময় কামাল বললো, জানিস বাবুল, ইউসুফ সাহেব ভাল বাংলা গান জানে।

বাবুল কৌতূহলী হয়ে তাকাতেই ইউসুফ লাজুকভাবে বললো, আমি ভাগলপুরের বাংগালীদের ইস্কুলে কিছুদিন পড়ালিখা করেছিলম। তখন দু'চারটা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখেছি। সব গানের কথা মনে থাকে না।

–এই পল্টন তোর বাড়িতে গীতবিতান নেই?

–আছে, কিন্তু ইউসুফ বাংলা পড়তে জানে না। একদিন দেখি কি উর্দু হরফে রবীন্দ্রসঙ্গীত সামনে রেখেছে, তাই দেখে দেখে গাইছে। ইউসুফ তোমার পকেকেট সেই কাগজ নেই?

ইউসুফ মাথা নেড়ে বললো, আজ তো সঙ্গে আনিনি, আর একদিন শুনাবো।

কামাল তবু পীড়াপীড়ি করে বললো, দু'চার লাইন গাও। যেটুকু মনে আছে।

শেষ পর্যন্ত ইউসুফ রাজি হয়ে চোখ বুজে খানিকক্ষণ সুর ভাঁজলো। তার কণ্ঠস্বর শুনলেই বোঝা যায় ক্লাসিকাল ট্রেনিং আছে। তারপর সে যে গানটি শুরু করলো তা শুনে একই সঙ্গে চমকিত ও পুলকিত হলো বাবুল। "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরাণ সখা বন্ধু হে আমার...।" গানটি বাবুলের খুবই প্রিয়।

গানটি শুনতে শুনতে বাবুলের একটা নতুন উপলব্ধি হলো।

ভারত থেকে অনেক মুসলমান চলে এসেছে এদিকে, এই সব রিফিউজিরা পূর্ব পাকিস্তানে নানান সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বিহার থেকে যারা এসেছে, তাদের সম্পর্কে স্থানীয় মানুষদের মনোভাব মোটেই ভাল নয়। এই বিহারীরা বাঙালীদের সঙ্গেও একাত্মতা বোধ করে না, এদের সমমর্মিতা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে এরা উর্দু ভাষার পক্ষে বাংলাভাষী মুসলমানদের এরা খানিকটা কম মুসলমান মনে করে বাঙালীদের প্রতি এদের যেন অবজ্ঞার ভাব আছে।

বিহারী মুসলমান শুনলে বাবুলের মনেও একটা বিরাগ ভাব জন্মায়। সে মনে মনে বলে অতই যদি উর্দু ভাষা প্রীতি আর কট্টর ইসলামী হতে চাও, তাহলে তোমরা ঢাকায় এলে কেন? লাহোর বা করাচীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেই পারতে।

কিন্তু আজ বাবুল একজন বিহারী মুসলমানকে দেখছো, যে উর্দু হরফে লিখে বাংলা গান গায়। রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে সে, কণ্ঠে কী দরদ।

সব মানুষকেই তার জাতি পরিচয় বা ধর্মীয় পরিচয়ে বিচার করা কত ভুল। বাবুল নিজেকে সব রকম সংস্কার মুক্ত মনে করে, কিন্তু তারও তো এরকম ভুল হয়।

কথা না ভুলে গিয়ে পুরোপুরিই গানটা সুন্দর ভাবে গাইলো ইউসুফ। বাবুল তৎক্ষণাৎ অনুরোধ করলো আর একটা....।

ইউসুফের মেজাজ এসে গেছে, সে এবার ধরলো "পুরানো সেই দিনের কথা..সেও কি ভোলা যায়.."

ইউসুফের গান শুনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পল্টনর স্ত্রী নীলা। বাবুল হাতছানি দিয়ে বললো, আসুন এখানে এসে বসুন।

[নী]লা কলকাতার মেয়ে, এখনো পূর্ব বাংলার ভাষা একটুও বলতে পারে না। পল্টনও ভালো মতন [পারে] না, কিন্তু চেষ্টা করে। নীলার সে চেষ্টাও নেই। সে বরং মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, তোমাদের বাঙালদের ভাষা বাপু আমি বুঝি না।

নীলার পাশে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে বাবুল লজ্জা পেয়ে গেল। এই মেয়েটি নীলার ছোট বোন এর নাম দিলারা। এই দিলারার সঙ্গে বাবুলের বিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। পল্টন দিলারার সঙ্গে বাবুলের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তো বটেই, একবার সবাই মিলে এক সঙ্গে পিকনিকে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাবুল ততদিনে মঞ্জুকে দেখে ফেলেছে। মঞ্জুই জুড়ে আছে তার ধ্যান জ্ঞান।

দিলারার অবশ্য বিয়ে হয়ে গেছে এতদিনে। তার ব্যবহারে কোনো আড়ষ্টতা নেই। নীলার সঙ্গে এসে সেও বসলো বিছানার এক ধারে।

মহিলাদের প্রতি সম্ভ্রম দেখবার জন্য অন্য সবাই মদের গেলাস নামিয়ে রাখলো, একমাত্র পল্টন ছাড়া। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে গান শুনে একটু একটু দুলছে। বাবুল আগে জানতো, পল্টন খুব একটা গানের ভক্ত নয়। বেশিক্ষণ গানটা চললে সে অবৈধ হয়ে উঠতো। এখন কি তার স্বভাব বদলেছে?

নীলা আর দিলারা বসেছে একেবারে বাবুলের মুখোমুখি। বাবুল সামনের দিকে চোখ তুলতে পারছে না, দিলারার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে ফিরিয়ে নিচ্ছে চোখ। দিলারার মুখের গড়ন অনেকটা পানপাতার মতন, মাথার চুল কোঁকড়া চোখদুটি ঢলঢলে। সে কিন্তু বেশ সপ্রতিভ, এক সময় সে নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছেন বাবুলভাই? মঞ্জুভাবীকে নিয়ে এলেন না কেন?

বাবুল অস্পষ্ট ভাবে বললো, না ও আসতে পারতো না, ছেলের একটু জ্বর।

পল্টন বললো, তোর ছেলে হয়েছে বুঝি? স কথা আমাদের বলিসনি এতক্ষণ? খাওয়াবি না আমাদের?

কামাল বললো, জিন তো ফুরিয়ে গেছে। বাবুলকে দিয়ে আর একটা বোতল আনাও। গান থেমে গেছে। নীলা উঠে দাঁড়িয়ে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো, তোমরা আরও খাবে? এবার বন্ধ করো।

পল্টন বললো, এর মধ্যেই কী? তোমার রান্না হয়েছে?

জহির জিজ্ঞেস করলো, কী রান্না করেছেন ভাবী? শুঁটকি মাছ হয়েছে নাকি? তাহলে এখন নিয়া আসেন, একটু চাট হিসাবে খাই।

নীলা কলকাতার মেয়ে হলেও এখানে এসে চমৎকার শুঁটকি মাছ রান্না করতে শিখেছে, জহিরের বাড়ি চট্টগ্রামে, সেও সার্টিফিকেট দিয়েছে।

নীলা দু' প্লেট শুঁটকি মাছ নিয়ে এলো, একটা চিংড়ির অন্যটা বম্বে ডাকের। পল্টন খাটের তলা থেকে আর একটা নতুন জিনের বোতল বার করে সগর্বে দেখালো। মণিলাল-জহিররা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললো সাবাস মিঞা। আরে পল্টন তো দেখছি খুব রিসোর্সফুল।

এবারে বাবুলকেও ঢেলে দেওয়া হলো একটা গেলাস। বাবুলের গোঁড়ামি নেই, কিন্তু মদে সে বিশেষ স্বাদ পায় না। অনেক খানি সোডা ঢেলে একটু খানি জিভে ছুঁইয়ে সে সরিয়ে রাখলো গেলাসটা।

রুটি চিড়ে খানিকটা শুঁটকি মাছ মাখিয়ে মুখে ভরে দিয়ে জহির দু'চোখ ঘোরাতে লাগলো। তারপর বললো অমৃত। অমৃত। নীলা ভাবী তোমার জবাব নেই।

ইউসুফ বিহারের মানুষ সে জানে না শুঁটকি খেতে। অন্যরা হই হই করে দীক্ষা দিতে লাগলো তাকে। তিন চারজন বেশ মাতাল হয়ে গেছে পল্টনই সব চেয়ে বেশি। ইউসুফের মুখের সামনে বীয়ারের গেলাস ধরে সে বলতে লাগলো ঝাল লেগেছে তাতে কী বীয়ার খাও বীয়ার খাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।.

এই সুযোগে উঠে পড়লো বাবুল। তাকে বাড়ি ফিরতে হবে মঞ্জু বসে থাকবে। বাবুলের সঙ্গে সঙ্গে কামালও বেরিয়ে এলো জোর করে। দু'জনে হাঁটতে লাগলো বড় রাস্তার দিকে।

কামাল বেশ শক্ত ধরনের মানুষ তার একটুও নেশা হয়নি। বাংলা বাজারে বইয়ের দোকানের আড্ডায় কামাল ছিল প্রধান তাত্ত্বিক, কথায় কথায় উদ্ধৃতি দিত নানা বই থেকে।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, তুই এরকম পোশাক করেছিস কেন বললি না তো।

কামাল বললো, তুই শুনিসনি, আমার বাবা গত বছর প্রচণ্ড মার খেয়ে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গেছেন।

–কেন, মার খেয়েছিলেন কেন? কারা মেরেছিল?

–উনি দাঙ্গা থামাতে গিয়েছিলেন। তুই জানিস না বোধ হয় আমার বাবা সত্যিই এক মৌলবীর সন্তান, কিন্তু এখনকার মৌলবীদের সঙ্গে ওনার মেলে না। আমাদের পাড়াটা হয়েছে জামাতে ইসলামীদের আড্ডা।

–তুই এখন কাজকর্ম কী করিস?

–সিনেমা লাইনে গেছি ডায়লগ স্ক্রিপ্ট লিখি।

–বাংলা সিনেমা। এগুলি তো একেবারে অগ্রাহ্য।

–কিন্তু এটাই সবচেয়ে নিরাপদ লাইন। আমার কিছু করে খেতে হবে তো। পয়সা মন্দ দেয় না।

বাবুল হাসতে লাগলো। কামালের মতন পড়ুয়া মানুষ, মার্কসবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে কথায় কথায় তর্ক তুলতো, সে প্যানপেনে প্রেমের গল্প মার্কা নিকৃষ্ট বাংলা ছবির সংলাপ লিখছে, এটা যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

কামাল একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকটা দুঃখের সঙ্গে বললো, জানিস বাবুল, আত্মগোপন করতে গিয়ে কিছুদিন পর অনেকে আত্মপরিচয়টাই ভুলে যায়। আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা। পলিটিকস করা যখন নিষিদ্ধ হয়ে গেল, তখন মিলিটারির ভয়ে অনেকেই অন্য লাইনে চলে গেল। পল্টনের মতন কেউ কেউ মজে গেল মদ ভাঙের নেশায়। কিন্তু এইভাবে তো দেশটা চলতে পারে না। কিন্তু অবস্থার তো আবার বদল হয়েছে, এখন আবার কিছু একটা করার সময় এসেছে, তবু অনেকেই মজে আছে নেশায়। আর বার হতে পারছে না। আজকের আড্ডাটা দেখে তোর কী মনে হলো?

কামালের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবুল খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে বললো, এখন আবার সময় এসেছে বুঝি?

কামাল বললো, কেন, তুই বুঝতে পারছিস না? আকাশ মেঘ গুরুগুরু করছে। আবার একটা বড়ঝড় আসবে, আমরা যদি সেই ঝড়ের সুযোগ না নিতে পারি..

বাবুল উদাসীন ভাবে বললো, না আমি তো সেরকম কিছু বুঝতে পারছি না। আমি এখন আর বুঝতেও চাই না।

॥ ৯ ॥

প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে বকুল গাছের নিয়ে দাঁড়ালো অলি। চারটে বেজে গেছে, তাদের বাড়ির গাড়ি এখনও আসেনি। অলির কাছে পয়সা আছে, সে অনায়াসে বাসে চড়ে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু গাড়িটা আসবার কথা, যদি জ্যামে আটকে গিয়ে থাকে তা হলে এরপর এসে ড্রাইভার কী করবে, বুঝতেই পারবে না। তাদের ড্রাইভার মন্থর বুদ্ধি বড় কম সে অলিকে না পেয়ে হয়তো এখানেই সারা সন্ধে বসে থাকবে।

শ্যামবাজারের দিক থেকে একটা মিছিল আসছে। মিছিলটা কাছে এসে পড়লে আর রাস্তা পার হওয়া যাবে না।

তার পাশে আর তিনটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো। মালবিকা, নাসিম আর বর্ষা, এরা তিনজনেই হিস্ট্রি অনার্সের। মালবিকা থাকে ভবানীপুরের দিকে মাঝে মাঝে অলির সঙ্গে ফেরে। সে জিজ্ঞেস করলো, অলি এক্ষুনি বাড়ি যাবি? আমরা কফি হাউসে একটু কফি খেতে যাচ্ছি।

অলি ভাবছিল সে কোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে বাড়িতে ফোন করবে কি না। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার অনেক প্রকাশকই তার বাবার চেনা, অলিদের বাড়িতেও অনেকেই আসেন। কফি হাউসে যাবার প্রস্তাব শুনে অলি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

ওরা প্রায় দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে এলো মিছিলটা আসবার আগেই। একটা পুলিসের গাড়ি জোরে হর্ন বাজাতে বাজাতে আসছে উল্টো দিক থেকে।

সিঁড়ির মুখে ইসমাইলের সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটি ছেলে, ওরাও প্রেসিডেন্সির সায়েন্সের ছাত্র মুখ চেনা। একজন মুখ ফিরিয়ে আলটপকা মন্তব্য করলো, এসপ্লানেডে ল্যাঠি চার্জ হচ্ছে। আজ আর বাড়ি ফেরা হবে না।

মালবিকারা কান দিল না ওদের কথায়। অলি ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় কাঁপছে। ওপরে কি বাবুলদা থাকবে? বাবলুদা তো প্রায়ই কফি হাউসে আড্ডা মারতে আসে। অলি আজ নিয়ে মাত্র তৃতীয়বার এলো কফি হাউস, এখানকার চ্যাঁচামেচি ও সিগারেটের ধোঁয়া তার পছন্দ হয় না।

বাবলুর সঙ্গে অলির দেড় মাস দেখা হয়নি। সেদিন সেই ঝড় বাদলার দিনে বাবলু অলিকে খুব কাঁদিয়েছিল। আচম্বিতে বাবলু অলির শরীর নিয়ে খেলা করতে শুরু করে অলির তা একটুও বালো লাগেনি চোরের মতন হুড়োহুড়ি করে ওরকম আদর অলির একটুও পছন্দ নয়। তার কাছে প্রেম একটা পবিত্র ব্যাপার, সে মনে মনে স্বপ্ন দেখতো, একদিন কোনো প্রিন্স চার্মিং তার হাতে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলবে, তোমার জন্য যদি আমি অপেক্ষা করতে চাই তুমি কি তার অনুমতি দেবে?

অলি কোনোক্রমে বাবলুর আলিঙ্গন ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, ছিঃ ছিঃ, বাবলুদা, তুমি এরকম তুমি আর কোনোদিন আমাদের বাড়িতে এসো না।

বাবলু বিশেষ পাত্তা দেয়নি, হাসছিল। অলি দ্বিতীয়বার ঐ একই কথা বলায় বাবলু বলেছিল এ বাড়িতে আসবো কি না আসবো, সেসম্পর্কে তুই বলার কে রে? এটা তোর বাড়ি? এটা কাকাবাবুর বাড়ি আমার যখন খুশী আসবো।

অলি বলেছিল, আমার সঙ্গে তুমি আর কখনো দেখা করার চেষ্টা করো না।

বাবলু অলির মাথায় একটা ছোট্ট চাঁটি মেরে বলেছিল, এতে কাঁদবার কী আছে? এমন কিছু করা হয়নি। তুই কি কচি খুকি নাকি?

তারপর সে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সে বুলির সঙ্গে হাল্‌কাভাবে দু'একটা ইয়ার্কি করে গেল।

কিন্তু সে আর সত্যিই আসেনি একবারও তারপর। আগে সে সপ্তাহে অন্তত দু'তিনদিন তার বাবার প্রুফ বা পাণ্ডুলিপি পৌঁছে দেবার জন্য আসতো বিমানবিহারীর কাছে, সে জন্যও এলো না। বাবলু যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেদিন অলি অনেকক্ষণ কেঁদেছিল, বুকের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য কষ্ট। সে কিছুতেই ভুলতে পারছিলনা। সেই চমৎকার বৃষ্টির দিনের ভালো লাগা, তার ওপরে পড়েছিল কালো কালির ছাপ। রাগের চেয়েও বেশি অভিমান হয়েছিল বাবলুর ওপর, সে বন্ধুত্বের মূল্য দিতে জানে না?

এরপর দেখা হলে সে বাবলুর সঙ্গে নিছক ভদ্রতার সম্পর্ক রাখবে ঠিক করেছিল। কিন্তু সে আর একাই না? এটাও অলির কাছে অবিশ্বাস্য লাগে, এরকম কেন বাবলুর চরিত্রের সঙ্গে মানায় না।

কোনোক্রমে সাতটা দিন পার হার পর অলিই বাবলুর জন্য ছটফট করেছে। অত্যন্ত ঝগড়া করার জন্যও তার বাবলুকে দরকার। কিন্তু কোথায় বাবলু? সে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে অলিদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই তার যাতায়াতের পথ, প্রত্যেক বিকেলবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকেও অলিতাকে একবারও দেখতে পায়নি।

বাবলুদের বাড়ি বেশি দুরে নয়, অলি ইচ্ছে করলেই যেতে পারে। আগে তো তারা দুই বোন বাড়ির একজন কাজের লোককে সঙ্গে নিয়ে কতবার গেছে। কিন্তু সেদিনের পর অলি কেন যেন বাবলুদের বাড়িতে যেতে সাহস পায় না। ওকে তো বিশ্বাস নেই, হঠাৎ সকলের সামনে কী বলে দেবে কে জানে।

কফি হাউসে বাবলু আসে কিন্তু অলি একা একা কফ হাউসে বাবলুকে খোঁজার জন্য আসার কথা ভাবতে পারে না। বাবলু সম্পর্কে তার মনের মধ্যে একটা ভয়ও ঢুকে গেছে। দোতলায় উঠে মালবিকা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় বসবি?

বর্ষা বললো, ওপরে আরও ওপরে, এই জায়গাটা বিচ্ছিরি।

দোতলায় কফির দাম একটু কম। এখানে সব টেবিল জুড়ে বসে থাকে আড্ডাধারীরা, কেউ কেউ দুপুর তিনটেয় বসে, রাত আটটার আগে ওঠে না। তিন কাপ কফি পাঁচ জনের ভাগ করে খায়। কলকাতার একমাত্র এই কফি হাউসেই ফরাসী নিয়ম এখানে কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিছু অর্ডার না দিয়ে চেয়ার দখল করে বসে থাকলেও বেয়ারারা তাকে উঠে যেতে বলার সাহস পায় না।

তিনতলার ব্যালকনিতে খরচ সামান্য বেশ মেয়েরা সাধারণত এখানেই আসে। এখানে সহজে টেবিল ফাঁকা পাওয়া যায় না, চেয়ার টেনে নিয়ে অন্যের টেবিলে বসে পড়ার প্রথা আছে। আজ কিন্তু দু'তিনটি টেবিল কালি। কয়েকটি ছেলে জানালার পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে রাস্তায়।

ওরা চারজনে একটা টেবিলে বসলো। মালবিকা আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বললো, আমার মাটন

ওমলেট খেতে ইচ্ছে করছে। জানিস, বাড়িতে এটা বানাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখানকার মতন স্বাদ হয় না।

বর্ষা জিজ্ঞেস করলো, দুধ দিয়েছিলি?

–দুধ?

–ডিমটা ফ্যাটাবার সময় কয়েক ফোটা দুধ দিতে হয়। তাতে ওমলেটটা বড় হয়ে ফুলে যায় আর নরম হয়।

–ওমা, সেটা জানতুম না।

আমাদের বাড়িতে আসিস একদিন, করে দেখিয়ে দেবো।

মালবিকা সবার দিকে তাকিয়ে বললো, তাহলে চারটে মাটন ওমলেট বলি? নাসিম ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বললো কিন্তু ভাই, উই উইল গো ডাচ্।

বর্ষা বললো ডেফিনিটলি।

প্রত্যেকেই ছোট ছোট পার্স খুলে দুটি করে টাকা বার করে রাখলো টেবিলের ওপর। নাসিম বললো, আমি পরে কোল্ড কফি খাবো।

জানলার ধারের ছেলেগুলি কী যেন দেখে হৈ হৈ করে ছুটে গেল নিচে।

অলি টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে দোতলার দিকে তাকালো। সিঁড়ির ডান পাশের কয়েকটি টেবিল ছাড়া আর অনেকখানিই দেখা যায়। তার কোনো টেবিলেই বাবলু নেই। বাবলুর এক বন্ধু কৌশিককে চিনতে পারলো অলি, কৌশিক তার দিকে তাকালো একবার। বাবলু এলে ঐ টেবিলে বসাটাই স্বাভাবিক ছিল। কৌশিকদের টেবিলে কিসের যেন উত্তেজিত তর্ক হচ্ছে।

বর্ষা জিজ্ঞেস করলো, তুই কাকে খুঁজছিস রে, অলি?

টেবিলে ফিরে এসে অলি বললো, তুই চিনবি না। আচ্ছা বাইরে এত গোলমাল হচ্ছে কেন?

মালবিকা বললো, ঐ যে কী একটা মিছিল এলো দেখলি না? আর পারা যায় না, রোজই মিছিল আর মিছিল।

পাশের টেবিলে বসে আছে তিনটি ছেলে, ওদরে অচেনা। তাদের একজন হঠাৎ উঠে এসে বললো, এক্সকিউজ মি, আপনাদের কার কাছে কলম আছে? একটু দেবেন?

আপনাদের বললেও ছেলেটি হাত বাড়িয়েছে নাসিমের দিকেই চার কন্যার মধ্যে নাসিমই সবচেয়ে দর্শনীয়া। সে খানদানি মুসলমান বংশের মেয়ে তার গায়ের রং দুধে আলতা। অন্য তিনজনের তুলনায় সে বেশি লম্বা।

নাসিম কলমটা এগিয়ে দিল। ছেলেটি নিজের বা-হাতের তালুতে একটুকরো কাগজ রেখে খস খস করে কিছু লিখে কলমটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো থ্যাঙ্ক ইউ।

অন্য তিনজন মুখ লুকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। সবাই জানে, এই কলম চাওয়াটা আর কিছুই না, একটু আলাপ করার ছুতো। ওরা সম্পূর্ণ গম্ভীর না থাকলে হতো ছেলেটি আরও কিছু বলতো। কিংবা, ঐ ছেলেটি তার বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলেছে দ্যাখ, ঐ ফর্সা মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে পারি কি না।

নিচের তলায় কারা যেন হুড়োহুড়ি দৌড়োদৌড়ি করছে, একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হলো। পাশের টেবিলে ছেলে তিনটি উঠে গিয়ে দেখলো উঁকি দিয়ে, কিন্তু এই চার কন্যার কোনো কৌতূহল নেই।

মাটন ওমলেট সত্যি বেশ উপাদেয়। ওদের খিদেও পেয়েছিল পয়সার হিসেব করে দেখা গেল, ওরা সিঙ্গল এর বদলে ডাবল ডিমের অর্ডার দিলেও পারতো। এরপর কফি। প্রথম চুমুক দিয়ে নাসিম জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, 'পরফিরিয়াজ লাভার' কবিতাটা ব্রাউনিং-এর লেখা, তাইনা?

অলি মাথা নাড়লো।

নাসিম আবার জিজ্ঞেস করলো, কবিটা ভালো মনেপড়ছে না, পরফিরিয়াকে তার প্রেমিক গলা টিপে মেরে ফেললো, তাই না?

অলি বললো গলা টিপে নয়, পরফিরিয়ারই চুল জড়িয়ে।

–কেন মেরেছিল? একটু বলো না। অলি ইংলিশ অনার্সের ছাত্রী তাকে ওরা মাঝে মাঝে এই সব প্রশ্ন করে।

অলি মৃদু গলায় কবিতাটা বর্ণনা করতে লাগলো, মালবিকা একটু অন্যমনস্ক, সে শুনছে না। বর্ষা তার খোলা চুলে আঙুল চালাচ্ছে। বর্ষা কখনো চুলে খোঁপা করে না, ঐরকম আঙুল চালানো স্বভাবের জন্য তার চুল সব সময় উস্কো খুস্কো দেখায়। সে কোনোরকম প্রসাধনই করে না। দিনের পর দিন একটা শাড়ি পরে কলেজে আসতেও তার লজ্জা নেই। বর্ষার বাবা মারা গেছেন কিছুদিন আগে, তার বাড়ির অবস্থা সচ্ছল নয়।

বর্ষা হঠাৎ মন্তব্য করলো, অদ্ভুত কবিতা। শুধু শুধু মেয়েটাকে মেরে ফেললো? পুরুষরা এরইরকমই লেখে। ওথেলো ডেসডিমোনাকে মেরে ফেললো কী একটা তুচ্ছ সন্দেহ করে অলি থেমে গেল।

বর্ষা আবার জিজ্ঞেস করলো, নাসিম হঠাৎ তোর এই কবিতাটার কথা মনে পড়লো কে। নাসিম দুঃখিত স্বরে বললো, আমার এক বোন আমার ফুফার মেয়ে এলাহাবাদে থাকতো, সে হঠাৎ আত্মহত্যা করেছে। কি তাকে একজন ভালোবাসতো খুব।

বাইরে রাস্তায় পর পর দুটি বোমা পড়ার প্রচণ্ড শব্দ হলো।

বর্ষা বললো, এই বোমা টোমা পড়ছে কী করে যে বাড়ি যাবো?

বর্ষা বললো, ওসব একটু বাদে থেমে যাবে। বোস্ না। নাসিম কীবলছে শোন।

নাসিম বললো, আমার বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে সুখী ছিল না, আমি জানতাম আমাকে চিঠি লিখতো প্রায়ই, ঐ যে আর একজনের কথা বললাম, সে ও আমার দূর সম্পর্কের ভাই হয়।

–তাহলে তার সঙ্গে-ই বিয়ে হলো না কেন? তোদের তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিয়ে হয়।

–আমার সেই ভাইয়ের একবার টি বি হয়েছিল।

হুড়মুড়করে লোক ঢুকে আসছে দোতলায়। দড়াম দড়াম করে জানালা বন্ধ হবার শব্দ হচ্ছে। কৌশিক দৌড়ে তিনতলায় উঠে এসে ওদর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, বাইরে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে, আর আপনারা এখানে নিশ্চিন্তভাবে গল্প করছেন।

বর্ষা মুখখানা কঠোর করে বললো, আপনি?

অলি বললো, এর নাম কৌশিক, আমি চিনি। কী হচ্ছে বাইরে?

কৌশিক বললো, আপনারা সত্যি অদ্ভুত। শুনতে পাচ্ছেন না? পুলিশ গুলি চালাচ্ছে।

নাসিম সরলভাবে জিজ্ঞেস করলো, কখন থামবে?

কৌশিক বললো, পুলিশ কি আমাকে জিজ্ঞেস করে গুলি চালাচ্ছে? শিয়ালদার দিক থেকে আর একটা মিছিল আসছে এরপর আর আপনারা বাড়ি ফিরতে পারবেন না।

মালবিকা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এই চলচল।

রাস্তায় আবার দুটি বোমা ফাটলো। ধুপ ধুপ শব্দে টিয়ার গ্যাস সেল ফাটার আওয়াজ। তারই মধ্যে মুহুমুহু ইনক্লাব জিন্দাবাদ শ্লোগান।

মালবিকা কৌশিককে জিজ্ঞেস করলো পুলিশ কেন গুলি চালাচ্ছেন? কিসের মিছিল?

কৌশিক বললো কিছুই খবর রাখেন না? ক'দিন ধরে খাদ্য আন্দোলন চলছে জানেন না?

বর্ষা বললো আপনি অত ধমকে ধমকে কথা বলছেন কেন? কাগজে সবই পড়েছি। কিন্তু সে আন্দোলন তো মফস্বল কৃষ্ণনগর না কোথায় যেন হচ্ছিল।

কৌশিক অলির দিকে তাকিয়ে বললো সামনের দিকে বেরুবার উপায় নেই। পেছুন দিকে একটা রাস্তা আছে, সেদিক দিয়ে আমিবার করে দিতে পারি। যেতে চান তো চলুন। এরপর যদি আরও গণ্ডগোল বাড়ে

অলি বললো, আপনি অতীন মজুমদারকে দেখেছেন?

কৌশিক বললো, হ্যাঁ অতীন একবার এসেছিল দুপুরে, তারপর আর দেখছি না। বোধ হয় ও মিছিলে গেছে।

–মিছিলে?

–দেরি করবার সময় নেই। যাবেন তো চলুন।

অন্য কোনো টেবিলে এখন আর কেউ নেই। নিচে বিরাট কলরব। ওরা দৌড়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। দোতলায় এস কৌশিক ওদের বা পাশের একটা গলি পথে নিয়ে এলো। এর দু'পাশে বইয়ের

গুদাম। পুরোনো কাগজ আর আঠার গন্ধ। গ্যামাক্সিন আর মরা আরশোলার গন্ধে দম আটকে আসে।
গলিটা ক্রমশ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আসছে। কৌশিক এগিয়ে যাচ্ছে সামনে সামনে, মেয়েরা হোঁচট খাচ্ছে বার বার। ঝলমলে আলোকিত কফি হাউসের বাড়িটার মধ্যেই যে এরকম একটা এঁদো অন্ধকার গলি থাকতে পারে তা ওরা কেউ কল্পনাই করতে পারেনি।
মেয়েদের মধ্যে এখন হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল একবার, সে চেঁচিয়ে উঠতেই কৌশিক বললো, আস্তে। শুনতে পেলে সবাই এদিক দিয়ে ছুটে আসবে।
ঘুরে দাঁড়িয়ে সে নাসিমের হাত চেপে ধরে জোরালো ফিসফিসানিতে বললো, আমার সঙ্গে আসুন।
একগুচ্ছ বালিকার পরিত্রাতার ভূমিকায় নেমে পড়ে কৌশিক বেশ উত্তেজিত সাহসী হয়ে উঠেছে। বুকের মধ্যে সে বোধ করছে একটা অতিরিক্ত বলিষ্ঠতা।
গলিটা এক প্রান্তে এসে আর একটা সিঁড়ির সঙ্গে মিশেছে। সে সিঁড়িটাও অন্ধকার ইদানীং ব্যবহারই হয় না মনে হয়। অলি সিঁড়িটা দেখে বুঝতে পারলো, এককালে এটা এ বাড়ির মেথরদের ব্যবহারের সিঁড়ি ছিল। অলিদের বাড়িতেও এরকম আছে।
কোনোরকমে নিচে এসে আরও কয়েকটা দোকান ঘরে পেছন দিক দিয়ে দৌড়ে তারা এসে পড়লো মহাত্মা গান্ধী রোডে। এদিকের মিছিল এখনো এসে পৌঁছোয়নি পুলিশ কর্ডন করে রেখেছে দু'দিকের রাস্তা, সেখানটা ধোঁয়ায় ভরা। একটু দূরেই কোথাও বোমার আওয়াজ হচ্ছে ঘন ঘন।
কৌশিক বললো কফি হাউসের দোতলা থেকে বোমা ছুঁড়ছে, আপনারা আর একটুক্ষণ থাকলে আর দেখতে হতো না।
মেয়ে চারটি নির্বাক হয়ে গেছে। বছর দু'এক কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় এমন বোমাবাজি আর পুলিশের লাঠি গুলি চলেনি। সেই জন্য অলি মালবিকাদের এই সব ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। তারা কলেজ করতে আসে, বাড়ি চলে যায়। এইরকম দৃশ্য আগে দেখেনি। খবরের কাগজে মিছিল আন্দোলন, বোমা-গুলি চালনার খবর তারা দেখে সব সময় মন দিয়ে পড়েও না, ওসব যেন অন্য জগতের ব্যাপার, তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। একটু আগে তারা ব্রাউনিং এর একটি প্রণয় গাথার সঙ্গে একটি সত্য ঘটনা মেলাচ্ছিল, জানলার বাইরে কী হচ্ছে তাতে গুরুত্ব দেয়নি।
মালবিকা বললো, কী করে বাড়ি যাবো?
কৌশিক ধমক দিয়ে বললো আমি না ডাকলে তো আপনারা এখনো বসে বসে গল্পই করতেন। তাহলে বাড়ির বদলে হাসপাতালে যেতে হতো।
সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকজন পুলিশ দপদপিয়ে ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক। মূল গোলমালটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির দিকে বোমার শব্দের বিরাম নেই। টিয়ার গ্যাসে ছলছল করছে ওদের চোখ। অলির শাড়ির আঁচলে জড়িয়ে গেছে অনেক খানি মাকড়সার জাল।
বর্ষার বাড়ি কাছেই, ঠনঠনের দিকে। সে রাস্তা পার হতে চায়। কৌশিক বললো সবাই রাস্তা পার হয়ে চলুন, পেছন দিকেই গোলমালটা বেশি। মাথার ওপর হাত তুলুন।
আরও কিছু কিছু লোক রাস্তা পার হচ্ছে, সকলেরই মাথার ওপর হাত তোলা। ওরাও সেইরকম করলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কী যেন ধমক দিয়ে বলা হলো তাদের। অলি চোখ বুজে ফেললো। বাবলুদা মিছিলে গেছে? বাবুল দাও পুলিসের দিকে বোমা ছোঁড়ে? কিছুই অশ্চর্য না। বাবলুদা একদিন গর্ব করে বলেছিল, আমি সহজে মরবো না জানিস। দেখলি না আমি গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আমি মরলুম না, মরে গেল আমার দাদা।
রাস্তাটা পার হয়ে এসেই বর্ষা সাহস ফিরে পেল চুলে আঙুল চালিয়ে সে বললে, আমি এবার দৌড়েই বাড়ি চলে যেতে পারবো। তোরা কি করবি? আমার বাড়িতে আসবি?
মালবিকা বললো না, না আমাকে যেমন করে হোক বাড়ি ফিরতেই হবে। মা দারুন চিন্তা করবে।
কৌশিক বললো, বাদবাকি আপনারা সব সাউথে? শিয়ালদার দিকে চলুন, ওখানে ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে।
বর্ষা ঢুকে গেল একটা গলির মধ্যে ওরা এগোলো শিয়ালদার অভিমুখে। বেশি দূর যাওয়া গেল না, ওদিক থেকেও একটা মিছিল আসছে এতক্ষণে। হঠাৎ ছুটতে লাগলো সবাই, পুলিসের কর্ডন ভেঙে গেল, আবার লাঠি চার্জ, ইট পাথরের বৃষ্টি।

একটা মানুষের ঢেউতে ধাক্কা খেয়ে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অলি দেখলো, সে কিছু অচেনা লোকের সঙ্গে দৌড়োচ্ছে, আর কোনো উপায়ও নেই, স্রোতের বিরুদ্ধে ফেরা যাবে না।
বেশ কিছু দূরে এসে সেই স্রোতের বেগটা কমে গেল। অলি দেখলো সে একটা পোস্ট অফিসের কাছে চলে এসেছে। এই জায়গাটা তার চেনা নয়, মালবিকা, নাসিম, কৌশিককে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ওরা কি একসঙ্গে আছে না প্রত্যেকেই আলাদা হয়ে গেছে। অলি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি ওরা তাকে খুঁজে নিতে আসবে?
টিয়ার গ্যাসের জ্বালা তো আছেই, তা ছাড়া প্রচণ্ড অভিমানে অলির কান্না এসে গেল। বাবলুদা কেন আজ কফি হাউসে ছিলনা? বাবলুদা থাকলে সে এরকমভাবে হারিয়ে যেতে পারতো?

॥ ১০ ॥

কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে বারো জন, সেই তালিকায় অতীন মজুমদারের নাম সবার শেষে। এতে তার বন্ধু ও পরিচিতদের মধ্যে দুরকম প্রতিক্রিয়া হলো। কোনোক্রমে হলেও সে যে একটা ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে গেছে তাতেই অনেক অবাক। কলেজে সে প্রায়ই ডুব দিত, তার স্বভাবটাই ফাঁকিবাজ ধরনের শেষের দিকে দু'তিন মাস রাত জেগে সে এরকম একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললো? আবার সিদ্ধার্থ, রবির মতন কয়েকজন অন্ধ ভক্ত আছে, তাদের ধারণা, অতীন একটি জিনিয়াস সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে পারতো অনায়াসে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছে।
বাড়িতে অবশ্য সবাই বেশ খুশী। সুপ্রীতি কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দিয়ে এলেন, তিনি বাবলুর নামে মানত করেছিলেন। এবাড়ি থেকে মন্দির বেশ কাছে, তিনি একাই যাতায়াত করতে পারেন। যাবার সময় তিনি মমতাকে ডেকেছিলেন মমতা একটা তুচ্ছ অজুহাতে এড়িয়ে গেছেন। ইদানিং মমতার ব্যবহার বোঝা খুব শক্ত। কে এক সময় মমতার চোখে এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যেন তাঁর জীবনে সুপ্রীতিই তাঁর প্রধান শত্রু। পিকলুর মৃত্যুর জন্য পরোক্ষে সুপ্রীতিই বুঝি দায়। কোনো যুক্তি আছে কি এরকম চিন্তার? পিকলু বাবলু -মুন্নিকে সুপ্রীতি কোনোদিন নিজের সন্তানের চেয়ে একটুও কম করে দেখেননি। বরং পিকলুর প্রতিই তার ভালোবাসা ছিল একটু অন্যায্য রকমের বেশি।
মমতা সব সময় এরকম ব্যবহার করলে অবশ্য এ বাড়িতে আর একসঙ্গে থাকা চলতোই না। কিন্তু মমতার ব্যবহার মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ বদলে যায়। কোনো কারণে একবার সুপ্রীতিকে আঘাত দিয়ে কথা বললেই কয়েকদিনই বাদেই সেটা সুধরে নেবার চেষ্টা করেন, খাতির করেন বেশি বেশি। তাতেও সুপ্রীতির অস্বস্তি বোধ হয়। আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন সুপ্রীতি। এ বাড়িতে আসার পর স্বাভাবি ভাবেই সংসারের কর্ত্রীত্ব তাঁকেই নিতে হয়েছিল, কিন্তু এখন তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন। সংসারের সব রকম কাজে সাহায্য করেন ঠিকই কিন্তু কবে নুন ফুরোবে, কবে চিনি আনতে হবে, সে হিসেব তিনি আর রাখেন না। তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন, তুতুল পড়াশুনা শেষ করলে তারপর সে বিয়ে করুক বা চাকরি করুক যাই-ই হোক তখন সুপ্রীতি দেওঘরে মায়ের কাছে গিয়ে থাকবেন।
কালীঘাট থেকে পুজোর প্রসাদ নিয়ে ফেরার সময় সুপ্রীতি দেখলেন, বসবার ঘরে বাবলু রয়েছে তার দু'জন বন্ধুর সঙ্গে। সুপ্রীতি তখনই প্রসাদটা দিতে গিয়েও থমকে গেলন। মমতার হাত দিয়ে দেওয়ানোই ভালো।
তিনি ভেতরে এসে বললেন, মমো, বাবলুকে ডেকে এই প্রসাদটা মাথায় ছুঁইয়ে দাও। ঠাকুরকে ডেকেছি, ঠাকুর আমাদের মুখ রক্ষা করেছেন।
মমতা অন্যমনস্কভাবে বললেন, ঐ তাকের ওপর রাখুন, ও আসুক ভেতরে তখন দেবো।
সুপ্রীতি বললেন, তোমাও নাও।
কিন্তু মমতা সে-কথা যেন শুনতে পেলেন না, চলে গেলেন রান্না ঘরের দিকে।
সুপ্রীতির পরনে একটা কালো নরুণ পাড় সাদা শাড়ী। চেহারাটা ইদানিং এত রোগা হয়ে গেছে যে মুখখানা খুবব ছোট্ট দেখায়। তাঁর কথায় ও ব্যবহারে যে ব্যক্তিত্বের জোর ছিল তা যেন আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেছে কোথায়। এখন তিনি সব সময় সংকুচিত হয়ে থাকেন। রবারের চটি জুতো জোড়া খুলে বাথরুমে পা ধুয়ে তিনি নিজের খাটে এসে মহাভারত খুলে বসলেন। আজকাল তার খুব

বই পড়ার নেশা হয়েছে, অন্য কোনো বই না থাকলে মহাভারতই পড়তে থাকেন যে-কোনো জায়গায়।

একটু পর বাবলু ভেতরে এসে চেঁচিয়ে বললো, মা রান্না হয়েছে? আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে বেরুবো।

মমতা বললেন, একটু দেরি আছে। চান করে নে আগে।

বাবলু বললো, আজ আর চান করবো না। যা রান্না হয়েছে দিয়ে দাও, খিদে পেয়ে গেছে খুব।

মমতা মৃদু তাড়না দিয়ে বললেন, এই গরমের মধ্যে চান করবি না কী রে? তোর গায়ের গন্ধে ভূতও পালাবে এবারে। যা, মাথায় একটু জল দিয়ে আয়।

মমতা প্রায় ঠেলতে ঠেলতে বাবলুকে বাথরুমে পাঠালেন। ভেতরে ঢুকেও বাবলু চেঁচিয়ে উঠলো চান করবো যে, জল কোথায়? মোটে দেড় বালতি জল ধরে রাখা আছে দেখছি। কলে জল নে

মহাভারতের পৃষ্ঠা থেকে চোখ সরিয়ে সুপ্রীতি নিজের ঘরে বসে সব শুনছেন। এ বাড়িতে জলের খুব কষ্ট। বাড়িওয়ালা উঠে যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছে। কিছু দিন ধরে প্রতাপের শরীরটা বেশ খারাপ, মাঝে মাঝেই জ্বর হয়, নতুন বাড়ি খোঁজ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় দিনই রাস্তার কল থেকে ভারি দিয়ে জল আনাতে হয়।

কিন্তু সুপ্রীতির মনে খচখচ করছে একটা কথা। মমতা বাবলুকে প্রসাদ দিল না। পুজোর প্রসাদ কি ফেলে রাখতে হয়? ভাত খাওয়ার পরে প্রসাদ খেতে নেই। ছেলেটার খিদে পেয়েছে, এখনই তো গোটা দু'এক সন্দেশ খেয়ে নিলে পারতো।

তুতুল, মুন্নিরা কেউ বাড়িতে নেই, তিনটের সময় আবার জল এসে যাবে, বাবলু ঐ দেড় বালতি জলের মধ্যে এক বালতি দিয়ে স্নান সেরে নিলে পারতো, তা না করে সে রাস্তার কল থেকে জল আনতে গেল। সুপ্রীতি ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন। আজকের দিনেও ছেলেটাকে না খাটলে হতো না? অতি দুরন্ত অবাধ্য ছেলে ছিল বাবলু তাকে নিয়ে কত ভয় ছিল অথচ সে পরীক্ষায় এত ভালো ফল করেছে, আজ সে বেশি বেশি আদর পাবার যোগ্য।

আগেকার দিন হলে সুপ্রীতি উঠে গিয়ে বাবলুকে জল আনতে নিষেধ করতেন। মমতাকে একটু বকতেন। নিজের হাতে প্রসাদ তুলে দিতেন বাড়িরে সবাইকে। কিন্তু এখন তাঁর সব ব্যাপারেই যেন দ্বিধা। তিনি আবার মন দিলেন মহাভারতের পাতায়।

খানিক বাদে তাঁর মনে একটা অন্য রকমের ভয় এলো। বাবলুর নামে তিনি পুজো দিয়ে এসেছেন, সেই প্রসাদ ছেলেটাকে না খাওয়ালে ওর অকল্যাণ হবে না? মমতা ভুলে গেলেও তাঁর মনে করিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি মহাভারতখানা মুড়ে রেখে খাট থেকে নামলেন।

বাইরে থেকে জল এনে কোনোরকমে কাক স্নান সেরে বাবলু খাওয়ার টেবিলে এসে বসেছে। মমতা তাকে ভাত বেড়ে দিচ্ছেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত ভাবে সুপ্রীতি বললেন, মমো, ওকে প্রসাদ দিলে না?

মমতা বললেন, ও বাবলু, ঐ যে বারান্দার তাকে প্রসাদ আছে, একটু খেয়ে নে তো।

মানত করা প্রসাদ গুরুজনদের কারুকে নিজের হাতে দিতে হয়। সুপ্রীতি বাবলুর নামে পুজো দিয়েছেন বলই কি মমতা ঐ প্রসাদ সম্পর্কে কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছেন না?

বাবলু উঠে গিয়ে শালপাতার ঠোঙাটা খুলে টপ্ করে একটা সন্দেশ মুখে পুরো দিয়ে বললো বাঃ খেতে ভালো তো। পিসিমণি কোন দোকান থেকে কিনেছো?

সুপ্রীতি আস্তে বললেন, ঐ তো মন্দিরের পাশেই আগেই খেয়ে ফেললি? কপালে একবার ছোঁয়াতে হয়।

–তা হলে আর একটা খাই?

আর একটি সন্দেশ নিয়েবাবলু সাড়ম্বরে কপালে ও মাথার চুলে ছুঁইয়ে গলার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলো, কিসের প্রসাদ?

সুপ্রীতি বললেন, তোর নামে পুজো দিয়েছিউই ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছিস।

বাবলু সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললো, আমরা খেটে খুটে ভালো রেজাল্ট করবো, আর পুজো পাবে মা কালী। বেশ মজা।

পুরুতরা নিশ্চয়ই। বাবু এর থেকে হাফ্ সন্দেশ মেরে দিয়েছে।

বাবলুর এ ধরনের কথাবার্তায় সুপ্রীতি দুঃখিত হলেন না, ছেলেমানুষরা এরকম বলেই। তিনি বরং খুশী হলেন বাবলু আরও একটি সন্দেশ খেয়ে নিল বলে।

মমতা বাবলুর সামনে ভাতের থালা ধরে দিয়ে বললেন, আগেই অত মিষ্টি খেলে ভাত খাবি কী করে? এবারে ওটা সরিয়ে রাখ।

রান্না ঘরটা লম্বা ধরনের। তারই এক পাশে খাবারের টেবিল পাতা। পুরোনো আমলের বাড়ি, দিনের বেলাতেও এ ঘরে আলো জ্বালতে হয়। দেয়ালে নোনা ধরে গেছে, একপাশের প্লাস্টার খসে খসে পড়ে মাঝে মাঝে, বাড়িওয়ালা সারাবে না। গরমকালে এই ঘরে বসে খাওয়ার সময় খুব ঘামতে হয়। ডাল দিয় ভাত মাখতে মাখতে বাবলু অকস্মাৎ বোমা ফাটার মতন একটি চমকপ্রদ কথা ঘোষণা করলো।

মা ও পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো, আমি আর পড়াশুনো করবো না। এবারে আমি চাকরি করবো।

মমতা আর সুপ্রীতি দু'জনেই একসঙ্গে বললেন, কী?

বাবলুর যা বলার তাতো বলা হয়েই গেছে, সে মিটিমিটি হাসছে।

মমতা বললেন, কী বলছিস পাগলের মতন কথা? তুই আর পড়বি না?

বাবলু বললো,নাঃ। কী হবে এম এসসি পড়ে? আমার আর পড়াশুনো করতে ভালো লাগে না।

মমতা দু'চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, কী সর্বনাশের কথা বলছিস, বাবলু? এত ভালো রেজাল্ট করে কেউ পড়াশুনো ছেড়ে দেয়?

বাবলু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, আমি এমন কিছু ভালো রেজাল্ট করিনি। মা। ডজনখানেক ছেলে-মেয়ে ফার্স্ট ক্লাসপেয়েছে। প্রত্যেক বছর এরকম ডজন ডজন ফার্স্ট ক্লাস পায়, তারা তাদের বংশের মুখ কতটা উজ্জ্বল করে তা আমি জানি না, তবে তারা কেউ রাজা-উজির হয় না, ভিড়ে হারিয়ে যায়।

সুপ্রীতি মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলেন, তোর এম এসসি পড়তে ভালো লাগে না, অন্য কিছু পড়তে চাস?

বাবলু ঠোঁট উল্টে বললো, অন্য কিছু পড়েই বা কী হবে। পড়াশুনো তো চাকরি জন্য। চাকরির বাজারে এম এসসি যা, বি এসসিও তাই। আমি তো মাস্টারি করতে যাচ্ছি না।

মমতা বললেন, শোনো ছেলের কথা। আমরা যেন আর কিছু বুঝি না। এম এসসি বি এসসি যদি সমানই হবে তাহলে এত ছেলে এম এসসি পড়তে যায় কেন?

–যাদের বাড়ির অনেক টাকা আছে তারা পড়তে যায়। যারা খোকা সেজে অনেকদিন ছাত্র থাকতে চায় তারা এম এসসি পড়ে, পি এইচ ডি কর, হায়ার স্টাডিজের জন্য বিদেশে যায়। আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমার জন্য কাজ আছে।

–তোর অন্য কাজ আছে মনে?

–মানে, পড়াশুনো ছাড়াও মানুষের আরও অনেক কিছু করবার থাকতে পারে। তা ছাড়া আমি চাকরি নিয়ে টাকা রোজগার করতে চাই।

–টাকা দিয়ে কী হবে?

–তুমি অদ্ভুদ কথা বলছো মা। টাকা দিয়ে কী হবে? টাকার দরকার নেই? আমাদের সংসারের জন্য টাকার দরকার নেই?

–দ্যাখ বাবলু, তুই বড্ড পাকা হয়েছিস। তোমাকে এর মধ্যেই কেউ টাকা পয়সা নিয়ে মাথা ঘামাতে বলেনি। তোমার বাবার যত কষ্টই হোক তোমাদের পড়াশুনোর খরচ কি কখনো আটকেছে? তোমার বাবা চান তুমি শেষ পর্যন্ত পড়াশুনো চালিয়ে যাবে, পিএইচ ডি করবে।

সুপ্রীতি চাইছেন এই কথা কাটাকাটি থামিয়ে দিয়ে অন্য কোনো একটা প্রসঙ্গ শুরু করতে। কিন্তু তিনি সুযোগ পাচ্ছেন না। এবারে তিনি মুখতুলে দেখলেন, মমতা তাঁর দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রয়েছে। মমতা কি বলতে চায় যে মা ও ছেলের ঝগড়ার সময় সুপ্রীতির সেখানে থাকার দরকার নেই? কিন্তু সেখান থেকে চলে যেতে সুপ্রীতির পা সরলো না। বাবলুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি তিনি উদাসীন থাকতে পারেন?

বাবলু ঘাড় গুঁজে খেয়ে যেতে লাগলো।

সুপ্রীতি এবারে নরম ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, বাবলু তোর যারা বন্ধু যারা এ বাড়িতে আসে টাসে, তারা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবে না? বাবলু বললো, দু একজন পড়বে, দু'একজন অন্য লাইনে যাবে। একজন তার বাবার কারখানায় জয়েন করবে। তুই তা হলে একা হঠাৎ চাকরির কথা ভাবলি কেন?

সুপ্রীতিকে থামিয়ে দিয়ে মমতা বাবলুকে ধমক দিয়ে বললেন, আজ এস সাত তাড়াতাড়ি যাচ্ছিস কোথায়? মামা-মাইমাকে প্রণাম করে এসেছিস? ভবানীপুরের কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করবি আজ বিকেলেই। উনি কতবার খোঁজ নিয়েছেন তোর রেজাল্ট বেরুলো কি না।

বাবলু বললো, আর একটু ডাল দাও।

–ইউনিভার্সিটির ফর্ম দিতে শুরু করেছে না? আজই ফর্ম নিয়ে আসবি।

–ফর্ম এনে কী হবে? আমি এম এসসি পড়বো না বললুমতো।

–পড়বি না মানে? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? শোন্, তোর বাবা বলেছেন বাবলু হঠাৎ জ্বলে উঠে চিৎকার করে বললো, শোনো মা, বাবা কী চানতা আমি জানি। তুমি কি চাও তাও আমি জানি। তোমরা সবাই চাও আমি যেন দাদার মতন হই। দাদা ভালো ছেলে ছিল, দাদা জিনিয়াস ছিল,সবার কথা মেনে চলতে পার তো। কিন্তু আমি দাদার মতন জিনিয়াস নই। আমি প্রত্যেকটা পরীক্ষা দিই আর তোমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকো, আমার রেজাল্ট দাদার মতন হয় কি না দেখার জন্য। ওঃ আমি আর পারছি না। আমি দাদার মতন নই। আমি অর্ডিনারি। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও।

মমতা হতবাক হয়ে বাবলুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে তাঁর চোখ জলে ভরে গেল। এখনও পিকলুর কোনো প্রসঙ্গ উঠলে তিনি নিজেকে সামলাতে পারেন না। আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে তিনি দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সুপ্রীতিও স্তব্ধহয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর বাবলুর কাছে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, ছিঃ, বাবলু, মায়ের মনে ওরকম আঘাত দিয়ে কথা বলতে আছে?

বাবলু গলার স্বর একটুও না বদলে বললো কিছু তো আঘাত দিতে চাইনি, যা সত্যি কথা তাই বলেছি। তোমরা কেউ আমার দিকটা দেখতে চাও না কেন?

–নিশ্চয়ই তোর দিকটা দেখবো। তা বলে আজকের দিনে হুট করে ওরকম একটা কথা বললি?

–আজকের দিনটার স্পেশাল ব্যাপার কী আছে?

–আজতোররেজাল্ট বেরিয়েছে, কত আনন্দের কথা

–হুঃ। তা আমাকে কেউ আর কিছু খেতে টেতে দেবে না নাকি? এই ডাল ভাত খেয়েই উঠে যাবে।

–বোস, আমি দিচ্ছি।

মমতা কড়াইতে ছোট ছোট চিংড়ি মাছ ভাজার জন্য চাপিয়ে ছিলেন, এতক্ষণ এই উত্তেজনার মধ্যে সেদিকে আর নজর দেননি। চিংড়িগুলো লাল হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো পোড়েনি। সুপ্রীতি কড়াই নামিয়ে চিংড়ি কটা বাবলুর থালায় তুলে দিলেন।

আজ কী কী রান্না হয়েছে তিনি জানেন না। কিছুদিন আগে পুরোনো রাঁধুনী বামুনদিদি বিদায় নিয়ে দেশের বাড়ি চলে যাবার পর আর রান্নার লোক রাখা হয়নি। দিনের বেলার রান্না মমতা একাই করেন আজকাল। সন্ধেবেলার নিরামিষ রান্নার ভার সুপ্রীতির ওপর এখন কোনো কোনদিন তুতুলও রান্নার সাহায্য করে।

বাটিগুলোর ঢাকনা উল্টে উল্টে দেখলেন সুপ্রীতি। আর একটা কুমড়োর তরকারি রয়েছে। বাবলু একেবারেই কুমড়ো খেতে চায় না সেইজন্যই মমতা তাকে ঐ তরকারি দেননি। মাছের ঝোল তো নেই? ঐ ছোট ছোট চিংড়িগুলো ছাড়া আর কোনো মাছ রান্না হয়নি? অবশ্য আজকে মাসের আঠাশ তারিখ।

বাবলুকে তিনি আরও একটু ডাল ও ভাত দিলেন। সে এক মনে খেয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা মিষ্টি দই ভালোবাসে,আজকের দিনে ওর জন্যে একটু দই এনে রাখলে হতো।

ওর এম এসসি পড়ার প্রসঙ্গ তিনি আর ভয়ে তুললেন না। এমন কি এই যে বাবলুকে তিনি এখন যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন এতেও তাঁর একটু ভয় ভয় করছে, এজন্য আবার মমতা চটে যাবে না তো। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি বলে একটা বক্রোক্তি আছে, মাসির বদলে অনায়াসে পিসি করা যেতে

পারে

তিনি আবার বাবলুর পিঠে হাত রেখে অনুনয়ের স্বরে বললেন, খেয়ে উঠে মায়ের পাশে গিয়ে একটু বোস। মামনে দুঃখ পেয়েছে, তুই গিয়ে একটু ভালো করে কথা বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাবলু ঘাড়টা বেঁকিয়ে সুপ্রীতির দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো, কোনো কথা বললো না। মুখ থেকে তার রাগের জ্বলজ্বলে ভাবটা চলে গেছে।

কিন্তু আঁচাবার পর সে আর একটুও দেরি করলো না। একটা জামা মাথায় গলিয়ে হুড় ম ধাড় ম কর বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

॥ ১১ ॥

রেল লাইনের ধারে একটা ভাঙা পাঁচিলে ওপর দুপাশে দু'জন সঙ্গীকেনিয়ে বসে বাদাম খাচ্ছে সুচরিত। জায়গাটা একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। সামনেই ঢাকুরিয়া লেক, সেখানে কিছু কিছু আলোর ব্যবস্থা থাকলেও একটু রাত হতেই কায়দা করে নিবিয়ে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে মৃদু চোখে পড়ে দু'একটা গাড়ির হেড লাইট। আকাশে আজ চাঁদ নেই।

সুচরিতকে তার নাম ধরে আর কেউ ডাকে না এখন। সে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে তাই তার নাম ল্যাঙা। সে ভালো করে হাঁটতে পারে না বটে কিন্তু দৌড়োয় হরিণের মতন। রোগা ছিপছিপে শরীর, বেশলম্বা হয়েছে সে। তার দুই সহচরে নাম লেটো আর মুঙ্গি, ওদের আর কোনো ভালো নাম থাকতে নেই, কোনো পদবীরও দরকার নেই। নামের বদলে অর্থহীন একটি ধ্বনাত্মক শব্দ। ওরা সরু ঘেরের প্যান্ট পরে, গায়ের রঙীন গেঞ্জি, মুঙ্গির বাঁ হাতে মোটা লোহার বালা, লেটো গলায় একটা রুমাল বাঁধতে ভালোবাসে।

বাদাম শেষ করার পর সুচরিত মুঙ্গিকে বললো, দে, একটা সিগ্রেট সেসগারেট ধরাবার পর লেটো বললো, এবারে অ্যাকশানে যাই?

সুচরিত বললো, আর একটু দাঁড়া। কটা বাজলো?

একমাত্র লেটোর হাতেই ঘড়ি আছে। সে দেশলাই জ্বেলে দেখে নিয়ে বললো, পৌনে আটটা।

সুচরিত বললো, আর একটু লোকজন কমুক।

সারাদিন অসহ্য গুমোট গরম গেছে, আকাশ মেঘলা হলেও দু'তিনদিন বৃষ্টি নামগন্ধ নেই। সন্ধের পর থেকে হু-হু করে আসছে বঙ্গোপসাগরের হাওয়া, অনেকেই বাড়ি ছেড়ে এই কৃত্রিম হ্রদের কিনারে সেই হাওয়া খেতে এসেছে।

এই শহরে তরুণ-তরুণীদের গোপনে দেখা করে মুখোমুখি বসে কিছুক্ষণ হৃদয়-বিনিময় করার জন্য জায়গা পাওয়া খুবই দুর্লভ। মানুষের পায়ের দাপাদাপিতে সব নিভৃত স্থান তছনছ হয়ে গেছে। এই লোকের পাড়ে পাড়ে সন্ধের পর অন্ধকারে ব্যাকুল যুবক-যুবতীরা কোনো রকমে এখানে সেখানে জায়গা খুঁজে নেয়। কিন্তু একটুও সুস্থির হয়ে বসবার উপায় নেই। একজন আর একজনের কাঁধে হাত রেখেছে কি রাখেনি অমনি মাটি ফুঁড়ে উঠে আসবে কোনো ভিখিরি বালক। লেকেরে ধারে প্রেম করতে এল সঙ্গে অনেক খুচরো পয়সা নিয়ে আসতে হয়। একটি ভিখিরি বালক পয়সা পেয়ে চলে গেলেই আর একজন আসবে। তারপর আসবে ফেরিওয়ালা, বাদাম, চটলেট এমনকি ধূপকাঠিও কিনতে হবে না কিনলে ওরা ঘনিষ্ঠ জড়াজড়ির সুযোগ দেবে না।

তবে সব কিছুরই নির্দিষ্ট সময় আছে। আটটা-সাড়ে আটটা বেজে গেলে যখন লোকজন কমতে থাকে, তখন ভিখিরি-ফেরিওয়ালারাও দূরে সরে যায়, তখন আসে সুচরিতের দল।

বড় গাছের নিচের মনোরম অন্ধকারে পুরোনো কালের একটা কামানের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আসে একটি বলিষ্ঠ যুবক ও এক তন্বী। ওরা শারীরিক উষ্ণতা বিনিময় করছে না, কোনো গভীর সঙ্কট নিয়ে আলোচনা এমনই তন্ময় যে কখন যে একটি ছায়ার মতন প্রাণী তাদের ঘিরে ধরেছে তা খেয়ালই করেনি।

লেটো ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বালাতেই যুবকটি উঠে দাঁড়ালো।

সুচরিত জিজ্ঞেস করলো, দাদা, কটা বাজে?

যুবকটি উদ্ধত ভাবে বললো, যটাই বাজুক না কেন।

সুচরিত বললে, আহা রাগ করছেন কেন? আপনার হাতে ঘড়ি রয়েছে তো, তাই জিজ্ঞেস করছি কটা বাজে?

যুবকটি এবারে বাঁ হাত তুলে বললো, আটটা কুড়ি।

সুচরিত বললো, উহুঁ এত কম তো হবার কথা নয়। আপনার ঘড়ি ঠিক আছে? মনে হচ্ছে গোলমাল আছে। দেখি ঘড়িটা একটু দিন তো।

মুঙ্গি ছেলেটির ঘড়ি শুদ্ধ হাতটা চেপে ধরতেই সুচরিত ধমক দিয়ে বললো, এই এই, গুণ্ডামি করতে এসেছেন? পুলিশ ডাকবো।

সুচরিত সপ্রশংস দৃষ্টিতে যুবকটির দিকে তাকালো। এর বেশ সাহস আছে স্বীকার করতে হবে। অনেকেরই গলা শুকিয়ে যায় তো-তো করে। সে মেয়েটির দিকে একবার তাকালো ভালো বাড়ির মেয়ে, বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝায় যায়।

সুচরিত হাসি মুখে বললো, পুলিশ ডাকতে চান, ডাকুন আমরা কিন্তু এখান থেকে নড়ছি না।

যুবকটি এদিক ওদিক তাকালো। কাছাকাছি আরও কয়েকটি যুগল বসে ছিল, কখন তারা উঠে গেছে। সে বিমর্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার গায়ের জোর আছে, কিন্তু মনের জোর কমে যাচ্ছে। তার ধারণা, পুলিশ ডাকলেই তাদের দু'জকে সারারাত থানায় কাটাতে হবে। পরের দিন খবরের কাগজে নাম ছাপা হয়ে যাবে দু'জনের।

সে ঘড়িটা খুলে দিল সুচরিতের হাতে।

লেটো নাকি সুরে আদুরে গলায় বললো,ওকে ঘড়ি দিলেন, আর আমায় কিছু দিলেন না? দশ-বিশটা টাকা দিন অন্তত।

যুবকটি গম্ভীরভাবে বললো, আমার কাছে টাকা নেই।

লেটো বললো, আপনার কাছে না থাকে দিদিমণির কাছে আছে নিশ্চয়ই। ঐ তো ব্যাগ রয়েছে।

লেটো ঝুঁকে মেয়েটির হাত ব্যাগটা নিতে যেতেই যুবকটি আর রাগ সামলাতে পারলো না, লেটোকে এক হাতে ঠেলে দিয়ে অন্য হাতে ঠাস করে এক চড় কষালো।

সঙ্গে সঙ্গে মুঙ্গি একটা ছুরি খুলে যুবকটি মুখের সামনে ধরলো।

সব কিছুই আগে থেকে নিখুঁত ভাবে মহড়া দেওয়া। এমনি এমনি এসব কাজ হয় না, বুদ্ধি খরচ করতে হয়। অনেক ছেলে মেয়েই তো এসে বসে, তাদের মধ্য থেকে বেছে নিতে হয় দু'একজনকে তাদের ওপর ওয়াচ রাখতে হয়। তারপর ঠিক টাইমিংটা বেছে নেওয়াই হল আসল কথা। এই সব শিকারদের কাছ থেকে ধরা বাঁধা দু'তিন রকম ব্যবহারই আশা করা যায়। মেয়েটির মাথায় সিঁদুর না থাকলে কোনো ছেলেই পুলিশ ডাকতে সাহস পায় না, বরং পুলিশের নামে ভয় পায়। আর গায়ে হাত তুলতে সাহস পায় খুব কম ছেলেই।

সঙ্গে ছুরি ছোরা থাকলেও সুচরিত সহজে রক্তারক্তি পছন্দ করে না। মুঙ্গিকে শেখানো আছে, সে শুধু লম্বা ছুরিটা মুখের সামনে তুলবে আর কিছু না।

সে মুঙ্গিকে নকল ধমক দিয়ে বললো, অ্যাই অ্যাই ছুরি তুলছিস কেন? দাদার মাথা গরম হয়ে গেছে বলে একটা চড় মেরেছে, তা বলে তুই ছুরি দেখাবি? সরে আয়।

তারপর সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার কাছে যদি কিছু টাকা থাকে তো দিয়ে দিন না। কেন ঝঞ্ঝাট বাড়াচ্ছেন?

মেয়েটি তার ব্যাগ খুলতে যেতেই যুবকটি একটি বোকামি করলো। সে বললো, তুমি দিও না, আমি দিচ্ছি।

এর ফলে দু'জনকেই টাকা দিতে হলো। সবশুদ্ধ পঁয়তিরিশ। মন্দ না।

যাবার আগে সুচরিত একটু ইয়ার্কি করার লোভ সামলাতে পারে না। সে যুবকটির কাঁধ চাপড়ে বললো, দাদা এ জায়গাটা ভালো নয়, আর বেশি দেরি করবেন না। বাড়ি যান। এসব জায়গায় ঘড়ি হাতে দিয়ে আসেন কেন?

একটু দূরে সরে গিয়ে ওরা তিনজন একসঙ্গে হাসতে থাকে। শোনা যায় মেয়েটির কান্নার ফোঁপানি।

এক রাতে একটার বেশি কেস করতে নেই। তা হলে বদনাম রটে যাবে, ভয়ে আর ছেলেমেয়েরা সন্ধের পর বসবে না। অতি লোভে যে তাঁতি নষ্ট হয়তা সুচরিতরা জানে।

যা পাওয়া গেলতার সবটাই রোজগার নয়, এরও অনেক ভাগ আছে। লিলি পুলের দারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন কনস্টেবল। একজন অনুচ্চ স্বরে ডাকলো, আরে এ ল্যাংড়া, ইধার আ, শুন্ শুন্।

সুচরিত বললো আসছি রে বাবা, আসছি। পালিয়ে যাচ্ছি নাকি?

ওরা তিনজন জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে এগিয়ে এসে পুলিশ দু'জনকেও সিগারেট দিল। দু'জনেই সিগারেট দুটি রেখে দিল পকেটে। একজন হাত বাড়িয়ে বললো, পুরা চাহি শ' রূপিয়া।

সুচরিত বললো, একশো টাকা? পাগল হয়েছোনাকি সেপাইজী? এখানে সব ফালতু পার্টি আসে, পকেটে দশ-পাঁচ টাকার বেশি থাকেই না।

–ঘড়ি কটা পেলি?

–একটা।

–তোমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলে কোনো লাভ আছে?

মিথ্যে-সত্যি যাই-ই হোক, সেপাইরা ওদের মুখের কোনো কথাই বিশ্বাস করে না। ওদের একজন সুচরিতদের সমস্ত শরীর থাবড়ে থাবড়ে খুঁজে দেখলো। এমনকি ওদরে পুরুষাঙ্গ ধরে নাড়াচাড়া করে কৌতুক করলো খানিকটা।

অন্যজন জিজ্ঞেস কলো কী ঘড়ি পেয়েছিস? বিলাইতি?

সুচরিত বললো, আরে নাঃ। আজকাল তো সব দেখছ রদ্দি মার্কা দিশি ঘড়ি। কিংবা সস্তার জাপানী মাল।

কিন্তু সেপাইটি সহজে ভোলে না। সে পকেট থেকে একটা কেরোসিন লাইটার বা করে জ্বেলে ঘড়িটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে অভিজ্ঞের মতন অভিমত দেয়, এ খাঁটি বিলাইতি আছে।

সুচরিত সঙ্গে সঙ্গে বললো, খুব পুরোনো। অন্তত থার্ড হ্যাণ্ড।

সেপাইটি ঘড়িটা তাকে ফেরত দিয়ে বললো, দে পঁচাশ রূপিয়া।

সুচরিত বললো, পঞ্চাশ ? হে-হে-হে, পেয়েছিই মোটে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ।

–ঘড়ি বেচে অনেক পাবি।

–এ ঘড়ির বিশ পঁচিশের বেশি দাম পাওয়া যাবে না।

–হামার সঙ্গে দিল্লগি করছিস?

–শোনো সেপাইজী, আমাদেরও পড়তা পোষাতে হবে? এখনও দ্যাখো গিয়ে বড় লেকের ওপাশটায় দু'তিনখানা গাড়ি আছে। সেখানে বাবুরা মাল খাচ্ছে আর মাগীদের সঙ্গে চুমোচুমি জড়াজড়ি করছে। সেখানে গিয়ে টাকা চাও না।

–তুই আগে দে।

শেষ পর্যন্ত কুড়ি টাকায় রফা হলো। লেটো আর মুঙ্গি প্রায় চুপচাপ ছিল এতক্ষণ। পুলিশের সঙ্গে দরাদরি করতে সুচরিত একেবারে নাম্বার ওয়ান। পুলিশেরাও ওকে পছন্দ করে।

পুলিশের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর ওদের নিজেদের মধ্য বখরা ভাগ হয়ে গেল। ঘড়িটা মুঙ্গি কিনে নিল পঞ্চাশ টাকায়। সে প্যান্টটা খুলে ফেলে ল্যাঙ্গোটে ভেতর থেকে বার করলো টাকা। সেপাইটি যে এই টাকাটার খোঁজ পায়নি, এটা তার পরম ভাগ্য। সেপাইটি আসলে সুচরিতকেই তল্লাশ করেছে মন দিয়ে।

মুঙ্গি পঞ্চাশ টাকায় ঘড়িটা কিনে নিল, এরপর ওটা বিক্রি করে যত বেশি লাভ করতে পারবে, সেটা তার নিজস্ব। তিনজনের বখরা সমান সমান নয়। দলপতি হিসেবে সুচরিত পায় অর্ধেক, বাকি দু'জন এক চতুর্থাংশ করে। এরপর সুচরিত নিজের টাকায় ওদের মাল খাওয়ার প্রস্তাব দিল।

পঞ্চাননতলা বস্তি থেকে কেনা হলো দু'বোতল চোলাই। তিনটে ভাঁড় জোগাড় করে ওরা বসেগেল রেল লাইনের ধারে। দু'তিন ঢোক দেবার পর লেটো বললো, গুরু, আমাদের লেকে আরও একটা পার্টি ঘুরছে। দু'তিনটে কেস হয়ে গেছে, মুড়িওয়ালা ধনাদা খবর দিল।

সুচরিত মাথা নেড়ে বললো, আমিও টের পেয়েছি। কোথাকার দল বল তো? এই পঞ্চাননতলার?

লেটো বললো, মনে হচ্ছে যাদবপুরের। ক'টা ফচকে ফচকে ছোঁড়া। দেবো একদিন চড়িয়ে?

মুঙ্গি বললো এ শালারা যাদবপুরের রিফিউজি পার্টি। এই হারামীর বাচ্চা রিফিউজিগুলো উইপোকার মতোন সব জায়গায় ঢুকে পড়ছে। তবে লেকে আমাদের কাকে বখের করলে আমি

শালাদের পেটে চাক্কু চালাবো।

সুচরিত মুন্সির ওপর রাগ করলো না। এরা তার পূর্ব পরিচয় জানে না। সুচরিতের উচ্চারণেও কোনো টান নেই। সে যে কাশীপুরেরর কলোনিতে এক সময় ছিল তা তার প্রায় মনেই পড়ে না। মা-বাবার কথাও মনে পড়ে না। তবে একদিনের জন্যও সে ভোলেনি চন্দ্রাকে।

লেটো বললো গুরু, ওদের কালকেই ঝাড় দেবো?

সুচরিত বললো, নাঃ এবার ওদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে বুঝলি? আমাদের এ আর পোষাচ্ছে না। ছুঁচো মেরে গন্ধ। আজ কটা টাকা হলো বল?

মুন্সি জিজ্ঞেস করলো, অন্য লাইনে যাবে?

ওদের সামনে দিয়ে খুব ধীর গতিতে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে। সেদিকে আঙুল তুলে সুচরিত জিজ্ঞেস করলো, এই লাইনটা কেমন?

মুন্সি বললো, আমাকে বড় তাজু একবার জিজ্ঞেস করেছেলো, আমি হ্যাঁ-না কিছু বলিনি।

লেটো বললো, বড় তাজুটা মহা হারামি, যখন তখন ঝুঁকি নেড়ে দেয়। ওর আণ্ডারে থাকতে হবে। সেটাই যে আমি পারি না।

–তা হলে একটা অন্য লাইন দ্যাখো।

–দেখছি, দেখছি।

আস্তে আস্তে রাত ঘন হয়, শব্দ লুপ্ত হতে থাকে, ওদের নেশা জমে। লেটো আরও এক বোতল চোলাই কেনার জন্য ঝুলোঝুলি করলেও সুচরিত রাজি হয় না। তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। তার বাড়ির টান আছে।

লেকের মধ্যে যেখানে যুদ্ধর সময় সামরিক হাসপাতালে ছিল সেখানে এখন অনেকগুলি রিফিউজি পরিবার জবর দখল করে আছে। এই তো কিছুদিন আগে চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ওদের উচ্ছেদ করার একটা চেষ্টা হয়েছিল। ছেলেমেয়ে বুড়ো সবাই এককা হয়ে পুলিশের লাঠির সামনে দাঁড়াতে শেষ পর্যন্ত পুলিশ হঠে যায়।

ইদানিং আবার নতুন করে উচ্ছেদের হুজুগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন নাকি ক'দিন আগে এদিক দিয়ে যেতে যেতে বলেছেন, আরে ছি ছি, লেকটাকে একেবারে বস্তি বানিয়ে ফেলেছে? রিফিউজিদের এত আবদর সহ্য করা হবে না।

অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীকে কে যেতে দেখেছে বা তাঁর এই উক্তি কে নিজের কানে শুনেছে তার কোনো ঠিক নেই, কিন্তু এই গুজবটা কলোনির প্রত্যেকের মুখে মুখে ঘুরছে। কেউ কেউ ঘরের মধ্যে লাঠি সোঁটা জমা করছে।

এই কলোনির একখানা ঘরে থাকে সুচরিত। ঘরখানা তার নিজস্ব নয়। বিপিন নামে একজন মোটর মেকানিকের কাজ করে, সুচরিতও কিছুদিন একটা গ্যারেজে ওয়েল্ডিং এর কাজ শিখেছিল, সেই বিপিনের সঙ্গে তার পরিচয়। খাওয়া থাকা জন্য সে বিপিনকে মাসে একশো টাকা দেয়। সুচরিত ভাত খেতে ভালোবাসে, রাস্তার দোকানের খাওয়া তার পছন্দ নয়।

যত রাতেই ফিরুক, সুচরিতের জন্য ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে। বিপিনের স্ত্রীকে সে বড়দি বলে ডাকে। সুচরিতের কোনো কালেই কোনো দিদি ছিল না, তবু বৌদির বদলে বড়দি ডাকটা কেন তার প্রথম মনে এসেছে কে জানে।

এই বড়দির মোটা সোটা আলুথালু চেহারা পাঁচটি সন্তানের জননী। দুটি সন্তান মারা গেছে, বড় ছেলেটি জেল খাটছে। সে ট্রেনে পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।

সুচরিত ফেরার আগেই বিপিনের সংসারে ঘুমিয় পড়ে সবাই। কেরোসিনের খুব অনটন বলে বেশিক্ষণ ওরা কুপি বা হ্যারিকেন জ্বালে না। সুচরিতের ঘরে মোম রাখা থাকে। অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে আন্দাজে আন্দাজে সে মোম খুঁজে নিয়ে জ্বালালো। তারপর রান্না ঘরে এসে খেতে বসলো।

পাশের ঘরটি পুরোপুরি অন্ধকার হলেও বড়দি ঘুমোয়নি। সে বললো, এই ন্যাডা, কড়াইতে দ্যাখ ডিমের ঝোল আছে। ভাত সবটুক নিস, রাখতে হবে না।

সুচরিত বললো, আচ্ছা।

মন দিয়ে সে খাওয়া শেষ করলো। ভাত, পুঁইশাকের তরকারি, আবুল খোসা ভাজা আর অনেকখনি ঝোলের মধ্যে আধখানা ডিম। ঝোলের স্বাদটা বড় অপূর্ব। ঐ ঝোলের জন্যই সবটা ভাত

খেয়ে ফেললো সুচরিত।

বাইরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে সে টচপট করে মেজে দিল নিজের থালা-গেলাস। এসব কাজ সকালে ভালো লাগে না।

সব শেষ করে নিজের ঘরের বিছানা মেলেও সে শুয়ে পড়লো না। একটা সিগারেট জ্বেলে বসে রইলো। এখন প্রতীক্ষা। প্রত্যেক দিনই এরকম হয়, নেশা করে এলেও সুচরিত খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ জেগে থাকে। কোনো কোনোদিন বড়দি উঠে আসে তারঘরে।

দিনের বেলা বড়দিকে দেখে বিশ্বাস করাই শক্ত যে তার ঐ শরীরের মধ্যে এতখানি লোভ আছে। দিনের বেলা সারাক্ষণ সে তার অতি দুরন্ত দুটি ছেলেমেয়েকে সামলাতেই ব্যতিব্যস্ত থাকে। তাছাড়া, উপরি রোজগারের জন্য সে ঠোঙা বানায়। দরজার সামনে সে পা ছড়িয়ে কোনোরকমে যে মাথার ওপরে একটা চাল জুটেছে আর দু'বেলা খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে, তাতেই সে সন্তুষ্ট। সন্ধের পরই সে ঘুমোয়, ঘুমের মধ্যে তার জোরে নাক ডাকে।

কাপড় চোপড়েরর খসখস শব্দ হতেই সুচরিত উৎকর্ণ হলো। আজ বড়দি আসছে। দু'ঘরের মাঝখানে রান্না ঘর। বাইরের দিক দিয়ে ঢোকার একটা দরজা আছে সচরিতের ঘরে। উঠোন দিয়ে ঘুরে এসে সেই দরজা প্রায় পুরোটা জুড়ে দাঁড়ালো বড়দি। তারপর আঙুল দিয়ে মোমবাতিটা দেখালো।

সুচরিত ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিতেই বড়দি তার বিছানার ওপর চলে এসে সুচরিতের গায়ে চেপে ধরলো নিজের বুক। বড়দির গায়ে শুধু একটা শাড়ি জড়ানো। সে নিজেই সুচরিতের একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের উরুর ওপর রাখে।

প্রত্যেকবার এই সময়ে সুচরিতের মনে পড়ে চন্দ্রার কথা। বড়দিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে চন্দ্রার মুখখানা দেখতে পায় অন্ধকারের মধ্যে।

॥ ১২॥

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে সুলেখা তাকালো ত্রিদিবের দিকে। বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে ত্রিদিব গভীর মনোযোগ দিয়ে চার্চিলের আত্মজীবনী পড়ছেন। রাত এখন পৌনে বারোটা এত রাতে কে টেলিফোন করলো তা জনানার আগ্রহ নেই ত্রিদিবের। পাছে দু'একটা কথা কানে চলে যায় তাই কি তিনি পাশ ফিরেছেন দেয়ালের দিকে? সুলেকা স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার মাথার মধ্যে পাতলা পাতলা চায়ার মতন নানা রকম চিন্তা ঘুরে যেতে লাগলো।

একটু বাদে সুলেখা শাড়ি ছেড়ে একটা পাতলা রাত পোশাক পরে নিল। আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সে নিজের মুখ দেখে নিজেই নিচু করলো চোখ। তার মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ সে কিছুতেই লুকোতে পারছে না। মুখে ক্রিম মেখে সে এসে দাঁড়ালো জানলার কাছে। কলকাতা শহর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। এখনও রাস্তা দিয়ে মানুষজন যাচ্ছে। তিন চারজন যুবক গল্প করছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, তাদের মধ্যে একজন হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ছে প্রায়, অন্য একজন হাততালি দিচ্ছে। সুলেখা জানলার কাঁচ খোলেনি, তাকে রাস্তা থেকে দেখা যাবে না।

সুলেখা আর একবার মুখ ফেরালো। না ডাকলে বোধ হয় ত্রিদিব সারা রাতই বই পড়ে যাবে। খাটের কাছে এসে সে বললো, রাতুল ফোন করেছিল।

বই থেকে চোখ না সরিয়ে ত্রিদিব বললো, ও।

এতই ভদ্র সে যে কিছুতেই জিজ্ঞেস করবে না, এত রাতে রাতুল কেন ফোন করেছিল কিংবা কী তার বক্তব্য। ত্রিদিবের এই ভদ্রতার শীতলতা এক এক সময় সুলেখার অসহনীয় লাগে। স্বামীর চরিত্র সে জানে, তবু তার মুখে যাতনার রেখাপাত হয়। রাতুল ত্রিদিবেরই বন্ধু, তবু সে টেলিফোনে ত্রিদিবকে ডাকেনি।

–আলো জ্বাল, থাকবে?

–উঁ? হ্যাঁ। **নিবিয়ে দিতেও পারো।**

–তুমি কী বললে, হ্যাঁ, না না?

–তোমার অসুবিধে হলে আলো নিবিয়ে দাও।

সুলেখা বিছানার ওপর এসে স্বামীর বাহুতে থুতনি ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি এখানে না চার্চিলের সঙ্গে লাহোর বা কাবুলে ঘুরছো?

ত্রিদিব হেসে বললো, থাক, আর পড়বো না। খুব ইন্টারেস্টিং। লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু ইংরেজিটা ভারি সুন্দর লেখে।

সুলেখা নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো, বাতুল তোমার কতদিনের বন্ধু?

–অনেক দিনের। মানে আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়েছে।

–ইস্কুলে একসঙ্গে পড়লেই কি সবাই বন্ধু হয়?

–না, তার কোনো মানে নেই। ছেলেবেলার কত বন্ধু তো হারিয়ে গেছে। কারুকে কারুকে হঠাৎ দেখলেও চিনতে পারি না।

–বন্ধুত্ব কাকে বলে? পুরুষ মানুষদের পরস্পরের প্রতি এক ধরনের ভালোবাসাই তো বন্ধুত্ব?

–হ্যাঁ তা বলতে পারো। তুমি তো থ্রি কমরেডস পড়েছো, সুলেখা। ঐ হচ্ছে বন্ধুত্ব। কোস্টার নামে ছেলেটি, সে তার বন্ধুর প্রেমিকার চিকিৎসা করাবার জন্য, কী যেন নাম মেয়েটির? প্যাট্রিশিয়া তার জন্য নিজের অত ফেভারিট গাড়িটা বিক্রি করে দিল।

–হ্যাঁ থ্রি কমরেডস আমি পড়েছি। বাতুল তোমার বন্ধু নয়। থ্রি কমরেডস-এর মতন বন্ধু তোমার একজনও নেই।

ত্রিদিব চিৎ হয়ে সুলেখার মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে তার কানের লতির নিচে আঙুল দিয়ে আদর করতে করতে বললো, সেরকম বন্ধু নেই, দোষটা বোধ হয় আমার। আমি খুব খোলাখুলি কারুর সঙ্গে মিশতে পারি না। আমি কোনোদিন কোনো ছেলের কাঁধ ধরে হাঁটুনি ছেলেরা যেমন হাসতে হাসতে একজন আর একজনের পিঠ চাপড়ে দেয়, সেরকমও করিনি কখনো ... আমার ঠিক আসে না ... তবে বাতুলের সঙ্গে অনেক দিনের চেনা, মাঝখানে কয়েক বছর বম্বেতে ছিল ... বাতুল, শাজাহান, অমর্ত্য, নিরুপম এদের তো আমি বন্ধু বলেই মনে করি, অনেকটা রুচিতে মেলে, কথা বলতে ভালো লাগে

- এরা কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারে কখনো?

- না, না, ক্ষতি করবে কেন? তাছাড়া এদের সঙ্গে তো কোনোরকম স্বার্থের সম্পর্ক নেই। শাজাহান অবশ্য বড্ড পয়সা খরচ করে আমাদের জন্য, প্রতিদান দেবার সুযোগ দেয় না।

- তবু ওরা কেউ তোমার বন্ধু নয়।

- এ কথা বলছো কেন? তুমি ওদের পছন্দ করো না?

- শোনো, তোমার একজনই বন্ধু আছে। তার নাম সুলেখা।

- সে কথা আর বলতে? তুমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

- কিন্তু তুমি আমায় সব সময় সাহায্য করো না। আমি কখনো কোনো অসুবিধেয় পড়লে তুমি বাচ্চা ছেলের মতন দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো।

- যাঃ, কী বলছো! আমি তোমায় সবচেয়ে বড় বন্ধু।

- কিন্তু তুমি আমায় সব সময় সাহায্য করো না। আমি কখনো কোনো অসুবিদেয় পড়লে তুমি বাচ্চা ছেলের মতন দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো।

- যাঃ, কী বলছো! আমি তোমায় সাহায্য করি না?

- তোমার ছোট কাকা যখন আমাকে ভীষণ বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছিলেন, তুমি আমায় সাহায্য করেছিলে?

- ওঃ, ছোট কাকার ঐরকম স্বভাব ... আমি জানতুম তুমি ঠিক সামলে নিতে পারবে।

- তবু তুমি নিজে মুখ ফুটে কিছু বলবে না।

- নিজের কাকাকে কি রূঢ় কথা বলা যায়?

- তা হলে যাকে তুমি বন্ধু বলে মনে করো, কিন্তু আসলে সে বন্ধু নয়, সেরকম কারুকে যদি কিছু বলতে হয়?

একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ আসছে বুঝতে পেরে ত্রিদিব হাই তুললেন। তিনি যে শুধু কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না তাই-ই নয়, তিনি কারুর সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতেও চান না। পৃথিবীটা যেন শুধু তাঁর রুচি অনুযায়ী চলবে।

সুলেখার ঘাড়ে ছোট একটি চুমু দিয়ে বললেন, ঘুম পেয়ে গেছে। কাল তো খুব ভোরে উঠতে হবে। লতুদের ট্রেন সাড়ে ছটায় না? তোমাকে হাওড়া স্টেশান যেতে হবে না। আমি একাই যাবো।

সুলেখা হাসলো। এই নিয়ে চারবার সে ত্রিদিবকে একটা বিষয় জানাবার চেষ্টা করছে, প্রত্যেকবারই ত্রিদিব এড়িয়ে যাচ্ছে। ত্রিদিব নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জানে। কিন্তু কিছুতেই তা নিয়ে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না।

আর একটা হাই তুলে ত্রিদিব আবার বললেন, প্রত্যেকদিন ঘুম আসার আগে আমার মনে হয়, আমার কী দারুণ সৌভাগ্য যে তোমার মতন একটি বউ পেয়েছি। অন্য কোনো মেয়ের পাল্লায় যদি পড়তুম, যে চ্যাঁচামেচি করে ঝগড়া করে কিংবা পরনিন্দা পরচর্চা করে, তা হলে কী হতো বলো তো? তা হলে বোধ হয় আমি আত্মহত্যা করতুম।

ঘুমের ভাগ নয়, একটু পরে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন ত্রিদিব।

সুলেখার চোখে ঘুম নেই। কাল এ বাড়িতে অনেক লোকজন আসবে। ত্রিদিবের ছোট বোনের স্বামী বদলি হয়ে আসছে কলকাতায়, এখনো তারা কোনো বাড়ি পায়নি, কিছুদিন থাকবে এখানে। ওদের দুটি ছেলে মেয়ে। সুলেখা লোকজন ভালোবাসে, ওদের জন্য ঘর-টর সাজিয়ে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওরা আসছে বলে আর একটা কারণে সুলেখা খুশী, তা হলে বাতুল আর যখন-তখন আসতে পারবে না এখানে।

কোথায় যেন একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে, সুলেখা কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। প্রায় সদ্যোজাত শিশুর মতন গলার আওয়াজ। কয়েকদিন ধরেই মাঝ রাতে সুলেখা শুনতে পাচ্ছে এই কান্না। তার সন্দেহ হয়, সে কি সত্যিকারের কোনো বাচ্চার কান্না শুনছে, না এটা তার মনের বিভ্রম? আশেপাশের কোনো বাড়িতে নতুন একটি শিশু তো জন্মাতেই পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা নেই সুলেখাদের, এরকম কোনো খবর সে শোনেনি। কাল বাড়ির ঝি-কে জিজ্ঞেস করতে হবে। ওরা ঠিক জানবে।

সুলেখার কোনো সন্তান হয়নি, অনেক বছরের বিবাহিত জীবন হয়ে গেল, এখন অন্যরা তাকে প্রশ্ন করে। সুলেখার মা আর বৌদি তো এই নিয়ে তাকে এখন বেশ জ্বালাতন করতে শুরু করেছেন। শুধু ত্রিদিব কিছুই বলেন না। সুলেখার নিজস্ব কোনো অভাব বোধ ছিল না এতদিন, অন্যদের কথা শুনতে শুনতে এখন মনে হয়, অন্তত একটি সন্তান থাকলে বেশ হতো। প্রতাপ একদিন সুলেখাকে ইঙ্গিত করেছিলেন, ত্রিদিবের উচিত ডাক্তার দেখানো। সুলেখা জানে, তারও উচিত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া, কারণ তার নিজেরও বন্ধ্যাত্ব থাকতে পারে। কিন্তু ত্রিদিব নিজে কিছু না বললে এ সম্পর্কে সুলেখার মুখ ফুটে কিছু বলতে লজ্জা করে। যদি ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে ত্রিদিবেরই কিছু খুঁত আছে, তা হলে তারপরেও কি ত্রিদিবের সঙ্গে তার সম্পর্ক এরকম ভারো থাকবে?

সুলেখা বুকের ওপর দুটি হাত এমনভাবে রাখলো যেন সে তার অজাত সন্তানকে আদর করছে। আবার শোনা গেল সেই শিশু কণ্ঠের ক্ষীণ কান্না।

বাতুল তাকে ঠিক এই জায়গাটাতে ধরেছে।

বিয়ের পর সুলেখা বাতুলকে বেশি দেখেনি। সে চাকরি নিয়ে বম্বেতে থাকতো। দু'একবার মাত্র এসেছে এ বাড়িতে। বম্বেতে বাতুলের স্ত্রী হঠাৎ গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়, ওদের একটি ছেলে এখন মানুষ হচ্ছে মামা বাড়িতে। সেই ঘটনার কিছুদিন পর বাতুল বম্বের পাট উঠিয়ে দিয়ে চলে আসে কলকাতায়। সে-ও প্রায় বছর চারেক হয়ে গেল। স্ত্রীকে সে ভালোবাসতো খুব, বছর তিনেক সে কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারতো না ভালোভাবে। তার বন্ধুরা তাকে বাড়িতে ডেকে ডেকে এনে সান্ত্বনা দিতে চাইতো।

বাতুলের সুন্দর স্বাস্থ্য, টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে তার না ছিল এক সময়। তার গানের গলাও চমৎকার। সে একা একা একটা মস্ত বড় ফ্ল্যাটে থাকে, তাই ইদানীং তার বন্ধুরা, বিশেষ করে বন্ধু পত্নীরা তাকে বলছে, আপনার আবার বিয়ে করা উচিত। সুলেখারও খুব মায়া লাগলেতো বাতুলকে দেখে, একদিন সে-ও বলেছিল, সত্যি এবারে আপনার আবার বিয়ে করা দরকার। একলা একলা সারা জীবন কাটাবেন কী করে? আমার তো ভাবলেই যেন কেমন লাগে।

কথাটা শুনে বাতুল এক দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল সুলেখার মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল, আমি বিয়ে করতে পারি ... তোমাকে।

এটা একটা ঠাট্টা হতে পারতো। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে এরকম ঠাট্টা চলতে পারে। কিন্তু কথাটা বলার সময় রাতুল একটুও হাসেনি, তার চোখের দৃষ্টি ছিল গাঢ়। এরকম দৃষ্টির সামনে সুলেখা অস্বস্তি বোধ করে। কৈশোর বয়েস থেকেই সে পুরুষ মানুষদের বাসনাময় দৃষ্টি দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু রাতুলের তাকানো সেরকমও নয়, দেখরে ভয় লাগে। এ বাড়িতে ত্রিদিবের সঙ্গে পরিচয় বা আত্মীয়তার সূত্রে যারা প্রায় প্রতিদিনই আড্ডা দিতে আসে তাদের সঙ্গে সুলেখা শুধু হাসা-পরিহাসের সম্পর্ক রাখে, বই-সিনেমা-থিয়েটার গান-বাজনা নিয়ে কথা বলে, তার বেশি কিছু না। সে কারুর ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি দিতেও চায় না। তবু কেন যে হঠাৎ সেদিন রাতুলকে ঐ কথাটা বলতে গেল।

কয়েকদিন বাদেই রাতুল জানালো যে সে অনেকদিন ধরেই সুলেখাকে ভালোবাসে, কথাটা এতদিন মুখ ফুটে বলেনি, সে সুলেখাকে বিয়ে করতে চায়, সুখেলা ছাড়া আর কোনো মেয়েকেই সে বিয়ে করবে না।

এরকম কথা পুরোপুরি শুনতেই চায়নি সুলেখা, তার শরীর অস্থির লাগছিল, কিন্তু রাতুল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ধীর গম্ভীর গলায় সবটা তাকে না শুনিয়ে ছাড়েনি। সেদিন সুলেখা খুবই কাতর বোধ করেছিল। মানুষ এরকমভাবে ভালোবাসার কথা বলে কী করে? এ কী ধরনের ভালোবাসা? সুলেখা তো কোনোদিন রাতুলকে সামান্যতম প্রশ্রয়ও দেয়নি। দু'জন মানুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলো না, হৃদয়সংবাদ বিনিময় হলো না, শুধু শুধু একজন ভালোবেসে ফেললো। তাও একজন বন্ধুর স্ত্রীকে? এখন মানুষ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রীকে বলতে পারে, তুমি তোমার স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে বিয়ে করো?

ত্রিদিবের সমান না হলেও সুলেখারও খুব বই পড়ার নেশা। কাব্য-সাহিত্যে সে অনেক একতরফা প্রেমের কাহিনী পড়েছে, কিন্তু সুলেখা মনে করে ঐ সব পুরুষ রচিত কাহিনীর নায়িকারা অধিকাংশই প্রতীক। বিয়াত্রিচে কি মানবী না দান্তের সরস্বতী? ঐ সব নারীদের সঙ্গে কবি-লেখকদের মলিন হয়, অনেক নরক পেরিয়ে যাবার পর স্বর্গে।

রাতুলের মুখে এ কথা শুনেও তাকে ঘৃণা করা যায় না, তার কারণ মানুষ হিসেবে সে অতি ভদ্র ও মার্জিত, তার ব্যবহারে কখনো রুচিহীনতা প্রকাশ পায় না, সে কোনোদিন সুলেখাকে শারীরিক ভাবে জোর করার চেষ্টা করেনি। ভালোবাসার কথা না বলেও অনেকেই সুলেখাকে নানাভাবে ছুঁয়ে দেবার চেষ্টা করে, রাতুল সেরকম না মোটেই।

রাতুল দ্বিতীয় দিন ঐ একই কথা বলতে এল সুলেখা হাসি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাতুল তাতে ভোলে না। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চায় যে সুলেখা ছাড়া আর কারুকেই সে বিয়ে করতে পারবে না।

এরকম কথায় আবার সুলেখার ওপর একটা দায়িত্ব বর্তে যায়। তার জন্য একটা লোক সারা জীবন নিঃসঙ্গ থেকে যাবে কেন? তাতে সুলেখার মনেও একটা অপরাধ বোধ থেকে যাবে না?

ত্রিদিব যখন বাড়িতে থাকে না তখনও রাতুল আসে। সুলেখা কিছুতেই তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারে না। বলতে পারে না আপনি আর আসবেন না।

একদিন সুলেখা রাতুলকে বললো, আপনি এরকম পাগলামি করছেন কেন? আপনি একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না, আমি তো আমার স্বামীকে খুবই ভালোবাসি। আমাদের মধ্যে কখনো কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়নি।

রাতুল সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, তুমি ত্রিদিবকে ভালোবাসো, তা আমি জানি না? আমাকে বিয়ে করার পরেও তুমি ত্রিদিবকে ভালোবাসবে। আমি যেমন মনিকাকে এখনো ভালোবাসি। তাকে তো ভুলে যাইনি।

এটা রাতুলের একটা অদ্ভুত যুক্তি। মৃত ও জীবিত মানুষের মধ্যে একটা তফাৎ থাকবে না? কিন্তু উত্তরটা সুলেখা মুখে আনতে পারেনি। রাতুলের মৃতা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা তাকে মানায় না।

রাতুল আবার বলেছিল, শোনো সুলেখা, ত্রিদিব তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে। তোমরা দশ-বারো বছর সুখের বিবাহিত জীবন কাটিয়েছো। কিন্তু ত্রিদিব কোনোদিনই তোমাকে সন্তান উপহার দিতে পারবে না। সে জন্য এস সময় তোমার মধ্যে একটা তিক্ততা আসবেই। বরং আমাকে বিয়ে করার পরও ত্রিদিব তোমার বন্ধু থাকতে পারে।

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল সুলেখা। ত্রিদিব কোনোদিন সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না এ কথা

রাতুল কী করে জানলো? কেন এত জোর দিয়ে বললো? রাতুল তো আর ডাক্তার নয়। কিংবা ত্রিদিব কখনো কি গোপনে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছে,তখন রাতুল সঙ্গে ছিল। ত্রিদিব তো সুলেখা লুকিয়ে কোনো কাজ করে না। এই একটা ব্যাপার সে সুলেখার কাছে গোপন করে গেছে? সুলেখা মুখ ফুটে এ কথা ত্রিদিবকে জিজ্ঞেস করতেও পারে না। যদি সত্যি হয়। না, না, সেরকম সত্য সলেখা সহ্য করবে কী করে?

গত কয়ে সপ্তাহ ধরে রাতুল যেন মরীয় হয়ে উঠেছে। সে আর দেরি করতে চায় না। সে যেন ধরেই নিয়েছে সুলেখার সঙ্গে তার বিয়ে হবেই। সে যখন তখন আসে কিংবা ফোন করে, ত্রিদিবকে অগ্রাহ্য করে সুলেখার সঙ্গে কথা বলে। সে যেন ত্রিদিবকে জানিয়ে দিতেই চায় তার উদ্দেশ্যটা। যেন এদিব একবার জেনে ফেললে, প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলেই সব কিছুর সুরাহা হয়ে যাবে। কিন্তু ত্রিদিব উদাসীন।

সুলেখা মন শক্ত করে রাতুলকে পুরোপুরি প্রত্যাখান করার কথা ভাবতে গিয়েই টের পেল তার মনের মধ্যে কখন একটা দ্বিধা এসে ঢুকে বসে আছে। রাতুলকে একেবারে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই। এর আগে অন্য কোনো পুরুষ মানুষ সম্পর্কে তার এরকম হয়নি। এখনো যে ত্রিদিবের প্রতি তার ভালোবাসা একটুও কমেছে তা নয়, ত্রিদিবকে ছেড়ে যাবার কথা সে চিন্তাও করে না, কিন্তু রাতুল আর আসবে না, সে আঘাত পেয়ে নিজের বাড়িতে একা একা মুষড়ে থাকবে, এ কথা ভাবতেও তার কষ্ট হয়।

নিজের মনের এরকম দুর্বলতা টের পেয়ে সুলেখা শিউড়ে উঠে ছিল। এরকম জটিলতা সে সহ্য করতে পারবে না। ত্রিদিবের সঙ্গে সে এতগুলি বছর চমৎকার কাটিয়েছে, বাকি জীবনটাও সুন্দরভাবে কাটাতে চায়, তার সন্তানের প্রয়োজন নেই। ত্রিদিব নিজে কিছু ব্যবস্থা করে না কেন? সব সমস্যা সমাধানের ভার সে স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দেবে? সে যদি রাতুলকে বলতো তুই আমার বউকে আর বিরক্ত করতে আসিস না..

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠতেই দারুণ চমকে উঠলো সুলেখা। বুকের মধ্যে দুম দুম শব্দ হতে লাগলো, পাগল হয়ে গেল নাকি মানুষটা? রাতে আবার কেউ ফোন করে?

সুলেখার উচিত ছিল ফোনটা নামিয়ে রাখা। কিংবা এখনও তো সে সাড়া না দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে পারে। এরকম তীব্র ঝনঝন আওয়াজেও ত্রিদিবের ঘুম ভাঙেনি? সে জেগে উঠে ধরুক, তারপর যা খুশী বলুক।

টেলিফোনটা বাজতেই লাগলো। এক সময় সুলেখা পাশ ফিরে রিসিভার তুলে দুঃখী গলায় বললো, ছিঃ এটা কি হচ্ছে? কত রাত হয়েছে জানেন না?

রাতুল বললো, কিছুতেই ঘুম আসছে না। সুলেখা তুমি আজ বিকেলে শাজাহানের সঙ্গে অতক্ষণ হেসে হেসে গল্প করলে আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলোনি, তাতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আগে কখনো শাজাহানকে ঈর্ষা করতুম না, কিন্তু আজ

–এসব কথা এখন না বললেই নয়?

–আমা যে মাথার মধ্যে এইসবই ঘুরছে, চোখ বুজলেও তোমাকেই দেখতে পাচ্ছি। আমি কোনোদিন ঘুমের ওষুধ খাই না। সুলেখা, তুমি আমার সঙ্গে একটু ভালোভাবে কথা বলো তাহলে আমার ঘুম আসবে।

–এই তো বলছি। মাথা ঠাণ্ডা করে ঘুমিয়ে পড়ু ন। কিংবা চোখ বুঝে দু'তিনশোটা ভেড়া গুনতে থাকুন, ঘুম এসে যাবে ঠিক।

–ঠাট্টা করো না। সুলেখা এবারে তুমি মন ঠিক করে ফেলো। দু'একদিনের মধ্যে সুলেখা রিসিভারটা কানের কাছ থেকে একটু সরিয়ে নিয়ে চুপ করে রইলো। আপন মনে কথা বলে যেতে লাগলো রাতুল। একটু পরে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে সে ডাকতে লাগলো সুলেখা, শুনতে পাচ্ছো না? সুলেখা, সুলেখা।

সুলেখা এবারে বললো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি।

–ঠিক করে ফেলোছো? বাঃ গুড! গুড! কবে বলবে ত্রিদিবকে কালই?

–হ্যাঁ কালই। এবারে ঘুমোন। গুড নাইট।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে সুলেখা আলো জ্বাললো। ত্রিদিব কি সব শুনেও ঘুমের ভান করে আছে?

অবশ্য ত্রিদিবের গাঢ় ঘুম। তার কপালে প্রশান্ত ভাব, একটা হাত বুকের ওপর রাখা।

খাট থেকে নেমে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো সুলেখা। সামনের দেয়ালের ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠায় শুধু সাদা মেঘের ছবি। যেন ঐ ছবিটাই এখন তার খুবই দরকার, এইভাবে সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুলেখা। একটু পরে সে চলে এলো জানলার কাছে। রাস্তা এখন একেবারে নির্জন, টুপটাপ টুপটাপ শব্দ হচ্ছে মৃদু বৃষ্টির। গভীর রাত্তিরে এইরকম একলা একলা বৃষ্টিপাতের দৃশ্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত মায়া আছে।

জানলার পাল্লাটা খুলে বাইরে হাত বাড়ালো সুলেখা। আস্তে আস্তে তার হাত ভিজে গেল বৃষ্টি জলে। তারপর সেই জলে সে ধুয়ে ফেলতে লাগলে তার নিঃশব্দ চোখের জল।

॥ ১৩ ॥

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মামুন দেখতে পেলেন সদর দরজা ঠেলে ঢুকছে একটি দম্পতি। মামুন থমকে দাঁড়ালেন, এই প্রৌঢ় বয়েসেও তাঁর বুক কেঁপে উঠলো। মঞ্জু এসেছে।

কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে এসেছে মঞ্জু, তার বুকে তার শিশু সন্তান। তার স্বামীর পরনে সাদা কুর্তা পাজামা। মামুন জানতেন যে মঞ্জুরা ঢাকায় ফিরেছে গত মাসের প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু এ পর্যন্ত মঞ্জু তার সঙ্গে দেখা করেনি।

মঞ্জু বাচ্চা মেয়ের মতন চেঁচিয়ে উঠলো, মামুন মামা। তুমি বাইরে যাচ্ছিলে নাকি? মামুন বললেন না। এসো।

মঞ্জু তার ছেলেকে স্বামীর কোলে দিয়ে দৌড়ে উঠে এসে মামুনের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করলো। বাবুল চৌধুরী অবশ্য তা করলো না। তার দু'হাত জোড়া এই ছল করে হাসিমুখে বললো, কেমন আছেন, মামুনভাই?

মঞ্জু অভিযোগের সুরে বললো, তুমি এখানে বাসা নিয়েছো আমারে জানাও নাই কেন?

অনেকদিন পর শহরের রাজনীতির স্বাদ পেয়ে মামুন আর গ্রামে ফিরে যেতে পারেন নি। বড় বোনের বাড়িতেও বেশিদিন আতিথ্য নিয়ে থাকা যায় না, তাই মামুন পুরানা পল্টনে আলাদা কষাকষি চলেছে কিছুদিন ধরে। কিন্তু এই এক জায়গায় মামুন বজায় রেখেছেন তাঁর জেদ। ফিরোজা বেগম মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকেন, যদিও সর্বক্ষণ তাঁর মন পড়ে থাকে মাদারিপুরে।

বাইরের লোকজনের গলার আওয়াজ শুনে মামুনের মেয়ে হেনা বেরিয়ে এলো বাইরে। নতুন বর্ষায় পুঁইডগার মতন সে ফনফনিয়ে লম্বা হয়ে উঠছে। মঞ্জু তাকে দেখে চোখ বড় বড় করে বললো, এটা কে, হেনা নাকি? উরি ব্বাইস রে। কত্ত বড় হইয়া গ্যাছে মাইয়াডা।

মামুন দেখছেন মঞ্জুকে। কত বদলে গেছে মঞ্জু। তার শরীরে সেই হিলহিলে ছটফটে ভাবটা একটুও নেই। তার ভুরুতে সব সময় মাখা থাকতো যে সরল বিস্ময়, তা কোথায় গেল? ঢাকায় পা দিয়েই সে মামুনের সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটে আসেনি। সে রকম আগ্রহ থাকলে সে তার মায়ের কাছ থেকে মামুনের এই বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করতে পারতো না?

বসবার ঘরটি সংক্ষেপে সাজানো। এক পাশে একটি চৌকির ওপর সুজনি পাতা, বাইরের কোনো অতিথি এলে ওখানেই শুতে দেওয়া হয়। আর কিছু বেতের চেয়ার একটি নিচু টেবিল যার ওপরে দাবার ছক আঁকা। এই দাবা খেলাটা মামুনের নতুন নেশা। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবার পর এতে বেশ ভালো সময় কাটে। এই একটি মাত্র খেলা যাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দ থাকা যায়।

ফিরোজা বাইরের লোকের সামনে বেরো না। কিন্তু এরা তো বাইরের লোক নয়, মামুন দু'তিনবার স্ত্রীর নামে হাঁক দিলেন, তুব কোনো সাড়া শব্দ নেই। ফিরোজা বেগম একবার উঁকিমেরে দেখেই বাথরুমে ঢুকে বসে আছেন। তিনি অতিমাত্রায় রূপ সচেতন। নিজের তেলতেলে মুখ কিংবা রান্না করার শাড়ি পরা চেহারা তিনি কারুকে দেখাতে চান না। হেনার হাত ধরে মঞ্জু চলে গেল অন্দর মহলে।

বাবুল বললো, মামুনভাই, আজকাল তো আপনি খবরের কাগজে খুব লিখছেন। আপনার লেখাগুলি সব পড়ি।

মামুন বললেন, হ্যাঁ, আগে ছিলাম কবি, এখন হয়ে উঠেছি ঝানু সাংবাদিক।

–কেন, কবিতা আর লেখেন না?

–নাঃ। আমার কবিতা কেউ চায়ও না, আমারও লিখতে ইচ্ছে করে না। তাও খবরের কাগজে কলম ধরেছিলাম রাজনৈতিক অ্যানালিসিস লিখবো বলে এখন সেনসরশীপের ধাক্কায় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে জীবনের বিকাশ জাতীয় এলেবেলে জিনিস লিখি। লেখাটাই জীবিকা হয়ে গেছে যে।

–আবার তো ইলেকশন হবে হবে বলে একটা রব শোনা যাচ্ছে।

–হলেও সেটা বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি ছাড়া আর কিছু হবে না। ফ্রন্ট ভেঙে গেল, কোনো দল কি একা একা পারবে সরকারি পার্টির সঙ্গে? আইয়ুব খান যথেষ্ট পপুলার। এদেশের মানুষ এখনো গণতন্ত্রের মূল্য বোঝে না।

–আমি তো গ্রামে থাকি, আমি দেখেছি আপনাদের আওয়ামী লীগ এখনও যথেষ্ট পপুলার। আপনাদের পার্টি তো ইণ্ডিয়ার সাহায্য পায় ইলেকশান হলে আপনাদের জেতবার যথেষ্ট চান্স আছে। ইণ্ডিয়ার ব্যাকিং-এই আপনারা মিনিস্ট্রি ফর্ম করতে পারবেন।

মামুন তীক্ষ্ণ চোখে বাবুলে দিকে তাকালেন। ছেলেটি কি তাঁকে বিদ্রূপ করছে? আপনাদের আওয়ামী লীগ কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন খোঁজ আছে। তিনি খানিকটা ধারালোভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ইণ্ডিয়া আমাদের সাহায্য করে কে বললো?

বাবুল হাসি মুখে বললো, লোকে বলে এই রকম কথা।

–লোকে তো অনেক কিছুই বলে। এমন বহু লোক আছে যারা বলে, পার্লামেন্টোরি ডেমোক্রেসির চেয়ে সামরিক শাসন ভালো। তুমি লেখা পড়া জানা শিক্ষিত ছেলে, তুমি যা বলবে তা গুরুত্ব দিয়ে ভেবে চিন্তে বলবে, এমন আশা করেছিলাম।

বাবুল হাসিটাকে আরো চওড়া করে বললো, আসলে ব্যাপার কী জানেন মামুনভাই আমি আজকাল পলিটিক্স নিয়ে একেবারে মাথা ঘামাই না। কোনো খবরও রাখি না। আমি এখন–

মামুন তাকেবাধা দিয়ে বললেন, এতে নতুনত্ব কিছু নাই। অনেকেই তো এখন ভয় পেয়ে রাজনীতি চেড়ে বাড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে আছে।

–ঠিক বলেছেন। আমি এখন শুধু চিন্তা করি যাতে আমার বউ-ছেলের কোনোক্রমে কোনো ক্ষতি না হয়। তবে লোকে যেসব কথা বলে, তা কানে আসে, কান তো আর বন্ধ রাখতে পারি না।

–কান বন্ধ রাখা যায় না বটে, তবে নিজস্ব বিচার বুদ্ধিটাকেও বন্ধ করে রাখা কোনো সুস্থতার পরিচয় নয়।

বাবুল আর তর্ক না বাড়িয়ে চুপ করে গেল। মামুন হঠাৎ খেয়াল করলেন যে তিনি এই ছেলেটির সঙ্গে যেন প্রথম থেকেই রাগ রাগ সুরে কথা বলছেন। অথচ বাবুল চৌধুরী এখন তাঁর কুটুম্ব, অনেকদিন পর বেড়াতে এসেছে, একে বরং বেশি বেশি খাতির যত্ন করা উচিত।

এক সময় এই বাবুল চৌধুরীকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। এর বড় ভাই আলতাফের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ, সে-ই তাঁকে প্রায় জোর করে অজ্ঞাতবা থেকে টেনে এনেছে জনজীবনের স্পন্দনের মধ্যে। এক সময় কত খাতির করেছে তাঁকে। কিন্তু হঠাৎ সবকিছু যেন বদলে গেল। আওয়ামীলীগ ভেঙে যখন ন্যাপের জন্ম হলো এরা দু ভাই চলে গেল ন্যাপে। রাজনৈতিক বিচ্ছেদে ব্যক্তিগত সম্পর্কও নষ্ট করতে হবে? মৌলানা ভাসানীর যেমন মুখ আলগা তেমনি ন্যাপের ছেলেরাও আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি বিষোদগার করতে লাগলে যখন তখন অথচ কিছুদিন আগেও দুপক্ষই ছিল ভাই-ভাই। ইস্কান্দার মীর্জার আমলে আওয়ামীলীগের মন্ত্রীত্ব গ্রহন এবং পশ্চিমী জোট বাঁধা বৈদেশিক নীতি আঁকড়ে থাকা ওরা সহ্য করতে পারেনি। ওদের কম্যুনিস্ট। মামুন লক্ষ করেছেন, এদেশে কম্যুনিস্টদের প্রধান হাতিয়ার হলো গালাগাল। বিরুদ্ধ পক্ষের লোক হলেই বিনা প্রামাণে তাকে পা চাটা, সুবিধাবাদী, সি আই-এর দালাল বলতে একটুও মুখে আটকায় না। যে আলতাফ একদিন মামুনকে মাথায় তুলে নাচতেও রাজি ছিল, সে-ই কিনা প্রকাশ্যে তাঁকে বলেছে, লোভী, হারামখোর, গুণ্ডা শেখ মজিবর রহানের লেজুড়, আরও কত কী। মামুন দারুণ দুঃখ পেয়েছেন সেসব শুনে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পেলেও তিনি কি কখনো মন্ত্রিত্বের উমোদারি করতে গেছেন? তিনি কখনো সরকারি পদ গ্রহণ করে একটা পয়সাও ছুঁয়েছেন? একটা সময় এসেছিল যখন জেল খাটা চোর ডাকাতরাও আমি সোহরাওয়ার্দি হক মুজিবগো সাথে জেইল খাটছি বলে পরিচয় দিয়ে সরকারি পদ পাবার চেষ্টা

করতো। মামুন কখনো নিজের কারাবাসের কথা কারুকে জানিয়েছেন?

বাবুল চৌধুরী অবশ্য কখনো ওরকম ভাষা প্রয়োগ করেনি তাঁর প্রতি। ছেলেটি বরাবরই মিতভাষী ও অতিশয় লাজুক ও বিনীত। কিন্তু মামুন জানেন ও ওর বড় ভাইয়ের চেয়েও বেশি উগ্রপন্থী চীনের মাও সে তু-এর ভক্ত। এই সব ছেলেরা ইলেকশানেও বিশ্বাস করে না। এরা চায় সশস্ত্র বিপ্লব। বাবুল গালাগালি করে না বটে, কিন্তু মামুনের সন্দেহ হয়, সব সময়েই ওর কথাবার্তার মধ্যে থাকে কটাক্ষ ও বিদ্রূপ।

পুরোনো কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করে মামুন বললেন, তোমার কথা কও, বাবুল। তোমরা কি এখন ঢাকাতেই থাকবে?

বাবুল বললো, ঠিক নাই কিছু। এখন তো কলেজ বন্ধ তাই চলে আসলাম। মঞ্জুও অনেকদিন বাপের বাড়ি আসে নাই।

—ভালো করেছো। তুমি তো ইচ্ছা করলেই ঢাকায় কাজ পেতে পারো। তুমি পি এইচ ডি-টা করলা না?

—এইবার করে ফেলবো ভাবছি। যদি ঢাকায় থাকি।

মঞ্জু ফিরে এলো এ-ঘরে। হেনার কোলে মঞ্জুর সন্তান। সে বললো, মামুনমামা, তুমি আমার ছেলেকে দেখলে না? বললে না ছেলে কেমন হয়েছে?

মামুন শশব্যস্ত হয়ে শিশুটির দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে তার গাল টিপে আদর করে বললেন, কী সুন্দর খোকা হয়েছে। এ যে রাজপুত্তুর। তা তো হবেই, বাপ-মা দুজনেই এত সুন্দর। কী নাম রেখেছো।

মঞ্জু বললো, কোনো নাম রাখিনি। তুমি তো নাম ঠিক করে দেবে।

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে মামুন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, নাম রাখো নজরুল ইসলাম। আমার প্রিয় কবির নামে। আমার ছেলে হলে আমি এই নাম রাখবো ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমার দুই-দুইটাই মেয়ে। তোমার ছেলের একটা ডাক নামও রাখতে হবে, কবি নজরুলের ডাক নাম শুনেছি দুখু মিঞা, সে নাম রেখো না, ওর নাম রেখো সুখু মিঞা। তোমরা যে-যাই বলো আমি ওকে সুখু মিঞা বলেই ডাকবো।

মামুনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একটি পুত্র সন্তান ছিল, বছর তিনেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে। সেই ছেলেটিও ডাক নাম ছিল সুখু।

মঞ্জু তাকালো তার স্বামীর দিকে। বাবুল কৃত্রিম ভদ্রতার সঙ্গে অতিরিক্ত উৎসাহ জুড়ে বললো বাঃ বাঃ এ তো অতি চমৎকার নাম। নজরুল ইসলাম আর সুখু। দারুণ। মামুনভাই ছাড়া এত সুন্দর নাম আর কে রাখবে?

মামুন বললেন, একটু দাঁড়াও এখনি আসতেছি।

চিট ফটফটিয়ে প্রায় দৌড়েই তিনি চলে গেলেন শয়নকক্ষে। ফিরে এলেন অল্পকালের মধ্যেই। আবার বাচ্চাটিকে আদর করতে করতে বললেন, দেখি দেখিরে সুখু মিঞা। হাতটা দেখি বাঃ, কী সুন্দর গোলাপি রঙের হাত।

শিশুর রঙীন করতলে তিনি গুজে দিলেন একটি মোহর।

মঞ্জু বললেন একী ওকে ওটা কী দিলে মামুনমামা?

মামুন বললেন বিশেষ কিছু না। একটা মোহর। কলকাতা থাকার সময় আমি দেখেছি দু'এক বাড়িতে নতুন শিশুকে প্রথম দেখার সময় গুরুজনেরা মোহর দেয়, তা আমার কাছে ছিল একটা।

মঞ্জু বললো না না, ওকে ওটা দিও না।

বাবুল বললো আপনি মোহর দিলেন? ওর যে অনেক দাম।

মামুন ঈষৎ আহতভাবে বললেন, তুমি দামে কথা বলো না। আমার দিতে ইচ্ছে হলো ছিল বাড়িতে একটা মঞ্জুর সন্তান সে যে আমার বুকের মণি।

মঞ্জু ছো মেরে বাচ্চার হাত থেকে মোহরটা তুলে নিয়ে বললো আমি সেজন্য বলছিনা। ছেলেটা এমন দুষ্টু হয়েছে হাতের কাছে যা পায় তাই-ই মুখেপুরে দেয়।

মামুন হাসতে হাসতে বললেন, যদি ও মোহর খেয়ে ফেলে তাহলে বুঝতে হবে এই সুখু মিঞা একদিন পাকিস্তানের বাদশা হবে। থুড়ি এ যুগে তো বাদশা হয় না, মিলিটারি ডিটেটর। হাঃ হাঃ হাঃ।

বাবুল তার স্ত্রীর হাত থেকে মোহরটি নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বললে, আকব্বরী

মোহর। এখন এটা এদেশে তো পাওয়াই যায় না। পূর্ব পাকিস্তানে যে কটা বা ছিল সবই পশ্চিমে চলে গেছে।

এই সময় ফিরোজা এসে ঢুকলেন হাতে একটি ট্রে নিয়ে। তিনি যে শুধু স্নান করে সেজেগুজে এসেছেন তাই-ই নয়, এর মধ্যেই বাড়ির নফরকে দোকানে পাঠিয়ে পাঁচ রকম মিষ্টি আনিয়েছেন। স্ত্রীকে দেখে মামুন মনে মনে প্রার্থনা করলেন, মোহর প্রসঙ্গটি যেন থেমে যায়।

ফিরোজা বেগমের ব্যক্তিত্বটি এমনই প্রবল যে তিনি যেখানেই থাকেন সেখানেই দৃশ্যের কেন্দ্রস্থলে তাঁর অবস্থান। তিনিই মূল কথাবার্তার ধারা পরিচালনা করেন। ওদের তিনি জোর করে করে মিষ্টি খাওয়াতে লাগলেন বাবুল মিষ্টি তেমন পছন্দ করে না, কিন্তু তার কোনো আপত্তি গ্রাহ্য হলো না, পাঁচ রকমের পাঁচটি সন্দেশ গলাধঃকরণ করতে হলো তাকে।

মঞ্জুকে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন তার সংসারের কথা, স্বরূপ নগরের বাড়িতে কখান ঘর কে রান্না করে, কলের পানি না পুকুরের পানি, মশা আছে কিনা। সেই সঙ্গে উপদেশ দিতে লাগলেন সন্তান পালন বিষয়ে।

মামুন চুপ করে রইলেন, এই সব কেজো কথা শুনেত তাঁর ভালো লাগে না। মাঝে মাঝেই তিনি দেখছেন মঞ্জুর মুখখানি, কিন্তু মঞ্জু তাঁর চোখে চোখ ফেলছে না। কতদিন মঞ্জুর গান শোনা হয়নি। মেয়েটা কি গানের চর্চা রেখেছে না বিয়ের পর সব ভুলে গেছে? এখন মঞ্জুকে গান গাইতে অনুরোধ করা যাবে না, কারণ ফিরোজা গান-টান পছন্দ করেন না একেবারেই।

মঞ্জু কত দূরে সরে গেছে। আগে সে মামুনের কাছে কতরকম আবদার করতো, মামুনের অগোছালোপনা দেখে শাসন করবো, মামুন রাত করে বাড়ি ফিরলে জেগে বসে থাকতো সে। আর এখন এক মাসের ওপর ঢাকায় থেকেও সে মামুনের সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটে আসেনি। আজ এসেও সে মামুনের সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি, নিজের ছেলের বিষয়েই গল্প করে যাচ্ছে। বিয়ের পর মেয়েরা এই রকম হয়ে যায়?

মঞ্জু চলে যাবার পর মামুন আর একটাও কবিতা লেখেননি। কবিতাও তাঁকে ছেড়ে গেছে।

অথচ মামুন নিজেই তো উদ্যোগ করে মঞ্জুর বিয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতার দুটি ছেলে এসে মঞ্জুর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাবার পর তার শিগগিরই একটা বিয়ে দেওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। মামুনই তাঁর আপা-দুলাভাইয়ের কাছে বাবুল চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করেছেন, বাবুলের কতরকম গুণপনার বর্ণনা করেছেন। বাবুলের পরীক্ষার কারণে বিয়েটা এক বছর পিছিয়ে যায় তার মধ্যেই ওদের দু'ভাইয়ের সঙ্গে মামুনের অনেকখানি মানসিক ব্যবধান ঘটে গেল। মামুনের জন্যই যে বাবুল চৌধুরী এমন একটি হীরের টুকরোর মতন মেয়েকে বউ হিসেবে পেয়েছে, সেকি তার জন্য মামুনের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করে?

মামুন আড়চোখে বাবুলের দিকে তাকালেন। বাবুলও মেয়েদের কথাবার্তায় যোগ দেয়নি। তার ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি লেগেই রয়েছে। এই ছেলের মনের মধ্যে কী যে চলে তা বোঝা শক্ত।

হঠাৎ মামুন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তোমরা গল্প করো, আমাকে একটু কাজে যেতে হবে।

বাবুলও সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমরাও যাবো।

মঞ্জুর ছেলে তার মায়ের বুকের কাছে কোমল দুটিহাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে খুঁ খুঁ শব্দ করছে, অর্থাৎ তার খিদে পেয়েছে। মঞ্জু খাটটার ওপর বসে পেছন ফিরে তাকে স্তন্য পান করাতে গেল। ফিরোজা হা-হা করে ওঠে বললেন,ভিতরে যাও না,ভিতরে যাও।

মামুনের আর কিছুই ভালো লাগছে না। তাঁর বুকের মধ্যে একটা অজ্ঞাত ব্যথা। তিনি বাবুলের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বললেন, তোমরা আবার এসো মঞ্জু। কেমন? আমি গেলাম।

বাইরে বেরিয়ে এসে মামুন একটা সিগারেট ধরালেন। ফিরোজা সিগারেটের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না বলে বাড়ির মধ্যে সিগারেট খাওয়াই হয় না। অশান্তি এড়াবার জন্য তিনি ফিরোজার অনেক বিধিনিষেধই মেনে চলেন।

তবে কি সিগারেটের নেশাই তাঁকে বাইরে টেনে আনলো। এতদিন পর মঞ্জুর সঙ্গে দেখা তবু তিনি শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর সঙ্গে রইলেন না। আর একটু অপেক্ষা করে তিনি ওদের সঙ্গে একসঙ্গে বেরুতে পারতেন, সেটাই ভালো দেখাতো। একথা অবশ্য ঠিক যে আবুল মনসুরের বাড়িতে তাঁর একটা মিটিং এ যোগ দেওয়ার কথা আছে, কিন্তু সেটাও এমন কিছু জরুরি নয়, এক আধ ঘন্টা পরে গেলেও ক্ষতি

ছিল না। কিন্তু কেন যেন বাবুল আর মঞ্জুর সঙ্গে এক সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাটার সম্ভাবনাটা তাঁর মনঃপুত নয়, তাই তিনি আগে বেরিয়ে এলেন।

মিটিং-এ যেতেও তাঁর ইচ্ছে হলো না। রাজনীতির কচকচি আজ সন্ধেবেলা আর ভালো লাগবে না। তাহলে কোথায় যাওয়া যায়? সংবাদপত্রে জনপ্রিয় কলামনিস্ট হয়েও মামুন কোনো কাগজে চাকরি নেননি। জীবিকার তাড়না তাঁর খুব একটা নেই, দেশের জমিজমা থেকে যা আয় আছে তাতেই অনেকটা চলে যায়। কেউ কেউ তাঁকে ওকালতি শুরু করার পরামর্শ দিয়েছিল। তাঁর একটা আইনের ডিগ্রি আছে। তাঁর ছাত্র বয়েসে কলকাতায় যারাই বি এ পাস করতো তারা অনেকেই সঙ্গে একটা ল'ডিগ্রি করে রাখতো। ল'কলেজে হাজিরা দেবার বাঁধাবাঁধি ছিলনা, পাস করাও ছিল সহজ। ঢাকায় মামুনের বন্ধুদের মধ্যে যারা আওয়ামি লীগ সরকারে মন্ত্রীটন্ত্রী হয়েছিল, রাজনীতি ঘুচে যাওয়ার পর তারা সবাই এখন চুটিয়ে ওকালতি করছে। বাংলায় কথাই আছে, যার নাই কোনো গতি সেই করে ওকালতি। মামুন ওদিকে যাননি।

উকিলরা আদালতের চেয়ে বাড়িতেই বেশি ব্যস্ত থাকে বিশেষত এই রকম সন্ধের সময়। তখন সব মক্কেলরা আসে। হঠাৎ করে এই সময়ে কোনো উকিল বাড়িতে গেলে সে অস্বস্তিবোধ করবে। মামুন ভেবে দেখলেন কবি জসীমউদ্দীনের বাড়িতে যাওয়া যেতে পারে, সেখানে প্রায় দিনই এই সময়ে আড্ডা জমে।

মামুন হাঁটতে লাগলেন জসীমউদ্দীনের বাড়ি পলাশবাড়ির দিকে আগের তুলনায় ঢাকায় দোকান পাটের সংখ্যা অনেক বেড়েছে রাস্তায় ঝলমলে আলো। হাঁটতে বেশ ভালোই লাগে।

কমলাপুর পৌঁছোতে বেশি দেরি হলো না। অনেকখানি জমির ওপর কবির বাড়ি, সামনে পেছনে বহু রকমের ফুল ও ফলের গাছ। কবি যেমন প্রকৃতি পাগল তাঁর স্ত্রীরও সেই রকম গাছপালার খুব শখ। নারায়ণগঞ্জের এক চেনা বাড়ির মেয়ে মণিমালাকে বিয়ে করেছেন জসীমউদ্দীন, সেই বিয়ের সময় থেকেই কবির সঙ্গে মামুনের পরিচয়। নারায়ণগঞ্জের মরগ্যান স্কুলে মামুন পড়িয়েছিলেন কয়েক মাস, মণিমালা ছিল নামকরা সুন্দরী।

পলাশ বাড়ির সামনে এসে মামুন দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাড়ির সামনে অনেকগাড়ি, দু'একখানা সরকারি বড়কর্তাদের গাড়ি বলে মনে হলো। এখানে আজ কোনো দাওয়াত উৎসব আছে নাকি? বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া তবে ঠিক হবে নাই কংবা সরকারের কোনো হোমরা-চোমরা দেখা করতে এসেছে। আশ্চর্য কিছু নয়। শোনা যায় স্বয়ং আইয়ুব খাঁও নাকি কবির খোঁজ খবর নেন।

তা হলে থাক। মামুন পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন আবার।

এই সন্ধ্যেবেলা তাঁর কোথাও যাবার জায়গা নেই। এটা যেন এক সমৃদ্ধ নগর নয়, তেপান্তরের মাঠ মামুন কোনো দিক খুঁজে পাচ্ছেন না। এতদিন পর অকস্মাৎ মঞ্জুকে দেখেই কি তাঁর এই দিশাহারা অবস্থা হলো? অনির্দিষ্ট ভাবে হাঁটতে মামুন নিজেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্ট করলেন। তাঁর দিদির মেয়ে মঞ্জু তাঁর অতি স্নেহের, অতি আদরের, সে যথোপযুক্ত স্বামী পেয়েছে, একটি স্বাস্থ্যবান পুত্রের জননী হয়েছে, এসব দেখে মামুনের তো খুবই আনন্দিত হবার কথা। কিন্তু আজ মঞ্জুকে দেখার পরেই তাঁর বুকে যে কম্পন শুরু হয়েছে তা শুধু সেই ধরনের আনন্দ নয় অন্য কিছু। নিজের ওপরেই রাগ করলেন মামুন। না, না, এটা ঠিকনয়, এটা স্বাভাবিক নয়। এখন কোনো আড্ডায় গিয়ে তর্কাতর্কিতে মেতে উঠতে পারলে এই চিন্তা মুছে যাবে।

কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি? আর কোনো প্রিয়জনের নাম,মনে পড়ে না। মঞ্জুর মুখখানি দেখার আরও কিছুক্ষণ সুযোগ ছিল তবু তিনি শুধু শুধু বেরিয়ে এলেন কেন?

॥ ১৪ ॥

কয়েকদিন এড়িয়ে এড়িয়ে চলার পর অতীনকে একদিন প্রতাপের সামনে পড়তেই হলো। মা কিংবা পিসিমণিকে সে চেঁচিয়ে তর্কে হারিয়ে দিতে পারে কিন্তু বাবার সামনে সে মুখচোরা।

সপ্তাহের মাঝখানে কাজের দিন হলেওপ্রতাপ সেদিন আদালতে যাননি। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর জ্বর ভাব ও শরীর কিছুটা অবসন্ন হয়েছে। অফিসে না যাবার সিদ্ধান্ত নেবার পর প্রতাপ দাড়িও কামাননি স্নান ও করেননি, দুপুরের খাওয়া সেরে নিজের ঘরে বসে কাগজ পড়ছেন। মমতাকে বলে রেখেছেন, বাবলু ফিরলেই যেন দেখা করে তার সঙ্গে। ইদানীং বাবলু সকালবেলা বেরিয়ে যায় সারাদিন কোথায় থাকে

ঠিক নেই। ফেরে রাত দশটা-সাড়ে দশটায় মাঝখানে দুপুরে একবার খেতে আসে এক একদিন তাও আসে না। বাড়ির শাসনের সীমা সে অতিক্রম করে গেছে। প্রতাপ খবর পেয়েছেন যে বাবলু এখন রাজনীতির হুজুগ নিয়ে মেতেছে।

আজ দুপুরে খেতে এসে বাবলু ধরা পড়েগেল। বাবা ডেকেছেন দেখা নাকরে উপায় নেই। বাইরে থেকে এসেই বাবলু গায়ের জামা ছুঁড়ে ফেলে স্নানের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল মমতা গম্ভীর ভাবে বললেন, বাবার সঙ্গে আগে দেখা করে আয়। তোর জন্য আজ তোর বাবা অফিস যায়নি।

বাবলু ঘাড় গোঁজ করে একটুখানি থমকে দাঁড়ালো। তার পেটে খিদে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। খিদে সে সহ্য করতে পারে না বেশিক্ষণ, বাস থেকে নেমে সে ছুটতে ছুটতে এসেছে। বাবা যখন বাড়িতে আছেনই তখন স্নান করে খেয়ে নেওয়ার পর বাবার সঙ্গে কথা বলা যায় না। কিন্তু মায়ের গলার সুর অন্য রকম।

বাবলু বাবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো। প্রতাপ মন দিয়ে একটি পত্রিকা পড়ছেন। দু'এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর বাবলু বললো, বাবা তুমি আমায় ডেকেছো?

প্রতাপ চোখ তুলে বাবলুকে দেখলেন। প্রায় মাসখানেক তিনি তাঁর ছেলেকে ভালো করে দেখেননি। সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। বাবলুর খালি গায়ের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন, ছেলেটার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই হয়েছে, বুকখানা পেটানো; কিন্তু সারাদিন নিশ্চয়ই রোদ্দুরে টো-টো করে ঘোরে। চোখের নিচে কালো দাগ মুখের রং পোড়া পোড়া, বোধ হয় দু'তিন মাস মাথার চুল কাটেনি।

প্রতাপ তাঁর বাবাকে অতিরিক্ত সমীহ করতেন। সেকালে যৌথ পরিবারের প্রধানরা ছিলেন গোষ্ঠি অধিপতির মতন প্রতাপশালী। প্রতাপদের আমলে বাবাকে আপনি বলে সম্বোধন করার রেওয়াজ ছিল। বাবলু কি তাঁকে ভয় পায়? ছেলেটার চোখের পাতা ঘন ঘন পড়ছে। ছেলের সঙ্গে ভয় বা অতিরিক্ত সমীহর সম্পর্ক চান না প্রতাপ। যদিও বাবলু সম্পর্কে একটা চাপা রাগ ঘোরাফেরা করছে প্রতাপের মাথার মধ্যে, তবু তিনি সংযত হতে চাইলেন। যেজন্য তাঁর একটু সময় দরকার।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোর সারা গা দেখছি ঘামে ভিজে গেছে। তুই চান করিসনি?

বাবলু মাথা নেড়ে বললো, না।

প্রতাপ নরমভাবে বললেন, আগে চান করে আয়। খেয়ে নে। তারপর তোর সঙ্গে আমার কতকগুলো কথা আছে।

বাবলু তবু দাঁড়িয়ে বলল, পরে চান করতে যাবো। তুমি বলো না।

প্রতাপ দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। পৌণে একটা বাজে। তিনি আবার বললেন না, আগে খাওয়া টাওয়া সেরে আয়।

বাবলু এবারে ফিরে গেল বাথরুমে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্নান সেরে সে রান্নাঘরের টেবিলে এসে বসলো। মুখে কোনো কথা নেই। যেন সে এ বাড়ির অতিথি কেউ খাবার দিলে খাবে, নইলে খাবে না। মমতা তাকে নিঃশব্দে ভাত বেড়ে দিলেন। বাবলুর সঙ্গে কয়েকদিন তিনি ভালো করে কথা বলতে পারছেন না। অভিমান এক এক সময় মাতৃস্নেহকেও অতিক্রম করে যায়।

সুপ্রীতি আড়াল থেকে সবকিছু লক্ষ্য করছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আজ পিতা পুত্রে একটা সংঘর্ষ হবে। প্রতাপের মাথা গরম, ছেলেটাকে যদি মার ধোর শুরু করে তখন সুপ্রীতিকে বাধা দিতেই হবে। রাগের মুহূর্তে প্রতাপ মমতাকেও অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু এখনও সুপ্রীতিকে অমান্য করতে পারে না। বাবলু খাওয়া শেষ করে উঠে গেল সুপ্রীতি দুঃখ পেলেন এই দেখে যে ছেলেটার আর একটু ভাত লাগবে কিনা, মমতা তা একবারও জিজ্ঞেস করলো না। অবশ্য একটু পরেই রান্নাঘরে এসে তিনি দেখলেন, বাবলু থালায় খানিকটা ভাত ফেলে রেখে গেছে।

বাবলু যখন আবার প্রতাপের ঘরে এলো তখন প্রতাপ পায়জামা ছেড়ে প্যান্ট শার্ট পরে বাইরে বেরুবার জন্য তৈরি হয়েছেন। দাড়ি কামাননি এখনো। বাবলুকে দেখে তিনি বললেন ভেতরে এসে এই চেয়ারটাতে বোস।

বাবলু আধখানা চেয়ারে খানিকটা কাৎ হয়ে বসলো সরাসরি সে তার বাবার দিকে তাকাচ্ছে না।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, তোর মা বলছিল, তুই নাকি চাকরি খোঁজার চেষ্টা করছিস?

বাবলু দ্বিধা না করে বললো, হ্যাঁ।

—তুই আর পড়তে চাস না? কেন?

–আমার আর পড়তে ভালো লাগে না। তাছাড়া চাকরি করা তো দরকার।

–কিসের দরকার?

–দরকার মানে টাকা পয়সার দরকার।

–কেন, দু'বেলা খেতে পাচ্ছিস না নাকি?

–সেজন্য না। ছোড়দি পড়ছে মুন্নি পড়ছে, ওদের পড়াশুনোর খরচ আছে।

–তোর পড়াশুনোর খরচ আমি চালাতে পারবো না, তুই বুঝি তাই ভেবেছিস? শোন, আমি এম এ পড়িনি, পড়ার দরকারও ছিল না, আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি আইন পাস করে আদালতে চাকরি করি। সেইসব সময়ে মুন্সেফ-হাকিমদের খুব সম্মান ছিল গ্রামের দিকে। যদি পার্টিশান না হতো, আমি ইস্ট বেঙ্গলেরই কোনো জেলায় থাকতাম, ছুটি-ছাটায় বাড়ি চলে যেতে পারতাম। আমার বাবা তাই-ই চেয়েছিলেন। তোর বেলায় আমি আমার সে রকম কোনো ইচ্ছে চাপিয়ে দিতে চাই না। তুই সায়েন্স পড়েছিস নিজের ইচ্ছেতে। ঠিক কি না?

বাবলু মাথা নাড়ালো।

প্রতাপ একদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই ভালো রেজাল্ট করেছিস। তুই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট না হয়েও যা হয়েছিস, তাতেই আমি খুশী হয়েছি। এই রকম রেজাল্ট করে কেউ হায়ার এজুকেশনের সুযোগ ছাড়ে না। আজকাল তো শুনি ইউনিভার্সিটিতেও সিট পাওয়াই শক্ত। তুই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস, তুই ঠিক সুযোগ পাবি। এর পরেও তুই যদি এম এস সি না পড়িস, লোকে বলবে আমি তোকে পড়াতে পারলাম না, আমার সে সামর্থ্য নেই। আমার কিন্তু সে-রকম অবস্থা এখনও হয়নি।

প্রতাপ চুপ করে গেলেন। বাবলুও চুপ করে রইলো। সে বাবার দিকে মুখ ফেরাচ্ছে না, কিন্তু সে বুঝতে পারছে যে বাবা তার কাছে থেকে একটা উত্তর আশা করছে।

সে বললো, আজকাল ইউনিবার্সিটিতে পড়াশুনো কিছু হয় না। ওরা নতুন কিছু শেখায় না।

প্রতাপ বললেন, পড়াশুনোর অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে ঠিকই। জীবনের শিক্ষা নিজেকেই নিতে হয়, মাস্টাররা আর কতখানি শেখাতে পারে। কিন্তু সায়েন্স শিখতে গেলে অ্যাকাডেমিক পড়াশুনোর দরকার আছে। আজকাল কেউ বাড়িতে বসে বিজ্ঞানচর্চা করত পারে না। এম এস সি ডিগ্রিটা ভালোভাবে পেলে তারপর রিসার্চ করার সুযোগ আসে, তখন নিজস্ব চিন্তা প্রকাশ করা যায়।

বাবলু তবু জেদের সঙ্গে বললো, তারপর তো সবাই চাকরিই করে।

প্রতাপ এবারে খানিকটা শ্লেষ গোপন করে পারেলেন না। তিনি বললেন, হ্যাঁ বিজ্ঞান পড়ে বাঙালীর ছেলো নিউটন আইনস্টাইন হতে চায় না। এমনকি সত্যেনবোসও হতেচায় না। সবাই চাকরি পেয়েই নিশ্চিন্ত হতে চায়। কিন্তু চাকরিরও তারতম্য আছে। বি এস সি ডিগ্রি নিয়ে তুই কী চাকরি পাবি? আমাদের অফিসে অনেক অর্ডিনারি এম এ, এম এস সি পাস ছেলে আসে কেরানিগিরির জন্য। তুই কেরানি হয়ে থাকতে চাস। ভালো কেরানিগিও তুই পাবি না। আমরা তো রিফিউজি এখনো আমরা পশ্চিম বাংলায় পুরোপুরি অ্যাকসেপ্টেড হইনি। আমাদের প্রতি পদে পদে লড়াই করতে হয়। সেই লড়াই হবে মেধা দিয়ে মনের জোর দিয়ে। বি এস সি ডিগ্রি নিয়ে চাকরি খুঁজতে গেলে তোকে পঞ্চাশটা অফিসের দরজায় ঘুরতে হবে কেউ কেউ জুতোর ঠোক্কর দেবে।

–কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন বেরোয়, তাই দেখে অ্যাপ্লাই করবো,পরীক্ষা দেবো।

–হ্যাঁ অ্যাপ্লাই করবি। পাঁচটা পোস্টের জন্য পাঁচ হাজার দরখাস্ত পড়ে এদের মধ্য থেকে কারা চাকরি পায় জানিস না? যাদের কানেকশন আছে। যাদের মামা, কাকা, পিসেরা বড় বড় পোস্টে আছে। তোকে এখন কে চাকরি দেবে? কিন্তু তোমার নামের পাশে যদি একটা পি এইচ ডি থাকে, তখন তোমাকে কেউ সহজে ফেরাতে পারবে না। তুই...

প্রতাপের কথার মাঝখানে একটা নাটকীয় কাণ্ড হলো। মমতা হঠাৎ ছুটে এলেন ঘরে, তাঁর দুটি চোখ নীরব ক্রন্দনে রক্তিম। এবার তিনি সরব হয়ে বাবলুকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতন বলতে লাগলেন বাবলু তুই কেন এম এস সি পড়বি না। বল, বল আমাকে? আমার কোন কথায় তোর রাগ হয়েছে। এই বংশের একটা চেলে লেখাপড়া শিখবে নাম করবে সবাই তাই চায়, আর তুই তোর কী হয়েছে বল বাবলু তুই আমাকে বল।

প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আঃ মমতা ছাড়ো ওকে ছাড়ো আমি ওর সঙ্গে আলোচনা করছি।

মমতা বললেন, না ছাড়বো না। ও আমার ছেলে নয়? আমি ওকে পেটে ধরিনি? ও আমার কাছেও মন খুলে কথা বলবে না?

প্রতাপ অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, আঃ আমি তো ওর সঙ্গে আলোচনা করছি, তুমি আবার কেন ডিস্টার্ব করতে এলে?

মমতা পাগলাটে গলায় বললেন, কেন আমি বুঝি কেউ না? ও আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। মুখ ফুটে কিছু খেতে চায় না। কেন কেন, আমি কী দোষ করেছি?

প্রতাপ গর্জে উঠে বললেন, এ সব কথা এখন থাক না। আমরা কাজের কথা বলছি। মমো তুমি বাইরে যাও।

মমতাও সমান তেজের সঙ্গে বলে উঠলেন না আমি যাবো না। আমি জানতে চাই ও কেন...

বাবলু হঠাৎ যেন এক প্রবল জলোচ্ছাসের শব্দ শুনতে পেল। নীল রঙের দারুণ ভারি তলার দিক থেকে চুম্বকের মতন টানে, সেই টানে বাবলু তলিয়ে যাচ্ছে, তার দাদা এসে তাকে ধরলো ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে পিকলু তাকে ওপরে তুলে ধরতে চাইছে সে পিকলুকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে মুখে এত জল ঢুকেছে যে সে আর নিশ্বাস নিতে পারছে না..

বাবলু উঠে দাঁড়িয়ে মাকে একটু দূরে সরিয়ে দিয়ে তাঁর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালো।

মমতাও সোজা তাকিয়ে থেকে বললেন, বাবলু একদিন আমি তোকে বলেছিলাম তোর জন্যই তোর দাদা সেই জন্য তুই আমাকে..

বাবলু বললো মা, মা, তুমি চুপ করো। হ্যাঁ আমি পড়বো এম এস সি পড়বো। তোমাকে এমনই বলেছিলাম।

মমতার কান্না ভেজা মুখে এক পলক রোদের মতন হাসি ফুটে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তীব্র চোখে বললেন পড়বি। সত্যিই তুই পড়বি।

বাবলু বললো, হ্যাঁ।

মমতা তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। একবার স্বামীর দিকে একবার ছেলের দিকে তাকালেন। বাবলুর ব্যবহারে তাঁর মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিল, বাঁচার সাধই চলে গিয়েছিল। সব হঠাৎ বদলে গেল?

মমতা বললেন, তুই ভর্তি হবি? আমার গা ছুঁয়ে বল।

বাবলু বললো এই তো তোমার গাছুঁয়ে আছি না। কৌশিকও আগে পড়বে না বলেছিল এখন দুজনেই ভর্তি হবো ঠিক করেছি। প্রতাপ বললেন টাকা জমা দেবার লাস্ট ডেট আর দুদিন আছে। আমি ফর্ম এনে রেখেছি। তুই ফিল্ আপ কর। তারপর চল, আমি যাই তোর সঙ্গে। তিনটের মধ্যে পৌঁছালেই হবে।

বাবলু গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর সে বাবকেবললো তোমাকে যেতে হবে না। আমিই যাচ্ছি। তোমার তো দু'দিন ধরে জ্বর।

মমতা বললেন, তোর বাবার যে জ্বর তুই তা জানলি কি করে? তুই তো আমাদের কারুর খোঁজই রাখিস না।

এর পরের দৃশ্যটি অনেকদিন পর পারিবারিক পুনর্মিলনের মতন আনন্দময় হলো। বাবার কাছ থেকে ফর্ম নিয়ে বাবলু সেটি পূর্ণ করলো বাধ্য ছেলের মতন। মমতা তার স্বামীকে বললেন, বাবলুর জন্য দুটো নতুন শার্ট কিনে দিতে হবে। ইউনিভার্সিটিতে ও কী পরে যাবে, ওর একটাও ভালো জামা নেই। প্রতাপ মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

সুপ্রীতি ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন, আমি জানতাম, ও রাজি হবে। বাবলু খুব ভালো ছেলে।

তিনি বাবলুর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, আরও বড় হও, গুণী হও, তোমাকে দিয়ে এই বংশের আরও সুনাম হোক।

জুতো-মোজা পরে প্রতাপ এক রকম জোর করেই বেরুলেন বাবলুর সঙ্গে। বাইরে দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। ওরা এসে দাঁড়ালো বাস স্টপে। এই দুপুরেও ট্রাম বাস খালি নেই। সিনেমার ম্যাটিনি শো-এর দর্শকরা যাচ্ছে ঝুলতে ঝুলতে। ইদানীং সংসার খরচের খুবই টানাটানি যাচ্ছে বলে ট্যাক্সির কথা প্রতাপের মনেই পড়ে না।

ওঠা হলো একটা ভিড়ের বাসেই। ভালো করে দাঁড়াবারও জায়গা নেই। দু'তিন স্টপে পরই বাবলু

ঠেলে ঠুলে একটা বসবার জায়গা পেয়ে চেঁচিয়ে বললো, বাবা, তুমি এখানে এসে বসো।

আরও দু'তিনজন লোক সেই সীট দখল করার জন্য বাবলুর ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে বাবলু দু'হাত দিয়ে তাদের আটকে আছে। এই রকম ভাবে বসতে প্রতাপের লজ্জা করে। তিনি হাত তুলে বললেন, না, থাক, আমি ঠিক আছি।

প্রতাপের শরীর অবশ্য ঠিক নেই। এত ভিড়ে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে প্রায়। কয়েকদিনের জ্বরে তাঁর মাথাটা হালকা হয়ে আছে টলটল করছে মাঝে মাঝে। তবু তিনি দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন।

ইউনিবার্সিটি ও সায়েন্স কলেজ ঘুরে সব কাজ চুকিয়ে ফেলার পর প্রতাপ নিশ্চিন্ত হলেন। পকেটে অনেকগুলো টাকা তাকে সব সময় শঙ্কিত থাকতে হচ্ছিল।

প্রতাপ বললেন, চল বাবলু কোন দোকানে বসে একটু চা খাই।

বাবার সঙ্গে বাবলু কখনো কোনো চায়ের দোকানে ঢোকেনি। এই গনগনে দুপুরে তার চা খাওয়ার ইচ্ছেও নেই। তবু বাবার এই অদ্ভুদ শখের কথা শুনে তার মজা লাগলো সে আপত্তি করলো না।

ওরা হেঁটে এগোলো রাজাবাজারের মোড়ের দিকে। রোদ্দুরটা প্রতাপের ঠিকসহ্য হচ্ছে না, মাথাটা ঘুরে উঠছে হঠাৎ দু'তিনদিন জ্বরের জন্যই কী এমন? না অন্য কোনো বড় অসুখ বাসা বেঁধেছে। চিন্তাটা প্রতাপ মন থেকে উড়িয়ে দিলেন। ছেলের সঙ্গে তিনি হাটছেন, যেন তাঁর বয়েস অনেক কমে গেছে। একটা অন্ধকার ঘুপচি মতন চায়ের দোকানে গিয়ে বসা হলো। ভনভন করে নীল ডুমো ডুমো মাছি উড়ছে। টেবিলের ওপর অয়েল ক্লথ পাতা, তাতে কেটা চটচটে ভাব। চায়ের সঙ্গে প্রতাপ কেকের অর্ডার দিলেন। বাবলু একটু আগে ভাত খেয়ে এসেছে। তার কেক খাবার ইচ্ছে নেই, তবু প্রতাপ শুনলেন না। কাচের বৈয়ামে রাখা কতকালের বাসি কেক তা কে জানে। চায়ে দু'একটা মরা পিঁপড়ে ভাসছে। প্রতাপ সেই চা-ই বেশ তারিয়ে খেতে লাগলেন।

বাবলুর চোখে চোখ রেখে তিনি বলতে লাগলেন, আমি তো ইউনিভার্সিটিতে পড়িনি তবে ল' কলেজে পড়তে আসতাম আমাদের সময় তোদের ঐ কফি হাউসের নাম ছিল অ্যালবার্ট হল তোর বিমানকাকা আর আমি গোলদিঘিতে বসে গল্প করতাম প্রায়ই ভাঁড়ের চা খেতাম, তখন ঐ চায়ের দাম ছিল এক পয়সা.. আমার বাবা আমাকে প্রতি মাসে তিরিশ টাকা হাত খরচ পাঠাতেন, তা দিয়ে যথেষ্ট বাবুয়ানি করা যেত। এক একদিন আমরা শখ করে ফিটন গাড়ি চাপতাম... থাকতাম আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটা মেসে। এখান থেকে বেশি দূর আমদের মেসে। পাটালি গুড় ঘি, নারকোল, নাড়ু তক্তি, আমসত্ত, সবাইকে ভাগ করে দিতাম তোর দেশের বাড়ির কথা মনে নেই, না রে বাবলু?

প্রতাপ জোরে নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোর মনে থাকবার কথা নয় তুই তখন কতটুকু আমার বাবা তোকে খুব ভালাবাসতেন।

হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর প্রসঙ্গ বদল করে বললেন, তোর নামে আমি একটা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দেবো, সেখানে প্রতি মাসে জমা করে দেবো পঞ্চাশ টাকা। এখন বড় হয়েছিস এখন রোজ রোজ বাবা-মায়ের কাছ থেকে পয়সা চাইতে তো লজ্জা করবেই। টিউশনি আর করতে হবে না, এ মাসেই ছেড়ে দে। পঞ্চাশ টাকায় তোর কুলিয়ে যাবে।

বাবলু লাজুক ভাবে বললো, না, অত লাগবে না।

—লাগবে, আজকাল সব জিনিসের তো খুব দাম এক কাপ চা পনেরো পয়সা...তোদের ক্লাসে তো এখন মেয়েরাও পড়বে...মেয়েদের সঙ্গে মিশবি, বন্ধুত্ব করবি, তবে কখনো তাদের কারুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবি না যাতে মনে দুঃখ পায়। মেয়েদের সঙ্গে যারা রুক্ষ ব্যবহার করে তারা জীবনে সুখী হয় না।

বাবলু কয়েক ঢোঁকে চা শেষ করে ফেলেছে। সে এখন উঠতে পারলে বাঁচে। প্রতাপ বাবলুর চঞ্চলতা দেখে বললেন, বোস না। আমি আর এক কাপ চা খাবো। বেশ ভালো লাগছে। তুই পড়াশুনোটা করতে চাইছিলি না কেন? ছাত্রজীবনটা কত আনন্দের ফুরিয়ে গেলেই তো গেল।

চায়ের দোকান থেকে বেরুবার পর বাবলু বললো বাবা তুমি তো বাড়ি ফিরবে? আমি মানিকতলায় একবন্ধুর বাড়িতে যাবো।

প্রতাপ বললেন, ঠিক আছে তুই যা। আমি বাস ধরে নেবো এখন।

প্রতাপ একটা সিগারেট ধরিয়ে বাস স্টপের দিকে এগোলেন, বাবলু রাস্তা পার হয়ে অন্য দিকে

চলে গেল। এখান থেকে সে হেঁটেও মানিকতলা চলে যেতে পারে। পমপমদের বাড়ি স্টাডি সার্কল বাবলুকে চুম্বকের মতন টানে। বাবলু শেষ পর্যন্ত এম এস সি-তে ভর্তি হলো বলে ওখানে কেউ কেউ ঠাট্টা করবে। অবশ্য মানিকদা তাকে গোপনে বলেছিলেন তুই ভর্তি হয়ে যা।

বাবলুর মনটা খচ খচ করছে।বাবাকে কি বাসে তুলে দেওয়া উচিত ছিল তার? ভিড়ের বাসে যেতে হবে। ট্রাম বরং কিছুটা ফাঁকা এসপ্লানেড থেকে ট্রাম বদল করে গেলে...

বাবলু পেছন ফিরে তাকালো। রাস্তার সোজাসুজি অন্য পারে প্রতাপ একটা বাতিস্তম্ভ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। থুতনিটা ঠেকে আছে বুকের কাছে, কেন যেন অদ্ভুত ভঙ্গি। একটু বেশি রাতের দিকে মাতালরা এইভাবে ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়ায়। বাবলু অবাক ভাবে চেয়ে রইলো। তার কি কিছু করা উচিত। বাবলুর বাবা শক্ত সমর্থ পুরুষ বাবলু কোনোদিন তাঁকে দুর্বল হতে দেখেনি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রতাপ সেই বাতিস্তম্ভটা ধরেই উবু হয়ে বসে পড়লেন রাস্তার ওপর। বাবলু সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে গাড়ি ঘোড়া অগ্রাহ্য করে রাস্তা পেরিয়ে চলে এল এদিকে। কাছে এসে ভয় পাওয়া গলায় ডাকলো বাবা।

প্রতাপ পথের ধুলোর ওপর বসে পড়েছেন, মুখটা ঘুরিয়ে তাকালেন বাবলুর দিকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁকে দারুণ অসহায় মনে হলো, মুখখানি একেবারে বিবর্ণ, তিনি হাতটা বাড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন বাবলু, বাবলু আমি পড়ে যাচ্ছি।

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে হাটু গেড়ে বসে পড়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো প্রতাপকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, তোমার শরীর খারাপ লাগছে? একটা রিকশা ডাকছি..

পাশ দিয়ে লোক জন হেঁটে যাচ্ছে, কারুর কারুর দৃষ্টি কৌতূহলী কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করছে না। কাছাকাছি কোনো রিক্শা নেই, বাবলু ব্যাকুল ভাবে তাকাতে লাগলো এদিক ওদিক। এখন বাবার দায়িত্ব তার ওপর।

একটুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন প্রতাপ। তিনি জোর করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই বাবলু জিজ্ঞেস করলো, কী হলো?

প্রতাপ স্বাভাবিক গলায় বললেন, হঠাৎ খুব মাথা ঘুরছিল। কেন এমন হলো বল তো।

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, প্রতাপ সেটা একবার তুলতে গিয়ে থেকে গেলেন। তারপরই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে রাতে গেলেন আর একটা দেশলাই জ্বালতে গিয়ে তাঁর হাতের আঙুল কাঁপতে লাগলো থরথর করে।

বাবলু চোখবড় বড় করে তাকিয়ে রইলো। তার ধারণা, বেশি অসুস্থ হলে মানুষ সিগারেট খায় না। বেশি সিগারেট খাওয়ার জন্য বাবাকে মা মাঝে মাঝে বকেন। কিন্তু সে তো বাবাকে নিষেধ করতে পারবে না।

সিগারেটে দুটো বড় বড় টান দিয়ে প্রতাপ বললেন ঠিক আছে। তুই যা...

বাবলু বললো, আমি তোমার সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছি।

প্রতাপ মাথা নেড়ে বললেন, না, না, আমি ঠিক আছি। আমি এখন নিজেই যেতে পারবো।

বাবলু বাবার হাত ধরে বললো, না, তুমি একা যাবে কেন? তোমার যদি আবার শরীর খারাপ হয় ... আমি যেখানে যাচ্ছিলাম, সেখানে না গেলেও চলবে, আমি তোমার সঙ্গে বাড়ি যাবো।

প্রতাপ ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সেদিনও বাচ্চা ছেলে ছিল বাবলু, আজ যেন হঠাৎ সাবালক হয়ে গেছে। তিবি বললেন, আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না, তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা, আমি ঠিক চলে যাবো। তুই কিছু চিন্তা করিস না। ঐ তো একটা বাস আসছে।

হাত তুলে প্রতাপ বাসটা থামালেন। তারপর বাবলুর দিকে আর একবার হাসি মুখ ফিরিয়ে জেদ করে উঠে গেলেন ভিড়ের মধ্যে।

॥ ১৫ ॥

মুড়ি ও তেলেভাজা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নান রকম হাসি-ঠাট্টা চলছিল, হঠাৎ মানিকদা জোরে দু'বার হাততালি দিয়ে বললেন, চুপ, সবাই চুপ। অনেক গল্প হয়েছে, এবারে কাজের কথা হবে।

প্রীতিময় বললো, চা আনতে গেছে। মানিকদা, আগে চা-টা খেয়ে নিলে হতো না?

মানিকদা একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন, আসুক, চা আসতে দেরি আছে, ততক্ষণ কথাবার্তা চলতে থাকুক।

তারপর তিনি একজনের দিকে আঙুল তুলে বললেন, এবারে তপন তুমি বলো, দেশ বলতে তুমি কী বোঝে।

তপন নামে এই ছেলেটিকে বাবলু আগে দেখেনি। বাবলুর থেকে বয়েসে তিন চার বছর বড়ই হবে, একটা ময়লা ধুতি ও নীল রঙের হাফশার্ট পরা, মাথায় চুল ঝাঁকড়া, গায়ের রং বেশ কালো, চোখ দুটিতে ভয় ভয় ভাব। মানিকদা একে সঙ্গে নিয়ে ঢোকার সময় বলেছিলেন, এই আমাদের একজন নতুন বন্ধু। আর কোনো পরিচয় কুরিয়ে দেননি।

এখন সকলের দৃষ্টি পড়লো তপনের ওপর, সে যেন অসহায় বোধ করছে, এই নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেবার সে সময় পায়নি। এই ঘরে যে এগারো জন যুবক-যুবতী উপস্থিত, তারা সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের, তাদের কেউ কেউ ছেঁড়া জামা পরে এক ধরনের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশে লালিত, সেই তুলনায় তপনের মুখ একেবারে টাটকা।

- চুপ করে রইলে কেন, কিছু বলো। দেশ বলতে তোমার চোখে কোন্ ছবি ফুটে ওঠে।

তপনের ঠিক থুতনির কাছে একটা আঁচিল। সেটা খুঁটতে খুঁটতে সে মুখ খোলার চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলো না। ঘরের মধ্যে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। অন্যদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে চোখ নিচু করে নিচ্ছে।

বাবলুর পাশে বসা কৌশিক বললো, মানিকদা, এ নতুন এসেছে, প্রথম দিনই কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। আগে ওর সঙ্গে আমাদের ভালো করে পরিচয় করিয়ে দাও।

মানিকদা বললেন, এ সব লজ্জা ফজ্জা কোনো কাজের কথা নয়। ফর্মালি আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেওয়াও আমি পছন্দ করি না, ওগুলো সব বুর্জোয়া সিস্টেম। আমাদের একজন নতুন বন্ধু এসেছে, তোমরা নিজেরাই তো আলাপ করে নেবে। যাই হোক, আমি কী করে ওর দেখা পেলুম, সেইটুকুই শুধু বলছি। শ্যামবাজারের মোড়ে যে কতকগুলো খুচরো- দোকান আর স্টল আছে, তারই একটা দোকান, বুঝলে, দোকানটা ঠিক ফুটপাথে নয়, একটা ওষুধের দোকানের দেয়ালের গায়ে, হেঁ দোকান থেকে আমি মাঝে মাঝে গেঞ্জি কিনি।

পেছন থেকে একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, মানিকদা, আপনিও গেঞ্জি কেনেন?

সবাই হেসে উঠলো একসঙ্গে। গেঞ্জি কেনার কথা টা সত্যি অবিশ্বাস্য শোনায়। সারা বছর মানিকদাকে একই পোশাকে দেখা যায়, একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি ও পাজামা, কাঁধে একটা ঝোলা। এক একদিন গায়ের পাঞ্জাবিটা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে যায়, পরের দিনও মানিকদা সেটাই পরে আসেন। সবাই বলে, মানিকদা চান করবার সময় কিংবা ঘুমোবার সময়ও পাঞ্জাবিটা খোলেন না, আর মানিকদার গালের দাড়িও কখনো বাড়ে-কমে না।

অমল নামে একটি ছেলে বললো, আপনাকে শীতকালেও তো গেঞ্জি পরতে দেখিনি।

মানিকদা নিজেও খানিকটা হেসে ফেলে বললেন, নিজের জন্য না হোক, বাড়ির লোকজনের জন্য তো কিনতে হয়। তা ছাড়া আমিও পরি, কলকাতার বাইরে গেলে ... কলকাতার শীত আমার গায়ে লাগে না, কিন্তু গ্রাম ট্রামের দিকে গেলে ঠাণ্ডা আটকাবার জন্য আর একটা গেঞ্জি অন্তত... তার পর শোনো, সেই গেঞ্জির দোকানের যে দোকানদার, বুড়ো মতন একজন লোক, তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমি কোনো মানুষের সঙ্গেই শুধু দেওয়া -নেওয়ার সম্পর্কে বিশ্বাস করি না, একটা কিছু ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখতে চাই ... একদিন গিয়ে দেখি সেই দোকানে মালিকের বদলে এই তপন বসে আছে।

এবারে তপন মুখ তুলে বললো, দোকানটা আমার জ্যাঠামশাইয়ের।

মানিকদা বললেন, জ্যাঠামশাইয়ের দোকানে তার ভাইপো দু'একদিন বসবে, আই মিন দাঁড়াবে, দেয়ালের গায়ে দোকান তো. বসার জায়গা নেই, মালিক বা কর্মচারিকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হয়, সেটা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু ....

তপন আবার বললো, একটা টুল আছে, সেটা ওষুধের দোকানে রোজ রেখে দেওয়া হয়। আপনি যেদিন গেলেন, সেদিন ওষুধের দোকান বন্ধ ছিল, তাই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ...

মানিকদা হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, আমাকে শেষ করতে দাও। তারপর শোনো, সেদিন সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তায় বেশি লোক নেই, শ্যামবাজারের অধিকাংশ দোকানদারই সেদিন মাছি তাড়াচ্ছে, আমি আমার ছোট ভাইয়ের জন্য একটা গেঞ্জি কিনতে গেছি ...

বাবলু একটু অবাক হয়ে কৌশিকের দিকে তাকালো। তাদের দু'জনের চোখেই পাতলা বিস্ময়। তাদের ধারণা ছিল, মানিকদার মা-বাবা, ভাই-বোন ইত্যাদি সম্পর্কের লোক থাকলেও তারা অনেক দূরে কোথাও আছে, মানিকদার মুখে কোনোদিন তাদের কথা শোনা যায়নি। মানিকদার মতন লোক কোনোদিন বাজার করে না, গেঞ্জি কেনে না, কোনদিন কোথায় কী খাবে তা নিয়ে চিন্তা করে না।

মানিকদা বলে চললেন, আমি গিয়ে দেখি, আমার চেনা বুড়ো লোকটি নেই, তার জায়গায় একটি নতুন ছেলে, খদ্দের নেই বলে সে এক মনে একটা বই পড়ছে। তোমরা ইমাজিন করতে পারবে, কী বই সেটা? শশধর দত্তের মোহন সিরিজ নয়, আধুনিক সাহিত্যিকদের কোনো ট্র্যাশও নয়, ও পড়ছিল, একটা কবিতার বই, সুকান্ত ভট্টাচার্যর 'ছাড়পত্র'। যাস্ট থিংক অ্যাবাউট ইট। ফুটপাথের একটা গেঞ্জির দোকানের কর্মচারি সুকান্তর কবিতা পড়ছে। তা হলে সুকান্তর কবিতা কতখানি ছড়িয়েছে। সেটাই তো দরকার। মাইকেল মধুসূদন বউবাজারের এক মুদিকে নিজের কবিতার বই পড়তে দেখে যে রকম থ্রিলড হয়েছিলেন, আমারও প্রায় সেই রকম অবস্থা। সুকান্ত বেঁচে থাকলে ... সুকান্ত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, তার কবিতা আমি আমার নিজের ...

সুকান্ত ভট্টাচার্য যে মানিকদার বন্ধু ছিলেন তা ঘরে উপস্থিত সবাই জানে। মানিকদা অনেকবার বলেছেন। বাবলু আগে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কোনো কবিতা পড়েনি, সে কবিতা-টবিতা পড়তে ভালোবাসে না, সে এখানে আসবার পরই কয়েকবার সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার আবৃত্তি শুনেছে কয়েকজনের মুখে।

পমপম বললো, মানিকদা, আমরা ওর মুখে একটা কবিতার আবৃত্তি শুনবো।

মানিকদা হাততুলে বললেন, পরে পরে পমপম অধৈর্য হচ্ছিস কেন? খানিকপরে কবিতার সেশান হবে। তার আগে সবটা শোন? ওর হাতে সেই বই দেখে আমি প্রথমেই ভেবেছিলুম ওকে জড়িয়ে ধরবো। নিজেকে অতিকষ্টে সংযত করেছি। আস্তে আস্তে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললুম। ফ্যান্টাস্টিক ছেলে। কী মনের জোর। আমরা এখানে যারা বসে আছি, ইনক্লুডিং মাইসেলফ বলছি আমাদের সবার চেয়ে ও অনেক বেশি স্ট্রাগল করেছে। বেশ কয়েকদিন ওর সঙ্গে মিশে, ওকে ভালো করে চেনবার পর একদিন জিজ্ঞেস করলুম তপন তুমি আমাদের স্টাডি সার্কেলে যাবে? ও রাজি হয়ে গেল। তাই ওকে আজ নিয়ে এসেছি। নাও হিয়ার হি ইজ। তপনকে নিয়েই আজ আমাদের মেইন আলোচনা হবে। তার আগে ওর ব্যাকগ্রাউণ্ডটা জানা দরকার। সেটা তপন নিজেই বলবে। তপন, এখানে লজ্জাটজ্জা পাবার কারণ নেই, এখানে সবাই তোমার বন্ধু তুমি নিজের কথা কিছু শোনাও।

তপন মুখ তুলে বললো কী বলবো মানিকদা? নিজের কথা মানে আপনিই তো বলে দিলেন...

মানিকদা বললেন, আমরা তোমার সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাই। এখানে যারা নিয়মিত আসে, তাদের প্রত্যেকের নাড়ি নক্ষত্র আমরা সবাই জানি। তুমিও জানতে পারবে। তুমি কোথা থেকে শুরু করবে, সেটা বুঝতে পারছো না তো। তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে প্রশ্ন করব, এটাকে জেরা বলে ভেবো না। আমরা সবাই সাবইকে ভালো ভাবে জানতে চাই। এই তোমরা প্রশ্ন করার জন্য তৈরি হও। প্রথম প্রশ্নটা আমিই করছি। তপন, তুমি সবাইকে বলো, তুমি কোথায় থাকো। একটু ডিটেইলসে বলো।

তপন বললো, আমি দমদমে নাগের বাজারের কাছে থাকি। জায়গাটার নাম ক্লাইভ কলোনি। ঐখানে লর্ড ক্লাইভের বাগান বাড়ি ছিল। লর্ড ক্লাইভ মানে যিনি ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে যিনি পলাশীর যুদ্ধে ... মুর্শিদাবাদ থেকে সব ধনরত্ন লুঠ করে এনে ...

মানিকদা আবার বাধা দিয়ে বললেন, আমরা লর্ড ক্লাইভ বিষয়ে জানি, তুমি তোমার থাকার জায়গাটা সম্পর্কে বলো। তুমি কি লর্ড ক্লাইভের বাড়িতেই থাকে। এতক্ষণ পরে তপন ফিকে ভাবে একটু হাসলো। তারপর বললো, না, আমি সে বাড়িতে থাকি না। জায়গাটার নাম ক্লাইভ কলোনি হলেও আসলে সেটা এখন একটা রিফিউজি কলোনি। আমি সেখানে আমার জ্যাঠামশাইদের সাথে থাকি।

–পাকা বাড়ি, না মাটির বাড়ি?

–পাকা বাড়ি মানে কি ইটের? ইঁটে বাড়ি না, চ্যাঁচার বেড়ার ওপরে মাটি ল্যাপা আগে খড়ের ছাউনি ছিল, গত বর্ষায় টিন দেওয়া হয়েছে। এখন আর জল পড়ে না।

–কটা ঘর? ক'জন থাকো।

–দুইটা ঘর। ফেমিলি মেম্বার নয়জন।

মানিকদা পেছন ফিরে খানিকটা বিরক্তভাবে বললেন, তোমরা আর কে কোনো প্রশ্ন করছো না কেন? আমাকে একলাই সব বলতে হচ্ছে।

বাবলু এবার হাত তুলে বললো, আমার একটা প্রশ্ন আছে। তপনবাবুর বাড়ি আগে কোথায় ছিল? উনি রিফিউজি কলোনিতে থাকেন বললেন...

তপন কিছু উত্তর দেবার আগেই মানিকদা বললেন, ওসব বাবু টাবু চলবে না। শুনলেই আমার গা জ্বালা করে। হয় ওকে তোমরা তপনদা বলবে, নয় শুধুও নাম ধরে ডাকবে। তপন তুমি উত্তর দাও প্রশ্নটার।

তপন বললো, আমাদের বাড়ি আগে ছিল কুমিল্লায়? আপনারা কেউ সরাইল-এর নাম শুনেছেন। সেই সরাইলে ছিলাম আমরা।

অনুপম বললো আমার বাবা-মার মুখে শুনেছি, আমাদের বাড়ি ছিল কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। আমি অবশ্য সেখানে কখনো যাইনি। তার কাছে?

তপন বললো, খুব দূরে না। পাকিস্তান হবার পরও আমরা মোটামুটি ছিলাম। আমি সেখানে মেট্রিক পর্যন্ত পড়েছি। কিন্তু আমার বাবা ছিল খুব তেজী মানুষ একবার জমি নিয়ে এক গণ্ডগোলে থানার দারোগার সাথে ঝগড়া হলো, সেই থেকে আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম, তারপর আমার বাবা খুন হলো আমাদের বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

অনুপম বললো, আসতে বাধ্য হলাম। আমি আসতে চাই নাই। আমি ঢাকায় থেকে পড়াশুনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উপায় নেই । কে আমার খরচ দেবে? বাবা মারা গেলেন..জ্যাঠামশাই আগেই চলে এসেছিলেন এই দ্যাশে, মায়ের নিয়ে আমারেও চলে আসতে হলো।

হঠাৎ যেন তপনের চোখে ঘনিয়ে এলো স্মৃতির মেঘ। সে চুপ করে গিয়ে তার থুতনি ঠেকালো বুকে।

মানিকদা বললেন, এরকম ঘটনা আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু এক্সট্রা অর্ডিনারি ব্যাপার হলো পায়ে হেঁটে বর্ডার ক্রশ করে রিফিউজি কলোনিতে জ্যাঠামশাইয়ের আশ্রয়ে থেকেও তপন হার স্বীকার করেনি। তাই না তপন? তুমি এখানে এসেও কী করে লেখাপড়া চালালে।

তাপন আবার মুখ তুললো এবারে তার কণ্ঠস্বর বেশ গম্ভীর। সে বললা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পেতে বেশ অসুবিধা হয়েছিল। একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল। তারপর আমি কলেজে ভর্তি হতে গেলে জ্যাঠামশাই রাজি হন নাই। আমাদের নাগেরবাজারে থাকেন প্রফেসর পিচ্যাটার্জি, তিনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আমাকে হাফ ফ্রি করে দিতে পারবেন বললেন, তাঁরও বাড়ি ছিল কুমিল্লায় আমি শিয়ালদা বাজারে কিছুদিন ডিম বিক্রি করেছি তাতে যাতায়াতের ভাড়াটা উঠে যেত কিন্তু গ্রেজুয়েট হয়েও কোনো লাভ হলো না কোথাও চাকরি পাই না এম. এ. পড়ার কোশ্চেন নাই, অনেক খরচ এদিকে চাকরিও জোটে না। তাই জ্যাঠমশাইয়ের দোকানে এখন মাঝে মাঝে বসি। আপনারাই বলেন গেঞ্জি বিক্রি করার জন্য কি বি এ পাশ করা কোন্নো কাজে লাগে?

অনুপম জিজ্ঞেস করলো, কেন, রিফিউজিদের জন্য তো আলাদা কোটা আছে শুনেছি। এতেও আপনি চাকরি পেলেন না।

মানিকদা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, শাট আপ। অনুপম, তুই কোটার কথা বলছিস, তোর লজ্জা করে না? মানুষে মানুষে আর এ রকম কত শ্রেণী বিভাগ হবে?

তপন তবু মুখ উঁচু করে অনুপমের উদ্দেশে বললো, হ্যাঁ কোটা আছে। যে অফিসে পাঁচজনের কোটা আছে, সেখানে দেড়শো জন রিফিউজি অ্যাপ্লাই করে। তাদের মধ্যে পঁচাত্তরজনই ওভার কোয়েলিফাইড। জানেন তো, যারা আমাদর মতন রিফিউজি না, যাদের বাপ ঠাকুর্দার দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে এদেশে অনেক দিন আছে বাড়িঘর আছে, তারাও এখন রিফিউজি সেজে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা নিতে চায়।

এই সময় বাধা কেবিনের এক ছোকরা এলো কেটলিতে চা আর কিছু ভাঁড়া নিয়ে। ছেলেটির বয়েস চোদ্দ পনেরোর বেশি না, বেশ নাদুশ নুদুশ চেহারা, সে এসেই ভারিক্কিভাবে চ্যাঁচায়। চা নিন। তাড়াতাড়ি করুন। দু'টাকা ষাট নয়া পয়সাটা দিয়ে দিন আগে।

স্টাডি সার্কেলের সদস্যদের প্রত্যেক জমায়েতে চল্লিশ নয়া করে চাঁদা দিতে হয়, সেই পয়সা জমা

হয় একটি ভাঁড়ে। পমপম তার থেকে চায়ের দাম মিটিয়ে দিল।

চাষের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে মানিকদা আর একাট বিড়ি ধরালেন কেউ সিগারেট দিলেও তিনি নেন না। অবশ্য অন্যান্য সদস্যদের তিনি ইচ্ছে মতন বিড়ি সিগারেট খাবার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। এখানে বয়েসের ব্যবধানকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

মানিকদা আবার দু'বার হাত তালি দিয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে বললেন, এতক্ষণ তোমরা তপন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করতে পেরেছো। এবারে অরিজিনাল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। আজ তপনকে কেন্দ্র করেই আমাদের আলোচনা হবে। তপন তুমি বলো দেশ বলতে তুমি কী বোঝো।

তপনের লাজুকতা অনেকটা কেটে গেছে। অনুপমের কাছ থেকে পাওয়া একটা সিগারেট প্রায় শেষ করে এনেছে সে খানিকটা দুঃখী দুঃখী গলা বললো মানিকদা দেশ বলতে এখনো আমি কুমিল্লার সেই সরাইলকেউ বুঝি। মাপ করবেন। এখনো ইণ্ডিয়ায় আছি কিন্তু প্রায়ই সরাইলের স্বপ্ন দেখি। যা সত্যি তাই বললাম। পাকিস্তান হবার পরও আমরা সেদেশে ছিলাম..পাকিস্তানকেই নিজের দেশ বলে মেনে নিয়েছিলাম কোনোদিন চলে আসতে হবে ভাবিনি, যে-বাড়িতে জন্মেছি যে পুকুরে সাঁতার শিখেছি, যে রাস্তা ধরে রোজ ইস্কুলে গেছি তা কি কেউ সহজে ছেড়ে আসতে চায়? তবু ছেড়ে আসতে হয়েছে এখন ইণ্ডিয়াতে রিফিউজি কলোনিতে বি এ পাশ করেও চাকরি পাই না বাসে ট্রামে বেশি ভিড় হলে শালা বাঙালদের জন্য দেশটা উচ্ছন্নে গেল। এই কথা শুনতে হয় তবু আমি বলবো, এখন ইণ্ডিয়াই অমার দেশ।

অনুপম জিজ্ঞেস করলো পাকিস্তানে থাকলেও কি আপনি বি এ পাশ করলেই চাকরি পেতেন? সে দেশে বেকার নেই?

তপন বললো, তা আছে। কিন্তু সেখানে আমাদের বাড়ি জমি ছিল ভাত কাপড়ের অভাব ছিল না, রিফিউজি বলে পদে পদে লাথি ঝাঁটা খেতে হতো না। আপনারা তো দেশ ভাগের ফল ভোগ করেননি..

মানিকদা রেগে গিয়ে বললেন আঃ অনুপম তুই আলোচনাটা বড্ড মানডেন দিকে নিয়ে যাচ্ছিস। এসব কথা তো বহুবার শোনা হয়ে গেছে। আমরা এর থেকে অনেক বড় ব্যাপার নিয়ে তপন তুমি আমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারেনি। তুমি পাকিস্তানের সিটিজেন বা ইণ্ডিয়ার সিটিজেন সেটা এমন কিছু ইমপর্টান্ট ব্যাপার নয়। দেশ বলতে আমি কোনো জিওগ্রাফিক্যাল বাউণ্ডারির কথা জিজ্ঞেস করছি না। দেশ নামে একটা ভাবমূর্তি তো আছে। তোমার কাছে সেটা কী রকম? সে কি বঙ্কিমের সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম।" না কি, রবি ঠাকুরের নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি। নাকি ডি এল রায়ের "সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।"

তপন বেশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে সবার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে ও মানিকদা ছাড়া আটটি যুবক ও তিনটি যুবতী রয়েছে এই ঘরে। যুবতীদের দিকেই চলে যাচ্ছে তার চোখ কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে মুখ নামিয়ে নিচ্ছে। এখন সবাই চেয়ে আছে তার দিকে।

সে বললো যে-দেশেই থাকি সব সময়ই দেশ আমার কাছে মায়ের মতন। নীল আকাশ সবুজ ধান খেত নদীর ধারে কাশ ফুল ফুটে আছে....

মানিকদা উঁচু গলায় হেসে উঠলেন। তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বললেন, দ্যাখো, এই একটা টিপিক্যাল উদাহরণ, এই ছেলেটি এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে তবু পুরোনো সংস্কার ছাড়তে পারেনি। দেশকে মা বলা কিংবা বাবা বলা একটা পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া কনসেপ্সান স্বার্থপর শ্রেণী নানারকম গানে ও কবিতায় এই সেন্টিমেন্টাল ইমেজটা বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

তপনের দিকে ফিরে তিনি ধমকের সুরে বললেন নীল আকাশ সবুজ ধান ক্ষেত কাশ ফুলের আড়ালে সর্বক্ষণ কী উঁকি মারছে তা তুমি দেখোনি। সেদিন সুকান্তর ছাড়পত্র পড়ছিলে সুকান্তর কবিতা তোমার মনে পড়লো না?

"এখানে মৃত্যু হানা যে বার বার
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার
এই যে আকাশ দিগন্ত মাঠ স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু মেলেছে এখানে ঘাঁটি
কাথাও নেইকো পার

মারী ও মড়ক মন্বন্তর ঘন ঘন বন্যার
আগাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ভাঙা নৌকোর পাল...

শোনো তপন দেশ বলে আলাদা কিছু নেই। এই পৃথিবীটাই সব মানুষের দেশ। আজও এই পৃথিবীতে দুটিই মাত্র জাতি আছে। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ এই সব আলাদা আলাদা জাত পাঁতের বাগও কৃত্রিম। শোষক ও শোষিত ছাড়া আর কোনো জাত নেই। তুমি হিন্দু বলে পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়েছো কিন্তু পাকিস্তানে ধনী মুসলমানরা কি গরিব মুসমানদের শোষণ কর না? তুমি হিন্দু হয়ে এদেশে পালিয়ে এসেছো বলে কি এদেশের ধনী হিন্দুরা তোমাদের আদর করে বুকে টেনে নিয়েছে? শোষক আর শোষিত ছাড়া আর কোনো জাত নেই। নিজেকে হিন্দু ভেবো না, মুসলমান ভেবো না, এগুলো ভুল। পৃথিবীতে একদিন শোষণ ও শোষিত শ্রেণীর লড়াই হবে ওরা হারবে ওরা হারতে বাধ্য তারপর যখন একটাই শ্রেণী থাকবে তখনই সত্যিকারের পৃথিবীটা হবে আমাদের দেশ। আমাদের মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি যাই-ই বলো।

এই বক্তৃতায় খুব বেশি বিচলিত না হয়ে তপন শান্তভাবে বললো এই সব কথা আমি আগেও শুনেছি। কিন্তু এই লড়াইটা কী করে হবে মানিকদা? যারা অত্যাচারী যাদের আপনি শোষক বললেন, তাদের হাতেই যে সব অস্ত্রশস্ত্র। তারা সুবিধা ভোগী তারা তারা দাবি চাড়বে কেন।

মানিকদা এবারে অনুপমের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি বেশি কথা বলে ফেলছি। এটা বক্তৃতার জায়গা নয়, স্টাডি সার্কেল। সবাইকে আলেচনায় অংশ নিতে হবে। অনুপম তুমি এবার তপনের প্রশ্নের জবাব দাও।

অনুপম বললো, শোষকদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে তা ঠিকই কিন্তু শোষিতরা সংখ্যা বেশি। অনেক বেশি। একদিন তারাও যে যা পারবে অস্ত্র তুলে নেবে। তারা স্বার্থপর নয়, সেই জন্যই তারা জিতবে। তবে লড়াইটা একদিনে আরম্ভ হয়ে একদিনেই শেষ হবে না। লড়াই শুরু হয়ে গেছে চলবে অনেকদিন।

বাল্লুর পাশ থেকে কৌশিক বলে উঠলো এ লড়াইতে নেতৃত্ব দেবে কে? চীন না রাশিয়া?

দারুণভাবে আহত হবার মতন মুখ বিকৃত করে মানিকদা বললেন, প্লিজ তোমাদের কতবার বলেছি, রাশিয়ার নাম উচ্চারণ করো না। ওরা বিপ্লবের পথ থেকে সরে গেছে। ওরা শোধনবাদী। এদেশে ওরা বুর্জোয়া ন্যাশনালিষ্ট সরকারের সঙ্গে আঁতাত করেছে। এর পর ওরা আমেরিকার সঙ্গে হাত মেলাবে। ওদের কথা বলো না। প্রোলেতারিয়েত দুনিয়ার একমাত্র ভরসা হলো চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর চীন।

তপন বললো, কিন্তু মানিকদা চীন তো আমাদের ইণ্ডিয়া আক্রমণ করেছিল গত বছর। ইণ্ডিয়াও একটা গরিব দেশ, তবু কেন চীন অ্যাটাক করলো।

মানিকদা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তপন তুমি কয়েক বছর আগে মাত্র পাকিস্তান থেকে এসেছো রিফিউজি কলোনিতে কষ্ট করে থাকো, তবু এর মধ্যেই ইণ্ডিয়া তোমার কাছে আমাদের ইণ্ডিয়া" হয়ে গেল? শোনো চীন কখনো ইণ্ডিয়া অ্যাটাক করতে পারে না করেনি ওটা জওহরলাল নেহরু দেশের লোককে ধোকা দিয়েছে। দেশের ইণ্টানলি সমস্যা চাপা দেবার জন্য এক্টা ইণ্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস সৃষ্ট করতে চেয়েছে। যুদ্ধটা নিজে থেকেই কে থামালো চীন থামায়নি? কখনো শুনেছো যে দেশ যুদ্ধে জিতছে সেই দেশ নিজে থেকেই সীজ ফায়ার ডিক্লেয়ার করে? গত বছর চীন ইণ্ডিয়ার মধ্যে ঢুকে এসেও তাই-ই করেছে কেন? কারণ চীন মিলিটারি ভিকট্রিতে বিশ্বাস করে না। এই চীনই এখন সারা দুনিয়ায়....

হঠাৎ এই সময় ঘরেরর মধ্যে ঢুকে এলেন পমপমের বাবা অশোক সেনগুপ্ত। সাদা পাঞ্জাবিও ধুতি পরা মাথার চুলে পাক লাগায় তাকে এই পোষাকে বেশ সৌম্য দেখায়। তিনি একজন বামপন্থী নেতা এই স্টাডি সার্কেল তাঁরই দাক্ষিণ্যে খোলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে দেখেই মানিকদা থেমে গেলেন।

অশোক সেনগুপ্ত উদার ভাবে বললেন এই যে মানিক তোমাদের চলছে এখনো? কিন্তু সাতটার সময় যে আমাদের একটা সেল মিটিং আছে এখানে?

মানিকদা হাসিমুখে বললেন, সাতটার তো দেরি আছে। আমরা উঠে যাবো একটু বাদে অশোকদা বসুন না।

কৌশিক ফিসফিস করে বাবলুকে জিজ্ঞেস করলো চল এবার উঠবি?

বাবলুর আরও একটু বসার ইচ্ছে ছিল। সে লক্ষ্য করেছে পমপমের বাবা অশোক সেনগুপ্তের সঙ্গে ইদানিং মানিকদার একটুও মনের মিল নেই। তিনি এই জায়গাটার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বটে কিন্তু তাঁর সঙ্গেয়ই মানিকদার কথা কাটাকাটি হয়। সেই তর্ক বাবলুর শুনতে ভালো লাগে।

কিন্তু আজ বাবলুকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। সে উঠে পড়ে কৌশিককে বললো চল

মানিকদা তাদের দিকে ফিরে বললেন, অতীন আর কৌশিক, তোমরা একটু তপনকে এগিয়ে দাও। খুব যদি কাজ না থাকে তা হলে কোনো পার্কে বসে তোমরা ওর সঙ্গে আর একটু কথা বলো। ওকে বুঝাতে, বোঝাবার চেষ্টা করো।

এটা অনুরোধ নয় আদেশ। বাবলু ও কৌশিক তা বোঝে। তারা সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানালো।

পেছন থেকে পমপম বললো আমাকে একবার শ্যামবাজার যেতে হবে আমিও যাবো ওদের সঙ্গে। এই তোরা একটু দাঁড়া...

তপনকে নিয়ে ওরা তিনজন বেরিয়ে এলা রাস্তায়। বাবলু লক্ষ করলো এই সন্ধের সময়ে বাড়ি থেকে বেরুবার জন্য পমপম তার বাবার অনুমত নিল না। পমপম সব ব্যাপারেই নিজেকে ছেলেদের সমান সমান বলে মনে করে। এই সময় কখনো বাড়ি থেকে বেরুলে বাবলুও তার মাকে বলে যায়। পমপমের অবশ্য মা নেই।

বাইরে ঝোড়া বাতাস বইছে রাস্তা ঘাট অনেকটা ফাঁকা। শ্যামবাজারের দিকে না গিয়ে ওরা মানিকতলা ব্রীজের মাঝখানে দাঁড়ালো ঝড় দেখবে বলে। পমপম ঝড় দেখতে ভালোবাসে। বাতাসের বেগ একই রকম রইলো, কিন্তু ঝড় উঠলো না। ওরা আড্ডা দিতে লাগলেন অনেক্ষণ ধরে। তপনের আড়ষ্টতা কিছুতেই কাটছে না দেখে এক সময় পমপম তপনের একটা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে অদ্ভুত বাবে হেসে বললো, আমাদের কথাবার্তা তোমার অপছন্দ হচ্ছে না তো?

তপন প্রবল ভাবে দু'দিকে মাথা নাড়লো।

পমপম বললো, অন্ধকারে মাথা নাড়া দেখে কি হ্যাঁ না বোঝা যায়? মুখে বলতে হয়। তুমি আমদের ছেড়ে চলে যেও না যেন। আজ থেকে তুমি আমাদের দলে।

॥ ১৬ ॥

অসুখ-বিসুখের ব্যাপার নিয়ে প্রতাপ আলোচনা করতে ভালোবাসেন না। নিজের কখনো শরীর খারাপ হলে সহজে তা স্বীকার করতে চান না, এমনকি মমতার কাছেও না। দেহ নামক যন্ত্রটিতে কখনো কখনো বিকার ঘটেই তখনও প্রতাপ ডাক্তার দেখাবার বদলে নিজেই গোপনে নিজের চিকিৎসা করেন।

রাস্তা ঘাটে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতন ঘটনা তাঁর জীবনে আর কখনো ঘটেছে কি না তা কেউ জনে না, তবে এবারের কথাটা বাবলু এসে তার মাকে বলে দিয়েছে। প্রতাপ তবু কয়েকবার অস্বীকা করবার চেষ্টা করলেন বললেন, ওটা কিছুই না সেদিন মাথায় বেশি রোদ লেগে গিয়েছিল তারপর থেকে তো আবার ঠিকই আছি ট্রামো বাসে চাপছি। মমতা তবু তাঁর এক আত্মীয় ডাক্তারকে ডাকার জন্য জেদ ধরতে প্রতাপ বললেন ঠিক আছে আগে বাড়ির ডাক্তারকে দিয়েই প্রেসার ট্রেসার মাপিয়ে দেখা যাক তুতুলকে একবার ডাকো।

বাড়িতে তুতুলের সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না কখনো। এ বাড়িতে দুটি মেয়ে আছে মুন্নি আর তুতুল মেয়েদের কণ্ঠস্বর সাধারণত একটু উচ্চগ্রামে বাঁধা, মুন্নির হাসি কান্না, কথাবার্তা অন্য ঘর থেকে শুনতে পাওয়া যায় প্রায়ই। তুতুল যদিও মুন্নির সঙ্গে একই ঘরে থাকে তবু সেঅদ্ভুত নিঃশব্দ। সে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে যায় প্রত্যেকদিন ঠিক সময় ফেরে তার কোনো বন্ধু বান্ধব আসে না এ বাড়িতে। সে কখনো চেঁচিয়ে বই পড়ে না, যদিও জেগে থাকে অনেক রাত পর্যন্ত। তাকে বাড়ির কিছু কাজ করতে বললে সে করে দেয় ঠিক ঠাক, এমনকি রান্নাবান্নাও করে জানে শুদু মুখের কথা খরচ করতেই তার যত কষ্ট। এজন্য সে প্রায়ই বকুনি খায় সুপ্রীতির কাছে।

ব্লাড পেসার মাপার যন্ত্রটি নিয়ে তুতুল এসে দাঁড়াল তাপের বিছানার কাছে।

শুক্রবারের সন্ধ্যা, আদালত থেকে ফিরে প্রতাপের আবার প্রানিকবাদে বেরুবার কথা বাড়ি বদলাবার ব্যাপারে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন রাত আটটায়, মাঝখানের সময়টুকুতে প্রতাপ

একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। অমনি মমতা উদ্বিগ্নভাবে এসে তাঁ কপালে হাত রেখে বলেছিলেন, তুমি বাড়ি ফিরেই শুয়ে পড়লে? নিশ্চয়ই আবার তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। প্রতাপ বলেছিলেন, আহা কী মুশকিল অফিস থেকে ফিরে একটুখানি শুতেও পারবো না? তোমরা চা-টা করো...

তুতুলের দু'পাশ ঘিরে রয়েছেন মমতা এবং সুপ্রীতি মুন্নিও এসে উঁকি মেরেছে পিছন তেকে। বাবাকে সবাই মিলে কাবু করে ফেলা হচ্ছে দেখে সে বেশ মজা পাচ্ছে।

তুতুল কিছু বলার আগেই দু'পাশ থেকে মমতা আর সুপ্রীতি নানারকম নির্দেশ দিতে থাকেন। এখন প্রতাপে কয়েকদিন অফিস যাওয়া চলবেনা ছুটি নিয়ে শুয়ে থাকতে হবে। বাড়িতে বসেও খো পড়ার কাজকরা চলবে না ওতে মাথার ওপর চাপ পড়ে রোজ সকালে থানকুনি পাতার রস খাওয়া ভালো।

তুতুল প্রতাপের বাহুতে পট্টি জড়াতে শুরু করেছে প্রতাপ তাকে বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়া তো একটু।

তিনি উঠে বসে আঙুল তুলে হুকুমের সুরে বললেন তোমরা সব বাইরে যাও। ডাক্তার যখন পেশেন্ট দেখে তখন অন্য কারুর সেখানে থাকার কথা নয় কোনো রোগ এখনো ধরা পড়েনি, এর মধ্যেই তোমরা আমার চিকিৎসা করতে শুরু করে দিয়েছো। বা রে বাঃ । যাও সবাই বাইরে যাও।

মমতা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে আবার বললেন, না হলে কিন্তু অমি দেখাবো না।

মমতা প্রতাপের জেদ জানেন তিনি সুপ্রীতির দিকে তাকালেন। মমতা বাইরে যেতে রাজি হলেও মনে মনে ঠিক করলেন, তুতুল এখনও ছাত্রী শুধু ওকে দিয়ে দেখালেই চলবে না একন বড়ডাক্তার ডাকতেই হবে।

মমতারা বেরিয়ে যাবার পর প্রতাপ বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয় তুতুল। তারপর তুই ঐ চেয়ারটা টেনে আমার সামনে বোস।

প্রতাপ বালো করে তুতুলকে দেখতে লাগলেন যেন তিনি অনেকদিন পরে ওকে দেখছেন লম্বা হয়েছে মেয়েটা কিন্তু অসম্ভব রোগা। রংটাও ময়লা ময়লা লাগছে। ব্লাউজা ঢলঢলে একটা বিবর্ণ শাড়ি পরে আছে মাথার চুলেরও যত্ন নেই। এই মেয়ে কিছুদিন পরে ডাক্তার হবে। তখন ওকে কেউ মানবে? অবশ্য তুতুল রেজাল্ট ভালো করে, ও পড়ছে নিজের স্কলারশিপের টাকায়। কিন্তু মুধু ভালো রেজাল্ট কলেই তো হয় না ডাক্তারদের খানিকটা ব্যক্তিত্ব না থাকলে চলে? এ মেয়ে শুধু রোগ নয়, শীর্ণ। তার ওপরের কথাই বলতেচায় না ডাক্তার হিসেবে ওকে মানাবে কে?

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ রে, তুতুল, তুই বাড়িতে খেতে পাস না নাকি? এত রোগা হচ্ছিস দিন দিন...

তুতুল একটু ম্লানভাবে হাসলো। অধিকাংশ প্রশ্নের তার এই উত্তর। নিতান্ত দরকার না হলে সে হ্যাঁ কিংবা না-ও বলে না।

প্রতাপ আবার বললেন, সেই সকালে বেরিয়ে যাস দুপুরে খাস তো কিছু? মেডিক্যাল কলেজে ক্যান্টি আছে তো?

তুতুল সম্মতিসূচক মাথা হেলালো একদিকে, তারপর যাতে আর কোনো প্রশ্ন শুনতে না হয় সেজন্য কানে গুজলো স্টেথোস্কোপ।

প্রতাপ তুতুলের চোখে চোখ ফেলার চেষ্ট করলেন কিন্তু সে মুখ নিচু করে আছে। প্রতাপ ভাবলেন, মেয়েটা প্রত্যেক রাত জেগে পড়াশুনো বড় বেশি পরিশ্রম করছে সেই জন্য তার মুখে ক্লান্তির চাপ। এরকম ভাবে চললে ওর শরীর ভেঙে যাবে। ও নিজে ডাক্তারি পড়ে আর নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা বোঝে না?

হঠাৎ নিজের বড় ছেলের কথা মনে পড়ে গেল প্রতাপের। বেঁচে থাকল পিকলু এতদিনে পরিপূর্ণ যুবক হয়ে যেত, কিন্তু মৃত্যুতে মানুষের বয়েস থেমে থাকে, পিকলুর নেই সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ চেহারাটাই চোখে ভাসে, তার তুলনায় তুতুলও বড় হয়ে গেল। এমনকি মুন্নিও একদিন পিকলুকে চাড়িয়ে যাবে..। পিকলুর মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে রাত্তিরবেলা শুয়ে মমতা চুপি চুপি প্রতাপকে বলেছিলেন, পিকলু আর তুতুল দু'জনেই বড় হচ্ছে এই বাড়িতে এত ছোট জায়গা, আমি আর দিদি দুপুরে সিনেম টিনেমায় গেলে ওরা একা একা থাকে আমার ভয় করে যদি কিছু একটা হয়ে যায়...

এই বয়েসী ছেলেমেয়েরা হঠাৎ মাথার ঠিক রাখতে পারে না।

প্রতাপ শুনে অবাক হয়েছিলেন। পিঠোপিঠি ভাই বোনের মধ্যে অনেক সময় ঝগড়া হয় অনেক সময় বেশিভাবও হয়। মামাতো পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে সেই ভাব যদি ভালোবাসাতেও উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তাতে ক্ষতি কী? সেই ভালোবাসার সম্পর্ক তো অতি মধুর। সেই সম্পর্কের মধ্যে নোংরামি আসতে পারে যদি ছেলে বা মেয়ের মধ্যে কেউ একজন বাদ হয়। পিকলু বা তুতুল দুজনের কেউই সেরকমনয়। ওরা অন্যায় কিছু করতেই পারে না।

প্রতাপ মমতাকে সেদিন ধমক দিয়েছিলেন। নিজের ছেলেমেয়ের ওপর যে বাপ-মা বিশ্বাসরাখতে পারে না, তারা ছেলেমেয়েদেরও ক্ষতি করে নিজেরাও অশান্তিতে ভোগে। ছেলেমেয়েদের ঠিক মতন লেখাপড়ার সুযোগ দাও মহবৎ শেখাও পারিবারিক সম্মান সম্পর্কে সচেতন করো আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলো তারপর ওদের ভালোমন্দ ওরা নিজেরাই বুঝে নেবে। কিছুদিন পর তো এই পৃথিবীটা ওদরেই হবে আমাদের চলে যেতে হবে ওরা যদি কিছু ভুলও করে সেই ভুলের বোঝাও ওরাই বইবে আমরা তো বইতে যাবো না।

মমতাও সঙ্কীর্ণমা না নন। প্রতাপের উপদেশ মেশানো বকুনি শুনে তিনি আহতভাবে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিলেন, ওরা খারাপ কিছু করবে আমি মোটেই সেকথা বলিনি। তুমি বাড়ি বদলাবার ব্যবস্থা করবে কি না বলো। জায়গায় মোটেই কুলোয় না, শুধু তুতুল কেন মুন্নিও তো বড় হচ্ছে, সে আর কতদিন আমাদের সঙ্গে শোবে? তুতুলের একটা আলাদা ঘর না হলে বাথরুমের দরজাটা ভাঙা বেচারা কাপড় ছাড়বারও জায়গা পায় না...

প্রসঙ্গ তখন বাড়ি বদলের সমূহ প্রয়োজীয়তার দিকে গড়িয়ে যায়।

সেই একবারই মৃদু প্রতাপ তুতুল আর পিকলুর সম্পর্কে কিছু শুনেছিলেন। তখন তিনি জীবিকার তাড়নায় ব্যস্ত ছিলেন বড় বেশি বাড়ি বদলাবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকে উপার্জন বাড়াবার চেষ্ট করতে হয়, তিনি ওদের দিকে লক্ষ্য করবার সময় পান নি।আজ তিনি তুতুলের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, ওদের বালোবাসা কতটা গভীর হয়েছিল, তুতুল কি এতদিন পরেও পিকলুর জন্যই মন মরা হয়ে থাকে?

প্রতাপের হাতের পট্টিটা খুলতে খুলতে তুতুল মৃদুস্বরে বললো, বেশি তো নয়।

প্রতাপ ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলেন কত কত দেখলি প্রেসার?

তুতুল সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক কী সব বললো প্রতাপ অত সব বোঝেন না। তিনি বোঝেন নিচেরটা আর ওপরেরটা। পঁচানব্বই আর একশো সত্তর। একে তো মোটেই আবনর্মাল বলা যায় না। তাঁর সহকর্মী একজন হাকিম, মনোমোহন সেন একশো দশ আর দুশো দশ ব্লাড প্রেসার নিয়ে দিব্যি কাজকর্ম করছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একই বিয়ে বাড়িতে কব্জি ডুবিয়ে পাঁঠার মাংস খেলেন...

প্রতাপের ধারণা ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধিই একমাত্র বয়ের বস্তু। তিনি উৎফুল্ল মুখে উঠে বসে বললেন, দেখলি, দেখলি আমার কিছু হয় নি? তোর মামীমার যত বাড়াবাড়ি, আমি বেশ ভালো আছি।

তুতল তার সরঞ্জাম গুছোতে গুছোতে বললো,ব্লাড সুগারটা একবার চেক করতে হবে ফ্যামিলিতে কারুর ডায়াবিটিস ছিল?

–কী জানি। আমার বাবা-মা থাকতে তো কখনো ব্লাডটেস্ট করান নি। মা-র স্বাস্থ্য এখনো ভালো আছে। বাবা মারা গেছেন হার্ট অ্যাটাকে, যতদূর জানি ডায়াবিটিসের কোনো সিমটম ছিল না, আমারও নেই তোর বাবার কিন্তু ছিল, আমার মনে আছে, অসিতদাকে ডাক্তার ইনসলিন নিতে বলেছিল..হ্যারে মামণি, তুই এত রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন?

তুতুল নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো।

–তোর বাবার কাছ থেকে তুই আবার ওটা পাস নি তো? শিগগির একদিন চেক করা। তুই আমার ওপর ডাক্তারি করতে এসেছিস, আমার তো মনে হচ্ছে তোরই চিকিৎসা করানো দরকার।

–আমি কাল-পরশু তোমার ব্লাড টেস্টের ব্যবস্থা করবো মামা।

–তুই আমর কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন রে? সব সময় গোমড়া মুখে থাকিস, এটাও শরীর খারাপের লক্ষণ। এই, তুই আমার দিকে ভালো করে তাকাচ্ছিসনা কেন? কী হয়েছে তোর? আমাকে সব বল তো।

–আমার কিছু হয় নি।

তুতুল গিয়ে দরজা খুলতে প্রতাপ চেঁচিয়ে বললে, তোর মা আর মামীকে জানিয়ে দে যে আমার শরীরে রোগ টোগ কিছু নেই। আমি চমৎকার আছি।

প্রতাপ তখুনি বাইরে খাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। আবার বাড়ি বদল করতে হবে। আগেরবার পিকলু...। এ বাড়ি বদলা না করে উপায় নেই। বাড়িওয়ালা ছিলেন একজন উকিল, বেশ সজ্জন, প্রতাপের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল তিনি হঠাৎ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হবার পর তাঁর জামাই এ বাড়ি খালি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

তুতুলকে দিয়ে ব্লাড প্রেসার চেক করাবার ফলে বেশ উপকার হলো প্রতাপের, আবার মনের জোর ফিরে পেয়েছেন। মুখে যতই অস্বীকার করুন সে দিন সায়েন্স কলেজের সামনের ফুটপাথের ঘটনার পর তাঁর মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতুনি ঢুকেছিল। রোদ্দুর লেগে মাথা ঘুরে যাবার ব্যাপার নয়, কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখের সামনে সব কিছু আবছা হয়ে এসেছিল, মনে হচ্ছিল, পায়ের তলায় মাটি নেই তিনি অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন, যেন মৃত্যুর দেশ তাঁকে টেনে নিচ্ছে, তিনি বাবলুর হাতধরে...। নাঃ হয়তো শারীরিক কিছু নয়, ওটা মনে বিকার। প্রেসার যখন ঠিক আছে, তখন সব ঠিক আছে।

সে রাতে বাড়ি বদলাবার বিষয়ে কিছু ঠিকঠাক হলো না। ভাড়া অত্যন্ত বেশি।

এরপর কয়েক দিন প্রতাপ তুতুল সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বারবার তাকে ডেকে কথা বলাতে চান, তার কলেজের পড়াশুনো সম্পর্কে জানতেচান। তবে মেয়েটা কিছুতেই মুখ খোলে না। তাকে বকুনি দিলেও কাজ হয় না। প্রতাপ পরাস্ত হয়ে গেলেন।

মমতা বললেন, আমি আর দিদি তো ওকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। কিছুই খেতে চায় না। ভাত খায় ঠিক এইটুকু, ওর থেকে মুন্নি অনেক বেশি খায়। কোনো মাছ তরকারি ওর পছন্দ হয় না। আমার ওপরে ওর কিছু রাগ টাগ হয়েছে কিনা জানি না, আমার সঙ্গে তো পারতপক্ষে ও একট কথাও বলতে চায় না।

–তুমি ওকে কোনোদিন বকেছো পিকলুর নামকরে বাবলুকে যেমন তুমি মাঝে মাঝে পাগলের মতন...

–না, ওকে আমি কোনোদিন কিছু বলিনি, বিশ্বাসকরো। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

–এভাবে বেশিদিন চললে তো মেয়েটা মরে যাবে। এই বয়েসের মেয়ে ভালো করে খাবে দাবে, সাজপোশাক করবেও কোনোদিন সিনেমা টিনেমাতেও যায় না?

–আমরা জোর করলেও যেতে চায় না। ও যেন ইচ্ছে করে এমন সাজ করে যাতে ওকে আরও খারাপ দেখায়। কানু বলছিল ও কলেজে কোনো ছেলে মেয়ের সঙ্গেও মেশে না।

প্রতাপ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, কানু?

প্রতাপের আশঙ্কা মিথ্যে হয় নি, কানু একবার ছ'মাসের জন্য জেল খেটে এসেছে। এর মধ্যেই সে অবশ্য বিয়েও করেছে বাচ্চা হয়েছে দুটি তার অবস্থা সচ্ছল হচ্ছে দিন দিন, মুখে বলে অর্ডার সাপ্লাই এর ব্যবসা। প্রতাপ তাকে সহ্য করতে পারেন না, কানু তা জানে, তাই সেশুধু দুপুরের দিকে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসে।

প্রতাপ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কানু কী করে জানলো তুতুলের কলেজে কী হয় না হয়?

মমতা বললেন, কানুর এক শালা যে মেডিকাল কলেজে ওর সঙ্গেই পড়ে। সেনাকি বলেছে, তুতুলে একটাও বন্ধু নেই, প্রফেসাররা ছাড়া ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে কথাই বলে না..দু'একজন প্রফেসার ওকে বেশি ফেভার করে, চেম্বারে আলাদা করে ডেকে নিয়ে যায়, সেইজন্য ছেলেমেয়েরা তুতুলকে ক্ষ্যাপায়।

প্রতাপ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, কানুর শালাও সেই ক্ষ্যাপাবার দলে আছে নিশ্চয়ই। একদিন আমি মেডিক্যাল কলেজে খোজ নিতে যাবো, যদি দেখি কেউ অন্যায় ভাবে আমার ভাগ্নীর পিছনে ফেউ লেগেছে তাহলে তাকে আমি চাবকে সোজা করবো।

মমতা হেসে স্বামীর বুকে হাত রেখে বললেন, তুমি এক কাজ করো। একটা চাবুক হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমেপড়ো একদিন তারপর যেখানে যত অন্যায়কারী দেখবে, সবাইকে চাবুক কষাবে এক ঘা করে।

এর কয়েক দিন পরে প্রতাপ ডাকবাক্স খুলে একটি অদ্ভুত খাম পেলেন। এয়ারমেলের লম্বাটে

লেফাফা, তাতে কেউ হাতে ছবি এঁকেছে। বিভিন্ন সাইজের হৃৎপিণ্ডের ছবি সেগুলি ক্রস কর কাটা। চিঠিটা তুতুলের নামে। ঠিকানার জায়গায় বাংলায় লেখা শ্রীমতী বহ্নিশিখা সরকার, তার নিচে ব্র্যাকেট দিয়ে বড় বড় লাল হরফে ইংরেজিতে লেখা Mrs. Grundy.

খামটি দেখে প্রতপের বুক কেঁপে উঠলো একবার। ঐ মিসেস গ্রান্ডি লেখার মানে কী? তুতুল কুমারী মেয়ে তার নামের নিচে মিসেস দিয়ে অন্য একটা পদবী গ্রান্ডি নামের কোনো লোককে তুতুল গোপনে গোপনে বিয়ে করেছে? সে কথাটা বলতে পারে না বলেই সে এমন মন মরা হয়ে থাকে। মেডিক্যাল কলেজে ঐ নামের কোনো অধ্যাপক আছে? সাহেব অধ্যাপকরা তো সবাই বিদায় নিয়েছে, যদি কোনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা পার্শী হতে পারে..

প্রতাপ মমতাকে এনে চিঠিটা দেখালেন। মমতাও বুঝতে পারলেন না কিছু। তুতুলকে এমনিতে কে চিঠি লিখবে? একসময় সে ফুলের মতন সুন্দর ছিল পাড়ার চোকরারা জ্বালাতন করতো কিন্তু ইদানীং তো কেউ...।

প্রতাপের সবচেয়ে বেশি ভয় হলো সুপ্রীতির জন্য। চিঠিটার মধ্যে যদি সে রকম কিছু থাকে, যদি সুপ্রীতিজানতে পেরে যান, তাহলে তিনি সামলাবেন কী করে?

ভাগ্নীর নামে চিঠি যদিও খুলে পড়া উচিত নয় তবু প্রতাপ কৌতূহল সামলাতে পারছেন না। যে-ই চিঠিটা লিখুক মিসেস গ্রান্ডি লিখলো কেন, ওপরে আবার হৃৎপিণ্ডের চবি, তাও কেটে দেওয়া...।

প্রতাপ মমতাকে জিজ্ঞেস করলেন, চিঠিটা খুলে দেখলে দোষ হবে?

মমতা একটা বাটিতে করে জল এনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর নিজেই আঙুলে জল লাগিয়ে বোলাতে লাগলেন আঠার জায়গায়। যাতে ছিঁড়ে না যায় খুব সাবধানে আস্তে আস্তে খোলা হলো।

ভেতরের চিঠিটাও অদ্ভুত। একটা গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে বড় বড় অক্ষরে শুধু কতকগুলি প্রশ্নসূচক দুর্বোধ্যবাক্য লেখা। নিচে কোনো সই নেই। বাক্যগুলি এইরকম মিসেস গ্রান্ডি অ্যানাটমি ক্লাসের সব ছবিতে জামা কাপড় পরাঁনো উচিত, তাই না?--মিসেস গ্রান্ডি আমরা হাইড্রোশিলের চিকিৎসা শিখবো না শিখবো না। মিসেস গ্রান্ডি গত শনিবার অনীতা সরকার আর সুশোভন ব্যানার্জি একসঙ্গে কোথায় গেল। কোথায় গেল? ..মিসেস গ্র্যান্ডি, শর্মিলা বুক কাটা ব্লাউজ পরে আসে, তুমি তার পাশে বসো না, আমাদের বসতে দাও, বসতে দাও..

চিঠিটা পড়তে পড়তে প্রতাপের মুখ বিকৃতি ঘটতে লাগলো, মমতা হাসতে লাগলেন। এ কোনো বদমাইস সহপাঠীর কীর্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ চিঠি তুতুলকে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, প্রতাপ রাগের চোটে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগলেন সেটাকে।

মমতা চন্ন কৌতকের সঙ্গে বললেন, তুমি ছিঁড়ে ফেললে? হাতের লেখার প্রমাণ থাকতো যে লিখেছে পরে তাকে ধরা যেত।

প্রতাপ বললেন হাকিমের বউ হয়ে তুমি দেখছি প্রমাণ ট্রমাণের ব্যাপারটা খুব শিখে গেছো। এখন থেকে ডাকবাক্সতে তালা লাগাবে, রোজ আমি এসে খুলবো।

চিঠির ব্যাপারটা চুকে গেলেও মনের মধ্যে একটা সন্দেহের কাঁটা রয়ে গেল। মিসেস গ্রান্ডি কেন? ইংরেজিতে ঐ নামের কোনো রেফারেন্স আছে। প্রতাপের ইংরেজি সাহিত্য তেমন পড়া নেই।

বিমানবিহারীর বাড়িতে অনেক লেখা পড়া জানা মানুষ আছে। একদিন ইংরিজির অধ্যাপক পরেশ গুহর সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে প্রতাপ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা পরেশবাবু মিসেস গ্রান্ডি কে আপনি জানেন।

পরেশ গুহ বললেন, মিসেস গ্রান্ডি? 'মিসেস গ্রান্ডি হচ্ছে আমার নপিসিমা। আমার নপিসিমা একদিন কী করেছেন জানেন? আমারে পাড়ায় একটা বড় বকুল গাছ আছে। বিকেল বেলা কি সন্ধেবেলা ওখানে ছেলেরা আড্ডা মারে। আজকাল তো মেয়েরাও আড্ডা দিতে শিখেছে, দু'একটি মেয়েও সেখানে যায়। একদিন আমার পিসিমা কীর্তন শুনে ফিরছেন, তখন সেই গাছতলায় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চুমুটুমু খায়নি বুঝলেন, পাড়ারই তো ছেলেমেয়ে এমনি দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, অমনি নপিসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, এই, তোরা এখানে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছিস কেন রে? তোদের লজ্জা সরম নেই। এত বড় একটা ধিঙ্গি মেয়ে এরকম করলে তোর কেনো দিন বিয়ে হবে? তা শুনে ছেলে-মেয়ে দুটো দৌড়ে পালালো। আমার ন'পিসিমার জন্য পাড়ার কোনো মেয়ে

জানলায় দাঁড়াতে পরবে না,কোনো ছেলে রাস্তায় গান গাইতে গাইতে যেতে পারবে না, আমার স্ত্রী তার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে সিনেমায় যেতে চেয়েছিল, তাই শুনে ন'পিসিমা নাক দিয়ে ঘোঁৎ শব্দ করে বললো, হুঁঃ, দিনে দিনে কত কী দেখবো। একেবারে পারফেক্ট মিসেস গ্রাণ্ডি।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, ঐ মিসেস গ্রান্ডি নামটা এলো কোথা থেকে?

–হঠাৎ মিসেস গ্রান্ডিকে নিয়ে আপনার এত কৌতূহল কেন, প্রতাপবাবু?

–এমনিই মানে, একটা জায়গায় হঠাৎ এ নামটা পেলাম

–একটা পুরোনো ইংরেজি নাটক আছে, বুঝলেন, মর্টনের লেখ, স্পীড দা প্লাও, তাকে ঐ মিসেস গ্রান্ডি বলে একটা চরিত্র আছে। প্রচণ্ড নীতিবাগিশ আর শুচি বায়ুগ্রস্ত তার থেকে এসেছে, ঐ রকম কোনো মহিলাকেই মিসেস গ্রান্ডি বলে ভিকটোরিয়ান মরালিটি কোন্ পর্যন্ত পৌঁছেছিল জানেন তো, প্রায় সবকিছুই অশ্লীল, একটা আন্দোলন উঠেছিল যে অপারেশানের সময় কিংবা বাবার জন্মদেবার সময়েও মেয়েদের জামাকাপড় খোলা চলবে না। পুরুষ ডাক্তাররা দেখে ফেলবে, এই চিন্তাটাও অন্যদের কাছে অশ্লীল..তখন কত শব্দ নিয়েও শুচিবাই ছিল, মোরগের ইংরেজি কক্ বলা চলতো না, কারণ ঐ শব্দটার অন্য খারাপ মানে আছে, কেউ কেউ বলতো রুস্টার। ষাঁড় মানে বুল শব্দটারও দোষ ছিল, তাই বলতে হতো জেন্টলম্যান কাউ।

–ঠিক আছে বুঝেছি

–আরও শুনুন না। শ্লীলতার বাতিক মানে প্রুডারি এতদূর পৌঁছে ছিল যে অনেক মহিলা দাবি করেছিল চেয়ার টেবিলের পায়াতেও পোশাক পরাতে হবে। কারণ চেয়ার টেবিলের পায়াও তো লেগ আর পোশাক ছাড়া লেগ দেখতে হবে ভালোই মিসেস গ্রান্ডিদের কান লাল হয়ে যায়...হাঃ হাঃ হাঃ।

কিন্তু প্রতাপের এইসব রসিকতা শোনার দিকে মন নেই। তুতুলের কথা ভেবে তাঁর মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। অমনসুন্দর মেয়ে ছিল তুতুল তার এই পরিণতি। এরকম কী করে হলো। তাঁদের বাড়িতে কেউ এরকম নয়। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তো তাহলে পিছনে লাগবেই। শচিবায়ুগ্রস্তরা দিন দিন রোগা হয়ে যায় এটা এক ধরনের পাগলামি। এই ভাবে চলতে থাকলে ও কি মেডিক্যাল কোর্স শেষ করতে পারবে, কিংবাকোর্স শেষ করলেই বা কী লাভ হবে?

প্রতাপ উঠে পড়লেন সেই আড্ডা থেকে। তুতুলকে এই অবস্থা থেকে ফেরাতেই হবে যদিও কী করে ফেরাবেন তা প্রতাপ জানেন না। নিজের জন্য নয়, তুতুলের জন্যই তাঁর এবার কোনো বড় ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেওয়া দরকার।

॥ ১৭ ॥

টেবিলের ওপর জোর একটা চাপড় মেরে হোসেন সাহেব দাঁত কড়মড়িয়ে বললেন, ইন্ডিয়া। তোমাগো সব কথায় ইন্ডিয়া আসে ক্যান? ইন্ডিয়া থিকা আমরা সেপারেট হইছি কি সব সময় ইন্ডিয়ার নাম জপ করার জইন্য?

আলতাফ বললো চাচা, মাথা গরম করছেন কেন? এমনিই একটা তুলনা দিতেছিলাম।

হোসেন সাহেবের ফর্সা মুখটা লালচে হয়ে গেছে চক্ষু দুটি বিস্ফারিত ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে ফ্যাসফেসে গলায় বললেন,যখন তখন ইন্ডিয়ার নাম শুনলে সত্যি আমার ম্যাজাজ গরম হইয়া যায়। আমি ব্লাড প্রেসারের রুগী, সে কথাটা মনে রাইখ্খো।

আলতাফ প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললো চাচা, দুই প্লেট ফিস্ ফিংগারের অর্ডার দ্যান।

হেসেনসাহেব আঙুল তুলে বললেন, বেলটা বাজাও।

একজন বেয়ারা যেন দরজার পাশেই অপেক্ষা করছিল বেলবাজাবার সঙ্গে সঙ্গে সে দরজা খুলে উঁকি মারলো।

হোসেন সাহেব ঘরে উপস্থিত সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, দুই প্লেট ফিস ফিংগার আর দুই প্লেট চিলি চিকেন আনো। জলদি করবা।

শাখাওয়াত হোসেনের নতুন সাতলা হোটেলের সপ্তম তলার এই ঘরটিতে খাট বিছানা নেই রয়েছে একটি গোলাকার টেবিল, অনেকগুলি চেয়ার, দুটি আলমারি এটা তার অফিস ঘর। একদিকের দেয়ালের গায়ে একটি বন্ধ দরজা, তার ওপাশে আর একটি ছোট ঘর আছে। খাট-বিছানায় সুন্দর

করে সাজানো, সেটি তাঁর বিশ্রাম কক্ষ, কখনো কখনো তিনি রাত্রে সেখানে থেকেও যান।

হোটেল ব্যবসায় শাখাওয়াত হোসেনের কপাল এমনই খুলে গেছে যে তিনি নিজেই যেন সব সময় বিশ্বাস করতে পারেন না। এই সব ব্যবসায় নিয়মই হলো, একবার ছড়াতে শুরু করলে থামানো যায় না। টাকাকে তুমি দ্বিগুণ চতুর্গুণ করার চেষ্টা না করলেই সে অর্ধেক সিকি হয়ে যাবে। হোসেন সাহেব এখন ঢাকায় দুটি এবং চিটাগাং ও করাচিতে একটি করে হোটেলের মালিক। একটি ফরেন চেইনের সঙ্গে কোলাবরেশানে তিনি শিগগিরই ঢাকা ও রাওয়ালপিণ্ডিতে আরও দুটি ফের স্টার খুলতে যাচ্ছেন।

হোটেলের ব্যবসা নিজে না দেখতে পারলে চুরিতে ফাঁক হয়ে যায়। কিন্তু তিনি নিজে কতদিক সামলাবেন? তাঁর পাঁচ কন্যা ও দুটি পুত্র, এর মধ্যে বড় ছেলেটি বরাবরই পিতৃ-বিরোধী, সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে আলাদা ব্যবসা শুরু করেছিল, দু'বছর আগে হঠাৎ সে মারা গেছে। ছোট ছেলেটি এখনও স্কুলের ছাত্র। নাদেরা ও মনিরা নামে তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, কিন্তু দুটি জামাই-ই কাজের ব্যাপারে অপদার্থ কিন্তু পয়সা খরচে ওস্তাদ। এইসব কারণে হোসেন সাহেব বড় অসুখী ছিলেন।

তাঁর আর একটা অতৃপ্তির কারণ, তিনি ধনপতি হয়েছেন বটে, তবে সমাজে সেরকম স্বীকৃতি পাননি। লোকে আড়ালে তাঁকে হোটেলওয়ালা হোসেন বলে। অনেককাল আগে আমিনবাজারে প্রথম একটা ভাতের হোটেল খোলার পর সেই যে তাঁর এই নাম হয়েছিল, এখনও সেটা রয়ে গেছে। তিনি লেখাপড়া বিশেষ করেননি, জীবনে কখনো রাজনৈতিক কোনো দলে ঢোকেননি এমন কিছু কাজ কখনো করেননি যাতে খবরের কাগজে নাম বেরুতে পারে। ব্যবসায়ী মহল ছাড়া তাঁকে কেউ চেনে না। বছরখানেক আগে, বায়তুল মোকাররমের কাছে তাঁর গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, একটা দোকানে ঢুকে তিনি তাঁর হোটেলে টেলিফোন করলেন আর একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, সেই দোকানের মালিক তাঁকে চিনতে পারলো না। দ্বিতীয় গাড়িটা আসতে দেরি হচ্ছিল, তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন, রাস্তা দিয়ে দলে দলে লোক যাচ্ছে, ছেলে-ছোকরারা হই-হট্টগোল করছে, কেউ ভ্রূক্ষেপও করছে না তাঁর দিকে। এতে তাঁর মনে খুব লেগেছিল। তিনি যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতেই লোকে আঙুল তুলে ঐ যে কারবার করে লাভ কী হলো?

কিন্তু শাখাওয়াত হোসেন শুধু হোটেলের ব্যবসাটাই বোঝেন, কী করে যে লোকের দৃষ্টি বা আঙুল নিজের দিকে ফেরাতে হয় তা তিনি জানেন না।

কয়েকমাস আগে বিদেশী পার্টনারদের আমন্ত্রণে শাখাওয়াত হোসেন ইওরোপের বিভিন্ন হোটেল ঘুরে দেখতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁর ছোট জামাই আবু সালেক-কে। সে ছোকরা অস্থিরমতি হলেও ইংরেজিটা ভালো জানে। ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম জার্মানির বন্ শহরে এসে দেখা পেলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলতাফের। সেই সময়েই আবু সালেক কয়েক দিনের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিল।

আটান্ন সালের আগে এই আলতাফ যখন সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল তখন একে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না হোসেন সাহেব। পরে অবশ্য তিনি শুনেছিলেন যে সব ছেড়েছুড়ে আলতাফ জার্মানিতে গিয়ে ভালোই কাজকর্ম করছে, ছোটখাটো ব্যবসাও করছে তবু তিনি আলতাফের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেননি। গত বছর আলতাফ যখন ঢাকায় এসেছিল, তখন একদিন মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে, একটি বিয়ে বাড়িতে।

বন-এ এসে তিনি দেখলেন, আলতাফ বিষম বিমর্ষ হয়ে আছে, তার হিন্দু স্ত্রীর সঙ্গে তার সদ্য ডিভোর্স হয়েছে। সে মেয়েটি দুটি সন্তানকে নিয়ে চলে গিয়ে মিউনিখে একজন জার্মানকে বিয়ে করে ফেলেছে এর মধ্যেই। কেউ কেউ বলে, আলতাফই তার স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করতো ইদানীং আবার কেউ কেউ বলে তার স্ত্রীই গোপনে গোপনে অন্য একজনের সঙ্গে পীরিত করে স্বামীকে ছেড়ে চলে গেছে। সে যাই-ই হোক, যাবার সময় সে জেদ করে তার সন্তান দুটিকে নিয়ে গেছে বলেই আলতাফ একেবারে ভেঙে পড়েছিল।

আলতাফের সেই অবস্থা দেখেই হোসেন সাহেব গোপনে গোপনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন এবং তাকে আবার পছন্দ করতে শুরু করলেন। তাঁর ধারণা ঐ হিন্দু প্রভাবেই আলতাফ এক সময় কমুনিস্ট হয়েছিল। তার শ্বশুর ঐ টাঙ্গাইলের উকিলটার প্রশংসায় আলতাফ হিন্দুদের কথায় নাচে। হিন্দুরা কেউ

পাকিস্তান চায়নি, পাকিস্তান সৃষ্টিতে তারা খুশী হয়নি, তারা তো এখন কমুনিজম্ চাইবেই। যাতে পাকিস্তান আবার ভেঙে যায়, ইসলাম মুছে যায়, তখন হিন্দুদের আবার কর্তৃত্ব ফলাবার সুযোগ আসবে।

ব্যক্তিগত গোপন দুঃখের কারণে হিন্দুদের ওপর শাখাওয়াত হোসেন সাহেবের জাতক্রোধ আছে। কমলা, আজও কমলার কথা মনে পড়ে। সে অনেককাল আগেকার কথা তখন পাকিস্তান নামটা ইকবালের কল্পনাতেও ছিল না ইংরেজ চলে যাবে এমন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, সেউ সময় তিনি নরসিংদির মেয়ে কমলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কমলাদের বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না, এমনকি ওদের পরিবারে সেরকম বিদ্বানও কেউ ছিল না, কমলার বাবা ছিল নরসিংদী বাজারে সামান্য একটা মুদিখানার মালিক, ব্রাহ্মণও নয়, কায়স্থ, সেই লোকটাই শাখাওয়াত হোসেনের প্রস্তাব শুনে জুতো তুলে মারতে এসেছিল। একগাদা লোকের সামনে। সেই ভিড়ের মধ্যে কে যেন একজন বলেছিল ঐ নেড়ে ব্যাটার মাথা ন্যাড়া করে তার ওপর গরম কল্কির একটা দাগ দিয়ে দে।

সব মনে আছে শাখাওয়াত হোসেনের সেদিনের সব ঘটনা স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করে।

তারপর অনেকগুলি বছর গেছে জীবন তাঁক অনেক কিছু দিয়েছে হোসেন সাহেব অন্তত সাতটি হিন্দু মেয়েকে নিজের শয্যায় নিয়ে শুয়েছেন, তবু তৃপ্তি হয়নি কমলার কথা ভুলতে পারেননি। কমলার বিয়ে হয়েছিল বরিশালের এক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে পঞ্চাশের রায়টে সে বিধবা হয় কমলা বাবা সেই নারায়ণ ঘোষ বাবুটাকে হাতের কাছে পেলে তিনি প্রথমে জোর করে তার মুখে গোমাংস ভরে দিয়ে তারপর তার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নুন ছিটিয়ে দিতেন। কিন্তু সে ব্যাটা ফরটি সেভেনেই পালিয়েছে।

সেই নারায়ণ গোষের ওপর রাগেই হোসেন সাহেব যখন যেখানেই কোনো হিন্দু সম্পত্তি পান, অমনি তা গ্রাস করতে উদ্যত হন। তাঁর এই নতুন হোটেলটিও একটি প্রাক্তন হিন্দু জমিদারের বাড়ি ভেঙে তৈরি হয়েছে।

যাই হোক, বিদেশে আলতাফের এ অবস্থা দেখে হোসেন সাহেবের মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে গিয়েছিল। এখন তো এই ছেলেটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। আলতাফ লেখাপড়া জানে, চালাক চতুর, বিদেশে সাহেব মেমদের সঙ্গে মেলামেশার সহবৎ শিখেছে, তাকে তাঁর হোটেল-গ্রুপের জেনারাল ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করলে কাজের কাজ হবে। রক্তের সম্পর্ক তো আছে।

আলতাফ প্রথমে রাজি হয়নি, পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্কই রাখবে না ঠিক করেছিল। মাত্র বছর খানেক আগেই সে সপরিবারে ঢাকা ঘুরে গেছে, সকলের কাছে সে সুখী ও সার্থক মানুষ হিসেবে অহংকার করেছে। এবার ফিরে গেলে লোকে বলবে, সে তার ছেলে-মেয়ে দুটিকেও ধরে রাখতে পারলো না?

নিজের সব দুঃখ সে মদে ডোবাতে চেয়েছিল, সেই সময় শাকাওয়াত হোসেন স্নেহশীল চাচার ভূমিকা নিয়ে তাকে ফেরাতে চেষ্টা করলেন। বন-এ তিনি থেকে গেলেন অতিরিক্ত দশ দিন। আলতাফ সেবারেই তাঁর সঙ্গে ফিরে এলো না বটে, কিন্তু তিনি লেগে রইলেন, দুবার তার কাছে লোক পাঠালেন।

মাস চারেক আগে জার্মানির পাট একেবারে গুটিয়ে চলে এসেছে আলতাফ। মদের নেশা কমিয়েছে অনেকটা এখন সে সুস্থ মানুষ, হোটেলের পরিচালনা ভার নিয়েই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

হোসেন সাহেব লোক-চরিত্র পর্যবেক্ষণ তীক্ষ্ণভাবে। যে-কোনো মানুষের গুপ্ত দোষ-গুণ বুঝে নিতে তাঁর বেশি সময় লাগে না, তাঁর জীবনের উন্নতির মূলে আছে এই ক্ষমতাটি। তিনি লক্ষ করলেন যে আলতাফ বিলাসী প্রকৃতির মানুষ লোকজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে অপব্যয় করতে ভালোবাসে, কিন্তু সে কাজে ফাঁকি দেয় না, কাজের প্রতি নিষ্ঠা আছে, মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই। হোসেন সাহেব তাকে টাকা খরচের ঢালাও অধিকার দিয়েছেন, নিজের জন্য কত খরচ করবে করুক, দু'লাখ পাঁচ লাখ?

আলতাফও তার চাচার বর্তমান মনোবাঞ্ছাটি টের পেয়েছে। চাচা টাকা করেছেন অনেক এখন নাম করতে চান। কিছুদনি ভেবে চিন্তে সে একটা প্রস্তাব দিল। একটা কাগজ বার করা যাক, একটা দৈনিক পত্রিকা নাম করার সেটাই দ্রুততম উপায়। নিজের কাগজে প্রায়ই নিজের নাম ছাপা হবে, ছবি ছাপা হবে, নিজের অনেক মতামত দেশবাসীকে জানানো যাবে।

প্রস্তাবটা লুফে নিলেন হোসেন সাহেব। এইজন্যই লেখাপড়া জানা ছেলেদের দরকার, এই রকম

একটা চিন্তা তো তাঁর মাথাতেই আসতো না। তিনি বড়জোর ভেবেছিলেন, নিজের গ্রামে একটা বড় সড় মসজিদ বানিয়ে দেবেন, কিন্তু তাতে তো মাত্র দু'পাঁচখানা গ্রামের লোক তাঁর নাম জানবে, কিন্তু খবরের কাগজে যে নাম ছড়াবে সারাদেশে।

এখন প্রত্যেকদিন সেই পত্রিকা বিষয়ে আলোচনা চলছে। হোসেন সাহেব আগে আয়-ব্যয়ের হিসেব কষে দেখেছেন। প্রথম ছ'মাস তাঁকে টাকা ঢালতে হবে, সেই টাকা আসবে ব্যাংক থেকে। ব্যাংকে তাঁর গুডউইল যথেষ্ট। পত্রিকার মূল আয় বিজ্ঞাপনে, সেদিকে অসুবিধে হবে না, ব্যবসায়ী মহলে তাঁর দহরম-মহরম আছে, শুধু এখানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও। ভালো ভালো সাংবাদিকদের ভাঙিয়ে আনতে হবে অন্য কাগজ থেকে। মেসিনপত্র আনাবেন জার্মানি থেকে, সে ব্যবস্থা আলতাফই করতে পারবে।

কাগজ শুরু হলে লোকবল দরকার। বছর পাঁচেক বিদেশে থাকায় আলতাফ তার বন্ধু বান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন, পুরোনো রাজনৈতিক সহকর্মীরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। সেইজন্য আলতাফ ধরলো তার ছোট ভাই বাবুলকে। মফঃস্বল ছেড়ে বাবুল এখন ঢাকাতেই অধ্যাপনা করে, তার বন্ধুবান্ধবের একটি গোষ্ঠী আছে। বাবুল প্রথমে আসতে রাজি হয়নি, তার এই বড়লোক চাচার সঙ্গে সে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না, রাখতে চায় না। সে লেখক নয়, সাংবাদিকতায় তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, এই সব বলে সে আলতাফের প্রস্তাব উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু কয়েকজন কবি-লেখক, কয়েকজন প্রাক্তন সাংবাদিক, বইয়ের ব্যবসায়ী। আলতাফ নিজে তাদের আমন্ত্রণ জানাতে তারা কিন্তু উৎসাহ দেখালো প্রায় সবাই। একটা নতুন কাগজ, একটা নিজস্ব কাগজ, এর টান সাংঘাতিক।

এখন প্রতিদিন সন্ধেবেলা হোসেন সাহেবের নতুন হোটেলের সাততলার ঘরে আলোচনা সভা বসে। পল্টন, কামাল, জহির, বসির এই সব বন্ধুদের টানে বাবুলকেও আসতে হয়েছে। সম্পাদক হিসেবে হোসনে সাহেবেরই নাম থাকবে। ইত্তেফাক কাগজের এক প্রবীন সাংবাদিকের সঙ্গে মানিক মিঞার মনোমালিন্য চলছে এই খবর পেয়ে তাঁকে এই কাগজে যোগ দেবার জন্য টোপ দেওয়া হয়েছে। নিত্য নতুন আরও খবর আসে।

সন্ধের এই আলোচনা সভায় হোসন সাহেবই মধ্যমণি। খাবার-দাবার সরবং চা-কফি-ঠাণ্ডা পানি পরিবেশিত হয় ঢালাওভাবে, কিন্তু মদ নেই। হোসেন সাহেব মদ্যপানের ঘোর বিরোধী। নিষ্ঠবান মুসলমান, এখানে বসে আলোচনা করতে করতেও তিনি মাগরেবের আজান শুনে পাশের ঘরে গিয়ে নামাজ পড়ে আসেন। বাবুলের মদ্যপ বন্ধুদের এই ব্যবস্থার একটুও আপত্তি নেই, এখানে আলাপ-আলোচনা করতে করতে খাওয়া দাওয়াটা বেশ ভালোই হয়। এর পর একটু অধিক রাত্রে আলতাফের নিজস্ব চেম্বারে আর একবার বৈঠক হয়, সেখানে আলতাফ উদারভাবে স্কচের বোতল খোলে।

পত্রিকার নীতি নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনা মতামত দিতে দিতে হোসেন সাহেব কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। রীতিমতন পাকাপোক্ত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতন তিনি মাঝে মাঝে এক একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দেন। তিনি বেশি দূর লেখাপড়া শিখতে পারেননি, ইংরেজি কাগজ পড়েন না,তবু এই সব ইংরেজি লেখাপড়া জানা অধ্যাপক লেখকরা যে তাঁর যুক্তির মূল্য দেয়, এতেই তিনি গভীর আনন্দ পান।

চাচার কথাবার্তা শুনে আলতাফ মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। সে আগে জানতো, তার চাচা একজন কট্টর মুসলিম লীগপন্থী, হক -ভাসানী সোহরাওয়ার্দিদের দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার দুর্নীতি ও অপদার্থতার জন্য যে সরকারের পতন হলো এবং আইয়ুব সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা হাতে নিয়ে পাকিস্তান রক্ষা করেছে, এই প্রচারের প্রবল সমর্থক। কিন্তু এখন হোসেন সাহেব সুর পাল্টে ফেলেছেন। তিনি চান তাঁর পত্রিকায় প্রথম থেকেই দাবি তুলতে হবে যে দেশে অবিলম্বে নির্বাচন চাই। গরম গরম লেখা দিয়ে ছাত্রদের ক্ষ্যাপাতে হবে, নইলে কাগজ চলবে না।

সেদিন কথায় কথায় তিনি বললেন, আমি আইয়ুব খাঁর ওপর কবে থেকে চটেছি জানো? আগের সংবিধান বাতিল করে দিয়ে যেদিন তিনি তাঁর পেটোয়া লোকদের দিয়ে নতুন সংবিধান কমিশান বসালেন। সেই কমিশান রায় দিল কী? না পাকিস্তালের নাগরিকেরা গণতন্ত্রের যোগ্য নয়। সর্বসাধারণের ভোটের অধিকার নাই। এইটা কি একটা বিবেচনা মতন রায় হইলো? পাশের দ্যাশ ইন্ডিয়া, সেখানে সকলে ভোট দিতে পারে, আর পাকিস্তানীরা ভোটের অযোগ্য? ইন্ডিয়ানরা যা পারে,

আমরা তা পারি না? ওরা আর আমরা কি আলাদা? এই সেদিনও পর্যন্ত একই দেশ আছিল, একই মানুষ, সব দিক থিকা এক, আর এখন ইন্ডিয়ানরা আমাগো চাইতে বেশি যোগ্য হইলো কিসে?

বসির হাসতে হাসতে বললো, চাচা এখন কিন্তু আপনিই বারবার ইন্ডিয়ার নাম উচ্চারণ করছেন।

বেশি উত্তেজিত হলে হোসেন সাহেব হাঁপিয়ে পড়েন। তিনি একটু দম নিয়ে বললেন, তোমরাই আমারে বুঝাও, কেউ সেধে সেধে নিজের মুখে চুনকালি দ্যায়? আইয়ুব খান হোল ওয়ার্লডরে জানাইলো যে ইন্ডিয়ার লোকেরা ভোট দিয়া ডেমোক্রেসি রাখতে পারে, আর পাকিস্তানী নাগরিকরা ভোটেরমর্ম বোঝে না। তারা বর্বর অশিক্ষিত। এই কথাটা ভাবলেই আমার পিত্তি জ্বইলা যায়।

বসির বললো কেন চাচা আইয়ুব খান তো তাঁর কোটের আস্তিন থেকে এক নতুন চিড়িয়া বার করেছেন। অন্যরকম এক ডেমোক্রেসি, সারা দেশে মাত্র আশী হাজার লোক ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে।

হোসেন সাহেব হুংকার দিয়ে বললেন, ঐটারই আমরা অপোজ করবো। বেসিক ডেমোক্রেসি না কচু পোড়া। ভোট হবে, দ্যাশের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ-মেয়েলোক ভোট দেবে। সোজা কতা আমরা ইন্ডিয়া সমান।

বসির আবার বললো, ইন্ডিয়া এমন কিছু অ্যাচিভ করে নাই যে তার সমান হবার জন্য আমাদের ব্যস্ত হতে হবে। পাকিস্তানকে হতে হবে ওয়ার্লড এর যে কোনো পাওয়ারের সমান। তার জন্য আগে ওয়েস্ট পাকিস্তান আর ইস্ট পাকিস্তানের মধ্যে প্যারিটি আনতে হবে। ফেডারাল স্ট্রাকচারের প্রশ্নে আমরা কী স্ট্যান্ড নেবো, সেটা আগে ঠিক করেন।

জহির বললো, আমি আজ উঠি। বাসায় ফিরতে হবে দিনকাল ভালো না, শুনছি নাকি আবার দাঙ্গা হতে পারে।

কামাল আর পল্টন সচকিত হয়ে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো, আবার দাঙ্গা? কে বললো তোমারে?

জহির বললো, শুনতে পাচ্ছি নানান জায়গা থেকে। বড় বিশ্রী লাগে। যা সব ঘটনা শুনি, তাতে মুখে ভাত রোচে না। মনে হয়, কোন্ যুগে বাস করছি।

পল্টন বললো, এই জানুয়ারি মাসেই তো একটা বীভৎস দাঙ্গা হয়ে গেল।

হোসেন সাহেব বললেন, ঐ সব কথা বাদ দাও। ইন্ডিয়ায় হউক আর পাকিস্তানেই হউক, এই একটা বিষয়ে পরস্পরের তুলনা চলে না। একপক্ষকে তো আগে বন্ধ করতেই হবে, নইলে অন্য পক্ষে বন্ধ হবে না। আমাদের এদিক থেকে যে বেশি লোক ভয়ের চোটে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সেকথা অস্বীকার করতে পারবেন? আমি ইন্ডিয়া একটা কাগজে পড়লাম যে এই বছর সাড়ে চার মাসে সাড়ে তিন লক্ষ উদ্বাস্তু গেছে পাকিস্তান থেকে। শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলেই ডেইলি পাঁচ থেকে সাত হাজার উদ্বাস্তু ঢুকছে। আর ইন্ডিয়া স্বাধীনতার পর মুসলমানের সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ।

হোসেন সাহেব ভুরু তুলে বললেন, তুমি ইন্ডিয়া কাগজ পড়ে বিশ্বাস করেছো? ওরা কক্ষনো সত্য কথা লেখে না। পাকিস্তান সম্পর্কে সব মিথ্যা লেখে। ইন্ডিয়ায় মুসলমানের কী অবস্থা তা তোমরা জানো না। দ্যাখো না, কাশ্মীরের শ্যাখ আবদুল্লারে পণ্ডিত জওহরলাল ক্যামন পুতুলের মতন নাচাইত্যাছে।

জহির বললো, ইন্ডিয়ার কাগজে মিথ্যা লেখে মানলাম। আমাদের যে কাগজ বাইরাবে তাতে সব সত্য কথা লেখা হবে তো? জানুয়ারিতে যে দাঙ্গা হইল, তার আসল কারণ এখানকার কোনো কোনো কাগজে বেরোয়নি। আমি আপনার কাগজে লিখবো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। ঢাকা শহরেই যে বাস্তুহারা হিন্দুদের জন্য পঁচিশটা শিবির হয়েছিল, সে ছবি বেরিয়েছিল কোনো কাগজে?

পল্টন বললো, ঐ দাঙ্গাটা বাধিয়েছিল আদমজী জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার করীম। ও রটিয়ে দিয়েছিল যে কলকাতায় ওর ভাই খুন হয়েছে, সেই শোকে মিল দু'দিন ছুটি।

হোসেন সাহেব বললেন, তোমরা এই সব বাজে গুজবে বিশ্বাস করো?

পল্টন বললো, গুজব হোক আর যাই-ই হোক, গুজবেরই কি কম শক্তি? সেই রটনা শুনেই তো আদমজী জুট মিলের হাজার হাজার অবাঙালী শ্রমিক আল্লাহর নামে জেহাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আমি তখন মাধবদি বাজারে ছিলাম। গোলকানদয়াল গ্রামে হিন্দুদের পৌষ সংক্রান্তি মেলা চলছিল, শ্রমিকরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথারি খুন করতে লাগলো, বাচ্চা মেয়েছেলে কারুরে বাদ দেয় নাই। একে দাঙ্গা বলে না, হিটলারের নাৎসীবাহিনীর সঙ্গে এর তুলনা দেওয়া চলে।

জহির বললো সেই সময়েই তো ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লক্ষীনারায়ণ কটন মিল আক্রমন করা হলো। হিন্দুদের একেবারে জানে মালে শেষ করে দিয়ে, এ দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলে কি আমাদের খুব লাভ হবে?

হোসেন সাহেব বললেন তোমাদের দেখি হিন্দুদের জন্য খুব দরদ? এটা তো আগে জানতাম না?

পল্টন বললো, হোসেন চাচা এখানকার হিন্দদের ঘৃণা করে আপনি যদি বিহার উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের প্রদি দরদ দেখান তা হলে ওদিককার মুসলমানদেরই বেশি ক্ষতি করবেন।

হোসেন সাহেব বললেন কইলকাতাতেও বড় রকমের দাঙ্গা হয়েছে। ইন্ডিয়ায় অনেক জায়গায় রায়ট হয়। গান্ধীরে যারা খতম কাছে, সেই হিন্দুগুলো এখন আরও স্ট্রং ব্রাহ্মণের বাইচ্চা জওহরলালের সাইধ্য নাই তাগো কন্ট্রোল করে। আর মুসলমান মারলে আমরা হিন্দু মারুম না? জাতভাইয়ের গায়ে যেখানেই হাত পড় ক কোনো সাচ্চা মুসলামান তা সহ্য করবে না। ভাবলেই আমার রক্ত গরম হইয়া ওঠে।

কামাল বললো, ওদেশে যারা মরে তারা যেমন নিরীহ মুসলমান তেমন এদেশে যারা মরে তারাও নিরীহ হিন্দু। দাঙ্গার সময় অসহায় নিরীহ আর গরিবরাই মরে। চোখের সামনে নিরীহ মানুষকে মরতে দেখেও যে লোক আনন্দে লাফায়, সে কোনো ধর্মেই সাচ্চা মানুষ হইতে পারে না।

জহির বললো জগন্নাথকলেজে প্রায় দশ হাজার হিন্দুকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, আমি নিজে দেখতে গিয়েছিলাম অধ্যক্ষ সৈদুর রহমান যেভাবে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি না থাকলে আরও অনেক মারা পড়তো তিনি আপনার চেয়ে কম খাঁটি মুসলমান নন।

পল্টন বললো, আমার যা লজ্জা লেগেছিল জগন্নাথ কলেজের সেই ক্যাম্পে গিয়ে শুনি সেখানে রয়েছেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ; এককালের কতবড় নাম করা বিপ্লবী লোকে তাঁকে মহরাজ বলে, তিনিও শেষে..

হোসেন সাহেব হাত তুলে বললেন, বাদ দাও ঐ সব কথা বাদ দাও।

এতক্ষণ বাদে আলতাফ বললো, আমি আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমানকে পছন্দ করতামনা, সে গুণ্ডা লেলিয়ে একবর আমার মাথা ফাটিয়েছিল এবারের দাঙ্গা কিন্তু সেই লোকই প্র্যাকটিক্যালি থামিয়ে দিল। পুলিশ গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিচ্ছিল, সরকার থেকে হিন্দুদের কোনো প্রোটেকশানই দেয়নি তখন শেখ মুজিবর রহমান আর বোধ হয় শাহ আজিজুর রহমান মিলে একদিন চীফ সেক্রেটারি আলি আসগরকে শাসিয়ে এলো, গুণ্ডামি বন্ধ না করলে তাঁরা মীরপুরের বিহারী কলোনি উড়িয়ে দেবেন। তারপরেই ততো সরকারের টনক নড়লো।

জহির বা পল্টন কেউই আওয়ামীলীগের সমর্থক নয়। তবে এখন তারা আলতাফের কথার প্রতিবাদ করলো না।

হোসেন সাহেব বললেন, তাহলে আজ এ পর্যন্তই রইলো। কাল সন্ধ্যাবেলা আবার সকলে চলে এসো। কাল আমরা কাগজ বার করার টারগেট ডেডট ঠিক করে ফ্যালবো।

সবাই উঠে দাঁড়ালো। বাবুল একটাও কথা বলেনি প্রায় প্রতিদিনই সে নীরব শ্রোতা। জহিরের সঙ্গে সে একসঙ্গে বাড়ি ফেরে। তার মতন জহিরও এর পরে আলতাফের মদের আসরে যোগ দেয় না।

বাবুলের কাঁধে হাত রেখে জহির ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, তা হলে ঐ কথাই ঠিক রইলো, হোসন চাচা। আমাদের কাগজে আমরা সব সত্যি কথা লিখবো। সত্যে মতন বড় অস্ত্র আর নাই।

হোসেন সহেব বললেন, সে ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা ইন্ডিয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে পারবা না। আমি ইন্ডিয়ার খবর ছাপাবো না, নেহাৎ বড় কোনো খারাপ খবর না থাকলে...

জহির বললো, চাচা আমাদের চেয়ে আপনিই তো অনেক বেশিবার ইন্ডিয়ার নাম উচ্চারণ করেন। আপনার ইন্ডিয়া বাতিক হয়ে গেছে।

সকলের ঠোঁটে একটা মৃদু হাসির ঢেউ খেলে গেল।

॥ ১৮ ॥

কফি হাউসে ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে অতীন কৌশিককে জিজ্ঞেস করলো এই উলুবেড়িয়া কী করে যেতে হয় জানিস?

কৌশিক অবাক হয়ে বললে উলুবেড়িয়া মানে উলুবেড়ে? কেন জাবনো না। ওর কাছেই তো আমার মামাবাড়ি। আমার মামাবাড়ির গ্রামটার নাম ফুলেশ্বর। তোকে তো একবার নিয়ে যাবো বলেছিলুম।

অতীন একটুক্ষণ কী যে চিন্তা করলো। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলো একদিনে ফিরে আসা যায়? ট্রেন যেতে হয় না?

কৌশিক হেসে ফেলে বললো, তুই আজও বাঙালই রয়ে গেলি অতীন। উলুবেড়ে কত দূর তুই জানিস না? ট্রেনে যাওয়া যায়, বাসে যাওয়া যা। কতক্ষণ লাগবে বড়জোর ঘণ্টা ডেড়েক।

–চল ঘুরে আসি তা হলে।

–হঠাৎ?

–না গেলে বলবো না।

–ঠিক আছে, কাল সকালে যাবো। কাল তো ছুটি আছে।

–গেলে আজই যেতে হবে।

কৌশিক চুপ করে গেল। এরপর সে অনেকগুলো যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করলেও অতীনের কাছে হেরে যাবে। অতীনের কথায় বিশেষ যুক্তি থাকে না, তার থাকে জেদ। হঠাৎ এক একটা ব্যাপারে তার ঝোঁক চাপে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। কৌশিক জানে, সে যেতে রাজি না হলেও অতীন একাই উলুবেড়ের দিকে রওনা হবে।

মে মাসের অসহ্য গরম। রাস্তায় পিচ গলে যাচ্ছে। ক'দিন ধরেই আকাশটা বারুদ রঙের, সব বাতাস চলে গেছে অন্য কোনো দেশে। এই রকম দুপুরে কফি হাউসে পাখার তলায় বসে এক দঙ্গল বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময়টা অগোচরে কেটে যায়, তার বদলে এই জ্বালা পোড়া রোদ্দুরে ট্যাং ট্যাং করে অতদূর যাবার কোনো মানে হয়? কৌশিকে ভুরু কুঁচকে গেল।

অতীন বললো, তুই এখানে ইসমাইলের দোকানটার কাছে দাঁড়া। তুই ওপরে গেলে আটকে যাবি। আমি চট করে ঘুরে আসছি।

–তা হলে দ্যাখ রবিকে পাস কিনা। রবি গেলে জমবে।

–আমি রবিকেই খুঁজতে যাচ্ছি।

অতীন লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে। আজ বিনা নোটিসে ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে বলে ইউনিভার্সিটি ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেমেয়েতে একেবারে গমগম করছে কফি হাউস। অতীনকে দেখে বিভিন্ন টেবিল থেকে হাত উঠলো কিন্তু সে কোনো টেবিলের কাছে গেল না, দ্রুত চোখ বুলিয়ে খুঁজতে লাগলো রবিকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সে অলি আর বর্ষার মুখোমুখি পড়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য সে ভাবলো, অলিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়? পরের মুহূর্তেই সে ভাবনাটা উড়িয়ে দিল। অলিকে নিতে চাইলে বর্ষাও যেতে চাইবে, মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ঠিক সময়ে ফিরে আসার একটা ঝামেলা আছে।

অলি জিজ্ঞেস করলো, এই বাবলুদা তুমি চলে যাচ্ছো?

অতীন তার খাতাটা অলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো এটা রাখ তো তোর কাছে। আজকাল ঘনঘন কফি হাউসে দেখছি তোকে. খুব আড্ডা দিতে শিখেছিস, তাই না?

বর্ষা বললো, কেন আড্ডা দেবো না? তোমরা দিতে পারো, তোমরা বুঝি কফি হাউসটা লিজ নিয়েছো?

একটা কোনো সুযোগ পেলেই বর্ষা তোমরা আমরা দিয়ে কথা শুরু করে দেয়। সে পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে চায়।

অতীন তাকে বললো ঠিক আছে আজ কফি হাউসটা তোমাদের দিয়ে দিলাম।

তারপর সে অলিকে বললো এই তোর কাছে ক'টাকা আছে? আমাকে পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারবি?

অলি সঙ্গে সঙ্গে তা হাত ব্যাগ খুললো। তার কাছে সাত টাকা রয়েছে অতীন উঁকি মেরে দেখে বললো ঐ তো যথেষ্ট আছে বাঃ ফাইন।

নিজেই সে তুলে নিল পাঁচ টাকার নোটটা।

অলি জিজ্ঞেস করলো তুমি কোথায় যাচ্ছো?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অতীন বললো খাতাটা তোদের বাড়ি থেকে পরে নিয়ে নেবোন। তারপর সে দৌড়ে নেমে গেল নিচে।

কৌশিকের পাশে অনুপম আর সিদ্ধার্থ এসে জুটেছে। অনুপম জিজ্ঞেস করলো এই তোরা উলুবেড়ে যাচ্ছিস কেনরে?

অতীন ভুরু তুলে কৌশিককে নিঃশব্দ বকুনি দিল। কৌশিকটার পেটে কোনো কথা থাকে না। এখন এরা দু'জন সঙ্গে সেঁটে থাকতে চাইবে। সে জায়গায় সবার সঙ্গে যাওয়া যায় না।

সে গলা চড়িয়ে বললো, ওখানে যাচ্ছি কৌশিকের মামাবাড়িতে দুধ ভাত খেতে। অন্য কারুর ভাগ বসানো চলবে না।

কৌশিকের হাত ধরে সে টেনে নিয়ে গেল সামনের দিকে। তারপর হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠে হাওড়ায়।

কৌশিক লোকাল ট্রেনের টিকট কাটলো কুড়ি মিনিট বাদেই ট্রেন। এর মধ্যেই ঘামে ভিজে গেছে ওদের জামা। ভাঁজের চায়ে চুমুক দিতে দিতে অতীন বললো আমি এদিকে বিশেষ কোথাও যাইনি, জানিস? যাওয়ার মধ্যে তো কয়েকবার গেছি দেওঘর, আমার ঠাকুমা থাকেন স্কুলে পড়ার সময় একবার শুধু মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম বাস। আর একবার বোধহ চন্দননগরে কোন বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে সেও অনেকদিন আগে...। উলুবেড়িয়া বসিরহাট নৈহাটি লক্ষীকান্তপুর কন্টাই এইসব জায়গুলোর নাম কাগজে পড়ি, কিন্তু এগুলো কী রকম জায়গা তার কোনো আইডিয়াই নেই। দেশটাকে এখনো ভালো করে চিনি না।

কৌশিক বললো, তোমরা বাঙালরা তো এখনও দেশ বলতে ইষ্ট বেঙ্গল ভাবিস। যার নাম এখন ইষ্ট পাকিস্তান।

অতীন চোখ পাকিয়ে বললো মারবো শালা পেছনে এক লাথি। আমরা আবর কিসের বাঙাল রে? ফটি সেভেনের আগে থেকে এদিকে আছি।

কৌশিক তবু বললো, তোরা রিফিউজি তা তো বলছি না, কিন্তু বাঙাল ঠিকই। সেটা গা থেকে ঘষে তুলে ফেলতে পারবি না। বাঙালদের অদ্ভুত সেন্টিমেন্ট। সেদিন একটা বিয়ের চিঠি পেলাম, আমার বাবার এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে ভদ্রলোকের মোটর পার্টসের ব্যবসা, পূর্ন দাস রোড বিরাট বাড়ি হাঁকিয়েছেন, তবু বিয়ের চিঠিতে লিখেছেন, 'পূর্ববঙ্গের বরিশাল জিলার কোটালিপাড়া গ্রামের অধিবাসী অধুনা কলিকাতার পূর্ন দাস রোড নিবাসী..যেন পূর্ণ দাস রোডের বাড়িটা টেম্পোরারি ওঁর আসল বাড়ি ঐ বরিশালে। সেখানে আর বাপের জন্মে কোনোদিন যেতে পারবেন কিনা ঠিক নেই।

–ওরকম কিছু কিছু লোকের বোকা সেন্টিমেন্ট এখনো রয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর কত বছর কেটে গেল খেয়াল নেই, কত বছর...এদিকে তিন আর চোদ্দ মোট সতেরো বছর এক যুগের বেশি...

–তোর বাবাও দেখবি তোর বিয়ের সময় ঐ রকম চিঠি ছাপাবেন...

–আমার বাবা খুব নস্টালজিয়ায় ভোগেন, হ্যাঁ আমার বাবা সারা জীবন বাঙালই থেকে যাবেন, কিন্তু আমার ঐ সব হ্যাং আপ নেই, আমার মায়েরও তেমন নেই। পার্টিশান না হলেও আমি কি ঐ গ্রাম ফ্রামে গিয়ে কোনোদিন থাকতুম নাকি? ধুস্।

–আচ্ছা অতীন এবার বল্ তো তুই হঠাৎ আজ উলুবেড়ে যাবার জন্য ক্ষেপে উঠলি কেন? হোয়াট ইজ সো স্পেশাল অ্যাবাউট উলুবেড়ে?

–তুই আজ সাকলে স্টেটসম্যান পরিসনি?

–কেন পড়বো না। কী আছে উলুবেড়ে সম্পর্কে কিছু আছে?

–কাগজ খুলে শুধু খেলার খবর ছাড়া আর কিছু পড়িস না, তাই না?

ট্রেন ছেড়ে দেবে ওদের উঠে পড়তে হলো। এই ঠা-ঠা দুপুরেও ট্রেনে ভিড় কম নেই কৌশিক অবশ্য আগেই জানলার কাছে রুমাল পেতে রেখেছে। একজন লোক সেই রুমালটা এক পাশে ঠেলে সেখানে পেছন ঠেকিয়েছিল, অতীন চোখ গরম করে বললো উঠুন আমরা ওখানে বসবো।

লোকটি বললো ওসব রুমাল পেতে জায়গা রাখা শিয়ালদা লাইনে চলে হাওড়ায় চলে না।

কৌশিক বললেন দাদা এ লাইনে অনেকদিন যাতায়াত করছি। আমাদের হাওড়া লাইন শেখাবেন না।

ঝগড়া আরও গড়াতে পারতো কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা একজন বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি বললো বড্ড গরম

পড়েছে এর মধ্যে আর মাথা গরম করবেন না। আপনারা রুমাল পেতে দুটো জায়গা রেখেছিলেন, একটা সিট ছেড়ে দিন একটাতে একজন বসুন।

অন্যরাও তাতে সায় দিল আতীন নিজে দাঁড়িয়ে কৌশিককে জোর করে বসালো সেই জায়গায়। আশ্চর্য যে লোকটি জায়গার জন্য ঝগড়া শুরু করেছিল সে নেমেগেল পরের বসবার জায়গা নিয়ে লোকে ঝগড়া করে সেদেশে কখনো ইউনিটি আসতে পার। দেখবেন শিগ্‌গিরই এমন দিন আসছে যখন হিন্দু মুসলমানের রায়টের দরকার হবে না, আমরা এমনি এমনিই মারামারি কাটাকাটি শুরু করে দেবো।

দরজার কাছে দু'তিনজন মুসলমান ব্যাপারি দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে থেকে একজন বললো, আবার ঐ সব অলুক্ষণে কথা তোলেন কেন?

কৌশিকের পাশে বসা একজন শীর্ণকায় প্রৌঢ় বললো আমাদের টাইমে দুপুরবেলা এই লাইনে এক এক কামরায় পাঁচ সাতটা লোক থাকতো কিনা সন্দেহ। বাঙালরা এসে দেশটা ভরিয়ে দিল, ট্রেনে জায়গা পাবেন কোথ্ থেকে?

আর একজন বললো আগে শেয়ালা লাইনেই বাঙালদের রাজত্ব ছিল, এখন আস্তে আস্তে এদিকটাতেও ভরে যাচ্ছে।

কৌশিক আড় চোখে তাকালো অতীনের দিকে। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছে। শীর্ণ প্রৌঢ়টি বললো, মেয়ালদা লাইন? আরে রাম রাম। আমি তো মরে গেলেও ওদিকের ট্রেনে কক্ষনো চলবো না। ওদেরকথা শুনলে মনে হয় আমাদের বাপ-পিতেমোর' বাংলা ভুলে যাবো।..

উলুবেড়িয়া স্টেশনে নেমে কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, যখন বাঙালদের নিয়ে ঐ সব কথা বলছিল তখন তোর কেমন লাগছিল সত্যি করে বল তো।

অতীন হেসে বললো, একটু একটু গায়ে জ্বালা ধরছিল সেটা অ্যাডমিট করছি।

–ঐ যে বললুম তোদের বাঙালত্ব কোনোদিন গা থেকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবি না।

–এক হিসেবে আমার অবস্থা আমার বাবাদের জেনারেশনের থেকেও খারাপ। আমার ইস্ট বেঙ্গলে কথা ভাল মনে নেই, কোনো ফিলিংও নেই। অথচ এদিককার লোক যখন রিফিউজিদের নামে দোষ দেয়, তখন তাদের সাইডও নিতে পারি না, আবার চুপ করে থাকলেও মনে হয় কাপুরুষের মতন নিজের পরিচয় গোপন করছি।

–শোন অতীন, এদিককার সব লোক রিফিউজিদের নামে দোষ দেয় না, অনেকে সিমপ্যাথিও দেখিয়েছে।

–এই সব ট্রেনে চাপলে দেশ-কাল সম্পর্কে সাধারণ লোকের অ্যাটিচিউড টের পাওয়া যায়। মানিকদাকে বলবো, আমাদের স্টাডি সার্কেল শুধু একটা ঘরের মধ্যে লিমিটেড না রেখে মাঝেসাঝে এই সব ছোটখাটো জায়গায় ঘুরে ঘুরে যদি হয়, তা হলে অনেক কিছু শেখা যাবে।

–মানিকদা নিজে প্রায়ই গ্রামে যায় কৃষক ফ্রন্টের কাজ করতে। যাকগে ওসব কথা উলুবেড়ে তো এলুম এখন যাওয়া হবেটা কোথায়?

–আমি কী ভেবেছিলাম জানি, কৌশিক এখানে এস দেখবো ঝাঁকে ঝাঁকে লোক গঙ্গার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। গঙ্গা কোন দিকে? আজ সকালবেলার কাগজে পড়লাম, একটা বিলিত জাহাজ এখানকার গঙ্গার কাছে কিসে যেন আটকে গিয়ে জখম হয়ে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে।

–হ্যাঁ সে জাহাজের খবরটা তো আমিও দেখেছি। এখানকার গঙ্গায় বুঝি? সেটা লক্ষ করিনি।

–তুই পুরো খবরটা পড়িসনি তার মানে।

–জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে বলে তুই এখানে ছুটে এলি? তুই আমি খুচরো আদার ব্যাপারি, আমাদের সঙ্গে জাহাজের কী সম্পর্ক?

–একটা জাহাজ আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে, সেটা তোর দেখতে যেতে ইচ্ছে করে না? এরকম সুযোগ ক'বার পাওয়া যায় জীবনে?

–তুই জাহাজডুবি দেখতে এসেছিস?

–এটা একটা দেখার জিনিস নয়?

–চল, বাইরে গিয়ে রিকশা ধরি, ওরা হয়তো জানবে ব্যাপারটা কোথায় হয়েছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওরা একটা রিকশায় উঠে বসলো। দলে দলে লোক গঙ্গার দিকে ছুটে

যাচ্ছে না, বটে তবে রিকশাওয়ালা ঘটনাটা জানে। জাহাজটা ডুবছে কয়েকদিন ধরে। প্রথমে ওটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা হয়েছিল, এখন আশা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

স্টেশন থেকে ঘটনাস্থলটি বেশ দূরে। গঙ্গার ধারে পৌঁছে দেখা গেল, কিছু লোক জমায়েত হয়ে আছে সেখানে। গঙ্গা নদী এই জায়গায় একটা বাঁক নিয়েছে, যেন বাঁকের মুখে কাৎ হয়ে আছে জাহাজটা। দু'খানি স্টিম লঞ্চ ও বেশি কয়েকটি নৌকো ঘিরে আছে তাকে।

এদিকের আকাশে মেঘ জমছে বেশ। এর মধ্যেই রোদ মুছে গিয়ে একটু একটু অন্ধকার অন্ধকার ভাব হয়েছে হেলে পড়া জাহাজটিকে যেন কোনো ট্রাজেডির নায়কের মতন দেখায়। দুটি মাস্তুল যেন আকাশের দিকে হাত তোলা।

ভিড় ঠেলে জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো দু'জনে। অতীন জাহাজটার দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে রইলো। কৌশিক বললো, আমার মামাবাড়ি তো গঙ্গার ধারেই প্রায়, ছোটবেলা কত জাহাজ দেখতুম। সবচেয়ে ভালো লাগতো রাত্তিরবেলা, এক একটা বিরাট বিরাট বিলিতি জাহাজ কত আলো জ্বেলে রাখতো এখন গঙ্গায় চড়া পড়ে যাচ্ছে, কলকাতা বন্দরটার বারোটা বেজে গেল। এই জাহাজটা তো এমন কিছু বড় নয়, এই সাইজের জাহাজই যদি আটকে যায়...

অতীন বললে, চল, একটা নৌকো ভাড়া নিয়ে আরও কাছ থেকে দেখে আসি।

–আবার নৌকো -ফৌকের ঝামেলা করে কী হবে?

–আমি কখনো খুব কাছ থেকে কোনো জাহাজ দেখিনি। ছেলেবেলায় ভাবতাম জাহাজে কোনো একটা চাকরি নেবো, তারপর সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবো। এই জাহাজটাও, তুই ভেবে দ্যাখ, কত দেশ ঘুরেছে, সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত আমাদের এই গঙ্গায় এসে ডুবে গেল ভালো বাংলায় কী যেন বলে সলিল সমাধি হয়ে গেল।

–এটা তো মনে হচ্ছে দিশি জাহাজ।

–কাগজে লিখেছে বিলিতি।

–হ্যাঁ জাহাজটার মালিক টার্নার মরিসন কম্পানি, জাহাজটার নাম এস এস মার্তণ্ড বোধ হয় ব্রিটিশ আমল থেকে চলছে। বুড়ো না হলে কোনো জাহাজ সহজে ডোবে না।

–টাইটানিক বুঝি বুড়ো ছিল?

অতীন নিজেই আর একটু নিচে নেমে গিয়ে দরাদরি করলো একজন নৌকো ওয়ালার সঙ্গে। তারপর কৌশিক ডেকে বললো, চলে আয়া, ও রাজি আছে।

কৌশিক কাছে এসে বললো, আকাশের অবস্থা ভালো নয়। অতীন, তুই সাঁতার জানিস?

অতীন হেসে দু'দিকের মাথা দোলালো।

কৌশিক উদ্বিগ্ন ভাবে বললো, তা হলে নৌকোয় যাওয়ার দরকার নেই। বছরের এই সময়টায় যখন তখন ঝড় ওঠে। তুমি মাঝিকে জিজ্ঞেস কর।

অতীন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, আমার কিছু হবে না। আমি অমর। আমি সাঁতার জানি না, আমি একবার জলে ডুবে যাচ্ছিলাম, আমার দাদা সাঁতার জানতো, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আমার দাদাই মরে গেল। অথচ আমার কিছু হলো না। এইরকম ছেলে কি আর কখনো জলে ডুবে মরতে পারে?

–তুই কি ভয় পেয়ে তোর দাদাকে জড়িয়ে ধরেছিলি? অনেক সময় হয়, যে বাঁচাতে যায়...

–সে সব আমার মনে নেই। তবে অনেকেই মনে করে, আমার বদলে আমার দাদারই বেঁচে থাকা উচিত ছিল। আমার মা-বাবাও বোধ হয় সেই রকমই মনে করে। অথচ বেঁচে রইলাম তো আমিই। শালা, পৃথিবীটা বিচিত্র জায়গা, চল তো।

কৌশিকের হাত ধরে টেনে সে জোর করে নৌকোয় তুললো। তারপর আকাশের দিকে বাঁচাবার চেষ্টা করিস না। তাহলে কিন্তু তুই-ই মরবি?

কৌশিক বললো, অতীন,আমি আগে কখনো তোর মুখে এই ধরনের কথা শুনিনি। তোর মধ্যে মনে হচ্ছে একটা ডেথ উইশ আছে?

-তোর মাথা খারাপ। আমি অন্তত একশো বছর বাঁচবো। অনেককে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তারপর নিজে যাবো।

–তোর দাদা খুব ট্যালেন্টেড ছিল তাই না?

-বাদ দে, বাদ দে। ওসব কথারাখতো দ্যাখ, জাহাজটাকে এখন কি রকম একটা ভাঙা দুর্গের মতন দেখাচ্ছে।

অতীনকে এরকম রোমান্টিক হতে কখনো দেখেনি কৌশিক। সে সব সময় চাঁছা ছোলা ভাষায় কথা বলে। হাওয়ায় চুল এলোমেলো হয়ে গেছে অতীনের চোখ দুটি যেন খুবই ব্যগ্র একটা ডুবন্ত জাহাজ দেখার জন্য তার এই ব্যাকুলতা যেন বিশ্বাসসহ করা যায় না।

কৌশিক হঠাৎ আবৃত্তি শুরু করলো :

I'll warrant him for drowing, though the ship were no stronger than a nutshell, and as leaky as an unstanched wench.

Lay her a hold, a hold! Set her two courses: of to sea again; lay her off.

তারপর থেমে গিয়ে বললেন, এটা কোথায় আছে বল তো?

অতীন উদাসীন ভাবে বললো, কী জানি। তুই তো জানিস, আমি কবিতা টবিতা পড়ি না।

কৌশিক বললে, হ্যাঁ লুকিয়ে লুকিয়ে পড়িস। একদিন হ্যামলেট থেকে মুখস্ত বলেছিলি। এটা শেকসৃপীয়ারের দা টেমপেস্ট নাটকের প্রায় শুরুতেই....

সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অতীন জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা কৌশিক আমরা আমাদের জন্মটা পেয়েছি মা-বাবার কাছ থেকে, সেইজন্য সারাটা জীবনই কি তাদের কাছে ঋণী থাকতে হবে?

কৌশিক কয়েক মুহূর্ত বন্ধু মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, এর উত্তর ইয়েস অ্যানড নো।

তার মানে?

-বায়োলজিক্যাল ব্যাপারটা সহজে এক্সপ্লেইন করা যায়। বায়োলজিক্যাল কারণে ঋণী থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু স্নেহ-মমতা ভালোবাসার তো এত সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। শুধু জন্মের টানে নয়, বাবা-মায়ের সঙ্গে তার পরে কতখানি স্নেহ-মমতা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার ওপর সব কিছু ডিপেন্ড করে। কত ছেলে মেয়ে তো বাবা-মাকে ভালো করে চেনেই না।

অতীন অস্ফুট ভাবে বললো, স্নেহ-মমতা ভালোবাসার বন্ধন, নাইলনের দড়ির চেয়েও অনেক শক্ত। স্টাডি সার্কলে মানিকদার কথা শুনতে শুনতে মনে হয়, কবে সব বন্ধন অগ্রাহ্য করে বেরুবো।

এখন ভাটার টান চলছে তাই জাহাজটার কাছাকাছি যেতে ওদের খানিকটা সময় লাগলো। ছোট নৌকো, দু'জনেই দুই ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ডুবন্ত এস এস মার্তণ্ড থেকে নামানো হচ্ছে মালপত্র, সন্নিহিত স্টিমবোট ও নৌকোগুলি সেই কাজে নিযুক্ত। বড় বড় সব খয়েরি রঙের পেটি।

একটি স্টিম বোট থেকে একজন পুলিশ অফিসার ওদের উদ্দেশ্যে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললো, এই এদিকে আসবে না। যাও, হটে যাও।

অতীন মাঝিকে তুমি ওর কথা শুনো না, আর একটু কাছে চলো তো ভাই।

মাঝি বললো, ঐ জাহাজের ধারে যাওয়া নিষেধ আছে। লোকে যদি জিনিস চুরি করে সেই ভয় আছে তো।

অতীন বললো ঐ পুলিষ ব্যাটারাই অনেক কিছু চুরি করবেউমি চলে এসো আর একটু কাছে চলো।

কৌশিক অবাক হয়ে অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন কী বলছিস পাগলের মতন। পুলিশ যদি গুলি চালায়? মাঝিভাই তুমি আর যেও না।

অতীন বললো, গুলি চালালেই হলো নাকি। অ্যাই, আরও কাছে না গেলে আমি জলে ঝাঁপ দেবো বলে দিচ্ছি।

পুলিশ অফিসারটি হুংকার দিতে শুরু করছে। অতীনদের নৌকো অন্য একটি নৌকো গায়ে লাগতেই অতীন লাফিয়ে চলে গেল সেটাতে। তারপর সামনে দৌড়ে গিয়ে জাহাজটির রেলিং ঘেঁষে দাড়ালো। একজন সাদা পোশাক পরা ইংরেজ অফিসার পুলিশের হম্বিতম্বি শুনে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে অতীনদের লক্ষ করছিল। এবারে সে সহাস্যে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার যুবক এই ডুবন্ত জাহাজে তোমার কোনো নিকট আত্মীয় রয়ে গেছে নাকি?তোমার বাক্দত্তা?

অতীন বললো, না, আমরা কলকাতা থেকে এসেছি এই জাহাজটা দেখতে। একবার ওপরে আসতে পারি?

অফিসারটি ভুরু তুলে বললো, তোমরা কলকাতা থেকে এই জাহাজটি দেখবার জন্যই এসেছো শুধু?

-হ্যাঁ।

-তবে তো অবশ্যই ওপরে আসতে পারো। এস এস মার্তণ্ড ধন্য মৃত্যুকালেও সে তোমাদের মতন দু'একজন উপযাজক ভক্ত পেয়েছে।

অতীন আর কৌশিককে ওপরে তোলা হলো। অফিসারটি তাদের ওপরের ডেকের কয়েকটি ফাঁকা ক্যাবিন ঘুরিয়ে দেখালেন। জাহাজটি ঝুঁকে আছে পোর্ট সাইডের দিকে ভেতরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উঁকি মারলে ইঞ্জিন ঘরে জল দেখা যায়।

অফিসারটি ওদের দু'প্যাকেট সিগারেট উপাহার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মা খাও?

অতীন আর কৌশিক একই সঙ্গে বললো, না।

অফিসারটি বললেন তা হলে আর তোমাদের সঙ্গে ফেয়ারওয়েল টোস্ট করা গেল না। আমি এর আগে সাতবার কলকাতা এসেছি আর কখনো আসবো না। গুড বাই।

ফেরার পথে ট্রেনে উঠে অতীন বললো, আমি জাহাজটাকে এখন যেন আরও ভালো করে দেখতে পাচ্ছি।

কৌশিক বললো, যাই-ই বল, ওপর উঠে আমার বেশ ভয় ভয় করছিল। যদি ভুস করে ডুবে যেত।

-একটা কী রকম ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ হলো।

-লোকটা বেশ ভদ্র ছিল ঠিই কিন্তু আমি ইংরেজদের পছন্দ করি না।

-ও ইংরেজ নয় ও একজন নাবি। ও যখন বললো, আর কোনোদিন কলকাতায় আসবো না, তখন আমার মনে হলো, ঐ লোকটা যেন এই জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে জলের তলায় তলিয়ে যাবে।

-যাঃ তা কখনো হয় নাকি? ও মালপত্র খালাস করাবার জন্য রয়ে গেছে।

-তা জানি। তবু ঐ রকম একটা দৃশ্য ভাবতে ভালো লাগে না। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, জাহাজটা একটু একটু করে ডুবছে, আর ঐ সাদা পোশাক পরা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে রেলিং ধরে...

কৌশিক বললো আমি কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না, তোর এই ডুবন্ত জাহাজ দেখতে আসার ব্যাপারটা।

অতীন ভুরু কুঁচকে বললো কেন, তোর ভালো লাগে না? জাহাজটার ওপরে যে ওঠা যাবে এতটা আশাই করিনি আমি।

কৌশিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ভালো লাগবে না কেন? দৃশ্যটার মধ্যে একটা ট্র্যাজিক মহিমা আছে, আকাশে সেই সময় সূর্যাস্তের রঙের সঙ্গে মিলেছিল কালো মেঘ। তবে কি জানিস অতনি, আগে এই সব দৃশ্য দেখে যত আনন্দ পেতাম, এখন আর পাই না। সুন্দর কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেই হঠাৎ কে যেন আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা।

অতীন জিজ্ঞেস করলো, এটা কী? কবিতা? তোরকানে কানে কে এই কবিতা বলে?

কোনো উত্তর না দিয়ে কৌশিক এবার জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলো বাইরে। হঠাৎ কৌশিকের মুখখানা কেন বিষণ্ন হয়ে গেল, তা বুঝতে পারলো না অতীন।

এত কাণ্ডের পরেও ওরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেল পৌনে ন'টার মধ্যে। কৌশিকের মামাবাড়িতেও বুড়ি ছুঁয়ে আসা হয়েছে। সত্যিকারের বুড়ি ছোওয়ার কারণ ওর থুরথুরে দিদিমা ছাড়া বাড়িতে আর কেউছিল না।

দু'জনে দু বাসে চাপলো। অতীন নেমে পড়লো ভবানীপুরে অলিদের বাড়ির সামনে। তার খাতাটা নিতে হবে। সায়েন্সকলেজে যাবার সময় খাতা নিয়ে বেরিয়েছিল, বাড়ি ফেরার সময় হাতে খাতা থাকবে না, এটা ভালো দেখায় না।

অলিদের অবারিতদ্বার বাড়িতে ঢুকে পড়ে অতীন একবার দোতলায় উঁকি মারলো, তারপর তিন তলায় উঠে এলো। অলির ঘরে তার পড়ার টেবিলের সামনে একজন মধ্য বয়স্ক পুরুষ বসে আছেন। ইনি ইংরিজির অধ্যাপক, অলিকে পড়াতে আসেন সপ্তাহে দু'দিন। এই লোকটিকে অতীন দু'চক্ষে দেখতে পারে না। সে ঠিক করে রেখেছে, কোনো একটা সুযোগ পেলেই সে ঐ অধ্যাপকটিকে

অলিদের বাড়ি থেকে তাড়াবে। এই উদ্দেশ্যে সে ইতিমধ্যে অধ্যাপকটির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছে।

অধ্যাপকটি মন দিয়ে কিছু লিখছেন, অতীনের পায়ের শব্দ পেয়েই অলি চোখ তুলে তাকালো। অতীন দু'হাত তুলে ইসারায় বুঝিয়ে দিল খাতাটার কথা।

একটু আসছি বলে উঠে এলো চেয়ার থেকে। তার চুলের বেনীটা বুকের ওপর ফেলা।

অলি দরজা দিয়ে বেরুতেই অতীন ক্ষিপ্র হাতে তাকে একপাশে টেনে নিয়ে সবলে বুকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটটা কামড়ে চুমু খেল। অলি ভয়ের চোটে কোনো শব্দ করতে পারলো না। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাও করলো না। তার মায়ের ঘরের দরজা খোলা, যে কোনো মুহূর্তে মা বেরিয়ে আসতে পারে।

একটু পরে অতীন অলিকে ছেড়ে দিয়ে বললো চলি। তোর টাকাটা আমি পরে শোধ করে দেবো।

অলি অতীনের একটা হাত চেপে ধরলো। তার চোখ ফেটে জল আসছে। সে কোনো কথা বলতে পারছে না। বাবলুদা এলেই এরকম একটা কাণ্ড করবে, আবার এজন্য তাকে বকুনি দিলে আসা বন্ধ করে দেবে। মাসের পর মাস এ বাড়িতে আসবে না।

অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বাবলুকে টেনে নিয়ে এলো সিঁড়ির কাছে। তারপর ধরা গলা বললো, তোমরা উলুবেড়িয়া গিয়েছিলে?

–হ্যাঁ। সে কথা বুঝি এর মধ্যে কফি হাউসে রাষ্ট্র হয়ে গেছে? কেন গিয়েছিলাম বল তো। এটকা দারুণ ব্যাপার দেখলাম। একটা জাহাজ ডুবে যাচ্ছে. ..

–আমার সঙ্গে দেখা হলো, তবু কেন আমায় সঙ্গে নিয়ে গেলে না?

–তোর সঙ্গে যে ঐ ফেমিনিস্ট মেয়েটা ছিল। তাছাড়া তুই যেতে পারতিস না। নৌকে-চৌকো চড়ার ব্যাপার ছিল কিন্তু আমি ভাবলাম, ফিরে এসেই তোকে সব শোনাবো সেইজন্য দৌড়োতে দৌড়োতে এসেছি, এদিকে তুই ঐ বদ মাস্টারটাকে নিয়ে বসে আছিস।

–ছিঃ, ও কথা বলবেন না ।

তা হলে তুই থাক ঐ মাস্টারকে নিয়ে আমি চলি।

অতীন পেছন ফিরতেই অলি আবার বাবলুর হাতে চেপে ধরলো। অতীন ধারালোভাবে হেসে জিজ্ঞেস করলো, কী?

অলি কোনো উত্তর দিল না। সে বুঝতে পেরেছে, এখন এভাবে সে বাবলুদাকে ধরে রাখতে পারবে না। তার মুষ্টি আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে এলো। তার ঠোঁট জ্বালা করছে, তার বুকের মধ্যেও সব কিছু কাঁপছে।

অতীনকে ছেড়ে দিয়ে সে দেয়ালে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

॥ ১৯ ॥

তিন তিনটে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে স্বাধীন ভারতে। প্রত্যেকবারই কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছে কংগ্রেস দল, একটানা প্রধান মন্ত্রিত্ব করলেন জওহরলাল নেহরু। যথেষ্ট বয়েস হয়ে গেলেও তাঁর আচরণ যুবকোচিত। সুদর্শন পুরুষ তিনি, তাঁর পোশাক -পরিচ্ছদ অতি সুরুচিসম্মত। সকলের সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহা। তিনি গোলাপ ফুল শিশু ও কবিতা ভালোবাসেন। এমন মানুষকে কেউ অপছন্দ করতে পারে না। ভারতের শেষ ভাইসরয়ের পত্নী শ্রীমতী মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত তাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। আরও কত নারী এই বিপত্নীক পুরুষটির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে তা কে জানে?

নিজের দলের মধ্যে জওহরলাল নেহরুর প্রতিদ্বন্দ্বী তো দূরের কথা, সমকক্ষ হবার মতন কাছাকাছিও কেউ নেই। বিরোধী দলগুলিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। দেশের যেখানেই তিনি যান হাজার হাজার মানুষ তাঁকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখে জীবন সার্থক করতে চায়। তিনিও বছরে দু'তিনবার প্রচুর ক্যামেরাম্যান ও সাংবাদিকদের চোখের সামনে সব রকম নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘন করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে একেবারে জনসাধারণের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান,

বয়স্কদের আলিঙ্গ করেন বাচ্চাদের গাল টিপে দেন। জাতির পিতা হলেন মহাত্মা গান্ধী, আর কর্ণধার চাচা নেহরু।

বিদেশেও তাঁর প্রচুর খ্যাতি ও সম্মান। পশ্চিমী দুনিয়ায় নেতারা প্রথম দিকে আশঙ্কা করেছিল, এই লোকটা কম্যুনিস্ট হয়ে না যায়। ওঁর লেখা বইপত্রে সমাজতন্ত্রের দিকে খানিকটা ঝোঁক দেখা গেছে। তাছাড়া, চীনের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব কিন্তু এত বড় দেশে তিন তিনটি সাধারণ নির্বাচন নির্বিঘ্নে পার করার পর সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। ভারতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দিন দিন বেড়েই চলেছেবটে, বহু লোক এখনও না খেয়ে থাকে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যখন তখনকয়েক শো লোক মারা যায় বন্যা, দর্ভিক্ষ, মহামারী কিছুই দমন করা যায়নি, কিন্তু জওহরলাল নেহরু গণতন্ত্রকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভাতের গণতন্ত্রের উজ্জ্বল পতাকা সগর্বে ওড়ে। ভারতে বিচ্ছিন্নআবাদের জিগির নেই, সরকারি ভাবে এ দেশ ধর্মনিরপেক্ষ।

দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করলেও জওহরলাল নেহরু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে পুরোপুরি হাত মেলানানি, জোট নিরপেক্ষতার নীতি আঁকড়ে ধরে থেকে তিনি তৃতীয় বিশ্বের প্রধান নেতা হয়ে উঠেছেন। ক্রেমলিন ও হোয়াইট হাউস থেকে তিনি সমান নেমন্তন্ন পান। দেশের মধ্যেও তিনি চালু রেখেছন মিশ্র অর্থনীতি। ইস্পতোর উৎপাদন ভার নিয়েছে পাবলিক সেকটর বিমা কম্পানিগুলি জাতীয়করণ করা হয়েছে। দেশীয় রাজ্যগুলি বশ্যতা স্বীকার করে ইণ্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত'-এর অন্তর্গত হয়েছে, একমাত্র হায়দ্রাবাদ ছাড়া অন্য কোথাও বলপ্রয়োগ করতে হয়নি। শুধু এখনও কাশ্মীর প্রশ্নটি গলার কাঁটা হয়ে ফুটে আছে।

এ বছরের গোড়ার দিকে ভুবনেশ্বরে কংগ্রেসদলের অধিবেশন চলার সময় জওহরলাল নেহরু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সারা দেশ জুড়ে একটা বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল। অনেকেরই ধারণা ছিল উনি চিরযুবা থাকবেন, কোনো দিন বৃদ্ধ হবেন না, এখনও তো দিনের মধ্যে উনিশ ঘণ্টা খাটেন, হাঁটা চলার মধ্যে একটুও শ্লথ ভাব নেই ক্লান্তি নেই দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছোটছুটিতে। সেই মানুষ শয্যাশায়ী হয়ে থাকবেন?

অনেকে বলতে লাগলো, শরীর নয় আসলে ওঁর মন ভেঙে গেছে। চীনের কাছ থেকে যে আঘাতটা পেয়েছেন, সেটা উনি কিছুতেই সামলাতে পারছেন না। এত দোস্তি ছিল চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর সঙ্গে দু'জনে এক সঙ্গে পঞ্চশীল ঘোষণা করেছেন, ভারত সফরে এসে চৌ এন লাই হিন্দী চীনী ভাই ভাই শ্লোগান দিয়েছেন, ফুর্তি করে লোকজনের সঙেগ নেচেছেন। সেই চৌ এন লাই আচমকা ভারত আক্রমণ করে বসলো? শান্তির প্রবক্তা নেহরুর কাঁধে চাপিয়ে দিল একটা যুদ্ধ, শুধু তাই নয়, পরাজয়ের কলঙ্ক। এখনও ম্যাকমাহন লাইনের এদিকের অনেকটা জমি চীনা সৈন্যরা দখল করে বসে আছে। ভারতের ডিফন্স ফ্যাকটরিগুলিতে বন্দুকের বদলে হাঁড়ি কড়াই বানাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল তা জেনে সবাই এখন ছি ছি করছে। প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হলো অনেক। মাঝে মাঝে গুজন শোনা যায়, চীনের পুরোচনায় এ দেশের কমুনিস্টরা নাকি পশ্চিম বাংলা পূর্ব পাকিস্তান আর আসাম নিয়ে পিপ্‌লস রিপাবলিক অফ বেঙ্গল গড়তে চাইছে। কেউ কেউ বেল, সি আই এ-রও একই মতলব।

কয়েক মাস বাদেই আবারনেহরু সুস্থ হয়ে উঠলেন, যাতায়াত করতে লাগলেন সংসদে প্রেস কনফারেন্স ডেকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, অনেকেই এখন জানতে চাইছে, আফটার নেহরু, হু?আপনার উত্তরাধিকারী কে হবে আপনি ঠিক করেছেন?

নেহরু হেসে উত্তর দিলেন, আমি আরও অনেকদিন বাঁচবো এখনই ঐ প্রশ্ন উঠছে কেন?

সাংবাদিকরা লক্ষ করলো, প্রধানমন্ত্রীর চোখের নিচের কালিমা মুছে গেছে, মুখে উৎফুল্ল ভাবটি ফিরে এসেছে, তিনি আবার সক্ষম স্বাস্থ্যবান হয়েছেন।

কাজে যোগ দিতে না দিতেই অনেক রকম সমস্যা। চতুর্দিকে নানান গোলমাল, খাদ্য পরিস্থিতি ভালো নয়, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুর্ভিক্ষের মতন অবস্থা, চালের দাম বাড়তে বাড়তে বত্রিশ টাকা মন পর্যন্ত উঠে এখন কালোবাজারে আত্মগোপন করেছে সব চাল। পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমন হঠাৎ বেড়ে গেছে এ বছর। এত উদ্বাস্তু সামলাতে একেবারে হিমসিম অবস্থা।

উদ্বাস্তুর সংখ্যা যত বাড়ছে ততই ভারতে ধূমায়িত হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। কট্টর হিন্দুরা প্রকাশ্যে বলাবলি করছে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে জওহরলাল নেহরু আসলে মুসলমানদের তোষামোদ করেছেন।

পার্টিশানের সময় দু'দেশ থেকে হিন্দু মুসলমান বদলা বদলির প্রস্তাব নেহরু মানেননি। তার ফল হলো এই যে পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা চলে আসছে আর ভারতে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পশ্চিম বাঙলা, আসাম, ত্রিপুরা প্রতিদিন হাজার হাজার উদ্বাস্তু আসছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। যে মাসে মাত্র একদিনেই পশ্চিম বাংলার সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছে সাত হাজার শরণার্থী। তাদের মুখে মুখে ছড়াচ্ছে অত্যাচার ও বিভীষিকার কাহিনী। পূর্বপাকিস্তানের বড় বড় ব্যবসা থেকে শাসন যন্ত্র পর্যন্ত সব অবাঙালী মুসলমানও সহযোগিতা করছে তাদের।

আবার সেখানে অনেক বুদ্ধিজীবী, শান্তিপ্রিয় মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের এক তরফা আধিপত্যের বিরোধী, ধর্মের চেয়ে মনুষ্যত্ব যাদের কাছে বড়, সেই রকম মুসলমান পূর্ব পাকিস্তান থেকে সমুলে হিন্দু বিতাড়নের প্রতিবাদ জানাতে চায়। অনেক রকম বুদ্ধিজীবী হিন্দুদের অনুপস্থিতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তার ফল ভালো হবে না। কিন্তু কে শোনে তাদের কথা।

পুনর্বাসনমন্ত্রী মহাবীর ত্যাগী দিল্লী থেকে পশ্চিমবাংলার সীমান্তে ছুটে আসছেন উদ্বাস্তুদের সংখ্যা গুণে দেখবার জন্য। তারপর স্বীকার করলেন, রাজধানীতে বসে যা শুনেছিলেন তা গুজব নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ বিবৃতি দিলেন দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকেও উদ্বাস্তুদের দায়িত্বের ভাগ নিতে হবে, দেশ বিভাগের কোনো আঁচই ওদের গায়ে লাগবে না। তা তো হতে পারে না।

নানারকম সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা জওহরলাল নেহরুর কাছে সবচেয়ে বড়। কাশ্মীর প্রশ্ন আবার প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শেখ আবদুল্লা মুক্তি পেয়েই কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করেছেন। তিনি পাকিস্তানে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চান।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গড়িয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের তরুণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বক্তৃতার আগুন ছোটাচ্ছেন। কাশ্মীর আদায়ের জন্য তিনি ভারতের সঙ্গে একহাজার বছর ধরে যুদ্ধ চালাতেও রাজি।

পাকিস্তানের বন্ধুরা নেহরুকে বিদ্রূপ করে বলছে, ভারত যদি এতই ভোটাভুটির ভক্ত হয়, গণতন্ত্র নিয়ে লম্বা চওড়া বড়াই করে,তা হলে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে কাশ্মীরে ভোটের ব্যবস্থা করছে না কেন?নেহরু এর জবাবদিয়ে রেখেছেন যে পাকিস্তানের একটা অংশ তো পাকিস্তানী ফৌজ দখল করে রেখেছে। ওরা হানাদারবাহিনী আগে সরিয়ে নিক তারপর ভোটের ব্যাপার দেখা যাবে। পাকিস্তানীরা বলে, ভারতই তো আসল হানাদার, ফৌজ সরাতে হয় ওরা সরাক। কাশ্মীরের হিন্দু রাজা ভারত ইউনিয়ানে যোগ দেবার জন্য আবদার ধরেছিল কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো মূল্য নেই? ভারতীয় মুখপাত্র আবার এর উত্তরে বলে, তোমরা পাকিস্তানী জনগণের ওপর সামরিক শাসন চাপিয়ে গলা টিপে রেখেছো তাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছো, এখন কাশ্মীরে ভোটের কথা তোমরা বলছো কোন মুখে?

আগে ফৌজ সরানো হবে না আগে ভোট হবে, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। যেমন, গাছ থেকে বীজ, না বীজ থেকে গাছ, এ ধাঁধার উত্তর কেউ জানে না।

নেহরুর ঘনিষ্ঠ মহল অবশ্য জানে যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেমন বিধান সভায় সরকারি দল গঠনের জন্য নির্বাচন হয়, সেই রকম একটি অঙ্গ রাজ্য হিসেবে কাশ্মীরেও নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করবেন নেহরু শেখ আবদুল্লাকে তিনি সেই উদ্দেশ্যেই ছেড়েছেন। সেটাই তো আত্মনিয়ন্ত্রণ। কাশ্মীর পাকিস্তানে যাব কি না, এ প্রশ্নই ওঠে না। কোনো কারণেই নেহরু কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে ছেড়ে দিতে রাজ নন। তাঁর ব্যক্তিগত দুর্বলতা তো আছেই, তা ছাড়া এতদিন পর কাশ্মীর হাতছাড়া হয়ে গেলে সারা দেশের মানুষের ক্রোধ তাঁকে এবং তাঁর কংগ্রেস দলকে ভস্ম করে দেবে। কাশ্মীরের জন্য তিনি চালের দর এক টাকা সের বেঁধে দিয়েছেন,সেখানে বনস্পতি নিষিদ্ধ সস্তা দরে পাওয়া যায় খাঁটি ঘি, এম এ পর্যন্ত পড়াশোনা ফ্রি, তুব কি কাশ্মীরীরা এতই অকৃতজ্ঞ হবে যে তারা পাকিস্তানে যেতে চাইবে?

দক্ষিণপন্থীদের প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও নেহরু শেখ আবদুল্লাকে পাকিস্তান সফরের অনুমতি দিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ঐ লোকটি জাতীয়তাবাদী, ধর্ম-গোঁড়া নয়। পাকিস্তানের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসুক।

অসহ্য গরম পড়েছে দিল্লীতে বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই, প্রত্যেক দিন দুপুরে লু বইছে। এর মধ্যে এত

কাজের চাপ। শুভার্থীরা নেহরুকে পরামর্শ দিলেন, কিছুদিন আগেই শক্ত অসুখ থেকে উঠেছেন, তারপরেই এত কাজের বাড়াবাড়ি ঠিক হচ্ছে না। শেখ আবদুল্লা ফিরে না আসা পর্যন্ত তো কাশ্মীর সম্পর্কে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হতে হচ্ছে না, আপনি কয়েকটা দিন কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় বিশ্রাম নিয়ে আসুন।

পরামর্শটা নেহরুর মনে ধরলো। একমাত্র মেয়ে ইন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেরাদুন চলে গেলেন। পাহাড় তাঁর প্রিয় প্রকৃতির কাছ থেকে শুশ্রূষা পাবার মতন চোখ তাঁর আছে। দু'একদিনেই তার শ্রান্তি কেটে গেল হিমালয়ের টাটকা বাতাসে তিনি যেন নতুন করে শারীরিক বল ও প্রেরণা পেলেন।

তিন দিন বাদেই রাজধানী আবার তাঁর মন টানল। কর্মোদ্যোগী পুরুষ তিনি। সুস্থ শরীরে কাজ ছাড়া বেশিদিনি থাকতে পারেন না। ইন্দিরাকে বললেন, বাক্স গুছোও, আজই দিল্লী ফিরবো।

দিল্লী এয়ারপোর্টে এসে পৌছোলেন সন্ধের সময়। দফতরবিহনীন মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এসেছেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁর সঙ্গে হাস্য পরিহাস করলেন কিছুক্ষণ। দিল্লীর আকাশ এখনো গুমোট, এই তুলনায় দেরাদুনের আবহাওয়া কত চমৎকার ছিল। সাহেবেরা শীতকালে রাজধানী দিল্লী থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত সিমলায়, সেখানে ঠাণ্ডার মধ্যে অনেক ভাল কাজ করা যেত। কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ব্রিটিশ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা মানায় না।

লাল বাহাদুরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বাড়ি চলে এলেন। নৈশভোজে বসে মোটামুটি জেনে নিলেন দিল্লীর পরিস্থিতি, তারপর শুয়ে পড়লেন তাড়াতাড়ি। কাল সকাল থেকে আবার সব কাজে হাত দেবেন।

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস তাঁর। প্রথমে খানিকটা পায়চারি করে নেন। কয়েক পা হাঁটতে না হাঁটতেই চীন, কাশ্মীর, দেরাদুনের স্মৃতি, রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা সব তালগোল পাকিয়ে গেল। তিনি চোখে হঠাৎ অন্ধকার দেখলেন, ঝুপ করে পড়ে গেলেন মাটিতে। সেই যে চক্ষু বুজলেন, আর খুলতে পারলেন না, জ্ঞান আর ফিরলো না একবারও, দুপুর দুটো বেজে এক মিনিটে তাঁর হৃৎস্পন্দন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। তাঁর এত সাধের দেশটিকে মাঝিহীন নৌকোর মতন মাঝ দরিয়ায় ছেড়ে দিয়ে পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেলেন তিনি।

কারুর কারুর থাকাটাই এমন অভ্যেস হয়ে যায় যে তাঁর নাম-থাকাটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য হতে চায় না। টানা সতেরো বছর ধরে যিনি একটি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী, তার আগেও যিনি বহু বছর ছিলেন নেতৃত্বের শীর্ষ সারিতে যিনি গতকালও ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ, তিনি আজ আর নেই, এই নির্মম সত্যটি কিছুতেই যেন মগজেঢুকতে চায় না। সারা দেশেরই হলো এই রকম উদভ্রান্ত অবস্থা। প্রাচ্যদেশীয় লোকেরা সশব্দ শোক প্রকাশ করে। ভারতের প্রত্যেক শহরের রাস্তায় ঘাটে বহু লোককে দেখা গেল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে।

পাকিস্তানেও নেহারুর জন্য শোক করার লোকের অভাব নেই। যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন তাঁদের অনেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। গণতন্ত্রবাদীরা এই উপমহাদেশের গণতন্ত্রের কাণ্ডারীর আকস্মিক প্রস্থানে সত্যিকারের দুঃখিত হলেন। কেউ কেউ ভাবলেন, দেশ বিভাগের জন্য যারা দায়ী, ইণ্ডিয়া পাকিস্তান নাম দুটি দেশের যারা স্রষ্টা, একে একে তারা সবাই চলে গেল। আবার এই দু'দেশেই লোকটা মরেছে, যাক বাঁচা গেছে। এমন চিন্তা করার মানুষ অনেক।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা প্রথামতন শোক বার্তা পাঠিয়ে দেবার পর বলাবলি করতে লাগলো, এবারে তো নেহরু সরে গেছে, এবার দেখা যাক ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে বিলাসিতা ক'দিন টেকে। মারামারি কাটাকাটি শুরু হলো বলে। ওদেশের আর্মি জেনারেলদের মধ্যে কি কেউ মরদের বাচ্চা নেই, এখনও মাথা তুলছে না কেন?

কলকাতায় সকালের দিকে নেহরুর অসুস্থতার খবর বিশেষ কেউ জানতে পারেনি। সুতরাং দুপুরে চরম সংবাদটি এলো একেবারে আচম্বিতে।

অতীন তখন একটি সিনেমা হলের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে। সত্যজিৎ রায়ের একখানা ছবি চলছে এখানে। খুব নাম হয়েছে ছবিটার, মমতা বেশ কয়েকদিন ধরে ছেলেকে বলছেন টিকিট কেটে দিতে, অতীনের আর সময়ই হয় না। আজ মমতা পাঠিয়েছেন জোর করে। বেশ ভিড় টিকিট পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। টিকিট নাকি ব্ল্যাক হচ্ছে। অতীন একা এসেছে তাই। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে

থাকলে সে টিকিট ব্ল্যাকারদের ঠাণ্ডা করে দিত।

হঠাৎ লাইনটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অতীন প্রথমে কারণটা বুঝতে পারলো না। সিনেমা হলের লোহার গেটটা ঝনঝন করে টেনে বন্ধ করা হচ্ছে। আশেপাশের দোকানগুলোরও ঝাঁপ পড়তে লাগলো এক এক করে। কংগ্রেসের পতাকা ওড়ানো একটা খোলা জিপ গাড়িতে চেপে একদল ছেলে বলতে বলতে গেল, দোকান বন্ধ করুন। দোকান বন্ধ করুন।

অতীন প্রথমেই ভাবলো দাঙ্গা শুরু হলো নাকি? তারপর নেহরুর মৃত্যু সংবাদটি শুনে তার তীব্র কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না, সে মনে মনে বললো, যাঃ,আজআর মা-পিসিমণির সিনেমা দেখা হল না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে অতীনের মনে বিশেষ কোনো শ্রদ্ধাগড়ে ওঠেনি। তার বাবা মাঝে-মাঝেই নেহরুর সমালোচনা করেন। তাদের স্টাপি সার্কেলের মানিকদা তো প্রায়ই বাপান্ত করেন নেহরুর। মানিকদার মতে পাকিস্তানের মতন ভারতেরও নেহরু সরকারের বদলে মিলিটারি শাসন থাকলে অনেক ভালো হতো, তা হলে এ দেশে বিপ্লব ত্বরান্বিত হতো। পাকিস্তানের জঙ্গি সরকারের সঙ্গে চীনের যে নতুন বন্ধুত্ব হয়েছে সেও নেহরুর ওপরে হাড়ে চটা। তার ধারণা উদ্বাস্তুদের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী ঐ জওহরলাল নেহরু।

অতীনের যা বয়েস তাকে একেবারে খুব কাছের প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারুর মৃত্যু বিশেষ অভিঘাত সৃষ্টি কর না। রাস্তার কিছু লোকের হাহাকার ও শোকের উচ্ছ্বাস দেখে সে ভাবল এত বাড়াবাড়ি করার কী আছে? নেহরুর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তাই তারা গেছে। এত বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীত্বগিরি করেছে, আরও কত চাই? মানুষ কি মরবে না নাকি?

বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মনটা ছটফট করলেও সে ভাবলো বাড়িতে গিয়ে মাকে খবরটা জানানো উচিত আগে। দেখতে দেখতে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেল, সে হাঁটতে শুরু করলো বাড়ির দিকে।

হাজরার মোড়ের কাছে একটা মুসলমান শালকরের দোকানের সামনে ছোটখাটো ভিড় জমেছে। এখানে আবার কী হলো, অতীন উঁকি মেরে দেখতে গেল। একজন লোক হাউ হাউ করে কাঁদছে। লোকটি বৃদ্ধ, লুঙ্গি ও ফতুয়া পরা, মাথায় সাদা টুপি, মুখভর্তি ধপধপে দাড়ি ঐ লোকটিই দোকানের মালিক। অতীন চেনে ওকে, গত শীতের আগে সে এই দোকানে বাড়ির দু'খানা শাল ধোলাই করতে দিয়েছিল।

লোকটির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে, সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলছে, হায়, হায়, অতবড় মানুষটা চলি গেল, আমরা বট বিরিক্ষের নিচে আশিশ্রিত ছিলু। মুসলমানের আর কে দ্যাখবে? এবারে কাজিয়া বাধলে আর বাঁচবো না, হায়, হায় উনি চলি গ্যালে গো, সব যে অন্ধকার হইয়ে গেল...

দু'জন কর্মচারি থামাবার চেষ্টা করছে বৃদ্ধকে, উনি কিছুতেই শুনছেন না। বারবার বলে যাচ্ছেন ঐ একই কথা। বৃদ্ধটি কাঁদছেন ঠিক শোকে নয়, অনেকখানি ভয়ে। ভয়ে যেন ওর মাথা বিগড়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন চেঁচিয়ে বললো, চুপ করো মিঞা। ঐ সব কথা বলছো কেন? তোমাকে কি কেউ ভয় দেখিয়েছে?

অতীন সেখানে আর দাঁড়ালো না, বাড়ির দিকে জোরে পা চালালো। কান্নার দৃশ্য সে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এই লোকটির কান্নার মধ্যে এমন একটা আকুলতা রয়েছে যে বুকে ধাক্কা মারে। সে চেষ্টা করেও লোকটির মুখটা ভুলতে পারলো না।

বাড়িতে এসে দেখলো, প্রতাপ আগেই খবর পেয়ে আদালত থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছেন। বাড়িতে একেবারে নিঝুম অবস্থা, প্রতাপ গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁর দু'পাশে মমতা আর সুপ্রীতি। অতীন আর সিনেমার প্রসঙ্গ তুললোই না। প্রতাপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এখন কী হবে? নেহরু শক্ত হাতে হাল ধরে ছিলেন, এবার দেশটা যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায় ওঁর মতন আর তো কেউ নেই..

বাবা নেহরুর সমালোচনা করতেন, সেই বাবা যে নেহরুর মৃত্যুতে এতখানি বিহ্বল হয়ে পড়বেন, তা অতীন ভাবতে পারেনি। দেশটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি আছে? বিপ্লবের পর আবার ছোট ছোট রাজ্যগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হবে, এই তো নিয়ম। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন হয়েছে।

মৃত্যুর পরে দেখা গেল নেহরু সত্যিই কোনো উত্তরাধিকারী ঠিক করে রেখে যাননি, তবে

গণতন্ত্রের বনিয়াদটি বেশ শক্ত করেই গড়ে রেখে গেছেন। মারামারি কাটাকাটি শুরু হলো না, বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিল না। দিল্লিতে ক্ষমতা দখলের কোনো কুৎসিত রূপও ফুটে উঠলো না। সৈন্যরা ব্যারাকেই রইলো। টু শব্দটিও করলো না কোন সেনাপতি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দকে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী করে কাজ চালিয়ে যাওয়া যেতে লাগলো। তলে তলে আলাপ আলোচনা চললো, পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন। প্রথমেই মোরারজি দেশাই জানালেন তাঁর দাবি। যদিও কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতার ইচ্ছে নিঝঞ্ঝাট, নিঃশত্রু লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে নেহরুর জায়গায় বসানো। কয়েকদিন বাদে এগিয়ে এলেন জগজীবন রাম। গান্ধীজী সমাজের নিচুতলা মানুষের নাম দিয়েছিলেন হরিজন, কোনো একজন হরিজনকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি করা উচিত, এরকম কথাও একবার বলেছিলেন না?

লালবাহাদুর শাস্ত্রী নিজে প্রথম দিকে চুপচাপ ছিলে, কয়েকদিন পর বললেন, তাঁর দল যদি অন্য কোনো প্রার্থকে মনোনীত করে, তা হলে তিনি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াবেন। কেউ কেউ বলতে লাগলো ঐ যে গুলজারিলাল নন্দ একবার প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছে। ও আর ছাড়বে না। এসব চেয়ার কি কেউ ছাড়ে, ওই অন্যদের হটিয়ে দেবে।

শেষ পর্যন্ত সে রকম কিছু হল না। দক্ষিণ ভারতের নেতা কামরাজের মধ্যস্থতায় ছোট্টখাট্টো মানুষ লাল বাহাদুরই হলেন প্রধানমন্ত্রী ; মোরারজি ও জগজীবন রাম তাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন না। মেনে নিরেন দলের সিদ্ধান্ত। গুলজারিলাল চেয়ার চেড়ে দিলেন বিনা বাক্যব্যয়ে। পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের প্রত্যাশা ব্যর্থ করে ভারতে টিকে গেল গণতন্ত্র।

দিন দশেক বাদে অতীন হাজরা মোড়ের সেই শালকরের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলো, সেই দোকানের মালপত্র টেনে বার করা হচ্ছে রাস্তায়। পাকা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধটি একটি লরিতে সেই সব মালপত্র তোলার তদারকি করছেন। আজও তাঁর মুখখানি বিষণ্ন। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি চোখ মুছছেন মাঝে মাঝে।

অতীন সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। টুকরো টুকরো কথাবার্তা শুনে সে বুঝতে পারলে, সেদিন ঐ বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিরেন তা একেবারে অমূলক নয়। এর মধ্যেই কারা নাকি দু'বার তাঁকে ভয় দেখিয়ে গেছে, এ পাড়ায় কোনো মুসলমানের ব্যবস্থা করা চলবে না। তিনি তাই দোকান বিক্রি করে ইস্ট পাকিসতান চলে যাচ্ছেন।

দু'চারজন লোক বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বলছে, মিঞা তুমি ঐ কয়েকটা গুণ্ডা বদমাসের কথা শুনে ভয় পেলে? আমরা তো আছি। থানায় একটা খবর দিয়ে রাখো। ওরা কিছু করতে পারবে না। দু'পুরুষের ব্যবসা ছেড়ে চলে যাবে?

বৃদ্ধটি চোখ মুছে বললেন, দুই পুরুষের দোকান ছাড়ি চলি যেতে কী কষ্ট হয় না? কষ্ট তো হবেই সাধ করে কি আর চক্ষে পানি ফেলছি রে দাদা। তবু যেতেই হবে। এখন ভালয় ভালয় যাতে যেতে পারি, সেই দোয়া করুন।

॥ ২০ ॥

ভিত নেই তবু বাসস্থান গড়ে উঠেছে, মাথার ওপর চাল যখন তখন ঝড়ে উড়ে যায়, তাহলেও এরই মধ্যে জন্ম মৃত্যু বিবাহ সবই চলে। খিদের কান্না মৃত্যুশোকের কান্না, স্মৃতির কান্নার মধ্যেও মাঝে মাঝে শোনা যায় উলুধ্বনি। রঙ্গ কৌতুক, দু'একটা যাত্রা পালার সংলাপ।

কয়েকদিন আগে দণ্ডকারণ্যের কুরুদ শিবিরে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে উদ্বাস্তুদের সব কটা মানুষের সংসার এখন খোলা আকাশের নিচে। এখনো কোনো রিলিফ এসে পৌঁছোয়নি, দিল্লিতে খবর পৌঁছেচে কি না সন্দেহ। যে তিনজন অফিসার এই অফিসার এই শিবিরের দায়িত্বে তাদের মধ্যে একজন ছুটিতে ছিল, আর দুজন উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভের ভয়ে পালিয়েছে।

হারীত মণ্ডল তার মেয়ে গীতার বিয়ে দিয়েছে মাত্র গত মাসে। পাত্র এই কুরুদ শিবিরেরই। নানান ক্যাম্পে ক্যাম্পে পাত্র আর পাত্রী একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে, এখন আর পাঁচ জনের পরামর্শে ওদের হাতে হাত মিলিয়ে দেওয়া হলো। বিয়ের নিয়ম কানুনও মানা হয়েছিল মোটামুটি, একজন পুরুত আছে এখানে, হারীত মণ্ডল তার পুতুল বেচা টাকায় দুখানা নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছে মেয়েকে, জামাই

মাধবের জন্য ধুতি। সেদিন পঁচিশ তিরিশটা পরিবারের খাদ্দ চাল নিয়ে রান্না হয়েছে এক সঙ্গে সবাই একসঙ্গে বসে খেয়েছে, সুতরাং সেটাকে বিবাহের প্রীতিভোজ বলা যেতে পারে। ফুলশয্যাতেও ত্রুটি রাখা হয়নি। আট দিনের দিন দ্বিরাগমন, সেই দিন গীতা পাকাপাকি চলে যাবে মাধবের বাড়িতে, সেই দুপুরেই ঝড় উঠলো। গীতার বাপের বাড়ি স্বামীর বাড়ি কিছুই রইলো না।

তিন দিন কেটে যাবার পরেও পলাতক অফিসারদের কোনো পাত্তা নেই বলে আজ সকালে ক্যাম্প অফিস লুট করে চাল-ডাল যা পাওয়া গেছে তা ভাগ করে নিয়েছে সবাই।

একদল লোক ঘিরে ধরেছে হারীত মণ্ডলকে। সে এখন আর নেতা হতে না চাইলেও সবাই তাকেই নেতা মনে করে। সবাই জানতে চায়, অফিসাররা যদি আর ফিরে না আসে তা হলে তাদের ভাগ্যে কী হবে?

হারীত মণ্ডলের যৌবনের সেই তেজ আর নেই। মাঝখানে তার শরীরটা খুবই ভেঙে গিয়েছিল এখন সামলে উঠেছে অনেকটা। তার স্ত্রীও প্রায়ই অসুস্থ থাকে ইদানিং তার পালিতা কন্যা গোলাপীই এখন তার সংসার দেখে।

এত দুর্যোগ-দুর্দিনের মধ্যেও অবশ্য সে তার কৌতুক বোধ হারায়নি। ঝড়ে যে ঘর বাড়ির চালা উড়ে গেছে, তাতে সে খুব একটা বিচলত নয়। ঝড় থামবার পর সে অন্যদের বলেছিল পাবি কী করে? সরকার বাহাদুর এই ক্যাম্পের বাড়িগুলান পল্‌কা নড়বড়ে করে বানায়েছিল, তার কারণ হইলো এ গুলান তো অস্থায়ী। আমরা তো আর চিরকাল ক্যাম্পে থাকবো না, এরপর পাকা বাড়িতে যাবো। তোরা শুনিসনি শিগগিরই আমাগো উদ্বাস্তু নাম ঘুচে যাবে। এই দ্যামের আর পাঁচটা রাম শ্যামা যদু মধুর মতন আমরাও হবো সাধারণ মানুষ।

হারীত মণ্ডলের এই ধরনের রসিকতা কারুরই পছন্দ হয় না। সকলেই নিদারুণ নৈরাশ্যে ভুগছে। যতই ছোট নড়বড়ে নোংরা চালাঘর হোক, তবু তো একটা মাথা গুঁজবার নিজস্ব আস্তানায় এই কয়েক বছর তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, এখন আবার সেটাও গেল

হারীত মণ্ডল সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করে আরে শোন, সব কিছুরই একটা ভালো দিক আছে। এই কুরুন্দ ক্যাম্পের কথা সরকার তো ভুইলেই গিয়েছিল, অখাইদ্য চাউল দিত আমরা নালিশ করলে কেউ শোনতো ? এই ঝড়ে সরকারের টনক নড়াবে। খবরের কাগজের মাইনেষেরা আসবে, আমাগো ফটো ছাপাবে, আবার একটা কিছু হবে।

এ কথাতেও কেউ ভরসা পায় না।

অনেক হারীতকে বললো, চলো কাকা, আমরা পশ্চিম বাংলায় ফিরা যাই। যদি মরতেই হয় সেখানে গিয়ে মরুম। তুমি আমাগো রাস্তা দেখাওআরতি মণ্ডল মাথা নাড়ে। এ প্রস্তাব তার কাছে বলেছিল, পশ্চিম বাংলায় নতুন করে লাখ লাখ উদ্বাস্তু ঢুকছে,সেখানে এখন দুর্ভিক্ষের মতন অবস্থা চাল একেবারেই পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় দণ্ডকারণ্য থেকে আবার রিফিউজিরা ফিরে গেলে তাদের কেউ ঠাঁই দেবে না। খেতে দেবে কে? এখানে তবু ভারত সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, আজ হোক কাল হোক, অফিসার ফিরে আসবেই। জোড়া তালি দিয়ে বাসস্থানের একটা কিছু হবেই। পশ্চিম বাংলায় ফিরে গেলে দুর দুর করে আবার তাড়াবে।

হারীত মণ্ডলকে ঘিরে সবাই চেঁচামেচি, তর্কাতর্কি করছে। এই সময় দূরে শোনা গেল একটা ঢোলের আওয়াজ। সবাই কথা থামিয়ে সন্ত্রস্ত। উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। এই ক্যাম্পে বসতি নেবার পর প্রথম দিকে প্রায়ই জঙ্গলের আদিবাসীরা হানা দিত রাত্তিরের দিকে।

এখানে আসবার আগে অনেকে রটিয়েছিল যে দণ্ডকারণ্যে নাকি রাক্ষসদের বাস। এসে দেখা গে, রাক্ষস নেই বটে, কিন্তু মারাত্মক তীর ধনুক ও টাঙ্গি নিয়ে এক জাতীয় কালো কালো অরণ্যবাসী মানুষ ঘুরে বেড়ায়। তারা এমনিতে সরল ও নিরীহ কিন্তু বহুকাল ধরে এই জঙ্গলে তারা ফল মূল কাঠ পাতার অধিকার ভোগ করে আসছে। হঠাৎ বাইরে থেকে হাজার হাজার মানুষ সেখানে উড়ে এসে জুড়ে বসলে তারা সহ্য করবে কেন? আদিবাসীদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংঘর্ষ হয়েছে একাধিকবার।

এখন কলোনিটি অরক্ষিত ও ছিন্নভিন্ন অবস্থায় আছে, এই খবর পেয়েই কি আদিবাসীরা আবার আক্রমণ করতে আসছে। সবাই লাঠি সোটা কুড়ুল যা পেল তাই নিয়ে তৈরি হলো।

ঢোল বাজনা ক্রমশ এগিয়ে এলো কাছে। দেখা গেল, একজন লোক ঢোল বাজাচ্ছে অন্য একজন তার পাশে পাশে হাটতে হাঁটতে চিৎকার করে কিছু বলছে। জঙ্গলের গাছপালাকে কী শোনাচ্ছে ওরা?

এ তো গান নয়, কোনো সওদা বিক্রির ব্যবস্তাও নয়, কারণ ওদের সঙ্গে কিছু নেই।

সবাই ছুটে গিয়ে ঐ দু'জনকে ঘিরে ধরলো।

ঢোল বাদকটি এবারে দর্শক ও শ্রোতা পেয়ে প্রবল উৎসাহে খানিকটা বাজিয়ে থেমে গেল হঠাৎ। তার সঙ্গের লোকটি হাতের ছোট লাঠিটি তুলে রাজকীয় ঘোষণার ভঙ্গিতে বললো ভাইয়ো আউর বহেনো অপলোগ সব শুনিয়ে ভারতকা পরাধান মন্ত্রীজী, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকো স্বরগ প্রাপ্তি হো গ্যায়া। ভারতকা পরধান মন্ত্রীজী পণ্ডিত জবারলাল...

এক মুহূর্তে সমস্তগোলমাল থেমে গেল। খবরটা হৃদয়ঙ্গম করতে সময় লাগলো খানিকটা। তারপর হারীত মণ্ডলের জামাই মাধব চেঁচিয়ে উঠলো, বেশ হয়েছে, আপদ গেছে?

অনেকেই গলা মেলালো তার সঙ্গে। আবার শুরু হয়ে গেল কলরব। দু'একজন নাচতে শুরু করে দিল।

এত কষ্ট ও হতাশার মধ্যেও একজন মানুষের মৃত্যু সংবাদ তাদের মধ্যে খানিকটা আনন্দ এনে দেয়। তারা ঢোল বাদক ও ঘোষককে চেপে ধরে জাতে চাইলো আর আরও তথ্য। লোকটাকে কেউ গান্ধীর মতন গুলি করে মেরেছে? কষ্ট পেয়ে মরেছে ? মৃত্যুকালে তার ঠোঁট জল দেবার মতন কেউ ছিল পাশে।

ঘোষক অতশত জানে না। ঘটনাটি দশ দিন আগেকার। সরকারি নির্দেশে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে রাজা বদলের খরবর জানাতে হয়। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বদল। হেরুর মৃত্যু হয়েছে, এখন লালবাহাদুর শাস্ত্রী গদীতে বসেছে।

সমস্ত বিশ্বের চোখে এক বরেণ্য নেতা, বিশ্ব শান্তির প্রবক্তা, স্বাধীন ভারতের একটানা সতেরো বৎসর ব্যাপী প্রধানমন্ত্রী, দেশের জন্য খাটতে খাটতে যিনি দেহান্ত করলেন সেই জওহরলাল নেহরু এই বাস্তুচ্যুত, দেশচ্যুত ভাগ্যতাড়িত মানুষগুলির কাছে একটুও জনপ্রিয় নন। জিন্না সাহেবের মতন নেহরুকেও এরা তাদের সমস্ত দুর্দশার জন্য দায়ী মনে করে।

খবর শুনে হারীত মণ্ডলের মুখটাও কুঁচকে গেল একবার। সে জনতার মধ্যে থেকে সরে গিয়ে একটা ভগ্নস্তূপের ওপরে গিয়ে বসলো। তারপর তার পালিতা মেয়েকে ডেকে বললো গোলাপী মা, একটু তাম্রুক সেজে দিবি।

এই ক্যাম্প থেকে মাইল পনেরো দূরে একটা হাট বসে মাসে একবার। এখনাকার কাঠ ভালো হারীত মণ্ডল নানা রকম পুতুল বানিয়ে সেই হাটে বিক্রি করে। তার তৈরি কয়েকটি পুতুল নাকি বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে দেবতা জ্ঞানে পুজো পাচ্ছে। পুতুল বিক্রির টাকায় আর যাই কেনা হোক বা না হোক কিছুটা তামাক হারীতের কেনা চাই। এটাই তার একমাত্র বিলাসিতা। বিড়ি ছেড়ে সে এখন হুঁকো ধরেছে।

দু'জন বয়স্ক লোক, পীতাম্বর আর হরেন,খানিকটা তামাকের ভাগ পাবার লোভে আর হারীতের মতামত কৌতুহলেও হারীতের পাশে এসে বসলো। হারীত এদের তুলনায় বেশি খবর রাখে। সে নেহরু লিয়াং চুক্তির কথা জানে। সে একথাও জানে যে পাঞ্জাবের রিফিউজিরা এরকম জঙ্গলের মধ্যে থাকে না, তাদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গরু ছাগলের মতন তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না। বস্তুত তারা আর রিফিইজি নয়, তারা এখন ভারতের নাগরিক। কিন্তু বাঙালী উদ্বাস্তুদের প্রতি নেহরু কোনোদিন সদয় ছিলেন না। তিনি পূর্ব বাংলার হিন্দুদের দেশ ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন বারবার যারা সে দেশ ছেড়ে আসছে তাদের তিনি বলেছেন কাপুরুষ। অথচ পূর্ব বাংলার কংগ্রেস নেতারাই দেশ ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে এসছেন সবার আগে। ওদিকক্কার সবচেয়ে নামকরা হিন্দু নেতা কিরণশঙ্কর রায়কে বিধান রায় ডেকেছিলেন পশ্চিম বাংলার স্ত্রী হতে।

নেহরু কি ভেবেছিলেন যে বাংলা বিভাগ একটা অবাস্তব ব্যাপার। সেইজন্য তিনি বাঙালী উদ্বাস্তুদের র্ভৎসনা করতেন? এদের তিনি এত বৎসর ধরে রিফিউজি আখ্যা দিয়ে রেখেছিলেন এই ভরসায় যে এইসব বাস্তুহারারা আবার ফিরে যাবে নিজেদের বাস্তু ভূমিতে? নেহরুর এই দিবাস্বপ্নের খেসারত দিল লক্ষ লক্ষ অসহায় পরিবার।

পীতাম্বর হারীতের হুঁকোর দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, এবার কী হইব, কও তো হারীত। তুমি তো অনেক কিছু জানো।

হারীতের এখনো মৌজ হয়নি, সে হুঁকো না দিয়ে বললো, আমি তত কিছু জানি না। তবে ঐ

যে আমি সব সময় কই না, সব ঘটানারই একটা ভালো দিক আছে? নেহরু মারা গ্যালেন, তাতে দিল্লির মহা বিপদ হইতে পারে, কিন্তু আমাগো বোধ হয় কিছু উপকার হবে।

হরেন বললো, কী উপকার হবে?

হারীত বললো আমরা এখন যা আছি, তার থিকা খারাপ তো আর কিছু হইতে পারে না। একটা কিছু বদল হইলেই বোঝবা কিছু ভালো হইলো।

হরেন বা পীতাম্বর হতে সন্তুষ্ট হলো না। এ কেমন যেন ভাসা ভাসা কথা। আজকাল হারীতের ওপর যেন আস্থা হারিয়ে ফেলছে সবাই। সংকটের মুহূর্তে সে কোনো উত্তেজক কথা বলে না।

এ কথা অবশ্য ঠিক যে চরখেতিয়া ক্যাম্প ছেড়ে আসার সময় হারত মণ্ডল আবার পুলিশের কাছে প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প থেকে তাদের আনা হয়েছিল চরবেতিয়ায়, সেখানেও অব্যবস্থার চূড়ান্ত। দিনের পর দিন এক ফোঁটা কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝেই চাল ফুরিয়ে যায়। হারীতের তখন দাপট ছিল, তার কথায় সবাই উঠতো-বসতো, সে বিদ্রোহ জানিয়ে একদিন সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। হারীত ভেবেছিল উড়িষ্যার পুলিশ তার সম্পর্কে কিছু জানবে না। কিন্তু পুলিশে পুলিশে কথা চালাচালি হয়, বেঙ্গল পুলিশ উড়িষ্যা পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে হারীতের চরিত্র বৃত্তান্ত। পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের ঘিরে ধরে শুধু হারীতকে আলাদা করে বেছে নিয়ে যায়। বেদম মার ও প্রাণ নাশের হুমকির পর সে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয় যে সে তার দলবল নিয়ে দণ্ড কারণ্যের দিকে চলে যাবে।

মার খেয়ে খেয়েই লোকটার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। সে এখনও হাসি ঠাট্টা করে বটে, কিন্তু উগ্র সরকারবিরোধী কথা তার মুখে একবারও শোনা যায় না।

একটু বাদে হারীত তার হুঁকোটা ওদের দযে দিল, কিন্তু আলাপ আলোচনা কমলো না। আবার একটা হৈ হৈ শোনা গেল।

ঢোল বাদক ও ঘোষককে রিফিউজির ছেলে-ছোকরারা ছেড়ে দেয়নি। হঠাৎ তারা উত্তেজিত হয়ে ঢোলটা আছড়ে ভেঙে ফেললো এবং লোকদুটিকে চড় চাপড় মারতে শুরু করে দিল। লোক দুটির একমাত্র দোষ, অতি নিম্নপদের হলেও তারা সরকারি কর্মচারি। রিফিউজিদের চোখে ওরাই অদৃশ্য সরকারের একমাত্র প্রতিভূ তাই ওদরে ওপর বর্ষিত হলো পুঞ্জীভূত রাগ। হারীতের হস্তক্ষেপ লোকদুটো প্রাণে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু ছেলে-ছোকরারা শাসিয়ে দিল, যা ব্যাটারা, তোরা বাবুদের গিয়ে বল, আমরা কী অবস্থায় আছি। কাইলকের মইধ্যে যেন র‍্যাশোন আসে, আর যদি না আসে, তবে তোগো এই দিকে আর একবার দ্যাখলে ঘেটি ভেঙে দেবো।

কিন্তু তার পরের দুদিনেও কোনো সাহয্যে এলো না। দুর্দশার একেবারে চরম অবস্থায় পৌছোলো এতগুলো মানুষ। দিনের বেলা অসহ্য গরম, রাত্তিরে নানা রকম পোকা মাকড়ের উৎপাত, তা ওপরে আছে সাপ। ক্যাম্প অফিসে আর এক কণা খাদ্য নেই। নেহরু মারা গেছে বলে কি সরকারি কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেছে? সবাই ভুলে গেছে এই ক্যাম্পের কথা? খবরের কাগজওয়ালারাও এলো না? বড় খবর পেলে তারা ছোট খবরে কাছে আসে না।

আর উপায় নেই, এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতেই হবে। ছেলে-ছোকরারা জোর করে রাজি করালো হারীতকে। কয়েকজন বললো, তারা জেনেছে যে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী এখন বীরেন মিত্র, নাম শুনে মনে হয় বাঙালী। কটক পর্যন্ত গিয়ে পৌছোলে তিনি কি কিছু সাহায্য করবেন না?

আবার শুরু হলো পদযাত্রা। সেই পঞ্চাশ সালে সুরু হয়েছিল, আজও ঘরছাড়ারার ঘর পায়নি। সামান্য বাসনপত্র, ছেঁড়া বিছানা বা দু'একটা জামা কাপড়ের পুঁটলি কাঁধে সাত হাজার নারী-পুরুষ-শিশু বৃদ্ধ জঙ্গল চেড়ে বললো শহরের খোঁজে।

অনিচ্ছুক নেতা হিসেবে হারীতকে যেতে হলো সকলের সামনে সামনে। তার কোলে গোলাপীর পাঁচ বছরের ছেলে নবা। কুপার্স ক্যাম্প থেকে চলে আসার পর অবিবাহিতা পোয়াতী মেয়ে গোলাপীকে নিয়ে অনেক প্রতীকূলতা সহ্য করতে হয়েছে হারীতকে। এমনকি তার সঙ্গী সাথীরাও তার নাম জড়িয়ে কুৎসিত কথা বলতেও ছাড়েনি, কিন্তু এই একটা ব্যাপারে কিছুতেই হার স্বীকার করেনি হারীত। গোলাপী তার কেউ নয়, তবু তাকে সে পরিত্যাগ করেনি, গোলাপীর অবৈধ শিশুটিকে সে এখন সকলের কাছে নিজের নাতি বলে পরিচয় দেয়। গোলাপীকে কেউ বিয়ে করতে রাজি হয়নি, তাতে কিছু যায় আসে না। এই নাতিকে নিয়েই এখন হারীতের অধিকাংশ সময় কাটে।

এই নিয়ে পাঁচবার গৃহত্যাগ করতে হলো হারীতকে। এর মধ্যে একবারও কলকাতার দিকে যায়নি সে। চন্দ্রার ঠিকানায় তার ছেলে সুচরিতের নামে দু'খানা পোস্কার্ড লিখেছিল কোনো জবাব আসেনি তার। হারীত তার ঘুমন্ত নাতির পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে মনে মনে বললো,একদিন না একদিন তোকে আমি একখানা নিজস্ব বাড়িতে তুলবোই। সে বাড়ির সামনের জমিতে লঙ্কাগাছ বেগুন গাছ জবা ফুলের গাছ থাকবে, ঘরের ছাউনির ওপর বসে শালিক পাখি ডাকবে..।

এই হতভাগ্যদের মিছিল নিয়ে বেশি দূর এগোনো গেল না। রিলিফ নিয়ে সরকারি কর্মচারীরা এতদিন পর এদিকেই আসছিল, গোলমালের আশঙ্কায় তারা সঙ্গে এক গাড়ি পুলিশও এনেছে।

পুলিশ দেখেই হারীতের শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। নবাকে চট করে গোলাপীর কোলে দিয়েই সে লাফিয়ে লাফিয়ে বলতে লাগলো, ভাইসকল, পুলিশের সাথে জেদাজেদি করতে যাইও না, তর্ক করো না, বসে পড়ো সবাই বসে পড়ো আমি হাত জোড় করতেছি, আমার কথা শোনো সরকার রিলিফ পাঠায়েছেন...আমাগো ভালোর জইন্যেই...

একদল স্পষ্ট বিদ্রোহ করলো হারীতের বিরুদ্ধে। তারা হারীতকে ধিক্কার দিয়ে দল বেঁধে ছুটে গেল ঠিক পুলিশের মুখোমুখি নয়, বাঁ দিকের জঙ্গলের মধ্যে তারা যে কোনো উপায়ে কটক পৌছোতে চায়। পুলিশ তাদের তাড়া করে গেল, কিন্তু খুব একটা আন্তরিকভাবে নয়, নামকায়োস্তে রিফিউজিরা পাই পাই করে ছুটতেই হুইশল বাজিয়ে পুলিশের দল ফিরে এলো।

হারীতের অনুগতরা প্রধানত বয়স্ক এবং স্ত্রীলোকেরাই বেশি, পথের ওপর বসে পড়েছিল হারীতের কথা মতন। খানিকটা দূরত্ব রেখে পুলিশরা লাইন করে দাঁড়িয়ে রইলো তাদের সামনে। প্রভুভক্ত হনুমানের মত ভঙ্গিতে হাত জোড় করে রইলো হারীত।

তবু একটুবাদেই পুলিশের দিক থেকে চোঙা ফুঁকে গোষণা করা হলো হারীত মণ্ডল কিসকা নাম হ্যায়? হারীত মণ্ডল । সামনে আও। মাথা পর হাত উঠাকে আও?

হারীতের বুক কেঁপে উঠলো । আবার তাকে মারবে। এবার মার খেলে কি সে আর বাঁচবে। তবু তাকে যেতেই হবে। সে একবার তাকালো নবা আর গোলাপীর মুখের দিকে তারপর অন্যদের বললো, তোমরা চুপচাপ বসে থাকো, আমি কথাবার্তা বলে আসি। ভয়ের কিছু নাই।

লাঠিওয়ালা পুলিশ লাইনের পেছন দিকে দুটি স্টেশন ওয়াগন দাঁড়ানো। দু'তিন জন পুলিশ অফিসার ও কয়েকজন সিভিলিয়ান অফিসার বসে আছেন সেই দুটি গাড়িতে। একজন সেপাই হারীতের হাত ধরে এখন পুলিশ অফিসারের কাছে নিয়ে গেল। তিনি প্রথমে মিষ্টি করে বললেন, তোমার নাম হারীত মণ্ডল? তুমি আবার রিফিউজিদের ক্যাম্প ডেজার্ট করার উস্কানি দিয়েছো?

হারীত বললো, ক্যাম্প কোথায় স্যার? দ্যাখেন গিয়ে ক্যাম্প নাই। ঝড়ে সব তছনছ করে দিয়েছে।

লোকটি হঠাৎ রেগে গিয়ে বললো, শাট আপ। যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।

সঙ্গে সঙ্গে হারীতহাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বললো, মারবেন না। মারবেন না স্যার? আপনার পায়ে ধরছি। কোনো দোষ করি নাই। দুই দিন ধরে আমরা কিছুই খেতে পাই নাই, তাই হুজুরদের কাছে দরবার করতে যাইতেছিলাম।

পাশের গাড়ি থেকে একজন সিভিলিয়ান বললেন, মিঃ দাস, আমি এই হারীত মণ্ডলের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

অফিসারটি গাড়ি থেকে নেমে হারীতের কাঁধে হাত দিয়ে একটু দুরের একটা গাছতলায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমার নাম অরুণ কুমার দাশ গুপ্ত আমারও দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। হারীতবাবু আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমা চাচ্ছি।

হারীত হকচকিয়ে গেল। এ আবার কী ধরনের কথা। মিষ্টি কথা শুনলে বেশি ভয় লাগে মনে হয় পিটুনীর প্রস্তুতি । এ লোকটার পূর্ব বঙ্গে বাড়ি ছিল তো কী হয়েছে। ভদ্দরলোক তো। ভদ্দরলোক রিফিউজিরা এদিককার ভদ্দরলোকদের মধ্যে ঠিক মিশে গেছে।

হারীত হাত জোড় করে বললো, আজ্ঞে?

অফিসারটি আরও মোলায়েম গলায় জিজ্ঞস করলো, এদিক কী হয়েছিল বলুন তো?

হারীত বললো, আজ্ঞে এমন কিছু না। নেহরুজী যেদিন মারা গেলেন, সেইদিনই ঝড়ে আর শিল পড়েআমাগো ঘরবাড়িগুলো ভেঙে গেল। অফিসার দু'জন গেলেন সদরে খবর দিতে, তা নেহরুজীর

মৃত্যুতে মনে ব্যথা পেয়ে বোধ হয় ভুলে গেলেন আমাগো কথা। তা তো হতেই পারে, কী বলেন। এতবড় একজন মানুষ চলে গেলেন, সেই তুলনায় আমরা তো মশা মাছি তবে কি না, তিন দিন ধইরা এক কণা দানাপানি নাই, অবুঝ পোলাপানগুলো কান্নাকাটি করে তাই ভাবলাম।

অফিসারটি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, অপদার্থ ছি ছি ছি ছি ছি। ঐ অফিসার দু'জনকে আমি ফিরেই সাসপেণ্ড করার অর্ডার দেবো। জানেন, হারীতবাবু, এই দণ্ডাকারণ্য প্রজেক্টে এখানো কোনো কো-অর্ডিনেশান নেই। কেউ কারুর কথা শোনে না। লোকাল অথরিটির সঙ্গে আমাদের এখনও ঠিক মতন আণ্ডারস্টাণ্ডিং হলো না।

—স্যার আমি ইংরাজি বুঝি না।

— আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। জানেন তো, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাঙালী রিফিউজিদের জন্য এখনও সে রকম কিছুই করছে না। আমরা যত টাকা চেয়েছি যতগুলো প্রজেক্ট, মানে পরিকল্পনা দিয়েছি, কোনোটাই ঠিক মতন পাস হচ্ছে না। আমি বাঙালী হয়ে সব সময় এটা ফিল করি। আমাদের চেয়ারম্যান, মিঃ শৈবাল গুপ্ত তো ডিসগাস্টেড হয়ে রিজাইন করতে চেয়েছেন।

—স্যার, আমার সাথীরা তিনদিন ধরে না খেয়ে অস্থির হয়ে আছে। আমার দেরি হলে তারা ভাববে, আপনেরা বুঝি আমারে গ্রেফতার করেছেন।

—না, না, অফ কোর্স। আমরা চিঁড়ে মুর্কির বস্তা সঙ্গে এনেছি। এক্ষুনি ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। তবে, হারীতবাবু, কাজের কথা হচ্ছে, এই কুরুদ শিবিরের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এখানকার ঝড়ে পড়ে যাওয়া বাড়িঘর আর নতুন করে তৈরি করা যাবে না। সে টাকার স্যাংকশান নেই। তবে উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার সোনাগড়াতে নতুন ক্যাম্প হয়েছে। আপনাদের যেতে হবে সেখানে।

—আবার আর এক জায়গায়?

—হ্যাঁ আই প্রমিস, সোনাগড়া আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। সেখানে কাজের সুযোগ আছে। আপনারা চাষবাস করতে পারবেন। বাঙালী রিফিউজিরা অলস, অকর্মণ্য, এই দুর্নামটাও তো ঘোচানো দরকার। আপনি আপত্তি করবেন না। আপনার লোকদের বোঝান।

হারীত অফিসারটির চোখে চোখ ফেলে হাসলো। তারপর বললো সোনাগড়া। নামটি সুন্দর। সেখানে গ্যালে আমরা সোনার ভবিষ্যৎ গড়তে পারবো, কী বলেন?

—নিশ্চয়ই। আই মীন, আই হোপ সো।

তিন দিন পরে সোনাগড়ার পথে এই হা-ঘরের দলটির আবার যাত্রা শুরু হলো। যাত্রা পথেই দুটি নিদারুণ খবর এসে পৌছোলো। সোনাগড়ায় নাকি সাঙ্ঘাতক জলকষ্ট সেখান থেকে ইতিমধ্যেই একদল উদ্বাস্তু পালিয়েছে অন্ধ্রের দিকে। আর হারীতদের দল থেকে যে অংশটি কয়েকদিন আগে কটকের দিকে পালিয়েছিল, তারাও কটক পর্যন্ত পৌছোতে পারেনি, মাঝপথে বীরেনমিত্রর পুলিশ বাহিনী তাদের ওপর গুলি চালিয়েছে। নিহত হয়েছে পাঁচজন চোদ্দজন গুরুতর আহত বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে কোথায় কে জানে।

ঐ দলটিতে গেছে হারীতের মেয়ে জামাই। তাদের জন্য উদ্বিগ্ন হবার আগেই হারীত ভাবলো, সে নিজে যদি ঐ দলটি থাকতো তা হলে পুলিশের প্রথম গুলিটি নিশ্চিত আসতো তার বুক লক্ষ্য করে।

আশ্চর্য, এরকম চিন্তা করার পরই হারীত তার পাঁচ বছরের নাতি নবাকে বুকে তুলে নিয়ে বেশ জোরে জোরেই পাগলাটে গলায় বললো, তোকে আমি একটা নিজস্ব বাড়ি দেবো। একদিন ঠিকই দেবো। তোমরা সবাই দেখে নিও।

অন্যরা অবাক হয়ে তাকাতে হারীত আরও গলা চিরে বললো, তোরা মনে রাসি আমরা কিছুতেই খতম হয় না। রক্তবীজের ঝাড় আমরা, আদাড়ে জঙ্গলে যেখানেই রাখুক আমাগো মাটি কামড়াইয়া থাকুম। এই নবা একদিন না একদিন ভারতের নাগরিক হবেই, ভোট দেবে?

॥ ২১ ॥

বৃষ্টির ছাঁট আসছে খুব তবু সুলেখা জানলা বন্ধ করবে না। জানলার গরাদে সে মুখ চেপে আছে,যেন সে তৃষিতের মতন মুখ-চোখে শুধু বৃষ্টি মাখছে না, শেষবারের মতন দেখে নিচ্ছে বাংলার মাটি। একটু আগে রানীগঞ্জ ছাড়িয়ে গেছে, আর দু'এক ঘন্টার মধ্যেই এই ট্রেন বাংলা ছাড়িয়ে বিহারে

ঢুকবে।

ওরা একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপে পেয়েছে, দরজা বন্ধ করে রাখলে আর অন্য কোনো যাত্রীর সঙ্গে সংশ্রব নেই। সুতরাং এর মধ্যে যে-কোন রকম ছেলেমানুষী করা যেতে পারে। বই থেকে চোখ তুলে ত্রিদিব মাঝে মাঝে সকৌতুকে লক্ষ করছেন সুলেখাকে। সুলেখার এমন ছটফটে ভাব তিনি আগে কখনো দেখেননি। যেন সে এই প্রথম কোনো দূর পাল্লায় ট্রেনে চেপেছে, মাঝে মাঝেই সে উচ্ছল হয়ে উঠছে বালিকার মতন।

একটা সেতুর ওপর দিয়ে যাবার সময় ট্রেটার গতি মন্থর হয়ে এলো, সুলেখা মুখ ফিরিয়ে বললো, এই দ্যাখো দ্যাখো, এক ঝাঁক বক কী রকম বসে আছে, কী সুন্দর।

ত্রিদিব হেসে বললেন, মনে হচ্ছে আমরা আবার হনিমুনে যাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা জানলার কাছ থেকে সরে এসে স্বামীর কণ্ঠলগ্না হয়ে তাঁর বুকে মুখ ঘষতে লাগলো। অনেকদিন এমনভাবে দিনের বেলা সে তার স্বামীর কাছ থেকে আদর চায়নি।

ত্রিদিব সুলেখার প্রগাঢ় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সুলেখার এই অস্থিরতার কারণ তিনি কিছুটা অনুমান করতে পারেন। সুলেখা নিজের মনের কাছেই অনেক কিছু চাপা দিতে চাইছে।

আসানসোর এসে পড়েছে, এখানে খাবার দেবে। সুলেখার পিঠে মৃদু চাপড় মেরে ত্রিদিব বললেন, এই ওঠো।

সুখেলা মুখ তুলে বললো, আমার দারুণ ভালো লাগছে, আজকের দিনটাও কি চমৎকার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

—দিল্লিতে কিন্তু গরম হবে। ওখানে দেরিতে বৃষ্টি নামে।

—দিল্লিতে আমরা ছাদে শোবো,অনেকেই শোয় শুনেছি, সত্যি?

—হ্যাঁ গরমকালে অনেকেই শোয়।

—আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে ঘুম আসে? পাশের বাড়ির ছাদ থেকে কি আমাদের ছাদ দেখা যাবে? আমাদের বাড়িটা কী রকম হবে?

—শুনেছিতো বাংলো ধরনের বাড়ি। সঙ্গে বাগান আছে, কিন্তু ছাদ আছে কিনা জানি না।

—আমি দিল্লিতে গিয়ে বাগান করা শিখবো। তুমি আমাকে গার্ডনিং-এর বই কিনে দিও। আমার মায়ের ফুল গাছের শখ ছিল, আমি কোনোদিন গাছটাছ লাগাইনি।

ত্রিদিব আবার হাসলেন, কয়েকদিন ধরে সুলেখার মুখে প্রায় সর্বক্ষণ দিল্লির কথা। দিল্লি যেন একটা ইউটোপিয়া, ওখানে সবরকম সুখ পাওয়া যাবে।

তিইদবের অফিস দিল্লিতে একটা ব্রাঞ্চ খুলছে, ত্রিদিবকে সেখানে ম্যানেজার হবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ত্রিদিব রাজি হননি। কলকাতায় তাঁর নিজস্ব বাড়ি, অনেকদিনের চেনা পরিবেশ, তাছাড়া সুলেখার কলেজের চাকরি আছে। নিজের চাকরি জীবনে বিশেষ উন্নতি করার দিকে ত্রিদিবের আগ্রহ নেই। তিনি নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকার মত মানুষ। নতুন জায়গায় নতুন অফিসের দায়িত্ব নেওয়া মানেই আবার অনেক নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয়, অনেক বেশি ব্যস্ততা।

সুলেখাও প্রথম শুনে উড়িয়ে দিয়েছিল। কলকাতার থিয়েটার, সিনেমা, সঙ্গীতের জলসা, এসব কি পাওয়া যাবে আর কোথাও? তাছাড়া কলেজে পড়াতে তার ভালো লাগে, সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দিল্লিতে শুধু হাউস ওয়াইফ হয়ে থাকতে রাজি নয় সুলেখা।

হঠাৎ এক সকালে সুলেখার মতের আমূল পরিবর্তন হলো। দিল্লি শহরের পঞ্চাশ রকম গুণপনা সে আবিষ্কার করে ফেললো, সে দিল্লিতেই যেত চায়,কলকাতায় আর একটুও ভালো লাগছে না। ত্রিদিবকে একপ্রকার সে জোর করেই রাজি করিয়েছে।

ত্রিদিব বুঝেছিলেন, কলকাতা থেকে পালাতে চাইছে সুলেখা। রাতুলের কাছ থেকে? রাতুলটা এখনো ছেলেমানুষ, হঠাৎ হঠাৎ যুক্তিহীন আবদার ধরে।

বিপত্নীক রাতুল যে হঠাৎ সুলেখার প্রতি বেশি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে তা ত্রিদিব জানেন। সুলেখার রূপ ও ব্যবহার দেখে পুরুষ মাত্রই মুগ্ধ হয়, এমনকি রিকশাওয়ালারাও তার কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নিতে চায় না। সুলেখার টানে অনেক বন্ধুরা তাঁর বাড়িতে আসেন, একথা ত্রিদিব বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এর মধ্যে খারাপ তো কিছু নেই। সুলেখার রূপ তো শুধু তার শরীরে নয়, তার চরিত্রে, তার ব্যবহারের মাধুর্যে। এই মাধুর্যের ভাগ অনেকেই নিতে

পারে।

কিন্তু সুলেখার প্রতি যারা মুগ্ধ হয়, তারা সম্পর্কটাকে সহজ বা প্রকাশ্য রাখতে পারে না, গোপনীয়তার দিকে নিয়ে যেতে চায় কেন, এটাই ত্রিদিব বুঝতে পারেন না। এইসব মানুষদের কি সম্মান জ্ঞান নেই? এরা সুলেখার শরীরটা দেখে, মন বোঝে না?

রাতুলের পাগলামি, দুপুরে দেখা করতে আসা, গভীর রাত্রে টেলিফোন, এসব টের পেয়েও ত্রিদিব একটিও কথা বলেননি, সুলেখার ওপর তাঁর অগাধ ভরসা, সুলেখা যা চাইবে, তাই-ই হবে। এমনকি সুলেখা যদি রাতুলকে ঘনিষ্ঠ প্রশ্রয় দেয়, তাহলেও তিনি ধরে নিতে রাজি আছেন যে রাতুল ওরকম প্রশ্রয় পাবার যোগ্য।

কিন্তু এবারে রাতুলের জন্য সুলেখা কলকাতাই ছেড়ে চলে যেতে চাইলো? এতখানি বিরাগ তো আগে কখনো ঘটেনি।

হাওড়া স্টেশনে রাতুল, শাজাহান ওদের বিদায় জানাতে এসেছিল। রাতুলে কেমন যেন বিহ্বল অবস্থা। ত্রিদিবরা যে কলকাতার পাট তুলে দিয়ে দিল্লি চলে যাচ্ছেন, এটা সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। সুলেখার চোখে চোখ ফেলে সে প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুযোগ পায়নি। এক একবার মনে হচ্ছিল , সে যেন সুলেখার হাত চেপে ধরে সরাসরি কিছু জানতে চাইবে, কিন্তু শাজাহান সব সময় ছিল তার পাশেপাশে। শাজাহানও জানে, কিংবা অনেকটাই অনুমান করেছে। শাজাহানও সুলেখার খুব অনুরাগী, সেইজন্য সে রাতুলকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়।

তাঁর স্ত্রীকে কেন্দ্র করে যে অন্য পুরুষদের মনে মনে নানারকম আবেগ-প্রবাহ চলছে তা অনুভব করে ত্রিদিব বেশ কৌতুকই বোধ করছিলেন। অন্য দম্পতিদের জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটে কি না তা কে জানে। মানুষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা কম, তবে উপন্যাসে ঘটে। অধিকাংশ উপন্যাসই তো ত্রিভুজ প্রণয়ের। বিবাহিত নারী-পুরুষদের প্রেম কাহিনী বাংলায় বিশেষ লেখা হয় না, কিন্তু ইওরোপিয় ভাষায় অজস্র। ওদের বিবাহ -বন্ধনটাও যে অনেক শিথিল।

আসানসোলে যখন কুপের দরজা খোলা হয়েছে, সেই সময় একজন দীর্ঘকায় পুরুষ উঁকি মেরে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, ত্রিদিববাবু, ডাব খাবেন?

ত্রিদিব সন্ত্রস্ত বোধ করলেন। হাওড়া স্টেশনে শাজাহান এই লোকটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, শাজাহানের ব্যবসার সঙ্গে এই ব্যক্তিটি কোনো সূত্রে যুক্ত, একই ট্রেনে দিল্লি যাচ্ছে। লোকটির নামও ভুলে গেছে ত্রিদিব, কী যেন মজুমদার।

ত্রিদিব বললেন, না ডাব খাবো না।

লোকটি জোর দিয়ে বললেন, খান না, বেশ ভালো ডাব, শস্তা বৌদি, আপনি খাবেন নিশ্চয়ই, এই ডাব, এদিকে এসো—

লোকটি হাঁকডাক করে একটা ছোকরা ডাবওলাকে একেবারে ভেতরে নিয়ে এলো। সুলেখার হাতে নিজে ডাব তুলে দিল, ত্রিদিবের দাম দেবার ক্ষীণ প্রস্তাব উড়িয়ে দিল এককথায়। তারপর ডাবওয়ালাকে বিদায় করে নিজে জেঁকে বসলো সেখানে।

একটু বাদেই ত্রিদিব আর সুলেখার জন্য খাবারের ট্রে এলো।

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করলেন মিঃ মজুমদার আপনি?

লোকটি বললো আপনারা খান-না, খান, আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি, সঙ্গে টিফিন আছে।

তৃতীয় ব্যক্তির সামনে, বিশেষত অচেনা কোনো লোকের সামনে খাওয়াটা ত্রিদিবের ঘোরতর অপছন্দ। তা হলে আর কুপে নেবার প্রাইভেসি রইলো কোথায়?

ত্রিদিব হাত গুটিয়ে বসে নিখুঁত ভদ্র গলায় প্রশ্ন করলেন। আপনাকে বুঝি প্রায়ই দিল্লি যাতায়াত করতে হয়, মিঃ মজুমদার।

—হ্যাঁ দাদা। মাসে অন্তত একবার তো বটেই। আমায় নাম ধরে ডাকবেন, আমার নাম বাসুদেব, আমার এক কাকা সত্যব্রত মজুমদার, করপোরেশনের কাউন্সিলারের নাম না জানা যেন তাঁরই অজ্ঞতা।

—আপনারা তো এই প্রথম দিল্লি যাচ্ছেন শুনলুম। কোনো অসুবিধে হলে আমায় বলবেন। বৌদি, বাড়ি সাজাবার জন্য যদি আপনার ফার্নিচার লাগে, আমার কনট প্লেসে ভালো দোকান চেনা আছে, রাষ্ট্রপতি ভবনে সাপ্লাই দেয়..

সুলেখাও খাবারে হাত দেয়নি, সে ত্রিদিবের স্বভাব জানে। সে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলো আপনি বুঝি ট্রেনের খাবার খান না?

— না বৌদি, আমার ঠিক ডাইজেস্ট হয় না, বড্ড মশলা দেয় তো। আমাকে ঘন ঘন ট্রাভেল করতে হয়।

যতই ইঙ্গিত দেওয়া হোক, লোকটি উঠবে না। ভদ্রতার প্রতিদান দেবার মতন মানুষ আজকাল খুঁজে পাওয়া শক্ত।

এর মধ্যে কামরার দরজার কাছে আর একটি লোক উঁকি মেরে বললো, বাসুদেব দা, আপনি এখানে? আপনাকে ওরা সবাই খুঁজেছে, তাস খেলার জন্য।

বাসদেব সোৎসাহে বললো, আরে সুখেন, এসো, এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

সুখেন নামের লোকটি সুলেখার দিকে একবার তাকিয়েই মন্ত্রমুগ্ধের মতন ভেতরে চলে এলো। এতটুকু ছোট কুপেতে আর দাঁড়াবারও জায়গা নেই। এই স্থান অসঙ্কুলানের একটা সুবিধে পাওয়া গেল, আর একজন তাস খেলোয়াড় এই দু'জনকে খুঁজতে এসে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেল না, তাই বাসুদেব ও সুখেনকে সে জোর করে ডেকে নিয়ে গেল।

সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে উঠে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল দরজায়। ত্রিদিব হো হো করে হেসে উঠলেন।

সুলেখা বললো, তুমি হাসছো? খাবারের থালাটা একবারও ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করেনি তোমার?

ত্রিদিব বললেন, একবার প্যায়ের কাছে নামিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়েছিল বটে। এককেই তো এরা ঠাণ্ডা খাবার দেয়, আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

—আর দিল্লি পৌঁছোবার আগে একবারও আমি দরজা খুলবো না। এই লোকটাকে তুমি আমাদের দিল্লির বাড়ির ঠিকানা দিও না, প্লীজ।

—শাজাহানের কাছ থেকেই জেনে যাবে। শাজাহান চিঠি লিখতে বলেছে।

—দিল্লিতে গিয়েও আমরা বাঙালীদের হাত থেকে রেহাই পাবো না।

—অবাঙালীরা এর থেকে বেশি ভদ্র হবে বলছো? আশা করা যাক।

সুলেখা সত্যিই আর কুপের দরজা খোলা রাখলো না দিল্লি পর্যন্ত। স্টেশনে ত্রিদিবের কম্পানি গাড়ি এসেছে, বাসুদেবের দলবল এসে ধরবার আগেই ওরা উঠে পড়লো সেই গাড়িতে।

কম্পানি থেকে ওদের জন্য সুন্দর একটি বাড়ি ভাড়া করে রেখেছে, কালকাজীতে একটি ছিমছাম বাংলো। সামনে পেছনে অনেকখানি বাগান, ঘেঁষাঘেঁষি করা আর কোনো বাড়ি নেই। ত্রিদিবের কম্পানিটির মালিক আগে ছিল সাহেবরা, এখন একটি মাড়োয়ারি গোষ্ঠী কিনে নিয়েছে কিন্তু সাহেবি কায়দা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ম্যানেজারের বাংলোয় বাবুর্চি, দারোয়ান এমনকি মালি পর্যন্ত আছে।

এখানে শুরু হলো সুলেখার অন্যরকম জীবন।

সুলেখা আগে কখনো দিল্লি আসেনি, তাই প্রথম দিকে দ্রষ্টব্য প্রচুর। ত্রিদিব অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো খুবই, কিন্তু শনিবার রবিবার সে অফিসের কাজ বাড়ি পর্যন্ত টেনে আনে না। ঐ দিন ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে খাবার-দাবার থাকে, হুমায়ুনস টুম্ব, কুতুব মিনার, লাল কেল্লা, জুম্মা মসজিদ এইসব জায়গায় সারাদিন কাটিয়ে দেয়। প্রত্যেক সপ্তাহান্তেই পিকনিক।

কলকাতার জন্য মন কেমন করে না সুলেখার। দিল্লিতেও ছবির এক্সিবিশান হয়, হলিউডের ফিল্ম কলকাতার চেয়েও আগে দেখা যায়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরও বসে। দিল্লির লোক যখন তখন কারুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় না।

কলকাতার সঙ্গে এখন যোগাযোগ চিঠিপত্রে। সুলেখা চিঠি লেখে, অনেক চিঠি আসে।

মমতা আর প্রতাপ দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। প্রতাপ কৌতুক করে লিখেছেন যে আদালত থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝে তিনি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সুলেখার হাতে তৈরি চা খেতেন, এখন আর তিনি কোনো চায়েই স্বাদ পান না। তালতলার বাড়িতে এখন ত্রিদিবের ছোট বোনরা এসে আছে, সুতরাং বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের কোনো চিন্তা নেই। সুলেখার দু'তিনটি ছাত্রীও খুব কাতর চিঠি পাঠিয়েছে।

রাতুলের চিঠি আসে সপ্তাহে অন্তত তিনখানা। রাতুলের হাতের লেখা চেনে সুলেখা, সে ওর একটি চিঠিও খোলে না, খাম শুদ্ধুই ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

একবার তো ভেবেছিল, দিল্লিতে এসে রাতুলকে সব কথা বুঝিয়ে চিঠি লিখবে। কিন্তু রাতুলকে

সে ভয় পায় রাতুল যেন অন্ধ হয়ে গেছে, সে কোনো যুক্তি বুঝবে না। একজন যদি বারবার না না বলে, তবু আর একজন জোর করে প্রেম, ভালোবাসা চাইতে পারে? না, একে প্রেম বা ভালোবাসা বলে না, রাতুল চায় জোর করে তাকে অধিকা করতে। রাতুলে কথা ভাবলেই এখন সুলেখার ধিক্কার এসে যায় নারী জন্মে।

ত্রিদিবকে এখানে প্রায়ই যেতে হয় ট্যুরে, কানপুর, মীরাট, আগ্রায়। কলকাতার তুলনায় তাকে খাটতে হচ্ছে অনেক বেশ। তার যেটা সবচেয়ে প্রিয় শখ, বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়া, তার জন্য সে সময়ই পায় না এখন। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। সে সব সময় উৎফুল্ল থাকে সুলেখাকে খুশী দেখলেই তার ভালো লাগে।

শাজাহান চিঠি লিখবে বলেছিল, কিন্তু চিঠির বদলে মাস দেড়েক বাদে সে নেজেই একদিন এসে উপস্থিত হলো।

তখন রাত সাড়ে আটটা, পরদিন ভোরে তাকে লখনৌ যেতে হবে। সুলেখা আর ত্রিদিব তখন সবে মাত্র ডিনার খেতে বসেছে। এখন তাদের রাত্রির খাবারে নাম ডিনার, কারণ বাবুর্চি প্রতি রাতে ঠিক সাড়ে আটটার সময় এসে বলে, মেমসাব, ডিনার লাগা দয়িা যায়?

শাজাহানকে দেখে তারা খুব খুশী হলো। সে কিছু খেয়ে এসেছে বললেও জোর করে তাকে বসানো হলো ডিনার টেবিলে। তারপর শুরু হলো কলকাতার গল্প।

শাজাহান এক সময় বললো, সুলেখা, তোমরা চলে এসেছো, কলকাতা একেবারে কানা হয়ে গেছে।

সুলেখা হেসে বললো, তাই নাকি। এরকম সুন্দর মিথ্যে কথা শুনতেও ভালো লাগে।

শাজাহান বললো, সত্যি বলছি। এখন সন্ধেবেলাগুলো কোথায় যাবো, ভেবেই পাই না। মার্থা গ্রাহামের নাচের টিম এলো, কার সঙ্গে যাবো, কে বুঝবে, এই সব চিন্ত করে আর যাওয়াই হলো না। আনসান্ লোকের সঙ্গে যাওয়া যায় না। একলা যেতেই ইচ্ছা করে না।

–আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যান না কেন?

–জানো তো, সে এসব ওয়েস্টার্ন গান বাজনার কোনো মজা পায় না। বাল-বাচ্চাদের ফেলে যেতেও চায় না কোথাও। যাক, আমি তো বিজনেসের জন্য মাঝে মাঝে দিল্লি আসি, এবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আরো ফ্রিকোয়েন্টলি আসবো।

ত্রিদিব জিজ্ঞেষসকরলেন, তোমার সঙ্গে দিল্লি কী বিজনেস কানেকশান? তোমরা তো চায়ের ব্যবসা করো, চায়ের অকশান হয় লন্ডনে, আর কলকাতা পোর্ট থেকেই বালক চা চলে যায় লন্ডনে। এর মধ্যে দিল্লি আসছে কোথা থেকে?

শাজাহান চোখ টিপে বললো, পাকিস্তান? পাকিস্তান।

এরপর শাজাহান যে কাহিনীটি বললো, সেটি চমকপ্রদ। পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট অঞ্চলে যদিও যথেষ্ট চা হয়, তবু পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন ব্যবসাদার ভারতীয় চা কেনে। সেগুলো তারা কোথায় বিক্রি করে তা কে জানে। করাচীর একটি বিখ্যাত পরিবারের সঙ্গে দিল্লির ভগৎরাম নামে এক ব্যবসায়ীর কয়েক কোটি টাকার চা ও তামাকের ব্যবসা আছে। ব্যবসাটা ঠিক প্রকাশ্য নয়, তবে নরম সীমান্ত দিয়ে প্রায় দিন দুপুরেই মালপত্র চালান যায়। সে সব ব্যবস্থা আছে।

ত্রিদিব সবিস্ময়ে বললেন, দু'দেশে এখন এত টেনশান চলছে, এর মধ্যেও এক কট্টর ওয়েস্ট পাকিস্তানী ফ্যামিলির সঙ্গে দিল্লির মাড়োয়ারির ব্যবসা?

শাজাহান বললো, আরে ভাই, বিজনেসের ব্যাপারে ধর্ম-টর্ম কিছু না, দেশ-জাতি কিছু না। ভগৎরাম নিরামিষ খায় আর হররোজ দু'বেলা হনুমানজীর পুজা করে। ওদিকে করাচীর আসফাকউল্লা দিনে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে। কিন্তু টাকার কোনো জাত নেই।

ত্রিদিব ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো, শাজাহান, তুমি এর সঙ্গে জড়িত। তাই আমি চিন্তা করছি। এর মধ্যে কোনোরকম বে-আইনী লেডি ডিল নেই তো

শাজাহান তার কাঁধ চাপড়ে বললো, আরে না রে ভাই, আমি চা আর তামাক সাপ্লাই করি। আর আমি মুসলমান বলে ভগৎরাম মাঝে মাঝে পাকিস্তানের সঙ্গে বিজনেসের সময় আমার নাম ইউজ করে। করাচীতে আমার রিলেটিভ্‌স আছে, আমি বছরে একবার যাই কন্ট্রাক্ট পাকা করতে।

কথা কথায় রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। ত্রিদিব দু'একটা হাই গোপন করলো। সপ্তাহের মাঝখানের দিনগুলো তাদের তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া অভ্যেস হয়ে গেছে। তাছাড়া কাল তাকে ভোর সাড়ে চারটেয় উঠতে হবে। কিন্তু সে তো শাজাহানকে চলে যাবার জন্য ইঙ্গিত করতে পারে না।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলো, আপনি দিল্লিতে এসে কোথায় উঠেছেন?

শাজাহান জানালো যে ডিফেন্স কলোনিতে তার এক চাচার বাড়ি আছে। বেশ বড় বাড়ি, প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে, সেই জন্য হোটেলের বদলে সে ওখানেই এসে ওঠে।

–সে জায়গাটা কত দূরে?

শাজাহান বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অনেক দূর এবার যেতে হবে, তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে এত ভালো লাগছিল যে সময়ের কথা মনেই ছিল না।

ত্রিদিব ব্যস্ত হয়ে বললো, বসো তুমি যাব কী করে? তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে?

শাজাহান জানালো যে সে দিল্লিতে এসে ট্যাক্সিতেই ঘোরাফেরা করে। কিন্তু গতকালই এসে সে এক কাহিনী শুনেছে যে এক মাসের মধ্যে রাত দশটার পর তিনজন ট্যাক্সি প্যাসেঞ্জার ছুরিতে খতম হয়েছে। রাত্রে দিল্লির ট্যাক্সি নিরাপদ নয়। সেইজন্য সে স্কুটারে যেতে চায়। ত্রিদিবের দারোয়ান একটা স্কুটার ডেকে দিতে পারবে না?

ত্রিদিবের অফিসের গাড়ি এখানে থাকে না। সেটা যেন তারই অন্যায়, সে জন্য সে সংকুচিত ভাবে দারোয়ানকে পাঠালো একটা স্কুটার ডেকে আনার জন্য। দারোয়ান কুড়ি মিনিট বাদে ফিরে এসে বললো, এ পাড়ায় এতরাতে স্কুটার পাবার কোনো আশা নেই।

আবার দাঁড়িয়ে পড়ে শাজাহান বললো, তবে তো ভারি মুশকিল হলো। তবে কি টেলিফোনে একটা ট্যাক্সিই ডাকবে?

ত্রিদিব আর সুলেখা চোখাচোখি করলো। ত্রিদিবের দৃষ্টিতে মিনতি।

সুলেখা বললে, তা হলে আপনি রাত্তিরটা এখানেই থেকে যান না। আমাদের একটা গেস্ট রুম আছে।

শাজাহান যেন এই প্রস্তাবের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে আগ্রহের সঙ্গে বললো, তা হলে তো খুবই ভালো হয়। আরও অনেকক্ষণ তোমাদের সঙ্গে গল্প করা যাবে।

ত্রিদিব আর সুলেখা আবার চোখাচোখি করলো।

॥ ২২ ॥

আদালতে প্রতাপ একটি সম্পত্তি ঘটিত বিবাদের সওয়াল শুনছিলেন। মামলাটি অতি বিরক্তিকর, দুই ভাইয়ের পৈতৃক জমি-জায়গার শরিকানা নিয়ে গণ্ডগোল, মামলা চলছে প্রায় সাগে তিন বছর ধরে।

এক এক সময় প্রতাপের মনে হয়, আগেকার কাজীর বিচারই বোধ হয় ভালো ছিল। এই মামলায় প্রথম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বড় ভাইটি ছোট ভাইকে ঠকাচ্ছে। প্রতাপের ইচ্ছে করে, বড় ভাইটির কানধরে দুই থাপ্পড় মেরে বলতে এই হারামজদা, দে তোর দখল করা সম্পত্তির অর্ধেকটা ছোট ভাইকে দিয়ে দে।

কিন্তু আইনের কূট কচালিতে এই রকম সমাধান তো সম্ভব নয়। বছরের পর বছর মামলা গড়াবে, উকিলদের পকেট ভারি হবে।

মামলা চলার মধ্যে প্রতাপের পেশকার তাঁর হাতে একটা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিল। অতি জরুরি তার বার্তা পাঠিয়েছেন দেওঘর থেকে ভস্তাদজী। "ইয়ের মাদার ওয়ান্টস টু সী ইউ। কাম শার্প বিশ্বনাথ।"

প্রতাপ অতীব বিস্মিত হলেন। প্রথম কথা, বাড়িতে ন পাঠিয়ে এটা আদালতের ঠিকানায় পাঠানো হলো কেন? দেওঘরের চিঠিপত্র সব বাড়িতেই আসে। দ্বিতীয় কথা, "ইয়োর মাদার ওয়ান্টস টু সী ইউ" মানে কী? মা খুব অসুস্থ। আগের চিঠিতেও বিশ্বনাথ লিখেছেন যে মা ভালো আছেন। মা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই কথাই তো জানানো উচিত ছিল। মা শুধু দেখা করতে চেয়েছেন বললে কি ততটা গুরুত্ব বোঝায়? তার জন্য আর্জেন্ট টেলিগ্রাম?

গত পুজোয় অবশ্য দেওঘর যাওয়া হয়নি, মা'র সঙ্গে দেখা হয়নি অনেকদিন।

যথারীতি মামলাটির আর একটি তারিখ ফেলে প্রতাপ উঠে গেলেন নিজের চেম্বারে। তাঁর চিত্ত খুব উতলা হয়ে গেছে। মা দেখা করতে চেয়েছেন। প্রায় দেড় বছর মায়ের কাছে যাওয়া হয়নি, এজন্য একটা প্রচণ্ড অনুতাপবোধ তাঁকে দংশন করতে লাগলো।

শরীর খারাপের জন্য প্রতাপ কিছুদিন আগেই ছুটি নিয়েছেন, এখন ছুটি পাওয়ার অসুবিধে আছে। তবু তাঁকে যেতেই হবে।

মাসের ছাব্বিশ তারিখ, হাতে বিশেষ টাকা পয়সা নেই। দেওঘরে যেতে গেলে কিছু কেনাকাটি করতেই হয়, ওস্তাদজী একবার লিখেছিলেন যে বাড়িটা না সারালে কোনদিন কড়িকাঠ খসে-পড়বে, তা ছাড়া মায়ের চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু টাকা হাতে রাখা দরকার। এত টাকা এখন কোথায় পাওয়া যাবে?

বিমানবিহারীর কাছ থেকে অনেক অগ্রিম নেওয়া আছে, এখন আর চাওয়া যায় না। যদিও বিমানবিহারী ঘুণাক্ষরে জানতে পারলেই পকেটে গুঁজে দেবেন টাকা।

অন্তত হাজার খানেক টাকা তো দরকারই। কে দেবে? প্রতাপের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স এখন দুশো-আড়াইশোর বেশি নয়। এত বড় সংসারের ব্যয়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, মাইনের টাকাতে কিছুতেই কুলোয় না। উপরি রোজগার বলতে বইয়ের অনুবাদ, কিন্তু এখন তার চাহিদাও কমে গেছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সবরকম শিক্ষা চালু হবে বলে একটা রব উঠেছিল, সেটা কেন যেন ধামা চাপা পড়ে গেল, এখন চতুর্দিকে গজাচ্ছে স্কুল মিডিয়াম স্কুল।

প্রতাপ লাখ লাখ টাকার মামলার নিষ্পত্তি করেন, এখন তিনি নিজেই এক হাজার টাকার চিন্তায় কাতর। খুব সংকটে পড়ে মমতার দু'একখানা গয়না বিক্রি করতে হয়েছে, কিন্তু নিজের মায়ের চিকিৎসার জন্য মমতার কাছে হাত পাততে তাঁর কিছুতেই ইচ্ছে হলো না। এই একটা ব্যাপার আছে, যা মুখে কোনোদিন বলা হয়নি, কিন্তু বাস্তবে কঠিন সত্য। মমতা তাঁর খুবই আপন, তুব প্রতাপ লক্ষ করেছেন, যখন নিজের মা বা দিদি বা দেওঘরের দিদি ওস্তাদজীর ব্যাপারে কখনো কোনো খরচ পত্রের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, তখনই মমতার সঙ্গে সে সব আলোচনা করতে প্রতাপ সঙ্কোচ বোধ করেন। মমতা যেন তখন অন্য দলের লোক হয়ে যান। যদিও মমতা কৃপণ নন মোটেই, ননদ বা শাশুড়ির সঙ্গে তাঁর ঝগড়াও নেই, তবু যেন কিসের একটা বাধা...

প্রতাপ খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তিনি একদা এক সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন, এখনও অর্থ সঙ্কটে পড়লে তাঁর মেজাজ গরম হয়ে যায়। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে হলেও তিনি এক হাজার টাকা হেসে খেলে যে কোনো কন্যা দায়গ্রস্ত পিতাকে দান করতে পারতেন। অথচ, আজ তাঁর মাতৃদায়, তিনি টাকা জোগাড় করতে পারছেন না।

বেশি দেরি করা যাবে না, একটা কিছু ব্যবস্থা করতে ই হবে। প্রতাপ শুনেছেন, এই আদালতেই অনেক টাকা ধার দেয়। বিপন্নদের ঋণ দিয়ে চড়া হারে সুদ নেয়। প্রতাপের অধস্তন কর্মচারিরা কেউ কেউ তাঁর তুলনায় অনেক গুণ অবস্থাপন্ন।

তিনি তাঁ পেশকার রতনমণি নাগকে ডেকে পাঠালেন। রতনমণির চিমসে চেহারা, ধুতির ওপর হাফ শার্ট পরে। চোখের দৃষ্টিতে সব সময় একটা ভয় ভয় ভাব। কিন্তু প্রতাপ জানেন, এই মানুষটি অতিশয় ধূর্ত।

প্রতাপ বিনীতভাবে বললেন, নাগবাবু, আমার মায়ের খুব অসুখ, কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে, শুনেছি এখানে কারা যেন টাকা ধার দেয়..

প্রতাপের কথা শুনে রতনমণি চোখ চক চক করে উঠলো। সে বললো, হ্যাঁ, সার, ব্যবস্থা হয়ে যাবে স্যার, আপনার কত টাকা লাগবে, কবে লাগবে বলুন। এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। টাকা ঠিক বাড়িতে পৌঁছে যাবে।

প্রতাপ রতনমণির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এই লোকটি কী ইঙ্গিত করছে তা বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধে হলো না। টাকা বাড়িতে পৌঁছে যাবে, এর মানে তো অতি সরল।

প্রতাপ এক মুহূর্ত ভাবলেন, তিনি আর কত ঋণের বোঝা টানবেন? তিনিও এবারে একটুর জন্য রাজি হয়ে গেলে ক্ষতি কী? সারা দেশ জুড়েই তো এই কারবার চলছে। আণ্ডার হ্যান্ড মানি, ব্ল্যাক মানি, গ্র্যাফট? প্রতাপ কি কোনোদিনই এসব দমন করতে পারবেন? কোনো আশা নেই। ইফ ইউ ক্যান্‌ট বীট দেম, জয়েন দেম।

পর মুহূর্তেই প্রতাপ বংশ গরিমায় অহংকারী হয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, টাকাটা আমার আজ, এক্ষুনি দরকার। আটশো থেকে হাজার। যা সুদ লাগে আমি দেবো। সুদ আর প্রিন্সিপালের খানিকটা আশ সামনের মাস থেকে আমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।

প্রতাপের কণ্ঠস্বর শুনেই রতনমণি খানিকটা সাবধান হয়ে গিয়ে বললো, আটশো হাজার অত টাকা তো স্যার এক্ষুনি জোগাড় করা শক্ত? তবু আমি দেখছি চেষ্টা করে।

–দেখুন। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে জানাবেন। আমার খুবই দরকার। এখানে না পেলে আমাকে অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে হবে।

প্রতাপের শরীরে একটা অস্থিরতা জেগে উঠলো। যেন দেরি হয় যাচ্ছে খুব। মায়ের সত্যি কী হয়েছে তার কেন একটু ইঙ্গিত দেননি ওস্তাদজী? যদি মায়ের সঙ্গে আর দেখা না হয়। অঅজ রাত্তিরেই ট্রেন আছে।

দারোয়ানরাও নাকি যখন-তখন হাজার দু'হাজার টাকা ধার দিতে পারে। ওরা বাড়ি ভাড়া দেয় না, ছাতু খেয়ে টাকা জমায় আর দেশের বাড়িতে টাকা পাঠায়। রতনমণি যদি টাকা জোগাড় করতে না পারে, প্রতাপ দারোয়ানদের কাছে চাইবেন? নিজের মুখে বলবেন কী করে? আদালিকে দিয়ে বলাবেন? তা প্রতাপ মুখ ফুটে বলতে পারবেন না। অহংকার না খেয়ে শুকিয়ে যদি মরতে হয় কখনো, তবু প্রতাপ এই অহংকার ছাড়তে পারবেন না।

রতনমণি একটু পরে এসে বললো, নশো টাকা জোগাড় করা গেছে স্যার।

জোগাড় শব্দটির ওপর সে জোর দিল হয়তো টাকাটা তার নিজেরই।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক আছে ওতেই হবে। সুদ কত?

–সে কথা এখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনারা বিশেষ দরকার বলছেন, এখন কাজ চালিয়ে নিন।

প্রতাপ গম্ভীর ভাবে বললেন, ওভাবে আমি কারুর কাছ থেকে টাকা নিতে পারবো না। আপনি হ্যান্ড নোট তৈরি করে আনুন, আমি তাতে সই করে তারপর টাকা নেবো।

টাকাটা হাতে পাবার পর প্রতাপ সত্যিকারের কৃতজ্ঞ বোধ করলেন রতনমণির ওপর। আর কারুর কাছে হাত পাতার গ্লানি তো তাঁকে সহ্য করতে হলো না?

বাড়ি ফিরে খবরটি প্রকাশ করতেই মমতা বললেন, তুমি একা যাবে না, না তা হবে না, তোমার নিজেরই শরীর ভালো না।

প্রতাপ মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মমতা লক্ষ করেছেন, ইদানীং প্রতাপের আহারে রুচি নেই, সেটাই তাঁর শরীর খারাপের লক্ষণ। আগে প্রতাপ যাই-ই খেতেন তৃপ্তি করে খেতেন। মুসুরির ডালের বদলে একদিন ভাজা মুগের ডাল হলেই বলতেন বাঃ। বড় ভালো হয়েছে তো, আর একটু দাও। সেই মানুষ এখন কী রান্না হলো না হলো তা গ্রাহ্যই করেন না।

কিন্তু কে যাবে? মমতা যেতে পারেন না, মুন্নির পরীক্ষা আছে সামনের সপ্তাহে। বাবার সঙ্গে বাবলুরই যাওয়া উচিত, কিন্তু কোথায় বাবলু? সে কোনোদিনই আটটার আগে সকাল সন্ধেবেলা কিছুতেই পড়তে বসে না। তার পড়াশুনোর ধরনটাই অন্য রকম। যেদিন তার ইচ্ছে হবে, সে সারা রাত জেগে পড়বে। পরীক্ষার আগেই তার এরকম জেদ চাপে। রেজাল্ট তো খারাপ করে না।

এখন বাবলু কোথায় আছে, তাকে খবর দেবার উপায় নেই। প্রতাপও বাবলুকে সঙ্গে নিতে চান না। প্রতাপ কবে ফিরতে পারবেন ঠিক নেই, কলকাতার বাড়িতে বাবলুর থাকা দরকার। বাড়িওয়ালাদের অত্যাচার ইদানীং খুব বেড়েছে। বাড়িতে একজনও পুরুষ মানুষ না থাকলে ওরা আরও পেয়ে বসবে।

সুপ্রীতি বললেন, আমি তোর সঙ্গে যাবো, খোকন। মাকে আমি অনেকদিন দেখিনি। প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। সুপ্রীতি তাঁর মায়ের বড় মেয়ে, প্রথম সন্তান, তাঁকে দেখলে মায়ের ভালো লাগবে। তা ছাড়া, আর যদি কখনো দেখা না হয়?

এর পর সুপীতি একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, তুতুলকেও নিয়ে যাবো।

এত বড় হয়েছে তুতুল, তবু তার সম্পর্কে ভয় পান সুপ্রীতি। মেয়েটা শুধু মেডিক্যাল কলেজে যায় আর ফিরে আসে, এ ছাড়া যেন তার আর কোনো জীবন নেই আগে গান শুনতে কত ভালোবাসতো, এখন গান শোনে না। নিজে থেকে কারুর সঙ্গে একটা কথাও বল না। সুপ্রীতির সব সময় আশঙ্কা হয়, বাল্‌ব ফিউজ হয়ে যাবার মতন, এ মেয়েটা হঠাৎ যদি একদিন মরে যায়?

এ প্রস্তাবও প্রতাপের পছন্দ হলো। ট্রেন ভাড়া বেশি লাগবে, তবু তুতুলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভালো। সে ডাক্তারির অনেকখানি জানে, সে মায়ের চিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারবে। তা ছাড়া প্রতাপ

তুতুলের সঙ্গে ভালো করে কথাবার্তা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন কয়েকদিন ধরেই।

তুতুল কিন্তু যেতে রাজি হলো না, তার কলেজ খোলা, সে এখন কী করে বাইরে যাবে? পড়াশুনোই তো তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। একদিনের জন্যও সে কলেজ কামাই করে না।

প্রতাপ তার আপত্তি শুনলেন না। রীতিমতন ধমকের সুরে তিনি বললেন, তোর যদি জ্বর হতো খুব অসুখ করতো, তা হলেও তুই কলেজে যেতি? কিংবা আমি যদি কাল হঠাৎ মারা যাই, তাহলেও তুই কাল কলেজে যাবি?

সুপ্রীতিও অনেক করে মেয়েকে বোঝাতে চাইলেন, তুতুল ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে কোনো কথার উত্তর দেয় না।

প্রতাপ শেষ আদেশ জারি করলেন, আর কোনো কথা শুনতে চাইনা না। ওকে যেতেই হবে। আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে, তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নে।

কিছু জিনিসপত্রের কেনাকাটির জন্য প্রতাপ বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছেন, সেই সময় সুপ্রীতি একটা একশো টাকার নোট দিতে এলেন তাঁকে।

প্রতাপ বললেন, এটা কী হবে? টাকা আমার কাছে আছে যথেষ্ট।

সুপ্রীতিজোর দিয়ে বললেন না, খোকন আমাদের দু'জনের টিকিট আরও অনেক খরচপত্র আছে, এটা তুই রাখ।

প্রতাপ বললেন, দিদি এমনভাবে আমাকে বলো না, আমার মনে লাগে। যদি হাত-পা ভেঙে কখনো অথর্ব হয়ে পড়ি, তখন হয়তো আর কিছুই পারবো না। ও টাকাটা তোমার সঙ্গে রাখো, পরে লাগলে দেখা যাবে।

বরানগরের বাড়ি থেকে এক সময় সুপ্রীতি কিছু টাকা পেতে শুরু করেছিলেন, তা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। আর একটি মামলা চাপিয়েছে অন্যকে শরিক। এখন সব মিলিয়ে তিন চারটি বেশ জটিল মামলা, প্রতাপের ধারণা, ঐ মামলা করতে করতেই সব কটি শরিক সর্বস্বান্ত হবে, ঐ বাড়ি থেকে তাঁর দিদির আর কিছু পাওয়ার আশা নেই। সুপ্রীতিও আর মামলার ঝঞ্ঝাটে যেতে চান নি।

প্রতাপ জানেন, দিদির গয়নাও সব শেষ হয়ে গেছে। তবে তুতুল শিগগিরই ডাক্তারি পাশ করবে, ঐ মেয়েই তো দিদির শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

এরই মধ্যে মমতা বাবলুর জন্য উদ্বেগ বোধ করতে লাগলেন। ছেলেটা কোথায় থাকে, কাদের সঙ্গে মেশে, তাই বা কে জানে। তার বাবা একটা দুঃসংবাদ পেয়ে দেওঘর চলে যাচ্ছেন, ছেলেটা সে কথা জানলোই না। বাবলু তো ওঁদের অন্তত ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে পারতো। আজাকাল বাবলু বাড়ির কোনো খবরই রাখে না। শুধু খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক।

প্রতাপ বেরিয়ে যেতে তিনি মুন্নিকে বললেন, একবার দেখে আসবি নাকি, মুন্নি তোর ছোড়দা অলি-বুলিদের বাড়িতে আছে কি না?

মুন্নি এখন একা একা স্কুল যায়। কালীঘাটা থেকে ভবানীপুর সে যেতে পারে রাস্তা চিনে, খুব দূর তো নয়।

কিন্তু মুন্নি বললো, ছোড়দা ওখানে বিকেলবেলা থাকে না।

মমতা বিরক্ত হয়ে বললেন, তাই কী করে জানলি? তোকে একবার দেখে আসতে বলছি, তুই যাবি কিনা বল্।

মুন্নি বললো, মা তুমি সব সময় আমাকে বকো। আমি বলছি ছোড়দা বিকেলবেলা ওখানে যায় না। তবু তুমি আমাকে জোর করে পাঠাবে?

–তুই কী করে জানলি, সেই কথাটা আমাকে বল

–ছোড়দা ওর বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে, আমি শুনেছি। সায়েন্স কলেজ থেকে বেরিয়ে ছোড়দা মানিকতলায় কোথায় যেন যায়। সেখানে অনেকক্ষণ থাকে। ছোড়দা সেখানে কাকে যেন পড়ায়।

–পড়ায়? ওকে যে টিউশানি করতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে?

–সে আমি কী জানি।

মমতা আবার চিন্তা বাড়লো। নিষেধ করা সত্ত্বেও বাবলু গোপনে গোপনে টিউশানি করছে? বাবলু তাঁর কাছে অনেক কিছু লুকোয়?

পতাপ অনেক কিছু বাজার করে ফিরলেন ঘন্টাখানেক পরে। কোথাও যাবার আগে প্রতাপ

শোরগোল করতে ভালোবাসেন। এটা নেওয়া হয়েছে? ওটা নেওয়া হয়েছে? খাবার জলের কুঁজো? মায়ের জন্য জর্দার কৌটো, সুপুরি, আখের গুড়। সুপ্রীতির সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক গোছানো হয়েছে তুতুলের?

মমতা তাড়াতাড়ি রুটি তরকারি আর ডিমের ঝোল বানিয়ে দিলেন। প্রতাপরা যখন খেতে বসেছেন তখন মমতা ভাবছেন, এর মধ্যেও যদি বাবলু ফিরে আসতো। কেন যেন তাঁর মনে হচ্ছে যাবার আগে প্রতাপের সঙ্গে বাবলুর একবার দেখা হবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বাবলু এলো না, প্রতাপরা বেরিয়ে পড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটাই যে খুব খালি হয়ে গেল তাই-ই নয়, মমতার বুকটাও খালি হয়ে গেল। এরকম অনুভূতি আগে কখনো হয়নি, প্রতাপ যেন অনেক দূরে চলে গেলেন, আবার কবে ফিরবেন তার ঠিক নেই। সুপ্রীতি আর তুতুলকে নিয়ে প্রতাপ যাচ্ছেণ তাঁর মায়ের কাছে, এটা যেন ওঁদের একটা পারিবারিক সম্মিলন, এর মধ্যে মমতার ভূমিকা অতি গৌণ। প্রতাপ যত আগ্রহ কর সুপ্রীতি আর তুতুকে নিয়ে গেলেন, মমতা আর মুন্নি যেতে চাইলে কি রাজি হতেন। খরচপত্রের কথা তুলতেন না? প্রতাপ নিশ্চয়ই টাকা ধার করে এনেছেন, মমত তা বুঝেছেন ঠিকই, অথচ প্রতাপ সে সম্পর্কে কিছুই বলেন নি তাঁকে।

মমতা খুব ভালো করেই জানেন, কারুর কাছে টাকা চাইতে, ধারের জন্য তো বটেই, এমন কি নিজের প্রাপ্য টাকা চাইতেও প্রতাপের আত্মভিমানে লাগে।

মমতার নিজের মা নেই অনেক দিন, শাশুড়িকে তিনি মায়ের মতনই দেখেন। সুহাসিনীর যদি গুরুতর অসুখ হয়ে থাকে, সুপ্রীতির মতন মমতারও কি তাঁকে একবার দেখার ইচ্ছে করতে পারে না। অথচ প্রতাপ একবারও সে কথা বললেন না মমতাকে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বুঝি কখনো রক্তের সম্পর্ক হয় না?

মমতা রান্নাঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।

অতীন ফিরলো ন'টার পর। প্রত্যেকদিনই সে সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে ফেরে। জামা খুলতে খুলতেই সে চিঁচিয়ে বলে, খাবার দাও। খাবার দাও।

চোখের জল মুছে মমতা ছেলের খাবার বেড়ে দিলেন।

খেতে বসেই অতীন চেঁচিয়ে বললো, আজও রুটি? ওফ্ আর পারি না। কম খান আর গম খান। কম খান আর গম খান। হারামজাদারা দেশের লোককে খাবার দিতে পারিস না, আমেরিকান গম খাওয়াচ্ছিস। যত সব জোচ্চোরের দল।

মমতা অতীনের পাশেবসে পড়ে বললেন, বাবলু, তুই ছাত্র পড়াচ্ছিস?

–কে বললো, তোমাকে?

–আমার কথার উত্তর দে।

–তোর বাবা তোকে বারণ করেছে না? এ বছর তোর ফাইন্যাল ইয়ার টাকা রোজগার করতে গিয়ে নিজের রেজাল্ট যদি খারাপ হয় এত টাকারই বা দরকার কিসের তোর?

–মা, আমি টাকা নিয়ে ছাত্র পড়াই না আর। আমাদের একটা স্টাডি সার্কল আছে।

সেখানে আমাদের চেয়ে যারা বেশি কিছু জানে, তারা আমাদের পড়ায়। আমরা আবার অল্প বয়েসী ছেলে-মেয়েদের কিছু কিছু পড়াই। ধরো, যারা স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ পায় নি, তাদেরও তো কিছু শেখাতে হবে। আমার রেজাল্টের জন্য বাবাকে চিন্তা করতে বারণ করো।

হঠাৎ কথা থামিয়ে অতীন উৎকর্ণভাবে এদিক ওদিক তাকালো। ভুরু কুঁচকে গেল তার। সে জিজ্ঞেস করলো, বাবা কোথায়, এখনো ফেরেননি?

মমতা কোনো উত্তর দিলেন না।

–বাড়িটা এত চুপচাপ কেন? পিসিমনির ঘর বন্ধ। পিসিমণির, ছোড়দি, এরা সব কোথায় গেছে?

মমতা কোনো উত্তর দিতে পারছেন না, তাঁর গলার কাছে বাষ্প জমে গেছে। তাঁর স্বামী যেন তাঁকে আজ অবহেলা করে চলে গেলেন। আদালত থেকে ফিরে প্রতাপ কি একটিবারও মমতাকে ঘরে ডেকে নিয়ে আলাদা করে কিছু বলেছে? তিনি কতদিন পর ফিরবেন, কী করে এইক'দিন সংসার চলবে, সে বিষয়ে কিছুই বলে গেলেন না।

ছেলের ওপরই বা ভরসা করবেন কী করে মমতা। ছেলের বাড়ির প্রতি মন নেই। মমতা তাঁর

ছেলেকে আঁকড়ে ধরতেগেলেও সে পিছলে পিছলে বেরিয়ে যায়। মমতা তা হলে কার ওপরে আর ভরসা করবেন?

খাওয়া থামিয়ে অতীন এক দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ যেন সমস্ত বাইরের জগৎ ভুলে গিয়ে সে দেখতে লাগলো শুধু মাকে। তার বুকটা কেঁপেউঠলো একবার।

–মা কী হয়েছে বলো তো। বাবা কোথায়? পিসিমনিরা কোথায় গেছে?

মমতা আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে চোখের জল ঝরাতে ঝরাতে বললেন, তাতে তোর কী আসে যায়? এ বাড়িতে কেউ মরুক, বাঁচুক, তোর কিছুই আসে যায় না।

অতীন সেই মুহূর্তে বালক হয়ে গেল। সে উঠে এসে মায়ের মাথার চুলে গাল ঠেকিয়ে বললো, মা তোমার কী হয়েছে বলো? আমি তো আছি আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো। তুমি কাঁদছো কেন? কী হয়েছে? কী হয়েছে?

॥ ২৩ ॥

সীট রিজার্ভেশানের কোনো সুযোগ পাওয়া যায়নি, প্রতাপদের উঠতে হয়েছে ভিড়ের কামরায়। কুলিকে বেশি পয়সা দিয়ে কোনোক্রমে একটি মাত্র বসার জায়গা পাওয়া গেছে, সেখানে জোর করে বসানো হয়েছে সুপ্রীতিকে। তুতুলকে নিয়ে প্রতাপ দাঁড়িয়েছেন বাথরুমের দরজার পাশে।

মানুষের ভিড় তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু এই সব কামরার লোকে এত মালপত্র তোলে যে সামান্য একটু নড়াচড়ার জায়গাও পাওয়া যায় না। লাগেজ কেরিয়ারে ভারি মালপত্র বুক করার প্রথা বোধহয় উঠেই গেছে। থার্ড ক্লাস কামরায় এক একজন যাত্রী তিনচারখানা বস্তা, স্টিলের ট্রাঙ্ক নিয়ে ওঠে, ব্যাংকে রাখার জায়গা না থাকলে সীটের তলায় না ঢুকলে সেগুলো যেখানে সেখানে পড়ে থাকে।

ট্রেন চলতে শুরু করার পর আস্তে আস্তে একটু একটু জায়গা হয়ে যায়। যারা করিৎকর্মা তারা অন্যদের ঠেলেঠুলে প্রথমে সূচ হয়ে ঢোকে। কেউ কেউ মালপত্রগুলোর ওপরেই বসে। প্রতাপ আর তুতুল সেরকমও কোনো জায়গা পেল না।

সুপ্রীতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মেয়ে আর ভাইয়ের দিকে। একটুও স্বস্তি নেই তাঁর মনে, দাঁড়িয়ে যেতে তাঁর একটুও কষ্ট হবে না, কিন্তু ওদের দু'জনের কেউই রাজি হবে না তাঁর জায়গায় বসতে। তিনি উঠে দাঁড়ালে অন্য কেউ জায়গাটা দখল করে নেবে। এক একবার সুপ্রীতি ভাবছেন, সেটাই ভালো কি না। তিনজনেই বেশ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যাবেন, তাতে তাঁর মনে শান্তি আসবে অন্তত।

কিন্তু সুপ্রীতি জানেন, তিনি উঠে দাঁড়াতে গেলেই বকুনি খাবেন ভাইয়ের কাছে। এ এক মহা জ্বালা।

রাত্রির ট্রেনের শব্দ বেশি। রাত্রির ট্রেনের দুলুনিও বেশি। রাত্রির ট্রেন ছোটেও কি বেশি জোরে? এটা একটা মেইল ট্রেন। আগেকার দিনে বলতো ডাক গাড়ি। মেইল শব্দটার সেই অর্থ এখন অনেকেরই মনে পড়ে না। মেইল ট্রেন শুনলেই মনে হয় এক দুর্দান্ত প্রকৃতির পুরুষ, দিগন্ত ভেঙে আর এক দিগন্তে যাচ্ছে। পাহাড় ডিঙিয়ে যায় অনায়াসে, গভীর জঙ্গলও এই মেইল ট্রেনকে দেখলে যেন দু'পাশে সরে যায় ভয়ে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই প্রতাপের ঝিমুনি এসে গেল। মা তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন, কী কথা কী কথা। এই চিন্তাটা সর্বক্ষণ তাঁর মাথার মধ্যে এমন ঘুরছে যে ক্রমশ তাকে ক্লান্ত করে দিচ্ছে। মার সঙ্গে শেষ দেখা হবে তো?

তুতুল প্রতাপের বাহু চেপে ধরে বলে উঠলো মামা।

প্রতাপের চটকা ভেঙে গেল। তিনি ঢুলতে ঢুলতে পড়ে যাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে জোর করে চোখ মেলে তাকালেন। দু'এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে পড়লো না তিনি কোথায় আছেন।

তুতুল বললো, মামা, তুমি আমার কাঁধে মাথা রাখো।

একটা বিস্ময়ে ধাক্কায় মিলিয়ে গেল ঘুমঘোর। অনেক দিন পর তুতুল নিজে থেকে একটা কথা বলেছে। তার মুখে অন্ধকার-অন্ধকার ভাবটা নেই। সে প্রতাপের ভর বহন করতে চায়।

–না রে, আমি এখন ঠিক আছি।

–তোমার মাথাটা এখানে রাখো না।

প্রতাপ নিজের মাথা রাখলেন না। তুতুলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোর বুঝি কষ্ট হচ্ছে না?

বর্ধমানের পর একজন টিকিট চেকার উঠলো। অল্পবয়েসী বেশ চটপটে স্বভাবের। ঘুমন্ত মানুষগুলিকে ঠেলে ঠেলে তুলে টিকিট দেখতে চাইছে। এক একজন মানুষের এক এক রকম প্রতিক্রিয়া। প্রতাপ সেদিকে চেয়ে রইলেন, এতক্ষণে তবু খানিকটা একঘেয়েমি কাটলো।

টিকিট চেকারটি ঘুরতে ঘুরতে এলো প্রতাপের সামনে। প্রতাপ আগে থেকেই টিকিট বার করে হাতে রেখেছিলেন. ছেলেটি তুতুলকে দেখতে দেখতে টিকিটগুলো নিল। রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা, ভালো করে খায় না, তবু আগেকার মাধুরীর কিছুটা বেশ তো রয়ে গেছে, অল্পবয়েসী ছেলেদের এখনও চোখ টানবেই।

টিকিটগুলো ফেরত দিয়ে গিয়ে ছেলেটি প্রতাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল যেন। অবাক ভাবে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বললো, প্রতাপদা না?

প্রতাপ চিনতে পারলেন না। আদালতে কত লোক যায় আসে, কত লোক কথা বলে সকলের মুখ কি মনে রাখা সম্ভব।

ছেলেটি এরপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো। প্রতাপের পায়ের কাছে একটা বস্তা, সেটার মধ্যে কিছু কঠিন দ্রব্য আছে, মনে হয় লোহা পাথরে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। টিকিট চেকারটি নিচু হয়ে, সেই বস্তাটা সরিয়ে প্রতাপের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ফেললো।

প্রতাপ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললে, আরে, আরে, একী একী।

আবার সোজা হয়ে সে বললো, প্রতাপদা আমায় চিনতে পারছে না? আমি সুবীর।

এই নাম শুনেও প্রতাপের কিছু মনে পড়লো না। তিনি এক দৃষ্টিতে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে পূর্ব পরিচয়ের কোনো চিহ্ন খুঁজতে লাগলেন।

মালখানগরে আপনদের বাড়ির কাছেই আমারে বাড়ি ছিল বোস বাড়ি। আমার বাবার নাম সুধাকান্ত বসু। আপনার বাবাকে আমরা জ্যাঠামশাই বলতাম। কতবার গেছি আপনাদের বাড়িতে।

–তুমি সুধাকাকার ছেলে?

–আমার ডাক নাম নাড়ু। আমাদের বাড়িতে বড় রথ ছিল, রথের দিন আপনারা সবাই আসতেন।

ওপাশ থেকে সুপ্রীতি সব শুনছেন। তিনি বলে উঠলেন নাড়ু। তোমার দিদির নামছিল মনিকা।

প্রতাপ হঠাৎ খুব অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছে করলো নাড়ু কে বুকে জড়িয়ে ধরতে। এ এক অদ্ভুত টান। প্রতাপের সব মনে পড়ে গেছে। বোসদের বাড়ি অনেকবার গেছেন তিনি। এই নাড়ু রই জ্যাঠতুতো দাদা প্রথমসিগারেট টানতে শিখিয়েছিল প্রতাপকে। ওদের বাড়ির সামনেই বকুল গাছছিল দুটো, পাশাপাশি কাছাকছি গেলেই গন্ধ পাওয়া যেত সেই প্রিয় বাল্যকাল, টুকরো টুকরো স্মৃতি সব কিছু যেন ফিরে এলো এই ছেলেটির ডাকবে মধ্যে দিয়ে।

নাড়ু বললো, আপনি আপনি এই ভাবে যাচ্ছেন, দাঁড়ান আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কত কাটা বিন টিকিটে জায়গা দখল করে আছে।

প্রতাপ বললেন, না, না, আমাদের জন্য কিছু করতে হবে না। আমরা ঠিক আছি।

নাড়ু গিয়ে সুপ্রীতিকেও প্রণাম করলো। তুতুলের পরিচয় জানলো। একটু আগে সে তুতুলের দিকে অন্য চোখে তাকাচ্ছিল, এখন তুতুল হয়ে গেল তার বোনের মতন।

তারপর শুরু হলো পুরোনো স্মৃতির বিনিময়। কে কোথায় আছে। নাড়ু বছর তিনেক আগেও একবার ভিসা নিয়ে গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে সে ওখানাকর খবর অনেক বেশি জানে। নাড়ু র এক কাকা অনেকদিন ওখানে ছিল, সে মারা যাবর পর আর কোনো সম্পর্ক নেই। প্রতাপদের বাড়িটাও সে দেখে এসেছে, সেখানে এখন একটা সরকারি অফিস হয়েছে, গোয়ালঘরের জায়গাটা ভেঙে একটা পাকা দোতলা কোঠাবাড়ি উঠেছে।

পরবর্তী স্টেশন আসতেই নাড়ু বললো, আজ স্পেশাল চেকিং হচ্ছে, সব বিনা টিকিটের যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হবে। প্রতাপদা, আপনার জন্য আমি অন্যায় কিছু করছি না। এবারে জায়গা পাবেন, বসুন।

বিনা টিকিটের যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রতাপ আপত্তি জানাতে পারেন না। কিন্তু এত রাত্রে ঘুমন্ত লোকগুলোকে টেনে টেনে নামানো সেই জায়গাতেই বসতে হলো প্রতাপ আর তুতুলকে।

নাড়ু যখন বিদায় নেবে তখন আর প্রতাপ আবেগ দমন করতে পারলেন না। তিনি তাকে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন, বড় ভালো লাগলো রে, তোকে দেখে নাড়ু । বড় ভালো লাগলো। ভালো থাকিস, নাড়ু সুধাকাকে বলিস আমাদের কথা।

তারপর বাকি রাত আধো ঘুমে তন্দ্রায় প্রতাপ যেন ফিরে গেলেন নিজের জন্মস্থান।

বিশ্বনাথের টেলিগ্রামের উত্তর পাঠানো হয়নি, তাই স্টেশনে কেউ নেই। প্রতাপের খুব চায়ের নেশা। ঘোড়াগাড়িতে ওঠার আগে প্রতাপ তাই একটু চা খেয়ে নিলেন। নিজের টাকা থেকে এক বাক্স মিষ্টি কিনলেন সুপ্রীতি।

যেখানে একসময় গেট ছিল, এখন সেখানে গেটের চিহ্নমাত্র নেই। যেখানে বাগান ছিল এখন সেখানে বাগান নেই। দারোয়ানের সেই ছোট ঘরটিতেও ভাড়াটে বসানো হয়েছে।

গোড়ার গাড়ির শব্দ শুনেই আগে বেরিয়ে এলেন শান্তি। লম্বা কাঠির মতন চেহারা শাড়িটা যেন গায়ের সঙ্গে ঝুলছে। প্রতাপের মনে হলো আসল ক্ষয় রোগ যেন ধরেছে তার এই দিদিকেই। সুপ্রীতি দৌড়েগিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, শান্তি শান্তি তোর এ কী চেহারা হয়েছে?

শান্তি নিষ্প্রাণ গলায় বললো বড় দেরি কইরা ফেলাইলা তোমরা। মায়ের শ্বাস ওঠছে সে গেছে ডাক্তার আনতে।

প্রতাপরা ছুটে গেলেন দোতলায়। যেটা আগে ঠাকুরঘর ছিল সেটাই এখন সুহাসিনীর শোবার ঘর। নোংরা চিটচিটে বিছানা, পানের পিকদানিতে গত রাত্রে বমি সেখানে মাছি উড়ছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন সুহাসিনী, তাঁর বুকে ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে, শান্তির মেয়ে হাত বুলোচ্ছে দিদিমার বুকে।

মায়ের এই অবস্থা দেখেও সুপ্রীতি ভেঙে পড়লেন না। দ্রুত হাতে তিনি শুরু করলেন ঘর পরিষ্কার করতে । তুতুল তার ব্যাগ নিয়ে বসলো শিয়রের কাছে।

একটু পরীক্ষা করে তুতুল মুখ তুলে বললো, মামা, অক্সিজেন সিলিণ্ডার পাওয়া যাবে? তাহলে ভালো হতো।

প্রতাপ তক্ষুনি ছুটলেন। বাড়ি থেকে বেরুবার পরই বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ডাক্তার নয়, বিশ্বনাথ একজন বৃদ্ধ কবিরাজকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছে। বিশ্বনাথের মুখে এখন দাড়ির জঙ্গল বাঙালী বলে চেনাই যায় না। কবিরাজটিও প্রবাসী বাঙালী।

কবিরাজ বললেন, অত চিন্তার কিছু নেই। কালই তো আমি দেখে গেছি। শ্লেষ্মা জমেছে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা।

প্রতাপ বললেন, আমারভাগ্নীকে সঙ্গে এনেছি, সে ডাক্তারি পড়ে। সে বলছে অক্সিজেন দেওয়া দরকার।

কবিরাজটি মাথা নেড়ে বললেন, প্রয়োজন হবেনা, আমি ওষুধ দিলেই কাজ হবে।

বিশ্বনাথ বললেন, আগে এখন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারকে দেখিয়েছি। তিনি অ্যাডভাইস করেছিলেন হাসপাতালে রিমুভ করতে। তোমাদের মতামত না দিয়ে তা করতে সাহস পাইনি।

প্রতাপ খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, অবস্থা এত খারাপ আগে জানাননি কেনআমাকে?

বিশ্বনাথ উদাসীন ভাবে বললেন, বয়েস হয়েছে অসুখ-বিসুখ তো লেগেই থাকবে। তোমার কাছে একবার টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম তুমি পাঠাওনি।

–মায়ের জন্য প্রতি মাসে যা পাঠাবার তা তো নিয়মতিই পাঠাচ্ছি। বাড়তি টাকা দেবার সামর্থ্য আমার নেই। তবু মায়ের চিকিৎসা জন্য যদি টাকা লাগতো আপনি সেকথা তো লেখেননি, লিখেছিলেন বাড়ি সারাবার কথা।

–গত থেকেই হঠাৎ ক্রিটিক্যাল হলো। তোমার কথা বারবার বলছিলেন, তোমাকে কী যেন জানাবার আছে–

–সে তো পাওয়া যাবে হাসপাতালে। আমদের দেবে কেন? এখানে কি আর দোকানে বাজারে ওসব জিনিস পাওয়া যায়?

কবিরাজটি বললো, আগেই এত উতলা হচ্ছেন কেন? আমি গিয়ে দেখি।

সবাই মিলে ওপরে আসার পর তুতুল সুহাসিনীর শিয়র ছেড়ে উঠে এসে বললো, একটা কোরামিন ইঞ্জেকশন দিয়েছি।

কবিরাজ বললেন, বেশ করেছো মা, ভালো করেছো। অধিকিন্তু না দোষায়। আমার ওষুধেই কাজ হবে। অ্যালোপ্যাথি কবিরাজিতে ঝগড়া নাই। হোমিওপ্যাথি হলে আলাদা কথা ছিল।

আধঘণ্টা দেখে কবিরাজ মশাই দশটি টাকা নিয়ে বিদায় হলেন। সুহাসিনীর তখনও জ্ঞান ফেরেনি। যাবার সময় কবিরাজ মশাই আবার বলে গেলেন ভয়ের তেমন কারণ নাই। আমি তো বুকে শুধু শ্লেষ্মাই দেখলুম।

প্রতাপ নিজেকে সামলাতে পারছে না। মাআর চোখ মেলবেন না? মা একটিবারও দেখবেন না? কী কথা বলতে চেয়েছিলেন মা?

কবিরাজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রতাপ বাইরে এসেছিলেন। আবার ফিরতে যেতেই বিশ্বনাথ তাঁর হাতধরে বললেন, শোনো ব্রাদার একটা কথা আছে। তোমার মা যদি চলে যান তাহলে এ বাড়ি কী হবে, তা নিয়ে কিছু ভেবেছো?

প্রতাপ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এখন এই কথা বলতে পারলেন বিশ্বনাথ? বাড়ি মানে কি, সম্পত্তি? প্রতাপ তার ভাগ নিতে আসবেন।

–এ বাড়ি আপনাদেরই থাকবে, ওস্তাদজী।

–তোমার মা কোনো উইল করেননি। আমি আগে অনেকবার বলেছি উনি বুঝতেন না।

–তাতে কী হয়েছে, আপনারা যেমন আছেন, তেমনই থাকবেন।

–উইলে একটা সই না থাকলে–

–আমি তো বলছি আপনাকে, এ বাড়ি ছোড়দি পাবে

কাষ্ঠহাসি হেসে বিশ্বনাথ বললেন, তোমার মুখের কতটা তো যথেষ্ট নয়। কাগজপত্রে লেখাপড়া থাকা দরকার। ধরো, তোমার ছেলে যদি কোনোদিন এসে ক্লেইম করে..

বিশ্বনাথের ঐ হাসিটা যেন অগ্নিশলাকার মতন প্রতাপের কানে বিধলো। বিশ্বনাথ এত নিচে নেমে গেছেন। মানুষের এত ডিগ্রেডেশন। এই সেই বিশ্বনাথ গুহ যিনি গান বাজনার নেশায় মজে একদিন ঘর সংসার ছেড়ে ছিলেন, টাকাপয়সার কোনো চিন্তা করেননি কোনোদিন...

প্রতাপ গম্ভীর ভাবে বললেন, ওস্তাদজী আমি আইন জানি। যদি সে রকম কিছু হয়, এখন থেকে যাবার আগেই আমি আপনাকে সব লিখেটিখে দিয়ে যাবো।

–তোমার মা বোধ হয় এই কথা বলার জন্যই তোমাকে ডেকেছেন।

প্রতাপ আর সে কথায় কর্ণপাত না করে ফিরে গেলেন মায়ের ঘরে তুতুলকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, কোনো বড় ডাক্তারকে কল দেবো?

তুতুল মাথা তুলে একটুক্ষণ থেমে থেকে বললো, বোধ হয় তার আর দরকার হবে না।

প্রতাপ এই কথার মর্ম ঠিক ধরতে পারলেন না। তার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে তাহলে মা সত্যি ভালো হয়ে উঠবেন?

সুহাসিনীর চেতনা ফিরে এলা দুপুরের দিকে। তিনি দু'বার ডাকলেন খুকন। খুকন।

প্রতাপ দৌড়ে এসে বিছানার ওপর বসে পড়ে বললেন, মা! মা!

সুহাসিনী পরিষ্কার চোখ মেলে তাকালেন টলটলে দৃষ্টি। একটা হাত তুলে প্রতাপের মাথার ওপর রাখলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, খুকন তুই আমার একটা কথা রাখবি?

–হ্যাঁ মা। বলো, বলো।

–খুকন, তুই আমাকে একবার সেখানে নিয়া যাবি।

প্রতাপ কেঁপে উঠলেন। আর কি কেউ বুঝতে পেরেছে মা কোথায় যেতে চান? মা কেন প্রতাপকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

প্রতাপ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

সুহাসিনী ছেলের চুল আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে সবরকম অনুনয়ের সুরে বলতে লাগলেন, খুকন, একবার আমারে নিয়া চল। এখানে মইরা আমি শান্তি পাবো না, সেই তুলসীমঞ্চের নিচে...

ট্রেনে নাড়ু র সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার পর থেকে মালখা নগরের স্মৃতি সর্বক্ষণ প্রতাপে মনে উথাল-পাথাল করছে। প্রতাপ পরিষ্কার দেখতে পেলেন উঠোনের মাঝখানে সেই তুলসী মঞ্চটি,

যেখানে তাঁর বাবাকে শোওয়ানো হয়েছিল...সেটা কি আর আছে? নাড় কিছু বলেনি। সেখানে আর কোনোদিন ফিরে যাওয়া যাবে না।

—ও খুকন লক্ষ্মী সোনা আমার, একবার নিয়া চল।

একদিনের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে তুতুল আর টুনটুনি, বিশ্বনাথ আর শান্তি। প্রতাপ মায়ের হাত ধরে আছে, সেই হাতে কোনো উত্তাপ নেই। নিশ্বাস এত মৃদু যে বক্ষস্পন্দন বোঝা যায় না। সারা শরীরে আর কোথাও জীবন চিহ্ন নেই, শুধু যেন প্রাণটুকু এখানো থেমে আছে চোখের দৃষ্টিতে আর কণ্ঠস্বরে। সুহাসিনীর শরীরটা এখন বালিকার মত ছোট্ট।

—ও খুকুন। তুই আমার এই কথাটা শুনবি না? আর একবার তুলসী, তুলসী তুলসীতলায়...

এ কী মাতৃ আজ্ঞা, না এক অবুঝ বালিকার আবদার? প্রতাপ যেন নিজেই বালক হয়ে, দেখতে পেলেন তার বহুকাল আগেকার যুবতী মাকে। প্রতাপ যখন যা চেয়েছেন মা সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন। চাইবার অতিরিক্ত অনেক কিছু। এখন মায়ের এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করার সাধ্য তাঁর নেই।

সারা ঘর নিস্তব্ধ। একটা সাঙ্ঘাতিক অসহায়তায় প্রতাপ অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে ঝরে পড়তে লাগলো জল।

॥ ২৪ ॥

শনিবার দুপুরে লোদিব গার্ডেনসে ত্রিদি আর সুলেখার নেমন্তন্ন। এক সপ্তাহ আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। ত্রিদিব বেলা দেড়টার সময় অফিস থেকে ফিরেই সুলেখাকে তুলে নেবে, এই রকম কথা আছে, কিন্তু যা আগে কোনোদিন ছিল না এখন ত্রিদিবের সেই রোগ ধরেছে। অফিসের কাজে মত্ত হয়ে সে মাঝে মাঝে বাড়ির কথা ভুলে যায়। পদোন্নতির মূল্য দিতে হচ্ছে তাকে।

সুলেখা সবকিছু গুছিয়ে তৈরি একটা চল্লিশ বেজে যাওয়ার পর ও ত্রিদিব এলো না দেখে সে একবার ভাবলো বাইরে বেরুবার শাড়ি খুলে ফেলবে কিনা। ক্ষীণ অভিমান জমা হয়েছে তার বুকে। কলকাতায় থাকার সময় সে নিজেও কলেজে পড়াতো। অধিকাংশ গৃহিণীদের মতন তাকে বাড়িতে বসে স্বামীর ফেরার প্রতীক্ষায় পল-অনুপল গুণতে হতো না। কিন্তু দিল্লিতে তার সময় কাটতে চায় না কিছুতেই।

এক মিনিট পরেই টেলিফোন বেজে উঠলো।

সেই ঝনঝন শব্দ শুনেই অভিমানটা বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে সেখানে জুড়ে বসলো খানিকটা লজ্জা। ত্রিদিবই টেলিফোন করেছে, সুলেখাও তো আগে টেলিফোনে দেরির কারণ জিজ্ঞেস করতে পারতো নিজে থেকে।

সুলেখা খানিকটা কৌতুকের সুরে বললো, খেয়ে নেবো, কোথায়? না, না, শোনো শোনো, আমার খাওয়াটা তো এমন কিছু নয়, আমি বাড়িতে খেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু তুমি কোথায় খাবে?

ত্রিদিব একটু অধীরভাবে বললেন, আমি স্যাণ্ডউইচ আনিয়ে নেবো।

—তা হলে লোদি গার্ডেন্সের নেমন্তন্নটা আজ ক্যানসেলড্ তো?

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা যেন বেশ কয়েকটি অনুভবের। তারপর ত্রিদিব টেলিফোনে হেসে উঠে বললেন, জানো জাপান থেকে দু'জন ডেলিগেট এসেছে, তারা একবর্ণও ইংরেজি বোঝে না। অনেক কষ্টে একজন সাউথ ইণ্ডিয়ান ইন্টারপ্রেটার জোগাড় করা হয়েছে। তার ইংরিজি উচ্চারণ আবার এত খারাপ, যে প্রত্যেকটা কথা প্রায় তিনবার করে বলতে হচ্ছে। ফলে সময় লেগে যাচ্ছে তিনগুণ, সেইজন্যই ঐ কথাটা একেবারে ভুলে হজম করে দিয়েছিলুম।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলো, তুমি সত্যিই স্যাণ্ডুউচ এনে খাবে তো, না উপোস করে থাকবে। আমি আদালিকে দিয়ে খাবার পাঠাতে পারি।

ত্রিদিব বললেন, যাঃ ভারত নিপ্পন বাণিজ্য সম্পর্ক আরও চল্লিশ ঘন্টা নিশ্চয়ই অপেক্ষা হলো কী করে।

সুলেখা বললো শোনো তা বলে তোমাকে কাজ নষ্ট করে ..

ত্রিদিব বললেন, ঠিক কুড়ি মিনিটের মধ্যে তৈরি থেকো এখন রেখে দিচ্ছি।

কুড়ি মিনিটের বদলে একুশ বা তেইশ হতে পারে, কিন্তু পঁচিশের বেশি না ঠিক পৌঁছে গেলেন ত্রিদিব। গেটের সামনে গাড়ি থামতেই খানসামা কয়েকটি টিফিন কেরিয়ার তুলে দিল সুলেখা এসে উঠলো হাতে একটি বড় প্যাকেট নিয়ে।

আবর গাড়ি ছাড়ার পর ত্রিদিব বললেন আমার খানিকটা দেরি হয়ে যাওয়াটা এমন কিছু অপরাধ নয় জানি, কিন্তু আমার ভুলে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ। ছি ছি, কী যে হচ্ছে আমার আজকাল।

সুলেখা বললো, তুমি তো ঠিক ভুলে যাওনি, তোমার সাব কনসাস মাইণ্ডে ঠিকই ছিল নইলে তুমি ফোন করতে না। অন্য দিন বাড়ি ফিরতে আধ ঘন্টা এক ঘন্টা দেরি হলে তো তুমি ফোন করো না। তোমাকে শনিবারেও এত কাজ করতে হয় কেন?

—জাপানীরা কাজের ব্যাপারে শনিবার রবিবার মানে না। কাজটা ওদরে কাছে প্রায় ধর্মীয় গোঁড়ামির মতন, খুঁটিনাটি পর্যন্ত নিখুঁত হওয়া চাই, দেখছি তো ক'দিন ধরে।

—তোমাকে কাজ নষ্ট করে চলে আসতে হলো না তো?

—আলাপ আলোচনা এখন চলবে ক'দিন ধরে। ভাগবকে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে বলে এসেছি আমি আবার বসবো কাল সকালে।

—আমি তোমাকে জোর করে দিল্লি নিয়ে এলাম, তোমাকে এখানে খাটতে হচ্ছে বেশি।

—দিল্লি আমার চমৎকার লাগছে।

লোদি গার্ডেনসে ওদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই। নেমন্তন্নটা শুধু ওদের দু'জনের এবং পরস্পরের। বিয়ের পর কলকাতায় থাকার সময় ওরা প্রায়ই ছুটির দিন বা শনি-রবিবার দু'জনে চলে যেত কাছাকাছি কোথাও, দিল্লিতে এসে ওরা আবার শুরু করেছে দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমা। এক সপ্তাহ সুলেখা ত্রিদিবকে নেমন্তন্ন করে অন্য সপ্তাহে ত্রিদিব সুলেখাকে।

দিল্লি শহরটা পুরোনো হতে সময় লাগে। ছড়ানো শহর, দ্রষ্টব্য অনেক। স্বাধীনতার পর রাজধানীকে নতুন ভাবে সাজানো হচ্ছে চওড়া হচ্ছে রাস্তাঘাটা, তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন উপনগরী। দিল্লির সঙ্গে রোমের অনেকটা তুলনা করা যায়। প্রাচীন ও আধুনিকের পাশাপাশি সহাবস্থান। কংক্রিটের নতুন রাস্তার পাশেই হাজার খানেক বছরের পুরোনো কোনো সমাধি ভবন।

লোদি গার্ডেনসের মধ্যেও লোদি সম্রাটবংশের অনেক সমাধি রয়েছে। এই শহরে ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের নিদর্শন এখানে রয়ে গেছে, এটা ত্রিদিবের খুব পছন্দ। ইতিহাস তাঁর শখের বিষয়।

এতখানি ছড়ানো, সুন্দর একটা বাগান, কিন্তু ভিড় বিশেষ নেই। আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে ওরা দু'জন সব কটি সমাধি ভবন ঘুরে ঘুরে দেখলো, ত্রিদিব শোনালেন ইতিহাসের নানারকম চুটকিলা। তারপর এক সময় একটা বড় গাছের ছায়ার বসে পড়ে বললেন, জানো, এইসব পুরোনো জায়গায় এলেই আমার মনে হয়, দিল্লিতে একটার পর একটা বংশ দাপটের সঙ্গে রাজত্ব চালিয়ে কিছুদিন পর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এখনকার এই কংগ্রেস -বংশই বা কতদিন টিকবে?

সুলেখা বললো, জওহরলাল নেহরু চলে যাবার পরেও তো কংগ্রেসটিকে গেলেই মনে হচ্ছে।

ত্রিদিব একটা সিগারেট ধরতে ধরাতে বললেন, কী জানি। আমি বাতাসে যেন যুদ্ধের গন্ধ পাচ্ছি।

—আবার যুদ্ধ? কার সঙ্গে? চীনের সঙ্গে?

—হতে পারে। চীন যে জায়গা দখল করেছিল,তা ছাড়ে নি। পাকিস্তানের সঙ্গেও হতে পারে। ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখো, যুদ্ধ ছাড়া কোনো রাজত্ব চলে না। হয় প্রতিবেশীকে আক্রমণ করো নয়, আক্রান্ত হও। শান্তি অতি কঠিন দুর্লভ ব্যাপার। ক'টা মানুষের জীবনে সত্যিকারের শান্ত আছে বলো। একটা রাষ্ট্রের জীবনে শান্তি তো আরও অসম্ভব।

সুলেখা মুখে বেদনার রেখা ফুটিয়ে বললো, আমার যুদ্ধ টুদ্ধের কথা ভাবতেই খুব খারাপ লাগেই

ত্রিদিব মৃদু হাস্যে বললেন, যদি সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একটা বোট নেওয়া যায়, তা হলে দেখা যাবে, অন্তত নব্বই ভাগ মানুষই যুদ্ধ চায় না। তবু যুদ্ধ হয়। পৃথিবীতে সব সময় কোথাও না কোথাও যুদ্ধ চলছে।

—এই ছোট্ট -খাট্টো মানুষ লালবাহাদুর শাস্ত্রী কি কোনো যুদ্ধ চালাতে পারবে? মনে হয় তো শান্ত শিষ্ট একটি পুরুত ঠাকুর।

—যুদ্ধ কি আর শুধু ওর একলার ইচ্ছেতে হচ্ছে। ভারত আর পাকিস্তানের রাজধানী বড্ড কাঁছাকাছি, সেইজন্য উত্তাপ দিন দিন বাড়ছে। পাকিস্তানের রাজধানী হওয়া উচিত ছিল ঢাকায়, ওদিকে জনসংখ্যা বেশি, ওদের একটা ন্যায্য দাবি আছে। আর ভারতের রাজধানী কোথায় হওয়া উচিত ছিল

জানো? আমার মতে মাদ্রাজে। দিল্লি বহুকাল ধরেই রাজধানী ছিল, কলকাতাও ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল অনেকদিন স্বাধীন ভারতের রাজধানী হওয়া উচিত ছিল নতুন কোনো জায়গায় দক্ষিণ ভারতে হওয়াটাই ছিল বেশি স্বাভাবিক। ওদিককার লোকেরা নিজেদের বলে সাউথ ইণ্ডিয়ান, শুধু ইণ্ডিয়ান বলে না।

সুলেখা ওপরের দিকে তাকিয়ে গাছটার দিকে দেখলো। এটা কী গাছ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অনেক কৃষ্ণচূড়ার মতন, ডালপালা বিস্তৃত, ছোট ছোট পাতা, কিন্তু কোনো ফুল নেই। আকাশ আজ মেঘলা, তাই ছায়া বেশি এবং ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

বাগানটিতে যত্ন নেই বিশেষ, এখানে ওখানে আগাছার ঝোপ। কাছেই একঝাড় টকটকে লাল রঙের কলাবতী ফুল ফুটে আছে। খানিকটা দূরে, আর একটা গাছের তলায় ছায়ায় সতরঞ্চি পেতে বসেছে পুরো একটি পরিবার। কর্তা গিন্নি, ছেলে মেয়ে জামাই পুত্রবধূ ইত্যাদি নিয়ে দশ-এগারো জন। তারা একটি রেডিও বাজাচ্ছে তারস্বরে। এই ট্রানজিস্টার রেডিও নামে বিদ্যুৎবিহীন বেতার যন্ত্রটি নতুন উঠেছে বাজারে, অনেকে বিদেশ থেকে নিয়ে আসে এবং যাদের বিদ্যুৎবিহীন বেতার যন্ত্রটি আছে, তারা এটা অন্যদের দেখাবার জন্য সর্বত্র সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করে। এরকম প্রকট দুপুরবেলা বাড়িতে থাকলে ঐ দশ এগারোজন লোক কি একসঙ্গে বসে রেডিও শুনতো?

সুলেখা ভাবলো, ঐ যান্ত্রিক আওয়াজ শুনে গাছপালাগুলোর কষ্ট হয় না? ওরা তো আগে এরকম আওয়াজ কখনো শোনেনি।

অফিসের পোশাকেই ত্রিদিব শুয়ে পড়েছেন ঘাসে। মুখে একটা চুরুট।

সুলেখা চমকে উঠে বললো, এই যাঃ ভুলেই। গিয়েছিলুম। তোমার জন্য তো আমি পাজামা পাঞ্জাবী এনেছি।

সেইরকমই কথা। যেদিন ওদের এরকম বাইরে পিকনিক থাকে, সেদিন সুলেখা একটু বেশি সাজগোজ করে, ত্রিদিব ও অফিসের পোশাক ছেড়ে নেয়। আজ সুলেখা পরে এসেছে একটা আকাশী রঙের শাড়ি, ত্রিদিবের জন্য সে লক্ষ্ণৌ-এর কাজ করা নতুন পাঞ্জাবী কিনে এনেছে।

এখানে যে-কোনো ঝোপের আড়ালে গিয়ে পোশাক পাল্টে নেওয়া যায়, কিন্তু ত্রিদিবের আলস্য লেগে গেছে। তিনি ওঠবার উদ্যোগ না করে সামনের ঝোপের ওপর একটা লম্বাটে ধরনে পাখির দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কী পাখি জানো?

সুলেখা পাখি-টাখি বিশেষ চেনে না, এই রকম লম্বা ল্যাজওয়ালা ইট রঙের পাখি সে আগে দেখেনি।

ত্রিদিব বললেন, আমাদের যশোরের বাড়িতে একটা বড় পেয়ারা গাছে এইরকম কেটা পাখি এসে বসতো মাঝে মাঝে। তখন আমরা শুনেছিলাম এর নাম ইষ্টকুটুম পাখি। এখানে নিশ্চয়ই অন্য নাম। আমার ঠাকুমা বলতেন, ইষ্টকুটুম পাখি বাড়ির সামনে এসে ডাকলে, সেদিন বাড়িতে অতিথি আসে।

সুলেখা বললো, তোমার ঠাকুমাকে আমার বেশ লাগতো। একটাও দাঁত ছিল না, কিন্তু বেশ মিষ্টি করে কথা বলতেন।

ত্রিদিব হেসে ঠাকুমার প্রসঙ্গ সরিয়ে দিয়ে বললেন, আজ আমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই অতিথি আসবে, এই পাখিটাকে দেখলাম...

–আজ মাসের কত তারিখ?

–পাঁচ তারিখ, শনিবার...

সুলেখা আর কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল, এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ত্রিদিবের মুখের দিকে।

ত্রিদিব আবার বললেন, আমার সঙ্গে যদি বাজি ধরো, তুমি হেরে যাবে। বিশেষ বিশেষ অতিথি এলে আমার তো ভালোই লাগে। যাক গে, তুমি আজ কী বই এনেছো?

মৃদু সুপবন বইছে, অনেকরকম ফুল আর গাছ পাতা মিলিয়ে একটা আলাদা গন্ধ, মেঘ নেমে আসছে নিচের দিকে। গাছতলায় শুয়ে থাকার মতনই দুপুর। সুলেখা ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললো ত্রিদিব ইয়েটসের কবিতা পড়ে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু সুলেখার আজ মন বসলো না কবিতায়।

শাজাহান প্রত্যেক মাসেই একবার করে দিল্লিতে আসে। তার ব্যবসার সঙ্গে যে দিল্লির এতটা যোগাযোগ তা আগে জানা ছিল না ত্রিদিবদের। শাজাহান প্রায় নিয়ম করেই মাসের প্রথম সপ্তাহের শনিবার সন্ধের পর এসে হাজির হয় ত্রিদিবদের বাড়িতে। গল্পে গল্পে অনেক রাত হয়, এখন ধরেই

নেওয়া হয়েছে সে রাত্তিরটা ওখানেই থেকে যাবে। শাজাহানের ব্যাগে তার রাত পোশাক থাকে।

মানুষ হিসেবে শাজাহান অতি সজ্জন, বন্ধু হিসেবেও আকর্ষণীয়। কোনো ব্যাপারেই সে বেশি বাড়াবাড়ি করে না। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান হলেও সে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে যথেষ্ট পড়াশুনো করেছে, সে একজন শেক্সপীয়ার বিশেষজ্ঞ, ঐ বিষয় নিয়ে ত্রিদিবে সঙ্গে প্রায়ই তার তর্ক জমে। গত মাসেই একদিন তারা মার্লো ও শেক্সপীয়ারের তুলনামূলক আলোচনায় রাত প্রায় ভোর করে দিয়েছিল।

রাতুলের সঙ্গে শাজাহানের এখানেই তফাৎ, রাতুল সাহিত্যের বিশেষ ধার ধারে না। এসে খেলাধুলো ভালোবাসে, ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেটের স্কোর পর্যন্ত তার মুখস্থ থাকে। সে গান গাইতে পারে ভালো, কিন্তু কবিতা-টবিতা তার সহ্য হয় না। কলকাতায় ত্রিদিব আর শাজাহানের শেক্সপীয়ার অলোচনার সময় তাকে নীরবে বসে থাকতে হতো, তাতে সে কিছুটা অবহেলিত বোধ করতো। তার পক্ষে সমগ্র শেক্সপীয়ার পড়ে ফেলা এখন আর সম্ভব নয়, তাই সে কিছু কিছু কোটেশান মুখস্থ করে মাঝে মাঝে যোগ দেবার চেষ্টা করতো ত্রিদিবের আলোচনায়। অপ্রাসঙ্গিকভাবে সেই সব উদ্ধৃতি এক এক সময় অতি হাস্যকর মনে হয়।

যেমন, একদিন সুলেখা চা তৈরি করে দিচ্ছিল ওদের। কাজের লোকটি টি কোজিতে ঢাকা এক পট চা, ফাঁকা কাপ সসার দুধ চিনি আলাদা ভাবে এনে দেয়, এটাই তাদের বাড়ির রীতি সেদিন সন্ধেবেলা সুলেখাদের একটা থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা, তাই সে একটু বেশি সাজগোজ করেছিল, একটা নতুন মারফিউম মেখেছিল।

শাজাহানের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতি প্রখর। সে নিশ্বাস টেনে বলেছিল, ভাবী, আজ জয় মেখেছে মনে হচ্ছে? চায়ের ফ্লেভার আপনার এই পারফিউমের গন্ধে ঢেকে যাবে।

সুলেখা অবাক ভাবে আপনার এই পারফিউমের গন্ধে ঢেকে যাবে।

সুলেখা অবাক ভাবে বলেছিল, জয়? বাবা, আপনার তো দারুণ নাক। শাজাহান মুচকি হেসেছিলেন।

রাতুল সেই আলোচনায় ঢুকে পড়ার জন্য হঠাৎ সুলেখারহাত মুঠোয় ধরে বলে উঠেছিল "আল দা পারফিউমস অফ আরাবিয়া উইলনট সুইটন দিস লিটল হ্যাণ্ড।"

ত্রিদিব আঁতকে উঠেছিলেন পায়। অতি ভদ্র তিনি, শুধু ভুরু তুলেছিলেন অনেকখানি, মুখে সুলেখা সরিয়ে নিয়েছিল নিজের হাত।

শুধুমাত্র পারফিউম শব্দরি সূত্র ধরে রাতুল যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছিল, তা যে শুদু অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল অর্থেই তা নয় রীতিমতন অপমানজনক। খুনের ষড়যন্ত্রকারিণী লেডি ম্যাকবেথের রক্তাক্ত হাতের সঙ্গে সুলেখার করতলের তুলনা?

রাতুল নিজের ভুলটা এর পরেও বুঝতে না পেরে শাজাহানের ওপর রেগে উঠে বলেছিল, তুমি হাসলে কেন? তুমি হাসলে কেন?

সুলেখার মায়া হয়েছিল। রাতুল শেক্সপীয়ার পড়েনি, তা বলে তার মুখের ওপর ওরকমভাবে হেসে ওঠা উচিত হয়নি শাজাহানের।

শাজাহান কিন্তু রাতুলের অজ্ঞতা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ বিদ্রূপ করতে ছাড়ে নি সেদিন। ত্রিদিব আর সুলেখা দু'জনেই সূক্ষ্মভাবে বাধা দিতে চেয়েছিনে। কিনতু রাতুল যে এই আড্ডায় যোগ দেবার যোগ্যনয় তা শাজাহান প্রায়ই বুঝিয়ে দিতে চায়।

শাজাহান আর রাতুলকে এক সঙ্গে দেখলেই শেষের দিকে ভয় ভয় করতো সুলেখার। দু জনে যেন হঠাৎ হঠাৎ হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কী নিয়ে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা?

সুলেখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েটসের কবিতা তোমার ভালো লাগছে?

সুলেখা বললো কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লো, এবারে উঠতে হবে।

ত্রিদিব বললেন, আর একটু জোরে বৃষ্টি আসুক। তোমাকে আজ একদম অন্যরকম লাগছে সুলেখা।

–কী রকম?

–যেন তুমি কোনো মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্য হয়েছিলে, হঠাৎ এই মাত্র রক্তমাংসের নারী হয়ে নেমে এলে।

সুলেখা জিনিস পত্র গুছোতে গুছোতে হেসে বললো, ছত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল আমার, বুড়ি হতে আর বাকি নেই, এখনও এইসব কথা।

জোরে বৃষ্টি নামলো, ওদের ফিরতেই হলো গাড়িতে। তখুনি সুলেখা আগামী শনিবারের জন্য ত্রিদিবকে হুমায়ুনস টুম্ব এ নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলো অগ্রিম।

বাড়ি ফেরার পর সুলেখাকে বেরুতে হলো আবার। সুলেখার পিসিমারা থাকেন দড়িয়াগঞ্জে। তার পিসেমশাই দিল্লিতে চাকরি থেকে অবসর নেবার পর এখানেই বাড়ি কিনে থেকে গেছেন। সুলেখা-ত্রিদিবের সন্ধান পেয়ে তিনি মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করেন। তাঁর মাধ্যমে কিছু কিছু প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হয়েছে, কেউ কেউ নেমন্তন্ন করেন, অমিশুক ত্রিদিব কোথাও যেতে চান না, সুলেখাকেই ভদ্রতা রক্ষা করতে হয়।

আজ সেই পিসেমশাই এস জানিয়ে গেলেন, তাঁর মেয়ের হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়েছে, পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করতে আসবে সন্ধেবেলা, সুলেখা ত্রিদিবকে যেতেই হবে একবার। ত্রিদিবের যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, বিশ্বস্ত ড্রাইভারের সঙ্গে তিনি পাঠিয়ে দিলেন সুলেখাকে। তারপর তিনি বইপত্র নিয়ে বসলেন।

ইষ্টকুটুম পাখির বার্তা ভুল হয়নি, খানিকবাদেই এসে উপস্থিত হলো শাজাহান।

ত্রিদিব তাকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানালেন, বাবুর্চিকে বলে দিলেন খানা বানাতে, কিন্তু আড্ডা জমলো না। সুলেখা বাড়িতে নেই শোনা মাত্র সে যেন কেমন চুপসে গেছে। তার দৃষ্টিতে জ্যোতি নেই, এমনকি খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর সে প্রস্তাব দিল, আজ সে ফিরে যাবে, কাল সকালে তার জরুরি কাজ আছে।

ত্রিদিব বললেন বসুন আর একটু বসুন। সুলেখার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলে সে দুঃখ পাবে।

সুলেখা ফিরলো রাত দশটার একটু পরে। তার চোখে মুখে অনেক গল্প। তার এম এ পাস পিসতুতো বোন শিখা একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছে। বাবা-মাকে আগে সে কিছু জানায়নি, কিন্তু গোপনে সে একটি পাঞ্জাব যুবকের বাগদত্তা। শিখার বাবা-মা এলাহাবাদের এক বঙ্গ সন্তানের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করেছেন, শিখা তার রাশভারি বাবার মুখের ওপর না বলতে পারে না, সেইজন্য সে এলাহাবাদের পাত্রটিকে চিঠি লিখে সব কথা জানিয়েছে। তাই নিয়ে আজ হুলুস্থুলু কাণ্ড। শিকার আজ আশীর্বাদ হবার কথা, কিন্তু এলাহাবাদ পক্ষ বাড়িতে এসে তর্জন গর্জন শুরু করে দিল, তারা অপমানিত বোধ করেছে।

এই সব গল্পে রাত হয়ে গেল অনেক শাজাহান থেকেই গেল শেষপর্যন্ত।

রবিবার সকালে দেরি করে উঠলেও ক্ষতি নেই,কিন্তু ত্রিদিবকে যেতে হবে জাপানী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা চালাতে। ব্রেক ফাষ্ট টেবিলেই কথা শুরু হবে।

ত্রিদিব উঠে পড়ায় সুলেখারও ঘুম ভেঙে গেছে। ত্রিদিব আলতো করে তার কপাল ছুঁয়ে বললেন, তুমি আরও একটু ঘুমিয়ে নাও না। আমাকে তো যেতেই হবে, উপায় নেই।

সুলেখা একটুখানি উঠে বসে বললো, তুমি তা হলে শাজাহানকে নিয়ে যাও। ওকে তোমার গাড়িতে লিফট্ দিলে ওর সুবিধে হবে।

ত্রিদিব বললেন, শাজাহান ঘুমোচ্ছেম এখন ওকে জাগিয়ে লাভ কী? ও থাক। ওকে বরং আজ দুপুরে এখানে খেয়ে যেতে বলো।

–তুমি কখন ফিরবে?

–আশা করছি লাঞ্চের আগে ফিরতে পারবো। রবিবার আমার বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না।

সুলেখার চোখে তখনও,এক রাশ ঘুম। সে আর কথা না বাড়িয়ে বালিশে মুখ গুঁজলো।

সকাল থেকেই টিপটিপ করে আবার বৃষ্টি পড়ছে। বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। দিন মজুর খেলোয়াড় কিংবা জাপানীদের সঙ্গে যারে ব্যবসার কথা চালাতে হয়, তারা ছাড়া আজ সকালে কারুর ঘুম থেকে ওঠার তাড়া নেই।

সুলেখার দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙলো সাড়ে নটায়। বারান্দায় পাজামার সঙ্গে ড্রেসিং গাউন পরে শাজাহান চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছে। সুলেখাকে দেখে সে সহাস্যে বললো, গুড মর্নিং ভাবী। আপনার লোক যা চা বানিয়েছে, মুখে দেওয়া যায় না। আপনার হাতের তৈরি আসল এক কাপ

চা এবার খেতে চাই।

সুলেখা বাবুর্চিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে শাজাহানের সামনে এসে বসে লজ্জিতভাবে বললো, ইস আজ বড্ড বেশি ঘুমিয়েছি। আপনি অনেকক্ষণ উঠেছেন?

শাজাহান বললো, না, এই তো কিছুক্ষণ, দাদা বেরিয়ে গেছেন শুনলাম, কখন গেলেন টেরও পাইনি।

শাজাহান প্রায় ত্রিদিবেরই সমবয়েসী, তবু সে ত্রিদিব সুলেখাকে দাদা ও ভাবী বলে। সৌজন্য ও বিনয়ে সে ত্রিদিবের চেয়েও এক কাঠি ওপরে যায়। সুলেখার দিকে সে মাঝে মাঝেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে ঠিক লালসা নেই কিন্তু অন্য একটা কিছু আছে। শাজাহানের সামনে একলা বসতে সুলেখা বেশ অস্বস্তি বোধ করে, যদিও তার কারণটা সে এখনও বুঝতে পারে না।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলো, রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

এটা একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন। নিছক কথা শুরু করার জন্যই বলা। এর উত্তরটাও মামুলি হয়। কিন্তু আজই প্রথম শাজাহান দু'দিকে মাথা নেড়ে গাঢ় স্বরে বললো, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম। আপনার এখানে আসি, আপনি যতক্ষণ চোখের আড়ালে থাকেন, ততক্ষণ মনটা অস্থির অস্থির লাগে।

সুলেখা মুখ নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো। এই সব কথা তার পছন্দ হয় না, যদিও মানুষ হিসেবে সে শাজাহানকে পছন্দ করে।

শাজাহান আবার বললো, ভাবী, প্রত্যেক মাসে দিল্লিতে ছুটে আসি শুধু আপনাকে একবার চোখের দেকা দেখবার জন্য। আমার ব্যবসা অন্য লোক এলেও চলে, কিন্তু আমি না এসে পারি না।

সুলেখা তখনও মুখ নিচু করে আছে দেখে শাজাহান খানিকটা ব্যাকুলভাবে বললো, আপনি রাগ করলেন? আমি মনের কথাটা বললাম আমি আপনার একজন দারুণ ভক্ত।

একটা কিছু বলা দরকার তাই সুলেখা চোখ না তুলেই বললো যা কী যে বলছেন।

...আজকের সকালটা ভারি সুন্দর না? আপনি সিমলা কিংবা নৈনীতাল গেছেন? বর্ষায় আমার পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে।

–যাবেন? আমি ব্যবস্থা করবো?

–ও যে এখন কাজে বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

–দাদাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবো। চলুন, সিমলায় তবে একটা হোটেল বুক করে ফেলি? আমার চেনা আছে।

বাবুর্চি চয়ের ট্রে এনে রাখলোসামনের গোল টেবিলে। আর তখনই একটা ট্যাক্সি থামলো সামনে। সেই ট্যাক্সি থেকে নামলো রাতুলসুলেখার বুকটা ধক্ করে উঠলো। একপলক দেখলেই বোঝা যায় রাতুল সুস্থ স্বাভাবিক নয়।

রাতুলের পোশাক সব সময় এমন পরিপাটি তাকে তার চেহারা থেকে তার পোশাককে কখনো আলাদাভাবে চোখে পড়ে না। এখন রাতুলের গায়ের জামাটা দোমড়ানো, যেন কাল সারা রাত সে ঐ জামা পরেই ট্রেনে শুয়েছিল। মুখে দু'দিনের দাড়ি মাথায় চুল এলোমেলো।

শাজাহান উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আরে, রাতুলবাবু, আসে, আসেন।

রাতুল যেন শাজাহানের কথা শুনতে পেল না, তাকে দেখতেও পেল না। সে সোজা এগিয়ে এসে বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় সুলেখাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি আমার চিঠির উত্তর দাও নি কেন?

সুলেখা নিষ্প্রাণ গলায় বললো, আপনি এসো বসুন। চা খাবেন? আমি চা করছি।

রাতুল আরও জোরে বললো, আগে আমার কথার উত্তর দাও, তুমি আমার চিঠির ... তুমি কি আমার জন্যই কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছো।

শাজাহান বললো, আরে, আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? এসে বসেন। কোন ট্রেনে এলেন?

রাতুল এবারে দেখলো শাজাহানকে। তার ঘরোয়া পোশাক, তার সাবলীল ভঙ্গি। গৃহস্বামীকে দেখা যাচ্ছে না, যেন তার ভূমিকাটাই নিয়েছে শাজাহান।

রাতুল একবার শাজাহান আর একবার সুলেখাকে দেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, ত্রিদিব কোথায়?

সুলেখা উত্তর দিল না, শাজাহান বললো, দাদা এখন বাড়িতে নেই।

–আপনি কবে এসেছেন?
–আমি কাল এসেছি।
–রাত্তিরে এখানে ছিলেন?
–হ্যাঁ।
রাতুল এবারে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো সুলেখার দিকে। ত্রিদিব বাড়িতে নেই। সদ্য বিছানা ছেড়ে আসা শরীর নিয়ে শাজাহান আর সুলেখা অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে চা খেতে বসেছে সকালে, এই দৃশ্যে তার মাথায় জ্বলে উঠলো ঈর্ষার আগুন। মাথার মধ্যে অন্য আগুনও ছিল, আগুনে আগুন যোগ হলো।
বাড়িতে যে কাজের লোকজন রয়েছে, তারা শুনবে, সেসব কিছু গ্রাহ্য না করে সে সুলেখাকে বললো, তোমরা আমার জন্য কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছো? আমি এমনই সাংঘাতিক প্রাণী? তুমি টেলিফোনে আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলে, আমি কি ছেলেমানুষ?
সুলেখা রাতুলকে কী বলবে তা ভেবে পাচ্ছে না। চিঠির উত্তর না দেওয়াটাই যে প্রত্যাখান তা যে বোঝে না, তাকে আর কী ভাবে বোঝানো যাবে? রাতুলকে সে অপছন্দ করে না। কিন্তু তাকে আর বেশি প্রশ্রয়ও দেওয়া যায় না।
রাতুল আজ সব ভদ্রতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। পুরুষ মানুষের এই রূপের সঙ্গে পরিচিত নয় সুলেখা।
সে কাতর মিনতির সঙ্গে বললো, আপনি প্লিজ বসুন।
রাতুল তবু কর্কশ ভাবে বললো, তুমি কেন আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে? হোয়াই? হোয়াই?
–আমি তো কিছু মিথ্যে বলি নি। আপনি ভুল বুঝেছিলেন।
রাতুল সুলেখার কাঁধ ধরে আরও চেঁচিয়ে বললো, আমি ভুল বুঝেছি? ইডডন উট ইউ সিডিউস মি...
শাজাহান উঠে এসে রাতুলের হাত ধরে বললো, এ কী করছেন? বসুন বসুন আগে একটু জিরিয়ে নিন। সারা রাত ট্রেন জার্নি করে এসেছেন।
রাতুল এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে বললো, আপনি সরে যান। আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে আসিনি। সুলেখার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।
–তা বলে এত চ্যাঁচামেচি করবেন? এটা ঠিক হচ্ছে না। মাথা ঠাণ্ডা করুন।
রাতুল আরও গলা চড়িয়ে বললো সুলেখা, তুমি এই মুসলমানটাকে তোমার বাড়িতে থাকতে দাও, আর আমার চিঠির জবাবও দাও না। এই তোমার সতীপনা। ত্রিদিব বুঝি কাল রাত্রেও বাড়িতে ছিল না?
সুলেখা এবার মুখ তুলে প্রবল বিতৃষ্ণা সঙ্গে বললো, ছিঃ।
শাজাহান বললো, রাতুলবাবু ইউ আর ক্রসিং ইওর লিমিট।
রাতুল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঠাস করে এক চড় কষালো শাজাহানের গালে। শাজাহান কয়েক পা পিছিয়ে গেল দ্বিতীয়বার মারার জন্য হাত তুলে রইলো রাতুল।
আঘাতের চেয়েও অনেকখানি বিস্ময় ফুটে উঠলো শাজাহানের মুখে। ত্রিদিবের বাড়ির পরিবেশে চড় মারামারি যেন অকল্পনীয় ব্যাপার।
–আপনি, আপনি আমাকে মারলেন, রাতুলবাবু? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?
–বেশ করেছি। আরও মারবো। তুই কোন সাহসে এ বাড়িতে আসিস। দূর হয়ে যা। শুয়োরের বাচ্চা পাকিস্তানী। যা পাকিস্তানে চলে যা।
সুলেখা আর সহ্য করতে পারলো না। দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে সে ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।
রাতুল আর শাজাহান মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। রাতুলে চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, সে আরও মারামারি করার জন্য তৈরি। আঙুল তুলে হুকুমের সুরে বললো, যা বেরিয়ে যা। কোনোদিন্ন যেন তোকে আর এ বাড়িতে না দেখি।
শাজাহান মৃদু শক্ত গলায় বললো, আপনি আমাকে পাকিস্তানে পাঠাতে চাইছেন? না আমি পাকিস্তানে যাবো না। দিল্লি জায়গাটা আপনার বাপের সম্পত্তি নয়। এ বাড়িতেও আপনাকে গুণ্ডামি করার অধিকার কেউ দেয়নি।

–দেখি, অধিকার আছে কি না। তুই যে পাকিস্তানের স্পাই তা আমি জানি না ভেবেছিস?
শাজাহান দু'চোখে তীব্র ঘৃণা ফুটিয়ে বললো, আপনি যে এত নিচে নেমে যেতে পারেন তা আমি কোনো দিন কল্পনাও করিনি। পাকিস্তানের স্পাই, আমি? শুধু মুসলমান বলে? না, আমি পাকিস্তানে যাবো না। আপনি আমার গায়ে হাত তুলেছেন, তার শোধ আমি নেবোই। হিন্দুদের নরকে সবচেয়ে যে খারাপ জায়গাটা আছে, সেখানে আমি আপনাকে পাঠাবো। আমি মুসলমানের বাচ্চা, আমার কথার খেলাপ হয় না।

॥ ২৫ ॥

পত্রিকার নাম নিয়ে আলাপ আলোচনা চললো বেশ কয়েকদিন। নাম ঠিক করা সহজ নয়, নানারকম মত বিভেদ। আলতাফের ইচ্ছে নবারুণ বা নবার্ক, এই জাতীয় নাম দেওয়া শাখাওয়াত হোসেনের আবার ঐ ধরনের সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দ অপছন্দ। তিনি প্রস্তাব দিলেন, নাম রাখা হোক 'জেহাদ'।
এই নামটি অবশ্য তরুণদের পছন্দ হয় না, কিন্তু শাখাওয়াত হোসেন পত্রিকার মালিক তার ইচ্ছেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না এককথায়। পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি তর্ক যতই চলুক হোসেন সাহেব নিজের পছন্দটি আঁকড়ে ধরে রইলেন। নামটি ছোট, তিন অক্ষরের শুনতে ভালো বেশ একটা তেজের ভাবও আছে।
ঐ নামটি যেদিন প্রায় ঠিক হবার উপক্রম, তার পরদিন পল্টন কাঁধের ঝোলায় একটি বাংলা অভিধান নিয়ে এলো। কথা শুরু হবার পর সে হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো চাচা, জেহাদ কথাটার মানে আপনি কী ভেবেছেন?
হোসেন সাহেব বললেন, কেন? এ সহজ কথার মানে সবাই জানে। জেহাদ মানে লড়াই।
পল্টন বললো, ডিকশনারিটা একবার কনসাল্ট করা যাক। বর্গের জ, জে জে জে, এই জেহাদ। লিখেছে, জিহাদ দেখো। আসল কথাটা হলো জিহাদ আমরা মুখে বলি জেহাদ। নাম রাখতে গেলে জিহাদই রাখতে হয়। জিহাদ মানে লিখেছে, "মুসলমানগণের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে একযোগে ধর্মযুদ্ধ।"
বসির, আলতাফরা এক সঙ্গে বলে উঠলো না, না, নাম রাখা চলবে না।
হোসেন সাহেব একটু খানি দমে গেলেন। কুর্তার পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল মুছতেই তাঁর আর একটা নাম মনে পড়ে গেল। তিনি উজ্জ্বল মুখে বললেন, তা হলে নাম দাও 'আজান'। এ নাম অতি সুন্দর।
পল্টন অভিধানের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো, এর মানেটা দেখেনি।
আলতাফরা হেসে উঠলো। আজানের মানে সবাই জানে।
পল্টন বললো আজীর আজল আজা আজাড় এই যে আজান। মানে হলো "আহ্বান, মুসলমানদিগকে নামাজ পড়িবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান। বৈদেশিক।"
হোসেন সাহেব বললেন, এতে আপত্তির কোন কারণ আছে? আমরা তো সকল মানুষরে ডাক দিতেই চাই।
অন্যরা কেউ চট করে কিছু মন্তব্য করলো না। যদিও এই নামটিও সকলের ঠিক পছন্দ হয়নি। বসির আর বাবুল চোখাচোখি করলো, এরা তলে তলে মার্ক্সবাদে দীক্ষা নিয়েছে পত্রিকার নামে ধর্মীয় গন্ধ রাখা এদের মনঃপুত নয়।
আলতাফ বললো, আমি একটা কথা কই, চাচা। মামুন ভাইরে আমরা নিচ্ছি, এডিটর হিসাবে আপনার নাম থাকলেও বারচুয়ালি তিনিই সব দেখাশুনা করবেন। মামুনভাই কবি মানুষ পত্রপত্রিকার সাথে অনেকদিন ধইরা কানেকটেড, নামের ব্যাপারে তাঁর একটা মতামত নেওয়া দরকার।
হোসেন সাহেব ঈষৎ অসন্তোষের সঙ্গে বললেন, ঠিক আছে লও হ্যার মতামত, কিন্তু আমার মন-পসন্দ না হইলে আমি ভেটো দিমু।
বাবুল তার বড় ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছোট করে কাশলো। পত্রিকার নামের ব্যাপারে মামুনভাই এর সঙ্গে আর আলোচনা হয়েছে আগেই। মামুন ভাই তার বাসায় প্রায়ই আসেন মঞ্জু আর

তার সন্তানের খোঁজ-খবর নিতে। মামুনভাই বলেছেন যে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি একটি নামই বলবেন এবং সেটাই গ্রহণ করতে হবে। তিনি ঠিক করে রেখেছেন, ভবিষ্যৎ। আমরা তো সবাই ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে আছি। বাবুল বলেছিল, কিন্তু য-ফলা দিয়ে নাম কি প্রাক্ট্যাটিকাল হবে? মামুন উত্তর দিয়েছিলেন, কেন? তয় তা দিয়ে ইত্তেফাক' যদি ভালোভাবে চলতে পারে, তা হলে য-ফলা দিয়ে 'ভবিষ্যৎ'কেন চলবে না।

আলতাফ মুখ ফেরাতেই বাবুল বললো, মামুনভাই তাঁর পছন্দের কথা আমাকে জানিয়েছে। উনি নাম রাখতে চান ভবিষ্যৎ।

হোসেন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ভেটো প্রয়োগ করে বললেন, ও চলবে না, আর কিছু সাজেস্ট করতে বলো।

শেষ পর্যন্ত কাগজের নাম হলো দিনকাল। আগে ঠিক ছিল আগামী ঈদের দিন থেকে পত্রিকার যাত্রা শুরু হবে, কিন্তু এর মধ্যেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন। অমনি সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নির্বাচনের মুখেই তো কাগজ চালাবার প্রকৃষ্ট সময়।

আইয়ুব যে নির্বাচন চাইলেন, তাতে দেশের সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। ভোট দেবে পাকিস্তানের দুই ডানা থেকে মাত্র আশী হাজার মানুষ, এদের নাম হলো বেসিক ডেমোক্রাটস, যাদের নির্বাচন আগেই হয়ে গেছে। এই বেসিক ডেমোক্রাটসরা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ নব্য ধনী সম্প্রদায় ব্যবসায়ী কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি, আইয়ুবের আমলে এদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হচ্ছে। এই বেসিক ডেমোক্রাটসরা নির্বাচিত করবে শুধু মাত্র প্রেসিডেন্টকে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আবার সেই পদের প্রার্থী।

এটা কি নির্বাচন, না নির্বাচনের প্রহসন? বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রথমেই এই নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানালো । এই নির্বাচন বয়কট করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রমনা পার্কের কাছে বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দিন-কাল কার্যালয় । সম্পাদক হিসেবে শাখাওয়াত হোসেন - এর নাম ছাপা হবে, নামের জন্যই তিনি কাগজ করছেন । তার আলাদা ঘর, সেখানে তিনি যখন ইচ্ছে আসবেন। মামুন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, তার নাম ছাপাবার আকাঙ্ক্ষা নেই, তিনি চান গণতন্ত্রের উদ্ধার, প্রথম দিন থেকেই তিনি খাটতে লাগিলেন দারুন ভাবে ।

তিনি আলতাফ বসির পল্টনের নিজের ঘরে ডেকে বললেন, আমরা কিন্তু এই নির্বাচন সমর্থন করবো। আমরা গণতন্ত্র চাই, নির্বাচন চাই, যে-কোনো নির্বাচন থেকেই দূরে সরে থাকা কোনো কাজের কথা নয়। ধরো, এই ইলেকশানে যদি আমরা আইয়ুবকে ফেলে দিতে পারি, তা হলে পরবর্তী প্রেসিডেন্টের ওপর জেনারাল ইলেকশান কল্ করার জন্য চাপ দেওয়া যাবে।

পল্টন জিজ্ঞেস করলো, আইয়ুব সঙ্গে কনটেস্ট করবে কে? সে রকম ন্যাশনাল ফিগারে কে আছে?

সেটা ভেবে দেখতে হবে। তোমরা অপোজিশান পার্টির লিডারদের ইন্টারভিউ করো।

আলতাফ বললো, মামুনভাই, একটা কথা বলবো। কাগজের পলিসি আপনিই ঠিক করবেন। কিন্তু সেটা আমার হোসেন চাচারে দিয়ে একটু অ্যাপ্রুভ করায়ে নিতে হবে। একটু কায়দা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আসল ব্যাপার কী জানেন আপনার মুখের কথাটাই ওনার মুখদিয়ে বলায়ে নিতে হবে আর কি।

মামুন বললেন, সেটা কী ভাবে সম্ভব? আলতাফ, তুমি জানো, আমি পয়সার জন্য এই চাকরি করতে আসি নাই। এসেছি তোমাদের কথাতে। তোমার চাচা যদি কোনো প্রতিক্রিয়াশীল মতামত চাপায়ে দিতে চান, আমি তৎক্ষণাৎ রিজাইন করবো। আবার তোমার বন্ধুরা যদি প্রো-চাইনিজ লাইন নিতে চায়, আমি তার মইধ্যেও নাই। আমি পাকিস্তানের সব মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী। আমি বিচ্ছিন্নতাবাদ ঘৃণা করি। পাকিস্তানের যারা ভাঙতে চায় আমি তাদের দুশমন মনে করি। আমি ন্যাশানালিস্ট। এই আমার সোজা কথা।

পল্টন বললো, আমরা এক একটা ইস্যু ধরে আপনার সাথে আলোচনা করবো। আমার ধারণা, আপনার সাথে আমাদের মতবিরোধ হবে না।

আলতাফ বললো, আগে আমার কথাটা কইতে দাও কাগজেই মালিকের স্বার্থ দ্যাখতে হয়। আমার চাচা...

মামুন বললেন, কাগজ লসে রান করলে বেশিদিন চলবে না সে আমি জানি। সার্কুলেশান যাতে বাড়ে সে দায়িত্ব আমার।

আলতাফ বললো, আমার চাচা শুধু প্রফিট চান না, তিনি সমাজে নাম কেনতে চান। মাঝে মাঝে তেনার দুই একটা ছবি ছাপাইতে হবে, এই আমার অনুরোধ। আর এমন একটা ভাব দেখাতে হবে, যেন ওনার মতামতেই সব কিছু চলতেছে। কায়দাটা আমি বলে দিই। বিচক্ষণ কথাটার ওপর আমার চাচার খুব দুর্বলতা আছে। মাঝে মাঝে ঐ শব্দটা ব্যবহার করবেন। যেমন ধরেন, আপনি যদি বলেন, হোসেন সাহেব আপনার মতন বিচক্ষণ মানুষ নিশ্চয়ই বুঝবেন যে এখন এই ইলেকশন আমাদের সাপোর্ট করা দরকার। দ্যাখবেন যে আমার চাচা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলবেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

পল্টন হেসে বললো, ঠিক এটা আমিও লক্ষ করেছি বটে।

মামুন ভুরু কুঁচকে বললেন, ছবি ছাপাতে হবে।

আলতাফ বললো, এমনি এমনি কীআর ছবি ছাপাবেন? ধরেন, উনি মোনেম খাঁর সাথে আলাপ করতে গেলেন, তখন দুইজনের ছবি ছাপাবেন। সেটা একটা নিউজও হইলো।

কাগজ চলতে লাগলো মন্দ না। মামুন প্রেসে পাঠাবার আগে প্রত্যেকটা কপি নিজে দেখে দিতে লাগলেন, ভাষার শুদ্ধতার প্রতি নজর রাখলেন সরকারের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণের বদলে সম্পাদকীয় কলমেব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রয়োগ করতে লাগলেন প্রচুর। বিভিন্ন জায়গায় রিপোর্টার পাঠিয়ে প্রকাশ করতে লাগলেন নানান দুর্নীতির কাহিনী। পাঠকরা এই সব পছন্দ করে।

বিরোধী দলগুলিও শেষ পর্যপ্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আইয়ুব বিরোধী সব দলগুলি একত্র হয়ে নাম নিল কম্বাইনড অপোজিশন পার্টি বা ক। এখন প্রশ্ন হলো, আইয়ুবের বরুদ্ধে দাঁড় করানো হবে কাকে? এমন কোন্ নেতা আছেন, যিনি পূর্ব ও পশ্চিম দুই পাকিস্তানেই সমানভাবে স্বীকৃত? সোহরাওয়ার্দি বেঁচে থাকলেও না হয় কথা ছিল..।

শেষ পর্যন্ত একটা নামই সবার মনে এলো। জিন্নার নামে পাকিস্তানের মানুষ এখনও মাথা অবনত করে। তিনি পাকিস্তানের স্রষ্টা, নতুন রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হবার পর তিনি বেশি দিনবাঁচেনি, তাই তাঁকে কোনো বদনাম কুড়োতে হয়নি। সেই জিন্নার নামের ম্যাজিকটা কাজে লাগানো দরকার। জিন্না সাহেবের বোন ফতিমা জিন্না এখনো বেঁচে আছেন। তিনি আগে বিশেষ রাজনীতি করননি, তাতে কী আসে যায়, তাঁর হয়ে প্রচার চালাবেন অন্যরা।

ফতিমা জিন্না এই নির্বাচনী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে রাজি হয়ে গেলেন।

কিন্তু মামুন বিপদে পলেন মাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে। একজন স্ত্রীলোক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবে, এই চিন্তাটাই তার কাছে অসহ্য। স্ত্রীলোক দেবে মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা? 'দিন-কাল' অফিসে ঢুকতে ঢুকতে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন ইমপসিবল। আমাগো কাগজ ফতিমারে সাপোর্ট করবে না। ইমপসিব। পাকিস্তানের আর কোনো পুরুষনাই? মাইয়া মানুষের এই মদ্দাপনা ইসলাম-বিরোধী।

মামুন নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে রইলেন। হোসেন সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠালেও তিনি দেখা করতে গেলেন না। বিকেলবেলা আলতাফ এলে তিনি গম্ভীরভাবে এক টুকরো কাগজ তুলে বলরেন, এই নাও আমার রেজিগনেশান লেটার। দিয়া আসো তোমার চাচারে। তিনিই এডিটারি করুন।

আলতাফ হালকাভাবে বললো, আরে মামুনভাই, আপনে মাথা গরম করেন ক্যান। কী হইছে শুনি।

মিতভাষী, নম্র স্বভাব মামুন হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে বললেন, তুমি বলতে চাও আমি ফতিমা জিন্নাকে ছেড়ে আইয়ুবকে সমর্থন করবো? যদি এক বাপের সন্তান হয়ে থাকি..

আলতাফ বললো, হায় আল্লা। আপনে দেখি বড় চটা চটছেন। দ্যাখেন না, সব ম্যানেজ কইরা দিতেছি। আচ্ছা মামুনভাই, আগে একটা কথা জেনেনি, হিস্ট্রিতে যেন পড়ছিলাম, দিল্লির মসনদে একবার এক সুলতানা বসে ছিল না? কী যেন নামটা?

–রাজিয়া।

–তিনি তো ভালোই রাজ্য চালিয়েছিলেন, তাই না? ব্যাস, তবে তো কেল্লা ফতে। এর পর আলতাফ কিছুক্ষণ মামুনের সঙ্গে শলা পরামর্শ করলো। তারপর দুজনে একসঙ্গে গেল হোসেন

সাহেবের ঘরে।

হোসেন সাহেব প্রথমেই বললেন, আমি নোট দিয়া দিছি আমর কাগজ ফতিমার এগেইনস্টে।

আলতাফ বললো, চাচা, আগে দু'একটা কথা শুইনা লন। খুব প্রাইভেট। দরজা বন্ধ করি। চা-পানি কিছু লাগবে।

হোসেন সাহেব অস্থিরভাবে বললেন, না। আগে কাজের কথা কও। মাইয়ালোকে রাষ্ট্রপতি হইতে চায়, তোরা তোরা এমন কথা শোনাও হারাম।

আলতাফ বললো, চাচা, মামুনভাই আপনের মতামতগুলিরে খুব মূল্য দানে। আজ সকালেই কইতেছিলেন, ওহে, তোমার চাচার মতন বিচক্ষণ মানুষকে যদি প্রশ্ন করা যায়, আইয়ুব না জিন্না আইয়ুব না জিন্না। এই দুটোর নামের মধ্যে আপনি কোন্টা বেছে নেবেন, তা হলে নির্ঘাৎ তিনি বলবেন, জিন্না, জিন্না।

হোসেনসাহেব বললেন, আলবাৎ। একশো বার। জিন্নার সাথে আইয়ুবের কোনো তুলনা চলে? কায়েদ এ-আজম হলেন জাতির পিতা।

জিন্নারে ইন্ডিয়ার লোক পছন্দ করে না, একথা আপনি স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই। জিন্না অনেক বড়, তিনি অনেক বেশি বুদ্ধি ধরতেন।

ঠিক আপনি ঠিক বলেছেন চাচা। পাকিস্তানরে স্ট্রং করার জন্য এখন আর এখন জিন্নার দরকার কি না?

হক কথা। যদি জিন্না সাহেবের এখন ভাই থাকতো কিংবা পোলা থাকতো, আমি তাকেই সালাম জানাতাম। তার বদলে তোমরা একজন মাইয়া মানুষেরে...

শোনেন চাচা, শোনেন। মামুনভাই বলছিলেন, শাখাওয়াত হোসেনের মতন বিচক্ষণ মানুষ নিশ্চয়ই বুঝবেন যে ফতিমা জিন্না আসলে আর একজন রাজিয়া সুলতানা।

হেডায় আবার কেডা?

আলতাফ মামুনের দিকে ফিরে বসলো, মামুনভাই, এবারে আপনিই বলেন।

মামুন একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, আপনি একটা নতুন পত্রিকা সম্পাদক, আপনার পত্রিকা থেকেই পাঠকরা জানবে যে একদা দিল্লির মসনদে বসেছিলএক মুসলমান কুমারী। তিনি দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেছেন, নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সৈন্য পরিচালনা করেছেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ ই-সিরাজ লিখে গেছেন যে নারী হয়েও রাজকার্যে তিনি ছিলেন বড় বড় বাদশাদের সমকক্ষ, ন্যায়পরায়ণ, বিদ্যোৎসাহিনী, যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ।

হোসেন সাহেবের ভুরু উঁচুতে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই এরকম কেউ দিল্লির সিংহাসনে বসেছিল? স্ত্রীলোক? মুসলমান?

মামুন বললেন, সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা রাজিয়া মসনদে বসেছিলেন বারো শো ছত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে। অযোগ্য রুকনউদ্দীনকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজিয়া মসনদে বসে প্রজাদের..

আলতাফ এর মধ্যে মাথা গলিয়ে বললো, ঐ রুকনউদ্দীন হইলো আমাদের আইয়ুব। বোঝলেন চাচা। রাজিয়াও কুমারী ছিলেন, ফতিমা জিন্নও কুমারী। এই সব মিলের কথা কোনো কাগজে এখনও ছাপা হয় নাই। আমাগো দিন কালে যদি প্রথম বাইরায় সেইজন্যই তো মামুনভাই বলছিলেন, আপনার মতন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এটা বেশি বুঝাতেই হবে না।

হোসেন সাহেব টেবিলে কিল মেরে বললেন, আরে, আমি তো তোমাগো টেস্ট করতেছিলাম। আমি রাজিয়ারকথা জানি না? তিনিই যে সব রূপে এসেছেন...কাইলকের কাগজে ব্যানার হেড লাইন দাও, ফতিমা জিন্না নব রূপে রাজিয়া সুলতানা.. ।

নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেকাগজের বিক্রিও বাড়তে লাগলো। মামুন কাজের নেশায় মেতে উঠলে। তিনি রিপোর্টার পাঠাতে লাগলেন গ্রাম গ্রামে।।

বাবুল চৌধুরী দিন কাল পত্রিকায় কাজ নেয়নি, তার কলেজের চাকরিটা সে রেখে দিয়েছে, তবে এখানে সে প্রতি সন্ধেবেলাতেই আসে, আড্ডার এক কোণে চুপ করে বসে থাকে। বন্ধুদের চাপে পড়ে সে দু'একটা প্রবন্ধও লিখেছে, তাও ছদ্মনামে। সে একটু আড়ালে আড়ালে থাকতে চায়।

বেশি আড্ডা জমে নিউজ রুমে। রিপোর্টাররা একটু রাতের দিকে নানা রকম খবর ও বহু অসমর্থিত গুজব নিয়ে আসে ঝুড়ি ভরে, সেই সব নিয়ে হাসি মস্কা হয়। বাবুল পারতপক্ষ মামুন বা

শাখাওয়াত হোসেনের ঘরে যায় না, ঐ দুই কক্ষে পত্রিকার নীতি নির্ধারক আলোচনায় সে অংশ নিতে চায় না। আলতাফ অনেক চেষ্টা করেও তার ছোটভাইকে এই কাগজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াতে পারেনি।

মামুনের সঙ্গে বাবুলের দেখা হয় তার নিজের বাড়িতে। বাবুলের ছেলে সুখু এখন হামগুড়ি দেওয়া ছেড়ে টলটলে ভাবে হাঁটতে শিখেছে, দু'একটা কথাও বলে। মামুন সুখুকে না দেখে থাকতে পারে না, সপ্তাহে অন্তত দু'তিনটি সন্ধেবেলা আসবেনই। পত্রিকা শুরু হবার আগে প্রতিদিন সন্ধেবেলা আসতেন। ঠিক সাতটা বাজার দু'এক মিনিট পরেও সিঁড়িতে ডাক শোনা যেত, মঞ্জু, মঞ্জু। মামুনমামাকে দেখলে মঞ্জুরও চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মামুন মামা আসতে পারেন বলে সে কোনো সন্ধেবেলাই পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে যেতে চায় না। মামুন এসেই সুখুকে কোলে তুলে নিয়ে এমন আদর করতে থাকেন যে মনে হয় তিনি নিজেও শিশু হয়ে গেছেন। সুখু কখনো কখনো তার মায়ের কোলে যেতে চাইলেও মামুন একটু পরেই আবার মঞ্জুর কোল থেকে সুখুকে তুলে আনেন নিজের বুকে। মামুনের এখন কোনো পুত্র সন্তান নেই বলেই হয়তো তিনি মঞ্জুর ছেলের ওপর তাঁর সমস্ত স্নেহ ভালবাসা আদর উজাড় করে দিতে চান।

একদিন একটু বেশি রাত করে বাড়ি ফিরে বাবুল মঞ্জুকে বললো, শোনো, আমি কয়েকটা দিন একটু মফস্বল থেকে ঘুরে আসবো ভাবছি।

সুখুকে সদ্য ঘুম পাড়িয়ে মঞ্জু তখন দেয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। পাশের ঘরের টেবিলে ঢাকা আছে রাতের খাবার। বাবুলে ফিরতে যতই দেরি হোক সে কোনোদিনই আগে খেয়ে নেয় না। বুলের ফিরতে দেরি হলে সে বকাবকিও করে না। পাশের বাড়িতেই থাকে মঞ্জুর ফুফাতো বোন জুনিপার, তার স্বামী শোভান একটি অতি বদ মতাল, প্রতি রাতে সে বাড়ি ফেরে চিৎকার করতে করতে এবং স্ত্রীকে সে অকথ্য ভাষায় যে-সব গালিগালাজ দেয় তা পাড়া-প্রতিবেশী সবাই শুনতে পায়। সেই তুলনায় বাবুল তো প্রায় ফেরেস্তা। সে মদ স্পর্শ করে না, সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, স্ত্রীর প্রতি এ পর্যন্ত একবারও দুর্ব্যবহার করেনি। যে-সব দিন বাবুল পুরোপুরি বাড় থাকে, সেইসব দিনেই যেন মঞ্জুর একটু একটু ভয় করে। কোনো মানুষ বই নিয়ে এমন পাগল হতে পারে? সাকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরই বাবুল চোখের সামনে বই খুলে বসে, তারপর সারা দুপুর বিকেল সন্ধে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সে বই থেকে চোখ সরায় না। মামুন এলে সে অন্য ঘরে বসে থাকে। শুধু মামুন কেন মঞ্জুর বাপের বাড়ির কোনো লোকের সঙ্গেই সে ভালো করে কথা বলে না। এইটা মঞ্জুর একটা গোপন দুঃখ।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাবে?

একটা লুঙ্গি গঞ্জি পরে নিয়ে বাবুল বললো, কয়েকটা জায়গায় একটু ঘুরবো ভাবছি। ইলেকশানের মিটিংগুলো নিজের চোখে দেখে আসতেচাই। শুনছি তো মিস জিন্নার মিটিং-এ ভিড় হচ্ছে খুব। মঞ্জু তুমি কাকে সাপোর্ট করো?

মঞ্জু বললো, আমার সাপোর্ট করা না করায় কী আসে যায়? আমার কি ভোট আছে?

তবু মনে মনে তো তোমার একজনের প্রতি সমর্থন থাকবে আমি চাই ফতেমা জিন্না জিতুন। মামুনমামা বলেছেন, ফতেমা জিন্না জিতলে আমাদের বাঙালিদের অনেক সুবিধা হবে।

বাবুল জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে রইলো। মঞ্জু তার পাশে গিয়ে কাঠের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কার সাথে যাবে?

বাবুল তার কোনো উত্তর না দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মঞ্জুর গালে ছোট একটা টোকা মেরে বললো, মোনেম খাঁর লোকজনরা কী বলে জানো? বেগম ফতেমা জিন্না পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থনে কখনো কোনো কথা বলেছেন কী? এই যে আমাদের এদিকে পরপর দু'বার এত বড় ঝড় আর সাইক্লোন হয়ে গেল, তাতে তিনি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা তো দূরের কথা, একটু ঠোঁটের দরদও দেখাননি।

মঞ্জু এস্তভাবে বললো, এ কী, তুমি কি আইয়ুব খানকে সাপোর্ট করো নাকি?

বাবুল বললো, চলো। খানা লাগাও। ক্ষুদা পেয়েছে খুব।

কী যেন একটা অজানা আশাঙ্কায় কাঁপছে মঞ্জুর বুক। সে তার স্বামীর চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ইলেকশন মিটিং-এ কেন যেতে চাও বলো তো? তুমি যে বলেছিলে আর কোনোদিন তুমি পলিটিকসের সাথে নিজেকে জড়াবে না?

বাবুল সহাস্যে স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে বললো, এত ভয় কিসের, বিলকিসবানু? আমি নিজেকে পলিটিকসে জড়াচ্ছি না, শুধু একটু দেখতে যাচ্ছি। আমি যে-কদিন থাকবো না, মামুনভাইকে বলে যাবো, যাতে তিনি প্রত্যেকদিন এসে তোমার খোঁজ-খবর নিয়ে যান।

মঞ্জুর তবু ভয় লাগে, সে বাবুলের বুকের কাছ থেকে সরতে চায় না।

ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে, ওপরতলায় আর কেউ নেই। বাবুল হঠাৎ দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় মঞ্জুকে, চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেয় তার শরীর। কৃত্রিম লজ্জায় ছটফট করতে থাকে মঞ্জু, জানলা খোলা, পর্দা সরে গেলেই সব দেখা যায় পাশের বাড়ি থেকে। জুনিপার মাঝে মাঝেই এই বেডরুমের দিকে চেয়ে থাকে।

বাবুল তখুনি মঞ্জুকে বিছানায় নিয়ে যেতে চাইলে মঞ্জু আগে দুটো জানলাই বন্ধ করে দিয়ে এলো। জুনিপারের জন্য তার মায়া হয়। আহা, সে বেচারা স্বামীর সোহাগ পায় না।

॥ ২৬ ॥

নোয়াখালিতে বসিরের বাড়ি। বসিরের সঙ্গে আগে থেকে কথা হয়েছিল তাই বাবুল প্রথমে নোয়াখালিতে গেল।

ভাদ্র মাস। নদী খাল-বিল জলে একেবারে টই টুম্বুর। যে দিকে তাকাও, শুধু সজল দৃশ্য খানিকটা বাসে আর খানিকটা নৌকোয় আসতে হলো বাবুলদের। যাত্রা পথে বাবুল অনুভব করলো, শহরের চেয়ে গ্রাম্য প্রকৃতি তাকে অনেক বেশি উদ্বেল করে। নাম না-জানা ফুলের গন্ধ, জলজ শ্যাওলার গন্ধ, এমনকি পাট-পচা গন্ধের মধ্যেও একটা মাদকতা আছে। একটা বিলের ওপর দিয়ে আসার সময় এক গুচ্ছ কচুরিপনার ফুলের সঙ্গে একটা হলদে রঙের ঢোঁড়া সাপের জড়িয়ে থাকার দৃশ্য দেখে তার মনে হয়, এই মুহূর্তে এই বিল দিয়ে না গেলে এই বিশেষ দৃশ্যটি তো জীবনে দেখা হতো না। ছবিটি অকিঞ্চিৎকর, তবু যেন চোখে লেগে থাকে।

বসিরার এক পুরুষের বুদ্ধিজীবী। বসিরের বাপ-ঠাকুদা চাষবাস নিয়েই থাকতেন। বসিরই লেখাপড়া শিখে সাংবাদিক হয়েছে, বসিরের এক বড় ভাই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে বড় অফিসার ছিলেন কিন্তু তিনি কোনো অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেছেন গত বছর। আর এক ভাই আবার একেবারে গণ্ডমূর্খ, চাষাবাসও করে না, সংসারের কিছু দেখেও না, গ্রামে মাতব্বরি করে।

বসিরদের বাড়িটি একটি খালের ধারে, বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন, উঠোনের একপ্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে আম-কাঁঠালের বাগান। দুটি বড় বড় ধানের গোলাও হাঁস-মুর্গির খোঁয়াড় অবস্থা বেশ সচ্ছল বোঝায় যায়, বসিরের এক চাচা এখনো দেড়শো বিঘে জমি চাষ করান।

খালের উল্টো দিকে হিন্দু পাড়া, এরা ঠিক বর্ণহিন্দু নয়, নমঃশূদ্র এদের জীবিকা মাছ ধরা, জাল বোনা ও নৌকোয় আলকাতরা লাগানো। এদের মধ্যে আবার কিছু কিছু খৃষ্টানও রয়েছে। এই অঞ্চলে দাঙ্গা হয়নি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো সহজ মেলামেশা আছে, পাশের গ্রামে দুর্গাপূজাও হয়।

খালের ধারে ধারে ফুটে আছে কাশফুল, শিউলি গাছেও ফুল এসেছে। কিন্তু আকাশের চেহারা এখনো ঠিক শরৎকালের নয়, মেঘ সাদা হয়নি, নীল শূন্যতা তেমন চোখে পড়ে না, যখন তখন ঝেঁকে বৃষ্টি আসে। পায়জামা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে, খালি পায়ে, দু'খানা ছাতা নিয়ে বাবুল আর বসির গ্রাম ঘুরতে বেরুলো।

খানিকটা যেতেই সদ্য গোঁফদাড়ি গজানো এক ছোকরা দৌড়োতে দৌড়োতে এসে জুটে গেল ওদের সঙ্গে। এর নাম সিরাজুল, বসিরের এক পিসির ছেলে বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, সে বসিরের হাত ধরে অভিমানের সুরে বললো, আপনে কাইল রাতে আসলেন, আমারে একটা খবরও দিলেন না?

বসির বললো, আবার তুই এসে জুটলি? তোরে আমি ভয় পাই।

তারপর বাবুলের দিকে ফিরে বললো, এই ছ্যামড়াডা মেট্রিক পাস করে বসে আছে, খুব ইচ্ছে কলেজে পড়ার। ওর বাপ দাদারা ওরে পড়াবে না, তার আমি কী করি বলো তো?

সিরাজুল বললো, আমি কতবার আপনেরে কইলাম আমারে একবার ঢাকা নিয়া চলেন, তারপর আমি নিজেই সব মেনেজ করবো।

—মেনেজ তো করবি। কিন্তু ঢাকায় গিয়ে তুই থাকবি কোথায়?

—কেন, আপনের বাসায়?

বসির আবার বাবুলের দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা কও তো, আমার বাসায় ও ক্যামনে থাকবে? দুইখান মাত্র ঘর।

বসির বললো, ইনি বাবুল চৌধুরী, ইকোনমিকসের লেকচারার; ঢাকায় গিয়ে যদি লাখাপড়া করতে চাস তো এনারে ধর।

সিরাজুল অমনি বাবুলের দিকে তাকিয়ে কাতরভাবে বললো, সর আমার একটা ব্যবস্থা কইরা দ্যান সার।

বাবুল হাসলো, মফঃস্বলের ছেলেদের কাছে ঢাকার ছাত্রজীবন খুব রোমাঞ্চকর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু দিন দিন যেরকম খরচ বাড়ছে, তাতে সাধারণ গরিব ঘরের ছেলেদের আর ঢাকায় গিয়ে পড়াশুনো চালানো সম্ভব নয়।

বসির বললো, ও মনে পড়ছে, শোনলাম, তুই নাকি এর মধ্যে শাদি করেছিস? ঢাকায় কে যেন খবর দিল অমারে।

সিরাজুল লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলো।

বসির একটু ধমক দিয়ে বললো, সত্যি কথা? এর মইধ্যেই শাদী করে ফেললে তুই আর পড়াশুনা করবি কী করে?

সিরাজুল বললো, কী করবো। আমার আব্বায় যে জোর কইরা আমার বিয়া দিল।

—জোর কইরা বুঝি বিয়া দেওয়া যায়? যাক যা করছোস তো করছোস, তোর বউ দেখবি না? চল তোর বউ দেইখ্যা আসি।

সিরাজুল এবার মাথা তুলে উজ্জ্বল মুখে বললো, যাবেন আমাগো বাসায় যাবেন?

দু'পাশে পাট খেতের মাঝখান দিয়ে কাঁচা রাস্তা। কাদায় পা গেঁথে যায়। পাট গাছের ওপর প্রচুর ফড়িং ওড়াউড়ি করছে। এক জায়গায় একটা বাঁশের সাঁকো। একখানা মাত্র বাঁশ পায়ের নীচে, আর একখানা বাঁশ ধরে ধরে যাওয়া বাবুলের ভয় ভয় করে। সে টাঙ্গাইল ও ঢাকা শহরেই বাল্য কৈশোর কাটিয়েছে, তেমন গ্রামে অভিজ্ঞতা তার নেই। সন্তর্পণে সেই সাঁকো পার হতে হতে সে তলার জলের দিকে তাকিয়ে দেখলো ঈষৎ লালচে রঙের এক ঝাঁক মাছের পোনা তার পাশেই রয়েছে একটা বড় কালো রঙের শোল মাছ যেন বাচ্চাগুলোর পাহারাদার। বাবুল এমন দৃশ্য আগে কখনো দেখেনি, সে মোহিত হয়ে থমকে যায়।

বসিরের সাংবাদিক প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে এর মধ্যে এসে সিরাজুলের কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এদিকে ভোটের গরম ক্যামন রে? কে জিতবে?

সিরাজুল বললো, ফতেমা জিন্না। আমরা কী শ্লোগান দেই জানেন না? স্বৈরাচারী আইয়ুব খান, ভোট দিয়ো না এক খান। আমি এখনই কইতে পারি, এদিকে আইয়ুব খান একটাও ভোট পাচ্ছে না।

—কপ্-এর নেতারা কেউ এদিকে আসে?

—জী, আসে। আইজ বিকালেই তো রথতলার মাঠে মিটিং আছে যাবেন?

—যাবো তো বটেই।

বাবুলের দিকে ফিরে সে বললো, পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার ভোটের মধ্যে আইয়ুব কয়টা পাবে আমারও সন্দেহ আছে। পশ্চিম পাকিস্তানে মিস জিন্নার সাপোর্টার কম হবে না। যদি ফেয়ার ইলেকশন হয় তাহলে আইয়ুবের জেতার কোনো চান্স নাই।

বাবুল বললো, জোর করে যে-লোক প্রেসিডেন্টের আসন দখল করেছে, এখনও সিভিল-মিলিটারি সব ক্ষমতা যার হাতে, সে আবার প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন ডেকেছে। কোনো কারণেই সে জায়গা ছাড়বে বলতে চাও? এটা শুধু নিজের পজিশানটাকে আইনসম্মত করা।

সিরাজুলদের বাড়ি বেশি দূর নয়। এরা বসিরদের তুলনায় অনেক দরিদ্র। খড়ের চালের ঘর, উঠোনে এক হাটু জল জমে আছে, সেই জলে ভাসছে কতগুলো মুর্গির পালক।

জল ঠেলে দাওয়ায় উঠে বসির বললো, ও পিসি, বাড়িতে মেহমান আইছে। কী খাইতে দিবা কও।

বসির এ বাড়িতে মান্যগণ্য অতিথি। একদল বাচ্চা এসে ওদের ঘিরে ধরে। তারা বাবুলের দিকেও অবাক ভাবে চেয়ে থাকে। বাবুলের চেহরা এমনিতেই সুদর্শন, তার ওপরে শহুরে পালিশ আছে, গ্রাম্য শিশুদরে চোখে সে যেন একজন অপরুপ মানুষ।

নারকোল কোরা ও মুড়ি খেতে দেওয়া হল ওদের। মুড়ি খেলেই বাবুলের চা তেষ্টা পায় কিন্তু এ বাড়িতে বোধ হয় চায়ের পাটই নেই। সিরাজুলের মা এমন ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখের গল্প শুরু করে যে একটু পরেই বাবুলের অধৈর্য লাগে।

সিরাজুলের বালিকা বধু কিছুতেই লজ্জায় ওদের সামনে আতে চায় না। সিরাজুল তাকে ধরে প্রায় টানাটানি করতে লাগল। এসে আরও চলতে থাকার পর বসির বললো, থাক সিরাজুল, তোর বিবির মুখ আমরা দ্যাখতে চাই না। তুই একলাই দেখিস।

বাবুল বললো, আমি না হয় বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।

এই সময় দু'তিনজন সাঙ্গপাঙ্গ সমেত একজন মুরুব্বি গোছের লোক বাইরে থেকে হাঁক দিল এই সিরাজুল সিরাজুল।

দীর্ঘকায় লোকটির পরনে সিল্কের লুঙ্গি, খালি গা, গলায় একটা সোনার চেন। বাঁ হাতে একটা সিগারেটকে গাঁজার কল্কের মতন ধরে হুস হুস করে টানছে। তাকে দেখে বাচ্চারা ভয় পেয়ে কোতায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সিরাজুলের মা আঁচলে মুখ ঢেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন সিরাজুলের যেন মুখ শুকিয়ে গেলএসে এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে গা মোচড়াতে মোচড়াতে দীন কণ্ঠে বললো, চাচা আপনি নিজে আইছেন, আমিই তো আপনের বাড়িতে যাইতাম কাইলই যাইতাম।

লোকটি রাগে দাঁত কিড়মিড় করে, নিচু হয়ে পায়ের জুতো খুলে মারার ভঙ্গি করলো, কিন্তু পায়ে জুতো নেই। চড় তুলে বললো, হারামখোর, আবাগীর পুত বেহায়া। তোরে কিছু কই না, তাই তুই মাথায় উইঠা বসছোস? সেই বকরিদের সময় টাহা হাওলাৎ নিছিল, এমন আউস ধান উঠানের সময় হইয়া গেল, আমার নিজেরই এহনে টানাটানি, তার উপর তুই আমার ছুট্টু ভাইরে মারতে গেছিলি। সাপের পাঁচ পা দেখছোস বুঝি না?

বসির চোখ গোল গোল রে বললো, ওরে বাবা, সেই লোকের এখন এই অবস্থা?

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, এই অভদ্র লোকটা কে?

বসির বললো, এর নাম ইরফান আলি, আগে কী সব ছোটখাটো কাম কাজ করতো, এখন সার, পেস্টিসাইডের ব্যবসা করে শুনেছি। আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, গলার আওয়াজেও অনেক জোর হয়েছে ইউনিয়ান কাউনিসিলের মেম্বার।

–সিরাজুল টাকা ধার করেছে বলে তারে মারতে এসছে?

–ভাবভঙ্গি তো সেইরকমই দেখি। দাঁড়াও আমি দাবড়ানি দিচ্ছি। ব্যাটা কী যেন একটা ইলেশনে দাঁড়িয়েছিল একবার। ওঃ হো, মনে পড়েছে, ইরফান আমি তো একজন বেসিক ডিমোক্রাট।

–বেসিক ডিমোক্রাট-এর একখান নমুনা?

–পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার এলিটের একজন। কম কথা নয়।

বসির দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে ভারিক্কি গলায় বললো, আরে ইরফান ভাই যে। কী ব্যাপার এত হল্লা কিসের?

ইরফান আলি যেন ভুত দেখলো কিবা জোঁকের মাথায় নুন পড়লো। এখানে বসিরকে দেখতে পারে, এটা যেন কল্পনাতীত ব্যাপার।

পূর্ব মূর্তি মুছে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরে কোমলতা ঝরিয়ে বিগলিত মুখে সে বললো, আরে বসির? তুমি কবে আইলা? আমারে একটা সংবাদ দাও নাই?

বসির বললো, তুমি তো এখন বিগ ম্যান। আমি তোমারে সংবাদ দেবো কোন্ সাহসে?

ইরফান আলি এগিয়ে এসে বসিরের হাত চেপে বললো, কী যে কও তুমি। আমরা হইলাম বিগ ম্যান হেঃ। কেউ মানে না। বসির তুমি এখন কুন্ পেপারে আছো?

বাবুল তাকিয়ে দেখলো, একটু দুরে সিরাজুলের পত্নী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। এখন আর সে কাঠ পুত্তলী নয়, এখন সে মানুষ, তার চোখমুখ শঙ্কা। যতদূর মনে হয়, ধারেই এখন সিরাজুলদের সংসার চলছে, আজকের মতন এই রকম ঘটনা আগেও ঘটেছে এ বাড়িতে।

হটাৎ বাবুলের বুকটা কেঁপে উঠলো, কতই বা বয়েস মেয়েটির বড় জোর পনেরো-ষোলো। আব্বা-আম্মাকে ছেড়ে একটি নতুন সংসারে এসেছে। সবার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগবে। তার আগেই এরকম অশান্তি। বাড়ি বয়ে এসে লোকেরা তার স্বামীকে মারতে আসে। স্ত্রীর চোখের সামনে যারা স্বামীকে অপমান করে, তারা কতখানি অমানুষ।

বাবুল আর একটা কথাও ভাবলো। সিরাজুলের স্বাস্থ্য ভালো, দেখলেই মনে হয় গায়ে বেশ জোর আছে। সে যদি একটা দলবল তৈরি করে নিতে পারতো তা হলে কেউ তার মুখের ওপর চোটপাট করতে সাহস পেত না। কিন্তু চেহারা বলশালীদের মতন হলেও সিরাজুলের প্রকৃতি নিশ্চয়ই নরম। গা-জুয়ারি করার বদলে সে আরও লেখাপড়া শিখতে চায়।

সিরাজুলের বউ এখন আর লজ্জাশীলা নয়। বাবুলের সঙ্গে একবার তার চোখাচোখি হলো। সেই দু'চোখে মিনতি। বাবুল নিজেই চোখ ফিরিয়ে নিল, তবু তার সারা অঙ্গে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। মেয়েটি যেন খুব চেনাচেনা। না, বাবুল এই মেয়েটিকে আগে কখনো দেখেনি, কিন্তু গ্রাম বাংলার সরল অসহায় নির্যাতিতা তরুণী মেয়েদের মুখ আঁকার সময় সমস্ত শিল্পীরা যেন অবিকল এই মুখটিই আঁকেন। মাটির রঙের শরীর, মাটির মতন সর্বসংহা কিন্তু মাটির মতন বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

বাবুল অধিকাংশ জায়গাতেই দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সে মনে মনে ভালো মন্দ ন্যায়-অন্যায় বিচার করে, কিন্তু নিজে কোনো সক্রিয় অংশ নেয় না। এই মুহূর্তে হঠাৎ যেন সে একটা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে সিরাজুলের নবোঢ়ার দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিতে জানালো ভয় নেই। তারপর সে নেমে গেল দাওয়া থেকে।

বাবুল এমনিতে লাজুক ও মৃদুভাষী হলেও কখনো কখনো বেশ কঠোর হতে পারে। বসিরের মধ্যস্থতায় সিরাজুল ও ইরফান আলির মধ্যে একটা রফা হলো, বাবুল সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। বসিরের কথা থামিয়ে সে সিরাজুলকে ডেকে অন্যদের শুনিয়ে বেশ জোরে জোরে বললো, শোনো সিরাজুল তুমি ঢাকায় যেয়ে যদি লেখাপড়া করতে চাও, আমার বাসায় থাকতে পারো। সেখানে থাকা-খাওয়ার কোনো অনুবিধা নাই। এখানে তোমার কত টাকা হাওলাৎ আছে? দুপুরে বসিরের বাড়িতে যেয়ে তুমি টাকটা নিয়ে এসো আমার কাছে। তুমি পরে আমারে শোধ দেবে।

বসির হকচকিয়ে বাবুলের দিকে ঘুরে তাকাতেই বাবুল আবার বললো, চলো ইস্কুল বাড়িটা দেখে আসি। এখানে আর কতক্ষণ থাকবে?

ইরফান আলি বিস্ফারিত লোচনে বসিরকে জিজ্ঞেস করলো, এনারে তো চেনলাম না?

বসির সঙ্গে সঙ্গে বললো, চেনো না? মোনেমখাঁর ভাইর ব্যাটা, বাবুল চৌধুরী পাকিস্তানের গভর্নর মোনম খাঁর নামশুনে ভয় পায় না এমন ব্যক্তির সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

আর সকলের থেকে বাবুল যেন আলাদা হয়ে গেল। সবাই শঙ্কা ও ভক্তির মিশ্রিত চোখে বাবুলকে দেখছে। ইরফান আলি রীতিমতন হাত কচলাতে শুরু করেছে। বসিরের ঠাট্টাটা সিরাজুলও বুঝতে পারে নি, সে ভাবলো, সত্যিই মোনেম খাঁর ভাইয়ের ছেলে এসেছে তার মতন এক গরিবের বাড়িতে? নিজে থেকেই তিনি আতগুলো টাকা দিয়ে দিতে চাইলেন? এ কী রূপকথা?

কোনো ঘটনারই কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকা নেওয়া বাবুলের শখ নয়। কেন সে এমন একটা নাকটীয় কাজ করে ফেললো তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। যে ইরফান আলির ব্যবহার দেখে তার গা জ্বলে যাচ্ছিল, সিরাজুলের বাচ্চা বউটার অসহায় দৃষ্টি দেখে তার মনে হয়েছিল চিরকালই কি গরিবরা এ রকম অপমান সহ্য করে যাবে, কেউ তাদের ভরসা দেবে না?

যদিও বাবুল জানে, নিজের টাকায় একজন গরিবের ধার শোধ করে দেওয়াটা কোনো সমস্যার সমাধানই নয়। সে নিজের বদান্যতা জাহির করতেও যায় নি, সে শুধু ইরফান আলিকে একটু অপমান করতে চেয়েছিল।

ইরফান আলি গদ্‌গদ ভাবে বললো, আমাগো বাড়িতে একবার পায়ের ধুলা দেবেন না সার?

একটু পান-তামুক খাবেন।

বাবুল কঠিন গলায় বললো, না। সময় নাই। চলো, সিরাজুল।

বিকেলবেলা ওরা গেল রথতলার মাঠে মিটিং শুনতে। একটি বড় পাকা বাড়ির সামনে প্রশস্ত মাঠ এককালে এখানে ধুমধামের সঙ্গে রথটানা হতো এখনবোধ হয় আর তেমন ধূমধাম হয় না কিন্তু একটি চলা ঘরের মধ্যে দোতলা সমান রথটি এখনো রয়ে গেছে।

মিটিং ডেকেছে ন্যাপ, তবে আওয়ামীলীগের কর্মীসংখ্যাই বেশি। প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ এসেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দুপুরের পর থেকে আর বৃষ্টি পড়েনি। মাঠটিও বেশ উঁচু, কাদা জমে না। জনতার মধ্যে চাষাভূষো জেলে মুসলমান-হিন্দু সবরকমই আছে।

ফতিমা জিন্না নিজেই এখন সারা দেশে ঘুরে ঘুরে মিটিং করছেন। বক্তৃতাও ভালো দেন। তা বলে তিনি এত ছোট জায়গায় আসবেন তা আশা করা যায় না। তিনি আসেননি, তাঁর লিখিত ভাষণই পাঠ করা হলো, প্রথমে-উর্দুতে, তারপর বাংলায়। তাঁর ভাষণে বেশ ভালো ভালো কথা আছে। তিনি ক্ষমতা হাতে পেলে সামরিক শাসনের অবসান ঘটাবেন। দেশে গণতন্ত্র আনবেন। প্রতিটি মানুষের সমান ভোটাধিকার থাকবে। অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেবেন। পাকিস্তান নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তাঁর ভাষণের মাঝে মাঝেই জনতার হর্ষধ্বনি হচ্ছে। যারা নিজের নামটিও স্বাক্ষর করতে জানে না, তারাও গণতন্ত্রের নামে উত্তেজনা বোধ করে। গণতন্ত্র যেন এক ম্যাজিক যা এলে সব সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে।

ছোট একটি প্যাডে নোট নিতে নিতে বসির বললো, তুমি সাধারণ মানুষের এনথুথিয়াজম লক্ষ করছো, বাবুল? এবারে দেশে একটা চেইঞ্জ না এসেই পারে না।

বাবুল কোনো মন্তব্য করলো না।

খানিকবাদে একজন বাঙালী নেতা বক্তৃতা শুরু করলো। সেই বক্তৃতার ভাষা সাদামাটা, কিন্তু কণ্ঠস্বরে বেশ নাটক আছে, তার বক্তব্য মন স্পর্শ করে।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, এই লোকটা কে?

বসির বললো, একে চেনো না? এই-ই তো আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমান। ঐ পার্টির বড় বড় নেতাদের সরিয়ে দিয়ে সে এখন প্রধান হয়ে উঠেছে।

বাবুল প্রায় পাঁচ ছ'বছর পর শেখ মুজিবর রহমানকে দেখলো। চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে তাই সে চিনতে পারেনি। রাজনৈতিক দলে ক্ষমতর ওঠা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতাদের চেহারা বদলায়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি আর ক্ষমতাচ্যুত সোহরাওয়ার্দির চেহারায় ও ব্যক্তিত্বে অনেক তফাত সে দেখেছে। এই শেখ মুজিবর রহমানও এক সময় যখন মওলানা ভাসানি আর সোহরাওয়ার্দির যুগল ছত্রছায়ায় ছিলেন তখন তাঁর চেহারা ছিল বেশি প্রশ্রয় পাওয়া ধনী ব্যক্তির নাতির মতন। এখন তাঁর কণ্ঠস্বরে পৃথক ব্যক্তিত্ব।

সভা অতি সার্থক ভাবে শেষ হবার পর বসির আর বাবুল একটা শিরীষ গাছের নিচে বসে রইলো কিছুক্ষণ। হেঁটেই তো ফিরতে হবে, সুতরাং কোনো তাড়া নেই।

শর্টহ্যাণ্ডে লেখা নোটগুলি পড়তে পড়তে বসির বললো, আরও দু'তিনটা মিটিং দেখে একটা সার্ভে রিপোর্ট লিখবো। ভালো কপি হবে। মামুনভাই খুশী হবে।

বাবুল কোনো মন্তব্য করলো না।

বসির আবার বললো, সাধারণ মানুষের এতখানি সাপোর্ট ফতিমা জিন্না পাওয়ারে আসবেনেই। আইয়ুব ইলেকশান ডেকে-নিজের কবর খুঁড়েছেন।

বাবুল এবারে বললো, তোমাকে একটা কথা বলবো, বসির? মিটিং শুনতে শুনতে আমার বউয়ের কথা মনে পড়ছিল খুব। তুমি হাসবে শুনে, তবু আমি আমার বউয়ের একটা কথা বলি। মঞ্জু বলেছিল, আমার সাপোর্ট করা না করায় কী আসে যায়? আমার কী ভোট আছে? এই কথাটাই আমার কানে বাজছিল এতক্ষণ। এই যে আজ হাজার দেড় হাজার মানুষ এসেছিল বক্তৃতা শুনতে এত উৎসাহের সঙ্গে চ্যাঁচামেচি করলো, এদের কিন্তু কারুরই ভোট নাই। এমন কি শেখ মুজিবর রহমানেরও ভোট দেবার অধিকার নাই। এ এক অদ্ভুত ফার্স একটা ইলেকশান হচ্ছে, যারা বক্তৃতা দিচ্ছে কিংবা বক্তৃতা শুনতে আসছে তাদের প্রায় কারুরই ভোট দেবার অধিকার নাই, ভোট দেবে মাত্র আশি হাজার মানুষ।

বসির বললো, দেশের এত মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, তা কি অস্বীকার করা যায়? বেসিক ডেমোক্রাটরা এর উল্টো দিকে যেতে পারবে?

–মাদাম জিন্না যা ঘোষণা করেছেন, তার সার কথাটা কী? তিনি সকলের জন্য গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার এনে দেবেন। অর্থাৎ বেসিক ডেমোক্রাটদের উচ্ছেদ। এরা কিন্তু সুবিধাভোগী শ্রেণীর। এরা নিজেদের সব সুযোগ সুবিধা বিসর্জন দেবে, ফতিমা জিন্নার জন্য? আশ্চর্য!

–তুমি এতটা নৈরাশ্যবাদী হয়ো না, বাবুল। রিগিং যাতে না হয় তার জন্য আমরা সর্বক্ষণ ভিজিলেন্স রাখবো।

–রিগিং হোক বা না হোক, বেসিক ডিমোক্রেসি তুলে দিতে চাইবে, ঐ ইরফান আলির মতন ডিমোক্র্যাটরা? এ আমি বিশ্বাস করি না। ফতিমা জিন্নার কোনো ভবিষ্যৎ নাই।

–তুমি বাজি রাখবে? এক বোতল স্কচ।

–আমি মদ খাই না, বসির।

এর পর চার পাঁচটা গ্রাম ঘুরে নির্বাচনী সভা দেখলো বাবুল আর বসির। সর্বত্রই সমান উত্তেজনা। কাগজে কাগজে লেখা হচ্ছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ভোটের উৎসাহ অনেক বেশি। বাঙালীরা গণতন্ত্র প্রিয়, তারা সামরিক শাসন চায় না, তারা ফতিমা জিন্নাকে চায়।

বাবুলের তবু মনে হয়, এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস। যারা ভোটের জন্য এত লাফাচ্ছে, তাদের মতামতের আসলে কোনো মূল্যই নেই।

শেষ পর্যন্ত বাবুলের কথাই ঠিক হলো। নির্বাচনী ফলাফলে শোচনীয় ভাবে হেরে গেলেন বেগম ফতেমা জিন্না। আইয়ুব খাঁ শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে নয়, পূর্ব পাকিস্তানেও সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট পেলেন, বিশ্বের চোখে তিনি হলেন পাকিস্তানের আইনসঙ্গত রাষ্ট্রপতি।

॥ ২৭ ॥

থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠতে না উঠতেই অলি তার কয়েকজন বান্ধবীকে হারালো। তার সহপাঠিনীদের টুপটাপ করে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এই ফাল্গুনেই তিনজন পদবী বদলালো। অনিন্দিতা বিয়ের পর চলে গেল কানপুর, নাসিমের শ্বশুরবাড়ি কলকাতায় হলেও সে আর কলেজে আসে না।

ক্লাসে বরাবর অলির পাশে বসে চন্দনা, সেও হঠাৎ একদিন বাড়িতে এসে লাজুক লাজুক মুখে একখানা প্রজাপতি আঁকা চিঠি বার করল। তার বিয়ে ঠিক হয়েছে একেবারে অকস্মাৎ, পাত্র তার বৌদির ভাই, ডাক্তারি পাশ করে সে বিলেত যাচ্ছে। বিলেতের সুলভ নারীদের সম্পর্কে নানা রকম রটনা আছে, তাই সেই তরুণ ডাক্তারটির সন্ত্রস্ত পিতা-মাতা ছেলের বিয়ে দিয়ে বউকে সঙ্গে পাঠাতে চান।

চন্দ্রনার বিয়ের খবর শুনে অলি খুবই অবাক। চন্দনা অসাধারণ ভালো ছাত্রী। অনার্সে ফার্স্ট বা সেকেণ্ড স্ট্যাণ্ড করবেই, সে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে?

দেখা গেল চন্দনা সে জন্য মোটেই দুঃখিত নয় বরং সে গোপন আনন্দে ঝলমল করছে। বিলেত যেন এক স্বর্গপুরী সেখানে যাবার সুযোগ কে উপেক্ষা করতে চায়।

চন্দনা এ বাড়িতে অনেকবার এসেছে, সে অলির বাবা-মাকেও নেমন্তন্ন করলো। সে চলে যাবার পর বিমানবিহারী সকৌতুকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন তাঁর মেয়ের দিকে তারপর বললেন, কী রে, তোর বন্ধুরা দেখছি একে একে গিয়ে ছাদনাতলায় বসছে, তোর জন্যও একটা পাত্তর টাত্তর দেখি? অলির মা কৌতুকের সঙ্গে নয়, বেশ উদ্বিগ্ন ভাবেই বললেন, আমি ঠিক সেই কথাই ভাবছিলুম। অলকাদি একটি ভালো ছেলের কথা বলছিলেন, সেও বিলে যাবে, অলকাদি বলছিলেন যদি আমরা অলির সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চাই...

অলি অনেকখানি ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো, সম্বন্ধ মানে? কল্যাণীধমক দিয়ে বললেন, মেমসাহব হয়েছিস নাকি? সম্বন্ধ করা কাকে বলে জানিস না?

বিমানবিহারী বললেন, আজকাল ভালো ভালো ছেলেরা সবাই বিলেত আমেরিকা চলে যাচ্ছে। তবু ওরকম ছেলের সঙ্গে আমি অলির বিয়ে দিতে চাই না।

কল্যাণী বললেন, কেন? অলকাদি যে ছেলেটির কথা বলেছেন সে জাস্টিস পি এন মিত্রর ছেলে, ব্যারিস্টারি পড়তে যাচ্ছে, চেহারাও সুন্দর।

বিমানবিহারী বললেন, তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু এরা যদি বিলেত থেকে আর না ফেরে? আমি মরে গেলে আমার এই ব্যবসা দেখবে কে? অলি আর অলির বরকেই তো সামলাতে হবে।

কল্যাণী বললেন, তোমার যত সব অদ্ভুত কথা। ফিরবে না কেন? ভালো বংশের ছেলেরা কখনো বিলেতের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে না। সবাই তো আর তোমার গুণধর ভাইটির মতন নয়। দু'চার বছরের জন্য যারা গায়ে ঘুরে আসে, তারা অনেক ভদ্র সভ্য হয় আমার ছোট মামার ছেলে অরুণকেই দ্যাখো না। কত ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে এসেছে। অলকাদিকে বলবো, তুমি ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে?

–তা আমি কথা বলে দেখতে পারি। জাস্টিস পি এন মিত্রর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ওর স্ত্রী

তো কৃষ্ণনগরের মায়ে নামকরা সুন্দরী ছিলেন, আমরা আতরদি বলে ডাকতুম। ওঁদের তো তিন ছেলে, তুমি কার কথা বলছো?

—ছোট ছেলে, ডাক নাম লালটু। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনোয় খুব মাথা। বুলির সঙ্গে মানাবে।

চায়ের টেবিলে চা-পান শেষ হয়ে গেছে। টেবলক্লথের ওপর ছড়িয়ে আছে কিছু বিস্কুটের গুঁড়ো বাবা আর মা বসেছেন পাশাপাশি, উল্টো দিকে অলি, পিছনের জানলা দিয়ে শীতের নরম রোদ এসে পড়েছে তার গায়ে। জানলার বাইরে এসে বসেছে তিনটি শালিক পাখি।

বাইরে সবাই অলিকে খুব লাজুক আর নম্র জানে, কিন্তু বাবা-মায়ের কাছে সে বেশ জেদী মেয়ে। সে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কার সম্পর্কে আলোচনা করছো?

কল্যাণী বললেন, লালটুকে তো তুই একবার দেখেছিস। নীপার বিয়ের দিন এসেছিল খুব ফর্সা রং হলদে সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছিল..

অলি বললো, হ্যাঁ, তার সঙ্গে কার বিয়ের কথা হচ্ছে? আমি যে সামনে বসে আছি আমি বুঝি একটা মানুষ নয়, আমার একটা মতামত নেবার কথাও বুঝি ভাবো না?

কল্যাণ গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন? তোর মতামত ছাড়া বিয়ে হবে তা কে বলেছে? হুট করে বললেই কি বিয়ে হয়ে গেল নাকি? কথাবার্তা চলবে দেখাশুনো হবে তোর মতামত নেওয়া হবে ছেলের মতামত তারপর সব কিছু যদি মেলে একেই তো বলে সম্বন্ধ করা।

—আমার মতামতটা আগে নিলে তোমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট কমে যাবে।

—সেটা কী শুনি?

—এটা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি নয়। গৌরীদানের প্রথা উঠে গেছে। আমার বিয়ের চিন্তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

বিমানবিহারী হো-হো- করে হেসে উঠে বললেন, তুই আমাদের একেবারে নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে ফেলে দিলি? তোর মায়ের কি গৌরীদান হয়েছিল নাকি?

অলি বললো, মার বিয়ে হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়েসে। তোমরা যদি ভেবে থাকো..

বিমানবিহারী বাধা দিয়ে বললেন, তোর মায়ের খুব একটা খারাপ বিয়ে হয়নি কি বলিস? ভেবে দ্যাখ ঐ বয়েসে আমার সঙ্গে যদি তোর মায়ের বিয়ে না হতো তা হলে হয়তো তোর জন্মই হতো না। সে একটা খুব খারাপ ব্যাপার হতো বল।

অলি উঠে পড়ে চলে যাচ্ছিল বিমানবিহারী ঝুঁকে তার হাত চেপে ধরে বললেন, পালাচ্ছিস কেন? তোর মতামতটা কি বল ভালো করে শোনা হলো না।

অলি ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, এম এ পাশ করার আগে আমি ওসব নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলতেও চাই না, শুনতেও চাই না।

—যাক বাঁচা গেল। আমারও ঠিক তাই মত। এখন তুই আর আমি দু'জনে মিলে তোর মায়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাবো। কি বল? জাস্টিস মিত্রের ছেলে লালটু অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করুক?

কল্যাণী বললেন, তোমাদের যা ইচ্ছে করো, আমি আর কোনোদিন কিছু বলতে যাবো না। এই প্রসঙ্গটা আপাতত এখানেই চাপা পড়ে গেল।

কলেজে অলির একমাত্র বন্ধু রইলো বর্ষা। বিয়ের ব্যাপারে তার মতামত আরও অনেক বেশী উগ্র। সে চন্দনার বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে যেতেও রাজি নয়।

অলি তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো, চন্দনা তাদের খুবই ঘনিষ্ঠ, তার বিয়েতে না গেলে সে দুঃখ পাবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বকুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে বর্ষা বললো, চন্দনার বাবা কত খরচ করছেন জানিস? মেয়ে জামাইয়ের বিলেত যাবার জাহাজ ভাড়া দেবেন, মুহম্মদ আলির দোকানে জামাইয়ের জন্য পাঁচখানা সুটের অর্ডার দিয়েছেন, এ ছাড়া গয়না দিয়ে চন্দনার গা তো মুড়ে দেবেনই। আর ছেলের বাবা কী করবেন? ওদের বাড়ি আসানসোলে। সেখান থেকে শ'খানেক বরযাত্রী আসবে, বাস রিজার্ভ করে। সেই বাসের আসা-যাওয়ার ভাড়াও তিনি চেয়েছেন চন্দনার বাবার কাছে।

—তুই অত সব জানলি কী করে?

—চন্দনা বাড়িতে এসেছিল নেমন্তন্ন করতে ওর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়েছি। যে কোন বিয়ের কথা শুনলেই আমি এই সব খবরগুলো জেনে নিতে চাই। যেসব বিয়েতে মেয়ের বাড়ি

থেকে পণ নেওয়া হয়, সে সব বিয়ের নেমন্তন্ন আমি খেতে যাই না। আমার ঘেন্না করে।

—চন্দনার বাবা তো ঠিক পণ দিচ্ছেন না।

—মেয়ে জামাইয়ের জাহাজ ভাড়া তিনি দিতে যাবেন কেন? ছেলেটার মুরোদ নেই? তুই একটা কথা ভেবে দ্যাখ অলি চন্দনা কি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী। দেখতে সুন্দর, তাকে যে বিয়ে করবে, সেই -ই তো ধন্য হয়ে যাবে? চন্দনা শুধু মেয়ে বলেই তার বাবাকে টাকা খরচ করতে হবে? এই বারবারিক সিস্টেমকে তুই সাপোর্ট করিস?

—চন্দ্রনার বাবার আছে বলেই দিচ্ছেন। উনি নিশ্চয়ই ইচ্ছে করেই দিচ্ছেন। ওরা চায়নি।

—কি করে বুঝলি ওরা চায়নি। চন্দ্রনার বাবা দিতে চাইলে, সেই হতভাগা ছেলেটা নিতে রাজি হলো না নে? তার কোনো প্রেস্টিজ জ্ঞান নেই? ওর আমি মুখও দেখতে চাই না। তুই বড্ড রেগে যাচ্ছিস বর্ষা। ঠিক আছে, আমরা চন্দনার বরের মুখ দেখবো না, শুধু চন্দ্রনার সঙ্গে দেখা করে আসবো।

—তোর যেতে ইচ্ছে করে তুই যা।

হ্যাণ্ড ব্যাগ খুলে বর্ষা একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করলো। শঙ্কিত ভাবে এদিক ওদিক তাকালো অলি। বর্ষার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি করা চাই। ছেলেরা যদি সিগারেট খেতে পারে তা হলে মেয়েরা কেন পারবে না, এই যুক্তিতে সে কিছুদিন ধরে সিগারেট টানতে শুরু করেছে। তাও সে লুকিয়ে চুরিয়ে খাবে না, প্রকাশ্যেই খাওয়া চাই। অনেকেই হা করে তাকিয়ে দেখে বয়স্ক লোকরা চলতে চলতে থমকে যায়, কেউ কেউ বিড় বিড় করে কী যেন বলে, খুব সম্ভবত ঘোর কলিকালের আগমন সম্পর্কে ঘোষণা, কেউ কেউ তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই কটূক্তি করে যায়। বর্ষার কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সহপাঠীরাও অনেকে টিটকিরি দেয়। তার প্রসঙ্গ উঠলেই ছেলেরা বলে কোন বর্ষা স্যান্যাল, সেই সিগারেট ফোঁটা পাগলিটা? ওয়াল ম্যাগাজিনে তার সম্পর্কে রস রচনা বেরিয়েছে, একটি ছেলে নিখুঁত ভাবে বর্ষার মুখ এঁকে দিয়েছে।

অলি অনেক ভাবে আপত্তি জানিয়েও শুধু ধমক খেয়েছে বর্ষার কাছ থেকে। বর্ষার ব্যক্তিত্বের কাছে সে হেরে যায়। তবে বর্ষার অনেক প্ররোচনাতেও সে নিজে সিগারেট ধরেনি। কয়েকবার সে সিগারেট টেনে দেখেছে, তার ভালো লাগে না।

সিগারেট ধরিয়ে বর্ষা বললো, আমার আরও রাগ দরে কেন জানিস? প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়া কত শক্ত, অনেক ছেলেমেয়ে চান্স পায় না, আর এই মেয়েগুলো ফোর্থ ইয়ারে উঠতে না উঠতেই বিয়ে করে কলেজ ছেড়ে দিচ্ছে। এটা একটা ক্রাইম। বিয়ের নাম শুনলেই মেয়েগুলো নেচে ওঠে। চন্দনার মতন মেয়েও যে পড়াশুনা ছেড়ে....

অলি বললো, চন্দনার কথা শুনে মনে হলো ওর বিলেত যাবার খুব ইচ্ছে হয়েছে।

—ও নিজে বিলেত যেতে পারতো না? ওর বাবার পয়সা আছে, তা ছাড়া ও ডেফিনিটলি ভালো রেজাল্ট কতো বিলেতের যে কোনো কলেজে অ্যাপ্লাই করলে স্কলারশিপ পেতে পারতো। সেটুকু ধৈর্য ধরতে পারলো না, বরের ল্যাজ ধরে ওকে সমুদ্র পার হতে হবে?

—তুই বড্ড খারাপ কথা বলিস বর্ষা।

—কী খারাপ কথা বলেছি রে? চন্দনার বরকে শুধু বাঁদর বলেছি, ওকে শালা বলা উচিত শালা।

—তুই মনীশকে বিয়ে করবি না?

—মনীশকে? তোর মাথা খারাপ হয়েছে অলি? তুই আমাকে এরকম একটা সিলি প্রশ্ন করতে পারলি? যে ছেলে ফ্রান্ৎস কাফকার নাম শোনেনি, থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি কী তা জানে না, তাকে আমি কথা বলার যোগ্যই মনে করি না।

—মনীশ কিন্তু তোর জন্য একেবারে পাগল?

—আমি পাগলটাগলদের থেকে দূরে থাকতে চাই। ছোটবেলা থেকেই আমি দেখলে ভয় পাই।

—ধ্যাৎ। আমি কি সেই সেন্সে বলছি নাকি?

—জানি। আমর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে মনীশকে আমার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। আমার রুচি, আমার মানসিকতা বুঝতে হবে, শুধু পেছন পেছন ঘোরা আর তোষামোদ করলেই তো চলবেন।। ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে আমার আপত্তি নেই, শুধু বন্ধুত্ব। বিয়ে ফিয়ের কথা ভাবলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে। কপালে সিঁদুর , হাতে লোহা এগুলো কিসের চিহ্ন জানিস? মেয়েদের জোর

করে ধরে এনে পুরুষরা তাদের চুলের মাঝখানটায় চিরে দিত। অর্থাৎ এই মেয়েটা আমার বন্দিনী। সেই রক্তের দাগ এখনকার সিঁদুর। বিয়ের পর হাতে লোহা পরতে হয় কেন, তার মনে লোহার শেকল দিয়ে হাত বাঁধা হলো এখনও চন্দনার মতন মেয়েরা সেধে সেধে ক্রীতদাসী হতে চায়। পৃথিবীতে যেদিন পুরুষ আর মেয়েরা একদম সমান সমান হবে সেইদিন আমি বিয়ের কথা ভাববো।

অলি হেসে ফেললো।

বর্ষাও হেসে বললো, ভাবছিস, ততদিনে আমি বুড়ি হয়ে যাবো?

–সে কথা ভাবিনি। তুই যখন এই সব কথা বলিস তোর মুখে এমন একটা সীরিয়াস ভাব ফুটে, মনে হয় তুই যেন আমার সঙ্গে কথা বলছিস না, গোটা পুরুষ জাতিটাই তোর চোখের সামনে...

–চল, কফি হাউসে যাবি?

একটু দ্বিধা করে অলি বললো না। কয়েকদিন আগে কফি হাউসে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে, সেই জন্য আর ওখানে যেতে ইচ্ছে করে না।

বর্ষা বললো, চল তাহলে আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটু বসবি? আজ আমাদের বাড়িতে কেউ নেই।

অলির জন্য এখন আর বাড়ির গাড়ি আসে না, সে নিজেই বারণ করে দিয়েছে। সে এখন ট্রামে-বাসে যাতায়াত করে। এখন দুপুর তিনটে পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ফিরলেই চলবে।

বর্ষাদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। তিনতলা বাড়িটিতে অনেকগুলি ভাড়াটে। দোতলায় বর্ষাদের দুটি মাত্র ঘর। বাবা মারা গেছেন, মা ছোট বোন আর দাদা বৌদির সঙ্গে থাকে বর্ষা। বাড়ির সবাই মুর্শিদাবাদে দেশের বাড়িতে গেছে। কলেজ খোলা বলে বর্ষা যায়নি।

একখানা নিজস্ব পড়ার টেবিল পর্যন্ত নেই বর্ষার। টেবিল ফেলার জায়গা নেই, দু'দিকে দুটি খাট পাতা, একটি তার মা ও ছোট বোনের। ঘরের দেয়ালে একটি জোন অব আর্ক এর বাঁধানো ছবি। বর্ষার খাটের ওপর বইপত্র ছড়ানো, সেগুলোই সরিয়ে সরিয়ে বর্ষা বললো, বোস এখানে আমি চা তৈরি করে আনছি।

বসবার ঘর নেই, শোওয়ার ঘরেই বাইরের লোক এসে বসে, তাও খাটের ওপর। এরকম দেখার অভিজ্ঞতা নেই অলির। পড়ার টেবিল নেই, তবু বর্ষা রেজাল্টের জোরে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছে। হাত খরচ চালানোর জন্য সে একটা টিউশনি করে। হঠাৎ অলির চোখ ছলছল করে উঠলো। নিজেকে তার মনে হলো স্বার্থপর। বর্ষার তুলনায় সে কত আরামে কত ভালো অবস্থায় থাকে। এটা যেন একটা অন্যায়।

শুধু চা নয়, দুটি ডিমের ওমলেটও ভেজে নিয়ে এসেছে বর্ষা।

অলি জিজ্ঞেস করলো, বাড়িতে আর কেউ নেই, তোর খাবার কে রান্না করে দেয়?

বর্ষা বললো, কে আবার দেবে? আমি নিজেই রান্না করি। আমাদের তো ঠাকুর চাকর নেই। অন্য সময় মা রান্না করে। আমার মা কী রকম জানিস? যেন পরের সেবা করার জন্যই জন্মেছে। আমার বাবা ছিলেন অটোক্রাট হিটলারের মতন। এক হিসেবে হিটলারের চেয়েও খারাপ। কারণ কোনো ক্ষমতা ছিল না, সাধারণ রেলের চাকরি করতেন বাড়িতে ছিল যত রকম হম্বিতম্বি, মা ভয় পেত খুব বাবাকে। আগে মা মুখ বুঁজে স্বামীর সেবা করে গেছে, এখন ছেলেমেয়ের সেবা করছে। নিজের কোনো সাধ আহ্লাদ নেই। দাদাকেও মা ভয় পায়। আমি সামনের বছর একটা চাকরি নেবো ঠিক করেছি। তখন মাকে নিয়ে দাদার সংসার থেকে চলে যাবো।

–তুই এম এ পড়বি না?

–প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবো। কোয়ালিফিকেশন তো বাড়াতেই হবে। এদিকে আয় অলি ..

বর্ষা একদিকের একটা জানলা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠলো একটা অপূর্ব দৃশ্যটা চমৎকার বাগান অনেক রকম ফুলের গাছ কয়েকটা বড় বড় আম গাছ, তার মাঝখানে একটি শ্বেত পাথরের নগ্ন নারীমূর্তি।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দুই বান্ধবী দাঁড়ালো জানলার পাশে। অলির তুলনায় বর্ষা লম্বা তার মাথার চুল আলুথালু বর্ষা বললো, এটা লাহাদের বাড়ির বাগান সুন্দর না? আমি বিনা পয়সায় এই বাগানের শোভাটা পেয়ে যাই। তবে জানলাটা সব সময় খুলি না, সব সময় দেখলে এই সুন্দর ব্যাপারটা যদি পুরোনো হয়ে যায়? ঐ লাহারা কি আর রোজ ওদের বাগানে এসে বসে?

পাথরের মূর্তিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বর্ষা বললো, ঐ মূর্তিটা দেখলেই আমার তোর কথা মনে পড়ে। মুখখানা ঠিক তোর মতন না?

লজ্জায় রক্তিম হয়ে অলি বললো, যাঃ কী যে বলিস।

অলির কাঁধে হাত রেখে বর্ষা বললো, তুই বড় সুন্দর রে অলি। এই বাগানটার মত নরম আর পবিত্র। এত নরম থাকিস না। এই পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর জায়গা, সবাই তোর ওপর সুযোগ নেবে।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো জানলার কাছে। বর্ষা সাধারণত বেশী কথা বলে, এখন সেও নীরব। অলির মনে পড়ছে বাবলুদার কথা। বাবলুদা এখন আর বেশি আসে না তাদের বাড়িতে। ক'দিন আগে কফি হাউসে অলির সামনেই বাবলুদা একটি ছেলের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়েছিল, সেই ছেলেটি নাকি কৌশিকের নামে কী খারাপ কথা বলেছে। বাবলুদা কি অলির চেয়েও কৌশিককে বেশী ভালবাসে? রাস্তায় কোনো ছেলে যখন অলির দিকে তাকিয়ে অসভ্য ইঙ্গিত করে তখন তো বাবলুদা তাদের কিছু বলে না?

ছেলেবেলা থেকে দেখছে তবু বাবলুদাকে এখনো ঠিক বুঝতে পারে না অলি। হঠাৎ হঠাৎ বাবলুদার মেজাজ বদলে যায়। বাবলুদা যখন তখন তাকে জোর করে আদর করতে চায় কিন্তু মুখে একটাও ভালো কথা বলে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বর্ষা বললো, চন্দনার মতন তুইও হঠাৎ বিয়ে করে চলে যাবি নাতো অলি? তা হলে আমি তখন কি করবো?

অলি বললো, যাঃ ওসব বিয়েটিয়ের কথা আমি ভাবিই না মোটে।

অলিকে আর একটু কাছে আকর্ষণ করে বর্ষা বললো তোকে আমি বড্ড ভালোবাসিরে, অলি তুই একদিন কলেজে না এলে আমারও ক্লাস -ফ্লাস করতে ইচ্ছে করে না।

বর্ষা অলির গালে তার গালটা ঠেকালো।

॥ ২৮ ॥

কবি জসিমউদ্দিনের বাড়িতে এক রবিবার সকালে আড্ডা দিতে গিয়ে মামুনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।

ঐ বাড়িতে একবার আড্ডায় জমে গেলে উঠে পড়া শক্ত। কবি নিজেই অত্যন্ত মজলিশী মানুষ, অফুরন্ত তার গল্পের স্টক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীনেশচন্দ্র সেন থেকে শুরু করে হাসন রাজা নজরুল প্রমুখ ব্যাক্তিদের সম্পর্কে অনেক অন্তরঙ্গ কাহিনী শোনা যায় তার মুখে। তা ছাড়া আরও অনেক বিশিষ্ট আড্ডাধারী এখানে এসে জমায়েত হন প্রায়ই।

মামুন ইদানীং আড্ডা দেবার সময় পান না, সংবাদপত্রের কাজ নিয়েই খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। নতুন কাগজ রেফারেন্স লাইব্রেরি নেই, কোনো তথ্য যাচাই করতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে হয় খুব। পুরোনো কোনো তথ্যের সন্ধানে তিনি নিজেই নানা জায়গায় ছোটাছুটি করেন। সেইরকম একটি কারণেই তাঁর খোঁজেই তিনি এসে পড়লেন কবি জসিমউদ্দীনের বাড়ির আড্ডায়। মোতাহার হোসেনের সঙ্গে দেখা হলো, প্রয়োজনও মিটলো কিন্তু আড্ডা ছেড়ে ওঠা গেল না। কবির গৃহের আতিথেয়তা বিখ্যাত শুধু গাল গল্প নয়, নাস্তা পানি না খাইয়ে তিনি কারুকে ছাড়েন না।

বৈঠকখানা ঘরটি বেশ প্রশস্ত। দেওয়ালে নানাবিধ ছবি তার মধ্যে একটি রাধাকৃষ্ণের। একটি বড় ক্যালেণ্ডারে পল্লী দৃশ্য ঝুলছে এক কোণে ক্যালেণ্ডারটি গত বৎসরের কিন্তু সুন্দর ছবিটির জন্যই সেটি এখনও স্থানচ্যুতহয়নি। সেই ছবিটির নিচে একটি ইজি চেয়ারে বসে আছেন একজন প্রায় বৃদ্ধ সুদর্শন পুরুষ। এক একজন মানুষের চেহারা ও পোশাক ছাড়িয়েও একটা ব্যক্তিত্বের জ্যোতি থাকে, একবার সে তাকালে আর একবার দৃষ্টি ফিরে আসে।

মানুষটি যে বেশ দীর্ঘকায় তা তাঁর ছড়ানো পা ও হাঁটুর উচ্চতা দেখলেই বোঝা যায়। পাজামা ও কর্তা পরা গালে নিখুঁতভাবে ছাঁটা কাঁচা-পাকা দাড়ি। চোখে রোদ-চশমা। ঘরের মধ্যেও ঐ চশমা পরে আছেন বলে তাঁর মুখখানি পুরোপুরি বোঝা যায় না। কিন্তু তাঁর চিবুক ও নাক দুই-ই সূচোলো। মামুনের সঙ্গে কেউ তাঁর পরিচয় করিয়ে না দিলেও তিনি চিনতে পারলেন।

অবিভক্ত বাংলার শেষ দশ বছরের রাজনীতিতে জনাব আবুল হাসেম ছিলেন একজন প্রভূত

ক্ষমতাশালী মানুষ। নিজে কিঞ্চিৎ আড়ালে থেকে তিনি মুসলিম লীগ ও কোয়ালিশন মিনিস্ট্রিতে কলকাঠি নাড়তেন। লেখাপড়া জানা, তীক্ষ্ণধী পুরুষ, আর্থিক অবস্থাও ভালো। বর্ধমানের দিকে ওঁদের অনেক জমি জায়গা ছিল। পার্টিশানের পর এদিকে চলে এসেছেন। মামুনের সঙ্গে সেই কলকাতার সময় থেকে যথেষ্ট চেনাশুনো থাকলেও এর মধ্যে বছর দু'তিন দেখা হয়নি। তবে মামুন শুনেছিলেন যে আবুল হাসেম সাহেবের দৃষ্টিশক্তি সম্প্রতি খুব খারাপ হয়ে গেছে, চোখে প্রায় দেখতেই পান না, কিন্তু মস্তিষ্ক আছে পুরোপুরি সজাগ। ওঁর এক ছেলের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই দেখা হয়, তার নাম বদরুদ্দিন ওমর। পত্র-পত্রিকায় এই ছেলেটির দীপ্ত খরসান ভাষায় প্রবন্ধ পড়ে মামুন অবাক ও মুগ্ধ হয়েছেন। তবে এর লেখার মধ্যে কিছুটা তিক্ততার ভাব আছে, যা মামুনের ঠিক পছন্দ হয় না। মামুনের সন্দেহ হয়, আবুল হাসেম সাহেবের মতন একজন ধর্মনিষ্ঠ, জাতীয়তাবাদী মানুষের এই পুত্রটি বোধ হয় কমুনিস্ট।

মামুন এগিয়ে গিয়ে বললেন, আস্সালামু আলাইকুম, হাসেম সাহেব।

কালো চশমা পরা মানুষটি মুখ তুলে প্রতি অভিবাদন জানালেন, তারপর উঁচু গলায় হাসলেন। জসিমউদ্দিনও হেসে উঠলেন। আরও দু'তিনজন।

বিস্মিত মামুনের পিঠে হাত দিয়ে জসিমউদ্দিন বললেন, সবাই ঐ এক ভুল করে। ওনারে চেনতে পারলা না? উনি হইলেন মুসাফির।

মামুনের তবু ভুরু কুঁচকে রইলো। মুসাফির মানে? সৈয়দ মোস্তাফা আলির ভাই মুজতবা আলি? যে এখন লেখক হিসেবে খুব নাম করেছে, শান্তি নিকেতনে পড়ায়? কিন্তু তার তো চেহারা অন্যরকম, টকটকে ফর্সা রং।

আর একজন কেউ বললো, সওগাতে এই মুসাফির সাহেব সিরিজ লিখতেন আপনি পড়েন নাই?

মামুন অস্ফুট স্বরে বললেন, হ্যাঁ, তা পড়েছি। কিন্তু ...

কথায় কথায় জানা গেল এই মুসাফির এক সময় বেশ পরিচিত লেখক ছিলেন, তারপর বহু বছরের জন্য উধাও হয়ে যান। সত্যিকারের মুসাফিরের মতন বহু দেশ ঘুরেছেন সম্প্রতি সেট্ল করেছেন ভারতে কয়েকদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে বেড়াতে এসেছেন।

মামুনের মুখ থেকে ফস্ করে প্রশ্ন বেরিয়ে এলো, ইণ্ডিয়ায় সেট্ল করলেন কেন?

মামুন অন্য কিছু ভেবে প্রশ্নটি করেননি, তাঁর মাথায় সব সময় এখন তাঁর পত্রিকার চিন্তা। মুসাফির সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে সেট্ল করলে তার পত্রিকার জন্য আর একজন লেখককে পাওয়া যাবে মামুনের এই কথাটাই প্রথমে মনে এলো। ভালো গদ্য লেখকের খুব অভাব।

মামুনের প্রশ্ন শুনে মুসাফির সাহেব হেসে বললেন, আপনারা নবাব ফারুকির নাম শুনেছেন? অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী ছিলেন একসময়।

সকলেই মাথা হেলালো। নবাব ফারুকীর নাম কে না জানে।

মামুন লক্ষ করলেন, মুসাফির সাহেবের কথায় পরিস্কার পশ্চিমবঙ্গীয় শান্তিপুরী টান। কণ্ঠস্বরটি ভরাট ও মিষ্টি।

মুসাফির সাহেব বললেন,পার্টিশানের পর নবাব ফারুকীকে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি কলকাতায় রয়ে গেলেন, পূর্ব পাকিস্তানে গেলেন না কেন? সেখানে আপনার জমিদারি রয়েছে তিনি কী উত্তর দিতেন জানেন? তিনি সবাইকেই বলতেন, ওদিকে যেতে পারি। কিন্তু ক্যালকাটা ক্লাবটাকে উপড়ে তুলে নিয়ে যেতে পারো ঢাকায়? ক্যালকাটা ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গে রোজ আড্ডা দিতে না পারলে যে দিকে মন টিকবে না। আমারও হয়েছে সেই অবস্থা। আমার অবশ্য ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে কোনো সমস্যা নেই। আমাদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে আছে একটা বাগান। নিজে হাতে আমি তার অনেক গাছ পুঁতেছি। সেই গাছগুলোকে তুলে না আনতে পারলে আমার একা আসা হবে না।

মোতাহার হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মুসাফির হয়েও নিজের বাড়ির বাগানের ওপর এত টান?

—আমি মুসাফির হতে পারি যাযাবর তো নই। আমার একটা শিকড় আছে, সেটা সব সময় টের পাই।

—ইণ্ডিয়ার অবস্থা এখন কী রকম? থাকার অসুবিধা নাই? কাগজে তো যা পড়ি মাঝে মাঝে—

—হ্যাঁ, অসুবিধে আছে। অন্তত ছ'রকম অসুবিধের কথা বলা যায়। তার মধ্যে তৃতীয়টি হলো,

হঠাৎ কোনোদিন দাঙ্গা লাগলে কচু -কাটা হতে পারি। ইণ্ডিয়ায় দাঙ্গার তো বিরাম নেই।

—এইটা হলে তৃতীয় অসুবিধে?

সবাই হেসে উঠলো একসঙ্গে। মামুন আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, ইণ্ডিয়ার অবস্থা সত্যিই এখন কী রকম বলেন তো। আপনার কাছ থেকে ঠিক খবর পাওয়া যাবে।

মুসাফির একটা চুরুট ধরালেন। কালো চশমাটা তিনি খোলেননি একবারও। ঠোঁটে সব সময় পাতলা হাসি। সব মিলিয়ে মানুষটিকে রহস্যময় মনে হয়।

তিনি চুরুটে টান দিয়ে বললেন, ইণ্ডিয়ায় একটা এক্সপেরিমেন্ট চলছে। হিন্দুরা অনেকদিন পর রাজ্য শাসনের ভার পেয়েছে। মুখে ওরা যাই-ই বলুক, ওদের কনস্টিটিউশানে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা থাক, হিন্দুরাই এখন শাসক। ধরুন প্রায় সাত শো বছর পর এই ক্ষমতা পেয়ে তাদের খানিকটা দিশেহারা অবস্থা। হিন্দু চিন্তা ধারার মধ্যে সব সময় একটা বৈপরীত্য থাকে। সেই তুলনায় মুসলিম মাইণ্ড বোঝা তবু সহজ। তা স্পষ্ট ও একমুখী। হিন্দুদের মধ্যে যেমন আছে গোঁড়ামি, তেমনই আবার ঔদার্যের প্রতি মোহ।

একজন বললো, ঔদার্যের বাণ। কিংবা ঔদার্যের ভণ্ডামিও হতে পারেন।

মুসাফির বললেন, মোহটাই বোধ হয় সঠিক আমার মতে। হিন্দুরা যেমন সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তেমনি নাস্তিকতাও তারা কিছুটা সহ্য করে। হিন্দুধর্মের একটা অংশের মধ্যে নাস্তিকতাবাদ চলে আসছে অনেকদিন ধরে। তারা একসময় বৌদ্ধদের পিটিয়ে মেরেছে আবার নিরীশ্বরবাদী গৌতমবুদ্ধকে অবতার বলেও স্বীকার করে নিয়েছে।

—স্বীকার করে নিয়েছে মুখ মুখেই। কোনো হিন্দু কি বিষ্ণু বা রামের মতন বুদ্ধের পূজা করে?

—বুদ্ধ মূর্তি দিয়ে তারা ঘর সাজায়। তাতে বাধা নেই। ঐটাই ঔদার্যের মোহ। এই থেকেই তারা মনে করে যে আধুনিক পৃথিবীতে তারা একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়তে পারবে। দু'পাঁচ শো জন হয়তো এটা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে। আবার হিন্দুদের একটা বিরাট অংশ মনে করে, ইংরেজদের কাছ থেকে তারাই ক্ষমতা ছিনিয়ে এনেছে, সুতরাং মুসলমানদের তারা দয়া করে যেটুকু দেবে, তা নিয়েই মুসলমানদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অধিকাংশ হিন্দু কংগ্রেস পার্টিকে ভোট দেয় কিন্তু মহারাষ্ট্রের সাভারকরকে অস্বীকার করে না। সুতরাং কাগজে কলমে ও হিন্দু মানসিকতায় একটা দো-টানা চলছে। এই জন্যই আমি বলেছি, এটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজ। তার পরে তাদের রাজ্য শাসনের অভিজ্ঞতা নেই, তারা ফলো করছে ব্রিটিশ মডেল। কিন্তু যে দেশে শতকরা সত্তর জনের ক-অক্ষর গোমাংস শতকরা ষাট জন দু'বেলা খেতে পায় না, শতকরা পঞ্চাশ জনের একটি গেঞ্জি পর্যন্ত গায়ে দেবার সামর্থ্য নেই, সেই দেশে ব্রিটিশ মডেল পদে পদে হাস্যকর হয়। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইকুয়ালিটি ইন দা আই অপল, আইনের চক্ষে ধনী নির্ধন সবাই সমান। জমিদার রামচন্দ্র তার প্রজা শ্যামচন্দ্র কিংবা শেখ রহিমের জমি কেড়ে নিল জোর করে। এখন শ্যামচন্দ্র কিংবা শেখ রহিম আইনের সাহায্য পাবে কী করে? আইন কিনতে পয়সা লাগে । আইন বুঝতে লেখাপড়া লাগে। ব্রিটেনে কী হয়? সেখানে সরকারের চোখ নাক অনেক বেশি সজাগ সরকারের হাত লম্বা। সারা দেশে কী ঘটছে সরকার তার খোঁজ খবর রাখে। সে দেশেও ধনীরা গরিবদের শোষণ করে বটে কিন্তু জমি কেড়ে নিতে পারে না, যাকে তাকে খুন করে পার পায় না, মাঝখানে সরকারের হাত এসে পড়ে। আর ভারতের নতুন সরকার বড় বড় শহরগুলোই সামলাতে পারছে না, গ্রাম তো সরকারের কড়ে আঙুলটিও কখনো পৌঁছোয় না।

মামুন বললেন, আমাদের এদিকেও তো একই অবস্থা।

মুসাফির বললেন, আমি আপনাদের দেশ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। আমি ইণ্ডিয়ার সিটিজেন সে দেশের সমালোচনা করতে পারি। আপনাদের সম্পর্কে শুধু কথাই বলতে পারি, আল্লা আপনাদের রক্ষা করুন।

—আপনি মুসলমান হয়েও আমাদের পর পর ভাবছেন? পার্টিশান তো একটা পলিটিক্যাল ডিভিশন, কিন্তু দু'দেশের মানুষ যে এত দূরে সরে যাচ্ছে...

—সেইটাই তো সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। ভারত কাগজে কলমে ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা করে বসে আছে, আর আপনারা গড়ছেন ইসলামিক রাষ্ট্র। আমার ধারণা পার্টিশান না হলে হিন্দু মুসলমানের সহাবস্থানের এক্সপেরিমেন্টটা তবু যদি বা সাকসেসফুল করা যেত এখন আর তার কোনো আশা নেই।

অবস্থা আরও খারাপ হবে যদি এই দুই দেশের মধ্যে একটা যুদ্ধ বাদে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, শিগগিরই সেরকম একটা যুদ্ধ বাধবে।

–আঃ আবার যুদ্ধ?

–আমি চোখ বুজলেই যেন সেই দৃশ্য দেখতে পাই। এবারে আর কাশ্মীরে সীমান্ত সংঘর্ষ নয়। পুরোপুরি দুই দেশের যুদ্ধ, প্লেন থেকে বোমা পড়বে

–না, না, না, আপনি বড় সিনিক্যাল কথা বলছেন।

মোতাহার হোসেন গম্ভীরভাবে বললেন, আমি মুসাফির সাহেবকে বহুদিন ধরে চিনি। ওকে তোমরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বলতে পারো। উনি যা যা বলেন সব মিলে যায়। নজরুলের যে এই অবস্থা হবে, সে কথা উনি আমাকে বহু আগেই বলেছিলেন। মনে আছে, আপনার? আমার নিজের জীবন সম্পর্কেও উনি কয়েকটা কথা বলেছেন, যা প্রত্যেকটা মিলেছে।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন উনি হাত দেখতে পারেন বুঝি।?

মুসাফির প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, না, না, আমি সেব কিছু জানি না। মোতাহার তুমি এসব কী আবোলতাবোল বলছো।

জসিমউদ্দিন বললেন, হ্যাঁ মুসাফিরের এই একটা আনক্যানি ক্ষমতা আছে আমিও লক্ষ করেছি।

আলোচনা অ্যদিকে ঘুরে গেল। অনেকেই মুসাফিরকে ঘিরে ধরে হাত বাড়িয়ে দিল। মুসাফির প্রথম কয়েকবার তাদের প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত এক একজনের হাত ছুঁয়ে নানান কৌতুকময় মন্তব্য ছুঁড়তে লাগলেন।

আড্ডা ভাঙলো বেল একটায়। মুসাফির সাহেবের জন্য একটা গাড়ি মজুত আছে। তাঁর কোনো ব্যবসায়ী বন্ধু কয়েকদিনের জন্য গাড়িটি দিয়েছে। কাগজের সম্পাদক হবার পর মামুন একখানা অফিসের গাড়ি পান বটে কিন্তু আজ ড্রাইভার আসেনি, তিনি রিকশায় এসেছেন।

মুসাফির সাহেব কয়েকজনকে লিফ্ট দিতে চাইলেন। মামুন উঠলেন সেই গাড়িতে। তিনি সব শেষে নামবেন। নামবার একটু আগে তিনি জিজ্ঞেলেন, আপনি কি সত্যিই ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখতে পান? সাধ-ফকিরদের যেরকম অলৌকিক ক্ষমতা থাকে শুনেছি ...

মুসাফির স্বভাবসিদ্ধ সহাস্য কণ্ঠে বললেন, না, আমার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। তবে ঐ জসিমউদ্দিন যা বললো, সেটাই ঠিক। মাঝে মাঝে অমার একটা আনক্যানি ফিলিং হয়, হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে....ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের একটা ছবি আমি প্রায়ই দেখি। আপন তো সাংবাদিক, সে জন্য তৈরি হয়ে থাকুন।

–কিন্তু কী নিয়ে যুদ্ধ হবে?

মুসাফির নিজের মাথায় টোকা মেরে বললেন, পাগলামি নিয়ে দু'দেশের পাগলামির তো একটাই নাম, কাশ্মীর।

–হায় আল্লা। এই গরিব দেশে যুদ্ধ।

–সব যুদ্ধেই গরিবরা গরিবদের মারে। বড়লোকরা মজা দেখে।

–আপনি.... মুসাফির সাহেব, আপনি কোনো মানুষের জীবনেরও এরকম ছবি দেখতে পান?

–হ্যাঁ, তাও কখনো কখনো দেখি। কী করে দেখি তা জানি না। খুব সম্ভবত টেলিপ্যাথি। অন্য একজনের সাবকনসাস মাইন্ডের ছবিটা আমার মস্তিষ্কের বেতার তরঙ্গে কী করে যেন ধরা পড়ে যায়। আমার নিজের ছোট ভাই, খালেদ, একদিন তার মুখের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলাম। দেখি যে, তার চোখের দুটো মণি নেই। সে তাকিয়ে আছে, কিন্তু চোখ দুটি সাদা। আমি খালেদকে তখুনি ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করতে বললাম। সে শুনলো না। তার আই সাইট পারফেক্ট। স্বাস্থ্য ভালো সে কেন ডাক্তারের কাছে যাবে। চাকরিও ভালো করে, বুদ্ধিমান ছেলে কিন্তু শুনলে হয়তো আপনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না, এক মাসের মধ্যে সেই সুস্থ ভাইটি আমার পাগল হয়ে গেল। একে আপনি কী বলবেন।

–সত্যি বিশ্বাস হতে চায় না।

–আরও আশ্চর্য হচ্ছে, আমি নিজের জীবনের ভবিষ্যতের কোনো ছবি দেখি না। অন্যদের দেখি। আমি জিন্না সাহেবকেও দেখেছিলাম। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের গোড়ার দিকে। আমি তখন জিন্না সাহেবের প্রচণ্ড অ্যাডমায়ারার। কিন্তু ওনার দিকে তাকিয়েই আমার বুক কেঁপে উঠলো। মুখে পরিষ্কার

মৃত্যুর ছায়া। ভাবুন তো আপনি, যে মানুষটা এতকালের একটা পুরাতন দেশ ভেঙে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, তার নিজের আর আয়ু নেই।

–মুসাফির কোনো উত্তর না দিয়ে মামুনের মুখের দিকেস্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মামুনের বুকটা কেঁপে উঠলো। এক্ষুনি জিন্না সাহেবের কথা বলার পরই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে এমন দীর্ঘশ্বাস...

–আপনি কী দেখলেন মুসাফির সাহেব? আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে নাকি।

–না, না, বালাই ষাট, আপনি আর অনেকদিন বাঁচবেন।

–তবে কী দেখলেন?

–না, সেরকম কিছু না।

–কী দেখলেন, তবু বলুন।

–আপনার না শোনাই ভালো। হয়তো ঠিকই আছে। জানেন, সময়ে সময়ে আমারও ভুল হয়।

–এটা আপনি কী করছেন, মুসাফির সাহেব। আমার মনের মধ্যে একটা খটকা ঢুকিয়ে দিলেন। এখন আমি অনবরত এই কথাই ভাববো। আমি তো ছেলেমানুষ নই, আপনার যা মনে এসেছে বলুন, শুনলেই যে আমি বিশ্বাস করবো, তারও তো কোনো মানে নাই।

–একটা ছায়া দেখলাম। হঠাৎ যেন আপনি দুটো মানুষ হয়ে গেলেন। একটা আপনার কর্ম জীবনের আর একটা আপনার ব্যক্তি জীবনের। এর মধ্যিখানে একটা ছায়া। একটি অল্পবয়েসী যুবতীর সে যেন দু'হাত মেলে আপনার ঐ দুটি সত্তাকে দু'দিকে সরিয়ে দিতে চায়, সে আপনার.....

মামুন হেসে বললেন, এটা আপনার স্বপ্নই বটে। না, কোনো যুবতী-টুবতী আমার জীবনে নাই। বুড়া হয়ে যাচ্ছি, এখন আর কে আসবে। সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকি। ব্যক্তি জীবনের কথা ভাবারও সময় পাই না।

মুসাফির বললেন হয়তো সে এখনও আসেনি। তাই তার ছায়া মূর্তি। আগামীতে কোনো সময় আসবে।

মামুন বললেন, যদি সে রকম কেউ আসেই মন্দ কী দেখা যাক যদি এই বুড়োকে কারুর পছন্দ হয়।

হালকা সুরেই শেষদিকের কথাবার্তা বলে মামুন নেমে পড়লেন সময়। মুসাফিরকে তাঁর বেশ পছন্দ হয়েছে। এই মানুষটির আসল নাম কী তা কেউ বলেনি। পরদিন তিনি মোতাহার হোসেনের সঙ্গে আবার টেলিফোনে কথা বললেন, তখন মুসাফিরের প্রসঙ্গ উঠলো। মোতাহার হোসেন এই মুসাফিরকে বহুদনি ধরে চেনেন, কিন্তু আসল নামটা ভুলে গেছেন। সকলেই ওঁকে মুসাফির বলে ডাকে। লেখাপড়া জানা মানুষ, অভিজ্ঞতাও প্রচুর, এই লোককে পূর্ব পাকিস্তানে ধরে রাখতে পারলে অনেক লাভ হয়।

মুসাফিরের সঙ্গে মামুনের পরিচয় হবার ঠিক চারদিন পরে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে গেল।

॥ ২৯ ॥

অতীনদের স্টাডি সার্কল মানিকতলার মোড় থেকে সরে গেছে আরও উত্তরে। গ্রে স্ট্রিট আর সার্কুলার রোডের মোড়ের কাছে। খান্না সিনেমার পাশে এ ফ্ল্যাট বাড়তে একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। বাড়িটাতে নানান জাতের পাঁচমিশেলি লোকেরা থাকে, কে কখন আসে যায় তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ঘরখানা সাবলেট করেছেন মানিকদার এক বন্ধু আবিদ আলি এই ভদ্রলোক এক সময় এ ডিভিশনে ফুটবল খেলতেন, এখন ছিট কাপড়ের ব্যবসা করেন। মানুষটি অকৃতদার ও সুরসিক।

মানিকতলার ঘরটা ছাড়তে হলো কারণ পমপমের বাবা অশোক সেনগুপ্তর সঙ্গে ওদের অনেকেই মতপার্থক্য দিন দিন বাড়ছিল। তাত্ত্বিক আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক প্রায়ই পর্যবসিত হচ্ছিল তিক্ততায়। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হবার পরেও কোনো কোনো নেতা দু' নৌকোয় পা দিয়ে রাখতে চাইছিলেন। অতীনদের গুরু মানিক ভট্টাচার্যের মতে অশোকদা সেই রকমই একজন। তিনি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকেও পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির দিকে নিয়ে যেতে চান বলে মানিকদার

দারুণ রাগ।

পমপমদের বাড়ি ছেড়ে আসা হলে পমপম এই স্টাডি সার্কল ছাড়েনি। পমপমের মা নেই, যদিও তাদের বাড়িতে মাসি পিসির সংখ্যা অনেক। ওদের বর্ধমানের গ্রামের বাড়ি থেকে প্রায়ই কেউ না কেউ এসে এখানে থেকে যায়, কিন্তু পমপমের সঙ্গে বাড়ির সম্পর্ক খুব কম। রোগা লম্বাটে চেহারা পমপমের, চোখ দুটো যেন বেশি উজ্জ্বল, সে কক্ষনো সাজগোজের ধার ধারে না, তার কাঁধে সব সময় একটা শান্তিনিকেতনী কাপড়ের ব্যাগ ঝোলে। একদিন কংগ্রেসী ছেলেদের গুণ্ডামি প্রসঙ্গে আলোচনার সময় পমপম খুব ক্যাজুয়ালি সেই ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা রিভলভার বার করে বলেছিল, আমার সঙ্গে ওরা কেউ বাঁদরামি করতে এলে আমি সোজা কপাল ফুটো করে দেবো।

পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যে ওটা খেলনা পিস্তল। আবার এ খবরও জানা গিয়েছিল যে পমপমদের মেমারির বাড়িতে অনেদিন ধরেই আসল বন্দুক আছে এবং পমপমের দাদু নিজে তাঁর প্রিয় নাতনীকে বন্দুক ছোঁড়া শিখিয়েছিলেন। পমপম সহজ মেয়ে নয়। সে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে এম এ পড়ছে, আবার সে গাছপালাও ভালো চেনে। এক বিঘে জমিতে কতটা সার কতটা জল, কতদিনের মজুরি দিলে কতখানি ফসল পাওয়া যায়, সে বিষয়ে স্টাডি সার্কেলের সদস্যদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বেশি জানে। পমপম তার বাবার চেয়ে মানিকদার বেশি ভক্ত মনে হয় পমপমের একটাই দোষ, সে প্রায় হাসেই না বলতে গেলে। তার ঠোঁটে হাসি দেখা অতি দুর্লভ ঘটনা। অতীন একদিন তাকে বলেছিল, এই তুই জানিস না, গম্ভীর মুখে ঠোঁট দুটো থাকে সোজা, আর হাসলে ঠোঁটে একটা ঢেউ খেলে যায়। ঢেউ খেলানো ঠোঁটেই মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

এর উত্তরে ঠোঁটে কোনো ঢেউ না খেলিয়েই পমপম বলেছিল, আসুক আগে সে রকম দিন আসুক তখন আনন্দ করে হাসবো।

পমপম ছাড়া আরো দুটি মেয়ে আসে স্টাডি সার্কেলে, অনীতা আর শুভ্রা, কিন্তু তারা আবার বড্ডই মেয়ে মেয়ে। কথা বলতেই চায় না কথা বলার সময় বারবার আঁচল ঠিক করে।

অতীনকে এখানে প্রথম এনেছিল তার বন্ধু কৌশিক। ওরা সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও দু'জনের স্বভাবে বেশ বৈপরীত্য আছে। কৌশিকের মুখে চোখে একটা সরল আদর্শবাদের আলো জ্বলে, সে এই পৃথিবীটাকে বদলাতে চায়। কৌশিকের ব্যক্তিগত চরিত্রও খুব নির্মল, তার বিশ্বাসের সঙ্গে তার জীবনযাত্রার কোনো অমিল নেই। কৌশিক খারাপ কথা তো বলেই না, তার মুখ দিয়ে সামান্য একটা মিথ্যে কথা বার করাও প্রায় অসম্ভব। বন্ধুরা অনেকবার এরকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

সেই তুলনায় অতীনের কোনো মূল্যবোধেই স্থির দৃঢ় বিশ্বাস নেই, আদর্শবাদীদের বক্তৃতাকে তার মনে হয় বড় বড় কথা, যে কোনো আলোচনাতেই উপদেশের গন্ধ পেলে সে নাক কুঁচকোয়, সে যে-কোনো মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে ভণ্ডামির চিহ্ন আছে কি না তা খোঁজার চেষ্টা করে। এই কারণেই সমাজের অনেক শ্রদ্ধেয় মানুষ তার চোখে অবজ্ঞার যোগ্য। এবং এক মাত্র এই কারণেই সে কৌশিককে ভালোবাসে।

কৌশিকের কথায় সে প্রথম এই সার্কেলে এসে যোগ দিয়েছিল। আস্তে আস্তে মানিকদাকেও তার পছন্দ হয়। মানিকদার সব মতামত সে মেনে নিতে পারে না, কিন্তু সে বুঝেছে যে মানুষটা খাটি। মানিকদা ইংরেজির ভালো ছাত্র ছিলেন, কিন্তু চাকরি বাকরির চেষ্টা করেন নি, পার্টিতেও উঁচু পদের দিকে ঝোঁক নেই। তিনি অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে তারে মধ্য থেকে বেছে বেছে ভালো পার্টি ওয়ার্কার তৈরি করবার কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই মানিকদার মধ্যে অতীন যেন তার দাদার খানিকটা মিল খুঁজে পায়। চেহারা বা ব্যবহারে কোনো মিল নেই, শুধু কথা বলার ধরনটা যেন কিছুটা পিকলুর মতন। অতীনের ধারণা, তার দাদা বেঁচে থাকলে সাধারণ ছেলেদের মতন চাকরি বাকরির দিকে না ঝুঁকে এই মানিকদারই মতন কোনো একটা আদর্শ নিয়ে থাকতো।

প্রথম দিকে খানিকা কৌতূহল আর খানিকটা অবজ্ঞার ভাব নিয়ে এলেও অতীন এখন এই স্টাডি সার্কেলের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে গেছে। ইউনিভারসিটিতে ইলেকশানের সময় কংগ্রেসী ছেলেদের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে অতীন, মাতায় চোট লেগেছিল, তারপর থেকে তার জেদ আরও বেড়ে যায়।

এখন থেকে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই বেশ রাত হয়ে যায় অতীনের। আলোচনা ও তর্কাতর্কি শেষ হতেই চায় না, অতীনেরও এই আড্ডা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। এক একদিন তেলেঙ্গানা ও কাকদ্বীপের তে-ভাগা আন্দোলনের কাহিনী শুরু হয়, আবিদ আলি সাহেবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে কাকদ্বীপের আন্দোলনের কংসারি হালদার নামে একজন বিপ্লবী নেতা সম্পর্কে এমন সব গল্প বলেন তিনি যা শুনতে শুনতে অতীনদের রোমাঞ্চ হয় শরীরে।

রাত সাড়ে নটা দশটার পরেও খান্না সিনেমা সংলগ্ন এই অঞ্চলটি মানুষজনের ভিড়ে বেশ রমরম করে। কাছেই একটি বৃহৎ বাজার রাস্তার ওপাশে আশুতোষ অয়েল মিলের গা ঘেঁষে লম্বা বেশ্যা পল্লী। ট্রাম লাইন থেকে মাত্র দু'তিন হাত দূরে লাইন বেধে দাঁড়িয়ে থাকে মুখে ফটফটে সাদা রং মাখা নানা বয়েসী স্ত্রীলোকেরা।

স্টাডি সার্কল থেকে বেরিয়ে অতীন আর কৌশিক গ্রে স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে হাতিবাগানের মোড়ের কাছে। অন্য অনেকেই উত্তর কলকাতায় থাকে, শুধু ওদের দুজনের বাড়ি সুদূর দক্ষিণে। এখান থেকে ওরা টু-বি বাস ধরে তাতে একটানা চলে যাওয়া যায়।

এক রাতে প্রায় কালি একটা দোতলা বাসে উঠতে গিয়েও কৌশিক অতীনের হাত চেপে ধরে বললো, এটা ছেড়ে দে, পরের বাসে যাবো।

রাতের দিকে বাসের সংখ্যা কমে আসে পরের বাসের জন্য অন্তত মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হবে, অতীন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো কী ব্যাপার?

সেই স্টপ থেকে তিন চারজন লোক ওঠার পর বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। পা-দানিতে দাঁড়ানো ধুতি ও শাদা হাফ শার্ট পরা একটা লোক মুখ ঘুরিয়ে বিস্মিতভাবে কৌশিক ও অতীনকে দেখলো। তার মুখের ভাবটা এমন যেন সে নিজে বাসে উঠে পড়লেও তার অন্য সঙ্গীরা উঠতে পারে নি, রয়ে গেল।

কৌশিক বললো, ঐ লোকটাকে দেখলি? ও রোজ খান্না সিনেমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা বেরুনর পর এক একদিন আমাদের এক একজনকে বাড়ি পর্যন্ত ফলো করে।

অতীন বললো যাঃ।

কৌশিক বললো, তুই লক্ষ করিস নি? কাল দেখিস। তপন আর উৎপলকে দু'তিনদিন একজন ধুতি আর মার্ট পরা লোক ফলো করে বাড়ি পর্যন্ত গেছে। আমাদের বাড়ির ঠিকানা জেনে রাখছে।

–লোকটা কে?

–পুলিসের ইনফর্মার হতে পারে। সি আই এ-র কোনো দালাল হতে পারে। আমাদের ওপর নজর রাখছে। কংগ্রেস গভর্নমেন্ট জ্যোতিবাবু প্রমোদ, দাশগুপ্তকে অ্যারেস্ট করেছে, এরপর পার্টির অনেক ওয়ার্কারকে রাউন্ড আপ করবে বলে শোনা যাচ্ছে।

অতীনের ঠিক বিশ্বাস হয় না। সে বা কৌশিক কেউই পার্টির কার্ড হোল্ডার নয়। মানিকদার কাছে তারা পার্টির মেম্বারশীপ পাবার জন্য আবেদন জানিয়েছিল, মানিকদা বলেছেন, এখনও সময় হয়নি। তবু পুলিশ তাদের এতখানি গুরুত্ব দেবে? তাদের স্টাডি সার্কল তো গোপন কিছু ব্যাপার নয়, প্রায়ই তাতে নতুন ছেলেমেয়েরা যোগ দিতে আসে। তা ছাড়া, শুধু ঘরের মধ্যে তো নয়, এক একদিন কফি হাউস থেকে বেরিয়ে কলেজ স্কোয়ারে ঘাসের ওপর বসে আড্ডা মারে। সেখানেও তো চেঁচিয়ে এইসব বিষয়েই কথা হয়।

ওরা পরের বাসটা ধরলো এবং পরবর্তী স্টপে সেই ধুতি শার্ট পরা লোকটা উঠলো। সে নেমে গিয়ে অতীনদের জন্যই অপেক্ষা করছিল? কৌশিক অতীনের গায়ে ঠেলা দিয়ে চুপিচুপি বললে, দেখলি? আমরা এসপ্লানেডে নেমে পড়ে একটু ঘুরে ফিরে তারপর অন বাসবা ট্রাম ধরবো।

অতীন ভালো করে লক্ষ করলো লোকটাকে। বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। বাসের ভেতরে ঢোকেনি, পাদানিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে অতীনদের দেখছে না, চেয়ে আছে রাস্তার দিকে।

অতীন কৌশিককে বললো, চুপ করে বসে থাক। আমরা একসঙ্গে কালীঘাটে নামবো। ঐ লোকটাও যদি আমাদের সঙ্গে নামে আমি ওর কলার চেপে ধরবো। যদি পুলিশ হয় বলবো ওয়ারেন দেখাও। যদি তা দেখাতে না পারে রামধোলাই দেবো শালাকে। আমার সঙ্গে চালাকি না।

কৌশিক বললো, চুপ কর অতীন।

অতীন বললো, কেন, ভয় কিসের রে। কনস্টিটিউশনে ফ্রিডম অফ স্পীচের গ্যারান্টি দিয়েছে,

তাও পেছনে পুলিশ লাগবে? মামদোবাজি নাকি?

অতীন আর কৌশিক বসেছে একতলায়, লোকটা গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো ভেতরে এলো না, বৌবাজার মোড়ের কাছে হঠাৎ নেমে গেল।

অতীন, কৌশিককে কনুই দিয়ে খোঁচা মারতেই সে বললো, ও বুঝতে পেরে গেছে যে আমরা ওকে চিনে ফেলেছি। কাল থেকে অন্য লোক লাগবে।

অতীন বললো, তাকেও আমরা চিনে ফেলবো।

—শোন অতীন তোকে একটা কথা বলবো? আমিই তো তোকে স্টাডি সার্কলে এনেছিলুম আমিই রিকোয়েস্ট করছি, তুই এখন কিছুদিন এখানে আসা বন্ধ করে দে।

—কেন?

—তোর এবার ফাইনাল পরীক্ষা। যদি সত্যিই পুলিশ ধরে-টরে—

—তার মানে। ফাইনাল পরীক্ষা আমার একার?

—আমি এবার ড্রপ করছি। আমার প্রিপারেশন ভালো হয়নি, আমি সামনের বছর দেবো।

কৌশিকের একথার গুরুত্ব দিল না অতীন। সে বললো ড্রপ করবি মানে? আমি ঘাড় ধরে তোকে পরীক্ষায় বসবো। তুই ড্রপ করলেও আমি শান্তনু আর নির্মলকে ডিঙিয়ে টপ পজিশনে পৌঁছোতে পারবো না।

—আমি সিরিয়াসলি বলছি, অতীন। হঠাৎ যদি আমাদের জেলে ভরে দেয়.....

—জেলের ভেতরটা আমার একবার ঘুরে দেখে আসার ইচ্ছে আছে। জেলে বসেও তো পরীক্ষা দেওয়া যায়।

—আমাদের পলিটিক্যাল প্রিজনারদের স্টেটাস দেবে না। বিনা বিচারে আটক করে চোর ডাকাতদের সঙ্গে রাখবে।

—ধ্যাৎ! তুই বেশি রোমান্টিসাইজ করছিস।

পরদিন সেই ধুতি হাফশার্ট পরা লোকটিকে খান্না সিনেমার আশেপাশে আর দেখা গেল না। তার বদলে আর কেউ এসেছে কিনা সেদিকে নজর রাখলো অতীনরা। সেরকম চেনা গেল না তার বদলে আর কেউ এসেছে কিনা সেদিকে নজর রাখলো অতীনরা। সেরকম চেনা গেল না কারুকে। যদিও মানিকদারও ধারণা তাদের স্টাডি সার্কলের প্রতি পুলিসের নজর পড়েছে।

অতীন একদিন অলিকে নিয়ে এলো এখানে। সপ্তাহে অন্তত একদিনেও দেখা না হলে অলি অভিমান করে। অতীন সময় পায় না। সেই জন্যই সে ঠিক করলো, অলিকে সে সপ্তাহে একদিন দুদিন অন্তত স্টাডি সার্কলেই নিয়ে আসবে। কলেজ যাওয়া ছাড়া অলি একা একা বাইরে কোথাও বেরোয় না। তাই বাইরের জগৎটা চেনে না। পমপমের মতন মেয়ের সঙ্গে কয়েকদিন মিশলে অলি অনেক কিছু শিখবে।

প্রথম দিন অলি আগাগোড়া প্রায় চুপ করে বসে রইলো। পমপম তার সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করেও বেশি কথা বলতে পারলো না। সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েও অলিকে যখন বাড়ি পৌঁছে দিল অতীন, তখন রাত সাড়ে নটা। এত দেরিতে অলি কখনো বাড়ি ফেরে না। অতীন তাকে কলেজ থেকে ফেরার পথে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, অলি বাড়িতে খবর দেবারও সময় পায়নি। বাড়ির সবাই উৎকণ্ঠিত, বিমানবিহারী বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর মেয়ে বাবলুর সঙ্গে ফিরছে দেখে তিনি অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন।

অতীন জানে, অলিকে তার বাবা-মা তুলোয় মোড়া বাক্সে আদরে যত্নে রাখতে চান। কুমারী মেয়ের সাড়ে নটায় বাড়ি ফেরা ওঁদের পক্ষে অকল্পনীয়। কিন্তু ওঁদের খানিকটা কালচার শখ দেওয়া দরকার। ছেলেরা দেরি করে ফিরতে পারে, আর মেয়েরা একটু দেরি করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

দুদিন বাদে অতীন অলিকে জিজ্ঞেস করলো, কীরে, তুই আবার যাবি আমার সঙ্গে ওখানে?

অলি বিনা দ্বিধায় বললো, হ্যাঁ।

সেদিন বাড়িতে অলি বকুনি খেয়েছে কিনা তা কিছুতেই স্বীকার করলো না। অলি তার বাবা-মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলেনি, বাবলুদার সঙ্গে সে কোথায় গিয়েছিল তা জানিয়েছে। তার বাবা-মায়ের কোনো আপত্তি নেই। তবে যেদিন সে ওখানে যাবে, সেদিন বাড়িতে জানিয়ে যেতে হবে।

অতীন দুষ্টুমি করে জিজ্ঞেস করলো, আর স্টাডি সার্কেলে যাবার নাম করে আমি যদি তোকে অন্য কোথাও নিয়ে যাই?

অলি বললো, অন্য কোথাও মানে?

অতীন বললো, এই ধর, ডায়মন্ড হারবার। সেখানে নদীর ধারে বালিতে দুজন শুয়ে থাকবো।

অলি অতীনের দিকে গাঢ় ভাবে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বললো, বাবলুদা, তুমি কোনোদিন আমায় ডায়মন্ডহারবার নিয়ে যাবে না তা আমি ভালোই জানি। তুমি যে সবসময় ব্যস্ত। আমি ডায়মন্ডহারবারে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে দুতিনবার গেছি। তুমি নিশ্চয়ই কখনো যাওনি। তুমি যদি চাও আমি তোমায় একদিন ট্রেনে করে নিয়ে যেতে পারি সেখানে। কিন্তু সেখানে নদীর ধারে বালি নেই, শুধু কাদা শুয়ে থাকা যায় না।

হঠাৎ অতীনের মনে পড়ে গেল একটা বিশেষ দিনের কথা। স্কুলে পড়ার সময় সে অলি মুখে ডায়মন্ড হারবার বেড়ানোর গল্প শুনেছিল আর খুব লোভ আর ঈর্ষা হয়েছিল। অমন একটা সুন্দর জায়গা অলি দেখেছে, অথচ সে দেখে নি-এক তাকে নিয়ে যাবে?

সেই বিশেষ দিনটিতে বাগবাজারের গঙ্গার ধারে মা আর পিসিমনির শাড়ি টাড়ি পাহারা দিতে দিতে তার দাদা পিকলু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে একদিন বাবলুকে ডায়মণ্ড হারবার নিয়ে যাবে। সে প্রতিশ্রুতি রাখে নি দাদা। সম্ভবত সেটাই ছিল দাদার শেষ কথা...

দৃশ্যটা মনে পড়লেই অতীনের যেন দমবন্ধ হয়ে আসে, চতুর্দিকে নীল জল, সেই জল তাকে টানছে ...

দৃশ্যটা মুছে ফেলার জন্য অতীন মাথা ঝাঁকালো, সিগারেট ধরালো। স্মৃতি যেন মাকড়সার জাল, তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া, অলি আর তার মাঝখানে একটা পর্দা নেমে আসছে। ঠিক পর্দা সরাবার ভঙ্গিতে হাত তুললো অতীন।

তারপর মুখ ফিরিয়ে বললো, তুই একদিন আমাকে নিয়ে যাস তো ডায়মণ্ডহারবার। ওখান থেকে কাকদ্বীপটা দেখে আসবো।

দুতিন দিন স্টাডি সার্কলে এসেও অলির ঠিক পছন্দ হলো না জায়গাটা। যেসব কথা সে বইতে আগেই পড়েছে সেইব কথাই অনেকে এখানে এমন ভাবে গলা ফুলিয়ে জোর দিয়ে বলে, যেন নতুন কথা। এরা কি বই পড়ে না? পমপম নামের মেয়েটি গ্রাম জীবনের সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করে বিভূতিভূষণ আর তারাশঙ্করকে খুব গালাগালি দিল। অথচ অলির এই তিনজনের লেখাই ভালো লাগে। পমপম এককথায় আরণ্যক উপন্যাসটিকে খারিজ করে দিল, অলির সন্দেহ হলো পমপম বোধহয় আরণ্যক পড়েইনি। বাবলুদা এসব বই পড়ে না, অলি তা জানে। কৌশিকও কি পড়ে না? মানিকদা বললেন চীনা লেখক লু সুনের লেখা পড়তে, অলি লু সুনের কয়েকটি গল্পের অনুবাদ আগেই পড়েছে কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলো না সেকথা।

তারপর এই শনিবারের রাতটা অলির বহুকাল মনে থাকবে।

স্টাডি সার্কল থেকে বেরিয়েই সে রাতে ওরা একটা বিরাট হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে গেল। সার্কুলার রোডের দুপাশে কয়েকশ লোক জড়ো হয়ে ইট ছুঁড়ছে দুম দাম করে ফাটছে বোমা। কী নিয়ে যে গণ্ডগোল তা বোঝা যাচ্ছে না।

অলির হাত শক্ত করে চেপে ধরে বাবলু বললো, তুই ঘাবড়াসনি, এসব এ-পাড়ার গুণ্ডা আর মাতালদের ব্যাপার, এরকম প্রায়ই হয়। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের দিকটায় গেলেই ফাঁকা হয়ে যাবে।

কিন্তু সে স্ট্রিট ধরে বেশিদূর এগোনো গেল না, স্টার থিয়েটারের পাশের গলি দিয়ে একদল লোক সোডার বোতল ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়ে এলো এদিকেই। কৌশিক চেঁচিয়ে বললো, পেছনে পুলিসের গাড়ি। ওরা আমাদের আগে ধরবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা ছিটকে গেল আশেপাশের গলিতে। অতীন অলির হাত ছাড়েনি, কিন্তু কৌশিক চলে গেলে অন্যদিকে। পুলিস গুলি চালাতে শুরু করেছে।

বছর দেড়েক আগে কফি হাউস থেকে বেরিয়ে অলি ঠিক এই রকম একটা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে একা হয়ে গিয়েছিল, সেদিন সে বাড়ি পৌঁছেছিল অতি কষ্টে, দু চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল কান্না। আজ বাবলুদা তার সঙ্গে রয়েছে, আজ তার একটুও ভয় করছে না। আজ সারারাত ধরে এরকম চললেও ক্ষতি নেই।

একটা গাড়ি বারান্দার তলায় ওরা একটুখানি দম নেবার জন্য দাঁড়াতেই ওপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো কারফিউ। কারফিউ ডিক্লেয়ার করেছে।

॥ ৩০ ॥

আজকালকাল যুদ্ধে কোনো রাষ্ট্রই আক্রমণকারীর ভূমিকা নিতে চায় না। যুদ্ধ থেমে নেই, পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যে যখন তখন বিষ-ফোঁড়ার মতন হানাহানি শুরু হয়, তবু যুযুধান দুই পক্ষই তারস্বরে বলতে শুরু করে, ওরা আগে আক্রমণ করেছে, আমরা উপযুক্ত জবাব দিচ্ছি! এমনকি রণোম্মদ হিটলারকেও পোলান্ড আক্রমণের আগে একটা ছুতো খুঁজতে হয়েছিল।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবার পরেও যথারীতি পাকিস্তানের নাগরিকরা জানলো যে নির্লজ্জ ভারত সরকার আচমকা আক্রমণ করে পাকিস্তান নামে নতুন ঐশলামিক রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করতে চাইছে। আর ভারতের নাগরিকরা জানলো যে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকরা দেশের বহুরকম অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান না করতে পেরে সীমান্তে সংঘর্ষ বাধিয়ে উত্তেজিত করতে চাইছে সে দেশের মানুষদের।

বোন অফ কনটেনশান অবশ্যই কাশ্মীর!

তুষারময় গিরিচূড়ায় ঘেরা হ্রদ ও নদীময় ফুল-ফলে ভরা এই সুরম্য উপত্যকাটির যেন অশান্তিই নিয়তি। মাত্র ৩৫০ মাইল লম্বা আর ২৭৫ মাইল চওড়া এই রাজ্যটির জনসংখ্যা গত আদমসুমারিতে ছিল ৩৬ লক্ষের কাছাকাছি। তার মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের বেশিই মুসলমান, বা কিরা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান। ধর্মীয় কারণে এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিশেষ হয়নি। এখানকার মানুষরা অধিকাংশই নম্র শান্তিপ্রিয় ও অতিথিপরায়ণ। কিন্তু এই রাজ্যটি নিয়ে অন্যদের খুব মাথাব্যথা।

ভারত বিভাগ হবার পর যুক্তিসঙ্গতভাবে এই রাজ্যটি পাকিস্তানেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। হলো না দুটি কারণে। মুসলমান প্রধান এই রাজ্যটির রাজা বংশানুক্রমিকভাবে হিন্দু ভারত ভাগের সময় তিনি দোলাচলে রইলেন। আর একটি কারণ হলো, শেখ আবদুল্লার মনোভাব।

এক শালকর পরিবারের ছেলে এই শেখ আবদুল্লা। অকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়, তাঁর বিধবা জননী ছেলেকে পারিবারিক পেশায় নিযুক্ত না করে লেখাপড়া শেখাতে চাইলেন। শ্রীনগর, জম্মু, লাহোর ও আলিগড়ে পড়াশুনো সমাপ্ত করে একটা এম এস-সি ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসে শেখ আবদুল্লা নিজের শহরে একটা সরকারি স্কুলে মাস্টারি নিয়েছিলেন। কিন্তু অত ছোট গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। অচিরেই তিনি চলে এলেন রাজনীতিতে।

তিরিশের দশকে কাশ্মীরে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আলিগড় থেকে লেখা পড়া শিখে এলেও মোল্লাতন্ত্র ও ধর্মান্ধতাকে অপছন্দ করতেন শেখ আবদুল্লা। তখন কাশ্মীরে একটি জনপ্রিয় দলের নাম মুসলিম কনফারেন্স্‌ শেখ আবদুল্লার উদ্যোগেই সেই দলের রূপান্তর হলো ন্যাশনাল কনফারেন্স হিসেবে; সেই দলে তখন থেকে যে-কোনো ধর্মের মানুষই যোগ দেবার অধিকারী। অবিলম্বেই শেখ আবদুল্লা শুধু কাশ্মীরে নয়, অবিভক্ত ভারতেও একজন প্রধান নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। গান্ধী নেহরু আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে নাম শোনা যেতে লাগলো তাঁর।

পাকিস্তান সম্ভাবনা যখন অনেকখানি দানা বেঁধেছে মহম্মদ আলি জিন্না যখন তাঁর দাবির সমর্থন আদায় করার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন, সেই রকম সময়েই জিন্না একবার এলেন কাশ্মীরে। আপাত উদ্দেশ্য বিশ্রাম কিন্তু এই সুযোগে কাশ্মীরী শের শেখ আবদুল্লাকেও তিনি স্বমতে আনতে চেয়েছিলেন। সেটা ১৯৪৪ সাল।

জিন্না সাহেবের সঙ্গে শেখ আবদুল্লার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তিরিশের দশকে একবার কাশ্মীরী পুলিসের এক দারোগা মেহের আলির বিরুদ্ধে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হানিফা বিবির খোরপোশের মামলার সময় শেখ আবদুল্লা জিন্না সাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন মহিলার পক্ষ নিয়ে আদালতে দাঁড়াতে। জিন্না মামলার বৃত্তান্ত শুনে বলেছিলেন, দাঁড়াতে পারি কিন্তু প্রত্যেক দিন এক হাজার টাকা করে দিতে হবে। শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর সহযোগীরা আকাশ থেকে পড়েছিলেন, তাঁরা এক নিপীড়িতা মহিলার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। এত টাকা পাবেন কোথায়? জিন্না সাহেব বলেছিলেন, তিনি প্রফেশনাল এথিক্সে বিশ্বাস করেন, তাঁর অনেক দান-ধ্যান আছে, তিনি অনেক

জায়গায় চাঁদা দেন, কিন্তু ব্যারিস্টার হিসেবে তিনি এক পয়সাও কম ফি নিতে রাজি নন। শেষ পর্যন্ত শেখ আবুদল্লার দল ঐ টাকাই চাঁদা করে তুলে দিতে রাজি হন।

জিন্না পরের বার কাশ্মীরে আসেন মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে বক্তৃতা দিতে। শেখ আবদুল্লা তখন প্রতিযোগীতা ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের নেতা। জিন্নাকে সেবার রাজ্য সরকার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কাশ্মীর ত্যাগ করার হুকম দেয়। জিন্না চলে যেতে বাধ্য হলেন পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ মুখে নিয়ে। শেখ আবদুল্লার প্রতি এই সময় তাঁর মনোভাব ভালো হওয়ার কথা নয়। শেখ আবদুল্লা নিজেই চিঠি লিখে জিন্নার সঙ্গে একটা সমঝোতার প্রস্তাব দিলেন না, জিন্না তাঁকে আহ্বান জানালেন দিল্লিতে আসার জন্য।

কিন্তু সমঝোতা হলো না। জিন্না সাহেব ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের নেতা আর শেখ আবদুল্লা যে রাজ্যের নেতা সেখানে মুসলমানরা প্রবলভাবে সংখ্যাগুরু। দু'জনের মনোভাব আলাদা হতে বাধ্য। সংখ্যালঘুদের নেতা সংখ্যাগুরুদের প্রতি সন্দেহ, বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষ পোষণ করতে পারেন, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু সংখ্যাগুরুদের যিনি নেতা তিনি সংখ্যালঘুদের প্রতি খানিকটা উদার, পৃষ্ঠপোষক,বড় ভাই সুলভ আচরণ করতেই পারেন। তরুণ শেখ আবদুল্লা দ্বিজাতিতত্ত্ব মানেন না, তিনি জিন্নাকে বলতে চাইলেন যে মূল সমস্যাটা ধর্মীয় ততখানি নয়, যতখানি শোষক ও শোষিতের। শোষণ ব্যবস্থা দূর করতে পারলে হিন্দু মুসলমান দু'দলই উপকৃত হবে। জিন্না সাহেব যে পাকিস্তানের পরিকল্পনা করছেন, তাতে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যে দূরত্ব থাকবে এক হাজার মাইল, ধর্ম ছাড়া এই দু'দিকের মানুষের মধ্যে কি অনেক-রকম বৈষম্য থাকবে না?

এ সব কথা জিন্নার পছন্দ হয়নি। শেখ আবদুল্লার বক্তব্য শোনার পর তিনি বলেছিলেন, শোনো শেখ, আমি তোমার বাবার মতন। রাজনীতি করতে করতে আমি ঝুনো হয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা এই যে কোনো হিন্দুকেই বিশ্বাস করা যায় না। তারা কখনো তোমার বন্ধু হবে না। সারা জীবন ধরে আমি তাদের আপন করতে চেয়েছি কিন্তু কিছুতেই ওদের আস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়। তোমারও জীবনে একটা সময় আসবে যখন তুমি অনুতাপ করবে, আমার কথার মর্ম বুঝবে। কী করে ওদের তুমি বিশ্বাস করবে, যারা তোমার হাত থেকে এমন কি পানি পর্যন্ত খাবে না? সেটাকে পাপ মনে করে? ওদের সমাজে তোমার কোনো স্থান নেই। ওদের চোখে তুমি একটা ইনফিডেল।

প্রবীণ জিন্না অনেক অভিজ্ঞতায় যা ঠেকে শিখেছিলেন, তরুণ শেখ আবদুল্লা আদর্শবাদের উদ্দীপনায় তা মানতে চাননি। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করছি না, হিন্দুদের একটা সাংঘাতিক রোগ আছে যার নাম অস্পৃশ্যতা। কিন্তু ওদের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণী এর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং এর পরিবর্তন করতে চাইছে। মহাত্মা গান্ধী হরিজনদের স্বীকৃতি এবং আরও অন্যান্য সামজ সংস্কারের চেষ্টা করছেন। বীর সৈনিকের মতন তিনি লড়ছেন অস্পৃতা নামের রোগটার বিরুদ্ধে। সুতরাং আমি মনে করি, সমস্ত সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয়েরই উচতি জাতিধর্ম, বিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করা। রোগ যতই ভয়ংকর হোক, একজন ডাক্তার সেই রোগীর গলা চেপে ধরে না কিংবা সেই রোগীকে না দেখে ফেলে চলে যায় না, বরং তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য সব রকম চেষ্টা করে। জিন্না সাহেব, আপনি এত বড় একজন আইনজ্ঞ, আপনি এটা বোঝেন না?

এ সব কথা শুনে জিন্না সাহেবের খুশি হবার কথা নয়। ১৯৪৪ সালে যখন তিনি কাশ্মীরে শেষ বারের মতন এলেন তখন তিনি স্পষ্টতই শেখ আবদুল্লার প্রতিপক্ষ। তিনি এসেছেন মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন আদায় করতে, কিন্তু মিটিং করতে গিয়ে দেখলেন, কাশ্মীরের যুব-জনতা শেখ আবদুল্লার পক্ষে। শেখ আবদুল্লা দুই জাতি তত্ত্বের প্রবল বিরোধী, আর জিন্না ঐ তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি যখন জয়যাত্রায় বেরিয়েছেন, কিন্তু কাশ্মীর হয়ে রইলো পথের কাঁটা। কাশ্মীরকে তিনি ভুলতে পারলেন না।

ব্রিটিশ ভারত দু' ভাগ হলো, দুটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হলো। দেশীয় করদ রাজ্যগুলি যে-কোনো একটিতে যোগ দেবে এই রকমই ছিল বোঝাপড়া, কিন্তু পৃথক সত্তা বজায় রাখলো কাশ্মীর। জিন্নার জীবদ্দশতাতেই কাশ্মীরে হয়ে গেল একটা যুদ্ধ, বাইরের লোকের চোখে সেটাই প্রথম ভারত-পাক সংঘর্ষ। অবশ্য, ভারতের বক্তব্য অনুযায়ী সেটা পাকিস্তানী হানাদারদের আক্রমণ; আর পাকিস্তানের মতে, সেটা কাশ্মীরীদের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান, যা দমন করতে এগিয়ে এসেছিল বে-আইনী ভারতীয় ফৌজ।

ভারত যাদের আখ্যা দিল হানাদার, পাকিস্তান ঘোষণা করলো তারাই মুজাহিদ। দেশ বিভাগের

মাত্র দু' মাস সাত দিন পরেই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে গেল ভারত-পাকিস্তান বৈরিতা। পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাসুদ, ওয়াজির ও আফ্রিদি সম্প্রদায়ের সশস্ত্র লোকেরা ঢুকে পড়লো কাশ্মীরে। এরা স্বভাবতই যোদ্ধা জাতি, তা ছাড়া কাশ্মীরে তখন কোনোরূপ যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল না। পাখতুনিস্তানের সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফফার খানও পাকিস্তানের একটি শিরঃপীড়া। এই পাখতুন নেতা এখনও পাকিস্তান সৃষ্টি মেনে নিতে পারেননি। কাশ্মীর পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হয়ে গেলে পাখতুনিস্তানের পৃথক হওয়ার দাবি এমনিই মিইয়ে যাবে, এ রকমই হয়তো ভেবেছিলেন জিন্না।

কিন্তু মাসুদ-ওয়াজির-আফ্রিদি উপজাতীয়দের অভিযানে তেমনভাবে সাড়া দিল না কাশ্মীরীরা। কাশ্মীরে পাকিস্তানের স্বপক্ষে কোনো-গণ-অভ্যুত্থান হলো না। বরং কাশ্মীরের হিন্দু রাজা সাহায্য প্রার্থনা করলেন ভারতের কাছে। জননেতা শেখ আবদুল্লাও ছুটে এলেন দিল্লিতে।

টেকনিকালি একটি স্বাধীন রাজ্যে ভারত নিজস্ব ফৌজ পাঠাতে পারে না। যেমন, পাকিস্তানী ফৌজ তো কাশ্মীর আক্রমণ করেনি, ঢুকে পড়েছে উপজাতীয়রা। যদিও ভারত ও পাকিস্তানের দু'দেশের নেতারাই কাশ্মীর সম্পর্কে লোলুপ। কাশ্মীরের রাজা এবং বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা শেখ আবদুল্লার অনুরোধে ভারত সরকারের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটন কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে সম্মতি দিলেন আগে, তারপর ফৌজ পাঠালেন।

জিন্না সাহেব তাঁর অকাল মৃত্যুর আগে কাশ্মীর নামে রঙিন পালকটি তাঁর শিরোভূষণে দেখে যেতে পারলেন না। যদিও কাশ্মীর সমস্যা রয়েই গেল। ভারতের দক্ষিণপন্থী নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের কাশ্মীরকে নিষ্কণ্টক করার আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও মুজাহিদ বা হানাদার বাহিনীকে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল যুদ্ধ। কাশ্মীর প্রশ্নটি চলে গেল রাষ্ট্রসংঘে। তারপর যুদ্ধ বিরতি সীমারেখায় পাকিস্তানের আধিপত্যমূলক এক অংশের নাম রইলো শুধু কাশ্মীর যেন সেটাই আসল কাশ্মীর, ক্রমে সেটি ভারতীয় একটি অঙ্গ রাজ্য হয়ে গেল। দু'দুটো সাধারণ নির্বাচন হলো সেখানে, তা ছাড়া কাশ্মীরী নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এসে আসন নিলেন ভারতীয় লোক সভায়। নীতির দিক দিয়ে এই কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিশ্চিত যুক্তিসিদ্ধ নয়। কিন্তু আইনের দিক দিয়ে কোনো খুঁত রইলো না।

সুতরাং পঁয়ষট্টি সালে যখন আবার যুদ্ধ বাঁধলো, তখন ভারতের পক্ষ থেকে বলা হলো, এটা তার একটা অঙ্গ রাজ্য আক্রমণেরই সমান। মাত্র কয়েক মাস আগেই কচ্ছের রান ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ হয়ে গেছে। গুজরাট সংলগ্ন ঐ অনুর্বর, বালিয়াড়ি ও গাধা খচ্চর অধ্যুষিত অঞ্চলটি নিয়ে দু'দেশের অস্ত্রক্ষয় চললো কয়েকদিন। তারপর সুমতি ফিরে এলো দু'দেশের। শান্তি চুক্তির সইয়ের সময় কলমের কালি শুকোতে না শুকোতেই আবার কাশ্মীরে যুদ্ধ।

ভারত কাশ্মীরে বৃহত্তর অংশটি নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেও ঠিক হজম করতে পারেনি। মুসলমান কাশ্মীরকে তোয়াজ করার জন্য ভারত সরকার খাদ্য ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কতগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসছিল। তার প্রতিক্রিয়া হলো দু'রকম। যাদের বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তারা সন্দেহ করে, তারা প্রশ্ন করে, তারা জানতে চায়, ব্যাপারটা কি? আমরাও যদি সমান ভারতীয় হই, তা হলে অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে আমরা সুযোগ সুবিধে বেশি পাবো কেন? কাশ্মীরে চালের দাম কেন এত কম, কেন কাশ্মীরের বেতার কেন্দ্রের নাম কাশ্মীর রেডিও, কেন পশ্চিমবাংলা বা মহারাষ্ট্রের মতন অল ইন্ডিয়া রেডিও নয়? আবার ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কিছু কিছু লোক চিন্তা করতে লাগলো, কাশ্মীর যদি ভারতের অন্তর্গত একটি রাজ্যই হয় তা হলে সেখানকার লোকেরা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবে কেন। কেন ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে-কেউ গিয়ে কাশ্মীরে বসতি স্থপন করতে পারবে না? কেন অন্য ভারতীয়দের কাশ্মীরে যেতে গেলে পারমিট লাগবে? এসব তো গণতন্ত্র বিরোধী ব্যাপার। এই প্রশ্ন নিয়েই হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরে গেলেন এবং অকস্মাৎ বন্দী অবস্থায় রহস্যময় ভাবে মৃত্যুবরণ করলেন।

ভারত সরকারে এই তোষণ নীতি কাশ্মীরী রাজনীতিতেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। এখন পাকিস্তারে দিক একটু ঝুঁকে কথা বললেই ভারত সরকারের কাছে থেকে বেশি খাতির পাওয়া-যায়। এ তো বেশ মজার ব্যাপার। ভারত-বিরোধী একটা বিক্ষোভ মিছিল বার করো, দিল্লি থেকে আরও চাল ঘরি আসবে। তাছাড়া ভারত পাকিস্তান বিবাদে ধর্মপ্রাণ কাশ্মীরীরা পাকিস্তানকেই সমর্থন জানাবে, ইসলামের বন্ধন তো অস্বীকার করা যায় না, ভারতের সঙ্গে তাদের কিসের আত্মীয়তা?

এতগুলি বছরে শেখ আবদুল্লাও মানোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। কাশ্মীরীদের একচ্ছত্র নেতা হয়ে থাকতে গেলে তাঁর পক্ষে পাকিস্তানকে অস্বীকার করা অসম্ভব। পুরোপুরি ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি দাবি তুললেন স্বায়ত্তশাসনের । দেশ বিভাগের ঠিক পর পরই নেহরু একবার কাশ্মীরে প্লেবিসাইটের কথা বলে ফেলেছিলেন, শেখ আবার খুঁচিয়ে তুললেন সেই প্রস্তাব। কাশ্মীরের জনসাধারণেরও খুব পছন্দ হলো এটা। টাঙ্গাওয়ালা শিকারাওয়ালা থেকে শুরু করে ছাত্র ও ব্যবসায়ীরা সবাই ধ্বনি তুললো, হমারা মুতলবা রায় সুমার! রায় সুমার ফওরন করো। আমাদের দাবি গণভোট গণভোট, পালন করো।

এই রকম একটা অবস্থায় কাশ্মীরে একটা যুদ্ধ লাগানোতে পাকিস্তান ও ভারত, এই দুই দেশেরই স্বার্থ আছে। কাশ্মীরে ভারত-বিরোধী হাওয়া বইছে, এই সুযোগে পাকিস্তান যদি মুজাহিদ ও সৈন্য পাঠায় তা হলে কাশ্মীরীরা তাদের সাদরে বরণ করে নেবে। কাশ্মীরে একটা গণ-অভ্যুত্থান হবে, ভারত বাধা দিতে এলে বিশ্ববাসীকে বোঝানো যাবে যে ভারত জোর করে কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করে রেখেছে।

আর ভারতের পক্ষেও কাশ্মীরের গণভোটের দাবি বা স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব বর্তমানে মেনে নেওয়া অসম্ভব। কাশ্মীর এখন ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য, সেখানে যদি স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তা হলে ভারতের অন্যান্য মুসলমান প্রধান অঞ্চলেও যে-কোনো দিন এরকম দাবি উঠবে। শুধু ধর্মীয় কারণে কেন, ভাষাগত উপজাতিগত কারণেও এরকম দাবি উঠবে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সুতরাং কাশ্মীর সীমান্তে এখন বড় রকম একটা যুদ্ধ ব্যাধিয়ে দিলে গণভোটের প্রশ্ন ধামা চাপা পড়ে যেতে বাধ্য।

যে পক্ষই আগে শুরু করুক, যুদ্ধ একটা লাগলো কাশ্মীরে। সেখানে গণঅভ্যুত্থান হলো না লড়াই করতে লাগলো ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্যরা।

যুদ্ধে যত গোলাগুলি ওড়ে, সেই তুলনায় মিথ্যে কথাও কম ছোঁড়াছুঁড়ি হয় না। যুদ্ধের প্রথম দিকে দু'পক্ষই সমানভাবে জেতে। খবরের কাগজগুলির পোয়াবারো। সরকারি মিথ্যে তথ্য তো আছেই, তার ওপর নিজস্ব সংবাদদাতারা অনেকগুণ রঙ চড়ায়। পাকিস্তানের মানুষ বেতার ও সংবাদ পত্র মারফত জানলো যে পাকিস্তানী বীর সৈনিদের হাতে ভারতীয় সৈনিকরা পোকা মাকড়ের মতন মরছে। একজন পাকিস্তানী সৈনিক দশজন ভারতীয়ের সমান,, মরলে শহীদ মরলে গাজী হওয়ার উদগ্র বাসনা নিয়ে তারা যুদ্ধে নেমেছে। আর ভারতে বেতার সংবাদপত্রে প্রচারিত হচ্ছে যে ভারতীয় সেনাদের সামনে পাকিস্তানীরা দাঁড়াতেই পারছে না, ছাম্ব সেকটরে তারা পিছু হটছে, হাজির পীর গিরিবর্ত্ম অনায়াসে ভারতের দখলে ইত্যাদি। এ পক্ষের বিমান ওপক্ষের বিমানবাহিনী ধ্বংস করে নিশ্চিন্তে ফিরে আসছে। ওদের ট্যাংকগুলি টিনের তৈরি, আমাদের গোলা লাগলেই ঘায়েল হয়, আমাদের ট্যাংকগুলি অভেদ্য বোমাও হজম করে নেয়।

অঘোষিত যুদ্ধ, তবু তাতেও মানুষ মরে, জলের মতন অর্থের অপব্যয় হয়। পৃথিবীর ধনী ও শক্তিমানী দেশগুলি হাসে। তাদেরই কাছ থেকে কেন অশস্ত্র নিয়ে দুটি চরম গরিব দেশ, যারা মাত্র সতেরো বছর আগে ছিল একই জাতি, এখন শিশুর মতন মারামারি করছে।

সংঘর্ষ চলছিল কাশ্মীরে, আচম্বিতে ভারতের সেনাপতি জয়ন্তনাথ চৌধুরী লাহোর সেকটারে আক্রমণ করে বসলেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি চেঁচিয়ে উঠলো লাহোর নগরীর পতন আসন্ন। কাশ্মীর সীমান্তে শক্তি সংহত করায় পাকিস্তান লাহোর সেকটারে ধরা পড়ে গেল খানিকটা অপ্রস্তুত অবস্থায়। তা হলে কি ভারত পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ হবে? এবারে কি পূর্ব পাকিস্তানও আক্রান্ত হবে?

ভারতীয় উপমহাদেশের এক প্রান্তে কাশ্মীর, আর এক প্রান্তে বাংলা। এই বাংলা আগেই দু'খণ্ড হয়েছিল, এবারে কাশ্মীরকে উপলক্ষ করে বাঙালী জাতিও সত্যিকারের দ্বিখণ্ডিত হলো। দু' দিকের নাগরিকদের তবু যা কিছু যাতায়াত ছিল তা বন্ধ হয়ে গেল একেবারে। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ি জমি শত্রু-সম্পত্তি বলে ঘোষিত হলো, গ্রেফতার হতে লাগলো সেখানকার গণ্যমান্য হিন্দুরা। নিষিদ্ধ হলো রবীন্দ্র সঙ্গীত। এক শ্রেণীর কবি সাহিত্যক দেশাত্মবোধের নামে উগ্র গল্প কবিতা লিখতে লাগলেন।

পশ্চিমবাংলাতেও অবস্থা প্রায় একই রকম। যুদ্ধের সময় নানারকম প্রচার যন্ত্রে মারাত্মক এক ধরনের কৃত্রিম দেশাত্মবোধ চাগিয়ে তোলা হয়। সাধারণ মানুষের মনোভাব হলো এই যে, এবারে পাকিস্তান নামের দেশটাকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। যে-কোনো পাকিস্তানী মানেই যেন

ব্যক্তিগত দুশমন। মুসলমান মাত্রই যেন পাকিস্তানের স্পাই। হুমায়ুন কবীর শা নওয়াজ খান প্রমুখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সম্পর্কেও সন্দেহ তোলা হলো, পাকিস্তানের সঙ্গে ওঁদের গোপন যোগযোগ আছে কিনা। লোকসভার সদস্য সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং আরও ৩৫০ জনকে আটক করা হলো ভারত রক্ষা আইনে। সৈয়দ মুজতবা আলি, আবু সয়দি আইয়ুবের মতন শ্রদ্ধেয় লোকদের সম্পর্কেও শোনা যেতে লাগলো ফিসফাস। সৈয়দ মুজতবা আলি শান্তিনিকেতন থেকে মর্মান্তিক ক্ষোভের সঙ্গে এক তরুণ লেখককে চিঠিতে জানালেন তুমি শোনোনি, চারদিকে গুজব মম করছে যে আমি পাকিস্তানের স্পাই।

যুদ্ধ মানেই ঘৃণা অবিশ্বাস। যারা যুদ্ধ বিরোধী, তারাও এই সময়ে কণ্ঠ তুলতে সাহস পায় না।

পূর্ব পাকিস্তানে এই যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে গেল। গভর্নর মোনেম খান লাট ভবনে সমস্ত বিরোধী নেতাদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আপনারা যুদ্ধের সরকারি ব্যবস্থা সমর্থন করে যুক্ত বিবৃতি দিন।

মৌলভীরা ঘোষণা করলো জেহাদ। কেউ কেউ কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে মসজিদে যেতে লাগলো নামাজ পড়তে জেহাদের সময় তা সুন্নত। মেয়েরা শুরু করলো কুচকাওয়াজ। তরুণরা শপথ নিল দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও পাকিস্তানকে রক্ষা করবে। ছাত্র সমাজে আলোচনা চলতে লাগলো যে আইয়ুব খাঁ কে যাবজ্জীবন প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব তোলা যায় কিনা! পূর্ব পাকিস্তানেও আইয়ুব হয়ে উঠলেন দারুন জনপ্রিয়।

কিন্তু যুদ্ধের আওয়াজ শুধু শোনা যেতে লাগলো রেডিওতে। আর কোথায় যুদ্ধ? সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পশ্চিমীরা যেন পূর্ব পাকিস্তানের কথা ভুলেই গেছে। ভারতীয় বাহিনী লাহোর আক্রমণের পর হঠাৎ পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট লোকদের খেয়াল হলো যে, এই দিকটা তো সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ভারত যদি চায় তো একদিনেই পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য যত খরচ কামান বিমান আর সৈন্যবাহিনী পোষা, সবই শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য? পূর্ব পাকিস্তানীরা অর্থ জুগিয়ে যাবে, ফল ভোগ করবে পাশ্চিমীরা। ভারত তাদের শত্রু কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরাও তাদের আপনজন মনে করে না। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের রক্ষা করবে কে?

॥ ৩১ ॥

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মামুন আকাশের দিকে তাকালেন কয়েকবার। রাস্তার বাতিগুলি জ্বালানো হয়নি কোনো বাড়ির একচিলতে আলোও এসে পড়েনি পথে, চতুর্দিকে আবছায়া অন্ধকার। কিন্তু আকাশে একটা বড়সড় চাঁদ উঠেছে, শত শত ঝরনা ধারার মতন নেমে আসছে জ্যোৎস্না। আকাশে কেউ ব্ল্যাক আউট করতে পারেনি।

সারাদিন ধরেই বারবার গুজব ছড়াচ্ছে, আজ বোমা বর্ষণ হবে। লাহোর ফ্রন্টে তুমুল আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর সব কটা প্লেনই চলে গেছে ওদিকে ঢাকা শহর রক্ষার জন্য একটাও রেখে যায়নি, এই সুযোগে আজ কলাইকুণ্ডা থেকে উড়ে এসে ভারতীয় বোমারু বিমান ঢাকা আক্রমণ করবে। সন্ধে থেকে বেশ কয়েকবার প্যানিক সৃষ্টি হয়েছে, লোকের বাড়ির জানলা দরজা জোরে বন্ধ করলেও বোমার শব্দ বলে ভুল হয়। ভারতীয় বিমানগুলি নাকি খুব ছোট ছোট ওগুলোর নাম ন্যাট বাদুড়ের মতন নিঃশব্দে উড়ে আসতে পারে।

এ গুজবের কোনো ভিত্তি নেই, তবু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পূর্ব পাকিস্তানেও ফ্রন্ট খুলে ভারত এই যুদ্ধটা সর্বত্র ছড়িয়ে দেবে, মামুনের তা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কাশ্মীর ছেড়ে লাহোরে তো ভারত আক্রমণ করেছে ঠিকই। এবারে এদিকেও অতর্কিতে এসে পড়তে পারে। ভারতের কি মতলোব তা হলে পাকিস্তানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া?

অফিসের কাজের চাপ সাঙ্ঘাতিক, তবু মামুন হঠাৎ এক সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন একা। শুধু তাঁর সেক্রেটারি শওকতকে বলে এসেছেন যে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরবেন, কোথায় যাচ্ছেন তা বলেননি। এখন পৌনে আটটা বাজে। প্রত্যেকদিন রাত সাড়ে বারোটা-একটা পর্যন্ত যুদ্ধের শেষতম খবর দিয়ে পাতা ছাড়তে হয়, পর পর কয়েক রাত মামুন বাড়ি ফেরেননি, অফিসে নিজের ঘরেই একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন কয়েক ঘণ্টা। আজ কাজ করতে করতে এক সময় তাঁর

অসহ্য লাগছিল, তাঁর মনে হলো মাথায় একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগানো দরকার। তা ছাড়া মামুন নিজের মনকে বোঝালেন, শুধু রিপোর্টারদের মুখ থেকেই তিনি খবর পাচ্ছেন, কিন্তু সম্পাদক হিসেবে তাঁর নিজের চোখেও এবার শহরের অবস্থাটা দেখে আসা উচিত। গাড়ি নেননি তিনি পায়ে হেঁটে বেরিয়েছেন। যদি সত্যিই প্লেন থেকে বোমা পড়ে তা হলে বাড়িতে বসে থেকেও কি নিস্তার পাওয়া যাবে?

অফিসে তাঁর মালিকের সঙ্গে রোজ রোজ তর্ক বাঁধছে, এক কাজ মামুন আর কতদিন করতে পারবেন তাতে সন্দেহ আছে। তবে, খবরের কাগজের কাজের একটা নেশা আছে, বিশেষত যুদ্ধ-বিগ্রহের মতন বড় ধরনের খবরের সময় কাজ ছাড়ার প্রশ্ন ওঠে না।

কাশ্মীরে সংঘর্ষ শুরু হবার পরদিনই হোসেন সাহেব মামুনকে তাঁর চেম্বারে ডাকিয়ে টেবিল চাপড়িয়ে বলেছিলেন, দ্যাখলেন, দ্যাখলেন আমি তখনই কইছিলাম না? আপনেরা ম্যাডাম ফতিমা জিন্নারে সাপোর্ট করলেন। আমাগো চৌদ্দ পুরুষের ভাইগ্য যে ফতিমা জিন্না জেতে নাই। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইজ যদি মাইয়া মানুষ হইত তাইলে আর রক্ষা আছিল? মাইয়া মানুষে এই যুদ্ধ চালাইতে পারতো? জবরদস্ত জেনারাল আইয়ুব খান আছে বইলাই তো ইণ্ডিয়া এখনো পাকিস্তানরে ডরায়। আপনেরা তখন ফতিমা জিন্নার নামে নাচতে আছিলেন।

মামুন নম্রভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ফতেমা জিন্না জয়ী হলে হয়তো এ যুদ্ধই হতো না। ফতেমা জিন্না প্রেসিডেন্ট হলে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, গণতান্ত্রিক সরকার এলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যেত। কিন্তু কে শোনে কার কথা। হোসেন সাহেব টেবিল চাপড়েই নিজের মতটা প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাঁর কাছে যুদ্ধ মানে যেন দুই দেশের শীর্ষ পদাধিকারীর দৈহিক লড়াই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছোট্ট খাট্টো মানুষ, আর আইয়ুব খান লম্বা চওড়া পুরুষ, সুতরাং এই যুদ্ধে পাকিস্তান জিতবেই। হোসেন সাহেব হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন, কী ভাবে আইয়ুব খান ঐ চড় ই পাখির মতন লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে বাঁ হাতের মুঠোয় পিষে মেরে ফেলবেন।

সংবাদ পরিবেশনা ও সম্পাদকীয় নিয়েও হোসেন সাহেবের সঙ্গে মামুনের মতভেদ হচ্ছে পদে পদে। হোসেন সাহেব ইণ্ডিয়ার বদলে হিন্দুস্থান নামটির ওপর জোর দিতে চান। লোকে মুখে মুখে পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের লড়াই বলে বটে, কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী পাশের রাষ্ট্রটির নাম ইণ্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত। কাগজেকলমে হিন্দুস্থান নামে কোনো দেশের অস্তিত্ব নেই, সুতরাং সাংবাদিকতার এথিক্স অনুযায়ী ইণ্ডিয়া বা ভারতই লেখা উচিত। হোসেন সাহেব সে যুক্তি বুঝবেন না। তাঁর মতে, ইণ্ডিয়া মানেই হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ।

গতকালের সম্পাদকীয় নিয়েও মতবিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল। হোটেলওয়ালা হোসেন সাহেব এখন সম্পাদকীয় পলিসিও ডিকটেট করতে চান। কয়েকদিন আগে আদমজী জুট মিলে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে, পুলিশ সেখানকার শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। এই খবরে অনেকেই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। বড় বড় সাম্প্রদায়কি দাঙ্গাগুলি ঐ জুট মিল এলাকা থেকেই শুরু হয়। মোনেম খাঁ এবং তার চ্যালারা এখন একটা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা লাগিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে পারে যাতে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানী যুদ্ধের দুর্বলতা এদিকে চাপা পড়ে যায়। মামুন সেই বিষয়েই লিখেছিলেন সম্পাদকীয়। ছাপতে দেবার আগেই সেই সম্পাদকীয় পড়ে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে হোসেন সাহেব বলেছিলেন, এদিকে এত বড় একটা যুদ্ধ চলতাছে, আর আপনে ল্যাখলেন এই রকম একটা তুচ্ছ বিষয়ে? আপনার কি মাথা খারাপ হইছে, এডিটর সাহেব?

মামুন বলেছিলেন, এটা মোটেই তুচ্ছ বিষয় নয়। এখন কোনোরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়াতে দেওয়া উচিত নয় আমাদের নিজেদের স্বার্থে। আসল লড়াইয়ের জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে না?

টেবিল থেকে সেদিনের "ইত্তেফাক" কাগজটা তুলে নিয়ে মামুন আরও বলেছিলেন, এই দেখুন, আজকের "ইত্তেফাক"-এও সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, "রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিরোধ যতই, মর্মান্তিক হোক, তা যেন বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি না ঘটায়।

হোসেন সাহেব তাঁর কাগজের সঙ্গে অন্য কোনো কাগজের তুলনা পছন্দ করেন না। তাঁর মতে "দিন কাল"ই বাংলার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র। তিনি তাঁর দাড়ি চেপে ধরে রাগের সঙ্গে বললেন, ঐ মানিক

মিঞার চোথা কাগজে কী ল্যাখছে তা আমার জানার দরকার নাই। মনে রাখবেন, "দিন-কাল" আওয়ামী লীগের মাউথ পীস না। আমাগো মতামত স্বাধীন। এই যুদ্ধে হিন্দুস্থানরে আমরা ক্র্যাশ কইরা দিমু। আপনে সেই রকম গরম গরম ল্যাখেন।

মামুন এবারে আলতাফের দিকে ফিরে কঠোরভাবে বলেছিলেন, তোমার চাচাকে জিজ্ঞেস করো, আমি এখনও এই কাগজের সম্পাদক আছি কিনা। যতক্ষণ আমি তা থাকবো ততক্ষণ আমার লেখার ওপরে কেউ কলম চালাতে পারবে না। আরও একটা কথা ওঁকে বলে দাও, খবরে কাগজে মিথ্যা মিথ্যা গরম গরম কথা লিখে একটা দেশকে ক্র্যাশ করে দেবার ক্ষমতাও আমার নাই, সেই রকম কোনো ইচ্ছাও নাই।

আলতাফ তার চাচাকে খুব ভালোই চিনে গেছে। মামুন ভাই যতক্ষণ শান্ত থাকেন ততক্ষনই হোসেন চাচা পেয়ে বসেন আর নানারকম হুংকার দেন। মামুন একবার পদত্যাগের কথা তুলতেই উনি চুপসে যান। এই অফিসের অধিকাংশ ছেলেছোকরাই মামুনের ভক্ত, মামুন কাজ ছেড়ে দিলে তারাও সদলবলে চলে যাবে, কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে।

আলতাফ সহাস্যে বললো, আরে না, না, মামুন ভাই, আমার চাচা বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি ঠিকই বোঝেন যে ওরকম কিছু সম্ভব না। উনি শুধু মাঝে মাঝে আপনারে একটু চ্যাতাইয়া দিতে চান, যাতে আপনে ইন্ডিয়া সম্বন্ধে আর একটু গরম গরম অ্যাটাকিং লেখেন।

রাস্তায় বেরিয়েও মামুনের মাথায় এই সব কথাই ঘুরছে। তিনি কিছুক্ষণ অফিসের বিষয় ভুলে থাকতে চান। তিনি সিগারেট ধরিয়ে এক খিলি পান খাওয়ার কথা ভাবলেন।

অন্ধকার হলেও রাস্তা একেবারে নির্জন নয়। মোড়ে মোড়ে মানুষের জটলা। অনেকেই তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। এমন ধপধপে চাঁদের আলোয় বোমারু বিমান এসে পড়লেও ওপর থেকে ঢাকা শহরটি স্পষ্ট চিনতে পারবে।

বড় দোকানপাট সব বন্ধ থাকলেও দু-একটা পান বিড়ির দোকান গোপনে বিক্রি বাটা চালাচ্ছে। একটা ছোটখাটো জটলার মধ্যে গান ধরেছে একজন ভিখিরি জাতীয় মানুষ। এরা সিনেমা হলের সামনে ভিক্ষে করে। ব্ল্যাক আউটের জন্য রোজগার বন্ধ। মামুন গানটা শুনলো মন দিয়ে।

আল্লাহ যদি করে ভাই লাহোরে যাইব
হুথায় শিখের সাথে জেহাদ করিব।
জিতিলে হইব গাজী মরিলে শহীদ
জানের বদলে জেন্দা রহিবে তৌহিদ।

গানটা শুনে মামুনের ঠোঁটে হাসি এলো। এটা অনেককাল আগেকার একটা ছড়া, খুব শৈশবে মামুন তাঁর পিতামহের মুখে শুনেছিলেন। সেই ছড়াতেই সুর দিয়ে এই লোকটি এখন বেশ বুদ্ধি করে কাজে লাগিয়েছে তো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মামুন লোকজনের কথাবার্তাও শুনলেন কিছু কিছু। অধিকাংশই গুজব চর্চা। দুটো গুজব নতুন শুনলেন মামুন। রেডিওতে নাকি বলেছে যে একজন মান্যগণ্য মৌলবী স্বপ্ন দেখেছেন, স্বয়ং রসুলুল্লাহ যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার সওয়ার হয়েছেন। মৌলবী জিজ্ঞেস করলো, হুজুর সওয়ারে কায়েজাত, কোথায় তশরীফ নিতে যাচ্ছেন। হুজুর উত্তর দিলেন, পাকিস্তানে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে, ওদের রক্ষার জন্যই যেতে হচ্ছে আমাকে।

আর একটি, যুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য আশমান থেকে নেমে আসছেন অসংখ্য ফেরেশতা। তাঁদের লম্বা দাড়ি ও সবুজ পোশাক। ইন্ডিয়ার সৈন্যরাই এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। হিন্দুস্থানী সোলজাররা ধরা পড়বার পর ক্যাম্পে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে, আমাদের যে সবুজ পোশাকধারী সৈনিকরা গ্রেফতার করলো তারা কোথায়?

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, ভাই-বেরাদরেরা শুনেছো, লাহোরে, আসল লড়াইডা লড়ত্যাছে কারা? আমাগো ইস্ট পাকিস্তানী ব্যাটেলিয়ান! আমাগো বাঙ্গালী সোলজারদের সামনেই ইন্ডিয়ানরা দাঁড়াইতে পারতেছে না, পিছু হাঁটতেছে।

আর একজন বললো, তা তো বোঝলাম, কিন্তু বাংগালী ব্যাটেলিয়ান রইলো লাহোরে, আর ইদিকে ইন্ডিয়ান আর্মি যদি যশোর দিয়া ঢুইক্যা পড়ে, তাইলে তাগো সাথে লড়াই দিবে কেডা? ইদিকে যে বেবাক ফাঁকা।

মামুন আবার হাঁটতে শুরু করলেন। একটা পান খেয়ে চাঙ্গা বোধ রছেন। অনেকদিন তিনি এরকম একলা একলা ঘুরে বেড়াননি সন্ধের পর। তিনি আজ নিজের চোখে দেখলেন, নিজের কানে শুনলেন, ঢাকা শহরের মানুষ এই যুদ্ধে অসহায় বোধ করছে, পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিরক্ষার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এখন রসুলুল্লার ও ফেরেস্তাদের ওপর তাদের ভরসা। কাশ্মীর নিয়ে কারুর বিশেষ মাথাব্যথা দেখা গেল না।

মামুন কোনো গন্তব্য ঠিক করে পথে বেরোনি। তবু তিনি একটি বাড়ির সামনে এসে থামলেন। পকেট থেকে সরু টর্চ জ্বেলে দেখলেন, সদর দরজা বন্ধ। একটু ইতস্তত করে তিনি টর্চের উল্টো দিক দিয়ে দরজায় ঠকঠক করে ঠুকলেন কয়েকবার।

একটু পরে হাতে একটি কুপি নিয়ে অল্পবয়সী একটি মেয়ে দরজার এক পাল্লা খুলে মামুনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, বাবুল বাসায় আছে না?

মেয়েটি বললো, জী না, বাসায় নাই।

মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, মামুন এক হাত দিয়ে ঠেলে তাকে রুখলেন। ভেতরে এসে ভর্ৎসনার সুরে বললেন তুই কে রে, ছেমরী, আমারে চেনোস না?

শালোয়ার কামিজ পরা কিশোরী মেয়েটি বললো, জী না। আপা গ্যাট বন্ধ রাখতে কইছেন।

–তোর আপা কোথায়? তারে গিয়া ক যে মামুন মামা আইছে।

–আপা গোসলখানায়।

–ঠিক আছে, আমি উপরে গিয়া বসতাছি।

সিঁড়ি দিয়ে মামুন চলে এলেন দোতলায়। এই সময় বাবুল কোথায় গেল? আলতাফের ছোট ভাই হলেও বাবুল চৌধুরী 'দিন-কাল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। মামুনের অনুরোধেও সে কিছু লিখতে চায় না। আগে সে নিউজ রুমে আড্ডা দিতে যেত সন্ধের দিকে এখন তাও যায় না, তা হলে কোথায় যায় সে?

ওদের বাচ্চাটি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে, নইলে তার সাড়া পাওয়া যেত। মঞ্জু ছেলেকে মামুন এত ভালোবাসেন যে কয়েকদিন না দেখলে তাঁর মন ছটফট করে। যুদ্ধের ডামাডোলে বেশ কিছুদিন তিনি এ বাড়িতে আসতে পারেন নি। বসবার ঘর পেরিয়ে মামুন শয়নকক্ষে এসে উঁকি দিলেন। সুখু মিঞা সত্যিই ঘুমিয়ে আছে। মামুন কাছে এসে আলতো করে তার কপালে একটা চুম্বন দিলেন, তাকে জাগালেন না।

মঞ্জু গা ধুয়ে আসুক, ততক্ষণে তিনি অপেক্ষা করবেন। বসবার ঘরে ফিরে এসে তিনি আর একটি সিগারেট ধরালেন। ইদানীং তাঁর সিগারেট খাওয়া বেড়ে গেছে। রাত জাগতে গেলে সিগারেট বেশি খেতেই হয়। অফিসে ফিরে গিয়ে আজও অনেক রাত জাগতে হবে। আর যদি ইন্ডিয়ান বোমারু বিমান আসে অনেকের ধারণা ওরা এসে আসবে মাঝরাত্তিরের পর থাক, মামুন এখন ওসব নিয়ে চিন্তা করতে চান না।

ঢাকা শহরে খুব ধরপাকড় চলছে। গ্রেফতার হয়েছেন আওয়ামীলীগের অনেক নেতা। এঁরা যে দেশপ্রেমিক তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? যুদ্ধের সময় কোনো দেশপ্রেমিক কি অন্য দেশের সমর্থক হতে পারে? গভর্নর মোনেম খাঁ হিন্দু ছেলেছোকরাদের যে আটক করছেন, তাতে অবশ্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় আমেরিকা তার নিজের দেশের মধ্যে জাপানী বংশোদ্ভূতদের আটক করে রাখেনি? পল্টন বাবুল আলতাফদের দু-একজন হিন্দু বন্ধু আটক হয়েছেন, সেজন্য তারা খুব উত্তেজিত, কিন্তু আপৎকালে এরকম কিছু কিছু ঘটনা তো ঘটবেই।

বাবুল হঠাৎ ধরা-টরা পড়ে যাবে না তো? এই ছেলেটি বড় গভীর-সঞ্চারী, মামুন ওকে ঠিক বুঝতে পারেন না। তাঁর অতি স্নেহের অতি আদরের মঞ্জুর স্বামী এই বাবুল। মামুনের নিজের পুত্র সন্তান নেই, তিনি বাবুলকে নিজের ছেলের মতন দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবুল তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। বাবুল বলে, সে এখন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নেই, সে আওয়ামীলীগে নেই, ন্যাপের সঙ্গেও নেই তা সত্যি। ফতেমা জিন্না হেরে যাবার পরে তো সব রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও আবার বন্ধ হয়ে গেছে। তবু, বাবুল যেন গোপনে গোপনে কিছু একটা করছে। সে প্রায়ই একা একা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে যায় কেন? ছেলেটার নিজের নাম প্রচারের চেষ্টা নেই, রোজগার

বাড়াবারও ধান্দা নেই, তবে সে কী চায়?

বাথরুমে মঞ্জু গায়ে জল ঢালছে সেই শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মেয়েটার তিনবেলা স্নানের বাতিক। তার হৃদয়ের মতনই তার শরীরটাও সব সময় ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। এই মেয়েটার কথা ভাবলেই মামুনের মনটা দ্রব হয়ে আসে। এই মেয়েটা কোনো বড় রকমের দুঃখ পেলে মামুন তা কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না।

রাস্তায় একটা হুড়োহুড়ি শব্দ কিছু লোক ছোটাছুটি করছে। মামুন জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আবার কিছু একটা গুজব। ও হরি, ওয়াটার ওয়ার্কসের শব্দ। প্রত্যেকদিনই এই শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু আজ ঐ শব্দতেই লোকে বোমারু বিমানের শব্দ বলে ভুল করেছে। অবশ্য আজ নিস্তব্ধতাও অনেক বেশি।

আকাশে কী শান্ত, সুমধুর জ্যোৎস্না। এর মধ্যেও আততায়ী এসে শত শত মানুষ খুন করার জন্য বোমা নিক্ষেপ করতে পারে? কিন্তু মানুষ তো মরছে। এই মুহূর্তে ছাম্ব আগনুরে পাকিস্তানী স্যাবার জেট আর ভারতীয় ভ্যামপায়ার অগ্নিবর্ষণ করছে, ইছোগিল খালের এপাশে ওপাশে গর্জন করছে রাইফেল।

মামুনের হঠাৎ মুসাফিরের কথা মনে পড়লো। রহস্যময় পুরুষ। তাঁকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে পরিচিত মহলে। লোকটা সত্যিকারের কী মহাপুরুষ, না জালিয়াৎ? বিশ্ব মানবতাবাদী, না গুপ্তচর? কাশ্মীর উপলক্ষ করে এই সময়ে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ যে শুরু হবে, তা উনি আগে থেকে কী করে জানলেন? মামুন তো কল্পনাও করতে পারেননি, ইণ্ডিয়ার অনেক পত্র-পত্রিকাতেও এই আকস্মিকতায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। তবে উনি কী করে জানলেন? স্বপ্ন দেখেছেন?

এর মধ্যে আরও দু-তিনবার মুসাফিরের সঙ্গে দেখা হয়েছে মামুনের। প্রত্যেকবারই উনি ওঁর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির প্রখরতায় মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। অবশ্য ম্যাজেশিয়ানরাও চকিতে মানুষকে মুগ্ধ করে দিতে পারে। মামুন একদিন অফিস আসার পথে দেখেছিলেন, গ্যাণ্ডেরিয়ার মোড়ে উনি একা দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর চেহারার জন্য ওঁকে ভিড়ের মধ্যেও আলাদা ভাবে চোখে পড়ে। দীর্ঘ, সমুন্নত দেহ সাদা কুর্তা পাজামা পরা, চোখে কালো চশমা। ঐ চশমা তিনি কক্ষনো চোখ থেকে খোলেন না। অথচ অন্ধও তো নন, একা একাই চলাফেরা করেন।

মামুন গাড়ি থামিয়ে তাঁকে তুলে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজি হননি। মৃদু হেসে বলেছিলেন, এখন যাবো না, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানারকম মানুষ দেখছি। বেশ লাগছে।

যেন মুসাফির অন্য গ্রহের অধিবাসী। তিনি মানুষ দেখতে এসেছেন। কথার সুরটি ছিল সেই রকম। মামুনের মজা লেগেছিল। লোকটিকে দিয়ে কিছু লেখাতে পারলে ভালো হতো।

কিন্তু তা আর হলো না। পরশুদিন মুসাফিরও গ্রেফতার হয়েছেন। তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। মুসলমান হলেও ঐ মুসাফির ইণ্ডিয়ান সিটিজেন এই যুদ্ধের সময় অন্য দেশের সিটিজেনদের আলাদা করে এক জায়গায় আটকে রাখাই তো স্বাভাবিক, সব দেশই তাই করে।

প্রথম দিনের আড্ডায় মামুন যাঁদের মুসাফিরের বন্ধু হিসেবে দেখেছিলেন, তারা এখন সবাই মুসাফিরের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করছেন। মামুন কবি জসিমউদ্দিনের কাছে খবর করেছিলেন, কবিও অনেকটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, পার্টিশানের আগে ওনার সাথে পরিচয় ছিল, তারপর অনেকদিন খবর রাখি না, এখন ওনার মতবাদ কী হয়েছে না হয়েছে তা আমি কী করে বলবো। কেউ কেউ বললো, লোকটা আসলে হিন্দু বিশেষ একটা মতলোবে এই সময়ে ঢাকায় এসেছিল। নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ার স্পাই। মামুনের এতটা বিশ্বাস হয় না। স্পাইয়ের চাকরির জন্য এতটা বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া স্পাই হলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনার কথা সে আগেই বলে দেবে কেন?

মুসাফির আরও একটা কথা বলেছিলেন, যা ভাবলেও এখনও মামুনের হাসি আসে। মামুনের ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের মাঝখানে নাকি একটি সুন্দরী নারী এসে ছায়া ফেলবে। মামুন দাড়িতে হাত বুলোলেন অর্ধেকের বেশি পেকে গেছে। মাথার পিছনে ইন্দ্রলুপ্ত। চশমা না পরলেই একেবারে অন্ধ। বয়েস তাঁর খুব বেশি হয়নি, কিন্তু অকাল বার্ধক্য এসে গেছে, এই সময় কোন্ সুন্দরী নারী স্বেচ্ছায় আসবে তাঁর জীবনে। আকাশ কুসুম ছাড়া আর কিছু পাওয়ার আশা নেই এ জীবনে।

রাস্তায় আবার গোলমাল, একটা ধাতব ঘর্ঘর শব্দ। দুটো সাঁজোয়া গাড়ি বেরিয়েছে। তা হলে সব কটা ট্যাঙ্ক পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়নি, কয়েকটা রয়ে গেছে? ঢাকাবাসীদের মনোবল

বাড়াবার জন্য সেগুলো রাস্তায় বার করা হয়েছে ভারতীয় বিমান এলে এই দু-চারখানা ট্যাঙ্কই তাদের মোকাবিলা করবে। পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি রোজ বড় বড় ব্যানার হেডলাইনে যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, এখানে একটা কিছু না ঘটলে আর ইজ্জত থাকে না।

মামুন জানলা বন্ধ করে দিতেই অন্য দিক থেকে একটা আলোর শিখা দেখতে পেলেন। পাছে মঞ্জু হঠাৎ তাঁকে দেখে ভয় পেয়ে যায় তাই তিনি আগে থেকেই সহাস্যে বললেন, কেমন আছিস রে, মঞ্জু? আমার বিলকিসবানুর খবর কী?

একটা বড় মোম হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো মঞ্জু। সদ্য স্নান করে সে একটা গোলাপি রঙের শাড়ি পরেছে, এক রাশ চুল পিঠের ওপর ফেলা। সে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে, বাতাস নিয়ে আসছে তার শরীরের সুগন্ধ। তার সারল্যমাখা দু'চোখে এখন অদ্ভুত বিস্ময় যেন সে মামুনকে চিনতে পারছে না।

মামুনও মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকারের মধ্যে মোমবাতি হাতে নিয়ে এই অসামান্য রমণীটি যেন উঠে এসেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। কিংবা সে রক্তমাংসের মানবী নয়, কোনো মহাকবির কল্পনা। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজনৈতিকদলাদলি ক্ষুদ্র স্বার্থ সব কিছু এই রূপের কাছে তুচ্ছ। নারীর এই রূপ যুগ যুগ ধরে পুরুষকে মহান শিল্প সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

এই প্রৌঢ় বয়েসেও মামুনের বুক কেঁপে উঠলো। তারপরই তিনি দেখলেন মঞ্জুর মুখে আতঙ্কের ছায়া।

খুব কাছে এসে মঞ্জু থমকে দাঁড়ালো। একদৃষ্টে চেয়ে রইলো,কোনো কথা বললো না।

মামুন মঞ্জুর এক হাত ধরে বললেন, কী হয়েছে তোর? ভয় পেয়েছিস নাকি? ভয় কী?

মঞ্জু খুব আস্তে আস্তে প্রায় ফিসফিসানির মতন গলায় জিজ্ঞেস করলো, মামুনমামা, উনি কোথায়? উনি আসেন নি?

মামুন বললো, বাবুলের খোঁজেই তো আসলাম। তাকে বাসায় দেখছি না। সে গেছে কোথায়, তোকে কিছু বলে যায়নি?

মঞ্জু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো না।

মামুন বললেন, আচ্ছা পাগল ছেলে তো। এমন দিনে বউকে একা বাসায় রেখে কেউ বাইরে থাকে? তবে তুই চিন্তা করিস না, রাস্তায় অনেক মানুষজন সে এসে পড়বে।

মোমবাতিটা খুব যত্ন করে একটা টেবিলের ওপর আটকালো মঞ্জু। তারপর হঠাৎ পেছন ফিরে মামুনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে হু-হু করে কাঁদতে লাগলো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, মামুনমামা, আমার কী হবে? উনি আমার সাথে আর ভালো করে কথা কন না, আমারে আর ভালোবাসেন না।

কত বাচ্চা বয়েস থেকে দেখছেন এই মেয়েটিকে, মামুন এর কষ্ট সইতে পারেন না। বাবুলের ওপর তাঁর বেশ রাগ হলো, কিসের এত আড্ডা সে ছেলের যে এমন বউয়ের কথা ভুলে যায়? মঞ্জুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মামুন সাবান, পারফিউম ও শরীরের একটা আলাদা মুগ্ধ পেলেন, তিনি ভুলে গেলেন যুদ্ধের কথা, ভুলে গেলেন অফিসের কথা। কোমল সুরে তিনি বলতে লাগলেন, তুই কিছু চিন্তা করিস না, মা সে এসে পড়বে। সে বুঝদার ছেলে, সে কোথাও যাবে না।

–আমি জাহানারা আপার বাসায় গেছিলাম, উনারাও কিছু বলতে পারলেন না। আগে ঐ বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় যেতেন প্রায়ই।

–তুই এই অন্ধকারের মধ্যে একা রাস্তায় বেরিয়েছিলি? কাজটা মোটেই ভালো করিস নাই।

বাবুল তো দায়িত্ববান মানুষ, নিশ্চয়ই কোথাও...

–সেই দুপুর দুইটার সময় বাইরাইছেন...আমি জুনিপারের বাসা থিকা তিন চার জাগায় টেলিফোন করলাম, কেউ কিছু জানে না, পল্টনভাইও কিছু কইতে পারলেন না। জুনিপার আমারে ভয় দেখাইলো–

–জুনিপারের কথা তুই শুনিস না।

মঞ্জু একবার মুখ তুলে জল ছলছল দু'চোখে বললো, মামুনমামা উনি কোথায় যান বলেন তো? আমি বুঝে গেছি উনি আমারে আর ভালোবাসেন না। তাইলে আমি কী নিয়া বাঁচবো।

মামুন মঞ্জুর মুখখানা আবার নিজের বুকে চেপে ধরলেন। বিদ্যুতের মতন একটা চিন্তা তাঁর মন ছুঁয়ে গেল। বাবুল ইদানীং খবরের কাগজের অফিসে যায় না, প্রত্যক্ষ রাজনীতিও করে না,বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, তা হলে কি সে অন্য কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়েছে? সে অত্যন্ত রূপবান যুবক,

ঢাকা শহরের অনেক যুবতীই তাকে আকৃষ্ট করতে চাইতে পারে। হাই সোসাইটিতে এরকম কিছু কিছু রমণী দেখেছেন তিনি, যাদের কোনো হায়াসরম নেই, বিবাহিত পুরুষদের দিকে তারা যখন তখন ঢলে পড়ে। নব্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে এরকম একটা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ তৈরি হয়েছে, যারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের বাড়িতে ডেকে পার্টি দেয় ঘরের বউ-ঝিদেরবাইরে বার করে বাবুল কি সেরকম কোথাও গিয়ে জুটলো? তিনি মনে মনে তৎক্ষণাৎ শপথ করলেন, যেভাবেই হোক, বাবুলকে তিনি ফিরিয়ে আনবেনই।

মামুন মঞ্জুর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, দূর পাগল, সে তোরে ভালোবাসবে না, এ কি হতে পারে? বাবুল আমাদের হীরার টুকরা। সে একটু বেশি আড্ডা দিতে ভালোবাসে এই যা। তোর কোনো ভয় নাই রে মঞ্জু সে আজ যতক্ষণ না আসে আমি থাকবো এখানে। কী, তা হলে হলো তো? আর ভয় নাই তো? একটু চা খাওয়াবি? .

চায়ের প্রস্তাবে মঞ্জু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো মামুনের বুক থেকে। কিন্তু মামুনের চায়ের জন্য তেমন ব্যস্ততা নেই। মেয়েটা ভয় পেয়েছে, তাকে সান্ত্বনা দেওয়াটাই অনেক বেশি জরুরি, তিনি মঞ্জুকে সম্পূর্ণভাবে বুকে জড়িয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন।

॥ ৩২ ॥

দুপুর থেকে রাত নটা পর্যন্ত কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস যাদের ঘর বাড়ি, তারা আজ সন্ধেবেলাতেই স্থানচ্যুত। তারা বেশ ক্ষুব্ধ, এখন তারা কোথায় যাবে? এই কফি হাউসের বেশ কয়েকটা টেবিল জুড়ে বসে নবীন কবি ও গল্পকারদের দল, লিটন ম্যাগাজিনের উদ্ধত, রাগী লেখক বৃন্দেরা কলেজ জীবন শেষ করেছে, অনেকেই কোনো চাকরি-বাকরি পায়নি, বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই তাদের। সাতজনের টেবিলে তিন কাপ কফির অর্ডার দিয়ে ভাগ করে নিয়ে সময় কাটায় দু'ঘণ্টা, তারপর বেয়ারা এসে গজ গজ করলে আরও দু'কাপের অর্ডার দেয়। একজন সিগারেট ধরিয়ে অর্ধেকটা টানতে না টানতেই হাত বাড়িয়ে দেয় আর একজন, আরও একজন বলে, লাস্ট সুখটানটা দিস। এদের দু'একজন টিউশনি করে কিছু টাকা রোজগার করে, যেদিন টিউশানির মাইনে পেয়ে কফি হাউসে আসে, সেদিন বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হয়ে যায়, বড় দলটার মধ্যে তৈরি হয়ে যায় একটা ছোট দল কফি হাউস ছেড়ে তারা চলে যায় খালাসিটোলায় দেশি মদের আড্ডায়। সেসব দিনে বাড়ি ফিরতে ফিরতে পেরিয়ে যায় মধ্যরাত।

ব্ল্যাক আউট শুরু হয়েছে সন্ধেবেলা সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। মিশমিশে অন্ধকার রাস্তাঘাটের কলকাতাকে সম্পূর্ণ অচেনা মনে হয়। রাতের কলকাতার প্রধান অলঙ্কারই তো আলো।

বম্বে-দিল্লির থেকেও কলকাতায় আলো বেশি এই শহর অনেক রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকে। বিজ্ঞাপনের রঙীন বাতিগুলি জ্বলে সারা রাত। সেই কলকাতা সন্ধেবেলাতেই ডুবে আছে নিথর অন্ধকারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্ল্যাক আউটের স্মৃতি এই প্রজন্মের অনেকেরই নেই। যে সব তরুণেরা এই শহরটিকে পাগলের মতন ভালোবাসে, তাদের এই অন্ধকার সহ্য হচ্ছে না।

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে অবিনাশ, পরীক্ষিৎ, হেমন্ত বরুণ, সুবিমলরা এসে দাঁড়ালো প্রেসিডেন্সি কলেজের উল্টোদিকে। সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে আর কোথাও যাবার জায়গা নেই বলেই এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। একটা অর্থহীন যুদ্ধ এবং অনভিপ্রেত অন্ধকারের প্রতি ওরা প্রতিবাদ জানাতে চায়।

মানিকদার স্টাডি সার্কলের সদস্য তপনও ইদানীং এই নব্য সাহিত্যিকের দলে ভিড়েছে। তপন কবিতা লেখে। স্টাডি সার্কলে সে একদিন তার কবিতা পড়ে শুনিয়ে খুব লজ্জা পেয়েছিল। সুকান্ত ভট্টাচার্যর বন্ধু মানিকদা শুধু বিস্মিত নয়, রীতিমত আহত হয়েছেলিন সেই সব কবিতা শুনে। গরিবের ছেলে তপন রিফিউজি কলোনিতে জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে থাকে, তুব সে লিখলো প্যানপেনে প্রেমের কবিতা? দেশের যা অবস্থা, এই কি প্রেমের কবিতা লেখার সময়? অন্য কয়েকজন সদস্যও বিদ্রূপ করেছিল তপনকে।

মানিকদার স্টাডি সার্কল সে ছাড়েনি, কিন্তু কফি হাউসের এই আড্ডাটাতেও তার নেশা ধরে

গেছে। দেশ, সমাজ, মা-বাবা, কবিতা মদ, নারী ইত্যাদি বিষয়ে এরা এমন তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলে যে তপন চমকে চমকে ওঠে। এরা পূর্ব-নির্ধারিত কোনো নীতির পরোয়া করে না, সব কিছু নিজেরা যাচাই করে নিতে চায়। এরা ধর্ম, দেশপ্রেম, কংগ্রেস গর্ভনমেন্ট আমেরিকান পালিসিকে অবজ্ঞা করে, আবার চীন রাশিয়া বা মার্কসবাদকেও অমোঘ, অকাট্য বলে মানে না। তপনের কাছে এসব নতুন অভিজ্ঞতা।

অবিনাশ বললো, চল, কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসি।

আজ সন্ধেবেলা পাওয়া যাবে কি যাবে না এই ঝুঁকি না নিয়ে দুপুরবেলাতেই কয়েক বোতল বীয়ার খেয়ে এসেছে হেমন্ত। তার মেজাজ বেশ ফুরফুরে। সে বললো, কেউ আমার একটা হাত ধরো ভাই, আমি বোমা খে মরতে রাজি আছি, কিন্তু অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পা ভাঙতে রাজি নই। শালারা রাস্তাগুলো যা করে রেখেছে না।

অবিনাশ বললো, এ বছর আর রাস্তা সারাবে না। যুদ্ধের জন্য বর্ডারের দিকে নাকি নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, শহরের রাস্তা সারাবার টাকা নেই।

হেমন্ত বললো, আরে বর্ডারের রাস্তা তো বানাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। শহরের রাস্তা সারাবে করপোরেশন। যুদ্ধের সঙ্গে করপোরেশনের কী সম্পর্ক।

সুবিমল অবজ্ঞার সুরে বললো, সব কিছুর সঙ্গেই সব কিছুর সম্পর্ক থাকে।

হেমন্ত তার কাঁধে এক চাপড় মেরে বললো, তার মানে। এটা তুই কী বললি? সব কিছুর সঙ্গে সব কিছুর সম্পর্ক থাকে, এর মানে কী?

সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর বদলে সুবিমল বললো ও কোনো মানে নেই বুঝি? তা হলে ভুল বলেছি।

পরীক্ষিৎ বললো না, সুবিমল তুই ভুল বলিসনি। সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক তো থাকেই। যেমন তেলের সঙ্গে জলের একটা সম্পর্ক আছে।

অবিনাশ বললো, আগুনের সঙ্গে খিদের যেমন একটা সম্পর্ক আছে।

মাঝে মাঝে গাড়ির হেড লাইটের আলো পড়ছে ওদের গায়ে। যানবাহন পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, হেডলাইটে কালো রঙ করাও হয়নি। সেই আলোতে ওরা দেখলো রাস্তার উল্টোদিকের ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে আছে অদিতি। একা।

অবিনাশ নিজের বুকে চাপড় মেরে বিরাট দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

অদিতি আর গায়ত্রী এই দু'জন এ বছর কফি হাউসের বিশ্ব সুন্দরী। গায়ত্রী ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী, আর অদিতি কেমিস্ট্রিতে রিসার্চ করে। গায়ত্রী ফর্সা, মুখের গড়ন অতি ধারালো, সে ভালো ডিবেট করে। অদিতির গায়ের রং মাজা মাজা বেশ লম্বা এবং গম্ভীর। গায়ত্রী এবং অদিতির মধ্যে কে বেশী সুন্দর তা নিয়ে কফি হাউসে মতভেদ এবং স্পষ্ট দুটি দল আছে। কিন্তু গায়ত্রী বা অদিতি কেউই এই কবি লেখকদের পাত্তা দেয় না, ওদের দু'জনের লেখকদের দলটি নারী বর্জিত, আধো চেনা এক আধজন বন্ধুর স্ত্রী বা কারুর মামাতো মাসতুতো বোন ক্কচিৎ কখনো আসে, সাহিত্য যশোপ্রার্থিনী দু'একটি মেয়ে কখনো কখনো ওদের টেবিলে বসে, কিন্তু বিকেল শেষ হতে না হতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে, সন্ধের পর তাদের বাইরে থাকার অনুমতি নেই। অবিনাশের মতে, যে সব গুডি গুডি টাইপ মেয়ে বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে যায়, তারা কবিতা গল্প লিখতে পারবে না কোনোদিন।

হেডলাইটের আলোয় অদিতিকে দেখাচ্ছে রাজেন্দ্রাণীর মতন। এই সব নারী কবিদের প্রেরণা হতে পারে, কিন্তু এরা কবিতা পড়ে না কোনোদিন।

অবিনাশ, বললো, ও অন্ধকারের মধ্যে একা একা কী করে বাড়ি ফিরবে? ওর সেই পাইলট বন্ধটা আজ আসেনি।

হেমন্ত বললো, তুই ওকে বাড়ি পৌঁছে দিবি নাকি? দ্যাখ না চেষ্টা করে।

অবিনাশ বললো, আমার ইচ্ছে করছে ওর সঙ্গে এক ট্রামে চেপে খানিকটা চলে যাই।

–যা না।

–ও যদি রাগ রাগ চোখে আমার দিকে তাকায়, তা হলে যে খুব খারাপ লাগবে। ঐ মুখখানাতে বিরক্তি মানায় না।

সুবিমল বললো, অদিতি যদি আজ আমাদের সঙ্গে খানিক ক্ষণ বসতো পার্কে, তারপর আমরা সবাই মিলে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারতুম।

হেমন্ত বললো, প্রস্তাবটা দিয়ে দেখবি নাকি?

আর একবার আলো পড়লো অদিতির মুখে। যেন একটা অন্ধকার মঞ্চে সে একলা দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে কোনো চাঞ্চল্য নেই,বাড়ি ফেরার জন্য কোনো দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই তার। এই মেয়ে কেন কবিতা লেখে না, কেন কবিতা ভালোবাসে না? কেমিস্ট্রিতে কী রস পায়?

অবিনাশ কেউই দ্বিধা কাটিয়ে রাস্তা পার হয়ে অদিতির কাছে গেল না। একটা ট্রাম এলো, অদিতি উঠে পড়লো।

অবিনাশ আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, অদিতি যদি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসতো তাহলে পৃথিবীর একটা উপকার হতো। হয়তো আজ রাত্তিরে আমি একটা ক্লাসিক স্ট্যাণ্ডার্ডের কবিতা লিখে ফেলতুম।

সুবিমল বললে, ভাগ্যিস পাকিস্তান যুদ্ধটা বাধিয়েছিল, তাই অন্ধকারের মধ্যে অদিতিকে দেখা গেল খানিকক্ষণ। অন্ধকারের ব্যাকগ্রাউণ্ডে সত্যি ওকে কী রকম মানিয়েছিল বল তো।

অবিনাশ বললো, চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য..

হেমন্ত বললো, পাকিস্তানী বোমরুগুলো অকর্মার ধাড়ী। এত দেরি করছে কেন? এর মধ্যে দু'চারটে বোমা ফেলে গেলেই তো পারতো। মনে কর, ঠিক পাঁচ মিনিট আগে যদি এখানে একটা বোমা পড়তো কী ফার্স্টক্লাস হতো। সবাই ছোটছুটি করছে, সেই সময় আমি অদিতির হাত ধরে বলতুম কোনো ভয় নেই, আমি তোমাকে শেলটারে নিয়ে যাচ্ছি।

অবিনাশ বললো, মাইরি আর কি তোকে চান্স দিতুম আর কি।

সুবিমল বললো, রোজই শুনছি পাকিস্তানী প্লেন আসবে আসবে এ আর ভালো লাগছে না। এলেই তো পারে। কলকাতার ওপর গোটা কতক বোমা ফেলে যাক না।

হেমন্ত বললো, কলকাতার এখন কিছু বোমা খাওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। কিছু ভাঙচুর হলে শহরটা নতুনভাবে তৈরি হবে।

সুবিমল বললো, কোথায় কোথায় বোমা পড়া উচিত বল তো?

–ডেফিনিটলি বড়বাজারে। ওখানে অন্তত ডজনখানেক বেশ বড় সাইজের বোমা ফেলে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের ঘুঘুর বাসা ভেঙে দেওয়া দরকার। আর রাইটার্স বিল্ডিং-ডালহাউসিতেও ডজনখানেক। আর গোটাকতক চিৎপুরে।

–চিৎপুরের ওপর আবার তোর এত রাগ হলো কেন? সাউথ ক্যালকাটাটা বুঝি বেঁচে যাবে।

এত অন্ধকারেও কলেজ স্কোয়ার সম্পূর্ণ নির্জন নয়। ফুচকা আলুকাবলিওয়ালারাও তাদের ব্যবসা বন্ধ করেনি। আকাশে ঝাঁক ঝাঁক মেঘ। তার আড়ালে একটা বড় আকারের চাঁদ দেখা যাচ্ছে দু'একবার, কিন্তু মেঘের জন্য জ্যোৎস্না ফোটেনি। ওরা বসে পড়লো এক কোণে ঘাসের ওপর। একজন কেউ বললো, একটা চাওয়ালা কাছাকাছি আছে কি না দ্যাখ না।

পরীক্ষিৎ বললো, দেখি একটা পাইট –ফাইট জোগাড় করা যায় কি না।

তপন আগাগোড়া চুপ করে আছে। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের মতন এতবড় একটা ব্যাপার নিয়ে অবিনাশ হেমন্তরা ঠাট্টা তামাশা করে যাচ্ছে আগাগোড়া, এতেই সে হতবাক। ওপার বাংলার স্মৃতি তার এখনো টাটকা। সে যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে, তাদের গ্রামের রাস্তাতেও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধটা কি ভারত পাকিস্তানের, না শেষ পর্যন্ত আবার হিন্দু মুসলমানের?

সে চুপি চুপি হেমন্তকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এই যুদ্ধের ওপর কোনো কবিতা লিখেছেন?

অন্যরাও তার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছে, তারা হেসে উঠলো হা-হা করে। হেমন্ত হুংকার দিয়ে বললো, কী ? এই বোকা....হারামী গাণ্ডুর বাচ্চাদের যুদ্ধ নিয়ে কবিতা? এই খোঁচাখুঁচিতে আপনার আমার কী যায় আসে মশাই? কাশ্মীর নিয়ে দিল্লি করাচী লড়ালড়ি করছে তার জন্য আমরা কেন সাফার করবো? কাশ্মীরটা ওদের দিয়ে দেওয়া হবে নাই-বা কেন? মোছলমানদের দেশ, মোছলমানরা পাবে। সোজা কথা কাশ্মীর যদি না-ই দিতে চাস, তা হলে শুয়ারের বাচ্চারা ফর্টি সেভেনে পার্টিশান করতে রাজি হলি কেন?

সুবিমল বললো, পাখতুন নেতা সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্ফার খান কাল কী স্টেটমেন্ট দিয়েছেন দেখেছিস? পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাবটাই মেনে নেওয়া উচিত হয়নি, ভারতকে এখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

অবিনাশ লম্বা পা ছড়িয়ে আধো কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বললো, ওদের পুরোনো কথা ছাড়। পাকিস্তান যখন হয়েই গেছে, আঠোরো বছর বয়েস এখন দেশটার, পাকিস্তান এখন একটা রিয়েলিটি, তাকে তার যা প্রাপ্য তা তো দিতেই হবে। কাশ্মীরে গণভোট করলে দেখা যাবে ওরা সবাই পাকিস্তানে যেতে চায়।

সুবিমল বললো, তবু যাই বলিস আমি কাশ্মীর ছাড়ার পক্ষপাতী নই। এমন সুন্দর একটা জায়গা পাকিস্তান চাইলেই দিতে হবে, এ কী মামাবাড়ির আবদার।

তপন বলে উঠলো, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে পূর্ব পাকিস্তানকে সব দিক থেকে বঞ্চিত করছে? আমি নিজে দেখেছি।

অবিনাশ বললো আপনি মশাই নিজেকে এখনো ইস্ট পাকিস্তানী মনে করেন তাই না? ওখানে শুনেছি এখন উর্দু মিশিয়ে বাংলা লেখা হচ্ছে। সংস্কৃত তৎসম শব্দগুলো সব খুঁটে খুঁটে বাদ দিয়ে সেখানে আরবী ফার্সী শব্দ ঢোকাচ্ছে।

তপন বললো, মোটেই না। নাজামুদ্দিনের ভাই সাহাবুদ্দীন সেরকম ফতোয়া দিয়েছিল, চেষ্টা করেছিল খুব, কিন্তু বাঙালী লেখকরা তা মেনে নেয়নি কেউ।

কী জানি ওখানকার বইপত্তর তো পাই না।

পরীক্ষিৎ ফিরে এলো একটুবাদে। সে অনেক চেষ্টা করেও বাংলা মদের পাইট জোগাড় করতে পারেনি, তার বদলে নিয়ে এসেছে খানিকটা গাঁজা। হেমন্তর কাধের ঝোলা থেকে একটা পত্রিকা বার করে নিয়ে সে ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিল, তারপর দেশলাই কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তামাক বার করতে লাগলো সিগারেট থেকে।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করলো, কোথায় পেলি রে গাঁজা।

–রিকশাওয়ালাদরে কাছ থেকে। শালা কী দাম বেড়েছে রে। ছোট পুরিয়া যেগুলোর দাম ছিল আট আনা, সেই পুরিয়াই দু'টাকা চার আনা নিল। গাঁজাও কি যুদ্ধের কাজে লাগে নাকি?

–আলবাৎ লাগে। এই যুদ্ধটাই তো গাঁজাখোরদের যুদ্ধ। পাকিস্তানী বোমারু পাইলটগুলো গাঁজায় দম দিয়ে একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে আছে, নইলে ব্যাটারা আসছে না কেন? বোমা ফেলার কাজটা চুকিয়ে দিলেই পারে।

সুবিমল বললো, কে বলেছে ওরা কলকাতায় বোমা ফেলতে আসবে? এদিকে ওরা ফ্রন্ট খুলবে, ওরা এত বোকা নাকি? ততখানি হিম্মত ও কি ওদের আছে?

–ওরা যে লাহোর আক্রমণের বদলা নেবে শুনছি? এখানকার খবরের কাগজগুলো তো খুব চ্যাঁচাচ্ছে। তা ছাড়া ক্যালকাটা বম্বিং হবার চান্স না থাকলে শুধু শুধু এখানে ব্ল্যাক আউট করতে গেল কেন?

–এসব হচ্ছে যুদ্ধের টেমপো তোলা। সোলজাররা যত না যুদ্ধ করে তার চেয়ে খবরের কাগজওয়ালারা অনেক বেশি যুদ্ধ চালায়। রোজ আট কলম ব্যানার হেড লাইন। কাগজের বিক্রি বাড়ে। আর গভর্নমেন্ট থেকেও চায় সাধারণ লোকের মধ্যে একটা কৃত্রিম দেশাত্মবোধ চাগিয়ে তুলতে। দেশের অন্য সব সমস্যা তা হলে চাপা পড়ে যাবে।

পরীক্ষিৎ-এর এই সব কথাবার্তা পছন্দ হয় না। যুদ্ধ টুদ্ধ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে এক ধমক দিয়ে বললো, কী ভ্যাড় ভ্যাড় করছিস তখন থেকে। চুপ মার তো।

তামাকের বদলে গাঁজা ভরে পরীক্ষিৎ সিগারেটটির আগের গড়ন প্রায় ফিরিয়ে এনেছে। নিজে সাজলেও প্রথমে সে নিজে ধরায় না, সে সম্মানটা সে দিল হেমন্তকে। হেমন্ত লম্বা দুটি টান দিয়ে সেটি চালান করে দিল অবিনাশকে, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তপনকে বললো, অপনি বুঝি যুদ্ধ নিয়েও কবিতা লেখেন?

তপন একটু কেঁপে উঠলো। সে সত্যিই দুটি কবিতা লিখে ফেলেছে। মানিকদাদের স্টাডি সার্কলে সে ঐ কবিতা পাঠ করতে পারবে না, ভেবেছিল এই আড্ডায় শোনাবে। কিন্তু হেমন্তর গলার আওয়াজে কৌতুকের সুর টের পেয়ে সে তাড়াতাড়ি বললো, না, না, যুদ্ধ নিয়ে নয়, আমি আমার গ্রাম নিয়ে দু'একা লিখেছি, এই সময় আবর খুব মনে পড়ছে।

–নস্টালজিয়া? মুখস্থ থাকে তো শোনান।

পরীক্ষিৎ সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, না, এই অন্ধকারের মধ্যে কবিতা-টবিতা চলবে না। হেমন্ত

বললো, জিনিসটা ফার্স্টক্লাস, আ একটা বানা তো পরীক্ষিৎ।
অবিনাশ জিজ্ঞেস করলো, মনে কর আমাদের এখানে অদিতি এসে বসেছে। ওর সামনে আমরা কথা বলতুম?
পরীক্ষিৎ বললো, তুই যে ঐ মেয়েটার জন্য হেদিয়ে মরলি রে। ওর পাইলট প্রেমিক জানতে পারলে তোকে ধোলাই দেবে।
–ঐ পাইলটটা কি যুদ্ধে গেছে? প্লেন ক্র্যাস করে পাকিস্তানে যদি ওয়ার প্রিজনার হয়ে থাকে বেশ হয়।
সুবিমল বললো, সে গুড়ে বালি। ও ছেলেটা আছে সিভিল অ্যাভিয়েশনে।
হেমন্ত বললো, বেশিদিন চলতেই পারে না। দু'সাইডেরই তো খেলনাগুলো ফুরিয়ে যাবে ক'দিনের মধ্যেই।
সুবিমল বললো, ইণ্ডিয়া কী ট্যাকটিকস নিয়েছে বুঝতে পারছিস না? ওয়াই বি চাবন আর জেনারাল চৌধুরী চায় যুদ্ধটাকে যতদূর সম্ভব প্রোলং করতে। যাতে পাকিস্তানের দম ফুরিয় যায়। আমেরিকা তো দু'পক্ষকেই আর্মস সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে। রাশিয়া তবু ইণ্ডিয়াকে কিছু কিছু দিয়ে যাবে। ইণ্ডিয়া নিজেও এখন টেন পারসেন্ট আর্মস বানায়। পাকিস্তানের তো নিজস্ব বলতে কিছুই নেই, ওরা কতদিন আর চালাতে পারবে?
হেমন্ত বললো, চীন দেবে। চীন এখন ওদের দিকে হেলেছে। চীন যদি এই সুযোগে সিকিম বা আসামের দিকে ইণ্ডিয়াকে আর একবার খোঁচাখুঁচি করে, তা হলে ইণ্ডিয়া বিপদে পড়ে যাবে।
সুবিমল বললো, চীন এখন ইণ্ডিয়াকে অ্যাটাক করতে পারে না। ওসব খবরের কাগজের রটনা। তা ছাড়া চীন পাকিস্তানকে কী অস্ত্র দেবে, ওদের কী স্যাবার জেট আছে, না মিগ আছে?
পরীক্ষিৎ রাগত স্বরে বললো আবার। আবার তোরা ঐ সব ফালতু কথা শুরু করলি। এই মোছলমানটা গেল কোথায় রে? তিন চারদিন ওকে দেখিনি।
অবিনাশ বললো রশীদ? কোথায় যেন বাইরে যাবে শুনেছিলুম।
সুবিমল বললো, কাল আমি দুপুরে ওকে একবার দেখেছি এসপ্লানেডে।
অবিনাশ বললো, তা হলে কফি হাউসে এলো কেন? তোরা তো কেউ রাজি হলি না রশীদ সঙ্গে থাকলে আজ আমি নির্ঘাৎ অদিতির কাছে গিয়ে কথা বলতুম।
–তুই এখনো সেই মেয়েটার কথা ভেবে যাচ্ছিস? সে এতক্ষণ বাড়িতে পৌঁছে, কাপড় টাপড় বদলে পুরোনো হয়ে গেছে।
হেমন্ত বললো, অদিতি নামের মেয়ের সঙ্গে অবিনাশ নামের কোনো ছেলে কক্ষণো ভাব হতেই পারে না। আমার মতন তিন অক্ষরের নাম চাই। আজ অদিতি বাই চান্স এখানে এলে ওকেও গাঁজা খাওয়াতুম। ভেবে দ্যাখ, ওর বুকের কাছ দিয়ে ধোঁয়া গড়িয়ে যেত, দেবী সরস্বতীর হাতে পদ্মফুল।
পরীক্ষিৎ চমকে গিয়ে যেত, বললো, অ্যা, কী বললি?
হেমন্ত ভালো করে চাইতে পারছে না, কষ্ট করে চোখ বড় বড় করে বললো, কী বলেছি, ভুল কিছু বলেছি?
–সরস্বতী কোথায় পেলি। পদ্মফুলই বা কোথায় পেলি। গাঁজার ধোঁয়াটা পদ্মফুল হয়ে গেল?
–হোক না, ক্ষতি কি? তবে, সরস্বতীর বদলে গায়ত্রী এলেও আমি কম খুশী হতুম না। গায়ত্রীও চমৎকার কীরকম টিকোলো নাক, ঠিক যেন ডবল শুজিয়া।
–বদলে মানে? সরস্বতী বদলে মানেটা কী?
পরীক্ষিৎ আর হেমন্ত দু'জনেরই নেশা ধরে গেছে, অন্যরা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। হেমন্ত অদিতি নামটা ভুলে গেছে তার বদলে সে বলছে সরস্বতী এবং জোর দিয়ে বলতে চাইছে, সরস্বতীর বদলে গায়ত্রীরই আজ আসা উচিত ছিল, কারণ গায়ত্রীর নাকের সঙ্গে অন্য কোনো মেয়ের নাকের যেনো তুলনাই হয় না।
তপন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এবার চলি। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।
সুবিমল বললো, হ্যাঁ দমদম, অনেক দূর, শ্যামবাজার থেকে বাস পাবেন?
তপন বললো বাস না পেলে হেঁটে যাবো। আমার অভ্যেস আছে।
হেমন্ত বললো, গ্রামের ছেলে, হাঁটার অভ্যেস আছে। নস্টালজিক কবিতা বানাতে বানাতে যশোর

রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে বর্ডার পার হয়ে একেবারে সরাইল পর্যন্ত তা ভাই অতদূরে যাবেন, দুএকটা টান দিয়ে গেলে হতো না?
পরীক্ষিৎ তপনের হাত চেপে ধরে হুকুমের সুরে বললো, হ্যাঁদুটো টান দিয়ে যাও। শুধু মুখে চলে যেতে নেই।
সুবিমল বললো, খালি পেটে হাঁটতে কষ্ট হবে ভাই। একটু দম নিয়ে নাও।
তপন কোনোদিন গাঁজা খায়নি। সে দ্বিধা করতে লাগলো। মানিকদা জানতে পারলে কী বলবেন? একদিন তিনি বলেছিলেন, আধুনিক কবি সাহিত্যিকরা অবক্ষয়ী মানসিকতার শিকার। সে হাত ছাড়িয়ে নিল খানিকটা জোর করেই।
এক সময় এদের আড্ডার দল ভাঙলো। অবিনাশ বললো, আমি একবার রশীদের কাছে যাবো। ছেলেটা স্পাই স্পাই বলে ধরা পড়ে গেল কিনা তা একটা খোঁজ নেওয়া দরকার।
পরীক্ষিৎ বললো, চল আমিও যাবো তোর সঙ্গে।
রশীদ থাকে পার্ক সার্কাসের কাছে একা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে। তার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন সবাই থাকে পাকিস্তানে। সাত আট বছর আগে সে কলকাতায় বেড়াতে এসে আর ফিরে যায়নি। তার যেতে ইচ্ছে করে না।
রাত বাড়ার পর রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে এসেছে। পার্ক সার্কাসের দিকটা একেবারে ফাঁকা। মেঘ সরে যাওয়ায় অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে এসেছে। সমস্ত বাড়ির দরজা, জানলা বন্ধ। রশীদ থাকে রাস্তার ধারে দোতলার একটা ঘরে। অবিনাশ আর পরীক্ষিৎ ছোট ছোট ইঁট কুড়িয়ে ওর জানলায় ছুঁড়ে মারতে লাগলো।
একটু বাদে জানলা খুলে রশীদ জিজ্ঞেস করলো কে?
অবিনাশ বললো, নিচের গেট খুলে দে।
নিচে এসে রশীদ এক গাল হেসে বললো, তোরা এত রাতে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস? ভয়-ডর নেই?
অবিনাশ বললো ভয়ের কী আছে? দাঙ্গা কিংবা কারফিউ তো না, শুধু ব্ল্যাক আউট।
রশীদ বললো, তোরা জানিস না কী সব কারবার হচ্ছে। এরকম ফাঁকা রাস্তায় লোকজন দেখলে পাবলিক তাদের ছত্রীবাহিনী বলে পেটাচ্ছে। আমাদের কী হয়েছিল শুনিসনি? খুব জোর বরাতে বেঁচে গেছি। আয়, ওপরে আয়!
ঘরে কোনো খাট নেই, মেঝের ওপর তোশক পাতা আর চারদিকে অসংখ্য বই ও পত্র-পত্রিকা। এক পাশে একটি স্পিরিট স্টোভ, একটা সসপ্যান, দু'চারখানা কাপ-প্লেট। এই নিয়ে রশীদের সংসার। রশীদের কাছে পৌনে এক বোতল হুইস্কি আছে, সেটা দেখে পরীক্ষিৎ যেন ধরে প্রাণ গেল। গেলাম মাত্র একটিই তার থেকেই চুমুক দেবে তিন জন।
রশীদ শোনালো তার অভিজ্ঞতা। শক্তি সুনীল শরৎদের সঙ্গে ও গিয়েছিল ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে বেলপাহাড়ী নামে একটা জায়গায়। কাছেই কলাইকুণ্ডায় এয়ারফোর্সের বেস। ওখানে পাকিস্তানী ছত্রীবাহিনী যে-কোনো সময় নামবে এই গুজবে সবাই সন্ত্রস্ত। অচেনা লোক দেখলেই সন্দেহ। ওরা এসব খেয়াল করেনি, ফাঁকা মাঠে বসে মহুয়া খেতে খেতে গান গাইছিল, হঠাৎ এক বিশাল জনতা ওদের ঘিরে ধরে। ছত্রীবাহিনীর লোকেরা ফাঁকা মাঠে বসে গান গাইবে কিনা সে প্রশ্ন কারুর মনে এলো না, হিংস্র জনতা শেষ পর্যন্ত হয়তো ওদের নিচু করে ফেলতো মাঝখানে দু'এক জনের হস্তক্ষেপে ওদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো থানায়।
অবিনাশ ভুরু তুলে বললো, কী সর্বনাশ, রশীদ, তুই ও ওদের সঙ্গে গিয়েছিলি কোন আক্কেলে? তুই যে সত্যিই পাকিস্তানী। ওরা যদি তোর প্যান্টুল খুলে মিলিয়ে দেখতো?
রশীদ বললো, শরৎদা আমার নাম করে দিল রতন চৌধুরী। আমাকে ওরা কিছু বলার আগে শরৎদা নিজের প্যান্টের বোতাম খুলে...
তিনজনে হাসতে লাগলো তুমুল মজায়। যেন একা কোনো বিপদের গল্পই নয়। যেন পুরো যুদ্ধটাই একটা হাস্য কৌতুকের ব্যাপার।
পরীক্ষিৎ এক সময় পকেট থেকে অবশিষ্ট গাঁজার পুরিয়াটা বার করে বললো, আমি আজ রাত্তিরে আর বাড়ি ফিরছি না। রশীদ আমি তোর এখানেই থাকবো।

কেউই অবশ্য আর বাড়ি গেল না। আড্ডায় আড্ডায় সময় গড়িয়ে গেল অনেকখানি। নেশার দ্রব্য সব ফুরিয়ে গেলে ওরা আবার বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। রাত এখন প্রায় দুটো। মেঘ সরে গিয়ে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না ফুটেছে রাস্তা দেখতে কোনো অসুবিধে হয় না। নির্জন রাত্রির রাজপথের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে, ওরা সেই সৌন্দর্যটা ভাঙতে লাগলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গেয়ে। অবিনাশ একটা গান বানালো, ওরে আয় রে উড়ে লাহোর থেকে একটা ছোট জঙ্গি বিমান, গোটা দশেক বোম্ ফেলে যা এই শহরে... । সেই গানে লাগালো একটা পরিচিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর।

কারফিউ আর ব্ল্যাক আউটের রাতে তফাত আছে। ব্ল্যাক আউটের মধ্যে কেউ বাইরে বেরুলেও পুলিশের আপত্তি থাকার কথা নয়। একটা পুলিশের গাড়ি ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার গতি মন্দ করলো, তারপর আবার ওদের অগ্রাহ্য করে চলে গেল।

ওরা চলেছে শ্মশানের দিকে। একমাত্র সেখানেই এত রাত্রে জীবনে স্পন্দন টের পাওয়া যাবে। সেখানে সিগারেট, গাঁজা এমনকি দেশি মদও পাওয়া যাবে। শ্মশানের ব্ল্যাক আউট নেই!

॥ ৩৩ ॥

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে সন্ধেবেলা একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন প্রতাপ। সিগারেট টানছেন আপন মনে, চোখের দৃষ্টি ভাসা ভাসা। এক এক মানুষ কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার কার্য কারণ ভুলে যায়, নিজেই যায় কিন্তু নিজেকেই প্রশ্ন করে, কেন এলাম? সেই সময় তার মুখের চেহারাও হয় অন্যরকম।

আদালত থেকে প্রতাপ কিছু জরুরি কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন, বাড়ি ফেরারই কথা ছিল, হঠাৎ কেন যেন তাঁর ভাবান্তর হলো, আদালির হাতে ফাইলপত্তর দিয়ে বললেন, কাল সকালে এগুলো আমার বাড়িতে নিয়ে আসিস। তারপর তিনি চড়ে বসেছিলেন একটি বিপরীতমুখী। দু'বার যানবাহন বদল করে প্রতাপ এ পর্যন্ত এসেছেন। কিন্তু কেন এসেছেন?

উত্তরটা প্রতাপ জানেন। কিন্তু নিজের কাছেও সেটা স্বীকার করতে চান না। অনেক রকম মানসিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটা টানেই প্রতাপকে হঠাৎ এতদূর আসতে হয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়া বেশ জটিল।

সাদা রঙের প্যান্ট শার্টের ওপর প্রতাপ একটা পাতলা নীল সোয়েটার পরে আছেন, পায়ে শু মোজা। অন্যদিন প্রতাপ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে এই সব বদলে স্নান সেরে, লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকেন। তাঁর মাথাটি কদম ফুলের মতন, মাতৃশ্রাদ্ধের পর এখনো ভালো করে চুল গজায়নি। বয়েস হয়ে গেলে চুল গজাতে দেরি লাগে।

দেওঘরে মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই প্রতাপ আর একটি নিদারুণ মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন। মৃত্যু নয়, আত্মহত্যা, দিল্লিতে সুলেখা শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে, নিজের রূপ নিজে নষ্ট করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

সে সংবাদে প্রতাপ দারুণ আঘাত পেলেও তার প্রতিক্রিয়া যেন খুব গভীরে প্রবেশ করেনি। মায়ের মৃত্যুতে প্রতাপ তখন খুবই আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। তখন দিল্লিতে গিয়ে ত্রিদিবের পাশে দাঁড়ানোও সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কী কারণে, কিসের দুঃখে, কিসের দুঃখে কোন্ যন্ত্রণায় সুলেখা এমন একটা সাঙ্ঘাতিক সিদ্ধান্ত নিল তাও তিনি জানেন না।

মাসখানেক আগে ত্রিদিব এসেছিলেন কলকাতায়? তাঁর সঙ্গেও কথা হলো না ভালো করে। প্রতাপ আশঙ্কা করেছিলেন ত্রিদিবের মতন সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ এত বড় আঘাত সামলাতে পারবেন না, ভেঙে পড়বেন একেবারে। কিন্তু ত্রিদিবকে দেখে প্রতাপ একেবারে অবাক। এ যেন একজন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ, সেই লাজুক ধীর স্থির ভাবটি একেবারেই নেই। কাটা কাটা পরিষ্কার কথা, শোকের সামান্য চিহ্নও নেই মুখের ভাবে, ভুরু দুটি কোঁচকানো, যেন সুলেখা এ রকম একটা নাটকীয় কাজ করে ফেলায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত।

সুলেখার সেই চরম দিনের ঘটনা নিয়ে কোনো আলোচনাই করলেন না ত্রিদিব, তিনি কলকাতায় এসেছিলেন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে। তালতলার বাড়িটি তিনি বিক্রি করে দিতে চান, প্রতাপ কিনে নিতে রাজি থাকলে তিনি যে-কোনো দামে দিয়ে দিতে রাজি এমনকি প্রতাপ পুরো টাকা এখন দিতে

না পারলেও চলবে। ত্রিদিব লন্ডনে একটা চাকরি পেয়েছেন, আগে থেকেই অফার ছিল, এখন সেখানে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত পাকা করতেই তিনি যেন খুব ব্যস্ত।

স্বপ্নেও বিলাসিতা করে প্রতাপ বাড়ি কেনার কথা ভাবতে পারেন না। সরকার তাঁকে এমন মাইনে দেন না যাতে সংসার খরচ চালাবার পরও কিছু সাশ্রয় করা যাবে। দুই ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ, তুতুলের ডাক্তারি খরচ চালবার পরও কিছু সাশ্রয় করা যাবে। দুই ছেলে মেয়ের পড়ার খরচ, তুতুলের ডাক্তারি পড়ার খরচ, এই সবে প্রতাপ একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছেন। আগেকার চক্ষুলজ্জা আর নেই, সুপ্রীতি গয়না বিক্রির প্রস্তাব দিলে তিনি শেষে আর অরাজি হন নি। তবে, সুপ্রীতির গয়নাও আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। বিমানবিহারীর কাছেও প্রতাপের অনেক ঋণ জমে গেছে।

খুব তাড়াহুড়ো করে, প্রায় জলেই দরেই বাড়িটি এক মাড়োয়ারির কাছে বিক্রি করে দিলেন ত্রিদিব। তারপর সেই টাকার কিছু অংশ তিনি দিতে চাইলেন তাঁর দুই বোনকে। সে কথা শোনা মাত্র প্রতাপ বললেন, এ প্রশ্নই ওঠে না। বাড়ির মালিক একা আপনি, আপনার বাবা আপনার নামে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন, আপনার বোনদের কোনো রকম লিগ্যাল রাইট নেই...

প্রতাপের কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ত্রিদিব বলেছিলেন, আপনি আমাকে ল দেখাচ্ছেন কেন, টাকাটা তো আপনাকে দিচ্ছি না, দিচ্ছি আমার বোনদের।

মমতাও সে টাকা প্রত্যাখ্যান করলেন। মমতা খুব ভালো ভাবেই জানেন, এখন তাঁর হাতে পাঁচ দশ হাজার টাকা এলেও তা সংসারের কত প্রয়োজনে লাগবে, কিন্তু পাছে অভাবের

তাড়নায় লোভের একটা নগ্ন রূপ বেরিয়ে পড়ে এবং পরে তার জন্য আত্মগ্লানিতে ভুগতে হয় সেই জন্যই তিনি তাড়াতাড়ি না বলে দিলেন। তাঁর বোন বিনতারও সেই এক কথা। বিনতার স্বামী সুকেশের বদলির চাকরি, এখন ওরা রয়েছে কোচিন শহরে, তাদের অবস্থাও ভালো। ত্রিদিবের চিদিবের চিঠি পেয়ে বিনতা জানালো যে দিদি যা ঠিক করবে সে তাই-ই মেনে নেবে, তার স্বামীও প্রতাপদার সঙ্গে একমত যে ঐ বাড়ির ওপর তাদের কোনো দাবি নেই।

ত্রিদিব যেন বেশ ক্ষুণ্ন হলেন বোনদের এই ব্যবহারে। মমতাদের বাড়িতে তাঁর একদিন খেতে আসার কথা, সেদিন এলেন না। দু'দিন পরে এলেন গম্ভীর হয়ে রইলেন আগাগোড়া। সুপ্রীতি সুলেখার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে গেলেন, 'কী জানি কী হয়েছিল' বলে। এক সময় তিনি শুধু প্রতাপকে বলেছিলেন, আমার বন্ধু শাজাহানকে পুলিশে আটকে রেখেছে জানেন তো? পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ তো মিটে গেছে এখনও ওদের ছাড়ে না কেন? আপনি একটু দেখুন না, চেষ্টা চরিত্র করে শাজাহানকে ছাড়াতে পারেন কি না।

প্রতাপ শুকনো ভাবে হেসে বলেছিলেন, আমি সামান্য সাব জজ। আমার কী ক্ষমতা আছে? ওসব তো স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ব্যাপার।

ত্রিদিব দেওয়ালের উঁচুর দিকে চোখ তুলে বলেছিলেন, যাওয়ার আগে শাজাহানের সঙ্গে দেখা হলো না।

ত্রিদিব সব সম্পর্ক চুকিয়ে চলেই গেলেন শেষ পর্যন্ত। বিলেতের গ্লাসগো শহর থেকে সংক্ষিপ্ত দু'লাইনের পৌঁছ-সংবাদ পাঠিয়েছেন।

প্রবাসী ত্রিদিবের সেই চিঠিখানা হাতে নেবার পরেই প্রতাপের চোখে প্রথম ভেসে উঠলো ছবিটা। প্রজ্বলন্ত সুলেখা, ঘরে মধ্যে নয়, বাড়ির ছাদে সেই বাড়ি যেন কুতুব মিনার সংলগ্ন, চারপাশে ইতিহাসের সাক্ষ্য, অন্ধকার আকাশের নিচে সুলেখা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার সর্বাঙ্গে লকলকে আগুনের শিখা। রূপের আগুন নয়, সত্যিকারের আগুন যা মায়া দয়াহীন, যা তীব্র যন্ত্রণা দিয়ে শরীরের মাংস মজ্জা পোড়ায়। কেন সুলেখা চলে গেল অমনভাবে কার ওপর অভিমানে? এইটুকু জেনেছেন প্রতাপ যে সুলেখার অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য ত্রিদিবকে পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি, সুলেখা নিজের হাতে আত্মহত্যার স্বীকারোক্তি লিখে গিয়েছিল, সে কারুকে দায়ী করেনি।

ঐ ছবিটা কল্পনা করেই প্রতাপের বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠেছিল। অসহ্য এক ব্যথা ঠিক যেন শরীরিক বুকের ব্যথা। যেন সহ্য করা যাবে না। সুলেখা সত্যিই চলে গেল, আর তার সঙ্গে কোনো দিন দেখা হবে না? সুলেখার সঙ্গে তাঁর প্রেম-ভালোবাসা ছিল না। আবার শুধু আত্মীয়তাও নয়, একটা অন্য সম্পর্ক, চোখে চোখে কিছু একটা কথা, কোনোদিন সুলেখার শরীর ছুঁতে হয়নি প্রতাপকে তবু সুলেখা ঠিকই জানতো। তালতলার বাড়িতে এখন অন্য লোক থাকে। ত্রিদিব তাড়াহুড়ো করে চলে

গেল ইংল্যান্ডে, সুলেখার সব চিহ্নও কি মুছে গেল তা হলে?

কয়েকটা দিন সুলেখার স্মৃতিতে বিভোর হয়ে রইলেন প্রতাপ। সুলেখার দু'একটা টুকরো কথা, নিষ্কলুষ হাসি, তার যতনায় হাত, এই সব কিছুই যেন এখনো জীবন্ত। সুলেখা দিল্লিতে ছিল, অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, তবু প্রতাপ কোনো অভাব বোধ করেননি, এ পৃথিবীর কোনো একটা প্রান্তে সুলেখার থাকাটাই যথেষ্ট ছিল। এই পৃথিবী তাকে সহ্য করতে পারলো না? গড়-মানুষের চেয়ে যারা অনেক উঁচুতে যাদের রূপ গুণ ব্যবহার অন্য অনেকের চেয়ে অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর তাদেরই কেন অকালে চলে যেতে হয়? যেমন তাঁর ছেলে পিকলু? রাস্তায় ঘাটে অনেক ছেলেকেই তো দেখেন প্রতাপ, কিন্তু পিকলুর মতন অমন নম্র ভদ্র, প্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল একজনকেও তো মনে হয় না। নিজের ছেলে বলেই কি তিনি বাড়িয়ে ভাবছেন? পিকলুকে সবাই ভালোবাসতো, এখনো তো কেউ কেউ পিকলুর নাম উঠলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তাঁর ছোট ছেলে বাবলুও তো পিকলুর তুলনায় কিছুই না। সামান্য জলে ডুবেওরকম একটা প্রাণ নষ্ট হয়ে গেল, প্রকৃতির কি কোনো যুক্তিবোধ নেই?

সুলেখার মৃত্যুর তিন মাসবাদে সুলেখার শোকে এমন আহত হলেন প্রতাপ, তা যেন মাতৃশোকের চেয়েও বেশি। মায়ের জন্য নয়, মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মালখানগরের বাড়ি, প্রতাপের বাল্য কৈশোর যৌবনের বহু স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। সেইজন্যই প্রাতপ যেন বেশি মোহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। মায়ের যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল, মা চলে যাবেন, এজন্য কি প্রতাপ মনে মনে কিছুটা তৈরি হয়ে ছিলেন না? বিশেষত আগেরবার ওস্তাদজীর পাগলামি আর মায়ের স্তব্ধ জড় ভাব দেখেই কি তাঁর মনে হয়নি যে আর বেশিদিন পারবেন না মাকে? মৃত্যুর আগে মা যে একবার মালখানগরে নিয়ে যাবার জন্য ছেলের কাছে কাকুতি মিনতি করেছিলেন, তখন প্রতাপ নিজের অসহায় অবস্থার জন্যই কষ্ট পেয়েছিলেন বেশি।

বাড়িতে, আদালতে, বাথরুমে, ঘুমের আগে, ঘুমের মধ্যেও কয়েকদিন প্রতাপ সুলেখার স্মৃতিতে কাতর হয়ে কাটালেন। সত্যিকারের দুঃখ তিনি নিবেদন করলেন সুলেখাকে। তারপর সুলেখার বদলে অন্য একটা মুখের ছবি এসে পড়লো।

এ যে কী এক বিচিত্র রসায়ন। কোন স্মৃতি যে অন্য কাকে কোথা থেকে টেনে আনে তা কিছুতেই বোঝা যায় না। ডার্ক রুমে একটি নেগেটিভ প্রসেস করতে গিয়ে যেন সেখানে ফুটে উঠলো অন্য একটি ছবি।

সুলেখার কথা ভাবতে ভাবতে প্রতাপের হঠাৎ একদিন মনে পড়লো বুলার কথা।

বুলাও কি সুলেখার মতন চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে? কিংবা সে কোথায় কী ভাবে আছে? এই চিন্তা প্রতাপকে উদ্বেলিত করে তুললো। এবারে দেওঘর গিয়ে প্রতাপ বুলার খোঁজ করেননি, সে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বুলা দেওঘরে থাকলে কি মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে একবারও আসতো না? না তা হতেই পারে না। তাছাড়া অত ব্যস্ততার মধ্যেও বুলার নাম একবার প্রতাপের কানে এসেছিল। বুলাকে কে যেন ডাকতে গিয়েও ফিরে এসেছে।

সুলেখার মতন বুলার সঙ্গেও যদি তার দেখা না হয়? কী ভাবে যেন বুলা সম্পর্কে প্রতাপের মনের মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ রয়ে গেছে। যদিও এ কথাটা মমতাকে বলা যায় না। কিসের দায়িত্ব, বাস্তবিক ব্যাপারে কিছুই না হতো।

বুলার শ্বশুরবাড়ি টালিগঞ্জে। বুলার দেওর সত্যেন বেশ একজন কেউ কেটা হয়েছে, কাগজে টাগজে মাঝে মাঝে তার নাম দেখা যায়। ক্যালকাটা ক্লাব, রোটারি ক্লাব, মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে দান এই সব ব্যাপারে সে যুক্ত। বুলার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা পেতে পারে।

প্রতাপ কি বুলার সঙ্গে দেখা করার জন্য এতদূর এসেছেন? যে কেউ এই প্রশ্ন করুক,, প্রতাপ দৃঢ় স্বরে উত্তর দেবেন কক্ষণো না। নিজে থেকে বিনা আমন্ত্রণে সত্যেনের মতন ঐ স্কাউনড্রেলটার বাড়িতে যাবেন তিনি? প্রতাপ মজুমদারের ব্যক্তিত্বের এখনও অত অধঃপতন হয়নি।

মনকে চোখ ঠারার জন্য প্রতাপ আর একটা যুক্তিও তৈরি রেখেছেন। দিন তিনেক আগে প্রতাপ খবর পেয়েছেন যে তাঁর মেজোমামা খুব অসুস্থ। ইনি প্রতাপের আপন মামা নন, তাঁর সৎ মায়ের ভাই, অর্থাৎ কানুর মামা। এই ভন্তু মামা অর্থাৎ জলধি বোসের সঙ্গে প্রতাপের কোনোকালেই ঘনিষ্ঠতা ছিল না, ইনি কানুকে নিজের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, এর ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলার ধরনটা প্রতাপ এককালে খুবই অপছন্দ করতেন। কিন্তু বয়েস হলে মানুষ হয়তো কিছুটা বদলায়। প্রতাপের মায়ের

মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইনি দেখা করতে এসেছিলেন এবং সুহাসিনীর নাম করে অশ্রু বর্ষণ করেছেন। প্রতাপের মাকে তিনি নাকি নিজের বোনের মতনই দেখনে, যদিও দেশ বিভাগের পর এতগুলি বছরে তিনি প্রতাপদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই দেখতেন, যদিও দেশ বিভাগের পর এতগুলি বছরে তিনি প্রতাপদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখেননি, ছেলে মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করা ছাড়া। কুম্ভীরাশ্রু হোক আর যাই-ই হোক, তবু বয়স্ক মানুষটি এসেছিলেন তো সুহাসিনীর শ্রাদ্ধে। তাঁর দুই ছেলে রাস্তা তৈরির কন্ট্রাককটরি করে এর মধ্যে বেশ ধনবান হয়েছে জলধি বোস গাড়ি কিনেছে, প্রতাপের সঙ্গে তিনি পুরোপুরি সর্ম্প ছেদ করতেও তো পারতেন। এখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ভদ্রতার বিনিময়ে প্রতাপের একবর দেখতে যাওয়া উচিত। অবশ্য জলধি বোসের বাড়ি টালিগঞ্জের দিকে হলে কি প্রতাপের মনে এই কর্তব্যবোধ জাগতো?

কিন্তু টালিগঞ্জ পর্যন্ত চলে এসেও প্রতাপের এখন এই সন্ধেবেলা একজন ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধের বিছানার পাশে গিয়ে বসতে একটুও ইচ্ছে করছে না। তিনি বেকার ছেলে ছোকরাদের মতন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে। ঘনিয়ে এসছে সন্ধে, শীতের প্রাক্কালে সমস্ত বড়ির উনুনের ধোঁয়া ওপরে উড়ে যেতে চায় না, ঝুলে তাকে জমাট বেঁধে রাস্তার আলোগুলো ফ্যাকাসে মনে হয়। এখানে রাস্তা বেশ সরু। তারই মধ্য দিয়ে ট্রাম বাস ঘোড়ার গাড়ি রিকশা জড়ামড়ি করে শ্লথগতিতে চলেছে। বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি হয়নি তবু এখানে সেখানে কাদা সব মিলিয়ে বিশৃঙ্খল, নোংরা নোংরা ভাব। এই জায়গাটায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কোনো দৃশ্য উপভোগ করার উপযোগী নয়। প্রতাপ অবশ্য পথের কোনো চলন্ত দৃশ্যই দেখছেন না।

বুলা কেমন আছে এইটুকুই শুধু জানতে চান প্রতাপ, আর কিছু না। কিন্তু হুট করে বুলার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যেনকে তিনি কিছুতেই পছন্দ করতে পারেননি, সত্যেনও তা জানে। ও বাড়ির আর কেউ প্রতাপকে চিনবে না। প্রতাপ কী করে মুখ ফুটে বলবেন, আমি বুলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ভন্তু মামা অসুস্থ, কিন্তু তিনি কি মৃত্যুশয্যায়? তা না হলে আর তাঁকে দেখতে যাওয়া নিয়ে আদিখ্যেতা করার কী আছে? উনি মারা গেলে ওর শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হলেই প্রতাপের কর্তব্য সারা হবে। এখন ভন্তু মামাকে খুশী করার কোনো দায় নেই প্রতাপের।

প্রতাপ ফিরে যাবার চিন্তা করেও ফিরতে পারলেন না, ধরা পড়ে গেলেন। একটা সাইকেল রিকশা থেমে গেল তাঁর অদূরে একটি তরুণ দম্পতি তার থেকে নেমে এগিয়ে একলো তাঁর দিকে। যুবকটি ডেকে উঠলো প্রতাপদা। তারপর দু'জনেই নিচু হয়ে প্রণাম করলো প্রতাপের পায়ে হাত দিয়ে। প্রতাপ তাদের একেবারেই চিনতে পারলেন না।

যুবকটি বললো, প্রতাপদা, তুমি এখানে? এই আমার বউ জয়ন্তী, তুমি তো ওকে দেখোনি, আমাদের বিয়েতে তুমি আসতে পারোনি, কিন্তু বড়দি এসেছিল তুতুলকে নিয়ে। তারপর তো আর কোনো যোগযোগই নেই।

প্রতাপ অনেকটা আন্দাজে বুঝলেন যে এই যুবকটি তাঁর এক বৈমাত্রেয় মামাতো ভাই। খুব ছোট বয়েসে দেখেছেন নিশ্চয়ই। পনেরো কুড়ি বৎসরের ব্যবধানে সেই সব বাল্যকালের মুখ আর চেনা যায় না। প্রতাপ আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে উদাসীন, সুতরাং তাদের চেহারা ও নামও নিজের স্মৃতিতে জায়গা জুড়ে রাখেননি।

প্রতাপ এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন, তার উত্তর দেওয়াও সহজ নয়। এই যুবকটিকে মামাতো ভাই হিসেবে নিশ্চিত জানলে অনায়াসে বলা যেত যে, তোমাদের বাড়িতে যাবার জন্যই তো এখানে এসেছি। কিন্তু সে রকম উত্তর দিলে মিথ্যে বলা হতো। প্রতাপের মনের মধ্যে সত্যি মিথ্যের বিভাজন রেখা অতি স্পষ্ট। ভন্তু মামার কথা আংশিক মনে রেখে এ পর্যন্ত এলেও একটু আগেই প্রতাপ তাঁ বাড়িতে আজ যাবেন না ঠিক করেছিলেন।

আর দু'একটি কথার পর প্রতাপ বুঝতে পারলেন, এই ছেলেটি ভন্তু মামার বড় ভাই, অর্থাৎ তাঁর নন্তুমামার সন্তান। এর নাম অনিরুদ্ধ। সে তাদের বাড়িতে প্রতাপকে নিয়ে যাবার জা পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। প্রতাপ তবুও বললেন না, তিনি ওদের বাড়িতে যাওয়ার কথা ভেবেই এতদূর এসেছেন।

অনিরুদ্ধের স্ত্রী জয়ন্তী বললো, দাদা আমার বিয়ের আগে আমাকে আপনার ছেলে বাড়িতে এসে

পড়াতো। অসীম মজুমদার অঙ্কের খুব ভালো ছাত্র, আমার দাদার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন, তখন তো জানতাম না....

প্রতাপ চমকে উঠলেন। অসীম মজুমদার তার মানে পিকলু। হ্যাঁ হাত খরচ চালাবার জন্য পিকলু দু'এক জায়গা টিউশনি করতো বটে। এই মেয়েটিকে পড়াতো পিকলু। এই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তিনি যেন পিকলুর খানিকটা যোগসূত্র পেয়ে গেলেন। এই মেয়েটির স্মৃতিতে পিকলু রয়ে গেছে।

অনিরুদ্ধর কথা শুনে প্রতাপ দোনামনা করছিলেন, জয়ন্তীর কথা শুনে তিনি রাজি হয়ে গেলেন বললেন, চলো তোমাদের বাড়ি তাহলে ঘুরেই আসা যাক। তোমাদের এই নতুন বাড়ি তো আমি দেখিনি।

আর একটা সাইকেল রিকশা ডাকা হলো। ট্রাম ডিপো থেকে বেশ দূরে অনিরুদ্ধদের বাড়ি একেবারে রিফিউজি কলোনির মধ্যে। আশেপাশে অনেকগুলি টিনের চালার ঘর তার মধ্যে এই একটা তিনতলা পাকা বাড়ি। প্রতাপের এই মামারা আগে থাকতেন ভাড়া বাড়িতে, বছর তিনচারেক হলো এই নতুন বাড়ি হয়েছে। এই জবরদখল রিফিউজি কলোনিতে নন্তু মামা ভন্তু মামারা কী করে যেন নিজেদের জন্য খানিকটা জমি দখল করে রেখেছিলেন।

এ বাড়িতে এখনও একান্নবর্তী পরিবার। নন্তু মামা মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েরা রয়েছেন এ বাড়িতেই, ভন্তু মামার দু'ছেলে টাকা রোজগার করছে চার হাতে, গিট্টু নামে আরও একজন মামা আছেন এ বাড়িতে যিনি প্রতাপের প্রায় সমবয়েসী, তিনি বিয়ে করেননি। প্রতাপের মনে পড়লো এই গিট্টুমামার বেশ মাথার দোষ আছে, প্রায়ই এর কোমর থেকে ধুতি খুলে যেত, একটা অস্বাভাবিক বড় পুরুষাঙ্গ দেখার স্মৃতি প্রতাপের এতদিন পরেও মনে পড়ে গেল। গিট্টু মামা এখন প্যান্ট পরেন আগেকার দিনের সাহেব শ্রমিকদের মতন শোলডার স্ট্র্যাপ দিয়ে সেই প্যান্ট টেনে রাখা হয়েছে।

সবাই মিলে বেশ খাতির যত্ন করতে লাগলো প্রতাপকে। মধ্য বয়স্ক পুরুষ হলেও প্রতাপের এটা তো মামার বাড়ি। এ বাড়িতে বাঙাল রীতিনীতি সবই পুরোপুরি চলছে। মহিলারা নির্ভেজাল বাঙাল কথা বলেন, ঘর দোর অগোছালো, বসবার ঘরের মেঝেতে মুড়ি ছড়িয়ে আছে, কথাবার্তার অধিকাংশই অমুক কেমন আছে আর তমুক এখন কোথায়।

ভন্তু মামা তেমন কিছুই অসুস্থ নন, মাত্র দু'সপ্তাহ আগে একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন দিব্যি হাঁটাচলা করছেন এবং মাঝে মাঝে গড়গড়ায় তামাক টানছেন। গ্রামের বয়স্ক পুরুষদেরও প্রতাপ কখনো অসুখ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখেননি। এই অবস্থায় ভন্তু মামাকে একজন অসুস্থ মানুষ হিসেবে দেখতে আসা খুব লজ্জার ব্যাপার হতো।

ইচ্ছের বিরুদ্ধেও প্রতাপকে গুটি তিনেক সন্দেশ খেতে হলো মামীদের উপরোধে। এর পর চায়ের প্রস্তাব শুনে তিনি আরও সঙ্কিত বোধ করলেন। যে বাড়িতে অনেক লোক, সে বাড়িতে সাধারণত চা বেশি বিস্বাদ হয়। পেয়ালা পিরিচ ঠিক মতন ধোওয়া থাকে না। কিন্তু জয়ন্তী নামের মেয়েটি একটি পাতলা, পরিচ্ছন্ন কাপে বেশ সুন্দর সৌরভময় চা এনে তাঁকে চমকে দিল। জয়ন্তীকে কাছে বসিয়ে তিনি তার বাপের বাড়ি গল্প শুনতে লাগলেন। জয়ন্তীর বাপের বাড়ি স্কটিশ চার্চ কলেজের কাছেই গোয়াবাগানে, পিকলু তাকে পড়াতে যেত সপ্তাহে তিনদিন সন্ধেবেলা..।

এক সময় ভন্তুমামা জিজ্ঞেস করলেন, খোকন, তুমি বাড়ি টাড়ি করেছো নাকি কোথাও?

প্রতাপ মাথা নেড়ে বললো আজ্ঞে না।

ভন্তুমামা গড়গড়ার নল ঠোঁটে দিয়ে বললেন জমি কিনে রেখেছিস? জমির যা দাম বাড়ছে দিন দিন।

প্রতাপ বললো না, জমিও কিনিনি কোথাও। বাড়ি করার কথা ভাবিনি কখনো।

–বাড়ি না হয় পরে হবে, কিন্তু জমি কিছুটা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। তোরা রিফিউজি কার্ড করেছিস না? এই রকম কোনো রিফিউজি এরিয়ায় যদি অন্তত পাঁচ দশ কাঠা জমিও রেখে দিতিস দ্যাখ না, আমাদের এ বাড়ির জন্য এক আধলাও জমির দাম দিতে হয় নাই...

হঠাৎ দপ্ করে প্রতাপের মাথায় জ্বলে উঠলো রাগ। ভন্তুমামার এই ধরনের কথার জন্যই প্রতাপ তাঁকে কোনোদিন পছন্দ করতে পারেননি। মালখানগরে মজুমদার বংশের ছেলে প্রতাপ মজুমদার সামান্য ভিখিরির মতন অন্যের জমি দখল করবেন? রিফিউজি কার্ড কিসের রিফিউজি কার্ড? প্রতাপরা তো রিফিউজি নন, পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল ঠিকই, সে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে এখনও সেইভাবেই

থাকেন, সরকারের কাছ থেকে তিনি এক পয়সা সাহায্য প্রত্যাশী নন।

জুতোর শব্দ করে প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এবার যাবো।

ভন্তুমামা বললেন, হ্যাঁ তা তো যাবিই, অনেক দূরে পথ, এসেছিস বড় খুশী হয়েছি। আবার আসিস। আমি যা বললাম, মনে রাখিস। নিজের নামে একটা জমি, বুঝলা না, ইন্ডিয়ায় এক টুকরো জমি করে না রাখলে সিটিজেনশীপ রাইট ঠিক তমন জন্মায় না। ওরে মানু তুতো পুনি তোরা প্রতাপদাদাকে গোটা বাড়িটা একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দে। একটু দেখে যা খোকন, কেমন বাড়ি করিছি। দক্ষিণখোলা, প্রত্যেক ফ্লোরে মোজেইক....

রিফিউজি কার্ডের সুযোগ নিয়ে জবরদখল জমিতে এ রকম তিনতলা বাড়ি হাঁকানো, প্রতাপের ঘৃণা হতে লাগলো। কিন্তু উপায় নেই, ভদ্রতার চাপে মুখ বুজে থাকতেই হবে। প্রতাপকে একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখতে হলো, অনিরুদ্ধ আর জয়ন্তী এমন কি ছাদেও নিয়ে এলো তাঁকে। প্রতাপের ছাদ দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তবু অনিরুদ্ধ বারবার বলতে লাগলো, আসুন না ছাদটা দেখলে ভালো লাগবে।

ছাদের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে গিট্টু মামা। মুখখানা নড়ছে কী যেন চিবোচ্ছেন। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখে কৌতূহলের হাসি, প্যান্টের দু'পকেটে হাত ঢোকানো। প্রতাপকে দেখে তিনি বললেন, খোকন, আজ রাত্তিরে এখানেই থেকে যা না। খাওয়া দাওয়া করবি, অনেকদিন তো আমাদের সাথে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিস না, তারপর আমার সাথে শুয়ে থাকবি....

বাল্য স্মৃতি আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠায় প্রতাপ প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, না, না, আমার এখানে থাকার উপায় নেই, আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে, দেরি হয়ে গেছে।

গিট্টুমামা থপ থপ্ করে ওদের পেছন পেছন ছাদে উঠে এলেন। বেশ প্রশস্ত ছাদ এখানে আরও একটি ঘর তোলার কাজ শুরু হয়েছে, সরঞ্জামগুলি এক পাশে স্তূপ করে রাখা।

অনিরুদ্ধ আর জয়ন্তী প্রতাপকে নিয়ে এলো কার্নিসের ধারে। জয়ন্তী একদিকে হাত তুলে বললো, এই দিকটা খুব সুন্দর, একেবারে ফাঁকা, এদিকে একটা খাল আছে।

অনিরুদ্ধ বললো, এই দিকটা পুরোপুরিই ছিল একজন মুসলমানের সম্পত্তি বুঝলে প্রতাপদা। ভদ্রলোক ধনী ছিলেন খুব এ দিককটায় নাকি বাগান ছিল, প্রায় দুশোটা ফ্যামিলি এখানে সেট্‌ল করেছে। ঐ যে বাড়িটা দেখছেন, একটু ডান দিকে তাকান, ঐ যে রেডিওর এরিয়ালওয়ালা বাড়ি ঐটা ছিল সেই মুসলমানের বসত বাড়ি।

প্রতাপ জয়ন্তীর কথা মতন ফাঁকা দিকটায় দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, এক ঝলকের জন্য বাড়িটার দিকে মুখ ফেরালেন।

অনিরুদ্ধ বললো, নারায়ণগঞ্জের এক ভদ্রলোক ঐ সেই বাড়ি। ঠিকানা দেখে বোঝা যায় কি যে এই দুটি বাড়ি এত কাছাকাছি হবে। সত্যেনদের বাড়িটার পেছন দিক যাচ্ছে, বেশি দূর নয়, দোতলার কয়েকটি ঘরে আলো জ্বলছে, কয়েকটি ঘর অন্ধকার। ওর কোনো একটি ঘরে বুলা থাকে। এখনো আছে বুলা? তাকে দেখা যাবে না।

গিট্টুমামা কী যেন বলছেন বিড়বিড় করে প্রতাপের সেদিকে কান নেই। তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দূরের বাড়িটার দিকে। মাঝখানে কিছুক্ষণ বুলার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, এখন বুলার কথা ভাবতেই সুলেখার কথা মনে পড়লো। তারপর দুটি মুখ মিলে মিশে এক হয়ে গেল।

॥ ৩৪ ॥

মেডিক্যাল কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাস থেকে কয়েকটা স্টপ আগে নেমে পড়লো তুতুল। জগুবাবুর বাজারের কাছে। এর আগে তুতুল কোনোদিন কোনো বাজারের মধ্যে ঢোকেনি, আজ সে ঢুকলো। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে তার বই খাতা কলেজে যাবার তাড়া থাকায় কোনোদিনই সে চুল বাঁধে না, একটা হলদে রঙের শাড়ি পরা, পায়ে রবারের চটি। সে মুদি দোকান খুঁজতে লাগলো.

আতপ চাল একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না। বিধবা হবার পর সুপ্রীতি আর সেদ্ধ চাল খান না, তাই দু'তিন দিন ধরে তিনি দিনের বেলা ভাতের বদলে সাবু কিংবা চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছেন। মমতা, তুতুল আর মুন্নিকে তিনি মাথার দিব্যি দিয়েছেন, এ কথা কিছুতেই যেন প্রতাপের কানে না যায়। সাবু

চিড়ে খেয়ে তিনি দিব্যি আছেন, কোনো অসুবিধে নেই, অম্বুবাচীর সময়েও তো তাঁকে ভাত ছাড়াই তিনদিন কাটাতে হয়।

বাড়ির পুরুষ দু'জন খেয়ালই করে না বাড়ির মেয়েরা কী খায় না খায়। অতীন নিজের খাবারটি পেলেই খুশী। প্রতাপও দু'বেলাই আলাদা খেতে বসেন। তাঁকে যা পরিবেশন করা হয়, বাড়ির অন্যরা তাই-ই খাবে, এটাই তিনি ধরে নিয়েছেন। চালের অনটনের কথা তিনি জানেন, সেইজন্যই দিনের বেলা ভাত আর রাত্তিরে রুটি চালু হয়েছে। প্রতাপের নতুন আদলি রওনক আলি তার হাওড়া জেলার গ্রামের বাড়ি থেকে কিছু চাল এনে দেবার প্রস্তাব জানিয়েছিল, প্রতাপ রাজি হননি। বাইরের জেলাগুলি থেকে কলকাতায় চাল আনা বে-আইনি, প্রতাপ তেমন কাজে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। যদিও রুটিতে তাঁর রুচি নেই, রুটি খেলে মন ভরে না।

তুতুল জানে তার মা একেবারেই রুটি খেতে পারেন না। রাত্তিরবেলা দুটো একটা রুটি দাঁতে কাটেন বাধ্য হয়ে, তাও জলে ভিজিয়ে রম করে। দিনের বেলা রুটি খাওয়ার চেয়ে চিড়ে মুড়ি-সাবুও ভালো।

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের উত্তেজনা শেষ হতে না হতেই খাদ্য সমস্যা হিংস্র দাঁত আর রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়েছে সারা দেশের ওপর। এ বছর ফসল ভালো হয়নি। আগামী বছর খাদ্য সংকট আরও বাড়বে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ বিরতি হলেও ভারতীয়দের ধারণা হয়েছে যে যুদ্ধে তারাই জিতেছে। জয়ের উম্মাদনায় চিৎকার করতে গিয়ে তারা দেখলো খালি পেটের জ্বালায় গলার জোর আসে না।

এই যুদ্ধে ব্রিটেন ও আমেরিকা পাকিস্তানের দিকে ঢলে ছিল বলে খবরে কাগজগুলিতে দিল্লির পার্লামেন্টে ঐ দুই দেশের প্রতি খুব উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এখন আবার সভয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে আমেরিকা গম পাঠাবে তো? পি এল-৪৮০ প্রকল্প চালু রাখবে তো? সোভিয়েত ইউনিয়ান ভারতকে অস্ত্র ও বন্ধুত্ব দিয়ে সাহায্য করলেও নিরন্ন ভারতীয়দের খাদ্য দিয়ে সাহায্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। বিশ্বের বাজার থেকে তাদেরও গম কিনতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কলকাতার ময়দানে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিতে এসে সাম্প্রতিক দেশপ্রেমের উম্মাদনাকে কাজে লাগাবার জন্য বললেন,এখন প্রকৃত দেশপ্রেম হলো কম খাওয়া। প্রতি সোমবার দেশের সমস্ত মানুষের উপোষ দেওয়া উচিত। অধিক খাদ্য ফলাতে হবে, সমস্ত পোড়ো, পতিত, অনাবাদী জমিতে ফসল ফলাতে হবে, এক ফসলী জমিকে দো ফসলী করতে হবে ইত্যাদি। এসব নিছক কথার কথা। দু'দশ বছরে এরকম উদ্যোগের ফল পাওয়া যায় না।

তুতুল জানে, তার মায়ের অ্যানিমিয়া আছে। তাছাড়া লো প্রেসার। ইদানীং যখন তখন একটা তীব্র পেট ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে সুপ্রীতি অনেক পরীক্ষা টরিক্ষা করিয়েও সে ব্যথার কারণটা ঠিক ধরতে পারেনি তুতুল। গতকালই তাদের এক প্রোফেসর পেটের রোগ সম্পর্কে পড়তে গিয়ে হঠাৎ তিক্ত ভাবে হেসে বলেছিলেন, আমি যে সব বই দেখে তোমাদের পড়াচ্ছি তোমরা যে-সব বই মুখস্ত করবে তাতে কোথাও লেখা নেই যে মানুষ যখন অনিচ্ছায় অনাহারে ভোগে খিদে আছে অথচ খাদ্য নেই, তখন তাদের কী কী রোগ হতে পারে। কোন ওষুধেই বা তাদের চিকিৎসা হবে। লালবাহাদুর তো বলে গেলেন সোমবার উপোস করতে এদিকে গ্রামের বহু মানুষ সপ্তাহে দু'তিন দিনও পেট ভরে খেতে পায় না।

মাকে নিয়ে তুতুল চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সুপ্রীতির সেই মনের জোর সেই তেজী ভাব একেবারেই যেন হারিয়ে গেছে এখন সর্বক্ষণ যেন মন মরা হয়ে থাকেন। না খেলে মাকে বেশিদিন বাঁচানো যাবে না। শুধু পেট ভরাই তো বড় কথা নয়, খেতে ভালো লাগারও তো একটা প্রশ্ন আছে। সুপ্রীতি ভাত খেতে ভালোবাসেন, ফেনা ভাতের সঙ্গে একটু আলুসেদ্ধ কাঁচা লঙ্কা হলেই তিনি তৃপ্তি পান। সেই সামান্য ভাতটুকুও তাঁকে দেওয়া যাবে না।

কলেজের সহপাঠীদের কাছেই তুতুল জেনেছে যে র‍্যাশনের বাইরেও বাজারের মুদি দোকানে গোপনে চাল বিক্রি হয়। কিন্তু তুতুল জানে না যে সেইভাবে চাল কিনতে গেলে একটু মুখ চেনার দরকার হয়। সে বাজারের মধ্যে ঢুকে এক একটি দোকানে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন চাল আছে, আতপ চাল? দোকানদাররা অন্য খদ্দেরদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে তারপর মাথা নেড়ে বলে, চাল? দোকানদাররা অন্য খদ্দেরদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে তারপর মাথা নেড়ে বলে, চাল? আমরা চাল রাখি না। দু'একজন চেনা খদ্দের হাসে।।

কয়েক দোকান ঘোরার পর একটি রোগা পাতলা ছেলে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, দিদি কতটা চাল নেবেন? এ দিকটায় সরে আসুন। থলে এনেছেন?

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, আতপ চাল আছে?

ছেলেটি মাথা নেড়ে বললেন, আতপ চাল কোথায় পাবেন? গোটা বাজার খুঁজলেও এক দানা পাবেন না। সেদ্ধ চাল দিতে পারি।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ার ভঙ্গিতে ছেলেটি বললো,তবে কামিনীভোগ দিতে পারি দাম অনেক বেশি পড়ে যাবে। সাড়ে দশ টাকা সের পড়ে যাবে।

তুতুল বললো, সেটাই নেবো।

যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তুতুলের তবু টাকা পয়সার হিসেবটা সে সদ্য বুঝতে শিখেছে। এতদিন সে বই পড়া ছাড়া আর কিছুই জানতো না। শুধু একটাই লক্ষ্য ছিল তার পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে। কলেজ যাওয়া আর কলেজে আসার বাইরে আর কোনো জীবন ছিল না তার। এই মাত্র মাস ছয়েক আগে তার জীবন বাঁক নিয়েছে অন্য একটা দিকে।

রোগা ছেলেটি তাকে নিয়ে এলো একটি কোণের দোকানে। বইরে না দাঁড় করিয়ে নিয়ে এলো ভেতরে। একজনকে ডেকে ফিসফিস করে বললো, ও দিনুদা এই দিদি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছেন, এঁকে কিছু কামিনীভোগ দিতে হবে।

দিনু নামের সেই লোকটি জিভ কেটে বললো এঃ হে, একটু আগে বললি না? আমার কাছে যা এক্টক দিল, এ পাড়ার জজ সাহেব যে সবটাই নিয়ে চলে গেলেন।

তুতুল কুড়িটি টাকা এনেছে, সেই টাকা সে রেখেছিল অ্যানাটমি বইয়ের পাতার ভাঁজে কাঁধের ঝোলা থেকে সে বইটা বার করলো।

রোগা ছেলেটি বললো আর নেই? দিদিকে কথা দিয়ে নিয়ে এলুম পরেশদার দোকানে আছে?

দিনু বললো, আজ আর কোনো দোকানে পাবি না। জজ সাহেব আরও চেয়েছিলেন, আমি নিজেই তো খুঁজে এলুম।

তুতুলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, সেদ্ধ চাল নিন না ভালো মাল আছে, গ্যারান্টি দিচ্ছি কাঁকর হবে না...

তুতুল কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো লোকটির মুখের দিকে। সেই মুহূর্তে সে একটা সিদ্ধান্ত নিল। জীবনে প্রথম সে বাজারে ঢুকে চাল কিনতে এসেছে, সে চাল না নিয়ে ফিরবে না।

সে দর দাম করতে জানে না, দশ টাকার নোট দুটি বাড়িয়ে দিয়ে সে বললো তাই দিন।

মোটাসোটা চালের ঠোঙাটি সে তার বইয়ের ব্যাগে ভরে নিয়ে বেরিয়ে এলো। বাড়ি ফিরে সে কারুকে কিছু না বলে রান্না ঘরে গিয়ে চাল রাখবার টিনের ড্রামটির মধ্যে খালি করে দিল ঠোঙাটা। সে বেশ তৃপ্তি বোধ করলো, এই প্রথম সে এই সংসারের জন্য কিছু একটা কাজ করেছে। এবার থেকে সে প্রায়ই কিছু না কিছু করবে।

মুখ হাত ধুয়েই সে তাড়াতাড়ি চলে গেল পাড়ার লাইব্রেরিতে। সাড়ে সাতটার সময় লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যায় এখনো এক ঘন্টা সময় আছে। পিকলু বেঁচে থাকতে সে প্রচুর গল্প উপন্যাস কবিতার বই পড়তো পিকলুই এনে দিত সেইসব বই। মাঝখানে কয়েকটা বছর তুতুল পড়ার বই ছাড়া আর কিছুই পড়েনি। ইদানীং তার আবার রস সাহিত্য পাঠের তৃষ্ণাটা ফিরে এসেছে, সে নিজেই ভর্তি হয়েছে এই লাইব্রেরিতে।

রাত্তিরবেলা বিছানায় শুয়ে সে সুপ্রীতিকে বললো, মা আজ একটা বই এনেছি তুমি পড়বে?

সুপ্রীতি ক্লান্ত ভাবে বললেন, না, আমার বই পড়তে ইচ্ছে করছে না। তুই পড়বি তো পড়, আলো নেবাবার দরকার নেই।

তুতুল বললো, আমি তোমাকে পড়ে শোনাবো?

–কী বই রে, ওটা? আজই শুনতে হবে? আমার যে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

তুতুলের ওষ্ঠে দুষ্টুমীর হাসি ফুটে উঠলো। সে মলাট দেওয়া বইটা খুলে বললো, এটার নাম 'মনুসংহিতা। খুব বিখ্যাত বই, তুমি পড়েনি নিশ্চয়ই আগে?

স্কুলে বেশি দূর না পড়লেও সুপ্রীতি বাংলা লেখাপড়া ভালোই করেছেন। মুনসংহিতার নাম জানেন তিনি। তাঁর প্রায় ডাক্তার হওয়া মেয়ে হঠাৎ খুব বিখ্যাত বই, তুমি পড়োনি নিশ্চয়ই আগে? মনুসংহিতা' পড়ছে দেখে তিনি ক্লান্ত শরীরেও খানিকটা সচকিত হয়ে উঠলেন।

তুতুল বললো, আমাদের হিন্দু সমাজ এই বইটির নির্দেশে চলার কথা। তাই সবটা পড়ে দেখলাম। আমাদের একজন স্যার বলেছেন, মানুষের চিকিৎসা করতে গেলে সমাজ ব্যবস্থাটাও জানা দরকার। এর পর মুসলমানদের হাদিস পড়বো। এই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে ভক্ষ্যাভক্ষ বিচার; শৌচ ও অশৌচ বিধি। অর্থাৎ হিন্দুরা কী খাবে না খাবে তাও এতে বলে দিয়েছে। বিধবাদের কী খাওয়া উচিত না উচিত সো খুঁজে দেখলাম। এতে আলে চাল সেদ্ধ চালের কোনো উল্লেখ নেই। তখন বোধহয় দু'রকম চাল ছিল না। মেয়েদের সম্পর্কে বা বিধবাদের সম্পর্কে কি লিখেছে জানো মা? তারা যেন সব সময় স্বামীর আরাধনা করে 'পর পুরুষের চিন্তা না করে। সৎ থাকার পবিত্র থাকার এই একটাই মাত্র ক্রাইটেরিয়ান। একটা শ্লোকে লিখেছে।

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্প মূল ফলে শুভৈঃ
নতু নামপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥

অতি কষ্টে থেমে থেমে সংস্কৃতটা উচ্চারণ করে তারপর তুতুল বললো, এর তলায় বাংলা মানেও লিখে দিয়েছে "পতির মৃত্যু হলে স্ত্রী এবং পবিত্র পুষ্প ফল ও মূল দ্বারা আল্পাহারে দেহ ক্ষয় করবেন, তবু পরপুরুষের নামোচ্চারণ করবেন না।" তার মানে মা, বুঝলে, এই মনু নামের লোকটা বিধবাদের অল্প খাইয়ে মেরে ফেলার কথা বলছেন যাতে বিধবারা অন্য পুরুষের নামও উচ্চারণ না করে। ফুল-ফলের মধ্যে চাল ডাল-গম এই সবই পড়ে। মুসুর ডাল খাওয়া বারণ তা কোথাও লেখা নেই। ঠিক তো?

সুপ্রীতি ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললেন, তুই এসব আমাকে বোঝাচ্ছিস কেন?

তুতুল বললো, তার কারণ, তুমি কাল থেকে সেদ্ধ চালের ভাত খাবে। মাস্ত্রে বারণ নেই।

সুপ্রীতি ত্রস্তে বলে উঠলেন না, না, না, এতদিন খাইনি, হঠাৎ এখন সেদ্ধ চাল খেতে যাবো কেন?

–যখন দু' রকম চাল পাওয়া যেত, তখন না হয়...

–আমার সাবু খেতে কোনো অসুবিধে হয় না

–যদি আতপ চাল আরও একমাস দু'মাস না পাওয়া যায়?

–তাতেও কিছু হবে না। তুই এ নিয়ে ভাবিস না, তুতুল।

–মনুসংহিতার এই মনু যাই বলুন না কেন, আমার মা বিধবা বলেই তাড়াতাড়ি মরে যাবেন, তা আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। শোনো মা, কাল আমার ছুটি। কাল আমি সেদ্ধ চাল আর মুসুরির ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করবো। তুমি যদি না খাও, আমিও তা হলে খাবো না। তুমি দুপুরবেলা যতদিন ভাত না খাবে, ততদিন আমিও কিছুতেই ভাত খাবো না।

–তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি?

–এটা কি পাগলের মতন কথা। বরং, তোমার এই মনু ভদ্রলোকই পাগল ছিলেন। আর একটা শ্লোকে কী লিখেছেন জানো? সংস্কৃতটা আমি আ পড়ছি না, বাংলা মানেটা হলো এই যে, "পতি সদাচার শূন্য, পরদার রত বা গুণহীন হলেও সাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে দেবতার মত পূজা করবেন।

–থাক, তুতুল, যাক ওসব কথা থাক।

–আমি মামাকে কাল জিজ্ঞেস করবো, তিনি এসব মানেন কিনা! আমার তো মনে হচ্ছে এই মনুসংহিতা নামের বইটি ব্যান করা উচিত। এতদিন লোকেরা এই বই সহ্য করেছে কী করে? একটা অপদার্থ, দুশ্চরিত্র, বদমাস লোকও যদি স্বামী হয়,তবু তার স্ত্রী তাকে দেবতার মতন পুজো করবে।

–এখন সময় বদলে গেছে। এখন কি আর লোকে ওসব মানে?

–এই সব বই পড়বারও কোনো মানে নেই। এই বইয়ের একটা কথাও ভালো নয়।

তুতুল বইটি খাটের তলায় ফেলে দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, মা, তুমি কেন দিন দিন এত রোগা হয়ে যাচ্ছো? কেন আর আগের মতন হাসো না?

সুপ্রীতির চোখে জল এসে গেল আনন্দে। তার নিজের জন্য নয়, তুতুলের যে হঠাৎ এই পরিবর্তন হয়েছে, তা তিনি যেন এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। এই মেয়েটাই তো পিকলুর কথা ভেবে ভেবে দিন দিন শালিকের মতন রোগা হয়ে যাচ্ছিল, কোনো সাধ আহ্লাদ ছিল না, ওর চিকিৎসার জন্য প্রতাপ কত চেষ্টা করেছেন সেই তুতুল হাসছে, জোর দিয়ে কথা বলছে।

খুব গোপনে একটা নিষিদ্ধ কথা বলার তমন তুতুল মায়ের কানে কানে বললো, মা, আজ আমি বাজারে গিয়েছিলাম চাল কিনতে।

সুপ্রীতি শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। শুধু চোখ নয়, নিজের কানকেও এবার তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। চোখ বড় বড় তিনি বললেন, তুই বাজারে গিয়েছিলি।

তুতুল বললো, হ্যাঁ। বাজারে বেশি দামে চাল বিক্রি হয়। কিন্তু সেখানেও আতপ চাল নেই। যেটুকু ছিল এক জজ সাহেব কিনে নিয়ে গেছেন। তোমার মত অনেক বিধবাই নিশ্চয়ই আতপ চাল খায় শুধু। গভর্নমেন্ট তাদের কথা চিন্তা করছে না। গভর্নমেন্টের উচিত ছিল সব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো যে এখন থেকে সব বিধবারাই আতপের বদলে সেদ্ধ চাল খেতে পারবে। তাকে কোনো দোষ নেই!

সুপ্রীতি বললেন, অনেকে তো ভাতের বদলে রুটি খেয়ে দেব থাকতে পারে।

–তোমার মতন বাঙালরা যে ভাত না খেয়ে থাকতে পারে না। তারা বুঝি আতপ চালের অভাবে না খেয়ে মরে যাবে? আমার মাকে আমি কিছুতেই মরতে দেবো না।

সুপ্রীতির বুকের মধ্যে কুল কুল করে একটা সুখের ঝরনা বয়ে যেতে লাগলো। তুতুল ঘুমিয়ে পড়লেও অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘুম এলো না। অঘ্রাণ মাস, একটু শিরশিরে ঠাণ্ডা পড়েছে। এক সময় উঠে সুপ্রীতি শিয়রের কাছের জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। তুতুল শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে। একই খাটে মা আর মেয়ে। আর কিছুদিন বাদেই মেয়ে ডাক্তার হবে, তার জন্য একটা আলাদা ঘর চাই।

তিনি একটা পাতলা চাদর বিছিয়ে দিলেন তুতুলের গায়ে।

পরদিন সকালে তুতুল অতীনকে ধরে বললো, এই বাবলু, তুই আমাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটা বড় ছবি জোগাড় করে দিতে পারবি?

অতীন বললো, সে ছবি আমি কোথায় পাবো?

–তুই তো অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করিস, একটু খোঁজ নিতে পারবি না? তোকে আমি পয়সা দিয়ে দেবো?

–হঠাৎ বিদ্যাসাগরের ছবি দিয়ে কী হবে?

–আমার ঘরে টাঙাবো। তোর মনে আছে, ইডেন গার্ডেনে আমরা একবার একটা খুব বড় মেলা দেখতে গিয়েছিলুম? সেখানে পিকলুদা বলেছিল, বাঙালি মেয়েদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত উপকার করেছিলেন অথচ মেয়েরা রামকৃষ্ণের ছবি ঘরে টাঙিয়ে পুজো করে। সত্যিই তো বিদ্যাসাগরের জন্যই তো আমরা স্কুল কলেজে যেতে পারছি। কাল মনুসংহিতা পড়তে গিয়ে পিকলুদার ঐ কথাটা আবার মনে পড়ে গেল।

তুতুল সকালবেলা হঠাৎ বিদ্যাসাগরে ছবির কথা তোলায় অতীন যত না অবাক হয়েছে তার চেয়েও বেশি চমকে গেল তুতুলের মুখে পিকলুর নাম শুনে। দাদার মৃত্যুর পর সে একদিনও ফুলদির মুখে দাদার উল্লেখ মাত্র শোনেনি। এমন কি তুতুল কাছাকাছি থাকলে অন্যরা পিকলুর কথা আলোচনা করতে করতেও থেমে যায়। ফুলদির মুখ চোখও আজ অন্যরকম।

আচ্ছা দেখবো ছবি পাওয়া যায় কি না, এই বলে অতীন বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, তুতুল আবার তাকে জিজ্ঞেস করলো, এই আজ তো ইউনিভারসিটি বন্ধ, তুই কোথায় যাচ্ছিস?

ইউনিভারসিটি বন্ধ থাকলেই যে বাড়ি বসে থাকতে হবে, এ তো বড় অদ্ভুত কথা অতীন হেসে বললো, যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে।

–কখন ফিরবি? শোন, আমি আজ খিচুড়ি রাঁধবো। তুই তাড়াতাড়ি ফিরবি কিন্তু, সবাই বসে খাবো একসঙ্গে। শোন বাবলু, তুই কয়েকটা ডিম এনে দিতে পারবি? মামা ডিম ভাজা খেতে ভালোবাসেন।

অতীন বললো, আমার যে আজ এক বন্ধুর বাড়িতে খাওয়ার কথা। আমি ডিম এনে দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।

অতীনের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তুতুল বললো, ও, তুই আজ খেতে আসবি না?

সঙ্গে সঙ্গে মত বদল করে অতীন বললো, ঠিক আছে আমি ফিরে আসবো। একটা দেড়টার মধ্যে। বাবা তো দেড়টার আগে খায় না।

খাওয়ার টেবিলে নয়, বারান্দায় সতরঞ্চি ভাঁজ করে লম্বা আসন পাতা হয়েছে, যেন নেমন্তন্ন বাড়ি। তুতুল জোর করে তার মা, মাসি-মা, মুন্নিকে বসিয়েছে, এমনকি অতীনও এসে গেছে। প্রতাপ লেখাপড়ার কাজ করছিলেন, দু'তিনের ডাকাডাকির পর এসে বললেন, হ্যাঁ শুনলাম তুতুল আজ

সবাইকে খাওয়াচ্ছে। কী ব্যাপার রে, তুতুল? তোর রেজাল্ট বেরিয়ে গেল নাকি?

অনেকক্ষণ রান্নাঘরে কাটিয়েছে বলে তুতুলের মুখখানি লালচে এবং ঘামে চকচকে। চূর্ণ চুল পড়েছে কপালে। সে মুখ তুলে বললো, সে সব কিছু নয়, আজ আমি প্রথম খিচুড়ি রেঁধেছি।

প্রতাপ সকৌতুকে বললেন, ওরে বাবা, প্রথম দিনই আমার ওপর এক্সপেরিমেন্ট করবি? আগে তো মা মামীদের ওপর পরীক্ষা করলে পারতি।

হাঁটু মুড়ে বসে প্রতাপ অতি গরম খিচুরি চামচে কর তুলে একটু মুখে দিলেন। তারপর আরও দু'চামচ। মুখের ভাব বদলে গেল, তিনি বললেন নারে, খারাপ হয়নি তো, ভালোই তো হয়েছে, ঝাল একটু কম। একটা কাঁচা লঙ্কা এনে দে।

অন্যদের দিকে তাকালেন প্রতাপ। অনেকদিন এরকম এক সঙ্গে খেতে বসা হয়নি। মমতাও খেতে শুরু করেছেন, সুপ্রীতি এখনও হাত দেননি। মমতা বললেন, খারাপ হয়নি, কী লচ্ছো? বেশ ভালো হয়েছে। খিচুড়িতে ঠিকস্বাদটা আনা সহজ নয়।

প্রতাপ বললেন, সত্যি ভালো হয়েছে, দিদি খেয়ে দ্যাখো। তোমার মেয়ের হাতের গুণ আছে।

সুপ্রীতি হেসে বললেন, পাগল মেয়ের যা কাণ্ড। এর মধ্যে পেঁয়াজ রয়েছে এ খিচুড়ি কি আমি খেতে পারি?

প্রতাপ বললেন, হ্যাঁ তাই তো পেঁয়াজ দিয়ে ফেলেছে। তুমি খাবে কী করে?

তুতুল বললো, মনুসংহিতায় কায়স্থবাড়ির বিধবাদের পেঁয়াজ খাওয়া নিয়ে কোনো নিষেধ তো নেই। ফল-মূল খেতে বলেছে, পেঁয়াজতো একটা মূল আলুরই মতন।

প্রতাপ চোখ গোল গোল করে হেসে উঠে বললেন, ওরে বাবা, একেবারে মনুসংহতা! তুই পড়েছিস বুঝি?

তুতুল মাথা নেড়ে সপ্রতিভ ভাবে বললো হ্যাঁ কালই পড়েছি।

প্রতাপ বললেন, তাহলে দিদি খেয়ে নাও। তোমার মেয়ে যখন মনুসংহিতা পড়ে বিধান দিয়েছে।

সুপ্রীতি বললেন, তা হলেই বা। প্রায় দশ বছর হয়ে গেল পেঁয়াজ খাইনি, এখন আমি পেঁয়াজের গন্ধই সইতে পারি না।

প্রতাপ বললেন, এঃ হে, আমরা খাবো, তুমি খাবে না? তুই এ কী করলি রে, তুতুল ? তোর মা কী খাবে?

সবাই খাওয়া থামিয়ে অপরাধীর মতন চেয়ে রইলো সুপ্রীতরি দিকে। এমনকি অতীনেরও মনে হলো পেঁয়াজ দেওয়া খিচুরি একজন বিধবাকে সত্যিই সম্ভব নয়। এটা বাড়াবাড়ি।

তুতুল হেসে জিজ্ঞেস করলো, পেঁয়াজ খাওয়া দোষের কেন; সেটা আগে বলো? ভারতের অনেক জায়গায় যারা নিরামিষ খায়, তারাও পেঁয়াজ খায়।

মমতা বললেন, দোষগুণের কথা হচ্ছে না। তোর মা যে গন্ধটাই সহ্য করতে পারবে না। অভ্যেস চলে গেছে।

প্রতাপ বললেন, দিদি একটু মুখে দিয়েই দেখো না।

সুপ্রীতি বললেন, নারে, পারবো না। তোরা খা, দেখতেই আমার ভালো লাগছে।

তুতুল বললো, আমি পেঁয়াজ ছাড়া খানিকটা আলাদা করে রেখেছি।

প্রতাপ বললেন বাঃ বাঃ মেয়েদের বুদ্ধি আছে। দিদি, এতক্ষণ ও তোমায় পরীক্ষা করছিল।

সুপ্রীতির খিচুড়ি বদলে দিল তুতুল। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, খাও, মুখে দিয়ে দ্যাখো আগে।

সুপ্রীতি এক গ্রাস মুখে তুলতেই তুতুল সগর্বে বললো, মামা এই খিচুড়ি আলো চাল না, সেদ্ধ চাল দিয়ে রেঁধেছি।

মমতা আর তুতুল মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসলো। সেদ্ধ চালের ব্যাপারটা মমতা আগেই শুনেছেন সুপ্রীতির কাছে। মমতাও নিজেও কর্তব বা অনুরোধ করেছেন সুপ্রীতিকে।

আলো চাল সেদ্ধ চালের তফাৎটা প্রতাপ ঠিক বুঝতে পারলেন না। তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না। তুতুল তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, একটা নিঃশব্দ বিপ্লব হয়ে গেল। এর পর সে মাকে মাছ মাংসও খাওয়াবে, তাঁর চিকিৎসার জন্য দরকার। রান্না মাছ মাংস যদি খাওয়ানো না যায়, তা হলে শার্ক লিভার অয়েল, প্রোটিনেক্স অন্তত...।

খাওয়ার মাঝখানে সদর দরজায় করাঘাত হলো। এই অসময়ে কে আসবে? বাড়িওয়ালার এক

জামাই ও ছোট ছেলে ইদানীং প্রায়ই এসে উৎপাত করছে, তাদের কেউ? প্রতাপের মুখ ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠলো।

মুন্নি এঁটো হাতে দরজা খুলে দিয়ে এসে বললো, ফুলদি, তোমাকে একজন ডাকতে এসেছে, নাম বললো, জয়দীপ।

তুতুলের মুখখান বিবর্ণ হয়ে গেল। অন্য সকলেও অবাক। তুতুলকে তো কেউ কখনো ডাকতে আসে না,তার সহপাঠীরাও কেউ আসে নি একদিনও।

বসবারঘরের গায়ে লাগা এই বারান্দা, ও ঘর থেকে সব দেখা যায়। এই রকম খাওয়ার দৃশ্য বাইরের একজন মানুষ দেখে ফেলবে, এই ভেবে সুপ্রীতি লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন।'যেন বাইরের কেউ এক পলক দেখেই বুঝে ফেলবে, তিনি সেদ্ধ চালের খিচুড়ি খাচ্ছেন। মুন্নি মাঝখানের দরজাটাও বন্ধ করে নি।

সেই দরজার কাছে দাঁড়ালো একটি যুবক। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ চোখ মুখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি। প্যান্টের ওপর হলুদ রঙের টি শার্ট পরা।

তুতুল বিব্রত ভাবে প্রতাপকে বললো, বড়মামা, এ আমাদের সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে এর না জয়দীপ।

জয়দীপ আড়ষ্ট গলায় বললো, এ কী, খিচুড়ি খাওয়া হচ্ছে? বাঃ বাঃ আমি একটু ভাগ পাবো না? খিচুড়ি আমার দারুণ ফেভারিট।

প্রতাপ বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বসো। এই, ওকে একটা দে।

সতরঞ্চিতে আর জায়গা নেই, জয়দীপ বসে পড়লো মাটিতেই। যেন সে এই বাড়িতে বহুবার এসেছে। সে বললো, খিচুড়ির সঙ্গে আর কী আছে, ডিম ভাজা? ফার্স্টক্লাস।

সুপ্রীতি সরাসরি না তাকিয়ে গোপনে দেখতে লাগলেন ছেলেটিকে। এর কথা তুতুল তাঁকে কোনোদিন বলে নি। অথচ দেখে মনে হচ্ছে, এই ছেলেটি তুতুলের খুবই বন্ধু। তা হলে এর জন্যেই তুতুলের ব্যবহারে হঠাৎ একটা পরিবর্তন এসেছে। আবার সে স্বাভাবিক হয়েছে।

সুপ্রীতি তৎক্ষণাৎ খুব পছন্দ করে ফেললেন জয়দীপকে।

॥ ৩৫ ॥

নোয়াখালিতে সিরাজুল নামে একটি ছেলেকে ঝোঁকের মাথায় একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছিল বাবুল, পরে সে কথা তার মনে ছিল না, সিরাজুলও সেই সময় ঢাকায় আসেনি। এক শীতের সকালে বৈঠকখানায় ঘরে বসে কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ একজন আগন্তুককে দেখে বাবুল চিনতে পারলো না। লম্বা, কালো চেহারা যুবকটির দুই কাঁধে দুটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ ঝুলছে, গালে অল্প অল্প দাড়ি, ময়লা কুর্তা পাজামা পরা, মুখে গ্রাম্য অপ্রস্তুত হাসি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে বললেন.আদাব বাবুল ভাই, আমি আইস্যা পড়ছি।

বাবুলের মেজাজটি ভালো নেই, ঘুম থেকে উঠেই মঞ্জুর সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। এখন সে খবরের কাগজ চোখের সামনে মেলে নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করছিল, এই সময় এক মূর্তিমান ব্যাঘাতকে দেখে সে হঠাৎ বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার?

যুবকটি বললো, বাবুলভাই, আমি সিরাজুল ইসলাম, সেই যে নয়াডাঙ্গায় আপনে গেছিলেন আমার বউরেও সাথে নিয়া আসতে হইলো।

নাম শুনেও বাবুলের কিছু মনে এলো না যুবকটি পেছন ফিরে তার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এলো ভেতরে, সেই মেয়েটির হাতে গোলাপ ফুল ছাপ মারা একটি টিনের সুটকেস। সিরাজুলকে দেখে চিনতে না পারলেও তার পত্নী মনিরার মুখের দিকে এক নজর তাকাতেই বাবুলের সব মনে পড়ে গেল। জয়নাল আবেদিনের আঁকা একটি ছবিতে অবিকল এই রকম একটি নারীর মুখ আছে, সেইজন্যই ভোলা যায় না।

মনের মধ্যে একটা প্রবল অস্বস্তি ও দ্বন্দ্ব থাকলেও বাবুল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এসো এসো।

সিরাজুল সবিস্তারে তার কাহিনী শোনালো। আইয়ুব খাঁ বনাম ফতিমা জিন্নার ভোট যুদ্ধের সময় গ্রামের অবস্থা দেখতে গিয়ে বাবুল চৌধুরী এই সিরাজুলের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, সিরাজুল যদি ঢাকায় এসে পড়াশুনো করতে চায় তা হলে বাবুল তাকে সবরকম সাহায্য করবে। সিরাজুল তখনই সে সুযোগ নিতে পারেনি কারণ তাদের গ্রামের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতা

ইরফান আলীর সঙ্গে সে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিল। বড়লোকদের সঙ্গে মামলা করে কোনোদিনই জেতা যায় না, তাই রাগের চোটে ইরফান আলীকে খুন করতে গিয়েছিল সিরাজুল। ইরফান আলীর মতন মানুষকে খুন করাও সহজ নয়, তারা সব সময় চ্যালাচামুণ্ডা পরিবৃত হয়ে থাকে, ইরফান আলীর ঘাড়ে কুড়ুলের কোপ মারতে গিয়ে সে ধরা পড়ে যায়, তার ফলে সে নিজেই যে খুন হয়ে যায়নি, সেটাই তার সাত পুরুষের ভাগ্য। তবে মার খেয়ে সে তিন মাস শয্যাশায়ী হয়ে ছিল, এখন তার ঘা শুকিয়েছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রামে বসবাস করা আর সম্ভব নয় তার পক্ষে। ইতিমধ্যে তার মায়েরও মৃত্যু হয়েছে। ভিটেমাটি সব ইরফান আলীর হাতে সঁপে দিয়ে সে এখন বাবুলের কাছে আশ্রয় প্রার্থী। দুনিয়ার আর কোথাও তার যাবার জায়গা নেই।

বাবুল ভেতরে ভেতরে বেশ খানিকটা দমে গেল। একটি গ্রাম্য যুবকের পড়াশুনোর প্রতি খুব আগ্রহ দেখে সে তাকে ঢাকার কলেজে পড়াবার ব্যাপারে সাহায্য করতে চেয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি সে ফিরিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু তাকে সপরিবারে আশ্রয় দেওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব? ঢাকার এই বাড়িখানা তো বাবুলের নিজস্ব নয়। তার বাবা-মা এখন অধিকাংশ সময় টাঙ্গাইলের বাড়িতে থাকলেও মাঝে মধ্যে এখানে এসে ওঠেন। তার বড় ভাই আলতাফ হোটেলেই বেশির ভাগ রাত কাটালেও এ বাড়িতে তার জন্য দুখানি ঘর রাখা আছে। এখানে কোনো বাইরের লোককে আশ্রয় দিতে গেলে তার বাবা মা ও আলতাফের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু সুটকেস ও বোঁচকা বুঁচকি সমেত এসে উপস্থিত হয়েছে যে তরুণ দম্পতি, তাদের সে এখন ফেরাবে কী করে?

একতলার গোটা তিনেক ঘরই তাদের পারিবারিক মালপত্রে ঠাসা তারই কোণে একটা ঘর পরিষ্কার করে এদের জায়গা দিতে হবে আপতত। তার আগে মঞ্জুকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। মঞ্জু সকাল থেকেই রেগে আছে, সেই রাগের ঝাল যদি এদের ওপরে পড়ে? এক্ষুনি মঞ্জুকে ডাকতে বাবুলের সাহস হচ্ছে না।

সে সিরাজুল ও মনিরার মুখের ওপর চোখ বোলালো। কী অসহায় দুটি মুখ। লজ্জিত, ভীত ব্যাকুল। মানুষই মানুষকে এরকম অসহায় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়। ইরফান আলীর মতন লোকেরা এখন ক্ষমতা পেয়েছে, গ্রামে তারা যা খুশি করতে পারে, গরিবের ধন প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেললেও তাদের বাধা দেবার কেউ নেউ থানা-পুলিস, সরকারি প্রশাসন সবই এখন ওদের কব্জায়। ইরফান আলীর কথা ভেবে বাবুল নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলে উঠলো। তার ফর্সা মুখখানি লালচে হয়ে গেল, সে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না।

সিরাজুল হুমড়ি খেয়ে বাবুলের হাঁটু ধরে বসে পড়ে কাতর গলায় বললো, সাহেব, আমাগো পায়ে ঠ্যালবেন না। আমাগে যেকোন কাম করতে কেন আমার বউ বাসন মাজবে, ঘর সাফ করবে, আর, আমি আপনে আমারে...

বাবুল মৃদু ধমক দিয়ে বললো, ও কী করছো, উঠে বসো।

প্রথমে সম্বোধন করেছিল বাবুলভাই, এখন বলছে সাহেব। আগে চেয়েছিল লেখাপড়া শেখার সুযোগ, এখন চাইছে চাকর-দাসী হিসেবে কোনো ক্রমে আশ্রয়। এইভাবেই নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব বন্ধ বাবুলের বাইরে বেরুবার তাড়া নেই। এখনও ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। বাবুল মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো এ বাড়িতে দুজন নতুন মানুষকে আশ্রয় দিতে গেলে পুরোপুরি দায়িত্ব সে একা নিতে পারবে না, মঞ্জু আর আলতাফের সঙ্গে পরামর্শ করতেই হবে। আলতাফ প্রায় নিশাচর, কোনো দিনই রাত দুটো আড়াইটের আগে শুতে যায় না। সকাল দশটার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠেনা। সকালের দিকে তার হোটেলে কিংবা খবরের কাগজের অফিসে কাজও থাকে না বিশেষ। টেলিফোন করলেও এখন জাগানো যাবে না আলতাফকে। মঞ্জু খুব সম্ভবত এখন গোসলখানায়। এদের সঙ্গে পরিচয় করবার আগে মঞ্জুর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে হবে।

একটি নতুন মেয়েকে রাখা হয়েছে বাড়ির কাজের জন্য বাবুল তার উদ্দেশে হাঁক দিল, সেফু সেফু। তারপর সিরাজুলকে বললো, অনেক দূর থেকে এসেছো, আগে নাস্তা পানি খেয়ে নাও তারপর তোমাদের ঘরের ব্যবস্থা করা হবে।

সিরাজুল আর মনিরার মুখ থেকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগের কালো ছায়াটা সরে গেল। এই প্রথম তাদের আশ্রয় দেবার স্বীকৃতি জানালো বাবুল। এতক্ষণ তারা বাবুলের আচরণে ভরসা পায়নি।

সিরাজুল আবার নেমে এসে পা জড়িয়ে ধরলো বাবুলের। ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ালো বাবুল। দাতা কিংবা পরোপকারীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা সে কখনো নেয়নি, যেকোনো কারণে কেউ তাকে কৃতজ্ঞতা জানালে কিংবা সামনা সামনি প্রশংসা করলে সে খুব অস্বস্তি বোধ করে।

সেফু নামে মেয়েটি এই সময় ঘরে ঢুকতেই সে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলো কিছু খেতে টেতে দাবি না? পরোটা ভেজেছিস? নিয়ে আয়। বাড়িতে মেহমান এসেছে, কয়েকখানা বেশি করে নিয়ে আয়। আর দ্যাখ, ভাবী গোসলখানা থেকে বেরিয়েছে কিনা।

মনিরা ভীতু ভীতু গলায় জিজ্ঞেস করলো, আমি একটু ওর সাথে যাবো?

বাবুল কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলো। মঞ্জুকে আগে কিছু বলার আগেই যদি মেয়েটিকে সে দেখতে পায়, তা হলে তার প্রতিক্রিয়া কী রকম হবে?

সে সেফুর দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বললো, ওনারে নিচের বাথরুমটা দেখায়ে দে।

ওপরে মঞ্জুর গলা শোনা গেল। তবু ওপরে যেতে বাবুল সময় নিচ্ছে, সে কি মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে? মঞ্জুর মতন সরল আর নরম স্বভাবের মেয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্তও যে কক্ষনো গলা চড়িয়ে কথা বলতো না, তাকেও ভয়? ইদানীং মঞ্জুর সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বাঁধছে, সেইজন্যই বাড়িতে বেশিক্ষণ বাবুলের মন টেকে না।

হঠাৎ বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামলো,তার থেকে নেমে এলো অলতাফ। পুরোদস্তুর সুট পরা, সদ্যস্নাত মাথার চুল মুখে চোখে ব্যস্ত ভাব। আলতাফ শুধু যে আজ সকাল সকাল জেগে উঠেছে তাইই নয়, সে কোথাও যাবার তৈরি। গট গট করে ভেতরে এসে সে বাবুলের সঙ্গে কোনো কথা না বলেই ওপরে উঠে যাচ্ছিল, বাবুল তাকে ডেকে বললো, ভাইয়া, তোমার সাথে একটা কথা আছে।

আলতাফ থেমে গিয়ে মুখ ফেরালো। ছোট ভাইটিকে সে এক সময় খুবই ভালোবাসতো। এখন তার প্রতিখানিকটা বিরক্তি মেশানো অবজ্ঞা জমেছে। তার ধারণা হয়েছে বাবুল নিতান্তই কুঁড়ে এবং অপদার্থ। কোনো কাজে তার সাহায্য পাওয়া যায় না। দিনকাল পত্রিকার কাজে তাকে জুড়ে দেবার অনেক চেষ্টা করা হলো, সে কিছুতেই মন লাগালো না, দু'একটা লেখা দিয়ে এখন একেবারে সরে পড়েছে। হোটেল ম্যানেজমেন্টের ভারও দিতে চাওয়া হয়েছিল তাকে, সে নেয়নি। নিজের ভবিষ্যৎ বা দেশের ভবিষ্যৎ কোনো কিছু সম্পর্কেই যেন বাবুলের মাথাব্যথা নেই।

বাবুল আলতাফকে একপাশে নিয়ে গিয়ে সংক্ষেপে সিরাজুলদের বৃত্তান্তটি জানালো। সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি হলো না আলতাফের। এই পরিবারের দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে সে বললো, অরা থাকুক এখানে। একটা ঘর খালি কইরা দে। আমাকে আইজই করাচী যেতে হবে, এগারোটার ফ্লাইট, আমি ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে ওদের জন্য কোনো কাজকর্ম জোটানো যায় কিনা।

তারপর সে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, কী নাম বললি? ইরফান আলী। ইনসেকটিসাইড ফার্টিলাইজারের ব্যবসা করে? বেসিক ডেমোক্র্যাট?

সিরাজুল মাথা নেড়ে বললো জী।

আলতাফ বললো, সে লোকটারে তো আমি চিনি। আমাদের হোটেলে এসে রেগুলার ওঠে। সে এমন অমানুষ নাকি?

বাবুল বললো, আমি নিজের চোখেই তার বাদরামির খানিকটা নমুনা দেখেছি।

আলতাফ বললো, আমি ফিরে আসি, তারপর আমাদের কাগজে ওরে টাইট দেবো। ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্টিং করে ওর বাপের নাম ভুলাবো।

মনিরার চোখে চোখ রেখে আলতাফ আশ্বাস দিয়ে বললো ভয় নাই, আমরা তো আছি। এখন আমার হাতে সময় নাই, পরে আলাপ করবো। কেমন?

বাবুল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আলতাফ দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। আলতাফ ওপরে উঠে যেতেই সে একতলার পেছন দিকের একটা ভাঁড়ার ঘর খালি করতে লেগে গেল। প্রচুর ধুলো ও মাকড়সার জাল, শৌখিন স্বভাবের বাবুল সেই ধুলোজাল মাখতে দ্বিধা করলো না। একটা কিছু কাজ সে করছে, এই অনুভূতি তার মন থেকে কিছুক্ষণ আগের বিরাগ ভাবটা মুছে দিতে লাগলো। এর আগে বাড়ির কোনো দেয়ালে নিজের হাতে একটা পেরেকও পোঁতেনি সে।

একটা পুরোনো আলমারির মাথায় নানান আকারের অনেকগুলি কাচ রাখা ছিল কে কবে কোন উদ্দেশ্যে ওখানে ঐ কাচগুলি রেখেছে তা বাবুল জানে না। আলমারিটি ঠেলে ঘরের বার করে দিতে গিয়ে সেই কাচ ককেটা খসে পড়ে গেল, তাতে এমন ঝন্ ঝন্ শব্দ হলো যাতে গোটা বাড়ির বাসিন্দারা

সচকিত হবেই।

সেই শব্দে বাবুলেরও চড়াৎ করে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আলতাফের সম্মতি পেয়েই সে অতি উৎসাহে সিরাজুলদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু মঞ্জুকে এখনো কিছু জানায়নি। এটা স্পষ্টতই মঞ্জুর প্রতি অবহেলা।

হাত মুছতে সে সিরাজুলকে বললো, তুমি একটা অপেক্ষা করো, আমি উপর থেকে আসছি।

বেরিয়েই সে দেখলো সিড়িরে ওপর দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জু। একা কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরা। তার একটু পেছনে সুখু মিএাকে কোলে নিয়ে আছে মনিরা। মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, কী ভাঙলো?

বাবুল বললো, এমন কিছু না কয়েকটা পুরোনো কাচ। আর শোনো, ইসে মানে, এই এরা এসে পড়েছে, এরা কয়েকদিন এখানে থাকবে।

মঞ্জু বললো, মনিরার কাছে সব শোনলাম। জানো, ঐ সিরাজুলের নাকি এখনও বুকে খুব ব্যথা হয়, ভালো করে সারে নাই, ওরে খাজুরের ডাল দিয়ে পিটায়েছিল, একবার ডাক্তার আশরাফ সাহেবের কাছে দেখবার বন্দোবস্ত করো।

বাবুল ভেতরে ভেতরে বিরাট এক স্বস্তি বোধ করলো। তাকে বিশেষ ব্যাখ্যা করতে হলো না, আলতাফের মতনই মঞ্জুও এই নবাগতদের এক কথায় মেনে নিয়েছে। চাপা অশান্তি সে একেবারে সহ্য করতে পারে না।

মঞ্জু আবার বললো, মামুন মামারে বলে ঐ শয়তান লোকটারে শাস্তি দেওন যায় না?

বাবুল একটু হাসলো।। মঞ্জুর চোখে তার মামুনমামা এক মহা শক্তিমান পুরুষ। আসলে মামুন ভাই একটি মাঝারি গোছের দৈনিকের সম্পাদক, দুর্বল ও মিনমিনে স্বভাবের মানুষ, তার কতটুকু ক্ষমতা আছে? আলতাফও আস্ফালন করে গেল, কিন্তু ঐ কাগজে সরকার পক্ষের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি সম্পর্কে কী ছাপা হলো বা না হলো, তাতে কিছুই যায় আসে না।

সে বললো, মামুনমামা এলে তেনাকে বলে দেখো।

সিরাজুল মনিরাকে এ গৃহে প্রতিষ্ঠার ভার মঞ্জুর ওপর সঁপে দিয়ে এক সময় আড্ডা দিতে বেরিয়ে পড়লো বাবুল। তার মনটা বেশ ভালো আছে, মঞ্জুর কাছে সে কৃতজ্ঞ বোধ করছে। মঞ্জু তো সত্যিই খুব ভালো, তার ওপর রাগ করার কোনো মানে হয় না।

বাবুল নিজে সাংবাদিকতা না করলেও সে তার বন্ধু জহিরের সঙ্গে গ্রামে ঘুরতে যায় প্রায়ই। এখন সেটা তার নেশা হয়ে গেছে। মোটামোটি বই পড়ে, তত্ত্ব মুখস্ত করে, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে সে অর্থনীতি শিখেছে, এখন গ্রামের মানুষদের দেখে সে অনুভব করে যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে স্বদেশের মানুষকে চেনা যায় না।

পল্টনদের বাসায় ঢোকার রাস্তায় কামালের সঙ্গে দেখা। যুদ্ধের মধ্যে সে লাহোরে আটকা পড়ে গিয়েছিল, একটা ফিলমের শুটিংয়ের জন্য গিয়েছিল সে, তার জন্য দুশ্চিন্তা ছিল সকলের।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, তুই তাহলে বেঁচে আছিস?

কামালের মুখে এখন চাপা দাড়ি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। বেশ মোটা হয়েছে,তাকে দেখলে এখন কল্পনা করাই শক্ত যে ছাত্রজীবনে সে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে অনেক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে।

কামাল বললো, শহীদ হবর চান্সটা মিস করলাম। তোরা বোধহয় শুনেছিলি যে লাহোর শহর ইন্ডিয়ার হাতে চলে গেছিলো? সে সব কিছু না। লড়াই হয়েছে ইছোগিল খালের আশেপাশে, ওরা অনেককানি এগিয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু লাহোর শহরে একটাও গোলা পড়ে নাই।

বাবুল বললো, শহর দখল করলে শহরের লোকদের খাওয়াতে হতো।

কামাল বললো, অনেকে অবশ্য ভয়ে পালিয়েছিল ... শোন বাবুল, ইসে তুই আর একটা খবর শুনেছিস?

কী?

নীলা ভাবীর বোন দিলারা, তার হ্যাজব্যান্ড তো আর্মিতে ছিল, সেই ইউসুফ মারা গেছে, যুদ্ধের একেবারে শেষ দিনে, যুদ্ধ বিরতির মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।

বাবুল গম্ভীর ভাবে বললো, হ্যাঁ এ খবর শুনেছি। এই যুদ্ধে আমাদের চেনাশুনাদের মধ্যে ইউসুফই একমাত্র ভিকটিম। গ্রেট ট্রাজেডি, মাত্র আড়াই বছর আগে বিয়ে হয়েছিল, ওরকম ইউথফুল এনারজেটিক ছেলে...

–দিলারা লাহোরে গিয়েছিল বডি আইডেন্টিফাই করতে

–জানি। দিলারা কিছুতেই বিশ্বাস করে নাই। তাকে কিছুতেই বুঝানো যায় নাই। জোর করে সে লাহোরে চলে গেল পল্টনের ছোট ভাইয়ের সাথে।

–সে সময় আমি ছিলাম লাহোরে। আমার সাথে ওদের দেখা হয়েছিল কিন্তু সে বডি একেবারে মিউটিলেটেড, আইডেন্টিফাই করার কোনো উপায় নাই, ঐ দিককার একজন লেফটেনান্ট কর্নেল আমাদের খুব সাহায্য করেছিল, সমস্ত প্রমাণ পত্তর দেখিয়েছিল, দিলারা অবশ্য তাতে কনভিন্সড হয় নাই, তার কান্না থামানোর জন্য সেই লেফটেনান্ট কর্নেল নিজের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেল সকলকে। আমাকেও নিয়ে গেল, আমাকে তার বেশ পছন্দ হয়েছিল, আমাকে প্রথম দেখেই সে কী বলেছিল জানিস? "আপ বাঙালি হোনেসে কেয়া হ্যায়, আপকো তো সাচ্চা মুসলমান মালুম হোতা যায়।"

দাড়ি চুমড়ে হেসে ফেললো কামাল। বাবুর হাসতে পারে না, দিলারার মুখখানি মনে পড়ে তার। কলকাতার মেয়ে, তার মুখে সপ্রতিভ চাপ, অনেক বইপত্র পড়েছে সে,তার দুলাভাই-এর বন্ধুদের সঙ্গে কখনো কখনো তর্ক করতেও সে দ্বিধা করেনি। এই মেয়েটির একটি সুন্দর জীবন প্রাপ্য ছিল।

পল্টনের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কামাল বললো, ভিতরে গিয়ে তুই আরও দু একটা নতুন খবর শুনবি। তার আগে তোকে ব্যাক গ্রাউন্ডটা বলে দিই। ওয়েস্ট পাকিস্তানের সেই সহৃদয় লেফটেনান্ট কর্নেলের নাম মীর মহম্মদ খান। বেশ সরল, ধর্মপ্রাণ, জেদী ধরনের মানুষ বাঙালীদের সম্পর্কে তার মনে বেশ খানিকটা অবিশ্বাসের ভাব আছে, আবার কিছুটা অনুকম্পাও আছে। না হলে দিলারার অমন কান্নাকাটি শুনে তার এত দয়া হবে কেন? নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে তার আব্বা-আম্মার সাথে পরিচয় করায়ে দিয়েছে, আমাদের তিনদিন ধরে খাইয়েছে। আর জানিস তো মায়েরা সব দেশেই এক ঐ কর্নেল সাহেবের মা দিলারাকে নিজের কন্যার মতন স্নেহ করেছেন। পরিবারটি সত্যিই ভালো। আমি ওদের খুশি করবার জন্য দৈনিক সব নামাজ পড়েছি, উর্দু সিনেমা দেখে যতখানি উর্দু শিখেছি, তর সবটা ফলিয়ে কথা বার্তা বলেছি উর্দুতে, আমার বাবা যে একজন মৌলবী তাও জানিয়েছি।

বাবুল ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলা এসব কিসের ব্যাকগ্রাউন্ড?

কামাল মৃদু হেসে বললো দিলারাকে ওরা এত যত্ন করেছে, তার কান্না থামিয়ে সুস্থ করেছে, এইজন্য অনেক ধন্যবাদ ওদের প্রাপ্য । ঠিক কিনা? কিন্তু তারপর...

পল্টন দরজা খুলে দিল এই সময়। তার মুখ থমথমে। কোঁচকানো ভুরুটা ওদের দেখে খানিকটা সোজা করে সে বললো, আয়।

বাবুল কিছুই বুঝতে পারলো না। পল্টন রঙ্গরস প্রিয় মানুষ বন্ধুদের দেখে সে হাসলো না পর্যন্ত। বাড়িতে আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে?

অন্দরমহলে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ। দু'তিনজন মহিলা যেন একসঙ্গে কাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে?

পল্টন কামালের দিকে তাকিয়ে বললো, এই কামালটাই তো যত নষ্টের গোড়া।

কামাল চোখ বড়বড় করে বললো, আরে, আমি কী করলাম?

পল্টন ধমক দিয়ে বললো, তুই কেন দিলারাকে সাথে নিয়ে এলি না? লাহোরে রেখে এলি কেন?

–বাঃ আমি কী করতে পারতাম। মীর মহম্মদের মা দিলারাকে আরও কয়েক দিন রেখে দেবার জন্য পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন, দিলারাও দেখলো অরাজি না, আমি কি তারে জোর করে নিয়া আসতে পারি? সে তো ওখানে ভালোই ছিল।

পল্টন নিচু গলায় বললো, সেই মীর মহম্মদ এখন ঢাকায়। গতকাল বাসায় এসেছিল, আজ সকালেও এসেছিল।

কামাল বললো, সে রোজই আসবে।

পল্টন বললো, সে কী প্রস্তাব দিয়েছে জানিস? সে দিলারাকে শাদী করতে চায়। লোকটার প্রথম বউ মরেছে দু'বছর আগে।

কামাল বললো, আমি জানতাম এ রকম হবেই। আমরা সিনেমার গল্প লিখি তো, তখন দেখেই বুঝেছিলাম।

পল্টন আবার তাকে ধমক দিয়ে বললো, তুই চুপ কর। এখন কী করা যায়, বল তো বাবুল?

–দিলারার কী মত? এত তাড়াতাড়ি ইউসুফের সাথে তার সুন্দর সম্পর্ক ছিল।
–ততটা সুন্দর ছিল না বোধ হয়। বাইরের থেকে বোঝা যায় না। ইউসুফের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সে অত কান্নাকাটি করেছিল, কিন্তু এখন মীর মহম্মদের প্রস্তাবে সে অরাজি নয় মেয়েমানুষের চরিত্র বোঝা দায় আসলে মীর মহম্মদের মাকে নাকি তার খুব পছন্দ হয়েছে।
তিন বন্ধু কথা বলছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, এক সময় দিলারা ছুটে এলো ভেতর থেকে, তার চুল এলোমেলো, তার পোশাক আলুথালু দুই গালে কান্নার রেখা, সে বাবুলদের দেখলো না, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে।
বাবুল ধীর স্বরে বললো, ও যদি রাজি থাকে, তাহলে আর আপত্তি কী আছে? বিধবা হয়ে শুধু কষ্ট পাওয়া ওর যখন কোনো বাচ্চা কাচ্চা নাই...
পল্টন বললো, নীলার একেবারে পছন্দ নয়। আর কিছুদিন বাদে এখানকারই কোনো ভালো ছেলের সঙ্গে দিলারার আবার বিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের সংসারে একটা পশ্চিম পাকিস্তানী এসে ঢুকবে?
কামাল বাবুলের বুকে হাত রেখে বললো, সেটা যেমনভাবেই হোক আটকাতেই হবে। ভারতের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবারে আমাদের আসল লড়াই হবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে। লাহোরে থাকতে থাকতেই আমি সেটা বুঝে গেছি। আমাদের মেয়েদের ওরা পছন্দ করতে পারে বটে, বাঙালী পুরুষদের ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না।
পল্টন বললো, তুই একটু চেষ্টা করে দ্যাখ। তুই বুঝিয়ে বললে...
বাবুল বললো, আমি কী করতে পারি? আমার কথা শুনবে কেন?
পল্টন বললো, তোর কথা শুনবে। তোর ওপর দিলারার দুর্বলতা ছিল, তোকে এখনও খুব পছন্দ করে, তুই যদি একটু ভালো করে বলিস, অন্তত একটু প্রেমের ভান করিস...
মুখটা কুঁকড়ে গেল বাবুলের। মাটির দিকে তাকিয়ে সে ক্লিষ্ট গলায় বললো, ওভাবে বলিস না, ওভাবে বলিস না.....

॥ ৩৬ ॥

স্টাডি সার্কল থেকে একটি ছোট দল যাবে বর্ধমানের মেমারিতে, থাকার ব্যবস্থা পমপমদের বাড়িতে, হবে সেই জায়গাটি কেন্দ্র করে ঘোরা হবে আরও কয়েকটি গ্রামে।
অতীন তো যাবেই এবং সে ধরেই নিয়েছে অলি যাবে না, অলিকে সে কিছু জিজ্ঞেসও করেনি। তা ছাড়া ক্রিসমাসের ছুটিতে বিমানবিহারী সপরিবারে প্রতি বছরই কৃষ্ণনগরের বাড়িতে যান, এবারেও যাওয়ার প্রস্তুতি চলবে, অলিই বরং অতীনকে বললো, বাবলুদা, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে?
অতীন ভুরু কুঁচকে বললো তোর বাবা-মায়ের সঙ্গে আমি কৃষ্ণনগরে গিয়ে কী করবো? খোকা সেজে সরপুরিয়া সর ভাজা খাবো? আমি তো এই শনিবার বর্ধমান যাচ্ছি, ওখানে আমাদের স্টাডি সার্কলের প্রোগ্রাম আছে।
এবারে অলির ভুরু কোঁচকানর পালা। নিয়মিত প্রতি বৈঠকে না গেলেও অলি এখন স্টাডি সার্কলের সদস্যা, সে চাঁদা দেয়।
অলি বললো, বর্ধমানে স্টাডি সার্কলের প্রোগ্রাম হচ্ছে? সে কথা আমাকে জানানো হয়নি কেন?
তিনতলায় অলির পড়ার ঘরে অতীন চেয়ারে বসে সামনের টেবিলে দুটো পা তুলে দিয়েছে, সে এরকম দ-এর ভঙ্গিতে বসতে ভালোবাসে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, মাত্র কিছুদিন হলো সে এই ঘরে সিগারেট টানার প্রশ্রয় পেয়েছে। ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ার বিশ্রী গন্ধ হয়ে যায়, অনেকক্ষণ সেই গন্ধটা থাকে, সেই জন্য অলি প্রথম প্রথম আপত্তি করতো। কিন্তু তা হলে অতীনকে দশ মিনিটের বেশি আটকে রাখা যায় না। সে ঝড়ের বেগে আসতো, অলির সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে বলতেই সে হঠাৎ পকেট চাপড়ে বলে উঠতো, ও তোর এখানে তো সিগারেট টানা যাবে না, তা হলে আমি এখন চলি। সুতরাং বাধ্য হয়েই অলিকে সম্মতি দিতে হয়েছে।
অতীন বললো সবাই তো যাচ্ছে না, ছোট একটা গ্রুপ, সবাই মিলে গেলে ওখানে থাকার অসুবিধে আছে।
–আমি বুঝি সেই ছোট গ্রুপের মধ্যে থাকতে পারি না?

–কেন পারবি না? তোর যদি যেতে ইচ্ছে করে তো চল।
–কে কে যাচ্ছে?
–কৌশিক, অনুপম অরুণ, প্রীতিময় শুভানন আর আমি। মানিকদা দু'দিন পরে জয়েন করবেন।
–পমপম যাচ্ছে না?
–পমপম তো যাবেই, ওদেরই বাড়ি, পমপম না গেলে আমাদের কে চিনবে?
– তা হলে আমিও যাবো। বাবলুদা তুমি আমার মাকে একটু বলো মা রাজি হলেই বাবা আর আপত্তি করবেন না।
–ওসব আমার দ্বারা হবে না ভাই। তোর মাকে বাবাকে আমি কিছু বলতে পারবো না। তুই কি কচি খুকী নাকি, অলি? নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ।
–শুধু আমি বললে মা-বাবা আমাকে একটা অচেনা জায়গায় যেতে দেবে?
–যেতে না দিলে যাবি না! তোর হয়ে আমি ওকালতি করতে পারবো না, আই অ্যাম স্যারি, সেদিন সেই রাত্তিরের পর......
অতীন টেবিল থেকে পা দুটি নামিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো, সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে দিল জানলা দিয়ে। সে বিদায় নেবার জন্য উদ্যত।
মাস কয়েক আগে একদিন স্টাডি সার্কল থেকে ফেরার পথে হঠাৎ হাঙ্গামা ও কারফিউতে ওরা দু'জন আটকে পড়েছিল, বাড়ি ফিরতে পারেনি। বাড়িতে কোনো খবর না জানিয়ে সারা রাত বাইরে কাটালে যতখানি নাটকীয় ব্যাপার হতো, ততটা হয়নি অবশ্য। যে গাড়ি বারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল, সেই বাড়ির সহৃদয় মালিক দরজা খুলে ওদের ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রে স্ট্রিটে সাত রাউন্ড গুলি চলেছে; রাত এগারোটার পর অবস্থা কিছুটা শান্ত হলেও সারা রাতের জন্য কারফিউ জারি হয়ে গেছে, ওদের পক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় ফেরা সম্ভব নয়। প্রথম দিকের উত্তেজনা খানিকটা স্তিমিত হয়ে গেলে অলি তার মা-বাবার চিন্তায় দারুণ মুষড়ে পড়েছিল। তাদের পরিবারে একটি কুমারী মেয়ের সারা রাত বাড়ি না ফেরা একেবারে অকল্পনীয় ব্যাপার। একমাত্র উপায় টেলিফোনে খবর দেওয়া কিন্তু সে বাড়ির টেলিফোনটি খারাপ। পাশের বাড়িতে টেলিফোন ছিল, কিন্তু তাঁরা কেউ সাড়া শব্দ দিচ্ছিল না। অতীন ছাদে পাঁচিল টপকে গিয়ে সে বাড়ির লোকজনদের ডেকে তোলে কিংবা তাদের মটকা ঘুম থেকে জাগায়। টেলিফোনের লাইন পাওয়া গেল, কিন্তু শুধু অতীনের কথা শুনে অলির মা কল্যাণী শান্ত হননি। তিনি অলির কণ্ঠস্বর শুনতে চেয়েছিলেন। তখন অলিকে আনার ব্যবস্থা করা হলো। তাতেও মিটলো না।
রাত দুটোর সময় পুলিসের গাড়ি চেপে মেয়েকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন বিমানবিহারী। সরকারি মহলে তাঁর অনেক চেনা-শুনো, গভীর রাতে হোম সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি পুলিসী সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। শান্তিনিকেতন এবং কৃষ্ণনগরের লোকদের হাতেই তো অধিকাংশ সরকারি ক্ষমতা।
সেদিনের ঘটনায় দুটি কারণে অতীন ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কলকাতা শহরে হঠাৎ দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধা কিংবা কারফিউ জারি হওয়ার জন্য তো অতীন দায়ী নয়। অলিকেও সে জোর করে স্টাডি সার্কলে নিয়ে আসেনি। তবু অলির মা বেশ কিছুদিন অতীনকে দেখেই মুখ গোমড়া করেছেন।
কথা বন্ধ করেননি, অতীনের নামে কোনো অভিযোগ করেননি, কিন্তু তাঁর ভাবটা অতীনের চোখ এড়ায়নি। তা দেখে অতীন ভেবেছিল, সে আর জীবনে কোনোদিন এ বাড়িতে আসবে না। কিন্তু অলি কান্নাকাটি করে। বিমানবিহারী নিজে একদিন এলগিন রোডের সামনে অতীনকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বলেছিলেন, এই বাবলু তুই আমাদের বাড়ি অনেকদিন আসিসনি কেন রে? কী হয়েছে তোর?
অতীনের দ্বিতীয় ক্ষোভের কারণ, সে রাতে বিমানবিহারী তাকে জোর করে পুলিসের গাড়িতে ফিরতে বাধ্য করেছিলেন। পুলিসের ওপর অতীনের জাতক্রোধ জন্মে গেছে, গোর্কির লেকা পড়ে বুঝেছে যে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় পুলিস বাহিনী হলো শ্রেফ বড়লোকদের দারোয়ান। এরা কক্ষনো শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ দেখে না। সেই পুলিসের সাহায্য নেবে অতীন? সে রাজি হয়নি, সে চেয়েছিল, বিমানবিহারী নিজের মেয়েকে নিয়ে চলে যান, সে ঐ গাড়িবারান্দাওয়ালা বাড়িটাতেই রাতটা কাটিয়ে যাবে। কিন্তু বিমানবিহারী তাতে রাজি হননি কিছুতেই, তিনি তো শুধু অলিকে নিতে আসেননি, অতীনও তো তাঁর সন্তানের মতন।

অতীন ভেবেছিল, তার এই পুলিসের গাড়িতে ফেরার ব্যাপারটা শুনে স্টাডি সার্কলের বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করবে; কৌশিককে সে অনুরোধ করেছিল খবরটা যেন মানিকদার কানে না পৌছোয়, কিন্তু মানিকদা ঠিকই জেনেছেন, পুলিসের উঁচু মহলে মানিকদার কয়েকজন বন্ধু আছে, তাদের কাছ থেকেই সম্ভবত জেনেছেন, কিন্তু কিছু উচ্চ বাচ্য করেননি।

অলি উঠে এসে অতীনের জামার একটা বোতাম ধরে গাঢ় গলায় বললো, বাবলুদা, আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো বর্ধমানে।

অতীন নিস্পৃহভাবে বললো, সে জন্য তোকে নিজেই ব্যবস্থা করতে হবে। দ্যাখ যদি তোর বাপ-মাকে বোঝাতে পারিস।

অত কাছে পেয়েও সে অলিকে বুকে টেনে নিল না, টপ করে একটা চুমু খাবার চেষ্টাও করলো না, অলির মিনতিময় চক্ষু দুটি অগ্রাহ্য করে সে বেরিয়ে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে গুন গুন করে সুর ভাজতে লাগলো পর্যন্ত।

অলিরও জেদ আছে। সে বর্ধমানে যাবেই। মায়ের কাছে এমনি এমনি বললে সে অনুমতি পাবে না, তাই সে পমপমকে ধরলো, তাকে একদিন ডেকে নিয়ে এলো বাড়িতে। মা ও বাবার সঙ্গে পমপমের চেহারা ও ব্যবহারে একটি স্বচ্ছল পরিবারের পালিশ আছে। দু'দিন বাদে পমপম আবার এসে অলির মায়ের কাছে প্রস্তাবটি জানালো, সে অলিকে তাদের বর্ধমানের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। কল্যাণী সরাসরি আবেদনটি অগ্রাহ্য করলেন না, রাজিও হলেন না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন যে তাঁদের কৃষ্ণনগরে যাওয়া সব ঠিকঠাক হয়ে আছে, তাঁর শাশুড়ি অর্থাৎ অলির ঠাকুমা এখন সেখানে আছেন, তিনি আর কতদিন বাঁচবেন তার ঠিক নেই, তিনি অলিকে না দেখলে দুঃখ পাবেন।

পমপম তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারিণী মেয়ে। মানুষকে যুক্তি দিয়ে জব্দ করার শিল্প সে যত্ন করে আয়ত্ত করেছে। সে নিরীহ মুখ করে কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, মাসিমা., আপনি বিয়ের আগে আপনার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ছাড়া কখনো আপনার বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেছেন?

কল্যাণী বললেন, আমাদে সময় এসব ছিল নাকি? বাড়ি থেকে এক পা বেরুতে দেওয়া হতো না। বড় বয়েস পর্যন্ত ইস্কুলে গেছি বাড়ির খুব কাছেই ইস্কুল, তবু বাড়ির দারোয়ান পৌছে দিয়ে আসতো। আমার বাবা তিনি কি এই অলির বাবার মতন নাকি? কী প্রচণ্ড ভয় পেতুম বাবাকে, চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস ছিল না...

পমপম বললো কিন্তু আপনার কখনো ইচ্ছে করতো না, বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যেতে, দেওঘর মধুপুর, কিংবা সারা দিন বোটানিকসে বা চিড়িয়াখানায়..সত্যি করে বলুন ইচ্ছে করতো না?

কল্যাণী পমপমের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না।

পমপম দৃষ্টি না সরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, সত্যি করে বলুন, ইচ্ছে করতো না?

–ওরে বাবারে, ওসব ভাবলেও ভয় হতো। বাবার কাছে এসব কথা বলার সাহসই হতো না

–আপনি ভয়ে আপনার বাবাকে বলতে পারেননি, কিন্তু মনে মনে আপনার ইচ্ছে হতো কি না সেটা বলুন?

কল্যাণী আবার চুপ করে গেলেন।

পমপম বললো, তার মানে আপনার ইচ্ছে হতো ঠিকই। আপনি অআপনার নিরেজ যেসব ইচ্ছে ফুলফিল করতে পারেননি, আপনার মেয়েকে সেই সব সুযোগ দেওয়া মেয়েকে সেই স্বাধীনতা যদি না দেন তা হলে বুঝতে হবে আপনি আপনার সেই ইচ্ছেগুলোকেই অপমান করছেন।

কল্যাণী বললেন, অন্য সময় গেলে আমার আপত্তি ছিলনা, কিন্তু ঐ যে বললুম, কৃষ্ণনগরে মা অলিকে না দেখলে দুঃখ পাবেন তিনি আশা করে আছেন...

পমপম সঙ্গে বললো, তা হলে নীতিগতভাবে আমার সঙ্গে অলিকে যেতে দিতে আপনার আপত্তি নেই? ঠিক আছে, অলি আমার সঙেগ বধমান চলুক কয়েকদিন বাদে আমি নিজে ওকে কৃষ্ণনগরে পৌছে দিয়ে আসবো। আমাদের ওদিক থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত বাস আছে। কাটোয়া লাইনে ট্রেনেও নবদ্বীপ যাওয়া যায়, আর নবদ্বীপ থেকে গঙ্গা পেরুলেই তো কৃষ্ণনগর। আমরও দেখে আসা হবে আপনাদের কৃষ্ণনগরের বাড়িটা।

বিমানবিহারীও আপত্তি করলেন না। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পমপমদের গ্রামের বাড়ির খবরাখবর নিলেন, তারপর বললেন, বেশ তো, তোমরা দু'জনে বর্ধমান ঘুরে তারপর কৃষ্ণনগরে চলে এসো।

অনুমতি পাওয়া গেল বটে, তবু অলির মনের মধ্যে রয়ে গেল একটা কাটার খচখচানি। মা, বাবা কারুকেই জানানো হলো যে তাদের সঙ্গে বাবলুদাও যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে আর কে কে যাবে সে প্রসঙ্গই তোলেনি পমপম। বাবলুদার সঙ্গে যাওয়াটা তো গোপন করা মতন কিছু ব্যাপার নয়। পরে এটা জানতে পারলে মা, বাবা দুঃখিত ও আহত হবেন। তাঁরা ভাবতেই পারেন যে বাবলুও যখন বর্ধমানে যাবে, তখন সে নিজে এসে কল্যাণী বা বিমানবিহারীর কাছে সে কথা বলে গেল না কেন? সত্যিই তো, বাবলুদার তো বলা উচিত ছিলই, কিন্তু অদ্ভুত সেই ছেলে, সে সেই যে একবার ঘাড় বেঁকা করেছে, আর কিছুতেই সোজা করবে না, সে বর্ধমান যাওয়ার ব্যাপারে অলির কোনো দায়িত্ব নিতে রাজি নয়।

অলি যাচ্ছে শুনে সুস্মিতা নামে আর একটি মেয়েও জুটে পড়লো, মূল দলটি থেকে বাদ পড়লো প্রীতিময়, কারণ তার মা অসুস্থ। ট্রেন হাওড়া ছাড়ার পর অলি সত্যিকারের একটা মুক্তির স্বাদ পেল। বাড়ির গাড়ি চেপে সে বাইরে অনেক ঘোরাঘুরি করেছে, ট্রেনেও গেছে পুরী আর বেনারস, কিন্তু এইভাবে শুধু সম বয়েসীদের সঙ্গে দল বেঁধে কোথাও যাওয়ায় অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। এর জন্য আনন্দ।

ওরা চেপেছে দুপুরবেলার লোকাল ট্রেনে, কামরা বেশ ফাঁকা জানলা দিয়ে এসে পড়েছে শীতের রোদ। অতীন বসেছে খানিকটা দূরে, কৌশিকের সঙ্গে খুব মন দিয়ে কী যেন আলোচনা করে যাচ্ছে। অলির সঙ্গে চোখাচোখি হল তাতে যেন ফুটে উঠছে একটা রাগ রাগ ভাব, যেন অলির আসাটা তার ঠিক পছন্দ হয়নি। অলির এক একবার সন্দেহ হয়, বাবলুদা কি তাহলে তাকে ভালোবাসে না? অথচ, অলির গানের মাস্টার, তার ইংরিজির স্যার, এদের ঘোরতর অপছন্দ করতো বাবলুদা, তার কথাতেই ওদের বিদায় করা হয়েছে, অন্য কারুর সঙ্গে অলির সামান্য ঘনিষ্ঠতাও সে সহ্য করতে পারে না।

অনুপম ভালো গান করে। কয়েক স্টেশান পর কামরা আর একটু জনবিরল হলে সে উচ্চ কণ্ঠে গান ধরলো। প্রথমেই ইন্টার ন্যাশনাল অ্যারাইজ ও প্রিজনার অফ স্টারভেশান, অ্যারাইজ ও রেচেড অফ দা আর্থ..।

অন্যরাও গলা মেলালো। শেষ হতেই অরুণ বললো এর নজরুলের অনুবাদটা জানিস। 'জাগো, জাগো, সর্বহারা।

অনুপম এর পর গাইলো, উই শ্যাল ওভারকাম, উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে..

অতীনের সঙ্গে কথা তামিয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, অনুপম তুই পুরোনো আই পি টি এ-র গান জানিস না?

অনুপম মাথা নেড়ে বললো আমার বাংলা গানের স্টক খুব কম ছোট বেলায় মুঙ্গেরে ছিলাম তো...

কৌশিক বললো, আমার দাদার কাছে কিছু ঐ সময়কার গান শুনেছি। আমার সেগুলো দারুণ লাগে, আমি চেষ্টা করছি।

..আমার ভিটেয় চড়লো ঘুঘু
                ডিম দিল তোমাকে
সেই আজব ডিমের আজব শিশু
                খাস দিল্লিতে থাকে
শুন শিশুর পরিচয়
যেমন তেমন নয়কো শিশু মস্ত মহাশয়
ওগো শুন শিশুর পরিচয়
হিটলার তাহার জ্যাঠা ছিল
                মুসোলিনী মেসো-ও-ও
আর মার্কিন দেশের মার্শাল মাসি
পাঠায় খেলনা ডলার ঝুম ঝুম
নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক ডুমাডুম ডুম
আর জান দিয়ে জানোয়ার পেলাম
                লাগলো দেশে ধূম..

অতীনের গলায় সুর নেই, সে গান গাইতে পারে না। কিন্তু এই গান শুনে সে মুগ্ধ এবং অবাক।

কৌশিক তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু কৌশিক যে এইরকম গান গাইতে পারে সে সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। সে বললো, দারুণ তো, আবার গান তো কৌশিক, গানটা তুলে নিই...

কৌশিক প্রথম দু'লাইন দু'তিনবার গাইলো, কিন্তু অতীনের গলায় তা উঠতে চায় না। অনুপম বাধা দিয়ে বললো, এই গানের ক্লাস এখন থাক। মেমারিতে গিয়ে তুই অতীনকে আলাদা শিখিয়ে দিস। অন্য গান হোক। আর কে কে গান জানে?

সুস্মিতা বললো, অলি নিশ্চয়ই গান জানে। অলিকে দেখেই মনে হয়। অন্যরা অনেক পিড়াপিড়ি করলেও অলি মুখ খুলতে চাইলো না, সে কখনো এমনভাবে খোলা গলায় গান করেনি। অতীন এক সময় বললো, থাক ওকে জোর করিস না। ও প্যানপ্যানানি রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু গাইতে জানে না।

অনুপম ও অন্য দু'একজন হই হই করে অতীনের কথায় আপত্তি জানালো। তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করে, তারা রবীন্দ্র সঙ্গীতই শুনতে চায়। শুভানন বললো, দেবব্রতর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে আমার মনটা এমন আনচান করে অলি, তুমি এই গানটা জানো, এ শুধু অলস মায়া...

ট্রেন একটা স্টেশানে থেমেছে। বাথরুমের দেয়ালের গায়ে একটি বিরাট পোস্টার, অশোক সেনগুপ্তর নামে। সেদিকে সকলেই দৃষ্টি পড়লো। অতীন জিজ্ঞেস করলো, পমপম তোর বাবা সামনের ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছেন বুঝি?

পমপম বললো, খুব সম্ভবত। কোঙারকাকু এসে খুব বোঝাচ্ছেন ক'দিন ধরে..

অরুণ বললো, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিরাট মার্কসিস্ট তাত্ত্বিক, তিনিও পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসির লাইন নিয়েছেন এখন। মানিকদা নাকি ওঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলেন। এখন ওঁদের বিপ্লব টিপ্লবের চিন্তা চুলোয় গেছে।

অনুপম বললো, সুরে বললো, স্টেট মেশিনারি দখল করার জন্য যে-কোনো পথ নেওয়া যায়..

অরুণ অবজ্ঞার সুরে বললো, স্টেট মেশিনারি দখল, হেঃ। দিল্লিতে ক্যাপিটালিস্ট অর ন্যাশনালিস্ট বুর্জোয়াজির যে ক্লিক আছে, সেটা দে করে ইলেকমানের মাধ্যমে আগামী পঞ্চাশ বছরেও ক্ষমতা দখলকরা যাবে তোরা মনে করিস?

অনুপম বললো, দিল্লিতে হয়তো সহজে ক্ষমতা দখল করা যাবে না। কিন্তু একটা একটা করে স্টেট যদি দখল করা যায়, যেরকম কেরালায় হয়েছিল, সেই রকমভাবে ওয়েস্টবেঙ্গলে, পাঞ্জাবে, আসামে...

অরুণ বললো, ওয়েস্টবেঙ্গলে? তুই খোয়াব দেখছিস অনুপম? অতুল্য ঘোষ প্রফুল্ল সেন গুষ্ঠকে তোরা হঠাতে পারবি? জ্যোতিবাবু অপোজিশান পার্টির লিডার হিসেবে গরম গরম বক্তৃতা দিতে দিতেই বুড়ো হয়ে যাবেন।

অনুপম বললো, অতুল্য ঘোস প্রফুল্ল সেন কি অমর?

—ওদের বদলে কংগ্রেসের সেকেন্ড র‍্যাংক উঠে আসবে। তোরা এখনও কমন বাঙালীদের চিনিস না, এই বাঙালীরা সুভাষ বোসের নাম শুনলেই নেচে ওঠে। তুই রটিয়ে দে, সুভাষ বোস হিমালয়ের কোনো গুহায় সাধু সেজে বসে আছে, অমনি দেখবি সব বাঙালী বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে ধেই ধেই করে নাচছে।

—তবু এই বাঙালীরা ফরোয়ার্ড ব্লককে ভোট দেয় না।

—ফরোয়ার্ড ব্লকের অর্গানাইজেশান নেই সেরকম। কংগ্রেস সেই সেন্টিমেন্টটা এক্সপ্লয়েট করছে। দেখবি প্রত্যেক ইলেকশানের আগে ওরা জনযুদ্ধের সেই ব্যাপারটা খুঁচিয়ে তোলে। সুভাষ বোস যদি বাই চান্স ফিরে আসে, তাহলে এরা ইন্দোনেশিয়ার প্যাটার্নে কমুনিস্টদের খুঁজে খুঁজে বার করে খুন করবে।

—সে গুড়ে বালি। সুভাষ বোস মরে ভূত হয়ে গেছে।

কৌশিক আর অতীনের দিকে সমর্থন চাওয়ার ভঙ্গিতে একবার তাকিয়ে অরুণ পমপমকে বললো ওসব ইলেকশান ফিলেকশানের ধাপ্পাবাজিতে আমরা বিশ্বাস করি না। পমপম, আমরা যদি তোর বাবার এগেইনস্টে কখনো কাজ করি, তুই তা হলে কী করবি?

পমপম নির্বিকার মুখে বললো, আমায় যিনি জন্ম দিয়েছেন, সব ব্যাপারেই যে তাঁকে আমার সাপোর্ট করতে হবে, এমন মাথার দিব্যি আমায় কেউ দেয়নি।

অলির এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না। সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। শরৎকাল

শেষ হয়ে গেছে, তবু মাঠের ধারে জলা জায়গায় এখনও ফুটে আছে কত কাশ ফুল। পুকুরগুলোতে লাল ও সাদা রঙের শালুক। সদ্য ধান কাটা হয়েছে। এক জায়গায় খড়ের স্তূপে লুটোপুটি খাচ্ছে দু'তিনটে বাচ্চা ছেলে মেয়ে, কী মিষ্টি তাদের হাসি। এদিকে ওদের কারুর চোখ নেই কেন?

॥ ৩৭ ॥

তিনতলার এই ঘরখানি সদ্য তৈরি হয়েছে। দেয়ালে ধপধপে সাদা চুনকাম জানলা দরজায় টাটকা সবুজ রং, এখনো সেই রঙের গন্ধ যায়নি। এ ঘরে কেউ বসবাস শুরু করেনি, কয়েকটি এলোমেলো ছড়ানো চেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দিলারা, জানলার ওপাশের আকাশ আজ বেশ পরিষ্কার নীল। দু'দিন ধরে ঢাকায় বেশ শীত পড়েছে। দিলারার অঙ্গে একটি হলুদ শাড়ি, তার ওপরে একটি কাশ্মীরী শাল জড়ানো। দীর্ঘাঙ্গী সে নাকটি তীক্ষ্ণ টানাটানা দুই চোখে আজ কোনো জলের চিহ্ন নেই।

একখানা দেয়াল ঘেঁষা চেয়ারে বসে আছে বাবুল। সে চোখ তুলতেই দিলারার সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে দিলারা, সে জানে বাবুলকে কোন নির্ভৃত আলোচনায় পাঠানো হয়েছে।

বাবুল কথা শুরু করতে পারছে না, জড়তাশূন্য পরিষ্কার কণ্ঠে দিলারাই বললো, আপনিও আমাকে নিষেধ করতে এসেছেন, তাই না বাবুল মিঞা?

কয়েক পলক দিলারার দিকে চেয়ে থেকে তারপর দু'দিকে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বাবুল না জানালো।

ওষ্ঠে সামান্য হাসি ফুটিয়ে দিলারা বললো, থ্যাঙ্ক ইউ। আমার ভরসা ছিল আপনি পেটি প্যারোকিয়ালিজম নিয়ে মাথা ঘামান না।

প্যারোকিয়ালিজম কথাটা শুনে বাবুলের হঠাৎ পরকীয়া শব্দটা মনে পড়ে গেল। দিলারা কিছুদিন আগেও পরকীয়া ছিল, এখও পরকীয়া হতে যাচ্ছে, এর মধ্যে বাবুল চৌধুরীর ভূমিকা কী থাকতে পারে? পল্টনদের যত সব পাগলামি। একটি শিক্ষিতা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে কি জোর করে আটকানো যায়? তবে এটাও বিস্ময়ের যে দিলারার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে মাত্র দু'মাস আগে, এর মধ্যেই সে দ্বিতীয় বিবাহে সম্মত হয়েছে।

—মঞ্জু ভাবী আর আপনার ছেলে কেমন আছে?

—ভালো।

—ঢাকাতেই আছে?

বাবুল সামনের দিকে দু'বার মাথা ঝোঁকালো। হঠাৎ বেশ জোরে হেসে উঠে দিলারা বললো, বাবুলমিঞা, আপনি যে আমার সাথে এই ভাবে কথা বলতে এসেছেন, মঞ্জু ভাবীর পারমিশান নিয়েছেন?

—কারুর সাথে কথা বলতে গ্যালেও বউয়ের পারমিশান নিতে হয় বুঝি? দু'পা এগিয়ে এসে মুখখানা একটু কানি নিচু করে দিলারা বললো আপনার মনে আছে, আমরা অনেকে মিলে একবার নারায়ণগঞ্জে পিকনিক করতে গেছিলাম? আপনি তখন সবে মাত্র শাদী করেছেন। আমি আপনার সাথে বলতে গেলেই আপনি ভাবীর দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন আমার কথার উত্তর দিতে গেলে ভাবীর অনুমতির প্রয়োজন। আমি তো তখনও প্রায় কলকাতার মেয়ে ছিলাম, আমি জানতাম না যে ঢাকায় কোনো নিউলি ম্যারেড পুরুষের সাথে অন্য মেয়েদের কথা বলতেও নাই।

অনুযোগটি এমনই সত্য যে বাবুল প্রতিবাদ করতেও পারলো না। অন্য যে কোনো মেয়ের মোটেই। কিন্তু তাদের বিয়ের টি আগেই পল্টনরা অনেকে মিলে বলাবলি করতে শুরু করেছিল যে দিলারার সঙ্গে বাবুলের বিয়ে হলে তারা সবাই খুশী হতো, দিলারাও মনে মনে বাবুলকে খুব পছন্দ করে। বাবুল চেয়েছিল, সেই কথাটা যেন মঞ্জুর কানে না যায়, মঞ্জু শুনে ফেললে কি দিলারাকে পছন্দ করতে পারতো? নারায়ণগঞ্জের পিকনিকে সে যেতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের পর কয়েক বছর সে পারতপক্ষে পল্টনদের বাড়ির দিকও ঘেঁষেনি।

কথা ঘোরাবার জন্য বাবুল বললো, নিউলি ম্যারেড কাপ্‌লাররা পরস্পরের দিকে একটু বেশি তাকায়। সেটা কি অস্বাভাবিক?

দিলারা বললো, আপনার বিয়ের সময় আপনি আমাদের বাড়ি শুদ্ধ সবাইকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, আমাকে আপনি নিজের থেকে তো কিছু বলেননি, আমার নামও দুলাভাইকে বলেন নাই। তারপর আর একবার তখন আমারও বিয়ে হয়ে গেছে পিকচার প্যালেসে হঠাৎ দেখা, একেবারে সামনা সামনি, আপনি মঞ্জু ভাবীকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মুখ ফিরায়ে নিলেন, যেন আমারে দেখতেই পান নাই, কিংবা দেখেও ভাবলেন, আমি একটা কতা বলার যোগ্য মানুষই না...

এই শীতের মধ্যেও বাবুলের কান দুটি উষ্ণ হয়ে এলো। দিলারা প্রত্যেকটি ঘটনা মনে রেখেছে, তার কণ্ঠস্বরে মর্মভেদী শ্লেষ। আগে সে তাকে বাবুলভাই বলতো, আজ বলছে বাবুলমিঞা। এই একটি বিষয়ে বাবুল নিজের অক্ষমতার কথা ভালো করেই জানে, সে মেয়েদের সঙ্গে কিছুতেই সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না, সে দিলারাকে প্রবোধ দেবার কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

দিলারা আবার জানলার কাছে চলে গেল। জানলার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, যে সময় আপনি আমার সাথে দুটা মিষ্টি কথা বললে, আমার দিকে একটু ফিরে চাইলে আমার প্রাণ নেচে উঠতো, সেই সময় আপনি আমার দিকে একবারও ফিরেও তাকান নাই। আজ আপনে এসেছেন আমাকে লাহোরে যেতে নিষেধ করতে। আমি লাহোরে না গিয়ে যদি ঢাকায় থাকি, তাতে আপনার কী আসে যায়, সত্যি করে বলেন তো?

বাবুল নির্বাক নত মস্তক।

কিছুক্ষণ এরপর ঘরে মধ্যে নিস্তব্ধতা। বাবুল এখন পালাতে পারলে বাঁচে। নিজেকে তার জবাইয়ের পাঠা বলে মনে হচ্ছে। অথচ সে উঠে চলেও যেতে পারছে না। দু'একবার আড় চোখে সে দেখছে দিলারাকে। তেজস্বিনী দিলারা হঠাৎ যেন বেশি সুন্দরী হয়ে উঠেছে।

একটু পরে কণ্ঠস্বর বদলে দিলারা জিজ্ঞেস করলো, আপনি লাহোরে গ্যাছেন কোনোদিন?

বাবুল বললো, না আমার ওয়েস্ট পাকিস্তানে যাওয়া হয় নাই।

—একবার গিয়া নিজের চোখে দেখে আসেন। আপনারা তো ঘরে বসে বসেই সব কিছু বুঝে যান। ঢাকার তুলনায় লাহোরে সোসাইটি অনেক নর্মাল। হিপোক্রেসি নাই। তারা যা বিশ্বাস করে, জীবনেও তা মানে। আপনারা বলেন যে ওয়েস্ট পাকিস্তানীরা আমাদের এক্সপ্লয়েট করে। প্রত্যেক ওয়েস্ট পাকিস্তানীই কি তাই। সেখানে গরিব নাই? সেখানে একজনও সৎ মানুষ নাই?

এবারে কথা খুঁজে পেয়ে বাবুল বললো না, না, আমি তা মনে করি না। কোনো দেশেরই জনসাধারণকে আমি দুশমন মনে করি না। অবশ্যই সেদিকে অনেক সৎ মানুষ আছে।

—আমার মা নাই। লাহোরের একজন মহিলার কাছ থেকে আমি মাতৃস্নেহের স্বাদ পেয়েছি অনেককাল পর। তিনি আমাকে পুত্রবধূ করে নিতে চান।

—আমার কোনো আপত্তি নাই, দিলারা।

—বহুৎ শুক্রিয়া, চৌধুরী সাহেব।

বাবুল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মাই কংগ্রাচুলেশনস্। আশা করি লাহোরের সেই মহিয়সী মহিলার পুত্রটিও তোমাকে খুশী করবে।

এমন শুষ্কভাবে শেষ কথা বলে চলে যাওয়া উচিত নয় ভেবে দরজার কাছে গিয়ে বাবুল আবার ফিরে তাকিয়ে বললো, ঢাকা থেকে একজন সুন্দরী মেয়ে কমে যাবে, সেইটুকুই যা আমাদের দুঃখ।

অদ্ভুত তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে দিলারা বললো, আমার হাজব্যাণ্ড ঢাকাতেই পোস্টিং নিচ্ছেন। কয় মাস পরে আমি ঢাকাতেই এসে থাকবো। কিন্তু তাতে কি আপনার কিছু যাবে আসবে? আমাদের বাড়িতে দাওয়াত দিলেও কি মঞ্জু ভাবী অপনাকে পারমিশান দেবে?

আর কোনো উত্তর না দিয়ে বাবুল ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো নিচে। পল্টনদের সঙ্গে দেখা না করে সে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কামাল ও জহির ছুটে এলো তাকে ধরবার জন্য, ততক্ষণে বাবুল মোড়ের মাথায় পৌঁছে গেছে।

কামাল জিজ্ঞেস করলো, কী হইলো? প্রথম প্রেমিকের কথা শুনে কি একটুও মন গললো দিলারা বেগমের?

বাবুলের এমনই মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে যে সে জোরের সঙ্গে কামালের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, কেন তোরা আমাকে এরকম বিরক্ত করিস? জানিস যে আমি এসব পছন্দ করি না।

জহির বললো, জানতাম, বাবুলের দ্বারা কিছু হবে না। বাবুল যে বেশি বেশি মরালিস্ট। টঁকা ঘরে পাঠানো হইলো, আমরা নিচে পাহারা দিতেছিলা, কেউ ডিস্টার্ব করতো না, বাবুল যদি দিলারাকে

জড়িয়ে ধরে কয়েকটা চুমা টুমা খেতো।

বাবুলের ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেছে, সে ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো বন্ধুদের দিকে।

কামাল তার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললো, ছাড়ান দে ওসব কথা। যা হবার তা তো হবেই। নবাব জমিদারদের দিন গ্যাছে, এখনতো সুন্দরী মেয়েরা আর্মি অফিসার আর বড় বড় ব্যবসায়িদেরই ভোগে লাগবে। ওয়েস্ট পাকিস্তানীরা আমাদের এদিককার সোনাদানা ফরেন এক্সচেঞ্জ সবই নিয়া ফাঁকা কইরা দিল, সুন্দরী সুন্দরী মাইয়াগুলারেও নিয়া যাবে, এ আর বেশি কথা কী?

জহির বললো, বাদ দে বাদ দে! চল বাবুল এখন আমরা একখানে যাবো।

বাবু বললো, এখন আমি বাড়ি যাবো।

কামাল বললো, বাড়ি তো যাবিই, তার আগে একটা জায়গায় ঘুরে যাই।

জাহির বললো, কাছেই, গোল্ডেন গুজ হোটেলে। একজনের সাথে তোর আলাপ করিয়ে দেবো। খুব জরুরী কথা আছে।

বাবুলের আপত্তি ওরা শুনলো না, প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে গেল।

সন্ধে হয়ে এসেছে, পথে অজস্র সাইকেল রিকশার জটলা। ওরাও দুটি সাইকেল রিকশা নিল। বিভিন্ন মসজিদ থেকে ভেসে আসছে মাগরেবের আজানের সুর। একটি সিনেমা হলের সামনে উর্দু সিনেমার লাইনে টিকিটের জন্য হঠাৎ মারামারি শুরু হয়ে গেছে।

নিউ মার্কেটের কাছেই গোল্ডেন গুজ হোটেল, মাঝারি ধরনের। কাউন্টারের ম্যানেজারটি কামালের চেনা, সে আদাব জানালো। ওরা উঠে এলো দোতলায়। একটি ঘরের দরজায় কামাল নির্দিষ্ট ছন্দে তিনটি করে তিনবার টোকা দিতে খুলে গেল দরজা। লাউঞ্জ শুট পরা একজন সুদর্শন যুবক দরজা খুলে হাসি মুখে বলল, ইউ আর লেইট।

ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দিল কামাল। তারপর বাবুলে দিকে হাত ছড়িয়ে দিয়ে বললো, আলাপ করায়ে দিই। ইনি বাবুল চৌধুরী, এর কথা তোমাকে বলেছিলাম, আর এই হচ্ছে সিরাজুল আলম খান, আমরা সবাই আলম বলে ডাকি, লণ্ডনে থাকে। আলম একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে আমাদের কয়েকজনের সাথে কথা বলতে।

আলম বললো, বসেন, আগে বসেন সবাই। চা কফি কিছু খাবেন, তাইলে আনতে বলি। যদিও দা টি দে আর সারভিং হিয়ার ইজ টেস্টলেস। আমরা লণ্ডনে অনেক ভালো চা খাই।

জহির বললো না, বিকালে দুই তিন কাপ খেয়েছি, এখন দরকার নাই।

—অন্য কিছু ড্রিংক্স নেবেন? সাম হার্ড ড্রিংক্স তাও আছে আমার কাছে।

—থাক, এখন থাক। তোমার সিগারেট দাও বরং।

বাবুল ধূমপানও করে না,অন্য তিনজন সিগারেট ধরালো। আলম বাবুলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি ইকোনোমিকস পড়ান? ইউ কে-তে আসেন নাই কখনো? আসেন একবার।

বাবুল শুকনো ভাবে বলো, হ্যাঁ যাবো কোনো সময়ে।

—আপনার বড় ভাই একটা নিউজ পেপার চালান? আমরা আপনাগো সাপোর্ট চাই। আমরা সব পারটির কাছেও অ্যাপ্রোচ করতাছি।

—আমরা মানে?

জহির বললো, আমি বুঝায়ে বলি। আগে ব্যাকগ্রাউণ্ডটা জানা দরকার। বাবুল তুই লণ্ডনের "উত্তর সুরি" গ্রুপের নাম শুনেছিস? আলম এসেছে সেই গ্রুপের পক্ষ থেকে।

আলম বললো, এখন "উত্তর সূরি" নামটা বিশেষ চালু নাই। এখন আমাদের গ্রুপের নাম 'ইস্ট পাকিস্তান হাউজ'। আমরা নর্থ লণ্ডনে হাইবেরি হিল এ একটা বাড়ি কিনেছি, সেই বাড়ির নাম ইস্ট পাকিস্তান হাউজ। সেখান থেকে আমরা দুটো সাপ্তাহিক কাগজ বার করি, ইংরেজি আর বাংলায়, 'এশিয়ান টাইড আর পূর্ব বাংলা। সে বাড়িতে আমাদের মিটিং হয় এক অংশে কিছু ছাত্রও থাকে।

দরজায় টক টক শব্দ হতেই আলম থেমে গেল। কামাল উঠে দরজা খুলে সামান্য ফাঁক করে কথা বললো যেন কার সঙ্গে। তারপর মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আলম তোমার সাথে দেখা করার জন্য কে যেন এসেছে নিচে।

আলমের মুখে সামান্য যেন আশঙ্কার ছায়া খেলে গেল। সে জিজ্ঞেস করলো, কে? নাম বলেছে কিছু?

কামাল বাইরের লোকটিকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়ে বললো, না, নাম বলে নাই।

আলম তার চিবুকটা নোখ দিয়ে চেপে ধরে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললো, আর কারুর তো আসার কথা নাই। কে আসবে? কামাল তুমি একটু নিচে গিয়ে লোকটাকে দেখে আসবে?

কামাল দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে না ফেরা পর্যন্ত বাকি তিনজন একেবারে চুপ। আলম একটা সিগারেট শেষ হতে না হতেই ধরালো আর একটা।

কামাল ফিরে এসে হাসি মুখে বললো, যতসব বখেরা। উটকো ঝঞ্ঝাট। অন্য এক আলম সাহেবকে খুঁজতে এসেছে। হোটেলের ম্যানেজার বোঝে নাই। তাকে আমি এবারে ভালো করে বলে দিয়ে এসেছি।

আলম বললো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমরা এতদিন....

বাবুল বললো, ঠিক আছে। হ্যাঁ যা বলছিলাম। আমরা এতদিন...

বাবুল বললো, আমি আপনাদের গ্রুপের অ্যাকটিভিটির কথা কিছু কিছু জানি। আপনারা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি তুলেছিলেন।

–জী। তবে সেটা এতদিন ছিল থিয়োরিটিক্যাল দাবি। ওয়েস্ট পাকিস্তান আমাদের কতখানি এক্সপ্লয়েট করে সেই চিত্র তুলে ধরে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গড়া ছাড়া আমাদের আর বাঁচা পথ নাই। এখন সেই দাবিকে কাজে পরিণত করার সময় এসেছে।

জহির বললো, লণ্ডনে বসে এরকম দাবি তোলা সহজ! এখানে ঐ কথাটা একবার রাস্তায় গিয়ে উচ্চারণ করে দ্যাখ না।

আলম বললো, টাইম ইজ রাইপ নাউ। ইণ্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধে আইয়ুব অপদস্থ হয়েছে। এই যুদ্ধে লাভ কী হলো? শুধু সৈন্যক্ষয় আর ধনক্ষয়। ইণ্ডিয়াকে ঠাণ্ডা করতে পেরেছে? কাশ্মীর দখল করতে পেরেছে? ওয়েস্ট পাকিস্তানেও আইয়ুব এখন আন পপুলার । বাঙ্গালীদের এন বোঝাতে হবে যে আমাদের জান মালের কোনো দায়িত্বই ওয়েস্ট পাকিস্তানীরা নেবে না। তারা শুধু শোষণই করবে। আমাদের রক্ত চুষে ওয়েস্ট পাকিস্তানের বাইশটা ফেমিলি ধনী হবে। এই অবস্থায় আমরা ওদের সাথে সব সম্পর্ক ছিড়ে ফেলবো না কেন?

–সেটা কি অত সোজা?

–জনমত গঠন করতে হবে। আমাকে পাঠানো হয়েছে সব পলিটিক্যাল লিডারদের সঙ্গে কথা বলতে। সিকস্টি থ্রি তে শেখ মুজিব যখন লণ্ডনে এসেছিলেন সোহরাওয়ার্দি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে তখন আমরা মুজিবকে বুঝাতে গিয়েছিলাম। উনি তখন আমাদের কথা মানেন নাই। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রস্তাব শুনে উনি আতকে উঠে বলেছিলেন, আমি বড় জোর সায়ত্তশাসন চাই, তার বেশি না। তাছাড়া উনি সোহরাওয়ার্দি সাহেবকে ভয় পেতেন, ওঁর কথার ওপর কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু এখন সিচুয়েশান অনেক চেইঞ্জড। শেখ মুজিব এখন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, তাঁর সর্বময় ক্ষমতা, আমি কাল তাঁর সাথে দেখা করবো, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি।

জহির জিজ্ঞেস করলো, কে তোকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিল?

আলম বললো, আমার লণ্ডনের সোর্স আছে। আমরা বিদেশে প্রচারের ভার নেবো, আইয়ুব লণ্ডনে কমনওয়েলথ কনফারেন্সে গেলে আমরা বিক্ষোভ দেখাবো। ফরেন প্রেসের কাছে আমাদের দাবির কথা জানাবো। এখানে প্রচারের জন্য জনমত সংগঠনের জন্য আমরা তোমাদের সাহায্য চাই।

বাবুল বললো, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গড়া একটা অবাস্তব প্রস্তাব। আমি থিয়োরিটিক্যালিও এই প্রস্তাব সমর্থন করি না। এটা মিসগাইডেড চিন্তা।

আলম ও কামাল এক সঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে দু'জনেই থেমে গেল, অবাক হয়ে তাকালো।

জহির জিজ্ঞেস করলো, কেন তুই এটাকে মিসগাইডেড চিন্তা বলছিস কেন?

বাবুল গম্ভীরবাবে বাঁ হাতের পাঞ্জা তুলে কর গুনতে গুনতে বললো, এক নম্বর যে কোনো ভাবে পাকিস্তানকে দুর্বল করার চেষ্টা দেশদ্রোহীতারই নামান্তর। দেশের মানুষ তা সহ্য করবে না। দুই নম্বর, আইয়ুবের নেতৃত্বে এখন চীনের সাথে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব হয়েছে, এই সময়ে আইয়ুবকে প্যাঁচে ফেলায়ে দিলে চীনের সাথেই শত্রুতা করা হবে। কোনো সোসালিস্ট তা চাইতে পারে না। তিন নম্বর, আওয়ামীলীগ একটা ন্যাশ্‌নালিস্ট পেটি বুর্জোয়াদের পার্টি তাদের নেতৃত্বে এদেশে কোনোদিন টোটাল সোসালিজম আসতেপারে না। ওয়েস্ট পাকিস্তানীদের বদলে বাঙালী বুর্জোয়া এলিটদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলে সাধারণ মানুষের কী লাভ হবে? এ দেশেও বাইশটি ধনী পরিবারের সৃষ্টি হবে। চার নম্বর, এখন আইয়ুবের হাত শক্ত করে, চীনের সাতে আরও ঘনিষ্ঠতা করে আমদের উচিত টোটাল

রেভলিউশনের জন্য তৈরি হওয়া। সর্বাত্মক বিপ্লব ছাড়া পথ নাই। এখনো তার সময় আসে নাই। এখন ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইস্ট পাকিস্তান মুভমেন্ট করতে গেলে সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রস্তুতিই ক্ষতি হবে।

কামালরা যেন দমবন্ধ করে বাবুলের কথা শুনছিল, এবারে কামাল বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, তুই দেখছি বুড়া মৌলানা ভাসানীর ন্যাপের সুরে সুর মিলায়ে এখনও কথা বলছিস।

জহির বললো, তুই গোপনে গোপনে এখনো ন্যাপের সুরে-সর মিলায়ে এখনও কথা বলছিস।

আলম বলল, কিন্তু আপনি যে টোটাল রেভলুশানের কথা বলছেন, এই ধর্মের ধ্বজাধারী দেশে তা কত দিনে হবে? ততদিন ওয়েট করতে গ্যালে দেশটা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে? আগে আমরা স্বাধীন হই, তারপর আমরা সামজতন্ত্রের পথে আগিয়ে যাবো।

বাবুল জোর গলায় বললো, আমাকে এখানে শুধাশুধি ডেকে আনা হয়েছে। আমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গঠন একটুও সমর্থন করি না। বরং আপনাদের এই চেষ্টার আমি বিরোধীতা করবো।

তর্কাতর্কিতে বেজে গেল রাত সাড়ে দশটা। এতক্ষণ ঘড়ি দেখার কথা কারুরই মনে ছিল না। হঠাৎ খেয়াল হতে বাবুল উঠে দাঁড়ালো। শেষের দিকে বাবুলে সঙ্গে আলমের প্রায় ঝগড়া বেঁধে যাবার উপক্রম। দিলারার সামনে বাবুল বিশেষ কিছু কথা বলতে পারেনি কিন্তু রাজনীতির ব্যাপারে তার জিহ্বা অতি ধারালো।

বাবুল উঠে দাঁড়াতেই আলমতাকালো কামালের দিকে। কামাল সঙ্গে সঙ্গে বললো না, না, সে বিষয়ে চিন্তা নাই। বাবুল আলম যে এই হোটেলে আছে এবং সে কী উদ্দেশ্যে এসেছে সে কথা আশা করি তুই অন্যদের বলে দিবি না। আলম এখানে গোপনে এসেছে।

জহির বললো, মতের বিরোধীতা থাকলেও বাবুল তো আমাদের বন্ধু। সে কখনো বিট্রে করবে না।

বাবুল কোনো উত্তর দিল না, বেরিয়ে এলো। রাস্তায় এসে রিকশায় পাওয়া গেল না সহজে বাড়ি ফিরতে তার আরও অনেক রাত হলো।

মঞ্জু কোনোদিনই ঘুমিয়ে পড়ে না। একতলায় সিরাজুলদের ঘরে বাতি জ্বলছেনা, কিন্তু সিঁড়িতে ও ওপরে আলো আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বাবুল ভাবলো, একটু গরম পানি পেলে এখন একবার স্নান করে নিতে পারলে ভালো হতো। তর্ক করে মাথা গরম হয়ে গেছে, সহজে ঘুম আসতে চাইবে না। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান না ঘোড়ার ডিম। লণ্ডনে আমোদ আহ্লাদের মধ্যে থেকে শৌখিন চিন্তা। কামাল, জহিররাও ঐ মাকাল ফলের মতন চেহারার ছেলেটার কথা শুনে মেতেছে। লাউঞ্জ স্যুট পড়ে হোটেলে বসে থাকে, তার আবার বাঙালীদের জন্য দরদ।

এত রাত্রে মঞ্জুকে গরম পানির কথা বলা যায় না। সে ঢুকে গেল গোসলখানায়। খুব খিদে লেগেছে, মঞ্জু এর মধ্যে খাবার বেড়ে ফেলবে।

আজ যে বাবুল দিলারার সঙ্গে দেখা করেছে একটি নিভৃত ঘরে সে কথা কি মঞ্জুকে বলা উচিত? গোপন করবারই বা কী আছে? কয়েকদিন ধরেই মঞ্জুর মন মেজাজ ভালো নেই, হঠাৎ যদি দপ করে জ্বলে ওঠে? এত রাতে ওসব ঝঞ্ঝাট আর তার ভালো লাগবে না। বাবুল ঠিক করলো, পরে কোনো এক সময় মঞ্জুকে গল্পচ্ছলে বলে দিলেই হবে।

খাবার টেবিলে বসে বাবুল ভাতের সঙ্গে কপির তরকারি মেখে খানিকটা খাওয়ার পর ভাবলো, বাড়িতে ঢুকে সে এ পর্যন্ত মঞ্জুর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। কিছু একটা তো বলা উচিত। সে বললো, বাঃ, সব্জিটা তো বেশ ভালো হয়েছে। তুমি নিজে রেঁধেছো নাকি?

মঞ্জু সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো তুমি আবার পলিটিক্স করত্যাছো, তাই না?

মুখ তুলে বাবুল বললো, পলিটিকস? কিসের পলিটিকস?

মঞ্জু একই রকম সুরে বললো, পার্টি। পার্টির কাজে যাও। তাই তোমার বাড়ি ফেরতে দেরি হয়। আবার তুমি জেলে যাবে!

–যাঃ এসব বাজে কথা কে বলেছে তোমাকে?

–যখন স্বরূপ নগর থিকা আসি, তুমি কথা দিছিলা, তুমি পার্টি পুষ্টি, পলিটিক্স আর করবা না। কথা দাও নাই? তুমি আমার জন্য আর সুকুর জন্য ঐ সব ছাড়বা।

–কথা দিছিলাম ঠিকই।

–তুমি কথা রাখো নাই। তুমি আবার জেলে যাইতে চাও!

হা-হা করে হেসে উঠলো বাবুল। অদ্ভুত কথা, কেউ কি সাধ করে জেলে যেতে চায়? জেলখানার মতন জায়গা বাবুল চৌধুরী একেবারেই পছন্দ নয়।

কথা ঘুরিয়ে সে বললো, তোমার মামুনমামা আজ আসেন নাই? রোজই তো তোমাগো খবর নিতে আসেন, আমি জেলে গেলেই বা তোমার এত চিন্তা কী।

॥ ৩৮ ॥

আলপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অতীনের বাঁ পায়ের চটি ছিঁড়ে গেল। ধান কাটা হয়ে গেছে, মাঠে মাঠে রয়ে গেছে খড়ের গোড়াগুলো, তার ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে পায়ে বেশ লাগে, আলের ওপর দিয়েও সব সময় হাঁটা যায় না। চটি জোড়া অতীনকে হাতে নিতে হয়েছে, এক একবার সে ভাবছে ছুঁড়ে ফেলে দেবে কি না। চটির বদলে তার সু আনা উচিত ছিল কিন্তু মানিকদা সবাইকে বলেছিলেন, দেখিস, যেন পিকনিকের বাবুদের মতন সেজেগুজে গ্রাম যাস না। অতীন বা কৌশিক কেউই সে জন্য ট্রাউজার্স বা কোটও আনেনি, পাজামা, পাঞ্জাবি আর আলোয়ান। কৌশিক অবশ্য চটির বদলে তার কেডস্ এনেছে, অতীনের কেডস্ নেই।

এমন খালি পায়ে হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার, কিন্তু সে কথা সে কিছুতেই মুখে স্বীকার করবে না। এক সময়ে তার পায়ে আরও বেশি ব্যথা লাগলো।

অতীনরা পা-জামা পরে এলেও গ্রামের অনেক ছেলেই প্যান্ট পরে। গতকাল সন্ধেবেলা কেটো হাটে গিয়ে সে রকম অনেককে দেখেছে, এমনকি যে লোকটি বিস্কুটের লটারি চালাচ্ছিল, তার পরনে প্যান্ট শার্ট ও ঘড়ি। কৌশিক বলেছিল, ওর ঘড়িটা প্লাস্টিকের খেলনা, কাঁটা নড়ে না।

সবাইকে একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে নিষেধ করেছে পমপম। এ রকম একটা শহুরে দলকে গ্রামের মধ্যে দেখা গেলে অনেক রকম কথা বলাবলি হবে। দু'জন দু'জন করে যাবে যেদিকে খুশী।

অতীন আর কৌশিক কালকের রাতটা নিরাপদ দাসের বাড়িতে কাটিয়েছে। পমপমদের গ্রাম থেকে প্রায় ন'মাইল দূরে। অচেনা চাষীর বাড়িতে গিয়ে ভাব জমিয়ে রাত্রিবাসের ব্যাপার নয়, এই নিরাপদর সঙ্গে মানিকদার পরিচয় আছে। একবার ধান কাটার দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ অংশ নিয়ে দেড় বছর জেল খাটতে হয়েছে নিরাপদকে, মানিকদাও সে সময় ঐ একই জেলে ছিলেন। তারপর থেকে মানিকদা এই নিরাপদ দাসের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

বেশ শক্ত সমর্থ, লম্বা চেহারা নিরাপদর, চোখ দুটো সবসময় খানিকটা কুঁচকে থাকে বলে তাকে নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ মনে হয়, কিন্তু কৌশিকদের সঙ্গে সে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। এবারে দাঙ্গা হয়নি এবং তার জমিতে ভালো ফসল হয়েছে বলে নিরাপদর মেজাজ প্রসন্ন। সারাদেশে অন্নের জন্য হাহাকার পড়ে গেলেও বর্ধমান জেলায় ধানের ফলন আশাতিরিক্ত।

নিরাপদর সংসারটি বেশ বড় তিনজন স্ত্রীলোক ও নানা বয়েসী আট দশটি ছেলেমেয়ে দেখে অতীন বুঝতে পারেনি, কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক। সারা দুপুর উঠোন জুড়ে ধানমলাই হচ্ছিল গোরু ও মানুষের পায়ের চাপে যে ধানগাছ থেকে ধান ঝরানো হয়, সে জ্ঞানই ছিল না অতীনের। কৌশিকের তবু গ্রামের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ আছে, তার মামার বাড়ির গ্রামে সে মাঝে মাঝে যায়, কিন্তু অতীনের কোনো গ্রাম্য স্মৃতি নেই। গ্রামের সব কিছুই তার কাছে নতুন। হুঁকো টানতে টানতে নিরাপদ কৌশিককে বোঝাচ্ছিল কেন সে লেভিতে ধান দেবে না.. লেভিতে তার কতখানি ক্ষতি। অতীন লেভি শব্দটা প্রায়ই খবরের কাগজে দেখেছে, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে মনোযোগ দেয়নি কখনো।

নিরাপদ দাসের বাড়িতে আলাদা ঘর নেই, তাদের থেকে কিছু কম বয়েসী তিনটি ছেলের সঙ্গে এক ঘরে শুতে দেওয়া হয়েছিল তাদের। কৌশিক চেষ্টা করেও সেই ছেলে তিনটির সঙ্গে ভাব জমাতে পারেনি, তারা কী একটা গুপ্ত কথা বলে অনবরত হি হি হো হো করে হাসছিল, আর একজন চড়ে বসছিল অন্য একজনের গায়ের ওপর। এক সময় তুতুলের বয়েসী একটি মেয়ে ঝাঁ ঝগড়ার ব্যাপার। মেয়েটির নাম উমা সারা দিনে ঐ ডাক অতীনরা অনেকবার শুনেছে। চূড়ো করে চুল বাঁধা অনেকখানি ঘাড় দেখা যায় মেয়েটির মুখখানা পান পাতার অতীন কোনো গ্রাম্য উপন্যাস পড়েনি, অচেনা মেয়েদের শরীর গঠন লক্ষ করার দিকে ঝোঁকও তার নেই।

সারারাত সে ভালো করে ঘুমোতে পারেনি। অন্যরা সবাই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেও অতীন কিছু একটা শব্দ শুনে চমকে চমকে জেগে উঠেছে। ঘরের মধ্যে যেন কার পায়ের আওয়াজ। তারপর

সে দেখেছে দেয়ালের গায়ে দুটি জ্বলন্ত বিন্দু যেন দু'কুচি হীরে অন্ধকার সেখানে ফুটো হয়ে গেছে। ভয় পেয়ে সে কৌশিককে ডেকে তুলেছিল, কৌশিক ঘুম চোখে অবহেলার সঙ্গে বলেছিল, ওঃ ও কিছু না, ইঁদুর। কিছু করবে না।

কৌশিক আবার ঘুমিয়ে পড়লে আবার সেই শব্দ সেই আলোর বিন্দু। ইঁদুরের চোখ ওরকম হীরের মতন জ্বলে, কত বড় ইঁদুর যদি গায়ের ওপর এসে পড়ে? কৌশিক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে দেখে তার হিংসে হচ্ছিল। সে ভাবছিল, কৌশিক পারছে, সে কেন পারবে না? কৌশিক ঘুমের ঘোরেও চটাস চটাস শব্দে মশা মারছে, অথচ মশার পিনপিনে ডাকে অতীনের চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেছে। তাদের বাগবাজারের বাড়িতেও মশা ছিল না। কালীঘাটের বাড়িতেও মশা নেই। অতীনের শীতও করছিল খুব, শুধু নিজের আলোয়ান দিয়ে গা ঢাকা, চ্যাঁচার বেড়ার ফাঁক ফোকর দিয়ে সোঁ সোঁ করে ঢুকছে হাওয়া।

অতীন নিজেকে বুঝিয়েছিল, প্রথমবার তো, তাই সে সহ্য করতে পারছে না। আস্তে আস্তে সহ্য হয়ে যাবে। মানিকদা বলেছেন প্রথমেই বেশি বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই, একটু একটু করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেই ভিত্তি মজবুত হয়।

আলপথ ছেড়ে কৌশিক আর অতীন গ্রামের রাস্তায় উঠেছে। ভাঙা শামুক কিংবা ঝিনুকের খোলায় অতীনের পায়ের তলায় কেটে গেছে অনেকটা, কিন্তু সে কথা সে কৌশিককে জানায়নি। তার প্রধান গরজ এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পমপমদের বাড়ি পৌঁছোনো। সকালবেলার ব্যাপারগুলো সবই তার বাকি রয়ে গেছে। এমন কি এক কাপ চাও খাওয়া হয়নি। নিরাপদ দাসের বাড়িতে চায়ের পাট নেই। উমা নামের সেই মেয়েটি চ্যাঁ-চোঁ শব্দে দুধ দুইছিল, গোরুটি ছবির মতন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল উঠোনের একপাশে,যেন সে উমাকে খুব স্নেহ করে। পেতলের গামলায় ফেনা ওঠা দুধ দেখে খুব লোভ হয়েছিল অতীনের, দুধ তার খুব প্রিয়, আর এমন খাঁটি দুধ, কিন্তু চাওয়া তো যায় না। নিরাপদর কথা শুনে একটা নিমের ডাল ভেঙে দাঁতন করতে গিয়ে অতীনের মুখটা এখনও তেতো হয়ে আছে।

সামনেই হাটখোলা, এখানে গতকাল হাটুরে মানুষের ভিড় গমগম করছিল, এখন একেবারে শুনশান। কিছু কলাপাতা, শালপাতা ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক, আর কয়েকটা ঘেয়ো কুকুর। বাঁশের চালাগুলো কাল তো এমন অসুন্দর দেখায়নি।

এক কোণে একটা চায়ের দোকান, সেখানে কিছু মানুষজন রয়েছে মনে হলো। বাইরে একজন লুঙ্গি পরা লোক রোদে দাঁড়িয়ে বেশ উপভোগ করে চা খাচ্ছে। কৌশিক বললো, চ, এখান থেকে ছা খেয়ে নিই।

অতীন বাড়ি ফিরতে চায়, সে বুঝতে পারছে তার পায়ের কাটা জায়গাটায় একটা কিছু ওষুধ লাগানো দরকার। যদি সেপটিক হয়, কিংবা টিটো নাস?

সে বললো, এখানে না, পমপমদের বাড়িতে গিয়ে চা খাবো।

কৌশিক বললো, আয় না, একটু বসে যাই, অনেকটা হেঁটেছি। চায়ের দোকানের গল্পে অনেক রকম মালমশলা পাওয়া যায়।

কৌশিক অতীনের হাত ধরে টানলো। অতীন অন্য হাত থেকে চটি জোড়া ফেলে দিয়ে বাঁ পাটা তুলতে গেল, এবারে কৌশিককে বলতেই হবে।

তখনই চায়ের দোকান থেকে ছুটে এলো সুশোভন, তার হাতে একটা খবরের কাগজ। সে বন্ধুদের দেখতে পেয়েছে। সে ওদের নাম ধরে ডাকছে।

উত্তেজিতভাবে সে বললো, এই তোরা খবর শুনেছিস? কাল আমরা কিছু টেরই পায়নি, যদি একবার রেডিও নিউজটাও শুনতুম

কৌশিক ভুরু তুলে বললো, কী হয়েছে?

–তোরা এখনও জানিস না? এটা কালকের কাগজ ঘটনাটা ঘটেছে পশু রাত্তিরে, ইণ্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার মারা গেছে...লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসকেন্টে ...

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কৌশিক বা অতীনের কোনো ভাব-ভালোবাসা নেই, তবু খবরটির আকস্মিকতায় একটু বিহ্বল হয়ে গেল। মানুষটি তো জলজ্যান্ত সুস্থ ছিলেন। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের পেড়াপেড়িতে লালবাহাদুর আর আইয়ুব খাঁ গেলেন তাসখেন্টে কাশ্মীর নিয়ে দরাদরি করতে। কৌশিকরা কলকাতা ছাড়ার দিনেও জেনে এসেছিল যে আলোচনা ভেস্তে যাচ্ছে, লালবাহাদুর ফিরে আসবেন খালি হাতে। রাশিয়া চায় আমেরিকার খপ্পর থেকে পাকিস্তানকে টেনে আনতে, কিন্তু

ওদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো অতি ধুরন্ধর।

কৌশিক কাগজটা টেনে নিল।

সুশোভন অতীনকে বলল, আমি মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে ছিলুম, বুঝলি, রাস্তায় একজন বললো এদিকে একটা চায়ের দোকান আছে,..ভেতরে ঢুকে কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই ...শেষ পর্যন্ত আইয়ুব আর লালবাহাদুর হাতে হাত মিলিয়েছিল, একটা যুক্ত বিবৃতি দিয়েছে। এরপর লালবাহাদুরের তো খুশী থাকারই কথা, যুদ্ধ বিরতি হয়ে গেল, তারপর ভোজ সভাতেও লালবাহাদুর ভালোই ছিল...শুতে যাবার পর রাত একটা পঁচিশে বুকে ব্যথা, সাত মিনিটের মধ্যেই শেষ। একটু চিকিৎসারও সময় পেল না।

কৌশিক খবরের কাগজে দ্রুত চোখ ছোটাতে ছোটাতে বললো, যুক্ত বিবৃতি না ছাই। গোঁজ মিল। কাশ্মীর নিয়ে কোনো সুরাহা হলো না, অনাক্রমণ চুক্তির কথাও নেই, শুধু কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথা। লালবাহাদুর নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বুঝেছিল দেশে ফিরলে মার খেতে হবে, পার্লামেন্টে তার নিজের পার্টির লোকেই চ্যাঁচাবে। এই দ্যাখ না, মৃত্যুর একটু আগে লালবাহাদুর তার বউ ললিতা দেবীকে ফোনে বলেছিল, দেশের খবরের কাগজগুলো রি-অ্যাকশন তাকে জানাতে।

সুশোভন বললো, ইস লোকটা ভালো করে প্রধানমন্ত্রিত্বগিরি করার চান্সই পেল না। আমরা জন্ম থেকে নেহরুর নাম শুনে আসছি। নেহরু মরবার পর লালবাহাদুর এলো, তখন ভাবলুম এই লালবাহাদুর এখন আবার অন্তত পনেরো কুড়ি বছর রাজত্ব চালাবে, এদেশে তো না মরলে কেউ জায়গা ছাড়ে না।..এই, আমার চা ফেলে এসেছি, চল চা খাবি?

অতীন বললো, তোরা গিয়ে বোস, আমি একটু বাড়িতে যাচ্ছি।

দুপুরবেলা পমপমদের বাড়ির পেছনে আমবাগানে ওদের মিটিং বসলো। গতকাল মানিকদার এসে পৌঁছোবার কথা ছিল, তিনি আসেননি, নিশ্চয়ই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর কারণেই। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের স্ট্র্যাটেজি ঠিক কতে হবে।

বাগানটি বেশ বড়, তাতে নানা রকম কলমের গাছ। এখানে বসবার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা আছে, একটা ফাঁকা জায়গায় কয়েকটা শাল কাঠের গুঁড়ির বেঞ্চ। বেশ কাঁকিয়ে পড়েছে শী, রোদে গা দিতে বেশ আরাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর শীত বেশি লাগে, সবাই এসেছে চাদর মুড়ি দিয়ে। খিচুড়ি খাওয়া হয়েছে আজ তারপর কারুর কারুর মুখে সুপুরির টুকরো কিংবা সিগারেট।

পমপম বললো, আমাদের বাড়ির রেডিওটা খারাপ। মেমারিতেযে দুটো খবরের কাগজ আসে, তাতে ট্র্যাস লেখে। মনে কর আজই যদি সারা দেশে একটা আর্মড রেভলিউশন শুরু হয়ে যায়, আমরা তার খবরই পাবো না।

কৌশিক এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললো, আর্মড রেভলিউশন? তুই কোন দেশের কথা বলছিস রে পমপম।

পমপম হাসে না,সে সকলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো, তোরা ভেবে দ্যাখ, এইটাই কি ঠিক প্রপার টাইমিং নয়? দেশের প্রধানমন্ত্রী মারা গেছে বিদেশে, কংগ্রেসের টপ লেভেল নেতারা পাজ্‌লড, কারুর হাতেই বিশেষ ক্ষমতা নেই, চ্যবন আর শরণ সিং ও বাইরে, ক্ষমতা দখলের এইটাই তো উপযুক্ত সময়। উই হ্যাভ এনাফ অফ ডেমোক্রেসি। দেশের মানুষকে এখন বিপ্লবের ডাক দিলে সবাই সাড়া দেবে।

কৌশিক বললো, বিপ্লব বুঝি হাতের মোয়া? কৃষক ফ্রন্টে কতটা সংগঠনের কাজ হয়েছে? কৃষক শ্রমিক ঐক্য কতটুকু এগিয়েছে? একবার গ্রামে ঘুরে জিজ্ঞেস করে আয় না, কটা লোক বিপ্লব কথাটার মানে জানে? তোরা যা বলছিস...

অতীন কোনো কথা বলছে না। পমপমদের বাড়িতে কোনো ওষুধ পাওয়া যায়নি, খানিকটা চুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তার ক্ষত স্থানে। পমপম বলেছিল, শীতকালে ও এমনি সেরে যায়। কিন্তু অতীনের মন মানেনি। পায়ের ক্ষতের চেয়েও তার মনটা খচখচ করছে বেশি। টিটেনাসের সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি। অন্যরা কেউ বলছে না বলেই সে ডাক্তার দেখবার কথাটা নিজে তুলতে পারছে না।

যদি টিটেনাস হয়ে এখানে সে হঠাৎ মরে যায়? তা হলে তার মা, বাবা.. মা কি পারবে সহ্য করতে? মায়ের আর একটাও ছেলে থাকবে না। অতীন যেন বারবার দেখতে পাচ্ছে তার মাকে, না; মায়ের জন্যই তার এখন মরা চলবে না।

অলি বসে আছে পমপমের পাশে। অলিকে তার পায়ের ক্ষতটা এখনও দেখায়নি অতীন। অলি বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে তার দিকে, সেই দৃষ্টি মধ্যে যেন একটা প্রশ্ন রয়েছে। সন্তর্পণে অতীন নিজের বাঁ পাটাকে আদর করতে লাগলো। মনের জোর দিয়ে কি টিটেনাস সারানো যায়?

সুশোভন বললো, আমিও পমপমের সঙ্গে একটা ব্যাপার এক মত। এই রকম একটা অবস্থার সুযোগ নিয়ে আর্মড রেভলিউশন ছাড়া আর কোনো পথ নেই। পার্লামেন্টারি প্রসেসে আগামী পঞ্চম বছরেও কংগ্রেসের ঘুঘুর বাসা ভাঙা যাবে না, ক্ষমতা দখল তো দূরের কথা।

কৌশিক বললো, তোরা যা বলছিস, তার প্লেইন অ্যান্ড সিমপ্‌ল মানে হলো আর্মিকে প্রশ্রয় দেওয়া। শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে কোনো লিডারশিপ নেই। আমরা বামপন্থীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছি, এখন বিপ্লবের একটা হুজুগ তুললে কোনো একজন আর্মি জেনারেল ক্ষমতা দখল করে নেবে। পাশের দেশ পাকিস্তানে যা হয়েছে। এখন তবু যা কিছু ডেমোক্রেটিক রাইটস আছে, সেগুলোও সব যাবে।

পমপম বললো, তবু একটা কিছু হোক। এই পঁচা গলা ডেমোক্রেসি আর আমাদের সহ্য হচ্ছে না।

অলি হঠাৎ নরম ভাবে বললো, আচ্ছা, আমাদের স্টাডি সার্কেলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর জন্য শোক প্রস্তাব নেওয়া উচিত না?

যেন এরকম একটা অদ্ভুত কথা আগে শোনেনি, এই ভাবে বিস্মিত হয়ে পমপম বললো, শোক প্রস্তাব? আমরা নেবো? কেন যে শ্রেণী শত্রু , সে মরলে শোকের কী আছে?

অন্য একজন বললো, মানিকদাক জিজ্ঞেস না করে...

অলি নিজেই একা উঠে দাঁড়ালো।

আরও একটি মেয়ে সেই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে জোর দিয়ে বললো, নিশ্চয়ই এক মিনিট নীরবতা পালন করা উচিত।

এর পরেও আলোচনা চললো প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে। অতীনকে কয়েকবার খুঁচিয়েও তার মুখ দিয়ে কথা বার করা গেল না। তার পায়ের তলায় একটা চিড়িক চিড়িক ব্যাথা শুরু হয়েছে, এটা নতুন রকম ব্যথা, এটাই কি টিটেনাসের শুরু? এ কথা কারুকে জিজ্ঞেস করাও যায় না। এরই নতুন রকম ব্যথা, এটাই কি টিটেনাসের শুরু? এ কথা কারুকে জিজ্ঞেস করাও যায় না। এরই মধ্যে একবার সে ভাবলো, এই আমবাগানে বসে এমন সীরিয়াস সুরে মিটিং চলেছে যেন ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব এখনই শুরু হবে কি না তা নির্ভর করছে এই সবার সিদ্ধান্তের ওপর।

সে রকম কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো না বটে, কিন্তু সকলেই ঠিক করলো, এখন যে-কোন মুহূর্তে দেশে একটা বড় রকম পরিবর্তন ঘটতে পারে, এই সময় গ্রামে বসে থাকা ঠিক হবে না। মানিকদা যদি আজ সন্ধের মধ্যেও না আসেন, তা হলে কাল সকালের ট্রেনেই সবাই চলে যাবে কলকাতায়।

অতীন এই কথায় খুশী হলো। প্রথমবারের পক্ষে তার যথেষ্ট গ্রাম দেখা হয়েছে, সে এখন নিজের বাড়িতে যেতে চায়। কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে সে আর কখনো এতখানি নিজের বাড়ির প্রতি টান অনুভব করেনি।

অলি অসহায় ভাবে চিবুক তুলে বললো, কিন্তু আমরা যে কৃষ্ণনগরে যাবার কথা?

পমপম বললো, তোমাকে আমরা নবদ্বীপের ট্রেনে তুলে দেবো, তুমি যেতে পারবে না?

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে নিজেই আবার বললো. না, তুমি পারবে না. একা যেতে পারবে না। ঠিক আছে। অতীন তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

যেন তার এই আদেশের ওপর আর কোনো বাদ প্রতিবাদ চলে না, এই ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো পমপম।

এই মনোরম শীতকালে দল মিলে গ্রামে বেড়াতে আসার মধ্যে একটা চমৎকার উপভোগ্য দিক ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা যেন পিকনিক পার্টির মতন হয়ে না যায়, সেদিকে ছিল পমপমের কড়া নজর। এক জায়গায় বেশিক্ষণ আড্ডা বা গান পমপমের পছন্দ নয়। খাওয়া নিয়েও কোনোরকম বাড়াবাড়ি চলবে না। পমপমদের বাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছল, দুটি বেশ বড় বড় ধানের গোলা, অনেক রকম ফলের গাছ, পমপমের ঠাকুর্দা এখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হলেও তিনি তাঁর নাতনীর বন্ধুদের সেবাযত্নের জন্য ঢালাও অর্ডার দিয়েছেন। তবু পমপম প্রথম দিনেই জানিয়ে দিয়েছিল, এই দলের কারুরই তাদের বাড়িতে দু'বেলা খাওয়া চলবে না, হাটে-বাজারে ঘুরে একবেলার খাওয়া নিজেদের

জোগাড় করতে হবে। কৌতুকবর্জিত সুরে সে বলেছিল, আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়াবার জন্য তো কারুকে ডেকে আনিনি। এ বাড়িটা শুধু একটা সেন্টার।

মানিকদা এসে পৌঁছোবার আগেপর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো প্রোগ্রাম ছিল না, শুধু গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এমনকি গ্রামের চাষী বা সাধারণ মানুষদের সঙ্গে রাজনৈতিক কথাবার্তা বলাও নিষিদ্ধ ছিল। এই সব ব্যাপারে এগোতে হয় নির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত কার্যসূচি নিয়ে। মানিকদা এলেন না, এর মধ্যে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর মতন ঘটনা না ঘটলে ওরা অনেকেই আর কয়েকদিন থেকে যেত, দশ বারোদিন তো থাকার কথা ছিলই। ভোরবেলা খেজুরের রস নতুন চালের ফ্যানা ভাত গাছ থেকে সদ্য ছিঁড়ে আনা বেগুনের টুকরো ভাজা পুকুর থেকে তুলে আনা মাছের স্বাদ, এই সব আকর্ষণ ছাড়াও ধুলো মাখা রাস্তা, গোরুর গাড়ির চাকার আওয়াজ, খড়ের গন্ধ মানুষজনের সাদাসিধে কথাবার্তা, এইসবও ভালো লেগে যাচ্ছিল জমিদারের বদলে গ্রামে গ্রামে গজিয়ে উঠছে জোতদার শ্রেণী, তাদেরও চেনা যাচ্ছিল একটু একটু। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের প্রান্তে দাঁড়ালে বেশ একটা দেশ দেশ ভাব মনের মধ্যে জাগে, শহরে এমন মনে হয় না, শহর যেন কারুর দেশ নয়।

পমপমই ফিরে যাবার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত। তার ধারণা, কলকাতায় দিল্লিতে বিরোধী পক্ষগুলির সঙ্গে কংগ্রেসীদের মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে। বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে যে আকস্মিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, এই সুযোগে কংগ্রেসের মৌরসিপাট্টা ভাঙার চেষ্টা অন্যরা করবেই। এ সময়ে দূরে থাকা চলে না।

কথা ছিল, অলিকে কৃষ্ণনগরে পৌঁছে দেবে পমপম। সে দায়িত্ব সে এখন অতীনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। অলিকে এখানে একটু বেশি খাতির করা হয়েছে, সে বিশেষ গ্রামে ঘুরতে যায়নি, একদিনও সে অন্য বাড়িতে রাত কাটায়নি, সকলে ধরেই নিয়েছিল অলি কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। সে বড়লোকের মেয়ে, হঠাৎ তার গা থেকে বুর্জোয়া গন্ধ মুছে ফেলা যাবে না। তার নিজের যদি আন্তরিকতা থাকে তবে সে নিজেই একদিন ডিক্লাসড হবে, ব্যস্ততার কিছু নেই।

অতীন একবারও অলিকে তার নিজের সঙ্গে নিয়ে বেরোয়নি। দুজন দুজনের যে দল করা হয়েছিল, তার কোনো দলেই একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল না, এ রকম কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি, সে রকম কেউ চায়ওনি। অতীন বরং অলিকে একটু এড়িয়ে এড়িয়েই চলেছে, অলিকে সে একবারও নিভৃতে তার কাছে অসার সুযোগ দেয়নি, বরং অলির প্রতি তার কথাবার্তা কিছুটা রুক্ষ। পমপমকে সে বলেছিল, তোরা ঐ মেয়েটাকে তুলোয় মুড়ে রাখতে চাইছিস কেন রে, তা হলে গ্রামে নিয়ে এলি কেন? ও কি মেম সাহেব নাকি? অলির প্রতি অতীনের এই ব্যবহার ছদ্ম কিংবা আরোপিত নয়। অলির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দেখলে অন্যরা রঙ্গরসিকতা করতে পারে, অতীন সে সম্ভাবনাকেও গ্রাহ্য করে না। তার ভয় নিজেকে।

অলিকে কৃষ্ণনগরে পৌঁছোবার দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ায় অতীন প্রথমে প্রতিবাদ করবে ভেবেছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলেনি, তখন তার পা নিয়ে সে খুবই চিন্তিত। যখন তার ধনুষ্টঙ্কার শুরু হবে, তখন অন্য সবাই বুঝবে ঠ্যালা। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মারা গেছেন শুনে সবাই অন্য কথায় এমন মেতে উঠেছে যে এদিকে যে অতীন মজুমদার মরতে বসেছে সেদিকে কারুর হুঁশ নেই। বিকেলের মধ্যেই তার পা-টা ফুলে উঠলো অনেকখানি, আর সন্ধের পর তার জ্বর এলো।

পরদিন সকালে অতীনের ঘুম ভাঙলো সকলের আগে এবং ভোরের স্নিগ্ধ আলোর মতন একটা খুশীতে ভরে গেল তার মন। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে, আর টিটেনাসের ভয় নেই। তা হলে সে বেঁচে গেছে। অতীন ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে খানিকটা ঘুরে বেড়াতে গেল, পায়ে অসহ্য ব্যথা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। টিটেনাস তো হয়নি। এখন বাকি রইলো সেপটিক হওয়া। সেটাও এমন কিছু না, একটা ক্ষত সেপটিক হলে কেউ প্রাণে মরে না, বড় জোর অপারেশন করার পর বাকি জীবনটা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে। তাতে বরং খানিকটা ব্যক্তিত্ব আসে। ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সে অপূর্ব দত্তকে দেখেছে, ডিবেট করার সময় তিনি যখন গ্যালারিতে ওঠেন, তখনই বোঝা যায় এই মানুষটি অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা। কৌশিক অবশ্য বলে, খবরদার অপূর্ব দত্তর বক্তৃতা শুনবি না, ওরা হচ্ছে হেরেটিক। ওরা চমৎকার ধারালো কুযুক্তি দিতে জানে।

সকাল আটটার মধ্যেই সবাই তৈরি হয়ে নিল। এরই মধ্যে গুজব শোনা গেছে যে ট্রেনের কী যেন গণ্ডগোল হচ্ছে, কলকাতা থেকে ফার্স্ট ট্রেন আসেনি। তাতেই পমপমের আরও ধারণা হলো যে কলকাতায় সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু শুরু হয়ে গেছে। ট্রেন বন্ধ থাকলে বাস বদল করে করে যেতেই

হবে। একটুও সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

পমপমদের বাড়িতে গোরুর গাড়ি আছে, এ বাড়ির মানুষ স্টেশানে পৌঁছোবার জন্য ঐ গাড়িই ব্যবহার করে। কিন্তু এক গাড়িতে সবাইকেধরবে না, তাছাড়া গোরুর গাড়ির টিকুস টিকুস চলা এখন সহ্য হবে না। তার চেয়ে হেঁটে অনেক আগে যাওয়া যাবে। পমপম অতীনকে বললো, তুই আর অলি ইচ্ছে করলে গো গাড়ি নিতে পারিস তোরা তো উল্টোদিকে যাবি, একটু দেরি হলেও ক্ষতি নেই।

অতীন রাজি হলো না। সে দুখানা রুমাল দিয়ে তার বাঁ পা ভালো করে বেঁধে নিয়েছে। তারা সবাই একসঙ্গেই মেমারি স্টেশান পর্যন্ত যাবে।

অতীনকে খোঁড়াতে দেখে অলি কাছে এস সরল বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, বাবলুদা, তোমার পায়ে কী হয়েছে?

অতীন শ্লেষের সঙ্গে বললো, মহারানীর এতক্ষণে নজরে এলো। কাল সারাদিন-একবারও দেখিসনি?

–না দেখিনি তো। কী হয়েছে, কাঁটা ফুটেছে?

–কিছু হয়নি। চল।

অতীন একটু পেছিয়ে পড়েছে। অলি তার বাহু ছুঁয়ে কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলো বাবলুদা, তুমি সব সময় আমার ওপর রাগ রাগ করে কথা বল কেন? আমি কী দোষ করেছি?

তারপর সে বললো, এ কি তোমার গা গরম । জ্বর হয়েছে?

অতীন ধমক দিয়ে বললো, চুপ কর। জ্বর হয়েছে তো কী হয়েছে? এ নিয়ে চ্যাঁচামেচি করতে হবে না। তাড়াতাড়ি চল।

গলা চড়িয়ে সে কৌশিককে কাছে ডাকলো একটা সিগারেট চাইবার জন্য।

মেমারিতে পৌঁছেই একটা ট্রেন পেয়ে পমপমরা উঠে পড়লো, অতীন আর অলিকে বসে থাকতে হলো উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে।

কৌশিকের কাছ থেকে প্যাকেটটা নিয়েছে অতীন, পায়ের ব্যথা ভোলার জন্য সে ঘন ঘন সিগারেট টানছে। একসময় সে বললো, আমি তোকে কৃষ্ণনগর স্টেশানে পৌঁছে দেবো, সেখান থেকে তুই সাইকেল রিকশা নিয়ে বাড়ি যেতে পারবি নিশ্চয়ই। আমি কিন্তু তোদের বাড়িতে যাব না।

অলি বললো, কেন আমাদের বাড়িতে গেলে কী হয়? একটা দিন থেকে যেতে পারো না?

–না। কলকাতায় আমার তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। তাছাড়া মাসি পিসি মামা-মামীর ভিড় ঐ সব নেটিপেটি ব্যাপার আমার বিচ্ছিরি লাগে।

–তোমার পা-টা এতখানি ফুলেছে, আমার পিসেমশাইকে একবার দেখিয়ে নিতে পারো। আমার পিসেমশাই ওখানকার নাম করা ডাক্তার।

–আরে যা যা মফস্বলের হাতুড়ে ডাক্তার দেখিয়ে আমার পা-টা হারাই আর কি। কেন, কলকাতায় ডাক্তারের অভাব? আমার নিজের বাড়িতেই দিদি আছে। আমি থাকতে টাকতে পারব না। ওখানে গিয়ে আমার ওপর জোর করবি না বলছি।

–ঠিক আছে, থাকতে হবে না।

অলি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো। অতীন কিন্তু অলিকেই দেখছে, কখনো অলির পা কখনো তার উরুর ওপর মেলে রাখা রতল। অতীনের বুক কাঁপছে।

একটুবাদে অলি বললো, এই যে গ্রামে তোমরা সবাই মিলে এলে এতে তোমাদের কী লাভ হচ্ছে?

অতীন বললো, লাভ আবার কী? অনেক কিছু দেখা হলো, তার মধ্য থেকেই কিছু কিছু শেখা যায়। এই যে নিরপদ দাসের বাড়িতে আমি আর কৌশিক রইলাম চব্বিশ ঘণ্টা, এই নিরাপদ দাস মাত্র তেরো বিঘে জমির মালিক। তেরো বিঘেতে কতটা ফসল হয় তুই জানিস? তাতে অত বড় একটা সংসার সারা বছর চলে না। ওদের প্রত্যেক বছর ধার করতে হয়। সেই ধার শোধ করার জন্য মহাজনের কাছে বেগার খাটতে হয়, প্রায় বণ্ডেড লেবারেরই মতন।

–কী রকম যেন মুখস্ত করা কথার মতন শোনাচ্ছে।

–মুখস্ত কথা মানে? আমি নিজের চোখে দেখলাম।

–তবুও। এসব কৌশিক তোমাকে বলেছে। তুমি নিজে উপলব্ধি করোনি। শোনো বাবলুদা। তোমরা যেভাবে এগোতে চাইছো, আমার মনে হচ্ছে সেটা অ্যামেচারিস!

–তোমরা তোমরা বলছিস যে! তুই নিজেও তো স্টাডি সার্কলের মেম্বার। তুই নিজে জোর করে

এখানে এসেছিস।

–হ্যাঁ। এখানে এসেই আমি বুঝলুম, তোমরা যেভাবে দেশটাকে বদলাতে চাইছো, সে পদ্ধতিটা ঠিক বা ভুল যাই-ই হোক, তাতে আমি বিশেষ কিছু করতে পারবো ন। আমার পক্ষে গ্রামে গ্রামে চাষীদের বাড়ি ঘোরা সম্ভব নয়। আমি নিজের লিমিটেশন জানি। যা আমি পারবো না, তা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

–তুই স্টাডি সার্কেল ছেড়ে দিবি?

–যদি আমাকে দিয়ে শহরে বসে কোনো কাজ করানো সম্ভব হয়, তা হলে থাকতে পারি। কিংবা তোমরা যদি বাদ দিতে চাও...

–থাক, ও কথা থাক এখন।

–দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোকই নিজের লিমিটেশন বোঝে না। আমি বলছি না, মানুষ সীমাবদ্ধ প্রাণী। মানুষ তার সীমানা ছাড়াতে পারে, তার আগে সীমানাটা চেনা দরকার ভালো করে, বুঝতে হয় কোথায় কোথায় তার অক্ষমতা আর কোথায় কোথায় তার ক্ষমতাকে একটু কাজে লাগানো হয়নি।

অতীনের মাথাটাখুব ভারী লাগছে। তার ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। স্টেশানে এত লোক, না হলে যদি অলির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়া যেত। অলির কোলটাকে তার মনে হচ্ছে অগাধ সমুদ্রের মধ্যে একটা সবুজ দ্বীপ। এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে অলির গায়ে। সেই বাদটা যেন অতীনের হৃদয়।

সে নিজেকে একটা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে আবার সিগারেট টানতে লাগলো। একটুক্ষণ সে অন্যমনস্ক হয়েগেল, চোখ অনেক সুদূরে । অলি তার পায়ে হাত রাখতেই সে চমকে উঠলো।

অলি জিজ্ঞেস করলো, খুব ব্যথা?

অতীন অলির চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললো, ট্রেনের দেখা নেই। কলকাতা থেকে আজ সারাদিনই যদি ট্রেন না আসে?

অলি কোনো উত্তর দিল না।

সমস্ত সকালের মধ্যে এই প্রথম অতীন একটু হেসে বললো, কৃষ্ণনগরে যে যেতেই হবে তার কি কোনো মানে আছে? অলি ,তুই আর আমি যদি এখন নিরুদ্দেশে চলে যাই তা হলে কেমন হয়?

॥ ৩৯ ॥

কয়েকদিনের জ্বরেই একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে কামাল। এ এক অদ্ভুত ধরনের জ্বর, উত্তাপ ওঠে একশো চার ডিগ্রি, সাড়ে চার ডিগ্রি, শরীরের সবকটি গ্রন্থীতে অসহ্য বেদনা, অথচ ম্যালেরিয়া নয়, শীতের কাঁপুনি নেই। একটা ফিলমের এডিটিং চলছে, কামালের সেখানে উপস্থিত থাকার খুব প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যাওয়ার ক্ষমতা নেই তার। আগামী সপ্তাহে এই ছবির কালার প্রিন্টিং এর জন্য হংকং যাবার কথা, শুধু সংলাপ চিত্রনাট্য লেখাই নয়, এই ছবিতেই তার প্রথম পরিচালনার হাতেখড়ি তাই ঝুঁকি অনেক।

সকালবেলা সে তার বন্ধু জহির রায়হানকে টেলিফোনে অনুরোধ করছিল এডিটিং ও ডাবিং -এর ব্যাপারে খানিকটা সাহায্য করতে। জহির দেখা করে গেছে কামালের সঙ্গে।

কামালের স্ত্রী হামিদা একটা স্কুলে পড়ায় দু'দিন সে ছুটি নিয়েছিল, আজ তাকে স্কুলে যেতেই হয়েছে একবার। তার এক চাচাতো বোনের অ্যাডমিশানের ব্যাপার আছে। হামিদা মাথার দিব্যি দিয়ে গেছে, কিছুতেই যেন কামাল বাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা না করে।

নানা রকম দুশ্চিন্তায় কামালের ঘুম আসছে না, দুপুরটা বিরাট লম্বা মনে হচ্ছে। জানলার বাইরে দুটো কাক ডেকে যাচ্ছে অশ্রান্তভাবে, আগে কখনো কাকের ডাক এত কর্কশ মনে হয়নি কামালের। কাকেরা তো প্রতিদিনই সারাদিন ধরে ডাকে, কিন্তু অন্যদিন কাকের ডাক কানেও আসে না। অতি কষ্টে দু'বার বিছানা ছেড়ে কামাল কাকদুটোকে তাড়াবার চেষ্টা করেছে, ওরা যাবে না। ওদের ডাক ঢাকার জন্যই কামাল বড় রেডিওটা খুললো, সঙ্গে সঙ্গে তার একটা কথা মনে পড়ে গেল, সে কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরার চেষ্টা করলো বি বি সি।

একটু পরেই নুরু নামে তাদের বাড়ির কাজের ছেলেটি এসে বললো, ছায়েব, এক মেমছাব

আইছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কামালের মুখে একটা আশঙ্কার ছায়া পড়লো। অচেনা মহিলা মাত্রই নুরুর কাছে মেমছাব। স্টুডিও মহলে এতক্ষণে রটে গেছে কামালের অসুস্থতার কথা। পরিচালক হবার পর উঠতি নায়িকাদের চোখে কামালের দাম বেড়ে গেছে অনেক, কেউ কেউ এই সুযোগে তার বাড়িতে হানা দিতে চাইবে। কিন্তু হামিদার স্পষ্ট নির্দেশ আছে, বাড়ি সিনেমার লোকের আনাগোনা চলবে না। বাংলা সিনেমা একেবারেই পছন্দ করে না হামিদা, তার স্বামীর এই পেশটাও তার মনঃপুত নয়। একদিন সে কাজরী অর আফজলকে বাড়ির দরজা থেকে তাড়িয়েই দিয়েছিল। আজ হামিদা যে-কোনো সময়ে ফিরে আসতে পারে। সে যদি দেখে একা একটি মেয়ে কামালের ঘরে, তা হলে সে তুলকালাম করবে।

কামাল জিজ্ঞেস করলো, মেমসাহেব একা এসেছে, না সাথে কেউ আছে?

নুরু বললো, জী না, মেমছাবের লগে কেউ নাই। মেমছাবের গায়ে কী সোন্দর গন্ধ। দ্যাখতেও খুব খুবছুরৎ!

একা ঘরে জ্বরতপ্ত কপালে কোনো সুন্দরী রমণীর হাতের স্পর্শ বেশ লোভনীয় মনে হলেও হামিদার মেজাজের কথা ভেবে কামাল তা সম্বরণ করলো। সে ফিসফিস করে বললো, যা বলে দে সাহেব ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরও বন্ধ উপরে আসা যাবে না। মেমসাহেব চলে গ্যালে দরজা বন্ধ করে দিবি। আর শোন চারটার সময় আমার দুই একজন দোস্ত আসবে তাদের যেন আবার ফিরায়ে দিস না।

–দুইজন না একজন?

–দুইজন হইতে পারে তিনজনও হইতে পারে। পুরুষ মানুষ আসলে ফিরাবি না, বোঝচোস?

–বুঝছি ছাব।

কামাল আবার রেডিও-তে বি বি সি নিউজ বুলেটিন শোনায় মন দিল। রাশিয়ার তাসখন্দ থেকে আইয়ুব ফিরে আসার পর পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, লাহোর ও লায়ালপুরে ছাত্ররা রাস্তায় গাড়ি পোড়াচ্ছে। ভারতের সঙ্গে আইয়ুবের চুক্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র ক্ষোভ। কাশ্মীর আদায়ে বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা করতে না পেরেও আইয়ুব কোন আক্কেলে ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে গেলেন? তাহলে কিসের জন্য যুদ্ধ হলো, কেন এত রক্তপাত, লোকক্ষয় ও অর্থ ব্যয়? সবই তো ব্যর্থ হলো।

পাকিস্তান রেডিও-তে এই সব খবর শোনা যাবে না। বি বি সি থেকে জানা যাচ্ছে যে পশ্চিম পাকিস্তানী ছাত্রবা রাস্তায় নেমেছে। মোনেম খাঁ-র ভয়ে ঢাকায় এখনো কিছু গণ্ডগোল শুরু হয়নি। মোনেমখাঁ ভেদবুদ্ধি চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে।

পাকিস্তানের খবর শুনতে শুনতে অন্য একটা খবর কানে আসায় কামাল আরও উৎকর্ণ হলো।

খানিকবাদে এসে উপস্থিত হলো আলম আর পল্টন। দু'জনেরই মুখ গম্ভীর। পল্টন জিজ্ঞেস করলো, কী রে, কেমন আছিস আজ?

কামাল বললো, একই রকম। তোদের খবর কী বল,গেছিলি শেখ সাহেবের কাছে। দেখা করলেন তিনি?

পল্টন বললো, দেখা তো হলো, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হলো না। ভালো করে শুনলোই না আমাদের কথা।

কামালের কপালটা একবার ছুঁয়ে আলম একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। সিগারেট ধরিয়ে বললো, শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি আগে যেমন দেখেছি তার থেকে অনেক বদলে গেছেন। আওয়ামী লীগের সর্বেসবা হবার পর হঠাৎ যেন অনেকখানি ব্যক্তি এসেছে, কথাবার্তাও বেশ ডিপ্লোম্যাটিক্যালি বলেন। আমাদের প্রস্তাবটা তুলতে না তুলতেই দু'হাতে কান চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, ঐসব বলবা না। আমার সামনে ঐ রকম কথা উচ্চারণও করবা না। আমি পাকিস্তান ভাঙার কোনো মতেই পক্ষপাতী না।

পল্টন বললো, ভাবী তো বাড়িতে নাই দেখালাম। তোর ঐ ছেলেটা চা বানাতে পারবে?

কামাল বললো, ওর হাতের চা খাওয়া য়া না। কেন, শেখ সাহেব, তোদের চা অফার করেন নাই।

পল্টন বললো,করেছিলেন, তবে না করারই মতন। উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ততার ভাণ দেখিয়ে বলেছিলেন, চা-পানি কিছু খাবেন? সুতরাং আমরা মাথা নেড়ে না বললাম।

কামাল বললো, হামিদা এখনই এসে পড়বে, তখন চা খাস। শেখ সাহেব তোদের পাত্তাই দিলেন না?

আলম বললো, শেখ সাহেব একটা অদ্ভুত কথা বললোন। পাকিস্তানের ক্যাপিটাল ঢাকায় শিফ্‌ট করলেই নাকি সব প্রবলেম সলভড হয়ে যাবে। উনি বললেন, আমরা বাঙ্গালীরা পাকিস্তানে মেজরিটি আমরা পাকিস্তান ভাঙতে চাবো কোন দুঃখে? আমরা এবার পাকিস্তানের লায়নস শেয়ার আদায় করবো।

পল্টন বললো, উনি চাইলেই আয়ুইব খাঁ বাঙ্গালীর হাতে নিজের হাতে মোয়াটি তুলে দিচ্ছেন আর কি। ঢাকায় ক্যাপিটাল শিফ্‌ট করার দাবিও তো অনেক পুরানো।

আলম বললো, আমার কেমন যেন মনে হলো, শেখ সাহেবের প্যাটে প্যাটে আরও কিছু মতলব আছে, মুইচকি মুইচকি হাসছিলেন কিন্তু কিছু খুলে বললেন না।

পল্টন বললো, রেডিওটা বন্ধ কর, কী ভ্যাড় ভ্যাড় শুনছিস?

আলম জিজ্ঞেস করলো, ওয়েস্ট পাকিস্তানের আর কিছু খবর আছে?

কামাল রেডিওর নবে হাত দিয়েও বন্ধ না করে দুই বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, বি বি সি-র নিউজ শুনতেছিলাম, ইন্ডিয়ার খবর।

পল্টন বললো, আমিও সকালে শুনেছি দশদিন হয়ে গেল ওদের প্রাইম মিনিস্টার লালবাহাদুর শাস্ত্রী মারা গেছেন, এর মধ্যে ইন্ডিয়ায় কোনো মারদাঙ্গা হয় নাই। সিংহাসন দখল করার জন্য লিডারগো মধ্যে কাজিয়া শুরু হয় নাই। আমাদের তুলনায় ইন্ডিয়ার কতখানি এগিয়ে আছে বুঝে দ্যাখ!

কামাল হঠাৎ শ্লেষের সঙ্গে বললো, পল্টন তুই আগে ইন্ডিয়ায় ছিলি, এখনও দেখি ইন্ডিয়ার জন্য তোর দরদ উথলাইয়া পড়ে!

পল্টন বললো, তুই আমাদের দেশের কথা ভাব তো। প্রাইম মিনিস্টারের সিংহাসন ভারচুয়ালি খালি পড়ে আছে, অথচ লিডাগো মধ্যে মাথা ফাটাফাটি শুরু হয় নাই, আমি জেনারাল এসে জবর দখল করে নাই, এরকম অবস্থা আমাদের দেশে কবে আসবে?

আলম বললো, ডেমোক্রেটিক প্রসেস ওদের ওখানে এখনও কাজ করছে। ইন্ডিয়ানরা আর আমরা একই সব কনটিনেন্টের মানুষ, আমাদের এখানেই বা আমরা কেন ডেমোক্র্যাসি এস্টাব্লিশ করতে পারবো না?

পল্টন বললো, প্রাইম মিনিস্টারের পোস্টের জন্য ওদের পার্লামেন্টারি পার্টিতে ইলেকশান হবে। এখন যে টেমপোরারি প্রাইম মিনিস্টার, সেই গুলজারিলাল, নন্দ সরে দাঁড়িয়েছে, স্বেচ্ছায় সে সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছে। মোরারজি ভাই দেশাই একজন প্রধান কনটেনডার। ওদিকে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন স্টেটের চীফ মিনিস্টাররা অনেকেই প্রপোজ করেছে ইন্দিরা গান্ধীর মাইয়া?

পল্টন বললো, ধেৎ! তুই কিছুই জানোস না। জওহরলাল নেহরুর মেয়ে, সে বিয়ে করেছে আর এক গান্ধীকে। তার সাথে মহাত্মা গান্ধীর কোনো সম্পর্ক নাই। এই ইন্দিরা গান্ধী তো অলরেডি ইন্ডিয়ার একজন মন্ত্রী। আজই ইলেকশানের রেজাল্ট জানা যাবে।

সিঁড়িতে শব্দ করে উঠে এলো হামিদা। অন্য দু'জন অতিথিকে গ্রাহ্য না করে জ্বলন্ত চোখে কামালের দিকে তাকিয়ে সে বললো, গ্যাটের সামনে দুইটা মাইয়া আর কখন ঢ্যামনা খাড়াইয়া আছে দ্যাখলাম, অরা কারা?

কামাল নিরীহ মুখ করে বললো, আমি তো জানি না।

হামিদা ঝঙ্কার দিয়ে বললো, আপনেরে আমি আবার কইয়া দিতেছি, ঐ সিনেমার বান্দরীগুলা যদি এই বাড়িতে ঢোকে আমি তাইলে অগো মুখে নুড়া ঠাইসা ধরুম। কপালে আবার সিন্দুরের টিপ পরছে। হিন্দুর পা-চাটা।

পল্টন দু'হাত তুলে বললো, আরে আরে, ভাবী আপনার এ অগ্নিমূর্তি ক্যান? আমরা সিরিয়াস ডিসকাশন করতে আছি, শিগগির এট্টু চা খাওয়ান।

কামাল ক্লিষ্টভাবে বললো, উফ, সাংঘাতিক মাথার বেদনা। এর উপর আর চেঁচাইও না। তোমারে তো আমি বলেই দিয়েছি, কোনো সিনেমার লোকরে বাড়িতে ঢুকতে দিবা না। কেউ যদি এসে পড়ে তো আমার ওপর চোটপাট করো কেন?

হামিদা পল্টনের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনেরাও এখন যান। দ্যাখতে আছেন না মানুষটা

কত অসুস্থ। এখন কথা কইতে পারবেন না।

পল্টন হেসে বললো, আরে আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন, আমরা কি সিনেমার লোক নাকি? আমরা অন্য কথা বলতে এসেছি।

কামাল বললো, হামিদা হইলো মোনেম খাঁ-র চর, ওর সামনে কিছু বলিস না। আমার বাড়ির মইধ্যে পুরাপুরি মিলিটারি রুল।

পল্টন হামিদার মাথায় একটা হাত রেখে বললো, হাজব্যান্ডের অসুখ হইলে বউয়ের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। ভাবী, আমাগো এই বন্ধুটির সাথে তা তো আপনার পরিচয় হয় নাই, আলাপ করায়ে দিই, এর নাম, সুফ আলম, লন্ডনে থাকে, বিশেষ প্রয়োজনে এসেছে। তা ছাড়া আলম একজন ডাক্তার।

আলম উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে হামিদাকে অভিবাদন জানালো।

একটু বাদে হামিদা চা বানাবার জন্য নিচে গেলে তিন বন্ধুতে আবার শুরু হলো আলোচনা।

কামাল আলমকে জিজ্ঞেস করলো, এর পার আর কার কার সাথে দেখা করতে যাবি তোরা?

আলম বললো, আমি শেখ সাহেবের সাথে আবার কথা বলার চেষ্টা করবো। ওঁকে রাজি করানো বিশেষ প্রয়োজন। উনি যদি আন্দোলন সংগঠন করতে পারেন, তাইলে ফান্ডের অভাব হবে না। লন্ডনে আমরা তো আছিই, তাছাড়া ইওরোপে আমেরিকায় অনেক ইস্ট পাকিস্তানী ছড়ায়ে আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইস্ট পাকিস্তানের জন্য তারা অনেকেই মদত দেবে। এখানে নুরুল আমিন আবুল, মনসুর আতাউর রহমান খান মানিক মিঞা এনাদের সাথেও আমার দেখা করার ইচ্ছা আছে।

পল্টন বললো, মৌলানা ভাসানীর কাছে গিয়ে তো কোনো লাভ নেই। বাবুল চৌধুরীর কাছে তো শুনলিই, চীনের মুখ চেয়ে ওরা এখন আইয়ুব খানের সাপোর্টার। ওরা শেখ মুজিবকে একেবারে দেখতে পারে না।

কামাল বললো, পল্টন তুই যে আলমের সাথে সাথে এই সব জায়গায় যাইতাছোস, তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস। আলম তো লন্ডনে ফিরে যাবে, কিন্তু মোনেম খাঁর স্পাই যদি তোর পিছনে লাগে।

পল্টন বললো, সে আমি গ্রাহ্য করি না। অনেকদিন চুপচাপ ছিলাম, আর কতদিন সহ্য করবো? বাড়িতে বসে বসে মনে মনে শুধু গুমড়াইলে মানসিক রোগ হয়ে যাবে। শয়তানের চ্যালা চামুণ্ডারা দেশটারে উচ্ছন্নে দেবে, আর আমরা শুধু দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরায়ে থাকবো?

আলম বললো, রেডিওটা আবার খোল। বি বি সি শুনি।

কামাল রেডিয়ো চালাতেই তিন বন্ধু উৎকর্ণ হলো। নিউজ বুলেটিন শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ার খবরই বেশি। ভারতের প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ নিয়ে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে মোরারজি দেশাই ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে, ভোট গণনা চলছে, একটা পরেই ফলাফল জানা যাবে।

এই সময় নুরু এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, আর এক ছাব আইছেন। উফরে আসতে চান না।

কামাল বিরক্ত ভাবে বললো, আঃ। তোরে কইছি না দরজা বন্ধ রাখতে? কারুর সাথে আইজ আমি দ্যাখা করুম না।

নুরু বললো, আপনে যে বললেন, পুরুষ মানুষ হইলে উফরে উঠাইতে!

—যাগো আসার কথা অছিল তারা আইচে। আর কাউর আসার দরকার নাই। তুই যা।

আলম বললো, ইন্দিরা গান্ধীই জিতে গেল। মোরারজি পেয়েছে ১৬৯ ভোট আর ইন্দিরা ৩৫৫। ভালো মেজরিটি।

পল্টন বললো, শুধু তাই না, শোন এই মাত্তর কী বললো। হেরে গিয়ে মোরারজি প্রেসফুলি হার স্বীকার করে নিয়েছে, ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সেও স্বীকার করেছে। বি বি সি থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের বয়ঃকনিষ্ঠা অধিশ্বরী হিসাবে অভিনন্দন জানালেন।

কামাল বললো, জওহরলালের মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী। এ কি ডেমোক্রাসিনা ডাইনাস্টি? এ যে উত্তরাধিকারী সূত্রে সিংহাসন দখল বাবা।

পল্টন বললো, মোটেই তা না। নেহরুর পর ইন্দিরা আসেন নাই। লালবাহাদুর বেঁচে থাকলে ইন্দিরার কোনো চান্স ছিল না। এবারেও ইন্দিরা গান্ধী এসেছেন পার্টির ভোটে জিতে, জোর করে চেয়ার কেড়ে নেন নাই, তারে কেউ উপর থেকে বসায়েও দ্যায় নাই।

আলম বললো, ইমপারশিয়ালি দেখতে গেলে এটা গণতন্ত্রের জয় বলেই ধরতে হবে। নেহরুর

যেয়ে হওয়াটা ইন্দিরা ডিসকোয়ালিফিকেশান হতে পারে না। আবার একথাও ঠিক, নেহরুর নামের ম্যাজিকটা উনি অনেকখানি কাজে লাগিয়েছেন। আমরা যেমন বেগম ফতিমা জিন্নাকে দাঁড় করায়েছিলাম।

কামাল বললো, কিন্তু ফতিমা জিন্না জেততে পারেন নাই।

পল্টন সঙ্গে সঙ্গে বললো, তার কারণ আমাদের ইলেকশানটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয় নাই।

চায়ের ট্রে নিয়ে হামিদা ঘরে ঢুকে আলমকে জিজ্ঞেস করলো, কী রকম দ্যাখলেন?

আলম উত্তর দিল, চিন্তার কিছু নাই, এক ধরনের ফ্লু, তিন চার দিন রেস্ট নিতে হবে।

পল্টন অতি উৎসাহের সঙ্গে বললো, ভাবী, নিউজ শোনছেন? ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী।

তার দিকে একটি ঠাণ্ডা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হামিদা বললো, ইন্ডিয়ার কে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন তাতে আমার কী আসে যায়?

–বাঃ একজন মহিলা এত বড় পোস্টে গেলেন, আপনাদের তো গর্ব হওয়ার কথা। মর্ডান ওয়ার্ল্ডে আর কোনো মহিলা কি কোনো দেশের প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন?

–প্রাইম মিনিস্টারগিরি করা কোনো মহিলার পক্ষে যে যোগ্য কাজ, তা আমি মনে করি না। কত মিথ্যা কথা বলতে হবে, সে হিসাব আছে?

আলম হাসতে হাসতে বললো, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। পলিটিশিয়ানদের প্রধান অস্ত্র!

হামিদা কামালের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে বললো, ইন্ডিয়া থেকে একজন মানুষ এসে নিচে বসে আছে। আপনের কাছে অন্য মানুষ আছে শুনে উপরে আসতে চায় না।

পল্টন বিস্ময়ে ভুরু তুলে বললো, সে কি ভাবী আপনি আমাদের তাড়ায়ে দিচ্ছিলেন, এখন অন্য মানুষকে বাড়ির মধ্যে অ্যালাউ করলেন কী করে?

কামালও ভুরু কুঁচকে বললো, ইন্ডিয়া থেকে লোক এসেছে? কী করে আসলো? বর্ডার সীলড না?

হামিদা পল্টনকে উত্তর দিল, যে এসেছে সে ওনার খালাতে ভাই। তারেও আমি খ্যাদায়ে দেবো নাকি?

কামাল আবার জিজ্ঞেস করলো, কে? শাজাহান নাকি, সত্যি? তারে উপরে পাঠায়ে দাও এখনই। বলো, এরা বাইরের মানুষ না, এরা আমার বিশেষ বন্ধু।

হামিদা নেমে যেতেই কামাল বন্ধুদের বললো, এই শাজাহান কলকাতায় থাকে,বড় ব্যবসায়ী, খুব শিক্ষিত মানুষ। সে কী ভাবে এখন ঢাকায় এলো বুঝতেই পারছি না।

পল্টন বললো, আরে বয়, বয়। শাজাহানের কাছ থেকে হয়তো কিছু নতুন খবর শোনা যাবে। তোদের সাথে গল্প গাছা করে শরীরটা ভালো লাগছে।

শাজাহানকে দেখে আলম ও পল্টন দু'জনেই কয়েক পলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতনই সুপুরুষ সে গাঢ় নীল সুট পরা, কিন্তু মুখখানি গাম্ভীর্য মাখা।

কামাল অন্য দু'জনের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এলে কী করে শাজাহান ভাই? বর্ডার কী খুলে দিয়েছে নাকি?

শাজাহান বললো, বর্ডার বেশ কয়েকদিন হলো খুলে দিয়েছে। ইন্ডিয়া পাকিস্তানের প্রিজনার বিনিময় দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপর দু'দেশে যারা আটকা পড়েছিল তাদের যাতায়াতের জন্য আমিও কিছুদিন জেলে ছিলাম।

–তুমি জেলে ছিলে? কেন?

–কেউ আমার নামে কমপ্লেন করেছিল, আমি পাকিস্তানের স্পাই।

পল্টন বললো, আমাদের এখানেও অনেককে আটকে রেখেছিল। মনিলাল, শম্ভুদের বোধ হয় এখনও ছাড়েনি।

কামাল তপ্তভাবে বললো, শাজাহান ভাইরা সাত আট পুরুষ ধরে কলকাতার মানুষ, ওনারা বাদশা ওয়াজির আলী শা'র সাথে সাথে লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, শাজাহান ভাই কোনোদিন মুসলিম লীগকে সাপোর্ট করেনি পল্টন বললো, যুদ্ধের সময় ওরকম কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়ই। শাজাহান ভাই, আপনি কি আজই আসলেন? ইন্ডিয়ার লেটেস্ট খবর শুনেছেন তো? ইন্দিরা গান্ধী আপনাদের প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শাজাহান বললো, শী ইজ ডেফিনিটিলি আ বেটার চয়েস।

মোরারজি লোকটা অনেক রি-অ্যাকশানারি।

–আপনার কী মনে হয়, একজন মহিলা প্রাইম মিনিস্টার হবার পর ইন্ডিয়ার অবস্থা কিছু পাল্টাবে?

–মাপ করবেন, আমি পলিটিস নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই না। আমি বিজনেসম্যান, বিজনেস বুঝি?

–এখানে কোনো বিজনেসের ব্যাপারে এসেছেন? ইন্ডিয়ার সাথে অবার আমাদের বিজনেস শুরু হচ্ছে নাকি? বইপত্তর তো কিছুই আসে না। টোটালি ব্যান করা হয়েছে।

– নাঃ আপাতত এখানে কোনো বিজনেসের ব্যাপারে আসিনি।

কামাল জিজ্ঞেস করলো, তুমি উঠেছো কোথায়? কোনো হোটেলে নাকি, না, না, সেসব চলবেনা। মালপত্তর আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসো।

শাজাহান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আপাতত একটা হোটেলেই আছি। এখানে একটা বাড়ি কিনতে চাই। সেই ব্যাপারে তোমার সাহায্যের দরকার হবে।

–তুমি এখানে বাড়ি কিনবে? কেন? ইন্ডিয়ার সিটিজেন হয়ে কি এখানে সম্পত্তি রাখা যাবে?

দোলের দিকে তাকিয়ে অনেকটা আপন মনে উচ্চারণ করার ভঙ্গিতে শাজাহান বললো, ভাবছি এখাই থেকে যাওয়া যায় কি না। ইন্ডিয়াতে আর আমার থাকতে ইচ্ছা করে না। আমার মন ভেঙে গেছে।

॥ ৪০ ॥

একটা ভিড়ের বাসে চেপে ওরা দু'জনে চলে এলো বর্ধমান। ট্রেন আর আসবে না বোঝাই গেছে। সকালের দিকে দু'একখানা ট্রেন শুধু কলকাতার দিকে গিয়েছিল, তারপর দু'দিকেই বন্ধ।

বর্ধমান থেকে আবার অন্য একটি বাসে নবদ্বীপ যাওয়া যায়। তবে ট্রেনের যাত্রীরা আজ সবাই হুড়মুড়িয়ে বসে উঠছে, প্রথম বাসে অতীনরা জায়গা পেল না। পরের বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, সে বাসের জন্যও আরও অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের ব্যথার জন্য অতীনের পক্ষে ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করা সম্ভব নয়।

অতীনের খুব খিদে পেয়েছে। আগের রাত্রে তার জ্বর ছিল বলে ভালো করে খেতে পারে নি, সকালেও খানিকটা মুড়ি-পাঁপরভাজা ছাড়া আর কিছু খাওয়া হয়নি, এখন জঠরের আগুনটা বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অতীন খিদে সহ্য করতে পারে না। অন্যান্য দিন বাড়িতে স্নান করার পর তাকে ভাত দিতে একটু দেরি হলেই সে চ্যাঁচামেচি করে, চুল আঁচড়াবার সময়টুকুও সে বাদ দিয়ে দেয়।

অলিকে একটা গাছতলায় দাঁড় করিয়ে অতীন দেখতে গেল অন্য কোনো রুটে নবদ্বীপ পৌঁছোনো যায় কিনা। এখান থেকে অনেক জায়গার বাস ছাড়ে। বোলপুর, কালনা, দুর্গাপুর, মাসানজোড়, রামপুরহাট, নানুর উদ্ধারণপুর ..এর কোনো জায়গাতেই যায় নি অতীন। অচেনা নামের জায়গাগুলি যেন হাতছানি দেয়, কৃষ্ণনগরে অলিদেরবাড়ি, সেই জন্যই খানিকটা চেনা চেনা, কিন্তু যেখানে একজনও চেনা মানুষ নেই, সেইসবজায়গা কেমন যেন রহস্যময়।

ফিরে এসে অতীন বললো, আজই নবদ্বীপ হয়ে কৃষ্ণনগর যেতে হবে, তার কি কোনো মানে আছে? অন্য যে-কোনো একটা জায়গাতেও তো যাওয়া যেতে পারে।

দু'দিকে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে অলি বললো,না।

অতীন ভুরু দুটো বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন যাবি না কেন?

–কেন যাবো আগে সেটা বলো! তোমাকে তো তখনই বলেছি, অমি নিরুদ্দেশ টিরুদ্দেশে যেতে চাই না।

–ঠিক আছে, এটা তো নিরুদ্দেশ হচ্ছে না। ধর রামপুরহাট কিংবা কালনায় গেলাম, সেখানে একটা হোটেলে ঘর ভাড়া করে থাকবো বিকেলবেলা বেড়াবো, সন্ধেবেলা তুই নদীর ধারে বসে গুনগুন করে গান গাইবি, তারপর কাল চলে যাবে নবদ্বীপে। আমাদের তো মেমারিতেই আরও দু'একদিন থেকে যাওয়ার কথা ছিল। সুতরাং একদিন দেরি হলেও ক্ষতি নেই।

–বাড়িতে গিয়ে বুঝি আমি মিথ্যে কথা বলবো?

–মাঝে মাঝে দু'একটা ছোটখাটো মিথ্যে কথা বলা এমন কিছু দোষের না। ঠিক আছে মিথ্যে কথা বলতে হবেনা, তুই কিছুই বলবি না, তোর বাবা-মা ভাববেন আমরা মেমারি থেকেই এসেছি।

–কিন্তু তোমার সঙ্গে একটা হোটেলে গিয়ে থাকবো কেন, সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না।
–এত কেন -র কী আছে। থাকতে ভালো লাগবে, কেউ আমাদের চিনবে না, আমরা কারুর সঙ্গে কথাই বলবো না।
অতীনের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অলি ভর্ৎসনার সুরে বললো, বাবলুদা, তুমি বড্ড অসভ্য হয়েছে। আজকাল প্রায়ই খারাপ কথা বলো।
–আরে, এর মধ্যে খারাপের কী আছে?
–আমি কোথাও যাবো না। নবদ্বীপের বাস এলে তাতে উঠবো, তুমি যদি না যেতে চাও, আমি একাই চলে যেতে পারবো।
–তোর কাছে কত টাকা আছে রে অলি?
–সত্তর -আশী টাকা আছে এখনো।
–ওরে বাবা, সে তো অনেক টাকা। আমার কাছেও গোটা পনেরো আছে। রামপুরহাটের ভাড়া মাত্র এক টাকা বারো আনা। হোটেলের ঘর ভাড়া আর কত হবে, বড় জোর দশ টাকা?
–আবার ঐ কথা বলছো? তোমাকে আমার সঙ্গে নবদ্বীপেও যেতে হবে না, যাও। তুমি একলা চলে যাও। টাকা চাই, দেবো?
অলিদের বাড়িতে অলি অতীনের প্রতি সামান্যতম রূঢ়তা দেখালে অতীন আর এক মুহূর্ত দেরি করে না। তারপর মাসের র মাস আর সে ও বাড়িতে যায় না। প্রত্যেকবার অলিই নিজে থেকে এসে তার অভিমান ভাঙায়। আজ কিন্তু অতীন একটুও রাগ করছে না, তার ঠোঁটে খানিকটা দুষ্টুমির হাসি লেগেই আছে।
সে বললো, দারুণ খিদে পেয়েছে রে, দাঁড়াতে পারছি না। ভিড় একটু কমুক না, খানিকটা পরের বাসে যাবে। রাস্তার উল্টোদিকে কয়েকটা ভাতের হোটেল আছে, চল না কিছু খেয়ে নিই।
অলি এই প্রস্তাবে আপত্তি করলো না।
হোটেলটা পথ-চলতি মানুষদের জন্য, অতিশয় শস্তা। নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চ, ভনভন করছে অসংখ্য মাছি, কঞ্চির বেড়ায় বহু পুরোনো ক্যালেন্ডারের ছবি, কাছেই হাত ধোওয়ার জায়গাটায় থিকথিকে কাদা হয়ে আছে।
ওরা বসতেই একটি অল্প বয়েসী নাদুশ নুদুশ চেহারার ছেলে ওদের সামনে কলাপতা রেখে তাতে নুন আর লেবুর টুকরো দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী লেবেন?
অতীন জিজ্ঞেস করলো, কী কী আছে?
ছেলেটি গড়গড়িয়ে বললো, রুটি, ডাল ট্যাড়োশের শবজি, আলু-ফুলকপি, মাছের কালিয়া, মাছের ঝোল...
–ভাত নেই?
–আছে, দাম বেশি পড়ে যাবে।
–তুমি ভাতই দাও, আর ডাল একটা তরকারি আর মাছ। আর ইয়ে বেগুন ভাজা দেবে দুটো করে।
–বেগুন ভাজা হবে না, মাছ ভাজা লিতে পারেন।
–মাছ ভাজা চাই না। তুমি চটপট নিয়ে এসো যা বললুম।
–হাফ না ফুল?
অতীন এ প্রশ্নের মর্ম না বুঝে অলির দিকে তাকালো। অলিও কিছু জানে না। অতীন বললো, আগে তুমি হাফই নিয়ে এসো।
বেগুন ভাজা অতীনের প্রিয়, সেটা না পেয়ে সে একটু ক্ষুণ্ণ হলো। হোটেলে পয়সা দিয়ে খেতে এসেও যদি ইচ্ছে মতন জিনিস না পাওয়া যায়...সে ছেলেটিকে ডেকে বললো, এই কাঁচা লঙ্কা নিয়ে আসবে।
একটু পরেই সে আবার অধৈর্যভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, কী হলো, খোকা ভাত দিয়ে গেলে না?
অলি এরকম হোটেলে কোনোদিন ঢোকে নি। বাইরে খাওয়ার ব্যাপারেই তাদের পরিবারের একটু পিটপিটিনি আছে। কলকাতার বাইরে কোথাও গেলে তারা সঙ্গে পর্যাপ্ত বাড়ির খাবার নিয়ে যায়, সাধারণ হোটেল যায় না। অলির আবার পরিষ্কার বাতিক আছে, নোংরা দেখলেই তার গা ঘিনঘিন করে। তার হিসেবে এই হোটেলটি এতই নোংরা যে সহ্য করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবু অতীনকে

অম্লান বদনে খেয়ে যেতে দেখে সে মুখে একটুও বিকৃতি ফোটালো না। তার শাড়ীর আঁচলটা একেবারে ঠেকে গেছে মাটিতে, ডায়িং ক্লিনিং-এ না পাঠিয়ে এ শাড়ি সে আর পরবে না।
হাফ প্লেট ভাতে পেট ভরে নি অতীনের, সে দ্বিতীয়বার ভাত নিল। মাছটা তার পছন্দ হয়নি, সে ডাল তরকারি নিল আবার।
অলি জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি করে কাঁচা লঙ্কাটা খাচ্ছো, ঝাল নেই?
অতীন বললো, হ্যাঁ, বেশ চমৎকার ঝাল। এই একটাই বাঙালত্ব টিকে আছে আমা ঝাল ছাড়া খেতে পারি না।
–বাবলুদা পাশের টেবিলটায় দ্যাখো।
অতীন একবার পাশ ফিরে তাকালো। লুঙ্গি পরা দু'জন মুসলমান হাটুরে শ্রেণীর লোক শুধু দু'বাটি ডাল আর এক গোছা করে রুটি নিয়ে বসেছে, দু'জনেরই হাতে কাঁচা লঙ্কা, তারা টিয়া পাখির মতন কচ কচ করে সেই লঙ্কা দাঁতে কাটছে।
অলি জিজ্ঞেস করলো, ওরাও বুঝি বাঙাল?
অতীন হেসে বললো, নাঃ বাঙাল মুসলমান হলে নিশ্চয়ই বর্ধমানের এই হোটেলে খেতে আসতো না।
–তোমার বাঙালত্বর আর একটা প্রমাণ আছে, বাবলুদা, তুমি ভাত ছাড়া খেতে পারো না।
–এখন মনে পড়লো, আজকাল হোটেলে রোজ ভাত বিক্রি করা বে-আইনী, কাগজে পড়েছিলুম। এ কী, তুই কিছুই খেলি না যে?
–আমার খিদে পায় নি।
–বুঝেছি, কেস্টনগরের দুধ-ভাত ছাড়া তোর মুখে আর কিছুই রুচবে না।
এই হোটেলে একটি চালু রেডিও-ও রয়েছে। তাতে সেতারের দুঃখের সুর বাজছে, লালবাহাদুরের জন্য এখন রাষ্ট্রীয় শোক চলবে বেশ কয়েকদিন। রাস্তায় অনেক মানুষ, তীব্র স্বরে হর্ন বাজিয়ে ও ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে বাস সাইকেল রিকশা ও ঠেলাগাড়ির জটলা, একটি কমলালেবুওয়ালার সঙ্গে জোরে জোরে বচসা করছে একজন খদ্দের। এসবই প্রতিদিনকার রুটিন বাঁধা দৃশ্য। দেখলে বোঝার উপায় নেই যে ভারতের ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ চলছে, যে-কোনো মুহূর্তে একটা বড়রকম রদবদল হয়ে যেতে পারে।
সেতারের বাজনাটা শুনেই অতীন একবার ভাবলো, এদেশেও কি সামরিক শাসন এসে যাবে? পর মুহূর্তেই সে এই চিন্তাটা উড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।
হোটেলের বাইরে এসে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, এবারে কি নিরুদ্দেশে যাওয়া হবে? রাজকুমারীর মত বদলেছে?
অলি বললো, তোমার ইচ্ছে হলে তুমি একা যেতে পারো। আমি সোজা নবদ্বীপ যেতে চাই।
অতীন বললো, কী সুন্দর রোদ উঠেছে, এরকম একটা গ্লোরিয়াস দিনে টপ করে বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না...উঃমাগো, উঃ উঃ। গেলাম রে।
একজন লোক ট্যালার মতন কাবলিজুতো পরা পায়ে ধাক্কা মেরেছে অতীনের ব্যথার পা-টিতেই। লোকটি পেছন ফিরে তাকালোও না চলে গেল হনহনিয়ে। অতীন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেও অলির হাসি পেয়ে গেল। অতীন বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না বলার সঙ্গে সঙ্গে উঃ মাগো বলে ফেলেছে। অলির ইচ্ছে হলো অতীনের পিঠে একটা কিল মারতে।
এর পর অতীনের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা ছাড়া আর কোনো উপায় রইলো না। অলি জিজ্ঞেস করলো, ঐ দিকে একটা ওষুধের দোকান আছে, ওখানে নিশ্চয়ই ডাক্তার পাওয়া যাবে। একবার দেখিয়ে নেবে পা-টা?
অতীন বললো, বর্ধমানে ডাক্তার দেখাই আর সে আমার পাখানা কুচ করে কেটে বাদ দিক আর কি? সেপটিক হয়ে গেছে, তাতো বুঝতেই পারছি। যা হবার কলকাতায় গিয়ে হবে। হ্যাঁরে, তোদের বাড়িতে কারু সামান্য একটু জ্বর হলেই অমনি ডাক্তার ডাকা হয়, তাই না? তোদের নিশ্চয়ই ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আছে?
–বাঃ, থাকবে না?
–আমাদের বাড়ির সিস্টেম কী জানিস, তিন-চারদিন ধরে জ্বর চললেও ডাক্তারের কাছে যাওয়া চলবে না। অসুখের কথা লুকিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের কাছে বীরত্বের পরিচয়। আমাদের ফ্যামিলি

ফিজিশিয়ান বলে কিছু নেই, আমরা বাবা জীবনে একবারও কোনো ডাক্তারের কাছে গেছেন কি না সন্দেহ।

—এখন তোমাদের বাড়িতেই তো তুতুলদি ডাক্তার।

—হ্যাঁ, কিন্তু ফুলদির নিরেজ দারুণ শরীর খারাপ হলেও কোনো ওষুধ খাবে না। সব ওষুধই নাকি একটু একটু বিষ। ভেবে দ্যাখ, একজন ডাক্তার হতে চলেছে অথচ কোনো ওষুধেই তার বিশ্বাস নেই। আমাদের বাড়িটাই একটা পাগলের বাড়ি।

—এই বাবলুদা, ওরকমবাবে কথা বলে না।

—আমার মায়ের যে আলসার আছে তা আমি এই সেদিনমাত্র জানলাম। অথচ সাত-আট বছর ধরে নাকি হয়েছে!

—তুমি তো বাড়ির কোনো খবরই রাখো না।

—ঠিক বলেছিস অলি, আমি একটা অপদার্থ। আমার দাদা যদি আমার বদলে বেঁচে থাকতো, তা হলে আমার বাবা-মা কত ভালোভাবে থাকতে পারতো, আমাদের সংসারের চেহারাটাই বদলে যেত।

—ছিঃ বাবলুদা।

চল্লিশ মিনিট পরে নবদ্বীপের একটা বাসে জায়গা পাওয়া গেল কোনোক্রমে। ভিড় প্রচুর। অলি একটা লেডিজ সীটে বসতে পারলেও অতীনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো হাতল ধরে। অনেকখানি জার্নি। বাসটা জোরে যেতেই পারছে না, মাঝেমাঝেই রাস্তায় বিফল ট্রেনযাত্রীরা জোর করে বাস থামিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, অনেকেই বসেছে বাসের ছাদে।

এত ভিড়ের মধ্যে কথা বলাও উপায় নেই, অতীন আর অলি চোখাচোখি করছে শুধু। দু'জনের দৃষ্টির মধ্যে যেন একটা সেতু। অলি তবু জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে বাইরে তাকাতে পারে কিন্তু অতীন একদৃষ্টিতে দেখছে শুধু অলিকে। বাসের অন্যান্য যাত্রীদের গায়ের স্পর্শ সে পেলেও তাদের অস্তিত্ব সে ভুলে গেছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা বাদে অলির পাশের বৃদ্ধা মহিলাটি নেমে গেলেন। অতীন তবু সেখানে বসলো না, দাঁড়িয়েই রইলো। অলি মৃদুভাবে তাকে ডাকলো কয়েকবার। অতীন যেন শুনতেই পাচ্ছে না। অলি একটু ঝুঁকে অতীনের হাত ধরে টানলো, তখন অতীন বসলো, কিন্তু বললো, দাঁড়িয়েই তো ভালো ছিলাম, পাশাপাশি বসলে ভালো করে মুখ দেখা যায় না।

অলি প্রগাঢ়ভাবে অবাক হলো। এরকম একটা কথা বলার পক্ষে বাবলুদা যেন পৃথিবীর শেষতম ব্যক্তি। আজ বাবলুদার সব কিছুই অন্যরকম।

অতীনকে ছুঁয়ে অলি তার শরীরের উত্তাপ টের পেয়েছে, সে উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, বাবলুদা তোমার আবার জ্বর এসেছে।

অতীন বললো, ও কিছু না। তোকে বললাম তো, আমাদের ফ্যামিলিতে দু'তিনদিনের জ্বরটা কোনো ব্যাপারই না। ও আমরা হজম করে ফেলতে পারি।

—কিন্তু তোমার এই জ্বরটা হচ্ছে পায়ের ব্যথার জন্য।

—তুই-ও বুঝি ডাক্তারি জানিস? গোপাল ভাঁড়ের গল্পে পড়েছি, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লোক যে জিনিসটা জানে তা হলো ডাক্তারি। ও, তোরাও তো গোপাল ভাঁড়ের দেশের লোক।

আরও বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বাসটা হঠাৎ থেমে গেল এক জায়গায়। ইঞ্জিনে ঘটাং ঘটাং শব্দ, একটুখানি চলার চেষ্টা করতেই ম্যালেরিয়ার রুগীর মতন কাঁপুনি। অনেক যাত্রী হইহই করে উঠলো, কেউ কেউ নেমে গেল ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে। শীতে সন্ধে নেমে এসেছে তাড়াতাড়ি, তার মধ্যে বাসটি অনড়।

প্রায় আধঘন্টা বসে থাকার পর অতীন বেশ উৎফুল্ল গলায় বললো, আর যাবে না মনে হচ্ছে। এবারে আর উপায় নেই, নেমে হোটেল খুঁজতে হবে। তাহলে রাতটা আমার সঙ্গেই কাটাতে হচ্ছে, রাজকুমারী।

অলি বললো, মোটেই না। আমি জায়গাটা চিনতে পারছি, এখান থেকে নবদ্বীপের ঘাট বেশি দূর না। হেঁটেই যাওয়া যায়। চলো, তাই যাবে?

দু'জনে নেমে পড়ে কয়েক পা হাঁটার পরই অলি খুব অনুতপ্তভাবে বলে উঠলো ইস, ছি ছি ছি ছি, আমি কি ভুল করতে যাচ্ছিলুম। চলো, বাসেই গিয়ে বসি। একসময় না একসময় তো চলবেই।

অতীন বললো, কেন, কী হলো?

—তোমার পায়ে ব্যথা। তুমি হাঁটবে কী করে?

—আমি ঠিক হাঁটতে পারবো। মনে কর, কোনো কারণে আমাদের পুলিশে তাড়া করলো তা হলে আমি পাঁই পাঁই করে ছুটতেও পারতাম।

—না, চলো। ফিরে চলো।

—বলছি তো, আমার কষ্ট হবে না। তোর কাঁধটা একটু ধরবো, তা হলে সুবিধে হবে?

অলি এদিক ওদিক তাকালো। এখনও অন্ধকার তেমন জমে নি। আরও অনেক লোক হাঁটছে। অলি লজ্জিত ভাবে বললো, এখানে মানে লোকে দেখে কী ভাববে।...

—লোকে দেখে কী ভাববে এই জন্য আমরা অনেক কিছুই করতে পারি না, তাই না? খেয়াঘাটে কিন্তু ভিড় বেশি নেই। দু'তিনটি নৌকো যাত্রীদের ডাকাডাকি করছে, অতীনরা যে-নৌকোয় উঠলো, সে নৌকোটি আর দু'তিনজন মানুষ পেয়েই ছেড়ে দিল।

শীতকালের পরিষ্কার আকাশ অসংখ্য তারা। গঙ্গায় অবশ্য জল বেশি নেই। এ-বছর বৃষ্টিও তেমন হয়নি। একজন যাত্রী মাঝি দু'জনের সঙ্গে এবছরে ধানের ফলন বিষয়ে এমন জোরে জোরে আলোচনা শুরু করে দিল যে নৌকোযাত্রাটা তেমন সুখকর হলো না। অতীন অলিকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল অমনি সেই যাত্রীটি তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, কী বললেন ভাই? যেন ধানের ফল চাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলা এ যাত্রায় নিষিদ্ধ।

ওপারে কয়েকটি সাইকেলরিকশা অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু অলি নৌকো থেকে নেমেই কোনো রিকশায় উঠতে রাজি হলো না। সে বললো, বাবলুদা, একটু দাঁড়াও, এই জায়গাটা বেশ ফাঁকা, এখানে একটু বসে যাই না।

অতীন বললো, ও বাড়ির কাছে এসে গিয়ে এখন রোমান্টিসিজম হচ্ছে। এই শীতের মধ্যে বসতে ভালো লাগবে?

অলি তীরভূমি দিয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে পায়ের চটি খুলে ফেলে জলে নামলো একটু। তারপর পেছন ফিরে ডেকে বললো, বাবলুদা এখানে এসো জলে হাত দিয়ে দেখো জল কিন্তু বেশি ঠাণ্ডা নয়।

অতীন কাছে এসে বললো, নদীর জল বেশি ঠাণ্ডা হবে কী করে? সব সময়ই তো দৌড়াচ্ছে।

অলি চাপা গলায় গান ধরলো। পর পর দুটি গান অমন ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া তারপর ঘাটে বসে আছি আনমনা যেতেছে বহিয়া সুসময় ...।

গান দুটি শেষ করার পর বেশ কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে অলি বললো, তুমি বলেছিলে নদীর ধারে গান গাইবার কথা... আচ্ছা, বাবলুদা, তুমি রবীন্দ্র সঙ্গীত পছন্দ করো না, তাই না? সেদিন ট্রেনে আসবার সময় বলছিলে কিন্তু আমি তো অন্য কোনো গান জানি না...তুমিই তো আমায় গান শিখতে দিলে না।

অতীন কোনো মন্তব্য করলো না।

অলি আবার বললো, আজকের সারা দিনটা এটাই তো আমাদের নিরুদ্দেশ। বর্ধমানের ঐ হোটেলে খাওয়া, তুমি আর আমি একসঙ্গে আর কেউ চেনা নেই, এরকম তো আগে কখনো হয়নি। তারপর বাসে এতখানি পথ আসা, সেই ছেলেবেলায় তুমি আমাদের বাড়িতে খেলতে আসতে, তারপর তো বহুদিন আমরা সারাদিন এক সঙ্গে থাকিনি...বাসে আমার পাশে বসার পর তুমি বললে পাশাপাশি বসলে মুখ দেখা যায় না, তখন আমার মনে হলো, সত্যিই আমি তোমার সঙ্গে নিরুদ্দেশে চলে যাচ্ছি, কী ভালো যে আজ লাগছে বাবলুদা, তোমার পায়ে ব্যথা, তবু তুমি আজ আমাকে একবারও বকুনি দাওনি..

কাছাকাছি একজন মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে অতীন চট করে ঘুরে দাঁড়ালো। কালো রঙের চাদর মুড়ি দিয়ে সত্যিই একজন মানুষ এসে সেখানে কখন দাঁড়িয়েছে। অলিকে আড়াল করে অতীন কাঁপা রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে? কী চাই?

লোকটি বললো, আপনারা কি রিকশা যাবেন? আমার রিকশাই লাস্ট যাচ্ছে, এরপর আর পাবেন না। খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

অগত্যা নদী তীর ছেড়ে ওদের রিকশাতেই এসে উঠতে হলো। ধারালো ছুরির মতন ফিনফিনে বাতাস বইছে। অতীন তার গায়ের শালটার খানিকটা অংশ জড়িয়ে দিল অলির শরীরে। এখন রাস্তা একেবারে নিকষ অন্ধকার। রিকশাওয়ালাকেও দেখা যাচ্ছে না, ওদেরও দেখা যাচ্ছে না। যেন ওরা চলন্ত অলীক।

অতীন তার ডান হাতে অলির কোমর বেষ্টন করে তারপর পায়রার বুকের মসৃণতার মতন, অর্ধ তরল পাথরের মতন উষ্ণ স্তনে করতল রাখলো। তার হাতটি যেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাজ পেয়েছে।

অলি অতীনের সেই হাত চেপে ধরে খুব মৃদু, কাতর গলায় বললো,না বাবলুদা, প্লীজ ...

চলন্ত রিকশাতে অলি জোরে প্রতিবাদ করতে পারবে না, রিকশাওয়ালা কিছু টের পাবার বদলে অলি সব সহ্য করবে, একথা জেনেও অতীন সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিল নিজের হাত, বললো, আচ্ছা আর বিরক্ত করবো না।

অলি নিজেই ধরে রইলো অতীনের হাত, সে কোনো শোক গাথা বলার মতন সুরে বললো বাবলুদা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? এবার তুমি সর্বক্ষণ আমার ওপরে রেগে ছিলে কেন? আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলো নি, আসবার সময় ট্রেনে, পমপমদের বাড়িতে আমি কি কোনো দোষ করেছি?

অতীন বললো, সত্যি কথাটা বলবো?

–তুমি আজকাল প্রায়ই মিথ্যে কথা বলো আমি জানি। এবারে আমাকে সত্যি কথা বলো প্লীজ, ফর এ চেইঞ্জ।

–আমি তোর কাছে মিথ্যে কথা বলি না। তবে কোনো কোনো ব্যাপার গোপন করে যাই। তুই এত নরম অলি, অনেক সত্যি কথা শুনলে তুই আঘাত পাবি, সেইজন্য সেগুলো বলি না। কোনো কিছু গোপন করা আর মিথ্যে কথা বলা কি এক?

–এখন কিছু গোপন করো না। আমার ওপরে কী কারণে তোমার রাগ হয়েছে সেটা সত্যি করে বলো।

–তোর নাম অলি কে রেখেছিল?

–তুমি কথা ঘোরাচ্ছো।

–কিছুদিন ধরে আমার মনের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক একটা লড়াই চলছে। একদিকে মানিকদা কৌশিকরা আর একদিকে তুই। একটা দারুণ ঝঞ্ঝাট চলছে এই নিয়ে অন্য কাউকে কিছু বলতে পারছি না, এমনকি তোকেও না।

–আমাকেও বলতে পারো না? আমি কি তোমার কোনো কাজের বাধা হয়ে উঠেছি?

–তুই যে অলি, তুই আমার একেবারে নিজস্ব অলি, তোকে অন্য কেউ ছোঁবার চেষ্টা করলেও তাকে আমি শেষ করে দেবো, অথচ আমি যেন তোকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছি, আমি তোর দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিই...

–বাবুলদা, তুমি কী বলতে চাইছো , আমি এখনো বুঝতে পারছি না।

–তবে বলি শোন। ঘাবড়ে যাস নি কিন্তু। দিন দশেক আগে থেকেই আমার কী যেন হয়েছে, আমি প্রায় সর্বক্ষণ মনে মনে একটা কথাই বলছি, এরকম আগে কখনো হয়নি। এখন আমি মনে মনে বলছি, আমার অলিকে চাই, আমার অলিকে চাই। সমস্ত শরীর দিয়ে চাই, সর্বস্ব দিয়ে চাই, এক্ষুনি, সর্বক্ষণ চাই ঠিক যেন পাগলামির মতন। তোর দিকে তাকালে মাঝে মাঝে সত্যি আমার মনে হচ্ছিল, পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো, এক মুহূর্তে ও তোর কথা মন থেকে সরাতে পারছি না, শুধু চাই চাই, অলিকে চাই, অলিকে চাই বলে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল। আর কারুকে ভালো লাগছিল না। কৌশিকের কথাও শুনতে ইচ্ছে করছিল না। আমি তবু অতি কষ্টে নিজেকে দমন করে তোর সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে আজ তুই আমার সঙ্গে কোনো হোটেলে যেতে চাস নি, খুব ভালো হয়েছে, যদি যেতাম, আম বোধহয় তোকে খেয়েই ফেলতাম, অলি আমার সংযম নেই, আমি তোকে এরকম পাগলের মতন কেন যে চাইছি..

অতীনের হাতে একটা চাপড় মেরে অলি বললো, বাবলুদা, আমি তোমার কাছে কী চাই, তা তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?

অলির এরকম প্রশ্ন শুনেও অতীন কিছু জানতে চাইলো না। সে নিজের মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে অলির একটি কানের লতি আলতোভাবে কামড়ে ধরলো।

॥ ৪১ ॥

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এলাকা ছাড়িয়ে অনেক দূরে শূন্যে মহাকাশ যান জেমিনি ৭ নম্বরে চমৎকার ঘুম হয়েছে জেমস্ লোভেলের। চোখ মেলে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে সে অদূরে তার সঙ্গীকে

দেখতে পেল। বন্ধ বাতাসে ভাসছে বিটোফেনের নবম সিমফনির সুর। যদিও বাইরের আকাশ দেখা যাচ্ছে না, তবু সেই সুরের মূর্ছনায় লোভেলের মনে হল এখন সব কিছুই ঘাড় নীল। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে সে বলল, গুড মর্নিং ফ্র্যাঙ্কি।

ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান একটি দূর নিরীক্ষণ যন্ত্রে চোখ দিয়ে বসেছিল এবং রেকর্ডের সঙ্গীতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শিস দিচ্ছিল। মুখ তুলে সে বলল, এটা কি সকাল না সন্ধ্যা?

দু'জনেই হেসে উঠলো এক সঙ্গে। সত্যিই তো, এই মহাশূন্যে সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, দিন নেই রাত্রি নেই পূর্ব পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ নেই। স্বদেশ-বিদেশ নেই, এমনকি আবহাওয়া পর্যন্ত নেই। সীমাবদ্ধ মানুষের কল্পনায় এরকম অনেক কিছু না থাকলেও এখানে যেন আরও অনেক কিছু আছে।

ফ্লাস্ক থেকে একটি কাপে খানিকটা কফি ঢেলে লেভেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বোরম্যান বলল, চটপট তৈরি হয়ে নাও জিমি আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জেমিনি ৬-এর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। আমরা খুব সম্ভবত একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে যাচ্ছি। এই নিবাত নিষ্কম্প শূন্যমণ্ডলে দুটি মহাকাশ যানের মিলন যদি সম্ভব হয়, অর্থাৎ রান্দেভু ও ডকিং নিখুঁত হয়, তবে চাঁদে নামবার পথে আমাদেআর কোনো বাধাই থাকবে না। এরপর খুব শিঘগিরই মানুষ একদিন চাঁদে পা দেবে।

ভালো করে উঠে বসে গোভেল বলল, যদি বলছো কেন, সম্ভব হবেই।

এই সময় পৃথিবী থেকে বার্তা আসতেই বোরমান বাজনাটা থামিয়ে দিল। ঘুমের রেশ তাড়াবার জন্য লোভেল চোখে জল দিয়ে দাঁতটা মেজে নিল দ্রুত,তারপর দুজনেই কাজে লেগে গেল এক সঙ্গে।

লোভেল এর চোখে ভেসে উঠলো পৃথিবীর ছবি। চার শো কোটি মানুষ অধ্যুষিত পৃথিবীর এই রূপ এ পর্যন্ত দেখেছে মাত্র অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন। সবুজ হালকা ঘেরা একটি পরিপূর্ণ গোলক যেখানে মরুভূমি নেই,সমুদ্র নেই, নগর কারখানা নেই। মানুষের চিহ্নমাত্র নেই, তবু সেই গোলকটিকে প্রকৃতির একটা খেলনা মনে হয় না। মনে হয় অতিমাত্রায় জীবন্ত, সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্নেহ প্রেম ভালোবাসা। মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে এলেও লোভেল ও বোরম্যান সেই সদূর সবুজাভ পৃথিবীর দিকে যতবার তাকিয়েছে, তারা অনুভব করেছে বুকের মধ্যে প্রবল এক হ্যাঁচকা টান।

কমপিউটারের দিকে চোখ রেখে লোভেল বললো, ফ্র্যাঙ্কি, তুমি ওয়েনডেল উইলকির লেখা ওয়ান ওয়ার্লড নামের লেখাটি পড়েছ? এখানে এসে আমার বারবার মনে হচ্ছে আমাদের পৃথিবীটায় যদি একটাই মানুষ জাতি থাকতো, যদি এই পথিবীতে সব মানুষের সমান অধিকার থাকতো। তা নয়, ভাষা ধর্ম গায়ের রঙের ভেদাভেদে আমরা পরস্পর মারামারি করে মরছি। এই সুন্দর পৃথিবীটি কেন হিংসায় ভরা?

বোরম্যান গম্ভীরভাবে বলল, এক সময়ে তো সব সমানই ছিল। মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়েছে নিজের দোষে। তুমি ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিস অধ্যায়ের দশ ও এগারো নং চ্যাপ্টার পড়নি?

লোভেল বলল, আমাদের পরিবার তোমাদের মতন চার্চ গোয়িং নয়, আমি ইস্কুলে শিশুপাঠ্য বাইবেল ছাড়া আর বিশেষ কিছু পড়িনি। কী আছে জেনেসিস অধ্যায়ে?

–তুমি টাওয়ার অফ ব্যাবেলের কথা জানো না?

–নামটা শুনেছি তো বটেই, অনেক লেখাতে উল্লেখও দেখেছি, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কী তা আমার জানা নেই।

–তবে সংক্ষেপে বলি শোনো। মানবজাতির আদি ভাষা ছিল হিব্রু..

লোভেল হা হা করে হেসে উঠল। তারপর দ্বিতীয় কাপ কফিতে একটা চুমুক লাগিয়ে বলল তুমি এই গাঁজাখুরি কথাটায় বিশ্বাস কর? মানুষের আদি ভাষা হিব্রু? আমার ভাষাতত্ত্বে কোনই জ্ঞান নেই, তবু আমি এইটুকু অন্তত জানি যে প্রাচ্য দেশগুলিতে এর চেয়ে অনেক প্রাচীনতর ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে।

বোরম্যান শান্ত কণ্ঠে বলল, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। তমি জেনেসিস অধ্যায়ের কাহিনীটা শুনতেচেয়েছো,সেটাই বলছিলুম। কোনো একটা সময়ে নিশ্চয়ই মানুষের একটাই ভাষা ছিল। জুডাইয়ো খ্রীষ্টান ট্র্যাডিশনে মনেকরা হয় সেই ভাষাটাই ছিল হিব্রু। নোয়ার বংশধররা ছিল হিব্রুভাষী,তারা প্রাচ্য দেশ ছেড়ে পশ্চিমে গিয়ে শিনার বা ব্যাবিলোনিয়ায় উপস্থিত হয়, সেখানে ব্যাবেল নামে একটি শহর নির্মাণ করে। পরবর্তীকালে সেই শহরেরই নাম হয় ব্যাবিলন। এই ব্যাবেল-এর রাজার নাম নিমরড, সে হচ্ছে নোয়ার দৌহিত্রের দৌহিত্র। এই এই নিমরড উত্তরাধিকারীসূত্রে এক জোড়া চামড়ার পোশাক পেয়েছিল,কোন্ পোশাক জানো? স্বয়ং ঈশ্বর অ্যাডাম ও ইভের জন্য যে

পোশাক বানিয়েছিলেন এই সেই পোশাক এবং এই পোশাক পরিধান কর নিমরড হয়ে উঠেছিল মহা শক্তিশালী বীর ও শিকারী। দুর্দান্ত অহংকারীও হয়ে উঠেছিল সে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে পর্যন্ত স্পর্ধা করতে শুরু করল...জিমি তোমার সামনের তিন নম্বর কমপিউটারে একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠলো, কী বলছে দ্যাখো তো।

লোভেল সে যন্ত্রের গণনা পাঠ করে বলল, আমাদের তৈরি থাকতে বলছে। রান্দেভু -র আর সত্তর মিনিট দশ সেকেণ্ড দেরি আছে। ফ্র্যাঙ্কি, তুমি নিমরডের গল্পটা শেষ করো।

বোরম্যান বলল, এই নিমরড এমন একটা গম্বুজ নির্মাণ করবে ঠিক করলে, যার চূড়া আকাশ স্পর্শ করবে। সেই গম্বুজে উঠে সে স্বর্গ আক্রমণ করবে। তার পূর্ব পুরুষদের বন্যার জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল বলে সে ঈশ্বরের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। শেষ পর্যন্ত তৈরি হলো এই গম্বুজ, যা সত্তর মাইল উঁচু।

–সত্তর মাইল উঁচুতেই স্বর্গ?

–তখনকার কল্পনার পক্ষে আকাশের দিকে সত্তর মাইল উচ্চতা নিশ্চিত অনেকখানি। এই বিশাল গম্বুজের পূর্ব দিকে একটা সিঁড়ি, যেটি আরোহণের জন্য আর পশ্চিম দিকে অবতরণের জন্য আর একটি সিঁড়ি। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের উদয় অস্তের মতনই এই পূর্ব-পশ্চিমের সিঁড়ি দুটি। সমস্ত কর্মীরা অভিন্নমত হয়ে মিলেমিশে সুশৃঙ্খলবাবে তৈরি করল এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটি। এই স্তম্ভই টাওয়ার অফ ব্যাবেল নামে পরিচিত।

–এই নামটার সঙ্গে মানুষের নানান ভাষার কচমচির কী একটা যেন সম্পর্ক আছে না?

–হ্যাঁ, এবারে সেটাই বলছি। এক রাত্তিরে স্বয়ং ঈশ্বর সেই স্তম্ভ ও নগরীটি দেখতে এলেন। তাঁর সিংহাসনের চার পাশ ঘিরে আছে সত্তরটি দেবদূত। ঈশ্বর মানুষের সেই সদর্প কীর্তি অবলোকন করে বললেন, দ্যাখো কাণ্ড। এই মানুষেরা একই জাতি এবং একটাই ওদের ভাষা, ওরা ভবিষ্যতে কী যে করতে পারে, এটা সবে মাত্র তার শুরু। এবং ওরা যা করতে চাইবে তা কিছুই আর অসম্ভব থাকবে না। তখন তিনি মানুষের ভাষার মধ্রে ধন্দ ঢুকিয়ে দিলেন পরস্পরকে আর তারা বুঝতে পারলো না, তারপর তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দিলো। গণ্ডগোলটা কী রকম হলো জানো? গম্বুজের কারিগরদের একজন হয়তো তার সহকারির কাছে একটা হামানদিস্তা চাইলো, সে ভাষা বুঝতে না পেরে এনে দিল ইট, বারবার এরকম ঘটতে থাকায় একজন আর একজনের মাথায় ইঁট ছুঁড়ে মারল। কিছুদিন মারামারি করার পর সেই মানুষেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন ভাষা নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো সারা পৃথিবীতে। ভাষা নিয়ে সেই ঝগড়া এখনো চলছে।

–কিন্তু এই কাহিনীতে তো দেখা যাচ্ছে মানুষের কোনও দোষ নেই, ঈশ্বরই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। অথচ মানুষ জাতি এই তথাকথিত ঈশ্বরের সন্তান।

–মানুষ স্বর্গ দখলের স্পর্ধা দেকালে ঈশ্বর রাগ করবেন না? তা ছাড়া মানুষের ঐ একতা দেখে ঈশ্বরের নিশ্চয়ই ঈর্ষা হয়েছিল; একতাবলে মহাশক্তিশালী হলে মানুষ আর ঈশ্বরকে গ্রাহ্য করবে না। এই জন্যই ওল্ড টেস্টামেন্টের ভগবানকে ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর বলা হয়েছে। অবশ্য অন্য কোনো ধর্মের ঈশ্বরকেই আমি কম হিংসুক বলতে পারি না সত্যের খাতিরে। কোনো ঈশ্বরই মনুষ্যজাতির অহিংস একতা চায় না এখনো।

–তাহলে, ফ্র্যাঙ্কি, তোমার কী মনে হয় না, আধুনিক মানুষের চিন্তার জগৎ থেকে এই ঈশ্বর নামের বিদঘুটে বিশ্বাসটিকে একেবারে ফিনাইল দিতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলা উচিত? ভগবান নামে এই ভূতটাই তো মানুষের প্রধানতম শত্রু।

–তুমি আমি চাইলেই কি তা মুছে ফেলা সম্ভব। পৃথিবীর সব দেশেই ঈশ্বরের দালালগুলি অতিশয় শক্তিমান। এমন কি যারা ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বর -টিশ্বরের ধার ধারে না অথচ ক্ষতার উচ্চ শিখরে বসে আছে, তারাও নিজেদের সুবিধের জন্য নিরীহ জনসাধারণের ওপর ভগবান নামে একটা বিরাট বোঝা চাপিয়ে রাখে। ধর্ম হচ্ছে মাদক ককটেল আর তার মাঝখানের চেরি। ফলটি হচ্ছেন ঈশ্বর।

–কিন্তু কম্যুনিস্টরা তো ঈশ্বরকে মুছে ফেলেছে। এই শতাব্দীতে এটা নিশ্চিত মস্ত বড় একটা ঘটনা ..এই রে, আমাদের কথাবার্তা আর্থ সেন্টার শুনতে পাচ্ছে না তো?

–না, আমি আগেই প্রধান কম্পিউটার রিডিং-এর সঙ্গে আর্থ সেন্টার জুড়ে দিয়েছি। আমাদের হাতে আর কতটা সময় আছে?

–অনেক। কথাবার্তা না বলে চুপ করে বসে থাকলে প্রতিটি মুহূর্তকেই মনে হয় অনন্ত মুহূর্ত।

ফ্র্যাঙ্কি, আমার নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যার কথা তেমন মনে পড়ছে না। গোটা মানবজাতির কথা এক সঙ্গে ভাবছি, যেন দেখতে পাচ্ছি একটিই অর্ধ-নারীশ্বরকে। এত দূরে এসেছি বলেই কি এরকম মনে হচ্ছে।

–নিশ্চিত তাই, জিমি। তুমি যে বললে, কমুনিস্টরা ঈশ্বরকে বুঝে ফেলেছ, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। সত্যিই কি মুঝে ফেলেছে? জনসাধারণের মাথার ওপর তারাও কি অন্য কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে না? মার্কসইজম্‌ তো অবিকল একটি ধর্মেরই মতন, গত শতাব্দীতে উদ্ভুত হলেও এই শতাব্দীতেই প্রত্যক্ষত পরীক্ষিত ধর্ম। এই ধর্মেরও সার কথা, আমার জানা অন্য যে কোনো ধর্মেরই মতন হয় সবাইকে নিজের দলে টানো, নয় তাদের মারো। সুতরাং মারামারি কাটাকাটি চলতেই থাকবে।

–হয়তো সারা পৃথিবীই কমুনিস্ট হয়ে গেলে মানুষের মধ্যে প্রকৃত শান্তি আসে। সেটাই তো কমুনিজমের মূল কথা, তাই না?

–এটা একটা তত্ত্ব মাত্র। যদি শেষ পর্যন্ত তা না হয়? তা হলে তো মারামারি কাটাকাটি চলতেই থাকবে। ক্রিশ্চিয়ানিটিও তো এই একই কথা বলতে চেয়েছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে তো ক্রিশ্চিয়ানিটিকে একবারও চান্স দেওয়া হয়নি। সকলেই ক্রিশ্চিয়ান হলে মানুষের মধ্যে সব ভ্রাতৃত্ববোধ আসতেও পারতো হয়তো।

–ক্রিশ্চিয়ানরা নিজেদের মধ্যেই তো মারামারি করেছে?

–কমুনিস্টরা এর মধ্যেই বুঝি নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেনি? পৃথিবীতে এখন যে কটা কম্যুনিস্ট দেশ তাদের মধ্যে মতের মিল আছে? হাঙ্গেরিতে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক নেমেছিল, চীন ও সোভিয়েট দেশের মধ্যে এখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তুমি জানো কি, রুমানিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ানরা পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না? আমার এক বন্ধু চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়েছিল সেখানে সে দেখেছে, একটা মদের পার্টিতে হঠাৎ দু'দলে বেঁধে গেল প্রচণ্ড ঝগড়া। এই দুটো দল কাদের জানো? একদিকে চেক অন্য দিকে শ্লাভেরা, একই দেশের মানুষ এবং মার্কসইজমে দীক্ষিত হয়েও এদের মধ্যে পুরোনো জাতিগত রেশারেশি রয়ে গেছে। পেটে একটু মদ পড়লেই তা বেরিয়ে পড়ে। এ যেন ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই ঈশ্বরের অভিশাপের মতন, মানুষে মানুষে রেশারেশি থাকবেই, এমন কি সাম্যের বাণীও তা ঘোচাতে পারছে না।

–কিন্তু তোমার ঐ ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর তো মানুষে মানুষে ভাষার বিভেদ ও সেই কারণে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু যেখানে সেই বিভেদ নেই, যেমন ধরো পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি একই ভাষা একই সংস্কৃতি, অথচ মাঝখানে কী গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গেল।

–তার কারণ ভাষা ও সংস্কৃতির চেয়েও ধর্ম অনেক বড় হয়ে ওঠে। আগেকার ইন্ডিয়া ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান হয়ে গেল যে কারণে। জার্মানিতেও ক্যাপিটালিজ ও কমিউনিজম নামে এ যুগের সব চেয়ে দুটি প্রবল ধর্মের সংঘাত, তার ফলে ঐ মাঝখানের দেওয়াল।

–কিন্তু ফ্র্যাঙ্কি পূর্ব জার্মানদের কি সোভিয়েটেরা জোর করে তাঁবে রেখেছে বলতে চাও? তারা অন্য অংশের সঙ্গে মিলন চায না? জার্মান জাত কি এত কাপুরুষ? দু'চারটে লোক পাঁচিল টপকে এদিকে আসার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু পূর্ব জার্মানিতেসে-রকম কোনো গণ অভ্যুত্থান তো হয়নি।

–পশ্চিম জার্মানির মানুষও কমিউনিজম মেনে নিয়ে অন্য জার্মানির সঙ্গে মিলতে চায় কি না তা জানবারও কোনো উপায় নেই। কারণ, ওদিকে যেমন সোভিয়েতরা, এদিকে তেমনি আমরাও ওদের ঘাড়ে চেপে বসে আছি। শোনো জিমিপূর্ব থাকলে পশ্চিম থাকবেই। সব দেশের মধ্যেই পূর্ব পশ্চিম আছে। আমাদের পৃথিবীটাও পূর্ব পশ্চিমে বিভক্ত, উত্তর দক্ষিণে নয়। এমন কি ভালো করে ভেবে দ্যাখো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও একটা করে পূর্ব পশ্চিম আছে। পূর্বের পশ্চিম অনেক বেশি বর্ণাঢ্য কারণ ধ্বংসের আগে কিংবা অস্তাচলে যাবার আগে আভাটা বেশি হয়। এরপর পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে পূর্বের আকাশ ও পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করো।

–ফ্র্যাঙ্কি, তুমি কি নৈরাশ্যবাদী?

– আঁ? না, না, আমি কখনোই নৈরাশ্যবাদী হতে চাই না। তবে আমি কোন আপ্ত বাক্য অর্থাৎ অন্যের প্রচারিত আদর্শবাদই বিনা যুক্তি তর্কে গ্রহণ করতে রাজি নই। যাই হোক জিমি, এখন আমাদের আশাবাদ নিবদ্ধ থাক আমাদের আশু সাফল্যের প্রতি। জেমিনি ৬ আর কত দূর? মানুষে মানুষে যতই বিভেদ থাক, দুই মহাকাশ যানের মিলন সার্থক করতেই হবে।

–আজ আমরা সার্থক হবই। আমি স্বপ্ন দেখেছি, রুশীদের আগে আমরাই চাঁদের মাটিতে পা

দিয়েছি।

এবারে বোরম্যান মৃদু হাস্য করে লোভেলের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, এতক্ষণ পরে তোমার ভেতর থেকেও বেরিয়ে এসছে আসল মানুষটা। কেন জিমি সোভিয়েট দেশের কেউ আগে চন্দ্র জয় করলে কী ক্ষতি আছে? সেও তো মানুষেরই জয়। তুমি সব মানুষের মিলনের কথা বলছিলে, কমিউনিজমের প্রশংসা করছিলে, তবু তোমার মধ্য থেকে থলে বন্দী বিড়ালের মতন জাতি বৈরী বেরিয়ে পড়ল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোভেল বলল, ঠিক বলেছ, আমাদের শিক্ষাদীক্ষার ধরন ও প্রচার যন্ত্রগুলির অনবরত চিৎকারে এরকম একটা ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। আমরা আমেরিকানরা, যে কোনো উপায়ে ছলেবলে কৌশলে সোভিয়েটদের ওপরে থাকতে চাই।

–তার জন্য যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও যেন কিছু আসে যায় না। দ্যাখো সোভিয়েটরা আর আমরা মহাকাশ অভিযানের প্রতিযোগিতায় নেমেছি। রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হচ্ছে। অথচ দুটি দেশ এক সঙ্গে হাত মিলিয়ে যদি গবেষণা চালাতো, কত অর্থের সাশ্রয় হতো। অগ্রগতি ত্বরান্বিত হত। মনুষ্যজাতিই তো সেই ফল ভোগ করতে। কিন্তু তা হবার নয়।

–ক্যাপিটালিজম ও কমুইনিজম নামে এ যুগের দুই ধর্মের লড়াই তো পৃথিবীটাকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের তো কোনো হারজিত নেই। কেন না, এরকম সর্বাত্মক ধ্বংসের অস্ত্র তো মানুষের হাতে আগে আসেনি।

–আশা করি আমাদের জীবৎকালের মধ্যে সেই মহাপ্রলয় দেখে যেতে হবে না।

–ফ্র্যাঙ্কি, ঈশ্বর নামে সত্যিকারের কেউ যদি থাকবেন, তা হলে এ সময় তিনি হস্তক্ষেপ করে কি মানুষকে বাঁচাতে পারবেন না? তিনি কি মনুষ্যজাতির ধ্বংস চান? তাহলে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন কেন?

–এ পৃথিবীতে মানুষের পাপের ভরা পূর্ণ হলে এক সময় তিনি মহাপ্লাবন ঘটিয়েছিলেন, আবার তিনি হয়তো সেই কারণেই মহাপ্রলয় চান।

–ফ্র্যাঙ্কি তুমি কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করো?

বোরম্যান সহসা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। একটুক্ষণ মুখ নিচু করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি ঠিক জানি না। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে পাই না, তবু প্রায়ই এই প্রশ্নটা জাগে, একটা কোনও শক্তি কি নেই, যা এই জগৎসংসার নিয়ন্ত্রণ করছে? শুধু আহার নিদ্রা মৈথুনের জন্যই কতগুলি বছর এই পৃথিবীতে কাটিয়ে যাওয়া এটাই যদি শেষকথা হয়,তাহলে জীবনটা অর্থহীন হয়ে পড়ে না? মানুষ কি কিছুই খুঁজবে না?

–চেতনার উন্নত স্তরে পৌঁছবার চেষ্টা করে যাওয়াই তো মানুষের জীবনের পরম অনুসন্ধান। আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতাই আমাদের শিক্ষক তা ছাড়া আর কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন আছে কি?

–তুমি ঠিক কীবলতে চাইছো, জিমি আমি ঠিক বুঝলামনা।

–জীবনের সার্থকতা হল বোধের বিকাশ। যে-কটা দিন বেঁচে গেলাম জীবনটাকে বুঝে গেলাম। পৃথিবী ছাড়িয়ে এসে, এই দিকহীন মহাশূন্যে এসে বারবার টের পাচ্ছি, আমি নামে এই মানুষটা কত সামান্য অণু-পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র, এই বিরাট বিশ্ব-সংসারে আমার যেন কোনো ভূমিকাই থাকতে পারে না। আবার সঙ্গে সঙ্গেই একথা মনে হয়, স্নেহ প্রেমমমতায় আমার যে জীবন,তাও তো কম বিশাল নয়, মহাকালের একটা অংশ আমি বহন করছি, আমার এই মগজে আমি এই নিখিল বিশ্বকে ধরে রাখতে পারি, আমার চেতনা এই আকাশের মতন পরিব্যাপ্ত। মানুষের এই বোধই তার জীবনটাকে সম্মানিত করতে পারে।

ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর বেশি দেরি নেই। সেই চর মুহূর্ত আগতপ্রায়। কী সুন্দর শুদ্ধ, পবিত্র এই মহাশূন্য। জিমি, ডকিং এর সময় জেমিনি ৬-এর সঙ্গে সমান্তরাল হতে যদি আমাদের কে মাইক্রো মিলিমিটার ব্যবধান ঘটে তা হলে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমরা টুকরো টুকরো হয়ে হারিয়ে যাবো। আমাদের আর কোনো চিহ্নও থাকবে না।

–তেমন যদি হয়ও তা হলেও কি কিছু থাকবে না? ধ্বংস হয়ে গেলেও কী জীবন একেবারে হারিয়ে যায়?

–যায় না?

–ফ্র্যাঙ্কি, ফ্র্যাঙ্কি আমরা এখানে কী করছি? কেন আমরা এখানে এসেছি? কি হবে এই মহাকাশযান প্রতিযোগিতায়? চাঁদে নেমেই বা আমাদের লাভ কী হবে? মনুষ্য জাতি এর থেকেকী পাবে?

–এসব প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, জিমি সামনে এগিয়ে যাওয়াইআমাদের নিয়তি। মানুষের জীবনে এটাই তো একটা প্রধান ট্র্যাজিডি যে তাকে এগিয়ে যেতেই হবে, থেমে থাকার কোনো উপায় নেই। মহাকাল যেমন গত শতাব্দীতে থেমে থাকেনি, মানুষের জীবন যেমন যৌবনেথেমে থাকতে পারে না, বিজ্ঞান যেমন কখনো বলতে পারবে না, যথেষ্ট হয়েছে, আর চাই না অস্ত্র প্রতিযোগিতা যেমন কোথাও শেষ হবে না, স্প্যানিশ জাহাজে চেপে কলম্বাস যেমন প্রথম দ্বীপটিতে পৌঁছেই বলতে পারেননি, আর যেতে চাই না...প্রবল এক অতৃপ্তি মানুষকে সব সময় ঘুরিয়ে মারে, এই অতৃপ্তি থেকেই যতসব উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম, হিংসারও জন্ম। এর পর যখন মহাকাশে পাশাপাশি দুটি মার্কিন ও সোভিয়েত মহাকাশ যান যাবে, আমরা অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকবো,আর একজন যাতে আগে যেতে না পারে, সেইজন্যে তাকে ধ্বংস করতে চাইবো, এমনকি এখন থেকেই অঙ্ক কষে অস্ত্র ছুঁড়ে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ দেশকে ঘায়েল করতে সুযোগও হারাবো না।

–এটা যে মনুষ্যজাতির আত্মধ্বংস, তা তো একটা শিশুও বোঝে।

–অনেকেই বোঝে। যে বৈজ্ঞানিক অস্ত্র বানাচ্ছেন, তিনি বোঝে না? অন্যকে মারতে গেলে নিজের মৃত্যুরও যে ডেকে আনার ভাবনা থাকে তা কে না বোঝে? তবু যেন কোনো উপায় নেই,মনুষ্যজাতির ইতিহাসের কোনো একটা বিশেষ অংশে দু'দণ্ড থেমেজিরিয়ে নেবার উপায় নেই। জন্ম থেকেই মানুষ একটা গড়ানে পাথরে ওপর চেপে বসে।

–ফ্র্যাঙ্কি, যদি আর একটু পরেই আমরা শেষ হয়ে যাই, তার আগে আবার পৃথিবীকে দেখেযেতে ইচ্ছে করছে। একবার দেখাও।

–এখন আমাদের চোখে আমাদের হাসি-কান্নার পৃথিবীটা আকাশের যে-কোনো গ্রহ তারকারই মতন। চোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পাবো না। এসো আমরা কল্পনায় দেখি।

রকেটের পোর্ট হোল দিয়ে দু জোড়া ব্যাকুল চক্ষু চেয়ে রইলো বাইরে।

এই সময় পৃথিবীতে যথা নিয়মে প্রেম ও প্রতারণা, সেবা ও স্বার্থপরতা, আদর্শবাদ ও ভণ্ডামি, শান্তির বাণী ও যুদ্ধ ক্ষুধা ও বিলাসী অপচয় সব কিছুই চলছে ঠিকঠাক। এরই মধ্যে একটি অতি ছোট্ট দৃশ্য এইরকম।

হরিদাসপুর পেট্রাপোল সীমান্তের দু'পাশে রক্ষীবাহিনী, কয়েকদিন আগেও তারা পরস্পরের দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছিল, আজ তারা অস্ত্র নামিয়ে রেখেছে পাশে। দু'দিকের রক্ষীবাহিনীর পিছনে যে সমস্ত মানুষ তাদের ভাষার বিভেদ নেই, সংস্কৃতির ঐক্য রয়েছে তবু তাদের মাঝখানে কঠোর সীমারেখা, তারা এখন দুই শত্রু দেশের নাগরিক। তারা ধর্মে কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান। অধিকাংশ হিন্দুই জানে না, তাদের ধর্মটা প্রকৃত পক্ষে ঠিক কী। বাপ ঠাকুর্দার কাছ থেকে গালগল্প শুনেছে মাত্র অথবা কিছু অশিক্ষিত পুরত পান্ডা যা খুশী বানিয়ে বলেছে, একটা অক্ষর সংস্কৃত ভাষা বোঝে না, তারা তবু ভুলভাল সংস্কৃত বচন শুনলে ভক্তিতে মাথা নোয়ায়। যারা মুসলমান তারাও অধিকাংশই কিছু জানে না ইসলামের মূলতত্ত্ব মোল্লা ও হঠাৎ নেতারা যা শোনায় তাই মাতা নিচু করে মেনে নেয়। সাকার নিরাকারেরর দ্বন্দ্বে তাদের ভাত কাপড়ের কী আসে যায় তা ভাবতে শেখেনি, এক বর্ণ বোঝে না আরবী ভাষা তবু আউড়ে যেতে হয়। এই দুই জাতির অন্তরে অন্তরে কোনো শত্রুতা নেই তবু একটা পারস্পরিক ঘৃণা ও অবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তোলা হয়েছে।

যুদ্ধ বিরতির পর সম্প্রতি সীমান্ত একটু নরম হয়েছে, যেন সামান্য একটু ফাঁক করা হয়েছে দরজা। বন্দী ও অন্তরীণ মানুষদের বিনিময় চলছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৩৮৫৩ জনকে যুদ্ধের দরুন আটকে রাখা হয়েছিল পাকিস্তানী নাগরিক বলে, পূর্ব পাকিস্তানে এই সংখ্যাটি হাজার পাঁচেক। মাত্র আঠারো বছর আগেই এরা ছিল একই দেশের নাগরিক, এখন এরা এসেছিল ওপার থেকে পাটালি গুড় কেউ এপার থেকে নিয়ে গিয়েছিল স্পঞ্জ রসগোল্লা, এরা বন্দী হয়েছিল দিল্লি ও করাচীর কয়েকজন মাত্র মানুষের জেদাজেদিতে।

বন্দী বিনিময় চলছে গুণে গুণে, সুশৃঙ্খলভাবে। আশ্চর্য ব্যাপার, ছাড়া পেয়েও উৎফুল্ল হবার বদলে কেউ কেউ কাঁদছে, এদিকে মাটি ছেড়ে ওদিকে যেতে তাদের পদক্ষেপ দ্রুত হচ্ছে না। পশ্চিম সীমান্ত থেকে একটি ক্রন্দনরত পরিবার ওদিকে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ একজন রেডক্রস

কর্মী, সদ্য তরুণ সে ছুটে গিয়ে সেই পরিবারের একজনের হাতে একটি ফুলের মালা দিয়ে বললো, আবার আসবেন।

তা দেখে পূর্ব দিকের একজন রক্ষী সেদিকের একজন ক্রন্দনরত মহিলার দিকে তাকিয়ে বললো, ঠিক আছে, আপনের পোটলাটা নিয়া যান। আর কাইন্দেন না, সময় ভালো হইলে আবার আসবেন।

॥ ৪২ ॥

সকাল থেকেই মামুনের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। তাঁর পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার নিচের চার কলম জুড়ে গভর্নর মোনেম খাঁর প্রশস্তিমূলক একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। তাঁর সম্পাদিত কাগজ পড়তে গিয়ে মামুন নিজেই আঁতকে উঠলেন।

কাগজ বড় হয়েছে, কাজ অনেক বেড়েছে, এখন প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা দেখে ছাড়া মামুনের পক্ষে সম্ভব হয় না। নিযুক্ত করা হয়েছে একজন অভিজ্ঞ নিউজ এডিটর। প্রত্যেকদিন বেলা একটার সময় মামুনের ঘরে সেই নিউজ এডিটর, চীফ রিপোর্টার ও দু'জন অ্যাসিস্টান্ট এডিটরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকার পলিসি ঠিক করা হয়। আইয়ুব খাঁ-র নির্লজ্জ তাঁবেদার মোনেম খাঁ-র পায়ে তৈল মর্দন করা দিন কাল পত্রিকার নীতি নয়, তবু এরকম খবর চাপা হয় কী করে? কুষ্টিয়ার এক কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মোনেমখাঁ যা সব আবোল তাবোল বকেছে, খবর হিসেবে তার কোনো মূল্যই নেই. ইংরিজি পত্রিকাগুলিতে সে খবর ছাপাই হয়নি, আর মামুনের কাগজে চার কলম। মানিক মিয়া বা অন্যান্য সম্পাদকদেরে এর পর দেখা হলে মামুনে নিশ্চিত বিদ্রূপ শুনতে হবে।

কাগজ পড়তে পড়তেই মামুন ফোন করলেন তাঁর নিউজ এডিটর নুরুল সাহেবকে। ফোন ধরেই নুরুল সাহেব দু'বার হাঁচলেন, তারপর যেভাবে কথা বলতে শুরু করলেন তা বুঝতে মামুনের বেশ অসুবিধে হলো। নুরুল সাহেবের নাক বর্তি সর্দি, দন্ত্য ন গুলি ল হয়ে গেছে। মোটকথা তিনি জানালেন যে, জ্বর জ্বর বোধ হও য়োয় তিনি গতকাল রাত আটটার সময় অফিস থেকে বাড়ি চলে এসেছিলেন, মামুন সাহেব তখন ঘরে ছিলেন না বলে তিনি চার্জ দিয়ে এসেছিলেন চীফ সাব সুধীর দাসের ওপর। প্রথম পাতার অ্যাংকর নিউজটি কে লিখেছে তিনি জানেন না। তিনি নিজেও ঐ খবর পড়ে অবাক হয়েছেন।

মামুন ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন। সুধীর দাসের বাড়িতে টেলিফোন নেই। আলতাফ হয়তো জানতে পারে। কিন্তু আলতাফ তো সাংবাদিক নয়, সে ম্যানেজার, আলতাফের কাছে কোনো সংবাদের সূত্র জানতে চাওয়া সম্পাদকের পক্ষে সম্মানজনক নয়। হাতের কাছে আর কারুকে না পেয়ে মামুন ফিরোজা বেগমের ওপরই উগ্র মেজাজ দেখাতে লাগলেন। তাঁর গোসলের জন্য গরম পানি দেওয়া হয়নি কেন? খেতে বসে তিনি মাছের বাটিটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন। শীতকালে ইলিশ মাছ তিনি একেবারে পছন্দ করেন না। ফিরোজা বেগম জানে না? তাঁর সেবা-যত্নের প্রতি বাড়ির লোকের নজরই নেই, তিনি তবু টাকা রোজগারের জন্য গাধার মতন খেটে চলেছেন। শেষ পাতে খানিকটা ডাল চুমুক দিয়ে খেতে মামুন ভালোবাসেন, আজ ডাল রান্নাই হয়নি।

তাড়াতাড়ি অফিসে পৌঁছে মামুন। হাঁকডাক শুরু করলেন। সুধীর দাস কোথায়? এখনো আসেনি। রিপোর্টাররাও কেউ এখনো আসেনি, একজন মাত্র সাব এডিটর ও দু'-তিনটি বেয়ারা ছাড়া আর কেউ নেই। দশটা থেকে শিফট শুরু হওয়ার কথা, বারোটার মধ্যেও অনেকেই এসে পৌঁছোয় না। মামুন তাঁর বেয়ারা আবদুলকে দিয়ে প্রুফ ডিপার্টমেন্ট থেকে আগের দিনের কপির বাণ্ডিল আনালেন, আশ্চর্যের ব্যাপার, তার মধ্যে ঐ বিশেষ কপিটিই নেই। ইচ্ছে করেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

মামুন চেঁচিয়ে বললেন, আবদুল, সব কমপোজিটারদের ডেকে নিয়ায়।

শান্ত প্রকৃতির মামুনকে এত রাগতে কেউ দেখেনি আগে। তাঁর চক্ষু দুটি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যে তিনজন কমপোজিটার এখন উপস্থিত, তারা কেউই ঐ নিউজ কমপোজ করেনি কে করেছে তারা জানে না। মামুনের সন্দেহ হলো তাঁর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে, তিনি তখুনি আলতাফকে টেলিফোন করতে গেলেন, কিন্তু আলতাফকেও পাওয়া গেল না।

মামুনের নিজস্ব সেক্রেটারি শওকতও এখানে এসে পৌঁছোয়নি। এই শওকত ইদানীং গান-বাজনা নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। অফিসে বসেও সে মাঝে মাঝে টেবিল বাজিয়ে গান গায়। মামুন

তার গান শুনতে পছন্দ করেন, কিন্তু এখন তার ওপর রেগে উঠে ভাবলেন, এবার ঐ গায়ক ছোকরাটাকে তাড়াতে হবে। সবকটা অকর্মাকে তিনি আজ থেকে সমঝে দেবেন যে এই অফিসে যা খুশী করা চলবে না।

এই সময় উপস্থিত হলো সুধীর দাস। এখনো বয়স্ক মানুষ সারা জীবন সাংবাদিকতা করে চুল পাকিয়েছেন, ধুতির ওপর সাদা শার্ট তাঁর প্রতিদিনের পোশাক। এমনই তাঁর নস্যি নেওয়ার বাতিক যে হাতে নস্যি না থাকলেও দুটি আঙুল সব সময় জুড়ে থাকে।

তাঁকে দেখে মামুন একেবারে ফেটে পড়লেন। সেদিনের কাগজটা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মামুন বললেন, এ কী ব্যাপার, সুধীরবাবু কে এটা লিখেছে, কার হাত দিয়ে পাস হয়েছে, আমি জানতে চাই।

প্রথমেই মামুনের কথার উত্তর না দিয়ে সুধীর দাস পেছন ফিরে কমপোজিটারদের বললেন যাও, তোমরা কাজে যাও।

তারপর এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে তিনি অতি স্বাভাবিক গলায় বললেন, আমার হাত দিয়েই পাস হয়েছে। কিন্তু আপনি এত চটছেন কেন, মামুন সাহেব? অতি নিরীহ নিউজ, এর মধ্যে দোষের কী দ্যাখলেন?

মামুন আরও উত্তপ্ত হয়ে বললেন, নিরীহ নিউজ? আপনার কী ভীমরতি হয়েছে? এবারে আপনার রিটায়ার করার বয়েস হয়ে গেছে দেখছি। পড়ে দেখে পাস করেছিলেন?

সুধীর দাস মৃদু হাস্যের সঙ্গে বললেন, জী, পড়ে দেখেই পাস করেছি।

—কে লিখেছে এই গর্ভস্রাব? তারে আইজই আমি সাসপেণ্ড করবো।

—সেটা বলতে পারবো না।

—তার মানে? আপনি কপি ছাড়লেন, অথচ আপনি জানেন না কে লিখেছে? এর মানে কি? কপিটা আপনার হাতে কে দিল?

—যে দিয়েছে, সে লেখে নাই।

—সুধীরবাবু, আপনি আমার সাথে রহস্য করতে আছেন? আপনি লিমিটে ছাড়ায়ে যাচ্ছেন, আপনার বয়েস হয়ে গেছে, আমি বলে কয়ে আপনারে কাজে রেখেছি।

—মামুন সাহেব, একটু শান্ত হন, আপনার প্রেসার হাই এত উত্তেজনা ভালো না। আপনারে আমি বুঝায়ে বলতেছি। কপি আমার হাতে এনে দিয়েছে ইয়াকুব।

—ইয়াকুব? সে কিছু দিলেও আপনি প্রেসে পাঠাবেন? আমার পত্রিকা এতখানি জাহান্নমে নেমেছে? সুধীরবাবু এতদিন ধরে জার্নালিজম করতেছেন, নিউজ পেপারে কোনো এথিকস শেখেন নাই।

—শোনেন শোনেন ইয়াকুব হইলো হোসেন সাহেবের খাস বেয়ারা। হোসেন সাহেব নিউজটা ছাপাতে বলেছেন, আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে যে না বলি? আপনি অ্যাকটিং এডিটর, আর হোসেন সাহেব এই কাগজের প্রোপ্রাইটর ছাড়াও চীফ এডিটর, আপনারা অনুপস্থিতিতে তিনি যদি কোনো নিউজ আইটেম ছাপার নির্দেশ দেন, আমি তা পালন করবো না?

—আমি অফিসে ছিলাম না, আমাকে টেলিফোনে কেন জানালেন না?

—টেলিফোন করেছিলাম, আপনি রাত্তির নয়টার সময় বাড়িতে ছিলেন না।

মামুন হঠাৎ চুপ করে গেলেন। হোসেন সাহেব ইদানীং আর কাগজের অফিসে বিশেষ আসেন না। সংবাদপত্র প্রকাশ করার সুফল তিনি ইতিমধ্যেই পেয়েছেন যথেষ্ট। অনেকেই এখন তাঁর নাম জানে, বার বার ছবি ছাপা হওয়ায় তার চেহারাটাও পরিচিত, পূর্ব পাকিস্তানে তিনি গণ্যমান্যদের একজন। এখন তিনি আবার ব্যবসা বুদ্ধিতে মন দিয়েছেন, একটি জ্যাম জেলি তৈরির ফ্যাকটরি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। আইয়ুব খাঁ এখন পূর্ব পাকিস্তানে কিছু কিছু লাইসেন্স ছড়াচ্ছেন, ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা লালায়িত হয়ে উঠেছে, এমনকি অনেক অধ্যাপক বুদ্ধিজীবীরাও নানা রকম সুযোগ সুবিধে পেতে শুরু করে সরকার-বিরোধী মনোভাব ঝেড়েফেলছে একেবারে।

তা হলে মোনেম খাঁ-র তোশামোদ করা এই খবর ছাপানোর পেছনে আছে হোসেন সাহেবের জ্যাম-জেলির ফ্যাকটরি?

কিন্তু এ তো শুধু সরকার তোষণ নয়, এ যে বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার সমূহ ক্ষতি করার চেষ্টায় সায় দেওয়া। ভবিষ্যতে এর কুফল তদূর পর্যন্ত গড়াবে, তা কেউ ভেবে দেখছে না? মোনেম খাঁ সর্বত্র বেল বেড়াচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে ও পাঠ্যপুস্তকে পরদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ আর সহ্য করা হবেনা? পরদেশী সংস্কৃতি মানে কী? পাকিস্তান সৃষ্টির আগে বাংলা ভাষায় যে-সব বই লেখা

হয়েছে তা আর পড়বে না এদিকের বাঙালীরা? পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের রচনা থাকবে না? বেতারে এর মধ্যেই রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। বাংলা ভাষায় বেছে বেছে সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়ে আর্বি ফার্সি শব্দ ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে। জোর করে কোনো ভাষা বদলানো যায়? ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে কোনো ভাষা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে? দেশ ভাগ হয়েছে বলে ভাষাকেও ভাগ করার কথা যারা ভাবে, তারা উন্মাদ ছাড়া আর কী? দুই জার্মানর ভাষা কী বদলে গেছে? দুই কোরিয়ায়? দুই ভিয়েৎনামে?

মুখ তুলে মামুন আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, তবু কপিটা কে লিখেছে, তা আমাকে বলবেন না সুধীরবাবু?

সুধীর দাস বললেন, খুব সম্ভবত এটা একটা সরকারি হ্যান্ড আউট। যদিও টাইপ করা না হাতের লেখা। ইয়াকুব প্রথমে কাগজখানা এনে দিয়েছিল নিউজ এডিটর নুরুল সাহেবকে। তিনি সেখান দেখেই শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়ি চলে গ্যালেন। তিনি জানেন আপনি এ খবর চাপা হলে রাগ করবেন। তিনি আরও জানেন যে, আমার হাতে পড়লে এ কপি চেপে রাখার সাহস আমার হবে না। সত্যই তো আমার তেমন সাহস নাই।

একটু পরে ঘর ফাঁকা করে মামুন সম্পাদকীয় লিখতে বসলেন। হোসেন সাহেব বা আলতাফের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে পরে। আজ তিনি কলমের কালি দিয়ে যতখানি আগুন ছোটানো যায় তা দিয়ে তিনি ভস্মসাৎ করবেন সরকারি নীতি। এ চাকরি চলে গেলেও তাঁর না খেয়ে মরার ভয় নেই, কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট হয়ে এরকম চাকরি আঁকড়ে ধরে থাকলে তিনি মরমে মরে যাবেন।

লেখা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন তাঁর টেবিলের ওপর একটা ছায়া। মুখ তুলে মামুন বিষম অবাক হলেন। কালো চশমা পরা দীর্ঘকায় একজন মানুষ সেই মুসাফির। কী করে লোকটি ঢুকলো এই ঘরে? মামুন যখন সম্পাদকীয় লেখেন, তাঁর কড়া নির্দেশ আছে, সেই সময় কোনো দর্শনার্থীকে আসতে দেওয়া হবে না। আবদুল কী ঘুমোচ্ছে?

মামুন কিন্তু বিরক্ত বোধ করলেন না। এক একজন মানুষের উপস্থিতিতেই একটা ভালো লাগার তরঙ্গ এসে গায়ে লাগে। মুসাফিরের হাস্যময় মুখ দেখে মামুন ভুরু কুঁচকোতে পারলেন না, অভিবাদন বিনিময় করে তিনি বললেন, বসেন একটু বসেন আমার আর দেরি নাই।

যে-রকম মনঃসংযোগ নিয়ে মামুন লিখছিলেন, তা যেন একটু নষ্ট হয়ে গেল একটা সিগারেট ধরিয়ে কপাল চেপে ধরে তিনি আবার লেখার মধ্যে ফিরে এলেন। সমাপ্তিটা মোটামুটি পছন্দই হলো তাঁর, একবার রিভাইজ করতে হবে, তার আগে মুসাফিরে সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি কলম বন্ধ করলেন।

জেল থেকে সদ্য ছাড়া পেয়েছেন মুসাফির, কিন্তু তাঁর পোশাকে বা মুখমণ্ডলে তার কোনো চাপ নেই। ধপধপে সাদা পোশাক, তার ওপরে একটি দামী শাল জড়ানো, মুখখানা প্রসন্নতা মাখা। তিনি একদৃষ্টিতে মামুনের মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

মামুন জিজ্ঞেস করে ছাড়া পেলেন?

–পরশুদিন। বিকাল তিনটার সময়।

–খুব কষ্ট দিয়েছে? টর্চার করেছে? কিছু কিছু রিপোর্ট পেয়েছি, তবে আপনার মতন একজন মানী লোককে....

– না, না, কোনো টর্চার করেনি, অসুবিধা কিছুই হয়নি, আপনাদের জেলখানায় খাদ্যও অতি উপাদেয়। দিব্যি বাহাল তবিয়তে ছিলাম।

–ক্লাস ওয়ান প্রিজনার হিসাবে রেখেছিল নাকি আপনাকে?

–তা তো জানি না, এক হল ঘরে দশ বারো জন ছিলা, সেটা ক্লাশলেস সোসাইটি বলা যায়।

মামুন বুঝলেন যে মুসাফি সাধারণ কয়েদী হিসেবেই জেলে ছিলেন কিন্তু তিনি সে সম্পর্কে কোনো অভিযোগ জানাতে চান না। হঠাৎ একটা কথা তাঁর মনে পড়লো। তিনি বেশ খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে বললেন, আপনি তো মশায় দূরদর্শী মানুষ। ভবিষ্যৎ দেখতে পান। ইন্ডিয়ার সাথে যুদ্ধ লাগবার কয়েকদিন আগেই আপনি ফোরকাস্ট করেছিলেন। কিন্তু আপনি নিজেও যে জেল খাটবেন তা কি আগে থেকে জানতেন?

এ কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে মুসাফির কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে হাসলেন। কেউ প্রশ্ন করলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন না, এতে যান তাঁর চরিত্রে অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব আসে।

অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি বললেন, আমার কয়েদ তো শেষ হয়ে গেছে, এবারে আপনার জেল খাটার পালা, মোজাম্মেল সাহেব।

মামুন আঁতকে উঠলেন। লোকটা বলে কী? তিনি আজ একটু আগে যে লেখাটি শেষ করলেন, সেটার জন্য সরকারের গোঁস হওয়ার কথা, কিন্তু এই লোকটি জানলো কী করে তিনি কী লিখছেন?

–আপনি কী বলছেন, আমাকে জেল খাটতে হবে কেন? সবে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এর মধ্যেই আবার ধরপাকড় শুরু হবে? নাঃ এটা আপনি ঠিক বলছেন না।

–আমি ঠিকই বলছি, আপনার ললাটে লেখা আছে।

–মুসাফির সাহেব, আমার ঐ সব ললাটের লেখা টেখায় বিশ্বাস নাই। আপনি এর আগেও আমার সম্পর্কে বলেছিলেন...

–সেটাও ভুল বলি নাই। একটা অল্পবয়েসী তরুণী মেয়ের ছায়া দেখতে পাচ্ছি আপনার মাথার পিছনে। সে আপনারে কষ্ট দেবে আপনিও তারে কষ্ট দেবেন।

–আমার এত কাজ আমি নিঃশ্বাস ফেলা সময় পাই না।

–বুঝেছি, আপনি ব্যস্ত আমারে চলে যেতে বলছেন। চলেই তো যাবো আমি ইন্ডিয়ায় ফিরে যাবো যাবার আগে একবার আপনার সাথে দেখা করতে এলাম। অযাচিত উপদেশ দিতে এসেছি ভাববেন না, জেলের মধ্যে বসেও আমি আপনার কথা চিন্তা করেছি। ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।

মামুন নিরস গলায় বললেন, ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।

মুসাফিরকে দেখে মামুন প্রথম যে ভালো লাগার তরঙ্গটি অনুভব করেছিলেন, সেটা হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেছে। তিনি ভেবেছিলেন, মুসাফিরকে তাঁর কাগজের জন্য কিছু লিখতে বলবেন। কিন্তু লোকটির জ্যোতিষীগিরির চেষ্টা দেখে কেমন যেন হামবাগ মনে হলো। তিনি আর লেখার প্রসঙ্গ তুললেন না। এমন কি মুসাফির বিদায় নেবার সময় মামুন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে দিতেও এলেন না।

লোকটা বলে কি না মামুনের জীবনে একটি তরুণী মেয়ের ছায়া পড়েছে। যতসব রাবিশ। লোকটা স্টান্ট দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে। দৈবাৎ দুটো একটা মিলে যায়। যেমন পাক-ভারত যুদ্ধের ব্যাপারটা মিলেছে। ঐ যুদ্ধের ফলে সে নিজেও যে গারদে যাবে তা বোঝেনি?

ঐ মুসাফির অযাচিত ভাবে আজ এসেছিল কেন? এসেই বললো, এবারে মামুনের জেলে যাওয়ার পালা-অদ্ভুত কথা। একটা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে জেলে দেবে গভর্নর মোনেম খাঁ অত বোকা নয়।

রমনা পার্কের এক কোণে ঘাসের ওপরে বসে আছে বাবুল আর মণিলাল। শীতের জন্য পার্কে একেবারে ভিড় নেই খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে শীতটা আরও জাঁকিয়ে পড়েছে। বাবুলের হাতে একটা খবরে কাগজ ছিল, সেই কাগজ পেতে দু'জনে বসেছে ঘাসের ওপর সামনে এক ঠোঙা বাদাম।

মণিলালকে সহজে চেনাই যায় না। তার মাথায় পাগলের মতন, উস্কোখুস্কো চুল গাল ভর্তি দাড়ি, চোখ দুটি বসে গেছে কোটরের মধ্যে। কয়েক সপ্তাহের কারাবাস সে সহ্য করতে পারেনি।

দু'জনে বসে আছে বেশ কিছুক্ষণ কিন্তু কথা বলছে সামান্যই মাঝেমাঝে দু'একটা কাটা কাটা কথা বেশির ভাগ সময়েই নিস্তব্ধতা। এরকম ভাবে বসে থাকতে মণিলালের ভালো লাগছে না, কিন্তু বাবুল কিছুতেই উঠতে চাইছে না।

এক সময় বাবুল জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি তা হলে ইন্ডিয়াতেই চলে যাবে?

ঝাঁঝের সঙ্গে মণিলাল বললো, তুই বার বার ঐ কথা বলছিস কেন রে? কিসের জইন্য আমি ইন্ডিয়াতে যাবো? সেখানে আমার কে আছে?

মণিলালের বাহুতে চাপড় মেরে বাবুল বললো, তুমি আমার ওপর মিছামিছি রেগে যাচ্ছো মণিদা। যে-কোনো কথায় ফোঁস করে উঠছো কেন?

মণিলাল একই ভাবে বললো, আমি ইন্ডিয়ায় চলে গ্যালে তোর কী লাভ? তুই আমার সম্পত্তি ভোগ করবি? আমার তো আছে কচু পোড়া।

বাবুল ঠোঙা থেকে কয়েকটা বাদাম বার করে বললো, নাও বাদাম খাও। শরীরটার কী দশা করেছো এই কয়দিনে? রাগ করে খাওয়া দাওয়া করো নাই বুঝি।

–ছাগলের খাদ্য মানুষে খাইতে পারে না। আমি ছাগল না।

-সেইজন্যই তো কইতাছি, আমার বাসায় চলো, মঞ্জু তোমারে রেঁধে খাওয়াবে। মঞ্জুর হাতের রান্না তুমি তো পছন্দ করো।

-না যাবে না, আমি কারুর বাসায় যামু না।

-তুমি পল্টন ভাই-এর ওপর রাগ করে আমার উপর সেইটা ফলাচ্ছো। শোনো, পল্টন ভাইয়ের অসুবিধার কথাটা তোমারে বলি। দিলারাকে মনে আছে তো তোমার? সেই দিলারা এক পাঞ্জাবী মিলিটারি অফিসারকে বিয়ে করেছে। সে লোকটা প্রায়ই এসে ঐ বাড়িতে বসে থাকে। সে যদি তোমারে দ্যাখে, যদি শোনে যে তুমি ওয়ারের সময় ডিটেইনড আছিলা, তা হলে যদি কিছু অশান্তি করে সেই জন্যই পল্টন ভাই তোমারে বাসায় নিয়া যাইতে চাই নাই।

-সে আমারে দ্যাখলেই বোঝবে যে আমি ইণ্ডিয়ার স্পাই? ক্যান, আমি পাকিস্তানের সিটিজেন না? একবার মাত্তর একটা বিয়ার নেমন্তন্ন ছাড়া আর কখনো ইণ্ডিয়াতে যাই নাই। ঠিক আছে, আমি কারুর বাসায় যাইতে চাই না, কারুরে বিপদে ফ্যালতে চাই না।

-তুমি আমার বাসায় চলো।

-না । এক কথা বার বার বলিস না, বাবুল। শুধু জেলে যাওয়ায় আমার ক্ষতি ছিল না, কিন্তু এর মধ্যে আমার বিজনেসটা চারেখারে গ্যাছে। ঢাকায় আমার নিজের বাসায় রাত্তিরে থাকতে ভয় হয়।

-এখন কিছুদিন তোমার ওখানে না থাকাই ভালো। আমার সাতে চলো । কিছুদিন চুপচাপ থাকো। তারপর ধীরে সুস্থে আবার বিজনেস শুরু করবা। তুমি একেবারে পানিতে পড়ো নাই, মণিদা, আমরা তো আছিই।

-বাবুল চৌধুরী , তোমার জেনারাস অফরের জন্যবহুৎ শুক্রিয়অ কিন্তু মণিলাল রায় এখনো মরে নাই। জেল থেকে যখন বেঁচে ফিরে এসেছি, আমি আবার ঠিক উঠে দাঁড়াবো। কামালের বাড়িতে গেছিলাম, ও আমার কাছে কিছু টাকা হওলাৎ করেছিল সে জইন্য না, আমি টাকা চাইতে যাই নাই, কিন্তু কামালের বউ আমারে ভিতরে ঢুকতেই দিল না এই বলে যে কামালের াকি জ্বর।

-সত্যিই কামালের জ্বর।

-আরে রাখ। কামালের বুঝি আগে কোনোদিন জ্বরজারি হয় নাই, তখন তারে আমরা দ্যাখতে যাই নাই?

-হামিদা ভাবীর স্বভাবের কথা তো তুমি জানোই, সকলের উপরেই ম্যাজাজ দেখায়-

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে মণিলাল বললো, আমি চলি রে, বাবুল।

বাবুল তার হাত ধরে টেনে বললো, কোথায় যাবে?

-তোরা ভাবোস, আমার কোথাও যাওনের জাগা নাই? গ্রামে একখান কুঁইড়া ঘর এখনো আছে।

বাবুলও উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মণিদাপল্টন বাইরে তুমি ভুল বুইঝো না, সে তোমারে সত্যিই ভালোবাসে। বেচারি নিজেই খুব অসুবিধার মধ্যে আছে। মণিদা, রাগ করো না, আর একটা কথা বলবো? তোমার টাকার দরকার থাকলে আমি কিছু দিতে পারি।

বাবুলের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে মণিলাল বললো, আমার এখনো ভিক্ষা করার স্টেজ আসে নাই।

বাবুল কোনোক্রমেই মণিলালকে নিরস্ত করতে পারলো না, সে একটা রিকশা ডেকে চলে গেল একা। এই মণিলাল সব সময় হাসি মস্করা করার জন্য বন্ধুদের মধ্যে প্রিয় ছিল।

বাস স্ট্যাণ্ডে এসে মণিলাল নারায়ণগঞ্জের বাস ধরলো। আকাশ মেঘলা বলে দুপুর বেলাতেই ছায়া ছায়া ভাব। যথারীতি বাসে প্রচণ্ড ভিড় মণিলাল বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অর ঠোঁটে একটা তেতো তেতো ভাব, বুকের মধ্যে অনির্দিষ্ট জ্বালা। পাকিস্তান সরকার তাকে জেলে আটকে রেখেছিল, এ জন্য তার ক্ষোভ নেই, নিজস্ব যুক্তি দিয়ে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে কিন্তু তার বন্ধুরাও তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে এখন এটা সে সহ্য করতে পারছে না। বন্ধু না থাকলে আর এ দেশে রইলো কী? ইণ্ডিয়াতেও তার কোনো নিকট আত্মীয় নেই, কে সেখানে তাকে আশ্রয় দেবে?

রাস্তায় একটা কিছু গোলমালে বাস থেমে যেতেই মণিলাল ভয় পেয়ে গেল। কিসের গণ্ডগোল? মুখে দাড়ি গোফ থাকলেও লোকে তাকে চিনে ফেলবে? যদি চিনতে পারে, যদি চিনতে পারে...

সেটা একটা ছাত্রদের মিছিল কয়েক মিনিট পরেই বাসটা আবার ঠিকঠাক ছুটলো।

বাস থেকে নেমে মণিলাল আবার একটা রিকশা নিয়ে চলে এলো শীতলক্ষা নদীর ধারে। খেয়া

নৌকোয় পার হয়ে সে ওপারে নামলো যখন তখন বিকেল প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এদিকে আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে বেশ খানিকটা তাই আকাশ পরিষ্কার, পশ্চিম দিকে খুব গাঢ় রং করে সূর্য ডুবছে।

মণিলাল হাঁটা পথ ধরলো। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, সে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিল ভালো করে, যদিও তার মাথাটা এখনো উত্তপ্ত হয়ে আছে। রাগের চেয়েও একটা প্রবল অভিমান দলা পাকিয়ে রয়েছে তর গলার কাছে। কামালের জ্বর সেই জন্য হামিদা বেগম তাকে ওপরে যেতে দিল না? কয়েক বছর আগে দাঙ্গাতে এই কামালই তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল। পল্টনের বাড়িতে সে যখন তখন গেছে, কত রাত ঐ বাড়িতেই কাটিয়েছে, সেই পল্টনের বাড়ির দরজা তার জন্য বন্ধ। তিন বার গিয়েও জহিকে বাড়িতে পাওয়া গেল না, সে কি সত্যিই এতকানি ব্যস্ত? এর আগে কত দুঃসময়ে গেছে মণিলাল নিজেকে কখনো এমন বিঁান্ধব মনে করেনি।

সে এগিয়ে চললো মুন্সিগঞ্জের দিক লক্ষ করে। রাস্তা ছেড়ে সে আলপথ ধরেছে, তবু দিক নির্ণয় করতে তার কোনেই অসুবিধে হয় না। দূরের গাছপালার সারি, এখানকার আকাশ আলপথের কাটাকুটি এই সবই তার খুব চেনা। ইণ্ডিয়ায় গিয়ে সে কি কোনো গ্রাম্য রাস্তায় এমন সাবলীলভাবে হাঁটতে পারবে?

চাষের সময় নয়, মাঠ একেবারে ফাঁকা। তার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একলা একজন অভিমানী মানুষ। প্রায় এক ঘন্টা পরে, সন্ধের মুখে মুখে মণিলাল মাঠ ছেড়ে ঢুকে পড়লো সাঁইবাজার গ্রাম। সে গ্রামের প্রান্তেই একটি চৌকো দিঘির পাড়ে একটি বিশাল ভূতুড়ে বাড়ি। সে বাড়িতে একটাও দরজা জানলা অক্ষত নেই, দোতলার একটি বারান্দা একদিকে ধসে পড়েছে, সেই অংশটা আধো অন্ধকারে একটা হাঁ করা দৈত্যের মতন মনে হয়।

এটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। মণিলালের মনে আছে, ছেলেবেলায় এই বাড়িটি সে কত জম জমাট দেখেছিল, কালীপুজোর সময় এই মল্লিক বাড়ির বাজি পোড়ানো দেখতে আট দশখানা গ্রামের লোক এসে জড়ো হতো। দীঘিটার দু'দিকে বাঁধানো ঘাট, একটা ঘাট ছিল মেয়েদের মল্লিক বাড়ির ছোট কর্তা একবার এই ঘাটের কাছে একটা পাগলা কুকুরকে গুলি করে মেরেছিলেন।

এর পরের বাড়িটা সেনগুপ্তদের । কিছুদিন আগেও দু'জন বুড়ো-বুড়ি ছিল এখানে তারা দু'জনেই মরে গেল নাকি, এ বাড়িতেও কোনো আলো জ্বলছে না।

পর পর সব খালি বাড়ি। এখন এটাকে আর গ্রাম বলা যায় না, একটা পরিত্যক্ত জনপদে যেমন কিছু কিছু ইঁদুর আর কুকুর বেড়াল থাকে, সেই রকম এখানে ওখানে কিছু মানুষ এখনো রয়ে গেছে। প্রায় নিস্প্রাণ, নিস্প্রদীপ। বামুন পাড়ায় একঘরও মানুষ নেই। ধোপা পাড়াতেও চার পাঁচ ঘর ছিল, তারা সব গেল কোথায়, ইণ্ডিয়া এত ধোপা নিয়ে কী করবে?

-কে যায়?

মণিলাল দারুণ ভাবে কেঁপে উঠলো। একটা বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে মোটা গলায় কেউ একজন হাঁক দিয়েছে। লোকটা হিন্দু না মুসলমান?

আঃ এই চিন্তাটা কেন যে মন থেকে কিছুতেই তাড়ানো যায় না। মানুষ আর শুধু মানুষ নেই, যে-কোনো মানুষ দেখলেই প্রথমেই যেন জেনে নেওয়া খুবই জরুরি যে লোকটি মুসলমান না হিন্দু।

নিজের গ্রামের রাস্তায় মণিলাল আগে কখনো এমন ভয় পায়নি। উত্তর না দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইলো। বাঁশ ঝাড়ের অন্ধকার ভেদ করে লোকটি এগিয়ে এলো কাছে। তাকে চিনতে পেরে মণিলাল যেন হাতে চাঁদ পেল, এর নাম ডোমরেল, বেশবলিষ্ঠ জোয়ান পুরুষ, হাতে একটা ল্যাজা অর্থাৎ বর্শা।

ডোমরেলরা নিম্নবর্ণ এদের পল্লীটা এখনো অটুট রয়ে গেছে, এরা মাছ দরে বেতের চুবড়ি বোনে। এদের জল-চল নেই, আগে এরা মণিলালদের বাড়িতে এলেও উঠোনো দাঁড়িয়ে থাকতো, দাওয়ায় ওঠার অধিকার ছিল না। এই ডোমরেল একবার একটা গোসাপ ধরে দেখাতে এনেছিল তাদের বাড়িতে, মণিলালের তখন মাত্র সাত-আট বছর বয়েস, মণিলালের বাবা একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন, যা বেটা দূর হ! ওডারে তো মাইরা খাবি, দ্যাখলেও আমাগো পাপ হয়।

ডোমরেল আরও কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কে?

মণিলাল তার হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাব বললো, ডোমরেলদাদা, আমি মণি, আমারে চেনতে পারো না? আমারে এট্টু বাড়িতে পৌছাইয়া দাও।

তুতুল একা একা কারুর বাড়িতে কখনো যায়নি। মেডিক্যাল কলেজ ও বাড়ির রাস্তা ছাড়া শহরের রাস্তাঘাট বিশেষ চেনে না। কিন্তু জয়দীপের বাড়িতে তাকে একবার যেতেই হবে। দু'দিন আগে সে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরেছে, তারপর কেমন আছে সে খবর পাওয়া যায় নি। শিখা আর হেমকান্তির কথা ছিল তুতুলকে নিয়ে যাওয়ার, কিন্তু সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলো, ওরা এলো না। আর দেরি করা যায় না।

সে মুন্নিকে জিজ্ঞেস করলো, আমার সঙ্গে যাবি এক জায়গায়?

মুন্নির আপত্তি নেই, বাড়ির বাইরে যাবার যে-কোনো সুযোগ পেলেই সে খুশী। এই সদ্যমুন্নির কাছে পৃথিবীটা বড় হতে শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে হঠাৎ তাদের স্কুল বাসটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, মুন্নিকে হেঁটে হেঁটে বাড়িতে ফিরতে হয়েছিল, বড় রাস্তার পাশে পাশে ছোট ছোট গলির দিকে তাকিয়ে তার মনে হচ্ছিল, ঐ সব গলির মধ্যে বাড়িগুলো কী রকম? ওখানে কারা থাকে?

প্রতাপ এখনও বাড়িতে ফেরেন নি। সুপ্রীতি ও মমতা তুতুলের সঙ্গে মুন্নিকে ছাড়তে আপত্তি করলেন না। ওরা যাবে নিউ আলিপুর বেশি দূরের রাস্তা নয়। জয়দীপের কথা মমতা আর সুপ্রীতি দু'জনেই জানেন, তার জন্য ওরাও খুব চিন্তিত।

একটা হালকা হলদে রঙের শাড়ি পরেছে তুতুল। ছিপছিপে লম্বা শরীর তার চুলে সে খোঁপা বাঁধে না। মুন্নিও লম্বা হতে শুরু করেছে, এর মধ্যেই সে তুতুলের কাঁধ ছুঁয়েছে প্রায়। সে পরেছে একটা কচি কলাপাতা রঙের ফ্রক।

রাস্তায় বেরিয়েই মুন্নি বললো, আমি কিন্তু আগে-ফুচকা খাবো।

তুতুলের এখন নিজস্ব উপার্জন হয়েছে, তার হাতব্যাগে কিছু টাকা থাকে। কিন্তু সে ফুচকা আলু কাবলি ইত্যাদি খাবার একেবারেই পছন্দ করে না, রাস্তায় কতরকম ধুলোময়লা ওতে মেশে, যে-লোকটা ফুচকা দেয় সে টক জলের হাঁড়িতে হাত ডোবায়, তার জলে কতরকম দূষিত জীবাণু আছে তার ঠিক কী। সে বললো, ওসব খেতে হবেনা, আমি তোকে আইসক্রিম খাওয়াবো।

মুন্নি তবু কিছুক্ষণ ফুচকার জন্য বায়না ধরলেও তুতুল তাকে প্রশ্রয় দিল না। কালিঘাট স্টপে দুটি আইসক্রিমের কাপ কিনে দু'জনে আগে শেষ করলো, তারপর উঠে পড়লো সাত নম্বর বাসে।

দুটি লোক লেডি সিট ছেড়ে দিতে ওরা জায়গা পেয়ে গেল। যে-দুটি লোক উঠে দাঁড়ালো, তাদের মধ্যে একজন বললো, আরে, মুন্নি, কেমন আছিস রে তোরা?

মুন্নি চোখ তুলে বললো, কানুকাকা?

কানু প্রথমে তুতুলকে লক্ষ করেনি। এর পরেই তুতুলকে দেখে সে বললো, ও তুতুল কত বড় হয়ে গেছিস রে। তুই তো এখন পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে গেছিস, তাই না? আমার শালাও তোর সঙ্গে পাশ করেছে, তার নাম অনিরুদ্ধ চিনিস তো?

বাসের ভিড়ের মধ্যে এই রকম যে-কোনো কথাই অন্য যাত্রীরা খুব মন দিয়ে শোনে, তারা মুখের দিকে তাকায়, সেইজন্য বাসের মধ্যে জোরে জোরে কথা চালানো তুতুলে পছন্দ নয়। সে শুধু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো।

মুন্নি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কানুকাকা তুমি বসো।

কানু আবার জিজ্ঞেস করলো, এদিকে কোথায় যাচ্ছিস রে, তোরা? আমার ওখানে আসবি নাকি চল না?

মুন্নি মাথা নেড়ে বললো, না, না, আমরা এখন নিউ আলিপুরে যাচ্ছি, ফুলদির এক বন্ধুর বাড়িতে।

কানু অবশ্য নেমে পড়লো টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে। তার আগে সে গুনিয়ে গেল নিজের সম্পর্কে অনেক খবর। শুধু বাসের যাত্রীদের মনোযোগ টানার জন্যই নয়, এসব খবর সে মুন্নি ও তুতুল মারফত প্রতাপকে জানাতে চায়। আনোয়ার শা রোড ছাড়িয়ে মাত্র সাত মিনিটের হাঁটা পথে সে একটি বাড়ি কিনেছে, তার তৃতীয় সন্তান জন্মেছে দু'মাস আগে তার বড় মেয়েটি ক্লাসে সেকেণ্ড হয়েছে, দেওঘরের জামাইবাবু তার কাছে এক হাজার টাকা ধার চেয়ে চিঠি লিখেছে, ইত্যাদি।

কানু নামবার পর মুন্নি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা ফুলদি, কানুকাকা আমাদের বাড়িতে আর আসে না কেন?

তুতুল বললো, কী জানি।

মুন্নি বললো, অনেকদিন আগে বাবা একদিন কানুকাকাকে খুব মেরেছিল, আমার মনে আছে।

তুতুল বললো, চুপ ওসব কথা বলতে নেই।

নিউ আলিপুরে নেমে ওদের খানিকক্ষণ ঠিকানা খোঁজাখুঁজি করতে হলো। যদিও জয়দীপের বাড়িতে এর আগে তুতুল দু'বার এসেছে বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু এখন সে বাড়ি চিনতে পারছে না। একজন রিকশাওয়ালা পৌঁছে দিল ওদের।

সামনে লোহার গেট বসানো বাড়ি, ভেতরে খানিকটা বাগান। গেটের সামনে একটা ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে চার-পাঁচটি ছোট ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে। মুন্নি মুচকি হেসে তুতুলের দিকে তাকাতেই তুতুল ভুরু নাচিয়ে নিষেধের ভঙ্গি করলো। মুন্নি এখানে ফুচকা খাবে না তা ঠিকই, তবু ফুলদির বন্ধুর বাড়ির ছেলেমেয়েরাও যে ফুচকা খায় এটা দেখে তার মজা লেগেছে।

দোতলার বারান্দায় গেঞ্জি পরা একজন মধ্যবয়স্ক সুঠাম পুরুষ দাঁড়িয়ে তিনি তুতুলকে দেখতে পেয়ে বললেন, কুকুর বাঁধা আছে, সোজা ওপরে উঠে এসো।

জয়দীপের ঘরটির তিনদিকে জানলা, প্রচুর আলো বাতাস, এরকম ঘরে ঢুকলেই মন ভালো লাগে। তিনটি বালিসে মাথা হেলিয়ে আধো শোওয়া হয়ে জয়দীপ আগাথাক্রিস্টির উপন্যাস পড়ছিল, তুতুলকে দেখে বইটি নামিয়ে রাখলো, কিন্তু কোনো সম্ভাষণ করলো না, হাসলো না, তাকিয়ে রইলো সোজা।

জয়দীপের দাদা শঙ্কর আর ওদের মা এসেছেন সঙ্গে সঙ্গে। তুতুল জিজ্ঞেস করলো, শিখা ওরা আসে নি? আসবে বলেছিল?

মা বললেন, না, আর তো কেউ আসে নি। তুমি এসেছো, খুব ভালো করেছো, দ্যাখো তো, খোকা আমাদের কারুর সঙ্গে কথা বলতে চায় না। কী যে হয়েছে এরকম করলে চলে? সব ডাক্তার বলেছেন, ভয়ের কিছুই নেই।

তুতুল এগিয়ে গিয়ে জয়দীপের একটা হাত ধরে বললো, কেমন আছো, আজ?

জয়দীপের দৃষ্টি একইরকম স্থির কোনো উত্তর দিল না।

মা বললেন, বহ্নিশিখা, তুমি ঐ চেয়ারটায় বসো। খানিকক্ষণ থাকো, ও নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে কথা বলে। এই মেয়েটিকে আমি ভেতরে নিয়ে যাই?

অচেনা বাড়িতে এসে মুন্নি তার দিদির পাশ ছাড়তে চায় না। কিন্তু তুতুল বুঝলো জয়দীপকে কথা বলাতে গেলে ঘরে অন্য কারুর না থাকাই ভালো। সে হেসে বললো, মাসিমা, এ আমার মামাতো বোন, ফুচকা খেতে খুব ভালোবাসে, আপনাদের গেটের সামনে একটা ফুচকাওয়ালা রয়েছে দেখছি, ও বরং সেখানেই যাক।

মুন্নি সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, আমি এখন ফুচকা খাবো না।

তুতুল চোখ দিয়ে মিনতি করে বললো, তাহলে মাসিমার সঙ্গে ভেতরে যা না মুন্নি। তোর বয়েসী একটি মেয়ে আছে এ বাড়িতে তার ঘরে গিয়ে বোস। অনেক বই আছে ...

অন্যরা বেরিয়ে যাবার সময় শঙ্কর দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেলেন।

জয়দীপের হাতে হাত রেখে তুতুল কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলো। কণ্ঠার হাড় জেগে গেছে জয়দীপের, চোখের নিচে গাঢ় কালো ছাপ, নাকটা খাড়া দেখাচ্ছে। খেলোয়াড় সুলভ স্বাস্থ্য ছিল তার।

তুতুলের নিজেরই কথা-না-বলা রোগ হয়েছিল। সেইসব দিনগুলি তার ভালোই মনে আছে। কিছুতেই বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করতো না। যদিও কোনো যুক্তি ছিল না, কিন্তু মনকে বোঝানো যেত না সেই যুক্তি দিয়ে। অন্যদের অধিকাংশ কথাই মনে হতো অর্থহীন। কত তুচ্ছ কথা নিয়ে মানুষ সারা দিন মুখ চালায়।

এই জয়দীপ ছিল কী দুর্দান্ত, দুরন্ত ও উচ্ছৃঙ্খল। মেডিক্যাল কলেজে প্রথম দুটো বছর সে তুতুলকে কম জ্বালিয়েছে। চিঠি লিখেছে বেনামীতে, কার্টুন এঁকেছে ব্ল্যাক বোর্ডে রাস্তায় যখন তখন সামনে এসে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত সব মন্তব্য করেছে। এক সময় শুধু এই জয়দীপের জন্যই তুতুল ডাক্তারি পড়া ছেড়েই দেবে ভেবেছিল। এই শেষ বছরটিতেই জয়দীপের সঙ্গে তার ভাব হয়, জয়দীপই তার মানসিক জড়তা কাটিয়ে দিয়েছে বলতে গেলে। পড়াশুনোতেও সাহায্য করেছে, অ্যানাটমি প্র্যাকটিক্যালে তুতুল খুব নার্ভাস বোধ করতো, জয়দীপ তাকে ধরে রাখতো জোর করে। ফাইন্যাল এম বি বি এস এ জয়দীপ আর সে প্রায় একই রকম রেজাল্ট করেছে।

জয়দীপের বা কানের ঠিক নিচে একটা বেশ বড় মতন আঁচিলের মতন ছিল, হঠাৎ সেদিকে নজর পড়লে মনে হতো জয়দীপ বুঝি এক কানে দুল পরেছে। শুধু বন্ধুবান্ধবরা নয়, জয়দীপ নিজেও হাসিঠাট্টা করতো সেই আঁচিলটা নিয়ে। পরীক্ষার পর থেকেই জয়দীপের সেই আঁচিলটা বড় হতে শুরু করে ক্রমশ সেটা একটা রয়াল গুলির মতন হয়ে যায়, সুতরাং সেটা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওদের সার্জারির প্রফেসর ডাঃ জি ব্যানার্জি নিজে ওটা অপারেশন করে দেবেন বলেছিলেন। অপারেশানের নির্দিষ্ট তারিখের ঠিক দু'দিন আগে জয়দীপ কলুটোলার মোড়ে কাছে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়, তার সঙ্গে তখন হেমকান্তি আর প্রদীপ ছির, ওরা জয়দীপকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে এমারজেন্সীতে। এখঘন্টা পরে জ্ঞান ফিরলেও জয়দীপ মাথায় অসহ্য ব্যথা নিয়ে ছটফট করছিল...

জয়দীপের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে তুতুল একবার ডান দিকের জানলাটার দিকে তাকালো। জানালার ঠিক বাইরেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ, এই মধ্যে এপ্রিলে সেটা ফুলে ভরে বাতাসের রং লাল। কোথায় যেন শানাই বাজছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল তুতুল, তাতেই তার চোখ জ্বালা করে আসছিল, সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার মনটা ফিরিয়ে চোখকে সংযত করে বললো বাঃ তোমার জানলার ধারে কী সুন্দর একটা গাছ।

জয়দীপের দৃষ্টি এখন তীব্র এখনও সে কথা বলছে না।

মাথার ব্যথার জন্য বা অপারেশনের জন্য জয়দীপের বাক্‌শক্তির যে কোনো ক্ষতি হয়েছে তা নয়, সে ইচ্ছে করে কথা বলছে না, যেন তীব্র এক অভিমানে সে মৌন।

তুতুল আবার বললো, হেমকান্তি আর শিখা একটু পরেই নিশ্চয়ই এসে পড়বে। জানো জয়দীপ একটা মজার কথা শুনবে? কাল প্রথম আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিসে রোজগার করলুম। আমাদের বাড়িওয়ালার ছেলের হঠাৎ রাত্তিরবেলা নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করেছিল আমায় ডেকে পাঠালো,এমন কিছু ব্যাপার নয়, বুঝতেই পারছো, আমি টাকা নিতে চাইনি টাকা নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু ওরা কিছুতেই ছাড়বে না, ডাক্তারকে ভিজিট না দিলে নাকি রুগীর অকল্যাণ হয়, জোর করে আমার ব্যাগে কুড়িটা টাকা গুঁজে দিল। তাহলে আমার ফি ঠিক হয়ে গেল কুড়ি টাকা? বাড়িওয়ালা নিজে এসে আমার মামাকে আবার বলে গেল, আমি নাকি খুব ভালো ডাক্তার, একবার ওষুধেই কাজ হয়েছে এবার থেকে ওরা সাবই আমাকেই দেখাবে।

একলা একলা হাসতে গিয়ে থেমে গেল তুতুল। জয়দীপকে কথা বলতে গিয়ে সে নিজে অদ্ভুত লাগছে। হেমকান্তিরা যদি এসে পড়তো...

হাতব্যাগ খুলে সে একটি ছোট প্যাকেট বার করে বললো, আমার প্রথম ভিজিটের টাকায় তোমার জন্য একটা জিনিস কিনে এনেছি। এর মধ্যে কী আছে বলো তো।

প্যাকেটটা জয়দীপের হাতে সে গুঁজে দিল। জয়দীপ সেটা ঠেলে সরিয়ে দিল না বটে, কিন্তু খুলেও দেখলো না, রেখে দিল মাথার কাছে।

কানের নিচের আলুটা নেই, শেলাইও কেটে দেওয়া হয়েছে, মুখখানা এখন অনেক পরিষ্কার দেখাচ্ছে। সে কি নিজে দাড়ি কামিয়েছে না বাড়িতে নাপিত এসে কামিয়ে দিয়েছে? জয়দীপের মতন ছেলে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকবে কোনো কথা বলবে না, এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

আগাথা ক্রিস্টির বইটা তুলে নিল তুতুল। সেটা দেখিয়ে সে আবার বললো, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না? তা হলে...এই বইটা আমার পড়া, কে খুনী এক্ষুনি বলে দেবো।

জয়দীপ এবারে খাটের অন্যদিকে সরে গিয়ে বেড সাইড টেবিলের ড্রয়ার খুলে সিগারেট দেশলাই বার করলো। ডাক্তার ব্যানার্জি জয়দীপের সিগারেট খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু তুতুল বুঝলো এখন তাকে বারণ করে লাভ নেই।

বরং সে মুখ ঝুঁকিয়ে বললো, দাও আমি দেশলাই জ্বেলে দিচ্ছি।

জয়দীপএতে আপত্তি করলো না। তুতুল তার সিগারেট ধরিয়ে দেবার পর খানিকটা ধমকের সুরে বললো, এটা কী হচ্ছে তোমার? কেন কথা বলছো না?

সিগারেটে বড় টান দিয়ে আস্তে আস্তে জয়দীপ বললো, যারা সত্যি কথা বলে না, তাদের সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

তুতুল ঝাঁঝের সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমি আমি মিথ্যে কথা বলি কখনো?

তুতুলের একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে জয়দীপ জিজ্ঞেস করলো, তাহলে বলো, বায়োপসির রিপোর্ট কী?

তুতুলের যেন হঠাৎ দম আটকে গেছে, সে কোনো কথা বলতে পারছে না। তার ধারণা ছিল, একটা ডুপ্লিকেট রিপোর্ট জয়দীপকে দেখানো হয়ে গেছে। হেমকান্তিরাই সে ব্যবস্থা করেছে।

তুতুলের হাতে একটা জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে জয়দীপ আবার জিজ্ঞেস করলো, বলো?

–রিপোর্ট তুমি দেখো নি?

–একটা ফল্‌স রিপোর্ট দেখিয়ে আমাকে ভোলবার চেষ্টা। আমি ছেলেমানুষ? গাঁজায় দম দিয়ে ডাক্তারি পাশ করেছি? আসল রিপোর্ট আছে কারসিনোমা, তাই না?

এবারে তুতুলের চুপ করে থাকার পালা। মাথা হেঁট করে সে তার শাড়ির পাড় দেখছে। যদিও সে বুঝতে পারছে, তার নীরবতা এখন মস্ত বড় ভুল যতই সে দেরি করছে ততই ভুল হয়ে যাচ্ছে, তবু তার গলায় স্বর আসছে না।

তুতুলের হাত ছেড়ে দিয়ে জয়দীপ পুরোপুরি শুয়ে পড়ে বললো, মাথার একঘেয়ে ব্যথাটা এখনো কেউ কমাতে পারলো না।

বন্ধ দরজার ওপাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভবত জয়দীপের মা। তিনি কি জয়দীপের কথাগুলো বুঝতে পারছেন? তবু জয়দীপ যে কথা বলছে, তা বুঝতে পেরেই তিনি খুশী।

তুতুল মুখ তুলে বললো, একেবারে ফার্স্ট স্টেজ, এমন কিছুই ব্যাপার নয়।

জয়দীপ বললো, এটাও মিথ্যে কথা। একটু মধু মাখানো খুব তেতো মিথ্যে।

তুতুল এবারে জোর দিয়ে বললো, না এটা মোটেই মিথ্যে নয়। একটুও মিথ্যে নয়। শোনো, আমাদের স্যার ম্যানে ডক্টর ব্যানার্জি তোমাকে একটা কথা জানাতে বলেছেন। উনি নিজেও আসবেন। তুমি যদি লন্ডনে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চাও, উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে জয়দীপ বললো, আমিও লন্ডনে যাবার কথা ভেবেছি। এত সহজে আমি ফুরিয়ে যেতে চাই না, আই শ্যাল ফাইট টু দা লাস্ট।

তুতুল জয়দীপের বুকে হাত রেখে ব্যাকুলভাবে বললো, জয়দীপ, বিশ্বাস করো, এই স্টেজে একদম সারানো যায়, তুমি পারফেক্টলি নর্মাল জীবন যাপন করতে পারবে, স্যার বারবার বলেছেন।

জয়দীপ খানিকটা ঠাট্টার সুরে বললো, একদম সেরে যাবে, তাই না? বেশ ভালো কথা। লন্ডনেই যাবো। তুমিও চলো। তুমিও আমার সঙ্গে চলো।

–আমি? আমি কী করে যাবো?

–কেন, যাবে নাই বা কেন? ওখানে এফ আর সি এস করে আসবে। আমি যদি সেরে উঠি আমিও তো ওখানে পড়বো।

–তা বলে কি আমি যেতে পারি? আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

–কেন, অসম্ভব কিসের? লন্ডনে আমার বড় মামা থাকেন, বেল সাইজ পার্কের কাছে নিজের বাড়ি, আমি ছেলেবেলায় একবার লন্ডনে গিয়েছিলুম, সে বাড়ি দেখে এসেছি, তুমি প্রথম কিছুদিন সেখানে থাকতে পারো। এদেশ থেকে যারা যায়, তারা অনেকেই প্রথমে আমার বড়মামার ওখানে ওঠে। উনি খুশী হয়ে থাকতে দেন, ওঁর অবস্থা বেশ ভালো। বড়মামা নিজেও ডাক্তার, ওখানে অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

–আমার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, জয়দীপ।

–তুমি না গেলে আমি যাবোই না।

–এটা তোমার ছেলেমানুষী। ঠিক বাচ্চা ছেলের মতন তুমি গাল ফুলিয়ে কথা বলছো।

–তোমার প্যাসেজ মানির কথা ভাবছো? যদি জোগাড় করতে না পারো, আমার কাছ থেকে ধার নেবে। লজ্জার কিছু নেই পরে শোধ দিয়ে দেবে আমাকে।

–তুমি বুঝতে পারছো না, আমার মা আছেন, মাকে ফেলে কী করে যাবো?

–তুমি কি তোমার মায়ের কাছে চিরকাল থাকবে নাকি?

–মা আমাকে ছাড়বেন না।

–তোমার মা যদি তোমাকে আঁকড়ে ধরে রাখেন, সেটা তাঁর স্বার্থপরতা। ঠিক আছে, তোমার মাকে আমি বুঝিয়ে বলবো। আমি সব ব্যবস্থা করবো তোমার জন্য।

–জয়দীপ প্লীজ।

বুকের ওপর রাকা তুতুলের হাতের ওপর নিজের হাত রেখে জয়দীপ হুকুমের সুরে বললো, তুমি না গেলে আমি যাবো না। আমার বুক ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো, তুমি যাবে?

দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো হেমকান্তি আর শিখা। শিখা বললো, এমন ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গিয়েছিলুম-

জয়দীপ ওদের দিকে না তাকিয়ে তুতুলের চোখের দিকে সেই আদেশের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, সে তুতুলের মুখ থেকে শপথটা শুনতে চায়। তুতুল হাতটা সরিয়ে নিতে গেল, পারলো না।

হেমকান্তি ওদের এই অবস্থায় দেখে বললো, প্রেমালাপ হচ্ছে, ডিসটার্ব করলাম বুঝি?

তুতুল এবারে জোর করে সরিয়ে নিল নিজের হাত।

এর পর আর বেশিক্ষণ সে রইলো না, তার ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। মুন্নির পড়াশুনো আছে। হেমকান্তিরা তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেও পারলো না।

হেমকান্তিরা এসে পড়ায় তুতুল স্বস্তি পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয় নি। আর একটু সময় পেলে জয়দীপ নিশ্চয়ই তার মুখ থেকে কথা আদায় করে নিত। জয়দীপের পাগলামি। বিলেত যাওয়া কি মুখের কথা, জয়দীপদের অনেক পয়সা-টাকা আছে জয়দীপ যেতে পারে। হেমকান্তিও যাবার চেষ্টা করছে। হেমকান্তিই জয়দীপকে দেখাশুনা করতে পারবে ওখানে।

এর পর কদিনের মধ্যেই জয়দীপের যাওয়ার ব্যবস্থা দ্রুত ঠিকঠাক হয়ে গেল। ওর শরীর ভেঙে পড়ছে। তুতুল জয়দীপকে আরও কয়েকবার দেখতে এসেছে, কিন্তু কখনো তার ঘরে একা থাকেনি। জয়দীপ যে তুতুলের মায়ের সঙ্গে কথা বলবে বলেছিল, তা সম্ভব হয় নি জয়দীপের একা চলাফেরার ক্ষমতা ছিল না, সে চাইলেও তাঁকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেওয়া হয় নি।

সহপাঠী,বন্ধুবান্ধবরা দল বেঁধে গেল দমদম এয়ারপোর্টে জয়দীপকে সি-অফ করতে। যাওয়ার দিনটিতে জয়দীপকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে , সে হাঁটছে সাবলীল ভাবে, হাসি-ঠাট্টা করলো কয়েকজনের সঙ্গে অনেকটা যেন পুরোনো জয়দীপ।

তুতুল রয়েছে একটু দূরে দূরে। জয়দীপের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে ঘিরে আছে তাকে। কত ফুল এসেছে জয়দীপের জন্য।

ধপধপে সাদা শাড়ী পরা জয়দীপের মা চিন্ময়ী সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ছেলের পাশে। আজ তাঁর মুখখানা পরিষ্কার, কোনো দুশ্চিন্তার রেখা নেই। হেমকান্তির যাওয়ার দিন পিছিয়ে দিতে হয়েছে, জয়দীপ লণ্ডনে একাই যাবে। চিন্ময়ী জানেন তাঁর ছেলের কী অসুখ, তবু তিনি ভেঙে পড়েননি একটুও, অন্তর বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। চিন্ময়ীকে দেখেখুব শ্রদ্ধা হয় তুতুলের।

অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও জয়দীপ মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে তুতুলের দিকে। তুতুলকে সে কাছে আসতে ইঙ্গিত করছে। তবু তুতুল থাকছে দূরে দূরে। বিদায় নেবার সময় জয়দীপ যদি বেশি আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে তাহলে সে সামলাবে কী করে? জয়দীপের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে শুধু বন্দুত্বের তা অনেকেই বোঝে না। জয়দীপ অবশ্য কয়েকবার প্রেমের কথা বলার চেষ্টা করেছে, ঠিক প্রেমের কথাও নয়। সে এমন ভাব দেখিয়েছে যেন তুতুল তার নিজস্ব সম্পত্তি , তুতুল অবশ্য জয়দীপের সে ভাবনার একটুও প্রশ্রয় দেয়নি। জয়দীপকে সে অগ্রাহ্য করতেও পারেনি, অথচ বন্ধুর বেশী আর কিছু মনেও করেনি।

হঠাৎ বাথরুমে যাবার নাম করে জয়দীপ চলে এলো তুতুলের কাছে। নিচু গলায় বললাম, আমি পৌছেই সব ব্যবস্থা করে চিঠি দেবো। টিকিট পাঠিয়ে দেবো। মনে থাকে যেন আমার বুকে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছো।

তুতুল বলতে গেল না, না, আমি তো প্রতিজ্ঞা করিনি। বুকে হাত রেখেছিলুম শুধু। আমি যেতে পারবো না, জয়দীপ।

কিন্তু একেবার বিদায়ের সময় এরকম কথা উচ্চারণ করতে পারলো না তুতুল। যদি জয়দীপ আবার পাগলামি শুরু করে। যদি আঘাত পায়। থাক, পরে চিঠিতে জানিয়ে দিলেই হবে। এখন তার চোখ জ্বালা করছে, চোখে এত জ্বালা।

॥ ৪৪ ॥

ঝোঁকের মাথায় প্রতাপ বাড়ি ফেরার পথে একটা মস্ত বড় ইলিশ মাছ কিনে ফেললেন। বিমানবিহারীর বাড়ি থেকে প্রতাপ হেঁটেই ফিরছিলেন, রাত প্রায় ন'টা জগুবাবুর বাজারে সামনে, ফুটপাতেই একজন ইলিশ নিয়ে বসেছিল, ঝুড়িতে মাত্র পাঁচটা মাছ। আর কিছু নয়, মাছগুলোর সাইজ

দেখেই প্রতাপকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। মাছের দেশের মানুষ, সত্যিকারের ভালো মাছ দেখলে চোখ আটকে যাবেই।

প্রত্যেকটি ইলিশই অন্তত পৌনে দু'কেজি ওজন হবে, চওড়া পিঠ, সরু পেট, আঁশের চকচকে ভাব দেখলেই বোঝা যায় বেশ টাটকা। এরকম নিখুঁত গড়নের ইলিশ সহসা বাজারে ওঠে না। বিক্রেতাটি বললো, আরমানি ঘাটের ইলিশ, বাবু মাত্তর এক ঘন্টা আগে ধরা পড়েছে।

রাত ন'টার সময় এত বড় একটা ইলিশ কেনার কোনো মানে হয় না, তবু প্রতাপ নড়তে পারছিলেন না। এরকম একটা ভালো জিনিসকে কি অবহেলা করা যায়? সরস্বতী পুজো পার হয়ে গেছে, এখন পেটে ডিম নেই, স্বাদ খুব ভাল হবে। একসময় প্রতাপদের বাড়িতে প্রত্যেক সরস্বতী পুজোর দিন জোড়া ইলিশ আসতো, তখন তাদের পরিবারে অনেক মানুষ ছিল ফেলে ছড়িয়ে খাওয়া হতো।

দরাদরি করার আগে ঝট করে একটা বাল্য স্মৃতি মনে পড়ে গেল। তখন প্রতাপের বয়েস কত হবে, তের কিংবা চোদ্দ, বাবার সঙ্গে কোথায় যেন নৌকো করে যাওয়া হচ্ছিল, আরিচা ঘাটে ইলিশ মাছের নৌকো দেখে বাবা দরাদরি শুরু করে দিলেন। সেই ইলিশগুলো কি এই রকমই বড় ছিল? প্রতাপের বাবা কক্ষনো কম জিনিস কিনতে পারতেন না, সামান্য একটু দরের সুবিধে হবে বলে তিনি এক হালি অর্থাৎ চারখানা ইলিশ কিনে ফেললেন । সুহাসিনী আঁতকে উঠে বলেছিলাম, এত মাছ কে খাবে? বাবা অম্লান বদনে উত্তর দিয়েছিলেন, শুধু নিজেদেরই খেতে হবে তার কী মানে আছে, অন্যদের দেবে, বোসেদের বাড়ি চক্রবর্তীদের বাড়ি পাঠাবে। তাই-ই হয়েছিল শেষ পর্যন্ত প্রায় মাঝ রাত্তিরে প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙিয়ে মাছ পাঠানো হয়েছিল এবং তারা খুশীও হয়েছিলেন।

ছাত্র বয়েসে প্রতাপের সঙ্গে তাঁর বাড়ির লোকদের প্রায়ই ইলিশ বিষয়ে তর্ক হতো। পদ্মার ইলিশ ভালো না গঙ্গার ইলিশ? প্রতাপ কলকাতার ছাত্র, তিনি বলতেন পদ্মার ইলিশ অনেক বেশি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সত্যিকারের ভালো স্বাদ গঙ্গার ইলিশের, বিশেষত বাগবাজারের ঘাটের। প্রতাপের বাবা, মা, দিদিরা হৈ হৈ করে উঠতেন একথা শুনে। সুহাসিনী ঠাট্টা করে বলতেন, ঘটিরা তো ইলিশ খাইবে জানেই না, কয় কি না, হাতে ত্যাল লাগে। আরে মরণ, ইলিশ খাইয়া যদি দুইদিন হাতে সেই ত্যালের গন্ধ না থাকে, তয় আবার সেডা ইলিশ কিসে?

প্রতাপ একবার ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় দুটি গঙ্গার ইলিশ কাটিয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, রান্নার পর সুহাসিনী মুখে একটা টুকরো ঠেকিয়ে থু থু করলেন এমন যে তাঁর আর কিছুই খাওয়া হলো না, অন্যরা কেউ সে মাছ ছুঁয়েও দেখলো না।

তবু প্রতাপ এখনো গঙ্গার ইলিশের ভক্ত। একবার তিনি ভাবলেন, ঝুড়ির পাঁচটা ইলিশই কিনে নেবেন। তাঁর পকেটে আজ টাকা আছে। এই মাছগুলো যদি আজ রাত্তিরেই বিক্রি না হয়, বরফ চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হয় কাল সকালের জন্য তখন তার স্বাদ হবে একেবারেই ভিন্ন, সেটা হবে এই সৌন্দর্য্যময় ইলিশগুলির প্রতি অপমান। ইলিশের প্রাণ থাকে জলের তলায়। জল থেকে তোলা মাত্র তার প্রাণ বিসর্জন হয়। সুতরাং তারপর যতই দেরি হবে, ততই সে অন্যরকম হয়ে যাবে।

পকেটে পয়সা থাকলেও যথেচ্ছ খরচ করার দিন আর নেই। পুরনো আমলের মেজাজ মাঝে মাঝে চড়া দিয়ে উঠলেও তা দমন করতে হয়। তাছাড়া এখন পাঁচটা ইলিশ নিয়ে কোন্ বাড়ি বাড়ি পৌছোবেন প্রতাপ? একজোড়া কেনা যেতে পারে, একটা দিয়ে আসা যায় বিমানবিহারীকে, সে দশটার আগে খেতে বসে না, গরম গরম মাছ ভাজা..

শেষ পর্যন্ত প্রতাপ একটাই কিনলেন। রাত হলেও দাম মোটেই কম নয়, ছ'টাকা করে সের চেয়েছিল, অনেক ধস্তাধস্তি করে এক সের আটশো ওজনের মাছটি দশ টাকায় রফা হলো বিমানবিহারীর বাড়ি মাছ পৌঁছোবার ব্যাপারটায় প্রতাপ সঙ্কোচ বোধ করলেন, কোনদিনই তিনি এরকম করেননি, আজ হঠাৎ একটা মাছ হাতে করে নিয়ে গেলে বিমানবিহারী নিশ্চিত হাসতেন। বিমানবিহারী খুব একটা মাছের ভক্তও নন।

ইলিশটির কানকোয় সুতলি বেঁধে প্রতাপের হাতে ঝুলিয়ে দিল মাছওয়ালাটি। এমন ভাবে মাছ নিয়ে রাত্তিরবেলা প্রতাপ বহুদিন বাড়ি ফেরেননি। একেবারে বাড়ির কাছে পৌঁছে প্রতাপের লজ্জা লজ্জা বোধ হলো। মমতার কী প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। এখন প্রতাপের খেয়াল হলো যে সুপ্রীতির অসুখের সময় যে রাধুনীটিকে রাখা হয়েছিল, সে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। সুপ্রীতি এখন ভালো হয়ে উঠলেও সন্ধের পর আঁশ ছোঁবেন না। মমতাকেই মাছটা কুটতে হবে, রাঁধতে হবে। বাঙাল বাড়ির বউ হলেও

মমতার বাপের বাড়ির লোকেরা সঠিক অর্থে বাঙাল নয় ইলিশ মাছ দেখলে মমতার চোখ চকচক করে না, যে-কোনো মাছই এক টুকরোর বেশি দু'টুরো খেতে সাধ হয় না তাঁর।

প্রতাপের দৃঢ় ধারণা, মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই খুশী হতেন। বিধবা হবার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সুহাসিনী প্রত্যেকদিন বাজার এলে আগ্রহের সঙ্গে দেখতেন যে কী মাছ এসেছে। ছেলে ভালোবাসে বলে মাছ রান্না করে দিতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। দেওঘরে প্রতাপরা গেলে সুহাসিনী অনেকবার মাছ রেঁধেছেন, প্রতাপকে যাতে মাছের মুড়োটা দেওয়া হয় সেজন্য তিনি পরিবেশনেরও সময়ও দাঁড়িয়ে থাকতেন।

আজকের মাছটা একজন কেউ জোর করে প্রতাপকে গছিয়ে দিয়েছে। মমতাকে এইরকম বললে কেমন হয়? দরকার সামনে দাঁড়িয়ে এরকম একবার চিন্তা করলেন প্রতাপ। কিন্তু এই সব ছোটখাটো মিথ্যে কথাও তাঁর মুখে আসে না, তিনি কি বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে পারবেন না। সুতরাং দরজা খোলার পর, নিটোল একটা শিল্পের মতন ইলিশটা উঁচু করে দেখিয়ে প্রতাপ বললেন, জানো, এত ভালো মাছটা দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। এরকম মাছ আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না।

মমতা খুশী হননি একটুও তাঁর বিস্ময়ই বেশি। অনেকা ভুরু তুলে তিনি বললেন, এত বড় মাছ তুমি নিয়ে এসেছো, এত রাত্তিরে, কে খাবে?

প্রতাপ বললেন, কেন সবাই খাবে? কী এমন রাত হয়েছে?

মমতা বললেন, ছেলেমেয়েরা এই একটু আগে খেয়ে নিয়েছে।

–তাতে কী হয়েছে। গরম গরম মাছ ভাজা ঠিক খেয়ে নেবে।

বসবার ঘরের দরজা বন্ধ, ভেতরে আলো জ্বলছে। ঐ ঘরটি আপাতত অতীনের দুর্গ, অন্য কারুর প্রবেশ নিষেধ। পাশের সরু বারান্দাটা দিয়ে ভেতরে আসবার পর মমতা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এতই যদি তোমার মাছ খাওয়ার লোভ, তাহলে একটা রেফ্রিজারেটার কেনা উচিত।

লোভ কথাটা প্রতাপের ব্যবহার করা ঠিক হয়নি ঐ শব্দটি মমতা প্রতাপের বিরুদ্ধে বারবার অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করার জন্য পেয়ে গেলেন। প্রতাপের মতন একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের এরকম লোভ থাকতে নেই।

প্রতাপ তবু মমতাকে খুশী করার জন্য বললেন, হাতে হঠাৎ অনেকগুলো টাকা এসে গেল বুঝলে, বিমানের কম্পানি থেকে অনেকদিন কিছু নিইনি, আজও কিছু অনুবাদের কাজ করে দিলাম। সব সুদ্ধু সওয়া দুশো টাকা পাওয়া গেল।

–ঐ টাকা বাজে খরচ না করে রেফ্রিজারেটারের জন্য জমানো উচিত ছিল। যে-বাড়িতে কারুর কোনো খাওয়ার সময়ের ঠিক নেই...

–বাঃ, তাহলে একদিন একটু বাজে খরচ করব না?

আজকের মাছগুলো দেখে বহুদিন আগে আরিচা ঘাটে তাঁর বাবার মাছ কেনার দৃশ্য যে মনে পড়ে গিয়েছিল, সে কথা এখন মমতাকে বলে লাভ নেই। একটা মাছেই এই, প্রতাপ যদি পাঁচটা ইলিশই কিনে ফেলতেন, তাহলে কী হতো।

নিজের দল ভারি করার জন্য প্রতাপ গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দিদি কোথায়? দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে?

বাল্যস্মৃতিতে ফিরে যাওয়ায় প্রতাপ বিস্মৃত হলেন যে সুপ্রীতি আর আগের মতন নেই। সুপ্রীতি নিজের দরজা খুলে বাইরে আসতেই প্রতাপ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, দিদি, দেখেছো, দেখেছো কী রকম টাটকা মাছ।

সুপ্রীতি পরনে কালো পাড়ের শাড়ি, মাথার চুলে হঠাৎ সাদা ছোপ লেগেছে, মুখখানি বিষণ্ন। তিনি হঠাৎ শিউড়ে উঠে বললেন, ইঃ, খোকন, এই রাতে এত বড় একটা মাছ আনলি। মমোকে কী বিপদে ফেললিবলতো। ওকে এখন রান্না করতে হবে।

মমতা বললেন, রান্না করলেই বা খাবে কে? মাছ কেনার তো একটা সময় আছে, ছেলেমেয়েরা একটু আগে খেয়ে উঠলো।

সুপ্রীতি বললেন, তুতুল তো ইলিশ মাছ খেতেই চায় না।

প্রতাপ একবার বাথরুমের পাশের নর্দমাটার দিকে তাকালেন। তাঁর মাথায় হঠাৎ রাগ চড়ে যায়। মাছটা নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেবেন? এখন রাগের থেকে অভিমানটাই হলো বেশি। স্ত্রী ও দিদির সঙ্গে মায়ের এই তফাত। মা থাকলে ছেলে শখ করে একটা জিনিস এনেছে যতই অসুবিধে হোক ঠিক রান্না

করে দিতেন। কী এমন বেশি রাত হয়েছে।

নর্দমায় ছুঁড়ে দিলেন না বটে, প্রতাপ সেখানেই নামিয়ে রাখলেন মাছটা।

মমতা জিজ্ঞেস করলেন, কাল সকাল পর্যন্ত রেখে দেওয়া যায় না?

প্রতাপ গম্ভীরভাবে বললেন, তোমাদের যা খুশী করো।

প্রতাপের এই স্বরটা মমতা চেনেন, কোমরে আঁচল গুঁজে তিনি মাছ কুটতে বসলেন। সুপ্রীতি বললেন, তুতুলকে ডেকে দেবো, ও তোমাকে সাহায্য করবে?

মমতা বললেন, না, ওকে ডাকতে হবে না। সারাদিন হাসপাতালে ডিউটি দিয়ে এসেছে মেয়েটা...

এক ঘণ্টা বাদে খেতে ডাকা হলো প্রতাপকে। সারা বাড়িতে ম ম করছে ইলিশ মাছের তেলের গন্ধ। অথচ বাড়িটা কেমন যেন নিস্তব্ধ। অন্যদিনের তুলনায় আজ যে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটছে, সে সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের কোনো আগ্রহ নেই।

মাছটা দেখে প্রতাপ যতখানি পছন্দ হয়েছিল, মাছ খাওয়াবে ততটা লোভ নেই প্রতাপের। পেটুকের মতন আট দশ খানা মাছ খাওয়া তাঁর স্বভাবে নেই, বড় জোর দু'তিন পীস খেতে পারেন। তিনি ভেবেছিলেন, সবাই মিলে আনন্দ করে খাওয়া হবে, ছেলেমেয়েরা উৎসাহে হই চই করবে, কেউ বলবে, আমাকে বড় পেটির মাছটা দাও...প্রতাপদের ছেলেবেলায় যেমন হতো, খেতে বসে আর ধৈর্য থাকতো না, মাছ ভাজার থালা আসতে না আসতেই শেষ।

ভাত আর ডালের বাটির সঙ্গে প্রতাপকে দু'খানা মাছ ভাজা দেওয়া হয়েছে, একটি পেটি আর একটা গাদা। এই রকম টাটকা ইলিশ ভাজতে গেলেই যে তেল বেরোয় তা অতি উপাদেয়, প্রতাপ লক্ষ করলেন, সেই তেল তাঁকে দেওয়া হলো না। ইলিশ মাছের পেটের মধ্যে যে তেলটা থাকে, সেটা ভাজা খাওয়া প্রতাপের অতি প্রিয়, মমতা বোধহয় সেটা ফেলেই দিয়েছেন।

মমতা একটা বড় থালা ভর্তি আট দশখানা মাছ ভাজা এনে বললেন, এত মাছ কে খাবে বলো তো? আরও তো একগাদা রয়েছে। তুতুল কিছুতেই খেতে চাইলো না, ওর গন্ধ লাগে। মুন্নি ঘুমিয়ে পড়েছে, ডেকে তুলে কত খাওয়াবার চেষ্টা করলুম, আধখানা কোনোরকম খেয়ে আবার চোখ বুজে ফেললো, জোর করে কি খাওয়ানো যায়?

রাত্রের রান্না আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, মমতাকে এত রাতে কোনোদিন রাঁধতে হয় না। আগুনের আঁচে মুখখানা লালচে হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য কোনো রাগের অভাব নেই। মাথার চুল ভুড়ো করে বাঁধা।

মমতার দিকে দু'এক পলক তাকিয়ে প্রতাপ বললেন, বাবলু? বাবলুকে দাওনি?

খেতে আসবার সময়েও প্রতাপ দেখেছেন বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। বাবলু পড়ছে।

মমতা এবারে খানিকটা যেন ভয় পেয়ে বললেন, বাবলুও খাবে না বললো, কাল সকালে...

প্রতাপ অবাক হলেন। বাবলু মাছ ভালোবাসে তিনি জানেন, খেতে বসে রোজই বাবলু আগে জিজ্ঞেস করে, আজ কী মাছ? সেই বাবলু এত ভালো মাছ খাবে না।

মমতা বললেন, বাবলু অনেক রাত জেগে পড়ে তো, পেট হালকা রাখতে চায়, খাওয়ার সময়েও তো মাত্র দু'খানা রুটি খেয়েছে ইলিশ মাছ খেলে পেট গরম হবে।

প্রতাপ বললেন, দূর। ঐ বয়সের ছেলে আবার পেট গরম কী? তুমি বলেছো ভালো ইলিশ?

–হ্যাঁ, বলেছি।

–বাবলু নিশ্চয়ই ঠিক বোঝেনি, দাঁড়াও বাবলুকে ডাকছি।

–না, ওকে ডেকে না।

প্রতাপ মমতার দিকে একটা অদ্ভুত চাহনি দিলেন। ছেলেকে তিনি ডাকবেন, তাতে মমতার আপত্তি কিসের?

পরীক্ষার দু'তিন সপ্তাহ আগে বাবলু পুরোপুরি বদলে যায়, বইয়ের পাতায় চোখ রেখে রেখে চোখ ক্ষইয়ে ফেলে একেবারে, বাড়ি থেকে বেরুতে ও চায় না। এই সময়টার তার মেজাজটাও তিরিক্ষি হয়ে থাকে। মমতার সেইটাই ভয়।

প্রতাপ এঁটো হাতে উঠে গিয়ে বসবার ঘরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন, বাবলু বাবলু!

দরজা খুলতে একটু দেরি হলো। প্রতাপ ভাবলেন, রাত জাগার জন্য বাবলু বোধহয় সিগারেট-টিগারেট খায়, তাই দরজা বন্ধ রেখেছে। বাবলুর থেকেও কম বয়েসে প্রতাপ সিগারেট ধরেছিলেন,

তাই ছেলের সিগারেট টানায় তিনি দোষের কিছু দেখেন না। বাবলু তো দরজা খোলা রেখেও সিগারেট টানতে পারে, মমতা এই কথাটা বলে দিতে হবে।

প্রথমেই দরজা না খুলে বাবলু জিজ্ঞেস করলো কে?

প্রতাপ বললেন, আমি রে আমি! একটু খোল তো।

–তুই একবার দরজাটা খুলতে পারছিস না?

দরজাটা খোলার সত্যি খানিকটা অসুবিধে আছে বাবলুর। রাত জাগার সে একটা নিজস্ব উপায় বার করেছে। সে সব জামা-কাপড় খুলে ফেলে। হঠাৎ প্রচণ্ড গরম পড়ে গেছে, ঘামে গেঞ্জি ভিজে যায়, পা-জামা পর্যন্ত চট চট করে,তাই বাবলু একা ঘরে কিছু গায়ে রাখতে চায় না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সে বই হাতে নিয়ে সারা ঘর পায়চারি করে। এই অবস্থায় যে-কেউ তাকে দেখলেই ভাববে পাগ, মাথায় চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটি জ্বলজ্বলে, তার ছিপছিপে লম্বা শরীরে একটা সুতো পর্যন্ত থাকে না। দরজা জানলা সব সে নিচ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করে রাখে, যাতে বাইরের কোনো আওয়াজ না আসে।

কিছু একটা বিপদের কথা ভেবেই দ্রুত পোশাক পরে নিয়ে বাবলু দরজা খুলে বললো, কী হয়েছে?

প্রতাপ বললেন, আজ খুব ভালো মাছ এনেছি। কয়েকখানা খেয়ে যা। আমাদের সঙ্গে একটু বসবি আয়।

এক ঝলক রাগ এসে গেল বাবলুর মুখে। কিন্তু সে বাবার মুখের সামনে চেঁচিয়ে কথা বলে না। পেছনে মায়ের দিকে একপলক ঝাঁক চোখে তাকিয়ে সে শান্তভাবে বাবাকে বললো, বাবা, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আর কিছু খাবো না।

প্রতাপ বললেন, সে তো অনেকক্ষণ আগে খেয়েছিস। এখন ক'খানা মাছ ভাজা খাবি, তাতে কী আছে।

–এখন আর আমি খেতে পারবো না বাবা।

–একবার এসেই দ্যাখ না, খুব ভালো মাছ, এরকম ইলিশ বাজারে চট করে দেখাই যায় না।

–আমার পেট ভর্তি মাকে তো বলেছি, আর রাত্তিরে আমি কিছু খেতে পারবো না।

–এত মাছ আনলুম, সব নষ্ট হবে?

–বাঃ, নষ্ট হবে বলে আমাকে জোর করে খেতে হবে? পরীক্ষার আগে আমি পড়বো, না শুধু খাবো?

শেষের কথাটায় প্রতাপ গলা চাড়িয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী বাবলুও কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলেছে। নিজেরটা প্রতাপ শুনলেন না, ছেলেরাই তাঁর কানে যেন এটা ঝাপটা মারলো।

তিনি আস্তে আস্তে বললেন, ও, খাবি না। আচ্ছা থাক।

প্রতাপ ফিরে এলেন খাওয়ার টেবিলে। নিঃশব্দে দুগ্রাস বাত মুখে তুললেন, তাঁর মুখ বিস্বাদ হয়ে গেছে। মাছটাও খেতে একটুও ভালো লাগছে না।

অন্যদিকে কথা ফেরাবার জন্য প্রতাপ মমতাকে বললো, তুমিও খেতে বসে যাও, দেরি করছো কেন?

মমতা বললেন, একটু পরে বসবো....একবার চট করে গা ধুয়ে নেবো, ইলিশ মাছ বাজলে সমস্ত শরীরে আঁশটে গন্ধ হয়ে যায়। শোনো, ঝালটোল করিনি কিন্তু, অর্ধেকটা ভেজেছি, বাকিটা হলুদ মাখিয়ে রেখে দেবো কালকের জন্য। যা গরম পড়েছে থাকবে?

প্রতাপ মৃদু গলায় বললেন, পাশের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও না। ওরা একবার মিষ্টি না কী যেন দিয়েছিল।

–তা বলে এত রাত্রে মাছ পাঠানো যায়? তুমি কি পাগল হয়েছো? তুমি নিজে চাও দিয়ে এসো, আমি পারবো না।

–মমো, মাছটা নিয়ে এসে তোমাদের খুব বিপদে ফেলে দিয়েছি, তাই না? আমার হঠাৎ যদি একদিন একটা কিছু সাধ আহ্লাদ হয়, তার কোনো দাম নেই তোমাদের কাছে। আমি শুধু টাকা রোজগা করে যাবো তোমাদের জন্য।

এবারে মমতা তীব্র অভিমানের সঙ্গে বললেন, তুমি এই কথা বলছো? এত রাতে আমি তোমার জন্য মাছ কুটে, রান্না করে দিইনি? কেরোসিন ফুরিয়ে গেছে, কয়লার উনুন জ্বেলে...তোমার ম [illegible] লোভ হয়েছে, তুমি খাও না কত খাবে। যদি চাও তো আরও ভেজে দিতে পারি।

–আমার লোভ।

প্রতাপ আর থাকতে পারলেন না, সম্পূর্ণ ভাতের থালাটা ধরে উল্টে দিলেন। তারপর মাছের প্লেটটা ফেলে দিলেন মাটিতে।

পর মুহূর্তেই তার অনুশোচনা হলো। ইদানীং তিনি একরম রাগের প্রদর্শন করেন না। জগুবাবুর বাজারের সামনে এক মাছওয়ালার ঝুড়িতে কয়েকটা টাটকা ইলিশ দেখে প্রতাপের বাবার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, সেই স্মৃতিটাই যত নষ্টের মূল। ঐসব স্মৃতি মুছে না ফেললে এখনকার জীবনে আর শান্তি নেই।

তিনি চেয়ার চেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আই অ্যাম সরি।

দু'জনে দু'জনের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন বেশ কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর মমতা অনুত্তেজিতভাবে বললেন, ঠিক আছে বসো, আরও ভাত এনে দিচ্ছি, আর কয়েকখানা মাছ ভেজে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি।

প্রতাপ উদাসীন ভাবে বললেন, না, আর খাবো না, যথেষ্ট হয়েছে।

হাত ধুয়ে তিনি চলে গেলেন নিজের ঘরে।

প্রতাপের থালা ওল্টাবার শব্দে সুপ্রীতি বেরিয়ে এসেছিলেন। সব বুঝেও তিনি কিছু বললেন না, আবার ফিরে গেলেন। ইচ্ছে থাকলেও তিনি মমতাকে সাহায্য করতে পারবেন না এঁটো তুলতে মাছ মাংসে হাত ছোঁয়াতে এখন তাঁর গা ঘিনঘিন করে। রামনাথ স্বামী নামে এক গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর আমিষের প্রতি তাঁর ঘৃণা হঠাৎ বেড়ে গেছে।

মমতা পরো খাবার ঘরটা পরিষ্কার কর, মাছগুলো ফেলে দিলেন রাস্তার আস্তাকুঁড়ে; বাড়ির মধ্যে রাখলে গন্ধ হবে। তারপর তিনি বাথরুমে গিয়ে শুধু গা ধোওয়ার বদলে স্নান করলেন ভালো করে। আর তাঁর একটুও খাওয়ার ইচ্ছে নেই, তবু খেতে বসলেন এবং নিজের জন্য একটি গাদার মাছ ভেজেও নিলেন। বস্তুত মমতাই সবচেয়ে ভালো করে খেলেন মাছটা। ইলিশ মছের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা নেই, কিন্তু প্রতাপের কথা ভেবেই খেলেন।

শোওয়ার ঘর সিগারেটের গন্ধে ভরপুর। অন্তত তিন চারটি সিগারেট টেনে কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রতাপ। মমতা ইচ্ছে করেই এতক্ষণ এ ঘরে আসেননি। একটা কথা বললেই ঝগড়া বেঁধে যেত। উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন প্রতাপ, মমতা জানেন, ঐটা রাগের ভঙ্গি ঠিক শিশুদের মতন। তাঁর স্বামীর চরিত্রে এখনো অনেক ছেলেমানুষী রয়ে গেছে। আজকের কাণ্ডটাও প্রতাপের ছেলেমানুষী ছাড়া আর কী? এত রাত্রে একটা অত বড় ইলিশ আনলেই বাড়ির সকলকে সেটা আহ্লাদ করে খেতে হবে? অত বড় একটা মাছ কেনার আগে বাড়িতে সে ফ্রিজ নেই সেকথা ভাবা উচিত ছিল।

বাবলুর ওপরেই বা রাগ করার কী মানে হয়? সে বেচারি এখন দিন রাত জেগে পাগলের মতন পড়ছে, এটাই ওর স্বভাব, প্রত্যেক পরীক্ষার আগে এরকম করে। এভাবে পড়লে শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। খাওয়া দওয়া সাবধানেই তো করা উচিত। অন্য কিছু খেতে চায় না বাবলু, দুধ ভালোবাসে, কাল থেকে ওর জন্য দুধ বাড়িয়ে দিতে হবে।

অনেক রাত পর্যন্ত মমতার ঘুম এলো না। ঠিক তিনি যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই, ওরকম তেলালো ইলিশ খেয়ে তাঁর অম্বল হয়ে গেছে।

জোয়ানের আরক খাবার জন্য আবার উঠতে হলো মমতাকে। তাঁর যে আলসারের ধাত আছে, একথা প্রতাপের মনে থাকে না।

ওষুধ খাবার পর মমতাঘড়ি দেখলেন। তার পর বাইরে এসে উঁকি দিয়ে দেখলেন বাবলুর ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। আলো জ্বেলেই ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? এই গরমে ও সব জানলাও বন্ধ করে রাখে কেন?

তিনি বেরিয়ে এসে ও ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে চাপা গলায় ডাকলেন, বাবলু, এই বাবলু।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো, আবার কী হলো?

মমতা বললেন, এখনো ঘুমোন নি? এবার শুয়ে পড়, আর পড়তে হবে না, শরীর খারাপ করবে।

–ঠিক আছে, মা তুমি যাও!

–না। তুই শো এবার। কটা বাজে জানিস? পৌনে তিনটে।

এবারে বাবলু প্রচণ্ড ধমক দয়ে বললো, আঃ, মা, যাও না, কেন বিরক্ত করছো আমাকে।

অন্ধকার বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মমতা। তাঁর স্বামীর মেজাজ সর্বক্ষণ চড়া, কখন

যে রাগারাগি করবেন তার ঠিক নেই। নিজের বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছেন যে ছেলেকে সেও আজকাল যখন তখন ধমকায়। বাড়িতে সবসময় একটা চাপা অশান্তি। সুপ্রীতিও আজকাল প্রায়ই রাগ কর কথা বন্ধ করে দেন। এসব হচ্ছে কেন? টাকার টানাটানি, আগেকার মতন স্বচ্ছল অবস্থা নেই, সেই জন্য? আগেকার মানে তো অনেকদিন আগেকার। মমতাও তো বেশ অবস্থাপন্ন বাড়ি থেকেই এসেছেন, কিন্তু এতদিনে তিনি সব কিছু মানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু মালখানগরের এই এরা এখনো পুরোনো গর্বের কথা ভুলতে পারে না। এত টানাটানির মধ্যে প্রতাপ দশ টাকা খরচ করে একটা ইলিশ নিয়ে এলেন, যা কেউ কেলই না। তারও যেন সব দোষ মমতার।

অভিমান, বিষাদ ও অনুশোচনা নিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মমতা আবার বসবার ঘরের দরজায় মৃদু চাপড় দিয়ে কাতর গলায় বললেন, বাবুল লক্ষ্মীসোনা, এবার ঘুমিয়ে পড়। আমার কথা শোন। ও বাবলু আজ থাক, শরীরকে কষ্ট দিলে কি পড়াশুনো হয়, না কিছু মনে থাকে।

বাবলু কোনো উত্তর দিল না। সে এর মধ্যেই ঘুমে ঢলে পড়েছে।

॥ ৪৫ ॥

সন্ধ্যারতির সময় ভক্ত ও দর্শকদের মধ্যে ঐ বিশেষ মানুষটিকে অসমঞ্জ রায় অনেক আগে থেকেই লক্ষ করেছিলেন। টাইট প্যান্ট ও সাদা টুইলের শার্ট পরা হাঁটু মুড়ে বসতে কষ্ট হচ্ছিল নিশ্চয়ই, বসার ভঙ্গি বদলাতে হচ্ছিল বারবার। লোকটির চোখ ও নাক বেশ ধারালো, মাথার কুচকুচে কালো চুল নিখুঁত ভাবে ব্যাক ব্রাশ করা। এ রকম আধুনিক ও তরুণবয়স্ক কারুকে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দেখলেন অসমঞ্জ রায় আজকাল আর বিশেষ অবাক হন না। তবে এই লোকটির মুখের হাসিটা যেন কী রকম কী রকম।

আশ্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সন্ধেবেলা মন্দিরের সামনের শামিয়ানার নিচের জায়গাটায় এক একদিন মানুষ ধরে না। অসমঞ্জ আগে ভাবতেন, শুধু বুড়ো বুড়িরাই ধর্মকর্ম করতে আসে। অথবা যারা পাপ করে, যারা মানুষ ঠকায় যারা ফাটকাবাজ, যারা চট করে ভাগ্য ফেরাতে চায়, তারাই ভয়ে কিংবা অলৌকিক কিছু পাবার আশায় কোনো গুরুজী বা মাতাজীর পায়ে ধরনা দেয়। কিন্তু চন্দ্রামা-র আশ্রমের সঙেগ যুক্ত হবার পর থেকে তিনি দেখছেন আঠেরো উনিশ বছরের ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে কত শিক্ষক-অধ্যাপক-সরকারি অফিসার, ব্যবসায়ী, রাজনীতির লোক এখানে আসে, প্রণাম করবার সময় তাদের চোখ-মুখ ভক্তিতে একেবারে মাখে-মাখো হয়ে থাকে।

চন্দ্রার মতন একজন রূপসী সন্ন্যাসিনীর টানেও নিশ্চয়ই অনেকে আসে।

অসমঞ্জ রায় শুধু এই আশ্রমের ট্রাস্টি বোর্ডের সেক্রেটারি নন, তাঁর আর একটি বড় দায়িত্ব চন্দ্রার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কারুকে আসতে না দেওয়া। তিনি নিজেই এই দায়িত্বটা নিয়েছেন, এ বিষয়ে চন্দ্রার সঙ্গে তাঁর কোনো কথা হয়নি, কিন্তু চন্দ্রা নিশ্চিত এর এই ভূমিকাটা সমর্থন করে, চন্দ্রা অসমঞ্জর কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে না, অসমঞ্জ তিন চারদিন না এলে আশ্রমের লোক তাঁর বাড়ি যায় খবর নিতে। গেটের বাইরে দু'জন দারোয়ান থাকে, তারা অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের আটকায়, যেমন কোনো মাতালের এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, গাড়ি নিয়ে কেউ এই আশ্রমের কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকতে পারবে না, হতদরিদ্র চেহারার লোকরা সন্ধেবেলা প্রার্থনার সময় আসতে পারে বটে কিন্তু অন্য সময় তাদের জন্য গেট বন্ধ। অসমঞ্জ তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ রাখেন, অতিশয় ভক্তির ভাব দেখিয়েও কেউ অন্য কোনো মতলবে চন্দ্রার খুব কাছাকাছি আসতে চায় কি না। এ রকম ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে।

এই আশ্রমের প্রথম ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক দত্ত মশাইকে নিয়েও বেশ কিছুদিন সমস্যা চলেছিল। একটা নিঃশব্দ দ্বৈরথ। দত্তমশাই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, অসমঞ্জ সেক্রেটারি, দু'জনের যখন তখন মতবিরোধ হয়েছে। চেয়ারম্যানের ক্ষমতা বেশী, সুতরাং অসমঞ্জ বারবার পদত্যাগ করতে চেয়েছেন, প্রত্যেকবারই মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে চন্দ্রা, সে কিছুতেই অসমঞ্জকে ছাড়বে না, দত্তমশাইকে অগত্যা মেনে নিতে হয়েছে চন্দ্রার কথা। অসমঞ্জর বরাবরেরই ধারণা ঐ দত্ত লোকটা একটা প্রচণ্ড ভণ্ড, ধর্মে টর্মে তার বিশ্বাস নেই। এই আশ্রম করা তার একটা ভড়ং আসলে সে চন্দ্রাকে নিয়ে খেলাতে চায়। চন্দ্রা কখনো ধরা দিতে চায় না বলেই তার জেদ চড়ে গেছে। লোকটা কিন্তু খাঁটি বর্বর নয়, জোর-জবরদস্তির দিকে যেতে চায় না। বুদ্ধির খেলার দিকেই তার ঝোঁক।

দত্তকে নিয়ে অসমঞ্জর শিরঃপীড়া হঠাৎ দূর হয়ে গেল অদ্ভুত ভাবে, আশ্রম প্রতিষ্ঠার বছর

খানেকের মধ্যেই। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে দত্তমশাই ভর্তি হলেন পি জি হাসপাতালে, অসমঞ্জ ধরে নিলেন ও আর বাঁচবে না। চন্দ্রা যাতে মনে না করে যে দত্তমশাই চলে গেলে আশ্রমের খরচ চালাতে অসুবিধে হবে,, তাই অসমঞ্জ এই সুযোগে একটা বিরাট চ্যারিটি শো-এর ব্যবস্থা করে তুলে দিলেন সতেরো হাজার টাকা। অসমঞ্জ দেখিয়ে দিলেন আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা তাঁরও কম নয়।

কিন্তু দত্তমশাইয়ের জান অতি কড়া। অত বড় হার্ট অ্যাটাক সামলেও তিনি আবার উঠে বসলেন, শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই জীর্ণ হয়ে যায় নি, নিজের পায়ে হেঁটে তিনি বেরুলেন হাসপাতাল থেকে, তবে তারপর থেকে তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ। নিজের ব্যবসাপত্তরের ভার সব ছেড়ে দিলেন জামাই ও ভাইপোদের ওপর। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, ডাক্তারদের চিকিৎসায় নয়, তিনি সেরে উঠেছেন চন্দ্রামার অলৌকিক কৃপায়। কোমায় থাকার সময় চন্দ্রা প্রতিদিন এসে পুজোর ফুল-বেলপাতা ছুঁইয়ে দিয়ে যেত দত্তমশাইয়ের মাথায়। সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও তিনি দেখতে পেতেন এক জ্যোতির্ময়ী দেবী-মূর্তি তাঁকে আশীর্বাদ করছেন, সেই দেবীর স্পর্শে তিনি নিবিড় শান্তি অনুভব করতেন সারা শরীরে। সবার সামনে তিনি চন্দ্রাকে মা মা বলে ডেকে পায়ের কাছে বসে পড়েন।

প্রথম প্রথম অসমঞ্জ সন্দেহ করতেন যে এটাও দত্তমশাইয়ের আর এক রকম চতুরালি। চন্দ্রার মাহাত্ম্য প্রচার করে আশ্রমের প্রতি আরও ভক্তদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা। আজকাল অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই হার্টের রুগী, তারা অনেকেই চন্দ্রার কাছ থেকে আশীর্বাদ, ফুল প্রসাদ পাওয়ার জন্য লালায়িত হবে। সে রকম ঘটতেও শুরু করলো, বড়বাজারের বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী অনেক টাকার প্রণামী দিয়ে সামান্য ফুল-বেলপাতা আর দু'চার টুকরো সন্দেশ কিনে নিয়ে যেতে লাগলো।

তবু অসমঞ্জকে এক সময় স্বীকার করতেই হলো, দত্তমশাই আর আগের মতন নেই, চোখের দৃষ্টিটাই বদলে গেছে, চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে, প্রতিদিন দুবার চন্দ্রাকে তাঁর প্রণাম করা চাই, কিন্তু চন্দ্রার পা পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। একটু দূরের মাটি ছুঁয়ে জিভে ঠেকান। আমিষ আহার ত্যাগ করেছেন, আশ্রমের বাগানের গাছগুলির নিজে হাতে যত্ন করার ঝোঁক হয়েছে তাঁর। অসমঞ্জর সঙ্গে কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ নেই তাঁর। যে-কোনো সমস্যা উঠলেই তিনি বলেন, ওসব আপনি যা বালো বুঝবেন তাই-ই হবে। আগে তিনি অসমঞ্জকে ডাকতেন মাস্টারবাবু বলে, এখন বলেন মাস্টারদা। এ আশ্রমের ছোট বড় সবাই তাঁর দাদা কিংবা দিদি।

শরীর দুর্বল হয়েছে বলে দত্তমশাইয়ের ভোগ বাসনাও অন্তর্হিত হয়েছে। শরীর এখন আর শরীর চায় না। এখন শুধু কোনোক্রমে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার লোভ। অসমঞ্জ এখন দত্তমশাইকে খরচের খাতায় তুলে দিয়েছেন।

চন্দ্রা সম্পর্কে ধাঁধার ভাবটা কিছুতেই অসমঞ্জর মন থেকে গেল না। চন্দ্রার সত্যিই কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে, এ তিনি মেনে নিতে পারেন না। কয়েকবছর আগেই এই চন্দ্রা টেনিস খেলতো, সিগারেট খেত, কখনো কখনো মদের গেলাসেও চুমুক দিয়েছে। হঠাৎ কি আকাশ থেকে তার ওপরে আধ্যাত্মিক শক্তি নেমে এলো? চন্দ্রার মুখে অনেক সময়ই একটা ভাবের ঘোরের মতন দেখা যায়, সেটা কি আরোপিত? মাঝে মাঝে যেন পুরোনো চন্দ্রা উঁকি, মারে।

অসমঞ্জ এ আশ্রমের পরিচালনার ভার নিয়েছেন, কিন্তু এখনো ভক্ত হতে রাজি হননি। পুজো ও আরতির সময় তিনি মন্দিরের সামনে বসেন না, অফিস ঘরের জানলা দিয়েই সব দেখতে পান। চন্দ্রাও তাঁকে কখনো দীক্ষা নেবার কথা বলেনি। চন্দ্রা যেন জানে, অসমঞ্জ তা কছে বাঁধা পড়ে থাকবেই। এখনো হঠাৎ হঠাৎ অসমঞ্জ চন্দ্রার হাত কিংবা শরীরের কোনো অংশ ছুঁয়ে দিয়ে বিদ্যুতের শিহরণ বোধ করেন, সেই শিহরনে সুখ নেই, প্রত্যেকবার তাঁর মনে হয়, চন্দ্রা তাঁর জীবনটা ধ্বংস করে দি, শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময় পর্যন্ত অসমঞ্জর এক গভীর অতৃপ্তি থেকে যাবে।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার ফলে, শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানই প্রধান হয়নি, সতেরাটি অনাথিনী নারী আশ্রয় পেয়েছে এখানে। এদের কয়েকজনকে কুড়িয়ে আনা হয়েছে রাস্তা থেকে, ওরা হাতের কাজ ও কিছু লেখাপড়া শিখছে, দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা এ পর্যন্ত ভালোই আছে। এই বিশাল দেশে অসংখ্য অসহায় নারী তাদের মধ্যে থেকে মাত্র সতেরোজনের পুনর্বাসন, হয়তো কিছুই না, তবু তো একটা কাজ। চন্দ্রার আশ্রম প্রতিষ্ঠার শখের এই ভালো দিকটা অসমঞ্জ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু এ দেশে যে-কোনো সামাজিক কাজ করতে গেলে কি একটা ধর্মের বাতাবরণ তৈরি করে নিতেই হবে?

সন্ন্যাসিনী হবার বছর খানেক পর থেকে চন্দ্রা একটু মোটা হতে শুরু করেছিল। আলো চালের

ভাত ও আলু সেদ্ধ ঘি মাখনের ফল। তা ছাড়া যে মেয়ে নিয়মিত ব্যাডমিন্টন খেলতো, সে যদি দিনের অধিকাংশ সময় বসে বসে ধ্যান করতে শুরু করে, তবে তার গায়ে তো চর্বি লাগবেই। অসমঞ্জ কষ্ট পেয়েছিলেন। চন্দ্রার ঐ রূপ এত তাড়াতাড়ি ফ্যাকাসে হয়ে যাবে? এ যে সৌন্দর্যের অনর্থক অপচয়। চন্দ্রা যদি ক্রমে একটি গোলগাল, নিরামিষ চেহারার গুরুমা-তে পরিণত হত তা হলে হয়তো উপকারই হতো অসমঞ্জর, চুম্বকের টান ছিন্ন হয়ে যেত।

কিন্তু ঠিক সময়ে সচেতন হয়ে গেল চন্দ্রা। সে কি গোপনে ব্যায়াম শুরু করেছে? সে আর মিষ্টি খায় না, সপ্তাহেএকদিন সে সম্পূর্ন উপবাস করে ও মৌন থাকে। আবার সে রূপের ঔজ্জ্বল্য ও ধারালো ভাবটি ফিরে পেয়েছে। শুধু পরমার্থের চিন্তাই নয়, চন্দ্রা তা হলে নিজের শরীর নিয়েও চিন্তা করে। তা হলে শরীরের অন্যান্য দাবিগুলোর কথা কি সে ভাবে না? তা বুকে, দু'বাহুর মধ্যে একটা আলিঙ্গনের শূন্যতা নেই? অসমঞ্জ চন্দ্রার চোখের দিকে চেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে সেটাই বুঝবার চেষ্টা করেন। এখনো তাঁর আশা, একদিন না একদিন চন্দ্রার সংযমের বাঁধ বাঙবে।

আরতি শেষ হয়ে যাবার পর আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে এলো। যারা নিয়মিত আসে, যাদের বাড়িতে হয়তো কথা বলার বিশেষ কেউ নেই, তারা আরও কিছুক্ষণ থেমে যায়। আজ অবশ্য চন্দ্রা বদলে প্রার্থনা পরিচালনা করেছে পূর্ণিমা, তাই আজ অন্যদের আকর্ষণ কম।

সেই সাদা শার্ট পরা নতুন লোকটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো মন্দিরের সিঁড়িরে কাছে। পূর্ণিমা তার হাতে এক টুকরো সন্দেশের প্রসাদ দিতে, সেটি নিয়ে সে কপালে ঠেকালো কিন্তু খেল না, পকেটে রেখে দিল।

তারপর অতি নম্র স্বরে সে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের এই আশ্রমের গুরুমার সঙ্গে একবার দেখা করা সম্ভব?

এই সময় অসমঞ্জ বেরিয়ে এলেন অফিস ঘর থেকে। মামুনের মুখের রেখাতেই অনেক কিছু প্রকাশ পায়। এই যুবকটি এতক্ষণ ধরে বসেছিল, কিন্তু এর মুখে ভক্তিভাব ছিল না একবিন্দু শুধু কৌতূহল।

অসমঞ্জ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী চাইছেন?

অসমঞ্জর এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে যুবকটি চেয়ে রইলো পূর্ণিমার দিকে। তার কাছ থেকে সে নিজের প্রশ্নের কোন আশা করছে।

পূর্ণিমা বললো, আজ তো দেখা হবে না। আজ বৃহস্পতিবার, ওঁর মৌন।

যুবকটি বললো, কথা বলবার দরকার নেই, আমি শুধু একটু দেখা করবো।

পূর্ণিমার বদলে অসমঞ্জ গলা ভারি করে বললেন, না, আজ দেখা হবে না। আজ উনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।

এতেও বিচলিত হলো না সেই আগন্তুক, পকেট থেকে একটি নোট বই ও কলম বার করে খসখস করে দু'লাইন লিখে কাগজটি ছিঁড়ে বললো, এই চিঠিটা একটু দিয়ে আসবেন, আমি অপেক্ষা করছি।

পূর্ণিমা অসমঞ্জর দিকে তাকালো। চন্দ্রার মৌনব্রতের দিনেও চিঠি পাঠাবার কোনো নিষেধ নেই। আশ্রমের নানান খুঁটিনাটি কথা তাঁকে সারাদিন ধরেই ছোট ছোট চিঠিতে জানানো হয়। চন্দ্রা উত্তরও লিখে দেয়। অসমঞ্জও একটু আগেই চিঠি পাঠিয়েছেন।

মৌনব্রতের দিন চন্দ্রা যে সর্বক্ষণ ধ্যান বা পুজো-আচ্চা করে তাও না। সেদিন সে চিলেকোঠায় একলা একলা কাটায়, সঙ্গে প্রচুর বই থাকে। সে বইও ধর্মপুস্তক নয়। শতবার্ষিকীর বছরে রাজ্য সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর পুরো এক সেট আছে সেখানে, ইয়েটস এজরা পাউণ্ড-এলিয়টের কাব্য সংগ্রহ আছে, অসমঞ্জ প্রায়ই চন্দ্রার জন্য নতুন বই এনে দেন।

অসমঞ্জ আপত্তি জানাতে পারলো না, পূর্ণিমা চিরকুটটি নিয়ে চলে গেল।

অসমঞ্জ জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

যুবকটি এবারে ফিরে বললো, আপনি অসমঞ্জবাবু, তাই না? আপনার কথা শুনেছি। আমি কাছ থেকেই আসছি। এখানকার গুরুমা-র যিনি বাবা, সেই আনন্দমোহন চক্রবর্তী আমায় চেনেন, তাঁর সোর্স ধরেই এসেছি, আমার একটা জরুরী সমস্যা আছে।

অসমঞ্জ বললো, আনন্দমোহনবাবু তো প্রায়ই এখানে আসেন, প্রার্থনা শোনেন, আজই আসেননি দেখছি।

- হ্যাঁ, তিনি এলে আমার খানিকটা সুবিধে হতো। আচ্ছা, এই আশ্রমের মধ্যে সিগারেট খাওয়া যায় না, তাই না? আমি একটু কম্পাউণ্ডের বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

- অফিস ঘরের মধ্যে আসুন।

বাইরের লোক অনেকেই চলে গেছে। দুটি আশ্রমের মেয়ে মন্দিরের সামনে উবু হয়ে বসে পরিষ্কার করছে ফুল-বেল পাতা। এদের মধ্যে একটি মেয়ে শিয়ালদা স্টেশনে ছিল। এখন খুব মন দিয়ে সব কাজ করে।

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে বাঁধা কপির তরকারি রান্নার গন্ধ। এক একদিন অসমঞ্জ এখান থেকেই খেয়ে যান। আগে এক বেলাও নিরামিষ খেতে পারতেন না। এখন মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না।

নিজেও একটি সিগারেট ধরিয়ে অসমঞ্জ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম?

যুবকটি হেসে বললো, নাম শুনে আপনি আমাকে চিনবেন না, আমি অতি সাধারণ মানুষ, আমি এসেছি একটা খুব ব্যক্তিগত ব্যাপারে।

ব্যক্তিগত শব্দটির ওপর বেশি জোর দিয়ে সে যেন বুঝিয়ে দিতে চাইলো, অসমঞ্জর কাছ থেকে সে আর কোনো কৌতূহলী প্রশ্ন শুনতে চায় না।

এই সময় পূর্ণিমা ফিরে এলো সবেগে। বোঝাই যায় সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে ছুটতে ছুটতে।

- আপনি চলে যান, দেখা হবে না!

অসমঞ্জ এবং যুবকটি পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারা দু'জনেই আরও কিছু শুনতে চায়।

পূর্ণিমা বললো, চিঠিটা পড়েই চন্দ্রামা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন, আমার দিকে রাগ রাগ চোখে তাকালেন।

যুবকটি মুখ নিচু করে সিগারেটে একটা জোর টান দিল। তারপর যখন আবার মুখ তুললো, তার চরিত্র বদলে গেছে। কঠিন গলায় সে বললো, ঠিক আছে, আমি আবার কাল আসবো! কালকে উনি প্রকাশ্যে দেখা দেবেন আশা করি?

অসমঞ্জ বললেন, আপনার কী দরকার যদি আমাকে বলতে পারেন...

কোনো উত্তর না দিয়ে সে পেছন ফিরে চলে গেল হনহনিয়ে।

পূর্ণিমা ফিস ফিস করে বললো, মাস্টারদা, খুব রেগে গেছেন চন্দ্রামা। বোধ হয় লোকটা ওঁর চেনা।

চিঠিখানা কেন আগে অসমঞ্জ সেনসর করে পাঠাননি, সে জন্য অসমঞ্জ অনুতপ্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল, এর পর থেকে কোনো উটকো লোকের চিঠিই চন্দ্রার কাছে পাঠানো হবে না। অসমঞ্জ নিজে আগে পড়ে দেখবেন। কে এই যুবকটি?

যেদিন চন্দ্রার মৌনব্রত থাকে, সেদিন অসমঞ্জ আর বেশিক্ষণ থাকেন না আশ্রমে। কিন্তু আজ তাঁর যেতে পা সরলো না। তিনি হিসেবের কাগজপত্র নিয়ে বসে গেলেন। মেয়েদের অনাথ আশ্রম চালাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি ইংরেজী আবেদন পত্রের মুশাবিদা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু কিছুতেই তাঁর ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না। এই যুকবটির ব্যবহার তার মনের মধ্যে একটা খটকা ধরিয়ে দিয়ে গেছে। ও সাধারণ কেউ নয়।

একসময় অসমঞ্জর মনে হলো, আজ চন্দ্রার সঙ্গে একবার দেখা না করে গেলে কিছুতেই রাতে ঘুম হবে না। তিনি দেখা করতে গেলেও কি চন্দ্রা ফিরিয়ে দেবে? সব নিয়মেরই তো ব্যতিক্রম আছে।

তিনি সিঁড় দিয়ে সোজা উঠে এলেন ছাদের ঘরে। তিনতলায় এই একটিই মাত্র ঘর। এদিকে এখনও তেমন নতুন বাড়ি ওঠেনি, ছাদ থেকে অনেকদূর পর্যন্ত ফাঁকা দেখায়। বোধ হয় শুক্লপক্ষ চলছে। সন্ধ্যের পর থেকে আকাশে পাতলা জ্যোৎস্না। ছাদের পাশেই দুটি নারকেল গাছের ডগা দুলছে বাতাসে। শেয়াল ডাকছে জলাভূমির ধারে।

চন্দ্রার ঘরের দরজাটা বন্ধ নয়, ভেজানো। খুব কাছে গিয়ে তিনি দু'বার আস্তে ডাকলেন, চন্দ্রা, চন্দ্রা।

বই পড়তে চন্দ্রা অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। আবার জেগে উঠে পড়ে। একদিন ভোর থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত এই রকম চলে। এই ঘরের সংলগ্ন একটি বাথরুম আছে, সুতরাং চন্দ্রাকে একবারও বেরুতে হয় না।

জেগে থাকলেও তো চন্দ্রা সাড়া দেব না। অসমঞ্জ নিজেই দরজাটা ঠেলে খুলবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় দরজাটা খুলে গেল। শ্বেতবসনা চন্দ্রা, মাথায় চুল খোলা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অসমঞ্জ খানিকটা কম্পিত বক্ষে লক্ষ করলেন, এরকম অসময়ে এলেও চন্দ্রার চোখে রাগ বা বিরক্তির চিহ্ন নেই।

অসমঞ্জ বললেন, একটু ভেতরে আসবো? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর কাছে চিঠিটা ড্রাফট করার জন্য দু-একটা পয়েন্ট...

দরজার কাছ থেকে সর গিয়ে চন্দ্রা মেঝেতে বসে পড়লো, এ ঘরে খাট বিছানা নেই, শুধু একটি কম্বল পাতা। একটি কাচের জগ ভর্তি জল ও গেলাস। চন্দ্রার উপবাস নিরম্বু নয়। আর একটা বৃহস্পতিবার মাত্র অসমঞ্জ এই ঘরে চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন বিশেষ দরকারে। এ ঘরে চন্দ্রাকে দেখলেই তার "যৌবন-যোগিনী" শব্দ দুটি বার বার মনে পড়ে।

রবীন্দ্ররচনাবলীর একটি গল্পের পৃষ্ঠা খোলা। রাজা নাটক পড়ছে চন্দ্রা। পাশে একটি খাতা। সেই খাতাটা টেনে নিয়ে চন্দ্রা লিখলো, গভর্নমেন্টের চিঠির কথা কাল হবে। তুমি নিশ্চয়ই অন্য কথা বলতে এসেছো? বলো।

খাতাটা নিয়ে লেখাগুলি পড়ে অসমঞ্জ তার তলায় লিখলেন, আজ একটি লোক এসেছিল, তোমাকে চিঠি পাঠালো। তুমি তাকে চেনো? সে কে?

চন্দ্রা আবার লিখলো, ও কথা থাক, অন্য কথা বলো।

অসমঞ্জ আবার কিছু লিখতে গিয়ে থেমে গেলেন। চন্দ্রার আজ মৌন, সে লিখে লিখে কথা বলবে। কিন্তু অসমঞ্জর তো লেখার দরকার নেই। তিনি তো মুখে বললেই পারেন। তা ছাড়া তাঁর বাংলা হাতের লেখা ভালো নয়।

তিনি বললেন, লোকটি আবার কাল আসবে বলে গেল। খুব রাগ রাগ ভাব। তুমি চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছো শুনে অপমানিত বোধ করেছে।

"আসুক কাল।"

– মানে হয় কাল একটু কিছু গণ্ডগোল করবে। আমরা কি ওকে গেটে আটকাবো?

"কোন দরকার নেই। ও কী বলবে তা আমি জানি।"

– চন্দ্রা, তুমি ওকে চেনো? ও কে?

"তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন, অসমঞ্জ? অন্য কথা বলো।"

– না, আমি জানতে চাই ঐ লোকটা কে? যদি আশ্রমের মধ্যে চ্যাঁচামেচি করে, যদি তোমাকে কোনো খারাপ কথা বলে...আগে থেকে তার প্রতিকার করা আমাদের কর্তব্য।

চন্দ্রা কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো অসমঞ্জর দিকে। তারপর আবার লিখলো, "ও বিমান! আমার স্বামী। এতদিন পরে এসেছে। ও খুব ভদ্র, ওর মুখ দিয়ে খারাপ কথা বেরোয় না।"

অসামঞ্জ প্রায় ফিসফিস করে বললেন, তোমার স্বামী? আমি প্রথমে তাই-ই ভেবেছিলুম। কিন্তু দেখলে তোমার চেয়ে বয়েসে ছোট মনে হয়...এতদিন পর এসেছে...কেন?

"ও কী চায়, আমি জানি। ও আবার বিয়ে করতে চায়...কিন্তু আমি ওকে বিবাহ-বিচ্ছেদ দেবো না। ওকেও সন্ন্যাসী হতে হবে!"

এবার গলা চড়িয়ে অসমঞ্জ বললেন, ও তোমার স্বামী..ডিভোর্স চাইতে এসেছে... একটা প্রচণ্ড স্ক্যান্ডাল হবে, আশ্রমের সুনাম নষ্ট হবে...চন্দ্রা, তুমি কোনোক্রমেই কাল ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। তুমি কয়েকটা দিন অন্য কোথাও গিয়ে থাকো।

"কোথায়?"

– তুমি পুরী যাবে বলছিলে, জগন্নাথ দর্শন করতে। আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি। চন্দ্রা, প্লীজ, ঐ লোকটিকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, একটা কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে। ওকে তুমি কেন ডিভোর্স দেবে না?...

"ও আর একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করবে। সে অধিকার ওকে দেওয়া চলে না।"

চন্দ্রা যতক্ষণ ধরে লিখছে ততক্ষণ যেন অসমঞ্জ ধৈর্য ধরে থাকতে পারছেন না। আবেগের আতিশয্যে তিনি চন্দ্রার অন্য হাতটা চেপে ধরলেন।

চন্দ্র মুখ তুলে নিবিড়ভাবে দেখলো অসমঞ্জকে। তারপর আবার লিখলো, অসমঞ্জ, তুমি কী চাও?

– আম চাই, তুমি কয়েকদিনের জন্য...আমার সঙ্গে পুরী যেতে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি নেই।

তুমি তো একা যেতে পারো না...

চন্দ্রা আমার ঐ একই কথা লিখলো, "অসমঞ্জ, তুমি কী চাও?"

এবারে অসমঞ্জ গভীর অভিমানের সঙ্গে বললেন, আমি কী চাই, তুমি জানো না। এতদিন ধরে...চন্দ্রা, তুমি আমার বউকেও তোমার মতন সন্ন্যাসিনী করেছো, তাকে দীক্ষা দিয়েছো, সে আমাকে আর স্বামীর মর্যাদা দেয় না...আমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছো তুমি, দিন দিন আমি শুধু এই আশ্রমের সেবাদাস হয়ে যাচ্ছি...সেসব কেন, কিসের জন্য? আজও তুমি জিজ্ঞেস করছো, আমি কী চাই?

চন্দ্রাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তিনি তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে গেলেন। চুম্বনের একটা ভঙ্গি মাত্র, প্রকৃত চুম্বন নয়, শুধু ঐটুকু স্পর্শেই সাতচল্লিশ বছর বয়স্ক অসমঞ্জ রায় এমন কেঁপে উঠলেন যে নিজেই পরের মুহূর্তে চন্দ্রাকে ছেড়ে সরে গেলেন দূরে। একটা ভয়ার্ত পশুর মতন বসলেন দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

ঠিক যেন সম্মোহন করার মতন অসমঞ্জর দিকে চন্দ্রা নিষ্পলকভাবে চেয়ে রইলো প্রায় পুরো এক মিনিট। তারপর রাগের বদলে তার মুখে ফুটলো হাসি। এবারে সে কথাও বললো। বুক থেকে আঁচল ফেলে দিয়ে সে বললো, তুমি এই চাও, অসমঞ্জ, এসো।

পটপট শব্দে ব্লাউজের টিপ বোতাম খুললো চন্দ্রা। ব্রেসিয়ার সে অনেকদিনই পরে না। অনেকদিন অস্পৃষ্ট, অনাঘ্রাত, নিটোল স্তন দুটির দিকে চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলো অসমঞ্জ। মা যেমন করে তার সন্তানকে স্তন্য পান করায়, সেইভাবে নিজের একটি বুকে হাত দিয়ে চন্দ্রা বললো, এসো।

অসমঞ্জ দেরি করছে দেখে চন্দ্রা নিজের শায়ার দড়িতে হাত দিয়ে আরও মধুর করে হেসে বললো, তুমি যা চাও, আজ সব দেবো, অসমঞ্জ। আমার তো কোনো লজ্জা নেই। পাপ নেই।

অসমঞ্জর মনে হলো যেন তার শরীরে হাজার হাজার তীর বিঁধছে। হাজার হাজার চোখ। এই আশ্রমের সব মেয়েরা, রাস্তার লোকেরা, তার স্ত্রী, তার শ্বশুরবাড়ির সবাই দেখছে, এক্ষুনি তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। চন্দ্রার মতন এই জ্বলন্ত আগুন নিয়ে সে কী করবে, কোথায় পালাবে, এই আশ্রম ভেঙে যাবে, কেউ আর তাদের দু'জনকে আশ্রয় দেবে না...না, না, এতখানি সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই, তিনি তো এত বেশি চাননি। চন্দ্রার একটু স্পর্শ, মুখের হাসি, যদি চন্দ্রা তার বুকে একবার মাথা রাখতে দেয়। সেই-ই তো যথেষ্ট বেশি।

অদ্ভুত ভয় মাখানো গলায় অসমঞ্জ বললেন, না, না, চন্দ্রা, আমায় ক্ষমা করো, আমি অন্যায় করেছি। আমার মাথায় ঠিক ছিল না।

চন্দ্রা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এত ভয় কিসের, অসমঞ্জ? তোমার যখন এতটাই ইচ্ছে, এই অতি সামান্য শরীর, রক্তমাংসের পিণ্ড, তার প্রতি তোমার যদি এতটাই মোহ থাকে, তবে সে মোহটাকে মিটিয়ে নাও। শরীরের তো পাপ-পুণ্য নেই, সব কিছুই মনের। অসমঞ্জ, যতদিন তোমার চোখে লোভ থাকবে, মোহ থাকবে, ততদিন তো তুমি কোনো বড় কাজে মন বসাতে পারবে না! এসো অসমঞ্জ, আমাকে ছুঁয়ে দেখো, আমার ভেতরেও যদি ষড়রিপুর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাকে শেষ করে দাও!

অসমঞ্জর মনে হলো, চন্দ্রা যেন তার মাথা ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে আরও ওপরে। চন্দ্রার দুই স্তন, তার নিম্ন উদর, তার দুই উরু, সবকিছুই বিশাল। চন্দ্রার তুলনায় তিনি কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছেন খুব দ্রুত। ঘরের অনেকগুলি জানলা দিয়ে শত শত নারী পুরুষ সকৌতুকে দেখছে সেই দৃশ্য।

একটু এগিয়ে এসে চন্দ্রা আবার বললো, অস্বীকার করতে পারি না, আজ আমার মধ্যেও চাঞ্চল্য ঘটেছে। আজ যে এসেছিল, সে আমার স্বামী, বিমান, কেন তাকে ছেড়ে এসেছিলাম এ পর্যন্ত কারুকে তা বলিনি। তুমি শুনতে চাও?

কথা বলার ক্ষমতাই যেন চলে গেছে, অসমঞ্জ শুধু ঘাড় হেলালেন।

চন্দ্রা আস্তে আস্তে থেমে থেমে বললো, আমাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়েছিল, যেমন যুবক যুবতীদের মধ্যে হয়। বিমান আমাকে বিয়ে করার জন্য সাধ্যসাধনা করেছিল, আমি তখনও ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, পরীক্ষা না দিয়েই ঝোঁকের মাথায় রাজি হয়ে গেলুম বিয়ে করতে। এই ঝোঁকটা আসলে কী বলো তো, শারীরিক মিলনে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য একটা সামাজিক স্বীকৃতি। তার নামই তো বিয়ে, তাই না? বিয়ে আমাদের হলে, শারীরিক মিলনের তীব্র সুখও যে পেয়েছিলাম, তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমাদের বিয়ের ঠিক এক বছর এক মাস সতেরো দিন বিমান তার এক মাসতুতো বোনের সঙ্গে শুয়েছিল, আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল। তাতে আমি প্রচণ্ড দুঃখ

পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী অবাক হয়েছিলাম। তা হলে ভালোবাসা কী? ভালোবাসা বলে কি কিছুই নেই? কিংবা শরীর পুরোনো হয়ে যায়, তবু ভালোবাসা থাকে। বিমান আমাকে ঠিক আগের মতনই ভালোবাসার ভান করতো, কিংবা সেটা ভান নয়, শরীর-নিরপেক্ষ ভালোবাসা? রবীন্দ্রনাথ তো এরকম ভালোবাসার কথা লেখেননি? কোনো কবি-সাহিত্যিক লেখে না। তুমি বিমানের সঙ্গে মিশে দেখো, অসমঞ্জ, সে চমৎকার মানুষ, তার ব্যবহারে কোনো খুঁত নেই, কিন্তু সে কি শুধু শরীরের মধ্যে ভালোবাসা খোঁজে? অসমঞ্জ, তুমি আরও শুনবে?

কম্পিত গলায় অসমঞ্জ বললেন, চন্দ্রা, চন্দ্রা, তুমি শান্ত হও! বাকি সব কথা পরে শুনবো!

চন্দ্রা অসমঞ্জর কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, আমিও শরীরের মধ্যে ভালোবাসা খুঁজেছি। কিছুতেই পাইনি। সে যে কী কষ্ট! শরীরে একটা জৈবিক সুখ আছে। কিন্তু ভালোবাসা না পাবার উপলব্ধির বেদনা যে আরও অনেক, অনেক বেশী তীব্র! তোমার স্ত্রী অসুস্থ, তুমি তার কাছ থেকে সুখ পাও না, তুমি আমার শরীরের মধ্যে কি ভালোবাসা খুঁজতে চাও, অসমঞ্জ? তবে নাও, খুঁজে দেখো, এসো অসমঞ্জ, লজ্জা কী?

অসমঞ্জ বলে উঠলেন, না, না, না!

চন্দ্রা নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে বললো, ভালো করে ভেবে দ্যাখো, অসমঞ্জ, মনে কোনো দ্বিধা রেখো না। যদি এই শরীরটাকে পেলে তোমার মোহ মিটে যায়...

রক্তচন্দনবর্ণা, স্খলিতবসনা চন্দ্রাকে অসমঞ্জর মনে হলো যেন কালী মূর্তি। তিনি আর তাকাতে পারছেন না। সত্যিকারেরর ভয়ে তার শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে।

হাত জোড় করে তিনি প্রায় কেঁদে ফেলে বলতে লাগলেন, এই শেষবারের মতন আমায় ক্ষমা করো, চন্দ্রা। আমি স্বীকার করছি, তুমি অসাধারণ, তোমার অলৌকিক শক্তি আছে, তুমি আমাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে...

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অসমঞ্জ চন্দ্রাকে প্রণাম করে ফেললেন।

॥ ৪৬ ॥

দোতলা থেকে কল্যাণী ডাকছেন, অলি, অলি!

অলি শুনতে পেয়ে একটু অবাক হলো। তাদের লম্বাটে ধরনের তিনতলা বাড়ি, যখন তখন একতলা-তিনতলায় ওঠানামা করতে হয়, তবু এ বাড়িতে কারুর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকার প্রথা নেই। বিমানবিহারী বা কল্যাণী কেউই কখনো উঁচু গলায় কথা বলেন না। অলি ভুরু কুঁচকে ভাবলো, মা কোনো কারণে ব্যস্ত হয়ে তার খোঁজ করছে, জগদীশকে পাঠালেন তো পারতো। নিশ্চয়ই ফাঁকিবাজ জগদীশটা ধারে-কাছে নেই, আর একটা নতুন ছেলে এসেছে ফটিক, সে আবার কানে কম শোনে।

অলি বসে আছে পড়ার টেবিলে, আর তার খাটে শুয়ে আছে বর্ষা। আজ সকাল থেকেই তারা এক সঙ্গে পড়াশুনো করছে। বর্ষার এক মামাতো ভাই হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে কানপুর থেকে, সেই জন্য তাদের বাড়িতে জায়গা নেই, অথচ পরীক্ষার আর মাত্র সাতাশ দিন বাকি।

বর্ষার বরাবরই শুয়ে শুয়ে পড়া অভ্যেস, কারণ তার কোনো নিজস্ব পড়ার টেবিলই নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা সে উপুড় হয়ে বইয়ের পাতায় চোখ আটকে রাখতে পারে। অলি আবার সারা দিন শুয়ে শুয়ে পড়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না।

অলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এই, আমি একটু আসছি রে।

বর্ষা চোখ তুললো না, ভালো করে শুনলোই না অলির কথা, মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ করলো শুধু।

আজ অলি চুল বাঁধেনি, বিকেলবেলায় শাড়ি-জামা বদল করেনি। একটা সাধারণ গোলাপী শাড়ি পরা, তার চুল আজ প্রায় বর্ষার মতনই উলুস-থালুস। দিশি ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করার বেশি বেশি ঝোঁক অলির, সেই পেনের কালি আঙুলে লাগবেই, খানিকটা কালি কখন যে তার থুতনিতে লেগেছে, তা সে খেয়ালই করেনি।

বাইরের সিঁড়িতে রেলিং ধরে উঁকি মেরে অলি মাকে দেখতে পেল না। ওপর থেকেই সংলাপ সেরে নেওয়া অলির ধাতে নেই, সে নেমে এলো দোতলায়।

অফিস ঘরের দরজার কাছে আসতেই কল্যাণী বললেন, আয় অলি, ভেতরে আয়।

এ ঘরে অন্য অতিথি আছে, পাক্কা সাহেবের মতন স্যুট পরা একজন মধ্যবয়স্ক সুপুরুষ, তাঁর

পাশে জর্জেটের শাড়ি-পরা একজন মহিলা। মহিলাটির প্রসাধন বেশ উগ্র, আই লাইনার দিয়ে চোখ আঁকা, ভুরুর ঠিক নিচে সবুজ আই শ্যাডো, চোখের পাতায় ম্যাসকারা।

আই দু'জনের দিকে দু'পলক তাকিয়েই অলির মনে পর পর কয়েকটি ভাব খেলে গেল। এই গরমে মহিলাটি জর্জেটের শাড়ি পরে আছেন কী করে? ইনি বেশ ডাকসাঁইটে ধরনের সুন্দরী, কিন্তু এত মেক-আপ না দিলেই বোধ হয় আরও বেশি ভালো দেখাতো। ভদ্রলোক স্যুটের সঙ্গে ওয়েস্ট কোট পর্যন্ত পরেছেন, বাবাঃ, আজকাল ওয়েস্ট কোট তো প্রায় দেখাই যায় না। বাইরের লোকের সামনে এভাবে হঠাৎ তাকে ডাকবার মানে কী? মায়ের কি আগে থেকে বলে দেওয়া উচিত ছিল না? অলির ব্লাউজের একটা বোতাম ছেঁড়া!

বিমানবিহারী বললেন, অলি, তুই এঁদের চিনিস তো? জাস্টিস পি এন মিত্র আর মিসেস মিত্র।

এই বিচিত্র দম্পতিকে আগে কখনো দেখে থাকলেও অলির মনে নেই। সে হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বললো না, মুখে সৌজন্যের হাসি ফোটালো।

কল্যাণী তাকিয়ে আছেন অলির চোখের দিকে। তিনি নিঃশব্দে যে আদেশ দিচ্ছেন তা বুঝতে পেরেও অলি শুধু দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো। মাত্র পাঁচজন নারী পুরুষ ছাড়া সে আর কারুর পায়ে হাত দিয়ে কখনো প্রণাম করবে না, ঠিক করে ফেলেছে।

বিমানবিহারী মহিলা-অতিথিটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আতরদি, তুমি তো অলিকে চেনো? আমাদের কেষ্টনগরের বাড়িতে এসছিলে!

মহিলা তাঁর ভুরু বাঁকিয়ে বললেন, ওকে কত ছোট দেখিছি, ফ্রক পরে দৌড়োদৌড়ি করতো, মাথার চুল কোঁকড়া ছিল না? এখন তো রীতিমতন ইয়াং লেডি!

জাস্টিস মিত্র বললেন,তুমি প্রেসিডেন্সিতে ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়ছো? শম্ভু...মানে, এস এন ব্যানার্জি, তোমাদের এখনও পড়ান?

অলি মাথা হেলিয়ে বললো, হ্যাঁ, উনি হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট।

– ঐ শম্ভু ছিল আমার ক্লাস মেট, লন্ডনেও আমরা একই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে...

জাস্টিস মিত্রের বাংলা বলার একটা নিজস্ব কায়দা আছে। গলার আওয়াজটি মিষ্টি, বাংলা শব্দগুলো উচ্চারণ করেন ইংরেজী কায়দায়, যেমন 'তোমাদের' কথাটা বললেন, তো-ও-মা-আ-দের, 'পড়ান' হলো পওড়ান!

জজ-পত্নী উঠে এসে অলির হাত ধরে বললেন, বসো, একটু বসো আমাদের সঙ্গে, আমরা কাছেই এক জায়গায় এসেছিলুম...

শনিবার বিকেল সোওয়া পাঁচটা, এই সময় মানুষ তো মানুষের বাড়িতে বেড়াতে আসতেই পারে, অলির পক্ষেই এই সময়টাতেও বই নিয়ে বসে থাকা অস্বাভাবিক। বাড়িতে অতিথি এলে তার আলাপ করা উচিত। টুকিটাকি কথা চলতে লাগলো।

জজ পত্নী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আর একটি মেয়ে আছে না? সে কোথায়, বিমান?

কল্যাণী বললো, ছোট মেয়ে এই সময় নাচের ইস্কুলে যায়।

– একদিন মেয়েদের নিয়ে এসো আমাদের বাড়িতে। তুমি তো আমাদের বাড়ি চেনো, বিমান?

– মে ফেয়ারের সেই বাড়ি তো? হ্যাঁ, গেছি একবার।

জাস্টিস মিত্র অলির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের একটি মাত্র ছেলে। সে বিলাতে গেছে ব্যারিস্টারি পড়তে। নেক্সট মানথে একবার আসবে। তুমি তার সঙ্গে আলাপ করলে নিশ্চিত খুশি হবে। ইংলিশ লিটরেচারে তার খুব ইন্টারেস্ট আছে।

অলি বললো, আমার সামনের মাসে পরীক্ষা।

– হ্যাঁ, পরীক্ষার পরই এসো। আমার ছেলে আসবে নেক্সট মাসের ফোর্থ উইকে, তারপর ফাইভ উইকস এখানে থাকবে।

বিমানবিহারী বললেন, অলি একটু দেখবি, জগদীশ কোথায় গেল? একটু চা—

জজ-পত্নী বললেন, না, না, চায়ের জন্য ব্যস্ত হবেন না।

অলি উঠে পড়ে একতলার রান্নাঘর থেকে জগদীশকে খুঁজে বের করলো। মৃদু বকুনি দিল তাকে, তারপর চাও জলখাবারের নির্দেশ দিয়ে সে আর অতিথিদের কাছে ফিরলো না, চলে এলো তিনতলায়।

বিছানার ওপর উঠে বসে বর্ষা এখন একটা সিগারেট ধরিয়েছে। অলির মুখের রক্তিম আভা তার চোখ এড়ালো না।

অলি বর্ষার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, দে, আজ আমিও একটু সিগারেট খাবো।

বর্ষা জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে রে? মাসিমা তোকে বকলেন নাকি?

অলি জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, হঠাৎ মা বকবে কেন? নিচে দু'জন অতিথি এসেছে, মা আমায় ডেকে ওঁদের পাত্রী দেখালেন।

– অ্যাঁ?

– হ্যাঁ রে। তুই জাস্টিস পি এন মিত্র-র নাম শুনেছিস? একেবারে টপ সোসাইটির লোক, ওঁর স্ত্রীকে নাকি অল্প বয়েসে মেমসাহেব বলে ভুল করা হতো, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব আছে, ব্রিটিশ আমলে বেঙ্গলের গভর্নর কেসির বউয়ের সঙ্গে উনি ব্যাডমিন্টন খেলেছেন, এই সব এইমাত্র শুনলুম। ওঁদের একমাত্র ছেলে ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়ে, তার সঙ্গে আমায় মানাবে না?

– তুই, তুই এরকম সাজপোশাক নিয়ে...যাঃ, তুই বানিয়ে বলছিস, অলি?

– বিশ্বাস না হয় নিচে গিয়ে দেখে আয়। ওঁরা বোধ হয় চেয়েছিলেন, 'তুমি যেমন আছো' তেমনি এসো, আর করো না সাজ।'

– আমার সত্যিই একবার ওঁদের দেখে আসতে ইচ্ছে করছে রে!

– উঁকি মেরে আসতে পারিস। ভেতরে-ঢুকে কথাও বলতে পারিস। জজের থেকে তার বউ বেশি ইন্টারেস্টিং। তবে দেখিস, তোকে যেন আবার পছন্দ করে না ফেলে! আমার চান্সটা নষ্ট করে দিস না ভাই!

বর্ষা সত্যি উঠে সিঁড়ি পর্যন্ত গেল। তারপর আবার ফিরে এসে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বললো, নাঃ, নিজেকে চেক করলুম। যদি ওঁদের সামনে উল্টো-পাল্টা কিছু বলে ফেলি, তোর বাবা-মা দুঃখ পাবেন। তুই সত্যি বিয়ে করতে রাজি আছিস নাকি রে, অলি?

উত্তর না দিয়ে অলি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।

বর্ষাও হেসে উঠে বললো, মেসোমশাই-মাসিমাকে এত ওলড ফ্যাশানড বলে তো মনে হয়নি কোনোদিন। বাড়িতে লোক ডেকে মেয়ে দেখানো...এতে পর্যন্ত রাজি হলেন?

– বাবা কোনো কিছুতেই না বলতে পারেন না।

– তোকে ওঁরা গান গাইতে বলেনি? শক্ত ইংরেজী শব্দের বানান জিজ্ঞেস করেননি? একটু হাঁটো তো মা, বলে পায়ের কোনো খুঁত আছে কিনা দেখার চেষ্টা করেনি?

– প্রায় সেই রকমই। জজমশাই দু'লাইন শেক্সপীয়ার কোট করে আমার দিকে চোখ সরু করে তাকালেন, কোন নাটকের সেটা আমি ধরতে চাইছি কি না জানতে চাইছিলেন।

– তুই বললি?

– কিছুই বলিনি। বললে বলা উচিত ছিল মিস কোট করেছেন। উনি ওথেলো থেকে বলতে গেলেন ঃ

Keep up you bright Swords, for the dew will rust them
Good Signior, you shall more command will years
Than with your weapons...

এর মধ্যে মেঘের with-টা বাদ দিয়ে ফেললেন।

– হঠাৎ এই লাইনগুলো কোট করার মানে?

– অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী! নিজের বয়েসের কথা বলতে গিয়ে...

দুই সখী এবার হাসলো অনেকক্ষণ ধরে। যে কোনো উচ্চ পদ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি বর্ষার একটা অবজ্ঞার ভাব আছে, সে চুটিয়ে ঠাট্টা করলো নানা রকম। তারপর এক সময় সে বললো, এবার আমি উঠি রে, অলি।

অলি বললো, কেন, বোস না। এরপর চা খেয়ে সেকেণ্ড পেপারটা একটু পড়বো।

বর্ষা তার চুলের গোছায় একটা গিট বাঁধতে বাঁধতে বললো, নাঃ, বিকেল হয়ে গেল, এখন তোদের বাড়িতে অনেক লোকজন আসবে।

– আর কেউ আসবে না। এ ঘরে আসবে না।

– ঐ পাগলা অতীনটা যদি এসে পড়ে...না বাবা, আমি পালাই!

– যদি আসেই বা, তুই কি বাবলুদাকে ভয় পাস নাকি?

– ভ্যাট, তোর ঐ প্যাংলা চেহারার বাবলুদাকে আমি ভয় পেতে যাবো কেন, কোনো ছেলেকেই

আমি ভয় পাই না। কিন্তু...আমার মনে হয়...ঐ অতীন মজুমদার আমাকে ঠিক পছন্দ করে না। আমার দিকে কীরকমভাবে যেন তাকায়...আমাকে বোধ হয় সন্দেহ করে।

অলি সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার কথার প্রতিবাদ করতে পারলো না। এ কথা তো ঠিকই, অতীন বর্ষাকে পছন্দ করে না, বর্ষার প্রসঙ্গ উঠলেই 'তোর ঐ ফেমিনিষ্ট বন্ধুটা' বলে ঠাট্টা করে, যদিও বর্ষার সামনে সে কিছু বলে না।

কিন্তু একটা শব্দে তার খটকা লাগলো। সে বললো, সন্দেহ মানে, তোকে কী সন্দেহ করবে?

বর্ষা বললো, ও হয়তো ভাবে, আমি তোকে খারাপ করে দিচ্ছি!মি তোকে বখাচ্ছি!

অলি বললো, আ-হা-হা-হা!

বর্ষা অলির একটি হাত ধরে তার পাশে নিজের অন্য হাতটি রেখে বললো, দ্যাখ অলি, তুই যে আমার তেকে বেশি ফর্সা তাই-ই না, তোর হাত কত নরম, তুলতুলে, আঙুলগুলো সরু সরু, আর্টিস্টিক, আর আমার হাত শক্ত, কড়া কড়া। দশ-এগারো বছরধরে আমি নিজের বাড়ির বাসনপত্তর মাজি, ঘর ঝাঁড় দিই, রান্না রান্না করি...তোর থেকে আমার অভিজ্ঞতা কত বেশি, আমার যখন তের বছরবয়েস, আমার এক কাকা আমাকে মোলেস্ট করেছিল, আমি যত রকম খারাপ গালাগাল শুনেছি, তুই কল্পনাও করতে পারবি না, তুই কখনো গয়নার দোকানে গয়না বিক্রি করতে গেছিস একা একা? আমাকে যেতে হয়েছিল, কলেজে ভর্তি হবার আগে, দাদাকে না জানিয়ে মায়ের একটা গয়না বউবাজারের এক দোকানে...আমাকে প্রথমেই কী বললো জানিস, কোন্ বাড়ি থেকে গয়নাটা চুরি করেছো? আমাকে ভেবেছিল কোনো বাড়ির ঝি...আর একজন জিজ্ঞেস করলো, এই,তুই বুঝি হাড়কাটায় থাকিস?...অলি, তুই জানিস, কাকে হাড়কাটা বলে? থাক, তোর জেনে দরকার নেই...সেদিন আমি এমন ভয় পেয়েছিলুম, ভেবেছিলুম ওরা আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে...সেই দোকানে আর একটা লোক বসেছিল, এখনও মনে আছে তার চেহারা, কালো, রোগা, সিল্কের জামা-পরা, গায়ে আতরের গন্ধ, সে আমায় বলেছিল, খুকী, তুমি গয়না বিক্রি করো না, আমার সঙ্গে চলো, তোমায় টাকাটা দিয়ে দেবো...সে লোকটাও ছিল বদমাইশ...

হঠাৎ থেমে গিয়ে বর্ষা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো হাঁটুর ওপর থুতনি ঠেকিয়ে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, জগদীশ আমাদের চা দেবে না?

অলি জিজ্ঞেস করলো, তোর তের বছর বয়েসে...তোর কাকা তোকে মোলেস্ট করেছিল মানে?

– সে সব ডিটেইলস্ তোর শুনে দরকার নেই...তখন আমরা আরপুলি লেনের একটা বাড়িতে দেড়খানা ঘরে গাদাগাদি করে থাকতুম, বাবা সদ্য মারা গেছে...ঐ রকমভাবে অনেক ফ্যামিলিই তো থাকে, একখানা দেড়খানা ঘরে সাত-আটজন...সে সব পরিবারের মরালিটি একেবারে অন্য রকম...সবচেয়ে বেশি সাফার করে উঠতি বয়েসের মেয়েরা...এক এক সময় আমার কী কষ্ট যে হতো, নিরিবিলিতে একটু পড়াশুনোর জায়গা পেতুম না...বেড়াল যেমন তার বাচ্চা মুখে করে ঘোরে, সেই রকম আমি বই বুকে নিয়ে একবার ছাদে, একবার সিঁড়িতে...

দরজায় শব্দ হতেই অলি উঠে গিয়ে দরজা খুলে জগদীশের কাছ থেকে চায়ের পেয়ালা নিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এক কাপ? আমার জন্য আনিস নি?

জগদীশ বললো, ধরো না! তোমার জন্য দুধ আনছি একটু পরে।

অলি লজ্জা পেয়ে ধমক দিয়ে বললো, দুধ আনতে হবে না, তুই আমাকেও চা দে।

বর্ষা বললো, তুই দুধ খা না, অলি। তোর অভ্যেস।

– না, আমি মোটেই রোজ বিকেলে দুধ খাই না। এই জগদীশটার মাথায় কিছু নেই...এই, যা, চা আন। আমাদের জন্য বিস্কুট আর সন্দেশও আনবি...

ফিরে এসে বললো, সে শোনবার মতন কিছু নয়। একঘেয়ে ব্যাপার। প্রেসিডেন্সিতে ঢোকবার আগে,জানিস, আমি বাবতুম, আমাদের জীবনটা তো এই রকমই, এইটাই যেন স্বাভাবিক। তারপর তোদের মতন কয়েকজনের সঙ্গে মিশে, তোদের বাড়িতে এসে বুঝতে পারলুম, আমাদের জীবনের এত তফাত যেন আলাদা আলাদা গ্রহ...তোরা কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস উপভোগ করতে পারিস, গান-বাজনা, ছবি,...তারপর একটু একটু করে পাপড়ি মেলা, তারপর সৌরভ, এরপর তো প্রজাপতি বা মৌমাছি আসবে...আমার এক জ্যাঠতুতো বোন ছিল, জানিস, ছিল মানে এখনও আছে, বিয়ে হয়ে গেছে...এক সময় আমাদের বাড়ির দুখানা বাড়ি পরেই থাকত, তার যখন পনেরো বছর বয়েস, তখনই সে ওদের বাড়িওলার ছেলের সঙ্গে কয়েকবার শুয়েছে...শুনে আমার যা গা ঘিন ঘিন করছিল...তুই

ভেবে দ্যাখ, ভালোবাসা কাকে বলে তা জানলোই না, তার আগেই শরীর চিনে গেল, তাও একটা লম্পটের সঙ্গে, সে লোকটি আমার ঐ বোনকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেনি। তা নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট হয়েছিল...কী কদর্য, অশ্লীল ব্যাপার...এই সব দেখে দেখে পুরুষ জাতটার ওপরেই আমার রাগ জন্মে গেছে।

অলি মৃদু স্বরে বললো, কিন্তু মনীশ? তুই ওকে আগের মতন আর বকাঝকা করিস না দেখেছি।

– হ্যাঁ, মনীশটা একেবারে নাছোড়বান্দা। ও আমার মধ্যে কী যে পেয়েছে! আমার না আছে রূপ, না আছে কোনো গুণ, সব সময় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলি...তবু ও আমার কাছে...তোর কথা না হয় বাদই দিলুম, অলি, তোর কাছে ঘেঁষতে অনেক ছেলেই ভয় পাবে, কিন্তু বেদয়ানী শ্বেতশ্রী, কুমকুম এই সব সুন্দরীরা থাকতেও—

– খুব হচ্ছে, না বর্ষা? তোর এরকম টল, সুন্দর ফিগার, তুই পড়াশুনোয় এত ব্রাইট

– ব্রাইট না ছাই! স্কলারশিপ না পেলে এম-এ পড়তে পারবো না, তাই দাঁতে-দাঁত চেপে সব মুখস্থ করে যাচ্ছি...আমিমনীশকে বলেছি, দ্যাখো বাপু, যতই আমার পেছনে ঘোরো, অন্তত দশ বছরের আগে আমার সঙ্গে ঘরটর বাঁধার কথা স্বপ্নেও মনে স্থান দিও না! এই পরীক্ষার পরেই আমি চেষ্টা করবো, আমার দাদার সংসার থেকে আলাদা হয়ে যেতে। বৌদি আমার মায়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না। বৌদি থাক তার নিজের সংসার নিয়ে। আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই কি নিজের বিধবা মায়ের দায়িত্ব নিতে পারবো না? ছেলেদেরই যে সব সময় শুধু বুড়ো বাপ-মায়ের দায়িত্ব নিতে হবে তার কী মানে আছে? আমি একটা মিশনারি স্কুলে চাকরি পেতে পারি, মোটামুটি একজনের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, সকালবেলা সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্লাস, ভালো মাইনে দেবে, আলাদা বাড়ি ভাড়া করে মা আর ছোট বোনটাকে নিয়ে যাবো, ছোট বোনটাকে লেখাপড়া শেখাবো, তারপর সে যা খুশি করবে, আমি অন্তত পি এইচ ডি না করে অন্য কিছু ভাববো না।

– তুই অনেক দূর পর্যন্ত প্ল্যান করে ফেলেছিস দেখছি।

– তুই বুঝি ভবিষ্যতের কথা কিছু ভাবিসনি?

– না।

– তোর বাবা-মাই ভাবছেন। হ্যাঁরে, অলি, ঐ বাবলুদা তোকে চুমু খেয়েছে?

অলি কোনো উত্তর দিল না, বর্ষার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বর্ষা আবার জিজ্ঞেস করলো, তুই ওর সঙ্গে শুয়েছিস একদিনও?

এবারে অলি কাতরভাবে বর্ষার হাত ধরে বললো, বর্ষা, প্লীজ, ওভাবেকথা বলিস না!

শোওয়া-টোওয়ার কথা এমন অনায়াসে বলে বর্ষা যেন জল-ভাতের মতন ব্যাপার। কিন্তু শোনা মাত্র অলির বুকে দুম দুম করে শব্দ হয়।

বর্ষা বললো, কেন জিজ্ঞেস করছি জানিস? শোন, তোকে একটা ঘটনা বলা হয়নি। গত মাসে মনীশ আমাকে একদিন ব্যারাকপুরে বেড়াতে নিয়ে গেল। আমি তো আগে কখনো যাইনি, সেদিন ভাবলুম, ঠিক আছে, দেখাই যাক না। সবাই ভাবে আমার কোনো রস-কষ নেই, আমার মধ্যে নাকি একটুও রোমান্টিজ্‌ম নেই, তাই ভাবলুম দেখা যাক, গঙ্গার ধারে কোনো ছেলের মুখে প্রেমের কথা শুনতে কেমন লাগে। ব্যারাকপুরে একটা গান্ধী ঘাট হয়েছে জানিস তো, বেশ সুন্দর জায়গা,মনীশ আমাকে সেটা দেখাবার নাম করে নিয়ে গেল...আসলে অন্য মতলোব, জানিস তো! ব্যারাকপুরে ওর দাদার বাড়ি, দাদারা সবাই ওয়ালটেয়ার বেড়াতে গেছে, সেই বাড়ির চাবি মনীশের কাছে...সেই বাড়িতে ঢুকেই মনীশ আমাকে তিনটে চুমু খেল!

অদ্ভুত ধরনের একটা হাসি দিয়ে অলির মুখের দিকে তাকিয়ে বর্ষা জিজ্ঞেস করলো, তুই বিশ্বাস করছিস না আমার কথা?

– কেন বিশ্বাস করবো না! ঠিক তিনটেই?

– শোন না! মনীশটা পাগলের মতন করছিল, তাই আমি প্রথমে দুটো চুমু অ্যালাউ করলুম।

– অ্যালাউ করলি? উইদাউট এনি পারটিসিপেশান?

– হ্যাঁ। তাও করেছি, মনীশ বললো, ওর পিঠে হাত রেখে জড়িয়ে ধরতে। সত্যি কথা বলছি, খুব একটা খারাপ লাগেনি। দারুণ ভালো যে কিছু, একেবারে আহা মরি ব্যাপার, তাও না! ঠিক আছে, মাঝে মাঝে কখনো-সখনও চলতে পারে।

অলি হাসতে লাগলো।

– তুই হাসছিস? বাকিটা শোন! সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন, তিনতলার বারান্দা থেকে জ্যোৎস্না গঙ্গা দেখাবে বলে মনীশ আমাকে নিয়ে এলো বেডরুমে। আমাকে সিডিউস করে যাচ্ছে, আমার সঙ্গে শুতে চায় আর কি! ঐ বাড়ির চাবি খোলার পর থেকেই আমি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিলুম...আমার সেক্স নিয়ে কোনো ইনহিবিশান নেই, আমার বাড়িতে এমন কোনো গার্জেনও নেই যে বেশি রাত করে ফিরলে বকুনি দেবে, আমার যা ইচ্ছে হবে, আমি তা করতে পারি। কিন্তু আমার ইচ্ছে করলো না! তোকে আমি সিনসিয়ারলি বলছি, আমার মনের ভেতর থেকে কোনো সাড়া পেলুম না, একটা ফাঁকা বাড়ি পাওয়া গেছে বলেই...হোল আইডিয়াটা আমার কাছে রিপেলিং মনে হলো, আমি মনীশকে বললুম, নথিং ডুয়িং, ফরগেট ইট

– মনীশ জোর করতে চায় নি?

– আমার ইচ্ছে না থাকলেও কেউ আমার ওপর জোর করবে? আমি তো এখন আর সেই বারো-তের বছরের কচি খুকিটি নেই! মনীশকে বললুম, ওসব হবে না। তখন মনীশ কাকুতি-মিনতি করে আর একবার চুমু খেতে চাইলো, সেটাই হলো থার্ড চুমু! তারপর অনেকক্ষণ এমনি এমনি বসে গল্প করলুম রে!

জগদীশ দ্বিতীয় কাপ চা ও সন্দেশ দিয়ে গেছে। সেগুলো খেতে খেতে অলির মনে পড়লো বাবলুদার সঙ্গে তার মেমারি থেকে কৃষ্ণনগর যাওয়ার দিনটার কথা। কিন্তু বর্ষাকে সে কথা তার বলতে ইচ্ছে করলো না। মনীশের সঙ্গে বাবলুদার কোনো তুলনাই চলে না।

একটুক্ষণ আপন মনে খুঁটে খুঁটে সন্দেশ খেতে খেতে বর্ষা হঠাৎ একটা অন্য রকম মুখ তুললো। সঙ্কটের ছায়া মাখানো, একটু যেন বিষণ্ণই। নিজে উঠে গিয়ে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে এসে সে আর একটি সিগারেট ধরালো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, এবারতোকে আমি একটা কথা বলবো, অলি, যা শুনলে তুই হয়তো রেগে যাবি। কিন্তু কথাটা আমার বলাই উচিত, চেপে রাখার কোনো মানে হয় না। এ কথা শোনার পর তুই যদি তোর বাড়িতে আমাকে আসতে বারণ করে দিস, তাহলে আর আমি আসবো না, তবু আমাকে বলতেই হবে।

অলির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। কী এমন কথা বলতে চায় বর্ষা? সে কোনো কঠিন কথা শুনতে চায় না। সে কি অজান্তে কখনো বর্ষার সঙ্গে কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করেছে? এ বাড়ির অন্য কেউ?

বর্ষা বললো, সেদিন মনীশ অত করে চাইলেও কেন আমার ইচ্ছে করলো না? কেন কোনো ছেলের সঙ্গে একা একা ঘুরে বেড়াতে কিংবা গল্প করতে আমার তেমন আগ্রহ হয় না? আমি নিজের মনটা অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করি। আমার আগে কয়েকটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হলেও...তারা তো কেউ বন্ধু ছিল না। কিন্তু এখনও যে-সব ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, তাদের কারুর সঙ্গেই...তোর একটা পরিষ্কার সত্যি কথা বলি, গত দু'মাস ধরে এই প্রশ্নটা আমার মাথার মধ্যে খুব ঘুরছে, আমি কি লেসবিয়ান?

অলি সঙ্গে সঙ্গে বললো, যাঃ!

– এ রকম তো হতেও পারে। অনেকের ক্ষেত্রে এটা একটা বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টের মতন, বিদেশে অনেকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে, হোমো-সেক্সুয়ালরা যদি সংখ্যায় এত বেশি হতে পারে...দু'তিন বছর আগে কলকাতায় অ্যালেন গীংসবার্গ বলে একজন বীটনিক কবি এসেছিল, সঙ্গে তার বউ, সে একজন পুরুষ!

– এ সব কথা আমার শুনতে ইচ্ছে করছে না রে, বর্ষা!

– আমার কথাটা তোকে শুনতেই হবে। অলি, আমি যখন বাড়িতে একা একা থাকি, তখন মনীশ বা অন্য ছেলেদের কথা আমার বিশেষ মনে পড়ে না, আমার প্রায় সর্বক্ষণ মনে পড়ে তোর কথা। তোর সঙ্গে দু'তিন দিন দেখা না হলে আমার মন ছটফট করে। কোনো দিন যদি তোর সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করি, পরে সে জন্য আমার এত মন খারাপ লাগে, কিংবা, তুই যদি আমার সঙ্গে ভালো করে কথা না বলিস,তুই যদি অতীন মজুমদারের সঙ্গে চলে যাস...ওর সঙ্গে আমার ভাব হলো না কেন জানিস, ওকে আমি আসলে ঈর্ষা করি। তোকে আমি এত ভালোবাসি, ও তার ওপর ভাগ বসাচ্ছে...অতীনও নিশ্চয়ই সেটা বোঝে, তাই আমাকে পছন্দ করে না।

অলির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে, সে কোনো কথা বলতে পারছে না। সে তাকাতেও পারছে না বর্ষার দিকে।

– আমি তোকে ভালোবাসি অলি! যে-কোনো সুন্দর কিছুর কথা মনে পড়লেই তোর মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেদিন ব্রাউনিং-এর কবিতাগুলো পড়তে পড়তে আমি ভাবছিলুম এই সব কথাই যেন আমি তোকে বলতে চাই...অলি, আমি কি সত্যি লেসবিয়ান? আমি কি তোদের ছেড়ে চলে যাবো? আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তবু...তবু...আজ যখন প্রসঙ্গটা উঠলোই, তুই আমাকে একটা এক্সপেরিমেন্ট করার চান্স দিবি?

অলি তবু চুপ করে আছে দেখে বর্ষা তার থুতনিতে আঙুল ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুই আমার কথা শুনছিস না?

অলি মুখ না তুলেই বললো, শুনছি।

– আমি এর মধ্যে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে লেসবিয়ানিজ্‌ম নিয়ে পড়াশুনো করেছি। আমি মিলিয়ে দেখে সিওর হতে চাই, অলি, একবার যদি এক্সপেরিমেন্ট করি, অলি, একবার...

– কী?

– একটু উঠে দাঁড়া।

বর্ষা নিজেই অলিকে দাঁড় করলো. ফেলে দিল তার বুকের আঁচল। তারপর দরজায় পিঠ দিয়ে সে আলিঙ্গন করলো অলিকে। অলির অনিচ্ছুক হাত দুটি জড়িয়ে নিল নিজের গলায়, অলির গালে সে গাল ঠেকিয়ে রাখলো।

অলি বাধা দিল না। একটা কথাও বললো না। মাত্র দু'এক সপ্তাহ আগেই সে একটা পেপার ব্যাক উপন্যাসে লেসবিয়ানদের কথা পড়েছে। অবাস্তব কিছু নয়। তবু তার যেন সাঙ্ঘাতিক ভয় করছে। যেন কোথাও যেতে যেতে চেনা রাস্তা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে, একটা খাদের কিনারে দাঁড় করানো হয়েছে তাকে।

বর্ষা তাকে জড়িয়ে ধরে আছে—কতক্ষণ...যেন মিনিটের পর মিনিট...অনেকক্ষণ কেটে যাচ্ছে...

বর্ষা তার একটা হাত বুলোচ্ছে অলির পিঠে। তার উরু দুটি অলির উরুর সঙ্গে জোড়া। বর্ষা তার হাতটি সামনের দিকে এনে একবার অলির বুকে রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে সে অলিকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে পড়লো বিছানায়। উপুড় হয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

অলি আরও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তা হলে কী হলো শেষ পর্যন্ত,খাদের কিনারে এসে কি বর্ষা পড়ে গেল নিচে? বর্ষর মতন মেয়ে যে কাঁদতে পারে, তা যেন কল্পনাই করা যায় না। অলি এখন কী করবে!

একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অলি বিছানার কাছে এসে বললো, এই বর্ষা, কী হলো? এই—

বর্ষা মুখ তুললো। সত্যি চোখের জলে তার মুখখানা মাখামাখি, কিন্তু সে হাসছে। অলিকে আবার জড়িয়ে ধরে সে বললো, আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে রে! তুই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিস, অলি, অন্য যে-কোনো মেয়ে আমাকে ভুল বুজতো।

অলিকে ছেড়ে সে আঁচল দিয়ে মুখ চোখ মুচলো। তারপর শান্ত গলায় বললো, তোর ঐ পাগলা অতীনটাকে বলিস, আমার ওপর রাগ করার কোনো দরকার নেই। আমি ওর ভালোবাসায় ভাগ বসাবো না। আমি লেসবিয়ান নই!

– কে কি তোকে লেসবিয়ান বলেছে? তুই নিজেই তো—

– জানিস, কোনো গোপ কঠিন অসুখ হলে যেমন কারুকে বলা যায় না, সেই রকমই প্রায় গত একটা মাস...আমি অবসেস্‌ড হয়ে গিয়েছিলুম, আমি সত্যি ভেবেছিলুম...আমি লেসবিয়ান, আমাকে সবাই অস্ট্রাসাইজ করে দেবে...কিন্তু আমি যাকে ভালোবাসি, আজ তাকেই সত্যি সত্যি ফিজিক্যালি জড়িয়ে ধরে দেখলুম, অন্তত পাঁচ মিনিট তো হবেই, আমার কোনো সেক্স-ইমপালস এলো না, আমার একবারও ইচ্ছে করলো না তোকে চুমু খেতে...কিংবা...তার মানে মেয়েদের শরীরের প্রতি আমার আকর্ষণ নেই...তোর প্রতি আমার যে ভালোবাসা, সেটা পিওরলি ইমোশানাল, তার মধ্যে কোনো সেক্স নেই...

বর্ষার চোখ আবার সিক্ত হয়ে গেল, ধরা গলায় সে বললো, আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, অলি, যেন আমার নতুন জন্ম হলো।

অলি এবারে দুষ্টুমী করে বললো, কিন্তু তুই যখন আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলি, আমার তো তখন বেশ ভালো লাগছিল। তা হলে কি আমি লেসবিয়ান?

বর্ষা বললো, ভ্যাট, একটা চাঁটি খাবি। অতীনটা একটা লাকি ডগ, তোর মতন মেয়েকে ভালোবেসে ধন্য হয়ে যাবে।

– তুই অনেক কিছুই ধরে নিচ্ছিস, বর্ষা। বাবলুদা যে আমাকে ভালোবাসে তাই বা তোকে কে বললো? মেলামেশা করলেই ভালোবাসা হয়? বাবলুদা তো আমাকে নিজের মুখে কোনোদিন ওসব কিছুই বলেনি!

– ওর টাইপটাই আলাদা। ওরা মুখে গদোগদো প্রেমের ডায়লগ দেবে না কক্ষনো! ঐ অতীনটা এক একদিন কফি হাউসে এসে যতই পাগলামি করুক, ওর কিন্তু একটা সিরিয়াস দিক আছে, সে জন্য আমি ওকে একটু একটু শ্রদ্ধা করি। ও দেশের কথা ভাবে, এই দেশের সিসটেমটা বদলাতে চায়। হ্যাঁরে, অতীন মজুমদার কম্যুনিস্ট, তাই না?

অলি দু'দিকে মাথা নাড়লো।

– ওদের সায়েন্স কলেজের পুরো ব্যাচটাই কম্যুনিস্ট। আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছেলেগুলো সব কেমন যেন ম্যাদামারা। মনীশকে আমার তেমন পছন্দ হয় না কেন আজ বুঝতে পারলুম। কারণ, ও মেয়েলি।

বই-খাতা টেনে নিয়ে বর্ষা এবার গম্ভীরভাবে বললো, নাও গার্লস, ব্যাক টু ওয়ার্ক। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এখন তাহলে সেকেণ্ড পেপারটা ঝালানো হোক।

বর্ষা বাড়ি ফিরে গেল ন'টার সময়। তার পরেও অলি পড়তেই লাগলো। জগদীশ তাকে খাবার জন্য ডাকতে এলেও সে গেল না। বর্ষা চলে যাবার পর তার বিকেলের ঘটনাটা মনে পড়ে গেছে। উদ্ভট সাজপোশাক করা দু'জন নারী-পুরুষের সামনের বাবা-মা তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান করেছে। এখন বাবা-মা'র সামনে গেলেই অলির ঝগড়া হবে।

বিমানবিহারী নিজেই একটু পরে এলেন অলির ঘরে।

দু'বার তাঁর ডাক শুনেও অলি মুখ ফেরালো না। বিমানবিহারী কাছে এসে মেয়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, যুগ পাল্টেছে, আজকাল পুরুষ মানুষদের কী দুর্দশা! সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। সারা জীবন বউয়ের কাঁটা হয়ে রইলুম, এখন মেয়ের বয়ে কাঁপছি। ওরে একবারও তাকাচ্ছিস না, আমাকে কি ভস্ম করে দিবে নাকি?

অলি মুখ ফেরাতেই তিনি আঙুল তুলে বললেন, রাগের কথা, বকুনির কথার আগে আমার কথা শুনতে হবে। দুটো মাত্র কথা। এক নম্বর হলো, জাস্টিস মিত্র আর ওঁর স্ত্রীকে আমরা নেমন্তন্ন করে ডেকে আনি নি, ওঁরা নিজের থেকেই এসেছেন, সোস্যাল ভিজিট। ওঁরা তোর সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন, সে ক্ষেত্রে না বলাটা অভদ্রতা নয়? ওঁদের দু'জনের আলটিরিয়ার মোটিভ যাই-ই থাকুক না কেন, আমরা নির্দোষ।

আর দু'নম্বর কথা হলো, এটা আমি মুদু নিজের দায়িত্বে বলছি, তোর মা আমার সঙ্গে এক মত নাও হতে পারেন, সেটা হচ্ছে, আমি মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নই। আমার ছেলে নেই, শুধু শুধু মেয়েদের হুড়োতাড়া করে বিয়ে দিয়ে বাড়ি খালি করতে চাইবো কেন? যত দেরি হয় ততই তো ভালো। আমার দুটি কন্যারই যখন ইচ্ছে হবে বিয়ে করবে। আর তোরা যদি বিয়ে করতে একেবারেই না চাস, তাতেও আমার আপত্তি নেই..

বাবা-মেয়ে পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো অপলক। অলির চোখ নরম হয়ে এসেছে, বাবাকে যে সে কতখানি ভালোবাসে, এই রকম এক এক সময় যেন নতুন করে টের পায়।

বিমানবিহারী হেসে বললেন, খাবার টেবিলে সব ঠান্ডা হচ্ছে, আমি এখনও খাইনি, আজ রাত্তিরে কি মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়ার সৌভাগ্য আমার হতে পারে? বেশ চনমনে খিদে পেয়েছে...

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অলি ভাবলো, একমাত্র বিয়ে করা ছাড়া, বাবার কথা শুনে পৃথিবীর আর যে-কোনো কাজ করতে পারে সে।

॥ ৪৭ ॥

একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ভর্তি মাছের ঝোল নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো মঞ্জু। একতলার রান্নাঘরে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হচ্ছে, তা শুনে বুঝলো যে মনিরাদের এখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি। কে এসে একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো, এই নে, এটা রাখ।

নিচের এই ঘরটি এক সময় নোকরের ঘর ছিল, একটি মাত্র উত্তরের জানলা, প্রচণ্ড গরম। মনিরার সারা মুখ ঘামে ভরা একটা কস্তা ডুরে তাঁতের শাড়ি পরে আছে সে শাড়িটা বেশ ময়লা।

দুঃখত মুখ তুলে সে বললো, আবার কী আনছেন, আপা? কেন যে আপনে...

– নে, ধর আগে। দেখিস্‌ গরম ...

– এতগুল মাছ...কে খাবে?

মঞ্জু দেখলো, কড়াইতে কী একটা শাক চড়িয়েছে মনিরা। মঞ্জু শাকপাতা বিশেষ চেনে না, তাদের বাড়িতে কেউ ওসব খায়ও না। মনিরা একদিন গল্প করেছিল, পাশের পাড়ার বড় উকিল সইফুদ্দিন চৌধুরীদের বাড়ির পেছনের পকুর ধারে কলমী শাক ফলে থাকেত দেখে সেকোঁচর ভর্তি তুলে এনেছে। বিনা পয়সায় হয়ে গেল। মঞ্জুর ধারণা, বিনা পয়সায় যা পাওয়া যায়, তা আগাছা, তা মানুষের খাদ্য নয়। পুকুর ধারে তো গরু-ছাগলের এসব খায়। মনিরার কলমী শাকের গল্প শুনে মঞ্জুর কষ্ট হয়েছিল।

আর একদিন মঞ্জু দেখেছিল, মনিরা লাউয়ের খোসা আর আলুর খোসা ভাজছে। ঐ ফেলে দেবার জিনিসগুলো কোনদিন কারুকে বেজ্ঞে খেতে দেখেনি মঞ্জু।

আজ মনিরা রেধেছে, বাত ডাল, আর একটা লাউয়ের ঘণ্টা কড়াইতে চাপানো শাকটাই তার শেষ পদ। পঞ্জু চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। সিরাজুলের মতন একটা জোয়ান ছেলে এই খেয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

সিরাজুলকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছে বাবুল। দিনি-কাল পত্রিকা অফিসে সে একটা প্রুফরিডারের চাকরিও পেয়েছে। দিনেরবেলা কলেজ, রাত্তিরে কাজ। প্রুফরিডারের চাকরির মাইনে সামান্য হলেও সিরাজুলের আত্মসম্মান বোধ আছে, বাবুলের কাছে সে পুরোপুরি আশ্রিত হয়ে থাকতে চায় না, মঞ্জু প্রথম থেকে অনুরোধ করলেও সে অন্নদাস হতে রাজি হয়নি। ওরা দু'জনে আলাদা রান্না করে খায়।

ওই অল্প বয়স্ক দম্পতিকে মঞ্জু খুব কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করে। সকালেওরা নাস্তার সময়েও ভাত খায়, পান্তা ভাত। একটু পেঁয়াজ-কাঁচা মরিচ আর শুধু ভাত। তারপর দুপুরে বাত খায়, রাত্তিরেও ভাত খায়। সঙ্গে সামান্য কিছু ভাজি আর সবজি। মাছ-মাংসের নাম-গন্ধ নেই, বড়জোর দু-একদিন আন্ডার ঝোল। একদিন দুপুরে মনিরা শুঁটকি মাছ রান্না করেছিল, ঠিক সেইদিনই সে সময়ে এ বাড়িতে আলতাফ এসে উপস্থিত। গন্ধ পেয়ে সে বাড়ি মাথায় করে তুললো।

মঞ্জুর শ্বশুর বাড়িতে শুঁটকি মাছ খাওয়ার চল নেই। আলতাফ বাবুলের স্বভাবে বেশ শহুরে শহুরে বাব, আলতাফ তো এখন পুরোদস্তুর সাহেব। এ বাড়িতে সিরাজুল-মনিরাকে থাকতে দিতে আরতাফ আপত্তি করেনি, তা বলে বাড়িটাকে ভাড়াটে-বাড়ি বানিয়ে তোলা চলবে না। শুঁটকি মাছ ফাচ রান্না করা চলবে না, সদর দরজা দিয়ে দেখা যায় এমন জায়গায় শায়া-লুঙ্গি মেলা চলবে না, স্বামী-স্ত্রীর কথা কাটাকাটির সময় দরজা জানলা বন্ধ রাখতে হবে, পাড়া-প্রতিবেশীদের শোনানো চলবে না।

এরপর মঞ্জু কতবার মনিরাকে অনুরোধ করেছে শুঁটকি মাছ রান্না করার জন্য, সে নিজে খেতে চেয়েছে, তবু মনিরার জেদ, সে আর একদিনও শুইক রাঁধেনি। মনিরাদের জামা কাপড় সে ছাদে শুকোতে দিতে বলেছে, কিন্তু মনিরা চাদে যায় না, বোধ হয় জামা-কাপড় কাচেই না। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনো কথা কাটাকাটি হয় কি না, তাও টের পায় না মঞ্জু।

আলতাফ অবশ্য নির্দয় নয়। সিরাজুলকে সে নিজে ডেকে তাদের পত্রিকায় চাকরি করে দিয়েছে, মনিরাকেও সে হোটেলে একটা কাজ দিতে চেয়েছিল। মনিরার কম বয়েস সে চটপট কাজ শিখে নিতে পারবে প্রথম কিছুদিন সে হোটেলের ঘরে ঘরে বিছানায় চাদর, বালিশের ওয়াড়, বাথরুমের তোয়ারে বদল করার কাজ করবে, তারপর সে স্টোর কীপারের পদে প্রমোশন পেতে পারে। তখন অনেক মাইনে হবে। কিন্তু সিরাজুল তার স্ত্রীকে চাকরি করতে পাঠাতে রাজি হয়নি।

তা হলেও, এ বাড়িত এলেই আলতাফ একবার করে ওদের খোঁজ খবর নেয়। গত মাসেও আলতাফ সিরাজুলকে একটা প্রস্তাব দিয়েছে। নিউ এস্কাটনে আলতাফ নিজস্ব একটা ফ্ল্যাট বাড়ি বানাচ্ছে, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সিরাজুল ইচ্ছে করলে সেই বাড়ির কেয়ারটেকার হয়ে থাকতে পারে, সেখানে তারা দু'খানা ঘর পাবে এবং কোনো ভাড়া লাগবে না।

সিরাজুল তাতেও রাজি হয়নি, সে বলেছে যে বাবুলভাইয়ের কাছ থেকে সে পড়াশুনা দেখে-বুঝে নেয় প্রায়ই, সেইজন্য সে বাবলুভাইয়ের দূরে থাকতে চায় না।

বাবুল অবশ্য মঞ্জুকে বলেছে যে কলেজী শিক্ষা পাওয়ার জন্য সিরাজুল নোয়াখালি থেকে ঢাকা চলে এলেও তার লেখাপড়া শেখার আশা খুবই কম। তার স্কুলের শিক্ষার ভিতই খুব কাঁচা তার ওপর

দু-দিন বছর গ্যাপ গেছে। ছেলেটার ইচ্ছে আছে খুবই, গোঁয়ারের মতন মুখস্ত করতে পারে কিন্তু বেশিক্ষণ পড়ার সময়ও তো তার নেই। গরিবের ছেলে যদি ছাত্রজীবনেই সংসারী হয় তাহলে তার লেখাপড়া শেখার শখ অনেকটা কাটা মুণ্ডের দিবাস্বপ্নের মতন।

প্রথম কিছুদিন বাবলু নিজেই খুব গরজ করে সিরাজুলকে নিয়ে পড়াতে বসিয়েছে, এখন সে সিরাজুলকে এড়িয়ে চলে। তার ধারণা, ওকে সারাজীবন ঐ প্রুফ রিডার হয়েই কাটাতে হবে, একটা ডিগ্রি জোগাড় করতে না পারলে সে সাব-এডিটরও হবে না!

একমাত্র মঞ্জুই হাল ছাড়েনি। সিরাজুলের উদ্দীপনাময় মুখ ও মনিরার সরল, জেদী জেদী ভাব দেখলে তার মায়া হয়। মনিরার বয়েস সবে মাত্র সতেরো আর সিরাজুলের একুশ, তারা নিতান্তই গ্রাম্য তরুন-তুরুণী, কিন্তু মোটেই তারা অতি সাধারণ নয়। তাদের চরিত্রে কোথাও একটা বিশেষ জোর আছে, সবরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই তারা হাসি মুখে থাকতে পারে।

একটা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে পড়ে মঞ্জু বললো, আরে ছেমরি, মুখখানা যে তোর বালিবর্ণ হয়ে গেল, এত মন দিয়া কী ছাই ঘাসপাতা রানতেছোস?

মনিরা বললো, এগুলা ঢেঁকি শাক, আপনেরা খান না, আপা?

মঞ্জু হেসে বললো, আমাগো পাকের ঘরে এইসব হাবিজাবি ঢোকে না, বাবুরা মাছ আর গোস্ত ছাড়া কোনো ভেজিটেবলই পছন্দ করেন না। কোন এক রাইটারের গল্পে যেন ঢেঁকির শাকের কথা পড়ছিলাম, খাওয়া তো দূরে থাক, দিখি নাই কখনো। দে তো, একটু চাইখ্যা দেখি!

– আপনে খাবেন আপা? কী যে কেন! আপনেগো খাওনের মতন না, আমি ভালো রানতেও জানি না!

– তুই দে তো ছেমরি!

মনিরা খুব শঙ্কুচিত বোধ করে। মঞ্জু মাঝে মাঝেই এসে তার হাতের রান্না কিছু না কিছু খেতে চায়। এইসব কি দেওয়া যায় ওকে? তাছাড়া কোন্‌ পাত্রে দেবে, তাদের ঘরে অতি শস্তার কলাইকরা কয়েকটা থালা গেলাস ছাড়া আর কিছু নেই।

বাবুল চৌধুরীর জীবিকা অধ্যাপনা হলেও সে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনের টাকায় তাকে সংসার চালাতে হয় না। তাদের টাঙ্গাইলের বাড়ি থেকে সারা বছরের খোরাকি চাল আসে। চিঁড়ে-খই-গুড় আসে। ঘি আসে, কখনও কখনও মাছও আসে। তাছাড়া ঢাকা শহরেই বাবুলদের পরিবারের আর দুটি বাড়ি আছে অফিস পাড়ায়, তার ভাড়ার একটা অংশ পায় বাবুল। মঞ্জুও এসেছে সচ্ছল পরিবার থেকে। ওদের চেহারার জৌলুসই অন্যরকম। গ্রামে থাকার সময় মনিবার কাছে এইরকম চেহারার মানুষরা ছিল অতি দূরের মানুষ, আর এখন এক অপরূপ সুন্দরী বড়লোকের বউ কি না তার রাননাঘরে পিঁড়িতে বসে তার হাতের রান্না খেতে চাইছে!

কড়াইটা উনুন থেকে নামিয়ে মনিরা জিজ্ঞেস করলো, শুধা শুধা খাবেন, না দুগ্‌গা ভাত দিয়ে খাবেন?

– দে, একটু ভাত দে!

একটি কলাইকড়া থালায় খানিকটা ভাত, ঢেঁকির শাক আর লাউয়ের ঘণ্ট বেড়ে দিল মনিরা। এদের দুটিই মাত্র থালা। এখন যদি সিরাজুল এসে পড়ে তাহলে মনিরার নিজের খাওয়ার জন্য এই থালা মেজে নিতে হবে। ওপরতলায় মঞ্জুর সংসারে থালা-বাসন অজস্র, কয়েকখানা এদের অনায়াসে দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মঞ্জু বুঝে গেছে, এদের অযাচিতভাবে সাহায্য করতে গেলেও এরা নেবে না। সিরাজুল মনিরার এই তেজটাও মঞ্জুর পছন্দ হয়।

মঞ্জু বললো, লাউয়ের রান্নাটা তো বেশ ভালো হয়েছে রে! জিরা ফোঁড়ন দিয়েছিস বুঝি?

– না, আপা, কিছুই দিই নাই। ঢেঁকির শাকটা বুঝি ভালো লাগলো না?

– কেমন যেন কাঠি কাঠি!

মরিনা চোখ গোলগোল করে বললো, খাইছে! তাইলে বোধ হয় এগুলা পাগলা ঢেঁকি! আমি চেনতে পারি নাই!

– পাগলা ঢেঁকি! সে আবার কী?

– দুই রকম ঢেঁকির শাক আছে। পাগলা ঢেঁকির কোনো শোয়াদ নাই।

– এগুলাও তুই দীঘির ধার থিকা উঠাইয়া আনছোস বুঝি?

মনিরা লাজুক ভাবে হাসলো। দিনেরবেলা সে বিশেষ বাড়ি থেকে বেরোয় না। ভোরবেলা,

সিরাজুলের ঘুম ভাঙার আগে, সে এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে আসে, কোনো মাঠ থেকে নিয়ে আসা নিমপাতা, কোনো রাস্তার ধার থেকে ডুমুর, কোনো বাগান তেকে কাঁচা তেঁতুল।

মঞ্জু বললো, তুই অ্যাতটুক একটা ছেমরি, তুই অ্যাতসব জানলি ক্যামনে রে? আমি তো পাগলা ঢেঁকির নামই শুনি নাই।

– আমরা তো গ্রামের মাইয়া, আপা।

সিরাজুল তাকে বলে ভাবী, মনিরা বলে আপা। মঞ্জুর অনেক ভাই বোন, আপা ডাকটি শুনতেই সে বেশি অভ্যস্ত।

সদর দরজা দিয়ে কে যেন ঢুকলো, মনিরা উৎসুক ভাবে দেখতে গেল বাইরে বেরিয়ে। সে ফিরে এলো একটু বাদে, তার মুখের শুকনো ভাবটা দেখেই মঞ্জু বুঝলো, সিরাজুল আসেনি।

– কে আসলো রে?

– ববুল সাহেব। আমি পানি দিতেছি, হাত ধুয়ে ন্যান।

মঞ্জু ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চিন্তা করলো। বাবুল চৌধুরী সাড়ে দশটা-এগারোটায় ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায়, দুপুর- বিকেল কোনোদিনই বাড়ি এস না, কোনো কোনোদিন রাত ন'টা দশটার আগে ফেরেই না, মাঝখানে খিদে পেলে কোনো দোকানে কিছু কেয়ে নেয়। সিরাজুল নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে সকাল ন'টার মধ্যে, দশটা থেকে তার ক্লাস; যেহেতু বইরে খাওয়ার পয়সা থাকে না তার, তাই প্রত্যেকদিন দুপুরে বাড়িতে খেতে আসে। আজ তার আসার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

মঞ্জু যে বাটি ভর্তি করে মাছ এনেছে, তার মধ্যে রয়েছে মস্ত বড় একটা কাৎলা মাছের মুড়ো। আলতাফ হোটেল থেকে প্রায়ই মাছ পাঠায়, তাদের বিলেতি ধাঁচের হোটেলে মাছের মুড়োর খদ্দের নেই বলেই বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। অত বড় মুড়ো ফ্রিজে রাখার অসুবিধে হলেই মঞ্জু নিচে নিচে নিয়ে এসেছে, এরকম একটা ব্যাখ্যা একটু আগেই মনিরাকে শোনাতে হয়েছে। ঃ

এবারে সে মুড়োটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ঐইটা তোরা দুইজনেই ভাগ করে খাবি।

মনিরা বললো, আমিমুড়া খাই না। ও তো পুরুষ মাইনসে খায়। আপা, সাহেব আসছেন, আনে উপরে যান এবার।

– দাঁড়া! আমি কি সাহেবের কনা বাঁদী নাকি, তিনি যখন তখন আইলেই আমারে গিয়া পদসেবা করতে হবে?

মনিরা আবার বিস্ফারিত চোখে তাকায়। নিরাজুল ও তার কাছে বাবুল একজন পীর-সদৃশ পুরুষ। বাবুল তাদের অনেক উপকার করেছে বলেই নয়, বাবুলের মধ্যে যে একটুও দেখানেপনার ভাব নেই, সেটাই তাদের মনে বেশি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আলতাফের মতন বাবুল কখনো উঁচু থেকে কথা বলে না। বাবুলের জন এরা দু'জন প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

ওপর থেকে বাবুলের ডাক শোনা গেল, সেফু, সেফু!

মনিরা বললো, ওই যে সাহেব ডাকছেন।

মঞ্জু দুষ্টামী করে বললো, আমাকে তো না, সেফুকে ডাকছে। তুই কি আমাকেও চাকরানীর সমান নাকি? ভাবিস

এই সব বাড়ির কর্তারা যে স্ত্রীর নাম ধরে ডাকার বদলে ঝি-চাকরের নাম ধরেই চেঁচিয়ে ডাকেন, মনিরা তা জানে। মঞ্জুর ব্যবহার দেখে ক্রমশই সে অবাক হচ্ছে।

রান্নাধরের এক কোণে মঞ্জু হাত ধুয়ে নিল। নিজের আঁচলেই মুছে নিল হাত। ওপরে তাদের পিংক টালি বসানো বাথরুমে বেসিন ও তোয়ালের রং ও পিংক। তবু মঞ্জু যেন মনিরার এই দমবন্ধ করা রান্নাঘরেই সময় কাটাতে পছন্দ করছে।

এরপর একটা রিনরিনে শিশকণ্ঠে আম্মা আম্মা ডাক শুনে মঞ্জু চঞ্চল হয়ে উঠলো। স্বামী নয়, ছেলের ডাকেই মঞ্জু ওপরে উঠে গেল দ্রুত।

সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে এসেছে গুগু, মঞ্জু তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললো, কী রে?

– আব্বু তোমায় ডাকছে!

মায়ের কোলে সে থাকতে চায় না এখন। সে সেফুর সঙ্গে লুডো খেলছিল। মঞ্জু ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে শয়নকক্ষে গেল।

জুতোও খোলেনি/বাবুল, জানলার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে চোখের সামনে বই মেলে ধরেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রাগ হয়ে গেল মঞ্জুর। বাড়িতে ফিরেই যদি বই পড়তে হয়, তা হলে মঞ্জুকে ডাকা কেন? কিছুদিন ধরেই মঞ্জু লক্ষ করছে, বাবুলের মধ্যে একটা উদাসীন ভাব। বাবুল চৌধুরীর চরিত্রে রূঢ়তা বা অভদ্রতা একটুও নেই, তবু সে যেন অতি সূক্ষ্মভাবে মঞ্জুকে অবজ্ঞা করে চলেছে। কেন, তার কারণ কিছুই জানে না মঞ্জু।

মঞ্জু কয়েক মুহূর্ত আড় চোখে তাকালো তার স্বামীর দিকে। বাবুল কথা না বললে সেও কথা বলবে না। সে হঠাৎ দেয়াল আলমারি গুছোতে শুরু করলো। আলমারিটার একটা পাল্লা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে আসে, সেটা আবার খুলতে গেলে ধড়াম করে শব্দ হলো।

এবার চাকিতে সে ফিরে তাকিয়ে দেখলো বাবুল বই নামিয়ে রেখেছে। তার সঙ্গে চোখচোখি হতে বাবুল বললো, কী?

মঞ্জুও বললো, কী?

– বিলকিস বেগমের আজ মেজাজা ঠিক নাই মনে হচ্ছে?

– তুমি হঠাৎ দুপুরবেলা বাসায় ফিরলে যে?

– দেখতে এলাম, তুমি দুপুরটা কেমনভাবে কাটাও! প্রত্যেকদিন লম্বা লম্বা দুপুর।

মঞ্জু জ্বলন্ত চোখে বললো, ও চেক করতে এলে যে আমি দুপুরগুলা কোনো নাগরের সাথে বেড়রুমের দরজা বন্ধ করে কাটাই কি না?

বাবুলের ফর্সা মুখখানি সঙ্গে সঙ্গে কালিমাময় হয়ে গেল, চোখের নিচে নেমে এলো মেঘের ছায়া। সে মঞ্জুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো অপলক কয়েক মুহূর্ত। যেন অনন্তকাল।

টাঙ্গাইল থেকে সন্তোষের রাজবাড়িতে যাবার পথে এক তরুণীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, তার মুখমণ্ডল ছিল বিষণ্ন, সে যেন তার বুকের শূন্যতা ভুলে যাবার জন্য একটা আশ্রয় খুঁজছিল। তারপর থেকে কটা বছর আর পার হয়েছে? সময় এমনই নিষ্ঠুর?

একই সঙ্গে অভিমান ও আহত মর্যাদার সঙ্গে দৃঢ়তা মিশিয়ে বাবুল বললো, ছিঃ মঞ্জু!

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর অনুতাপ হলো। সে জানে, বাবুল একেবারেই কোনো খারাপ শব্দ সহ্য করতে পারে না। যেন ঠিক শারীরিক আঘাত পায়। 'নাগর' শব্দটা ব্যহার করা মঞ্জুর উচিত হয়নি, এই শব্দটি সে সদ্য একটি উপন্যাসে পড়েছে বলেই মনে এসে গেছে। একজন ইন্ডিয়ান রাইটারের লেখা বই, বাজে, বাজে, মঞ্জু ওসব বই আর কোনোদিন পড়বে না।

সঙ্গে সঙ্গে তো আর ক্ষমা প্রার্থনা করা যায় না, তাই মঞ্জু কণ্ঠস্বর বদলে জিজ্ঞেস করলো, তুমি চা খাবে?

– ওরকম কথা তুমি বললে কেন, মঞ্জু?

– যাঃ, আমি বুঝি একটু ঠাট্টা করতে পারি না?

– এটা ঠাট্টা? ও, ঠিক আছে। মঞ্জু, এখানে এসে একটু বসো। সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে প্রায়ই কোনো না কোনো অতিথি এসে, তোমার সঙ্গে ঠিক মতন কথা বলা যায় না।

– কে আসে?

– কেউ না কেউ আসি, বাঃ, বাড়িতেলোকজন তো আসবেই...রাত্তিরে যখন আমি ফিরি, তোমার তখন ঘুম পায়, বিশেষ কিছু কথা হয় না, সেই জন্য এখন...

সন্ধ্যেবেলা কেউ না কেউ আসে, এর মধ্যে যেন একটু খোঁচা আছে, সেটাই মঞ্জুর গায়ে লাগলো। বাবুল যে তাকে এখন নিভৃতে কিছু বলতে চায়, তাতে সে গুরুত্ব দিল না।

– তুমি হঠাৎ চলে এলে, ক্লস নাই?

– ছাত্ররা স্ট্রাইক করেছে, আজ বিরাট মিছিল।

– সিরাজুল এখনো ফেরে নাই, মনিরা বেচারী না খেয়ে বসে আছে।

– ও, মঞ্জু, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। গত দু'তিন মাস ধরে আমি খবর পাচ্ছি, সিরাজুল বেশ একজন নামজাদা ছাত্র নেতা হয়ে উঠেছে।

– ছাত নেতা?

– কার যে কোন্ দিন গুণ থাকে সব সময় বোঝা যায় না। আমি ভেবেছিলাম ওর লেখাপড়া বেশিদূর হবে না। কিন্তু ওর সংগঠনের বিশেষ ক্ষমতা আছে। গ্রামে থাকতে এই গুণটা প্রকাশ পায়নি। এখন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এসে...আজ তো বিরাট মিছিল, শেখ মুজিবর রহমানকে সরকার পর পর কয়েকবার গ্রেফতার করলো, সেই প্রতিবাদে, যে কোনো সময় ভায়োলেন্ট হয়ে যেতে

পারে...াবার কলেজ ইউনিভার্সিটি যে কতদিনের জন্য বন্ধ হবে।

– সিরাজুল আছে ঐ মিছিলে?

– থাকাই তো সম্ভব! সে এখন লীডার, পড়াশুনো ওর হবে না, ঐ মিছিল-টিছিলই করবে।

– তুমি বুঝি ছাত্র বয়েসে মিছিল করো নাই! একবার মাথা ফাটিয়েছিলে না?

– ও, হ্যাঁ, তা ঠিক।

– তুমি এত ঠাণ্ডা ভাবে কথা বলছো কী কর। সিরাজুল মিছিলে গেছে, যদি লাঠি বা গুলি চলে...মনিরা বেচারি একা বসে আছে, খায়নি দায়নি...সিরাজুলেরও শরীর ভালো না।

– ঠিক বলেছো, সিরাজুলকে দেখতেই তাগড়া কিন্তু ভেতরটা ঝাঁকরা। এই তাগৎ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লড়বে কী করে?

– তা হলে এখন কী হবে?

– এখন কী হবে মানে? তোমার সাথে আমার অন্য কথা ছিল, কিন্তু এখন সিরাজুল বিষয়েই আমরা আলাপ-আলোচনা করে যাবো? সে একটা হুজুড়ে মেতে মিছিলে গিয়ে লাফাচ্ছে, সেজন্য আমরা দায়ি হবো? আওয়ামী লীগের একজন লীডারকে সরকার গ্রেফতার করেছে, তা নিয়ে ছাত্রদের এত উত্তেজিত হবার কী কারণ আছে? এখনকার ছাত্ররা টোট্যাল দেশটার কথা চিন্তা করে না!

– তা বলে মনিরা ভাতের থালা নিয়ে বসে থাকবে, সিরাজুল কখন ফেরে না ফেরে, যদি পুলিশ ওর জেলে নিয়া যায়, মনিরা না খেয়ে বসেই থাকবে।

– খুবই মর্মন্তুদ পিকচার। যে-কোনো নভেলিস্ট পেলে লুপে নিতো। কিন্তু মঞ্জু, পৃথিবীটা এরকমই নিষ্ঠুর! শুধু আমাদের এই ইস্ট পাকিস্তানেই না, বহু দেশে, তুমি ভাবো তো ভিয়েৎনামের কথা! এই মুহূর্তে সেখানে কী চলেছে: বর্বর মার্কিনীরা সতেরো হাজার মাইল দূর থেকে এসে...বোমা, গুলি গ্যাস নিয়ে...সে দেশে কত মা, কত স্ত্রী তাদের সন্তান বা স্বামীর পথ চেয়ে বসে আছে।

– আমি ভিয়েৎনাম চিনি না। কিন্তু আমি যদি পুরুষমানুষ হতাম—

– কী বললো, তুমি...পুরুষ মানুষ? তুমি পুরুষ মানুষ হলে কয়েকজন লোক খুবই দুঃখ পেত...পৃথিবীতে পুরুষ মানুষ আছে কোটি কোটি, কিন্তু বিলকিস বেগম মাত্র একটিই...সে যাই হোক, তুমি 'যদি' দিয়ে বললে...তুমি পুরুষ মানুষ হলে কী করতে?

– আমি পুরুষ মানুষ হলে আমি এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে সিরাজুলের খবর করতাম। তার যদি কিছু হয়...

– আই সাপোজ, ইউ আর রাইট, মঞ্জু! যে-কোনো পুরুষ মানুষেরই উচিত...উৎকণ্ঠিতা পত্নী বসে আছে...তার স্বামীর খোঁজ করা।

বাবুল উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পলক নিজের ঘরটি মমতাভরে দেখে নিল। সে প্যান্ট-শার্ট পরা, জুতো-মোজা খুলে রেখেছিল, সেগুলো পরে নিল দ্রুত। প্যান্টের পকেট থাবড়ে দেখে নিল পার্শটা ঠিক আছে কিনা।

তারপর ঠোঁট বাঁকিয়ে মৃদু কৌতুকের হাসির সঙ্গে বললো, সিরাজুলের খোঁজ না নিয়ে আমি ফিরছি না। হয়তো আমারও ফিরতে দেরি হবে। একেবারেই যদি না ফিরি আজ রাত আটটা নটার মধ্যে, তাহলে তোমার মামুনমামার কাছে খোঁজ নিও। উনি নিশ্চয়ই লেটেস্ট ক্যাজুয়াল্টি আর অ্যারেস্টেডের ফিগার জানবেন। বাই-ই মঞ্জু, তুমি চা খাওয়াতে চেয়েছিলে, সেটা পাওনা রইলো।

হঠাৎ মঞ্জুর বুকটা ধক্ করে উঠলো। বাবুলের গলার আওয়াজটা অন্য রকম, যেন ইস্পাতের শব্দের মতন। মামুনমামার নামটা বললো সে চিবিয়ে চিবিয়ে। কী হয়েছে বাবুলের, মামুনমামার ওপর এত রাগ কেন? না, আজ মঞ্জুরই দোষ বেশী। বাবুল অসময়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চেয়েছিল। মঞ্জু তা না শুনেই সিরাজুলের নাম করে তাকে উত্যক্ত করতে লাগলো। আর একটু পরে গেলেই বা কী হতো। এমনকি স্বামীকে সে এক কাপ চাও খেতে দিল না?

অনুতাপে কেঁপে উঠে মঞ্জু ছুটে এসে বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি খুব জলদি চা বানিয়ে আনছি। একটু বসে যাও!

স্বামীর হাত ধরতে যাচ্ছিল মঞ্জু, বাবুল তা ধরতে দিল না। আর একবার গাঢ় ভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো, কোনো কথা বললো না। তারপর ব্যস্তভাবে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

॥ ৪৮ ॥

এত বড় তেঁতুল গাছ বড় একটা দেখা যায় না। এদিককার ঝোপ-জঙ্গল অনেকটাই সাফ হয়ে

গেছে, কিন্তু তেঁতুল গাছটার গায়ে কেউ কুড় ল ছোঁয়ায়নি। এই গাছে প্রচুর কাক-চিলের বাসা, এই গাছের নিচে চায়া অনেকখানি।

এই তেঁতুল গাছটাকে হারীত মণ্ডলের খুব চেনা লাগে, খুব আপন মনে হয়। ঘরের দাওয়ায় বসে সে এক এক সময় এক দৃষ্টিতে তেঁতুল গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর দু'হাত জুড়ে কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজে বলে ওঠে জয় জয় গুরু, জয় বাবা কালাচাঁদ!

এক শো পনেরো ডিগ্রি গরমে শুকিয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে মাটি। পূর্ব বাংলায় একটা চলতি কথা ছিল ফুটি ফাটা, এখানকার ভূমি অবিকল ফুটিফাটারই মতন। এই গরমে পোকা মাকড়রাও গর্ত ছেড়ে বেরুতে চায় না। তবু মানুষকে বেরুতে হয়। তাদের কারুর কারুর মাথায় খেজুর পাতার টোকা। হারীত মণ্ডলকে বসে থাকতে দেখলে তারাও বলে ওঠে, জয় জয় গুরু! জয় বাবা কালাচাঁদ!

এই সুভাষ কলোনির অনেকেই এখন সাধক গুরু কালাচাঁদের ভক্ত। যদিও কালাচাঁদকে তারা কেউ চোখে দেখেনি। একমাত্র হারীত মণ্ডলই তাঁকে দেখেছে, তাও স্বপ্নে। বছর খানেক আগে হারীতের প্রথম এই স্বপ্ন দর্শন হয়এসেই সময়টাও ছিল বৈশাখ মাস, শুধু দিনের বেলা নয়, রাত্তেও এত গরম যে মনে হয় সূর্য অস্ত যায়নি, জঙ্গলের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে আছে। সেই বৈশাখের এক শেষ রাতে এক জটাজুটধারী মহাপুরুষ হারীত মণ্ডলের কুটিরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বেদব্যাস মুনির মতন তাঁর দাড়ি ছাড়িয়ে গেছে তাঁর নাভি, তাঁর মাথায় গঙ্গাধর শিবের মতন জটা, তাঁর চক্ষু দুটি কিন্তু বড় কোমল, পদ্ম-পলাশ বর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের মতন। মনে হয় তাঁর বয়েসের গাছ-পাথর নেই। তিনি শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, ওরে হারীত, আমারে চেনোস না? তোর বাপ কৈলাশ, তার বাপ আছিল ধরণীধর, তারে আমি দীক্ষা দিছিলাম। তোগো জইন্যে আমার মন এখনও কান্দে রে, বাপধন।

স্বপ্ন ভাঙার পর হারীত সর্বাঙ্গে ঘাম নিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল। বেশ কিছুক্ষণ তার ঘোর ভাঙেনি, যেন বোধ হচ্ছিল, সেই তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষ তার ঘরে সশরীরেই উপস্থিত হয়েছিলেন। আস্তে আস্তে হারীতের মনে পড়েছিল যে তাঁর ঠাকুর্দা যশোরের বিখ্যাত অন্ত্র সাধক কালাচাঁদ বাবার শিষ্য হয়েছিলেন বটে। সে তো বহুকাল আগেকার কথা!

এই স্বপেন কথা হারীত তার স্ত্রী পারুলবালা এবং তারই সমবয়েশী যশোদাদুলাল ছাড়া আর কারুকে বলেনি। কিন্তু যেহেতু এই কলোনির নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রায় কোনো ঘটনাই ঘটে না, তাই এরকম একটা ব্যাপাপারও পাঁচ কান হতে দেরি হয় না।

দশ দিন বাদে আবার হারীতের সেই একই স্বপ্নদর্শন হলো। এবার সেই সাধক কালাচাঁদ হারীতের সঙ্গে অনেক কথা বললেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথাটি হলো এই যে, শিগগিরই হারীত এবং তার মতন অন্যসব উদ্বাস্তুদের দুঃখ ঘুচে যাবে, সুদিন আসবে। তিনি স্বয়ং এসে সেই সুদিনের সন্ধিক্ষণটি জানিয়ে যাবেন।

এই দ্বিতীয় দৈববাণীর হারীত এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে সে চৈতন্য হারিয়ে ফেলে টলে পড়ে যায় এবং তারপর সাতদিন প্রবলজ্বলে ভোগে। জ্বরের ঘোরে প্রলাপের মধ্যে সে শুধু ওই স্বপ্নের কথাই বলতে থাকে।

সুদিনের আশ্বাস যেন বাতাসে আগুনের মতন ছড়িয়ে যায়। শুধু সুভাষ কলোনি নয়, আশপাশের আরও আট দশটা কলোনির মানুষ ছুটে আসে হারীতের সেই প্রলাপ শোনার জন্যে।

তারপর থেকেই হারীত এখানকার অনেকের গুরু। পুলিশের মারের ভয়ে হারীত আর উদ্বাস্তুদের নেতা হতে চায় না, গুরুও হতে চায় না, কিন্তু সে সাধক কালাচাঁদের ব-কলমে গুরু। আগে হারীতের কথা পরামর্শ শুনে অনেকে তর্ক করতো, প্রতবাদ করতো, কিন্তু এখন মাত্র দু'চারজন ছেলে ছোকরা ছাড়া আর সবার কাছে হারীতের প্রতিটি কথাই যেন বেদবাক্য।

হারীত নিজে প্রায়ই সেই স্বপ্নের কথা ভাবে। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়! কিন্তু এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন সে দেখলোই বা কেন? স্বপ্নে সে তন্ত্রসাধক কালাচাঁদকে দেখেছে এর মধ্যে কোনো ভুল নেই, তিনি সুদিন আসার কথাও বলেছেন; কিন্তু কি করে তিনি বললেন? যশোরের কালাচাঁদ স্বামী কি এতদিন বেঁচে থাকতে পারেন? সে যে অসম্ভব। হারীত মিথ্যে কথা বলে তার কাছের মানুষদের ধোঁকা দিতে চায় না, কিন্তু সে যে এই প্রকার স্বপ্ন দেখেছে, তা তো মিথ্যে নয়!

দিনের বেলা ঝাঁকড়া তেঁতুলে গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হারীতের এক এক সময় মনে হয়, এই গাছটার সঙ্গে যেন মহাপুরুষ কালাচাঁদের কোথায় মিল আছে। ঠিক কী রকম যে মিল তা সে বলতে পারবে না।

এখানে খবরের কাগজ আসে না। রেডিও নেই। রিলিফ অফিসের বাবুদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে বাইরের পৃথিবীর কিছু কিছু খবরাখবর পাওয়া যায়। তা ছাড়া গুজবের জন্ম হতে বাধা নেই। গত বছর হারীত তার পূর্ব পুরুষের গুরুদেবকে স্বপ্ন দেখার কিছুদিন পরেই খবর এলো যে ইণ্ডিয়া ও পাকিস্তানে সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধ বেধে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ কলোনির সব মানুষ দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, চতুর্দিকে রটে গেল যে এইবার ইণ্ডিয়া পাকিস্তান আবার এক হয়ে যাবে! ইণ্ডিয়াতে গান্ধী-প্যাটেল-নেহরু কেউ বেঁচে নেই, পাকিস্তানে জিন্না-লিয়াকত্-সোহরাওয়ার্দিরা কেউ নেই। যারা দেশ ভাগ করেছিল তারা সব মৃত, তবে এখন দুটি আলাদা দেশকে কে সামলাবে? লালবাহাদুর শাস্ত্রী বা আইয়ুব খাঁর নাম উদ্বাস্তুরা আগে কখনো শোনেনি, তারা ধারণা করে নিল, এরা অতি শিশু! সবাই ভিড় করে এল হারীত মণ্ডলের কাছে। তা হলে দুদিন এসে গেলো?

হারীত মণ্ডল তাদের অযথা স্তোকবাক্য দিতে পারলো না। স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরু তাঁকে সুদিনের সন্ধিক্ষণের কথা জানিয়ে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু তিনি এর মধ্যে আর স্বপ্নে আসেন নি। হারীতের নিজেরও ভ্যাবাচ্যাকা খাবার মতন অবস্থা।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার খবরও এক সময় এই কলোনির মানুষের কানে এলো। কিন্তু সুদিন এলো না। বরং প্রতিদিনের জীবনযাত্রা আরও কঠিন। রিলিফ অফিসের বাবুদের কেমন যেন আলগা আলগা ভাব। জওহরলাল নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী দিল্লির সিংহাসনে বসেছেন, কিন্তু তিনি উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেননি।

হারীত মণ্ডল আরও দু'বার গুরু কালাচাঁদ সাধককে স্বপ্নে দেখেছে, তিনি কী যেন বলতেও চেয়েছেন, হারীত কিছুই বুঝতে পারে নি। হারীতের কানে যেন তখন তালা লেগে যাবার মতন অবস্থা। দু'বারই ঘুম থেকে জাগার পর হরীত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ।

পারুলবালার উপদেশ অগ্রাহ্য করেও হারীত তেঁতুল গাছতলায় মিটিং ডেকে সবাইকে জানিয়েছিল যে সে স্বপ্নে গুরুদেবকে আবার দেখলেও তিনি তাতে কোনো নির্দেশ দেননি বা দিলেও সে বুঝতে পারে নি। সুদিনের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

এই সরল স্বীকারোক্তিতে হারীতের জনপ্রিয়তা কমে যাবার বদলে বেড়েছে।

হারীতের পরিবারটি এখন ছোট। কুরুন্দ শিবির ছাড়ার সময় তার মেয়ে গীতা আর তার জামাই মাধব বিদ্রোহ জানিয়ে উড়িষ্যার কটকের দিকে চলে যায়। তাদের সঙ্গে ছোট একটি দলও গিয়েছিল। তাদের কয়েকজন পুলিশের গুলিতে মরেছে, অনেকে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু গীতা আর মাধবের খবর পাওয়া গেছে অনেকদিন পর। মাধব খুর্দারোড স্টেশনে কুলিগিরি করে এবং এক বস্তিতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে উদ্বাস্তু পরিচয় ঘুচিয়েছে। এর মধ্যে গীতা একদিন দেখাও করতে এসেছিল হারীত ও পারুলবালার সঙ্গে, খুর্দা রোডে চলে এলে যে বাবা-মায়েরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, সে প্রলোভনও সে দেখিয়েছিল, কিন্তু হারীত হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সে প্রস্তাব। কলোনির অন্য লোকজনদের ছেড়ে তার চলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অগত্যা গীত তার ছোট ভাইকে নিয়ে গেছে নিজের কাছে। সে-ও ভবিষ্যতে খুর্দা রোডের কুলি হবে কিংবা রিক্সা চালাবে, এরকম আশা করা যায়।

হারীতের পালিতা কন্যা গোলাপী আর তার ছেলে নবা রয়ে গেছে তাদের পরিবারে। নবা পারুলবালার বেশ ন্যাওটা, নিজের মাকে সে বলে দিদি আর পারুলবালাকে বলে মা। পরুলবালার ধারণা, নবার চেহারা ও স্বভাব চরিত্র যেন অবিকল তাঁর প্রথম সন্তান ভুলু অর্থাৎ সুচরিতের মতন। অল্প বয়েসে ভুলুও এরকম দুরন্ত ছিল।

ভুলুর কথা মনে পড়লে পারুলবালা এখনো মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলেন। তাঁর ধারণা লেখা পড়া শিখে ভুলু একদিন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে, কিন্তু সে কি তার বাবা-মায়ের কথা ভুলে যাবে? যে সন্তান বাবা মায়ের কথা মনে রাখে না, তাকে লেখা পড়া শিখিয়ে লাভ কী? বরং জমি চাষ করলে সে সংসারের কিছু সাহায্য করতে পারতো!

হারীর মণ্ডলও সুচরিতের কথা প্রায়ই ভাবে বটে কিন্তু স্ত্রীর মতন উতলা হয় না। সুচরিতের কাছে কয়েকখানা চিঠি লিখেও উত্তর পাওয়া যায়নি। চন্দ্রা নামের সেই উগ্র সমাজ সেবিকাটি অবশ্য হারীতকেবলেই দিয়েছিলেন, আপনি যখন চলেই যাচ্ছেন, পশ্চিম বাংলায় থেকে লড়ে যাবার মতন মনের জোর আপনার নেই, তখন আর পিছুটান রাখবেন না। আপনি যদি নিজেদের দুঃখ দুর্দশার ঘ্যানঘ্যানানি জানিয়ে ছেলেকে বারবার বিরক্ত করেন তা হলে ওর লেখা পড়া হবে না। ছেলেকে আমার হাতে দিয়ে যাচ্ছেন, নিশ্চিন্ত মনে চলে যান। এইটুকু শুধু মনে রাখবেন। আপনাদের যাই-ই

হোক না কেন, আপনাদের ছেলে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে!

হারীত মণ্ডল ভাবে, সুচরিত লেখা পড়া শেষ করুক, দাঁড়িয়ে যাক, সমাজের একজন বিশিষ্ট মানুষ হিসেবে গণ্য হোক। তারপর ভাগ্যে যদি থাকে, ছেলের সঙ্গে একদিন না একদিন দেখা হবেই। যদি না-ও হয়, তাদের একজন বংশধর অন্তত এদেশে সসম্মানে বসবাস করুক।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, চন্দ্রা নামের মহিলাটি অযাচিতভাবে হারীতদের এত উপকার করলেও তার মুখ হারীতের এখন ভালো করে মনে পড়ে না। তাঁর ঠিকানা লেখা কাগজটাও কোথায় হারিয়ে গেছে। বরং মনে পড়ে তালতলার সুলেখার কথা। মনে পড়া মাত্রই যেন হারীতের বুকের ভেতরটা আলোকিত হয়ে যায়। অত নরম, অত সুন্দর কি কোনো মানুষ হয়? সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও ঐ একটি মুখের ছবি যেন সব আক্ষেপ ভুলিয়ে দিতে পারে। এক এক দিন কোরাপুটে গিয়ে বিভিন্নমুখী বাস দেখে হারীতের তীব্র ইচ্ছে হয়, একবার একটা রায়পুরগামী বাসে চড়ে বসলে হয় না, সেখান থেকে কলকাতা গিয়ে একবার শুধু সুলেখাকে দেখে আসার জন্য।

গোলাপীর ছেলে নবা খুব দুরন্ত হলেও তাকে সামলানো যায়, কিন্তু গোলাপীকে নিয়েই এখনও কিছু কিছু সমস্যা আছে। গোলাপীর অতীত ইতিহাস অনেকেই ভোলেনি। যৌন কাহিনী সব সময়ই মুখরোচক। গোলাপীর বিয়ে হয়নি তবু তার একটি সন্তান আছে, সুতরাং গোলাপী নিজেই একটি সখরীর গল্প। হারীত অবশ্য পশ্চিমবাংলা ছাড়বার পর সবাইকে বারবার বলেছে যে অরক্ষণীয়া হবার পর গোলাপীর সঙ্গে একটি কলাগাছের বিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কলাগাছের রক্ত মাংসের পিতৃত্বের কথা এই কলিযুগে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

গোলাপীর এখন পূর্ণ যৌবন, এই অভাগিনী মেয়েটা না খেয়ে না দেয়েও কী করে যে শরীরটা এত সুঠাম রেখেছে কে জানে! সন্তান সমেত গোলাপীকে কোনো দোজবরে পুরুষও বিয়ে করতে চায় না। তবু অনেকেই তার চার পাশে ঘুরঘুর করে। হারীত নিজে চাষবাসের কাজ করে না, গোলাপীই মাঠে যায়, সুতরাং তাকে একা পাওয়ার সুবেধে আছে। দিন দুপুরে কেউ কেউ গোলাপীরকাছে কুপ্রস্তাব করে। স্বামী নেই এমন বেওয়া স্ত্রীলোককে সবাই মনে করে সহজলভ্যা। একবার যে অসতী হয়েছে তার বেশ্যা হতে দোষ কী?

কলোনির তিন জন মানুষের প্রতি হারীত তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। এরাই গোলাপীকে নষ্ট করার জন্য দিন দিন দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। এদের শাস্তি দেওয়া হারীতের পক্ষে খুব সহজ। সে নিজে অধিকার ফলাতে চায় না, কিন্তু সে জানে যে তার মুখের কথাই এখানে আইন। সে সামান্য ইঙ্গিত করলে দুশো-তিনশোজন লোক ঐ তিনজনেরও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবু হারীত প্রকাশ্যে ওদের কিছু বলে না।

হারীতের বেশি চিন্তা গোলাপীকে নিয়েই। হতভাগিনীর একবার ঠকেও শিক্ষা হয়নি। একবার সে মরতে বসেছিল, মরতে চেয়েও ছিল, কিন্তু তারপর কয়েকটা বছরকেটে যাবার পর সুস্থ শরীর নিয়ে এখন শরীরের গোলাপী যখন বাড়ির বাইরে যায়, তখন চোখ মুখ ঘুরিয়ে কথা বলে, তার ঠোঁটে ফুটে ওঠে পাতলা হাসি। অথচ গোলাপীকে বাড়ির মধ্যে সর্বক্ষণ তো আটকে রাখাও যায় না। গোলাপীই এই সংসার চালায়। হারীত মণ্ডল রিলিফের খাদ্য পাবার জন্য অফিসের সামনে লাইন দিতে পারে না, তার ভক্তরাই তাকে নিষেধ করেছে, দরকার হলে তারা প্রত্যেকের ভাগ থেকে এক মুষ্টি দেবে। সুতরাং গোলাপীকেই যেতে হয় প্রতি সপ্তাহে।

গোলাপীর মধ্যে মাতৃত্বের ভাবও বেশ কম। অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে। সেই সন্তানের প্রতি তার মায়া পড়েনি। প্রায় জন্মের পর থেকেই তার ছেলেটা পারুলবালার কোলে আশ্রয় পেয়েছে, কিছুতেই সে গোলাপীকে মা বলে ডাকে না। হারীত ভাবে, গোলাপীকে যদি কেউ বিয়ে করতে চাইতো, তা হলে নবাকে নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না, সে থেকে যেত পরুলবালার কাছে। কিন্তু কে বিয়ে করবে গোলাপীকে?

একদিন হারীত কলোনির বাইরে বড় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে যোগানন্দ নামে একটি ছেলেকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো, তারপর তার কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে লাগলো উল্টো দিকে।

এদিকে এখনো ছাড়া ছাড়া জঙ্গল রয়ে গেছে, দূরে দেখা যায় কয়েকটি টিলা। দণ্ডকারণ্য শুনে যে ভয়াবহ জঙ্গলের কথা মনে আসে, তেমন গভীর জঙ্গল এদিকে ওরা দেখেনি। কোরাপুট জেলার সোনাগড়ায় ওরা মাত্র তিনমাস ছিল, সেখানে সাংঘাতিক কলকষ্ট, বরং এখানে চলে এসে অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে।

গাড়ি গাড়ি ইঁট-সিমেন্ট আসছে, একটু দূরেই তৈরি হচ্ছে বড় একটা সরকারি অফিস। গত মাসে একটা ইস্কুলও খোলা হয়েছে। মনে হয় এদিককার কলোনিগুলো পাকা হয়ে গেল, আর কোথাও যেতে হবে না ওদের।

গরমে রাস্তা এমন তেতে গেছে যে পা রাখা যায় না। এ বছর এদিকে একদিনও বৃষ্টি হয়নি। চৈত্র মাসটা শুধু ঝড়ের ওপর দিয়ে গেল, কিন্তু সেই ঝোড়ো বাতাস কোনো মেঘ উড়িয়ে আনলো না। সবাই চাষের জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে, বৃষ্টির অপেক্ষায়। সেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, কাছাকাছি নদী-নালা নেই, বৃষ্টিই একমাত্র ভরসা।

যোগানন্দকে নিয়ে হারীত রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো। অধিকাংশ গাছের পাতা শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। গাছের ছায়াতেও যেন শান্তি নেই, হাওয়ায় যেন আগুনের হল্কা। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের চাং পড়ে আছে, সেগুলো সম্পর্শ করার উপায় নেই। খানিকটা ঝোপ মতন জায়গা বেছে নিয়ে বসবার আগে হারীত ভালো করে দেখে নিল সাপখোপ আছে কিনা। এদিকে বড় সাপের উৎপাত।

বসে পড়ে হারীত কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মুছলো, দাড়ি কামানো ছেড়ে দিয়েছে হারীত, মাথার চুলও ছাঁটে না, তার শীর্ণ লম্বা শরীরটা সাধু সাধুই দেখায় আজকাল। শুধু একটা ধুতি পরা, এই গরমে গেঞ্জি গায়ে দেবারও প্রশ্ন ওঠে না।

যোগানন্দর মুখখানা শুকিয়ে গেছে। হারীত তাকে একা ডেকে এনেছে বলেই বিপদের আশঙ্কা করেছে সে। কলোনির দু'তিনজন মানুষ দেখেছে তাকে হারীতের সঙ্গে যেতে। এতক্ষণ হারীত তার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি।

হারীত যোগানন্দর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না যোগানন্দ, সে মুখনিচু করে। হারীত তার থুতনিটা ধরে তুলে বললো, চেয়ে থাক আমার দিকে।

যোগানন্দর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো, সে হারীতের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে বললো, বড়কত্তা আমার ক্ষমা করেন!

হারীত যোগানন্দর রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো স্নেহের সঙ্গে। নরম গলায় বললো, ওঠ, আমার কথা শোন।

যোগানন্দ আবার সোজা হয়ে বসার পর হারীত তার কাঁধে হাত রেখে বন্ধুত্ব মতন বললো, যোগা, তুই আমার মাইয়া গোলাপীরে খুব পছন্দ করোস, তাই না?

যোগানন্দ বিস্ফারিত ভাবে চেয়ে রইলো হারীতের দিকে। কোনো কথা বলতে পারলো না।

হারীত মৃদু হেসে আবার বললো, আমি বুঝি রে, বুঝি! জুয়ান বয়স, রক্ত চনমন করে, তোর মতন বয়স কি আমার ছিল না? তা শোন্ যোগা, তোর যখন গোলাপীরে অ্যাতই মনে ধরছে, তুই অরে বিয়া কইরা ফ্যালা! আমি সব ব্যবস্থা কইরা দিমু।

বেশ স্বাস্থ্যবান পুরুষ এই যোগানন্দ, কিছুদিন আগেই সে দা দিয়ে কুটিয়ে একটা ভাল্লুক মেরেছে, সরকারি অফিসের বাবুদের সঙ্গে সে চোটপাট করে কথা বলে, সেই যোগানন্দও চোখ ছলছলিয়ে এলো, হারীতের এই কথা শুনে, কম্পিত গলায় সে বললো, বড় কত্তা, আর কোনোদিন আমি...ক্ষমা করেন, ক্ষমা করেন; আমার ঘরে বউ আছে।

– জানি, জানি, তোর বউ আছে। সেই বউটারে গলা টিপ্‌পা মাইরা ফ্যালা। তুই ভাল্লুক মারছোস, একখান মাইয়া মানুষরে মাতে কী লাগে? বউটার ঘেটি ভাইংগা পুড়াইয়া ঝুড়াইয়া দে, তারপরে গোলাপীরে বিয়া কইরা তুই সুখে ঘর কর।

গোঁয়ার হলেও যোগানন্দর এইটুকু অন্তত বোঝার ক্ষমতা আছে যে হারীতের এই সব কথাই মারাত্মক ধরনের ঠাট্টা। হারীত কখনো সোজাসুজি কথা বলে না। সে আবার হারীতের পা ধরলো।

– আমারে কী শাস্তি দেবেন কন্, আমি আপনের পা ছুঁইয়া কিরা করতেছি, আর কোনোদিন আমি গোলাপীরে...আমি তারে নিজের বুইনের মতন দ্যাখবো।

আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগলো হারীত। সামনের শিমুল গাছটায় একটা কাকা শুকনো খরখরে গলায় অবিশ্রান্ত ডেকে যাচ্ছে। সেটার দিকে তাকিয়ে হারীত বললো, অত সহজ না রে! একবার কোনো কোনো মাইয়া মানুষের জইন্য প্রলোভন হইলে তারে আর মা-বুইন ভাবে দেখা যায় না। মানুষের মনটারে কি লাগাম পরানো যায়? তোরে আমি দোষ দেই না, যোগা! নিমাই আর হারানরেও দোষ দেই না, আমি তো জানি, আমার মাইয়ারও দোষ আছে। সে তোগো টানে। বুঝি

আমি সবই, কিন্তু কী করি ক তো? মাইয়াডারে তো ফেলাইয়া দিতে পারি না।

যোগানন্দ আবার কোনো শপথ করতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে হারীত বলতে লাগলো, এই মাইয়া নষ্ট হইলে অনেকগুলার ঘর ভাঙে। সমাজে পোকা লাগে। দ্যাখ, দ্যাশ-ঘর ছাঁইড়া আইছি কিন্তু জাইত ধরম তো ছাড়ি নাই। চোখের সামনে কিছু ঘটলে সহ্য করি ক্যামনে? আবার গোলাপীর কষ্টটাও বুঝি! তুই এক কাম কর যোগা, তুই গোলাপীর নিয়া পালাইয়া যা! রায়পুরে যা, বড় শহর, সেখানে একটা কাজ-কাম জুটাইতে পারবি না?

– অমন কথা আমারে বলবেন না বড় কত্তা! আমি বাপ-মায়ের নাম লইয়া কই, আর কোনোদিন আমি গোলাপীরে অইন্য চক্ষে দ্যাখলে আমার চক্ষু যেন ক্ষইয়া যায়...আমি ওরে পাহারা দিমু, যাতে অইন্য কেউ...আমি নিমাই আর হারানরেও কইয়া দিমু...বড়কত্তা, আপনে একটা কথা বোধহয় জানেন না, রিলিফ অফিসের সুধীর দাস, তার সাথে গোলপীর...হঠাৎ দপ করে জ্বেলে উঠে হারীত বললো, কে? কী বললি?

যোগানন্দ কাচুমাচু হয়ে জানালো যে রিলিফ অফিসের একজন ক্লার্ক সুধীর দাস, তার সঙ্গে গোলাপী গোপনে গোপনে দেখা করে, সেই লোকটির মতলব ভালো নয়, যোগানন্দ আর হারান দু'জনে মিলে গোলাপীকে এই ব্যাপার নিয়ে একদিন সাবধান করতে গিয়েছিল...

হারীত দাঁতে দাঁত চেপে বললো, তারে আমি বলি দেবো! তার মায়ের চামড়া ছুলে লবণ ছিটাবো! আমাগো কলোনির কেউ যদি বান্দরামি করে তারে আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু কোনো ভদ্রলোকের ছাওয়াল যদি আমার মাইয়ার গায় হাত-ছোঁয়ায়, তারে আমি ছাড়বো না। তারে খুন কইরা আমি ফাঁসি যাবো!

যোগানন্দর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে হারীত বুঝলো যে তার নজরের আড়ালেও অনেক কিছু ঘটে যায়। সুধীর দাসের ব্যাপারটা সে জানতোই না কিন্তু সম্পর্কটা অনেকদূর গড়িয়েছে। গোলাপীও যোগানন্দ-নিতাইদের বিশেষ পাত্তা দেয় না, তার ঝোঁকও ঐ সুধীর দাসের দিকে। সুধীর দাস বিবাহিত কিনা জানা যায় না, এখানে সে একা থাকে।

যোগানন্দ আরও বললো যে, একদিন ওদের দু'জনকে হাতে নাতে ধরে ফেলে তারপর ওদের জোর করে বিয়ে দিলে কেমন হয়?

হারীত রাগের সঙ্গে সে প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিল। জোর করে বিয়ে দিলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দাসী করে রাখবে কিংবা দু'চারদিন পরে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। হারীত ওদের আর একদিনও প্রশ্রয় দিতে চায় না। আজই সে সুধীর দাসের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

উঠে দাঁড়িয়ে সে যোগানন্দের চুলের মুঠি চেপে ধরে বললো, তুই যদি আমারে মিছা কথা বলিস, তাইলে তুই প্রাণে বাঁচবি না!

যোগানন্দ বললো, বড় কত্তা, আপনে যদি আমারে মারেন, তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আপনে আমারে ঘেন্না করলে তা সহ্য করতে পারুম না।

– চল, এখনই চল।

দু'জনে বেরিয়ে এলো জঙ্গল থেকে। দুপুর এখন খুব গাঢ়, এই সময় রিলিফ অফিসে জন-মনুষ্য থাকবে না জানা কথা, তবু দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে গেল সেই পর্যন্ত। সরকারি কর্মচারিদের মেস খানিকটা দূরে, সেই পর্যন্ত যাবে কিনা তাও একবার ভাবলো হারীত। যোগানন্দ ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে নিরস্ত করলো।

হারীতের মাথার মধ্যে কষ্ট হচ্ছে। সুধীর দাসকে যদি গোলাপীই আকৃষ্ট করে থাকে, তাহলে শাস্তি তো আগে গোলাপীরই প্রাপ্য। কিন্তু গোলাপীর ব্যাপারে যেন হারীত অন্ধ। কুপার্স ক্যাম্পে সেই ঘটনার সময় হারীত সকলের বিরুদ্ধে গোলাপীর পক্ষ নিয়েছিল। সকলেই মনে করেছিল, গোলাপীই পাপীয়সী, পুরুষরা পুরুষদের দোষ দেখে না।

চোখ বুজে হারীত মহাপুরুষ কালাচাঁদকে স্মরণ করলো। তিনি যদি এই সময় কোনো নির্দেশ দিতেন! অনেকদিন তিনি স্বপ্নে দেখা দেন না, হারীতের জীবনটা শূন্য বোধ হয়।

কলোনির মধ্য থেকে একটা গোলমাল শোনা গেল। স্ত্রী কণ্ঠের চিৎকারই বেশি। গরমে তিতিবিরক্ত হয়ে এখানকার স্ত্রীলোকেরা এমনিতেই মাঝে মাঝে ঝগড়া শুরু করে দেয়, ওতে গুরুত্ব দেবার কিছু নেই, কিন্তু আজকের চ্যাচামেচির মধ্যে যেন খানিকটা আর্তনাদের সুর আছে।

হারীত জোরে পা চালালো।

একটা ভিড় জমেছে তেঁতুল গাছটার নিচে। হারীত প্রথমেই দেখলো গোলাপীকে, তার মুখখানা যেন এখন অন্যরকম মনে হলো। তার ছেলে নবা কাঁচা তেঁতুল পাড়তে ঐ তেঁতুল গাছে উঠেছিল, সেখান থেকে পড়ে গেছে, পরুলবালা জোড়াসনে বসে নবাকে কোলে শুইয়ে রেখেছে, আর একজন তার মাথায় ঢালছে জল।

গুরুর পদে উত্তীর্ণ হবার পর হারীত এখানকার চিকিৎসকও হয়েছে। সে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে অনেকের রোগভোগ সেরে যায়। তাকে দেখে একটা গুঞ্জন উঠলো। কিন্তু প্রিয় নাতির এই বিপদ দেখেও হারীতের মনে কোনো চাঞ্চল্য এলো না, তার মাথা জোড়া অশান্তি। কাছে এসেও সে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে।

পরুলবালা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি পোলাডারে দ্যাখবা না?

হারীত স্ত্রীর মখের দিকে অকারণ চেয়ে রইলো কয়েক পলক। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কী হইছে? নবু, এই নবু ওঠ!

নবা কোনো উত্তর দিল না। সে উপুড় হয়ে আছে, অনেকে ভাবছে তার জ্ঞান নেই।

হারীত আরও কাছে এসে ঝুঁকে নবার এক হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, ওঠ! ওঠ!

পারুলবাবা জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করলেও হারীত নবাকে টেনে দাঁড় করালো। তার মুখখানা আমসিবর্ণ হয়ে গেছে, নাকের ফুটো দিয়ে গড়াচ্ছে রক্তের ধারা। কিন্তু চোখে জল নেই।

হারীত জিজ্ঞেস করলো, কী হইছে তোর হাত ভাঙছে, না পা ভাঙছে?

নবা দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। এক পায়ে চোট লেগেছে তার। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে সে হারীতের দিকে।

হারীত তার দুটো হাত ধরে উঁচু করলো, তারপর বললো, হাঁট, আমার সাথে হাঁট! দেখি কিছু ভাঙছে নাকি?

ভিড় ফাঁক হয়ে গেল, হারীত তার নাতির হাত ধরে দশ পা এদিকে দশ পা ওদিকে হাঁটলো। তারপর চকিত একবার মুখ ফিরিয়ে গোলাপীকে দেখে নিয়ে সে নবাকে বললো, ওঠ, আবার গাছে ওঠ। তোর কিছু হয় নাই।

এবার পরুলবালা এসে বললো, আরে ছাড়ো, ঘরে লইয়া যাই! শুইয়া থাকুক কিছুক্ষণ।

হারীত হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বললো, না! ও ঘরে যাবে না! গাছে চড়তে গিয়ে একবার আছাড় খাইলেই ভয় পাবে ক্যান? আবার গাছে ওঠবে। ওঠ নবু। আমি কাঁচা তেঁতুল খাবো। আন আমার জইন্যে।

নবা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে ভয়ার্ত আছে, ভয়ার্ত ভাবে চাইছে পারুলবালার দিকে।

হারীত তার ঘাড় চেপে ধরে টানতে টানতে গাছের কাছে এনে বললো, ওঠ, ওঠ, তোকে ওঠতেই হবে।

গোলাপী ছুটে এসে হারীতের হাত জড়িয়ে ধরে বললো, বাবা, ওরে ছাড়েন! ও আর কোনোদিন গাছে ওঠবে না!

হারীত গোলাপীকেও ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললো, আলবাৎ ওঠবে। এখনই ওঠবে! তোরা সইরা যা!

বিড়ালছানার মতন নবাকে সে দু'হাতে তুলে গাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে দিল।

তারপর সরে এসে বললো, ওঠ, ভয় নাই, ওঠ! জল জয় গুরু! জয় বাবা কালাচাঁদ!

এবার অন্য সবাই বললো, ওঠ, ভয় নাই, ওঠ! জয় জয় গুরু! জয় বাবা কালাচাঁদ

এবার অন্য সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, জয় জয় গুরু, জয় বাবা কালাচাঁদ। সেই ধ্বনিতে গোলাপীর কান্নার শব্দ চাপা পড়ে গেল।

॥ ৪৯ ॥

স্টাডি সার্কেল শেষ হয়ে যাওয়ার পর অন্যরা চলে গেছে, অতীনরা দু'তিনজন তখনো বসে আড্ডা দিচ্ছে মানিকদার সঙ্গে। কিছুদিন আগেই মানিকদা খুব প্লুরিসিতে ভুগেছেন, এখনও তাঁর মুখখানা অনেকটা পাংশুমতন, শুধু তাঁর মনের জোরে চিহ্ন রয়েছে তাঁর দুটি উজ্জ্বল চোখে। এই অসুখ হলে ভালো ভাবে খাওয়া-দাওয়া করতে হয়, কিন্তু মানিকদা মুড়ি তেলেভাজা খেয়ে পেট ভরান। দুধ উনি স্পর্শ করেন না, ডিমে অ্যালার্জি, কেউ বেশি করে মাছ মাংস খাবার পরামর্শ দিলে হেসে বলেন, পয়সা কোথায়? বাড়িতে মাংস রান্নার গন্ধ পেলেই বাড়িওয়ালা এসে ক্যাঁক করে চেপে ধরবে। পাঁচ মাসের

বাড়ি ভাড়া বাকি!

একসময় আবিদ আলি এ ঘরে ঢুকে বললেন, ও মানিকবাবু, আপনাদের পেছনে ফেউ লেগেছে, টের পেয়েছেন?

আবিদ আলি সাধারণত ফেরেন অনেক রাতে, তাঁর সঙ্গে স্টাডি সার্কেলের সদস্যদের দেখাই হয় না। শনি-রবিবার উনি চলে যান কাকদ্বীপ।

মানিকদা চোখ নাচিয়ে বললেন, আমরা যদি বাঘ হই, তাহলেপেছনে তো ফেউ লাগবেই, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই!

আবিদ আলি ওদের পাশে বসে পড়ে বললেন, না মশাই, ঠাট্টা নয়। গত সপ্তাহে একজন লোক এসে জিজ্ঞেস করে গেল, আপনারা কারা, কেন এখানে আসেন এইসব হ্যানো হ্যানো ত্যানো। মনে হলো, সাদা পোশাকের পুলিশ।

কৌশিক বললো, একটা স্পাই এখানে ঘুর ঘুর করে, আমি অনেকদিন দেখেছি।

মানিকদা বললেন, ঘুরুক না স্পাই, তাতে ক্ষতি কী আছে? আমরা তো গোপনে কিছু করছি না। আমাদের পার্টি কি ব্যান্‌ড নাকি?

আবিদ আলি বললেন, সে লোকটি এমন ইঙ্গিত দিল, যেন এখানে গোপনে গোপনে বোমা বানানো হয়।

এই তো ফাঁকা ঘর, একটা সতরঞ্চি আর কিছু কাগজপত্তর ছাড়া আর কিছুই নেই, ভেতরে এনে দেখিয়ে দিলেই পারতেন!

আরও শুনুন না, কাল রাত এগারোটার সময় এক দঙ্গল ছেলে এসে বললো, তাদের এই ঘরটা ভাড়া দিতে হবে। আমি যত বলি যে আমার এ ঘর ভাড়া দেবার কোন কোশ্চেনই ওঠে না, তারা শুনবে না। কংগ্রেসের ছেলে মনে হলো, তারা এখানে পার্টি অফিস করতে চায়।

আপনি বললেন না কেন, আপনি অলরেডি এই ঘর আমাদের ভাড়া দিয়েছেন?

ওরা জানলো কী মশাই যে আপনাদের আমি ভাড়ার রসিদ দিই না? রসিদ দেবোই বা কী করে, সাবলেট করা তো বেআইনী! ওরা বললো, ওদেরও রসিদ লাগবে না, ওরা দেড়শো টাকা ভাড়া দেবে!

এই একখানা ছোট ঘরের জন্য দেড়শো টাকা দেবে?

হ্যাঁ, আপনারা যে চল্লিশ টাকা দেন, তা ওরা জানে। আপনাদের দলের মধ্যে নিশ্চয়ই ওদের কোনো স্পাই আছে।

এসব জানা এমন কিছু কঠিন নয়। আমরাই কেউ কথায়-কথায় অন্য লোকদের হয়তো কখনো বলেছি।

পমপম বললো, মানিকদা, অনুপমের খুড়তুতো ভাইটা কংগ্রেসী করে। বেশ পাণ্ডা গোছের। অনুপম নিশ্চয়ই ওকে বলে ফেলেছে।

বলাটা অন্যায় কিছু নয়। কত টাকা ঘর ভাড়া দিই, সেটা কি একটা সিক্রেট নাকি? আমাকেও কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দিতুম। তা হলে আবিদ আলি সাহেব, চল্লিশ টাকার বদলে দেড়শো টাকার অফার পেয়ে আমাদের কী তাড়াবেন ঠিক করেছেন?

আরে ছি ছি, আপনি একথা বললেন মানিকবাবু? আমি কি টাকার লোভে আপনাদের এই ঘরটা ব্যবহার করতে দিয়েছি? আমার ছোটখাটো ব্যবসা, আপনাদের দোয়ায় কোনোরকমে চলে যায়। কিন্তু আপনারা তো কেউ এই পাড়ায় থাকেন না, পাড়ার ছেলেরা যদি এসে হামলা করে...

ভয় পাবেন না, ঐ ছেলেদের বলবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

ভয় আমি পাই না। কাল অত রাতে এমন হল্লা করতে শুরু করলো, আশেপাশের ঘর থেকে ভিড় জমে গেল, ওরা আমায় চোখ রাঙাচ্ছিল, কেউ প্রতিবাদ করলো না। একটা ব্যাপার বুঝে দেখুন, আমি মাইনরিটি কমুইনিটির লোক, রুলিং পার্টিকে চটিয়ে আমি ফ্যাসাদে পড়তে চাই না। এখানে আমার ওপর জুলুম হলেও কেউ সাহায্য করতে আসবে না। এই যদি কাকদ্বীপ হতো, সেখানে যদি এরকম কোনো দল এসে আমার মুখের ওপর তড়পাতো, ইনসাল্লা, আমি তাদের পেছনে লাথি মেরে যদি ভূত না ভাগাতুম তো কী বলেছি?

আবিদ আলির চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে মানিকদা নীরস গলায় বললেন, তাহলে আপনি কী বলতে চান? আমরা আর এখানে আসবো না।

আবিদ আলি গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আমি বলি কী, কিছুদিন আপনারা ক্লাস বন্ধ রাখুন,

শিগগিরই ইলেকশান হবে শোনা যাচ্ছে, সেসব ঝঞ্ঝাট চুকে যাক, তারপর আবার দেখা যাবে।

মানিকদা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ইলেকশানের সঙ্গে আমাদের ক্লাস বন্ধ রাখার কী সম্পর্ক আছে! আমরা একটা জরুরি ডিসিশান নিচ্ছি, আমরা স্টাডি সার্কেলের একটা মুখপত্র ছাপিয়ে বার করবো এখান থেকে।

আবিদ আলি ও এবার কড়া সুরে বললেন, ইলেকশানের কথা শুনে পাত্তা দিলেন না, তবু প্রত্যেকবার আপনাদের পার্টি এত ক্যান্ডিডেট দাঁড় করায় কেন? কংগ্রেসীদের তো কোনোদিন পাওয়ার থেকে সরাতে পারবেন না, শুধু অ্যাসেম্বলিতে অপোজিশান পার্টি হয়ে গলা ফাটাবেন! এই তো আপনাদের বিপ্লব! না মশাই, আমার এই অ্যাড্রেস থেকে আপনাদের কোনো পত্রিকা-ফত্রিকা বার করা চলবে না। পুলিশ ওদের হাতে, এরপর পুলিশ এসে হুজ্জোত করবে!

আবিদ আলির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্ক হলো। বোঝা গেল, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তাঁর ফ্ল্যাটে আর স্টাডি সার্কেল চালাতে দিতে চান না। মানিকদাও অনড়, স্টাডি সার্কেল তিনি কিছুতেই বন্ধ রাখবেন না, তিনি এক মাসের নোটিশ চান, তার মধ্যে অন্য একটা জায়গা ঠিক করে তারপর এই ঘর ছাড়া হবে।

ওরা সবাই নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়ালো, মানিকদা একটা বিড়ি ধরিয়ে দুঃখিত ভাবে বললেন, আবিদ আলি কীরকম বদলে গেছে দেখলি? আগে ও আমাদের সাপোর্টার ছিল, এখন খুব টাকা পয়সা চিনেছে, আজ আমি ওর মুখে মদের গন্ধ পেলাম।

কৌশিক বললো, মাইনরিটি কমুইনিটি বলে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এদিককার দোকানদারদের মধ্যে তো মুসলমান কম নেই। মানিকদা, এই ফ্রন্টে আমাদের বিশেষ কাজ করা হয়নি, এরা সবাই কংগ্রেসের সাপোর্টার...

রাত দশটা বেজে গেলেও রাস্তার লোক চলাচল খুব কম নেই। এটা বাজার এলাকা কাছেই বেশ্যাপল্লী, খান্না সিনেমায় এখনো চলছে নাইট শো। অতীনদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তাদের বাড়ি ফেরার তাড়া নেই।

দুটি ছেলে রাস্তা পার হয়ে এসে ওদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। দু'জনেরই পরণে চোঙ প্যান্ট ও রঙীন গেঞ্জি। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। শুক ও সারীর গানের ভঙ্গির মতন এরা শুরু করলো কথাবার্তা।

এই চীনের দালালগুলোকে দেখছিস? সিক্সটি টু-তে যুদ্ধের সময় এরা বলেছিল ইণ্ডিয়াই প্রথম চীনকে অ্যাটাক করেছে!

আর সিক্সটি ফাইভের যুদ্ধের সময় এরা কী বলেছিল?

তখনও বলেছিল ইণ্ডিয়াই প্রথম অ্যাটাক করেছে। এরা সব সময় ইণ্ডিয়ার দোষ দেখে।

এরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কী বলেছিল?

কুইসলিং! কুইসলিং! এ বাঞ্চোৎদের বাপ আগে ছিল রাশিয়া, এখন বাপ বদলেছে। এখন মাও সে তুং-কে বাবা মেনেছে!

তাহলে এরা এদের বাপের দেশে চলে যান না কেন? ভুজ্জি এঁড়ের মতন এখানে ল্যাজ তুলে লাফালাফি করে কেন?

পমপম হঠাৎ ওদের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললো, অ্যাই, আমার গায়ে হাত দিয়েছো কেন? রাসকেল, ইডিয়েট!

একটি ছেলে পমপমের থুতনি ধরে বললো, খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দম, তোমার ঐ ছিরিঅঙ্গে কে হাত বোলাবে, মান্তু? চৌরঙ্গিতে চাঁদা তোলো গে যাও!

অতীন আর কৌশিক এ ছেলেদুটির এরকম অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে বারবার মানিকদার দিকে তাকাচ্ছিল, কী ভাবে ওদের কথার প্রতিবাদ জানানো হবে তার একটা নির্দেশ চাইছিল। কিন্তু পমপমের গায়ে ওদের হাত দিতে অতীনরা দেখেনি, পমপমই ইচ্ছে করে ওদের কাছ ঘেঁষে এসেছে।

এবার পমপম আরও গলা চড়িয়ে রাস্তার লোকদের শোনাবার জন্য বললো, মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছো, তোমাদের বাড়িতে মা-বোন নেই?

কৌশিক বললো, পমপম, তুমি সরে এসো!

অন্য পক্ষের একটি ছেলে বললো, ঢলানী মাগী, আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, তার মধ্যে তুই মাথা গলাতে এসেছিস কেন রে? এটা পাবলিকের রাস্তা! যা, আশুতোষ অয়েল মিলে লাইন দিগে যা!

অতীন ছুটে গিয়ে সে ছেলেটির কলার চেপে ধরে চোয়ালে এক ঘুঁষি কষালো, তারপর দু'জনেই জড়ামড়ি করে পড়ে গেল রাস্তার ওপর।

অন্য ছেলেটি অমনি পেছন ফিরে চিৎকার করতে লাগলো, এই অজিত, হেবো, পঞ্চুদা...

কৌশিক দেখলো রাস্তার উল্টো দিকে, কোনাকুনি একটা বড় দল দাঁড়িয়ে আছে, তারা দৌড়োবার জন্য ঝুঁকেছে।

সামনেই একটা ট্যাক্সি, কৌশিক ঝট করে তার দরজা খুলে মানিকদাকে টানতে টানতে নিয়ে বললো, শিগগির উঠে পড়ুন, পমপম চলে আয়...

ফিরে গিয়ে সে অতীনকে ছাড়াতে যেতেই অন্য ছেলেটির হাতে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি খেল, ছিটকে গেল তার চশমা। তবু ওপারের দলটি এসে পৌঁছোবার আগেই তাদের ট্যাক্সিটা স্টার্ট নিল, দম্ দম্ করে কয়েকটা ইঁট এসে পড়লো ট্যাক্সির গায়ে, পেছন দিকে একটা বোমা ফাটলো।

মানিকদা থরথর করে কাঁপছেন, ভয়েনয়, উত্তেজনায়, তাঁর দুর্বল শরীর এই আবেগ সামলাতে পারছে না, শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। অতীন তার বাঁ কাঁধটা চেপে ধরে বললো, হারামীর বাচ্চাটা আমায় কামড়ে ধরেছিল। জানোয়ার!

কৌশিক প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললো, অতীন, তুই ইডিয়টের মতন মাথা গরম করতে গেলি, ওরা তৈরি হয়ে এসেছিল, আমাদের ছাতু করে দিত!

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি বললো, ঐসব গুণ্ডাদের সঙ্গে আপনারা লাগতে গিয়েছিলেন কেন? সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে, ভদ্দরলোকেরা কি ওদের সঙ্গে পারে?

অতীন বললো, ওরা পমপমকে...তখনও আমরা কিছু বলবো না?

পমপম কঠিন গলায় বললো, আমার জন্য কারুর সাহায্যের দরকার ছিল না, আমি নিজেই নিজেকে ডিফেণ্ড করতে পারি। আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে ওদের মার খাওয়াতুম!

কৌশিক বললো, এত রাতে...ওরা বোমা চার্জ করলে কেউ কাছে আসতো না।

অতীন বললো, আমরা এর বদলা নেবো, আমরা ছাড়বো না!

অতীন, তোকে চিনে রেখেছে, তুই এ পাড়ার দিকে চট কর আসিস না।

ট্যাক্সিটা আগে পৌঁছোতে গেল পমপমকে। তখনই কৌশিক পমপমের বাবাকে পুরো ঘটনাটা জানাতে চায়। কিন্তু মানিকদা রাজি হলেন না। কয়েকদিন আগে অশোক সেনগুপ্তর সঙ্গে প্রবল তর্কাতর্কির পর মানিকদার সঙ্গে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে আছে।

মানিকদা আগে থাকতেন তাঁর দাদার সংসারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন এক বন্ধুর বাড়িতে। সেই বন্ধুটিও ইদানীং বেকার। শ্যামপুকুরের সেই বাড়িটাতে মানিকদাকে পৌঁছে দিতে এসে সেখানেও কিছুক্ষণ আলোচনা হলো এই ঘটনা নিয়ে। মানিকদার বন্ধু সুবিমলদা অতীনদের খুব ধমকালেন। কংগ্রেসের ঐ সব লুমপেন ক্যাডারদের সঙ্গে কনফ্রনটেশানে যাওয়া ওদের মোটেই উচিত হয়নি। ওরা তো ইচ্ছে করেই প্রভোক করতে এসেছিল। ইলেকশানের আগে ওরা বামপন্থীদের মারবে, জেলে ভরে দেবার চেষ্টা করবেই। মানিকদার দুর্বল শরীর, তাঁর গায়ে যদি হঠাৎ আঘাত লাগতো? এখন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে, ইলেকশান পর্যন্ত ওদের এড়িয়ে চলা।

মানিকদা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এখনো কথা বলতে পারছেন না, খাটে শুয়ে পড়লেন।

অতীন সুবিমলদাকে বললো, আমি আপনাদের ওসব স্ট্র্যাটেজি বুঝি না। আমায় কেউ অপমান করতে এলে, মারতে এলে আমি ছাড়বো না। তাতে যা হয় হোক!

মানিকদাকে পৌঁছোনোর পর ওদের কাছে আর ট্যাক্সি ভাড়া নেই। এখনো ট্রাম চলছে। শ্যামপুকুরের মোড়ে, টাউন স্কুলের কাছে কয়েকজন যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অতীনের শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। ওরাই এখানে চলে আসে নি তো?

কৌশিক বললো, কোনোদিকে তাকাবি না, সোজা রাস্তাটা পার হয়ে যা!

মিনিট দশেক অধীরভাবে অপেক্ষা করবার পর যে ট্রামটা এলো, সেটাই শেষ ট্রাম, সামনের বোর্ড ঝুলছে। সিনেমা-ভাঙা ভিড়ে ভর্তি হয়ে গেল সেটা।

এসপ্লানেডে পড়ার পর আর কোনো ট্রাম নেই। বাস আসবে কি না বলা শক্ত। এ পাড়ার ইংরেজী সিনেমাগুলো আগে আগে শেষ হয়ে যায়। রাস্তা ফাঁকা। রাস্তার রং যে কত কালো, তা রাত্তিরবেলা, দু'ধারে আলো-জ্বলা শূন্য পথ দেখলেবোঝা যায়। অসহ্য গুমোট গরমের রাত।

অতীন বললো, চল, হাঁটি! তোর চশমাটা গেছে, আর কোনো জায়গায় বেশি লেগেছে?

নাঃ! চশমাটা কুড়িয়ে নেবার সময় পেলুম না, তখন খুঁজতে গেলে...তোকে কামড়ে ধরেছিল!

হ্যাঁ, আমার কাঁধটা কামড়ে ও হাত দুটোকে ফ্রি করে নিজের কোমরে ঢোকাতে যাচ্ছিল, বোধহয় ছুরিটুরি বার করতো। হ্যাঁ রে, মানুষের দাঁতে বিষ আছে? টিটেনাস হতে পারে?

কী জানি! তোর খুব টিটেনাসের ভয়। দ্যাখ, সুবিমলদা ঠিকই বলেছে, ওদের দেখেই আমাদের চলে যাওয়া উচিত ছিল।

ওরা ঐ সব খারাপ কথা বলবে আর আমরা ল্যাজ গুটিয়ে পালাবো?

আমরা কি ছুরি-ছোরা চালাতে জানি, না যুযুৎসু জানি! আমরা শিখেছি শুধু বই মুখস্থ করে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে। যা প্যাকটিক্যালি কোনো কাজে লাগে না। আমাদেরও আগে তৈরি হতে হবে, আর্মস ব্যবহার করার ট্রেনিং নিতে হবে। তোর কি ও জায়গাটায় খুব ব্যথা করছে, অতীন?

না, ব্যথা বিশেষ নেই, কিন্তু এখনো রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। এই, বাস, বাস!

একটা খালি একতলা সরকারি বাস মৃগী-রুগীর মতন কাঁপতে কাঁপতে এবং বিকট ঝকার ঝকার শব্দ করতে করতে আসছে, ওরা মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে, হাত উঁচু করে বাসটা থামালো। সেটা যাচ্ছে গ্যারাজে, ভেতরে তিনি চারজন কন্ডাকটর বসে ঢুলছে, ওদের তুলে নিতে আপত্তি করলো না।

পরীক্ষার পর এখন অতীন প্রায়ই দেরি কর বাড়ি ফেরে। তার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে, ছেলে বাড়িফেরার পর মমতা সেগুলো গরম কর দেন। যেদিন বাবা-মা ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েন, সেদিনও অতীন টের পায় যে কোনো এক সময় মা এসে দেখে যান, ছেলে ফিরেছে কি না।

ক'দিন ধরে মমতার শরীর ভালো যাচ্ছে না খুব কাশি আর জ্বর। অতীন প্রায় নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করলো। পা টিপে টিপে গেল খাবার ঘরে। মাকে সে আজ জাগাতে চায় না। যত বেশিক্ষণই সে বাইরে কাটাক, বাড়িতে ফেরা মাত্র যেন খিদেটা পেটের মধ্যে তাণ্ডব নাচ শুরু করে দেয়।

আজ মাছ রান্না হয়নি, ভাত, ডাল, ঝিঙে-পোস্ত আর ডিমের ঝোল। ঝোলটার মধ্যে একটা আঙুল ডুবিয়ে তারপর সেটা সে মুখে ঠেকিয়েই স্বাদ নিয়ে বুঝলো, এটা মায়ের রান্না নয়, ফুলদি রেঁধেছে। তাহলে আজ বোধহয় বেশি শরীর খারাপ হয়েছে মায়ের।

আজ যদি ঐ গুণ্ডাটা তার পেটে একটা ছুরি বসিয়ে দিত, তাহলে মাঝরাত্তিরে কিংবা ভোরবেলা কেউ এস এবাড়িতে খবর দিত, অতীন মজুমদার মারা গেছে। তখন মা কী করতেন?

যারা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার, যারা কোনো আদর্শের জন্য লড়াই করতে যায়, তাদের সকলেরই তো মা-বাবা আছে! একটা সমাজ ব্যবস্থা পাল্টাবার জন্য মৃত্যুর ঝুঁকি তো নিতেই হবে। কিন্তু অন্য কোনো পরিবারে তো তার দাদার মতন একটা ছেলে হঠাৎ মরে যায়নি! দাদা চলে গিয়ে তাকে কী বিপদেই না ফেলে গেছে!

ঝিঙে-পোস্তটা ভালো হয়েছে বেশ। সবটা ভাত শেষ করার পরও অতীনের খিদে মিটলো না। খানিকটা ডিমের ঝোল আর একটু ভাত পেলে বেশ হতো! আরও ভাত কোথাও ঢাকা দিয়ে রাখা আছে কিনা দেখার জন্য অতীন উঠতে যেতেই দেখে পড়লো, একপাশে একটা ছোট বাটি, তার ওপর একটা কাচের প্লেট চাপা দেওয়া।

প্লেটটা তুলে দেখলো, তার মধ্যে খানিকটা পায়েস! এই গরমকালে পায়েস রান্না হয়েছে কেন, আজ কারুর জন্মদিন নাকি?

অতীন প্রথমেই নিজের জন্মতারিখটা মনে করলো। না, তার নয়। মায়েরও হতে পারে না, বাবার জন্মদিনটা যেন কবে? ফুলদি কিংবা মুন্নি, এদের মধ্যে একজনেরই হওয়া স্বাভাবিক!

তারপরেই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। ১৬ই জুন, আজ তো তার দাদা পিকলুর জন্মদিন! কতদিন হয়ে গেল সে নেই, তবু এখনও মমতা প্রত্যেক বছর পিকলুর জন্য তারিখে জন্মদিনে পায়েস রান্না হতো? বোধহয় না। অতীন এখন বুঝতে পারে, সেইসময় তারা খুব গরিব হয়ে পড়েছিল, পিসিমারা বরানগরের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন, দেওঘরে নিয়মিত টাকা পাঠাতে হতো বাবাকে...একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে অতীন শুনতে পেয়েছিল, গয়না বিক্রি নিয়ে বাবা ও মায়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি...

পায়েস খেতে খেতে অতীন যেন তার দাদাকে চোখের সামনে দেখতে পেল। পরিষ্কার ছবি, একটুও মলিন হয়নি, ফর্সা, গেঞ্জি পরা পিকলু, হাতে একটা বই...দাদা কবিতা লিখতো না? সে কবিতাগুলো গেল কোথায়? কালকেই অতীন দাদার পুরোনো খাতাপত্র খুঁজে দেখবে।

আঁচাতে গিয়ে তার চোখে পড়লো, তুতুল -মুন্নিদের ঘরের দরজা বন্ধ থাকলেও তলা দিয়ে আলোর রেখা আসছে। তুতুল অনেক রাত জেগে পড়ে। পাশ কর ডাক্তার হয়ে গেছে তুতুল, এখনো তার পড়ার নেশা যায়নি।

অতীন আবার ঘাড়ে হাত বোলালো। শুওয়োরের বাচ্চাটা অনেকখানি দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। কৌশিক ঠিকই বলেছে, তার টিটেনাস-ভীত আছে, হঠাৎ নাকি ব্যথার চোটে শরীরটা ধনুকের মতন বেঁকে যায়।

দরজাটা আস্তে ঠেলতেই খুলে গেল। এই ঘরের কিছু বদল হয়েছে, অতীন এর মধ্যে এই ঘরে আসেনি। আগে পাশাপাশি খাট ছিল, এখন দুটি খাট ঘরের দু'দিকের দেয়ালে, মাঝখানে একটা টেবিল, দেয়ালে বিদ্যাসাগরের ছবিটার দু'পাশে রবীন্দ্রনাথ ও লুই পাস্তুরের দু'খানা ছবি।

দরজার দিকে পেছন ফিরে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বসে পড়ছে তুতুল। অতীন খুব মৃদু গলায় ডাকলো, ফুলদি।

তুতুল মুখ ফেরাতেই অতীন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। সে মুন্নির ঘুম ভাঙাতে চায় না। মুন্নি দেয়ালের দিকে ফিরে পাশ বালিশ জড়িয়ে আছে।

তুতুল উঠে আসতেই অতীন চলে এলো নিজের ঘরের দিকে। ভেতরে এসে সে জিজ্ঞেস করলো, ফুলদি একটা কথা, কোনো মানুষ যদি অন্য একজন মানুষকে কামড়ে দেয়, তাহলে কি টিটেনাস কিংবা সেপটিক হতে পারে?

অতীনের মুখের দিকে কয়েক তাকিয়ে, সামান্য হেসে তুতুল বললো, তুই নরখাদকদের দেশে গিয়েছিলি বুঝি? কোথায় কামড়েছে দেখি?

অতীন লুকোবার চেষ্টা করলো না, জামার কলারটা ধরে কাঁধ পর্যন্ত খুলে ফেললো। এখন যেন তার বেশি জ্বালা করছে।

তুতুল সে জায়গাটা পরীক্ষা করতে করতে জিজ্ঞেস করলো, কোনো মেয়ে, না ছেলে: জামা ভেদ কর মাংসতে দাঁত বসে গেছে। কোনো মেয়ে যদি এরকম ভাবে কামড়ে দিয়ে থাকে, তাহলে আমি তোর চিকিৎসা করবো না। নিশ্চয়ই তুই কিছু বাঁদরামি করতে গিয়েছিলি!

মেয়েও না, ছেলেও না। রাস্তার একটা গুণ্ডা।

আজকাল বুঝি রাস্তার গুণ্ডাদের সঙ্গে কোলাকুলি করা হচ্ছে? একবার বাইরে থেকে ফিরে এলি ফোলা পা নিয়ে, আজ আবার এত রাত্রে...

আমাদের পার্টি ছেলেমেয়েদের ওপর ওরা হামলা করতে এসেছিল, আমাদের কোনো দোষ ছিল না, আমিও একটাকে দিয়েছি খুব ধোলাই—

রাস্তার গুণ্ডারা মানুষকে কামড়ে দেয়, এমন তো কখনো শুনিনি। গুণ্ডা না ক্যানিবাল? দাঁড়া, আমার ঘর থেকে অ্যান্টিসেপটিক লোশন নিয়ে আসি।

ফুলদি, মা যেন কিছু জানতে না পারে।

তুতুল একটু পরেই তুলো আর ওষুধ নিয়ে ফিরে এলো। স্পিরিট ভেজানো তুলোয় আগে জায়গাটা ঘষে নিল ভালো করে। তারপর ওষুধ লাগালো লাগাতে বললো, তুলোর সঙ্গে কতখানি ময়লা উঠে এলো দ্যাখ। আজকাল ভালো করে চানও করিস না বুঝি?

আরে লাগছে, লাগছে, লাগিয়ে দিচ্ছো তুমিও

চুপ করে বসে থাক, বাচ্চাদের মতন ছটফট করলে মার লাগাবো। সামান্য একটু জ্বালা করবে!

ফুলদি, তুমি বিলেত যাচ্ছো?

তুতুলের হাতটা কেঁপে গেল। সে থেমে গিয়ে বিবর্ণ মুখে বললো, যাঃ, কী আজেবাজে কথা বলছিস বাবলু? তোকে এসব কে বললো?

আমি জানি। কালকেও তো লেটার বক্সে তোমার নামে একটা ইংল্যান্ডের স্ট্যাম্প মারা চিঠি ছিল।

ওদেশে আমার বন্ধু থাকতে পারে না? কেউ যদি চিঠি লেখে...

কৌশিকের দাদা অনীশদা, মেডিক্যাল কলেজে পড়ান, তুমি চেনো তো, উনি বলছিলেন, তুমি স্কলারশিপ পেতে পারো।

বাজে কথা! একদম বাজে কথা।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররা একটু ভালো রেজাল্ট করলেই বিলেত -আমেরিকায় যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে থাকে। ঐ সব ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলোও এদের পাউণ্ড-ডলারের ঝুমঝুমি বাজিয়ে ডাকে।

ওদের তো সুবিধে, আমাদের মতন গরিব দেশের সরকারি টাকায় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হব, ওরা তাদের ইউজ করবে।

তোদের এম-এস-সি পাশ করা ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝি বিদেশে যায় না?

আমি তাদের মানুষ বলে গণ্য করি না। ফুলদি, তুমিও যে এদেশ ছেড়ে পালাতে চাইবে, তা আমি কল্পনাই করি নি।

তুই ভুল শুনেছিস, বাবুল। আমার যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই, আমি কোনো স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই-ও করিনি। আমি মাকে ছেড়ে, তোদের ছেড়ে কোথায় যাবো? এসব কথা মার সামনে কক্ষণো উচ্চারণ করবি না, বাবলু! কথা দে, তুই কিছু বলবি না, প্রমিস কর

সত্যি যাবে না? ঠিক আছে, আই প্রমিজ...

মানুষের দাঁতে হয়তো কোনো বিষ নেই। তুতুলের চিকিৎসার জন্যই হোক বা যে-জন্যই হোক পরদিন অতীনের কাঁধে কোনো ঘা হলো না, ব্যথাও হলো না। সকালবেলাই সে কৌশিককে নিয়ে মানিকদাকে দেখতে গেল।

মানিকদা বিছানায় শুয়ে আছেন, অনবরত কাশছেন। কথা বলতে গেলে বেশি কাশি হচ্ছে। সুবিমলদা বললেন, এটা অ্যালার্জির কাশি। প্লুরিসির পর ভালো মতন বিশ্রাম হয়নি, পুষ্টিকর খাবার খায়নি, এরকম চললে মানিকদার শরীর একেবারেই ভেঙে যাবে। ওঁর এখন উচিত কিছুদিনের জন্য কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে থাকা। পার্টি সংগঠন করতে গেলে শরীর মজবুত রাখা সবচেয়ে বেশি দরকার।

মানিকদার এক মামার বাড়ি জলপাইগুড়ি। সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকা যেতে পারে। কিন্তু এই অবস্থায় মানিকদাকে একা পাঠানো যায় না। কৌশিক আর অতীন দু'জনেই পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি, তারা মানিকদার সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল। ট্রেন ভাড়া জোগাড় করাও অবশ্য একটা সমস্যা, মানিকদার কাছেও টাকা নেই, সুবিমলদার হাতেও এখন কিছু নেই। অতীন নিজের যাওয়া আসার ভাড়া কোনোক্রমে জোগাড় করতে পারবে, কৌশিকের অবস্থা একটু ভালো, ওদের স্টাডি সার্কেলের সব সদস্য-সদস্যাদের কাছ থেকে কিছুকিছু চাঁদা তোলাই ঠিক হলো। স্টাডি সার্কেল অবশ্য বন্ধ থাকবে না, আপাতত সুবিমলদার ঘরেই চলবে।

সুবিমলদা বললেন যে, জলপাইগুড়ির পার্টি ওয়ার্কাররাও মানিকদাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। ওখানকার ডিস্ট্রিক্ট কমিটির একজন মেম্বারের সঙ্গে সুবিমলদার ভালো পরিচয় ছিল একসময়। খুব ভালো সংগঠক। জেলা কমিটির সেই সদস্যটির নাম চারু মজুমদার।

॥ ৫০ ॥

জানলায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বিমানবিহারী বললেন, তোমরা একটা টকটক গন্ধ পাচ্ছো না? আমি পাচ্ছি। কী দারুণ কথা লিখে গেছেন সুকুমার রায় মশাই, "শুনেছো কী বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো?/আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ!" সত্যি, এখন আকাশের দিকে তাকালেই এই টকটক গন্ধটা পাওয়া যায়।

পরেশ গুহ রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বললেন, এক্সেলেন্ট! এই টকটক গন্ধটা কী রকম জানো? মনে করো আজকের রান্না ডাল কালকে খাবে বলে রেখে দিলে, কিন্তু সেটা পচ গেল, সেই ডালে যেমন টকটক গন্ধ হয়।

প্রতাপ একটু হেসে বললেন, আপনার উপমাটা বোধহয় সঠিক হলো না মিঃ গুহ। পচা ডালের টক গন্ধ খুব খারাপ নয়। আমাদের দেশে ডাল পচে গেলেও সেটাকে জ্বাল দিয়ে ঘন করে একেবারে শুকিয়ে খাওয়া হতো, মন্দ লাগতো না।

বিমানবিহারী বললেন, আমার তো ঘামে ভেজা মানুষের গায়ের টকটক গন্ধটাই মনে পড়ে। আমার গায়ে এখন যেমন হয়েছে, পাখার হাওয়াতে ঘামছি।

পরেশ গুহ বললেন, সত্যি আর পারা যাচ্ছে না। এত গরম বহুকাল পড়েনি। ক্লাউড বার্স্ট করিয়ে বৃষ্টি নামাবার টেকনোলজি কতদিনে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, মানুষ এখন চাঁদে যেতে চলেছে—আর আমাদের এখানে উড়িষ্যায় বৃষ্টির জন্য যাগযজ্ঞ হচ্ছে।

বিমানবিহারী বললেন, উড়িষ্যার অবস্থা খুব খারাপ, ভয়াবহ খরা, মানুষ না খেয়ে মরছে।

প্রতাপ বললেন, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের অবস্থাই বা কী ভালো? গত বছরের চেয়ে আরও বেশি ফুড শর্টেজ।

কয়েকদিন ধরে দিনে ও রাতে সমান গরম চলছে। সাধারণত বিকেলের দিকে বঙ্গোপসাগর থেকে যে উদাত্ত হাওয়া আসে, সেটাও বন্ধ। এইরকম গুমোট গরমে কলকাতা শহরটা বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। যে-কোনো আড্ডাতেই এখন উত্তাপ প্রসঙ্গ।

বিমানবিহারী আবার জানলা দিয়ে আকাশ দেখে বললেন, জুনের মাঝামাঝি হয়ে গেল, এই সময় তো মনসুন এসে পড়ার কথা। সমুদ্রের মেঘেরা কী এবারে এদিকের রাস্তা ভুলে গেল?

পরেশ গুহ বললেন, উড়িষ্যার সম্বলপুরে যজ্ঞ করেই নাকি খানিকটা বৃষ্টি হয়েছে। এক বাংলা কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা তো তাই লিখেছে। আসুন এখানেও আমরা একটা যজ্ঞটজ্ঞ শুরু করে দিই। ঋক বেদে মেঘের এক দেবতা আছে, তার নাম পর্জন্য। সেই পর্জন্যের নামে একটি শ্লোক হচ্ছে এইরকম : "পর্জন্যায় প্রগায়ত পুত্রায়মীড় পুষে স নো যবসমিচ্ছতু।"

প্রতাপ বিস্মিতভাবে পরেশ গুহর দিকে তাকালেন। ইনি ইংরেজীর অধ্যাপক, অক্সফোর্ডে পড়েছেন, এঁর মুখে হঠাৎ এরকম সংস্কৃতি শুনবেন আশা করেননি। তিনি বললেন, বাঃ, আপনার সংস্কৃত উচ্চারণ বেশ ভালো তো।

পরেশ গুহ বললেন, আমাদের কালে তো সংস্কৃত কমপালসারি ছিল, আমি বি এ পর্যন্ত সংস্কৃত পড়েছি। আপনারা পড়েননি?

প্রতাপ বললেন, ইস্কুলে পড়েছি একটু-আধটু, সে সব ভুলে গেছি। আপনি যে শ্লোকটা বললেন, তার মানে কী?

এর মানে হলো..."অন্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জন্যদেবের উদ্দেশ্যে স্তোত্র উচ্চারণ করো। তিনি আমাদের অন্য ইচ্ছা করুন।" এই পর্জন্যদেব বৃষ্টিপাতে শুধু ফসলই ফলান না, আর একটা শ্লোকে আছে, "যো গর্ভ...অর্থাৎ যে পর্জন্যদেব ওষধিসমূহের, গো-সমূহের, অশ্বসমূহের ও নারীগণের গর্ভ উৎপাদন করেন..."

বিমানবিহারী বললেন, পরেশ, তুই কায়স্থর ছেলে হয়ে খুব বেদ আউড়ে যাচ্ছিস তো! আমরা সংস্কৃত জানি না, তুই ভুলটুল বললেও ধরতে পারবো না।

পরেশ গুহ বললেন, আমি মাঝে মাঝে বেদের অনুবাদ পড়ি, সত্যিকারে কাব্য আছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই কী বলেছিলেন জানিস, বেদ হচ্ছে পলগ্রেভ সাহেবের গোল্ডেন ট্রেজারির মতন একখানা কবিতার সংকলন, ধর্মগ্রন্থ-ট্রন্থ কিছু না। আর বামুন-কায়েতের কথা বলছিস? বেদ-এর প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেছিল জানিস, সেও এক কায়স্থ, রমেশ দত্ত নামে এক সিভিলিয়ান। ঐ রমেশ দত্তর ফ্যামিলির সঙ্গে আমাদের খানিকটা আত্মীয়তা আছে।

বিমানবিহারী বললেন, আমরা ছাত্র বয়েসে শুনেছিলুম, ডঃ শহীদুল্লা, যিনি ইস্ট পাকিস্তানের একজন নামকরা স্কলার, এক সময় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন, মুসলমান বলে তাকে বেদ পড়তে দেওয়া হয়নি।

– ওসব হলো তানই তোমাদের হিন্দু অর্থোডক্সির হিপোক্রিসি। বাড়িতে সংস্কৃত শিখে যে খুশী পড়তে পারে। সৈয়দ মুজতবা আলী নামে একজন বাংলার রাইটার আছেন না, রেডিও স্টেশানে বড় চাকরি করেন, একবার রেডিওতে একটা টাক দিতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল, খুব গল্পে মানুষটি, উনি আমায় বলেছিলেন, উনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছেলে বিনয়তোষ ভট্টাচার্যির বাড়িতে গিয়ে টানা সাত-আট বছর বেদ পাঠ নিয়েছেন।

বিমানবিহারী বললেন, মুজতবা আলী আমার খুব ফেবারিট রাইটার। উনি ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েও টিকতে পারেননি, এদেশেই আবার চলে এসেছিলেন। এখন বোধহয় শান্তিনিকেতনে থাকেন। একদিন ডাকবো আমার বাড়িতে।

গরম, সুকুমার রায়, বেদ, ইস্ট পাকিস্তান, মুজতবা আলীর গদ্য চালের চোলাচালান এইরকম এক প্রসঙ্গ থেকে দ্রুত অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় আড্ডা। পরেশ গুহই প্রধান বক্তা, অধ্যাপকরা বোধহয় চুপ করে থাকতে পারেন না। প্রতাপ প্রায় নীরব শ্রোতা, কারণ হাকিমদের লম্বা লম্বা উকিলী বক্তৃতা শুনতে শুনতে চুপ করে থাকাই অভ্যেস হয়ে গেছে। বিমানবিহারী মাঝে মাঝে দু-একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সুবক্তা হলেও পরেশ গুহর ভাষার রাশ কিছুটা আলগা উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি শালা, শুয়ারের বাচ্চা ইত্যাদি ব্যবহার করে যান অবলীলাক্রমে। তাঁর বাড়ি চন্দননগরে, প্রতিদিন ট্রেনে যাতায়াত করার সময় তিনি চালের চোরাকারবারিদের দেখতে পান। এখন গ্রামের

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়িরাও এই কাজে নেমে গেছে। করডনিং ব্যবস্থাকে কাঁচকলা দেখিয়ে মফস্বল থেকে কলকাতা শহরে চাল আসছে অনবরত। গ্রামের সাধারণ নারী পুরুষ বেআইনী কাজ করতে লেগে গেল দ্রুত, পুলিশকে তারা ঘুষ দেয়, যুবতী মেয়েদের পুলিশরা প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানি করে প্ল্যাটফর্মের ওপর। এই সামাজিক অবক্ষয়ের জন্যই পরেশ গুহ বেশি ক্ষুব্ধ।

তিনি এক সময় বলে উঠলেন, সেন্টারে একটা নভিস প্রাইম মিনিস্টার, নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা দিল্লি অ্যাডমিনিস্ট্রেশান চালাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। স্টেটগুলোর দিকে নজর নেই,আর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা অপদার্থ সরকার, যতসব শুয়ারের বাচ্চারা।

প্রতাপ প্রতিবাদমূলক খুক খুক করে কাশি দিলেন দু'বার।

বিমানবিহারী বললেন, ওরে পরেশ, তুই গভর্নমেন্ট সম্পর্কে যে সব অ্যাডজেকটিভ প্রয়োগ করছিস তাতে আমাদের জুডিশিয়ারির একজন প্রতিনিধির আপত্তি আছে। আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে কনটেম্পট অফ কোর্ট করে দেবে।

পরেশ গুহ সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বললেন, ইয়োর অনার, অপরাধ করে ফেলেছি।

প্রতাপ বললেন, আপনি বেদ-এর শ্লোক ও মুখস্থ বলতে পারেন, আবার ঐ যে কী যেন বলে, অতি দেশজ শব্দও অনায়াকে উচ্চারণ করেন...

বিমানবিহারী জিজ্ঞেস করলেন, প্রতাপ, তোমার আদালতে কখনো কোনো ইস্কুল-কলেজের মাস্টারকে আসামী হিসেবে পাও না?

প্রতাপ বললেন, অ্যাঁ? হ্যাঁ হয়তো কখনো আসে, তবে ঠিক খেয়াল করতে পারছি না।

– এ বিষয়ে একটা চমৎকার জোক আছে, শোনো। এটা আমি শুনেছিলুম আমার আর এক বন্ধু, তুমি তাকে চেনো, সিগনেট প্রেসের দিলীপ গুপ্তর কাছে। আমেরিকায় একটি আদালতে একবার একজন স্কুলের শিক্ষয়িত্রীকে আনা হয়েছে। সে মহিলা ট্র্যাফিকের লাল বাতির মধ্যেও গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, এই অপরাধে।

পরেশ গুহ বললেন, আমাদের দেশে ওরকম কত লোক যায়!

– আরে গল্পটা শোনো না! পুলিশ থেকে ভদ্রমহিলাকে কোর্টে প্রোডিউস করার পর জাজকে অনুরোধ করা হলো, কেসটা একটু তাড়াতাড়ি বিচার করতে, কারণ ওর ক্লাসের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করে আছে। জাজ হঠাৎ আহ্লাদে ডগোমগো হয়ে উঠে মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি স্কুল টিচার? আজ আমার জীবনের একটা মস্ত বড় আশা পূর্ণ হবে। আমি এত বছর ধর অপেক্ষা করেছি কবে আমার এজলাসে একজন স্কুল টিচার আসবে...যান, ঐ বেঞ্চিটায় বসে কাগজ কলম নিয়ে পাঁচশোবার লিখুন। আমি আর কোনোদিন লালবাতি দেখেও গাড়ি চালাবো না...

পরেশ গুহ এত জোরে জোরে হাসতে লাগলেন যে তাঁর নাক দিয়ে শিকনি বেরিয়ে গেল। রুমাল দিয়ে মুখটুক মুছে তিনি বললেন, তাহলে আমি জজ সাহেবদের সম্পর্কে দু-একটা গল্প শোনাই।

এমন সময় দড়াম দড়াম শব্দে দরজা-জানলা আছড়াবার শব্দ হলো। ঝড় উঠেছে। তিনজনেই দ্রুত চলে এলেন জানলার কাছে। শনিবারের সন্ধ্যায় রাস্তায় অনেক মানুষ, আকস্মিক ঘূর্ণিঝড় সবাই চোখমুখ ঢেকে ছুটছে। কোনো একটা দোকানের টিনের সাইনবোর্ড খসে পড়লো ঝনঝন শব্দে। এই সময় জানলা বন্ধ করে দেওয়াই সঙ্গত, তবু তিন প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন বাইরের দৃশ্য।

একটু পরেই শিল পড়তে শুরু করলো। ঠিক এক ঝাঁক অশ্বারোহীর মতন খটখট শব্দ। গাড়ি বারান্দাটার দরজা খুলে বাইরে এসে প্রতাপ ছেলেমানুষের মতন শিল কুড়োতে লাগলেন। বিমানবিহারী দু'খানা কুড়িয়ে তা চেপে ধরলেন পরেশ গুহর মাথায়। তিন প্রৌঢ় এখন যেন তিন কিশোর।

প্রতাপ বললেন, ঐ যে অলি আর বুলি আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে সংযত হয়ে গেলেন অন্য দু'জন। একটা বাস থেকে নেমে অলি আর বুলি ছুটছে বাড়ির দিকে। অলি শক্ত করে চেপে ধরে আছে দু'হাতে তার আঁচল আর শাড়ির তলার দিকটা।

বিমানবিহারী বললেন, যাক, মেয়ে দুটো ঠিক সময় ফিরেছে।

এ বাড়ির সদর দরজা এমনিতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই হাট করে খোলা থাকে। কিন্তু কী কারণে যেন আজই এখন বন্ধ। ঝড়ের তাড়া খাওয়া দুটি পাখির মতন অলি আর বুলি সেই দরজার ওপর এসে পড়েদুমদুম করে ধাক্কা মারতে লাগলো।

ওপর থেকে বিমানবিহারী বললেন, আঃ, ধীরাজটা গেল কোথায়? দাঁড়া, আমি ডেকে দিচ্ছি।

ধীরাজ যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ দু'বোন ঝড়ের ঝপটা খাবে, সেইজন্য প্রতাপ নিজেই নেমে

গেলেন নিচে। দরজার ছিটকিনি খুলেই যেন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দেবার মতন সুরে বললেন, জানিস, শিল পড়ছিল একটু আগে।

অলি বললো, জানি। এত ধুলো ঢুকে গেছে আমার চোখে!

একতলার উঠোনটাও শিল পড়ে প্রায় সাদা হয়ে গেছে। প্রতাপ একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন। প্রত্যেকবছরই বোধহয় দু-একদিন এরকম ঝড়ের সময় শিলাপাত হয়, প্রতাপ অনেকদিন দেখেন নি। এই শিল পড়ার সঙ্গে যেন বাল্যস্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেই মালখানগরে এরকম ঝড় উঠলেই ছেলেমেয়েরা আমবাগানে ছুটতো। জুন মাস নয় অবশ্য, মার্চ-এপ্রিলের ঝড়েঅনেক কাঁচা আম ঝড়ে পড়ে। শিললাগা আমগুলোতে একটা তামাটে দাগ হয়ে যায়। প্রতাপদের বাড়ির পুকুরের ওপারের বাগানে...এখন কী সেই বাগনটা আছি? ছোট ছেলেমেয়েরা আজও সেখানে আম কুড়োতে যায়?

দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে গেল।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অলি বললো, প্রতাপকাকা, এখন যাবেন না! এই বৃষ্টি চট করে থামবে না। আমরা এসপ্ল্যানেডে দেখে এলুম, আকাশ একেবারে কালো হয়ে গেছে।

–কোথায় গিয়েছিলি রে, তোরা।

–লাইটহাউসে একটা সিনেমা দেখতে।

–অলি, তুই বাবলুর খবর কিছু জানিস?

অলি সচকিত হয়ে প্রতাপের মুখের দিকে তাকালো। অকারণেই যেন রক্তাভ হলো তার কানের দুই লতি। আমতা আমতা করে বললো, আমি? কেন, কী হয়েছে বাবলুদার?

প্রতাপ বললেন, ছেলেটো ওর বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে গেল। গিয়ে একটাও চিঠি লেখেনি এ পর্যন্ত। দশ-বারোদিন তো হয়ে গেল, ওর মা চিন্তা করে।

অলির বুক টিপটিপ করছে। বাবলুদার কাছ থেকে সে একটা চিঠি পেয়েছে দু'দিন আগে। বাবলুদার প্রথম চিঠি। সে চিঠিও অতীন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লেখেনি, সে যাবার আগে অলির সঙ্গে যখন দেখা করতে এসেছিল, বাবলুদা, তুমি যদি চিঠি না লেখো, তোমার সঙ্গে জীবনে আর আমি কথা বলবো না।

অলি কিছুতেই প্রতাপের সামনে সেই চিঠির কথা উচ্চারণ করতে পারলো না। আর কোনো কারণে নয়, যদি প্রতাপ হঠাৎ চিঠিটা একবার দেখতে চান! কোনো কিছু গোপন করার অভ্যেস নেই অলির, কিন্তু বাবলুদার চিঠিটা অন্য কারুকেই দেখানো যায় না।

উত্তর দেবার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেল অলি, এরকম বৃষ্টির মধ্যেও দরজার কাছে এটা গাড়ি থামলো। সেই গাড়ি থেকে নামলেন বিখ্যাত প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত।

একটু আগেই এর কথা হচ্ছিল, বিমানবিহারী এর কাছ থেকে শোনা একটা গল্প বলছিলেন। এই বাড়িতেই দিলীপকুমারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে প্রতাপের। প্রতাপ হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আরে, আসুন, আসুন!

সুবিশালদেহী দিলীপকুমার গুপ্তর ঠোঁটে সব সময়েই একটা পাতলা হাসি মাখা থাকে। এতবড় চেহারা সত্ত্বেও তাঁর স্বভাবের মধ্যে যেন একটি শিশু লুকিয়ে আছে!

গমগমে গলায় তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, বিমান কোথায়?

প্রতাপ বললেন, ওপরের ঘরে। চলুন—

দিলীপমুমার অনেকখানি ভুরু তুলে মহাবিস্ময়ের সঙ্গে বললেন. ঘরে বসে আছে? ওর কী মাথা খারাপ! এইরকম সময়ে—

প্রতাপ ভাবলেন, কোথাও নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। বিশেষ প্রয়োজন না হলো এইরকম ঝড়-জল মাথায় করে দিলীপকুমার নিশ্চয়ই ছুটে আসতেন না।

তিনি অলিকে বললেন, বাবাকে ডাক তো।

ডাকতে হলো না, ওপর থেকে নিশ্চয়ই দিলীপকুমারের গাড়ি দেখতে পেয়েছেন, তাই বিমানবিহারী নিজেই নেমে আসতে লাগলেন নিচে। রেলিং ধরে ঝুঁকে বললেন, কী ব্যাপার, ডি কে, এসো, ওপরে এসো!

দিলীপকুমার বললেন, তুমিনেমে এসো। এক্ষুণি বেরুতে হবে।

সিঁড়ির আরও কয়েক ধাপ নামতে নামতে বিমানবিহারী উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কী ব্যাপার? কী হয়েছে!

দিলীপকুমার আবার বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বললেন, বা, তুমি জিজ্ঞেস করছো কী ব্যাপার? কেন, তোমার চোখ নেই। শোনা বিমান, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা এগুলোর ঠিকঠাক ব্যবহার করার জন্য তোমার দেওয়া হয়েছে, এগযলোকেগুম পাড়িয়ে রাখার জন্য নয়!

–ডি কে, প্রহেলিকা ছেড়ে একটু খুলে বলো। কী হয়েছে কী!

–কী আবার হবে, কতদিন পর এরকম ঝড় উঠলো, এটা সেলিব্রেট করার হবে না? আমি দেখে এরুম, ময়দানের কটা গাছ ভেঙে পড়েছে, আরও ভাঙবে, তুমি চোখের সামনে কখনো গাছ ভেঙে পড়তে দেখেছো? চলো, চলো, আর দেরি করলে কিছুই দেখা যাবে না!

প্রতাপ চমৎকৃত হলেন। দিলীপকুমার একে তো প্রখ্যাত প্রকাশক, তাছাড়া এখন বাটা কম্পানীর মস্ত অফিসার, সদাব্যস্ত মানুষ। এইরকম মানুষেরও ঝড়-বৃষ্টি ও গাছ ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখার জন্য ময়দানে যাওয়ার এত ব্যাকুলতা!

বিমানবিহারী বললেন, এখন বেরুতে হবে, তাহলে পা-জামাটা ছেড়ে ধুতি পড়ে আসি

–কিস্সু দরকার নেই। গাড়িতে যাবে তো, ঝড় দেখতে যাওয়া হবে, কোনো স্বয়ম্বর সভায় তো যাচ্ছো না!

–আমার দু'জন বন্ধু রয়েছেন, তাহলে এঁদেরও...

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তবে দেরি করো না।

প্রতাপের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, এই যে, ইয়ে, চন্দ্রশেখরবাবু, চলুন, ঘুরে আসা যাক।

প্রতাপ হাসলেন। দিলীপকুমার প্রায়ই তাঁর নাম ভুল করেন। তবে এই ভুলের মধ্যেও একটা প্যাটার্ন আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উপন্যাসের দুটি চরিত্রের নাম বদলা-বদলি করে ফেলেন তিনি। আর একদিন তিনি প্রতাপকে ডেকেছিলেন শিবনাথ বলে। সেটাও ব্রাহ্ম সমাজের দুই নেতার নাম পরিবর্তন।

প্রতাপের সঙ্গে দিলীপকুমারের বেশ কয়েকবার দেখা হলেও, প্রতাপ বুঝতে পারেন, দিলীপকুমার তাঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কথা বলেন না। সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রকাশক, ছাপাখানাওয়ালা এঁদের নিয়েই তিনি সব সময় মত্ত।

দিলীপকুমারের গাড়ির ড্রাইভার আছে, কিন্তু ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালাবেন তিনি নিজে। পেচনের সীটে বিমানবিহারী, পরেশ গুহ ও প্রতাপ। ঝড় এখন অনেকটাই প্রশমিত, বৃষ্টি পড়ছে প্রবল তোড়ে। এ বছরের প্রথম মনসুন।

ময়দানে কয়েকটি গাছ ভেঙে পড়ে আছে, নতুন কোনো গাছের ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখা গেল না। দিলীপকুমার রেড রোডের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, রেসকোর্সের প্রান্ত ধরে আলিপুরের দিকে অনেকখানিক গিয়ে বেলবেডিয়ারের পাশ দিয়ে ঘুরলেন কয়েকবার। এ যেন কলকাতা নয়, কোনো অচেনা সুন্দর শহর। জনমানবহীনা রাস্তা, অন্য গাড়িগুলির ছুটে যাওয়ার দারুণ ব্যস্ততা, দুটি পাশাপাশি শিশু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা একপাল গোবেচারার মতন গোরু।

খানিক বাদে দিলীপকুমার বললেন, বিমান, তুমি তো মিষ্টি খেতে ভালবাসো, চলো, শ্যামবাজারের সেনমশাইয়ের দোকানে খাওয়ায়...

পরেশ গুহ বাড়ি ফেরার তাড়ায় নেমে গেলেন ধর্মতলায়। ওঁদেরও আর শ্যামবাজার পর্যন্ত যাওয়া হলো না। ওদিকে রাস্তায় প্রচুর জল জমেছে।

এদিকেও, এলগিন রোড পর্যন্ত মোটামুটি ঠিক থাকলেও তারপর ভবানীপুরের দিকে এক হাঁটুর বেশি জল। দিলীপকুমার সেই জল ঠেলেই বিমানবিহারী ও প্রতাপকে বাড়ি পৌঁছাবার প্রস্তাব দিলেও ওঁরা দু'জেন রাজি হলেন না! এত জলে গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবার সমূহ সম্ভবনা। জোর করে নেমে পড়লেন দু'জনে।

দিলীপকুমার এতক্ষণ গাড়িতে নানারকম রঙ্গ রসিকতা করছিলেন। এবারেও বললেন, বিড়লা মরার পর এক চান্সের স্বর্গে যাবেন কেন জানো তো; অন্যের অ্যাকাউন্টে বিড়লার অনেক পূণ্য জমে যাচ্ছে। বিড়লার এই অ্যামবাসেডর গাড়ি, এই গাড়িতে প্রত্যেকদিন বাড়ি পৌঁছোবার পর লোকে বলে, থ্যাঙ্ক গড, আজ গাড়িতে কোনো গোলমাল হয়নি। বিড়লার জন্য এত লোক ভগবানের নাম নিচ্ছে...

বিমানবিহারী ও প্রতাপ একটি রিক্সা নিলেন। কলকাতার বর্ষায় রিক্সাওয়ালারাই অতি বিশ্বস্ত ভরসা। রাস্তার বাতিগুলো কী কারণে যেন নিবে গেছে। দোকানপাটও সব বন্ধ। অন্ধকার পথটাকে নদী বলে মনে হতে পারে। প্রতাপ একটা খালের কথা ভাবছেন, এই রিক্সাটা যেন নৌকো।

মালখানগরে যেতে হলে নদী ছেড়ে একটা খালের ঢুকতে হতো।

বিমানবিহারীকে আগে নামতে হলো। তারপর প্রতাপ একটি নিজস্ব সিগারেট ধরালেন। দিলীপকুমার তাঁর গাড়ি সফরের সময় অকৃপণভাবে সিগারেট বিলিয়েছেন। মানুষটার স্বভাবের মধ্যে একটা অতি ভদ্র কিন্তু দিলদরিয়া ভাব আছে। প্রতাপ ভাবছিলেন, এই লোক কী করে অপিস টফিসে চাকরি করে, ব্যবসা চালায়? এইসব মানুষের হাতে অফুরন্ত টাকা খরচ করার স্বাধীনতা দিলে সেই টাকার সদ্ব্যবহার হতে পারে। অবশ্য সেজন্য একটা অন্য দেশ কিংবা অন্য শতাব্দীও দেওয়া দরকার।

প্রতাপের মনটা এখন বেশ ভালো লাগছে। রুটিনের বাইরের জীবন, রুটিনের বাইরের মানুষ তাঁর বিশেষ পছন্দ, যদিও নিজের দৈনন্দিন জীবনে সে রকম বিশেষ কিছু ঘটে না।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে প্রতাপ দেখলেন, তাঁদের বাড়ির দরজার সামনে আর একটি রিক্সা থেমেছে। রাত প্রায় নটা, অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না, তবু মনে হলো, একজন বৃদ্ধ সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক, নামলো সেই রিক্সা থেকে, তারপর রিক্সাওয়ালার সঙ্গে দরদাম করতে শুরু করেছে।

এরকম সময়ে হঠাৎ কেউ দেখা করতে আসবে না। প্রতাপ বুঝলেন, এই বৃষ্টি-বাদলার রাতে তার বাড়িতে অতিথি এসেছে।

আগেকার দিন আর নেই, এখন বাড়িতে অতিথি এলে মনটা ভারী খুশী হয় না। মনে হয় অবাঞ্ছিত উপদ্রব। অতিথি আসা মানেই ব্যয় বৃদ্ধি। সবসময় অর্থ চিন্তা। অর্থের জন্য কি দয়া-মায়া সৌজন্য সব বিসর্জন দিতে হবে? মমতা কিছুদিন অসুখে ভুগলেন, সে জন্য এ মাসে অতিরিক্ত খরচ হয়ে গেছে। বিমানবিহারীর কাছে আবার হাত পাততে হবে। এই দৈন্য, এই গ্লানি, এ সবের জন্য প্রতপের হঠাৎ হঠাৎ ঘর সংসার ছেড়ে নিরুদ্দেশে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

॥ ৫১ ॥

চায়ের কাপ তুলে একটা চুমুক দিয়ে খসখসে গলায় বিশ্বনাথ গুহ বললেন, বাপরে, বাপ, কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! বাস চলে না। রিক্সাওয়ালা ব্যাটা পাঁচ টাকা ভাড়া নিল! আট আনা পয়সা পর্যন্ত কমাবে না। একেবারে চশমখোর!

প্রতাপ চিবুকটা বুকে ঠেকিয়ে বসে আছেন। বিশ্বনাথকে দেখেই তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, তার ওপর বিশ্বনাথ এসেই যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা শুনে প্রমাদ গুনেছেন।

মায়ের মৃত্যুর পর বিশ্বনাথের সঙ্গে প্রায় কোনোই সম্পর্ক রাখেননি প্রতাপ। এককালে এই জামাইবাবুটির সঙ্গে তাঁর যে মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে। মা যখন মৃত্যুশয্যায় তখনই বিশ্বনাথ বিষয় সম্পত্তির কথা তুলেছিলেন,তারপরেও নানান ছুতো- নাতায় তিনি প্রতাপকে দোহন করার কম চেষ্টা করেননি। এককালের বিবাগী, সুর-সাধক বিশ্বনাথ গুহ'র মুখে এখন সব সময় টাকা পয়সার কথা।

দেওঘরের বাড়িটা তো পুরোপুরিই দিয়ে দেওয়া হয়েছে শান্তি—বিশ্বনাথকে, এখন ওঁরা নিজেদের সংসার নিজেরা যেমন করে হোক চালাবেন। মা মারা গেছেন, প্রতাপের আর কোনো দায়িত্ব নেই। এই দুর্দিনে কে আর অন্যের বোঝা টানতে পারে।

দড়ি-পাকানো চেহারা এখন বিশ্বনাথের, ধুতিটা ময়লা, পাঞ্জাবীতে, নস্যির দাগ, মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি। গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা, তবু অনবরত কথা বলে চলেছেন। চা শেষ করার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে তিনি বললেন, নাঃ, কাপ চায়ে ঠিক জুৎ হলো না, ও মুন্নিমা, আর একটু চা খাওয়াবি?

দুপুর থেকেই মমতার পেটে ব্যথা। সন্ধ্যের দিকে খুব বেড়েছিল, তাই তুতুল ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। এখন বাড়িতে লোকজন এলে মুন্নি চা-টা করে দিতে পারে।

আজ সন্ধ্যেটা বড় ভালো কেটেছে প্রতাপের, বেশ একটা ফুরফুরে মন নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। দরজায় পা দিতে না দিতেই এই মূর্তিমান উপদ্রব, তার ওপর আবার মমতার শরীর খারাপ। বিমানবিহারী, দিলীপকুমার, পরেশ গুহ নিশ্চিত এখন বাড়িতে বসে হাত পা ছড়িয়ে রেডিও-গ্রামাফোনে গান বাজনা শুনছে। কিংবা বউ ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করছে, আর প্রতাপের কপালে এই!

টুনটুনির ভিজে শাড়ী ছাড়াবার জন্য সুপ্রীতি তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের ঘরে। এখন দু'জনেই আবার ফিরে এলেন। দিদিকে দেখে একটু স্বস্তি পেলেন প্রতাপ। একা একা বিশ্বনাথের সঙ্গে

কথাবার্তা চালাতে তাঁর একটুও ভালো লাগছিল না।

সুপ্রীতি জিজ্ঞেস করলেন, ও বিশ্বনাথ, তুমি শান্তিকে নিয়ে এলে না কেন? তাকে একা ফেলে এলে?

বিশ্বনাথকে দেখেই প্রতাপ এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে মেজদির কথা তাঁর মনে পড়েনি। সত্যিই তো, শান্তি অসহায় ধরনের নারী। অন্য কারুর অবলম্বন ছাড়া সে নিজে যেন দাঁড়াতেই পারে না। সে একা দেওঘরের ঐ বাড়িতে থাকে কী করে?

বিশ্বনাথ বললেন, পাশের বাড়ির একটা বুড়ি এসে ওর সঙ্গে থাকবে। বাড়ি খালি রেখে সবাই একসাথে আসি কী করে? নিচের তলার ভাড়াটে হারামজাদারা যদি পুরো বাড়িটা দখল করে নেয়? ও শালারা একেই তো ভাড়া দেয় না।

সুপ্রীতি বললেন, টুনটুনি বলছিল, শান্তির নাকি শরীর খারাপ?

বিশ্বনাথ অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, ওরকম শরীর খারাপ তো সারা-বছর লেগেই আছে! হাঁটা চলা করতে পারে।

প্রতাপ টুনটুনির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেছে মেয়েটা। আগে তিনি টুনটুনিকে শাড়ী পরা অবস্থায় দেখেছেন কি না মনে করতে পারলেন না। মাতৃবংশের ধারা পেয়েছে। বেশ লম্বা হয়েছে টুনটুনি। রোগা হলেও মুখশ্রীটা সুন্দর। সুপ্রীতির অল্প বয়েসী চেহারার সঙ্গে যেন মিল আছে।

সুপ্রীতি আবার জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটাকে তুমি কলেজে পড়ালে না কেন বিশ্বনাথ?

—ভেবেছিলাম তো ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে চকরিতে দেবো। কিন্তু পড়াশুনোয় ওর মাথা নেই, বড়দি।

—আহা—হা মাথা নেই আবার কী? চেষ্টা করে দেখতো। তুমি তো ওকে কলেজে ভর্তি করালেই না। এটা বাপু তোমার অন্যায়।

—আমার না হয় অন্যায়। কিন্তু আপনাদেরও তো বোনঝি। আপনারা কি একবারও খবর নিয়েছেন যে মেয়েটা কলেজে ভর্তি হলো কি হলো না?

কথাটা শুনে প্রতাপের আবার রাগ হয়ে গেল। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বললেন, তোমার মেয়ে, তুমি তাকে কলেজে ভর্তি করতে পারো না। আমরা কেন দায়িত্ব নিতে যাবো? তুমি ওর জন্ম দিতে গিয়েছিলে কেন?

সুপ্রীতি বিশ্বনাথের কাছে কথায় না হেরে গিয়ে বললেন, আমরা খবর নেবো কি, তুমি তো চিঠিপত্র লিখতে, কই জানাওনি তো যে টুনটুন কলেজে ভর্তি হয়নি। আমরা তো ধরেই নিয়েছি যে আমাদের বংশের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবেই।

—তাই তো আপনাদের বংশের মেয়েকে আপনাদের কাছেই রেখে যেতে এসেছি।

প্রতাপ দ্রুত চিন্তা করছেন, বিশ্বনাথ আর তাঁর মেয়েকে থাকতে দেওয়া হবে কোন্ ঘরে। এখন না হয় বাবলুর ঘরটা খালি, কিন্তু বাবলু কাল-পরশুই ফিরে আসতে পারে। বাবলুর ঘরটা খুবই ছোট। সেখানে দু'জনেই শোওয়ার ব্যবস্থা করা যায় না। বাবলু তার ঘরে অন্য কারুর যখন তখন ঢোকাই পছন্দ করে না। সে এখন সাবালক হয়েছে। সে তো এখন খানিকটা প্রাইভেসি চাইবেই! বিশ্বনাথকে তখন এই বসবার ঘরে বিছানা পেতে দিতে হবে। বসবার ঘরে কারুকে শুতে দেওয়া প্রতাপ একেবারে পছন্দ করেন না। প্রতাপের কাছে লোকজন আসে। বাবলুর বন্ধুরা যখন তখন আসে। মুন্নি তুতুলেরও বন্ধু আসে। বসবার ঘরে যাকে শুতে দেওয়া হয়, তারও যেমন অস্বস্তি, বাড়ির লোকেরও অস্বস্তি।

বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করলেন, ব্রাদার, তোমার ট্রামের মান্থলি আছে?

—না, কেন বলুন তো?

—কলকাতায় তো অনেকদিন আসিনি। এক সময় অনেকের সঙ্গে চেনাশুনো ছিল। ভাবছি যতজনের সঙ্গে পারি দেখা করে যাবো। ট্রাম-বাসের যা ভাড়া বেড়েছে, ওফ্! আমাদের সময় দু'পয়সা ট্রাম-ভাড়া ছিল, তোমার মনে আছে, ছ'আনার পাওয়া যেত অল-ডে টিকেট? তুমি আমায় কাল পাঁচটা টাকা দিও!

প্রতাপ মনে মনে আবার প্রমাদ গুণলেন। বিশ্বনাথ ট্রাম-বাস ভাড়ার জন্য পয়সা চাইছেন। তার মানে ওঁর দেওঘরে ফিরে যাবার ট্রেন ভাড়া নেই। যাদের ফেরার ভাড়া থাকে না, তাদের ফিরে যাবার তাড়াও থাকে না। উনি তা হলে এখানে কতদিন থাকবেন?

মুন্নি আবার চা বানিয়ে নিয়ে এলো। বিশ্বনাথ তার পিঠে ও মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক আদর করলেন। তুতুলকেও ডেকে পাঠালেন তিনি, তুতুলকে বললেন, তুই মা আমার দাঁতটা একটু দেখে দিবি। দাঁতের ব্যথায় বড়কষ্ট পাচ্ছি। শক্ত কিছুই খেতে পারি না।

তুতুল হেসে বললো, আমি তো দাঁতের ডাক্তার নই, মেসোমশাই! ঠিক আছে, আপনাকে বউবাজারে এক ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যাবো।

বিশ্বনাথ বললেন, সে তুই যা ভালো বুঝবি, আমি তোর হাত-ধরা হয়ে থাকবো। বাঁ চোখটাতেও ভালো দেখি না। ওখানে তো সেরকম চিকিৎসার সুযোগ নেই, তোকেই একটু ব্যবস্থা করে দিতে হবে!

প্রতাপ দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন। স্বার্থপরতার চূড়ান্ত! একবার যখন কলকাতায় এসেছেন বিশ্বনাথ, তখন পরের পয়সায় সব রকম চিকিৎসা করিয়ে নিতে চান। আরও রোগ বেরুবে। ওঁর টি-বি'র এখন কী অবস্থা? সে সম্পর্কে তো কিছুই বলছেন না।

একসময় বিশ্বনাথ মেয়েদের বললেন, তোমরা এখন ভেতরে যাও মা, আমরা একটু কাজের কথা বলি?

সুপ্রীতি বললেন, দু'বছর কলেজে ভর্তি না হয়ে বাড়িতে বসে থেকেছে, এখন কী আর কলেজে ভর্তি হয়ে তাল সামলাতে পারবে টুনটুনি?

বিশ্বনাথ মুখটা ঝুঁকিয়ে বললেন, কলেজে পড়ুক না পড়ুক, ওকে এখন আপনাদের কাছেই রাখতে হবে, বড়দি। নইলে জাত-ধর্ম সব যাবে। আপনাদেরও তো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বিয়ে-শাদীর সময়...এখানে মেয়ের জন্য আপনারা একটা ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। আপনারা যা ভালো বুঝবেন, আমাকে দেখাবারও দরকার নেই।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের ওদিকেও তো এখন অনেক বাঙালী সেট্‌ল করেছে। ওখানে কোনো পাত্র পেলেন না?

—বিপদের কথা তোমাকে কী বলবো ভাই, ও মেয়ে কিছুতেই বাড়ি থাকতে চায় না। সব সময় টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। এই বয়েসের মেয়ে যে গলার কাঁটা! তোমার দিদিকে তো জানোই, ব্যক্তিত্ব নেই, মেয়েকে সে সামলাতে পারে না, আমিও প্রায় সময়েই বাড়ি থাকি না। কোনোদিন যদি একটা অঘটন ঘটে যায়...আমার বাড়ির ভাড়াটেগুলো একেবারে হারামজাদা, এক পয়সা ভাড়া ঠেকায় না, আবার টুনটুনিকে লোভ দেখায়। দুপুরবেলা ওদের ঘরে গিয়ে বসে থাকে। একদিন মেরে পিঠের চামড়া তুলে দিতে গিয়েছিলাম, তাতে ও আমাকে ধাক্কা মেরে বললো, বেশ করবো, যাবো! বুঝে দ্যাখো! এমনিতে দেখছো তো চুপচাপ, লাজুক, আসলেও মেয়ে হয়েছে বদমাইসের জাসু!

সুপ্রীতি অপ্রসন্ন ভাবে বললেন, তোমরা ভালো শিক্ষা দিতে পারো নি।

বিশ্বনাথ বললেন, দোষ আমাদের দিতে পারেন ঠিকই। আপনারাও দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। আপনাদের মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথা কেয়েছেন। আমাদের কোনো কথা তিনি শুনতেন না। আমি বাঙালী-অবাঙালী মানি না। একটা ভালো মতন ছেলে পেলে দেওঘরের বাড়ি বিক্রি করেও ওর বিয়ে দিয়ে দিতাম। কিন্তু সুশিক্ষিত বা ভালো বংশের ছেলে না হলে আমি কিছুতেই বিয়ে দেবো না, বরং মেয়ের গলা টিপে মেরে জলে ভাসিয়ে দেবো। তোমার তো জানো না, ওদেশে অনেক ছেলেই বাঙালী মেয়ে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তাদের গ্রামে একটি করে বউ আগে থেকেই।

সে রাতে প্রতাপের মেজাজটা খারাপ হয়েই রইলো।

পরদিন মমতা অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন। টুনটুনিকে এ বাড়িতে রাখার বিষয়ে মমতা ও সুপ্রীতির সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন প্রতাপ। মমতা ও সুপ্রীতি দু'জনেই টুনটুনিকে এ বাড়িতে রেখে দেওয়ার পক্ষে। বিশ্বনাথ যেভাবে অনুরোধ করছেন, তাতে না বলা যায় না। দেওঘরে থাকলে মেয়েটা গোল্লায় যাবে। এই বংশেরই তো মেয়ে।

দিদি ও স্ত্রীর যুক্তি প্রতাপ অস্বীকার করতে পারেন না। তবু তাঁর মন ঠিক সায় দেয় না। টুনটুনির প্রতি তাঁর স্নেহ জন্মায়নি। তা ছাড়া বাড়িতে আর একটি মানুষ বাড়বে, তার একটা খরচ আছে। সব ঠাট বজায় রেখে কীভাবে যে খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন, তা শুধু প্রতাপই জানেন।

প্রতাপের আসল আপত্তি, টুনটুনির ছুতো ধরে বিশ্বনাথ গুহ এখানে প্রায়ই যাতায়াত শুরু করবেন।

কিন্তু এই সব আপত্তির একটিও মুখে প্রকাশ করা যায় না।

বিশ্বনাথ টুনটুনিকে প্রায় এক বস্ত্রে নিয়ে এসেছেন। প্রায় পালিয়ে আসার মতন। আসল ব্যাপার

হয়তো আও কিছু ঘটেছে, বিশ্বনাথ তা খুলে বলছেন ন। মমতার দু'খানা শাড়ী দেওয়া হয়েছে টুনটুনিকে। কিন্তু তার জন্য সায়া-ব্লাউজ কেনা দরকার এখনই। তার পায়ের চটিটা চায়ারের, কলকাতার কোনো ভদ্র মেয়ে ঐ চটি ব্যবহার করে না।

বিশ্বনাথ গুহকে নিয়ে তুতুলকে কয়েকদিনের ঘুরতে হলো ডেন্টিস্ট ও চোখের ডাক্তাররের কাছে। বিশ্বনাথ পকেট থেকে একটাও পয়সা বার করেন না। বরং রাস্তায় বেরিয়ে তিনি তুতুলের কাছে আবদার করেন, অনেকদিন কুলপি মালাই খাইনি। খাওয়াবি, মা? হ্যাঁরে, দ্বারিক, ঘোষের দোকানে কচুরি ডাল পাওয়া যায় এখনও? আঃ, ওদের ডালটার যা স্বাদ ছিল না, এখনও জিভে লেগে আছে।

তুতুলের উপার্জন অতি সামান্য। পাশকরার পর দু'মাস পি আর সি এক করার পর সে এখন হাউস স্টাফ হয়ে কিছু মাইনে পাচ্ছে, পঁচাত্তর টাকা। না, না, পুরো পঁচাত্তর নয়। তার বন্ধুরা বলে, আমাদের মাইনে চুয়াত্তর টাকা নব্বই পয়সা! দশ পয়সা কেটে নেয় রেভিনিউ স্ট্যাম্পের বাবদে'। তুতুলের সহপাঠীদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন পরিবার থেকে এসেছে,তারা মাসের প্রথমে ঐ টাকা পেয়ে একদিনে উড়িয়ে দেয় দল মিলে চিনে হোটেলে খেয়ে। আর তুতুলের মতন যারা, তাদের ঐ টাকাতেই সারা মাস চালাতে হয় টিপে টিপে।

বিশ্বনাথের জন্য চার পাঁচ দিনেই তুতুলের সব টাকা খরচ হয়ে গেল। তারপরেও তাঁর আবদারের শেষ নেই। তিনি সিনেমা দেখতে চান, গানের জলসা শুনতে যেতে চান। অনেকদিন পর কলকাতায় এসে তিনি যেন আদেখলা হয়ে গেছেন।

রাস্তায় বেরিয়ে এক পা-ও হাঁটতে চান না তিনি। তাঁর রিক্সা চাই। যে-কোনো পুরুষ মানুষের স্পর্শে তুতুলের অস্বস্তি হয়, বিশ্বনাথ তার কাঁধে হাত রাখেন।

শুধু টাকা পয়সার অসুবিধের জন্যই নয়, তুতুলের সময়ও নষ্ট হচ্ছে খুব। বিশ্বনাথের ব্যবহার অবুঝের মতন। শেষ পর্যন্ত তুতুল মায়ের কাছে খুব সংকোচের সঙ্গে অভিযোগ জানালো। তুতুল হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে পারছে না। একদিন বিশ্বনাথকে সে হাসপাতালে ডিউটিতে যাবার কথা বলতে বিশ্বনাথও তার সঙ্গে হাসপাতালের গিয়ে সর্বক্ষণ বসে ছিলেন।

সুপ্রীতি বাধ্য হয়ে বিশ্বনাথকে তুতুলের কাজের কথা বুঝিয়ে বললেন এবং তাকে কুড়িটা টাকা দিলেন। তবু ভয়ের চোটে তুতুল ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

টুনটুনিকে নিয়েও সমস্যা হলো। টুনটুনি আসবার পর থেকেই মুন্নি আর তুতুলের দু-একটা ছোটখাটো জিনিস হারাচ্ছে। ওগুলো যে টুনটুনিই নিয়ে লুকিয়ে রাখছে রাখছে, তা অতি স্পষ্ট। এতই সামান্য সব জিনিস, লবঙ্গের কৌটো কিংবা নকল পাথরের দুল, ওসব টুনটুনি চাইলেন ওরা দিয়ে দিত। তুতুল বা মুন্নি টের পেয়ে গেলেও কিছু বলে না, কিন্তু ওদের ভয়, বাবলু এসে পড়লে, তার ঘর থেকে কোনো জিনিস সরালেসে চেঁচেয়ে সারা বাড়ি মাথায় করবে। এর মধ্যেই বাবলুর ঘর থেকে টুনটুনি কিছু সরিয়েছে কি না কে জানে!

মমতা একদিন টুনটুনিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন কালীঘাট মন্দিরের কাছে বাজার করতে। টুনটুনি কলকাতা শহরে কিছুই প্রায় দেখেনি। কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে সে তার বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে। এমনকি ট্রাম চলতে দেখলেও সে সবিস্ময়ে তাকায়।

মমতার মায়া হয়। মেয়েটা তো আসলে এখনও ছেলেমানুষ, কতই বা বয়েস, কুড়িও পূর্ণ হয়নি। ওকে আস্তে আস্তে চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল এই সব দেখিয়ে দিতে হবে।

হারিয়ে যাবার বয়ে টুনটুনি মমতার আঁচল চেপে ধরে আছে। মমতা ওকে রঙীন কাচের চুড়ি কিনে দিলেন, পায়ের নোখের জন্য নেলপালিশ কিনে দিলেন, আইসক্রিম খাওয়ালেন।

বাড়ি ফেরার পথে টুনটুনি ফিকফিক ফিকফিক করে হেসে বললো, মামী, এই দ্যাখো!

আঁচলের তলা থেকে সে একটি ছোট পাউডারের কৌটো বার করলো। মমতা স্তম্ভিত। এত সরল, লাজুক আর ভীতু মনে হচ্ছিল মেয়েটাকে, তার এই কান্ড। দোকান থেকে পাউডারের কৌটো চুরি করেছে?

মমতা নিজের ছেলেমেয়েদের আদর করলেও শাসন করতে কখনো কার্পণ্য করেননি। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে টুনটুনির দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোর পাউডার দরকার ছিল, বললি না কেন আমায়?

টুনটুনি শরীর মুচড়ে বললো, এইটার তো দাম লাগলো না?

–দাম না দিয়ে দোকান থেকে জিনিস নিলে তাকে কী বলে তুই জানিস না? তোর মামা কী কাজ

করেন, তা জানিস? তোর মামা এই সব চোরদের জেলে দেয়। এরকম করলে তুই কী কাজ করেন, তা জানিস? তোর মামা এই সব চোরদের জেলে দেয়। এরকম করলে তুই কলকাতায় থাকতে পারবি না! তোর মামা যদি একবার শোনে...

টুনটুনি সঙ্গে সঙ্গে মমতার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বললো, মামী, আর কোনোদিন করবো না, তুমি মামাকে বলে দিও না!

মতা তবু ছাড়লেন না। টুনটুনিকে নিয়ে ফিরে গেলেন কালীঘাট মন্দিরের কাছে। সেই দোকানটির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, যা, ফেরৎ দিয়ে আয়। বলবি, ভুল করে নিয়ে গিয়েছিলি।

বাড়ি ফিরে তিনি সুপ্রীতিকে এই ঘটনাটা বলতেই সপ্রীতি জানালেন যে ও মেয়ের যে হাত-টান স্বভাব তা তিনিও লক্ষ্য করেছেন। ওরেক চোখে চোখে রাখতে হবে।

টুনটুনির নামে তিনি প্রতাপের কাছে নালিশ করলেন না বটে, কিন্তু দু-একদিন পরেই মমতা প্রতাপকে আর একটি বিষয় জানালেন। কানু মাঝে মাঝেই দুপুরের দিকে আসে। আগেরদিন এসে সে বলেছে যে বিশ্বনাথ তাকে খুব বিরক্ত করছেন। এর আগে দেওঘর থেকে বিশ্বনাথ প্রায়ই কানুর কাছে টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছেন। কানু দিয়েছিল দু-একবার। এখন তিনি মেয়ের বিয়ের কথা বলে ছ'হাজার টাকা চেয়েছেন। মেয়ের বিয়ে নাকি ঠিক হয়ে গেছে। কানু এখন অত টাকা দিতে পারবে না। কানু আরও খবর পেয়েছে যে, কানুর বাড়িতে বসেই নতুন দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশ্বনাথের আলাপ হয়েছিল, বিশ্বনাথ সেই দুই ভদ্রলোকের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে টাকার জন্য জ্বালাতেন করেছেন।

প্রতাপ প্রথমটা হুঁ হাঁ করে শুনছিলেন, হঠাৎ মাথা তুলে উত্তেজিতভাবে বললেন, উনি বিমানবিহারীর বাড়িও যাতায়াত করছেন শুনলুম। বিমানের কাছেও টাকা চেয়েছেন নাকি?

এ কথাটা মনে আসা মাত্র প্রতাপ বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। আদালত থেকে ফিরে তাঁর জলখাবারও খাওয়া হয়নি। মমতার অনুরোধেও কর্ণপাত করলেন না।

বিমানবিহারী প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। না, না, ওসব কিছু না বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন অনেকবার। কিন্তু প্রতাপ ছাড়বার পাত্র নন, প্রচুর জেরা শোনার অভ্যেস আছে তাঁর।

শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে বিশ্বনাথ এখানে মেয়ের বিয়ের বদলে স্ত্রীর অসুখের প্রসঙ্গ তুলে কিছু টাকা ধার চেয়েছিলেন। বিমানবিহারী তাকে দুশো টাকা ধার দিয়েছেন।

প্রতাপ হুকুমের সুরে বললেন, বিমান, ভাউচার বার করো। আমার নামে দুশো টাকা লেখো। আমি এক্ষুনি তোমার টাকা শোধ করে দিতে চাই।

বিমানবিহারী বললেন, আহা, ব্যস্ত হচ্ছো কেন? সামান্য টাকা, পরে একটা কিছু ব্যবস্থা হবে।

প্রতাপ বললেন, আমার কাছে সামান্য নয়। তুমি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে এক্ষুনি কেটে নাও!

বিমানবিহারী জানেন, প্রতাপের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তাঁর এই গোঁয়ার বন্ধুটিকে তিনি এক কাপ চা খাওয়াবার জন্যও আর ধরে রাখতে পারলেন না। ভাউচারে সই করই প্রতাপ হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

বিশ্বনাথ গুহ বাড়িতে ছিলেন না। প্রতাপ বাইরের ঘরে বসে রইলেন ঠায়। বিশ্বনাথ বাড়ি ফেরা মাত্র ভেতরের দিকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, বসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

প্রতাপ একসময়ে বিশ্বনাথকে ওস্তাদজী বলে ডাকতেন। এখন সেই খোনা-গলার ভাঙাচুরো মানুষটিকে এ সম্বোধন করলে তা ব্যঙ্গের মতন শোনাবে।

তিনি রাগের চেয়ে বেশি দুঃখিত গলায় বললেন, বিশ্বনাথবাবু, আপনার নামে আমি এসব কী শুনছি? আপনি আমারই বাড়িতে থেকে লোকজনের কাছে টাকা চেয়ে বেড়াচ্ছেন? আপনার নিজের মানসম্মান না হয় বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু আমার একটা মানসম্মান জ্ঞান এখনো টিকে আছে, যারা আমার বন্ধু, আপনি আমায় কিছু না জানিয়ে তাদের কাছে গিয়ে...এমনকি আপনার জন্য কানু এসে এ বাড়িতে কথা শুনিয়ে যায়...

বিশ্বনাথ চোখ পিটপিট করে শুনতে লাগলেন, প্রতাপের গলায় উত্থান পতন শুনেও তিনি বিশেষ বিচলিত হলেন না। প্রতাপ একটু থামতেই তিনি বললেন, তুমি আসল কথাটা বলতে পারছো না ব্রাদার। আসল কথাটা হলো আমি ভিক্ষে করছি। হ্যাঁ, ভিক্ষেই তো করছি। নানান কথার ছলনায় ভুলিয়ে...তবেই বুঝে দ্যাখো, পোড়া পেটের জন্য মানুষ কি না করে? ভিক্ষে না করলে খাবো কি বলতে পারো? দেওঘরে একটা শুধু বাড়ি আছে, আর একটা পয়সা রোজগার নেই। ভাড়াটেগুলো

গাজুয়ারি করে পয়সা দেয় না, তাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করার সামর্থ্য আমার নেই। মেয়েটাকে এখানে গছিয়ে গেলাম, আমরা আর দুটি প্রাণী, বেঁচে থাকতে হবে তো?

জামাটা খুলে নিজের পেটের ওপর হাত রেখে আবার বললেন, এই যে, এইটিই সব কিছু। পেট কোনো যুক্তি শোনো না। ক্ষুধাই হলো মায়া, ক্ষুধাই ঈশ্বর। শ্মশানে যাবার আগে কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা মরে না। কী করি বলো, ব্রাদার!

॥ ৫২ ॥

আকাশে জোরে বিদ্যুৎ চমকালেই বজ্র গর্জন শোনা যাবে একটু পরে। আলোর থেকে শব্দের গতি অনেক কম, তাই মেঘ সংঘর্ষের পর প্রথমেই দেখা যায় আলোর চমক, তারপর এসে পৌঁছোয় বজ্র নির্ঘোষ। কতদিনই তো ঝড়-বৃষ্টি হয়, তবু এক-একদিন যেন নেশার মতন হয়ে যায়, বিদ্যুৎ চমক দেখলেই প্রতীক্ষা করতে হয় বজ্রের শব্দ শোনার জন্য। সেই শব্দ এক-একবার এক রকম।

মামুনের ঘরের জানলার পর্দা কাচতে দেওয়া হয়েছে, মাঝ রাত্রেও কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের খেলা। বৃষ্টি তেমন নেই, বিদ্যুৎ-বজ্র ঝড়ের দাপটই বেশি। এখন কৃষ্ণপক্ষ, এক-একবার তীব্র বিদ্যুতের ঝলক যেন আকাশটাকে চিড়ে দিচ্ছে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত। ঘুম আসছে না মামুনের, তাঁর মাথার মধ্যে বারবার ঘুরে আসছে মাইকেলের একটি লাইন, "ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে।" এই লাইনটা এমন কিছু কবিত্বময় নয়, তেমন কিছু স্মরণযোগ্য নয়, তবু কোনো কোনো দিন এরকম একটা কবিতার লাইন বা গানের লাইন মাথা জুড়ে বসে যুক্তিহীনভাবে, কিছুতেই যেতে চায় না।

বিদ্যুৎ আর বজ্র, এ দুটি যেন ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া। মামুন আকাশের দিকে চোখ রেখে ভাবছেন, যে-কোনো ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকবেই। এটাও একটা অতি সাধারণ চিন্তা, তবু মামুন বারবার ঐ একই কথা ভেবে চলেছে। এক একবার বজ্রের শব্দ এমন প্রচণ্ড যে বুক কেঁপে উঠছে তাঁর, তখন মনে হচ্ছে অতি সাধারণ ক্রিয়ারও প্রতিক্রিয়া হতে পারে প্রচণ্ড। বড় খাটটার এ-পাশে ও-পাশে ছটফট করছেন মামুন।

ফিরোজা বেগম তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে পাশের ঘরে শুয়ে আছেন। অনেকদিনই এ রকম পৃথক শয়নের ব্যবস্থা। অপিস থেকে ফিরতে মামুনের প্রায়ই রাত হয়, তা ছাড়া ফিরেও মামুন টেপ রেকর্ডারে কিছুক্ষণ ধরে ফিরোজার প্রায়ই জ্বর হচ্ছে, ডাক্তারের সন্দেহ তাঁর পুরোনো বিকোরাই রোগটি ফিরে এসেছে। চিকিৎসায় ফল হচ্ছে না বিশেষ, অমন সুন্দর রূপ ও স্বাস্থ্য ফিরোজা বেগমের, ইদানীং তাঁকে ফ্যাকাশে দেখায়।

কিছুদিন ধরে মামুন পারিবারিক সমস্যায় বিব্রত। ফিরোজা বেগমের নিরন্তর অভিযোগ যে তাঁর স্বামী সংসারের প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেন না এবং সে অভিযোগ মিথ্যেও নয়। মামুনের ধারণা, সংসার চালাবার টাকা রোজগার করে এনে দেবেন তিনি, বাকি সব কিছু তো দেখবে স্ত্রী। মামুনের বড় মেয়ে হেনা বিবাহযোগ্যা হয়েছে, মামুন সে ব্যাপারেও মাথা ঘামাননি, মামুন চান তাঁর দুই মেয়েই অন্তত এম এ পর্যন্ত পড় ক, তারপর বিয়ের চিন্তা করা যাবে। তাঁর ছোট মেয়ে মীনা পড়াশুনোয় খুব ভালো, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার, কিন্তু হেনা বি-এ পরীক্ষায় ফেল করেছে। হেনার জন্য ফিরোজা বেগম একটি পাত্র ঠিক করে ফেলেছেন এরই মধ্যে, সম্বন্ধ প্রায় পাকা হয়ে যাবার পর সে খবর জানতে পেরে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন মামুন। ছেলেটার একমাত্র যোগ্যতা, তার চেহারা সুন্দর, যেমন ফর্সা, তেমন দীর্ঘকায়, হঠাৎ দেখলে পাঠান বলে মনে হয়, কিন্তু সে কোনো চাকরিবাকরি করে না, কী একটা এজেন্সি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ছেলেটির বাবা জামাত-এ-ইসলামীর একজন ছোটখাটো নেতা, মামুন জানেন, ওঁদের পরিবার অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, ঐ পরিবারের সঙ্গে মামুন কুটুম্বিতার সম্পর্ক রক্ষা করবেন কী করে? মামুন তাঁর দুই মেয়েকেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন, হেনা একা একা স্কুল-কলেজে গেছে, সে ঐ পরিবারের বউ হলে সুখি হতে পারবে?

আজ রাত্রে খাওয়ার সময়েও এই প্রসঙ্গ নিয়ে জোর কথা কাটাকাটি হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর। শরীর ভালো নেই বলে ফিরোজা বেগমের মেজাজ আরও খিটখিটে হয়েছে, তিনি বেশ কিছু খারাপ ভাষা ব্যবহার করেছেন। এখনও মাথা গরম হয়ে আছে মামুনের, ঘুম আসবে কী করে?

হঠাৎ যেন দরজায় খটখট শব্দ হলো। দরজায় না জানলায়? বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়ছে নাকি? না, আবার দু'বার শব্দ হলো দরজাতেই। মামুন ভুরু কোঁচকালেন। তাঁর থাকেন দোতলায়, একতলায় অন্য ভাড়াটে, এত রাতে সদর দরজা বন্ধ থাকবেই, সুতরাং দোতলায় উঠে এসে কেউ দরজা ধাক্কাবে কী করে?

শব্দ বেশি জোরে নয়, কিন্তু দৃঢ়। যে এসেছে, সে কোনো অধিকার নিয়েই এসেছে। আর একবার বিদ্যুৎ চমকালো, সঙ্গে সঙ্গে মামুনের মনে হলো, তা হলে কি আলতাফ! সুখবর দিতে ছুটে এসেছে এত রাত্রে? দু'দিন ধরে গুজব শোনা যাচ্ছিল, মামুন তাঁর সদস্য প্রকাশিত দ্বিতীয় কবিতা পুস্তকটির জন্য এ বছর আদমজী পুরস্কার পাবেন। মেয়ের বিয়েদিতে হবে, টাকার এখন বিশেষ দরকার মামুনের।

বিছানায় উঠে বসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে?

বাইরে থেকে উত্তর এলো, হক সাহেব, দরজা খোলেন, পুলিশ!

অবাক হবার বদলে মামুন বিড়বিড় করে বললেন, "ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে।" তারপর ভাবলেন, সুখবর দিতে হলে আলতাফ তো টেলিফোন করতেই পারতো, এত রাত্রে নিজে ছুটে আসবে কেন? তা ছাড়া, মামুন সরকারের নেক নজরে নেই, আদমজী পুরস্কার তাঁকে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি নিজেও লোভীর মতন ঐ গুজবে বিশ্বাস করেছিলেন।

দরজা খুলে দেখলেন, তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, ইউনিফর্ম-পরা না থাকলেও চেহারা দেখেই পুলিশ বলে বোঝা যায়।

পুলিশ দেখে মামুনের ঠিক আতঙ্ক হলো না, বরং প্রথমেই এই প্রশ্নটা জাগলো যে, একতলার সদর দরজা খুলে দিল কে? নিচের ভাড়াটেরা? পুলিশ দেখে তারা ওপরে এসে আগে মামুনকে খবর দিতে পারতো না? এদিকে তো তারা মুখে মামুনের সঙ্গে খুব খাতির দেখায়।

তিনজনের মধ্যে একজন মামুনকে অভিবাদন করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, স্যার, আমি ডি এস পি সামসুজ্জামান, আপনারে একবার আসতে হবে আমাদের সাথে।

মামুন উষ্মার সঙ্গে বললেন, এখন ক'টা বাজে? মাঝ রাতে ডাকতে এসেছেন মানে, ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না?

ডি এস পি সাহেব বাঁ হাতের কব্জী ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, এখন বাজে চারটা চল্লিশ, স্যার, আপনারে ঠিক ডাকতে আসি নাই...

—গ্রেফতার করতে এসেছেন? আপনার কাছে ওয়ারেন্ট আছে?

—জী, আছে।

পরোয়ানটা হাতে নিয়ে তিন-চারবার পড়ে দেখলেন মামুন। দেশরক্ষা বিধানের ৩২ ধারা মোতাবেক তাঁকে আটক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সহজ ইংরাজি বাক্য, তবু তিনি যেন মানে বুঝতে পারছেন না। দেশরক্ষার কারণে আটক...তিনি কি দেশের শত্রু? পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিতে তিনি তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলিতে সব রকম সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, কতদিন আহার জোটেনি, কতদিন শুতে হয়েছে মসজিদের চাতালে, তখন কোথায় ছিল আইয়ুব খান বা মোনায়েম খান, কোথায় ছিল এই সব পুলিশ অফিসাররা?

পরোয়ানার তারিখ ১৬ই জুন। হ্যাঁ, ইংরেজী মতে রাত বারোটার পরেই ১৬ই জুন পড়েছে, তাই এদের রাত ফুরোবার সবুর সয়নি। সাধারণ চোর ডাকাতের মতন বাড়ি থেকে পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। তিনি পাকিস্তানের শত্রু!

পুলিশ অফিসারটির দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন মামুন। অনিদ্রায় তাঁর চক্ষু লাল। কেন যেন তাঁর মনে হচ্ছিল, শিগগিরই কিছু একটা ঘটবে।

ফিরোজা ও তাঁর দুই কন্যা এখনো জাগেনি। বৃষ্টি বাদলার জন্য অন্য শব্দ শোনা যায় না, ঘাড় ঘুমে ঘুমোচ্ছে তারা। ওদের কি জাগাবার দরকার আছে? পরে তো জানবেই।

অফিসে একটা খবর দেওয়া দরকার, এত রাত্রে কেউ থাকবে না, আলতাফ কিংবা হোসেন সাহেবের বাড়িতে ফোন করা যায়। সম্পাদক হিসেবে তাঁর একটা দায়িত্ব আছে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কে কী কাজ চালাবে সেই নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। কিন্তু পুলিশ কি তাকে ফোন করতে দেবে? থাক, এদের কাছে তিনি কোনো অনুরোধ জানাবেন না।

মামুন বললেন, চলেন, আমি রেডি। হাতকড়া দিতে চান তো দ্যান।

ডি এস পি বললো, স্যার, আমাদের ওপর রাগ করবেন না। আমরা হুকুমের চাকর। হাতকড়া দেবার কোনো অর্ডার নাই। আমরা বাইরে অপেক্ষা করতেছি, আপনি কিছু পোশাক-আসাক গুছায়ে

লন, যদি গোসল করতে চান, তাও করে নিতে পারেন।

মামুন বললেন, কোনো কিছুর দরকার নাই আমি এইভাবেই যাবো।

এবারে পাশের ঘরের সরজা খুলে ফিরোজা বেগম বেরিয়ে এলেন। পুলিশ দেখা মাত্র তিনি দৌড়ে এসে মামুনকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, না, ওনারে নিতে পারবেন না, আমারে না মেরে ফেলে...আমার আব্বাকে খবর দিতে হবে, জসিমদ্দিন সাহেবরে...আমার চাচা সরকারের বড় অফিসার...

মেয়ে দুটিও জেগে উঠলো। বড় মেয়ে হেনা বাবাকে বেশি ভালোবাসে। সে কাঁদতে শুরু করে দিল মামুনকে জড়িয়ে ধরে। এরকম নাটকীয় পরিস্থিতি মামুনের একেবারেই পছন্দ নয়। তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে বোঝাতে লাগলেন যে ভয় পাবার কিছু নেই, নিশ্চয়ই এরা ভুল করে তাঁকে ধরতে এসেছে, তিনি দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

টুথব্রাস, পেষ্ট ও এক প্রস্থ পোশাক সঙ্গে নিয়ে মামুন বেরিয়ে পড়লেন একটু পরেই। এই পুলিশের দলটি ব্ল্যাক মারিয়া আনেনি, এনেছে একটি জাপানী টয়োটা গাড়ি, পেছনের সীটে বসানো হলো মামুনকে, দু'জনেই মাঝখানে। এখনও বৃষ্টি পড়ছে প্রবল ধারায়।

জেল গেটে পৌছোবার পরমামুন দেখলেন, আর একখানা গাড়িও থেমেছে সেখানে। সে গাড়ির চালক তাঁর চেনা, মানিক মিঞার বড় ছেলে মইনুল বসে আছেন পুলিশ পরিবৃত হয়ে। তা হলে মামুন একা নন, ধরা হচ্ছে অন্য সম্পাদকদেরও!

প্রথমে তাঁদের দু'জনকে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখা হলো ডেপুটি জেলারের ঘরে। মানিক মিঞার মুখখানি অস্বাভাবিক রকমের বিমর্ষ। এককালে বন্ধুত্ব থাকলেও ইদানীং মানিক মিঞার সঙ্গে মামুনের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। 'ইত্তেফাক'-এর প্রতিপত্তিশালী সম্পাদক মানিক মিঞার দেখা হলেই মামুনের সঙ্গে ব্যঙ্গের সুরে কথা বলেন। মামুনের 'দিন-কাল' পত্রিকার কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই, নীতির বালাই নেই, সম্পাদকীয় লেখা হয় এক সুরে, খবর পরিবেশন করা হয় অন্য সুরে। কথাগুলো একেবারে মিথ্যে নয়, তবু মামুন ঠিক সহ্য করতে পারেন না।

এখন দু'জনেই এক খাঁচার পাখি। মামুন খানিকটা রসিকতার সুরে মানিক মিঞাকে বললেন, পলিটিশিয়ানরা সব ফুরায়ে গেছে, তাই এবার ওরা আমাদের ধরছে, না কি বলেন?

রসিকতার উত্তর না দিয়ে মানিক মিঞা শুষ্কভাবে বললেন, ভাই, আমার মেয়ে বেবীর কাল রাতে একটা বড় অপারেশান হয়েছে, এখনো ক্রাইসিস কাটে নাই, এই অবস্থায় আমারে ধরে আনলো? বেবীর ভালো করে জ্ঞান ফেরার পর যদি এই খবর শোনো, যদি সেই ধাক্কা সামরাইতে না পারে...আমারে আর কয়েকটা দিন জেলের বাইরে রাখলে কি পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেত?

মানিক মিঞা এখন জবরদস্ত সমপাদক নন, তিনি সন্তান স্নেহে কাতর এক পিতা। মামুন তাঁর বাহু স্পর্শ করে বললেন, আল্লারে ডাকেন, আল্লা দয়া করবেন, বেবী ভালো হয়ে যাবে।

খানিক বাদে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হলো বিশ নম্বর সেলে। সেই বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের সময় মামুন একবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, তারপর এই দ্বিতীয়বার। ব্রিটিশ আমলে মামুন কখনো জেলখানা দেখেননি, জেলের অভিজ্ঞতা তাঁর স্বদেশী আমলেই। আগেরবারও মামুন এই বিশ নম্বর সেলেই ছিলেন।

এই সেলে আগে থেকেই অনেক আওয়ামী লীগের নেতা বন্দী হয়ে আছেন। মামুন চোখ বুলিয়ে দেখলেন, শেখ মুজিব সেখানে নেই। অন্য নেতারা সবাই বাইরের খবর জানবার জন্য মানিক মিঞাকে ঘিরে ধরলেন, মামুন তাঁদের বেবীর কথা জানিয়ে বললেন, ওনার মন ভালো নেই, এখন একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

বিশ নম্বর সেলে কয়েকটি ছোট ছোট কক্ষ আছে। সি ক্লাস প্রিজনার হিসেবে মামুন ও মানিক মিঞাকে রাখা হলো সে রকম দুটি আলাদা কক্ষে, খোরাকী হিসেবে দৈনিক ভাতা বরাদ্দ হলো দেড় টাকা। লোহার দরজা ছাড়া সেই ঘরে কোনো জানলা বা ভেন্টিলেটার পর্যন্ত নেই। বাইরে বৃষ্টি অথচ এই ঘরের মধ্যে অসম্ভব গরম। আর দুর্গন্ধ। কাছেই একটি পায়খানা, আড়াই'শো-তিনশো'জন রাজবন্দীর জন্যট ঐ একটাই, প্রায় সর্বক্ষণ তার সামনে লম্বা লাইন—

কষ্ট সহ্য করার একটা নিজস্ব উপায় আছে মামুনের। মনটাকে শরীর থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে নিতে হয়। শরীলটা শুয়ে থাকুক এই কারাগারে, মনটা চলে যাক কোনো আনন্দলোকে।

মামুন চোখ বুজে দৃশ্যের পর দৃশ্য পুনর্নির্মাণ করতে লাগলেন।

—অফিসে নিজের ঘরে একলা বসে মামুন তাঁর একটি লেখার প্রুফ সংশোধন করছিলেন, হঠাৎ তাঁর আদালি এসে খবর দিল, এক মেমসাব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিছুতেই ছাড়বে না। রাত তখন ন'টা। এই সময় কোনো স্ত্রীলোক খবরের কাগজের অফিসে আসে না। আদার্লিকে তিনি বললেন, নিয়ে এসো।

আলুথালু বেশ, মাথার চুল খোলা, মঞ্জু! এর আগে কোনোদিন সে পত্রিকা অফিসে আসেনি। আজ এত রাত্রে...মামুনকে কোনো প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে সে ঘরে ঢুকেই দৌড়ে এসে মামুনের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো। তার বিলাপের মধ্যে শুধু একটাই কথা, সে কোথায় গেল? সে আর ফিরবে না!

অফিসের মধ্যে এরকম একটা দৃশ্যে ভিড় জমে যাবেই। আলতাফ কিংবা হোসেন সাহেব সে সময় অফিসে ছিলেন না। মামুন অন্যদের চলে যেতে বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কী যে হয়েছে তা মঞ্জু কিছুতেই খুলে বলতে পারে না, শুধু কাঁদে। একটু একটু করে জানা গেল।

শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে সেদিন সমস্ত ঢাকা শহর উত্তাল। বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র-জনতার মিছিলে লাঠি ও গুলি চলেছে। বাবুল দুপুরবেলা বেরিয়ে গেছে, আর বাড়ি ফেরেনি।

এ খবর শুনে মামুন প্রথমে বিচলিত বোধ করেননি। তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে বাবুল চৌধুরী ও তার বন্ধুরা শেখ মুজিবের সমর্থক নয়। ওরা ন্যাপের চীন পন্থী গ্রুপ। সুতরাং বাবুল কিছুতেই ঐ সব সভা মিছিলে যাবে না। শেখ মুজিব লাহোরে গিয়ে ছয় দফা প্রস্তাবের নামে যে বোমা ফাটিয়ে এসেছে, যার জন্য আইয়ুবসাহী আবার বাঙালীদের ওপর খড়্গহস্ত, সেই ছয় দফাকেও সমর্থন করে না বাবুল চৌধুরীরা। শেখ মুজিবের গ্রেফতারে তাদের খুশি হবার কথা।

কিন্তু ঐ সভা মিছিলে বাবুল যেতে না চাইলেও মঞ্জু তাকে জোর করে পাঠিয়েছে সিরাজুলের খোঁজ নেবার জন্য। সিরাজুলের সঙ্গে বাবুলের দেখাও হয়েছে, সিরাজুল বাড়ি ফিরেছে অক্ষত শরীরে, তবু কেন বাবুল ফিরলো না?

মঞ্জু ঝগড়া করেছিল তার স্বামীর সঙ্গে, বাবুল এক কাপ চা খেতে চেয়েছিল, মঞ্জু সেই চা-ও দেয়নি, তাই অভিমান করেছে বাবুল, সে বোধ হয় আর কোনোদিন ফিরবে না।

মঞ্জুকে কিছুতেই শান্ত করা যায় না। মামুন তাকে নিয়ে বেরুলেন একটা গাড়িতে, সব কটা হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিলেন, হোম সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গ্রেফতারের লিস্টেও বাবুলের নাম পেলেন না। বাবুলের বিশেষ বন্ধু জহির, কামাল, পল্টনদের বাসায় গিয়েও বাবুলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, বাবুল যেন সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেছে;

মঞ্জুর তখন পাগলের মতন অবস্থা, কিছুতেই শান্ত করা যায় না তাকে। বাবুল এর আগেও অনেকবার বেশি রাত করে বাড়ি ফিরেছে, আজ অবশ্য শহরের অবস্থা খুব অস্বাভাবিক, কারফিউ জারি করা হয়েছে দশটা থেকে যেতে হলো ও বাড়িতে। বাচ্চা মেয়ের মতন মঞ্জুকে তিনি কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই সে ঘুমোবে না। মঞ্জুর কষ্টে মামুনেরও বুক যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাবুলের জন্য তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা হচ্ছিল না। বাবুল বাড়ি না ফেরায় মামুন যেন খুশিই হয়েছিলেন। আজকাল বাবুলকে তিনি একেবারেই পছন্দ করতে পারেন না।

হঠাৎ সর্বাঙ্গের রোমকূপ শিহরিত হলো এক উপলব্ধিতে। মামুনের মনে পরে গেল মুসাফির নামের বিচিত্র লোকটির কথা। অলৌকিক শক্তি আছে নাকি লোকটার, সে দূরের জিনিস দেখতে পায়, সে বলেছিল, মামুনের সংসারে ও কর্তব্যের মধ্যে এসে দাঁড়াবে একটি রমণী। তবে কি সে মঞ্জুর কথাই বলেছিল। আর তো কোনো রমণী নেই তাঁর জীবনে! সপ্তাহে তিন-চার দিন অন্তত মঞ্জুকে চোখে দেখা না দেখে মামুন থাকতে পারেন না, মঞ্জুর মুখ তাঁর মনে পড়ে অহরহ, মঞ্জুকে আদর করে তিনি পরম শান্তি পান।

মামুন দু'হাতে নিজের মাথা চেপে ধরলেন। মুসাফির যখন ঐরকম ইঙ্গিত করেছে, তখন অন্য লোকেও কি মঞ্জুর সঙ্গে তাঁর একটা নিষিদ্ধ সম্পর্কের কথা ভাবে? সেই জন্যই কি বাবুল আজকাল মামুনকে সব সময় এড়িয়ে যেতে চায়, দেখা হলেও কথা বলে না?

মাথার ওপর আল্লা আছেন, তিনি জানেন, মঞ্জু সম্পর্কেমামুন কখনো কোনো পাপ-চিন্তা করেননি। সেদিন সারা রাত মঞ্জুর সঙ্গে থাকলেও তিনি একবারও মঞ্জুকে কামভাবে স্পর্শ করেননি। মঞ্জুকে তিনি ভালোবাসেন ঠিকই, কিন্তু সে তো স্নেহের ভালোবাসা। মঞ্জু যেন তাঁরই সৃষ্টি, মঞ্জুকে তিনি গান শিখতে উৎসাহ দিয়েছেন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন। বাবুল চৌধুরীর সঙ্গে তিনি

নিজে উদ্যোগ করে মঞ্জুর বিয়ে দেননি? মঞ্জু তাঁর বন্ধু, মঞ্জু তার সব সুখ দুঃখের কথা মামুন মামাকে বলে, মঞ্জুর সান্নিধ্যে এলে মামুনের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়, মঞ্জুর অনুরোধে তিনি আবার কবিতা লিখছেন, এসব অন্যায়?

বাবুল ফিরে এসেছিল পরদিন সকালে। সে রাত কাটিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী এক আর্মি অফিসারের বাড়িতে। সেই অফিসারটি পল্টনের বোন, দিলারার স্বামী, তাদের বাসায় কাল খানাপিনা ছিল, তাই বাবুলকে কিছুতেই ছাড়লো না।

এসব বলার সময় বাবুলের মুখে বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ ফুটে ওঠেনি। যেন একটা রাত বাড়িতে খবর না দিয়ে অন্য জায়গায় কাটিয়ে আসা এমন কিছুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। যেন, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা যখন আইয়ুব শাহীর লাঠি গুলিতে মরছে, তখন পশ্চিম পাকিস্তানী এক আর্মি অফিসারের বাড়িতে খানাপিনায় যোগ দেওয়া অতি স্বাভাবিক ঘটনা।

মামুনকে দেখে সে যেন খুশিই হয়েছিল, পাতলা হাসির সঙ্গে বলেছিল, আমি তো জানতামই যে আপনি মঞ্জুর খবরাখবর নেবেন, আমি মঞ্জুকে বলেও গিয়েছিলাম আপনাকে খবর দিতে...

তখনই মামুন ঠিক করেছিলেন, তিনি আর কোনোদিন মঞ্জু-বাবুলদের বাড়িতে আসবেন না। মঞ্জুকে তিনি এতটাই ভালোবাসেন যে মঞ্জুর দাম্পত্যজীবন অটুট রাখার জন্য তিনি চিরকালীন বিচ্ছেদও সহ্য করতে পারবেন। সেই দিনটা ছিল ছ'তারিখ, তার পরদিন প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আগের দিন, তারপর এই দশ দিনের মধ্যে মামুন আর একবারও যাননি ঐ বাড়িতে দিকে। এখন কতকাল জেল খাটতে হবে কে জানে, এমনিতেই দেখা হবে না।

দেখা না হলেও মনে মনে কথা বলতে তো বাধা নেই। নির্জন সেলে শুয়ে শুয়ে মামুন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, মঞ্জু সুখু মিঞাকে খাওয়াচ্ছে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গুন গুন করছে গানের কলি, স্নান সেরে এসে সে চিরুনি চালাচ্ছে তার ভিজে, লম্বা চুলে। মঞ্জু কি এতক্ষণে মামুনের গ্রেফতারের খবর জেনে গেছে? এ খবর পেয়ে মঞ্জু কি কাঁদবে? না, তুই কাঁদিস না মঞ্জু, আমি যেখানে, যতদূরেই থাকি, আসলে সব সময় তোর পাশে পাশেই আছি।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলেন মামুন। মুসাফির নামের লোকটা আগেই তার জেলখাটার কথা ফোরকাস্ট করেছিল। লোকটি কি সত্যিই দূরদর্শী, না শয়তান? ওর কথা মনে পড়তেই রাগে মামুনের শরীর জ্বলে যাচ্ছে। এর পর কোনোদিন দেখা হলে ঐ লোকটির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

॥ ৫৩ ॥

দিনের পর দিন কেটে যায়, মামুনের কাছে কোনো ভিজিটর আসে না। দুশ্চিন্তায় অস্থিরতায় তাঁর সারাটা বুক ব্যথা হয়ে গেছে, যেন অসংখ্য বোলতা কামড়েছে তাঁকে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, জোরে শ্বাস টানতে গেলে ঘড় ঘড় শব্দ হয়। একেবারেই খিদে নেই। কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। খানিকটা হাই-প্রেসার ছাড়া মামুনের অন্য কোনো অসুখ ছিল না। কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। খানিকটা হাই-প্রেসার ছাড়া মামুনের অন্য কোনো অসুখ ছিল না, জেলখানায় এসে এরকম শারীরিক যন্ত্রণায় তিনি বিমূঢ় বোধ করছেন। অন্যায়ের প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, এটাই তাঁর বেশি কষ্টের কারণ।

শুয়ে শুয়ে মামুনের মনে পড়ে সেই ভাষা আন্দোলনের সময় কারাবাসের দিনগুলির কথা। সেবারও এই বিশ নম্বরেই ছিলেন, তবে সলিটারি সেলে নয়, বড় হলঘরে অনেকে মিলে একসঙ্গে। সেবারে কোনো রকম ভয় ছিল না, কষ্টবোধ ছিল না। সারাদিন হৈ-হল্লা ও আড্ডা, মুহুর্মুহু শ্লোগান। পালা করে রান্না, যেন একটা পিকনিক। তখন শরীর ভরা যৌবন ছিল, যৌবন অনেক কিছুই সহ্য করতে পারে, যৌবনের অনেক দুঃখ-যন্ত্রণাকেও মনে হয় বিলাসিতা। এবারে মামুন টের পাচ্ছেন যে তাঁর বয়েস হয়ে গেছে।

শুধু মৃত্যুর কথা নয়, নিজের সংসারের কথা ভেবেও প্রবল দুশ্চিন্তা হচ্ছে তাঁর। বাড়িতে আর পুরুষ মানুষ নেই, ফিরোজা বেগম মেয়েদুটিকে সামলে রাখতে পারবেন? ছোটমেয়েকে নিয়ে তেমন চিন্তা নেই, কিন্তু হেনার মতিগতি বোঝা শক্ত। গত কয়েকটা বছর কাজ নিয়ে এমন পাগলামি করেছেন মামুন যে নিজের পরিবারের দিকে তাকাতে পারেননি, তিনি যেন পিতা কিংবা স্বামী ছিলেন না, ছিলেন শুধু একজন ব্যস্ত সম্পাদক। জেলখানায় এসে মামুন আবার পিতা ও স্বামী হলেন।

এরা খবরের কাগজ পড়তে দেয় না। প্রতিদিন বন্দীর সংখ্যা বাড়ছে, সেল-এর মধ্যে আর তিল ধারনের জায়গা নেই, এরা কি সারা পূর্ব পাকিস্তানের সব শিক্ষিত লোককে জেলখানায় আটকে

রাখবে? নতুন যারা আসছে, তাদের মুখে বাইরের খবর কিছু কিছু জানা যায়, সবই ধর-পাকড় আর অত্যাচারের কাহিনী, মামুনের প্রিয়জনদের কথা কেউ বলতে পারে না। তবে কোনো কোনো বাড়িতে বারবার খানাতল্লাশের অজুহাতে স্ত্রীলোক ও শিশুদের ওপরেও নাকি নিপীড়ন চলেছে।

মামুনের খুব আশা ছিল, আলতাফ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। বড় উকিল লাগিয়ে তাঁকে জামিনে খালাস করবার চেষ্টা করবে। আলতাফ করিৎকর্মা মানুষ, সরকারি উঁচুমহলে তার দহরম মহরম আছে। মামুনের ধারণা, আলতাফ তাঁকে এখনো ভালবাসে। রাজনৈতিক নির্বাসন থেকে আলতাফই তো মামুনকে টেনে এনেছিল নতুন কর্মক্ষেত্রে। হোসেন সাহেবের সঙ্গে এরা মধ্যে যতবারই ঝগড়া হয়েছে মামুনের, আলতাফই মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়েছে। ইদানীং হোসেন সাহেবের সঙ্গে মামুনের সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছিল, তিনি আওয়ামী লীগ এবং সে দলের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে একেবারে সহ্য করতে পারেন না। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় থেকেই তাঁর ভারত বিদ্বেষ একেবারে চরমে উঠে বসে আছে, তার ধারণা, শেখ মুজিবের ছয় দফা প্রস্তাব আসলে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য ভারতের চক্রান্ত! ঐ লোকটা ভারতের দালাল। মামুন যত বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, আমাদের ভারত নিয়ে মাথা ঘামাবার এখন কোনো দরকার নেই, আমাদের লড়তে হবে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য। শেখ মুজিব এমন কিছু নতুন কথা বলেননি, তাঁর ঐ ছয় দফা অনেকদিন ধরেই আমাদের মনের কথা। হোসেন সাহেব তা মানবেন না, তিনি টেবিলে কিল মেরে বললেন, পূর্ব পাকিস্তান আবার কী? পূর্ব পাকিস্তান কি একটা পৃথক দেশ? গোটা পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বার্থের কথা যে চিন্তা করে না, সে হয় হিন্দু ভারতের এজেন্ট অথবা কমুনিস্ট?

মামুনের আপত্তি সত্ত্বেও পত্রিকার চীফ সাব সুধীর দাসকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলেন হোসেন সাহেব। তাঁর কাগজে তিনি কোনো মালাউনকে রাখবেন না। সেই ইস্যুতে মামুন নিজের পদত্যাগপত্র দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা আঁচ পেয়ে সুধীর দাস নিজেই হঠাৎ চাকরি ছেড়ে গেছে। লোকটা খানিকটা ফাঁকিবাজ হলেও কাজ জানতো, সে চলে যাওয়ায় মামুনের অসুবিধে হয়েছে যথেষ্ট।

যতই মালিকের সঙ্গে মতবিরোধ থাক, তবু মামুন এখানে দিন-কাল পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকা অফিস থেকে সম্পাদকের জামিনের জন্য কোনো চেষ্টাই করা হবে না? আলতাফও চুপচাপ রয়ে গেল?

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন কেউ জিজ্ঞেস করলে, আরে মামুন মিঞা, সারাদিনই কি ঘুমাও নাকি?

লোকটার মাথার পেছনের দিকে আলো, সামনের দিকে অন্ধকার, তাই মামুন মুখখানা ঠিক দেখতে পেলেন না। একজন মোটাসোটা, গোলগাল ধরনের মানুষ। মামুন জিজ্ঞেস করলেন, কে?

—পুরনো দোস্তরে একেবারে ভুইলা গ্যালা? আমার গতরখান না হয় খোদার খাসীর লাহান হইছে, কিন্তু গলার আওয়াজও কি পাল্টাইয়া গেছে?

—বদ্রু?

—হ, হ, আমি পটুয়াখালির বদ্রু! মামুন মিঞা, মনে নাই, সেই বায়ান্ন সালে তুমি আর আমি এক সাথে এই জেলে আছিলাম?

মামুন উঠে বসলেন। বদ্রু শেখ তাঁর পুরোনো বন্ধু হলেও মামুন এখন আর তাঁকে পছন্দ করেন না। বছর তিন চারেক দেখাও হয়েছে, কিন্তু মামুন তাঁর কীর্তিকলাপ সবই জানেন। আমদানি-রফতানির ব্যবসায় অনেক টাকা করেছে সে, তা করুক, কিন্তু বেশ কয়েকটি নারীঘটিত কেলেঙ্কারিও শোনা গেছে তার সম্পর্কে। ঢাকা ও চিটাগাঙে দুটি রক্ষিতা আছে তার। সে আওয়ামী লীগকে মোটা চাঁদা দেয় আবার সরকারি কর্তাদের ঘুষঘাস দেবার সব রকম ফন্দি-ফিকিরই তার জানা। অথচ, এই বদ্রুই ছিল এক সময় এক ফায়ার ব্র্যাণ্ড পলিটিক্যাল ওয়ার্কার। রক্ত গরম করা বক্তৃতা দিতে পারতো সে।

মাস ছয়েক আগে মামুনের কাগজের এক তরুণ রিপোর্টার বদ্রুর ব্যক্তিগত জীবনের নানা রসালো খবর ও কয়েকটি ফটোগ্রাফ জোগাড় করে এনেছিল, মামুন সে রিপোর্ট ছাপেননি। সাংবাদিকটিকে তিনি ধমক দিয়ে বলেছিলেন, এই সব কী? কারোর ব্যক্তিগত স্ক্যাণ্ডাল ছেপে আমি কাগজের বিক্রি বাড়াতে চাই না। আসলে পুরোনো বন্ধুর প্রতি মামুন সম্পূর্ণ আবেগশূন্য হতে পারেননি। কিন্তু মামুন না ছাপলেও সেই খবর এবং ছবি অন্য কাগজে ছাপা হয়ে গিয়েছিল এবং বদ্রু শেখ মানহানির মামলা

এনেছিল সেই কাগজের বিরুদ্ধে। সে মামলার নিস্পত্তি আজও হয়নি বোধহয়।

দিনের বেলা লোহার দরজাটা খোলাই থাকে, বদ্রু সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। পকেট থেকে একটা মার্কিনি সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললো, নাও।

মামুনের বুকটা ধক্ করে উঠলো, বহুদিন পর যেন এক অতি প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ! জেলে আসার সময় মামুনের কুর্তার জেবে একটি প্যাকেটে সাতখানি সিগারট ছিল, পরবর্তী দু'দিনে অতি কৃপণের মত সেই সাতখানি সিগারেট উপভোগ করেছেন একটু একটু করে, তারপর আর সিগারেট পাওয়ার উপায় নেই। মামুন শুনেছেন বটে যে কারারক্ষীদের ঘুষ দিয়ে সিগারেট আনানো যায়, কিন্তু সামান্য নেশার দাসত্ব করার জন্য ঘুষ দেবেন মামুন? মাঝে মাঝেই সিগারেট ছেড়ে দেবার চিন্তা তার মাথায় উদয় হয়েছে আগে, এবারে এই সুযোগে ধূমপানের নেশা একেবারে ত্যাগ করবেন ঠিক করেছিলেন।

বদ্রুর হাতের প্যাকেটটার দিকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতন চেয়ে রইলেন।

বদ্রু মৃদু হেসে প্যাকেটটা মামুনের কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এইটা তুমি রাখো!

মামুন প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, ফ্যাকাসে ভাব বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ!

চারদিন পর প্রথম সিগারেটটি ধরাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপতে লাগলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বদ্রু, তোমারে অ্যারেস্ট করলো ক্যান? তুমি রাস্তার ডেমনস্ট্রেশানে গেছিলা নাকি?

বদ্রু মাটিতে বসে পড়ে বললো, নাঃ, আমারে বাসা থিকা অ্যারেস্ট করছে। বত্রিশ ধারায়। দ্যাশ রক্ষা আইনে, আমি দ্যাশের শত্তুর!

মামুন বদ্রুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আইয়ুবের আমলে পূর্ব পাকিস্তানের মাঝারি ব্যবসায়ীরা মোটামুটি খুশী আছে, আগের তুলনায় সুযোগ সুবিধে পাচ্ছে কিছু কিছু। অনেক বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক ও সাহিত্যিককেও নানা রকম উপঢৌকন দিয়ে হাত করেছে গভর্নর মোনেম খাঁ। তারা আর সরকার বিরোধিতা করে না।

বদ্রু বললো, আমারে ধরার একটাই কারণ থাকতে পারে। আমি মার্চ মাসে শেখ মুজিবের সাথে লাহোরে আছিলাম। আমি তার সাপোর্টার।

–আওয়ামী লীগের ডেলিগেশানের সাথে তুমি লাহোরে গেছিলা? সে খবর তো শুনি নাই!

–আমি ডেলিগেশনের সাথে যাই নাই। আমি গেছিলাম অন মাই ওউন ব্যবসার কাজে, লাহোর এয়ারপোর্টে শেখ সাহেবরে রিসিভ করলাম;তারপর রইয়া গেলাম সাথে সাথে। মামুন মিঞা সেই মিটিং-এর থ্রিল-এর কথা তোমারে কী কমু! ব্যবসা ট্যাবসা কইরা এখন আমার চামড়া মোটা হইয়া গেছে, চর্বিও জমাইছি অনেক, তবু এই চর্বি-চামড়া ভেদ কইরা রোমাঞ্চ হইলো। আমরাই তো একসময় পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য জান কবুল করছিলাম, সেই আমারাই আবার লাহোরে...

–লাহোরে মিটিং-এর কথা আমরা সবাই জানি।

–তবু তুমি আমার কাছে শোনো! সেই লাহোর, যেখানে চল্লিশ সালে ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব নেওয়া হয়, যে-প্রস্তাবের বয়ান আমার এখনও মুখস্ত আছে....that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the north-western and eastern zones of India. Should be grouped to constitute units shall be autonomous and sovereign তোমার মনে আছে, মামুন, এই প্রস্তাব পাশ হবার খবর শুনে আমরা কলকাতায় সেদিন আমজাদিয়া হোটেলে বিরিয়ানি খেতে গেছিলাম, কত রাত পর্যন্ত আমোদ করেছি? ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট স্টেটস, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট স্টেসট! স্টেট না, সেই স্টেটসগুলি হবে অটোনমাস অ্যাণ্ড সভারেন?

মামুন শুকনো গলায় বললেন, ফর্টি সিক্সে দিল্লি কনভেনশনে আবার লাহোরে প্রস্তাব সংশোধন করে বলা হয়েছিল, স্টেট্স-এর এসটা টাইপের ভুল, ওটা স্টেট-ই হবে।

–ঐ কনভেনশানের কোনো লিগ্যাল স্ট্যাণ্ডিং নাই! ছয়বছর ধরে যে প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান আন্দোলন চালানো হইলো জনগণের মধ্যে তা হঠাৎ একটা অ্যাজেণ্ডা বিহীন কনভেনশানে বাতিল করে দিলেই হলো? এরে পাকিস্তানের নাম পশ্চিমী শাসন?

–যাক, ওসব পুরনো কথা তুলে আর কী হবে?

–লাহোরের কথাটা শোনো! সেই ঐতিহাসিক লাহোর, যেখানে পাকিস্তান প্রস্তাব পাস হয়েছিল, সেই লাহোরেই ছাব্বিশ বছর পর, অরিজিন্যাল প্রস্তাবের সেই লুপ্ত এসটা ফিরায়ে আনার দাবি তুললো

বাঙ্গালী মুসলমান। পাকিস্তান একটা স্টেট থাকবে না; স্টেটস হবে। মুজিবের ছয় দফা তো সেই এস-এর পুনরুদ্ধার ছাড়া আর কী? এর মধ্যে তো পাকিস্তান ভাঙ্গার কথা নাই!

মামুন এবারে শীর্ণভাবে হাসলেন। ইংরেজী অ্যালফাবেট-এর একটি মাত্র অক্ষরের জন্য এত রক্তপাত, এত নির্যাতন, খুন, কারাবাস? বদ্রু শেখ অতি সরল করে দেখেছে ব্যাপারটা।

বদ্রু বললো, সেই কনফারেন্সে তুমি শেখ সাহেবের ব্যক্তিত্ব দ্যাখলে অবাক হয়ে যেতে, মামুন। জানি তুমি শেখ মুজিবকে এখনো পুরোপুরি সার্পোট করো না, আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে যখন ন্যাপের জন্ম হয়, তখন তুমি মুজিবকেই সেজন্য দায়ী করেছিলে, আমার ওপরেও চটেছিলে, তাই না? আসলে আমরাই তো আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন রোধ করতে চেয়েছিলাম! এখন দ্যাখো না, ন্যাপের কী ভূমিকা? কোনো ভূমিকাই নাই, আওয়ামী লীগই বাঙ্গালীর একমাত্র পার্টি, যাই হোক, শোনো এবারে লাহোরে কনফারেন্সে শেখ মুজিব কী রকম ধীর স্থির ভাবে বোমাটি ফ্রাটালেন, তা যদি তুমি দেখতে! ছয় দফা প্রস্তাবের দাবি নিয়ে বই ছাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সাথে, সেই বইয়ের উপর ল্যাখা, "আওয়ার রাইট টু লীভ"। প্রথমে সেই বই বিলি করে দিলেন সবার মধ্যে, নিজের বলার সময় উঠে দাঁড়িয়ে নির্ভীক ভাবে গম্ভীরগলায় বললেন, পাকিস্তানে ফেডারেশন গড়তে হবে, তা হবে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে, পূর্ব পশ্চিমের অধিকার হবে সমান সমান! পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু সেই অনুপাতে আমরা বেশি চাই না, সমান সমান চাই, এতে পশ্চিম পাকিস্তানই লাভবান হবে।

–এইসব খবরই আমার কাগজে ছাপা হয়েছে বদ্রু। যাই হোক, শেখ মুজিব এখন কোথায়? তারে কি এই জেলে রাখছে?

–না! তার খবর কেউ জানে না, যতদূর মনে হয়, ক্যান্টনমেণ্টে তারে লুকায়ে রেখেছে। কোনদিন না গোপনে খতম করে দেয়।

–বাইরের খবর কিছু জানো?

–ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে। দেশরক্ষা আইনে নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

–সে খবরও জানি। মানিক মিঞা আছেন পাশের ঘরে। একদিন মাঝরাত্রে তাঁর হাতে ঐ মর্মে সরকারি নোটিশ ধরায়ে দিল।

–তোমার কাগজ কিন্তু বার হচ্ছে ডেইলি। পুরাপুরি সরকারের ধামাধরা হয়ে গেছে।

– সম্পাদক হিসাবে কার নাম চাপা হচ্ছে?

– সেটা লক্ষ্য করি নাই।

– বদ্রু, আমাদের বউ-বাচ্চাদের সংবাদ পাবার কোনো উপায় নেই? এরা কি আমাদের আদালতেও নিয়ে যাবে না।

–দেশরক্ষা আইনে জামিন নাই, আদালত নাই। কতদিন এই ভাবে রাখবে তারও ঠিক নাই। আইয়ুব খাঁ বলেছেন না, ছয় দফার কথা যারা উচ্চারণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি ল্যাঙ্গোয়েজ অফ ওয়েপন ব্যবহার করবেন?

–তোমাকে সুখে থাকতে ভুতে কিলালো কেন, বদ্রু? আমি তো শুনেছিলাম পলিটিকসের সাথে তোমার এখন কোনো সম্পর্ক নাই!

–পলিটিকসের সাথে সম্পর্ক নাই, কিন্তু দেশপ্রেম কি কখনো ধুয়েমুছেযেতে পারে? এক সময় এই পাকিস্তানের জন্য শরীরের রক্ত পানি করি নাই? ভাষা আন্দোলনের সময় আমার বুকে গুলি গালতে পারতো না? সেইসব কি মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। শোনো মামুন, জানি, তুমি আমার নামে অনেক কথা শুনেছো। তার কিছু সত্যি, কিছু মিথ্যা। দেশের জন্য সব কিছু ত্যাগ করে,খেটে খেটে শরীরটাকে উপোসী রেখে মরে যাবো, সে ফিলোসফি আমার নয়। বয়েসও তো হয়ে গেল অনেক! আমি ভোগেও আছি, ত্যাগেও আছি। বিশ্বাস করো আর নাই করো, দেশের জন্যে এখনো অনেক স্বার্থত্যাগ করি, গ্রামের গরিব-বেকারদের যথাসাধ্য সাহায্য করি, আবার অন্যদিকে, তুমি বোধহয় জানো না, আমার বিবি গত চার বছর ধরে সূতিকায় ভুগে ভুগে বিছানার সাথে মিশে আছে, আমি কাছে গ্যারেই ভয় পায়...পোলাপানদের মুখ চেয়ে দ্বিতীয় শাদী করি নাই, তা বলে বাকি জীবনটা কি আমি নারীসঙ্গ বঞ্চিত থাকবো? মাঝে মাঝে শরীরে মাইয়া মানুষের কোমল হাতের ছোঁয়া না পাইলে কোনো কাজেই উৎসাহ আসে না!

এই সময় গেটের বাইরে একজন সেপাই মামুনকে ডাকলেন। বদ্রু মামুনকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত

করলো সিগারেটের প্যাকেটটা বিছানার তলায় রেখে যেতে। তারপর মামুনের কাঁধ চাপড়ে বললো, গুডলাক। নিশ্চয় তোমার ভিজিটর এসেছে। তোমার কাগজের মালিক হোসেন সাহেব ইচ্ছে করলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে।

মামুনকে নিয়ে আসা হলো ডেপুটি জেলার (সিকিউরিটি)-এর ঘরে। সেখানে মামুনের চেনা কেউ নেই। ডেপুটি জেলার মন দিয়ে একটি ফাইল পড়ছে। টেবিলের উল্টোদিকে একটি খালি চেয়ার, অভ্যেসবশতঃ মামুন সেখানে বসতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে একজন সেপাই সে চেয়ারটি সরিয়ে নিল তাঁর পেছন থেকে।

মামুন ধড়াস করে পড়ে গেলেন মাটিতে। ডেপুটি জেলার ও সেপাইটি হেসে উঠলো হা-হা করে। ব্যথার বোধের থেকেও মামুন অবাক হলেন বেশি। চাইল্ডিশ প্র্যাংক! ইস্কুলের ছেলেরা এরকম করে। ডেপুটি জেলার একজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার, আর তিনি একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক!

ডেপুটি জেলার হাসি থামিয়ে বললো, মোজাম্মেল হক সাহেব, বিনা অনুমতিতে কয়েদীদের চেয়ারে বসবার অধিকার নাই, আপনি জানেন না! ঠিক আছে, এবার উইঠ্যা বসেন। অনুমতি দিলাম!

মামুনের পশ্চাৎদেশে বেশ চোট লেগেছে, তবু তিনি মুখ অবিকৃত রাখলেন, উঠলেন না, শান্তভাবে বললেন, ঠিক আছে, আমি মাটিতেই বসছি আপনি কেন ডেকেছেন বলেন!

যে লোকটি কয়েক মুহূর্ত আগে কৌতুকে হাসছিল, সে হঠাৎ এবারে রক্তচক্ষে পচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, উঠে বসেন! বেয়াদপি করলে...

সেপাইটি মামুনের চুল ধরে টেনে তুললো। বিস্ময়ের ঘোর এক পলকে কেটে গেল মামুনের। তিনি তখনই বুজতে পারলেন, সামনে কত দুর্দিন আসছে। সরকারি কর্মচারিরা আগে থেকে টের পায়, সেই অনুযায়ী এদের ব্যবহার বদলে যায়। তাঁকে যে-রাত্রে গ্রেফতার করে আনা হয়েছিল, সে রাত্রও এই ডেপুটি জেলারটি তাঁর সঙ্গে অনেক নরম-ভদ্র ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে নতুন কোনো নির্দেশ এসেছে নিশ্চয়ই!

ফাইলটি খুলে রেখে ডেপুটি জেলার জিজ্ঞেস করলো, হক সাহেব, আপনার আবাবা-আম্মার নাম এখানে যা লেখা আছে, তাতে কিছু ভুল আছে মনে হয়। কী কী নাম ছিল বলেন তো?

মামুন নিজের বাবা ও মায়ের নাম বললেন।

ডেপুটি জেলার মাথা নেড়ে বললেন, উঁহু কিছু একটা ভুল আছে। কোনো হিন্দু খানকীর পেটে আপনার জন্ম হয় নাই? আপনার ফেমিলিতে কোনো হিন্দু কানেকশন নাই? তবে, আপনার এই ধুতি-পরা ছবি...

ফাইলটা মামুনের সামনে ঝপাৎ করে ফেলে দিল সে। মামুন দেখলেন তাতে রয়েছে প্রায় বিবর্ণ একটি খবরের কাগজের কাটিং, একটা গ্রুপ ফটো, ফজলুল হকের একপাশে মামুন, বোধহয় উনিশশো চল্লিশ-একচল্লিশ সালের। মামুনের রোগা পাতলা চেহারা, কলকাতায় থাকার সময় তিনি প্রায়ই ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন!

–এই ছবিটা আপনের না? ডিনাই করতে পারবেন?

মামুন বুঝলেন, ভয় পেয়ে কোনো লাভ নেই। এদের কাছে কাকুতি-মিনতি করেও কোনো ফল হয় না। এদের ক্রোধ, হিংস্রতা, খারাপ ভাষা এসবই কৃত্রিম। প্রচণ্ড মাতালকে যেমন কিছুই বোঝানো যায় না।

তিনি শান্ত এবং দৃঢ় গলায় বললেন, ডিনাই করার প্রশ্ন নাই। ধুতি পরেছি...আপনার বাব জীবিত আছেন কি না জানি না, জীবিত থাকলেতেনারে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, এক সময় অনেক মসলমাই ধুতি পরতো, সেটা দোষের কিছু ছিল না!

–ইণ্ডয়ার কাছ থেকে আপনি মান্থলি কত টাকা পান?

–ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে...ইণ্ডিয়ায় আমাকে কোনো প্রপার্টি নাই, সেখান থেকে টাকা পাবার তো কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

–ঘেটি সেধা করে কথা বলেন। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে কত টাকা পান?

সেপাইটি চুলের মুঠি ধরে মামুনের মাথাটা সোজা কর ধরে রাখলো। মামুনের মাথাটি যেন কাটা মুণ্ড, চোখ বিস্ফারিত, ঠোঁট দুটি নড়ছে। তিনি বললেন, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট কোন্ সুবাদে আমাকে টাকা দেবে?

–দালালদের যে জন্য দ্যায়। আপনি ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ ওঝার বাসায় কয় দিন ডিনার খেয়ে গেছেন?

–মিঃ ওঝা কে, তারে আমি চিনিই না।

–ঝুট বাৎ বললে দাঁতগুলো খুলে নেবো! আপনি শেখ মুজিবর রহমানের সাথে মিঃ ওঝার আলাপ করায়ে দ্যান নাই?

–আপনি যে-সব কথা বলছেন, তার বিন্দু বিসর্গ আমি বুঝতে পারছি না। আমি একজন ল ইয়ারের সাথে যোগাযোগ করতে পারি কি? একটি পত্রকার সম্পাদক হিসাবে আমার একটা রাইট আছে।

ডেপুটি জেলার হা-হা করে হেসে উঠলো তিয়েটারি কায়দায়। অকারণে টেবিলে জোরে একটা চাপড় দিয়ে বললো, ঠিক আছে, এখন যান। পরে আবার কথা হবে!

সেপাইটি মামুনকে সেল-এ ফিরিয়ে নিয়ে গেল না, এলো আর একটি ঘরে। বদ্ধ শেখ ঠিকই আন্দাজ করেছে। মামুনের একজন ভিজিটর এসেছে। আলতাফ!

আলতাফ একটা চেয়ারে বসে ছিল, দ্রুত উঠে এসে মামুনের পা ছুঁ কদমবুসি করলো। মামুন পা সরিয়ে নিতে ভুলে গেলেন। আলতাফের এত ভক্তি তিনি আগে কখনো দেখেননি।

খব কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন সেপাই। তাদের দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আলতাফ বললো, সময় দিছে মোটে পাঁচ মিনিট। জরুরি কথাগুলি আগে বলে নেই, মামুন ভাই। আপনার বউ মেয়েরা ভালো আছে। চিন্তা করবেন না। ফিরোজাভাবী আপনার ছোট মেয়েকে নিয় মাদারিপুর চলে গেছে, আমি নিজে ওনাদের স্টিমারে তুলে দিয়ে এসেছি। তিনি হাজার টাকাও দিয়েছি ভাবীর হাতে।

–আর আমার বড় মেয়ে হেনা?

–সে আছে আপনার আপার বাসায়। সরকারের কাছে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। পারমিশান পাওয়া গেলেই সে আপনার সাথে দেখা করতে আসবে। এবারে আর একটা ভালো খবর দেই মামুন ভাই। হোসেন সাহেব 'দিন-কাল'-এর সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন আপনাকে। বিশ তারিখ থেকে আপনার সার্ভিস টারমিনেটেড। সম্পাদক হিসাবে এখন হোসেন সাহেবরই নাম ছাপা হবে। এটা একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার, কাগজ-কলমে আপনাকে বরখাস্ত করা হলো। আপনি ফুল তিন মাসের বেতন পেয়ে যাবেন, তারপর অবস্থা আবার নর্মাল হলে আবার আপনাকে সম্পাদক হিসাবে ফিরায়ে নেওয়া হবে নিশ্চিয়। এটাই ভালো হল না? 'দিনকাল' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেই আপনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, এখন আপনি আর সম্পাদক না থাকলে আপনাকে ডিটেইনড্ কবার কোনো কারণই থাকলো না। আপনাকে ছেড়ে দেবে নির্ঘাৎ।

যেন সেপাইটি এখনও চুলের মুঠি ধরে এনেছে! বিনা নোটিশে বরখাস্ত করা হয়েছে তাঁকে। যে-সময় তাঁর পেছনে একটা সংবাদপত্রের জোর থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল সেই, সময়েই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হলো সম্পাদকের পদ থেকে। এখন তিনি একজন সাধারণ নাগরিক। সেইজন্যই ডেপুটি জেলারটি অমন ব্যবহার করতে সাহস পেয়েছে তাঁর সঙ্গে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, আলতাফ, ভালো থেকো তোমরা। আমি আল্লার কাছে দোয়া করবো, যেন তোমাদের কখনো বিপদ না হয়। মঞ্জু-বাবুল ভালো তো? আর সুখ মিঞা?

॥ ৫৪ ॥

করোনেশান ব্রীজের কাছে এসে জিপ থেকে নেমে পড়লো অতীনরা। কৌশিকই বললো, এই ব্রীজটা ওরা হেঁটে পার হবে, গাড়িতে গেলে এমন সুন্দর দৃশ্যের প্রায় কিছুই উপভোগ করা যায় না। কৌশিক এদিকে আগে দু'বার এসেছে। মানিকদাও একবার এসেছিলেন খুব ছোটবেলায়, শুধু অতীনের কাছে তিস্তা নদীর এই রূপ একেবারে নতুন।

ব্রীজের অনেক নিচে নদী, দু'পাশে খাড়া পাহাড়, দুপুরের রোদে জল একেবারে রূপোলি। এই রকম কোনো কোনো জায়গায় প্রকৃতি একসঙ্গে অনেকখানি ঐশ্বর্য দেখিয়ে দেয়, যা দেখে মানুষ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

এখানকার সুন্দরের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আছে। শুধু জঙ্গল, পহাড়, সেতু, ও নদী নয়, সব মিলিয়ে একটা অপূর্ব নির্মাণ।

ব্রীজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে বড় বড় মালবাহী লরি, কয়েকটি আর্মির ট্রাক। একদিকের পাহাড়

কেটে রাস্তাটা চওড়া করার কাজে নিযুক্ত কিছু নেপালী শ্রমিক। গাড়ির গর্জন ও পাথরে ভাঙা আওয়াজের যে মিলিত ধ্বনি, তাও যেন কানে বেসুরো লাগছে না, এখানে মানিয়ে যায়।

একটু পরে কৌশিক বললো, দাখো অতীন, ব্রীজে ওঠার আগে যে রাস্তাটা সিধে চলে গেল, ওটা গেছে কালিম্পঙের দিকে। আর ব্রীজ পেরিয়ে আমরা যাবো ডান দিকের রাস্তা ধরে হাসিমারায়।

অতীন বললো, কালিম্পঙ! ওখান থেকে একবার ঘুরে আসতে পারি না? কতক্ষণ লাগবে?

ওদের সঙ্গে দীপক নামে আর একটি ছেলে এসেছে, মানিকদার মামাতো ভাই। সে বললো, কালিম্পঙ খুব কাছে নয়, এখন গেলে সন্ধ্যের আগে আর ফেরা যাবে না!

মানিকদার একটা কাশির দমক উঠলো। কাশতে কাশতে তিনি হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলেন। তাঁর গলায় দুটো শিরা ফুলে উঠলো। কাশতে কাশতে তিনি হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলেন। তাঁর গলার দুটো শিরা ফুলে উঠেছে। শিলিগুড়িতে এসেও মানিকদার শরীরের বিশেষ উন্নতি হয়নি।

দীপকের দাদা কাজ করে হাসিমারার কাছে এক চা-বাগানে। মানিকদা সেখানে কিছুদিন থাকবেন শরীর সারাবার জন্য। অতীন আর কৌশিক মানিকদাকে হাসিমারায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবে কলকাতায়। শিলিগুড়িতে ওদের কেটে গেছে দু'সপ্তাহ।

কৌশিক মানিকদার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

অতীন কয়েকটা পাথরের নুড়ি জোগাড় করে টুপ টুপ করে ফেলতে লাগলো তিস্তার জলে। এত ওপর থেকে নুড়িগুলো পড়তে বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে, জলে পড়ার পর একটা গোল আবর্ত স্পষ্ট দেখা যায়। অতীন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে বারবার। কয়েকদিন শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে এদিকে ওদিকে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে উত্তর বাংলার পার্বত্য সৌন্দর্য দেখে সে মোহিত হয়ে আছে। দেওঘরের ত্রিকূট ছাড়া বড় পাহাড় তো সে আগে দেখেনি, জঙ্গলের এই রূপও তার জানা ছিল না।

সুন্দর কিছু দেখলেই তার মনে পড়ে অলির কথা। অলিকে নিয়ে এই জায়গায় একবার বেড়াতে আসতে হবে। কোনো কিছুর দিকে অলির কথা অলিকে নিয়ে এই জায়গায় একবার বেড়াতে আসতে হবে। কোনো কিছুর দিকে অলি যখন অবাক হয়ে কিংবা মুগ্ধ ভাবে তাকায়, তখন অলির চোখদুটি যে কী গভীর হয়ে যায়। একটা পবিত্র পবিত্র ভাব, অলির মতন ওরকম চোখ পৃথিবীতে দুটি যে কী গভীর হয়ে যায়। একটা পবিত্র পবিত্র ভাব, অলির মতন ওরকম চোখ পৃথিবীতে আর কারো নেই।

একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে অতীন দেখলো তার হাত কাঁপছে। অলিকে সে অনুভব করছে সারা শরীরে। নিশ্বাসে সে পাচ্ছে অলির চুলের গন্ধ।

অতীনের একটু একটু অপরাধ বোধ হলো। মুখের সামনে ধোঁয়া সরাবার মতন সে হাত নেড়ে অলির ছবিটাকে মুছে দিতে চাইল, যেন অন্যরা টের পেয়ে যাবে. কয়েকদিন ধরে তারা যে সব আলোচনার মধ্যে রয়েছে. সেখানে অলিকে যেন মানায় না।

দীপক বললো. এই যে তিস্তাকে এখানে এত সুন্দর দেখছেন, আসলে কিন্তু ডেঞ্জারাস নদী, বর্ষাকাল এলেই আমাদের ভয় হয়...

অতীন মুখ ঘুরিয়ে তাকালো দীপকের দিকে, শূন্য দৃষ্টি, কথাটা তার মাথায় ঢুকলো না। অতীন এই মুহূর্তে এখানে নেই, তাকে ফিরে আসতে হবে।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে মানিকদা বললেন, রোদ্দুরটা আমার সহ্য হচ্ছে না রে, চল এবার গাড়িতে উঠি।

মানিকদার চোখের পাতায় সূক্ষ্ম জলের পর্দা, বেশীক্ষণ কাশতে কাশতে এরকম হয়। তিনি চারদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন, এইসব সুন্দর দৃশ্য দেখবার জন্য মনটাকে তৈরি করতে হয়। আর মন তখনই তৈরি হবে, যখন জানবো যে দেশটা বদলেছে, দেশের সব মানুষ সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার পেয়েছে।

কয়েক পা এগিয়ে মানিকদা আবার বললেন, চরুবাবু ঠিকই বলেছেন, কলকাতায় বসে শুধু তর্ক আর আলোচনায় কোনো কাজ হবে না, আসল সংগ্রাম শুরু করতে হবে এই রকম জায়গা থেকেই।কৌশিক বললো, মানিকদা কলকাতায় আমাদের স্টাডি সার্কেলে আমরা এই লাইনেই চিন্তা করছিলুম, কিন্তু চারুবাবুর কথাবার্তা অনেক কংক্রিট। উনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে কমরেড লেনিনের পর বিপ্লবী সংগ্রামের নেতৃত্ব এখন মাও সে তুঙ-এর হাতে। চীনের পার্টির বিরোধিতা করা মানে মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিপ্লবী পথ থেকে সরে যাওয়া। আমাদের পার্টি তো এখন তা-ই করছে।

মানিকদা বললেন, চারুবাবুর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না, আমি জানতুম না যে শিশিগুড়িতে সে অ্যাকচুয়াল সংগ্রামের পদ্ধতি-নিয়ে একজন এইসব চিন্তা করছে!

অতীনরা শিলিগুড়িতে পৌঁছবার বেশ কয়েকদিনের মধ্যেও চারু মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। মাত্র দু'দিন আগে এই দীপকই ওদের নিয়ে গিয়েছিল চারুবাবুর বাড়িতে। চারুবাবুর স্ত্রী লীলা দেবীকে দীপক চেনে অনেকদিন ধরে, সেই সূত্রে।

শিলিগুড়ির প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা বীরেশ্বর মজুমাদারের ছেলে এই চারু মজুমদার। শীর্ণ, হাড়-চামড়া সম্বল চেহারা, চোখদুটিতে রয়েছে তীব্রতা। বাল্য বয়সে মেধাবী ছাত্র ছিলেন, ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে পাবনার এডোয়ার্ড কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন, কিন্তু ধরাবাঁধা পড়াশুনোয় মন বসেনি, বি এ পরীক্ষার আগেই কলেজ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন রাজনীতিতে। প্রথম দিকে ছিলেন কংগ্রেসের সোসালিস্ট পার্টিতে, তারপর জলপাইগুড়ি জেলার শচীন দাশগুপ্ত ও বীরেন দত্তের প্রভাবে চলে আসেন কমুনিষ্ট পার্টিতে, কাজ শুরু করেন কৃষক ফ্রন্টে। ছেচল্লিশ সালের তেভাগা আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সেই আন্দোলনকে ছাপিয়ে গেল দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ডুয়ার্সের মঙ্গলবাড়িতে পুলিশের গুলিতে মারা গেল এগারোজন, পার্টি নেতৃত্ব সেই আন্দোলন বন্ধ করে দিতে চাইলে চারু মজুমদার দারুণ বিক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই।

জেল থেকে ছাড়া পান তিন বছর বাদে, তখন স্বাধীন ভারতের বয়েস মাত্র চার বছর। প্রকৃত মার্কসবাদীর চোখে এই স্বাধীনতা মোটেই প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, দেশব্যাপী শ্রমিক কৃষকরা আগের মতনই দারিদ্র্য ও অবিচারের নিগড়ে বন্দী। তিনি কাজ শুরু করলেন চা বাগানের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার আদায়ের আন্দোলনে, সভাপতি হলেন রিকশাওয়ালাদের ইউনিয়নের। কিন্তু পার্টির সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হতে থাকে নানা বিষয়ে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে আন্তর্জাতিক কমুনিস্ট আন্দোলনের একমাত্র পথ হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। কিন্তু স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর থেকেই ক্রুশ্চেভপন্থী এক ধরনের শোধনবাদ ছড়িয়ে পড়ছে পার্টির নেতাদের মধ্যে। শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ও শোষক-শোসিতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান! পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই বুলি কপচেছেন, এই নীতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া, ভারতের কম্যুনিস্ট পর্টির নেতারাও এই সুবিধাজনক নিরীহ পথে এগোতে চাইছে। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় ডাঙ্গে-রাজেশ্বর রাও প্রমুখ নেতারা সমর্থন জানালেন নেহরুকে, চারু মজুমদারের মতন আরও কয়েকজন যুব নেতা পার্টির মধ্যে জ্বলন্ত ভাষায় করলেন এর প্রতিবাদ, তাঁরা বললেন, "জন বিরোধী ভারত সরকারই চীনকে আক্রমণ করেছে। কমুনিস্ট আন্তর্জাতিকবাদের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের উচিত এই যুদ্ধের বিরোধিতা করা।" এতটা ঔদ্ধত্য প্রমোদ দাশগুপ্তের মতন রাজ্যনেতাদেরও সহ্য হয়নি।

চারু মজুমদার একবার নির্বাচনেও দাঁড়িয়েছিলেন, জলপাইগুড়ির এক বাই-ইলেকশনে। সংসদীয় রাজনীতিতে যাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, তাঁকে নির্বাচনে অংশ নিতে হয়েছিল সম্ভবত স্থানীয় সহকর্মীদের উপরোধে, সেবারে তাঁর জামানত জব্দ হয়েছিল।

ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অগ্রাহ্য করে তিতিন গ্রামে গ্রামে, চা-বাগানে কাজ করেছেন অক্লান্ত ভাবে, তাঁর শরীর বরাবরই অপটু, মনোবলই তাঁর প্রধান সম্বল, তবু চৌষট্টি সালে তাঁর একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। কমুনিস্ট পার্টির সেই সময় দ্বিখণ্ড হয়েছে। তিনি সি পি আই (এম)-এর দিকে চলে এলেও পার্টির নেতাদের চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছেন না। দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রকৃত মার্কসবাদী কর্মীর কর্তব্য কী সে সম্পর্কে তিনি দলিল রচনায় মন দিলেন।

মোট পাঁচটি প্যামফ্লেট রচিত হবার পরেই তিনি গ্রেফতার হলেন দ্বিতীয়বার। পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দের তৎপরতায় প্রায় এক হাজার কমিউনিস্টকে বন্দী করে রাখা হয়। চারুবাবু এতে বিস্মিত হননি। প্রতিক্রিয়াশীল ভারত সরকারের কাছ থেকে এছাড়া আর কী আশা করা যায়? চারুবাবু বিশ্বাস করেন যে কাশ্মীর একটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবার জন্য কাশ্মীরীদের আন্দোলন যুক্তিপূর্ণ, এবং সেই আন্দোলন দমন করার জন্যই ভারত সরকার নানান ছুতোয় পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। প্রকৃত বিপ্লবীর কর্তব্য হচ্ছে এই সরকারকে যতভাবে সম্ভব আঘাত করা।

অতীনরা যেদিন চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল, তার মাত্র একমাস আগে তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এখন তাঁর বয়েস প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, শরীর বেশ দুর্বল। প্রথমে তিনি

মনিকদার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতেই চাননি, কলকাতার বক্তৃতাবাজ পার্টি কর্মীদের সম্পর্কে তাঁর মনে স্পষ্টই একটা বিরাগ ভাব আছে বোঝা গেল। মানিকদা ধৈর্য হারাননি, বিনীতভাবে উত্তরবাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে টুকটাক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, হঠাৎ চারুবাবু ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, আগে আসল কথাটা বলুন তো! সশস্ত্র সংগ্রামের পথে বিশ্বাস আছে? আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে দেশের এখন যা অবস্থা তাতে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করার এটাই উপযুক্ত সময়? 'মজুত উদ্ধার', 'ঘেরাও' 'লাগাতার ধর্মঘট', 'প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট' এইসব ন্যাকা মধ্যবিত্ত-সুলভ উগ্র বামপন্থী আওয়াজ শুনলে আমার গা জ্বলে যায়! আপনাদের ঐ সব বিশ্বাস থাকলে আমার কাছে কোনো সুবিধে হবে না!

মানিদকা মৃদু হেসে অতীন ও কৌশিকের দিকে তাকিয়েছিলেন। এইসব ব্যাপার নিয়েই আন্দোলন নিয়ে ঠাট্টা করায় একবার হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রচণ্ড বকুনি দিয়েছিলেন তাঁকে।

মানিকদা বললেন, চারুবাবু সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবে কী করে, কী ভাবে অস্ত্র যোগাড় করা যাবে, সে সম্পর্কে কি আপনি কিছু ভেবেছেন? শাসক দলের সঙ্গে রয়েছে পুলিশবাহিনী ও আর্মি, তাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে অস্ত্র, জোগাড় করাই কি প্রধান সমস্যা নয়?

মানিকদার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থেকে চড়া গলায় চারুবাবু বললেন, অস্ত্রের দোহাই দিয়ে, নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকাও আসলে শোদনবাদ! কেন, দা, কুড়ুল, শাবল, কাস্তে, লাঠি এগুলোও কি অস্ত্র নয়? গ্রামের মানুষ এই সব অস্ত্রই ব্যবহার করতে জানে। এইসব দিয়েই লড়াই শুরু করা যায়। গ্রামের মানুষকে এই সব অস্ত্রই ব্যবহার করতে জানে। এইসব দিয়েই লড়াই শুরু করা যায়। গ্রামের মানুষকে বোঝাতে হবে যে জোতদার পুলিশ-বুর্জোয়া পার্টির অত্যাচারে মুখ বুঝে থাকলে চলবে না। প্রতিঘাত করতে হবে। ছোট ছোট এলাকা ভিত্তিক মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

—তারপর?

—তারপর ওদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। মাও সেতুঙ বলেননি যে 'শত্রুর অস্ত্রাগার আমাদেরই অস্ত্রাগার'?

অতীন কোনো কথা বলেনি, সে চুপ করে শুনছিল। মানিকদার সঙ্গে কৌশিক মাঝে মাঝে কথায় যোগ দিয়েছে। চারুবাবুর চোখের দৃষ্টিতে যেন চুম্বক আছে। এমন প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি কথা বলেন যে প্রতিটি শব্দ মনের মধ্যে গেঁথে যায়। গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট ইউনিট গঠন করে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের যে ব্লুপ্রিন্ট দিলেন, তা শুনে অতীনের মনে হয়েছিল, এক্ষুনি কাজ শুরু করার দরকার।

পরের দিনও দীর্ঘসময় ধরে চারুবাবুর সঙ্গে ঐ বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হলো। কিন্তু শেষের দিকে চারুবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাঁর বুকে উঠলো ইসকিমিয়ার ব্যথা। জেলে থাকার সময় তাঁর শরীর আরও ভেঙেছে অথচ মানুষটি যেন কিছুতেই বিশ্রাম নিতে জানেন না। লীলাদেবী তাঁকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন প্রায় জোর করে। মানিকদারও বিশ্রী কাশিটা না সারালেই নয়। তাই ঠিক হলো কয়েকদিনের আলোচনা স্থগিত থাকবে। কৌশিক আর অতীনকেও একবার ফিরতেই হবে কলকাতায়।

পাহাড়ী রাস্তা ধরে জিপটা চলেছে, কৌশিক আর মানিকদা চারুবাবু সম্পর্কেই কথা বলে চলেছেন, অতীন আবার অন্যমনস্ক।

অতীন জানে, তার মনের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব আছে। মানিকদার সংস্পর্শে এসে সে দেশের মানুষের কথা ভাবতে শিখেছে। এই সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য যে যে-কোন কাজ করতে প্রস্তুত। মানিকদার মতন মানুষ, চারুবাবুর মতন মানুষ যদি নিঃস্বার্থভাবে দেশের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে, তাহলে সেই বা পারবে না কেন? ওঁরা এমন কিছু অসাধারণ মানুষ নন।

কিন্তু মানিকদা বা আরও কয়েকজনকে সে দেখেছে, যাঁরা সর্বক্ষণ এই সব কথাই ভাবেন, আলোচনা করেন, তাঁদের অন্য কোনো দিকে আগ্রহ নেই, কোনো হাসিঠাট্টা নেই, ছাই-গাদার মধ্যে একটা গাঁদা-ফুলের গাছ থাকলেও তাঁরা ছাইটাই দেখবেন, ফুল দেখবেন না। তার বন্ধু কৌশিকেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ফার্স্ট ইয়ার সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ার সময় কৌশিক খুব কবিতা-টবিতার চর্চা করতো, নিজেও লিখতো গোপনে গোপনে। সেই কৌশিক হঠাৎ একদিন জীবনানন্দ দাশের একটা কবিতার বই জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল, ধুৎ এসব আর্টস ফর আর্টস সেক-এর সাহিত্য আর কোনোদিন পড়বো না। শুধু শুধু মনটাকে বিগড়ে দেয়।

অতীন অবশ্য কবিতার ভক্ত নয়, তবু নিছক তর্কের খাতিরেই সে বলেছিল, আধুনিক বাংলা কবিতার বই না হয় তুই ছুঁড়ে ফেলে দিলি, কিন্তু তোর কাছে যে শেক্সপীয়রের বই আছে, সেটা কী করবি?

কৌশিক উত্তর দিয়েছিল, ওসব ক্লাসিকস নিয়েও পরে চিন্তা করা যাবে, এখন আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখবো!

অতীন কবিতার ভক্ত নয়, ফুলটুলেরও ভক্ত নয়, ছাইগাদায় একটু গাঁদা ফুল দেখলে তার চোখ টানে বটে, মন উথলে ওঠে না। কিন্তু তার ভালো লাগে সিনেমা দেখতে, বিশেষত ও ওয়েস্টার্ন ফিল্ম। চৌরঙ্গি পাড়ার হলগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন দেশেরই ছবি আসে বেশি আর কিছু কিছু ব্রিটিশ ফিল্ম অন্য কোনো দেশের সিনেমা দেখার তো প্রায় কোনো সুযোগই নেই, তবু ঐ সব ছবিও সে উপভোগ করে। মনে মনে তার একটা অপরাধ বোধ হয়। এসব সিনেমা দেখা তার উচিত নয়, তবু নেশার মতন, দেওয়ালের পোস্টারে সোফিয়া লোরেন, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, গ্রেগরি পেক, ইনগ্রিড বার্গম্যানের ছবি দেখলেই তার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।

আর যখন-তখন মনে পড়ে অলির কথা। স্টাডি সার্কেরে সঙ্গে অলি সম্পর্ক ছেদ করেছে, আর সে তাদের সহযাত্রিণী নয়। অনুপমরা প্রায়ই অলিকে বড়লোকের আদুরে মেয়ে বলে ঠাট্টা করতো। ওরা জানতো, অলি কোনো আদর্শের টানে স্টাডি সার্কেলে আসেনি, এসেছিল শুধু অতীনের টানে। অলিরা বড়লোক? হ্যাঁ, এদেশের স্ট্যাণ্ডার্ডে ওদের বড়লোকই বলতে হবে। অলির বাবা বইয়ের ব্যবসা করেন, তিনিও কি তাহলে শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ? এই গরিব দেশে অন্য অনেক লোককে বঞ্চনা না করে কেউ ধনী হতে পারে না।

তাহলে কি অলির সঙ্গে তার আর মেশা উচিত নয়? এই চিন্তাটা এলেই অতীন দিশাহারা হয়ে যাবে। অলি তার নিজস্ব, অলি যেন তার শরীরেরই একটা অঙ্গ। অন্য কোনো পুরুষ অলির সঙ্গে সামান্য ঘনিষ্ঠতা করতে এলেই অতীনের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। এমনকি অলির মেয়ে বন্ধুদেরও সে পছন্দ করতে পারে না। অলির সঙ্গে গল্প করার সময় একদিন বিমানবিহারী ওপরের ঘরে থেকে মেয়েকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, অতীন অলির হাত চেপে ধরে রক্ত চক্ষে বলেছিল, এখন যেতে হবে না, একটু পরে যাবে! অতীন জনাতে চেয়েছিল, অলির বাবা চেয়েও অলির ওপর তার অধিকার বেশি!

সেই অলির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ কি সম্ভব?

মানিকদাকে সে ভালোবাসে, মানিকদার কথায় সে প্রাণ দিতে পারে, মানিকদা যদি কোনোদিন বলেন, অতীন, একজন সংগ্রামী কর্মীর পক্ষে ব্যক্তিগত প্রেম ভালোবাসা এগুলো হলো তুচ্ছ বিলাসিতা, এসব এখন মুলতুবি রাখতে হয়, তুমি অলির সঙ্গে আর মিশো না! তখন অতীন কী করবে?

পাহাড় ছেড়ে জিপটা সমতলে নেমেছে, দু'পাশে চা-বাগান। অতীন আগে কখনো চা-বাগান দেখেনি। বুক সমান উঁচু, সমান করে ছাঁটা গাছ, মনে হয় যেন মাইলের পর মাইল। মাঝে মাঝে এক একটা লম্বা লম্বা অন্য গাছও রয়েছে। দীপক তাকে বোঝালো যে, ঐ গাছগুলোকে বলে শেড ট্রি, ওদের ছায়াটা দরকার, চা-গাছের পাতায় বেশি রোদ লাগলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

দীপক বি এ পাস করে আপাতত বেকার। বেঁটে খাটো বলিষ্ঠ চেহারা। কিছু কিছু পার্টির কাজ করে, যে-কোনো একটা চা-বাগানে চাকরির চেষ্টাও করছে। ছেলেটি অনেক কিছুরই খবর রাখে।

অতীন জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, অনেক জায়গায় তো দেখেনি কোনো বেড়া নেই। বাইরের লোকে চা-পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে পারে না?

দীপক বললো, কত নেবে? একটু আধটু নিলেও কিছু যায় আসে না। তাছাড়া কাঁচা চা-পাতা তেমন লাভ নেই, প্রসেসিং না করলে লিকার হয় না। মাঝখানে অনেক ব্যাপার আছে।

কৌশিক বললো, নর্থ বেঙ্গলে চা-বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে কী বিরাট একটা অর্গানাইজড ফোর্স হতে পারে ভেবে দ্যাখ তো? যদি কোনোদিন এরা একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায়...

একটা টি-এস্টেটের মধ্যে ঢুকে পড়লো জিপটা। দু'পাশে চা-বাগান, তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। অনেকখানি ভেতরে যাবার পর সব কোয়ার্টার্স। দীপকের দাদা অসীম এই চা-বাগানের সহকারি অ্যাকাউন্টান্ট। তার কোয়ার্টারে যাবার আগেই সহকারি ম্যানেজারের বাংলো, সেই বাংলোর চওড়া বারান্দায় বসে আছেন কয়েকজন নারী-পুরুষ। সেদিকে তাকিয়ে দীপক বলে উঠলো, এই রে!

কৌশিক বললো, কী হলো?

দীপক আঙুল দেখিয়ে বললো, ঐ যে খদ্দরের পাঞ্জাবী পরা লোকটাকে দেখছেন, কাঁচা-পাকা

চুল, উনি হলেন শৈলেন দাশগুপ্ত!

কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, বিখ্যাত লোক? নাম শুনলেই চিনতে পারার কথা?

—রাম শোনেননি? নর্থ বেঙ্গলের বেশ বড় গোছের কংগ্রেস লিডার, অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজারের শ্বশুর হয়, বেড়াতে এসেছে। ঐ শৈলেন দাশগুপ্তের এত ক্ষমতা যে এস পি, ডি এমরা ও কথায় ওঠে বসে।

মানিকদা বললেন, তাতে আমাদের কী আসে যায়? কংগ্রেসীদের দেখেই ভয় পেতে হবে; এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে নাকি?

—না তা নয় তবে আপনাদের পরিচয় এখানে না জানানোই ভালো, তা হলে আমার দাদার ট্রাবল হতে পরে!

মানিকদা বললেন, তোমার দাদার কাছে আত্মীয় স্বজনরা বেড়াতে আসতে পারবে না?

অসীমকে কোয়ার্টারেই পাওয়া গেল। সে বিবাহিত, দুটি ছেলেমেয়ে এখানকার স্কুলেই পড়াশুনা করে। অসমি প্রায় মানিকদারই সমবয়সী, ছেলেবেলায় দু'তিন বছর একই স্কুলে পড়াশুনো করেছে। ওদের পেয়ে সে খুব খুশী। বৈলেন দাশগুপ্তর ব্যাপারটা সে আমলই দিল না। বরং বলল, উনি পুরনো আমলের কংগ্রেসী, খুব ভদ্দরলোক!

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর মানিকদা ঘুমিয়ে পড়লেন, অতীন আর কৌশিক চা-বাগান দেখতে বেরুলো। দীপকের হাতে একটা লাঠি, চা-ঝোপের আড়ালে নাকি অনেক সময় শেয়াল লুকিয়ে থাকে।

চতুর্দিকে শুধু সবুজ, তাতে চোখ জুড়িয়ে যায়। এখন সীজন নয়, তাই কুলি-কমিনদের পাতা তুলতে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। বিমাল চা-বাগানটি শুনশান হয়ে পড়ে আছে। দুপুরের একটা শেড দেকিয়ে দীপক বললো, ঐটে কারখানা, ঐখানে প্রসেসিং-এর কাজ চলছে, ওদিকে যাবেন?

অতীনের কারখানা দেকার ইচ্ছে নেই, সে চায় শুধু এই সবুজের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে। কৌশিক বললো, সে একবার মধেসিয়া শ্রমিকদের বস্তিটা দেখতে যাবে।

আকাশে আজ রোদ নেই, ঘোরাঘুরি করছে টুকরো টুকরো মেঘ, তার মধ্যে কয়েকটি বেশ কালো, যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। সে যখন বৃষ্টি নামবে, তখন দেখা যাবে, তার আগে এখন আবহাওয়াটি বড় মনোরম।

একটা বাঁক ঘুরতেই শৈলেন দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বেশ দীর্ঘকায় পৌঢ়, ধপধপে সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, মুখে বেশ একটা সৌম্য ভাব আছে। তাঁর সঙ্গে একটি যুবতী ও একটি কিশোরী। মেয়েটি প্রায় অলি আর বুলির বয়েসী। বড় মেয়েটি লম্বা, ছিপছিপে, মাজা মাজা রং, ভুরু দুটি প্রায় জোড়া। অলির সঙ্গে চেহারার কোনো মিল নেই, তবু তাকে দেখে অতীনের মনে পড়লো অলির কথা।

শৈলেন দাশগুপ্ত নিজেই আগে হাত তুলে বললেন, নমস্কার, আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কুচবিহার না জলপাইগুড়ি?

কৌশিক বললো, আমরা কলকাতা থেকে আসছি। আমাদের একজন আত্মীয় আছেন এখানে।

শৈলেন দাশগুপ্তর বয়েসী লোকেরা সাধারণত অতীন-কৌশিকদের বয়েসীদের সঙ্গে তুমি বলে কথা বলতে শুরু করে। ইনি আপনি বললেন, মানুষটি বেশ আলাপী, অনেক কথা শুরু করলেন কৌশিকের সঙ্গে।

এখানে আসবার আগেই কয়েকটি কংগ্রেসী, গুণ্ডার সঙ্গে মারামারি হয়েছে বলে কংগ্রেসী নাম শুনলেই অতীনের গা জ্বলে যায়। শৈলেন দাশগুপ্তর ব্যবহারে তাঁকে অপছন্দ করার কোনো কারণ নেই, তবু অতীন লোকটির দিকে তাকাচ্ছেন না, কোনো কথাও বলছে না। এবং একজন কংগ্রেসী নেতার মেয়ে বলে সে ঐ মেয়েদুটিকেও গ্রাহ্য করলো না।

শৈলেন দাশগুপ্ত চা-বাগানের খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন আলাপ ফেঁদে বসেছেন কৌশিকের সঙ্গে যে চট করে চলেও যাওয়া যাচ্ছে না। বাবা-জ্যাঠার বয়েসী লোকের সামনে অতীন সিগারেট কায় না, কিন্তু এই লোকটির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য সে ফস করে একটা সিগারেট ধরালো।

মেয়ে দুটি শৈলেন দাশগুপ্তর কন্যা নয়। তিনি নিজেই আলাপ করিয়ে দিলেন, ওরা তাঁর জামাইয়ের বোন, বড়টির নাম শর্মিলা, ছোটটির নাম সুভদ্রা, ওরাও জামসেদপুর থেকে বেড়াতে এসেছে এখানে। অতীনরাও নিজেদের নাম জানালো।

শর্মিলা অতীনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা চিতা বাঘটা দেখেছেন?

অতীন অবাক হয়ে বললো, চিতাবাঘ? কোথায় চিতাবাঘ?

শর্মিলা বিস্ময়মাখা হাসি দিয়ে বললো, ওমা, আপনারা চিতা বাঘটার কথা শোনেননি? কাল রাত্তিরে ম্যানেজারের বাংলোয় ধরা পড়েছে, কী সুন্দর দেখতে!

তার ছোট বোন সুভদ্রা দুটো হাত তুলে মাপ দেখিয়ে বললো, এইটুক, গাটা একেবারে সিল্কের মতন!

শৈলেন দাশগুপ্ত বললেন, চিতা বাঘ নয়, লেপার্ড। এদিকে চা-বাগানগুলোতে তো প্রায়ই চলে আসে জঙ্গল থেকে। এটা তিন চার মাসের বাচ্চা হবে, ধরে রেখে দিয়েছে ম্যানেজারের বাংলোয়।

শর্মিলা উৎসাহের সঙ্গে বললো যাবেন, যাবেন, দেখতে যাবেন? আমরা নিয়ে যেতে পারি।

চিড়িয়াখানার বাইরে অতীন কখনো জংলী জানোয়ার দিকে তাকালো, দৃষ্টি দিয়ে যেন বলতে চাইলো, শ্রমিকদের বস্তিতে যাবার আগে একবার লোার্ডের বাচ্চাটা দেখে এলে কি খুব বলতে চাইলো, শ্রমিকদের বস্তিতে যাবার আগে একবার লেপার্ডের বাচ্চাটা দেখে এলে কি খুব দোষ হয়?

কৌশিক বললো, চল দেখে আসি!

শর্মিলা, অতীনের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন, আপনি বুঝি হাসতে জানেন না?

অতীনকে উত্তর দিতে হলো না, তক্ষুনি নেমে গেল ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টি এরকম হুড়মুড়িয়েই আসে। শর্মিলা হাততালি দিয়ে বললো উঠলো, পালানো চলবে না কিন্তু, আমরা বৃষ্টিতে ভিজবো!

সবাই একটা শেড ট্রি-র নীচে দাঁড়ালো।

॥ ৫৫ ॥

পর পর তিনবার সিটি দিয়ে তেমে গেল ট্রেনটা। সেই তীক্ষ্ণ শব্দ যেন মিশমিশে অন্ধকারের মধ্যে আর্তনাদের মতন শোনায়। এই অঞ্চলটায় কোনো বসতি নেই, ট্রেন লাইনের একদিকে ফসল-কাটা মাঠ, অন্যদিকে জলা। ইঞ্জিনের জোরালো আলোয় দেখা যাচ্ছে যে দুশো আড়াইশো গজ দূরে লাইনের ওপর সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে মানুষের মতন একটা মূর্তি শুয়ে আছে। তা দেখেই ব্রেক কষেছে ইঞ্জিন ড্রাইভার।

ট্রেনটা থামা মাত্র লাইনের দু'পাশ থেকে উঠে এলো সাত আটটি ছায়া মূর্তি। বজবজ থেকে আসছে এই মালগাড়ি, কোন্ বগিতে কোন্ মাল আছে, তাও যেন এই ছায়ামূর্তিরা আগে থেকেই জানে। টর্চ জ্বেলে দেখে নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো একই বগিতে। তালা ভাঙতে আধ মিনিটও সময় লাগলো না।

ট্রেনের সামনে এবং পেচন থেকে ড্রাইভার ও গার্ড উঁকি মেরে দেখলো। কী ব্যাপার ঘটছে তা বুজতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়, আজ রবিবার, যে কোনো কারণেই হোক, রবিবার রাতেই এই সব বেশি ঘটে। সশস্ত্র ডাকাতদের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব গার্ড বা ইঞ্জিন ড্রাইভারের নয়, গার্ডসাহেব তাঁর লগহ বুক খুললেন।

ধুপ ধুপ করে চিনির বস্তাগুলো পড়তে লাগলো মাঠে। সুচরিত তার দলের লোকদের ঠিক দশ মনিট সময় দিয়েছে। মুঙ্গ, ইয়াসিন, লেটো, পল্টুরা এত দ্রুত হাত চালাচ্ছে যে ততখানি তৎপরতার সঙ্গে ভারতের কোনো কলকারখানায় শ্রমিক কাজ করতে জানে না। অনেকের ধারণা ভারতীয়রা অলস, এই মুহূর্তে এসে তারা সুচরিতের দলটাকে দেখুক তো!

সুচরিত নিজে হাত লাগায় না। তার এক হাতে একটা হুইস্‌ল সে সিগারেট টানছে উত্তেজিত ভাবে। এই ট্রেনে কোনে আর্মড নেই, সে খবর নেওয়া আছে আগে থেকে, একটাও প্যাসেঞ্জার কামরা নেই, কোনো দিক থেকেই বাধা আসবার সম্ভাবনা নেই, তবু বলা যায় না, এক একদিন পুলিশ হঠাৎ কেরদানি দেখাবার জন্য ঠিক সময় হাজির হয় অন্ধকার ফুঁড়ে কাগজে নিজেদের বীরত্বের কাহিনী ছাপাবার জন্য সেদিন তারা গুলি চালায়। পুলিশের মতন এমন নিমকহারাম প্রাণী সুচরিত আর দ্বিতীয় দেখেনি, এরা টাকাও খাবে, আবার মর্জি মতন এক একদিন গুলিও চালাবে।

ইঞ্জিনটার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সুচরিত। ইঞ্জিন ড্রাইভার সম্ভবত তাকে দেখতেও পাচ্ছে, তাতে কিছু যায় আসে না। ঠিক দশ মিনিট পার হতেই সে গার্ড সাহেবের ভঙ্গিতে লম্বা করে হুইস্‌ল

বাজালো। কাজ শেষ, সে এখন ট্রেন ছাড়ার নির্দেশ দিচ্ছে। লাইনের ওপর সাদা কাপড় জড়ানো মূর্তিটা সরে গেল এই মুহূর্তে, ইঞ্জিন ড্রাইভার আবার সিটি দিল নিয়মমাফিক।.

পরিষ্কার কাজ, কোনো ত্রুটি নেই। রেলের লোকেরা সাধারণত পয়সা পেলে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যে ট্রেন লুঠ হবে, সে-ট্রেন কোনো দিন এক মিনিটও লেট করে আসে না। লুণ্ঠিত হবার জন্য তার ব্যাকুলতা অতি নিখুঁত। এখন ঠিক দশটা পঁচিশ।

মাঠের মধ্যে অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একটি ট্রাক। বস্তাগুলো এবার ট্রাকে ওঠাতে হবে। চিনির দাম এখন সোনার মতন। খোলা বাজারে চিনি উধাও, কন্ট্রোলেও সরকার চিনি দিতে পারছে না। অধিকাংশ র‍্যাশান শপেই চিনি নেই, মিষ্টির দোকানগুলো বন্ধ হবার উপক্রম। বিয়ে বাড়িতে মিষ্টি খাওয়াবার জন্যও সরকারের কাছে পারমিট চাইতে হয়, তার জন্য কত ধরাধরি।

বস্তাগুলো লোডিং হচ্ছে অতি সাবলীল দ্রুততার সঙ্গে। সুচরিত অনবরত মাথা ঘোরাচ্ছে এদিক-ওদিক। কোথাও কোনো আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে না। তার মাথার মধ্যে একটাই কথা ঘুরছে, পুলিশকে বিশ্বাস নেই, পুলিশকে বিশ্বাস নেই!

কয়েকটা বস্তা তোলা তখনও বাকি, ছায়ামূর্তিগুলির মধ্য থেকে একজন সুচরিতের কাছে এগিয়ে এসে বললো, ওস্তাদ, একটা কথা আছে।

কিছুদিন আগেও সঙ্গীসাথীরা সুচরিতকে শুধু ল্যাঙা বলে ডাকতো। খিদিরপুরের কেসটার পর সে ওস্তাদ হয়েছে। এমনি এমনি দলপতি হওয়া যায় না, তার জন্য মুরোদ লাগে। আর এ লাইনের শ্রেষ্ঠ মুরোদ হচ্ছে ধরা পড়ার পরেও পালাবার ক্ষমতা দেখানো। সেবার ওদের কাজটা ছোটই ছিল, ডক এরিয়া থেকে এক পেটি রিস্টওয়াচ ডেলিভারি আনা। পেটিটা জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে একজন, সুচরিত আর তার দু'জন সঙ্গী শুধু পেটিটা ডক এরিয়া পার করে আর এক জায়গায় পৌঁছে দেবে। এমন কিছুই না। কিন্তু তিন নম্বর গেটের কাছাকাছি হঠাৎ তিনজন আর্মড গার্ড ওদের ঘিরে ধরলো, বন্দুক উঁচিয়ে বললো, হল্ট! তখন আর কোনো উপায় নেই, হল্ট হবার আগেই যে গুলি চালায়নি, সেই ওদের বাপের ভাগ্য, এবার ভাগ্যে আছে জেলের খিচুড়ি। একজন গার্ড মুঙ্গির পেটে অকারণে কষালো একটা লাথি, ঠিক সেই মুহূর্তে সুচরিত একটা পেটো ঝাড়লো অন্য একজনের ঠিক বুকের ওপর। শুধু তার হাতের ছিল বন্দুক। লোকটা মরবার আগে গলা দিয়ে একটা আওয়াজও বার করতে পারেনি। সুচরিতের সেটাই প্রথম খুন এবং নিখুঁত খুন। তিনজন গার্ডকে এক লাইনে রেখেছিল সে। অন্য দু'জন এগিয়ে আসার সময় পায়নি।

পালাবার সময় সুচরিত রিস্টওয়াচের পেটিটাও ফেলে আসেনি। খোঁড়া পায়ে সুচরিত ঠিক মতন দৌড়াতে পারে না, সে ক্যাঙারুর মতন লাফায়, সাঙ্ঘাতিক তার দম, দেড় দু'মাইল ওরকম একটানা লাফিয়ে চলে আসতে পারে। সে রাতে আলিপুরের আখড়ায় মুঙ্গিরা সুচরিতকে কাঁধে করে নেচেছিল, মদ খেয়ে চুরচুর মাতাল হয়েছিল এবং তখন থেকেই ওস্তাদ খেতাব দেওয়া হয়েছিল তাকে।

এ-লাইনে একটা অলিখিত নিয়ম আছে, যতই মাথা গরম হোক আর যতই ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকুক, কিন্তু পুলিশের গায়ে হাত দেওয়া চলবে না। পুলিশ বাহিনী নিজ পরিবারের প্রতি অতি বিশ্বস্ত। সামান্য একজন কনস্টেবলের মৃত্যুও পুলিশ বাহিনী সহ্য করে না। পুলিশকে যে মারবে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। পুলিশ এমনিতে চোর-ডাকাত-ছিনতাইবাজ-ওয়াগন ব্রেকার ইত্যাদি সকলেরই মোটামুটি সুলুক সন্ধান জানে, কাকে কখন ধরবে বা ধরবে না, সে ব্যাপারে তাদের নিজস্ব নিয়মকানুন আছে, ওপর থেকে চাপ আছে, কিংবা ধরা-ছাড়ার মধ্যে নানা রকম চুক্তি করা যায়। কিন্তু কোনোক্রমেই কোনো পুলিশের খুন সহ্য করা হবে না, পুলিশকে মেরে এ-লাইনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এরকম একজনকেও দেখা যাবে না।

সুচরিত তা জানতো এবং সেই রাতেই সে ঠিক করেছিল, এ লাইন থেকে চিরবিদায় নেবে। কিন্তু তার ভাগ্য ভালো, যাকে সে খুন করেছিল, সে পুলিশ নয়, কোনো একটি কোম্পানির গার্ড, পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সুতরাং তার খুন নিয়ে পুলিশ বাহিনী বিশেষ মাথা ঘামায়নি। শুধু ডক এরিয়ে ছাড়তে হয়েছে সুচরিতকে।

বাল্লুর ডাক শুনে সুচরিত চমকে উঠে বললো, কী রে?

এই বাল্লু সুচরিতের চেয়ে বছর চারেকের বড়, মাথায় তারই সমান ঢ্যাঙ, একটা চোখ ট্যারা। সে বললো, ওস্তাদ, যাবার পথে দশটা বস্তা গড়িয়ায় কিষেণচাঁদের গোডাউনে নামিয়ে দিতে যেতে হবে।

সুচরিত ভুরু বাঁকিয়ে বললো, কেন? কিষেণচাঁদের সঙ্গে তো কোনো কন্ট্রাক্ট নেই।

বাল্লু বললো, কিষেণচাঁদ খুব করে ধরেছে। গড়িয়া-সোনারপুরের দিকে একদানা চিনি নেই। যা খুশী দাম পাওয়া যাচ্ছে।

যা ভাগ। বস্তাগুলো তোল জলদি। আমি কথার খেলাপ করি না। পুরো ডেলিভারি দমদমে যাবে।

এক ওয়াগনে কতগুলো বস্তা থাকতে তার কি কোনো ঠিক ছিল? দশটা বস্তা কম থাকতে পারে না!

কিষেণচাঁদকে বলবি, আসছে হপ্তায় দেখা যাবে!

শোনো ওস্তাদ, শোনো...

ওঠ ওঠ, আগে লরিতে ওঠ!

দলপতি হিসেবে ট্রাক ড্রাইভারের পাশেই সুচরিতের বসবার কথা। কিন্তু সুচরিত এসে পেছন দিকে তার দলবলের সঙ্গে বস্তাগুলোর ওপরেই বসলো। অসহ্য গুমোটের রাত। এখানে বসলে তবু একটু আরাম পাওয়া যায়। আকাশে জমাট মেঘ, এক একবার একটু-একটু চাঁদের আলো ছিটকে আসছে।

চলন্ত ট্রাকে কেউ কোনো কথা বলছে না। এ কাজে দারুণ উৎকণ্ঠা থাকে, পরিশ্রমও প্রচুর, যতক্ষণ কাজ চলে ততক্ষণ অন্য কোনো বোধ থাকে না, তার পরেই খুব অবসন্ন লাগে। এখন মাল টানার জন্য গলা সকসক করছে সবার, কিন্তু সঙ্গে কিছু নেই। একটা বস্তা ফুটো হয়ে গেছে, তার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে ছাঁদাটাকে বড় করে নিয়ে, চিনি বার করে খাচ্ছে, মুঙ্গি আর লেটো।

মাঠের মধ্য দিয়েই অনেকটা যাবার পর ট্রাকটা একটা রাস্তায় উঠলো। একটা কোনো কারখানায় অনেক আলো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে লেটো বলল, এ আবার কোন্ দিকে যাচ্ছে?

বাল্লু সুচরিতের দিকে তাকিয়ে বললো, ওস্তাদ,ড্রাইভারকে আমার বলা ছেল, একবার গড়িয়ায় ঘুরে যাবে।

দু'তিনজন অবাক হয়ে একসঙ্গে বললো, গড়িয়া? কেন?

সুচরিত প্রশ্রয়ের হাসি দিয়ে বললো, এই শালা বাল্লুটা মহা এটেলবাজ! বারণ করলাম, তাও শুনলো না! ওর কোন পেয়ারের নাগরকে চিনি খাওয়াবে।

বাল্লু বললো, আমি কিষেণচাঁদকে কথা দিইছি, কিছু না দিতে পারলে আমার প্রেস্টিজ পাংকচার হয়ে যাবে। মালকড়ি ভালো ছাড়বে!

মুঙ্গি বললো, কিন্তু ওস্তাদ, ভাটিয়ার কাছে আমাদের কথার খেলাপ হয়ে যাবে না? ওকে পুরো ডেলিভরি দেবার কথা। এই বাল্লু, হারামি, তুই কিষেণচাঁদের সঙ্গে সিঙ্গল সিঙ্গল কথা বলতে গেলি কেন?

বাল্লু তড়পে উঠে বললো, বেশ করিছি! বেশ করিছি! আমার হক আছে।

সুচরিত হাত তুলে বললো, আঃ ঝগড়া করছিস কেন? যাক গে, বাল্লু বলেছে যখন, দশটা বস্তা নামিয়ে দেবো। কিরে বাল্লু, নগদা দেবে তো?

বাল্লু বললো, হাতে হাতে।

সুচরিত তার কাঁধ চাপড়ে বললো, ঠিক আছে! দে, একটা সিগ্রেট ছাড় তো।

কারখানাটা পার হয়ে যাবার পর রাস্তাটা আবার ফাঁকা। একেবারে শ্মশান। একটা সাইকেল রিকশাও চলছে না। রাস্তার ধারে ধারে এঁদো পুকুর, এখন একটু জ্যোৎস্না পড়ে চকচক করছে জল।

সুচরিত বসে আছে ড্রাইভারের ঠিক পেছন দিকটায়। এবারে সে মুখ ঝুঁকিয়ে বললো, গাড়িটা একটু স্লো করো তো, আমি একটু হিসি করতে নামবো।

লেটো বললো, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেড়ে দাও না!

সুচরিত বললো, নাঃ, নামতে হবে। কী রে বাল্লু, তুই যাবি?

আমার পায়নি গো, তুমি যাও ওস্তাদ!

সেটাই বাল্লুর ইহজীবনের শেষ কথা। সুচরিত হঠাৎ জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরলো বাল্লুর গালে। আচমকা যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠতেই সুচরিত তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে বললো, কুত্তার বাচ্চা, আমার কথার ওপর কথা! এত সাহস তোর...

কথা বলতে বলতেই সুচরিত বাল্লুর পেটে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে। পুরো বাঁ দিক থেকে ডান দিক। চুলের মুঠি ধরেই বাল্লুর মাথাটা বাইরের দিকে নিয়ে এসে গলাটা চেপে ধরলো ট্রাকের এক পাশের

কাঠের দেয়ালে। অর্ধেক বলি দেওয়া পাঠার মতন ছটফট করতে করতে বিকট চ্যাঁচাতে লাগলো বাল্লু, তবে দু'তিনবার মাত্র, তার মধ্যেই সুচরিত শেষ করে দিল তাকে।

একটা পা খোঁড়া বলেই বোধ হয় সুচরিতের হাত দুটোয় সাংঘাতিক জোর। সে এবার বাল্লুর নিথর শরীরটা উঁচু করে তুলে উঁচু করে তুলে ছুঁড়ে দিল রাস্তার ধারে। তারপর ট্রাক ড্রাইভারকে বললো, চালাবি? না তুইও ঝাড় খাবি? সোজা দমদম!

অন্যরা চুপ করে বসে আসে, বাল্লুকে সাহায্য করবার জন্য একটা আঙুলও তোলেনি। কয়েক মিনিট আগে সুচরিত বাল্লুর সঙ্গে হেসে কথা বলছিল, তার কছে সিগাটে চাইলো, তারপরেই সে ছুরিটা চালিয়ে দিল। সুচরিতের এই বিচিত্রি মেজাজটাকেই ওরা ভয় পায়।

সুচরিতের অনুমতি ছাড়াই ট্রাক ড্রাইভারকে গড়িয়ায় যাওয়ার নির্দেশের কথা বাল্লু যেই উচ্চারণ করেছে, সেই মুহূর্তেই সুচরিত মনে মনে তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এরকম অবাধ্যতার প্রশ্রয় দিলে দল চালানো যায় না। অন্যরা একটু আগেই তাকে হাসতে দেখলেও আসলে সুচরিতের রাগ বড্ড বেশি, যখন তখন চড়াৎ করে চড়ে যায়। বাল্লুকে খতম করার জন্য তার আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এই রকম ভাবে রাস্তার ওপর, ট্রাক থামিয়ে, রাতও এমন কিছু বেশি নয়, পেটে ছুরি খেলে খানিকটা চ্যাঁচাবেই...কিন্তু সুচরিত আর ধৈর্য রাখতে পারলো না। অবশ্য এইসব রাস্তায় রাত এগারোটাতেই কারুর মৃত্যু আর্তনাদ শুনলেও অন্য কেউ কৌতূহলী হয়ে দেখতে আসবে না।

দুটো চিনির বস্তা ওপর অনেকখানি রক্ত পড়েছে। ভেতরের কিছু চিনি ডেলা পাকিয়ে যাবে। অনেক চিনির সঙ্গে মিশে গেলে ল তেমন কিছু বোঝা যাবে না,ওরকম কিছু কিছু ডেলা তো থাকেই। এখন চিনি যা আক্রা, এক দানা কেউ ফেলতে চায় না। হয়তো এই চিনি, দিয়েই কোনো বিয়ে বাড়িতে তৈরি হবে সন্দেশ-রসগোল্লা, যারা খাবে, তারা কিছু টেরও পাবে না।

ঘামে বিজে গেছেসুচরিতের সারা গা। এখনও সে ঘামছে গলগল করে। গায়ের জামাটা সে খুলে ফেলে সেটা মুঙ্গির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, যতটা পারিস রক্তটা মুছে ফ্যাল তো এটা দিয়ে!

মুঙ্গির পাশে বসে আছে ইয়াসিন। বাল্লুই তাকে অন্য দল থেকে ছাড়িয়ে এ দলে এনেছে। সে বললো, তুমি ঠিক করেছো, ওস্তাদ! ও শালা অনেকদিন ধরেই তোমার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছিল। তুমি কিছু না বললে একদিন আমিই ওকে ঝাড়তুম!

লেটো বললো, গাড়িয়ার ঐ কিষেণচাঁদ কী রকম মাল আমি জানি। ওখানে গেলে পুরো ট্রাক হাপিস করে দিত।

তারপর সবাই বললো কিছু না কিছু। এসব হচ্ছে সুচরিতের প্রতি আনুগত্যের শপথ। অবশ্য এটা শুধু আজ রাতের জন্য, কাল রাতেই ওদের মধ্যে কেউ আবার বদলে যেতে পারে।

মাস খানেক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হলো সুচরিতকে। বাল্লুর একটা ভাইও যে এ-লাইনে আছে, তা আগে কোনোদিন জানা যায়নি। সেই কাল্লু নাকি বদলা নেবার জন্য সুচরিতকে খুঁজছে। দুই ভাইতে ভাব ছিল না মোটেই, ভাব থাকলে তো দু'ভাই মিলে একসঙ্গেই কাজ করতো। একটি রক্ষিতাকে নিয়েই নাকি দুই ভাইয়ে ঝগড়া। কিন্তু এখন বাল্লুর মৃত্যুর পর কাল্লু যদি বদলা নেবার চেষ্টা না করে, তা হলে তার সাকরেদদের কাছে মান থাকে না।

এই সব খবর সুচরিত শুনলো ইয়াসিনের কাছ থেকে। লেকের আস্তানা আগেই ছেড়েছে সুচরিত, এবারে সে ঘাঁটি গাড়লো রাজাবাজারে। এর আগেও একবার তার অভিজ্ঞতা হয়েছে, আত্মগোপন করার জন্য মুসলমান বস্তিই সবেচেয়ে ভালো জায়গা। মুসলমান বস্তির খুব ভেতরে পুলিশও ঢুকতে চায় না, হিন্দু গুণ্ডারাও এদিকে এসে হামলা করতে সাহস পায় না, তাতে যখন তখন কমিউনাল রায়টের রূপ নিতে পারে। খাঁটি লাইনের লোকেরা ঐ সব উটকো ঝামলা এড়িয়ে চলে।

ইয়াসিন তাকে একটা ঘর জোগাড় করে দিয়েছে। এখানে সুচরিতের নাম আবু শেখ। মাসখানেকের মধ্যেই মুখে বেশ দাড়ি গজিয়ে গেছে তার। এই রকম সময়ে দাঁড়ি রাখাই নিয়ম। পুলিশের দিক থেকে সুচরিতের কোনো ভয় নেই। পুলিশের সঙ্গে বাল্লুর তেমন কিছু আশনাই ছিল না। বাল্লুকে কে মেরেছে, ওদিককার পুলিশ তা জানে, বাল্লুর হত্যাকারীকে যে কাল্লু খুঁজছে তাও তাদের অজানা নয়, এই সব গল্প তাদের কাছে খুব মুখরোচক। বাল্লু খুন হয়েছে বেঙ্গল পুলিশের এরিয়ায়, ক্যালকাটা পুলিশ তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাবে না। তাদের জন্য কত কাজ আছে।

এই রাজাবাজারের বস্তিতে ইয়াসিন ছাড়াও বজলু আলি নামে আর একজনকে আগে থেকেই চেনে সুচরিত। বজলুর বয়েস বছর তিরিশেক, সে সংসারী মানুষ, তার ঘরে বিবি ও বালবাচ্চা আছে,

তার একটা প্রকাশ্য চাকরিও আছে এক দর্জির দোকানে। কিন্তু বজলু খুব গোপনে মেয়ে চালান দেবার কাজ করে। মুর্শিদাবাদের গ্রাম থেকে মেয়ে এনে সোনাগাছির দালালদের কাছে বিক্রি করে দেয়। বছর দু'এক আগে মুঙ্গির মারফৎ বজলু এসেছিল তার কাজে সহযোগিতা একটা প্রস্তাব নিয়ে। অনেক ভেবেচিন্তে সুচরিত শেষপর্যন্ত রাজি হয়নি। ও লাইনে লাভ খুব কম। একটা মেয়ের দাম মাত্র আড়াই শো, তিনশো টাকা। বোম্বাই নিয়ে গিয়ে বেচতে পারলে পাঁচশো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মাঝখানে খরচখর্চা আছে

সুচরিতকে চিনতে পেরেও বজলু কারুর কাছে মুখ খুললো না, বরং নিজের বাড়িতে একদিন সুচরিতকে দাওয়াত কর খাওয়ালো। একটা মাঠ কোঠায় দোতলায় থাকে বজলু, দর্জির দোকানের কর্মচারি হলেও তার ঘরে রেডিও আছে, খাটিয়ার ওপর বেশ বাহারী ফুলছাপ দেওয়া একটা চাদর। বেশ খাতিরযত্ন করলো সে সুচরিতকে। তার এই অতিথি বড় গোস্ত খাবে না ভেবে সে নিজের একটি পোষা মুর্গা জবাই করেছে। সুচরিত অবশ্য সবই খায়।

বজলুর বউকে দেখে সুচরিতের মাথা ঘুরে গেল। তার চেনা এক নারীর সঙ্গে এর মুখের দারুণ মিল। টানা টানা চোখ, চওড়া কপাল, বেশ সুন্দরী এই রেশমা। ঘরে এমন বউ থাকতেও বজলু মেয়ে-চুরির কারবার চালিয়ে যেতে পারে? কিংবা, এই মেয়েটিকেও কোনো জায়গা থেকে চুরি করে এনেই শাদী করেছে নাকি? একথা জিজ্ঞেস করা যায় না। কিন্তু রেশমাকে দেখে রীতিমতন কাতর হয়ে পড়লো সুচরিত। প্রথম দর্শনেই প্রেমের মতন। যদিও সে জানে, বজলুর পরিবারের দিকে সে হাত বাড়াতে পারবে না, বজলু তাকে শেষ করে দেবে। বজলু হয়তো তার মতন ছুরি চালাতে জানে না, কিন্তু চোখ দেখলেই বোঝা যায়, বজলু কাকের মতন ধূর্ত, তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

রেশমাকে দেখার পর তেকে সুচরিত নরীসঙ্গ কাতর হয়ে পড়লো। কিন্তু এখন কোথাও যাওয়া যাবে না। কাল্লু এখন সবকটা বেশ্যাপল্লীতেই তাকে খুঁজে বেড়াবে। কাল্লুকে একবার দেখা দরকার সুচরিতের, মানুষটার চেহারা ও চোখ মুখ না দেখলে তার ক্ষমতা ঠিক আন্দাজ করা যাবে না। এটা তো ঠিকই যে হয় কাল্লু অন্য কোনো লোকের হাতে বা পুলিশের হাতে এরমধ্যে খতম হয়ে যেতে পারে। যেমন, সুচরিতকেও যে কোনো দিন ধরিয়ে দিতে পারে ইয়াসিন কিংবা বজলু। সুচরিত নিজে কাছে বিশেষ টাকা পয়সা রাখেনি, সেকথা সে জানিয়েও দিয়েছে ওদের দু'জনকে।

কতদিন আর এই একটা বস্তির মধ্যে চুপচাপ শুয়ে বসে কাটানো যায়? সুচরিত একটু একটু বাইরে বেরুতে চাইলে ইয়াসিন নিষেধ করে। বাজার খুব গরম। কাল্লুর অনেক সাঙ্গ পাঙ্গ আছে। কাল্লু নাকি লাইনে রটিয়ে দিয়েছে যে ল্যাংডা ওস্তাদটার যে খোঁজ দিতে পারবে, তাকে সে পাঁচশো টাকা ইনাম দেবে। একথা শুনে সুচরিতের মনে হয়, পাঁচশো টাকার লোভে ইয়াসিনই তাকে ধরিয়ে দেবে না তো? এবার জায়গা বদল করতে হবে।

আরও একটা কারণে এই জায়গাটা ছাড়া দরকার। রেশমার চিন্তা তাকে পাগল করে দিচ্ছে। একদিন দুপুরে বজলুর অনুপস্থিতিতে সুচরিত তার বাড়ি গিয়েছিল, রেশমা বেশ সহজ ভাবে কথা বলে, তাকে বিরিয়ানি আর বুরহানি খাওয়ালো। সুচরিতের পাগলের তন ইচ্ছে করছিল রেশমাকে জড়িয়ে ধরতে, অতি কষ্টে সে নিজেরক দমন করেছে।

দিনের বেলা আস্তে আস্তে বেরুতে শুরু করলো সুচরিত। কোনো কাজকর্ম না থাকলে তার শরীর নিমপিশ করে। কাজের চেয়েও তার বেশি প্রয়োজন আধিপত্য, তার অধীনে পাঁচ-সাত-দশজন লোক থাকবে, সে তাদের ওপর হুকুম চালাবে, এতেই তার বেশি আনন্দ। রাজাবাজারের বস্তিতে সে যেন ইয়াসিন আর বজলুর দয়ার ওপরে আছে। সে এখন একটু প্যাঁচে পড়েছে বলে বজলু আবার তাকে সেই প্রস্তাবটা দিয়েছিল। দুটো মাল নিয়ে যেতে হবে বোম্বাই। বোম্বাইতে গেলে সুচরিত কিছুদিন নিরাপদে থাকতে পারবে। সুচরিত রাজি হয়নি।

বস্তির মোড়ে একটা ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যান্ড। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি এখনও এই অঞ্চলেই টিকে আছে। এই মোড়ের মাথায় একজন সৌম্যদর্শন মুসলমান ভদ্রলোককে ঘিরে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। এঁকে ঘিরে এরকম ভিড় মাঝে মাঝেই দেখে সুচরিত। ভদ্রলোকটি সিল্কের লুঙ্গি ও সিল্কের পাঞ্জাবি পরে, মুখে কাঁচা পকা দাড়ি, হাতের ঘড়ির ব্যান্ড ও চোখের চশমার ফ্রেম মনে হয় সোনার। সুচরিত কৌতূহলী হয়ে ভিড়ের মধ্যে উঁকি মেরে ভদ্রলোকের কথা শোনার চেষ্টা করলো। একটু শুনেই আগ্রহ চলে গেল তার। ভদ্রলোক ভোটের কথা বলছেন। পলিটিকসের লোক!

হাঁটতে হাঁটতে সুচরিত মানিকতলার কাছে খাল পেরিয়ে আরও খানিকটা চলে গেল এক দুপুরে।

কিছুই ঘটলো না, কেউ তাকে পেছন দিক থেকে এসে জাপটে ধরলো না। দিনের আলোয় এসব অবাস্তব মনে হয়।

তার সাহস বেড়ে গেল, পরের দিন সে বাসে শ্যামবাজার এসে, সেখান থেকে বাস বদলে চলে এলো পাতিপুকুরে। সেখানে মহিলা আশ্রমটির সামনে দিয়ে দু'বার হেঁটে গেল আস্তে আস্তে, খুব ইচ্ছে হলো একবার ভেতরে ঢোকার, কিন্তু ঢুকলো না। একটু দূরে বড় রাস্তার পাশের চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসলো।

এই আশ্রমটি সুচরিত বছরখানেক আগেই আবিষ্কার করেছে। যাদের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান নেই, তারাই শহরটাকে ভালোভাবে চেনে। কলকাতা ও শহরতলির কোনো অলিগলিই সুচরিতের এখন চিনতে বাকি নেই। উল্টোডাঙ্গা-পাতিপুকুরেও দু'এক রাত্রে রেলের কাজ করতে হয়েছে তাকে, তখন সে অন্য দলের হয়ে কাজ করতো, প্রয়োজনে পালাবার রাস্তা ঠিকঠাক বুঝে নেবার জন্য সে দিনের বেলা এই সব দিকে অনেক ঘোরাঘুরি করে গেছে। তারই মধ্যে একদিন সে দেখেছিল চন্দ্রাকে।

চায়ের দোকানে বসে সুচরিত দেখলো, বাস থকে নামলেন চন্দ্রার বাবা আনন্দমোহন। তিনি একবার এই দোকানের দিকে তাকালেন, সুচরিতের চোখে চোখও পড়ল, কোনো ভাবান্তর হল না। সুচরিতের চেহারার বদল হয়েছে অনেক, তাছাড়া এখন মুখভর্তি দাড়ি, চিনতে পারার প্রশ্নই ওঠে না। চন্দ্রা ও কি তাকে চিনতে পরবে না?

পরপর তিনদিন ঐ চায়ের দোকানে বসে থাকার পর সুচরিত দেখতে পেল চন্দ্রাকে।

আশ্রমের লোহার গেট খুলে গেছে, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, গাড়িতে ওঠার আগে তিনি কথা বলছেন দু'তিনজনের সঙ্গে। গেরুয়া শাড়ি পরা, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। তাঁর গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে, সুচরিতের মনে হলো, এই ক'বছরে তিনি যেন আরও অনেক বেশী সুন্দরী হয়েছেন।

চুম্বক আকৃষ্টের মতন সুচরিত দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এসে, রাস্তা পার হয়ে অনেকটা কাছে এসে দাঁড়ালো। চন্দ্রার পাশে ঐ যে একজন হাত-পা নেড়ে কথা বলছে, ও সেই মাস্টারটা না? কী যেন নাম ছিল, সুচরিতের মনে পড়ছে না। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রার মুখের দিকে। চন্দ্রার ঠোঁটে মাখানো হাসি, ঠিক যেন অমৃত। চন্দ্রার মুখের সঙ্গে সত্যিই কিছুটা মিল আছে রেশমার। রেশমাকেদেখে সুচরিতের যে কামনা জেগেছিল, এখনও তার চুটে গিয়ে চন্দ্রাকে জড়িয়ে ধার সেরকম একটা অদম্য বাসনা হলো। ঐ হ্যাংলা মাস্টারটা পেটটা ছুরি দিয়ে ফাঁসিয়ে দিলে কেমন হয়?

চন্দ্রাম এবার গাগিতে উঠলেন, সুচরিতের পাশ দিয়েই গাড়িটা বেরিয়ে গেল, সুচরিতের দিকে তিনি তাকালেনও না। সুচরিতের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। সে আশ্রম বাড়িটাকে দেখলো ভালো করে, মনে মনে ঠিক করলো, এখানে আবার আসতে হবে তাকে, একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে!

সেই রাতে ইয়াসিন একটা প্রস্তাব দিল তাকে। তাদের পাড়ায় যে সুদর্শন ব্যক্তিটি ভোটের কথা বলতে আসেন, তাঁর নাম আবদুল মান্নান। তিনি তাঁর হেয়ে ভোটের কাজ করার জন্য কয়েকজন বিশেষ ধরনের লোক খুঁজছেন। তিনি এমন লোক চান, যারা কোনো কাজেই ভয় পায় না, দরকার হলে বিপক্ষ দলের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস যাদের আছে।

সুচরিত প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিল। সে মাথা নাড়িয়ে বললো, না, না, না, ওসব ফালতু পয়সা, কিন্তু ওতে মার্কা মারা হয়ে যেতে হয়! পঞ্চাননতলার হাবু, সে আগে রেলের কাজ করতো, পলিটিকসের দলে ভিড়ে শুধু-মুধু একদিন বোমা খেয়ে মরলো! ছাড় তো ওসব কথা!

ইয়াসিন বললো, তুমি বুঝছো না, ওস্তাদ! মান্নান সাহেব মালদার পার্টি, বসিরহাটের হাজার বিঘে জমির মালিক ভালো পয়সা দেবে! আমাদের জন্য জিপ দেবে, সঙ্গে মাল ঝাল থাকবে, যেদিকে ইচ্ছে ঘোরাঘুরির অসুবিধে নেই। পার্টির ফ্ল্যাগ থাকলে পুলিশেও ধারে কাছে ঘেষবে না।

সুচরিত থমকে গিয়ে বললো, জিপ থাকবে?

একটা জিপের প্রতি তার খুব লোভ। কিছুদিন ধরেই সে ভাবছে একটা জিপ জোগাড় করার কথা। নিজে একটা জিপ চালিয়ে হাওয়ার মতন উড়িয়ে যেখানে খুশী যাবে, ব্যারাকপুর, আসানসোল, ধন্যবাদ...এইসব ভালো ভালো জায়গা। একটা জিপ থাকলে সে কাল্লুকে পরোয়া করতো?

ইয়াসিন বললো, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য জিপ দেবে বলেছে, মান্নান সাহেবের গাড়ির পেছু পেছু থাকতে হবে আমাদেরকে, বুঝলে না, যদিকেউ অ্যাটাক করে, আমরা সামাল দেবো! তুমি রাজি হয়ে যাও, ওস্তাদ, কতদিন ঘরে বসে থাকবে? মান্নান সাহেবকে আমি তোমার কথা বলেছি, সাহেব বল্লেন কি, রেজাল্ট বেরুবার পর উনি কাল্লুব্যাটাকে লালবাজারে ভরে দেবেন। ব্যস, তোমার কাম ফতে!

জিপের কথা শুনেই সুচরিতের মনটা নরম হয়ে গিয়েছিল, আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর সে রাজি হয়ে গেল। সে খোঁড়া, কিন্তু জিপ গাড়ি চালাবার সময় কেউ বুঝবে না যে তার পায়ে খুঁত আছে।

সে জিজ্ঞেস করলো, তুই সাহেবকে আমার কী নাম বলেছিস? আবু শেখ, না সুচরিত মণ্ডল?

ইয়াসিন বললো, তুমি ফের হিন্দু বনে যাও ওস্তাদ। হিন্দু মহল্লাতেও সাহেবের কাম-কাজ আছে, তুমি সেসব করতে পারবে, সাহেব বলেছেন সেকথা।

হাতে টুসকি দিয়ে সুচরিত বললো, ঠিক হ্যায়, কাল সকালেই দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলবো!

॥ ৫৬ ॥

একটা সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে এলো শাজাহান। গেটের সামনে অনেক লোকের ভিড়, সেই ভিড় এড়িয়ে আসতে পারছে না কামাল। নানাজনের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে তাকে। শাজাহান খানিকটা এগিয়ে একটি সিগারেটের দোকানের সামনে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। সিনেমা হলটির দেয়াল জুড়ে ক্যাটকেটে রঙের বিরাট পোস্টার, তাতে দুটি পুরুষের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, একটি নারীর কান্নামাখা মুখ, দু'হাত তোলা এক অন্ধ ফকির, পালতোলা নৌকো ও আকাশে দ্বিতীয়বার চাঁদ ইত্যাদি অনেক কিছু রয়েছে। কামালের নিজস্ব পরিচালনায় প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র 'স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা' বেশ কিছুদিন ডিস্ট্রিবিউটারদের টালবাহানার পর সদ্য মুক্তি পেয়েছে, প্রথম দু'দিন দর্শকের সংখ্যা বেশ ভালোই।

কামাল যথেষ্ট শিক্ষিত মানুষ, কিছুদিন সে একটা কলেজে পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপকের কাজ করেছিল, এক সময় গল্প কবিতা লিখতো। কিন্তু তার এই বাংলা সিনেমাটির কাহিনীতে ট্রিটমেন্টে সংলাপে সামান্য একটুও বুদ্ধির ছাপ নেই, আগাগোড়া সব অবাস্তব দৃশ্য। অকারণ নাচ ও গান, একটি মেয়ে এতবার কেঁদেছে যে অন্তত সেরখানেক চোখের জল ফেলত হয়েছে তাকে। আড়াই ঘন্টা ধরে বসে থাকে এই সিনেমা দেখতে দেখতে প্রায় শারীরিক কষ্ট হয়েছে শাহাজানের, এক একবার তার বমি পেয়েছে। শাজাহান শেক্সপীয়ারের ভক্ত, বিশুদ্ধ শিল্প-সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছুতেই তার রুচি নেই। তাকে জোর করে এরকম একটি সিনেমা দেখানো সত্যিই প্রায় অত্যাচারের পর্যায়ে পড়ে।

সিনেমা হলে বসে থাকতে থাকতেই শাহাজান একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

হালকা বাদামী রঙের সুট পরে আছে শাজাহান। চোখে সান-গ্লাস, তার মাথার একটা চুল এদিক ওদিক হয় না। একটুক্ষণ একা থাকলেই তার মুখে একটা বিষণ্ণতার ছাপ পড়ে। সুলেখার মৃত্যুর পর থেকে অনেক চেষ্টা করেও এই বিষণ্ণতাটা সে মুছে ফেলতে পারছে না। সুলেখা...রক্তমাংসের পবিত্রতা...তার সঙ্গে কি শাজাহান কোনোদিন একটুও অসমীচীন ব্যবহার করেছে...সুলেখার মৃত্যুর জন্য সে কি কোনোক্রমে দায়ী? সুলেখার সঙ্গে তার শুধু বন্ধুত্ব ছিল। আর তো কিছু না। মাঝখানে ঐ ক্রিকেট খেলোয়াড় স্কাউন্ড্রেলটা এসে...। শাজাহান চোখ বুঝলো দিল্লিতে সেই একটি সকালের দৃশ্য মনে পড়লেই তার শরীর জ্বালা করে।

কামাল তার পিঠে হাত দিয়ে বললো, চলো শাজাহান ভাই...আমার ছবিটা তোমার কেমন লেগেছে তা জিজ্ঞেস করবো না।

শাজাহান অতি ভদ্রতার ধার ধারে না। কারুকে খুশী করার জন্য মিথ্যে কথা বলতে পারে না, সে শুকনোভাবে বললো, ইউ বেটার নট!

কামাল অন্য উৎসাহে এখন টগবগ করছে। সে এখন সমালোচনার ধার ধারে না। এ দেশে সমালোচকদের মতামতের ওপর টিকিট বিক্রি নির্ভর করে না। ছবিটা রিলিজ করার ব্যাপার সে বেশ কয়েক মাস দুশ্চিন্তায় ভুগেছে। সে বললো, মনে তো হয় বক্স অফিস হিট করবে। সেইটাই বড় কথা! আমি তো আর্ট করতে যাই নাই, আমি সাধারণ মানুষের জন্য পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল এন্টারটেইনমেন্ট-এর ছবি বানিয়েছি। তোমারে যে জন্য নিয়ে এসেছি, আমার নায়িকা সেলিমার অভিনয় তোমার কেমন লাগলো?

-থরোলি ডিসগাসটিং!

-যাঃ, এটা তুমি কী কইলা শাজাহান ভাই? সেলিমা রিয়েলি ট্যালেন্টেড অ্যাকট্রেস। বোম্বাইয়ের ওয়াহিদা রহমানের থিকা কোনো অংশে কম না।

-আমি ওয়াহিদা রহমানের কোনো ফিল্ম দেখিনি। কিন্তু তোমার ঐ সেলিমা। ওর মুখখানা

খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজের মতন। শী হ্যাজ নো বিজনেস টু অ্যাক্ট! শী শুড বী ব্যানিশ্‌ড ফ্রম দা ফিল্‌ম ওয়ার্ল্ড!

গাড়ির দরজার হাতল খুলতে গিয়ে ঠিক বলছো না। সেলিমার অভিনয়ের অনেকেই প্রশংসা করেছে। আমার এই ছবি মস্কো ফিল্‌ম ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে। অনেকেই ধারণা সেলিমা একটা কিছু অ্যাওয়ার্ড পাবেই!

–যদি পায়, তা হলে বুঝতে হবে, সেটা শিল্পের প্রতি রাশিয়ানদের নবতম তাচ্ছিল্য!

গাড়িটা শাজাহানের, ইদানীং কামাল সেটা প্রায়ই ব্যবহার করে। 'স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা' ছবির প্রেডিউসারের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় কামাল যখন ফ্যাঁসাদে পড়েছিল, তখন শাজাহানই এগিয়ে এসেছিল তার সাহায্যের জন্য। প্রিন্ট-পাবলিসিটির খরচ বাবদ সে দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছে, তার আগে সে নিজে ছবির রাসেজ-ও দেখতে চায়নি। শাজাহান তো ব্যবসায়ী, ছবি যদি বক্স অফিসে সাকসেসফুল হয় তাতে তার খুশী হওয়ার কথা। তার লগ্নী করা টাকা সে সুদ সমেত ফেরৎ পাবে। অথচ ছবিটা চলা না০চলার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহই নেই। আশ্চর্য মানুষ এই শাজাহান। সে কামালের আত্মীয় হলেও কামাল ওর কোনো কথার জোরালো প্রতিবাদ করতে ভয় পায়।

গাড়িতে উঠে বসে কামাল খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ড্রাইভারকে বললো, তুমি...ইসে...এখন সোজা চলো...নিউ এস্কাটনে যাবা।

তারপর শাজাহানের দিকে ফিরে বললো, সেলিমার বাসায় আমাদের যাবার কথা, তুমি ওখানে যেয়ে যেন ওরে বকাবকি করো না!

শাজাহান এবার সামান্য হেসে বললো, তুমি খানে যাবে? তোমার বউ তোমাকে কোনো অ্যাকট্রেসের বাড়িতে যেতে নিষেধ করেছে না?

কামাল মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, অথচ কোনো হিরোইনের সাথে সেটের বাইরে দেখা করবো না। এটা একটা পাগলের মতন কথা না? সেলিমার বাড়িতে আজ পার্টি, আজ আমার একটা স্পেশাল ডে।

–কত লোক আসবে সেখান? তুমি তো জানো কামাল, আমার বেশি মানুষের ভিড় সহ্য হয় না, আমি তোমাকে ওখানে নামিয়ে দিয়ে চল যাবো!

–আরে না, না। তেমন কিছু নয়। খুব প্রাইভেট পার্টি। পাঁচ সাত জন, তুমি সবাইরে চেনো। শাজাহান ভাই, আমার নেক্‌স্ট ভেঞ্চারে তুমি আমার পার্টনার হবে তো? এবার একটা জব্বর স্টোরি ভেবেছি। ইয়োর মানি রিটার্ন ইজ গ্যারান্টিড। বাংলা ও উর্দু ডাব্‌ল ভার্সান হবে...

–আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আই ওন্ট বী এব্‌ল টু ডু দ্যাট। আমি হয়তো আর পূর্ব পাকিস্তানে থাকবো না।

–থাকবে না? তাইলে কোথায় যাবে। পশ্চিম পাকিস্তানে? ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাবে?

–জানি না। এখনও ঠিক করিনি। তবে এখানে আর থাকবো না।

–কেন। কী হলো তোমার?

একথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে শাজাহান কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো কামালের মুখের দিকে। যদিও তার ওষ্ঠে সামান্য হাসি। তবু শাজাহানের মুখমণ্ডলে একটা গাঢ় বিষাদের ছাপ। যেন সে তার বেঁচে থাকার উৎসবের আলোগুলি ইচ্ছে করে নিবিয়ে রেখেছে।

একটু পরে সে বললো, কামাল ঘটনা শুনবে? তুমি জানো, আমাদের আদি বাড়ি ছিল লখনৌতে। কলকাতায় আমাদের বেশ কয়েক পুরুষের বাস। তবু আমাদের ফ্যামিলির অনেকেরই ধারণা, আমরা খানদানি মুসলমান, আমরা বাঙালী নই, আমরা আপকান্ট্রির। আমাদের পরিবারের মুরুব্বিরা এখনো বাড়িতে উর্দু জবান চালু রেখেছে। আমি একবার আমার রুট্‌স খুজতে লকনৌ গিয়েছিলাম। কোনা কারণে কলকাতায় আমার মন টেঁকেনি, ভেবেছিলাম লখনৌতে সেট্‌ল করবো। অসুবিধা কিছু ছিল না। সেখানে আমাদের চেনাজানা বেশ কয়েকজন আছে। বিজনেস কানেকশান আছে। আমি উর্দু জানি। বিরিয়ানি মুরগ্‌ মসল্লম খেতে ভালোবাসি, লখনৌ কালচারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতেও পারতাম। মাসখানেক থাকা হলো, নানান লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবার পর একদিন আমি রিয়েলাইজ করলাম, মাই গড, আমি এখানে টোটালি মিসফিট! যাদের সাথে মেলামেশা করতে যাই, তাদের সাথে আমার মনের একটুও মিল নেই! আমও মুসলমান আর তারাও মুসলমান। আমিও উর্দু বলি, তারাও উর্দু বলে। তবু কোনো কমুনিকেশান হয় না। আমি কলকাতার মতন একটা বড় শহরে মানুষ হয়েছি। আমি মুসলমান হলেও কসমোপলিটান, ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার কোনো কমন

গ্রাউণ্ড খুঁজে পাই না। ওরা গান-বাজনার কতা উঠলে পুরোনো আমলের গান-বাজনার কথাই শুধু বলে। সেখানেই থেমে আছে। বাখ-মোৎসার্টের কথা তুললে ওরা ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে। ওরা সুরের হারমানাইজ করার বিশ্বাস করে না। কনসার্টের রস ওরা বুঝতে চায় না। ওরা কোনো নতুন এক্সপেরিমেন্টই মানতে চায় না। এমনকি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কোনো ঠাটের সামান্য সরগমের অদল বদলকেই মনে করে বেওকুফি! কোরান-হাদিস আমিও কম পড়িনি, কিন্তু ওদের ব্যাখ্যার সাথে আমরা ব্যাখ্যা মেলে না। ওরা স্ত্রীলোকদের যে চক্ষে দেখে, তা শুনে আমি শিউরে উঠি। ওদের ভ্যালুজ আর আমার ভ্যালুজ সম্পূর্ণ আলাদা! এই উপলব্ধি যখন হলো, সেদিন কী দুঃখ যে হয়েছিল, কামাল!

কামাল বললো, দ্যাখো, সিয়া আর সুন্নিদের মধ্যে এই পার্থক্য...

তাকে বাধা দিয়ে শাজাহান প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠলো, না, না, না, এটা সিয়া-সুন্নির পার্থক্য নয়, এটা সম্পূর্ণ আলাদা মূল্যবোধের ব্যাপার। আমি অনেক ভেবেচিন্তেই এই কথা বলছি। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে তোমরা মিলতে পারছো না, তার কারণ ভাষার তফাৎ। তাছাড়া, পশ্চিমীরা তোমাদের ঠিক খাঁটি মুসলমান মনে করে না। এই ঐস্লামিক রাষ্ট্রে ওরা নিজেদের বেশি মুসলমান মনে করে বলেই তোমাদের ওপর সর্দারি করতে চায়, বাঙালী মুসলমানরা হিন্দু-ঘেঁষা, এই কথা ভেবে ওরা তোমাদের সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন করে রাখতে চায়। কিন্তু আমার কেসটা সম্পূর্ণ আলাদা। আমি ওদের মতন সমান উর্দু বলতে পারি। ওদের মতনই আমার খানাপিনা, পোশাক-আশাক, ওদের চেয়ে আমি কোনো অংশে কম মুসলমান নই। লখনৌতে আমার শিকড় আছে, কিন্তু টাইম হ্যাজ চেইঞ্জড, নাউ আই বিলং টু আ ডিফ্‌রেন্ট কালচার। যে লোক শেক্সপীয়ার, রবি ঠাকুর, ওমর খৈয়াম, ইকবাল, কাহলির জিবরান, টি এস এলিয়ট, জীবনানন্দ দাশ পড়ে আনন্দ পায়, সে তো শুধু মুসলমান নয়। সে ওয়ার্ল্ড সিটিজেন! কিন্তু তার আশ্রয় কোথায়? এক হিসেবে সে হতভাগ্য!

–শাজাহান ভাই, তবে তো কলকাতাই তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভালো জায়গা ছিল। বড় শহর, অনেক রকম মানুষ, ইচ্ছা করলে নিজস্ব একটা বন্ধুগোষ্ঠী বেছে নেওয়া যায় শুনেছি। তাহলে কলকাতায় তোমর মন টিকলো না কেন?

–সেটা খুব প্রাইভেট ব্যাপার। সেটা খুলে বলার মতন আমার মনের অবস্থা এখনও হয়নি। তোমাকে আমি আরও বলি, গত বছর ইণ্ডো-পাকিস্তান ওয়ারের আগে আমি করাচি-রাওয়ালপিণ্ডিতে অন্তত তিনবার গিছি। ইচ্ছা করলে আমি সেখানেও সেট্‌ল করতে পারতাম। কিন্তু ঐ একই গণ্ডগোল। সেখানে বুদ্ধিমান, খোলা মনের মানুষ নিশ্চয় বেশ কিছু আছে, কিন্তু তারা কোথায় যে লুকিয়ে থাকে, খুঁজে পাওয়া শক্ত। প্রকাশ্যে কেউ কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। বা, করতে সাহস পায় না। সেখানে অধিকাংশ মানুষই যেন এক রূপকথায় বুঁদ হয়ে আছে!

–শাজাহান ভাই, তুমি উর্দু যতই ভালো জানো, আসলে তো তুমি এখন বাঙালী মুসলমান। পূর্ব পাকিস্তানে এসেও কি তুমি বন্ধুত্ব করার মতন মানুষ পাওনি? তুমি এখান থেকেও চলে যাবে বছলো। হঠাৎ তোমার এই মত পরিবর্তন কেন হলো?

–সত্য কথা বললে আশা করি, তুমি মনে দুঃখ পাবে না, কামাল? আমার মনের পরিবর্তন হলো আজই। তোমার তোলা সিনেমাটা দেখে। তুমি বললে না, সাধারণ লোকের এন্টারটেইনমেন্টের জন্য তুমি এই রদ্দি ছবি করেছো। তবে কি এই দেশের সাধারণ মানুষ একেবারে গরু-ছাগল? না, তারা গরু-ছাগল নয়। সেকথা বোঝা যায় তাদের ফোক সঙ শুনে। তাদের যাত্রা, কবির লড়াই দেখে। কিন্তু তোমরা তাদের মনে করো গরু-ছাগল, তাই তাদের এইসব ভুষিমাল গেলাতে চাও! তোমরা তাদের এই রকম গরু-ছাগল মনে করো বলেই তাদের মুক্তির জন্য তোমরা কোনোদিন সত্যিকারের লড়াই করবে না। তোমাদের লড়াইয়ের বুলি সব শখের বুলি। অন্ধকার ঘুপচি ঘরে বসে লম্বা লম্বা বাৎ ঝাড়বে, তারপর পুলিশ বা মিলিটারির একটু কোঁতকা খেলেই সব চুপ করে যাবে! গত বছর যখন এখানে আসি, তখন তোমাদের কথা শুনে মনে হয়েছিল, কত কী-ই যেন করত যাচ্ছো! তোমার সেই সব বন্ধুরা এখন গেল কোথায়? লণ্ডন থেকে আলম বলে যে ছেলেটি এসেছিল, সে লন্ডনে ফিরে গিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্চ করেছে? নিম্নি নিজের কেরিয়ার গোছাচ্ছে! লাহোরে মুজিব সাহেব ছয় দফা প্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসনের কথা উচ্চারণ করতেই আইয়ুব খান খুব হুড়কো দিয়েছে, কয়েক হাজার লোককে ভরে দিয়েছে জেলে। ব্যাস তারপরেই ভয় পেয়ে সব চুপচাপ। আর কেউ কোনো কথা বলে না। তোমাদের পূর্ব পাকিস্তানে সব আন্দোলন বন্ধ। পত্র-পত্রিকায় এখন খুব আইয়ুব খানের প্রশংসা দেখতে পাই। আইয়ুব খাঁর দাক্ষিণ্যে এখন কলেজের সাধারণ প্রফেসাররাও জাপানী গাড়ি কিনছে।

কামাল, আমি নিজে কখনো পলিটিকস করিনি, কিন্তু যারা কিছুতেই শ্রদ্ধা করতে পারি না। কামাল, তুমি নাকি এককালে বিপ্লবী ছিলে? এখন এই যে ট্র্যাস বাংলা ছবি তুলছো, এটা কি তোমার আত্মগোপন?

—শাজাহান ভাই, এবার আমি একটা কথা বলি? ইণ্ডিয়া থেকে যারাই আসে, তারা মুসলমান হলেও বেশ একটা হামবড়াই ভাব দেখায়। যেন ইণ্ডিয়াতে তারা খুব সুখে আছে!

—আমার ট্র্যাজেডি কী কানো? আমি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন, আমার ইণ্ডিয়ান পাসপোর্ট, ইণ্ডিয়াতেই জন্ম-কর্ম সব কিছু, তবু শুধু মুসলমান বলেই, আমার নামে কেউ লাগিয়েছিল, লাষ্ট ওয়ারের সময় আমাকে পাকিস্তানের স্পাই বলে অ্যারেস্ট করেছিল ওখানে। এবার এই ইস্ট পাকিস্তানেও বোধ হয় আমাকে ইণ্ডিয়ার স্পাই বলে ধরা হবে। চতুর্দিকে অ্যান্টি ইণ্ডিয়া ক্যামপেন চলছে। এই সময় আমার মতন দু'দশজনকে অ্যারেস্ট করলে গভর্ণমেন্টের মর্যাদা বাড়বে! এর মধ্যেই আমার পেছনে পুলিশ লেগেছে, আমি টের পেয়েছি। অর্থাৎ আমার কোনো দেশ নেই। আমি না ইণ্ডিয়ার, না পাকিস্তানের! আমি রিফিউজি না, কিন্তু রুটলেস। এখন পশ্চিমী কোনো দেশে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার কোনো গতি নেই। আমি এখান থেকে কলকাতায় ফিরতে চাইলেও তা পারবো না। ঢাকা থেকে কলকাতায় দূরত্ব কত তা নিশ্চয়ই জানো? সোওয়া দুশো মাইলের বেশি নয়। কিন্তু ঢাকা থেকে কলকাতায় একটি চিঠি পাঠাতে হলে, প্রথমে সেটা পাঠাতে হয় লণ্ডনে কোনো চেনা লোকের কাছে। সে আবার সেটা অন্য খামে পুরে কলকাতায় পাঠায়। দিস ইজদা গ্রেটেস্ট জোক অফ হিস্ট্রি ইন দিস সেঞ্চুরি!

গাড়ি এসে থামলো নিউ এস্কাটনের একটি নতুন তিনতলা বাড়ির সামনে। বাড়িটি এমনই নতুন যে গায়ে এখনও বাঁশের ভা বাঁধা আছে। বাইরের দেয়ালের রঙ সম্পূর্ণ হয়নি। কাছাকাছি আর কয়েকখানা বাড়িরও কনস্ট্রাকশান চলছে। ঢাকা শহরের অনেক জায়গাতেই এখন নতুন বাড়ি তৈরির চুন-সিমেন্টের গন্ধ। এক হাজার কোটি টাকা খরচ করে ইসলামাবাদে তৈরি হয়েছে পাকিস্তানের নতুন রাজধানী, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বদান্যতা দেখিয়ে ঢাকাতেও দ্বিতীয় রাজধানী বানাবার জন্য বরাদ্দ করেছেন কুড়ি কোটি টাকা। এখন জমি বাড়ির কন্ট্রাকটরদের বেশ সুসময়।

সেলিমার দ্বিতীয় স্বামী ইউসুফও একটি কনস্ট্রকশান ফার্মের মালিক। এমই লম্বা-চওড়া চেহারা যে হঠাৎ দেখলে পাঠান বলে ভ্রম হয়, কণ্ঠস্বরটিও গমগমে। পায়জামার ওপর সে একটি সবুজ রঙের সিল্কের কুর্তা পরে আছে। তার মাথার চুল এলোমেলো। দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সে বললো, আসেন, আসেন, এত দেরি হইলো, সেলিমা তো অধৈর্য হয়ে গেছে আপনাদের জন্য।

সেলিমার অঙ্গে সি-থ্রু কাপড়ের তৈরি স্যালোয়ার কামিজ। যেন মসলিনের প্রত্যাপবর্তন ঘটেছে। থিয়েটারি কায়দায় মাথা ঝুঁকিয়ে কপালে হাত ছুঁইয়ে সে শাজাহানকে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম! আস্‌সালামু আলাইকুম। এ গরিবের বাসায় আপনি দয়া করে এসেছেন...

শাজাহান বললো, আলাইকুম আস্‌সালাম। আপনি আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন, সেজন্য ধন্য হয়েছে।

—ছবি দেখে এলেন। কেমন লাগলো বলেন, আমি কী রকম করেছি?

প্রথমেই এই প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে গেল শাজাহান। কামাল কিছু একটা বলে কথা ঘোরাতে এলেও সেলিমা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শাজাহানের দিকে।

নিজের মুখে মিথ্যে কথাটা উচ্চারণ করতে পারবে না বলে শাজাহান কামালের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, ওকে সব বলেছি। ওকে জিজ্ঞেস করুন।

ইঙ্গিতটা বুঝে গেল কামাল। সেলিমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত গলায় সে বললো, দারুণ, মার্ভেলাস! শাজাহন ভাই বললো, তুমি ওয়াহিদা রহমানের থেকেও অনেক ভালো, সুপার্ব! এ ছবির জন্য তুমি একখান ইন্টার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাবেই। আমি আজ শুনেছি, তোমার অ্যাপিয়ারেন্সের সময় দর্শকরা চারবার সিটি দিয়েছে, আর লাষ্ট সিনে, তোমার সেই বেঙে পড়া কান্নার সিকোয়েন্সে গোটা হল জুড়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ। সবাই কান্‌তে লেগেছিল!

সেলিমা কামালের দুই গালে ফটাফট কর চুমো খেয়ে প্রায় লাফাতে লাগলো বলতে লাগলো, কামাল তুমনে কামাল কিয়া! কামাল তুম নে কামাল কিয়া! আমি বলে দিচ্ছি, এ বই সুপারহিট হবেই।

ইউসুফ একটু দূরে দাঁড়েয় এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মিটিমিটি হাসছে। লম্বা ঘরটির মধ্যে আরও সাত-আটজন নারী পুরুষ, তাদের মধ্যে শুধু পল্টনকে চেনে শাজাহান। কামালের ফিল্‌মের নায়ককে এখানে দেখা যাচ্ছে না।

কামাল ও সেলিমার উচ্ছ্বাস বিনিময় এক সময় থামিয়ে দিয়ে ইউসুফ বললো, রুবি। মেহমানদের গেলাস দাও!

ঘরের এককোণে একটি গোল টেবিলের ওপর নানা রকম মদের বোতল ও গেলাস। কোনো বেয়ারা নেই, সেলিমা নিজে গেলাসে পানীয় ঢেলে নিয়ে এসে প্রথমে দিল শাজাহানের হাতে। কৌতুকের সুরে বললো, বন্দেগী জাহাপানা শাহজাহান, আপনি এর সাথে পানি নিবেন, না সোডা?

শাজাহান আগেই দেখে নিয়েছে যে দ্রব্যটি প্রিমিয়াম স্কচ। সে মাথা নেড়ে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ, কিছুই লাগবে না।

ইউসুফ আবার বললো, রুবি, কাবারের পেটটা নিয়ে আসো। দ্যাখো গরম গরম আছে কি না!

শাজাহান ইউসুফের দিকে তাকাল। এটাই তা হলে ইউসুফের সুখ। লোকজনের সামনে জনপ্রিয় নায়িকা সেলিমা আখতারকে হুকুম করে সে আত্মপ্রাসাদ অনুভব করে। সেলিমা তার কাছে একটা দাসীর সমান। এই বিয়ে বেশিদিন টেঁকার নয়। সেলিমার জনপ্রিয়তা ও রোজগার আর একটু বাড়লেই সে ইউসুফকে ঝেড়ে ফেলে দেবে। ওদের দাম্পত্য জীবনে ফাটলের কথা সে এর মধ্যেই কামালের মুখে শুনেছে। শাজাহান এটাও লক্ষ্য করেছে যে সেলিমা যেন তার সঙ্গে একটু বেশি খাতির করে কথা বলে। দেখা হলেই গা ঘেঁষে দাঁড়াতে চায়।

সেলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বললো, খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজের মতন, কোমল, মসৃণ, ভাবলেশ শুন্য।...হার ব্রেইন অ্যালাউজ ওয়ান হাফ-ফর্মড থট টু পাস; "ওয়েল নাও দ্যাট'স ডান; অ্যাণ্ড আই'ম গ্ল্যাড ইট্‌স ওভার"। এর বেশি কিছু আর চিন্তা করা কি ওর পক্ষে সম্ভব?

এর আগে কামাল বেশ কয়েকবার ইঙ্গত করেছে যে শাজাহান ইচ্ছে করলেই সেলিমাকে নিয়ে নিতে পারে। ধানমণ্ডিতে শাজাহান একলা বাড়ি বাড়া করে রয়েছে, ইণ্ডিয়া থেকে সে হুণ্ডি মারফত টাকা পেয়েছে অজস্র, এখন সেলিমার মতন একটি সুন্দরী রমণীকে বিয়ে করলেই তাকে মানায়। ঢাকার উঁচু সমাজ তাকে এক নিমেষে নিনে যাবে।

কোনো একটি নারীকে সঙ্গিনী হিসেবে পাবার কথা আজকাল চিন্তা করে শাজাহান। কিন্তু কোন্ নারী? সেলিমর মতন মেয়েদের প্রতি তার কিছুতেই আকর্ষণ জন্মায় না। বরং রিপালশান হয়। তা হলে? শাজাহান জানে, সে সুলেখার স্মৃতি চিরকাল বুকে ধরে রাখবে না, সেটা মবিডিটি, সুলেখার স্মৃতি আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যাবেই। কিন্তু এখনও যাচ্ছে না কেন? কেন অন্য কোনো মেয়েকে দেখলেই সুলেখার সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়? এটাও বোধহয় এক ধরনের অসুখ। আচ্ছা, সুলেখার স্মৃতির প্রতি অপমান করলে কেমন হয়? কোনো একটা ব্রেইনলেস মোমের পুতুলের মতন মেয়ের সঙ্গে চুটিয়ে লম্পট্য করা যায়, তা হলে সুলেখার স্মৃতি নিশ্চয়ই লজ্জায় কুঁকড়েমিলিয়ে যাবে!

কিন্তু এই পার্টিতেও শাজাহান কারুর সঙ্গে ভাব জমাতে পারলো না। সেলিমা তার কাছাকাছি আসছে, ইউসুফ একটা না একটা হুকুম করে তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। শাজাহান আবার ইউসুফের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললো, তোমার এই খোসা-ছাড়ালো পেঁয়াজটি নিয়ে নেবার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। এটিকে তোমার মাথার ওপরে চাপিয়ে রাখতে পারলেই আমি খুশী হবো।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই প্রায় সবাই মাতাল হয়ে গেল। এরা দ্রুত গেলাস শেষ করে। শাজাহান সেই প্রথম থেকে এক গেলাস নিয়েই নাড়াচাড়া করছে। এরা সবাই কথা বলছে কামালের সিনেমা বিষয়ে, এখনকার সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রি বিষয়ে। শাজাহান এ আলোচনায় যোগ দিতে পারছে না। সে দাঁড়ালো গিয়ে একটা জনলার ধারে।

এই ঘরে আজ যে আনন্দ-ফূর্তির ফোয়ারা, তা সব কিছুই হচ্ছে দরিদ্র ও চাষা, খেত মজুর, ার কারখানার শ্রমিকদের গটি কাটা টাকায়। এন্টারটেইনমেন্টের নাম করে তাদের দেখানো হচ্ছে রুপালি পর্দায় ভোজবাজি। বড়ঘরের সুন্দরী মেয়ের নাচ, তার স্তনের দোলানি ও নাভির প্রদর্শনী, এসব তো তারা চর্মচক্ষে বাস্তবে কোনোদিন দেখতে পাবে না। সেইজন্য অতি কষ্টের রোজগার করা পয়সা খরচ করে দেখতে আসবে। তাদের সেই ঘামে ভেজাটাকায় তৈরি হবে সেলিমা ও কামালদের মতন মানুষদের বড় বড় বাড়ি, কেনা হবে বিদেশী গাড়ি, স্কচ হুইস্কি, ফরাসী পারফিউম...

এখান থেকে চলে যেতে হবে শাজাহানকে। কোথায় যাবে সে? পশ্চিম বাংলায় সে থাকতে পারলো না। পূর্ব বাংলাতেও তার মন টিকলো না। তবে কি আরও পশ্চিমে?

এখানে কামালই সব চেয়ে বেশি মাতাল হয়ে গেছে। আজ সে আনন্দ সামলাতে পারছে না, এক হাতে মদের গেলাস মাথার ওপর রেখে, অন্য হাতে কোমর ধরে সে নাচতে শুরু করেছে অশ্লীল

ভঙ্গিতে, অন্যরা হাততালি ও শিষ দিচ্ছে।

শাজাহান ভাবলো, এবার সে চুপি চুপি সরে পড়বে। তখনই পল্টন এসে দাঁড়ালো তার পাশে। পল্টন নিম্নস্বরে বললো, শাজাহান ভাই, আজ আপনি নাকি গাড়িতে আসতে আসতে কামালকে খুব অ্যাটাক করেছেন? ও একটু আগে দুঃখ করছিল। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, এটা বুঝতে পারলেন না, এই সবই কামালের ছদ্মবেশ। ও একবার জেলখাটা মানুষ, খাঁটি দেশপ্রেমিক, ওর মধ্যে কোনো খাদ নেই।

শাজাহান আঙুল তুলে ধেই ধেই করে নৃত্যরত কামালকে দেখিয়ে শ্লেষের সঙ্গে বললো, এটা ছদ্মবেশ? এই বেলেল্লাপনা?

পল্টন বললো, নিশ্চয়! ছদ্মবেশ ধরতে গেলে নিখুঁতভাবে সাজাই তো ভালো। এখন যতদূর সম্ভব বোকা সাজতে হবে। কিংবা সুবিধাবাদী ভূমিকা নিতে হবে। পুলিশের খাতায় আমাদের নাম আছে, একটু ওদিক হলেই আমাদের জেলে ভরে দেবে। এখন আমরা জেলে যেতে চাই না। বাইরে অনেক কাজ আছে।

–আপনারা বাইরে এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন? তার কোনো প্রমাণ তো দেখতে পাই না। সবাই তো নেশা-ফুর্তিতে গা ঢেলে দিয়েছে দেখি।

–প্রমাণ আপনার চোখে পড়লে পুলিশের চোখেও ধরা পড়ে যাবে। এখন এইখানে, এই ঘরের মধ্যেও মোনেম খানের কোনো চর আছে কিনা তাও কি বলা যায়? ঐ ইউসুফকে সন্দেহ করার তো খুবই কারণ আছে। শাজাহান ভাই, বাঙালী মুসলমান একবার যখন জাগতে শুরু করেছে, তখন আর থামবে না। এবারে একটা হেস্তনেস্ত হবেই।

হাতের গেলাসটা উঁচু করে শাজাহান বললো, আমি হয়তো এখানে তখন থাকবো না, তবু, আই উইস ইউ গুড লাক।

॥ ৫৭ ॥

বাড়িতে কোনো বন্ধুটন্ধু এসে পড়লে তুতুলের খুব অস্বস্তি হয়। জায়গার খুব টানাটানি, তুতুলের এখনও একটা নিজস্ব ঘর নেই, তার ওপর আবার টুনটুনি এসেছে। টুনটুনির শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে সুপ্রীতির ঘরে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই সে মুন্নি আর তুতুলের ঘরে কাটায়। ছোট্ট একটা বসবার ঘর, সেখানে ছুটির দিন সকাল-বিকেল প্রতাপ বসেন, অন্যান্য দিনে সেটা থাকে বাবলু ও তার বন্ধুদের দখলে। বাবলু আবার তার বন্ধুরা এলে দরজা বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যে তুতুলের বন্ধুরা এসে পড়লে তাদের সে বসতে দেবে কোথায়? অথচ সব বন্ধু ও সহকর্মীদের তো বলে দেওয়া যায় না যে তোমরা কেউ আমার বাড়িতে দেখা করতে এসো না।

রবিবার বিকেল চারটের সময় হাজির হলো শিখা আর হেমকান্তি। প্রতাপ ভেতরে ঘুমোচ্ছেন। বসবার ঘরে বাবলু ও তার একজন মাত্র বন্ধু। তুতুল বাধ্য হয়ে বললে, এই বাবলু, তুই তোর বন্ধুকে নিয়ে নিজের ঘরে যা না প্লীজ, আমরা এখানে একটু বসবো।

বাবলু আপত্তি করলো না, ভেতরেও গেল না, বেরিয়ে পড়লো তার বন্ধুর সঙ্গে। এরপর কখন যে সে ফিরবে, তার কোনো ঠিক নেই।

শিখা এম ডি করবে ঠিক করেছে। হেমকান্তি বর্ধমানে তার নিজের দেশে ফিরে গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করতে চায়। অথচ ওরা কেউ কারুকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। শিখার বাড়ির অবস্থা সচ্ছল, আর হেমকান্তি ইস্কুল মাস্টারের ছেলে। দু'জনের মনের মিল হয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তব অবস্থার অনেক গরমিল। প্রেমের দেবতা এইরকম গরমিলের মধ্যেও দু'জনের মনকে জুড়ে দিয়ে কৌতুক করেন বোধহয়।

হেমকান্তি ভালো রেজাল্ট করেছে। শুধু একটা এম বি বি এস ডিগ্রি নিয়ে গ্রাম্য ডাক্তার হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তার পক্ষে মানায় না, কিন্তু হেমকান্তির এক কথা, বুড়ো বাপ যথাসর্বস্ব খরচ করে আমায় ডাক্তারি পড়িয়েছে, আর আমি তাঁর ঘাড় ভাঙতে পারবো না, আমায় এখন টাকা রোজগার করতে হবে। শিখা আবার চিরকালই কলকাতা শহরে মানুষ, সে গ্রামে থাকবার চিন্তাতেই শিউরে ওঠে।

এইসব বিষয়ে টুকিটাকি কথাবার্তা চলছে, এমন সময় সদর দরজার সামনে একটি গাড়ি থেকে নামলেন একজন সুসজ্জিতা পৌঢ়া মহিলা। তাকে দেখেই তুতুলের বুকটা ধক করে উঠলো। জয়দীপের মা!

হেমকান্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মাসিমা, আমি আর শিখা কিন্তু ঠিক চারটের সময় এসেছি।

জয়দীপের মা চিন্ময়ী রীতিমতন বিদুষী মহিলা, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা হিসাবে রিটায়ার করেছেন মাত্র কিছুদিন আগে, মৌর্য-কুষাণ যুগ সম্পর্কে তাঁর ইংরেজীতে লেখা দু'তিনটি বই আছে। তাঁর স্বামী ধনী ব্যবসায়ী, তবু কলেজে পড়ানোর কাজ ছাড়েননি। এককালে সুন্দরী ছিলেন বেশ, হঠাৎ খুব খুব রোগা হয়ে গেছেন দু'তিন মাসে, ব্লাউজটা কাঁধের কাছে ঢলঢলে দেখাচ্ছে। তিনি পরে এসেছেন একটা নীল পাড়সাদা সিল্কের শাড়ী। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

ঘড়ি দেখে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার দেরি হলো, হঠাৎ দুপুরবেলা ভাবলুম, আমার এখানে আসাটা ঠিক হবে কি না। বহ্নিশিখা যদি রাগ করে...

তুতুলের মুখখানা অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে যেন আটকা পড়েছে একটা ফাঁদে। শিখা-হেমকান্তিরা আজ ষড়যন্ত্র করে এখানে এসেছে। গত দেড়-দু'মাস ধরে সে একটা কথা অতি সাবধানে গোপন করে এসছে বাড়ির সবার কাছ থেকে, এমনকি নিজের কাছেও অস্বীকার করেছে। জয়দীপের কাছ থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসছে একটা করে চিঠি, সে চিঠি একটাও সে বাড়িতে রাখেনি। মেডিক্যাল কলেজে তাঁর খুব প্রিয় অধ্যাপক ডঃ ব্যানার্জি মাঝে মাঝে ডেকে বলছেন ঐ একই কথা, তুতুল শুধু না না বলেছে। আজ যেন হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটবে।

তুতুল এখন পর্যন্ত চিন্ময়ীকে বসতে পর্যন্ত বলেনি, একটা সম্বোধনও করেনি। চিন্ময়ী জিজ্ঞেস করলেন, শঙ্করকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলুম, তুমি একবারও কেন আমার সঙ্গে দেখা করলে না, বহ্নিশিখা?

তুতুল কোনো উত্তর দিল না।

চিন্ময়ী আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা'র সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, তাতে তোমার আপত্তি আছে? তার আগে, তোমাকেই একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সেটাই খুব ইম্পর্টান্ট, তুমি কি জয়দীপের কাছে কিছু প্রতিজ্ঞা করেছিলে, মানে, কিছু কথা দিয়েছিলে? সে বারবার আমাকে লিখছে...

তুতুল এবারেও কিছু উত্তর দিতে পারলো না। সে কি বলবে? না, সে জয়দীপের কাছে কোন প্রতিজ্ঞা করেনি! জয়দীপ তার বুকের ওপর তুতুলের একটা হাত রেখে জোর করে তাকে দিয়ে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তুতুল কিছুই উচ্চারণ করেনি নিজের মুখে।

কিন্তু জয়দীপের মাকে সে কথা সে কী করে বলবে?

হেমকান্তি বললো, হ্যাঁ বহ্নিশিখা সেই সময় জয়দীপকে কথা দিয়েছিল, আমরা জানি। জয়দীপ সে কথা আমাদেরও বলে গেছে।

তুতুল এবারে অস্ফুটভাবে বললো, মাসিমা, আপনি বসুন।

শিখা জিজ্ঞেস করলো, আমি ভেতরে গিয়ে তোর মাকে ডেকে আনবো? সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের দরজার কাছ থেকে টুনটুনি বললো, আমি ডেকে আনছি।

অনেক আগে থেকেই দরজার ও দিকে দাঁড়িয়ে ছিল টুনটুনি। কলকাতা এখনও তার কাছে নতুন, বাইরের মানুষজন সম্পর্কে তার খুব কৌতূহল। বাবলুর বন্ধুদের আড্ডায় দরজা খোলা থাকলেই সে এক একবার ভেতরে ঢুকে পড়ে। বাবলু তাকে ধমকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। সে আড়াল থেকে ওদের কথাবার্তা শোনে।

সুপ্রীতি দুপুরে ঘুমোন না। একটা সেলাই নিয়ে বসেছিলেন, টুনটুনির কথা শুনে আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে বাইরে এলেন। সুপ্রীতির শাড়ীটি আজ বড় মলিন। নাকের ওপর একটু একটু মেছতার দাগ, পাতলা হয়ে এসেছে কপালে চুল। বাইরের ঘরে এসে এক ব্যক্তিত্বময়ী রমণীকে দেখে তিনি খানিকটা জড়োসড়ো হয়ে গেলেন।

সুপ্রীতিও এক সময় এক বনেদী বাড়ির বধূ ছিলেন, বড়লোকদের দেখে মোটেই তার মধ্যে হীনমন্যতা জাগতো না। শুধু বরানগরে সরকার বাড়ির বধূ নয়, তিনি মালখানগরের ভবদেব মজুমদারের কন্যা। কিন্তু আগেকার সেই ঘাড় সোজা করে তাকানোর অভ্যেস তাঁর চলে গেছে। অনেকগুলি বছর ধরে তিনি তাঁর ছোট ভাইয়ের সংসারে আশ্রিতা, তাঁর স্বামী তাঁকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি, নিজের মেয়েকে নিয়ে নানা সময়ে নিদারুণ দুশ্চিন্তায় ভুগেছেন, অর্থচিন্তা তাঁকে গোপনে গোপনে কুরে কুরে খেয়েছে। আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কখন যে তিনি হার স্বীকার করে বসে আছেন, তা তিনি নিজেও জানেন না।

এখন তাঁর শরীর ও মনে যেন সূর্যাস্তের পালা।

চিন্ময়ী হাত জোর করে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আমি জয়দীপের মা। যেচে আপনার বাড়িতে এসেছি।

শিখা নিজের জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে বললো, মাসিমা, আপনি এখানে এসে বসুন।

বসবার আগে সুপ্রীতি বললেন, একটু চা করতে বলি? এই টুনটুনি কেটলিতে জল বসা তো।

হেমকান্তি বললো, মাসিমা জয়দীপ আমাদেরবন্ধু ক্লাসফ্রেণ্ড, আপনি তার কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই বহ্নিশিখার মুখে?

সুপ্রীতি বললেন, হ্যাঁ, সে তো বিলেতে চলে গেছে, তাই নয়?

তুতুল চমকে তাকালো মায়ের দিকে। মা কী করে জানলো? সে তো মাকে জয়দীপ সম্পর্কে কোনো কথাই বলেনি। মুন্নি কিছু বলেছে? কিংবা বাবলু?

চিন্ময়ী বললেন, হ্যাঁ আমার ছেলে...

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। তার চোখ শুকনো। লোকজনের সামনে অশ্রুবর্ষণ করা তাঁর স্বভাব নয়, কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তিনি কথা বলতে পারছেন না। তাঁর মনীষা ও যুক্তিবোধ দিয়েও তিনি তাঁর অপত্য বন্ধনকে ভুলতে পারছেন না এক মুহূর্তের জন্যও। তিনি জানেন, আজ এ বাড়িতে তিনি যে-প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তা যুক্তিহীন।

হেমকান্তি চিন্ময়ীর অসুবিধেটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাবার জন্য সুপ্রীতিকে বললো, মাসিমা আমাদের প্রফেসর ডক্টর ব্যানার্জি আপনার মেয়ের সবসময় এমন প্রশংসা করেন যে আমাদের হিংসে হয়। এমন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী উনি নাকি কখনো দেখেননি। অথচ ওর থেকে শিখার রেজাল্টও এমন কিছু খারাপ নয়।

শিখা বললো, মোটেই না, বহ্নিশিখা অনেক বেশি নম্বর পেয়েছে।

চিন্ময়ী এর মধ্যে অনেকটা সামলে নিয়েছেন। হ্যান্ডব্যাগ থেকে তিনি বার করেছেন রুমাল, কিন্তু রুমাল দিয়ে ভেতরের রক্তক্ষরণ মোছা যায় না।

সুপ্রীতি কোনো কথা বলছেন না নিজে থেকে। বাইরের লোকজনের সামনে সঙ্কুচিত ভাবটা কাটছে না তাঁর। অথচ এমন একদিন ছিল, যখন যে-কোনো ঘরোয়া আসরে তিনিই থাকতেন মধ্যমণি হয়ে।

চিন্ময়ী বললেন, আমার এ বাড়িতে আসার কথা ছিল অন্যভাবে। আমার ছেলে..সে আপনার মেয়েকে খুব পছন্দ করে ওরা দু'জনেই ডাক্তারি পাস করেছে, ওরা যদি চাইতো, আমি নিজে এসে আপনাকে অনুরোধ জানাতুম...

সুপ্রীতি বললেন, ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে গেলে, তাদের ইচ্ছে অনিচ্ছেটাই বড় কথা।

ধানাই পানাই করার বদলে সোজাসুজি কথা বলাই চিন্ময়ীর স্বভাব। তিনি সুপ্রীতির চোখের দিকে কোমল ভাবে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু তা হবার নয়। আমার ছেলে অসুস্থ, সে আর কতদিন বাঁচে তার ঠিক নেই, এ অবস্থায় ওরকম কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সুপ্রীতি একটু কেঁপে উঠলেন, জয়দীপের কী অসুখ হয়েছে, তুতুল তা না বললেও তিনি জানেন্তবু তিনি ধরেই রেখেছিলেন, এই সিল্কের মাড়ীপরা মহিলা তাঁর রুগ্ন ছেলের সঙ্গে তুতুলের বিয়ে দিতে চাইলে তাতে না বলার ক্ষমতা তাঁর নেই।

তিনি তুতুলের দিকে তাকালেন। তুতুল মুখ নিচু করে আছে। একটা সময় আসে, যখন ছেলে মেয়েরা পর হয়ে যায়। তুতুল এখন হয়তো এই মহিলার কথাই বেশি করে শুনবে।

চিন্ময়ী বললেন, আপনার কাছে আমি শুধু একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আমি ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছি আগামী মাসে, লণ্ডন শহর আমার দাদা আছেন অনেক দিন ধরে, আমার দাদাও ডাক্তার, বেলসাইজ পার্কে বেশ বড় বাড়ি, ওখানে থাকা-টাকার কোনো অসুবিধে নেই। আপনার মেয়েকে কি আমার সঙ্গে নিতে যেতে পারি? যদি শেষ কটা দিনে আমার ছেলেটা একটু শান্তি পায়--সে খুব করে চাইছে...অবশ্য আপনি অমত করলে...

সুপ্রীতি ফাঁকাভাবে তাকিয়ে রইলেন চিন্ময়ীর দিকে। এই মহিলার কথার অর্থ তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না। এঁর ছেলের অসুখ, লন্ডনে আছে, সেখানে তুতুল যাবে তার সেবা করতে? ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করে, না না-করে? সে আর বেশিদিন বাঁচবে না জেনেও তুতুলকে তার সঙ্গে...

চিন্ময়ী বললেন, আপনার মেয়ের কেরিয়ার নষ্ট করে তাকে আমি নিয়ে যেতে চাই না।

বহ্নিশিখার হাউস স্টাফ থাকার পীরিয়ড এখনো শেষ হয়নি আমি জানি। ওখানে গিয়েও সেটা কমপ্লিট করা যায়। তারপর ওখানে যাতে এফ আর সি এস করে আসতে পারে সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। ওখানে থেকে আসবে কয়েক বছর...

হেমকান্তি বললো, ডক্টর ব্যানার্জি বলেছেন, উনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। মাসিমা, জয়দীপ ওখান থেকে বহ্নিশিখার নামে টিকিট পাঠিয়েছে, সব রেডি, আপনি আপত্তি করবেন না।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে সুপ্রীতি আবেগশূন্য গলায় বললেন, আমার তো আপত্তি নেই। তবে আমার ভাই, ভাইয়ের বউ, ওদের মতামত নেওয়া দরকার, ওদের একটু ডাকি?

দরজার কাছ থেকে টুনটুনি বললো, আমি ডাকছি, আমি ডাকছি।

তুতুল সর্বাঙ্গ দিয়ে চিৎকার করে বলতে চাইলো, না না। আমি বিলেত যেতে চাই না। সবাই মিলে আমাকে ফাঁদে ফেলেছে। আমার বিলেত যাবার একটুও ইচ্ছে নেই। আমি জয়দীপের কাছে কোনো প্রতিজ্ঞা করিনি। জয়দীপের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তার বেশি কিছু তো নয়। জয়দীপ এখন পাগলামি করছে। হেমকান্তি যে-কারণে বর্ধমানে তার গ্রামে চলে যেতে চায়, সেই কারণেই তো তুতুল তার মায়ের কাছে থাকতে চাইছে। না, না শুধু সেই কারণে নয়, মাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না, সে চলে গেলে তার মা একটা অবলম্বনশূন্য লতার মতন নেতিয়ে পড়ে যাবেন, তা সে ভালো করেই জানে।

কিন্তু তুতুল মুখ দিয়ে কোনো কথাই উচ্চারণ করতে পারলো না।

প্রথমে প্রতাপ এলেন না, শুধু মমতা। তিনি বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। সুপ্রীতির তুলনায় মমতা অনেক সপ্রতিভ। তুতুলের বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ সম্মতি আছে। আজকাল ডাক্তারি করতে গেলে বিলিতি ডিগ্রি না হলে চলে না। তুতুলের যখন যোগ্যতা আছে তখন যাওয়াই তো উচিত।

প্রতাপ এসেও সেই মতই দিলেন। তবে তিনি বারংবার সুপ্রীতিকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, দিদি, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো? কয়েকটা বছরের তো মাত্র ব্যাপার..

সুপ্রীতি প্রত্যেকবার জানালেন, তাঁর কোনো আপত্তি নেই।

আর তুতুলের মুখ নিচু করা মৌনই সম্মতির লক্ষণ হিসাবে ধরে নেওয়া হলো।

শেষ কথা হিসেবে প্রতাপ চিন্ময়ীকে বললেন, ঠিক আছে আমি কালই ওর পাসপোর্টের ব্যবস্থা করছি। তবে, আপনি আপনার ছেলের পাঠানো টিকিটটা ফেরৎ দিয়ে দিন। তুতুলের টিকিটের ব্যবস্থা আমরাই করবো। ওর কিছু ফরেন এক্সচেঞ্জেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার শালা ত্রিদিব আছে গ্লাসগো শহরে, তাকে আমি লিখে দিচ্ছি।

এরকম একটা সার্থক ব্যবস্থাপনার পরেও ফেরার পথে গাড়িতে একা একা কাঁদতে লাগলেন চিন্ময়ী। শিখা আর হেমকান্তি তুতুলকে নিয়ে গেল বাইরে।

এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, মমতা, প্রতাপ আর সুপ্রীতি অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করতে লাগলেন এই বিষয়ে। চিন্ময়ীর সামনে সুপ্রীতি যে কথাটা বলতে পারেননি, এবারে সেই আশঙ্কাটাই ব্যক্ত করলেন। জয়দীপকে বিয়ে করে এত অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যাবে তুতুল? তারপর বাকি জীবন সে কী করবে? শুধু ডাক্তার হয়ে থাকবে?

সুপ্রীতির তুলনায় মমতা অনেক আধুনিক। তিনি বললেন, প্রথম দিকে ধরা পড়লে এই রোগ সেরেও যেতে পারে। তবে, পুরোপুরি সেরে না ওঠা পর্যন্ত জয়দীপের সঙ্গে তুতুলের বিয়ে হবার তো কোনো দরকার নেই। জয়দীপকে সঙ্গ দেবে তুতুল, সে জন্যে বিয়ে করতে হবে কেন?

হঠাৎ মনে পড়া ভঙ্গিতে সুপ্রীতি প্রতাপকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে খোকন, তুই যে বললি ভাড়ার টাকা আমরা দেবো ..সে যে অনেক টাকা। এরোপ্লেনের টিকিট ওরা যখন কেটেই ফেলেছিল...

প্রতাপ খানিকটা বিরক্ত ভাবে বললেন, দিদি আমরা কী মরে গেছি? আমাদের বাড়ির একটা মেয়ে বিলেত যাবে, সেজন্য অন্য লোকের দয়ার দান নিতে হবে?

প্রতাপ তাকালেন মমতার দিকে। মমতা জানেন যে প্রতাপ এখন তাঁর কাছ থেকে কী শুনতে চান। তিনি হেসে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। তবে, তোমাকেও চিন্তা করতে হবে না। পাঁচ সাত হাজার টাকা তোমাকে আমিই দিতে পারবো।

সুপ্রীতি বললেন, তোমরা তো অনেক দিয়েছো। আমার একজোড়া মকর মুখো বালা একটা টিকলি। সব মিলিয়ে ভরি পাঁচেক সোনা এখনও আছে আর তো কোনো কাজে লাগবে না ...

দু'দিন পরে বাবলুর সঙ্গে তুতুলের একটা ঘোরতর সংঘর্ষ হলো।

বাবলু বাড়ি ফিরেছে রাত এগারোটার পর। মমতা তার খাবার গরম করে দেবার পর মৃদু বকুনির সুরে বললেন, শোনো তোমার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে বলেই যে তুমি সাপের পাঁচ পা দেখেছে, তা ভেবো না। তোমার বাবা বলেছেন, বাবলু এতরাত পর্যন্ত কোথায় তথকে কী করে তা তিনি বাবলুর মুখেই শুনতে চান। যেদিন তোমাকে ধরবেন সেদিন বুঝবে ঠ্যালা।

মায়ের বকুনি গায়েই মাখলো না বাবলু। পৌনে এগারোটায় ফিরেছি, এটা কি বেশি রাত্তির নাকি? নাইট ইজ কোয়ায়েট ইয়াং!

ছেলের মাথায় এক চাঁটি মেরে মমতা বললেন, এই তুই তোর বাবাকে ওল্ড ম্যান বলছিস যে? তোর বাবা মোটেই বুড়ো হয়নি।

–মা তুমি কি ইংরেজিটা ভুলে গেছো একদম? একবার সেই যে মেম কাকীমা এসেছিল একজন, তখন তো তুমি তার সঙ্গে খুব ইংরেজি বলেছিলে? নিজের বাবাকে ওল্ড ম্যান বললে মোটেই বুড়ো বলা হয় না... মা, তোমরা নাকি ফুলদিকে প্যাসেজ মানি দিয়ে বিলেত পাঠাচ্ছো?

–হ্যাঁ কেন? তোর আপত্তি আছে নাকি? তুই যদি পি-এইচ ডি করার জন্য বিদেশে যেতে চাস, তোর প্যাসেজ মানিও আমরা দিতে পারবো।

–আমি? তোমরা কী ভাবো আমাকে? বাপ-মা'র টাকা নিয়ে বিদেশে যাবো? কেন, আমি কি ভিখিরির ছেলে যে বিদেশ যেতে হবে? এদেশে পি-এইচ ডি করা যায় না? পি-এইচ ডি করেই বা আমার কী ল্যাজ গজাবে? আর আমি পড়াশুনো করতে পারবো না। এবারে চাকরি খুঁজবো?

–চুপ, বাবলু, আস্তে আস্তে। তোর বাবা ঘুমিয়েছেন এই সবে মাত্র।

এ বাড়িতে অনেক রাত্তিরের দিকেও কিছু কিছু ঘটনা ঘটে।

এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে মমতা তাঁদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। সুপ্রীতিও ঘুমিয়ে পড়েন বেশ আগে আগে। এই দুই ঘরের আলো নেবানো। তুতুল অনেক রাত জেগে পড়াশুনো করেছে গোটা ছাত্রী জীবন, এখনও তার সে অভ্যেস যায়নি। বাবলুও ইদানীং খুব রাত জাগে। পরীক্ষার সময়তা কথাই নেই। এখন তার কোনো অ্যাকাডেমিক পড়াশুনোর চাপ না থাকলেও সে দুটো তিনটের আগে ঘুমোতে যায় না।

একদিন বাবলু রাত দুটো আন্দাজ বাথরুমে ঢুকে হঠাৎ ভূতের ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর তার কী লজ্জা। সে ভূতে বিশ্বাস করে না, তবু তার ভূতের ভয়। আসলে সে দেখেছিল টুনটুনিকে। এ বাড়িতে যে একজন নতুন মানুষ এসে আছে, তা অনেক সময় তার মনেই থাকে না। ভাগ্যিস বাবলুর চিৎকারটা তুতুল ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়নি।

টুনটুনি সুপ্রীতির সঙ্গে শুয়ে পড়লেও প্রায় দিনই আবার একটু পরে চুপিচুপি বেরিয়ে আসে। সে যেন রাত্তিরের পাখি। হঠাৎ সে উঁকি মারে বাবলুর ঘরে কিংবা তুতুলের ঘরে মধ্যে ঢুকে পড়ে। তুতলু মুন্নি বাবলু এরা দিনে অনেকটা সময় বাড়ির বাইরে কাটায়, সীজন শুরু হয়নি বলে টুনটুনিকে এখনো কোনো কলেজে ভর্তি করা যায়নি, তাই সে বাইরে বেরুতে পারে না। মামাতো, মাসতুতো ভাইবোনেরাই তার বাইরের জানালা।

বাবলুর সঙ্গে কথা বলার সময় সে একেবারে বাবলুর গা ঘেষে দাঁড়ায়। দেওঘরে তারে বাড়ির একতলার ভাড়াটে ছেলেদের সঙ্গে সে এইভাবেই মিশতো। এইভাবেই দাঁড়িয়ে সে বাবলুকে নানান প্রশ্ন করে।

দু'তিনদিন পর বাবলু হঠাৎ টের পেল, টুনটুনির স্পর্শে তার শরীরটা গরম হয়ে উঠছে। সে বেশ অবাক হলো। এ পর্যন্ত অলি ছাড়া আর কোনো মেয়ে সম্পর্কে সে কোনো শারীরিক বা মানসিক আকর্ষণ বোধ করেনি। তা হলে এটা কি হচ্ছে? এই মেয়েটা তার মাসতুতো বোন, কিন্তু দীর্ঘ অপরিচয়ের জন্য একে ঠিক আত্মীয় মনে হয় না, একটা মেয়ে মেয়েই মনে হয়।

টুনটুনি দু'মাস আগে যখন এ বাড়িতে আসে তখন সে ছিল তার মায়েরই মতন রোগা পাতলা। কিন্তু তার শীর্ণতা ছিল অপুষ্টির জন্য, এই দু'মাসেই বর্ষার চারা গাছের মতন সে ফনফনিয়ে বেড়ে উঠেছে, মাংস লেগেছে তার গালে, বুক দুটি সুস্পষ্ট, হাটা চলার সময় তার উরুতে খেলা করে একটা ছন্দ।

বাবলু টুনটুনির কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় বসলেও টুনটুনি আবার ঘন হয়ে এসে বাবলুর শরীরে শরীর ছোঁয়ায়। বন্ধু বান্ধবদের মাঝখানে টুনটুনি এসে পড়লে বাবলু তাকে বাইরে

যাবার জন্য হুকুম করতে পারে, কিন্তু এই সময়, সে কিছু বলতে পারে না। তার দু'কানের পাশে আগুণের আঁচ। ইচ্ছে করে একটা হাত তুলে টুনটুনির কোমর জড়াতে, কিন্তু সে হাত তোলে না।

কৌশিকের সঙ্গে বাবলু সব রকম বিষয়ে আলোচনা করে। শুধু সায়েন্স নয়, অন্য অনেক বিষয়েও পড়াশুনো করেছে কৌশিক, তার মতামতের দাম আছে বাবলুর কাছে। একদনি বাবলু তাঁকে জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা কৌশিক, প্রাপ্তবয়স্ক দুটি ছেলে মেয়ের শরীর যদি কাছাকাছি আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ফিজিক্যাল আর্জ জেগে ওঠা তো স্বাভাকি ব্যাপার?

কৌশিক মুচকি বললো, তুই বুঝি অলিকে বিয়ে করার কথা ভাবছিস? এই সময় তুই বিয়ে টিয়ের কথা চিন্তা করলে তোকে আমরা রেনিগেড বলবো।

অলির নামটা উচ্চারিত হওয়ায় বিরক্ত হয়ে বাবলু বললো, ধ্যাৎ। বিয়ে টিয়ের কথা আসছে কী করে। আমি তোকে একটা থিয়োরিটিক্যাল প্রশ্ন করছি। এই যে আর্জ, এটা স্বাভাবিক কি না।

–যদি পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা থাকে, তাহলে এই আর্জা স্বাভাবিক । আর না হলে ...

–ভালোবাসারও কোনো প্রশ্ন নেই। আমি বলছি, পিওরলি ফিজিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে, যদি দুটি শরীর কাছাকাছি আসে, তাহলে দুটি শরীরই রেসপণ্ড করবে না? সেক্স সিগন্যাল টের পাওয়া যাবে।

–ট্রামে বাসে আমরা তো কত মেয়ে পাশপাশি যাই, ভিড়ের মধ্যে অনেকের গায়ের সঙ্গে গা ঠেকে যায়, তাতেই কি সেক্স সিগন্যাল শুরু হয়ে যায় নাকি?

–অনেক সময় হয়, সত্যি করে বল?

–হলেও সেটাকে দমন করাই সভ্যতা। অতি বদ লোকেরাই ট্রামো বাসে মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করে।

–পাবলিকলি এরকম কিছু করলে সেটা অসভ্যতা নিশ্চয়ই। কিন্তু যদি প্রাইভেসি থাকে–একটা ফাঁকা ঘরে যদি দু'জন কাছাকাছি আসে, মনে কর, তাদের মধ্যে প্রেম নেই, কোনো রকম মানসিক যোগাযোগ নেই, তবু শরীর সাড়া দিতে পারে না?

–কী আজেবাজে কথা বলছিস, অতীন? তোর মাথারমধ্যে সেক্স ঢুকেছে নাকি? আমি প্রেমের সম্পর্কের মানে বুঝি, কিন্তু শুধু অ্যানিমাল সেক্স, এটা কোনো আলোচনার বিষয়ই নয়।

–মাথায় যদি ঢুকেও থাকে, সেটাকে তাড়াতে হলে তো যুক্তি দিয়ে তাড়ানো দরকার। টুবি ফ্র্যাঙ্ক ইউথ ইউ সিনেমায় এলিজাবেথ টেলরকে দেখলে একএক সময় আমি উত্তজনা বোধ করি। অথচ তার সঙ্গে কি আমার প্রেম আছে? না কোনো মানসিক যোগাযোগ? কথারকথা বলছি, এলিজাবেথ টেলর যদি হঠাৎ রক্তমাংসের শরীরে আমার খুব কাছাকাছি আসে।

–ডিসগাস্টিং। তুই যা বলছিস, তা হলো সেক্সুয়াল অ্যাবারেশন। সভ্য শিক্ষিত মানুষ এইসবের উপরে উঠতে চেষ্টা করে সব সময়। দু'জন নারী পুরুষ যদি পরস্পরকে সত্যিকারের ভালবাসে, তখন তাদের শারীরিক মিলন একটা পবিত্র, সুন্দর ব্যাপার। অবশ্য কিছু সামাজিক রীতিনীতি মেনে নিতেও হয়, ফর দা বেনিফিট অফ ফিউচার জেনারেশন। এছাড়া শারীরিক মিলনের কথা যারা ভাবে, তারা বদলোক, ক্রিমিন্যাল অথবা মহাপুরুষ। শুনেছি, বড় বড় কবি আর শিল্পীরা...

বাবলু হাসতে হাসতে বললো, ইন দিস কেস আই অ্যাম টেমপ্টেড টু ডিক্লেয়ার মাইসেলফ এ মহাপুরুষ।

কৌশিকের কাছ থেকে কোনো সমাধান পেল না বাবলু। অলিকে সে ভালোবাসে অথচ টুনটুনি তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালে সে শারীরিক উত্তেজনা বোধ করে কেন? ওকে তো ঠেলে সরিয়ে দিত ইচ্ছে করে না, বরং নিজের ওপর একটু একটু রাগ হয়। দিনেরবেলা তবু অতটা মনে হয় না, কিন্তু রাত্তিরে, নিস্তব্ধতার ঝিমঝিমের মধ্যে শরীর যেন আরও স্পর্শকতর হয়ে থাকে। রাত্রির মাদকতা অগ্রাহ্য করা খুব শক্ত।

আজ রাতে টুনটুনি আবার আসতেই বাবলু ভাবলো, আজ পরীক্ষা করে দেখাই যাক না।

টুনটুনি পরে আছে সেমিজের মতো একটা ঢলঢলে পোশাক, এটা পরে সে শোয়, ঐ ভাবেই সে উঠে এসেছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তার স্তনের ডৌল, উরুর বিভঙ্গ। বাবলু তার দিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারছে না, এই মেয়েটা তার আত্মীয় হয়, এর সঙ্গে শারীরিকভাবে কিছু করা অন্যায়, তা বাবলু জনে। তবু ড্যাম ইট কেন তার ফিজিক্যার রি-অ্যাকশন হচ্ছে? শরীরের কি আলাদা ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে? কৌশিক সেই কথাটাই বোঝাতে পারল না।

চেয়ারে বসে আছে বাবলু, টুনটুনি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তার পিঠে লেগেছে টুনটুনির

উরু, তার মাথার খুব কাছে ওর বুক। সে কিন্তু কথা বলছে খুব নিরীহ ভাবে, সে শুনতে চাইছে কফি হাউসের গল্প।

বাবলু আজই প্রথম টুনটুনির কোমর জড়িয়ে ধরলো, তার মনে কি অপরাধবোধ জাগছে? কই না তো? অলির প্রতি সে অন্যায় করছে? তবু সে হাতটা সরিয়ে নিতে পারছে না কেন? তার গা কাঁপছে। সে হাতটা নামিয়ে এনে টুনটুনির নিতম্বে বোলাতে লাগলো, কোমর জড়িয়ে ধরাটাও দোষের নয়, কিন্তু এখন সে যা করছে, এটা যৌন খেলা, নিষিদ্ধ সম্পর্কের প্রথম ধাপ, এখনো বাবলু হাত সরাতে পারছে না, তার ভালো লাগছে। কী মসৃণ, কোমল অথচ শক্ত...

টুনটুনির কোনো লজ্জা বা বিকার নেই। দেওঘরে ভাড়াটে ছেলেরাও তার সঙ্গে ঠিক এইরকমই খেলা খেলতো। সে আরও ঘন হয়ে এল।

এবার কি বাবলু টুনটুনির বুকে হাত দেবে? না দেবার কী কারণ থাকতে পারে? মনের মধ্যে একটা দুর্দান্ত ইচ্ছে শিকল-ছেঁড়া সিংহের মতন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সারা বাড়িতে কোনো শব্দ নেই রাস্তাও এখন নিঝুম, বাবলুর নিঃশ্বাসে ড্রাগনের মতন হল্কা।

সে টুনটুনির বুকে অন্য হাতটা রাখলো। এভাবে সে অলিকেও কখনো ছোঁয়নি। হঠাৎ জড়িয়ে ধরে সে অলিকে চুমু খেয়েছে কয়েকবার, কিন্তু সব সময়ই অলি ছটফট করে ছাড়িয়ে নিয়েছে নিজেকে। টুনটুনি বাধা দিচ্ছে না, সে হাসছে মৃদু মৃদু। বাবলু আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগলো তার দুই স্তনে, শুধুই তো দুটি মাংসের ডেলা, তবু কী অসম্ভব ভালোলাগা, চুম্বকের মতন বাবলুর হাত আটকে গেছে, এবার কি সে অন্য হাতে টুনটুনির মুখটা নিচু করে এনে তার ঠোঁটটা কামড়ে ধরবে?

–বাবলু?

মা কিংবা পিসিমণি নয়, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফুলদি। বাবলু লজ্জা পেল না। নিজেকে অপরাধী বোধ করল না, তার মাথায় অসম্ভব রাগ চড়ে গেল ফুলদিকে দেখে। টুনটুনি সামান্য একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালো বাবলুর চেয়ারের পিছন দিকে।

তুতুল অবশ্য বাবলুকে মাসন করতে আসেনি, টুনটুনির সঙ্গে তার অতখানি শারীরিক ঘনিষ্ঠতাও সে লক্ষ করেনি পেছন দিক থেকে তার ও সব দিকে মন নেই এখন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে বাবলুকে বলতে এসেছে। তার হাতে একটা পুরনো খাতা।

যে কথা সে বলবে তা টুনটুনির সামনে বলা যায় না। তুতুল তাই বললো, টুনটুনি তুই এখন শুতে যাতো, ওর সঙ্গে আমার দু'একটা কথা আছে।

বাবলু জেদের সঙ্গে বললো, না, টুনটুনি থাকবে, ওকে আমি কফি হাউসের গল্প শোনাচ্ছিলাম।

তুতুল কাতরভাবে বললো, তা হলে একটু পরে আবার আসিস। আমার মিনিট দশেক লাগবে।

টুনটুনি বেরিয়ে যেতেই বাবলু কড়া গলায় বললো, ফুলদি, তোমার সম্পর্কে আমার যা ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল, সব চলে গেছে। তুমি বিলেত যাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছো। তোমাকে অন্যরকম ভাবতাম। একজন ডাক্তারকে তৈরি করতে গভর্নমেন্ট এক্সচেকারের কত টাকা খরচ হয় জানো না? গরিব দেশের টাকায় ডাক্তারি পাশ করে এখন সাহেব মেমদের পদসেবা করবে।

–তুই জানিস না বাবলু, আমি ইচ্ছে করে যাচ্ছি না?

–তোমায় কেউ জোর করে পাঠাচ্ছে? তুমি কি কচি খুকী? জয়দীপের ক্যানসার হয়েছে বলে কি কেউ তোমাকে ব্ল্যাকমেল করছে? তার ক্যানসার হয়েছে সে এ দেশে না মরে ও দেশে গিয়ে মরতে চায়, তা বলে তোমাকেও ছুটতে হবে সেখানে? আসলে তুমি তোমার কেরিয়ার গোছাতে চাও, বিলিতি ডিগ্রির মোহ।

তুতুলের কান্না এসে গিয়েছিল, সে চোখের জল মুছে সংযত গলায় বললো, তুই আমাকে বকছিস, বাবলু, কেন বিলিতি ডিগ্রি নিতে গেলেই বা সেটা দোষের কেন হবে? অনেকেই তো যায়, আবার ফিরে আসে।

–অর্ধেকের বেশিই ফেরে না। এখন আমেরিকাতেও ডাক্তারদের খুব ডিম্যাণ্ড, স্টার্লিং ডলারের ঝুমঝুমি যারা একবার মুগ্ধ হয়, তারা আর এই পোড়া দেশে ফিরবে কেন?

–তোদের ছেড়ে আমি বিদেশে থাকবো, তুই একথা ভাবতে পারলি?

–তোমাদের এই লোভটা দেখলেই আমার গা-টা রি রি করে ফুলদি। এ দেশে লেখাপড়া করে পুরোপুরি ডাক্তার হওয়া যায় না? ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো তোমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলেই তোমরা তু তু করে ছুটে যাবে....

ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে এরকম কড়া কড়া কথা শোনার অভ্যেস নেই তুতুলের, এর উত্তরে সে ধমক দিতেও পারবে না। এমনিতেই তার মনটা এখন আরও দুর্বল হয়ে আছে। একদিকে তার প্রস্তুতির তাড়াহুড়ো, এরই মধ্যে সব সময় তার কান্না পায়। মা তাকে সত্যি সত্যি মন খুলে যেতে দিতে হয়েছে কি না, তা সে এখনও বুঝতে পারে নি।

ধরা গলায় সে বললো, তোর সঙ্গে এই নিয়ে আমি তর্ক করতে আসিনি, বাবলু। যাওয়া আমার ঠিক হয়ে গেছে।কক্রর মুখের ওপর আমিজোর দিয়ে না বলতে পারি না। হয়তো সেটাই আমার দোষ। তোকে আমি একটা জিনিস দিতে এসেছি। এটা আমার কাছে এতদিন রাখা ছিল, আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না, যদি হারিয়ে যায়।

–কী এটা?

–পিকলুদার কবিতার খাতা।

–দাদার কবিতার খাতা? কয়েকদিন আগেই আমি খুঁজেছি...

–তুই তো আমাকে জিজ্ঞেস করিসনি, আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলুম, মাঝে মাঝে পড়তাম, তুই যদি লেখাগুলো কোথাও চাপাতে পারিস...

প্রায় কেড়ে নেকরে ভঙ্গিতে বাবলু রুক্ষ গলায় বললো, দাও, ওটা আমাকে দাও।

বাবলুকে তো দিতেই এসেছিল তুতুল, তবু যেন একটা অমূল্য সম্পদ তার হাত থেকে চলে যাচ্ছে, এইভাবে সে শেষ মুহূর্তেও খাতাটা আবার ফিরিয়ে নিতে চাইলো, পারলো না। শূন্য হাতে সে একটা দেওয়ালের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

বাবলুর শরীরময় অতৃপ্তি, তার থেকে ক্রোধ, সেই ক্রোধের সবটা ঝাঁঝ সে তুতুলের উপর ছড়িয়ে দিয়েও এখনও মনে মনে গজরাচ্ছে।

॥ ৫৮ ॥

বছরের প্রথম দিনটি ভালো মন্দ খাওয়ার কথা, কিন্তু আজ দুপুরে ভাতের বদলে রুটি। বাড়িতে এক দানা চাল নেই, বাজারেও কোথাও চাল নেই। রেশানের দোকানে সপ্তাহে মাথা পিছু মাত্র তি শো গ্রাম চাল বরাদ্দ ভবানীপুর কালীঘাট অঞ্চলে কোনো রেশানের দোকান দু'সপ্তাহ ধরে সেই চালটুকুও দিতে পারছে না। তাদের স্টক আসেনি। তারা চালের বদলে গম দিচ্ছে।

প্রতাপ নিজে সকালে চাল খুঁজতে গিয়েছিলেন, জগুবাবুর বাজারের কথা আগেই জানা ছিল, আজ গেলেন লেক মার্কেটে, সব মুদি দোকানের মালিকই চালের কথা শুনলে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে। অথচ প্রতাপ খবরে কাগজে পড়েছেন, কালোবাজারে চালের দাম এখন দু'টাকা কিলো। কোথায় সেই কালোবাজার, কী ভাবে সেখানে ঢুকতে হয়? দু'টাকা দরে সেই চাল কিনে কারা খায়?

দু'টাকা কিলো দাম শুনলেই মাথাটা গরম হয়ে যায়। এই কলকাতা শহরেই সাত-আট টাকা মন দরে চাল কেনার স্মৃতি এখনও অনেকের মন থেকে মুছে যায় নি। এখন একজন কেরানি বা ইস্কুল মাস্টারের মাস মাইনে দেড় শো টাকা, তার যদি চার পাঁচ জনের সংসার হয় তা হলে দু'টাকা কিলো দরে চাল কিনে তারপর সে বাড়িভাড়া জামা-কাপড় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এসবের খরচ জোগাবে কী করে? সাতচল্লিশ থেকে সাতষট্টি স্বাধীনতা এবার কুড়ি বছরে পা দিল, আজও এই স্বাধীনতা দেশের মানুষকে শুধু দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারলো না? স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষ সব রকম কষ্ট স্বীকার করতে পারে। কিন্তু সে কষ্ট স্বীকারের মধ্যে একটা গৌরব বোধ থাকা চাই। কিন্তু এখন কিসের গৌরব, কিসের জন্য কষ্ট স্বীকার? অপদার্থ সরকার চালাচ্ছে এই দেশ, সব কিছুরই এখন কালোবাজার, এক শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর পয়সা আর দরিদ্ররা হচ্ছে দরিদ্রতর। সরকার লোককে সপ্তাহে তিন শো গ্রাম চাল খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলছে, তাও প্রতিশ্রুতি মতো রেশানের দোকান থেকে সে চালটুকুও দিতে পাচ্ছে না। কিন্তু যার পয়সার গরম আছে সে পার্ক স্ট্রিট চৌরঙ্গির হোটেল রেস্তোরায় প্রতিদিন দু'বেলাই ফ্রায়েড রাইস বিরিয়ানি পোলাউ খেতে পারে। দু'টাকা কিলো দরেও তো কালোবাজার থেকে চাল কেনার লোক আসছে।

বাজারে মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে প্রতাপের মনে পড়লো, কয়েকদিন আগে তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার একটি বুলেটিন দেখেছিলেন। তাতে স্বীকার করা হয়েছে যে এ দেশের সাড়ে বারো কোনটি মানুষ একদিন অন্তর একদিন খেতে পায়, আর দু'কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকশুধু একবেলার খাবার টুকু

কোনোক্রমে জোটাতে পারে। এই লোকগুলো একদিন অন্তর একদিন বা রোজ একবেলা ভাত-রুটি খায় না বরার দানা খায়, তা অবশ্য বলা হয়নি।

বাজারে ঘুরতে গেলেও মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত। সব কিছুরই আগুন দাম। মাছের বাজারে তো ঢোকারই উপায় নেই।

বেশ কিছুদিন ধরেই প্রতাপ একবেরা রুটি খেতে বাধ্য হয়েছে। গত দু'সপ্তাহ ধরে দু'বেলাই রুটি। আজ ছুটির দিন, আজও দুপুরে একটু তৃপ্তি করে ভাতখাওয়া যাবে না? ছুটির দিনে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়া হয়, প্রতাপ নিজেও যেমন রুটি পছন্দ করেন না, ছেলেমেয়েরাও রুটি ভালোবাসেন না।

প্রতাপ শুধু বাজারে চক্করই দিচ্ছেন কিছুই কেন হচ্ছে না। তার দু'চোখে ঝলসাচ্ছে রাগ 'কার ওপর এই রাগ? আদালতে প্রতাপ যখন বিচারকের আসনে বসেন, তখন আসামীর চোখে তিনি বিচ্ছুরিত ক্রোধ দেখেছেন, যেন বিনাদোষে তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। আদালতের বাইরে, আজকাল প্রতাপ প্রায়ই অনুভব করেন, তিনি নিজেই যেন ঐ রকম একজন আসামী।

কাটাপোনা, ভেটকি মাছের দাম লাফিয়ে উঠেছে, সাত টাকায়। অথচমাছের বাজারে ভিড় তো কম নয়, এই দামেও মাছ কেনার লোক আছে। প্রতাপ ওদিকে গেলেন না। এক জোড়া মুর্গীর ডিম চাইছে ছাপ্পান্ন পয়সা। লোকটার কি চোখের চামড়া নেই? এই সেদিনও চার আনায় এক জোড়া পাওয়া যেত। শীতের সময় কড়াইশুটি ফুলকপি শস্তা হবার কথা, তাও ডবল্ দাম কড়াই শুটি তো এ বছর দেড় টাকায় চড়ে বসে আছে। চালের দাম বাড়লে সব কিছুরই দাম বাড়ে।

প্রতাপ আবার ফিরে গেলেন মাছের বাজারে। তিনি কিছুতেই বেশি পয়সা খরচ করবেন না। আজকাল এক রকম নতুন মাছ উঠেছে, তার নাম তেলাপিয়া কেউ কেউ বলে আমেরিকান কই। আমেরিকানরা জাহাজ ভর্তি করে গম পাঠাচ্ছে, সেই সঙ্গে তারা মাছ কিংবা অচেনা মাছ চট করে ঢোকাতে চায় না রান্না ঘরে, সেইজন্যই এই তেলাপিয়া বা অআমেরিকান কইয়ের দাম এখনও বেশ শস্তা। কয়েকদিন আগে ছিল দেড় টাক কিলো, আজ চাইছে এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা। প্রতাপ এই মাছ দু'একবার খেয়ে দেখেছেন, একটু কাদা কাদা গন্ধ; তাও চলে যায় আছটার প্রধান গুণ কই মাছের মতনই জ্যান্ত থাকে। রুটিই যদি খেতে হয়, তা হলে এই শস্তার মাছই যথেষ্ট।

বাজার থেকে বাড়ি ফিরে প্রতাপ দেখলেন তাঁর মামাতো ভাই অনিরুদ্ধ আর তার বউ জয়ন্তী বসে আছে তার জন্য। সেই একবার ভন্তু মামার অসুখের খবর পেয়ে প্রতাপ একবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন টালিগঞ্জে, তারপর আর যোগযোগ নেই। ওঁদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতেও আগ্রহী নন প্রতাপ। তবে অনিরুদ্ধার স্ত্রী জয়ন্তীকে তাঁর বেশ ভালো লেগেছিল, সে এককালে পিকলুর ছাত্রী ছিল। এর হৃদয়ের কোনো একটা জায়গায় পিকলু স্মৃতি আছে।

মমতা ওদের চা-মিষ্ট দিয়েছেন। মমতা কি জানে, এই যে জয়ন্তী, এই আর একজন যে পিকলুকে মনে রেখেছেন? মমতা বেশ হেসে হেসে গল্প করছেন ওদের সঙ্গে, ওদের বাড়ির খবরাখবর নিচ্ছেন, এই সময় প্রতাপ আর পিকলুর কথা তুলতে চাইলেন না।

ওদের দেখে প্রতাপের আরও একটা কথা মনে পড়লো। ওদের বাড়ির ছাদ থেকে বুলাদের বাড়ি দেখা যায়। প্রতাপের আর যাওয়া হয়নি ওদিকে, কেমন আছে বুলা কে জানে। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে সত্যেন রায়ের নাম চোখে পড়ে।

অনিরুদ্ধ বললো, খোকনদা, আমার ছোট বোনের বিয়ে, বড় কাকা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে। বড়কাকা নিজে আসতে পারলেন না...বৌদি কথা দিয়েছেন যে উনি যাবেন, বৌদি আমার নতুন বাসায় একবারও আসেন নি..

মমতার দিকে এক পলক তাকিয়ে প্রতাপ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন, পড়তে লাগলেন। 'কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রাম নিবাসী, অধুনা কলিকাতার উপকণ্ঠে টালিগঞ্জের অধিবাস মমাগ্রজ স্বর্গীয় নকুলেশ্বর ঘোষের কন্যা শ্রীযুক্তা সুচরিতার সহিত ফরিদপুরের মাদারিপুর-মহকুমার ধূয়াস্যার গ্রামের রায় বংশের সুযোগ্য সন্তান শ্রীমান নিরঞ্জনের ...

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন প্রতাপ, অন্য সবাই সচকিত হয়ে তাকালো।

প্রতাপ অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর ছোট বোনের বয়স কত? সে কখনো ব্রাহ্মণবাড়িয়া চোখে দেখেছে? সে পূর্ববঙ্গে গেছে কখনো? তোরা তো ফরটি সেভেনেই দেশ ছেড়ে এসেছিস।

অনিরুদ্ধ বললো না, ফটি নাইনে আমার ছোট বোন এখানে আসার পরই জন্মায়, ওর ঠিক

আঠারো বছর হলো।

—আঠারো বছর কি কম সময়? তোর বড় কাকা লিখেছেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সেই বাড়ি তোদের আছে এখনও?

—তা নেই অবশ্য।

—তা হলে? এখনও ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে? তোদের টালিগঞ্জের বাড়িটাকে তুই বললি 'আমাদের বাসা', যেন ওটা টেম্পোরারি অ্যাবোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়াই আসল।

—চিঠিতে তো এই রকমই বয়ান লেখে সবাই।

—পাত্র পক্ষও তো দেখছি ফরিদপুরের। যত সব গাঁজাখুরি ব্যাপার। কবে চুকে বুকে গেছে ওসব সম্পর্ক, এখন খবরের কাগজে পুব বাংলার কোনো খবরই থাকে না দিনের পর দিন, এতদিনে ওরা আর আমরা সত্যিকারের আলাদা হয়ে গেছি, মুখ দেখাদেখি বন্ধ। আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, তাদের কাছে মাদারিপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়ো এইসব নামে কী মর্ম আছে?

জয়ন্তী বললো, নস্টালজিয়া। আমাদের বাড়িতে তো প্রায় প্রত্যেকদিনই দেশের বাড়ির গল্প হয়। আমার শাশুড়িতো প্রায় সব কিছুর সঙ্গেই এমনকি লাউ-কুমড়ো বেগুনের সঙ্গেও তুলনা দিয়ে বলেন, ওখানে এইসব জিনিসই বেশ ভালো ছিল।

মমতা প্রতাপকে একটু খোঁচা দিয়ে বললেন, তোমার মুখ দিয়েও তো মাঝে মাঝেই এ রকম কথা বেরিয়ে পড়ে। কালকেই না তুমি একবার বললে, ঢাকার মরণচাঁদের দোকানের দই-এর স্বাদ এখানকার চেয়ে অনেক ভালো?

প্রতাপ বললেন, তা বলে আমি আমার ছেলেমেয়েদের বিয়ের সময় চিঠিতে মালখানগর নিবাসী লিখবো না।

—আহা, ওরা চিঠিতে লিখেছে লিখেছে, তা নিয়ে তুমি অত রাগারাগি করছো কেন?

—না, না, রাগারাগি করছি না, এমনিই বললাম। এ রকম লেখা খানিকটা ইললিগ্যালও বটে, ইণ্ডিয়ার সিটিজে হয়ে তুমি যদি বলো পাকিস্তান নিবাসী ...যাক গে, ওটা টেকনিক্যাল ব্যাপার, ঐ নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাতে আসবে না..হ্যাঁরে তোরা কত লোকনেমন্তন্ন করেছিস? এই দুর্দিনের বাজারে বেশি লোককে খাওয়ালো চিনি পাওয়া যায় না, চাল পাওয়া যায় না।

অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সব ম্যানেজ হয়ে গেছে, তিন মন খুব ফাইন রাইস স্টক করে রেখেছি, চিনিরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে...আমরা চলি খোকনদা, আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে..আপনারা সেদিন সকালেই যাবেন কিন্তু গাড়ি দেবো গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।

ওদরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে প্রতাপ মমতাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই বিয়েতে যেতে রাজি হয়েছো?

—ওরা এমন ভাবে বললো।

—তিন মন চাল স্টক করেছে।

—সবাই কি আর তোমার মতন হাকিমী বুদ্ধি নিয়ে সূক্ষ্ম আইনের চুল চেরা বিচার করে, না মাথা ঘামায়। এই বাজারে অনেকেই চাল জমায়। পাশের বাড়ির মিসেস মুখার্জি দুটো বড় বড় মাটির জালা কিনেছেন, প্রত্যেক সপ্তাহে বর্ধমানে গিয়ে চাল কিনে আনেন।

—আমাদের জন্য গাড়ি পাঠাবে বললো। যেন আমরা ট্রাকে বাসে যেতে পারি না। ওদের যে গাড়ি আছে, সেটা জানানোই আসল উদ্দেশ্য। জানো তো, এই যে নন্তু মামা, ভন্তু মামা, এরা আমার মায়ের আপন ভাই নয়, ওদের অবস্থা বিশেষ বালো ছিল না। আমার বাবার কাছে এসে কাচুমাচু হয়ে বসে থাকতো, ওদের ছেলেমেয়রা কেউ বিশেষ লেখাপড়া শেখেনি, কী সব কন্ট্রাক্টারি করে বড়লোক হয়েছে। আমরা এখন ওদের গরিব আত্মীয়। তবু আমাদের ডাকডাকি করে কেন জানো, নিজেরা যে বাড়ি গাড়ি করেছে, সে সব গরিব আত্মীয়দের না দেখাতে পারলে ঠিক সুখ হয় না। ভন্তু মামা আমার সঙ্গে পিঠ চাপড়ানির সুরে কথা বলে। একদিন বলেছিলেন, কি রে, খোকন তুই কলকাতায় এক টুকরো জমি নিজে রাখতে পারলি না? আমি কি টাকা পয়সা চুরি করি যে জমি কিনবো, বাড়ি বানাবো?

—আহা, এ কথার কোন মানে হয় না। যারা মাথা গোঁজাবার জন্য একটা বড়ি বানাচ্ছে তারা সবাই চোর?

—যারা বাঁধা মাইনের চাকরি করে, চুরি জোচ্চুরি না করলে তাদের পক্ষে এই বাজারে বাড়ি বানানো সম্ভব? আর পাঁচ ছ'বছরের ব্যবসাতেই বা কী করে এত লাভ হয় যাতে তিনতলা বাড়ি

গাড়ি..হুঁ একে ব্যবসা বলে না। বাড়িতে তিন মন চাল স্টক করেছে।

মমতা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ঐ চালের ব্যাপারটাই তোমার খুব মনে লেগেছে না? নিজে চেষ্টা চরিত্র করবে না...আমার বাবা রুটি খেতে এমন কিছু কষ্ট হয় না...তোমরা এখনো ভেতো বাঙালী রয়ে গেলে।

—ঐ বিয়েতে আমি যাবো না। তোমার ইচ্ছে হলে যেতে পারো। আবার উপহার কেনার জন্য একগাদা টাকা খরচ।

একটু বাদেই এলেন বিমানবিহারী। গাড়ি থেকে নেমেই হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে বললেন, বাবলু কোথায়? সে কি খেলা দেখতে গেছে?

বাবলু বেরিয়ে গেছে সকালেই, সে খেলা দেখতে গেছে কি না তা বলে যায়নি। প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, কেন কী হয়েছে?

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বিমানবিহারী বললেন, আজ ক্রিকেট খেলার মাঠে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়েছে। আমাকে আমার ভায়রা একটা টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিল, এই খেলায় টিকিটের জন্য এত হাহাকার, তাই ভাবলুম টিকিটটা নষ্ট করি কেন, দেখেই আসি। আরে ভাই, খেলা দেখতে গিয়ে প্রাণটা যাবার জোগাড়।

—হাঙ্গামা হয়েছে বুঝি।

—হাঙ্গামা মানে, এ রকম কেউ কখনো দেখেইনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে খেলা, সে খেলা তো ঠিক মতন শুরু হতেই পারলো না, একদল লোক জোর করে হুড়হুড়িয়ে ঢুকে পড়লো মাঠে, পুলিশ তাদের ওপরে লাঠি চালাতেই বেঁধে গেলে ধুন্ধুমার কাণ্ড। দর্শকরাও ইট মারতে লাগলো পুলিশের দিকে, মাথা ওপরে যে চাঁদোয়াগুলো ছিল, তাতে আগুন ধরিয়ে দিল, পুলিশ তখন ছুঁড়তে লাগলো টিয়ার গ্যাস, তারপর যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল, বুঝলে আমি ভাবলুম সেই কুম্ভমেলা স্ট্যাম্পিডের ঘটনা না ঘটে যায়। ভেবে দ্যাখো তুমি, হাজার হাজার লোক বসে আছে, সেদিকে কখনো টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে? আমি তো একবার ভাবলুম, মরেই যাবো বুঝি। আমার চেনা ভদ্রলোক, সীতেশ রায়, তিনি নিজে রিস্ক নিয়ে দৌড়ে পুলিশের সামনে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন, টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া থামাতে, আমাদের সবার চোখের সামনে পুলিশ তাকে লাঠি পেটা করে শুইয়ে দিল। তাঁর কী অবস্থা এখন কে জানে। এ কি পুলিশ না নাৎসী বাহিনী?

প্রতাপ বললেন, বাবলুটা যায়নি তো খেলার মাঠে? মমতাকে জিজ্ঞেস করছি।

মমতা এসেও কিছু বলতে পারলেন না। খেলা দেখতে যাওয়ার কথা বাবলু কিছু জানায়নি তবে দু'একদিন আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে এই টেস্ট খেলার টিকিট বিষয়ে আলোচনা করছিল।

বিমানবিহারী বললেন, কী কেলেঙ্কারি ব্যাপার জানো, সোবার্স, কানহাই, ক্লাইভ লয়েডের মতন বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়, তাদেরও দেখলাম ভয় পেয়ে ময়দান দিয়ে ছুটতে। ইণ্ডিয়ার ক্যাপ্টেন পতৌদিও নাকি কিছুটা ইঞ্জিওর হয়েছেন। কী লজ্জার কথা। স্টেডিয়ামের চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, গণ্ডগোলটা শুরু হলো কী ভাবে?

—আসল ব্যাপার যা মনে হচ্ছে, ঐ ইনকমপ্লিট স্টেডিয়ামে যাট হাজার সীট টিকিট বিক্রি করেছে অনেক বেশি যে সব দর্শক জোর করে ঢুকেছে, তাদের অনেকেরই হাতে নাকি টিকিট ছিল..কতটা দুর্নীতি ভেবে দ্যাখো, কয়েক হাজার একস্ট্রা টিকিট বিক্রি করে বসে আছে...আর দর্শকদেরও দেখলুম পুলিশকে একটু ও ভয় পায় না, সবাই ক্ষেপে আছে যেন, এ রকম আগে দেখিনি কখনো, শেষ পর্যন্ত মাঠে আর্মি নামাতে হয়েছে।

মমতার মুখে একটা কালো ছায়া পড়েছে। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, বাবলুটা...কখন কোথায় যায়, কিছু বলে না।

বিমানবিহারী বললেন, চিন্তা করবেন না, দুপুরে ফিরবে নিশ্চয়ই। বছরের প্রথম দিনটাই এই ভাবে শুরু হলো। এমনিতেই তো গণ্ডগোল লেগেই আছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে স্ট্রাইক চলছে কয়েক মাস ধরে, ট্রাম স্ট্রাইক প্রায় কুড়ি বাইশ দিন ট্রাম চলছে না, কাল বিকেলে আমাদের বাড়ির সামনে হঠাৎ একটা মারামারি শুরু হয়ে গেল লোকজন একেবারে ক্ষেপে আছে যেন।

প্রতাপ বললেন, আসল কারণটা হলো চাল লোকে ভাত খেতে পাচ্ছে না, তাই সব সময় মনে মনে গজরাচ্ছে, যে-কোনো একটা উপলক্ষ পেলেই ফেটে পড়ছে।

বিমানবিহারী খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, চাল? চাল, পাওয়া যাচ্ছে না বুঝি?

প্রতাপ বললেন, তুমি তো বাড়ির কোনো খবরই রাখো না। তোমরা গিন্নীই সব দিক সামলান দু'বেলা ভাত খেতে পাচ্ছো?

—আমি বরাবরই রাত্তিরে পরোটাই খাই। চাল---হ্যাঁ, আমাদের চাল তো কৃষ্ণনগর থেকে আসে, নিজেদের জমির চাল।

—বাইরে থেকে কলকাতায় চাল আনা বে-আইনী নয়? করডনিং সিস্টেম যখন চালু আছে।

—বেআইনী নাকি? কোনোদিন তো কেউ কিছু বলেনি? কতটা বে-আইনী জেলে টেলে যেতে হবে নাকি?

বিমানবিহারী হাসতে লাগলেন। মমতা ভ্রুভঙ্গি করলেন প্রতাপের দিকে তাকিয়ে। চালের অভাব থাকলেও তাঁদের চেনাশুনো সকলেই এখনো ভাত খায় কোর্টে যেন আর কেউ চাকরি কর না, তারা সকলেই কি আইন মেনে বাতের বদলে রুটি খাচ্ছে?

প্রতাপও হাসলেন। আজ সকালে বাজারে ঘোরার সময় তাঁর নিজেও একবার কালোবাজার থেকে চাল কেনার ইচ্ছে হয়েছিল। অন্তত শুধু এই ফার্স্ট জানুয়ারি দিনটায়...কিন্তু কোথায় সেই কালোবাজারের চাল তার সন্ধানই তিনি পাননি।

বিমানবিহারী বললেন, এরা দেশটা চালাতে পারছে না। রোজই রাস্তায় রাস্তায় মিছিল একটা বিদেশী টিম খেলতে এসেছে, সেটা যাতে ঠিকঠাক হয় সেটুকু দেখারও যোগ্যতা নেই।

প্রতাপ বললেন, অপদার্থ। অপদার্থ। সামনেই আবার ইলেকশন, এরা ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে ভোট চাইবে। খেলার মাঠে মিলিটারি নামাতে হয় যাদের...

—কাকেই বা ভোট দেবে। অপোজিশান পার্টি বলে তো কিছু নেই। দুটো স্ট্রং প্যারালাল পার্টি না থাকলে ডেমোক্রেসি কখনো ফাংশান করতে পারে? ইংল্যাণ্ডে লেবার পার্টি আছে, আর আমাদের এখানে কম্যুনিস্ট পার্টি যাও বা ছিল, এখন দু'ভাগ হয়ে গিয়ে ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে তার ওপরে আছে বলশেভিক পার্টি, আর সিপি আই, আর এস পি, এস ইউ সি, এরা সবাই নাকি মার্কসিস্ট, অথচ আলাদা আলাদা। আর ঐ অজয় মুখার্জির বাংলা কংগ্রেস, আমি বলে রাখছি তোমাকে ইলেকশনের পর বাংলা কংগ্রেস আবার কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমে দুধে মিশে যাবে। জ্যোতি বসুকে সারা জীবন ঐ বিরোধী দলের নেতা হয়েই থাকতে হবে, দেখো।

—অতুল্য ঘোষ থাকতে আর কারুর ইলেকশানে জেতার আশা নেই, তা জানি। এই ইলেকশানের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

বিমানবিহারী মুখ তুলে মমতার দিকে তাকিয়ে বললেন, বৌদি, কী রান্না করেছেন? আজ আপনার বাড়িতে খেয়ে যাবো। নিজের বাড়িতে আমার খাওয়া নেই, ওরা তো জানে আমি খেলা দেখে বিকেলে ফিরবো।

প্রতাপের হঠাৎ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। বিমানবিহারী এ বাড়িতে আসেন কদাচিৎ। বন্ধু হলেও তিনি এ বাড়িতে বিশিষ্ট অতিথি। তিনি নিজের মুখে খেতে চেয়েছেন। অথচ আজই বাড়িতে তেলাপিয়া মাছ। অন্য অনেক ছুটি দিনে মাংস রান্না হয়, আজ প্রতাপ রাগ করে এখনও মাংস কিনে এনে চাপালে...না তা সম্ভব নয়, কালীঘাট থেকে পাঞ্জাবী দোকানের কষা মাংস যদি অন্যানো যায়

মমতারও মুখখানা লাল হয়ে গেছে। তাঁর স্বামীর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, ছুটির দিনে দু'একজন লোক তো এসে পড়তেই পারে, মাংসের বদলে তবু যদি একটা ভালো মাছ থাকতো।

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে মমতা বললেন, আপনি খাবেন ...আজ কিন্তু আমাদের ভাত হয়নি, আমরা সরকারের সব নিয়ম কানুন মেনে চলি তো, তাই আমরা রুটি খাই।

বিমানবিহারী বললেন, রুটি খেতে আমার একটুও আপত্তি নেই। আপনার হাতের রান্না আপনি যা দেবেন, তাই-ই খাবো।

মমতা স্বামীর দিকে একটা দুঃখের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন।

প্রতাপ তখন দ্রুত চিন্তা করে যাচ্ছেন, পাঞ্জাবি দোকানের কষা মাংস কাকে দিয়ে আনানো যায়। বাবলুটাকে তো দরকারের সময় কিছুতেই পাওয়া যাবে না, বাড়িতে কোনো চাকর-বাকর নেই, বিমানবিহারীকে বসিয়ে রেখে এখন প্রতাপ বেরিয়ে যেতে পারবেন না, একমাত্র মুন্নিকে যদি পাঠানো যায়...

বাথরুমে যাবার নাম করে প্রতাপ একবার ভেতরে গেলেন। মুন্নি বাড়িতে নেই। সে তো আজ

বোটানিক্যাল গার্ডেনসে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে গেছে, আগে থেকেই ঠিক ছিল। টুনটুনি আছে, কিন্তু সে এখনও একা একা বাইরে বেরুতে শেখেনি, সে পারবে না। প্রতাপের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো।

রান্না ঘরে উঁকি দিয়ে তিনি গম্ভীর ভাবে মমতাকে বললেন, যা আছে, তাই-ই দাও। এক কাজ করো, বিমানরা এমনি রুটি খায় না, তুমি রুটি সেঁকবার সময় একটু ঘি মাখিয়ে দাও ওপরে।

মুখ না ফিরিয়েই মমতা বললেন, ঘি ফুরিয়ে গেছে।

ভবদেব মজুমদারের ছেলে প্রতাপ মজুমদার বাড়িতে একজন অতিথি খাওয়ানোর ব্যাপারে জীবনে এত লজ্জা পাননি। তাঁদের বাড়িতে বারো মাস দীয়তাং ভুজ্যতাং লেগে থাকতো। ভবদেব মজুমদার প্রায় প্রতিদিনই দু'একজন আত্মীয় বা বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসতেন।

বিমানবিহারী হাত ধুয়ে বসলেন খেতে। প্রথমে রুটির সঙ্গে ছোলার ডাল আর আলু বাঁধাকপির তরকারি। তাই খেয়েই আহা-হা করতে লাগলেন বিমানবিহারী, মমতার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রতাপ আড়ষ্টভাবে তাকিয়ে আছেন, তাঁর গলা দিয়ে রুটি নামতে চাইছে না। তেলাপিয়া মাছ বিমানবিহারী নিশ্চিত ঐ মাছ খান না, কোনো স্বচ্ছল পরিবারে ঐ মাছ ঢোকে না, ছুটির দিনের দুপুরে এ বাড়িতে আর কোনো মাছ নেই, মাংস নেই...

মমতা মাছের বাটিটা আনতে যেতেই প্রতাপ ঠিক করলেন বিমানকে তেলাপিয়া মাছের উপকারিতা বুঝিয়ে বলবেন। সব সময় জ্যান্ত পাওয়া যায়, কই মাছের সাবস্টিটিউট, প্রোটিনে ভর্তি, আমেরিকানরা দু'তিনরকম মাছের ক্রস ব্রীড করিয়ে এই মাছ....

হঠাৎ অন্য একটা উপলব্দিতে প্রতাপের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি হেরে যাচ্ছেন। দারিদ্র্য লুকোবার চেষ্টাটাই আসল মানসিক দারিদ্র্যের লক্ষণ। তিনি নিজে বাড়িতে যা খান, সেই খাবার একজন বন্ধুকে খাওয়ানোতে লজ্জা কিসের।

মমতা মাছের বাটিটা টেবিলের ওপর রাখতেই প্রতাপ বললেন, বিমান, তুমি তেলাপিয়া মাছ কখনো খাওনি বোধ হয়? দ্যাখো একটু টেস্ট করে খেতে পারো কি না। আমাদের বাড়িতে এখন কিছুদিন অস্টারিটি চলছে, তুতুল চলে গেল তো অনেক, খরচপত্র হয়েছে, তাই আমরা এখন শস্তার মাছ খাই।

বিমানবিহারী খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, তেলাপিয়া? নামটাই শুনেছি, আমাদের বাড়িতে কখনো আনে না কেন কে জানে। দেখি, দেখি তো...

একটা মাছ বেঙে খানিকটা মুখে দিয়ে তিনি বললেন, বাঃ, স্বাদ তো বেশ ভালোই, সর্ষেবাটা দিয়ে রান্নাও ভালো হয়েছে, এই মাছ শস্তা বুঝি।

বন্ধুকে চেনেন প্রতাপ, খারাপ লাগলেও ঐ মাছ খেয়ে যাবেন বিমানবিহারী, অন্তত বমি না পেলে ফেলবেন না। বিমানবিহারীর ভদ্রতা অতি সূক্ষ্ম ধরনের।

বিমানবিহারী বললেন, বৌঠান, আপনিও আমাদের সঙ্গে বসে গেলে পারতেন। এবারে বসে পড় ন। বেলা অনেক হলো।

মমতা বললেন, বাবলু এখনও এলো না, খেলা দেখতে গেলেও খেলা ভেঙে গেছে, তা হলে বাড়িতে আসবে না কেন?

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে কি খেতে আসবে বলেছিল?

মমতা বললেন, খেতে আসবে না, সে রকম তো কিছু বলে যায়নি। সকালে বেরুলে দুপুরে তো খেতে আসে।

বিমানবিহারী বললেন, খেলার মাঠে গেলে একটু চিন্তারই ব্যাপার আছে। পুলিশ এমন পিটিয়েছে, কতজনের যে হাত-পা ভেঙেছে ঠিক নেই।

মমতা বললেন, বাবলুর একটু খোঁজ নেবে না?

প্রতাপ বললেন, কোথায় খোঁজ নেবো? আজ তো সব ছুটি, কোথায় সে টো-টো করে ঘুরছে।

মমতা বললেন, ওর বন্ধু কৌশিক, দু'জনে সব সময় এক সঙ্গে থাকে, কৌশিকের বাড়িতে একবার খোঁজ নিলে জানা যেত।

ছেলের বন্ধুর বাড়িতে খোঁজ নিতে যাওয়ার প্রস্তাবটা প্রতাপের মনঃপুত হলো না। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, দ্যাখো, একটু বাদে আসবে নিশ্চয়ই।

হঠাৎ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুপ্রীতি। তাঁর চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ। সুপ্রীতি

শুয়ে শুয়ে রেডিও শুনছিলেন, এই মাত্র রেডিওতে খেলার মাঠের দুর্ঘটনার খবর শোনালো।

সুপ্রীতি বললেন ও খোকন তুই একবার বাবলুর খবর নিয়ে আয়। ইডেন গার্ডেনে গিয়ে দ্যাখ, আমার ভালো লাগছে না...

সুপ্রীতি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটা দৃশ্য। গঙ্গার ঘাটে গোল করে দাঁড়ানো মানুষের ভিড়, তার মাঝখানে শোওয়ানো রয়েছে দুটি কিশোরের শরীর...

বিমানবিহারী পাত্র ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো প্রতাপ আমার সঙ্গে তো গাড়ি আছে, একবার দেখে আসা যাক।

॥ ৫৯ ॥

পুরোনো গাড়িটার বদলে কিছুদিন আগে একটা নতুন ফিয়াট গাড়ি কিনেছেন বিমানবিহারী। ভেতরে এখনও নতুন নতুন গন্ধ। পুরোনো বুড়ো ড্রাইভারটি এখনো রয়ে গেছে, সে কিছুক্ষণ পর পরই একটা পালকের ঝাড়ন দিয়ে গাড়িটা মুছে নেয়।

চমৎকার শীতের অপরাহ্ন, রাস্তায় নিশ্চিত মানুষের মুখ, কোনো কিছুই দেখে বোঝার উপায় নেই যে আজ ময়দানে একটা খণ্ড প্রলয় ঘটে গেছে। তবে দু'একটা রাস্তার মোড়ে যুবকদের জটলা, তারা আলোচনা করছে ঐ ভাঙা খেলার।

বিমানবিহারী বললেন, এখন স্টেডিয়ামের দিকে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আগে বরং ঐ কৌশিকের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখা যাক। কী বলো?

এইভাবে বিমানবিহারীর সঙ্গে বেরুবার একটুও ইচ্ছে ছিল না প্রতাপের। শুধু শুধু বিমানকে ব্যতিব্যস্ত করা। বন্ধুর গাড়িতে চেপে ছেলেকে খুঁজতে যাওয়া...সত্যি কি সেরকম কিছু ঘটেছে? হয়তো একটু পরেই বাবলু বাড়িতে ফিরে আসবে। মমতা আর সুপ্রীতির যুক্তিহীন আশঙ্কার জন্যই প্রতাপকে বেরুতে হলো।

প্রতাপ বললেন, আমার ছেলেটা ..বুঝলে বিমান, যদিও বড় হয়েছে, কিন্তু এখনও ছেলেমানুষের মতন রয়ে গেছেন। ধুড় ম ধাড় ম করে দরজা জানলা বন্ধ করে, খিদে পেলেই চ্যাঁচায়, আবার এক একদিন নাওয়া খাওয়া ভুলে বাইরে কাটিয়ে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এম এস সি পাস করলো, কিন্তু এখনও ম্যাচিওরিটি আসেনি।

বিমানবিহারী বললেন, যতদিন ছেলেমানুষ থাকা যায়, ততই তো ভালো। এরপর একবার সংসারের ঘানিতে জুতলেই তো...আমরাও ধরো না কেন, আমাদের বাবা-কাকাদের মতন অতটা বুড়ো হয়েছি কি? আমার বাবা আমার মতন এই বয়েসে হাতে ছড়ি নিয়ে ঘুরতেন, মাথার চুল প্রায় সাদা। আমার তবু কিছু চুল পেকেছে, তোমার মাথাটি তো এখনও দিব্যি কালো রয়েছে, প্রতাপ। কলপ টলপ মাখো নাকি?

–আরে যাঃ। চুলে কলপ মাখাবো কাকে ভোলাতে? তবে আমারও চুল পাতলা হয়ে আসছে।

–বাবুলকে আই এ এস পরীক্ষায় বসাবো নাকি? মেরিটোরিয়াস ছেলে, ও ঠিক পেরে যাবে।

–ওর মা ওকে একবার সাজেস্ট করেছিল, তাতে মায়ের ওপর ওর কি চোটপাট? ও নাকি কোনোদিন সরকারি চাকরি করবে না। আজকালকার ছেলেদের জোর করে কিছু করানো যায় কি?

–সরকারি চাকরি করবে না...যদি বেঙ্গল কেমিক্যালে ঢুকতে চায়, আমি চেষ্টা করতে পারি। রাজশেখর বসু মশাইয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ জানাশুনো ছিল, এই সূত্রে ওখানকার অনেককেই চিনি।

–আমার ইচ্ছে, চাকরিতে ঢোকার আগে পি-এইচ ডি করুক।

–পি-এইচ ডি যদি করতেই হয়...এদেশে করবে? ভালো রেজাল্ট করেছে, অনায়াসে বিদেশের কোনো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে যেতে পারে। আজকাল তো দলে দলে ছেলেমেয়েরা আমেরিকা চলে যাচ্ছে।

–ওর মা'র মুখে শুনেছি ওর বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি আছে।

–ওর মা'র মুখে শুনেছো...কেন তুমি ওকে নিজে জিজ্ঞেস করতে পার না?

–এই একটা দুঃখের ব্যাপার হয়েছে, বিমান ছেলেটা সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলতেই চায় না। আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। হয়তো আমারই দোষ, অল্পবয়সে একটু বেশি শাসন করেছি, খুবই দুরন্ত ছিল তো, পড়াশুনোয় একেবারে মন ছিল না।

–পড়াশুনোয় মন ছিল না, কিন্তু প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই রেজাল্ট ভালো করেছে।

–সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সারা বছর পড়ে না ওর মায়ের সঙ্গে যেমন মাঝে মাঝেই ঝগড়া হয়, আবার মায়ের সঙ্গেই মনের কথা হয়, আমাকে কিছু বলতে চায় না।

কৌশিকদের বাড়ির কাছাকাছি গাড়িটা থামলো। মমতা কৌশিকদের ঠিকানা বলে দিয়েছিলেন, ছেলের কাছে তিনি কৌশিকদের বাড়ির বর্ণনাও শুনেছেন। পুরোনো আমলের বাড়ি, সামনে কোলাপসিব্‌ল গেট একপাশে একটা বড় কদমফুলের গাছ।

বিমানবিহারীকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে প্রতাপ নামলেন। এখন দুপুর পৌনে তিনটে। এই সময় কারুর বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করা কি ঠিক? এ বাড়ির অন্য কেউ প্রতাপকে চেনে না, এমনকি কৌশিকের সঙ্গেও তাঁর কোনোদিন একটাও কথা হয়নি। বসবার ঘরে ছেলের বন্ধুদের দেখে তিনি গম্ভীর ভাবে ভেতরে ঢুকে যান ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করার কথা কোনোদিন তাঁর মনে আসেনি। বাবলুর বন্ধুরাও তাকে দেখলে আড়ষ্ট হয়ে চুপ করে বসে থাকে।

প্রতাপ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর অহমিকা প্রবল তিনি অযাচিতভাবে এ বাড়িতে এসেছেন, এমন দুপুরবেলা বিরক্ত করার জন্য যদি এ বাড়ির কেউ প্রথমেই তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে?

গেটের পাশে একটি কলিং বেল আছে। অনেকখানি দ্বিধা নিয়ে প্রতাপ সেখানে আঙুল রাখলেন। ছেলের খোঁজ নিতে এসেছেন বটে, কিন্তু প্রতাপের মনের একটা অংশ চাইছে, বাবলু যেন এখানে না থাকে। এম এস সি পাস করা ছেলে বাবাকে এইভাবে ছুটে আসতে দেখলে কি খুশী হবে? তার আত্মসম্মানে লাগতে পারে। একমাত্র মায়ের মন এইসব বোঝে না।

দু'তিনবার বেল বাজবার পর দোতলার বারান্দা থেকে একটি তরুণী মেয়ে রেলিং এ অনেকখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো কে? এই যে, ওপরে তাকান, কী চাই?

প্রতাপ যেন একজন ফেরিওয়ালা। তাঁর মুখ লালচে হয়ে গেছে, তবু শান্তভাবে তিনি বললেন, কৌশিক আছে কী? তার সঙ্গে একটু কথা বলতাম।

তরুণীটি বললো, কৌশিক তো নেই, বেরিয়ে গেছে।

প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ত হলেন। কৌশিক নেই, বাবলুও এখানে নেই যাক বাঁচা গেল, প্রতাপ এখন ওদের মুখোমুখি হতে চাইছিলেন না।

দোতলার তরুণীটি প্রতাপকে ফিরতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, কৌশিককে কিছু বলতে হবে কী? আপনার নাম?

প্রতাপ মাথা নেড়ে বললেন, আমার নাম শুনে চিনতে পারবে না, দরকার নেই...

–এই যে শুনুন রাস্তার উল্টোদিকে, ঐ যে হলদে বাড়িটার পাশে একজন মুচি বসে আছে তাকে একটু ডেকে দেবেন প্লীজ।

তরুণীটির অনুরোধ প্রতাপ মান্য করবেন অবশ্যই। তরুণীটি প্রতাপকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করছে। এরপর প্রতাপ যখন গাড়িতে উঠবেন, তখন সে লজ্জা পেয়ে যায় যদি। বিস্মিত বিমানবিহারীর চোখের সামনে দিয়ে প্রতাপ রাস্তা পার হয়ে মুচিটিকে নির্দেশ দিলেন, তারপর ধীরে সুস্থে একটি সিগারেট ধরালেন। তরুণীটি যাতে দেখতে না পায়, তিনি মুখ ফিরিয়ে আছেন অন্যদিকে।

গাড়িতে ফিরে আসার পর বিমানবিহারী জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো?

–কৌশিক বাড়িতে নেই বললো।

–বাবলু এসেছিল এখানে?

–তা জিজ্ঞেস করিনি।

–বাঃ, সে কথাটা জিজ্ঞেস করলে না? বাবলু আর ঐ ছেলেটি যদি একসঙ্গে বেরিয়ে থাকে...যাও, একবার বাবলুর কথাটা জিজ্ঞেস করে এসো।

–থাক, দরকার নেই। এখানে নেই যখন.....

বিমানবিহারী একটু চিন্তা করে বললেন, চলো আমার বাড়িতে যাই। আমার জন্যও ওরা হয়তো চিন্তা করতে পারে, রেডিওতে খবর শুনেছে নিশ্চয়ই, বাবলুও থাকতে পারে ওখানে অলির সঙ্গে তো প্রায়ই গল্প করতে আসে।

গাড়ি আবার ঘুরলো, প্রতাপের একটা কথা মনে পড়লো, বাবলু না-ফেরা পর্যন্ত মমতা না খেয়ে

থাকবেন। মমতার আলসার আছে, বেশিক্ষণ খালি পেটে থাকা তার পক্ষে ঠিক নয়। বাবলুর হয়তো কিছুই হয়নি, সে কোথাও বসে আড্ডা দিচ্ছে, কিন্তু দুপুরে বাড়িতে এসে খাবে কি খাবে না, সে কথা কেন বলে যায়নি হতভাগা ছেলেটা?

বিমানবিহারী আবার বললেন, বাবলু কোনো পলিটিক্যাল পার্টিতে যোগ দিয়েছে নাকি, তুমি কিছু জানো?

প্রতাপ দু' দিকে মাথা নাড়ালেন।

–অলির সঙ্গে প্রায়ই পলিটিক্সি নিয়ে তর্ক করে, আমি মাঝে মাঝে শুনতে পাই। উঃ, এক এক সময় এমন চ্যাঁচামেচি করে ঝগড়া লাগায় দু'জনে, ঠিক যেন পিঠোপিঠি ভাই বোন।

প্রতাপ একটু হেসে উঠলেন। অলিকে তাঁর খুবই পছন্দ এমন শান্ত শ্রীময়ী মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। সেও চেঁচিয়ে ঝগড়া করতে জানে নাকি? মমতার মাথায় সম্প্রতি একটা চিন্তা ঘুরছে ছেলে এম এস সি পাস করেছে, দু'এক বছরের মধ্যে তার বিয়ের কথা ভাবতে হবে অলির সঙ্গে বাবলুর ছেলেবেলা থেকে বন্ধুত্ব, অলির সঙ্গে বিয়ে হলে সবদিক থেকেই চমৎকার হয়, যদি বিমানবিহারীদের আপত্তি না থাকে....এই বিষয়ে প্রতাপ কি বিমানবিহারীর সঙ্গে একটু আলোচনা করতে পারেন না?

প্রতাপ তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। বাবলুর বিয়ে নিয়ে তিনি এখন একটুও মাতা ঘামাতে চান না আগে পড়াশুনো শেষ করুক, চাকরি বাকরিতে ঢুকুক ...তাছাড়া বিমানবিহারীর কাছে তিনি কিছুতেই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারবেন না। কোনো রকম প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারেন না প্রতাপ, নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে তো নয়ই। অলির বিয়ে সম্পর্কে বিমানবিহারী ও কল্যাণী যদি অন্যরকম চিন্তা করে থাকেন? তাঁদের এই দুই পরিবারের অবস্থা সমান নয়। কল্যাণী কোনো ধনী পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতেই পারেন...অলি আর বাবলু দু'জনেই লেখাপড়া শিখেছে, তারা নিজেরা যদি ঠিক করে, কিংবা বিমানবিহারী ও কল্যাণীর কাছ থেকে যদি কোনো প্রস্তাব আসে....তার আগে প্রতাপ নিজে থেকে মুখ ফুটে কিছুতেই কিছু বলবেন না।

বিমানবিহারী এইমাত্র বললেন, অলি আর বাবলু পিঠোপিঠি ভাই-বোনের মতন। তা হলে বোধ হয় বিমানবিহারীর চিন্তা অন্যরকম।

ভবানীপুরে পৌঁছে দোতলার ঘরেই দেখতে পাওয়া গেল অলিকে। ছুটির দিনেও সে অফিস ঘরে বসে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করছে। টেবিলের ওপর অনেক কাগজপত্র ছড়ানো, অলির হাতে একটা পুরোনো আমলের গেরুয়া রঙের মোটা পার্কার কলম।

বাবলু এখানে নেই। আজ সে এ বাড়িতে আসেনি।

বিমানবিহারী বললেন, অলি, আমাদের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করবি? জগদীশটা বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

অলি উঠে যেতেই বিমানবিহারী বললেন, দাঁড়াও, লালবাজারে একটা ফোন করি। ধরো, কোনো কারণে বাবলু যদি খেলার মাঠে ইনজিওরড্ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে থাকে, ওদের কাছে নিশ্চয়ই লিস্ট থাকবে।

প্রতাপ বললেন, না, না, তার দরকার নেই। এত ব্যস্ত হবার কোনো মানে হয় না। শক্ত সমর্থ ছেলে...খেলার মাঠে গিয়ে থাকলেও সে নিশ্চয়ই একা যায়নি, কিছু একটা হয়ে থাকলে অন্য কেউ না কেউ নিশ্চয়ই খবর দিত।

বিমানবিহারী তবু লালবাজারে তাঁর পরিচিত ডি সি ডি ডি ওয়ান-কে ফোন করলেন, কিন্তু কোনো সুবিধে হলো না, ছুটির দিনে ডি সি ডি ডি নেই অফিসে, এমার্জেন্সি সেল থেকেও হতাহতদের লিস্ট দিতে পারলো না, এখনও তাদের হাতে আসেনি।

বিমানবিহারী ফোন রেখে দিয়ে বললেন, দাঁড়াও চা-টা খেয়ে নিই, তারপর পি জি হাসপাতালে যাওয়া যাবে, কাছেই তো, ওখানেই প্রথমে নিয়ে আসবে, কিংবা মেডিক্যাল কলেজে...

প্রতাপ এবারে প্রবল আপত্তি করলেন, বিমানবিহারীকে তিনি আর মোটেই ব্যতিব্যস্ত করতে চান না, বিমানবিহারী পেট্রল পুড়িয়ে নিয়ে ঘুরবেন সারা কলকাতা, এরও কোনো মানে হয় না। পেট্রলের দামও তো কম না।

প্রতাপ বললেন, হয়তো আমরা বাড়াবাড়ি করছি, এতক্ষণে বাবলু বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে। আগে আমি একবার বাড়ি যাই, বুঝলে, যদি দেখি সন্ধের মধ্যেও ফিরলো না, ও বেচারি শুধু শুধু চিন্তা করবে....

চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন প্রতাপ।

বিমানবিহারী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও তাঁর গাড়ি ব্যবহার করতে খুবই লজ্জা বোধ করছিলেন তিনি। টাকা পয়সার ব্যাপারটা কিছুতেই ভোলা যায় না। ল কলেজে পড়ার সময় যখন বিমানবিহারীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়, তখন প্রতাপদের অবস্থা বেশি সচ্ছল ছিল। বিমানবিহারীদের কৃষ্ণনগরের বাড়ির চেয়ে মালকানগরে প্রতাপদের বাড়ি ছিল অনেক বড়, ছাত্র বয়েসে প্রতাপ বেশ ভালো টাকা হাতখরচ পেতেন, বন্ধুদের চপ-কাটলেট খাওয়াতেন ফারপো হোটেলে। আজ বিমানবিহারীকে তেলাপিয়া মাছ খাওয়াতে হলো।

বাড়ি ফিরে যদি দেখা যায়, বাবলু এখনও খেতে আসেনি, তা হলে মমতা সুপ্রীতিকে কী সান্ত্বনা দেবেন প্রতাপ? তিনি নিজে খুব একটা উদ্বেগ বোধ করছেন না। খেলার মাঠে গেলে বাবলু সেকথা নিশ্চয়ই বলে যেত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে এই খেলা দেখার জন্য সারা কলকাতা পাগল হয়ে উঠেছিল, টিকিট ব্ল্যাক হয়েছে, সেই খেলার টিকিট জোগাড় করতে পারলে বাবলু কি সে কথা বাড়িতে জানাতো না? আজ দুপুরে খেতে আসতে পারেনি, নিশ্চয়ই কোথাও আটকে গেছে, কোনো বন্ধুর বাড়িতে জোর করে খেয়ে নিতে বলেছে, টেলিফোন তো নেই যে খবর দেবে।

মমতা বা সুপ্রীতি এইসব যুক্তি মানতে চাইবে না। বাবলুর আড়ালে ছায়া হয়ে দাঁড়াবে পিকলু। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। কত সামান্য তুচ্ছ কারণে চিরকালের মতন হারিয়ে গেল পিকলুর মতন একটা প্রাণবন্ত ছেলে। এরকম দুর্ঘটনা তো ঘটে। আজ বেশি করে পিকলুর কথা মনে পড়বে আবার। বাবলুকে বাঁচাতেগিয়েই পিকলু চলে গেছে। বাবলু বোঝে না যে তার মায়ের কাছে তার দাদার অভাবটাও পূরণ করতে হবে তাকেই, তার দ্বিগুণ দায়িত্ব। ছেলেটার এই কাণ্ডজ্ঞান হলো না এ পর্যন্ত।

পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছলেন প্রতাপ। নিজেই তিনি অবাক হলেন, পিকলুর কথা মনে পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এসে গেল তাঁর এত বছর পরেও? পুত্রস্নেহের টান এমন প্রবল হয়? তিনি কিন্তু পিকলুকে ভুলে যেতেই চান। যে চিরকালের মতন হারিয়ে গেছে, তার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে রাখার কোনো মানে হয় না। মমতার আপত্তি সত্ত্বেও শয়নকক্ষ থেকে পিকলুর ছবি সরিয়ে রেখেছেন তিনি।

বাড়ির দিকে যেতে পা উঠছে না প্রতাপের। মমতা ও সুপ্রীতি একসঙ্গে কান্নাকাটি শুরু করলে তিনি সামলাবেন কী করে? বকাবকি করতে হবে। কিন্তু আর কোথায়ই বা বাবলুর খোঁজে তিনি যাবেন এখন? হাসপাতালে যাওয়ার একেবারেই প্রবৃত্তি নেই তাঁর।

প্রতাপ যে-বাসে উঠলেন, সেই বাসেই বসে আছে বাবলু। সঙ্গে দুজন বন্ধু। তাদের মধ্যে কৌশিক নেই, পেছনদিকের লম্বা টানা সিটটায় বসে বাবলু তাদের সঙ্গে গল্পে মত্ত। বাবলু নিজে থেকেই বাবাকে দেখতে না পেলে প্রতাপ ছেলের সঙ্গে তখুনি কথা বলতেন না। দুশ্চিন্তার অবসান হলেই মন সবসময় ফুর্তিতে ভরে ওঠে না। অনেক সময় তীব্র রাগ হয়। প্রতাপ ঠিক করলেন, বাবলু বাড়ির স্টপে নামে কিনা সেটা তিনি আগে লক্ষ করবেন। কিন্তু বাসে বেশি ভিড় নেই, বাবলু তাঁকে দেখতে পেয়েছে।

গল্প থামিয়ে অবাকভাবে বাবলু জিজ্ঞেস করলো, বাবা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

প্রতাপ উদাসীনভাবে বললেন, এই এদিকে বিমানদের বাড়িতে।

বাবলুর দুই বন্ধু তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মেসোমশাই, আপনি এখানে এসে বসুন।

বাবলুও উঠে দাঁড়িয়েছে প্রতাপ বুঝলেন, আপত্তি করে লাভ নেই, ছেলের বন্ধুরা তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে না, যদিও বাড়ি বেশি দূরে নয়।

প্রতাপ বসলেন, বাকি জায়গাটাতে অন্য দুই বন্ধুও বসলো, বাবলুই দাঁড়িয়ে রইলো। বাবলু পরিচয় করিয়ে দিল, তার দুই বন্ধুর নাম অলোক আর সিদ্ধার্থ। অলোক তাঁকে মেসোমশাই বলে ডেকেছে সিদ্ধার্থ বললো, কাকাবাবু, আজ খেলার মাঠে কী কাণ্ড হয়েছে শুনেছেন? গারফিল্ড সোবার্স ময়দান দিয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়েছে, হেল্প হেল্প। আর রোহন কানহাই নাকি ভয়ের চোটে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা খেলা দেখতে গিয়েছিলে?

সিদ্ধার্থ আর অলোক দু'জনেই শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ওরা টিকিট পায়নি, ওদের হস্টেলের কয়েকটি ছেলে গিয়েছিল রঞ্জি স্টেডিয়ামে, তাদের মধ্যে একজনের হাত ভেঙেছে, একজনের কাঁধের ওপরে এসে পড়েছে টিয়ার গ্যাসের শেল...ওরাও পুলিশের কয়েকজনকে শুইয়ে দিয়েছে মাটিতে...

বাড়ির কাছাকাছি এসে প্রতাপ উঠে দাঁড়ালেন। বাবলু যদি নামতে না চায় তিনি কিছু বলবেন না। বাড়িতে গিয়ে বাবলুর খবরটা দিলেই তো হলো। ছেলের যদি বাড়ি ফেরার মন না থাকে, তিনি জোর করতে যাবেন কেন?

বাবলুও নামলো প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বাবার পাশাপাশি না হেঁটে সে রইলো এক পা পিছিয়ে। রাস্তার লোক দেখে ভাববে, ওরা দু'জন অচেনা মানুষ, আলাদা পথচারী।

একটু পরে বাবলু মৃদুগলায় বললো, বাবা, আমি শিলিগুড়ি কলেজে একটা লেকচারারের পোস্টের অফার পেয়েছি। নেবো?

প্রতাপ মুখ ফিরিয়ে বললেন, কলেজে পড়ানোর চাকরি? তুই পি এইচ ডি করবি না?

–চাকরি পাওয়া এখন দারুণ শক্ত ব্যাপার। এটা পাচ্ছি যখন পি এইচ ডি পরেও করা যায়।

–মফস্বলের চাকরি, তুই পারবি?

–আমার নর্থ বেঙ্গল খুব ভালো লাগে। এই যে আমার বন্ধু সিদ্ধার্থ, ওর দাদা ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল, কেমিস্ট্রির একটা পোস্ট খালি হয়েছে...এই রকম চান্স সহজে পাওয়া যায় না

–চাকরিই যদি করতে হয়, তা হলে কলকাতায় চেষ্টা করা যেতে পারে, তোর বিমানকাকা বলছিল বেঙ্গল কেমিক্যালের কথা..তুই কলেজে পড়াতে পারবি?

–চেষ্টা করে দেখি অন্তত কয়েক মাস। ভালো না লাগলে ছেড়ে দেবো।

–তোর মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে দ্যাখ।

–সকালে শিবপুরে চলে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম দুপুরের আগেই ফিরবো...ওদের হস্টেলে আজ খিচুড়ি আর ফ্রায়েড প্রণ হয়েছিল, ওরা জোর করে ধরে রাখলো, না খাইয়ে ছাড়লো না, এমন চমৎকার খিচুড়ি হয়েছিল, অনেকদিন এরকম খাইনি...ওদের রুটি খেতে হয় না, ওদের হস্টেলের জন্য চালের কোটা আছে। নর্থ বেঙ্গলেও শুনলুম চাল পাওয়া যায়।

প্রতাপ আর কোনো মন্তব্য করলেন না। বাড়ির মধ্যে ঢুকে রান্না ঘরের দিকে এক পলক দৃষ্টি দিয়েই তিনি বুঝলেন, মমতা এবং সুপ্রীতি এখনো না খেয়ে রয়েছেন। বাবলু ঢুকে গেল বাথরুমে।

প্রতাপ শোওয়ার ঘরে আসতেই মমতা বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন বাবলু? বাবলু কোথায়?

প্রতাপ ধীরে স্বরে বললেন, তোমার ছেলে ফিরে এসেছে।

মমতার কপালটা ফর্সা হয়ে গেল, চোখে জ্বলে উঠলো আলো। কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো কৃতজ্ঞতা। তিনি এগিয়ে এসে স্বামীর হাত ধরে বললেন তুমি বাবলুকে খুঁজে আনলে? কোথায় ছিল? কৌশিকদের বাড়িতে যেতে তো এতক্ষণ লাগে না....

প্রতাপ বললেন, না, আমি খুঁজে আনিনি। ও বাড়িতেই ফিরছিল, আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো।

মমতার মুখের দিকে বেশ কয়েক পলক স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন প্রতাপ। তারপর মিনতি মাখা কণ্ঠে বললেন, আমি যে ওকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, সে কথা ওকে বলবার দরকার নেই। বলো না কিন্তু। বলো না।

॥ ৬০ ॥

যেমন অকস্মাৎ মামুনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, সেইরকমই হঠাৎ একদিন ছেড়ে দেওয়া তাকে। মুক্তি পেয়েই মামুন যেন বেশি বিস্মিত হলেন। অন্যান্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে তাঁকে রাখা হয়েছিল আর্মি ক্যান্টনমেন্টে। মাসের পর মাস তাঁর ওপর মানসিক ও শারীরিক উৎপীড়ন চলেছে। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা দিয়ে তাঁকে ভারতের গুপ্তচর সাজাবার চেষ্টা হয়েছে। মামুন ধরেই নিয়েছিলেন, একটা কুকুরকেও ফাঁসী দেবার আগে যেমন একটা বদনাম দিতে হয়, সেই রকমই কিছু চেষ্টা চলছে। জেরার সময় ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেকটরি মিঃ ওঝা, চিটাগাঙ এর আওয়ামী লীগ নেতা মানিক চৌধুরী ও স্টুর্ট মুজিবুর রহমান, শেখ মুজিব নয়, অন্য একজন এদের নাম তোলা হচ্ছিল বারবার। অথচ মামুন এই তিনি ব্যক্তিকে কোনোদিন চক্ষেও দেখেননি।

বিনা ভূমিকায় মামুনকে জেল গেটের বাইরে যেতে দেওয়া হলো। তাঁর পকেটে একটি পয়সা নেই, বাইরে তাঁর জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই। ইন্টেলিজেন্স এর লোকদের অত্যাচারে এবং

রক্তামাশয় ভুগে মামুনের শরীরটা শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে, তবু শীতকালের পরিষ্কার আকাশ দেখে তাঁর মনটা আনন্দে ভরে গেল। কী সুন্দর টাটকা আলো। মুক্তির স্বাদ যে এত সুন্দর তা জেলখানায় কিছু দিন না কাটলে বোঝা যায় না।

বেলা এখন এগারো। আজ ঠিক কী বার বা তারিখ, তা মামুনের খেয়াল নেই। পথের গাড়ি-ঘোড়ার জটলা ও মানুষজনের যাওয়া আসার ব্যস্ত ভঙ্গি দেখলে ছুটির দিন মনে হয় না। শোনা যাচ্ছে গতিশীল পৃথিবীর একটা গমগম শব্দ।

রাস্তার কোনো মানুষ কি মামুনকে দেখে বুঝতে পারছে যে তিনি এই মাত্র জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন? শুধু কারবাস থেকে মুক্তি কেন, হয়তো তিনি ফিরে এসেছেন মৃত্যুর সীমান্ত থেকেও। এক সময় সত্যি তাঁর মৃত্যুভয় ধরে গিয়েছিল্ । ইন্টারোগেশনের সময় অফিসাররা যেমন ভাবে যখন তখন তাঁর মাথার চুল খামচে ধরতো কিংবা শিরদাঁড়ায় লাথি মারতো, তাতে মনে হতো, ঐ সব আঘাতে হ্যজির করানো হয়। সুতরাং তাঁ লাশ গায়ের করে ফেলতেও অসুবিধে ছিরল না কিছুই।

মামুন নিজের বেশ কয়েকটি কবিতায় মৃত্যুর বন্দনা করেছেন, রবীন্দ্রনাতের অনুসরণে মৃত্যুকে সম্বোধন করেছেন বন্ধু বলে, কিন্তু জেলখানার অত্যাচারে যখন এক একবার দারুণ যন্ত্রণা ও অপমানের রূপ ধরে মৃত্যু এসে উঁকি মারতো, তখন মামুন শিউরে উঠতেন, তাঁর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হতো না, না, না, আমি আরও বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচতে দাও।

হাঁটতে হাঁটতে মামুনরে খুব ইচ্ছে করছে, কোনো একজন অচেনা লোকের হাত চেপে ধরে বলতে ওরে বাই শোনো, আমি এই মাত্তর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি, আমি বেঁচে ফিরে এসেছি।

এখন কোথায় যাওয়া যায়? হেনা দু'বার দেখা করার অনুমতি পেয়েছিল, তার কাছ থেকেই মামুন জেনেছেন যে ঢাকায় তাঁদের বাসা তুলে দেওয়া হয়েছে, ফিরোজা বেগম চলে গেছেন মাদারিপুর। আলতাফ আর একদিনও আসেনি। দিন-কাল পত্রিকা অফিসে মামুনের নিজস্ব ঘরটির ওপর এখন তাঁর আর কোনো অধিকারই নেই। ঐ ঘরের জানলার পর্দা রংও মামুন নিজে পছন্দ করেছিলেন। এখন তাঁর চেয়ারে অন্য কেই বসে।

চেনাশুনা কারুর কাছে অযাচিতভাবে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু একটি প্রধান বাস্তব সমস্যা হলো পকেটে একটা আধলাও নেই। বাইরে টাটকা বাতাসে বিশ্বাস নিয়ে তাঁর স্বাধীন, সুস্থ মানুষের মতন খিদে পেয়ে যাচ্ছে। কতদিন কালো জিরে ফোড়ন দেওয়া মুসুরির ডাল খাওয়া হয়নি।

মামুন সেগুন বাগিচার দিকে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর আপার বাসাতো তো একবার যেতেই হবে, হেনা সেখানেই থাকে। এই কয়েকমাসেই রাস্তা ঘাটের চেহারায় কিছু উন্নতি হয়েছে মনে হয়। খানা-খন্দ কম, অনেক নতুন গাড়ির আমদানী হয়েছে দেখা যাচ্ছে। ফুটপাথে বিক্রি হচ্ছে কমলালেবু আর কলা। গতববছর শীতে কমলালেবুর খুব দাম ছিল, এবারে মনে হচ্ছে চালান এসেছে ভালো। পকেটে পয়সা নেই, তবু কমলা লেবু খাওয়ার জন্য কী লোভই যে হলো তাঁর।

মামুনের দুলহাভাই একজন নামজাদা উকিল, তবু তিনি মামুনের জামিনের জন্য একবারওে চষ্টা করেনিনি তো। কিংবা, চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন? একবড় একজন উকিল হয়ে জেলে গিয়ে একবার দেখাও করতে পারলেন না? ওখানে অন্যান্য সহবন্দীরা অনেক বলাবলি করেছে যে, অনেক উকিলই নাকি পলিটিক্যাল আসামীদের কেস নিতে চাইছে না সরকারের বিরাগভাজন হবার ভয়ে। আর্মি রেজিমেন্ট বিচারকরাও নিরপেক্ষ রায় দিতে পারে না, এখন জুডিশিয়ারির হাতেই হাত-কড়া।

কিন্তু নিজের জামাইবাবু পর্যন্ত ভয় পেলেন। শামসুল আলমের সঙ্গে মামুনের শুধু আত্মীয়তা নয়, গভীর বন্ধত্বের সম্পর্ক ছিল। এখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলে তিনি আবার বিব্রত বোধ করবেন না তো?

দরজার সামনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মামুন। কী অসহায় যে লাগছে তাঁর। দিদির বাড়িতে আগে যখন তখন এসেছেন, মাসের পর মাস এখানে থেকে গেছেন, মলিহা বেগম তাঁর মায়েরই মতন স্নেহময়। আজ যদি কেউ তাকে অবাঞ্ছিত মনে করে?

মামুন একবার পেছন দিকে তাকালেন। কেউ কি তাঁকে অনুসরণ করছে? এতক্ষণ এ কথাটা মনে পড়ে নি। জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে ওরা কি এখন নজর রাখতে চায় যে মামুন কোথায় যান, কার সঙ্গে কথা বলেন? আবার একটা বেড়াজালে ফেলে আরও অনেকের সঙ্গে মামুনকে ধরবে?

কিন্তু হেনার সঙ্গে তো দেখা করতেই হবে। দ্বিধা কাটিয়ে মামুন দরজায় ধাক্কা দিলেন।

ভৃত্যটি নতুন। সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে মনে হয়, মাথার চুল তেল চুকচুকে বছর কুড়ি বসে।

সে জিজ্ঞেস করলো, কারে চাই?

এ বাড়িতে এসে ভৃত্যর কাছে জবাবদিহি করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। মামুন বললেন, সর আমি উপরে যাবো।

মামুন তার পাশ দিয়ে ঢুকতে যেতেই সে হাত ছড়িয়ে বাধা দিয়ে বললো, ও ছায়েব, ও ছায়েব কই যান? কারে চান আগে কইয়া লন।

মামুনের আর ধৈর্য থাকছেনা, ধাক্কা দিয়ে ছেলোটিকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছে হলো তাঁর। অতিকষ্টে নিজেকে দম করে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, ওরে তুই সর, আমি এই বাড়িরই মানুষ হেনার বাপ।

তারপর সামনে চোখ তুলেই মামুন অনড় হয়ে গেলেন, তাঁর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলে। একতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জু।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে, এতটা পথ হেঁটে এসে পরিচিত মানুষদের মধ্যে মঞ্জুকেই প্রথম দেখবেন, এটা মামুনের স্বপ্নের অগোচর ছিল অথচ অস্বাভাবিক তো কিছু নয়। এটা মঞ্জুর বাপের বাড়ি।

মঞ্জুও যেন প্রথমটায় ঠিক বিশ্বাস করতে পারলো না। মামুনের শরীর এমনই শীর্ণ হয়ে গেছে যে মঞ্জু কয়েক মুহূর্ত ভাবলো, অনেকটা তার মামুনমামারই মতন চেহারার একজন আগন্তুক। না সত্যিকারের মামুনমামা? তার হাতে একরাশ কাপড় জামা। সে বোধহয় কাচতে দিতে যাচ্ছিল, সেগুলো ফেলে সে ছুটে এসে মামুনকে জড়িয়ে ধরে বললো, মামুনমামা, তুমি? তুমি সত্যি ফিরে এসেছো?

মঞ্জুর কণ্ঠস্বর আবেগ, আনন্দ ও কান্নায় মাখা।

মামুন মঞ্জুকে সরিয়ে দিয়ে শুকনো গলায় বললেন, কেমন আছিস রে, মঞ্জু? ছেলেটা ভালো আছে?

মঞ্জু বললো, মামুনমামা, তোমারএ কী চেহারা হয়েছে? তোমায় কবে ছাড়লো? তুমি কার সাথে আসলে?

এসব কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মামুন মঞ্জুকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন দোতলায়।

ছোটভাইকে দেখে মলিহা বেগমের আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোনো খাদ নেই। তিনি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন। হেনা কলেজে গেছে, তিনি তখুনি ভৃত্যটিকে পাঠালেন হেনাকে ডেকে আনার জন্য। আজ তার বাবা জেল থেকে ফিরেছে, আজ হেনার কলেজ করার দরকার নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই মামুন ঠিক করে নিয়েছেন, শামসুল আলম সাহেবের সঙ্গে তিনি খোলাখুলি আলোচনা করে নেবেন। মামুনকে নিয়ে তাঁর যদি সামান্যতম অস্বস্তি বা উদ্বেগ থাকে, তাহলে মামুন এ বাড়িতে একরাতও কাটাবেন না। তাঁর জন্য তাঁর দিদির স্বামীর পেশার কোনো ক্ষতি হোক, তা তিনি চান না।

জেলে বাইরের প্রথম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মামুন জিজ্ঞেস করলেন, দুলাভাই কোর্ট থেকে কয়টার সময় ফিরবেন?

মলিহা বেগম বললেন, হায় আমার পোড়া কপাল, তুই শোনোস নাই বুঝি? হ্যায় তো আর কোর্টে যায় না, রিটায়ার করছ, এখন সর্বক্ষণই বাসায় থাকে। মাথায় ভূত চাপছে।

মামুন প্রকৃত বিস্মিত হয়ে বললেন, দুলাভাই রিটায়ার করেছেন? কেন? শরীল গতিক ঠিক আছে তো?

–তা আছে। কিন্তু ঐ যে কইলাম, মাথায় ভূত চাপছে। উপরের ঘরে একা একা থাকে। আর বিড়বিড়াইয়া নিজের মনে মনে কথা কয়। দুফুরে খাইতে নামবে, তখন তুই কথা কইয়া দেখিস, দ্যাখ যদি বুঝাইতে পারোস কিছু।

অন্যান্য ভাগ্নে ভাগ্নীরা ঘিরে ধরেছে মামুনকে, মঞ্জু এসে বসেছে একেবারে মামুনের মুখোমুখি। সবাই জেলের গল্প শুনতে চায়। মামুনের ক্লান্ত লাগছে খুব। তিনি মঞ্জুর চোখের দিকে একবারও সরাসরি তাকাচ্ছে না। অন্যদের প্রশ্নের কয়েকটা সামান্য কাটাকাটা উত্তর দেবার পর তিনি মস্তবড় একটা হাই তুলে বললেন, এখন আমি ঘুমাবো।

মামুনকে মুখ ফুটে বলতে হয়নি, আজ এ বাড়িতে রান্না হয়েছে মুসুরির ডাল। তাতে পুরু করে হলুদ মেশানো। এসব ছোটখাটো প্রাপ্তিগুলি অকেখানি গুপ্ত সুখ এনে দেয় গরম ভাত, আলুসেদ্ধ মাখা

সর্ষের তেল দিয়ে, শুঁটকি মাছ দিয়ে রান্না কুমড়োর শাক। মাগুর মাছের কালিয়া, এই প্রত্যেকটি খাবরই মামুনের প্রিয়। কিন্তু যতখানি তৃপ্তির সঙ্গে খাবেন ভেবেছিলেন তা হলো না,জেলের অখাদ্য খেয়ে খেয়ে পেট ও জিভ মরে গেছে, এই খাবরগুলি দেখে লোভ হচ্ছে। কিন্তু গলা দিয়ে নামছে না। অনেকটাই ফেলে ছড়িয়ে শেষ পাতে একটি ডালে চুমুক দিয়ে মামুন উঠে পড়লেন।

আলম সাহেব এখনও খেতে নামেন নি। বাড়ির বাচ্চারা কয়েকজন গিয়ে তাঁর কাছে মামুনের আগমন বার্তা জানিয়ে এসেছে, কিন্তু তিনি চক্ষু বুজে গভীর চিন্তায় মগ্ন। ছাদের যে-ঘরটিতে মামুন কিছুদিন থেকে গেছেন, এখন সেখানেই আলম সাহেবের আস্তানা।

দোতলার একটি ঘরে মামুনকে শুতে দেওয়া হলো। বিছানায় একবার গড়িয়ে পড়ার পরও মামুন উঠে এসে দরজাটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন। বাচ্চাদের জন্য নয়, মঞ্জুর জন্য। মঞ্জু নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে বিরলে গল্প করতে চাইবে। সেবা করতে চাইবে। মামুন আর মঞ্জুর সঙ্গে কখনো একা থাকতে চান না। মঞ্জু তাঁর অন্যান্য ভাগ্নে ভাগ্নীদের মতন একজন বিশেষ কেউ নয়। মঞ্জুর দাম্পত্য জীবনে আর কোনোদিন মামুনের ছায়া পড়বে না।

মঞ্জু কি এ বাড়িতেই এখন কিছুদিন থাকবে? তাহলে মামুনের আর এখানে থাকা হবে না একই বাড়িতে থেকে তিনি মঞ্জুকে এড়িয়ে চলবেন কী করে?

জেলখানায় কোনোদিন ভালো ঘুমহতো না। একটানা বড় জোর এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ঘুম। আজ দুপুরে প্রাণ ভরে ঘুমিয়ে নেবেন ভাবলেন, তবু ঘুম আসছে না। ধপধপে সাদা চাদর চোখের সামনে বারবার আসছে মঞ্জুর মুখ বিস্মিত বিহ্বল, বেদনামাখা মুখ।

একটা কিছুই পড়তে পারলে সুবিধে হতো। সামনের তাকে অনেকগুলি বই। মামুন উঠে গিয়ে ঘাটঘাটি কতে লাগলেন। অনেকদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন নি, অনেকবার মানসিক অশান্তির সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

এই তাকে রবীন্দ্রনাথে বই নেই। একটা সেটা খুঁজতে খুঁজতে তিনি একটা নজরুলের কবিতা সংকলন পেলেন। মাঝখানটা খুলতেই দেখতে পেলেন এই কবিতা।

কত ছল করে যে বারে বারে দেখতে আসে আমায়।
কত বিনা-কাজের ছলে চরণদুটি
আমার দোরেই থামায়।
জানলা-আড়ে চিকের পাশে
দাঁড়ায় এসে কিসের ত্রাসে
অনামিকায় জড়িয়ে আঁচল গাল দুটকে ঘামায়॥

এ কবিতা মামুনের চেনা, একবার দেওঘর ঘুরে এসে সেখানকর কোনো একটি মেয়েকে দেখার স্মৃতি ধরে রেখেছেন এই 'ছলকুমারী' কবিতায় কাজী নজরুল।

আমার দ্বারের কাছটিতে তার ফুটতো লালী গালের টোলে
টলতো চরণ, চাউনী বিবশ...

পুরো কবিতার সংকলনটা পড়া হয়ে গেল, তবু মামুনের ঘুম এলো না। দুপুরে নিঃঝুম ভাব কেটে গিয়ে একসময় সারাবাড়িতে জেগে উঠলো বিকেলের কলরব।

খানিক বাদে মামুন নিজেই গেলেন ছাদের ঘরে আলম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। জানুয়ারি মাসের হাওয়া দিচ্ছে, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব, তবু শুধু লুঙ্গিপরে খালি গায়ে বসে আছেন শামসুল আলম। আগের চেয়ে মোটা হয়েছেন অনেক, তাঁর গৌরবর্ণ যেন ফেটে পড়ছে। মামুন তাঁকে কখনো দাড়ি রাখতে দেখেন নি, সঙ্গীতপ্রিয় আমুদে ধরনের মানুষ ছিলেন, এখন মুখে অযত্ন বর্ধিত দাড়ি। কপালে অনেকগুলি ভাঁজ।

তিনি বললেনন, আগে মামুন মিঞা আসো। তোমার ছাড়া পাওনের খবর দুপুরেই শুনেছি। তুমি ঘুমাইয়া পড়ছিলা, আমি যখন খাইতে যাই। আছো কেমন কও। জেলখানায় তোমাগো কোরআন শরীফ পড়তে দিত? নাকি জালিমগুলা তাও দ্যায় নাই?

প্রথমে এই প্রকার প্রশ্ন শুনে মামুন একটু হকচকিয়ে গেলেন। মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ তা দিত। আপনি...

মামুনের হাত ধরে কাছে টেনে এনে তিনি বড় বড় চোখ মেলে বললেন, তুব ভালো। কোরআন শরীফ পড়লে সব সময় মনে শান্তি পাওয়া যায়। তোমার মনে যে-কোনো প্রশ্ন আসুক, তুমি উত্তর

পাবা। কেমন কিনা। যেমন ধরো, মক্কায় আবির্ভূত যে সূরা এনাম, তাতে আছে "জিজ্ঞাসা করো। কোন বস্তু সাক্ষ্যদান বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? তুমি বল, তোমাদের ও আমার মধ্যে ঈশ্বরই সাক্ষী...

পরপর আয়াত বলে যেতে লাগলেন তিনি। মামুনের বিস্ময় ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছিল, তারপর তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝলেন। দুলহাভাই আগে ধর্ম নিয়ে বিশে মাথা ঘামাতেন না বরং কিছুটা ভোগবাদী নাস্তিক ধরনেরই ছিলেন। একটা বয়েসে মানুষের হঠাৎ ধর্মের দিকে মতি ফেরে। নাস্তিকেরা যখন আস্তিক হয়, তখন সর্বক্ষণ সেই আনন্দেই বিভোর হয়ে থাকে। দেশের ও সমাজের দুঃসময়ে বেশি বেশি করে ধর্মকে আঁকড়ে ধরাও স্বাভাবিক ব্যাপার।

মামুন ভক্তি ভরেই আলম সাহেবের কথাগুলি শুনে যেতে লাগলেন। তারপর একবার একটু ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দুলাভাই আপনি হঠাৎ ওকালতি ছাড়লেন কেন? এত ভালো পশার ছিল...

উদার ভাবে হেসে আলম সাহেব বললেন, আর ওসবে কী হবে? পয়সা তো যথেষ্ট করেছি। সারা জীবনে কত মিথ্যা নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করলাম এখন যদি সত্যের সন্ধান না করি, তা হইলে পরকালে কী জবাবদিহি করবো? অ্যাঁ? তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। আইজকাইল আমি প্রায়ই ঘুমের মধ্যে ফেরেশতা জিবরাইলরে স্বপন দেখি। আমার সাথে কথা বলেন। আরও কী হয় জানো, জাইগা থাকার সময়ও মাঝে মাঝে আমি কানের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি শোনতে পাই। তারপরই শুনি এক বাণী।

এবারে মামুন চোখ সঙ্কুচিত করে তাকালেন।

আলম সাহেব মুখ ঝুঁকিয়ে এনে বললেন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতেছ না? আমার উপর অহী নাজিল হয়।

মামুন খানিকটা দমে গেলেন। এত অল্পদিনে দুলাভাই এতদূর চলে গেছেন? কিন্তু এইসব বিষয়ে তর্ক চলে না। তিনি বুঝতে পারনেল এর সঙ্গে কোনো কাজের কথা বলা যাবে না এখন।

একটু পরে তিনি ওঠার চেষ্টা করতেই আলম সাহেব তাঁর ঘাড় খামচে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, মামুনমিঞা, তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছো, কও তো "খাতামান নবিয়্যীন" এর সঠিক অর্থ কী?

মামুন ব্যক্তিজীবনে ধর্মাচরণ তেমন না করলেও ধর্মশাস্ত্রগুলি পাঠ করেছেন মোটামুটি। তবু তিনি বিনীতভাবে বললেন,আ মি ও কথার অর্থ জানি না, দুলাভাই। তেমনভাবে পড়াশুনো করার আর সময় পাইলাম কোথায়?

–তুমি বলো, নবুয়তের সিলসিলা কি খতম হয়ে গেছে? পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসবে না?

–এ আপনি কী বলছেন, দুলাভাই? কোরআন হাদীশ যে পড়েছে, সে-ই তো জানে যে রসুলুল্লাহ(সঃ শেষ নবী। তিনি অনেকবার বলেছেন আমার পর আর কোনো নবী নাই আর আার উম্মতের পর আর কোনো উম্মত নাই।

–মৌলবীরা ভুল ব্যাখ্যা করেছে।

তুমি শুনে রাখো আমার কাছে। "খাতামান নবিয়্যীন" এর অর্থ নবীদের মোহর অর্থাৎ শীলমোহর। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর পর তাঁর মোহরাঙ্কিত হয়ে আরও নবী আসবেন। সেই সময় এসে গেছে।

মামুন এবার ভয় পেয়ে গেলেন। এ যে কাদীয়ানীদের মতন কথাবার্তা। মির্জা গোলাম মহম্মদ কাদিয়ানীর চ্যালারা একসময় এই রকম কথা প্রচার করেছি। কাদিয়ানীদের কেউ পছন্দ করে না। অনেকে তাদের প্রকৃত মুসলমান বলেও মনে করে না। তারা বিপথগামী।.

মামুন বললেন, এরকম কথা উচ্চারণও করবেন না, দুল্যভাই। রসুলুল্লা (সঃ) এর পর কেউ যদি নিজেকে নবী বলে দাবি করে, তাহলে সে হবে মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, কাজ্জাব। একথা আপনি বাইরে বলতে যাবেনা না, বিপদে পড়বেন।

–আলবাৎ বলবো। আমাদের পাকিস্তানের এই দুঃসময়ে একজন নবীর আবির্ভাব হবে, তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন। আমি কয়ে দিলাম, তুমি মিলায়ে নিও। আর দেরি নাই, তিনি আসবেন, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান তাঁর আদেশে সকলে সমান ভাই ভাই হবে...মুসলমান আর মুসলমানরে মারবে না, শোষন করবে না...তাকে আসতেই হবে, দোয়া করো, মামুনমিঞা, দোয়া করো..

খানিকপরে মামুন যখন উঠে এলেন, তখনও আলম সাহেব চিৎকার করছেন আপন মনে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মামুন।

সিঁড়ি দিয কয়েক ধাপ নামতেই মঞ্জুর সঙ্গে দেখা। সে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে। আগে যখন মামুন ওপরের ঘরটিতে থাকতেন, তখন কতদিন

মঞ্জু এসে তাঁকে গান শুনিয়েছে। সময় কী নিষ্ঠুর, আজ মঞ্জুকে দেখে মামুনের একটা কথা বলতেও ইচ্ছে হলো না।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার ওপরে রাগ করেছ, মামুন মামা?

মামুন কয়েক ধাপ নামতে নামতে নীরস গলায় বললেন, নারে, রাগ করবো কেন? বাবুল কেমন আছে, সে আসবে আজ?

মঞ্জু মামুনের সঙ্গে সঙ্গে নামেনি, দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। সে বললো, না, সে এ বড়িতে আসে না। মামুনমামা, সে আর আমাকে দ্যাখে না। আমার সাথে ভালো করে কথা বলে না। আমি নিজে থেকে

মামুন দ্রুত নামতে লাগলেন, তিনি মঞ্জুর বাকি কথাগুলো শুনতে চান না। মঞ্জুদের দাম্পত্য জীবনের কোনো ব্যাপারেই তিনি থাকতে চান না আর। তবু মঞ্জুর শেষ কথাগুলো ঠিকই তার কানে এলো।

মঞ্জু বললো, আমি নিজে থেকে কিছু বলতে গেলে সে তোমার নামে খোটা দ্যায়। তুমি আমারে ভালোবাসতা, আমার খোঁজ খবর নিতা, তাতেই তার রাগ...

মামুন দু'হাতে কান চাপা দিতে চাইলেন। বাবুলটা কত গাধা? মঞ্জুকে তিনি ভালোবাসতেন ঠিকই, কিন্তু তা কি কোনো অবৈধ ভালোবাসা? এক একজনের ওপর একটু বেশি স্নেহের টান থাকে না? আর তো তিনি ওদের মাঝখানে যাবেন না কথা দিয়েছেন, মনও কঠিন করেছেন, তবু বাবুল কষ্ট দিচ্ছে এই মেয়েটাকে?

মঞ্জুকে সুখী করার তা হলে বোধহয় আর একটাই উপায় আছে। মৃত্যু। এই মুহূর্তে মামুনের বেঁচে থাকার সমস্ত সাধ চলে গেল।

॥ ৬১ ॥

লণ্ডন শহরে পা দিয়ে তুতুলের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এই তবে লণ্ডন। লণ্ডন শহরটি যে ঠিক কী রকম হবে, সে সম্পর্কে তুতুলের মনে স্পষ্ট কোনো ছবি ছিল না। পত্র পত্রিকার ছবিতে কিংবা কয়েকটি ব্রিটিশ ফিল্মে সে টুকরো টুকরো লণ্ডন আগে দেখেছে, কিন্তু তাতেও কোনো ধারণা গড়ে ওঠে না। ছেলেবেলা থেকেই সে নানা লোকের মুখে লণ্ডন বা বিলেত নামটি এমন ভক্তির সঙ্গে উচ্চারিত হতে শুনেছে, যাতে তার মনে হয়েছিল সাহেবদের এই দেশটি বোধ হয় স্বর্গ-টর্গর মতন কিছু একটা হবে।

জয়দীপের মা চিন্ময়ী আগে একবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে বিমান যাত্রায় তুতুল কোনো অসুবিধে হয়নি। হিথরো এয়ারপোর্টে কাস্টমস বেরিয়ার থেকে বেরিয়ে আসার পর সামনের একটি ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চিন্ময়ী বলেছিলেন, ওই তো আমার দাদার ছেলে রঞ্জন।

রঞ্জনের বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর, ধূসর রঙের ফ্ল্যানেলের সুট পরা, গলায় চওড়া মেরুন রঙের টাই, তার গায়ের রং যেমন ফর্সা, হাবভাবও তেমনি সাহেবী সাহেবী। তার সঙ্গে একজন বন্ধু এসেছে, রঞ্জন পরিচয় করিয়ে দিল, ওর নাম সিরাজুল আলম খান, সে একজন ডাক্তার এবং জি পি। এই সিরাজুল আলম একটা বুক খোলা শার্ট পরে আছে। তার ওপর রেইন কোর্টি জড়ানো।

তুতুলের কেন যেন আগে থেকে মনে হয়েছিল, লণ্ডন শহরে বাংলায় কথা বলা যায় না। সাহেবরা বাংলা শুনলে রাগ করবে। ইংরিজি বলা সম্পর্কেই তুতুলের মনে জমে ছিল রাজ্যের দ্বিধা আর আশঙ্কা। ইংরিজিতে কথা বলা তো তার অভ্যেস নেই, ঠিক সময়ে শব্দটি মনে পড়তে চায় না। কিন্তু এখানে অন্য অনেকেই, যারা আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিতদের নিতে এসেছে, তারা দিব্যি হিন্দী, গুজরাটি, বাংলায় কলকল করে কথা বলে যাচ্ছে। আলম নামের লোকটি এক গাল হেসে পূর্ব বাংলার বাসায় তুতুলকে বললো, দ্যান আপনার লাগেজটা আমারে দ্যান।

তুতুলের কাঁধে একটি ভারি ব্যাগ, তবু সে সেটা নিজেই কাছে রাখতে চাইলো, সদ্য পরিচিত এক ব্যক্তিকে দিয়ে সে তার ব্যাগ বহন করাতে চায় না। আলম দু'তিন বার অনুরোধ করলেও তুতুল লাজুকভাবে বললো, না না, ঠিক আছে।

রঞ্জন চিন্ময়ীর ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বললো, পিসীমা, জয়দীপ ভালো আছে, খুব কুইক রিকভারি হচ্ছে, বাবা এয়ারপোর্টে আসতে পারলেন না। হি হ্যাজ অ্যান ইমপর্টান্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে যেতে লাগলো সামনের দিকে। তুতুল মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিমানবন্দরে মানুষজনদের দেখছিল ভালো করে, এত ভারতীয়দের উপস্থিতি দেখে সে বিস্মিত হচ্ছিল, হঠাৎ তার শাড়ীর আঁচলে যেন কার পা পড়লো, একজন মানুষের ধাক্কা, তার ব্যাগটাও গলে নেমে এলো কাঁধ থেকে। একই সঙ্গে শাড়ী ও ব্যাগটা সামলাতে গিয়ে সে পারলো না, সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সামনের দিকে। একেবারে সোজাসুজি আছাড় খেয়ে পড়লে কী লজ্জার ব্যাপারই হতো, তুতুল একেবারে মরমে মরে যেত, কক্ষু সে পড়বারই আগেই তাকে ধরে ফেললো আলম। ক্ষিপ্র হাতে তুতুলে ডানবাহু ও পিঠ ধরে সামলে নিয়ে সে ফিসফিস করে বললো, কিছু হয় নাই, লজ্জার কিছু নাই। প্রথমপ্রথম এইরকম একটু হয়, এই দ্যাখোকেউ কাউরে দ্যাখে না,ধাক্কা মাইরা শুধু সরি কইয়া চইল্যা যায়। বললাম না, আপনার ব্যাগটা আমারে দ্যান।

চিন্ময়ী রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলায় নিমগ্ন ছিলেন, তিনি এই ছোট ঘটনাটা দেখতে পেলেন না। আলমকে নীরব দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা জানালো তুতুল।

আলম জিজ্ঞেস করলো, আপনিও ডাক্তারির ছাত্রী শুনলাম?

তুতুল যে এম বি বি এস পাশ করেছে সে কথা আর জানালো না, মাথা নাড়ালো শুধু। এখনও লজ্জায় তার শরীর কাঁপছে।

এয়ারপোর্টের মধ্যে বেশ গরম ছিল, বাইরে বেরুতেই কনকনে শীতের হাওয়া ঝাপটা মারলো চোখেমুখে। তুতুলের ওভারকোটা নেই, সে পরে আছে দুটো সোয়েটার, তবু সে কেঁপে উঠলো শীতে।

তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়া হলো। কালো রঙের চৌকো ধরনের গাড়ি সামনের সীট ও পেছনের সীটের মাঝখানে কাচের দেওয়ালউতুরে ধারণা ছিল সব ট্যাক্সিতেই বুঝি হলুদ রং থাকে। চারজন যাত্রী তোলার ব্যাপারে ট্যাক্সি ড্রাইভারের আপত্তি ছিল, রঞ্জন তার সঙ্গে কী একটা চুক্তি করলো। গাড়িরমধ্যে আর অতটা ঠাণ্ডা নেই।

শহরতলি অঞ্চলটা বেশ সুন্দর লাগছিল তুতুলের। বিশ মিষ্টি মিষ্টি চেহারার বড়ি চওড়া রাস্তার দু'পাশে গাছ। তুতুল জানলা দিয়ে অবাক চোখ মেলে দেখছে, রাস্তায় লেকজন প্রায় নেই বলতে গেলে। মুদু গাড়ি। সে তাহলে সত্যিই বিলেতে চলে এসেছে, এখন থেকে কলকাতা কত দূর।

শহরে ঢোকার পরই তার আবার মনে হলো, এই লণ্ডন।

এমন কিছু অচেনা বা রোমহর্ষক তো লাগছে না। লাল রঙের ডবল ডেকার বাস, বাড়িগুলোর আকরও চেনা চেনা, কলকাতার ডালহাউসি, পার্ক স্ট্রিট,এমনকি ভবানীপুরের সঙ্গেও বেশ মিল। গুঁড়ি গুঁড়ি শাড়ী পরা মহিলা কিংবা মুখভর্তি দাড়িগোঁফ ও মাথায় পাগরিপরা সর্দারজীদের দেখে সে চমকে চমকে উঠছে।

তুতুল জানতো জয়দীপের মামার বাড়ি বেল সাইজ পার্কে। সে মনে মনে ছবি এঁকে রেখেছিল, বিরাট একটি পার্কের পাশে হবে সেই বাড়ি। ট্যাক্সিটা কিন্তু বেশি কয়েকটা ছোট ছোট রাস্তা ঘুরে থামলো একটা বাড়ির সামনে। তার আশেপাশে কোনো পার্ক নেই।

রাস্তাটি মহিম হালদার স্ট্রিটের মতনই সরু। ফুটপাথে অসংখ্য ঝরাপাত। পাশাপাশি সব বাড়িগুলিই প্রায় একরকম দেখতে। প্রত্যেক বাড়ির সামনেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি তারপর দরজা। সেই সিঁড়ির দু'পাশে কয়েকটা গোলাপ ফুলের গাছ। তিন চরিটি নিগ্রো ছেলে সেই রাস্তায় একটা ফুটবল পেটাচ্ছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই রঞ্জন তুতুলকে বললো, চটপট বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ো নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

আলম সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজার বেল বাজালো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিল একটি কিশোরী মেয়ে, তার এক হাতে একটা চকোলেট বার। একগাল হেসে সে বললো, ওয়েলকাম টু লানডান। ডিড য়ু হ্যাভ আ নাইস জার্নি?

তারপরই সে গলা চড়িয়ে বললো, মামমি, দা গেস্টস হ্যাভ অ্যারাইভড, উইল য়ু প্লীজ কাম ডাউন?

ওপরতলা থেকে উত্তর এলো, ওয়ান মোমেন্ট ডিয়ার।

এতক্ষণ বাদে তুতুলের বুক টিপটিপ করতে লাগলো। এইবার জয়দীপের সঙ্গে দেখা হবে। জয়দীপকে সে প্রথম কী কথা বলবে? জয়দীপের মামা মামীমা যদি ভাবেন, তুতুল কে হয় জয়দীপের? সে কলকাতা থেকে এতদূর উড়ে এসেছে কেন?

মালপত্র ভেতরে পৌছে দেবার পর তুতুল আর চিন্ময়ীকে আলম বলল, আমি এবার চলি। আমাকে সার্জারিতে যেতে হবে। বাই-ই

রঞ্জন পাশের একটা বসবার ঘর দেখিয়ে বললো, পিসিমা, এইখানে বসুন আপনারা টেইক সাম রেস্ট, মা আপনাদের ঘরটা প্রিপেয়ার করে দেবেন।

চিন্ময়ী সে ঘরে না ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, জয়দীপ কোন ঘরে? আমি আগে সেখানে যাবে।

রঞ্জু চট করে উত্তর না দিয়ে বসবার ঘরের সোফা থেকে অদৃশ্য ধুলো ঝাড়তে লাগলো। ম্যান্টল পীস থেকে একটা ঘড়ি তুলে নিয়ে দম দিল।

চিন্ময়ী আবার বললেন, রঞ্জু খোকা কোন ঘরে আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

রঞ্জন এবার মুখফিরিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো চিন্ময়ীর দিকে। তারপর বললো, পিসিমা, সরি, তোমাকে আগেই ডিসক্লোজ করিনি বাবা অ্যাডভাইজ্‌ড মী টু ডু সো, তোমরা খানিকটা রেস্ট নেবার পর মানে এতখানি জার্নি করে এসেছো তো, এখন কিছুটা রেস্ট করে না নিলে....

চিন্ময়ী তীক্ষ্ণগলায় জিজ্ঞেস করলেন, খোকার কী হয়েছে রঞ্জু...

রঞ্জন সারা শরীর মুচড়ে বললো না, না, জয়দীপ ভালো আছে। হিজ কণ্ডিশান ইজ মিরাকুলাসলি ইমপ্রুভিং তবে দু'দিন আগে তাকে হসপিটালাইজড করা হয়েছে হি ইজ আন্ডারগোয়িং কেমোথেরাপি ট্রিটমেন্ট, বাড়িতে ঠিক সুবিধে হয় না, অনেক প্যারাফারনেলিয়া আছে তো।

চিন্ময়ী অস্ফুট গলায় বললেন, খোকা হাসপাতালে? দাদা যে আমাকে লিখেছিল বাড়িতেই ...

রঞ্জন বললো, আগে বাড়িতে রেখেই ট্রিটমেন্ট চলছিল, কিন্তু এখন এই স্টেজে কেমোথেরাপি না করালে...তা ছাড়া তোমরা আসছো, বাড়িতে সবার অ্যাকোমোডেশানের কোয়েশ্চন আছে হসপিটালে হি উইল গেট দা বেস্ট অ্যাটেনশন।

চিন্ময়ী আচ্ছন্নভাবে বললেন, চল আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল।

রঞ্জন বলল, এখনই তো যাওয়া যাবে না, ভিজিটিং হাওয়ার্স ছাড়া।

তুতুল আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে। জয়দীপ হাসপাতালে আছে শুনে তারও বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল অবশ্য এটা কি ঠিক? কেমোথেরপির জন্য হাসপাতালই উপযুক্ত, বিলেতের হাসপাতালের নিশ্চয়ই ব্যবস্থা খুব ভালো। কিন্তু জয়দীপ যদি হাসপাতালে থাকে, তাহলে তো তাকে তুতুলের সেবা করার প্রশ্ন আসে না। হাসপাতালে সে কতক্ষণ জয়দীপের পাশে থাকতে পারবে।

ওপরের সিঁড়ি দিয়ে এবারে নেমে এলেন ড্রেসিং গাউনপরা একজন মোটাসোটা মহিলা। এমনই ফর্সা তিনি যে তুতুলে প্রথমে মনে হলো মেমসাহেব নাকি? তারপরেই নজরে পড়লো তাঁর মাথার চুল ভারতীয়দের মতো কালো।

তিনি নিচে এসে চিন্ময়ীর হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, কেমন আছো, চিনু? জার্নিতে কষ্ট হয়নি তো? ওঃ, যা ব্যাড ওয়েদার চলছে লন্ডনে, রেইনিং অল দা টাইম, ইউ নো, দু'একদিনের মধ্যেই ইট উইল স্টার্ট স্নোয়িং তোমরা একটু ওয়াশ করে নেবে? ইউ মাস্ট বী স্টারভিং। প্লেনে যা বিচ্ছিরি খাবার দেয়, আমি তোমাদের জন্য ইণ্ডিয়ান ফুড কুক করে রেখেছি...

চিন্ময়ী তুতুলকে দেখিয়ে বললেন, অমলা এই মেয়েটির নাম বহ্নিশিখা সরকার জয়দীপের সঙ্গে পাস করেছে।

অমলা সঙ্গে সঙ্গে তুতুলে দিকে ফিরে বললেন অফ কোর্স। তুমি তো এর কথা লিখেছিলে, শী উইল স্টে উইথ আস, তুমি ভাই জুতোটুতো খোলো...

তুতুল আগেই শুনেছিল, চিন্ময়ীর এক স্কুলের বন্ধবীর সঙ্গে তাঁর দাদার বিয়ে হয়েছিল সেইজন্যই চিন্ময়ী এঁকে বৌদি না বলে নাম ধরে ডাকলেন। চিন্ময়ীর দাদা অমরনাথ বিলেত থেকেই ডাক্তারি পাস করে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, সেখানেই বিয়ে করেছেন, কিন্তু কলকাতায় প্র্যাকটিস জমাতে না পেরে সপরিবারে চলে এসেছিলেন এদেশে, বারো তের বছর আগে।

অমলা এমন উচ্ছ্বসিত ভাবে কথা বলতে লাগলেন, ওদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে খেতে বসিয়ে দিয়ে লণ্ডনে কী কী খাবার পাওয়া যায় এবং যায় না সে বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন, যেন চিন্ময়ী ও তুতুল দেশভ্রমণের জন্য এসেছে এখানে।

রান্নাঘর ও খাবারঘর একই সঙ্গে জোড়া। গোল ডাইনিং টেবিলে ছটি চেয়ার। কে কোন চেয়ারে বসবে তাও বলে দিলেন অমলা। তুতুল বুঝলো, এদেশের খাবার ঘরে যে-কোনো চেয়ারে বসা যায় না। টেবল ম্যাটের ওপর একটা করে প্লেট ও সাইড ডিশ দিয়ে তার ওপর কাগজের রুমাল সাজিয়ে,

অমলা তাঁর ছেলেকে বললেন, রঁন টু ডে ইজ ইয়োর টার্ন টু ওয়াশ দা পট্‌স অ্যাণ্ড প্যান্‌স, ডোন্ট ফরগেট..। তারপর চিন্ময়ী ও তুতুলের দিকে যুগপৎ তাকিয়ে বললেন, জানো তো এদেশে এই একটা বিচ্ছিরি নিয়ম, আফটার ইউ ফিনিশ ইয়োর ফুড, ইউ ডোন্‌ট নীড ইয়োর প্লেইটস অ্যাণ্ড গ্লাসেস অন দ্যা টেব্‌ল নিজেরটা নিজেকেই ধুতে হয়, ঝি চাকর তো পাওয়া যায় না এদেশে।

একটুখানি দেখেই তুতুলের মনে হলো, অমলার কথা বার ধরনটা বেশ কৃত্রিম চিন্ময়ীর প্রতি তাঁর ব্যবহার স্কুলে বান্ধবীর মতন তো নয়ই, একজন নিকটা আত্মীয়কে অনেকদিন পর কাছে পাওয়ার কোনো আন্তরিক আনন্দও তাতে নেই। বাড়ির মধ্যেও অনাবশ্যক ইংরিজি বলছেন তিনি, সেই ইংরিজিতেও ছোট ছোট ভুল।

প্রথমে দুটি গেলাসে ফলে রস দিয়ে তিনি বললেন, এপ্রিকট জুস, আগে খেয়েছো, চিনু? দ্যাখো, আই থিংক ইউ উইল লাইক ইট। তোমরা চীজ্‌ খাও তো? আমি চীজ দিয়ে কারি রেঁধেছি, আমার ছেলেমেয়েদের খুব ফেভারিট ডিশ্‌।

ফলের রসের গেলাসটা ঠোঁটের কাছে এনেও স্পর্শ না করে নামিয়ে রেখে চিন্ময়ী বলরেন, আমার এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, অমলা। জয়দীপ হাসপাতালে আমি জানতুল না...ওকে কখন দেখতে যাবো?

অমলা বললেন, হাসপাতালটা বেশি দূর নয়, টিউবে মাত্র তিনটে স্টেশন, বাট ইউ কান্ট গো দেয়ার এনি টাইম ইউ লাইক ইউ নো, ভিজিটিং আওয়ার্স ছাড়া...

–কটায় ভিজিটিং আওয়ার?

–কখন রে, রঞ্জন?

রান্নাঘরে ডেকচ মাজতে মাজতে রঞ্জন উত্তর দিল, ফোর থার্টি। ইউ হ্যাভ টু ওয়েইট অ্যানাদার হাওয়ার...

তুতুলের কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। জীবনের প্রথম বিমান যাত্রায় তার মাথায় যেন এখনো একটা ঘোর লেগে আছে। দুটো কান দিয়ে মাঝে মাঝে ফুস ফুস করে বেরুচ্ছে হাওয়া। প্লেনে চাপতে হয়েছিল মাঝরাত্রে। সকালবেলা প্লেনের বাথরুমের সামনে যাত্রীদের লাইন দেখে সে প্রাতঃকৃত্য সারতে পারেনি, শরীরটা নোংরা নোংরা লাগছে। এতদূরের পথ পাড়ি দিয়ে আসার পর সে ভেবেছিল, এ বাড়িতে একটা নিজস্ব ঘর পেয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবে, জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করবে..। কিন্তু এখনও তাদের ঘর দেখিয়ে দেওয়া হয়নি, প্রথমেই এনে বসিয়ে দেওয়া হলো খাবার টেবিলে, এটা তুতুলের অদ্ভুত লাগছে। এ দেশে বুঝি এরকমই নিয়ম।

চিন্ময়ী কিছুই খেলেন না, তুতুলকে বাধ্য হয়ে কিছু মুখে দিতে হলো, তারপর সবাই মিলে এলো বসবার ঘরে। অমলা বললেন, তোমরা একটু টি ভি দ্যাখো, ততক্ষণে আমি তোমাদের বেডরুমটা....

এটা চিন্ময়ীর দাদার বাড়ি, তবু তিনি এ বাড়িতে অতিথি। তিনি গম্ভীর হয়ে আছেন। টি ভি জিনিসটা আগে দেখেনি তুতুল, রঞ্জন সেটা চালিয়ে দিল, তাতে দ্বিতীয় মহাযুওদ্ধর একটা ফিল্ম দেখানো হচ্ছে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তুতুল আর কোনো আগ্রহ বোধ করলো না।

একটা ব্যাপারে তুতুলের খটকা লাগলো। চিন্ময়ী যে আজ লণ্ডনে এসে পৌছোবেন, তা তো অনেক আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবু তাঁর জন্য থাকার ঘর আগে ঠিক করে রাখা হয়নি? এ বাড়িতে পৌছোবার দেড়ঘন্টার মধ্যেও তারা বসার ঘর ও খাবার ঘর ছাড়া আর কিছুই দেখেনি।

একটু পরে অমলা এসে ওদের ডেকে নিয়ে গেলেন সিঁড়ির পাশের একটা ঘরে। বেশ ছোট ঘর, কলকাতায় তুতুল আর মুন্নির ঘটার মতনই। জানলায় সাদা লেসের পর্দা। দেওয়ালের র‍্যাকে প্রচুর বই। একপাশে একটি মাঝারি সাইজের খাট ঘরটায় পুরুষ পুরুষ গন্ধ।

অমলা বললেন, তোমাদের দু'জনকে এ ঘরে স্কুইজ করে থাকতে হবে একটু কষ্ট হবে হয়তো এটা আমার ছেলের ঘর।

চিন্ময়ী ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, রঞ্জুর ঘর? তাহলে রঞ্জু কোথায় শোবে?

–ও কটা দিন বেসমেন্টে ঘুমোবে।

–তোমার আর এক ছেলে শংকর, সে কোথায় ? তাকে দেখছি না?

–সে এখন এ বাড়িতে থাকে না।

–জয়দীপ কোঘরে থাকতো?

–ওপরে দুটো ঘর আছে, বুঝলে, জয়দীপ কিছুদনি ওপরের ঘরে ছিল, কিন্তু আমার মেয়ে নীটা,

সে বড় হচ্ছে, শী নিড্স সাম প্রাইভেসি তাই জয়দীপকে এ ঘরেই রাখা হয়েছিল।

খানিকবাদে অমলা বেরিয়ে যাবার পর চিন্ময়ী দেওয়ালে একটি ছবি দেখার ছলে তুতুলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়োলেন। মাত্র দুবার হেঁচকির মতন সামান্য কান্নার আওয়াজ শোনা গেল, তারপর শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছে তিনি মুখ ফিরিয়ে তুতুলকে বললেন, জামা কাপড় বদলাবে তো বদলে নাও, হাসপাতালে যাবার সময় হয়ে গেছে।

এবারে আর ট্যাক্সি নয়, টিউব ট্রেন। প্রথম টিউব ট্রেনে চাপার অভিজ্ঞতাও তুতুলের এমন কিছু অসামান্য মনে হলো না। সব কিছুই তো অন্য ট্রেনের মতন, শুধু মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া। তুতল ভেবেছিল কলকাতার বাস ট্রামের মতন এদেশে কেউ দাঁড়িয়ে যায় না। তা তো ঠিক নয়, ট্রেনে বেশ ভিড়, অনেকেই দাঁড়িয়ে কগজ পড়ছে, ওঠা ও নামার সময় রীতিমতো ঠ্যালাঠেলি।

অমলা বা তাঁর মেয়ে আসেনি, রঞ্জনই ওদের পথ প্রদর্শক। রঞ্জনকে আজঅফিস থেকে ছুটি নিতে হয়েছে। হাসপাতালে ঢোকার মুখে রঞ্জন চিন্ময়ীকে বললো, ইয়ে পিসিমা..এদেশে হাসপাতালে কেউ চেঁচিয়ে কথা বলে না, কান্নাকাটিও করে না।

কথাটা শুনে বেশ বিরক্ত বোধ করলো তুতুল। রঞ্জন কি তার পিসিমাকে ঠিক মতন চেনে না? চিন্ময়ীর মতন বিদুষী মহিলা কি কলকাতার হাসপাতালে গিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলেন, না কান্নাকাটি করেন?

লিফ্ট দিয়ে তিনতলায় উঠে লম্বা করাইডোর দিয়ে হেঁটে একেবারে কোণের একটি ঘরে ঢুকলো রঞ্জন। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই থমকে গেল তুতুল। ক্যাবিন বটে কিন্তু জয়দীপের নিজস্ব নয়। দুটি বেড। প্রথম বেডটিতে শুয়ে আছে একজন বিশালাকায় কালো মানুষ, তাকে ঘিরে রয়েছে তার আত্মীয় স্বজন। তাদের ভেদ করে জয়দীপকে প্রথমে দেখাই গেল না।

এই একটা ছোট ঘরে, অন্য লোকজনদের সামনে সে জয়দীপের সঙ্গে কী কথা বলবে?

জয়দীপকে চেনাই যায় না। অমন চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তার, লম্বা চওড়া পুরুষ হঠাৎ যেন গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। তার মুখখানা মসীবর্ণ। চিন্ময়ী প্রথমে এগিয়ে গিয়ে শুধু বললেন, খোকন। জয়দীপ তার মায়ের হাত চেপে ধরে চোখ দিয়ে তুতুলকে খুঁজতে লাগলো। তুতুল চিন্ময়ীর পাশে এসে দাঁড়াতে জয়দীপ তার মাকে ছেড়ে তুতুলের দিকে হাত বাড়ালো, তুতুল তার কম্পিত হাত রাখলো জয়দীপের বুকে। তার মনে হলো, সে নিজেই বুঝি ভদ্রতা রক্ষা করতে পারবে না, হঠাৎ তার গলা দিয়ে তীব্র কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসবে।

ফ্যাসফেসে হয়ে গেছে গলার আওয়াজ, সে বললো, আমি ভালো আছি।

কলকাতার খবর কী? হেমকান্তি শিখা ওরা কেমন আছে?

অমলা বা রঞ্জন একবারও কলকাতার কোনো খবর জিজ্ঞেস করেনি। কলকাতার কোনো একজন মানুষের কথাও জানতে চায়নি।

পাশের নিগ্রো পরিবার বেশ জোরে জোরে কথা বলছে। একজন একটি বিয়ারের টিন খুলে তাদের রুগীকে খাওয়ালো। চিন্ময়ী আর তুতুলকে রেখে রঞ্জন সিগারেট খেতে বেরিয়ে গেছে। ওরা প্রায় নিঃস্তব্ধ হয়ে বসে রইলো জয়দীপের পাশে। আশ্চর্য মনের জোর চিন্ময়ী, ছেলের কাছে এসে চোখ ভেজেনি তাঁর। একটু বাদে তিনি বললেন, বহ্নিশিখা, তুমি খোকনের কাছে একটু একা থাকো, আমি বাইরে দাঁড়াই।

একা একা কী কথা বলবে তুতুল? জয়দীপ একবার জিজ্ঞেস করলো তোমাকে কি মা জোর করে ধরে এনেছে? তুমি টিকিটের টাকা ফেরত দিয়েছো শুনলাম....

তুতুল জোরে জোরে মাথা নাড়লো। তারপর বললো, তুমি বেশি কথা বলো না।

পাশের বেডের রুগীকে একজন স্বাস্থ্যবতী মহিলা অন্যদের সামনেই ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে, সেদিকে চোখ পড়তেই লজ্জায় অরুণবর্ণ হয়ে গেল তুতুলের মুখ। জয়দীপ নিজের হাতটা তুলে দিল তুতুলের গালের ওপর।

এতদূর থেকে আসা, তবু জয়দীপের সঙ্গে বিশেষ কোনো কথাই হলো না। পাশের রুগীটি দু'তিনদিন পরেই ছাড়া পাবে, সেই আনন্দে তার আত্মীয়স্বজন বেশি উচ্ছ্বসিত। দু'একবার অবশ্য তারা চিন্ময়ী আর তুতুলের দিকে ফিরে বললো, স্যরি। একটু গলা নামিয়ে কথা বলার চেষ্টাও করলো তারা, মিনিট খানেক বাদেই আবার যে কে সেই।

চিন্ময়ী আর তুতুল একটি দুটি বাক্য বিনিময় করতে লাগলো জয়দীপের সঙ্গে। বাকি সময় চুপ

করে চেয়ে থাকা। তুতুল ভালো করে তাকাতে পারছে না জয়দীপের দিকে। সেই মুখ থেকে জীবনের আভা অনেকখানি মিলিয়ে গেছে।

বিদায় নেবার আগে তুতুল জয়দীপের হাতে ছোঁয়ালো তার ঠাণ্ডা ওষ্ঠ।

বাড়ি ফেরার পর দেখা হলো অমরনাথের সঙ্গে। তিনি নিজে ডাক্তার হলেও নিজস্ব প্র্যাকটিস নেই, চাকরি করেন একটি ওষুধের ফার্মে। বেশ দীর্ঘকায় পুরুষ, হঠাৎ মোটা হতে শুরু করেছেন মনে হয়, চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। কে একজন মানুষ থাকে যাদের কোনো পোশাকেই ঠিক মানায় না, অমরনাথও সেইরকম। সুটটা তার গায়ে যেন ঢলঢল করছে। টাইয়ের গিট আলগা তার দাড়ি কামানো মুখেও গলার কাছে কিছু পাকা দাড়ির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

অমরনাথ ইংরিজি ব্যবহার করেন না বিশেষ। বসবার ঘরে সোফায় এলিয়ে বসে তিনি বললেন, বুঝলি চিনু, আজকের দিনটাতেই এমন কাজ পড়ে গেল, এক ব্যাটা আইরি সাহেব আজই এসে উক টেকিং করার জন্য যাক তোদের অসুবিধে হয়নি তো কিছু? প্লেনটা তো লেট করেছে আড়াই ঘন্টা, তারপর তোরা এমন সময় এলি, সারাদিন প্যাচপেচে বৃষ্টি

কথা বলতে বলতে অমরণাত পাশের সোফায় পা তুলে দিতেই অমলা ধমক দিয়ে বললেন, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং? তোমার ন্যাস্টি হ্যাবিটগুলো কিছুতেই যাবে না।

স্ত্রীর কথা শুনে পা নামালেন বটে অমরণাথ, কিন্তু উল্টে ধমক দিয়ে বললেন, টি ভিটা বন্ধ কর না, কী ভ্যাজর ভ্যাজর শুনছো....

অমলা বললেন, আজ একটা সিরিয়াল আছে, এটা আমি মিস করি না...

–তা বলে আমার বোন এসেছে এতদিন বাদে তার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না? আস্তে করো, আমার বোতল আর গেলাস এনে দাও?

–ইউ গেট ইয়োর ওউন ড্রিংকস্।

অমরনাথ উঠে গিয়ে একটা কাবার্ড খুলে একটা হুইস্কির বোতল আনলেন। গেলাসে অনেকখানি ঢেলে একটা বড় চুমুক দিয়ে বললেন, সারাদিন এমন গাধার খাটুনি গেছে, এই শালা আইরিশগুলো এমন খচ্চর হয়–

ঘরের এক কোণ থেকে ছোট মেয়ে নীটা বললো, ড্যাডি, মাইন্ড ইয়ের ল্যাঙ্গোয়েজ।

চিন্ময়ী যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন। হুঁ-হুঁ ছাড়া কিছুই বলছেন না। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর অমরনাথ দাঁড়িয়ে বললেন, ও আজ তো আবার নেমন্তন্ন আছে, চিনু তোরা তৈরি হয়ে নে। উপেন মিত্তিরকে মনে আছে তো। বাবার বন্ধু ছিলেন, তার ছেলে কল্যাণ এখানে বড় চাকরি করে, তোরা আজআসছিস শুনে পার্টিতে ডেকেছে। চল আর বেশি দেরি করা যাবে না, যেতে হবে সেই সাউথ লণ্ডনে।

তুতুল শিউরে উঠলো কথাটা শুনে। কলকাতা থেকে আজই এসে পৌঁছেছেন চিন্ময়ী। হাসপাতালে অতখানি অসুস্থ ছেলেকে দেখার পর তিনি এখন নেমন্তন্ন খেতে যাবেন? অথচ অমরনাথ এমনভাবে বললেন কথাটা, যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

চিন্ময়ী মৃদু গলায় বললেন, দাদা আমি আজ খুব ক্লান্ত, আমি আজ কোথাও যাবো না।

কিন্তু তুতুলছাড়া পেল না। সে অনেকবার না না বললেও অমরনাথ তার আপত্তি গ্রাহ্যই করলেন না, প্রায় জোর করেই তুতুলকে নিয়ে গেলেন। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা বলে তুতুলকে পরিয়ে দেওয়া হলো অমলার একটা ওভারকোট।

কল্যাণ মিত্রের বাড়ির পার্টিতে চোদ্দ পনেরো জন নারীপুরুষ, সকলেই অতিরিক্ত সুসজ্জিত এ বাড়িটাও অনেক বেশি সাজানো। এক কোণে খোলা হয়েছে বার কাউণ্টার প্রত্যেকের হাতে নানারকম মদের গেলাস এরম কোনো পার্টিতে তুতুল কখনো যায়নি, সে সিনেমায় দেখেছে। কল্যাণ মিত্রের স্ত্রী গায়ত্রী অবশ্য বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে আলাপ করলেন তুতুলের সঙ্গে। আলাপ হলো আরও দু'জন মহিলার সঙ্গে। মেয়েরা কেউ কেউ বীয়ার বা ওয়াইন নিয়েছে তুতল নিল কোকাকোলা।

একটু পরে সেখানে এসে ঢুকলো আলম, তার সঙ্গে শিরিন নামে একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে। একমাত্র আলমের গলাতেই টাই নেই। সে সোজা তুতুলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী ঘুম পাইতেছে না? জেট ল্যাগ হয় নাই?

তুতুল দু'দিকে মাথা নাড়ালো।

আলম ধপাস করে তার পাশে বসে পড়ে বলল, মিস সরকার না বাহ্নিশিখা দেবী কী নামে ডাকব

আপনাকে?

তুতুল বলল যেটা আপনার খুশি।

–আমারে আপনি শুধু আলম কবেন, আমি বহ্নিশিখা বলে ডাকবো, ঠিক আছে?

তুতুল ঘাড় হেলালো। আলম তার সঙ্গের মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, শিরিন তুমি এনার পাশে বসো, ভদ্রমহিলা নতুন আসছেন। একটু অস্বস্তি ফিল করবেন তো বটেই, তুমি একটু লণ্ডনের হালচাল বুঝাইয়া দাও।

তুতুলের অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে। শিরিনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও সে চোখ মেলে রাখতে পারছে না।

এখানে কেউ জয়দীপের নাম একবারও উচ্চারণ করেনি। এই সব পার্টিতে অসুখের আলোচনা করা বোধ হয় নিষেধ।

খাবার দেওয়া হলো রাত এগারোটার পর। সে খাওয়া যেন আর শেষ হতেই চায় না। খাওয়ার চেয়ে গল্প আর হাসাহাসি হচ্ছে বেশী। এমন সব লোকের নাম নিয়ে অন্যরা গল্প করছে, যাদের কারুকেই তুতুল চেনে, না, সে কিছু বুঝতেও পারছে না। শিরিন আর আলম চলে গেছে ডিনার না খেয়েই, তারপর আর তুতুলের সঙ্গে কেউ কথা বলে না।

বাড়ি ফিরতে রাত একটা হলো। অমরনাথ বেশ মাতাল হয়ে গেছেন, তাই গাড়ি চালালেন অমলা। আসবার সময় তুতুল গাড়িতে ঘুমে ঢুলতে লাগলো, অধিক রাতে লণ্ডনে নগরের দৃশ্য তার দেখা হলো না।

চিন্ময়ী তখনও জেগে আছেন তুতুলের জন্য। বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসা, তাঁর হাতে একটাই বই। এক নজর দেখেই তুতু বুঝতে পারলো, সারা সন্ধে তিনি এক একা কেঁদেছে চোখদুটি ফোলা।

কিন্তু এখন তাঁর কণ্ঠস্বরে কোনো জড়তা নেই। তুতুলকে তিনি দরজাটা বন্ধ করে দেবার ইঙ্গিত করলেন। তারপর বললেন, বহ্নিশিখা, আমি একটা জিনিস ঠিক করেছি, তোমাকে এতদূরে শুধু শুধু নিয়ে এলাম, কিন্তু উপায় নেই, আমি জয়দীপকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

তুতুল কিছু বলার আগেই তিনি আবার বললেন, তোমার যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, তা আমি দেখবো। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আজ ভালো করে ঘুমিয়ে নাও..

তারপর তিনি তুতুলের একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে মাথা নীচু করে রইলেন।

॥ ৬২ ॥

সারারাত ভালো করে ঘুমোতে পারেনি তুতুল। দু'কানে অবিরল শুনতে পাচ্ছিল বিমানের গোঁ গোঁ ধ্বনি, তাছাড়া কূল-কিনারাহীন দুশ্চিন্তা। চিন্ময়ীও জেগেই ছিলেন মনে হয়, কিন্তু ছটফট করেননি। জানলার সব পর্দা টানা, সকালের আলো ফুটলেও বোঝা যাবে না। তুতুল এক সময় বেড সুইচ টিপে ঘড়ি দেখল। পৌনে সাতটা তার মানে তো রীতিমতন সকাল তুতুলের ছ'টার মধ্যে উঠে পড়া অভ্যেস। সে ধরড়মড় করে নেমে পড়লো খাট থেকে। চিন্ময়ীর চক্ষু বোজা, নিঃশ্বাস পড়ছে সমান ভাবে, বোধ হয় ভোরের দিকে তাঁর একটু ঘুম এসেছে।

ঘরের দরজা খুলে বেরুতে গিয়ে তুতুল একটু দ্বিধা করলো। সে শাড়ি পরেই শুয়েছিল। অমলাকেসে বাড়িতে ঐ রকমই একটা পোশাক পরে থাকতে দেখেছে। তুতুলের ওসব কিছু নেই। তাহলে কি হবে? এখানে এসে কোনো আদব কায়দাভুল না হয়ে যায়, সেই ভয় তুতুলের সব সময়। কিন্তু তাকে তো এখন বাথরুমে যেতেই হবে। দরজায় কান রেখে সে শুনলো, বাইর কোনো শব্দ নেই, সে দরজাটা খুলে ফেললো।

সারা বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ বাড়ির কেউ এখনো জাগেনি মনে হয়। বিলেতে সবাই তো বেশ সকাল সকাল স্কুল কলেজে, অফিসে যায়। এরা কেউ যাবে না? আজ কী বার, আজ বুধবার, ছুটির দিন তো নয়। বসবার ঘরে এসে তুতুল ভারি পর্দাটা সরিয়ে বাইরেটা একটু দেখলো, এবংচমকে উঠলো। ঘড়িটা কি সে ভুল দেখেছে, এখনও ভোর হয়নি? না, বসবর ঘরের একটা ঘড়িতেও একই সময়। বাইরেটা এখনও রীতিমতন অন্ধকার, ছির ছির কর বৃষ্টি পড়েই চলেছে, রাস্তায় কোনো মানুষ নেই। বিলেতে তার এথমসকাল, কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়।

এখন সকাল সাতটা, তার মানে কলকাতায় দুপুর। ঝকঝক করছে রোদ, রাস্তায় কত মানুষ রান্নাঘরে এতক্ষনে মা কিংবা মামীমার রান্না প্রায় শেষ, বাবলু নিশ্চয়ই এখন বাড়িতে নেই, মুন্নি কলেজে গেছে, টুনটুনি সারা বাড়ি ঘুরঘুর করছে স্পষ্ট সবদেখতে পাচ্ছে তুতুল, তুব কলকাতা কত দূরে।

মাকে চিঠি লিখতে হবে, সবাইকে চিঠি দিতে হবে। কাল তো একটুও সময় পাওয়া যায়নি। কয়েকখানা এরোগ্রাম কিনতে হবে, কত দাম লাগবে কে জানে, তুতুলের কাছে আছে মাত্র তিন পাউণ্ড।

ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠতেই দারুণ চমকে কেঁপে উঠলো তুতুল। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ তাকে বলে বাইরের কোনো শব্দ শোনা যায় না, সারা বাড়িতেই কোনো শব্দ নেই। টেলিফোনের শব্দটা তাই এত জোরালে মনে হয়। তুতুল কোনোদিন এত নিস্তব্ধ বাড়িতে থাকেনি।

ফোনটা দেওয়ালের গায়ে, সেটা বেজেই চলেছে। তুতুল প্রথমে ভাবলো, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ উঠে এসে ধরবে, কিন্তু কেউ এলো না। বেশ কয়েকবার বাজজার পর ফোনটা থেমে গেল, কয়েক মুহূর্ত বাদে আবার বাজতে শুরু করলো। তুতুল ফোনটা তুলতে ভয় পাচ্ছে। সাহেব-মেমদের উআরণই সে বুঝতে পারবে না, তারা কিছু জানতে চাইলেও সে উত্তর দিতে পারবে না।

তবু ফোনটা জেদীভাবে বেজে চলেছে, একটা কিছু করা দরকার। অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে তুতুল ফোনটা তুললো। তারপরেই দারুণ বিস্ময়। হৃদপিণ্ডটা যেন লাফ দিয়ে চলে এলো গলায়।

ফোনের ওপাশে একটি ভারি পুরুষ কণ্ঠস্বর প্রথমে টেলিফোন নাম্বারটা মিলিয়ে নিয়ে তারপর পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলো, বহ্নিশিখা সরকারের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

তুতুল আমতা আমতা করে বললো, আমি আমি বহ্নিশিখা সরকার।

–ও, বহ্নিশিখা, মানে তুতুল। কেমন আছো? কেমন লাগছে লণ্ডন? খুব প্যাচপেচে বৃষ্টি না? আর সারাদিন অন্ধকার? আমি কে বলছি বুঝতে পারছো তো? ত্রিদিব, তোমার মামা না কাকা কী যেন হই..প্রতাপ চিঠিতে লিখেছেন তোমার এখানে আসবার কথা..

প্লেন থেকে নামবার পর এই প্রথম তুতুলের একটা সুন্দর অনুভূতি হলো। পিকলু-বাবলুদের ত্রিদিব মামা, তারও মামা, অতি চমৎকার মানুষ। তিনি যে বিলতের টেলিফোনে কথা বলছেন তা বোঝাই যায় না। অতি স্বাভাবিক নয়, পরিষ্কার বাংলা।

ত্রিদিব প্রথমে কলকাতার প্রত্যেকের খবরাখবর নিলেন। তারপর বললেন, তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, বলো তুতুল? ডাক্তারি পাস করে এসেছো শুনলুম, এফআর সি এস করবে কোথায় লণ্ডনে?

তুতুলের সামনে কোনো ভবিষ্যতের ছবি নেই। জয়দীপের জন্য সে এসেছে, জয়দীপকে যদি তাঁর মা কলকাতায় ফেরত নিয়ে যান, তা হলে তুতুল কী করবে? সেও ফিরে যাবে না এখানে থাকবে? এখানে কোথায় থাকবে?

তুতুল বললো, এখনো কিছু ঠিক করিনি।

ত্রিদিব বললেন, প্রথমে এক কাজ করো, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল এক কপি জোগাড় করে নাও। ওতে দেখবে অনেক চাকরির বিজ্ঞাপন থাকে, দেখেশুনে একটা অ্যাপ্লাই করে দাও, তোমাদের চাকরি পেতে অসুবিধা হবে না। তারপর তুমি পড়াশুনোর জন্য তৈরি হয়ো আস্তে আস্তে তার আগে কয়েকটা দিন গ্লাসগোতে আমার কাছে এসে থেকে যাও না। গ্লাসগো এমন কিছু ভালো জায়গা নয় অবশ্য বেশ নোংরা আর বাতাসে সর্বক্ষণ ধোঁওয়া। তবে এখানে এখনোরোদ আছে। চলে এসো কয়েকটা দিনের জন্য কলকাতা থেকে এতদূরে প্রথম এলে বিলেতে এসে প্রথম প্রথম একটা কালচার শক লাগে, অনেক কিছুই তো অন্যরকম–কবে আসবে বলো? আমি শনিবার লণ্ডনে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসতে পারি।

তুতুলের মনে হলো ত্রিদিবমামার কাছে কয়েকদিন থাকলে তার ভালোই লাগবে, ত্রিদিবমামা নিজেদের লোক, এখানে চিন্ময়ীর দাদার বাড়িতে প্রথম থেকেই তার বেশ অস্বস্তি লাগছে। কিন্তু জয়দীপের ব্যাপারটা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সে কী করে যাওয়ার কথা বলবে? সে বললে ত্রিদিবমামা, এখানে আমার এক বন্ধু অসুস্থ হাসপাতলে আছে এখন কয়েকটা দিন ....

ঠিক আছে, আমাকে পরে জানিও আমার টেলিফোন নাম্বারটা লিখেনাও, আর শোনে তোমার কাছে পয়সা কড়ি নিশ্চয়ই কিছু নেই, ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট তো মাত্র তিনি পাউণ্ড হাতে গুঁজে দিয়েবাইরে

পাঠিয়ে দেয় আমি তোমাকে একশো পাউণ্ডের ড্রাফট আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি, পরে যখন অনেক টাকা রোজগার করবে, তখন শোধ দিও।

ফোনটা রেখে দেবার পরই তুতুলের মনে পড়লো সুলেখার কথা। সুলেখার চেয়ে বেশি লাবণ্যময়ী কোনো রমণীকে এ পর্যন্ত দেখেনি তুতুল, সেই সুলেখা কেন গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরলেন? এত ভালো যাঁর স্বামী ত্রিদিবমামাকে কিছু বলতে হলো না, তিনি নিজে থেকেই তুতুলের সমস্যা গুলো বুঝে নিয়ে ইস্ সুলেখাও যদি এখান থাকতেন তাহলে যেমন করেই হোক দু'একদিনের মধ্যে তুতুল একবার গ্লাসগো ঘুরে আসতো।

মুখ ফেরাতেই তুতুল দেখলো বেসমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে রঞ্জন। মুকে কাঁচা ঘুম ভাঙার বিরক্তি মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, তার গায়ে একটা ড্রেসিং গাউন জড়ানো। তুতুলের দিকে তাকিয়ে সে বললো 'মর্নিং'।

তুতুল বললে, গুড মর্নিং?

–ওয়াজ দা ফোন রিংগিং?

–ইয়েস।

–হু কলড্? ডিড্ য়ু নোট ডাউন দা নেইম অ্যাণ্ড দা নাম্বার?

–ফোনে আমাকেই ডাকছিলো..গ্লাসগো থেকে, আমাদের একজন আত্মীয় ত্রিদিব মিত্র রঞ্জন ভুরু কুঁচকে কয়েক লহমা তাকিয়ে রইলো তুতুলের দিকে। তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, তোমার ফোন কল? কী করে আমাদের ফোন নাম্বার জানলো? য়ু র‍্যাং হিম ফার্স্ট?

–না, আমি আগে ফোন করিনি?

–হাউ ডিড হিনো আওয়ার নাম্বার?

–তা জানি না। আমি জিজ্ঞেস করিনি।

–ট্রিডিব মিট্রা ফ্রম গ্লাসগো? ডোন্ট থিংক আই হ্যাভ হার্ড দা নেইম বিফোর..

তুতুলের কান গরম হয়ে গেল। টেলিফোন করতে পয়সা খরচ হয়, রঞ্জন কি ভাবছে যে সে চুপিচুপি ভোরবেলা উঠে টেলিফোন করে ওদের পয়সা খরচ করিয়ে দিচ্ছে?

মাথার চুল খামচে ধরে রঞ্জন বললো.উফ, বেসমেন্টে যা ঠাণ্ডা ...মা রাত্তিবেলা হিটিং অফ করে করে দিয়েছে...তোমার বালো গুম হয়েছিল তো?

তুতুল আবার অপরাধ বোধ করলো। তারা এসেছে বলেই রঞ্জনকে মাটিরতলার ঘরে শুতে হচ্ছে। কলকাতায় থাকতে সে অনেকবার শুনেছে যে বিলেতে জয়দীপের মামার নিজস্ব খুব বড় বাড়ি আছে। কলকাতায় বসে, খুব বড় বাড়ি শুনলে মনে হয়, অন্তত আট দশখানা ঘর, টানা টানা বারান্দা, তিন চারটে বাথরুম....

রঞ্জন এবার হেসে উঠে বললো, য়ু লুক হ্যাপি আফটার টকিং টু দ্যা ম্যান অ্যাট গ্লাসগো। ইজ্ হি কামিং টু মীট য়ু?

তুতুল মাথা নেড়ে বললেন না। আমার খোঁজখবর নিচ্ছিলেন।

–তুমি এত ভোরে উঠেছো, কফি তেষ্টা পেয়েছি বুঝি? ইউ কুড প্রিপেয়ার ইওর ওউন কফি। এদেশে যার যখন যেটা দরকার হয়, নিজেই বানিয়ে নেয়।

–আমি গ্যাসের উনুন জ্বালাতে জানি না।

–গ্যাসের উনুন? ওঃ হো। কলকাতায় বুঝি গ্যাসের রান্না হয় না? কয়লার চুল্লি এখনো চলছে? এসো, শিখিয়ে দিচ্ছি।

প্রথম থেকেই রঞ্জন তাকে তুমি বলছে। অথচ রঞ্জন তার চেয়ে বয়েসে বছর দু'এক বড় হবে। ইংরেজিতে তুমি আপনি ভেদ নেই, সেই্ জন্য? ওর বন্ধু আলম কিন্তু তাকে আপনিই বলে, অবশ্য আলম এত ইংরেজিও বলে না।

রান্না ঘরে এসে রঞ্জন গ্যাস জ্বালিয়ে কেটলি চাপালো। সিঙ্কে কিছু এঁটো বাসনপত্র পড়ে আছে, সেগুলো ধুতে গিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে বললো,, তুমিও এসে হাত লাগাও। এদেশে তো ঝি চাকর পাওয়া যায় না। এসব কাজ নিজেদেরই করতে হয়।

তুতুল বললো, আপনি সরুন, আমি ধুয়ে দিচ্ছি।

রঞ্জন তুব তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাকে সাবানের ব্যবহার শেখাতে লাগলো। রান্নাঘরটি ছোট, কোনো পুরুষ মানুষের এতকাছাকাছি দাঁড়াতে তুতুলের খুবই অস্বস্তি হয়। রঞ্জন কি ইচ্ছে করে তার

গা ছুঁয়ে দিচ্ছে? নাকি এদেশে নারী-পুরুষে এত সহজ মেলামেশা যে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না?

কেটলিটা এক সময় বাঁশীর মতন বেজে উঠলো। হুইশ্‌লিং কেট্‌ল, তুতুল বইতে পড়েছে, এই তা হলে সেই? জল গরম হয়ে গেলেই এ রকম শব্দ হয়।

দু'খানা পেল্লায় সাইজের মগে রঞ্জন কফি বানালো। কালো কফি, নিজে একটা নিয়ে বসে সে তুতুলকে বললো, তুমি যদি দুধ-চিনি মেশাতে চাও, ফ্রিজ খুলে দুধ বার করো, আর কাবার্ডে দ্যাখো চিনি আছে।

মেডিক্যাল কলেজ ক্যান্টিনে তুতুল কয়েকবার কফি খেয়েছে বটে, কিন্তু কফির স্বাদ ভালো লাগে না। এতখানি কফি তাকে খেতে হবে? সকালবেলা তার চা খেতে ইচ্ছে করে। এদের বাড়িতে বোধ হয় চায়ের পাট নেই। বিলেতে ভালো চায়ের খুব দাম, তুতুল আগেই শুনেছে। চিন্ময়ী কয়েক প্যাকেট চা নিয়ে এসেছেন কিন্তু তুতুল মুখ ফুটে চায়ের কথা বলতে পারলো না।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে রঞ্জন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তুতুলের দিকে। তুতুল মুখ নিচু করে রইলো। একটু বাদে রঞ্জ লঘু হাস্য করে বললো, ইউ আর আ প্রীটি গার্ল। টেল মি সামথিং, আর য়ু এনগেইজড টু জয়দীপ?

তুতুল টি জয়দীপের কথাই বাবছিল। একটু চমকে উঠলেও সে মুখ না তুলে দু'দিকে মাথা দোলালো।

–ইউ আর ডকটর ইয়োরসেল্‌ফ। টেলমী, জয়দীপের কণ্ডিশান কী রকম দেখলে?

–তুতুল এবারও মাথা তুলল না, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না।

–হি ইজ ডেসটিন্‌ড টু ডাই। ম্যাটারঅফ মান্‌থস, ইফ নট উইকস্। মুধু শুধু অনেক টাকা খরচ হবে কিন্তু এ রোগের চিকিৎসা নেই। তুমি এখন...

রঞ্জনের কথা শেষ হলো না, সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে এলো প্রথমে তা ছোট বোন, তারপর তার বাবা। এরপর বাড়িতে যেন একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কে আগে বাথরুমে যাবে, কে দাড়ি কামাবে, কে বেকফ্রস্ট বানাবে অমলা নামলেন সবার শেষে, একমাত্র তাকেই বাইরে যেতে হবে না। তুতুল গিয়ে চিন্ময়ীকে ডেকে নিয়ে এলো। বাড়ির কর্তা ও ছেলেমেয়ে দুটি তৈরি হয়ে নিল আধ ঘণ্টার মধ্যে অমরনাথ ছুটলেন টাই বাঁধতে রঞ্জনের হাতে আধ খাওয়া স্যাণ্ডউইচ। যাবার সময় রঞ্জন বলে গেল, তার বন্ধু আলম এসে সকালে ওদের হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

অসাধারণ বক্তিত্ব চিন্ময়ীর। ছেলের অবস্থা দেখে তিনি ভেতরে ভেতরে কতটা ভেঙে পড়েছেন না পড়েছেন, তার কোনো চিহ্ন নেই বাইরে। ব্রেকফাস্ট টেব্‌লে বসে তিনি ফলের রস খেলেন, কলা আর দুধ দিয়ে ব্রেকফাস্ট খেলেন কিন্তু স্যাণ্ডউইচ প্রত্যাখ্যান করলেন। অমলার সঙ্গে চালিয়ে গেলেন টুকিটাকি কথা। অমলাও একবারও জয়দীপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না। চিন্ময়ীও সে সম্পর্কে কিছু বললেন না। এরা দু'জনে স্কুলে সহপাঠিনী হলেও এদের দু'জনের যে মনের মিল নেই, তা বুঝতে অসুবিধে হল না তুতুলের।

এক সময় অমলা বললেন, তোমরা স্নান টান করে তৈরি হয়ে নাও আলম এসে পড়বে। আমি আজ ওয়াশিং মেশিনটা চালাবো, তোমাদের ময়লা জামা কাপড় যা আছে দিয়ে দাও।

অমলা বেসমেমন্টে নেমে যাবার পর চিন্ময়ী বললেন, আমি আজ সকালে হাসপাতালে যাবো না, ঐ ছেলেটি এলে তুমি ঘুরে এসো, বহ্নিশিখা।

–আপনি যাবেন না, মাসীমা?

–না । এখানে দু'এক জায়গা থেকে টাকা পাওয়ার কথা আছে, এরা পউণ্ড দিলে আমি দেশে গিয়ে রুপিতে শোধ করে দেবো, সেই টেলিফোন করতে হবে। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি, বহ্নিশিখা। খোকনকে এখানে রেখে লাভ নেই। কাল তোমরা চলে যাবার পর আমি টেলিফোনে ওর ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি।

–এতদিন জয়দীপের কী চিকিৎসা হয়েছে, মাসীমা?

–সে কথা এখন আর বলে লাভ নেই। কিন্তু বহ্নিশিখা, তোমাকে আমি জোর করে নিয়ে এলুম তুমি কী করবে? এখানে থেকে যাবে? একলা একলা থাকতে পারবে? তোমার মামা খরচপত্র করে তোমাকে পাঠিয়েছেন।

–মাসীমা, আমি শেষপর্যন্ত জয়দীপের সঙ্গে থাকতে চাই।

চিন্ময়ী বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন তুতুলের দিকে। সে এই মাত্র একটা মিথ্যে কথা

বলেছে। সে যে বলল, শেষপর্যন্ত জয়দীপের সঙ্গে থাকতে চায়, এই কথাটার মধ্যে বিশ্বাসের জোর নেই। জয়দীপের জন্য তার অনুভূতি কখনো তেমন তীব্র হয়নি। সে লণ্ডনে এসেছে একটি মাতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে, এখনো সে যে ফিরে যাবার কথা বলল, তা জয়দীপের জন্য নয়। চিন্ময়ীকে আশ্বস্ত করার জন্য।

চিন্ময়ী উঠে এসে তুতুলের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তুমি যে এই কথাটা বললে, সেটাই তো যথেষ্ট, বহ্নিশিখা । আমি মা হয়েও বলছি, তুমি লন্ডনে যখন এসেই পড়েছো, একটা কিছু ডিগ্রী না নিয়ে তোমার ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। জয়দীপের জন্য তোমার ফিরে যাওয়া না তা আর দরকার নেই। আজই খোকনকে এসব কথা কিছু বলো না..সব ব্যবস্থা করতে দু'চারদিন সময় লাগবে।

আলম একটু বাদেই এসে পড়ল একটা লাল রঙের গাড়ি নিয়ে। বাইরে খুব ঠাণ্ডা, তাই অমলার ওভারকোর্ট আজও ধার করতে হল। সেই সঙ্গে গরম মোজা এবং জুতো। তুতুল চটি ছাড়া কিছু আনেনি।

গাড়িতে আলম তাকে নানারকম প্রশ্ন করে যেতে লাগল, তুতুল শুধু হ্যাঁ কিংবা না ছাড়া কিছুই বলতে পারছে না। তার মনের মধ্যে একটা উথাল পাথাল চলছে। সে কি ফিরে যাবে না এখানে থাকবে? এখানে সে একা থাকবে কী করে? জয়দীপের মামার বাড়িতে সে কিছুতেই থাকতে পারবে না।

কয়েকটা ফাঁকি এর মধ্যেই ধরা পড়ে গেছে । সবাই জানতো যে জয়দীপের মামা বিলেতে বড় ডাক্তার, দারুণ বড়লোক, মস্ত বড় বাড়ি, সেখানে জয়দীপ একবার পৌঁছোলেই তার চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বিলেত ডাক্তার মামা খোদ লন্ডন শহরে নিজস্ব বাড়ি এসব শুনলেই একটা মোহময় ছবি ফুটে ওঠে। আসলে, জয়দীপের মামা অমরনাথ বিলেতে এসেও সুবিধে করতে পারেননি, নিজস্ব প্র্যাকটিসের বদলে তাঁকে চাকরি নিতে হয়েছে। এলোমেলো স্বভাবের জন্য তাঁকে ঘন ঘন চাকরি বদলাতে হয়। তাঁর অবস্থা মোটেই ভালো নয়, বাড়ির মর্টগেজ শোধ হয়নি, তাছাড়া তিনি অ্যালকোহলিক। তাঁর এক ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বড় ছেলে রঞ্জন একটি মেম বিয়ে করেছিল, একটি বাচ্চা সমেত তার বউ ডিভোর্স নিয়েছে এক বছর আগে, সেই বউকে অ্যালিমিনি দিতে হয়। অমলা শ্বশুরবাড়ির লোকদের আসা বিশেষ পছন্দ করেন না, তাঁর বাপের বাড়ির লোকজন এখানে প্রায়ই আসে, আগামী সপ্তাহে তাব দাদা বৌদির আসার কথা আছে। চিন্ময়ী ও তুতুল এ বাড়িতে প্রায় অবাঞ্ছিত অতিথি। চিন্ময়ী ভেবেছিলেন তিনি তাঁর দাদার বাড়িতে আসছেন নিজস্ব অধিকারে আসলে তাঁর দাদার কোনো ব্যক্তিত্বই নেই।

হাসপাতালে জয়দীপের ক্যাবিনের দরজা বন্ধ বাইরে একটা বোর্ড টাঙানো, স্যরি নো ভিজিটর। তুতুলকে বাইরে দাঁড় করিয়ে আলম তবু দরজা ঠেলে ঢুকে গেল। তুতুল ওভারকোটটা খুলে ফেলল, বইরে ঠাণ্ডা ভেতরে ঢুকলেই গরম লাগে। বারান্দা দিয়ে ডাক্তার নার্সরা দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, এদেশে কেউ আস্তে হাঁটে না, শীতের দেশের মানুষের স্বভাবই এই।

আলম একটু বাদে বেরিয়ে এসে বলল, দু'জন পেশেন্টকেই সিডেটিভ দিয়ে রেখেছে। একবার ভেতরে গিয়ে দেখে আসবেন? আমি নার্সকে বলেছি।

তুতুল বলল থাক। বিকেলে আবার আসব।

হাসপাতালের চত্বরে প্রায় শ খানেক গাড়ি। এরই মধ্যে আল ভুলে গেছে কোথায় সে গাড়িটা রেখেছে। গাড়িটা খুঁজতে খুঁজতে সে তুতুলকে জিজ্ঞেস করলো, এখনই বাসায় ফিরবেন, না আমার সাতে এক জাগায় যাবেন?

—কোথায়

—নর্থ লণ্ডনে হাইবেরি হিল-এ আমাদের একটা আস্তানা আছে। সে বাড়ির নাম ইস্ট পাকিস্তান হাউস। সেখানে গ্যালে অনেকের সঙ্গে আলাপ সালাপ হবে। সেখানে সবাই বাংলায় কথা কয়। অ্যাট হোম ফিল করবেন। আপনার দেশ ছিল কোথায়?

—দেশ মানে বাড়ি? আমাদের বাড়ি কলকাতায় ..আগে ছিল বরানগর।

—ও কলকাত্তাইয়া মাইয়া? কোনো ইস্টবেঙ্গল কানেকশান নাই?

—আমার মায়ের দেশ মানে মামাবাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে।

—ও, তবে তো হাফ বাঙাল। পূর্ববঙ্গে কোথায়?

—বিক্রমপুর জেলায়, মালখানগরে। আমি অবশ্য সেখানে খুব ছোটবেলায় একবারই গেছি।

—মালখানগরের বোস?

—না, আমার মামাবাড়ির ওঁরা মজুমদার। আপনি চেনেন মালখানগর?

—আমাদের বাড়িও ঐ কাছাকাছিই।

লাল রঙের গাড়িটা খুঁজে পেয়ে, দরজা খুলে সামনের সীটে বসলো দু'জনে। আলম একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, আপনি কি অনেক ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে এসেছেন, না চাকরি-বাকরি করার দরকার হবে?

—যদি এখানে থাকি তা হলে চাকরি করতেই হবে।

—যদি মানে? এসেছেন যখন একটা ডিগ্রি করে যাবে না? আমি যে সার্জারির সাথে অ্যাটাচড সেখানে সামনের সপ্তাহে একটা পোস্ট খালি হবে। সার্জারি মানে বুঝলেন তো? দেশে যাকে ডাক্তারের চেম্বার বলে, এখানে তারই নাম সার্জারি। চার-পাঁচজন ডাক্তার মিলে এক সাথে একজন আমেরিকায় চলে যাচ্ছে, সেইখানে আপনার জন্য কথা বলতে পারি, আমি আছি তো, একজন চেনা লোক থাকলে আপনার সুবিধে হবে।

—তা তো নিশ্চয়ই।

—থাকবেন কোথায়? ঐ রঞ্জনদের বাড়ি? যদি পৃথক থাকতে চান, আমাদেরঐ ইস্ট পাকিস্তান হাউজে একটা রুমের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। ওখানে কিছু ছাত্র থাকে।

—ইস্ট পাকিস্তান হাউসে আমার জায়গা হবে কী করে? আমি তো পাকিস্তানী নই।

—আমাগো অত শুচিবাই নাই, তাছাড়া আপনি তো হাফ-বাঙাল। চলুন, রুমটা দেখে আসবেন, লণ্ডন শহরটাও খানিকটা দেখা হবে।

—কিন্তু বাড়ি না ফিরলে মাসীমা চিন্তা করবেন।

—ওখানে পৌঁছে টেলিফোন করে দেবো। চিন্তার কী আছে? আপনি পানিতে পড়েন নাই। আমিও বাঘ কিংবা সিংহ না।

হা হা করে হেসে উঠে আলম স্টার্ট দিল গাড়িতে। বৃষ্টি থেমেছে একটু কিন্তু এখানে ওখানে কুয়াশা। একটু দূরের জিনিস দেখা যায় না। তবু এরই মধ্যে রাস্তায় অনেক গাড়ি।

আলম বললো, এখনও টেম্‌স নদী দ্যাখেন নাই তো? চলেন ওয়াটার্ল ব্রীজের উপর দিয়ে একটু ঘুরে যাই। ফগ্‌-এর জন্য কিছুই দ্যাখতে পারেন না ভালো করে। পাশেই টেম্‌স নদী আমাদের বুড়ি গঙ্গার তেকেও অনেক ছোট., মনে করেন একখান খাল, তার উপরেই কতকগুলো ব্রীজ।

—সকালে আপনার ছুটি থাকে?

—ঠিক ছুটি বলা যায় না। আমি সার্জারিতে যাই বিকালে, সকালের দিকটায় এসিয়ান টাইড আর পূর্ব বাংলা নামে দুইটা কাগজ বার করি আমরা, সেই কাগজের কাজ দেখাশোনা করতে হয়। কিছু কিছু পলিটিক্যাল কাজকর্মের সাথেও যোগ আছে আমার। আমাদের ইস্ট পাকিস্তানের পলিটিক্যাল সিচুয়েশন সম্পর্কে কিছু জানি না।

আলমের এমনিতেই মুখখানা হাসি মাখানো, তা ওপর যখন তখন সে জোরে জোরে হেসে ওঠে। সিগারেট টানে একটার পর একটা। গাড়ির সুইচগুলোর কাছেই কী একটা টিপে দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড বাদে বার করে আনে, সেটার মুখটা লাল গনগনে। সেটা দিয়েই সিগারেট ধরায়। এরকম লাইটার তুতুল আগে দেখেনি।

আলম বললো, এবারে জানবেন। কলকাতার কাগজে ইন্ডিয়ার কোনো কাগজেই আমাদে ওদিককার খবর কিছু থাকে না প্রায়। ব্রিটিশ কাগজে খবর পাবেন। তাছাড়া আমাদের মুখপত্র তো আছেই। আমাদের ওখানে অবস্থা খুব খারাপ। সাংঘাতিক রিপ্রেশন চলছে। আমি এখানে থাকলে আপনার কলেজ-টলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিতাম সব কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যেই আমাকে একবার ঢাকায় যেতে হবে। কবে ফিরবো, বলা যায় না। ঢাকায় আমি পার্সোনা নন গ্রাটা পুলিশ একবার আমারে পাইলে ছাড়বে না। আমার দুইখান পাসপোর্ট, এবারে অন্য একটা নামে যাবে। তবু যদি ধরে ব্যাটারা।

—এরকম বিপদ হতে পারে জেনেও যাচ্ছেন কেন? কারুর অসুখ বুঝি?

—ঠিকই কইছেন, পুরা দেশটারই অসুখ। আমরা তো এখানে বেশ ভালোই আছি, তাই না। রোজগরপাতি ভালোই করি মদ মুদ খাই, ফুর্তি ফার্তা করি, তবু মাথার মইধ্যে একটা পোকা কামড়ায়, দুঃখিনী দেশ আমারে টানে, আমার বাংলা দেশেই যেন আমার নিয়তি বাঁধা।

হঠাৎ কথা থামিয়ে একটা ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি থামিয়ে তুতুলের দিকে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে সে প্রায় আপন মনেই বললো, একটুখানি আলাপেই আপনাকে এত সব কথা বলছি কেন কে জানে?

॥ ৬৩ ॥

ট্রাম ধর্মঘট মিটলো দেড় মাস পরে। এতদিন ধরে ট্রাম চলেনি বলে ট্র্যাকগুলোতে মর্চে পড়ে গেছে। চৌরঙ্গির পাড়ায় সাউন্ড অফ মিউজিক সিনেমা দেখে অতীন বাড়ি ফিরলো ট্রামে চেপে। অনেকদিন পর ট্রামে চড়ায় তার বেশ নতুন নতুন লাগছে। মনটা বেশ ফুর্তিতে আছে তার। ফিল্মটা খুবই ভালো, আর একবার দেখার মতন, তা ছাড়া আজই অতীন শিলিগুড়ি কলেজ থেকে তার চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি পেয়েছে।

ট্রামের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অতীন ভেতরে ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। বুকফোলা একটা জহরকোট গায়ে সে ঠান্ডা বাতাস বেশ উপভোগ করছে। নর্থ বেঙ্গলেআরও অনেক বেশি ঠান্ডা হবে, এখন থেকেই সইয়ে নেওয়া ভালো। হঠাৎ সে যেন দেখতে পেল দিগন্তের গায়ে আঁকা পাহাড়ের শ্রেণী। জঙ্গল, কাঞ্চনজঙ্ঘা সে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলো, দা হিল্স আর অ্যালাইভ উইথ দা সাউন্ড অফ মিউজিক...

ভবানীপুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে একবার ভাবলো, অলিদের বাড়িতে একবার নামবে, না নামবে না? অলিকে খবরটা দিতে হবে। অলি খুশি হবে খুব অলি আগেই বলেছে, ছুটির সময় সে দার্জিলিঙ বেড়াতে যাবে, ততদিনে অতীন সব চিনে যাবে ওদিকটা। কিন্তু ভবানীপুর পেরিয়ে গেল অতীনের নামা হলো না। অলির কাছে কাল আসবে, এখন রাত পৌনে ন'টা, বাবা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে থাকবেন তার যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য।

বাড়ির স্টপে নেমে অতীন দেখলো তাদের রাস্তার মোড়ের একটা মিষ্টির দোকান খুব আলো-টালো দিয়ে সাজানো হয়েছে, সেখানে মাইক বাজছে। কী ব্যাপার? বেশ কিছুদনি ধরে এই দোকানটা বেশ মন মরা হয়েছিল, প্রায় কিছুই পাওয়া যেত না। দোকানটা এখানে আছেকি নেই, সেটাই বোঝা যেত না।

দোকানটার সামনে বেশ ভিড় দু'খানা বিরাট কাঠের পরাত ভর্তি ডাই করা সন্দেশ, লোকে চিলুবিলু করে কিনছে। ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে লোকজনের কথাবার্তা শুনে অতীন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ থেকে ছানার মিষ্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। আজ ময়রা ও মিষ্টি ব্যবসায়ীদের পক্ষে একটা বিরাট আনন্দের দিনই বটে। প্রফুল্ল সেনের খেয়ালে এই অদ্ভুত নিষেধাজ্ঞায় কতমিষ্টির দোকানের কারিগর যে এতদিন বেকার হয়ে বসে ছিল তার ঠিক নেই। কয়েকজনের আত্মহত্যার খবরও বেরিয়েছে কাগজে।

আনন্দের চোটে আজ এই দোকানে সস্তায় মিষ্টি দেওয়া হচ্ছে। চার আনা দামের বড় সাইজের সন্দেশ আজ এক টাকায় ছ'টা। অতীনও কিনে ফেললো দু'টাকার। এই প্রথম সে বাড়ির জন্য নিজে থেকে কিছু কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

সন্দেশের বাক্সটা হাতে নিয়ে অতীন মনে মনে হাসলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার সন্দেশ খেতে দিচ্ছে সবাইকে। এদিকে বাজারে চাল নেই। ভাত খেতে না পাও তো সন্দেশ খাও। ফরাসী দেশের রানী মেরি আঁতোয়ানেৎ বলেছিল না, লোকেরা রুটি খেতে পাচ্ছে না, তাতে কি, তারা কেক খেতে পারে। দাঁড়াও না, একদিন এই ব্যাটাদেরও সবটার গলা কাটা যাবে।

ট্রামের পর সন্দেশ। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় চার মাস ধরে যে ধর্মঘট চলছে, সেটাও দু'একদিনের মধ্যেই মিটে যাবে শোনা যাচ্ছে। ভোটের আগে সরকারের এই সব তৎপরতা ভোট। স্বাধীন ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। এবারে এখন অনেক তরুণ তরুণী ভোট দেবে যাদের পরাধীন ভারতের কোনো স্মৃতি নেই। স্বাধীনতার দু'এক বছর আগে মাত্র জন্মেছে।

অতীন অবশ্য ভোট গ্রাহ্য করে না। শিলিগুড়িতে যেতে না হলেও সে ভোট দিত না। এ তো গাঁজাখোরদের ভোট। দেশের অর্ধেকের বেশি লোক খেতে পায় না, থ্রি ফোর্থ পপুলেশান পড়ে তারাই এ দেশের জনগণ। জোতদার, জমিদার আর কালোবাজারিদের পেটোয়া পার্টি কংগ্রেস মুঠো মুঠো টাকা ছড়াবে আর প্রত্যেকবার জিতে যাবে। ছিটোফোটা পাবার আশায় শোধনবাদী বামপন্থীদলগুলোও এই ভোটের খেলায় মেতে আছে। পার্লামেন্ট একটা শুয়োরের খোয়াড়।

বাড়িতে পা দিয়েই বাবার মুখোমুখি হবার ইচ্ছে ছিল না অতীনের, কিন্তু প্রতাপ বসবার ঘরেই বসে আছেন আদালতের কাগজপত্র মেলে।

অতীনের বাইরের কলেজে চাকরি নেওয়ার ব্যাপারে প্রতাপ আপত্তিও করেননি, উৎসাহও দেখাননি। মমতার একটুও স্মৃতি ছিল না। অতীন প্রায় জোর করেই দরখাস্ত পাঠিয়েছে। বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন বাইরে থাকার জন্য তার মন ছটফট করছে। বাড়িতে সে যেন কিছুতেই সাবালক হয়ে উঠতে পারছে না। বাড়ির কাঠ পেয়ে ঢুকলেই মা আর পিসিমা চিমল তাকে একনও বাচ্চা ছেলে করে রাখতে চায়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অতনি বেশ কয়েক পলক বাবার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলা। আজ সে তার জীবনের একটা খুব বড় সিদ্ধান্তের কথা জানাতে চলেছে। সেই একদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ি না ফিরে একা একা খুব বড় সিদ্ধান্তের কথা জানাতে চলেছে। সেই একদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ি না ফিরে একা একা দোতলা বাসে চেপে দক্ষিণ কলকাতায় যাওয়া বাবার কাছে সেদিন সে খুব মার খেয়েছিল। হঠাৎ সেই দিনটার কথা মনে পড়লো। বাবা পরে বলেছিলেন তুই আমাদের সব কথা বলিস না কেন। বাবলু, তুই আমাদের কাছে কিছু লুকোবি না....

–বাবা, আমি শিলিগুড়ি থেকে আজ অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি পেয়েছি।

প্রতাপ এতদিন চশমা পাতেন না, এখন রিডিং গ্লাসে দরকার হয়। চোখ থেকে চশমাটা খুলে বাবলুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ও পেয়েছি চিঠি? কবে জয়েন করতে হবে?

–ফিফটিনথ ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

–পার্মানেন্ট পোস্ট? কত স্কেল দিয়েছে?

–আপাতত লীভ ভ্যাকেনসি। তবে সিদ্ধার্থ আমাকে বলেছে, যে-ভদ্রলোক ছুটিতে গেছেন, তিনি আর ফিরবেন না, খুব সম্ভবত বিদেশে চলে যাচ্ছেন। এখন আমাকে একশো পঁচাত্তর দেবে।

–কই চিঠিটা দেখি?

–ভেতরে আছে। আমি একটু পরে এনে দেখাচ্ছি, বাবা বাথরুম থেকে আসছি। একটু থেমে, সে আবার যোগ করলো, আমার প্রফেসার গাইডকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি, ওখানে বসেও পি-এইচ ডি করা যাবে।

ভেতরে ঢুকে অতীন দেখলো, মায়ের ঘরে দু'জন অচেনা মহিলা বসে গল্প করছেন। সেই জন্যই প্রতাপকে অফিসের কাজকর্ম নিয়ে বাইরের ঘরে বসতে হয়েছে। সন্দেশের প্যাকেটটা সে রান্নাঘরে রেখে দিল।

খানিক বাদে বাথরুম থেকে জামা কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে সে দেখলা, বাবা ফিরে গেছেন নিজের ঘরে, সেখানে মায়ের সঙ্গে বাবার কী নিয়ে যেন উষ্ণ বাদানুবাদ চলছে। এখন আর চিঠিটা হাতে নিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। খিদে পাচ্ছে অতীনের এখন কাকেই বা সে খাবার কথা বলবে, পিসিমা তো রাত্তিরে আর ঢোকেনই না, তুতুল চলে যাবার পর তিনি কেমন যেন ঝিম মেরে গেছেন। অতীন নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে একটা বই খুললো।

ঠিক এক পাতা পড়ার পর মুন্নি এসে বললো, এই ছোড়দা, মা তোমাকে ঐ ঘরে ডাকছেন।

বিছানা থেকে ওঠবার আগে অতীন মুন্নিকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললো, আই মুন্নি, আমার ঘরের এই ক্যালেন্ডারটা তোর খুব ভালো লাগে বলেছিলি যা, নিয়ে যা।

মুন্নি বিনা বাক্যব্যয়ে দেয়াল থেকে ছ'খানা বিখ্যাত বিদেশী চিত্রকরদের ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারটি খুলতে লাগলো। ছবি আঁকার দিকে মুন্নির খুব ঝোঁক। ছোড়দা কেন এই ভালো ক্যালেন্ডারটা তাকে দিয়ে দিচ্ছে, তা সে জানে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি হাতে নিয়ে অতীন গেল মায়ের ঘরে। প্রতাপ বিছানায় কাতহয়ে শুয়ে একটি সিগারেট ধরিয়েছেন, তাঁর গেঞ্জি পরা বুকখানি বেশ প্রশস্ত। প্রতাপের শরীরের গড়নটি চওড়া ধরনের তার উচ্চতাও সাধারণ বাঙালীর তুলনায় ভালোই। মমতা বসে আছেন খাটের পাশের একটি চেয়ারে। এখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহের কোনো চিহ্ন নেই।

প্রতাপ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলেন, মমতা জিজ্ঞেস করলেন, তুই এই চাকরিটা নিবি ঠিক করেছিস বাবলু?

অতীন বললো, বাঃ নেবো না? চাকরি কি সহজে পাওয়া যায়?

–কেন, কলকাতায় চাকরি আর দু'দিন অপেক্ষা করলে পাওয়া যেত না?

–কাগজে বিজ্ঞাপন দেখো না, সবাই অন্তত চার পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স চায়। এক্সপেরিয়েন্স কি এমনি এমনি হবে?

–এক্ষুনি চকরিতে ঢোকার জন্য তাড়াহুড়ো করার কী ছিল তোর? কোয়ালিফিকেশান বাড়ালে লোকে ডেকে চাকরি দেবে।

–মা তোমাকে তো বলেইছি, বাড়িতে বসে থেকে শখের পি-এইচ ডি করার একটুও ইচ্ছে নেই আমার।

প্রতাপ মুখ তুলে বললেন, ও তো যাবেই ঠিক করেছে, এখন আর এসব কথা বলে লাভ কী মমো? ইচ্ছে যখন হয়েছে, বাইরে কিছুদিন থেকে আসুক না। একটা অভিজ্ঞতা হবে।

মমতা বললেন, ওখানে তুই কোথায় থাকবি তা ঠিক হয়েছে? কলেজ থেকে কি কোয়ার্টার দেয়?

অতীন বললো, না কোয়ার্টার দে না, কয়েকজন অধ্যাপক মিলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেস করে থাকে, মানে যারা বাইরে থেকে গেছে, সেখানে থাকতে পারি, কিংবা আলাদা বাড়ি ভাড়া করেও থাকা যায়।

–তোর বাবা তো যেতে পারবেন না বলছেন। আমি তোর সঙ্গে যাবো তা হলে।

–তুমি যাবে কেন? তোমরা পরে বেড়াতে যাবে, আমি যখন বাড়ি টাড়ি ভাড়া নেবো–

বাঃ, তুই একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছিস, তোর জিনিসপত্র সব গুছিয়ে টুছিয়ে দিয়ে আসতে হবে না? তুই কি আগে কখনো বাইরে থেকেছিস একা একা?

–তুমি কি পাগল হয়েছো মা? তুমি আমার জিনিস গুছিয়ে দিতে যাবে? ওখানকার সবাই হাসবে না? আমি কি ছেলেমানুষ? জিনিস গোছাবার আবার কী আছে? কত লোক বাইরে চাকরি করতে যাচ্ছে, তারা কি বাবা-মা'কে সঙ্গে নিয়ে যায়?

মমতা আড় চোখে তাকালেন প্রতাপের দিকে। বাবলুর বয়েসী ছেলেরা একা একা বাইরে গিয়ে থাকে, তা কি তিনি জানেন না? কিন্তু তাঁদের যে এই একটি মাত্র ছেলে। বাবলুটা শেষ পর্যন্ত সাঁতার শিখলোই না, হুট করে যদি জলে-টলে নামে শিলিগুড়িতে কি পুকুর কিংবা নদী নেই? পরিবেশটা নিজের চোখে দেখলে, কাছাকাছি মানুষজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলে মমতা অনেকটা ভরসা পেতেন।

মমতা দৃঢ়ভাবে বললেন, তবু আমি যাব তোর সঙ্গে।

অতীন বললো, মা, একটা কথা বলো তো, বাবারও তো একসময় মফস্বলে পোস্টিং ছিল তখন কি ঠাকুর্দা ঠাকুমা বাবার সঙ্গে যেতেন?

মমতা বললেন, তখনকার কথা ছিল আলাদা। চাকরির প্রথম বছরেই তোর বাবার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

মা ও ছেলের তর্কাতর্কির মাঝখানে বাধা দিয়ে প্রতাপ বললেন, তোমার এখন যাবার দরকার নেই, মমো। শিলিগুড়ি একটা শহর সেখানে আরও পাঁচজনের সঙ্গে একসঙ্গে থাকবে, ও ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবে। বাবলু তো ঠিকই বলেছে, তোমরা কিছুদিন পরে বেড়াতে যেও।

বাবার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করলো অতীন। বাবা ঠিক বুঝেছেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছোলে অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে তার লজ্জায় মাথা কাটা যেত।

একটু বাদে নিজের ঘরে এসে অতীন তার জিনিসপত্র গোছাতে লাগলো। যদিও তার যাওয়ার অনেক দেরি। কত দিনের কত কাগজ জমে আছে, এক সময় সব কিছুই মনে হতো খুব জরুরী। এখন অনেকগুলোই ফেলে দেওয়া যায়। অলির চিঠি আছে কয়েকখানা। ওগুলো থাকবে। দাদার কবিতার খাতাটা? সে নিজে কবিতা বোঝে না, কৌশিক আর প্রভাতকে সে পড়িয়েছিল লেখাগুলো। দু'জনের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কৌশিকের মতে ওগুলো নিতান্তই রোমান্টিক বুর্জোয়া সেন্টিমেন্টের কবিতা, এখনকার এই কঠিন সংক্রান্তির সময়ে ঐ সব কবিতার কোনো মূল্য নেই। প্রভাতের মতে কবিতাগুলোর মধ্যে ভাষার খুব জোর আছে, রোমান্টিক কবিতার আবেদন চিরকালই থাকবে, বিপ্লবের সঙ্গে রোমান্টিকতার কোনো বিরোধ নেই।

কৌশিকই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কৌশিক পরামর্শ দিয়েছে, ব্যক্তিগত স্মৃতি হিসেবে খাতাটা অতীন নিজের কাছে রেখে দিতে পারে, কিন্তু ঐ কবিতাগুলি ছাপানো এখন আদিখ্যেতার মতন মনে হবে। মৃতদের স্মৃতি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে নেই।

খাতাটা সে সঙ্গে নিয়ে যাবে না, এখানে রেখে যাবে, কিংবা আর কারুকে দেবে, সে বিষয়ে

অতীন সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না। সে নিজে কবিতা সম্পর্কে আগ্রহী নয়, কিন্তু এই কবিতাগুলির মধ্যে তার দাদা যেন এখনও জীবন্ত দাদার নিজের হাতের লেখা। সে পাতা উল্টে উল্টে কবিতাগুলি পড়তে লাগলো। অধিকাংশ লাইনেরই মানে বোঝা যায় না।

টুনটুনি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, ছোড়দা, তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছো?

খাতাটা বন্ধ করে রেখে অতীন বললো, চলে যাচ্ছি মানে কী? প্রত্যেক মাসেই একবার করে আসবো, এই ঘরটা আমারই থাকবে। খবরদার আমার কোনো জিনিসে হাত দিবি না। এই নে একটা কলম নিবি?

টুনটুনিকে চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। অতীন তাকে দু'একদিন পড়া দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল টুনটুনির পড়াশুনোর দিকে একেবারেই মন নেই। কী করে সে দেওঘর থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে এসেছে কে জানে।

কয়েকটা পুরোনো খাতা, একটা ছবির বই এক গাদা পেন্সিল সে দান করে দিল টুনটুনিকে। অতীন জানে, টুনটুনি প্রায়ই তার ঘর থেকে পেন্সিল কলম চুরি করে। এসব নিয়ে সে কী করে কে জানে?

যথারীতি অতীনের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে টুনটুনি। দুই উরু দিয়ে সে চেপে ধরেছে চেয়ারে বসে থাকা অতীনের কাঁধ। শারীরিক স্পর্শের জন্য সে যেন সব সময় কাঙাল। অতীন তাকে আর প্রশ্রয় দেয় না, তাকে বকুনি দিলেও সে শোনে না।

অতীন গলা চড়িয়ে ডাকলো, মুন্নি এই মুন্নি।

টুনটুনি এবার খানিকটা সরে গেল। মুন্নি এসে দাঁড়াতেই অতীন জিজ্ঞেস করলো, এই আমার অনেক খাতায় কিছু কিছু সাদা পাতা রয়ে গেছে দেখছি। তুই নিবি?

মুন্নি বললো, আহা, আমাদের কে নিয়ে যাবে? মা কি একা একা যেতে দেবে? ফুলদি থাকতে তবু দু'একবার আমাদের নিয়ে গেছে। তোমার তো পাত্তাই পাওয়া যায় না।

–ঠিক আছে, আমি তোদের এটা দেখাবো। টিকিট কেটে হলে বসিয়ে দেবো, আবার ভাঙার সময় নিয়ে আসবো।

মুন্নি মুচকি হেসে বললো, ইস্। এখন চলে যাচ্ছো কি না, তাই হঠাৎ আমাদের জন্য দরদ উথলে উঠেছে। তোমার নিজের বুঝি দেখা হয়ে গেছে?

সত্যি সত্যি বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে বলেই অতীনের একটি কথা ভেবে সামান্য অনুতাপ হলো। ছোট বোনটাকে সে কখনো কিছুই দেয়নি। আসলে, ফুলদি থাকতে মুন্নি ছিল পুরোপুরি তার চার্জে। মুন্নির কথা বলার ধরনটাও অনেকটা ফুলদির মতন।

সে বললো, বড় হয়েছিস, এখন একা একা চলাফেরা করতে শেখ।

মুন্নি বললো, ছোড়দা আমাকে শম্ভু মিত্রর অয়দিপাউসের টিকিট কিনে দিবি? ঐ নাটকটা আমার খুব দেখার ইচ্ছে।

–থিয়েটারের টিকিট তো অনেক দাম। আমি অত পয়সা পাবো কোথায়? মার কাছে চেয়ে দ্যাখ।

–মার কাছ চাইতে হবে না। টিকিটের দাম আমি দেবো, আমি রোজ পাঁচ পয়সা করে জমাই। আমার আর টুনটুনির জন্য দু'খানা টিকিট দশ টাকায় হবে না?

অতীন আর একটা ব্যাপার অনুভব করলো। সে এখান থেকে চলে গেলে এ বাড়িতে থাকবে টুনটুনি আর মুন্নির বয়েসী দুটি মেয়ে। এই বয়েসটা বিপজ্জনক। পাড়াটাও দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এ পাড়ায় একটা বখা ছেলের চোখ পড়েছে টুনটুনির ওপর, একদিন টুনটুনিকে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চেয়েছিল, অতীন তা টের পেয়ে ছেলেটার কলার ধরে খুব কড়কে দিয়েছে। অতীন চলে যাবার পর আবার যদি ঐ ধরনের ছেলেরা বাড়াবাড়ি করে, তখন কে সামলাবে?

পরক্ষণেই এ চিন্তাটাকে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উড়িয়ে দিল। সব পরিবারেই কি ছেলে থাকে? এই সব ছেঁদো কারণের জন্য কি কেউ বাইরে চাকরি করতে যাবে না? তাছাড়া, সে তো মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসবে।

অলির সঙ্গে সে দেখা করতে গেল পরদিন বেলা দশটায়। দোতলায় অফিস ঘরে সে আগে বিমানবিহারীকে খবরটা জানালো। বিমানবিহারী খুশি হলেন না। তাঁর মতে, শিলিগুড়ি অতি বাজে জায়গা। চীন যুদ্ধের পর নথ বেঙ্গলে যেমন আর্মির তৎপরতা বেড়েছে, তেমনি যত রাজ্যের

ব্যাবসায়ীরা গিয়ে ওদিকে ভিড় জমিয়েছে। ওখানে পড়াশুণোর পরিবেশ নেই। তা ছাড়া মফস্বলে একবার চাকরি নিলে আর সহজে কলকাতায় আসা যায় না। অতীনের উচিত ছিল একেবারে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই চাকরি শুরু করা। তার জন্য আর দু'তিন বছর অপেক্ষা করে। এইচ ডি-টা সেরে নিলে ক্ষতি কী ছিল? সে চাকরি না করলে তাদের সংসার চলছেনা, এমন তো নয়। মফস্বলে মাস্টারিতে ক' পয়সাই বা মাইনে পাবে অতীন, তাকে আলাদা এস্টাব্লিশমেন্ট করতে হবে, নিজের খরচই কুলোতে পারবে কিনা সন্দেহ।

অতীন বিশেষ তর্ক করলো না, হুঁ-হা দিয়ে উঠে গেল। সিঁড়িতে সে পেয়ে গেরয বুলিকে। বুলি এখনও ফ্রক ছাড়েনি, শরীরটা বেশ মোটা হয়ে যাচ্ছে তার। অনেকে বলে, বুলির মুখখানা অলির চেয়েও অনেক সুন্দর, কিন্তু আইস ক্রিম আর চকলেট খেয়ে খেয়ে সে তার ফিগার ঠিক রাখতে পারছে না।

বুলি বললো, বাবলুদা আমি আর দিদি আজ সন্ধেবেলা সাউন্ড অফ মিউজিক দেখতে যাচ্ছি, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে? চলো, চলো।

অতীন যে সিনেমাটা আগেই দেখে ফেলেছে, সে কথা শুনলে অলি অভিমান করবে। এটা এতক্ষণে খেয়াল হলো অতীনের। কাল সিদ্ধার্থ একবার বলতেই অতীন ছবিটা দেখতে রাজি হয়ে গেল, তখন অলির কথা তার মনে পড়েনি। তবে ছবিটা দেখতে দেখতে সে জুলি অ্যান্ড্রুজের মুখের সঙ্গে অলির মিল খুঁজে পেয়েছিল।

এখন মিথ্যে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। বুলির কাঁধে হাতে রেখে সে বললো, আমার যে এখন বড্ড কাজ, এখন সিনেমা দেখার একদম সময় নেই, আমি বাইরে চলে যাচ্ছি জানিস তো।

–কোথায়? তুমিও বিলতে যাচ্ছো?

–ভ্যাট। বিলেত যাবো কেন, আমি যাচ্ছি পাহাড়ে, শিলিগুড়িতে কাছেই দার্জিলিং-

–আজই তো যাচ্ছো না। চলো না সিনেমায়।

আরও অনক মিথ্যে কথা বলে ভোলাতে হলো বুলিকে। এদের বাড়িতে একটা সুবিধে আছে, দুই বোন সিনেমা দেখতে গেলেও কোনো পুরুষ সঙ্গী লাগে না। টিকিট কাটা হবে অনেক বেশি দামের, বাড়ির গাড়িতে আসবে যাবে। এইসব বাড়ির মেয়েদের পাড়ার ছেলেরাও ঘটাতে ভয় পায়।

অলির ঘরে তার বন্ধু বর্ষা বসে আছে। বিমানবিহারীর কথাগুলো শুনে অতীনের মনের মধ্যে একটা চাপা রাগ জমেছিল, বর্ষাকে দেখে তার আরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এই মেয়েটি তাকে পছন্দ করে না, অতীন বুঝতে পারে, সেও ওকে দেখতে পারে না। তবু এই বর্ষা কেন ঘনঘন আসে অলির কাছে?

মাথার চুলগুলো কাকের বাসা, শাড়িটা মোচড়ানো, চোখে একটা গোল সিকেলের ফ্রেমের চশমা, এ মেয়েটা যেন কিছুতেই একটুও সাজ-পোশাক করবে না ঠিক করেছে। পমপমও কোনোরকম মেকআপ নেয় না। কিন্তু পমপমের সঙ্গে এ মেয়েটির বেশ তফাত আছে। বর্ষা ভাব না-সাজাটাই সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়। কফি হাউসে অতীন গুজব শুনেছে, এই বর্ষা নাকি সাঙ্ঘাতিক পুরুষ-বিদ্বেষী। মনীষ নামে একটা ছেলে এর সঙ্গে প্রেম কতে গিয়েছিল, সকলের সামনে সে মনীষকে অপমান করেছে।

বর্ষার হাতে একটা সিগারেট, সে পা দোলাচ্ছে চেয়ারে বসে। অতীনের দিকে সে তাকালো কিন্তু কোনো কথা বললো না। দেয়াল আলমারি খুলে কিছু একটা খুঁজেছিল অলি, মুখ ফিরিয়ে বললো, আচ্ছা বাবলুদা, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশানে কি আছে যে চাকরির ব্যাপারে ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে ডিসক্রিমিনেট করা যাবে?

বাবলু ভুরু কুঁচকে বললো, আমি কনস্টিটিউশান পড়িনি, কী আছে জানি না। তবে অনেক চাকরি আছে, যেমন আর্মি, পুলিশ, দমকল সেখানে কি আর মেয়েদের নিতে পারে? কেন, কী হয়েছে?

–পুলিশ দমকল নয়। এই বর্ষা একটা সিগারেট কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভ ট্রেইনীর পোস্টে অ্যাপ্লাই করেছিল। ও তো নামের আগে মিস বা শ্রীমতী লেখে না, তাই ওর নাম দেখে বুঝতে পারেনি, ইন্টারভিউতে কল পেয়েছিল, ও হাজির হবার পর ওরা বললো, ঐ পোস্টে মেয়েরা এলিজিবল নয়। ওর ইন্টারভিউ নিলই না। এট অন্যায় নয়?

অতীন অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, ঐ সিগারেট কম্পানি...ও তো মাল্টিন্যাশনাল কম্পানি, ওরা যা

খুশি করতে পারে। ওখানে চাকরির অ্যাপ্লাই করবারই বা কী মানে হয়?

বর্ষা বললো, ওরা মাইনে বেশি দেয়। চাকরি তো টাকার জন্যই। যেখানে বেশি টাকা দেয় বর্ষার হাতের সিগারেটের গন্ধ পেয়ে অতীনেরও সিগারেটর তেষ্টা পেয়ে গেল, কিন্তু বর্ষা টানলে যেন কিছুটা বক্তৃত্ব দেখানো হয়ে যায়। অলি আগে সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে খুব আপত্তি ছিল।

অলি বললো, বাবলুদা, বর্ষা চাইছে চাকরির ব্যাপারে মেয়েদের ওপর যে অবিচার করা হয় তাই নিয়ে একটা আন্দোলন করতে। মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিগুলোর এরকম আস্পর্ধা হবে কেন?

অতীন বললো, আন্দোলন মানে তো খবরের কাগজে চিঠি লেখা?

জানলার কাছে গিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে রইলো। এই মেয়েটা কি উঠবে না? মেয়েটা এত সিগারেট খায় বলেই কি সিগারেট কম্পানিতে চাকরির জন্য এত আগ্রহ। সমাজ ব্যবস্থাটা গোটাটাই বদলাতে না পারলে যে এসব কিছুই বদলানো যায় না। সেটুকু বোঝার মতন বুদ্ধিও এদের নেই।

বর্ষা আর অলি কী সব কথা বলছে, অতীন ঘুরে তাকিয়ে বললো, অলি, তোর সঙ্গে আমার বিশেষ একটা কথা আছে।

স্পষ্ট ইঙ্গিত। অলির মুখটা লালচে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাবার জন্য সে বললো বাবলুদা, জানো, আমাকে ফুলদি একটা চিঠি লিখেছে, গ্লাসগো থেকে। এত সুন্দর চিঠি –

অতীনের ভুরু কুঁচকে গেল। ফুলদি চিঠি লিখেছে অলিকে? বাড়িতে ফুলদির দু'খানা চিঠি এসেছে এর মধ্যে। তার মধ্যে বাবলুর নামে আলাদা কোনো চিঠি নেই। যাওয়ার কয়েকদিন আগে ফুলদির সঙ্গে সে ঝগড়া করেছিল। তা বলে ফুলদি তাকে এক লাইনও চিঠি না লিখে অলিকে চিঠি লিখলো?

এরকম ইঙ্গিত পেয়েও বর্ষা এখনো উঠছে না। সমানে পা দুলিয়ে চলেছে। অতীনের সঙ্গে চোখ-চোখি হতেই বর্ষা হাসি মুখে বললো, আমি এখন যাচ্ছি না। আমি আগে এসেছি আমার কাজ না হলে আমি যাবো কেন?

অলি বললো বাবলুদা, তুমি একটু পরে আসবে? বর্ষা এখন মেয়েদের অর্গানাইজেশন তৈরি করতে চায়, সেই নিয়ে কথা বলতে এসেছিল, আমরা একটা নামের লিস্ট করছি...তুমি দুপুরে একবার অসতে পারবে না? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

অলি যে নিছক ভদ্রতা করেই বর্ষাকে উঠতে বলতে পারছে না, তা অতীন বুঝলো না। সে ওসবের ধার ধারে না। শুধু শিলিগুড়ির চাকরি না, সে অলির সঙ্গে টুনটুনি বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছিল। সে অলিকে একটা স্বীকারোক্তি দিতে চায়। আর ক'দিন বাদেই সে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে। এখন অলি এই ফেমিনিস্ট মেয়েটাকে নিয়ে মত্ত?

আর একটাও কথা না বলে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অলিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো অতীনের একটা বাহু ছুঁয়ে সে বললো, এই বাবলুদা তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছে নাকি? তুমি দুপুরেলা আসবে তো?

রাগের সময় অতীনের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। যে-কথা সে বলবে বলে এসেছিল, তার বলে মুখ দিয়ে এলো সম্পূর্ণ অন্য কথা। সে বেশ জোরে জোরে বললো, তোর বাবা আমাকে কী মনে করে বল তো? আমি কি এ বাড়ির চাকর? তোর বাবা আমার গলায় চেন দিয়ে বেঁধে কলকাতায় ধরে রাখতে চায়?

অলির মুখখানা শুকনো পদ্মপাতার মতন হয়ে গেল। তার বাবার সম্পর্কে এমন কঠোর কথা সে বাবলুদার মুখে কখনো শোনেনি। আবার একথাও ঠিক, কাল তার বাবাও বাবলুদা সম্পর্কে অলিকে কিছু কথা শুনিয়েছেন। বাবলুদার কিছু কিছু কার্যকলাপ বাবার পছন্দ হচ্ছে না।

অসীম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অতীন বললো, তোদের বাড়িতে আর আমার আসতেই ইচ্ছে করে না। আসবো না আর কোনোদিন।

॥ ৬৪ ॥

ট্রেন সড়ে চার ঘণ্টালেট, তবু অতক্ষণ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঠায় বসেছিলেন মানিকদা। মুখে একটুও বিরক্তির চিহ্নই, অতীন ও কৌশিককে তিনি জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। মানিকদার স্বাস্থ্য এখন অনেকটা ভালো হয়েছে, খাকি প্যান্টের ওপর জমকালে একটা সবুজ রঙের কোট পরেছেন।

কৌশিক প্রথমেই হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, মানিকদা, আপনি এই অদ্ভুত কোটটা কোথা থেকে পেলেন?

মানিকর্দা বললেন, একজন নেপালী ড্রাইভারের কাছ থেকে খুব সস্তায় কিনেছি রে। কেন, খারাপ হয়েছে? এখানে গ্রামের দিকে খুব শীত পড়ে। অতীন, তুই গরম জামা টামা এনছিস তো?

অতীন আর কৌশিক দু'জনেই পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর শাল জড়িয়ে এসেছে, কৌশিকের সঙ্গে শুধু কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। অতীনের সঙ্গে টিনের সুটকেশ ও বেডিং মা জোর করে বেডিটা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে ওরা এক রাউণ্ড চা খেয়ে নিল, তারপর স্টেশরে বাইরে এসে দুটো সাইকেল রিক্শা ধরলো।

মানিকদা অতীনর পাশে বসে বললেন, কি রে, প্রথম বাড়ি ছেড়ে বাইরে চাকরি করতে এসেছিস, মন কেমন করছে না তো?

অতীন কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাড়ির কথা মনে পড়লো না, মনে পড়লো অলির মুখ। আসবার আগে সে অলির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এসেছে। আজই অলিকে একটা চিঠি লিখতে হবে।

অতীন বললো, এ চাকরিটা না পেলেও আমি এদিকে চলে আসতুম। নর্থ বেঙ্গল আমাকে টানছিল।

–বেশির ভাগ বাঙালী ছেলেদেরই কলকাতা রোগ-আছে। কলকাতায় চাকরি চাই। কলকাতা ছেড়ে কোথায় যেতে চায় না। এমনকি আমি শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ির ছেলেদেরও দেখেছি, কোনো রকমে কলকাতায় যে-কোনো একটা চাকরি পেলেই যেন বর্তে যায়। কলকাতাটা তো দিন দিন একবারে জঘন্য হয়ে যাচ্ছে। এখানে কী টাটকা হাওয়া ।

–মানিকদা আমার জয়েনিং ডেট কালকে, আমরা কি এখন কোনো হোটেলে উঠবি, মানিক ঠাকুরের হোটেল। চল না, গিয়ে দেখবি। এই রিক্শা ডাইনে ডাইনে অত জোরে নয় একটু আস্তে আস্তে চলো ভাই–।

অনেকগুলো গলি ঘুরে ঘুরে রিকশা থামলো একটা ফাঁকা মতন জায়গায়। একটা এদো পুকুরের ধারে একতলা বাড়িতে ঢুকলেন মানিকদা। সে বাড়িটাতে টিনের চাল সামনে কয়েকটা জবা ফুলেগাছ, এক পাশে একটা বেশ বড় চালতা গাছ, তাতে চালতা ফলেও আছে।

, মানিকদা হাঁকডাক করতেই বাড়ির ভেতর থেকে যে দুজন বেরিয়ে এলো তাদের দেখে অতীন অবাক। তপন আর পমপম। তপনের মুখে একগাল হাসি আর পমপম ভুরু নাচিয়ে বললো, কীরে কীরকম সারপ্রাইজ দিলুম।

মানিকদা বললেন, এই বাড়িটাতে তিনখানা মোটামুটি বড় রুম আছে, ভাড়া মাত্র এইটি ফাইভ রুপিস। নিজেরা রান্না করে খাই, খুব সস্তা পড়ে। অতীন, তোরা এখানে থাকতে পারবি না?

অতীন দারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তাদের কলকাতার স্টাডি সার্কেল উঠে গেছে, মানিকদা কি এখানে আবার সেই স্টাডি সার্কল বসাতে চান? মানিকদার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা হবে, এটাই তো দারুণ আনন্দের ব্যাপার।

মানিকদা বললেন, দ্যাখ না, একে একে আরও অনেককে টেনে আনবো এদিকে। তপন এখানে ইনসিওরেন্স অফিসেকাজ পেয়েছে, ওর হিল্লে হয়ে গেছে। পমপমের জন্যও যদি একটা মাস্টারি ফাস্টারি জোগাড় করা যায়।

পমপম বললো, আমার জন্য তোমায় চাকরি খুঁজতে হবে না, মানিকদা। আমি আমার থাকা খাওয়ার খরচ এমনিই দিতে পারবো।

কৌশিক বললো, ইস আমারও যে লোভ হচ্ছে মানিকদা। কিন্তু আমাকে ফিরে যেতে হবে।

পমপম বললো, আমাকেও ফিরতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝেই আসা যেতে পারে। মোটে এক রাতের জার্নি।

বাড়ির ভেতর দিকে একটা ঢাকাবরান্দা, তারই এক পাশে রান্না ঘর। সামনের উঠোনে লঙ্কা ও বেগুন গাছ অনেকগুলো। সেখানে নেমে মানিকদা গাছগুলোতে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, দেখেছি, আমাদের ভেজিটেবিল গার্ডেন? লঙ্কা তো কিনতেই হয় না, বেগুনগুলোও কিছুদিনের মধ্যেই বড় হয়ে যাবে। তপন গ্রামের ছেলে, ও এসব পারে ভালো। তপন রাঁধেও চমকার। আমিও খারাপ

রান্না শিখিনী, কী বল পমপম? কাল তোদের কেমন আলুর দম খাওয়ালুম?

পমপম চায়ের জল বসিয়ে দিল। তপন বললো, আজ তাহলে বাজার থেকে মাছ নিয়ে আসি? নতুন গেস্টদের অনারে...

মানিকদা বললেন, এখানে গেস্ট কেউ না। সবাইকে পয়সা দিয়ে খেতে হবে। আগেই ওদের বলে দিয়েছি, এটা মানিক ঠাকুরের হোটেল। আমরা এখানে মাছমাংস বিশেষ খাই না, বুঝলি অতীন, তাতে খরচ অনেক কম পড়ে। তবে, আজ একটু মাছ খাওয়া যেতে পারে। শীতকালে এখানে ভালো রুই ওঠে।

কৌশিক বললো, আমি মাছ কেনার পয়সা দিচ্ছি। আজ ভালো করে মাছ খাওয়া হোক।

অতীনের মনে হলো, সে যেন একটা পিকনিকের মধ্যে এসে পড়েছে। বারান্দায় বসে গল্প করতে করতে সবাই নানারকম কাজ করতে লাগলো আতীনকেও দেওয়া হলো আলু ও পেঁয়াজের খোসা ছাড়াবার ভার। এইরকম কাজ অতীন জীবনে কখনো করেনি। পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে তার চোখ একেবারে কান্নায় মাখামাখি।

দুপুরবেলা খাওয়ার পর কিছু কাজের কথা হলো।

মাকিদা বললেন, স্টাডি সার্কেলের আর দরকার নেই। এবারে নেমে পড়তে হবে মাঠে দেশের সত্যিকারের মানুষের মধ্যে এখানকার মহকুমার কিষাণ সভার সেক্রেটারি জঙ্গল সাঁওতালের সঙ্গে মানিকদার অনেক আলোচনা হয়েছে। চারুবাবুর সঙ্গে দেখা হয় প্রায়ই।

শিগগিরই ভূমি দখলের লড়াই শুরু হবে। মার্কসবাদী কমুনিস্ট পার্টি জোতদারের জমি কেড়ে নেবার প্রোগ্রাম নিয়েছে, আপাতত কাজ চলবে সেই প্রোগ্রাম অনুসারে। দিকে দিকে কিষাণ সবার ঝাণ্ডা উড়িয়ে নাস্তানুবাদ করে দিতে হবে কংগ্রেস সরকারকে।

রাত্রে ট্রেনে ভালো করে ঘুম হয়নি, অতীনের চোখ ঢুলে আসছে, পমপম চিমটি কেটে জাগবার চেষ্টা করছে তাকে। তবু সে চোখ খুলে রাখতে পারছে না। মানিকদা দেখতে পেয়ে বললেন, অতীন, তুই একটু ঘুমিয়ে নে বরং। কৌশিক তুই-ও যা।

কৌশিক বললো আমার ঘুম পায়নি।

সঙ্গে সঙ্গে অতীনের শরীরে যেন বিদ্যুতের শক্ লাগলো। কৌশিক আর সে একই সঙ্গে রাত জেগে এসেছে, অথচ কৌশিকের এখন গুমের দরকার নেই, তার ঘুম পাচ্ছে? সে কি কৌশিকের থেকে দুর্বল? বাইরে গিয়ে অতীন দু'চোখে জলের ঝাপটা দিল তো বটেই দশবার ওঠ বোস করে নিল ঘুম তাড়াবার জন্য।

সন্ধেবেলা রান্নার ট্রেনিং দেওয়া হলো অতীনকে। সে কোনোদনি এক কাপ চা-ও বানায়নি, কী করে ডিম সেদ্ধ করতে হয় তাও জানে না। কেমিস্ট্রির ভালো ছাত্র হলেও কোন্ রান্নায় কী কী মশলা লাগে সে সম্পর্কে তার ধারণা নেই বিন্দুমাত্র।

পমপম হাতে ধরে দরে ভাতের ফ্যান গালা শেখাতে লাগলো অতীনকে। তার কানে ফিসফিস করে বললো, বিপ্লবীকে সব কিছু শিখতে হয়।

পমপম সচরাচর হাসে না, সব কথাই ধ্রুব সত্য হিসেবে বলে। বিপ্লবী শব্দটা শোনামাত্র আত্মগোপনকারী লেনিন...অরোরা জাহাজ থেকে কামান গর্জন...মাও সে তুঙ ফিদেল কাস্ট্রো..। এতদিন তারা ছিল রাজনৈতিক কর্মী, এই প্রথম বিপ্লবী কথাটা উচ্চারণ করল পমপম। সত্যি শুরু হবে বিপ্লব? অতীনের একটু একটু গ্লানি বোধ হচ্ছে, সে যেন ঠিক খাঁটি বিপ্লবী নয়। আজ সারাদিনই বারবার তারমনে পড়ছে অলির কথা, অলির মনে সে ব্যাথা দিয়ে এসছে, অলির সেই বিহ্বল দুটি চোখ..। প্রকৃত বিপ্লবীর কি এইসব দুর্বলতা থাকা উচিত?

পমপমকে সে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে আমাদের আর্মসের ট্রেনিং নেবার দরকার নেই? আমি জীবনে কোনোদিন কোনে বন্দুক রিভলভার ছুঁয়েই দেখিনি। তুই তো তবু ওসব চালাতে জানিস।

পমপম বলল, আর্মড স্ট্রাগল ছাড়া কোনো বিপ্লবই হতে পারে না। তবে সেটা আর একটু পরের স্টেজ। এখন জমি দখলের লড়াইয়ে গ্রামের লোকের যে সব ট্রাডিশনাল ওয়েপনস্ তাকে লাঠি টাঙ্গি দা কুড়োল সেই সবই কাজে লাগাতে হবে। মানিকদা বললেন, এটাই চারুবাবুর থিয়োরি।

–পমপম, তুই কি সঙ্গে পিস্তল টিস্তল কিছু এনেছিস? একবার আমাকে দিবি, একটু ধরে দেখব? যেন সে অতীনের চেয়ে বয়েসে বড় এরকম একটা ভাব করে পমপম। তার কাছে কোনো

আগ্রেগ্রস্ত আছে কি নেই তা খোলাখুলি স্বীকার না করে সে অতীনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, হবে হবে। সময় মতন সব কিছু পাবি।

তারপরই সে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে অতীন মনে কর তুই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলি। তারপর অন্য সবার নাম-ধাম খবরাখবর তোর পেট থেকে বার করবার জন্য পুলিশ তোকে টর্চার করবে, তখন তুই তা সহ্য করতে পারবি? প্রত্যেক বিপ্লবীর এটা একটা কঠিন পরীক্ষা।

–ওরা গায়ে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়, তাই না?

–শুধু কি ঐ একরকম। আমাদের বাড়িতে তো অনেক পলিটিক্যাল সাফারার আসে এমনকি ফর্টি সেভেনের আগে ব্রিটিশের হাতে যারা টর্চারড হয়েছে তাদের অনেককে দেখেছি ছেলেবেলা থাকে, তাদের মুখে জেলের গল্প শুনেছি, এক একটা পুলিশ অফিসার হয় চূড়ান্ত সেডিট, আসামীকে যন্ত্রণা পেতে দেখে হা-হা- করে হাসে। আর যন্ত্রণা দেবার কত যে কৌশল ...তোর ওপর দু'একটা ট্রাই করবো, দেখবি তুই সহ্য করতে পারিস কি না?

অতীন সম্মতি জানবার আগেই পমপম তার একদিকের জুলপি ধরে এমন জোরে টান মারলো যে অতীন আঁতকে উঠে আ-আ-আ-চিৎকার করে উঠলো। সেই চিৎকার শুনে মানিকদা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। মানিকাদ জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো, কী হলো?

অতীন বললো, এই পমপমটা কি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর, আর একটু হলে মেরে ফেলেছিল আর কি।

পমপম বলল, বাচ্চা ছেলে একটা। একটু জুলপি ধরে টেনেছি, তাতেই এত চিৎকার পুলিশ যখন আসল টর্চার করবে, তখন জুলপি পটপট করে ওপড়াবে, তখন কী করে সহ্য করবি?

–সে তখন দেখা যাবে। সত্যি সত্যি কিছু গোপন করার কথা থাকলে তবে তো সহ্য করার প্রশ্ন ওঠে। এখন কী আছে।

মানিকদা বললেন, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম চিৎকার শুনে। ভাবলুম কাঁকড়া বিছে-টিছে কামড়ালো নাকি। একবার একটা বিছে বেরিয়েছিল, সাবধানে থাকিস।

আড্ডা চললো অনেক রাত পর্যন্ত। অতীন শুধু ভাত রান্না করেছে। প্রথম দিনের পক্ষে সে ভাত একেবারে আদর্শ বলা যায়। খাওয়া শেষ হলো পৌনে বারোটায়, তারপর শুতে শুতে রাত দুটো। কৌশিক আর সে এক ঘরে শুয়েছে, কৌশিক ঘুমিয়ে পড়ার পরেও তার ঘুম আসছে ন। ঘুম চটে যওয়া বলে একে। দুপুরের ঘুম পাওয়াটাকে সে সম্মান করেনি বলে রাত্তিরেও আর ঘুম আসবে না সহজে।

অন্ধকারে ভাসছে অলির মুখ। সারাদিনে এক মুহূর্ত নিরিবিলি সময় পাওয়া যায়নি, তাই অলিকে চিঠি লেখা হয়নি। এখন লেখা যায়। কিন্তু আলো জ্বেলে চিঠি লিখতে গেলে কৌশিক জেগে যেতে পারে, সে ঠাট্টা করবে।

সত্যি সারা রাত আর ঘন ঘুম হল না অতীনের, ভোরের আলো ফুটতেই সকলের আগে সে জেগে উঠলো। তাড়াতাড়ি সে চোখ ধুয়ে এসে বসে গেল চিঠি লিখতে।

প্রথম চিঠিখানা লিখলো মাকে। মোটামুটি এই জায়গাটার বর্ণনা দিল, মানিকদার কথা পমপমের কথা, এমনকি তার ভাত রান্নার বিরাট সার্থকতাও বাদ গেল না। খাওয়া থাকার সত্যি কোনো অসুবিধে নেই এখানে, সে বিষয়ে মিথ্যে কথা বলতে হলো না। মা যে মশারি কিনে দিয়েছে, সেটা খুব কাজে লেগে গেল। কলকাতায় বাবলু কখনো মশারি নিচে শোয়নি।

মায়ের চিঠি হলো দু'পাতা। তারপর দ্বিতীয় চিঠি।

অলি,

বদমেজাজী মানুষেরা নিজেদের যেমন ক্ষতি করে, অন্যদেরও তেমন ক্ষতি করে। অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়। এসব আমি জানি, কিন্তু এক এক সময় জ্ঞান থাকে না। সেদিন তোর বাবার...

একটু থেমে, চিন্তা করে অতীন 'তোর বাবার' কেটে লিখলো, জ্যাঠামশাই।

সেদিন জ্যাঠামশাই আমাকে যে-সব কথা বললেন, তা আমি মোটেই পছন্দ করিনি, যদিও তাঁর মুখে মুখে কোনো উত্তর দিইনি। আমি ছেলেমানুষ নই, আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজেই ঠিক করবো। আমার বাবা আমার কোনো কাজেবাধা দেন না। যাই হোক সেদিন তোর সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করেছি, সেজন্য পরে খুব লজ্জা পেয়েছি। তোর সঙ্গে অনেক কথা ছিল, কিন্তু আসবার আগে আর দেখাই হলো না।

এখানে একটু গুছিয়ে বসি, তারপর তোকে আবার লিখবো।

ইতি–

চিঠিখানা দু'বার পড়লো সে। খুব ছোট হয়ে গেল।। নিজেই বুঝতে পারলো, চিঠিটা বড়ই সাদামাটা আর রসকষহীন। কিন্তু আর কী লেখা যায়? মাকে যে-সব কথা লিখেছে, সেগুলোই আবার অলিকে লিখতে ইচ্ছে করছে না। কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর একজন জেগে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি পুনশ্চ দিয়ে লিখলো, অলি, তোর বিষণ্ণ মুখখানা প্রায় সব সময়েই মনে পড়ছে।

চিঠির কাগজ একটা বই দিয়ে চাপা দিতেই পমপম এসে দাঁড়ালো সেখানে। ঘুমের পর মানুরে মুখখানা বোধ হয় একটু ফোলা ফোলা দেখায়। পমপমের মাথর চুল সব খোলা, শাড়িটা আলগা ভাবে শরীরে জড়ানো। অ্য সময় পমপম যে মেয়ে তা সব সময় খেয়াল থাকে না। এখন তাকে নারী বলে মনে হচ্ছে। মুখখণা বেশ কোমল।

–এত ভোরে উঠে কী করছিস রে, অতীন? পড়ছিস?

–চিঠি লিখছি। মাকে কথা দিয়েছিলাম–

–অলিকে লিখবি না?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে পমপমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অতীন। পমপমের কোমরের খাঁজ যে এতসুন্দর, তা আগে কোনোদিন চোখে পড়েনি। সে পমপমকে কখনো এই ভাবে দেখেনি। পম্পমের নাভিটা যেন কুয়াশার মধ্যে একটু একটু দেখা চাঁদের মতন।

আশ্চর্য, অলিকেই ভালোবাসে অতীন, অলিকেই সে চায়;তবু পম্পমের নাভি ও কোমরের খাঁজের দিকে তার বারবার তাকাতে ইচ্ছে করছে কেন? কেন সে টুনটুনির বুকে হাত রেখেছিল? এগুলো কি সত্যি অন্যায়? এ বিষয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। কৌশিককে জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি, কৌশিক বড্ড থিয়োরিটিক্যাল কথা বলে।

হয়তো পম্পমের সঙ্গেই এ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করা যেতে পারে। অতীন আর একবার মুগ্ধ চোখে পম্পমের কোমরের দিকে তাকালো।

পমপম তার চুল হাতে জড়িয়ে একটা গিট বাঁধছে। মুখের নরম ভাব কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এবার সে সারাদিনের জন্য তৈরি হবে। সে অন্যমনস্ক ভাবে বললে, অলি মেয়েটা বেশ ভালো। তবে বাবা মায়ের বড্ড আদুরে। একটু স্পয়েল্ট।

বাথরুমের দিকে চলে গেল পম্পম। কেন যেন একটা অপরাধ বোধ জেগেছে অতীনের মনে, সে ঝিম মেরে একই জায়গায় বসে রইলো অনেকক্ষণ।

খানিকটা বেলা হতে কলেজে গিয়ে জয়েনিং রিপোর্ট দিয়ে এলো অতীন। কলেজ এখন ছুটি। আগামীকাল জেনারাল ইলেকশান। শিলিগুড়ি শহরে ইকেশারে কোনো টেম্পোই নেই। দেয়ালে দেয়ালে পেস্টারে দ্বিপাক্ষিক গলাবাজি আছে ঠিকই, কিন্তু সবই যেন নিয়মরক্ষা। কংগ্রেসের বুড়োগুলো আবার এসে বসবে গদি আঁকড়ে, অপোজিশানের শুধু গলাবাজিই সম্বল। বড়জোর মাঝে মাঝে বন্ধ ডাকবে। ব্যাস।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে মানিকদা সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শিলিগুড়ি শহরটা লম্বাটে, এত দোকানপাট আর কোনো মফস্বল শহরে দেখা যায় না। সাইকেল রিকশাও লরিতে সব সময় রাস্তা জ্যাম। শহর ছাড়িয়ে জলপাইগুড়ির রাস্তায় এসে পড়ার পর বেশ ভালো লাগলো অতীনের। শীতের ফিনফিনে হাওয়া বইছে, পরিষ্কার আকাশ।

ওরা রিকশা নেয়নি, হাটছে পাশাপাশি। পম্পমের শরীরটাএখন আবার সরলরেখার মতন,মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। হাঁটতে তার ক্লান্তি নেই, হাঁটতে হাঁটতে সে মাকিদার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল। তপনকে কিছু একটা বোঝাচ্ছে কৌশিক, অতীন একা একটু পেছনে।

জোরে ছুটে আসা একা লরি একটা ধুলোর ঝড় ছুঁড়ে দিয়ে গেল ওদেরওপরে। ওদের রাস্তার পাশে নেমে পড়তে হলো। লরিটা গতি দেখে ভয় পেয়ে একটা গরুর গাড়িও নেমে পড়েছে মাছে। সেজায়গাটা অনেকটা ঢালু, গাড়োয়ান ছপটি মেরে মেরেও গরুদুটোকে তুলতে পারছে না। কৌশিক বললো, আয় আমরা হাত লাগিয়ে গাড়িটাকে তুলে দিই।

গাড়িটার মাঝখানে বসে আছে একটি মাঝবয়েসী লোক, গায়ে একটা মাল জড়ানো। ওর হাতের আঙুলে অনেকগুলো আংটি, ডান বাহুতে একটি রূপোর তাগা, মুখে মিটিমিটি হাসি। এতগুলি ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে একটা গরুর গাড়ি ঠেলায় হাত লাগিয়েছে দেখে সে যেন বেশ মজা পেয়েছে।

জোরে দু'বার ধাক্কা দিতেই গাড়িটা উঠে গেল রাস্তায়, তারপর তড়বড়িয়ে ছুটতে লাগলো।

পম্‌পম বললো, ঐ লোকটা কী অসভ্য। আমরা গাড়ি ঠেলছি, তবুও ওপরে বসে রইলো নামলো না?

তপন বললো, ঐ লোকটা একাই তো গাড়িটাকে ঠেলে তুলতে পারতো, তা না, ওজন বাড়িয়ে বসে রইলো।

মানিকদা বললো, আরা সাহায্য করেছি, গরুদুটো আর গাড়োয়ানের জন্য। ঐ লোকটাকে আগে লক্ষ করিনি, ওকে চিনি আমি, ব্যাটা এক জোতদার। নামে-বেনামে অনেক জমি। ওর জমি দখল করবার কথা আছে, দাঁড়াও না, মার্চ মাসটা পড়ুক ঠ্যালা বুঝবে। মোটামুটি ঠিক আছে যে তার্ড মার্চ থেকে অ্যাকশান শুরু হবে।

তপন বললো, মানিকদা জমি দখল করতে গেলে পুলিশ বাধা দেবে না? জোতদারদের তো নিজস্ব লাঠিয়াল থাকে।

মানিকদা বললো, আমরাও তৈরি হয়ে যারে। ভূমিহীন কৃষকরা এখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। সাঁওতালা তাদের হাতিয়ার নিয়ে যাবে, তাদের বলাই হয়েছে যে দরকার হলে মারতে হবে মরতে হবে। পুলিশ তো জোতদারদের হেল্‌প করতে আসবেই, এবারে সরাসরি কনফ্রনটেশান হবে পুলিশের সঙ্গে।

অতীন যেন চোখের সামনে দেখতে পেল দৃশ্যটা। মাঠের মধ্যে ছুটছে দলে দলে মানুষ লাঠি নিয়ে তাড়া করছে পুলিশ, পুলিশের মাথাতেও ইঁট পাথর পড়ছে, এবার পুলিশ বন্দুক তুলেছে, কোথাও একটা বোমা ফাটলো, অতীনের হাতেফ্ল্যাগ, একটা গুলি লাগানো তার কাঁধে মাটিতে পড়ে যাবার আগে সে ঝান্ডাটা তুলে দিচ্ছে কৌশিকের হাতে।

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে অতীন ভাবলো, তার মা-বাবা ঘুণাক্ষরেও জানেন না, অতীন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে শিলিগুড়ি এসেছে। এখানে পুলিশের গুলিতে যদি সে সত্যিই একদিন মরে যায়? সে এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ছে কেন? কলেজের চাকরি নিয়েই খুশী থাকতে পারতো, হাজার হাজার ছেলে এম এসসি পাশ করে যা করে, সেও যেতে পারতো সেই লাইনে। তা না গিয়ে সে যে বিপদের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, তার কারণ সে কি সত্যিই বিপ্লবী হতে চায়? সে কি দেশটাকে বদলাতে চায়, শ্রমিক কৃষকের রাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে রাজি আছে? অথবা সে এসব কিছু করছে মুধু মানিকদার কথা শুনে, মানিকদার মুখ রক্ষা করার জন্য? মানিকদাকে সে নিজের দাদার মতন মনে করে, এতদিন মিশেও সে মানিকদার চরিত্রে কোনো খাদ দেখতে পায়নি, মানিকদার কথায় সে অনায়াসে প্রাণ দিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু তার প্রাণ কি সম্পূণ্য তার নিজের? তার দাদা আগে চলে গিয়ে তাকে এমন একটা বন্ধনে জড়িয়ে গেছে, সেটা থেকে সে বেরুবে কী করে?

॥ ৬৫ ॥

শহরের সমস্ত লোক যেন বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে সন্ধেবেলা। সকলেরই মুখে বিস্ময়। এ কি সত্যি, এ কি সম্ভব?

সাধারণ মানুষ ভোটের ফলাফল নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। সেই তো খোড়-বড়ি খাড়া আর খাড়া-বড়ি খোড়। এর চেয়ে আর উনিশ বিশ কী হবে? কংগ্রেসের দু-চারটে আসন কমবে কিংবা বাড়বে, এ ছাড়া তো আর কিছু না।

দুপুর থেকেই হঠাৎ রটে গেল যে কংগ্রেস এবার গো-হারান হারছে। রাস্তা দিয়ে জিপ গাড়ি নিয়ে হল্লোড় করতে করতে যাচ্ছে অল্পবয়েসী ছেলেরা। বিকেলের দিকে বেরিয়ে গেল টেলিগ্রাম। কংগ্রেসে সত্যিই ইন্দ্রপতন ঘটে গেছে, বড় বড় নেতারা ডুবেছেন প্রায় সবাই। পূর্ব ভারতে কংগ্রেসের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা, প্রতিটি ভোটযুদ্ধে যিনি সার্থক সেনাপতি, সেই অতুল্য ঘোষ নিজেই হেরে গেছেন সি পি আই-এর এক প্রায় অপরিচিত প্রার্থী জিতেন্দ্রমোহন বিশ্বাসের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে হারালেন তাঁর আজীবন সহকর্মী ও বন্ধু, বর্তমানে ব্রিটিশ শাসন থেকে মেদিনীপুরের খানিকটা অংশকে মুক্তাঞ্চল করেছিলেন যিনি, সেই অজয় মুখার্জিকে কিছুদিন আগে চরম লাঞ্ছনার সঙ্গে বিতাড়ন করা

হয়েছিল কংগ্রেস অপিস থেকে, আজ তিনি তার প্রতিশোধ নিলেন।

বর্ষীয়ান নেতাদের মধ্যে প্রকাশ্য রেষারেষি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হলেও কংগ্রেসের এতখানি বিপর্যয় সত্যি বিস্ময়ের। কারণ বিরোধী দলগুলি শেষ পর্যন্ত এককাট্টা হতে পারেনি। বিরোধীদের মধ্যেও আলাদা দুটি ফ্রন্ট। অনেক আসনে লড়াই হয়েছে ত্রিমুখ। কংগ্রেসের সংগঠন অনেক বড়, সরকারি শাসনযন্ত্র তাদের হাতে এবং ভোটের জন্য টাকা খরচ করার ক্ষমতাও অনেক বেশি তবু যে কংগ্রেস হারলো তাতেই প্রমাণ হয় যে জনসাধারণ কতটা বিরক্ত হয়েছিল তাদের প্রতি।

নামতে নামতে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা এসে থামলো ১২৭-এ। বিধানসভায় ২৮০টি আসনের মধ্যে সরকার গড়ার মতন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কংগ্রেসের রইলো না। ওদিকে মার্কসবাদী কমুনিস্ট দল পেয়েছে ৪৪টি, সি পি আই ১৬, ফরোয়ার্ড ব্লক ১৩,বাংলা কংগেওস ৩৪, বাকিগুলি অন্যান্য ছোট ছোট দলের। তা হলে সরকার গড়বে কারা?

দ্বিধাবিভক্ত বিরোধীদের এ দুই ফ্রন্টে একতা এসে গেল চট করে, তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও মার্কসবাদী কমুনিস্ট পার্টি মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি ছেড়ে দিল, সেই সম্মান দেওয়া হলো বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখার্জিকে, তাঁর আহত অপমানিত ভাবমূর্তি কংগ্রেসকে বাঙতে অনেকটাই সাহায্য করেছে।

ঠিক তিরিশ বছর পর কংগ্রেস আবার বসলো বিরোধীদের আসনে। স্বাধীনতার আগে ১৯৩৭ সালে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে ফজলুল হকের দলের সঙ্গে হাত মেলায় নি কংগ্রেস। গড়তে দিয়েছিল লীগ মন্ত্রীসভা। এবারেও কংগ্রেস বিরোধীদের হাতে ছেড়ে দিল সরকার।

স্পীকারের বাঁ পাশে বসে বিরোধী দল, তাই তাদের নাম বাপন্থী, অনেকে বলাবলি করতে লাগলো, তাহলে কি আগের বামপন্থীা এখন শাসক দলে গিয়ে দক্ষিণপন্থী হয়ে গেল?

পরাজয়ের পর যেন খানিকটা শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ফিরে পেল কংগ্রেস। ১২৭টি আসন পেয়ে সরকার গড়ার লোভ ছেড়ে দিল কংগ্রেস, খুচরো খুচরো দলগুলো থেকে ১৩-১৪ জন এম এল এ কি তারা টাকা দিয়ে কিনে নিতে পারতো না? সে রকম উদ্যোগ না নিয়ে তারা গণতন্ত্রের মান রক্ষা করেছে। তা ছাড়া আগে, বিরোধীরা অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেনদের নামে বহু কুৎসা রটিয়েছে, লোকে তা বিশ্বাসও করছে। অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেনরা চুরি করেছেন কোটি কোটি টাকা, ডালহাউসি স্কোয়ারে অফিস পাড়ায় বেনামীতে কিনেছেন বিশাল অট্টালিকা, খবরের কাগজে ছাপা হতো এইসব কহিনী। ক্ষমতাচ্যুত হবর পর দেখা গেল, এঁদের ব্যক্তিগত ধন সম্পদ তেমন নেই। তবে কংগ্রেস দলের মধ্যে দুর্নীতি যে তাঁরা রোধ করতে পারেন নি, সে দায়ভাগ তাদের নিতেই হবে।

এ বছর সারা ভারতেই কংগ্রেসের অবস্থা শোচনীয়। পশ্চিমবাংলা ছাড়াও কংগ্রেসের হাত ছাড়া হয়ে গেছে কেরল, পাঞ্জাব, রাজস্থান। এবং উড়িষ্যা, বিহার, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশেও কংগ্রেসের টলমলঅবস্থা। কেন্দ্রের লোকসভায় ৫২২টি আসনের মধ্যে ২৭৬টি পেয়ে ইন্দিরা গান্ধী কোনো রকমে সরকার গড়তে পেরেছেন। সাধারণ মানুষ কংগ্রেসকে খানিকটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু এতটা হীনদশা চায়নি, এখনো অনেকের ধারণা কংগ্রেস দলটা ভেঙে পড়লে এতবড় দেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলায় এই প্রথম শুরু হলো কংগ্রেস বিরোধী এক পাঁচমিশেলি যুক্ত ফ্রন্টের শাসন।

ঠিক তার কয়েকদিন পরেই উত্তর বাংলায় নকশালবাড়ি থানার অধীনে একটি গ্রামে একটি জমি দখলের ঘটনা ঘটে গেল। একদল আদিবাসী কৃষক তীর ধনুক বর্শা, লাঠি সোটা নিয়ে হৈ করে ছুটে এসে বসে পড়লো জমিব ওপর, জমির মালিক বিশেব প্রতরোধের সুযোগ পেল না। সেই জমির চারপাশে লাল পতাকা পুঁতেদিয়ে ঘোষণা করা হলো যে এই জমি এখন থেকে কিষাণ সভার সম্পত্তি।

ছোট্ট একটি ঘটনা, আপাতত এর তেমন গুরুত্ব নেই। জোর করে জমি দখল করার চেষ্টা বা ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া এমন কিছু নতুন ঘটান নয় পশিচম বাংলায়। এ বছর মার্চ মাস থেকে উত্তরবঙ্গে ভূমিহীন কিষাণদের জন্য এরকম জমিবজর দখলের সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল কৃষাণ সভা। তখন অবশ্য কেউ কল্পনাও করেনি যে কংগ্রেসের হাত থেকে সরকারি ক্ষমতা চলে যাবে। হঠাৎ ঘটে গেল এক বিরাট পরিবর্তন, এখন পশ্চিম বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু, পুলিশ বাহিনী তাঁর হাতে।

তার ফলে উৎসাহ উদ্দীপনা অনেক বেড়ে গেল। পরবর্তী দশ সপ্তাহে কাছাকাছি তিনটি থানার

অধীনে এরকম জমি দখলের ঘটনা ঘটলো ৬০টি, কোথাও কোথাও সংঘর্ষ হলো সামান্য, কিন্তু জয় হলো কিষাণ সভার নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষকদের।

কিষাণ সভা শুধু জমি দখলেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু শিলিগুড়ির নেতা চারু মজুমদারের ধারণা অন্যরকম। তিনি চিন্তা করছেন সশস্ত্র বিপ্লবের, যার প্রথম ধাপ এলাকা ভিত্তিক ক্ষমতা দখল। চাষী মজুরদের নিত্য ব্যবহার্য অস্ত্র দিয়েই ছোট ছোট এলাকা দখল করে বিপ্লবকে ছড়িতে দিতে হবে।

২৫শে মে ঐ নকশালবাড়ি থানার অধীনেই একটি গ্রামে জয়ের স্বাদ পাওয়া উগ্র কৃষক মুজরদের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো একটি পুলিশবাহিনীর। পুলিশেরা তেমন তৈরি ছিল না। আহত হলো বেশ কয়েকজন পুলিশ, তাদের মধ্যে একজন ইন্সপেক্টর ওয়াংদি দুদিন পরে মারা গেলেন হাসপাতালে। ওয়াংদি যেদিন মারা যান, সেদিনই আর একটি পুলিশ দলকে ঘেরাও করলো উত্তেজিত জনতা। আজ পুলিশের বাহিনী তৈরি, তাদের চোখে জ্বলছে সহকর্মী হত্যার প্রতিহিংসার আগুন, গুলি চালালো সামান্য প্ররোচনাতেই। দশজন নিহতের মধ্যে সাতজন নারী এবং দুটি শিশু। যেন একটা ছোটখাটো জালিয়ানওয়ালাবাগ।

এই প্রথম নকশালবাড়ি নামে উত্তরবঙ্গের একটি অকিঞ্চৎকর জায়গার নাম উঠলো খবরের কাগজে। ঘটনার বিবরণে সবাই স্তম্ভিত। মার্কসবাদী কমুনিস্ট পার্টির নেতার হাতে এখন পুলিশ দফতর। এই দল বরাবরই কৃষক ও মজুরদের ওপরে পুলিশের গুলি চালনার বিরোধী, সেই দলেরই আমলে পুলিশের হাতে মারা যায় সাতজন গ্রামের মহিলা ও দুজুন শিশু। মার্কসবাদী কমুনিস্ট দলও এই ঘটনায় সাংঘাতিক বিব্রত, তারা সরকারি শাসনযন্ত্র পরিচালনায় এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে নির্দেশ দেওয়া হলো, ঐ রকম ঘটান যাতে আর না ঘটে, এই জন্য যেখানে কৃষকা বেশি সংঘবদ্ধ, যেখানে তারা বেশি ক্ষুব্ধ, সেখানে আপাতত আর পুলিশ পেট্রল পাঠাবার দরকার নেই।

পুলিশের ঐ গুলি চালনার পর জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ির কিছু তরুণ শপথ নিয়েছিল, নারী ও শিশুদের ঐ রক্তপাত ও প্রাণদান বৃথা যাবে না, প্রতিশোধ নিতে হবে।

কিছু কিছু এলাকা এখন পুলিশরে টহল মুক্ত। সেখানে সরকারি শাসন নেই। এতে চারু মজুমদারের তত্ত্বই যেন সমর্থিত হলো। এই ভাবেই তো ছোট ছোট অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করা যায়। বিদ্রোহী মজুররা এইভাবেই জয়ের স্বাদ পেতে পারে।

হঠাৎ একমাস বাদে পিকিং রেডিও এক অদ্ভুত ঘোষণা করলো। নকশালবাড়িতে নাকি মাও সে তুঙ-এর নির্দেশিত পথে বিপ্লবী ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ দেখা দিয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে তিনটি পুলিশ স্টেশন, নিহত হয়েছে এগারো জন পুলিশ, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে লড়াই, পুলিশ এখন অনেক গ্রাম ভয়ে যান না। চীনের জনগণের অনুসরণে ভারতের মানুষ সে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের উচ্ছেদ করবে। আগে গ্রামে গ্রামে তৈরি হবে বিপ্লবের ঘাঁটি তারপর গ্রাম থেকে ঘিরে ফেলা হবে বড় বড় শহরগুলি, সেই পথেই আসবে বিপ্লবের বিজয়।

কয়েকদিন পর চীনের পিপলস্ ডেইলি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে এক প্রবন্ধ, ভারতের ওপর বসন্ত বজ্র। তাতেও বলা হয়েছে যে ভারতের কমুনিস্ট পার্টির একটি বিপ্লবী অংশে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করে দিয়েছে। সেই বিপ্লব কোন পথে গেলে সার্থক হবে, তারও নির্দেশ দেওয়া হলো ঐ প্রবন্ধে। উগ্রপন্থীদের সমর্থন কর, ভারতের দুটি কমুনিস্ট পার্টিকে তীব্র শ্লেষ, বিদ্রুপ ও নিন্দেও করা হলো। এক দেশের কমুনষ্টি পার্টির অন্যদেশের কোনো কমুনিস্ট পার্টির ওপর এরকম আক্রমণ অভূতপূব। ভারতের কমুনিস্ট পার্টিগুলি তৈরি থাক বা না থাক, এখনই ভারতে একটা বিপ্লব শুরু করিয়ে দেবার ব্যাপারে চীন খুব ব্যস্ত।

ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে বেশ কিছু অংশ সারা দেশের ক্রম-অধোগতি দেখে দেখে ফুঁসছে ভেতরে ভেতরে। সম্পূর্ণভাবে এই সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে না পারলে এ দেশের মানুষের মুক্তির কোনো আশা নেই এবং একমাত্র সর্বাত্মক বিপ্লবই আনতে পারে সেই পরিবর্তন। এবারের নির্বাচনের পর বামপন্থীরাও গণতান্ত্রিক পথ আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে দেখে তারা আরও ক্ষুব্ধ। এই

গণতন্ত্রে গ্রামের মানুষ চলে যাচ্ছে দারিদ্র্য সীমা নীচে, ক্রমশ এই বিপ্লবের ডাক সেই তরুণদের মনেজাগিয়ে তুললো আগুন।

কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে দেখা গেল নকশালবাড়ির সংগ্রামের সমর্থনে পোস্টার। মাও সে তুঙ-এর লাল বই থেকে উদ্ধৃতি, চীনের চেয়াম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, এই ঘোষণা। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভালো ছাত্ররা অসীম চ্যাটার্জির নেতৃত্বে শুরু করলো সরকার বিরোধী মিছিল ও সংগঠন।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অর্ন্তদ্বন্দ্ব দেখা দেওয়া ছিল খুবই প্রত্যাশিত। শুধু কংগ্রেসে বিরোধিতা নিয়েই বাঁধা হয়েছে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে গাঁটছড়া, তাছাড়া আর কোনো আদর্শের মিল নেই। অজয় মুখার্জিরা বাংলা কংগ্রেস প্রকৃত পক্ষে কংগেসেরই বি-টিম। জাতীয়তাবাদ ও ধনতন্ত্রের সঙ্গে আপোসনীতি তাদের মর্মে গেথে আছে। চীন তাদের চোখে ভারতের আগ্রাসনকারী তো বটেই তাছাড়া পাকিস্তানের বন্ধু। সেই চীনের সমর্থনে পোস্টার এবং বিপ্লবের ডাক দেখে তাদের গাত্রদাহ হবেই।

বাংলা কংগ্রেস ও অন্যান শরিকদের চোখে উত্তরবঙ্গের হাঙ্গামাকারীরা সব মার্কসবাদী কমুনিস্ট দলের লোক। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল এরা তো ঐ দলেরই সদস্য। কলকাতার শক্তিশালী মার্কসবাদী নেতা পরিমল দাশগুপ্তও নশালবাড়ির সমর্থক। এদিকে মার্কসবাদী কমুনিস্ট দল সরকারের অংশীদার, পুলিশ দফতর তাদের হাতে, অথচ তারাই বেআইনী জমি দখল ও আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রতিশ্রুতি দেবে, এ কী করে হতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে জিতে সংবিধানের শপথ নিয়ে তারা মন্ত্রিসভায় এসেছে, তবু তাদেরই দলের এক অংশ বিপ্লবের ডাক দিচ্ছে, এ যে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর।

মার্কসবাদী কমুনিস্ট দলও এই রকম ঘটনায় বিব্রত অবস্থা কাটিয়ে ওটার পথ খুঁজতে লাগলো। উত্তরবঙ্গের হঠকারী বিদ্রোহীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা হলো অনেক। চীনা বেতারে ক্রমাগত প্রচার বিভ্রান্তি ছড়ালো আরও। চীনা বেতারের খবর অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের প্রকৃত বিপ্লবীরা সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারায় সুবিধাবাদী ও অনুগ্রহলোভী কমুনিস্ট দলগুলি তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না।

মাদুরাই-এ মার্কসবাদী কমুনিস্ট দলে সেন্ট্রাল কমিটি মিটিং-এ জবাব দেওয়া হলো চীন বক্তব্যের। নকশালবাড়ির সামান্য একটা বিচ্ছিন্ন দলকে সমর্থন জানিয়ে ভ্রাতৃপ্রতিম কমুনিস্ট দলকে আক্রমণ কখনো মার্কসবাদী লেনিনবাদী নীতি সম্মত হতে পারে না। চীনের এই অপপ্রচারে ভারতে প্রতিক্রিয়াশীলদেরই মদত দেওয়া হচ্ছে। রুশ কমুনিস্ট পার্টির হস্তক্ষেপে এবং প্রচারে চীনারা এক সময় ক্ষিপ্ত হয়েছিল, আজ ভারতের ব্যাপারে চীনা কমুনিস্ট পার্টি তো সেই একই কাণ্ড করছে।

চারু মজুমার ও তাঁর সমর্থকদের যখন কিছুতেই চুপ করানো গেল না তখন মার্কসবাদী কমুনিস্ট দল থেকে খারিজ করে দেওয়া হলো তাঁদের নাম। দার্জিলিং জেলা কমিটি ভেঙে দেওয়া হলো, দল থেকে বহিষ্কৃত হলো প্রায় এক হাজার জন উগ্রপন্থী, সৌরেন বোস, সরাজ দত্ত এমনকি দেশহিতৈষীর সম্পাদক সুশীতল রায়চৌধুরীর মতন প্রবীণ নেতাও বাদ গেলেন না। সরকারের অন্যান্য শরিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে উত্তরবঙ্গের হাঙ্গামায় মার্কসবাদীদলের সমর্থন নেই। এতদিন পুলিশকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল, চীনের বেতারের মতে সেটাই সরকারি শক্তির পরাজয়, সশস্ত্র কৃষকদের প্রতিশোধ করার ক্ষমতা পুলিশ বাহিনীর নেই, সুতরাং বিপ্লব সেখানে শুরু হয়ে গেছে।

এবারে পুলিশকে যতদূর সম্ভব কম রক্তপাত ঘটিয়ে ঢুকে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হলো গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায়। সুসংহত পুলিশবাহিনীর সামনে কৃষকরা প্রতিরোধে দাঁড়াতেই পারলো না। সংঘর্ষ হলো অতি সামান্য। বন্দী করা হলো প্রায় এক হাজার মানুষকে, পনেরো দিনের মধ্যে সব বিদ্রোহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জঙ্গল সাঁওতাল গ্রেফতার হলেন, কানু সান্যাল পলাতক। অসুস্থ চারু মজুমদার আটক হলেন নিরোধমূলক আইনে। বাংলা বিপ্লব তখনও শুধু গর্জন করতে লাগলো পিকিং বেতারে।

এরপরেও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ফাটলে জোড়াতালি দেওয়া গেল না। আজ যায়, কাল যায় অবস্থা। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ এখন প্রতিদিন রাজনীতির আলোচনায় মত্ত। সরকারের মধ্যে দলাদলি ও কলহ বেশ একটা মুখরোচক বিষয়।

শিলিগুড়িতে চাকরি নিয়ে যাওয়া পর সাত আট মাস কেটে গেছে, অতীন এর মধ্যে একবারও কলকাতায় আসে নি। সে চিঠিপত্তর দেয়বটে, তবু মমতার উদ্বেগ কমে না। এতদিন একটানা ছেলেকে না দেখার যে কষ্ট তা অন্য কে বুঝবে না। মমতা নিজেও যেন বুঝতে পারেন না। ছেলে বড় হয়েছে।

সে তো বাইরে থাকবেই, লেখাপড়ার জন্য, চাকরির জন্য সন্তানদের আরও কত দূর দূর দেশে যেতে হয়। এ সব জেনেও তাঁর বুক টনটন করে কেন? ছেলেটা বড় হয়েছে ঠিকই, তবু ওর মধ্যে একটা বাচ্চা বাচ্চা ভাব রয়ে গেছে, যখন তখন মাথা গরম করে, পরে দুঃখও পায় সেজন্য। ছেলেটার মন যে কত নরম, তা শুধু মমতা জানেন, নতুন জায়গায় নতুন মানুষজনের সঙ্গে ও কি মানিয়ে নিতে পারবে? নর্থ বেঙ্গলে কী সব যেন গণ্ডগোল হচ্ছে, তা শুনে মমতার আরও আশঙ্কা হয়।

মমতার খুব ইচ্ছে একবার শিলিগুড়িতে গিয়ে বাবলুর থাকার জায়গাটা দেখে আসার। ছেলেটা কেমন ঘরে থাকে, দু'বেলা ঠিক মতন খেতে পায় কি না, রাত্তিরে মশারি টাঙাতে ভুলে যায় কি না, এসব জানতে পারলে অনেক স্বস্তি হয়। বাবলু সে সব কিছু লিখতেই চায় না। প্রথম প্রথম একবার লিখেছিল, বেগুন ভাজতে গিয়ে গরম তেলের ছিটে লেগে তার বাঁ গালে একটা ফোস্কা পড়েছে। সে চিঠি পড়ে মমতা হেসেছিলেন। যে ছেলে কোনদিন এক কাপ চা তৈরি করে খায় নি, সে রান্না করতে শিখছে। তবু হোটেলের খাওয়ার চেয়ে নিজে রান্না করে খাওয়া ভালো।

এখন বাবলু আর বাড়ির কথা কিছু লেখে না। শুধু একটা পোস্টকার্ডপাঠায়। প্রতিবার প্রায় একই কথা, আমি ভালো আছি, তোমরা কেমন আছো? চিঠি লিখতে জানে না ছেলেটা, সেই তুলনায় তুতুল অনেক সুন্দর চিঠি লেখে। প্রথম বিদেশে গিয়ে বেশ বিপদে পড়েছিল তুতুল, এখন সামলে নিয়েছে অনেকটা। একটা চাকরিও পেয়েছে।

একটা ব্যাপারে খটকা লাগে মমতার। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করার গরজ না থাক, অলির সঙ্গে দেখা করার জন্যও ছেলেটা আর এলো না? এমন তো কিছু দূর নয়, কলেজের চাকরিতে ছুটিছাটও থাকে অনেক। প্রত্যেকটা ছুটিতেই বাবলু দার্জিলিং, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ারে বেড়াতে যাবার কথা লেখে।

ছেলের বিয়ে দেওয়ার চিন্তা করেননি মমতা। অলি আর বাবলু যে পরস্পরের খুব পছন্দ করে, তা মমতা জানেন। অলি অত্যন্ত ভালো মেয়ে, বাবলু মতন ছন্নছাড়া নয়, ওদের বিয়ে হলে বাবলুই ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা বিয়ে কতে চায় কিনা তা কী করে বোঝা যাবে? বাবলু সঙ্গে এ সম্পর্কে কখনো কোনো কথা হয়নি মমতার। প্রতাপের কাছে দু'একবার এই প্রসঙ্গ তুলেছেন, প্রতাপ পাত্তাই দেন নি। বিমানবিহারীর কাছে প্রতাপ কোনোক্রমেই এরকম প্রস্তাব দিতে পারবেন না। বিমানবিহারীরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি অবস্থাপন্ন তাঁরা কোথায় মেয়ের বিয়ে দেবেন, সে তাঁরা বুঝবেন। প্রতাপ কিছুতেই বন্ধুত্বের সুযোগ নিতে চান না।

মমতা ঠিক করেছেন, তিনি অপেক্ষা করবেন। অলির যদি অন্য কোথাও বিয়ের কথাবার্তা হয়, তখন তিনি লক্ষ করবেন তাঁর ছেলে প্রতিক্রিয়া। বাবলু যদি কষ্ট পায়, তা হলে তিনি নিজে গিয়ে অলির মা কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলবেন।

মমতা একদিন প্রতাপকে বললেন, চলো না, আমরা কয়েকদিনের জন্য শিলিগুড়ি ঘুরে আসি। কতদিন কোথাও যাওয়া হয় না। সেই মা থাকার সময় তবু দেওঘর যাওয়া হতো, তারপর তো সে সব চুকেবুকে গেছে, এখন কলকাতায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, বাবলু কি তোমাকে শিলিগুড়িতে যাবার জন্য একবারও লিখেছে? মমতা বললেন না, সে কথা লেখেনি। তবে, সে আমাদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাবে তার কি মানে আছে? আমরা নিজের থেকে যেতে পারি না?

প্রতাপ বললেন, ছেলেদের কাজের জায়গায় মা-বাবাদের হুটহাট করে যেতে নেই। তুমি কোথায় থাকবে, না থাকবে, তা নিয়ে বাবলু মুশকিলে পড়ে যেতে পারে।

–আমরা না হয় হোটেলে উঠবো।

–আমাদের বুঝি অঢেল টাকা পয়সা? মাসে মাসে ধার শোধ করছি। সামনের মাসে মুন্নির পরীক্ষার ফি দিতে হবে।

–আমি তোমায় একশো টাকা দিতে পারি।

–মমো, তোমার কাছে যদি একশো টাকা থাকে, সেটা বর্ষার দিনের জন্য জমিয়ে রাখো। আমার সব কটা সোর্স শুকিয়ে আসছে।

–তা বলে আমরা কোথাও একটুও বেড়াতেও যেতে পারবো না? কষ্ট করেও লোকে মাঝে মাঝে যায় বাইরে...বছরের পর বছর কলকাতায় এই একঘেয়ে জীবন।

–এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? ছেলেটাকে একটু সেটল করার সময় দাও। আমারও একবার দার্জিলিং ঘুরে আসার ইচ্ছে আছে।

একথায় মমতা সান্ত্বনা পেলেন না। মাঝে মাঝেই তিনি বাবলুকে স্বপ্ন দেখছেন। তুতুল নেই, বাবলু নেই, বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বাবলুর বন্ধুরাও কেউ আসে না।

মমতা ঠিক করলেন তিনি একাই যাবেন শিলিগুড়ি। অসুবিধের কী আছে, ট্রেনে চাপবেন, শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে বাবলু তাঁকে নিয়ে যাবে। এতগুলি বছর সংসার সামলাতে তিনি বাধ্য হয়ে ঘরকুনো হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনে একা চলাফেরা কতে এখনো তাঁর অসুবিধে হয় না। প্রতাপ সময় পান না, বাবলু নেই, এখন প্রায়ই মমতাকেই বাজার-হাট করতে যেতে হয়।

মুন্নির সামনেই পরীক্ষা তাকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না। টুনটুনিকে নিলে আরও অসুবিধে হবে। বরং মমতা চলে গেলে ওরা প্রতাপকে দেখাশুনো করতে পারবে। একা একা ট্রেনে করে অনেক দূরে যাওয়ার চিন্তাটা মমতাকে বেশ আরাম দেয়। কল্পনায় যেন মুক্তির বাতাস লাগে। এতখানি জীবনে তো নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী কিছুই করা হলো না।

মমতা যেদিন শিলিগুড়ি যাওয়ার ব্যাপারে একেবারে মনস্থির করে ফেললেন, তার পরেরদিনই একটা খামে চিঠি এলো বাবলুর। চিঠিটা পড়ে মমতা খুশী হলেন তো বটেই, আবার একটু একটু নৈরাশ্যও বোধ করলেন। সামনের সপ্তাহেই বাবুল কলকাতায় ফিরছে, মমতার আর যাওয়া হবে না। বাবলু লিখেছে।

মা,

আমাদের কলেজে একটা গোলমাল চলছে, ক্লাস বন্ধ, শিগগিরই খুলবে বলে মনে হয় না। আমার পক্ষে ভালোই হলো। প্রত্যেক মাসেই কলকাতায় একবার ফিরবো ফিরবো ভাবছিলুম, কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠছিল না। এই মাসে একসঙ্গে বেশ কিছু কলেজ ডি এ পেয়েছি। আগে প্রত্যেক মাসেই কিছু না কিছু জিনিসপত্র কিনতে হচ্ছিল। মাঝখানে আমাদের বাড়িতে চোর এসে বিছানা বালিশ জামা কাপড় সব নিয়ে গেছে। জলের কুঁজো দুটো ভেঙে দিয়ে গেছে। আমাকে একা কম্বল কিনতে হলো, দু'বার দুটো ছাতা হারিয়েছি। কিন্তু এখানে ছাতা ছাড়া চলে না।

আমি ১২ তারিখ সোমবার কলকাতায় পৌঁছোবো। কৌশিক এসেছে, কৌশিকও আমার সঙ্গেই ফিরবে। মানিকদার হাঁপানি বেড়েছে, ওঁকেও নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। মানিকদা হয়তো কয়েকদিন আমাদের বাড়িতেই থাকবেন। অনেকদিন নিজেদের রান্না খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে। অনেকদিন তোমার হাতের মুগের ডাল খাইনি। মানিকদাকে তুমি একদিন নারকেল চিংড়ি খাইয়ো। এদিকে চিংড়ি মাছ ভালো পাওয়া যায় না।

টুনটুনি পড়াশুনো করছে তো? মুন্নিরও পরীক্ষা এসে গেল। পিসিমাকে আমি আগে চিঠি দিয়েছি দুবার, পিসিমা একবারও নিজের হাতে উত্তর দেননি। পিসিমা ফুলদিকে চিঠি লেখেন, আমায় লিখতে পারেন না? বাবা ভালো আছেন নিশ্চয়ই। বাবার একজন বন্ধুর সঙ্গে এখানে আলাপ হয়েছে।

তোমরা আমার প্রণাম নিও।

বাবলু

বিছানার ওপর জোড়াসনে বসে চিঠিটা বারবার পড়ে যেতে লাগলেন মমতা। বাবুলদের ওখানে চুরি হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই রাত্তিরে দরজা বন্ধ করতে ভুলে যায়। আজাকাল চোরের উপদ্রব সব জায়গায়। মুগের ডাল খাবার শখ হয়েছে বাবলুর আগে তো কোনোদিন বলেনি যে মুগের ডাল তার প্রিয়?

এতদিন পর ছেলে আসছে, মমতার তো খুশী হবারই কথা। তবু একটু একটু ক্ষোভও হচ্ছে তাঁর আর একা একা ট্রেনে চেপে শিলিগুড়ি যাওয়া হলো না।

॥ ৬৬ ॥

সিঁড়ির মুখে ল্যাভলেডিকে দেখে তুতুল বললো, গুড মর্নিং মিসেস সেফেরিস।

ল্যাভলেডিটি এক বিশাল বপু গ্রীক রমণী। প্রায় পৌনে ছ'ফিট লম্বা, চওড়াও প্রায় ততখানি, তার হাত দুটি গদার মত, স্তন দুটি যেন ঈষৎ চোপসানো ফুটবল, যে-কোনো পোশাকেই যেন তার শরীর

ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। মিসেস সেফেরিসের বয়েস পঞ্চান্ন চাপ্পান্ন হবে, কিন্তু শরীরে এখনও বার্ধক্যের ছায়া পড়েনি। দু'গালে মেচেতার দাগ, কিন্তু মুখখানা সব সময় হসি খুশি। এর স্বামীটি অতিশয় গোমড়ামুখো, তাকে দেখলেই তুতুল এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

ল্যান্ডলেডি সিঁড়িতে বসে ছেঁড়াকার্পেট সেলাই করছিল, মুখ ফিরিয়ে বললো, মর্নিং দক্তর। ইউ আউট সো আর্লি ? হোয়াটস দা ওয়েদার লাইক?

তুতুল বললো, আজ সকালে বাইরে রোদ ঝকঝক করছে।

কয়েকটা জিনিস কেনাকাটি করতে বেরিয়েছিল তুতুল, তার হাতে শপিং ব্যাগ। সেদিকে ঘন দৃষ্টি দিয়ে ল্যান্ডালেডি সোৎসাহে জিজ্ঞেস করলো, ইউ বাই ফিস্ টু দে? বিগ ইনদিয়ান ফিস?

তুতুল হেসে দু'দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না, মাছ কিনিনি।

এই একটা মজার ব্যাপার। এ দেশে আসার পর থেকেই তুতুল শুনেছিল নিরেজ ঘরে মাছ রান্না করলেও ল্যান্ডলেডিরা চটে যায়। ডালে লঙ্কা ফোঁড়ন দিলে তো সেই ভাড়াটেকে তক্ষুনি নোটিস দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁদের এই গ্রীক বাড়িউলীর কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। মাঝে মাঝে তুতুল যখন রান্না করে বাড়িউলী এসে তার ঘরে নক্ করবেই। তুতুল কী রান্না করছে জানতেচাইবে, তারপর বলবে, মে আই তেস্‌ত ইত? তুতুল যা দেবে, সোনা মুখ করে খেয়ে নেবে মিস সেফেরিস। মাছ খেতে তো খুবই ভালো বাসে। সারাদিন ধরেই এই স্ত্রীলোকটি কিছু না কিছু খেয়ে চলেছে। খাওয়াটাইতার নেশা।

ল্যাণ্ডলেডি খানিকটা নিরাশ হয়ে বললো, নো ফিস? দেন হোয়াত ইউ বাই?

তুতুল বললো, তোমার জন্য একটা আইসক্রিম এনেছি।

ল্যান্ডলেডির মুখখানা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। যেন একটি বাচ্চা মেয়ে, তুতুল যখনই বাজারে যাবে, তখনই এর জন্য কিছু না কিছু আনতেই হবে। অতি সাবধানে টিপে টিপে পয়সা খরচ করতে হয় তুতুলকে, তবু এই খরচটা সে ধরেই রেখেছে।

তুতুল রান্না খুবই কম করে। দিনের পর দিন শুধু স্যান্ডুইচ খেয়ে কাটায়। তার বাড়িউলীর পছন্দ করে, তুতুলে জানা ছিল না। তুতুলকে স্যান্ডুইচ খেতে দেখলে ল্যান্ডলেডি বলে, নো কুকিং? ইউ দক্‌তর ইউ আর্ন স্যাকফুল অফ মানি।

মিসেস সেফেরিসের ধারণা, ডাক্তার মানেই বড়লোক। তুতুল যে রাত্রে সামান্য একটা চাকরি করে ও সেই টাকায় পড়াশুনো করতে হয় দিনের বেলায়, তা এই মহিলাটি কিছুতেই বুঝবে না।

এখনো এক বছর পুরো হয়নি, এর মধ্যেই অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে তুতুলের। লন্ডন শহরটা যে কতখানি কসমোপলিটন তা এখনো না এলে জানা যায় না। কত জাতের লোক যে এখানে রয়েছে তার ঠিক নেই। ইটালিয়ান, আর্মেনিয়ান, গ্রীক, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান, সিলেটী, পঞ্জাবী, গুজাতি এই সব জাতিগোষ্ঠি বেশ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। কতরকমের জীবিকা, জীবনযাত্রা। তাদের বাড়িওয়ালা বাড়িউলী এক সময় একটা মাংসের দোকান চালাতো, এখন দোকানটি বিক্রি করে দিয়ে এই বাড়িটি কিনেছে ছোট ছোট চারটে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দিয়ে ওদের দিব্যি চলে যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে ভালো করে ইংরিজি না শিখেও এই ইংরেজদের দেশে ওরা বেশ চালিয়ে যাচ্ছে। মিসেস সেফেরিস লন্ডনে আছে টানা পঁয়তিরিশ বছর। এখনও তার ইংরিজি কলকাতার বউবাজারের জুতোর দোকানের চীনেদের মতন।

আরও দু'জায়গা ঘুরে তুতুল এই বাড়িতে এসেছে মাত্র তিন মাস আগে। পুরো একটা অ্যাপার্টমেন্ট সে ভাড়া নেয়নি, সে-ক্ষমতা তার নেই। একটি রেস্তোরার দরজায় হাতে লেখা বিজ্ঞাপন দেখে সে এই জায়গাটার সন্ধান পেয়েছিল। একটি গুজরাতি মেয়ের সঙ্গে তাকে অ্যাপার্টমেন্টটা শেয়ার করতে হয়।

সেই মেয়েটির নাম ভাবনা প্যাটেল। দু'জনে যদিও সমান ভাড়া দেয়, কিন্তু ভাবনা আগে সম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্টটি নিজের নামে ভাড়া নিয়ে তারপর তুতুলকে সাব লেট করেছে বলে সে বেশি সুযোগের অধিকারিণী। ভাবনার খাটটি জানলার পাশে, আলমারিতে তার তিনটে তাক তুতুলের দুটো একটি মাত্র বেড ল্যাম্প সে-ই ব্যবহার করে, তার ভাবভঙ্গি আর একটি বাড়িউলীর মতন। তুতুল এমনিতেই লাজুক ও মুখচোরা স্বভাবের ভাবনা তার ওপর প্রায়ই এটা ওটা হুকুম চালায়।

অবশ্য ভাবনা মেয়েটি এমনিতে ভাল। প্রাণখোলা, স্পষ্ট বক্তা। তার গায়ের রং মাজা মাজা ও

চুলের রঙ কালো, এ ছাড়া তার মধ্যে আর কোনো ভারতীয়ত্ব খুঁজে পাওয়া শক্ত। ভাবনা প্যাটেলের পরিবার দু'পুরুষ ধরে আফ্রিকায় উগানডার অধিবাসী। ভাবনার বাবা সেখানে মশলার ব্যবসায়ী, মেয়েকে লন্ডনে পাঠিয়েছেন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়াতে।

ভাবনা ইংরিজিটা ছাড়া কথাই বলে না, ইংরিজি বলেও সে মেম সাহেবদের মতন, গুজরাতি সে জানেই না ভালো করে, সে শাড়ি পরতেও জানে না। একমাত্র গুজরাতি চরিত্র যে-টুকু অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে, তা হলো নিরামিষ খাওয়া, মাছ-মাংস সে ছোয় না তবে কেকের মধ্যে ডিম থাকলে তার খেতে আপত্তি নেই। এবং সিগারেট ও মদ যে-হেতু আমিষের মধ্যে পড় না, তাই বাড়িতে থাকলে অধিকাংশ সময় তার এক হাতে থাকে বিয়ারের টিন, অন্যহাতে লম্বা সিগারেট।

আজ শনিবার, ছুটির দিন, ভাবনা বিছানায় শুয়ে হেনরি মিলার পড়ছে। এখনো মুখও ধোয়নি। তুতুল কত আগে উঠে, বাথরুম টাথরুম সেরে, বাজার পর্যন্ত করে নিয়ে এলো। আজ অনেকদিন বাদেতুতুলের ভাত-ডাল বেগুন ভাজা খেত ইচ্ছে হচ্ছে, সে রান্না করবে মাছ-মাংস আনেনি, যদিও তুতুল এ ঘরের মধ্যে মাছ-মাংস এনে খেলে ভাবনা আপত্তি করে না। কিন্তু ভাবনা খায় না বলে তারও বিশেষ খেতে ইচ্ছে করে না। সে নিরামিষ রান্না করলে ভাবনা তার সঙ্গে খেয়ে নিতে পারে। সপ্তাহে দু'একদিন তুতুল কলেজ ক্যান্টিনে ফিস অ্যান্ড চিপস খেয়ে নেয়।

তুতুলকে দেখে ভাবনা বললো, হ্যালো বহ্নি, এরমধ্যে কেনাকাটি করে এলে, তোমার জন্য কি দোকানগুলো আগে আগে খোলে? এখন ক'টা বাজে?

তুতুল হেসে বললো, পৌনে দশটা।

ভাবনা বইটা মুড়ে বললো, কিছুই না। ডার্লিং, তুমি নিশ্চয়ই আর একটু চা খাবে এখন? আমার জন্যও একটু বানাবে? আমার কৌটোয় ভালো চা আছে, সেটা তুমি ইউজ করতে পারো।

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, শুধু চা, না একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেবে? আমি কর্নফ্লেকস্ আর কলা এনেছি, তৈরি করে দিতে পারি।

ভাবনা বললো, না, না, এখন শুধু চা। বেশি করে বানিও।

একটাই বড় ঘর। দুটি খাট ও দুটি টেবিল ছাড়া, এক কোণে রয়েছে একটা সিঙ্ক, একটা গ্যাস স্টোভ। হাত-মুখ ধোওয়া ও চা ব্রেকফাস্ট, ছোটখাটো রান্না ঘরের মধ্যেই হয়ে যায়। বারান্দার এক কোণে আছে একটা কমন রান্না ঘর, অন্য কোণে বারোয়ারি বাথরুম। এ বাড়ির অন্যান্য অ্যাপার্টমেন্টে থাকে কয়েকটি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ছাত্র, একবৃদ্ধ ইটালিয়ান দম্পতি ও দুই আইরিশ মোটর মেকানিক। রান্না ঘরটায় গেলেই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তারা বড্ড গায়ে পড়ে ইয়ার্কি মারতে আসে বলে তুতুল পারতপক্ষে যায় না। তবে পচনশীল খাদ্য টাদ্য কিছু থাকলে রান্না ঘরের বড় ফ্রিজটায় রেখে আসতে হয়। এখানে কেউ অন্যের খাবারে ভুলেও হাত দেয় না।

ঘরে ফোন নেই, বারান্দায় সকলের জন্য একটি টেলিফোন। তুতুল চা বসিয়েছে, এমন সময় বারান্দায় ফোন বেজে উঠলো, ভাবনা অমনি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল ফোন ধরতে। লজ্জায় কর্ণমূল রক্তিম হয়ে গেল তুতুলের। বাড়িতে যখন থাকে, তখন ভাবনা শুধু একটা ড্রেসিং গাউন ছাড়া তলায় আর কিছু পরে না। বোতামও লাগায় না ভালো করে। তার শরীরের যে-কোনো অংশ যখন তখন দেখা যায়। এমনকি পোশাক বদলাবার সময় তুতুলের সামনেই সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যেতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। তুতুল মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু তার খুব অস্বস্তি লাগে। ভাবনা বুকের বোতামগুলো খোলা অবস্থায় শুধু এক হাতে চেপে ঐ অবস্থায় বাইরে গেল, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানস ছেলেগুলো বারান্দা দিয়ে সর্বক্ষণ যাওয়া আসা করে, তুতুল এরকম ভাবতেই পারে না। সে আজও ড্রেসিং গাউন, হাউস কোট, বা স্লিপিং স্যুট ব্যবহার করে না। শাড়ি পরে ঘুমোয়, সকালে উঠেই সেই শাড়ি বদলে অন্য শাড়ি পরে নেয়। বাইরে বেরুবার সময়েও সে প্যান্ট পরেনি আজ অবধি, সে বুঝে গেছে লন্ডনে শাড়ী পরে চলাফেরায় কোনো অসুবিধে নেই, খুব শীতের সময় তলায় একটা ড্রয়ার পরে নিতে হয় শুধু।

ভাবনার টেলিফোন ছাড়তে ছাড়তে চা প্রায় জুড়িয়ে এলো। আবারজল গরম করতে হলো তুতুলকে। ঘরে ফিরে উৎসাহঝলমল মুখে ভাবনা বললো, বহ্নি, বহ্নি, আজ নাইট শো-তে একটা মুভি দেখতে যাবে? আমাদের পাড়ার হলে মেরিলিন মনরোর একটা দারুণ দুর্দান্ত ছবি এসেছে। মিসফিট, তুমি দ্যাখোনি নিশ্চয়ই? ইজ্ন্ট টেরিফিক. উইথ ক্লার্ক গেবল অ্যান্ড মন্টগোমারি ক্লিফট তুমি

চিন্তা করতে পারো, দুই নায়ক এক নায়িকা, ইউ মাস্ট সি ইট।

সিনেমা থিয়েটার প্রায় কিছুই দেখা হয় না তুতুলের। চাকরি আর পড়াশুনো, দুটোতেই প্রচণ্ড খাটুনি, এ দেশে চাকরিতে ফাঁকি দিলে এক কথায় ছাড়িয়ে দেয়, আর পড়াশুনোয় ফাঁকি দিলে নিজেরই টাকা নষ্ট, তাই একদমই সময় পাওয়া যায় না। ছুটির দিনে তুতুল তার পড়াশুনো খানিকটা এগিয়ে রাখে।

ভাবনার উৎসাহ দেখে সে বললো, ঠিক আছে, যাবো। টিকিট পাওয়া যাবে? না, আমি দুপুরে গিয়ে অ্যাডভান্স টিকিট্ কেটে আনবো দু'খানা?

তুতুল মনে মনে হিসেব করলো, তার কাছে চার পাউন্ড আর কিছু খুচরো শিলিং আছে, দুটো টিকিটে অন্তত দু'পাউন্ড লাগবে, আর পপ কর্নের জন্য কিছু, তার মাইনে পেতে আরও পাঁচ দিন বাকি, তবু এই দিয়েই চালিয়ে দিতে হবে, দরকার হলে সন্ধেবেলা শুধু খেয়ে থাকবে, তবু ভাবনার পয়সায় সে সিনেমা দেখবে না।

ভাবনা তুতুলকে জড়িয়ে ধরে বললো, না। মাই সুইট গার্ল, তুমি টিকিট কাটবে কেন? আমি টিকিট কেটে দেবো। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, তোমার সঙ্গে আর কে যাবে সেটা তুমি ঠিক করো।

—আমার সঙ্গে আর কে যাবে মানে? তুমি দেখবে না সিনেমাটা?

সারা মুখে দুষ্টু হাসি ছড়িয়ে ভাবনা বললো, আমি কী করে যাবো, আজ সন্ধেবেলা যে আমার কাছে টম আসবে। তা ছাড়া ঐ ছবিটা আমার দেখা। আমি চাই ওরকম একটা ভালো ফিল্ম তুমিও দ্যাখো। ইউ মাস্ট নট মিস ইট।

ব্যাপারটা তুতুলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সন্ধের পর ভাবনা এই ঘরটা শুধু নিজের জন্য পেতে চায়, এই জন্যই তুতুলকে সিনেমায় পাঠাবার জন্য তা এত গরজ। এই এক উপদ্রব এখানে। এক একটা শনিবার ভাবনার ছেলে-বন্ধু এসে পড়ে, সঙ্গে মদের বোতল, কিছু খাবার। তুতুলের সঙ্গে সে কিছুক্ষণ ভদ্রতার কথা বলে, তারপর ভাবনার সঙ্গে জড়াজড়ি শুরু করে দেয়। ভাবনা তখন তুতুলের দিকে এমনভাবে তাকায়, যার একটাই অর্থ। তুতুলকে তখন সিঁড়িতে কিংবা রান্নাঘরে গিয়ে বসে থাকতে হয়। সে এক অসহ্য অবস্থা। একদিন একটি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ছেলে মাতাল অবস্থায় রান্না ঘরে এসে তুতুলের হাত ধরে টানাটানি করেছিলআরপর থেকে তুতুল রান্না ঘরে বসে থাকতে আপত্তি জানিয়েছিল, সেই জন্য আজ তাকে সিনেমায় পাঠানো হচ্ছে।

ছেলে বন্ধুকে নিয়ে বেমালুম দরজা বন্ধ করে দেয় ভাবনা। ওর জন্য তুতুলেরই যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়। ভাবনার একজন বয় ফ্রেন্ড নয়, দু'জন তারা বদলে বদলে আসে, এদের কারুর সঙ্গেই ভাবনার বিয়ের কিছু ঠিক নেই। টম নামে যে লোকটি আসে, সে আসলে ভারতীয় এবং নাকি বিবাহিত, তবু তার সঙ্গে শুতে একটুও দ্বিধা নেই ভাবনার। আফ্রিকায় জন্মেও সে খাঁটি মেমসাহেব হয়ে গেছে। সব মেমসাহেবরাও কি এরকম করে?

ভাবনার চরিত্রের এই দিকটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, তবু এই অ্যাপার্টমেন্টটা সে ছাড়তে চায় না একটি মাত্র কারণে, এখান থেকে তার চাকরির জায়গা খুব কাছে। রাত্তিরে হেঁটে ফিরতে পারে।

তুতুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তা হলে দুটো টিকিটের দরকার নেই। আমি একটি যাবো, আমার টিকি কেটে নোবো।

ভাবনা বললো, আজ শনিবার, আজ কোনো মেয়ে একা সিনেমা দেখতে যায়? যাঃ। কেন, তোমার কোনো ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো।

—তার দরকার নেই, সেরকম কোনো বন্ধু নেই আমার।

—তুমি মাঝে মাঝে অনেক রাত্তির পর্যন্ত বাইরে থাকো, আমার ধারণা তোমার কোনো স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে।

—মাঝে মাঝে রাত্তিরে আমি লাইব্রেরিতে পড়তে যাই।

—আর কত পড়াশুনো করবে ডার্লিং। শোনো বহ্নি, তুমি লজ্জা করো না। তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড থাকলে তাকে এখানে ডাকতে পারো। আমি সেলফিস নই, সেদিন আমি তোমাদের জন্য ঘর ছেড়ে দেবো।

—বলছি তো আমার সেরকম কেউ নেই।

—তিনতলায় থাকে জেফ্রি, সে তোমার দিকে নরম চোখে তাকায়, আমি লক্ষ করেছি, সে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

—ঐ দৈত্যের মতন নিগ্রোটা?

—ছিঃ, নিগ্রো বলতে নেই। তোমার কালোদের সম্পর্কে প্রেজুডিস আছে বুঝি?

—না, না, তা নয় ওকে দেখলেই আমার ভয় করে।

—ঠিক আছে, তোমার দেশের কোনো ছেলে তারও তো অভাব নেই। সেই যে একটি ছেলে প্রথম প্রথম দু'চারবার এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

অমরনাথদের বাড়ি ছাড়বার পরও রঞ্জন কিছুদিন তুতুলে সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্ট করেছে, তার চোখের দৃষ্টিতে ছিল অতি ব্যস্ত লোভ। সে ধরেই নিয়েছিল তুতুল একটি অসহায় বোকাসোকা মেয়ে, চিন্ময়ী কলকাতায় ফিরে যাবার পরে সে বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে, তাকে কিছু সাহায্য ও লন্ডনে পা রাখার জায়গা করিয়ে দেবার অছিলায় অঠার মতন, তার ধারণা তার চেহারা দেখে যে-কোনো মেয়েই মুগ্ধ হবে এবং এক সময় বিছানায় যেতে চাইবে। তুতুলের পিঠে সে হাত রাখলে তুতুল পিছলে সরে গেছে, পরে সে সরাসরি তুতুলকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলে তুতুল শান্ত দৃঢ় গলায় বলেছে, প্লীজ, ওরকম করবেন না। একদিন সিনেমা দেখাতে গিয়ে রঞ্জন অন্ধকারে তার উরুতে হাত রেখেছিল, তুতুল উঠে চলে গেছে মাঝ পথে। তারপর থেকে রঞ্জন উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে তুতুল সম্পর্কে।

তুতুল ভাবনাকে বললো, হি ওয়াজ যাস্ট অ্যান অ্যাকোয়েনটেন্স।

ভাবান বললো, তা হলে, তা হলে; একদিন পিকাডেলি সার্কাসে তোমার সঙ্গে একজন ছিল তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে, একজন মুসলিম ডক্টর, সে তোমার বন্ধু নয়?

তুতুল বললো, হ্যাঁ, সে একজন ভালো বন্ধু শুধুই বন্ধু তার বেশি কিছু নয়। কাজের ব্যাপারে মাঝে মাঝে দেখা হয়।

—বহ্নি, ব্যাক হোম, তুমি কি একটি রেখে এসেছো? তুমি বিবাহিতা? ইন্ডিয়াতে শুনেছি অল্প বয়েসেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়।

—তুমি তো ইন্ডিয়াতে যাওনি কখনো। এখন অনেক মেয়েরেই বিয়ে করার বা না-করার স্বাধীনতা আছে।

—তবে কি তোমার কোনো ফিয়াসে আছে? কারুর প্রতি তুমি বাগদত্তা।

তুতুল হাসি মুখে দু'দিকে মাথা নাড়লো। ফস করে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে চোখ বড় বড় করে ভাবনা বললো, ইন্ডিয়াতে তোমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই। এখানে তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই, ডু ইউ মীন টু সে, ইউ আর স্টিল আ ভারজিন?

—এটা খুব আশ্চর্যব্যাপার বুঝি?

—আর ইউ ক্রেজি অর হোয়াট? তুমি তোমার জীবনের সুন্দর সময়টুকু এভাবে নষ্ট করছো?

—সুন্দর সময় কাটানো সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি আর আমার দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো আলাদা ভাবনা।

—লিসন বহ্নি, তুমি লাজুক লাজুক আর ভীত ভীত ভাব করে থাকো, কিন্তু আমি জানি তুমি যথেষ্ট ইনটেলিজেন্ট আর স্মার্ট। আমার চেয়েও বেশি বুদ্ধি তোমার। তা ছাড়া তুমি ডাক্তারি পড়ছো, তোমার বোঝা উচিত এরকম লোনলি জীবন কাটানো অস্বাভাবিক। তোমার স্বাস্থ্য ভালো, চেহারা সুন্দর, তুমি কেন জীবনটা ভোগ করবে না? হঠাৎ একদিন দেখবে শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে।

—পুরুষ বন্ধু ছাড়া বুঝি জীবন উপভোগ করা যায় না। পৃথিবীতে কত কী দেখবার আছে, শোনবার আছে, বোঝবার আছে।

—ডোনট টক ননসেন্স। এটা ইন্ডিয়া নয়, এটা ইওরোপ। এখানে মানুষ জানে স্বাধীনতা কাকে বলে। চিন্তার স্বাধীনতা, ইচ্ছে মতন জীবন কাটাবার স্বাধীনতা। যদি শুধু শুধু কয়েকটা ইনহিবিশান আঁকড়ে থাকো, অকারণে শরীরকে কষ্ট দাও, গান্ধীর মতন রিপ্রেশনেই আত্মার শুদ্ধি হয় মনে করো, তা হলে এক সময় পস্তাতেই হবে। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির মরালিটি নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে বাঁচা যায় না। একটা ভালো সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার মতনই একটি মনোমত পুরুষের সঙ্গে বিছানায় কিছুক্ষণ কাটানো একটা সুখকর অভিজ্ঞতা। তার বেশি কিছু নয়। এতে লজ্জা বা গ্লানির কি আছে?

তুতুর কৃত্রিম ভয়ের বঙ্গি করে দু'হাতে কান চাপা দিয়ে বলে রক্ষে কর। তোমার এই জীবন দর্শন আমার একদম পোষাবে না। আমি বেশ আছি।

ভাবনা এক লাফে বিছানায় উঠে একটা হাত তুলে স্টাচু অফ লিবার্টির ভঙ্গিতে হুকুমের সুরে বলে, অবস্টিনেট গার্ল আই বিসিচ্ ইউ গো, গেট আ বয়ফ্রেন্ড রাইট নাও! প্রন্টো!

তুতুলকে সিনেমায় যেতেই হয় ভাবনা ছাড়লো না। রাত্তিরের শো-তে একা একা সিনেমা দেখা যে কী কষ্টকর । এই সব শহর ছুটির সায়াহ্নে যেন কারুর একা থাকার অধিকার নেই। সব একারাই দোকা খোঁজে। এখানকার সিনেমা হলে সীট নাম্বার থাকে না, অনেক সীট খলি থাকে প্রায়ই। তুতুল নিরিবিলিতে বসবার চেষ্টা করলেও কেউ না কেউ দূর থেকে তার পাশে এসে বসবেই। ফিস ফিস করে কথা বলবে। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় কেউ চাঁছছোলা অসভ্য প্রস্তাব দেবে।

সিনেমাটা ভালো, তবু তুতুলের মন বিষিয়ে রইলো। রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আস্তে আস্তে একবার সে ঘড়ি দেখালো। ভাবনা বলে দিয়েছে বারোটার আগে ফেরা চলবে না, এখনো চল্লিশ মিনিট বাকি, এতক্ষণ কোথায় সময় কাটাবে সে। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া দিচ্ছে, তুতুল গ্লাভস নিয়ে আসেনি, ওবারকোটের পকেটে হাত দুটো রেখেও আঙুলের ডগাগুলো যেন অসাড় হয়ে আসছে। এখন ভাবনা শুয়ে আছে গরম বিছানায়।

তুতুলে কান্না পেয়ে গেল। এক সময় সে বেশ জোরেই বলে উঠলো, উঃ মা, আমি আর পারছি না। কবে বাড়ি যাবো? আমার এই লন্ডন ফন্ডন কিছু ভালো লাগছে না।

হাঁটতে হাঁটতেবাড়ির সামনে দিয়ে একবার চলে গেল তুতুল। দোতলায় তাদের ঘরে আলো জ্বলছে। ভাবনার ছেলে বন্ধু এখনো যায়নি, সে সহজে যেতেই চায় না। ওর মুখোমুখি পড়তে চায় না তুতুলআর ,খুব অস্বস্তি লাগে। তুতুল আবার এগিয়ে যায়, ঠাণ্ডায় তার মুখ বেঁকে যাচ্ছে, নাঃ এরকমভাবে আর চলে না। এরপর ভাবনাক বলতেই হবে। ইচ্ছে মতন সে নিজের বিছানায় শুতে পারবে না, অথচ প্রতি মাসে ভাড়া গুনছে? রান্না ঘরে বসে থাকার ব্যাপারে আপত্তি জানাতে ভাবনা হাসতে হাসতে বলেছিল, তা হলে তুমি ঘরের মধ্যেই থেকো, চোখ বুজে, দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে, আই ডোন্ট মাইন্ড। মেয়েটার মুখে কিছুই আটকায় না।

আরও খানিকটা দূর এগিয়ে যাবার পর তুতুল ফিরলো। খাঁ খাঁ করছে রাস্তা অবিরাম ঝরে পড়ছে গাছের পাতা।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা লোক এসে চলতে লাগলো তুতুলের পাশে পাশে। গায়ে লম্বা ওভারকোট, মাথায় টুপী। কালো নয় কিন্তু কোন জাতের মানুষ বোঝা যায় না। লোকটি হেসে জড়িত গলায় বললো, হ্যালো, সুইদার্ট, ফিলিং লোনইল? মি টু।

তুতুল কোনো উত্তর দিল না, দ্রুত সরে যাবার চেষ্টা করলো।

লোকটি তুতুলের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, কাম অন লেট্স হ্যাভ ফান।

কুঁকড়ে গেল তুতুলের শরীর। যে কোনো পুরুষের স্পর্শেই তার এরকম হয়। ঘেন্না ঘেন্না লাগে। সে অসম্ভব আর্ত গলায় কেঁদে উঠে বললো, লেট মি গো প্লিজি প্লীজ।

লোকটা হকচকিয়ে গেল। সে এরকম আশা করেনি। একলা একটা মেয়ে হাঁটছে, সে তাকে এই ঠাণ্ডার রাতে উষ্ণতা দিতে চেয়েছে। মেয়েটা যদি তাতে রাজি না থাকে, সে কথা বললেই পারে। কাঁদবার কী আছে? সে তো মেয়েটার ব্যাগ কেড়ে নেয়নি।

তুতুল ছুটতে ছুটতে নিজেদের বাড়ির কাছে পৌঁছে বাড়ির সিঁড়িতে বসে রইলো। দু'হাতে ঢাকলো মুখ কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীর।

একটু বাদে ফিরলো বাড়িওয়ালা বেশ মাতাল অবস্থা। সন্ধের পর পাবে গিয়ে মদ খাওয়া ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। তুতুলকে দেখে অবাক হয়ে সে বললো, হ্যাল্লো, দক্কর। তুমি এখানে বসে কী করছো?

নিজেকে সামলে নিয়ে তুতুল বললো, সদর দরজার চাবি নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। বেল বাজাইনি, অন্যরা বিরক্ত হবে।

দারুণ মজা পেয়ে হো হো করে হাসতে লাগলো বাড়িওয়ালা। তারপর সহানুভূতির সুরে বললো, আই নো আই নো ইয়োর রুমমেট, নটি গার্ল, চলো, ভেতরে গিয়ে তুমি আর আমি একসঙ্গে একটু কফি খাই।

আস্তে আস্তে বেশ কিছু লোকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তুতুলে। দু'তিনটি বাঙালী পরিবার, বেশ কিছু ছাত্র। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গেলে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। তুতুলদের ব্যাচের দু'জন ছাত্র ও একজন ছাত্রীও আছে লন্ডনে। মিলনী নামে একটি বাঙালী ক্লাবের অনুষ্ঠানেও সে গেছে দু'একবার, সেখানে পূর্বপাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীরাও আসে।

পরিচিতদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে সত্যিকারের সাহায্য করেছে। আবার সে একা একটি মেয়ে বলেই কেউ কেউ তার সঙ্গে বেশি বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে চেয়েছে, অনুপ নামে তার দু'বছরের সিনিয়ার একন প্রায়ই তুতুলকে তার গোল্ডার্স গ্রীনের সুসজ্জিত অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে চায়। অনুপমের অনেক টাকা, সে নাক স্ট্যাম্প জমাবার মতন, বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে বিছানায় শোওয়ার অভিজ্ঞতা জমায়। ইংরেজ মেয়েদের মাথার দু'একটি চুলদেখিয়ে বন্ধুদের কাছে গর্ব করে।

তুতুল সকলেরই সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে যায়। কেউ উইক এন্ড পার্টিতে নেমন্তন্ন করলে সে কোনো একটা ছুতো দেখিয়ে না বলে দেয়। অন্যের পয়সায় সে খেতে চায় না, অন্যদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার ক্ষমতাও তার নেই। প্রতিটি পাউন্ড হিসেব করে চলতে হয় তাকে। প্রতাপ মামা ধার করে তার প্যাসেজ মানি দিয়েছেন। কলকাতায় তাদের সংসার কত কষ্ট করে চলছে সে বুঝতে পারে। একবার সে অতি কষ্টে পঞ্চাশ পাউন্ড পাঠিয়েছিল বাড়িতে, তাতে খুব ধমক দিয়ে চিঠি লিখেছেন প্রতাপ মামা। তুতুলের কিছুতেই টাকা পাঠাবার দরকার নেই, সে যেন তার পড়াশুনোর ক্ষতি না করে, অতিরিক্ত পরিশ্রম না করে। তুতুল ঠিক করে রেখেছে কোনোক্রমে তিন বছরের মধ্যেই পড়াশুনো শেষ করে সে দেশে ফিরে যাবে।

কিন্তু সেই তিন বছর আগেও কতদূর। এখনও এক বছরও পুরো হয়নি। মাঝে মাঝে তার অসহ্য লাগে, দেশের জন্য মন ছটফট করে। ইচ্ছে করে, সব ছেড়েছুড়ে একদিন দৌড়ে গিয়ে প্লেনে উঠে পড়তে। গত শীতটা কিছুতেই কাটতে চায়নি, আবার শীত আসছে। প্রথম তুষারপাতের সময়, চারদিক নির্জন, বিষণ্ণ তখন দেশের প্রিয় মানুষদের কথা ভেবে মনের মধ্যে একটা আকুলি-বিকুলি ভাব হয়।

সারা সপ্তাহ ধরে শুধু যন্ত্রের মতন কাজ আর পড়াশুনো। সকালবেলা ঘর থেকে বেরুবার পর যার সঙ্গেই দেখা হয় তার সঙ্গেই শুকনো গুড মর্নিং, গুড মর্নিং বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামা। লান্ডলেডির সঙ্গে প্রত্যেকদিন প্রায় একই রসিকতা আর আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা। তারপর হাঁটতে হাঁটতে টিউব স্টেশান। আট'টা বাজলেই ভিড় শুরু হয়ে যায়, তাই তুতুলকে একটু আগে আসতে হয়। তুতুল খবরে কাগজ কেনে না, অন্যের ফেলে যাওয়া খবরের কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে। ট্রেন থেকে নামলেই জনস্রোতে মিশে যাওয়া।

॥ ৬৭ ॥

তুতুল যে স্মার্জারিতে কাজ করে, তার কাছেই মার্ক অ্যান্ড স্পেনসারের একটি বড় দোকান। সেখানে একদিন দেখা হয়ে গেল শিরিনের সঙ্গে। শিরিন জানালো যে কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে ফিরে আলম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আলম বহ্নিশিখার খোঁজখবর নিচ্ছিল, সে তার নতুন বাসার ঠিকানা জানে না।

আলম তুতুলে জন্য অনেক কিছু করেছে। রঞ্জনের সূত্রেই আলমের সঙ্গে পরিচয়, কিন্তু দু'জনের চরিত্র একেবারে আলাদা। প্রথম প্রথম আলমের পরামর্শ ও সাহচর্য না পেলে তুতুল আরও বিপদে পড়তো। আলমই এই চাকরিটা জোগাড় করে দিয়েছে তুতুলকে, তার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেজন্য আলম কোনো প্রতিদান চায় না। তাকে ধন্যবাদ দিতে গেলেও সে এমনবাবে হেসে উড়িয়ে দেয় যেন এটা কোনো আলোচনার ব্যাপারই না। আলম কখনো তুতুলের শরীর ছোঁয়ার চেষ্টা করেনি, বরং সে একটা সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রাখে। আলমের কাছে তুতুল সত্যিই কৃতজ্ঞ । যদিও ইদানীং আলমের সঙ্গে বেশি দেখা হয় না। সে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে পড়েছে, বছরে দু'তিনবার ঢাকা যায়।

আলম অসুস্থ, তাকে একবার দেখতে যাওয়া উচিত। তুতুর শিরিনকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি দু'একদিনের মধ্যে যাবে ওর বাড়ি? তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

শিরিন একটু ভেবে চিন্তে পরদনি সন্ধে সাতটায় সময় দিল। সে একটা নির্দিষ্ট টিউব স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, সেখান থেকে আলমের বাড়ি দু'তিন মিনিট।

যথা সময়ে গিয়ে তুতুল সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো, কিন্তু শিরিনের দেকা নেই। তুতুল অপেক্ষা

করলো আধঘণ্টা। এই সময় ট্রেনের সংখ্যা অনেক,একটা ধরতে না পালে পাঁচ সাত মিনিট পরেই আর একটা পাওয়া যায়, এত দেরি হবার তো কোনো কারণ নেই। নিশ্চয়ই শিরিন কোনো কারণে আটকে গেছে। বিশেষ কিছু না ঘটলে কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেইল করে না। প্রত্যেকবার ট্রেন থামার পর যাত্রীরা হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসে। তুতুল উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে।

চল্লিশ মিনিট পরে তুতুল অস্থির হয়ে উঠলো। আর আশা নেই। ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পায়নি। এমনকি হতে পারে? তুতুল তো নিউজ স্ট্যাণ্ডের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, সব পত্র পত্রিকার হেড লাইন তার মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন তুতুল কি করবে? আলমের বাড়িতে একা যাওয়া যায়? আলম অতি ভদ্র, তাতে কখনো অসুবিধে নেই। তাছাড়া যেমন আড্ডাবাজ নিশ্চয়ই ওর আরও বন্ধু টন্ধু আছে। শিরিন তাকে খুঁজে না পেয়ে হয়তো ওখানেই চলে গেছে। অনেক বলে কয়ে তুতুল আজ সার্জারি থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে, এরপর আর সময় পাবে না। এত দূর এসেও সে ফিরে যাবে?

আলমের সঙ্গে তুতুলের দেখা করতে ইচ্ছে করছে। ফিরে যেতে একেবারেই মন চাইছে না।

হাঁটতে হাঁতে তুতুল ভাবতে লাগলো, শিরিনের সঙ্গে আলমের কী সম্পর্ক? ঠিক বোঝা যায় না। আলম বলেছিল শিরিন তার কাজিন। এক এক সময় মনে হয়, শিরিন তার বান্ধবী। শিরিনের একবার ডিভোর্স হয়ে গেছে, কিন্তু দেখলে মনে হয় কুমারী ফুটফুটে বাচ্চা বাচ্চা চেহারা। শিরিন কি আলমকে ভালোবাসে? ওদের মধ্যে তো কাজিনের সঙ্গেও বিয়ে হয়।

দোতলার ফ্ল্যাটটির দরজা খুললো আলম, সে সম্পূর্ণ একা। সে একটা পাজামা ও গেঞ্জি পরে আছে। বাইরে সাত ডিগ্রি টেম্পারেচার। বাড়ির মধ্যে গরম। আলমের চোখ দুটি লালচে, চুল উস্কোখুস্কো, মুখখান কিছুটা শীর্ণ। সে তুতুলকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো।

ঘরের মধ্যে ঢুকে, ওভারকোট খুলে তুতুল জিজ্ঞেস করলো, আপনার অসুখ হয়েছে শুনলাম?

অলম সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বললো, আরে ধুৎ কিছু না, কিছু না। সামান্যই ব্যাপার। কে তোমারে খবর দিল? শিরিন? বাঃ শিরিন তো একখান বেশ ভালো কাম করছে। সে নিজে আসলো না ক্যান?

তুতুল নিজের ঠাণ্ডা হাতখানা আলকের কপালে ছোঁয়ালো। আলমের বেশ জ্বর অন্তত চার সাড়ে চার তো হবেই।

আলম হেসে বললো, এক ডাক্তার আসছে আর এক ডাক্তারের চিকিৎসা করতে। হো আমার একটা বিশ্রি ঠাণ্ডা লাগার ধাত আছে। এ দ্যাশে বরফের মধ্যে হাঁটলেও ঠাণ্ডা লাগে না। কিন্তু নিজের দ্যাশে গ্যালে গরমে ঠাণ্ডায় সর্দি বসে যায়। কী মুশকিলের কথা। ঠিক হয়ে যাবে। দু' দিনে ঠিক হয়ে যাবে।

তুতুল আলমের নাড়ি টিপে বললো, পালস্ রেট বেশ হাই। কী ওষুধ খাচ্ছেন?

–তোমারে সর্দারি করতে হবে না।বসো তো কী খাবে? তুমি তো ওয়াইন টোয়াইন খাও না, বীয়ারও চলে না, একটু কফি করে দেবো?

–কিছু করতে হবে না, আপনাকে বেশ দুর্বল দেখাচ্ছে । আপনি বসুন। শিরিন কি ফোন করেছিল এখানে?

–না তো। বাদ দাও এখন শিরিনের কথা। তুমি এসেছো, সেটাই বড় কথা। এবারে ঢাকায় গিয়ে কী হলো জানো? আমার যাওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কী সাঙ্ঘাতিক খারাপ অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের। আয়ুবের কোঁতকা খেয়ে সব পলিটিশিয়ান চুপ করে মেরে গেছে। অধিকাংশ জেল্যোরা বাইরে আছে, তারাও ভয়ে বাড়িতে বসে থাকে। শেখ মুজিবের নামে কী বদনাম দিয়েছে জানো? শেখ মুজিব নাকি ইণ্ডিয়ার স্পাই। ইণ্ডিয়া সাথে ষড়যন্ত্র করে শেখ সাহেব নাকি পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

–এখানকার কাগজেও একটা খবর বেরিয়েছিল।

–মিথ্যা কথা। সব মিথ্যা কথা। মোনেম খার উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। আইয়ুবও এমন একটা ডাহা মিথ্যার সুযোগ নিয়ে শেখ মুজিবকে-শেষ করে দিতে চায়। ক্যান্টনমেন্টে বন্ধী করে রেখেছে। কিন্তু তার থেকেও খারাপ কথা কী জানো ঢাকার কোনো উকিল ব্যারিস্টার শেখ সাহেবের পক্ষ নিয়ে মামলাও লড়তে চায় না। শেখ সাহেবের এত ফলোয়ার, এখন তারা সবাই মুখসেলাই করে রেখেছে। যেন শেখ সাহেব খতম। পূর্ব পাকিস্তানের সব আন্দোলন খতম। আমি আমার বন্ধু মওদুদ আমেদ ও আর কয়েকজনের সাথে এক সন্ধ্যাবেলা গ্যালাম বেগম মুজিবের সাথে দেখা করতে। ধানমণ্ডির সেই বাড়ি একেবারে অন্ধকার, আগে সব সময় সেখানে পার্টির লোকজন থাকতো, আজ একজনও নাই। বেগম আমাদের দেখে কেন্দে ফেলান। তিনি কইলেন, আত্মীয়-বন্ধুরা কেউ আর এই রাস্তা দিয়েও হাঁটে না, একটা কাউয়াও এই বাড়ির উপর দিয়া উইড়া যায় না, তোমরা ক্যান আসছো? আমাগো

তিনি বিশ্বাস করতে পারতেছিলেন না। আমরা প্রস্তাব দিলা, শেখ মুজিবের পক্ষে লড়ার জন্য আমরা ব্রিটিশ ব্যারিস্টার নিয়া যাবো। দুই তিনদিন আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত মানিক মিঞার মধ্যস্থতায় তিনি রাজি হইলেন। ওকালতনামা মানে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছেন আমাদের নামে। বহ্নিশিখা, তুমি দেখবে সেই কাগজ? এবার তুলকালাম হবে। ব্রিটিশ ব্যারিস্টার নিয়া গেলে ওয়ার্ল্ড প্রেসের নজর পড়বে..

এক একজনের সঙ্গে গল্প করার জন্য কোনো বিষয় খুঁজতে হয় না, শব্দ ভাবতে হয় না। সাবলীলভাবে এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়া যায়। আলমেরন নানান ব্যাপারে কথা বলার খুব উৎসাহ তুতুল মুগ্ধ শ্রোতা। কখন যে সময় কেটে যায়, হিসেব থাকে না তার।

এক সময়তুতুল ঘড়ি দেখে বললো, ইস সাড়ে নটা বাজে। আমাকে এক্ষুনি উঠতে হবে কত দূরে যাবো।

আলম উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে দেখে বললো, বাইরের শব্দ তো শোনা যায় না। দ্যাখো, এসো, কী রকম কুকুর বিড়ালের বৃষ্টি হচ্ছে, সেই রকম ঝড়ো হাওয়া। এর মধ্যে যাবে কী করে?

তুতুল পরমাশ্চর্য হয়ে বললো, ঝড় বৃষ্টি? আজ সকাল থেকে চমৎকার সানি ওয়েদার। এক ফোঁটা মেঘ দেখিনি আকাশে। আজই আমি রেইন কোটি নিয়ে বেরুইনি।

আলম বললো, এই হচ্ছে লন্ডন ওয়েদার। নারীর চরিত্রে মতন দুজ্ঞেয়। এই বৃষ্টি মাথায় পড়লে জ্বর হবে নির্ঘাৎ। বসো, বসে যাও।

–আপনার রেইন কোট কিংবা ছাতা যদি ধার নিই। এরপর টিউবে উঠতেও ভয় করবে।

–আগে ঝড়টা তো থামুক। তুমি কি ডিনার করে এসেছো? একটু সুপ আছে, গরম করে দিতে পারি।

জানলার কাছে গিয়ে ঝড় দেখতে দেখতে তুতুল মিথ্যে করে বললো, আমি খেয়ে এসেছি। এখন কিছু লাগবে না।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আলম একটি সিগারেট ধরালো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, এবার ঢাকায় গিয়ে আর একটা সমস্যা হয়েছিল। এতরকম ঝঞ্ঝাট,তার মধ্যেও বন্ধুরা জিজ্ঞেস করছিল, তুই এত অন্যমনস্ক কেন রে? তাদের কী করে বলি যে বহ্নিশিখা নামে একটি হিন্দু মেয়ের মুখ আমার মাথায় ঘুরে ফিরে আসছে, সে কেমন আছে, তার কোনো অসুবিধা হলো কি না, থাকার জায়গা নিয়ে যে গন্ডগোল চলছিল–

তুতুল মুখ ফেরালো। এখন আলমের কন্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ফুটে উঠেছে, যা হৃদয়ের কোনো একটা জায়গায় লাগে। তুতুল কোনোক্রমেই আর কারুর বাড়িতে এত বেশি সময় বসে থাকতো না। আলমের এখানে তার গড়ি দেখার কথা খেয়াল হয়নি কেন?

তুতুল বললো, আপনি আমার কথা এত ভাবতে যাবেন কেন, আমি কি ছেলেমানুষ? এখন সব চিনে গেছি।

–মনকে তো বোঝানো যায় না। যখন তখন তুমি আমার মনের মধ্যে চলে আসো। তোমার মনে আছে, প্রথম দিন তুমি লন্ডনে পৌঁছালে, এয়ারপোর্টে দু'কদম হাঁটতে গিয়ে তুমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে, আমি তোমার হাত ধরলাম? সেইদিন থেকেই আমার মনে হয়, তুমি কোনো বিপদে পড়লে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে। তোমার হাত ধরতে পারলে আমি ধন্য হয়ে যাবে। একথা এতদিন বলি নাই।

–আমি এবার যাই।

–যাবে? বৃষ্টি থামে নাই এখনো, বেশ জোর। ঠিক আছে, একটা ট্যাক্সি ডাকি, তাতে চলে যাও।

তুতুল আঁতকে উঠে বললো, ট্যাক্সি? সে তো অনেক ভাড়া হবে, আমার বাড়ির কি এখান থেকে কত দূরে? অসম্ভব।

আলম বললো, তবে আমি তোমাকে পৌছে দিয়ে আসবো। টিউবে, একেবারে বাড়ি পর্যন্ত। আমার ফেরার কোনো অসুবিধা নাই। আমার নিজের গাড়িটাও সারাইতে গেছে। নইলে তাতেই তোমারে পৌচাইয়া দিয়া আসতে পারতাম।

–গাড়ি থাকলেও আপনাকে যেতে দিতাম না। আপনার এত জ্বর টিউব স্টেশনেও যেতে হবে না, আমি একাই যেতে পারবো। একটা শুধু ছাতা।

–এত রাত্তিরে তোমার একা টিউবে যাওয়া সেইফ না। আমাদের এই লাইনটায় প্রায়ই মাগিং হয়। একটা বাজে গ্রুপ আছে। একা কোনো মেয়ে এই সময় যায় না। ..আর একটা অলটারনেটিভ আছে, আমার আর একটা ছোটঘর আছে, একটা সোফা আছে। সেকানে আমি সচ্ছন্দে শুয়ে থাকতে

পারি, তুমি যদি এই ঘরে থাকো।
তুতুল মুখ নিচু করে বললো, না, তা সম্ভব নয়।
–কেউ তো তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবে না? তোমার রুমমেটকে টেলিফোন করে বলেও দিতে পারো।
–তার দরকার নেই, আমি ঠিক চলে যেতে পারবো। আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়, মানে, কাল খুব সকালেই–
–সম্ভব নয়, ও আচ্ছা। আমি তবে তোমার সঙ্গে যাবোই।
–নাঃ, প্লীজ, এই জ্বর গায়ে গেলে...আমার রাত্তিরে ঘুম হবে না।
–বহ্নিশিখা আমি তোমার কাছে কিছু চাই না। বাট আই ডু কেয়ার ফর ইউ। তোমাকে আমি ভালোবাসি, শুধু সেই কথাটা জানিয়ে রাখতে চাই।
তুতুল দেয়ালের দিকে মুখ করে উদাসীন গলায় বললো, আমাকে ভালোবাসলে আপনি ভুল করবেন। আমি অপয়া।
–তার মানে?
–আমাকে যারা ভালোবাসে, তারা কেউ বাঁচে না।
আলম এবার সকৌতুকে হেসে উঠে বললো, মরণ আমারে তিনবার দেখা দিয়ে গেছে। এখনও তালে তালে আছে। আমি যদি বাঁচি তবে অন্য কারুর আয়ুর জোরে। ভালোবাসার জোরেই বাঁচবো। হয়তো তুমিই আমাকে বাঁচাতে পারো।
তুতুল অনেকটা যেন নিজেকে শোনাবার জন্যই বললো, আমার এতক্ষণ এখান থেকে জোর করে চলে যাওয়া উচিত ছিল। তবু আমি যেতে পারছি না।
–কেন পারছো না?
–বোধ হয় আমার মনের জোর কমে যাচ্ছে। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছি।
–সেজন্য কি তোমার অনুতাপ হচ্ছে? তুমি কিছু ভুল করছো?
–না, তা বোধ হয় বলা যায় না ঠিক জানি না।
–বহ্নিশিখা, তুমি এ ঘরে এসেই টিপিক্যাল ডাক্তারের মতন অটোমেটিক্যালি আমার কপালে হাত রাখলে, আমার পাল্‌স দেখলে। এখন একবার, এমনিই অকারণে আমার হাতটা একটু ধরবে?
আলমের দিকে ফিরে তুতুল চুপ কর দাঁড়িয়ে রইলো।
আলম আবার অনুনয় করে বললো, আমি কি তোমার হাতটা একটু ছোঁবার অনুমতি পেতে পারি?
তুতুল বাড়িয়ে দিল নিজের হাত।
শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিতেই ফিরতে হলো তুতুলকে। আলম কিছুতেই শুনলো না, টেলিফোনে একটা ট্যাক্সি ডেকে, সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতেই গুঁজে দিল দশটা পাউণ্ড। সেই ট্যাক্সি থেকে নেমে, বাড়ির সদর দরজা চাবি দিয়ে খুলতে খুলতেই তুতুল ভিজে গেল অনেকটা।
ভাবনা ঘুমিয়ে পড়েছে, তবু শাড়ি বদলাবার জন্য তুতুল গেল বারান্দার বাথরুমে। ভিজে শাড়ী ব্লাউজ, ব্রা, শায়া খুলে সে দাঁড়ালো আয়নার সামনে। দেয়াল জোড়া আয়না, এভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুতুল কখনো আশিরপদনখ নিজেকে দেখেনি। তার মুখে একটা তীব্র অনুভূতির ছাপ। তার জীবনের একটা দিকবদল আসন্ন, সে টের পাচ্ছে যে এতদিনে তার শরীর জেগে উঠেছে।
আয়নার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তুতুল। তার মনে পড়লো পিকলুর কথা। আলমের ঘরে থাকতে থাকতেই পিকলুদার কথা মনে পড়ছিল। পিকলুদা একদিন দুপুরে দেখতে চেয়েছিল এই শরীর, এইভাবে। তুতুল রাজি হয়নি পিকলুদার সেই আহত দৃষ্টি....
কোথায় হারিয়ে গেছে পিকলুদা। জয়দীপও হারিয়ে গেল। আলমকেও কি সে হারিয়ে যেতে দেবে? এমন সম্মান দিয়ে কেউ তো তার শুধু হাত ধরতে চায়নি।
তুতুল অনেকক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদলো যেন একা বহুদিন জমে থাকা বরফ গলে যাচ্ছে। জন্ম হচ্ছে একটি নতুন ঝর্নার প্রবল তার তোড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে তুতুলের সর্বাঙ্গ।
এরপর প্রায় প্রতিদিন দেখা হতে লাগলো আলমের সঙ্গে। আলম নিজের কাজ নষ্ট করে তুতুলে কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত্রে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়, দরজা পর্যন্ত তুতুলদের বাড়ির মধ্যে ঢোকে না। নিজের অ্যাপার্টমেন্টেও তুতুলকে ডাকে না। সে শুধু তুতুলের সঙ্গে থাকতে চায়। তার রাগ অভিমান নেই, হাসি ঠাট্টায় মশগুল রাখতে চায় তুতুলকে। তুতুলই একদিন দুপুরে আলমকে বললো, তুমি বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছো, কিছু খাওনা বুঝি? এসো, আজ আমর বাড়িতে এসো, আমি তোমায় ভাত রেঁধে খাওয়াবো।

সেই রাতে তুতুল তার মাকে চিঠি লিখতে বসলো। এতদিন সে শুধু কাজের কথা পারিপার্শ্বিকের কথা, অন্য মানুষজনের কথা লিখেছে। আজ লিখলো নিজের মনের কথা।
সেই চিঠি কলকাতায় পৌঁছোলো পাঁচ দিন বাদে। সকালে ডাকের চিঠি। প্রতাপ তখন আদালতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। পোস্টম্যানের হাত থেকেই খামটা নিয়ে মুন্নি চেঁচিয়ে বললো, পিসিমণি, তোমার চিঠি । ফুলদি নতুন স্ট্যাম্প পাঠিয়েছে, খামটা নিয়ে মুন্নি চেঁচিয়ে বললো, পিসিমণি, তোমার চিঠি। ফুলদি নতুন স্ট্যাম্প পাঠিয়েছে খামটা আমি নেবো।
জপ করতে বসেছিলেন সুপ্রীতি, মেয়ের চিঠির কথা শুনে তিনি দ্রুত মন্ত্র শেষ করলেন। এবারে তুতুলের চিঠি একটু দেরিতে এসেছে। মাত্র সাত আট লাইন পড়েই তিনি দারুণ এক আর্তনাদ করে উঠলেন, ও খোকন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। ও মমতা....
সে রকম চিৎকার শুনলেই সাঙ্ঘাতিক কোনো দুঃসংবাদের আশঙ্কা হয়। প্রতাপ ও মমতা ছুটে এলেন এক সঙ্গে। উৎকণ্ঠায় চাই বর্ণ মুখে প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে দিদি? দেখি চিঠিটা?
সুপ্রীতির নাভিমণ্ডল থেকে হাহাকার উঠে এলো। সর্বনাশ হয়েছে। আমি বিষ খাবো! তুতুল মুসলমান বিয়ে করতে চায়।
প্রতাপ দ্রুত চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। সুপ্রীতি সত্যিই যেন বিষের জ্বালায় ছটফট করছেন। বেশ কিছুদিন ধরে সুপ্রীতি একেবারে নির্জীব হয়ে গিয়েছিলেন, বাড়িতে তাঁর গলার আওয়াজ শোনাই যেত না। আজ এক প্রচণ্ড আঘাতে যেন তিনি আবার জেগে উঠেছেন।
কণ্ঠে ফুটে উঠছে রাগ ও দুঃখের তীব্রতা। তিনি বারবার বলতে লাগলেন বিষ দে। ও খোকন বিষ দে আমাকে। নিমক হারাম, অকৃতজ্ঞ মেয়ে, এত কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছি, তোদের কত কষ্ট হয়েছে। এ বাড়িতে কেউ একট দুধ খায় না, মাছ খায় না, সেই মেয়ে বিলেতে গিয়ে মুসলমান বিয়ে করবে, একথা শোনার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে হলো?
সুপ্রীতির এতখানি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে প্রতাপ খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। তুতুল ডাক্তারি পাস করে বিদেশে গেছে, সে তো তার নিজস্ব ইচ্ছে অনিচ্ছে অনুসারেই জীবনটা ঠিক করবে। দিদিকে কী করে সান্ত্বনা দেবেন প্রতাপ? চিঠিটা মমতার হাতে দিয়ে তিনি বললেন, দিদি, তুমি মুসলমান বলে এত আপত্তি করছো কেন? তুতুল বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে যাকে পছন্দ করবে, সে নিশ্চয়ই ভালো ছেলেই হবেএস ছেলে যদি মুসলমানও হয়...
সুপ্রীতি চোটপাট করে বললেন, তার মানে? মুসলমান জামাই আমি মেনে নেবো? কক্ষনো না? ওদের জন্য আমাদের দেশ ছাড়তে হয়নি? আমাদের সর্বস্ব গেছে। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, কত মানুষকে মেরে ফেলেছে। লক্ষ লক্ষ রিফিউজি এখনো ভিখিরি, সেই রিফিউজিদের হাতে খুন হয়েছে আমার স্বামী, তার জন্যও তো মুসলমানরাই দায়ী। কত লাঞ্ছনা, কত অপমান সহ্য করেছি, সেসব আজ ভুলে যাবো? তুই এত কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছিস, সবই তো ওদেরই জন্য আমার মেয়ে, সে এ কী করলো খোকন, বংশের মুখে চুনকালি দিল, ওরে খোকন।
প্রতাপ বললেন, দিদি আস্তে আস্তে পাড়ার লোকে শুনলে ভাববে আমাদের বাড়িতে বুঝি কেউ...
সুপ্রীতি বললেন, তার থেকে কম কী হয়েছে? ও মেয়ে মরে গেলেও আমি এক কষ্ট পেতাম না রে, ওঃ ওঃ খোকন আমার বুক ধড়ফড় করছে। এত কষ্ট, নিজের পেটের মেয়ে এত কষ্ট দিতে পারে মাকে...
মমতা বললেন দিদি, আগেই এত উতলা হচ্ছেন কেন? বিয়ে তো এখনও হয়নি। তুতুল লিখেছে, আলম নামে একটি ছেলেকে তার পছন্দ হয়েছে, ছেলেটি ডাক্তার, খুব ব্রিলিয়ান্ট, ভালো বংশের ছেলে।
–সে মুসলমান।
–হ্যাঁ, আলম নাম যখন মুসলমান তো হবেই। তবে, বিয়ের তারিখ টারিখ এখনো কিছু ঠিক হয়নি, তুতুল লিখেছে সে আপনার আশীর্বাদ চায়..
মমতার দিকে কটমট করে তাকিয়ে সুপ্রীতি বললেন, আশীর্বাদ? তাকে লিখে দাও, সে যেন পত্রপাঠ ফিরে আসে। দরকার নেই তার বড় ডাক্তার হওয়ার। ওদেশে ছেলেরা গিয়ে মেম বিয়ে করে, আর আমার মেয়ে গিয়ে বিয়ে করতে চাইলা...খোকন, তুই আরও লিখে দে, সে যদি আসতে না চায়, কোনোদিন সে আর আমার মুখ দেখতে পাবে না....আমার আশীর্বাদ চায়, এত নির্লজ্জ বেহায়া হয়েছে সে। লন্ডন শহরে বিষ পাওয়া যায় না? আমার অভিশাপ, সে বিশ খেয়ে মরুক। মুসলমানের বউ হওয়ার চেয়ে ও মেয়ের মৃত্যুর খবর পেলেও আমি চোখের জল ফেলবো না।

পমপম একটা রেডিও রেখে গেছে। রেডিওটি দেখতে ছোট কিন্তু শক্তিশালী, পমপমের বাব একবার হংকং থেকে কিনে এনেছিলেন। মানিকদার বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই তাই রেডিওটি চালাতে হয় ব্যাটারিতে। এইসব ব্যাটারি এখনও ভারতবর্ষে তৈরি হয় না, কিন্তু শিলিগুড়ির একটা বাজারে ভালোভাবে খুঁজলে পাওয়া যায়। এই বাজারটিরও স্থানীয় ডাকনাম হংকং মার্কেট।

এই রেডিওতে বি বি সি এবং পিকিং ধরা যায়, একটু রাতের দিকে স্পষ্ট শোনা যায় পিকিং এর ইংরিজি অনুষ্ঠান। অতীন, মানিকদা আর তপন গভীর আগ্রহ নিয়ে সেই খবর ও ভাষ্য শোনে। প্রথম যেদিন ২৮ শে জুন পিকিং বেতারে উত্তর বাংলার কৃষক বিদ্রোহের সংবাদ শোনা গেল, সেদিন কী বিপুল উত্তেজনা। বিপ্লবের ডাক এসেছে। সেদিনকার সেই বার্তায় একটা লাইন মুখস্থ করে ফেলেছে অতীন, দা ফ্রন্ট প অফ দা রেভোলিউশানারি আর্মড স্ট্রাগল লন্‌চড বাই ইন্ডিয়ান পিপুল আন্ডার আন্ডার দা গাইডেন্স অফ মাও সে-তুংস টিচিংস।

তারপর থেকে প্রায় প্রতিরাত্রেই খাওয়া দাওয়ার পর ঘণ্টা দু'এক ধরে পিকিং রেডিও শোনার চেষ্টা করে ওরা। লেনিনের পর মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার নেতৃত্ব এখন যাঁর হাতে সেই চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর সরাসরি নির্দেশে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে ভারতের বিপ্লব স্ফুলিঙ্গ, এটা একটা বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা.। শুনলেই রোমাঞ্চ হয়।

পিকিং বেতারের নারী-ভাষ্যকারটির কণ্ঠস্বর অতি ধারালো, ইংরিজি বাক্যগুলি বলে ভেঙে ভেঙে বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। একদিন সেই মেয়েটি জানালো, উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি অঞ্চলের তিনটি গ্রামের পুলিশ স্টেশন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, একজন পুলিশ অফিসার ও দশজন পুলিশ নিহত। পুলিসরা এখন ভয়ে অনেক গ্রামে ঢুকতে সাহস করে না।

তপন জিজ্ঞেস করলো, মানিকদা, একজন ইনপেক্টর ওয়াংদি তো শুধু মারা গেছে, দশজন পুলিশের মরার খবর তো এখানে শোনা যায়নি?

মানিকদা বললেন, ওরা ঠিকঠাক খবর রাখে। এখানকার গর্ভনমেন্ট অনেক কিছু চেপে যায়। দেখছিস না দিল্লিরও টনক নড়ে গেছে, তা কি এমনি এমনি। হরেকৃষ্ণ কোঙার বারবার শিলিগুড়িতে ছুটে আসছেন কেন? এই নিয়েই তো অজয় মুখার্জির সঙ্গে জ্যোতিবাবুর ঝগড়া লেগে গেছে।

অতীন বললো, মানিকদা, হরেকৃষ্ণ কোঙারের মতন মানুষও বুরোক্রেসি মানছেন? উনি আইন আদালত মেনে ভূমিহীন চাষীদের জমি দিতে চান?

মানিকাদ বললেন, সংবিধানের শপথ নিয়ে মন্ত্রী হয়েছেন যে। তাতে মোল্লার দৌড় ঐ মসজিদ অবধি।

অতীন বললো, আমি তো মনে করি, আগে জোতদার জমিদারদের কাছ থেকে সব জমির দলিল কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। নইলে এদেশের কিচ্ছু হবে না।

মানিকদা মৃদু মৃদু হেসে মাথা নাড়তে থাকেন।

অতীন কলেজে ক্লাস নেওয়া শুরু করে দিয়েছে অনেকদিন। তার ভয় ছিল, সে ঠিক মতন পড়াতে পারবে না, মফস্বল কলেজের ধেড়ে ধেড়ে ছেলেদের সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাবে। কিন্তু সেদিক থেকে তার কিছু অসুবিধা হলো না। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের ইনঅরগানিক কেমিস্ট্রি পড়ানো এমন কিছুই না, প্রায় গল্প বলে যাওয়ার মতন। এমনিতেই অর্ধেক ছেলে আসে পড়াশুনোয় কিছুটা মন আছে, অতীনও ঠিক করেই রেখেছে যে শুধুমাত্র পড়াশুনোয় যারা খুব আগ্রহী তাদেরই সে সাহায্য করবে। বাকি ছাত্ররা যার যা খুশি করুক। কোনোরকমে একটা ডিগ্রি নিয়েই বা তাদের কী এমন হাতি ঘোড়া হবে?

ক্লাস রুমে রাজনীতি আলোচনা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন মানিকাদা। কলেজের গভর্নিং বড়িগুলো কংগ্রেসের ঘাঁটি। অতীন অস্থায়ী নিয়োগপত্র পেয়েছে, সামান্য কারণে তার চাকরি যেতে পারে। চাকরি চলে গেল তার আর উত্তরবঙ্গে থাকা হবে না।

ক্লাস রুমে অতীন সে রকম কিছু না বললেও সে সহকর্মীদের কাছে নিজেকে চেপে রাখতে পারে না। প্রফেসার্স রুমে এখন কোনো পড়াশুনোর কথা হয় না, সব সময় রাজনীতির আলোচনা। যারা বাড়ির চাকরদের সঙ্গে রিকশাওয়ালা, বাজারের ছোট দোকানদার, গ্রামের চাষা, কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে তুই-তুকারি ছাড়া কথা বলে না, তাদের মুখেও শ্রমিক কৃষক শ্রেণী সম্পর্কে বড় বড় কথা শুনলে অতীনের পিত্তি জ্বলে যায়। তাছাড়া, বেশীর ভাগ এইসব তথাকথিত শিক্ষিত অধ্যাপকদের পৃথিবীর ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান যে এত কম, অতীনের তা ধারণায় ছিল না। কিছুদিন

আগেও সে ছিল ছাত্র, অধ্যাপক শ্রেণীকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হতো, আরও মনে হতো, এরা সাবই অন্য চাকরি না নিয়ে শিক্ষা জগতের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে অনেক আত্মত্যাগ করছেন। এখন অতীন অনেক বয়স্ক অধ্যাপকদের সঙ্গে এক ঘরে বসে আড্ডা দেয় এবং টের পায় যে এঁরা অধিকাংশই অতি স্যাঁতসেঁতে ধরনের সাধারণ মানুষ। এঁদের এত কাছাকাছি না এলেই ভালো হতো।

সখের বামপন্থীদর মতন অতনি ধীর স্থির যুক্তিবাদী নয়। অ্যদের মুখে প্রতিক্রিয়াশীল কথাবার্তা শুনেও সে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি হাসতে পারে না। সে রেগে ওঠে সে টেবিল চাপড়ায় কারুর মুখেরও ওপর বলে দেয়, আপনি মশাই মঙ্গলকাব্য পড়েছেন বলে লাও চাও এর লেখা পড়বেন না, এমনকি কেউ মাতার দিব্যি দিয়েছে আপনাকে।

সহকর্মীদের মধ্যে অতীনের গোপন ডাকনাম হয়ে গেছে রাগী মজুমদার।

গরমের ছুটিতে অতীনের কলকাতায় যাওয়া হলো না, সেই সময়েই তো আসল ঘটনাগুলো ঘটতে লাগলো উত্তরবঙ্গে। অতীন আশা করেছিল, ভূমি দখলের লড়াইগুলিতে গোপনে গোপনে তারাও অংশনেবে। কিন্তু মানিকদা বলেছেন, তার কোনো প্রয়োজন নেই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদে ঐ সব জায়গায় দেখা গেলে পুলিশ তৎপর হয়ে উঠবেই। এখনও তার সময় আসেনি। অতীন আর কৌশিক অবশ্য মানিকাদাকে না জানিয়ে তবু দুটো জায়গায় জমি অধিকার দেখতে গিয়েছিল। দু'জায়গাতেই প্রতিরোধ হয়েছে অতি সামান্য।

মানিকদার আখড়ায় এখনও অতীন আর তপন নিয়ে তিনজনই স্থায়ী বাসিন্দা। পমপম আর কৌশিক আসে মাঝে মাঝে। পুরোনো স্টাডি সার্কলের আরও কেউ কেউ আসে, কিন্তু বেশিদিন থাকে না।

অতীন তার মন থেকে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেছে। বিপ্লব শব্দটা শুনলেই তার রক্ত চনমন করে ওঠে। একটা সত্যিকারের বিপ্লবে অংশ নেবার জন্য তার আর তর সইছে না। একট অটুট যুক্তিও তৈরি হয়ে গেছে মনের মধ্যে। তার বাবাও তাদের পরিবারকে সে অনেক কষ্ট সহ্য করতে দেখেছে। সে দেখেছে অনেক মূল্যবোধের অবক্ষয়। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এখনো এদেশে মাথা গোঁজাবার জায়গা পায়নি কিংবা পায়নি মানুষের সম্মান। তারা যেন মানুষের চেয়ে হীনজাতীয় কিছু। এজন্য তার বাবা এবং আরও অনেকে শুধু দেশ বিভাগকেই দায়ী করেন। আসলে এটাই চরম ভুল। ভারতের স্বাধীনতাই তো নিছক সেন্টিমেন্টাল ব্যাপাল ছাড়া আর কিছু না। তাদের পরিবারের মতন আরও অনেক পরিবারই দিন দিন নেমে যাচ্ছে নীচে, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা যে-অবস্থায় আছে, এদেশের কোটি কোটি ভূমিহীন খেত মজুরদের অবস্থা তাদের থেকে কোনো অংশে ভালো নয়। আসলে সমাজ ব্যবস্থারই কোনো পরিবর্তন হলো না। ঘুচলো না শ্রেণী বিভেদ, আর সববন্টনের কথা তো শাসক শ্রেণী উচ্চারণই করে না। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ঘুচলো না ধর্মীয় বিভেদ। জাতীয়তাবাদের মিষ্টি মিষ্টি বুলি দিয়ে ক্রমাগত ঢাকা দেবার চেষ্টা হচ্ছে দেশ জোড়া দারিদ্র্যের দগদগে। এতদিন ব্রিটিশরা শুয়েছে এখন শুষছে মহাজন, জোতদার, ব্যবসায়ী, ও আমলাতন্ত্র। সশস্ত্র আঘাত না দিলে, আগুন না জ্বাললে এই ব্যবস্থা বদলাবে না। সেই বদলের প্রক্রিয়ায়, সেই বিপ্লবে অতীন যদি অংশ নিতে পারে, তাহলে সে তো তার বাবা-মায়ের আক্ষেপই দূর করবে। সে একদিন তাঁর বাবার সামনে গিয়ে বলতে পারবে, দ্যাখো, তোমরা যা পারোনি, আমরা তাই করেছি, আর কোনো বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে ভারি হবে না এদেশের বাতাস।

পুজোর ছুটিতে অলি দার্জিলিং বেড়াতে আসবার কথা লিখেছিল। অতীন তাকে নিষেধ করেছে। অলি বলে রেখেছিল, অতীন উত্তরবেঙ্গ চাকরি নিলে সে এই দিকটা ভালো করে বেড়াবে। একা আসবে না অবশ্য, দু একজন বান্ধবীকে আনবে, ছোট বোন বুলিকেও আনতে হবে, তাছাড়া অলির এক মামাতো বোন সঙ্ঘামিত্রাও আসতে চায়। কিন্তু এখন অতীনের পক্ষে অলিদের গাইড হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করা একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া এই কি বেড়াবার সময়? যে কোনোদিন বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অলির তিন চারখানা চিঠির উত্তরে অতীন একটা চিঠি লেখে, তাও বেশ সংক্ষিপ্ত। অলি ঠিক কোনো অনুযোগ করে না,তবু অতীনের মনে অপরাধ বোধ জমে। সে কেন ভালো করে চিঠি লিখতে পারে না? অলি ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্রী সে বাংলাও ভালো জানে, সে সুদীর্ঘ বর্ণনামূলক চিঠি লেখে। অতীন রবীন্দ্রনাথের মতন সাহিত্য সাতিহ্য চিঠি লিখবে তা নিশ্চয়ই কেউ আশা করে না, কিন্তু সে কেন নিজের মনের কথাও লিখতে পারে না স্পষ্ট করে? সে অলিকে ভালোবাসে এতে তা কোনো ভুল নেই, দূরে এলে ভালোবাসার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বোঝা যায়, প্রতিদিন অলির কথা তার মনে পড়ে অনেকবার, সে কথা আর কারুকে বলা যায় না, কিন্তু অলিকেও চিঠিতে লেখা যায় না? সে চিঠি

লিখতে বসলেই মানিকদা, কৌশিক, পমপমের মুখগুলো মনে পড়ে, ওরা তো কারুর সঙ্গে প্রেম করে না, প্রেমের চিঠি লেখে না, তবে অতীন কি স্বার্থপর? কৌশিক মানিকদা পমপম জীবনে অন্য কারুকে চুমু খেয়েছে একথা ভাবাই যায় না। ওরা যদি জানতে পারে তাহলে কি অতীনকে নিজেদের দল থেকে বাদ দিয়ে দেবে? ঠাট্টা করবে?

তবু একদিন অলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে খুব আশ্চর্য ঘটনা। অলি চিঠিতে কিছুই লেখেনি, অতীনেরও সেদিনঐ সময় হিল ভিউ হোটেলের সামনে যাবার কথা নয়। কয়েকদিন আগেই কৌশিক চিঠিতে জানিয়েছিল যে ধর্মতলা স্ট্রিটে "দেশহিতৈষী অফিসে পার্টির একদল ক্যাডার জোর করে ঢুকে পড়ে সুশীতল রায়চৌধুরীকে তাড়িয়ে দিয়ে পত্রিকাটার দখল নিয়েছে। তারপরেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থকরা দেশব্রতী ও "লিবারেশান" নামে দুটি পত্রিকা বার করার সিদ্ধান্ত নেয়, দু'চারদিনের মধ্যেই বেরুবে। হিল ভিউ হোটেলের তলায় মনোজবাবুর কাছে পাওয়া যাবে সেই পত্রিকা। অতীন গিয়েছিল সেই খোঁজ নিতে।

সেই পত্রিকার কোনো কপি আসেনি, অতনি দেখতে পেল অলি আর তার তিনজন বান্ধবীকে। তাদের মধ্যে একজন বর্ষা।

অতীন প্রথমেই ভাবলো, বইওয়ালা বিমানবিহারী খুব মডার্ন হয়েছে তো। কোনো পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছে? এমনকি ইনফরমার হিসেবে ছোট মেয়ে বুলিকেও পাঠায়নি?

অলি তখনও দেখতে পায়নি অতীনকে, সে পেছনফিরে কথা বলছে একজন ড্রাইভার জাতীয় লোকের সঙ্গে। বর্ষার সঙ্গেই তার প্রথম চোখাচোখি হলো, বর্ষার মুখে একটা চাপা বিদ্রূপের হাসি। অতীন বেশ খানিকটা দ্বিধার মধ্যে পড়লো। এমনভাবে, কোনো খবর না দিয়ে, এক দঙ্গল মেয়ে নিয়ে এসে পড়লো অলি। এখন ওদের থাকার ব্যবস্থা করা যাবে কোথায়? মানিকদার ওখানে ঘর আছে বটে, কিন্তু সেখানে ওদের নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে? মানিকদা একদিন বলেছিলেন, খাঁটি রাজনৈতিক কর্মীদের শুধু নৈতিক চরিত্র বিশুদ্ধ রাখাই বড় কথা নয়, তাদের সব সময় সজাগ থাকা দরকার যাতে কেউ তাদের লঘুচিত্ত, বিলাসী বলে মনে না করে।

সত্যিকারের কর্মীদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে একেবারেই খুঁতখুঁতে হলে চলবে না, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করার ব্যাপারে সব সময় সংযত থাকা দরকার। পমপমের কথা আলাদা সে এলে একসঙ্গেই তাকে, কিন্তু স্টাডি সার্কেলের অন্য মেয়েরা এসে উপস্থিত হলে মানিকাদ তাঁর মামাবাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

অলিকে চেনেন মানিকদা, অলি স্বেচ্ছায় স্টাডিসার্কল ছেড়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে রয়েছে আবার উগ্র সাজপোশাক করা দুটি মেয়ে আর বর্ষা ঐ বর্ষা নামের মেয়েটা মানিকদার মুখে মুখে কী কথা বলে বসবে তার ঠিক নেই। এদের মানিকদার আস্তানায় নিয়ে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ওদের জন্য একটা হোটেল ঠিক করে দিতে হবে। অতীন বেশ বিরক্ত বোধ করলো অলির ওপর।

বর্ষা অলির কাঁধ ছুঁয়ে ইঙ্গিত করতেই অলি পেছন ফিরে অতীনকে দেখলো। তার সরল দুটি চোখে ফুটে উঠলো প্রকৃত বিস্ময়। সে লজ্জা লজ্জা ভাব করে হেসে জিজ্ঞেস করলো বাবলুদা, তুমি কী করে খবর পেলে? মুন্নি বুঝি চিঠি লিখে দিয়েছে? তুমি আমাদের জন্য কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছো এখানে? ট্রেন একটু লেট ছিল .. আলাপ করিয়ে দিইভ, এই আমার মামাতো বোন সংজ্ঞামিত্রা, আর এ হচ্ছে অনীতা, আমাদের সঙ্গে পড়তো এক সময়।

অতীন বললো চল আগে তোদের জন্য হোটেল ঠিক করি, এখানে এই সময়টায় হোটেল পাওয়া মুশকিল।

অলি বললো, আমরা এখানে থাকবো কেন? আমরা তো দার্জিলিং যাচ্ছি।

অতীন ভুরু কুঁচকে বললো, দার্জিলিং যাবি? এতজনে মিলে সেখানে থাকবি কোথায়? আগে থেকে বুক না করলে কি দার্জিলিং-এ হোটেল পাওয়া যায়?

–এই সজ্ঞামিত্রাদের একা বাড়ি আছে ম্যালের কাছেই, সেখানে থাকবো, সব ব্যবস্থা করা আছে। তাছাড়া দার্জিলিং এর এস পি বাবার বন্ধু...।

অতীন ধরেই নিয়েছিল যে অলিদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা ও দেখাশুনো করার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। কিন্তু অলিরা শিলিগুড়িতে থাকতে আসেনি দার্জিলিং ভ্রমণের ব্যবস্থা তারা আগেই ঠিক করে নিয়েছে। কোনো অচেনা জায়গায় থাকতে গেলে অতীন হোটেলের কথাই ভাবে, সে উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান, তার খেয়াল থাকে না যে অলিরা অনেকটা উচ্চস্তরের মানুষ, তার মামা কিংবা কাকাদের বাড়ি থেকে দার্জিলিং কিংবা পুরীতে হাইকোর্টের জজ ব্যারিস্টারা তাদের মেসোমশাই

পিসেমশাই হয়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের এস পি দের তারা অমুকদা, তমুকদাবলে ডাকে। প্রথমে অলিদের থাকার ব্যবস্থা থাকে করতে হবে ভেবে অতীন অস্বস্তি বোধ করছিল, এখন ওদের জন্য কোনো ব্যবস্থাই তাকে করতে হবে না জেনে সে একটু অপমানিত বোধ করলে।

সজ্ঞামিত্রা নমের মেয়েটি বললো, আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে? চলুন না, তনি চারটে ঘর আছে, কোনো অসুবিধে হবে না।

অলি ছেলেমানুষের মতন আবদারর সুরে বললো, চলো বাবলুদা, চলো! দুটো তিনটে দিন কলেজ থেকে ছুটি নিতে পারবে না?

উত্তর বাংলায় চাকরি করতে এসেও এতদিনের মধ্যে অতীনের দার্জিলিং কালিম্পং দেখা হয়নি। নিছক ভ্রমণের জন্য হয়তো ওদিকে কখনো যাওয়াও হবে না। মানিকাদ বলেছেন এখন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ির তরাই অঞ্চলেই সংগ্রামের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে।

অলি আর সজ্ঞামিত্রার কথা শুনে অতীনের একবার লোভ হলো। চট করে দিন তিনেকের জন্য ঘুরে এলে কেমন হয়? কলেজে ছুটি নেওয়া কোনো সমস্যাই নয়।

পরমুহূর্তেই সে ভাবলো, এটা অসম্ভব। চারটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে সে একা পুরুষ মানুষ হিসেবে পাহাড়ে বেড়াতে যাবে? যে-কেউ এটাকে বেলেল্লা মনে করবে না? মানিকদা শুনলে ছি ছি করবেন। এই যে সে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে এদের সঙ্গে কথা বলছে, এটাই কি শোভন হচ্ছে, তার ছাত্রেরা ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই দেখছে, যদি কিছু বদনাম ছড়ায়?

অলির প্রতি তার অভিমান হলো। অলি একা আসতে পারতো না? অলির সঙ্গে তার কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি। সেই শুধু একবার কৃষ্ণনগর যাওয়ার পথে...।

সে শুকনো গলায় বললো, আমি কী করে যাবো। আমার কয়েকটা জরুরী কাজ আছে।

অলি তবু বললো, বাবলুদা প্লীজ চলো। খুব মজা হবে।

অতীন বললো আমার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তোরা কি টয় ট্রেনে দার্জিলিং যাবি?

–না। ট্যাক্সিতে, ঠিক করা হয়ে গেছে।

তাহলে তো আর কিছুই বাকি নেই। অতীন কি ওদের অন্তত এককাপ করে চা খাওয়াবে? এতদিন পর অলির সঙ্গে দেখা, তার বুকের ভেতরটা এখনও উত্তেজনায় থরথর করছে, অথচ অলির সঙ্গে একটাও ব্যক্তিগত কথা বলা হলো না। বাকি তিনটি মেয়ের কাছ থেকে অলিকে আলাদা করে সরিয়ে নেওয়া যায় না। অলি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অতীনের মুখের দিকে। সে যেন কিছু শুনতে চাইছে।

কিন্তু আর কিছুই বলা হলো না। ট্যাক্সি ড্রাইভার তাড়া দিচ্ছে, ওরা উঠে পড়লো গাড়িতে। অতীন ওরে চা খাওয়াবার প্রস্তাবও দিল না। বর্ষা একটাও শব্দ উচ্চারণ করেনি, কিন্তু তার ঠোঁটে সেই চাপা হাসি, যেন সে বলতে চায়, অলির ওপরে অতীনের চেয়ে তার অধিকার বেশী।

গাড়িটা ছাড়ার আগের মুহূর্তে অলি জিজ্ঞেস করলো, ফেরার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

অতীন খানিকটা যুক্তিহীনভাবে বললো, আমি সামনের সপ্তাহে কলকাতা ফিরছি, তোরা এই সময়ে কেন এলি? আমাকে অনেক কিছু কাজকর্ম গুছিয়ে নিতে হবে।

অলি বললো, তুমি যে ফিরছো, সে কথা তো আমায় জানাওনি। আমরা ভেবেছিলুম, তোমার আর কলকাতায় যেতে ইচ্ছেই করে না। কিন্তু কবে যাবে, আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে ফিরো। আমরা মঙ্গলবার বিকেলে এখানে চলে আসছি।

–আমায় রোববার ট্রেন ধরতে হবে।

–কেন, দুটো দিন অপেক্ষা করতে পারবে না? আমরা ট্রেনে এক সঙ্গে যেতে পরি তাহলে

–মাকে চিঠি লিখে দিয়েছি সোমবার পৌঁছোবো, এখন আর বদলানো যাবে না।

ট্যাক্সিটা যানবাহনের স্রোতে মিলিয়ে যাবার পরেও অতনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মিনিট। মাকে সে ফেরার তারিখ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে, অলিকে কিছু লেখেনি। আজই সে অলিকে চিঠি পাঠাবে ঠিক করেছিল, এ কথাটা অলিকে বলা হলো না, বললেও অলি কি বিশ্বাস করতো? এই কয়েক মাসেই অলি যেন অনেকটা বদলে গেছে।

সাইকেল রিকশা না নিয়ে অতীন হাঁটতে লাগলো বাড়ির দিকে।

আজ অতীনের অফ ডে। কলেজ যাবার তাড়া নেই, আজ তার ওপর রান্নার ভার। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে সে দেখলো তপন অফিস যায়নি, রান্নাবান্না সে-ই সেরে রেখেছে এর মধ্যেই। মানিকদা মেঝেতে বড় একটা কাগজ মেলে মন দিয়ে ম্যাপ আঁকছেন। ইদানীং ম্যাপ আঁকার খুব ঝোঁক হয়েছে মানিকদার। একদিন তিনি খুব দ্রুতগতিতে মাত্র কয়েকটা টানে অতীনের মুখের একটা স্কেচ

করেছিলেন, তাতে বোঝা যায় মানিকদার বেশ ভালোই আঁকার হাত কিন্তু তিনি ঐ প্রসঙ্গ তুললেই দিতে চান।

আজ সকালের ঘটনায় অতীনের ঠিক মন খারাপ হয়নি কিন্তু মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে চারটে মেয়ে ঝলমলে পোশাক পরে দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছে, এরকম অনেকেই যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে অলি থাকবে কেন? অলিকে মানায় না। বর্ষাও পরেছে শাড়ির বদলে শালোয়ারকামিজ, যথারীতি সিগারেট টানছিল, ঐ মেয়েটাকে অতীন পছন্দ করে না জেনেও অলি কেন ওকে প্রশ্রয় দেয়? এরপর অলিকে একদিন স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে, তুমি বর্ষা আর আমার মধ্যে একজনকে বেছে নাও।

নিজের ঘরে গিয়ে সাদা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে রইলো অতীন। ছোটবেলায় তার রাগ হলেই দেয়ালের এক কোণে গিয়ে এইভাবে বসে থাকতো সে। একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেশলাই কাঠির বারুদটা ফস করে অনেকটা জ্বলে গিয়ে তার আঙুলে ছ্যাঁকা লাগলো। এক একদিন এরকমই হয়। কেন সে আজ ঐ সময়ে বাস স্টেশনে গেল অলির সঙ্গে তার আজ দেখা না হলেই ভালো হতো। অতীন শিলিগুড়িতে রয়েছে, তবু তাকে কিছু না জানিয়েই অলি দার্জিলিং যাবার ব্যবস্থা করবে, এটা অন্যায় নয়?

মানিকদা একসময় অতীনকে ডেকে ম্যাপটা দেখাতে লাগলেন। একটা পিন টানতে টানতে বললেন, এই দ্যাখ, পশ্চিমে নেপাল, পুবে সিকিম আর ভুটান, আর দক্ষিণে হলো পূর্ব পাকিস্তান। এইটুকু এরিয়ার মধ্যে আমাদের কাজ। আর্মড স্ট্রাগল শুরু করার পক্ষে এরকম স্ট্র্যাটেজিক এরিয়া পাওয়াই একটা দারুণ ব্যাপার। নকশালবাড়ি আর নেপালের মাঝখানে এই যে নদীটা দেখছিস, এর নাম মেচি শীতকালে প্রায় শুকিয়ে যায়, পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। এরপর যখন সরকার পুলিশের সঙ্গে আমাদের সত্যিকারের কনফ্রনটেশান হবে, তখন আমাদের হাইড আউট হবে, এই নদী পার হয়ে নেপালে।

তপন বললো, কিন্তু আন্দোলন তো থেমে গেল, মানিকাদা। টাঙ্গি, লাঠি, শাবল নিয়ে যে বন্দুকধারী পুলিশের বিরুদ্ধে লড়া যায় না, তা তো প্রমাণ হয়ে গেল।

মানিকদা বললেন না, কিছুই প্রমাণ হয়নি। আন্দোলন থামেনি, এটা হচ্ছে প্রথম রাউন্ড। এর থেকে কিছু কি শিক্ষা পাওয়া যায়নি? প্রধান শিক্ষাই হলো এই যে এই প্রথম দেখা গেল চাষীরা শুধু জমি কিংবা ফসলের জন্য লড়েনি, তারা লড়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য। সরকার কিংবা পুলিশের বিরুদ্ধে তারা তাদের নিজস্ব অস্ত্র নিয়ে লড়েতে ভয় পায়নি। কোনো কোনো জায়গায় পুলিশের হাত থেকে রাইফেলও কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কী হয়নি?

তপন দুবার মাথা নাড়লো। অতীন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, তবু সে যেন ঘাড় ধরে তার মনটাকে ফেরাতে চায়।

মানিকদা আর একটি ম্যাপ বার করে বললেন, এটা দ্যাখ, এটা হচ্ছে ফাঁসি দেওয়া থানা এরিয়ার ডিটেইল, তার মধ্যে এই জায়গাটার নাম চৌপুখুরিয়।

অতীন জিজ্ঞেস করলো, এখানে কী হবে?

মানিকদা বললেন, আজ দুপুরে ঐ চৌপুখুরিয়ায় যাবো, যদি তোদের আপত্তি না থাকে। কিন্তু কেন যাচ্ছি, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা চলবে না।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা বেরিয়ে পড়লো। খানিকটা রাস্তা যাওয়া হলো বাসে, তারপর মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটা। সকালে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। দুদিকের মাঠে কোনো কোনো জমিতে ফসল ফলেছে, কোনো কোনো জমি ফাঁকা। এরই কিছু কিছু জমিতে কিষাণ সভার ঝাণ্ডা উড়েছিল, দু'এক মাস পুলিশ এদিকে পা বাড়াতেই পারেনি কিন্তু এখন সেইসব ঝাণ্ডার আর কোনো চিহ্ন নেই। মাঝারি চাষী ও জোতদারেরা ফিরে পেয়েছে তাদের জমি-জায়গা।

এটা ক্ষেত্রে দিকে হাত দেখিয়ে মাকিদা বললেন, এই জমিটা ছিল বিগুল কিষানের। মনে আছে তার কথা?

অতীন আর তপনের কিছু মনে নেই। মানিকদা বললেন, বিগুল কিষান ছিল একজন বর্গাদার। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা যেদিন থেকে এলো, সেদিন থেকে হঠাৎ রটে গিয়েছিল যে এই অকংগ্রেসী সরকার এবার মাঝারি চাষী ও জোতদারদের জমির মালিকানা কেড়ে নিয়ে বর্গাদার আর ভূমিহীন শ্রমিকদের দিয়ে দেবে। তাই জোতদারেরা বর্গাদারদের হঠাতে শুরু করে দিল, জমি চাষ করা বন্ধ করে দিল। এই বিগুল কিষানও জমি থেকে বিতাড়িত হয়ে মামলা লড়তে গেল কোর্টে এবং আশ্চর্যের ব্যাপার জিতেও গেল। এতে আমাদের হরেকৃষ্ণ কোঙারদের মতন নেতাদের খুশি হওয়ার কথা। তাঁরা তো

আইনের পথেই চাষীদের অধিকার দিতে চান। দ্যাখ কোঙারদাকে তো আমি অনেকদিন ধরে চিনি, মানুষটা সাচ্চা, গ্রামে গঞ্জের চাষীদের অবস্থাও খুব ভালো বোঝেন, তবু তিনি যে কেন আইন-কানুনকে এত ভক্তি শ্রদ্ধা করতে শুরু করলেন সেটাই বুঝি না।

তপন জিজ্ঞেস করলো, বিগুল কিষান জেতবার পর কী হলো?

–লবডঙ্কা হলো। মামলায় জেতবার পরেও জমি মালিক তাকে জমিতে পা দিতে দিল না, মেরে ধরে তাড়িয়ে দিল তাকে। এত ভেতরের দিকের গ্রামে কে আইনকানুন মানে? কে কোর্টের রায় গ্রাহ্য করে? যারা একটু অবস্থাপন্ন তারা পয়সা দিয়ে পুলিসকে হাত করে রাখে। মামলায় জিতেও বিগুল কিষান কিছুই পেল না। তখন সে গেল জঙ্গল সাঁওতালের কাছে। গত মে মাসে কিষাণ সভার একটি বড় দল এসে জবর দখল করে গেল এই জমি, এখানে ঝাণ্ডা পোঁতা হলো, জোতদারের গুণ্ডারা এদিকে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

–তারপর আবার তার জমি চলে গেল, এই তো?

–হ্যাঁ, আবার জোতদার আর পুলিস হাত মিলিয়ে তাকে হঠিয়েছে বটে, কিন্তু বিগুল একটা জিনিস বুঝেছে। তার মতন গরিব লোকদের আদালতের দ্বারস্থ হয়ে কোনো লাভ নেই। যদি তাকে অধিকার ফিরে পেতে হয়, তাহলে সঙ্ঘবদ্ধ চাষীদের সঙ্গে থেকেই সে তা পাবে। এরপর তাদের আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

–আচ্ছা মানিকদা, বিগুল কিষানের মতন যারা এবছর কোনো জমিই চাষ করার সুযোগ পেল না, তারা এখন কী করবে, তারা সারা বছর কী খেয়ে বাঁচবে?

–যারা জেলে যায়নি, তারা হেরে যায়নি, কিছুটা প্রস্তুতি নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

একটু থেমে পকেট থেকে ভাঁজ করা ম্যাপটা বার করে দেখতে লাগলেন মানিকদা। এর মধ্যে মেঘে আকাশ কালো হয়ে এসেছে, ভালো করে দেখা যায় না। এক জায়গায় আঙুল দিয়ে ছোটখাটো জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা মুসলমানদের গ্রামে যেতে হবে আমাদের।

তপন বললো, মানিকদা মাঠের মধ্যে খুব জোর বৃষ্টি এসে গেলে মুশকিলে পড়ে যাবো।

মানিকদা বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু বৃষ্টির চেয়েও বেশি মুশকিল হবে অন্ধকার হয়ে গেলে। তখন আর জঙ্গলে ঢোকা যাবে না।

তারপর পেছন দিকে একবার ঝট করে তাকিয়ে বললেন, তোরা কি লক্ষ করেছিস, অনেকক্ষণ ধরেই ঐ তিন-চারটে লোক আমাদের পেছন পেছন আসছে? ওরা কি আমাদের ফলো করছে না এমনি গ্রামের লোক।

তপন বললো, আমিও অনেকক্ষণ ধরেই ওদের দেখছি। আর কোনো লোক নেই, শুধু ওরা তিনজনই আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই যাচ্ছে।

মানিকাদ চিন্তিতভাবে বলেন, তাহলে বোধ হয় আজ আর না যাওয়াই ভালো, চল বড় রাস্তায় উঠে পড়া যাক।

অতীন অবাক হয়ে বললো, আমরা মাঠ দিয়ে হেঁটে যাবো, তাতে আমাদের কেউ ফলো করবে কেন? এদিকে যাদের বাড়ি তারা তো মাঠ দিয়েই যায়। আমরা কারুর জমি দিয়ে যাচ্ছি না, আল দিয়ে হাঁটছি।

মানিকাদ বললেন, লোকগুলো সুবিধের মনে হচ্ছে না। চল আজ ফিরে যাওয়াই যাক।

অতীন বললো, এতদূরে এসে ফিরে যাবো? আপনি হঠাৎ এত ভয় পাচ্ছেন কেন মানিকদা? চলুন, চলুন কিছু হবে না।

মানিকদা অতীনের চোখের দিকে চেয়ে বললেন, তুই বলছিস যেতে? তাহলে চল। আমি ভয় ঠিক পাচ্ছি না।

তপন বললো, ওরা যদি বাজে লোক হয় তা হলে এই মাঠের মাখখানে আমাদের ঘিরে ফেললে আমরা কিছুই করতে পারবো না।

অতীন তাকে এক ধমক লাগিয়ে বললো, তুই তো দেখছি মহা ভীতুর ডিম। কোনো একটা কাজে বেরিয়ে সেটা ফুলফিল না করে ফিরে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।

আবার ওরা হাঁটতে লাগলো সামনের দিকে। এদিকের মাঠ একেবারে ফাঁকা, কাছাকাছি কোনো জনবসতি নেই। পেছনের লোকগুলোকেও আর দেখা গেল না। মেঘ একেবারে নিচু হয়ে এসেছে, আর বিশেষ দেরি নেই বর্ষণের। কেন যেন অসংখ্য ফড়িং উড়ছে এখানে। আকাশের গায়ে রেখা টেনে উড়ে যাচ্ছে অনেক চিল।

অতীন বললো, দেখলি তপন, ওরা এমনি নিরীহ লোকই ছিল, তুই শুধু শুধু ভয় খাচ্ছিলি।

মানিকদা, এটা কথা জিজ্ঞেস করবো? আপনি অনেকক্ষণ সাসপেন্সে রেখেছেন। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, এবার জানতে পারি?

মানিকদা হেসে বললেন, হ্যাঁ, এবার বলা যেতে পারে। ইস্ট পাকিস্তান থেকে এসেছেন যে কমরেড খোকন মজুমদার, তিনি এখানে এক জায়গায় লুকিয়ে আছেন। চারুবাবু তাঁকে একটা বিশেষ খবর দেবার জন্য পাঠিয়েছেন আমাকে। খবরটা জরুরী। অন্য কারুর মুখেও পাঠানো যায় না।

অতীন বললো, কমরেড চারু মজুমদার আপনাকে একটা কাজ দিয়েছেন, তবু সেটা কমপ্লিট করে আপনি ফিরে যেতে চাইছিলেন? কী বলছেন, মানিকদা?

—আরে, আমি যদি মাঝপথে ধরা পড়ে যাই, তাহলে আমিও পৌঁছোবো না, খবরটাও পৌঁছোবে না। তাতে কি কোনো লাভ আছে?

—আমরা থাকতে আপনাকে কে ধরবে? আপনার সঙ্গে কি কোনো চিঠি টিঠি আছে না ওয়ার্ড অফ মাউথ।

—কমরেড খোকন মজুমদারকে যা বলার তা শুধু আমাকেই বলতে হবে। সে কথা এখন তোদের জেনে লাভ নেই।

তপন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মানিকদা, ঐ খোকন মজুমদার হিন্দু না মুসলমান?

মানিকদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ এই কথাটা মনে হলো কেন তোর? তপন, তুই ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাস নাকি?

তপন একটু লজ্জিতভাবে বললো, না, না, সে জন্য না। উনি পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এসেছেন কি না, সেইজন্য জানতে ইচ্ছে হলো।

মানিকদা খানিকটা ভাবগম্ভীরভাবে বললেন, খোকন মজুমদার সাচ্চা একজন বিপ্লবী, শুধু এইটুকুই আমি জানি। নজরুলের লেখা মনে নেই? হিন্দু না ওরা মুসলিম, ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী, বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোরা মা'র। এখানে 'ডুবিছে'র জায়গায় 'লড়িছে' হবে।

একটু থেমে দু'বার কেশে মানিকদা আবার বললেন, তবু তোদের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আজ আমার কেন যেন নার্ভাস লাগছে, কিসের যে একটা পিছুটান ... আমি নিজেই ম্যাপ এঁকে এখন নদীটা খুঁজে পাচ্ছি না। দে তো অতীন, তোদের একটা সিগারেট দে।

বেশ কাছেই সাত-আটটা খেজুর গাছের জটলা, খানিকটা উঁচু জমি। সেখানে দাঁড়িয়ে আজ চারজন মানুষ, দু'জনের হাতে লোহার ডাণ্ডা, একজনের কাঁধে একটা ঝোলা। অন্যজন আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর রেখেছে দু'হাত, সে কর্কশ গলায় বললো, কী রে মানিক, এদিকে কোথায় চললি? তোদের কানু সান্যার এখানেই লুকিয়ে আছে নাকি রে? অ্যাঁ?

মানিকদা লোকটিকে চেনেন না, কখনো দেখেন নি। কিন্তু এরা যখন তাঁর ওপর নজর রেখেছে, তখন এদের মতলোব খারাপ। মানিকদা নিরীহ মুখ কর বললেন, আপনাদের তো চিনলাম না? আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি বড় রাস্তাটা কোন্ দিকে হবে বলতে পারেন?

লোকটি বললে, সবচেয়ে বড় রাস্তা হলো যমের দক্ষিণ দুয়োরের দিকে চল সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। তোদের বাপ চারু মজুমদার আর তোদের বাঁচাতে পারবে না।

মানিকদা কৃত্রিম ভয় পাওয়া নাকি সুরে বললেন, চারু মজুমদারকে? আপনারা কার কথা বলছেন?

লোকটি সামান্য একটু ঠোঁট ফাঁক করে রসিকতার সুরে বললো, কেন ন্যাকামি করছিস মানিক। বাপের নাম ভুলে গিলি? সব শালা চীনের দালাল। তোরা তিনটে শুয়োরের বাচ্চা, মাথার ওপর হাত তোল, তারপর এক পা এক পা করে এগিয়ে আয়..

মানিকদা অতীন আর তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে বোঝালেন ভয় নেই। তারপর ফস করে কোমর থেকে একটা রিভলভার বার করে সেটা উঁচিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, কেন ঝামেলা করছিস তোরা? রাস্তা ছেড়ে দে। এটা দেখেছিস? এবার তোরা মাথার ওপর হাত তুলে পেছন ফিরে এক পা এক পা করে হাঁট।

মানিকদার মতন একজন নরম ধরনের মানুষের সঙ্গে যে রিভলভার থাকতে পারে তা অতীন কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। এতদিন ধরে মানিকদার সঙ্গে মেলামেশা, এক বাড়িতে থাকা, অথচ মানিকদার কাছে যে এমন একটা সাংঘাতিক অস্ত্র আছে তা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানাননি। অতীনের ভয় করছে না। মানিকদার প্রতি তার শ্রদ্ধা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শতগুণ বেড়ে গেল।

মানিকদা রিভলভার তুলতেই ঐ চারজন লোক কথা থামিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো

মানিকদা আবার আদেশ করলেন, মাথার ওপর হাত তোল, পেছন ফের। আমি কোনো ঝঞ্ঝাট করতে চাই না আমাদের চলে যেতে দে।

ওরা এবার ছেন ফিরলো, দু'পা গেল, তারপরেই যার কাঁধে ঝোলা সে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে গিয়ে হাত উঁচু করে একটা বোমা ছুঁড়লো মানিকদার দিকে। মানিকদা ধাপাস করে পড়ে গেলেন, অতীন আর তপন আত্মরক্ষার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে।

বোমা ফাটার বিকট শব্দ, তারপরেই ধোঁয়া। অতীন ওর মধ্যেই দেখলো, মানিকদা নিস্পন্দ হয়ে গেছেন, তাঁর এক হাতে তখনও অস্ত্রটা ধরা। অতীন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, চোখের নিমেষে কী হয়ে গেল ব্যাপারটা? মানিকদা মারা গেছেন? ওদিকের লোকটা বোমটা ছোঁড়ার জন্য হতো তুললে, টিপ করলো, তখনও মানিকদা গুলি চালালেন না? মানিকদা এ কী করলেন?

মানিকদা মারা গেছেন মানিকদা, মানিকদা ঐ লোকগুলোকে দেখে মানিকদা আর এগোতে চাননি, অতীনই জোর করেছিল, মানিকদা তার দাদার মতন অতীনের জন্যই তার দাদাও জলে ডুবে গিয়েছিল অতীনের জন্যই...মানিকদা, মানিকদা, না, না, অসম্ভব...

অতীন মুখ উঁচু করে দেখলো অপরপক্ষের একজন লোহার ডাণ্ডা উঁচিয়ে ছুটে আসছে। এবার তাকে মারবে? মানিকদার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেবে? তপন কোথায়? মানিকদা মরে গেলে অতীনও আর বেঁচে থাকতে চায় না। এই লোকটা তার মাথা চুরমার করে দেবে? মানিকদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না? মাঠের মাঝখানে সামান্য কয়েকটা গুণ্ডার হাতে এইভাবে ব্যর্থ মৃত্যু....

অতীন লাফিয়ে উঠে মানিকাদর হাত থেকে রিভলভারটা খুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালো। একবার দু'বার তিনবার..। অতীন জীবনে কখনো রিভলভার ছুঁয়েও দেখেনি, তার কোনো অস্ত্র শিক্ষা নেই। প্রথমবার তার শরীরে এমন ঝাঁকুনি লাগলো যে গুলিটা চলেগেল হেঁচড়ে পালাবার চেষ্টা করছে,,,সাঙ্ঘাতিক রাগে জ্বলছে অতীনের মাথটা, মানিকদাকে মেরেছে ঐ লোকটাকে কিছুতেই বাঁচতে দেওয়া হবে না, বিপ্লবের শিক্ষা হলো, শুধু শুধু প্রাণ দিও না, মেরে মরো প্রতিক্রিয়াশীলরা পাগলা কুকুর....

অতীন দৌড়ে গিয়ে ঐ লোকটার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে পেটাতে লাগলো প্রাণপণ শক্তিতে।

পেছন থেকে কারা যেন তাকে ডাকছে, অতীন, অতীন, বাবুল বাবুল....

যেন সহসা প্রবল ঝড় উঠেছে, আকাশে বজ্র গর্জন পায়ের তলায় চড়াৎ চড়াৎ করে ফেটে যাচ্ছে মাটি, সেই সব কিছুর মধ্যে থেকে ভেসে আসছে ডাক, অতীন, অতীন, বাবলু, বাবলুদা, তুমি কী করছো, কী করছো, আর না, অর না পালাও পালাও,...

সেই ব্যাকুল স্বরে মিশে আছে তার মা, বাবা, প্রেমিকা,বোন বন্ধু সকলের আহ্বান। সবাই তাকে থামতে বলছে, ফিরে যেতে বলছে। তবু সে থামলো না।

তারপর শোনা গেল, মানিকদা গলা, এই অতীন, এই অতীন,....

এবার চমকে সে ফিরে তাকালো। মানিকদা উঠে বসেছেন। সমুদ্রের বড় একটা ঢেউয়ের মতন আনন্দের ঝাপটা লাগলো অতীনের শরীরে। মানিকদা বেঁচে আছেন? তার নিজের দাদার মতন মানিকদা হারিয়ে যাননি এখনো....

সে কয়েক পা পিছিয়ে এসে বললো, আপনার চোট লাগেনি মানিকদা?

মানিকদা বললেন, খানিকটা লেগেছে, খুব সীরিয়াস কিছু নয়। তুই লোকটাকে একেবারে মেরে ফেললি অতীন?

অতীন জয়ের গর্বে বললো, বেশ করেছি। তোমার গায়ে বোমা ছুঁড়েছে আর একটু হলে আমাকেও খতম করে দিত।

—কী করছিল রে তুই। ওদের শুধু ভয় দেখালেই চলতো। একেবারে মার্ডার এখনো তার সময় হয়নি।

—আমরা আত্মরারক্ষার জন্য মেরেছি। আমরা না মারলে ওরা আমাদের শেষ করে দিত।

—আমাকে চেনে, তোকেও জড়াবে মার্ডার চার্জ।

অতীনকে সত্যি সত্যি গুলি চালাতে দেখে অন্যরা পালিয়ে গেছে। যে লোকটা গুলি খেয়েছে মানিকদা তাকে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার প্রাণ নেই। তপনকেও দেখা যাচ্ছে না।

মানিকদা বললেন, আর সময় নষ্ট করা যাবে না। ওরা এক্ষুনি ফিরে আসবে। অতীন তুই পালা

আমরা দু'জনে দু'দিকে...

–না, মানিকদা আমি আপনার সঙ্গে থাকবো।

–ছেলেমানুষী করিস না। যা বলছি তাই শোন। দৌড়ো, দৌড়ে বড় রাস্তায় উঠে পড় কোনোরকমে, না হলে ওরা লিনচ করবে, শিলিগুড়ি ফিরিস না এখন....কলকাতাতেও যাসনি, যা, যা. অতীন এঁকেবেঁকে ছুটবি।

–মানিকদা আপনি দৌড়োতে পারবেন না।

–আমি ঠিক পারবো, আমার সঙ্গে রিভলভারটা রইলো, আমার জন্য চিন্তা নেই.....দূরে একটা হই হই রব শোনা যেই মানিকদা ঠেলে দিলেন অতীনকে।

অতীন দৌড়োতে লাগলো। কোন দিকে বড় রাস্তা ? বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বৃষ্টির মধ্যে ওরা তাকে দেখতে পাবে না...অতীন মজুমদারকে ধরা অত সহজ নয়....সে ঠিক বেঁচে যাবে, মৃত্যু তাকে ছোঁয় না...আরও জোরে আসছে বৃষ্টি...অলিরা এখন দার্জিলিঙে, অলি ডেকেছিল তাকে, অলিদের সঙ্গে গেলে এসব কিছুই ঘটতো না...একটা লোক মারা গেছে মার্ডার চার্জে অতীনকেই সবাই খুনী বলবে, সে যে আত্মরক্ষার জন্য না, না, বিপ্লবী কক্ষনো আদালতে যায়না, সে কিছুতেই ধরা দেবে না...ইস, মাকে ফেরার তারিখটা জানিয়ে কেন চিঠিটা লিখতে গেল সে, মা অপেক্ষা করবে, কিন্তু এখন কলকাতায় ফেরা বিপজ্জনক.. সে লুকোবে পেছনে পেছনে ওরা কি তেড়ে আসছে...বৃষ্টিতে সব ঝাপসা..কোথায়, কোনোদিকে রাস্তা তাকে ধরার সাধ্য পৃথিবীতে কারুর নেই...

সমস্ত দিগন্ত জুড়ে এখন ধারাবর্ষণ, তার মধ্যে ছুটতে লাগলো অতীন। সে সামনে পেছনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তবু সে অন্ধের মতন ছুটছে।

[যৌবন পর্ব সমাপ্ত]

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৮৯ থেকে ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৩৯০০০
সপ্তম মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৯৫ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০০
প্রচ্ছদ ঃ সুনীল শীল

ISBN 81-7066-183-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কিম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

Rs- 150

॥ ১ ॥

ভোরবেলা থেকে পেঁজা তুলোর মতন পাতলা তুষার দুলতে দুলতে নামছে। বৃষ্টির শব্দ থাকে, কিন্তু তুষারপাত একেবারে নিঃশব্দ। আস্তে আস্তে সাদা হয়ে আসছে গাছগুলোর মাথা। এদিকটায় নদীর ধারে সারি সারি উইলো গাছ, ঝুঁকে আছে জলের দিকে। এই গাছগুলির নাম উইপিং উইলো, দেখলেই কেমন যেন করুণ আর বিষণ্ণ মনে হয়। আরও অনেক গাছ এখানে, তার মধ্যে পপ্‌লার ও মেপ্‌ল চেনা যায়।

হাড্‌সন নদীর ধার দিয়ে সুদৃশ্য পথ, রিভার সাইড ড্রাইভ। গাড়ি চলার রাস্তা ছাড়াও রয়েছে আলাদা পায়ে চলা রাস্তা, তার পাশে পাশে, গাছ তলায় অনেক বসবার জায়গা, সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো তাশ খেলা কিংবা দাবা খেলার টেবিল। এখন অবশ্য সেখানে কেউ বসে নেই।

এ দেশের গাড়ি হর্ন বাজায় না, মসৃণ রাস্তায় গাড়ির কোনো ঝাঁকুনি নেই, তবু চলন্ত গাড়ির সঙ্গে বাতাসের ঘর্ষণের একটা অদ্ভুত শব্দ আছে। সেটাই শহরের শব্দ। হ্ স্ স্। হ্ স্ স্! এখানকার হাওয়া এক মুহূর্ত ও অক্ষত থাকে না।

ওভারকোটের পকেটে দু'হাত ভরে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে অতীন। গ্লাভস পরে আছে যদিও, কিন্তু দুটোতেই কয়েকট ফুটো, হাত বাইরে রাখলেই কন্‌কন করছে আঙুলের ডগা। অতীনের গালে শৌখিনভাবে ছাঁটা দাড়ি, বেশ পুরুষ্ট একটা গোঁফ, চোখে সান গ্লাস, মাথায় টুপী। সে মাথা নীচু করে হাঁটছে, একবার সে ডান দিকে তাকিয়ে রাস্তার অন্য পারের একটি ব্যাঙ্কের ঘড়ি দেখলো। এই ঘড়িতে একবার সময়, আর একবার তাপমাত্রা দেখায়। এখন সকাল আটটা সতেরো, তাপমাত্রা বিয়োগ চার।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি ঠাণ্ডা বেশ কমে গিয়েছিল, গলতে শুরু করেছিল বরফ, মনে হয়েছিল এবার বুঝি বসন্ত আসবে। আশার ছলনা! এ দেশে এত তাড়াতাড়ি বসন্ত আসে না। দু'দিন ধরে রোদ মুছে গেছে একেবারে, আকাশ গম্ভীর, আবার শুরু হয়েছে তুষারপাত।

অতীনের খুব সিগারেট টানতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু গ্লাভস পরা হাতে সিগারেট জ্বালা যায় না। গ্লাভস খোলার তো প্রশ্নই ওঠে না, সিদ্ধার্থ তাকে ফ্রস্ট বাইটের ভয় দেখিয়ে রেখেছে। ফ্রস্ট বাইট হলে নাকি আঙুলের ডগাগুলো চিরকালের মতন অসাড় হয়ে যায়।

হাতে সময় আছে বলেই অতীন ইচ্ছে করে হাঁটছে। বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে অনেক আগে। একটা গরম গেঞ্জি, তার ওপর টেরিউলের শার্ট, তার ওপর জ্যাকেট, তার ওপরে ওভার কোট, ঠাণ্ডা লাগার কোনো সম্ভাবনাই নেই। যথেষ্ট গরম পোশাক থাকলে বরফের মধ্যেও হাঁটতে ভালো লাগে, শরীরটা খুব তাজা লাগে। নিঃশ্বাসে একেবারে টাটকা বাতাস।

আরও কিছু কিছু নারী-পুরুষ হেঁটে যাচ্ছে এই পথে। রিভার সাইড ড্রাইভে অনেকে শখ করে বেড়াতে আসে। আজ ছুটির দিন নয়, তবু এতবড় শহরে নিষ্কর্মা কিছু লোক থাকেই। তা ছাড়া আছে টুরিস্ট, সারা বছর ধরেই তাদের আসার বিরাম নেই।

দু'জন যুবককে দেখে অতীনের মনে হলো তারা ভারতীয় তো বটেই, বাঙালীও হতে পারে। ঠিক অতীনের মুখোমুখি আসছে। পথ ছেড়ে চট করে অতীন একটা পপ্‌লার গাছের আড়ালে চলে গেল। যদি ওরা তাকে দেখে কথা বলতে চায়? অতীন অচেনা বাঙালীদের সঙ্গে আলাপ করতে একেবারেই আগ্রহী নয়। আড়ালে গেল বটে, তবু অতীন কান খাড়া করে রইলো। হ্যাঁ, তার অনুমান ঠিক, লোক দুটি বাংলাতেই কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, কথার টান শুনে মনে হয় পূর্ব পাকিস্তানী।

ঠিক ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিটে অতীন সেন্ট্রাল পার্কের একটা গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। উল্টো দিকে প্লাজা হোটেল অতীনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক ন'টায়। তুষারপাত থেমে গিয়ে খুচ্ করে একটু রোদ উঠে গেছে। এ দেশের আবহাওয়া বোঝা সত্যি দুষ্কর।

এখন একটা সিগারেট না খেলে আর চলে না। এরপর অনেকক্ষণ সিগারেট টানা যাবে না। বুকের মধ্যে একটা ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেছে, এক একবার মনে হচ্ছে ফিরে গেলে কেমন হয়?

অতীন একটা লাকি স্ট্রাইক ধরিয়ে পার্কের ভেতর দিকে তাকালো। বরফের ওপরে ছুটোছুটি করছে কয়েকটি বাচ্চা, উজ্জ্বল লাল-নীল পোশাক পরা, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। একজন বৃদ্ধ একটু দূর থেকে এমন লোভীর মতন দেখছে সেই বাচ্চাদের খেলা, যেন তাঁর কোনোদিন কোনো

সন্তান হয়নি, অথবা তার সন্তানরা তাকে ত্যাগ করেছে।

সিগারেটটা শেষ করলো না অতীন, কয়েকটা ঘন ঘন টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে এলো। হোটেলটির দরজার রং সোনালি। অতীন আগে থেকেই শুনে এসেছে প্লাজা হোটেলটি বেশ অভিজাত, বড় বড় কম্পানির প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্টরা এখানে ওঠে, কিংবা ফিল্ম স্টারেরা, সাধারণ টুরিস্টদের পক্ষে এই হোটেল ধরা ছোঁওয়ার বাইরে।

এ দেশের এই একটা সুবিধে, যে-কোনো বড় দোকান বা হোটেলেই ঢুকে পড়া যায়, কেউ বাধা দেয় না। কিছু না কিনেও কোনো দোকান বা হোটেলের আরকেডে ঘোরা যায়, হয়তো অনধিকারীদের ওপর এরা আড়াল থেকে নজর রাখে। কালো লোকেরা এই সব হোটেলে বোধ হয় ঢুকতে সাহসই পায় না। অতীন সোজা দৃষ্টি ফেলে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ঘোরানো কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে চলে এলো।

ডান পাশে কাউন্টার, তার ওপাশে সিঁড়ি, তারপর লিফটের দরজা, সামনে প্রশস্ত লবি। সিঁড়ির রেলিং, লিফটের দরজা, লবির চেয়ারগুলি সবই যেন সোনা দিয়ে তৈরি। একেই বোধ হয় সোনার জলে গিল্টি করা বলে।

অতীন কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো। এখন তার বুকটা থরথর করে কাঁপছে বলে সে নিজের ওপরেই বিরক্ত হচ্ছে। এরকম তো কথা ছিল না। নার্ভাস হবার কী আছে, যা হবার তা হবে, কিছুতেই কিছু আসে যায় না!

রিসেপশান কাউন্টারে পাঁচজন তরুণ-তরুণী, তাদের মধ্যে সবচেয়ে যার ভালো মানুষের মতন মুখ, তাকে বেছে নিল অতীন। টাইয়ের গিটটায় একবার অনাবশ্যকভাবে হাত দিয়ে, গলা পরিষ্কার করে সে বললো, আমি শ্রীযুক্ত স্যামুয়েল হুইলারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

যুবকটির মাথায় সোনালি চুল, নীল চক্ষু। সে এমনই রূপবান যে সে ফিলমের নায়ক না হয়ে হোটেলের সামান্য কর্মচারি হয়েছে কেন, এই প্রশ্ন তাকে দেখলে মনে জাগবেই। সে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কি সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট আছে?

ভারতীয়রা অনেক সময় শুধু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়, এ দেশে সেটা সৌজন্য সম্মত নয়। তাই অতীন মাথা ঝোঁকালো বটে, মুখেও বললো, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে শ্রীযুক্ত হুইলারের সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট আছে।

যুবকটি বললো, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন, দয়া করে।

এই সব হোটেলে বাইরের আগন্তুকদের কাছে অতিথিদের ঘরের নম্বর বলে দেওয়ার নিয়ম নেই। যাকে-তাকে ওপরে পাঠিয়ে দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

যুবকটি প্রথমে একটি তালিকা দেখলো, তারপর কানে টেলিফোন যন্ত্র লাগিয়ে কিছুক্ষণ শুনলো, তারপর অত্যন্ত বিনীতভাবে বললো, আমি ভীত হচ্ছি, মহাশয়, ঘরে কেউ নেই।

অতীনের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ঘরে কেউ নেই মানে? সামুয়েল হুইলারের সঙ্গে সে গতকালই নিজে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। তিনি তাঁকে ন'টার সময় দিয়েছেন। তবে কি অন্য কোনো তারিখে! না, তিনি স্পষ্ট বলেছেন, শুক্রবার সকাল ন'টায়। তবু লোকটা নেই? সাহেব জাতি এরকম কথা দিয়ে কথা রাখে না?

তারপরই অতীন ভাবলো, সকাল ন'টার সময় সাক্ষাৎকারের সময় দিয়ে লোকটা ঘরে বসে থাকবে কেন? নীচে নেমে আসবে কিংবা ব্রেকফাস্ট খাবার জন্য গিয়ে বসবে।

সে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি খাবারের ঘরগুলো একটু খুঁজে দেখতে পারি?

যুবকটি অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বললো না। হোটেলে কাজ করার জন্য এরা একরকম নিখুঁত ভদ্রতা দেখানোর শিক্ষা পায়, তার মধ্যে মানবিক উত্তাপ একটুও থাকে না। অতীন যে অনেক দূর থেকে এসেছে, একটা সমস্যায় পড়েছে, তা কি এই লোকটা বুঝতে পারছে না? বুঝতে সে চায়ও না, সেটা তার চাকরির অন্তর্গত নয়।

অতীন লবিতে বা ডাইনিং হলগুলিতে খুঁজতে গেলে কেউ বোধ হয় আপত্তি করবে না, কিন্তু ঐ কথাটা সে উজবুকের মতন বলেছে। সে তো স্যামুয়েল হুইলারকে চেনেই না, এমনকি তার ছবিও দেখেনি! সে কি জনে জনে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, আপনিই মিস্টার হুইলার?

যুবকটি অন্যদের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো, অতীন গরু-চোরের মতন মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তার বুকের মধ্যে এখন আর কোনো শব্দ নেই, বুকটা একেবারে খালি, সে কি এতদূর এসে ফিরে যাবে। এত প্রস্তুতি, অপরের কাছ থেকে সুট ধার করে আনা, সব ব্যর্থ?

কাউন্টারের যুবকটি একটু পরে, অন্য একজনের সঙ্গে কথা শেষ করে, অতীনকে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, যান্ত্রিক দায়িত্ব বশত চাবির খোপ দেখলো। আপন মনে বললো, উনি চাবি দিয়ে যাননি। তারপরই স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ভঙ্গিতে সেই খোপ থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে এনে, একটা পিস দিয়ে বললো, আমি দুঃখিত, মহাশয়, এই যে একটা নির্দেশ রয়েছে। আপনার নামটি অনুগ্রহ করে জানাবেন কী?

অতীন পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে দিল। সেটি দেখে, হাতের কাগজটির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সে বললো, হ্যাঁ, এই তো, শ্রীযুক্ত স্যামুয়েল হুইলার আপনার জন্য সাঁতার-পুকুরে অপেক্ষা করছেন!

এবারে অতীনের চক্ষু ছানাবড়া হবার জোগাড়। এই শীতের মধ্যে সুইমিং পুলে? সেখানে লোকটি দেখা করবে অতীনের সঙ্গে? পাগলের কাণ্ড নাকি?

—সাঁতার-পুকুরটি কোন্ দিকে?

যুবকটির বিনয়ের মুখোসপরা মুখেও একটা অধৈর্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। নিতান্ত গাঁইয়া ছাড়া এরকম প্রশ্ন যেন কেউ জিজ্ঞেস করে না। একজন উটকো লোকের জন্য সে অনেকখানি সময় খরচ করে ফেলেছে। এ চাকরিতে তার প্রতি ছ'মিনিটের দাম এক ডলার।

সে একদিকের দেয়ালে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অতীনের দিকে পিঠ ফেরালো।

দেয়ালের গায়ে স্বর্ণাক্ষরে সুইমিং পুল, সান বাথ, কনফারেন্স রুম ও বিভিন্ন রকম খাবারের কক্ষের নামের নীচে নীচে তীর চিহ্ন আঁকা। কিন্তু এই সব কথা যে দেয়ালের গায়ে লেখা থাকে, সেটাই বা একজন নতুন লোক জানবে কী করে?

একটি তীর চিহ্ন ধরে অতীন এগোলো। গোলক-ধাঁধার মতন পথ। এ দেশে প্রায় বছর খানেকের বেশী কেটে গেলেও অতীন এখানে অনেক কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এখন তার মনে পড়লো, এখানে অনেক ঢাকা সুইমিং পুলে শীতকালের উপযোগী ঈষদুষ্ণ জল থাকে। যাদের স্বাস্থ্য বাতিক, তারা সাঁতার কাটে সারা বছর।

সুইমিং পুলে যদি অনেক লোক থাকে এখন, তা হলে স্যামুয়েল হুইলারকে অতীন কী করে খুঁজে পাবে? একমাত্র ভরসা তিনি অতীনকে চিনে নেবেন। এ পর্যন্ত আর কোনো ভারতীয় তো দূরের কথা, একজনও অশ্বেতকায় মানুষ দেখা যায়নি।

সুইমিং পুলে ঢোকার মুখে একটি লোক বসে আছে, সে অতীনের দিকে নিঃশব্দে হাত বাড়ালো, এখানে পোশাক খুলে রাখতে হয়। অতীনের উচিত ছিল ঢোকার মুখেই ক্লোক রুমে ওভার কোটটা জমা করে আসা। ভেতরে গরমের জন্য সে ওভার কোটটি খুলে হাতে নিয়েছে। সে লোকটিকে বললো, আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি না, একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

এ কথা সে বললো বটে, তবু বোকার মতন সে লোকটির হাতে তুলে দিল তার ওভার কোট। এ দেশে পদে পদে, যে-কোনো লোককে দিয়ে যে-কোনো কাজ করাতে গেলেই পয়সা লাগে। শুধু একটা কোট হাতে ধরার জন্যই ফেরার সময় এই লোকটিকে কত বকশিশ দিতে হবে কে জানে! কম বকশিশ দিলে এরা বড্ড অবজ্ঞার চোখে তাকায়। অতীন এ দেশে ট্যাক্সি চাপে না, প্রথম দিকে দু'একবার চাপতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। প্রথমবার সে ট্যাক্সির মিটার দিয়ে আর অতিরিক্ত কত দেবে ভেবে হাতের পয়সা গুণছিল, পর্টুরিকান ড্রাইভারটিই তার তালু থেকে একটি ডলারের আধুলি ও দুটি সিকি তুলে নিল। তারপর থেকে অতীন জেনে গেছে যে ট্যাক্সি ভাড়ার ওপরে আরও পনেরো শতাংশ গুণাগার না দিলে এখানে চলে না।

সুইমিং পুলে গোটা পাঁচ-ছয় বাচ্চা, তিন-চারটি তরুণী ও একজন মাত্র পুরুষ। মাথা খারাপ করে দেবার মতন স্বাস্থ্যবতী একটি তরুণী একটি টাইয়ের মাপের জাঙ্গিয়া পরে জল ছেড়ে ঘাটলার ওপরে বসে আছে। বাকল ছাড়ানো কলাগাছের মতন মসৃণ তার উরু, তার বুকে কোনো বন্ধন নেই, সদ্য সমুদ্র থেকে তোলা শঙ্খের মতন তার দুই স্তন। অতীন শুনেছে, ষাটের দশকের গোড়া থেকে এ

দেশের রমণীরা প্রকাশ্যে বুক উন্মুক্ত রাখতে শুরু করেছে, এমন পোশাক তারা পরে, যার নাম টপ্‌লেস। নারী মুক্তিতে যারা বিশ্বাসী, সেই সব মেয়েদের বক্ষ বন্ধনীর ওপর খুব রাগ।

স্বভাবতই এই অপরূপা, নির্লজ্জা অপ্সরার দিকে অতীনের চোখ আটকে যাবেই। কিন্তু প্রয়োজন বড় দায়। সে জোর করে চোখ সরিয়ে পুরুষটিকে দেখলো। রীতিমতন বলিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট, মাঝারি উচ্চতার, মাঝ-বয়েসী এই লোকটির বুক ভর্তি পাকা চুল, অথচ মাথার চুল কালো, মুখখানা চৌকো ধরনের, চোখ দুটি কুৎকুতে, সে অতীনের দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে সে অতীনকে হাতছানি দিল। অতীন এগোতেই সে চৌকো পুকুরটার মাঝখান থেকে সাঁতরে চলে এলো রম্ভোরু অপ্সরাটির কাছাকাছি তীরে।

অতীন ভেবেছিল, ন'টার সময় যখন সাক্ষাৎকার, তখন নিশ্চয়ই স্যামুয়েল সাহেব তাকে প্রাতরাশের টেবিলে বসিয়ে আলোচনা করবে। অতীন এই জন্য কিছু খেয়ে আসেনি। এই লোকটা তাকে ডেকেছে সুইমিং পুলে? এর মধ্যে একটা হেলা-তুচ্ছ করার ভাব আছে না? অপমান-বোধে অতীনের কান ও নাকের ডগা গরম হয়ে গেল।

অতীন লোকটির কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বললো, আপনি কি শ্রীযুক্ত স্যামুয়েল হুইলার? আমার নাম...

লোকটি বললো, হাই...

তারপর এক নজর সেই আগুনের ঢেলার মতন তরুণীটির দিকে তাকিয়ে নিয়ে সে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো, ইউ প্যাকি অর অ্যান ইন্‌জান?

অতীন টানা ছ'মাস টেলিভিশানের সামনে প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা ধৈর্য ধর বসে আমেরিকান ইংরিজি উচ্চারণ অভ্যেস করেছে। তবু লোকটির কথা শুনে সে হকচকিয়ে গেল। বিড় বিড় করে কী বলছে লোকটি?

তারপরই তার চকিতে মনে পড়লো, এই দেশে, ছোটদের কমিক্‌সে আর টি ভি-র ফিল্‌মে, এখানকার যারা প্রকৃত আদিবাসী, বাংলা ভূগোলের বইতে যাদের বল রেড-ইন্ডিয়ান, সেই তাদের এরা বলে ইন্‌জান। আর প্যাক মানে পাকিস্তানী। অর্থাৎ লোকটা তার সঙ্গে প্রথম থেকেই রসিকতা করতে শুরু করেছে। যখন তখন রসিকতা করতে শুরু করেছে। যখন তখন রসিকতা করাটা আমেরিকানদের একটা মুদ্রাদোষ।

অতীন বিনীতভাবে বললো, স্যার, আমি একজন ভারতবর্ষের ভারতীয়।

স্যামুয়েল বললো, উত্তম উত্তম! আমি ভারতীয়দের পছন্দ করি। আমি একবার ভারতে গিয়েছিলা, সেই উনিশ শো চুয়াল্লিশে, তখন আমি সেনাবাহিনীতে ছিলাম,...বম্‌বেই, ক্যাজুরায়ো, আজান্টা...আমার বিদ্য মনে আছে! শোনো যুকব, তোমাকে এখানে ডেকেছি, আশা করি তুমি কিছু মনে করছো না, আমি পৃথিবীর যেখানে থাকি, সকালবেলা খানিকক্ষণ সাঁতার না কাটলে আমার মর্জি ঠিক থাকে না...এবারে কাজের কথা হোক, তুমি ভারতের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে ডিগ্রি নিয়েছো?

এই কি চাকরির ইন্টারনভিউ? অতীন ক্ষোভের সঙ্গে ভাবলো, এই স্যামুয়েল নামের লোকটা একটি বড় মাল্টি ন্যাশনাল কম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান। লোকটির চেহারা যদিও গেরিলার মতন, তবু যোগ্যতা আছে নিশ্চয়ই। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় জলে শরীর ডুবিয়ে সে অতীনকে প্রশ্ন করছে। অতীন যদি ভারতীয় না হয়ে একজন শ্বেতাঙ্গ এম এস-সি পাশ যুবক হতো, তবে তার সঙ্গে এরকম বেয়াদপি করার সাহস পেত কি স্যামুয়েল?

অতীনের একবার ইচ্ছে হলো উঠে চলে যাওয়ার। কিন্তু কয়েদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে। নিউ জার্সিতে একজন বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার ছেলে হঠাৎ খুন হয়েছে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে। পুলিশ এখনও হত্যাকারীকে ধরত পারেনি। স্থানীয় অনেক বাঙালীরা ধারণা, ঐ ইঞ্জিনিয়ারটিকে খুন করেছে তারই জনৈক বন্ধু। ঐ ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি প্রাক্তন নকশাল, দেশে থাকতে সে কারুকে খুন করে এসেছিল কি না তা অবশ্য কেউ জানে না, নিশ্চয়ই সেরকম কিছু ব্যাপার আছে, তারই প্রতিশোধ নিয়েছে অন্য কোনো বাঙালী। পশ্চিম বাংলায় যারা মরেছে, তাদের ভাই-টাই বা দলের ছেলেরাও তো এ দেশে চাকরি করতে বা পড়তে আছে।

এই ঘটনার পর সিদ্ধার্থ অতীনকে বলেছে, তুই নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে যা, যদি প্রাণে বাঁচতে চাস। গোটা নিউইয়র্ক স্টেটে অনেক বাঙালী স্থায়ী বাসিন্দা। তা ছাড়া অনেক বাঙালী আসছে-যাচ্ছে। জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির কেউ অতীনকে হঠাৎ চিনতে পারলে বদলা নেবার চেষ্টা করতে পারে। অতীনের পক্ষে মিড-ওয়েস্ট কিংবা অ্যারিজোনা-নিউ মেক্সিকোর দিকে চলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে, ঐ সব দিকে বাঙালীর সংখ্যা কম, টুরিস্টও বেশী যায় না।

সিদ্ধার্থর কথায় যুক্তি আছে। লন্ডনে থাকার সময়ই অতীন এই ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গে বছর দুই-আড়াই নকশাল ছেলেরা দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখাবার পর তারা পিছু হটছে। ইন্দিরা গান্ধী আর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় লেলিয়ে দিয়েছে পুলিশ-মিলিটারি। যেখানে সেখানে নকশাল বিপ্লবীদের কিংবা নকশাল সন্দেহে অন্য ছেলেদের পিটিয়ে মারা হচ্ছে। সরোজ দত্তের মতন বুদ্ধিজীবীকে ভোরবেলা কলকাতায় পুলিশ ময়দানে পাগলা কুকুরে মতন গুলি করে মেরেছে। এর প্রতিফলন পড়েছে বিদেশও। লন্ডনে একটা জায়গা তর্ক করতে করতে অতীন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, তখন একটি নিতান্ত ছাপোষা, উন্নতিকামী, এলেবেলে বঙ্গসন্তান হঠাৎ বলে উঠেছিল, আপনি মশাই অতীন মজুমদার, আপনার বাড়ি কি কালীঘাটে ছিল? কালীঘাটের সাবজজ প্রতাপ মজুমদারের ছেলে তো একটা খুনী, বেইল জাম্প করে দিয়েছে পালিয়ে এসেছে! এবার দেশে গিয়ে শুনলুম...

সিদ্ধার্থর পরামর্শ হয়তো সঠিক, কিন্তু মিড ওয়েস্ট বা অ্যারিজোনার দিকে চাকরি পাওয়া কি সোজা কথা? এখানকার বন্ধুরাই বলে যে আগের দশকে আমরিকায় চাকরি ছিল অফুরন্ত। যে যখন খুশী ইচ্ছে মতন পেশা বদলাতে পারতো। সিটিজেনশীপ বা গ্রীন কার্ড পাওয়াও ছিল অনেক সহজ। কিন্তু বছর দুয়েক আগে থেকেই অবস্থা অনেক বদল গেছে, আরব দেশের তেল এখন আমেরিকার প্রধান শিরঃপীড়া, সেখানকার হঠাৎ পাওয়া গলিত স্বর্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে গিয়ে আমেরিকা হঠাৎ উপলব্ধি করেছে যে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে একচক্ষু হরিণের মতন তাকিয়ে থাকাটা তাদের ভুলে হয়েছে।

বিজ্ঞাপন দেখে দেখে আরিজোনার একটি ওষুধের কম্পানিত একটা দরখাস্ত করেছিল অতীন, তারপর সিদ্ধার্থর জামাইবাবুর সূত্র ধরে এই কম্পানিতে খানিকটা চেনা-শুনোও বেরিয়েছে, সেই জন্যই অতীন এখানে একটা ইন্টারভিউয়ের সুযোগ পেয়েছে। অতীনও আর নিউইয়র্কের মতন বড় শহরে থাকতে চায় না। কোনো লোক তার পূর্ব পরিচয়ের প্রসঙ্গ তুললেই অসম্ভব মাথা গরম হয়ে যায় তার, রাত্রে ঘুম আসে না কিছুতেই। এমনকি কোনো লোক তার সঙ্গে ঠাট্টার সুরে কথা বললেই সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, দু'একবার সে রকম লোকদের গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল। সে, অতীন মজুমদার তো খুনী নয়! আত্মরক্ষা করবার জন্য...

নিজেকে দমন করে অতীন স্যামুয়েলের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে লাগলো। বেশীরভাগই এলেবেলে কথা, যার সঙ্গে চাকরির কোনো সম্পর্কই নেই। অতীনের বেশী খারাপ লাগছে এই জন্য যে খুব কাছেই বসা, প্রায় নির্বসনা সুন্দরীটি সব কথা শুনতে পাচ্ছে। যদি চাকরির ব্যাপার না হতো, তা হলে হোঁৎকা স্যামুয়েলের চেয়ে অতীনের নিশ্চিত বেশী সুযোগ ছিল মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করবার। এ দেশের মেয়েরা চেহারার কদর দেয় বটে। তার চেয়েও বেশী দেয় টাকা ও ক্ষমতার। মেয়েটি নিশ্চিত বুঝতে পারছে যে স্যামুয়েল একজন কেউকেটা ব্যক্তি, আর অতীন সামান্য একজন দয়াপ্রার্থী।

হোটেলের পরিচারক এসে মেয়েটিকে দিয়ে গেছে এক কৌটো হাইনিকেন বীয়ার। মেয়েটি বীয়ারে চুমুক দিতে দিতে তাকিয়ে আছে এদিকেই। বীয়ার খেলে মেদ জমে, এই তরুণীটি বীয়ারও পান করে আবার সাঁতার কেটে মেদ ঝরিয়েও নেয়।

স্যামুয়েল মেয়েটির নগ্ন স্তনের দিকে বার বার চোরা-দৃষ্টি হানছে। হাসি ছুঁড়ে দিচ্ছে, আর অতীন সোজা তাকিয়ে আছে স্যামুয়েলের মুখের দিকে। স্যামুয়েল অর্থাৎ আংকল স্যাম যা খুশী করতে পারে, কিন্তু অতীন, সে এক অকিঞ্চিৎকর ভারতীয়, দয়াপ্রার্থী, চাকরির ইন্টারভিউতে একবার অন্যমনস্ক হলে তার আর কোনোরূপ আশা নেই। এ কি অসম প্রতিযোগিতা!

সুইমিং পুলের জল ঠিক সমুদ্রের মতন গাঢ় নীল। কয়েকটা বাচ্চা সেখানে দাপাদাপি করছে আর

অবাক হয়ে দেখছে অতীনকে। অতীন এখানে পুরো পোশাক পরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে বলেই সে দ্রষ্টব্য, না কালো মানুষ বলে? অন্য যে দু'তিনটি তরুণী সাঁতার কাটছে, তাদের পুরো দস্তুর সাঁতারের পোশাক। শুধু এই একটি মেয়েই পাড়ে উঠে বসে জেদীর মতন তার শরীর দেখাতে চায়। নীচু ছাদ থেকে কৃত্রিম আলো পড়েছে তার ওপরে, ঠিক রোদ্দুরের মতন।

অন্যান্য কথার মাঝখানে স্যামুয়েল হুইলার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, তুমি স্প্যানীশ জানো?

চাকরির মৌখিক পরীক্ষার সব কিছুতেই হ্যাঁ বলতে হয়, কিন্তু অতীনের এক বর্ণও স্প্যানীশ ভাষা-জ্ঞান নেই। সে একটু ইতস্তত করে বললো, না স্যার!

–তোমাকে কাজের জন্য মাঝে মাঝে মেক্সিকোতে যেতে হবে, স্প্যানীশ ভাষা জানা অতি আবশ্যিক!

–আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারবো, স্যার। অন্তত তিন মাসের মধ্যেই–

–বাঃ! তোমাকে দাড়িটা কামিয়ে ফেলতে হবে। গুম্ফটি রাখতে পারো, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু দাড়ি চলবে না। আমাদের চেয়ারম্যান যে-কোনো দাড়ি-ওয়ালা ছোকরাকেই বীটনিক মনে করে। ওর ছেলে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে বাউণ্ডুলে হয়ে যায়।

অতীন হাসি হাসি মুখে চুপ করে রইলো। মনে হচ্ছে চাকরিটা হয়ে যাবে। লোকটাকে যত খারাপ মনে হয়েছিল, ততটা কঠোর নয়। সিদ্ধার্থ অবশ্য বলে দিয়েছে, এ দেশে বড়লোকদের ব্যবহারেও একটা নকল আন্তরিকতা থাকে। ভারতে যারা চাকরির ইন্টারভিউ নেয়, সেই সব বড় অফিসাররা সবাই গোমড়ামুখো হয়, এ দেশে এরা হেসে কথা বলে।

কিন্তু এই লোকটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ টেনে আনছে। স্প্যানীশ ভাষা শিখতে বলছে, দাড়ি কামাতে বলছে, এতটা যখন এগিয়েছে...না হয় অতীন দাড়িটা কামিয়েই ফেলবে! যে-কোনো উপায়ে সে নিউইয়র্ক ছেড়ে যেতে চায়। নিউ জার্সির বাঙালীদের মধ্যে অন্তত দু'জন তাকে ঘোরতর অপছন্দ করে, অতীন তার কারণ বুঝতে পারে না। অ্যারিজোনায় অপরিচিতদের মধ্যে গিয়ে সে শুরু করবে নতুন জীবন।

স্যামুয়েল আবার বললো, আর একটি কথা। তোমার নামটিও বদলানো দরকার। অন্তত নামের প্রথম অংশটি। আমাদের কম্পানিতে সবাই সবাইকে প্রথম-নাম ধরে ডাকি। তোমার ঐ ভারতীয় নামটি কেউ উচ্চারণ করতে পারবে না, আমি তো পারিনি। একটা বেশ সহজ, মিষ্টি নাম...টম্ নামটা কি তোমার পছন্দ?

অতীনের মুখখানা পাট-পচা জলের মতন বিবর্ণ হয়ে গেল। চাকরির জন্য বাপ-মা'য়ের দেওয়া নামও বদলে ফেলতে হবে? কয়েকদিন আগেই সিদ্ধার্থর বন্ধু ধ্রুব বলেছিল, ওদের দেশের বাড়িতে সমব চাকরেরই নাম বদলে দেওয়া হয়। যে চাকরই আসুক, তার নাম রাম। একজন রাম চাকরি ছেড়ে চলে গেল, তারপর যাকে রাখা হলো, তার আসল নাম হয়তো দুর্যোধন, কিন্তু ঐ খটমটে নাম কে মনে রাখবে? দুর্যোধনের নাম পাল্টে রাখা হলো রাম। দুর্যোধন, কিন্তু ঐ খটমটে নাম কে মনে রাখবে? দুর্যোধনের নাম পাল্টে রাখা হলো রাম। দুর্যোধনেরা তাতে আপত্তি করে না। এ দেশেও আমরা সবাই ঐ রাম।

বীয়ার পান শেষ করে, ক্যানটি পাশে নামিয়ে রেখে মুক্তবসনা তরুণীটি এবার জিজ্ঞেস করলো, স্যামি, তোমার কি আরও দেরি আছে? আমি এবার ঘরে ফিরবো!

স্যামুয়েল বললো, না ডারলিং, আমার শেষ হয়ে গেছে। তোমার কেমন লাগলো এই ছেলেটির কথা শুনে?

অতীনের দিকে না তাকিয়ে, মেয়েটি তার পায়ের নখ পরিষ্কার করতে করতে বললো, ও কে!

অতীনের আবার স্তম্ভিত হবার পালা। এই মেয়েটি স্যামুয়েলের চেনা, ওর বউ নাকি? এই পৌঢ়ের এতটা তরুণী বউ? কিংবা হোটেলে এসে সংগ্রহ করা সাময়িক বান্ধবী? সে যাই হোক, অতীনের চাকরির ব্যাপারে এরও মতামতের মূল্য আছে? এই যুবতী স্যামুয়েল হুইলারের সহকর্মিনী নয় তো? বউকে ফাঁকি দিয়ে বড় কর্তারা প্রাইভেট সেক্রেটারিকে নিয়ে দূরের কোনো শহরে ফূর্তি করতে যায়, এরকম গল্প প্রায়ই দেখা যায় খবরের কাগজে।

স্যামুয়েল জল থেকেই তার ভিজে হাতটা অতীনের দিকে বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য। তারপর

বললো, ঠিক আছে বাকিটা তোমাকে চিঠি লিখে জানানো হবে!

'ধন্যবাদ' বলে অতীন উঠে দাঁড়ালো, তারপর পেছন ফিরে হাঁটতে লাগলো যন্ত্রের মতন। ওভার কোটটা ফেরত নেবার সময় বকশিশ দেবার কথা তার মনে পড়লো না। কেউ যেন ঠাস ঠাস করে তার দুই গালে থাপ্পড় কষিয়েছে। তার চোখ দিয়ে এক্ষুনি জলের ফোঁটা নামবে। সে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে।

বাইরে রোদ নিভে গিয়ে আবার তুষারপাত শুরু হয়েছে। অতীন গ্লাভস পরলো না, ওভার কোটটাও গায়ে চাপাতে ভুলে গেল। তার গরম লাগছে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে তার হাত কাঁপতে লাগলো একটু একটু।

মালখানগরের প্রতাপ মজুমদারের ছেলে সে, অতীন মজুমদার, তাকে এতটা নীচে নামতে হবে? তার বাবা কোনোদিন কারুর কাছে মাথা নীচু করেননি, শুধু একবারই তাঁকে লোকের কাছে দয়া চাইতে হয়েছে, তাও তাঁর ছেলের জন্য!

একটা জলে গা-ডোবানো গেরিলা আর একটা আধ-ন্যাংটো মেয়ে নেবে তার চাকরির ইন্টারভিউ? অ্যামেরিকানরা ইনফরমাল হয়, তা বলে এতটা ইনফরমাল...নাকি একটা কালো ভারতীয় ছেলের জন্য অন্য সময়ে সময় নষ্ট করা যায় না? চাকরির জন্য তাকে দাড়ি কামাতে হবে, নাম বদলাতে হবে। এরপর যদি বলে তুমি বাপের নাম বদলাও, মায়ের নাম বদলাও, সারা গায়ে খড়ি মেখে ফর্সা হও...এরকম চাকরির মুখে লাথি! চিঠি এলে সে ছিঁড়ে ফেলে দেবে!

ঘোরের মাথায় খানিকটা হেঁটে এসে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালো অতীন। সকালটা কত একটা সুন্দর সম্ভাবনা দিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন সব কিছু বিস্বাদ হয়ে গেছে। সামনে লম্বা, টানা ফিফ্থ অ্যাভিনিউ। একটা পৃথিবী-বিখ্যাত পথ, এখানে সে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেললেও কেউ তার দিকে ফিরে তাকাবে না।

দাঁতে দাঁত চেপে অতীন বেশ জোরে বললো, শুয়ারের বাচ্চা!

॥ ২ ॥

সিদ্ধার্থ এসে অতীনকে ঘুম থেকে টেনে তুললো। এখন সন্ধে সাতটা, এখন মোটেই ঘুমোবার সময় নয়। টি ভি চলছে, জানলার পর্দা টানা, বেড সাইড টেবিলে গোটা ছয়েক বীয়ার ক্যান, অতীন শুয়ে আছে খাটের একেবারে ধার ঘেঁষে, তার একটা হাত পাশে ঝুলছে। সিদ্ধার্থ সেই হাতটা ধরে টান মেরে বললো, এই বাবলু, ওঠ্!

জড়ানো গলায় অতীন বললো, আঃ বিরক্ত করিস না। আমি এখন ঘুমোবো। আজ আমি রান্না-ফান্না করতে পারবো না!

টি ভি বন্ধ করে জানলার পর্দা সরিয়ে কাঁচের ওপাশের আলোকোজ্জ্বল নগরীর দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ বললো, তোর একটা চিঠি এসেছে!

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে উঠে বসলো অতীন। খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বললো, যাঃ, বাজে কথা!

কোটের পকেট থেকে বার করে একটা এয়ার মেল খাম দেখিয়ে আবার সেটা পকেটে ভরে ফেললো সিদ্ধার্থ। তারপর বললো, দেবদাস, অ্যাঁ? দিনের বেলা একাকী মদ্যপান, বিরহ, বেকারত্বের দুঃখ! আজ কাজে যাসনি!

–দে চিঠিটা দে! কার চিঠি!

–আগে উঠে মুখ চোখ ধুয়ে আয়। ঐ জঘন্য নোংরা গেঞ্জিটা না খুললে তোর এই চিঠি পড়ার কোনো রাইট নেই। ঘরটাকে এত গরম করে রেখেছিস কেন? এত গরম খুব আনহাইজিনিক।

অতীন দু'হাতে মাথা চেপে ধরলো। দিনের বেলা বীয়ার খেয়ে ঘুমোলেই তার মাথা ধরে। আবার একলা একলা বীয়ার খেলে ঘুম পাবেই। উঠে দাঁড়িয়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে সে জিজ্ঞেস করলো, তোর কাছে টাইলেনল আছে?

–কড়া করে কফি খা, মাথা ছেড়ে যাবে। যখন-তখন ওষুধ খাওয়া ভালো নয়।

সিদ্ধার্থ ওভারকোট খুলে ওয়ার্ডরোবে ঝোলালো। টাই খুললো, চেয়ার বসে জুতো-মোজা খুললো, সব গুছিয়ে রাখলো ঠিক জায়গায়। সে পরিপাটি ধরনের ছেলে। এদিক-ওদিকে জিনিসপত্র ছড়িয়ে

রাখা সে একেবারে পছন্দ করে না। ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলো অতীন কী কী অগোছালো করে রেখেছে। বাইরে শূন্যের নিচে তাপমাত্রা হলেও ঘরের মধ্যে ঘাম হচ্ছে, সিদ্ধার্থ দেয়ালের রেগুলেটার ঘুরিয়ে গরম কমালো, বীয়ারের খালি টিনগুলো ফেলে দিল ট্র্যাস ক্যানে, দু'তিনটে সিগারেটের টুকরো কুড়োলো মেঝে থেকে। তারপর সে পাশের রান্নাঘরে এসে গ্যাস জ্বেলে কেটলিতে জল চড়ালো।

অতীন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো টেবিলের ওপর এনভেলাপটি রাখা। ঠিকানার হাতের লেখা দেখেই সে চিনেছে। সাহেবরা হাতের লেখা পড়তে পারবে না এই ভয়ে মা পুরো ঠিকানাটাই ক্যাপিটাল অক্ষরে লেখে।

মায়ের চিঠির সঙ্গে মুন্নিরও একটা আলাদা চিঠি আছে। বাবা চিঠি লেখেন না। অতীনও তো মাকে লেখা চিঠির শেষে এক লাইন জুড়ে দেয়, বাবা ভালো আছে নিশ্চয়ই, বাবাকে প্রণাম জানিও। বাবাকে চিঠি লেখে না অতীন, কিন্তু এখানে সে প্রায়ই বাবার সঙ্গে মনে মনে কথা বলে, তর্ক-বিতর্ক করে।

প্রথমে সে দুটো চিঠিতেই দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল, কোনো বড় রকমের খবর আছে কি না জানার জন্য। পরে ভালো করে পড়বে। একবার নয়, তিন চারবার। মা কিংবা মুন্নি কোনো চিঠিতেই কারুর অসুখের কথা লেখে না।

সিদ্ধার্থ দু'কাপ কফি নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, বাড়ির চিঠি?

অতীন চিঠি থেকে চোখ না তুলে মাথা নাড়লো। সিদ্ধার্থ হেসে বললো, ড্রয়ারে এরোগ্রাম আছে, এবার উত্তর লিখতে বসে যা! যত পারিস গুল-গাপ্পা ঝাড়। লেখ্ যে, এই উইক এন্ডে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলুম। জানো তো, মা একটা লাল রঙের গাড়ি কিনেছি, আমার বাড়ির বাগানে কী সুন্দর গোলাপ ফুটেছে, অফিসে একজন সাহেবকে ডিঙিয়ে আমার প্রমোশন হয়েছে, অফিসের বস কাল ব্রডওয়ে-তে থিয়েটার দেখালো, তারপর ডিনার খাওয়ালো...আরও কী কী যেন তুই বানাস?

অতীন চিঠি দুটো খামে ভরে কফিতে চুমুক দিল।

সিদ্ধার্থ আবার বললো, কলকাতায় বাবা মা ভাবছে, ছেলে আমাদের কী না সুখে আছে! লন্ডন ছেড়ে চলে এসেছে সোনার দেশ আমেরিকায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর নিউ ইয়র্কে তার বাড়ি, নিজের গাড়ি চেপে অফিস যাচ্ছে, পকেটে সব সময় ঝমঝম করছে ডলার।

অতীন প্যান্টের পকেট থেকে একটা দশ ডলারের নোট বার করে এগিয়ে দিল সিদ্ধার্থর দিকে।

–ড্রয়ারে রাখ। আজ কাজ পেয়েছিলি তা হলে?

কাছেই একটা সুপার মার্কেটে অতীন দিন-মজুরির ভিত্তিতে কুলির কাজ করে। তাও প্রত্যেকদিন নয়, মাঝে মাঝে কাজ পায়। ট্রাক থেকে আপেল ভর্তি বড় বড় কাঠের ক্রেট নামিয়ে দোকানের মধ্যে এক জায়গায় জড়ো করা। সবচেয়ে নিম্নতম কাজ। সেজন্য তাকে একটা নীল ওভারঅল জড়াতে হয় গায়ে, মাথায় পড়তে হয় কাপড়ের টুপি। কারুর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা নেই, ট্রাকে ওঠো ক্রেট নামাও। দু'হাতে বয়ে নিয়ে যাও! ভারি ভারি ক্রেটগুলো বইতে গিয়ে সে কুঁজো হয়ে যায়, হাতের জোড়ে টন টন করে, তবু কোনো কথা বলতে হয় না বলেই সে সন্তুষ্ট। কথা বলতে গেলেই তার মুখ দিয়ে খারাপ ভাষা বেরিয়ে আসে, এ জন্য দু'জায়গায় সে কাজ হারিয়েছে। ঘণ্টায় দু'ডলার। কত আপেল, শুধু একটা সুপার মার্কেটেই এত আপেল, এরা রাক্ষসের মতন আপেল খায়।

সিদ্ধর্থ বললো, আজ দশ পেয়েছিস? ডলারের রেট কত করে যাচ্ছে যেন, পাঁচ আমি, ছ টাকাই ধর। দেশের লোক ভাবছে ষাট টাকা, অনেক টাকা! তুই শিলিগুড়ি কলেজে ক'পয়সা মাইনে পেতিস রে?

অতীন এবারও কোনো উত্তর দিল না। কফিটা শেষ করে সে একটা সিগারেট ধরালো। বাইরে ঝিরঝির কর তুষারপাত হচ্ছে, জানলার কাচের ভেতর দিকে জমে যাচ্ছে বাষ্প। একটা আঙুল দিয়ে সেই বাষ্পে সে আঁকিবুকি কাটতে লাগলো।

–খিদে-টিদে পায়নি, বাবলু! রান্না করতে হবে না!

–ও বেলার খিচুড়ি করা আছে। দু'একটা সসেজ আর ডিম ভেজে নিলেই হবে। আমার ইচ্ছে করছে না। তুই ভেজে নে।

–বাড়ির চিঠি পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেছে? কিছু টাকা পাঠাতে চাস তো বল, ম্যানেজ হয়ে যাবে।

ব্রুকলিনের হাসপাতালে একটা কেমিস্টের কাজ খালি আছে, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলুম, মাইনে খুব খারাপ না। চেষ্টা করবি?

–না।

–তা হলে তুই শুধু এই সব অড্ জব করে যাবি? গ্যাস স্টেশানের কাজটা তো এই কুলিগিরির চেয়ে অনেক ভালো ছিল, টাকা বেশী দিত।

–ওখানে একটা লোক যখন-তখন ব্যাস্টার্ড বলতো!

–ওটা এদের কথার কথা! অনেক সময় আদর করে বলে। পুরো দেশটাই তো ব্যাস্টার্ডদের দেশ। দেখা যাচ্ছে, মিক্সড ব্লাডের মানুষ বেশি হার্ড ওয়ার্কিং হয়। তোর এদেশে কিস্যু হবে না বাবলু! তুই এখানে ভ্যাতবেতে বাঙালী রয়ে গেলি! এখানে ছোটখাটো অপমান গায়ে মাখলে চলে না। আমাদের মতন ইমিগ্রান্টদের একমাত্র মটো কী? টাকা রোজগার করো, টাকা রোজগার করো! যত পারো শালা টাকা জমাও! আমি তো ঠিক করেছি এক লাখ ডলার জমালেই দেশেকেটে পড়বো। মধ্যমগ্রামে বিরাট বাড়ি হাঁকাবো আর ফুলের চাষ করবো!

অতীন সিগারেটের টুকরোটা জঞ্জালের বালতির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতেই সিদ্ধার্থ তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, তুই আবার না নিবিয়ে ও রকম ভাবে সিগারেট ফেলছিস? আগুন লেগে গেলে কী হবে জানিস? এ দেশে সব সময় আগুনের ভয়। বাড়িগুলো তো এক একটা জতুগৃহ!

অতীন ঝুঁকবার আগেই সিদ্ধার্থ নিয়ে নিবিয়ে দিল সেটা। তারপর বললো, এক কাজ কর, জামা-জুতো পরে নে। আজ বাইরে খাবো!

–না, আমার বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না। খিচুড়ি তো রয়েছেই।

–ধ্যাৎ, রোজ রোজ ঐ একঘেয়ে খিচুড়িখেতে ভালো লাগে কারুর? অনেকদিন স্টেক খাইনি। ভিলেজে একটা ভালো দোকান দেখে রেখেছি, চ, চ, ওঠ, ওঠ!

–এই ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে যাবো?

–ঠাণ্ডা তো কী হয়েছে, তুই কি ন্যাংটো হয়ে যাচ্ছিস নাকি? ইংল্যান্ডে থাকার সময় রাত্তিরে বেরুতি না কক্ষনো? ইংল্যান্ডে কি এর চেয়ে কম ঠাণ্ডা? দিন দিন কুঁড়ের যম হচ্ছিস। তুই আমার ব্লু পার্কাটা চাপিয়ে নে, তোকে ওটা ভালো মানায়।

অতীন বললো, তুই যে এক লাখ ডলার জমাবার কথা বললি, স্টেক খেতে তো অনেক পয়সা বেরিয়ে যাবে!

–তা বলে কি না খেয়ে টাকা জমাবো নাকি? বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়, লভিব মুক্তির স্বাদ...তার পর কী যেন! তোর মনে আছে?

অতীন কাঁধ ঝাঁকালো। সে কবিতা-টবিতা বিশেষ পড়েনি। সিদ্ধার্থ মোজা পরতে পরতে বললো, দেশ থেকে দুটো বই এনেছিলুম সঙ্গে, সঞ্চয়িতা আর আবোল তাবোল। প্রথম প্রথম মন খারাপ হলেই পড়তুম। কোন্ শালা যেন সঞ্চয়িতাখানা মেরে দিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো দু'জনে। ম্যানহ্যাটনের এক প্রান্ত লোয়ার ইস্ট সাইডের তিন নম্বর রাস্তার একটা ছ'তলা বাড়ির ছাদের ঘরটা সিদ্ধার্থর অ্যাপার্টমেন্ট, এদেশের ভাষায় অ্যাটিক। লিফ্‌ট নেই। ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি, নড়বড়ে রেলিং, দেয়ালে নানা রকম অসভ্য কথা লেখা। বাড়ির অধিকাংশ বাসিন্দাই পোর্টুরিক্যান আর গরিব ইহুদী, তিন চারটে কালো পরিবার আছে। সিঁড়িতে প্রায়ই আলো থাকে না। সব মিলিয়ে এমন একটা নোংরা নোংরা ভাব যে একটা কংক্রিটের উর্ধ্বমুখী বস্তি বলা যায়। নিউ ইয়র্কের নগর কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই বাড়ি ভাঙার নির্দেশ জারি করেছে, দু'এক মাসের মধ্যেই সিদ্ধার্থকে এই অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়তে হবে।

বেশ খানিকা হেঁটে এসে ওরা ঢুকে পড়লো ওয়াশিংটন স্কোয়ারে। এত ঠাণ্ডার মধ্যেও টুরিস্টদের ভিড় যথেষ্ট। এক সময় গ্রীনিচ ভিলেজ ছিল শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকদের পাড়া, এখন সেখানে নকল কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকে ভরে গেছে, উদ্ভট পোশাক ও বিরাট দাড়িওয়ালা মুখ নিয়ে তারা টুরিস্টদের তৃপ্তি দেয়। কাফে-রেস্তোরাঁয় এক সময় এক দশক আগেও নামকরা প্রতিবাদী কবিরা চিৎকার করে কবিতা পড়তেন, এখন অনেক কাফে-রেস্তোরাঁতেই কবি সেজে আসা অভিনেতারা অশ্লীল ছাড়া শোনায়, বহু লোক টিকিট কেটে তা শুনতে আসে। এখানকার অনেক রেস্তোরাঁ ও দোকানপাট খোলা

থাকে সারা রাত। ঠাণ্ডা আটকাবার জন্য সব রেস্তোরাঁতেই দু'পাল্লা কাঁচের দরজা, কখনো দুটো দরজাই এক সঙ্গে খুলে গেলে ছিটকে বেরিয়ে আসে বাজনার শব্দ।

অতীন বললো, আমি রাত্তিরের দিকে এদিকায় আসিনি আগে। একটা পাড়াতেই এত হোটেল-রেস্টুরেন্ট? গোটা কলকাতাতেও বোধ হয় এত নেই।

সিদ্ধার্থ বললো, আমেরিকাতে দুটো কী কী জিনিসের সবচেয়ে বেশী অপচয় হয় বল্ তো? আলো আর কাগজ। এত আলো তুই পৃথিবীর আর কোনো শহরে দেখতে পাবি না। দ্যাখ, যে-সব দোকানগুলো বন্ধ, সেগুলোরও ভেতরে সব আলো জ্বলছে। সব বিজ্ঞাপনের আলোগুলো সারা রাত জ্বলে। কেউ কি সারা রাত ধরে দেখে? লিংকন্ টানেলের মধ্যে গিয়ে দ্যাখ, অত আলো চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলছে। আর দেখবি কাগজ। যেখানে সেখানে কাগজের ছড়াছড়ি। পেপার ন্যাপকিন তুই একটা চাইলে পাঁচখানা দেবে। খবরের কাগজগুলো তাগড়া তাগড়া। নিউ ইয়র্ক টাইমস একশো কুড়ি পাতা, লোকে পাঁচ-দশ মিনিট পড়ে, তারপর পুরো কাগজটাই ফেলে দেয়। পুরানো। খবরের কাগজ বিক্রি করা যায় না বলে প্রথম প্রথম আমার গা কচ্কচ করতো।

—আমাদের দেশে কাগজের কত অভাব।

—আমাদের দেশের কথা বাদ দে। তুই নতুন এসেছিস তো, এখন তোর আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনাটা প্রায়ই মনে আসবে। কিন্তু তুলনা করতে গেলে খেই পাবি না। এটা পৃথিবীর উল্টো দিক। এখানে সব কিছুই উল্টো। আমাদের দেশের লোক খেতে পায় না, এখানে জাহাজ ভর্তি গম সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসে।

—এ দেশে এত কাগজ নষ্ট হয়, তবু বইয়ের কিন্তু বেশ দাম।

—এরা সস্তায় বিশ্বাস করে না। এদের ব্যবসা মানেই হচ্ছে, তোর পকেট থেকে কী করে বেশী টাকা খরচ করাবে। খুব সাধারণ একটা জিনিস ধর না, টয়লেট পেপার। প্রত্যেকেরই লাগবে। আগে ছিল সাদা, এখন পিংকে বেরিয়েছে, ব্লু বেরিয়েছে। ২০৬ পৌছার কাগজ সাদা হলো না গোলাপী, নীল হলো তাতে কী আসে যায়? এরা বিজ্ঞাপন দিয়ে বোঝালো যে রঙীন কাগজ টয়লেট রুমে মানায় ভালো। ব্যস, দশ পনেরো সেন্ট দাম বেড়ে গেল, লোকে সাদার বদলে রঙীন টয়লেট পেপার কিনছে পাগলের মতন। তোর পকেট থেকে যত পয়সা বেরিয়ে যাবে, তত তুই বেশি রোগারের জন্য ব্যস্ত হবি। আর যত তুই বেশি রোজগার করবি, তত তোর খরচ বাড়বে। এই হচ্ছে কনজিউমার সোসাইটির গোলকধাঁধা।

কোনাকুনি পার্কটা পার হয়ে সামনের বড় রাস্তা পেরিয়ে সিদ্ধার্থ একটা ছোট রাস্তার মধ্যে ঢুকলো। সে একটা বিশেষ রেস্তোরাঁয় যাবে। এ শহরের সমস্ত রাস্তাই সোজা-টানা, ঘোরানো-প্যাঁচানো গলি একটাও নেই। একটা আলো ঝলমল রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে সিদ্ধার্থ বললো, তুই ডিলান টমাসের নাম শুনেছিস! খুব বড় একজন ব্রিটিশ কবি, মাতালের হদ্দ ছিল, এই দোকানটায় শেষ দিনে নাকি এক ঘণ্টায় আঠারো পেগ মদ খেয়ে মারা যায়। ভেতরে গিয়ে একদিন দেখিস, সেই কথাটাই এরা গর্ব করে লিখে রেখেছে।

আর একটা রাস্তার মোড়ে এসে সিদ্ধার্থ বললো, এবার তোকে এই সোসাইটির একটা ভালো জিনিস দেখাই। তোর একটা টেব্‌ল ল্যাম্প লাগবে বলছিলি না? দ্যাখ্ এটা চলবে?

একটা পার্কিং মিটারের পাশে রাখা রয়েছে কয়েকটা কাগজের বক্স, কিছু সাময়িক পত্রিকা, কিছু কাপ-প্লেট, একটা প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা বাতিদান, ওপরে চমৎকার শেড, কিছু গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদি।

সিদ্ধার্থ বললো, এরা বাড়ি বদলাবার সময় অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নেয় না। আমাদের দেশে দেখেছি লোকে ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে মর্চে ধরা বালতি, পাইখানার মগ, ছেঁড়া মাদুর, ভাঙা টব কিছুই বাদ দেয় না। এরা বাড়তি জিনিস রাস্তার মোড়ে রেখে যায়, অন্য যার কাজে লাগবে, সে নিয়ে যেতে পারবে। এ সব জিনিসের রি-সেল ভ্যালু খুব কম, এরা দু'চারটে টাকা পরোয়া করে না, বরং অন্য যে বিনা পয়সায় পাবে, সে খুশী হবে।

বাতিদানটি সুন্দর পালিশ করা কাঠের, বাল্‌ব পর্যন্ত লাগানো আছে, প্লাগটিও অক্ষত। সেটার গায়ে হাত বুলিয়ে অতীন বললো, এটা তো একটুও ভাঙেনি, নষ্ট হয়নি, তবু ফেলে গেল কেন?

—এত বড় স্ট্যান্ড ল্যাম্প কেউ আর এখন ঘরে রাখে না। ফ্যাসানেবল নয়। এটাও মনে রাখবি, ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির ইউটিলিটিটাই বড় কথা নয়। যাদের বেসিক নীডগুলো মিটে গেছে, তারা নানা রকম শৌখিনতা নিয়ে মাথা ঘামাবেই।

—এখানেও আমি কয়েকজনকে ভিক্ষে করতে দেখেছি।

—এ পাড়াতেই বেশী দেখতে পাবি। সেগুলো মাতাল, গেঁজেল কিংবা শখের ভিখিরি। সে আর কটা! তুই এ জিনিসটা নিবি তো তুলে নে। লজ্জার কিছু নেই। আমার ঘরের অনেক কিছুই এরকম রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া।

নিচু হয়ে ঝুঁকে সিদ্ধার্থ রেকর্ডগুলো দেখতে লাগলো। তার পছন্দ হলো না। সে বললো, সব কটাই প্যাট বুন, শুনলেই আমার গা জ্বলে যায়। টেপ রেকর্ডারের যুগ এসে গেছে, এখন আর কেউ এ সব ভারি ভারি রেকর্ড জমিয়ে রাখতে চায় না। একদিন আমি এরকম জায়গা থেকে পল রবসন পেয়েছিলাম, জানিস!

—এত বড় একটা বাতিদান ঘাড়ে করে আমরা দোকানে খেতে যাবো?

—তাতে কী হয়েছে? এ দেশে সব কিছু চলে। আমার বাবার কাছে গল্প শুনেছি, ওঁদের আমলে টাই না পরে, জ্যাকেট গায়ে না দিয়ে এ দেশের কোনো ভদ্র রেস্তোরাঁয় ঢোকা যেত না। এখন দ্যাখ না, যেই সামার শুরু হবে, আমেরিক্যান ছেলেরাই চটি পরে, গেঞ্জি গায়ে যেখানে সেখানে ঢুকে যাবে। হিপিরা এ দেশে পোশাকের ব্যাপারে ন্যাকামির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

সিদ্ধার্থ নিজেই তুলে নিল অত বড় বাতিদানটা। তারপর খানিকটা গিয়ে একটা রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়ালো। এ দোকানে গান-বাজনা নেই, একটু ভেতরের দিকে বলে নিরিবিলি।

ঢোকার মুখে একটি দীর্ঘকায় যুবতীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সিদ্ধার্থ বললো, হাই! যুবতীটিও ফিক হয়ে হেসে বললো, হাই!

টেবিল পেয়ে বসবার পর অতীন জিজ্ঞেস করলো, মেয়েটা তোর চেনা?

—কেন, চেনা না হলে বুঝি হাই বলা যায় না?

জিনস-এর প্যান্ট ও উজ্জ্বল হলুদ রঙের পুলওভার পরা মেয়েটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাকে যেন খুঁজছে, তার ঠোঁটে একটা লম্বা হোল্ডারে বসানো সিগারেট। বেশ চোখে পড়ার মতন রূপসী সে।

সিদ্ধার্থ বললো, মেয়েটা বোধ হয় খালি আছে, ডাকবো আমাদের টেবিলে? ওকে আমি একটু একটু চিনি, আমাদের অফিসের হ্যারি একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ও মেয়েটা এত লম্বা তো, তাই কোনো ছেলে ওর সঙ্গে ডেট করতে চায় না। তোর সঙ্গে মানাবে, তুই ডেট করতে চাস তো বল...

অতীন কোনো কথা না বলে সিদ্ধার্থর মুখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলো।

—এমন কিছু খারাপ কথা বলিনি যে আমার দিকে অমন কট কট করে তাকাতে হবে। ঠিক আছে, কী খাবি বল, তোর স্টেক ভালো লাগে? অন্য কিছুও খেতে পারিস।

—তোর যেটা ইচ্ছে বল না।

—কেন, তোর নিজের কিছু ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই? লবস্টার খাবি? দামের জন্য তোকে চিন্তা করতে হবে না।

—না, না, আমি অত দামী কিছু খাবো না!

টেবিলের ওপর থেকে এক গোছা ন্যাপকিন তুলে অতীনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, তোর ঐ বিপ্লবী-বিপ্লবী অভিমানী অভিমানী মুখখানা মুছে ফ্যাল তো! এদেশে যখন এসেই পড়েছিস, এখানেই যখন থাকতে হবে, তখন সব সময় মুখ গোমড়া করে রেখে লাভটা কী? হাসতে শেখ। এদেশে হাসতে না শিখলে বাঁচা যায় না!

অতীন তবু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাইলো।

সিদ্ধার্থ ধমক দিয়ে বললো, মুখখানা মুছে নে, তেলতেলে হয়ে গেছে। শোন, অত চিন্তা করিস না। এপ্রিল থেকে ইউনিভার্সিটিগুলোতে নতুন সেমেস্টার শুরু হচ্ছে, পাঁচখানা অ্যাপ্লিকেশন পাঠানো হয়েছে, তুই একটা না একটাতে ঠিক চান্স পেয়ে যাবি। তোর রেজাল্ট তো ভালো! কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। লেক্সিংটনে ইন্ডিয়ান ছাত্রদের একটা মেস বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে দ্যাখ, ডক্টরেট ডিগ্রি

গিয়ে এসেও কেউ কেউ এক বছর দু'বছর অড্ জব করছে। প্রথম দিকে আমাকে কি কম কষ্ট করতে হয়েছিল? বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বিক্রি করতুম।

যে হোটেল কর্মীটি ওদের অর্ডার নিতে এসেছিল, সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, স্যার, আপনারা বাঙালী।

দু'জনে মুখ তুলে দেখলো, ওদেরই বয়েসী একজন যুবক, ঠোঁটে সামান্য হাসি ফোটালেও মুখে একটা উদ্বিগ্ন ভাব রয়েছে। নিউ ইয়র্কের হোটেল রেস্তোরাঁয় ভারতীয় বা পাকিস্তানী পরিচারক দেখতে পাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। বাংলা কথা শুনলে বাঙালীরা খুশী হয়।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথাকার?

লোকটি বললো, আমার বাড়ি চিটাগাং, দুই বৎসর এদেশে আসছি। ঢাকার নতুন খবর কিছু জানেন?

–নতুন খবর তো কিছু জানি না। সপ্তা দু'য়েক আগে নিউ ইয়র্ক টাইমসে একটা ছোট খবর দেখেছিলাম।

–সেটা আমিও দেখছি। তারপর মিটমাট কিছু হইলো কি না–

একটু পরে যুবকটি অর্ডার নিয়ে চলে যাবার পর অতীন জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে ঢাকায়?

সিদ্ধার্থ বললো, ইস্ট পাকিস্তানে বিরাট গোলমাল চলছে। ইয়াহিয়া খান ইলেকশন কল করেছিল, তুই সে খবর জানিস?

অতীন ঘাড় নাড়লো। তাদের দু'জনের সংসারে খবরের কাগজ কেনা হয় না, টি ভি-তে যেটুকু খবর দেখে। এদেশের টি ভি-তে ভারত-পাকিস্তানের প্রায় কোনো উল্লেখই থাকে না। সিদ্ধার্থ অফিসের লাইব্রেরিতে কাগজ পড়ে আসে।

সিদ্ধার্থ বললো, ইলেকশন ডেকে ইয়াহিয়া প্যাচে পড়ে গেছে। ইস্ট পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সিক্স পয়েন্ট ফর্মুলার ভিত্তিতে ভোটে নেমে দারুণ ভাবে জিতেছে। ইস্ট পাকিস্তানে তো সুইপ করে বেরিয়ে গেছে বটেই, গোটা পাকিস্তানেই ওদের মেজরিটি, এখন মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী না করে উপায় নেই। কিন্তু ভুট্টো তা মানবে কেন? সে নানান রকম বায়নাক্কা তুলেছে। এই নিয়ে খুব হাঙ্গামা ওখানে। আজ কত তারিখ? পঁচিশে মার্চ তো, আজও ওদের ওখানে...

অতীন শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পাকিস্তানের ঘটনা সম্পর্কে তার আগ্রহ নেই, তার মনে পড়ে গেছে মানিকদা, কৌশিকদের কথা। কৌশিক আর পমপম দু'জনেই ধরা পড়ে জেলে আছে, মানিকদার কোনো হদিস নেই। সে আপন মনে বললো, কতদিন দেশের বন্ধুবান্ধবদের খবর পাইনি।

সিদ্ধার্থ বললো, ওয়েস্ট বেঙ্গলের অবস্থাও খুব খারাপ। 'ইন্ডিয়া অ্যাব্রড' বলে একটা ট্যাবলয়েড কাগজ বেরোয়, তাতে একটা নিউজ দেখলুম, সিদ্ধার্থ রায়ের গবর্ণমেন্ট নতুন ট্যাকটিকস্ নিয়েছে, নকশাল ছেলেগুলোকে কোর্টে পাঠাচ্ছে না। পুলিশের গাড়িতে চাপিয়ে ময়দানে এনে ছেড়ে দিয়ে বলছে, যা বাড়ি যা, পালা! ছেলেগুলো দৌড়তে শুরু করলেই পেছন থেকে গুলি করে শেষ করে দিচ্ছে, এর নাম এনকাউন্টার! ফিল্মস্টার উত্তমকুমার ময়দানে মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে নাকি এ রকম একটা দৃশ্য দেখে ফেলেছে। তুই ভাগ্যিস দেশ থেকে ঠিক টাইমলি পালাতে পেরেছিলি, এখন জেলে থাকলে তুই খতম হয়ে যেতিস।

অতীন টেবিলে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তার চোখ দুটি রক্তিম। সে কর্কশ গলায় বললো, আমি খাবো না। বাড়ি যাচ্ছি।

সিদ্ধার্থ তার হাত চেপে ধরে বললো, আরে পাগল, বোস, বোস! অতীত নিয়ে মানুষ বাঁচে না। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

–দ্যাখ সিদ্ধার্থ আমাকে অপমান করার কোনো রাইট নেই তোর।

–ইয়াকিং-ঠাট্টাও বুঝিস না? সব সময় মাথা গরম!

চট্টগ্রামের ছেলেটি ওদের জন্য দু'প্লেট স্টেক নিয়ে এলো। সঙ্গে একটি রেড ওয়াইনের বোতল। সিদ্ধার্থ ওয়াইনের অর্ডার দেয়নি, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে যেতেই ছেলেটি বললো, ওটা আমার কমপ্লিমেন্ট। আপনাদের বাড়ি কি ঢাকা?

–না, আমরা কলকাতার লোক।

–স্যার, গত সপ্তায় দ্যাশ থিকা একজন আসছে, সে কইলো, ঢাকায় স্টুডেন্টরা স্বাধীন বাংলা ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে, মিলিটারি গুলি চালিয়ে অনেককে মেরেছে।

–সেটা তো দু'সপ্তাহ আগের খবর। আজ পঁচিশে মার্চ, আজ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হচ্ছে, আজ শেখ মুজিবরের হাতে ক্ষমতা দিতেই হবে। কালকের কাগজে কিছু খবর থাকবে নিশ্চয়ই। আপনিও বসুন না আমাদের সঙ্গে?

–না স্যার, অন ডিউটি, আপনাদের ঠিকানা দ্যান, একদিন গল্প করতে যাবো।

ছেলেটি চলে যাবার পর অতীন অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, স্বাধীন বাংলা না কচু হবে! আর্মি রেজিমে কখনো সিসেশান হতে পারে? ওদের দেশে রেভোলিউশান হবার স্কোপ ছিল, তার বদলে আবার ভোটের দিকে গেল।

সিদ্ধার্থ বললো, ইস্ট পাকিস্তানে কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, যেটা ওয়ার্ল্ডে আর কোথাও বোধ হয় হয়নি। নেতাগুলো তো অনেকেই জেলে ছিল কিংবা চুপ মেরে গিয়েছিল। কিন্তু সিক্সটি নাইন থেকে ছাত্ররা এমন বিরাট আন্দোলন শুরু করলো যে তাতেই সরকার টলে যাচ্ছে। ছাত্রদের দাবিতেই এখন নেতারা গলা মেলাচ্ছে। ছাত্রদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস ওখানে কোনো নেতার নেই। স্টুডেন্ট পাওয়ার একটা দেশের পলিটিক্যাল চেইঞ্জ নিয়ে আসছে...আর তোরা ওয়েস্ট বেঙ্গল কী করলি? নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি...

–আমেরিকায় বসে দেশের সমালোচনা করতে খুব মজা লাগে, তাই না?

–চল উঠে পড়ি, টি ভি-তে রাত সাড়ে এগারোটায় একটা ভুতের ছবি দেখাবে। ফেরার পথে সিদ্ধার্থ বললো, এবার বিনা পয়সায় কফি খেতে হবে। জায়গাটা চিনে রাখ।

সত্যিই একটি রাস্তার ওপরের দোকানের কাউন্টারে দুটি মেয়ে কাগজের গেলাসে কফি বিলি করছে। সিদ্ধার্থ দু'গেলাস নিয়ে এলো। চুমুক দিয়ে বললো, ভালো কফি! এদেশের ছেলে-মেয়েদের গাঁজা-খাওয়ার অভ্যেস ছাড়ানোর জন্য স্যালভেশান আর্মি থেকে এই বিনা পয়সার কফি খাওয়াচ্ছে। অ্যাজ ইফ কফি খেলে কেউ আর গাঁজা খেত চাইবে না। কী বুদ্ধি এদের!

এতক্ষণ পরে অতীন খুক খুক করে একটু হাসলো।

বাড়ি ফিরে সিদ্ধার্থ খাটে শুয়ে টিভি দেখতে লাগলো, অতীন চিঠি লেখার জন্য বসলো টেবিলে। চিঠি পেতে একটু দেরি হলেই মা উতলা হয়ে পড়ে। সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই একদিন তার চিঠি পড়ে ফেলেছিল। মাকে চিঠি লেখার সময় অনেক গল্প বানাতেই হয়। ছেলে কুলিগিরি করছে শুনলে মা অজ্ঞান হয়ে যাবে।

একটু পরে অতীন খানিকটা ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলো, সিদ্ধার্থ, একটা ফোন করবো বোস্টনে? সিদ্ধার্থ ঘড়ি দেখে বললো, আর দশ মিনিট পরে করিস। বারোটার পর চার্জ অনেক কম লাগবে।

–আমি পয়সাটা দিয়ে দেবো তোকে।

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিবি দিবি! তুই হার্ভার্ডে না হোক, বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে একটা চান্স পেয়ে গেলে খুব ভালো হয়। তখন আর তোকে ঘন ঘন লং ডিসটেন্স কল করতে হবে না।

একটু থেমে সিদ্ধার্থ আবার বললো, দ্যাখ অতীন, তোকে একটা কথা বলি। শর্মিলার মতন এরকম সত্যিকারের একটা ভালো মেয়ে খুব কম দেখেছি। তোর মতন একটা অপদার্থ, গোঁয়ারকে যে ওর কী করে পছন্দ হলো সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। তুই যদি মেয়েটাকে কষ্ট দিস, সেটা হবে বিরাট ক্রাইম, তাহলে তোর সঙ্গে আর জীবনে কথা বলবো না। তুই শর্মিলাকে ডিচ্ করিস না।

॥ ৩ ॥

সাদা পা-জামা আর তাঁতের পাঞ্জাবি পরা, তার ওপর একটা গরম হাফ-কোট, আর মুখে পাইপ নিয়ে শেখ মুজিব বসে আছেন তাঁর বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে, বসবার ঘরে। সারাদিন ধরে মানুষজন আসার বিরাম নেই, আসছে অজস্র মিছিল, পার্টিকর্মী ও শুভার্থীরা ঘিরে বসে আছে তাঁকে। কথা বলতে বলতে শেখ সাহেবের মুখে ফেনা উঠে আসছে। তাঁর পাশেই সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবির ওপর একটা আস্তুল। এক এক সময় ক্লান্ত হয়ে গিয়ে শেখ মুজিব অত্যুৎসাহীদের বলছেন, তোমরা তাজুদ্দীন সাহেবের সাথে কথা কও, আমারে একটু চিন্তা করতে দাও।

দু'দিন আগেই "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" এবং "স্বাধীন বাংলা শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ" প্রতিরোধ দিবস পালন করেছে। দেশের জনসাধারণ এখন উত্তাল। শেখ মুজিবের ঐ দোতলা বাড়ির ছাদে শস্যশ্যামলা বাংলার প্রতীক সবুজের পটভূমিতে, শহীদের রক্তে-রাঙা সূর্যের প্রতীক লাল বৃত্তের মধ্যে, সোনালি রঙে প্রতীক সবুজের পটভূমিতে, শহীদের রক্তে-রাঙা সূর্যের প্রতীক লাল বৃত্তের মধ্যে, সোনালি রঙে পূর্ববাংলার মানচিত্র আঁকা এক নতুন পতাকা। শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নান ঐ একই রকম আর একটি পতাকা তুলে দিয়েছে বাড়ির সামনে। এই বাড়ি এখন ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র।

শেখ মুজিবের মুখে, চোখে, ভুরুতে নিদারুণ অস্বস্তি। স্বাধীন বাংলা। পাকিস্তান কি ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে? পাকিস্তান ভাঙা কি এতই সহজ? তা ছাড়া, কেনই বা তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চাইবেন এখন ভাঙা কি এতই সহজ? তা ছাড়া, কেনই বা তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চাইবেন এখন! ছয় দফা দাবীর জয় হয়েছে, এবারের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার পর বাঙালী মুসলমানের হাতে শাসন ক্ষমতা না দিয়ে ইয়াহিয়া খান যাবে কোথায়? শেখ মুজিব গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব পেলে তিনি পাকিস্তান ভাঙতে যাবেন কেন?

ছাত্ররা ছয় দফার থেকেও বাড়িতে এগারো দফা দাবী তুলেছে। স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন বাংলা রব উঠেছে চতুর্দিকে। সামরিক শাসকদের হাত থেকে দেশের অর্ধেক অংশ ছিনিয়ে নেওয়া কি মুখের কথা? তিনি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু বাংলার মাটির দুর্গ পশ্চিম পাকিস্তানীদের কামানের মুখে কতক্ষণ টিকবে? শুধু মনের জোর দিয়ে কি রাইফেল-বোমার বিরুদ্ধে লড়া যায়? তিনি পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা আটানব্বই ভাগ ভোট পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যদি সত্যি লড়াই লাগে তাহলে কি এ দেশের সব মানুষ তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াবে? যদি লড়াই লাগে...সে লড়াই কতদিন ধরে চলবে ঠিক নেই, কত লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হবে, সে দায়িত্ব তিনি একা নেবেন?

পার্টির উগ্রপন্থী সদস্যরা তাঁকে বারবার বলছে ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের সঙ্গে আলোচনায় আর যোগ না দিতে। অযথা কথা বাড়িয়ে, দেরি করিয়ে কৌশলে ওরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও সেনা আনাচ্ছে। কিন্তু শেখ মুজিব এখনও চূড়ান্ত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তাঁর এখনও ধারণা, ইয়াহিয়া খান লোকটা আইয়ুবের মতন কুটকৌশলী নয়, এর চক্ষুলজ্জা আছে, নির্বচনের ফলাফলকে এই সেনাপতি মর্যাদা দেবে। আলাপ, আলোচনা এখনো একেবারে অন্ধ গলিতে পৌঁছোয়নি, আজ রাত্রেই একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যেতে পারে।

মাঝখানে বেশ গরম পড়ে গিয়েছিল, আজ আবার একটু শীত শীত ভাব। থমথম করছে বাতাস। প্রত্যেকটি মানুষের মুখে কী হয় কী হয় ভাব। আজ সারাদিন ধরেই একটা গুজব চতুর্দিকে ঘুরছে যে যে-কোনো মুহূর্তেই মিলিটারি এসে আওয়ামী লীগের সব নেতা এবং ছাত্র নেতাদের বন্দী করবে।

সকাল থেকে পঞ্চান্নটি মিছিল এসেছে শেখ সাহেবের কাছে, তার মধ্যে শুধু মহিলাদেরই মিছিল ছিল ছটা। সকলেরই এক কথা, এবারে কিছুতেই সামরিক শাসকগোষ্ঠীর কাছে নতি স্বীকার করা হবে না। শেখ মুজিব অভিভূত হয়ে পড়ছেন। দৃঢ় ভাষায় তাদের ভরসা দিতে গিয়েও তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে যাচ্ছে। যদি সত্যিই রাষ্ট্রবিপ্লব বেঁধে যায়, কোনো কোনো দেশ সাহায্য করবে, কারা অস্ত্র দেবে? যদি কেউ না দেয়? যদি ইন্ডিয়াও দোনামনা করে? তা হলে কামানের মুখে ছাতু হয়ে যাবে এই সব সরল, তেজী, আদর্শবাদী ছেলে মেয়েগুলো। না, শেখ মুজিব এখনও আলোচনার টেবিলে বসে সমাধান সূত্র খুঁজতে চান। খানিকবাদেই ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময় নির্দিষ্ট আছে।

হুড়মুড় করে একদল ছাত্রলীগ জঙ্গী বাহিনীর ছেলে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। তাদের মুখপাত্র হয়ে কামরুল আলম খসরু বললো, মুজিব ভাই, আপনি আন্ডার গ্রাউন্ডে চলুন। আপনার এখন বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে শেখ মুজিব প্রবল ভাবে মাথা নাড়লেন।

তারপর বললেন, তোরা তৈরি হ-গে যা! আমার জন্য ভাবিস না। আমার আর কী করবে, বড় জোর ধরে নিয়ে যাবে। তা বলে আমি চোরের মতন পালিয়ে যেতে পারি না। তাছাড়া আমি পালিয়ে গেলে আমার খোঁজে ওরা সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালাবে, বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেবে। আমার লোকদের আমি বিপদের মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে পারি না।

কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি হলো, কিন্তু শেখ মুজিব অনড়। তিনি আলোচনার শেষ দেখতে চান।

ছাত্রদলের সঙ্গে সিরাজুলও বেরিয়ে এলো বাইরে। একজন কেউ বললেন, আচ্ছা শেখ সাহেব তো গোঁয়ারের মতন বসে থাকবেনই ঠিক করেছেন, কিন্তু ভাবী আর ছেলেমেয়েদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত না? সংগ্রাম শুরু হলে এই বাড়িই তো ফার্স্ট টার্গেট হবে।

সিরাজুল আবার ভেতরে খবর নিতে গেল। ফিরে এসে জানালো যে ভাবী আর পরিবারের অন্য সবাই শামিবাগে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে গেছেন।

এবার ওরা চললো জহুরুল হক হলের দিকে। তার আগে, মধুর ক্যান্টিনে ছাত্র লীগের মিটিং আছে রাত এগারোটায়।

পাকিস্তানের ভাবমূর্তির স্রষ্টা কবি ইকবালের নামে ছিল ছাত্রদের একটি হস্টেল, ইকবাল হল। ছাত্ররা সেই নাম বদলে দিয়েছে। সামরিক বাহিনীর সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের মতনই আর একজন আসামী ছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। বিচার শেষ হবার আগেই কারাগারের মধ্যে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয় এই সৎ মানুষটিকে। ছাত্ররা তাই তাঁকে স্মরণীয় করেছে ইকবালের নাম মুছে দিয়ে।

জিন্নার নামে যে রাস্তা, সে রাস্তার নামও পাল্টে সূর্য সেনের নামে রাখার দাবী তুলেছে ছাত্ররা।

–মধুদা, পাঁচ কাপ চা!

অন্যরা এখনো আসেনি। সাজাহান, সিরাজ ও নজরুল ইসলাম না এলে মিটিং শুরু করা যাবে না। চা খেতে খেতে কাদের জিজ্ঞেস করলো, এই সিরাজুল, তুই যার বাসায় থাকোস, সেই বাবুল মিঞা এক আর্মির মেজরের কোয়ার্টারে যাতায়াত করে ক্যান রে?

সিরাজুল কিছু উত্তর দেবার আগেই অন্য একজন বললো, মদ-মুদ গেলতে যায় বোধ হয়! আমাগো প্রফেসরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছে ফিফথ কলামনিস্ট!

কাদের বললো, কিন্তু বাবুল চৌধুরীর ভালো মানুষ বইলাই জানতাম। মদ তো খাইতো না আগে, সিগারেটও টানতে দেখি নাই। হ্যার পোশাক-পরিচ্ছদের মতন মানুষটাও ক্লিন আছিল।

–আলতাফের ছোট ভাই তো। ঐ আলতাফের পত্রিকা এই ইলেকশানের সময় আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট করে নাই। হেই কাগজের মালিক ঐ হোটেলওয়ালা হোসেন মিঞা আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেটের এগেইনস্টে কনটেস্ট করছিল। ওরা সব কয়টাই দুই নম্বরী!

–আমি বাবুল চৌধুরীর কাছে পড়ছি। এমনিতে তো মার্কসিস্ট, অথচ আর্মির সাপোর্টার, কিছুদিন আগেই চীনা ঘুইরা আসলো।

–ঐসব ফরেন ট্রিপের লোভেই তো আমাগো তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালার আর্মির ধামা ধর। এসব কয়টা হারামখোররে একদিন খতম করতে হবে!

–কী রে, সিরাজুল, চুপ কইরা আছোস ক্যান? বাবুল চৌধুরীর নুন খাইছোস, তাই কিছু বলবি না।

সিরাজুল মাথা নীচু করে রইলো। বাবুল চৌধুরীকে এক সময় সে পীরপয়গম্বরের মতন ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। এই মানুষটির জন্য সে মনিরাকে নিয়ে গ্রাম থেকে চলে আসতে পেরেছে। ঢাকা শহরে আশ্রয় পেয়েছে। বিদ্বান ও নিখুঁত ভদ্রতার প্রতিমূর্তি বাবুল চৌধুরী ছিল তার আদর্শ পুরুষ।

সেই বাবুল চৌধুরী তার শ্রদ্ধার আসন থেকে কত নীচে নেমে এসেছেন!

সারাদেশে যখন শেখ মুজিবের নামে রোমাঞ্চিত হচ্ছে, তখনও বাবুল চৌধুরী উঠতে বসতে শেখ সাহেবের নামে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। জামাতে ইসলামীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে বলে যে ছয় দফা হলো পাকস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র। আওয়ামী লীগ ভারতের টাকা খায়, ইন্দিরা গান্ধীর অঙ্গুলি হেলনে এই পার্টি পাকিস্তানের সর্বনাশ করছে। আর্মি যে ইস্ট পাকিস্তানের ওপর অনবরত দুরমুশ চালাচ্ছে, এই মার্চ মাসেই কত ছাত্রকে গুলি করে মেরে ফেললো, সে সম্পর্কে বাবুল চৌধুরীর কোনো প্রতিবাদ নেই। এখনও নির্লজ্জের মতন তার বন্ধু এক ওয়েস্ট পাকিস্তানী মেজরের বাড়িতে খানাপিনা করতে যায় নিয়মিত। কেউ কেউ বলে, সেই মেজরের স্ত্রীর সাথে নাকি বাবুল চৌধুরীর গোপন আশনাই আছে।

মঞ্জু ভাবীর মতন অমন চমৎকার এক মহিলা, তাকেও খুব কষ্ট দিচ্ছে বাবুল চৌধুরী। প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, মঞ্জু ভাবী রাগ করে চলে যায় বাপের বাড়ি। আর ঐ আলতাফ, সেটা তো

একটা শয়তান। সে মনিরার ওপর কুদৃষ্টি দিয়েছে।

সিরাজুল বললো, না, আমি বাবুল চৌধুরীর নুন খাই নাই। উনি বাসায় থাকতে দিয়েছেন ফ্রিতে, সেটা ঠিক, কিন্তু কোনোদিন আমি তার কাছে থেকে এক আধলাও সাহায্য নিই নাই। এবার ও বাসা ছেড়ে দেবো।

হঠাৎ দূরে পর পর কয়েকটা বিকট শব্দ হতেই ওরা কথা থামিয়ে উৎকর্ণ হলো। মেশিন গানের আওয়াজ। এখন গুলি চলছে কোথায়? এখন তো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ সাহেব ও ভুট্টোর মিটিং চলার কথা।

কাদের উঠে গিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখলো, রাস্তায় লোকজন ছুটোছুটি করছে। আরও কয়েকবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল। মন্টু নামে একটা ছেলে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বললো, আইস্যা পড়ছে। আইস্যা পড়ছে! আর্মি, আর্মি!

এবার শোনা গেল মেঘ গর্জনের মতন গুরু গুরু ধ্বনি। ট্যাঙ্ক বেরিয়েছে মনে হচ্ছে। লোকজন দুপ্‌দাপি পালাচ্ছে। আর এখানে থাকার কোনো মানে হয় না। চায়ের দাম টেবিলের ওপর রেখে সিরাজুল বললো, মধুদা, তুমিও দোকান বন্ধ করে দাও। জগন্নাথ হলে চলে যাও।

জহুরুল হলে দোতলার একটি ঘরে কিছু বোমা ও কয়েকটি থ্রি ও থ্রি রাইফেল জড়ো করে রাখা আছে। পুলিশই হোক আর আর্মিই হোক, তাদের কিছুতেই হলের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সিরাজুলরা এসে দেখলো কিছু ছেলে হল ছেড়ে পালাচ্ছে। কাদের তাদের ধমক দিতে লাগলো। হলে একসঙ্গে এত ছেলে থাকতে ভয়ের কী আছে? কয়েকজন তবু পালিয়ে গেল, কয়েকজন ফিরলো।

সিরাজুল পজিশন নিল দোতলার ঘরটায়। এখনও তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। এত তাড়াতাড়ি কি আলোচনা ভেঙে গেল? শেখ সাহেব বলছিলেন, কাল থেকেই মার্শাল তুলে নেবার খুবই সম্ভাবনা। তা হলে আজ রাত্তিরে রাস্তায় আর্মি বেরুবে কেন?

প্রচণ্ড শব্দে একটা শেল এসে পড়লো খুব কাছাকাছি। তারপর আর একটা। কামান থেকে গোলা দাগছে? জানলা দিয়ে আর্মির গাড়ি বা কিছুই দেখা গেল না। কাদের একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে ছুঁড়ে মারলো পর পর দুটো বোমা। তারপরই শুরু হলা বৃষ্টির মতন গুলিবর্ষণ।

বিপদের গুরুত্বটা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ রাত্তিরবেলা ছাত্রদের মারতে আসবে কেন আর্মি? আজ তো ছাত্ররা কোনো বিক্ষোভ দেখায় নি। কেউ কোনো ভুল অর্ডার দিয়েছে? বাইরে গুলি-গোলার আওয়াজ, হলের মধ্যে চিৎকার করছে ছেলেরা। ঝনঝন শব্দে ভাঙছে জানলার কাচ। ট্যাঙ্ক থেকে গোলা ছুঁড়ছে, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে শব্দ, একদিকের দেয়াল ভেঙে পড়লো হুড়মুড় করে। সিরাজুল লাফিয়ে সরে এলো সেদিক থেকে।

প্রথম লুটিয়ে পড়লো কাদের, তারপর মন্টু। কাদের যে মরে যেতে পারে তা বিশ্বাসই করতে পারছে না সিরাজুল। এক মিনিট আগে ও লাফিয়ে লাফিয়ে চিৎকার করে যে খানসেনাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছিল, একটা গুলিতেই সে শেষ হয়ে গেল? কাদেরের নিস্পন্দ শরীরটা ধরে পাগলের মতন ঝাঁকাতে লাগলো সিরাজুল।

কে যেন তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল সে ঘর থেকে। হলের মধ্যে ছাত্রদের গুলি করে মারবে। যে-কোনো ছাত্রকে!

এখন আর বাইরে বেরুবার উপায় নেই, হুড়োহুড়ি করে ছেলেরা চলে যাচ্ছে ছাদে। ছাদে এসে গোলা পড়লে তারা আবার নেমে আসছে নিচে, কে যে কোথায় যাবে তা ঠিক করতে পারছে না, যেন খাঁচার মধ্যে ইঁদুরের দৌড়। আতঙ্কের চিৎকার আর বারুদের ধোঁয়ায় পুরো জায়গাটা যেন নরক।

সিরাজুলের হাতে তখনও রাইফেল, সেটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল হায়দার। পেছন দিকের একটা ঘরের জানলার ভেঙে বাইরে এসে ওরা দু'জন অন্ধকারের মধ্যে একটু দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল গ্যারেজ, আর কিছু চিন্তা না করে দু'জনে উঠে পড়লো সেই গ্যারেজের চালের ওপর। সেখানে আরও দু'তিনজন ছাদে গা মিশিয়ে শুয়ে আছে, তারা বললো, চুপ চুপ!

আর্মি একটু পরেই ঢুকে পড়লো হলের মধ্যে, প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে গুলি করে মারছে ছেলেদের। শুধু ছাত্র হওয়াই অপরাধ। যারা জীবনে কখনো রাজনীতি করেনি তারা হাউ হাউ করে কাঁদছে, কেউ কেউ ভাঙা ভাঙা উর্দুতে দয়া ভিক্ষে করছে, সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো কথা নেই,

শুধু গুলি, শুধু গুলি।

গ্যারেজের ছাদে পাঁচটা প্রাণী একেবারে কাঠ হয়ে আছে। সিরাজুল অনবরত ভাবছে, মরে যবো, মরে যাবো! কাদের মরে গেছে, আমিও যাবো। কাদের, কাদের, একটু আগি বেঁচে ছিল কাদের, সে আর নেই! কাদের বোমা ছুঁড়ে ভুল করেছিল, কিন্তু বোমা না ছুঁড়লেও ওরা গুলি চালাতোই, ছাত্র আন্দোলন একেবারে শেষ করে দেবার জন্য ওরা সব ছাত্রদেরই মেরে ফেলার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। এরকম নির্লজ্জভাবে আর্মি এসে সিভিলিয়ানদের মারবে, এ রকম কি কেউ ভাবতে পেরেছিল?

মনিরার কী হবে? সিরাজুল যতক্ষণ না বাড়ি ফেরে, ততক্ষণ মনিরা জেগে থাকে। আজ কথা ছিল, শেখ সাহেবের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের মিটিং-এর ফলাফল কী হলো তা না জেনে বাড়ি ফেরা হবে না। সারারাত ও কোনো হলে কাটিয়ে দিতে পারে। আজকের রাতটা কী আর কাটবে? যদি গ্যারেজের ছাদের ওপর টর্চের আলো ফেলে...বাঁচার আশা নেই...শুধু মৃত্যু আর্তনাদ আর গুলির শব্দ...কেউ বাঁচবে না। পূর্ব বাংলার যুবশক্তিকে আজ এরা ধ্বংস করে দেবে...

জহুরুল হলের সঙ্গে সঙ্গে আরও সাঁজোয়া গাড়ি গিয়ে আক্রমণ করলো জগন্নাথ হল, সলিমুল্লা হল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসগুলি। নির্বিচারে হত্যা। কামান ও মর্টারের গোলায় লাল হয়ে উঠছে আকাশ।

জগন্নাথ হলের ছেলেরা ভেবেছিল, তারা মাইনরিটি কমিউনিটি, তাদের গায়ে হাত পড়বে না। হলে সরস্বতীর মূর্তি রয়েছে, সেই প্রতিমা নিশ্চয়ই খান সেনারা ছোঁবে না। বেশীর ভাগ ছাত্র গোলাগুলির আওয়াজ শুনে সেই সরস্বতী প্রতিমার পেছনে গিয়ে জড়াজড়ি করে বসেছিল।

কিন্তু আর্মির চোখে পূর্ব পাকিস্তানের সবাই হিন্দু অথবা হিন্দুর দালাল। বাঙালী মুসলমান খাঁটি মুসলমান নয়। তাদের আরও বোঝানো হয়েছে যে প্রচুর ভারতীয় হিন্দু অনুপ্রবেশকারী ঢাকায় আত্মগোপন করে ছাত্রদের খ্যাপাচ্ছে।

মিলিটারি জগন্নাথ হলে ঢুকে লাথি মেরে ভেঙে ফেললো সরস্বতী প্রতিমা। একদল ছাত্রকে দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি চালাবার পর আর একদল ছাত্রদের বাধ্য করা হলো লাশগুলো বাইরে বয়ে নিয়ে যেতে। তারপর তারা মরলো, সেই লাশ বয়ে নিয়ে গেল আর একদল ছাত্র।

জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট, ইংরিজির অধ্যাপক জ্যোর্তিময় গুহ ঠাকুরতা বাধা দিতে এসে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। দর্শনের প্রবীণ অধ্যাপক গোবিন্দ দেব নিজের কোয়ার্টার থেকে ছুটে এলেন, তিনি হাত তুলে বললেন, আমার ছেলেদের মেরো না। তোমাদের অফিসার কে আছে, তাঁর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দাও!

মালাউন কি বাচ্চা বলেই একজন এক ঝাঁক গুলি চালিয়ে দিল তাঁর দেহে। ঘরের মধ্যে ছিল তাঁর পালিতা কন্যা রোকেয়া সুলতানা, কোলে তাঁর বাচ্চা, পাশে তাঁর স্বামী। রোকেয়ার স্বামী বাধা দিতে এসে গুলিতে প্রাণ হারালো, রোকেয়া আর্তনাদ করে আল্লাহ্ বলে। হিন্দুর ঘরে আল্লার নাম শুনে সৈন্যরা একটু থমকে দাঁড়ালো, তরপর ফিরে গেল।

পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ মুনিরুজ্জামান সাহেব যেমন পণ্ডিত তেমনই ধার্মিক। জল্লাদেরা গভীর রাতে তার কোয়ার্টারে যখন ঢোকে, তখন তিনি জায়নামাজে বসে কোরআন তালাওয়াত করছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি নিহত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ দিল তাঁর ভাই, ছেলে।

কামান দাগা হলো ইত্তেফাক অফিসে, পুড়িয়ে দেওয়া হলো 'পিপ্‌ল' পত্রিকার কার্যালয়, গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হলো ভাষা আন্দোলনের শহীদ মিনারের চূড়া। মিলিটারি চলাচলে বাধা দেবার জন্য কয়েকটি রাস্তায় লোকেরা ব্যারিকেড করেছিল, ট্যাঙ্ক এসে সেই ব্যারিকেড উড়িয়ে দিল, আগুন লাগিয়ে দিল কাছাকাছি সব কটি বাড়িতে। যারা মরছে তারা মৃত্যুর আগের মুহূর্তের বুঝতে পারছে না, তাদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের এত রাগ কেন। শুধু বাঙালী হওয়াই অপরাধ?

সিরাজুলরা গ্যারেজের ছাদ থেকে নামলো পরদিন বিকেলবেলা।

দিনের আলো ফোটার পর শুরু হয়েছিল কবর খোঁড়ার পালা। ছাত্রাবাসগুলির সামনের জমিতেই সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এক হাত দু'হাত মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে ফেলা দেওয়া হচ্ছে লাশ। দু'একটা হাত-পা বেরিয়ে থাকছে, তাতে কিছু আসে যায় না।

সামরিক গাড়ি ও বুটের আওয়াজ যখন আর শোনা গেল না তখনই ভরসা করে নেমে পড়লো

সিরাজুলরা। হায়দার সারারাত মুখে হাত চাপা দিয়ে বমি করেছে। সেই বমি সিরাজুলের গায়েও লেগেছে, দু'জনের জামাতেই দুর্গন্ধ। হায়দারের চোখ দুটিও ঘোলাটে হয়ে গেছে। দারুণ সাহসী হায়দারই কাল সিরাজুলকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু এখন আর সে মানসিক চাপ সহ্য করতে পারছে না।

অনেক মৃতদেহ এখনও কবর দেওয়া হয়নি। ছড়িয়ে আছে রাস্তায়। কয়েকটা আধ পোড়া বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কোথাও কোনো শব্দ নেই। যেন সত্যিকারের একটা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ঢাকা নগর।

একটা গলির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলেন জিন্নাত আলী, ইনি জহুরুল হলের সহ-সভাপতি। মুখখানা একেবারে বরফের মতন সাদা, ওদের দেখেও কোনো কথা বললেন না।

রাস্তার গা ঘেঁষে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে ওরা। মৃতদেহগুলিকে দেখে ওরা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না যে নিজেরা কী করে বেঁচে আছে। ওদের বাড়িতে কি কেউ বেঁচে আছে?

খানিকটা এগোতেই একজন মিলিটারি চেঁচিয়ে উঠলো, কৌন হ্যায়?

আশ্চর্য ব্যাপার, সৈনিকটি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ঠিক মাঝখানে। হাতে সাব-মেশিনগান তবু তাকে ওরা দেখতে পায়নি কেউ। ওরা দেখছিল শায়িত মৃতদেহগুলির মুখ, কোনো কোনো লাশ একেবারে ছিন্নভিন্ন, তবু এদের মধ্যে চেনা কেউ আছে কিনা, সেটা জানার ব্যাকুলতা।

মিলিটারি একেবারে ওদের সামনে, পালাবার কোনো উপায় নেই। প্রায় পৌঢ় চেহারার এক পাঠান, চোখ দুটো লালচে, চৌকো চোয়াল। সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। একটু নড়াচড়া করলেই পরপর গুলিতে ফুঁড়ে দেবে সবাইকে।

আর বাঁচার কোনো আশা নেই। সামান্য একটু অসাবধানতার মূল্য দিতে হবে প্রাণ দিয়ে। সিরাজুল একবার ভাবলো, কোনোক্রমে লাফিয়ে পড়বে লোকটার ওপরে; তার নিজের প্রাণ গেলেও অন্যরা সেই সুযোগে ছুটে পালাতে পারে। কিন্তু প্রাণ দেওয়া এত সহজ নয়। লোকটা অস্ত্র তুলে আছে, সিরাজুল ওর কাছে পৌঁছোতেই পারবে না।

সিরাজুল তাকালো জিন্নাত আলীর দিকে। তিনি যদি কোনো বুদ্ধি বার করতে পারেন। সিরাজুল দেখতে পাচ্ছে মনিরার মুখ। মনিরা যেন ভালো থাকে!

সৈন্যটি হাতের অস্ত্র নেড়ে ইঙ্গিত করলো কাছে আসার। রবার দিয়ে তৈরী তিনটি পুতুলের মতন ওরা এগিয়ে গেল।

আশ্চর্য ব্যাপার সৈনিকটির মুখের ভঙ্গি বেশ নরম। সে একবার চট করে পেছন দিক দেখে নিয়ে বললো, ইধার কেয়া কর রহা হ্যায়?

জিন্নাত আলী বললেন, স্যার, হামলোগ ইদারহি রহেতা হ্যায়।

সৈনিকটি জিজ্ঞেস করলো, মুসলমান হ্যায় ইয়া হিন্দু হ্যায়?

হায়দার বললো, মুসলমান হ্যায় সাব, মুসলমান, হামলোগকে সবহি ক বখ্না হ্যায়।

সৈনিকটি ইঙ্গিত করলো পাজামা খুলে ফেলতে। কেউ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলো না। সৈনিকটি ভালো করে তাকিয়ে দেখলোও না, মুখ ফিরিয়ে নিল। অস্ত্রটা নিচু করে সে বললো, যাও, জলদি জলদি ভাগ চলো, আভি আভি কাপ্টেন সাব চলা আয়গা। তব তো তুমলোগকো ভি নেহি ছোড়ে গা!

তারপর সে দুঃখিত ভাবে মুখ কুঁচকে বললো, কেয়া হো রহা হ্যায় ই দেশ মে!

পাজামার দড়ি না বেঁধেই দৌড়োলো ওরা তিনজন।

॥ ৪ ॥

কৃষ্ণনগরে বিমানবিহারীদের বাড়ির একটি অংশে হঠাৎ আগুন লেগে গেল এক রাত্রে। বিমানবিহারী দু'দিন আগেই সপরিবারে দেশের বাড়িতে এসেছেন। অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা চলেছিল, তিনি এলেই প্রতিবেশীরা অনেকেই দেখা করতে আসে, খাওয়া-দাওয়া হয়। রাত দশটার সময় খানিকটা ঝড় উঠে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। আগুন লাগার স্বাভাবিক কোনো কারণই নেই, কেউ লাগিয়েছে। গোয়াল ঘর আর হাঁসঘর থেকে রান্নাঘর অনেকটা দূর, কিন্তু তিন জায়গাতেই আগুন ধরেছে একসঙ্গে। সেই আগুন ছড়িয়ে গিয়েছিল বসতবাড়ির পেছন দিকে দোতলা পর্যন্ত।

শেষ রাত্রে হৈ চৈ, হুড়োহুড়ি, হাঁকাহাঁকি, পটোপাড়া থেকে অনেকে ছুটে এসেছিল সাহায্য করতে, পাছ-পুকুর থেকে ঘড়া ঘড়া জল এনে আগুন নেবাবার চেষ্টা চলতে লাগলো। এ সময় মনে হয়েছিল

গোটা বাড়িটাই বুঝি ভস্ম হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত বসতবাড়ির খুব বেশী ক্ষতি হয়নি, হাঁসগুলো সব মরে গেছে, একটা গরু দারুণ ভাবে ঝলসে গেছে। তার আর্ত চিৎকারে কান পাতা দায়। গরুটাকে বাঁচানো যাবে না, আবার মুমূর্ষু গরুটাকে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার কথাও কেউ চিন্তা করছে না। একজন ভেরেটিনরি ডাক্তারকে ডাকতে লোক গেলে, সে কখন আসবে তার ঠিক নেই।

বিমানবিহারীর এক জ্ঞাতি দাদা রাজচন্দ্র চুরুট টানতে টানতে বিজ্ঞভাবে বললেন, এ নির্ঘাৎ নকশালদের কাজ। তোমাদের আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, বিমান!

সদ্য ভোর হয়েছে, গোয়ালঘর রান্নাঘরের খড়ের চালে প্রচুর জল ঢালা হলেও এখনও সেখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে উঠছে ধোঁয়া। বিমানবিহারীর কাকার ছেলেরা প্রচুর খাটাখাটনি করে চলেছে, অলি আর বুলিও হাত লাগিয়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিমানবিহারী চশমার কাচ মুছলেন।

রাজচন্দ্র কবে তাঁকে নকশালদের সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন, তাঁর মনেই পড়লো না। এক ধরনের মানুষ থাকে যে কোনো ঘটনা ঘটলেই বলে, আমি তো আগেই বলছিলাম, রাজচন্দ্র সেই দলে।

বিমানবিহারী ভাবলেন, নকশাল ছেলেদের তাঁদের বাড়ির ওপর রাগ থাকবে কেন? তাঁরা তো জমিদার বা জোতদার নন। তাঁদের পরিবারের কুড়ি বাইশ বিঘে জমি আছ মাত্র। বিমানবিহারী কলকাতায় বইয়ের ব্যবসা করেন। কৃষ্ণনগরের বাড়িটি বিক্রি না, করে রেখে দিয়েছেন, এই তাঁর দোষ?

রাজচন্দ্রদাদা নিজে পুরনো কংগ্রেসী এবং তার দুই ছেলেও কংগ্রেসের পাণ্ডা। বিমানবিহারীর কাকার ছেলেরা সি পি এম পার্টির সদস্য। এ শহরের ইস্কুল-কলেজের ছাত্ররা নাকি দলে দলে নকশালপন্থী হয়ে গেছে। এখন কংগ্রেস-সি, পি, এম ও নকশাল ছেলেদের মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই চলছে নানান জেলায়। প্রতিদিনই কাগজে কয়েকটি তরুণপ্রাণ বিনষ্ট হবার সংবাদ থাকে।

বিমানবিহারীর পুত্র সন্তান নেই, দুটি মেয়ে পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত, কলেজ রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়নি। তাঁদের পরিবারটি রাজনৈতিক পরিবার নয়। তবে তাঁরা কাদের আক্রমণের লক্ষ্য?

বছরখানেক আগে বিমানবিহারী কঙ্কালের ছবি আঁকা একটি লাল কালিতে লেখা চিঠি পেয়েছিলেন। সেই চিঠিতে তাঁর কোনো অপরাধ নির্দেশ করা হয়নি। তাঁকে কোনো ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়াও হয়নি, তাঁকে যে খতমের তালিকায় রাখা হয়েছে, সেই কথাটিই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

চিঠিখানা দেখে বিমানবিহারী যে খুব ভয় পেয়েছিলেন তা নয়, বিভ্রান্তিবোধ করেছিলেন। তিনি আইন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশ করেন, মাঝারি ধরনের ব্যবসা, এতে কৃষক আর শ্রমিক নিপীড়নের কোন ব্যাপার নেই, তবু তাঁকে হত্যা করা হবে কেন?

চিঠিখানা তিনি পুলিশ কমিশনারকে দেখিয়েছিলেন।

পুলিশ কমিশনার তো হেসেই উঠলেন সে চিঠি দেখে। প্রথমে একটি লাল কলম নিয়ে, পরে সেটি বদলে একটি সবুজকালির কলম নিয়ে তিনি চার জায়গায় দাগ দিয়ে বললেন, এই দ্যাখো, বিমান, তিনটে বানান ভুল। এক জায়গায় কনস্ট্রাকশান ভুল। নকশালরা এ চিঠি লিখতে পারে না। আফটার অল, ভালো ভালো ছাত্ররা ঐ দলের ভিড়েছে, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা আছে, যতই মাথা বিগড়োক, তারা লেখাপড়া জানে। তারা এরকম বাজে চিঠি লিখবে না। কতকগুলো মস্তান এখন নকশালদের নাম করে যা তা করে বেড়াচ্ছে। তুমি এ চিঠিটা ফেলে দিতে পারো; আর তুমি যদি চাও, পুলিশ প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করে দিতে পারি তোমার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে সব সময় একজন সেপাই ঘুরবে, এ ব্যাপারে বিমানবিহারীর একেবারে মনঃপূত হয়নি।

কমিশনার আরও বললেন, দেখো, এরপর বোধ হয় তোমার কাছে দু'পাঁচ হাজার টাকা চাদার জুলুম করতে আসবে। আমাদের কাছে খবর আছে, এরকম এক্সটরশান চলছে। অনেকে ভয় পেয়ে দিয়ে দেয়। এই মুভমেন্টের আয়ু আর বেশি দিন নেই, চায়না ব্যাক আউট করেছে...

বিমানবিহারী জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা রুনু, ছেলেগুলো তো একটা বড় আদর্শ নিয়েই মেরে ফেলা হচ্ছে, এটা কি ঠিক? এটা তোমরা আটকাতে পারো না?

—খুন করলে যে শাস্তি পেতে হয়, তা তো একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। এরা যে রাস্তায় ঘাটে যাকে-তাকে খুন করছে, চায়না রাশিয়াতেও তো এরকম ইনডিসক্রিমিনেট কিলিং দিয়ে রেভোল্যুশন শুরু হয়নি। আমরাও তো কিছু পড়াশুনো করেছি, নাকি?

ঘরে অন্য লোক ঢুকে পড়তে আর বেশী কথা হয়নি। বিমানবিহারী উঠে পড়েছিলেন। কমিশনার তাকে আশ্বস্ত করার জন্য আবার বলেছিলেন, তুমি চিন্তা করো না। এইসব আজে বাজে চিঠি পেয়ে কয়েকজনের হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে শুনেছি, ইচ্ছে করলে কিছুদিন অন্য জায়গায় বেড়িয়ে এসো...এদের ব্যাপারটা শিগগিরই শেষ হয়ে যাচ্ছে...তোমার সেই বন্ধুর ছেলে ভালো আছে তো?

এর দু'তিন দিন বাদেই কুমোরটুলীতে একজন হাইকোর্টের বিচারক খুন হলেন দিনের বেলায়, প্রকাশ্য রাস্তায়।

তখন বিমানবিহারী ভাবলেন, তিনি যে আইনের বই ছাপেন, সেটাই কি তবে দোষের? এদেশে এখনও ব্রিটিশ রচিত আইনই মোটামুটি চলে, তার ওপর ঐ বিপ্লবী ছেলেদের রাগ আছে?

পুলিশ খুনের পর, বিচারক, অধ্যাপক, ভাইস চ্যান্সেলর খুন শুরু হয়ে গেল। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় গিয়ে বিমানবিহারী শুনলেন যে টালায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও নাকি পুলিশ পাহারা বসেছে, তারাশঙ্করের নামেও ঐ রকম লাল কালিতে লেখা জঘন্য ভাষায় চিঠি এসেছে।

বিমানবিহারী কল্যাণীর কাছে ঐ লাল চিঠির কথা গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুলিশ কমিশনারের স্ত্রীই তাকে একদিন ফোন করে কথায় কথায় জানিয়ে দেন। কল্যাণী দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন, বিমানবিহারী তাঁকে কিছুতেই শান্ত করতে পারলেন না, সপরিবারে তাঁকে চলে যেতে হলো বেনারস।

কুমোরটুলীর ঐ বিচারক খুন হবার পর বিমানবিহারী তাঁর বন্ধু প্রতাপ সম্পর্কেও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রতাপ জেদী মানুষ, কারুর সঙ্গে নরম সরমভাবে কথা বলা তাঁর ধাতে নেই। এখন যা দিনকাল, কালীপুজোর চাঁদা দিতে অস্বীকার করলেও পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়।

বেনারসে বেশ একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। বিমানবিহারী প্রতাপকেও তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে বেনারস যাবার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন, প্রতাপ রাজি হননি। বিমানবিহারী মমতাকেও গিয়ে ধরেছিলেন, মমতা ম্লান হেসে বলেছিলেন, আপনার বন্ধু একবার না বললে কি তাকে দিয়ে হ্যাঁ করানো যায়, আপনি জানেন না?

বিমানবিহারী সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ। প্রতাপের অসম্মতির কারণটা তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। দুই পরিবারের আর্থিক অবস্থার অনেক তফাত! বেনারসে এক সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে গেলে বিমানবিহারী বেশীরভাগ খরচপত্র চালাবেন, সেটাই মেনে নিতে পারবেন না প্রতাপ। তাঁর মালখানগরের বংশগৌরব তাতে নষ্ট হবে! বিপদের সময় মানুষ কি বন্ধুর কাছে আশ্রয় নেয় না? তা হলে আর বন্ধুত্ব কী? প্রতাপের সব কিছুই আলাদা। বিমানবিহারী কিছু টাকা প্রতাপকে ধার হিসাবে দিতে চেয়েছিলেন, প্রতাপ বলেছিলেন, তোমার কাছে আমার ঋণের পাহাড় জমে গেছে, আর বাড়াতে চাই না!

বেনারসে দু'মাস নিরুপদ্রবেই কেটেছিল। কল্যাণী কিছুদিন হাঁপানীতে ভুগছিলেন, তাঁর বেশ স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো। স্থানীয় বাঙালী ক্লাবের দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে গান গেয়ে বেশ নাম হলো তাঁদের ছোট মেয়ে বুলির। অলি গান শেখা ছেড়ে দিলেও বুলির খুব গানের দিকে আগ্রহ, সে এর মধ্যেই রেডিওর অডিশনে পাশ করেছে।

আগ্রায় বেড়াতে গিয়ে দেখা হলো জাস্টিস স্বরূপ মিত্রের সঙ্গে। তিনিও তিন মাস ধরে আগ্রায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। এ যেন সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার অবস্থা, বাধ্য হয়ে কলকাতা ছেড়ে বাইরে থাকা! এরকম কতজন যে ঐ রকম লালকালির চিঠি পেয়েছে কে জানে!

স্বরূপ মিত্রের ছেলে প্রবীর থাকে পশ্চিম জার্মানিতে, সে দেখা করতে এসেছে বাবা-মার সঙ্গে। সে তাদের পশ্চিম জার্মানিতে নিয়ে যেতে চায়। প্রবীর খুব চমৎকার ছেলে। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মিষ্টি ব্যবহার। প্রবীর এখনো বিয়ে করেনি শুনেই কল্যাণী দারুণ উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রবীরের সঙ্গে অলির সম্বন্ধ করা গেলে একেবারে রাজযোটক হতো!

জ্যোৎস্নারাতে সবাই মিলে তাজমহল বেড়াতে যাওয়া হলো, প্রবীরের সঙ্গে অনেক গল্প করলো

অলি, কিন্তু তারপর আর কিছুই না। বিয়ের প্রস্তাবে সে কান দিতেই চায় না একেবারে। এখনকার তরুণ-তরুণীরা বেশ সাবলীল ভাবে মেলামেশা করে চায়ের দোকানে গল্প করে, এক সঙ্গে বেড়াতে যায়, তবু যে তাদের কথায় কথায় প্রেম হয় না, এটাই বুঝতে পারে না কল্যাণী। তাঁদের কালে বয়ঃসন্ধির পর থেকেই মেয়েদের বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতো। প্রায় প্রতিদিনই এই প্রসঙ্গে শুনতে হতো মাসি-পিসি-আত্মীয়স্বজনদের কথা, বিয়েটাই যেন ছিল মেয়েদের জীবনের প্রধান ঘটনা। আর এখন মেয়েরা বিয়ের খুব ভালো সম্বন্ধও উড়িয়ে দেয় এক কথায়।

বিমানবিহারী অলির বিয়ের ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখান না। মেয়ে যদি বিয়ে একেবারেই না করে, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই, মেয়ে তাঁর ব্যবসা দেখবে। অলি এর মধ্যেই তার প্রকাশনার অনেকটা ভার নিয়েছে।

কলকাতায় ফিরে আসার পর বিমানবিহারী খবর পেলেন যে প্রতাপের ওপর একবার আক্রমণ হয়ে গেছে এর মধ্যে। তাঁরা বেনারস যাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই। প্রতাপ চিঠিতে কিছু জানাননি।

শিয়ালদার কাছেই, প্রতাপ আদালত থেকে বেরুবার পর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, সরকার থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে, তিনজন হাকিম এক গাড়িতে যাতায়াত করেন, আর দু'জন ছিলেন প্রতাপের খানিকটা পেছনে। একটি ছেলে হঠাৎ যেন তাঁর সামনে মাটি ফুঁড়ে উঠে একটা ছুরি তুললো। এক সময় ফুটবল খেলতেন প্রতাপ, এখনও তাঁর স্নায়ু শিথিল হয়নি, তিনি হাতের গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটি সঙ্গে সঙ্গেই তুলে ধরলেন বুকের কাছে, ফলে ছুরিটা তাঁর ডান বাহুতে খানিকটা ঘেঁষে গেল। পরের মুহূর্তেই প্রতাপ সেই ব্যাগটি দিয়ে ছেলেটির মুখে একটা আঘাত করলেন। তারপরই হৈ চৈ উঠে গেল, ছেলেটির আরও দু'জন সঙ্গী ছিল, তারা একটা বোমা ফাটালো, সেটা অবশ্য পালাবার পথ পরিষ্কার করবার জন্য।

ছেলে তিনটিকে ধরা গেল না। কেউ অবশ্য তাদের ধরার জন্য পিছু ধাওয়াও করেনি।

প্রতাপের জামা রক্তে ভিজে গেলেও প্রতাপের আঘাত তেমন গুরুতর না। অন্য হাকিমদের অনুরোধেও তিনি হাসপাতালে যেতে রাজি হননি, সোজা বাড়ি চলে এসেছিলেন, নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়েছিলেন ব্যাণ্ডেজ।

বিমানবিহারীর সঙ্গে দেখা হবার পর প্রতাপ বলেছিলেন, আরে না না, ওরা আমাকে মারতে আসেনি। আমাকে নিশ্চয়ই অন্য কারুর বদলে ভুল করে...। আমাকেই টারগেট করলে কি ওরা এত সহজে ছেড়ে দিত? ওরা তিনজন ছিল, সঙ্গে বোমা ছিল...। আমাকে ওরা মারবে কেন বলো! আমি তো ক্রিমিন্যাল কেস বা পলিটিক্যাল কেস করি না। কোনো নকশাল ছেলেকে শাস্তিও দিইনি..

কী জন্য যে কে কাকে মারছে সেটাই তো বোঝার উপায় নেই, যাদবপুরের ভাইস চ্যান্সেলর যেদিন রিটায়ার করলেন, সেদিনই বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে খুন করার কী যুক্তি থাকতে পারে? সব খুনই কি নকশাল ছেলেরা করছে? এখন তো গুন্ডার কারবারে নেমে পড়েছে অনেকেই। এমনকি কারুর ওপর ব্যক্তিগত রাগ থাকলেও তাকে খুন করে সেটা রাজনৈতিক হত্যা নামে চালিয়ে দেওয়া যায়। এই সব খুন নিয়ে পুলিশও মাথা ঘামায় না, তারা নকশালদের মারতে ব্যস্ত।

বাবলুর বাবা হিসেবে অন্য পার্টির ছেলেদেরও রাগ থাকতে পারে প্রতাপের ওপর, তারই হয়তো প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে কথা বিমানবিহারী বললেন না! ছেলের ব্যাপারে প্রতাপ খুবই স্পর্শকাতর। প্রতাপের এখনও দৃঢ় ধারণা শিলিগুড়িতে বাবলু নিজের হাতে কারুকে খুন করেনি, তার কোনো বন্ধু-টন্ধুর দায়িত্ব সে ইচ্ছে করে নিজের কাঁধে নিয়েছে।

প্রতাপকে সাবধানে চলাফেরা করার জন্য উপদেশ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। বিমানবিহারী নিজেই বা কী করে সাবধান হবেন?

চোর-ডাকাতদের সম্পর্কে সাবধান হওয়া যায়, যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হলে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করা যায়, কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা খুনী হয়ে উঠলে তাদের সম্পর্কে আর কী করে সতর্ক হওয়া যাবে? এরা তো প্রায় নিজেদের বাড়ির ছেলেরই মতন। নানান কাজে, এই বয়েসী ছেলেরা বাড়িতে বা অফিসে অনবরত আসে, তাদের যে কেউ হঠাৎ একটা ছুরি বা রিভলভার বার করতে পারে। এই রকমই তো ঘটছে। সন্ধের পর কোনো কোনো রাস্তায় যাওয়াই নাকি অপরাধ! কাগজে এরকম খবর বেরোয় যে মফস্বলের কোনো

ছেলে হয়তো কলকাতায় এসে কোনো আত্মীয়দের বাড়ির ঠিকানা খুঁজছে, তাকে স্পাই সন্দেহ করে খতম করে দেওয়া হলো! পুলিশ থেকে তো ম্যাপ এঁকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়নি যে সন্ধের পর কলকাতার কোন্ কোন্ রাস্তায় ঢোকা নিষিদ্ধ!

বিমানবিহারী গাড়িতে চলাফেরা করেন, তাঁর তবু খানিকটা নিরাপত্তা আছে। বাড়ির দরজায় একজন দারোয়ান বসিয়েছেন। কিন্তু প্রতাপ যেন বেপরোয়া। আদালতে যাওয়া-আসার সময়টুকু শুধু তিনি গাড়ি পান, কিন্তু অন্য সময় বাড়িতে বসে থাকার মানুষ তিনি নন। প্রতিদিন পায়ে হেঁটে বাজারে যান। ছুটিছাটার দিনে বাসে-ট্রামে ঘোরেন। একবার যার ওপর আক্রমণ করে বিফল হয়েছে, পরের বার তাকে পুরোপুরি শেষ করে দেবার জন্য যে আততায়ীরা সুযোগ খুঁজবে, সে সম্পর্কে প্রতাপের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। যা হয় হোক, এই রকমই যেন তাঁর মনোভাব।

এবারেও কৃষ্ণনগরে আসার আগে, বিমানবিহারী প্রতাপকে সঙ্গে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মমতার সামান্য শরীর খারাপ, এই অজুহাতে প্রতাপ এড়িয়ে গেছেন। মমতা আলসারে কষ্ট পান, কৃষ্ণনগরের জল ভালো, এখানে কয়েকদিন থাকলে মমতার উপকারই হতো।

কলকাতার রাস্তায় এখন সব সময় ভয়ে ভয়ে চলতে হয়। সারা ভারতেই এখন কলকাতা সম্পর্কে বিষম বদনাম। অফিসের কাজে বা ব্যবসার কাজেও বম্বে ও দিল্লি থেকে কেউ এখন কলকাতায় আসতে চায় না। বিদেশী টুরিস্টরা তো কলকাতার নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে। কৃষ্ণনগরে এসে বিমানবিহারী অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন। এটা তাঁর জন্মস্থান, নিজের জায়গা, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে তাঁদের পূর্ব পুরুষের ইতিহাস আছে এই শহরে। তাঁদের এক পূর্ব পুরুষের সঙ্গে কবি রামপ্রসাদের পরিচয় ছিল। রামপ্রসাদের নিজের হাতে লেখা দু'খানি গানের পাণ্ডুলিপি তাঁদের পারিবারিক সম্পদ।

বিমানবিহারী এই শহরের অনেক মানুষকে চেনেন, বছরে তিন চারবার এখানে নিয়মিত আসেন, তাঁর মায়ের নামে এখানে একটি স্থানীয় স্কুলের একাংশে পাকা বাড়ি তুলে দিয়েছেন। জ্ঞাতিদের সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই, তাঁর কাকাদের সঙ্গে সম্পত্তি আপোসে ভাগ করা হয়ে গেছে। কাকা এখন জীবিত নেই কিন্তু তাঁর ছেলেরা তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এখানে কারা এসে তাঁর বাড়িতে আগুন লাগালো? আগুনে যত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য নয়, তাঁর জন্মস্থানে কেউ তাঁকে অবাঞ্ছিত মনে করে, এই ধাক্কাটাই বেশী করে বিমানবিহারীর মনে লেগেছে!

গো-বদ্যি আসবার আগেই থেমে গেল আহত গরুটার আর্তনাদ। যারা আগুন লাগিয়েছে তারা গোয়ালঘর আর হাঁসঘরের দরজা খুলে দিতে পারতো না? তাহলে অবোলা প্রাণীগুলোকে মারতে হতো না এমন ভাবে। মানুষের ওপরেই তো মানুষের রাগ থাকে। ওদের ওপরে তো নয়?

একটা জিনিসও খোয়া যায়নি, শুধু তিনটে গরু চুরি করে নিলেও অনেক টাকা পেত। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, চোর-ডাকাতদের কাজ নয়, যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের উদ্দেশ্য শুধু ধ্বংস করা।

অলি দু'কাপ চা নিয়ে এসে বললো, বাবা তোমরা ভেতরে যাও, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে?

রাজচন্দ্র বললেন, ইস অলি-মা, তোমার মুখখানা যে কালি বন্ন হয়ে গেছে। তুমি আর আঁচের কাছে যেও না!

অলি আঁচল দিয়ে মুখ মুছে দুঃখী গলায় বললো, বাবা, তিনটে হাঁস মরে গেছে, আর দুটোও বেশীক্ষণ বাঁচবে না। ওগুলো কী হবে?

বিমানবিহারীর বদলে রাজচন্দ্রই বললেন, ফেলে দিতে হবে। মরা হাঁস খেতে নেই। কিংবা দ্যাখো যদি ঐ যারা বাইরে থেকে এসেছে তারা কেউ নেয়!

অলি বললো, আমি খাবার কথা বলিনি। যে-দুটো এখনো বেঁচে আছে, ওদের গায়ে কী বার্নল লাগানো যায়?

বিমানবিহারী কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি বাড়ির বার মহলের দিকে চলে গেলেন। রাজচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু রাজচন্দ্র কিছুতে তাঁর সঙ্গ ছাড়বেন না। কথা বলা তাঁর নেশা, শেষ রাত্রে তিনি ঘুম ভেঙে উঠে এসেছেন, এখন বিমানবিহারীর ওপর প্রচুর উপদেশ বর্ষিণ করে তার ক্ষতিপূরণ করবেন।

বিমানবিহারীর সঙ্গে যেতে যেতে রাজচন্দ্র নিচুগলায় বললেন, তোমার ঐ খুড়তুতো ভাইগুলো...মুখে খুব মিষ্টি ভাব থাকে, ওদের বিশ্বাস করো না, এই আমি বলে দিলাম, কখন যে কুলোপানা চক্কোর তুলবে তার ঠিক নেই।

বিমানবিহারী বললেন, রাজুদা, ছোটকাকার ছেলেদের সঙ্গে আমার তো আর কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই। তবু দেখুন ওরা নিজেরাই গায়ে পড়ে আমার উপকার করতে এসেছে।

—ওসব লোক-দেখানো ব্যাপার, বুঝলে? ওরাই যে আগুন লাগায়নি, তার কোনো গ্যারান্টি আছে? এটাই ওদের কায়দা বুঝলে, বাঁ হাত বাড়িয়ে তোমাকে সাহায্য করবে, আর ডান হাতে তোমাকে ছুরি মারবে!

রাজচন্দ্র একটু আগেই নকশালদের দায়ী করেছিলেন, এখন আবার বিমানবিহারীর খুড়তুতো ভাইদের নামে দোষ চাপাচ্ছেন। বয়েস হয়েছে, কখন কী বলেন মনে রাখতে পারেন না।

এটাও বিমানবিহারী জানেন যে, কিছু কিছু লোকের ব্যাধি থাকে সব সময় অপরের নামে নিন্দে করা। এই যে রাজচন্দ্র তাঁর খুড়তুতো ভাইদের নামে তাঁকে বিষিয়ে দিতে চাইছেন, এতে ওঁর নিজের কোনো লাভ নেই। শুধু শুধু ঝগড়া বাঁধিয়েই আনন্দ।

বিমানবিহারী রাজচন্দ্রের কোনো কথায় গুরুত্ব দেন না, কিন্তু বয়েসে বড় বলে ওঁর মুখের ওপর কোনোও কড়া কথা বলতে পারেন না।

রাজচন্দ্রের বয়েস সত্তরের ওপর, শরীরে এখনও বেশ সামর্থ্য আছে। সারা জীবন জীবিকার্জনের জন্য কোনো কাজ করেননি, পারিবারিক সম্পত্তিতেই চলে গেছে। কলকাতা থেকে তিনি দামী চুরুট আনান, আরও তাঁর কিছু কিছু শখের জিনিস কলকাতা থেকে আসে। কিন্তু তিনি নিজে কলকাতায় যেতে চান না। কলকাতার জল-হাওয়া তাঁর সহ্য হয় না।

—অলি মা'র বিয়ে দাও এবার! দুটো পাস তো দিয়েছে। এরপর মেয়ে অরক্ষণীয়া হয়ে যাবে। আমাদের এখানে একটিপ সুপাত্র আছে, সম্বন্ধ করবো নাকি? ছেলেটি ম্যাজিস্ট্রেট, ভালো বংশ।

—রাজুদা, অলির বিয়ের ব্যাপারটা আপনি অলিকেই জিজ্ঞেস করবেন। তার অমতে তো কিছু হবে না।

বিমানবিহারীর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি ফুটে উঠেছিল, তাই রাজচন্দ্র চুপ করে গেলেন। বাড়িতে আগুন লেগেছে, সেই চিন্তায় বিমানবিহারী নিমগ্ন, এখন কি মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তা করার সময়?

একটু পরে রাজচন্দ্র আবার সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, বিমান, তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি নাকি একটা খুনে নকশাল ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছো?

এবার বমানবিহারী দারুণ চমকে উঠলেন। যে-ব্যাপারটি অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল, তা কৃষ্ণনগরেও পৌঁছে গেল কী করে? বাতাসে কী খবর ছড়ায়? মাত্র তিন-চার জন ছাড়া বাবলুর ঘটনা আর কারুরই জানবার কথা নয়। অথচ যে রাজচন্দ্র কখনো কলকাতায় যান না, তাঁর কানেও এ খবর এতদিন পরে পৌঁছে গেছে!

রাজচন্দ্র আবার বললেন, কে যে কার ওপর এখন বদলা নিচ্ছে তার ঠিক নেই, বুঝলে? নকশালদের মধ্যেও দল ভাগ হয়ে যাচ্ছে শুনছি। তুমি ঐ যে একজনকে দেশের বাইরে পাঠিয়েছো, সেজন্য তোমার ওপর অনেকে রেগে আছে। সাবধান, বিমান, সাবধানে থেকো!

॥ ৫ ॥

কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর কতখানিই বা দূর! ছেলেবেলায় অলিরা অনেকবার বহরমপুর হয়ে মুর্শিদাবাদ, খোসবাগ দেখতে গেছে, একবার সেই মেম কাকিমার সঙ্গে হাজারদুয়ারী দেখতে গিয়ে ছবি তোলা হয়েছিল, ফ্রকপরা অলির সেই ছবি এখনো আছে অ্যালবামে। তখন অবশ্য অভিভাবক শ্রেণীর কেউ না কেউ সঙ্গে থাকতেন, এখন অলি অনায়াসেই একলা যেতে পারে, লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চাপলে দু'আড়াই ঘণ্টার পথ।

কিন্তু বাড়িতে আগুন লাগার পর বিমানবিহারী মেয়েদের বাইরে বেরুতে বারণ করে দিয়েছেন। তাঁর মন ভেঙে গেছে। তিনি তক্ষুনি কলকাতায় ফিরতে পারলে খুশী হতেন, কিন্তু বসতবাড়ির পেছন দিকের পোড়া অংশগুলো কিছু মেরামত না করলে একেবারে ভেঙে পড়বে। তিনি মিস্ত্রি খাটাচ্ছেন।

প্রত্যেকবার অলি-বুলি ঘূর্ণীতে নানারকম মাটির পুতুল কিনতে যায়, পুতুলের শখ বুলিরই বেশী, বাড়ি থেকে একটা রিকশা নিয়ে যাওয়া আর সেই রিকশাতেই ফিরে আসা, কিন্তু বিমানবিহারী বললেন এবার পুতুল কিনতে যেতে হবে না। একই রকম তো পুতুল, পরে অনেক পাওয়া যাবে।

ঘূর্ণীতেই যাওয়া হচ্ছে না, তা হলে বহরমপুর যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। অলি একবার সে প্রসঙ্গ তুলতেই বিমানবিহারী উড়িয়ে দিলেন।

অথচ বহরমপুরে শুক্রবার বিকেলবেলা অলিকে একবার যেতেই হবে।

বাবা কোনো কাজেই প্রায় বাধা দেন না, সুতরাং বাবা কোনো ব্যাপারে একবার না বললে আর তর্ক করা যায় না। কৃষ্ণনগর থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা ইস্কুল বাড়িতে বোমা মারামারি হয়েছে বুধবার দুপুরে, সেই খবর পাবার পর বাবা-মা আরও সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। কিন্তু এই সব বোমা, খুন, আগুন লাগানোর ঘটনা সাধারণ মানুষের গা-সহা হয়ে গেছে। জীবনযাত্রা তো থেমে নেই। ট্রেনে-বাসে একই রকম ভিড়। যে-রাস্তায় বোমাবাজি হয়, সেখানে দোকান পাটগুলো দ্রুত ঝাঁপ ফেলে দেয়। ঘণ্টা দু'এক বাদেই আবার খুলে যায় সবকিছু। যে-পাড়ায় খুন হয়, পরের দিন সে পাড়ায় মানুষজনকে দেখলে বোঝাই যায় না যে সেখানে কিছু ঘটনা ঘটেছে।

বহরমপুরে কল্যাণীর ছোট ভাই থাকেন, তিনি ডাক্তার, সদ্য একটি নার্সিং হোম খুলেছেন বাস স্ট্যান্ডের কাছেই। অলি-বুলিদের সেই শান্তিমামা ও রীতা মামীমা গাড়ি নিয়ে এলেন কৃষ্ণনগরে, এখানকার রোমান ক্যাথলিক চার্চের ফাদার শান্তিমামার পেসেন্ট, সেই ফাদার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলেই আসতে হয়েছে শান্তিমামাকে, সেই সঙ্গে তিনি দিদি জামাইবাবুর সঙ্গেও দেখা করে যাবেন।

বৃহস্পতিবার দিন এই শান্তিমামা ও রীতা মামীমা যেন দৈব প্রেরিত। অলি সাধারণত কারুর কাছে কিছু চায় না, কিন্তু রীতা মামীমার কাছে সে বাচ্চা মেয়ের মতন আবদার ধরলো, আমাকে তোমাদের সঙ্গে বহরমপুরে নিয়ে চলো, বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলো।

গাড়িতেই যাওয়া, তবু বিমানবিহারী খুব পছন্দ করলেন না। অলি ফিরবে কার সঙ্গে? শান্তিমামা বললেন, বহরমপুর থেকে তাঁর চেনা কতলোক প্রত্যেকদিন কলকাতায় যায়, একজন কারুর সঙ্গে অলিকে ট্রেনে তুলে দেবেন সকালবেলা, কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে রিকশা ধরে অলি বাড়ি চলো আসবে। দিনের বেলা ভয়ের কী আছে? ছেলে-ছোকরারা মারামারি খুনোখুনি করছে বটে, কিন্তু মেয়েদের গায়ে কোথাও হাত দিয়েছে, এমন তো শোনা যায়নি।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হতেই বিমানবিহারী তাঁর শ্যালককে তাড়া দিলেন, এবার তোমরা বেরিয়ে পড়ো, গাড়িতে কম সময় তো লাগবে না! সন্ধে হয়ে গেলে...রাস্তায় যদি কোথাও গাড়ি খারাপ হয়ে যায়?

বিমানবিহারী আগে এরকম ভীতু ছিলেন না। বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনার পরেই খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

গাড়িতে বেশ গল্প করতে আসা হচ্ছিল। পলাশীর কাছে উঠলো কালবৈশাখীর ঝড়। ফাঁকা রাস্তার দু'পাশে মাঠ, বিকেলবেলাতেই এমন মিশমিশে কালো আকাশ অলি কখনো দেখেনি। সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে ঠিক যেন সমুদ্রে জাহাজ যাওয়ার মতন। হাওয়ার দাপটে মনে হচ্ছে যেন গাড়িটা দুলে দুলে উঠছে, যে কোনো সময়ে উল্টে যাবে। সমস্ত কাচ তুলে গাড়িটা এক জায়গায় থামিয়ে রাখা হলো। বড়গাছপালা থেকে অনেক দূরে। একটু আগেই ওরা রাস্তায় ওপর একটা শিরীষ গাছের ডাল ভেঙে পড়তে দেখেছে।

শান্তিমামা বেশ মজার মানুষ। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবার বদলে তিনি স্টিয়ারিং হুইল চাপড়ে চাপড়ে গান ধরলেন, ঝড় নেমে আয়, ওরে আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে ডালে...

রীতা মামীমা চোখ গোল গোল করে বললেন, এখন কী হবে? এই ঝড় যদি সহজে না থামে?

শান্তিমামা বললেন, তাতেই বা কী এমন হবে? আমরা সারা রাত এখানে থেকে যাবো!

রীতা মামীমা বললেন, যদি গাড়িটা শুদ্ধু উড়িয়ে নিয়ে যায়?

শান্তিমামা হেসে উঠে বললেন, সেটা হবে একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড! আকাশ পথে অ্যাম্বাসেডর

গাড়ি! বিড়লার অপূর্ব কৃতিত্ব! একই সঙ্গে গাড়ি ও এরোপ্লেন! তোমার মাথাও খেলে বটে, ঝড়ে কোনদিন গাড়ি উড়ে গেছে এমন শুনেছো?

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন পড়ছে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। গাড়ির ছাদে যেন অনেকগুলো কাক একসঙ্গে দৌড়চ্ছে। রাস্তায় আর একটাও গাড়ি নেই।

আরও একটা গান গাইতে গাইতে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গিয়ে শান্তিমামা বললেন, অলি, তোদের বাড়িতে আগুনটা কে লাগালো বল তো? আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা পলিটিক্যাল নয়। কৃষ্ণনগরে কোনো ছেলের সঙ্গে তোর প্রেম-ট্রেমের ব্যাপারে কোনো ঝগড়া হয়নি তো?

অলির বদলে রীতা মামীমাই বললেন, যাঃ, কৃষ্ণনগরে আবার কার সঙ্গে ওর প্রেম হতে যাবে?

শান্তিমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, আবার মানে? অলির কী একটা প্রেম অল রেডি হয়ে গেছে নাকি?

—জামাইবাবুর এক বন্ধু, সাব জজ, তাঁর ছেলে অতীনের সঙ্গে অলি তোর ভাব ছিল না? সেই ছেলেটি এখন কোথায় রে, অলি?

—অলি এবার মৃদু গলায় বললো, সে এখন অ্যামেরিকাতে!

—কী করতে গেছে রে? চাকরি করছে, না পড়াশুনো?

—কেমিস্ট্রিতে পি-এইচ ডি করছে।

শান্তিমামা বললেন, কেমিস্ট্রিতে পি-এইচ ডি করার জন্য আমেরিকায় যাবার দরকারটা কী ছিল? সে যাকগে, অলির আর একটা বন্ধু থাকলেও কৃষ্ণনগরের কোনো ছেলে ওর প্রেমে পড়তে পারে না? একবার আমার নার্সিং হোমে একটা কেস এসেছিল, বুঝলি অলি বহরমপুরের একটা ছেলে এক উকিলের মেয়েকে ভালোবাসতো, ছেলেটা একটু মাস্তান টাইপের, উকিলবাবু তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তো রাজি নয়, মেয়েকে মিশতেও বারণ করে দিলেন, তারপর সেই ছেলেটা একদিন উকিলবাবুকে মিস করে তার প্রেমিকার মামার মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে মারলো! সেই মামা ভদ্রলোকের একটা চোখ তো বাঁচানোই গেল না। বুঝে দ্যাখ ব্যাপারটা অলি, তোর প্রেমে কেউ ব্যর্থ হয়ে আমার পেটে বসিয়ে দিল ছুরি! দিনকাল হয়েছে এই রকম!

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলো শান্তিডাক্তার।

তারপর বললো, ঝড় অনেকটা কমেছে, নাও লেট্স স্টার্ট এগেইন!

খুব তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে বলে রাস্তার সামনের দিকটা প্রায় কিছুই দেখা যায় না। গাড়ি চলছে খুব আস্তে। পেছনের সীটে বসেছে অলি আর রীতা মামীমা। গাড়ির মালিক নিজেগাড়ি চালালো বাড়ির কোনো লোককে সামনের সীটে বসতে হয়, এটাই নিয়ম, কিন্তু সামনের সীটে রাখা আছে একগাদা পেঁয়াজ কলি আর গোটা তিনেক লাউ, গাড়ির পেছনেও ভরে দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো ঝুনো নারকোল। এসব অলিদের কৃষ্ণনগরের বাড়ির বাগানের ফসল।

রীতা মামীমার ছেলেমেয়ে কিছু হয়নি, তাঁর চেহারা অল্পবয়েসী তন্বীর মতন। শান্তিমামা মোটাসোটা ভারিক্কী ধরনের মানুষ, যদিও স্বভাবটা অনেকটা ছেলেমানুষ ধরনের। অলি তাকে কক্ষনো গম্ভীর সুরে কথা বলতে শোনেনি।

রীতা মামীমা এক সময় বললেন, অলি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছো, খুব ভালো লাগছে, কিন্তু তুমি হঠাৎ বহরমপুরে আসার জন্য জেদ ধরলে কেন? এখানে কি তোমার বিশেষ কোনো কাজ আছে? কারুর সঙ্গে দেখা করতে হবে?

শান্তিমামা বললেন, এই রে, তুমি ওকে একটা পার্সোনাল ব্যাপার জিজ্ঞেস করে ফেললে? মেয়েটাকে তো আমি বাচ্চা বয়েস থেকে দেখছি, মিথ্যে কথা বলতে গেলেই ওর চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। তোতলাতে শুরু করে। খুব প্রাইভেট কিছু হলে তোকে বলতে হবে না রে, অলি!

অলি বললো, ছোটমামা, তোমাকে আর মামীমাকে আমি বলবো ঠিকই করেছিলুম। কিন্তু তোমার প্লীজ বাবাকে কিছু জানিও না। বহরমপুর জেলে একজনের সঙ্গে আমাকে একটু দেখা করতে হবে!

—বহরমপুরের ছেলে...তার মানে পলিটিক্যাল প্রিজনার..কে?

—আমাদের একজন বন্ধু।

—আমাদের বন্ধু মানে? আমরা কি তাকে চিনি?

—না, তোমরা ঠিক চেনো না।

রীতা মামীমা বললেন, সেই অতীনের কোনো বন্ধু। তার মানে নকশাল। অতীন তো কী একটা বড় রকম চার্জে পড়েই আমেরিকায় পালিয়ে গেছে না?

অলি চমকে রীতা মামীমার দিকে তাকালো। আজকাল আর কারুকে কিছু বলার দরকার হয় না। সবাই সব কিছু জেনে যায়। শান্তিমামা রীতা মামীমারা মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন, হয়তো বাবলুদাকে দু'একবার দেখেছেন তাদের বাড়িতে, যদিও বাবলুদার বিষয়ে ওদের সঙ্গে অলির কোনোদিন কোনো কথাই হয়নি!

শান্তিমামা বললেন, নকশাল প্রিজনারের সঙ্গে দেখা করবি, সে তো আগে থেকে পারমিশান করাতে হয়। এমনি এমনি তো দেখা করতে দেবে না!

অলি বললো, আমার পারমিশানের চিঠি আছে। শুক্কুরবার বিকেল সাড়ে চারটে...তোমরা যদি হঠাৎ চলেনা আসতে কৃষ্ণনগরে, তা হলে বাবাকে না বলে আমাকে একই আসতে হতো।

–অলি, তুই বুঝি পার্টি করিস? তোর মতন এরকম নরম-সরম মেয়েও যে ভেতরে ভেতরে–

–না। আমি পার্টি করি না। বিশ্বাস করো। একজন আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে। গাড়ির ড্যাস বোর্ড থেকে একটা রামের পাঁইট বার করে গলায় ঢালবার আগে শান্তিমামা বললেন, আমি একটু খাচ্ছি, অলি তুই কিছু মনে করবি না তো?

রীতা মামীমা তাড়না দিয়ে বললেন, এই, তুমি ড্রিংক করছো যে এক্ষুনি? নার্সিং হোমে যেতে হবে না?

–আজ পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত নটা বেজে যাবে। আজ আর নার্সিং হোমে যাওয়া যাবে না। শুভংকরের ডিউটি আছে, ও ম্যানেজ করবে।

গলায় খানিকটা রাম ঢেলে শান্তিমামা বললেন, তোকে একটা ঘটনা বলি, অলি! রীতা, সেই যে, সেই ডিসেম্বরের শনিবার রাত্তিরের ব্যাপারটা!

রীতা মামীমা বললেন, ওঃ, ভাবলেও এখনও আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়!

–ওরা কিন্তু ব্যবহার খারাপ করেনি, যাই বলো! শোন, অলি, সেটা এই তো মাস তিনেক আগের ঘটনা। ডিসেম্বরের শেষ শনিবার। ডি এম-এর বাংলোয় আমি তাশ খেলতে গেসলুম। বেশ শীত পড়েছিল সে রাতে। তাশ খেলা ভাঙলো যখন, তখন রাত পৌনে বারোটা। রীতাকে বলা ছিল, ফিরতে দেরি হবে। তাশ-টাশ খেলে আমি গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছি, তারপর পাঁচ মিনিটও হয়নি, হঠাৎ আমার কাঁধে ঠেকলো একটা পাইপগ্যানের নল। ওরা দু'জন গাড়ির পেছনের সীটের তলায় শুয়ে ছিল। ভাব তুই ওদের সাহস, ডি এমের বাংলোর সামনে গাড়ি পার্ক করা, সেখানে সেন্ট্রি-ফেন্ট্রি থাকে, তারই মধ্যে ওরা কী করে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে শুয়ে ছিল। কতক্ষণ ধরে শুয়ে ছিল তাই বা কে জানে! ওদের ঐ সাহসের জন্যই আমি মনে মনে বললুম, জিতা রহো বেটা!

রীতা মামীমা বললেন, হ্যাঁ, ভয় পেয়েছিলুম ঠিকই। একবার ভাবলুম, এবারে রীতা বিধবা হলো। অপারেশন টেবলে আমার হাতে কত লোক খতম হয়েছে, এবারে আমিও খতম। কিন্তু মনে মনে ছেলেগুলোর সাহসেরও তারিফ করেছিলুম। এটাও ঠিক! ওদের মধ্যে একজন বেশ ভদ্রভাবেই বললো, ডাক্তারবাবু, আমাদের একজন পেশেন্টকে দেখতে যেতে হবে। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখটা আমরা বাঁধবো, আপনি সরে বসুন! আমরা গাড়ি চালাবো।

রীতা বললেন, না তুমি ভুল বলছো! ওরা তোমার চোখ বাঁধলো গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে।

–ও হ্যাঁ। প্রথমে ওদের একজন আমার গাড়িটা চালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই সময় আমার গাড়িটার যখন তখন স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। গাড়িও তো অনেকটা ঘোড়ার মতন, ঠিক চেনা হাতের ছোঁয়া ছাড়া চলতে চায় না। গঙ্গার ধার পর্যন্ত আমিই চালিয়ে নিয়ে গেলুম। তারপর গাড়ি থেকে নামিয়ে আমার চোখ বাঁধলো একটা কালো কাপড়ে। সেখান থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল প্রায় পনেরো মিনিট। অত রাতে, শীতের মধ্যে ওদিকে আর লোক নেই তো একটাও। আমি তখন কী ভাবছি বল তো? এরা সাধারণত একেবারে শেষ সময়ে ডাক্তার ডাকে। অনেক সময়ই সে রুগীর আর আশা থাকে না। ডাক্তারের হাতে রুগী মারা গেলে ডাক্তারের দোষ হয়। ওদের হাতে বন্দুক পিস্তল আছে, রাগে ঝড়াস করে গুলি চালিয়ে দেবে আমার পেটে। আজ রীতার বিধবা হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। আমি তখন মনে মনে আমার টাকা পয়সা উইল করে যাচ্ছি, আর মনে মনে বলছি, রীতা, তুমি আবার

বিয়ে করো। তোমার চেহারা এখনও সুন্দর আছে।

–অ্যাই বাজে কথা বলো না! এই সবগুলো তুমি বানাচ্ছো!

–সত্যিই এই সবই ভাবছিলুম। চোখ বন্ধ থাকলে তো কিছু দেখার উপায় নেই, শুধু ভেবে যেতে হয়। একটা পড়ো বাড়িতে ঢুকেয়ে তো আমার চোখ খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন একজন বললো, এত দেরি করে ফেললি, সব শেষ! রীতার কপালে দ্বিতীয় বিয়ে নেই। আমি তার কী করবো? আমি পৌঁছোবার আগেই ওদের পেশেন্ট মারা গেছে। তখন আর আমাকে দোষ দেয় কী করে? আমাকে বললো, ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিতে। লিখলুম। যে মারা গেছে, তার নাম মানিক ভট্‌চাজ। সে ওদের একজন বড় গোছের লীডার!

অলি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, কী নাম বললেন? চেহারাটা মনে আছে আপনার?

–আমি শুধু হাতটা তুলে ছুঁয়ে দেখেছি। মুখ দেখার দরকার হয়নি। ওরা সবাই মানিকদা, মানিকদা বলে খুব কান্নাকাটি করছিল। অবশ্য একজন আমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। ওফ্, সেই একখানা রাত্তির গেছে বটে! আগে অতটা ভয় পাইনি বোধহয়, কিন্তু ওরা যখন গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল, বুঝলুম যে আমি এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছি, আর কোনো ভয় নেই, তখনই আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়েগেল। সে একপিকিউলিয়ার ফিলিং। গাড়ি আর স্টার্ট দিতেই পারি না।

গাড়ির মধ্যে অন্ধকার। তাতে অলির চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। তার কান্নায় কোনো শব্দ নেই। অলি স্টাডি সার্কেলে বেশীদিন যায়নি, ওদের দলের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেনি, কিন্তু মানিকদাকে সে সত্যিই শ্রদ্ধা করতো। শুধু শ্রদ্ধাই নয়, মানিকদাকে দেখলেই কেমন যেন মায়া লাগতো। মানিকদা নেই? অত নরম মনের একজন মানুষ, অতীন-কৌশিকরা প্রায়ই বলতো, মানিকদা যেন ওদের মায়ের মতন!

সারা পথ অলি আর কোনো কথা বলতে পারলো না।

পরদিন যথা সময়ে সে গেল কৌশিকের সঙ্গে দেখা করতে।

একটা ছোট ঘরের মাঝখানটায় আগে ছিল শুধু লোহার গরাদ, এখন জাল দিয়েও ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কোনো জিনিস দেবার বা নেবার উপায় নেই। জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অলি যে চিঠি পেয়েছিল, তাতেও লেখা ছিল যে প্রিজনারের জন্য কোনো উপহার আনা চলবে না।

সেই ঘরেরও দরজা আছে একজন লোক দাঁড়িয়ে, সে কথাবার্তা শুনবে।

এক মুখ দাড়ি হয়েছে কৌশিকের, মাথার এত বড় বড় চুল যে নিশ্চয়ই উকুন আছে। চোখ দুটো ও টিকোলো নাক দেখে চেনা যায় কৌশিককে। কপালের রংটাও যেন কালো হয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকে কৌশিককে দেখা মাত্রই অলির চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। কিন্তু তাকে হাসি মুখে কথা বলতে হবে।

অলির খুব অভিমান হলো বাবলুদার ওপর। বাবলুদা যেন স্বার্থপরের মতন একা পালিয়ে গেছে। যে দেশটাকে সে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করতো, সেই দেশে সে এখন টাকা রোজগার করছে, লাল রঙের গাড়ি কিনেছে, উইক-এন্ডে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়। আর তার প্রাণে বন্ধু কৌশিক এই বহরমপুরের জেলে...

কৌশিকই প্রথমে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো অলি?

অলি কিছু না বলে মাথাটা হেলালো শুধু।

কৌশিক আবার জিজ্ঞেস করলো, বুলুদির কাছ থেকে চিঠিপত্র পাও? বুলুদির ছেলে খুব অসুস্থ শুনেছিলুম।

বুলুদি নামে কেউ নেই। অলিকে সব আন্দাজে বুঝে নিতে হবে। হয়তো বুলুদি মানে বাবলুদা!

–হ্যাঁ, চিঠি পেয়েছি। এখন ভালো!

–তোমাদের বাগানে লাল গোলাপ ফুল ফুটেছে এবার? ইস, কতদিন যে লাল গোলাপ দেখিনি। একটা আনতে পারলে না?

লালগোলাপ মানে লালবাজার। পমপমকে লালবাজারে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন জেরা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শারীরিক অত্যাচার। মাঝখানে রটে গিয়েছিল যে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পমপম পাগল হয়ে গেছে। সেই খবরটা দিতেই অলির এখানে আসা। পমপমের অসম্ভব মনের জোর।

পমপম ফিটের রুগী হবার ভান করে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। পি জি হাসপাতালে পমপমের সঙ্গে অলি দেখা করেছিল একদিন। পমপম ভালো আছে। পমপমই অলিকে অনুরোধ করেছিল যে-কোনো ভাবে হোক একবার কৌশিকের সঙ্গে দেখা করতে।

সে বললো, না, এবার সব লালগোলাপ ফুরিয়ে গেছে। সাদা ফুটেছে কয়েকটা।

গেটের সামনে দাঁড়ানো লোকটির ঠোঁটে মৃদু হাসি। সে জানে যে এসব অর্থহীন কথার অন্তরালে অন্য কোনো অর্থ আছে। হয়তো মনে মনে টুকে নিচ্ছে কথাগুলো। পরে ডি-কোড করবার চেষ্টা করবে!

দু'একটা সাধারণ কথা বলার জন্যই অলি জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে এরা কী খেতে-টেতে দেয়? পেট ভরে?

কৌশিক বললো, আমরা তো এখানে রান্না করে খাই, জানো না?

—তোমাদের কি শিগগিরই কোর্টে প্রোডিউস করবে?

—সেরকম কিছু শোনা যাচ্ছে না।

অলি আর একটা কথা চিন্তা করলো। ছোটমামা বলেছিলেন, জেলের ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর চেনা আছে। তিনি তাঁকে বলে কৌশিককে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে পারেন। তা হলেও স্পেশাল ডায়েট পাবে। কিছুটা আরামে থাকবে। কিন্তু অলির ধারণা, সেরকম চেষ্টা করা হলেও কৌশিক একা নিজের জন্য আলাদা কোনো সুযোগ নেবে না।

তবু সে জিজ্ঞেস করলো, তোমার যে পেটে ব্যথা হতো খুব? আলসার কিনা দেখিয়েছো?

কৌশিক সেটা উড়িয়ে দিয়ে বললো, এখন ভালো আছি। ব্যথা-ট্যাথা কিছু নেই। ওসব সেরে গেছে।

তারপর অলির চোখের দিকে চোখ রেখে কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, আমার মা কেমন আছে? মায়ের সঙ্গে তুমি কি দেখা করে এসেছো?

কৌশিকদের বাড়িতে অলি যায় নি বটে, কিন্তু তার মা সম্পর্কে বিশেষ খারাপ কোনো খবর শোনে নি। এখনকার দিনে কেনো ছেলে যদি নকশাল হিসেবে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তাহলে তার মা নিশ্চয়ই রাত্তিরে ঘুমোতে পারেন নি। সুতরাং কৌশিকের মা নিশ্চয়ই ভালো নেই, তবে বেঁচে আছেন।

অলি বললো, তোমার মায়ের শরীর সুস্থ আছে।

কৌশিক আবার জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে? তিনি কিছু বলেছেন?

অলি এবার বুঝতে পারলো, কৌশিক নিজের মায়ের কথা জানতে চাইছে না। বাবুলদা-কৌশিকরা যাঁর সম্পর্কে বলতো আমাদের মায়ের মতন সেই মানিকদার কথাও জানতে চাইছে। কিন্তু কৌশিকের সামন্য কিছুতেই দুর্বলতা দেখালে চলবে না।

এমনও তো হতে পারে, অলি প্রশ্নটা বুঝতে পারলো না। মা মানে পার্টির হেড মনে করাও সম্ভব। চারু মজুমদার এখনও ধরা পড়েননি।

অলি জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, ভালো আছেন। তোমার মা ভালো আছেন!

॥ ৬ ॥

অতীনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ তাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে গেল শান্তাবৌদির বাড়িতে।

শান্তাবৌদি ইলিশ মাছ খাওয়াবার নেমন্তন্ন করেছেন, ইলিশ মাছের নাম শুনেও যেতে রাজি হয় না, অতীন কি এমনই পাষাণ? বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে থাকা অতীনের গায়ে একটা জামা ছুঁড়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ বললো, আর কিছুদিন থাক তারপর বুঝবি। এদেশে আমাদের বাঙালীত্ব বলতে টিকে থাকতে শুধু ইলিশ মাছ, দুর্গা পুজো আর রবীন্দ্রনাথ। এই নিউ ইয়র্কে একমাত্র শান্তাবৌদির বাড়িতেই ঐ তিনটে জিনিস পাবি!

বাঙাল পরিবারের ছেলে হলেও অতীনের ইলিশ মাছের প্রতি লোভ নেই। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোনোরকম মাছ না খেলেও তার কিছু আসে যায় না, ভাতের বদলে স্যাণ্ডুইচ বা হ্যামবার্গার খেয়ে সে দিব্যি চালিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া নতুন কারুর সঙ্গে আলাপ করতে সে একেবারেই আগ্রহ বোধ

করে না। শান্তাবৌদি নামে এক অচেনা মহিলার বাড়িতে সে কেন যাবে?

সিদ্ধার্থ এসব ওজর আপত্তিতে কানই দিল না। শান্তাবৌদিকে সে জানিয়ে দিয়েছে যে তার সঙ্গে একজন বন্ধু থাকে, শান্তাবৌদি বিশেষ করে বলে দিয়েছেন সেই বন্ধুটিকে নিয়ে আসতে।

গজগজ করতে করতে উঠে বসে অতীন বললো, শনিবার দিনটা শুধু শুয়ে কাটাবো তারও উপায় নেই? গাদা গুচ্ছের প্যান্ট-শার্ট-কোট-জুতো-মোজা পরে বেরুতে কারুর ভালো লাগে?

সিদ্ধার্থ হাসতে হাসতে বললো, তুই গেটের 'পোয়েট্রি অ্যান্ড লাইফ' পড়েছিস?

—না, আমি কবিতা-টবিতা কিছু পড়িনি ভাই!

—এটা কবিতা নয়, প্রবন্ধ। তাতে গেটে এক জায়গায় বোরডমের একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, একজন ইংরেজ একদিন ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করে ফেললো, তার কারণ প্রত্যেকদিন নিয়মমাফিক জামা-কাপড় পরা আর খোলা তারসহ্য হচ্ছিল না। সভ্যতার এই তো এক জ্বালা ভাই? তাও তো আমরা ইংরেজদের মতন নেমন্তন্ন বাড়ি যেতে হলে ফর্মাল ইভনিং ড্রেস পরি না, গলায় কোনো বো বাঁধি না। তুই ইচ্ছে করলে তো পাজামা পাঞ্জাবির ওপর ওভারকোটটা চাপিয়ে নিতে পারিস!

সিদ্ধার্থ অবশ্য একটু বেশী সাজ পোশাকই করলো। একটা সিল্কের সার্টে লাগালো ঝুটো মুক্তোর কাফ লিংক। টাইয়ে বদলে গলায় কায়দা করে জড়িয়ে নিল একটা বাটিকের কাজ করা স্কার্ফ।

রাস্তায় বেরিয়ে সিদ্ধার্থ অতীনকে দশটা ডলার দিয়ে বললো, কারুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলে সঙ্গে কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত। তুই লিকার স্টোর থেকে এক বোতল ওয়াইন কিনে আয়, আমি সামনের দোকান থেকে কিছু ফুল কিনে নিচ্ছি।

অতীন পেছনে ফিরে পা বাড়াতেই সিদ্ধার্থ ডেকে বলল, এই, কী ওয়াইন আনবি বল তো? অতীন নির্বিকার মুখে জিজ্ঞেস করলো, কী ওয়াইন? দশ-ডলারের মধ্যে যা পাওয়া যায়!

সিদ্ধার্থ হেসে বললো, বাঙাল আর কাকে বলে! এতদিন ইংলন্ডে কাটিয়ে এলি, ওখানে ওরা তোকে কিছু শেখায়নি? একটা যে-কোনো ওয়াইন নিলেই হলো? ইলিশ মাছের নেমন্তন্ন না? সাদা মদ। এক বোতল বোর্দো হোয়াইট ওয়াইন নিয়ে আয়।

সিদ্ধার্থ কিনলো এক গুচ্ছ লালগোলাপ। ওয়াইনের বোতলের চেয়েও তার দাম বেশী। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালো এইট্থ স্ট্রিটের মোড়ে। সিদ্ধার্থের এক বন্ধু সমীর তাদের এখান থেকে তুলে নেবে।

অতীন একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোর ঐ শান্তাবৌদির স্বামী কী করেন?

সিদ্ধার্থ বললো, শান্তাবৌদির হাজব্যান্ড হলেন পাঁচুদা। একেবারে নিপাট ভালোমানুষ। পাঁচুদা আমাদের শিবপুর থেকে পাস করা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু আমি প্রায়ই ভাবি,ঐ গোবেচারা মানুষটি শিবপুরের হোস্টেলে পাঁচটি বছর কাটালেন কী করে! পাঁচুদা এক ঘণ্টায় একটার বেশী কথা বলেন না। ওদের বাড়িটাকে কেউ পাঁচুদার বাড়ি বলে না, সবাই বলে শান্তাবৌদির বাড়ি। শান্তাবৌদি গান গাইতে পারেন। এখানে বাঙালীদের থিয়েটার হলে শান্তাবৌদী বাঁধা হিরোইন। আবার লোককে ডেকে ডেকে খাওয়াতেও ভালোবাসেন! ওঁদের বাড়ি তো কুইন্স-এ, শান্তাবৌদিও এখনকার বাঙালীদের কুইন, মক্ষিরানীও বলতে পারিস।

—আমি ওখানে গিয়ে কী করবো বল তো, সিদ্ধার্থ? নিশ্চয়ই আরও অনেক লোক থাকবে, কারুকে চিনি না...

—এইভাবেই তো চেনাশুনো হয়।

—আমার শরীরটা সত্যি ভালো লাগছে না রে! আমি বাড়ি ফিরে যাই। আমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

—একটা থাপ্পড় খাবি, অতীন। বলছি না, শান্তাবৌদির ওখানে গেলেই তো জড়তা কেটে যাবে।

অতীন সিদ্ধার্থ চোখের দিকে চোখ রেখে অদ্ভুতভাবে হাসলো। কলকাতার কফি হাউসে তার বন্ধুদের মধ্যে সে ছিল স্বাভাবিক নেতা গোছের, তার মেজাজের জন্য সবাই তাকে ভয় পেত, এই সিদ্ধার্থ কোনোদিন তার মুখের ওপর একটাও কথা বলেনি।

সিদ্ধার্থ অতীনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো, চিয়ার আপ মাই বয়!

সমীর এসে পৌছলো কাঁটায় সাড়েসাতটায়। দরজা খুলে দিয়ে বললো, চটপট উঠে পড়ো, এক্ষুনি টিকিট দিয়ে দেবে!

নো পার্কিং এলাকায় গাড়ি কয়েক মহূর্ত থামানোই দারুণ অপরাধ, সিদ্ধার্থ দৌড়ে উঠে পড়লো সামনের সীটে, অতীন পেছনে।

আরও খানিকটা দূরে এসে সমীর একটা ড্রাগ স্টোরের সামনে থেকে তুললো তার স্ত্রী বাসবীকে। অতীনের সঙ্গে বাসবীর দেখা হয়নি আগে। সিদ্ধার্থ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, আমার বন্ধু অতীন, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, কয়েক মাস আগে এসেছে...

অতীন শুধু একটা শুকনো নমস্কার করলো, সারা রাস্তা একটাও কথা বললো না অন্যদের সঙ্গে।

শান্তাবৌদিদের বাড়িটা একটা সুন্দর নির্জন রাস্তায়, সামনে এক টুকরো বাগান। গাড়ি থেকে নেমে অতীন প্রথমেই লক্ষ করলো, সেই বাগানে অনেকগুলো বেশ বড় বড় গোলাপ ফুটে আছে। সিদ্ধার্থও গোলাপ ফুলই এনেছে।

বেল বাজাবার পর দরজা খুললেন শান্তাবৌদি নিজে। বেশ লম্বা ও বড় চেহারার মহিলা, মাথায় অনেক চুল, দেবী প্রতিমার মতন মুখের গড়ন। প্রথমেই তিনি বকুনির সুরে বললেন, তোমরা এত দেরি করলে, সমীর নিশ্চয়ই লেট করেছে? এই বাসবী, তোমায় বলেছিলুম না আগে এসে আমায় একটু হেল্প করবে!

বাসবী বললো, আমার যে আটটায় ছুটি, তবু আমি পনেরো মিনিট আগে অফ নিয়েছি!

অতীনের দিকে চেয়ে শান্তাবৌদি বললেন, আপনিই বুঝি সিদ্ধার্থর বন্ধু? এ কী, আপনি ওয়াইন এনেছেন কেন? প্রথম দিন আমার বাড়িতে...না না এটা খুব অন্যায় হয়েছে, এত ওয়াইন জমে গেছে আমাদের...

সিদ্ধার্থর হাত থেকে গোলাপের গুচ্ছ নিয়ে তিনি বললেন, আঃ কী সুন্দর! ঠিক এই পারপ্‌ল কালারটা আমার বাগানে কিছুতেই ফোটাতে পারি না!

শান্তাবৌদিকে দেখেই অতীনের মনে হলো, এই মুখখানা যেন তার পরিচিত। কোথায় দেখেছে আগে?

ড্রয়িংরুমে ছ'সাতজন নারী পুরুষ আগে থেকেই উপস্থিত। পুরুষরা বাসবীর জন্য উঠে দাঁড়ালো, শান্তাবৌদি বললেন, তোমরা নিজেরা পরিচয় করে নাও, আমি চট করে একবার কিচেন থেকে ঘুরে আসছি! বাসবী, একটু এসো না আমার সঙ্গে!

বাড়িতে ফায়ার প্লেস আছে, তারমধ্যে কাঠের আগুনের বদলে জ্বলছে একটা ইলেকট্রিক হীটার। তার এক পাশে সাদা পাঞ্জাবি ও পাজামা পরে বসে আছেন এই পরিবারের কর্তা পাঁচুদা, মুখে পাইপ। সিদ্ধার্থ বসলো একটি কিশোরী মেয়ের পাশে। একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক অতীনকে ডেকে বসালেন নিজের কাছে। হাত তুলে নমস্কার করে তিনি বললেন, আমার নাম অমিয় মিত্র। আপনি দেশ থেকে নতুন এসেছেন বুঝি? দেশের খবর কী বলুন?

উল্টোদিক থেকে সিদ্ধার্থ বললো, অমিয়দা, ও হচ্ছে আমার কলেজের বন্ধু অতীন, এখানে আসবার আগে বছর খানেক ইংল্যান্ডে কাটিয়ে এসেছে।

অমিয় মিত্র বললেন ওঁ, ইংল্যান্ড! আমিও সেখানে ছিলাম, সেভেন ইয়ার্স, ওখানকার ওয়েদার আমার সুট করলো না, রোদ্দুর এত কম দেখা যায়, এত ঠান্ডা...বরফ তো এখানেও পড়ে, কিন্তু ইংল্যান্ডে একেবারে ওয়েট কোল্ড...তা ছাড়া ব্রিটিশ জাতটা এখনো এত কনসিটেড, ওদের সঙ্গে মানিয়ে চলা...

সিদ্ধার্থ বললো, আসল কথাটা বলছেন না কেন অমিয়দা? ইংল্যান্ডের চেয়ে এখানে টাকা রোজগারের স্কোপ বেশী। অনেকেই এখন চান্স পেলে আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছে!

অমিয় মিত্র বললেন, যব স্যাটিসফ্যাকশান এখানে অনেক বেশী। ইফ ইউ ক্যান প্রুভ ইয়োর মেরিট অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি, এখানে তুমি কাজ করার অনেক সুযোগ পাবে। রিসার্চের কাজ করতে গেলেও এখানে এতরকম সুবিধে আছে...

সিদ্ধার্থ আবার বললো, জব স্যাটিসফ্যাকশনের চেয়েও বড় কথা হচ্ছে টাকা! আমি অন্তত তাই বুঝি! পাউন্ডের থেকে ডলার অনেক স্ট্রং টনিক!

সমীর এসেই বার টেন্ডারের দায়িত্ব নিয়েছে। কার কী লাগবে, কার গেলাস খালি, এই সব দেখতে দেখতে সে অতীনের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে কী দেবো? স্কচ না বার্বন?

অতীন বললো, কিছু না!

কিশোরী মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে চমকে মুখ তুলে সিদ্ধার্থ তাকালো তার বন্ধুর দিকে। কয়েক সপ্তাহ ধরে অতীন খুব বেশী মদ্যপান করছে, বাড়িতে একা একা বসে বোতল শেস করে, তার হঠাৎ মদ্যপানে অরুচি! পাঁচুদার বাড়িতে সিভাস রিগ্যাল থাকে, ঐ বোতল কেনার সাধ্য তার বা অতীনের নেই। পাঁচুদার বাড়িতে যত ইচ্ছে খাওয়া যায়।

সিদ্ধার্থ বললো, অতীন তুই বীয়ার নিবি? ভালো ডাচ্ বীয়ার আছে।

অতীন আবার দু'দিকে মাথা নাড়লো। এমনকি কোকাকোলা নিতেও সে রাজি হলো না। তার ইচ্ছে করছে না। এই সব পার্টিতে মদই হোক বা ঠান্ডা নরম পানীয়ই হোক, হাতে একটা গেলাস ধরে থাকাই রীতি, অতীন শুধু সিগারেট টানতে লাগলো। কারুর সঙ্গে আলাপ করার বদলে সে টেবিল থেকে তুলে নিল নিউজউইক।

সব পার্টিতেই একজন কেউ প্রধান বক্তা থাকে। এখানে সেই ভূমিকা নিয়েছেন অমিয় মিত্র। ইনি অন্যদের কথা বলার বিশেষ সুযোগই দেন না। এঁর কায়দানি বিচিত্র। ইনি অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কিছু প্রশ্ন করেন, তারপর উত্তরটি শোনার আগেই সে বিষয়ে নিজে বলতে শুরু করে দেন।

এখন তিনি বলতে শুরু করেছেন প্রবাসীদের একটি অতি প্রিয় বিষয় নিয়ে। দেশের নিন্দে! অমিয় মিত্র দু'বছর আগে মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য দেশে ঘুরে এসে এমনই শিহরিত হয়েছেন যে সেই সম্পর্কেই বলে যাচ্ছেন অনবরত। কলকাতায় গেলে ইংরিজি উচ্চারণ পর্যন্ত ভুলে যেতে হয়। ওখানকার ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ফ্যার্স্ট হয় না, ফাস্ট হয়! অমিয় মিত্রর এক খুড়তুতো ভাই হিস্ট্রি অনার্স পড়ে, তার যা ইংরিজি উচ্চারণের বহর! কলকাতার রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, শিক্ষারও সেই একই রকম দুরবস্থা! নকশাল ছেলেরা স্কুল-কলেজ পোড়াচ্ছে, মাস্টারদের মারছে। লেখাপড়ার আর দরকার নেই। ...কলকাতার বাতাসে নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হয়...

সিদ্ধার্থ দু'একবার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে তারপর কিশোরী মেয়েটির প্রতিবেশী মনোযোগ দিল। অন্য মহিলারা এক পাশে উঠে গিঁয়ে সুপার মার্কেটে কী কী জিনিসের সেল দিচ্ছে সেই বিষয়ে আলোচনা করছেন। পাঁচুদা পাইপ টানতে টানতে হাসছেন মুচকি মুচকি। অতীন কোনো কথাই শুনছে না। সে যেন পৃথিবীর লাজুকতম ব্যক্তি।

শান্তাবৌদি আবার এ ঘরে এসে ঢুকতেই অতীনের মনে পড়লো, এই মুখখানা সে দেখেছিল অনেকদিন আগে, দেওঘরে। তখন অতীন খুব ছোট, একটা বেশ বড় বাড়িতে থাকতেন বুলামাসি, শান্তবৌদির মুখখানা অবিকল সেই বুলামাসির মতন। কিন্তু সেই বুলামাসিই এই শান্তাবৌদি হতে পারেন না, এতদিনে বুলামাসির অনেক বয়েস হয়ে যাবার কথা...একবার ত্রিকূট পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখা হয়েছিল বুলামাসিদের সঙ্গে। অতীনের মনে পড়ে যাচ্ছে, দাদা খুব মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকতো বুলামাসির মুখের দিকে, তখন বুঝতে পারেনি, অথীন এখন বুঝতে পারছে, দাদা বুলামাসির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, দাদার কবিতার খাতায় দেওঘরের পটভূমিকায় দুটো কবিতা বোধ হয় বুলামাসিকে নিয়েই...। কোথায় গেল সেই কবিতার খাতা?

অতীন কি সেটা শিলিগুড়ি নিয়ে গিয়েছিল? নাকি ফুলদির কাছেই রয়ে গেছে? ঠিক মনে পড়ছে না। শিলিগুড়িতে নিয়ে গেলে, সেটা আর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। ফুলদির কাছেই রাখা উচিত ছিল...

শান্তবৌদি বললেন, খাবার কিন্তু রেডি। তোমরা গরম খেয়ে নাও, ঠান্ডা হলে একেবারে ভালো লাগবে না।

অমিয় মিত্র তখন একটা লম্বা গল্পের মাঝখানে, তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হলো প্রায় জোর করে। ডাইনিং রুমে চলে এলো সবাই। টেবিলে এক সঙ্গে একজন বসতে পারবে না, প্লেটে তুলে নিতে হবে। ধপধপে সাদা গরম ভাত থেকে ধোঁওয়া উড়ছে। ইলিশ মাছ ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি পদ টেবিলে সাজানো।

এদেশের এই ইলিশের নাম শ্যাড মাছ। সাহেবদের দেশে সব কিছুই বড় বড়, পদ্মা-গঙ্গার ইলিশের চেয়ে এই শ্যাডও আকারে বড় হয়, তিন কেজি সাড়ে তিন কেজি ওজনেরও পাওয়া যায়। শান্তাবৌদি জানালেন যে, একটি ইটালিয়ান মাছওয়ালা তার দোকানে এই শ্যাড মাছ এলেই শান্তাবৌদিকে ফোন করেন। এই মাছ যে বাঙালীদের অতি প্রিয় তা ইটালিয়ানরাও জেনে গেছে।

ভাতের সঙ্গে খানিকটা ডাল নেওয়ার পর হঠাৎ অতীন ঠিক করে ফেললো, সে ঐ মাছ খাবে না!

শান্তাবৌদি একটু পরেই অতীনের প্লেটের দিকে নজর দিয়ে বললেন, এ কী, আপনি মাছ নিলেন না? দাঁড়ান আপনাকে আমি পেটির মাছ তুলে দিচ্ছি।

অতীন প্লেটটা সরিয়ে নিয়ে বললো, আমি ইলিশ মাছ খাই না। আমার গন্ধ লাগে।

শান্তাবৌদির মুখখানা ফ্যাকাস হয়ে গেল। তাঁর নিজের হাতে রান্না করা মাছকে প্রত্যাখ্যাণ করা যেন তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত অপমান।

তিনি সিদ্ধার্থর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কী, সিদ্ধার্থ, তুমি একথা আমাকে আগে বলোনি? আমি ইচ্ছে করে আজ মাংস করিনি, উনি কী দিয়ে খাবেন? ফ্রিজে স্যামন্‌ মাছ আছে, একটু দাঁড়ান, কয়েকখানা ভেজে দিচ্ছি!

সিদ্ধার্থও অবাক হয়ে গেছে। কলকাতায় অতীনদের বাড়িতে সে তিন-চারদিন ভাত খেয়েছে, অতীনকে সে ইলিশ মাছ খেতে দেখেছে। তবু অতীনের হঠাৎ মত পরিবর্তনে সে কোনো জোর করলো না। সে বললো, শান্তাবৌদি, আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। অতীন নিরামিষ খাওয়া প্র্যাকটিস করছে। ঐ তো ফুলকপির তরকারি, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা রয়েছে, ওতেই ওর হয়ে যাবে। আপনি পটল কোথা থেকে জোগাড় করলেন?

অন্যদের চেয়ে আগে খাওয়া শেষ করে প্লেট নামিয়ে রেখে অতীন চলে এলো লিভিংরুমে। তাড়াতাড়ি সে একটা সিগারেট ধরালো, সে বুঝতে পারছে, কারুর সঙ্গে আলাপ না করা, কথা না বলা, খাওয়ার জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প-হাসি-ঠাট্টায় যোগ না দেওয়া, শান্তাবৌদির রান্নার প্রশংসা না করে চলে আসা, এসবই অস্বাভাবিক ও অভদ্রতা। তবু কিছুতেই সে মন খুলতে পারছে না।

খাওয়ার ঘরে হঠাৎ সব শব্দ থেমে গেছে। বোধ হয় হয় সিদ্ধার্থ ফিসফিস করে অতীন সম্পর্কে ওঁদের বলছে অনেক কিছু। যা খুশী বলুক।

...বাবা একদিন অনেক রাত্তির একজোড়া ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছিলেন বাড়িতে। তা নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল মায়ের সঙ্গে। অতীনে তখন পরীক্ষা চলছে, না পরীক্ষা আরম্ভ হয়নি বোধ হয়, দু'একদিন বাকি ছিল, কিন্তু অত রাতে ইলিশ-টিলিশ খেতে একদম ইচ্ছে করেনি তার, সে রাগারাগি করেছিল...বাড়িতে ফ্রিজ নেই, সেই মাছ, রেখে দেবার উপায় ছিল না, বাবা সব ফেলে দিয়েছিলেন...বাবা মনে দুঃখ পেয়েছিলেন...এখনও তো বাড়িতে ফ্রিজ নেই, বাবা অনেক টাকা ধার করেছেন তারজন্য...তিন-চার শো ডলার পাঠাতে পারলে একটা ফ্রিজ কেনা যায়...যতদিন না কলকাতার বাড়িতে একটা ফ্রিজ কিনে দেবার ক্ষমতা তার হবে, ততদিন সে ইলিশ মাছ কেন, আর কোনো মাছই খাবে না।

হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল নরম পুরু কার্পেটে। তক্ষুনি নিচু হয়ে সিগারেটটা তুলে নেওয়া উচিত, কিন্তু সে তুলছে না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেদিকে। কার্পেটে আগুন ধরে যেতে দেরি হলো না, ধোঁয়া উঠছে, এক্ষুনি যে-কেউ এঘরে এসে পড়তে পারে, ধোঁয়া দেখে আঁতকে উঠবে, এদেশে সাংঘাতিক আগুন-ভীতি। শান্তবৌদিকে খারাপ লাগেনি অতীনের, পাঁচুদার মুখেও একটা স্নিগ্ধ ভাব আছে, তবু কেন সে এদের বাড়ির দামি কার্পেট [illegible]ছে?

পাশের ঘরে হঠাৎ সবাই একসঙ্গে হেসে উঠতেই অতীন চমকে উঠলো। এবার সে তাড়াতাড়ি সিগারেটটা তুলে পা দিয়ে নেবাতে লাগলো আগুন। অনেকটা পুড়েছে, একটা আধুলির সাইজের কালো গোল গর্ত হয়ে গেছে। চোখে পড়বেই। অতীন তার সোফাটা টেনে এনে পোড়া জায়গাটা চাপা দিল। তারপর নিজে গিয়ে বসলো উল্টো দিকে।

সবচেয়ে আগে এ ঘরে এলেন পাঁচুদা। একেবারে অতীনের কাছে এসে নরম গলায় বললেন, এখনও হোম সিকনেস কাটেনি? আমারও মাঝে মাঝে...

অতি সাধারণ একটা কথা। তবু অতীনের মাথায় দপ করে জ্বলে উঠলো রাগ। বাড়ির কথা মনে

পড়া, নিজের দেশের কথা মনে পড়া একটা অসুখ? সিকনেস?

কিছু উত্তর দিতে গেলেই অতীনের মুখ দিয়ে কঠিন কথা বেরিয়ে আসবে, তাই সে চুপ করে চেয়ে রইলো। পাঁচুটাও যেন উত্তর চাননি, চলে গেলেন নিজের নিজের আসনে।

অন্যরা এসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রশংসা করতে লাগলো মাছ রান্নার ও স্বাদের। শান্তবৌদি ছাড়া আর কেউ অতীনের সঙ্গে যেচে কথা বললো না। অন্য মাছ বা মাংস রান্না করেছি বলে শান্তাবৌদির আফসোসের শেষ নেই, তরকারিও সেরকম কিছু ছিল না। অতীন যদি নিরামিষ পছন্দ করে তাহলে তিনি আর একদিন অতীনকে শুধু নিরামিষই রান্না করে খাওয়াবেন। অতীনকে আবার আসতেই হবে।

এরপর শান্তাবৌদি পর পর তিনখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন সকলের অনুরোধে।

অতীন খুব একটা গানের সমঝদার নয়, তবু সে সে বুঝতে পারলো, মহিলা ভালই গান জানেন। অনেকটা রাজেশ্বরী দত্তের মতন গলা। গান শুনতে শুনতে হঠাৎ অতীনের একটা কথা মনে পড়ে গেল। খাবার শেষ করার পর সে তার প্লেটটা টেবিলের নিচে রেখে দিয়েছিল। সেটা একটা তো নেই, কে অন্যের এটো বাসন মাজবে?

তার প্লেটটা কি এখনো টেবিলের নীচে রয়ে গেছে? তাহলে এই বেলা মেজে দেওয়া উচিত। গানের মাঝখানে অতীন উঠে গেল ডাইনিং রুমে, না টেবিলের নিচে তার প্লেটটা নেই, এমনকি সিংকেও নেই। কে ধুয়েছে, শান্তাবৌদি না সিদ্ধার্থ?

ডাইনিং রুমটা বেশ গরম। পাশের ঘরে গিয়ে গান শোনার বদলে এই ঘরে থাকাটাই তার কাছে আরামপ্রদ মনে হলো। এ বাড়িতে বসবার ঘরের বাইরে জুতো খুলতে হয়। সেই সময় অতীন মোজাও খুলে ফেলেছে বলে তার পায়ে শীত লাগছে।

খানিকবাদে বাসবী এসে দেখলো, সেই ঘরের ঠিক মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে অতীন। সোজা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে।

বাসবী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখানে কী করছেন?

অতীন কড়াগলায় বললো, দেখতেই তো পারছেন, এমনিই দাঁড়িয়ে আছি।

বাসবীর ভুরু কুঁচকে গেল। এরকম উত্তর পেতে সে অভ্যস্ত নয়। সে বললো, আমরা এখন বাড়ি যাবো, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চান–

শুধু মাত্র যদি কথাটার জন্যই অতীন বললো না, আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো না। পরক্ষণেই সিদ্ধার্থ দরজার কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে বললো, এই অতীন চল্‌!

সিদ্ধার্থর কাছে অবশ্য জেদাজেদি করতে পারলো না অতীন, তাকে সমীরের গাড়িতেই উঠতে হলো। এবার সে বসলো সামনের সীটে। কিশোরীর মতন চেহারার মেয়েটি ঠিক কিশোরী নয়, তার নাম নীতা, সে পি-এইচ ডি'র ছাত্রী। তাকেও পথে নামিয়ে দিতে হবে, সিদ্ধার্থ বাসবী আর নীতার সঙ্গে পেছনে বসেছে, সিভাস রিগ্যাল অনেকটা পান করে বেশ ফুরফুরে নেশা হয়েছে তার। সে নীতার কাঁধে মৃদু চাপড় দিতে দিতে গান গাইছে, দেয়ার ইজ আ গোল্ড মাইন ইন দা স্কাই ফার অ্যাওয়ে, উই উইল ফাইন্ড ইট...। অন্যসময় সিদ্ধার্থ নানারকম বাংলা গান গায় কিন্তু বিলিতি মদের নেশা হলেই তার গলা ইংরিজি গান ছাড়া অন্য কিছু বেরোয় না।

নীতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার দরকার হলো না, সে নিজে থেকেই অতীনকে বললো, আপনি খুব অহংকারী, তাই নয়? কারুর সঙ্গে কথা বলছিলেন না!

সিদ্ধার্থ নীতার কাঁধে চাপ দিয়ে ইঙ্গিত করলো চুপ করতো। নীতা তবু বললো, আপনি সবার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন, আপনার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, আমরা সবাই বোকা, আপনিই একমাত্র বুদ্ধিমান!

সিদ্ধার্থ বললো, আরে, তুমি জোর করে আমার বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া বাধাচ্ছো কেন? লিভ হিম অ্যালোন!

নীতা ফস্‌ করে ঝেঁঝে উঠে বললো, হি হ্যাজ নো রাইট টু ইনসাল্ট শান্তবৌদি? সাচ্‌ আ নাইস লেডি, এত যত্ন করে খাওয়ান....আপনার বন্ধুটি খাবার নামে একটা ফার্স করলেন, তারপর শান্তবৌদির গানের মাঝখানে ঐ ভাবে উঠে যাওয়া...কেউ কখনো যায়? শান্তাবৌদি দুঃখ পেলেও মুখে কিছু বললেন না!

বাসবী বললো, উনি গানের মাঝখানে ডাইনিং রুমে উঠে চলে গেলেন, আমি ভাবলুম, বুঝি আবার খিদে পেয়ে গেছে! যদি ওকে কিছু হেল্প করতে পারি, সেইজন্যে গিয়ে দেখি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কেন দাঁড়িয়ে আছেন, জিজ্ঞেস করতেই এমন ধমকে দিলেন আমাকে!

সিদ্ধার্থ বলল, হ্যাঁরে অতীন, তুই অতক্ষণ ডাইনিংরুমে কী করছিলি? সত্যি খিদে পেয়েছিল নাকি?

সমীর জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছো, ফেরার সময় আমার গাড়িতে যাবে না বলছিলে কেন?

অতীনের মনে হলো, এই গাড়ির অন্য চারজন এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে, তাকে উত্তর দিতেই হবে? ডাইনিং রুমে সে কেন গিয়েছিল তার মনে পড়ছে না এখন। কোনো ঘরের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাটা কি অপরাধ? সে উত্তর দিলে এরা তাকে ছাড়বে না। সারা রাস্তা প্রশ্নবাণ দিয়ে তাকে খোঁচাবে। সত্যি সত্যি যেন ঐ চারজনের হাতে ধারালো অস্ত্র, তারা অতীনকে খোঁচাচ্ছে, অতীনের হাত-পা বাঁধা...

সিদ্ধার্থ, বাসবী, সমীর, নীতা চার রকম গলায় বলতে লাগলো, কেন? কেন? কেন? কেন? অতীন, তুমি কেন ওটা করো নি? তুমি কেন ওটা করেছো?

অতীন ছটফট করতে লাগলো, দু' হাতে কান চাপা দেবার চেষ্টা করলো। কোনো উত্তর দিতে পারছে না সে, প্রশ্নও সহ্য করতে পারছে না!

ঝট করে অতীন খুলে ফেললো সীটবেল্ট, তারপর গাড়ির দরজাটাও খুলে এক লাফ দিল রাস্তায়। মেয়েদুটি আর্তনাদ করে উঠলো!

সিদ্ধার্থ পাংশু মুখে, ফ্যাসফেসে গলায় বললো, মিরাক্ল! মিরাক্ল!

অতীন গাড়ির দরজার হ্যান্ডেল খোলার চেষ্টা করতেই সমীরের পা যান্ত্রিকভাবেই চলে গিয়েছিল ব্রেকে। দরজাটা খুলে যেতেই সে পুরো ব্রেকে চাপ দেয়।

এরপর অনেকগুলি দৈবাৎ যোগাযোগ তারা বড় রকম দুর্ঘটনা থেকে বেঁচেছে। এরকম হঠাৎ ব্রেক কষার গাড়ি উল্টে যেতে পারতো, তা না করে খানিকটা এদিক ওদিক বেঁধেছে মাত্র। সমীরের গাড়ির ঠিক পেছনেই কোনো গাড়ি ছিল না, থাকলে সেই গাড়ি নির্ঘাৎ এসে ধাক্কা মারতো তাকে।

অতীন গড়িয়ে গেছে পাশের লেনে। সেখানে পর পর তিনটি গাড়ি, চাপা পড়ে ছাতু হয়ে যাবার কথা ছিল তার। কিন্তু প্রথম গাড়িটি শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষেছে, দ্বিতীয় গাড়িটা কিছুটা দূরত্বে ছিল। সে ব্রেক কষলেও সামান্য ধাক্কা মেরেছে এসে প্রথম গাড়িতে তৃতীয় গাড়ি মেরেছে তাকে।

সিদ্ধার্থ আর সমীর দু'জনেই দৌড়ে গেল অতীনের কাছে। একটা ক্যাডিলাক গাড়ির সামনের চাকা থেকে মাত্র দু'হাত দূরে পড়ে আছে অতীন। তার কোনো অঙ্গেরই কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। সমীর ঠিক সময় ব্রেকে পা দিয়ে গতি কমিয়ে দিয়েছিল, নইলে ষাট-সত্তর মাইল গতিতে চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ার আঘাতেই সে মরে যেতে পারতো।

সিদ্ধার্থ তার বন্ধুকে হাত ধরে টেনে দাঁড় করালো, কপালের একটা পাশ সামান্য ছড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি অতীনের।

ক্যাডিলাক গাড়ির ড্রাইভার নেমে এসে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো ব্যাপারটা? আমি প্রথমে ভাবলাম, তোমরা বুঝি একটা ডেডবডি ডিসপোজ অফ করছো!

সমীর তাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, আমাদের গাড়ির সামনের দরজাটা হঠাৎ খুলে গিয়েছিল, সেইজন্যই এই দুর্ঘটনা।

ক্যাডিলাক গাড়ির প্রৌঢ় ড্রাইভার এপাশে এসে সমীরের সেকেন্ড হ্যান্ড ফোর্ড গাড়িটা দেখলো। সামনের দরজার লকটা পরীক্ষা করলো তিন চারবার। পুরানো গাড়িতে একটু লড়ঝড়ে তো থাকেই। সে অতীনের দিকে তাকিয়ে বললো, ঈশ্বর আজ আমাকে খুনী হওয়ার দায় থেকে বাঁচালেন। তোমাকে মারলে আমার কোনো শাস্তি হতো না, কিন্তু মনে একটা দাগ তো থেকে যেত!

রাত পৌনে বারোটা হলেও রাস্তায় পর পর জমে যেতে লাগলো গাড়ি। পুলিশের গাড়িও এসে গেল অবিলম্বে। কোনো রকম চ্যাঁচামেচি, রাগারাগি, অন্যকে দোষারোপের ব্যাপার নেই, সবাই চুপচাপ। সমীরের গাড়ির ইনসিওরেন্স কম্পানির নাম ও নম্বর টুকে নিল পুলিশ। সমীর মাত্র দু'পেগ হুইস্কি খেয়েছে, তাকে ড্রাংক ড্রাইভারও বলা যাবে না, অতীনের মুখেও মদের গন্ধ নেই। অতীনের

বয়েসী একটি যুবক ইচ্ছে করে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে লাফ মারবে, এটা ওদের কাছে অকল্পনীয়। একটুবাদেই পুলিশ ওদের ছেড়ে দিল।

মেয়ে দুটি আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। গাড়ি ছাড়ার পরও কেউ কোনো কথা বললো না।

একটু বাদে সিদ্ধার্থ বললো, তুই কী করে বেঁচে গেলি, অতীন, সেটাই মহা আশ্চর্য ব্যাপার। মিরাকুলাস এসকেপ ছাড়া আর কী বলা যায়? নেকস্টা টাইম তোর যখন একরকম নাটক করার ইচ্ছে হবে, তুই ওয়াশিংটন ব্রীজ থেকে ঝাঁপ দিস, আমাদের এরকম বিপদে ফেলিস না।

সমীর বললো, এখন এসব কথা থাক, প্লীজ।

সিদ্ধার্থ তবু বললো, আমার মাথা গরম হয়ে গেছে! পুলিশ দেখলেই আমার...অতীন, তোকে আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, এই সবার সামনে। আমি তোকে সাত দিনের নোটিস দিলাম, তুই আমার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে অন্য জায়গা খুঁজে নিবি। অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করেছি ভাই, আর না। তোকে আর আমি জায়গা দিতে পারবো না।

অতীন মুখ ঘুরিয়ে সিদ্ধার্থের দিকে চেয়ে হাসলো।

॥ ৭ ॥

দরজা খোলার জন্য ওভারকোটের বিভিন্ন পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে চাবি খুঁজতে লাগলো সিদ্ধার্থ। অতীনের কাছেও চাবি থাকে, কিন্তু সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। যেন ধরা-পড়া চোরের মতন মুখচোখ, তার দাড়িতে লেগে আছে রাস্তার ধুলো।

প্যান্ট-সার্ট-জ্যাকেট ও ওভারকোট মিলিয়ে দশ-বারোটা পকেট, সব কটা পকেট খুঁজে চাবিটা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। ভেতরে এসে, আলো জ্বেলে রাগে গরগর করতে করতে সিদ্ধার্থ বললো, এমন দামি নেশা, শালা চৌপাট হয়ে গেল একেবারে। ভেবেছিলুম রাত্তিরটা থানায় কাটাতে হবে!

ওভারকোটটা খুলে সে ছুঁড়ে ফেললো বিছানার ওপর। তারপর উগ্রমূর্তিতে অতীনের দিকে ফিরে বললো, এবার বল, কেন ঐ কাণ্ডটা করতে গেলি? গাড়িতে দুটো মেয়ে ছিল, নইলে তোকে তখনই এমন পেটাতে ইচ্ছে করছিল আমার।

অতীন যেন সঙ্কোচ-গ্লানিতে সরু হয়ে গেছে। সে ওভারকোট খুললো না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকেই নীচু গলায় বললো, আমি এখনই চলে যাবো! জিনিসপত্র গুটিয়ে নিতে মিনিট দশেক লাগবে, সেইটুকু যদি সময় দিস–

সিদ্ধার্থ বললো, চলে যাবি মানে? এত রাত্তিরে কোথায় যাবি?

অতীন বললো, সে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। সাবওয়েতে রাত্তিরে শুয়ে থাকা যায়।

সিদ্ধার্থ তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললো, ব্লাডি ইডিয়েট, আমার সঙ্গে মাজাকি হচ্ছে? এক্সপ্লেইন ইয়োর বিহেভিয়ার ফার্স্ট। কেউ কি তোর সঙ্গে একবারও খারাপ ব্যবহার করেছে? তবু তুই সবাইকে অপমান করলি কেন?

–সিদ্ধার্থ, আমার মাথাটা দুর্বল লাগছে। ঘুম পাচ্ছে। যদি কাল সকালে–

–মারতে মারতে তোর আমি ঘুম ঘুচিয়ে দেবো আজ। তুই আজ যা সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলি আমাদের...

অতীন চেয়ারে বসে পড়ে ফ্যাকাসে গলায় বললো, কেন তুই আমাকে ঐ পার্টিতে নিয়ে গেলি! আমি যেতে চাইনি, তুই জোর করে...

সিদ্ধার্থ এগিয়ে এসে অতীনের চুল খামচে ধরে বললো, তোকে আমি শান্তাবৌদির বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অন্যায় করেছি। তোকে ইংল্যান্ড থেকে এখানে ডেকে আনাটাও আমার অন্যায় হয়েছে? আমার অ্যাপার্টমেন্টে তোকে থাকতে দিয়েছি, সেটাও আমার অন্যায়? তুই যদি মরতেই চাস, দেশে থেকেই মরতে পারতি না? এখানে একা একা যেখানে খুশী গিয়ে মর না! মরার জায়গার অভাব আছে? আমাদের জড়াতে চেয়েছিলি কেন?

অতীন বললো, আমি চেষ্টা করলেও মরতে পারি না।

অতীনের চুল ধরে টানতে টানতে জানলার কাছে নিয়ে এসে, জানলাটা খুলে দিয়ে, সিদ্ধার্থ বললো, লাফা, এখন থেকে নীচে লাফিয়ে পড়। দেখি শালা, তুই মরিস কি না।

সিদ্ধার্থর হাতটা ধরে অতীন বললো, ছাড়, আমার লাগছে! সত্যি, তোদের ওরকম বিপদে ফেলা আমার অন্যায় হয়েছে। গাড়ির মধ্যে হঠাৎ যেন আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, সবাই আমাকে অপমান করছে, আমার বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

–কেউ তোকে অপমান করেনি। শাস্তাবৌদি কাছে এখন টেলিফোন করে মাপ চাইবো?

অতীনের চুল ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ বললো, এত রাত্তিরে আমি ন্যাকামি করতে হবে না! দ্যাখ অতীন, মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আমি আর তোকে ট্যাকল করতে পারছি না। আমি কি সব সময় তোকে পাহারা দিয়ে থাকবো? তুই এখানে আছিস বলে আমার কোনো বান্ধবীকে এই অ্যাপার্টমেন্টে ডাকি না, উইক এন্ডে ডেট করি না, আর কত স্যাক্রিফাইস করবো তোর জন্যে?

অতীন একটা সিগারেট ধরিয়ে ম্লান গলায় বললো, তুই আমাকে সাতদিনের নোটিস দিয়েছিস, তার আগেই আমি তোর অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যাবো।

–আমার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে রেল স্টেশানে গিয়ে শুবি? হারামজাদা ছেলে, গাড়ির দরজা খুলে, যখন ঝাঁপ দিলি, তখন তোর মা-বাবার কথা একবারও মনে পড়লো না? আচ্ছা, মা-বাবার কথাও না হয় বাদ দিলুম, ঐ শর্মিলা বলে মেয়েটির কথাও একবারও ভাবলি না!

–আমি এখন একটা ক্রাইসিসের মধ্যে পড়েছি, তাতে মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব কেউ আমাকে কোনো হেল্প করতে পারে না। আমি এমন একটা বিরাট অন্যায় করে ফেলেছি, যার থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই নেই। সেইজন্যই ভাব যে আমার এখন মরে যাওয়াই ভালো।

–অন্যায় আর অন্যায়! তোর এই একটা অবসেশান তুই মুছে ফেলতে পারছিস না? যুদ্ধ করতে গেলে মানুষ মারতে হয়। যুদ্ধ ব্যাপারটাই একটা অন্যায় হতে পারে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল যুদ্ধে নেমে পড়লে মানুষ মারা অন্যায় নয়। নইলে নিজেকে মরতে হবে। তুইও একটা আদর্শের জন্য যুদ্ধে নেমেছিলি।

অতীনের চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠলো, শক্ত হয়ে গেল চিবুক, সে ঘাড় সোজা করে বললো, না, না, না, না, নর্থবেঙ্গলে আমি যে একজনকে মেরেছি, সেটা আমি মোটেই অন্যায় করিনি। বেশ করেছি মেরেছি! সেটা ছিল একটা সমাজবিরোধী, জোতদারের দালাল, ভাড়াটে গুণ্ডা, আমাদের দিকে আগে বোমা ছুঁড়েছিল, মানিকদা ইনজিওরড হয়েছিলেন, তারপরেও লোহার রড নিয়ে তেড়ে এসেছিল আমাদের দিকে। আমি তাকে গুলি না করলে সে-ই আমার মাথা ছাতু করে দিত। নট ওন্‌লি ফর সেলফ-ডিফেন্স, তাকে শাস্তি দেবার মরাল রাইট ছিল আমার হান্ড্রেড পারসেন্ট! বেশ করেছি তাকে মেরেছি! ওরা আমার নামে মিথ্যে কেস সাজিয়েছিল, কিন্তু আমি জানি, আমি কোনো অন্যায় করিনি।

সিদ্ধার্থ বললো, তুই যদি নিজেকে এত স্টাউটলি ডিফেন্ড করতে পারিস, তা হলে আর লজ্জা পাবার কী আছে? চোর-চোর ভাব করে থাকিস কেন? লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারিস না। দিনদিন তুই মরবিড হয়ে যাচ্ছিস। কাল তুই ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলি!

অতীনের শরীরটা আবার শ্লথ হয়ে গেল, নুয়ে গেল মুখ। মেঝের দিকে তাকিয়ে সে বললো, পালিয়ে থাকার সময় আমি এমন একটা কাজ করে ফেলেছি...প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে...মাথার ঠিক ছিল না...তারপর থেকে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না! অন্য কারুকে সে কথা বলতেও পারি না, কী যে করবো এখন তা বুঝতেও পারি না।

–ইডিয়েট, তুই সে কথা আমাকেও বলতে পারিস না? আমি তোর বন্ধু নই? একা একা ব্রুড করে তুই দিন দিন যে একটা ওয়ার্থলেস হয়ে যাচ্ছিস, তাতে কোনো লাভ আছে?

–কোনো বন্ধুই আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।

–আমি আজই সব শুনতে চাই। ইটস হাই টাইম...

সেই এক ঘোর বৃষ্টিময় বিকেলে অতীন একটা লোককে গুলি করার পর দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছিল। কোথায় যাবে সে? মানিকদার আস্তানায় যাওয়া যাবে না, ওরা মানিকদাকে চিনে ফেলেছে। কলকাতার বাড়িতেও ফেরা যায় না এখন, পুলিশ নির্ঘাৎ খোঁজ পেয়ে যাবে সে বাড়ির। কয়েক মিনিট আগেও অতীন জানতো না যে সে একটা লোককে খুন করবে। কিন্তু ওরাই আগে আক্রমণ করেছে, প্রায় বিনা কারণে, বিনা প্ররোচনায়...পুলিশ ওদেরই তাঁবেদার...পুলিশের হাতে ধরা পড়লে অত্যাচার করবে, বালির বস্তা দিয়ে পেটাবে, কানু সান্যাল-খোকন মজুমদারের সন্ধান জানবার জন্য জেরা করবে...তারপর কি ওরা অতীনকে ফাঁসি দেবে? কিছুতেই ধরা দেবে না অতীন, বিপ্লবীরা কখনো ধরা দেয় না, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়!

প্রথম রাতটা অতীন কাটালো মাদারিহাটের কাছে একটা জঙ্গলে। সারা রাত তার চোখে একফোঁটা ঘুম আসেনি। মাত্র দু'এক মিনিটের একটা ঘটনায় তার জীবনটা বদলে গেছে। সে এখন অন্য মানুষ। সে আর মমতা-প্রতাপ মজুমদারের ছেলে নয়, তাঁদের কাছে অতীন কী করে আর মুখ দেখাবে? অলির সঙ্গেও আর সম্পর্ক থাকবে না কিছু। অলির বাবার চোখে সে এখন অস্পৃশ্য, একটা ক্রিমিন্যাল।

সেই রাতেই অতীন বুঝেছিল যে জঙ্গলে একা একা লুকিয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানিকদা একবার বলেছিলেন বর্ডার ক্রস করে নেপালে চলে যাবার কথা। কিন্তু নেপালে গিয়ে সে কোথায় থাকবে? তার কাছে টাকাকড়ি নেই, নেপালে কোনো কনট্যাক্ট নেই। যদি সঙ্গে আর একজন কেউ থাকতো, তাহলে দু'জনে মিলে যুদ্ধ করে একটা কিছু করা যেত। তপনটা কোথায় গেল? কাপুরুষের মতন পালিয়েছে আগেই...

পরদিন সন্ধের অন্ধকারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অতীন মাদারিহাটে এসে রঞ্জিতকে খুঁজল। এই রঞ্জিত এখানে একটা ইস্কুলে পড়ায়,. কয়েকবার এসেছে শিলিগুড়িতে মানিকদার বাড়িতে। সে তাদের মতবাদে, বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী।

রঞ্জিতরা খুবই গরিব, দু'খানা মাত্র টিনের ঘরে মা-বাবা-ভাই-বোন মিলিয়ে সাতজন থাকে। সেখানে অতীনকে আশ্রয় দেবে কী করে? তা ছাড়া মাদারিহাটের মতন একটা ছোট জায়গায় একজন নতুন লোক দেখলেই জানাজানি হয়ে যাবে। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকবেই বা ক'দিন! রঞ্জিতদের বাড়ির গা ঘেঁষাঘেঁষি অনেকগুলো বাড়ি, সবই প্রাক্তন রিফিউজিদের, এক বাড়ির লোক অন্য বাড়িতে যখন তখন আসে।

খুনের কথা এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। রঞ্জিতের কাছ থেকেই অতীন খবর পেল যে মানিকদা ধরা পড়েননি। যে-ছেলেটি মারা গেছে, ফরোয়ার্ড ব্লকে তার নাম লেখানো থাকলেও সে ছেলেটি আসলে একটি গুণ্ডা। এর আগে সে বেশ কয়েকটা খুন করেছে। কিন্তু এখানে রটেছে যে সি পি এম-এর উগ্রপন্থীদের হাতে খুন হয়েছে ফরোয়ার্ড ব্লকের একজন কর্মী। তাই নিয়ে একটা মিছিল বেরিয়ে গেছে কুচবিহারে।

রঞ্জিত পরামর্শ দিল অতীনকে বিহারে চলে যেতে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের আওতার কাটিয়ে আসতে পারলে ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যাবে। কাটিহারে রঞ্জিতের এক মামাতো ভাই থাকে, সে যথাসাধ্য সাহায্য করবে অতীনকে।

রঞ্জিতের অত টানাটানির সংসার, তবু সে পঞ্চাশটা টাকা জোগাড় করে দিল অতীনকে। নিজের একটা জামা দিল এবং তার মামাতো ভাইয়ের নামে একটা চিঠি।

কিষানগঞ্জ দিয়ে অতীন ঢুকে পড়লো বিহারে। তারপর বাস ধরে পূর্ণিয়া, সেখান থেকে কাটিহার। বিহারে এসেই অতীন অনেকটা স্বাভাবিক বোধ করলো, যেন তার বিপদ কেটে গেছে, এখানে কেউ তাকে চেনে না।

এর মধ্যে কলকাতায় ফেরার কথা ছিল অতীনের। মাকে সে চিঠিটা যে কেন লিখতে গেল। ঠিক দিনে অতীন না পৌঁছোলে মা উতলা হয়ে উঠবেন। সোমবার দিন নিশ্চয়ই তার জন্য রান্না করে রেখেছিলেন মা। এখন অতীনের কাছ থেকে কোনো সাড়া শব্দ না পেলে মা-বাবা কী করবেন? প্রথমে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবেন শিলিগুড়িতে। কোনো উত্তর পাবেন না। তারপর? মা বাবাকে জোর করে পাঠাবেন শিলিগুড়িতে? কিংবা কৌশিকও আসতে পারে। কৌশিক পমপমেরা কি সব জেনে ফেলেছে? মানিকদা কোথায় গেলেন?

দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে অলিরা নিশ্চিত খোঁজ করবে অতীনের। আর কিছুদিন যাক, অলিকে সব কথা বুঝিয়ে একটা চিঠি লিখতে হবে।

কাটিহারে রঞ্জিতের মামাতো ভাইয়ের নাম পরাণ, একটা ছোট মনিহারি দোকান আছে তার। এরাও রিফিউজি কিন্তু ক্যাম্পে না থেকে কোনোক্রমে জীবনযাপনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। শুকনো, চিড়ে-চ্যাপ্টা গোছের চেহারা এই পরাণের, বছর তিরিশেক বয়েস, সে রাজনীতির ধার ধারে না। কিন্তু

রঞ্জিতের চিঠি পেয়ে সে কোনো প্রশ্ন করলো না, অতীনকে তার দোকানের কাজে লাগিয়ে দিল।

দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিয়েছিল অতীন, এবারে তাকে আরও কিছু ছদ্মবেশে নিতে হলো। প্যান্টের বদলে ময়লা ধুতি ও খালি গায়ে সে দোকানে বসে, স্নান করে না, চুল আঁচড়ায় না। তার চেহারা থেকে শহুরে পালিশটা একেবারে মুছে ফেলা দরকার। পারতপক্ষে খদ্দেরদের সঙ্গে কথাও বলে না অতীন। পরাণ দরদাম করে, অতীন জিনিসপত্র বেঁধে দেয়। স্টেশানের কাছে, রেলেরই জমি জবরদখল করে, টিনের ছাউনির দোকান, রাত্তিরে অতীন সেই দোকানেই শোয়। পরাণদের বাড়িতেই দু'বেলা খাওয়া, শুধু ডাল-ভাত আর একটা তরকারি, অধিকাংশ দিনই ঝিঙে বা ঢ্যাঁড়শের।

কাটিহারে পৌঁছোবার কয়েকদিন পরেই অতীন স্টেশানের খবরের কাগজে দেখলো যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের খবর। উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে ভূমি দখলের আন্দোলন একেবারে থিতিয়ে গেছে, কিন্তু কলকাতায় ছাত্রসমাজ সশস্ত্র কৃষক-বিপ্লবের সমর্থনে মিছিল বার করছে প্রায়ই।

টানা সাড়ে তিনমাস অতীন কাটিহারে রয়ে গেল সেই মনিহারি দোকানের বোকা-সোকা কর্মচারীর ছদ্মবেশে। বাড়িতে সে চিঠি লেখেনি, অলিকেও সে চিঠি লেখেনি। এই অজ্ঞাতবাস তার বেশ পছন্দই হয়ে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়ে যাবার ফলে পুলিশ এখন লাগামছাড়া। প্রতিদিন ডজন ডজন গ্রেফতারের খবর।

রঞ্জিত এর মধ্যে চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে অতীন যেন অন্য কোথাও চলে না যায়। মানিকদার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে, মানিকদা অতীনকে আপাতত কাটিহারে থাকতেই নির্দেশ দিয়েছেন।

পুরো শীতকালটা তার কাটলো বিহারের ঐ ক্ষুদ্র শহরে।

তারপর চৈত্রমাসে এক ঝড়-বৃষ্টির সন্ধ্যায় অতীন আর পরাণ যখন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ উপস্থিত হলো এক আগন্তুক। গায়ে বর্ষাতি মাথায় টুপী, মুখে চাপ দাড়ি, সে প্রায় ঝাঁপটা তুলে জোর করে দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়তেই অতীন একটা আড়াইসেরী বাটখারা তুলে নিয়েছিল হাতে। না লড়াই করে সে ধরা দেবে না।

ঐ বিচিত্র পোশাকের জন্য কৌশিককে চিনতে পারেনি অতীন। হঠাৎ এতদিন বাদে কৌশিককে দেখে তার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কৌশিক যেন তার সত্তার অপর একটি অংশ, কৌশিকের চেয়ে প্রিয় তার কেউ নেই।

পরাণকে প্রচুর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেই রাতেই ওরা দু'জন রওনা হলো রাজমহলের দিকে। তারপর সেখান থেকে ধন্যবাদ, রাঁচী ঘুরে জামসেদপুর।

কৌশিকের কাছ থেকেই অতীন জানলো চারু মজুমদারের আদর্শে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি মোটেই থেমে যায়নি, বরং সংগঠন গোপনে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কানু সান্যাল-মানিকদারা আশা করেছিলেন যে সি পি এম পার্টি ক্যাডারদের মধ্যে একটা বিরাট ভাঙন ধরবে, তারা অবলম্বন করবে চারুবাবুর প্রদর্শিত পথ। তা হয়নি অবশ্য। সি পি এম দল থেকে প্রায় হাজারজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তারপর তাদের পার্টির মধ্যে আর কোনো প্রকাশ্য মতবিরোধ নেই। কিন্তু ছাত্রসমাজ থেকে প্রচুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, এই আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের নানা প্রান্তে, তৈরি হয়েছে একটা অল ইণ্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি। একদিকে অন্ধ্র প্রদেশ অন্যদিকে পাঞ্জাব, এর মধ্যে শুরু হয়েছে মাওপন্থীদের মধ্যে যোগাযোগও সমন্বয়, খুব শিগগিরই একটা আলাদা পার্টি ফর্ম করা হবে। এখন অনেক কাজ!

কিন্তু অতীন এই সব কাজে এখন কোনো অংশ নিতে পারবে না। তপন ধরা পড়েছে, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পুলিশের কাছে সে অতীন ও মানিকদার নাম জানিয়ে দিয়েছে। ওয়ারেন্ট আছে এই দু'জনের নামে। এখন অন্তত এক বছর পশ্চিমবাংলায় অতীনের ঢোকা চলবে না। তারপর দিকে দিকে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলে পুলিশের ঐসব হুলিয়া-টুলিয়া তুচ্ছ হয়ে যাবে।

কৌশিক খানিকটা ভর্ৎসনার সুরে অতীনকে বলেছিল, এই সময়টায় আমাদের গোপনে গোপনে সংগঠন জোরদার করার কথা, এর মধ্যে তোরা এমন একটা বেমক্কা কাজ করে ফেললি! এখন খুন জখমের মধ্যে যাবার কী দরকার ছিল?

অতীন উত্তর দিয়েছিল, আমরা কি প্ল্যান করে কিছু করেছি নাকি? হঠাৎ হয়ে গেল। মানিকদা চারুবাবুর কাছ থেকে একটা গোপন মেসেজ নিয়ে যাচ্ছিলেন খোকন মজুমদারের কাছে, মাঠের মধ্যে

ওরা হঠাৎ আমাদের অ্যাটাক করলো...

—মানিকদা বলেছেন, তুই মাথা গরম করে হঠাৎ গুলি চালিয়ে দিলি! ওকে একেবারে প্রাণে মেরে না ফেললে চলতো না?

—মানিকদা বলেছেন এই কথা? আমি না মারলে ওরা নির্ঘাৎ আমাদের মেরে ফেলতো। ওরা মারতেই এসেছিল। মানিকদার গায়ে বোমা ছুঁড়েছিল, তারপর লোহার রড নিয়ে তেড়ে এসেছিল! তুই জানতি, কৌশিক, মানিকদার সঙ্গে রিভলভার থাকে?

—সেই রিভলভারটা নিয়ে তুই কি ওদের ভয় দেখাতে পারতি না?

—ওরা কি ভয় পাবার মতন মানুষ? মানিকদার হাতে রিভলভার দেখেও ওরা বোমা ছুঁড়েছিল। খুন করতে ওদের হাত কাঁপে না। জানিস কৌশিক, দু'এক মুহূর্তের এদিক ওদিক, আমার গুলি যদি লোকটার গায়ে না লাগতো, ও আর একটা বোমা ছুঁড়লেই আমরা শেষ হয়ে যেতাম। হ্যাঁরে, তপন ধরা পড়ে সব বলে দিল? হারামজাদা বাঙালটা এত ভীতু?

—জেলের মধ্যে আমাদের অন্য ছেলেও আছে। তাকে দিয়ে তপনের ওপর ওয়াচ রেখেছি। তবে আমার মনে হয় ও রাজসাক্ষী হবে না। অনেকে সহ্য করতে পারে না, বুঝলি, প্রথমটায় ভেঙে পড়ে, তারপর আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে ওঠে। মানিকদা এখনও তপনকে অবিশ্বাস করেন না।

—মানিকদা কোথায়?

—সেকথা তোকে বলা যাবে না। বাই চান্স তুই যদি ধরা পড়িস, তাতে টর্চারের মধ্যে তুই যাতে বলে না ফেলিস, সেই জন্য এই প্রিকশান। তুই না জানলে আর বলবি কি করে? আরে, না না, তোকে অবিশ্বাস করছি না। তুই তপনের মতন উইক সেকথাও বলছি না, তবে এই রকমই একটা সিস্টেম করা হয়েছে। আর মানিকদার সেফটির ওপর আমরা ম্যাক্সিমাম জোর দিয়েছি। মানিকদার শরীর খারাপ।

—আমার বাড়ির কোনো খবর জানিস?

—হ্যাঁ, সবাই ভালো আছেন। আমি মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কোর্টে দেখা করে বলেছি, আপনার চিন্তা করবেন না। বাবলু ভালো আছে। তুই কোথায় আছিস সে কথা জানাইনি অবশ্য।

—বাবা কী বললেন তোকে?

—অত্যন্ত স্ট্রেঞ্জ ব্যবহার করলেন। আমার কথাগুলো সব শুনলেন মন দিয়ে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না, একটা কথাও বললেন না আমাকে। সব শোনার পর চুপ করে রইলেন, সিগারেট টানতে লাগলেন। এবার তোর হাতের লেখা দু'লাইন চিঠি নিয়ে গিয়ে তোর মাকে দেখাবো।

—আর অলি? তোর সঙ্গে অলির দেখা হয়েছিল এর মধ্যে?

—না, অলির সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে খবর পেয়েছে নিশ্চয়ই। তুই কিন্তু পোস্টে কোনো চিঠি পাঠাসনি বাবলু! স্ট্রিকটলি নিষেধ!

জামসেদপুরে সতীশ মিশ্র নামে একজন ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে তোলা হলো অতীনকে। ভদ্রলোক কিছুদিন আগে বিপত্নীক হয়েছেন, দুটি অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে আছে। অতীন তাদের গৃহশিক্ষক। সতীশ মিশ্র মুঙ্গেরের লোক হলেও যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনো করেছেন, মোটামুটি বাংলা জানেন। ভদ্রলোক কথা বলেন কম, কিন্তু বেশ সাহসী মানুষ। অতীনের পটভূমিকা তিনি জানেন, তিনি অতীনকে বলে দিয়েছেন, দিনের বেলা বিশেষ বেরুবেন না, তাহলে আর ভয়ের কিছু নেই।

জামসেদপুরে অতীনকে ঠিকঠাক ভাবে স্থিতি করিয়ে দিয়ে কৌশিক ফিরে গেল।

এই সতীশ মিশ্রের বাড়ির পাশেই থাকে একটি বাঙালী পরিবার। সেই পরিবারে দুটি মেয়ে এ বাড়ির মাতৃহীন ছেলেমেয়েদুটির জন্য মাঝে মাঝেই নানারকম খাবার ও খেলনা নিয়ে আসে। অতীনের মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ থাকলেও বড় মেয়েটি তাকে দেখেই চিনতে পারলো। এই মেয়েটির নাম শর্মিলা, জলপাইগুড়ির এক চা-বাগানে এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অতীন আর কৌশিকদের। শর্মিলার সব মনে আছে।

জামসেদপুরে ঐ বাড়িতে অতীনের কাটতে লাগলো মাসের পর মাস। এখানে অতীন নিয়মিত ইংরিজি খবরের কাগজ পায়। সে জানতে পারলো, কানু সান্যাল ধরা পড়ে গেছেন। মানিকদার কোনো খবর নেই। রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে দেবার দাবিতে জোরদার আন্দোলন চলছে কলকাতায়। বামপন্থীরা

অন্তর্বর্তী নির্বাচন চাইছে।

কৌশিক সেই যে গেল আর তার আসার নাম নেই। তবে তার কাছ থেকে খবর নিয়ে এর মধ্যে আরও দু'জন এসেছিল, তারা কেউই অতীনের চেনা নয়। তাদের একজনের হাতে অতীন পেয়েছিল তার মায়ের চিঠি। অতীনও তাদের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল দু'খানা।

জামসেদপুরে বাঙালীর সংখ্যা অনেক, দুর্গাপুজো হয় বেশ কয়েকটা। সাকচিতেই প্রায় পাশাপাশি দুটো প্যান্ডেল। এই সময় সবকিছুই ঢিলেঢালা। তাই অতীন ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলো দিনের বেলায়। পুজো প্যান্ডেলে যাওয়ার যে খুব আগ্রহ আছে তার তা নয়, কিন্তু সে স্বাধীনতা ভোগ করতে চাইছিল।

নবমী পূজোর দিন ভোরবেলা এক গাড়ি পুলিশ এসে বাড়ি ঘিরে ধরলো এবং অতীন গ্রেফতার হলো প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায়। পাঁচদিন পর তাকে নিয়ে আসা হলো আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

পরে অবশ্য অতীন জেনেছিল যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছেন অলির বাবা বিমানবিহারী।

এত গোপনীয়তার মধ্যেও কী করে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল অতীনের অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা। প্রতাপ-মমতা জেনেছিলেন, অলি জেনেছিল। অলি কৌশিককে ধরে ছিল, সে একবার অতীনের সঙ্গে দেখা করতে জামসেদপুরে যাবে। সে উদ্যোগ নেবার আগেই বিমানবিহারী প্রতাপের কাছ থেকে জানতে পেরে গেলেন জামসেদপুরের কথা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিশ কমিশনরের কাছে গিয়ে সব ঘটনা জানিয়ে এলেন।

বিমানবিহারী আসলে একটা সূক্ষ্ম বুদ্ধির চাল চেলেছিলেন।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বামপন্থীদের নির্বাচনী শ্লোগানের মধ্যে আছে যে, ক্ষমতায় এলে তারা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবেন। বিমানবিহারী হাওয়া দেখে বুঝেছিলেন যে বামপন্থীদের যুক্তফ্রন্টের আবার জয়ী হয়ে ফিরে আসার সম্ভবনাই খুব বেশি।

অতীন আত্মগোপন করে থাকলে তার নামে ওয়ারেন্ট রদ করা সহজ হবে না। বরং কিছুদিন রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে জেল খাটলেই নির্বাচনের পর তার মুক্তি পাওয়ার সুযোগ খুব উজ্জ্বল।

বিমানবিহারীর অনুমান প্রায় নির্ভুল। মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয় হলো, জ্যোতি বসু হলেন হোম মিনিস্টার এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলেন, তাঁদের ঘোষিত শত্রু কানু সান্যালরাও ছাড়া পেয়ে গেলেন। কিন্তু অতীনের কেসটা আটকে গেল। নথীপত্রে দেখা গেল অতীন রাজনৈতিক বন্দী নয়, তার নামে ক্রিমিন্যাল কেস, সে সাধারণ একটা খুনের আসামী।

এদিকে অতীনকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা সব পাকা হয়ে গিয়েছিল। প্রতাপ ত্রিদিবকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন ইংল্যান্ডের অতীনকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিয়ে। ত্রিদিব রাজি হয়েছিলেন সাগ্রহে। উঁচু মহলের বিভিন্ন ব্যক্তিকে ধরে অতীনের পাশপোর্ট এবং টিকিটেরও বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে সব আটকে যাবার উপক্রম হলো।

কানু সান্যাল সমেত পরিচিত অন্যান্যরা সবাই ছাড়া পেয়ে গেলেও অতীন যখন মুক্তি পেল না, তখন সে খুবই ভেঙে পড়েছিল। বিমানবিহারী কিন্তু হাল ছাড়েননি। একটা প্রবল ঝুঁকি নিয়ে তিনি অতীনকে পাঁচ হাজার টাকার জামিনে খালাস করে আনলেন। তারপর জামিন ভঙ্গ করে তিনি অতীনকে তুলে দিলেন বিদেশের জাহাজে।

অতীন বিদেশে যেতে একেবারেই রাজি ছিল না। বাবা এবং বিমানকাকাকে সে অনেকবার বলেছে যে মুক্তি পেলেও সে লন্ডনে যাবে না। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা সে যখন পেল না, সাধারণ ক্রিমিন্যাল হিসেবে কয়েকদিনের জন্য মাত্র জামিনে ছাড়া পেয়ে তার দিশেহারা অবস্থা। আবার তাকে জেলে যেতে হবে। বিচারে তার ফাঁসি না হলেও চৌদ্দ বছর অন্তত জেল খাটতে হবে, কৌশিকই তখন বলেছিল, অলির বাবা ঠিক পথই বাতলেছেন। কিছুদিনের জন্য অন্তত বিলেতে থেকে আয়, এর মধ্যে তোর কেসটাকে পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল দিতে হবে। বিমানবিহারী জ্যোতিবাবুকে বোঝাবেন, স্নেহাংশু আচার্যের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা..

কলকাতার ময়দানে যে দিবসে কানু সান্যাল প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন নতুন এক রাজনৈতিক দলের জন্মের। দলটার নাম সি পি আই (এম এল) এবং এই দল পরিচালিত হবে মাও সে তুং-এর চিন্তাধারায়। মাও সে-তুং এর একটি রেড বুক আন্দোলিত করে তিনি বললেন, এই দলই ভারতে প্রথম সঠিক বিপ্লবী দল।

ঐ দিনই ময়দানের অন্য প্রান্তে আর এক বিশাল সভায় জ্যোতি বসু বললেন, তাঁর সরকার একদিনে নকশালদের দমন করতে পারে কিন্তু তিনি জনসাধারণের হাতেই সে ভার ছেড়ে দিতে চান। নকশালদের রাজনৈতিক বক্তব্য মোকাবিলা করা হবে রাজনৈতিক ভাবে, কিন্তু তাদের খুন-জখমের ক্রিয়াকর্মগুলো সাধারণ অপরাধীদের মতন বিচার করা হবে আইনের চোখে।

তার পরদিনই অতীন জাহাজে ভেসে পড়লো।...

সিদ্ধার্থ বললো, তোর বিলেতে থাকার অভিজ্ঞতাগুলো আমি শুনেছি। কিন্তু জামসেদপুরে কী হয়েছিল? এখন বোস্টনে যে শর্মিলা থাকে, তার সঙ্গে তোর আলাপ জামসেদপুরে? সেখানেই প্রেম হয়েছিল?

অতীন চুপ করে রইলো। সিগারেট ধরাতে গিয়ে তার হাত কাঁপছে। সে আর কথা বলতে পারছে না। শর্মিলার সঙ্গে কি তার প্রেম হয়েছিল? না বন্ধুত্ব? মাসের পর মাস সেই অজ্ঞাতবাসে শর্মিলাই ছিল তার কথা বলার একমাত্র সঙ্গী। সঙ্গিনী নয়, সঙ্গীই। অতীন প্রথম বেশ কিছুদিন শর্মিলাকে মেয়ে হিসাবে গ্রহণ করেনি, সহজ বন্ধুর মতন ছিল। অলি ছাড়া আর কোনো মেয়েকে ভালোবাসার কথা সে চিন্তাই করেনি।

কিন্তু পরপর কতকগুলো নির্জন দুপুর, অতীনের তখন প্রায়ই জ্বর হতো, শর্মিলা এসে সেবা করতো তাকে, এমন চমৎকার মেয়ে শর্মিলা, সরল ভুলোমনা, পবিত্র। তার হাতের ছোঁয়ায় জাদু ছিল, প্রবল জ্বরের ঘোরে অতিনের একদিন মনে হলো শর্মিলই অলি, সে তাকে জড়িয়ে ধরলো, বুকের কাছে টানলো, শর্মিলা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল নিজেকে।

একজন বিপ্লবীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায় রোমাঞ্চিত বোধ করতো শর্মিলা। অসুস্থ, অসহায় এই মানুষটিকে সেবা করে অদ্ভুত তৃপ্তি পেত, কিন্তু তার কোনো প্রেমের বোধ ছিল না। অতীন তো তাকে কোনোদিন ভালোবাসার কথা বলে নি। বিপ্লবীদের নিয়ম অনুযায়ী অতীন শর্মিলাকে তার পূর্ব পরিচয় কিছুই জানায় নি, অলির কথা, তার বাবা-মায়ের কথা, মানিকদার কথা একবারও উচ্চারণ করে নি সে।

কিন্তু মাসের পর মাস অনিশ্চিত অবস্থা, তার ওপর অসুখে ভুগে ভুগে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল অতীন, তার মধ্যেই জেগে উঠেছিল এক প্রবল শারীরিক টান, এক এক সময় জ্বরের ঘোরে সে শর্মিলাকেই অলি মনে করে আদর করতে চাইতো। অলিকে সে ভালোবাসে, কিন্তু এখন অলি কেন তার কাছে নেই? এক অদ্ভুত, অযৌক্তিক অভিমান হচ্ছিল অলির ওপর। নারী-শরীরের স্পর্শের জন্য সে ছটফট করতো।

শর্মিলা কিন্তু অতীনকে কখনো প্রশ্রয় দেয় নি, প্রলুব্ধ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তখনও যেন শর্মিলার যৌন চেতনা জাগে নি। অসুস্থ একজন মানুষকে সে ধমক দিতে পারে না, কিন্তু অতীন বাড়াবাড়ি করতে গেলেই সে দূরে সরে যায়।

তিনদিন পর অতীন শর্মিলার জানু ধরে বললো, আমি তোমাকেই চাই!

শর্মিলাকে রাজি করাতে আরও সাতদিন লেগেছিল অতীনের। সেদিন একশো চার জ্বর, সে কিছুতেই ডাক্তার ডাকবে না, সে শুধু শর্মিলাকে চায়। শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়লো শর্মিলার। সে অতীনের বুকে এলো। তারপর একটা প্রবল জোয়ার উঠলো, সে জোয়ারে ছেঁড়া চিঠির টুকরোর মতন অতীন ভাসিয়ে দিল অলিকে।

॥ ৮ ॥

আরিচা ঘাটে বিশাল যমুনা নদীর দিকে তাকিয়ে মামুন ভাবলেন, নিয়তি এবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে? সামনে কী আছে?

অন্ধকার হয়ে এসেছে। আজ আর নদী পার হবার কোনো উপায় নেই। অন্য সময় আরিচার এই ফেরীঘাটে কত ব্যস্ততা থাকে, আজ একেবারে শুনশান, একটাও লঞ্চ নেই, সৈন্যরা যাতে ব্যবহার করতে না পারে সেইজন্য সব কা ফেরী লঞ্চ ওপারে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ঢাকা থেকে অনেকগুলো পরিবার এই ফেরীঘাটে এসে দাঁড়িয়ে আছে অসহায়ভাবে। কেউ কোনো কথা বলছে না, এমনকি শিশুরা পর্যন্ত ভয়ে চুপ করে আছে।

একটু পরে কয়েকটি ছেলে এসে বললো, আপনারা ইস্কুল বাড়িতে যান, ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। তাছাড়া আর কী করবেন!

সেই ছেলেরাই সাহায্য করলো মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে। স্কুলের দোতলার একখানা ঘরে আরও দুটি পরিবারের সঙ্গে জায়গা পেলেন মামুনরা। হেনা আর মঞ্জু শুয়ে পড়লো দেয়াল ঘেঁষে, মঞ্জুর ছেলে সুখুকে নিয়ে মামুন আবার বেরুলেন কিছু খাবার কিনে আনার জন্য। পুঁটুলিতে করে বেশ খানিকটা চিঁড়ে-গুড় নিয়ে এসেছেন মামুন, তা থাক ভবিষ্যতের জন্য, এখানে দু'একটা খাবারের দোকান খোলা রয়েছে।

সুখুর হাত শক্ত করে ধরে আছেন মামুন। ট্রাকে করে আরো লোক আসছে, ফেরী বন্ধ দেখে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছোটাছুটি করছে অনেকে, এরপর আর ইস্কুল বাড়িতেও জায়গা হবে না। এত লোক রাত্তিরে থাকবে কোথায়? দোকানগুলো থেকেও খাবার শেষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত, মামুন ছ'খানা রুটি আর কিছু শুকনো কাবাব জোগাড় করতে পারলেন অতি কষ্টে।

খাবারের দোকানে স্থানীয় একজন স্কুল মাস্টার বিবর্ণমুখে মামুনকে জিজ্ঞেস করলেন, ঢাকায় ঠিক কী হয়েছে বলেন তো! নানাজনের কাছে নানান কথা শুনতেছি। আমার ফেমিলি আছে ঢাকায়, তাগো কোনো খবর পাই নাই।

মামুন শুধু বললেন, ঢাকার খবর ভালো নয়!

তা ছাড়া আর কী বলবেন মামুন। এখনো সব কিছুই যেন এক অবিশ্বাস্য, চরম দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। এ কী সত্যি হতে পারে যে নিজের দেশের সরকার রাস্তায় মিলিটারি নামিয়ে সাধারণ নিরীহ লোকদের পর্যন্ত গুলি করে মারছে? কোনো যুক্তিতেই এটা বিশ্বাস করা যায় না, তবু এটাই ঘটছে। ঢাকার পথে পথে পড়ে আছে নির্দোষ মানুষের লাশ।

পঁচিশে মার্চ রাতে এই ভয়বহ কাণ্ড শুরু হবার পর মামুন কোনোক্রমে বাড়ি ফিরে তারপর আর তিন চারদিন তিনি পথে বার হননি। তবু তিনি একসময় বুঝতে পারলেন যে ঢাকায় থাকা তাঁর পক্ষে কোনোক্রমেই নিরাপদ নয়। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুঁজে আওয়ামী লীগের সদস্যদের খুন করছে, সেই সঙ্গে মারছে সাংবাদিক, অধ্যাপক ও ছাত্রদের। কোনো দেশের আর্মি কামান দেগে প্রেস ক্লাব উড়িয়ে দেয়, এরকম কেউ শুনেছে? বাঙালী পুলিশদের মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌সের সৈন্যদের নিরস্ত্র করে খতম করে দেবারও চেষ্টা করেছে। ইয়াহিয়া খান কি উন্মাদ হয়ে গেল, সমগ্র বাঙালী জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে সে পাকিস্তান শাসন করবে?

শেখ মুজিবের কোনো সন্ধান নেই। তিনি নিজেই আত্মগোপন করেছেন, না সৈন্যরা তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে গেছে, তা কেউ জানে না। কিন্তু জানতে পারা গেছে যে বাঙালীরা শুধু পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে না, দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। চট্টগ্রামে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স তুমুল লড়াই করছে পশ্চিম পাকিস্তানী আর্মির সঙ্গে। চট্টগ্রাম শহর থেকে কিছুটা দূরে কালুরঘাটে রেডিও ট্রান্সমিটিং সেন্টারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র, সেখান থেকে জাতির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে জিয়াউর রহমান নামে একজন মেজর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে?

গতকাল মামুন দেখলেন তাঁর বন্ধু কবি ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদকে। আর্মি এসে যখন প্রেস ক্লাবের লাল রঙের বিল্ডিংটাতে কামান দাগতে শুরু করে, তখন ফয়েজ ছিলেন ঐ প্রেস ক্লাবের দোতলায়। সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেও তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটা মসজিদে। তিনদিন তিনরাত একটা বাথরুমে লুকিয়ে থেকে কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন সেই ফয়েজ আহমদ মামুনকে বললেন, পালাও ঢাকা থেকে পালাও কোনো গ্রামে চলে যাও, ওরা আমাদের শেষ করে দেবে, 'ইত্তেফাক'-এ যারা এক লাইনও লিখেছে, তাদের কারুকে ওরা ছাড়বে না। মামুন, তুমি আজই সরে যাও ঢাকা থেকে।

ফিরোজা বেগম কয়েকদিন আগে ছোট মেয়েকে নিয়ে টাঙ্গাইলে বাপের বাড়িতে গেছেন, তাঁকে খবর দেবার উপায় নেই। মামুনের পক্ষে টাঙ্গাইলে যাওয়াও নিরাপদ নয়, সেখানেও নিশ্চয়ই তাঁর খোঁজ পড়বে। বড় মেয়ে হেনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই মঞ্জু এসে বললো, সেও তার ছেলেকে নিয়ে মামুনের সঙ্গে যাবে। বাবুল এখন ঢাকা ছেড়ে যেতে রাজি নয়, তবে মামুনের সঙ্গে

তার স্ত্রী ও সন্তানকে পাঠাতে তার আপত্তি নেই।

বাবুলের ব্যবহারটা বেশ বিচিত্র। পঁচিশে মার্চ রাত্তিরে শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের চূড়ান্ত মিটিং হবার কথা, কিন্তু তার আগেই প্রেসিডেন্ট সাহেব সন্ধ্যেবেলা চুপিচুপি বিশেষ বিমানে ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন করাচীর দিকে। সৈন্যবাহিনীকে হুকুম দিয়ে গেলেন, নিরস্ত্র বাঙালীদের হত্যা করতে। এই দারুণ বিশ্বাসঘাতকতাতেও বাবুল বিচলিত নয়। তার ধারণা, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সব শান্ত হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে সামরিক শাসন পাকিস্তানের পক্ষে অনেক ভালো।

চতুর্দিকে খুন ও অত্যাচারের কাহিনী শুনে মঞ্জু ভয় পেয়ে আগেই ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে চাইছিল, কিন্তু বাবুল তাতে কর্ণপাত করে নি। সে বলেছে, এতে ভয় কিসের? ঐ তো দ্যাখো না, জাহানারা ইমামরা কি পালিয়েছেন? কামাল কিংবা পল্টনরা তো ইন্ডিয়ায় যাচ্ছে না। আমাদের বাসায় কোনো অ্যাটাক হবে না।

কিন্তু মামুনের সঙ্গে মঞ্জু গ্রামের দিকে যেতে চায় শুনেই বাবুল হঠাৎ মত বদলে ফেললো। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই বললো, তুমি তোমার মামুনমামার সঙ্গে যেতে চাও? তা হলে যাও।

মঞ্জু তার স্বামীকেও সঙ্গে আনবার জন্য খুব সাধাসাধি করেছিল, তবু বাবুলকে টলানো গেল না। শেষ মুহূর্তে মঞ্জু তার হাত ধরে কাতর ভাবে বলেছিল, তুমি সাবধানে থাকবে কথা দাও!

বাবুল হেসে বলেছিল, তোমরা ভালো থেকো!

একখানা গাড়ি জোগাড় করা হয়েছিল এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে। বিকেল চারটে থেকে কারফিউ, সকালে হঠাৎ গুজব শোনা গেল যে মীরপুরের কাছে ব্রীজটা উড়ে গেছে, ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু রেডিওতে ঘোষণা করা হচ্ছে যে মীরপুরের ব্রীজ ঠিক আছে, যানবাহন সব চলছে স্বাভাবিক ভাবে। ঝুঁকি নিয়ে মামুন বেরিয়ে পড়লেন। মীরপুরের কাছে এসে দেখলেন, ব্রীজের পাশে আর্মি ঘোরাঘুরি করছে, ব্রীজটার ক্ষতি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এরমধ্যেই মেরামত করা হয়েছে অনেকটা। মীরপুর ছাড়িয়ে আমিনবাজারের কাছে আসতেই চোখে পড়লো আর্মি কনভয়। মেশিনগানের লম্বা নলগুলো দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। মামুন মাথা নীচু করে রইলেন, যেন তাঁর মুখ কেউ দেখতে না পায়। তাঁর অতি প্রিয় ঢাকা শহর ছেড়ে তিনি পালাচ্ছেন চোরের মতন। নয়ারহাটে পৌঁছোতেই শুনতে পেলেন পেছনে গোলাগুলির শব্দ। সেনাবাহিনী আবার কোথাও শুরু করেছে ধ্বংসযজ্ঞ।

কোথায় যে যাবেন মামুন তা এখনও ঠিক করতে পারেননি। একবার ভাবেলন, মানিকগঞ্জে তাঁর এক ছেলেবেলার বন্ধু থাকে, তার বাড়িতে উঠবেন। তারপর আবার ঠিক করলেন, ঢাকা থেকে আরও অনেক দূরে সরে যাওয়াই ভালো, পাবনা কিংবা বগুড়ার দিকে।

আরিচা ঘাটে এসে যে ফেরীর অভাবে এভাবে আটকা পড়তে হবে তা আগে কল্পনা করতে পারেননি। যদি কালকেও ফেরী না চলে? এই বিশাল নদী নৌকোতে পার হওয়া যায় বটে কিন্তু এত মানুষ এসে জমা হয়েছে, নৌকোও পাওয়া যাবে কী? হেনা, মঞ্জু আর সুখুকে সঙ্গে এনে তিনি আরও মুশকিলে পড়েছেন, একলা হলে তাঁর দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না। যে-সব মানুষ উদ্যোগী হয়ে যে-কোনো পরিস্থিতিতে ঝটপট একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতে পারে, মামুন যে সেই দলে পড়েন না। তিনি ভালো করে মিশতেই পারেন না অচেনা লোকের সঙ্গে।

খাবার নিয়ে ফিরে এসে ইস্কুল বাড়ির দোতলায় উঠতে উঠতে একজন লোককে দেখে মামুনের চেনা চেনা মনে হলো। বেশ হৃষ্টপুষ্ট কালো চেহারা, মোটা গোঁফ, মাথায় অনেক চুল, মামুনকে দেখে সেই মানুষটিও থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, মামুনভাই!

মামুনের তখনই মনে পড়ে গেল, এই মানুষটিকে তিনি ইত্তেফাক অফিসে দেখেছেন একসময়, সম্ভবত রিপোর্টারের কাজ করতো, খুব রসিক লোক, নিজে প্রাণ খুলে হাসতে এবং অন্যদের হাসাতে জানে। এর নাম এম আর আখতার। সবাই ডাকতো মুকুল বলে। মাঝখানে অনেকদিন এর সঙ্গে দেখা হয়নি।

এখন হাস্য-পরিহাসের সময় নয়, প্রত্যেকের ভুরুতেই উদ্বেগ মাখানো, কথাও সব এক। চেনাশুনো কে কে মারা গেছে আর কার কার সন্ধান নেই। দু'চারটি কথার পর মামুন আখতারকে

অনুরোধ করলেন, কাল নৌকোর ব্যবস্থা করতে পারলে আমাদেরও সঙ্গে নেবেন।

আখতার বললেন, অবশ্যই, অবশ্যই!

মাঝ রাত্তিরে সবাই যখন শুয়ে পড়ছে, নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে বাতি, কে ঘুমিয়েছে, কে যে জেগে আছে তা বোঝার উপায় নেই, তখন মামুন শুনতে পেলেন একটি নারীকণ্ঠের কান্না। কোনো ভাষা নেই, শুধু একটা টানা শব্দ, সে শব্দ যেন উঠে আসছে হৃদয়ের অতল গভীর থেকে, এমনই একটা তীব্র শোক আছে সেই কান্নার সুরে যা শুনলেই বুকটা মুচড়ে ওঠে।

একটু পরেই মঞ্জু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, মামুনমামা, কে কান্দে?

পাশ থেকে হেনা বললো, এই ঘরে কেউ না।

মামুন বুঝলেন, হেনা আর মঞ্জু জেগেই আছে, আজ রাতে বোধহয় কারুরই ঘুম হবে না। কান্নার শব্দটা এক ঘরের নয় ঠিকই। মামুন উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। সব কটা ঘরেই মানুষজন ভরা, কোনো ঘরেরই দরজা বন্ধ নয়, মামুন একটার পর একটা ঘরে গিয়ে উঁকি মারলেন, কোনো ঘরেই সেই ক্রন্দনরতা নারীকে দেখতে পেলেন না। আরও অনেকে সেই কান্নার শব্দ শুনে উঠে বসেছে।

হঠাৎ মামুনের শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠলো। এই কান্না কি অশরীরী? কিংবা সারা দেশ জুড়ে স্বামীহারা, সন্তানহারা, ভাইহারা নারীরা যে কান্নার রোল তুলেছে, এই কান্না তারই প্রতীক। দেশ-জননীই এমন আকুল হয়ে কাঁদছে।

পরদিন ভোরে উঠে ফেরীঘাটে এসে পাওয়া গেল একটা নৌকো। বিকেলের দিকে নৌকো পৌঁছোলো নগরবাড়ি। সেখানে এসে মামুন শুনলেন যে পাবনায় গণ্ডগোল চলছে খুব, সেই তুলনায় বগুড়ার খবর আশাপ্রদ। বগুড়ায় ছাত্ররা মুক্তিবাহিনী গঠন করে বেশ কিছু পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা করেছে, বাকি সৈন্যরা পালিয়ে গেছে। বগুড়ায় আপাতত কোনো শত্রুর চিহ্ন নেই। সুতরাং মামুন ঠিক করলেন, পাবনার বদলে তিনি বগুড়ার দিকেই যাবেন।

কিন্তু যাওয়া যাবে কী করে? নগরবাড়িতেই শোনা গেল যে পেট্রল-ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও, বাস চলাচল বন্ধ হয়ে আসছে প্রায়। তা ছাড়া, নানান জায়গায় গ্রামের লোকেরা রাস্তা কেটে রেখেছে, যাতে আর্মির ট্রাক যেতে না পারে। বহুলোক এখন শহর ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে গ্রামের দিকে।

বগুড়ার দিকের একটা বাস পাওয়া গেল ভাগ্যক্রমে। তাতেও অবশ্য যাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত বাঘাবাড়ির কাছাকাছি এসে দেখা গেল রাস্তা বন্ধ, রাস্তার মধ্যে গাছ কেটে ফেলা রয়েছে, কিছুটা রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এবার হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। মামুন সঙ্গে মালপত্র বিশেষ কিছু আনেননি, শুধু কয়েকটা কাঁধ ব্যাগ। সুখু বেশ হাঁটতে পারে, তাতে কোলে নিতে গেলেই বরং সে আপত্তি করে। হেনা আর মঞ্জু শহুরে মেয়ে, তাদের হাঁটার অভ্যেস নেই, চৈত্রমাসের গনগনে রোদে তাদের মুখ লাল হয়ে ওঠে।

বাঘাবাড়ির ঘাট পেরুবার পর পাওয়া গেল আর একটি অতি লজ্ঝড়ে চেহারার বাস। একটি ছোকরা কন্ডাকটর সেই বাসের গা চাপড়ে চাপড়ে চলছে, আসেন, আসেন, পংখীরাজ, পংখীরাজ! লাস্ট ট্রিপ, আর চান্স পাইবেন না!

প্রতি মুহূর্তে থেমে যাবে থেমে যাবে ভাব করেও সেই বাসটা চলতে লাগলো বেশ। এক সময় তাকে বাধ্য হয়ে থামতে হলো অবশ্য, সেটা তার নিজের দোষে নয়। উল্লাপাড়া লেভেল ক্রসিং-এ রাস্তা বন্ধ, একটা মালগাড়ি দিয়ে সেই ক্রসিংটা আটকে দেওয়া হয়েছে। বাস রেল লাইনের ওপারে যেতে পারবে না। বাস থেকে নেমে আবার পদযাত্রা।

আখতার সাহেব করিৎকর্মা মানুষ, তিনি উল্লাপাড়া ডাক বাংলোতে রাত্তিরটা থাকার ব্যবস্থা করে ফেললেন। মামুনরা এই পরিবারটির সঙ্গ নিয়ে কিছুটা সুবিধা ভোগ করছেন। আখতার সাহেবের চেয়ে মামুন বয়সে প্রবীণ, তাছাড়া একটা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং জেল খেটেছেন বলে লেখক-সাংবাদিকদের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু আখতারের মতন একজন চেনা লোক না পেলে কেউ এই ডামাডোলের মধ্যে তাঁকে পাত্তাই দিত না।

ডাকাবাংলোর বেয়ারা-চৌকিদার সব উধাও। খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই। হোটেলও নেই এখানে। শোনা গেল যে বাজারের কাছে একটা লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে, সেখানেই একমাত্র খাবার

পাওয়া যেতে পারে। অগত্যা যেতে হলো সেখানেই। লঙ্গরখানায় অনেকেই পাত পেড়ে বসে গেছে, দেওয়া হচ্ছে শুধু গরম ভাত আর ডাল। আর কিছু না। আখতার সাহেবের ছেলে মেয়েরা আর সুখু মিশ্রা সেই ভাত ডাল নিয়ে বসে রইলো, তাদের ধারণা, এরপর কোনো তরকারি বা ভাজাটাজা আসবে। শুধু ডাল আর বাত যে খাওয়া যায়, তা তারা জানেই না। মামুন দেখলেন, মঞ্জুর চোখ চলছল করছে। তিনি ফ্যাকাসে ভাবে বললেন, এরপর যে ভাগ্যে আরও কী আছে তা কে জানে!

সেই রাত্রে মামুনের হু হু করে জ্বর এসে গেল। মামুন নিজের ওপর মহা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এই কি জ্বরের সময়? যেতে হবে আরও অনেকটা পথ। তার জ্বরের কথা টের পেয়ে গেলে অন্যরা বিব্রত হবে। কিছুতেই কারুকে জানানো চলবে না। সুখু তাঁর বুক ঘেঁষে শুয়েছে। বাচ্চা ছেলে হলেও সে জ্বরতপ্ত শরীর ছুঁয়ে বুঝতে পারবে ঠিকই, মামুন তাই খানিকটা সরে গেলেন।

বগুড়ায় মহিলা কলেজের সামনে ছাত্রদের সঙ্গে পাকিস্তানী আর্মির জোর লড়াই হয়েছে, শেষ পর্যন্ত খান সেনারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। আঁড়িয়াবাজারের মিলিটারি ক্যাম্পেরও পতন হয়েছে, জয়-জয়কার পড়ে গেছে মুক্তিবাহিনীরা উল্লাপাড়াতেই শোনা গেল এই সব কাহিনী। বগুড়া শহরে জলেশ্বরীতলায় মামুনের এক শ্যালকের একটা ওষুধের দোকান আছে, সে যদি শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে বগুড়ায় আশ্রয় পাবার কোনো অসুবিধে হবে না।

সারা রাত মামুন জ্বরের ঘোরে ছটফট করলেন, পরদিন সকালেও জ্বল ছাড়লো না। কিন্তু কারোকে জানতে দেওয়া হবে না। তিনি সকলের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে রইলেন।

আর বাস পাবার কোনো আশা নেই, তবে সাইকেল রিক্সা আছে। কিছু দূর অন্তর অন্তর রিক্সা বদল করে যাওয়া যেতে পারে। সুযোগ বুঝে রিক্সাওয়ালারা যাচ্ছে তাই ভাড়া হাঁকছে। না দিয়েই বা উপায় কী!

এই রিক্সা-যাত্রাতেও স্বস্তি নেই। এক মাইল দু'মাইল অন্তর অন্তরই রাস্তা কাটা। রিক্সাচালকরা আগেই চুক্তি করে নিয়েছিল যে রাস্তা কাটা থাকলে সওয়ারিদেরই রিক্সা ঘাড়ে করে অন্য ধারে নিয়ে যেতে হবে। মামুনের প্রায় একশো পাঁচ জ্বর, চোখ জ্বালা করছে, ঝাঁ ঝাঁ করছে কান, সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, তবু তিনি টু শব্দটি করছেন না যথাসময়ে রিক্সা বইবার জন্য কাঁধ দিচ্ছেন।

চান্দাইকোনা পৌঁছোবার আগে ঠিক ন'বার রিক্সা থেকে নেমে, রিক্সাটাকেই কাঁধে করে পার হতে হলো গর্ত।

চান্দাইকোনায় এসে এই তিনজন রিক্সাচালক আর যেতে রাজি হলো না। এবারে অন্য রিক্সা ধরতে হবে। এখানে একজন লোক হঠাৎ মামুরে সামনে এসে বললো, চেনা চেনা লাগে, আপনে 'দিন-কাল' পত্রিকার সম্পাদক সাহেব না?

মামুন মৃদু হেসে বললেন, ছিলাম একসময়ে, এখন যে মালিক, সে-ই সম্পাদক। আমি বেশ কিছুদিন আগেই বিতাড়িত!

লোকটি বললো, আপনিই তো কাগজটা স্টার্ট করেছিলেন। সার, আপনার আর্টিকেলগুলো আমি সব পড়তাম, বড় ভালো লাগতো। আমার নাম এজাজ আহমদ, বগুড়ায় আমার বুক স্টল ছিল, ঢাকায় গিয়া আপনারে তিন চাইরবার দেখছি।

অতি ভক্তিতে লোকটি নীচু হয়ে মামুনকে কদমবুসি করতে যেতেই মামুন তার হাত ধরে বাধা দিলেন। এজাজ আহমদ চমকে উঠে বললো, এ কী, সার আপনার হাত এত গরম...

চান্দাইকোনায় এম. আর. আখতার মুকুলের পরিবারের সঙ্গে মামুনদের বিচ্ছেদ হলো। এজাজ আহমদ এরকম অসুস্থ অবস্থায় কিছুতেই মামুনকে যেতে দিল না বগুড়ায়। এক দৈনিক পত্রিকার কীর্তিমান সম্পাদক এতখানি জ্বর নিয়ে আবার ঘাড়ে করে সাইকেল রিক্সা বইবেন, এই চিন্তাও যেন তার কাছে অসহ্য। চান্দাইকোনায় তার বাড়িতে কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার পর সে নিজে মামুনদে বগুড়ায় পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল।

আখতার সাহেবের স্ত্রী মাহমুদা খানম রেবার সঙ্গে হেনা আর মঞ্জুর খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল এর মধ্যে, এখন ছাড়াছাড়ি হতে সজল হয়ে এলো ওদের চোখ। যেন আর কখনো দেখা হবে না।

এজাজ আহমদের বাড়িটি বেশ সুস্নিগ্ধ। বড় একটা উঠোনকে ঘিরে অনেকগুলি মাটির ঘর, চারপাশে প্রচুর গাছপালা, দু'দিকে দুটি পুকুর। মনোরম কোনো গ্রামের বাড়ি বলতে যে ছবিটি ফুটে

ওঠে, ঠিক সেই রকমই বাড়ি। রয়েছে ধানের গোলা ও গোয়াল ঘর। উঠানো একটা তুলসীমঞ্চ দেখে বোঝা যায় এককালে এটা হিন্দুর বাড়ি ছিল। এজাজ আহমেদের আদি বাড়ি ছিল বালুরঘাট, তার মরহুম পিতা একজন হিন্দুর সঙ্গে বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে এদিকে চলে এসেছিলেন পার্টিশানের দু'বছর পরেই।

জ্বরের ঘোরে মামুন অজ্ঞান হয়ে রইলেন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। একজন বৃদ্ধ এল এম এফ পাশ ডাক্তারকে পাওয়া গেল, তিনি শুধু নাড়ি টিপেই বললেন এ নির্ঘাৎ টাইফয়েড। বগুড়ায় জলেশ্বরীতলায় লোক পাঠিয়েও মামুনের শ্যালকের কোনো খবর পাওয়া গেল না, ওষুধের দোকান বন্ধ করে তার মালিক কোথায় পালিয়েছে কেউ জানে না। চতুর্দিকে লুঠপাট চলছে, ভয়ে এখন কেউই দোকান খোলে না। এমনকি নুন পর্যন্ত সাংঘাতিক দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

প্রায় বিনা ওষুধে ও চিকিৎসায়, শুধু বেঁচে থাকার এক প্রবল তাগিদেই যেন মামুন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন সাতদিনের পর। শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকানা নয়, মামুনের আর দীর্ঘজীবনের সাধ নেই, কিন্তু এই অচেনা জায়গায়, এমন দুঃসময়ে তিনি হঠাৎ মারা গেলে হেনা মঞ্জুদের কী হবে? জ্বরের ঘোরেও মামুন সেই চিন্তাই করতেন। হেনা আর মঞ্জু দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে, চোখের নীচে কালি। জ্বরের ঘোর কাটবার পর হেনা আর মঞ্জুকে দেখে মামুনের মনে হলো, চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়লো মানুষ ও পশুর চোখের দৃষ্টির কোনো তফাত থাকে না।

সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ও অচেনা হয়েও এজাজ আহমদের পুরো পরিবার মামুনদের যে সেবা যত্ন করলো তার তুলনা নেই। মানুষের স্নেহ ভালোবাসা যে কোথায় কার জন্য জমা থাকে তার ঠিক নেই। চান্দাইকোনার মতন এক অখ্যাত জায়গায় যেন মামুনের অন্নঋণ ছিল।

জ্বর ছেড়ে যাবার পর মামুন সব খবরাখবর নিলেন। এই ক'দিনেই অবস্থা অনেক বদলে গেছে। পঁচিশে মার্চের প্রথম আক্রমণের ঝোঁকে বাঙালীরা প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। কতজন যে প্রাণ হারিয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। তারপর ই পি আর এবং ছাত্র-যুব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধে বেশ কয়েকটা জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা মার খেয়েছে, ক্রোধ-উন্মত্ত জনতা তাদের ধরে ধরে ছিন্নভিন্ন করেছে। এখন আবার পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী নতুন শক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পুনর্দখল করে নিচ্ছে একটার পর একটা জায়গা। চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বোমা মেরে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার ই পি আর পশ্চাৎ অপসরণ করেছে ভারত সীমান্তের দিকে। যে-সব জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি ছিল, আর্মি এসে ফ্লেম থ্রোয়ার দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে সেইসব গ্রাম। যে-কোনো বাঙালী যুবককে দেখা মাত্র গুলি চালাচ্ছে, বাড়ি বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে যুবতী মেয়েদের। সেনাবাহিনীকে ঢালাও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে লুণ্ঠন ও ধর্ষণের। বাবা-মায়ের সামনে মেয়েকে, স্বামীকে দাঁড় করিয়ে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করার ঘটনা শোনা যাচ্ছে প্রত্যেক দিন। শিশুদের শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে গুলি করছে চার পাঁচজন মিলে, যেন টারগেট প্র্যাকটিস।

এদিকে শুরু হয়েছে এক উৎপাত। গ্রামে গ্রামে লেগে গেছে বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা। দেশ বিভাগের সময় বিহার থেকে যে-সব মুসলমান এইসব অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল, এই চব্বিশ বছরেও তারা বাঙালীদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেনি, তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সমর্থক। আর্মি তাদের লেলিয়ে দিয়েছে বাঙালীদের বিরুদ্ধে।

মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের অস্ত্র গোলা বারুদ ফুরিয়ে এসেছে এর মধ্যেই, অসীম সাহসে তারা সেনাবাহিনীকে মাঝে মাঝে অ্যামবুশ করতে গিয়ে নিজেরাই মরছে দলে দলে।

এজাজ আহমদ সর্বশেষ খবর নিয়ে এলো, রংপুর, পার্বতীপুর পুনর্দখল করে পাকিস্তানী আর্মি এগিয়ে আসছে হিলির দিকে। হিলির বর্ডার দিয়ে মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা সীমান্তের ওপারে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে বলে আর্মি হিলিতে এসে ঐ বর্ডার বন্ধ করে দিতে চায়। তারপর তারা নওগাঁ, বগুড়া ও আশেপাশে চিরুনি অপারেশন শুরু করবে।

এজাজ আহমদ ইতস্তত করে বললো, মামুনভাই, এই অবস্থায় আপনাদের আর এখানে ধরে রাখতে চাই না। বর্ডার খোলা থাকতে থাকতে আপনে ইন্ডিয়া চলে যান। আপনার সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে, ওদের এখানে রাখা একেবারেই নিরাপদ নয়। পশুরা যে কী বিভৎস কাণ্ড করতেছে আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না মামুনভাই।

মঞ্জু পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল, সে বললো, মামুনমামা, আমরা ঢাকা ফিরে যেতে পারি না?

এজাজ আহমদ বললো, ঢাকায় ফেরার সব পথ বন্ধ। ঢাকায় গোলমাল আরও বেশী!

মামুন বললেন, ইন্ডিয়ায় যাবো কোন্ ভরসায়? তারা আমাদের আশ্রয় দেবে? আমাদের পাসপোর্ট-ভিসা কিছু নাই।

এজাজ বললো, অনেকেই যাচ্ছে। মামুনভাই, সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। এরপর বর্ডার সীল করে দিলে আর কোনো উপায় থাকবে না।

মামুন চেষ্টা করলেন বগুড়ার এম আর আখতার মুকুলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, কিন্তু তাঁর সন্ধান পেলেন না। সেইদিনই জয়পুরহাটে এক বিরাট দাঙ্গার খবর পাওয়া গেল। চতুর্দিকে রব, আর্মি আসছে, আর্মি আসছে।

এজাজ আহমদ একটা জিপ জোগাড় করে দিল, অনেকটা দিশাহারার মতনই মামুন রওনা দিলেন হিলি সীমান্তের দিকে। মঞ্জু আর হেনাকে দেশের মধ্যে রাখা নিরাপদ নয়, তাদের জন্য আশ্রয় নিতে হবে অন্যদেশে! নাৎসী বাহিনী আক্রমণ করেছিল পোলাণ্ড, সেখানকার লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু প্রাণ দিয়েছে, আর এখানে নিজের দেশেরই সেনাবাহিনী, একই ধর্ম...

ক্ষেতপাল এসে নদী পার হতে হবে, একটা কাঠের ব্রীজ রয়েছে এখানে, তার মাঝখানের অংশটা খোলা। গ্রামবাসীরাই সেটা খুলে রেখেছে। এখানে আবার দেখা পাওয়া গেল এম আর আখতার মুকুলের। মুকুল গ্রামবাসীদের বোঝাচ্ছেন যে তাঁদের সীমান্তে পৌঁছোনো বিশেষ প্রয়োজন, প্রবাসী সরকার গঠন করতে না পারলে এই লড়াই বেশীদিন চালানো যাবে না।

এই পথ দিয়ে সশস্ত্র অবাঙালীরা ঢাকার দিকে যাচ্ছে বলে গ্রামবাসীরা ব্রীজটা খুলে রেখেছিল। মুকুলের বাক্‌পটুতায় মুগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা ভাঙা অংশটা আনতে গেল।

মুকুল মামুনকে বললেন, মামুনভাই, দোয়া করেন, যাতে আর্মি এসে পড়ার আগেই আমরা বর্ডারে পৌঁছোতে পারি।

তারপর নদী পেরিয়ে, পাঁচবিবি হয়ে একসময় দুটি জিপ এসে থামলো জয়পুরহাট সুগার মিলের সামনে। মুকুল সাহেব আগে থেকে ব্যবস্থা রেখেছিলেন, সেখানেই গেস্ট হাউসে কাটানো হলো রাতটা।

পরদিনই পার্বতীপুর থেকে রেল লাইন ধরে কামান দাগতে দাগতে এগিয়ে এলো পাকিস্তানী বাহিনী। তাদের আগে হিলি পৌঁছোতেই হবে, নইলে আর কোনো উপায় নেই। এদিকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ছোট বাহিনী প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়ে আছে।

রাত্রির অন্ধকারে বাতি না জ্বেলে যাত্রা করলো দুটো জিপ। মেয়েরা অবিরাম সুরা পাঠ করছে। মামুন স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, ভয় কিংবা উত্তেজনার চেয়েও দারুণ এক বিমর্ষতায় তিনি আক্রান্ত। চল্লিশের দশকে তাঁর মতন যারা পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য প্রাণপণ করেছিলেন আজ তাঁদেরই এরকম অসহায় অবস্থায় পালিয়ে যেতে হচ্ছে পাকিস্তান ছেড়ে। সে সময় কোথায় ছিল ইয়াহিয়া খান, কোথায় ছিল ভুট্টো সাহেব? আজ তারাই পাকিস্তানের রক্ষক ও ভক্ষক?

হিলি রেল স্টেশানে জিপ দুটো পৌঁছোলো রাত বারোটার পর। রেল লাইনের ওপরেই ভারত। যৌবনে মামুন অন্তত দু'বার এ পথে যাতায়াত করেছেন, কিন্তু তখন ওপারটা বিদেশ ছিল না।

মুকুলের সঙ্গে সিরাজগঞ্জের এস ডি ও শামসুদ্দীন সাহেব এসেছেন, তিনি আগেই জানিয়েছিলেন যে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের সঙ্গে কথা হয়ে আছে, তারা কারুকে ওপারে যেতে বাধা দিচ্ছে না। রেল লাইনের মাঝখানে এসে শামসুদ্দীন সাহেব থেমে গিয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি এবার যাই!

মুকুল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আপনি আমাদের সঙ্গে ওপারে আসবেন না?

শামসুদ্দীন সাহেব হেসে বললেন, বাঘাবাড়ির চরে আমি পজিশন নিয়ে আমার জোয়ানদের রেখে এসেছি। তারা আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। আমি কি এখন যেতে পারি? তাছাড়া আপনারা যাতে শিগগিরই সসম্মানে স্বাধীন বাংলায় ফিরে আসতে পারেন, তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে তো!

হঠাৎ মঞ্জু হেঁচকি তুলে কেঁদে উঠতেই মামুন তাঁর মাথায় হাত রাখলেন। বলার কিছু নেই। বছরের পর বছর ভারত সম্পর্কে এমন প্রচার করা হয়েছে যে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ধারণা হয়ে

গেছে যে ভারত হলো হিন্দু দুশমনদের দেশ। তারা এখন কী ভাবে আশ্রয় দেবে? যদি অপমান করে, লাথি-ঝাঁটা মারে? কতদিন থাকতে হবে সে দেশে, খরচ চলবে কী ভাবে? মামুনের কাছে মাত্র দু'হাজার পাকিস্তানী টাকা।

শেষবার মাতৃভূমির দিকে তাকিয়ে সবাই পার হয়ে এলো রেললাইন। একজন ভারতীয় সরকারি কর্মচারী অপেক্ষা করছিলেন এদিকে, তিনি বেশ ভদ্রভাবেই বললেন, আসুন, বেশী চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত আপনারা, ডাক বাংলোতে শোবার ব্যবস্থা আছে, তার আগে থানায় শুধু নাম-ধাম লিখিয়ে নিতে হবে। আসুন।

রাত একটা। থানা মানে পুলিশ চেক পোস্ট, ছোট্ট একটা ঘর, সেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। একজন জমাদার লম্বা একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে ধরেছে, আর বিরাট এক খাতা খুলে বসে আছে গেঞ্জি গায়ে এক রোগা সিড়িঙ্গে থানাদার। এই দলটিকে দেখে তিনি বললেন, লাইনে দাঁড়ান, এক এক করে বলুন নাম, বাপের নাম, সাকিন, পেশা।

লিখতে লিখতে মাঝপথে কলম থামিয়ে সেই রোগা পুলিশটি মুখ তুলে বললেন, ভাইগ্যাই যদি পড়বেন, তা হইলে এই গণ্ডগোলটা বাজাইলেন ক্যান, অ্যাঁ?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই সবাই নীরব।

লোকটি আবার বললেন, এলায় আপনারা যে ভাগতেছেন, আপনাগো মনের অবস্থাটা কী? মানে কিনা, আপনাগো মনটা কেমন হাউ হাউ করতাছে?

লোকটির কর্কশ কণ্ঠের সঙ্গে খানিকটা বিদ্রূপ মেশানো। সদ্য ওপার থেকে এসে মাথাভর্তি বিরাট একটা প্রকাণ্ড অনিশ্চয়তার বোঝা নিয়ে যারা দাঁড়িয়েছে, তারা এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উত্তরে কী আর বলতে পারে!

পুলিশটি আবার বললো, বুঝছেন, আমাগো বাড়িও বর্ডারের হেই মুড়া, মানে বরিশাল। পঞ্চাশ সনের রায়টে বউ-পোলাপান লইয়া ভাগছি। এলায় বুঝছেন, আপনারা যখন আমাগো খেদাইছিলেন, তখন আমাগো মনডা এইরকমই করছিল। হে ভগবান, কত কিছু দেখাইলা। এবার তো দেখতাছি, হিন্দু-মুসলামান হগলই ভাগতাছে!

মামুন তাকালেন মুকুলের দিকে। তাঁর মুখখানা যেন পাথরের মতন।

সরকারি গাইড ভদ্রলোকটি এবার বললেন, ওসব কথা ছাড় ন। একটু তাড়াতাড়ি করুন, রাত অনেক হয়েছে, এঁদের সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চা রয়েছে...

দু'দিন পর হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলেন মামুন। স্টেশনের বাইরে এসে গঙ্গারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, ওপারের কলকাতায় সবে মাত্র ভোর হচ্ছে। সেই কলকাতা তাঁর ছাত্রজীবন ও যৌবনের কলকাতা! গত চব্বিশ বছরে এই শহর কতখানি বদলেছে কে জানে!

মামুন মঞ্জুকে বললেন, এক সময় তুই কলকাতায় আসার জন্য কী কান্নাকাটি করেছিলি, তোর মনে আছে মঞ্জু? দ্যাখ, শেষ পর্যন্ত তোর সেই কলকাতাতে আসা হলো।

॥ ৯ ॥

এক সময় উত্তর ও মধ্য কলকাতার রাস্তাঘাট খুব ভালোই চিনতেন মামুন, চব্বিশ বছরের ব্যবধানে সব কিছুই যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। এখন কলকাতা একটা বিদেশী শহর, এতগুলি বছরে কত পরিবর্তন হয়েছে কে জানে, এই শহর কি তাঁদের সহৃদয়ভাবে গ্রহণ করবে? কোথায় থাকবেন কোনো ঠিক নেই। বালুরঘাট থেকে মালদা হয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন শুধু এই ভরসায় যে এর মধ্যেই আওয়ামী লীগের অনেক নেতা, পূ: পাকিস্তানের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপক কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। কিন্তু এত বড় শহরে কোথায় সন্ধান পাবেন তাঁদের? আগে একটা মাথা গোঁজার জায়গা ঠিক করা দরকার। হোটেল ছাড়া গতি নেই। কলকাতার হোটেলে মুসলমানদের থাকতে দেয় তো? ছেচল্লিশের দাঙ্গার স্মৃতি অবধারিতভাবে মনে পড়ে, এবং গা ছমছম করে ওঠে। মামুনদের ছাত্র বয়েসে চৌরঙ্গি, পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলকে বলা হত সাহেব পাড়া, আর পার্ক সার্কাস, বেকবাগান, কলুটোলা, মীর্জাপুর, কলাবাগান, রাজাবাজার ইত্যাদি অঞ্চলগুলো ছিল প্রধানত মুসলমান পাড়া। সেই সব অঞ্চলে অনেক মুসলমানদের হোটেল ছিল। কিন্তু এখনও কি সেই

সব হোটেল আছে? অধিকাংশ হোটেলই তো ছিল অবাঙালী মুসলমানদের।

বাস বা ট্রামে উঠলে ঠিক দিশা পাবেন না, এই জন্য মামুন বাধ্য হয়ে একটা ট্যাক্সি নিলেন। দাড়িওয়ালা, বলিষ্ঠকায় একজন পাঞ্জাবী সর্দারজী সেই ট্যাক্সির চালক, তার কোমরে কৃপাণ। লাহোর-করাচী থেকে বিতাড়িত শিখদের নিশ্চয়ই জাতক্রোধ আছে পাকিস্তানীদের সম্পর্কে, এই লোকটাও সেই রকম কেউ নাকি? মামুন যথাসম্ভব কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বললেন, চলিয়ে বেকবাগান।

হেনা আর মঞ্জুর মুখে উৎকণ্ঠার কালো ছায়া। তারা বারবার মামুনকে দেখছে চকিত দৃষ্টিতে। এই এক অচেনা বৃহৎ শহরে তাদের সামনে পড়ে আছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। মঞ্জু ভেতর ভেতরে দারুণ অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে, এখন মনে হচ্ছে, ঢাকা ছেড়ে চলে আসা তার উচিত হয়নি। আর কি কোনোদিন সে তার স্বামীকে ফিরে পাবে? বাবুল যেন ইচ্ছে করেই তাকে দূরে সরিয়ে দিল। ঢাকায় যদি এত বিপদ, তা হলে বাবুল কেন থেকে গেল সেখানে? মামুনমামাকে সে একটুও পছন্দ করে না, তবু মামুনমামার সঙ্গেই তাকে পাঠিয়ে দেবার এত আগ্রহ কেন তার?

মামুন কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বললো, এই যে হাওড়া ব্রীজ দেখছিস তোরা, দ্যাখ মাঝখানে কোনো সাপোর্ট নাই, এত বড় ঝুলন্ত সেতু এশিয়ায় আর নাই। ঐ দ্যাখ কত লোক এই সাত সকালেই গঙ্গার পানিতে ডুব দিতে এসেছে, হিন্দুরা মরে করে গঙ্গায় তিনবার ডুব দিলেই সব পাপ দূর হয়ে যায়! ঐ পাড়টা হলো বড়বাজার, মাউড়া ব্যবসায়ীদের বড় বড় দোকান।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, মামুনমামা, বেকবাগানে তোমার চেনা কেউ আছে?

মামুন উত্তর দিতে ইতস্তত করলেন। কলেজ জীবনে তাঁর অনেক হিন্দু বন্ধু ছিল। ভারত সীমান্তে পা দেবার পর থেকেই তাঁর মনে পড়ছে তাঁর এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতাপ মজুমদারের কথা। কিন্তু দীর্ঘকাল কেউ কারুর খোঁজ রাখেনি।

মামুন বললেন, চেনা তো অনেকেই আছে, আস্তে আস্তে খুঁজে বার করতে হবে।

তারপর তিনি সুখুর কাঁধ চাপড়ে বললেন, এই দ্যাখ ট্রাম। আগে তো কখনো ট্রাম দেখিস নাই। কেমন, সুন্দর না?

সুখু বিজ্ঞের মতন বললো, ট্রাম তো ইস্টিমারের মতন। মাটির উপরে চলে।

মামুন বললেন, ঠিক বলেছিস! আর ঐ দ্যাখ, দু'তলা বাস।

হেনা বললো, বাবা, কইলকাতায় এত মানুষ?

এখন মাত্র সকাল সওয়া ছ'টা, তবু পথে মানুষের স্রোত শুরু হয়ে গেছে। ব্রীজ শেষ হবার পর হ্যারিসন রোডের মুখটায় রিকশা, ঠ্যালাগাড়ি ও ঝাঁকা মুটেদের জটলা পাকানো। এইটুকু এসেই মামুন উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর যৌবনের সেই সুন্দর, ঝকঝকে, প্রাণবন্ত শহরের সঙ্গে এখানকার কলকাতার বিশেষ মিল নেই। বাড়িগুলির চেহারা মলিন রাস্তাগুলো হাড় বার করা, আর যেদিকেই চোখ যায়, শুধু মানুষ, অসংখ্য মানুষ।

বেকবাগান ও পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ঘুরে শেষ পর্যন্ত একটা ছোটখাটো হোটেল পাওয়া গেল। নাম 'হোটেল মদিনা'। কাছেই একটি মসজিদ, সেই মসজিদ থেকে তখন মাইক্রোফোনে আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

হোটেলের মালিকের মুখে উর্দু শুনে মামুন হতচকিত হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল, পার্টিশানের পর অবাঙালী মুসলমানরা সবাই কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে। তা তো সত্যি নয় দেখা যাচ্ছে। এখানে এখনো এরা ব্যবসা চালায়? আশেপাশের বস্তিও মুসলমানদের।

তিনখানা বেডওয়ালা একটা বড় রুম পাওয়া গেল, ভাড়া দৈনিক পঞ্চাশ টাকা। খাওয়ার খরচ আলাদা। মামুনের কাছে যা রেস্ত আছে, তাতে দশ-বারোদিনের বেশি চলবে না। মঞ্জুর হাতে দুটো সোনার বালা আর হেনার কানে দুটো মুক্তোর দুল, এইগুলো বিক্রি করলে কিছু পাওয়া যাবে, কিন্তু তারপর?

একটি অল্প বয়েসী ছোকরা তাদের নিয়ে এলো দোতলার ঘরে। দেওয়ালের রং ফাটা ফাটা, অন্ধকার-অন্ধকার ভাব, ঘরের মধ্যে আরশোলার ডিমের গন্ধ। মঞ্জু আর হেনার ঘর পছন্দ হয়নি, তবু মামুন তাদের বোঝালেন যে আপাতত এখানেই কয়েকদিন থাকতে হবে। দু'একদিন বিশ্রাম নেওয়া যাক, তারপর খোঁজ-খবর নিয়ে দেখতে হবে অন্য কোথায় যাওয়া যায়।

ছোকরাটিকে একটা টাকা বকশিশ দিয়ে তিনি বললেন, একটু জল খাওয়া তো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েছে। কী গরম এখানে!

ছোকরাটি টেবিলের ওপর রাখা একটি টিনের জগে টোকা মেরে বললো, সাব, এতে পানি ভরা আছে। চা-নাস্তা খেতে হলে আপনাদের নিচে যেতে হবে। এই হোটেলে রুম সার্ভিস পাবেন না।

মামুন হাসলেন। বর্ডার পার হবার আগে, দারুণ সঙ্কট আর উত্তেজনার মধ্যেও এস ডি ও শামসুদ্দীন সাহেব শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ইন্ডিয়ায় গিয়ে আর পানি বলবেন না, জল বলবেন। ওরা পানি শুনলে ভুরু কুঁচকায়। সেই থেকে মামুন হিলির ডাক বাংলোয়, বালুরঘাটে, মালদায়, ট্রেনে সব সময় সচেতনভাবে পানির বদলে জল বলে এসেছেন। অথচ, কলকাতার হোটেলের এক বেয়ারা তাঁর মুখের ওপর পানি বলে গেল!

মামুনদের ছাত্র বয়েসে জলপানি বলে একটা কথা প্রচলিত ছিল। স্কলারশিপের বাংলা। হয়তো হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রদের কথা ভেবেই শব্দটা তৈরি করা হয়েছিল। অনেকদিন মামুন জলপানি শব্দটা শোনেননি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের যে-কোনো প্রস্তাবই অপরাধ বলে গণ্য করা হত। পশ্চিম পাকিস্তানীদের চোখে হিন্দু মাত্রই কাফের এবং পাপের সঙ্গী। বাঙালী মুসলমানদের তারা আধা হিন্দু মনে করেই তো ঘৃণা করেছে। ভারত অর্থাৎ ইন্ডিয়াতেও নিশ্চয়ই তার বিপরীত ধারণাই গড়ে উঠেছে।

হেনা একটা বন্ধ জানলা ঠেলে ঠেলে খুলে দিয়ে বললো, বাবা, কইলকাতা শহরে, কী রকম যেন একটা গন্ধ।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, কী রকম গন্ধ রে?

দু'বার জোরে জোরে শ্বাস টেনে, ভুরুতে ঢেউ খেলিয়ে বললো, কী জানি, ঠিক বুঝা যায় না, তবে অন্য রকম, ঢাকার মতন না।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, মামুনমামা, আমরা কতদিন থাকবো এখানে?

এ প্রশ্নের উত্তর মামুনের জানা নেই। তিনি সুখুর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঘরের সংলগ্ন বাথরুম নেই, যেতে হবে বারান্দার এককোণে। সেখান থেকে ঘুরে এসে হেনা বললে, কী নোংরা! কাপড় ছাড়ার জায়গা নাই। কলকাতা শহরে পঞ্চান্ন টাকা ভাড়ার হোটেল আর কত ভালো হবে। নিরাপত্তা আছে কিনা সেটাই বড় কথা। সেদিক থেকে মনে হয় ভয়ের কিছু নেই।

মামুন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোরা কাপড়-টাপড় ছেড়ে নে, আমি একটা ঘুরা দিয়ে আসি।

একতলায় এসে দেখলেন, একজন লোক ইংরিজি কাগজ পড়ছে। মামুন পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলেন। প্রথম পৃষ্ঠায় ছ'কলমের হেড লাইনে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের সংবাদ। যশোরে একটা সাইকেল রিকশার ওপর তিনটি লাশের ছবি। বিদেশী সাংবাদিকদের বিবরণ।

পশ্চিম বাংলাতেও খুনোখুনির সংবাদ রয়েছে প্রথম পৃষ্ঠাতেই। নকশালপন্থী, পুলিশ, সি পি এম আর কংগ্রেসীদের লড়াই। শামসুদ্দীন সাহেব সাবধান করেও দিয়েছিলেন, কলকাতার কোনো কোনো অঞ্চলে নকশালপন্থীরা নাকি অচেনা মানুষ দেখলেই খুন করে।

একটা বাংলা কাগজ কেনার জন্য মামুন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। এপ্রিল মাসের রোদ শরীরে আলপিন বিঁধিয়ে দেয়। এর মধ্যেই ট্রামগুলো টই-টুম্বুর ভর্তি, বাইরেও লোক ঝুলছে। মামুন হাঁটতে লাগলেন, কোন রাস্তা কোন দিকে গেছে তা তাঁর মনে পড়লো না। তবে পাড়াটা চেনা চেনা লাগছে। আগের তুলনায় অনেক ঘিঞ্জি হয়েছে, ফাঁকা জায়গা এক ইঞ্চিও পড়ে নেই কোথাও।

খানিক বাদে তিনি এসে পৌঁছোলেন চৌরাস্তার মোড়ে। এই জায়গাটা তাঁর স্পষ্ট মনে পড়লো। বাঁ দিকে পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরস্থান। সামনে আরও এগিয়ে গেলে নতুন খ্রীষ্টানী কবরখানা, সেখানে শুয়ে আছেন মাইকেল মধুসূদন। ডান দিকে কিছু দূরে পার্ক সার্কাস ময়দান। রিপন স্ট্রিটের একটা মেসে মামুন কিছুদিন ছিলেন, সে জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূর হবে না।

একখানা আনন্দবাজার কিনে মামুন চা খেতে ঢুকলেন এক দোকানে। দোকানটিতে নাস্তা খাওয়ার জন্য লোকেদের বেশ ভিড়। অধিকাংশ খদ্দের এবং লুঙ্গিপরা বেয়ারারা কথা বলছে উর্দুতে। দু'একটি টেবিলে উর্দু সংবাদপত্র। মামুনের হাতে বাংলা কাগজ দেখে অন্যরা কি তাঁকে হিন্দু ভাবছে? প্রথম দিন

এসেই কলকাতা শহরের এই চিত্রটি দেখবেন, মামুন একেবারেই তা আশা করেননি।

আনন্দবাজার পত্রিকাটা মামুন দেখলেন অনেকদিন পর। যখন তিনি মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন, তখন এই পত্রিকার নীতির সঙ্গে তাঁর খুবই মতবিরোধ ছিল। মনে আছে, একবার তাঁরা রাস্তায় এই কাগজ পুড়িয়েছিলেন।

এই পত্রিকায় এখন চলিত ভাষায় খবর লেখা হয়। মামুন বরাবর সাধু বাংলাতেই লিখে এসেছেন। যশোর-খুলনা-চট্টগ্রামের অত্যাচার ও সঙ্ঘর্ষের খবরই বেশি। ঢাকায় গুলি চালনা বিষয়ে রয়টারের খবরের একটি ছোট বক্স আইটেম। চতুর্থ পৃষ্ঠায় আবদুল আজাদ নামে একজনের লেখা ঢাকায় পঁচিশে মার্চ রাত্রির নারকীয় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। মামুন মন দিয়ে লেখাটি পড়লেন, সত্যি কথাই লিখেছে, পড়লে মনে হয় লেখকটি ঢাকার একজন সাংবাদিক। কিন্তু আবদুল আজাদকে? পড়লে মনে হয় লেখকটি ঢাকার একজন সাংবাদিক। কিন্তু আবদুল আজাদ কে? ঢাকার সাংবাদিক লেখকদের প্রায় প্রত্যেককেই মামুন চেনেন, হয়তো এই লোকটি ছদ্মনামে লিখেছে।

পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে হাজার হাজর রিফিউজি আসছে ভারতে, সে খবরও রয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়, সঙ্গে ছবি। মামুন ভাবলেন, তিনিও তো রিফিউজি।

পাশের টেবিলে কয়েকটি ছোকরা বোম্বাইয়ের একটি সিনেমা বিষয়ে আলোচনা করছে। দিলীপকুমার নামে একজন নায়ক নাকি আসলে মুসলমান, সে রাজকাপুর নামে আর একজন নায়কের চেয়ে যে অনেক বড় অভিনেতা, সেটাই ওদের বক্তব্য। নার্গিস ও সায়রা বানুর মতন দুই সুন্দরী অভিনেত্রীর সঙ্গে বোম্বাইয়ের আর কোনো মেয়ের তুলনাই চলে না। মহম্মদ রফি হেমন্তকুমারের চেয়ে অনেক বড় গায়ক।

কলকাতার কোনো চায়ের দোকানে যে এ ধরনের কথাবার্তা শুনবেন, মামুন কল্পনাই করতে পারেননি। এ যেন মীরপুরের কোনো দোকান। কোনো অলৌকিক উপায়ে কলকাতার এই রেস্তোরাঁটি কি চব্বিশ বছর আগের জগতেই রয়ে গেছে? কোনো হিন্দু কি এ দোকানে আসে না? দোকানের দরজার ওপর 'নো বীফ' লেখা একটা ছোট্ট বোর্ড ঝুলছে।

কলকাতা থেকে মাত্র শ'খানেক মাইল দূরেই মুসলমান এখন মুসলমানকে মারছে খুন হচ্ছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ, মুসলমানের ঘরের মেয়েদের ধর্ষণ করছে মুসলমান সৈন্য, গ্রামের পর গ্রাম জ্বলছে আগুনে, সে সম্পর্কে এখানে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই? এরা কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না? ওদের সামনে টেবিলে যে উর্দু কাগজ পড়ে আছে, তাতে কী লিখেছে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা সম্পর্কে? মামুন উর্দু শুনে বুঝতে পারলেও পড়তে পারেন না। ঐ লোকগুলির সঙ্গে কথা বলতেও মামুনের ভয় করলো। নিদারুণ একাকীত্ব বোধের অবসাদে ছেয়ে গেল তাঁর বুক।

হোটেলে ফিরে এসে মামুন লম্বা এক ঘুম দিলেন। বিকেলে একবার ঘুম থেকে উঠে বেরুবার কথা চিন্তা করেও বেরুলেন না শেষ পর্যন্ত। কোথায় যাবেন? একটা কোনো চেনা মানুষের ঠিকানা তাঁর সঙ্গে নেই। এম আর আখতার মুকুলরা সদলবলে এসে কোথায় উঠবেন, সেটাও যদি জেনে রাখতেন। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কতদিন থাকতে পারবেন এই কলকাতা শহরে। এত বড় শহর, এর প্রকাণ্ড উদর, এখানে যে আসে সে-ই ঠাঁই পেয়ে যায়, তারপর কে মরলো, কে বাঁচলো, তা কেউ খেয়ালও করে না।

সন্ধে হতে না হতেই আবার ঘুমিয়ে পড়লেন মামুন। তাঁর শরীর পুরোপুরি সুস্থ নয়, টাইফয়েডের পরে এখনও গায়ে জোর পাননি।

হোটেলের আব্বাস নামে একটি বাচ্চা বেয়ারাকে এর মধ্যেই হাত করে নিয়েছে মঞ্জু, সে নিচের তলা থেকে চা-খাবার এনে দেয়। মঞ্জু আর হেনা দু'জনে মিলে ঠেলাঠেলি করেও মামুনকে কিছু খাওয়াতে পারলো না।

পরদিন মামুন জোর করে ঝেড়ে ফেললেন অবসাদ। একটা কিছু করতেই হবে। তিনি ঠিক করলেন, তিনি কোনো খবরের কাগজের অফিসে যাবেন। সাংবাদিকরাই বলতে পারবে, পূর্ব বাংলার নেতাদের মধ্যে কে কোথায় উঠেছেন, মুক্তি আন্দোলন চালাবার জন্য কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেও সহজভাবে কথা বলতে পারবেন সাংবাদিকদের সঙ্গে।

আনন্দবাজার অফিসটা বর্মণ স্ট্রিটে না? একবার যেন গিয়েছিলেন কার সঙ্গে। কিন্তু কাগজটা নিয়ে

দেখলেন অন্য ঠিকানা। এই জায়গাটা কোথায়? পোস্টাল জোন যখন কলিকাতা-১, তখন জি পি ও-র কাছাকাছি হবে।

মামুন বেরুবার উদ্যোগ করতেই হেনা জিজ্ঞেস করলো, বাবা, আমরা কইলকাতা শহর দেখবো না?

মামুন বললেন, দেখবি, দেখবি, আমি তোদের নিয়ে যাবো সব জায়গায়, দু'একটা দিন সবুর কর।

মঞ্জু খাটের ওপর পা মেলে বসে আছে, শাড়িটা এলোমেলো, চুল বাঁধেনি, চোখ দুটো ফুলো ফুলো, সে যে গোপনে কান্নাকাটি করছে, তা দেখলেই বোঝা যায়।

মামুন বললেন, তোরা ঘর থেকে এক পাও বাইরাস না। সুখুকে দেখবি, যেন ছুট করে রাস্তায় না যায়। আমি ঘুরে আসতেছি।

কলকাতা শহরে মামুন অন্তত দশ বারো বছর কাটিয়েছেন, এখন এই শহরে রাস্তা হারিয়ে ফেললে খুব লজ্জার বিষয় হবে। মোড়ের মাথায় এসে তিনি এসপ্লানেড লেখা একটা ট্রামে চড়ে বসলেন।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তিন পেয়ে গেলেন আনন্দবাজার অফিস। মস্ত বড় লোহার গেট, অনেকগুলি দারোয়ান, এই পত্রিকার আগেকার অফিসের সঙ্গে কোনো মিলই নেই। একজন দারোয়ান ভেতরে যাওয়ার পর দেখিয়ে দিল।

কাচের দরজার ওপাশে একটা কাউন্টার। তার এক পাশ দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে। মামুন সেখান দিয়ে ঢুকতে যেতেই একজন বেশ মোটা গোঁফওয়ালা বলিষ্ঠ ব্যক্তি প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, এই যে, কোথায় যাচ্ছেন?

মামুন বিনীতভাবে বললেন, সম্পাদক মশাইয়ের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

গোঁফওয়ালা লোকটি মুখে হাসি ছড়িয়ে বিদ্রূপের সুরে বললো, এডিটরের সঙ্গে দেখা করতে চান? চাইলেই কি দেখা করা যায় নাকি? আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

মামুন বললেন, জী না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাই।

–তবে দেখা হবে না। তিনি এমনি এমনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।

–নিউজ এডিটরের সাথে দেখা হতে পারে কী?

–তিনি খুব ব্যস্ত। যার-তার সঙ্গে দেখা করেন না।

–তা হলে অন্য কোনো সাংবাদিকের সঙ্গে যদি দেখা করা যায়!

–আপনার কী দরকার, কোথা থেকে এসেছেন, সেটা বলুন।

–দেখুন, আমি নিজেও একজন সাংবাদিক, ঢাকা থেকে এসেছি, যদি এখানে কারুর সাথে একটু আলাপ করা যায়।

গোঁফওয়ালা লোকটি লাফিয়ে উঠে বললো, ঢাকা থেকে? জয় বাংলা? হ্যাঁ, হ্যাঁ আসুন আসুন। এই যে স্লিপে নাম লিখুন।

লোকটির ব্যবহার সম্পূর্ণ বদলে গেল, খাতির করে নিজে এসে মামুনকে লিফটে তুলে নিয়ে গেলেন ওপরে, একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বললেন, অমিতবাবু, ইনি ঢাকা থেকে এসেছেন, রিপোর্টার।

অমিতবাবুও হাসি মুখে বললেন, আরে মশাই, বসেন, বসেন! বাড়ি কোন্ জেলায়? সিলেট নাকি?

সেই টেবিলের উল্টোদিকে একজন লম্বা মতন লোক নিউজ প্রিন্টের প্যাডে খসখস করে দ্রুত কী যেন লিখে চলেছে, মামুন তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, গাফ্ফার না?

লোকটি মুখ ফিরিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলকভাবে চেয়ে রইলো, তারপর বললো, মামুন ভাই? আমি শুনেছিলাম আপনাকে ধরে নিয়ে গেছে? ছাড়া পেলেন কী করে?

মামুন বললেন, না আমাকে ধরতে পারে নাই। হিলি বর্ডার দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে পেয়ে মামুন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তাঁকে নিজের মুখে পরিচয় দিতে হলো না এখানে। গাফ্ফার কয়েকদিন আগেই এখানে এসেছেন, অনেকের সঙ্গে চেনা হয়ে গেছে।

অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করার পর গাফ্ফার বললেন, চলেন, আপনারে সন্তোষদার কাছে নিয়ে যাই। তিনিই এই কাগজের সর্বেসর্বা।

কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষের ঘরে তখন খুব ভিড়, ভেতরে ঢোকা গেল না। গাফ্ফার তাঁকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবার পর এলেন দেশ পত্রিকার ঘরে। সম্পাদকের সামনে গিয়ে বললেন, সাগরদা, ইনি সৈয়দ মোজাম্মেল হক, আমাদের ঢাকার খুব শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক, একটা ডেইলি পত্রিকার এডিটর ছিলেন। জঙ্গীবাহিনী এঁকে ধরতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে কোতল করে দিত। বহু কষ্ট করে পালিয়ে এসেছেন।

দেশ পত্রিকার সম্পাদক মধ্যমাকৃতি, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, দেখলে খুব গম্ভীর মনে হয়। গাফ্ফারের কথা শুনে তিনি শুধু হাত তুলে নমস্কার করলেন, মুখ দিয়ে কিছু উচ্চারণ করলেন না।

মামুন বললেন, আমি এক সময় দেশ পত্রিকা নিয়মিত পড়েছি। সিক্সটি ফাইভের পর তো আমাদের ওখানে এদিককার কোনো পত্র-পত্রিকাই পাওয়া যেত না। অনেকদিন টাচ নাই। আজ আপনার সাথে আলাপ করে খুব খুশী হলাম।

সম্পাদক মশাই এবারেও একটিও কথা বললেন না।

গাফ্ফার বললেন, জানেন সাগরদা, দুটি মেয়ে আর একটি বাচ্চাকে নিয়ে মামুন-ভাই যেভাবে প্রায় দেড় শো মাইল রাস্তা পার হয়ে বর্ডার ক্রশ করে এসেছেন, সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার।

সম্পাদক মশাই হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পেছন ফিরলেন। এবার বোঝা গেল তাঁর নীরবতার রহস্য। জানলার কাছে গিয়ে পানের পিক ফেলে এসে তিনি মুখে সহৃদয় হাসি ফুটিয়ে বললেন, আপনার অভিজ্ঞতার কথা লিখে দিন না আমাদের কাগজের জন্য। পূর্ব বাংলায় সত্যি সত্যি কী ঘটছে সব পাঠকরা জানতে চায়। দেরি করবেন না, কালই লিখে আনুন।

মামুন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনি যে বললেন, এতেই আমি ধন্য হয়ে গেলাম। লেখার চেষ্টা করবো অবশ্যই, যদি আপনার পছন্দ হয়...

খানিক বাদে গাফ্ফার মামুনকে নিয়ে ঢুকলেন সন্তোষকুমার ঘোষের ঘরে। ছোটখাটো চেহারার মানুষটি, গায়ে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি, তার এক জায়গায় মাংসের ঝোলের দাগ। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। স্বভাবটি যে অত্যন্ত ছটফটে তা অল্পক্ষণ দেখলেই বোঝা যায়। বাঁ হাতে একটা কাগজ তুলছেন, ডান হাতে একটা কাগজ ছুঁড়ে ফেলছেন, লম্বা সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে জল খেলেন এক চুমুক, আবার ধরিয়ে ফেললেন একটা সিগারেট। অন্য একজনের সঙ্গে কী নিয়ে যেন বকাবকি করছিলেন, সেই ব্যক্তিটি চলে যাবার পর গাফ্ফার সামনে এসে মামুনের পরিচয় দিলেন।

সন্তোষকুমার কপালের কাছে হাত তুলে বললেন, আস্সালাম আলাইকুম। সবুন! কী নাম বললেন? সৈয়দ মোজাম্মেল হক? নামটা চেনা চেনা...

ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তু করতে করতে ফস্ করে পকেট থেকে একটা ক্যাটকেটে সবুজ রঙের চিরুনি বার কর চুল আঁচড়ে নিলেন অকারণে। তারপর বললেন, সৈয়দ মোজাম্মেল হক? আপনি এক সময় সওগাত কবিতা লিখতেন না? 'আশমানের প্রজাপতি' নাম আপনার কবিতার বই আছে, আমি পড়েছি। কিছুদিন 'দিন কাল' নামে একটি ডেইলি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'অনুসন্ধিৎসু' ছদ্মনাম দিয়ে আপনিই তো একটা কলাম লিখতেন, তাই না?

মামুন স্তম্ভিতভাবে তাকিয়ে রইলেন মানুষটির দিকে।

গাফ্ফার বললেন, মামুন ভাই, এই হচ্ছেন সন্তোষদা। ফ্যানটাসটিক মেমারি। বাংলা ভাষায় বোধ হয় একটাও ছাপার অক্ষর নাই, যা উনি পড়েন নাই। আমার নাম শোনামাত্রই উনি বলেছিলেন, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটা আপনার লেখা না?

সন্তোষকুমার গাফ্ফারকে এক ধমক দিয়ে বললেন, চুপ করো! আমি যখন কথা বলবো, তখন অন্য কেউ কথা বলবে না। আপনি পঁচিশে মার্চ রাত্তিরে ঢাকায় ছিলেন? মিলিটারি অ্যাকশান কিছু দেখেছেন নিজের চোখে?

মামুন বললেন, অনেক কিছুই দেখেছি।

সন্তোষকুমার বললেন, কালই সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখে আনুন। পার্সোনাল টাচ দিয়ে লিখবেন, প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ নয়, ঠিক যা-যা দেখেছেন।

মামুন বললেন, দেশ পত্রিকার সাগরময় ঘোষবাবুও আমাকে ঐ বিষয়ে লিখতে বললেন।

সন্তোষকুমার চোখ রাঙিয়ে বললেন, ঐ সব দেশ পত্রিকা-টত্রিকা ছাড় ন। আমি বলছি, এখানে

লিখতে হবে। দেশে লিখে ক'পয়সা পাবেন? এখানে রিফিউজি হয়ে এসেছেন, টাকার দরকার নেই? উঠেছেন কোথায়?

—একটা হোটেলে।

—ব্যাঙ্ক লুট করা টাকা এনেছেন নাকি?

মামুন এবারে হাসলেন। এই মানুষটির কথাবার্তায় একটা কঠিন ব্যক্তিত্ব আরোপের চেষ্টার মধ্যেও যে একটা সরল ছেলেমানুষী আছে, তা বুঝতে দেরি লাগে না।

সন্তোষকুমার আবার বললেন, গাফ্‌ফার এখানে লিখছে। সৈয়দ সাহেব, আপনি ইচ্ছে করলে এই কাগজে একটা রেগুলার ফিচার লিখতে পারেন। তাতে আপনার এখানকার খরচ চলে যাবে।

মামুন বললেন, আমাকে সৈয়দ সাহেব বলবেন না। বড্ড গালভারি শোনায়। অনেকেই আমাকে মামুন বলে ডাকে। আপনি আর আমি বোধ হয় এক বয়েসই হবো।

সন্তোষকুমার আবার একটু চাকরি করতুম মোহাম্মদী কাগজে, তা জানেন? আমার বাড়ি ছিল ফরিদপুর। আপনার বাড়ি...দাঁড়ান, দাঁড়ান, বলবেন না, উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে কুমিল্লা। তাই না?

আধঘণ্টা পরেই মামুনের মনে হলো, এই মানুষটির সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের চেনা। তিনি একবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো অনেককিছু জানেন, কলকাতায় আমার এক পুরনো বন্ধুকে খুঁজে বার করতে চাই, প্রতাপ মজুমদার, তাঁর কোনো সন্ধান দিতে পারেন?

—প্রতাপ মজুমদার? তিনি কী লেখেন? না ঐ নামে কোনো লেখক নেই। কী করেন তিনি?

—মুন্সেফ ছিলেন, এখন বোধ হয় সাবজজ বা ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়েছেন। কলকাতায় থাকেন কিনা তাও অবশ্য জানি না।

—সেভাবে তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক যদি বাড়িতে টেলিফোন থাকে, গাইডে ঠিকানা পাওয়া যাবে।

মামুন চমৎকৃত হয়ে ভাবলেন, তাই তো, টেলিফোন গাইড দেখার কথা তো তার আগে মনে আসেনি?

সন্তোষকুমার আবার চ্যাঁচামেচি করে উঠলেন, গাইডটা কোথায় গেল? আঃ, কাজের সময় ঠিক জিনিসটা পাওয়া যায় না, গুনধর, গুনধর! ষ্টুপিড, কে এখান থেকে গাইডটা নিয়ে গেছে? যাও, তোমার আর চাকরি নেই!

টেলিফোনের ওপর সামনেই মোটা গাইডটা রাখা। গুনধর নামে বেয়ারাটি সেটি নিঃশব্দে এগিয়ে দিল। সন্তোষকুমার পাঁচ টাকার একটা নোট বকশিশ হিসেবে তাকে ছুঁড়ে দিয়ে ফরফর করে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। তারপর বললেন, না, ও নামে কেউ নেই। আর কেউ চেনা নেই?

মামুন বললন, আর একজন ছিল বিমানবিহারী, তার পদবী মনে নাই।

—ওভাবে কলকাতায় মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছুদিন থাকুন, আস্তে আস্তে খোঁজ পাবেন। লেখাটা কিন্তু কালকেই চাই। আপনার কিছু টাকা অ্যাডভান্স লাগবে?

খানিকটা পরে গাফ্‌ফারের সঙ্গে আনন্দবাজারের গেট দিয়ে বাইরে এসে মামুন বললেন, বুকখানা এখন হালকা লাগছে। এদেশে আমাদের শুভার্থী আছে সেটা ঠিক আছে বুঝ নাই। আচ্ছা গাফ্‌ফার, আনন্দবাজার অফিসে ঢোকার এত কড়াকড়ি কেন? গেটে পাহারাদার খবরের কাগজের অফিস, অথচ কেমন যেন দুর্গ দুর্গ ভাব!

গাফ্‌ফার বললেন, নকশালদের ভয়ে এই ব্যবস্থা। নকশালরা যদি বোমা মেরে প্রেস উড়িয়ে দেয়! বামপন্থীদের এই কাগজের উপর খুব রাগ। এরা তো বলে জাতীয়তাবাদী দৈনিক, ইন্ডিয়াতে জাতীয়তাবাদ মোটেই ফ্যাসানেবল নয়। কলকাতার অনেক দেয়ালে দেখবেন চীনের চেয়ারম্যানের নামে প্রশস্তি।

মামুন বললেন, আনন্দবাজার বরাবরই অ্যান্টি পাকিস্তানী কাগজ। ঢাকায় বসে আমরা কেউ আনন্দবাজারের নাম ও উচ্চারণ করতাম না। এখন এই কাগজই আমাদের বড় সাপোর্টার। তুমি আর আমি এই কাগজের লেখক হতে চলেছি। একেই বলে নিয়তি!

॥ ১০ ॥

পি জি হাসপাতালের গেটের সামনে পরিচিতদের ভিড় দেখেই প্রতাপ থমকে গেলেন। সবাই

নীরব। এরপর আর কোনো প্রশ্ন করার দরকার হয় না। প্রতাপ ভেতরে ঢুকলেন না, রেলিং-এর এক পাশে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। কাছেই দু'গাড়ি ভর্তি পুলিশ। এখন হাসপাতালের গেটেও পুলিশ পাহারা রাখতে হয়।

হাইকোর্টের বিচারপতি কিরণলাল রায়কে কুমোরটুলিতে তাঁর বাড়ির সামনেই গাড়ির মধ্যে গুলি করা হয়েছিল গতকাল। হাসপাতালে এনেও তাঁকে বাঁচানো গেল না। বিদ্বান ও সজ্জন ছিলেন তিনি, তবু কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে নিছক একটি খুন করার জন্যই তাঁকে পৃথিবী থেকে অসময়ে সরিয়ে দিয়ে গেল। সরকারি কর্মচারি, পুলিশ, শিক্ষক, বিচারপতি এইরকম সমাজের নানা স্তরের মানুষদের এলোমেলো ভাবে খুন করে এরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়। একমাত্র ব্যবসায়ীদের গায়েই এরা হাত ছোঁয়াচ্ছে না।

একটু পরে বিমানবিহারী বেরিয়ে এলেন হাসপাতালের চত্বর থেকে। ভুরু দুটো কুঁচকে আছে, শোকের বদলে তাঁর মুখে অসম্ভব একটা বিরক্তির ছাপ। প্রতাপকে দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এসে বললেন, বডি বার করতে দেরি আছে, তুমি কি এখনো থাকবে?

প্রতাপ নিঃশব্দে দু'দিকে ঘাড় নাড়লেন।

বিমানবিহারী বললো, চলো, তাহলে আমার সঙ্গে চলো। পরে খবর নিয়ে না হয় শ্মশানে যাওয়া যাবে।

গাড়ির দরজা খুলে তিনি প্রতাপকে ভেতরে বসালেন। তারপর নিজে ঢুকেই প্রচণ্ড ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, এসব কী হচ্ছে বলো তো! কিরণ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, গত সপ্তাহে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে...এমনি ভাবে হঠাৎ তাকে চলে যেতে হলো। কয়েকটা বকাটে গর্দভ ছেলের জন্য! কোনো প্রোটেকশান নেই, এর কোনো বিহিত নেই!

প্রতাপ কোনো উত্তর না দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন।

বিমানবিহারী বললেন, আমি এখনও ভাবতে পারছি না, কিরণ আর নেই! এমন অকারণে একজন মানুষের জীবন যাবে! জানো প্রতাপ, আজ পর পর দুটো খারাপ খবর পেলুম। আজ কাগজে সন্তোষ ভট্টাচার্যের কথা পড়েছো?

প্রতাপ বললেন, না, খেয়াল করতে পারছি না তো! সন্তোষ ভট্টাচার্য কে?

—বহরমপুরের সৈদাবাদে খুন হয়েছেন সন্তোষ ভট্টাচার্য! আমার বিশেষ পরিচিত। আমাদের পাবলিকেশনের বই নিতে এসেছেন কতবার। শিক্ষক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা এই সন্তোষবাবু, এবার পার্লামেন্টারি ইলেকশনে দাঁড়াবার কথা ছিল...সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরছিলেন ভদ্রলোক, কটা ছেলে এসে তাকে ছুরি মেরে গেল। আচ্ছা বলো তো, অরাজকতা আর কাকে বলে! এইরকমভাবে আর কিছুদিন চললে সমাজ, সভ্যতা সব গোল্লায় যাবে। এ ওকে মারবে, সে তাকে মারবে! বুড়ো অজয় মুখার্জি দ্বিতীয়বার চীফ মিনিস্টার হয়ে এলো, একটা জোড়াতালি দেওয়া গভর্নমেন্ট, এরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সর্বনাশ করে দেবে না?

প্রতাপ ধীর স্বরে বললেন, যতবার এই রকম খুনের খবর কাগজে পড়ি কিংবা লোকের মুখে শুনি, আমার ভেতরটা পুড়তে থাকে। একটা প্রচণ্ড অপরাধবোধ,...এর জন্য আমিও তো কিছুটা দায়ী। আচ্ছা বলো তো বিমান, কী প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব আমার পক্ষে?

এক মুহূর্তে বিমানবিহারীর সমস্ত উত্তেজনা মিলিয়ে গেল, তিনি বিবর্ণ মুখে প্রতাপের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বন্ধুর হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, না, না, প্রতাপ, আমি তোমাকে আঘাত দেবার জন্য কিছু বলিনি, বিশ্বাস করো, একই দিনে দু'জন চেনা মানুষের এরকম ঘটনা শুনে আমার সেবার এমন লেগেছে...না, না, তুমি এজন্য দায়ী হতে যাবে কেন?

—আমার দায়িত্ব নেই? আমার নিজের ছেলেই তো এইসব শুরু করেছে!

—ননসেন্স! তুমি এখনো ঐ ভুল ধারণাটা আঁকড়ে বসে আছো? তোমাকে তো কতবার বলেছি যে বাবলুর অ্যাকশানটা ছিল পিওরলি সেলফ ডিফেন্স। রণজিৎ গুপ্ত নিজে আমাকে বলেছে। যে ছেলেটা খুন হয়েছিল, সে ছিল একজন কনফার্মড ক্রিমিন্যাল, ওরা কয়েকজন বোমা-রড নিয়ে বাবলুদের অ্যাটাক করেছিল। মনে করো, রাস্তায় একটা গুণ্ডা হঠাৎ তোমাকে মারতে এলো, তুমি উল্টে রেজিস্ট করবে না? সেই ছেলেটার সঙ্গে যে আর দু'জন ছিল, তাদের স্টেটমেন্ট আর বাবলুর বন্ধু তপনের

স্টেটমেন্ট মিলে গেছে!

—বাবলুর কাছে রিভলভার কী করে এলো? রিভলভার ছোঁড়া শিখলই বা কবে? অথচ সে নিজের হাতে ফায়ার করেছে, তাতেও তো কোনো সন্দেহ নেই!

—রিভলভার ছোঁড়া শিখতে দোষ নেই। শিখে ভালোই করেছিল। নইলে সে নিজেই মরতো। তোমার দুটি ছেলের একটিও আর থাকতো না। তাছাড়া, বাবলুদের ঘটনাটা ঘটেছিল এখানকার এইসব পলিটিক্যাল খুনোখুনি শুরু হবার অনেক আগে, একটা স্ট্রে ইনসিডেন্ট, এসবের সঙ্গে কোনো যোগই নেই। প্রতাপ, তুমি ঐ এক ব্যাপার নিয়ে অবসেস্‌ড হয়ে থেকো না। ওসব তো চুকেবুকে গেছে!

—সত্যিই কি চুকে গেছে? বাবলু আর কোনদিন দেশে ফিরতে পারবে?

—কেন পারবে না? ধরে নিতে পারো, প্র্যাকটিক্যালি বাবলুর নামে কেস ড্রপ্‌ড হয়ে গেছে। বাবলুর যে অ্যাকমপ্লিস ছিল, যে বাবলুকে রিভলভারটা সাপ্লাই করেছে, সেই মানিক ভট্টাচার্যও মারা গেছে শুনেছো তো? কাগজেও বেরিয়েছিল খবরটা। রণজিৎ আমাকে বলেছে যে কোর্টে নাকি ঐ কেসের কাগজপত্রই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং ও নিয়ে আর কেউ কোনোদিন মাথা ঘামাবে না। এখন চতুর্দিকে এত সব কাণ্ড হচ্ছে, দু'আড়াই বছর আগেকার ঐ সামান্য একটা ঘটনা কে মনে রাখবে?

প্রতাপ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন।

বিমানবিহারী প্রতাপের কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, এবার যখন বাবলুকে চিঠি লিখবে, ওকে লিখে দিও ও এখন ইচ্ছে করলেই দেশে ফিরতে পারে। কোনো ভয় নেই অবশ্য ও যদি আরও দু'এক বছর থেকে কিছু টাকা জমিয়ে আনতে চায়, সেটাও মন্দ না। মমতার নিশ্চয়ই ছেলেকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

গাড়িটা বিমানবিহারীর বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে, হঠাৎ দেখা গেল গলির মুখে একটা হুড়োহুড়ি লোকজন এদিকে সেদিকে ছুটছে। কিসের যেন একটা চিৎকার! ওখানে একটা কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে। বিমানবিহারী ড্রাইভারের কাছে ঝুঁকে এসে আতঙ্কে চেঁচিয়ে বললেন, গাড়ি ঘোরাও, গজু, শিগগির গাড়ি ঘোরাও!

কয়েকটি রিকশা ও সাইকেল এলোমেলো ভাবে পালাচ্ছে, তারই মধ্য দিয়ে ড্রাইভার একটা ইউ টার্ন নিয়ে ঘুরিয়ে নিল গাড়ি। এলগিন রোডের কাছাকাছি এসে গাড়িটা থামলো। এখানে রাজপথের চিত্র একেবারে স্বাভাবিক। ট্রাম-বাস চলছে, লোকজন ঠিকঠাক হেঁটে যাচ্ছে, কোমরে চেন বাঁধা রিভলভার সমেত একজন ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখাচ্ছে, তাকে পাহারা দিচ্ছে আর একজন পুলিশ।

বিমানবিহারী সাঙ্ঘাতিক মর্মবেদনার সঙ্গে বললেন, দিনে-দুপুরে নিজের বড়িতেও ফিরতে পারব না? এই বর্বর দেশে আমরা বাস করছি! প্রতাপ, ওরা আমার বাড়ি অ্যাটাক করেনি তো? আমরা ভয়ে পালিয়ে এলাম!

প্রতাপ বললেন, না, না, তোমার বাড়ি অ্যাটাক করবে কেন?

—কেন অ্যাটাক করবে, তার কি কোনো যুক্তি খোঁজার দরকার আছে? আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে কারা আগুন লাগালো, কেন আগুন লাগালো, তা তো আজও জানা গেল না!

—তা হলে চলো আমরা ফিরে যাই। আমরা গাড়ির মধ্যে আছি, চ্যাঁচামেচি দেখেই তক্ষুনি ফিরে না আসাই উচিত ছিল ছিল। একটু দেখে নিলে হতো।

—গাড়িতে থাকলেই বা কী অসুবিধে? জাস্টিস কিরণলাল রায় তো নিজের বাড়ির সামনে গাড়িতেই বসে ছিলেন। তিনি বাঁচতে পারলেন? এখন কী হবে, বাড়িতে মেয়েরা রয়েছে, একবার লালবাজারে যাবো?

—আমার মনে হয়, বিমান, একবার কাছাকাছি ফিরে গিয়ে দেখে নেওয়া যাক। আগে থেকেই বেশী করা ঠিক হবে না।

—আমাদের পেলেই যদি...তোমার ওপরেও রা। থাকতে পারে, একবার তোমার ওপর অ্যাটেম্‌ট নিয়েছিল, না, না, রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না লালবাজারে গিয়ে ইনফর্ম করাই ভালো।

—আমার মনে হয়, আগে একবার তোমার বাড়িতে গিয়ে দেখে নেওয়াই উচিত। বাড়িতে মেয়েরা রয়েছে, যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে...এখন তো দেখছো, পুলিশও প্রটেকশান দিতে পারছে না।

গাড়িতে আমরা দু'জনে রয়েছি, ড্রাইভার আছে, এত ভয় কিসের?

ড্রাইভারও বললো, একবার বাড়িতে গিয়েই দেখুন না স্যার! আমার মনে হচ্ছে সীরিয়াস কিছু নয়, উটকো ঝামেলা।

গাড়ি আবার ফিরে এলো ভবানীপুরে। এখন তেমন উত্তেজনা নেই, গলির মুখটায় কিছু লোক জমে আছে শুধু, গলির মধ্যে বিমানের বাড়ির সামনে কেউ নেই। আজকাল ভিড় দেখলেই বরং অভয় পাওয়া যায়।

গাড়িটা গলির মধ্যে ঢুকতেই বিমানবিহারী জানলা দিয়ে মুখ বার করে জিজ্ঞেস করলেন, এই, কী হয়েছিল গো এখানে একটু আগে?

একটি ফর্সামতন যুবক এগিয়ে এসে বললো, বিমানকাকা, ডেঞ্জারাস ব্যাপার হয়ে গেল। ঐ যে ইলেকট্রিকের দোকানটা দেখছেন, ওর ভেতরে একটা ছেলে বসে ছিল, মালিকের ভাইপো, সিউড়িতে থাকে, কালই এসেছে সিউড়ি থেকে। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে এখানটায় থামলো, ঐ যে ঠিক ঐ ল্যাম্পপোস্টের গা ঘেঁষে, তার থেকে তিনটে ছোকরা বেরিয়ে এসে, দোকানে ঢুকে সেই সিউড়ির ছেলেটাকে জাপটে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল!

—কোথায় নিয়ে গেল?

—সেই ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সিটায় স্টার্ট দেওয়াই ছিল।

—তোমরা সব দেখলে?

—নিজের চোখে দেখলুম, এই তো এই পানের দোকানের সামনেটায় আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। ওপরে হাতে পাইপ গান, আর এই অ্যাত বড় ড্যাগার, কে আটকাতে যাবে বলুন! ওদের চ্যালেঞ্জ করতে গেলেই জানে মেরে দিত!

—ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল কেন?

—দোকানের মালিক তো সে কথা কিছুই বুঝতে পারছে না। সে বলছে যে তার ভাইপো বি এতে ফার্স্ট অনার্স পাওয়া ভালো ছেলে, পার্টি-ফার্টি করতো না। অবিশ্যি সিক্রেট্‌লি কিছু করতো কিনা...

বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নামবার পর বিমানবিহারী বললেন, নাঃ, বাবলুকে এখন আসতে বারণ করে দাও! কোনো দরকার নেই এর মধ্যে ফিরে আসার। এই রকম হঠাৎ যদি যে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল, নির্ঘাৎ কালকে তার ডেড বডি পাওয়া যাবে কোনো রেললাইনের ধারে।

দ্রুত দোতলায় উঠে এসে বিমানবিহারী বললেন, তুমি একটু অফিস ঘরটায় বসো। তোমাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি!

বিমানবিহারী চলে গেলেন তিনতলায়। প্রতাপ অফিসঘরে এসে বসবার আগে এক কোণায় কুঁজো থেকে নিজেই গড়িয়ে নিয়ে পর পর দু'গেলাস জল খেলেন। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল তাঁর। যদি এসে দেখতেন, এ বাড়ির মধ্যে দু'তিনটে ছেলে ঢুকে পড়ে বোমা মেরে সব কাগজপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাতেও কিছুই আশ্চর্যের ছিল না। এখন সব কিছুই সম্ভব।

টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিলেন তিনি। যদিও পড়া কাগজ তবু তিনি সন্তোষ ভট্টাচার্যের খবরটা খুঁজলেন। কয়েকদিন আগেও প্রায় প্রত্যেকদিনই প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে এইসব খুনের খবর ছাপা হতো। এখনও খুন-জখম এই রকম ভাবে চলছে যদিও, কিন্তু সেই সব খবরের আর গুরুত্ব নেই। ভেতরের পৃষ্ঠায় ছোট করে দেওয়া থাকে পাঁচটি খুন, সাতটি খুন!

এখন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে প্রায় সবটাই পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদ। রংপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া এইসব নামগুলো কত বছর পরে আবার ফিরে এসেছে কলকাতার খবরের কাগজের পাতায়। পূর্ব পাকিস্তানকে এখানকার কাগজগুলো বাংলাদেশ বলে লিখতে শুরু করেছে, বিশেষত বাংলা পত্রিকাগুলো। কী করে বাংলাদেশ হলো। পাকিস্তানী সরকার কি ছেড়ে দিয়েছে? কাদের নিয়ে বাংলাদেশ? শেখ মুজিব কোথায় তিনি মৃত না জীবিত, তা কেউ জানে না। আওয়ামী লীগের অন্য নেতারাই বা কোথায়?

একটু বাদেই বিমানবিহারী দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ফিরে এসে বললেন, দেখেছো কাণ্ড? অলি এখনও বাড়ি ফেরেনি। সে নাকি প্রেসে গেছে। মেয়েটাকে এত করে বারণ করেছি আমহার্স্ট স্ট্রিট কলেজ স্ট্রিটের দিকে যেতে, তবু কিছুতেই শুনবে না। এখন কী করা যায় বলো তো? প্রেসব টেলিফোন

খারাপ, খবর নেবারও কোনো উপায় নেই।

প্রতাপ বললেন, এক কাজ করো, ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে প্রেসে পাঠিয়ে দাও, অলিকে নিয়ে আসুক প্রেস থেকে।

বিমানবিহারী একটু চিন্তা করে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, ড্রাইভারকেই পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

প্রতাপ আবার খবরের কাগজে মন দিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সুশিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামে সুসজ্জিত নিষ্ঠুর সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাঙালী মুক্তিবাহিনী প্রায় খালি হাতে লড়ে যাচ্ছে, এই যুদ্ধের খবর বারবার পড়তেও তাঁর ভালো লাগে। কলকাতার খবরের কাগজগুলো অত্যুৎসহে হয়তো কিছুটা বাড়িয়ে লিখছে। যশোরে সত্যিই কি একটা স্যাবার জেট ফেলে দিয়েছে মুক্তিবাহিনী? চট্টগ্রামের বিমানবন্দর দখল করে নিয়েছে? ময়মনসিংহ থেকে সব পাকিস্তানী বাহিনী পালিয়ে গেছে?

কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও ঘোরতর লড়াই যে চলছে সেখানে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতাপ নিজে বি বি সি'র খবর শুনেছেন, ব্রিটিশ কাগজের সংবাদদাতারাও যুদ্ধের খবর দিচ্ছে। তারা প্রশংসা করছে মুক্তিবাহিনীর। পঁচিশে মার্চের পর দু'তিন দিন সাংঘাতিক অত্যাচার চলার পর পূর্ব বাংলার বাঙালীরা আর শুধু পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে না। সেখানকার তরুণরা রুখে দাঁড়িয়েছে, দেশের সর্বত্র তারা ছড়িয়ে দিয়েছে প্রতিরোধ।

সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে সাধারণ নাগরিকেরা, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কিছু প্রাক্তন পুলিশ আর সীমান্ত রক্ষী আর মাত্র কয়েকজন বাঙালী মেজর আর কর্নেল। বাঙালীরা সত্যি সত্যি যুদ্ধ করছে? এর আগে বাঙালীরা যুদ্ধ করেছিল সেই কবে, বার ভুঁইঞাদের আমলে! বাঙালী ছেলেদের বীরত্বের কাহিনী পড়লে প্রতাপের গর্বে বুক ভরে যায়।

মুক্তিবাহিনী যে কোনো কোনো জায়গায় সত্যি বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে, তার কংক্রিট প্রমাণও আছে। কিছু কিছু পাকিস্তানী খানসেনা এর মধ্যেই সীমান্ত পেরিয়ে এসে ধরা দিচ্ছে ভারতের পায়ে। খবরের কাগজে এরকম ধরা-দেওয়া পাকিস্তানী সেনাদের ছবি বেরিয়েছে। তারা নাকি বলছে, মুক্তি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার চেয়ে ভারতীয় সেনাদের হাতে ধরা দেওয়া তাদের কাছে অনেক বেশী কাম্য। রোগা রোগা বাঙালী ছেলেদের তারা এত ভয় পায়?

ওপারের তরুণরা জাতীয় সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য এরকম জীবনপণ লড়ছে, আর কী করছে এপারের তরুণরা? এখানে চলেছে শুধু ভ্রাতৃবিরোধ! এপারের যুবকদের সামনে আর কোনো শত্রু নেই শুধু নিজের ভাই বন্ধু কিংবা সমবয়েসী অন্য ছেলেরা অন্য পার্টির কর্মী হলেই তাকে খুন করতে হবে! খুনের বদলা খুন! চীনের মাও সে-তুঙ মার্কসবাদের নতুন এক ব্যাখ্যা দিলেন, আর তাই নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করে চলেছে পশ্চিম বাংলার ছেলেরা। এরপর কোনোদিন যদি মাও সে-তুঙ বলেন, যে, না, না, আমার ঐ ব্যাখ্যায় একটু ভুল হয়েছিল, ওটা অন্যরকম হবে, কখনো অন্য পক্ষের লোকের সঙ্গেও হাত মেলানো যায়, তখন কি এইসব বিনষ্ট প্রাণ আর ফিরে আসবে? কত হীরের টুকরো ছেলে, পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট, সৎ, আদর্শবাদী, অথচ কোন অন্ধ আবেগের তাড়নায় তারা হাতে ছুরি আর রিভলভার তুলে নিয়েছে শুধু কিছু নিজেরই বয়েসী ছেলেদের অথবা কিছু নিরীহ মাস্টার, কেরানি জজদের খুন করার জন্য। এর কাপুরুষতার দিকটাও তাদের চোখে পড়ছে না? ওপারের ছেলেরা প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় লড়ছে অটোমেটিক রাইফেল আর লাইট মেশিনগানধারী সৈন্যদের বিরুদ্ধে। আর এ পারের ছেলেরা এক অসহায় শিক্ষককে বাড়ি ফেরার পথে পেটে ছুরি মারছে।

প্রতাপ আবার কুমিল্লা রণাঙ্গনের বিবরণ পড়ায় মন দিলেন। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছিল খান সেনা, মুক্তিবাহিনী তাদের আটকে দিয়েছে, সাতজন পাঠানকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছে বাঙালী ছেলেরা। কুমিল্লা শহরটা প্রতাপের চোখে চলচ্চিত্রের মতন ভেসে উঠলো। মনে পড়লো তাঁর ছাত্র বয়েসের বন্ধু মামুনের কথা। কোথায় আছে সে? কিছু বিপদ হয়নি তো মামুনের? বুলাদের বাড়ি...সেই বাড়িতে কি এখন আর কেউ থাকে? সেই এক ঝড় বৃষ্টির রাতে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে মামুনদের বাড়ি যাওয়া, তারপর বুলাদের বাড়িতে...

—প্রতাপকাকা, আপনি কখন এসেছেন?

চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রতাপ দেখলেন অলিকে। একটা লাল শাড়ী পরে আছে অলি, এই গরমে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, তবু যেন ঝলমল করছে তার মুখখানি। কী সতেজ, সুন্দর হয়েছে অলি, ঠিক

যেন শরৎকালের একটা স্থলপদ্ম গাছের মতন।

প্রতাপ বললেন, তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ? সবাই চিন্তা করছে, তোমার জন্য গাড়ি পাঠানো হলো একটু আগে। এ পাড়ায় কী কাণ্ড হয়েছে জানো তো?

কাছে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অলি বললো, জানি। বাস থেকে নেমেই শুনলুম। মোড়ের দোকানটা থেকে একজনকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে কয়েকটা ছেলে। নিশ্চয়ই ঐ ছেলেটা সিউড়িতে কোনো অ্যাকশান করে এসেছে।

প্রতাপ বললেন, অ্যাকশান! এই কথাটা এখন খুব চালু। আগে আমরা একশ্যান শব্দটার অন্য মানে জানতুম। প্রতিটি ক্রিয়ারই ঠিক ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে, এটা একটা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। তা কি এরা জানে না?

সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে অলি বললো, প্রতাপকাকা, আজ কলেজ স্ট্রিটে বাবলুদার এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, সে আমার কাছে বাবলুদার খবর জানতে চাইলো। তা আমি তো লেটেস্ট খবর কিছুই জানি না।

প্রতাপ অলির মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। আজকাল বাবলুর চিঠি নিয়মিতই আসে তার মায়ের কাছে। সেই চিঠি পড়ে মনে হয়, বাবলু লন্ডন থেকে আমেরিকায় যাবার পর বেশ ভালোই আছে, ফুর্তিতে আছে। সে কি অলিকে চিঠি লেখে না?

তিনি বললেন, বাবলু তো একটা নতুন চাকরি পেয়েছে, শিগগিরই বোধহয় নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়েস্টে চলে যাবে। এর মধ্যে ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়ে গেছে। তুমি বাবলুর চিঠি পাও না।

খুব স্বাভাবিক ভাবে হেসে অলি বললো, নাঃ, বাবলুদা আর আমাদের চিঠি-টিঠি লেখে না। আমাদের ভুলেই গেছে বোধ হয়।

—ওর চিঠি লেখার অভ্যেসটাই কম। আমাকেও লেখে না, শুধু নিজের মাকে লেখে, তাও কাটা কাটা কথা। আট-দশ লাইনের বেশী না। নতুন কী কী কোর্স নিয়েছে, সেই নিয়ে ব্যস্তও নাকি খুব।

—প্রতাপকাকা, আমি একবার আমেরিকায় যাবো ভাবছি।

—বাঃ, খুব ভালো কথা। ঘুরে এসো। তোমার বাবাকে বললে এক কথায় রাজি হয়ে যাবেন।

—আমি ওখানকার সাতটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিলুম, তার মধ্যে তিন জায়গা থেকে ভর্তির কল পেয়েছি, ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায়। শুধু একটা ব্যাপারই চিন্তা করছি, আমি চলে গেলে বাবার এই পাবলিশিং ব্যবসা কে দেখবে? বাবা একলা আজকাল আর সব দিক সামলে উঠতে পারেন না।

—তা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমরা তো আছি! পাবলিশিং-এ এমনিই মন্দা চলছে, তুমি ব্যবস্থা করো, চলে যাও।

প্রতাপ বেশ উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন। অলি আমেরিকায় গেলে সবচেয়ে খুশী হবেন মমতা। বাবলু সম্পর্কে মমতার এখনও দুশ্চিন্তা যায়নি। আমেরিকায় সম্পর্কে বাবলুর মনে একটা ঘোর বিতৃষ্ণা ছিল, সেখানে সে কিছুতেই যেতে চায়নি, বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছে, এখন মোটামুটি ভালোই আছে মনে হয়, তবু যা মাথা গরম স্বভাব ওর। যদি হঠাৎ কোনোদিন কারুর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে! অলি গেলে বাবলুকে সামলে রাখতে পারবে, অলির কাছ থেকে খবরাখবরও পাওয়া যাবে সব রকম। হয়তো অলিকে নিয়ে বাবলু একদিন সংসারী হবে। তিনি বললেন, তুমি কোন্ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশান নিতে চাও, ঠিক করে ফেলো। আমি বাবলুকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেবো।

অলি বললো, তার দরকার নেই কিছু। আমি যদি যাই, ওখানে পৌঁছে বাবলুদাকে টেলিফোন করে চমকে দেবো!

একটু পরে অলি চলে গেল ওপরে! তার পরেই বিমানবিহারী নেমে এলেন। হাতে একটা পুরনো আমলের কারুকার্য করা আখরোট কাঠের বাক্স। তিনি বললেন, চাবিটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। সেইজন্য আসতে দেরি হলো। দেখলে তো, তোমার কথা শুনে গাড়িটা পাঠালুম, তারপরেই অলি ফিরে এলো। গাড়িটা শুধু শুধু তেল পুড়িয়ে অতটা যাবে।

সারাদিনের নানা রকম ঘটনায় প্রতাপের মনের মধ্যে যে অপ্রীতিকর বাষ্প জমেউঠেছিল, তা যেন হঠাৎ মুক্ত হয়ে গেছে অলিকে দেখে ও তার কথা শুনে। তিনি বললেন, তা একটু তেল পুড়বে পুড় ক।

ওহে বিমান, অলির তো এখন আবার বিদেশে গিয়ে পড়াশুনো করার ইচ্ছে হয়েছে। এতদিন যেতে চায় নি, এখন নিজে থেকেই অনেকগুলো জায়গায় অ্যাডমিশান চেয়ে চিঠি লিখেছে শুনলুম, চান্সও পেয়েছে!

বিমানবিহারী একটা পেতলের চাবি দিয়ে আখরোট কাঠের বাক্সটা খোলার চেষ্টা করতে করতে বললেন, তা যেতে পারে, যদি ইচ্ছে করে!

বিমানবিহারীর কণ্ঠস্বরে উষ্ণতার অভাব লক্ষ করে প্রতাপ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, তোমার খুব একটা ইচ্ছে নেই নাকি? আগে তো তুমি নিজেই ওকে কতবার যেতে বলেছো।

বিমানবিহারী মুখ না তুলে বললেন, আমার ইচ্ছে থাকবে না কেন? ঐ মেয়ে কী ধাতুতে গড়া তা তো জানো না। ঐরকম নরম সরম চেহারা। কিন্তু কী সাংঘাতিক জেদী! আমি বেশী ইচ্ছে প্রকাশ করলে অমনি বেঁকে বসবে। ভাববে, আমি ওকে জোর করে পাঠাচ্ছি। যা দিনকাল পড়েছে, ইয়াং ছেলেমেয়েরা যত কলকাতা থেকে দূরে চলে যায়, ততই তো মঙ্গল!

কিন্তু এতদিন আমি বুঝিয়েছে, ওর মা বুঝিয়েছে, তবু যেতে চায়নি।

—এবার কিন্তু ইচ্ছে হয়েছে, নিজে থেকেই যখন অ্যাপ্লিকেশান পাঠিয়েছে, ওর রেজাল্ট ভালো, স্কলারশীপও পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

—টাকা পয়সার অসুবিধে হবে না। ওর রেজাল্ট অনুযায়ী ফুল ব্রাইট থেকেও প্যাসেজ মানি পেতে পারে। যদি নাও পায় সে টাকা আমি দেবো, সে সাধ্য আমার আছে। এখন তুমি ধীরে সুস্থে ওকে বোঝাও। বেশী চাপাচাপি করো না।

—আমি কালই ওর জন্য পাসপোর্ট ফর্ম আনাবো।

বাক্সের ডালাটা খুলে ফেলে বিমানবিহারী বললেন, এই দ্যাখো, বিউটি, বিউটি, একেবারে নতুনের মতন রয়েছে এখনও।

প্রতাপ মহা অবাক হয়ে দেখলেন, সেই বাক্সের মধ্যে গাঢ় নীল ভেলভেটের ওপর রাখা এক জোড়া রিভলভার!

সে-দুটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বিমানবিহারী বললেন, মাউজার গান! আমার ঠাকুর্দা রডা কম্পানি থেক কিনেছিলেন। দারুণ জিনিস!

প্রতাপ অস্ফুট স্বরে বললেন, রডা কম্পানি...মাউজার পিস্তল...মলঙ্গা লেনের হাবু

—তার মানে?

—কোথায় যেন পড়েছিলাম, পরাধীন আমলে, কয়েকজন টেররিস্ট ঠেলাওয়ালা আর ঝাঁকা মুটের ছদ্মবেশ ধরে মলঙ্গা লেনের কাছে রডা কম্পানির পঞ্চাশটা মাউজার পিস্তল চুরি করেছিল। তারপর সেই পিস্তলগুলো দিয়েই শুরু হয়েছিল সারা ভারতে সাহেব খুন করার অভিযান!

—এগুলো সেই চুরি করা পিস্তল নয়। আমার ঠাকুর্দা কিনেছিলেন। এ দুটো আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি।

—তা বুঝলাম, কিন্তু তুমি হঠাৎ এ দুটো বার করলে কেন? তোমার কাছে এই অস্ত্র আছে তা জানাজানি হলেই বিপদ আছে!

—বিপদ আবার কী! এর একটা আমি সবসময় সঙ্গে রাখবো। আর একটা তোমার কাছে রাখতে পারো ইচ্ছে করলে। আমি তোমার নামে লাইসেন্স বার করে দেবো, তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। এবার আমি ঠিক করেছি। বিপ্লবের নাম করে ঐ গুণ্ডাগুলো হামলা করতে এলেই আমি ওদের কুকুরের মতন গুলি করে মারবো।

—খবর্দার। বিমান, ওরকম চিন্তাও মাথায় স্থান দিও না। গুলি করতে তুমি পারবে না, তোমার হাত উঠবে না। বরং উল্টো ফল হবে। ওরা এখন অস্ত্র কাড়ার একটা অভিযান চালাচ্ছে, তোমার কাছে এই জিনিস আছে, ঘুণাক্ষরেও তার সন্ধান পেলে ওরা এই অস্ত্র কাড়তেই আসবে, তোমাকেও মেরে রেখে যাবে!

—মেরে রেখে যাব, অত সোজা? কেড়ে নেবে, অত সোজা! দু'একটাকে না মেরে আমি মরবো না! কিরণলালকে গাড়ির মধ্যে অসহায় অবস্থায় গুলি করে মারলো, তার পর থেকেই আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে! তোমাকে যদি মারতে আসে, তুমি আত্মরক্ষা করবে না? ওদের সঙ্গে অস্ত্র থাকে, আমরাও অস্ত্র রাখবো!

প্রতাপ দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

তিনি মুখে আর কিছু উচ্চারণ করলেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, না, আমি ওদের মারতে পারবো না। এইসব ছেলেরা, এরা তো তাঁর বাবলুরই মতন। ভুল করুক, দোষ করুক, তবু এরা সন্তানতুল্য। এরা যদি পিতৃহত্যা করে বিপ্লব আনতে চায়, তাহলে এদের বাধা দিয়েও কোনো লাভ হবে না। বরং তারপর যদি ওদের অনুতাপ হয়, ওরা ভুল বুঝতে পারে, তবে সেটুকই যথেষ্ট। ভবিষ্যতের পৃথিবীটা তো ওদেরই জন্য।

প্রতাপ একটা পিস্তল হাতে তুলে নিলেন। জিনিসটা এমনই মসৃণ, সুদৃশ্য ও ওজনদার যে হাতে নিলেই মনে হয় বেশ দামী ধরনের অস্ত্র। সেই ঠাণ্ডা ইস্পাত প্রতাপ গালে ছোঁয়ালেন। তিনি ভাবলেন, এইরকম একটা অস্ত্র নিয়ে যদি সীমান্তের ওপারে অত্যাচারী বর্বর সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে একজন নিপীড়িত বাঙালীকেও সাহায্য করা যেত, তাহলে জীবনটা ধন্য হতো।

॥ ১১ ॥

হেনা দু'বার ডাকতেই মামুন ধড়ফড় করে উঠে বসে ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী? কী হইছে? কয়টা বাজে? দেরি হইয়া গেল, অ্যাঁ?

হেনা বললো, সাড়ে চারটা! আপনে বলেছিলেন ঠিক সাড়ে চারটায় ডেকে দিতে।

মামুন কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ঘড়ি দেখলেন। জানলার বাইরে মিসমিস করছে অন্ধকার। ঘরে জ্বলছে টিউব লাইট। হেনার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জু, তার হাতে চায়ের কাপ। মামুন একটু লজ্জা পেলেন, মেয়ে দুটো এত আগেই উঠে পড়েছে, অথচ তাঁর ঘুম ভাঙেনি। কী যেন একটা লম্বা স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি, এখন আর মনে পড়ছে না।

বাসি মুখেই চা খাওয়া তাঁর অভ্যেস, মঞ্জুর হাত থেকে কাপটা নিয়ে জোরে জোরে চুমুক দিতে লাগলেন। মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, আরও চা আছে, দেবো?

মামুন বললেন, দে, দে, জলদি দে। কলে পানি এসেছে কিনা দ্যাখ তো।

হেনা বললো, আমি রাত্তিরেই বালতিতে পানি ভরে রেখেছি।

দ্রুত চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে মামুন চলে গেলেন গোসল করতে।

হোটেল ছেড়ে মাত্র তিন দিন আগে বেকবাগানে এই বাড়িতে চলে এসেছেন মামুন। একটা বড় সড় ঘরের ভাড়া দুশো পঁচিশ টাকা। তবু হোটেলের চেয়ে অনেক ভালো, সঙ্গে রান্না ঘর আছে, ইচ্ছে মতন রেঁধে খাওয়া যায়। কলকাতায় পৌঁছে মামুন প্রথম দিন টাকা ভাঙিয়ে একশো টাকায় আষ্টাশী ভারতীয় টাকা পেয়েছিলেন, গতকাল পেয়েছেন এক শো টাকায় পঁচাত্তর টাকা, হু হু করে পাকিস্তানী টাকার দাম কমে যাচ্ছে। আর দু'চারদিন বাদে কেউ পাকিস্তানী টাকা ছোঁবেই না বোধহয় এই বাংলায়। মামুন সব টাকা ভাঙিয়ে নিয়েছেন, তবে তা নিঃশেষ হতে বেশীদিন লাগবে না। এর পর গয়না বিক্রি করতে হবে। মামুন খোঁজ নিয়েছেন, ইন্ডিয়ায় এখন সোনার ভরি একশো উননব্বই টাকা। সামান্য যা গয়না আছে, তাও ফুরিয়ে যাবার পর কী হবে? কতদিন এরকম উদ্বাস্তু হয়ে থাকতে হবে তার কোনো ঠিক নেই। একমাত্র ভরসা, এখানকার খবরের কাগজে তাঁর প্রথম রচনাটি ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে দেড় শো টাকা পেয়েছেন। মাসে অন্তত চার পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হলে কোনো ক্রমে চলে যাবো।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই মামুন দেখলেন, হেনা ততক্ষণে তাঁর জন্য টোস্ট আর ওমলেট বানিয়ে ফেলেছে। মামুন বললেন, আরে, এসব আবার করেছিস কেন? এত সকালে কি আমি কিছু খেতে পারি?

মঞ্জু বললো, তা বলে খালি পেটে যাবে নাকি? না, খেয়ে নাও। কতক্ষণ লাগবে আর একটু চা করে দেবো।

হঠাৎ মামুন ফজরের নামাজে বসে গেলেন। নিয়মিত নামাজ আদায় করার অভ্যেস তাঁর নেই। মনের মধ্যে তেমন কোনো ধর্মীয় টান তিনি অনুভব করেন না এই বয়েসেও। তবু আজ একটি বিশেষ দিন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ধ্যানে মনের জোর বাড়ে। তাঁকে নামাজ পড়তে দেখলে মঞ্জু আর হেনাও কিছুটা ভরসা পাবে।

কিন্তু ফল হলো বিপরীত। মঞ্জু আর হেনার মুখে আরও ঘনিয়ে এলো শঙ্কা। এতদিন পর মামুনকে

নামাজ পড়তে দেখে আজকের ঘটনার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল তাদের কাছে। মামুন শেষ করতেই মঞ্জু উদ্বিগ্ন গলায় বললো, মামুন মামা, তোমার না গেলে হয় না?

হেনা তাঁর হাত চেপে ধরে বললো, বাবা, তুমি যেও না। আমরা একলা থাকতে পারবো না।

মামুন হেসে বললেন, আরে, এত ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি কি একলা যাচ্ছি নাকি, আরও অনেক যাচ্ছে, চিন্তা করিস না, আমি সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবো।

মঞ্জু আর হেনা দু'দিক থেকে তাঁকে চেপে ধরে বলতে লাগলো, না, যেতে হবে না। আজ থাক না, পরে একদিন যেও।

মামুন অনেক কষ্টে তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে কুর্তা-পাজামা পরে নিলেন। মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা ধক ধক করছে। যেতে তাঁকে হবেই। একটা ঐতিহাসিক ঘটনার তিনি সাক্ষী থাকতে চান।

পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছে সুখু, মামুন তার ললাট চুম্বন করলেন। মঞ্জু আর হেনার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, খুব সাবধানে থাকবি, ঘর থিকা এক পা বাইড়াবি না। কারুরে দরোজা খুলবি না। আমি আসি।

মঞ্জু মামুনের গা ছুঁয়ে কদমবুসি করতে গিয়ে কেঁদেই ফেললো। মামুন তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছে দিলে বললেন, কী পাগল। দ্যাখ তো হেনা শক্ত আছে। আমি ফিরে আসি, কাল তোদের মেট্রোতে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবো। তোরা দোয়া কর, সারাদিন বাংলাদেশের নামে দোয়া কর।

রাস্তায় বেরিয়ে মামুন দেখলেন অন্ধকার সামান্য ফিকে হয়ে এসেছে। এর মধ্যেই কিছু কিছু মানুষ বেরিয়ে পড়েছে পথে। চলতে শুরু করেছে ট্রাম। মামুনের মনে পড়লো, ছাত্র বয়েসে কলকাতায় থাকার সময় তিনি দেখতেন, অনেক হিন্দু ভদ্রলোক ভোরবেলার প্রথম ট্রামে চেপে গঙ্গা স্নান করতে যেতেন। এখনো কি লোকেরা সেই রকম গঙ্গা স্নান করতে যায়? এত ভোরেও ট্রামে যাত্রীর সংখ্যা কম নয়। দু'তিনটে ট্যাক্সিও দাঁড়িয়ে আছে বেকবাগানের ফোটার-আগেই যানবাহন পাওয়া যায়। ট্যাক্সিগুলো বোধহয় সারা রাতই চলে।

মামুন ট্যাক্সি নেবার বদলে ট্রামে চেপে বসলেন। হাতে এখনও কিছুটা সময় আছে, বেশি পয়সা খরচ করার তো দরকার নেই। ভোরের ট্রাম অনবরত ঠং ঠং শব্দ করে চলে। সেই শব্দে মনে পড়ে যায় ছাত্র বয়েসের স্মৃতি।

ধর্মতলার মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে মামুন ঘড়ি দেখলেন। পৌনে ছ'টা। এর মধ্যেই খবরের কাগজের হকারদের দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে গেছে। ছড়ি হাতে বয়স্ক লোকেরা বেরিয়েছে প্রাতঃভ্রমণে। এককালে কার্জন পার্কটা কত সুন্দর ছিল, কত ফুল ফুটতো এখানে, এখন চেনাই যায় না। মনুমেন্টটাকে আগে আরও উঁচু মনে হতো না? ছোট হয়ে গেল নাকি?

কলকাতার ময়দানের মতন এতবড় ময়দান ঢাকাতে নেই। কেউ কেউ বলে বিলেতের হাইড পার্কও নাকি এত বড় নয়। রেড রোডের ধারে সার কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটেছে। রেড রোড নামটা সার্থক। এই রাস্তাটা আগের মতনই আছে। মামুনের মনে পড়লো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই রাস্তায় মিত্র বাহিনীর প্লেন নামতো।

কয়েকজন স্বাস্থ্য উদ্ধারকারীকে জিজ্ঞেস করে করে মামুনকে প্রেস ক্লাব খুঁজে বার করতে হলো। ঢাকার তুলনায় কলকাতার প্রেস ক্লাব যে এত ছোট হবে তা মামুনের ধারণা ছিল না। ঢাকার প্রেস ক্লাবের দোতলা বাড়ি, আর এখানে সামান্য একটা তাঁবু। ময়দানে খেলার ক্লাবগুলির অনেক তাঁবু আছে, তারই মধ্যে একটা এই প্রেস ক্লাব। কলকাতায় এত বড় বড় খবরের কাগজ আছে, কত বিদেশী সাংবাদিক আসে এখানে, অথচ এখানকার প্রেস ক্লাবের এই দশা।

দশ বারোখানা গাড়ি জমা হয়ে গেছে প্রেস ক্লাবের সামনে। অন্তত জনা তিরিশেক দেশী-বিদেশী সাংবাদিক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়, কিন্তু সবাই নিঃশব্দ। এখনো কেউ জানে না কোথায় যেতে হবে।

মামুন ইউসুফ আলীকে খুঁজে বার করলেন। গত পরশুদিন দৈবাৎ এই ইউসুফের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল বলেই মামুন আজকের ঘটনাটা জানতে পেরেছেন। এক সময় ইউসুফের সঙ্গে একই ঘরে প্রায় দেড় বছর কাটিয়েছিলেন মামুন, সেই বন্ধুত্বের সুবাদে মামুনের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি ইউসুফ, মামুনকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু এমনই গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে যে

ইউসুফ মামুনকে পর্যন্ত বলেননি আজকের গন্তব্যস্থল কোথায়।

একটা অ্যাম্বাসেডর গাড়িতে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে মামুনকে বসিয়ে দিলেন ইউসুফ আলী। তারপর নিজে একটা জিপে উঠে সকলকে বললেন, সেই জিপটাকে অনুসরণ করতে। চাপা উত্তেজনায় তাঁর গলাটা ভাঙা ভাঙা শোনালো।

একটা গাড়ির কনভয় চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে এগিয়ে, শ্যামবাজার পাঁচ মাথা পার হয়ে যশোর রোডে পড়লো। পার্টিশান হয় গেছে চব্বিশ বছর আগে, তবু এই রাস্তার নাম এখনও যশোর রোড। এখানে পথের ধারে বাজার বসে গেছে, লোকজন থলি হাতে বাজার করতে এসেছে, মুটেরা সবজির ঝাঁকা মাথায় নিয়ে ছুটছে, একটা মস্ত বড় ষাঁড়ের পাশে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ মেলে একসঙ্গে পড়ছে তিনজন লোক,মামুন একজনের মন্তব্যও শুনতে পেলেন, ওরে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে গাভাসকর থার্ড সেঞ্চুরি করেছে...। এখানে অন্য যে-কোনো দিনের মতনই একটা দিন, সাধারণ, নিরুপদ্রব জীবন। অথচ এই রাস্তা ধরে সত্তর-আশী মাইল সোজা গেলেই যশোর, সেখানে চলতে নারকীয় তাণ্ডব, মিলিটারির সঙ্গে সাধারণ মানুষের চলছে অসম লড়াই, গ্রামের পর গ্রাম পুড়ছে...।

সেই যশোরেই যাওয়া হবে নাকি?

গাড়িতে অন্য সবাই অপরিচিত, কেউ কোনো কথা বলছে না, নিজে থেকে কারুর সঙ্গে আলাপ জমাবার ইচ্ছেও মামুনের নেই। তিনি জানলা দিয়ে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরে। দমদম, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, এই সব নামগুলিই মামুনের চেনা, বারাসতে তাঁর এক মামার বাড়ি ছিল, সেখানে একবার এসেছিলেন, থার্টি এইটে, তখন এদিকে এত বাড়ি ঘর ছিল না, শুধু ঝোপ জঙ্গল আর চায়ের জমি।

গাড়ির কনভয় প্রথম থামলো কৃষ্ণনগরে। এখানে চা খাওয়া হবে। আসল উদ্দেশ্য অবশ্য তা নয়। একটি গাড়ি এগিয়ে গেছে খবর নিতে, সীমান্তের কোন্ অংশটা নিশ্চিত নিরাপদ। রাস্তার ধারের একটা ছোট দোকান থেকে মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছে সাংবাদিকরা, কারুর মুখে কোনো প্রশ্ন নেই। সদা-কৌতূহলী সাংবাদিকরাও বাধ্য হয়ে চুপ করে আছে, কারণ আগেই তাদের বলে দেওয়া হয়েছে যে যাত্রা পথে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে না।

পিচের রাস্তা ছেড়ে গাড়িগুলো একসময় চলতে লাগলো কাঁচা রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ মামুনের সর্বাঙ্গে একটা শিহরন হলো। তবে কি পশ্চিম বাংলার সীমান্ত পার হয়ে ঢুকে পড়ার গেছে পূর্ব পাকিস্তানে? না, না, পূর্ব পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশ, এখনো ঠিক মনে থাকে না। দৃশ্যগত কোনো পরিবর্তন নেই, দু'পাশে একই রকম গাছপালা, মাটির বাড়ি, একই চেহারার মানুষ। তবে কয়েকটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে, কোনো বাড়ির দেয়ালে আগুন লাগার দাগ। এই বাংলাদেশ। মামুন আবার ফিরে এসেছেন তাঁর স্বদেশভূমিতে। তাঁর বুক কাঁপছে।

গাড়িগুলো শেষ পর্যন্ত এসে থামলো একটি বিশাল আমবাগানের মধ্যে। এই গ্রামটি নাম বৈদ্যনাথতলা, জেলা কুষ্টিয়া, মহকুমা মেহেরপুর। কিছু লোক সেখানে দৌড়োদৌড়ি করে চেয়ার সাজাচ্ছে, অধিকাংশই হাতল ভাঙা চেয়ার, কাছাকাছি গ্রামের বাড়িগুলো থেকে জোগাড় করে আনা। জায়গাটিকে ঘিরে রাইফেল আর এল এম জি হাতে পজিশান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পঁচিশ-তিরিশ জন সৈন্য, তাদের ঠিক মুক্তি বাহিনীর ছেলে বলে মনে হয় না, খুব সম্ভবত প্রাক্তন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একটি বিদ্রোহী বাহিনী।

মামুন গাড়ি থেকে নেমে এক পাশে দাঁড়াতেই কলকাতার একটি বাংলা কাগজের একজন সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে যেচে আলাপ করে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, এই কুষ্টিয়া আগে নদীয়া জেলার মধ্যে ছিল না?

মামুন মাথা নেড়ে বললেন, জী, হ্যাঁ।

সাংবাদিকটি বললো, আমরা ঐ যে কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়ে এলাম, তার কাছেই পলাশী। ঐ পলাশীর আমবাগানে একদিন বাংলার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল ব্রিটিশরা। আর আজ সেই জেলারই আর এক আমবাগানে জন্ম নিচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র। তাই না? ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট।

মামুন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

—আপনি কোন কাগজ থেকে কভার করতে এসেছেন?

–আমি রিপোর্ট করতে আসিনি। আমি এই বাংলারই মানুষ।

–আপনি আওয়ামী লীগের নেতা? আচ্ছা, কোনজন তাজুদ্দীন একটু চিনিয়ে দিন তো। তাজুদ্দীনের সঙ্গে একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?

মামুন হেসে বললেন, না, আমি নেতা নই। আমিও আপনারই মতন সাংবাদিক ছিলাম এক সময়। তাজউদ্দিন সাহেব এখনও আসেন নাই। আসলে তাঁকে আর চিনায়ে দিতে হবে না, তিনিই তো ভাষণ দেবেন।

–আচ্ছা মৌলানা ভাসানী কি আসবেন? তিনি কি মুক্তিযুদ্ধ সাপোর্ট করছেন?

–মৌলানা ভাসানী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে এসেছেন শুনেছি। এদিকে যখন এসেছেন, তখন পাকিস্তানকে নিশ্চয়ই আর সাপোর্ট করছেন না। স্বাধীন বাংলার দাবি তিনি আগেই তুলেছেন। তবে তিনি আজ এখানে আসবেন কিনা তা আমি জানি না।

–একটা জিনিস দেখুন, সৈয়াদ সাহেব, যতই সিক্রেট রাখা হোক, এই আমবাগানেই যে মুজিব নগর স্থাপিত হবে, সেটা কিন্তু জানাজানি হয়ে গেছে। কত লোক এসেছে দেখুন।

কথাটা মিথ্যে নয়। আশপাশের গ্রাম থেকে ধেয়ে এসেছে বিপুল জনতা। অস্ত্রধারী সেনাদের বৃত্ত ভেদ করে তারা হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারছে না বলে অনেকেই আমগাছগুলোতে চড়তে শুরু করেছে। একটা অশুভ আশঙ্কায় মামুনের বুক কেঁপে উঠলো। এরা সবাই কি পাকিস্তানি উৎখাত করে স্বাধীন বাংলাদেশ চায়? মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামের কর্মীরা মোটেই চায় না, তা মামুন ভালোভাবেই জানেন। এই জনতার মধ্যে পাকিস্তানের স্পাই থাকতে পারে না? পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে খবর পৌঁছে গেলে যদি তারা হঠাৎ এসে আক্রমণ করে? যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিমানে উড়ে আসতে কতক্ষণ লাগবে? আওয়ামী লীগের সব ক'জন বড় বড় নেতাকে যদি মেরে ফেলতে পারে কিংবা বন্দী করে নিয়ে যায়, তা হলে স্বাধীনতার সংগ্রাম কি আর এগুতে পারবে? ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী বর্ডার পেরিয়ে এদিকে ঢুকবে না, তা নাকি আগেই বলে দিয়েছে। ই পি আর এর এই সামান্য ক'জন সৈন্য পাক বাহিনীর আক্রমণের মুখে কতক্ষণ টিকবে?

হঠাৎ একটা শব্দে সবাই সচকিত হয়ে উঠলো। এসে গেল নাকি পাকিস্তানী সৈন্যরা? না, সে রকম কিছু নয়, অনেকগুলো লোকের ভার বইতে না পেরে ভেঙে পড়েছে একটা আমগাছের ডাল।

অনুষ্ঠান শুরু হলো এগারোটার পর। তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সবাই এসে গেছেন। তবে, যাঁর উপস্থিতি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ছিল, তিনি নেই, তিনি আসবেন না। শেখ মুজিব যে কোথায় আছেন তা এখনো জানা যায়নি।

তবু অনুপস্থিত শেখ মুজিবর রহমানের নামই ঘোষণা করা হলো রাষ্ট্রপতি হিসেবে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ। মন্ত্রীসভার জন্য তিনজন সদস্য হলেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এইচ এম কামারুজ্জামান এবং এম মনসুর আলী। বাংলাদেশ সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ নিযুক্ত হলেন রিটায়ার্ড কর্নেল এম ওসমানী।

এর সাতদিন আগেই কলকাতার থিয়েটার রোডের অস্থায়ী মুজিব নগর থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করা হয়েছিল। আজ, ১৭ই এপ্রিল, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার, ঐতিহাসিক দলিলটি পাঠ করলেন চীফ হুইপ ইউসুফ আলী। ই পি আর-এর প্লাটুন গার্ড অফ অনার দিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে।

তারপর সাংবাদিকরা ঘিরে ধরলো তাজউদ্দিনকে। ধীর স্থিরভাবে উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন এক সদ্য প্রসূত রাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। একজন বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্ন করলো, আপনারা যে বাংলাদেশ সরকার গড়লেন, বাংলাদেশের কতটুকু পর্যন্ত আপনারা মুক্ত করতে পেরেছেন?

মাথা ঘুরিয়ে চতুর্দিকে একবার দেখে নিলেন তাজউদ্দিন। তারপর প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, গোটা বাংলাদেশটাই তো মুক্ত। শুধু সামরিক ঘাঁটিগুলো ছাড়া। বাংলার মাটিতে পাক বাহিনী এখন বিদেশী সৈন্য বাহিনী। আমরা তাদের তাড়াবোই।

বাংলা কাগজের যে সাংবাদিকটি মামুনের সঙ্গে যেচে আলাপ করেছিল, তার নাম অরুণ সেনগুপ্ত। বেশ সুশ্রী চেহারা, মাথায় চুল ঢেউ খেলানো, কথা বলার সময় চোখ দুটো কুঁচকে আসে। কিন্তু ঠোঁটে হাসি মাখানো। তাঁর হাওয়াই শার্টে চার পাঁচটা পকেট। ফেরার সময় মামুন তাঁর সঙ্গে এক গাড়িতেই

উঠলেন। আসার সময় সকলেই মুখ ছিল থমথমে, এখন সবাই উৎফুল্ল। বিপদের আশঙ্কা, হঠাৎ পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা সকলের, মনেই ছিল, কিন্তু কোনেই গণ্ডগোল হয়নি। সব কিছু সুষ্ঠুভাবে চুকে গেছে! কালকের খবরের কাগজ দেখে পাকিস্তানী শাসকদের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে।

কোথা থেকে মিষ্টি জোগাড় হলো কে জানে, অরুণ সেনগুপ্ত গাড়ির সবাইকে জোর করে মিষ্টি খাওয়াতে লাগলেন। তারপর একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললেন, নিন, নিন। এখনও যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। এত বড় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা সত্যি ঘটে গেল? পাকিস্তান ভেঙে জন্ম হলো বাংলাদেশের? আমরা তার সাক্ষী?

একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক বললেন, এখন পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশ এই বাংলাদেশ সরকারকে রিকগনাইজ করবে। সেটাই হলো প্রশ্ন।

অরুণ সেনগুপ্ত জোর দিয়ে বললেন, আমার ধারণা, ইন্ডিয়া আজ রাত্তিরেই রেকগনিশান দেবে। তা হলে ইন্ডিয়ার বন্ধু রাষ্ট্রগুলোও দেবে সঙ্গে সঙ্গে...

ব্রিটিশ সাংবাদিকটি বাঁকা সুরে বললেন, ইন্ডিয়ার বন্ধু রাষ্ট্র...সে রকম কেউ আছে নাকি?

কয়েক মুহূর্তের জন্য সবাই চুপ করে গেল। তবু দমে না গিয়ে অরুণ সেনগুপ্ত বললেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন আছে। নেপাল, ভুটান, সিকিম...

অন্য একটি বাঙালী সাংবাদিক সুর করে বলে উঠলো, হায় চীন, সোনালি ডানার চীন...। দশ বছর আগেও চীনের সঙ্গে আমাদের কত বন্ধুত্ব ছিল, আমরা হিন্দী চীনী ভাই ভাই করেছি। সেই চীন এখন পাকিস্তানের সব বর্বরতা সাপোর্ট করছে।

ব্রিটিশ সাংবাদিকটি বললো, এখনো তো কলকাতার দেয়ালে লেখা দেখছি, চীনের চেয়ারম্যান আপনাদেরই চেয়ারম্যান।'

মামুন একটাও কথা বলছেন না। তাঁর বুকটা এখনো থরথর করে কেঁপেই চলেছে। আজকের ঘটনায় তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তা এরা কেউ বুঝবে না। শুধু আনন্দ নয়, রক্ষা করা গেল না শেষ পর্যন্ত। শুধু আজকের ঐতিহাসিক ঘটনাই নয়, আরও একটা বিরাট ঐতিহাসিক ভুলেরও তো তিনি অংশীদার। সে জন্য কিছুটা আত্মগ্লানি তিনি এড়াবেন কী করে?

ভাত খাওয়ার জন্য আবার নামা হলো কৃষ্ণনগরে। বেলা প্রায় তিনটে বাজে। ডাল, ভাত আর ডিমের ঝোল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না হোটেলে। অরুণ সেনগুপ্ত মামুনের সঙ্গে বসলেন এক টেবিলে। হেসে বললেন, মাছ ছাড়া খেতে আপনাদের কষ্ট হয়, তাই না? বলুন, আজ রাত্তিরে আপনি আমরা বাড়িতে খেয়ে যাবেন।

মামুন বললেন, না, না, ডিমের কারি আমার ভালোই লাগে।

–অনেক সময় এই সব হোটেলে খুব ভালো পাকিস্তানী মাছ আছে। সরি, পাকিস্তানী না, বাংলাদেশী মাছ। বর্ডার পেরিয়ে স্মাগলড হয়ে আসে, আমি অনেকবার খেয়েছি। এখন যুদ্ধ টুদ্ধ হচ্ছে বলে বোধহয় আর আসছে না।

–পশ্চিম বাংলার মানুষ মাছ খেতে পায় না। বাজারে গিয়ে দেখেছি, মাছের একেবারে আগুন দাম।

–পপুলেশনের কী চাপ দেখছেন না? এখন তো পাঞ্জাব রাজস্থান থেকেও কলকাতার বাজারে মাছ আসে। সে যাই-ই আসুক, পদ্মার ইলিশ আর সিরাজগঞ্জের রুইয়ের সঙ্গে কি সেসব মাছের তুলনা চলে?

হঠাৎ মুখটা ঝুঁকিয়ে গোপন কথার মতন ফিসফিসিয়ে অরুণ সেনগুপ্ত বললেন, আচ্ছা, সৈয়দ সাহেব, একটা কথা বলুন তো! এই যে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের ক্যাবিনেট তৈরি হলো, এতে সবাই আওয়ামী লীগের, এটা ঠিক হলো?

মামুন অবাক হয়ে বললেন, কেন? ঠিক হবে না কেন? লাস্ট ইলেকশানে আওয়ামী লীগ ওভারহোয়েলমিং মেজরিটি পেয়েছে। তাদেরই সরকার গড়ার কথা ছিল। ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টো জোর করে হতে দেয়নি। এখন বাংলাদেশ সরকার গড়তে গেলে...

–সে ইলেকশান তো ছিল পাকিস্তানের ইলেকশান। এখানে তৈরি হলো বাংলাদেশ সরকার। এ দুটো আলাদা ব্যাপার নয়? বাংলাদেশে যতদিন না ভোট হচ্ছে, ততদিন সব পার্টির নেতাদের নিয়ে

একটা ন্যাশনাল ক্যাবিনেট গড়া উচিত ছিল না? মুক্তিযুদ্ধ কি শুধু আওয়ামী লীগ চালাবে?

–না, মুক্তিযুদ্ধে সারা বাংলাদেশের মানুষ অংশ নেবে।

–নেতৃত্ব দেবে শুধু আওয়ামী লীগ? আপনাদের দেশে বামপন্থীরা আছে, উগ্রপন্থী আছে, ধর্মীয় দলগুলি আছে, তারা যদি এই নেতৃত্ব মেনে নিতে না চায়? এরকম একটা বিরাট ক্রাইসিসের সময় পার্টি পলিটিকসের উর্ধ্বে উঠে সবাইকে এক প্লাটফর্মে দাঁড় করাবার চেষ্টা করাটাই বেশী কার্যকর হতো না কি?

একটু ইতস্ত করে মামুন বললেন, তা অবশ্য ঠিকই বলেছেন। তবে আজ তো ছোট একটা ক্যাবিনেটের কথা ঘোষণা করা হলো, পরে যখন বাড়ানো হবে, তখন অন্য দলের নেতাদেরও নেওয়া হবে আশা করি।

অরুণ সেনগুপ্ত পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোট বই বার করতেই মামুন তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, না, না, আমায় কোট করবেন না, প্লীজ। আমি পলিটিকসের কেউ না, আমি সামান্য একজন রিফিউজি। বাংলাদেশ সরকারের মতামত দেবার কোনো অধিকার আমার নাই। আমিও তো এক সময় আপনার মতন সাংবাদিক ছিলাম। কাকে যেমন কাকের মাংস খায় না, সেই রকম কোনো সাংবাদিকও সাংবাদিকের মাংস...

অরুণ সেনগুপ্ত হো হো করে হেসে উঠে বললেন, আসুন, তা হলে ডিমের ঝোল খাওয়া যাক।

কলকাতায় পৌঁছে, অরুণ সেনগুপ্তর বাড়ির অন্য একদিন নেমন্তন্ন যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মামুন বাড়ি ফিরে এলেন। রাস্তা থেকেই দেখতে পেলেন, মঞ্জু আর হেনা অধীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে জানলার গরাদ ধরে। তাঁর দিকে চোখ পড়া মাত্র মেয়ে দুটির মুখে যে হাসি ফুটে উঠলো, মামুনের মনে হলো, একেই বোধহয় স্বর্গীয় হাস বলে। হাত তুলে ওদের আশ্বস্ত করে মামুন মোড়ের দোকানে কিছু মিষ্টি কিনতে গেলেন। অনেকদিন পর তিনি গুন গুন করে ধরলেন একটা গান, আমার সোনা বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

মিষ্টির দোকানের সামনে চার-পাঁচটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। মামুন তাদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করলেন। এরা আলোচনা করছে ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে আজ যে কী বিরাট ব্যাপার ঘটে গেল সে সম্পর্কে ওদের কোনো হুঁসই নেই? নাকি ওরা কেউ এখনও জানে না। অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে কিছু বলেনি? দোকানের মালিক একটা ময়লা নোট নিয়ে কথা কাটাকাটি করছে একজন খদ্দেরের সঙ্গে। আজ কি এমন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করার দিন?

দশ টাকার মিষ্টি কিনে মামুন উঠে এলেন দোতলায়। দরজা খুলেই তিনি মঞ্জুর ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে বলতে লাগলেন, ওরে সুখু মিঞা, আজ থিকা আমরা কেউ আর পাকিস্তানী না। আমরা বাংগালী, বাংগালী। তুই নিজেকে কী বলবি বল তো? বাংগালী। তোর দেশ বাংলাদেশ।

উদ্ভাসিত মুখে মঞ্জু বললো, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে?

মামুন বললেন, না, যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নাই, তবে হবে, হবে। কতদিন আর ওরা পারবে? পশু-শক্তি কি মানুষের সাথে পারে?

হেনা বললো, বাবা, তুমি সত্যি বাংলাদেশের মইধ্যে গেছিলা?

মামুন মেয়ের মাথায় চুল ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, হ রে ছেমড়ি, হ। একেবারে কুষ্টিয়ার মইধ্যে, মেহেরপুরে। সেখানে আমাগো আর্মি ছিল, পাকিস্তানীরা ভয়ে ধারে কাছে আসে নাই।

হেনা আবার জিজ্ঞেস করলো, বাবা, সেখান থিকা মা'র কোনো খবর পাও নাই? কুষ্টিয়া থিকা মাদারিপুর কতদূর?

মামুন নাচ থামিয়ে সুখু মিঞাকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন। মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার মুখেও অনেকগুলি প্রশ্নের রেখা। ফিরোজা বেগম, বাবুল চৌধুরীর কোনো খবর এতদিনে জানা যায়নি, জানার কোনো উপায় নেই। তারাও মামুনদের কোনো খবর জানে না।

বাধ্য হয়ে মিথ্যে কথা বলার জন্য মামুন জোর করে মুখের হাসি বজায় রেখে বললেন, চিন্তার কিছু নাই, কুষ্টিয়ায় শুনে আসলাম, ঢাকা, ফরিদপুর, চিটাগাঙ এখন শান্ত। খান সেনারা ভয় পেয়ে গেছে, মুক্তিবাহিনীর ভয়ে তারা ক্যান্টমেন্টে ঢুকে বসে থাকে, সিভিলিয়ানদের আর একদম ঘাঁটায় না।

আমি শিগগিরই মুক্তি বাহিনীর ছেলেদের হাত দিয়ে ওদের কাছে চিঠি পাঠাবো। এখন খা, সন্দেশ খা। আইজ কত বড় একটা আনন্দের দিন। মঞ্জু, গান ধর তো, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

ঘরের দরজা বন্ধ। খানিকটা দ্বিধার পর মঞ্জু গান শুরু করে দিল, হেনা আর সুখুও যোগ দিল তার সঙ্গে। মামুন যেন মোশান মাস্টার, তিনি দু'হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগলেন, আবার-আবার।

সেই পঁচিশে মার্চের পর এই ভয়ার্ত, শঙ্কাতুর, দুঃখী পরিবারটিতে দেখা গেল এই প্রথম কিছুটা আনন্দের হিল্লোল।

এরপর মঞ্জু আর হেনা রান্না ঘরে চলে গেলে মামুন একটা রেডিও খুলে বসলেন। এই সস্তার ট্রানজিস্টারটা তিনি দু'দিন আগে কিনেছেন। ঢাকা ধরা যায়, ঢাকার খবরে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা থাকে, তবু শুনতে ইচ্ছে করে। যদি ঐসব মিথ্যের ফাঁক দু'একটা সত্য হঠাৎ ঝিলিক দেয়। ঢাকার সংবাদে মুক্তি বাহিনীর কোনো উল্লেখই থাকে না, ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদগারই প্রায় সবটুকু। ভারতীয় সেনাবাহিনী নাকি ছদ্মবেশে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে সাধারণ নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে।

আজ মামুন অল ইন্ডিয়া রেডিও'র খবরই শুনতে চান। ভারত সরকার যখন কখন স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে? কলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশন কি যোগ দেবে বাংলাদেশের পক্ষে? ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলীকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তিনি বাঙালী মুসলমান হয়েও এ পর্যন্ত রাজি হননি। এখনো পাকিস্তানের প্রতি এই আনুগত্য কি শুধু চাকরির মায়ায়?

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের খবরে কোনো উল্লেখ নেই, দিল্লি থেকে প্রচারিত ইংরিজি সংবাদেও ভারত সরকারের কোনো প্রতিক্রিয়া জানা গেল না। মুজিব নগরের বাংলাদেশ সরকারকে ইন্দিরা গান্ধী যদি শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি না দেন!

সারা দিন অনেক ধকল গেছে, রেডিও শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন মামুন। খাবার জন্য মঞ্জু আর হেনা তাঁকে ডেকে তোলার চেষ্টা করেও পারলো না।

পরের দুটি দিন গেল উদ্বেগ আর নিরানন্দে। ভারত সরকার স্বীকৃতি দেননি, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধী একেবারে চুপ। অনেকে বলছে, উদ্বাস্তুদের তিনি আশ্রয় দিলেও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাবেন না। ভারত এখন যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চায় না।

হঠাৎ একটি সুসংবাদ এলো অন্য দিক থেকে। ইয়াহিয়া সরকারের একটা ভুল চালে সুবিধে হয়ে গেল বাঙালী বিদ্রোহীদের। কলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলীকে রাওয়ালপিণ্ডিতে বদলির অর্ডার এলো। হোসেন আলীর স্ত্রী ও আত্মীয় পরিজনেরা বেঁকে বসলেন, এই অবস্থা মধ্যে তাঁরা কিছুতেই হোসেন আলীকে রাওয়ালপিণ্ডি যেতে দিতে চান না, যদি সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে অ্যারেস্ট করা হয়? পাকিস্তান সরকারের কোনো উঁচু পদেই আর বাঙালী রাখা হবে না, এ তো সবাই জেনে গেছে।

হোসেন আলী একবার তাজউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন নিজেই। একাত্তর জন বাঙালী কর্মচারী নিয়ে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখাতে চান। ডেপুটি হাই কমিশনের বাড়িটিও থাকবে তাঁদের দখলে।

সারা কলকাতায় সারা পড়ে গেল। পাকিস্তান যে সত্যি ভাঙছে, এটা তার একটা সত্যিকারের বাস্তব প্রমাণ। দূতাবাসের আনুগত্য বদল তো সহজ কথা নয়। এই ঘোষণার পরদিন সকালেই পার্ক সার্কাসে সেই দূতাবাসের সামনে ছুটে এলো হাজার হাজার মানুষ। ভূতপূর্ব পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের নাম হয়ে গেল বাংলাদেশ মিশন, সেখানে শুরু হলো এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎসব। শুধু সাংবাদিকরাই নয়, তাতে যোগ দিলেন কবি-সাহিত্যিক, সঙ্গীত শিল্পীরা। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে-সব রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীরা এদিকে এসে আশ্রয় নিয়েছেন বাধ্য হয়ে, তাঁদের সকলের চোখ মুখে উল্লাস। এতদিন পর কলকাতায় তাঁদের মিলনের একটা নিজস্ব জায়গা হলো। এখানে উড়ছে বাংলাদেশের সবুজ-সোনালি পতাকা।

একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মন দিয়ে সেই গান শুনতে শুনতে হঠাৎ ডায়াসের কাছাকাছি একজন মানুষকে দেখে চমকে উঠলেন মামুন। আর কোনো কিছু চিন্তা না

করে তিনি এগোতে লাগলেন ভিড় ঠেলে। অরুণ সেনগুপ্ত তাকে দেখতে পেয়ে হাত ধরে বলতে গেলেন কিছু, মামুন তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেলেন সামনে। উদ্দিষ্ট লোকটির পাশে গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে আবেগ কম্পিত গলায় বললেন, প্রতাপ, প্রতাপ।

লোকটি মুখ ফিরিয়ে বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন মামুনের দিকে।

মামুন বিনীতভাবে বললেন, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, আপনার বোধহয় ভুল হয়েছে, আমার নাম প্রতাপ নয়।

॥ ১২ ॥

সরকারি মতে বসন্ত এসে গেছে। টাইমস পত্রিকায় ছাপা হয়েছে রাস্তার ধারের ঘাষফুলের ছবি। কে প্রথম রবিন্ পাখির ডাক শুনেছে তাও জানিয়েছে খবরের কাগজে চিঠি লিখে। তবু আজ দুপুর থেকে হঠাৎ বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেল! এদেশের আবহাওয়ার মতি গতি বোঝা ভার। এক একদিন সকাল থেকে রাত্তিরের মধ্যেই যেন তিন চারটে ঋতু খেলা করে যায়। আজ সকালে ছিল ঝকঝকে রোদ, দুপুরে বইতে লাগলো হিমেল হাওয়া।

ওভারকোটটা তুলে রেখেছিল তুতুল, আবার বার করতে হলো। জানলার বাইরে লাগানো ছোট্ট থার্মোমিটার দেখলো তাপমাত্রা নেমে গেছে দশের নিচে। শুধু রেইন কোট দিয়ে কাজ চালানো যাবে না। এখন পৌনে তিনটে বাজে, তুতুলকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে পাঁচটার সময়। আকাশের রং স্লেটের মতন, আজ আর রোদ্দুরে ওঠার আশা নেই।

তুতুলকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে একা। সপ্তাহের মাঝখানে কারুর তো ছুটি নেবার উপায় নেই। পরপর কয়েকটি নাম মনে পড়লো তুতুলের, তাদের কারুকে ফোন করলে হয়তো অফিস থেকে ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে আসতেও পারে, কিন্তু এরকম ভাবে কারুর কাছে সাহায্য চাইতে তুতুলের সঙ্কোচ হয়। সে মুখ ফুটে একজনকেও বলতে পারবে না, তুমি তোমার কাজ নষ্ট করে আমার সঙ্গে চলো। শুধু গতকাল সন্ধেবেলা সে শিরিনকে একবার অনুরোধ করেছিল। শিরিন উপস্থিত কোনো চাকরি করছে না, সে যেতে পারতো। কিন্তু শিরিন একটা অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে তুতুলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এয়ারপোর্টে গেলেই তার নাকি দারুণ মন খারাপ হয়ে। তাই সে এয়ারপোর্টে যেতে চায় না।

চারটের সময় সাজগোজ করে সঙ্গে একটা অতিরিক্ত ওভারকোট নিয়ে তুতুল নিচে নামলো। গাড়িটা বার করলো গ্যারাজ থেকে। পেট্রল বেশ কম আছে, ভরে নিতে হবে রাস্তা থেকে। পার্সটা খুলে একবার দেখে নিয়ে তুতুল গাড়িতে স্টার্ট দিল। সাধারণত সে গাড়ি না নিয়ে টিউব ট্রেনেই যাতায়াত করে। রাস্তা চিনতে এখনও তার গণ্ডগোল হয় তবে হিথ্‌রো ডিরেকশানে যেতে অসুবিধে নেই। কয়েকদিনের উষ্ণতার পর হঠাৎ আবার ঠাণ্ডা পড়েছে বলে বেশী ঠাণ্ডা লাগছে, তুতুল গরম হাওয়া চালিয়ে দিল গাড়ির মধ্যে।

রাস্তার দু'ধারে চেস্টনাট গাছগুলোতে নতুন পাতা এসেছে, ফুল এখনো চোখে পড়ে না। কেউ কেউ বলে, এগুলো নাকি হর্স চেস্টনাট। তুতুল তফাৎ বোঝে না। তার মনে পড়ে একটা কবিতার লাইন, "ঘোড়া নিমে কোরালির ডাক..."। পিকলুদা এই লাইনটা প্রায়ই বলতো, তুতুলের মনে গেঁথে আছে। নিমগাছ দু'রকম হয়। নিম আর ঘোড়া নিম। সেইরকম চেস্টনাটেরও ঘোড়া চেস্টনাট আছে? আশ্চর্য! আগে তুতুল গাছ বা ফুল বিশেষ চিনতো না। কিন্তু লণ্ডনে বাগান নিয়ে কথা বলা একটা ফ্যাসান। যার বাড়ির সামনে এক চিলতে বাগান আছে, সে সেই বাগানের প্রসঙ্গ তুলবেই, এবং তাতে অন্যদেরও যোগ দিতে হয়। প্রায় সব বাগানেই গোলাপ ও চন্দ্রমল্লিকা ফোটে। লণ্ডনে আসবার আগে এতরকম গোলাপ তুতুল দেখেইনি। আস্তে আস্তে লণ্ডন শহরটা ভালো লাগতে শুরু করেছে তুতুলের, এত ফুলের জন্যই বেশী ভালো লাগে। এই ঘিঞ্জি শহরেও তো প্রায় সব বাড়ির সঙ্গেই একটু না একটু বাগান থাকেই। তুতুল এখন টিউলিপ থেকে ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা পর্যন্ত অনেক ফুলই চিনে গেছে।

বসন্তকাল এসেছে তাই ফুলের কথা মনে পড়ছে। আজ কি এয়ারপোর্টে এক গুচ্ছ গোলাপ নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল? তুতুল আপন মনে হাসলো, সেটা বোধ হয় অদিখ্যেতা বলে মনে হতো।

একটা হলুদ রঙের গাড়ি তুতুলের গাড়িটাকে ওভারটেক করতে করতে সেই গাড়ির চালক তুতুলের দিকে তাকিয়ে এক চোখ টিপে দিল। লণ্ডন শহরে ফুলের শোভার এই এক বিপরীত দিক। একা কোনো নারীকে দেখলে এখানকার পুরুষরা অনেকেই কোনো না কোনো যৌন কৌতুকের চেষ্টা করে। সত্তর মাইল স্পীডে গাড়ি চলতে, তার মধ্যেও এই কৌতুক! এত ওরা কী আনন্দ পায়? প্রথম প্রথম তুতুলের বিষম রাগ হতো, এখন গা-সহা হয়ে গেছে। সে একটা সান গ্লাস পরে নিল। এতে আর চোখচোখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তুতুল আজকাল সাহেবদের মধ্যেও তফাত বুঝতে পারে, ঐ গাড়ির চালকটি ইংরেজ নয়, খুব সম্ভবত ইতালিয়ান কিংবা গ্রীক!

হিথ্‌রো এয়ারপোর্টের পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি রেখে তুতুল এসে দাঁড়ালো কাস্টমস্ এরিয়ার বাইরে নির্ধারিত জায়গাটিতে। ভারতীয়-পাকিস্তানী চেহারা বেশ কয়েকজন নারী পুরুষ উপস্থিত সেখানে। তুতুল চোখ বুলিয়ে দেখলো তার চেনা নয় একজনও। কিন্তু একজন স্যালোয়ার-কামিজ পরা মহিলা তার চোখে চোখ ফেলে তাকিয়ে রইলো বেশ কয়েক পলক। মহিলাটি যদি অল্পস্বল্প চেনাও হন। তবু তিনি নিজে থেকে এসে কথা না বললে তুতুল আলাপ করতে পারবে না। এই তার দোষ!

প্রথম দিন বিলেতের মাটিতে পা দেবার পর তুতুল আলমকে দেখেছিল এখানে। আজ সে আলমকে নিতে এসেছে। কিন্তু তুতুলকে সেই প্রথম আগমনের তুলনায় আজকের দিনটির গুরুত্ব অনেক বেশী। তুতুল তার আবেগ, উত্তেজনা সব চাপা দিয়ে রেখেছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে তার মুখখানি শান্ত। তুতুল একা একা সবই সহ্য করতে পারে, তবু তার বারবার মনে হচ্ছে, আজকে সঙ্গে আর একজন কেউ থাকলে ভালো হতো!

পি আই এ-র প্লেন ল্যান্ড করার খবর জানা গেছে, ঠিক সময়েই ফ্লাইট পৌঁছেছে। যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে একে একে, প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রচুর মালপত্র। আলমকে দেখা যাচ্ছে না এখনও। আজ আলম আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। টেলিফোনে একটি অচেনা কণ্ঠস্বর তুতুলকে জানিয়েছিল, আজ আলমের ফেরার সম্ভাবনা আছে। লোকটি নিজের নামও বলেনি, তুতুল আরও দু'একটা কথা জানতে চেষ্টা করায় সে লাইন কেটে দিয়েছিল।

পঁচিশে মার্চের পর আলম আটকা পড়ে গিয়েছিল লাহোরে। তার পাসপোর্ট, ট্রাভেলার্স চেক সব চুরি গেছে। লণ্ডনে আলমের বন্ধুরা বলেছিল, আলম এখন নন এনটিটি, সে আর পাকিস্তান থেকে বেরুতে পারবে না। গোটা মার্চ মাস জুড়েই ঢাকায় সাংঘাতিক কাণ্ড চলছিল, তারমধ্যেই জোর করে দেশে চলে গেল আলম। কিন্তু ঢাকা থেকে হঠাৎ লাহোরে কেন গিয়েছিল আলম, তা বোঝা গেল না।

পাকিস্তানে ঠিক যে কী ঘটছে, তা বোঝা যাচ্ছে না স্পষ্ট। ব্রিটিশ প্রেস পঁচিশে মার্চের ক্র্যাক ডাউনের খবর ছেপেছিল, তারপর মাঝে মাঝে দু'একটা গণ্ডগোলের ঘটনা। এখন একেবারে চুপ করে গেছে। কিন্তু ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গিয়ে কলকাতায় কাগজগুলো পড়লে মনে হয়, গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের লড়াইতে নেমে গেছে গোটা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। আলমের বন্ধুরা অবশ্য এইসব কাগজের রিপোর্ট বিশ্বাস করে না। তাদের মতে, ভারতীয় কাগজগুলো একশো গুণ বাড়িয়ে লিখছে। হ্যাঁ, আওয়ামী লীগের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেছে বটে, কয়েকটি জায়গায় কিছু সংঘর্ষ ও হয়েছে, তা বলে একটা দেশের আর্মি শুধু শুধু সিভিলিয়ানদের গুলি করে মারবে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে তা কখনো হতে পারে? চীন, সোভিয়েত, আমেরিকা চুপ করে আছে, শুধু একা একা চ্যাঁচাচ্ছে পাকিস্তানের জন্মশত্রু ভারত!

তুতুল কলকাতা থেকে মায়ের চিঠি পেয়েছে গত সপ্তাহে, সে চিঠিতে যুদ্ধ বিগ্রহের কোনো উল্লেখ নেই। অবশ্য মা তো কোনো চিঠিতেই দেশের অবস্থা বা রাজনীতির কথা কিছু লেখেন না। ঢাকা থেকে একখানাও চিঠি বা একজনও চেনা মানুষ লণ্ডনে আসেনি গত এক মাসের মধ্যে। আলমও কেন কোনো খবর পাঠাতে পারছে না?

টেলিফোনে কে খবরটা দিল তুতুলকে? সে কি শুধু শুধু তুতুলকে এয়ারপোর্টে পাঠাবার জন্য প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছে? এরকম একটা খবর পেলে তুতুলের না এসেও উপায় নেই।

প্রায় সব যাত্রীই তো বেরিয়ে এলো, আর বোধ হয় সম্ভাবনা নেই আলমের আসার। তবু তুতুলকে

শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তার চোখ জ্বালা করছে।

কিছুদিন ধরেই শরীরটা খারাপ যাচ্ছে তুতুলের। মাথার মধ্যে চিড়িক চিড়িক করে একটা ব্যথা হয়। একদিন সে কয়েক সেকেন্ডের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তার কাছে এরকম কোনো পেশেন্ট এলে অবিলম্বে তাকে ই ই জি করাতে বলতো তুতুল। কিন্তু নিজের বেলায় সে ভাবছে, আরও কয়েকটা দিন দেখা যাক, না, হয়তো দুশ্চিন্তা থেকেই হচ্ছে এরকম। তিন মাস আগে তার এফ আর সি এস হয়ে গেল। কিন্তু সে এর বিচিত্র ডাক্তার, চিকিৎসা শাস্ত্রে এতখানি জ্ঞান অর্জন করেও সে নিজে বিশ্বাস করে না ওষুধ খাওয়ায়।

দরজা দিয়ে হঠাৎ আলমকে বেরিয়ে আসতে দেখে তুতুলের শুধু বুক কেঁপে উঠলো না মাথার মধ্যে ঝনঝন করতে লাগলো সে চোখ বুঝে মনের জোর আনবার চেষ্টা করলো, এসময় তার অজ্ঞান হয়ে গেলে কিছুতেই চলবে না।

এই এক মাসের মধ্যেই অনেক রোগা হয়ে গেছে আলম, তার সুটটা ঢলঢলে মনে হচ্ছে। এমনিতেই সে লম্বা, এখন আরও যেন ঢ্যাঙ দেখাচ্ছে তাকে। একজন অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুসজ্জিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে আলম। তাকে কেউ নিতে এসেছে কি না, তা সে তাকিয়েও দেখছে না।

তুতুল ভিড় ছেড়ে বাইরে চলে এলো। আলমের অতি নাটক করার অভ্যেস আছে। হয়তো হঠাৎ সে তুতুলের কোমর দু'হাতে ধরে শূন্যে ফেলবে। লোকজনের সামনে তুতুলের লজ্জা করে।

তুতুলকে দেখে আলম এমনই অবাক হয়ে গেল যে কোনো রকম নাটক করার বদলে সে বেশ কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, কী রে, তুলতুলি, তুই বুঝি ভেবেছিলি, আমি মরে গেছে?

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তুতুল চুপ করে রইলো।

এগিয়ে এসে আলম তুতুলের থুতনিটা আলতো করে ছুঁয়ে বললো, এই দ্যাখ, আমি কোয়াইট অ্যালাইভ অ্যান্ড কিকিং। তবে আর একটু হইলেই দিত সাবাড় করে। তুই কী করে জানলি যে আমি আজ ফিরবো? কে তোকে খবর দিল?

তুতুল এখনও কোনো কথা বলতে পারছে না। তার মাথার মধ্যে ঝনঝনানি থামে নি।

আলমের সঙ্গী ভদ্রলোকটি বললেন, আমি তাহলে যাই। আচ্ছা, গুড বাই!

আলম বললো, না, না, দাঁড়ান, আপনাকে ড্রপ করে দেবো। এই তুতুল তুই গাড়ি এনেছিস তো? আলাপ করায়ে দিই, আমার বান্ধবী তুতুল, এর একটা গালভরা ভালো নামও আছে ডক্তর বহ্নিশিখা সরকার, এফ আর সি এস! আর ইন শাজাহান চৌধুরি, ইন্ডিয়ান সিটিজেন, অ্যাকচুয়ালি, কলকাতার মানুষ, লন্ডনে সেটল করেছেন, ব্যবসার সূত্রে ওয়েস্ট পাকিস্তান গিয়েছিলেন, প্লেনে আলাপ হলো।

শাহাজাহান চৌধুরী সালাম জানাবার বদলে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন তুতুলকে। তারপর বললেন, কেন শুধু শুধু বদার করবেন, আমি টিউব নিয়ে চলে যাবো, মালপত্র বেশি নেই।

আলম বললো, না, না, আপনার বাসা আমাদের পথেই পড়বে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার পর তুতুল প্রথম কথা বললো। সে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছিল লাহোরে?

আলম একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, শস্তা থ্রিলারের মতন ব্যাপার স্যাপার বুঝলি! যা ঘটেছে তা যদি আমি আমি বলি, শুনলে মনে হবে গাঁজাখুরি গল্প। কিন্তু আমাকে প্যাঁচে ফেলার একটা প্ল্যান যে করা হয়েছিল তাও ঠিক।

আলম বসেছে সামনের সীটে, তুতুলের পাশে। পিছনে শাজাহান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই গোলমালের মধ্যে ঢাকা থেকে লাহোরে চলে এলেন কেন?

আলম হেসে বললো, সেইটাই মিস্ট্রি নাম্বার ওয়ান। ঢাকায় এত উত্তেজনা, ছাত্রদের পাল্লায় পড়ে শেখ সাহেব এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এই ঘোষণা করে দিয়েছেন। সেরকম সময় আমার ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমি লাহোরে যেতে যাবো কোন্ দুঃখে। কিন্তু ঠিক চব্বিশ তারিখ আমার নামে একটা টেলিগ্রাম এলো, আমার জাফরমামা খুব অসুস্থ, আমাকে একবার দেখতে চান। এই জাফরমামা প্রায় আমার বাবার মতন। ছোটবেলায় আমি মামার বাড়িতেই মানুষ

হয়েছি। বিজনেসের জন্য জাফরমামাকে মাঝে মাঝে করাচী-লাহোরে গিয়ে থাকতে হয়। এরকম একটা টেলিগ্রাম পেলে আমি না গিয়ে পারি কী করে? আমার অসুখ, খবর পেয়েও আমি যদি না যাই, আমি আবার বিলেতি ডিগ্রীওয়ালা ডাক্তার, তা হলে আমি নিমকহারাম হয়ে যাবো না? সত্যি কথা বলতে কী, আমার যেতে ইচ্ছে করছিল না। পঁচিশ মার্চের মধ্যেই একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাবার কথা? তবু সেইদিন সকালের ফ্লাইটেই আমাকে লাহোরে যেতে হলো।

শাজাহান বললেন, পঁচিশে মার্চ রাত্তিরেই ঢাকা শহরে অন্তত হাজার খানেক মানুষ মারা গেছে।

আলম বললো, তার বেশী ছাড়া কম না। আমার এক বন্ধু ইত্তেফাকের সাংবাদিক ছিল, সেও মারা গেছে শুনেছি।

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, তোমার পাসপোর্ট কোথায় হারালে?

আলম বললো, লাহোর এয়ারপোর্টে নেমে দেখি একজন লোক আমার নাম লেখা একটা বোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটারে আমি চিনি না। আমি যে সেই ফ্লাইটের আসবো তা জানাইনি, আন্দাজে ধরে নিয়েছে। লোকটা পাঞ্জাবী, ভাঙাভাঙা বাংলা জানে, সে বললো, মামুন কম্পানিতে চাকরি করে। কিন্তু সে কোনো গাড়ি আনেনি, ভাড়া করে রেখেছে একটা ট্যাক্সি। তাইতেই আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি শুধু ভাবছিলাম, মামুর সাথে আমার শেষ দেখা হবে কি না। মামুনকে একটু ভালো দেখলেই ঢাকায় ফিরে যাবো। ট্যাক্সিটা যখন জুবিলি পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার হলো। একটা পুলিশের গাড়ি টেশানারি ছিল, হঠাৎ সেটা চলতে শুরু করলো, তারপরই আমাদের ট্যাক্সির সাথে হেড অন কলিশন। আমি ডেফিনিট যে অ্যাকসিডেন্টটা কনককটেড! পুলিশের গাড়িটা ইচ্ছে করে ধাক্কা মেরেছে।

অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনেই তুতুল চকিতে আলমের দিকে তাকালো।

আলম সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, আমার লাগেনি। সেরকম কিছুই হয়নি। আমি শুধু একটা গুতা খেয়েছিলাম।

তুতুল তবু বুঝতে পারলো, আলমের কণ্ঠস্বর একটু দুর্বল হয়ে গেছে। মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেও সে যে সম্পূর্ণ অভাবিত কোনো দারুণ সংকটের মধ্যে পড়েছিল, তা লুকোতে পারছে না।

আলম বললো, তরপরই পুলিশগুলো এসে ট্যাক্সি থেকে ড্রাইভারকে টেনে নামালো। কিন্তু ঐ ড্রাইভারের খুব একটা দোষ ছিল না, কিন্তু আমি তর্ক করতে চাইনি, আমি শুধু বলেছিলাম, আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আর একটা ট্যাক্সি ধরার জন্য আমি নেমে দাঁড়ালাম। বুঝলে, লাহোরে তো সহজে ট্যাক্সি পাওয়াও যায় না...এর মধ্যে সেখানে ভিড় জমে গেছে, একজন পুলিশ অফিসার আমাকে বললো, ঐ ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে আমাকেও থানায় যেতে হবে। বোঝো ঠ্যালা! আমি কেন থানায় যাবো? এইসব গণ্ডগোলের মধ্যে দেখি যে আমার হ্যান্ডব্যাগটা নেই। তার মধ্যে আমার পাসপোর্ট, ট্রাভলার্স চেক, রিটার্ন টিকিট সব কিছু।

শাজাহান জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাগটা আপনার হাতে ছিল?

—না, ট্যাক্সিতে রাখা ছিল। তখন আমাকে যেতেই হলো থানায়, ডাইরি করতে তো হবেই। এর মধ্যে সেই যে লোকটা আমায় এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে গিয়েছিল, সে সরে পড়েছে। দেন গুনলি আই স্মেল্ট র‍্যাট। পুরো ব্যাপারটাই একটা ট্র্যাপ। ক্যান ইউ বিলিভ ইট, থানায় নিয়ে যাবার পর আমাকে ডায়েরি করতে দিল না, আমাকে গারদে ভরে দিল! কোনোরকম কারণ দেখালো না, কিছু না। আমি একটা টেলিফোন করতে চাইলাম, তাও দেবে না।

—আপনার মামার অসুখের কথাটা মিথ্যে?

—সেটা অনেক পরে জানতে পেরেছি। অসুখ বিসুখ কিছু না। জাফরমামা ঐ টেলিগ্রাম পাঠান নাই, তিনি কিছু জানেনও না। পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্সের কারবার। তারা ঠিক খবর নিয়েছিল যে ঐ জাফরমামার গুরুতর অসুখের কথা জেনেই আমি ঢাকা থেকে ছুটে আসবো! ইন ফ্যাক্ট ওরা আমার সম্পর্কে অনেককিছুই জেনেছিল আগে থেকে। সন্ধেবেলা একজন ইন্টারোগেট করতে এলো আমাকে, এসেই বললো, আপনি ডাক্তারি করেন না পলিটিকস করেন? লন্ডনে আপনি একটা বাংলা আর একটা ইংরেজি কাগজের সাথে কানেকটেড, আপনাদের কাগজে ইস্ট পাকিস্তানের অটোনমি দাবি করা

হয়েছে।

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে মেরেছে?

–না, মানে, ফিজিক্যাল টরচার বিশেষ করে নাই।

–বিশেষ করেনি মানে, কিছু করেছে? কোথায় মেরেছে?

–সে এমন কিছু না। পরে বলবো। শোনো, তার চেয়েও ডেঞ্জারাস ব্যাপার হলো, থানা থেকে পরদিন আমাকে আর একটা বাড়িতে নিয়ে গেল, সে জায়গাটা যে কী কিছু বুঝলাম না একটা ব্যারাক বাড়ির মতন, চারদিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, চব্বিশ ঘণ্টা আর্মড গার্ড। সেখানে দুইদিন থাকার পরই আমার মনে হলো, এরা আমাকে মেরে ফেলবে। কেউ কিছু জানবে না, গুলি করে গোর দিয়ে দেবে। আমার পাসপোর্ট নাই, কোনো আইডেনটিটি নাই, কেউ আমার খোঁজও করবে না লাহোরে। ওরা যতবার আমাকে ইন্টারোগেট করতে আসে, আমি আমার ব্যাগটার কথা তুললেই ওরা হেসে উড়িয়ে দেয়। একজন তো বলেই ফেললো, আপনার আর পাসপোর্ট দরকার হবে না! তখন সত্যি ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আর বাঁচার কোনো উপায় নাই।

তুতুলের পিঠে হাত রেখে আলম আবেগ চাপবার চেষ্টা করে বললো, সত্যি ভেবেছিলাম, তোমার সাথে আর দেখা হবে না!

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, একজন যে আমাকে টেলিফোনে খবর দিল, তোমার পাসপোর্ট টাকা পয়সা হারিয়ে, গেছে, সে কে! সেই লোকটি জানলোই বা কী করে? সে বলেছিল, আমি আলমের বন্ধু, লাহোর থেকে এসেছি।

–শোনো না ব্যাপারটা। সেইই লোকের জন্যই তো বেঁচে গেলাম। যে ব্যারাক বাড়িটাতে আমারে আটকে রেখেছিল, সেখানে দু'বেলা শুধু চাপাটি আর সবজি খেত দিত, চা-টা কিছু না। যে-লোকটা রোজ খাবার দিয়ে যেত, তার বদলে একদিন অন্য একজন লোক এলো। তাকে দেখেই আমার সন্দেহ হলো বাঙালী বলে। সে লোকটাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে কানের কাছে ফিসফিস করে বললো, সার চিটাগাঙে কী হইতাছে, হুনছেন? তার কাছেই আমি জানতে পারলাম পঁচিশে মার্চের রাত্তিরের ঘটনা। দু'জন বাঙালী আর্মি অফিসারদের কোয়ার্টারেও সে খাবার দেয়। সেখান থেকে শুনেছে। বাঙালী আর্মি অফিসাররাও পালাবার মতলোব করছে নাকি! সেই কুকটি প্রথমে আমাকে কোনো সাহায্য করতে রাজি হয়নি, সে ভয় পাচ্ছিল, তার ওপরেও নজর রাখা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটা উপায় আমার মাথায় এলো। যে লোকগুলো আমায় ইন্টারোগেট করছিল, তাদের কথা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম, ওরা আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানলেও একটা খবর জানে না। আমি যে বছর খানেক আগেই ব্রিটিশ সিটিজেনশীপ পেয়ে গেছি, সেটা তারা উল্লেখ করে না। আমি পাকিস্তানী পাসপোর্টও ক্যানসেল্ড করাই নাই। ব্রিটিশ পাসপোর্ট খানা ঢাকায় রয়ে গেছে, ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাবার সুবিধার জন্যই পাকিস্তানী পাসপোর্টখানা লাহোরে যাবার সময় সাথে নিয়েছিলাম।

শাজাহান বললেন, আপনি ব্রিটিশ সিটিজেন হলে তো আপনাকে আটকে রাখার অধিকার ওদের নেই। সে কথা ওদের জানিয়ে দিলেন না কেন?

আলম বললো, সে কথা জানালে, ওরা তখুনি আমাকে মার্ডার করতো। আই ওয়াজ ডেফিনিট অ্যাবাউট দ্যাট। আমাকে ওরা বাঁচিয়ে রেখেছিল শুধু আমার পেট থেকে কথা আদায় করার জন্য। লন্ডন থেকে কোন কোন বাঙালী মুসলমান আওয়ামী লীগকে সাহায্য করে, টাকা পয়সা তুলে দেয়, সেটাই ওরা জানতে চেয়েছিল। আমার দু'একজন বন্ধুর নাম করে জিজ্ঞেস করেছিল, এরা তো চায়নাপন্থী লেফটিস্ট, এরাও কি শেখ মুজিবকে সাপোর্ট করে? বুঝুন তা হলে, কতটা ওরা জানে!

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী করলে তারপর?

আলম বললো, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনে আমার একজন বাঙালী বন্ধু পি আর ও'র কাজ করে। তার নাম মেহেদী আলী ইমাম মিন্টু। সেই মিন্টু আমার পোলাপান বয়েসের বন্ধু। আমাকে একমাত্র সেই বাঁচাতে পারে। কোনো রকমে যদি তারে খবর দেওয়া যায়। ব্যারাকের সেই বাঙালী কুককে কাকুতি-মিনতি করলাম, কোনো রকমে আমার একখানা চিঠি মিন্টুর নামে পোস্ট করে দিতে হবে। আমার মামুনের জানায়ে কোনো লাভ নাই, তিনি কিছু করতে পারবে না, মিন্টুই ভরসা! এরপর যা একখান কাকতালীয় ব্যাপার হলো, প্রায় অবিশ্বাস্য বলা যায়। আল্লাহর

বোধ হয় হঠাৎ নেক নজর হয়েছিল আমার উপর। আমার চিঠিখানা মিন্টু যখন হাতে পেল, তার ঠিক ছ'ঘণ্টা পরেই তার লন্ডনে আসার কথা। তাতে খুব সুবিধা হয়ে গেল। মিন্টু লন্ডনে পৌঁছেই ফরেন অফিসকে সব জানলো। পাকিস্তান হাই কমিশনে গিয়েও হুমকি দিল যে কোনো ব্রিটিশ সিটিজেনকে যদি এরকম ভাবে ডিটেইন করা হয়, তা হলে সে খবরের কাগজে সব ফাঁস করে দেবে! ঐ মিন্টুই তোমাকে ফোন করেছিল তুতুল! যদি আর দুই তিন দিন দেরি হতো, তা হলে বোধ হয় আমারে আর দেখতে পেতে না। সেই বাঙালী কুকটি অ্যারেস্টেড হয়ে যায় পরের দিনই।

শাজাহান বললেন, থ্যাংক ইয়োর স্টারস্। সত্যিই আপনি খুব জোর বেঁচে গেছেন। আমি তোত আর্মির সঙ্গে সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করি, আর্মির অফিসারের পার্টি দিতে হয় মাঝে মাঝে। তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু যা কথা শুনেছি, হরিবল, আনথিংকেবল! বাঙালীদের ওপর তাদের অসম্ভব রাগ। তারা গর্ব করেই বলেছে যে, এবার ইস্ট পাকিস্তান থেকে ওয়ান ফোর্থ পপুলেশন কমিয়ে দেবে! যত পারে মারবে। বাকিদের তাড়িয়ে দেবে ইন্ডিয়া। হিন্দুদের সরাতে পারলেই তো কমে যাবে অনেক। আওয়ামী লীগের সাপোর্টারদের খুঁজে খুঁজে বার করে কুকুরের মতন গুলি করবে! এ তো জেনোসাইড!

আলম জিজ্ঞেস করলো, ওখানে মুক্তিযোদ্ধারা নাকি খুব জোর দিচ্ছে। সে সম্পর্কে শুনেছেন কিছু?

আলম বিরণ মুখে বললো, এক হাজার ছাত্রকে মেরেছে? গর্ব করে বললো এই কথা? নিজের দেশের ছেলেদের ....আপনাকেই বা বললো কেন এই কথা?

শাজাহান বিচিত্রভাবে হেসে বললেন, আমি বিলেতে থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা করি, নামে মুসলমান, সুতরাং ইন্ডিয়ান সিটিজেন হলেও ধরেই ওরা নিয়েছে আমি অ্যান্টি ইন্ডিয়ান, অ্যান্টি হিন্দু হবোই! অনেকেই তো তাই মনে করে।

শাজাহান সাহেবের বাড়ি সাউথ হ্যারোতে, তাঁর নামার সময় এসে গেল। সুটকেস নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে তিনি পকেট থেকে নিজের একটা কার্ড বার করলেন। সেটা আলমের হাতে দেবার আগে তিনি তুতুলের মুখে দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, অনেকক্ষণ থেকে মনে করার চেষ্টা করছি তোমাকে আগে কোথায় দেখেছি! প্রতাপ মজুমদার তোমার কে হন?

তুতুল বিস্মিত ভাবে বললো, উনি আমার মামা!

শাজাহান বললেন, তোমাকে অনেক ছোট বয়েসে দেখেছি! আমি ত্রিদিবের বন্ধু ছিলাম। তুমি প্রতাপবাবুর ছেলে পিকলুর সঙ্গে ত্রিদিব-সুলেখাদের বাড়িতে আসতে মাঝে মাঝে। পৃথিবীটা আসে খুব ছোট, তাই না?

তুতুল বিস্ফারিত চোখে আলমের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, ত্রিদিব মামাও তো এদেশেই আছেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শাজাহান আলমকে বললেন, এই কার্ডে আমার ফোন নাম্বার আছে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে খুশী হবো!

তারপর তিনি আর দাঁড়ালেন না।

আলম শরীর এলিয়ে দিয়ে বললো, এখন দুইদিন আমি টানা ঘুমাবো। কোথায় যাবো রে তুলতুলি, গোল্ডার্স গ্রীনে তোর অ্যাপার্টমেন্টে আমারে থাকতে দিবি?

তুতুল বললো, যেতে পারো। তোমার অ্যাপাট্যমেন্টটাও আমি ঠিকঠাক করে রেখেছি। যা ময়লা জমেছিল, এই রবিবার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালিয়েছি সারা দিন।

আলম হাই তুলে বললো, অর্থাৎ, তোর বাসায় আমাকে নিতে চাস না। একা একা আমার বাসায় নির্বাসন দিতে চাস, তাইই তো? কী মাইয়ার পাল্লাতেই পড়েছিল, সিংহের থাবা থেকে কোনোক্রমে বেঁচে ফিরে আসলাম, তাও একটা মিষ্টি কথা বলে না, একটু আদর করে না।

–কে বলেছিল এই মাইয়ার পাল্লায় পড়তে? আরও কত সুন্দরী মেয়ে তোমার জন্য পাগল ছিল, শিরিন, বেচারি কত দুঃখ পেয়েছে।

–ইচ্ছা করে কি আর পড়েছি! গ্রহের ফের, একেই বলে গ্রহের ফের।

–এখানো সময় আছে গ্রহরে ফের কাটাবার! বলো, নাসিম-রেবেকাদের অ্যাপার্টমেন্টে নামিয়ে দেবো? ওরা কত খুশী হবে তোমায় পেলে।

হঠাৎ তুতুলের পিঠে একটা কিল মেরে আলম বললো, তুমি আমকে কাটিয়ে দিতে পারলেই খুশী

হও, তাই না?

আলম এবার তুতুলের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে গাঢ় স্বরে বললো, তুতুল, তুমি কি স্বাধীনতার থেকেও বেশী দূরে?

তুতুল রক্তিম মুখে বললো, এই প্লীজ, ওঠো, আমি ক্লাচ দিতে পারছি না। লোকে দেখছে, লোকে দেখছে!

আলম বললো, লন্ডন শহরে লোকে দেখলেও কিছু আসে যায় না। আর কতদিন আমাকে দূরে দূরে রাখবে? প্রথমে বললে, মায়ের ভীষণ আপত্তি, কিছুদিন অপেক্ষা করা যাক। তারপর বললে, আগে এফ আর সি এস হয়ে যাক। তারপর বললে, এক সাথে দেশে ফিরে...তুতুল, লাহোরে আটক থাকার সময় সর্বক্ষণ কী ভেবেছি জানো? একেবারে খাঁটি সত্যি কথা বলছি। এতদিন আমি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য অনেক কাজ করেছি, খেটেছি, এ কাজের জন্য যে হঠাৎ প্রাণটা চলে যেতে পারে তা কি আমি জানতাম না? সে জন্য তো তৈরিই ছিলাম। কিন্তু লাহোরে ঐ কয়েদখানায় বসে মনে হতো, স্বাধীনতা আমি দেখে যাবে কি না জানি না। কিন্তু তুতুলের সঙ্গে আর দেখা হবে না? অন্তত আর একবার...। সেইজন্যই বাঁচার চেষ্টাটা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। তুমি বলবে, মানুষ বাঁচার চেষ্টা করে শুধু নিজের জন্য। না, সব স্বাধীনতার যুদ্ধও পুরোপুরি শুরু হয়ে গেছে। একদিন না দিন স্বাধীনতা আসলেই। কিন্তু তুমি কি কোনোদিন আমার হবে না? এরকম দূরে দূরেই থাকবে?

–আমি বুঝি দূরে দূরে আছি? তুমি কিছু বোঝো না।

–তুমি কেন সম্পূর্ণ আমার হবে না? শোনো, আমি বড় ক্লান্ত, ভিতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে আছে। তোমার কাছে আমাকে কয়েকটা দিন থাকতে দাও। বিশ্বাস করো, আমি আর কিছু চাই না, শুধু তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকবো, অনেক কথা আছে। প্লিজ, গাড়িটা ঘোরাও।

–উঠে বসো, লক্ষীটি। তোমাকে ওরা মেরেছে কিনা সত্যি করে বলো। কোথায় মেরেছে?

–গাড়ি না ঘুরিয়ে কথা ঘোরাচ্ছো? তোমার বাসার এক কোনায় আমাকে একটু আশ্রয় দিতে পারবে না? বুঝেছি? থাক, আর বলবে না।

–কী বুঝেছো?

–এ শাজাহান সাহেব তোমায় পিকলুদার কথা বললেন, তাই শুনেই তোমার মন খারাপ হয়ে গেল। তোমার মুখ দেখেই টের পাওয়া যাচ্ছে। পিকলুদাকে তুমি কিছুতেই ভুলতে পারো না! তোমার পিকলুদা খুব চমৎকার মানুষ ছিল জানি, তোমায় খুব ভালোবাসতো, বাট হি ইজ ডেড লং টাইম এগো! আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা একজন মৃত মানুষের সঙ্গে। দিস ইজ আনফেয়ার! একজন মৃত মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে কেউ কি জিততে পারে!

তুতুল আলমের চুলে একটা হাত রেখে বললো, তমি কিছু জানো না, কিছু বোঝো না! পিকলুর কথা মনে পড়লে আমার এখন আর কষ্ট হয় না, মনটা, ভালো লাগায় ভরে যায়। পিকলুদা আমার সেই বয়েসেই থেমে আছে, আমার এখনকার সঙ্গী তোমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে না! গাড়ির মধ্যে শুয়ে থাকলে কি রাস্তা দেখা যায়? গাড়িটা কোন্ দিকে যাচ্ছে তাও তোমার খেয়াল নেই। ওঠো, আমরা প্রায় এসে গেছি।

॥ ১৩ ॥

অতীন প্যান্ট বেল্ট বেঁধে বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছে, এমন সময় ঝনঝন করে বেজে উঠলো টেলিফোন। অতীন মুখ ফিরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। টেলিফোনটা সে ধরবে, কি করবে না? আর আধ মিনিট বাদে, দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলে এসে ঐ টেলিফোনের আওয়াজ শুনতেই পেত না। আধ মিনিটে কী আসে যায়! এই ভর সন্ধেবেলা কেউ জরুরি টেলিফোন করে না!

কয়েকবার বেজে থেমে গেল ঝনঝনানি। অতীন নিশ্চিন্ত হয়ে জ্যাকেটটা গায়ে গলিয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিতে যাবে, আবার টেলিফোন বাজলো। দু'বার ডাকের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা থাকে। এবারে ধরতেই হয়।

প্রথম একজন অপারেটরের কৃত্রিম কণ্ঠস্বর। কালেক্ট কল্, শ্যান্টি রেচাড্রি কথা বলতে চাইছে, অতীন কি নেবে?

–হ্যালো সিদ্ধার্থ? আমি শান্তা বৌদি বলছি, একটা মুশকিলে পড়েছি ভাই।

–সিদ্ধার্থ এখনো বাড়ি ফেরেনি, আপনি যদি কোনো মেসেজ দিতে চান–

–আপনি কে? অতীনবাবু, সিদ্ধার্থ কখন ফিরবে?

–এই সময়েই ফেরার কথা। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে বোধ হয়।

আপনি কি বাড়িতে আছেন? আমি একটু আসতে পারি? আমার বিশেষ দরকার আছে, আমি কাছাকাছি এক জায়গা থেকেই বলছি।

ভদ্রমহিলা এখানে আসতে চাইছেন, অতীন না বলতে পারে না। কিন্তু অতীনের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো। কেন সে ফোনটা ধরতে গেল? অতীন তো বেরিয়েই যাচ্ছিল, তা হলে উনি কোনো সাড়া পেতেন না।

শান্তা বৌদির বাড়িতে গিয়ে অতীন অভদ্র ব্যবহার করেছিল, তারপর একদিন সে টেলিফোনে ক্ষমা চেয়েছে বটে কিন্তু ওঁর বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ এড়িয়ে গেছে। এখন সেই শান্তা বৌদির মুখোমুখি পড়ে যেতে হবে? সর্বনাশের ব্যাপার!

ভদ্রমহিলা কালেক্ট কল্ করলেন কেন, তাও কাছাকাছি থেকে? সিদ্ধার্থের সঙ্গে ওঁর দরকার, অতীন বসে থেকে কী করবে? অতীনের কোনো কাজ নেইত অবশ্য সারাদিন বাড়িতে বসে ছিল বলেই সে একবার ঘরে আসতে চাইছিল রাস্তা থেকে।

সিদ্ধার্থ এসে পড়লে সে কেটে পড়তে পারে। অফিস থেকে সাধারণত এই সময়েই ফেরে সিদ্ধার্থ, কিন্তু আজ যদি কোনো কারণে আটকে যায়? ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরতেই হবে, সেরকম তো কোনো মাথাব্যথা নেই।

সিগারেট ধরিয়ে সে বিরক্তমুখে অ্যাপার্টমেন্টে পায়চারি করতে লাগলো। অকারণে ফ্রিজটা খুলে দেখলো একবার। জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারলো রাস্তায়। অনেক নীচের রাস্তাটা যেন তাকে টানছে। বাইরের টাটকা বাতাস, রেস্তোরাঁর গান-বাজনা...

দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়লেন শান্তা বৌদি। অতীন দরজা খোলা মাত্র তিনি এক গাল হেসে বললেন, যা একখানা বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়েছে। আজ! এমন বিপদে পড়ে গেছি! আমার হ্যান্ডব্যাগটা চুরি হয়ে গেল!

ভেতরে এসে বললেন, কী কাণ্ড বলুন তো! আমার আগে কক্ষনো এরকম হয়নি। ব্যাগের মধ্যে আমার চেক বই, টাকাপয়সা, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সব কিছু। কী ভাগ্যিস গাড়ির চাবিটা অন্যমনস্কভাবে হাতের মুঠোয় রেখেছিলুম, ব্যাগে ঢোকাইনি!

অতীন আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলো, ব্যাগটা কী করে চুরি গেল?

শান্তা বৌদি বললেন, কী জানি, বুঝতেই পারলুম না। একটা গ্রসারি স্টোরের কাউন্টারের ওপর ব্যাগটা রেখে দু'একটা জিনিস দেখছিলুম, বোধ হয় এক মিনিটও হয়নি, তার মধ্যেই ব্যাগটা হাওয়া! কত খোঁজাখুঁজি হলো, দশ বারোজন মাত্র লোক ছিল দোকানে, তাদেরই কেউ নিয়েছে, না বাইরে থেকে কেউ এসে, আপনাদের এই পাড়াটায় বড্ড চোরের উপদ্রব!

অতীন বললো, আপনি কুইন্সে থাকেন, অত দূর থেকে এ পাড়ায় গ্রসারি স্টোরে বাজার করতে এসেছিলেন কেন?

শান্তা বৌদি চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, আমাকে একটা কাজে ম্যানহাটানে আসতেই হয়েছিল, তারপর অফ ব্রডওয়ে থিয়েটারের টিকিট কাটলুম দুটো, সেই টিকিটও গেল, ঐ ব্যাগের মধ্যে ছিল। এদিকে এলে আমার বাজার করে নিয়ে যাই, এ পাড়ায় একটা দোকানে খুব ফ্রেস ক্যাবেজ পাওয়া যায়। এমনিতে তো এদেশের বাঁধাকপিতে কোনো স্বাদই নেই। ফিফ্থ স্ট্রিটের ঐ গ্রসারি স্টোরটা দেখেছেন? ওরা পৃথিবীর সব দেশের ভেজিটেব্ল রাখে আমি একদিন ঢেঁকির শাক পর্যন্ত পেয়েছি, লাউ পেয়েছি....আপনাদের ঘরটা বড্ড গরম হয়ে আছে, বাইরে কিন্তু আজ বেশ ঠাণ্ডা!

শান্তা বৌদি বললেন, ব্যাগটা চুরি যাওয়ায় একেবারে বোকা বনে গেছি। সঙ্গে তো আর একটাও পয়সা নেই, বাড়ি ফিরবো কী করে? আমার কর্তা অফিসের কাজে শিকাগো গেছেন, বাড়িতে ফোন করে কোনো লাভ নেই। গাড়িটা রেখেছি একটা পার্কিং লটে, সেখানে দু'তিন ডলার দিতে হবে, গাড়িটা ওখানে রেখে দিয়ে ট্রেনে যে ফিরবো, সে টিকিট কাটারও উপায় নেই, তাই ভাবলুম, কাছেই

সিদ্ধার্থের অ্যাপার্টমেন্ট, যদি তার সাহায্য পাওয়া যায়।

অতীন টেবিলের প্রথম ড্রয়ারটা খুললো। এখানে সিদ্ধার্ত আর সে খুচরো পয়সাগুলো রাখে। এদেশে অনেক খুচরো জমে যায়। অতীন দেখলো, কোয়ার্টার আর ডাইম মিলিয়ে সাত-আট ডলার হয়ে যাবে। সে বললো, পার্কিং লট থেকে আপনার গাড়িটা ছাড়াবার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে!

শান্তা বৌদি বললেন, আমার ড্রাইবিং লাইসেন্টাও যে ব্যাগের মধ্যে ছিল! পার্কিং লটে গিয়ে যদি বলতুম আমার ব্যাগ চুরি গেছে, তা হলে ওরা এমনিই ছেড়ে দিত নিশ্চয়ই, পরে ওদের পাওনাটা চেকে পাঠিয়ে দিতুম, কিন্তু লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালাবো কী করে? ধরলে ছেলে দিতে দেবে!

এ দেশে সবাই গাড়ির ওপর নির্ভরশীল, আবার গাড়ি একটা ভয়েরও বস্তু বটে। শহরে এসে গাড়ি রাখার জায়গা খুঁজে পাওয়াই বিরাট ঝামেলা, যেখানে সেখানে রাখলে পুলিশ টিকিট দিয়ে দেবে কিংবা গাড়ি টো করে নিয়ে যাবে। পার্কিং লটে রাখতে গেলে অনেক পয়সা দিতে হয়। গাড়ি খুব জোরে চালালো পুলিশ ধরে, আস্তে চালালেও ধরে, ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে রাখতে হবে সব সময় বলে, একদিন এ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া যাওয়া যায় না?

শান্তা বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে? তা হলে আপনি আমায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারেন, গাড়িতে অনেক জিনিসপত্রও আছে।

—আমি গাড়ি চালাতে জানি না!

—তা হলে তো সিদ্ধার্থের জন্য অপেক্ষা করতেই হয়। একটু চা খাওয়াতে পারবেন? আমিই তৈরি করে নিতে পারি।

—না, না, আমি করে দিচ্ছি। টি ব্যাগস আছে, অসুবিধে কিছু নেই।

—আপনি কি বেরুচ্ছিলেন? কোথাও যাবার তাড়া আছে?

—হ্যাঁ, একটু আছে। আপনাকে চা-টা করে দিই, আশা করি সিদ্ধার্থ একটু বাদেই এসে পড়বে!

কেটলিতে জল ভরে স্টোভে চাপিয়ে দিল অতীন। এখনও তার অস্বস্তি যাচ্ছে না। সিদ্ধার্থটা আসছে না কেন? আজই সে সেই বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে কি না কে জানে!

অতীন শান্ত বৌদির দিকে পেছন ফিরে আছে। ভদ্রমহিলা দেখতে বেশ সুন্দর, কিন্তু রূপের জন্য অহঙ্কারের ভাবটা নেই, ব্যবহার চমৎকার। এই যে ব্যাগ হারিয়ে বিপদে পড়েছেন, সেটা নিয়েও হেসে হেসে কথা বলছেন। এই রকম একজন মহিলার বুঝতে পারছে না, সে কেন এই মহিলার উপস্থিতি পছন্দ করতে পারছে না। ওঁর সঙ্গে আলাপের প্রথম দিনেই গণ্ডগোল করে ফেলার জন্য। উনি তো একবারও কোনো ভাব দেখান নি যে উনি তার সেদিনের ব্যবহারে আহত হয়েছেন!

শান্তা বৌদি কাছে এসে বললেন, ব্যাচেলরদের ঘরে ভীষণ পুরুষ পুরুষ গন্ধ থাকে। জানেন, আমার পরিষ্কার-বাতিক আছে। এই রকম কোনো ঘরে এলেই আমার হাত দুটো নিশপিশ করে, ইচ্ছে করে সব কিছু গুছিয়ে ঠিকঠাক করে দিই। রান্নাঘরে ওয়ালপেপারেও ঝোলের দাগ লাগিয়েছেন?

অতীন শুকনো ভাবে জিজ্ঞেস করলো, আপনার ক' চামচ চিনি?

—এক চামচ। কিন্তু দুটো কি ব্যাগ দেবেন।

—দুধ মেশাবো, না লেবু?

—লেবুও আছে নাকি?

আসল লেবু নয়, একটা প্লাস্টিকের তৈরি অবিকল হলদে রঙের লেবু, তার মধ্যে কে আউন্স রস, টিপলে ফোঁটা ফোঁটা পড়ে। সেটা হাতে নিয়ে শান্তা বৌদি বললেন, এই জিনিসটা আমি কখনো ব্যবহার করিনি। আমি ফ্রেস লেবুই পছন্দ করি।

চায়ের কাপটা শান্তা বৌদির হাতে তুলে দিয়ে অতীন একটু দূরে সরে গেল। ভদ্রমহিলা একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্য কোনো মতলব আছে না কি? দরজা বন্ধ, ঘরের মধ্যে দু'জন নারী আর পুরুষ, এত কাছে এসে কথা বলার দরকার কী?

অতীন মনে মনে ঠিক করলো, এই মহিলা যদি তার সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করেন, তা হলে সে এমন শিক্ষা দেবে, যা উনি জীবনে ভুলবেন না। এদেশের এসে মেমসাহেব হয়েছেন, যার তার সঙ্গে ঢ্যাঙচার স্ব বেড়ান মনে হচ্ছে। সিদ্ধার্ত ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সে বলবে, তুই যে শান্তা বৌদির আমার

এত প্রশংসা করছিলি, ইনি যে আমার সঙ্গে শুতে চাইছিলেন। রে! এই সব মেয়েছেলেদের আমার ছুঁতেও ঘেন্না করে।

অতীন আড় চোখে শান্তা বৌদির দিকে তাকালো। বারোয়ারি, বৌদি, থিয়েটার করেন, সবাইকে ডেকে ডেকে খাওয়ান, আর একলা ছেলেদের অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসেন যখন তখন!

শান্তা বৌদি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, বাঃ! থ্যাঙ্ক ইউ! আপনার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। আপনি কি চাকরি করেন, না এখনো পড়ছেন?

—আমি কুলিগিরি করি!

শান্তা বৌদি মধুরভাবে হাসলেন।

অতীন আবার জোর দিয়ে বললো, আমি কাছেই একটা সুপার মার্কেটে লরি থেকে মালপত্তর নামাই। সপ্তাহে তিন দিন।

—প্রথম প্রথম এসে অনেকেই এরকম অড জব করতে হয়। কত ছাত্র-ছাত্রী হোটেল রেস্তোরাঁয় বাসন মাজার কাজ করে। এদেশের ডিগনিটি অফ লেবার আছে।

—ডিগনিটি অফ লেবার আবার কী! এদেশের টাকা ছাড়া একদিনও বেঁচে থাকা যায় না বলেই লোকে বাধ্য হয়ে যে-কোনো ডিগনিটি অফ লেবার নেই!

—আমার এক দেওর অনেকদিন গ্যাস স্টেশনে অ্যাটেনডেন্ট-এর কাজ করেছে। এখন হোয়াইট কলার জব পেয়েছে। প্রথম কিছুদিন কষ্ট করতে হয়।

—এখানে লাথি ঝাঁটা খেয়েও দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতে হয়, যদি একদিন বড়লোক হওয়া যায় এ আশায়!

শান্তা বৌদি এবার এত জোর হেসে উঠলেন যে তাঁর হাতের চায়ের কাপ চলকে গেল, খানিকটা বা পড়লো শাড়িতে। তাড়াতাড়ি কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, পেপার ন্যাপকিন আছে?

অতীন দু'তিনখানা কাগজে এনে দিল। শান্তা বৌদি শাড়ি মুছতে মুছতেও হাসতে লাগলেন। অতীনের গা জ্বলতে লাগল। এরকম অকারণ হাসি মেয়েরাই শুধু হাসতে পারে।

অতীন এবার আর সরে গেল না। শান্তা বৌদি হাসি থামিয়ে একদৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। অতীন ভেতরে ভেতরে অপেক্ষা করছে, সে মহিলাকে সিডাকশান শুরু করার সুযোগ দিচ্ছে।

—আপনি নাকি সেদিন, আমার বাড়ি থেকে ফেরার সময় চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়েছিলেন?

—এ কথা কে বলেছে আপনাকে?

—যে-ই বলুক, ঘটনাটা কি সত্যি?

—হ্যাঁ।

—কেন, ঐ রকম করেছিলেন কেন?

—আমার ইচ্ছে হয়েছিল।

—প্রথমে শুনে ভেবেছিলুম, আমি কিংবা আমার বাড়ির কেউ সেদিন আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। আমার এত লজ্জা হয়েছিল।

শান্তা বৌদি এটা হাত তুললেন। অতীন ভাবলো, এইবার উনি তাকে ছোঁবেন, সান্ত্বনা দেবার ছলে সিডাকশনের প্রথম স্তর। ওঁর বুকের আঁচলটা খসে গেছে অর্ধেকটা, ইচ্ছে করেই করেছেন নিশ্চয়ই

শান্তা বৌদি তাঁর ফর্সা, নরম বাঁ হাতের তালুটা অতীনের মুখের কাছে এনে বললেন, এই দেখছেন, কত বড় একটা কাটা দাগ, একবার একজন আমাকে ছুরি মারতে এসেছিল, আর একটা দাগ আছে ঘাড়ে, সেটা চুলের তলা ঢাকা পড়ে যায়।

হাতটা নামিয়ে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কেন যে তিনি হঠাৎ এই কথাটা বললেন তা বোঝা গেল না। পরক্ষণেই তিনি বললেন, আপনি আমাকে দু'ডলার ধার দিন। সিদ্ধার্থের আসতে দেরি হবে মনে হচ্ছে, আমি ট্রেনে করেই বাড়ি চলে যাই।

একটু অবাক হলেও অতীন ড্রয়ার থেকে বেশ কিছু খুচরো তুলে নিল। শান্তা বৌদি হাতে পেতে

সেগুলো নিলেন, তারপর বললেন, আপনি চা খাওয়ালেন, পয়সা দিলেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। সিদ্ধার্থ ফিরলে বলবেন একটা ফোন করতে। গাড়িটা থাক আজকে।

অতীন বললো, আপনি ইচ্ছে করলে আর একটু অপেক্ষা করতে পারেন। সিদ্ধার্থ জেনারেলি এই সময়েই ফেরে।

—নাঃ, আপনার নিশ্চয়ই অন্য কাজ আছে, আপনার সময় নষ্ট করবো না।

—আমি যদি আপনাকে আর কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি, মানে, আপনার একটা ট্রেনে যাওয়ার অভ্যেস আছে তো?

শান্তা বৌদি আবার হেসে বললেন, হ্যাঁ, অভ্যেস আছে। একসময় তো আমি চাকরিও করেছি।

দরজার কাছে গিয়ে আবার পেছনে ফিরে তিনি বললেন, জীবনের যেমন অনেক খারাপ দিক আছে, তেমন ভালো দিকেও আছে, তাই না? সব সময় খারাপ দিকগুলিই দেখা ঠিক না। কত সময় মানুষ কত সামান্য জিনিস পেলেই দারুণ খুশী হয়ে যায়!

—হঠাৎ আমাকে এই কথাটা বলছেন কেন?

—এমনিই মনে এলো। আমি মাঝে মাঝে এরকম উল্টোপাল্টা কথা বলি। এখানকার সবাই জানে, কেউ কিছু মনে করে না।

—এর আগে আপনি ছুরি মারার কথা বললেন। আপনি কি কোনো কারণে আমাকে ভয় পেয়েছিলেন?

—না, না, আপনাকে ভয় পাবো কেন? আপনাকে প্রথম দিন দেখেই আমার ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়েছিল। তা আরও ঠিক আপনার মতনই রাগী রাগী স্বভাব আর বয়েসের তুলনায় ছেলেমানুষ। সে আবার কট্টর কমিউনিষ্ট। এই দেশটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আমি এদেশে থাকি বলে আমাকেও সে অ্যামেরিকান মনে করে। তা হলে আজ চলি!

দরজায় চাবি ঘোরাবার শব্দ হলো, শান্তা বৌদিকে প্রায় ঠেলে ভেতরে ঢুকলো সিদ্ধার্থ। তারপরই সে চেঁচিয়ে উঠলো, কী ব্যাপার, শান্তা বৌদি, আবার নেমন্তন্ন নাকি? করে, কবে?

শান্তা বৌদি বললেন, হ্যাঁ, এই শনিবার। এবারে তাড়াতাড়ি আসতে হবে কিন্তু, সেই যে তোমরা রাত দুপুর করে আসো, সেদিন গান বাজনা হবে, সামনের রবীন্দ্রজয়ন্তীর প্রোগ্রাম ঠিক হবে।

—টেলিফোনে না বলে আপনি নিজে এত দূর চলে এসেছেন?

—এ পাড়ায় এসেছিলুম, ভাবলুম নিজের মুখে বলেই যাই। তোমার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করাও হলো।

—আপনি অতীনের সঙ্গে গল্প করলেন? ও গল্প করতে জানে? তো একটা টিপিক্যাল হুঁকোমুখো হ্যাংলা, বাড়ি তার বাংলা, মুখে তার হাসি নাই দেখেছো? ও আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি বা রাগারাগ করেনি তো?

—না, না, আমার সঙ্গে রাগারাগি করবেন কেন? উনি তো নিজের ওপরেই খুব রেগে আছেন মনে হলো! যাই হোক, আমাকে চা-টা খাইয়েছেন। সিদ্ধার্থ, আমি আজ চলি, শনিবার ঠিক এসো, তোমরর বন্ধুর যদি খুব আপত্তি না থাকে তা হলে সঙ্গে নিয়ে এসো!

অতীন এবারে প্রকৃতই অবাক হয়ে গেছে। এই ভদ্রমহিলার চরিত্রটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ব্যাগ হারানোর কাহিনীটা তা হলে কি রসিকতা, সেই জন্যই হাসতে হাসতে বলছিলেন? কিন্তু ঐ ছুতোয় এসেও তিনি অন্য কিছু তো করলেন না!

সে বললো, আপনার তা হলে হ্যান্ডব্যাগ হারায় নি?

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করলো, হ্যান্ডব্যাগ হারিয়েছে? কবে?

শান্তা বৌদি অতীনকে চোখ দিয়ে ধমকে বললেন, আপনি আমার কথা শুনে বুঝতে পারলেন না যে ও কথাটা ওকে এখন বলতে চাইনি! বেচারি অফিস থেকে খেটেখুটে এসেছে, এখন আমি ওকে কোনো ট্রাবল দিতে চাই না। গাড়িটা কাল নিয়ে গেলেই হবে। যা যাবার তা তো গেছেই!

সিদ্ধার্থ বললো, হ্যান্ডব্যাগ? গাড়ি? কী হয়েছে বলুন তো! বসুন, শান্তা বৌদি, এত হুড়োহুড়ি করেছেন কেন?

সিদ্ধার্থ সব শুনে একগাল হেসে বললো, আপনি যে একদিন বলছিলেন আপনার কিচ্ছু হারায় না। ইউ ক্যান অলওয়েজ টেক কেয়ার ইয়োরসেলফ? এবার ঠ্যালা বুঝলেন তো? গ্রীনিচ ভিলেজে কবি,

টুরিষ্ট আর চোর সব সময় গিসগিস করছে। একদিন কী হয়েছে জানেন, একটা টুরিষ্ট ফ্যামিলি, বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে সব মিলিয়ে চারজন, এখানকার রাস্তা দিয়ে ঘুরছে আর খচাখচ ছবি তুলছে। কিন্তু সবার ছবি তো একসঙ্গে উঠছে না, যে তুলছে, তারটা বাদ যাচ্ছে, সেইজন্য রাস্তার একজন লোককে, ডেকে, ক্যামেরাটা তার হাতে দিয়ে বললো, ভাই, তুমি আমাদের একটা ছবি তুলে দেবে? সেই লোকটা ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে একটু পোজ মারলো, তারপর হঠাৎ এক দৌড়ে পালিয়ে গেল গেল। আর ধরাই গেল না তাকে। নেশাখোর, বুঝলেন না? ক্যামেরটা নিয়ে গিয়ে পন্ শপে বিক্রি করে গাঁজা কিনবে!

শান্তা বৌদি বললেন, বাবাঃ, আমি আর তোমাদের পাড়ায় কক্ষনো বাজার করতে আসছি না। দরকার নেই আমার ফ্রেস ভেজিটেবলে!

সিদ্ধার্থ বললো, শান্ত হয়ে বসুন! নো প্রবলেম। এ পাড়ার পার্কিং লট দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে, আমি গাড়ি বার করে দেবো, কোনো চিন্তা নেই, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো। অতীন ব্যাটা নিশ্চয়ই কিছু রান্না করে রাখেনি করে রাখেনি আমার জন্য, আপনার বাড়িতে গেলে ডাল-ভাত খাওয়াবেন নিশ্চয়ই। দেয়ার ইজ অ্যানাদার গ্রেট নিউজ জন্য, সেলিব্রেট করতে হবে!

শান্তা বৌদি বললেন, তুমি গাড়ি কিনছো, তাই তো? আজই কিনে এনেছো নাকি?

সিদ্ধার্থ হাসতে হাসতে বললো, গাড়ি কেনা তো সামান্য ব্যাপার। এদেশে গাড়ি কেনা আবার কোনো নিউজ নাকি? বেকাররাও গাড়ি কেনে! এই অতীন হারামজাদা, ফ্রিজে কয়েকটা বীয়ারে ক্যান ছিল না? বার কর, বার কর, সব শেষ করে দিসনি তো? আমাকে দে, শান্তা বৌদিকে দে!

শান্তা বৌদি বললেন, আমি এখন বীয়ার খেতে পারবো না। আমি বীয়ার ভালোও বাসি না, তুমি জানো।

সিদ্ধার্থ বললো, ভালো না বাসলেও আজ একটু খেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আপনার ব্যাগ হারিয়েছে বটে, কিন্তু আপনি দারুন গুড লাক নিয়ে এসেছেন আজ এই অ্যাপার্টমেন্টে। আপনি এত ছটফট করছেন কেন, পাঁচুদা তো নেই শহরে। বাড়িতে কে আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে?

সোফায় বসে পড়ে সিদ্ধার্থ সামনের লো টেবিলে পা তুলে দিল। তারপর গলার টাইয়ের গিট আলগা করতে করতে বললো, শান্তা বৌদি, আপনি কতক্ষণ আগে এসেছেন?

শান্তা বৌদি বললেন, তা প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তোমার বন্ধু এর মধ্যে আমাকে চা করে খাইয়েছেন।

সিদ্ধার্থ বললো, এতক্ষণের মধ্যে ও আপনাকে একাধিকবার শোনায় নি যে ও কুলিগিরি করে? আই বেট! এই কথাটা ও সবাইকে গর্ব করে জানাতে ভালবাসে!

শান্তা বৌদি সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, ইউ লুজ, সিদ্ধার্থ! না, উনি এ কথা আমাকে একবারের বেশী বলেন নি তো!

ফ্রিজ খুলে বীয়ার ক্যান বার করতে গিয়ে অতীন ওদের দু'জনের দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকালো। ওরা কৌতুক করছে তাকে নিয়ে। সে যেন একটা বোকাসোকা ভ্যাবা গঙ্গারাম। অথচ সে কোনো উপযুক্ত উত্তরও দিতে পারছে না।

সিদ্ধার্থ আবার মুরুব্বি চালে জিজ্ঞেস করলো, এই অতীন! লেজি বোন্‌স! তুই আজ সারাদিনে ঘর থেকে বার হসনি, তাই না?

অতীন সঙ্গে সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, একবার বেরিয়েছিলুম।

সিদ্ধার্থ শান্তা বৌদির দিকে তাকিয়ে বললো, সেল্ফ পিটি মানুষের কতখানি ক্ষতি করে দেখলেন তো? এ ছেলেটা আগে ভাল ছিল, এখন অনবরত ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগতে ভুগতে মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে।

তারপর মুখ ফিরিয়ে বললো, শালা, তুই নীচে গেলে একবার লেটার বক্সও দেখতি না? আমাকে ভোগা দিচ্ছিস?

পকেট থেকে সে দুটি চিঠি বার করলো। একটি লম্বা, সাদা লেফাফা, অন্যটি ভারতীয় খাম। সেই দু'খানা চিঠি সে বাঁ হাতে তুলে ধরে নাটকীয় ভাবে বললো, র‍্যাগ টু রিচেস! র‍্যাগ টু রিচেস! দা গ্রেট আমেরিকান মিথ! যে অতীন মজুমদার গতকাল পর্যন্ত ছিল সুপার মার্কেটের কুলি, আজ থেকে সে

রেসপেকটেব্‌ল স্কলার। অ্যাই অতীন, এই দুটো চিঠিই তোর! তুই বস্টন ইউনিভার্সিটির কাজটা পেয়ে গেছিস! পোস্ট ডক্টরেট করবি, প্লাস অ্যাসিস্টান্টশীপ, সাড়ে ছ'শো ডলার করে পাবি!

অতীনের দু'হাতে বীয়ারের টিন, সে মর্মরমূর্তির মতন স্থির হয়ে গেল। সে, জানে, সিদ্ধার্থ এরকম একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ইয়ার্কি করবে না। তবু, এ কী সত্যি হতে পারে? সেমেস্টারের শুরুতে যে চিঠি পায়নি, অথচ এখন,...ও, এবার তো সামার কোর্স শুরু হবে!

সিদ্ধার্থ বললো, আমার কাছে তোর তিন শো নব্বই ডলার ধুদার, সব কিছু কড়ায় গণ্ডায় কথাবার্তা আমি শুনতে চাই না। মানি ইজ মানি!

অতীনের ইচ্ছে করলো, দৌড়ে গিয়ে সিদ্ধার্থকে জড়িয়ে ধরতে। তিন শো নব্বই ডলার তো অতি সামান্য, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা সিদ্ধার্থ খরচ করেছে তার জন্য। সিদ্ধার্থ এইটাই এইটা বড় গুণ, সে সব কথাই হাল্‌কা সুরে বলে। সিদ্ধার্থ সঙ্গে এতদিন থেকেও অতীন তা শিখতে পারলে না।

অতীন মনে মনে ছুটে যাবার কথা ভাবলেও সে দাঁড়িয়ে রইলো একই জায়গা। তার পা দুটো যেন পেরেক পুঁতে আটকে দিয়েছে। সে এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি সে বস্টনে যাবার সুযোগ পেয়েছে? সাড়ে ছ'শো ডলার দেবে? অনেক টাকা! এই শান্তা বৌদি আজ সৌভাগ্য নিয়ে এসেছেন।

সিদ্ধার্থ শান্তা বৌদিকে বললো, কীরকম লাকি ডগ জানেন? রোজ রাত্তিরে বস্টনে শর্মিলা বলে একটা মেয়েকে ফোন করে অতীন। লং ডিসটেন্স কল করতে করতে আমাকে ফতুর করে দিল, বুঝলেন, শান্তা বৌদি! পুরোনো বন্ধু, মুখে কিছু বলতেও পারি না। তা ছাড়া প্রেমের ব্যাপার। এখন দেখু, কাজ পেল সেই বস্টনেই। আর টেলিফোন খরচ করার ঝামেলা রইলো না। প্রেমিকতার সঙ্গে দু' বেলাই দেখা হবে!

শান্তা বৌদি বললেন, বাঃ, খুব ভালে কথা তো। এবার আশা করি ওর রাগ কমে যাবে। শর্মিলা, মানে কোন্ শর্মিলা? যে খুব ভালো গান করে?

সিদ্ধার্থ হাতটা লম্বা করে বললো, এই নে চিঠি দুটো। সেকেন্ডটা আমি খুলিনি, আমি কক্ষনো পার্সোনাল চিঠি পড়ি না।

অতীন হাত বাড়িয়ে চিঠি দুটো নিল। তবে, যে-চাকরির ওপর তার ভবিষ্যৎ জীবন, নিরাপত্তা, তার আত্মীয়-বন্ধুদের খুশী হবার ব্যাপার আছে, সেই দরকারি চিঠিটা দেখবার আগে সে দেশের চিঠিটা উল্টোপাল্টে দেখলো। দেশ থেকে খুব কমই চিঠি আসে। তবু এক একখানা এলেই অতীন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, চিঠিখানা ছুঁয়েই সে যেন দেশের মাটির স্পর্শ পায়।

দ্বিতীয় চিঠিখানা খুলতেও হলো না। ঠিকানার হাতের লেখা দেখেই অতীন বুঝতে পারলো, সেটা অলির চিঠি! অতীনের সর্বাঙ্গের রোম সর্তক হয়ে উঠলো। অনেকদিন অলির সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ নেই। কিন্তু প্রতিদিনই সে অলির সঙ্গে কথা বলেছে মনে মনে। অতীনের চিঠি না পেয়ে অলিও বোধ হয় অভিমান করে চিঠি দেয়নি। আজই অলির চিঠি এলো!

॥ ১৪ ॥

দরজায় বেল শুনে দৌড়ে এসে খুলে টুনটুনি, আগন্তুককে দেখেই সে কাঠ হয়ে গেল। বাড়িয়ওয়ালার ছেলে পরেশ। সাদা প্যান্টের ওপর তোয়ালের মতন কাপড়ের শার্ট পরা, ঘাড়ে পাউডার, চোখে হালকা নীল রঙের রোদ চশমা। টুনটুনির দিকে কয়েক পলক স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকে সে চশমাটা খুললো, তার একটা চোখ টকটকে লাল, থুতনিতে স্টিকিং প্লাস্টার। সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের মতন বললো, আমি প্রতাপবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

টুনটুনি কিছু বলার আগেই সে ভেতরে ঢুকে এসে একটা বেতের চেয়ারে বসলো এবং সিগারেট ধরালো। টুনটুনির বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে, সে দাঁড়িয়েই রইলো দরজার কাছে।

পরেশ হুকুমের সুরে বললো, প্রতাপবাবুকে খবর দাও আমার তাড়া আছে।

মামাকে ডাকবার আগে টুনটুনি চলে এলো মুন্নির কাছে। খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে একরাশ বই ছড়িয়ে পড়াশুনো করা স্বভাব মুন্নির। বাবলুর ঘরটা এখন মুন্নির দখলে। তার পিঠে লাল রঙের ব্লাউজের ওপর খোলা চুল ছড়ানো। টুনটুনি খাটের পাশে বসে পড়ে ফিসফিক করে বললো, এই মুন্নি, এই মুন্নি সে এসেছে!

সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস থেকে মন ফিরিয়ে এনে মুন্নি তাকালো টুনটুনির দিকে। টুনটুনির মুখখানা ভয়ে সরু হয়ে গেছে, চোখদুটিতে রাজ্যের উৎকণ্ঠা।

মুন্নি বললো, এসেছে তো কী হয়েছে, তোকে কী বললো?

–আমাকে কিছু বলেনি। মামার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

–বাবাকে ডেকে দে!

–এই মুন্নি, ও যদি মামাকে সব কথা বলে দেয়!

মুন্নির চোখে এখনও সপ্তম শতাব্দীর ঘোর। হঠাৎ তার বাবাকে মনে হলো কোনো রাজ্যহীন প্রৌঢ় রাজার মতন। কপাট বক্ষে চামড়ার বর্ম, কোমরে তলোয়ার, ক্রোধদীপ্ত চক্ষু, বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেবার জন্য তাঁর ওষ্ঠে শপথের কঠোর ভঙ্গি। সে হেসে বললো, বলুক না বাবাকে, বলুক, তারপর ও ঠ্যালা বুঝবে। বসবার ঘরের দেয়ালে একটা চাবুক ঝুলছে দেখিসনি!

–মুন্নি তুই একটু গিয়ে মামাকে বল!

–আমি এখন উঠতে পারবো না। যাঃ, অত ভয়ের কী আছে? বাবা তোকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সব সত্যি কথা বলবি! তবে দ্যাখ, ও বোধহয় তোকে বিয়ে করতে চায়!

প্রতাপ যখন বসবার ঘরে ঢুকলেন তখনও পরেশের সিগারেট শেষ হয়নি, কিন্তু আর টানা না দিয়ে সেটা সে অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিল। টুনটুনির সামনে প্রতাপবাবু বললেও এখন সে অস্পষ্টভাবে বললো, কাকাবাবু, আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি।

প্রতাপ বললেন, হুঁ, বসো। তোমার বাবা কেমন আছেন?

মাথা নীচু করে অ্যাশট্রেটা ঘোরাতে ঘোরাতে পরেশ বললো, এখন ভালো আছেন।

কাকাবাবু, শুনেছেন বোধহয়, আমার দিদির বিয়ের চেষ্টা চলছিল অনেকদিন, ধরে, এবারে ঠিক হয়েছে। এই সামনের মাসেই।

প্রতাপ স্পষ্টত খুশী হয় বললেন, তাই নাকি, বাঃ, শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে তাহলে?

কোথায় ঠিক হলো? পাত্র কী করে?

–সায়েন্স কলেজের রীডার। দিদির সঙ্গে একসঙ্গেই...মানে, কাকাবাবু, বলছিলুম কী

–তোমার বাবাকে বলো, খুব খুশী হয়েছি। হ্যাঁ যাবো, নিশ্চয়ই যাবো, কত তারিখ পড়েছে?

–তারিখ এখনো ঠিক হয়নি, মানে, আমি আজ.....

এ বাড়ির মালিক জ্ঞানাঞ্জন গুহনিয়োগীর সঙ্গে প্রতাপের পরিচয় বহুদিনের। ক্রিমিন্যাল কেসের উকিল হিসেবে একসময় বেশ নাম করেছিলেন এবং প্রচুর টাকা। কলকাতা শহরে তাঁর তিনখানা বাড়ি। দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীন হয়ে যাওয়ায় তিনি ওকালতি বন্ধ করে দিয়েছেন অনেক আগেই। তাঁর ছেলেরা কেউ বাবার পেশা নেয়নি, তারা লেখাপড়ায় সুবিধে করতে পারেনি, বরং তাঁর মেজোমেয়ে সুমিতা ন্যাশনাল স্কলার হয়েছিল। এখন সে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকসে পি এইচ ডি করে সায়েন্স কলেজে পড়াচ্ছে। সুমতিাকে দেখতেও বেশ সুশ্রী, কিন্তু সে জেদ ধরেছিল কিছুতেই বিয়ে করবে না। এই নিয়ে জ্ঞানাঞ্জনবাবু অনেকবার আক্ষেপ করেছেন প্রতাপের কাছে। যে পিতার আর্থিক সঙ্গতি আছে, তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে না পালে যেন সমাজে অপদস্থ হয়ে যান। ধুমপাম করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া গেল না, তাহলে আর এত টাকা রোজগার করে লাভ কী হলো!

কিন্তু পরেশ তার দিদির বিয়ের নেমন্তন্ন করতে আসেনি। এক বাড়িতে সে সিগারেট ধরিয়ে ঢোকেনি আগে, কখনো, আজ তার চালচলন অন্যরকম। প্রতাপের সামনে প্রাজিক জড়তা কাটিয়ে উঠে সে এবার বললো, কাকাবাবু, আমি অন্য একটা কথা বলতে এসেছিলুম।

–বলো!

দিদির বিয়ে ঠিক হয়েছে... আমাদের এখন খুব জায়গায় টানাটানি, তাই এই বাড়িটা আমাদের লাগবে। সেইজন্যই বলছিলাম, আপনারা যদি একটা অন্য বাড়ি খুঁজে নেন।

সামান্য একটা ছোট একতলা বাড়ি, জ্ঞানাঞ্জন গুহ নিয়োগীর অন্য সম্পত্তির তুলনায় অতি নগণ্য। বউবাজারে তাঁর অন্য একটি বাড়িতে তিরিশ ঘর ভাড়াটে। সম্প্রতি নিউ আলিপুরে আর একটি জমি কিনেছেন। প্রতাপ অবিশ্বাসের হাসি নিয়ে বললেন, তোমার দিদির বিয়ের জন্য এই বাড়ি লাগবে কেন, পাত্রটি কি ঘরজামাই হতে চায় নাকি?

পরেশ নিরস স্বরে বললো, এ বাড়িতে আমাদের কিছু আত্মীয়স্বজন এসে থাকবে বিয়ের সময়, তার আগে বাড়িটা মেরামত করতে হবে।

প্রতাপ বললেন, বাড়িটা বিক্রি করতে চাও নাকি? জমির দাম যে-রকম হু হু করে বাড়ছে, এই বাড়িটাই ভেঙে যদি এখানে একটা তিন চারতলা তুলতে পারো, লাভ হবে অনেক বেশী। তাই করতে বলো না বাবাকে। আমাদের একটা ফ্ল্যাট দিও।

—কাকাবাবু, সেরকম কোনো প্ল্যান আমদের নেই এখন। নিজেদের লোকজনদের জন্যই লাগবে।

—আমাদের তুলে দিতে চাইছো? বেশ তো, যাবো।

—আপনারা যদি এ মাসের মধ্যেই

—এ মাসের মধ্যেই কোথায় যাবো? অন্য একটা বাড়ি খুঁজে পেতে হবে তো।

—দিদির বিয়ে সামনের মাসের দশ-বারো তারিখের মধ্যেই পড়বে, তার আগে এ বাড়িটা সরিয়ে না দিলে,....আমি বাইরে থেকে দেখছিলুম, বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে! সব ভাড়াটেরাই বাড়ির এত অযত্ন করে।

প্রতাপ ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন পরেশের দিকে। তার মধ্যেই তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বছর তিনেক আগে এই পরেশের ঠিক ওপরের ভাই ধীরেশ এইরকমভাবে প্রতাপের কাছে এসে বাড়ি ছেড়ে দেবার খুব বায়নাক্কা ধরেছিল। প্রতাপ তখন জ্ঞানাঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি সব শুনে অবাক হয়েছিলেন এবং ধমক দিয়েছিলেন নিজের ছেলেকে। যে-ভাড়াটে নিয়মিতভাবে ভাড়া দিয়ে যায়, তাকে যে হুট করে তুলে দেওয়া যায় না, তা তিনি নিজে ঝানু উকিল হয়ে ভালোই জানেন।

প্রতাপ বললেন, তোমার বাবার সঙ্গে এক জজের শ্রাদ্ধবাড়িতে দেখা হলো গত সপ্তাহে, কই তিনি তো কিছু বললেন না! অনেকক্ষণ গল্প করলেন আমার সঙ্গে!

পরেশ বললো, বাবা আর এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। প্রপার্টির ব্যাপারগুলো আমিই দেখাশুনো করছি। আপনাকে কাকাবাবু এমাসের মধ্যেই বাড়ি ছাড়তে হবে। আমি ঠিক করেছি...

—তুমি কী ঠিক করছো, তা আমার শোনার আগ্রহ নেই পরেশ। বাপের সম্পত্তি দেখাশোনা করছো, বেশ ভালো কথা, তার আগে সব নিয়মকানুন শিখে নাও! আধখানা মাসের মধ্যে কোনো ভাড়াটেকে তুলে দেবার নোটিশ দেওয়া যায়!

—ঠিক আছে, আজ তো মাসের ছ' তারিখ। আপনাকে আগামী মাসের ছ' তারিখ পর্যন্ত টাইম দিচ্ছি!

—তুমি বোধহয় জানো না, তোমার বাবা আমাকে নিজে ডেকে এনে এই বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলেন। এখনও ভাড়ার রশিদে তাঁর সই থাকে। তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। তোমার বাবার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসো, কিংবা, তোমার কাছে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আছে? কই দেখি?

—কাকাবাবু, এসব কথা তুললে শুধু ঝামেলা বাড়বে। এ বাড়ি আপনাদের এবার ছেড়ে দিতে হবেই। এত কম ভাড়ায় ভাড়াটে রাখলে আমাদের হেভি লস্।

এই পরেশকে অনেক ছোট বয়েস থেকে দেখছেন প্রতাপ। একবার ওকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশণ স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে পালিয়ে আসে। আর একবার তাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল বেহালার একটি কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে। জ্ঞানাঞ্জনবাবু চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলেরা খেটে খেতে শিখুক, কিন্তু কিছুতেই তা হবার নয়, ওরা অল্প বয়েস থেকেই বাবার টাকার স্বাদ পেয়ে গেছে।

প্রতাপ বললেন, ঝামেলা বাড়বে মানে? একবার তোমার দাদা এই নিয়ে বাঁদরামি করতে এসেছিল, তোমার বাবা তাকে শুধু মারতে বাকি রেখেছিলেন। সে এখন গেল কোথায়? তুমিও কি তার পথ ধরেছো নাকি? অন্য বাড়ি পছন্দ হলে এ বাড়ি ছেড়ে দেবো, এক মাস দু'মাসের মধ্যে ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

—এখানেই এত কম ভাড়ায় আছেন, এরপর আর কোনো বাড়িই আপনাদের পছন্দ হবে না। সব ভাড়াটেই এই কথা বলে, আমি জানি, এই বলে টাইম পাস করে।

—তুমি বেশি পাকা পাকা কথা বলছো, পরেশ! তোমার বাবার সই করা নোটিস দাও আগে,

তারপর দেখবো কবে উঠে যাওয়া যায়।

—তাহলে আর বাবার চিঠি নয়, আপনাকে উকিলের চিঠিই পাঠাবো! মানে পাঠাতে বাধ্য হবো! উইথ ওয়ান মান্থস নোটিস!

দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো প্রতাপের মাথায়। প্রায় থাপ্পড় মারার জন্য হাত উঠিয়েছিলেন তিনি, অতি কষ্টে সামলে বললেন, কী, তুমি আমাকে উকিলের চিঠির ভয় দেখাচ্ছো? বেয়াদপি করতে এসেছো এখানে? জ্ঞানাঞ্জনবাবু একজন সজ্জন, ভদ্রলোক, তার যত কুলাঙ্গার সন্তান! বেরোও, বেরোও এখান থেকে!

পরেশও উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দেখুন, চোখ রাঙাবেন না! ওসব ঢের দেখা আছে। আপনার সঙ্গে এতক্ষণ সম্মান করে কথা বলেছি... আপনি বেরুতে বলছেন কাকে? এটা আমার নিজের বাড়ি!

প্রতাপ বললেন, বাড়ি একবার ভাড়া দিলে এস বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বিনা অনুমতিতে বাড়িওয়ালার ঢোকার অধিকার থাকে না। তুমি খবর্দার তুমি এ বাড়িতে ঢুকবে না! যাও, আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও...

চ্যাঁচামেচি শুনে ছুটে এলেন মমতা। স্বামীকে আড়াল করে বললেন, আঃ কী শুধু শুধু মাথা গরম করছো! চুপ করো তো। কী হয়েছে পরেশ! বসো, বসো, একটু চা খাবে তুমি?

পরেশ ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, চা? এখন আমাকে চা খেতে বলছেন! আপনারা যতদিন থাকবেন, ততদিন এ বাড়িতে আমি পেচ্ছাপও করতে আসবো না। আর এ কথাও বলে দিচ্ছি, পারি, তাহলে আমার নাম পরেশ গুহ নিয়োগী নয়! সব জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেবো। যদি হিম্মৎ থাকে, আমায় রুখবেন!

অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে সে দড়াম করে দরজা ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল!

প্রতাপ বললেন, আমাকে থ্রেট করে গেল? এক্ষুনি থানায় ডায়েরী করবো, ওর নামে ক্রিমিন্যাল কেস আনবো! একটা হতচ্ছাড়া বাঁদর।

মমতা বললেন, কী হচ্ছে কী? প্লিজ চুপ একটু! তোমার হাই প্রেসার, এরকম বাড়াবাড়ি করল...তুমি ছেলেটাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললে কেন? এটা তোমার অন্যায়!

মমতাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রতাপ তখনই বাইরে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন, হঠাৎ তাঁর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। তিনি বসে পড়লেন চেয়ারে।

টুনটুনি আড়ালে দাড়িয়ে শুনছিল, সে এবার মুন্নির কাছে এসে কেঁদে ফেললো। তার মনে ক্ষীণ আশা জেগে, ছিল, হয়তো পরেশ তাকে বিয়ে করার প্রস্তাবই দেবে!

মুন্নি আবার ফিরে গেছে সুদূর অতীতে, বাইরের ঘরের গোলমাল তার কানে আসেনি। সে টুনটুনিকে দেখে বললো, কী হলো রে, সব ঠিক হয়ে গেল?

টুনটুনি বললো, কি লোকটা মামাকে অপমান করলো, খারাপ খারাপ কথা বললো। এই মুন্নি, মামা অজ্ঞান হয়ে গেছে!

রাজ্যহীন, অভিমানী প্রৌঢ় রাজার মুখখানা আবার ভেসে উঠলো মুন্নির চোখে। এইসব রাজারা বারবার লাঞ্ছিত অপমানিত হন বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ঠিকই জিতে যান!

টুনটুনির সঙ্গে মুন্নিও চলে এলো বাবাকে দেখতে। প্রতাপ অজ্ঞান হয়ে যাননি বটে, কিন্তু চোখ বুজে মাথা এলিয়ে বসে আছেন পরেশেরই পরিত্যক্ত চেয়ারে। পাখাটা ফুল স্পীডে চালিয়ে দিয়ে মমতা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর কপালে। প্রতাপের ঠোঁটের দু'পাশ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মুন্নি তাকালো টুনটুনির দিকে, এবারে আসল ঘটনাটা আর গোপন রাখা যায় না।

একটু বাদে প্রতাপ অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে স্নান করতে গেলে মুন্নি মমতাকে ডেকে বললো, মা শোনো, একটা কথা আছে!

কলেজে ভর্তি হয়েও টুনটুনির পড়াশুনোয় মন যায়নি। সে এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। তাকে সামলানোর দায়িত্ব মুন্নির, যদিও সে টুনটুনির চেয়ে বয়েসে ছোট। টুনটুনিকে বিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু এখনো ঠিক হয়নি কিছু।

দু'দিন আগে সন্ধেবেলা টিউশানি সেরে ফেরার পথে মুন্নি হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল টুনটুনি পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে এই পরেশের সঙ্গে, হাজরা পার্কের পাশে। মুন্নি শুধু অবাক হয়নি, রেগেও

গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। এই পরেশের দাদা ধীরেশের সঙ্গে বাবলুর একবার হাতাহাতি হয়েছিল, কারণ সে একটা খারাপ কথা বলেছিল ফুলদির নামে। পরেশটাও বদ ছেলে, মুন্নি জানে, সে মেয়েদের দিকে বিশ্রীভাবে তাকায়। এই পরেশের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে টুনটুনি!

সন্ধেবেলা রাস্তায় অনেক মানুষজন, তাই মুন্নি ভয় পায়নি, সে সোজা ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল, এই টুনটুনি বাড়ি চল!

পরেশ বলেছিল, না, ও এখন বাড়ি যাবে না। ওর জন্য আমি থিয়েটারের টিকিট কিনেছি, ও আমার সঙ্গে থিয়েটারে যাবে!

মুন্নি টুনটুনির চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, টুনটুনি, তুই থিয়েটারে যাবি, বাড়িতে বলে এসেছিস?

টুনটুনি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলেছিল, না, আমি থিয়েটারে যাবো না!

ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াতো না। এরকম ছোটখাটো নাটক তো রাস্তাঘাটে প্রায়ই হয়, কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। কিন্তু জগুবাবুর বাজারে দোতলায় মদের দোকানে পরেশ সারা দুপুর-বিকেল মধ্যপান করেছিল বলেই সে কাণ্ডজ্ঞানটুকু হারিয়েছিল। কলকাতার রাস্তায় চলাফেরার কয়েকটি অঘোষিত নিয়ম-রীতি আছে। তার মধ্যে একটা হলো এই যে প্রতিটি মোড়েরর মাথায়ত গুচ্ছ গুচ্ছ নিষ্কমা যুবকের যদি পথ-চলতি যুবতীদের দিকে নানা রকম রসালো মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়, তা কেউ গায়ে মাখে না। আরও কিছু কিছু অসভ্যতাও সহ্য করা হয়। কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ! তখনই জেগে ওঠে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালিদের নীতিবোধ ও বীরত্ব।

মুন্নির সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে করতে পরেশ এক সময় টুনটুনির হাত চেপে ধরে জড়িত গলায় বলেছিল, আলবাৎ ও যাবে আমার সঙ্গে। তুই যা না, পুঁচকে মেয়ে বাড়িতে গিয়ে মায়ের আঁচল ধরে দুধ খেগে যা! এ আমার গার্ল ফ্রেন্ড, একে আমি যেখানে খুশী নিয়ে যাবো!

টুনটুনি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বলে উঠেছিল, না, না, আমি যাবো না! আমি বাড়ি যাবে!

তক্ষুণি কোথা থেকে চার পাঁচটি ছেলে হৈ হৈ করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পরেশের ওপর! মেয়েছেলের ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি! বাড়িতে মা-বোন নেই!

তারা কিল-ঘুঁষি-লাথি মারতে লাগলো পরেশকে। মুন্নিরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল! পরেশ তাদের বাড়িওয়ালার ছেলে, তাকে ওরা এতটা শাস্তি দিতে চায় নি। কিন্তু তখন আর ওদের বাধা দেবারও ক্ষমতা নেই। একজন প্রৌঢ় ওদের বললেন, মা, তোমরা বাড়ি চলে যাও। এই নোংরা ব্যাপারে মধ্যে আর থেকো না!

ফেরার পথে মুন্নির জেরার উত্তরে টুনটুনি বলেছিল, তার কোনো দোষ নেই, পরেশ প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করে বলে, আমি তোমায় ভলোবাসি! আমি তোমায় ভালোবাসি! আইসক্রিম খাওয়াতে চায়, বালিগঞ্জ লেকে নিয়ে যেতে চায়। টুনটুনি যত বলে সে মারা জানতে পালে রাগ করবেন....

সরল মেয়েরাও খুব মিথ্যেবাদী হতে পারে। মুন্নির কাছে নিখুঁত নিরপরাধের ভাব করে থাকলেও টুনটুনি এর আগে তিনবার পরেশের সঙ্গে জোড়া গীর্জার পাশে পাঞ্জাবী হোটেলের পর্দা ঢাকা কেবিনে বসে চপ কাটলেট খেয়েছে ও চুমু পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছে। তার মুখ দেখে এসব কিছুই বোঝার উপায় নেই, সব দোষ সে দিয়ে দিল পরেশের ঘাড়ে।

এ কাহিনী শুনে মমতা দারুণ আতঙ্কিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলবেন, এ বাড়িতে আর কিছুতেই থাকা চলবে না। পরেশ প্রতিশোধ নিতে এসেছে, সে ছাড়বে না সহজে। জ্ঞানাঞ্জনবাবু বুড়ো হয়েছেন, চোখে দেখতে পান না, তিনি কী করে সামলাবেন এই অসভ্য ছেলেদের। প্রতাপ বুঝবেন না, শুধু আইন-কানুন দিয়ে দেশটা চলে না, মামলা করে ওরা ভাড়াটে ওঠাতে না পারলেও এমন অত্যাচার শুরু করবে যে টেঁকা যাবে না। আগেরবার তবু বাবলু ছিল বাড়িতে, বাবলুর বন্ধুবান্ধবের দল ছিল, তাদের ভয় পেতো ধীরেশ-পরেশরা। এখন প্রতাপ আদলতে চলে গেলে বাড়িতে শুধু চারটি নারী, ওরা কখন কী উৎপাত করবে, তার কিছু ঠিক নেই। এই সময় নকশালদের নাম করে বাড়িতে যখন তখন ছেলেরা ঢুকে পড়তে পারে।

মমতার প্রস্তাব শুনে প্রতাপ যথারীতি গর্জন করে বলে উঠলেন, এ বাড়ি ছাড়বো? কক্ষনো না! যদি ভালো করে, ভদ্রভাবে বলতো, অন্য বাড়ি দেখেশুনে নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতাম। কিন্তু আমাকে ভয় দেখাবে? মুখের ওপর শাসিয়ে যাবে? করুক ওরা মামলা, অন্তত তিন চার বছর চলুক।

সুপ্রীতি সকালবেলা জপে বসেছিলেন, তাই পরেশের চোটপাট তখন শোনেননি। তিনি মৃদু গলায় বললেন, এত শস্তার ভাড়া, এখন ছাড়তে গেলে নতুন বাড়িতে অনেক বেশী ভাড়া দিতে হবে না? তবে দিনকার খারাপ, ওরা যদি মারতে-টারতে আসে....

প্রতাপ বললেন, বিমান আমাকে একটা রিভালভার দিতে চেয়েছিল, সেটা এবার এনে বাড়িতে রাখবো। এইসব ত্যাঁদোড় ছেলেদের কী করে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি।

মমতা চোয়াল শক্ত করে স্বামীর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন। তিনি জানেন, প্রতাপের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, একবার গোঁ ধরলে প্রতাপ যুক্তির ধার ধারেন না। টুনটুনির সঙ্গে পরেশের ঘটনাটাও জানানো যাবে না প্রতাপকে, তা হলে তিনি হয়তো টুনটুনিকে তুলে আছাড় মেরেই বসবেন।

প্রতাপের গোঁ-এর একমাত্র উত্তর মমতার জেদ। ওঁদের দু'জনের কথার মাঝখানে তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, আমি এ বাড়িতে আর কিছুতেই থাকবো না!

প্রতাপ বললেন, তুমি বলছো কি মমো! একটা চ্যাংড়া চেলে এসে ভয় দেখালেই আমাদের উঠে যেতে হবে?

বিকেলবেলা আদালত থেকে ফিরেও প্রতাপ মমতার জেদ টলাতে পারলেন না। একটুও। মমতার মুখে থমথমে হয়ে আছে। মুন্নি আর টুনটুনির একবারও বেরুলো না ঘর থেকে। প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, আবার বাড়ি খুঁজতে হবে!

এককালে কলকাতার অনেক বাড়িতে টু-লেট লেখা বোর্ড ঝুলতো, সেই সব বোর্ড কবেই অদৃশ্য হয়ে গেছে! এখন লোকে বাড়ি ভাড়ার সন্ধান পায় কী করে? খবরের কাগজে যেসব ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপন থাকে, সেগুলোর ভাড়া আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা! অত টাকা বাড়ি ভাড়া দেবার মত লোকও আছে এ শহরে! ডাকাতি না করে কেউ এতটাকা রোজগার করতে পারে?

আদালত থেকে ফেরার সময় আজকাল প্রতাপের নিজস্ব আদালি রজ্জব শেখ ফাইলপত্র নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত আসে। এক হিসেবে এ এখন প্রতাপের বডি গার্ডও বটে। তার কাছ থেকে প্রতাপ বাড়ি খোঁজার ব্যাপারে পরামর্শ নিলেন। রজ্জব শেখ বললো যে অনেক পানের দোকানে বাড়ি ভাড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। পানওয়ালার খবর রাখে পাড়ার কোন্ বাড়ি খালি হলো কিংবা ভাড়াটে এলো। পানের দোকানের সামনে বাড়ির দালালরাও দাঁড়িয়ে থাকে। রজ্জব শেখের বাড়ি বেহালায়, দরকার হলে সে সেদিক সাহেবের জন্য বাড়ি খুঁজে দিতে পারে।

মমতা এ বাড়ি তো ছাড়বেনই, কালীঘাট পাড়াতেই আর থাকবেন না বলেছেন। প্রতাপ দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ের পানের দোকনের সামনে একজন দালালের সন্ধান পেলেন। তার হাতে পাঁচখানা বাড়ি আছে। প্রতিটি বাড়ি দেখানোর জন্য তাকে দিতে হবে দশটাকা, আর কোনো বাড়ি পছন্দ হলে তাকে দিতে হবে একমাসের ভাড়া। অগত্যা সেই দালালের সঙ্গেই এক সন্ধেবেলা মমতাকে নিয়ে বেরুলেন প্রতাপ। পর পর চারটি ফ্ল্যাট দেখবেন, প্রত্যেকটিই অখাদ্য, মমতা নাক সিঁটকে রইলে। পঞ্চম ফ্ল্যাটটি কিন্তু চমৎকার, বেশ পছন্দসই। যতীন দাস রোডে একটি ছোট দোতলা বাড়ির পুরো দোতলাটা ভাড়া দেওয়া হবে, বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার আলো-হাওয়া যুক্ত, তিনখানা শোওয়ার ঘর, আর একটি ছোট ঘর ও টানা বারান্দা। ভাড়া তিন শো পঁচিশ টাকা, প্রতাপের সাধ্যের অতিরিক্ত নয়। বাড়িওয়ালাটি ফুটফুটে ফর্সা চোট্টখাট্টো মানুষ, বেশ ও ভদ্র, তিনি থাকেন একতলায়, তাঁর স্ত্রী বাতের অসুখ, সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না বলে দোতলাটা ভাড়া দিচ্ছেন।

মমতার মুখে হাসি ফুটেছে। প্রতাপও অনেকটা হালকা বোধ করছেন। এত সহজে যে এমন সুন্দর একটা বাড়ি পাওয়া যাবে তিনি আশাই করেননি। বস্তুত, কালীঘাটের বাড়ির তুলনায় এ বাড়ি অনেক বেশী মনোমত, পাড়াটাও ভালো। বাড়িওয়ালা চা আনিয়েছেন, সেই চায়ে চুমুক দিতে দিতে প্রতাপ বললেন; তাহলে আজই ফাইনাল করে নিতে চাই। অ্যাডভান্সের টাকাটা...

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি দালালটির দিকে মুখে ফিরিয়ে বললেন, অ্যাই বেচু, তুই এঁনাদের সব কন্ডিশন বলে এনেছিস তো?

দালালটি বললো, না বলিনি, তবে তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। ইনি হলেন হাইকোর্টের জাজ...

প্রতাপ বাধা দিয়ে বললেন, না হাইকোর্টের নয়...

দালালটি বললো, ঐ হলো গিয়ে, আপনি স্যার জাজ তো! স্যার, এ বাড়ির দুটি কনিডশন আছে। একগাদা বাচ্চাকাচ্চা থাকলে চলবে না। আর স্যার সেলামি দিতে হবে দশ হাজার টাকা!

প্রতাপ প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, সেলামি? দশ হাজার টাকা?

সেলামি কথাটা যে প্রতাপ আগে শোনেননি তা নয়। বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারে এই জিনিসটা যে চলছে সে কথা খবরের কাগজেও বেরোয়। কিন্তু অন্যের মুখে শোনা আর খবরের কাগজে পড়ার তুলনায় নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানার তীব্রতা অনেকখানি। কথাটা শুনেই প্রতাপের মনে হলো, এই ছোটখাটো ফর্সা মানুষটিকে যেন তিনি সত্যিই সেলাম করতে বাধ্য হবেন এবং এর পায়ের কাছে বসে বাণ্ডিল বাণ্ডিল একশো টাকার নেজাট উৎসর্গ করবেন। এই লোকটি বাড়িওয়ালা, শুধু সেই যোগ্যতেই তার সেলাম ও নৈবেদ্য প্রাপ্য।

প্রতাপ আবার বললেন, দশ হাজার টাকা!

বাড়িওয়ালাটি মিষ্টি করে বললেন, তার থেকে তো কম করা যাবে না। এই ফ্ল্যাটের ভাড়া এমনিতে কত হয় জানেন? অন্তত সাড়ে পাঁচশো। ভাড়া কমিয়ে রেখেছি।

প্রতাপ কাঁচুমাচুভাবে বললেন, তিনখানা ঘর তিনশো টাকা কম তো নয়। তারপরেও পঁচিশ টাকা।

—বাজার ঘুরে দেখুন, তাহলে রেট বুঝতে পারবেন। একজন মাড়োয়ারী তো এ পাবিড় নেবার জন্য ঝুলোঝুলি করছে, নেহাৎ কোনো বাঙালিকে দেবো বলেই...। বেশী ভাড়া নিয়ে লাভ নেই, বুঝলেন, কর্পোরেশন ট্যাক্স কাটক্কব, তারপর ইনকাম ট্যাক্স, প্রায় সবই কেটে নেবে। সব টাকাটা হোয়াইটে নিলে লাভের ধন পিঁপড়েয় খেয়ে যায়।

প্রতাপ মাথা নীচু করে বসে রইলেন। কত কারণে মানুষের কাছে ছোট হয়ে যেতে হবে। এই লোকটা তাকে অসহায় করে দিয়েছে, সেটা উপভোগ করে মিটিমিটি হাসছে। এই লোকটি জানে না, এই বাড়ির অন্তত কুড়ি গুণ দামের সম্পত্তি তাদের ছিল এক সময়। কিন্তু-সে কথা এখানে উচ্চারণ করাও যাবে না!

দশ হাজার টাকা এখন প্রতাপের স্বপ্নেও স্পর্শযোগ্য নয়। বাবলুকে বিদেশে পাঠাবার সময় মমতার গয়নাগুলো সব গেছে। লাইফ ইনসিওরেন্স থেকে ধার করতে হয়েছে, এছাড়াও ধার আছে বিমানবিহারীর কাছে। বাড়ি ভাড়া সওয়া তিনশো টাকা দিতেই সংসারের কিছু কিছু খরচ কাটছাঁট করতে হবে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতাপ বললেন, দশ হাজার টাকা ব্ল্যাক মানি ক'জন বাঙালি দিতে পারবে

বাড়িওয়ালাটি শব্দ করে হাসতে লাগলেন। সেই হাসির মধ্যে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তাঁর মনের কথাটি অর্থাৎ দশ হাজার টাকার কথা শুনলেই যাদের মুখ শুকিয়ে যায়, তাদের আবার এই রকম বাড়ি দেখতে আসার শখ কেন?

লোকটি আবার বললো, আপনি জজ, আপনাদের তো নানা রকম রোজগার। আপনারা ইচ্ছে করলে ...

লোকটি বাঁ হাত বাড়িয়ে একটা ধরনের ইঙ্গিত করতে যাচ্ছিল। মমতা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তাকে আড়াল করলেন। স্বামীর মেজাজ যে ক্রমশ চড়ছে, তা তিনি বুঝে গেছেন।

লেকটির ব্যবহার এতক্ষণ বেশ ভদ্র ছিল, কিন্তু হাসির শব্দটি যেন খুবই অশ্লীল। প্রতাপের ইচ্ছে হলো, পা থেকে চটি খুলে লোকটার দু গালে ঠাস ঠাস করে পেটাতে। আর কোনা কথা না বলে মমতাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাড়ির বাইরে।

দালালটি বিদায় নিল একটি দশ টাকা নিয়ে। আজ শুধু শুধু প্রায় পঞ্চাশ টাকা গচ্চা গেল।

একটুখানি এগিয়ে এসে মমতা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে বললেন, ইস, বাড়িটা বড় পছন্দ হয়েছিল গো। কি সুন্দর শান্ত পাড়া -

বাড়িওয়ালার ওপর যতটা রাগ জমেছিল সবটা মমতার মুখের ওপর ফাটিয়ে দিয়ে প্রতাপ বললেন, তোমরা কি আমাকে চুরি ডাকাতি করতে বলো? অত টাকা পাবো কোথায় আমি?

অবুঝ রমণী তবু হেসে বললেন, আহা, কলকাতায় যারা বাড়ি ভাড়া নেয়, তারা সবাই বুঝি চুরি-ডকাতি করে?

সেদিন রাত্রে পর পর দুটো বোমা পড়লো কালীঘাটের বাড়ির সদর দরজায়। রাত তখন পৌনে একটা, ঘুমিয়ে পড়েছিল সবাই, বোমা ফাটার বিকট শব্দে জেগে উঠে মমতা ভাবলেন পরেশ বুঝি দলবল নিয়ে এখনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসবে। অন্য অস্ত্রের অভাবে প্রতাপ ছুটে গিয়ে চাবুকটা হাতে নিলেন। কিন্তু আর কিছুই ঘটলোনা। এ শুধু পরেশের ক্রোধের দুটি স্ফুলিঙ্গ। সে জানিয়ে দিচ্ছে, ক্রমশই এরকম ঘটতে থাকবে।

সদর দরজায় একটা পাল্লা কাত হয়ে পড়েছে। বোমার শব্দে প্রতিবেশীদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। নকশালদের দৌরাত্ম্যে দুটি মাত্র বোমা পড়া অতি সামান্য ঘটনা। থানার খবর দিলেও পাত্তা দেবে না। কেউ খুন-জখম হয়নি, এটা আবার কোনো কেস নাকি?

পরদিন প্রতাপ টেলিফোনে জ্ঞানাঞ্জনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে জানলেন, তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নার্সিং হোম ভর্তি হয়েছেন। মমতা, মুন্নি আর টুনটুনির বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করে দিলেন একেবারে। প্রতাপকে তিনি বললেন, যেমন করে হোক, এ মাসের মধ্যে উঠে যেতেই হবে!

এখন প্রতাপ ঢাকুরিয়া, টালিগঞ্জের দিকে বাড়ি দেখতে শুরু করেছেন। রজ্জব শেখ খিদিরপুর একটা সস্তার বাড়ির সন্ধানে এনেছে, সেখানেও দু' মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে। এজলাশে বসে শুনানি শুনতে শুনতে প্রতাপানমনস্ক হয়ে যান। যাকে বলে হাঘরে, তাঁর এখন সেই অবস্থা। একবার যে বাস্তুভূমি থেকে চ্যুত হয়, সে বোধহয় আর কোনোদিনই স্থির বাসস্থান পায় না। প্রতাপের কথাবার্তায় বোধহয় বোঝা যায় যে তাঁর টাকার জোর করে নেই, নইলে সব বাড়িওয়ালাই তাঁর সঙ্গে অবজ্ঞার সুরে কথা বলে কেন?

মাস শেষ হতে আর মাত্র ছদিন বাকি। এর মধ্যে প্রতাপ জ্ঞানাঞ্জনবাবুর প্যাডে লেখা ফর্মাল নোটিস পেয়ে গেছেন। পরেশকে দেখেছেন দু' একবার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। প্রতাপ যে ভয় পেয়ে বাড়ি খুঁজছেন, তা ওরা নিশ্চয়ই জেনে গেছে। প্রতাপের মুখের ওপরে পড়েছে একটা কালো ছাপ। এ সময় নিজের ছেলেটা যদি অন্তত পাশে থাকতো। না, ছেলে বিপ্লব ও দেশোদ্ধারের ছুতোয় এই সংসারটাকে সর্বস্বান্ত করে এখন বিদেশে বসে আছে, সেখানে সে মজায় আছে, নিজস্ব গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়ায়...।

আদালত থেকে বেরুবার মুখে একজন সুদর্শন যুবক প্রতাপের সামনে এসে নমস্কার জানিয়ে বললো, স্যার, আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার, একজন বাংলাদেশী ভদ্রলোক আপনার নামে একজনকে খুঁজছেন। আপনিই তো প্রতাপ মজুমদার?

সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের ব্যবধান। মামুন ও প্রতাপ দু'জনেরই চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, মামুনের গালে অযত্নবর্ধিত দাড়ি প্রতাপের চুলে পাক ধরেছে, তবু দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়েই চিনতে পারলেন।

এতদিন পরে বাল্যসুহৃদকে দেখে যতটা উচ্ছসিত হয়ে ওঠা উচিত ছিল, ততটা পারলেন না প্রতাপ। তাঁর মুখে একটা তেতো তেতো ভাব। প্রতাপ বললেন, মামুন! তুমি কবে এসেছো! মামুন ও প্রতাপকে দেখেই লাফিয়ে উঠলেন না। বরং একটু অপরাধীর মতন হেসে বললেন এসেছি বেশ কিছুদিন, তোমার সন্ধান পাই না!

তারপর আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন দুই বন্ধু।

রিপোর্টার অরুণ সেনগুপ্ত বললো, আপনারা আমে-দুধে মিশে গেলেন তো! আমি তাহলে এবার চলি?

মামুনের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রতাতে সংক্ষেপে শুনে নিলেন ঢাকার খবর ও মামুনদের রোমহর্ষক পলায়ন-বৃত্তান্ত। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মেয়ে, তোমার ভাগ্নী সঙ্গে এসেছে তারা আছে কোথায়?

মামুন বললেন বেকবাগানের কাছে একটা বাসা ভাড়া নিয়েছি, সেখানে আছে কোনোরকমে! প্রতাপ আবার বিমর্ষ হয়ে গেলেন। মামুনের মেয়ে-ভাগ্নী এসেছে, তারা অন্য জায়গায় থাকেব কেন? প্রতাপের বাড়িতে এক্ষুনি তাদের নিয়ে আসা উচিত! প্রতাপ সে কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। কোথায় আনবেন ওদের? আজ রাত্তিরেই যদি আবার বোমা পড়ে! কলকাতা শহরেই প্রতাপের যে

প্রায় বাস্তহারার মতন অবস্থা, তা কি প্রথম দিনেই মামুনকে বোঝানো যাবে!

॥ ১৫ ॥

বড় তেঁতুল গাছটার নিচে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে গোলাপী। আজ আকাশে বড় বেশী জ্যোৎস্না। এই মাঝরাতে জ্যোৎস্না একেবারে ফটফট করছে। দুটো কুকুর লেজ নাড়ছে এসে গোলাপীর পায়ের কাছে, কিন্তু ডাকছে না, গোলাপীর গায়ের গন্ধ তাদের খুব চেনা, তাছাড়া গোলাপীর তাদের খেতে দেয়। সারাদিন অসহ্য গরমের পর এখন বাতাস একটু মোলায়েম হয়েছে, এই সময় সবাই গাঢ়ভাবে ঘুমোয়।

গোলাপী চোখ দুটো যেন জ্বেলে রেখেছে, তার মুখে ও শরীরে ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই, সে অতিরিক্ত সাবধানী হতে চায়। তেঁতুল গাছটার তলায় ছায়া আছে, কিন্তু জ্যোৎস্না মধ্যে হাঁটতে গেলে দৈবাৎ কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারে। নেপীর ঠাকুর্দা কেশো রুগী, সে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকে ঘরের সামনের দাওয়ায়। গুদাম ঘরের দু' জন গার্ড আছে, তাদেরও জেগে থাকবার কথা।

একটা দমকা হাওয়ায় গাছের পাতার সরসর শব্দ হলো, তখনই একটা দৌড় দিল গোলাপী। সে নিজেও যেন চলন্ত বাতাস। কুকুর দুটো কিছু দুর এলো তার সঙ্গে, তারপর হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গিয়ে উল্টো দিকে ফিরলো। গোলাপী নেমে গেল ঢালু জমিতে, বেশ খানিকটা ঘুরে স্টাফ কোয়ার্টারের পেছন দিক দিয়ে এসে একটা দরজার সামনে দাঁড়ালো । দরজাটা একটুখানি ফাঁক করা, ভেতরে মোম জ্বলছে। ঘরের মধ্যে একটি মাত্র তক্তাপোশ ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। বিছানার ওপর বসে স্টোর ক্লার্ক বাসুদেব চক্রবর্তী একমনে কী যেন লিখে যাচ্ছে।

গোলাপী দরজাটা সামান্য ঠেলতেই সেই শব্দ শুনে বাসুদেব মুখে ফেরালো। তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে সে গোলাপীর হাত ধরে ভেতরে আনলো, খিল দিল দরজায়। গোলাপীকে খাটে বসিয়ে সে চোপসানো গলায় জিজ্ঞেস করলো, কেউ, কেউ দেখেনি তো? গোলাপীর চেয়ে বাসুদেবই অনেক বেশী বিচলিত, তার মুখখানা অতিরিক্ত ভয় পাওয়া মানুষের মতন। ঘরের একটি মাত্র জানালা ও বন্ধ করে দিয়ে সে আবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, সুশীলবাবুর ঘরে আলো জ্বলছিল? ব্যাটা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে!

গোলাপীর ঠোঁটে পাতলা হাসি, সে মাথা নেড়ে জানালো, না।

বাসুদেব একটু দূরে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি সত্যি এসেছো? আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। গোলাপী, তুমি জল খাবে? তোমার তেষ্টা পায় নি?

গোলাপী আবার দু'দিকে মাথা নাড়লো। বাসুদেব নিজেই ঘরের কোণে রাখা কুঁজো থেকে খানিকটা জল গেলাসে ঢেলে খেতে গিয়ে গেঞ্জি ভেজালো। গেঞ্জিটা খুলে ফেললো সে। তার পরণে শুধু লুঙ্গি। গোলাপীও শুধু একটা হলদে ডুরে শাড়ী পরে আছে। রাত্তিরে শোবার সময় সে শায়া-ব্লাউজ পরে না। সেই ভাবেই বিছানা থেকে উঠে এসেছ। গোলাপীকে খাটে বসিয়ে বাসুদেব দাঁড়িয়ে রইলো দরজায় পিঠ দিয়ে। সে গলগল করে ঘামছে। চোখ দুটি বিস্ফারিত। ঘরের মধ্যে জলজ্যান্ত একটি নারী বসে আছে, এটা সে যেন এখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না। গোলাপী বললো, আপনি আমারে ডেকেছিলেন...

বাসুদেব মাটিতে বসে পড়লো গোলাপীর পায়ের কাছে।

গোলাপী বিব্রত হয়ে বললে, একী, একী, আপনি উঠে বসেন।

গোলাপী পা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই বসুদেব তার পা চেপে ধরে বললো, না, আমি এখানেই একটু বসি, তোমাকে দেখি। জানো গোলাপী, আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে আমার এত কাছে এসে বসেনি! কারুকে আমি এভাবে ছুঁয়ে দেখিনি। গোলাপী, তুমি কি ভালো, তুমি আমার মতন একজন মানুষকে... গোলাপী, তুমি কি সুন্দর !

–না, আপনি ওপরে উঠে আসেন। মোমবাতিটা নিভায়ে দ্যান, শুধু শুধু জ্বলছে।

– অ্যাঁ, আলো নিভিয়ে দেবো? ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে?

– আলো দেখে যদি কেউ এদিকে আসে?

– কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে আমার ভয় করবে! অন্ধকার হলে তোমাকে আমি দেখবো কী করে?

গোলাপী হেসে ফেললো। বাসুদেবের বাহু ছুঁয়ে সে বললো, আমাকে দেখার কী আছে? আমি একটা সামান্য মেয়ে। অন্ধকারের মধ্যে আপনার ভয় করবে? আমাকে ভয়?

বাসুদেব বললো, তোমাকে ভয় পাবো কেন? আমার এমনিই ভয় করছে। বুকের মধ্যে দুড়ুম দুড়ুম শব্দ হচ্ছে। অন্য সময় তোমার দিকে ভালো করে তাকতে পারি না।

– আপনি ঐ ভাবে বসে থাকলে আমার লজ্জা করে না?

–ঐ আলোটুকু থাক। গোলাপী, তুমি আমার একটা কবিতা শুনবে?

– কবিতা? পদ্য? আমি তো কিছু বুঝবো না!

– হ্যাঁ বুঝবে! নিশ্চয়ই বুঝবে। সব মানুষেই কবিতা বোঝে। মানুষের জন্যই তো কবিতা ঠিক মতন মন দিয়ে পড়তে হয়।

–আমি যে লেখা পড়া শিখিনি। ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছি। কুপাস ক্যাম্পে প্রাইমারি ইস্কুল ছিল।

তাতে কী হয়েছে। তোমার অক্ষরজ্ঞান তো আছে। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল, কোনো মেয়ের পায়ের কাছে বসে কবিতা শোনানো। সেইজন্যই তো ডেকেছি তোমাকে। এই দ্যাখো, এখন ও আমার বুক কাঁপছে, তুমি সত্যি সত্যি এসেছো!

–আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না।

– না, না, বেশীক্ষণ না, মোটে দুটো কবিতা, ঐ খাতাটা দাও।

কবিতা পড়তে গিয়ে বাসুদেবের গলা কাঁপতে লাগল। গোলাপী মাথা নিচু করে শুনলো খুব মন দিয়ে, সে কিছুটা বুঝলো, অনেকটাই বুঝলো না।

পড়া শেষ করে বাসুদেব ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করলো বুঝতে পারলে? কেমন লেগেছে? বাসুদেবের মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে গোলাপী বললো, খুব সুন্দর হয়েছে! আপনি আমার পায়ে হাত দেবেন না, আমরা ছোট জাত।

–জাত? আমি ওসব জাত-টাত মানি না। মেয়েরা হলো বসুন্ধরার মতন তারাই তো আমাদের ধারণ করে, তাদের আবার নীচু জাত, উঁচু জাত কী? আমি তোমার পায়ে একটা চুমু খাবো? মোটে একবার। তুমি রাগ করবে না?

গোলাপী জোর করেও পা সরিয়ে নিতে পারলো না। বাসুদেব তার পায়ের পাতায় চুমু খাবার পর মুখ তুলে খুব কাতর ভাবে বললো, গোলাপী, তুমি আমার ওপর রাগ করলে না তো? আমি কি অন্যায় করছি। রাত্তিরবেলা তুমি আমার ঘরে এসেছে, কেউ জেনে ফেললে আমায় খুব খারাপ ভাববে না? কিন্তু, আমি যে তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি, গোলাপী! আর একটা কবিতা শোনাবো?

গোলাপী এবার খাট থেকে নেমে বাসুদেবের পাশে বসে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরলো। বাসুদেব যেন শিউরে উঠলো খানিকটা। অবাক ভাবে গোলাপীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, এত ভালো লাগে? কোনো মেয়ের শরীরের সঙ্গে শরীর ছোঁয়াতে.... এতদিন শুধু কল্পনা করেছি। আর একটা কবিতা শুনবে? এই সবগুলোই তোমাকে নিয়ে লেখা তা বুঝতে পারছো? সেই যে একদিন কোপ্তগা ও-এর রাস্তায় তুমি আমাকে দেখে একটা ধান খেত থেকে উঠে এলে, তোমার সারা গায়ে কাদা, কাদা, কালো পাথরের মতন মূর্তি, তোমাকে দেখে মনে হলো এক ভিল রমণী, যেন নিবিড় কোনো জঙ্গলে তুমি থাকো, তুমি জঙ্গলের দেবী। এই কবিতায় যে ভিল রমণীর কথা, সে হচ্ছে তুমি?

–না।

–যদি আমার সাধ্য থাকতো, তোমাকে এই কলোনী থেকে নিয়ে যেতাম। কোনো একটা জঙ্গলে গিয়ে থাকতাম তুমি আর আমি। আমরা বিয়ে করতাম গন্ধর্ব মতে। কিন্তু তার যে উপায় নেই। আমার বাবা মারা গেছে, পাঁচটা ভাই বোন, শুধু আমার দিদি বর্ধমানের একটা ইস্কুলে চাকুরি করে, দিদির বিয়ে হয়নি, আমার আরও দুটো বোনের বিয়ে হয়নি। কী করে বিয়ে দেবো বলো, সংসারই চলে না, আমি আড়াই শো টাকা মাইনে পাই, তার মধ্যে দুশো টাকাই মানি অর্ডার করি প্রত্যেক মাসে। দিদি আর বোনেদের বিয়ে না দিতে পারলে আমার ও বিয়ে হবে না। বলো, আমি কি বিয়ে করতে পারি?

–দেশে আপনাদের জমি নাই?

–কিসের জমি! নিজস্ব বাড়িই নেই।

–আপনারাও কি আমাদের মতন রিফিউজি?

–না গো। রিফিউজি হলেও গর্ভনমেন্টের কাছ ভাতা পেতাম। আমরা মেদিনীপুর লোক । আমার বাবা ছিল পোস্ট অফিসের পিওন, আমি অতিকষ্টে স্কুল ফাইনাল পাস করেছি। আগে জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে থাকতুম, বাবা মারা যাবার পর তাড়িয়ে দিয়েছে। এই চাকরিটা না পেলে না খেয়ে মরতুম।

– পশ্চিমবাংলার মানুষেরও নিজের বাড়ি থাকে না?

–কাটোয়ায় দিদি পঁয়তিরিশ টাকা দিয়ে একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে। জানো গোলাপী, এখানে স্টোরের চাবি আমি নিজের কাছে রাখি না। ক্ষিতিবাবু স্টোর থেকে চাল সরায়, বালু সিং তোমাদের ওজন কম দেয় আমি সব জানি, ক্ষিতিবাবু আমাকে ভাগ দিতে চেয়েছিল, আমি নিই না, চুরির কথা ভাবলেই আমার বুক ধড়ফড় করে। ক্ষিতিবাবুরা ভাবে আমি ভীতু আর আমি মনে মনে কী ভাবি জনো, আমি ভাবি, আমি তো কবি, আমি কি চোর হতে পারি? মা সরস্বতী হা হলে আমাকে অভিশাপ দেবেন না? গোলাপী, তুমিও কি আমাকে ভীতু ভাবো ?

গোলাপী খিলখিল করে হেসে ফেললো।

–আস্তে আস্তে। আচ্ছা গোলাপী, আগে এখানে সুধীর দাস বলে একজন কাজে করতো, তোমার বাবা নাকি তাকে মেরেছিল?

–বাবা আর যোগনন্দ তার এক পায়ের হাঁটু ভেঙে দিয়েছিল। সে খারাপ লোক ছিল। সে আমাকে বিয়ে করবে বলে মিথ্যা কথা বলেছিল।

–সর্বনাশ! তোমার বাবা যদি টের পায়... গোলাপী, আমার ইচ্ছে থাকলেও যে তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না! বাড়িতে তিন তিনটে অবিবাহিত বোন, সেখানে তোমাকে নিয়ে গেলে তারা তোমাকেএক দণ্ড তিষ্ঠোতে দেবে না! তাছাড়া আমি এখন বিয়ে করলে সবাই আমাকে বলবে স্বার্থপর! আমার তিন বোনের বিয়ে দিতে দিতেই আমি বুড়ো হয়ে যাবো?

–আপনাকে বিয়ে করতে হবে না। আপনি আর একটা পদ্য বলেন।

–শুনবে? সত্যি শুনবে? আঃ এর আগে আমাকে কেউ এরকম অনুরোধ করেনি! গোলাপী, আমি তোমার হাতে এখানে একটা চুমু খাবো? তাতে কি দোষ হবে? মোটে একবার। আমার ওপর একটু দয়া করো অনুমতি দাও!

গোলাপী আবার দুলে দুলে হাসতে লাগলো।

মোমটা নিবু নিবু হয়ে আসছে। ঘরের মধ্যে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশী, সেই অন্ধকারও দুলছে। আঁচলটা সরে গিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে গোলাপীর নগ্ন বুক, সেদিকে প্রগাঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে বাসুদেব। ঐ বুক স্পর্শ করার সাহস তার নেই, শুধু দেখেই যেন তার জীবন ধন্য হয়ে যাচ্ছে।

গোলাপী বাসুদেবের একটা হাত ধরে বললো, আপনি সেদিন আমারে বলেছিলেন, আপনার ঘরে আসলে আপনি আমাদের পদ্য শোনাবেন। আমি ভেবেছিলাম, পদ্য শোনাবার কথাটা মিছা কথা।

–না, না,মিছে কথা কেন হবে? আমার জীবনে আর কী আনন্দ আছে বলো? জন্ম থেকেই শুধু দেখছি, অভাব আর অভাব। না খেতে পাওয়ার কষ্ট। বাড়িতে কান্নাকাটি। ছোটবেলা থেকেই আমি শুধু কবিতা লিখে আনন্দ পাই। কয়েকটা পত্রিকায় পাঠিয়েছি, কোথাও ছাপা হয়নি, তবু লিখতে ভালো লাগে।

–আপনি আমারেই শোনাতে চাইলেন ক্যান? আমি অতি সামান্য মেয়ে মুখ্য কিছু জানি না।

–তুমি সামান্য কেন হবে? ঐ যে বললাম, প্রথম দিন ধান খেতের পাশে তোমাকে দেখেই মনে হয়েছিল বনদেবী। আমি একটা নগণ্য মানুষ, কোনো মেয়েকে কোনদিন কবিতা শোনাতে পারবো, এ তো বাঁদর! আমি চাকরি খোয়াবার ভয়ে কারুর কোনো কথায় প্রতিবাদ করি না। রিফিউজিদের সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করি কখনো? তোমাকে আমার ঘরে আসতে বলে দোষ করেছি ? আমি শুধু তোমার পায়ে আর হাতে চুমু খেয়েছি। আর কোনো অন্যায় করেছি?

–না। আমি এবার যাই?

–গোলাপী, তুমি আমাকে যে কতখানি ধন্য করে গেলে, তা তুমি নিজেও বুঝবে না!

আবার একদিন আসবে? আমি... তোমার কোনো ক্ষতি করবো না, শুধু তুমি আমার পাশে একটু বসবে, আমার কবিতা শুনবে... দিনের বেলায় তো এসব করা যায় না...

গোলাপী বাসুদেবের হাতটা নিজের বুকে ছোঁয়ালো। যেন বিদ্যুতের স্পর্শ লেগেছে, এইভাবে বাসুদেব সরিয়ে নিল হাতটা । গোলাপী চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোটা জল গড়িয়ে পড়ছে।

খানিক পরে গোলাপী বাসুদেবের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আবার ঢালু জমিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। গোলাপীর মুখের ওপর জ্যোৎস্না, কিন্তু লোকটি দাঁড়িয়ে আছে গাছতলার অন্ধকারে। গোলাপী একটা দৌড় মারবার চেষ্টা করতেই হারীত মণ্ডল ডাকলো, এদিক আয় হারামজাদী!

গোলাপী পালাতে পারলো না, এগিয়ে এলো পায়ে পায়ে। হারীতে মণ্ডল খপকরে চেপে ধরল তার মাথায় চুল, তার এক হাতে টাঙ্গি। এই টাঙ্গিটা সে মাত্র কয়েকদিন আগে কিনেছে আদিবাসীদের হাট থেকে, এখনো এতে রক্তের ছোঁয়া লাগেনি।

হারীত বললো, দুইএক কোপে ঘেটি ফ্যালাইয়া?

গোলাপী মৃদু স্বরে বললো, দাও!

তোরে সেই কুপার্স ক্যাম্পেই মাইরা ফ্যালান উচিত ছিল আমার। তাইলে আমি বাঁচতাম। আমারে এইখানকার সক্কলে গুরু বইল্যা মানে, আর তুই আমার মাইয়া হইয়া এমন কলঙ্কের কাজ করোস! আমার মুখে কালি দ্যাস তুই!

–সক্কলেই জানে, আমি তোমার মাইয়া না। আমার বাপ-মা নাই, আমিএকটা নষ্ট মাইয়া মনুষ! আমারে নিয়া তোমার এত জ্বালা, তুমি আমারে তখনই খেদাইয়া দ্যাও নাই ক্যান? ক্যান আমারে সাথে লইয়া আন্দর আইছো?

–আইজ তুই আমারে এমন কথা কইলি? আমি তোরে খেদাইয়া দিমু? তুই নিজে নষ্ট না হইলে কেউ তোরে নষ্ট করতে পারে?

–মাইয়া মানুষ একবার নষ্ট হইলেই চিরকালের নষ্ট! এই কলোনির কেউ আমারে ঘরে ঢোকতে দেয় না! কেউ আমরে ভালো চক্ষে দেখে না!

–সেই জইন্যেই বুঝি তুই বাবুদের ঘরে যাস? তোর লজ্জা করে না. আমি বামুন কায়েতগো দুই চক্ষে দ্যাখতে পারি না. তুই জানোস! কলোনির পুরুষ গুলার সাথে তুই গোপনে গোপনে আশনাই করোস, আমি এখন দেই খ্যাও না দেখার ভাণ কইরা থাকি। কিন্তু তুই বাবুগো সাথে...

গোলাপী এবার কেঁদে উঠলো । ফোঁপাতে ফোঁপাতে ভাঙা ভাঙা ভাবে বলতে লাগলো যে, সে কলোনির সব পুরুষদের ঘেন্না করে। এই কলোনির পুরুষরা কেউ প্রকাশ্য তার সঙ্গে কথা বলার সাহস পায় না, কিন্তু আড়লে তাকে নিয়ে টানাটানি করে তার ওপরে জোর করে এই কলোনিতে তার আর একটুও তাকতে ইচ্ছে করে না!

হারীত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। শত চেষ্টা করেও সে গোলাপীর সমস্যাটা সামাধান করতে পারছে না। গোলাপীকে কেউ বিয়ে করতে চায় না, তার একটি অবৈধ সন্তান আছে সে কথা কেউ ভুলতে পারে না, অথচ গোলাপীর শরীরের প্রতি প্ররুষেরা লোভ করে। হারীত কজনকে শাসন করবে? কিন্তু গোলাপী বাবুশ্রেণী বা ভদ্রলোক শ্রেণীর কারুর সঙ্গে ব্যভিচার করবে, এটা তার আরও অসহ্য মনে হয়। এর থেকে মেয়েটার মরে যাওয়াও ভালো। যুবতী মেয়ে শরীর না যেন আগুন!

হারীত জিজ্ঞেস করলো, কার ঘরে গেছিলি?

গোলাপী মুখ তুলে বললো, তুমি তার হাত কিংবা পাও ভাঙবা ? না, তার দোষ নাই, আমি নিজের ইচ্ছায় গেছি। সে জোর করে নাই।

–কার ঘরে গেছিলি, নামটা ক! আমি তার নামে হেড অফিসে নালিশ করুম। রিফিউজি মাইয়ারা শস্তা! তাদের ধর্ম নাই, সম্মান নাই।

– বাবা, তোমারে কইলাম তো, আমি নিজের ইচ্ছায় গেছি। আমার জীবনে কেউ কখনো এমন সম্মান করে নাই। সে ব্রাহ্মণ হইয়া আমার পায় হাত দিছে!

–ব্রাহ্মণ? স্টোরের ছোটবাবু? সে তোর পায় হাত দিছে, ক্যান?

–সে জাইত মানে না। সে আমারে দেবী কইয়া ডাকছে।

–ঐসব ঐ বান্দরদের মন ভুলানো কথা। হারামজাদারা! তোরে পয়সা দিছে? তুই পয়সা ন্যাস!

–পয়সা দেবার ক্ষ্যামতা তার নাই। সে গরিব। তার বাড়িতে অনেকগুলি খাওয়ার মানুষ।

–গরিব ? স্টোরের বাবু গরিব হয়? চোর সব শালারা চোর!

–সে চুরি করতে জানে না। সে আমারে পদ্য শুনাইছে, আর কিছু করে নাই।

এবার হারীত বিমূঢ় বোধ করলো। এসব কী নতুন কথা সে শুনছে! কোনো মেয়েকে রাত্তিরবেলা ডেকে নিয়ে একজন পুরুষ পদ্য শোনায়? লোকটা কি অতি বড় শয়তান, না পাগল। গোলাপীর কাছে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও অনেক কথা শুনলো হারীত, মনে মনে তখনই ঠিক করলো, এরপর ঐ স্টোরের ছোটবাবুটিকে ভালো করে যাচাই করে দেখে নিতে হবে।

পরের দিনটিই সাপ্তাহিক র‍্যাশান দেবার দিন। স্টোর খোলার পরই হারীত গিয়ে বসলো সেখানে। স্টোরের দু'জন বাবু, ক্ষিতীশ আর বাসুদেব, আর বালু সিং চাল-ডাল ওজন করে দেয়। ক্ষিতীশ মোটাসোটাম, লম্বা চওড়া চেহারা, সে -ই বড়বাবু, আর বাসুদেব রোগা-পাতলা, তার চেহারা একটা শালিক শালিক ভাব।

হারীত একটা টুল টেনে নিয়ে বসে বললো, ওজন টোজন ঠিক মতন দেও তো, সিংজী? দ্যাখতে আইলাম!

বালু সিং রাগের ভাণক বললো, কিউ! ম্যায় ওজন কম দেতা? কৌন বোলা?

হারীত মুচকি হেসে বললো, আমি কি কম দেওয়ার কথা কইছি? গত হপ্তায় তুমি আমারে এক কিলো অড়হর ডাইল দিলা। আমি বাড়ি গিয়া মাইপ্যা দেখি এক কিলোর উপরে এক শো গেরাম বেশী!

ক্ষিতীশ হেসে ফেললো! হারীত লোকটা অত্যন্তধূর্ত সে জানে, তার আক্রমণ যে কোন্ দিক দিয়ে আসবে বোঝা যায় না। বাসুদেব হাসলো না, সে মন দিয়ে খাতা লিখছে। হারীতকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা ছাই রঙের হয়ে গেছে।

কলোনির অন্য কোনো লোক এই ফুড স্টোরে টুল টেনে বসবার সাহস পাবে না। কিন্তু হারীত যে এখানকার নেতা তা ক্ষিতীশদের মতন বাবুশ্রেণীর সর্মচারীরা জানে। হারীতকে রাস্তায় ঘাটে দেখলেও কলোনির প্রত্যেকটা লোক জয়বাবা কালচাঁদ বলে ধ্বনি দেয় এবং প্রনাম করে।

হারীত বললো, সত্যি সিংজী আমারে বেশী দ্যায়। চাউলও বেশী বেশী ঠ্যাকে। তাই আমি ভাবি আমারে বেশী দিলে অইন্য কেউ কি কম পায়?

ক্ষিতীশ বললো, বসুন, বসুন, একটা সিগারেট খাবেন নাকি?

হারীত নির্লিপ্ত ভাবে হাত বাড়িয়ে বললো, দ্যান একটা!

তারপর বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ছোটবাবু সিগ্রেট খান না?

বাসুদেব মুখ না তুলেই বললো,না!

হারীতে ক্ষিতীশের জ্বালানো দেশলাই কাঠি থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললো, বড়বাবু, এই চাউল কি বর্মা মুলুক থিকা আনছেন নাকি?

ক্ষিতীশ বললো, না না, বার্মা থেকে আসবে কেন? এ তো ইউ পির চাল! হারীত বললো, কইলাম এই জন্য যে যুদ্ধের সময় আমাগো পূর্ববঙ্গের চাউলের খুব আকাল পড়ছিল। দুর্ভিক্ষ হইছিল জানেন নিশ্চয়। কত মানুষ না খাইয়া মরছে। তারপর গভোর্নমেন্ট র‍্যাশোনে একরকম চাউল দিল, সে চাউলের রং কালা কালা, তাতে আবার ছাইরপোকার গন্ধ। তখন অনেকে কইলো যে সেই চাউল বর্মা মুলুক থিকা আসছে, অতদূর থিকা আসছে তো তাই গন্ধ হইয়া গেছে। এখানের চাউলেও সেই গন্ধ পাই কি না!

ক্ষিতীশ বললো, গন্ধ? কই না তো! আমিও তো এই চাল খাই, কোন গন্ধ পাই না তো!

–বড়বাবু, আপনেও এই চাউল খান? আপনার তো তাইলে দাঁত খুব শক্ত!

–হেঁ হেঁ হেঁ, দু' চারটে কাঁকর আছে বটে... তা গভর্নমেন্টের চাল, যখন যেমন পাওয়া যায়, একটু কাঁকর বেছে নিতে হয়।

– সেই যে কথার আছে না, ভিক্ষার চাউল, তার আবার কাঁড়া না আকাঁড়া! আরও একটা কথা আছে, ঠক বাছতে গাঁ উজাড়ে!

কথা ঘোরবার জন্য ক্ষিতীশ বললো, ও মশাই, আপনাদের দেশে তো যুদ্ধ বেঁধে গেছে! চমক উঠে হারীত জিজ্ঞেস করলো, যুদ্ধ...মানে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান, আবার?

–না, ইন্ডিয়া নেই। এবার ওরা নিজেরাই লড়ালড়ি করছে। মোছলমানরাই মারছে মোছলমানদের। খবরের কাগজে তো প্রত্যেক দিনই জবর খবর! পড়েননি?

–আপনার কাছে খবরের কাগজ আছে?

–আমি মেইন অফিসে গিয়ে পড়ে আসি। আজকেরটা পড়তে যাবো আর খানিক বাদে। বুঝুন দেখি কাণ্ড, মোলমানরা আলদা দেশ চায় বলে ইন্ডিয়া থেকে কেটে পাকিস্তান বানালো, আপনাদের ওদেশ থেকে তাড়ালো, এখন নিজেরা সামলাতে পারছে না। ওয়েস্ট পাকিস্তানীরা ইস্ট পাকিস্তানীদের ধরে বেধড়ক প্যাদাচ্ছিল, এখন ইস্ট পাকিস্তানীরাও উল্টে হাতিয়ার ধরেছে, যশোর-খুলনা-চিটাগাঙে জোর লড়াই চলছে।

হারীত তবু অবিশ্বাসের সুরে বললো, মুসলমানরা মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করছে,এ কখনো হয়?

ক্ষিতীশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, কেন হবে না? মোগল-পাঠানে লড়াই হয় নি? শের শা' র সঙ্গে হুমায়ুন বাদশার যুধ....সে সব হিস্ট্রিতে আছে! অষ্ট পাকিস্তানের এখন নাম হয়েছে বাংলাদেশ, ওরা নাকি স্বাধীন হতে চায়! আরও মজার কথা শুনবেন ইন্ডিয়াতে আবার রিফিউজি আসছে দলে দলে। এবার কারা আসছে জানেন, মোছলমানেরা। বোঝো ঠ্যালা!! আপনাদের মতন লাখ লাখ রিফিউজি নিয়েই এখনো গর্ভনমেন্ট হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তার ওপর আবার মোছলমান রিফিউজি। বনগাঁ বর্ডার দিয়ে নাকি রোজ হুড় হুড় করে ঢুকছে। কলকাতা ভরে গেছে!

বাসুদেব একবার উঠে গিয়ে বাথরুম করে এলো, তারপরও সে হিসেবের খাতা লিখতে লাগলো ঘাড় নিচু করে, এসব কোনো আলোচনাতেই যোগ দিচ্ছে না।

হারীতের মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। অন্তত গত পাঁচ বছর সে খবরের কাগজ চোখেই দেখেনি, পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদ সে কিছুই জানে না। পশ্চিম বাংলায় কমুনিস্টরা নিবার্চনে জিতে সরকারি দলে এসেছে, এরকম একটা ভাসা খবর সে শুনেছিল বাবুদের মুখে। তাতে তার মনে একটা আশা জেগেছিল। কমুনিস্টরা বরাবরই রিফিউজিদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছে। কংগ্রেস সরকারই তো তাদের পশ্চিম বাংলা থেকে ঠেলে পাঠিয়েছে এই এতদূরে জঙ্গলে আর পাথরে জমিতে কমুনিস্টরা ক্ষমতায় এলে নিশ্চয়ই রিফিউজিদের জন্য একটা কিছু ভালো ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু এ যে একেবারে অন্য খবর। পাকিস্তানের মধ্যে ঘরোয়া যুদ্ধ! পূর্ব পাকিস্তানের নাম এখন বাংলাদেশ? কী মধুর একটা শব্দ!

ক্ষিতীশ আবার বললো, আমার মনে হয় কী জানেন, এ লড়াই বেশীদিন টিকবে না। আবার এতগুলো রিফিউজির বোঝা ইন্ডিয়া গর্ভনমেন্ট কতদিন ঘাড়ে নিয়ে বইবে? এবার ইন্ডিয়া একটা গুঁতো দিলেই পাকিস্তান ভেঙে দু' টুকরো হয়ে যাবে! তাতে তো আপনাদেরই সুবিধা হয়ে যাবে মশাই!

হারীত আর ও বেশী বিস্মিত হয়ে বললো, আমাদের সুবিধা হবে? কেমন করে? ক্ষিতীশ বললো, আমাদের একটা আলাদা রাষ্ট্র হয়ে গেলেই ইন্ডিয়া গর্ভনমেন্ট বলবে, তোমাদের রিফিউজিদের ফেরত নাও। তারা নিতে বাধ্য। তখন এই রিফিউজিদের সঙ্গে আপনারাও হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়বেন। কে কবে এসেছে তার কে হিসেব রাখে। তাহলে আপনারা আপনাদের জায়গা জমি ফেরত পেয়ে যাবেন আবার।

হারীতের চোখের সামনে যেন একটা সোনালি রঙের স্বপ্ন ঝিলিক দিয়ে উঠলো। আবার সেই ভিটে মাটিতে ফিরে যাওয়া যাবে? সেই পুকুর-আমবাগান-ধান ক্ষেত। এখানে এই রিফিউজি কলোনিতে চরম অপমানজনক বন্দী জীবনের চেয়ে নিজের ভিটে মাটিতে গিয়ে আধাপেটা খেয়ে থাকাও সহস্র গুণ ভালো! সত্যিই কি এই স্বপ্ন সম্ভব হতে পারে! গুরু কালচাঁদ একদিন স্বপ্নে বলেছিলেন; আবার সুদিন আসবে। সেই সুদিন কাছাকাছি এলে তিনিই জানিয়ে দেবেন। কই, তিনি তো অনেকদিন আর স্বপ্নে দেখা দিচ্ছেন না।

ক্ষিতীশ বললো, তবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেসব রিফিউজি আছে, বিশেষ করে ক্যালকাটার আশে পাশে, তারাই তারাই বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার চান্স নেবে আপনারা এতদূর থেকে আর কী করবেন? আপনারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবেন। কী বলো বাসুদেব, ঠিক বলিনি! বাসুদেবের সারা কপালে ঘাম, ঠোঁট একেবারে শুকনো। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ক্ষিতিদা, আমায় একমাস ছুটি দিতে হবে। আমি দেশে যাবো!

ক্ষিতীশ বললো, সে কি, এখন ছুটি নেবে? এই গরমের মধ্যে ছুটি নিয়ে করবে কী? বাসুদেব বললো, আমি এক বছর আনর্ড লীভ নিইনি। আমার বিশেষ দরকার।

–এখন তোমাদের বর্ধমানে খুব নকশালী হামলা চলছে, এখন যেও না, বিপদে পড়ে যাবে।

– আমার যেতেই হবে ক্ষিতিদা, আমার মায়ের অসুখ। আমি মেইন অফিসে গিয়ে দরখাস্ত দিয়ে আসবো? এখন যাই!

হারীত ও উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি যেন অফিসে যাচ্ছেন, ছোটবাবু? আপনার সাইকেল আমারে একটু ডাবল ক্যারি করে নিয়ে যাবেন? আমি যেন অফিস গিয়া খবরের কাগজ পড়ে আসবো।

বাসুদেব প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বললো, আমি ডাবল ক্যারি করতে পারি না। আমি ভালো সাইকেল চালাতে জানি না!

ক্ষিতীশ হাসতে হাসতে বললো, ও ন্যাকপ্যাক সিং আপনাকে ক্যারি করতে পারবে না। আপনি বরং খানিক ওয়েট করুন। স্টোর বন্ধ করার পর আমি যাবো তখন আমি নিয়ে যাবো আপনাকে।

হারীত বললো, থাক আমি হেঁটেই যাবো, কতই বা দূর। আট-নয় মাইলের বেশী না! পারুলবালার কাছে একটা ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে হারীতে যোগানন্দকে সঙ্গে নিল। তার মাথায় একটা নতুন চিন্তা এসেছে। কোনোক্রমে গাড়ি ভাড়া জোগাড় করে তাকে একবার কলকাতায় ঘুরে আসতে হবে। অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, পুলিশ নিশ্চয়ই তার ওপর এখন নজর রাখবে না। কলকাতায় গেলে সত্যি সত্যি সীমান্তের ও ধারে কী ঘটছে তা জানা যাবে। তার ছেলেটার খোঁজ নিতে হবে। ত্রিদিব-সুলেখার বাড়িতে নিশ্চয়ই কয়েকদিনের জন্য থাকার জায়গা পেয়ে যাবে সে। কাছাকাছি দু'তিনখানা কলোনির মানুষ তাকে গুরু বলে মানে। প্রত্যেকটি পরিবার থেকে যদি দুটো টাকা ও চাঁদা দেয়, তাতেই আসা-যাওয়ার খরচ কুলিয়ে যাবে হারীতের।

বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হারীত জিজ্ঞেস করলো, যোগা, তোরে যদি কেউ কয়, দ্যাশের বাড়িতে ফিরা যাবি, না ইন্ডিয়াতেই থাকবি, তাইলে তুই কী করবি?

যোগানন্দ বললো, আপনে এ কী জিগাইলেন বড়কত্তা? সে চান্‌স পাইলে আমি অ্যাক্ষুনি ইন্ডিয়া ছাইরা দৌড় লাগামু। কিন্তু সে চানছ কি এই জীবনে আর আসবে! বাংগালী মুসলমানরা নাকি ভেন্ন হইয়া স্বাধীন হইতে চায়। স্বাধীন হইলে তারা আমাগো ফিরাইয়া নেবে না!

–হ্যারাই তো আমাগো তাড়াইছে। হ্যারা আর আমাগো নেবে ক্যান?

–ইন্ডিয়ার সাথে যদি বন্ধুত্ব হয়? পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে তো ওরা মাইর খাইলো। এখন যদি ভাবে যে হিন্দুগো সাথে আর কাইজ্যা কইরা লাভ নাই, বরং মিলা মিশা থাকলে শান্তিতে থাকবে।

–আমার বিশ্বাস হয় না। বড়কত্তা, আমাগো ঘর বাড়ি কি আছে? সেই সব ওরা অ্যাদ্দিনে দখল কইরা লয় নাই?

–হেইডা গিয়া একবার ঘুইরা দেইখ্যা আইলে হয়! হ দ্যাখ আমাগো গেরামের মুসলমানরা খারাপ আছিল না, আমাগো কোনো ক্ষতি করে নাই। শহরে দাঙ্গা হইছে বইল্যাই তো আমরা ভয় পাইছি, তাই না? আমাগো ভিটায় তুলসীমঞ্চ আছিল, মুসলমানরা তুলসীগাছ সহজে নষ্ট করে না।

–বড় কত্তা, জীবনে যদি আর কোনোদিন বাপ-ঠাকুর্দার ভিটায় তুলসী মঞ্চের ধারে বইস্যা এক গাল মড়ি খাইতে পারি।

কথা বলতে গল ধরে গেল যোগানন্দর, সে বাঁ হাতের উল্টেপিঠ দিয়ে চোখ মুছলো।

প্রখর গ্রীষ্মের গনগনে দুপুর। দু' জনেরই খালি গা, ঘামে, চকচক করছে। মাঝে মাঝে দু' একটা লরি ছাড়া এ রাস্তায় এই সময় আর বিশেষ গাড়ি চলে না। পেছন দিক থেকে লরি আসছে কি না, তা ওরা এক একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। একবার দেখতে পেল খুব কাছেই সাইকেল সমেত বসুদেবকে। ছুটির দরখাস্তের মুশাবিদা করতে তার খানিটা দেরি হয়েছে। হারীতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বাসুদেব সাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। যেন তার সামনে একটা বিরাট বাধা, আর যাবার উপায় নেই। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো হারীতদের দিকে। হারীত ভাবলো বাসুদেব বোধহয় তাদের কিছু বলবার জন্য থেমেছে। সে ঘুরে কয়েক পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে ছোটবাবু!

হারীত ভাবলো বাসুদেব বোধহয় তাদের কিছু বলবার জন্য থেমেছে। সে ঘুরে কয়েক পা এগিয়ে

এসে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে, ছোটবাবু!

বাসুদেবের চোখ দুটো ঝিমিয়ে এলো, যেন সে এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। এখানে গরমের সময় সর্দি-গর্মিতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। প্রত্যেক বছরই এই সময় কয়েকটা শিশু ও বৃদ্ধ মারা যায়। হারীত ব্যস্ত হয়ে আরও এগিয়ে এসে বললো, কী হয়েছে, শরীর খারাপ লাগছে?

বাসুদেব অতিকষ্টে চোখ মেলে ফ্যাসফেসে গলায় বললো, আপনারা আমাকে মারবেন তো মরুন!

হারীত বুঝতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী বললেন? কে মারবে আপনারে?

বাসুদেবে বললো, আপনারা মারুন। আমি দোষ করেছি, যত ইচ্ছে মারুন। তবে দয়া করে আমার ডান হাতটা ভেঙে দেবেন না, তাহলে আর আমি লিখতে পারবো না। আমার হাত কিংবা যে-কোনো পা ...এইটুকু শুধু দয়া করুন আমাকে।

হারীতে হা হা করে হেসে উঠে বললো, আপনাকে আমরা মারতে যাবো কেন? আমরা কি ডাকাত? আরে ছিঃছিঃ! আমি বরং আপনার কাছে একটা সাহাইয্য চাই। আপিনি ছুটি নিয়া দ্যাশে যাবেন তো, আমারে সাথে লইয়া যাবেন? আমি তো এইদিকের রেলগাড়ির সব ব্যাপার জানি না। কোথায় কী টিকিট-টুকিট কেনতে হয়... আপনি বর্ধমান পর্যন্ত আমারে পৌছাইয়া দিলেই আমি কলকাতায় যাইতে পারবো। নেবেন আমারে আপনার সাথে?

॥ ১৬ ॥

ছেলের প্যান্ট সেলাই করতে বসেছেন জাহানারা ইমাম। একটা মাত্র কাঁধে ঝোরানো ব্যাগ নিয়ে যাবো রুমী, তাতে দু' চারখানা জামা কাপড়ের বেশী ধরবে না, অথচ সে কতদিনের জন্য যাচ্ছে কে জানে! একটা প্রায় নতুন প্যান্টের কোমরের কাছে ভেতরের দিকের মুড়ির সেলাই খুলে ফেলে সেখানে ভরে দিলেন দশখানা একশো টাকার নোট, তারপর আবার এমন নিখুঁতভাবে সেলাই করলেন যাতে আর বোঝার উপায় রইলো না। নিজের কাজ দেখে খুশী হবার বদলে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো তাঁর চোখ দিয়ে।

রুমী আজ চলে যাবে। কিছুতেই আর তাকে বাধা দেওয়া যাবে না। প্রায় এক মাস ধরে রুমী তার মাকে বোঝাচ্ছে, মায়ের অনুমতি না নিয়ে সে যেতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা ডিবেটার রুমী, তার সঙ্গে তা মা যুক্তি-তর্কে পারবেন কী করে! জাহানারা ইমামের সচেতন বিবেক রুমীর যুক্তিগুলি অগ্রাহ্য করতে পারে না, কিন্তু মায়ের প্রাণ যে মানতে চায় না! রুমী চলে যাবে, যদি আর না ফেরে!

ইঞ্জিনিয়ারিং -এর ছাত্র রুমী, আমেরিকায় ইলিনয়ে আই আই টি-তে সে অ্যাডমিশন পেয়ে গেছে, সেপ্টেম্বরে সেখানে যাবার কথা, আর মাত্র পাঁচ মাস বাকি। কিন্তু ভাই-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন যখন চতুর্দিকে অসহয়ের মতন মরেছে, তখন রুমী শুধু নিজের কেরিয়ার গোছাবার জন্য কিছুতেই আমেরিকায় যেতে চায় না।

সত্যি সত্যি যে কতখানি অত্যাচার হচ্ছে আর কতটা গুজব, তা অনেকদিন ভালো করে বুঝতে পারেননি জাহানারা। পঁচিশে মার্চের পর কয়েকদিনের ঢাকায় কোনো খবরের কাগজই বেরোয়নি, এখন দু' একটি কাগজ বেরুচ্ছে, তাও দু' পাতা, চারপাতা মাত্র, তাতে শুধু সরকারি ঘোষণা ছাড়া আর কোনো খবরই থাকে না। টি ভি, রেডিও আবার চালু হয়েছে, তারা মিলিটারির বেয়নেটের ভয়েই হোক আর যে- করণেই হোক, এখন আবার গাইছে পাকিস্তান সরকারের গুণগান, তাদের কথা শুনলে মনে হয় দেশের অবস্থা স্বাভাবিক। কিন্তু রুমীরা বলে, দেশের একটু নামকরা লোদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে রেডিও টিভিতে ওদের মনোমত কথা বলচ্ছে। দেখো আম্মা, একদিন তোমার কাছেও আসবে, তোমাকে দিয়েও রেডিওতে মিথ্যে কথা বলাবে।

অথচ কলকাতার রেডিও শুনেও পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। সবাই এখন দরজা-জানলা বন্ধ করে আকশবাণী শোনে। আকশবাণীর খবর শুনলে মনে হয়, ঘোরতর যুদ্ধ চলছে বাংলাদেশে, কোনো কোনো শহর অঞ্চল জয় করে নিয়েছে মুক্তিবাহিনী, এসবের কতখানি সত্যি? বেগম সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহিমকে খুন করেছে পাকিস্তানী সেনা আবার গভর্নর টিক্কা খাঁ মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত এসবও শোনা গেছে আকাশবাণীতে, কিন্তু সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহিম মোটেই মারা

যায়নি। কাগজে তাদের ছবি বেরিয়েছে। আর টিক্কা খান তো বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে। তাঁর ওদের খবর বিশ্বাস করা যায় কী করে?

রুমী বলে, দু'চারটে খবর ভুল হতে পারে। কিন্তু ইউনিভার্সিটির ডঃ জি সি দেব, মনিরুজ্জামান, এফ আর খান, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, শরাফত আলী এঁদের যে গুলি করে মেরে ফেলেছে, তাতে কি কোনো ভুল আছে? ঢাকার কতবা জ্বালিয়ে দিয়েছে, তা তো তুমি নিজের চোকেই দেখেছো!

তবু সন্দেহ যায় না। আর্মি -পুলিশ মিলে দারুণ অত্যাচার করছে তা ঠিকই। কিন্তু এরকম তো পাকিস্তানে আগেও হয়েছে। শেখ মুজিব যখন তখন গ্রেফতার হয়েছেন কতবার। হাজার হাজার পলিটিক্যাল ওয়ার্কারদের জেলে ভরা হয়েছে, গুলি চালানো হয়েছে ছাত্রদের মিছিলে। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মিলিটারির কর্তাদের আলোচনা ভেস্তে যাবার পর জারি হয়েছে সামরিক শাসন। তারপর সব কিছু আবার ঠাণ্ডা। এবারেও কি তাই হবে না? রুমীরা বলছে স্বাধীনতার কথা? -কী নিয়ে ওরা লড়বে?

যে-কয়েক ঘন্টা কারফিউ থাকে না, সেই সময়ে জাহানারা নিজেই সাহস করে গাড়ি নিয়ে ঢাকা শহর ঘুরে দেখে আসেন মাঝে মাঝে। লালবাগ থেকে চকবাজারে গেলে দেখা যায়, প্রায় পুরো বাজারটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসলামপুর, শাঁখারিপট্টি, ওয়াইজ ঘাট, পাটুয়াটুলি, সদরঘাট, নবাবপুর সর্বত্র প্রায় একই দৃশ্য। চতুর্দিকে শুধু ধ্বংসের তাণ্ডব। কামানের গোলা দেগে মহল্লার উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শাখরিপট্টিতে পচা লাশের গন্ধ, দরজা জানলা ভাঙা যে কয়েকটি দোকানঘর এখনও কোনোক্রমে টিকে আছে, সেগুলোর গায়ে ঝুলছে নতুন চটের পর্দা, তার উপর সাঁটা কাগজে কী যেন লেখা। কৌতূহল দমন করতে না পেরে জাহানারা গাড়ি থেকে নেমে সেই পড়তে গিয়েছিলেন। তাতে আছে নতুন মালিকানার ঘোষণা। শাঁখারিপট্টির দোকানগুলো অবাঙালী মুস্লিমদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছে।

ক্রমে নিজেদের চোনাশুনো আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যু সংবাদ কানে আসতে লাগল। ঢাকা থেকে যারা পালিয়ে গিয়েছিল বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরায়, সেখানে অনেকেই গুলি খেয়ে মরেছে। গ্রামের পর গ্রাম ঘিরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে মিলিটারি, সাধারণ যাত্রীবাহী নৌকোর ওপর হয়েছে মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি। জাহানারা এক খালতো ভাই ভিখু চৌধুরী মারা গেছে। সেইসঙ্গে তার বউ মিলি, সে বাড়ির বুড়ো-বাচ্চা কেউ বাদ যায়নি। করটিয়ায় গ্রামের বাড়িতে পুরো একটি পরিবার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, চোখ মুখ ধুয়ে নাস্তা খাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল, হঠাৎ এসে হানা দিল সাক্ষাৎ যমদূতেরা। ধানমণ্ডিতে ভিখু চৌধুরী দাদার বাড়িতে গিয়ে সব শুনে জাহানারা স্তম্ভিত হয়ে। আর্মির লোকেরাও তো মানুষ। পশু তো নয়, তারা নিষ্ঠুর হয় কী করে? বিনা প্ররোচনায় বিনা দোষে নিরীহ নারী-পুরুষ শিশুদের তারা হত্যা করে কোন বিবেকে! অথচ সত্যি সত্যি যে এরকম ঘটছে, তাতে তো আর কোনো সন্দেহ নেই। গুলি লেগেছে খালা আম্মার তলপেটে, তবু তিনি কোনোক্রমে বেঁচে ফিরে এসেছেন, তাঁরই মুখে জাহানারাকে শুনতে হলো তাঁর ছেলে ভিখু চৌধুরী আর পরিবারের অন্যাদের নিধনের বর্ণনা। এত চোখের জল পর্যন্ত শুকিয়ে যায়!

নারিন্দা থেকে আত্তা ভাই একদিন এসে শোনালেন আর ও সাঙ্ঘাতিক খবর। আজীবন ধর্মানুরক্ত, সদাপ্রসন্ন এই আত্তা ভাই, তাঁকে জাহানারা কখনো রাগতে দেখেননি, তিনি এলেই বাতিতে আনন্দের সাড়া পড়ে যেত, তিনি অনেক মজার মজার গল্প শোনাতেন। সেই মানুষটি আজ দারুণ উত্তেজিত ও বিচলিত মনে হয় তিনি রাতের পর রাত ঘুমোননি, তাঁর হাত কাঁপছে। তিনি বললেন, বুঝলে জাহানারা, ওদের আর বেশীদিন নাই। ইসলামের নামে ওরা যা করছে তাতে খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। মসজিদে বসে কোরান তেলাওয়াত করছিলেন ক্বারীসাহেব, তাকে পর্যন্ত গুলি করে মেরেছে। খোদার ঘরে ঢুকে মানুষ খুন! মায়ের সামনে ছোট ছেলেকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। ছেলের সামনে মাকে বেইজ্জত করেছে। খোদাতাল্লা সইবেন এত অত্যাচার?

রুমী বললো শোনো আম্মা শোনো! এবার বিশ্বাস হয় তোমার? বুড়িগঙ্গা দিয়ে হাত পা বাঁধা ছেলেদের লাশ ভেসে যায়, আমরা প্রত্যেকদিন দেখি। গ্রামের মেয়েদের তুলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আর্মি। আবার কিছু কিছু লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের শরীর থেকে সিরিঞ্জে করে বার করে নেওয়া হচ্ছে সব রক্ত। অবিকল নাৎসীদের কায়দায়। আমার চেনা একজন ডাক্তারকে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে এই

কাজ করিয়েছে। তুমি তার নিজের মুখে শুনতে চাও? আরও শোনো, ঢাকা শহরের সব ইয়ংম্যানদের নামের লিস্টি বানানো হচ্ছে, তাদের সবাইকে একদিন তুলে নিয়ে যাবে। এলিফ্যান্ট রোডের মোড়ের মাথায় দু' জন বিহারী মুসলমান সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আমরা কখন কোথায় যাই, খবর রাখে। এর পরেও তুমি আমাকে বাড়িতে ধরে রাখতে চাও?

নিউজ উইক পত্রিকার কয়েকটা কাটিং গোপনে জোগার করে এনেছে রুমী। তাতে আছে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় মুক্ত যুদ্ধের খবর। সীমান্তের কোথায় যেন মুজিবনগর হয়েছে, সেখান থেকে লড়াই চালাচ্ছে অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। লড়াই একটা চলছে ঠিকই, আর অস্বীকার করা যায় না।

হাজার হাজার তরুণ নেমে পড়েছে স্বাধীনতার সংগ্রামে, আর রুমী তাতে যোগ দেবে না, তা কী হয়? স্বাস্থ্যবান, টগবগে ছেলে রুমী, সে বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্যে খুব আগ্রহী, কবিতা মুখস্ত বলে গড়গড় করে, খেলাধুলোতেও ওস্তাদ, আবার ইতিহাস রাজনীতি নিয়েও মাথা ঘামায়। জাহানারা তাঁর ছেলেকে কখনো স্বার্থপর হতে শেখাননি, তারা মিথ্যে কথা বলে না, সরল সুন্দর আদর্শে উজ্জ্ব তাদের মুখ।

রুমী যদি কারুকে কিছু না জানিয়ে, গোপনে বাড়ি ছেড়ে মুক্তি যোগ দিতে চলে যেত, তাহলে হয়তো জাহানার কোনোক্রমে তা মেনে নিতেও পারতেন। কিন্তু এ ছেলে সে ভাবে কিছুতেই যাবে না। সে তার মায়ের অনুমতি চায়। পিছুটান রেখে সে কী করে লড়াই করতে যাবে। সেইজন্য সে প্রত্যেকদিন তর্ক করে মায়ের সঙ্গে। একদিন তর্ক থামিয়ে সে হঠাৎ শান্ত গলায় বললো, ঠিক আছে, আম্মা তুমি যদি জোর করো, তাহলে আমি দেশ ছেড়ে আমেরিকাতে চলে যাবো। তোমাকে খুশী করার জন্য আমি পড়াশুনো করে বড় ইঞ্জিনিয়ার হবো। কিন্তু আমার বিবেকের কাছে চিরকালের মতন অপরাধী হয়ে থাকবো, আম্মা, তুমি কি সত্যি-ই চাও?

জাহানারা চোখ বন্ধ করে বলে উঠেছিলেন, না তা চাই না! ঠিক আছে, তোর কথাই মেনে নিলাম। দিলাম তোকে দেশের জন্য কোরবানী করে। যা তুই যুদ্ধেই যা!

রুমী অনুমতি পেয়েছে শুনে ছোটভাই জামী লাফিয়ে উঠে বলেছিল সেও যাবে! সেও দাদার সঙ্গে যুদ্ধে যাবে। তাকে অতিকষ্টে নিরস্ত করা হয়েছে এই বলে যে দুটি ছেলেই চলে গেলে এ বাড়ির ওপর সন্দেহ পড়বে, আর্মি তাদের বাপ-দাদাকেও ছাড়বে না। প্যান্ট সেলাই করার পর চোখের জল মুছতে মুছতে জাহানারা রুমীর ব্যাগ গোছাতে লাগলেন। রুমী আমের আচার ভালবাসে, এক কৌটো আচার দিলেন ব্যাগ ভরে। একটুখানি গাওয়া ঘি দিলেন.... না, রাগ করবে রুমী। লাল স্ট্রাইপ শার্টটা ওর খুব প্রিয়, কিন্তু সঙ্গে নেবে না বলেছে, তার বদলে তিন চার খানা গেঞ্জি, গরমকালটা শুধু গেঞ্জি পরেই কাটিয়ে দেবে। ব্যাগের মধ্যে আগে থেকেই দু'খানা বই ঢুকিয়ে রেখেছে রুমী জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা আর সুকান্ত সমগ্র। যুদ্ধ করতে যাবার সময়েও তার কবিতায় বই সঙ্গে রাখা চাই।

বইয়ের খুব শখ রুমীর। পঁচিশে মার্চের পর বাড়ি সার্চ হওয়া ভয়ে অনেক কিছু সরিয়ে ফেলতে হয়েছে বাড়ি থেকে। অনেক পত্র-পত্রিকা -ইস্তাহার পুড়িয়ে ফেলেছে রুমী। মার্কস এঙ্গেলস মাও সে তুঙ, রবীন্দ্রনাথ, চে গুয়েভারায় বইগুলো সব একটা বস্তার ভরে রেখে দেওয়া হয়েছে বাথরুমের দেওয়ালের পেছনে একটা গর্তে। প্রিয় বইগুলিকে ওভাবে রাখতে খুবই কষ্ট হয়েছিল রুমীর, কিন্তু উপায় তো নেই!

চারদিন আগে ছিল জাহানারার জন্মদিন। এবছর জন্মদিন নিয়ে কোনোরকম ঘটা করার প্রশ্নই ওঠে না। অন্য বছর ছেলেরা মায়ের জন্মদিন নিয়ে খুব আনন্দ করে, আগের রাত্তিরেই জাহানারা বলেছিলেন, এবার কোনো স্পেশাল রান্নাও হবে না, বাড়িতে কারুকে ডাকাও হবে না।

তবু সকালবেলা অন্যান্য বছরেরই মতন দুই ছেলে দরজায় টোকা দিয়ে বলেছিল, আম্মা আসি? প্রত্যেক বছর দুই ভাই, মা বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেই দুটি সারপ্রাইজ গিফট দেয়, মাকে নিয়ে নানারকম মজাকরে। এবার মায়ের চোখ অশ্রুসিক্ত, ছেলেদের মুখ থমথমে। রুমী চলে যাবে, সব ঠিক হয়ে গেছে।

এবারেও অবশ্য দুই ভাই দুটি উপহার এনেছিল। ছোটভাই জামী বাগান থেকে তুলে এনেছে একটি আধ-ফোটা কালো গোলাপ। আর রুমীর হাতে একটা পুরনো বই। রুমী বললে জামী তুই

আগে বনি-প্রিন্সটা আম্মার হাতে দে।

তারপর সে বইটা মাকে দিয়ে বললো, আম্মা এই বইটা পড়লে তুমি মনে অনেক জোর পাবে। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় নাৎসীবাহিনী পোল্যাণ্ডে ঢুকে যখন অমানুষিক অত্যাচার চালচ্ছিল, তখন পোলিশরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যে ভাবে গেরিলা লড়াই চালিয়েছিল, এটা তারই কাহিনী। নাৎসীরা ইহুদীদের মানুষ বলেই গণ্য করে না, মুসলমান বলে গণ্য করে না। তুমি এই বইটা পড়ো নাম-ধাম বদলে দিলে তোমার মনে হবে, এ যেন অবিকল বাঙলাদেশেরই কাহিনী। বইটি লিয়ন ইউরিসের মাইলা-১৮'। কালচে গোলাপটা হাতে নিয়ে জাহানারার মনে হয়েছিল এ যেন জমাটবাঁধা রক্তের রং। কত রক্ত ঝরিয়ে আসবে স্বাধীনতা? তিনি কেঁপে উঠেছিলেন।

রুমী এখনও ঘুমিয়ে আছে। কাল রাতে অনেকক্ষণ রুমীর চুলে বিলি কেটে দিয়েছেন জাহানারা। দুইভাইয়ের ছোটবেলা থেকেই এই অভ্যেস, ঘুমোবার আগে মাকে চুলে বিলি কেটে দিতে হবেই। কে বেশীক্ষণ পাচ্ছে, আর কে কম, তা নিয়ে দু'জনে ঝগড়া করেছ কতদিন! কাল জামী স্বেচ্ছায় বলেছিল, আজ আমায় দিতে হবে না, আজ আমার সময়টাও তুমি ভাইয়াকেই দাও!

জাহানারা আদর করছিলেন, আর রুমী আস্তে আস্তে শিস দিয়ে গাইছিল, একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। মাত্র কিছুদিন আগেই এই ছেলে বিলিতি গান-বাজনার কী ভক্তই না ছিল! না, চোখের পানি ফেলতে নেই, শেষ সময়ে মন দুর্বল হয়ে গেলে চলবে না। জাহানারা চোখ মুছে নাস্তার ব্যবস্থা করতে গেলেন। ঘুম থেকে উঠে একেবারে স্নানটান সেরে নিয়ে রুমী খাওয়ার টেবিলে এসে ধীর স্বরে বললো, আম্মা, যাওয়ার সময় নাটকীয় কিছু করতে পারবে না কিন্তু। যেমন অন্যদিন আমরা বাড়ি থেকে বেরোই ঠিক সেই ভাবে যাবো। তুমি গাড়ি চালাবে। আমাকে সেক্রেটারিয়েটের

সেকেণ্ড গেটের সামনে নামিয়ে দেবে। তারপর তোমার চলে যাবে, পিছন ফিরে তাকাবে না একবারও।

জাহানারা ধরা গলায় বললেন, শুধু একটা কথা বলে। তোর সাথে কে কে যাবে এবার? কোন দিকে এখন যাবি তোরা?

রুমী বললো, ওসব কথা জিজ্ঞেস করো না, আম্মা। ওসব বলা নিষেধ। জানো তো, আমি মিথ্যে কথা বলতে পারবো না।

রুমীর বাবা শরীফ টেবিলের অন্য প্রান্তে বসে কাগজের মুখ ঢেকে রয়েছেন। জাহানারার মতন তিনিও রুমীকে যেতে দিতে রাজি হয়েছেন, তবে তাঁর পিতৃহৃদয়ে যে কী তোলপাড় চলছে তা তাঁর মুক দেখে বোঝা যায় না।

ক' দিন ধরে ঝড়বাদল হচ্ছে বিকেলের দিকে। আজও সকাল থেকেই আকাশ প্রায় অন্ধকার। রুমীর যাবার দিনটাই এরকম কেন? গাড়িতে উঠে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে জাহানারা মনে মনে বললেন, ইয়া আল্লা আজ যেন ঝড়-বৃষ্টি না আসে!

এয়ার ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে, যেন অন্যদিনের মতনই কলেজ যাচ্ছে, এই ভঙ্গিতে পেছনের সীটে গিয়ে বসলো রুমী, তার পাশে তার বাবা, তাঁর হাতে এখনও খবরের কাগজ। গাড়িটা খানিকদূর যাবার পর রুমী ঘাড় ঘুরিয়ে একবার একটা দোতলা বাড়ির দিকে তাকালো। তারপর সে বললো, আম্মা , বাবুল চৌধুরী যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, তাকে কিছুই বলো না। অন্যদের যদি কিছু বলতে হয়ে তো বলবে যে আমি কিছুদিন গুলসানের বাড়িটায় থাকবো।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবুল দেখলো রুমীকে। ওদের গাড়িটা এলিফ্যান্ট রোডে পড়ে বাঁক নিল। বাবুল তবু এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইরো সেদিকে। রুমীর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার সে দেখেছিল রুমীর চোখে অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য। বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি যে রুমীর জীবনে আজ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বাড়ি ছেড়ে যুদ্ধে যোগ দিতে যাচ্ছে ছেলেটা?

বাবুলকে দেখে রুমী অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইদানীং রুমী তাকে দেখলেও কথা বলতো না। অথচ একসময় এই রুমী দু'বেলা আসতো তার কাছে। মাও সে-তুঙ-এর রেড বুকের ব্যাখ্যা শোনার কী উৎসাহ ছিল তার।

'বাবুল আপন মনে একটু হাসলো। রুমীর মতন ছেলেরা অনেকেই ইদানীং তাকে এড়িয়ে চলে। এরা কী মনে করে তাকে, দেশদ্রোহী? চতুর্দিকে এখন একেবারে দেশপ্রেমের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কয়েক

মাস আগেও, যারা ছিল মার্কসবাদী, এখন তারা হঠাৎ বাঙালী হয়ে উঠেছে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নিয়ে উন্মাত্ত।

অতি তরলমতি, ভাবলুতাপুর্ণ এই ছেলেরা। কখনো চোস্ত প্যান্ট পরে ফরফর করে ইংরেজি বলে আর আমেরিকান কায়দায় নাচানাচি করে, কখনো চীনা পন্থী হয়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে, আবার হুজুগে মেতে জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভেসে যায়। একটু ধৈর্য নেই। পাকিস্তান এখন যে পথে এগোচ্ছে, তাতে একদিন না একদিন এদেশে সর্বাত্মক বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য, তখন শোষকশ্রেণীকে একেবারে ঝাড়মূলে নির্বংশ করে দেওয়া যাবে। তার বদলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এরা এখন মেতে উঠেছে, স্বাধীন বাংলাদেশের নামে কী চাইছে এরা? এরা কি বোঝে না যে পাকিস্তান সত্যিই যদি দু'টুকরো হয় তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানী আর্মির বদলে আসবে আর একটি শোষকশ্রেণী।

বাবুলের বন্ধুরাও প্রায় কেউ আর যোগাযোগ রাখে না তার সঙ্গে। জহির, কামাল এদের পাত্তা নেই। এরাও ভয় পেছে? ই পি আর এর বিদ্রোহ আর শখের মুক্তিবাহিনীকে দমন করবার জন্য সৈন্যবাহিনী নানা জায়গায় খুব অত্যাচার চলাচ্ছে তা ঠিক। কিন্তু জহির কামালরা কি জানে না যে একটা দেশের বিপ্লব শুরু হবার আগে অত্যাচার আর নিস্পেষণ কত চরম অবস্থায় পৌঁছোয়। এই বোকারা কি বুঝছে না যে সমাজ তন্ত্রী চীন পাকিস্তানের সেনা সরকারকে মদত দিয়ে তাদের আরও সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে!

ইউনিভার্সিটি বন্ধ, বাবুলের কোথাও যাবার জায়গা নেই। ঢাকার অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে, কিছু কিছু দোকান পাট, অফিস কাছারি খুলেছে, ইস্কুলগুলো জোর করে খোলাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, কিন্তু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের সরকার এখনো বিশ্বাস করে না। দরকার নেই এখন পড়াশুনোর।

আলতাফ হঠাৎ ইণ্ডিয়ায় চলে গেছে। সেও যে কেন ভয় পেল, তা বোঝা যাচ্ছে না। ইণ্ডিয়ার প্রতি তার এতদিন বিদ্বেষ ভাবই ছিল। হোসেন সাহেবেরও পাত্তা নেই, তিনি বোধহয় পালিয়েছেন করাচীতে। ওদের কাগজটা কেন বন্ধ করে দিল কে জানে! বছর দুয়েক ধরে কাগজটা তো পাকিস্তান সরকারের তোষামোদ করে আসছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় ওরা শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী, বিদেশের দালাল আখ্যা দিয়ে ছবি ছাপাতো প্রায় প্রতিদিন।

বাবুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মঞ্জুও তার ছেলেকে নিয়ে মামুনমামার সঙ্গে চলে গেছে ইণ্ডিয়ায়। বাবুল প্রায় জোর করেই মঞ্জুকে পাঠিয়েছে, জোর করেছিল এইজন্য যে মঞ্জুর প্রবল ইচ্ছে যাওয়ার, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারছে না, সে বুঝতে পেরেছিল বাবুল। ঢাকা শহরের বাড়ির মধ্যে থেকে মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যাবে, এরকম অবস্থা কখনো আসেনি। মামুনমামাকে ভালোবাসে মঞ্জু, বাবুল তা জানে, হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চিত সে ভালোবাসার মধ্যে কোনো নোংরামি নেই, শারীরিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু এইরকম ভালবাসাও এক এক সময় এমন তীব্র হতে পারে, যাতে কোনা নারীর কাছে তার স্বামীর চেয়েও সেই ভালোবাসার মানুষটি অনেক বড় হয়ে উঠতে পারে। মামুনমামাকে ঈর্ষা করে না বাবুল, এই সব ঈর্ষা-টির্ষা অতি খেলো ব্যাপার, কিন্তু প্রতিদিন বাড়ি ফিরলেই যদি দেখা যায় স্ত্রী কোনো একজন পুরুষের সঙ্গে সে আত্মীয় হোক আর যেই হোক, গল্পে মেতে আছে, কিংবা তাকে খাতির যত্ন করছে, তাতে কোন স্বামীর ভালো লাগে? মামুন একজন টোটালি কনফিউড মানুষ, তাকে অত ভক্তিশ্রদ্ধা করারই বা কী আছে, তাও ভেবে পায় না বাবুল!

যাক, কিছুদিন মামুনের সঙ্গে থেকে আসুক মঞ্জু, খুব কাছ থেকে দেখলে হয়তো মানুষটি সম্পর্কে তার মোহ কেটে যেতেও পারে। আশা করি ভাবতে গিয়ে ওরা কোনো বিপদে পড়বে না। মঞ্জুর জন্য নয়, ছেলেটার জন্য মাঝে মাঝে বাবুলের মনটা উতলা হয়ে ওঠে। বাড়িতে একটা বাচ্চা থাকলে বাড়ি সরগরম থাকে, সুখু নেই বলেই বাড়িটা এখন নিঝুম মনে হয়।

এ বাড়িতে এখন আড়াইজন মাত্র মানুষ। নিচতলায় মনিরা থাকে একা। সিরাজুলকে পঁচিশে মার্চের পর একবার মাত্র দেখেছে বাবুল। তারপর থেকে সে উধাও। সে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে নিশ্চিত। এই অবস্থায় মনিরার কি এ বাড়িতে থাকার কোনো মানে হয়? তাকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল বাবুল, কিন্তু এমন জেদী মেয়ে, কিছুতেই শুনবে না। সিরাজুল নাকি এখানেই মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এই সব মুক্তিযোদ্ধা টৌদ্ধাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ দিতে

চায় না বাবুল, তার বাড়িতে থেকে সিরাজুল এসব কাজকর্ম চালাবে, এতে তার ঘোর আপত্তি আছে। কিন্তু মনিরাকে সে তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে না।

সেফু নামে কিশোরী মেয়েটিকে মঞ্জু মাথার দিব্যি দিয়ে গেছে, সে যেন সাহেবকে ছেড়ে কোথাও না যায় কখনো। সেই সেফুই বাবুলের জন্য রান্না করে দেয়, গোসলের পানি গরম করে রাখে। গ্রীষ্মকালেও ঈষদুষ্ণ জলে বাবুলের স্নান করা অভ্যেস। দিনের মধ্যে সে আটবার চা খায়।

বারান্দা থেকে ঘর এসে বাবুল। বই পড়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। পড়তে পড়তে এক সময় চোখ ব্যথা হয়ে যায়। শুধু পড়াশুনো নয়, এবার একটা কর্মোদ্যোগে নামতে হবে। বুড়ো ভাসানীও ভারতে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে স্বাধীন বাংলার দাবি সমর্থন করে বসে আছেন। কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দলের পুরনো কর্মীরা রয়ে গেছে এখনো কিছু কিছু। এইবার যোগাযোগ করতে হবে তাদের সঙ্গে। কাজ শুরু করতে হবে সম্পূর্ণ গোপনে, রুখতে হবে এই জাতীয়তাবাদের তরঙ্গ।

দু'দিন পরে সকালবেলা বাবুল সবে মাত্র বিছানায় শুয়ে দ্বিতীয়বার চা খেয়েছে, তখনও মুখ ধোয়নি, সেফু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললো, সাব সাব, মিলিটারি আইছে! মিলিটারি!

বাবুল বই থেকে মুখ তুলে বললো, আইছে তো কী হইছে? তুই লাফাইতে আছোস ক্যান?

চোখ প্রায় কপালে তুলে সেফু বললো, আমাগো বাড়িতে আইছে, সাব। মনিরা আপার ঘরে ঢোকছে।

এবার বাবুল একতলায় দুড় ম দরাম শব্দ শুনতে পেল। সত্যি তার বাড়িতে আর্মি এসেছে? এরা জানে না যে স্বয়ং টিক্কা খানের সঙ্গে পরিচয় আছে তার।

খালি গায়েই নেমে এলেন বাবুল। এরই মধ্যে কয়েকজন সৈন্য মনিরার ঘর থেকে সব জিনিসপত্র টান মেরে ফেলে দিয়েছে বাইরে। একজন মনিরার চুলের মুঠি চেপে ধরে আছে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই বাবুল ইংরেজিতে বললো, থামো! তোমরা কার হুকুমে এ বাড়িতে এসেছো? আগে মেয়েটিকে ছেড়ে দাও। আমি এখনই কর্নেল আনসারীকে টেলিফোন করছি।

কোনো উত্তর না দিয়ে একজন সৈন্য হাতের রিভলভার তুলে পর পর দু'বার ফায়ার করলো, তারপর অন্যদের বললো, আর চলো!

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বাবুল। যন্ত্রণার চেয়েও মহা বিস্ময়ে সে ভাবলো, সে কি সত্যি মরে যাচ্ছে? মৃত্যু এই রকম? এত তুচ্ছ ভাবে মৃত্যু!

মনিরা চিৎকার করে কাঁদছে, বাবুলের নাম ধরে ডাকছে, তাকে রক্ষা করবার কোনো ক্ষমতাই নেই বাবুলের, ক্রমশই সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসছে তার কানে। বুজে আসছে চোখ।

॥ ১৭ ॥

জানলার পর্দাটা সরালেই দেখতে পাওয়া যায় ছোট বাগান। ঝকঝক করছে সকালের রোদে। এরকম একটা ঘর যে পাওয়া যাবে, অতীন স্বপ্নেও ভাবেনি। এতদিন পর তার একটা নিজস্ব ঘর! অতীন মনে মনে বললো, থ্যাংকস্ আ লট, পাঁচুদা!

কার কাছে যে কখনও কোন উপকার পাওয়া যাবে, তা কিছুই বলা যায় না আগে থেকে। অতি স্বল্পভাষী পাঁচুদা, অনেকের ভিড়ে এমন এক কোণে বসে থাকেন যে তাঁর প্রতি অন্যদের নজরই পড়ে না। তিনিও অন্যদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কিনা তাও বোঝা যায় না কক্ষনো। আসবার আগেরদিন শান্তাবৌদির বাড়িতে আবার খাওয়া-দাওয়া হল। প্রথমদিন শান্তাবৌদির বাড়িতে এসে অতীন যে কুণ্ঠিত ব্যবহার করেছিল, তার স্মৃতি সে পুরোপুরি মুছে দিয়েছে সে রাতে প্রচুর হৈ চৈ করে, সে শান্তাবৌদির গানের সময় তাল দিয়েছে কার্পেট চাপড়ে, নিজেও একসময় হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠেছে অ্যারাইজ ও প্রিজনার অফ স্টার্ভেশন, অ্যারাইজ ও রেচেড অফ দা আর্থ...

এরই মাঝে খানে পাঁচুদা একবার হাতছানি দিয়ে অতীনকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি বস্টনে থাকবে কোথায়?

এই সমস্যাটা নিয়ে অতীন চিন্তিত ছিল ভেতরে ভেতরে। বস্টন শহরে, বিশেষত কেমব্রিজে, চট করে বাড়ি পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও একা একটা পুরো অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া নেওয়া অতীনের সামর্থ্যের বাইরে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল, সমীরের দাদা-বৌদি থাকেন ওখানে, সেই বাড়িতেই অতীন আপাতত উঠবে, তারপর ডর্মিটারিতে সীট পাওয়ার চেষ্টা করবে। যদিও অচেনা কোনো

পরিবারের মধ্যে থাকাটা অতীনের একেবারে পছন্দ হয় না! কিন্তু আর কোনো উপায় তো নেই!

পাঁচুদা বলেছিলেন, কোনো ব্যবস্থা না হলে আমি সত্যকিংকরকে বলে দেখতে পারি। ওর ওখানে যদি জায়গা থাকে।

এই নামটাও অতীনের পছন্দ হয়নি। সত্যকিংকরটা আবার কে? সমীরের দাদা বৌদির সঙ্গে তবু তো একটা যোগসূত্র আছে, এই লোকটা তো আরও অচেনা, তার বাড়িতে অতীন থাকতে যাবে কেন?

সে বিনীতভাবে বলেছিল, না, অন্য একটা জায়গায় উঠছি আপাতত। মানে...একটা ব্যাপার কী জানেন পাঁচুদা, আমার খানিকটা প্রাইভেসি দরকার, কোনো ফ্যামিলির সঙ্গে থাকলে সেটা ঠিক পাওয়া যায় না।

পাঁচুদা হেসে বলেছিলেন, ঠিক তাই। আমাদের দেশের অনেকে প্রাইভেসির মর্মই বোঝে না। সত্যকিংকরের কাছে তোমাকে পয়সা দিয়ে থাকতে হবে। একটা আলাদা ঘর পাবে মেইন ডোরের পাস কী পাবে, যখন ইচ্ছে আসবে-যাবে, কেউ ডিসটার্ব করবে না। তবে রান্নাঘর, বাথরুম কমন, ভাড়া বোধহয় পঁচাত্তর-আশি ডলার, টেলিফোন বা গ্যাসের আলাদা চার্জ দিতে হয় না।

এবার অতীন একটু উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিল, পঁচাত্তর কিংবা আশি ডলারে একটা আলাদা ঘর? ওটা কি মেস বাড়ির মতন ব্যাপার নাকি? ঐ ভাড়ায় একটা ঘর পেলে আমি এক্ষুনি নিতে রাজি আছি।

টেলিফোনটার দিকে হাত বাড়িয়ে পাঁচুদা বলেছিলেন, দাঁড়াও দেখছি, সত্যিকাংকরের বাড়িতে ঘর খালি আছে কি না। না, মেস বাড়ি নয়। সত্যকংকর মানুষটি ভারি অদ্ভুত, আলাপ করলে তোমারে হয়তো ভালো লাগবে। আর যদি ভালো না লাগে দু'এক মাসে অন্য কোথাও চলে যেও!

পাঁচ মিনিটে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। ফোন পাওয়া গেল সত্যকিংকরকে। তিনি জানালেন, তাঁর বাড়িতে অ্যাটিকের ঘর খালি আছে, অন্য ঘরের জন্য আশি ডলার লাগে, কিন্তু অ্যাটিকের ঘর বলেই তার ভাড়া বাহাত্তর ডলার।

এ এক অভাবনীয় যোগাযোগ। গম্ভীর, নির্লিপ্ত ধরনের পাঁচুদা যে অতীনের জন্য চিন্তা করেছেন, এই জন্যই তাঁর প্রতি আরও কৃতজ্ঞতাবোধ হয়। শান্তাবৌদির অনেক গুণ। তিনি সুন্দরী, গান গাইতে, অভিনয় করতে পারেন, চমৎকার রান্না করেন, সেইজন্য তাঁর খুব জনপ্রিয়তা, পাঁচুদাকে বিশেষ কেউ পাত্তাই দেয় না, কিন্তু অতীনের মনে হয়েছিল, মানুষ হিসেবে পাঁচুদা অনেক উঁচুতে। পরে অতীন আরও শুনেছে যে পাঁচুদা নাকি চুপি চুপি এরকম অনেকের উপকার করেন।

এদেশে উপার্জনের এক চতুর্থাংশই চলে যায় বাড়ির ভাড়ায়। খাওয়ার খরচটাই সবচেয়ে কম। কিন্তু জামা-কাপড়, যাতায়াত আর বাড়ি ভাড়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়। সেই তুলনায় অতীন বেশ সস্তায় একটা চমৎকার ঘর পেয়েছে। অ্যাটিকের ঘর তো কী হয়েছে, এটাই তার বেশি ভালো লেগেছে।

যেসব অঞ্চলে খুব বেশি তুষারপাত হয়, সেখানে কোনো বাড়ির ছাদ থাকে না। বাড়িগুলি হয় কৌণিক, ছাদের ঘরটা অনেকটা টোপরের মতন। এতেই অতীনের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। ঘরে সমস্ত আসবাব রয়েছে, খাট, চেয়ার-টেবিল, বুক র‍্যাক, ওয়ার্ডরোব, এমনকি কম্বলও কিনতে হয়নি অতীনকে। ঘরখানা তার খুব মনের মতন।

সিদ্ধার্থ-সমীররা গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে অতীনকে। সঙ্গে নীপা আর বাসবী ও এসেছিল, নিউইয়র্ক থেকে বস্টন আসতে প্রায় আট ঘণ্টা লেগে গেল, সারা রাত এক ফোঁটাও না ঘুমিয়ে প্রবল হুল্লোড় করতে করতে ওরা এসেছে। শনিবার সকালে পৌঁছে ওরা ফিরে গেছে রবিবার রাত্তিরে।

সত্যিকিংকর নামটা শুনলেই মনে হয় গলায় পৈতে আছে, তাদের বাড়িতে দৈনিক নারায়ণ পুজো হয়। আতপ চাল আর চাপা কলা চটকে মেখে প্রসাদ খায়, ফর্সা নিরামিষ চেহারা, মাথায় অল্প টাক...অতীনের মনে এইরকম একটা ছবিই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সত্যকিংকর লাহিড়ী একজন পাক্কা সাহেব, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, স্বাস্থ্যবান পুরুষ, তিনি ঘুম থেকে উঠেই বোধহয় গলায় টাই পরে নেন, কারণ তাঁকে গ্রীষ্মকালেও নাকি কেউ ক্যাজুয়াল পোশাকে দেখেনি। এ দেশে আছেন প্রায় তেইশ বছর, মেম বিয়ে করেছেন, তাঁর স্ত্রীর নাম মার্থা। দম্পতিটি নিঃসন্তান।

বাড়িটি সত্যকিংকরের নিজস্ব। চারখানা ঘর ভারতীয় ছাত্রদের ভাড়া দেন, স্বামী-স্ত্রী থাকেন বেসমেন্টে। বাগানওয়ালা এমন একখানা সুন্দর বাড়ির মালিক হয়েও কেন যে নিজেরা মাটির তলার

ঘরে থাকেন, তা বোঝা যায় না। সত্যকিংকর বাড়ি ভাড়া দেন লাভের জন্যও নয়, তা হলে তিনি আরও অনেক বেশি ভাড়া চাইতে পারতেন। অতীনের ঘরের ভাড়া বাহাত্তর ডলার পঁচাত্তর বা আশি তো হতেই পারতো, অন্যান্য ঘরের ভাড়াও আটত্তর বা চুরাশি এইরকম খুচরো ধরনের, অর্থাৎ সত্যকিংকরের একটা কিছু হিসেব আছে। নিছক চাকরিজীবীদের তিনি বাড়িতে রাখেন না, ছাত্র বা রিসার্চ স্কলারদের শুধু ভাড়া দেন, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, ভারতের যে-কোনো অঞ্চলের ছাত্ররা থাকতে পারে, এমনকি দু'জন পাকিস্তানীও আছে এক ঘরে।

সোমেন দত্ত নামে একজন বাঙালী ছেলে থাকে একতলায়। সে প্রথমদিন আলাপে অতীনকে বলেছিল, বাড়িওয়ালা সত্যদা ভাড়াটেদের কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলান না, তবে তিনি যদি জানতে পারেন যে কোনো ছাত্র পড়াশুনোয় ফাঁকি দিচ্ছে, কোনো সেমেস্টারে পাস করতে পারেনি, তা হলে তিনি তাকে ঘর ছেড়ে দেবার নোটিস দেন। অর্থাৎ মানুষটি আদর্শবাদী।

প্রথম দিন অতীন এসে দেখেছিল, সুট-টাই, জুতো-মোজা পরা সত্যকিংকর অ্যাটিকের ঘরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পর্দা সেলাই করছেন। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটি রয়েছে একপাশে, বোঝা যায়, তিনি নিজেই একটু আগে ঘর পরিষ্কার করে এখন পর্দা মেরামত করতে লেগে গেছেন। অতীনকে দেখে তিনি বিশেষ কোনো স্বাগত ভাষণ না জানিয়ে শুধু মুখটা একবার ফিরিয়ে বলেছিলেন, হাই! ডিড ইউ হ্যাভ আ গুড জার্নি?

অতীন একটু শঙ্কিত হয়ে ভেবেছিল, এই রে, এই লোকটা সর্বক্ষণ ইংরিজি বলবে নাকি? এর মেম বউকে সে আগেই নিচে দেখে এসেছে। লন্ডন বা আমেরিকায় অতীন এর আগে শুধু বাঙালীদের সঙ্গেই থেকেছে। সত্যকিংকর আবার পর্দা সেলাই করতে করতে ইংরিজিতে বলেছিলেন, তুমি অ্যাটিকের ঘরে আগে কখনো থেকেছো? এখানে শীত একটু বেশি লাগতে পারে। এখনও শীত একেবারে যায়নি, বৃষ্টি হলেই বেশ ঠান্ডা পড়ে। রুম হিটার আছে, তবু যদি শীত করে আমার স্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত কম্বল চাইতে পারো।

অতীনের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল সিদ্ধার্থ, সে বাংলাতেই বলে উঠেছিল, মিঃ লাহিড়ী, আপনার এখানে কি কুকিং-এর ব্যবস্থা আছে? ঘরের মধ্যে চা-টা বানানো যাবে?

সত্যকিংকর এবার কাজ থামিয়ে ঘুরে বসে বাংলাতে জিজ্ঞেস করলেন, বাঙালী? এই ঘরে তো দু'জনের থাকার কথা ছিল না। পাঁদুদা আমাকে বলেছিলেন—

অতীন তাড়াতাড়ি বলেছিল, না, না, ও আমার বন্ধু, আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছে। আমার নাম অতীন মজুমদার, আমি এখানে থাকবো।

সত্যকিংকর বলেছিলেন, হ্যাঁ, রান্নার ব্যবস্থা আছে নিচের কিচেনে। একটা বড় ফ্রিজ আছে, সেখানে খাবার জিনিসপত্র রাখতে পারেন, তবে বীফ কিংবা পর্ক জাতীয় কিছু রাখা যাবে না। দু'জন মুসলমান আছে, একটি গুজরাটি ছেলে আছে, সে বীফের ছোঁয়াও খায় না। ইচ্ছে করলে একটা ছোট ফ্রিজিডেয়ার কিনে নিজের ঘরে রাখতে পারেন। যেমন, বসবার ঘরে টি ভি আর ফোন আছে সকলের ব্যবহারের জন্য, কিন্তু ইচ্ছে করলে যে-কেউ ঘরে আলাদা ফোনের কানেকশান নিতে পারে, নিজের টি ভি-ও রাখতে পারে। সেগুলোর চার্জ যার যার নিজস্ব। আপনার কোন্ ডিসিপ্লিন? পোস্ট ডক্টরেট করতে এসেছেন?

ইংরিজিতে আপনি-তুমি নেই, বাংলায় কথা বলার সময় সত্যকিংকর ওদের আপনি সম্বোধন করায় অতীন খুশী হয়েছিল। বয়েসে বড় বলেই যে হুট করে তুমি বলা শুরু করবে, তার কোনো মানে নেই। লোকটির ইংরিজি উচ্চারণ নিখুঁত হলেও বাংলা কথায় বেশ প্রকট বাঙাল টান আছে। অতীন তাকে নিজের পড়াশুনো এবং এখানকার কাজের কথা জানালো।

সিদ্ধার্থ একটা সিগারেট ধরাতেই সত্যকিংকর উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আই ডোন্‌ট মাইন্ড আদার পিপ্‌ল'স স্মোকিং, কিন্তু ধোঁয়ার গন্ধ আমার সহ্য না। আমি এখন যাচ্ছি, কোনো রকম অসুবিধে হলে আমাকে কিংবা আমার স্ত্রীকে বলতে দ্বিধা করবেন না। টেবিলের ড্রয়ারে একটা অ্যাশট্রে আছে, ব্যবহার করবেন।

মার্থার সঙ্গেও আলাপ হয়েছে অতীনের। বেশ মোটকা-সোটকা মহিলা, গাল দুটো ফুলো ফুলো এবং একেবারে গোলাপি রঙের, তাঁকে সত্যকিংকরের চেয়ে বয়েসে বড় দেখায়। মার্থার বাবা-মা শ্বেত

রাশিয়ান, যদিও মার্থার জন্ম এ দেশেই। ভাঙা বাংলা বলতে পারেন মার্থা, তিনি তাঁর স্বামীর মতন আদব-কায়দা দুরস্ত নন। বেশ কথা বলতে ভালোবাসেন। যদিও তাঁর সন্তান হয়নি, তবু তাঁর ব্যবহারে একটা মা মা ভাব আছে। প্রথম আলাপেই তিনি অতীনের নামটা গুলিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন অনেকবার। উটিন? ওতেন? আটিন্‌ন? এমন কিছু শক্ত নাম নয়, তবু অতীন কথাটা কিছুতেই তাঁর ঠোঁটে আসে না। হাসতে হাসতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ডোণ্ট য়ু হ্যাভ আ নিক নেইম?

বাবলু নামটা শুনে তিনি যেন দারুণ স্বস্তি পেয়ে বললেন, দ্যাট্স ইজি, এটা আমি পারবো, বাল্‌বু? বাব্‌লিউ?নো? বাব্-লু? বাব্-লু! আমি তোমার এই নাম কল করবো! বাব্-লু, ভেরি সুইট নেইম!

প্রথম দিনের উপহার হিসেবে তিনি অতীনকে একটা বেশ বড় পিৎসা খাওয়ালেন।

সবদিক থেকেই বাড়িটা বেশ পছন্দ হয়েছে অতীনের। দেশত্যাগ করার পর সে এত আনন্দে আর কখনো থাকেনি।

সিদ্ধার্থ-সমীররা যে দু'দিন থেকে গেল, তার মধ্যে শর্মিলার সঙ্গে দেখা হয়নি ওদের। উইক এন্ডে শর্মিলাকে যেতে হয়েছিল ওয়াশিংটন ডি সি-তে তার মামার কাছে। আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল, ক্যানসেল করার উপায় ছিল না, শর্মিলার মামা অত্যন্ত জাঁদরেল ধরনের মানুষ, শর্মিলা তাঁকে ভয় পায়। সিদ্ধার্থ-সমীরদের সঙ্গে যে শর্মিলার এ যাত্রায় দেখা হয়নি তাতে অতীন খুশীই হয়েছে। সিদ্ধার্থের জিভ আল্‌গা, শর্মিলার সামনে সে কী উল্টো-পাল্টা ইয়ার্কি বলে বসতো তার ঠিক নেই। সেই যে এক রাতে শান্তাবৌদির বাড়ি থেকে ফেরার পথে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারটা অতীন ঘুণাক্ষরেও জানায়নি শর্মিলাকে। সিদ্ধার্থ প্রায়ই ব্ল্যাকমেইল করার ছলে বলতো, টেলিফোন করবো শর্মিলাকে? ওকে বলবো যে তুই আসলে ওকে একটুও ভালোবাসিস না, স্বার্থপরের মতন মরতে গিয়েছিলি।

আজ শর্মিলা ফিরবে দুপুর তিনটের বাসে। অতীন চেয়েছিল বাস স্টেশনে গিয়ে শর্মিলাকে নিয়ে আসতে, কিন্তু শর্মিলা বারণ করেছে। তার সঙ্গে একজন মামাতো বোন থাকবে, বাস স্টেশান থেকে সোজা এখানে আসতে পারবে না শর্মিলা।

আমেরিকায় এসে এই এতগুলো মাসের মধ্যে শর্মিলার সঙ্গে অতীনের দেখা হয়েছে মাত্র দু'বার। একবার নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্টে আর একবার গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশানে। কোনো নিভৃত জায়গায় নয়। নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্টে আর একবার গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশানে। কোনো নিভৃত জায়গায় নয়। নিউ ইয়র্ক থেকে বস্টনে আসার গাড়ি ভাড়া ছিল না অতীনের। শর্মিলা এখানে থাকে তার মামাতো বোনের সঙ্গে, তার পক্ষেও যখন তখন নিউ ইয়র্ক যাওয়া সম্ভব ছিল না।

আজ অতীনের একটা নিজস্ব ঘর আছে, সেখানে এসে বসবে শর্মিলা। চার দেওয়ালের মধ্যে শুধু তারা দু'জন জামশেদপুরের পর এই প্রথম।

কাজে যোগ দিতে এখনও দু'দিন দেরি আছে অতীনের, তবু সকালে সে একবার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ঘুরে এলো। রান্নাবান্না সে এখনও শুরু করেনি, দুপুরে একটা ড্রাগ স্টোরে ঢুকে দুটো হট ডগ আর কফি নিয়ে বসে বেশ কিছুক্ষণ একটা থ্রিলার পড়লো। তবু সময় কাটছে না। এই অচেনা শহরে রাস্তায় রাস্তায় একলা ঘুরে বেড়াবার কোনো মানে হয় না, তাছাড়া এই মে মাসেও বেশ সিরসিরে হাওয়া দিচ্ছে। মাঝে মাঝে খুব মিহিন বৃষ্টি। অতীনকে একটা রেইন কোট কিনতে হবে।

বাড়িতেই ফিরে এলো অতীন। দুপুরে অন্য ছাত্ররা কেউ থাকে না। সত্যকিংকর অফিসে গেছেন। মার্থা কিছুদিন কোনো কাজ করছেন না, এ দেশে এরা যখন ইচ্ছে চাকরি ছাড়ে, কলেজে রুশ ভাষা পড়ান, হঠাৎ তাঁর গ্রীক ভাষা শেখার শখ হয়েছে, তাই তিনি চাকরি ছেড়ে গ্রীক ভাষার চর্চা করছেন। অদ্ভুত এঁদের ব্যাপার-স্যাপার।

বসবার ঘরে এসে অতীন টি ভি খুললো। দুপুরবেলা প্রায় সব চ্যানেলেই বাজে বাজে সোপ অপেরা অপেরা হয়, অথবা রান্নার রেসিপি শিখায়, অথবা ন্যাকা ন্যাকা টক শো। সি বি এস-এ একটা পুরনো সিনেমা পাওয়া গেল, তাও আবার হিস্টোরিক্যাল, এইসব সঙের মতন পোশাক পরা হলিউডী ইতিহাস অতীনের একেবারে সহ্য হয় না। নেহাত ইউল ব্রাইনার আছে বলেই দেখা যায়। শর্মিলা তিনটের বাসে পৌঁছালেও পাঁচটার আগে আসতে পারবে না এ বাড়িতে।

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই অতীন টি ভি-র ভলিউম কমিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল। আওয়াজ

শুনেই তার ধারণা হলো এই টেলিফোন তারই জন্য।

একটি পুরোপুরি মার্কিনী নারী কণ্ঠ আদুরে আদুরে গলায় বললো, হাই ডারলিং, হাউ হ্যাড য়ু বীন?

অতীন খানিকটা হতাশ হয়ে বললো, হুম ডু য়ু ওয়ান্ট?

খিলখিল করে হেসে সেই নারী কণ্ঠ বললো, আই ওয়ান্ট য়ু, সুইটি? আর য়ু ফ্রি দিস ইভিনিং? আই অ্যাম ফ্রি!

এ বাড়িতে বেশ কয়েকজন অবিবাহিত যবক থাকে, তাদেরই কারুর বান্ধবী হতে পারে। কিংবা অল্পবয়েসী মেয়েরা টেলিফোনে এরকম ইয়ার্কি করে। নতুন ছেলেরা এই সব মেয়েদের পাল্লায় পড়ে নাকানি চোবানি খায়!

ফোনটা রেখে দিতেই কয়েক সেকেন্ড পড়ে আবার বেজে উঠল। এবারও অতীন শুনলো সেই মেয়েটার হাসি। অন্য সময় হলে অতীন হয়তো এর সঙ্গে খানিকটা রসিকতা করতো, এখন ভেতরে ভেতরে সে উত্তেজনায় কাঁপছে। সে কড়া গলায় বললে, গেট লস্ট! তারপর জোরে শব্দ করে রেখে দিল।

হঠাৎ, খুবই অপ্রাসঙ্গিকভাবে অতীনের মনে পড়ে গেল, অলি আসবে?

যে-কথাটা সে গোপন করে রাখতে চাইছে, কিংবা ভুলে যেতে চাইছে, সেটা অবচেতন থেকে হঠাৎ হঠাৎ ভুস করে মাথা তুলছে। টেলিফোনে একটা প্রগল্‌ভা মেয়ের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অলির কথা মনে পড়ার কোনো সম্পর্কই নেই, তবু মনে এলো।

অলি হয়তো এ মাসেই পৌঁছে যাবে এদেশে। অলি অ্যাডমিশানের সুযোগ পেয়েছে এদিককের ইউনিভার্সিটিতে, নিউ ইয়র্ক হয়েই তাকে যেতে হবে। নিউ ইয়র্কেও তার বাবার চেনা কেউ থাকতে পারে। অলি কি প্রথম সেখানে উঠবে? না, তা হতেই পারে না। অলি নিশ্চয়ই আশা করবে যে বিমান থেকে নেমেই সে দেখতে পাবে অতীনকে। এ দেশে প্রথমবার পা দিয়ে একটা চেনা মুখ না দেখতে পেলে যে কী খারাপ লাগে, তা কি অতীন জানে না? সে যেদিন প্রথম নিউ ইয়র্কে আসে, সেদিন সিদ্ধার্থ এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে চল্লিশ মিনিট দেরি করেছিল, তার মধ্যেই দারুণ বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল অতীন।

অলিকে শর্মিলার কথা কিছুই জানানো হয়নি। শর্মিলাও জানে না অলির কথা। অতীন এদের দু'জনের সঙ্গেই তঞ্চকতা করছে? না, অলি কিংবা শর্মিলাকে কোনো ভাবেই সে ঠকাতে চায় না, ওদের একজনকেও সে আঘাত দিতে চায় না। বলতে তো হবেই, কিন্তু কী করে বলবে? অলিকে কি বলা যায়, আমি তোমাকে আর চাই না, আমি শর্মিলা নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসি? তা ছাড়া এটাও তো মিথ্যে, অলিকে তো সে এখনো একটুও কম ভালোবাসে না, অলিকে সে কোনোভাবে দুঃখ দিচ্ছে, এটা ভাবতে গেলেই তার বুক টনটন করে। আর শর্মিলা, সেও একটা অসাধারণ মেয়ে, কোনো রকম স্বার্থ জ্ঞান নেই তার, অতীন যদি শর্মিলাকে বলে যে অলি নামের একটি মেয়ের সঙ্গে তার অনেকদিনের সম্পর্ক, তাহলে শর্মিলাকে বলে যে অলি নামের একটি মেয়ের সঙ্গে তার অনেকদিনের সম্পর্ক, তাহলে শর্মিলা নিশ্চিত সরিয়ে নেবে নিজেকে। সে কাঁদবে হয়তো, কিন্তু অতীনকে জানতে দেবে না।

শর্মিলাকে ছাড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। শর্মিলার সঙ্গে সে যতখানি অন্তরঙ্গ হয়েছে, শর্মিলা তার ওপর এত নির্ভর করে, এখন শর্মিলাকে কোনোভাবে সরিয়ে দেবার চিন্তাটাও চরম নীচতা ও কাপুরুষতা!

মুখে বলার চেয়েও চিঠিতে জানানো তবু সহজ। একবার কোনাক্রমে লিখে ফেলতে পারলেই হলো। অলি এখানে এসে পৌঁছোবে, তার সঙ্গে অতীনের দেখা হবে না, এ রকম তো হতেই পারে না। অতীনকে সেদিন যেতেই হবে নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্টে। কিন্তু এখানে পৌঁছোবার পর অলি যখন জানতে পারবে, সে দারুণ আঘাত পাবে না? খুব নরম মেয়ে অলি, বিদেশে এসেই এ রকম একটা আঘাত পেলে যদি একেবারে ভেঙে পড়ে? সে ভাববে, বাবলুদা তার সঙ্গে বিশ্বসঘাতকতা শুধু করেনি, নিছক বাজেলোকদের মতন সে কথা এতদিন গোপন করেও গেছে। আগে জানতে পারলে তবু অলি মনটাকে শক্ত করে নিতে পারবে। অতীন তো তার বন্ধু থাকছেই। এদেশে অলি এলে অতীন তাকে সব রকম সাহায্য করবে।

চিঠি লেখার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। আজকালের মধ্যেই পোস্ট না করলে সে চিঠি হয়তো অলির

কাছে আর পৌঁছোবেই না। আজই একটা এরোগ্রাম কিনে আনলে হতো।

চিঠি লেখার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। আজকালের মধ্যেই পোস্ট না করলে সে চিঠি হয়তো অলির কাছে আর পৌঁছোবেই না। আজই একটা এরোগ্রাম কিনে আনলে হতো।

আসলে, অতীন অলিকে চিঠি লিখতে পারছে না, তার কারণ সে মন ঠিক করতে পারছে না, কাকে আগে জানাবে? অলি দূরে আছে বলে এমন কি দোষ করেছে যে প্রথম আঘাতটা তাকেই দিতে হবে? অলি এসে পৌঁছবার পর যদি শর্মিলা সব জানতে পারে, তখন শর্মিলার মনে হবে না যে, অতীন এসব কথা তাকে আগে কেন বলেনি?

এই গোপনীয়তার বোঝা অসহ্য হয়ে উঠছে অতীনের, অথচ সে জানিয়েও ফেলতে পারছে না।

সবচেয়ে ভালো হয়, আজই শর্মিলাকে খোলাখুলি সব কিছু জানিয়ে দেওয়া। শর্মিলার পায়ের কাছে বসে অতীন পরিপূর্ণ স্বীকারোক্তি দিয়ে বলবে, এবার তুমি আমার বিচার করো। আমাকে যা খুশি শাস্তি দাও, কিন্তু আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়তে পারবো না।

টি ভি-তে সিনেমা শেষ হয়ে শুরু হয়েছে বাচ্চাদের প্রোগ্রাম, অতীন কিছুই দেখছে না।

তার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে কিন্তু বাইরে গিয়ে সিগারেট কিনতে ইচ্ছে করছে না। যদি এর মধ্যেই শর্মিলা এসে পড়ে, কিংবা বাস স্টেশন থেকে ফোন করে? এখানে পৌঁছেই সে হয়তো ফোন করবে। এতটা সময় নষ্ট না করে বইপত্র নিয়ে বসলে হতো। পড়াশুনোয় এবার মন দিতে হবে, কিন্তু শর্মিলার সঙ্গে দেখা না হলে এখানে যেন কিছুই শুরু করা যাচ্ছে না। বস্টনে পৌঁছোবার পর অতীন এক ক্যান বীয়ারও খায়নি। সে মদ্যপান ছেড়ে দেবে, সিগারেট খাওয়া কমাবে, এখন শুধু পড়াশুনো। আর টাকা বাঁচিয়ে পাঠাতে হবে বাড়িতে। মায়ের একটা ফ্রিজ কেনার শখ ছিল, আজও বোধহয় কেনা হয়নি, হলে মুন্নি নিশ্চয়ই চিঠিতে জানাতো।

শর্মিলার সঙ্গে যদি দেখা না হতো কখনো? শর্মিলার সঙ্গে দেখা হবার পরই তার জীবনের একটা অন্য পর্ব শুরু হয়েছে। শর্মিলার সঙ্গে ঐ একটা সম্পর্ক না হলে সে জেল থেকে বেরিয়ে কিছুতেই বিলেতে পালাতে রাজি হতো না। এ রকম নির্লজ্জের মতন বাঁচতে চাইতো না সে।

বেসমেন্ট থেকে মার্থা উঠে এসে বললেন, হাই বাব্‌-লু, তুমি বুঝি টি ভি অ্যাডিক্ট? সাবানের বিজ্ঞাপন দেখতে ভালোবাসো?

বাবলু কোনো উত্তর না দিয়ে হাসলো।

মার্থা মাথায় একটা স্কার্ফ বাঁধতে বাঁধতে বললো, আমি একটু শপিং-এ যাচ্ছি!

মার্থা বেরিয়ে পরার একটু পরেই একটা ট্যাক্সি থামলো গেটের সামনে। সময় বাঁচাবার জন্য ট্যাক্সির পয়সা খরচ করে এসেছে শর্মিলা।

যার জন্য সারাদিন উদ্‌গ্রীব অপেক্ষা, তাকে দেখেই যে হৃদয় আনন্দে ঝলমল করে উঠবে তার কোনো মানে নেই। শর্মিলাকে দেখেই অতীনের মনে হলো, যদি শর্মিলার বদলে এখন অলি আসতো? এই প্রথম যেন অতীন আবিষ্কার করলো, শর্মিলার সঙ্গে অলির চেহারার বেশ মিল আছে।

একটা গোলাপি রঙের শাড়ির ওপর পাতলা সাদা রঙের রেইন কোট পরে এসেছে শর্মিলা। মাথার চুল সব খোলা। তার মুখে সব সময় একটা লজ্জা লজ্জা ভাব থাকে।

অতীন এগিয়ে গিয়ে শর্মিলার হাত ধরতেই সে বললো, সুমিকে একটা একটা মিথ্যে কথা বলে চলে এলুম! এক মিনিট দেরি করতে ইচ্ছে করছিল না!

বাড়িতে এখন কেউ নেই। মার্থা বেরিয়ে যাওয়ায় অতীন খুশী হয়েছে। যদিও সে জানে যে তার ঘরে কোনো বান্ধবীকে নিয়ে গেলে কেউ কিছুই মনে করবে না, তবু অন্যদের সামনে একটু অস্বস্তি লাগে। এখন কেউ দেখবার নেই। এই পর্চে দাঁড়িয়েই শর্মিলাকে চুমু খাওয়া যায়। কিন্তু আজ শর্মিলাকে আগে অলির কথা বলে নেবে অতীন।

শর্মিলা বললো, চমৎকার বাড়ি পেয়েছো, যদিও আমার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে।

—চলো। আমার ঘরটা দেখবে চলো!

শর্মিলার হাত ছেড়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি উঠলো অতীন। তার বুকের মধ্যে দুম দুম শব্দ হচ্ছে। অলির কথা শুনে কী প্রতিক্রিয়া হবে শর্মিলার? যদি সে বলে, ছিঃ, তুমি একটা মেয়েকে কষ্ট দিয়ে আমাকে খুশী করতে চাও!

দরজার সামনে এসে সে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়েই আঁতকে উঠলো। চাবি নেই! ঘরের মধ্যে চাবি রেখে সে দরজা টেনে বেরিয়ে এসেছে, এতক্ষণে মনে পড়লো। এখন কী হবে? তার ঘর দেখাতে পারবে না শর্মিলাকে? মার্থা বেরিয়ে গেলেন, তাঁর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটাও তো এখন পাওয়া যাবে না।

তার ফ্যাকাশে মুখ দেখে শর্মিলা জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে? অতীন বললো, চাবি ভেতরে রয়ে গেছে...ল্যান্ডলেডিও বাড়িতে নেই, কী করে ঢুকবো?

শর্মিলা বললো, তুমি দেখছি, আমার চেয়েও ভালো! একটু সরে এসো তো!

অতীনের হাত টেনে ধরে সরিয়ে দিয়ে শর্মিলা নিচু হয়ে দরজার সামনের কার্পেটের কোণটা তুলে দেখলো। তারপর বললো, এই দ্যাখো, তোমাদের মতন গ্রীন হর্ণদের জন্য ডুপ্লিকেট চাবিটা এখানে রাখা থাকে।

ঠিক যেন ম্যাজিশিয়ানদের ভঙ্গিতে শর্মিলা চাবিটা দিল অতীনের হাতে।

তক্ষুনি শর্মিলাকে আলিঙ্গন করে দরজার গায়ে চেপে ধরে অসংখ্য চুমু দেবার জন্য আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো অতীনের বাসনা। কিন্তু না, আগে অলির কথা বলে নিতে হবে।

চাবিটা সে শর্মিলাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, তুমি খোলো।

শর্মিলা দরজাটা খুলে বললো, জানো আমার কী খারাপ লাগছিল? তুমি শনিবার এসে পৌঁছোলে, আমি থাকলে সব জিনিস-টিনিস গুছিয়ে দিতে পারতুম! একী, এত সুন্দর করে সাজিয়ে কে দিল?

অতীন বললো, আগে থেকেই সবকিছু এরকম ছিল। আমি শুধু আমার সুটকেস, বইপত্তর আর রাস্তা থেকে কুড়োনো একটা স্ট্যান্ড ল্যাম্প ছাড়া আর কিছু আনিনি নিউ ইয়র্ক থেকে ঘরটা সুন্দর না? জানলার কাছে এসো, নদী দেখা যায়, খানিকটা দূরে অবশ্য।

শর্মিলা বললো, সবকিছুই আগে থেকে ছিল? বিছানার চাদর, এটাও তোমার নিজের না?

অতীন দু'দিকে মাথা নাড়লো।

শর্মিলা একটানে চাদরটা তুলে ফেলে বললো, অন্যের চাদরে তুমি শোবে, তোমার ঘেন্না করে না? কাল আমি তোমায় বেডশীট এনে দেবো।

অতীন বললো, বাঃ, আমরা যখন কোনো হোটেলে থাকি!

শর্মিলা বললো, এটা কি হোটেল? আমি মাঝে মাঝে এখানে দুপুরে এসে থাকবো।

শর্মিলা দ্রুত হাতে ঘরের টুকিটাকি জিনিসপত্র এদিক ওদিক করতে লাগলো। নারী স্পর্শের লালিত্যে ঘরের চেহারাটা কেমন বদলে যায়। অতিন এক দৃষ্টিতে দেখছে শর্মিলাকে, এই ক'মাসে বেশ রোগা হয়ে গেছে যেন, বেরিয়ে গেছে কণ্ঠার হাড়। তবু সে কী সুন্দর, যেন মূর্তিমতী সরল্য।

অতীন বললো, শর্মি, তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।

টেবিলের ওপরের কাচটা তুলে বিছানার চাদর দিয়ে মুছছিল শর্মিলা সে মুখ তুলে তাকিয়ে বললো, তোমার কী হয়েছে বলো তো? কীরকম গম্ভীর গম্ভীর দেখছি।

জানলার কাছ থেকে ছুটে এলো অতীন। শর্মিলাকে বুকে চেপে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট মেলালো। সে চুম্বনের যেন কোনো শেষ নেই। এখন কথা বলার কোনো উপায় নেই। সেই রকম ঠোঁটে ঠোঁট, বুকে বুক, উদরে উদর, উরুতে উরু মেলানো অবস্থাতেই দু'জনে শুয়ে পড়লো বিছানায়। অতীনের কোনো কথাই বলা হলো না।

॥ ১৮ ॥

কতদিনই বা আগের কথা, মাত্র পাঁচ ছ'বছর! এই পথ দিয়ে একদিন দলবেঁধে হৈ হৈ করে যাওয়া হয়েছিল, ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীদের চুপ করিয়ে দিয়ে ওরা চিৎকার করে গেয়েছিল কোরাস গান। আজ ওরা মাত্র দু'জন! আসবার সময় পমপম একটা কথাও বললো না, জানলায় মাথাটা হেলান দিয়ে বসে রইলো চোখ বুজে। অলি মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যা। মন বসাতে পারেনি। লোকাল ট্রেনে ভিড় যথেষ্ট, বিভিন্ন স্টেশানে লোকজন উঠছে নামছে, কিন্তু ওদের কোনাকুনি বিপরীত দিকে দু'জন লোক বসে আছে গ্যাঁট হয়ে, তাদের নামার কোনো লক্ষণ নেই। অলি চোখ তুললেই চোখাচোখি হচ্ছে ওদের সঙ্গে।

দুটি যুবতী মেয়ের দিকে দু'জন পুরুষ মাঝে মাঝে তাকাবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু লোক দুটির গড়া-পেটা চেহারা, তেমন অল্প বয়েসী ও নয়। ওদের ঠিক রাস্তাঘাটের রোমিও বলে মনে হয় না। পুলিস? অন্য কোনো পার্টির ভাড়া করা গুণ্ডা? ওদের চোখে চোখ পড়তেই গা-টা ছমছম করছে অলির। যদিও এখন বেলা এগারোটা, ট্রেনে এত মানুষ, তবু আজকাল প্রকাশ্য দিবালোকেই বহু লোকের চোখের সামনে খুন-জখম হয়, দুটো বোমা ফাটালেই কেউ আর বাধা দিতে আসে না।

মেমারি স্টেশানে অনেক লোক নামলো, অন্য যাত্রীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে পমপমের হাত ধরে নেমে পড়লো অলি। পমপম ফিসফিস করে বললো, আমায় ছেড়ে দে অলি, আমি হাঁটতে পারবো! অলি তবু ছাড়লো না, প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে চলে এলো গেটের বাইরে। আগে পমপমদের গ্রামের বাড়িতে গরুর গাড়িতে যেতে হতো, এখন সাইকেল রিকশা চলে। একটা রিকশায় উঠে পড়ে অলি পেছন দিকে না তাকিয়ে পারলো না, সেই লোক দুটিও এই স্টেশানে নেমেছে, কিন্তু ওদের অনুসরণ করবার জন্য অন্য রিকশায় চাপেনি, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সৈনিকের মতন, জামার পকেটে হাত। ওরা যে সাধারণ যাত্রী নয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এবার কি ওরা গুলি ছুঁড়বে? রিকশাটা চলতে শুরু করলে অলি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইলো পিছন দিকেই, ওরা যা খুশি করুক, বাধা দেবার উপায় তো নেই, শুধু ওদের দিকে ঘৃণা ছুঁড়ে দেওয়া যেতে পারে।

লোকদুটি কিছুই করলো না, দাঁড়িয়ে রইলো একইভাবে। রিকশাটা বাঁক ঘুরে যাবার পর অলি ভাবলো, তা হলে কি পমপমের বাবা অশোক সেনগুপ্ত ওদের পাহারা দেবার জন্য পাঠিয়েছেন লোক দুটোকে?

মানিকতলা কেন্দ্রে বাই-ইলেকশানে জিতে কয়েক মাস আগে এম এল এ হয়েছেন অশোক সেনগুপ্ত। তাঁর প্রভাবেই নিশ্চত ছাড়া পেয়ে পমপম, যদিও তিনি আগে বলেছিলেন মেয়ের ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না, পমপমও কিছুতেই তার বাবার সাহায্য নিতে চায়নি। পমপমকে ছাড়া হয়েছে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে, সে প্রায় শয্যা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। মুক্তি পাবার পরেও মানিকতলার বাড়িতে কয়েকদিন থেকেই আবার বিদ্রোহ করেছিল পমপম, সে-বাড়িতে অনবরত তার বাবার পার্টির লোকজন আসছে, অনেকে পমপমকে খুব বাচ্চা বয়েস থেকে চেনেন, তাঁরা পমপমকে উপদেশ দিতে চান, পমপমেরই ভালোর জন্য তাকে অন্যদিকে ফেরাতে চান, অমনি পমপমের সঙ্গে তর্ক বেধে যায়, পমপম উত্তেজিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, পমপম গ্রামের বাড়িতে কিছুদিন থেকে শরীর সারাবে। তবে একটা শর্ত আছে, পমপম সেখানে আবার নকশালদের আড্ডা করতে পরবে না। কোনো পলাতককে আশ্রয় দিতে পারবে না। এই শর্তে পমপম রাজি না হলে তাকে ব্যাঙ্গালোরে এক মাসির বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে, এটাই অশোক সেনগুপ্তর শেষ নির্দেশ!

অলি ভাবলো, ঐ গুণ্ডা চেহারার লোকদুটোকে যদি পমপমের বাবা পাঠিয়ে থাকেন, তা হলে ওরা কি পাহারা দেবার জন্য এসেছিল, না ওদের সঙ্গে আর কেউ আসে কি না তাই লক্ষ রাখতে এসেছিল?

পমপম কিছু বুঝতে পারেনি, অলি তাকে কিছু বললোও না।

একমাত্র মনের জোরটাই টিকে আছে পমপমের, তার শরীরটা একেবারে ভেঙে দিয়েছে ওরা। খানিকটা হাঁটলেই তার পা থরথর করে কাঁপে, হাত দুটো যেন শরীরের সঙ্গে আলগা হয়ে ঝুলছে, একখানা বই পড়তে গেলেও যখন-তখন তার হাত থেকে খসে পড়ে যায়। মুখখানা একেবারে রক্তশূন্য। তবু লালবাজারে পমপমের ওপর কী ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে, তা সে কিছুতেই বলবে না। এমনকি অলিকেও না। শুধু মাঝে ফিসফিস করে, ওদের মুখগুলো জো চিনে রেখেছি, একদিন ঠিক শোধ নেবো! ওদের ছেলেমেয়েরাও ওদের নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা পাবে।

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পমপমকে যখন কিছুদিনের জন্য পি জি হাসপাতালে রাখা হয়েছি পুলিশ পাহারায়, তখন, নার্সের পোশাক পরে অলি দেখা করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে। পি জি-র সুপারিনটেনডেন্ট অলির শান্তিমামার বিশেষ বন্ধু, সেইজন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। অলিকে দেখে পমপম শুধু অবাক হয়নি, বিরক্তও হয়েছিল খুব। অলি তাদের দলের কেউ নয়, কয়েকদিন স্টাডি সার্কেলে এসেছিল মাত্র, তারপর নিজে থেকেই সে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, সে কেন এই ঝুঁকি নেবে? অলির ওপর পুলিসের নজর পড়ে যাবেই, অলিকে যদি পুলিস অ্যারেস্ট করে তা হলে পমপমের ওপর যে ধরনের অত্যাচার হয়েছে, অলি তা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। অলি খুবই মেয়েলি ধরনের

মেয়ে, তুলো-মোড়া বাক্সের পুতুলের মতন।

পমপমের নিষেধ শোনেনি অলি, তিনবার গিয়েছিল সে, বহরমপুর জেলে আটক কৌশিকদের খবরাখবর সে-ই জানিয়েছে পমপমকে। শুধু মানিকদার কথাটা গোপন করে গেছে।

পমপম ছাড়া পাবার পরেও কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে যায়নি। দলের অধিকাংশই এখন জেলে, আর যারা পলাতক তাদের মধ্যে কতজন নিহত আর কে কে জীবিত তা জানার উপায় নেই। আর যারা সক্রিয় কর্মী না হলেও সিমপ্যাথাইজার ছিল, তারা কেউ আর সম্পর্ক রাখতে চায় না, ভয়ের চোটে দেখা হলেও না-চেনার ভান করে।

শুধু অলি গেছে পমপমের কাছে, প্রত্যেকদিন।

পিচ নেই, শুধু খোয়া ফেলা রাস্তা, রিকশাটা লাফাচ্ছে অনবরত, অলি পমপমকে চেপে ধরে আছে শক্ত করে। স্টেশান থেকে পমপমদের বাড়ি যে এতখানি দূর, তা আগেরবার মনেই হয়নি। অলির মনে পড়লো, আগরবার তারা যখন এই রাস্তা দিয়ে ফিরছিল, তখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল বাবলুদা, তার ধারণা হয়েছিল, তার পায়ে সেপটিক হয়েছে!

একবার চোখ মেলে পমপম বললো, মানিকদাকে একটু খবর দিতে পারবি? কতদিন মানিকদাকে দেখিনি!

যে-অলি কোনোদিন মিথ্যে কথা বলতে পারে না, সে একটুও গলা না কাঁপিয়ে বললো, আমি এখান থেকেই কৃষ্ণনগর যাবো, যাবার পথে মানিকদার সঙ্গে দেখা করে যাবো।

পমপম অলির কাঁধে মাথা হেলিয়ে দিয়ে বললো, তুই একা একা কৃষ্ণনগর যাব কী করে? এখানে দু'চারদিন থাক, আমি একটু শক্ত হলে আমিও তোর সঙ্গে যাবো।

অলি বাচ্চা মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার মতন করে বললো, না রে পমপম, তোর এখন যাওয়া চলবে না। তুই গেলে পুলিশ ফলো করবে।

–আর তোকে কেন পুলিশ ফলো করবে না?

–আমাকে তো কেউ চেনে না।

–হ্যাঁরে অলি, একটা সত্যি কথা বলবি? অতীন বেঁচে আছে? তোরা বলছিস, তাকে নাকি বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস হয় না।

–তার নামে যে মার্ডার চার্জ ছিল! সে যেতে চায়নি, তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে থাকলে এতদিনে তাকে...

–কৌশিক আর অতীন কি এক জেলে ছিল?

–কৌশিক এখন আর জেলে নেই, জানিস না? ওরা জেল ভেঙে পালিয়েছে!

ধড়মড় করে পমপম নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলো, অ্যাঁ, কী বললি? কে জেল ভেঙে পালিয়েছে, অতীন, না কৌশিক? কোন্ জেল? আগে বলিস নি কেন আমাকে?

কথাটা হঠাৎ বলে ফেলে অলি একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। সে এরকম ভাবে ঠিক জানাতে চায় নি। পমপম বোধহয় খবরের কাগজও পড়ে না। খবরটা যে ঠিক কী ভাবে পমপমকে জানানো উচিত, তা অলি বুঝতে পারছে না।

সে বললো, আগে বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নে, তারপর সব বলবো।

পমপম তীব্র গলায় ধমক দিয়ে বললো, না, এক্ষুনি বল! কৌশিক এখন কোথায়?

কৌশিক যে এখন কোথায়, তা অলি জানে না। দু'দিন আগে একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে। দমদম জেলের মধ্যে কারারক্ষী ও নকশালপন্থী বন্দীদের মধ্যে মুখোমুখি একটা সংঘর্ষ, রীতিমত যুদ্ধের মতন। একতরফা ভাবে বিনা বিচারে নকশাল ছেলেদের মেরে ফেলার ঘটনা এটা নয়, সম্ভবত আগে থেকেই এরকম কিছু একটা আভাস পেয়ে নকশাল ছেলেরাও তৈরি হয়েছিল। গোলাগুলি চালিয়েছে দু'পক্ষই, সব শুদ্ধ নিহত হয়েছে পনেরো জন এবং সাতাশ জন আহত, এর মধ্যে বেশ কয়েকজন কারারক্ষীও আছে। তবে কোন পক্ষে কতজন হতাহত, সে তথ্য জানায়নি সরকার। কিন্তু বত্রিশ জন বন্দী এই সুযোগে পালিয়েছে জেলের পাঁচিলের বাইরে।

দু'সপ্তাহ আগে বহরমপুর জেল থেকে কৌশিকদের দলটাকে দমদম জেলে আনা হয়েছিল, সে খবর

পেয়ে অলি। কৌশিক নিশ্চয়ই পলাতকদের মধ্যে আছে। কৌশিক কিছুতেই মরতে পারে না, অলির দৃঢ় বিশ্বাস। যেন অলির প্রবল ইচ্ছাশক্তিতেই কৌশিক বেঁচে থাকবে।

দমদম জেলের ঐ ভয়াবহ খবর জানার পর অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল অলি। সেই কান্নার মধ্যেই সে বারবার বলেছিল না,না, কৌশিক কিছুতেই মরেনি, সে বেঁচে আছে, সে বেঁচে আছে!

কৌশিক, পমপম, মানিকদা, তপন এরা সবাই অতীনের জীবনের অঙ্গ। এদের কাছাকাছি এলেই অলি তার বাবুলদার সংস্পর্শ বোধ করে।

পমপমের ঠাকুর্দা এখনও বেঁচে আছেন, তবে চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না, কানেও কম শোনেন। পমপমের এক কাকা এখানকার চাষবাস দেখেন। আর রয়েছেন দু'জন বিধবা পিসিমা। কিছুদিন আগে এ বাড়িতে একবার পুলিশের হামলা হয়ে গেছে।

পমপমকে পৌঁছোতে এসে অলি পুরো দুটো দিন রয়ে গেল এখানে। পমপম তাকে ছাড়তে চায় না। অলিও অনুভব করলো, পমপম এখানে একা থাকলে কী করে? এ বাড়ির কারুর সঙ্গে তার আর মানসিক যোগাযোগ নেই; কাকিমা, পিসিমাদের সঙ্গে একটুক্ষণ কথা বলেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শরীর সারাবার জন্য পমপমের এখন বিশ্রাম নেওয়া খুবই দরকার, কিন্তু তার একজন সঙ্গী তো চাই।

অলির পক্ষেও এখানে বেশিদিন থাকার উপায় নেই। তারও যে অনেক কাজ!

মে মাসের সাঙ্ঘাতিক গরমেও খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরের মধ্যে তেমন কষ্ট হয় না। চতুর্দিকে অনেক গাছপালা। দ্বিতীয়দিন বিকেল বেশ একটা ঝড়ের দাপট দেখা দিল, তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি। সারাদিন শুয়েই থাকে পমপম, এই সময় সে অলির হাত ধরে ধরে দাওয়ায় এসে বসলো ঝড় দেখার জন্য। অলি যেন তার নার্স, সকালবেলা পমপমের মুখ ধুইয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে তাকে দুধ খাওয়ানো, জোর করে ভাত খাওয়ানো, সবই অলি করে। অলি এর আগে কোনোদিন এভাবে কারুর সেবা করেনি, কিন্তু এ-সব যেন শিখতে হয় না, প্রয়োজনের সময় মানুষ সবই পারে।

পমপম এক সময় বললো, আমি একটু বৃষ্টিতে ভিজবো! দু-দুটো বছর বৃষ্টি দেখিনি!

এই দুর্বল শরীর নিয়ে পমপমের বৃষ্টি ভেজা উচিত কি না তা বুঝতে পারলো না অলি। কিন্তু দু'বছর জেলে-হাসপাতালে কাটিয়ে সত্যিই তো বৃষ্টি দেখেনি পমপম। এ যে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

পমপমকে সে উঠোনে নিয়ে আসতেই অন্য একটা ঘর থেকে একজন পিসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওমা, একী অলুক্ষণে কাণ্ড! এই অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজলে মরবি যে। ঘরে যা, ঘরে যা!

পমপম বললো, ওদের কথা শুনিসনি, অলি। চল, আমরা আম বাগানের দিকে যাই। ঝড়ের সময়গাছ থেকে কাঁচা আম খসে পড়ে, কতদিন সেই আম কুড়াইনি রে! চল।

অলির মনে হলো, বৃষ্টি ভিজলে পমপমের যেটুকু শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা, তার চেয়েও তার এই বাসনা পূর্ণ করার মূল্য অনেক বেশি। পমপম যদি আর না বাঁচে!

আমবাগানে যাওয়া হলো না, তখুনি বাড়ির সামনে একটি জিপ এসে থামলো। প্রথমে সেই জিপ থেকে নামলো দু'জন বলিষ্ঠকায় পুরুষ, এই দুজনকেই অলি দেখেছিল ট্রেনে আসবার সময়। তারা জিপের দু'পাশে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে নিল, তারপর নামলেন পমপমের বাবা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, মুখে অন্যমনস্কতার ছাপ।

ঝড় থেমে গেছে, বৃষ্টি পড়ছে বড় বড় ফোঁটায়, ঠিক বর্ষার বৃষ্টি নয়, এ শুধু ভ্রাম্যমান মেঘের ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্য। তবে উত্তাপ অনেকটা কমে গেছে।

অশোক সেনগুপ্ত তাঁর মেয়ের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, বৃষ্টি ভিজছিস? শরীরটা এখন একটু ভালো লাগছে বুঝি?

পমপম অলির হাত ছেড়ে দিয়ে নিজেই হেঁটে হেঁটে ফিরে গেল ঘরে।

একটু পরেই সেই ঘরে এলেন অশোক সেনগুপ্ত। পমপমের কপালে হাত দিয়ে তাপ দেখলেন। তারপর অলির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমি খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, তুমি ওদের পার্টির অ্যাকটিভিটির সঙ্গে জড়িত ছিলে না, তোমার কোনো পলিটিক্যাল ইনভলভ্‌মেন্ট নেই, তবু তুমি আমার মেয়ের জন্য এতটা করেছো, এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। তোমার ওপর পুলিশের নজর পড়তে পারে।

পমপম বললো, ও আমার বন্ধু।

অশোক সেনগুপ্ত বললেন, তা হতে পারে। কিন্তু বিপদের সময় কত বন্ধুই তো বন্ধুকে ছেড়ে যায়। তোদের স্টাডি সার্কেলে কত ছেলেমেয়েই তো ছিল, কই আর কেউ তো তোর খবর নিতে আসে না!

ঘরে একটিই বড় চৌকি, তার ওপর পাতলা তোষক পাতা বিছানা। আর একটি বেতের চেয়ার। সেই চেয়ারে বুড়ো পড়ে তিনি অলিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাপ-টাপের ভয় নেই? আসবার সময় বুড়োশিবতলায় দেখলুম, ছেলেরা একটা সাপ মেরেছে। খুব সম্ভবত দাঁড়াস সাপ। এই সময়টায় খুব সাপের উপদ্রব হয়। এই ঘরটায় খুব সাপের উপদ্রব হয়। এই ঘরটায়, এক সময় আমি থাকতুম। একদিন রাত্তিরবেলা দেখি আমার মশারির ওপর একটা সাপ, সেটা ছিল খরিস সাপ। তুই তখন খুব ছোট ছিলি, তোর মনে আছে, পমপম! কত কাণ্ড করে সেটাকে মারা হলো।

পমপম জিজ্ঞেস করলো, বাবা, তুমি কি অলিকে ভয় দেখাতে এসেছো? তুমি অলিকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাও?

অশোক সেনগুপ্ত হাসলেন। তাঁর মুখখানি রেখাবহুল। চোখের নীচে কালো ছাপ। সচ্ছল পরিবারের সন্তান হলেও সারাজীবন তাঁকে অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়েছে। ছাত্র বয়েস থেকেই বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব কম, এক সময় কংগ্রেসী ছিলেন, বেয়াল্লিশ সালে জেল খাটার সময়ে মার্ক্সবাদে দীক্ষা নেন। তারপর থেকে অনেকবার কারাবাস, পুলিসের নির্যাতন, অজ্ঞাতবাসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে বছরের পর বছর। কিন্তু তাঁর স্বভাবে তিক্ততা নেই, হাসতে পারেন যখন তখন।

হাসতে হাসতে তিনি বললেন, শুধু তোরাই আমাদের ভয় দেখাবি, আমরা কিছু বলতে পারবো না? তোর দলের ছেলেমেয়েরা আমাকে খুন করলে তুই খুশি হবি নাকি রে, পমপম?

পমপম কোনো উত্তর না দিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো।

অশোক সেনগুপ্ত পাঞ্জাবির পকেট থেকে কিছু একটা বার করতে করতে বললেন, ফরোয়ার্ড ব্লকের অজিত বিশ্বাস কাল খুন হয়ে গেছেন। তোরা শুনিসনি নিশ্চয়ই। যারা হেমন্ত বসুকে খুন করেছিল, এটা নিশ্চয়ই তাদেরই কাণ্ড। হেমন্তবাবুর জায়গায় অজিতবাবু ইলেকশানে দাঁড়িয়েছিলেন...এ সব কী পাগলামি হচ্ছে বল তো?

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে তিনি ভাঁজ খুলে দেখালেন। একটা মাথার খুলি আঁকা লাল কালিতে চিঠি। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, অশোক সেনগুপ্ত, এবার তোমার পালা!

অলির মুখখানা বেদনায় কুঁকড়ে গেল, পমপমের মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। অশোক সেনগুপ্ত চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন, যতসব ছেলেমানুষী! এই সব করে কী লাভ হচ্ছে বল তো? এই অকারণ খুনোখুনি, এর নাম মার্ক্সবাদ? এই শিখেছিস তোরা?

পমপম বললো, ওরকম চিঠি আমাদের দলের কেউ লেখে না!

অশোক সেনগুপ্ত বললেন, তোদের পার্টির নাম লেখা আছে, সেটা তো দেখলি? তা হলেই বুঝে দ্যাখ, একটা স্ট্রং পার্টিবেস পর্যন্ত তোরা গড়ে তুলতে পারিসনি, এক একটা ইউনিট যা খুশি তাই করছে, সেন্ট্রালি কোনো কনট্রোল নেই তাদের ওপর, তার আগেই তোরা বিপ্লবে নেমে পড়েছিস? বিপ্লব কি গাছের ফল? এক একটা দেশে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ এক একরকম হবে। হতে বাধ্য। যে সব দেশে গণতন্ত্রের একটা কাঠামো অন্তত আছে, সেখানে বিপ্লব করা এত সহজ! সেখানে গণতান্ত্রিক পথেই আগে ক্ষমতা দখল করতে হয় আমরা সেই পথেই এগোচ্ছি, তোরা সেটা বানচাল করে দিতে চাস, তার মানে তোরা যে প্রতিক্রিয়াশীলদেরই সাহায্য করছিস, তা তোরা বুঝতে পারিস না?

পমপম বললো, ক্ষমতা দখলের নামে তোমাদের ক্ষমতার মোহ পেয়ে বসেছে। পার্লামেন্ট-অ্যাসেম্বলিতে যাওয়াই এখন তোমাদের জীবনের চরম সার্থকতা, এখন কেউ বিপ্লবের কথা বললেই তোমরা ভয় পেয়ে যাও!

–এসব তোদের মুখস্থ করা বুলি, পমপম। একজন দু'জনের মধ্যে ক্ষমতার মোহ এসে যেতে পারে, কেউ কেউ দুর্বল হয়ে যায়, তবু আমরা পার্টি থেকে ওয়াচ রাখি। কিন্তু দিন দিন আমাদের শক্তি বাড়ছে। অজয় মুখার্জির এই পাপেট সরকারের আয়ু কতদিন! এই সময়ে মার্ক্সবাদীদের মধ্যেই আত্মকলহ যে কত ক্ষতিকর...আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, তোদের দলের দু'একজন চীনে পৌঁছে গিয়েছিল, সেখানে তো চৌ-এন লাইয়ের কাছে ওরা ধমক খেয়েছে। মাও সে তুং নাকি বলেছেন, কলকাতার দেওয়ালে 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' লিখতে কে বলেছে তোমাদের? আমি

মোটেই তোমাদের চেয়ারম্যান নই! জানতুম, উনি এই রকম কথাই বলবেন!

–বাবা, এটা কি তোমাদের পার্টির রিপোর্ট, না সি আই এ-র রিপোর্ট?

–পমপম, তুই এতদিন জেলে ছিলি, জানিস না এর মধ্যে কত কী ঘটে গেছে। চারুবাবু অতি বিপ্লবীপনার থিয়োরি দিয়ে এতগুলো ভালো ভালো ছেলে-মেয়েকে কোথায় ঠেলে দিলেন? এখন তারা হয় মারছে অথবা মরছে। অথচ এ দুটোর কোনোটারই দরকার ছিল না। এই সময় এই হাজার হাজার ডেডিকেটেড ছেলে-মেয়েদের যদি আমাদের সঙ্গে পেতাম, চারুবাবু যদি আমাদের লাইনটা অ্যাকসেপ্ট করতেন, তা হলে আমরা এতদিন কংগ্রেসকে কোথায় ঠেলে দিতুম!

–বিপ্লবের পথ ছাড়া আমরা কোনো পথই স্বীকার করি না। একবার যখন শুরু হয়ে গেছে।

–তোরা যা শুরু করেছিলি, তা শেষ হতে আর দেরি নেই। এটা বিপ্লব, না রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার? ইস্ট পাকিস্তানে যে-রকম গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে, এখন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনোরকম বিশৃঙ্খলার প্রশ্রয় দেবে না। আমরা খবর পেয়েছি, শিগগিরই অজয় মুখার্জিকে সরিয়ে এখানে প্রেসিডেন্টস্ রুল হবে, তারপর আর্মি নামিয়ে দেবে। ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে আর্মি মার্চ করাবে, ইস, আরও কত ছেলে-মেয়ে যে মরবে! দ্যাখ পমপম, মানিককে আমি কত ভালোবাসতুম একসময়, ছোটবেলা থেকে তাকে দেখছি, সেই মানিক তোদের ক্ষ্যাপালো...পার্টির অনেকে আমাকে দোষ দেয়, আমি নিজের মেয়েকে কেন বোঝাতে পারিনি...মানিকের খবরটা শুনে আমি চোখের জল সামলাতে পারিনি, যতই মিসগাইডেড হোক, একসময় সে ছিল খুবই সিনসিয়ার ওয়ার্কার।

পমপম ঝট করে একবার অলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, মানিকদা?

অলি কিছু বলতে পারলো না, মাথা নীচু করলো। অশোক সেনগুপ্ত ভুরু তুলে বললেন, মানিক মারা গেছে সে খবর পাসনি তোরা? সে তো বেশ কয়েক মাস আগে।

পমপম হঠাৎ এই খবর জেনেও কোনো আবেগ দেখালো না। বাবার সামনে সে কিছুতেই মচকাবে না। সে তাকিয়ে রইলো জানলার দিকে।

অশোক সেনগুপ্ত বললেন, অসুস্থ শরীর নিয়ে চারুবাবুও আর কতদিন পালিয়ে থাকতে পারবেন? তোদের পার্টি তছনছ হয়ে যেতে আর দেরি নেই। একটা আন্ডার গ্রাউন্ড পার্টি চালাতে গেলে যে কত নিখুঁত সংগঠনের দরকার হয়, তার কোন অভিজ্ঞতাই তোদের নেই। যেখানে সেখানে ইস্কুল বাড়ি পোড়ানো আর কনস্টেবল খুন, এই ধরনের আলট্রা লেফটিইজমের প্রতিক্রিয়া কী হবে জানিস? চরম রাইট রিঅ্যাকশনারিরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তোরা যাকে এখন কনফনট্রেশানের নামে মাঠের মধ্যে বন্দীদের ছেড়ে দিয়ে গুলি করে মারছে। ছি ছি ছি ছি, ইতিহাস থেকে তোরা কোনো শিক্ষাই নিতে পারিসনি!

পমপম বললো, বাবা, তুমি কি কলকাতা থেকে আজ এখানে এলে আমাকে এইসব কথা বলার জন্য?

–আমার কথা তুই শুনবি না, মানতে চাইবি না, এই তো? আমি এসেছি, কাল সকালে বর্ধমান টাউনে আমার একটা মিটিং আছে, রত্তিরটা এখানে থেকে যাবো। আমার ওপর তোর এত রাগ কেন রে, পমপম?

–আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি একটু ঘুমোই?

–হ্যাঁ ঘুমো, বৃষ্টি ভিজেছিস, মাথাটা একটু মুছে নে। আমি এখানে আরও এলাম, তোর বন্ধু অলিকে একটা খবর দিতে।

তিনি অলির দিকে মুখ তুলে বললেন, তোমার বাবা বিমানবিহারীবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তুমি তো আমেরিকা যাচ্ছো? গতকাল তোমার ভিসা পাওয়া গেছে, তোমার বাবা বললেন, তোমার খুব তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যাওয়া দরকার।

পমপম আবার বড় বড় চোখ মেলে তাকালো অলির দিকে। অলির মুখখানা লজ্জায় একেবারে নীল হয়ে গেছে। এই কথাটাও সে পমপমকে ঘুণাক্ষরে জানায়নি। পমপমের বাবা কি আড়ালে এই খবরটা দিতে পারতেন না।

পমপম বালিসে মাথা দিয়ে দেয়ালের দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়লো। অশোক সেনগুপ্ত উঠে

দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি আর দেরি করো না, অলি, কালই কলকাতায় ফিরে যাও। পুলিশ তোমার পেছনে লাগলে পাসপোর্ট ইমপাউন্ড করে নিতে পারে। তুমি চলে গেলে, পমপম এখানে একা থাকবে? পমপম, তুই ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে থেকে আয় না কিছুদিন। তোর মাসি মেসো অনেক যত্ন করবে, ওখানকার ওয়াদারও ভালো।

পমপম অস্ফুট স্বরে বললো, না, আমি এখানেই থাকতে পারবো।

অশোক সেনগুপ্ত কাছে এসে পমপমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নরম গলায় বললেন, তোর দলের ছেলেরা যদি হঠাৎ আমায় খুন করে, তাতে তুই খুশি হবি কিনা, সে কথা তো বললি না খুকী?

এতক্ষণ বাদে পমপম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। অশোক সেনগুপ্ত মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। তারপর আঙুল দিয়ে তার চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন, না রে, তুই ওসব কিছু ভাবিস না। আমার কিছু হবে না!

তিনি চলে যাবার পর অলি পমপমের গায়ে হাত রাখতেই সে একেবারে জোরে জোরে কেঁদে উঠলো। সেই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলো, মানিকদা! মানিকদা!

একটু পরে সে ধড়ফড় করে উঠে বসে অলির হাত জড়িয়ে ধরে রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলো, তুই কেন আমাকে মানিকদার খবর দিসনি? ভেবেছিলি আমি দুর্বল? সহ্য করতে পারবো না? আর কে কে মারা গেছেন, তুই বল! খবর্দার, মিথ্যে কথা বলবি না! অতীন, তপন, কৌশিক, সরোজ দত্ত, সুশীলত রায়চৌধুরী, জয়শ্রী, সন্তোষ, বল বল, সত্যি করে বল!

অলিও কাঁদছে। সে অসহায়ের মতন বললো, আমি সকলের খবর জানি না রে! সত্যি জানি না!

–তুই মানিকদার খবর তো আগে জানতিস?

–হ্যাঁ, তা জানতুম। আমার মামা ডাক্তার, তাঁর কাছ থেকে শুনেছি।

–কে মেরেছে মানিকদাকে? সি পি এম? কংগ্রেস?

–না, পুলিশ। আমার মামাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য, কিন্তু মামা পৌঁছোবার আগেই...

–তুই আমার সঙ্গে সব সময় সেঁটে আছিস, তার মানে অতীন নেই, তাই না?

–না, না, বাবলুদা বিদেশে গেছে। পালিয়ে বেঁচে গেছে।

–আর কৌশিক?

–কৌশিকের খবর জানি, না, তোকে সত্যি কথা বলছি, কোনো খারাপ খবর পাইনি। তারপর দু'জনে হাত ধরাধরি করে মানিকদার নাম করে কাঁদলো অনেকক্ষণ।

পরদিনও অলির কলকাতায় ফেরা হলো না। অশোক সেনগুপ্ত তাঁর মিটিং সেরে ফেরার পথে তাঁর জিপেই অলিকে কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, অলি রাজি হয়নি। পমপম এমনই ভেঙে পড়েছে, যে তাকে ফেলে যাওয়া অলির পক্ষে অসম্ভব।

সেদিন রাত্তিরবেলা এসে উপস্থিত হলো সমীরণ আর ভানু নামে দুটি ছেলে। তখন রাত প্রায় দুটো, বাইরে কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে খুব জোরে, সেই শব্দেই অলির ঘুম ভেঙে গেল, তারপর সে শুনলো জানলায় তিনটে টোকার শব্দ। পমপমের পাতলা ঘুম, সেও জেগে উঠেছে, সে মন দিয়ে সেই টোকার শব্দ একটু ক্ষণ শুনেই বললো, অলি, দরজা খুলে দে, দরজা খুলে দে, আমাদের দলের ছেলে!

অলি শিউড়ে উঠলো। অশোক সেনগুপ্ত স্পষ্ট বলে গিয়েছিলেন, এ বাড়িতে পমপমের দলের ছেলেদের আশ্রয় দেওয়া যাবে না। তাঁর লোক কি এ বাড়ির ওপর নজর রাখছে না? এক্ষুনি যদি মারামারি শুরু হয়ে যায়।

তবু তাকে দরজা খুলতেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদুটি ভেতরে এসে নিজেরাই দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো। একজনের হাতে রিভলভার, অন্যজনের হাতে পাইপ গান। এ ছেলে দুটিকে অলি চেনে না।

সমীরণ বললো, উঃ, আর একটু হলে কুকুরগুলোকেই গুলি করতে হতো। কতক্ষণ ধরে জানলায় ঠকঠক করছি, তোদের ঘুমই ভাঙে না!

পমপম বললো, তোরা কোথা থেকে এলি, সমীরণ? এই গ্রামটা তোদের পক্ষে একদম সেফ নয়!

ভানু বললো, আমরা এক্ষুনি চলে যাবো। পমপম, আমাদের কিছু টাকা লাগবে। কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারবি?

পমপম বললো, বোস আগে, কোথা থেকে এসেছিস, কী ব্যাপার সব বল।

দরজায় হুড়কো দিয়ে ওরা দু'জনে বিছানার কাছে এসে বললো, বেশি দেরি করা যাবে না। হাতে একদম পয়সা নেই, খেতে পাচ্ছি না, ওষুধ কিনতে হবে। তুই কেমন আছিস পমপম? আজই বিকেলে খবর পেলুম যে তুই কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে এসেছিস। আমরা কয়েকজন কাছাকাছিই আছি, জঙ্গলমহলে। কিছু টাকা জোগাড় করে দিতে পারবি না?

পমপম বললো, হাতে তো বিশেষ কিছু নেই। অলি, তোর কাছে কত আছে?

অলি বললো, একশো টাকার মতন।

ভানু বললো, ওতে কিছু হবে না, আমরা সাতজন আছি একসঙ্গে, অন্তত হাজারখানেক টাকা যদি এখন দিতে পারিস!

সমীরণ অলির দিকে তাকিয়ে বললো, কৌশিকের পায়ে গুলি লেগেছে। জেল থেকে পালাবার সময়, গুলিটা ঢুকে বসে আছে, অপারেশন করাতে না পারলে...

এই অবস্থাতেও অলির বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। এ যেন তার ইচ্ছাশক্তিরই জয়। কৌশিক বেঁচে আছে!

খানিকক্ষণ ওদের কাহিনী শোনার পর পমপম বললো, গ্রামের বাড়িতে তো টাকা পয়সা বিশেষ থাকে না। অলির কাছে আর আমার কাছে যা আছে, সব মিলিয়ে বড়জোর শ দেড়েক। আর একটা কাজ করা যায়, আমি তোদের কিছু জিনিস দিতে পারি, তা বিক্রি করলে অন্ততসাত-আটশো টাকা পাবি।

সমীরণ জিজ্ঞেস করলো, কী জিনিস? গয়না-টয়না বিক্রি করতে গেলেই ধরা পড়ে যাবো!

পমপম বললো, গয়না না। এ জিনিস খুব সহজে বিক্রি করা যায়, যে কোনো মুদির দোকানে। তোরা একটু বোস, নিয়ে আসছি। আয় তো অলি...

মিশমিশ করছে অন্ধকার রাত। সারা বাড়ি ঘুমন্ত। কোথা থেকে যেন গায়ে জোর পেয়ে গেছে পমপম, সে অন্ধকারের মধ্যেই বেশ জোরে জোরে হেঁটে উঠোনটা পেরিয়ে গেল। উল্টো দিকের একখানা ঘরে ওর ঠাকুর্দা থাকেন। দাওয়ায় ঘুমোয় বাড়ির একজন মুনিষ। ঠাকুর্দার কখন কী প্রয়োজন হয়, সেই জন্য দরজাটা খোলাই থাকে। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘুমন্ত লোকটির পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে খাটের নীচে বসে পড়লো ওরা দু'জন। পমপম হাত বাড়িয়ে কয়েকটা কাপড়ের পোঁটলা টেনে বার করলো। সব মিলিয়ে চারটে। পোঁটলাগুলো বেশ ভারি।

সেগুলো নিয়ে আবার খুব সাবধানে ওরা নেমে এলো উঠোনে। অলি এখনও বুঝতে পারছে না এই পোঁটলার মধ্যে কী আছে।

পমপম বললো, এগুলো সুপুরি। আমাদের বাগানের। সুপুরির খুব দাম, এগুলো বিক্রি করলে অনেক টাকা হবে।

সুপুরির কত দাম হতে পারে, সে বিষয়ে অলির কোনো ধারণাই নেই। তার খুব আফসোস হচ্ছে, সে কেন সঙ্গে বেশি টাকা আনেনি। বাবার কাছ থেকে সে প্রতিমাসে তিনশো টাকা হাত খরচ পায়।

উঠোনের মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে ভয় পাওয়া গলায় পমপম বললো, কৌশিকের পায়ে গুলি লেগেছে ওরা বললো, পায়ে না লেগে পেটে কিংবা বুকে গুলি লেগে থাকে যদি? তা ওরা কিছুতেই স্বীকার করবে না! অলি, কৌশিককে বাঁচাতেই হবে! আমি ওদের সঙ্গে যাবো, আমি কৌশিককে নিজের চোখে দেখতে চাই।

অলি বললো, তুই কী করে যাবি? ওরা বললো, জঙ্গলমহলে, পায়ে হেঁটে যেতে হবে অনেকখানি, তুই পারবি না, পমপম। বরং আমি যাই। যদি সেখানে কোনো কাজে লাগতে পারি...।

পমপম বললো, তুই যাবি? তোর যে কলকাতায় ফেরা দরকার, তুই বিদেশে যাবি, না রে, অলি, তোর ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি ওদের বলছি, ওরা আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাবে।

অলি জোর দিয়ে বললো, তুই গেলে, তুই বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে, আবার তোকে নিয়েই বিপদে পড়ে যাবে ওরা। তার বদলে আমি যাবো। আমি কৌশিককে দেখে আসবো।

সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দ্বিধা করলো না অলি। কৌশিক তার বাবলুদার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

কৌশিক আহত হয়েছে শুনলে বাবলুদা কি এক্ষুনি ছুটে যেত না? বাবলুদা নেই, তাকেই যেতে হবে।

॥ ১৯ ॥

দুপুরবেলা জাহানারা ইমাম খেতে বসেছেন, এমন সময় বেজে উঠলো কলিংবেল। একটানা বেজেই চললো, কেউ সুইচে আঙুল টিপে রেখেছে। অসময়ে এরকম বেল শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে, তার ওপর, যে এসেছে সে যেন বিশেষ কোনো ক্ষমতা দেখাতে এসেছে। জাহানারা তবু বাড়ির কাজের লোকটিকে বললেন, দ্যাখ তো কোন্ বেয়াদপ এমনভাবে বেল বাজায়?

দরজা খোলার পর যে ভেতরে এলো, সকাল থেকে তার কথাই শুধু ভাবছিলেন জাহানারা, খেতে বসেও তার কথা মনে করে খাবার গিলতে পারছিলেন না, অথচ এখন তাকে চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। প্রায় ভয় পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠলেন, রুমী তুই?

সারা মুখে ঝলমলে হাসি, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা এমনভাবে নামিয়ে রাখলো রুমী, যেন সে অন্য যে-কোনো দিনের মতই কলেজ থেকে ফিরছে। যদিও মাথার চুল উস্কো খুস্কো, চোখ দুটো কোটরে ঢোকা, গায়ের জামাটা তিন চারবার ঘামে ভিজেছে ও শুকিয়েছে। সে বললো, আম্মা, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও!

টেবিলে বসে পড়ে সে মায়ের দিকে চোখের ইঙ্গিত করলো। অর্থাৎ এখন কোনো কথা জিজ্ঞেস করা চলবে না।

ডাল, ভাত, মাছের পাত্রগুলো টেবিলের ওপরেই রয়েছে, কাজের লোকটি এনে দিল একটি প্লেট, তারপর দাঁড়িয়ে রইলো কাছেই। আগে রুমী বাইরে থেকে এসে খেতে বসলেই মা বলতেন, এই হাত ধুলি না? যা, আগে হাত ধুয়ে আয়! আজ তাঁর মুখে কোনো কথা নেই। রুমী প্লেটে ভাত তুলে মাছের ঝোল দিয়ে মেখে তিন চার গেরাস খেয়ে নিল বুভুক্ষুর মতন। তারপর মায়ের দিকে তাকালো। ঠিক পটে আঁকা ছবির মতন জাহানারা খাওয়া বন্ধ করে, ছেলের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বসে আছেন। তাঁর বুকের মধ্যে যত আনন্দ, মুখে ততখানি ভয়ের ছাপ।

রুমী কাজের লোকটিকে বললো, বারেক, রান্নাঘর থেকে দুটো শুকনো মরিচ পুড়িয়ে আনতো। কোনো রান্নায় তো ঝাল দিসনি! দেখবি বেশী পুড়ে না যায় যেন। সাবধানে অল্প আঁচে সেঁকবি আস্তে আস্তে, বুঝলি?

সে চলে যেতেই রুমী মাকে ছদ্ম ধমকের সুরে বললো, এক্ষুনি সব না শুনলে তো তোমার পেটে ভাত হজম হবে না, তাই না? এখন শুধু এইটুকু শুনে রাখো, আমাদের যে-রাস্তা দিয়ে যাবার কথা হয়েছিল, সেখানে ঘাপলা হয়েছে। আর একটু হলে আর্মির হাতে ধরা পড়ে যাচ্ছিলাম। তাই আপাতত ফিরে আসতে হলো!

তারপর সে মন দিয়ে খেয়ে খেতে লাগলো। ভাত শেষ করার পর চুমুক দিয়ে শুধু ডাল খেলো অনেকখানি। বারেককে বললো, ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানি বার করে দে! উঃ, এবার যেন বেশী বেশী গরম পড়েছে!

আঁচাবার পর সে সেদিনকার খবরের কাগজ দু'খানা বগলে নিয়ে শিস দিতে দিতে ওপরে উঠে গেল।

জাহানারা প্রথমেই ভেতরের ঘরে গিয়ে স্বামীর অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিলেন খবরটা। তারপর আপাতত শান্ত ভাব বজায় রেখে খাবার-দাবারগুলো গুছোলেন, বারেককে ছুটি দিলেন দুপুরের জন্য। তারপর দৌড়ে দোতলায় উঠে এসে রুমীর ঘরের দরজা বন্ধ করে, হেসে কেঁদে রুমীকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, এবার বল্ রুমী, কী হলো সব খুলে বল!

ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাবার জন্য যত না দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তার চেয়েও তাঁর নিজেরই একটি কথা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল সর্বক্ষণ। রুমী যাবার দু'দিন আগে তিনি ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিলেন, যা, তোকে দেশের জন্য কোরবাণী করে দিলাম।

মায়ের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রুমী বললো, বসো আম্মা, শান্ত হয়ে বসো! সব বলছি। প্রথমে তো আমরা সদরঘাট থেকে বুড়িগঙ্গা পার হলাম।

জাহানারা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা মানে কে কে? তোরা কয়জন ছিলি?

রুমী ভ্রুকুটি করে বললো, এই তো! তোমার বেশী বেশী কৌতূহল! তোমায় আগেই একদিন বলেছি না, অন্যদের নাম ধাম জানতে চাইবে না?

মা যেন বয়েসে অনেক ছোট, এইভাবে বকছে রুমী। মাত্র কিছুদিন আগেই যে ছিল সদ্য যৌবনে ওঠা একটি টগবগে ছেলে, তার মুখে এরমধ্যেই একটা অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে গেছে, তার হাসির আড়ালেও উঁকি মারে একটা গাম্ভীর্য!

কামাল লোহানী, প্রতাপ হাজরা, মনিরুল আর ইশরাক নামে দু'জন ছাত্র নেতা, একজন আহত হাবিলদার ও কয়েকটি হিন্দু পরিবার মিলে রওনা দিয়েছিল সীমান্তের দিকে। বুড়িগঙ্গা পার হবার পর সাত-আট মাইল হাঁটা পথ, সেই সময়ে আবার প্রবল ঝড় বৃষ্টি, হাবিলদারটির হাঁটার ক্ষমতা ছিল না, রুমী আর একজন কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। জল কাদার মধ্য দিয়ে ওরা সেই অতখানি রাস্তা হেঁটে পৌঁছোয় ধলেশ্বরীর পারে। হাবিলদারটিকে কাছাকাছি একটি গ্রামে লুকিয়ে রেখে ওরা ধলেশ্বরী পার হয়ে এলো সৈয়দপুরে। সেখান থেকে আরও আট মাইল দূরে শ্রীনগর। আগেই খবর পাওয়া গেছে যে শ্রীনগর থানা-অঞ্চল এখন মুক্তিবাহিনীর অধীনে। সেখানে অপেক্ষা করছে সিরাজুল আর কয়েকজন, তারা রুমীদের ত্রিপুরা বর্ডারে পৌঁছে দেবে, এইরকমই ঠিক হয়ে আছে।

স্পীড বোটে পুরো দলটা সন্ধের অন্ধকারে পৌঁছোলো শ্রীনগর। রাতটা কাটানো হলো কাছেই নাগরভাঙা গ্রামে ডাক্তার বর্ধনের বাড়িতে। কিন্তু পরদিন রওনা হওয়া গেল না, এরমধ্যেই ধলেশ্বরী পার হয়ে সৈদপুরে এসে গেছে আর্মি। তারা এগোচ্ছে বিক্রমপুরের দিকে। পুরো অঞ্চলটা তারা ঘিরে ফেলে বহিরাগতদের বেছে বেছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যারা ধরা পড়ছে, তারা কেউ আর ফিরে আসে না।

তখন একমাত্র উপায় কুমিল্লার শ্রীরামপুরের দিক দিয়ে বর্ডার ক্রশ করা। কয়েকটা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ওরা যাত্রা করলো এক ভোর রাতে। তাও বেশী দূর যাওয়া গেল না, এর মধ্যে শ্রীরামপুরেও এসে গেছে পাকিস্তানী বাহিনী। এখন আর সামনে যাওয়া যাবে না, পেছন দিকে সৈদপুরেও ফেরা যাবে না।

বিবরণ থামিয়ে ফিক করে হেসে রুমী বললো, এরপর আমরা কয়েকজন কী করে ঢাকা এসে পৌঁছোলাম, তা আর জানতে চেও না আম্মা! কোনোরকমে, অনেক ঘুর পথে, এক একবার গুলি খেতে খেতেও বেঁচে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এসেছি। তবে সবাই আসতে পারেনি। ঝড়ের সময় একটা নৌকা ডুবে গেল, তাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের থামার উপায় ছিল না, আর একটা ছোট দলও সম্ভবত আর্মির হাতে ধরা পড়েছে। তাদের কী হয়েছে জানি না। আমি ঐ দলে থাকতে পারতাম!

প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে শুনতে জাহানারা বললেন, তুই গুলি খেতে খেতে বেঁচে গেছিস? যারা ধরা পড়েছে, তুইও তাদের মধ্যে থাকতে পারতি?

অম্লান মুখে রুমী বললো, হ্যাঁ। বাই চান্স আমি অন্য নৌকায় ছিলাম!

জাহানারা ছেলের পিঠে হাত দিয়ে দেখলেন। এই কি তাঁর সেই রুমী না অন্য কেউ? দু'একদিন আগে যে মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়েছিল, সে একটু আগে খাওয়া দাওয়ার পর শিস দিয়ে গান গাইছিল!

রুমী বললো, আম্মা, সাহস দেখলাম বটে সিরাজুলের! গুলি-গোলা কিছু মানে না। এর মধ্যে সে সাতজন খান সেনাকে খতম করেছে নিজের হাতে। আমাদের সাথে সে এলো না, যে দলটা ফিরতে পারে নাই, তাদের খোঁজে সে ফিরে গেল সৈদপুরে। একেবারে সিংহের গুহায় যাবে বলে।

বার বার শুনেও আশ মেটে না জাহানারার, তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও জানতে চান। এক সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে রুমী, তা হলে তোকে তো এখন আর যেতে হবে না? ঢাকাতেই থাকবি?

রুমী উষ্ণ গলায় বললো, যেতে হবে না মানে? দেশের জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়ে যারা ডেজার্ট করে, তাদের দোজখেও স্থান হয় না, জানো না? আমি খালেদ মশারফের আন্ডারে সেক্টর টু-তে যোগ দেবো, এই ঠিক হয়ে আছে।

জাহানারা মিন মিন করে বললেন, না, তুই যে বললি যাবার রাস্তা সব বন্ধ করে দিয়েছে!

রুমী বললো, রাস্তা নেই অন্য রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে। তা ছাড়া কতদিন ওরা দখল করে রাখবে? ঐ দিক থেকে আমাদের বাহিনী এসে গুঁতো দেবে না? দু'একদিনের মধ্যেই আমার কাছে খবর আসবে, চলে যেতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। আমি কি আরাম করার জন্য ঢাকায় ফিরে এসেছি? তা ছাড়া

শুনে রাখো, হানাদার বাহিনী ঢাকায় কোনো ইয়াং ছেলেকে বাইরে রাখবে না। যুদ্ধে যোগ দাও বা না দাও, একই কথা। বাঙালী হওয়াটাই এখন অপরাধ। কিছু ছেলে এখন আর্মির সাথে হাত মেলাচ্ছে, তারা আর বাঙালী না, তারা রাজাকার। তুমি কি আমাকে রাজাকার হতে বলো?

হঠাৎ থেমে গেল রুমী। মাকে বেশী বেশী বকুনি দেওয়া হয়ে যাচ্ছে ভেবে সে মায়ের কোলে মাথাটা রেখে বললো, আমি জানি, তুমি কখনো আমার কোনো ইচ্ছায় বাধা দেবে না। আমার আম্মা পৃথিবীর বেস্ট আম্মা! আমার কথা তো শুনলে, এবার তোমাদের কথা বলো তো! কার কী খবর? মোতাহার চাচার কী? মীরপুরের বিহারীরা নাকি রাস্তায় বাস-কোচ থামিয়ে বাঙালী যাত্রীদের খুন করছে?

জাহানারা বললেন, তোদের প্রফেসর বাবুল চৌধুরীর খবর শুনেছিস? তাকে ওরা গুলি করে গেছে। সে বোধ হয় আর বাঁচবে না।

চোখ বুজিয়ে ফেলেছিল রুমী, চোখ না খুলেই বললো, বাবুল চৌধুরীকে মেরেছে? বেশ করেছে! আমাদেরই কোনো দল ওকে মেরেছে। দেশদ্রোহীদের চরম শাস্তি দেবার একটা প্ল্যান নিয়েছি আমরা। উনি আমাদের কাছে কত বড় বড় কথা বলতেন, অথচ নিজে সাপোর্ট করলেন এই ইয়াহিয়া রেজিমকে। আর্মির সঙ্গে দহরম-মহরম?

জাহানারা বললেন, কিন্তু আর্মির লোকই তো ওকে গুলি করেছে?

বড় বড় করে চোখ মেলে, ধড়ফড় করে উঠে বসে রুমী জিজ্ঞেস করলো, কী বললে? আর্মি ওকে মেরেছে, তুমি ঠিক জানো?

–এক পাড়ার মধ্যে, জানবো না কেন? সিরাজুলের খোঁজে আর্মি এসেছিল ঐ বাড়ি সার্চ করতে, তারপর ওরা মনিরাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, বাবুল চৌধুরী উপর থেকে নেমে এসে তাকে আটকাতে যেতেই...

–মনিরাকে ধরে নিয়ে গেছে? কোথায় নিয়ে গেছে, জানো?

–তা কি কেউ বলতে পারে? আমি সেদিন বাসাতেই ছিলাম, মনিরাকে ওরা টানতে টানতে এনে গাড়িতে উঠালো, মেয়েটার কী বুক ফাটা চিৎকার, কিন্তু কেউ বাধা দিতে পারলো না। ঐ যমের দূত আর্মিগুলোর সামনে কে যাবে বল।

–ইস, আম্মা, এখন সিরাজুলের কী হবে? ঢাকায় আমাদের যে কন্টাক্ট আছে, তাদের বলা হয়েছিল মনিরাকে কোনো নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে। আমি তো জানি মনিরা এর মধ্যে চলে গেছে।

–যাদের ওপর ভার ছিল, তারা দেরি করে ফেলেছে রে। আর কি মেয়েটাকে পাওয়া যাবে? অমন সরল, ভালো মেয়ে, ওরে রুমী, ভাবলেই শেষ হয়ে যেতে দেবে!

–আমি ভাবছি, সিরাজুলটা পাগল হয়ে না যায়! এর মধ্যে দু'বার সে সাজ্ঘাতিক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মনিরাকে দেখতে এসেছিল। আমার বন্ধুরা ওকে জরু কা গোলাম বলে ক্ষ্যাপায়। নিয়তির কী আয়রনি দ্যাখো, আম্মা, বাবুল চৌধুরী এই ফ্যাসিস্ট রেজিমের সাথে গলাগলি করতে গিয়েছিল, টিক্কা খানের সাথেও নাকি তার ভাব, সেই টিক্কা খানের সৈন্যই তাকে শেষ করে দিয়ে গেল! ন্যাপের ভাসানী সাহেবও কলকাতায় গিয়ে চীনের কাছে আবেদন পাঠিয়েছেন বাংলাদেশকে সাপোর্ট করার জন্য, আমাদের কলেজে যে সব প্রোচাইনীজ নেতা ছিল সবাই মুক্তি যুদ্ধে জয়েন করেছে, শুধু বাবুল চৌধুরী আর দুই চারজন মোটে হার্ড কোর আলট্রা লেফট পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দেয়নি। বাবুল চৌধুরীর মতন তারা সবাই একে একে শেষ হয়ে যাবে।

জাহানারা বেগম একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, ছেলের শেষ কথাটি শুনে চমকে উঠে বললেন, ওরে বাবুল এখন মারা যায় নাই, তবে আয়ু আর কতটুকু আছে কে জানে।

রুমী বিদ্রূপের সুরে বললো, এখনো মারা যায় নাই?

–অমন করে বলে না, রুমী! তোর শিক্ষক ছিলেন না এক সময়? তাঁর জন্য দোয়া কর। সেদিন কী হলো জানিস? আর্মির লোক তো ওকে গুলি করে ফেলে চলে গেল। ঐ বাসায় সেফু বলে ছোট একটা মেয়ে কাজ করে, মিলিটারি তারে দেখতে পায় নাই, সে রাস্তায় এসে চিৎকার করতে লাগলো, আমার সাহেবের গুলি করছে, আমার সাহেবরে বাঁচান...। কিন্তু কেউ ভয়ে দরজা খোলে না। একটু

পরেই আবার কারফিউ ডিক্লেয়ার হয়ে গেল, কে যাবে? কিন্তু সেই মেয়েটার আর্তনাদ সহ্য করা যায় না। যেন তার নিজের বাপ মরতে বসেছে। শেষ পর্যন্ত তোর বাবা বললো, আমি একবার দেখে আসি, যা হয় হোক। আমিও গেলাম তার সাথে। গিয়ে দেখি সিঁড়ির শেষ ধাপে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে বাবুল, চতুর্দিকে রক্ত আর রক্ত, কিন্তু তখনও তার বুকটা ধুকপুক করছে। ঐ অবস্থায় ফেলে আসা যায়? ওদের চিনি কতদিন ধরে! কারফিউয়ের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সাহস হলো না। আমাদের গাড়িতে তুলে ওকে নিয়ে গেলাম ডাঃ আজিজের পলি ক্লিনিকে।

–সেখানেই আছে এখনও?

–সব দায়িত্ব পড়ে গেছে আমাদের ওপর। বাবুলের বাপ মা আছেন টাঙ্গাইলে, তাদের খবর দেবার উপায় নাই। টেলিফোন পাওয়া যায় না। ওর বড় ভাই আলতাফ কোথায় জানি উধাও হয়ে গেছে। বাবুলেরও বউও তো ইন্ডিয়ায় চলে গেছে শুনেছি। শেষ পর্যন্ত যদি কিছু একটা হয়ে যায়, ওর নিকটজন কেউ জানতেই পারবে না।

একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো রুমী।

বিকেলবেলা সে যে কোথায় যাচ্ছে, তা জিজ্ঞেস করাও চলবে না।

জামীকে বাসায় রেখে এক সময় শরীফ আর জাহানারা গেলেন বাবুল চৌধুরীর খবর নিতে। আজ সন্ধেবেলা কারফিউ নেই, শুরু হবে রাত বারোটায়।

কাছেই মেইন রোডের ওপর ডঃ আজিজের পলি ক্লিনিক কাম নার্সিং হোক। পাশাপাশি দু'খানা বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে, একটার দোতলায় স্বামী-স্ত্রীর কোয়ার্টার। আজিজের স্ত্রী সুলতানাও ডাক্তার। এই দুর্দিনে এঁরা দু'জনে গোপনে অনেকের চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। টাকা পয়সার কথা চিন্তা করেন না। আজিজ একটু গম্ভীর প্রকৃতির হলেও সুলতানা সব সময় ছটফটে, হাসি খুশী। কোনো পেশেন্টকে ভেঙে পড়তে দেখলে সুলতানা তার গালে ছোট ছোট চাপড় মেরে বলেন, ও কী, অত মুখ গোমড়া করার কী আছে? হাসো, হাসো! হাসতে ভুলে গেলে বাঁচবে কী করে?

সুলতানা নিজে কখনো হাসতে কার্পণ্য করেন না। চরম দুঃখের কথাও তিনি দিব্যি রসিকতার ছলে বর্ণনা করতে জানেন, এই জন্য আড়ালে কেউ কেউ তাঁকে বলে, পাগলী!

শরীফ আর জাহানারাকে দেখে সুলতানা এক গাল হেসে বললেন, আজ ভালো খবর আছে। আপনাদের পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে পুরোপুরি! খানিক আগে তাকে গল্প বলে বলে আধ গেলাস হরলিকস খাইয়েছি!

জাহানারও না হেসে পারলেন না। বাবুল চৌধুরী যেন একজন কট্টর বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক নয়, তিন বছরের শিশু। তাকে গল্প বলে হরলিকস খাওয়াতে হয়!

সুলতানা আবার বললেন, অপারেশান করে ওর পেট থেকে দুটো বুলেট বার করেছি, আল্লার দয়ায় বেঁচে যাবে মনে হয় এ যাত্রায়। কিন্তু কিছুই যে খেতে চায় না। আপনারা দ্যাখেন তো যদি একটা হাফ বয়েল আণ্ডা অন্তত খাওয়াতে পারেন!

জাহানারার ইচ্ছে হলো রুমীর ফিরে আসার কথাটা সুলতানাকে জানাতে। কিন্তু কখন কাকে কী যে বলা উচিত তা-ই যে বুঝে ওঠা যায় না, এখন এমনই এক সন্দেহের সময়।

দোতলায় একটি ক্যাবিনে রাখা হয়েছে বাবুলকে। তার পাশের ক্যাবিনেই আছে জাহানারাদের আর এক পরিচিতা, তার নাম সালেহা। এই সালেহার স্বামী রসুল সাহেব একজন ধর্মভীরু পারহেজগার মানুষ। মুখে কালো চাপ দাড়ি, মাথায় কালো জিন্না টুপী, প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন তিনি। রসুল সাহেবের বদলির চাকরি। কিছুকাল আগে ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। পঁচিশে মার্চের পর কিছুদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিল জয় বাংলা ধ্বনি দেওয়া লোকদের দখলে, তারপরেই সেখানে শুরু হলো পাকবাহিনীর বম্বিং। কোথাও কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করেনি তবু প্লেন থেকে বোমা পড়েছে গ্রামের পর গ্রামে। রসুল সাহেব কোনোরকমে সপরিবারে এক বস্ত্রে পালিয়েছেন, বহু জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়ে ঢাকায় এসে উঠেছেন ভূতের গলিতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। গ্রামের পথে দৌড়োদৌড়িতে তাঁর স্ত্রীর এক পায়ে একটা হাড় ফুটে গেছে কখনো, প্রথমে সেটা আমল দেননি। এখন সেটা সেপটিক হবার মতন অবস্থা, পা-টা বাদ দিতে হবে কি না ঠিক নেই।

রসুল সাহেব কোনোদিন রাজনীতির সাতে পাঁচে থাকেননি, পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ গড়ায়

বিশ্বাস করেননি, তবু তাঁর এই অভাবিত দুর্ভাগ্যে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। জাহানারাই উদ্যোগ করে তাঁর স্ত্রীকে ভর্তি করে দিয়েছেন এই নার্সিং হোমে।

সালেহা যন্ত্রণায় কোঁকাচ্ছে শুনে জাহানারা আর শরীফ আগে উঁকি দিলেন সেই ক্যাবিনে। তাঁদের দেখেই সালেহা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললো, বড় আপা গো, আমি আর বাঁচবো না। আমার ছেলে মেয়েগুলোর কী হবে? আমাদের যে সব গেছে। ওরা খাবে কী?

জাহানারা তার শিয়রের কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, অমন করে না! সব ঠিক হয়ে যাবে!

চোখের সামনে একটা বীভৎস দৃশ্য দেখার মতন ভঙ্গি করে সালেহা বললো, বড় আপা, খান সেনারা কি মানুষ না? ওরা কি মুসলমান না? হিন্দু খুঁজে খুঁজে তো কতই মারলো, কলমা জানা মুসলমানকে পর্যন্ত ওরা কাফের মনের করে মারলো? আল্লার একী বিধান!

জাহানারা মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, নার্সিং হোমে অত জোরে চ্যাঁচায় না। তুমি তো ভাগ্যবতী। তোমার গায়ে আর্মির গুলি লাগেনি, পায়ে শুধু হাড় ফুটেছে। সুলতানা আমাকে বললো, অপারেশনে তোমার পা ভালো হয়ে যাবে!

সালেহাকে আরও একটুক্ষণ সান্ত্বনা দিয়ে ওরা এলেন বাবুল চৌধুরীর ক্যাবিনে।

হঠাৎ দেখল মনে হয় বাবুল সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। সারা গায়ে একটা সাদা চাদর ঢাকা, তার পেট জোড়া ব্যান্ডেজ সেই চাদরের তলায় ঢাকা পড়ে আছে। তার ফর্সা, নারী সুলভ কমনীয় মুখখানি অনেকটাই রক্তশূন্য, কিন্তু ক্যাবিনের স্বল্প আলোকে তা টের পাওয়া যায় না। বই ছাড়া সে অন্য কিছু দিয়ে সময় কাটাতে জানে না, তাই জ্ঞান ফেরার পরেই সে চোখের সামনে মেলে ধরেছে একটা শক্ত অর্থনীতির বই। তার খাটের পাশেও একটি বইয়ের সারি, সম্ভবত আজই সেন্টুকে দিয়ে বাড়ি থেকে আনিয়েছে।

জাহানারা পর্দা সরিয়ে ঢুকেই বললেন, ওমা, বাবুল তো ভালো হয়ে উঠেছে দেখছি। ও বাবুল, আল্লা আমাদের ডাক শুনেছেন! তোমার জন্য আমরা দিনরাত দোয়া করেছি!

বইখানা সরিয়ে বাবুল নিঃশব্দ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

জাহানারার মনে হলো, আজ রুমী ফিরে এসেছে, আজ তিনি চতুর্দিকেই ভালো কিছু দেখবেন, ভালো শুনবেন। সালেহার পা ঠিক হয়ে যাবে, বাবুল আবার হাঁটা চলা করবে। যদি পাকিস্তানীদের মারণযজ্ঞটাও আজ শেষ হয়ে যেত!

শরীফ বললেন, বাবুল, টাঙ্গাইলে আমি একটা খবর পাঠিয়েছি, রাস্তা খোলা থাকলে ওনারা দু'একদিনের মধ্যে এসে পড়বেন নিশ্চয়।

বাবুল এবারেও কোনো কথা বললো না।

জাহানারা বললেন, মঞ্জু ইন্ডিয়ার কোথায় আছে অ্যাড্রেস জানো? তাহলে তাকেও একটা খবর দেবার চেষ্টা করতাম। কাল একজন বললো, এখান থেকে লন্ডনে ফোন করে চেনা কোনো মানুষকে খবর দিলে, সে আবার লন্ডন থেকে কলকাতায় ফোন করে খবর জানাতে পারে। চিঠিও যেতে পারে সেইভাবে।

এবার, যেন কিছু একটা বলতে হয়, সেইভাবে বাবুল বললো, থাক, তাকে ব্যস্ত করার দরকার নাই।

শরীফ বললেন, তুমি কিছু খেতে চাচ্ছো না কেন, বাবুল? না খেলে গায়ের জোর হবে কী করে? একটা আণ্ডা সিদ্ধ খাবে?

বাবুল বললো, আজ না কাল খাবো। পাশের ঘরের মহিলার কী হয়েছে? এত চিৎকার করে কাঁদছে কেন? ওনার কেউ মারা গেছে?

শরীফ বললেন, না, ওদের ফ্যামিলির কেউ মার যায় নাই, তবে চোখের সামনে অন্যদের মরতে দেখেছে, আসলে বেশী আঘাত লেগেছে ওদের বিশ্বাসে। ধর্মভীরু মুসলমানকেও যে অন্য মুসলমান আঘাত হানতে পারে, সেটা ওঁরা কিছুতেই এখনও মেনে নিতে পারছেন না!

জাহানারা বললেন, এ তো ক্ষমতা দখলের হিংস্রতা, এখানে আবার ধর্ম কোথায়?

বাবুল ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকালো। তার আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই, কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার আগ্রহও নেই।

শরীফ ও জাহানারা বিদায় নিলেন একটু পরে।

বাবুল আবার চেষ্টা করলো বই পড়ার। তার মনের জোর যতই থাকুক, শরীর খুব দুর্বল হলে মনকে বশে রাখা যায় না। যে-বই সে পড়ছে, তার একবর্ণও আজ মাথায় ঢুকছে না। বইখানা খসে গেল হাত থেকে। আজ বারবার মনে পড়ছে মনিরার কথা ও নিজের ছেলে সুখুর কথা। ভালো করে জ্ঞান ফিরেছে দুপুরের দিকে, তারপর থেকেই মনে হচ্ছে, মনিরার কী হলো? এদেশের মেয়ের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল এদেশেরই সৈন্য, এরপর মনিরার ওপর তারা বলাৎকার করবে? খুন করবে? দিলারার স্বামী কর্ণেল সাহেবকে যদি একবার ফোন করা যেত!

সুখু এখন কোথায়? সে কি বাবার জন্য কাঁদে একবারও? কোথায় যেন একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সব সহ্য করতে পারে বাবুল, কিন্তু শিশুদের কান্নার শব্দ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

বাবুল ঘুমিয়ে পড়েছিল, এক সময় কিসের যেন শব্দে তার চটকা ছুটে গেল। আবার বুঝি ঢাকা শহরের সব বাতি নিবে গেছে, ক্যাবিনের ভিতরটা একেবারে অন্ধকার। শিয়রের কাঁচের জানলা দিয়ে দিয়ে সামান্য ছাই রঙের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, অর্থাৎ বেশ রাত হয়েছে। ক্যাবিনের মধ্যে কে যেন ঢুকেছে একজন, দেখা যাচ্ছে তার ছায়া-ছায়া মূর্তি। আজিজ ডাক্তার এসেছে ইঞ্জেকশান দিতে?

ছায়ামূর্তিটি বাবুলের খাটের ওপরেই বসে পড়ে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলো, এই হারামজাদা, মনিরা কোথায়?

বাবুলের মনে হলো, ছায়া মূর্তিটি যেন তার নিজেরই বিবেক। কিংবা তার আত্মা তার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক সত্তা হয়ে গেছে।

বাবুল অনুতপ্ত কণ্ঠে ফিসফিস করে বললো, আমি জানি না, সে কোথায়! তুমি বলো, তুমি বলো! আমি জানতে চাই!

ছায়ামূর্তি আবার বললো, নছল্লা করোস আমার সাথে, শুয়ারের বাচ্চা! তারে কোথায় পাঠাইছোস বল আগে!

বাবুল বললো, আমি তাকে কোথাও পাঠাইনি, তাকে সিরাজুলের কাছে চলে যেতে বলেছিলাম। সে গেল না। আর্মি তাকে ধরে নিয়ে গেল!

–মিথ্য কথা! তুই-ই আর্মিরে খবর দিছিলি! তুই আর্মির হাতে তারে তুলে দিছিস। এখন নিজের সাধু সাজতেছোস!

–না, না, না, আমি তুলে দিইনি। তা হলে আর্মি আমাকে গুলি করে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে কেন?

–কোনো একটা বোখা সোলজার ভুল করে গুলি করেছে। হয়তো সে উপরের অর্ডার জানতো না। কিংবা, সবটাই তোর সাজানো। তুই গুলি খাওয়ার ভড়ং কইরা এইখানে লুকাইয়া আছোস! দেখি তো, তো সত্যিই গুলি লাগছে কি না!

ছায়ামূর্তি বাবুলের গা থেকে চাদর সরিয়ে ফেলে তার পেটের ব্যান্ডেজ খুলতে লাগলো।

বাবুলের ব্যথা লাগছে, তার ঘুম ও ওষুধের ঘোর কেটে যাচ্ছে, সে বুঝতে পারলো, এই মাত্র যার সঙ্গে সে কথা বললো, সে তার বিবেক নয়, একজন জলজ্যান্ত মানুষ? নিশ্চয়ই ডাক্তার আজিজ, এমনই দায়িত্বশীল তিনি যে এই অন্ধকারের মধ্যেও বাবুলের ড্রেসিং চেইঞ্জ করে দিতে এসেছেন। কিন্তু আজিজ ডাক্তার এত তাড়াহুড়ো করে টেনে ব্যথা লাগিয়ে দিচ্ছেন কেন?

যন্ত্রণায় বাবুল চেঁচিয়ে উঠলো, আঃ, আঃ, একটু আস্তে!

তখন সেই ছায়ামূর্তি বাবুলের পেটে একটা চাপড় মেরে বললো, চুপ।

এবারে বাবুলের পরিপূর্ণ বোধ ফিরে এসেছে। সে চিনতে পারলো ছায়ামূর্তির কণ্ঠস্বর। মনিরার স্বামী সিরাজুল।

বাবুল অনেকটা স্নেহে বলতে চাইলো, সিরাজুল, সিরাজুল, তুমি এত দেরি করলে!

সিরাজুল বাবুলের পেটের ব্যান্ডেজ সবটা খুলে ফেলেছে। একটা টর্চ জেলে সে ক্ষতস্থানটা দেখলো। তারপর বললো, দেরি হয়েছে বটে, কিন্তু তোমারে ছাড়ছি না। বেজন্মা, দালাল!

বাবুল ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললো, ওরে সিরাজুল, আমার লাগছে! খুব কষ্ট হচ্ছে! ডান দিকের মিটসেফের উপরে দ্যাখ ওষুধ আছে।

সিরাজুল দাঁতে দাঁত চেপে বললো, তোর সব কষ্ট এখনি কি শেষ হবে রে! হারামজাদা! তোর পেটের সব শিলাই ছিঁড়ে নাড়িভুঁড়ি লন্ডভণ্ড করে দেবো! আর্মির পা-চাটা কুত্তা!

অসহ্য ব্যথায় প্রায় অবশ হয়ে গিয়ে বাবুল ফিসফিস করে বললো, আমাকে মারিস না, সিরাজুল! আমি মানিরাকে...

বাবুলের গলা বন্ধ হয়ে আসছে, হাত তুলে সিরাজুলকে বাধা দেবারও ক্ষমতা নেই তার। সে উপুড় হতে চাইলো, পারলো না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সিরাজুল তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা ছুরি বার করলো। তারপর সে আবার বাবুলের উরুর ওপর বসে পড়ে, একহাতে বাবুলের দুটো হাত বন্দী করে অন্য হাতে সাবধানে সেলাই কাটতে লাগলো। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত।

তক্ষুনি ক্যাবিনে এসে ঢুকলো আরও দুটি ছায়া মূর্তি। একজন সিরাজুলের কাঁধ ধরে টেনে বললো, এই সিরাজুল, কী করছিস?

সিরাজুল এবারে প্রচণ্ড জোরে গর্জন করে উঠলো, ছাড়, ছাড় আমারে, এই কুত্তাডারে আমি শ্যাষ কইর‍্যা দেই আগে!

অন্য দু'জন টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো সিরাজুলকে। তিনজনে লেগে গেল ঝটাপটি। পাশের ক্যাবিন থেকে সালেহা চেঁচিয়ে উঠলো, আবার অরা আইছে, অরা আইছে, হায় আল্লা, বাঁচাও বাঁচাও!

চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে জেগে উঠেছে সবাই, ছুটে এলেন ডাক্তার আজিজ আর সুলতানা। ততক্ষণে সিরাজুলের হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে রুমী আর ইশরাক তাকে মাটিতে শুইয়ে চেপে ধরেছে।

আলো জ্বেলে দিয়ে ডাক্তার আজিজ সবিস্ময়ে একবার রক্তাক্ত বাবুলের বিছানা ও একবার তিনজন আগন্তুককে দেখে নিয়ে বললেন, এ কী, রুমী, তোমরা? লোকটাকে মেরে ফেললে?

সুলতানা দ্রুত বাবুলের কাছে চলে এসে তার বুকে হাত রেখে বললো, এখনো বেঁচে আছে, শিগগির গরম পানি আনতে বলো, ইঞ্জেকশান রেডি করো।

তারপর রুমীদের দিকে তাকিয়ে হিংস্র কণ্ঠে বললেন, গেট আউট। ক্লিয়ার আউট! না হলে আমি পুলিশে খবর দেবো!

বাবুল চৌধুরী তবু বেঁচে গেল। বিনা অ্যানেসথেসিয়াতেই আবার সেলাই করা হলো তার পেট। দুদিন পরে সেখানে সামান্য একটু ঘায়ের মতন পুঁজ জমে উঠলেও সেপটিক হলো না। তবে এই অবস্থায় সে কিছুই খেতে পারে না, এমনকি সামান্য দুধও সহ্য হয় না। একবার বমি করতে গিয়ে সে এমন কষ্ট পেল যে তার চেয়ে না খাওয়া অনেক ভালো। তার শরীরটা চুপসে গিয়ে লেগে রইলো বিছানার সঙ্গে।

জাহানারা ইমাম ছাড়া তাকে আর কেউ দেখতে আসে না। আর থাকে সেফু। সে ছলছল চোখ করে চুপটি করে বসে থাকে। সেই রাতের ঘটনার পর সে সাহেবের ঘরে সর্বক্ষণ থাকার জন্য জেদ ধরেছিল, ডাক্তার দম্পতি তাকে অনুমতি দিয়েছেন। ঐটুকু মেয়ে এর মধ্যেই বেশ নার্সিং শিখে গেছে।

বাবুল আর বই পড়ে না, সর্বক্ষণ চুপ করে ওপরের দিকে চেয়ে থাকে। সেফু কথা বলার চেষ্টা করলে সে এক একবার দুর্বল হাতখানি তুলে সেফুর মাথায় রাখে। এই মেয়েটার বাপ-মা নেই।

জাহানারা ইমাম এসে নানারকম খবরাখবর শোনান। তিনি দু'একদিন আগে শহিদ মিনারের দিকটা দেখতে গিয়েছিলেন। শহিদ মিনার ভেঙে চুরমার হয়ে আছে, সেখানে নাকি সরকার মসজিদ বানাবে। রমনার প্রাচীন কালীবাড়ি ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, সেখানে যে কোনোকালে মন্দির ছিল তা বোঝাই যায় না। রায়েরবাজার মোকাররমের অনেক দোকানপাট লুঠ হয়েছে। নিউজ উইকে প্রবন্ধ বেরিয়েছে, 'পাকিস্তান প্লাঞ্জেস ইন টু সিভিল ওয়ার'। লিখেছে লোরেন জেংকিনস, সে নিজে ক্র্যাক ডাউনের সময় ঢাকায় উপস্থিত ছিল। এখন আর পাকিস্তান সরকার বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিতে পারবে না যে কিছু ভারতীয় চরের উস্কানিতে এখানে সেখানে ছোটখাটো গণ্ডগোল হচ্ছে।

কথাবার্তা প্রায় এক তরফাই হয়। বাবুল অধিকাংশ সময় চুপ করেই থাকে। একদিন সে হঠাৎ

জিজ্ঞেস করলো, আপা, আমি যে মানিরাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, তা ওরা বিশ্বাস করলো না। আপনিও কি অবিশ্বাস করেন?

জাহানারা বললেন, না, না, অবিশ্বাস করবো কেন? সেফু আমাদের সব বলেছে। বাবুল, তোমার মতন ভদ্র মানুষ কখনো মেয়েদের অপমান সহ্য করবে, এ কেউ ভাবতে পারে না। রুমীরাও তোমাকে বিশ্বাস করে। সিরাজুলের কথা বাদ দাও, ওর প্রায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জানোই তো মনিরাকে ও কত ভালোবাসতো!

–সিরাজুলকে একবার ডেকে আনতে পারেন?

–সে তো এখানে নাই। আবার অ্যাকশানে যোগ দিতে চলে গেছে।

–কোথায় গেছে? কোন্ দিকে গেছে?

–তা তো জানি না। সে সব কথা কি আর আমাকে বলে!

–সিরাজুলের সাথে আমার আর একবার দেখা করা খুব দরকার!

অন্য রুগীদের স্থান দেওয়া যাচ্ছে না, তাই বাবুলকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো কয়েকদিন পরেই। এখন তার প্রয়োজন শুধু বিশ্রাম। এখনও তার বাব-মা কোনো খবর পাননি বোধহয়।

শরীরে একটু জোর পাবার পর বাবুল প্রথম দু'তিনদিন ঘরের মধ্যে পায়চারি করলো, সেফুকে ধরে ধরে। তারপর সে নিজে হাঁটতে শিখলো। দোতলা থেকে একতলায় নামতে পেটে ব্যাথা বোধ হলো কিছুটা, কিন্তু ব্লিডিং হলো না।

সিঁড়ির ঠিক যেখানটায় খান সেনারা বাবুলকে গুলি করেছিল, সেখানে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। সে মরে যায়নি, সে একটা নতুন জীবন পেয়েছে।

সেইদিনই মঞ্জুর ভাই আপেল এসে উপস্থিত হলো।

শ্বশুর বাড়ির লোকেরা যে কেউ ঢাকায় নেই তা জানতো বাবুল। মঞ্জুর বাবা অনেকদিন অসুস্থ, তাঁকে রাখা হয়েছে গ্রামের বাড়িতে, তিনি প্রায় সব সময় বিড়বিড় করে আপন মনে হামদ্, নাত, দরুদ, মিলাদ পাঠ করেন আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠেন, ঐ আসছে, ঐ আসছে! মঞ্জুর মা পড়েছেন বিপদে, ছেলেগুলো কোনো কম্মের না, এই আপেলও ব্যবসা করতে গিয়ে অনেক টাকা খুইয়েছে। অন্য সবাই গ্রামে, শুধু আপেল সস্ত্রীক রয়ে গেছে ঢাকার বাড়িতে। মাত্র দু'দিন আগে সে কানা ঘুষোয় শুনেছে। যে দুলাভাই বাবুল চৌধুরী নাকি গুলি খেয়ে মরতে বসেছে।

এখন সে বাবুলকে সুস্থ দেখে চমকে গেল। ঢাকায় এখন কত রকম গুজবই যে ছড়াচ্ছে রোজ। বাবুলও তার কাছে সত্যি কথা ভাঙলো না। হেসে উড়িয়ে দিল গোলাগুলির কথা।

পরদিন বাবুল সিঁড়ি দিয়ে ওপর নীচ করলো দু'তিনবার। তেমন আর অসুবিধে হচ্ছে না। আর দেরি করা যায় না। সন্ধেবেলা সে সেফুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, আমি যদি এই বাসা এখন তালা দিয়ে চলে যাই, তুই কী করবি? কোথায় যাবি?

হাতির পুলের কাছে সেফুর এক গ্রাম সম্পর্কে চাচা থাকে, সে একজন কসাই, সেখানে সেফু কিছুতেই যেতে চায় না। সে বাবুলের হাত জড়িয়ে ধরে ভয় পেয়ে বলে উঠলো, আমি কুথাও যামু না, কুথাও যামু না। ভাবী আমারে বলে গেছেন আপনের লগে লগে থাকতে।

বাবুল তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললো, শোন, আমারে যে কাজে যেতে হবে। এইখানে বসে থাকলে, আবার যদি মিলিটারি আসে? বুঝলি না? তুই প্রথমে জাহানারা আপার বাসায় যাবি, বলবি, সাহেব আমারে আপনের এখানে থাকতে বলেছেন। উনি খুব ভালো মানুষ, তোরে রাখবেন। আর যদি দেখিস, ওঁর বাসায় অনেক লোকজন, তোর থাকোনের জায়গা নাই। তাইলে তুই যাবি আপেল সাহেবের বাড়ি। সে বাড়ি চেনোস তো!

সেফু আবার বললো, সাহেব আমি কুথাও যামু না, আমি এই বাসাতেই থাকুম!

বাবুল বললো, দূর বোকা! আমি চলে গেলে তুই একা থাকবি কী করে, তোরে মিলিটারি ধরে নিয়ে যাবে না? শোন, তুই কিন্তু ঠিক জাহানারা আপা কিংবা আপেল সাহেবের বাসায় থাকবি, অন্য কোনো বাসায় কাজ নিবি না। তাহলে আমি ফিরে এসে আবার তোরে খুঁজে পাবো কী করে?

সব ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে, সদর দরজায় তালা দিয়ে বাবুল বললো, সেফু, তুই এখানে কিছুক্ষণ বসে থাক। আমি চলে যাবার আধঘন্টার মধ্যে কাউকে কিছু বলবি না। আমি একটা কাজে

যাচ্ছি রে, সেফু। ফিরে আসলে আবার তোরে ডেকে নিয়ে আসবো। মন খারাপ করিস না, কেমন?
বাবুলের নিজেরই চোখ ছলছল করছে সেফুকে ছেড়ে যেতে। তবু সে একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়লো। মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

॥ ২০ ॥

প্রায় হাজারখানেক নারী-পুরুষ বড় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে বাস থামালো। এমন ভাবে থামাবার দরকার ছিল না, এখানে এমনিই বাস স্টপ আছে, তবু সবাই বাসটাকে ঘিরে লাফিয়ে লাফিয়ে চিৎকার করতে লাগলো, জয় বাবা কালাচাঁদ! জয় বাবা কালাচাঁদ! অন্যান্য বাসযাত্রীরা হারীত মণ্ডলকে দেখে ভাবলো, তার নামই বুঝি কালাচাঁদ!

হারীতের মুখে এখন ঘন চাপ দাড়ি। মাথার চুল, এখন কিছুটা পাতলা হয়ে গেলেও সে কাটে না কখনো, কাঁধ ছাড়িয়ে নেমেছে। পরনে একটি গেরুয়া রঙে ছোপানো লুঙ্গি ও ফতুয়া, হাতে একটি তেল চুকচুকে লম্বা বাঁশের লাঠি। কলোনির দুঃখী মানুষেরা প্রত্যেক পরিবার থেকে আট আনা করে চাঁদা তুলেছে হারীতের জন্য, তার গলায় পরিয়েছে তিনখানা মোটা মোটা গাঁদা ফুলের মালা, তাদের নেতাকে তারা পাঠাচ্ছে মুক্তির সন্ধানে।

হারীত সঙ্গে নিতে চেয়েছিল শুধু যোগানন্দকে, একজন কেউ সঙ্গে থাকা ভালো, সে নেতা হলেও ফিরে এসে তার লোকজনকে যে-সব খবরাখবর শোনাবে, তার একজন সাক্ষী থাকা দরকার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জোরজার করে বাসে উঠে পড়লো গোলাপীর ছেলে নবা, সে কিছুতেই হারীতকে ছেড়ে থাকবে না। বাস ছাড়তে দেরি হয়ে গেল সেইজন্য। নবার যাওয়া ব্যাপারে জনমত দ্বিধা বিভক্ত, কিন্তু সকলেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গোলাপী বাসে উঠে এসে টানাটানি করতে লাগলো নবাকে, সে দু'হাতে হারীতের হাঁটু ধরে আছে শক্ত করে। শেষপর্যন্ত হারীত বললো, আচ্ছা, থাক, ও আমার সাথে যাক, তোরা চিন্তা করিস না!

বাসুদেব একটু দূরে একটা জানলার ধারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। গোলাপীর দিকে একবারও তাকাবার পর্যন্ত সাহস নেই তার। বুকের মধ্যে ট্রেনের ইঞ্জিনের মতন আওয়াজ হচ্ছে। এখনও সে বিশ্বাস করতে পারছে না হারীত মণ্ডলকে। হয়তো এই কলোনি থেকে অনেকটা দূরে চলে গিয়ে হারীত আর যোগানন্দ তার হাত-পা ভেঙে দেবে!

বাসে যেতে হবে রায়পুর, সেখান থেকে ট্রেন।

হারীত গলা থেকে মালাগুলো খুলে ফেললো। এমন অসহ্য গরম যে গায়ে কিছু রাখতে ইচ্ছে করে না। বাসে ভিড় বেশ নেই, হারীত নবাকে ভালো করে পাশে বসালো। টাকাকড়ি যা উঠেছে, তা সে দিয়েছে যোগানন্দের কাছে। নোট নেই, খুচরো পয়সার একটা তোড়া।

কন্ডাকটর সামনে আসতেই হারীত যোগানন্দকে বললে টিকিট কাট।

কন্ডাকটর বিগলিত মুখে বললো, নেহি সাধুবাবা, আপলে কো টিকিট নেহি লাগে গা।

একটু নীচু হয়ে সে ভক্তিভরে হারীতের দুই হাঁটু স্পর্শ করলো।

সাধুদের টিকিট লাগে না! হারীত সাধুর ভেক ধরেছে পুলিশের নজর এড়াবার জন্য। কলকাতা ও চব্বিশ পরগণায় তার প্রবেশ নিষেধ, পুলিশের এই আদেশ এখনও জারি আছে কিনা সে জানে না, তবু সে ঝুঁকি নিতে চায়নি। সাধু সাজলে টিকিটের পয়সাও বাঁচানো যায়? তা হলে কি ট্রেনেও টিকিট কাটতে হবে না? মাত্র দু'শো বাইশ টাকা সম্বল করে তারা তিনজন চলেছে পশ্চিমবাংলায়।

হারীত কন্ডাক্টরের মাথায় হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ জানালো, জিতা রহো! ভগবান তুমহারা মঙ্গল করে গা!

হারীতের একটা বিড়ি খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু এই সাধুবেশে বিড়ি ধরানো ঠিক হবে না। অন্যদের বিড়ি-সিগারেটের গন্ধে তার চিত্ত চঞ্চল হচ্ছে, তাই চোখ বুজে রইলো সে।

প্রায় আট ঘন্টার পথ, এই গরমের মধ্যে শুধু বসে বসে ঝিমোনো ছাড়া আর কিছুই করার নেই। মাঝখানে কোনো একটা জায়গায় চা খেতে নেমে বাসুদেবের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল নবার। নবাকে সে জিলিপি খাওয়ালো। যোগানন্দ পাশে এসে দাঁড়াতে তাকেও সে কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কিছু খাবেন? আমি দশ টাকার নোট দিয়েছি, খুচরো দিতে পারছে না...

সাধু-সুলভ সংযম দেখিয়ে হারীত চা বা জিলিপি কিছুই খেল না।

রায়পুর স্টেশনেও অপেক্ষা করতে হবে পাঁচ ঘন্টা। ট্রেন আসবে রাত তিনটের সময়। যোগানন্দর জন্য একখানা ও নবার হাফ টিকিট কাটা হয়েছে, নিজের জন্য টিকিট না কিনে হারীত পরীক্ষা করে দেখতে চায়। যদি সে নিজের টিকিটের পয়সাটা বাঁচাতে পারে, তা হলে ফেরার সময়ে যোগানন্দ আর নবাকেও গেরুয়া রঙের কাপড় পরিয়ে আনবে। আর যদি ধরে, টিকিট চেকারের দয়া না হয়, তা হলে আর এমন কী হবে, বড় জোর নামিয়ে দেবে মাঝখানের কোনো স্টেশনে। তখন দেখা যাবে!

বাসুদেব ওদের নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে নিয়ে এসেছে, সে প্লাটফর্ম এখন নিঝুম, নির্জন। যোগানন্দ আর নবা ঘুমিয়ে পড়লো একটু বাদেই। হারীতদের সঙ্গে কোনো মালপত্র নেই। শুধু দুটি ঝোলা। বাসুদেব টিনের সুটকেস ও সতরঞ্চি জড়িয়ে বাঁধা বেডিং এনেছে, তার ওপরে সে বসে আছে একটু দূরে, ক্ষীণ আলোয় একটা খাতা খুলে কিছু পড়ছে।

সেদিকে একটুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হারীত বললো, ছোটবাবু, একটু শুনেন!

সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো বাসুদেবের। ফ্যাকাসে মুখখানি ফিরিয়ে সে হারীতকে দেখলো। বয়েস হলেও হারীতের শরীরটা এখনও বেশ মজবুত, টানটান। প্রকৃত সাধুর ভঙ্গিতে সে জোড়াসনে সিধে হয়ে বসেছে, পাশে রাখা লাঠিখানা, এখন সে একটা বিড়ি ধরিয়েছে বটে কিন্তু সেটিকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে সে টানছে গাঁজার কল্কের মতন। হারীতের মাথার পেছনেই, খানিকটা দূরে জ্বলজ্বল করছে সিগন্যালের লাল আলো।

এখন হারীত লাঠিটা ঘুরিয়ে একবার মারলেই বাসুদেবের মাথাটা ছাতু হয়ে যাবে!

সে প্রায় লাফিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে হারীতের পায়ের ওপর পড়ে বললো, আমাকে দয়া করুন, আমাকে দয়া করুন! আমি ক্ষমা চাইছি, আমি আপনার শিষ্য হবো!

হারীত বিব্রত ভাবে পা সরিয়ে নিয়ে বললো, এ কী! আপনে ব্রাহ্মণ হয়ে আমার পায়ে হাত দ্যান ক্যান? ছি ছি, এতে আমারই পাপ হবে!

–আপনি সাধু পুরুষ, সাধুদের কোনো জাত নেই। জয় বাবা কালাচাঁদ! জয় বাবা কালাচাঁদ!

–আপনে ভালো করেই জানেন যে আমি আসল সাধু না! বসন রাঙাইলেই কি যোগী হওন যায়? আমি মুখ্যু মানুষ, তন্ত্রমন্ত্র কিছুই জানি না।

–আপনি আমাকে দয়া করুন!

–শোনেন, ঠিক হয়ে বসেন। আপনের একটা কথা জিগাই, সঠিক উত্তর দেবেন। আপনে আমার মাইয়া গোলাপীরে রাইতের বেলা আপনার বাসায় ডাকছিলেন পদ্য শুনাবার জইন্য? সত্য কথা বলেন!

–আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি বিশ্বাস করুন। অন্য সময় এলে লোকে পাঁচ কথা বলতো, তাই ভেবেছিলুম, রাত্তির বেলা, যখন অন্য কেউ জানতে পারবে না, তখন নিরিবিলিতে তাকে একটু কবিতা শোনাবো!

–আপনের অন্য কোনো মতলোব ছিল না? রাত্তিবেলা একজন সোমথ মেয়েরে ডেকে এনে তার গায়ে হাত দ্যান নাই?

–আমি তার পায়ে হাত দিয়েছি। মা কালীর দিব্যি, আমি শুধু তার পা দু'খানা ধরে–

–কী পদ্য তারে শুনায়েছিলেন, আমারেও শুনান।

–আজ্ঞে?

–আমারেও সেই পদ্য শুনান।

–সে এমন কিছু নয়, আপনার ভালো লাগবে না। আমার লেখা দেখে অনেকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। কোনো মেয়ে কখনো আমার লেখা পড়েনি, তাই আমি ভেবিছিলুম...

–এখন পড়েন তো দেখি।

বাসুদেব খাতাটা নিয়ে আসতে বাধ্য হলো। পাতা উল্টে যেতে লাগলো, গোলাপীকে যে কয়েকটা কবিতা সে শুনিয়েছিল, সেগুলি হারীতকে শোনাতে তার সাহস হলো না। সেগুলি নারী বিষয়ক। সে কাঁপা কাঁপা গলায় অন্য একটি কবিতা পড়তে শুরু করলো:

শুকনো নদী শূন্য মাঠ নিরানন্দ গাঁ
যেখানে যাই যেদিকে চাই তোমাকে দেখি মা...

সমস্ত মনোযোগ ভুরুতে এনে চুপ করে শুনলো হারীত। সে লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি বটে কিন্তু

সেও একজন শিল্পী। সে এক সময় মাটি দিয়ে ঠাকুর দেবতার মূর্তি গড়েছে। এখনও সে ভালো মতন একটা কাঠের টুকরো পেলে পুতুল বানাতে পারে। তার চোখের সামনে কোনো মূর্তি লাগে না, তার আঙুলের খেলায় অবিকল মানুষের মূর্তি ফুটে ওঠে।

একজন শিল্পী অন্য শিল্পের তরঙ্গও ঠিকই অনুভব করে। কবিতার সব শব্দ ব্যবহার সে ঠিকমতন না বুঝলেও কাব্যরস তার মন স্পর্শ করলো। ক্যাম্প অফিসের একজন কেরানী, যার কাজ টাকা-পয়সা, চাল-ডালের হিসেব রাখা, এই কবিতাগুলির মধ্যে সে যেন একেবারে একজন অন্য মানুষ।

খানিকক্ষণ শোনার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হারীত বললো, আপনে একজন দুঃখী, তাই না? আমার মেয়েটাও বড় দুঃখী, ছোটবাবু! তার কোনো দোষ নাই, যেমন মনে করেন মাটি, মাটির কি কোনো দোষ আছে, তবু মানুষে মাটির জন্য কামড়াকামড়ি করে। আমি কইলকাতায় যাইতাছি, ছোটবাবু, যদি কোনো কারণে আর না ফিরি, যদি পুলিশে আমারে ধইরা রাখে, আপনে আমার মেয়েটারে দ্যাখবেন। লোকে যা কয় কউক, আপনে তারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাইখ্যেন।

এরপর হারীত অনেকক্ষণ গল্প করলো বাসুদেবের সঙ্গে। এক সময়ে ঝমঝমিয়ে এসে গেল ট্রেন। থার্ড ক্লাস কামরায় প্রচণ্ড ভিড়, তার মধ্যে কোনো ক্রমে উঠে পড়লো ওরা। সারা রাস্তায় কেউ টিকিট দেখতে এলো না।

বাসুদেব নেমে গেল খড়গপুরে। ট্রেনও ফাঁকা হয়ে যেতে লাগলো। হারীত বেশী বেশী সাধু সেজে ধ্যানে বসে রইলো চোখ বুজে। যদিও অনেক লোক উঠে দাঁড়িয়ে থাকছে দরজার কাছে, আবার নেমে যাচ্ছে দু'এক স্টেশন পরে, তাদের টিকিটের কোনো ব্যাপারই নেই মনে হয়। নবা খুব অবাক হয়ে গেছে চতুর্দিকে এত বাংলা কথা শুনে। স্টেশনের নাম বাংলায় লেখা, ট্রেনের মধ্যে উঠে হকাররাও চ্যাচাচ্ছে বাংলায়।

হাওড়া স্টেশনে এসে ওরা পৌঁছোলো সকাল দশটায়। এই সময় অফিসযাত্রীর এমনই ভিড় ও ঠেলাঠেলি যে টিকিট দেখার যেন প্রশ্নই নেই, ওরা সেই জনস্রোতে প্রায় ভাসতে ভাসতেই বেরিয়ে এলো বাইরে।

নবা বললো, এঃ, আমরা ক্যান টিকিট কাটলাম? রেলে টিকিট লাগে না!

হারীতও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এত সহজে পয়সা বাঁচানো যাবে সে আশা করেনি। ফেরার সময়ে তা হলে আর চিন্তা নেই। ট্রেনে ভালো খাওয়া হয়নি, এখন আগে পেট ভরে খেয়ে নিতে হবে।

হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে আসবার পর কলকাতার মাটিতে পা দিয়ে হারীতের বুক নয়, সমস্ত শরীর টনটন করে উঠলো। এখানে সে কম মার খায়নি। পুলিশের চোখে সে মার্কামারা হয়ে গিয়েছিল, পুলিশ তাকে যখন তখন মেরেছে। মেরে মেরে তাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। সেইসব পুলিশের লোকেরা এখনও কি তাকে চিনতে পারবে?

ছেলেটার খবর নিতে হবে। রাস্তার নাম মনে আছে, মোহনবাগান লেন। সে রাস্তা অনেক দূরে। তার আগে বোধহয় পড়বে তালতলা। রাত্তিরে থাকার জন্য তালতলার মা জননীর কাছে আশ্রয় চাইলে পাবে না?

নবার কাঁধ চাপড়ে হারীত বললো, চল, তোগো আইজ একটা নতুন জিনিস খাওয়ামু। এই কইলকাতা শহরে খাওনের অনেক মজা।

মাঠ-জঙ্গলের তুলনায় কলকাতার পিচের রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটা বেশী কষ্টকর, কলকাতার গরমে ঘামও বেশী হয়, তবু ওদের যেন কোনো কষ্টই হচ্ছে না। এটা কলকাতা, এই নামটার মধ্যেই একটা জাদু আছে।

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে ওরা এসে উপস্থিত হলো মনুমেন্টের কাছে। আগে কয়েকবার এসপ্ল্যানেড-ডালহাউসি অঞ্চলে মিটিং-মিছিলে এসে হারীত কিছু শস্তার খাওয়ার জায়গা খুঁজে বার করেছিল। সে জেনেছিল যে কলকাতার রিকশাওয়ালা ঠেলাওয়ালারাই সব চেয়ে শস্তায় খায়। সে খাবার এমন কিছু খারাপও নয়।

মনুমেন্টের পায়ের কাছে ওরা এক দোকানীর সামনে বসে পড়লো। ঝকমকে কাঁসার থালাভর্তি ছাতু, সঙ্গে নুন আর কাঁচালঙ্কা। আর এক ঘটি জল। হারীত আগে দেখে গিয়েছিল, এই খাদ্যের দাম

আনা পয়সা, এখন এক টাকা কুড়ি পয়সা হয়েছে। আরও কিছু পয়সা দিলে খানিকটা চিনিও দেয়। আট আনার চিনি কিনে নিয়ে সে নবার ছাতুতে জল ঢেলে, চিনি মিশিয়ে কয়েকটা গোল্লা পাকিয়ে বললো, এবার খাইয়া দ্যাখ, নতুন রকমের মিঠাই।

সেই ছাতু গোলা খুব আগ্রহের সঙ্গে মুখে দিল নবা, খুব যে ভালো লেগেছে তা তার চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল না, তবু অল্প বয়েসের ক্ষুধায় খেতে লাগলো একটা একটা করে। যোগানন্দ নুন-কাঁচালঙ্কা দিয়েই পুরো ছাতুটা উড়িয়ে দিল, হারীত নিজেই ভালো করে খেতে পারলো না, তার গলায় আটকে আটকে যাচ্ছে। তিন ঘটি জলই শেষ করে ফেললো সে।

কলকাতার রাস্তাঘাট ভালো করে জানা নেই হারীতের, তবু সে আন্দাজে আন্দাজে পৌঁছে গেল তালতলায়। ত্রিদিবের বাড়ির সামনের দিকটা অনেকটা বদলে গেছে, লোহার গেট বসেছে, সেখানে একজন নেপালী দারোয়ান। সেই দারোয়ান হারীতের কোনো কথায় পাত্তাই দিতে চাইলো না। বাড়ির ভেতর থেকে একজন অবাঙালী ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেয়া হুয়া, সাধুবাবা? আইয়ে, অন্দর আইয়ে, কৃপয়া বৈঠকে যাইয়ে!

হারীত ভেতরে গেল না, কিন্তু সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝলো, তিনি ত্রিদিব-সুলেখার নাম শোনেননি। এ বাড়ি তারা মাত্র গত বছরই কিনেছেন, সেই বাড়িওয়ালাও বাঙালী ছিল না।

হারীত খুব ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেল। তবে কি তার বাড়ি চিনতে ভুল হচ্ছে? সে গলি দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেল অনেকখানি। পুলিশের তাড়া খেয়ে আহত অবস্থায় দৌড়ে এসে যে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে ত্রিদিবের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো। দেয়ালে নোনা ধরেছে, তাছাড়া বাড়িটার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ত্রিদিবেরই কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি এটা। প্রায় পা মেপে মেপে সেখান থেকে হারীত আবার ফিরে এলো, এখানে সে অনেকবার এসেছে, তার ভুল হবার কথা নয়। ত্রিদিবের বাড়ি থেকেই সে গ্রেফতার হয়েছিল। দু'পাশের দুটো বাড়ি অবিকল এক আছে, মাঝখান থেকে ত্রিদিব-সুলেখার বাড়িটাই অদৃশ্য হয়ে গেছে!

পাশের দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে একজন খালি-গায়ে, লুঙ্গি পরা মাঝবয়েসী লোক বললো, আপনি ত্রিদিববাবুকে খুঁজছেন? উনি তো এ বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন অনেকদিন! তারপর দু'বার এ বাড়ি হাতবদল হয়ে গেল।

হারীত মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, ওনারা কোথায় গেছে? ঠিকানাটা বলতে পারেন?

লোকটি বললো, প্রথমে তো দিল্লি চলে গেলেন। তারপর কোথায় গেছেন জানি না। ও হ্যাঁ, একবার মাঝখানে ত্রিদিববাবু এলেন বাড়ি বেচবার সময়, তখন উনি বললেন, উনি শিগগির বিলেতে যাচ্ছেন। হ্যাঁ। আরও কে যেন বললো একদিন, ত্রিদিববাবু বিলেতেই থাকেন।

—বিলাতে চলে গেছেন? ওনার ইস্ত্রীও গেছেন কি?

—ওঁর স্ত্রী তো.... কী যেন হয়েছিল...

লোকটি পেছনে মুখ ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে কাকে যেন জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁগো, সুলেখাবৌদির কী যেন হয়েছিল?

ঘরের ভেতর থেকে একজন কী উত্তর দিল তা বোঝা গেল না। লোকটির চোখ-মুখ কুঁচকে গেল, কী যেন চিন্তা করে বললো, নাঃ, সুলেখাবৌদির কী হয়েছে আমরা জানি না।

আগ্রহ হারিয়ে লোকটিও ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। হারীত তবু তাকিয়ে রইলো সেই বারান্দার দিকে। সুলেখার সঙ্গে দেখা হবে না? গজদাত্রীর মতন রূপ সেই নারীর, হারীত তাকে মা জননী বলে ডেকেছিল। সেরকম দয়াবতী রমণী আর কখনো দেখেনি হারীত। কলকাতা শহরটাই শূন্য মনে হলো।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এসে কিছুক্ষণ বসলো হারীত। যোগানন্দ কোনো কথা বলছে না, কিন্তু নবা ছটফট করছে। সে কখনো ট্রাম দেখেনি, সিনেমার পোস্টার দেখেনি। এত বড় বড় বাড়ি দেখেনি। আইসক্রিমওয়ালা দেখেনি। তাকে আট আনা দিয়ে একটি লাল রঙের কাঠি আইসক্রিম কিনে দিতেই হলো। এই প্রথম বরফ স্পর্শ করলো তার জিভ।

এবার যেতে হবে মোহনবাগান লেনে। কিন্তু সুলেখাকে দেখবার জন্য হারীত যতখানি উৎসাহ

নিয়ে এসেছিল, নিজের ছেলের কাছে যাবার জন্য তেমন উৎসাহ বোধ করছে না। ছেলে যদি লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হয়ে গিয়ে থাকে, সে কি তা হলে চিনতে পারবে বাবাকে? ছেলে এতদিন কোনো খোঁজ তো নেয়নি, চেষ্টা করলে কি খোঁজ নেওয়া যেত না? হারীত দু'বার পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল, তারও কোনো উত্তর আসেনি। হয়তো ঐ ঠিকানায় এখন ওরা থাকে না।

যে-মহিলার কাছে ছেলে রেখে গিয়েছিল হারীত, আশ্চর্য ব্যাপার, তার নামটি মনে আসছে না। কোথায় যেন নাম ঠিকানা লেখা ছিল, সে কাগজ হারিয়ে গেছে এতদিনে। মহিলাকে কেমন দেখতে ছিল তাও মনে আসছে না হারীতের। শুধু সুলেখার মুখখানাই চোখের সামনে ভাসছে। সহজে ভেঙে পড়ে না হারীত, এখন তার চোখ ফেটে জল আসছে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজারের দিকটা হারীতের মনে আছে, ট্রাম লাইন ধরে সোজা হাঁটা পথ। নবা ট্রামে ওঠবার জন্য বায়না ধরলেও হারীতে কর্ণপাত করলো না। নিঃস্ব মানুষদের চাঁদার পয়সা, যেমন তেমন ভাবে খরচ করা যায় না। মে মাসের রোদে পিচ গলে যাচ্ছে, পায়ে পিচ লেগে যাওয়ায় নবা বেশ মজা পাচ্ছে। সে ইচ্ছে করে আরও পিচ মাখছে।

মোহনবাগান লেনের বাড়িটাও পাওয়া গেল একসময়ে। এ রাস্তায় তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। বাড়িটার সামনে একটা চাঁপা ফুলের গাছ। ঘোর দুপুরে সুনসান করছে পাড়া। বড় পাল্লাওয়ালা কাঠের দরজাটায় ধাক্কা দিতেই একজন কিছুটা ফাঁক করে হারীতের আপাদমস্তক দেখে বললো, এখন ভিক্ষেটিক্ষে হবে না, যাও যাও!

বিশ্রী মানসিক অবস্থার মধ্যে হারীত ক্লিষ্ট ভাবে হাসলো। কলকাতার মানুষ সাধু-সন্ন্যাসীর ভড়ং দেখলেও সহজে ভোলে না। সাধু দেখলে ভিখিরি মনে করে। সে যোগানন্দর দিকে করতে হয়নি। তারা বাস্তুহারা, কিন্তু ভিক্ষুক নয়।

প্রকৃত সাধুর মতনই হারীত হুংকার দিয়ে বললো, জয় বাবা কালাচাঁদ! জয় বাবা কালচাঁদ! দরজা আবার ফাঁক করে লোকটি বিরক্তির সঙ্গে বললো, আরে বলছি যে এখানে কিছু হবে না! অন্য জায়গায় যাও বাবা!

হারীত বললো, এই বাড়ীতে আসছি, অইন্য জায়গায় যাবো কেন? তোমার বাবুদের ডাকো। সুচরিতবাবু কোথায়?

লোকটি ভুরু কুঁচকে বললো, সুচরিতবাবু? সে আবার কে? ভুল জায়গায় এসেছো, সাধুবাবা, এ বাড়িতে ঐ নামের কেউ নেই?

–সুচরিত এই বাড়িতে নাই?

–বললুম তো, তোমার ঠিকানা ভুল হয়েছে।

হারীত অতি কষ্টে অপ্রস্তুত ভাবটা দমন করলো। সেই মহিলার নাম এখনও তার মনে পড়ছে না। এ বাড়িতে আর কে কে থাকতেন, তাও সে জানে না। হঠাৎ বিদ্যুতের মতন একটা নাম মাথায় এসে গেল। অসমঞ্জ! এই মাস্টার ভদ্রলোকই প্রথম তার ছেলের ভার নিয়েছিল। তার ঠিকানাও হারীতে জানা নেই। এই বাড়ি থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলে ছেলের সন্ধান পাবার আর কোনো সূত্রই থাকবে না হারীতের।

সে বললো, অসমঞ্জবাবু এ বাড়িতে আসেন না? তাঁর সাথে আমার দেখা করার যে খুব প্রয়োজন ভাইডি!

একটা চেনা নাম শুনে লোকটির মুখ থেকে সন্দেহের ভাব ঘুচে গেল। দরজাটা পুরো খুলে দিয়ে বললো, ভেতরে ছায়ায় এসে বসো! মাস্টারদাদাকে খুঁজতে এসোছো তো আশ্রমে যাওনি কেন?

–আশ্রম মানে, কিসের আশ্রম? কোথায়?

দোতলার জানলা খুলে আনন্দমোহন জিজ্ঞেস করলেন, কে রে বীরু?

আনন্দমোহনকে মাত্র একবারই দেখেছিল হারীত কিন্তু এখন মুখ তুলে তাকিয়েই চিনতে পারলো। যাক, তাহলে ত্রিবিদ-সুলেখার মতন ব্যাপার এখানে হবে না।

সে বললো, আজ্ঞে, আমরা অনেক দূর থিকা আসতেছি!

আনন্দমোহন হাত তুলে অপেক্ষা করতে বলে নিচে এলেন। সামনের চত্বরটা পার হয়ে এরা তিনজনে এসে বসলো একতলায় বারান্দায়।

ধুতি ও ধপধপে গেঞ্জি পরা আনন্দমোহন ভেতরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দু'হাত জোড় করে বললেন, নমস্কার! আপনারা কোন আশ্রম থেকে আসছেন বললেন?

হারীত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি চমকে বললেন, আরে একী একী, আপনি সাধু মানুষ, আমার পায়ে হাত দিচ্ছেন!

হারীত বললো, আপনি ব্রাহ্মণ। আমি সাধু না, আমি একজন সামান্য রিফিউজি। সরকার আমাগো দণ্ডকারেণ্য নির্বাসন দিছে। সাহস কইরা আবার কইলকাতায় আইয়া পড়ছি একটা সংবাদ নিতে।

আনন্দমোহন অস্ফুট স্বরে বললেন, হারীত মণ্ডল!

–আজ্ঞে আপনের সাথে আমার একবার দেখা হইছিল, অনেক বৎসর আগে, আপনার নিশ্চয় মনে নাই–

–আপনার চেহারা দেখে চিনতে পারিনি। কিন্তু হারীত মণ্ডল নামটা ঠিকই মনে আছে?

–আপনে আমাকে তুমি করে বলেন। গেরুয়া পরেছি ময়লা কম হয় তাই, আমি অতি নগণ্য মানুষ। আমার পোলাডারে, মানে আমার ছেলেরে আপনাগো কাছে রেখে গেছিলাম, বাপ হয়েও এতদিন তার কোনো খবর নিতে পারি নাই, সে কেমন আছে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনন্দমোহন বললেন, আমি জানতাম, আপনি একদিন ফিরে আসবেন। আপনার ছেলে... আপনার ছেলে সে অনেকদিন হলো এখানে থাকে না।

–অন্য জাগায় বাসা ভাড়া নিছে?

আনন্দমোহন দ্বিধা করতে লাগলেন। হারীতকে দেখে পুরনো অপরাধবোধটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সুচরিতের বাবাকে তিনি কী উত্তর দেবেন, সুচরিত বেঁচে আছে কি না তাও তিনি জানেন না।

চন্দ্রা গেছে নৈহাটির আশ্রমে, কালই তার ফেরার কথা। যা কিছু বলার চন্দ্রাই বলবে। তিনি ভাসা ভাসা ভাবে হারীতকে উত্তর দিলেন, সে যেন কোথায় আছে, আমি ঠিক জানি না, আমার মেয়ে জানে, আপনারা আসুন, ভেতরে এসে বসুন। ওরে বীরু, চা করতে বল তো!

চা খেতে খেতে হারীত চন্দ্রার আশ্রম বিষয়ে অনেক কথা শুনলো। তার ছেলের কথা যে এই ভদ্রলোক এড়িয়ে যাচ্ছেন তা বুঝতে হারীতের দেরি হলো না। হ্যাঁ, চন্দ্রা, নামটা মনে পড়েছে এবার, চেহারাটাও ফিরে এসেছে স্মৃতিতে। সেই ঠোঁটে রংমাখা, সিগারেট ফোঁকা মেয়েছেলেটি সন্ন্যাসিনী হয়েছে, এ তো ভারি আশ্চর্যের কথা!

আনন্দমোহন হারীতকে চন্দ্রার আশ্রমে ঠিকানা দিয়ে দিলেন। সেখানে অতিথিশালা আছে, হীরাতরা রাত্তিরে থেকে যেতেও পারবে। কিন্তু হারীত পাতিপুকুরের দিকে গেল না। সে গেল কাশীপুরে।

সরকারদের যে বাগানবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল হারীত, সে বাড়িটি কিন্তু এখনো উদ্বাস্তুদের দখলেই। সে বাড়ির ভাঙা পাঁচিলের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লো হারীত। যোগানন্দ এই বাড়ি দেখেনি, সে প্রথম থেকেই আশ্রয় পেয়েছিল কুপার্স আর নবার তো জন্মই বাংলার বাইরে।

এখনকার রিফিউজি কলোনির চেহারা অনেকটা বদলেছে। প্রত্যেকটি পরিবারের টুকরো টুকরো জমিতে বেড়া দেওয়া আলাদা বাড়ি। কারুর কারুর বাড়িতে ইঁটের দেওয়াল। গাছ কাটা পড়েছে অনেক, মাঝখানের নাচঘরটি ধসে পড়েছে প্রায়। ভেতরে যে-সব বাচ্চাকাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা একেবারে রোগা ডিগডিগে নয়। একটি রাজনৈতিক দলের পোস্টার পড়ছে অনেকগুলি দেয়ালে। ডান দিকের কোনের বাড়িটি ছিল হারীতের, সে বাড়ির চালে লকলক করছে লাউ ডগা, একটা বড় লাউয়ের গায়ে চুন লেপা। সে থাকে এখন ঐ বাড়িতে?

এই বাগান বাড়িটি হারীতের নেতৃত্বেই দখল করা হয়েছিল, এখন হারীতেরই এখানে স্থান নেই। পুলিশ তাকে কলকাতার সীমানার মধ্যেই ঢুকতে নিষেধ করেছিল!

নবার হাত ধরে হারীত বললো, আয় যোগা! অ্যারাও আমাগো মতন রিফুজি, আমাগো থিকা অ্যারা অনেক ভালো আছে মনে হয় না? আয় দেইখ্যা আসি!

যোগানন্দ বললো, বড়কত্তা, অ্যারা কলিকাতায় থাকার জায়গা পাইলো, আর আমাগো অত দূরে দেখাইয়া দিল ক্যান?

উত্তর না দিয়ে হারীত হাসলো। জীবনে অনেক কেনরই উত্তর পাওয়া যায় না, তবু মানুষ জিজ্ঞেস করে, কেন, কেন, কেন?

কলোনির ভেতরে ঢুকে একটা আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে হারীত হাঁক দিল, জয় বাবা কালাচাঁদ! জয় বাবা কালাচাঁদ!

প্রথমে দৌড়ে এলো বাচ্চারা, ঘিরে দাঁড়ালো হারীতের। তারপর কয়েকটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো মেয়ে-বউদের দল। একজন মাঝবয়সী স্ত্রীলোক হারীতের সামনে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এ বাবা, আমার ভাগ্যটা একটু দেখে দাও। আমার ছেলেটা...

কৌতুক করার জন্য হারীত তার হাতের রেখা দেখার ভান করে বললো, তোগো বাড়ি আছিল খুলনার বাঘমারা গেরামে, ঠিক কইছি না? তোর বাপ মরছিল জলে ডুইব্যা। তোর স্বামীর নাম বরদাকান্ত, না? সে কোথায়?

স্ত্রীলোকটি বিমূঢ়ভাবে বললো, সে তো বাজারে দোকান দিছে। কিন্তু আমার ছেলেটা–

হারীত অন্য একজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, কী গুপীর মা, তোমার বাতের ব্যামো কমছে? আর তোমার বড় পোলা ⁻ুবল, সে ঘুমের মইধ্যে চিক্‌খের দ্যায় এখনো?

সন্ন্যাসীর বেশে হারীতকে কেউ চিনতে পারছে না। সন্ন্যাসীদের পূর্ব পরিচয় জানবার জন্য সহসা কেউ কৌতূহলও প্রকাশ করে না। হারীতের কথা শুনে সবাই হকচিকের যাচ্ছে।

বিকেল পড়তে ফিরলো পুরুষেরা। তাদের মধ্যে একজন শুধু হারীতের কণ্ঠস্বর শুনে বিস্ময়ের সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, সোনাকাকা? তুমি সাধু হইছো?

হারীত তার কাঁধে চাপড় মেরে বললো, নারে নেপু, আমি সাধু হই নাই। আমি সাধক কালাচাঁদের ভারশিষ্য। তোরা সগগলডি এক সাথে আমার লগে লগে বল, জয় বাবা কালাচাঁদ! জয় বাবা কালাচাঁদ! তোরা যশোরের ত্রিকালজ্ঞ সাধক কালাচাঁদা জীউয়ের নাম শুনেছিস তো? তেনার একশো বৎসরের উপর বয়স, তিনি আমারে স্বপ্নে দেখা দিছিলেন, তিনি আমাগো কথা চিন্তা করেন। তিনি কইছেন, ওরে হারীত, তোগো সুদিন আসবে আবার!

এখানকার কেউই সাধক কালাচাঁদের কথা আগে শোনেনি বটে, কিন্তু এই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষের কথা বিশ্বাস করতে কারুর দ্বিধা হলো না। তারা হারীতের কাছ থেকে তার গুরুর মাহাত্ম্য শুনলো।

তারপর অনেক সুখ-দুঃখের গল্প হলো। কে কে আছে, কে কে নেই। দণ্ডকারণ্যের অবস্থা কেমন? আন্দামানে যারা গেছে, তারা নাকি সত্যিই ভালো আছে? এই কলোনির উদ্বাস্তুদের অবস্থা মোটেই ভাল না, এখনও তাদের উৎখাতের চেষ্টা চলছে, সরকারি সাহায্যে আর মেলে না। নিজেরাই কোনোক্রমে ব্যবস্থা করছে, তবে খেন পাশাপাথি কলোনির উদ্বাস্তুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে...

গোপাল নামে একজন একটু আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল, হারীত একসময় তার হাত ধরে বললো, তোর ভয় নাই রে, তোর ঘর আমি দখল করতে আসি নই। আমরা আবার ফিরা যাবো।

গোপল সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, না, আপনে আইস্যা থাকেন না, যতদিন ইচ্ছা থাকেন!

হারীতে বললো, না রে, আইলে আমি কে আমু না। পাকিস্তানে নাকি যুদ্ধ লাগছে আবার, তোরা শোনছোষ কিছু? বর্ডারে নাকি আর পাহারা দেয় না?

নেপু লাফিয়ে উঠে বললো, সোনাকাকা, আমি গেছিলাম, আমি যশোরের মধ্যে ঢুকছিলাম! ঐ ধার থিকা দলে দলে মানুষ এদিকে আসত্যাছ, আমি গেছিলাম উল্টা দিকে।

স্বভাবনীরব যোগানন্দ এবার চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, তুমি যশোরে ঢুকছিলা? দ্যাশের মাটি ছুঁইছো? কেউ কিছু কইলো না?

নেপু বললো না, কেউ কিছু কইলো না। মোছলমানেরা পর্যন্ত খাতির করলো। হ্যারা পাকিস্তানে আর্মির নামে গালি দ্যায়, ইন্ডিয়ার প্রশংসা করে। এক মোছলমানের বাড়িতে বইস্যা খাইলাম।

যোগানন্দ চোখ বড় বড় করে বললো, আমি যাব। বড় কত্তা, আমি একবার আমাগো দ্যাশের মাটি ছুঁইতে যাবো! ভাবি নাই যে আর কোনোদিন...

হারীত বললো, হু, যামু, আমিও যামু, কাইল সকালেই, যশোরের মাটিতে একবার পা দিয়া কমু, জয় বাংলা!

॥ ২১ ॥

পেটরাপোল স্টেশান দিয়ে অনেক দিন কোনো ট্রেন চলাচল করেনি, রেললাইনে মর্চে ধরে গেছে, টিকিট কাউন্টারে মাকড়াসার জাল। সেই স্টেশানের প্ল্যাটফর্মই এখন লোকে লোকারণ্য, এক দিকে জ্বলছে সদ্য পাতা চারটি উনুন, তার ওপর বড় বড় হাঁড়িতে হচ্ছে খিচুড়ি। দুটি প্ল্যাপফর্মের কয়েক শো উদ্বাস্তু পবিার আশ্রয় নিয়েছে, চতুর্দিকে চ্যাঁচামেচি, হৈ-হট্টগোল, তারই মধ্যে একদল পুলিশবাহিনী এসে দক্ষিণের প্ল্যাটফর্মটি খালি করে দিল। এই পুলিশদের হাতে লাঠি ও বন্দুক আছে বটে, কিন্তু সেগুলি উঁচিয়ে ধরতে হলো না, একজন অফিসার হাতজোড় করে বিনীতভাবে বললো, আপনারা দয়া করে এই দিকটা খালি করে দিন, আমরা অনুরোধ করছি, লাইনের ওপর দিয়ে দাঁড়ান, সবাই দেখতে পাবেন।

কেউ আপত্তি করলো না। সকাল থেকেই রটে গেছে যে আজ একটা বিশেষ দিন। ছন্নছাড়া মানুষগুলোর চোখে মুখে উদ্বেগ ও প্রতীক্ষা। বাচ্চা-কাচ্চারাও হঠাৎ কেঁদে উঠলে মায়েরা তাদের থামিয়ে দিচ্ছে। কোনো ট্রেন আসবে না, তাই লাইনের ওপর গিসগিস করছে মানুষ। একটু দূরে কারা যেন ঢাক বাজাচ্ছে, ঠিক দুর্গাপুজোর আগের আবাহনের বাজনা। উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিছু ঢাকীও আছে নিশ্চিত।

যেটা এক সময়ে ছিল স্টেশান মাস্টারের ঘর সেখানে এসে বসেছেন পশ্চিম বাংলা ও কেন্দ্রীয় সরকারে বড় বড় অফিসাররা। একটা ওয়্যারলেস সেটে অদ্ভুত ধাতব মনুষ্য কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। অল্প বয়েস একটি ছেলে একটি অতিকায় কেটলি ও একসঙ্গে অনেকগুলো মাটির ভাঁড় হাতে নিয়ে দিয়ে গেল চা।

বাংলাদেশ মিশানের কয়েকজন প্রতিনিধির জন্য সেই ঘরের বাইরে পাতা হয়েছে একটি বেঞ্চ, সেখানে দু'জন মাত্র বসে আছেন, তাঁদের পাশে এসে বসলেন মামুন ও প্রতাপ। দু'জনেরই হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, প্রচণ্ড গরমে এত তেষ্টা পেয়েছে যে গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ, কিন্তু জল খাবার উপায় নেই। সবাই এখানে জল খেতে নিষেধ করেছে, কারণ এখানকার শরণার্থী শিবিরগুলোতে কলেররা শুরু হয়ে গেছে। একটু আগে সব জায়গায় ছড়ানো হয়েছে ব্লিচিং পাউডার, তার তীব্র সন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে খিচুড়ি রান্নার গন্ধ।

বাংলাদেশ মিশানের একজন প্রতিনিধি গলাটা লম্বা করে ঝুঁকিয়ে মামুনের বদলে প্রতাপকে জিজ্ঞেস করলেন, কী মনে হয়, বাংলাদেশের স্বীকৃতি আজ ডিক্লেয়ারড হবে?

প্রতাপ বিনীতভাবে বললেন, আজ্ঞে, আমি তো বলতে পারবো না, আমি সে রকম কেউ না!

বস্তুত এই প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার মুখে দু'জন পুলিশ অফিসার প্রতাপদের আটকে দিয়েছিল। মামুনের কাছে বাংলাদেশ মিশানের ছাপ দেওয়া আইডেনটিটি কার্ড দেখে তাঁকে বিনা বাক্যব্যয়ে ছেড়ে দিলেও প্রতাপকে আটকেছিল। মামুন তখন অনুরোধ করেছিলেন, ইনি আমার পুরনো ফ্রেন্ড, আমার সঙ্গে এসেছেন! প্রতাপের তুলনায় মামুনের এখানে সম্মান বেশি।

দু'হাঁড়ি খিচুড়ি নেমে গেছে, দেরি করে আর লাভ নেই, স্বেচ্ছাসেবকরা পরিবেশন শুরু করে দিল। ক্ষুধার্তদের লাইন সামলাতে প্ল্যাটফর্ম থেকে নীচে নেমে গেল কয়েকজন পুলিশ। যদিও তেমন কিছু ঠ্যালাঠেলি, হুড়োহুড়ি নেই, আজ যেন সবাই নিজে থেকেই সুশৃঙ্খল।

হঠাৎ একগাদা ক্যামেরাম্যান ছুটতে ছুটতে ঢুকে পড়তেই বোঝা গেল প্রধানমন্ত্রী এসে গেছেন। এই ফটোগ্রাফাররা সামনে তাকিয়ে পিছু হটে, নাচের ভঙ্গিতে লাফায় ও শরীর মোচড়ায়, কিন্তু কেউ পা পিছলে পড়ে যায় না।

শুরু হয়ে গেল কোলাহল, বাতাসে ছড়িয়ে গেল দরুণ বিমিশ্র এক শব্দতরঙ্গ। বেজে উঠলো শাঁখ, শোনা গেল উলুধ্বনি, গর্জে উঠলো স্লোগান, জয় বাংলা! ইয়াহিয়া হুঁশিয়ার, বাংলার মানুষ আছে তৈয়ার! ভারত সরকার জিন্দাবাদ!

মামুনদের সামনে দিয়েই হেঁটে গেলেন ইন্দিরা গান্ধী। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, শরীরে এখনও পূর্ণ যৌবন, মুখের চামড়া মসৃণ, নাকটা ঈষৎ লম্বা, মাথার চুলের খানিকটা অংশ শুধু চমকপ্রদ ভাবে সাদা, একটা হালকা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছেন। গট গট করে হেঁটে এসে তিনি

প্ল্যাটফর্মের একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়ালেন। একটুক্ষণ শুনলেন নানা রকমের শ্লোগান, তারপর হাত তুলে শান্ত হবার ইঙ্গিত করলেন।

কিন্তু কেউ তাতে ভ্রুক্ষেপ করলো না, ধ্বনি বাড়তেই লাগলো।

এদিকের প্ল্যাটফর্মে কোনো উদ্বাস্তুর থাকার কথাই নয়। তবু কী করে যেন ঢুকে পড়েছে এক বুড়ি। বয়েসের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে, মাথার চুল শনের মতন, ছেঁড়া ঝুলি ঝুলি একটা শাড়ি দিয়ে কোনোরকমে গা ঢাকা। কেউ তাকে লক্ষ করেনি কিংবা গ্রাহ্য করেনি সে সোজা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইন্দিরা গান্ধীর পায়ের ওপর। কেঁদে, ফুঁপিয়ে কী সব যেন বলতে লাগলো।

ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে চমকে গিয়ে পিছিয়ে গেলেন একটু। দু'জন সরকারী অফিসার বুড়িটাকে টেনে সরিয়ে দিতে গেল, ইন্দিরা গান্ধী তাদের নিষেধ করে বললেন, আপ উঠিয়ে, যো বোলনা হায়, আপ–

তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে, কৈশোরে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শেখা বাংলাভাষ স্মৃতিতে এনে ইন্দিরা গান্ধী নরম সুরে আবার বললেন, আপনি উঠুন, বুড়ি মা! ভয় নেই, কিছু ভয় নেই!

বুড়ি হাউ হাউ করে কেঁদে বললো, আমার পোলাডারে মাইরা ফ্যালাইছে! রাইক্ষসেরা আমাগো গেরামে আগুন জ্বালাইয়া দিছে

পাশ থেকে একজন ইন্দিরা গান্ধীকে বুঝিয়ে দিল, পোলা মিনস্ ছেলে। সান। হার সান ওয়াজ মার্ডারড্ অ্যান্ড দেয়ার ভিলেজ ডেস্ট্রয়েড বাই আরসন।

ইন্দিরা গান্ধী মাথা নাড়লেন। বুড়ি আবার বললো মাগো, তোমরা চরণে আশ্রয় নিছি। ছোট ছোট বাইচ্চারা সাথে আছে, পুতের বৌ, মাগো রক্ষা করো।

পাশের লোকটিকে অনুবাদের সুযোগ না দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী বললেন, বুড়িমা, আপনারা এ দেশের অতিথি, আর কোনো ভয় নেই!

জননী যেমন সন্তানকে আদর করে, কান্না থামিয়ে বুড়িটি সেইভাবে ইন্দিরা গান্ধীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

সব শ্লোগান, সব ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেছে, সবাই দেখছে এই দৃশ্য। কিন্তু এতখানি নাটকীয়তা বোধহয় ইন্দিরা গান্ধীর পছন্দ হলো না, তিনি বুড়িকে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে! তারপর পেছন ফিরে দ্রুত হেঁটে গেলেন খিচুড়ির হাঁড়ির দিকে।

স্বেচ্ছাসেবকরা পরিবেশণ বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দিরা গান্ধী একজনের হাত থেকে পেতলের বড় হাতাটি নিয়ে হাঁড়িতে ডুবিয়ে তুললেন খানিকটা খিচুড়ি। অন্য হাতে সেই গরম খিচুড়িই খানিকটা টিপে দেখে একজন স্বেচ্ছাসেবককে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, নট পারফেক্ট্লি বয়েলড্।

অন্য একটি হাঁড়ি থেকে আবার খিচুড়ি তুলে টিপে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি নিজেই পরিবেশণ করতে গেলেন লাইনের প্রথম লোকটিকে।

লাইনের প্রথমে যে দাঁড়িয়ে আছে সে একজন বাইশ-তেইশ বছরের যুবক, খালি গা, কালো রঙের চকচকে শরীর, বাঁ হাতে একটা ব্যান্ডেজ। সে সেই আহত হাতটি উঁচু করে তুলে চেঁচিয়ে বললো, আমাগো খাদ্য চাই না, আমাগো অস্ত্র দ্যান, আমরা ফিরা গিয়া দেশ স্বাধীন করবো!

ইন্দিরা গান্ধী তার চোখে চোখ রেখে বললেন, আগে খেয়ে নিন।

মামুন ফিসফিস করে প্রতাপকে বললেন, একটা ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, ওনার কাছাকাছি কোনো সিকিউরিটির লোক নাই? এত বড় দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি এরকম ভাবে লোকজনের ভিড়ে চলাফিরা করেন! পাকিস্তানে এটা চিন্তাই করা যায় না!

প্রতাপ বললেন, তোমাদের ওখানে আর্মি রুল, তারা সাধারণ মানুষের কাছে আসতে ভয় পায়। কিন্তু ডেমোক্রাসিতে সাধারণ মানুষকে ভয় পাবার তো কোনো কারণ নেই।

মামুন বললেন, ভদ্রমহিলা খুবই তেজস্বিনী, তবুও রিস্ক আছে। ধরো, এখানে কিছু পাকিস্তানী এজেন্টও তো ঢুকে পড়তে পারে? যদি কেউ একটা গুলি-টুলি ছোঁড়ে....পাকিস্তানীরা এখন ইন্ডিয়াতে একটা কমুনাল রায়ট বাঁধাবারও খুব চেষ্টা করবে, যদি তারা সাকসেসফুল হয়, তাইলে বাংলাদেশ ফিনিশড্!

প্রতাপ কোনো মন্তব্য করলেন না।

মামুন প্রসঙ্গ বদলে প্রতাপকে একটু খোঁচা মারার জন্য বললেন, তুমি তো খুব গর্বের সুরে ইন্ডিয়ার ডেমোক্রাসির কথা বললে। খাঁটি গণতন্ত্রই যদি হবে, তাইলে জওহরলাল নেহরুর মেয়ে প্রাইম মিনিস্টার হয় কী করে? দিল্লির মসনদে আবার একখানা ডাইনাস্টি?

প্রতাপ বললেন, সেটা হয়েছে, তার কারণ, এ দেশে আর শক্ত মেরুদণ্ডওয়ালা কোনো পুরুষ নেই বোধহয়। অন্তত কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে নেই! মোরারজি একটু চেষ্টা করেছিলেন রুখে দাঁড়াবার, সাপোর্টার পেলেন না!

–ইন্দিরার সঙ্গে যে আর একজন মহিলা এলেন, উনি কে?

–উনি পদ্মজা নাইডু। এখন ওয়েষ্ট বেঙ্গলের গভর্ণর। সরোজিনী নাইডুকে মনে আছে তো, তাঁর মেয়ে।

–ও, সরোজিনী নাইডু, নাইটিঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া! তার মেয়ে! আর যে ভদ্রলোক ওনার সঙ্গে গল্প করছেন মাথা দুলায়ে দুলায়ে...

–শোনো, তোমাকে চিনিয়ে দিচ্ছি। অজয় মুখার্জিকে তো চিনতে পারছো, মাথায় পাকা চুল, এখন আমাদের চীপ মিনিস্টার, অবশ্য কতদিন থাকবেন তার ঠিক নেই। তার পাশে যে হ্যান্ডসাম লোকটি, হেসে কথা বলছেন, উনি সিদ্ধার্থ রায়, সেন্ট্রালের শিক্ষামন্ত্রী। ইনি কে জানো তো? সি আর দাশ, মানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাতি।

–মতিলাল নেহরুর নাতনী আর সি আর দাশের নাতি?

–এককালের কংগ্রেসের সেউ প্রো-চেইঞ্জার আর নো-চেইঞ্জারদের দলাদলির কথা মনে আছে? তখন মতিলাল আর চিত্তরঞ্জন হাতে হাতে মিলিয়েছিলেন, এখন তাঁদের নাতি-নাতনীরা দেশ শাসন করছে।

–সুভাষবাবু-শরৎবাবুদের ফ্যামিলির কেউ লাইম লাইটে নাই?

কয়েকজনকে খিচুড়ি পরিবেশন করার পর ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সহচরদের অনুরোধে স্টেশন মাস্টারের ঘরে একটু বিশ্রাম করতে গিয়েছিলেন। মে মাসের অসহ্য গরম, আজ যেন রোদের আঁচ বেশী বেশী তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

একটু পরেই খাদ্য পরিবেশণ বন্ধ রইলো। ইন্দিরা গান্ধী আবার বেরিয়ে এলেন বক্তৃতা দিতে। মুহুর্মুহু শ্লোগান শুরু হলো আবার, রিপোর্টাররা নোট বই খুললো। মামুন-প্রতাপরাও কথা থামিয়ে উৎকর্ণ হলেন।

সদ্যস্থাপিত মাইক্রোফোনের সামনে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে বাংলায় বললেন, মা ও ভাই-বোনেরা! আপনারা আমাদের অতিথি, আমাদের বন্ধু! আমি বেশী কথা বাংলায় বলতে পারি না, সে জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আস্তে আস্তে হিন্দীতে বলছি।

তারপর তিনি বললেন, ভারত গরিব দেশ, তবু সে যথাসাধ্য অতিথিদের সেবা করবে। গত পঁচিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু এসেছে ৭০ লক্ষ, আবার পঁচিশে মার্চের পর মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই উদ্বাস্তু এসেছে প্রায় ২০ লক্ষ এবং প্রতিদিন আসছে। যারা অত্যাচারিত, নিপীড়িত হয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে চায় তাদের একজনকেও ফেরানো হবে না। তবে সারা বিশ্বকে বুঝতে হবে, এই শরণার্থীদের খাওয়ানো-পরানো ভারতের একার দায় নয়। এই উদ্বাস্তু সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা! পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রগুলি এখনো চুপ করে আছে কেন?....পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যে আত্মমর্যাদার লড়াইতে নেমেছে, আশা করি তারা সার্থক হবে। অদূরে ভবিষ্যতেই সকলে দেশে ফিরে যেতে পারবে....।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের কোনো প্রসঙ্গই উঠলো না। বাংলাদেশ নামটাও তিনি একবারও উচ্চারণ করলেন না! তাঁর অন্যান্য আশ্বাসবাক্য ভরা বক্তৃতা শুনেও অনেকের মুখে নেমে এলো হতাশার ছায়া!

ইন্দিরা গান্ধী পেট্রাপোল স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেলেন ইটখোলা ক্যাম্পে। সেখানেও ঐ একই বক্তৃতা। কয়েকজন চেঁচিয়ে সরাসরি বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি তুললেও তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

সেখান থেকে তিনি এলেন বনগাঁ হাসপাতাল।

ছোট্ট, ঘুমন্ত শহর বনগাঁ যেন ভোজবাজিতে রাতারাতি বদলে গেছে। চতুর্দিকে শুধু মানুষ আর মানুষ, অসংখ্য মানুষ। একদিকে যেমন উদ্বাস্তুদের স্রোত, তেমনই আবার কলকাতা থেকে আসছে নানান সেবা প্রতিষ্ঠানের লোক ও সরকারি কর্মচারীরা। এরই মধ্যে আবার দেখা যায়, অলিভ রঙের শার্ট পরা, মাথায় বড় বড় চুল তরুণ যবক্‌দের, তাদের কাঁধে ঝুলতে রাইফেল কিংবা কোমরে রিভলভার। হঠাৎ এক একটি দিকে সেইসব তরুণেরা গলা ফাটিয়ে জয় বাংলা ধ্বনি দিতে দিতে চলে যায়। এই শহরে, গাড়ি ও ফেরিওয়ালার সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে।

হারীত, যোগানন্দ, নবা ও ও নেপুদের দলটি বনগাঁ হাসপাতালের কাছে এক ঝলক শুধু দেখতে পেল ইন্দিরা গান্ধীকে। একটা খোলা জিপে এসে তিনি হাসপাতালে আহত ও রোগার্তদের সান্ত্বনা দিতে চলে গেলেন। হারীতের খুব ইচ্ছা ছিল ইন্দিরা গান্ধীর সামনে গিয়ে দুটো কথা জিজ্ঞেস করার, কিন্তু এতই ভিড়ের চাপ যে সে কাছ ঘেঁষবার সুযোগই পেল না। সে হাত তুলে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো!

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কড়া পাহারা হরিদাসপুর থেকেই। পাকিস্তানী আর্মি নাকি সীমান্তের ওধারে এসে ঘাঁটি গেড়েছে, গত দু'দিন ওদিক থেকে কোনো উদ্বাস্তুও আসছে না, এদিক থেকে ওদিকে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। উদ্বাস্তুরা আসছে অন্যদিকে থেকে, রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে।

কোনো উদ্বাস্তু শিবিরেও হারীতদের প্রবেশ অধিকার নেই। এবারের সব শরণার্থীদের আলাদা পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে যাতে বাইরে কোনো লোক মিশে যেতে না পারে সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে।

তবু বাজার এলাকায় কিছু কিছু যশোর-খুলনার মানুষদের সঙ্গে আলাপ হলো তারীতের। তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের ভেতারের খবর শুনলো। সকলের মুখেই প্রায় এক কথা। কোন্ অপরাধে এবং কিসের জন্য যে পাকিস্তানী আর্মি সাধারণ মানুষকে মারছে আর গ্রামে আগুন লাগাচ্ছে, সেটাই তারা বুঝতে পারছে না! হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে বেশী মারছে ঠিকই, কিন্তু মুসলমানদেরও তো রেয়াৎ করছে না? শেখ মুজিব ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন বলে এরা মেরে মেরে বাঙালীদের শেষ করে দেবে?

ফেরার পথে ট্রেনের কামরায় তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখতে পেল হারীতরা। একটা জানলার দু'ধারে তারা বসেছে, লম্বা করা ছড়িয়ে দিয়েছে পা। মুখে অল্প অল্প দাড়ি তাদের জুতোর কাদা মাখা, প্যান্ট-শার্টও ছেঁড়া-ময়লা, তবু দেখলে সচ্ছল ঘরের ছেলে মনে হয়। প্রকাশ্যে তারা কোনো অস্ত্র বহন করছে না, সিগারেট টানছে।

বিকেল হয়ে এসেছে, কামরায় বেশী ভিড় নেই। একজন টিকিট চেকার উঠে প্রথমেই অন্যদের পাশ কাটিয়ে তিনটি ছেলের কাছে এসে বললো, টিকিট!

ছেলে তিনটি কথা থামিয়ে চুপ করে গেল। ওদের মধ্যে যার বয়েস একটু বেশী, সে থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, আমাদের কাছে টিকিট নাই।

চেকারটি বিদ্রূপের সুরে বললো, টিকিট নাই তো ট্রেনে উঠেছেন কেন? এটা কি বাড়ির বৈঠকখানা?

ছেলে তিনটি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। বড় ছেলেটিই আবার কৌতুকের সুরে বললো, বাড়ির বৈঠকখানায় বসি নাই অনেকদিন। আমরা ফ্রিডম ফাইটার। মুজিব নগরে যাবো, বর্ডার থেকে বলে দিয়েছে যে পয়সা না। থাকরে টিকিট না কাটলেও চলবে।

–ফ্রিডম ফাইটার? সঙ্গে কোনো আইডেনটিটি কার্ড আছে?

–দেখি কী আছে!

একটি ছেলে কাত হয়ে প্যান্টের পকেট থেকে প্রথম বার করলো একটা সিগারেটের প্যাকেট, একটা দামী লাইটার, কয়েকটি বাংলাদেশী টাকা। একটা রিভলভার, কয়েকটা চিউয়িং গাম, গোটা পাঁচেক বুলেট....। ম্যাজিসিয়ানের ভঙ্গিতে সে একটার পর একটা জিনিস পাশে নামিয়ে রাখতে লাগলো। তারপর কৃত্রিম হতাশার সুরে বললোন, নাঃ, আইডেনটিটি কার্ড তো কিছু নাই!

চেকারটি চোখ বড় বড় করে রিভলভার ও কার্তুজগুলো দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, ঠিক

আছে, ঠিক আছে। আপনার কোথা থেকে আসছেন, আপনাদের নাম কী?

লম্বা ছেলেটি বললো, এ হে হে, ফ্রিডম ফাইটারদের নাম জিজ্ঞাসা করতেই না। ধরে ন্যান, আমাদের নাম রহিম, করিম আর রাম। নিবাস বাংলাদেশ।

চেকারটি এবার ওদের আরও কাছে এসে অত্যুৎসাহী মুখ করে বললো, জানেন আমাদের বাড়ি ছিল খুলনায়, বাগেরহাট। ওদিকেও খবর কী? পাকিস্তানী আর্মিদের আপনারা হঠাতে পারবেন?

একটি ছেলে বললো, বাগেরহাট আমি চিনি।

আর একজন বললো, আপনাদের প্রাইম মিনিস্টার তো স্বাধীন বাংলাদেশকে এখানো রেকগনিশান দিচ্ছেন না। ঠিকঠাক আর্মস সাপ্লাই পেলে আমরা হানাদার বাহিনীকে দশদিনে সাবাড় করে দেবো।

–পারবেন? সত্যি পারবেন?

–ইন্ডিয়ার হেল্প না পেলেও আমরা পারবো। একটু বেশী লাগবে, আরও কিছু মানুষ মরবে!

–আচ্ছা ভাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আমরা আমাদের বাড়িঘর দেখতে যেতে পারবো? তখন পাকিস্তানীদের মতন আপনারও আমাদের মারতে আসবেন না তো?

–আপনাদের বাড়িঘর দেখতে যাবেন, নিশ্চয় যাবেন! তবে শুধু দেখতেই যাবেন, ফিরে আবার সব কিছু দাবি করলে মুশকিল হবে!

–না, না, থাকতে যাবে না, শুধু একবার দেখবো। আমাদের পুকুরের চারদিকে চারটে শিবমন্দির ছিল, এখনও সেসব আছে?

ট্রেন একটা স্টেশানে থেমেছে, কিছু যাত্রী ওঠা-নামা করলো এখানে, ওদের কথা আর শোনা গেল না। হারীত ভাবলো, চেকারটি চলে গেলে সে ঐ ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে, কিন্তু সেটাও সম্ভব হলো না। চেকারটি এবার চলে এলো তাদের দলটির কাছে। যেন সে এক নজর তাকিয়েই বুঝতে পারে, কাদের কাছে টিকিট নেই।

পশ্চিমবাংলায় সাধুর পোশাকের অত খাতির নেই। চেকারটি হারীতকে বললো, এই যে, সাধুবাবা, টিকিট দেখি!

হারীত বললো, সারা, আমরা রিফুজি। আমাগো পয়সা নাই!

চেকারটি বললে, রিফিউজি তো এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ক্যাম্প ছেড়ে আপনাদের তো বাইরে যাবার নিয়ম নেই। কলকাতায় গিয়ে ভিড় বাড়াতে কে বলেছে?

হারীতে কোনো তর্ক করার সুযোগই পেল না। চেকারটি প্রায় ঘাড় ধরেই ওদের নামিয়ে দিল হাবড়া স্টেশানে। সত্যিই সে নবার ঘাড় ধরে ঠেলা দিয়েছিল।

ট্রেনটি চলে যাবার পর হারীতে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে বললো, যাঃ কয়লা! আমরা পুরানো রিফিউজি, তাই আমাগো কোনো খাতির নাই

যোগানন্দ বললো, বড়কর্তা, এখন কী হবে? এ কোথায় নামাইলো?

নেপু বললো, কী আর হবে? আবার পরের ট্রেনটায় উইঠ্যা পড়বো। সব গাড়িতে চ্যাকার থাকে না।

হারীত বললো, জয় বাবা, কালাচাঁদ ল্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়! আমাগো আর কী হবে, যতবার নামাইবে, ততবার নামাবো। আবার উইঠ্যা পড়বো! ঠিক কইছস, নেপু! আয় জিলাপি খাই! ট্রেনে টিকিট কাইট্যা পয়সা নষ্ট করোনোর চাইয়া জিলাপি খাওয়া অনেক ভালো! কী কস, নবা?

আর বিশেষ কিছু ঝকমারি হলো না অবশ্য। পরের ট্রেন এলো শেষ বিকেলে, তাতে যাত্রী আরও কম। হারীত উঠে বসেই একটা গান ধরলো; "শ্মশান ভালোবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি, শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি..."

তেমন সুর নেই গলায়, কিন্তু জোর আছে। কয়েকজন ভক্ত জুটে গেল আশেপাশে। পর পর বেশ কয়েকটা গান গেয়ে গেল সে। এইরকম ভক্ত পরিবৃত অবস্থায় কোনো টিকিট চেকার কি তাকে নামিয়ে দিতে পারবে? আর এলোই না কেউ।

হারীতের দলটি নেমে পড়লো দমদম স্টেশানে। কাশীপুরের কলোনিতে পৌছাতে হলে এখান দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু হারীত এখন যাবে পাতিপুকুরের আশ্রমে। যোগানন্দ আর নবাকে নেপুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে সে হাঁটতে শুরু করলো।

আজকের সীমান্তের অভিজ্ঞতা খুব আশাপ্রদ নয়। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে এখনই ফিরে যাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, অদূর ভবিষ্যতেও কী হবে তা বলা যায় না। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও কি ফেরা যাবে? সে তখন দেখা যাবে! এখন আর একটি কাজ করা যায়। পশ্চিমবাংলার রিফিউজি কলোনিগুলো ঘুরে ঘুরে একটা যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা অন্তত করা উচিত। যাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হয়েছে, তাদের কথা কি এখানকার সকলে ভুলে গেছে? তারা মরলো কি বাঁচলো, সেই খবরও কেউ রাখবে না? এখানকার রিফিউজিদের মধ্যে গুরু কালাচাঁদের বাণী প্রচার করে তাদের বাঁধতে হবে এক সূত্রে।

সন্ধের পর হারীতে এসে উপস্থিত হলো পাতিপুকুরের নারী কল্যাণ আশ্রমে। এখানে সবে আরতি শুরু হয়েছে, আশ্রমের বাইরে তিন চারখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভেতরে এসে হারীতে দেখতে পেল দেবদেউলের সামনে উপবিষ্ট গেরুয়াবসনধারিণী চন্দ্রাকে। পিঠের ওপর খোলা চুল, চোখ দুটি ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন। যেন এখানে তার বিশেষ অধিকার আছে, এই ভঙ্গিতে হারীতে চলে এলো একেবারে সামনে। ঘন্টধ্বনি ও নামগান অগ্রাহ্য করে সে বেশ জোরে বলে উঠলো, নমস্কার, দিদিমণি!

চন্দ্রা চোখ মেলে হারীতকে দেখলো, তার মুখ কোনো বিস্ময় বা চাঞ্চল্য ফুটলো না, সে মৃদু স্বরে বললো, হারীতে এসেছো? বসো!

অর্থাৎ চন্দ্রা তার বাবার কাছ থেকে আগেই সব শুনেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই, তাই হারীতে বসে পড়লো সিঁড়িতে কাছে। ধুনোর ধোঁয়ার তার চোখ জ্বালা করে উঠলো। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে অন্য লোকগুলোর মুখ দেখার চেষ্টা করলো। সুচরিত কোথাও নেই।

আরতি শেষ হবার পর প্রসাদ বিতরণ হলো। এখানো কী শান্ত, ভাবগম্ভীর পরিবেশ! দুপুরবেলা হারীতে সীমান্তে যে দৃশ্য দেখে এসেছে, লক্ষ অসহায় মুখ, ক্ষুধা, অসুখ, অনিশ্চয়তা, তার সঙ্গ এখানকার কোনো মিল নেই। এরা যেন কেউ জানেই না, মাত্র পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে কী ঘটছে।

চন্দ্রা চলে গেল ভেতরে। হারীত ভাবলো, সেও চন্দ্রাকে অনুসরণ করবে কি না, কিন্তু কয়েকজন নারী ও পুরুষ বিনা পায়ের শব্দের ভেতরে থেকে আসছে ও যাচ্ছে, তাদের ভঙ্গি দেখেই মনে হয় বিনা অনুমতিতে কেউ ভেতরে যায় না।

হারীত ঠিকই করে ফেললো, সেই মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর চ্যাঁচামেচি শুরু করে। কেন যেন তার মনে হচ্ছে, এই আশ্রমের সবটাই ভণ্ডামি। ধনী ব্যক্তিদের ধর্ম বিলাসিতা।

একটু পরেই একজন বিধবা মহিলা এসে বললো, আসুন, আপনাকে চন্দ্রা-মা ডাকছেন!

তার সঙ্গে সঙ্গে হারীত একটা অফিস ঘর পেরিয়ে, উঠোনের পাশ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় চলে এলো। সেই ঘরের মেঝেতে একটি বাঘ-ছালের ওপর বসে আছে চন্দ্রা। ঘরের চারটি দেয়াল সাদা ধপধপে, কোনো আসবাব সেখানে নেই।

চন্দ্রার সামনে একটি পাথরের থালা ভর্তি ফল ও মিষ্টি। একটি শ্বেত পাথরের গেলাস ভর্তি জল। চন্দ্রা সুমিষ্ট স্বরে বললো, এসো, হারীত, বসো!

হারীত হাঁটু গেড়ে বসলো। তার নিজের অঙ্গেও সন্ন্যাসীর বেশ, সে অন্য কোনো সন্ন্যাসিনীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে না। সে হাত জোড় করে বললো, নমস্কার। ভালো আছেন আপনি? আমি আমার ছেলেটার খবর নিতে আসছি!

চন্দ্রা বললো, হ্যাঁ, সব কথা হবে। আগে এগুলো খেয়ে নাও!

হারীত একটু ও দ্বিধা করলো না। ভালো খাবার পেলে সে অগ্রাহ্য করবে কেন? প্রথমেই এক চুমুকে জলটা শেষ করে বললো, আর একটু জল দিতে বলেন। তারপর সে একটা সন্দেশ মুখে ভরলো।

চন্দ্রা জিজ্ঞেস করলো তুমি কার কাছে দীক্ষা নিয়েছো, হারীত?

হারীত বললো, কাউর কাছে না। আমার পোশাকটাই শুধু রঙীন। আমি আপনের শেষ যখন দেখি, তখন আপনি...অইন্যরকম ছিলেন। আপনি কি শ্রীরামকৃষ্ণ-বেলুড় মঠের...

চন্দ্রা বললেন, না, আমারও শুধু বসন রাঙানোই বলতে পারো।

–আপনি যোগিনী হইলেন কেন?

–সত্যি কি যোগিনী হয়েছি? ইচ্ছে করলেই কি হওয়া যায়?

–আমার ছেলেটা কি মরে গেছে?

–হারীত, তুমি যদি আমার নামে অভিযোগ জানাও, আমি মাথা পেতে নেবো। তোমার ছেলেকে আমি নিজের কাছে রেখেছিলাম, তাকে লেখাপড়া শেখাবো, দেশের কাজে লাগাবো, এই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি পারিনি। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ভালো মাস্টার রেখে তাকে পড়ানো হচ্ছিল, কিন্তু আকাশের চিলকে কি খাঁচায় পোষ মানানো যায়? সে থাকলো না।

–সে কিসে মরলো?

–কে বললো, সে মারা গেছে? সে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু সে কি সহজে হার স্বীকার করার ছেলে? সে উধাও হয়ে গেল বটে, কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে সে বেঁচে থাকবেই জানতাম। কিন্তু তার পরিণতি যে এই হবে–

–সে চোর-ছ্যাঁচোড় হইছে?

–সবাই তাকে বলে গুণ্ডা। ন্যাঙা গুণ্ডা। সে নাকি কথায় কথায় ছুরি চালায়। এখন সে পলিটিক্যাল পার্টির হয়ে ভাড়া খাটে। তার একটা দল আছে।

থালাটা প্রায় চেটেপুটে শেষ করে হারীত দ্বিতীয় গেলাস জল খেল। তারপর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললো, আঃ! বড় ভালো লাগলো। ছেলেটা তাইলে মরে নাই? আপনের বাবার কথা শুনে মনে হইছিল...কোথায় গ্যালে তারে পাওয়া যাবে?

চন্দ্রা মুখ নীচু কর বললো, তা তো আমি জানি না। লোকে নানান কথা বলে। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল মাস ছয়েক আগে। সে একা হঠাৎ এই আশ্রমে এসে হাজির হয়েছিল একদিন ভোরে। তখনও কেউ জাগেনি। আমি বাগানে ফুল তুলছি, হঠাৎ দেখি সামনে সুচরিত।

চন্দ্রা মুখ তুলে হারীতের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর খুবই দুঃখিত ভাবে বললো, আমার ওপর তার কেন যে এত রাগ তা জানি না। তাকে দেখে আমি খুশী হয়েছিলাম, ফুলের সাজি ফেলে তাকে ধরে বলেছিলাম, সুচরিত, তুই? ওমা, এতদিন কোথায় ছিলি? সে আমার কথার কোনো জবাব দিল না, খপ করে আমার হাত চেপে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল।

হারীত জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে চিনেছিল? সে জানতো যে আপনি যোগিনী হয়েছেন?

–তা হয়তো সে জানতো না। কিন্তু আমাকে চিনবে না কেন? আমার কি কিছু বদল হয়েছে? সেই সকালবেলাতে সুচরিতের চোখ টকটকে লাল, মুখে ভকভক করছে নেশার গন্ধ, বুঝলে হারীত, সে কোনো কারণে আমার ওপর খুব রেগে ছিল, আমাকে জোর করে টেনে আশ্রমের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, ভাগ্যিস সেইসময় আশ্রমের দারোয়ান দেখে ফেললো! কেন আমার ওপর তার এত রাগ থাকবে? তুমি কিছু বলতে পারো? সেদিনের কথা ভাবলেই আমার এত কষ্ট হয়। আর সে আসেনি।

হারীতের কোনো উত্তর দেওয়া হলো না। এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন অসমঞ্জ। হারীতের দিকে না তাকিয়ে তিনি গম্ভীরভাব বললেন, চন্দ্রা, ডি সি নর্থ মিঃ চৌধুরী তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান, বলছেন খুব জরুরি!

চন্দ্রা ভ্রূকুটি করে বললো, পুলিশ? আশ্রমের মধ্যে পুলিশ আসবে কেন? না বলে দাও, দেখা হবে না!

অসমঞ্জ বললেন, তা হলে কি তুমি গেটের বাইরে যাবে?

–তার মানে?

–তোমার নামে ওয়ারেন্ট আছে। আমাকে দেখালেন।

–আমার নামে ওয়ারেন্ট? তুমি কী বলছো অসমঞ্জ? লোকটা তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে!

–আমি নিজে সেটা হাতে নিয়ে দেখেছি, চন্দ্রা।

–তা হলে তাকে ডাকো।

কয়েক মুহূর্ত বাদেই দু'জন পুলিশ অপিসার ঢুকলেন সেখানে। তাঁর জুতো খুলে রাখলেন বাইরে। প্যান্ট পরা সত্ত্বেও তাঁর মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে ভক্তি ভরে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন চন্দ্রাকে। একজন চকিতে একবার দেখে নিলেন হারীতকে। অন্যজন নম্র গলায় বললেন, আমার নাম বিনায়ক চৌধুরী, আমি ডি সি নর্থ, আর ইনি এস বি ডিপার্টমেন্টের অমরেশ দাশগুপ্ত। আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে লজ্জিত। বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি আপনার কাছে।

মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ বলেই হারীতের মুখের বিবর্ণতা বোঝা যাচ্ছে না। বুক ঢিপঢিপ করছে তার। পুলিশ দেখলেই তার হৃৎকম্প হয়। শেষ পর্যন্ত এখানেও পুলিশ।

নিজেকে খানিকটা সামলাবার চেষ্টা করে সে ঈষৎ কাঁপা গলায় বললো, আমি তা হলে উঠি, মা জননী।

অমরেশ দাশগুপ্ত মুখ ফিরিয়ে বললেন, না, আপনিও বসুন। আপনার সঙ্গেও কথা আছে।

হারীত বললো, আমি এনার সাথে শুধু দেখা করতে এসেছিলাম।

অমরেশ দাশগু হেসে বললেন, জানি। আপনার নাম হারীত মণ্ডল তো? সুচরিত মণ্ডল আপনার ছেলে?

চন্দ্রা বললো, আমি সুচরিতের কোন খবর জানি না। সে অন্তত ছ'মাসের মধ্যে এখানে আসেনি।

বিনায়ক চৌধুরী বললেন, আমরা সুচরিতের খোঁজে এখানে আসিনি। অত সামান্য ব্যাপারে আপনাকে ডিস্টার্ব করতাম না। আপনি বেশ ভালোই তো আশ্রম চালাচ্ছিলেন। এর মধ্যে আবার নকশালদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গেলেন কেন? আমরা ধর্মস্থানে এসে উৎপাত করতে একেবারেই চাই না, বিশ্বাস করুন। কিন্তু আপনার আশ্রমটা সার্চ করতে আমরা বাধ্য।

চন্দ্রা রেগে উঠে বললো, আমার আশ্রম সার্চ করবেন মানে? কী অধিকার আছে আপনাদের? কোর্ট থেকে অর্ডার এনেছেন?

বিনায়ক চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বাধা দিলে আমাদের কাজটা আরও আনপ্লেজান্ট হবে। আমরা পাকা খবরটবর না নিয়ে তো আসিনি। আপনি বড্ড ভুল করে ফেলেছেন, চন্দ্রাদেবী।

তারপর তিনি পেছন ফিরে বললেন, অসমঞ্জবাবু, আমাদের বাকি লোকদের ডাকুন।

॥ ২২ ॥

গোল্ডর্স গ্রীনে তুতুলের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় তিনবার টোকা মারলো আলম। এখন সকাল সড়ে আটটা, এই বছরের মধ্যে এমন ঝকঝকে সোনালি রোদ আর ওঠেনি। গ্লোরিয়াস সান সাইন যাকে বলে। এরকম রোদ দেখলেনই মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে, বাড়ি ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। ইংরেজরা দেখা হলেই কেন আবহাওয়ার কথা বলে, তা এই সব দিনে বোঝা যায়। এই দ্বীপভূমিতে রোদ ওঠা-না-ওঠায় অনেক তফাত। মেঘলা কিংবা কুয়াশাভরা দিনে মনের মধ্যে একটা অহেতুক বিষণ্ণতা জমতে থাকে। সুইডেনে একটানা পর পর কয়েকদিন মেঘলা থাকলে আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে যায়।

কোনো সাড়া না পেওয় ভুরু কোঁচকালো আলম। যদিও কলিং বেল আছে, তবু দরজায় টোকা মারা তার স্বভাব। শিস দিয়ে একটা গান গাইতে গাইতে আলম আবার টোকা দিল তিনবার। এত সকালেই তুতুল বেরিয়ে গেছে? তার তো আজ বারোটার আগে হাসপাতালে ডিউটি নেই।

তবু তুতুল শপিং করতে যেতে পারে। কিংবা গতকাল তো ফোনে বলেছিল ওর ত্রিদিবমামা শহরে এসেছেন, তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে গেছে হয়তো।

এই অ্যাপার্টমেন্টর একটা চাবি থাকে আলমের কাছে। তুতুল বাইরে গেলেও সে এখানে অপেক্ষা করতে পার। খুট করে দরজাটা খুলে সে ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। তুতুল ঘুমোচ্ছে!

তুতুলের গায়ের ওপর রূপোলি পাড় দেওয়া একটা সমুদ্রের মতন নীল রঙের কম্বল। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাসই তুতুল রাত্তিরে ঘরের হিটিং অফ করে দেয়। বাইরে রোদ থাকলেও তুতুলের ঘরটা এখনও ঠান্ডা। সমস্ত পর্দা টানা, তাই আধো অন্ধকার।

একটা পর্দা সরিয়ে দিল আলম। রোদের রেখা সোজাসুজি গিয়ে পড়লো তুতুলের মুখে। তাতেও তার ঘুম ভাঙলো না দেখে আলম বুঝলো, তুতুল স্লিপিং পিল খেয়েছে। ইদানীং প্রায়ই তার ঘুম আসে না বলে ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়।

আলম এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। যেন এক ঘুমন্ত রাজকন্যা। নিঃশ্বাসে সামান্য দুলে উঠলে বুক। মাথার ঈষাৎ কোঁকড়া চুল ছড়িয়ে আছে বালিশের ওপর। অনেকগুলি স্বপ্নের রেশ এখনো লেগে আছে মুখশ্রীতে। শিয়র ও পায়ের কাছের সোনার কাঠি রূপোর কাঠি বদলাবদলি না করে দিলে এই কন্যা জাগবে না।

আলম ভাবলো, এই মেয়েটি তার নিজস্ব। পৃথিবীতে এমন কোনো কথা নেই যা সে তুতুলকে বলতে পারে না। সে খুব ভালো করেই জানে, তুতুল তার জন্য প্রাণ দিয়ে দিতে পারে। তুতুল এমনই সৎ যে সে আলমকে ভালোবেসেছে বলে আর কোনো যুবকের সঙ্গে কক্ষনো একটুও ফ্লার্ট করে না। লণ্ডনে ইতিমধ্যে কম ছেলে তো তুতুলকে জ্বালাতন করেনি। এখন অনেকেই জেনে গেছে যে তুতুলের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে কোনো সুবিধে হবে না। তবু তুতুল আলমের সঙ্গেও একটা আড়াল রেখেছে। শারীরিক সম্পর্কের বাধার ব্যাপারটা তো আছেই, তুতুল কিছুতেই বিবাহপূর্ব মিলনে রাজি নয়। আলমও কখনো জোর করেনি। কিন্তু তা ছাড়াও আরও একটা কিসের যেন আড়াল রয়ে গেছে, তুতুলকে এক এক সময় বুকে জড়িয়ে ধরেও মনে হয়, সে খুব দূরের মানুষ!

আলম শুনেছে, তার বন্ধুরা আড়ালে বলে, একটা নরম-সরম এক ফোঁটা মেয়ে কী জাদুই জানে। আলমের মতন একটা বেপরোয়া ছেলেকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে!

আলম তুতুলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আঙুল দিয়ে তার কপাল থেকে কয়েকটা চুল সরিয়ে দিল, চোখের পাতায় আলতো করে আঙুল বোলালো, ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালো।

এবারে তুতুল জেগে উঠে চোখ মেলে প্রথমে আতঙ্কিত, তারপরেই আলমকে চিনতে পেরে লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে গেল। আলম তার কাঁধ ধরে চেপে বললো, না না না। অমন ধড়ফড় করে ঘুম থেকে ওঠা মোটেই ভালো না স্বাস্থ্যের পক্ষে। টেইক ইয়োর টাইম! আগ চক্ষু মেলে ভালো করে পৃথিবীটা, অর্থাৎ নিজের ঘরটা দেখো, তারপর জানালা দিয়ে আকাশখানা দেখো, তারপর একটা হাত তোলো, বাকি শরীরটার ঘুম ভাঙার আরও সময় দাও!

তুতুল আপত্তি করলো না, সে আবার বালিশে মাথা দিল।

আলম জিজ্ঞেস করলো, কাল আবার স্লিপিং পিল খেয়েছিস? কয়টা?

কাল রাত্তিরে খুব মাথার যন্ত্রণা করছিল, এখনও গাটা ম্যাজম্যাজ করছে, সে কথা তুতুল আলমকে বললো না। আলম খুব ফুরফুরে মেজাজে আছে। সে আঙুল তুলে দেখালো, দুটো তারপর বললো, তুমি কতক্ষণ এসেছো?

আলম বললো, মনে তো হইত্যাছে যেন অনন্তকাল! ওরে তুলতুলি, এই সোনা রঙের রোদ্দুর তোর মুখে আইস্যা পড়ছে, তোরে আইজ একেবারে জেনুইন প্রিন্সেস-এর মতন দেখাইত্যাছে। তা প্রিন্সেস, গোলাম হাজির, কী হুকুম কঁর!

তুতুল ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললো, চা না খেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। তুমি কেটলিটায় জল ভরে চাপিয়ে দেবে?

–অবশ্যই! আমি তোরে বেড-টি দিমু! ইভন্ আই শ্যাল সার্ভ ইয়োর ব্রেকফাস্ট ইন বেড। টোস্ট উইথ মার্মালেড, এগস্ অ্যান্ড বেকন।

–আলম, দারুন খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি কাল–

–সিভিলাইজড লোকেরা স্বপ্ন নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করে না। খারাপ স্বপ্নের কথা তো কারুকেই বলতে নাই!

–তোমাকেও বলা যাবে না?

–আমাকে বলতে হবে না, আমি গেস করে নিয়েছি। তুই স্বপ্ন দেখেছিস যে আমি মরে গেছি। তাই তো? তার মানে বহুৎ দিনের মধ্যে আমার মরণ নাই!

–আলম, আমি বাড়িতে যাবো!

–বাড়ি? কোন বাড়ি? তুই আমার বাড়িতে যাইতে চাস? চল চল চল চল, এক্ষুনি চল! কতদিন ধরে তোরে বলছি, শুধু শুধু দুটো অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া গোনার কোনো মানে হয় না!

–আমি দেশে যাবো!

–দেশ, মানে ইণ্ডিয়ায়? স্বার্থপর! তুই না বলেছিলি, আমার সাথে এক সাথে কলকাতায় যাবি? এখন তুই একা একা পালিয়ে যেতে চাস?

–কেন, তুমি যাবে না আমার সঙ্গে? আমরা দু'জনেই যাবো!

–এখন? পাগল নাকি? ফাণ্ড রেইজিং প্রোগ্রাম নিয়ে এখন আমি কত ব্যস্ত জানিস না? এই শনিবারেই তো পিকাডেলিতে একটা বড় জমায়েত আছে। তা ছাড়া আমার আর ছুটি পাওনা কোথায়?

পাকিস্তানে আটকা পড়ে সব ছুটি খরচ হয়ে গেছে না?

রান্নাঘরের গ্যাস স্টোভে হুইশলিং কেটলটা হুইশল দিয়ে উঠলো। আলম উঠে গেল সেখানে। তুতুল টি ব্যাগ পছন্দ করে না, তাই আলম পাতা চা ভেজালো। কাবার্ড থেকে কাপ-সসার বার করে, চিনি খুঁজে, দুধটা একটু গরম করে চা বানালো নিপুণ হাতে।

দুটি কাপ হাতে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে বললো, দুধবরণ কন্যা ওগো, কুচবরণ কেশ, এই নাও তোমার চা! আমি নিজের হাতে চা বানিয়ে একটা মেয়েকে খাওয়াচ্ছি, এই কথা শুনলে আমার বাপ-দাদার কবরের মধ্যে শিউরে উঠবে! আমাদের চোদ্দ পুরুষে কেউ এসব করে নাই! দ্যাখ তো, কেমন হয়েছে?

চায়ে চুমুক না দিয়ে তুতুল আলমের দিকে চেয়ে রইলো এক দৃষ্টিতে। তারপর হঠাৎ সে উঠে আলমকে জড়িয়ে তার বুকে মাথা রেখে আর্ত স্বরে বলতে লাগলো, আলম, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই! আমার কিছুই কি পাওয়া যাবে না? আমি কী এমন দোষ করেছি?

আলম সন্ত্রস্ত বোধ করলো। তুতুলের এইরকম ব্যবহার একেবারেই অস্বাভাবিক। এতদিনের ঘনিষ্ঠতার পরেও তুতুল কখনো নিজে থেকে আলমকে আলিঙ্গন করে না, আলম তাকে কাছে টানলেও সে লজ্জা পায়। আজ কী এমন ঘটলো? নিশ্চয়ই গত রাত্তিরের দুঃস্বপ্নের ফল!

তুতুলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আলম বললো, এ কি ছেলেমানুষী করছিস? হঠাৎ মরার কথা উঠছে কেন? এই তুলতুলি, তাকা, আমার মুখের দিকে তাকা, কী হয়েছে সত্যি করে বল?

মুখ না তুলে তুতুল বললো, আমি খুব খারাপ! স্বার্থপর! প্রথম প্রথম এসে দেশের জন্য মন ছটফট করতো, প্রত্যেকদিন ফিরে যেতে ইচ্ছে করতো। আর এখন, চার বছর কেটে গেছে, একবারও যাইনি, যাওয়ার কথা মনেই পড়ে না। আমার মা, আমার মামা-মামীমারাও কেউ আমার ফেরার কথা চিঠিতে লেখে না, তারা বুঝে গেছে যে এই স্বার্থপর মেয়েটা আর ফিরবে না, শুধু নিজেকে নিয়েই—

—ঠিক আছে, একবার ঘুরে আয় দেশ থেকে। আমি টিকিটের খোঁজ নিচ্ছি।

—আমি একা যাবো না। তোমাকেও যেতে হবে সঙ্গে।

—আমার যে যাওনের এখন কোনো উপায় নাই রে! হেভি রেসপনসিবিলিটি নিয়া বসছি। এখন লণ্ডন ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। তোর মন খারাপ হয়েছে, তুই ঘুরে আয়।

তুতুল এবার সংযত হয়ে চোখ মুছলো। এতদিনেও সে স্লিপিং স্যুটে অভ্যস্ত হয়নি, শাড়ি পরেই শোয়া। আঁচল ঠিক করে, মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বললো, গত রবিবারের মিটিং-এ হাসান যে বললো, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তোমরা যে ফাণ্ড তুলছো, পাঁচ হাজার পাউণ্ড উঠলে তোমাদের মধ্যে একজন সেই টাকা নিয়ে যাবে, ওদের হাতে তুলে দেবে। তখন তুমি যেতে পারো না?

—হাসানের নিজেরই যাওয়ার ইচ্ছা খুব।

—হাসানের পাকিস্তানী পাসপোর্ট, ভিসা পাবে কি না ঠিক নেই। কিন্তু তোমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট, তোমার পক্ষে যাওয়াই সুবিধে।

—পাঁচ হাজার পাউণ্ড তো এখনো ওঠে নাই। তা ছাড়া আমার সার্জারি বন্ধ রাখার অসুবিধা আছে। তুই একাই এবার যা। লক্ষ্মীসোনা! শিরিন যে ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করে, সেখান থেকে আমি ধারে তোর টিকিট কেটে দেবো।

—আমি কিছুতেই একা যাবো না! তুমি খুব ভালো করেই জানো, আমি তোমাকে এখানে একা ফেলে রেখে যেতে পারবো না। তার মানে আমার দেশে ফেরা হবে না! এর মধ্যে আমি যদি মরে যাই—

তুতুলের চোখে আবার জল এসে যাচ্ছে দেখে আলম পরিবেশ হালকা করার জন্য বললো, ব্ল্যাকমেইল, দিস ইজ ব্ল্যাকমেইল। মেয়েদের চিরকালের অস্ত্র, চোখের জল! ওরে দুষ্টু মেয়ে, আমি তোর মতলোবখানা ভালো করেই বুঝেছি!

—কী বুঝেছো?

—আমারে সাথে নিয়ে তুই কলকাতায় যাবি। তারপরের চিত্রনাট্যখানা এই রকম। ওয়ান ফাইন মরনিং ডাক্তার মিস বহ্নিশিখা সরকার বিলাত থেকে ফিরবেন কলকাতায়, মামা-মামী, ভাগ্নে-ভাগ্নী আর মায়ের জন্য অনেক প্রেজেন্ট সঙ্গে নিয়ে, টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা, পারফিউম, ট্রানজিস্টার এইসব

হাবিজাবি। সবাই খুব খুশি, বাড়িতে হৈ চৈ চ্যাঁচামেচি। এর মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করবে, বহ্নিশিখা, তোমার সাথে ঐ লোকটি কে? ঐ যে চোরের মতন মুখ করে বৈঠকখানায় বসে আছে? ডক্তর মিস বহ্নিশিখা সরকার যেই তার লণ্ডনের বন্ধুটির পরিচয় দেবেন, অমনি তাঁর মা, হিন্দু ঘরের বিধবা চিক্কৈর দিয়া ওঠবেন, অ্যাঁ? এই সেই মোছলমানের ছাওয়াল, অ্যারে তুই বিয়া করতে চাস? আমি আইজই গলায় দড়ি দিমু, বিষ খামু! এই সব কইতে কইতেই চক্ষু উল্টাইয়া অজ্ঞান! তখন ডাক্তার মিস বহ্নিশিখা সরকার অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে বলবেন, ভাই আলম, তুমি তো দেখলেই সব। আমার খুবই ইচ্ছে ছিল তোমাকে শাদী করার, কিন্তু মায়ের মনে দুঃখ দিই কী করে? দশটা নয়, পাঁচটা নয়, আমার একটা মাত্র মা? সেই মা আত্মঘাতিনী হলে আমার যে নরকেও স্থান হবে না। তাই, হে বন্ধু বিদায়! তুমি তোমার পথে যাও, আমি আমার পথে। শেষের কবিতা!

—তুমি বম্বে ফিলমের চিত্রনাট্য লিখলে সত্যিই অনেক টাকা রোজগার করতে পারতে!

—আমার ট্যালেন্ট যে কতদিকে ওয়েস্টেড হলো। ডাক্তারি ছাড়া আমি অন্য অনেক কিছুই ভালো পারি।

—তবে তুমি আমাকে ভালো চেনো না তাই বহ্নিশিখা সরকারের চরিত্রটা একেবারেই দাঁড় করাতে পারোনি। লণ্ডন ছাড়ার আগে বহ্নিশিখা সরকার একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, সেটা তুমি ভুলে যাচ্ছো!

—ওঃ, আবার সেই দুস্বপ্নের কথা। সেটা শুনতেই হবে? বাইরে কী সুন্দর একখানা সকাল, তার মধ্যে দুঃস্বপ্ন! ঠিক আছে, বলো শুনি!

—আমি দুঃস্বপ্ন দেখেছি যে একটা বিচ্ছিরি চেহারার, বাউণ্ডুলে, দায়িত্বজ্ঞানহীন মুসলমান ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে!

—অ্যাঁ? সে আবার কে? স্বপ্নে তার মুখখানা দেখেছো?

—অফ কোর্স দেখেছি! সে একজন পচা ডাক্তার, ডাক্তারি ছাড়া অন্য পাঁচ রকম ব্যাপার নিয়ে মেতে থাকে। ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে হয় না। কলকাতায় যাবার আগেই সেই লোকটার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যাবে!

খুবই অভিপ্রেত কিছুও হঠাৎ সামনে এসে পড়লে তাকে গ্রহণ করা সহজ হয় না। গত আড়াই বছর ধরে আলম তুতুলকে বিয়ে করার জন্য ঝুলোঝুলি করেছে, তুতুল কিছুতেই তাতে সায় দিতে পারেনি। আজ হঠাৎ তুতুল নিজে থেকেই সে প্রস্তাব দিতে আলমই দ্বিধা করতে লাগলো। তুতুল কি ঝোঁকের মাথায় এরকম বলছে? তুতুলের মায়ের আপত্তির কথা সে জানে, সে ভদ্রমহিলার সেন্টিমেন্টে হঠাৎ তুতুল নিজে থেকেই সে প্রস্তাব দিতে আলমই দ্বিধা করতে লাগলো। তুতুল কি ঝোঁকের মাথায় এরকম বলছে? তুতুলের মায়ের আপত্তির কথা সে জানে, সে ভদ্রমহিলার সেন্টিমেন্টে হঠাৎ আঘাত দেওয়া যায় না, তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে সুজিয়ে...

আলম নরম গলায় বললো, তুমি দেশে ফেলার জন্য ডেসপারেট হয়ে এই কথা বলছো, তাই না? আমি জানি, হঠাৎ দেশের মানুষজনের কথা মনে পড়লে কী সাংঘাতিক টান হয়। আর একদিনও এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাবে কথা দিয়েছিলে। আমি যদি সেই সঙ্কল্প থেকে তোমাকে মুক্তি দেই? রিয়েলি, আই ওন্ট মাইণ্ড, তুমি একা ঘুরে এসো।

তুতুল বিছানা থেকে নেমে এলো। বাথরুমে যাবার জন্য কয়েক পা এগিয়েও ফিরে তাকালো আলমের দিকে। তার মাথা টলটল করছে, দুই ভুরুর মাঝখানে চিড়িক চিড়িক ব্যথা। পায়েও যেন জোর পাচ্ছে না। কাল রাত্তির থেকেই মনে হচ্ছে, তার আর বেশীদিন আয়ু নেই।

আবার সে আলমের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিসফিস করে বললো, আলম, আমাকে ধরো, আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো। আমাকে কোনোদিন ছেড়ে দিও না।

বাড়ি ছেড়ে ওরা বেরিয়ে পড়লো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে। আকাশ এখনো পরিষ্কার। যদিও ছুটির দিন নয়, তবু আজ টেমস নদীর ধারে বেশ মানুষজনের ভিড়। এর মধ্যে টুরিস্ট আছে অনেক, লণ্ডন শহরের বুড়োবুড়িরাও আজ রোদ পোহাতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। অফিস পালিয়ে চলে এসেছে যুবক-যুবতীরা।

ওয়াটার্লু ব্রীজ পেরিয়ে গাড়িটা পার্ক করে ডান দিকের এমব্যাঙ্কমেন্ট ধরে খানিকটা হাঁটলো তুতুল আর আলম। তুতুলের শরীরটা এখন অনেকটা ভালো লাগছে। দু'জনের হাতে হাত ধরা। রেলিং-এর

ধারে একটা ফাঁকা বেঞ্চ পেয়ে বসলো ওরা এক সময়। এমন কিছু বড় নদী নয়, তবু এই নদী দিয়ে বহু স্টিমার ও বোট চলে। টুরিস্টদের ঘুরিয়ে দেখায় যে বোটগুলো, সেগুলো আজ ভর্তি। রোদ্দুরের দিন মানেই যেন এ দেশে উৎসবের দিন।

কাছেই একটা স্টলে স্যান্ড উইচ, হট ডগ আর কফি বিক্রি হচ্ছে। আলম উঠে গিয়ে হট ডগ, কফি আর এক গোছা পেপার ন্যাপকিন নিয়ে এলো। সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি, দুপুরে ওরা নিয়ম করে লাঞ্চ খাবে না, আজ সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরবে, আর বারে বারে টুকিটাকি খাবে। ইচ্ছে হলে লং ড্রাইভে কোনোদিকে গিয়ে একটা কোনো গ্রামের পাব-এ বসতে পারে।

হঠাৎ একটু দূরে একজন শাড়ী পরা মহিলার দিকে চোখ পড়তেই আলম বললো, শিরিন না?

মহিলাটি ওদের দিকে পেছন ফিরে হাঁটছে, তার সঙ্গে একজন পুরুষ। মনে হচ্ছে শিরিন আর মুরশিদ। আলম জিজ্ঞেস করলো, ওদের ডাকি?

তুতুল মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো।

আলমের মুখে তখন অর্ধেক খাবার। সেটা কোনোক্রমে শেষ করে সে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলো, শিরিন! মুরশিদ! তারপর এদেশের নিয়ম লঙ্ঘন করে আর একবার বেশ জোরেই ডেকে উঠলো।

সেই নারী-পুরুষ যুগল এদিকে ফিরলো না, হঠাৎ নেমে গেল একদিকের সিঁড়ি দিয়ে। অনেকটা দূরে চলে গেছে, এখন দৌড়ে গেলেও বোধহয় ওদের ধরা যাবে না।

আলম আর চেষ্টা করলো না। ফিরে এসে বসে পড়ে বললো, ওরা শুনতে পায়নি!

তুতুল বললো, হ্যাঁ, শুনেছে। শিরিন একবার আমাকে দেখেওছে। ও আজকাল ইচ্ছে করে আমাকে অ্যাভয়েড করে।

–সেকি? শিরিন তোমাকে অ্যাভয়েড করবে কেন? সে তোমার ভালো বন্ধু না?

–হ্যাঁ, বন্ধুত্ব ছিল এক সময়। কিন্তু গত সপ্তাহে একটা টিউব ট্রেনে শিরিন আর আমি একই কামরায় উঠেছিলুম। শিরিন একটু দূরে বসেছিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ও চোখ ফিরিয়ে নিল। তারপর নেমে গেল পরের স্টেশনে, যতদূর মনে হয় সেখানে ওর নামার দরকার ছিল না, নামার সময় আমার দিকে একবার তাকালো না পর্যন্ত" আলম, তুমি যেমন আমার মায়ের কথা বললো, সে রকম আমাকে বিয়ে করার জন্য তোমার অনেক আত্মীয়-বন্ধুও বিরক্ত হবে, তুমি সেজন্য তৈরি থেকো!

আলম গম্ভীরভাবে একটুক্ষণ সিগারেট টানলো। তারপর বললো, এটা সে ব্যাপার নয়। আরও কমপ্লিকেটেড। শিরিন ফেব্রুয়ারি মাসে মুরশিদকে বিয়ে করলো, যদি আর একটা মাস ও ওয়েট করতো! এক মাসের মধ্যে যে অনেক ডিফারেন্স হয়ে গেল!

তুতুল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো, ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসের মধ্যে কী ডিফারেন্স হয়ে গেল?

–ফেব্রুয়ারি মাসেও মুরশিদ আর আমরা সবাই ছিলাম পাকিস্তানী। কিন্তু পাকিস্তানের দুটো উইং কি আর এক থাকবে? পঁচিশে মার্চের পর একটা পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন এসে গেল না? এবার যখন লড়াই শুরু হয়েছে, এখন ইস্ট পাকিস্তানে স্বাধীন বাংলাদেশ হবেই। তুমি বোধহয় জানো না, এরমধ্যেই লন্ডনে ইস্ট পাকিস্তানী আর ওয়েস্ট পাকিস্তানীদের মধ্যে শার্প দুটো ভাগ হয়ে গেছে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সাউথ লন্ডনের একটা পাবে করাচীর কিছু ছাত্র আর ঢাকার কিছু ছাত্রের মধ্যে তর্কাতর্কির পর হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেছে। মুরশিদ ওয়েস্ট পাকিস্তানী। শিরিন এখন কী করবে। বাঙালীদের সঙ্গে ও কি আর খোলাখুলি মিশতে পারবে?

–কিন্তু মুরশিদ ইজ আ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ আস। চমৎকার মানুষ। সে ওয়েস্ট পাকিস্তানী বলেই তোমরা তার সঙ্গে আর মিশবে না?

–পরে একসময় হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন খুব বেশী টেনশান, পরস্পরের প্রতি চরম অবিশ্বাস, এখন মেলামেশা শক্ত হবে ঠিকই।

–আমি কোনো মানুষকে তার দেশের পরিচয় বা জাতির পরিচয় দিয়ে বিচার করা খুবই অপছন্দ করি! ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগরমশাই কি তাই? আইনস্টাইন কি শুধু ইহুদি? হিটলার জার্মান ছিলেন বলে কি সব জার্মান...

–আহা, আমাকে তুমি ছেলেমানুষের মতন বোঝাবার চেষ্টা করছো কেন, আমি কি এসব জানি না?

কিন্তু যুদ্ধের সময় ঘৃণা আর অবিশ্বাস এমনই তীব্র হয়।

–যুদ্ধ হচ্ছে ইস্ট পাকিস্তানে, তা বলে লন্ডনেও ঝগড়া করতে হবে? তুমি যাই বলো, আমি আমাদের বিয়েতে মুরশিদকে নেমন্তন্ন করতে চাই!

–আমি তো ওদের ডাকলাম। তুমিও বলছো, ওরা ইচ্ছে করে এলো না।

রাত্তিরবেলা টেলিফোন না করেই ওরা দু'জনে উপস্থিত হলো শিরিন-মুরশিদদের বাড়িতে।

সারওয়ার মুরশিদ ইতিহাসের দুর্ধর্ষ ছাত্র, অধ্যাপক ব্যাসামের প্রিয় শিষ্য। বেলসাইজ পার্কে ওদের সুন্দর ছোট্ট বাড়ি। সারওয়ার মুরশিদের জন্মস্থান লাহোর, কিন্তু ওর বাবা পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বড় অফিসার, সাত বছর ঢাকায় ছিলেন। সেই সুবাদে মুরশিদও পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে। পাঠানদের মতন লম্বা-চওড়া চেহারা, তার মুখে বাংলা শুনতে বেশ মজা লাগে।

ওদের দেখে শিরিন খানিকটা আড়ষ্ট বোধ করলেও মুরশিদ সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানালো। আজ সন্ধের পরেও ঠাণ্ডা পড়েনি। খুলে দেওয়া হয়েছে জানলার কাচের পাল্লা, সাদা নেটের পর্দা বাতাসে উড়ছে, এদেশে এই দৃশ্য বিশেষ দেখা যায় না।

আলম বললো, তোমাদের দাওয়াত দিতে আসলাম। আগামী শনিবার আমরা বিয়ে করছি। গোল্ডার্স গ্রীনে তুতুলের অ্যাপার্টমেন্টে খুব ছোট্ট একটা পার্টি, তোমাদের দুইজনকেই সেখানে আসতে হবে।

শিরিন তেড়ছা চোখে তুতুলের দিকে তাকালো। মুরশিদ বললো, নেক্সট শনিবার? এত তাড়াতাড়ি? হঠাৎ ঠিক হলো বুঝি?

আলম তুতুলের মাথায় টোকা মেরে বললো, এই মেয়েটা একেবারে বিয়ে পাগলী হয়ে গেছে! রোজ ঘ্যান ঘ্যান আমায় বিয়ে করো, আমায় বিয়ে করো! তাই আর না করে উপায় কী বলো!

মুরশিদ হা-হা করে হেসে উঠে বললো, গুড কজ ফর সেলিব্রেশন। ভালো ইটালিয়ান রেড ওয়াইন আছে, খোলা যাক তা হলে?

আলম বললো, আপত্তি নাই।

তারপরই বললো, আপত্তি নাই।

তারপরই সে শিরিনের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললো, এই ছেমরি, তুই মুখ গোমড়া কইরা আছোস, কথা কস না যে? আমাগো শাদীর খবর শুইন্যা তুই খুশী হস নাই?

শিরিন কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, ওমা, খুশী হবো না কেন? কিন্তু তোমাদের পার্টিতে আমরা যাবো, অন্য কেউ যদি কিছু মনে করে?

–কে কী মনে করবে? ঐ সব কথা বাদ দে, শুধু ওয়াইন খাবো না, আমার ক্ষুধা পাইছে, কিছু খাবার দে!

শিরিন তবু বললো, আলম ভাই, একটা সাফ কথা বলি। তোমাদের হাসান হাফিজ যদি সেখানে থাকে, সে পার্টিতে আমি আর মুরশিদ যাবো না! সেই লোক কয়েকদিন আগেই আমাকে বলেছে, আমি নাকি বাঙালীর দুশমনরে শাদী করছি!

আলম কিছু উত্তর দেবার আগেই মুরশিদ আলমের হাতে একটা চাপড় মেরে মৃদু হেসে বললো, ডোন্ট ওয়ারি, হাসান ওরকম কথা বললেও আমি তোমাদের পার্টিতে যাবো। আই ডোন্ট মাইন্ড। আমি ডক্টর বহ্নিশিখা সরকারের একজন গ্রেট অ্যাডমায়ারার।

ওয়াইন বোতলের কর্ক খুলে সে দুটি গেলাসে ঢালার পর তুতুলকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি একটু পান করবেন তো? আজ আপনাকে একটু মুখে ছোঁয়াতেই হবে।

তুতুল বললো, হ্যাঁ, নিতে পারি। শিরিন খাবে না?

মুরশিদ বললো, শিরিন? সাচ্চা মুসলমান জেনানার মতন শরাব ওর কাছে হারাম। যত বোঝাবার চেষ্টা করি যে ওয়াইন আর মদ এক নয়, তা বুঝবে না। আরবরা ওয়াইন কাকে বলে জানতোই না। আরও মজার কথা, শিরিন হালফিল আমার সঙ্গে উর্দুতে বাতচিত শুরু করেছে। শী ওয়ান্টস টু বিকাম আ ট্রু পাকিস্তানী।

গেলাসে চুমুক দিয়ে আলম বললো, মুরশিদ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ইস্ট পাকিস্তানে আর্মি যে অত্যাচার শুরু করেছে, নিরীহ সিভিলিয়ানদের খুন করছে, গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সে খবরে

তুমি বিশ্বাস করো?

মুরশিদ বললো, ব্রিটিশ কাগজগুলোতে কিছু কিছু খবর বেরিয়েছে। বিশ্বাস না করে উপায় কী?

—টাইম, নিউজ উইকেও সাপ্তাহিক সব বিবরণ বেরিয়েছে। আমেরিকা বরাবরই পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে মদৎ দেয়. সেই দেশের কাগজে যদি পাক আর্মির অত্যাচারের এমন খবর বেরোয়া, তার গুরুত্ব আরও বেশী হবে। তাই না? মুরশিদ, আমি তোমার কাছে জানতে চাই, এই যে ইস্ট পাকিস্তানের মানুষদের ধরে ধরে মারছে, একই দেশের তো মানুষ, তাতে ওয়েস্ট পাকিস্তানে কোনো রিঅ্যাকশান নেই? তুমি তো করাচীর দু-একটা কাগজ রাখো।

—সেখানকার কাগজে এসব কিছু খবর থাকে না।

—পশ্চিম পাকিস্তানে কেউ প্রতিবাদও করছে না? আর্মি কি মনে করে, শুধু মেরে মেরে ইস্ট পাকিস্তানের জনসংখ্যা কমিয়ে দেবে? কত মানুষ খুন করবে, এক কোটি, দুই কোটি? পশ্চিমের থেকে পুবের মানুষ কম হয়ে যাবে! এইরকম পৈশাচিক পরিকল্পনার কথা কেউ কখনো শুনেছে? পশ্চিম পাকিস্তানে কেউ এর প্রতিবাদ করবে না? যেখানে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মতন কবি আছেন, মান্টোর মতন লেখক, আঃ মান্টোর এক একটা গল্প কী টাচিং, মনে আছে সেই গল্পটা? নামটা ঠিক মনে নাই, পাগলদের গল্প। পার্টিশানের পর ভারত আর পাকিস্তানের দুই দেশের কর্তাদেরই টনক নড়লো যে দুই দেশের পাগলা গারদেই তো কিছু হিন্দু আর মুসলমান পাগল রয়ে গেছে। পাকিস্তানে ইসলামিক স্টেট, লাহোর করাচীর পাগলা গারদে হিন্দু পাগলদের কেন পোষা হবে সরকারি খরচে? তাই হিন্দু পাগলদে পাঠাতে হবে ইন্ডিয়ায়, কিন্তু পাগলরা তো বোঝেই না, দেশ ভাগ কাকে বলে! এক সর্দারজী, সে তো কিছুতেই যেতে চায় না লাহোর ছেড়ে, তাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো, তারপর সে গুলি খেয়ে মরে পড়ে রইলো দুই দেশের সীমানার মাঝখানে হাত পা ছড়িয়ে। আসলে দুই দেশের নেতারা যে কত বড় পাগল...এই রকম গল্প লেখা হয়েছে যে পাকিস্তানে, সেখানে এখনকার গণহত্যা নিয়ে কোনো প্রতিবাদ নাই, এটা বিশ্বাস করি কী করে?

—সেখানকার সাধারণ মানুষ সবাই সে আর্মির এই ম্যাসাকার পলিসি সাপোর্ট করছে, তা আমিও বিশ্বাস করি না, আলম। পাকিস্তানের প্রেস গ্যাগড, কেউ প্রতিবাদ করলেও সে খবর বেরুবে না। তবে ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করা স্বৈরাচারীদের একটা কৌশল। ইয়াহিয়া আর তার হেলচম্যানেরা পশ্চিম পাকিস্তানে একরম একটা ধারণার সৃষ্টি করে দিয়েছে যে শেখ মুজিব ইন্ডিয়ার চর, হিন্দু কনসপিরেটররাই ইস্ট পাকিস্তানে সিসেশানের দাবি তুলেছে, আর্মি শুধু তাদের দমন করছে। অ্যান্টি অ্যান্টি ইন্ডিয়া আর অ্যান্টি হিন্দু সেন্টিমেন্ট বেশী করে প্লে আপ করে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সমর্থন অনেকটা পাওয়া গেছে।

শিরিন ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, হিন্দুরাই তো ক্ষ্যাপাচ্ছে, সেটা মিথ্যা নাকি? মোটেই না!

আলম অবাক ভাবে শিরিনের দিকে তাকালো।

মুরশিদ জোরে হেসে উঠে বললো, কইলাম না, তোমাদের কাজিন খুব র‍্যাপিডলি ওয়েস্ট পাকিস্তানী হয়ে উঠছে! শিরিন জানে না আমার মা হিন্দু, উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণের মেয়ে। ওকে যখন লাহোরে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবো সী উইল হ্যাভ দা শক অফ হার লাইফ টাইম। আমার মা ফেয়ারলি এডুকেটেড। মার সাবজেক্টও হিস্ট্রি। আমার স্পেশালাইজেশন অ্যানসিয়েন্ট আর্য পিরিয়াড নিয়ে। আমার মায়ের সঙ্গে অনেক সময় আমি সংস্কৃতে কথা বলি!

তুতুল আস্তে আস্তে বললো, আমি আলমকে আজই বলছিলাম, যে-কোনো মানুষকেই শুধু তার দেশের পরিচয় বা জাতের পরিচয় দিয়ে বিচার করা কতখানি ভুল!

মুরশিদ বললো, ঐতিহাসিক কারণে, এক একটা জাতের মধ্যে, বা এক একটা অঞ্চলে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন, বেঙ্গলে পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোসাল মুভমেন্ট শুরু হয়েছে গত সেঞ্চুরির মাঝখান থেকে। সেইজন্য বাঙালীরা পলিটিক্যালি যতখানি কনসাস, ওয়েস্ট পাকিস্তানে তা অনেক কম। বাঙালীরা ডেমোক্রাসির স্বাদ আগে থেকেই পেতে শুরু করেছে. ওয়েস্ট পাকিস্তানে অনেকেই এখনও ডেমোক্রেসির মর্ম ঠিক বোঝে না। সেইজন্যই আর্মি রুল হলে ইস্ট পাকিস্তানে যতখানি রি-অ্যাকশান হয়, ছাত্ররা যেমন ক্ষেপে যায়, ওয়েস্ট পাকিস্তানে তা হয় না। তারা মোটামুটি ফিউডাল যুগেই রয়ে গেছে অনেকটা। পশ্চিম পাকিস্তানীরা আরবের কাছাকাছি, আর পূর্ব পাকিস্তানীরা আরব

থেকে অনেক দূরে, সেখানকার মুসলমানদের একটা আলাদা কালচার গড়ে উঠেছে, হিন্দু কালচারের প্রতি তাদের একটা অ্যাফিনিটি থাকা খুবই স্বাভাবিক, আরও একটু দূরে, ইন্দো চায়নার মুসলিমদের মধ্যে হিন্দু মাইথোলজির প্রভাব এখনও অনেকখানি। আবার পূর্ব বাংলার হিন্দুদের মাধ্যে, উত্তর প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে অনেক মুসলিম ইনফ্লুয়েন্স আছে। এসব অস্বীকার করা কিংবা জোর করে চেপে দেওয়া যায় কখনো? ওয়েস্ট পাকিস্তানের আর্মির কর্তারা তো বটেই, পালিটিশিয়ানরাও অনেকেই মূর্খ। তারা বলে যে বাংলা নাকি হিন্দুর ভাষা! বাংলা ভাষায় কত আরবী-ফার্সি শব্দ আছে, তা তারা জানে না! আরবী-ফার্সি শব্দ বাদ দিয়ে বাংলায় পর পর তিন-চরটি সেনটেন্স বলাও প্রায় অসম্ভব! আর উর্দুর মধ্যেও যে কত সংস্কৃত শব্দ আছে, তা এরা কল্পনাও করতে পারবে না! বাঞ্চ অফ ইডিয়েটস্!

আলম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তবুও মানুস অকারণে মরছে!

দু'জন মাত্র সাক্ষী নিয়ে তুতুল আর আলমের রেজিস্ট্রি হলো খুবই বিনা আড়ম্বরে। সন্ধেবেলায় পার্টিতেও ডাকা হয়েছে মাত্র দশজনকে। প্রথমে এলেন ত্রিদিব। গ্লাসগো থেকে কাজের জন্য তাঁকে লন্ডনে আসতে হচ্ছে প্রায়ই। এই শনিবারটা তিনি থেকে গেছেন। সেই ছিপছিপে শরীর আর নেই ত্রিদিবের, কিছুটা মেদ লেগেছে, পাতলা হয়ে এসেছে মাথার চুল। আলম আর তুতুলের জন্য একগাদা উপহার এনেছেন তিনি, সঙ্গে একটি শ্যাম্পেন ও একটি ব্ল্যাক লেবেল স্কচের বোতল। শ্যাম্পেনের বোতলটা খোলা হবে সবাই আসার পর, ত্রিদিবের ততক্ষণ অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই, তিনি গেলাসে হুইস্কি ঢেলে বসলেন।

হাসানের স্ত্রী বুলবুল এসে রান্নাবান্না করছে বিকেলে থেকে, তুতুল তাকে সাহায্য করতে গেল। একজন দু'জন করে বন্ধুরা আসছে, আলম কথা বলছে তাদের সঙ্গে। এক সময় বেজে উঠলো টেলিফোন। আলম রিসিভার তুলে দু-একটা কথা বলে চেচিয়ে ডাকলো, তুতুল, তোমার—!

ফোনটা এসেছে আমেরিকা থেকে, পরিষ্কার কণ্ঠস্বর, তবু তুতুল যেন প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারলো না! সে দুবার জিজ্ঞেস করলো, কে বলছেন? হু ইজ স্পিকিং!

অন্যদিকে থেকে শোনা গেল, ফুলদি, আমি বাবলু! শোনো, আমি এখন বস্টনে এসেছি, অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছি, তুমি আমার ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা লিখে নাও। তুমি কলকাতা থেকে কোনো চিঠি পেয়েছো? আমি অনেকদিন খবর পাইনি কিছু, দুটো চিঠি দিয়েছি, সবাই ভালো আছে তো?

এখনো তুতুলের বিশ্বাস হচ্ছে না। বাবুল? সত্যি বাবলু? আমেরিকায় যাবার পর এক বছরের মধ্যে বাবলু একদিনও ফোন করেনি। চিঠি লিখলে উত্তর দেয় না, সেই বাবলু নিজে থেকে ফোন করেছে আজই, এই বিশেষ দিনে?

তার বিয়ের কথা বাড়ির কেউ জানে না। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সূত্র ত্রিদিবমামা। সেইজন্যই করে সে আজ ত্রিদিবমামাকে থাকতে বলেছে। আর বাবলু তার ভাই!

তুতুল কোনো কথা বলতে পারছে না। তার চোখে জল এসে যাচ্ছে। এই আকস্মিক যোগাযোগ তার বুকে দারুন একটা আন্দোলন তুলে দিল। তার অসম্ভব আনন্দ হচ্ছে। অথচ বাবলুকে খবরটা জানাতেও লজ্জা করছে তার।

বাবলু আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে, তিন মিনিট হলেই কেটে দেবে, তাই তুতুল হঠাৎ বলে ফেললো, বাবলু, তুই আজ ফোন করে কী ভালো যে করেছিস, বাবলু, আজ একটু আগে আমি বিয়ে করেছি!

কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল বাবলু, যেন সে কথাটা বুঝতে পারেনি। আবার জিজ্ঞেস করলো। তুমি কী করেছো বললে? বিয়ে? কাকে?

—লন্ডনে থাকার সময় তুই তো ডক্টর আলমকে দেখেছিলি, আমার বন্ধু, সেই আলমকে, এখানে ত্রিদিবমামাও আছেন।

—তুমি সত্যি বিয়ে করেছো? তোমার ব্রত কেটে গেছে তা হলে?

—ব্রত? কিসের ব্রত!

—কংগ্রাচুলেশনস্, ফুলদি! ইউ আর আ ব্রেভ গার্ল!

এমন অসভ্য ছেলে বাবলু, পয়সা বেশী খরচ হবার ভয়ে কট করে কেটে দিল এর পরেই। বাবলুকে আরও অনেক কথা বলার ছিল, আরও একটুক্ষণ বাবলুর গলার আওয়াজ শুনতে ইচ্ছে করছিল। ও কালেক্ট কল করলেই পারতো।

তুতুল নিজেই বাবলুর নাম্বারটা নিয়ে চেষ্টা করবে কি না ভাবতে ভাবতেই এসে উপস্থিত হলেন শাজাহান চৌধুরী। একটা অসম্ভব সুন্দর সামার-সুট পরে এসেছেন তিনি, হাতে এক গুচ্ছ গোলাপ ও একটি ভেলভেটের বাক্স। নিছক কলকাতার লোক এবং ত্রিদিবমামার বন্ধু বলেই শাজাহান চৌধুরীকে আজ ডেকেছে তুতুল।

শাজাহানও ততোধিক ভদ্রতার সুরে বললেন, হ্যালো, ত্রিদিব–

এরপরেও অন্যদের অগ্রাহ্য করে দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। যেন দুই যযুধান।

অন্য সবাই নিজেদের মধ্যে গল্পে মত্ত। তুতুল বিস্মিত ভাবে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো, কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটে গেছে। আজ সন্ধ্যে এদের এক সঙ্গে ডাকা ঠিক হয় নি। এই দু'জন পুরুষের দৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি অদৃশ্য নারী। সুলেখা। আজকের বিশেষ দিনটিতেও সুলেখার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তুতুলের মন খারাপ হয়ে গেল।

॥ ২৩ ॥

ক্রিস্টোফার রোডে বিরাট লম্বা লাইন পড়েছে ভোর থেকে। মঞ্জু-হেনা সুখুকে নিয়ে মামুন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এসেও দাঁড়ালেন প্রায় আড়াই শো-তিন শো জনের পেছনে। লরিতে চেপে বিভিন্ন ক্লাবের ছেলেমেয়েরা আসছে দল বেঁধে। কেটল ড্রাম ও বিউগল বাজাতে বাজাতে এলো একটা মিছিল, সব মিলিয়ে একটা উৎসবের পরিবেশ। একটু দূরে একটু মাইক্রোফোনে শোনা যাচ্ছে ভরাট গলায় আবৃত্তি।

মশা মেরে ঐ গরজে কামান–'বিপ্লব মারিয়াছি।
আমাদের ডান হাতে হাত-কড়া, বাম হাতে মারি মাছ।'
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার মরে বাঁচি।...

মঞ্জু আর হেনা দু'জনেই সাতসকালে উঠে স্নান সেরে নিয়েছে, তাদের ভিজে চুল ও চোখের পল্লবে লেগে আছে স্নিগ্ধতা। সুখুর উৎসাহ সবচেয়ে বেশী, তার ভালো নাম নজরুল ইসলাম, সে এসেছে আর এক নজরুল ইসলামকে দেখতে। নতুন কুর্তা-পাজামা পরানো হয়েছে তাকে, মাথায় একটি জরির টুপি। এই ফুটফুটে ছেলেটিকে অনেকেই গাল টিপে আদর করে যাচ্ছে।

ধীর গতিতে এগোচ্ছে লাইন। মঞ্জু আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, আবার না বৃষ্টি অ্যাইস্যা পড়ে!

গত রাত্রে খুব একচোট ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ এখনও পরিষ্কার নয়, তবে গরমটা একটু কমেছে। হেনা বললো, বৃষ্টি নামলেও ভিজবো!

মামুন একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। তাঁর মনে পড়েছে নজরুলের অনেক কবিতার লাইন। এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি খুঁজতে লাগলেন চেনা-শোনা কেউ এসেছে কি না। সেরকম কারুকে চোখে পড়লো না। এখানে কত দেরি হবে! তিনি ভেবেছিলেন, দশটার মধ্যে এখান থেকে চলে যেতে পারবেন।

এক ঘণ্টা কেটে যাবার পর সুখু আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না, ছটফট করছে, এক সময় সে মায়ের হাত ছাড়িয়ে সামনের দিকে ছুটে যেতেই মামুন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরলেন। পুরোনো আমলের একটা অদ্ভুত জন্তুর মুখের মতন কর্পোরেশনের কল থেকে জল ঝরে পড়ছে অবিরাম। সুখু সেই জল খেতে চায়। মামুন তাকে একটা মৃদু ধমক দিলেন।

সারা গায়ে দু'তিনটি ক্যামেরা ঝোলানো একজন ফটোগ্রাফার খচাখচ করে সুখু ও মামুনের দু'তিনটি ছবি তুলে ফেললো। একটি জলের কল, জড়ির টুপি পরা বালক ও এক প্রৌঢ় এই

কমপোজিশন সম্ভবত তাকে আকৃষ্ট করেছে। ছবি তোলার পর ফটোগ্রাফারটি বললো, আপনারা কী জয় বাংলার লোক?

মামুন মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, জী!

ফটোগ্রাফারটি বললো, আপনারা কতক্ষণ এই লাইনে দাঁড়াবেন? সঙ্গে বাচ্চা রয়েছে, আসুন আমার সঙ্গে!

মামুন বললেন, আমার সাথে আরও দুটি মেয়ে রয়েছে, আমার কন্যা আর ভাগনী!

–তাদেরও নিয়ে আসুন, আমি ঢুকিয়ে দিচ্ছি!

ফটোগ্রাফারটি সত্যি বেশ করিৎকর্মা। সে ভিড় ঠেলে, দু'তিনজনকে ফিসফিস করে কী সব বুঝিয়ে সে মামুনদের দলটিকে ঠিক নিয়ে গেল ভেতরে।

সে সময় বাংলাদেশ মিশনের হোসেন আলী উপস্থিত হয়েছেন সদলবলে, এসেছেন কলকাতা শহরের মেয়র, আরও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাই বাইরের লাইনের লোকদের এখন আসতে দেওয়া হচ্ছে না।

একটা ফরাসের মাঝখানে বসে আছেন কবি। এদিকে ওদিকে ছড়ানো অসংখ্য ফুল ও মালা। কবির কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ফটোগ্রাফাররা বলছে, একবার মুখ তুলুন, একবার এদিকে তাকান! কেউ কেউ চেঁচিয়ে তাঁকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে তাঁরই কবিতার লাইন। কবি কিছুই দেখছেন না, কিছুই শুনছেন না।

মামুণের মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হলো একটা গানের লাইন : ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?

হোসেন আলী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে মাল্যদান করলেন কবিকে। কবি হাত দিয়ে সেই মালা ছেঁড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন। নগর-কোটাল পাঠ করলেন কবির উদ্দেশ্য একটি মানপত্র, কবি বিড়বিড় করতে লাগলেন আপন মনে। কবির পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী ভক্তদের আনা উপহারের বাক্সগুলি থেকে একটা সন্দেশ নিয়ে ভেঙে খাওয়াতে গেলেন কবিকে, কবি থুঃ থুঃ করে ছেটাতে লাগলেন চারদিকে। কল্যাণী অনুনয় করে বলতে লাগলেন, বাবা, খান, একটুখানি খান।

মানুষের বারবার মনে পড়ছে ছাত্র বয়েসে দেখা কবির চেহারা, কোথায় গেল মাথার সেই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চোখের দীপ্ত জ্যোতি। কী সুন্দর করে হেসে বলেছিলেন, তুমি মোতাহারের ব্যাটা না?

পাশ ফিরে তিনি দেখলেন, হেনার মুখখানা যেন ভীতি-বিহ্বল আর মঞ্জুর চোখের কোণে চিকচিক করছে অশ্রু। সুখু এখনও বুঝতেই পারেনি, এর মধ্যে কোনজনকে দেখতে আসা হয়েছে, সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করছে, আম্মা, কে? কে?

আর বেশীক্ষণ এখানে থাকার কোনো মানে হয় না, মামুন সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। ঘরের মধ্যে খুব গরম ছিল, ঘামে ভিজে গেছে সারা গা।

কবি যে সুস্থ নেই তা জানতেন মামুন, কিন্তু নিজের চোখে দেখার অভিঘাত অনেক প্রবল। তাঁর মনটা বিষণ্ণ হয়ে রইলো, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মামুন একটুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না।

নিজের নামের আর একজন মানুষকে দেখার সাধ মিটে গেছে সুখুর। সে মামুনের হাত ধরে টেনে বলতে লাগলো, চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানায় যাবো এবার!

মামুন আজ ওদের ভিক্টোরিয়া ও চিড়িয়াখানা নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওদের তো বাড়ি থেকে বেরুনোই হয় না।

মৌলালির মোড়ে এসে বাসস্টপে দাঁড়াবার কয়েক মুহূর্ত পরেই একখানা প্রাইভেট গাড়ি থামলো তাঁদের সামনে। সেই গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন জিজ্ঞেস করলো, হক সাহেব না! আপনে কবে আইলেন?

মামুন প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হোটেলওয়ালা হোসেন সাহেব, দিনকার পত্রিকার মালিক! এই ব্যক্তিকে মামুন কলকাতায় দেখবেন আশাই করেননি। ঢাকায় গণ্ডগোল হলে এঁর পক্ষে করাচি কিংবা রাওয়ালপিণ্ডিতে আশ্রয় নেওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

হোসেন সাহেব সহর্ষে বললেন, আস্সালামো আলাইকুম! আস্সালামো আলাইকুম!

মামুন শুকনো গলায় প্রতি-অভিবাদন জানালেন।

হোসেন সাহেবকে বললেন, কোথায় যাইত্যাছেন? গাড়িতে উঠেন! গাড়িতে উঠেন।

হোসেন সাহেবকে দেখে মামুনের উল্লসিত হবার কোনো কারণ নেই। এই ব্যক্তিটি একসময় তাঁকে বিনা নোটিশে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে। তাঁকে বলেছিল, ইণ্ডিয়ার দালাল।

মামুন বললেন, ধন্যবাদ। আমরা বাস ধরবো!

হোসেন সাহেব বললেন, ওঠেন, ওঠেন। যেহানে যাবেন, নামাইয়া দিমু! বিদ্যাশে কোনো চেনা মানুষরে দ্যাখলেই আনন্দ হয়।

সুখু এর মধ্যে গাড়ির দরজা খুলে ফেলেছে। তার গাড়ি চড়ার লোভ। মামুন আর আপত্তি করতে পারলেন না।

হোসেন সাহেব বসছেন সামনে ড্রাইভারের পাশে, মামুন সপরিবারে উঠলেন পেছনে। খুব সম্ভবত ভাড়া করা গাড়ি, ড্রাইভারটির মুখ ভাবলেশহীন।

- কোন দিকে যাবেন?

- ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

- ভালো কথা, ভালো কথা, আমিও হেইখানে যামু। দেইখ্যা লমু আপনাগো লগে লগে!

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর হোসেন সাহেব পেছনে ফিরে একটা সোনার সিগারেট কেস বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ন্যান। ধূমপান করেন। বাসা লইছেন কোথায়? নাকি কোনো রিলেটিভ আছে কইলকাতায়?

হোসেন সাহেব পরে আছেন একটি সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ আদ্দির পাঞ্জাবি। দাড়ি কামানো মসৃণ মুখ। দু'হাতে হীরে-মুক্ত বসানো অন্তত সাত-আটটি আংটি। যে-লাইটারটি বাড়িয়ে তিনি মামুনের সিগারেট ধরিয়ে দিলেন, সেটাও সোনার।

তিনি বললেন, আজমীর শরীফ ঘুইরা আসলাম ইতিমধ্যে, বোঝলেন? আপনি গ্যাছেন নাকি? বড় সুন্দর দ্যাশ এই ইন্ডিয়া, রেল-ব্যবস্থা খুব ভালো, আপনি যখন যেখানে ইচ্ছা যান, কোনো অসুবিধা নাই। রাজস্থানে আছিলাম দশদিন, হোটেলের চার্জ শস্তা।

মামুনের হাসি পেল। এই হোসেন সাহেব প্রতিদিন ইণ্ডিয়ার মুণ্ডপাত না করে পানি খেতেন না, আজ তার মুখে ইণ্ডিয়ার এত প্রশংসা! এক জীবনে কতরকম ভেল্কির খেলাই যে দেখতে হয়!

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, আলতাফের কী খবর? সে আপনার সাথে আসে নাই?

হোসেন সাহেব বললেন, না! সে আসলো না! কী জানি সে কোথায় আছে! আইচ্ছা, হক সাহেব, কইলকাতা থিকা একটা পেপার বার করা যায় না? আমাগো স্বাধীন বাংলাদেশের সব খবর থাকবে? আমি কিছু কিছু হোটেল মালিকের সাথে আলাপ করত্যাছি, যদি এইখানে একটা হোটেল খোলন যায়, অনেকেই তো আসতে আছে বর্ডার ক্রশ কইরা-

মামুন বললেন, পত্রিকা তো বার হচ্ছে একটা।

-ঐ বালু হক্কাক লেনের 'জয় বাঙলা'? গেছিলাম অগো আড্ডায়। ঐ প্যাপারে কোনো কাম হবে না! আপনার মতন একজন তেজী সম্পাদক চাই!

মামুন এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। মানুষ এমন অম্লান বদনে বিপরীত কথা বলতে পারে!

- হাসলেন যে? আমি সীরিয়াস। কেপিটাল আমি যোগাড় করমু, হ্যার জন্য কোনো চিন্তা নাই, আমার সোর্স আছে। আসেন, খুব শিগগিরই আপনার সাথে বইস্যা আলোচনা করা যাক। কাইল আসবেন, গ্র্যান্ড হোটেলে আমার সাথে লাঞ্চ খান!

- আমার আর সম্পাদক হবার শখ নাই।

- এটা কি শখের ব্যাপার? দ্যাশের কাজ! দ্যাশ স্বাধীন করতে হবে। হক সাহেব, টাকা পয়সার কথা ভাইবেন না, ইণ্ডিয়ার যে-কোনো প্যাপারের এডিটরের সমান বেতন পাবেন।

- আপনার অফারের জন্য ধন্যবাদ। আপনি অন্য সম্পাদক খোঁজেন, হোসেন সাহেব। আমি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে অন্য একটি কাজে যুক্ত আছি।

গাড়িটা এসে থামলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটে। হোসেন সাহেব আরও অনেকক্ষণ সঙ্গে সেঁটে থাকবে ভেবে মামুন শঙ্কিত করছিলেন, কিন্তু হোসেন সাহেব এর মধ্যেই আবার মত বদলেছেন। মামুনরা নামতেই তিনি বললেন, এই রাখেন আমার কার্ড। কাইল পরশুর মধ্যে একবার আইস্যা পড়েন, আপনার সাথে আরও অনেক কথা আছে। আমি আর নামলাম না, আমার একটা

অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বাংলাদেশ মিশনে।

গাড়িটা চলে যাবার পর মামুন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর তিনি বললেন, ইস, প্রতাপের মেয়েটা বুঝি এতক্ষণে ফিরে চলে গেছে?

গেটের উল্টোদিকে মহারানীর ভিক্টোরিয়ার মূর্তির পাদদেশে একটা বই হাতে নিয়ে বসে আছে মুন্নি। সে এসেছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে তার কপালে।

সিঁড়ি থেকে নেমে এসে সে বললো, মামুনকাকা, এই যে আমি!

তারপর সে মামুনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো।

মামুন তার কাঁধ ধরে টেনে তুলে বললেন, আহা রে, তোরে কতক্ষণ বসায়ে রেখেছি। নিদারুণ ভিড় হয়েছিল রে কবির বাসায়।

মুন্নি বললো, আমি একবার দেখতে গিয়েছিলাম ওঁর জন্মদিনে। প্রত্যেক বছরই ভিড় হয়।

- এ বৎসর আরও বেশি ভিড়। জয় বাংলার সকলেই গেছে তো! বাসার সব কেমন আছে, মুন্নি? তোমার মায়ের জ্বর সারছে?

- হ্যাঁ, সেরে গেছে। আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে আপনাদের সবার নেমন্তন্ন। বাবা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

- ওর মধ্যে আবার ওসব কেন? নতুন বাসা, এখনও সব সাজানো-গুছানো হয় নাই।

- মোটামুটি হয়ে গেছে। নেমন্তন্ন মানে কী, দুপুরে খাওয়াটা ওখানে গিয়ে খাবেন।

মামুন বললেন, মঞ্জু, হেনা, তোরা মুন্নির সাথে ভিতরে গিয়ে দেখে আয় সব। আমি আর যাবো না, আগে তো দেখেছি, আমি গাছের ছায়ায় গিয়ে একটু বসি।

সুখু বললো, চিড়িয়াখানা! আমরা চিড়িয়াখানায় যাবো না?

মামুন তার মাথায় চাঁটি মেরে বললেন, যাবো, যাবো, আগে এটা দেখে নে! এটাও কত সুন্দর।

ফাঁকা জায়গা পেয়ে সুখু এক দৌড় লাগালো। তিন তরুণী আস্তে অস্তে এগোতে লাগলো শ্বেত সৌধের পটভূমিকায়, মামুন সেদিকে একটুক্ষণ মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে থেকে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলেন।

বোধশক্তিহীন কবিকে দেখে তাঁর মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল, হোটেলওয়ালা হোসেন সাহেবকে দেখার পর তাঁর মন অন্যরকম জর্জর বোধ হচ্ছে।

হোসেন সাহেব কট্টর ইসলামী এবং পাকিস্তানের গোঁড়া সমর্থক। হঠাৎ পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে তাঁর এত উৎসাহ জাগলো কেন? মানুষ কি রাতারাতি বদলে যেতেপারে? নাকি এর মধ্যে অন্য কিছু আছে?

এই বিষয়টি নিয়ে অন্তরঙ্গ কয়েকজনের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আলোচনা হয়েছে।

পশ্চিম বাংলায় তথা ভারতে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে, যেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষই পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে, সকলেই স্বাধীনতা চায়। প্রবাসী সরকারকে জোরদার করার জন্য-এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য এরকম একটা প্রচারও চালানো হচ্ছে সঙ্গত কারণেই। কিন্তু মামুনরা তো জানেন, এরকম একটা সর্বাত্মক দেশাত্মবোধ অলীক ব্যাপার। এখনো অনেকেই মনে করে হিন্দু ইন্ডিয়া ইসলামের দুশমন। ইণ্ডিয়ার সাহায্য নিয়ে পাকিস্তানকে ভাঙার অর্থ ইণ্ডিয়ার ফাঁদেই পা দেওয়া। অনেক মানুষ কি পাকিস্তানী শাসকদের সঙ্গে হাত মেলায়নি? অনেকেই কি ভাবছে না যে এই আন্দোলন কিছুদিন পরেই থেমে যাবে, পাকিস্তান যেমন ছিল তেমনই থাকবে?

সীমান্ত পেরিয়ে যারা এদিকে চলে আসছে, তারা সকলেই কি স্বাধীন বাংলার সমর্থক? মাঝে মাঝেই এমন কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, যারা কিছুদিন আগেই ছিল কট্টর মৌলবাদী তারা বাঙালী জাতীয়তাবাদকে ইসলামবিরোধী মনে করে। তাছাড়া উগ্র চীনা পন্থীরাও পাকিস্তানী জঙ্গী শাসনের বিরোধীতা করে নি, তারা এদিকে আসছে কেন? হোসেন সাহেবের মতন মানুষ এদেশে এসেও এত টাকা পাচ্ছেন কোথা থেকে? কেউ কেউ কি স্বাধীনতা আন্দোলনে স্যাবোটাজ করার চেষ্টা করবে না? সে সম্ভাবনা মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেউ কেউ নিশ্চয়ই এসেছে সীমান্তে মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর ও কলকাতায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের গোপন ক্রিয়াকর্মের কথা ঢাকায় জানিয়ে দেবার জন্য। ঢাকা বেতারে মাঝে মাঝেই এসব খবর প্রচার করছে, যা শুনলে চমকে যেতে হয়। একটা যুদ্ধ

মানেই অনেক ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, গুণ্ডাদের তৎপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, এইরকম অনেক কিছু।

রোদ্দুরে ঝকঝক করছে অনেক রকম ফুল। দু'দিকে দুটি সুন্দর বাঁধানো পুষ্করিণী, তাতে টলটল করছে স্বচ্ছ জল। পাশের ঝোপটায় ডাকছে কয়েকটা বুলবুলি পাখি, একটু দূরে এক ঝাঁক শালিক। মেমোরিয়ালের উঁচু গম্বুজের চূড়ায় ডানা-মেলা কৃষ্ণপরীর ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক টিয়া পাখি।

চতুর্দিকে এতসব সুন্দর, এর মাঝখানে বসে মামুন ভেবে যাচ্ছে যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার কথা? এক সময় যিনি কবিতা লিখতেন, তাঁর মনে একটুও কবিত্ব জাগছে না। মামুন নিজেই ভর্ৎসনা করলেন। এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জীবন কত শান্ত, নিরুদ্বেগ। জোড়ায় জোড়ায় তরুণী ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে, কেউ কেউ বসেছে ঘাসের ওপর। দূরে দ্রুত, চলন্ত গাড়ির শাঁ শাঁ শব্দ, বড় বড় রেনট্রি ও কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর ওপর দিয়ে হিল্লোলিত হচ্ছে বাতাস।

একগুচ্ছ রক্তিম রঙ্গন ফুলের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মামুন। একটা বড় আকারের ভোমরা সেখানে ঘুরে ঘুরে উড়ছে বোঁ বোঁ শব্দ করে। এত ব্যস্ত ও হুড়োহুড়িময় কলকাতা শহরের মধ্যেও এই জায়গাটা এমন নিস্তব্ধ যে পাখির ডাক, ভোমরার ডানার শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়।

সেই ফুলের গুচ্ছের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও মামুনের মনে কোনো কবিত্ব জাগলো না, চোখের সামনে ভেসে উঠলো থকথকে রক্ত। ছাব্বিশে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে তিনি দেখেছিলেন এখানে সেখানে ছড়ানো লাশ, আর কালো রাস্তার ওপর টগবগে, তরুণ ছেলেদের রক্তের দাগ।

ভিক্টোরিয়া থেকে হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া হলো চিড়িয়াখানা। সেখানে বেশীক্ষণ থাকা হলো না, গরমে টেকা যায় না। এর মধ্যে হেনা একবার বমি করে ফেললো। মেয়েটার বমির ধাত আছে। মামুন আরও ভয় পেলে গরমে সর্দি-গর্মি না হয়ে যায়। কলকাতায় গরম যেন এখন অনেক বেশী পড়ে। ঢাকায় এত গরম লাগে না মে মাসে। মামুনের যৌবনেও কলকাতা বোধহয় এত তেতে উঠতো না। চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ারেরাও এই গরমে ঝিমিয়ে পড়েছে।

সেখান থেকে দু'বার বাস বদলে আসা হলো ঢাকুরিয়ায়। মাত্র সাতদিন আগে বাড়ি বদল করেছেন প্রতাপ, বড় রাস্তা থেকে পাঁচ সাত মিনিট হাঁটা পথে, গলির মধ্যে একটা বাড়ির দোতলায় ছোট ছোট তিনখানা ঘর, আর এক চিলতে বারান্দা। বাড়িটা পশ্চিমমুখো, ভালো করে আলো ঢোকে না। কিছুক্ষণ আগে চিড়িয়াখানায় দেখা খাঁচায়বন্দী বাঘের ছবিটাই মামুনের মনে আসে প্রতাপকে দেখে।

কালীঘাটের বাড়িতে অনেক ঝঞ্ঝাট চলছিল বলে মামুনদের সবাইকে এ পর্যন্ত একদিনও নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে পারেননি প্রতাপ। বাইরে অনেকবার দেখা হয়েছে, মামুনও কালীঘাটের বাড়ি ঘুরে গেছেন দু'বার। প্রতাপ আজ ছুটি নিয়েছেন। পাজামা ও গেঞ্জি পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়, ওদের দেখে নিচে নেমে এসে উদ্বগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এত দেরি হলো তোমাদের? মুন্নি, তুই রাস্তা ভুল করেছিলি নাকি?

মামুন বলল, না, মুন্নিমা আমাদের খুব ভালো করে সব ঘুরিয়ে দেখিয়েছে, আমরাই দেরি করে ফেলেছি।

সরু, অন্ধকার সিঁড়ি। তা দিয়ে উঠতে উঠতে মামুনের মনে পড়লো, মালখানগরে প্রতাপদের কত বিরাট বাড়ি ছিল। প্রতাপের মনটাও ছিল বড়। এখনও তার মন সেইরকমই আছে, কিন্তু সামর্থ্য নেই। প্রতাপের আর্থিক অনটনের কথা মামুনের বুঝে নিতে দেরি হয় নি, তবু প্রতাপ মামুর সঙ্গে ট্রাম-বাসে উঠলে কিছুতে মামুনকে টিকিট কাটতে দেবেন না। মামুনের সিগারেট তিনি কিনে দেবেন, এর মধ্যেই মমতার নাম করে মঞ্জু-হেনা-সুখুকে শাড়ী জামাও দিয়েছেন। প্রতাপকে নিষেধ করেও কোনো লাভ নেই।

প্রতাপ বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের খিদে পেয়েছে, আগে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে যাও।

মামুন বললেন, আগে ছোটরা খেয়ে নিক, তুমি আর আমি পরে বসবো।

তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে তিনজন মহিলা এসে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলেন দরজার কাছে। টুনটুনির কাছে তাঁরা আগেই শুনেছিলেন যে আজ কয়েকজন জয় বাংলার মানুষ আসবে এ বাড়িতে। জয় বাংলার মানুষ এখন একটা দ্রষ্টব্য বিষয়।

মঞ্জু আর হেনাকে ঘিরে ধরে সেই মহিলারা নানান প্রশ্ন করতে লাগলেন। ওরা দু'জনেই যে

পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে, এটাই যেন মহা বিস্ময়ের ব্যাপার। পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে পূর্ব বাংলার বাঙালীদের বিচ্ছেদ মাঝখানের কতকগুলি বছরে এমনই গভীর হয়ে গেছে যে, এদিকের মানুষ ওদিক সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। মুসলমান মেয়েরাও স্বাভাবিক বাংলায় কথা বলে, একইভাবে শাড়ী পরে, কপালে টিপ দেয়! তিনতলার মহিলাদের ধারণা ছিল, ঢাকার মেয়েরা বুঝি বোরখা না পরে বাইরে বেরোয় না।

ওঘরের কিছু কিছু কথা ছিটকে আসছে এ ঘর, মামুন কৌতুক বোধ করছেন। এমনকি মঞ্জু হঠাৎ লাজুক লাজুক গলায় এক সময় দু'লাইন গান গেয়েও শোনালো ওদের।

এক সময় মামুন বললেন, প্রতাপ, তোমার দিদি কোথায়? একদিনও তাঁর সাথে দেখা হলো না।

মামুন এর আগে যে-দুদিন এসেছিলেন, সুপ্রীতি তখন বাড়িতে ছিলেন না। কানুর স্ত্রী হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, বাড়িতে দুটি অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে, বিপদে পড়ে কানু এসে খুব কাকুতি-মিনতি করেছিল। দিদি, দাদা-বৌদিরাই তো তার নিজের লোক। মমতা দু'দিন গিয়ে দেখে এসেছেন কানুর স্ত্রীকে, সুপ্রীতিকে কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল।

সুপ্রীতি অবশ্য এখন ফিরে এসেছেন। তবু প্রতাপ মমতা আমতা করে বললেন, থাক, খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও, পরে বিকেলে না হয়–

মামুন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না, না, আগে দিদির সাথে দেখা করে আসি!

প্রতাপ মামুনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি অস্বস্তি লুকোতে পারছেন না। এরা সবাই আসার পরেও দিদি একবারও ঘর থেকে বেরোননি। সকালবেলাতেই তিনি বলে রেখেছেন। বাড়িতে অতিথি আসবে আসুক, তিনি কোনো ব্যাপারের মধ্যে থাকবেন না!

প্রতাপের মনে পড়লো, দায়ুকান্দিতে মামুনদের বাড়িতে সেই প্রথম যাওয়ার দিনটির কথা। সেদিন মামুনের মনের ভাব কী হয়েছিল, তা আজ প্রতাপ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। ঘাম জমে যাচ্ছে প্রতাপের কপালে। বন্ধুর মুখের দিকে ভালো করে তাকাতে পারছেন না। তাঁর নিজের বাড়িতে যে কখনো এরকম একটা অবস্থা হবে, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন না। সুপ্রীতি এক সময় মামুনকে ঠিক নিজের ভাইয়ের মতনই স্নেহ করতেন। কিন্তু তুতুলের ব্যাপারে তিনি একেবারে অবুঝ হয়ে গেছেন।

প্রতাপ বললেন, শোনো, মামুন, দিদির বয়েস হয়েছে তো, শুচিবাই হয়েছে, পুজো-আচ্চার দিকে মন গেছে। এমন ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক হয়েছে যে স্নান করার পর আমাদেরই ছুঁতে চান না...

মামুন হেসে উঠে বললেন, আমি মোছলমান বলে দিদি আমারে ছোঁবেন না? দূর, তাও কী হয়? দিদিরে আমি চিনি না? দিদির বরানগরের বাসায় গিয়ে কতবার আমি খেয়ে এসেছি।

মামুন ঘর থেকে বেরুতে উদ্যত হতে প্রতাপ তাঁর পিঠে হাত রেখে ধীর স্বরে বললেন, শোনো,মামুন, আরও দু'একটা কথা আছে। দিদির জীবনে অনেক দুর্ভোগ গেছে। জানো তো, জামাইবাবু অসময়ে হঠাৎ মারা যান। শ্বশুরবাড়িতে ওরা দিদিকে থাকতে দেয়নি, সম্পত্তির ভাগ দেয় নি, দিদি তবু কারুর কাছে মাথা নীচু করেননি কখনো। বড়লোকের বাড়ির বউ ছিলেন, আমার এখানে এতগুলো বছর কষ্ট করে কাটালেন...

–তুমিও এক সময় বড়লোকের ছেলে ছিলে!

–সে তো প্রায় আগের জন্মের কথা! দিদির একটাই মোটে মেয়ে, ভালো মেয়ে, পড়াশানায় খুব ভালো, ডাক্তার, দিদির শেষ গয়না বিক্রি করে তাকে বিলেতে পাঠানো হলো, দিদির খুব আশা ছিল, সে ফিরে এলে একটু সুখের মুখ দেখতে। কিন্তু তাতেও একটা মুশকিল হয়ে গেল–

–সেই মেয়ে ফিরে আসে নাই?

–ব্যাপার হলো কী জানো, তুতুল ওখানে গিয়ে একটা মুসলমান ছেলের সঙ্গে ভাব করলো, তাকেই বিয়ে করতে চাইলো। তাতে দিদির ঘোর আপত্তি! চিঠি পেয়েই দিদির একবারে ক্ষেপে উঠেছিলেন।

মামুন ভুরু কুঁচকে দু'এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বিরক্তির সঙ্গে বললেন, সেই মেয়েরই বা কেন মুসলমান বিয়ে করার জন্য জেদ ধরা? বিধবা মায়ের যদি আপত্তি থাকে...স্বজাতির মধ্যে কি ভালো পাত্র পাওয়া যায় না?

প্রতাপ বললেন, ঐভাবে তো বলা যায় না। আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়ে, বিলেতে গেছে,

তার যদি কারুকে বিশেষ পছন্দ হয়–
–তুমি সে বিয়েতে মত দিয়েছিলে?
–আমি না-ও বলিনি, হ্যাঁ-ও বলিনি!
–আমি হলে আপত্তি জানাতাম। তোমার দিদি সারা জীবন অত কষ্ট পেয়েছেন, তার ওপরে তাঁকে আবার দুঃখ দেওয়া মোটেই উচিত নয়। বয়স্ক লোকদের কিছু কিছু বিশ্বাস, সংস্কারের মূল্য দিতে হয়।
–বিয়েটা এখনও হয়নি। তার ফল আরও খারাপ হয়েছে। মেয়ে বিয়েও করে না, দেরি করে ফেরে না। কিছুদিন আগে একবার সে কিছু টাকা পাঠিয়েছিল, দিদি রিফিউজ করে দিয়েছে!
–ঠিক করেছেন! সেইজন্যই কি দিদির সব মুসলমানদের ওপরেই রাগ? দিদির চোখে আমিও কি মুসলমান? তা হতেই পারে না!
–থাক, মামুন, দিদিকে এখন আর ঘাঁটাবার দরকার নেই। খাওয়ার আগে যদি তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, মঞ্জুরা যদি কিছু শুনে ফেলে–
–দিদি আমাকে দূর দূর ছাই ছাই করলেও আমি কিছু মনে করবো না!
ঘরের দরজা ভেজিয়ে রেখেছিলেন সুপ্রীতি। প্রতাপ ঠেলা দিয়ে সেই দরজা খুললেন, তাঁর মতন মানুষেরও কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল। মামুনদের তিনি আজ খাবার নেমন্তন্ন করেছেন, এই সময় দিদি ওদের কোনো রকম অপমান করেন...
প্রতাপ বললেন, দিদি, মামুন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মনে আছে তো মামুনকে?
ঘরটা অবুঝা অন্ধকার। চৌকির ওপর জোড়াসনে বসে আছেন সুপ্রীতি, সাদা থান পরা, চেহারাটা শীর্ণ শালিকের মতন।
মামুন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই সুপ্রীতি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, থাক থাক, ঐখান থেকে কথা বলো! ঐখান থেকে।
মামুন বললেন, দিদি, আপনাকে প্রণাম করবো না?
সুপ্রীতি বললো, না, প্রণামের কী দরকার?
মামুন বললেন, দিদি আপনার মনে আছে, বরানগরে আপনার শ্বশুরবাড়িতে কতদিন গিয়ে আপনার হাতের রান্না খেয়েছি। অসিতদাদা আমাকে খুব স্নেহ করতেন।
সুপ্রীতি নীরস গলায় বললেন, তোমরা সব সুখে থাকো, ভালো থাকো।
মামুন বললেন, সুখে থাকবো, ভালো থাকবো কী দিদি! আমার বউ আর এক মেয়েকে ওখানে ফেলে আসতে হয়েছে, তাদের জন্য সর্বক্ষণ চিন্তা। আমার সাথে যে ভাগ্নী এসেছে, তার স্বামী আছে ওখানে, তার কোনো খবর পাই না। আবার কবে দেশে ফিরবো তা জানি না, এই অবস্থায় কী ভালো থাকা যায়? আমার মেয়েকে আপনি দেখবেন না? প্রতাপ, হেনা আর মঞ্জুকে একটু ডাকো!
সুপ্রীতি বললেন, থাক, থাক, এখন ডাকার দরকার নেই। বললাম তো, তোমরা সুখে থাকো, বেঁচে বর্তে থাকো, আমার আর ক'দিন! আমি আছি বা নেই, তাতেই বা কি আসে যায়।
–আপনে এরকম ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবেন? বাইরে আসেন দিদি!
–আমি এখন ঘুমোবো!
প্রতাপ মামুনের হাত ধরে টানলেন। আর দরকার নেই, দিদি যে রাগারাগি করেননি, সেটাই যথেষ্ট! মামুনকে তিনি বাইরে নিয়ে এলেন।
এ বাড়িতে কোনো খাওয়ার ঘর নেই। মঞ্জু হেনাদের খেতে দেওয়া হয়েছে মুন্নির ঘরে। তাদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রতাপ বললেন, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে, মমো আমাদের এই বারান্দাতেই জায়গা করে দাও!
পুরোনো আমলের দুটি পশমের আসন পেতে দেওয়া হলো। আজ তিনি কাঁসার থালা ও গেলাসও বার করেছেন। বারান্দায় জল ছিটিয়ে থালা পাতলেন মমতা। প্রথমে বাটিতে করে মাছ তরকারি সাজিয়ে দিলেন।
আসনে বসে পড়ে মামুন বললেন, পাগলের কাণ্ড, এর কোনো মানে হয়!
তিনরকম মাছ রান্না করা হয়েছে, সেই সঙ্গে মুর্গীর মাংস। মোচার তরকারি, দু'রকম ডাল, পটল ভাজা, আলু ভাজা। কলকাতায় মাছের কী আগুন দাম তা মামুন জানেন, বড় চিংড়ি মাছ তো ছোঁয়াই

যায় না। প্রতাপ গাদা খানেক টাকা খরচ করেছেন আজ।
মমতা ভাত বেড়ে দিতে এলে মামুন হাততুলে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, বৌঠান, আপনার হাতের রান্না এরপরেও বহুদিন খেতে হবে। আপনি নেমন্তন্ন না করলেও আসবো। কিন্তু আজ দিদি নিজের হাতে পরিবেশন না করলে আমি খাবো না!
প্রতাপ অনুরোধের চোখে মামুনের দিকে তাকালেন। কেন মামুন সব কিছু কঠিন করে তুলছেন আজ!
এত ছোট ফ্ল্যাট যে বারান্দার কথা যে-কোনো ঘর থেকেই শোনা যায়। সুপ্রীতিও নিশ্চয়ই শুনেছেন। মামুন আবার চেঁচিয়ে বললেন, দিদিকে বলো, উনি পরিবেশন না করলে তাঁর ছোটভাই মামুন আজ খাবে না কিছুতেই।
তারপর প্রতাপের দিকে ফিরে তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, সত্যিই আমি খাবো না।
প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মমো তুমি ডেকেবলবে দিদিকে?
মুন্নি বেরিয়ে এসেছে এর মধ্যে। সে বললো, আমি ডাকছি!
ঘরের দরজা খুলেই সে চেঁচিয়ে বললো, ওমা, পিসিমা আবার ফিট হয়ে গেছেন!
মামুন আর প্রতাপ এক সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে এলেন। খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়েছেন সুপ্রীতি, দু'দিকে ছড়ানো হাত দুটো মুঠো করা, পা দুটো ছটফট করছে, মুখ দিয়ে তিনি ই-ই-ই করে একটা শব্দ করছেন।
প্রতাপ বিচলিত হলেন না, তিনি বললেন, মুন্নি, স্মেলিং সল্ট নিয়ে আয়–।

॥ ২৪ ॥

চার্লস নদীর এক পারে বস্টন শহর, অন্য পারে কেমব্রিজ। না, কলকাতা-হাওড়ার সঙ্গে কোনোমতেই তুলনা করা চলে না। এখানকার এই দুই সহোদরা নগরীই বড় চোখ জুড়োনো সুন্দর। এর মধ্যে কেমব্রিজের ছোট ছোট বাড়ি ও নিরিবিলি রাস্তাগুলির সঙ্গে যেন পুরোনো লন্ডনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জনস্রোতে ঝলমলে পোশাকে ছাত্র-ছাত্রীদেরই বেশি করে চোখে পড়ে বলে কেমব্রিজকে মনে হয় যৌবনের শহর।
এক একদিন বিকেলবেলা শর্মিলা অতীনকে নিয়ে শহর চেনাতে বেরোয়। শীতের বাতাস শেষ বিদায় নিয়েছে, এখন সত্যি সত্যি বসন্তকাল। চতুর্দিকে ফুলের সমারোহ। এদেশের শহরগুলি অনেকখানি যান্ত্রিক হলেও প্রকৃতিতে ধরে রাখার চেষ্টা আছে, যত্নও আছে। গাছের পাতাগুলি খাঁটি সবুজ, ধুলোর আস্তরণে মলিন নয়। একদিন এক বাগানের মালিকে বড় বড় গাছের ডগায় পাইপে করে জল ছিটিয়ে দিতে দেখে অতীন বিস্মিত হয়েছিল। ভারতে কৃষ্ণচূড়া বা দেবদারু গাছের পাতা জল দিয়ে ধুইয়ে দিতে কে কবে দেখেছে?
একদিন কেমব্রিজ শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে, যেখানে চার্লস নদীর ওপরে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে, তার কাছেই সায়েন্স মিউজিয়াম দেখতে গেল ওরা দু'জনে। ভিড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই, লোকের চেঁচিয়ে কথা বলে না, এখানকার মিউজিয়ামগুলিতে তিন চার ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায় অনায়াসে।
সারা দুপুর সেই প্রদর্শনী দেখে, নদী পেরিয়ে ওরা বস্টনের দিক দিয়ে হাঁটতে লাগলো উদ্দেশ্যহীনভাবে। শর্মিলা হাঁটতে ভালোবাসে, তার ধারণা হেঁটে হেঁটে না ঘুরলে কোনো শহরকেই ভালোভাবে চেনা যায় না। অতীনের অবশ্য শহর চেনার জন্য এমন কিছু ব্যস্ততা নেই, এখানেই যখন বেশ কিছুদিন থাকতে হবে, তখন আস্তে আস্তে সব কিছু তো চেনা হবেই। কিন্তু এই বসন্তকালে শর্মিলা ঘরের মধ্যে বা রেস্তোরাঁয় বেশিক্ষণ বসে থাকতে রাজি নয়।
অতীন বাস কিংবা ট্রেন নিতে চাইছে কিন্তু শর্মিলা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে যে আজ সে অতীনের সঙ্গে লংফেলো ব্রীজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নদী দেখবে। যেন ওই ব্রীজের সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। শর্মিলার এরকম থাকে। অন্য লোকেরা যেরকমভাবে সিনেমা-থিয়েটার-কনসার্টে যায়, শর্মিলাও সেইরকম মাঝে মাঝেই কোনো বিশেষ রাস্তা কিংবা পার্ক কিংবা গীর্জা দেখার কথা ঠিক করে ফেলে। যেমন দুদিন আগেই সে সকালবেলা অতীনকে ফোন করে বলেছিল, সে

সমারভিল-এ স্প্রিং ফিল্ড স্ট্রিটের একটি ছোট দোকানে চা খেতে যাবে। সেই দোকানটির চায়ের আলাদা কোনো খ্যাতি নেই, তবু অতদূরের ওই বিশেষ দোকানটার সামনের পেভমেন্টে অনেকগুলো পায়রা এসে খেলা করে, ঘুম থেকে উঠেই যেন শর্মিলার চোখে ঝকঝকে রোদ্দুরে সেই পায়রাদের ওড়াউড়ির দৃশ্যটা ভেসে উঠেছে। তক্ষুনি একবার গিয়ে সেই দৃশ্যটা না দেখলে তার চলবে না।

মুখে আপত্তি জানালেও অতীন শর্মিলার এই সমস্ত পাগলামি পছন্দই করে।

কিন্তু আজ মিউজিয়ামে অনেকক্ষণ দু'পায়ে খাড়া থাকতে হয়েছে, তারপরে হাঁটতে হয়েছে যথেষ্ট, এরপর আর অতীনের ব্রীজ দেখার শখ নেই। অবশ্য নদী পরাপারের জন্য ওরা হার্ভার্ড ব্রীজই বেশী ব্যবহার করে, লংফেলো ব্রীজে তেমন আসা হয় না, কিন্তু দুটো ব্রীজে তফাত কী আছে, তা অতীন বোঝে না। একজন কবির নামে ব্রীজ বলেই সেটা বিশেষ দর্শনীয় হবে? একথা শুনে শর্মিলা যেন আকাশ থেকে পড়ে। একটা সেতুর সঙ্গে আর একটা সেতুর কোনো মিল থাকতে পারে? প্যারিস শহরে প্রত্যেকটি সেতুই কি বিশেষ দ্রষ্টব্য নয়? প্রতিটি সেতু থেকেই শহরকে অন্যরকম দেখায়।

অতীন প্যারিসে যায়নি, সে আর তর্ক করে না শর্মিলার সঙ্গে।

লংফেলো ব্রীজের ওপর কিছুটা আসতেই হাওয়ায় উড়তে থাকে শর্মিলার জর্দা রঙের সিল্কের শাড়ির আঁচল। যেন তার মাথার ওপর একটা পতাকা ছটফট করছে। এমনই প্রবল বাতাস এখানে যে শর্মিলা সামলাতেই পারছে না তার শাড়ি, অতীন মজা পেয়ে হাসছে হা-হা করে। অন্য কয়েকজন নারী-পুরুষ শর্মিলাকে সকৌতুকে দেখতে দেখতে চলে গেল।

সায়েন্স মিউজিয়াম থেকে পাওয়া কতকগুলো বুকলেট খসে পড়ে গেল শর্মিলার হাত থেকে, সে কোনোক্রমে দাঁড়ালো রেলিং ঘেঁষে। অতীন বই-কাগজপত্রগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বললো, হার্ভার্ড ব্রীজে কোনোদিন আমি এরকম অবাধ্য বাতাস দেখিনি, এই ব্রীজটা সত্যি আলাদা!

শর্মিলা বললো, সিল্কের শাড়ি না পরে আসাই উচিত ছিল। এমন মুশকিল হয়...

অতীন শর্মিলার কাঁধে হাত রেখে বললো, আমি তোমাকে ধরে থাকছি!

বিকেল শেষ হয়ে আসছে, আকাশে লাল রঙের আভা। নদীর জলও এখন রঙীন। কিন্তু এখানে নিস্তব্ধতা কিংবা নিঃসঙ্গতা বোধ করার কোনো উপায় নেই। ব্রীজের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে অনবরত গাড়ি নদীর জলও চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে অনেকগুলি স্পীড বোট। এখানকার আকাশে সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফেরা পাখির ঝাঁক চোখে পড়ে না। ফট ফট ফট ফট শব্দ করে ঘুরছে দুটো হেলিকপ্টার। আবহাওয়া সুন্দর বলে পায়ে-হেঁটে ব্রীজ পারাপার করছে অনেক মানুষ। তবু এর মধ্যেও আলাদা হয়ে যাওয়া যায়। অতীন শর্মিলাকে শক্ত করে চেপে ধরে আছে, শর্মিলার গালের সঙ্গে ঠেকে গেছে তার গাল, কিন্তু তাদের দিকে তাকাচ্ছে না, কেউ তাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না।

শর্মিলা বললো, কলকাতার যে দুটো ব্রীজ আছে, হাওড়া ব্রীজ আর বালি ব্রীজ, দুটো কি একরকম? হাওড়া ব্রীজ দিয়ে কক্ষনো হাঁটতে ইচ্ছে করে না কিন্তু বালি ব্রীজ দিয়ে বেড়াতে কী ভালো লাগে!

অতীন বললো, আমি তো বালি ব্রীজের ওপর দিয়ে কোনোদিন বেড়াইনি! ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে দু'একবার গেছি দক্ষিণেশ্বরে, কিন্তু বালি ব্রীজে উঠেছি কি না মনে পড়ে না!

–আমার মামার বাড়ি দক্ষিণেশ্বরে। আমি কতবার গেছি! তুমি তো নিউ ইয়র্ক শহরে এতগুলো দিন রইলে, ব্রুকলীন ব্রীজ আর ওয়াশিংটন ব্রীজ দেখেনি? কত তফাত! ব্রুকলিনের দিক থেকে এইরকম কোনো মেঘ বিকেলে ম্যানহাটনের দিকে তাকিয়ে দেখেছো? সারা পৃথিবীতে এরকম দৃশ্য আর নেই। ঠিক মনে হবে সোনা দিয়ে তৈরি এক স্বর্ণনগরী।

–স্বর্ণনগরী, না স্বর্ণলঙ্কা?

–তুমি কোনোদিন কোনো নদীতে সাঁতার কেটেছো?

–আমি সাঁতারই জানি না!

শর্মিলা যেন প্রায় শিউরে উঠে অতীনের দিকে ফিরে বললো, এত বড় ছেলে, তুমি সাঁতার জানো না? এই সামারেই তুমি পাবলিক সুইমিং পুলে সাঁতার শিখে নেবে!

কয়েক মুহূর্তের জন্য অতীনের কাছে সেই অনুভূতিটি ফিরে এলো। সে ডুবে যাচ্ছে, চতুর্দিকে জল, লোহার মতন কঠিন জল, সেই জল তার গলা টিপে শ্বাস বার করে নিতে চাইছে। হঠাৎ দেখতে পেল কাছে তার দাদার মুখ, দাদা তাকে বাঁচাবে, সে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলো দাদাকে.....

ছবিটাকে মুছে ফেলার জন্য সে টপ করে শর্মিলার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলো।

শর্মিলা ছটফটিয়ে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো নিজেকে। এদেশে ছেলেমেয়েদের প্রকাশ্য চুম্বন একেবারেই অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু শর্মিলার খুব লজ্জা। এর আগে অতীন কয়েকবার পীড়াপীড়ি করলেও সে রাজি হয়নি, তার মতে, শাড়ি পরা মেয়েদের এরকম অসভ্যতা মানায় না।

অতীন আজ কিছুতেই শর্মিলাকে ছাড়লো না, সে একেবারে বজ্র আঁটুনিতে চেপে ধরে রাখলো শর্মিলার মাথাটা, জোর করে এমন দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন দিল যে প্রায় বন্ধ হয়ে আসার মতন অবস্থা।

শর্মিলা অতীনের বুকে কিল মারতে মারতে বলতে লাগলো, অসভ্য! তুমি এমন খারাপ আর পাজী–

অতীন হাসছে, তার মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

শর্মিলা একবার এদিক তাকিয়ে দেখে নিল কেউ তাদের লক্ষ করছে কি না। কেউ তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি। শর্মিলা তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে লিপস্টিক বার করলো, অতীন এত হাওয়ার মধ্যেও কায়দা করে ধরালো একটা সিগারেট।

শর্মিলা বললো, খবরদার আবার যদি কক্ষনো এরকম করো, তোমার সঙ্গে কথা বলবো না!

অতীন শর্মিলার কোমর জড়িয়ে ধরে বললো, চুমু খাবার পরেই ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে নেই। একটুবাদে টয়লেট যাবার ছুতো করে ঠোঁটের রঙ ফিরিয়ে আসতে হয়। এদেশের এতদিন আছো, এই এটিকেট শেখোনি?

শর্মিলা ভুরু কুঁচকে বললো, তুমি শিখলে কী করে? অন্য কোনো মেয়ে বলেছে বুঝি?

–টিভি দেখলেই শেখা যায়। দুপুরবেলার টিভি প্রোগ্রামগুলো সবই তো চুম্বনের সহজপাঠ! কতরকমভাবেই যে এরা চুমু খেতে পারে!

–দুপুরবেলা বসে বসে বুঝি ওই অখাদ্য সিরিয়ালগুলো দেখা হয়?

–নিউ ইয়র্কে সিদ্ধার্থর সঙ্গে যখন থাকতাম, দুপুরে কোনো কাজ ছিল না, টিভি শুনে শুনে অ্যাকসেন্ট শিখতাম।

–ছাই শিখেছো! তুমি এখনো শিডিউলড বলো, স্কেজুউল বলতে পারো না।!

–মিলি, তোমাকে আমার আগে আর কেউ চুমু খায়নি?

–ড্যাট। আবার অসভ্যের মতন কথা। তোমাকে বলেছি না, আমার কোনো বন্ধু ছিল না, আমি এত লাজুক ছিলুম, অচেনা কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারতুম না। শুধু তোমার সঙ্গেই যে কী করে এই সব হয়ে গেল।

–বন্ধু না থাক, তোমার কোনো মাসতুতো দাদা কিংবা জামাইবাবু, এরকম কেউও চুমু খায়নি? বলো না, আমি কিছু মনে করবো না!

–কী অদ্ভুত কথা বলছো, এরকম আবার হয় নাকি? মাসতুতো দাদা, জামাইবাবু....যাঃ! মেয়েরা কক্ষনো এত শস্তা হয় না। এর আগে আমার গায়ে কেউ সামান্য হাত ছোঁয়াতে সাহস করেনি। এক তুমিই একটা ডাকাত...

–তোমার ছেলেবেলার কথা আমার জানতে ইচ্ছে করে। বাচ্চা বয়েসে তুমি ফ্রক পরে কোথায় দৌড়োদৌড়ি করতে? জামশেদপুরেই ইস্কুলে পড়েছো?

–না, তখন বাবা বদলি হয়েছিলেন পাটনায়। একদিন বেশ তুমি আর আমি পা ছড়িয়ে বসে ছেলেবেলার গল্প করবো!

–আমার ছেলেবেলাটা খুব খারাপ কেটেছে। শোনবার মতন কিছু নেই!

–তোমাদের দেশ তো ছিল পূর্ববঙ্গে। তুমি মা-বাবার সঙ্গে দিয়েছো নিশ্চয়ই তোমার কিছু মনে আছে?

–মিলি, এত হাওয়ায় আমার একটু শীত শীত করছে। চলো এবার বাড়ি যাই!

–তোমার শীত করছে? ওই দ্যাখো, ছেলেরা শুধু গেঞ্জি পরে যাচ্ছে! আলোগুলো জ্বলুক, তখন এখান থেকে দুদিকের দুটো শহর কী সুন্দর যে দেখাবে!

কয়েকদিন ধরেই বিকেল বেশ দীর্ঘ। ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে না। গাড়িগুলো এখনও হেডলাইট জ্বালেনি। এক দঙ্গল জার্সি পরা ছেলে কোনো ফুটবল মাঠ থেকে হৈ হৈ করে ফিরছে।

কেউ একটা খবরে কাগজ ফেলে রেখে গেছে, সেটা রেলিং-এ আটকে ফরফর করে উড়ছে। অতীন সেটা তুলে নিয়ে জলে ফেলে দিতে যেতেই শর্মিলা তার হাত চেপে ধরে বললো, এই, কী করছো!

—খবরের কাগজের শব্দ আমার ঠিক পছন্দ হয় না!

—তা বলে নদীতে ফেলবে? এইভাবেই নদীগুলো পলিউটেড হয়!

—এটা তো ভাই কোনো সাহেবই ফেলে গেছে, আমি তো ফেলিনি। একটু বাদে জলে গিয়ে পড়তেই। পলিউশানের জন্য আমি দায়ী নই!

—ওটা হাতে রেখে দাও, পরে কোনো ট্রাশ ক্যান-এ ফেলে দেবো!

অতীন কাগজটা চোখের সামনে মেলে একপলক দেখলে। শস্তা ধরনের পত্রিকা, প্রথম পাতাতে শুধু রগরগে খবর। খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, চিত্রতারকাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ। একটি ন-দশবছরের ফুটফুটে বালিকার মুখের প্রায় সিকি পৃষ্ঠা জোড়া ছবি, তার নীচে যাট পয়েন্টের টাইপে রোমহর্ষক হেডিং।

শর্মিলা কাগজের পৃষ্ঠাটির দিকে একবার মাত্র অন্যমনস্কভাবে তাকিয়েই চোখ বুজে ফেললো। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ, ঠোঁট কাঁপছে। হঠাৎ সে রেলিং-এর ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে দিল।

অতীন তখনও সিগারেট টানতে টানতে কাগজটা পড়ে যাচ্ছে ওদিকে শর্মিলার যেন হঠাৎ বদলে যাচ্ছে সমস্ত জীবন। পৃথিবীটা ঘুরছে। এই ঘুরন্ত পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে যে, অতীন তাতে ধরে রাখতে পারবে না। অতীন তাকে ধরতে চাইবেও না, বরং সে-ও যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে।

অতীন অনামনস্ক ভাবে শর্মিলার হাতটা ধরতে গেল, শর্মিলা সেটা ছাড়িয়ে নিল। অতীন তার পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো?

মুখ না তুলেই শর্মিলা বললো, আমার শরীর খারাপ লাগছে! আমি মরে যাচ্ছি!

—কী হয়েছে? কী রকম খারাপ লাগছে?

—আমার মাথা ঘুরছে! সারা শরীর ঝিমঝিম করছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। বাবলু, বাড়ি চলো!

—চালো তা হলে!

—আমি হাঁটতে পারছি না! আমার ভীষণ মাথা ঘুরছে!

—কিন্তু এই ব্রীজের মাঝখানে তো বাসটাসে উঠতে পারবো না। ট্যাক্সি থামবে না। চলো, আমি তোমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি! হঠাৎ কেন এরকম হলো তোমার?

শর্মিলাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কয়েক পা মাত্র গেল অতীন। যতই শরীর খারাপ লাগুক, কোনো মাতালকে তার সঙ্গী যেভাবে টেনে নিয়ে যায়, সেইভাবে রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে না শর্মিলা। বাবলুকে ছেড়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু চোখ খুলে রাখতে পারছে না। অতীনের হাত ধরে বললো, চলো, আমি যেতে পারবো!

অতীন বেশ ঘাবড়ে গেছে। এরকম আকস্মিক অসুস্থতা শুধু বুঝি মেয়েদেরই হয়! শর্মিলা যেরকম করছে, এর মধ্যে যদি অজ্ঞান হয়ে যায়, তা হলে সে কী করবে? রাস্তার কোনো চলন্ত গাড়ি থামিয়ে লিফ্ট চাইবে?

কোনোক্রমে ব্রীজটা পেরিয়ে এলো শর্মিলা। এর মধ্যে আলো জ্বলতে শুরু করেছে। ব্রীজ থেকে আলোকময় নগর দেখার এত ইচ্ছে ছিল শর্মিলার, এখন সে চোখই খুললো না। একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল সমানেই।

ট্যাক্সিতে ওঠার পরেও মাথাটা হেলিয়ে চোখ বুজে রইলো শর্মিলা। অতীন জিজ্ঞেস করলো, খুব কষ্ট হচ্ছে?

শর্মিলা কাতরভাবে বললো, হ্যাঁ। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও, বাবলু! আমি আর পারছি না! সহ্য করতে পারছি না।

—এই তো সোজা বাড়িতেই যাচ্ছি। তার আগে, কোনো ডাক্তারের কাছে যাবে?

—না। ডাক্তার দরকার নেই। বাড়ি গেলেই ঠিক হয়ে যাবে!

অতীন শর্মিলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেলে সে সরিয়ে দিল হাতটা। সারা রাস্তা সে আর

একটাও কথা বললো না।

পার্ল স্ট্রিটে মামাতো বোনের সঙ্গে একখানা ঘর ভাগাভাগি করে থাকে শর্মিলা। ঘরখানা একতলাতেই। বয়েসে একটু ছোট হলেও সুমি যেন শর্মিলার অভিভাবিকা। তাকে শর্মিলা ভয় পায়। তার জন্যই অতীনকে কখনো এ বাড়িতে আসতে বলে না শর্মিলা। আজ অতীন ঠিক করলো, শর্মিলাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সুমিতে বলবে কোনো ওষুধ-টষুধের ব্যবস্থা করতে।

কিন্তু ট্যাক্সি থেকে নামার পরই শর্মিলা প্রায় যেন রূক্ষভাবে বললো, ঠিক আছে, তুমি এবার যাও! তারপর সে প্রায় দৌড়ে ঢুকে গেল ভেতরে। কয়েক মুহূর্ত হতবুদ্ধির মতন দাঁড়িয়ে রইলো অতীন। তার একটা অপরাধবোধ হচ্ছে। শর্মিলার কি সত্যি শরীর খারাপ হয়েছে, না মেজাজ খারাপ হলো? ব্রীজে দাঁড়িয়ে অতীন কি তাকে এমন কিছু বলেছে, যাতে সে আঘাত পেয়েছে? এমনভাবে চলে গেল কেন শর্মিলা?

অতীন কি তাকে কোনো সাহায্যই করতে পারতো না? ওষুধ-টষুধ এনে দিতে পারতো অন্তত দরকার হলে।

ট্যাক্সিতে ছেড়ে দিয়েছে, এবার হাঁটতে আরম্ভ করলো অতীন। এখান থেকে তার বাড়ি বেশ দূর। দুবার বাস বদল করতে হবে বলে সে আর সেই ঝঞ্ঝাটে গেল না। হঠাৎ কী হলো শর্মিলার? না, প্রকাশে চুমু খাওয়ার জন্য রোগ এটা নয়। ওতে শর্মিলা লজ্জা পেয়েছে বেশী, রাগেনি। ঠোঁটে ঠোঁটে ছোঁয়াতেই শর্মিলার সারা মুখখানা উষ্ণ হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে প্রত্যাখ্যান ছিল না। তা হলে কী জন্য সে এমন বদলে গেল। যদি শরীর খারাপ হয়েও থাকে, তাতে সে অতীনের সঙ্গে ভালো করে কথা বলবে না? বাড়ির সামনে থেকে তাকে বিদায় করে দিল ঠিক একটা এলেবমে লোকের মতন!

অতীন আশঙ্কা করেছিল, ট্যাক্সির ভাড়া মেটাবার জন্য তাকে শর্মিলার ব্যাগ খুলে পয়সা নিতে হবে। তা অবশ্য হয়নি, ভাড়া উঠেছিল দশ ডলার, ড্রাইভারকে এক ডলার টিপস দিতে হয়েছে, এখন অতীনের পকেটে খুচরো কিছু পয়সা পড়ে আছে। এই পয়সার এক প্যাকেট সিগারেটও হয় না। অতীনের সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, এমন জ্বালাতন, এদেশে এক প্যাকেটের কম সিগারেট কেনার উপায় নেই।

আস্তে আস্তে অভিমানের বাষ্পে ভরে যাচ্ছে অতীরে মন এখন শর্মিলা ততক্ষণ চোখ বুজে রইলো? এমনকি বাড়িতে ঢোকার সময়েও সে একবারও অতীনের দিকে তাকালো না!

মেয়েদের কি বুকের ভেতরটাও দেখে ফেলার বিশেষ কোনো ক্ষমতা আছে? আজ ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে সিগারেট টানার সময় দু-একবার অলির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সেই সেরা সে নবদ্বীপ থেকে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে কৃষ্ণনগরের দিকে আসা, তারপর অন্ধকারের মধ্যে বসে অলি গান গাইলো....সেই দিনটা কত দূরে সরে গেছে, অলি এখন পৃথিবীর উল্টোপিঠে, তবু হঠাৎ হঠাৎ অলির মুখটা মনে পড়া তো কেউ আটকাতে পারবে না। শর্মিলা কি টের পেয়ে গিয়েছিল যে তার পাশে দাঁড়িয়েও অতীন অন্য একটি মেয়ের কথা ভাবছে? সে শর্মিলাকে ঠকাচ্ছে?

একদিন না একদিন শর্মিলাকে বলতেই হবে অলির কথা। তখন অতীন একথাও জানাবে যে, সে তার কোনোদিন অলির কাছে ফিরে যাবে না বটে, কিন্তু অলিকে সে তার জীবন থেকে একেবারে বাদ দিতেও পারবে না! এ ব্যাপারটা কি শর্মিলা মেনে নেবে? হ্যাঁ, মানবে, তাকে মানতেই হবে। শর্মিলা খুব নরম, সুন্দর মনের মানুষ, সে ঠিকই বুঝবে!

প্রায় এক ঘন্টার রাস্তায় অতীন একবারও অন্য কোনোদিকে তাকায়নি। শুধু শর্মিলার সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে বলতে এলো। এখনো সে বুঝতে পারেনি, শর্মিলা কোন কারণ রেগে গেল তার ওপর!

লিভিং রুমে টিভি চলছে, সেখানে বসে আছে সোমেন। সে প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা নিয়ম করে খবর শোনে। ওয়াল্টার কনক্রাইটের গলা না শুনলে বুঝি তার ঘুম হয় না। পর্চে দাঁড়িয়ে সত্যকিঙ্কর দেখছেন রাত্রির আকাশ। অ্যাস্ট্রোনমিতে তাঁর খুব উৎসাহ। আজ রাতের আকাশে প্রচুর নক্ষত্রময়।

এদেশীয় ভদ্রতা অনুযায়ী চেনা কারুর সামনে দিতে যেতে হলে দুটো কথা বলতেই হয় তার সঙ্গে। তা সে যত অকিঞ্চিৎকর কথাই হোক। এমনকি চলতি অচেনা মানুষের চোখে চোখ পড়ে গেলেও মুখ ফিরিয়ে নেবার নিয়ম নেই, মুখে হাসি ফুটিয়ে বলতে হয়, হাই! ইংল্যান্ডে এসব ব্যাপার

নেই, তাই প্রথম প্রথম আমেরিকায় এসে অচেনা মানুষের মুখে এরকম সম্বোধন শুনে অতীন চমকে চমকে উঠতো।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে রোজ রোজ কী আর কথা বলা যায়! সত্যকিঙ্করকে দূরে সরিয়ে দেবার একমাত্র উপায়, ওঁর সামনে সিগারেট ধরানো। উনি ধোঁয়া সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু এখন অতীনের পকেটে সিগারেটও নেই।

অতীন বললো, 'ইভনিং! আজকের আকাশটা খুব পরিষ্কার। এত তারা কোলকাতার আকাশে কোনোদিন দেখা যায় না।

বয়েসে অনেক বড় হলেও সত্যকিঙ্কর তাঁর কোনো ভাড়াটেকে তুমি বলেন না। তাঁর কণ্ঠস্বর সবসময় মৃদু। তিনি বললেন, আমার ছেলেবয়েস কেটেছে পাবনায়। সেখানেও পরিষ্কার আকাশ দেখেছি। ওই দেখুন, গ্রেট বীয়ার আর লিটল বীয়ার দুটোর আজ এত স্পষ্ট....গ্রেট বীয়ারকে কী যেন বলে বাংলায়?

নামটা জানা থাকলেও অতীন মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, ঠিক জানি না।

এখন গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে আলোচনা করার একটুও উৎসাহ নেই অতীনের। সে চাঞ্চল্য গোপন করতে পারছে না। সত্যকিঙ্কর আঙুল তুলে আরও নক্ষত্রের নাম বলে যাচ্ছে, তিনি মুখখানা না নামালে অতীন বিদায় নিতে পারছে না।

সুরেশ নামে গুজরাতি ছেলেটি এই সময় এসে পড়ায় অতীন মুক্তি পেল। সুরেশ বেশ জমিয়ে গল্প করতে পারে, পৃথিবীর যে কোনো বিষয়েই তার কিছু কিছু জ্ঞান আছে।

দু'তিন ধাপ সিঁড়ি একসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে এসে অতীন নিজের ঘরে ঢুকে বেশ জোরে শব্দ করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। এখন এই ঘরের মধ্যে তার ছোট্ট নিজস্ব জগৎ, এখানে কেউ তাকে বিরক্ত করতে আসবে না।

সারাদিন ধরে দরজা-জানলা বন্ধ, ঘরটা গরম হয়ে আছে। পর্দাগুলো সব টানা। জামা-প্যান্ট খুলতে লাগলো অতীন, ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো প্যান্ট-শার্ট। বাড়ির পোশাক পরে নেবার বদলে সে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো নগ্ন হয়ে। ঘরটা আজ অসম্ভব খালি খালি লাগছে। যেন এটা তার নিজের ঘর নয়। এরকম একটা ছাদ-নীচু ঘরে যে মাসের পর মাস কাটাবে কী করে?

কথা ছিল, সায়েন্স মিউজিয়াম থেকে ফেরার পথে কিছু খাবার-টাবার কিনে এনে শর্মিলা আর সে এই ঘরে সারা সন্ধেটা কাটাবে। শর্মিলা তাকে একটা সেকেণ্ড হ্যান্ড রেকর্ড প্লেয়ার কিনে দিয়েছে। রেকর্ডও জোগাড় হয়েছে কয়েকটা, গানবাজনা শুনতে শুনতে গল্প আর ভালোবাসাবাসি। হঠাৎ সব কিছু বদলে গেল।

ব্রীজের ওপর অমন চমৎকার হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কী এমন অসুখ হতে পারে? পেট ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা? শর্মিলার এরকম কোনো রোগের কথা অতীন শোনেনি। শর্মিলার মাঝে মাঝে মাথা ধরে, একটু রোদ লাগলেই তাকে ওষুধ খেতে হয়। সব মেয়েরই নাকি একটু আধটু মাথা ধরার রোগ থাকে। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মাথার বেশী স্পর্শকাতর। আজ তো সে রকম চড়া রোদ ছিল না! অতীন একবার শর্মিলার মাথায় হাত রাখতেই সে জোর করে সরিয়ে দিল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেও তার আপত্তি? মাথা ধরাটা এমন কিছু রোগ নয় সে তার মধ্যে কোনো কথা বলা যাবে না!

টেবিলের ওপর একটা সিগারেটের প্যাকেট আছে। পোশাক না পরেই অতীন একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা জানলা খুলে দিল আর ঘরটা অন্ধকার, অন্য কোনো বাড়ি থেকে তাকে দেখা যাবে না। একেবারে গায় ঘেঁষাঘেষি অন্য কোনোও বাড়িও নেই।

শর্মিলা, আমি কী খারাপ ব্যবহার তোমার সঙ্গে? একবার বুকে হাত লেগে গিয়েছিল, কিন্তু তা তো আমি ইচ্ছে করে দিইনি! এদেশে অনেক লোকের চোখের সামনে চুমু খাওয়া যায়। কিন্তু তার বেশী কিছু করাটা রুচিহীনতা। আলিঙ্গন চলে কিন্তু বুকে হাতে দেওয়ার চলে না, অতীন তা ভালোই জানে। হঠাৎ বুকে একবার হাত লেগে যাওয়াটা দোষের কিছু নয় নয় শর্মিলা, তুমি কি তা বুঝতে পারোনি? তাও তো বেশ কিছুক্ষণ যাওয়াটা দোষের কিছু নয় আমার সঙ্গে কথা বললে, হাসলে! আর কী দোষ করেছি! এর আগে কোনোদিন তুমি আমাকে এরকমভাবে অগ্রাহ্য করোনি!....

অতীন মজুমদার, অতীন মজুমদার, তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে তুমি আধঘন্টা ধরে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে একটা একটা মেয়ের কথা চিন্তা করে যাচ্ছো? তোমর আর কোনো কাজ নেই? একটা মেয়েই তোমার কাছে এখন সব কিছু?

অতীন ঠাস ঠাস করে নিজের দু'গালে দুটো চড় কষালো বেশ জোরে। অভিমান কিংবা হতাশার বদলে এখন তার শরীর অতীনের জ্বলছে রাগে! শর্মিলা ভালো মেয়ে, সরল মেয়ে, কিন্তু বড্ড জেদী। সে কি ভেবেছে, অতীনের সঙ্গে যেমন খুশী ব্যবহার করা যায়? কোনো কারণে যদি তাকে শর্মিলার ভালো না লাগে, তা হলে কক্ষনো সে আর শর্মিলাকে বিরক্ত করত যাবে না! শর্মিলা এরকম যখন-তখন মেজাজ দেখালে অতীন মজুমদার কিছুতেই তা সহ্য করবে না। এরপর শর্মিলা যদি আবার নিজে থেকে তার কাছে আসে, তাহলে শর্মিলাকেই ক্ষমা চাইতে হবে।

এখন শর্মিলার কথা একেবারে ভুলে যাওয়া দরকার।

অতীন দ্রুত একটা প্যান্ট পরে নিয়ে টেবিলে বসলো। ঘরো আধ বোতল মদ আর এক প্যাকেট কুকি ছাড়া আর কোনো খাদ্য পানীয় নেই। না, অতীন এখন মদ খাবে না। একটা মেয়ের ওপর রাগ করে একা বসে বসে মদ্যপান করা টিপিক্যাল দেবদাসের ব্যাপার। তার খিদে পেয়েছে, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে খাবার কিনে আনার একটুও ইচ্ছে নেই।

দরকারি বই খুলে সে মিষ্টি নারকেলি বিস্কুটই দাঁতে কাটতে লাগলো একটা একটা করে। অতীনের এই ক্ষমতাটা আছে, যখন সে বই পড়ায় মন দেয় তখন সে আর অন্য কোনো কথা ভাবে না। খাতায় সে নোট নিতে লাগলো গভীর মনোযোগ দিয়ে। পি-এইচ ডি করে ফেলতে হবে এক বছরের মধ্যে।

রাত সাড়ে এগারোটায় অতীনের সিগারেট শেষ, মিষ্টি বিস্কুট শেষ। এবার পড়া বন্ধ করে ঘুমানো যায়। একটা হাই তুলে বই বন্ধ করতেই শর্মিলার মুখচ্ছবি ফিরে এলো আবার!

আজ এত উৎসাহ করে শর্মিলা নিয়ে গেল লংফেলা ব্রীজে, কত হাসি আর গল্প, তার মধ্যে হঠাৎ শর্মিলার এই ভাবান্তর, এই রহস্যটা কী সেটাই অতীনের জানা দরকার। শর্মিলা না চাইলে অতীন আর তার সঙ্গে দেখা করবে না। কিন্তু সে কী জন্য....

আবার অতীনের মন অনুশোচনায় ভরে গেল। ইস, ছি ছি, সে শুধু নিজের দিকটাই ভাবছে! শর্মিলার যদি সত্যি সত্যি কোনো কঠিন অসুখ হয় থাকে? সে হয়তো অতীনকে কোনো দায়িত্বে মধ্যে ফেলতে চায়নি বলেই মুখ ফুটে কিছু বলেনি। তা বলে অতীন স্বার্থপরের মতন দূরে সরে থাকবে?

দরজা খুলে সে দৌড়ে নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। লিভিং রুমে এখন কেউ নেই আলো জ্বেলে অতীন ফোনটা তুলে নিল।

ওদিক থেকে ফোন ধরলো সুমি। সে নীরস গলায় বললো, শর্মিলা এখন ঘুমোচ্ছে!

অতীন জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে শর্মিলার?

সুমি বললো, তার শরীর খারাপ?

অতীন অস্থিরভাবে বললো, তা জানি! তার কী অসুখ হয়েছে? ডাক্তারকে কিছু জানানো হয়েছে? এখানে ডাক্তার সর্বাধিকারী আছেন আমাদের চেনা।

সুমি বললো না, আজ আর কিছু করা হয়নি। ওরা মাথা ধরেছিল, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

–সুমি, আমি ওর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।

–এখন সম্ভব নয়। আমি ডাকতে পারবো না। গুড নাইট।

লাইন কেটে দিয়েছে সুমি। এই মেয়েটা যে কেন গোড়া থেকেই অতীনকে অপছন্দ করেছে, তা কে জানে? মরালিস্ট? কিন্তু ওরও তো বয় ফ্রেন্ড আছে একজন। কিন্তু সুমি অতীনের সঙ্গে কথা বলতেই চায় না।

অতীন আবার টেলিফোন তুললো। শুধু মাথা ধরা? না, হতে পারে না।

এবার অতীনের গলার স্বর শুনেই লাইন কেটে দিল সুমি। অতীনের মুখের চামড়ায় জ্বালা করছে! বাড়ি ফিরেও শর্মিলা তাকে কোনো কিছু বলতে পারতো না? সাড়ে এগারটা এমন কিছু রাত নয়, এখন শর্মিলাকে ডাকা যাবে না কেন? অতীন কি একটা এলেবেলে মানুষ!

আবার ফোন করতেই অতীন শুনতে পেল এনগেজড টোন। অর্থাৎ তুমি সুমি রিসিভারটা নামিয়ে

রেখেছে। সারারাত আর ফোন করা যাবে না। ছোট্ট একটা ঘরে, দুটো খাটের মাঝখানে ফোন। দু বার ফোন বাজলো, তবু শর্মিলা শুনতে পায়নি? কিংবা শর্মিলা ইচ্ছে করে ফোন ধরছে না?

শর্মিলা, তুমি তলে এখনো অতীন মজুমদারকে ভালো করে চেনোনি।

॥ ২৫ ॥

অন্য সবাই চলে গেছে, ল্যাবরেটরিতে একা একা কাজ করছে অতীন। সাতটা বেজে গেছে, তার খেয়ালই নেই। কেউ অবশ্য তাকে যেতে বলবে না। দারোয়ান বা গার্ড এসে বলব না, এবার আপনি যান, দরজা বন্ধ করবো। এখানে লাইব্রেরি খোলা থাকে রাত দুটো পর্যন্ত, যদি একজন বা দু'জন মাত্র পাঠক থাকে, তাদেরও বই সরবরাহ করার জন্য উপস্থিত থাকে একজন লাইব্রেরি অ্যাসিস্টান্ট। এই লেবরেটরিতেও রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করা যায়। তারপরেও যদি কেউ থাকতে চায় তা হলে দরজার বন্ধ করার দায়িত্ব তার ওপর। সে বেরুবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যাবে। লিটমাস পেপার চতুর্দিকে ছড়ানো, তবু চুরি যাবার প্রশ্ন নেই।

সিগারেট খাওয়ার জন্য মনটা আনচান করছে অনেকক্ষণ ধরে, অতীন এক সময় কাজ থামিয়ে মুখ তুলে তাকালো। এত বড় লেবরেটরিতে সে যে একা রয়েছে তা অতীন খেয়াল করলো এইমাত্র। অনেকগুলো আলো জ্বলছে। আজ ক্যামপাস হলে কুরোসোয়া-র একটা নতুন ফিল্ম দেখাচ্ছে, সেটা দেখতেই গেছে সবাই। কোনো একটা টেবিলে কেউ তাড়াহুড়োতে বুনসেন বার্নার নিবিয়ে দিতে ভুলে গেছে, সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে, অতীন সেটা নিবিয়ে দিল, তারপর সিগারেট টানার জন্য দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

এরমধ্যেই এটা তার অভ্যেস হয়ে গেছে। লেবরেটরির মধ্যে সিগারেট খাওয়ার নিয়ম নেই, সবাইকেই বাইরে যেতে হয়, তিন্তু এখন তো নিষেধ করার কেউ নেউ, অতীন অনায়াসেই নিজের জায়গাতে বসেই সিগারেট খেতে পারতো, তবু সে বাইরে চলে এলো। অতীন দেখেছে, রাত তিন-চারটের সময় ফাঁকা রাস্তায় একটা মাত্র গাড়ি, আর কোনো দিকে অন্য গাড়ির চিহ্ন নেই, ট্রাফিক পুলিশ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না, তবু মোড়ের মাথায় লাল আলো দেখে সেই গাড়িটা থেমে যায়। অভ্যোস!

অতীন ড্রাইভিং লেসন নিতে শুরু করেছে দু'দিন ধরে। গাড়ি চালানো না জানলে এদেশের জীবনযাপন করা খুব শক্ত। এরপর সে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি কিনবে। শ দেড়েক ডলারের মধ্যেই মোটামুটি চলনসই গাড়ি পাওয়া যায়। পুরনো গাড়ি তো অনেকে ফেলেই দেয় এখানে। তাও যেখানে সেখানে ফেলার উপায় নেই, পুলিশ ঠিক গাড়ির মালিককে খুঁজে বার করে এত ফাইন করবে যে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে। অনেক জায়গাতেই আছে পুরনো গাড়ির কবরখানা, অটোমোবিল গ্রেভ ইয়ার্ড। মানুষের কবরখানার মতন, সেখানেও গাড়ি কবর দিতে গেলে পয়সা খরচ করতে হয়।

অতীন আপাতত একটা সাইকেল কিনেছে। বাস কিংবা ট্রেন ভাড়ায় বড্ড খরচ পড়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই এখানে সাইকেল ব্যবহার করে। সেই বাগবাজারে থাকার সময় স্কুলজীবনে অতীন সাইকেল চালানো শিখেছিল, সেটা এখন কাজে লেগে গেল। শিলিগুড়িতেও সে মাঝে মাঝে সাইকেল ব্যবহার করেছে।

সিগারেটটা টানতে টানতে অতীন অনুভব করলো তার বেশী খিদে পেয়েছে। দুপুরে সে ক্যান্টিনে একটা সুপ ও একটা হ্যামবার্গার খেয়েছে মাত্র। অন্তত পাঁচ দিন সে ভাত খায়নি, এইসব খেয়েই কাটিয়ে দিচ্ছে। আগে তার মনে হতো, দিনে একবেলা অন্তত ভাত না খেলে পেটই ভরে না।

পেটে খিদের জ্বালাটা নিয়েই অতীন আরও এক ঘন্টা কাজ করলো লেবরেটরিতে। এক এক সময় খিদেটাকেও নেশার মতন মনে হয়, সেটাকে মিটিয়ে না দিয়ে টিকিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। শরীরটাও বেশ তরতাজা লাগে। অতীন ঠিক করে ফেললো, আজ রাত্তিরে সে আর কিছু খাবে না।

খাতা-পত্র বন্ধ করে সে বাতি নেবাতে লাগলো। সবকটা টেব্‌ল ঘুরে দেখল কোথাও কোনো আগুন জ্বলছে কি না, কিংবা অ্যাসিডের বৈয়ম খোলা আছে কিনা। তারপর নির্জন লম্বা বারান্দা দিয়ে হেঁটে এলো। গেটের মুখে একটি ছোট্ট ঘরে একজন হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি গভীর মনোযোগ দিয়ে টাইম ম্যাগাজিন পড়ছে। অতীন বললো, গুন্নাইট, জর্জ!

লোকটি মুখ তুলে বললো ওয়ার্কি লেট? ইউ ডোনট কেয়ার ফর জাপানিজ ফিল্মস?

অতীন হেসে বললো, আই অ্যাম নট আ ফিল্ম বাফ! আই হার্ডলি স্পেন্ড মাই মানি ফর মুভিজ।

লোকটিও হেসে উত্তর দিল, গুড ফর ইয়োর হেল্‌থ!

বাইরে এসে অতীন দেখলো টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের মধ্যে থেকে কিছুই বোঝা যায়নি। অতীন রেইন কোট কিংবা ছাতা আনেনি। কিন্তু একলা একলা দাঁড়িয়ে থাকারও কোনো মানে হয় না, এই বৃষ্টি কখন থামবে তার ঠিক নেই। অতীন সাইকেলে চেপে বসলো।

দুপুরবেলায় বেশ গরম ছিল, কিন্তু বৃষ্টি নামলেই গা শিরশির করে। এই বৃষ্টিতে ভিজলে নাকি নির্ঘাৎ জ্বর হবার কথা। দেখা যাক! সেই জামসেদপুরের পর আর অতীনের একবারও জ্বর হয়নি!

শর্মিলার সঙ্গে আর একবারও দেখা হয়নি সেদিনের পর। শর্মিলা ওয়াশিংটন ডি সি-তে তার মামার কাছে আছে। সে একলা গেছে, সুমি এখানেই আছে। শর্মিলা তেমন কিছু অসুস্থ হলে একলা গ্রেহাউণ্ড বাসে চেপে অতদূর যেত কি? সুমির সঙ্গে চোখাচোখি হলেও অতীন কথা বলবে না ভেবেছিল, সুমি নিজেই একদিন একটা বইয়ের দোকানের সামনে অতীনকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে শর্মিলার খবরটা জানালো।

অতীন ওয়াশিংটন ডি সি-তে শর্মিলার মামার ফোন নাম্বার জানে না, সুমিকে জিজ্ঞেসও করেনি। শর্মিলা নিজে থেকেই কি ফোন করতে পারতো না? শর্মিলা হঠাৎ ওখানে চলে গেছে নিশ্চিত অতীনকেই এড়াবার জন্য। এর কী দরকার ছিল, শর্মিলা যদি চায়, অতীন বস্টন-কেমব্রিজ ছেড়েই চলে যেতে রাজি আছে!

বৃষ্টি বাড়ছে ক্রমশ, অতীন মাথাটা নিচু করে চালাচ্ছে সাইকেল, বৃষ্টির ঝাপটা বাঁচাবার জন্য। ক্রমশ সে স্পীড বাড়াচ্ছে। সে বাতাস কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে।

কালো কুচকুচে রাস্তা, দু'পাশে আলো। সামনে যতদূর দেখা যায়, রাস্তাটায় কোনো বাঁক নেই, যেন সোজা চলে গেছে অসীমে। পথিক নেই একটিও, বৃষ্টির মধ্যে সাইকেলেও কেউ যাচ্ছে না এসময়, গাড়ির অবশ্য বিরাম নেই, বৃষ্টির শব্দ আর গাড়ির গতির শব্দ মিলে একটা অন্যরকম ঝংকার। অতীনের হঠাৎ মনে হলো, এটা কোন্ দেশ, এখানে সে কী করছে? এখানে তো তার থাকার কথা নয়। এখানে তার কোনো কাজ নেই, কোনো প্রতিষ্ঠা নেই, কোনো বন্ধু নেই। সে কি হাওয়ায় উড়ে আসা তুলোর বীজ? সে আর এক দণ্ড এই বিদেশে থাকবে না, এই সাইকেল চালিয়েই সে সোজা চলে যাবে বন্দরে....

বিকট আওয়াজ করে একটা গাড়ি ব্রেক কষতেই অতীন সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে এদেশের রাস্তায় ডান দিক দিয়ে সব গাড়ি চলে, সেটা অতীন এখনও রপ্ত করতে পারেনি।

রাস্তায় পড়ে যাওয়ার মুহূর্তেই অতীন ভাবলো, গাড়িটা কি তাকে এবার চাপা দেবে? থেঁতলে দেবে শরীর? না, গাড়িটা থেমে গেছে। অতীন তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। তার কি হাত কিংবা পা ভেঙেছে। চোখে চোট লেগেছে? না, কিছুই হয়নি। অতীন মজুমদারকে মারা অত সহজ নয়। স্বয়ং মৃত্যুই যেন তাকে পাহারা দেয়।

গাড়ির চালকটি একটা কথাও বললো না। এটা প্রধানত ছাত্রদের শহর, এখানে সাইকেল আরোহীদের বিশেষ অধিকার আছে। সে এক নজরে অতীনকে সুস্থ অবস্থায় দেখে নিয়ে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

সাইকেলটা তুলে টাল ঠিক করলো অতীন। তার জামা-প্যান্ট সম্পূর্ণ ভেজা, রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিল একবার। এইরকম সময়ে একটা সাংঘাতক একাকিত্ব বোধ হয়! সে সাইকেল থেকে পড়ে গেল, অথচ রাস্তার একটা লোকও তার কাছে এসে একটা কথা বললো না! অবশ্য সে যদি হাত ছড়িয়ে রাস্তাতেই শুয়ে থাকতো, তাহলে প্রায় ভোজবাজির মতনই হঠাৎ এসে উপস্থিত হতো একটা পুলিশের গাড়ি, তারপর একটা অ্যাম্বুলেন্স, অনেকগুলো মুখ ঝুঁকে আসতো তার কাছে।

শরীরে কোনো আঘাত না লাগলেও মনে একটা ধাক্কা লেগেছে, অতীন আবার বাস্তবে ফিরে এসেছে। সে বন্দরে যাবে না, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরবে। এখানেই তাকে থাকতে হবে আরও অন্তত দু'তিন বছর।

বাড়িতে পৌঁছে সে সাইকেলটা উঁচু করে তুলে এনে পর্চে রেখে তালা দিল। অন্য কিছু চুরি না

গেলেও এখানে সাইকেল বেশ চুরি হয়। কে কার সাইকেল নিয়ে কখন চলে যাবে, কোনো ঠিক নেই। অতীন ঠিক করে রেখেছে, তার সাইকেলটা যদি হঠাৎ চুরি যায়, তা হলে সে আর নতুন সাইকেল না কিনে সেও ক্যামপাস থেকে অন্য কারুর সাইকেল তুলে নেবে।

আজও লিভিং রুমে বসে টিভি দেখছে সোমেন। ঘাড় ফিরিয়ে সে উত্তেজিত ভাবে বললো, অতীনবাবু, এদিকে দেখবেন আসুন, চট করে আসুন!

সোমেনের সঙ্গে ঠিক বন্ধুত্ব না হলেও বেশ আলাপ হয়েছে অতীনের। সোমেন অর্থনীতির ছাত্র, তার কথাবার্তাও বেশ গম্ভীর গম্ভীর হলেও বেশ ভালো গান করে। বিশেষত পল্লীগীতি। সেগুলো শুনতে অতীনের ভালো লাগে।

অনেকের সঙ্গে একসঙ্গে বসে টিভি দেখা অতীনের পছন্দ নয়। এক একজন এক একরকম মন্তব্য করে, যা শুনলে কখনো কখনো গা জ্বলে যায়। তাছাড়া চ্যানেল নিয়ে মতভেদ অতীনের সি বি এস-এর অনুষ্ঠানগুলি বেশী পছন্দ, অন্যরা অনেকেই দেখতে চায় এন বি সি, কেউ কেউ দেখতে চায় স্থানীয় প্রোগ্রাম। দুপুরবেলা সুযোগ পেলে অতীন একা টিভি দেখে, সন্ধেবেলা সাধারণত এঘরে ঢোকে না। অন্য কেউ ডাকলেও সে এড়িয়ে যায়।

আজ সে সোমেনের ডাকে সাড়া দিল। এখন নিজের ঘরে গিয়ে একা থাকতে ইচ্ছে করছে না। সারাদিন সে প্রায় মুখ বুজে কাজ করছে, এখন সে একটু মানুষের সঙ্গ চায়।

ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অতীন ভাবলো, এরা কেউ জানে না যে মাত্র মিনিট দশেক আগে তার সাইকেল একটা গাড়ির সঙ্গে প্রায় ধাক্কা মেরেছিল্যার দু'এক সেকেণ্ড এদিক ওদিক হলেই তাকে যেতে হতো হাসপাতালে কিংবা মর্গে চরকালের জন্য হারিয়ে যেত অতীন মজুমদার। জীন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে এত সূক্ষ্ম একটা সুতো। তাকে দেখে এরা কেউ বুঝতে পারবে না যে সে প্রায় পুনর্জীবন পেয়ে ফিরে এলো। এখন কারুকে কিছু বলারও মানে হয় না। শর্মিলাও কোনো কিছুই জানতে পারবে না। সেদিন ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেন বদলে গেল শর্মিলা?

সোমেন বললো, শিগগির এসে বসুন, একটা দারুন ব্যাপার দেখাচ্ছে।

সোমেন ছাড়াও ঘরের মধ্যে রয়েছে সুরেশ আর তার বান্ধবী তিন্নি। আর আবিদ হোসেন। অতীন একটা চেয়ার ঘুরিয়ে বসলো। বাড়িওয়ালা উপস্থিত নেই, সুতরাং এখানে বসে অনায়াসে সিগারেট খাওয়া যায়।

সাড়ে আটটায় টক শো। জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। রয় রবসন নামে একজন অতি বুদ্ধিমান সুবক্তা, প্রতিটি অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন থেকে একজন কারুকে বেছে নিয়ে আসে, তারপর তাকে নানান প্রশ্ন করে তার জীবন কাহিনীটা সবার সামনে তুলে ধরে। প্রশ্ন করার গুণে প্রতিটি জীবন কাহিনীই মনে হয় এক একটা রোমাঞ্চকর গল্প।

সোমেন ফিসফিস করে বললো, আজ রয় রবসন যে 'অতিথি'-কে নিয়ে এসেছে তার নাম পল গ্রে। এই লোকটা জাহাজী ইঞ্জিনিয়ার, জাহাজে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। দু'মাস ওদের জাহাজ চিটাগাং-এ আটকা পড়েছিল। এই সবে শুরু হলো....

রয় রবসন : মিঃ গ্রে, আপনি যে-জাহাজে কাজ করেন, সেই জাহাজ কী ধরনের মালপত্র নিয়ে যায়?

পল গ্রে : নানা ধরনের মালপত্র, কখনো কোনো মেশিন, তারপর গাড়ি, ইয়ে, বিমানের যন্ত্রাংশ।

রয় রবসন : আপনাদের এই জাহাজে অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে যাওয়া হয় নিশ্চয়ই?

পল গ্রে : হ্যাঁ, কিছু কিছু হালকা ধরনের অস্ত্রও নিয়ে যাওয়া হয়।

রয় রবসন : কী ধরনের হালক অস্ত্র?

পল গ্রে : সেটা বলা নিষেধ।

রয় রবসন : এবারে আপনাদের যে-জাহাজ চিটাগাং পোর্টে গিয়ে আটকে ছিল, সেটাতেও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ছিল নিশ্চয়ই।

পল গ্রে : না, না, এবারের মালপত্র ছিল শুধু খাদ্য। শুধু গম।

রয় রবসন : গম বোঝাই জাহাজ! ও! চিটাগাং পোর্টে আপনাদের কতদিন আটকে থাকতে হয়েছিল?

পল গ্রে : প্রায় তিন সপ্তাহ। মাল খালাস হচ্ছিল না, আমরা অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম।

রয় রবসন : মাল খালাস হতে দেরি হচ্ছিল কেন?

পল গ্রে : সেখানে কিছু একটা গোলমাল চলছিল, এক ধরনের বিদ্রোহ। আপনি জানেন কি না জানি না। পাকিস্তানে দুটি জাতি আছে। একটি পাকিস্তানী, আর একটি বাঙালী। এই দুই জাতির মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল।

রয় রবসন : বাঙালীরাও পাকিস্তানী। মনে করুন, আমাদের এখানেও অনেক ইতালিয়ান বা গ্রীক অরিজিনের লোক আছে। কিন্তু তারাও তো আমেরিকান তাই না? আপনি বলতে চাইছেন, সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের লড়াই চলছিল।

পল গ্রে : অনেকটা তাই।

রয় রবসন : আপনরার জাহাজ ভর্তি অস্ত্র নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ সৈন্যবাহিনীকে সাহায্যে করবার জন্য।

পল গ্রে : না, না, না, আমরা গম নিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা তো গরিব, ওরা খেতে পায় না, তাই আমরা গম দিয়ে সাহায্য করি।

রয় রবসন : তাহলে গম খালাস করতে দেরি হচ্ছিল কেন? ক্ষুধার্ত লোকেরা তো যত তাড়াতাড়ি খাবার পাবে, ততই খুশি হবে।

পল গ্রে : হয়তো সৈন্যবাহিনী চাইছিল, সাধারণ মানুষকে না খাইয়ে রেখে জব্দ করতে। আমরা প্রথম কয়েকদিন বন্দুক ও কামানের গোলাগুলির শব্দ পেয়েছি। তারপর সব থেমে গেল। কিন্তু মাল খালাস করার জন্য বন্দরে কোনো কুলি ছিল না। বন্দর একেবারে জনমানবশূন্য ছিল।

রয় রবসন : আপনারা কি তাহলে দিনের পর দিন জাহাজে বসে থাকতেন?

পল গ্রে : মাঝে মাঝে আমরা শহরে যেতাম। অবশ্য চিটাগাং ক্লাব ছাড়া ওই শহরে আর কোনো ভালো পানাহারের জায়গা নেই, বাধ্য হয়েই যেতাম সেখানে।

রয় রবসন : মিঃ গ্রে, চিটাগাঙে এই প্রথমবার গেলেন আপনি?

পল গ্রে : না, এই নিয়ে তৃতীয়বার, প্রত্যেকবারই ঐ চিটাগাং ক্লাবে গেছি। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপও হয়ে গিয়েছিল।

রয় রবসন : যাদের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল, তাদের মধ্যে কোনো বাঙালী ছিল?

পল গ্রে : আগের দু'বার কয়েকজন বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু এবার তাদের দেখিনি। আমি একজন আর্মি ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মিঃ হামিদ কোথায়? ক্যাপটেনটি ঘৃণায় নাক কুঁচকে বললো, হামিদ? সে তো একটা বেজন্মা বাঙালী। তার নাম আর উচ্চারণ করো না। ভবিষ্যতে এই চিটাগাং ক্লাবে কোনো কুকুর কিংবা বাঙালীকে ঢুকতে দেওয়া হবে না! যদিও সেই ক্লাব প্রাঙ্গনে কয়েকটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আপনি জানেন কি না জানি না, মিঃ রবসন। প্রাচ্য দেশের যে কোনো শহরেই রাস্তায় অনেক কুকুর ঘুরে বেড়ায়। তারা বড় বড় হোটেল এবং ক্লাবেও ঢুকে পড়ে।

রয় রবসন : খুবই কৌতুহলজনক, খুবই কৌতূহলজনক। আপনি চিটাগাং ক্লাবে কুকুর দেখেছেন, কিন্তু বাঙালী দেখেননি। চিটাগাং তো দেখছি বেঙ্গল-এর একটি শহর? সানফ্রান্সিসকোর কোনো ক্লাবে সানফ্রান্সিসকোর কোনো অধিবাসী ঢুকতে পারে না, এরকম কি হতে পারে?

পল গ্রে : প্রাচ্য দেশে এরকম হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়াতে এরকম হয়। এমনকি আমাদের ফ্লোরিডার অনেক ক্লাবেও ফ্লোরিডার কালো মানুষদের ঢুকতে দেওয়া হয় না!

রয় রবসন : বাঙালীরা কি কালো?

পল গ্রে : পাকিস্তানী ও বাঙালীদের মধ্যে আমি গাত্রবর্ণের কোনো তফাত বুঝতে পারিনি। তবে বাঙালীদের ওপর ঐ পাকিস্তানীদের খুবই রাগ। সেই ক্যাপটেন বলেছিস যে, এরপর আর কোনো বাঙালীকে গাড়ি চড়তেও দেওয়া হবে না। যাদের গাড়ি আছে, সেইসব পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে। আর প্রত্যেক পাকিস্তানী সৈন্য একজন করে বাঙালী মেয়েকে রক্ষিতা রাখবে।

রয় রবসন : ওরা বাঙালী পুরুষদের ঘৃণা করে আর বাঙালী মেয়েদের পছন্দ করে?

পল গ্রে : হয়তো তাই। ক্যাপটেনটি অবশ্য অন্য কারণ দেখিয়েছিল। বাঙালীদের সংখ্যা নাকি, পাকিস্তানীদের চেয়ে কিছুটা বেশি। এরা কিছু বাঙালীকে মেরে ফেলবে, আর বাঙালী রক্ষিতাদের গর্ভে

যে সন্তান জন্মাবে তারাও হবে পাকিস্তানী।

রয় রবসন : তোমার সঙ্গে কোনো বাঙালীর কোনো কথাই হয়নি এবারে?

পল গ্রে : না, কোনো বাঙালীকে দেখতে পাইনি। তারা ভয় পেয়ে পালিয়েছিল। কিছু বাঙালী শহরের বাইরে থেকে লড়াই করছিল।

রয় রবসন : তোমার সঙ্গে শুধু পাকিস্তানী আর্মির লোকদেরই কথা হয়েছে। কী করে জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করা যায়, সেই ব্যাপারে তারা আলোচনা করেছিল?

পল গ্রে : না, না, অস্ত্র-শস্ত্র নয়, গম। তাছাড়া মাল খালাসের ব্যাপারে তারা জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে আলোচনা করবে, আমার সে দায়িত্ব নয়।

রয় রবসন : ওখানে যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে, তার কোনো নমুনা তুমি নিজের চোখে দেখেছো?

পল গ্রে : একটি দৃশ্যই দেখেছি। আমি তখন বন্দর থেকে চিটাগাং ক্লাবের দিকে যাচ্ছিল। এক জায়গায় দেখি একটি ব্যারাকবাড়ির দেওয়ালের দিকে মুখ করে দশ বারো জন লোককে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুনলাম তারা বিদ্রোহী পুলিশ। তাদের গুলি করে মারা হলো, আমি তার একটা ছবিও তুলেছি।

পর্দায় ভেসে উঠলো সেই ছবি। লুঙ্গি পরা, খালি গায়ে রোগা রোগা কয়েকজন মানুষ, তাদের কোনোক্রমেই পুলিশ বলে মনে হয় না। পেছনে ফিরে হাত তোলা অবস্থায় গুলি খেয়ে তারা যখন পড়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ছবিটি তোলা।

আমেরিকান টিভিতে নিরুপদ্রবে কোনো অনুষ্ঠান দেখার উপায় নেই। বিশেষ বিশেষ আগ্রহের মুহূর্তেই অনুষ্ঠান থামিয়ে দিয়ে শুরু হয়ে যায় বিজ্ঞাপনমালা।

ওরা এতক্ষণ প্রায় নির্বাক হয়ে দেখছিল, এবার তিন্নি বললো, এই বীভৎস দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারি না।

সুরেশ বললো, এটা একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আমেরিকান টিভি-তে এটা দেখাচ্ছে সেটাই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। আমেরিকা তো পাকিস্তানী আর্মির এক নম্বর সাপোর্টার। ঐ যে রয় রবসন ইঙ্গিত করছিল না, জাহাজটায় গম আছে না, অস্ত্র, আছে, আসলে আমেরিকান অস্ত্র নিয়েই তো ওরা লড়ছে।

ওড়নাটা বুকে জড়িয়ে নিয়ে তিন্নি বললো, আমি আর দেখবো না। আমি বাড়ি যাচ্ছি।

সুরেশ তাতে এগিয়ে দিতে গেল।

আবিদ হোসেন থুতনিতে হাত দিয়ে ঝিম মেরে বসে আছে। তার বাড়ি চট্টগ্রামে। তিন-চারদিন আগেও সে পাকিস্তানের সমর্থনে তুমুল তর্ক করেছে সোমেনের সঙ্গে। তার মতে শেখ মুজিব একজন দেশদ্রোহী।

সোমেন জিজ্ঞেস করলো, আবিদ সাহেব, এবার আপনার বিশ্বাস হলো কি? নাকি, আপনি মনে করেন, পুরো প্রোগ্রামটাই কনককটেড?

আবিদ হোসেন ফিসফিস করে বললো, চিটাগাং ক্লাবে কোনো বাঙালী ঢোকে না? আমার ফাদার ঐ ক্লাবের সেক্রেটারি। তিনি কিছু জানান নাই।

–ক'দিন আগে তার চিঠি পেয়েছেন?

উত্তর না দিয়ে আবিদ হোসেন স্থির ভাবে চেয়ে রইলো সোমেনের দিকে। তার মুখে ছায়া ঘনিয়ে আসছে। চট্টগ্রাম সম্পর্কে বেশ কয়েকটা খবর বেরিয়েছে সংবাদপত্রে, এখন শোনা গেল একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। রয় রবসনের অনুষ্ঠানে কেউ মিথ্যে কথা বলে পার পায় না।

অতীন চুপ করে বসে আছে। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা নিয়ে এখনো কোনো নির্দিষ্ট মতামত গড়ে ওঠেনি তার মনে। এটা উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে স্বৈরাচারীদের সংঘর্ষ, এর মধ্যে কোনো পক্ষকেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু শক্তিশালী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচারে পূর্বে চ্যানেলগুলো বেসরকারী, এরা আমেরিকান সরকারের নীতি মানতে বাধ্য নয়, এরা অনেক সময় সত্যি খবর দেয়। এমন কি ভিয়েৎনামে আমেরিকান সৈন্যদের বদমায়েশীর অনেক চমকপ্রদ তথ্যও টিভিতে দেখা যায়।

সে শুকনো গলায় সোমেনকে জিজ্ঞেস করলো, এরা অনেকদিন ইণ্ডিয়ার খবর দেয় না, এরা ইণ্ডিয়াকে অ্যাভয়েড করে, তাই না?

সোমেন উত্তেজিত ভাবে বললো, কালকেই তো একটা সাঙ্ঘাতিক খবর দিয়েছে, আপনি দেখেন নি? কলকাতার খবর! দমদমে জেল ব্রেক। রিসেন্ট টাইমসে এত বড় জেল-ব্রেক আর হয়নি! দমদম জেলে নকশাল বন্দীদের সঙ্গে গার্ডদের লড়াই। নকশালীরা প্রচুর আর্মস-অ্যামুনিশান স্মাগল করে এনেছিল জেলের মধ্যে, ভেবে দেখুন, ওরা জেলের মধ্যে বোমা চার্জ করেছে, প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে দু'পক্ষ গুলি বিনিময় করেছে, খবরের বললো যে ১৫টি নকশাল ছেলে মারা গেছে আর ৩২ জন পালাতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত!

অতীনের সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগলো। মাথায় যেন এক শো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। এরকম একটা সংবাদের ধাক্কা সে সামলাতে পারছে না। কোনোক্রমে সে বললো, ১৫ জন মারা গেছে?

সোমেন বললো, জেলের ভেতরের একটা ছবিও দেখিয়েছে। কী করে এরা এইসব ছবি পায় কে জানে! ডেড বডির ছবি। অবশ্য কতজন গার্ড গেছে সে কথা বলেনি।

–মৃতদের নাম বলেছে?

–না, নাম বলেনি? আজকের নিউ ইয়র্ক টাইমসেও ছোট করে খবরটা বেরিয়েছে। আজকের পেপার আরও একটা বড় খবর আছে, লক্ষ করেন নি? ইন্দিরা গান্ধী ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো ন্যাশনালাইজ করেছে। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল মন্তব্য করেছে যে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার পুরোপুরি সোভিয়েত ক্যাম্পে চলে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট নিকসন এখনো তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

অতীনের আর কিছু শোনার মতন অবস্থা নেই। সে ঘোর লাগা মানুষের মতন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ১৫ জন নিহত। মানিকদা, কৌশিক, পমপম, তপন, অরিন্দম, এরা কি কেউ ছিল তার মধ্যে? অনেকদিন ওদের কোনো খবর জানে না অতীন!

যুদ্ধ এখনও চলছে। তার বন্ধুরা হার মানেনি। জেলের দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকতে তারা রাজি নয়, জেল ভেঙে বেরিয়ে আসছে, বাইরে এসে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তারা আবার শোষকশ্রেণীকে আঘাত হানবে!

আর সে কী করছে, সে আমেরিকায় বসে আছে? সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ধনতন্ত্রী এই দেশটির বিরুদ্ধেই তাদের প্রধান আক্রোশ, আর সে এই দেশেরই টাকায় খাচ্ছে, পরছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দু'তিন ধাপ সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে অতীন উঠে এলো নিজের ঘরে। আর একদিনও এখা থাকা চলে না। তাকে ফিরে যেতেই হবে, তারপর যা হয় হোক! ওয়ার্ডরোব থেকে সে সুটকেসটা টেনে বার করলো। খুব প্রয়োজনীয় জিনিস কটা গুছিয়ে নিতে হবে শুধু! ১৫ জন মারা গেছে! কে কে আছে তাদের মধ্যে? মানিকদা, কৌশিকদের যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে তার বেঁচে থাকার কোনো মানে হয়?

দরকারি কয়েকটা বই ও জামা কাপড় উত্তেজনা বশে সুটকেসে ভরতে ভরতেই তার মনে হলো, টিকিট কাটতে হবে; টাকাটা কোথায় পাওয়া যাবে? এ তো হাঁটা পথ নয়, মাঝখানে রয়েছে দুটো মহা সমুদ্র!

টাকা, অনেক টাকার ব্যাপার! কে দেবে তাকে সেই টাকা?

তাকে ফিরে যেতেই হবে, যে-কোনো উপায়ে!

জাহাজ-ফাহাজে আজকাল কেউ যায় না। প্যাসেঞ্জার লাইনারগুলো উঠে গেছে। যেতে হবে প্লেনেই। অত টাকা কোথায় পাওয়া যায়? কে ধার দিতে পারে?

এখানকার ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদেরও দেয়। ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু অতীনের নতুন অ্যাকাউন্ট, মাত্র দশ বারো ডলার পড়ে আছে, তাকে দেবে না, শর্মিলা পেতে পারে। শর্মিলার মামা এখানে বড় চাকরি করেন, তিনি গ্যারান্টার হলে কোনো অসুবিধেই নেই। শর্মিলা? শর্মিলা তো অতীনের কেউ নয়! সে অতীনকে সহ্য করতে পারে না বলে ওয়াশিংটন ডি সি-তে পালিয়ে গেছে! শর্মিলার সঙ্গে এই ঘরে, এই বিছানায় সে রাত্রি কাটিয়েছে, শর্মিলা নিশ্চয়ই সেই স্মৃতিও মুছে ফেলতে চায়?

আর কে ধার দিতে পারে?

অতীনের হঠাৎ পাঁচুদার কথা মনে পড়লো। স্বল্পভাষী পাঁচুদাকে দেখলেই যেন একটা আস্থা

পাওয়া যায়। পাঁচুদা অতীনের মনের অবস্থাটা নিশ্চিয়ই বুঝবেন। ইচ্ছের বিরুদ্ধে অতীন এখানে আর কিছুদিন থাকলে পাগল হয়ে যাবে! জেলখানায় তার ১৫ জন বন্ধু মারা গেছে, আর সে এখানে বসে ডিগ্রি অর্জনের বিলাসিতা করবে? আমেরিকান ডিগ্রির মুখে লাথি!

কিন্তু, পাঁচুদার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা নেই, মাত্র অল্প দিনের পরিচয়, তার কাছে কি মুখ ফুটে অতগুলো টাকা ধার চাওয়া যায়? ধার মানে কি, অতীন জীবনে কি কখনো তিন-চার হাজার ডলার শোধ দিতে পারবে? পাঁচুদার কাছে চাইবার পর তিনি যদি না বলেন, শান্তা বৌদিও খুব ভালো, কিন্তু তিনি যদি বলেন, আমাদের ভাই বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তার মধ্যে টাকা পয়সার কথা এনো না! প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারে না অতীন!

সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থ দিতে পারে। সিদ্ধার্থ নতুন গাড়ি কিনেছে, অন্য অ্যাপার্টমেন্টে গেছে, ওর হাতে এখন বিশেষ পয়সা নেই, কিন্তু অফিস থেকে কিংবা ব্যাঙ্ক থেকে যোগাড় করে দেওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব নয়। ওর এক পাঞ্জাবী বন্ধুর ট্রাভেল এজেন্সি আছে, তার কাছ থেকে বাকিতে একটি টিকিট যোগাড় করে দিতে পারবে না?

অতীনকে দেশে ফিরে যেতেই হবে।

সে খালি পায়ে তরতর করে নেমে এলো নিচে। লিভিং রুম এখন ফাঁকা, সবাই যে-যার ঘরে চলে গেছে। অতি ব্যস্তভাবে অতীন সিদ্ধার্থকে ফোন করলো। সিদ্ধার্থ বাড়িতে না থাকলেই মুশকিল।

কয়েকবার রিং হবার পর সিদ্ধার্থ এসে ফোন ধরলো। অতীনের গলা শুনে সে বেশ রিক্তভাবে বললো, তুই কি ফোন করার আর সময় পেলি না? আমি একজনকে কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিলুম। তুই নিজে তো কবিতা টবিতা...

অতীন তাকে বাধা দিয়ে প্রায় চিৎকার করে বললো, সিদ্ধার্থ আমি দেশে ফিরে যেতে চাই! কালকেই!

সিদ্ধার্থ বললো, দেশে ফিরতে চাস! দেশ কি মামারবাড়ি নাকি? যখন ইচ্ছে যাওয়া যায়?

–সিদ্ধার্থ, আমাকে যেতেই হবে! আমাকে যেতেই হবে, আমি আর একদিনও থাকতে চাই না! আমি ডিগ্রি-ফিগ্রি কিছু চাই না! এই ক্যাপিটালিস্টদের দেশে আমার অসহ্য লাগছে!

–গাঁধার মতন চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? আস্তে বলা যায় না? আমার কান ফেটে যাচ্ছে।

–তুই শুনেছিস, দমদম জেলে ওরা ১৫ জন নকশালকে গুলি করে মেরে ফেলেছে? টিভিতে বলেছে। কাগজে বেরিয়েছে।

–হ্যাঁ, আমি টিভিতে শুনেছি।

–তারপরেও তুই বলতে চাস, আমি এদেশে পড়ে থাকবো? আমি কি মানুষ না? তুই বুঝতে পারছিস না...

–আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। তোর বিবেক দংশন হচ্ছে। বিবেক থাকলেই তাতে মাঝে মাঝে দংশন হবে। তুই এক কাজ কর, আজ স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমো। তারপর স্বপ্নে দেশে ফিরে যা। আমি তো স্বপ্নে এরকম কতবার যাওয়া আসা করি।

–ঠাট্টা নয়রে, সিদ্ধার্থ। আমি যাবোই ঠিক করেছি। তুই আমার টিকিটের টাকাটা ধার দিবি?

–না!

–দিবি না! তোকে আমি শোধ করে দেবো, যে কোনো উপায়ে হোক। আমি মরে গেলেও তুই টাকটা পাবি। তুই আমার একটা টিকিটের ব্যবস্থা করে দে।

–স্যরি ওল্ড চ্যাপ! টাকা ফাকা আমি দিতে পারবো না।

–সিদ্ধার্থ, আই বিসিচ ইউ, প্লীজ, তুই আমার এই লাস্ট উপকারটা কর।

–অতীন, টাকা ফাকার কথা আমার কাছে আর উচ্চারণ করিস না। রাত দশটার পর টাকা কথাটাই আমার কাছে অশ্লীল বলে মনে হয়!

–চশমখোর, আমি এত করে বলছি, তুই আমাকে এই টাকাটা দিবি না! এটা আমার জীবন মরণ প্রশ্ন!

–আমি চশমখোর তো বটেই। আমি চেনাশুনো সবাইকে টেলিফোন করে বলে দেবো! কেউ যেন ভুল করেও তোকে টিকিট কাটার টাকাটা না দেয়!

–আমি ফিরতে চাইলে কে আমাকে আটকাবে?

–হনুমানের মতন লাফিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যা! তারপর কলকাতায় গেলেই তোকে পুলিশ ক্যাঁক করে ধরবে। তোর নামে এখনও ওয়ারেন্ট ঝুলছে, তা কি আমি জানি না? সেন্টিমেন্টাল ফুলের মতন তুই দেশে ফিরে গেলেই ধরা পড়বি, আবার জেলে যাবি, হয়তো ঐ ১৫ জনের মতন তুইও গুলি খেয়ে মরবি। তাতে বিপ্লবের কী উপকারটা হবে শুনি?

–আমি ধরা পড়বো না! আমি সোজা কলকাতায় না গিয়ে দিল্লিতে নেমে, তারপর সেখান থেকে...

–দিল্লিতে বুঝি পুলিশ নেই? ধরা তুই পড়বিই।

–শোন, সিদ্ধার্থ

–আমার আর এসব আজে বাজে কথা শোনার সময় নেই! আমি ব্যস্ত আছি! কট্ করে সিদ্ধার্থ লাইন কেটে দিল।

কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো অতীন। খাঁচায় বন্দী পশুর ছবিটা ফিরে এলো তার কাছে। কোনো উপায় নেই, ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই। মানিকদা কৌশিক পমপমরা তাকে কাপুরুষ, পলাতক ভাবছে!

বহুদিন বাদে অতীনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো। অসম্ভব এক নির্মম একাকিত্ব যেন শক্ত দড়ির মতন হাত-পা পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেছে। সে শিশুর মতন দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে লাগলো, মা, মা, মা

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। সারা বাড়িতে কোনো শব্দ নেই। যানবাহন হাল্কা হয়ে এসেছে রাস্তায়। অতীন এক সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। খালি পা, গেঞ্জি গায়ে। কালো রঙের রাস্তাটা মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সে। কোনো গাড়ি তাকে চাপা দেবে না, সে জানে। দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু নেই। কিন্তু অসুখ-বিসুখও কি তার হতে পারে না? আজ সে সারা'রাত বৃষ্টিতে ভিজবে এখানে দাঁড়িয়ে।

॥ ২৬ ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গাড়ি পার্ক করে বিমানবিহারী, মামুন এবং প্রতাপ ট্রামলাইন পার হয়ে এলেন। কলেজ স্কোয়ারের গেটের দু'পাশে দুটি পুলিশের গাড়ি পার্ক করা। রাইফেলধারী সিপাহীরা সকলেই দাঁড়িয়ে আছে, তারা পিঠে পিঠ দিয়ে নজর রেখেছে দু'দিকে। পার্কের মধ্যে জমায়েত হয়েছে কুড়ি-পঁচিশজন মানুষ, প্রায় সকলেই বেশ বয়স্ক, তাদের চোখে মুখে অশান্তির চিহ্ন। কয়েকজনের হাতে ফুল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক মুখোমুখি বসানো বিদ্যাসাগরের মূর্তিটির মাথা সাদা কাপড় দিয়ে মোড়া। মাত্র কয়েকদিন আগেও এই পথের পথচারীরা দেখেছে বিদ্যাসাগরের মুণ্ডহীন মূর্তি। শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র এই কলেজ স্ট্রিটে এদেশে নারী ও শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ব্যবস্থার অগ্রণী পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুণ্ডপাত করা হয়েছিল কিছুদিন আগে। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি।

বিপ্লবী যুবসমাজ এখন মূর্তিভাঙার উল্লাসে মত্ত। বিদ্যাসাগর ছাড়াও রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও অন্যান্য জাতীয় নেতাদের মূর্তি ভাঙা হয়েছে অনেক জায়গায়, দেয়াল থেকে তাঁদের ছবি নামিয়ে এনে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে আগুনে। বিদ্যাসাগরের ওপর রাগটাই যেন বেশী, বিদ্যাসাগরের শুধু মুণ্ডুই কাটা হয়নি, তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিও ছড়িয়ে পড়েছে প্রচণ্ড ঘৃণা, দিকে দিকে স্কুল-কলেজে ভাঙচুর-তছনছ হচ্ছে, এমনকি স্কুলের ছাত্ররাও পুড়িয়ে দিচ্ছে তাদের স্কুল। প্রতিবাদ করার সাহস কারুর নেই। বিপ্লবী ছাত্রদের কাছে এখন প্রচুর হাতবোমা, সেগুলি যথেষ্ট কার্যকর, তাতে শুধু ভয়-ধরানো প্রচণ্ড শব্দই হয় না, মানুষও মরে। একসঙ্গে তিন চারটি যুবক ও তাদের সঙ্গে তিন চারটি হাতবোমা, এদের দেখলেই সাধারণ মানুষ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালায়, যেন নতুন বর্গীর আমল এসেছে।

মূর্তি ভাঙার এই বিপ্লবের নির্দেশ যে ঠিক কার কাছ থেকে প্রথম এসেছিল তা ঠিক জানা যায় না। পরীক্ষার হলে ছাত্ররা হঠাৎ প্রশ্নপত্র ও খাতা ছিঁড়ে, চেয়ার-টেবিল ভেঙে পরীক্ষা ব্যবস্থাটাকেই লণ্ডভণ্ড করতে গিয়ে কখনো হয়তো গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের ছবিও ভেঙে ফেলেছে। পূজনীয় মনীষীদের প্রতি এই অসম্মানে মধ্যবিত্ত নীতিবাগিশ শ্রেণীর মধ্যে যে হাহাকার জেগে ওঠে, তা দেখেই যেন বেশী মজা

পেয়েছে অল্প বয়েসীরা। মধ্যবিত্ত মানসিকতার আঘাত করতেই তো তারা চায়। ভাঙুক, সব কিছু ভাঙুক, পুড়ে যাক, পুরোনো সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাক।

মূর্তি ও ছবি এবং শিক্ষাব্যবস্থা ভাঙার ব্যাপারে যুবসমাজের এই প্রবল ও স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ দেখে নকশাল আন্দোলনের নেতারা এতে নৈতিক সমর্থন জানালেন। এই সব অত্যুৎসাহী ছাত্রেরা সি পি আই (এম এল) দলের সদস্য নয়, কিন্তু তারাও বিপ্লবী। এই ভাবেই তো বিপ্লব ছড়ায়। তাত্ত্বিক নেতা সরোজ দত্তের মতে, এইসব ছাত্র ও যুবকেরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনো নির্দেশ না পেয়েই এই মূর্তি ভাঙা শুরু করেছে, কিন্তু এরা জনসাধারণের চিন্তা ধারা ঠিক মতন অনুধাবন করতে পেরেছে, বিপ্লবী দলের রাজনৈতিক লাইনের সঙ্গেও এর কোনো অমিল নেই। এরা মূর্তি ভাঙছে নতুন মূর্তি গড়বে বলে। গান্ধীকে সরিয়ে এরা ঝাঁসীর রাণীর মূর্তি বসাবে, ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাট হবে মঙ্গল পাণ্ডে ঘাট। এই সব নবীনেরা শোধনবাদী অতীতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়।

চারু মজুমদারও সমর্থন জানালেন এই তারুণ্যের উদ্দীপনাকে। তিনি লিখলেন, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা আর ধনতন্ত্রের দালালদের প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলো না ভাঙলে নতুন বিপ্লবী-শিক্ষা ও সংস্কৃতির পত্তন করা যাবে না।...বাংলায় সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ আজ এক বাস্তব সত্য...তারই প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র ও যুবসমাজ অস্থির হয়ে উঠেছে। যারা বারবার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহকে শান্তির বাণী ও শোধনবাদ দিয়ে চাপা দিতে চেয়েছে, তাদেরই মূর্তিতে এখন আঘাত হানছে ছাত্ররা। এই ছাত্র ও যুবসমাজের লড়াই সেইজন্য সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহেরই অঙ্গ!

ভাঙতে গেলে শেষ পর্যন্ত আর বাদ বিচার থাকে না, একটা মূর্তি ভাঙলে অন্য মূর্তি ভাঙতেই বা দোষ কী! আবেগপ্রবণ বাঙালী মানুষ খুনের চেয়েও কোনো পূজনীয় পাথরের মূর্তির শিরশ্ছেদে বেশী শিহরিত হয়। অল্প বয়েসীদের তাতেই বেশী আনন্দ! বিপ্লবী পার্টির বয়স্ক নেতারা তাতেও আপত্তি জানালেন না। শুধু সুশীতল রায়চৌধুরীর মনে একটু দ্বিধা এসেছিল। গান্ধী আর বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথকে সমান পর্যায়ে দেখা কি ঠিক? এঁদের কয়েকজনকে অন্তত কি বুর্জোয়া ডেমোক্রাট বলা যায় না? ইস্কুল কলেজের চেয়ার-টেবিল ভাঙা ও ফাইল পোড়ানোর বদলে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের একটা আন্দোলনও কি শুরু করা উচিত নয়? রবীন্দ্রনাথের বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও সীমাবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে কি কাজে লাগানো যায় না?

এর উত্তরে চারু মজুমদার কমরেড পূর্ণকে (সুশীতলের ছদ্মনাম) সতর্ক করে দিলেন একটি প্যামফ্লেটে যে, পার্টি কংগ্রেসের প্রোগ্রামেই বলা হয়েছে, ভারতীয় বুর্জোয়ারা প্রথম থেকেই একটি দালাল শ্রেণী। তাদের মধ্য থেকে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটদের খুঁজে বার করার চেষ্টাই পার্টির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাবে। এদেশের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশ এবং সাধারণ মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায়। বিপ্লবী আদর্শ এবং মাও সে তুং-এর চিন্তা ধারায় যারা বিশ্বাসী, এই শিক্ষব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করাই তাদের পবিত্র দায়িত্ব। সেই ঘৃণা থেকে যদি ছাত্ররা চেয়ার-টেবিল ভাঙে, কাগজপত্র পোড়ায়, তাহলে কোনো বিপ্লবীর তাদের বাধা দেবার অধিকার নেই।

হুগলীর এক গুপ্ত সভায় সরোজ দত্ত আরও আগুন ছড়ালেন। জনসাধারণ কখনো ভুল করতে পারে না। বিপ্লবের সময় কিছু বাড়াবাড়ি হয়েই থাকে। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিপ্লবও এগিয়ে যাবে। তিনি সহকর্মীদের বললেন, অতীতকে ভুলে যাও! পুরোনো কবিদের ভুলে যাও! সংগ্রামী কৃষকদের মধ্য থেকেই লড়াকু কবিরা এগিয়ে আসবে। চারু মজুমদারের বাণীই আজকের কবিতা! "আজ অনুতাপের সময় নয়, আজ প্রদীপ্ত শিখার মত জ্বলে ওঠার দিন," কিংবা "সত্তরের দশক মুক্তির দশক হোক" এই সবই তো কবিতা!

সুতরাং সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েরা, যারা রবীন্দ্ররচনাবলীর একশো ভাগের এক ভাগও পড়েনি, রামমোহন কে ছিলেন ভালো ভাবে জানে না, বিদ্যাসাগর সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাদের সমর্থন করেননি শুধু এইটুকুই শুনেছে কারুর কাছ থেকে, তার ভাঙতে লাগলো, ভাঙার নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো। বাধা পেল না বিশেষ। খবরের কাগজে বিস্তর অশ্রু বর্ষণ হলেও একটাও ভাঙা মূর্তি জোড়া লাগাতে এগিয়ে এলো না কেউ।

মূর্তি ভাঙা ও স্কুল বাড়ি পোড়ানোর সার্থকতার পর তরুণ বিপ্লবীরা এবার জীবন্ত শত্রুর দিকে মন দিল। বিপ্লবীদের দমনে পুলিশী অত্যাচার ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠছে, ডেবরায়, গোপীবল্লভপুর,

শ্রীকাকুলাম থেকে নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী ভেসে আসছে, সুতরাং এবার প্রতিশোধ পালা। শুরু হলো পুলিশ খুন। প্রথম দিকে তার সার্থকতাও চমকপ্রদ। প্রকাশ্য দিবালোকে চার পাঁচটি ছেলে শুধু ছুরি-ভোজালি দিয়েই একজন কনস্টেবলকে খুন করে বিনা বাধায় চলে যেতে পারে। রাস্তার লোকজনেরা বিস্ফারিত চোখে দেখে কিংবা ভয়ে পালায়। পুলিশ তো ধনিক শ্রেণীর পাহারাদার, তাদের হত্যা করতে কোনো রকম দ্বিধা নেই। মেরে মেরে পুলিশ বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হবে, তাদের মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে যাতে তারা চাকরি ছেড়ে পালাতে শুরু করে।

অতর্কিতে কোনো কনস্টেবল বা ইনসপেক্টারকে আক্রমণ করে তার অস্ত্রটাও কেড়ে নেওয়া যায়। গ্রামের জোতদার কিংবা মফস্বলের ব্যবসায়ীদেরও অনেকেরই বন্দুক থাকে, সেগুলোও দখল করে নিতে পারলে বিপ্লবের জন্য অস্ত্র মজুত হবে।

মূর্তি ভাঙা, পুলিশ খুন, অস্ত্র লুঠ, শোধনবাদী পার্টির কর্মীদের বিনাশ এইসব চলতে লাগলো মাসের পর মাস। যেন মনে হলা, সত্যিকারের বিপ্লব এসে গেল, এসে গেল।

তারপর শুরু হলো চরম প্রতিক্রিয়া। পশ্চিম বাংলায় সরকারের পতনের পর রাষ্ট্রপতির শাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হলে এলেন সিদ্ধার্থ রায়। পুলিশের বদলে নামানো হলো বি এস এফ এবং সি আর পি।

গেরিলা যুদ্ধের কোনোরকম ট্রেনিং যারা নেয়নি, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করার পরিকল্পনা যারা নেয়নি, যারা শুধু দেয়ালে স্লোগান লিখেছে, পাথরের মূর্তি ভেঙেছে, একা পেয়ে কোনো কনস্টেবলকে খুন করে হাত পাকিয়েছে, সেইসব মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত ঘরের আদর্শবাদী ছেলেরা এবার সম্মুখীন হলো এক সুশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনীর। প্যারা মিলিটারি ফোর্সের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সামনে তারা সামান্য হাতবোমা, পাইপগান কিংবা পুরোনো রিভলভার নিয়ে দাঁড়াতেই পারলো না।

অন্য মার্কসবাদী দল এবং কংগ্রেসের ছেলেরাও এবার উঠে পড়ে লাগলো নকশালদের নির্মূল করার কাছে। মাঠে-ঘাটে, রেল লাইনের ধারে প্রতিদিন দেখা যেতে লাগলো সুন্দর, সুকুমার, স্বপ্নময় চোখের ছেলেদের মৃতদেহ। শাসকদের শক্তি এবং অন্য দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিশোধ স্পৃহা, এই ত্রিমুখী আক্রমণে পর্যুদস্ত হতে লাগলো নকশালপন্থীরা। জেলখানাও ভরে যেতে লাগলো।

বিদ্যাসাগর, রামমোহন, গান্ধীর ভাঙা মূর্তিগুলো এতদিন এমনই পড়ে ছিল, এবার কারুর কারুর নজর পড়লো সেদিকে। বিবেক দংশন তীব্র হলো।

কলেজ স্ট্রিটে দোকানে আসার পথে বিমানবিহারী বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ভাঙা মূর্তিটার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিতেন। অসহ্য কষ্ট হতো তাঁর। কয়েক মাস ধরেই তিনি কয়েকজন প্রকাশককে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, এই মূর্তিটা সারানো তাঁদেরই পবিত্র কর্তব্য। বিদ্যাসাগর শুধু এদেশে বিদ্যাচর্চারই প্রসার ঘটাননি, তিনি বাংলার প্রকাশকদেরও আদি গুরু। কিন্তু অন্যরা কেউ উদ্যোগ নিতে সাহস পাননি, যে ঐ মূর্তি সারাতে যাবে, নকশালরা তার ওপরেই প্রতিশোধ নেবে।

এখন নকশালরা অনেকটা কোণঠাসা অবস্থায় এসে পড়েছে, তাই অনেকে এগিয়ে এসেছে বিদ্যাসাগরের মূর্তি পুনরুদ্ধারের কাজে। গতকাল রাতেই বিদ্যাসাগরের কাঁধে নতুন মাথা বসানো হয়েছে, আজ সকাল দশটায় তার উদ্বোধন হবে। আহ্বান করা হয়েছে সর্বদলীয় নেতাদের। আজ তাঁরা এখানে বাংলার যুবসমাজের মধ্যে খুনোখুনি বন্ধের প্রস্তাব নেবেন।

বিমানবিহারীরা একটু আগে এসে পড়েছেন। সাবধানের মার নেই বলে দু'গাড়ি সি আর পি মোতায়েন করা হয়েছে আজ, কেন না নকশালরা এখনও মরীয়া হয়ে এখানে সেখানে আক্রমণ চালাচ্ছে, হঠাৎ কলেজ স্কোয়ারেও বোমা চার্জ করতে পারে।

তিন প্রৌঢ় সিগারেট ধরালেন। আজ ভোরবেলাই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই এখন বিশেষ গরম নেই, চারদিক ভিজে ভিজে। আকাশ এখনো মেঘলা।

মামুন বিদ্যাসাগরের বিশেষ ভক্ত। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মতন একজনও জন্মাননি, তাই গত শতাব্দীতে বাঙালী মুসলমানরা শিক্ষার ব্যাপারে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। অবশ্য যৌবনে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় মামুন একথাও বুঝেছিলেন যে, একজন মুসলমান বিদ্যাসাগর যদি গত শতাব্দীতে বহুবিবাহ রদের কথা, বিদ্যাসাগর আবার নাস্তিক ছিলেন, একজন নাস্তিক মুসলমান সমাজ সংস্কারকের কথা কি এখনও কল্পনা করা যায়?

মামুন বললেন, ভাই, এই সব নকশাল ছেলেমেয়েরা তো বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পদ্ধতিতেই লেখাপড়া শিখেছে। আর লেখাপড়া শেখেই তো তারা মার্কসবাদ বলো আর যাই-ই বলো বুঝতে শিখেছে। তবু বিদ্যাসাগরের উপর তাদের এত রাগ কেন সেটাই বুঝি না!

প্রতাপ বললেন, ওদের মতে ইংরেজ সরকার নিজেদের দরকারে কেরানী বানাবার জন্য ইংরেজি শিক্ষা চালু করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাতেই মদত দিয়েছেন। এটা বিজাতীয় শিক্ষা!

বিমানবিহারী অসহিষ্ণুভাবে বললেন, তুমি কী বলছো, প্রতাপ? শিক্ষার আবার জাত আছে নাকি? শিক্ষা জিনিসটাকে যেভাবে নিতে পারে। সব দেশেই কিছু লোক লেখাপড়া শিখে কেরানী হয়, কিছু লোক পণ্ডিত, চিন্তাবিদ হয়। এই শিক্ষাতেই আমাদের দেশে জগদীশ বোস, সি ভি রমন, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বড় হননি? চারু মজুমদার নিজেই কি চীনে গিয়ে এ বি সি ডি পড়ে এসেছে? মামুন বললেন, এরা মূর্তি তো ভাঙছে, তার বদলে কার মূর্তি গড়বে তা কি বলেছে? শুধু কি মাও সে তুং আর লেনিন, কার্ল মার্কস? এদেশে কোনো নেতা নেই?

প্রতাপ বললেন, এদের একটা লিফলেটে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের কথা পড়েছিলাম একবার।

বিমানবিহারী বললেন, মুখ্যু, মুখ্যু! আসলে এরা নিজেরাই পড়াশুনো কিছু করে নি। আর কারুকে খুঁজে পেল না। শেষ পর্যন্ত ঝাঁসীর রাণী হলো আদর্শ!

প্রতাপ বললেন, বিমান তুমি এদের আর যাই বলো, মুখ্যু বলতে পারো না! এদের মধ্যে অনেকেই ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া ছেলে, প্রেসিডেন্সি কলেজের নাম করা ছাত্র।

বিমানবিহারী বললেন, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলেই ভালো ছাত্র হয় না! স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশই যথার্থ শিক্ষার লক্ষণ। তা না চিলে কান নিয়ে গেছে শুনেই চিলের পিছনে ছোটা। সাধারণ যাত্রা-থিয়েটারে ঝাঁসীর রাণী একজন হিরোইন হতে পারে কিন্তু ইতিহাসে তার স্থান কোথায় তা যারা মন দিয়ে ইতিহাস পড়েছে তারাই জানে। রমেশ মজুমদারের বই খুলে দ্যাখো, সেখানেই আছে যে ঝাঁসীর রাণী নিজে চিঠি লিখে ইংরেজদের জানিয়েছিল যে, সে নিজে মোটেই বিদ্রোহে যোগ দিতে চায় না, কিন্তু সেপাইরা তাকে ভয় দেখাচ্ছে। সে তাদের দলে যোগ না দিলে সেপাইরা তার প্রাসাদ উড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়েছে। অর্থাৎ সেপাইরা বন্দুকের নল দিয়ে পিছন থেকে ঠেলে ঠেলে এনে ঝাঁসীর রাণীকে নেত্রী করেছে।

মামুন বললেন, তাই নাকি? এটা তো আমার জানা ছিল না!

বিমানবিহারী বললেন, যাত্রা-থিয়েটারের যে গলা কাঁপানো সেন্টিমেন্ট, সেটাই আমাদের দেশে দেশাত্মবোধ হিসেবে চলে! এই জঙ্গী বিপ্লবীরাও সেই সেন্টিমেন্টেই চলছে। আদর্শ মানে শুধু গাল ভরা কথার ফুলঝুরি! হুঃ বিপ্লব! বিপ্লব যেন হাতের মোয়া! আমি মাও সে তুং কে তবু শ্রদ্ধা করি, তিনি অনেক দিনের প্রস্তুতি নিয়ে তারপর সংগ্রামে নেমেছিলেন। আর এরা যুদ্ধ কাকে বলে জানেই না! শুধু শুধু কিছু লোক মারলো, এখন নিজেরা মরছে।

মামুন বললেন, এই নকশালদের দেখে আমার সেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবীদের কথা মনে পড়ে। খুব মিল আছে। তোমাদের মনে আছে সেই সময়টার কথা?

বিমানবিহারী বললেন, তখন আমি খুবই ছোট ছিলুম, তবে জানি, ব্যাপারটা জানি, ওটা আবার বিপ্লব নাকি? আমরা অনেক বাড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখেছি। সিনেমা বানিয়েছি, কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই তো একটা ফিয়াসকো! ইংরেজরা নিশ্চয়ই খুব হেসেছিল সেই সময়!

মামুন বললেন, একবার অনন্ত সিং-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর মুখে আমি আসল সত্যি কথাটা শুনেছি। ওনারা চিটাগাং-এর অস্ত্রাগার লুঠ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু আর্মস অ্যামিউনিশান সম্পর্কে কোনো ট্রেনিং-ই ছিল না। একটা হোটেলে খাবারের অর্ডার দিয়ে ওনারা গেলেন আর্মারি রেইড করতে, যেন ব্যাপারটা অতই সোজা! তবু তো ফাঁকতালে ইংরেজদের খানিকটা অসতর্কতার সুযোগে অনেক অস্ত্র পেয়ে গেলেন, কিন্তু একটাও ব্যবহার করতে পারেননি শেষ পর্যন্ত! কেন পারেননি জানো? তার কারণ, অস্ত্র পেয়েছিলেন, গোলাগুলি পাননি! ওঁরা এই সিম্পল ব্যাপারটাই জানতেন না যে, কোনো দেশেই অস্ত্র আর গোলাবারুদ এক জায়গায় রাখা হয় না!

বিমানবিহারী বললেন, গোলাবারুদের ডিপোটা ছিল মাত্র এক মাইল দূরে, সেখানেও সে রাতে তেমন কিছু পাহারা ছিল না, তবু ওরা সন্ধানটাই পায়নি! এই তো বিপ্লবীদের মহান কীর্তি! শুধু

নিজেদের প্রাণ নষ্ট করেছে। ওরা যখন পালাতে যাচ্ছিল, তখন নিজের দেশের মানুষই ওদের সাধারণ ডাকাত মনে করে ওদের কয়েকজনকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে!

প্রতাপ অন্য দুই বন্ধুর এই সব মন্তব্য ঠিক পছন্দ করতে পারলেন না। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। তিনি বললেন, তোমরা চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠনের ব্যাপারটা যে এত তুচ্ছ বলে মনে করছো, সেটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। ঐ ঘটনার ফলে সারা দেশে যে বিপুল উত্তেজনা এসেছিল, তা কি অস্বীকার করতে পারো? সূর্য সেনের মতন মানুষ মৃত্যুর পরেও হাজার হাজার অল্প বয়েসী ছেলেদের মনে প্রেরণা জুগিয়েছেন।

বিমানবিহারী বললেন, না, না, আমি চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারে লুণ্ঠনের ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করতে চাই না মোটেই। সূর্য সেনও অবশ্যই নমস্য। আমি বলছি, বিপ্লবের প্রস্তুতির কথা। ঠিক মতন জন সংযোগ না হলে, একটা ব্যবস্থার বদলের জন্য সাধারণ মানুষকে আগ্রহী করা, শুধু আগ্রহীই নয়, দরকার হলে সাধারণ লোকেও যাতে রাস্তায় নেমে পড়ে হাতিয়ার ধরতে পারে, সেই ভাবে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে, শুধু, দু'চারটে খুন-জখম করলে বিপ্লব হয়?

মামুন বললেন, এই নকশালদের ধরন-ধারণ দেখলে তো মনে হয়, ওরা যুদ্ধের কোনো ট্রেনিংই নেয়নি। ইস্কুল-কলেজের ভালো ছাত্র, মনে রয়েছে একটা আদর্শবাদ, কিন্তু ঠিক মতন তৈরি হয়ে না নিলে...

প্রতাপ অন্যমনস্কভাবে জলের দিকে তাকিয়েছিলেন। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন, মামুন, তোমাদের ওখানেও তো পাকিস্তানী শক্তিশালী আর্মির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ লড়াইতে নেমেছে, তারা কি ট্রেনিং নিয়েছে?

মামুন বললেন, তারা তো ভাই বাধ্য হয়ে নেমেছে। মরতে মরতে রুখে দাঁড়িয়েছে। আর তো কোনো উপায় ছিল না। তাও তো আমি মনে করি, এভাবে লড়াই করে পাকিস্তানী ট্রেইন্ড আর্মিকে কোনোদিন হারানো যাবে না, যদি না অন্য কোনো দেশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। চার মাস কেটে গেল, কী যে হবে!

বাইরের রাস্তায় একজন কোনো বড় গোছের নেতা নামলেন গাড়ি থেকে। তাঁর সঙ্গে একটি জিপ, তাতে রয়েছে কয়েকজন যুবক, তাদের হাতে লাঠি। ঐ নেতার দেহরক্ষী যুবকদের পকেটে বোমা-পিস্তল থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। এরাও বোধহয় আশঙ্কা করেছে যে আজ এখানে নকশাল হামলা হতে পারে।

সেদিকে তাকিয়ে প্রতাপ ভাবলেন, শেষ পর্যন্ত কি সত্যিই একটা সামান্য পাথরের মূর্তিকে কেন্দ্র করে এখানে একটা খণ্ডযুদ্ধ ঘটে যাবে?

বিমানবিহারী একবার নিজের কোমরটা থাবড়ে দেখে নিলেন। তাঁর নিরীহ খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবির নিচে তিনি রিভলভারটা গুঁজে এনেছেন। ইদানীং তিনি সবসময় সশস্ত্র থাকেন।

ভাইস চ্যান্সেলরের আসবার কথা। তিনি এখনো এসে পৌঁছোননি বলেই অনুষ্ঠান শুরু হতে পারছে না। তবে ভিড়টা হয়েছে মন্দ না, সত্তর-আশিজন হবেই। এর মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা নগণ্য, তিন চারজনের বেশী না। এদেশের রমণীদের জন্যই বিদ্যাসাগর জীবনের অনেকগুলি বছর খেটে খেটে মুখে রক্ত তুলেছেন।

দূরে কোথাও একটা বিকট শব্দ হলো। পটকা না গাড়ির টায়ার-টিউব বার্স্ট করার আওয়াজ? এরকম কিছু শুনলেই গা ছমছম করে। গতকালও হাওড়ায় এক সাংবাদিক রাখাল নাহা খুন হয়েছে। এস এস কে এম হাসপাতাল থেকে একজন নামকরা নকশাল নেতা মহাদেব মুখার্জি পালিয়ে গেছে। নকশালরা নাকি ঘোষণা করেছে, এক একজন বিপ্লবীর মৃত্যুর আর কে যে প্রতিবিপ্লবী তা বোঝার উপায় নেই। বিমানবিহারীর বাড়িতে পুলিশের একজন বড় কর্তা বলছিলেন, নকশাল আর সি পি এম-এর মধ্যে যখন মারামারি হয়, তখন আমরা চোখ বুজে থাকি, ওদের মধ্যে কে কত বড় মার্কসবাদী, তা ওরা নিজেরাই বুঝে নিক, আমাদের কথা গলাবার দরকার কী! সে কথা শুনে প্রতাপের ইচ্ছে হয়েছিল পুলিশের কর্তাটিকে ঠাস করে একটা চড়া কষাতে। তাঁর আজকাল প্রায়ই এরকম পাগলাটে ইচ্ছে হয়। ইদানীং তিনি যেন অনেক বেশী অধৈর্য ও খিটখিটে হয়ে গেছেন। খবরের কাগজ খুললেই শুধু নরহত্যার খবর তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না।

মামুন হঠাৎ পাংশু মুখে বললেন, ভাই, আমাদের কী হবে বলো তো? তোমাদের ইন্দিরা গান্ধী যে একেবারে চুপ মেরে গ্যালেন। আমরা কি আর দেশে ফিরতে পারবো না?

বিমানবিহারী বললেন, কেন, এখানে খুব খারাপ লাগছে?

মামুন বললেন, খারাপ-ভালো লাগার প্রশ্ন নয়। শেষে কি আমাদের টিবেটান রিফিউজদের মতন দশা হবে? আমাদের কথা সারা পৃথিবী ভুলে যাবে?

বিমানবিহারী বললেন, রিফিউজিদের সংখ্যা সত্তর লাখ ছাড়িয়ে গেছে শুনছি। এত রিফিউজিকে ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্ট কতদিন খাওয়াবে? ইন্দিরা গান্ধীকে একটা কিছু ব্যবস্থা ব্যবস্থা নিতেই হবে। তার আগে দেশের ভেতরকার অবস্থাটা একটু গুছিয়ে নিতে হবে না?

প্রতাপদের কাছেই একটি যুবক এসে দাঁড়িয়েছে একটু আগে। বছর উনিশ কুড়ি বয়েস। খাঁকি প্যান্টের ওপর একটা গেঞ্জি পরা, খালি পা। চুলে অনেকদিন চিরুনি পড়েনি, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর। মোমের তৈরি কোনো দেবতার মুখের মতন কোমল।

ছেলেটি প্রতাপের কথাই যেন শুনছে মন দিয়ে। হঠাৎ সে জামার পকেট থেকে একটা দোমড়ানো সিগারেট বার করে প্রতাপের দিকে তাকিয়ে খ্যাসখেসে গলায় বললো, দাদা একটু দেশলাইটা দিন তো!

দেশলাই দেবার বদলে প্রতাপের ইচ্ছে হলো ছেলেটির কান মুলে দিতে। আজও প্রতাপ নিজে তাঁর চেয়ে বেশী বয়স্ক ব্যক্তিদের সামনে সিগারেট ধরান না। তাঁদের যৌবনে যে-কোনো অচেনা বয়স্ক ব্যক্তিদেরই গুরুজন মনে করা হতো। এখনকার ছেলেরা যত ইচ্ছে সিগারেট খাবে খাক না, তা বলে বেয়াদপি করবে কেন?

প্রতাপ ছেলেটির কথা না শোনার ভান করে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

ছেলেটি এবার প্রতাপের গায়ে ঠেলা দিয়ে বললো, এই যে দাদা, আগুনটা–

প্রতাপ বললেন, আমার কাছে দেশলাই নেই।

কথাটা মিথ্যে নয়, প্রতাপ বিমানবিহারীর লাইটার থেকে সিগারেট ধরিয়েছেন। মামুন আর বিমানবিহারী নিজেদের মধ্যে কথা বলায় ব্যস্ত। ছেলেটি তবু প্রতাপের ঠোঁটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, আপনার সিগারেটটা দিন, ধরিয়ে নিচ্ছি!

রাগে প্রতাপের গা জ্বলছে, তবু কিছু বলা যাবে না। যৌবন এমনই মহা শক্তিমান ব্যাপার যে তার কোনো প্রতিবাদ করা যায় না। প্রতাপ অর্ধ সমাপ্ত সিগারেটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে ছেলেটিকে দিলেন। সে নিজের কাজ সেরে সেটা আবার ফেরত দিতে এলে প্রতাপ অসীম অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, দরকার নেই, ফেলে দাও!

ছেলেটি মুচকি হেসে নিজের সিগারেটটা টানবার আগে প্রতাপেরটাও দু'টান টেনে নিল। তারপর জিজ্ঞেস করলো, এখানে কিসের মচ্ছব হচ্ছে?

এই ছেলেটির সঙ্গে বাক্যালাপ করার কোনো ইচ্ছে নেই প্রতাপের, তিনি সেখান থেকে সরে গেলেন খানিকটা। ছেলেটির চোখ ঘন ঘন পিট পিট করছে। প্রতাপ সরে এসে ছেলেটির পিঠের দিকটা দেখলেন, তার কাঁধের কাছে কালো গোল গোল দাগ।

ছেলেটি এবার মামুনকে বললো, ও দাদা, এখানে আজ কিসের মোচ্ছব হচ্ছে?

মামুন বললেন, আজ এখানে...সকলে এসেছেন...বিদ্যাসাগরের মূর্তি...

ছেলেটি বললো, ঐ মূর্তিটা তো? ওর মুণ্ডুটা সারিয়েছে, না? মুণ্ডুটা কে ভেঙেছিল জানেন? আমি, আমি, আমি! এই সমীর নাগ!

মামুন ও বিমানবিহারী বিস্ফারিত চোখে তাকালেন ছেলেটির দিকে। বিমানবিহারী বিদ্রূপের সুরে বললেন, তুমি ভেঙেছিলে? কেন ভেঙেছিলে?

ছেলেটি কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, বেশ করেছি! তাতে তোর কী রে শালা?

প্রতাপ বিমানবিহারীর হাতধরে টেনে সরিয়ে আনলেন। ছেলেটির চোখ পিটপিটুনি দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, এখন স্পষ্ট বোঝা গেল এর মাথায় গোলমাল আছে। এর ধারে কাছে থাকা ঠিক নয়।

তিন প্রৌঢ়ই সরে গেলেন বেশ খানিকটা দূরে। মামুন আপসোসের সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ইস, চেহারা দেখে মনে হয় ভালো ঘরের ছেলে। খালি পায়ে ঘুরছে। নিশ্চয় ছাড়া-পাগল!

ছেলেটি রেলিংয়ের গায়ে ঠেস দিয়ে গলা ফাটিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বললো, অ্যাই শুয়োরের বাচ্চারা শোন, ঐ শুয়োরের বাচ্চা বিদ্যাসাগরের মুণ্ডুটা আমি ভেঙেছি! বেশ করেছি!

বিমানবিহারী বললেন, ঘাড়ের কাছে কালো দাগগুলো দেখছো? খুব সম্ভবত পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করেছে। তারপর পাগল হবার পর ছেড়ে দিয়েছে। কিংবা ওর বাড়ির লোক ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে ছাড়িয়ে এনেছে। কিন্তু ওকে নজরে রাখা উচিত ছিল।

ছেলেটির চিৎকার অনেকেই শুনতে পেয়ে ঘুরে তাকিয়েছে। আজ সবাই একটা পবিত্র মনোভাব নিয়ে এখানে এসেছে, তার মধ্যে একি উৎপাত? ছেলেটি পাগল হলেও তার মুখ যথেষ্ট খারাপ।

ছেলেটি আবার চেঁচিয়ে বললো, আমি সমীর নাগ। পুলিশের বাপকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর আমাকে চেনে কি না। আমি ঐ বিদ্যাসাগরের মুণ্ডু ভেঙেছি। তোরা নতুন করে বসা, আবার ভাঙবো! তোদের ভক্তি-শ্রদ্ধার মুখে আগুন জ্বালাবে! পুরোনো বই পুড়িয়ে দাও, নতুন বই লেখা হবে!

বড় দরের রাজনৈতিক নেতার দেহরক্ষী যুবকেরা এগিয়ে এলো এবার। পাগল-ছাগল যাই হোক, এর মুখে শেয়ানার মতন কথা। পাগল হলেও নকশাল। এ নিজে যদি বিদ্যাসাগরের মুণ্ডু না ভেঙেও থাকে, তবু এ ভাঙাটাকে সমর্থন করে। লাঠি-হাতে এক যুবক রুক্ষ ভাবে বললো, অ্যাই, যা বাড়ি যা! ফোট!

ছেলেটি একটা কুৎসিত গালাগালি দিয়ে সেই মাস্তান যুবককে লাথি মারতে গেল। তখন লাঠি তুললো আরও দু'জন। একজন ঐ ছেলেটির মাথাটা রেলিং-এ খুব জোরে ঠুকে দিয়ে বললো, এখানে রংবাজি করতে এসছিস?

মামুন ভয়ার্ত গলায় বললেন, ও বিমান, ওরা ঐ পাগলটাকে মেরে ফেলবে নাকি?

হঠাৎ প্রতাপের চোখ জ্বালা করে উঠলো। তাঁর কোনোদিন এমন হয় না, লোকজনের সামনে তিনি আবেগ দেখানো পছন্দ করেন না। কিন্তু তাঁর মনে হলো, ঐ সুকুমার চেহারার ছেলেটি ঠিক বাবলুর বয়েসী না? বাবলুর মুখের সঙ্গে একটা মিল আছে না?

প্রতাপ ছুটে গিয়ে, অন্যদের ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, মেরো না, মেরো না, ওকে ছেড়ে দাও, আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

একজন মাস্তান প্রতাপের হাত চেপে ধরতেই প্রতাপ কাতর ভাব বললেন, ও তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, দয়া করে ভাই ছেড়ে দাও ওকে, ও আমার খুব চেনা। ও আমার...

তারপর প্রতাপ সেই পাগলটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

॥ ২৭ ॥

শেষ পর্যন্ত অলিকে একলা যেতে দিতে রাজি হয়নি পমপম। তার শরীর যতই দুর্বল হোক, তার মন এখনও সুদৃঢ় ধনুকের ছিলার মতন টানটান। চোখদুটো অনেকখানি কোটরগত, তাতে তার দৃষ্টি যেন আরও বেশী তীক্ষ্ণ। তাকে যে নার্ভের ওষুধ দেওয়া হয়েছে, তার একটার বদলে তিনটে ট্যাবলেট সে খেয়ে ফেল্লো অলিকে লুকিয়ে। অন্য ওষুধও প্রত্যেকটা দ্বিগুণ করে খেল। তার ঘন্টাখানেক পরে, উঠোনের তারে যে কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছিল তা সে পাড়লো লাফিয়ে, ঠাকুর্দার ঘর থেকে সুপুরির পুঁটুলি চুরি হয়ে গেছে বলে সে নিপুণ অভিনয়ে ধমকালো বাড়ির প্রত্যেকটি লোককে। তার শোয়ার ঘরের বারান্দার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে বললো, দ্যাখ অলি, আমি একদম ভালো হয়ে গেছি। দেখবি, এখন থেকে নীচে ঝাঁপাবো, ছেলেবেলার মতন।

অলি তার হাত চেপে ধরে বললো, থাক, অত আর বাড়াবাড়ি করতে হবে না। তবে তোর চোখ-মুখ আজ অনেকটাই ভালো দেখাচ্ছে। আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারবো। যদিও কলকাতায় ফিরতে আমার একটুও ভালো লাগছে না!

পমপম বললো, তোর বাবা খবর পাঠিয়েছেন, তোকে তো ফিরতেই হবে রে! বাইরে যাওয়ার কত রকম ফর্মালিটি আছে। আমি তোকে স্টেশানে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

অলির তাতে ঘোর আপত্তি। পমপমের স্টেশানে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। এ বাড়ির একজন মুনিষ তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। কিংবা একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে সে একাও চলে যেতে

পারে। পমপমের যাবার কোন দরকার নেই।

কিন্তু অলি একা আর পমপমকে কতখানি বাধা দেবে। এ বাড়িতে সব কিছুই কেমন যেন ছাড়া ছাড়া। ঠাকুর্দা চোখে দেখতে পান না, পমপমের এক বিধবা পিসি ও কাকা-কাকীমা রয়েছেন, তাঁরা পমপমের কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামান না। কথাই বলতে চান না ভালো করে। পমপম এখানে থাকবে না চলে যাবে, তাতে যেন তাঁদের কিছু যায় আসে না। পমপম যেন অনেকটা অচ্ছুৎ! অলি ঠিক বুঝতে পারে না, কেন তাঁদের এরকম মনোভাব। পমপম তার বাবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যরকম রাজনীতি করেছে বলে? কিংবা, লালবাজার লকআপে পমপমের ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল, তারই কোনো অতিরঞ্জিত কাহিনীতে তারা পমপমকে ধর্ষিতা মনে করে?

এরকম উদাসীন বা বিরূপ আত্মীয়দের মধ্যে পমপমকে একা রেখে যেতেও ইচ্ছে করছে না অলির, অথচ এখন তার আর থাকার উপায় নেই। কলকাতার বাড়িতেও পমপম যেতে চায় না, তা হলে সে থাকবে কোথায়?

দুপুর পেরিয়ে বিকেল হতে হতেই অলি চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাকে পাঁচটা কুড়ির ট্রেন ধরতেই হবে। সে অনুনয় করে বললো, পমপম, লক্ষীটি, তুই স্টেশনে আসিস না, ফিরতে ফিরতে তোর রাত হয়ে যাবে। আমি যদি বিদেশে যাই, তার আগে আর একবার এসে দেখা করে যাবো তোর সঙ্গে।

পমপম একটা ছোট্ট ব্যাগ তুলে নিয়ে বললো, আমি মত পাল্টে ফেলেছি, আমি তোকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি না, আমিও তোর সঙ্গে ফিরবো। এখানে আমার একা থাকতে ইচ্ছে করছে না।

অলি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললো, তুই আজই ফিরবি? আর দুদিন অন্তত থাক, তোর বাবা আবার এখানে আসবেন বলে গেলেন, তাঁর সঙ্গে তুই গাড়িতে চলে যেতে পারিস কলকাতায়।

অলির চোখের দিকে গাঢ় ভাবে কয়েকপলক তাকিয়ে থেকে পমপম বললো, জিপে এতখানি রাস্তা যাওয়ার চেয়ে ট্রেনে যাওয়া অনেক বেশী আরামের। তোর সঙ্গে এসেছি, তোর সঙ্গেই ফিরবো।

অলি তবু আমতা আমতা করে বললো, আমি ভাবছিলুম, সোজা কলকাতায় না গিয়ে কৃষ্ণনগর হয়ে ফিরবো। ট্রেন থেকে নেমে বাস বদল করতে হবে, নদী পার হতে হবে, তোর খুব কষ্ট হবে পমপম, তুই পারবি না!

পমপম অলির বাহুতে হাত রেখে বললো, তোর তো মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই। তুই আমাকে ভোলাতে পারবি না। আমরা প্রায় স্কুল থেকেই রাজনীতি করছি, আমরা যখন তখন মিথ্যে কথা বলতে পারি। একটাও চোখের পাতা কাঁপে না। আমি জানতুম, তুই সোজা কলকাতায় ফিরবি না।

–পমপম, এই শরীর নিয়ে তোর যাওয়াটা কিছুতেই ঠিক হবে না।

–আমি যদি না যাই, তা হলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোর জন্য দুশ্চিন্তায় এতখানি দগ্ধাবো যে তাতে আমার শরীরের আরও বেশী ক্ষতি হবে! চল, আর দেরি করে লাভ নেই।

সারাদিনই ঝেঁকে ঝেঁকে বৃষ্টি আসছে। এখন বৃষ্টি ইলশেগুঁড়ি। রিকশার সামনের পর্দাটাও ফেলে দিতে হলো। রাস্তায় বেশ কাদা। একটু আগেই একটা ট্রেন এসে পৌঁছেছে, তাই এ পথ দিয়ে অনেক রিকশা আর সাইকেল ফিরছে।

রিকশার ঝাঁকুনিতে কষ্ট হচ্ছে পমপমের, তার শরীরের সমস্ত হাড় পাঁজরা যেন আলগা হয়ে গেছে। বেশী নড়াচড়া করলেই তার নিম্ন উদরে একটা ব্যথা শুরু হয়, বারবার হিসি পায়। অনর্গল কথা বলে গেলে ব্যথার উপলব্ধিটা অনেক কম হয়।

পমপম বললো, তুই কৌশিককে কতদিন চিনিস, অলি? নিশ্চয়ই অতীনের বন্ধু হিসেবে–

অলি বললো, হ্যাঁ, বাবলুদার বি এসসি পরীক্ষার পর কৌশিক প্রথম একদিন বাবলুদার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। খুব লাজুক মনে হয়েছিল প্রথম দিনটায়।

পমপম বললো, আমি ওকে চিনি প্রায় বাচ্চা বয়েস থেকে। এক সময় ওরা আমাদের পাড়ায় থাকতো। মানিকতলায় আমাদের বাড়ির ঠিক দুখানা বাড়ি পরে। ঐ পাড়াতেই অতুল্য ঘোষের বাড়ি জানিস তো? অতুল্য ঘোষের ভাইপো ভাইঝিদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল, ওদের বাড়িতে খেলতে যেতুম, তাদের সঙ্গে আমার এখনও বন্ধুত্ব আছে। সেই বাড়িতে কৌশিকও যেত। ঐ বাড়ির দিলীপদার সঙ্গে তো কিছুদিন আগেও দেখা হয়েছে, দিলীপদা রাজনীতিতে যান নি।

–তুই কংগ্রেসীদের বাড়িতে যেতিস?

–হ্যাঁ। ছেলেবেলায় অত শত তো বুঝতুম না। তবে ওদের বাড়ির পরিবেশটা খুব ভালো লাগতো আমার। অতুল্যবাবুকেও জ্যেঠু জ্যেঠু বলতুম, তিনি বেশ হেসে হেসে গল্প করতেন, কয়েকবার প্রফুল্ল সেনকেও দেখেছি ঐ বাড়িতে। ওঁরা দু'জনেই খুব পাওয়ারফুল নেতা, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে খুব অমায়িক, সেটা স্বীকার করতেই হবে। আমার বাবা সি পি আই-এর নেতা, ছেলেবেলায় আমি কমুনিস্ট আর কংগ্রেসী অনেক নেতাকেই দেখেছি খুব কাছ থেকে, সি পি আই-এর বয়স্ক নেতারাও অনেকে একসময় কংগ্রেসী ছিল, আমার বাবাও স্বাধীনতার আগে ছিলেন কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে, অতুল্যবাবু তো আমাকে দেখলেই বলতেন, হ্যাঁরে খুকী, তোর মা কেমন আছেন? তোর মা যা চমৎকার ধোকার ডালনা রাঁধে...অতুল্যবাবু একবার আমাদের এই মেমারির বাড়িতেও এসেছিলেন, আমার মায়ের হাতের রান্না খেয়েছেন...আমার মা তখন হাঁপানিতে শয্যাশায়ী...হ্যাঁ, যা বলছিলুম, ঐ বাড়িতেই কৌশিকের সঙ্গে পরিচয়, তখন আমাদের প্রায় পুতুলখেলার বয়েস। তারপর কৌশিকরা একসময় নিউ আলিপুরে বাড়ি করে উঠে গেল, তারপরেও যোগাযোগ নষ্ট হয় নি, কৌশিকের মা আমাকে খুব ভালোবাসতেন, আমার মা মারা যাবার পর তিনি আমাকে নিউ আলিপুরের বাড়িতে মাঝে মাঝে নিয়ে গিয়ে সারাদিন রেখে দিতেন।

হঠাৎ কথা থামিয়ে পমপম রিকশাটাকে থামাতে বললো। সে আর অবদমন করতে পারছে না। অন্ধকার রাস্তা। এরমধ্যে যানবাহন কিছুটা কমে এসেছে। পমপম রিকশা থেকে নেমে চলে গেল একটা ঝোপের আড়ালে। লজ্জা পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ছোট বাথরুম করতে গেলেই তার মাথা ঝিমঝিম করে, এ কথা সে এ পর্যন্ত কারুকে বলেনি, ডাক্তারকেও না।

আস্তে আস্তে পা ফেলে সে ফিরে এসে রিকশায় উঠে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, অলি, একটা লবঙ্গ দে তো! আর মিনিট দশেকের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে যাবো।

অলি আড়ষ্ট গলায় বললো, লালবাজারে তোকে খুব কষ্ট দিয়েছে, নারে?

পমপম বললো, ওসব কথা এখন থাক। কৌশিকের কথা শোন। কৌশিক ছাত্র হিসেবে ব্রিলিয়ান্ট ছিল, অতীনের চেয়ে অনেক ভালো, অতীন তো স্কুল ফাইনালেও ভাল রেজাল্ট করেনি, ফাঁকিবাজ টাইপের ছিল।

অলি বললো, বাবলুদা কাছে শুনেছি, ওর পড়াশুনোয় তেমন মন ছিল না, খেলাধুলোর দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। কিন্তু ওর দাদা, সে ছিল সত্যিকারের ব্রিলিয়ান্ট, সে হঠাৎ জলে ডুবে মারা যায়, তখন বাবলুদা ওর বাবা-মায়ের দুঃখ কিছুটা ঘোচাবার জন্যই পড়াশুনোয় মন দেয়।

–ওর দাদা ওর জীবনে একটা ছায়া ফেলে আছে। তুই জানিস না, অলি, অতীন মাঝে মধ্যেই আফসোস করে বলতো, দাদাটা মরে গিয়ে আসলে আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে। আমার সব সময় একটা পিছুটান। দাদা বেঁচে থাকলে বাবা-মাকে খুশী রাখতে পারতো, আমি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে যা খুশী করতে পারতুম! একসময় অতীনকে নেপাল ঘুরে চীনে পাঠাবার প্রস্তাব হয়েছিল আর একজনের সঙ্গে, খুবই রিস্কি জার্নি, শেষ পর্যন্ত অতীন যেতে পারেনি তার বাবা-মায়ের কথা কনসিডার করে! কিন্তু আলটিমেটলি তো ছাড়তেই হলো, এখন ইংল্যান্ড না আমেরিকা কোথায় গিয়ে যেন বসে আছে!

–তুই কৌশিকের কথা বলছিলি।

–কৌশিক ছিল সত্যিকারের পড়ুয়া। ইনট্রোভার্ট। লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতো। সেই কৌশিক সেকেন্ড ইয়ারে উঠে প্রেম নিবেদন করে ফেললো আমাকে।

–তোকে?

–কেন, আমায় বুঝি কেউ প্রেম নিবেদন করতে পারে না। আমাকে এতই নীরস আর কাঠখোট্টা মনে করিস?

–না, না, সেজন্য নয়। কৌশিকের সঙ্গে তোর অন্যরকম সম্পর্ক দেখেছি।

–আমি কৌশিককে শুনিয়েছিলুম সুভাষবাবুর একটা কবিতা লাইন, 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা...' তখন আমি ছাত্র রাজনীতিতে দারুণভাবে জড়িয়ে পড়েছি। আমি বুঝতে পেরেছিলুম, আমার বাবাদের জেনারেশান আমাদের দারুণভাবে বিট্রে করেছে। আমাদের

বাড়িতে বাবার বন্ধুর আর পার্টি ওয়ার্কারদের মুখে আমি কতবার বিপ্লবের কথা শুনেছি। একটা টোটাল রেভলিউশান ছাড়া এদেশের সমাজ ব্যবস্থার কোনো বদল হতে পারে না। বিপ্লব শব্দটা শুনলেই আমার রোমাঞ্চ হতো। আমি স্বপ্ন দেখতুম, সারা দেশজুড়ে শুরু হয়ে গেছে লড়াই, আমিও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, আমার হাতে লাল পতাকা... কিন্তু কোথায় সেই বিপ্লবের প্রস্তুতি? আমাদের বাবা-কাকারা মুখেই বিপ্লবের কথা বলেন, কিন্তু আসলে পার্লমেন্টারি ডেমোক্রেসির নিশ্চিন্ত পথের দিকেই তাঁদের ঝোঁক। এই সব ব্যাপার নিয়ে আমি খুব রেগে আছি। তার মধ্যে হঠাৎ কারুর মুখে প্রেমের প্যানপ্যানানির কথা কি সহ্য করা যায়? তবে ন্যাকা মেয়েদের মতন আমি কৌশিকের কথা শুনে বিগলিতও হইনি, আবার ফোঁস করে উঠে তাকে কামড়ে দিতেও যাইনি। আমি ঠিক করেছিলুম, কৌশিককে আমি নিজের হাতে তৈরি করবো। কৌশিককে আমি প্রায় জোর করে নিয়ে এলুম আমাদের পার্টিতে।

—তার আগে কৌশিক রাজনীতি করতো না?

—একদম মাথাই ঘামাতো না। ওদের বাড়িতেও কোনো পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। বুর্জোয়া মিডল ক্লাশ বাড়ির টিপিক্যাল ভালো ছেলেদের মতন কৌশিকের বিলেত আমেরিকায় গিয়ে সো কলড উচ্চ শিক্ষা নেবার কথা ছিল। কিন্তু কৌশিক কতখানি বদলেছে তুই ভেবে দ্যাখ। তার মতন লাজুক ছেলের মধ্যেও যে এতখানি সংগঠন শক্তি থাকতে পারে তা ক'জন কল্পনা করতে পারে? আমাদের স্টাডি সার্কেলটা তো কৌশিকই মেইনলি অর্গানাইজ করেছে। কৌশিকই তো ডেকে এনেছে অতীনকে। অনুনয়, তপেশ্বর, বারীন, জয়শ্রী এদের মতন আরও অনেকে কৌশিকের রিক্রুট। চারু মজুমদারের সঙ্গে কলকাতার বিপ্লবী ছাত্রদের প্রথম দিকের লিংকও কৌশিক। বুঝলি অলি, আমি যদি কৌশিককে দলে না টানতুম, তা হলে তোর বাবলুদাও এসবের মধ্যে আসতো না, তাকে এরকম ফেরার হয়ে পালিয়ে বেড়াতে হতো না। তোকেও এরকম জলকাদার মধ্যে গ্রামে আসতে হতো না, একটা অসুস্থ মেয়ের নার্সগিরি করতে হতো না। তা হলে বুঝে দ্যাখ, তোর সব বিপদের মূলে আমিই।

—আরও বেশী মূলে যেতে গেলে তোর বাবাকেই কৃতিত্ব দিতে হয়। কারণ তিনি তোর মতন একটি বিপদের আগুনের জন্ম দিয়েছেন, তাই না?

—জন্ম দেবার কোনো কৃতিত্ব নেই। ওটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। রোজই তো লাখ লাখ জন্মাচ্ছে। আমি নিজেকে নিজে তৈরি করেছি। কৌশিকও কতটা নিজেকে তৈরি করেছে ভাব। যে একদিন আমাকে প্রেম নিবেদন করেছিল, সে এরপর কত জায়গায়, কত রকম পরিবেশে আমার পাশে শুয়ে থেকেছে, কিন্তু কোনোদিন আমার শরীরে একবারও হাত ছোঁয়ায়নি। এই না হলে পুরুষ? সেই কৌশিক পায়ে গুলি খেয়ে এক জায়গায় মরো মরো অবস্থায় পড়ে আছে, সে খবর জেনেও আমি তাকে দেখতে যাবো না? নিজে বাঁচবার চেষ্টা করবো? সবাই তোর অতীনদার মতন স্বার্থপর হয় না।

—বাবলুদা বিদেশে চলে না গিয়ে জেল খাটলেই বুঝি ভালো ছিল? মার্ডার চার্জে তার ফাঁসীও হতে পারতো।

—কেন, সেও কৌশিকের মতন জেল ভেঙে পালাবার চেষ্টা করতে পাতো না? কৌশিক পারে, সে পারবে না কেন?

—তুই বুঝি বাবলুদাকে ঘেন্না করিস, পমপম। একথা আগে কোনোদিন বলিস নি তো! মানিকদাকে বাঁচাবার জন্য বাবলুদা একজন মানুষকে মারতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর সেই মার্ডার চার্জে সে যখন ধরা পড়ে, তখন কেউ তাকে সাহায্য করতে আসেনি। আমি নিজে জানি, মানিকদাই খবর পাঠিয়েছিলেন তাকে দেশের বাইরে পালিয়ে যেতে।

অলিকে জড়িয়ে ধরে পমপম বললো, না রে, না রে, আমি অতীনকে মোটেই ঘেন্না করি না। এটা আমার রাগের কথা। অভিমানের কথা। কৌশিকের এই রকম অবস্থার কথা শুনে আমার যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কৌশিক যদি মরতে বসে থাকে, তা হলে এই সময় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অতীন তার পাশে নেই, এই কথাটাই মনে হচ্ছে বারবার। অতীন যখন খুনটা করে, সেই সময় আমাদের অ্যানিহিলেশনের প্রোগ্রাম শুরুই হয়নি, সেইজন্য ও একা পড়ে গিয়েছিল। জেলেও ওর সঙ্গে আর কেউ ছিল না। ও দেশের বাইরে চলে গিয়ে ঠিকই করেছে।

অলি তবু ক্ষোভের সঙ্গে বললো, বাবলুদাকে তোরা আর যা, কিছু মনে করতে পারিস, সে স্বার্থপর

নয়। আমি ঠিকই বুঝতে পারি, বিদেশে বসে থেকে সে খুবই কষ্ট পাচ্ছে, সেইজন্য চিঠিপত্র পর্যন্ত লেখে না।

পমপম নরম গলায় বললো, এইবার তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, অলি, তুই আমাদের পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছিলি। অতীনও তোকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দলে রাখতে পারেনি। তোর প্রসঙ্গ উঠলে অতীন এক এক সময় বলতো, ও বড়লোকের আদুরী মেয়ে, ওর দ্বারা কিছু হবে না! তবু তুই আমাদের মধ্যে ফিরে এলি কেন? বিশেষ করে এখন চতুর্দিকে বিপদ।—আমি তো ফিরে আসি নি। তোদের পার্টির কাজ করার ক্ষমতা আমার নেই। মারামারি, খুনোখুনি, ওরে বাবা, আমি রক্ত সহ্যই করতে পারি না।

—তুই যে আমার জন্য এতটা করলি—

—তোমার জন্য কিছুই করা হয় নি। পার্টির মেম্বার ছাড়া বুঝি বন্ধু থাকে না? বন্ধুত্ব অসুখ হলে বুঝি বন্ধু দেখতে আসে না?

—আমাকে তুই দেখতে এসেছিস, সেটাও না হয় বুঝলুম। আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি, আমার বাবা ইলেকশানে জিতেছেন, পুলিশ এখন আর চট করে আমাদের বিশেষ ঘাঁটাবে না। কিন্তু কৌশিক জেল ভেঙে পালিয়েছে পুলিশ তাকে খুঁজছে, দেখলেই পাগলা কুকুরের মতন গুলি করে মারবে। তবু তুই কৌশিকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস কোন্ সাহসে?

অলি সরলভাবে বললো, কেন, পুলিশ কি আমাকেও গুলি করে মারবে নাকি?

দাঁতে দাঁত চেপে পমপম বললো, এ দেশের পুলিশই হলো সবচেয়ে বড় অর্গানাইজড গুণ্ডা বাহিনী। মেয়েদের দিকে গুলি ছুঁড়তেও তাদের হাত একটুও কাঁপে না। পুলিশ যে কতখানি হিংস্র, অমানুষ হতে পারে, তা তো আমি জানি...

পমপমের পিঠে হাত দিয়ে অলি ব্যাকুল ভাবে বললো, পমপম, তোর সারা শরীরটা কাঁপছে কেন রে? তোর খুব কষ্ট হচ্ছে?

—না, আমি ঠিক আছি। অলি, পুলিশের গুলি যদি তোর গায়ের নাও লাগে, ঐ জায়গায় ধরা পড়লেও পুলিস তোকে সহজে ছাড়বে না। তা হলে ইউ এস গভর্নমেন্ট তোর ভিসা আটকে দেবে, ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্টও তোর পাসপোর্ট ইমপাউন্ড করবে। আর এক সপ্তাহের মধ্যে তোর বাইরে যাওয়ার কথা।

—তাতে আর কী, আমার বাইরে যাওয়া হবে না! যাবো না!

—প্লীজ পাগলামি করিসনি, অলি, এবার তোকে আমার কথা শুনতেই হবে। তুই সোজা কলকাতায় ফিরে যা। আমি তো যাচ্ছিই কৌশিকের কাছে। দু'জনে মিলে যাবার দরকার নেই। প্লীজ, অলি, আমার এই কথাটা শোন!

—কী অদ্ভুত কথা বলছিস, পমপম। তোর শরীরের এই অবস্থা, আমি তোকে একলা ছেড়ে দেবো? আমার বিদেশ যাওয়ার অত গরজ নেই।

—অলি, তুই বুঝতে পারছিস না। আমি কমিটেড। আমার যাই হোক না কেন, আমি শেষ না দেখে ছাড়বো না। কৌশিকের কাছে আমাকে যেতেই হবে। সে আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, বন্ধুর চেয়েও অনেক বেশি। কৌশিকের সঙ্গে তো তোর এতখানি ঘনিষ্ঠতা হয় নি কখনো! কৌশিক তোকে দেখলে খুশীও হবে না। তুই মাঝপথে পার্টি ছেড়ে দিয়েছিলি বলে তোর ওপর কৌশিকের রাগ আছে।

—তা রাগ করুক না। তবু আমি যাবোই।

—তুই অতীনের কথা ভাবছিস?

—অনেকটা তাই। ওরা দু'জনে প্রাণের বন্ধু, বাবলুদা যদি জেল থেকে পালাতে গিয়ে এরকমভাবে ইনজিওরড হতো, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যেতুম না? বহরমপুর জেলে আমি কৌশিকের সঙ্গে দেখা করে তোর খবর বাবলুদার খবর ওকে পৌঁছে দিয়েছি। তা ছাড়া ধর, সত্যি যদি আমার বিদেশে যাওয়া হয়, বাবলুদার সঙ্গে দেখা হলে সে প্রথমেই কৌশিকের খবর জিজ্ঞেস করবে। আমি কী বলবো, জানি না? কিংবা বলবো, জেল থেকে পালাতে গিয়ে তার গায়ে দু'তিনটে বুলেট লেগেছে, সেই অবস্থায় সে কোনো জঙ্গলের মধ্যে পালিয়েছে। সেই খবর জেনেও আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি? তুই বাবলুদার মেজাজ জানিস না? একথা শুনলে সে হয়তো আমাকে চড় মেরেই বসবে,

জীবনে আর আমার মুখ দেখতে চাইবে না।

–আমি তবু বলছি, অলি, রিসক বড্ড বেশি। তুই কলকাতায় ফিরে যা, আমি তোকে কৌশিকের সব খবর জানাবো।

ষ্টেশান এসে গেছে। রিক্সা থেকে নেমে অলি পয়সা মেটাতে লাগলো, আর পমপম প্রায় ছুটে চলে গেল প্ল্যাটফর্মের বাথরুমে। তার মাথাটা ঘুরছে, নিম্নাঙ্গে অসহ্য ব্যথা। হঠাৎ যেন সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। দেয়াল ধরে সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তাদের দলে আরও তো কয়েকটি মেয়ে ছিল, তাদের কেউ এলো না, অলিকেই আসতে হলো? পমপম একলা বোধহয় সত্যিই পৌঁছোতে পারবে না। কৌশিকের কাছ থেকে যে ছেলেদুটি এসেছিল, তারা অলির সঙ্গেই যোগাযোগের ব্যবস্থাটা ঠিক করে গেছে।

এই সময় বর্ধমানের দিকের ট্রেনে বেশ ভিড়। কলকাতার নিত্যযাত্রীরা ফিরছে। বসবার জায়গা পেল না ওরা, দাঁড়িয়ে যেতে হলো, অলি ধরে থাকলো পমপমের কাঁধ।

বর্ধমান ষ্টেশানে নেমে ওরা দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। অলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো, কেউ তাদের অনুসরণ করছে কিনা। অনুসরণকারীদের চোখ মুখ সে দেখতে লাগলো, সে তাদের অনেকটা চিনতে শিখেছে। নিজেদের ব্যাগ দুটো নামিয়ে রাখলো পায়ের কাছে।

ভিড় পাতলা হয়ে যাবার পর একজন কুলি এসে ওদের ব্যাগদুটো তুলে নিয়ে বললো, আসুন, রিক্সায় যাবেন তো?

অলি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে অনুসরণ করলো কুলিটিকে। বাইরে এসে একটি রিক্সায় বসে সে কুলিটিকে দুটি টাকা দিল। কুলিটি নমস্কার জানিয়ে চলে যাবার পর সে তাকালো পমপমের দিকে। তারা দু'জনেই তপনকে চিনতে পেরেছে।

সাইকেল রিক্সার চালকটিকে অবশ্য চিনতে পারলো না। অলি অন্যদের শুনিয়ে তাকে বললো, সুধা হোটেলে যাবো।

সুধা হোটেলটি শহরের মধ্যেই, কিন্তু সাইকেল রিক্সাটি শহর ছাড়িয়ে চললো জঙ্গল মহলের দিকে। পমপম অলির কাঁধে মাথা দিয়ে আছে। ওষুধ খাওয়ার কৃত্রিম তেজ ফুরিয়ে আসছে, সে এখন খুবই অবসন্ন বোধ করছে। রিক্সার ঝাঁকুনিতেই তার বেশী কষ্ট হয়, হাঁটলে এতটা হয় না। তবু কৌশিকের সামনে তাকে স্বাভাবিক ব্যবহার করতেই হবে।

প্রায় এক ঘণ্টা রিক্সাটা চলার পর রাস্তার পাশে একটা হোটেলের সামনে থামলো। এটা সুধা হোটেল নয়, পাঞ্জাবীদের ধাবা। রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে অলিরা তার ভেতরে ঢুকে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিল। এক গেলাস চা খাবার পর পমপম বললো, আমার আরও একটু চা চাই। গরম চায়ে তার উপকার হচ্ছে। আরও দু'গেলাস চা খেল ওরা।

তারপর অলি বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের এখানে বাথরুম আছে।

বেয়ারাটি বললো, হ্যাঁ, আছে, আসুন।

দোকানের পেছন দিকে বাইরে মাঠের মধ্যে চট দিয়ে ঘেরা বাথরুম। পমপম ঢুকে পড়লো সেখানেই। পাশেই জঙ্গল, একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অলি তাকিয়ে রইলো সেই অন্ধকারের দিকে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। তা হলে কি তারা তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে?

একটু পরে সেই জঙ্গলের মধ্যে খুব মৃদু ক্রিং ক্রিং সাইকেলের বেলের শব্দ হলো দু'বার। পমপম বাথরুম থেকে বেরোবার পর অলি তার হাত ধরে সেই বেলের আওয়াজের দিকে এগিয়ে গেল।

দু'খানা সাইকেল নিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। তাদের মধ্যে একজন তপন, সে পৌঁছে গেছে এরই মধ্যে।

তপন পমপমকে মৃদু ধমক দিয়ে বললো, তুমি এলে কেন? তোমার তো আসার দরকার ছিল না?

দলের কর্মীদের মধ্যে তপনের স্থান পমপমের অনেক নীচে, তার ধমক দেবার অধিকার নেই। পমপমই রাগের সঙ্গে হিসহিস করে বললো, অ্যামেচারিস প্ল্যান। যেকোনো মোমেন্টে পুলিশ ধরে ফেলতে পারতো। এবার কী করে যেতে হবে, বল।

তপন বললো, দুটো সাইকেল আছে, তোমাদের দু'জনকে ক্যারি করবো।

পমপম শিউরে উঠলো। আবার সাইকেল? তাকে পা ঝুলিয়ে বসে যেতে হবে। কিন্তু অন্য কোনো ব্যবস্থা এখন নিশ্চয়ই আর করা যাবে না। সে তপনের সাইকেলের মাঝখানের রডে উঠে বসলো।

আলো নেই, ঠিক মতন রাস্তা নেই, সাইকেলটা অনবরত লাফাচ্ছে। যাতে যন্ত্রণার শব্দ না বেরিয়ে যায়, সেইজন্য নিজের ঠোঁট কামড়ে আছে পমপম। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ পারবে না। কথা বলতে হবে, কথা বলে ভুলে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

সে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে তপন, ও কি মানিদার খবর জানে?

তপন বললো, চুপ।

পমপম তবু বললো, এই, তোকে যা জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দে।

–এখন কথা বলা চলবে না।

–হ্যাঁ, চলবে। না হলে আমাকে নামিয়ে দে। আমি হেঁটে যাবো।

–সাত-আট মাইল রাস্তা, তুমি কতক্ষণ ধরে হাঁটবে, না, কৌশিক মানিকদার কথা এখনো কিছু জানে না।

–কৌশিকের কোন পায়ে গুলি লেগেছে?

–ওসব কথা এখন বলা চলবে না।

–ইডিয়েট, একটু বাদে গিয়েই তো আমি কৌশিককে দেখতে পাবো। যা বলছি, সত্যি করে উত্তর দে। কৌশিক বেঁচে আছে?

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেঁচে আছে।

–শুধু পায়ে গুলি লেগেছে, না আরও কোথাও?

–পায়ে আসলে গুলি লাগেই নি। ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় পা ভেঙেছে। গুলি লেগেছে একটা পেটে আর একটা বাঁ কাঁধে। এর মধ্যে পেটের গুলিটা এখনও বার করা যায়নি।

–জেলের মধ্যে ক'জন মারা গেছে? কাগজে বেরিয়েছে ষোলোজন।

–মিথ্যে কথা লিখেছে। অন্তত পঁয়তিরিশজনকে ওরা গুলি করে মেরেছে। সবাইকে মেরে ফেলতো। আমাদের সেদিন জেল ভাঙার কোনো প্ল্যান ছিল না। ওরা দু'একটা গেট খুলে দিল, ফলস অ্যালার্ম বাজিয়ে গুলি করতে শুরু করলো, জেলের গার্ড সেন্ট্রি ছাড়াও বাইরে থেকে সি আর পি এনেছিল। শুয়ারের বাচ্চা গভর্ণমেন্ট সব নকশালদের শেষ করতে চেয়েছিল একদিনে। কিন্তু আমরা কিছু আর্মস জোগাড় করে রেখেছিলাম। তাই দিয়ে রেজিস্ট করেছি বলেই এই ক'জন পালাতে পেরেছি।

–আমাদের চেনার মধ্যে কে কে গেছে?

–মুর্শিদাবাদ আর নদীয়া গ্রুপের ছেলেরাই মরেছে বেশী। আর কথা নয়, পমপম, সামনে একটা গ্রাম আছে।

দেড়ঘণ্টা সাইকেল চালাবার পর তপন আর তার সঙ্গী থামলো একা ঝুপড়ির সামনে। বাইরে পাহারা দিচ্ছে সাত আটজন। ঝুপড়ির ভেতরে শুধু একটা মোমের আলো।

সাইকেল থেকে নেমেই হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল পমপম। সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি ঠিক আছি।

পমপমের শাড়ী ভেজা, তার গা দিয়ে হিসির গন্ধ বেরুচ্ছে, এতটা পথ সে সামলাতে পারেনি। তবু এখানে সে নেত্রীর ভূমিকা নিয়ে আদেশের সুরে বললো, কৌশিকের সঙ্গে প্রথম শুধু আমি আর অলি কথা বলবো। তখন আর কেউ সেখানে থাকবে না।

ভেতরে একটা খড়ের গাদায় হেলান দিয়ে বসে আছে কৌশিক। একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা পা সামনে ছড়ানো। তার পেটে ব্যান্ডেজ, বুক জুড়ে ব্যান্ডেজ। ব্যান্ডেজ মানে কী, ধুতি শার্ট ছিঁড়ে বাঁধা। খালি গা। মাথায় বড় বড় চুল, গালে, সাত আট দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মোমের আলোয় তার মুখখানি দেখেই চমকে উঠলো দুই তরুণী। সেই মুখে পরিষ্কার মৃত্যুর ছায়া। যে কখনো মৃত্যু দেখেনি, সেও এই ছায়া চিনতে পারে।

সেই ঝুপড়ির মধ্যে শুয়ে আছে আরও চার পাঁচজন, সম্ভবত তারাও আহত কিংবা ঘুমন্ত। একমাত্র জেগে আছে কৌশিক। সে মুখ তুলে প্রথমে চমকে উঠলো, তারপর বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল।

সে কর্কশ ভাবে বললো, আরে এখানের মেয়েদের কে আসতে বললো? এই তপন, এই বিদ্যুৎ,

কে তোদের অর্ডার দিয়েছে?

দরজার কাছে তপন দাঁড়িয়ে, সে কোনো সাড়া দিল না।

পমপম হাঁটু গেড়ে বসলো কৌশিকের পাশে। তারপর মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বললো, আমি যখন এসে পড়েছি, এবার থেকে আমিই অর্ডার দেবো।

পমপম কৌশিকের মাথায় হাত রাখতে যেতেই কৌশিক ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললো, এসব কী ন্যাকামি হচ্ছে, পমপম? যে কোনো সময় এনকাউন্টার হতে পারে। এখানে তোরা এসে আরও বিপদ বাড়িয়ে দিলি? জানিস, সুবীরকে আমি চোখের সামনে মরতে দেখেছি। সুবীর আমার পাশে পাশে দৌড়োচ্ছিল

দরজার আড়াল থেকে তপন বললো, না, না, সুবীর বেঁচে আছে। সুবীর এখানেই আছে।

কৌশিক পাগলাটে গলায় বললো, আর ইউ সিয়োর? কোথায় সুবীর, তাকে আমি দেখতে চাই! আমার দু'পাশ থেকে আমার নিজের হাত-পা খসে যাবার মতন কে কে চলে গেল, আমার জানা দরকার।

পমপম জিজ্ঞেস করলো। তোকে কোনো ডাক্তার দেখেছে, কৌশিক?

কৌশিক বললো, বিদ্যুৎ দেখেছে, বিদ্যুৎ ডাক্তারির থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছে। আই অ্যাম ফাইন।

তারপরই হঠাৎ সে গলা চড়িয়ে বললো, কে এই মেয়েদুটো এখানে এনেছে। এক্ষুনি এদের ডাবল মার্চ করিয়ে জঙ্গলের বাইরে দিয়ে আয়।

পমপম ধমক দিয়ে বললো, আস্তে। আস্তে। কমরেড কৌশিক রায়, আমি মানিকদার কাছ থেকে একটা জরুরি অর্ডার নিয়ে এসেছি।

কৌশিক দারুণ অবাক হয়ে বললো, মানিকদা? কোথায় আছেন মানিকদা? এরা কেউ মানিকদার সঙ্গে কনটাক্ট করতে পারছে না। আমি সবাইকে বলছি।

–মানিকদা যেখানেই থাকন, তিনি আমার থ্রু দিয়ে অর্ডার পাঠিয়েছেন।

–মানিকদার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে? কবে?

–অফ কোর্স দেখা হয়েছে। মানিকদা বলে পাঠিয়েছেন, তোদের এই জঙ্গল মহল থেকে ডিসপার্স করতে হবে। এখানে বসে থেকে পুলিশ আর্মির সঙ্গে কনফ্রনটেশানে যাওয়াটা মূর্খামি হবে।

–এখানকার ট্রাইবালরা আমাদের সাপোর্ট করছে। পুলিশ সহজে ঢুকতে পারবে না। আমি এখানকার কমান্ডার, শুধু উঠে দাঁড়াতে পারছি না।

–কমরেড কৌশিক রায়, তোমার সম্পর্কে স্পেশাল ইনস্ট্রাকশান আছে। আজ রাত্তিরেই তোমাকে এখান থেকে রিমুভ করতে হবে। প্রথমে যাবে ঘাটশিলায়। সেখানে আমাদের নিজস্ব একটা হসপিটাল সেট আপ করা হয়েছে। সেখান থেকে একটু সুস্থ হলেই তুমি প্রসিড করবে বাঙ্গালোরে। সেখানে আমার মাসির বাড়িতে থাকবে তুমি।

–কেন, হঠাৎ বাঙালোরে কেন? তোর মাসির বাড়িতে দুধ ভাত খেতে যাবো? যা ভাগ, বাজে বক বক করিস নি, পমপম। এখানে আমরা ব্যস্ত আছি। কুত্তার বাচ্চাদের যে কটাকে পারি খতম করবো।

–তোমাকে বাঙ্গালোরে যেতে হবে, কারণ অন্ধ্র ইউনিট তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে যেখানে। কমরেড নাগি রেড্ডি আসবেন। ফারদার ইনস্ট্রাকশান না পাওয়া পর্যন্ত তুমি বাঙ্গালোরে অপেক্ষা করবে। এটাই মানিকদার নির্দেশ। আমি তোমায় বাঙ্গালোরে নিয়ে যাবো।

–এটা মানিকদার নির্দেশ? রিটেন কিছু আছে? কই, দেখি

–মানিকদা কমরেড চারু মজুমদারের সঙ্গে ঘুরছেন। এখন রিটেন কিছু দেবার তার সময় আছে?

–আমি তোকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

পমপম মুখ তুলে একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করলো অলির দিকে। তারপর আবার কৌশিকের দিকে ফিরে বললো, সেইজন্য আমি অলিকে সঙ্গে এনেছি। মানিকদা যখন দেখা করতে আসেন তখন অলি আমার পাশে ছিল। একথা সবাই জানে যে অলি কক্ষনো মিথ্যে কথা বলে না। মিথ্যা কথা বলার ক্ষমতাই ওর নেই। অলি তুই বলতো মানিকদা কী কী নির্দেশ দিয়েছেন?

অলি একটুও গলা না কাঁপিয়ে বলল, মানিকদা বলেছেন, আমি নিজের কানে শুনেছি, কৌশিককে এক্ষুনি ঘাটশিলায় যেতে হবে। হয়তো সেখানেই মানিকদার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে। ঘাটশিলা থেকে কৌশিককে যেতে হবে বাঙ্গালোরে।

॥ ২৮ ॥

অনেক চেষ্টা করেও অতীন জ্বর কিংবা কোনো শক্ত অসুখ বাধাতে পারেনি, কিন্তু, গেঞ্জি গায়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে তার এমন ঠাণ্ডা লেগেছে যে বুকে সর্দি বসে গেছে। সে ঘঙ ঘঙ করে কাশে, একবার কাশি শুরু হলে আর থামতে চায় না। এদিককার ঠাণ্ডা একবার লেগে গেলে আর ছাড়তে চায় না সহজে। সাধে কি আর এদেশের লোক এত জামা কাপড় পড়ে থাকে! একমাত্র রোদ পোহাবার সময় এরা পোশাকের জবরজং থেকে মুক্ত হয়।

শীতকালে ঠাণ্ডা লাগেনি অতীনের, লেগে গেল বসন্তকালে। সকালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করে না, দুর্বল লাগে শরীরটা। কেউ কি এক কাপ চা নিয়ে এসে তার ঘুম ভাঙাবে? সে বিছানা না ছাড়লে কেউ তাকে ডাকবেও না। কেউ ফোনও করবে না। শর্মিলা ছাড়া আর তো কেউ চেনা নেই এখানে। সে যদি এই বিছানায় শুয়ে হঠাৎ হার্ট ফেইলিয়রে মারা যায়, তা হলে যতক্ষণ না এ ঘর থেকে পচা গন্ধ বেরুচ্ছে...

অতীন উঠে স্টোভ জ্বালিয়ে কেটলি বসালো। চা বানাবার অনেক ঝামেলা, টি-ব্যাগে ঠিক মতন স্বাদ হয় না, তাইসে কফি খায়। তার ঘরে ফ্রিজ নেই, তাই দুধও থাকে না। নিচের রান্নাঘর পর্যন্ত কে যাবে, দুধ ছাড়া কালো কফিই চালিয়ে দেয় অতীন।

আমেরিকানদের মতন পর পর তিন চার কাপ কফি না খেলে তার শরীরটা ধাতস্থ হয় না। তারপর দিনের প্রথম সিগারেট। সেটা ধরানোমাত্র কাশির দমক শুরু হয়ে যাবে, তবু না ধরিয়েও তো উপায় নেই। বাথরুম যাওয়ার আগে সিগারেট ধরানো অভ্যেস হয়ে গেছে।

বুকে হাত দিয়ে কাশতে লাগলো অতীন। আগের দিন এত কাশি হয়েছিল যে পিঠটা ব্যথা হয়ে আছে। কোনো রকম ওষুধ খাচ্ছে না অতীন। সর্দি কাশির আবার ওষুধ কী? দেশে থাকতে, ছোটবেলায় কখনো বুকে ঠাণ্ডা বসে গেলে মা নানারকম জিনিস মিশিয়ে সেদ্ধ করে একটা পাঁচন বানাতো, সেটা গরম গরম খেতে হতো। স্বাদটা বেশ ভালোই লাগতো। তালমিছরি আদা গোলমরিচ ছাড়া আর কী কী থাকতো কে জানে! অতীন সুপার মার্কেট থেকে খানিকটা টাটকা আদা কিনে এনেছে, তারই একটা টুকরো মুখে দিল।

মায়ের একটা চিঠি এসেছে গতকাল। এ পর্যন্ত অন্তত সাতবার পড়া হয়েছে চিঠিটা, অতীন আর একবার চোখ বুলোলো। চিঠিটাতে যে বিশেষ কোন খবর আছে তা নয়, মায়ের চিঠিতে কোন অভিযোগ, আফসোসও থাকে না। এমনি, অতীন বুঝতে পারে, মা ইচ্ছে করে কলকাতার কোনো খারাপ খবরও লেখে না। প্রত্যেক চিঠির শেষে মা লেখে, আমরা সবাই বেশ ভালো আছি। তুমি ভালো থেকো, শরীরের যত্ন নিও।

অতীন উত্তর না দিলেও মায়ের চিঠি আসে প্রত্যেক সপ্তাহে। অতীন প্রায় পনেরো-কুড়ি দিন বাড়িতে চিঠি লিখতে পারেনি। মা অতীনের এই বস্টনের নতুন বাড়ির একটা ছবি পাঠাতে অনুরোধ করেছে। একটা সস্তায় ক্যামেরা কিনে কিছু ছবি তুলতে হবে।

সাড়ে আটটার মধ্যে পৌঁছোতে হবে ইস্কুলে। এখানে প্রায় সবাই ইউনিভার্সিটিকে স্কুল বলে। সিদ্ধার্থ ঠাট্টা করে বলে, তোর তো আর বয়েস বাড়লো না, ইস্কুলের পড়াশোনা মন দিয়ে করিস! শরীর খারাপ লাগলেও অতীনের না গিয়ে উপায় নেই, সকালের দিকটায় তাকে ল্যাব-এসিস্ট্যান্টের কাজ করতে হয়, কামাই করা চলে না। আধ ঘন্টা দেরি করে গেলেও মাইনে কাটে। অতীনের কাছে এখন প্রতিটি ডলার মহামূল্যবান।

হাতঘড়িটা পরে নিয়ে অতীন বাথরুমে গেল। খবরের কাগজ আনতে গেলে নিচে যেতে হবে, আর নিচে যেতে হলে গায়ে ড্রেসিং গাউন জড়াতে হবে কিংবা পুরো শার্টপ্যান্ট পরে নিতে হবে। অতীনের ড্রেসিং গাউন নেই, স্লিপিং সুট নেই, সে এখনো দেশ থেকে আনা পাজামা গেঞ্জি পরে শোয়। এই পোশাকে নিচে নামা বাড়িওয়ালা পছন্দ করেন না।খবরের কাগজের বদলে অতীন একটা ডিটেকটিভ বই নিয়ে গেল টয়লেটে, কিন্তু তাতেও একবিন্দু মন বসলো না।

ঠিক আটটা দশে দাড়ি কামিয়ে, জুতো মোজা পরে অতীন নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। একতলায়

সোমেনের ঘরে গীটারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মৃদু গলায় গান গাইছে সোমেন। একটুখানি দাঁড়িয়ে গানটা শুনলো অতীন, তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। এই গানের কথা যেন তাকে উদ্দেশ্য করেই:মন তুই পড়গা ইস্কুলে, নইলে কষ্ট পাবি শেষ কালে, পড়গা ইস্কুলে.....। সোমেন এইসব ফোক সঙই ভালো গায়, একদিন ওর ঘরে বসে ভালো করে গান শুনতে হবে।

সাইকেলটা বারান্দা থেকে নামালো অতীন। ঠিক পনের মিনিট লাগলো তার পৌঁছোতে। বাইরের হাওয়ায় প্রথম ঝাপটাতেই তার কাশি শুরু হলো। কাশতে কাশতে যেন গলা ছেড়ে যায়, কিন্তু রক্ত পড়েনি এখনও।

শর্মিলা বস্টনে ফিরে এসেছে, অতীন জানে। তবু শর্মিলা একবারও যোগাযোগ করেনি অতীনের সঙ্গে। শর্মিলার মতন মেয়েও যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে, তা আগে কল্পনাই করা যায়নি। অতীনকে সে সরাসরি অবজ্ঞা করছে, যেন অতীন একটা মানুষই না, তার সঙ্গে একটা কথাও বলা যায় না। শর্মিলার কাছাকাছি থাকতে পারবে বলেই অতীন এখানকার এই কাজটা নিয়েছে, এর থেকেও আর একটা ভালো অফার সে পেয়েছিল ফিলাডেলফিয়ায়। এখন শর্মিলা তার মুখও দেখতে চায় না।

ঠাণ্ডামাথায় অতীন অনেক ভেবে দেখেছে, শর্মিলার হঠাৎ এইরকম ভাবে বদলে যাবার কারণ কী হতে পারে? একটাই কারণ থাকা সম্ভব, শর্মিলা হঠাৎ উপলব্ধি করেছে যে অতীন একজন খুনি, তার সঙ্গে মেলামেশা করা বিপজ্জনক। সেই ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে অতীন একটা কুড়োনো খবরের কাগজ পড়ছিল, তাতে অনেক খুন জখমের কথা ছিল, একটা সদস্য খুন হওয়া মেয়ের ছবিও ছিল, সেই কাগজটা দেখেই শর্মিলার ভাবান্তর হলো। তখনই কি শর্মিলা ভাবলো যে অতীনও তার গলা টিপে মেরে ব্রীজ থেকে জলে ফেলে দিতে পারে? একবার যে খুন করে, সে খুনীই থেকে যায়?

অতীন ঐ ব্যাপারটা শর্মিলার কাছে একটুও লুকোয়নি। উত্তর বাংলার একটা ফাঁকা মাঠে মেঘলা বিকেলে একজন সমাজবিরোধীর দিকে কেন রিভলবার চালিয়েছিল, তা অতীন অনেকবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলেছে। সেই লোকটা আগে বোমা চার্জ করেছিল, তারপর লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারতে এসেছিল, সে ছিল প্রকৃত খুন, মানিকদাকে খতম করে দেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য, অতীনকেও ছাড়তো না, সেই লোকটার হাতে অসহায়ভাবে প্রাণ দেওয়াই ছিল গৌরবের? শর্মিলা প্রত্যেকবার শুনে বলতো, বেশ করেছো, তুমি ঠিকই করেছো, একটা পাগলা কুকুর কামড়াতে এলে তাকে মেরে ফেলা মোটেই দোষের নয়...কোর্টে মামলাটা সাজানো হয়েছিল অন্যভাবে, ষড়যন্ত্রের রঙ দেওয়া হয়েছিল গাঢ়ভাবে, একজন কলেজের অধ্যাপক হয়েও অতীন ঐ নির্জন মাঠে রিভলভার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল কেন, সেই প্রশ্নই তোলা হয়েছিল বারবার। কিন্তু শর্মিলা অতীনকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস তার ভেংগে গেল একটা রগরগে খবরের কাগজের ছবি দেখে! অতীনকে সে এখন ভয় পায়। মেয়েরা এমন বদলে যায়! অতীনের সঙ্গে এতদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সে অস্বীকার করলো একেবারে?

যাক, চুলোয় যাক, শর্মিলাকে সে মন থেকে মুছে ফেলবে একেবারে। একটু সময় লাগবে, এখনো নামটা মনে পড়লেই বুকটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে, তার নিজের বিছানায় সে শর্মিলার গন্ধ পায়...আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। অলির কাছে সে অন্যায় করেছে, সেইজন্য তার এই শাস্তি। অলি কোনোদিন তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করতে পারতো না। সাড়ে আটটা বাজার দু'মিনেট আগে অতীন পৌঁছে গেল ল্যাবে। ছাত্রছাত্রীরা এখনো কেউ আসেনি, অতীন ঝট করে একটা ওভারঅল পরে তৈরি হয়ে নিল। কাজে ডুবে গেলে ওসব কথা আর মনে পড়ে না। অতীনের এখন দু'টো উদ্দেশ্য। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পি-এইচ-ডি শেষ করতে হবে, আর দেশে ফেরার জন্য ভাড়ার টাকা জমাতে হবে। টাকাটা যদি আগেই জমে যায়, তা হলে সে পি-এইচ-ডি শেষ না করেই পালাবে এই দেশ থেকে।

দেশে যাদের ডেমনস্ট্রেটর বলে, এখানে তাদেরই নাম ল্যাব-টিচার। ফাঁকি মারার উপায় নেই, ছাত্রছাত্রীরা খাটিয়ে খাটিয়ে মারে। এখানে ছাত্রছাত্রীরাও যে ফাঁকি দেয় না তার কারণ আছে। অধিকাংশ ছেলেমেয়েই বাবার টাকা নেয় না, নিজেরা উপার্জন করে পড়াশুনার খরচ চালায়। হোটেল রেস্তোরাঁয় ডিশ ধোয়ার কাজ করে, সুপার মার্কেটে সেলসম্যান বা সেলস গার্ল হয়। অনেকে ছ'মাস চাকরি করে টাকা জমিয়ে বাকি ছ'মাস ইউনিভার্সিটিতে একটা কোর্স পড়ে নেয়। এখানে পড়াশুনার খরচও যথেষ্ট। একটা সেমেস্টার ফেল করলে আবার দ্বিগুন টাকা খরচ করতে হবে এই ভয়ে এরা

দিনরাত খেটে পাশ করার চেষ্টা করে।

তিনটি ভারতীয় ছাত্রও আছে এখানে। তাদের পড়াশুনোর প্রতি নিষ্ঠা দেখলে দেশের মা-বাবারা হাঁ হয়ে যাবে। এরা তিনজনই পার্ট টাইম চাকরি করে পড়ছে, দৈত্যের মতন খাটে। নিজেদের উপার্জন করা পয়সায় পড়তে হচ্ছে বলেই এদের পাশ করার এত গরজ। অথচ দেশে থাকতে এইসব ছেলেরা বাপ-মায়ের আদরের দুলাল, হোটেলে বাসন মাজার চাকরির কথা কল্পনাও করতে পারে না। এদের মধ্যে একটি ছাত্রের নাম, ভূপিন্দর সিং, সে এক ধনী পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীর ছেলে, কিন্তু অতীন তাকে দেখেছে ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে মাথায় টুপি পরে রান্না ঘরে আলু ভাজার কাজ করতে। সর্দি-কাশির জন্য অতীন একটু আড়ষ্ট হয়ে আছে। কাশি উঠলে চেপে রাখা যায় না, আবার ল্যাবের ভেতরটায় কনকনে ঠাণ্ডা বলে নাক দিয়ে পাতলা সর্দিও গড়াচ্ছে। রুমালে কুলোচ্ছে না। শ্রাদ্ধ হচ্ছে টিসু পেপারের। কাশির শব্দ শুনে পাশের ডেস্কের জুডি বড় বড় চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে।

অ্যামেরিকানদের দারুন স্বাস্থ্যবাতিক। কারু সর্দি হলে অন্য কেউ তার হাতটা পর্যন্ত ছোঁয় না। নিঃশ্বাসের দূরত্বে থেকেও দূরে থাকে। জুডি অন্যদিন তার টেবিল থেকে এটা সেটা জিনিসপত্র নেয়, মাঝে মাঝে হেসে গল্প করে। আজ অতীন প্রথম দর্শনে হাই জুডি, হাউ হ্যাভ ইউ বীন, এইটুকু শুধু বলেই পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। এ দেশে যখন তখন ছুটি নেবার প্রশ্নই ওঠে না, সর্দি হয়েছে বলে অতীন তো আর তার মাইনে খোয়াতে পারবে না!

জুডি মেয়েটি বেশ লম্বা, পাঁচ ফুট আট ন'ইঞ্চি তো হবেই, অতীনের প্রায় মাথায় মাথায় সমান। সুতরাং মেয়েদের তুলনায় সে যথেষ্টই লম্বা, কিন্তু ধড়েঙ্গা নয়। স্বাস্থ্যটিও ভাল। তাকে অনায়াসেই দৈত্য-বংশের কন্যা বলা যায়। মাথার চুল ভালো করে আঁচড়ায় না জুডি, সাজ-পোশাকের কোনো যত্ন নেই।

এখানে স্টিভ নামে আর একজন ল্যাবটিচার আছে, তার সঙ্গে অতীনের মোটামুটি ভাব আছে। পড়াশুনোয় খুব তীক্ষ্ণ, কিন্তু স্টিভ মাঝে মাঝে বেশ খারাপ কথা বলতে ভালবাসে। স্টিভ একদিন বলেছিল, বেচারা জুডির কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই কেন জানো? ওর সঙ্গে কেউ ডেটিং করে না, তার কারণ, অত লম্বা মেয়ের পাশাপাশি হাঁটতে কোনো ছেলে পছন্দ করে না। ছেলেরা চায় মেয়েদের মুখটা তাদের বুকের কাছাকাছি থাকবে, চুমু খাওয়ার সময় মেয়েরা মুখটা ওপরের দিকে তুলবে, ছেলেরা মুখটা নামিয়ে আনবে, দ্যাট ইজ দা আইডিয়াল পজিশান, মেয়েদের লোয়ার পোরশান কিন্তু ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী লম্বা হয়, সেটা দেখেছো তো! সেইজন্য আলিঙ্গনের সময় বেঁটে মেয়েদের অ্যাবডোমেনও ছেলেদের সঙ্গে ঠেকে থাকে.....।

স্টিভ বেচারী অবশ্য বেশ বেঁটে, জুডির তুলনায় অনেকখানি ছোট লাগে। জুডির কাছে প্রেম জানিয়ে সে কখনো ব্যর্থ হয়েছে কি না কে জানে! শুধু লম্বা বলেই জুডির ওপর তার বেশ রাগ। অবশ্য স্টিভের বান্ধবীর সংখ্যা একাধিক। স্টিভ অতীনের তুলনায় এক বছরের বেশী অভিজ্ঞ। কাজের ব্যাপারে অতীনকে মাঝে মাঝে স্টিভের সাহায্য নিতে হয়। স্টিভ ভারতীয় পুরাণ ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী। ওপেন হাইমারের সূত্র ধরে এ দেশের বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে ভগবদ্গীতা বইটির নাম মোটামুটি পরিচিত। স্টিভ কখনো গীতা বিষয়ে প্রশ্ন করলে অতীন হকচকিয়ে যায়। সে গীতা টিতা পড়েনি কক্ষনো,তাদের বাড়িতেও এসবের চর্চা ছিল না।।

লাঞ্চ আওয়ারে অতীন কোনরকমে গোটা দুয়েক স্যান্ডউইচ খেয়ে নিয়ে লাইব্রেরিতে খবরের কাজ পড়তে যায়। যে সব দোকানে আগে সে শর্মিলার সঙ্গে কখনো কখনো খেতে গেছে, সে-সব দোকানের ধারেকাছেও সে ঘেঁষে না। শর্মিলার মুখোমুখি পড়তে চায় না সে। লাইব্রেরিতে লুকিয়ে বসে থাকে। ভারতীয় সংবাদপত্রও যে এখানে পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে তার আগে কোনো ধারণাই ছিল না। সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে এমনকি বাংলা কাগজও পাওয়া যায়, একদিন সে আনন্দবাজার দেখেছে। কত দেশের কাগজই যে এরা রাখে!

নিজেদের লাইব্রেরিতে বসে সে স্টেটসম্যানের ওভারসীজ এডিশান পড়ে। এতদিন অতীন যেন ইচ্ছে করেই দেশের খবর রাখতে চায়নি। সে নির্বাসিত, সেই অভিমানে সে মহাসমুদ্রের ওপারের দেশের দিকে ফিরে তাকাতে চায়নি আর। দমদম জেলে পনেরোজন নকশাল খুনের খবরটা শোনার পর থেকে সে আর স্থির থাকতে পারছে না। মানিকদা কিংবা কৌশিক তাকেও পর্যন্ত একটা চিঠি

লেখেনি। অলির চিঠিও, আসেনি বেশ কিছুদিন। দেশ ছাড়ার সময় কৌশিক তাকে বলেছিল, তুই আমাদের চিঠি লিখিস না, আমরা কখন কোথায় থাকবো তুই জানতে পারবি না, কিন্তু আমরা লিখবো। অলির কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে আমরা তোকে নিয়মিত সব খবর দেবো। কথা রাখেনি কৌশিক।

দেশের খবরের কাগজে পাকিস্তান-বাংলাদেশের খবরই এখন বেশী থাকছে। পশ্চিমবাংলায়, অন্ধ্রে, পাঞ্জাবে বিপ্লবের প্রস্তুতিও চাপা থাকছে না। পশ্চিমবাংলায় রিভলভার, বন্দুক কাড়া চলছে নিয়মিত। জোড়াতালি দেওয়া সরকার ভেঙে এখন সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন। বীরভূমের সব থানার ও সি বদলি করা হয়েছে। অতীনের বরাবরই ধারনা ছিল বীরভুম আর মেদিনীপুরে তাদের শক্ত ঘাঁটি হবে। কানু সান্যাল, অসীম, সন্তোষদের নামের উল্লেখ থাকে মাঝে মাঝে। মানিকদা-কৌশিকদের কোনো খবর পাওয়া যায় কি না, অতীন তা তন্ন তন্ন করে খোঁজে।

গতকাল এদেশের সংবাদ পত্রে একটা বড় খবর বেরিয়েছে। অধিকাংশ কাগজেই হেড লাইন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিকসনকে আমন্ত্রন জানিয়েছে চীন। হেনরি কিসিংগার গোপনে গিয়েছিল পাকিস্তানে। পাকিস্তানের মাধ্যমেই চীনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। এই জন্যই পাকিস্থান সরকারের প্রতি কিসিংগার-নিকসনের এত দরদ!

খবরটার মর্ম ঠিক বুঝতে পারেনি অতীন। চীন এতকাল বলে এসেছে যে শোষিত দুনিয়ার এক নম্বরে শত্রু হলো আমেরিকান সরকার। সেই আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করলো চীন? মাও সে তুং এই লোকটার সঙ্গে হেসে কথা বলবেন? শুধু তাই নয়, চৌ এন লাই বিবৃতি দিয়েছেন যে শান্তিপূর্ণ পথেই বিশ্বের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে।

শান্তিপূর্ণ পথ! চৌ এন লাই হটাৎ গান্ধীবাদী হয়ে গেলেন নাকি?

সন্ধেবেলা নিজে ল্যাবে কাজ করার বদলে অতীন বাড়ি ফিরবে ঠিক করল। হটাৎ শনশনে হাওয়া দিতে শুরু করেছে। সমুদ্রের ধারের শহরের এই একটা মুশকিল, আবহাওয়ার স্বভাব চরিত্র ঠিক থাকে না। আকাশের অবস্থা ভালো নয়। রাত্তিরে বৃষ্টি হতে পারে। চমৎকার রোদ চলছে ক'দিন, এখন বৃষ্টি হলে আবার মন খারাপ লাগবে।

বাড়ি ফিরে আবার রাত্তিরের খাওয়ার জন্য বেরুবার কোনো মানে হয় না। একটা দোকান থেকে অতীন কিছু ব্রাউন ব্রেড, মাখন আর স্যালামি কিনে নিল। এতেই চলে যাবে। অন্তত দিন সাতেক অতীন বীয়ার কিংবা মদ কেনেনি, পয়সা বাঁচাতে হচ্ছে। প্রতিটি ডাইম গুনে গুনে খরচ করবে। ড্রাইভিং লেসন নেওয়াও আপাতত বন্ধ, গাড়ি-ফাড়ি কেনার কোনো দরকার নেই, সাইকেলেই বেশ চলে যাচ্ছে। গাড়ি কেনার কথা সে ভেবেছিল শর্মিলার জন্য। শর্মিলা বেড়াতে ভালোবাসে।

হটাৎ মায়ের কথা মনে পড়লো অতীনের। টানা আট দিন সে এবারও ভাত খায়নি। মা জানতে পারলে আতকে উঠতো। দেশে থাকতে অতীন অসুখ-বিসুখ হলেও রুটি খেতে চাইতো না। অতীন বেশী রাত করে ফিরলেও মা ভাত গরম করে দিত। অতীন নিজে এখন ভালোই রান্না করতে পারে। শিলিগুড়িতে মানিকদাদের সঙ্গে থাকবার সময় রান্না শিখেছিল, নিউ ইয়র্কে সিদ্ধার্থর কাছে থাকবার সময় তো রান্নার পুরো দায়িত্বই ছিল তার ওপর। এখানেও সে শর্মিলাকে স্যামন মাছের ঝোল রেঁধে খাইয়েছে। এখানে পাওয়া যায় তো সব কিছুই। অনেকরকম মাছ, নানা ধরনের তরকারী, বেগুন আর ফুলকপিগুলো বিরাট বিরাট, আর মুসুরির ডালের চমৎকার স্বাদ। মুসুরির ইংরিজি যে লেনটিল সেটা অতীন জানতো না আগে, ইটালিয়ানরা খুব লেনটিল সুপ খায়, সেটা তো প্রায় সম্বার না দেওয়া মুসুরির ডাল সেদ্ধ! আর একটা ইংরিজি ভুল শেখানো হয় দেশের ছেলেমেয়েদের, অতীনও শিখেছিল বেগুনের ইংরিজি ব্রিঞ্জাল! অথচ এ দশে বেগুনকে বলে এগপ্ল্যান্ট, ব্রিঞ্জাল বললে কেউ বোঝেই না। দইকেও কেউ কার্ড বলে না। বলে ইওগার্ট। এ দেশের দইয়ের স্বাদ বড় ভালো।

শুধু নিজের জন্য কি আর রান্না করতে ইচ্ছে করে! স্টিভ বলেছিল, ওকে একদিন ভারতীয় খাবার খাওয়াতে। কোনো একটা ছুটির দিন দেখে স্টিভকে নেমন্তন্ন করে অতীন ভাত রাঁধবে। কিংবা স্টিভকে খিচুড়িও খাওয়ানো যায়।

একটা মাফলার কিংবা স্কার্ফ গলায় জড়িয়ে নিতে পারলে ভালো হতো। সাইকেলটা একটু জোরে চালাতে গেলেই বেশী শীত করছে আর কাশি হচ্ছে। সাইকেল থেকে নেমে হাঁটতে লাগলো অতীন, তার এমন কিছু তাড়া নেই।

একটু পরেই সে দেখতে পেল, উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে জুডি, তার দু'হাতে দুটি বেশ পেল্লায় শপিং ব্যাগ, তাছাড়া বেশ কয়েকখানা বই ও পত্রিকা, রীতিমতন ব্যালান্স করে হাঁটতে হচ্ছে তাকে। জুডি বোধ হয় এক সপ্তাহের বাজার করে ফেলেছে।

দেখা মাত্রই অতীন বললো, হাই জুডি! মে আই ক্যারি ইয়োর ব্যাগস?

এটা প্রায় অভ্যেস বশেই বলা। চেনা কোনো মহিলাকে ভারী ভারী বোঝা বহন করতে দেখলে যে-কোনো পুরুষই এমন প্রস্তাব দেবে।

জুডি বললো, তুমি একটা ব্যাগ ধরো তা হলে, আটিন!

অতীন দু'টো শপিং ব্যাগই ঝুলিয়ে নিল তার সাইকেলের হ্যান্ডেলে। তারপর বললো, চলো, তোমার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

জুডি বললো, আমার বাড়ি বেশী দূর নয়। তোমার কোনো তাড়া ছিল না তো?

অতীন দু'দিকে মাথা নাড়লো। তারপর বললো, দেখছো, আজ রাত্তিরে বোধ হয় আবার বৃষ্টি আসবে।

জুডি বললো, আই লাভ ইট! বিশেষত রাত্রে বৃষ্টির শব্দ আমার খুব ভালো লাগে।

অতীন একটু অবাক হলো। এটা একটু অন্যরকম কথা। এ দেশের কোনো ছেলেমেয়েই বৃষ্টি পছন্দ করে না। এরা রৌদ্র-প্রিয়।

জুডি জিজ্ঞেস করলো, তুমি ভারতীয় হয়ে বৃষ্টি ভালোবাসো না? তোমাদের দেশে তো এখন বৃষ্টির সিজন শুরু হয়ে গেছে। আমার জন্ম ইন্দোনেশিয়ায়, আমার বাবা ওখানে পোস্টেড ছিলেন, ছেলেবেলায়, আমি খুব বৃষ্টি দেখেছি।

অতীন বললো, আমাদের দেশে বৃষ্টিতে ভিজলে এরকম চট করে ঠাণ্ডা লাগে না।

জুডি বললো, ওঃ হো, আজ তো সকালে তোমার রানিং নোজ দেখেছি। খুব ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসেছো বুঝি?

অতীন সঙ্কিত বোধ করলো। এই রে, সর্দি-নাকে সে জুডির পাশাপাশি হাঁটছে, এটা তো ঠিক হয়নি! জুডির শপিং ব্যাগ সে হাতে ছুঁয়েছে, তাতে সব কিছু অশুচি হয়ে যাবে না তো? জুডিকে দেখে সাহায্য করার সময় এই কথাটা তার মনেই ছিল না। জুডিও তো আপত্তি করলে পারতো।

জুডি বললো, তুমি কিছু ওষুধ খেয়েছো?

–ওষুধে কি সর্দি সারে?

–তা সারে, না বটে! হ্যাভ ইউ ট্রায়েড গ্রগ?

–গ্রগ? সেটা আবার কী?

–একটা কনককশান। দু'বছর আগে আমি যখন ফ্রান্সে গিয়েছিলাম, তখন আমারও খুব ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। শীতকালে ঠান্ডা লাগে না, এইরকম ওয়েদারেই অসাবধান থাকলে চট করে বুকে ঠাণ্ডা বসে যায়, তখন ওখানে গ্রগ খেয়ে বেশ উপকার পেয়েছিলাম।

অতীন ভাবলো, এখানকার ছেলেমেয়েরা গোটা পৃথিবীটাকেই হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। জুডির জন্ম ইন্দোনেশিয়ায়, এক সময় ফ্রান্সে গিয়েছিলো কিছু দিন সে সাউথ আমেরিকায় ছিল, তা অতীন আগেই শুনেছে, সেইজন্য সে স্প্যানীশ ভাষা জানে। অনেক ছেলেমেয়েই পৃথিবীর এদিক-ওদিক ঘুরে এসেছে।

জুডির বাড়ি কাছেই একটা ছোট রাস্তায় ঢুকে। দিঘলা বাড়ির ওপরের তলায় থাকে জুডি। পর্চে ব্যাগ দু'টো নামিয়ে রাখলে জুডি দু'বারে এসে নিয়ে যেতে পারবে। অতীন বললো, গুড নাইট, জুডি। সী ইউ টুমরো!

জুডি বললো, খুব যদি ব্যস্ত না থাকো, ওপরে এলে তোমাকে আমি গ্রগ খাওয়াতে পারি।

অতীনের এত সর্দি জেনেও যে জুডি তাকে ওপরে ডাকলো, এতে সে কৃতজ্ঞ বোধ করলো। তা হলে ওপরে না যাওয়ার তো কোনো কারণ নেই!

সাইকেলটা ওপরে তুলে তালা দিয়ে সে দু'টো ব্যাগই নিয়ে উঠে এলো তিনতলায়। জুডির ঘরটা প্রায় ঠিক তার ঘরেরই মতন অ্যাটিকে। অতীনের চেয়েও এলোমেলো স্বভাব জুডির, মেঝেতে পর্যন্ত

বইপত্র ছড়ানো, বিছানার ওপর ব্রা, প্যান্টিহোস। সারা ঘরে মেয়েলি গন্ধ।

অত বড় চেহারা জুডির, মনে হয় যেন তার মাথা ছাদে ঠেকে যাবে, তার হাঁটার সময় কাঠের মেঝেতে দুম দুম শব্দ হয়। দ্রুত হাতে জিনিসপত্র কিছুটা সাফ-সুতরো করে জুডি বললো, বসো, আটিন। আমার ঘরে অনেকদিন কেউ আসেনি! তুমি এখানে সিগারেট খেতে পারো! অ্যাশট্রে নেই, একটা সসার দিচ্ছি।

ঘরে একটাই আরাম কেদারা, তার খোলের মধ্যে অনেক বই-খাতা। খাটে না বসে অতীন বই-খাতা সরিয়ে সেই চেয়ারেই বসলো। এক পাশে পর্দা না-টানা অনেকখানি কাচের জানলা। সারা দেয়ালে প্রচুর ছবির প্রিন্ট সাঁটা, তার মধ্যে অতীন একটাই চিনতে পারলো ভ্যান গঘের সূর্যমুখী। আগে অতীন বিদেশী চিত্রকলা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতো না। এখন খানিকটা বুঝতে শিখেছে। এ দেশের বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরাও ছবি-গান-সাহিত্য সম্পর্কেও মোটামুটি খবর রাখে।

কাবার্ড থেকে একটা জামাইকান রামের বোতল বার করে জুডি জিজ্ঞেস করলো, তোমার অ্যাকোহল পান করার অভ্যেস আছে তো? তুমি কি অধিকাংশ ভারতীয়ের মতই নিরামিষাশী?

অতীন বললো, ভারতীয়দের মধ্যে আমরা আবার বাঙালী। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ বাছ-বিচার নেই। হ্যাঁ, অ্যালকোহলও আমার সহ্য হয়।

জুডি বললো, তা হলে গ্রগ বানানোটা শিখে নাও!

একটা ছোট সস্‌প্যানে সে খানিকটা রাম ঢাললো। তাতে মেশালো কয়েক চামচ চিনি। তারপর দিল একটুখানি গোলমরিচ। এবার তাতে কিছুটা জল মিশিয়ে সস্‌প্যানটা রাখলো জ্বলন্ত স্টোভে। একবার ফুটে উঠতেই নামিয়ে নিয়ে সে সেই তরল পদার্থটি একটা গেলাসে ঢেলে বললো, একটু একটু চুমুক দিয়ে পান করো, গরম থাকতে থাকতে।

দু'তিনবার চুমুক দিয়েই অতীনের মুখে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠলো। তার মা তালমিছরি-আদা দিয়ে যে পাঁচনটা বানাতো, এর স্বাদও অনেকটা সেইরকম। সর্দির সময় মিষ্টি গরম কিছু খেতে হয়, আইডিয়াটা একই।

কিন্তু এই কথাটা জুডিকে বলা যাবে না। মায়ের কথা তুললেই সে ভাববে যে তার বয়েস সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এ দেশের মেয়েরা বয়েস সম্পর্কে বড্ড স্পর্শকাতর।

সে বললো, চমৎকার হয়েছে তো! খেতে খুব ভালো লাগছে।

জুডি বললো, মাঝে মাঝে ব্যানিয়ে খেয়ো। কাশি অনেক কমে যাবে।

অতীন বললো, আমি এ দেশে এসে আগে কক্ষনো রাম খাইনি। তুমি বুঝি জ্যামাইকান রাম ভালোবাসো?

জুডি বললো, আমি রাম খাই না, স্কচ বারবান খাই না, আমি পারতপক্ষে হার্ড ড্রিংক্স খেতে চাই না। তবে রাম, ব্র্যান্ডি বাড়িতে রাখি, অনেক রান্নার রেসিপিতে লাগে। রান্না করা আমার শখ। রান্নাও তো কেমিস্ট্রি, তাই না? তুমি আজ আমার সঙ্গে খেয়ে যাও না, আটিন্‌। আমি এখন রান্না করবো।

অতীন বললো, আমার খাবার কিনে এনেছি। নষ্ট হবে।

–নষ্ট কেন হবে, ফ্রিজে রেখে দিও। এরপর তুমি একদিন আমাকে রান্না করে খাইয়ো। আমি অবশ্য ইন্ডিয়ান রান্না দু'একটা জানি। লন্ডনে ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় কারি খেয়েছি, থেকে কারি রান্নাও শিখে নিয়েছি। তুমি ওয়াইল্ড রাইস খেয়েছো?

–না। নাম শুনেছি বটে। সত্যি ওয়াইল্ড রাইস কিনতে পাওয়া যায়?

–হ্যাঁ, দাম একটু বেশী। ওয়াইল্ড রাইস-এর সঙ্গে কর্নড বীফের একটা খুব ভালো প্রিপারেশান হয় আমি রান্না শুরু করি, তুমি আমার সঙ্গে গল্প করো, আমাকে ইন্ডিয়ার গল্প বলো।

গ্রগ পান করতে করতে অতীনের খুব গরম লাগছে, ঘামের বিন্দু ফুটে উঠছে কপালে। তা দেখতে পেয়ে জুডি বললো, এই তো তুমি ঘামছো, অর্থাৎ তোমার কাজ হচ্ছে। দাঁড়াও, ঘাম মোছার জন্য তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি, না, না, রুমাল ব্যবহার করো না, একটু ধৈর্য ধরো!

সিঙ্কে গরম জলের কলটা খুলে দিয়ে অনেকখানি জল আগে ছেড়ে দিল জুডি। যখন গরম জল থেকে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো, তখন তাতে একটা ছোট তোয়ালে ভেজাতে লাগলো সে। তার আগে সে দু'হাতে দ্রুত দস্তানা পরে নিয়েছে। মিনিট দু'এক সেই আগুন-গরম জলে তোয়ালেটা ভেজাবার

পর চিপড়ে নিয়েই সে সেটা এনে অতীনের মুখে চেপে ধরলো। তারপর খুব যত্ন করে মুছিয়ে দিতে লাগলো অতীনের মুখ।

এত সর্দি হয়েছে জেনেও জুডি তাকে একটুও অবজ্ঞা করছে না, অতি আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা করছে। অতীন এরকম স্বপ্নেও ভাবেনি। জুডির সঙ্গে তার ভালো করে ভাবই হয়নি আগে।

তোয়ালেটা ঠাণ্ডা হয়ে যেতেই জুডি আবার সেটা গরম জলে ভিজিয়ে এনে অতীনের মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললো, এরকম রোজ দু'তিনবার করবে, দেখবে নাক পরিষ্কার হয়ে যাবে, রাত্রে ভালো ঘুম হবে।

জুডির বিশাল উরুর স্পর্শ লেগেছে অতীনের বাহুতে। এক-একবার তার স্তনের ছোঁয়া লাগছে অতীনের মাথায়। অতীন আরামে চোখ বুজে আছে।

এ দেশে আসার পর প্রথম প্রথম সিদ্ধার্থ যখন জানতো না যে অলি বা শর্মিলার সঙ্গে অতীনের আগে থেকেই সম্পর্ক আছে, তখন সিদ্ধার্থ অতীনকে নানারকম উপদেশ দিত। সিদ্ধার্থ বলেছিল, এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে ডেটিং করার নিয়ম কী জানিস? শিখে নে! যখন তখন অসভ্যতা করে ফেলিসনি। কোনো মেয়ের সঙ্গে ডেট করে তাকে নিয়ে সিনেমায় যেতে পারিস, কোনো রেস্তোরাঁয় খেতে যেতে পারিস, কিন্তু প্রথম দু'তিনদিন গায়ে-টায়ে হাত দিস না যেন। মেয়েটি যদি সন্ধের পর বাড়ি পৌঁছে দিতে বলে, বাড়ির দরজায় পৌঁছেই যদি হাত নেড়ে বিদায় জানায়, তা হলে তুক্কুনি চলে যাবি। কিন্তু মেয়েটি যদি সঙ্গে সঙ্গে গুড নাইট না বলে পর্চে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট গল্প করে, তা হলে বুঝতে হবে, সে তোকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তা হলে তাকে একটা চুমু খেতে চাইবি। না, না, গালে-টালে না, গালে চুমু খেলে মেয়েটা তোর সঙ্গে আর কথাই বলবে না, ঠোঁটে, চুমু খবি, মাত্র একবার। হ্যাংলামি করতে নেই প্রথম প্রথম। সেইসময় ঠোঁটে চুমু খেতে না চাইলে মেয়েটি অপমানিত বোধ করবে। তারপর তার রি-অ্যাকশান লক্ষ করবি। চুমু খাওয়ার পরেও মেয়েটি যদি বলে, ওপরে এসো না, আমার ঘরে একটা ড্রিংক নাও, কিংবা একটু কফি খেয়ে যাও, তা হলে বুঝবি, কী বুঝবি? গাড়লের মতন তাকিয়ে আছিস কেন? মেয়েরা একা বেড রুমে ডেকে নিয়ে গেলে সেই বেড রুমের পুরোপুরি ব্যবহার করতে হয়!

সিদ্ধার্থর সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল অতীনের। জুডির সঙ্গে সে ডেট করেনি, এমনিই হঠাৎ রাস্তায় দেখা। পর্চে দাঁড়িয়ে সে জুডিকে চুমু খায়নি, সে প্রশ্নই ওঠে না। জুডি তাকে ওপরে ডেকে নিয়ে এসেছে। দরজা বন্ধ, জুডি তাকে অনেকক্ষণ থাকতে বলছে। এর কি সত্যিই অন্য কোনো মানে আছে? সেক্স ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক হতে পারে না মেয়েদের সঙ্গে?

জুডিকে এক একবার তার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে ঠিকই। কিন্তু এই ইচ্ছেটাও তেমন তীব্র নয়। শর্মিলার ওপর তার যতই রাগ বা অভিমান হোক, শর্মিলার বদলে অন্য কোনো মেয়েকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে তার মন চাইছে না। বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে শার্মিলার কথা।

এরপর দেড় ঘন্টা সেখানে রইলো অতীন। আরও এক গেলাস গ্রগ পান করলো। জুডি তাকে বন্য চাল ও মাংসের কিমা দিয়ে নতুন ধরনের একটা রান্না খাওয়ালো, গল্প করলো অনেক। কিন্তু জুডির ব্যবহারে কোনোরকম শারীরিক ইঙ্গিত নেই। অতীনকে সে শুধু একজন বন্ধু বলে ধরে নিয়েছে। এ দেশে নারী ও পুরুষের বন্ধুত্ব হলেই তার মধ্যে বিছানায় স্থান অবধারিত। কিন্তু জুডি যেন সে ব্যাপারটা জানেই না। অতীনের হাত ধরে টেনে সে একবার নিয়ে গেল রান্না ঘরে, কিন্তু চোখে মুখে লাস্য ফোটালো না।

বিদায় নেবার সময় তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো, জুডি। নির্জন, আধো-অন্ধকার সিঁড়ি, মনে হয় যেন সারা বাড়িতে আর জনপ্রাণী নেই।

জুডি তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললো, তোমার সর্দি অনেকটা সেরে গেছে না? হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জুডিকে জড়িয়ে ধরলো অতীন। ফিস ফিস করে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ জুডি, থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভরিথিং!

জুডি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল না, আবার চুম্বনের প্রতীক্ষাও রাখলো না ওষ্ঠে। সুন্দর করে হাসলো। অতীনেরও চুমু খাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। এই আলিঙ্গনের মধ্যেও অন্য কিছু নেই, শুধু বন্ধুত্বের বন্ধনটা দৃঢ় করা।

বাইরে বেরিয়ে তার মনটা হঠাৎ ভালো লাগলো অনেক দিন পর।

॥ ২৯ ॥

খবরের কাগজের জন্য একটা প্রবন্ধ কালই দিতে হবে, তাই মামুন লিখতে বসেছেন সন্ধেবেলা। কয়েকদিন আগে সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল একটা পার্টিতে, মামুন মাসখানেক কোনো লেখা দেননি বলে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি মামুনের কাছে বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকার ওপর একটা বড় লেখ চান। ভদ্রলোকের ইতিহাস ও ভূগোল জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যান মামুন। কোনো বইপত্র না দেখেই তিনি বহু ঐতিহাসিক ঘটনার নিখুঁত সাল তারিখ মুখে মুখে বলে যান গড়গড় করে। ওঁর জন্ম পূর্ব বাংলায়। এখনও সেখানকার প্রতিটি মহকুমা এবং রাস্তাঘাটের এমন বর্ণনা দেন যেন কয়েকদিন আগেই সেখান থেকে ঘুরে এসেছেন! মামুনের আগের লেখাটিতে তিনি দু'টি ভুল বার করেছিলেন, সামান্য খুঁটিনাটির ভুল, তবু ভুল তো বটে।

থিয়েটার রোডের অস্থায়ী মুজিবনগরে এখন ঢাকার কিছু কিছু বই ও পত্র-পত্রিকা পাওয়া যায়। মামুন আজ দু'খানা বই নিয়ে এসেছেন, লিখতে লিখতে মামুন বই খুলে মিলিয়ে নিচ্ছেন রেফারেন্স। কিন্তু লেখায় পুরোপুরি মন দিতে পারছেন না তিনি।

ঘরে চেয়ার-টেবিল নেই, মামুনকে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে লিখতে হয়। পাশের খাটে রেডিও শুনছে মঞ্জু আর হেনা। সন্ধে পর রেডিও শোনা ছাড়া ওদের আর তো কোনো সময় কাটাবার আকর্ষণ নেই, তাই মামুন ওদের রেডিও বন্ধ করতে বলতে পারেন না। মঞ্জু এক একদিন ঢাকায় ফেরার জন্য উতলা হয়ে ওঠে, অথচ ফেরার কোনো উপাও যে নেই, তাও বোঝে। এরমধ্যে মামুনকে মিথ্যে করেই বলতে হয়েছে যে ঢাকা থেকে সদ্য আগত দু'জনের মুখে তিনি মঞ্জুর স্বামী বাবুল চৌধুরীর খবর পেয়েছেন, বাবুল ভালো আছে।

মঞ্জু আর হেনা রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একবার কলকাতার আকাশবাণী আর একবার স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের অনষ্ঠান শোনে। আকাশবাণীতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোকের খবর পড়া ওদের প্রতিদিন শোনা চাই-ই। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে এমন আবেগ ফুটে ওঠে যে কখনো রক্ত চনমন করে ওঠে, কখনো চোখে জল এসে যায়। মঞ্জুর ছেলে এই ভদ্রলোকের গলা নকল করার চেষ্টা করে।

একটা গান শুনে মামুন অন্যমনস্ক গেলেন। আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা সেই অতি পরিচিত গান, একুশে ফেব্রুয়ারি। হঠাৎ মামুন চমকে উঠলেন, আরে, এই গানটা তো তাঁর কাজে লাগবে! গানটির সব কথা তাঁর মুখস্থ নেই। কিন্তু ভাষা আন্দোলনবিষয়ক লেখাটিতে এই গানটি ব্যবহার করা দরকার।

গানটি শেষ অংশ গাওয়া হচ্ছে, মামুন দ্রুত হাতে লিখে নিতে লাগলেন ঃ

ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি!

তুমি আজ জাগো, তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি।
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুন ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালিছে ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি .....

মামুনের মনে পড়লো, গাফফার যখন সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র, সেই সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

হাসাপাতালের বেডে একটি বুলেটবিদ্ধ তরুণের শিয়রে বসে সে এই কবিতাটা লিখেছিল। কতদিন আগেকার কথা, পাকিস্তানের বয়েস তখন মাত্র পাঁচ বছর, সেই সময়ই বাঙালী মুসলমান তরুণসমাজের মনে হয়েছিল, 'ওরা এ দেশের নয়, মামুন তখন জেলে ছিলেন, শাসকশ্রেণীর প্রতি একটা তিক্ততার বোধ তাঁরও ওষ্ঠে লেগেছিল, কিন্তু পাকিস্তানকে ভাঙার কথা তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবেননি। এখন পাকিস্তানকে কে ভাঙতে চাইছে, শেখ মুজিব, বাঙালী উগ্রপন্থী তরুণেরা, না পশ্চিমের অত্যাচারী সামরিক শাসকেরা?

হেনা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, আব্বু, চরমপত্র! চরমপত্র!

এই অনুষ্ঠানটা মামুনও বাদ দিতে চান না। তিনি কাগজপত্রের ওপর বই চাপা দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। এই অভিনব অনুষ্ঠানটির তুলনা নেই। চরমপত্র যিনি পড়েন তাঁর নামটি গোপন রাখা হয়, কিন্তু প্রথমদিন শুনেই হেনা-মঞ্জুরা চিনতে পেরেছিল। এম আর আখতার মুকুলের সঙ্গে তাঁরা দেশ ছাড়ার সময় অনেকটা পথ একসঙ্গে এসছিলেন। এখানেও পার্ক সার্কাসে বালু হক্কাস লেনে 'জয় বাংলা' পত্রিকা অফিসে মুকুলের সঙ্গে মামুনের দেখা হয়েছে কয়েকবার। এই দুঃসময়েও তিনি আড্ডায়, হাসি-গল্পে অনেককে মাতিয়ে রাখেন।

...যা ভাবছিলাম, তাই-ই হইছে, মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুগুলার আতকা, গাবুর, কেচ্‌কা আর গাজুরিয়া মাইর একটুক কইর‍্যা কড়া হইয়া উঠতাছে আর খেইলটা জমতাছে। এর মাইদ্দে টিক্কা-নিয়াজীর হেই জিনিস খারাপ হইয়া গেছে গা! তাগো তিনটা ডিভিশানের বেস্ট সোলজাররা বাংলাদেশের কেদোর মাইদ্দে ঘুমাইয়া পড়ছে। এইদিকে নর্দান রেনজারস, গিলগিট স্কাউট, লাহোর রেনজারস, পশ্চিম পাকিস্তানী আর্মড পুলিশ জাগোই ময়দানে নামাইতাছে, তারাই আছাড় খাইতাছে। আইজ কাইল এইগুলো আছাড় খাইলে আর কান্দে না। লগে লগে আগরী দমড়া ছাইড়া দেয়। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় হানাদার সোলজাররা ট্রেনে চাপলে ডিনামাইট, রাস্তায় গেলে মাইন, টাউনে ঘুরলে হ্যান্ড গ্রেনেড আর দরিয়াতে নামলেই খালি চুবানি খাইতে হয়! এইরকম একটা অবস্থায় পড়ায় চাইর মাস যুদ্ধ হওনের পর টিক্কা-নিয়াজী জমা-খরচের হিসবা কইর‍্যা ভিমরী খাইছে। এলায় করি কী?....

খালি কলসের আওয়াজ বেশী। ঠং ঠং কইর‍্যা আওয়াজ হইলো। বাংলাদেশের কেদোর মাইদ্দে আড়াই ডিভিশান সোলজার নষ্ট করনের পর ইয়াহিয়া সাব এলায় অতকা ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করনের ধমক দেখাইছেন। বেডা এক খান। হেতনে কইছে ইন্ডিয়া যদি বাংলাদেশের কোনো এলাকার দখলী লইতে চায়, তয় যুদ্ধ ঘোষণা কইর‍্যা দিমু। হগল দুনিয়ারে কইয়া দিতাছি, আমি ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করমু। আর আমি একলা নাইক্যা, আমার লগে মামু আছে।

চাচা রইছে।

"কেমন বুঝতাছেন? হেতনে জ্ঞান পাগল হইছে.....।"

হেনা জিজ্ঞেস করলো, আব্বু, 'গাজুরিয়া মাইর' কী?

মামুন হাসলেন। মুকুল সাহেব এমন এমন সব শব্দ ব্যবহার করেন, যার অর্থ তিনিও জানেন না। কিন্তু শুনতে বেশ মজা লাগে। এই 'চরমপত্র' শুনলে খানিকটা ভরসাও পাওয়া যায়, মনে হয়, মুক্তিবাহিনী কোথাও থেমে নেই। একদিন না একদিন তাদের জয় হবেই।

কিন্তু সেই জয় কত দূরে?

মামুন আবার লেখায় মন দিলেন। রেডিওতে এরপর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটা শুরু হতেই তাতে গলা মেলালো মঞ্জু!

একটু পরে দরজায় টক টক শব্দ হলো। দরজা বন্ধ নয়, ভেজানো। সুখু গিয়ে দৌড়ে খুলে দিল। বাইরে থেকে একজন বললো, মামুনভাই, আসতে পারি? আমি শওকত?

মামুন ব্যস্ত হয়ে বললেন, কে? শওকত ওসমান সাহেব? আসেন, আসেন!

লোকটি মুখ বাড়িয়ে বললো, না, আমি মীর শওকত আলী! আপনার ঠিকানা লইলাম কামরুল হাসান সাহেবের কাছ থিকা!

মামুন এবারে চিনলেন। তিনি যখন দিন-কাল পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন এই মীর শওকত আলী ছিল তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। মামুনের চাকরি যাবার পর শওকতও চাকরি ছেড়ে দেয়, তারপর সে চলে গিয়েছিল চিটাগাঙ। ছেলেটিকে মনে রাখবার আর একটি কারণ, সে চমৎকার গান

গাইতো।

দেশের যে-কোনো মানুষকে দেখলেই খুশি হবার কথা, কিন্তু মামুন এখন ততটা উৎসাহিত হতে পারলেন না। লেখাটা শেষ হবে কী করে? লেখার মাঝখানে কেউ এসে পড়লে বিরক্তি গোপন করাটাই মুশকিল হয়ে পড়ে।

খুব পরিচিত ছাড়া অন্য কারকে মামুন বাড়িতে আসতেও বলেন না। একটাই মোটে ঘর, বাইরের লোকরা এসে বসলে মেয়েরা যায় কোথায়? মেয়েদের আব্রু রক্ষা করার একটা ব্যাপার আছে। অনেক সময়, সে রকম কোনো অতিথি এলে মঞ্জু আর হেনা গিয়ে রান্নাঘরে বসে থাকে। রান্নাঘরটা ঘুপচি অন্ধকার মতন, সেখানে কি বেশীক্ষণ বসে থাকা যায়? মঞ্জুর আবার খুব মাকড়সার ভয়! এক একজন অতিথি এমন বে-আক্কেলে হয় যে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেলেও উঠতে চায় না।

মামুন অপ্রসন্ন ভাবে বললেন, আসো শওকত। কী ব্যাপার কও!

শওকত বললো, মামুনভাই, আমার সাথে একজন ভদ্রলোক আসছেন, আমি তো রাস্তাঘাট চিনি না, এনার নাম পলাশ ভাদুড়ী।

মামুন এবারে খাট থেকে নামলেন। শওকতের সঙ্গে একজন সুদর্শন হিন্দু যুবক এসেছে, এর প্রতি অগ্রাহ্যের ভাব দেখানো যায় না।

মামুন আপ্যায়ন করে বললেন, আসুন, আসুন ভেতরে আসুন, না, না, জুতা খুলতে হবে না, চেয়ার-টেয়ার কিছু নাই, এই খাটেই বসুন!

মঞ্জু আর হেনা রেডিও বন্ধ করে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসেছে। মামুন তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরে হেনা-মঞ্জু, বাসায় মেহমান এসেছে, একটু চা খাওয়াবি না?

অর্থাৎ মঞ্জু-হেনাকে রান্না ঘরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন মামুন।

শওকত বললো, মামুনভাই, আমি মাত্র তিনদিন আগে আসছি বর্ডার পার হইয়া।

সে যে মাত্র তিনদিন আগে ওপার থেকে এসেছে, সেটাই তার বড় পরিচয়। নতুন কেউ এলেই সবাই তাকে ছেঁকে ধরে টাটকা খবর শোনার জন্য। প্রেমের বিরহের চেয়ে দেশত্যাগীদের বিরহও কিছুমাত্র কম তীব্র নয়। বাধ্য হয়ে যারা ভারতে আশ্রয় নিয়ে আছে তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরের খবর জানার জন্য ব্যাকুল। গত সপ্তাহে মঞ্জুর নামে একটি ছেলে আত্মহত্যা করেছে। কারণটি ঠিক জানা না গেলেও অনেকে বলাবলি করছে যে দেশে ফেরার বিষয়ে অনিশ্চয়তার টেনশান সে আর সহ্য করতে পারছিল না।

মামুন অবশ্য তেমন আগ্রহ দেখালেন না, তাঁর লেখাটার চিন্তাই মাথায় ঘুরছে, তিনি বললেন আগে বসো।

শওকত আর পলাশ ভাদুড়ী প্রায় সমবয়েসী। পলাশ প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট পরা, মুখে ফ্রেঞ্চকার্ট দাড়ি, চোখ ও ওষ্ঠে কৌতুকমাখা হাসি।

সে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললো, মামুন সাহেব, আমায় চিনতে পারেননি নিশ্চয়ই? আমি কিন্তু জানতুম না যে আপনারা এখানে থাকেন। শওকত যে ঠিকানা লেখা কাগজটা দেখালো, তাতে সৈয়দ মোজাম্মেল হকের নাম লেখা। আপনার পুরো নাম আমার জানাও ছিল না।

মামুন যুবকটির মুখের দিকে ভালো করে তাকালেন। অপরিচিত হিন্দু নাম সব সময় মনে থাকে না। এই যুবকটিকে তিনি আগে কখনো দেখেছেন বলেও মনে পড়লো না।

হেনা আর মঞ্জুকে দরজা দিয়ে বাইরে বেরুতে গেলে এদের খাটের পাশ দিয়েই যেতে হবে। পলাশ প্রথমে হেনাকে দেখে বললো, মামুন সাহেব, এই আপনার মেয়ে না? ইস, কত বড় হয়ে গেছে!

তারপর সে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো, মঞ্জু?

মঞ্জু গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে এক পলকের জন্য দেখলো পলাশকে। তারপর প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পলাশ হেসে বললো, মঞ্জুও আমায় চিনতে পারে নি। মামুন সাহেব, আপনাকে মনে করিয়ে দিই, আমি আমার এক বন্ধু শহীদের সঙ্গে একবার ঢাকায় গিয়েছিলুম সিক্সটি ফাইভের আগে—

মামুনের মস্তিষ্কে একটা বিদ্যুৎ চমকে গেলো। সেই পলাশ আর শহীদ! যে-দু'জন যুবককে দেখে মঞ্জু প্রথম কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে উত্তীর্ণা হয়েছিল, যাদের জন্য মঞ্জু দিনের পর দিন কেঁদেছে।

তিনি বললেন, ও, তুমি সেই পলাশ, সুরঞ্জন ভাদুড়ীর ছেলে? চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এরকম দাড়িও আগে ছিল না বোধহয়। শহীদ কোথায়?

পলাশ বললো, শহীদ নর্থবেঙ্গলে ওদের চা বাগানে আছে। সামনের সপ্তাহে এসে পড়বে। আমরা কেউ খবরই পাইনি যে আপনারা এখানে আছেন। আমি কালই শহীদকে টেলিফোনে জানাবো। আপনার দিদির বাড়িতে কত মজা করেছি, কত গান বাজনা হয়েছিল।

মামুন বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। দ্যাখো দেখি কী কাণ্ড, মঞ্জু তোমাকে চিনতেই পারে নি! দাঁড়াও।

মামুন তাড়াতাড়ি মঞ্জুকে ডেকে আনতে গেলেন।

তাঁর আরও একটা কথা মনে পড়লো। পলাশ আর শহীদ, এই দু'জনের কোনো একজনের প্রেমে পড়েছিল মঞ্জু। ঠিক কার যে প্রেমে পড়েছিল, তা মঞ্জু খুলে বলেনি, মামুনও নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেননি। ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে শহীদের প্রতিই মঞ্জুর দুর্বলতা, শহীদের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ের প্রস্তাবও উঠেছিল, শহীদ রাজি হয়নি। তা হলে কি তখন পলাশকেই ভালোবেসেছিল মঞ্জু? অল্প বয়েসের ব্যাপারে, ওতে গুরুত্ব দেবার কিছু নেই, কিন্তু মেয়েরা কি প্রথম প্রেমের কথা ভুলে যেতে পারে?

রান্নাঘরে গিয়ে মামুন মঞ্জুর হাত ধরে রঙ্গ করে বললেন, কী রে মঞ্জু ঐ ছেলেটিকে চিনতে পারলি না? এক সময় ওদের সাথে কলকাতায় আসবি বলে বায়না তুলে কেঁদে ভাসিয়েছিলি! ওর নাম পলাশ।

মঞ্জুর চমকালো না। সে চিনতে পেরেছে ঠিকই। কিন্তু মামুন ধরে টানাটানি করলেও সে ও ঘরে গিয়ে পলাশের সঙ্গে কথা বলতে রাজি নয়। লজ্জায় তার মুখখানা লাল হয়ে গেছে। মামুন প্রায় তাকে একপ্রকার জোর করেই নিয়ে এলেন।

পলাশ খুব স্বাভাবিক ভাবেই বললো, কী মঞ্জু, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে বলে আমাদের আর চিনতে পারছো না? এই বুঝি তোমার ছেলে? কী সুন্দর দেখতে হয়েছে ছেলেকে।

শওকত বললো, পলাশদাদা খুব নাম করা গায়ক। আমার সাথে পরশুদিনই একটা ফাংশানে আলাপ হইলো। দ্যাশে থাকতেও ওনার রেকর্ড শুনেছি।

পলাশ বললো, মঞ্জুও তো চমৎকার গান জানে। মঞ্জু তোমার কোনো রেকর্ড বেরোয় নি।

মঞ্জু মাথা নিচু করে নোখ দিয়ে মেঝে খুঁটতে লাগলো মামুন বললো, বিয়ের পর ও তো গানের চর্চা একেবারে ছেড়েই দিল!

শওকত বললো, আমরা সিঁড়ি দিয়া ওঠার সময় এই ঘরে গান শুনতে পাইছিলাম। কে গাইছিল?

পলাশ বললো এখানে বাংলাদেশের জন্য প্রায়ই তো ফাংশান হচ্ছে এখানে সেখানে। সেখানে মঞ্জু গান গাইছে না কেন? আজই তো একটা ফাংশান আছে, এই কাছেই, পার্ক সার্কাস ময়দানে, আমার প্রোগ্রাম আছে সাড়ে আটটায়। চলো, যাবে?

মঞ্জু দু'দিকে মাথা নেড়ে দৌড়ে চলে গেল চা আনতে। মামুন শওকতের দিকে তাকালো এবার তিনি শওকতের কথা শুনতে চান।

শওকত চিটাগাঙ শহরে হাঙ্গামা শুরু হবার পর পালিয়ে গিয়েছিল কুমিল্লায়, গ্রামে গিয়েও সুস্থির ভাবে থাকতে পারেনি, তারপর আগরতলা বর্ডার দিয়ে সে ইন্ডিয়ায় ঢুকেছে। শওকতের কাহিনীর মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নেই, সকলের প্রায় একইরকম অভিজ্ঞতা, গ্রামে আগুন, মিলিটারির অত্যাচার, চোখের সামনে প্রিয়জনের মৃত্যু....

কিন্তু শওকত শুধু এসব শোনাবার জন্যই আসেনি। এক জায়গায় থেমে গিয়ে সে হঠাৎ বললো, মামুনভাই, আগরতলায় আলতাফের সাথে দেখা হয়েছিল আমার। সে তো এখন মুক্তিফৌজের কমান্ডার।

মামুন অনেকখানি চমকে উঠলেন। আলতাফ? কোন আলতাফ?

শওকত বললো, আমাদের অফিসের সেই জেনারেল ম্যানেজার আলতাফ। মঞ্জুভাবীর হাজব্যান্ড বাবুল চৌধুরীর বড় ভাই!

মামুন আবার ভুরু তুললেন। সেই আলতাফ? অল্প বয়েসে যে বিপ্লবের আদর্শে গলা ফাটাতো, একবার মাত্র জেল খেটেই যে পালিয়েছিল জার্মানিতে, ফিরে এসেছিল একটি সুখী, বিলাসী, হ্যাপি

গো লাকি চরিত্র হয়ে, হোটেলের ব্যবসায় আর পত্রিকার ব্যবসায় যে হয়ে উঠেছিল তার মামা হোসেন সাহেবের এক নম্বর খোসামুদে, আইয়ুব খাঁর আমলে যে ছিল পাকিস্তানী সরকারের স্তাবক, সেই আলতাফ যোগ দিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে? মামুন কানাঘুষো শুনেছিলেন যে আলতাফ পালিয়ে গেছে করাচীতে, কিংবা সে আবার জার্মানিতে ফিরে গেছে, তার বদলে মুক্তিবাহিনীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপদসঙ্কুল জীবন সে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে? শেখ মুজিবের ভক্ত ছিল না সে কোনোদিনও, এখন সে শেখ মুজিবের নামে শপথ নিতে দ্বিধা করেনি!

মামুনের বিস্ময় দেখে শওকত বললো, আলতাফের বেশ নাম হয়েছে, দুই তিনটা দুঃসাহসিক অপারেশানে সে সাকসেসফুল হয়ে ফিরে এসেছে, সবাই বললো।

তারপর কাঁধের ঝোলাটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে বললো, আমার উপরে একটা দায়িত্ব দিয়েছিল আলতাফ, সেইজন্যই আমি কলকাতায় এসেই আপনার খোঁজ করেছি। একটা চিঠি পৌঁছায়ে দিতে বলেছে আপনার হাতে, খুব জরুরি আর সিক্রেট।

খামটির মুখ বন্ধ, মামুন দ্রুত ছিঁড়ে ফেললেন সেটা। মঞ্জু আর হেনা চা এনেছে, পলাশ আর শওকত কথা বলছে তাদের সঙ্গে, মামুন চিঠিখানা পড়তে গিয়ে। কেঁপে উঠলেন। সংক্ষিপ্ত বারো-চোদ্দ লাইনের চিঠি, সেটাই তিনি পড়ে যেতে লাগলেন একাধিকবার।

চিঠি দেখে মঞ্জু উৎসুক ভাবে তাকাতেই অকম্পিত গলায় মামুন বললেন, টপ সিক্রেট, মুজিবনগর সরকারকে একটা খবর দিতে হবে, কাল সকালেই যাবো।

চিঠিখানা ভাজ করে তিনি রাখলেন পাঞ্জাবির পকেটে।

শওকত বললো, আমার রেসপনসিবিলিটি শেষ। পলাশদাদা, আপনার ফাংশানের দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? কয়টা বাজে? আমার ঘড়িটা বেচে দিতে হয়েছে আসার পথে।

পলাশ নিজের হাতঘড়ি দেখে বললো, এখনো মিনিট কুড়ি দেরি আছে। মঞ্জু, যাবে না আমাদের সঙ্গে? শওকতকে দিয়েও গান গাওয়াবো!

হেনা বললো, চলো, চলো, আব্বু, আমরা যাবো? যাই না।

শওকত বললো, মামুনভাই, আপনেও চলেন।

মঞ্জু হেনারা বাড়ির মধ্যে অধিকাংশ সময় আবদ্ধ থাকে, বাইরে যাবার যে-কোনো প্রস্তাব পেলেই লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু মঞ্জু পলাশকে দেখে এখনও লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তার ফর্সা মুখখানিতে লালচে আভা। শুধু পলাশ-শওকতের সঙ্গে বাড়ির বাইরে যেতে মঞ্জু রাজি হচ্ছে না। মামুন নিজে সঙ্গে গেলে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না।

কিন্তু মামুন যাবে কী করে? লেখাটা শেষ করতে হবে না?

তবু মামুনের মনে হলো, এখন মঞ্জুর একটু বেড়িয়ে আসা খুবই দরকার। কিছুক্ষণ মঞ্জু তাঁর চোখের আড়ালে থাকলে তিনি স্বস্তি বোধ করবেন।

মামুন বললেন, আমি তো যেতে পারবো না। আমার কাজ আছে। তোরা যা তবে। মঞ্জু, একটু তৈরি হয়ে নে।

মঞ্জু বুকে চিবুক ঠেকিয়ে বললো, হেনা যাক তাইলে। আমি যাবো না।

পলাশ বললো, আরে চলো! ঠিক আছে, তোমাকে গান গাইতে বলবো না, তুমি শুনবে। একবার তোমাদের দেখা পেয়েছি, আর কি সহজে ছাড়ছি? শহীদকেও আনিয়ে নিচ্ছি কলকাতায়। তুমি কি কলকাতায় পর্দানশীন হয়ে থাকবে ভাবছো নাকি?

শওকত বললো, আমি আগে কলকাতায় আসি নাই। বড় মজার জায়গা। রাত্তির দশটা পর্যন্ত ফাংশান হয়, লোকজন বসে বসে শোনে।

পলাশ বললো, রাত দশটা কেন, অনেক ক্লাসিকাল গান-বাজনার জলসা সারা রাত চলে। এখন গরম কাল বলে ঐসব একটু কম।

মামুন বললেন, আমরা ঢাকায় তো কারফিউ আব মারশাল ল-তে ভুগছি অনেকদিন ধরে, সন্ধ্যার পর কোনো অ্যাকটিভিটি থাকতো না। এখানে তো সেরকম কোনো ভয় নাই।

পলাশ বললো আছে এখানেও এখন নকশালদের ব্যাপারে লোকে ভয় পায়। কোথায় কখন বোমাবাজি শুরু হবে তার ঠিক নেই। তবুও লোকে গান-বাজনা শুনতে আসে। মঞ্জু, আর দেরি

করলে কিন্তু আমাদের দৌড় লাগাতে হবে।

মামুন বেশী বেশী উৎসাহ দেখিয়ে মঞ্জুকে তাড়া দিয়ে বললেন, দেরি করিস না। দেরি করিস না, তৈরি হয়ে নে! সবসময় কি আর আমি তোদের নিয়ে যেতে পারবো!

মঞ্জু হঠাৎ শওকতকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার সাথে আলতাফ ভাইয়ার দেখা হয়েছিল, উনি তার ছোট ভাইয়ের কথা কিছু বলেন নাই?

শওকত মামুনের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, না, বলেন, বলেন নাই কিছু! তিনি ঢাকাতেই আছেন শুনেছি।

পলাশ মঞ্জুকে বললো, আর সাজগোজ করতে হবে না। 'যেমন আছো তেমনি এসো আর করো না সাজ!' এরপর সত্যি দেরি হয়ে যাবে!

মঞ্জুর আর কোনো আপত্তি টিকলো না। সুখুকেও সঙ্গে নিয়ে গেল ওরা। মামুন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় দিলেন।

এখন নিরিবিলিতে লেখাটা শেষ করার সবর্ণ সুযোগ। তবু মামুন খাটে ফিরে না গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এতসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কি লেখা হয়? মাথাটা একেবারেও গোলমাল হয়ে গেছে।

নির্বাসিত মামুনের একটা দিনও বোধহয় শান্তিতে যায় না। আজ পলাশ এলো মঞ্জুর কুমারী জীবনের একটা বিশেষ স্মৃতি ঝিলিক দিয়ে যাবার কথা। পলাশকে দেখে যতখানি উচ্ছ্বাস দেখানো উচিত ছিল, ততটা দেখাতে পারেননি মামুন। বাবুল চৌধুরী সঙ্গে আসেনি, এই ক'মাসে তার কাছ থেকে কোনো খবরও আসেনি, মঞ্জু তাঁর সঙ্গে রয়েছে বলে মামুনের একটা অতিরিক্ত দায়িত্ববোধ আছে। এখন পলাশ শহীদদের সঙ্গে মঞ্জুর নতুন করে মেলামেশা করতে দেওয়াটা ঠিক হবে কিনা, তা মামুন বুঝতে পারছেন না। তবু তিনি জোর করেই যে মঞ্জুকে পলাশদের সঙ্গে এখন পাঠালেন, তার কারণ মামুনের ভালো অভিনয় ক্ষমতা নেই। শওকত এসেছে ভগ্নদূত হয়ে।

পকেট থেকে তিনি চিঠিটা আবার বার করে পড়লেন। আলতাফ লিখেছে তার ছোট ভাই সম্পর্কে। গত মাস দেড়েক ধরে বাবুল চৌধুরীর কোনো খোঁজ নেই। শেষ খবর পাওয়া গিয়েছে যে সে আর্মির গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছিল। তাদের বাড়ি থেকে আর্মির লোকজন সিরাজুলের স্ত্রী মনিরাকে ধরে নিয়ে গেছে। তাদের প্রতিবেশিনী জাহানারা বেগমও বাবুলের আর কোনো সন্ধান জানেন না। যতদূর মনে হয়, বাবুল চৌধুরীকে আর্মি ব্যারাকেই আটকে রাখা হয়েছে। অথবা সে ইন্ডিয়ায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে কি না, সে সংবাদ মামুনই ভালো জানবেন।

মামুন অস্ফুট ভাবে বললেন, আর্মি ব্যারাক!

আর্মি ব্যারাকে যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তারা আর কেউ ফেরে না। এরকম শত শত ঘটনা শোনা গেছে। আর বাবুল যদি ইন্ডিয়ায় পালিয়ে আসে, তা হলে কলকাতা ছাড়া আর কোথায় যাবে? ইন্ডিয়ার প্রতি বরাবর একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল বাবুলের। তবু যদি সে কলকাতায় আসতো, নিজের স্ত্রী-পুত্রের খোঁজ করতো না? শওকত যে-ভাবে মামুনের ঠিকানা যোগাড় করেছে, সে ভাবে বাবুলও এই বাসায় চলে আসতে পারতো।

মঞ্জুকে কী বলবেন মামুন? তিনি চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়লেন, তারপর উড়িয়ে দিলেন জানলা দিয়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখার জন্য তাঁর বুক ব্যথা করছে।

॥ ৩০ ॥

এবারে পুলিশ হারীতকে মারধর করলো না কেন, তা হারীত নিজেই বুঝতে পারলো না। পুলিশের গাড়িতে ওঠার পরই হারীত ধরে নিয়েছিল, বুড়ো হাড়ে সে আর মার সহ্য করতে পারবে না। এবারে পুলিশ তাকে শেষ করে দেবে। কিন্তু একটা রুলের আঘাতও পড়লো না তার শরীরে, তার বদলে শুধু জেরা, ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন। সে জেরাও কোনো মাথা মুণ্ডু নেই, পুলিশ যেন সব কথাই জানে, তবু সেইসব কথাই তারা আবার হারীতের মুখ দিয়ে বলাতে চায়।

সেদিন-চন্দ্রার আশ্রমে পুলিশের কাণ্ডকারখানা দেখে হারীত হাঁ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিনের ব্যবধান, হারীতের মুখ-ভর্তি দাড়ি গোঁফ এবং শরীরে সাধুর পোশাক সত্ত্বেও পুলিশদের একজন তাকে চিনতে পেরে নাম ধরে ডেকেছিল। তবে তখুনি তাকে হাত-কড়াও পরায়নি কিংবা মাথার চুল খামচে

ধরে শালা-হারামজাদাও বলেনি। বরং আপনি আজ্ঞে সম্বোধন করে নিষ্টিভাবে বলেছিল, আপনি বসুন হারীতবাবু, আপনার সঙ্গে পরে কথা হবে।

পুলিশ প্রথমে প্রমীলা আশ্রম তন্নতন্ন করে সার্চ করলো। তারা নকশালদের খোঁজ করতে এসেছিল। হারীতের ধারণা, পুলিশের কখনো ভুল হয় না, তারা যা খুঁজতে এসেছে তা পাবেই। চন্দ্রা একটুও ভয় পায়নি, তার মুখের একটা রেখাও কাঁপেনি, বাঘছালের আসন ছেড়ে সে একবারও উঠলো না পর্যন্ত। গোটা আশ্রমটা খুঁজে খালি হাতে ফিরে আসার পরে চন্দ্রা তীব্র বিদ্রূপের সুরে বলেছিল, পেছন দিকে একটা নতুন গোয়ালঘর করাত হয়েছে, সেটা দেখেছেন? চারটে গরু রাখা হয়েছে সেখানে। গোয়ালঘরটাও একবার দেখে আসুন, যদি সেখানে কিছু লুকোনো থাকে। তবে সাবধান, একটা ভাগলপুরী গরু আছে, সেটা বড্ড গুঁতোয়!

পুলিশ আবার গোয়ালঘরটা দেখতে গেল এবং ফিরে এলো খালি হাতে। চন্দ্রার তুলনায় অসমঞ্জ বরং অনেকটাই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, সার্চ করার সময় তিনি সর্বক্ষণ পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন। পুলিশ যখন সত্যিই কিছু পেল না, তখন অসমঞ্জ ব্যক্তিত্ব ফিরে পেয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। তিনি বলতে গেলেন, আপনারা মিছিমিছি একটা আশ্রমে ঢুকে হ্যারাস করলেন, আমি পুলিস কমিশনারের কাছে.....খবরে কাগজে...

চন্দ্রা হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি চুপ করো, অস"্ঞ! ওঁদের ডিউটি ওঁরা করেছেন। ওঁদের যখন একটা সন্দেহ হয়েছিল....

পুলিস অফিসার দু'জনের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রা বলেছিল, তা হলে এবার স্বীকার করছেন, আপনাদের ভুল হয়েছে? আপনারা এই আশ্রমে অযথা উৎপাত করতে এসেছেন!

পুলিশ দু'জন কোনো কথা না বলে অপ্রস্তুত ভাবে হাসলো।

চন্দ্রা বললো, ভুল করলে শাস্তি পেতে হয়। আমি পুলিশ কমিশনারের কাছে নালিস করতে চাই না, খবরের কাগজেও কিছু জানাতে চাই না। আপনারা দু'জন কান ধরে পাঁচবার ওঠবোস করুন, তাহলেই আমি খুশি হব।

হারীতের চোখ দুটি কপালে ওঠার উপক্রম হয়েছিল। এই স্ত্রীলোকটির এত তেজ, পুলিসকে কান ধরতে বলে? চন্দ্রার চোখ দিয়ে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে, সত্যিই কিছু অলৌকিক শক্তি আছে নাকি তার?

এব বি অফিসার অমরেশ দাশগুপ্ত বাচ্চা ছেলের মতন লজ্জা পেয়ে মাথা চুলকে বলেছিলেন, আজ্ঞে, সে ইস্কুল-টিস্কুল ছাড়ার পর তো আর কেউ কান ধরে ওঠবোস করতে বলেনি, তাই ওটা ঠিক পারবো না। আপনি বরং অন্য কিছু শাস্তির কথা ভাবুন। তার আগে আপনাকে গোটা কতক প্রশ্ন করতে পারি?

অসমঞ্জ গলা গরম করে বললেন, আপনারা যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছেন। আর কোনো প্রশ্ন নয়। আমাদের এখন জরুরি কাজ আছে।

বিনয়ের অবতার হয়ে বিনায়ক চৌধুরী বললেন, সত্যি, অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছি, আর মিনিট পাঁচেকের বেশী লাগবে না। মিঃ দাশগুপ্ত, আপনিই শুরু করুন তা হলে?

অমরেশ দাশগুপ্ত পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোট বই বার করে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, কী যেন নামটা? আপনাদের আশ্রমের সুপার, এই যে হ্যাঁ, পেয়েছি, পেয়েছি, কুমুদিনী, কুমুদিনী সাহা, তিনি এখন কোথায়?

অসমঞ্জর দিকে একবার চোখাচোখি করে চন্দ্রা বললো, হ্যাঁ, সে আগে ছিল এখানে। এখন চলে গেছে।

–কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, না [illegible] বাড়ি-টাড়ি চলে গেছে?

–এখানে কেউ চাকরি করে না, সুতরাং [illegible] ছাড়ার প্রশ্ন ওঠে না। কুমুদিনীর কোথাও কোনো বাড়িঘর আছে কি না তাও আমরা জানি না। এখানে তার মন টেকেনি, অনেক তাকে বাঘিনী বলে খেপাতো, আমি বারণ করলেও আড়ালে কেউ কেউ বলতো, সেইজন্য সে এখানে থেকে চলে গিয়ে সম্ভবত অন্য কোনো আশ্রমে যোগ দিয়েছে।

–সম্ভবত বলছেন, ঠিক কোন আশ্রমে তিনি যোগ দিয়েছেন, তা আপনি জানেন না?

–না, জানি না।

–আপনি দু'দিন আগে নৈহাটি গিয়েছিলেন?

–আমি কোথায় যাই, না যাই, সে সম্পর্কেও আপনাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

–না, না, কৈফিয়ৎ নয়, ও ভাবে ধরছেন কেন। সামান্য দু-একটা ইনফরমেশন। নৈহাটিতে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

–নৈহাটিতে একজন একটা ছোট বাড়ি দান করেছে, সেখানে আর একটি আশ্রম খোলা হচ্ছে। সেটাই তদারকি করতে গিয়েছিলাম।

–তার মানে, আপনাদের প্রমীলা আশ্রমের একটা ব্র্যাঞ্চ খুলছেন নৈহাটিতে, এই তো। এখানকার এই আশ্রমে অনাথা মেয়েদের রাখা হয়, ঐ নৈহাটির আশ্রমে কাদের রাখা হবে?

–সেখানেও অসহায় মেয়েদেরই রাখা হবে। অলরেডি ছ'-সাতজনকে রাখাও হয়েছে।

–আমি যদি বলি, নৈহাটির সেই আশ্রমে একটিও মেয়ে নেই, সেখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল কয়েকজন আহত নকশাল ছেলেকে? তাদের মধ্যে দু'জন আবার দাগী ক্রিমিনাল, এখনকার ভাষায় লুমপেন প্রলেতারিয়েত। আপনি পরশুদিন একজন ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিলেন নৈহাটির সেই বাড়িতে।

বিনায়ক চৌধুরী কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে বললেন, এবার ওয়াইণ্ড আপ করুন! পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে।

যেন খুব খুদে খুদে অক্ষর পড়তে হচ্ছে, এইভাবে নোট বুকটাকে প্রায় চোখের সামনে এনে অমরেশ দাশগুপ্ত বললেন, হ্যাঁ, নৈহাটির আশ্রম সার্চ করে পাওয়া গেছে দুটি রিভলবার, একুশটা বোমা, তিনটে পাইপগান, চন্দ্রা দেবীর ওখানকার একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাস বই, জেলের কয়েদীদের তিনটে জামা, রিসেন্টলি দমদম জেল ব্রেক থেকে পালানো চার-পাঁচজন ওখানে ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন ধরা পড়েছে অবশ্য।

ফট করে হারীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, আপনার ছেলে সুচরিতও নৈহাটির বাড়িতে ছিল, কিন্তু এবারেও সে পালিয়েছে, তবে বেশী দূর যেতে পারবে না।

আবার চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, কুমুদিনী সাহাকে আপনি সেই নকশাল আশ্রম চালাবার ভার দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা ভদ্রমহিলার বাঘিনী নামটা সার্থক, রেজিস্ট করেছিলেন খুব, শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁকেও ধরে আনা হয়েছে, বাইরে গাড়িতেই আছেন।

ফিক করে হেসে ফেলে তিনি বললেন, তাহলেই বুঝতে পারছেন, চন্দ্রা দেবী, ভুল আমাদের হয়নি, এবারে আর আপনি আমাদের কোনো শাস্তি দিতে পারছেন না। আপনি তৈরি হয়ে নিন, একটু যেতে হবে আমাদের সঙ্গে!

অসমঞ্জ বললেন, এসব কী বলছেন আপনারা? সব মিথ্যে কথা! চন্দ্রাকে আপনারা ধরে নিয়ে যাবেন? শী ইজ আ হোলি পারসন, স্পিরিচুয়াল লীডার অফ সো মেনি ডিভোটিজ! আমি আগে একজন ল-ইয়ার ডেকে আনবো।

বিনায়ক চৌধুরী বললেন, আজকাল আর ল-ইয়ার লাগে না, আমরা এমনিই অ্যারেস্ট করতে পারি। চ্যাঁচামেচি করে কোনো লাভ নেই।

অমরেশ দাশগুপ্ত বললেন, অসমঞ্জবাবু, আপনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের রীডার, এই আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি, আপনাদের ট্রাস্ট ডিডে কি নৈহাটি ব্র্যাঞ্চেরও নাম আছে? মানে, নৈহাটি আশ্রমের কোনো দায়িত্বও কি আপনাকে নিতে হয়?

পাংশুমুখে অসমঞ্জ বললেন, না, না, না, নৈহাটি আশ্রমের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি কিছুই জানি না! সেখানে যে একটা আশ্রম খোলা হয়েছে, সে কথাও আমাকে জানানো হয়নি।

–দেন, উই হ্যাভ নাথিং এগেইনস্ট ইউ। এই আশ্রম সার্চ করে কোনোরকম ইনক্রিমিনেটিং অবজেক্টস পাওয়া যায়নি, সুতরাং এ আশ্রম যেমন চলছে তেমনি চলতে পারে। প্রার্থনা-ট্রার্থনা শেষ হয়ে যবার পর, বাইরের লোকজন সব চলে গেলে আমরা এসেছি। ব্যাড পাবলিসিটি আমরা দিতে চাইনি। শুধু চন্দ্রা দেবী আপাতত অ্যাবসেন্ট থাকবেন!

চন্দ্রা শিরদাঁড়া সোজা করে বসে একদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে।

অমরেশ দাশগুপ্ত বললেন, চন্দ্রা দেবী, আপনি যদি কিছু পোশাক-টোশাক সঙ্গে নিতে চান, নিতে পারেন।

চন্দ্রা মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বললো, পুলিশে চাকরি করলেও আপনারা তো এদেশেরই মানুষ। আদর্শবাদী, বিপ্লবী ছেলেগুলোকে আপনারা ক্রিমিনাল সাজাচ্ছেন, যখন তখন গুলি করে মারছেন, আপনাদের কি বিবেক বলে কিছু নেই?

হঠাৎ বিনায়ক চৌধুরী অস্বাভাবিকভাবে চেঁচিয়ে বললেন, শাট আপ! এসব বাজে বক্তৃতা আমাদের শোনাবেন না! কতকগুলো ফল্স আদর্শের কথা শুনিয়ে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন আপনারা! শুধু শুধু তারা মরছে!

ধমক খেয়েও চুপসে না গিয়ে চন্দ্রা একই রকম ঠাণ্ডা, কঠিন গলায় বললো, নৈহাটিতে নিশীথ সরকার নামে একটি ছেলেকে আপনারা গুলি করে মেরেছেন, জীবনে সে কখনো একটাও অন্যায় কাজ করেনি, সে ছিল তার বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান।

–সি পি এম কিংবা কংগ্রেসের যে-সব ছেলেদের আপনারা মারছেন, তারা কেউ বুঝি কোনো বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান হতে পারে না?

অমরেশ দাশগুপ্ত বললেন, এখন তো সাধারণ গুণ্ডা-বদমাশরাও যাকে তাকে খুন করে নকশালী বিপ্লব বলে চালাচ্ছে। বেশ মজা পেয়েছে ওরা। এই তো হারীতবাবুর ছেলেই অন্তত তিনটে খুন করেছে। আগে সে এক কংগ্রেস লীডারের হয়ে গুণ্ডামি করতো, এখন সে নকশাল হয়ে গেছে! কলেজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকদের মেরে কিসের বিপ্লব হয়, অসমঞ্জবাবু, আপনিই বলুন না!

অসমঞ্জ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি কোনোরকম পলিটিক্সের মধ্যেই নেই! আমার মনে হয়, আপনাদের এখনও ভুল হচ্ছে। চন্দ্রাও কখনো রাজনীতি নিয়ে...নৈহাটির বাড়িটায় আপনারা যে সব আর্মস পেয়েছেন, সেগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা রেখে যায়নি তো?

–নৈহাটিতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা? হাসালেন মশাই! চন্দ্রা দেবী, চলুন, চলুন, আর দেরি করে কী হবে?

চন্দ্রা আর হারীতকে এক গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলেও রাখা হলো না একই জায়গায়। চন্দ্রাকে সেদিনের পর আর হারীত দেখেনি, চন্দ্রার ভাগ্যে কী ঘটেছে তাও সে জানে না।

পশ্চিম বাংলায় ফিরে আসার ব্যাপারে হারীতের ওপরে যে একটা নিষেধাজ্ঞা ছিল, সে ব্যাপারটা একবারও উল্লেখ করেনি পুলিস। তারা শুধু সুচরিত সম্পর্কে আগ্রহী। মোহনবাগান লেনে আনন্দমোহনের সঙ্গে দেখা করার পর থেকে হারীতের গতিবিধি সবই পুলিসের জানা। হারীত বনগাঁ সীমান্তে গিয়েছিল কেন? সেখানেই কি কোথাও লুকিয়ে আছে সুচরিত! কিংবা সে বর্ডার ক্রশ করে ওপারে পালিয়েছে? কাশীপুরের রিফিউজি কলোনিও সার্চ করে দেখা হয়েছে, সেখানেও সুচরিত নেই। চন্দ্রার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে হারীতই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে তার ছেলেকে, সেই জায়গাটা কোথায়?

পুলিশ একই কথা বারবার বলে। ঐ অমরেশ দাশগুপ্ত নামে লোকটির ধৈর্য অসীম, একটুও রাগ করেন না, হাসিমুখে বলেন, হারীতবাবু, আপনি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছেন না, আমাদের হাতে ধরা পড়লে তবু আপনার ছেলের বাঁচার আশা আছে। সে জেল খাটবে। বাইরে থাকলে একদিন না একদিন সে খুন হবেই। কংগ্রেসের একজন বড়গোছের চাঁইয়ের হত্যার ব্যাপারে তার নাম জড়িত, কংগ্রেসের ছেলেরা বদলা না নিয়ে ছাড়বে?

পুলিশের কাছ থেকেই হারীতকে তার ছেলের জীবন কাহিনী শুনতে হয়। অথচ পারুলবালা এতদিন আশা করেছিল, কলকাতার ভালো বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে তার মেধাবী ছেলে অনেক লেখাপড়া শিখবে, একদিন সে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে!

দিন সাতেক পরে গারদ থেকে বার করে হারীতকে চাপানো হলো একটা ঢাকা গাড়িতে, ভেতরে পাহারাদারদের সঙ্গে আরও দু'জন কয়েদী। সেই দু'জনই কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে, হাত-পা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। চোখ চেয়ে থাকলেও মনে হয় যেন ঘুমন্ত। বুঝতে অসুবিধে হয় না, তাদের এত মারধর করা হয়েছে যে এর মধ্যেই তারা প্রায় অর্ধমৃত। আশ্চর্য, হারীত মারধরও খায়নি, তার হাত-পাও বাঁধেনি। সাধুর পোশাক পরেছিল বলেই কি তার প্রতি এতখানি খাতির?

তখন প্রায় শেষ বিকেল। শহর ছাড়িয়ে গাড়িটা ছুটলো গ্রামের দিকে। কিছুদূর যাবার পরই শুরু হলো ঝড় বৃষ্টি, ভাঙা রাস্তায় গাড়িটা লাফাচ্ছে অনবরত। ঢাকা গাড়ি হলেও ওপরটা ফুটো, জল আসছে সেখান থেকে। দু'জন সিপাহী গায়ে বর্ষা জড়িয়ে নিয়ে সিগারেট টানতে লাগলো। ক'দিন ধরে

এমনিতেই কাশি হয়েছে হারীতের, বৃষ্টি ভিজলে আরও বাড়বে। কিন্তু সে দুশ্চিন্তার থেকেও সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধে তার মন বেশী আনচান করে উঠলো। এই কদিনের গারদবাসে সে ধূমপানের কোনো সুযোগ পায়নি।

সে হঠাৎ বলে উঠলো, জয়বাবা কালাচাঁদ! জয় শংকর! ও সেপাইজী, একটা কথা বলবো!

একজন কনস্টেবল খেঁকিয়ে উঠে বললো, এই চুপ যা!

হারীত তবু বললো, বোম ভোলানাথ! বোম শংকর! সেপাইজী, আমি সাধু মানুস, আমায় ভুল করে ধরেছে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলবো, সরকার বাহাদুর ভুল করে ধরলেও আমায় কোনো অযত্ন করে নাই! তোমাদের মঙ্গল হোক, বাল বাচ্চারা সুখে থাকুক!

আশীর্বাদের ভঙ্গিতে সে হাত তুললো সিপাহীদের দিকে। মনে মনে সে একটা পৈতের অভাব বোধ করলো। সাধুই যখন সেজেছে, তখন একটা পৈতে লাগালেই বা কী ক্ষতি হতো! আশীর্বাদের সময় পৈতেটা হাতে জড়িয়ে নিলে আরও ভাল দেখায়। দেশে থাকতে সে পণ্ডিতমশাইদের এই ভাবেই আশীর্বাদ করতে দেখেছে।

সিপাহীদের মধ্যে যে একটু বয়স্ক সে হাতজোড় করে হারীতের দিকে একটা নমস্কার জানিয়ে ফেললো। তার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হারীত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, একটু সিগারেট টানতে দাও বাবা! তোমাদের পুণ্য হবে! ছেলে পুলিসে নোকরি পাবে, মেয়ের শাদী হবে দরোগার সাথে।

বয়স্ক সিপাহীটি একটু হেসে নিজের অর্ধেক সিগারেটটাই এগিয়ে দিল হারীতের দিকে।

লোভীর মতন সেটা নিয়েই হারীত জোরে টান দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাশিতে নুয়ে পড়লো। কয়েকদিনের অনভ্যাস। কষ্ট হবে খুব, তবু নেশার সুখটাও পাওয়া যাচ্ছে খানিকটা।

অন্য ছেলে দুটি একটু নড়ে চড়ে বসতেই তাদের হাত-পায়ের শিকলের ঝনঝন শব্দ হল। ছোকরা সিপাহীটা রাইফেলের কুঁদো দিয়ে একজনের কাঁদে খোঁচা দিয়ে বলল, কেয়া হুয়া রে?

তীব্র ঝলকে একটা বিদ্যুৎ আর জোর শব্দে বজ্রপাত হল এই সময়ে।

হারীতের একবার মনে হল, ঐ ছেলে দুটির হাত-পা যদি শিকল বাঁধা না থাকত, তা হলে সেপাই দুটোকে কাবু করে এই গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করা যেত একবার। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গাড়ির গতি বেশী নয়, অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে পালানোও শক্ত হত না। তার নিজের জীবন তো শেষ হতেই চলেছে, এই অল্পবয়েসী ছেলে দুটিকে কোনক্রমে বাঁচানো যায় না? কী এমন দোষ করতে পারে এরা!

কিন্তু ছেলেদুটির সমস্ত উদ্যমই যেন নষ্ট হয়ে গেছে। মার খেয়ে তারা কোকাচ্ছে, ফুঁসে উঠতে পারছে না। আহা রে, ছেলেদুটির মায়েদের নিশ্চয়ই বুক ফাটছে শোকে-দুঃখে।

এক সময় গাড়ি এসে থামলো বসিরহাট থানায়। অমরেশ দাশগুপ্ত সেখানে আগে থেকেই বসে আছেন, তাঁর হাতে চায়ের কাপ। গাড়ি থেকে তিনজন কয়েদীকে নামাবার পর তিনি একজন সাব ইনসপেকটরকে বললেন, অন্য ছেলে দুটিকে নিয়ে যেতে। তারপর হারীতকে আপ্যায়ন করে বললেন, আসুন হারীতবাবু, আসুন, চা খান! এই কৌন হ্যায়, একঠো কুর্সি লাও!

সত্যিই অতবড় একজন পুলিস সাহেবের পাশে একটি চেয়ারে বসতে দেওয়া হল হারীতকে। গরম চা দেওয়া হল। দাশগুপ্ত সাহেব নিজে থেকেই বললেন, সিগারেট খাবেন নাকি, এই নিন।

তারপর স্মৃতি রোমন্থনের ভঙ্গিতে তিনি বললেন, আমারও বাড়ি ছির খুলনায়, বুঝলেন। আপনি তো তো এক সময় মূর্তি-টুর্তি গড়তেন, তাই না? আমাদের দেশের বাড়িতে খুব বড় করে দুর্গাপুজো হত, প্রতিমা যে বানাতো, তার নাম সৃষ্টিধর, কী অপূর্ব হাত ছিল তার, মায়ের চোখ একেবারে জীবন্ত। খুব নাম ছিল আমাদের বাড়ির প্রতিমার। সেই সৃষ্টিধরের চেহারা ছিল অনেকটা আপনারই মতন। মতন। সে এখন কোথায় আছে কে জানে, হয়তো আপনারই মতন কোনো রিফিউজি ক্যাম্পে।

এসব কথায় না ভুলে হারীতে লঘু সুরে জিজ্ঞেস করল, আমাকে এত দূরে নিয়া আসলেন ক্যানো সার? এইখানে বুঝি ফাঁসি হয়?

অমরেশ দাশগুপ্ত চমকে উঠে বললেন, ফাঁসি! আপনাকে ফাঁসি দেওয়া হবে কেন? তাছাড়া আমরা কি ফাঁসি দেবার মালিক? সে তো আদালতের ব্যাপার, আমাদের কাজ ইনভেস্টিগেট করা। হঠাৎ ফাঁসির কথা আপনার মনে এল কেন?

মুচকি হেসে হারীত বলল, গারদের মইধ্যে অইন্যরা বলতেছিল কি না যে এখানে আর একরকম ফাঁসি হয়। মাঠের মাঝখানে গাড়ি থিকা লামাইয়া দিয়া পিছন থিকা দুই একখান গুলি চালাইলেই, ব্যাস, কাম ফতে! জজ-ম্যাজিস্টেটের জামেলাও নাই!

অমরেশ দাশগুপ্ত রেগে উঠে বললেন, বাজে কথা! এসব কথা কে বলেছে আপনাকে? কে কে বলেছে, তাদের নাম বলুন!

–আমি কি কাউর নাম জানি? অন্ধকারের মইধ্যে মুখও দেখি নাই! গাড়িতে আসতে আসতে দ্যাখলাম, এই দিকে বেশ সুন্দর সুন্দর ফাঁকা মাঠ আছে। আমি মরলে, কাশীপুরের নেতাজী কলোনিতে আমার এক পালিত পোলা আছে, তারে একটা খবর দিবে, সার? সে ঠিক আমার পোলা না, নাতি, কিন্তু আমারে বাবা বইল্যা ডাকে। তার নাম নবা!

–আহ্, হারীতবাবু, আপনি মিছিমিছি এসব বাজে কথা বলছেন। আপনার মরার কোশ্চেন উঠছে কোথায়? আপনাকে এ পর্যন্ত কেউ টর্চার করেছে? আমি নিজে ইস্ট বেঙ্গলের লোক, আই হ্যাভ স্ট্রং সিমপ্যাথি টু দা রেফিউজিস্!

–আমি ইংরেজি বুঝি না, সার!

–বলছি যে, রেফিউজিদের প্রতি আমার পুরো সিমপ্যাথি, মানে, ইয়ে, সহানুভূতি আছে। তারা তো আমাদেরই জাত ভাই।

–রিফুজিদের উপর গভরনমেন্টের যা সহানুভূতি, তার চোটেই আমরা কোনোরকমে আধমড়া হয়ে আছি। আর বেশী সহানুভূতি দেখাইলে একেবারে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যাব, সার। সহানুভূতির কথা শোনলেই আমার ভয় করে। এই সহানুভূতির ঠ্যালায় আমাগো কতগুলো ক্যাম্পে যে ঘুরতে হইছে তা তো জানেন না!

–হারীতবাবু, আপনি বড্ড সিনিক হয়ে গেছেন। গভর্নমেন্ট যথাসাধ্য করছে, কিন্তু এত রেফিউজি, তার ওপর দেখুন না, ইস্ট পাকিস্তান থেকে আবার লাখ লাখ আসতে শুরু করেছে!

–আমাকে এতদূরে কেন আনলেন, তাতো কইলেন না?

–আপনাকে একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে। তারপরেই আপনার ছুটি।

–কী ছোট কাজ?

–বসুন, চা খান ভাল করে। ইস, একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি। আপনার বড় ছেলেটাকে কলকাতায় রেখে গেলেন কেন, হারীতবাবু? আপনাদের সঙ্গে সে দণ্ডকারণ্যে গেলে সংসারের অনেক সাহায্য করতে পারত। আই অ্যাম সরি টু সে, কলকাতার আশেপাশে যে-সব রেফিউজি থেকে গেছে, তাদের ছেলেরা হয় বড় বেশী পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, অথবা ক্রিমিন্যাল হয়ে যাচ্ছে!

–আপনি ইস্টবেঙ্গলের মানুষ হইলেও আপনার ছেলেমেয়েরা ভাল আছে তো, সার?

একটু বাদেই হারীত দেখল, সে শিকল-বাঁধা ছেলে দুটিকে ঠেলতে ঠেলতে এনে আবার তোলা হল গাড়িতে। অল্প আলোতেও দেখতে পাওয়া যায়, তাদের দু'জনেরই নাক দিয়ে গড়াচ্ছে রক্তের ধারা।

অমরেশ দাশগুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে কাকে যেন জিজ্ঞেস করলেন, ওরা আইডেন্টিফাই করেনি তো? জানতাম!

তারপর তিনি হারীতের হাত ধরে বললেন, এবার আপনি চলুন!

একজন লোক ছাতা মাথায় ধরলো অমরেশ দাশগুপ্তর, হারীত ভিজছে দেখে তিনি তাকে কাছে টেনে নিলেন। মানুষের কাছ থেকে এত ভাল ব্যবহার পেতে দেখলেই হারীতের ভয় করে। এই লোকটার মতলোব কী? ছেলের অপরাধে বাপকে মেরে ফেলবে? অমরেশ দাশগুপ্তর ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে সে আর একটা সিগারেট চাইল। যা থাকে কপালে, আগে তো দামী সিগারেট খেয়ে নেওয়া যাক।

ওরা এসে দাঁড়াল একটা টিনের ঘরের সামনে। দরজাটা ভেজানো। সেটা খোলার আগে অমরেশ দাশগুপ্ত বলল, একটু মন শক্ত করুন, হারীতবাবু! আপনাকে এমন একটা দৃশ্য দেখতে হবে, হঠাৎ খুব আঘাত পাবেন। আই অ্যাম সরি, কিন্তু আমাদের চাকরিতে এরকম কতবার যে করতে হয়!

ঘরের মধ্যে খড়ের ওপর শোয়ানো একটি মনুষ্য মূর্তি। সাদা চাদর দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত

ঢাকা। একটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে, বিচ্ছিরি একটা ভ্যাপসা গন্ধ, কিচ মিচ শব্দ করে পালালো কয়েকটা ইঁদুর।

একজন কনস্টেবল টান মেরে সরিয়ে দিল চাদরটা। এত পোড় খাওয়া মানুষ হয়েও আঁতকে উঠল হারীত। সম্পূর্ণ নগ্ন যুবকটির বুক থেকে পেটের অংশটা একেবারে ছিন্নভিন্ন, মনে হয় কেউ যেন কোদাল দিয়ে কুপিয়েছে। ইঁদুরেও টুকরে খেয়েছে সেই মাংস। তবে মুখটা প্রায় অবিকৃত, বয়েস হবে পঁচিশ তিরিশের মধ্যে মাথা ভর্তি চুল।

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে অমরেশ দাশগুপ্ত বললেন, বাঁ পায়ের পাতাটা দোমরানো, খুঁড়িয়ে হাঁটতো, সেই জন্য ওর ডাক নাম ল্যাঙা। আর কোন ব্যার্থ মার্ক দেখতে পাচ্ছেন? আমি তো বলেইছিলাম, হারীতবাবু, আমাদের কাছে ধরা দিলে প্রাণে বেঁচে যেতে পারত। এই খেলায় যারা একবার নামে, তারা শেষ পর্যন্ত কেউ বাঁচে না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে নিল হারীত। সেই মৃতদেহের ওপর আচড়ে পড়ে সে আর্তনাদ করতে লাগল, ওরে ভুলু! ভুলুরে! আমার কপালে এই ছিল! তোর মায়রে আমি কী কমু! তোর মায় কত আশা কইরা আছে, ওরে ভুলুরে, তুই আছিলি আমাগো শেষ আশা-ভরসা।

একজন কনস্টেবল হারীতের কাঁধ ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল। অমরেশ অন্য একজনকে বললেন, নোট করে নিন, আর একটা ডাক নাম ভুলু! আহা, ভদ্দরলোককে একটু কাঁদতে দিন না, এতদিন পর ছেলের দেখা পেলেন।

হারীত প্রায় বুক আছড়ে কাঁদতে লাগল। বারবার সে একই কথা বলতে লাগল, তোর মায়রে কী কবো, ভুলু! তুই এত নিষ্ঠুর হইতে পারলি, মায়ের কথা একবার ভাবলি না, তুই ল্যাখাপড়া শিখা আমাগো উদ্ধার করবি, সেই ভরসায় আছিলাম! ভুলুরে–

একটু বাদে অমরেশ জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে এ ঠিকই আপনার ছেলে সুচরিত। কোনো আইডেনটিটি মার্ক, বার্থ মার্ক আছে কিনা মিলিয়ে দেখেছেন?

ইংরিজি না বুঝেও হারীত বলল, ঐ যে নাকের উপর তিল! সেই চক্ষু, সেই নাক, কে আমার ভুলুর এমন সর্বনাশ করল, বলেন সার! পুলিসে মারে নাই, তয় কে মারছে?

অমরেশ বললেন, সে সব কথা এখন থাক। বডি এখন পোস্ট মর্টেমে যাবে। আপনারা যদি পরে বডি দাহ করতে চান লর্ড সিন্‌হা রোডে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কাল-পরশু। হারীতবাবু, আপনাকে আর আটকে রাখতে চাই না। ইউ আর ফ্রি!

একটা রিপোর্ট তৈরিই ছিল, হারীত তাতে টিপসই দিল। যদিও সে খানিকটা লেখাপড়া জানে, নাম সই করতে তো জানেই, কিন্তু কেউ তাকে সই দিতে বলল না, আগেই বুড়ো আঙুলের ছাপ নেবার জন্য নিয়ে এসেছিল স্ট্যাম্প প্যাড।

অমরেশ আর হারীতের সঙ্গে কোনো কথা না বলে বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে ডেড বডিটা শহরে পাঠাবার জন্য কিছু নির্দেশ দিলেন। হারীতকে তিনি হঠাৎ মুক্তি দিলেও এই রাতে, বৃষ্টির মধ্যে সে কী করে ফিরবে, তা চিন্তাও করলেন না।

হারীত থানার কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল, কাছেই একটা বাজার, সেখানে কিছু দোকানপাট খোলা আছে। বাজারটা পেরিয়েও চলে গেল হারীত, এটুকু ফাঁকা জায়গায় এসে সে আপন মনে চেঁচিয়ে উঠলো, জয় বাবা, কালাচাঁদ! প্রভু, তুমি ধন্য!

হারীতের এখন নাচতে ইচ্ছে করছে। গুরু কালাচাঁদ ঠিক সবসময় তাকে রক্ষা করে চলেছেন। এবার তাকে মার খেতে হয়নি, গারদেও থাকতে হয়নি বেশীদিন। গুরু কালাচাঁদের দয়াতেই বেঁচে আছে তার ছেলে সুচরিত। ভুলুর নাকের গভায় কস্মিন কালেও অতবড় তিল ছিল না। ঐ মৃত যুবকটি আর কোন মা-বাবার স্নেহের দুলাল, মুখখানা দেখলে মনে হয় ভাল ঘরের ছেলে। লেখাপড়া জানে। কিন্তু সে কিছুতেই সুচরিত নয়। পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করতে পেরেছে হারীত। এখনও তার সারা মুখ চোখের জলে মাখামাখি।

॥ ৩১ ॥

আজ ছুটির দিন, অতীন ঠিক করেই ফেলেছে যে আজ সারাদিন সে বাড়ি থেকে বেরুবে না। এমন কি ঘর থেকে বেরুবারও কোনো দরবার নেই। কোথায় যাবে সে? এক একদিন বাইরের কোনো

দৃশ্য না দেখলে নিজের ঘরটাই পৃথিবী হয়ে যায়। এক একটা দিন তো নিজেকেও দেখা দরকার। অন্য মানুষজনের মধ্যে থাকলে নিজের দিকে চোখই পড়ে না।

ঘুম ভাঙার পরেও অনেকক্ষণ সে বিছানা ছেড়ে উঠলো না। নিচে গেলে খবরের কাগজ আনা যায়, ইউনিভার্সিটির একটা দৈনিক পত্রিকা বিনা পয়সায় পায় অতীন। কিন্তু একদিন কাগজ না পড়লে কী আসবে যাবে? ডাক পিওন এসে যায় বেশ সকালে, এখানকার সব বিদেশী ছাত্রেরই ঘুম ভাঙার পর ছুটে গিয়ে চিঠির বাক্সটা খুলে দেখা একটা নেশা; রোজ কিছু না কিছু চিঠি থাকবেই, তার মধ্যে অধিকাংশই বিজ্ঞাপন, তার মধ্যে আবার নানারকম উপহারও থাকে, ব্লেড, টুথ পেস্ট, পুঁচকে পুঁচকে শিশিতে পারফিউম, একদিন সে একটা মাঝারি সাইজের বোতলের রান্নার তেলও পেয়েছিল। এই সপ্তাহেই অতীন দেশ থেকে মায়ের চিঠি পেয়েছে, আজ আর কোনো দরককারি চিঠি পাবার আশা নেই।

সাড়ে নটার সময় অতীন উঠলো। তার শরীরে কোনো পোশাক নেই। রাত্তিরে এই অবস্থাতেই সে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে শোয়। ঘর থেকে বেরুতে না হলে শুধু শুধু গায়ে জামা কাপড় চাপাবারই বা কী মানে হয়? দু'দিন ধরে বেশ পচা গরম পড়েছে। এ দেশে ঘর গরম করার ব্যবস্থা আছে, ঘর ঠাণ্ডা করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এই সাহেবদের দেশেও যে এত গরম পড়ে তা অতীন আগে অনুভব করেনি। নিউ ইয়র্ক কিংবা লন্ডনেও সে গ্রীষ্মকালে গরম পেয়েছে, কিন্তু এতটা নয়, বস্টনের মতন বন্দর-শহরে যখন হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তখন রীতিমতন চিটচিটে গরম লাগে।

দ্রুত ব্রেক ফাস্ট সেরে নিয়েই অতীন পড়ার বই হাতে নিল। পাগলের মতন পড়াশুনো শুরু করেছে সে, ঠিক কলকাতায় পরীক্ষার আগেকার দিনগুলোর মতন। সে কলকাতার কথা, বন্ধুবান্ধবদের কথা একবারও ভাববে না, অলি কিংবা শর্মিলার কথা মনেও আনবে না। তাকে পড়াশুনা শেষ করে এদেশ থেকে পালাতে হবে। আমেরিকা ছাড়ার আগে সে বস্টন থেকে অন্তত দূরে চলে যাবে।

সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় অতীত হাতে একটা বই নিয়ে ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে দৌড়োচ্ছে। বিছানায় শুয়ে কিংবা টেবিলে বসে তার পড়ায় ঠিক মন লাগে না। দৌড়ে দৌড়ে পড়বার একটা সুবিধে, তাতে পড়াও হয়, খানিকটা ব্যায়ামও হয়।

মাঝে মাঝে থামতে হয় অবশ্য। জুডির তৈরি গ্রগ খেয়ে তার সর্দিটা অনেকটা কমেছে বটে কিন্তু খঙখঙে কাশিটা একেবারে যায়নি। সে জন্য সে সিগারেট খাওয়া কমিয়েছে কিন্তু কোনো ওষুধ খাবে না প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে।

এক সময় তার সারা শরীর ঘামে জবজবে হয়ে গেল। ব্যায়াম হয়েছে ভালোই, পড়াশুনোও মন্দ চলছে না। এখন মিনিট দশেক রিসেস নেওয়া যায়। তেষ্টাও পেয়েছে খুব। ঘরে গোটা ছয়েক বীয়ারের ক্যান আছে, এ বাড়ির একটি পাঞ্জাবী ছেলে নিজের ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় তার একটা মিনি ফ্রিজ পনেরো ডলারে বিক্রি করে গেছে অতীনকে। অতীন বীয়ার নিল না, কফির জন্য জল চড়ালো। গতকালই সে মাইনে পেয়ে অনেক কিছু বাজার করে এনেছে, কিন্তু সে স্কচ বা বার্বনের মতন হার্ড ড্রিংকস কিছু কেনেনি, এক প্যাক বীয়ার ক্যান যে এনেছে তাও ঘরে কোনো অতিথি এলে তাকে অফার করবার জন্য। অতীন এখন প্রতিটি ডাইম ও নিকেল জমাতে চায়। সিদ্ধার্থর কাছে এখনো তার কিছু ধার আছে। মাস গেলে তার বাড়িভাড়া ও অন্যান্য খরচ বাবদ মাইনের অর্ধেকের বেশী খরচ হয়ে যায়। হঠাৎ প্লেনে চেপে এ দেশ থেকে পালানোও তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে তো আসলে নির্বাসিত, কবে তার মেয়াদ শেষ হবে?

ঘামে ভেজা শরীর নিয়েই অতীন ধপাস করে শুয়ে পড়লো বিছানায়। চাদরটা অনেকদিন কাচা হয়নি। শর্মিলা এসে দেখলে প্রথমেই একটানে চারদটা খুলে ফেলে দিত। এই চাদরটাও শর্মিলারই কেনা। শর্মিলা এ ঘরে আর কোনোদিন আসবে না।

শর্মিলাকে নিশ্চয়ই কেউ অলির কথা বলে দিয়েছে। ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল শর্মিলার? তাছাড়া আর তো কোনো ব্যাখ্যা নেই। অলির ওপর অবিচার করেছে অতীন, সে ব্যাপারটা তার নিজের মুখেই বলা উচিত ছিল শর্মিলাকে। তা সে পারেনি, সেই জন্য সে শাস্তি পেয়েছে। তার জবিনে এখন অলিও নেই, শর্মিলাও নেই। না, অলিকেও সে কিছুতেই মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। যাক, তার আর কারুকেই দরকার নেই।

মাঝে মাঝে একটা সাঙ্ঘাতিক নৈরাশ্য যেন দৈত্যের মতন ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কী হলো এই জীবনে? একটার পর একটা ভুল। তাহলে কি আর বেঁচে থাকার কোনো মানে হয়? অথচ, আশ্চর্য, মৃত্যু তাকে ছোঁয় না। এই যে সেদিন তার সাইকেলের সঙ্গে একটা গাড়ির ধাক্কা লাগলো, তবু তার শরীরে একটা আঁচড়ও পড়লো না? এইসব দুর্ঘটনায় যখন-তখন লোক মারা যায়।

গায়ের ঘামটা শুকোচ্ছে না, একটা জানলা খুলতে হবে, যদি হাওয়া আসে একটু। কফি বানিয়ে, কাপটা হাতে নিয়ে একদিকের পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে অতীন জানলার একটা পাল্লা খুলে দিল। তার কোমর পর্যন্ত দেখা যাবে না। বাইরে একেবারে তলোয়ারের মতন রোদ। এখান থেকে একটি বাড়ির বাগান সোজাসুজি চোখে পড়ে। এই রোদের মধ্যেও বাগানে একটা ডেক-চেয়ারে আধোশোয়া হয়ে বসে আছে একটি যুবতী মেয়ে। গায়ের চামড়া ট্যান করার কী সাঙ্ঘাতিক চেষ্টা। শুধু একটা জাঙ্গিয়া পরা, কিছু একটা ক্রিম মেখেছে সারা গায়ে, মেয়েটিকে দেখাচ্ছে কোনো অয়েল পেইন্টিং-এর মতন।

অতীন মেয়েটিকে দেখছে না, এমনি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নৈরাশ্যের দৈত্যটা ছাড়ছে না তাকে। খালি মনে হচ্ছে, কী হলো, এ জীবনে কী হলো? দেশের সমাজব্যবস্থা পাল্টাবার জন্য পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে শুধুমাত্র একটা মানুষ খুন করে পালাতে হলো তাকে? না, না, মাঠের মধ্যে ঐ লোকটাকে অতীন মারেনি। যে-মৃত্যু সবসময় অতীনকে রক্ষা করে, সেই মৃত্যুই অতীনের হাত দিয়ে ওকে শেষ করে দিয়েছে। নইলে, জীবনে কক্ষনো বিভলভার ছোঁড়েনি অতীন, তবু তার গুলি লোকটার গায়ে লাগলো! অবশ্য তারপরেও অতীন একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে লোকটাকে পিটিয়েছিল.....তখন সে ভেবেছিল, মানিকদা শেষ! একজন বিপ্লবী হয়ে সে তার প্রতিশোধ নেবে না? মানিকদা একটাও চিঠি লিখলেন না, এতদিনের মধ্যে, এমন কি কৌশিক, তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু কৌশিক, সেও কি ভুলে গেছে অতীনকে?

বাগানের সেই যুবতীটি হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে বোঝা গেল, তার উর্ধ্বাঙ্গেও কোনো বক্ষবন্ধনী নেই। সে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে গেল একটা ন্যাসপাতি গাছের নিচে। আশপাশের বাড়ি থেকে কেউ তোকে দেখছে কি না, তাতে তার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। এরা শরীর দেখাতে ভালোবাসে। অতীন এবার লক্ষ্য না করে পারলো না যে মেয়েটির সারা শরীরের তুলনায় সুগোল স্তনদুটি বেশী ফর্সা, ব্রেসিয়ারের পরিষ্কার দাগ।

সঙ্গে সঙ্গে তার দরজায় খট খট শব্দ হলো। প্রচণ্ড অপরাধবোধে কেঁপে উঠলো অতীন। যেন সে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পর্দা টেনে দিল সে। কিন্তু নিজের এই অবস্থায় দরজাই বা খোলে কী করে?

জাঙ্গিয়টা পায়ে গলাতে গলাতে সে জিজ্ঞেস করলো, হু ইজ ইট?

বাইরে থেকে শোনা গেল, আমি সোমেন। আপনার টেলিফোন।

—একটু ধরতে বলুন, প্লীজ। আমি এক্ষুণি আসছি!

এই সময় কে তাকে টেলিফোন করবে? পয়সা সস্তা হয় বলে সিদ্ধার্থ করে রাত দশটার পর। কাল সন্ধেবেলা জুডি একবার ফোন করেছিল, অতীন দু'দিন সন্ধেবেলা ল্যাবে নিজের কাজ করতে যায়নি, সেইজন্য সে অতীনের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিচ্ছিল। জুডি একদিন তাকে রান্না করে খাইয়েছে। অতীনের উচিত তাকেও একদিন ডেকে খাওয়ানো। এদেশে সবসময় একটা অদৃশ্য বিনিময় প্রথা চলে।

প্যান্টের মধ্যে একটা শার্ট গলিয়ে নিয়ে বেল্টটা বাঁধতে বাঁধতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো অতীন। লিভিংরুমে একা মুখ চুন করে বসে আছে আবিদ হোসেন। ক'দিন ধরেই ওর মন খুব খারাপ। দেশ থেকে কোনো চিঠি পাচ্ছে না, টেলিফোনেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

ফোনটা তুলে, ওদিকের কণ্ঠস্বর শুনে অতীনের শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা জলের স্রোত নেমে এলো। শর্মিলা? সত্যি শর্মিলা?

শর্মিলার গলায় কোনো আবেগ নেই, সে শান্তভাবে বললো, সরি, বাবলু, তোমায় বিরক্ত করলুম। তুমি কি ব্যস্ত ছিলে?

অতীনও নিস্পৃহ গলায় বললো, সেরকম কিছু না।

শর্মিলা বললো, আমি একটা চাবি খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি কি আমায় একটু হেল্প করতে পারবে?

অতীন বললো, চাবি? কিসের চাবি?

—আমি তো প্রায়ই চাবি হারিয়ে ফেলি, এই চাবিটা অনেকদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না, মানে, আমার

কলেজের ফাইল ক্যাবিনেটের চাবি, অনেক দরকারি কাগজপত্র আছে, খুলতে পারছি না বলে এত অসুবিধে হচ্ছে–

–সেজন্য আমি কী করতে পারি?

–চাবিটা কি বাই এনি চান্স তোমার ঘরে কখনো ফেলে এসেছি? তুমি কি ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং করার সময় কোনো চাবি পেয়েছো?

শর্মিলার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর অতীন একদিনও ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালায়নি। কিন্তু ফ্লোরে কোনো চাবি পড়ে থকলে কি সে দেখতে পেত না?

–না, কোনো চাবি পাইনি!

–তোমার ওয়ার্ডরোবে আমি মাঝে মাঝে আমার হ্যান্ডব্যাগটা ঝুলিয়ে রাখতুম। ওখানে যদি পড়ে গিয়ে থাকে, যদি একটু খুঁজে দ্যাখো.....

–ঠিক আছে, দেখবো খুঁজে....

–বাবলু, কাল ক্যাবিনেটটা খোলা খুবই দরকার, আমার প্রফেসার একটা কাজের ভার দিয়েছিলেন, সেটা যদি কাল সাবমিট না করি....আমি ফোনটা ধরে আছি, তুমি একটু ওয়ার্ডরোবটা খুঁজে দেখে এসে বলবে প্লীজ?

–আচ্ছা ধরো, দেখে আসছি!

সে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই আবিদ হোসেন গোমড়া মুখে বললো, আমি অপারেটরকে একটা কল বুক করেছি, এনি মোমেন্ট এসে যেতে পারে।

অতীন বললো, কানেকশন পেয়ে গেলে ওরা ইন্টারসেপ্ট করবে, তখন পানি লাইন নিয়ে নেবেন।

দৌড়ে সে উঠে গেল ওপরে। তার মুখটা তেতো লাগছে। শর্মিলা তার সঙ্গে শুধু একটা চাবি নিয়ে কথা বলে গেল? যেন একটা চাবি খুঁজে পাওয়া ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে তার অতীনের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহই নেই। তার গলায় অতিরিক্ত ভদ্রতার কৃত্রিম সুর।

ওয়ার্ডরোবে কোনো চাবি পড়ে নেই জেনেও অতীন ভারো করেই খুঁজে দেখলো। শর্মিলা এখানে তার হ্যান্ডব্যাগটা ঝুলিয়ে রাখতো ঠিকই। একদিন বৃষ্টি ভিজে এসে শর্মিলা তার শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ সব খুলে রুম হিটারে শুকোতে দিয়ে অতীনের প্যান্ট-শার্ট পরে নিয়েছিল। সে সব যেন গত জন্মের কথা।

ফিরে এসে অতীন এবার বেশ কঠিন গলাতেই বললো, আমার ঘরে তোমার চাবি কিংবা অন্য কোনো কিছুই পড়ে নেই!

শর্মিলা বললো, এক্সট্রিমলি সরি টু বদার ইউ, বাবলু! কিছুতেই চাবিটা পাচ্ছি না, আই যাস্ট টুক আ চান্স! থ্যাঙ্কস অল দা সেইম! তোমার কাশি হয়েছে?

–কে বললো না, তো!

–দু' একবার কাশছিলে। শরীরের যত্ন নিও।

–থ্যাঙ্কস ফর দা অ্যাডভাইস!

অতীন নিজেই রেখে দিল ফোনটা। তারপর আবিদ হোসেনের দিকে তাকিয়ে বললো, এক্ষনও লাইন পাননি? বসে থাকুন, আশা ছাড়বেন না। গুড লাক!

অতীন ঠিক করলো, নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আবার পড়তে পড়তে সে জানলটা খোলাই রাখবে। পাশের বাড়ির সবুজ বাগানে একজন প্রায় নগ্ন শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখতে দোষ কী? দেখলে তো ভালোই লাগে। জুডিকেও সে দু'একদিনের মধ্যেই নেমতন্ন করে তার ঘরে এনে রেঁধে খাওয়াবে। এতে দোষ কী আছে? জুডি মেয়েটে মোটেই সাধারণ অ্যামেরিকান মেয়েদের মত নয়!

তবু ও ওপরে ওঠবার আগে সে সোমেনের দরজার কাছে দাঁড়ালো। এদেশে থাকতে থাকতে একটা ধন্যবাদ-কালচারে অভ্যস্ত হতেই হয়। থ্যাঙ্কস আর থ্যাঙ্ক ইউ সবসময় ঝুলিয়ে রাখতে হয় ঠোঁটে। একটি অত্যন্ত বিষাক্ত টেলিফোন-ডাক হলেও সোমেন ওপরে গিয়ে অতীনকে এই টেলিফোনের খবর দিয়ে এসেছে, এ জন্য তাকে ধন্যবাদ না জানানো অত্যন্ত অভদ্রতা।

দরজাটা ভেজানো, ভেতরে গীটার বাজিয়ে গান চলছে। মনে হচ্ছে, সোমেন ছাড়াও ঘরে আরও কেউ আছে। সোমেনের এক অ্যামিরিকান বান্ধবী আসে মাঝে মাঝে। অতীন দরজায় মৃদু টোকা দিল।

সোমেনের বদলে অর্ধেক দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে একটি সুদর্শন যুবক বললো, ইয়েস? কাম অন ইন!

অতীন বললো, আমি সোমেনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

অপরিচিত যুবকটি সরে গেল, সোমেন দরজার কাছে আসতেই অতীন বললো, আই যাস্ট ওয়ান্টেড টু থ্যাঙ্ক ইউ!

সোমেন অতীনের হাত ধরে টেনে বললো, আরে মশাই, ভেতরে আসুন না! এখানে আড্ডা হচ্ছে। আমার এক বন্ধু সদ্য লন্ডন থেকে এসেছে।

অতীনের আপত্তি সত্ত্বেও সোমেন ছাড়লো না, অতীনকে ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরটি সিগারেটের ধোঁয়ায় ভর্তি। কিন্তু গন্ধটা সিগারেটের তামাকের নয়, অন্য কিছুর। সেই অপরিচিত যুবকটি ছাড়াও সোমেনের বান্ধবী লিন্ডা রয়েছে, তার ঢুলু ঢুলু চোখ দেখেই বোঝা যায়, সে গাঁজা টেনেছে। এর আগে দু'একদিন কথা বলেই অতীন বুঝেছে, এই লিন্ডা নামের মেয়েটি একটি প্রাক্তনী হিপিনী এবং এখনও ভারত-উন্মাদিনী। এর কাছে ভারতবর্ষ মানে গাঁজা-চরস-সাধু-সন্ন্যাসী-অতীন্দ্রিয় দর্শন এবং মোক্ষ সাধনা। অর্থাৎ দু'হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষ।

সোমেন বললো, লিন্ডাকে তো তুমি চেনোই, আর এ আমার বাল্যবন্ধু, লন্ডন থেকে পরশুই এ দেশে পা দিয়ে দেশটাকে ধন্য করেছে, এর নাম বাপ্পা, সরি, বাপ্পা ওর ডাক নাম, ভালো না জ্যোতি রায়, ও অবশ্য নিজেকে বলে জিওটি রে! খুব সাহেব তো! আর এ আমার নেবার। সরি, হাউসহোল্ড মেট অ্যান্ড গ্রেট স্কলার অতীন মজুমদার! আ রিয়াল নথ্শ্যালাইট লীডার ফ্রম বেঙ্গল!

অতীন বুঝতে পারলো, সোমেনও আজ তার বান্ধবীর পাল্লায় পড়ে গাঁজা সেবন করেছে। অন্য সময় সে অতীনকে আপনি বলে, এখন বললো তুমি। নক্‌শালাইট লীডার বললো কেন? সোমেনের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কোনোদিনই আলোচনা হয়নি। সবাই সবকিছু জেনে যায় কী করে?

লিন্ডা বললো, কাট ইট আউট। লেট্‌স হিয়ার দা সঙ!

স্প্যানীশ গীটারটা তুলে নিয়ে বাজাতে বাজাতে সোমেন ধরলো একটা খাঁটি বাংলা গান : রঙ্গিলা ভাসুর গো, তুমি কেন দ্যাওর হইল না! ও রঙ্গিলা ভাসুর-গো....

লিন্ডা সেই গানে তাল দিচ্ছে মহা উৎসাহে এবং গলা মেলাবার চেষ্টা করছে। অতীনের একটা ব্যাপার ভালো লাগলো, লিন্ডার বাংলা উচ্চারণ খুব খারাপ নয়, সোমেরন কাছ থেকে সে অনেকটা শিখেছে! সোমেনের নবাগত বিলিতি বন্ধু অবশ্য এই গান খুব একটা উপভোগ করছে বলে মনে হয় না!

সোমেনের পরের গান : ডাইল রান্ধো রে কাঁচা মরিচ দিয়া, গুরুর কাছে লওগা মন্তর বিরলে বসিয়া, ও মন ডাইল রান্ধো রে!

গানের মাঝে মাঝে সোমেন লিন্ডাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে অর্থ। হঠাৎ সে জ্যোতি রায়ের দিকে ফিরে বললো, আমার এই সাহেব বন্ধুটাও কিন্তু অনেক বাংলা কথার মানে বোঝে না! কী রে ব্যাটা, তুই কাঁচা মরিচ কারে কয় বোঝোস?

জ্যোতি রায় চিবিয়ে বললো, তাই আন্ডারস্ট্যান্ড ব্রডলি দা মিনিং! বাট হোয়াট ইজ কাঁচা মরিচ!

–গ্রীন চিলি! কাঁচা লঙ্কা! শালা, তুই-ও তো বাঙালের বাচ্চা, তুই কাঁচা মরিচ চিনিস না? কাঁচা মরিচ ছাড়া ডাল রান্নাই হয় না!

জ্যোতি রায় বললো, মাই ফাদার ওয়াজ আ বাঙাল অলরাইট, বাট আই হার্ডলি, রিমেমবার ভিজিটিং দ্যাট পার্ট অফ, আওয়ার কান্ট্রি!

লিন্ডা বললো, লেটস হীয়ার অ্যানাদার সঙ! ডাইল র‍্যান্ডে রে, কানসা মরিচ ডিয়া....লাভলি, লাভলি তারপরেই সে অতীনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, হোয়াট হ্যাপনড টু দ্যাট গাই? হি সিমস টু বী বোরড্ টু ডেথ!

অতীন বস্তুত গান শুনছিল না, এ ঘরের কোনো ব্যাপারে মনোযোগও দিতে পারেনি, সে পালাবার সুযোগ খুঁজছিল । তার কিছুই ভালো-লাগছে না।

সে সচেতন হয়ে, মুখে কষ্ট করে হাসি ফুটিয়ে বললো, না, সোমেনবাবু, গান করুন, গান করুন, গানের মাঝখানে এত কথা ভালো লাগছে না।

সোমেন বললো, তুমি এত গোমড়া মুখ করে আছো কেন ভাই? কী হয়েছে? তুমি এখানে বসে আছো। অথচ তুমি যেন এখানে নেই! তাহলে শোনো। এবারে তোমাকে নিয়ে একটা গান গাইছি!

গীটারে খানিকটা টুং টাং করে সে গাইলো, তুই লালপাহাড়ীর দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা,

হেথায় মানাইছে না গো! ইক্কেবারে মানাইছে না গো!

গাইতে গাইতে এগিয়ে এসে সে অতীনের থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বললো, হেথায় তুরে মানাইছে না গো! ইক্কেবারে মানাইছে না গো! তুই লালপাহাড়ীর দেশে যা....

সোমেনের এই গানটি গেঁথে গেল অতীনের মাথায়। খানিক পরে ওপরে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে সে ঝরঝর করে কাঁদলো, কাঁদতে কাঁদতে নিজেই ঐ গানটা গাইতে লাগলো বারবার!

সোমেনের ঘরে লিন্ডার সনির্বন্ধ অনুরোধেও অতীন গাঁজাভরা সিগারেটে টান দিতে রাজি হয়নি, কিন্তু সোমেনের পেড়াপীড়িতে কিছু খাবার খেতে হয়েছে। সোমেনের বন্ধু জ্যোতি রায় খুব সাহে হলেও মাছ খেতে ভালোবাসে। বিলেতে ভালো মাছ পাওয়া যায় না, অ্যামেরিকায় মাছ অঢেল। সোমেন রান্না করেছে এ দেশের ইলিশ অর্থাৎ শ্যাড মাছ! সে মাছ অতীনের মুখে রোচেনি, সে দু'এক এক টুকরো ভেঙে খেলেও বাকিটা ফেলে দিয়েছে গোপনে। ইলিশ শুনলেই তার বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা ইলিশ মাছ ভালোবাসেন খুব। এক একদিন রাত্তিরবেলা ইলিশ মাছ নিয়ে আসতেন অনেক উৎসাহ করে, মা রাগারাগি করতেন, অতীনও দু'একবার খেতে চায়নি, বাবা দুঃখ পেয়েছেন। তখন কিছু বুঝতে পারেনি, কিন্তু এখন সে-সবের উপলব্ধি হয়। শেষের দিকে বাবা পয়সার অভাবে তেলাপিয়া মাছ কিনতেন!

একটা স্মৃতি থেকে অন্য স্মৃতি। এ বাড়িতে একটা বারোয়ারি রেফ্রিজারেটর থাকা সত্ত্বেও অতীন নিজের ঘরের জন্য আর একটা শস্তার ফ্রিজ কিনেছে। কিন্তু তাদের কলকাতার বাড়িতে আজও ফ্রিজ নেই। কতবার স ভেবেছে, একটা ফ্রিজ কেনার জন্য মাকে টাকা পাঠাবে। কলকাতায় একটা ফ্রিজের দাম কত, চার পাঁচশো ডলার হবে নিশ্চয়ই? অত টাকা অতীন কোথায় পাবে? সে নিজেই এখনও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। দেশে সবাই মনে করে, অ্যামেরিকায় যারাই যায়, তারাই লক্ষ লক্ষ টাকা রোগজার করে!...দাদা বলেছিল, চাকরি করে সে মাকে একটা অল ওয়েভ রেডিও কিনে দেবে। দাদা দিতে পারেনি, অতীনও তো তার বাবা-মাকে কিছুই দেয়নি! ফুলদি বরং হাউস সার্জন থাকার সময় নিজের সামান্য উপার্জনে বাড়ির জন্য একটা রেডিও কিনেছিল। যেমন করেই হোক, অতীন সামনের মাসেই মায়ের নামে অন্তত এক শো ডলার পাঠাবে!

সোমেনের বন্ধু জ্যোতি রায় আর একটা কথা মনে করিয়ে দিল! জ্যোতি রায় মাঝে মাঝেই ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিল অতীনের দিকে, এক সময় সে জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

এইসব কথা শুনলেই অতীন ভয় পায়। তকে কি এই ছেলেটি জলপাইগুড়ি কিংবা উত্তরবাংলা থেকে এসেছে? রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল? পুরোনো প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে তুলবে?

অতীন আড়ষ্ট গলায় বলেছিল, আমি লন্ডনে কিছুদিন ছিলাম বটে, বাট আই ডোন্ট থিংক উই মেট বিফোর!

জ্যোতি রায় মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, নো, নট ইন লানডান! তারও আগে। আমি মানুষের মুখ মনে রাখতে পারি, আপনাকে চেনা লাগছে, কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক মনে করতে পারছি না!

অতীন বলেছিল, হয়তো আমার মতন চেহারার অন্য কারুর সঙ্গে আপনি গুলিয়ে ফেলছেন। আপনাকে আমি আগে দেখিনি!

অতীন সরে গিয়েছিল জ্যোতি রায়ের পাশ থেকে। এ কথা ঠিক, জ্যোতি রায়কে সে আগে কখনো দেখেনি। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা জ্যোতি রায়ের, অতীনের থেকে দু'চার বছরের বড় হবে বয়েসে, এর মধ্যেই তার মাথায় সামান্য টাক পড়েছে। চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা আছে।

এটুকু পরে জ্যোতি রায় আবার তার কাছে এসে কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিল, লেট মি ট্রাই এগেইন! আপনি কখনো বিহারের একটা শহরে দেওঘর অর বৈদনাথধাম, এরকম একটা জায়গায় থাকতেন? আপনার কোনো আত্মীয়ের গানের ইস্কুল ছিল?

সঙ্গে সঙ্গে অতীনের সব মনে পড়ে গেল। মাথায় টাকপড়া, এই নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরা সুপুরুষ ব্যক্তিটিকে ভেদ করে সে দেখতে পেল একটি জেদী কিশোরকে। দেওঘর! বাপ্পা! বুলা মাসির ছেলে! একবার বুলা মাসদির সঙ্গে ত্রিকূট পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল, সেবার কি বাপ্পা ছিল সঙ্গে? সেবারের কথা মনে না থাকলেও আর একবার পুজোর সময় দেওঘরে গিয়ে এই বাপ্পার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল, সে প্রায়ই খেলতে আসতো তাদের সঙ্গে, সেই বয়েসেই সে ইংরিজি গান গাইতো।

অতীনের চেয়ে তার দাদার সঙ্গেই বাপ্পার বন্ধুত্ব হয়েছিল বেশী।

অতীনের উদ্ভাসিত মুখ দেখে জ্যোতি রায় বলেছিল, ইউ সি, আই ডোন্ট ফরগেট ফেসেস!

অনেকদিন আগেকার কথা, তাই না? তুমি খুব পোয়েট্রি রিসাইট করতে। তোমার কথা আমার পারটিকুলারলি মনে আছে, কারণ, একদিন হঠাৎ তোমার সঙ্গে আমার মারামারি হয়েছিল, আমি ঘুঁষি মেরে তোমার নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলাম।

–আমার নয়, আমার দাদার!

–তোমার দাদাকে মেরেছিলাম? অফ কোর্স, তোমরা দু'ভাই ছিলে, ঠিক? তোমাদের দু' ভাইয়ের মুখের খুব মিল আছে তো! দোষটা আমারই ছিল। আই ওয়াজ ভেরি ইমপালসিভ দোজ ডেইজ, পরে আমি রিগ্রেট করেছি। এমার দাদা এখন কোথায় আছেন, দেশে? তাকে চিঠি লেখার সময় তুমি জানিয়ে দিও প্লীজ যে, সেই জ্যোতি রায় এতদিন পরেও সিনসিয়ারলি তার কাছে ক্ষমা চাইছে!

নিজের ঘরে ফিরে অতীনের বারবার এইসব কথাই মনে পড়তে লাগলো। দেওঘরের সেই দিনগুলো কী অপূর্ব সুন্দর ছিল , হ্যাঁ, বাপ্পার সঙ্গে তার দাদার একবার মারামারি হয়েছিল বটে, দাদা বিশেষ মারামারি করতে পারতো না, বাপ্পাটাই ছিল ছিল গোঁয়ার, কিন্তু সে এমন কিছু না, পরে বাপ্পার সঙ্গে দাদার আবার ভাবও হয়ে গিয়েছিল, যতদূর মনে পড়ে। দাদার সঙ্গে তার মুখের মিল আছে, একথা তো বহুদনি কেউ বলেনি!

আজ সারাদিন পড়াশুনো করার কথা ছিল, অন্য কোনো কথা একবারও ভাববে না ঠিক করেছিল অতীন, কিন্তু এখন পড়াশুনো মাথায় উঠে গেল, যত রাজ্যের পুরোনো কথাই মনে পড়ছে! চোখের জল সে সামলাতে পারছে না কিছুতেই। হেথায় তুমায় মানাইছে না গো! ইক্কেবারে মানাইছে না গো!

এক সময় মুখ তুলতেই সে দেখতে পেল তার টেবিলের এক কোণে একটা চাবি পড়ে আছে। সে দারুণ চমকে উঠলো। এ কি ব্যাপার? ম্যাজিক নাকি? এখানেই পড়ে আছে চাবিটা, অথচ সে গত দু'সপ্তাহের মধ্যে একবারও দেখতে পায়নি? মাঝখানে কেউ এসে রেখে গেছে? না, তা হতেই পারে না। তার ঘরে অন্য কে ঢুকবে? দরজার বাইরে পাপোসের তলায় তার ঘরে ঢোকার আর একটা চাবি আছে বটে, শর্মিলা কখনো সখনো একা এসে পড়লে সেটা ব্যবহার করতো। কিন্তু শর্মিলা এই কদিনের মধ্যে তার ঘরে আসবে, সে প্রশ্নই ওঠে না। চাবিটা আগে থেকেই এখানে পড়ে আছে, অতীন খেয়াল করেনি, হয়তো কোনো বইতে চাপা পড়েগিয়েছিল, এছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

চাবিটা অতীন হাতে তুলে নিয়ে চুপ করে বসে রইলো। ছোট একটা চাবি, টেবিল ক্লকে দম দেবার চাবির মতন, হ্যাঁ ফাইল ক্যাবিনেটের চাবিও এই রকমই হয়। শর্মিলা এই চাবিটাই খুঁজছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দরকারি চাবি, তবু সেটার কথা এতদিন পর মনে পড়লো শর্মিলার?

এখন এটা নিয়ে কী করা যায়? শর্মিলাকে ফোন করে বলবে এলে এসে নিয়ে যেতে? না, তা হয় না। শর্মিলাকে কোনো ছুতোতেই সে আর তার বাড়িতে আসতে বলতে পারে না। শর্মিলা আজ টেলিফোনে যে-সুরে কথা বললো, তাতেই বোঝা যায়, সে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। অতীন এতদিন চাবিটা দেখতে পায়নি, আজও টেলিফোন করার সময় খুঁজতে এসে পায়নি, এখন হঠাৎ পেয়ে গেল, এটা কি শর্মিলা বিশ্বাস করবে?

সবচেয়ে সহজ উপায়, চাবিটা একটা খামে ভরে পোস্ট করে দেওয়া। এখানে অনেক লোক হোটেলের চাবি ভুল কর পকেটে নিয়ে চলে যায়, পরে কোনো একটা জায়গা থেকে পোস্টে সেই চাবি হোটেলে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

পোস্ট করলে শর্মিলা চাবিটা পর্শুর আগে পাবে না। শর্মিলা বলছিল, কাল সকালে চাবিটা ওর বিশেষ দরকার। এইসব চাবি ডুপ্লিকেট করা অনেক ঝামেলার ব্যাপার। অতীনের উচিত চাবিটা পৌঁছে দিয়ে আসা। শর্মিলার সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই, তবে পুরোনো সম্পর্কের খাতিরে কি সে এইটুকু উপকার করতে পারে না!

বাড়ি থেকে বেরুবে না ভেবেছিল, তাও বেরুতে হলো। সে অবশ্য দাড়ি কামালো না, সাইকেলটাও নিল না। সন্ধে হতে এখনও কিছুটা দেরি আছে, সে হাঁটবে। শর্মিলার সঙ্গে দেখা না করেও চাবিটা পৌঁছে দেবার একটা উপায় ভেবে ফেলেছে সে। শর্মিলার বাড়ির লেটার বক্সে সে চাবিটা ফেলে দিয়ে আসবে গোপনে। চাবিটা সেইজন্য সে একটা সাদা খামে ভরে এনেছে। কাল সকালে বেরুবার আগে শর্মিলা লেটার বক্স দেখবেই।

একটু ঘুর পথে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো অতীন। আকাশে আবার মেঘ জমেছে, যাক, গরমটা এবার কাটবে। আজ রাত্তিরেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামতে পারে। সর্দিটা জমে শুকনো হয়ে গেছে তার বুকে, আর একবার বৃষ্টি না ভিজলে গলবে না।

পার্ল স্ট্রিটে শর্মিলাদের বাড়ির কাছে পৌঁছোতে পৌঁছোতে অন্ধকার হয়ে এলো। কিন্তু একটু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো অতীন। ঐ বাড়ির পর্চে দাঁড়িয়ে তিনটি সাদা ছেলেমেয়ে গল্প করছে। ওদের সামনে দিয়ে গিয়ে লেটার বক্সে কি কিছু ফেলা যায়? ফেললেও ওরা কিছুই বলবে না, অতীনের দিকে ফিরেও তাকাবে না, তবু ওদের মধ্যে কেউ যদি অতীনকে চিনে ফেলে? অতীন নিজেই যে চাবিটা ফেরত দিতে এসেছে, সে কথা সে কারুকে জানাতে চায় না।

একটা স্ট্রিট লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে পর পর দুটো সিগারেট পোড়ালো অতীন। সিগারেট টানলেই কাশি আসছে, তবু একা একা কি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? ছেলেমেয়েগুলো যে যাচ্ছে না! এই চাবিটা দেবার পরেই শর্মিলার সঙ্গে সব যোগাযোগের ইতি। বেরুবার আগে অতীন খুব ভালো করে নিজের ঘরটা দেখে এসেছে, শর্মিলার আর কোনো কিছুই সেখানে পড়ে নেই। চাবিটা টেবিলের ওপরেই ছিল, এটা যেন প্রায় একটা মিরাক্ল।

রাস্তায় একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে দারুণ বোকা বোকা লাগে। কাঁধটা উঁচু করে রয়েছে। দুপুরবেলা সোমেনের ঘরে অত হৈ হল্লা হচ্ছিল কিন্তু অতীন তার সঙ্গে সুর মেলাতে পারেনি। সে আমেরিকান ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও প্রাণখুলে মিশতে পারে না, বাঙালী কিংবা ভারতীয়দের সঙ্গেও হৃদ্যতা হয় না। সব জায়গাতেই সে আড়ষ্ট, এমন কি এই যে একা একা দাঁড়িয়ে থাকা, এখানেও সে স্বাভাবিক নয়। হেথায় তুমায় মানাইছে না গো! ইক্কেবারে মানাইছে না গো!

ছেলেমেয়ে তিনটি এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অতীনের সামনে দিয়েই চলে গেল। ভাগ্যিস অতীন যায়নি, ওদের মধ্যে একটি মেয়ে শর্মিলাদের পাশের ঘরেই থাকে। শর্মিলার বোন সুমির মুখোমুখিও পড়তে চায় না অতীন। সুমিকে সে ভয় পায়।

আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করার পর অতীন এগোলো। খামটা পকেট থেকে বার করে হাতে নিয়েছে। পরপর অনেকগুলো চিঠির বাক্স, এর মধ্যে কোনটা শর্মিলাদের? এই জায়গাটায় আলো জ্বালা নেই। সুইচটা কোথায় কে জানে! আধো-অন্ধকারের মধ্যেই অতীন ঝুঁকে ঝুঁকে বাক্সর নামগুলো পড়তে লাগলো।

ভেতরের দরজাটা ঠেলে হঠাৎ বেরিয়ে এলো শর্মিলা, প্রথমে সে অতীনকে দেখতে পায়নি, দ্রুত নেমে যেতে যাচ্ছিল, অতীন সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সে মুখ ফেরালো। বলে উঠলো বাবলু?

অতীন খামসুদ্ধ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নিরাসক্ত গলায় বললো, তোমার চাবি!

যেন চাবি শব্দটা সে জীবনেই শোনেনি, এইরকম গাঢ় বিস্ময়ে শর্মিলা বললো, চাবি? কিসের চাবি?

অতীন ভুরু কুঁচকে বললো, তোমার চাবি, হারিয়ে ফেলেছিলে! সেটা কি পেয়ে গেছো নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে আবার বদলে গেল শর্মিলা, হাহাকারের মতন তার গলা ভেঙে গেল, সে বললো, না, পাইনি, আমার চাবি হারিয়ে গেছে!

অতীন বললো, এই নাও, আমার ঘরেই পড়েছিল, আমি আগে দেখতে পাইনি।

অতীনের চোখের দিকে না তাকিয়ে শর্মিলা খামটা নিল। নিজের হাতব্যাগে সেটা ভরতে গিয়েও ফেলে দিল মাটিতে। তখুনি তুলে নেবার বদলে সে ঘুরে গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে হু-হু করে কেঁদে ফেলে বললো, তুমি আমায় ক্ষমা করো বাবলু, যদি পারো, যদি পারো, আমি আর কোনোদিন তোমাকে মুখ দেখাতে পারবো না।

শর্মিলার কান্নাটা অতীনের ন্যাকামি মনে হলো। মানুষকে অপমান করে, দিনের পর দিন অবহেলা দেখিয়ে তারপর একবার ক্ষমা চাইলেই হলো! শর্মিলা তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চায় না সেটা সোজাসুজি বলে দিলেই পারতো, এত নাটক করার কী দরকার ছিল?

অতীন কড়া গলায় বললো, ক্ষমা টমার কী আছে! আমি তোমার চাবিটা আগে খুঁজে পাইনি, আই অ্যাম সরি ফর দ্যাট!

শর্মিলা দেয়ালে মাথা রেখে বললো, বাবলু, তুমি আমাকে ভুলে যেও! আমি তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছি। আমি খারাপ, খুব খারাপ, আমি তোমার যোগ্য নই। আমি অনেক কথা ভুলে যাই, লোকে

বিশ্বাস করে না, আমি ইচ্ছে করে তোমায় মিথ্যে কথা বলিনি বাবলু, সত্যি আমার মনে ছিল না.....

–মিথ্যা কথা? কী মিথ্যে কথা তুমি বলেছিলে আমাকে?

–একটা সাংঘাতিক মিথ্যে, মানে, এমন একটা অন্যায় আমি গোপন করে গেছি, যার কোনো ক্ষমা নেই!

–অন্যায়? কিসের অন্যায়? আমার সঙ্গে তোমার.....

–তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, আমার সঙ্গে আগে কারুর সম্পর্ক ছিল কি না। কেউ আমাকে কখনো আদর....কেউ আমাকে আগে ছুঁয়েছে, আমি বলেছিলাম, না, কেউ না, সেটা মিথ্যে কথা বাবলু! কিন্তু আমি ইচ্ছে করে তোমাকে ঠকাতে চাইনি বাবলু, সত্যি আমার মনে ছিল না! লংফেলো ব্রীজে তুমি একটা কাগজ কুড়িয়ে নিলে, তাতে একটা ছবি দেখে হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল। ছি ছি ছি, বাবলু, আমি তোমাকে ঠকাতে গিয়েছিলুম। আমি নষ্ট, আমি, আমি, তোমার মতন একজন মানুষকে।

এবারে অতীনের অবাক হবার পালা। এসব কী বলছে শর্মিলা? শর্মিলা আর যাই করুক, তার মতন মেয়ে কারুকে ঠকাবে, মিথ্যে কথা বলবে, এটা বিশ্বাস করা যায় না। শর্মিলা জেদী, অভিমানী, কিন্তু এ সে কিছুতেই অসৎ হতে পারে না!

–তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে? না, আমি তা বিশ্বাস করি না।

–আমার জীবনটাই মিথ্যে হয়ে গেছে, বাবলু! ঐ কাগজটায় একটা বাচ্চা মেয়ের ছবি ছিল, ঠিক আমার ঐ বয়েসে....আমাদের বাড়িতে একজন মাষ্টার মশাই থাকতেন, আমরা তাকে মাষ্টারজ্যেঠু বলতুম, ভাইবোন সবাইকে পড়াতেন, সেই মাষ্টারজ্যেঠু একদিন আমার ঠোঁটে...আমাকে জোর করে কোলে নিয়ে...আমার ফ্রক খুলে, আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু আমি নষ্ট, বাবলু, তোমাকে বলিনি আগে, তুমি আমাকে এত বিশ্বাস করেছিলে–

অতীন শর্মিলার হাত চেপে ধরে বললো, এসব কী বলছো তুমি? তোমার আট-ন বছর বয়েসে কী একটা ঘটেছিল, সেই জন্য তুমি এরকম করছো? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

শর্মিলা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, আমাকে আর ছুঁয়ো না বাবলু, আমি তোমার যোগ্য নই, আমি ভীষণ খারাপ।

সত্যিই প্রায় উন্মাদিনীর মতন হেঁচকি তুলে তুলে কাদছে দেখে অতীন তাকে জোর করে বুকে চেপে ধরে বললো, মিলি, চুপ করো! চুপ করো! আট ন'বছর বয়েসে, তখন তোমার ভালো করে জ্ঞান হয়নি, সেইসময় একটা পারভার্ট তোমার শরীর ছুঁয়েছিল, সেটা আবার একটা মনে রাখবার মতন ব্যাপার নাকি? এটা জানলে আমি কিছু মনে করবো, তুমি আমাকে এতই অর্ডিনারি ভাবো? তুমি আমাকে একটুও চেনোনি?

জলভরা মুখখানা তুলে শর্মিলা ধারালো গলায় বললো, এইসব শুনেও তুমি আমাকে ঘেন্না করবে না?

অতীন বললো, অত ছোট বয়েসের ওটা তো কোনো ব্যাপারই নয়, বড় বয়েসেও কেউ যদি হঠাৎ কোনোদিন তোমার শরীর নিয়ে...তা হলেও আমি কিছুই ভাবতাম না। তবু তুমি আমার কাছে পবিত্র!

–আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল বাবলু! আমি আত্মহত্যা করার কথা ভেবেছিলুম, আমি ওয়াশিংটন ডি সি-তে গিয়ে একদিন স্লিপিং পিল–

–ছিঃ মিলু! চুপ করো, চুপ করো, তুমি আমাকে কত কষ্ট দিয়েছো জানো না? আমাকে তুমি একটা কথাও বলোনি......

–বাবলু, আমি ভেবেছিলুম সারা জীবন তোমাকে আমার এই মুখটা আর দেখাতে পারবো না!

অতীন এবার জিভ দিয়ে শর্মিলার চোখের জল চেটে নিতে লাগলো। সুমি এসে পড়তে পারে, কিংবা অন্য কেউ দেখলো বা না দেখলো তাতে কিছু আসে যায় না। অতীন টের পেল তার বুক অসম্ভব জোরে কাঁপছে, শর্মিলারও সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। শুধু দুটি হৃদয় নয়, দুটি শরীরও পরস্পরের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল।

সুমি বাড়িতে নেই। এটুকু পরে শর্মিলা অতীনকে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। তারপর কান্নায়-হাসিতে, আদরে-উত্তাপে কাটতে লাগলো সময়। এর আগে কোনোদিন ওরা এই ঘরে মিলিত হতে সাহস করেনি। কিন্তু আজ সবকিছু তুচ্ছ।

এক সময় শর্মিলার পাশে শুয়ে একটা সিগারেট ধরাবার পর অতীন ভাবলো, এবার কি সে শর্মিলাকে অলির ব্যাপারটা সব খুলে বলবে? পরক্ষণেই সে মন বদলে ফেললো! শর্মিলার বালিকা বয়েসের ঐ তুচ্ছ ঘটনাটার সঙ্গে তার আর অলির সম্পর্কের কোনো তুলনাই চলে না। এখন অলির কথা তুললে অলিকে ছোট করা হবে! অলির প্রতি হাজার অবিচার করলেও অলির মার্যাদাকে তুচ্ছ করার কোনো অধিকার তার নেই।

॥ ৩২ ॥

আজ রাতেই অলির প্লেন, অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরমিশান পাওয়া গেল দুপুর দেড়টার সময়। অর্থাৎ সেইসময় পর্যন্ত অলির যাওয়াটা অনিশ্চিত ছিল। পাশপোর্ট থেকে আরম্ভ করে প্রায় সব কটা সরকারি অফিসেই প্রায় শেষ মুহূর্তের আগে কাজ হয় না। অলির থেকেও তার বাবা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় অনেক বেশী কাহিল হয়ে পড়লেন।

ব্যাঙ্কের কাজ শেষ করেই অলিকে দৌড়াতে হলো ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে একটা দর্জির দোকানে। অলি রেডিমেড পোশাক পরতে পারে না। শীতের ভয় দেখিয়ে অনেকেই অলিকে বলেছে কয়েকটা টেরিউলের ব্লাউজ ও ড্রয়ার নিয়ে যেতে, একজন চেনা দর্জির কাছে তার মাপ দেওয়া ছিল, আগেরদিন পর্যন্ত সে সেগুলো ডেলিভারি দিতে পারেনি। কিছু কিছু উপহারের জিনিসও কিনে নিয়ে যাওয়া দরকার। অনবরত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছোটাছুটি, অলির সঙ্গে সর্বক্ষণ রয়েছে বর্ষা।

এরই মধ্যে অলির মনে একটা অপরাধবোধ খচখচ করছে। আজ দুপুরে মমতা তাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবেন বলেছেন, কয়েকদিন আগেই কথা দেওয়া আছে, মমতারা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন। ওঁদের বাড়িতে টেলিফোন নেই, তাই খবরও দেওয়া যায়নি, সেখানে একবার যেতেই হবে। বর্ষা বলেছে আজ সে সারাদিন থাকবে অলির সঙ্গে, একেবারে এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে আসবে। বর্ষাকে কি অতীনদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায়? মমতাকাকীমা অলির সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলবেন বলে আর কারুকেই নেমন্তন্ন করেননি।

পৌনে তিনটের সময় অলি নিরুপায়ভাবে বলে উঠলো, বর্ষা, বাবলুদার মা আমাকে ওদের বাড়িত খেতে বলেছেন, একবার না গেলে ওঁরা খুব দুঃখ পাবেন। তুই যাবি আমার সঙ্গে, একটু বসবি ওখানে?

বর্ষা রীতিমতন বিরক্ত হয়ে বললো, আজই নেমন্তন্ন? তোর মাথা খারাপ, শেষদিন কেউ নেমন্তন্ন নেয়? রাত দেড়টায় প্লেন, তোর এখন বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া উচিত, তা ছাড়া আরও কত খুঁটিনাটি দরকারি জিনিসের কথা মনে পড়বে...

পমপম আর কৌশিকদের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায় এর মধ্যে অলি নিজেই আগে আর মমতার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। দোষটা তো অলিরই! তা কি অলি আগে বুঝেছিল? সে ভেবেছিল, শেষ দিনটাতেই দুপুরে তার কিছু করার থাকবে না।

অলি বললো, আমাকে একবার যেতেই হবে রে, বর্ষা!

বর্ষা বললো, ঠিক আছে, তুই ঘুরে আয়, আমি তোদের বাড়িতে বসছি। এক ঘণ্টার বেশী দেরি করিস না!

শহরের উপান্তে মমতাদের বাড়ি যখন পৌছোলো অলি, তখন তিনটে বাজে। সে প্রায় হাঁফাচ্ছে! আদালত থেকে ছুটি নিয়ে একটার সময় বাড়ি চলে এসেছেন প্রতাপ কারুরই খাওয়া হয়নি, সবাই অপেক্ষা করছেন অলির জন্য। অলির চোখমুখের অবস্থা দেখে শিউরে উঠে মমতা বললেন, একী, কী হয়েছে তোর, আজ যাওয়া হবে না?

ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারেন্সের ঝঞ্ঝাটের ঘটনাটি প্রতাপ সবিস্তারে শুনলেন এবং গজরাতে লাগলেন। অনুমতি যখন দিলই, আগে দিলে কী হতো? আজই যাবার তারিখ, একটি মেয়ে একা একা অত দূর বিদেশে যাবে, তার যে কতখানি টেনশন হয়, তা কি ওই সরকারি লোকগুলো বোঝে না?

মমতা বললেন, যাক, শেষপর্যন্ত তো ব্যবস্থা হয়েছে! এখন খেতে বোস, অলি, তারপর কথা বলবো?

অলি ক্লিষ্ট মুখে বললো, আর এখন খেতে ইচ্ছে করছে না, কাকীমা!

মমতা অলির মাথার হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, সত্যি, এত দৌড়োদৌড়ি করলে কি আর

খিদে থাকে? একটুখানি খেয়ে নে, যেটুকু ইচ্ছে হয়, তোর জন্য কইমাছের পাতলা ঝোল করেছি, তুই কইমাছ ভালোবাসিস, ওদেশে তো আর এসব মাছ পাওয়া যায় না।

সকাল থেকেই অলি কিছু খায়নি, খেতে বসে দেখলো, তার খারাপ লাগছে না, ভেতরে একটা চাপ খিদে রয়ে গিয়েছিল ঠিকই।

আজ অলি বিদেশে যাবে, তাই হঠাৎ সে সকলের একসঙ্গে মনোযোগের কেন্দ্রমণি হয়ে উঠেছে। মুন্নি-টুনটুনিরা একদৃষ্টিতে তার খাওয়া দেখছে।

সুপ্রীতি নেই, পরশুদিন সুপ্রীতিকে ভর্তি করতে হয়েছে নীলরতন হাসপাতালে। তাঁর কিডনিতে অসহ্য ব্যথা, অপারেশন করা ছাড়া গতি নেই।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে কী ঠিক হলো, অলি, তুই কি মাঝপথে লন্ডনে থেমে যাবি?

কইমাছের কাঁটা বাছতে বাছতে অলি বললো, হ্যাঁ, লন্ডনে তিনদিন থাকবো। বাবার এক বন্ধু আছেন, তাঁর বাড়িতে।

প্রতাপ বললেন, হ্যাঁ, রমেশ দাশগুপ্ত, আমিও চিনি, সে এয়ারপোর্টে আসবে তোকে নিতে?

অলি বললো, হ্যাঁ। বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে।

মমতা বললেন, তুতুলকেও লিখে দেওয়া হয়ছে, সেও নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টে দেখা করতে আসবে তোর সঙ্গে। আমার তো মনে হয়, তুতুলই জোর করে তোকে নিয়ে যাবে তার কছে।

প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এ বাড়ির দুটি ছেলেমেয়ে চলে গেছে বিদেশে। কেন যেন মনে হয়, তারা হারিয়ে গেছে চিরকালের মতন। ছেলেটার তো দেশে ফেরার পথ বন্ধ, আর তুতুল, সে তার মাকে এত ভালোবাসতো, সেও তার মায়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে না?

মমতা বললেন, দিদির অসুখের কথা কি তুতুলকে জানানো ঠিক হবে? কিডনির অপারেশন এমন কিছু ভয়ের তো না! শুধু শুধু অতদূরে বসে মেয়েটা দুশ্চিন্তা করবে!

প্রতাপ কোনো মতামত দিলেন না।

মমতা নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন, আমার তো মনে হয়, না বলাই ভালো। তুই ওসব কিছু বলিস না রে, অলি। বলবি, আমরা সবাই ভালো আছি।

অলির তৎক্ষণাৎ মনে হলো, হাসপাতালের সুপ্রীতির সঙ্গে তার একবার দেখা করে যাওয়া উচিত। সুপ্রীতি নিশ্চয়ই সেরকম আশা করে রয়েছেন। এদিকে বাড়িতে একগাদা আত্মীয়স্বজনের আসবার কথা বিকেলে, অনেকেই চেনা শুনো কারুর জ ন্য জিনিসপত্র পাঠাবে। তবু সন্ধের আগে খানিকটা সময় বের করতেই হবে অলিকে।

প্রতাপ এবার বললেন, মাস দেড়েক আগে তুতুল লিখেছিল, শিগগিরই সে দেশে আসবে একবার। তারপর আর তার কোনো সাড়াশব্দ নেই। কী ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না।

মমতা বললেন, তারপরেও তো তুতুলের দু'খানা চিঠি এসেছে। তুমি দেখোনি বোধ হয়। ও প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই চিঠি লেখে, সে বিষয়ে ও মেয়ের কোনো গাফিলতি নেই।

প্রতাপ বললেন, দু'খানা চিঠি লিখেছে আমি জানি, কিন্তু তাতে দেশে ফেরার বিষয়ে তো আর কিছু উচ্চবাচ্য করেনি! দিদি অনেক আশা করেছিল, লাস্ট চিঠি পাবার পর থেকেই তো দিদির পেট ব্যথাট্য বাড়লো!

মমতা বললেন, কোনো অসুবিধেয় পড়েছে নিশ্চয়ই। হয়তো ছুটি পাচ্ছে না। ওদের ছুটি পাওয়া খুব শক্ত না?

প্রতাপ বললেন, হ্যাঁ, ছুটি পাওয়া শক্ত। তা হলেও কেউ কি বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য দেশে ফেরে না?

অপ্রিয় প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য মমতা তাড়াতাড়ি অলিকে বললেন, তুই লন্ডনে পৌছেই আমাদের একটা চিঠি দিস, কেমন?

অলি আমেরিকায় পড়াশুনো করতে যাচ্ছে বলে মমতাই যেন সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছেন। অলির সঙ্গে বাবলুর দেখা হবে। অলি চমৎকার মেয়ে, বাবলুর মতন গোঁয়ারগোবিন্দ, মাথা-গরম ছেলেকে অলি ঠিক সামলে রাখতে পারবে। আর যে কথাটা দুই পবিারের মধ্যে আজও একবাও উচ্চারিত হয়নি, সেটা কি এবার ঘটবে না?

মাছ খাওয়া হয়ে গেছে অলির, মমতা একটা ছোট্ট বাটি করে খানিকটা পায়েস দিলেন তাকে।

অলি বললো, কাকীমা, আমি আর খেতে পারছি না। মিষ্টি খাবো না।

মমতা ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, একটুখানি মুখে দে অন্তত।

পায়েস রাঁধবার কারণটা মমতাকে বলতে হলো না, মুন্নি বলে উঠলো, আজ কেন পায়েস রান্না হয়েছে জানো, অলিদি? আজ ছোড়দার জন্মদিন। ছোড়দা তো আর খেতে পেল না, তুমি একটু খাও, ছোড়দাকে গিয়ে বলো! ছোড়দা বোধহয় নিজের জন্মদিনের কথা মনেই রাখে না!

মমতার মনটা প্রসন্নতায় ভর গেল, প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্মদিনেই তিনি পায়েস রান্না করেন। সেই নর্থবেঙ্গলে চাকরি করতে যাবার পর থেকেই অতীন আর বাড়িতে আসেনি, তিন তিনটে জন্মদিন সে বাড়ির বাইরে, তবু মমতা প্রত্যেক বছর তার জন্মদিনে পায়েস রেঁধেছেন। কী আশ্চর্য্য যোগাযোগ, অলি আজ বাইরে যাচ্ছে, আজই বাবলুর জন্মদিন, আজ অলিকে তিনি এই পায়েস খাওয়াতে পারছেন বলে কত ভালো লাগলো।

পায়েস মুখে দিতে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে গেল অলি। বাবলুদার জন্মদিন বলেই আজকের দিনে বিশেষ করে অলিকে নেমন্তন্ন করেছিলেন মমতা। যদি অলি শেষ পর্যন্ত আসতে না পারতো, তা হলে মমতা কত আঘাত পেতেন! তারপর পায়েসটুকু সব শেষ করে সে বললো, দারুণ ভালো হয়েছে, কাকীমা, নারকোল দিয়ে রান্না করেছেন, আর একটু দিন।

মমতা কিংবা প্রতাপ মুখ ফুটে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারেননি। মুন্নি জিজ্ঞেস করলো, ছোড়দাকে তোমার যাবার কথা জানিয়েছো তো? ছোড়দা উত্তর দিয়েছে?

অলি লাজুকভাবে বললো, হ্যাঁ। বস্টন থেকে নিউ ইয়র্ক এসে আমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করবে লিখেছে। লন্ডন থেকে আমি ফ্লাইট নাম্বার আর তারিখ জানিয়ে দেবো।

প্রতাপ বললেন, মমো, এবার অলিকে ছেড়ে দাও, ওর নিশ্চয়ই আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করবার আছে।

মমতা উঠে গিয়ে একটা প্যাকেট নিয়ে এসে বললেন, এই নে, অলি, এটা আমি তোর জন্য এনেছি, তুই না বলতে পারবি না!

অলি প্রায় আঁতকে উঠে বললো, এত দামি টাঙ্গাইল শাড়ি! কাকীমা, আমার অনেক শাড়ি জমে গেছে, বেশী নিতে পারবো না, এটা মুন্নিকে দিন!

মমতা ছদ্ম ধমক দিয়ে বললেন, তুই নে তো! তোর নাম করে কিনেছি, তুই পারবি ওখানে গিয়ে–

প্রতাপ বললেন, সুতির শাড়ি কি ওখানে পরার সুযোগ পাবে?

অলি শাড়িটা হাতে নিয়ে বললো, হ্যাঁ, তা পরা যাবে। ওখানে বুঝি গরম পড়ে না? রঙটা খুব সুন্দর, এটা আমি নিয়ে যাবো, কাকীমা!

মুন্নি বললো, অলিদি, তুমি আজই এটা পরে যাও।

মমতা এরপর খানিকটা কুণ্ঠিতভাবে বললেন, তোর কি অনেক জিনিসপত্তর হয়ে গেছে অলি? বাবলুর জন্য দু'একটা জিনিস নিয়ে যেতে পারবি?

অলি বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন নিতে পারবো না? কুড়ি কেজি পর্যন্ত অ্যালাউড, কম নাকি?

মমতা বললেন, বাবলুর জন্য একটি শার্ট, আর এক শিশি ঘি। ও ঘি দিয়ে গরম ভাত খেতে ভালোবাসে ও দেশে মাখন পাওয়া গেলেও ঘি তো পাওয়া যায় না!

মুন্নি বললো, আমি ছোড়দার জন্য ছখানা রুমাল দেবো। আমেরিকায় সুতির রুমালের খুব দাম। ফুলদির জন্য ব্লাউজ পীস আর একজোড়া দুল।

মমতা বললেন, বাবলুর জন্য একটু আচার আর পাঁপর আর...

প্রতাপ এবার বাধা দিয়ে বললেন, আর শাড়িও না, আর বাড়িও না। মেয়েটার ঘাড়ে কত কী চাপাবে?

মমতা বললেন, তুতুলের জন্য একটা শাড়ি তো নিতেই হবে। সেটাও আমি আগেই কিনে রেখেছি।

প্রতাপ বললেন, তুতুল দেশে আসবার কথা লিখেছিল, যদি শিগগির আসতে পারে, তা হলে আর তার জন্য শাড়ি পাঠানোর কী দরকার?

মমতা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, তবু পাঠাতে হয়, তুমি বোঝো না, সোঝো না, চুপ করো তো!

অলি তুতুলের শাড়িটাও হাত পেতে নিল।

প্রতাপ বললেন, ব্যস, এ পর্যন্ত। আচার পাঁপর-পাঁপর আর দিতে হবে না। ওদের কাস্টমসে অনেক সময় ফুড মেটেরিয়াল অ্যালাউ করে না, কাগজে পড়েছি।

অলি বললো, না, ওগুলোও দিয়ে দিন কাকীমা। নিয়ে তো যাই, কাস্টমস্ যদি অ্যালাউ না করে তখন বলবো, তোমরা তা হলে রাখো। নিজেরাই খাও!

মমতা বললেন, তুতুল আচার খায় না। ঘিয়ের শিশি থেকে তুই অর্ধেকটা তুতুলকে ঢেলে নিতে বলিস।

বিদায় নেবার সময় মমতা অলিকে জড়িয়ে ধরে বললেন ধরে বললেন, তুই অতদূরে যাবি, জীবনে যে-মেয়ে একা একা কৃষ্ণনগর যায়নি...খুব সাবধানে থাকিস অলি, আর আমার ছেলেটাকে বলিস–

ছেলেকে কী বলতে হবে তা আ রজানাতে পারলেন না মমতা, হঠাৎ তাঁর চোখে জল এসে গলা বুঁজে গেল। কান্নায় কান্না টানে। অলিও সামলাতে পারলো না নিজেকে। কিসের জন্য এই কান্না কে জানে!

প্রতাপ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, অলি, আর দেরি করিস না। তোর বাবার সঙ্গে কথা হয়ে আছে, রাত্তিরে আমিও যাবো এয়ারপোর্টে।

বাবলুর সময়ে প্রতাপ যেতে পারেননি। একটা চোরাই জিনিসের মতন বাবলুকে পাচার করা হয়েছিল গোপনে। তাও ট্রেনে তাকে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বম্বে। বিমানবিহারী প্রতাপকে হাওড়া স্টেশনেও যেতে দেননি, যদি পুলিশ প্রতাপের ওপর নজর রেখে থাকে, তা হলে একটা ঝুঁকির ব্যাপার হবে। প্রতাপকে সেদিন অন্যদিনের মতই বসতে হয়েছিল আদালতের এজলাসে। পাঁচ পাঁচটা মামলার হিয়ারিং শুনতে হয়েছিল ধৈর্য ধরে।

আজ অলি যাবে, আজকের দিনটা প্রতাপের পক্ষে ভালো নয়। দিদিকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে বলে মনটা ভালো নেই। হাসপাতালের বিশ্রী নোংরা পরিবেশে, জেনারেল ওয়ার্ডে সাত-সতেরো রকম রুগীদের সঙ্গে শুয়ে আছেন সুপ্রীতি। প্রথমদিন সেখানে দিদিকে রেখে আসার সময় প্রতাপের বুক মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল। মালখানগরের ভবদেব মজুমদারের কন্যা, বরানগরের একদা বিখ্যাত সরকার পরিবারের বধু, সুপ্রীতিকে বাধ্য হয়েই দিতে হয়েছে জেনারেল ওয়ার্ডে, অনেক চেষ্টা করেও ক্যাবিন পাওয়া যায়নি। দিদিকে নার্সিংহোমে রাখার সাধ্য নেই। প্রতাপের কেউ কি বিশ্বাস করবে যে এই মহিলারই মেয়ে বিলেতের ডাক্তার! সুপ্রীতি প্রতাপকে মাথার দিব্যি দিয়েছেন, তাঁর অসুখের কথা যাতে কিছুতেই তুতুলকে চিঠিতে জানানো না হয়!

ক'দিন ধরে প্রতাপের নিজের শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। মাথাটা ঝিম ঝিম করে মাঝে মাঝে। এটা তাঁর একটা পুরোনো রোগ, রাস্তায় ঘাটে এরকম হলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। এই অস্বস্তিটার জন্য রাত্তিরে ঘুমও হচ্ছে না ভালো। এখন দিদির অসুখ প্রতাপ নিজের এই শারীরিক অসুবিধের কথা কারুকে জানাননি।

তবু তিনি অলিকে বিদায় জানাতে এয়ারপোর্টে যাবেনই ঠিক করেছেন। অলিকে তিনি খুব পছন্দ করেন। অলির মুখের মধ্যেই এমন একটা পরিচ্ছন্নতার ছাপ আছে, যা আজকাল খুবই দুর্লভ, যেন সে জানেই না অন্যায় কাকে বলে।

অলির সঙ্গে প্রতাপও বাইরে বেরিয়ে এলেন। চারটে বেজে গেছে, তিনি হাসপাতালের দিদির কাছে যাবেন। মমতা মুন্নিরা সকালে গিয়েছিল। এ বেলা প্রতাপের যাওয়ার পালা।

অলি জিজ্ঞেস করলো, কাকাবাবু, আপনাকে আমি খানিকটা পৌঁছে দেবো?

প্রতাপ বললেন, নারে, আমি এই তো ঢাকুরিয়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে চলে যাবো শিয়ালদায়, তাতেই সুবিধে হবে। তুই কতদিন বিদেশে থাকবি, অলি, কিছু ঠিক করেছিস?

অলি বললো, দু'বছরের বেশী একদিনও নয়। আপনি লিখে রাখতে পারেন, প্রতাপকাকা। ওখানে গিয়ে তো আমাকে আবার এম এ করতে হবে। এক বছর বোধহয় শেষ করে উঠতে পারবো না। পি এইচ ডি করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। দু'একটা পাবলিশিং ফার্মে ট্রেনিং নেবার ইচ্ছে আছে বরং।

প্রতাপ বললো, হ্যাঁ, তাই করিস। খুব বেশীদিন থাকস না। তুই তোর বাবা-মা'র অনেকখানি ভরসা। তবে, বাবলুকে তুই বলিস, সে যেন হঠাৎ ফিরে আসার চেষ্টা না করে। দেশের অবস্থা কীরকম তুই তো দেখেই যাচ্ছিস। পুলিশ এখন একটু নকশাল গন্ধ পেলেই ছেলেগুলোকে খুন করছে। আরও

অন্তত বছর দু'য়ের ক্যাটুক...

অলি জিজ্ঞেস করলো, প্রতাপকাকা, তুতুলদির মা'র অসুখটা কী খুব সিরিয়াস? তুতুলদির সঙ্গে দেখা হলে তো জিজ্ঞেস করবেই।

উত্তর দেবার জন্য প্রতাপ একটু সময় নিলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ডাক্তাররা তো বলছেন, খুব একটা ভয়ের কিছু নেই। তোর কাকীমা যে বললো, তুতুলকে কিছু না জানাতে, দিদিরও সেটাই ইচ্ছে। না জানানোই ভালো বোধহয়। তুতুল ওখানে একজনকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সে ব্যাপারে তুই কিছু জানিস?

অলি দু'দিকে মাথা নাড়লো।

প্রতাপ বললেন, তুতুল আমাদের মতামত না নিয়ে আগেই একজনকে পছন্দ করেছে, সেইজন্যই দিদির অভিমান হয়েছে খুব। তুতুল তো সেরকম মেয়ে ছিল না। যাই হোক, সে সম্পর্কেও তুতুল আর কিছু লেখে না।

পরক্ষণেই প্রতাপ ব্যস্ত হয়ে বললেন, তুই আজ যাচ্ছিস, তোকে এত সব কথা ভাবতে হবে না তো! তুই যা, বাড়িতে সবাই নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এতক্ষণে। তোর মায়ের সঙ্গেও তো খানিকটা সময় কাটাবি!

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে তুতুলকে উঠতে দিয়ে প্রতাপ বললেন, গিয়েই কিন্তু চিঠি লিখিস!

অলি বাড়িতে এসে দেখলো বর্ষা ছাড়াও তার কলেজের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবী এসে বসে আছে তার ঘরে। দোতলায় বাবার কাছে এসেছেন তাঁর কয়েকজন বন্ধু এবং তাঁদের স্ত্রীরা তিনতলায় মায়ের কাছে। সারা বাড়ি ভর্তি মানুষজন, যেন একটা উৎসব।

নিজের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে পারলো না অলি, মা তাকে ডেকে পাঠালেন। মায়ের ঘরে মহিলাদের কয়েকজনের মুখচেনা, কয়েকজন একেবারে অপরিচিতা। এঁদের সকলেরই ছেলে কিংবা মেয়ে-জামাই কিংবা ভাই-টাই কেউ থাকে বিলেত-আমেরিকায়। প্রত্যেকরই হাতে একটি করে প্যাকেট। অলি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে, তেসব জিনিস, এত ঠিকানা, সে সব সামলাবে কী করে?

মুখের ওপর কারুকেই কোনো ব্যাপারে না বলতে পার না অলি, মায়ের নির্দেশে সবাইকেই প্রণাম করে। সকলেই জিনিপত্র এক জায়গায় রেখে দিচ্ছে অলি। সে নিচ্ছে একটা সুটকেশ, এতগুলি প্যাকেট দুটো সুটকেশেও আঁটবে না। মা-ও কিছু বুঝছেন না, শেষ পর্যন্ত বাবার সাহায্য নিতে হবে অলিকে।

সম্ভ্রান্ত চেহারার মহিলারা শুধু যে আপনজনের জন্য উপহার দ্রব্য দিচ্ছেন অলিকে তাই-ই নয়, উপদেশও দিচ্ছেন অনেক। অলি মাথা নেড়ে শুনে যাচ্ছে সব।

একজন এমনকি বলে উঠলেন, এই বয়েসের মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে বিদেশে পাঠাচ্ছো, কল্যাণী, তোমার সাহস তো কম নয়! মেমে যদি তোমার সাহেবজামাই হয়?

কয়েকজন মহিলা মিষ্টির বাক্সিও এসেছেন। তাঁরা ওই মিষ্টি কল্যাণীকে দেননি, অলির হাতে তুলে দিয়ে বলছেন, তোমার জন্য এনেছি! অলি কি আজই এই সব মিষ্টি খাবে, না সঙ্গে নিয়ে যাবে?

কৌশিক পমপমদের ঘাটশিলায় পৌঁছে দিয়ে অলি কলকাতায় ফিরে এসেছে মাত্র চারদিন আগে। এর মধ্যে গত দিন সাতেকে সে এত মিথ্যে কথা বলেছে,তার এতদিনের জীবনেও সেরকম বলতে হয়নি। সে মার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে, বাবার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। মিথ্যে কথা সম্পর্কেতার মনের মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব ছিল, এখন সে নিজের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্য অনবরত মনে মনে বলে যাচ্ছে উইলিয়াম ব্লেকের দুটো লাইন :

A truth told with bad intent
is worse than all lies that you can invent...

সত্যিকথা বলা অনেক সময় ক্ষতিকর। অলি এবার প্রত্যক্ষভাবে নিজে তা বুঝেছে। পমপমের কথায় সাক্ষ্য দেবার জন্য সে কৌশিকের কাছে মানিকদার নামে মিথ্যে কথা বলেছে, সে সময় সত্যি কথা বললে কৌশিককে বাঁচানো যেত না। কৌশিকের সারা শরীরে ব্যান্ডেজ বলে ট্রেনে নেবার সময় কৌশিককে শাড়ি পরিয়ে মেয়ে সাজানো হয়েছিল, নইলে তার সারা শরীর ঢাকা যেতো না। ট্রেনের কামরার এক কোণে কৌশিক মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঘুমের ভান করে পড়েছিল। খড়্গপুর স্টেশনে দাঁড়াবার পরেই সেই কামরায় তিনজন পুলিশের লোক উঠেছিল। এমনই চমকপ্রদ ব্যাপার, তাদের মধ্যে একজন চিনতে পারলো অলিকে। অলি কিন্তু পুলিশটিকে চেনে না। কিন্তু সে অলির নাম ঠিকঠাক

বললো, তার বাবাকে চেনে, অলিদের বাড়িতে সে ছাত্রজীবনে এসেছে কয়েকবার, অলির বাবা নাকি তার পড়াশুনোর ব্যাপারে কিছু সাহায্য করেছিলেন। সেই লোকটি অলিকে যেই জিজ্ঞেস করলো যে সে কোথায় যাচ্ছে, অমনি অলি উত্তর দিয়েছিল, সে তার এক অসুস্থ দিদিকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি রাঁচিতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। কী করে যে এই উত্তরটা সেই মুহূর্তে তার মাথায় এলো, তা সে নিজেই এখনো বুঝতে পারছে না। অদ্ভুত কাজ হলো তাতেই। পুলিশ তিনটি কামরার কিছু লোকের ঘুম ভাঙিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেসবাদ করছিল, অলিদের কাছে আর ঘেঁষলোই না। দামামা ধ্বনির মতন শব্দ হচ্ছেল তখন অলির বুকের মধ্যে, কিন্তু তার মুখ দেখে কেউ কি কিছু বুঝেছে? পুলিশের সেই ছেলেটিকে মিষ্টি হেসে অলি বলছিল, আপনি আসবেন একদিন আমাদের বাড়িতে, বাবাকে বলবো আপনার কথা।

সেইসময় সত্যি কথা বলাটা মানুষ খুন করার মতন অপরাধ হতো না? দারুণ আহত ও অসুস্থ হলেও কৌশিক তার সঙ্গে অস্ত্রটা রেখেছিল এবং সে ঠিক করেই রেখেছিল, পুলিশের কাছে সে নিরীহভাবে ধরা দেবে না, পুলিশ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে এলেই সে গুলি চালাতো। কী একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হতো তা হলে!

এমনকি বর্ষাকেও অলি সঠিক বলেনি, সে পমপমের সঙ্গে কোথায় গিয়েছিল। ঘাটশিলা নামটাই উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। একটা বিরাট গোপনীয়তার বোঝা সে বহন করে চলেছে। আজ সারাদিন ধরে তার এত ব্যস্ততা, এত লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে, তবু ভেতরে ভেতরে সে অনবরত ভেবে চলেছে কৌশিক-পমপমদের কথা। নিশ্চয়ই ওদের আর কোনো বিপদ হয়নি।

একবার বাবার ডাক শুনে দোতলায় নেমে যাচ্ছে অলি, অচেনা পৌঢ়দের সামনে লাজুক লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে আড় ল খুঁটতে খুঁটতে অবান্তর কথা শুনে যেতে হচ্ছে। একবার দৌড়ে আসছে বন্ধুদের কাছে, সেখানে শুনতে হচ্ছে নানারকম রসিকতা। অলি ঠোঁটে হাসি ফোটাচ্ছে বটে কিন্তু কিছুতেই দেন যোগ দিতে পারছে না। এরই মধ্যে মায়ের ঘরে এক দূর সম্পর্কের পিসিমা একটা হাস্যকর ব্যাপার করলেন।

এই পিসিমা এ বাড়িতে বিশেষ আসেন না। এঁর কোনো ছেলেমেয়ে আত্মীয়ও লন্ডন বা আমেরিকায় নেই। কিন্তু ইনি এসেছেন একটি বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে। তাঁর ঝোলার মধ্যে একখানা জগদীশবাবুর বাংলা গীতা। সেই গীতা ছুঁয়ে অলিকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে সাহেবদের দেশে গিয়ে সে কোনোদিন কোনোক্রমেই গো-মাংস স্পর্শ করবে না।

গোরুর মাংস খাওয়া না-খাওয়া সম্পর্কে অলি কিছু চিন্তা করেনি। গোরুর মাংস হয়তো সে এমনিতেই খেতে না কোনোদিন, কারণ সে কোনো মাংসই বিশেষ পছন্দ করে না। কিন্তু এত প্রতিজ্ঞার বাড়াবাড়ির কী আছে? কিন্তু বাতিকগ্রস্ত ওই পিসিমাটির ধারা, এ বংশের একজন কেউ গো-মাংস ভক্ষণ করলেই সমস্ত বংশটির জাত যাবে।

কল্যাণীও অতিশয় ভদ্র বলে কারুকে মুখের ওপর কিছু কঠিন কথা বলতে পারেন না। এই পিসিমাটিকেও বাধা দিতে পারছেন না তিনি। মাস কয়েক আগে হলেও গীতা ছুঁয়ে এরকম একটা প্রতিজ্ঞা করতে দ্বিধা করতো, কিন্তু গত কয়েকটা দিনে সে অনেক বেশী অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, সে বুঝেছে, সত্য মিথ্যে, ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাখ্যা নির্ভর করতে পারে। সুতরাং এইরকম একটা প্রতিজ্ঞা করা না করাতেও কিছু আসে যায় না।

সে বিদেশে যাচ্ছে একাধিক গোপনীয়তার বোঝা নিয়ে। পমপম বারবার বলে দিয়েছে, মানিকদার মৃত্যুর কথাটা এখন যেন অতীনকেও জানানো না হয়। মানিকদা অ্যাবসকণ্ড করে আছেন, এইটুকু জানানোই যথেষ্ট।

লন্ডনে গিয়ে তুতুলদিকে জানানো চলবে না তার মায়ের অসুখের কথা। কিন্তু আমেরিকায় বাবলুদার কাছে সে মানিকদার খবরটা কতদিন গোপন রাখবে? বাবলুদার সামনে সে মিথ্যে অভিনয় চালিয়ে যেতে পারবে কী? তুতুলদির কাছে পারলেও বাবলুদাকে নিয়েই তার ভয়!

॥ ৩৩ ॥

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি ছোট্ট বাড়িতে প্রায় সারা দিনরাত ধরেই চলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাজ; নাটক ও গানের রিহার্সল, প্রোগ্রামের রেকর্ডিং। এই পাড়াটি এমনিতে নির্জন ও নিরিবিলি, অধিকাংশই উচ্চবিত্ত মানুষদের বাড়ি, অনেকখানি জুড়ে আর্মির এলাকা, এরই মধ্যে একটি

বাড়ি সবসময় সরগরম। কিছুদিন আগে এই বাড়িটিই ছিল মুজিবর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের দফতর, এখন তিনি বেতারকর্মীদের ব্যবহার ও বাসস্থানের জন্য বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র উঠে গেছেন।

এই একই বাড়িতে বেতারকেন্দ্রের সবরকম কাজ ও প্রায়, সত্তর জন শিল্পী, সংগঠক ও কলাকুশলীদে মাথা গোঁজার জায়গা। যে যেখানে পারে পাঁচ-ছ ঘন্টা ঘুমিয়ে নেয়। দুটো মাত্র বাথরুম, এক একসময় সে দুটোর দরজার সামনে লাইনে পড়ে যায়। খেতে হয় দু'বেলাই খিচুড়ি কিংবা ভাত-ডাল আর একটা লম্বা ঝোলা। তবু সবাই মিলে এক জায়াগায় থাকার একটা আনন্দ আছে, কেউ কেউ আগে বেশ আরাম ও বিলাসিতার জীবনে অভ্যস্ত থাকলেও এখানে দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের গরিমা উপভোগ করার মেজাজে মেনে নিচ্ছে সব অসুবিধে। অবশ্য হঠাৎ হঠাৎ ছোট ছোট দল উপদলে ধারণা, চ্যাঁচামেচি ও ঝগড়াঝাঁটি চলে, শিল্পীদের পক্ষে সর্বক্ষণ একজোট হয়ে থাকা সম্ভব নয় বোধহয়, কিন্তু বৃহত্তর কারণটি মনে পড়ে যেতেই আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যায়।

মাঝে মাঝেই সীমান্তের ওপার থেকে নতুন মানুষ এসে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের ছ'টি বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে পাকিস্তানী প্রচার যন্ত্রের চাকরি ছেড়ে দলে দলে যোগ দিচ্ছেন মুজিবনগর সরকারের পক্ষে। কেউ কেউ আগেই চাকরি ছেড়ে গ্রামে লুকিয়ে ছিলেন। এঁরা অনেকে পাচার করে আনছেন কিছু কিছু পুরোনো অনুষ্ঠানের, গান-বাজনার টেপ, এঁদের মুখে শোনা যায় পাকিস্তানী বাহিনীর অত্যাচারের নতুন নতুন কাহিনী।

সবচেয়ে সাড়া পড়ে গিয়েছিল চট্টগ্রামের বেতারকর্মীদের আগমনের দিনটিতে। বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে সেই এগারোজন পেয়েছিলেন বীরের অভ্যর্থনা। পাকিস্তানী শাসকদের অগ্রাহ্য করে এঁরাই প্রথম স্থাপন করেছিলেন 'বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। ২৫ শে মার্চ শুরু হয়েছিল পাকিস্তানী বাহিনীর নারকীয় অত্যাচার, পরের দিনই কালুরঘাট ট্রানসমিশন ভবন থেকে এই বিদ্রোহী কর্মীরা স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করে দেন। ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের এক মেজর জিয়াউর রহমান এই গোপন কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের নাম করে যখন আবার স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের বাণী ঘোষণা করেন, তখন তা নিপীড়িত, শঙ্কাতুর কিন্তু প্রতিবাদে উন্মুখ বাঙালীদের মনে ভরসা যুগিয়েছিল।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটি বেতার কেন্দ্র হলেও এখান থেকে ট্রান্সমিশনের ব্যবস্থা নেই। এখানে থেকে রেকর্ড করা অনুষ্ঠানের টেপ নিয়ে যাওয়া হয় সীমান্তের কাছাকাছি কোনো একটি জায়গায় একটি পঞ্চাশ কিলোওয়াটের ট্রান্সমিটারে সম্প্রচারের জন্য। সে জায়গাটির নাম সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে, কেননা, পাকিস্তানী সামরিক শক্তি যে-কোনো উপায়ে সেই ট্রান্সমিশন যন্ত্র ধ্বংস করে দিতে চাইবেই, এবং সীমান্তের এপারেও পাকিস্তানী গুপ্তচরদের অভাব নেই।

তাজউদ্দীন সাহেবের নিজস্ব ঘরখানাকেই বানানো হয়েছে স্টুডিও। সাউণ্ড প্রুফ করার জন্য বিছানার চাদর ঝুলিয়ে আর তুলো গুঁজে কোনোক্রমে বন্ধ করা হয়েছে জানলা-দরজার ফুটোফাটা। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ধার দিয়েছেন দুটো পুরোনো টেপ রেকর্ডার, অনুষ্ঠান প্রযোজনা ও রেকর্ডিং-এর জন্য তাঁরা কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সহযোগিতারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু মুজিবনগর সরকারের প্রচার দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন যিনি, সেই টাঙ্গাইলের জনাব আবদুল মান্নান বলেছিলেন, নাঃ, আমাগো প্রোগ্রাম আমাগো পোলাপানরাই করবো। আপনারা ট্রান্সমিশনের ব্যবস্থা করতেছেন, সেইটাই যথেষ্ট!

যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অপ্রতুলতা পূরণ করে দিয়েছে এখানকার কর্মী-শিল্পীদের অদম্য পাণশক্তি ও অফুরান উৎসাহ। সীমান্তে মুক্তযোদ্ধারা জল-কাদার মধ্যে প্রতিদিন লড়াই করে যাচ্ছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শহরে-গ্রামে অসংখ্য মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গড়ে তুলছে প্রতিরোধ, সীমান্তের এপারে যারা আশ্রয় নিয়েছে, সেই শিল্পী বুদ্ধিজীবীরাও কোনো না কোনো ভাবে এই যুদ্ধে অংশ নিতে চান। স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠানগুলিও এক হিসেবে যুদ্ধ, তাই এ-বাড়িতে সর্বক্ষণই যেন যুদ্ধকালীন ব্যস্ততা।

শওকতের সঙ্গে মঞ্জু আর হেনা একদিন এলো এই বেতার কেন্দ্রটি দেখতে। মামুন আজ বাড়িতে থাকবেন, তিনি সুখুর দেখাশুনো করবেন, তিনিই জোর করে পাঠিয়েছেন মেয়েদুটিকে। বাবুল চৌধুরীর এখনও কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

আব্দুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, অজিত রায়, কাদেরী কিবরিয়া এইসব শিল্পীদের দেখতে পেয়ে মঞ্জু আর হনা দু'জনেই বেশ উত্তেজিত। এইসব বিখ্যাত লোকদের ছবিই আগে দেখেছে ওরা, এখন

তাঁরাই জলজ্যান্ত অবস্থায় চোখের সামনে। এবং এঁদের চালচলন একেবারে সাধারণ মানুষের মতন। লুঙ্গি পরে খালি গায়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের তালিম নিচ্ছেন যাঁরা, তাঁরা মাত্র কয়েকমাস আগেও ঢাকায় ছিলেন সুদূর তারকালোকের মানুষ। 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' গানটা শুনলেই রোমাঞ্চ হয়। একটা ঘরে বসে কামাল লোহানী খবর লিখে যাচ্ছেন। পাশের ঘরে রিহার্সাল চলছে 'জল্লাদের দরবার' নাটকের। 'চরমপত্রের' জন্য বিখ্যাত এম আর আখতার মুকুল মঞ্জু আর হেনাকে দেখে চিতে পেরে বললেন, কী! তোমরাও গান করবা নাকি? আমাগো কোরোসের জন্য কয়েকটা ফিমেল ভয়েস দরকার।

সঙ্গীত পরিচালক সমর দাসও চিনতে পারলেন মঞ্জুকে। একসময় তিনি ওদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন, মঞ্জুর গান শুনেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম বিলকিস বানু না? তুমি তো অনেক নজরুলের গান শিখেছিলে, আমাদের এখানে গান করো!

মঞ্জু লজ্জায় শরীর মোচড়াতে থাকে। অনেক দিন অভ্যেস নেই, বিয়ের পর সে গান গাওয়া ছেড়েই দিয়েছে।

শওকত চোখ টিপে বললো, আপনি ছাড়বেন না, সমরদা। ওদের আপনারা গানের দলের সাথে জুইড়া লন! সেইজন্যই ওরে নিয়া আসছি!

সমর দাস হাতঘড়ি দেখে বললেন, আমাকে একটা রি-রেকর্ডিং করতে হবে। এখন একটু ব্যস্ত আছি। আপনেরা একটু ঘোরেন ফেরেন। ঠিক ফরটি ফাইভ মিনিট্‌স পর আমি এই মেয়েটিরে নিয়ে বসবো।

সেই ঘর থেকে বেরিয়েই একজন লোককে দেখে শওকত বললো, সেলাম আলেকুম, জহির ভাই! আপনি এখানে?

সেই ভদ্রলোক বললেন, এই যে শওকত, তুমও আইস্যা পড়ছো? আমার একটা টক আছে, রেকর্ড করাবো।

শওকত মঞ্জু আর হেনার দিকে চেয়ে বললো, ইনি কে চিনেছো? জনাব জহির রায়হান, ফেমাস ফিল্‌ম ডাইরেকটার অ্যান্ড রাইটার।

মঞ্জু আর হেনা দু'জনেই ওঁর নাম আগে শুনেছে, তারা অভিবাদন জানালো।

শওকত আবার বললো, জহিরভাই, আপনার 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিটার নাকি একটি প্রিন্ট এসেছে? কলকাতায় দেখানো হবে?

জহির রায়হান বললেন, চেষ্টা চলছে। কিছু এডিটিং দরকার। পরে কথা হবে, বাংলাদেশ মিশানে এসে দেখা করো!

শওকত বললো, আপনি টক দেবেন, আমরা একটু শোনতে পারি না?

–ভিতরে বোধহয় ঢুকতে দেবে না। বাইরে দাঁড়াতে পারো।

অন্য কেউ একজন ওদের কথাবার্তা শুনে বললো, ঠিক আছে, ভিতরেই আসো, কিন্তু কোনো শব্দ করবা না,হাঁচি কাশির রোগ নাই তো?

হেনা-মঞ্জুরা রেকর্ডিং রুমে ঢুকে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলো। বেশ তীব্র উত্তেজনা বোধ করছে তারা। স্পষ্টভাবে উচ্চারিত না হলেও তারা বুঝতে পারছে যে তারা এখানে ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

জহির রায়হানের কথিকাটির নাম 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ'। পরিষ্কার উচ্চারণে তিনি বলতে লাগলেন,...পাকিস্তানের এই অপমৃত্যুর জন্য বাংলাদেশের মানুষ দায়ী নয়। দায়ী পাকিস্তানের শাসক চক্র, যারা, পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের স্বাধিকারের প্রশ্নকে লক্ষ লক্ষ মৃতের লাশের নিচে দাবিয়ে রাখতে পেরেছে...। বাংলাদেশ এখন প্রতিটি বাঙালীর প্রাণ। বাংলাদেশে তারা পাকিস্তানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না। সেখানে তারা গড়ে তুলবে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, সেখানে মানুষ প্রাণভরে হাসতে পারবে, সুখে শান্তিতে থাকতে পরবে...।

পড়া শেষ হতেই কলাকুশলীরা সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। চমৎকার বলা হয়েছে, ভবিষ্যতের সুন্দর ছবিটা যেন সকলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঐ ছবিটাই তো বর্তমানের সব দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জহির রায়হান বললেন, কলকাতায় যেন ঢাকার থেকেও বেশী গরম পড়ে মনে হয়, তাই না?

শওকত বললো, কইলকাতায় কত মানুষ! বাপরে বাপ! রাস্তা দিয়ে হাঁটনের সময়ও মাইনষের গায় মাইনষের ধাক্কা লাগে!

জহির রায়হান বললেন, তবে সন্ধ্যেবেলা কলকাতায় একটা সুন্দর বাতাস ওঠে প্রায়ই, বঙ্গোপসাগরের হাওয়া।

মঞ্জু শওকতকে মৃদু খোঁচা মেরে বললো, শওকতভাই, এবার বাসায় চলো।

শওকত বললো, সমঝদার কথা শুনে পলাইতে চাও তাই না? ঐসব হবে না, আজ তোমারে গান গাইতে হবে!

সমর দাস অন্য কাজ শেষ করার পর হারমোনিয়াম নিয়ে বসে সা-পা টিপে বললেন, দেখি গলা খোলো তো! একটা লাইন গাও!

মঞ্জু তবুও দ্বিধা-শরম কাটাতে পারছে না, তার ফর্সা মুখটা লালচে হয়ে উঠেছে। হেনা আর শওকত দু'জনে মিলে তাকে অনেক করে বোঝাতে লাগলো। শওকত বললো, শোনো মঞ্জু, স্বাধীনতা এমনি এমনি পাওয়া যায় না, তার জন্য প্রত্যেককেই কিছু না কিছু দিতে হয়। এখানে ঘরে বসে শুধু দিনগুলো নষ্ট করবে কেন? স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনে মুক্তিযোদ্ধারা কতটা প্রেরণা পায় তা তুমি জানো? আমি নিজে দেখে আসছি...

হেনা বললো, আপা, বাংলাদেশের মইধ্যে সকলে এই প্রোগ্রাম শোনে। দুলাভাই তোমার গলা শোনলেই চেনতে পারবেন! তাইলে তিনি বোঝবেন যে আমরা ভালো আছি। চিঠিপত্র তো পাওয়া যায় না!

এই কথা শুনে মঞ্জু চোখ বড় বড় করে তাকালো।

শওকত বললো, হেনা ঠিক বলেছে। এইভাবেই তো দেশের মইধ্যে অনেকে আমাগো খবর পায়। তুমি যদি বাবুল চৌধুরীর একটা ফেভারিট গান করো, সেইটাই হবে তোমার চিঠি!

সমর দাস খানিকটা অস্থিরভাবে বললেন, কোন্ গান বলো, আমিও ধরছি!

মঞ্জু এবার খুব আস্তে আস্তে শুরু করলো, 'দুঃখ যদি না পাবে তো, দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে...

সমর দাস একটুক্ষণ গলা মিলিয়ে থেকে হঠাৎ থেমে গেলেন। অনেকদিনের অনভ্যাসের জন্য মঞ্জুর গলা কাঁপা কাঁপা লাগছে, লয়ও ঠিক থাকছে না। সমর দাস মন দিয়ে শোনার পর বললেন, হুঁ, গলায় সুর আছে কিন্তু কয়েকটা দিন প্র্যাকটিস করা দরকার। এখনই প্রোগ্রাম করা ঠিক হবে না।

এরপর শুরু হলো মঞ্জুর গলা সাধা। শওকত, পলাশ আর তার এক বন্ধু বরুণ নিয়মিত এসে উৎসাহ দিতে লাগলো। এরা তিনজনেই গান-পাগল, এরা মঞ্জুকে গায়িকা করে তুলবেই। বরুণ একটা হারমোনিয়াম এনে দিল মঞ্জুকে। মঞ্জুর সঙ্গে ওরাও গান করে, ঘন্টার পর ঘন্টা চলে।

মামুন নিজে গান-বাজনা ভালোবাসলেও ঘরের মধ্যে এই হৈ হট্টগোলে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়লেন। ছেলেগুলো ভালো, এদের উৎসাহ উদ্দীপনায় মঞ্জু যেন একটা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, তার মুখ অন্যরকম দেখায়। হেনার গানের গলা নেই কিন্তু সেও স্বাধীন বাংলা বেতারে অনুষ্ঠান করবে বলে নজরুলের কবিতা বেছে আবৃত্তির অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে, এতে মামুনের খুশি হবারই কথা, তিনি অখুশিও নন, তবু তাঁর নিজের কাজের অসুবিধেটাও অনুভব করছেন।

একদিন মঞ্জু বললো, মামুনমামাও ভালো গান করে।

পলাশ বললো, ঠিক তো, আমি মামুনমামার গান শুনেছি তোমাদের বাড়িতে। আপনিও একটা গান করুন না!

বরুণ এসে মামুনের হাত ধরে টানাটানি করে বললো, আসেন মামুনভাই, আসেন, আমাদের একটা গান শোনান!

মামুন লজ্জায় মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, আরে দুর দুর আমি গুন গুন করতাম,সেও অনেকদিন আগে, সেসব তোমাদের শোনাবার মতন নয়।

ওরা নাছোড়বান্দা, মামুনকে টানতে টানতে নিয়ে বসালো হারমোনিয়ামের সামনে। পলাশ সেটা বাজায়, বরুণ একটা মোটা বইতে টোকা মেরে তবলার তাল দেয়। অনেকদিন পর মামুনের যেন বয়েস কমে গেল। তিনি শুধু গান করতে বাধ্য হলেন না, গলা খুলে হাসলেনও। বরুণ তাঁর গান শুনে মন্তব্য করলো, মামুনভাই, আপনার গলা তো ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতন! মামুন বললেন, আর তোমার গান তো অন্যদিকে ফিরে শুনলে মনে হয় হেমন্তবাবু গাইছেন!

দশদিন পর মঞ্জুর দু'খানা গানের রেকর্ডিং হলো বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের স্টুডিওতে। বেশ সুনাম হলো তার গানের।

শুধু স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠানেই নয়, বাংলাদেশের শিল্পীরা কলকাতা ও কাছাকাছি মফস্বলের নানান জলসাতেও অংশ গ্রহণ করেন। ক্রমে সেইসব আসরেও ডাক পড়তে লাগলো মঞ্জুর। ব্যারাকপুর, চন্দননগর কিংবা বর্ধমানে দলবল মিলে হৈ হৈ করতে করতে যাওয়া, সেখানে বিপুল সংবর্ধনা ও গান-বাজনা, খাওয়া-দাওয়া, তা ছাড়া রিলিফ ফাণ্ডের জন্য কিছু টাকাও পাওয়া যায়। অনেক গায়ক, শিল্পী, সাংবাদিক এসে পড়েছেন, তাঁদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হয় না বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে, কলকাতায় শুভার্থীরা তাঁদের জন্য আলাদা আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ল্যান্সডাউন রোডের একটা ফ্ল্যাটে এরকম রয়েছেন পনেরো-ষোলোজন, পলাশ ও বরুণরা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে এঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, সেখানেও প্রায় সবসময়েই চলে গান বাজনা ও নাটকের মহড়া।

মঞ্জু ও হেনাকে সেখানে নিয়ে যায় শওকত। মামুন আপত্তি করেন না, সন্ধেবেলাটা ঘর ফাঁকা থাকলে তাঁর লেখালেখির সুবিধে হয়। আবার মনের মধ্যে একটা খটকাও থাকে। এভাবে মঞ্জু হেনাকে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে? এখনকার ছেলেমেয়েরা সমানভাবে মেশে, কলকাতায় এটা প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার, তবে কি মামুন এখনও ভেতরে ভেতরে প্রাচীনপন্থী রয়ে গেছেন?

হেনা আর মঞ্জুকে অনেকেই ভাবে পিঠোপিঠি দুই সহোদরা, মঞ্জু একটু সাজগোজ করলে মনেই হয় না যে তার একটি সন্তান আছে। এই দু'জনের প্রতি যুবকদের উৎসাহ দেখলে ভয় হবারই কথা। এখানে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তৌফিক ইমামের সঙ্গে মামুনের বেশ পরিচয় হয়ে গেছে, কাছেই তাঁর বাড়ি। জাস্টিস ইমামের পরিবারের লোকজন হেনা-মঞ্জুদের বেশ পছন্দ করে, ওরা সে বাড়িতে প্রায়ই যায়। সুখুর সমবয়েসী দুটি বাচ্চা আছে বলে মঞ্জু মাঝে মাঝে সেখানে সুখুকে রেখে আসে। একদিন মঞ্জু বলেছিল, মামুনমামা, জজসাহেবের সম্বন্ধ করলে কেমন হয়? হেনার সাথে খুব ভালো মানাবে!

মামুন প্রবল বেগে মাথা নেড়েছেন। দেশ স্বাধীন হবার আগে তিনি মেয়ের বিয়ের কথা চিন্তাই করতে চান না। কিন্তু তার আগেই মেয়ে যদি কারুকে পছন্দ করে বসে?

বাংলাদেশ মিশনের ঠিকানায় লন্ডন থেকে ফিরোজার এই ভাইয়ের একটি চিঠি এসেছে মামুনের নামে। তাতে তিনি জেনেছেন যে, ফিরোজা এবং তাঁর ছোট মেয়ে গ্রামের বাড়িতে ভালো আছে, মামুনও লন্ডন ঘুরিয়ে একটা চিঠি লিখেছেন স্ত্রীকে। মাদারীপুরে সেরকম কিছু হামলা হয়নি, সে খবরও তিনি পেয়েছেন আগে। বাবুল চৌধুরীর এখনও কোনো সন্ধান নেই। ঢাকা থেকে যারা আসছে, তারাও বাবুল সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না।

শ্রীরামপুর বাংলাদেশের শিল্পীদের একটা বিরাট সংবর্ধনা সভা হবে, সেখানে মঞ্জুকে নিয়ে যেতে চায় শওকত। আও দু'জন মহিলা শিল্পীও যাচ্ছে। তিনখানা কোরাস গানে মঞ্জুর রিহার্সাল দেওয়া আছে, সেইজন্য মঞ্জুকে বিশেষ দরকার।

মামুন বললেন, শ্রীরামপুর? সে তো অনেকদূর।

শওকত বললো দূর কোথায়, মামুনভাই! গাড়িতে যাওয়া-আসা, আমরা রাত্তির সাড়ে নটা-দশটার মধ্যে ফিরে আসবো। অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

মামুন খুঁত খুঁত করতে লাগলেন। মঞ্জুকে অতদূর পাঠাতে তাঁর মোটেই ইচ্ছে করছে না, অথচ সরাসরি আপত্তি জানাতেও পারছেন না। শওকত হেনাকে নিয়ে যাবার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেনি, মামুন শেষ পর্যন্ত বললেন, হেনাও তাহলে সঙ্গে যাক। তোমার ওপরে দায়িত্ব দিলাম, শওকত।

হেনাকে তিনি সঙ্গে পাঠাতে চান মঞ্জুকে পাহারা দেবার জন্য। কিন্তু মঞ্জু যদি গানটান নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন হেনাকে কে পাহারা দেবে? মঞ্জুর চেয়ে হেনার বয়েস অনেক কম, তার যদি মাথা ঘুরে যায়? কোন্ দিকটা যে মামুন সামলাবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। শওকতকে তিনি বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করেন না। মামুন রাগ করতে পারেন এমন কোনো কাজ শওকত কিছুতেই করবে না। কিন্তু অচেনা যায়গায় কত রকম মামুন থাকে!

একজন বিবাহিতা রমণী অনাত্মীয়দের সঙ্গে দূরের কোনো অনুষ্ঠানে গান গাইতে যাবে, এটা কিছুদিন আগেও অবিশ্বাস্য ছিল কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন সবকিছু পাল্টে গেছে। এই কয়েক মাসের

মধ্যেই পরিবর্তিত হয়েছে অনেক মূল্যবোধ।

ওরা চলে যাবার পর মামুন একটা লেখা শেষ করবেন ভেবে বসলেন। কিন্তু একলাইনও লেখা এগোচ্ছে না। গোলমালের মধ্যেই তাঁর লেখা অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন নির্জনতার মধ্যে আর চিন্তাশক্তি কাজ করতে চায় না। সুখুকে পাঠিয়ে দেওয়া জাস্টিস ইমামের বাড়িতে, মামুন আজ প্রকৃতই একা।

লেখা ছেড়ে মামুন রেডিওটা নিয়ে খুটখাট করতে লাগলেন। এখন ভালো কোনো প্রোগ্রাম নেই। খাটে শুয়ে কিছুক্ষণ একটা বই পড়ার চেষ্টা করলেন, তাতেও মন বসলো না। ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। একবার ভাবলেন, প্রতাপের বাড়িতে যাবেন আড্ডা দিতে, কিন্তু সে-বাড়ি অনেক দূর, সন্ধের পর গেলে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যায়। বালু হক্কাক লেনে 'জয় বাংলা' অফিসে গিয়ে দেখলেন সেখানেও আজ কেউ নেই।

পার্ক সার্কাস ময়দানে ঢুকে মামুন চিনেবাদাম খেতে লাগলেন। সারাদিন অসহ্য গরম গেছে, সন্ধের পর অনেকেই পার্কে হাওয়া খেতে আসে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই, বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে, পার্কের মধ্যে এদিকে সেদিকে জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষদের বসে থাকতে দেখা যায়। দু'দিন আগেই এই তল্লাটে নকশালরা প্রচুর বোমাবাজি করেছে তবু লোকে সন্ধের পর এখানে আসতে ভয় পায় না।

মামুনের মনে পড়ে গেল ঢাকার কথা। শোনা যায়, প্রায়ই সন্ধের পর ঢাকা শহরে কারফিউ থাকে। আজও কি কারফিউ? কলকাতার আকাশে জ্যোৎস্না ফুটলে ঢাকাতেও আজ জ্যোৎস্না থাকতে পারে। কতই বা দূর! জ্যোৎস্নার মধ্যে ঢাকার রাস্তাঘাট সব সুনসান ফাঁকা? মাঝে মাঝে দারুণ দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বোমা ফাটাতে শুরু করেছে, চোরাগোপ্তা খুনও হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকেরা। এই সময় কি সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে পেট্রোল দিতে? প্রেস ক্লাব বিল্ডিং-এ পঁচিশে মার্চ রাতে গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল, তারপরেও কি সেখানে আর কেউ যায়? ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে যারা দিনের পর দিন কুৎসিত সব মিথ্যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তারাও তো বাঙালী, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায় না? কিংবা শুধু আর্মির ভয়েই তারা জেনেশুনে এইসব মিথ্যে প্রচার করছে? বাবুল চৌধুরী কোনোদিন আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেনি, এই যুদ্ধ সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ নেই, আর্মির অফিসারদের সঙ্গে তার চেনাশুনো আছে, সুতরাং তার কোনো বিপদহবার কথা নয়। হয়তো সে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ নিয়ে কোনো কাজ করছে এখন, আর তার বউ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা দেবার জন্য গান গাইছে বেতারে!

শ্রীরামপুরের অনুষ্ঠানে তাঁকেও তো ডাকলে পারতো। তিনি হেনা-মঞ্জুদের সঙ্গে গেলে আর কোনো চিন্তা থাকতো না। তাঁর মতন একজন বয়স্ক মানুষকে ওরা সবসময় সঙ্গে নিতে চায় না। তাতে অনেক মজা মাটি হয়। পৃথিবীটাই যৌবনভোগ্য। মামুনের পতন প্রবীণদের এখন স্থান ছেড়ে দিতে হবে।

নটা বাজবার আগেই মামুন বাড়িতে ফিরে এলেন। মঞ্জুরা যাওয়ার আগে তাড়াহুড়ো করে রান্না করে রেখে গেছে। খরচা বাঁচাবার জন্য এমনিতেই প্রায় দিনই একবেলা রান্না হয়। ভাতে পানি ঢালা আছে, এই গরমে পান্তা ভাত বেশ ভালোই লাগে।

সুখু আজ রাতটা জজ সাহেবের বাড়িতেই থাকবে। মঞ্জুরা খুব সম্ভবত খেয়েই আসবে। ভাত না খাওয়ালেও এইসব অনুষ্ঠানের পর এতসব নোন্তা আর মিষ্টি খাবার দেয় যে তারপর আর বাড়িতে এসে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।

রেডিওটা চালিয়ে ঘড়ির দিকে চোখ রেখে মামুন একই খেতে বসলেন সাড়ে নটার সময়। কিছু কাজ করার না থাকলেই বেশি খিদে পায়। এইবার মঞ্জুদের এসে পড়া উচিত।

দশটা বেজে গেল, তবু ওদের ফেরার নাম নেই। শওকত কথা দিয়ে গিয়েছিল, এরা কথা রাখতে জানে না। দশটা কি কম রাত? গাড়ি করে আসবে, পরে কত রকম বিপদ হতে পারে, ওদের কি তাড়াতাড়ি রওনা দেওয়া উচিত ছিল না? ছেলে ছোকরাদের কোনো আক্কেল নেই।

শওকত বিয়ে করেছিল তাঁরই পরিচিত ওয়ালীউল ইসলামের ছোট মেয়ে নাসিমকে। বড় চাপা আর নিরীহ মেয়ে ছিল সে। সে বেচারি প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। তারপর কি আর শওকত বিয়ে করেছে? কিছু বলেনি তো! মঞ্জুকে সে কি শুধু স্নেহ করে না অন্যকিছু? হঠাৎ মামুনের মনে পড়ে গেল, বাবুল চৌধুরীর সঙ্গে শওকতের কোনোদিন ঠিকমতন ভাব জমেনি। একদিন শওকতের সঙ্গে বাবুলের কী নিয়ে যেন খুব কথাকাটাকাটি হয়েছিল না? শওকত এখানে প্রথম দিন এসে আলতাফের চিঠি দিয়েছিল, তারপর সে আর বাবুল সম্পর্কে কোনোরকম উচ্চবাচ্য করেনি। বাবুলের কোনো বিপদ হলেও যেন কিছু যায় এস না। সে মঞ্জুকে নিয়ে মেতে উঠেছে।

এগারোটা বেজে যাবার পর মামুন রীতিমতন ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। জনবহুল কলকাতা রাস্তাও এখন প্রায় নিঃশব্দ হয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে ওদের। মঞ্জুর যদি খারাপ কিছু ঘটে যায়, তা হলে মামুন তাঁর দিদির কাছে, মঞ্জুর স্বামীর কাছে কী কৈফিয়ত দেবেন? সকলেই বলবে, মামুন কেন মঞ্জুকে অতদূর যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন! মঞ্জুর সঙ্গে হেনাও গেছে, সেটা তাঁর আরও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কাজ হয়েছে।

এখন মামুন কী করবেন, কাকে খবর দেবেন? থানায় যাওয়া উচিত? বাংলাদেশ মিশনে? সেখানে এত রাতে কেউ থাকবে?

অসহায়ভাবে ছটফট করতে লাগলেন মামুন, কিছুক্ষণ বাড়ির সামনে রাস্তায় পায়চারি করলেন, তারপর ওপরে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন জানলায়।

পৌনে একটার সময় বাড়ির সামনে একটা প্রাইভেট গাড়ি থামলো। সদর দরজা খোলাই রেখেছেন মামুন, তিনি দেখলেন প্রথমে হেনা নেমেই দৌড়ে ঢুকে এলো বাড়ির মধ্যে। তারপর মঞ্জু নেমে কয়েক পা এগোতেই গাড়ির মধ্যে থেকে কেউ তাকে ডাকলো।

গাড়ি থেকে নামলো পলাশ, শওকত কোথায়? গাড়িতে আর কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। নিয়ে গেল শওকত আর ফিরে এলো পলাশের সঙ্গে? পলাশের হাতে কিসের যেন একটা বড় প্যাকেট। মঞ্জুর কাছে এসে সে প্যাকেটটি তুলে দেবার আগে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকালো, মঞ্জুও চেয়ে রইলো একদৃষ্টিতে। যেন সেই দৃষ্টির মধ্যে একটা সেতুবন্ধন আছে।

দপ করে মামুনের মাথার মধ্যে জ্বলে উঠলো একটা তীব্র শিখা। সেটা রাগ না ঈর্ষা। বাবুল চৌধুরীকে কী কৈফিয়ত দেবেন সে কথা মামুনের মনে পড়লো না, তাঁর মনে হলো পলাশ নামের ঐ ছোকরা মঞ্জুকে তার কাছে থেকে কেড়ে নিচ্ছে! ঐ ছেলেটায় চোখদুটো উপড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হলো মামুনের।

॥ ৩৪ ॥

দু'শো-আড়াই শো জন যুবক মিলে একটা পুকুর কাটতে শুরু করেছে। পাশের গ্রামের চাষীদের কাছ থেকে যে যা পারে খন্তা-কোদাল-শাবল ধার করে এনেছে, ঝুড়ি-ঝোড়াও যোগাড় হয়েছে কিছু। খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে সকাল থেকে, দুপুরবেলাতেই আকাশে ঘনাচ্ছে কালো মেঘ, আজ সন্ধেবেলা আবার নির্ঘাৎ ঝড় বৃষ্টি নামবে, কাজ শেষ করে ফেলতে হবে তার আগে আগে।

একেবারে শুকনো জায়গায় পুকুর কাটা হচ্ছে না, এখানে একটা কাদাজলের ডোবা ছিল আগেই। কাছাকাছি কোনো জনবসতি নেই, চার পাশটা অনেকটা পতিত জমির মতন। এখানে কয়েকসার নতুন ক্যাম্প বসাবারও জায়গা পাওয়া যাবে।

এখন যুদ্ধের চেয়ে পুকুর খোঁড়াটাই বেশী জরুরি। বেলুনিয়া পতনের পর বোঝা গেছে, বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু আক্রমণ ও প্রতিরোধ কর মুক্তিযোদ্ধ চালানো যাবে না। যুদ্ধের প্রস্তুতি ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

কিন্তু প্রতিদিন শত শত যুবক আসছে মুক্তি যুদ্ধের সৈনিক হবার জন্য নাম লেখাতে। ভারতীয় সীমান্তের ক্যাম্পগুলিতে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। এদের ট্রেনিং দেবার উপায় তো দূরে থাক, শুধু থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেই হিমসিম খাবার মতন অবস্থা সেক্টর কমান্ডারদের। অথচ ছেলেগুলি আসছে প্রচণ্ড উদ্দীপনা এবং দেশ স্বাধীন করার মৃত্যুপণ নিয়ে, এদের ফিরিয়ে দেওয়াও যায় না। তাঁবুগুলির অতি জীর্ণদশা, ইতিমধ্যে নেমে গেছে প্রবল বর্ষা, এখন কোনোক্রমে মাথা গোঁজাই একটা বড় সমস্যা। দু'বেলা আহার্যের মধ্যে শুধু চাল আর ডাল, তাও দু'একদিন অন্তরই চাল ফুরিয়ে যাওয়ায় আবার বস্তা বস্তা চাল যোগাড় করার জন্য মাথা ঘামাতে হচ্ছে। প্রতিবছরই জুন-জুলাই মাসে চালের দর বাড়ে, এবার আরও বেড়েছে।

খাদ্যের চেয়েও পানীয় জল এবং গোসল করার পানির সমস্যা কম জরুরি নয়। সীমান্ত

ক্যাম্পগুলির কাছাকাছি পুকুরের জল দূষিত হয়ে গেছে। হুড়োহুড়ি করে যে দু'চারটি টিউবওয়েল খোঁড়া হয়েছিল, তাও অকেজো হয়ে যাচ্ছে অতি ব্যবহারে। খাদ্যের চেয়েও পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী, তা বোঝা যায় এইসব সঙ্কটের সময়ে। দু'একটি ক্যাম্পে কলেরা শুরু হতেই ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক, তার ওপর হয়েছে অদ্ভুত এক চোখের অসুখ। হঠাৎ চোখ লাল হতে শুরু করে, তারপর চোখের কোণে পুঁজ জমতে থাকে। সেই সঙ্গে দুর্বিষহ জ্বালা। ডাক্তাররা এই রাগের নাম বলেন কনজাংক্টিভাইটিস। কিন্তু লোকের মুখে মুখে এ রোগের নতুন নাম হয়েছে জয় বাংলা! কেউ বলে, এই রোগ আসছে ঢাকা থেকে, কেন না পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যেও এই চোখ লাল করা রোগ আসছে ঢাকা থেকে, কেন না পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যেও এই চোখ লাল করা রোগ ছড়িয়েছে, আবার কেউ বলে ভারত থেকেই আসছে এই ভাইরাস! মোটকথা, ঢাকা-আগরতলা-কলকাতা, কোথাও এই বিরক্তিকর রোগের উপদ্রব কম নয়। ঢাকাতে কলেরাও শুরু হয়ে গেছে এবং পাকিস্তান রেডিও অশ্রান্ত ভাবে প্রচার করে যাচ্ছে যে এই কলেরার জীবাণু ছড়াচ্ছে ভারত।

চোখের রোগটার কোনো ওষুধ নেই, শুধু জলের ঝাপটা দিলে খানিকটা জ্বালার উপশম হয়। কিন্তু প্রাণে ধরে কি কেউ নিজের চোখে দুর্গন্ধ নোংরা জলের ঝাপটা দিতে পারে! তাই গত দু'দিন ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলিতে অন্য সব কাজ বন্ধ রেখে শুধু নতুন পুকুর কাটার উদ্যম চলছে।

যারা মাটি কাটছে ও মাটি বইছে, তাদের দেখলেই বোঝা যায় যে, তারা জীবনে কখনো কখনো এই কাজ করেনি। অধিকাংশই কলেজের ছাত্র, সচ্ছল বা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে এসে তাদের পক্ষে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দেওয়া তবু সহজ, কিন্তু পুকুর কাটা, কলেরা রোগীর সেবা করা, কিংবা ছেঁড়া তাবু, বাঁশ, চাটাই বেড়া, হাঁড়িকুড়ি মাথায় করে বয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া এদের পক্ষে অনেক শক্ত কাজ।

ভারতীয় সীমান্তের ঠিক ধার ঘেঁষে ঠাকুর গাঁও শিবিরের কাছাকাছি দুটি পুকুরই একেবারে নোংরা হয়ে যাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা নিজেরাই নতুন পুকুর খোঁড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এত কষ্টের হাস্য পরিহাস বন্ধ হয়নি।

টাঙ্গাইলের এক ছেলে গৃহত্যাগ করার সময় তাদের পারিবারিক সম্পত্তির মধ্যে থেকে একটি পুরোনো তলোয়ার সঙ্গে এনেছিল, শাবল-কোদাল কিছু যোগাড় করতে না পেরে সে সেই তলোয়ার দিয়েই মাটি খুঁড়ছে, তার কাছাকাছি লোকেরা প্রবল হা হা শব্দে হাসছে। তলোয়ার দিয়ে পুকুর খোঁড়া, এটা হাসির ব্যাপার নয়! কাদার মধ্যে বারবার আছাড় খেয়ে কারুর চেহারা হয়েছে ভূতের মতন।

বিকেলের দিকে সন্‌সনে হাওয়া ও টিপিটিপি বৃষ্টি শুরু হলো। দুপুরে কেউ কিছু খায়নি, তবু এই বৃষ্টির মধ্যেও কেউ কাজ ছেড়ে চলে গেল না। আজ সন্ধের মধ্যে শেষ করতে পারলে বৃষ্টির জলে পুকুর ভরে যাবে। কুমিল্লা ভিকটোরিয়া কলেজের অধ্যাপক হাস্‌মত সাহেব সবকিছু দেখাশুনোর দায়িত্ব নিয়েছেন, রোগা-পাতলা মানুষটি পুকুরের চার ধার ঘুরে ঘুরে লাফিয়ে লাফিয়ে বলছেন, হাত চালাও! হাত চালাও! ভাই ও বন্ধু হাত চালাও, হাত চালাও! সন্ধ্যার সময় গরম গরম খিচুড়ির সাথে আইজ ডিম সেদ্ধ পাবা, হাত চালাও, হাত চালাও!

হঠাৎ হাস্‌মত সাহেবের নজর গেল একজনের প্রতি। টাউজার্স ও গেঞ্জিপরা এই ব্যক্তিটি অসম্ভব রূপবান, গায়ের রং রক্তচন্দনের মতন, বেশ দীর্ঘকায় ও ছিপছিরে, তীক্ষ্ণ নাক, ওষ্ঠাধর এমনই পাতলা যে নারীদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যদিও সারা মুখে অল্প অল্প দাড়ি, তবু এই মানুষটিকে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয় হাসমত সাহেবের। এই লোকটি কারুর সঙ্গে কোনো কথা বলছে না, নিজেই কোদালে মাটি কেটে একটা ঝুড়িতে ভরছে, তারপর নিজেই সেটা মাথায় নিয়ে ওপরে উঠে এনে ফেলে যাচ্ছে নির্দিষ্ট জায়গায়। লোকটার চোখেমুখে যে চাপা আভিজাত্যের ছাপ, তাতেই বোঝা যায় যে, তাকে অন্য কোনো সম্মানীয় কাজ দেওয়া উচিত ছিল। বয়েসেও সে অন্যদের চেয়ে বড় মনে হয়।

হাসমত তবু বিশেষ মাথা ঘামালেন না। চেনা লোক হলেও তার সঙ্গে এখন আলাপ করার সময় নয়। তা ছাড়া চেনা কারুর সঙ্গে কথা বলতেও ভয় হয়, প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ট্র্যাজিক কাহিনী বহন করে এনেছে। কত আর শোনা যায়! সারা বাংলাদেশে পাক বাহিনীর অত্যাচার সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যতার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।

খানিকবাদে এক জায়গায় হৈ চৈ ও ক্ষুব্ধ চিৎকার শুনে হাস্‌মত সেদিকে ছুটলেন। ওখানে মারামারি লেগে গেছে। এরকম মারামারি লাগছে প্রায়ই। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা

লড়বার জন্য ছুটে এলেও এইসব যুবকেরা এখনো পুরোনো রাজনৈতিক দলাদলি কিংবা ব্যক্তিগত শত্রুতা পুরোপুরি ভুলতে পারেনি। শরীরের বিষ ফোঁড়ার মতনই ক্রোধ ও বিদ্বেষ মাঝে মাঝে ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। মুক্তি যোদ্ধাদের ক্যাম্প চালাতে গিয়ে হাসমত গোড়া থেকেই অনুভব করছেন যে শুধু দেশপ্রেমের আবেগই যথেষ্ট নয়, একটা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কতে গেলে প্রত্যেককে আগে কঠোর ভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার ট্রেনিং দেওয়ার খুবই দরকার ছিল। কিন্তু তার সময় কোথায়? দলে দলে ছেলেরা আসছে, তাদের চার-পাঁচ দিন কোনরকমে প্রাথমিক গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়ে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরা একটা রোমান্টিক যুদ্ধের স্বপ্ন চোখে নিয়ে এসেছে, প্রত্যেকেই কোনো না কোনো অ্যাকশানে যেতে চায়, কিন্তু প্রত্যেকের হাতে তুলে দেবার মতন অস্ত্রও নেই, তা ছাড়া এলোমেলো অ্যাকশনেরও কোনো মানে হয় না।

হাসমত ছুটে এসে দেখলেন, সেই ফর্সা, সুদর্শন পুরুষটিকেই মাটিতে শুইয়ে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসেছে একজন, আর দশ-বারোজন এক সঙ্গে চ্যাঁচাচ্ছে, মার, মার, খতম কইরা ফ্যালা!

হাসমত রুক্ষভাবে অন্যদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে গিয়ে বললেন, থাম, থাম! কী হইছে, কী হইছে আগে ক!

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, স্পাই! স্পাই! রাজাকার! আলবদর!

কয়েকজন শাবল, খন্তা উঁচিয়েছে, এখুনি লোকটির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে, হাসমত দু'হাত তুলে গলা ফাটিয়ে বললেন, খবর্দার, কেউ মারবা না! সেকটর কমাণ্ডারের অর্ডার, স্পাই ধরা পড়লে হ্যার কছে নিয়ে যাইতে হবে! ইন্টারোগেশান কইরা খবর বাইর করতে হবে! অরে আমার হাতে দ্যাও!

স্পাই শব্দটাই এমন যে একবার উচ্চারিত হলেই বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, স্পাইকে খুন করার আগ্রহে ছড়িয়ে পড়ে দারুণ উল্লাস। ফর্সা লোকটির বুকে যে চেপে বসে আছে তার নাম সিরাজুল। দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এর মধ্যেই তার খুব নাম ছড়িয়েছে। একটি প্লাটুনের নেতৃত্বের ভার তার ওপর। সেই সিরাজুল রক্ত চক্ষু তুলে বললো, সার এডারে আমি ভালো কইরা চিনি, আমি নিজের হাতে এডারে শ্যাষ কইরা দিতে চাই!

হাসমত কঠোরভাবে বললেন, ছাড় অরে তুই! উইঠ্যা আয়!

কোথা থেকে দড়ি যোগাড় হয়ে গেল, লম্বা লোকটির হাত দুটো বাঁধা হলো পিছমোড়া করে। তার নাক দিয়ে দরদর করে গড়াচ্ছে রক্ত, একটা চোখ বুজে গেছে, হাসমত আর এক মিনিট দেরি করলে একে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। অন্যরা চ্যাঁচামেচি করে যা অভিযোগ জানাচ্ছে তার মর্মার্থ এই যে, এই লোকটি গত তিন চার দিন হলো এখানকার ক্যাম্পে যোগ দিয়েছে। কিন্তু সে কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি, এর নাম কেউ জানে না, কোথা থেকে এসেছে তারও কোনো উদ্দেশ নেই। এর সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছিল, আজ সিরাজুল একে একজন কোলাবোরেটার হিসেবে চিনে ফেলেছে!

হাসমত বললেন, আমি এরে মেজর সাহেবের কাছে নিয়ে যাইতাছি, তোমরা কাজ করো, কাজ করো! কাজ শেষ না করলে ছুটি নাই!

যেন অন্যদের খুশি করার জন্যই হাসমত সেই বন্দীর গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই, তুই কথা কস্ ক্যান? তোর নাম কী?

থাপ্পড় খেয়ে লোকটির মুখখানা একদিকে বেঁকে গেল, তবু কোনো শব্দ বেরলো না।

সিরাজুল বললো, স্যার আমিও আপনার সাথে যামু। এডারে আমি কিছুতেই ছাড় ম না।

তারপর সে লোকটিকে এক ঠ্যালা মেরে বললো, চল হারামজাদা!

অন্য লোকজনদের ছাড়িয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে সিরাজুল হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো, গভীর বিস্ময়ে মুখ ফিরিয়ে হাসমত জিজ্ঞেস করলেন, তোর আবার কী হইলো? এই সিরাজুল, কী হইলো?

কান্নার আবেগে সিরাজুল কোনো কথা বলতে পারছে না। যেন তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে, মাটিতে বসে পড়ে সে প্রায় দম বন্ধ গলায় চিৎকার করতে লাগলো, মনিরা, মনিরা!

সিরাজুলের মতন একটা বেপরোয়া জেদী ছেলে যে এরকমভাবে কাঁদতে পারে তা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না হাসমত। তিনি বারবার হাত বাঁধা লোকটির মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। এখন আরও বেশী চেনা চেনা লাগছে। মুখখানি গভীর বিষাদে মাখা। কিন্তু যার উপলব্ধি গভীর নয়, তার

মুখে এরকম বিষাদ ফুটতে পারে না। এরকম চেহারার মানুষ কি গুপ্তচর হতে পারে? গ্রামের অশিক্ষিত গুণ্ডা ধরনের ছেলেদের নিয়েই রাজাকার, আলবদর বাহিনী গড়েছে পাকিস্তানী সরকার। এই মানুষ কিছুতেই সে রকম হতে পারে না।

হাত বাঁধা লোকটি এবার আস্তে আস্তে বললো, আমি মনিরাকে অনেক খুঁজেছি, সিরাজুল, বিশ্বাস করো–

সেই কণ্ঠস্বর শুনেই চিনতে পারলেন হাসমত। এ যে তাঁর সহপাঠী। বাবুল চৌধুরী, তাঁদের সময়কার ফার্স্ট বয়!

তিনি বলে উঠলেন, বাবুল? আমারে চিনতে পারস নাই? আমি হাসমত। বাবুল,তুই এইখানে!

সিরাজুল কান্না থামিয়ে লাফিয়ে উঠে চৌধুরীর টুঁটি চেপে ধরে বললো, আজরাইল! এই আজরাইলডা আমার সর্বনাশ করছে! অরে আমি নিজের হাতে...

অতি কষ্টে সিরাজুলের হাত থেকে বাবুলকে ছাড়িয়ে হাসমত তাকে নিয়ে গেলেন সেকটর ওয়ান-এর কমাণ্ডার মেজর রফিকুল ইসলামের কাছে। মেজর রফিকুল ইসলাম তখন আরও কয়েকজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে জরুরি বিষয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তিনি হাসমতের ওপরেই ভার দিলেন এই বিবাদের নিষ্পত্তি করতে।

একটা ফাঁকা তাঁবুতে বাবুল চৌধুরীকে নিয়ে বসলেন হাসমত, কিন্তু সিরাজুল এমনই চ্যাঁচামেচি করতে লাগলো যে আসল ঘটনা জানারই কোনো উপায় রইলো না। তার চিৎকার শুনে আশেপাশে অন্য লোকও জড়ো হয়ে যায়। একটু পরে অবশ্য খানিকটা সুবিধে হলো, মেজর রফিকুল ইসলামের অর্ডার্লি এসে ডেকে নিয়ে গেল সিরাজুলকে।

হাসমত দু'কাপ চা যোগাড় করে আনলেন। তারপর নিজের সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ইস্, এমনভাবে মারছে আগে আমার সাথে যোগাযোগ করিস নাই ক্যান? তোর এই অবস্থা হইলো ক্যামনে? তুই মাটি কাটতে গেছোস...সব কথা আমারে খুইলা বল তো এবার!

চা-টা খেয়ে নিল বাবুল, কিন্তু সিগারেট প্রত্যাখ্যান করলো। কথা বলতেও তার ইচ্ছে করছে না। সে দীর্ঘশ্বাস নিতে লাগলো বারবার। তার ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে।

হাসমত বাবুলকে একটা ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সিরাজুলের সাথে তোর আগে কোথায় দেখা হইছিল? মনিরা কে? ব্যাপারটা কী ঘটছে?

বাবুল হাসমতের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, কিন্তু তার দৃষ্টি যেন অনেক দূরে। অস্ফুট স্বরে সে বললো, আমি দেখলাম একজন মা নিজের হাতে তার ছেলেটারে মেরে ফেললো।

হাসমত আঁতকে উঠে বললেন, কোন মা? সেই কি মনিরা?

বাবুল দু'দিকে মাথা নাড়লো।

গত কয়েক মাসে বাবুল বহু সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতা পার হয়ে এসেছে কিন্তু তার এখন শুধু মনে পড়ছে মাত্র দিন সতেক আগের একটা ঘটনা। সেটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না বলে কথাও বলতে পারছে না।

প্রতিদিন দলে দলে মানুষ যাচ্ছে সীমান্তের দিকে। গ্রাম থেকে যুবকেরা অনেক আগেই সরে পড়েছে। এখন যাচ্ছে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোত। অসহায়, দুঃখী মানুষেরা চলেছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। ভারতের রেফিউজি ক্যাম্পগুলিতে কলেরার তাণ্ডবের খবর এদিকেও এসে পৌঁছেছে, তবু এরা নিবৃত্ত হচ্ছে না। রোগ ভোগের মৃত্যুটা প্রকৃতির সংহার। হানাদারের অস্ত্রে মরার চেয়েও সেটাও বোধহয় শ্রেয়।

বাবুল শেষপর্যন্ত জুটে পড়েছিল এই রকম একটি দলে। দিনেরবেলা ঝোপেজঙ্গলে লুকিয়ে থেকে রাত্তিরবেলা পথ চলা। রাত্তিরে যখন তখন আর্মি পেট্রল কিংবা হেলিকপটার-টহলে ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে। এই দলটারই কিছু কিছু আর্মির গুলিতে মরেছে, দুটি যুবতীকে সকলের সামনে লাঞ্ছনা করেছে, তারা শেষপর্যন্ত আর আসতেই পারেনি।

তৃতীয় দিন ভোরবেলা ওরা হঠাৎ প্রায় ধরা পড়ে যেতে বসেছিল। একটা ছোট নদী পার হতেই দেখলো দূরে দুটি মিলিটারির গাড়ি। তখন আর পেছোবার উপায় নেই। পাশেই একটা পাট ক্ষেত দেখে সবাই ঢুকে পড়লো সেখানে। প্রায় সাত-আট ফুট লম্বা পাট গাছের বিস্তীর্ণ ক্ষেত। তারমধ্যেও একদল মানুষ ঢুকে বসে থাকলে বোঝবার উপায় নেই। শুধু কোনো শব্দ করা যাবে না, বাচ্চা

ছেলেমেয়েরাও এটা বুঝে গেছে, তবু দু'আড়াই বছরের একটি শিশু মায়ের কোলের মধ্যে হঠাৎ কেঁদে উঠলো। হয়তো তাকে কোনো পোকা কামড়ে ধরেছিল, কিন্তু তখন আর তা দেখার সময় নেই, মা তার সন্তানের মুখটা চেপে ধরলো। তখন মিলিটারির গাড়ি পাট ক্ষেতের ধার দিয়ে যাচ্ছে, কী শ্লথ তাদের গতি, যেন কিছু সন্দেহ করেছে, খান সেনাদের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। শিশুটি কিছু বুঝছে না, সে মায়ের হাত ছাড়াবার জন্য ছটফট করছে, আর তার মা প্রাণপণে চেপে ধরে আছে তার মুখ...

খানসেনারা নদী পার হবার আগেই শিশুটি মারা গেছে তার মায়েরই হাতের চাপে। কেউ তার জন্য অতি তুচ্ছ। তার সামান্য কান্নার আওয়াজ শোনা গেলেই দলকে দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সবাই বললো, ছেলেটাকে ঐ পাটক্ষেতেই ফেলে চলে যেতে, এমন কি শিশুটির বাবা পর্যন্ত, কিন্তু জননীটির তখন এক অদ্ভুত বিহ্বল অবস্থা, সে যেন তখনও ঠিক বুঝতে পারছে না যে সে কি একজন হত্যাকারিণী, না এতগুলি মানুষের জীবনদাত্রী। এই শিশুটির জীবনের বিনিময়েই যদি এতগুলি মানুষ প্রাণে বাঁচে থাকে তা হল তার জন্য এই শিশুটি কোনো সম্মান পাবে না। মৃত শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে তার মা একটি দৌড় লাগালো।

শিশুটির মুখ একবারই মাত্র দেখেছিল বাবুল। অবিকল যেন তার ছেলে সুখুর মতন।

এই ঘটনা কি কারুর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করা যায়? সে ভাষা নেই বাবুলের।

নিজের বাড়ির ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার পর বাবুল তার পুরোনো বন্ধুদের খোঁজ করেছিল। জহিরের বাসা ফাঁকা, সেখানে কেউ নেই, কোথায় গেছে তাও কেউ বলতে পারে না। অন্য বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন ইণ্ডিয়ায় পালিয়ে গেছে, কয়েকজন আশ্রয় নিয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামে, আর দু'একজন যোগ দিয়েছে শান্তি কমিটিতে। পল্টন যোগ দিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে, সে আছে মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে।

মনিরার খোঁজ করার জন্য বাবুল আর্মি ক্যান্টনমেন্টে পর্যন্ত গিয়েছিল। তার বন্ধু পাকিস্তানী কর্নেলটি তাকে জোর করে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে। একটু দেরি হলে তারা বাবুলকেও ছাড়তো না। সাধারণ সোলজাররা কোনো যুবতীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলে তারপর আর তার খোঁজ করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছুদিন পরেই তার লাশ শিয়াল-শকুনের খাদ্য হবে। কিন্তু মনিরার লাশ না দেখা পর্যন্ত বাবুল নিবৃত্ত হতে চায়নি। সে শুধু এইটুকু খবর পেয়েছিল যে, যে হাবিলদারটি মনিরার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সে বদলি হয় গেছে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রাম পর্যন্ত আর পৌঁছোতে পারেনি বাবুল।

সন্ধে হতে না হতেই বৃষ্টি নামলো। হৈ হৈ করে গান গাইতে গাইতে ফিরে এলো পুকুর-কাটা যুবকের দল। হাসমত বাবুলের মুখ থেকে কোনো কথা বার করতে না পেরে শেষপর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে ফেলে বললেন, তাইলে তুই শুইয়া থাক, বিশ্রাম নে। তবে কোথাও চইল্যা যাইস না, মেজর সাহেবের কাছে আমারে তোর ব্যাপারে রিপোর্ট করতে হবে।

বাবুল এবারে হাসমতের হাত চেপে ধরে বললো, সিরাজুলের সাথে আমার কথা বলতেই হবে। ও যদি আমারে খুন করতে চয় তো করুক। কিন্তু নিজের জান দিয়েও আমি মনিরারে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি, সে কথাটা ওরে বিশ্বাস করাতেই হবে।

হাসমত বললো, আইচ্ছা, তুই বয়, আমি দেখি সিরাজুল কোথায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল সিরাজুল তখনও রয়েছে মেজর সাহেবের ক্যাম্পে। সেখানে দু'জন অপরিচিত ব্যক্তিও রয়েছে, খুব সম্ভবত ইণ্ডিয়ান বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের দু'জন অফিসার। সেখানে চলেছে দীর্ঘ ইন্টারভিউ।

আরও আধ ঘণ্টা পরে সিরাজুল সেই ক্যাম্প থেকে বেরুতেই হাসমত তাকে ধরলেন। সিরাজুলের চোখ মুখের চেহারা এমন সম্পূর্ণ অন্য রকম, যেন বেশ একটা গর্ব আর আনন্দের ভাব। বিকেলবেলা মাঠের মধ্যে বসে যে কেঁদেছিল, সে যেন অন্য সিরাজুল।

বি এস এফ-এর অফিসাররা দু'জন খুব ভালো সাঁতার জানা, শক্ত সমর্থ, সাহসী যুবককে নিতে এসেছে, কোনো একটা বিশেষ ব্যাপারে ট্রেনিং দেবার জন্য। মেজর সাহেব বেছে বেছে পনেরো জনকে হাজির করিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে থেকে একমাত্র সিরাজুল মনোনীত হয়েছে। রফিকুল ইসলাম নিজে সিরাজুলের কাঁধ চাপড়ে তাকে কনগ্র্যাচুলেট করেছেন। শিগগিরই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে কোনো অজ্ঞাত জায়গায়।

নিজেকে এখন খুব দামী আর প্রয়োজনীয় মনে করছে সিরাজুল। সেইজন্যই যেন বাবুল চৌধুরীর ওপর রাগ কমে গেছে অনেকখানি।

হাসমত তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, শোন, আমি তো বাবুল চৌধুরীকে অনেকদিন থিকা চিনি। সে মিথ্যা কথা কওয়ার মানুষ না। সে কইছে, সে নিজের জান দিয়াও তোর বউরে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। হয়তো তোর বউ আছে কোথাও পলাইয়া।

সিরাজুল হাসমতের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, ও কথা বাদ দ্যান, সার। কিন্তু আসল কথা হইলো, বাবুল চৌধুরী আমাগো ক্যাম্পে আইছে ক্যান সেইটা জানছেন? সে মুক্তিযুদ্ধ সাপোর্ট করে না, স্বাধীন বাংলা দেশ মানে না, সে তো চীনাপন্থী।

হাসমত বললেন, অনেক চীনাপন্থী এখনে মত চেইঞ্জ করছে, মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে আসতেছে।

সিরাজুল বললো, আমি বিশ্বাস করি না, সার। অনেক আর্মি অফিসারের সঙ্গে তার দোস্তি আছে, সে একজন কোলাবরেটর। সে এখানে কোনো মতলোবে ইছে!

–এ কথা ঠিক না, সিরাজুল। বাবুল চৌধুরীগো মতন মানুষ স্পাই হয় না। তার ইডিয়লজির সাথে তোমার মিল না হইতে পারে কিন্তু সে খাঁটি মানুষ।

–তার সাথে আর্মি অফিসাগো দোস্তি আছে, আমি নিজে জানি! অনেকেই জানে।

–আর একটা বিরাট পরিবর্তন হইছে, কেমন যেন ঘোর-লাগা মানুষের মতন ভাব। সিরাজুল,তুমি বাবুলরে জয়দ্গিন জানো? সে নিজে নিজে পুকুরের মাটি কাটতে গেছিলো।

–সার, আপনেরে আমি সাফ কথা বলি। সে কি কোনো অ্যাকশানে যাবে? সে দেশের জন্য প্রাণ দিতে রাজি? আজ রাত্তিরেই দুইটা অ্যাকশান টিম অ্যামবুশ করতে যাবে। তারে একটা দল পাঠান।

–এত তাড়াতাড়ি না। সে অসুস্থ, শুধু শরীরে না, মনেও। তা ছাড়া তার ট্রেনিং নাই।

–সে যে পাপ করেছে, সেই পাপস্খালন হবে যদি সে দেশের জন্য প্রাণ দিতে যায়। নইলে আমি আপনেরে কইয়া দিলাম, সার ঢাকায় তারে যারা জানতো, সেইরকম কোনো মুক্তিযোদ্ধা তারে দ্যাখলেই মাইরা ফেলবে। আমি না মারি, অন্য কেউ মারবে, সিওর!

সিরাজুলকে নিয়ে হাসমত একটু পরে গেলেন বাবুল চৌধুরীর কাছে। বাবুল ঠিক একই জায়গায় ঠায় একেবারে বসে আছে চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে তার।

সিরাজুলকে দেখে সে শান্তভাবে বললো, আমারে মারিস না, আমার মারলে একজন ফ্রিডম ফাইটার কমে যাবে।

সিরাজুল হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললো, ওঠো বাবুল চৌধুরী, আজই তোমারে রাইফেল নিয়া যুদ্ধে যাইতে হবে। তুমি কী রকম ফ্রিডম ফাইটার তার প্রণাম দাও।

॥ ৩৫ ॥

খবরটা এনেছিল একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে। তার নাম তোতা মিঞা, সে নিজেই বলে, আমার নাম সাব, তোতা মিঞা, আমি ইস্কুলে কেলাস ফোরে পড়ি। তার পরনে একটা ঢোকা খাঁকি হ্যাফ প্যান্ট, সেটা তার নিজের নয়, প্রাপ্তবয়স্ক কারুর তা বোঝাই যায়, গায়ের রং পদ্মপাতার মতন, চোখ দুটি টানাটানা, তার মুখে এখনো শৈশবের দুধ-লাবণ্য লেগে আছে। যদিও সে কথা বলে বেশ জোর দিয়ে, দায়িত্বের সঙ্গে, মাঝে মাঝে চঞ্চলভাবে পিছন ফিরে তাকায়, যেন এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায়সে অনেক বয়স্ক হয়ে উঠেছে।

এমনই দিনকাল যে এইটুকু একটি বালকের কথাও সহজে বিশ্বাস করা যায় না। দিন দিন নিত্যনতুন সংবাদ আসছে যে দেশের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকও জালিমদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, নামে শান্তি কমিটি গড়লেও গণ-হত্যায় সম্মতি দিতে তাদের কোনো বিবেকের বাধা নেই। এখন পাকিস্তানী আর্মি মোকাবিলা করছে সীমান্ত মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে। আর দেশের অভ্যন্তরে শান্তি কমিটির নেতৃত্বে আল বদর, জামাতে ইসলামী, আল শামস, মুজাহিদ, রাজাকার, ইপকাফ ইত্যাদি সশস্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এরা অত্যাচারীদের সহচর।

হরিণা এবং ঠাকুরগাঁও ক্যাম্পে এরকম একটি শান্তি কমিটির মিটিং-এর ইস্তাহার এসে পৌছেছে কোনো ক্রমে। শান্তি কমিটির এই মিটিংটি হয়েছিল লাকসামে, মে মাসের গোড়ার দিকে। তাতে বলা হয়েছে যে (১) তথাকথিত মুক্তিবাহিনী এবং তাদের তহবিল সংগ্রহ, সদস্যভুক্তি ইত্যাদি গোপন

কার্যক্রমের বিস্তৃত বিবরণ, তথ্যাদি যথাশীঘ্র কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিকে জানানো হোক। যারা মুক্তি বাহিনীর জন্য চাঁদা আদায় করছে এবং যারা চাঁদা প্রদান করছে, তাদের একটি তালিকা কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কাছে পেশ করা হোক। (২) লাইসেন্স ছাড়া সমস্ত বন্দুক, রাইফেল ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের খোঁজ জানানো হোক। (৩) ইউনিয়ন শান্তি কমিটিকে পুনরায় অনুরোধ জানানো হল যে, মালি, মেথর, পেশাদার ধোপী, জেলে এবং নাপিত ছাড়া সকল হিন্দুকে উৎখাত করা হোক। (৪) পাকিস্তানে আশঙ্কামুক্ত হয়ে সকল বৌদ্ধ যাতে বাস করতে পারে সেজন্য তাদের সব রকম সুযোগসুবধা দেওয়া হোক। (৫) অধুনালুপ্ত ও বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের যে সব সদস্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে, তাদের এই মর্মে সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা দিতে বলা হোক যে, (ক) অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের বিভক্তির জন্য এবং কার্যত ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার জন্য কাজ করে এবং (খ) উক্ত রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণীভিত্তিক ঘৃণা ছড়ায়। তাদের মধ্যে জাতিসত্তাগত বা প্রদেশগত সংঘর্ষে উৎসাহিত করে এবং তারাই পাকিস্তানের সর্বাত্মক ক্ষতি করার জন্য দায়ী। (৬) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমূহের সামরিক লোকদের ও প্রাক্তন সামরিক ব্যক্তিদের তালকা পেশ করা হোক। (৭) সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের অফিসারবৃন্দ ও কারখানার শ্রমিকদের কাজে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হোক ইত্যাদি।

ইস্তাহারটি পড়ার পর মুক্তি বাহিনীর কেউ কেউ যাচ্ছে তাই ভাষায় গালিগালি শুরু করলেও অনেকেরই মুখ পংশুবর্ণ হয়ে যায়। অনেকেরই বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন রয়ে গেছে দেশের মধ্যে, তাঁদের ওপর কী ধরনের অত্যাচার হচ্ছে কে জানে। এমনও শোনা যাচ্ছে যে প্রতিদিন নাকি ছয় থেকে বারো হাজার মানুষ খুন হচ্ছে বাংলাদেশে। এরচেয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর কী কোথাও ঘটেছে পৃথিবীতে? শান্তি কমিটির নাম নিয়ে এমন হিংসা ও অত্যাচার ঘটনা আর কি কখনো দেখা গেছে ইতিহাসে? এদের তালিকায় যাদের নাম ওঠে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

কয়েকজন সেই ইস্তাহার দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে, কয়েকজন দাঁতে দাঁত চেপে বলেছে, একবার স্বাধীনতা আসুক, তারপর ঐ খুন দালালদের প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়া হবে রমনার ময়দানে।

বালক তোতা মিঞার কাহিনী সেইজন্যই প্রথমে বিশ্বাস করা যায়নি। সে যদি গুপ্তচর হয়? তাকে হয়তো সেনাবাহিনী থেকে পাঠানো হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ফাঁদে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যারা এই বয়েসী বালকদের বেয়নেটের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন করতে পারে, তারা এই রকম একটি বালককে দিয়ে যে-কোনো জঘন্য কাজ করাতেও দ্বিধা করবে না।

তোতা মিঞা সীমান্ত পেরিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাম্পে এসে সোজা ঢুকে পড়েছিল সেক্টর কমান্ডরের তাঁবুতে। আর কোথাও গেল না, সে সেক্টর কমান্ডরের কাছেই প্রথমে এলো কী করে, কে তাকে ঐ তাঁবু চেনালো? সে এসেছে ছুটতে ছুটতে। সেক্টর কমান্ডারের পায়ের কাছে বসে পড়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিস, সব, সব, দুইশো জন ধরা পড়ছে! আপনেরা আগো বাঁচান। অগো মাইরা ফেলাবে।

তার বক্তব্য এই যে কারিয়াবাজারে বাস্তুত্যাগী বাঙালীদের একটা বড় দলকে আটকে আটকে করে রেখেছে পাকিস্তানী সৈন্যরা। ওদের গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য আশ্রয়ের আশায় ওরা রওনা হয়েছিল ভারত সীমান্তের দিকে।

পাকিস্তান সরকার এখন সারা বিশ্বে প্রচার করতে চাইছে যে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা পুরোপুরি শান্ত, ভারতের শত উস্কানিতেও এখন দেশ ছেড়ে আর কেউ ভারতে যেতে চাইছে না, বরং ভারতের শরণার্থীরাই ফিরে আসছে দলে দলে। এই প্রচারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য তারা যথাসম্ভব বর্ডার সীল করে দিচ্ছে, উদ্বাস্তুদের স্রোত দেখলেই বন্দী করছে কিংবা গুলি করে শেষ করে দিচ্ছে। সুতরাং কারিয়াবাজারে দুশো জনের একটি দলের ধরা পড়ার ঘটনা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু অবিশ্বাস্য লাগে ছেলেটির নিখুঁত বর্ণনা দেবার ভঙ্গিটি। সে একটি কাঠি নিয়ে নরম মাটিতে এঁকে দেখিয়ে দেয়, এইটা হই স্কুল, এই বাড়িতে রয়েছে ৫৪ জন পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্য, তাদের দলপতি একজন মেজর। আর স্কুলবাড়ির পাশে চারখানা দোকানঘর আর একটা ফাঁকা বাড়িতে রাখা হয়েছে বন্দীদের। মধ্যের এই দুটি ঘরে আছে নারী ও শিশুরা। দু'দিন ধরে তাদের কিছু খেতে দেওয়া হয়নি। সৈন্যরা সবাইকে একসঙ্গে মারছে না। কাল বিকেলে বারোজন বন্দীকে নিয়ে দাড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল খানিকটা দূরের একটা আমগাছ তলায়। তারপর সৈন্যরা রাইফেল নিয়ে টারগেট প্র্যাকটিস করেছে। কাল মাঝরাতে স্কুলবাড়ির ছাদ থেকে একটি তরুণী সারা গায়ে আগুন লাগা অবস্থায় লাফিয়ে পড়েছে

নিচে।...

সেক্টর কমান্ডার বারবার ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেন, তোরে কে পাঠাইছে এখানে? তুই বর্ডার ক্রশকরলি ক্যামনে?

তোতা মিঞা সরল চোখে প্রত্যেকবার একই উত্তর দেয় যে, তাকে কেউ পাঠায়নি। সে নিজেই এসেছে। বর্ডারে তাকে কেউ আটকায় নি। তবে তারা বাবা সেনাবাহিনীর অধীনে বাবুর্চির কাজ করে। সেই জন্য সে সব কিছু নিজের চোখে দেখেছে। সে জন্যে যে লম্বা-চওড়া খান সেনারা 'মুক্তি'র নামে ভয় পায়। মাত্র চুয়ান্ন জন খান সেনার সঙ্গে এতবড় মুক্তিবাহিনী লড়াই করে জিততে পারবে না? তারা গিয়ে না বাঁচালে ঐ বাড়ালীদের একজনেরও প্রাণে বাঁচার আশা নেই।

সেক্টর কমান্ডার এবং তাঁর চার পাঁজন সহকারী অনেক জেরা করেও তোতা মিঞার কাছ থেকে আর অন্য কোনো কথা বার করতে পারলেন না। ছেলেটির কথা সত্যি হলে ঐ বন্দীদের উদ্ধার করার জন্য একটা অ্যাকশানে যাওয়া উচিত। আর যদি ফাঁদ হয়?

সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধের আক্রমণাত্মক উদ্যমে কিছুটা ভাটা পড়েছে। পঁচিশে মার্চের পর যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তাতে অনেক জায়গায় পাকিস্তানী বাহিনী আকস্মিক আঘাতে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। এখন তারা শক্তি সংহত করেছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দুটি নতুন ডিভিশন এনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সীমান্তের সর্বত্র। এ দিকে মুক্তিবাহিনীর হাতে যথেষ্ট অস্ত্র নেই, প্রয়োজনীয় সরবরাহ নেই, খাদ্য নেই, এই অবস্থায় শুধু মনোবল নিয়ে তারা কতটা লড়তে পারে? মুক্তিবাহিনীর প্রাণহানির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল। সেই জন্য কিছুদিন অ্যাকশন স্থগিত রাখা হয়েছে। চিন্তা করতে হচ্ছে নতুন স্ট্র্যাটেজি।

আজও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে পৃথিবীর কোনো দেশ স্বীকৃতি দেয়নি। ভারতের কাছ থেকে যতখানি সাহায্য পাওয়া যাবে আশা করা গিয়েছিল, তা প্রায় কিছুই পাওয়া যায়নি। ভারত শরণার্থীরা আশ্রয় দিচ্ছে বটে, মুক্তিযোদ্ধাদের সীমান্তের এপার থেকে তৎপরতা চালাতে বাধা দেয়নি। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানীদের মুখোমুখি হতে আগ্রহী নয়। ভারত সরকার সরাসরি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে চায় না। পাকিস্তান সরকার প্রথম থেকেই ভারতকে মুসলমানের শত্রু বলে চিহ্নিত করে এসেছে। ভারত যুদ্ধে নেমে পড়লে কি বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের সমর্থন পাবে? শুধু সেনাবাহিনীকে পরাজিত করলেই তো যুদ্ধে জেতা যায় না। তা ছাড়া, ভারত যুদ্ধে ব্যাপৃত হলে সারা বিশ্বে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী প্রচারই সত্য বলে গণ্য হবে। সকলেই বলবে, ভারত নিজের স্বার্থে পাকিস্তান ভাঙতে চাইছে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতার ক্ষমতাও কি আছে ভারতের? চীন যে-কোনো সময় আবার ক্রমণ করতে পারে বলে ভারতীয় বাহিনীর একটি বিশাল অংশ চীন সীমান্তে মোতায়েন করা আছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সীমান্তেও সতর্ক পাহারা দিতে হচ্ছে। পূর্ব ভারতে মিজো-নাগা বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে অনবরত, পশ্চিমবাংলাতেও নকশালপন্থীদের দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনী নামাতে হয়েছে। ভারত এখন নিজের ঘর সামলাবে, না বাংলাদেশকে মুক্ত করাতে আসবে?

কয়েক দিন আগে মুক্তযুদ্ধের উচ্চ পার্যায়ের সেনানীদের একটা গোপন কনফারেন্স হয়ে গেছে কলকাতার থিয়েটার রোডে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এবং পধান সেনাপতি এম ওসমানী। সেখানে নানান আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মধ্যে ঠিক হয়েছে যে এলোমেলো ভাবে যুদ্ধ করে আর কোনো লাভ হবে না। দুর্ধর্ষ ও সুশৃঙ্খল পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়তে গেলে বাংলাদেশ বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ও পুরোপুরি নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে, সম্মুখ সমর এড়িয়ে জোর দিতে গেরিলা যুদ্ধে, তার জন্য চাই উপযুক্ত ট্রেনিং। সমগ্র বাংলাদেশকে ভাগ করা হল এগারোটি সেক্টরে, সেইসব সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কতগুলি সাব সেক্টর ও ট্রুপস থাকবে তাও নির্ধারিত হল।

এইসব সত্ত্বেও অনেকেই হতাশার মনোভাব চাপা দিতে পারেননি। বাংলাদেশ কি তা হলে আর একটি ভিয়েৎনাম হতে যাচ্ছে? কতদিন চলবে এই গেরিলা যুদ্ধ পনেরো বছর? কুড়ি বছর? সাধারণ মানুষের মনোবল কতদিন অটুট থাকবে?

শুধু হতাশ নয়, তার থেকে বেরিয়ে আসে তিক্ততা। কেউ কেউ আড়ালে প্রশ্ন তুলছে, শেখ মুজিব সাতই মার্চের মিটিং-এ স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়ে বসলেন, কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের যে দীর্ঘ প্রস্তুতি

লাগে, তা তিনি জানতেন না? যুব সমাজের মধ্যে সামরিক ট্রেনিং এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করেননি কেন? একবার তিনি বলে ফেললেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, তবু তিনি সংগ্রামের বদলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা পাওয়ার আশায় পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কাটালেন, সেই সুযোগে ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ব্যাটেলিয়ানের পর ব্যাটেলিয়ান সৈন্য আনিয়ে নিলেন এদিকে। সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শেখ মুজিবের কি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া উচিত ছিল না আগেই? তিনি প্রথমেই ধরা দিয়ে বসলেন? আওয়ামী লীগের নেতারাও সকলেই চলে গেলেন কলকাতার নিরাপদ আশ্রয়ে! আর বাংলাদেশের জ্বলন্ত যৌবন, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছাত্রসমাজ, সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী, ই পি আর, পুলিশ আর সামরিক বাহিনীর লোকেরা, যারা প্রথম থেকেই পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তারাই শুধু রণাঙ্গনে জল-কাদার মধ্যে প্রাণ দেবে?

কলকাতার কনফারেন্স সেরে নিজের এলাকায় ফিরে এসেছে এক নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম। এখন কিছুদিন সীমান্ত পেরিয়ে অ্যাকশন, অ্যামবুশ বন্ধ রেখে তিনি তার বাহিনীটি গুছিয়ে নিতে চান। এরই মধ্যে এসে পড়লো তোতা মিঞা নামের এই বিস্ময়কর বালক এবং তার রোমহর্ষক কাহিনী। একবেলার মধ্যেই তোতা মিঞা কথা ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ক্যাম্পে।

সিরাজুল প্রথম থেকেই তোতা মিঞাকে বিশ্বাস করেছে। সে নিজে তোতাকে নাস্তা খাইয়ে অনেক গল্প করেছে তার সঙ্গে। তারপর সে তোতার হাত ধরে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে মেজর সাহেবের কাছে। সে দৃঢ়ভাবে জানিয়েছে তার বক্তব্য। সে বলতে চায় যে, সবাই তোতাকে সন্দেহ করছে, কিন্তু এর উল্টো দিকটা তারা ভেবে দেখছে না কেন? শেখ মুজিবের আহ্বানে এই দেশটা আজ কতখানি বদলে গেছে যে একটি এগারো বছরের বালকও দেশপ্রেমিক হয়ে উঠেছে, সে বিপদের পরোয়া না করে ছুটে এসেছে সীমান্ত পেরিয়ে। রাজাকার, আল বদরদের সে-দেশ কিছুতেই পরাধীন থাকতে পারে না। দু'শো জন বন্দীকে বাঁচাবার জন্য এই বালকের প্রাণ কেঁদেছে, আর আমরা কি এতই কাপুরুষ যে তাদের উদ্ধার করার জন্য বন্দীকে বাঁচাবার জন্য এই বালকের প্রাণ কেঁদেছে, আর আমরা কি এতই কাপুরুষ যে তাদের উদ্ধার করার জন্য ছুটে যাবো না!

সিরাজুলের মতামতের একটা বিশেষ মূল্য আছে। পরপর কয়েকটি অ্যাকশানে সে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছে। মাত্র দু'সপ্তাহ আগেই সে রামগড়-করেরহাট রোডের চিকনছড়ায় একটা সাংঘাতক কাণ্ড করেছিল। ঘন বনঘেরা পাহাড়ী পথ, সেখান দিয়ে পাক আর্মি শক্তি সমাবেশ করছিল রামগড়ের দিকে। উদ্দেশ্য ছিল তাদের সাপ্লাই লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কিন্তু পাক আর্মির তীব্র সার্চ লাইট ও গোলাবর্ষণের জন্য কিছুতেই কাছে এগোনো যাচ্ছিল না। এরই মধ্যে সিরাজুল কী করে যেন সেই সড়কের ওপর ঝুঁকে পড়া একটা গাছের ওপর গিয়ে একজন ক্যাপ্টেন ও বেশ কয়েকজন অফিসার, সিরাজুল এল এম জি চালিয়ে সবাইকে খতম করে দেয়। মাইক্রোবাসটা রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকে, দিনের পর দিন ঐ পাকিস্তানী সৈন্যদের মৃতদেহ সরাতেও কেউ আসেনি!

সিরাজুল দাবি ধরে বসলো, সে কারিয়াবাজারে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য একটা অভিযান পরিচালনা করতে চায়। মেজর রফিকুল ইসলাম শেষ পর্যন্ত এই অভিযানে একটি দল পাঠাতে রাজি হলেন, কিন্তু সিরাজুলকে তিনি যেতে দিতে চান না। সিরাজুল দক্ষ সাঁতারু বলে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছে, তার এখন কোনো অ্যাকশানে না যাওয়াই উচিত, যদি সে কোনো কারণে আহত হয়ে পড়ে। সিরাজুল সে কথা শুনতেই চাইলো না। সে বললো যে, সে যদি এরকম একটা অ্যাকশানে আহত হয়ে পড়ে, তা হলে বুঝতে হবে, সে বড় কোনো ট্রেনিং-এর যোগ্যই না।

আজকের অভিযানের দলটিও নির্বাচন করতে চায় সিরাজুল। পঁয়তাল্লিশ জন ট্রেইনড গেরিলার সঙ্গে সিরাজুল বেছে নিল বাবুল চৌধুরীকেও।

সন্ধে থেকেই প্রবল বর্ষণে তাদের পুকুর কাটা সার্থক হয়েছে বটে, কিন্তু এই দুর্যোগের মধ্যে যুদ্ধ পরিচালনা করা সহজ কথা নয়। প্রায় কারুরই পায়ে জুতো নেই, অতিকষ্টে কিছু রাবারের চটি সংগ্রহ করা গেছে। কাঁধে দু'ইঞ্চি মর্টার, রকেট লঞ্চার, এল এম জি কিংবা রাইফেল আর পায়ে রবারের চটি। বেশ কয়েকজনের গায়ে জামাও নেই, যদিও এখানে বৃষ্টি পড়লে বেশ শীত শীত করে।

এই বৃষ্টির মধ্যে চতুর্দিক একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। আকাশের দিকে তাকালে মনেই হয় না যে কোনোদিন সেখানে চাঁদ-নক্ষত্রের আলো থাকে। দিক হারাবার ভয় পদে পদে। একটি এগারো

বছরের বালকের কথার ওপর ভরসা করে তারা এগোচ্ছে।

তোতা মিঞাকে সিরাজুল রেখেছে নিজের পাশে। এক সময় তার কাঁধ চাপড়ে সিরাজুল বললো, দ্যাখ ছ্যামড়া, তুই যদি রাস্তা করোছ, তাইলে আমরা তো মরুমই, তুইও পুট্টুস কইরা মইরা যাবি।

তোতা মিঞা বালিকার মতো সুরেলা গলায় বললো, না সাব, আমি ভুল করুম না। এক্কেবারে নাক বরাবর রাস্তা।

তারপর সে বেশী উৎসাহিত হয়ে বললো, সব, বৃষ্টি হইছে তো আরও ভালো হইছে। এই রাত্তিরে খান স্যানারা নাকে ত্যাল দিয়া ঘুমাবে! ইনসানাল্লা, আইজ সব কয়টা খতম হবে!

সিরাজুলের মনটা একটু খচখচ করে। সে নিজের দায়িত্বে এতগুলি মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে এনেছে! তোতা যদি সত্যিই স্পাই হয়? সে নিজেই বলেছে যে তার বাবা আর্মি ক্যান্টিনের বাবুর্চি, তপার বাবার প্রাণের ভয় দেখিয়ে ছেলেকে গুপ্তচর হতে বাধ্য করা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এইটুকু ছেলে কি এত নিখুঁত অভিনয় করতে পারে? যদি ফাঁদও হয়, তবু যেতে হবে, মুক্তিবাহিনী এমনি প্রাণ দেবে না, যে-কজন পাকিস্তানী সেনাকে সম্ভব মেরে তারপর মরবে।

দু'শো জন বাঙালীকে ওরা বন্দী করে রেখেছে। যদি তাদের মধ্যে মনিরা থাকে? খানসেনাদের হাত থেকে কোনোক্রমে ছাড়া পেলে মনিরা কি সীমান্তের দিকে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করবে না? এই সম্ভাবনাই সিরাজুলকে আরও উদ্দীপ্ত করে তোলে।

সামনেই একটা সরু খাল। গতকালও এই খালটা প্রায় শুকনোই দেখে গেছে সিরাজুল, কিন্তু আজকের বৃষ্টিতে কতখানি পানি জমেছে তার ঠিক নেই। খালের ওধারেই পাক সেনারা ওঁত পেতে আছে কি না তাই বা কে জানে।

সিরাজুল মাটির দিকে টর্চ জ্বাললো। তার পিছনের বাহিনীকে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে সে অপেক্ষা করলো খানিকক্ষন। খালের ওপারে কোনো সাড়া শব্দ নেই। বৃষ্টির জন্য টর্চের আলোও ওপার পযন্ত পৌঁছায় না।

মিনিট পাঁচেক পর সে টর্চের আলো বাবুল চৌধুরীর মুখের ওপুর ফেলে বললো, তুমি আগে নামো, তুমি আগে খাল পার হয়ে দেখে আসো।

বাবুল চৌধুরীর হাতে একটা রাইফেল। ঠাকুরগাঁও ক্যাম্পে এসে সে মাত্র দু' দিন রাইফেল ছোঁড়া প্র্যাকটিস করেছে, তার আগে জীবনে কখনো অস্ত্র ধরেনি। শহুরে মানুষ সে, জল-কাদায় চলাচল করতে অভ্যস্ত নয় একবারেই। সে তবু একটু ও দ্বিধা করলো না, খালে নেমে পড়লো।

সিরাজুল চাপা গলায় আদেশ দিল। শব্দ করবা না।

বাবুল চৌধুরীর পরনে একটা প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট, দুটোই কাদালেপা, তার খালি পা, সে বকের মতন এক পা তুলে তুলে এগোতে লাগলো। টর্চ নিবিয়ে দিল সিরাজুল।

খালের জল বাবুলের হাঁটু ছাড়ালো না। তবে তলায় এমনই কাদা যে পা গেঁথে যায়, অন্য পা ফেলার সময় ব্যালান্স রাখা শক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে একবারও আছাড় খেলো না। খালের অন্য পাড়ে এসে সে মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। বৃষ্টির ঝিরিঝিরি শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সামনে কিছু দেখা যায় না, পেছনে সিরাজুলের দলটাও যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে, এই রণক্ষেত্র বাবুল একা। দূর থেকে একটা গুলি এসে তাকে বিদ্ধ করলে সে চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে।

বাবুল আবার খাল পেরিয়ে ফিরে এসে বললো, পানি বেশি নাই, ওপারেও এনিমি টেঞ্চ নাই। ক্লিয়ার!

তোতাকে নিয়ে এবার প্রথমে খালে নামলো সিরাজুল। তোতার কাঁধটা সে প্রায় খিমচে ধরে আছে। ছেলেটাকে সে অবিশ্বাস করতে পারে না, তবু দেখতে হবে যেন ছেলেটা এই পর্যন্ত এসে কোনোক্রমে পালিয়ে না যায়।

খালাপাড়ের উঁচু বাঁধের আড়াল দিয়ে সবার আগে, অন্যরা খানিকটা দূরত্বে। যদি কোনো ফাঁদ থাকে, সিরাজুল নিজে তাতে ধরা পড়লেও অন্যদের জানিয়ে দেবে।

একসময় দু'একটি বাড়িঘরের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারা গেল, তারা কারিয়াবাজার গ্রামের সীমান্তে এসে পৌঁছেছে। পাকবাহিনী যে-গ্রামে বা শহরে আশ্রয় নেয়, সেখানকার প্রান্তবর্তী বাড়িগুলো পুড়িয়ে দিয়ে সামনেটা খোলা রাখে। এখানেও সে কাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

সিরাজুল তোতাকে জিজ্ঞেস করলো, এবার ইস্কুলবাড়ি কোন দিকে?

তোতা বললো, আমাগো ইস্কুলে আমি চক্ষু বুইজ্যাই যাইতে পারি,সাব। আর বেশি দূর নাই।

সিরাজুল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চার পাশটা একবার দেখে নিল। বৃষ্টি অনেক কমে এসেছে। অন্ধকার চোখে সইয়ে নিয়ে এখন দূরের কিছু কিছু গাছপালা ও বাড়ি দেখা যায়। কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না। হয়তো এ গ্রামে অন্য কোনো মানুষজন নেই। কিংবা হানাদার বাহিনী যেখানে এসে থানা গেড়েছে, সেখানে নিশ্চিত আলো জ্বলবে, বাইরে সেন্ট্রি থাকবে। কোথায় সেই আলো।

তোতার মাথার চুল মুঠো করে ধরে সিরাজুল মনে মনে বললো, ওরে বিচ্ছু, যদি তুই বিশ্বাসঘাতক হস, তোরে আগে আমি নিজে কচুকাটা করবো!

অন্ধকে যেমন ভাবে পথ দেখায়, সেইভাবে সিরাজুলের হাত ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো তোতা মিঞা। এই দিকটায় বেশ কিছু ছাড়া ছাড়া বড় গাছ, মনে হয় যেন একটা ফলের বাগান, তার কিনারায় এসে তোতা বললো,ম ঐ দ্যাখেন সাব ইস্কুল।

শ পাঁচেক গজ দূরে ইস্কুলবাড়িটার গেটের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে দুটো মশাল। পরপর সার দেওয়া পাঁচখানা ট্রাক ও একটি বাস। কোনো সেন্টিকে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, কিন্তু বাড়িটার ভেতর থেকে মানুষের গলায় মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে। তার মধ্য থেকে কি ফুটে উঠছে কোনো স্ত্রীলোকের তীক্ষ্ণ কান্নায় আওয়াজ? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দূর থেকে কান্নার শব্দ ও হাসির শব্দ অনেক সময় একই রকম শোনায়।

এই জায়গাটা বেশ সুবিধেজনক, বড় বড় গাছগুলোর আড়াল পাওয়া যাবে। এই এগারো বছরের বালকটি কি যুদ্ধনীতি বোঝে যে ঠিক ঘুরিয়ে তাদের এই বাগানের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছে? এ পর্যন্ত কোনো ফাঁদের আভাস পাওয়া যায়নি। আর দ্বিধা করার কোনো মানে হয় না, ঐ গাড়িগুলো দেখেই বোঝা গেছে যে ঐ বাড়িতে পাক সেনারা রয়েছে। এরপর হয় মারো নয় মরো! যে কটি শত্রুসৈন্যকে কতম করা যাবে, সেই কয়েক পা এগিয়ে যাওয়া হবে স্বাধীনতার দিকে।

বন্দীরা কোথায়? এখান থেকে গোলাগুলি চালালে তাদেরও গায়ে লাগবে না তো? তোতা আঙুল তুলে যে দোকানঘরগুলি দেখিয়ে দিল, সেগুলি ইস্কুলবাড়ির বেশ কাছাকাছি। একটু দূরে একটা একতলা বাড়ি।

সিরাজুল তার বাহিনীকে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিল ডানদিকে। আর দেরি করা যাবে না। তোতা যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তা হলে যে-কোনো মুহূর্তে পেছন দিক থেকে এসে পড়বে পাকবাহিনী। সিরাজুল সবাইকে বলে দিল একসঙ্গে আক্রমণ চালাতে হবে শুধু স্কুলবাড়িটার ওপর, ওখানে পাক সেনাদের আটকে রাখতে পারলে বন্দীরা পালাবার সুযোগ পাবে। গাড়িগুলি দেখেই সিরাজুল শত্রুপক্ষর শক্তি অনেকটা আন্দাজ করে নিয়েছে, এখানে সিরাজুলা বেশীক্ষণ যুদ্ধ চালাতে পারবে না, পাকিস্তানী সৈন্যরা একবার স্কুলবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারলে তাদের আর জয়ের আশা নেই।

সিরাজুল নিজেই প্রথমে মর্টার চার্জ করলো। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলো এল এম জিও রাইফেল। একটা রকেট সোজা গিয়ে পড়লো স্কুলবাড়ির ছাদে। মর্টারের গোলায় আগুন ধরে গেল একটা ট্রাকে।

পাকিস্তানীরা সত্যিই অসতর্ক ছিল, প্রথম দু তিন মিনিট তাদের দিক থেকে কোনো প্রতিআক্রমন এলো না। শুধু চিৎকার-চ্যাঁচামেচি, আগুনের শিখায় পরিষ্কার দেখা গেল কয়েকজন খানসেনা খালি গায়ে শুধু জাঙ্গিয়া পড়ে দৌড়োচ্ছে।

মুক্তিবাহিনীর সবাই গোলাগুলি চালাতে চালাতে তারস্বরে বলতে লাগলো, বন্দীরা পালাও বন্দীরা পালাও!

সবকটা দোকানঘর ও পাশের একতলা বাড়িটা থেকে ভেসে এলো আর্তকান্নার রব। প্রত্যকটি দরজা বাইরে থেকে তালাবন্দ, তারা দরজা ভেঙে বেরুতে পারছে না।

এর মধ্যেই পাক সেনারা শুরু করলো পাল্টা গোলাবর্ষণ। তারা বুঝতে পেরেছে যে মুক্তিযোদ্ধারা বন্দীদের মুক্ত করার জন্যই এসেছে, সেই জন্য তারা দোকানঘরগুলোর দিকেও ফায়ারিং করছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ যে দৌড়ে গিয়ে দরজাগুলো খুলে দেবে তারও উপায় নেই, সামনের ফাঁক জায়গাটা পেরুতে গেলেই ব্রাশ ফায়ারের মধ্যে পড়তে হবে।

স্কুলবাড়িটার জানলা ভেঙে লাফিয়ে বেরিয়ে আসছে পাক সৈনিকরা। সিরাজুল তার এল এম জি-

র লক্ষ্য স্থির রেখে শেষ করে দিচ্ছে এক একজনকে। স্কুল বাড়িটার পেছন দিক থেকেও এগিয়ে আসছে একটা ট্রুপ, মর্টার দিয়ে ঠেকানো হচ্ছে তাদের। আর সময় নেই আর সময় নেই, আর ঠেকানো যাবে না, এরপর আর পালাবার সুযোগও পাওয়া যাবে না! এখনই সিরাজুলদের রিট্রিট অর্ডার দেওয়া উচিত।

চাইনীজ মেশিনগান থেকে ঝড়ের মতন গুলি বর্ষণ হচ্ছে মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীকে কিছুতেই আমবাগান ছেড়ে বেরুতে দেবে না! তা হলে কি বন্দীদের মুক্ত করা যাবে না? পাক বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের ক্ষমতা নেই সিরাজুলদের, তাতে তাদের অনর্থক শক্তি ক্ষয় হবে। কিন্তু মনিরা, বন্দীদের মধ্যে যদি মনিরা থাকে?

হঠাৎ একজন লম্বা চেহারার লোক ছুটে গেল বন্দীদের ঘরগুলির দিকে। সিরাজুল দেখলো সেই লোকটি বাবুল চৌধুরী। লাইট মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি মধ্যে সে ছুটে যাচ্ছে এঁকেবেঁকে। ও কি পৌঁছোতে পারবে? সেদিকে মনোযোগ দেবার উপায় নেই, সিরাজুল তার মর্টার চার্জ করলো পাক সেনাদের দিকে।

পরের মুহূর্তেই তার পাশ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল তোতা মিঞা। বাবুল চৌধুরী দোকানঘরগুলোর কাছে পৌঁছে গেছে, তীরের মতন ছুটে গিয়ে তোতা তাকে দেখিয়ে দিচ্ছে মেয়েদের ঘর দুটো। বাবুল রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরে মেরে তালা ভাঙার চেষ্টা করছে। আঃ ও এত বোকামি করছে কেন, তালার ওপর গুলি চালাতে পারছে না?

বন্দীরা বেরিয়ে আসছে গুড়মুড় করে। এবার ওরা গুলি খেয়ে পোকামাকড়ের মতন মরবে। পাকবাহিনীর আক্রমণ ওদিক থেকে ফেরাতেই হবে। দু জন পাক সৈন্য অনেকখানি এগিয়ে গেছে বাবুল চৌধুরীর দিকে, সিরাজুল আর দ্বিধা করলো না। আমবাগান ছেড়ে সে বেরিয়ে এলো বাইরে, তার দেখাদেখি আর ও কয়েকজন, লাফাতে তারা চ্যাঁচাতে লাগলো, আয় শালার! হিম্মৎ থাকে তো আয়!

শেষ ঘরের দরজাটাও খুলে দিয়েছ বাবুল চৌধুরী। তখনই সেই ঘরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো দু জন পাক সৈন্য। তাদের রাইফেল তোলার সুয়োগ দিল না সিরাজুল, তার এল এম জি-র মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে সে হুংকার দিয়ে উঠলো ইনসানাল্লা, আজ সব সয়টা জানোয়ার খতম হবে।

এরপর সিরাজুল যা করতে গেল, সেটা যুদ্ধ নয়, পাগলামি। মুক্তিবাহিনীর ফায়ারিং পাওয়ার সহ্য করতে না পেরে পাক সৈন্যরাই রিট্রিট করে আশ্রয় নিচ্ছে স্কুলবাড়িটার পেছন দিকে মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখনই ফিরে যাওয়ার প্রকৃষ্ট সময়, তবু সে তা সবকটি পাক সৈন্যকে হত্যা করার জন্য ধেয়ে যেতে চায়। সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড হাসমত এসে তাকে টেনে ধরলো এবং সেই হুইশল বাজিয়ে দিল।

এদিক ও দিক ছড়িয়ে আছে অনেকগুলো লাশ। দু' তিন জায়গায় আগুন জ্বলছে, এরই মধ্যে দিয়ে পিছু হঠতে হঠতে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে মুক্তিবাহিনী। পাক সেনা ছাড়াও বন্দীদের মধ্যে মারা পড়েছে বেশ কয়েকজন। বাবুল আর সিরাজুল দু' জনেই এরই মধ্যে দেখে নিচ্ছে চেনা কোনো মুখ আছে কি না সেই নিহতদের মধ্যে। এক জায়গায় তাদের দু জনেরই চোখ আটকে গেল।

শেষের কয়েক মিনিট তোতা মিঞার ওপর আর নজর রাখা হয়নি। শেষ রক্ষা করতে পারলো না ছেলেটা। হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে সেই বালক, বুকের গর্ত দিয়ে এখনও বেরিয়ে আসছে রক্ত, তার চোখ দুটি নিষ্পলক, কী সরল ও সুন্দর সেই চোখ। রাইফেলটা অন্য একজনকে দিয়ে চৌধুরী দু হাতে কোলে তুলে নিল সেই বালকের নিস্পন্দ শরীর।

॥ ৩৬ ॥

হাসপাতাল থেকে প্রায় জোরজার করেই গতকাল তুতুল ফিরে এসেছে গোল্ডার্স গ্রীনের অ্যাপার্টমেন্টে। তার মাথা জোড়া ব্যাণ্ডেজ, শরীর অত্যন্ত দুর্বল তো বটেই, কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে ঘুমে ঢলে পড়ে। তরল খাদ্য ছাড়া কিছুই সে খেতে পারে না, তাতেও তার রুচি নেই। আলম একই সঙ্গে তার ডাক্তার ও নার্স, এক মুহূর্তের জন্যও সে বাড়ি ছেড়ে বেরুচ্ছে না।

সন্ধের পরই ট্র্যাঙ্কুইলাইজার দিয়ে তুতুলকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার কথা, কিন্তু তুতুল আজ কিছুতেই ঘুমোবে না। আলম তাকে ওষধ খাওয়াতে এলে প্রত্যেকটা ওষধ খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে, তাকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। আলম তাকে চিকেন স্টু জোর করে খাওয়াতে গেলেও সে দু' চুমুক দিয়ে রেখে দিয়ে বললো, আমাকে একটু ব্র্যাণ্ডি দেবে? তোমরা যে রেমি মারত্যাঁ-র বোতল ছিল, তার থেকে

একটুখানি?

আলম প্রসন্ন বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, সেই বোতলটার কথাও তোর মনে আছে? ডাক্তাররা তাইলে তোর ব্রেনের খোপগুলো উল্টাপাল্টা কইরা দ্যায় নাই!

তুতুল ক্লিষ্টভাবে হেসে বললো, আমার সব মনে আছে।

অ্যালকোহল তুতুলের ঠিক সহ্য হয় না, স্বাদ ও পছন্দ হয় না। কোনো পার্টিতে অন্যরা জোরজার করলে সে কখনো-সখনো রেড ওয়াইনে দু' এক চুমুক দিয়েছে। আজ সে নিজে থেকেই ব্র্যাণ্ডি চাইছে কেন তা আলম জানে। খুব ছোট্ট একটা লিকিওর গ্লাসে খানিকটা ঢেলে এনে বিছনার পাশে বসে সে প্রথমে তুতুলের পাণ্ডর ঠোঁটে একটা চুম্বন দিল, তারপর জিজ্ঞেস করলো, আমি খাইয়ে দেবো?

তুতুল বললো, না আমাকে দাও! আমাকে একটু উঁচু করে তুলে দাও!

পেছনে দুটো বালিশ দিয়ে তুতুলকে বসিয়ে দিল আলম। একটা সোনালি রঙের লেপ দিয়ে তার শরীর ঢাকা। পাতলা মেঘের আড়ালে ডুবে যাওয়া চাঁদের মতন মুখখানি অস্পষ্ট। ঘরখানার চারদিকে সে একবার চোখ বোলালো। সব কিছুই তার এখন এত প্রিয় লাগছে। এমনকি হাতল-ভাঙা টি-পটটাও, আগে অনেকবার ভেবেছিল ওটাকে ফেলে দেবে, এখন মনে হচ্ছে, থাক, ওটাও থাক। হাসপাতাল থেকে তুতুল যে এ বাড়িতে আর কখনো ফিরে আসবে, তা যেন সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। যতদূর মডেন হয়, এ যাত্রা সে বেঁচে যাবে। কিন্তু এই বেঁচে ওঠার মধ্যেও একটা বিষন্নতার বোধ আছে। তার জীবনের বিনিময়ে মৃত্যু যদি অন্য কিছু দাবি করে? পিকলুদা, জয়দীপ এরা যেন তুতুলকে তদের আয়ু দিয়ে চলে গেছে। এরপর আলমের আবার কিছু হবে না তো? জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আলম, আত্মবিশ্বাস ও কৌতুক মাখানো তার মুখ, সে এত ভালো, তার কোনোরকম ক্ষতি হলে তুতুল কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না!

আলমকে এই আশঙ্কায় কথা বললেই সে হেসে উড়িয়ে দেয়।

তুতুল, বললো, অলির আসতে এখনো তো কিছুটা দেরি আছে। তুমি আমাকে একটা প্যাড আর কলম দেবে? মা' কে চিঠি লেখা হয়নি অনেক দিন, কবে যেন শেষ চিঠিটা লিখেছি? ইস, ছি ছি...

কাগজ-কলম নিয়ে এসে আলম বললো, তুই এখন চিঠি লিখতে পারবি?

তুতুল বললো, হ্যাঁ পারবো। মাকে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে লিখি মা চিন্তা করছে কত

–তোর হাতের লেখা নকল করে আমি লিখে দেবো?

–যাঃ! অন্য হাতের লেখা মা ঠক বুঝে ফেলবে! তা হলে তো সাংঘাতিক ভয় পেয়ে যাবে...

–এক লাইন লিখে স্যাম্পল দেখাচ্ছি তোকে। বেশ গোটা গোটা গোল গোল করে লিখবো

–আমার হাতের লেখা মোটেই গোল গোল না। এই, তুমি সরে যাও। আমি কী লিখছি, তুমি দেখবে না!

লিখতে গিয়েই তুতুল বুঝলো, তার হাতে একটুও জোর নেই, কলম কাঁপছে। তবু লিখতেই হবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে এক চুমুক কনিয়াক খেয়ে নিল। তারপর প্যাডটা নিয়ে এলো বুকের কাছে।

মা,

তোমাকে গত সপ্তাহে চিঠি লিখতে পারিনি, সে জন্য রাগ করেছো নিশ্চই। আমাকে হঠৎ লন্ডনের বাইরে যেতে হয়েছিল....

লণ্ডন শব্দটা বাংলায় লিখতে তিনবার কাটলো তুতুল। কিছুতেই 'ণ্ড' লিখতে পারছে না, কলম এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। ইংরিজিতে লেখা সোজা। হাতের লেখা যাচ্ছেতাই হয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে আসছে হঠাৎ।

আবার সে মনের জোর এনে লিখলো, আমরা চারজন গিয়েছিলাম। জায়গাটা দারুণ সুন্দর। এবার সমুদ্রে স্নান করলাম খুব। জানো তো, এখানে এসে আমি সাঁতার শিখেছি। তোমার ... শরীর, তোমার শরীর, তোমার শরীর আমি ত্রিদিবমামাকে বলেছি কলকাতায় এখন আমি খুব ভালো আছি, আমার তিন পাউ, তিন পাউ,তিন পাউ,ওজন বেড়েছে..... তোমার শরীর তোমার শরীর একদিন স্বপ্ন ....

একটু পরে আলম পেছন এসে প্যাড আর কলম সরিয়ে নিতে গেল। তুতুল ঘুমে ঢলে পড়েছে। আলমের ছোঁয়া পেতেই সে জেগে উঠে বললো, কী? হয়েছে?

আলম হাসতে হাসতে বললো, আরে এই চিঠি পড়লে তোর মা ভাববে তুই গাঁজা খেয়েছিস!

হাতের লেখাটা দ্যাখ, তুই নিজেই চিনতে পারবি না।

তুতুল চিঠিটা পড়তে হেসে ফেললো। তারপর বললো, দাও, ওটাই ছিঁড়ে ফেলে আমি আর একটা লিখছি।

আলম বললো, ক্ষ্যামা দে, ছেমরী! পারবি না। এর থেকে আমার হাতের লেখা অনেকটা কাছাকাছি হবে। আমি তোর থেকে ভালো গল্প বানাতে পারবো। তুই আবার সমুদ্রে স্নান করলি কবে রে?

তুতুল বললো, থাক, কাল লিখবো। তুমি তোমার দাড়ি কামাবার আয়নাটা একবার দাও তো!

সেই আয়নায় তুতুল যেন নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না। তার মুখখানা রক্তশূন্য, চোখে জ্যোতি নেই, চামড়াও খসখসে হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে বললো, আমার ঠোঁট দুটো শুকনো হয়ে গেল কী করে?

আলম ঝুঁকে এসে একটি আলতো চুম্বন দিয়ে বললো, এখন আর শুকনো নাই।

তুতুল মাথার ব্যান্ডেজে হাত বুলিয়ে বললো, এটা ঢাকা যায় না? যদি একটাা স্কার্ফ বেঁধে রাখি?

আলম বললো, দাঁড়া তোকে আমি সাজিয়ে দিচ্ছি। স্নো-পমেটম লাগিয়ে একেবারে সিনেমার হিরোইন বানিয়ে দেবো!

একটা জাপানী সিল্কের স্কার্ফ এনে আলম এমনভাবে তুতুলের মাথায় বেঁধে দিল যে সত্যিই ঢাকা পড়ে গেল ব্যাণ্ডেজ। ঠোঁট বুলিয়ে দিল হালকা করে লিপস্টিক। গালে রুজ লাগাতে গেলে তুতুল আপত্তি করলো, আলম শুনলো না।

আয়নাটা তুলে আলম বললো, এইবার দ্যাখ, আদেগর চেহারা ফিরে এসেছে কি না! আর একটু কনিয়াক খেয়ে নে. তাইলে গায়ে জোর পাবি!

তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে তুতুলকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার পর আলম বললো, শোন, একটা কথা বলি। আমি বাইরে চলে যাবো? তোর দেশ থেকে চেনা মানুষ আসবে, সে তো আমার কথা জানে না।

তুতুল বললো, না, তুমি কোথায় যাবে? তোমার কথা আমি জানিয়ে দেবো। মা'কেও এবারে চিঠিতেই সব লিখবো। কিন্তু তুমি আমার অসুখের কথাটা বলো না, প্লীজ। মা দারুণ ভয় পেয়ে গিয়ে নিজেই একটা অসুখ বাধিয় বসবে।

একটু থেমে তুতুল আবার বললো, তুমি আমার এক মুহূর্তের জন্যও ছেড়ে যেও না।

অলি এলো ঠিক সাড়ে সাতটার সময়। তার সঙ্গে তার বাবার বন্ধুর মেয়ে বিশাখা। আলম তো দরজা খোলার সময়েই তুতুল কনিয়াকে শেষ চুমুক দিয়ে গেলাসটা নীচে ফেলে দিয়ে হাসি মুখে বললো, আয় রে, অলি। দ্যাখ আমার কী অবস্থা! সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে আছাড় খেয়ে কোমরে চোট লেগেছে, উঠতে পারছি না বিছানা ছেড়ে! দু'দিন হয়ে গেল!

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, অল্প অল্প ভিজে এসেছে অলি। মাথার চুল খোলা। তুতুল প্রথমেই লক্ষ করলো অলির সারা শরীর ঝলমল করছে স্বাস্থ্যের দীপ্তি। অলির হাত ধরে সে বললো, তুই কী সুন্দর হয়েছিস রে, অলি! কতদিন তোকে দেখলাম।

অলি বললো, তুমি এত রোগা হয়ে গেলে কী করে, তুতুদি? অবশ্য রোগা হলেও তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

–আমি বুঝি কোনদিন মোটা ছিলাম? এ দেশের সবাই রোগা হবার সাধনা করে। আলাপ করিয়ে দিই। এই আমার স্বামী আলম। আর এই অলি, অলিকে আমি ওর বাচ্চা বয়েসে থেকে চিনি ফ্রক পরে খেলা করতে আসতো।

আলমের পরিচয় পেয়ে অলি অবাক হয়নি। লণ্ডনের বাঙালী মহলে তুতুল ও আলমের বিয়ের কথা অনেকেই জানে। বাংলাদেশে যুদ্ধের জন্য প্রচার ও চাঁদা তোলার অনুষ্ঠানের একজন প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে আলমের নাম বেশ পরিচিতি, এই বিবাহ-কাহিনী বহু আলোচিত। অলিও লণ্ডনে পা দেবার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে অলি বললো, আপনি তা হলে আমার জামাইবাবু!

বিশাখা বললো, ওঁরা বলেন দুলাভাই, তাই না!

বিশাখা অনেক কম বয়েস থেকে রয়েছে এ দেশে, তার উচ্চারণে খানিকটা জড়তা থাকলেও সে

মোটামুটি বাংলা বলতে পারে। সে একটি স্কুলে পড়ায়। আলম তাকে বললো, আসুন আমরা একটু অন্য জায়গায় বসি, ওরা দু' জনে তো এখন কলকাতার গল্প করবে!

তুতুল বললো, কেন, তোমাদের বুঝি কলকাতায় গল্প শুনতে ইচ্ছে করে না? আগে আমার মায়ের কথা বলো, আসবার সময় আমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মিথ্যে কথা বলতে অলির আর দ্বিধা নেই। প্রতাপকাকাও তাকে মিথ্যে বলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সে বললো হ্যাঁ, আসবার দিন বিকেলেই তো পিসিমণির সঙ্গে দেখা গয়েছে। পিসিমণি ভালো আছেন। তুমি আজকাল কম চিঠি লেখো বললেন।

তারপর প্যাকেট খুলে বললো, এই নাও তোমার জন্য শাড়ী পাঠিয়েছেন পিসিমণি। আর তোমার ঘি আর আচার। মুন্নি তোমার জন্য পাঠিয়েছেন দুল। দুলাভাই, আপনার জন্য কিন্তু কিছু নেই, আপনার বিয়ের কথা এখনো জানাননি।

আলম বললো, এমন বিয়ের করলাম, জামাই আদর আর কোনদিন ভাগ্যে জুটবে না!

–কেন, আপনার কলকাতায় যাবেন না?

তুতুল বললো, এই সেপ্টেম্বরেই যাবো ঠিক করেছি রে! এবার ঠিক যাবো। এতদিন যাবো যাবো করে কিছুতেই যাওয়া হয়নি!

আলম বললো আমাকেও নিয়ে যেতে চাও? তারপর শাশুড়ি যদি আমার দিকে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসেন?

অলি বললো, যাঃ, কী বলছেন? পিসিমণি মোটেই সেরকম মানুষ নন।

আলম হাসলো। তুতুল যখন তার মাকে প্রথম তার মনোনীত মুসলমান স্বামীর কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিল, তার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন যে মুসলমান বিয়ে করলে তিনি জীবনে আর মেয়ের মুখ দেখবেন না। সে চিঠি আলম দেখেছে। এরপর যে তুতুলের মায়ের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তুতুল তবু জোর দিয়ে বললো, এবার আমরা কলকাতা যাবোই!

বিশাখা এখনো বিয়ে করেনি। তার একজন ঘনিষ্ঠ পুরুষ বন্ধুও মুসলমান, তবে সে আলজিরিয়া লোক। তার সঙ্গে মেলামেশার সময় সে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যের ব্যাপারটা কিছুই বোঝেনি, অথচ দেশের লোকদের মুখেই শুধু এই ধরনের কথা শোনা যায়। আলম-তুতুলের বিয়ে নিয়ে তাদের বাড়িতেও অনেক কথা হয়েছে, তার মা এর বিপক্ষে। অথচ তার আলজিরিয়ান বন্ধু হামিদের মা তাকে খুব পছন্দ করেন। হিন্দু-মুসলমানের যত দ্বন্দ্ব কি শুধু ইণ্ডিয়া -পাকিস্তানে? অবশ্য আলজিরিয়ায় হিন্দু নেই।

অন্যান্য গল্প হতে হতে তুতুল এক সময়ে জিজ্ঞেস করলো, তুই কবে নিউ উয়র্ক যাচ্ছিস রে, অলি? এখান থেকে বাবলুকে ফোন করেছিস?

অলি বললো, না, ফোন করিনি। আমি এখানে চারদিন থাকবো।

–লণ্ডনে পৌঁছে একবারও ফোন করিসনি? এখন কর, আমাদের এখান থেকেই কর, তা হলে আমিও কথা বলবো। আলম, লাইনটা ধরে দাও না। দ্যাখো, বস্টনের নম্বর লেখা আছে।

তুতুল বললো, পার্সন টু পার্সন কল করো। অলির গলা শুনে একেবারে চমকে যাবে ছেলেটা!

অলির একটু একটু লজ্জা করছে। এখানে এতজনের সামনে সে বাবলুদার সঙ্গে কী কথা বলবে? সে কবে-কখন নিউইয়র্ক পৌঁছোচ্ছে, সে খবর তো বাবলুদা জানেই। তার মৃত আপত্তি কেউ শুনলো না।

আলম বললো, খুব ভালো হবে, একটা প্লেজান্ট সারপ্রাইজ হবে। শুধু তাকে এখন বাড়িতে পেলে হয়।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে আলম বললো, আমাদের বিয়ের রাত্তিরেই অতীন ও খান থেকে ফোন করেছিল। ভেরি নাইস অফ হিম। তুতুল তোমার ভাইয়ের পদবীটা যেন কী?

অন্য তিনজন কথা থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলো। আলম কথা বললো অপারেটরের সঙ্গে একটুক্ষণ ধরে রইলো তারপর বললোক, নট অ্যাট হোম। জানি তা, আমেরিকায় ইয়াং ছেলে-পুলেরা বাড়িতে প্রায় থাকেই না! কাল রাত্তেও সে নাকি বাড়িতে ফেরে নি!

অলি আস্তে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর বললো তুতুলদি আজ বিশাখা আমাদের

জন্য সিনেমার টিকিট কিনেছে, বেশীক্ষণ থাকতে পারছি না।

তুতুল বললো, ও মা, আজই সিনেমায় যাবি? কিছুই তো শোনা হলো না। আলম তোদের চা-ও খাওয়ালো না।

আলম বললো, সন্ধ্যার পর চা খাওয়া ভালো না। ব্যাড ফর হেলথ। যদি ওয়াইন-টোয়াইন খেতে চাও...

অলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না, না, ওসব কিছু খাবো না। আজ তা হলে যেতে হয়।

তুতুল বললো, সিনেমা তো সব জায়গাতেই দেখতে পাবি। লন্ডনে দু'একটা থিয়েটার দেখে যা। ব্রিটিশ মিউজিয়াম আর আর টেট গ্যালারিতে অবশ্যই একবার যাবি। আমার হঠাৎ এই কোমরে ব্যথা না হলে আমিই তোকে নিয়ে যেতে পারতাম।

অলি বললো, বিশাখাই আমাকে অনেক জায়গায় ঘোরাচ্ছে। ওর স্কুল এখন ছুটি। আজই তো টেট গ্যালিরি আর মাদার টুসো দেখলুম। কাল যাচ্ছি স্ট্রার্ট ফোর্ড অন আভন্।

তুতুল অলির চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললো, অলি, সত্যি কথা বল তো, আমার মায়ের শরীর কেমন আছে? একদিন স্বপ্নে দেখলাম...

অলি জোর দিয়ে বললো, পিসিমণি এখন সত্যি বেশ ভালো আছেন। মাঝখানে কিছুদিন সর্দি কাশিতে ভুগেছিলেন, সে মাসখানেক আগে। উনি আমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে একতলার দরজা পর্যন্ত নেমে এলেন। আমার হাত ধরে বললেন, মেয়েটা আজকাল আর বেশী চিঠি লেখে না, তুই গিয়েই একটা খবর দিবি–

তুতুল বললো, তুই যেন আমার কোমরে ব্যথার কথাটা মাকে লিখতে যাস না। দু'দিনেই ভালো হয়ে যাবো। কালকেই মাকে চিঠি লিখবো। আমার বিয়ের কথাটা এবারে জানাবো। আমিই জানাবো, তোর লেখার দরকার নেই।

–সেই ভালো! তুতুলদি, আমি যাবার আগে পারলে আর একবার আসবো!

আলম ওদের এগিয়ে দিতে গেল লিফ্‌ট পর্যন্ত। সে একটা সিগারেট ধরালো। সিগারেটের ধোঁয়ায় যদি হঠাৎ তুতুলের হাঁচি আসে, তাতে তার খুব ক্ষতি হবে, সেই জন্য আলম ঘরের মধ্যে সিগারেট খায় না।

অলি জিজ্ঞেস করলো, অপারেশন তো সাকসেসফুল হয়েছে? আর কোনো ভয় নেই, তাই না?

আলম তার বিস্ময়ের চমকটা লুকোতে পারলো না। তার দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

বিশাখা বললো, মিঃ আলম, আপনারা দু'জনে একটি রোমান্টিক কাপল হিসেবে লন্ডনে বেশ ফেমাস। মিসেস আলমের যে ব্রেইন টিউমার অপারেশান হয়েছে, তাও অনেকে জানে। বিয়ের পরেই এরকম একটা অসুখ...

আলম বললো, আপনি বুঝতে পেরে গেছেন? আপনার চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য তুতুলকে কত রকম মেক আপ দেওয়া হলো।

অলি বললো, মেয়েদের চোখ ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। সত্যি কী হয়েছিল এবার বলুন তো?

আলম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, অসুখের সিম্‌টম দেখা গিয়েছিল বিয়ের আগেই। খুবই সাকসেসফুল অপারেশান হয়েছে। রিকভার করতে খানিকটা সময় লাগবে, কিন্তু আর ভয়ের কিছু নেই।

অলি বললো, তুতুলদি ভালো হয়ে যাবেন। নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবেন।

আলম বললো, আই মাস্ট থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি যে বুঝতে পেরেছেন বা জানেন, সেটা ওকে একবারও বুঝতে দেননি।

অলি বললো, আমি ওঁর মাকে কিছু লিখবো না। চিন্তা করতে বারণ করবেন। এই সময় চিন্তা করা খুব খারাপ। কলকাতার সবাই ভালো আছে, আপনি বুঝিয়ে বলবেন ওঁকে। তুতুলদিকে সবাই ভালোবাসে, তার কোনো কাজে কেউ রাগ করবে না।

অলিরা চলে যাবার পর আলম সিগারেটটা অর্ধেক অবস্থাতেই ফেলে দিয়ে ফিরে এলো ঘরে। তুতুল চোখ বুজি ছিল, শব্দ শুনে চোখ মেলে, ফ্যাকাসেভাবে হেসে জিজ্ঞেস করলো, আমি কেমন অভিনয় করলাম?

আলম বললো, যেমন ফুটফুটে সুন্দরী দেখাচ্ছে, তেমনই দুর্দান্ত অভিনয়, তোরে এবার সিনেমায় নামাতেই হবে দেখছি!

আলমকে বিছানার কাছে ডেকে বসিয়ে তুতুল বললো, অলিকে দেখে আমার এমন মন কেমন করলো কলকাতার জন্য। মাঝে মাঝে জোর করে কলকাতার কথা ভুলে থাকতে চেষ্টা করি! অলি আগে খুব লাজুক ছিল, এখন বেশ স্মার্ট হয়েছে। তোমার ওকে ভালো লাগেনি?

আলম বললো, হুঁ, বেশ স্মার্ট। এবার তুই ঘুমা। ওষুধগুলা দেই?

–আমার আজ এত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। আর একটু গল্প করি। আলম, এই সেপ্টেম্বরে কিন্তু সত্যিই একবার দেশে যাবো।

–তোমার দেশে তুমি যেতে পারো। আমি তো ঢাকায় যেতে পারবো না। কতদিনে আমাদের যুদ্ধ শেষ হবে কে জানে!

–তুমিও কলকাতায় যাবে। মা এখন ঠিকই বুঝবে। তোমাকে দেখলেই মা সব রাগ ভুলে যাবে।

–আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখন কিন্তু তোমারে ঘুমাইতে হবে। ত্রিদিববাবুর আজ আসার কথা আছে একবার। ফোন করেছিলেন। তখনই তুমি ঘুমায়ে থাকলেও ক্ষতি নেই। আমি ওনার সাথে কথা বলবো।

–তুমি কিন্তু ত্রিদিবমামাকে আজ মদ খাওয়াবে না। মদ খেয়ে উনি উঠতেই চান না, বড্ড রাত করে দেন।

–উনি যে স্কচ খান, তা রাখিই নাই আমার কাছে।

–উনি তো নিজেই নিয়ে আসেন। তুমি গেলাস দেবে না। ঘরের মধ্যে চুরুট খাওয়াও অ্যালাউ করবে না।

–ঠিক আছে, ঠিক আছে, অতশত ভাবতে হবে না। তুমি এবার চোখ বুঝে শুয়ে থাকো।

আলম তুতুলকে পর পর কয়েকটা ওষুধ খাওয়ালো। জল খাওয়াবার পর ঠোঁট মুছিয়ে দিয়ে বললো, এইবার একখানা ঘুমপাড়ানি গান করবো? আয় ঘুম যায় ঘুম দত্ত পাড়া দিয়ে, দত্তদের বউ পান খেয়েছে এলাচদানা দিয়ে...

ঝনঝন করে বেজে উঠলো টেলিফোন। অল্প একটুক্ষণ কথা বলে আলম ফিরে আসার পর তুতুল জিজ্ঞেস করলো, কে? বাবুল?

–না। ভারি মজার ব্যাপার। শাজাহান সাহেব, তিনি কাছেই এক জায়গায় আছেন, একবার আসতে চান। একেই বলে বোধহয় নিয়তি।

–কোন, নিয়তি কেন?

–যে দিন তোমার ত্রিদিবমামা আসেন, সে দিনই শাজাহান সাহেবও এসে হাজির হয়ে যান। অথচ ওনারা দু'জন যে পরস্পরকে পছন্দ করেন না, তা তো বোঝাই যায়। আমি আর কী করবো, শাজাহান সাহেব আসতে চাইলে তো না বলতে পারি না।

–এবার আমার সত্যি ঘুম পেয়ে গেল। ওঁরা দু'জন এলে তুমি বেশী রাত করো না। আর একটা কথা শোনো। কাল থেকে তুমি সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকবে না আমার জন্য। তুমি তোমার কাজ করতে যাবে। তোমার এখন কত কাজ!

–এই যে একটু আগে কইলা যে আমি যেন এক মুহূর্তের জন্যও তোমারে ছেড়ে না যাই!

–সেই অন্য। তুমি দূরে থাকলেও আমাকে ছেড়ে যাবে না।

শাজাহানই এলেন ত্রিদিবের আগে। যথারীতি তাঁর নিখুঁত পোশাক, হাতে এক গুচ্ছ ফুল। এর আগে তিনি হাসপাতালেও তুতুলকে দেখতে গিয়েছিলেন। তুতুলকে ঘুমন্ত দেখে তিনি নিঃশব্দে চলে এলেন জানলার ধারে। আলমকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন খবরা-খবর।

তুতুল একবার চোখটা একটু খুলে জিজ্ঞেস করলো, কে?

শাজাহান এগিয়ে এসে ব্যগ্রভাবে বললেন, কেমন আছো, বহ্নিশিখা? আমি শাজাহান!

তুতুল অস্ফুট গলায় বললো, ভালো আছেন, শাহাজানভাই?

শাজাহান বললেন, আমরা তো ভালো আছিই। আমরা তোমার জন্য...তুমি খুব জল্দি সেরে উঠলেই আমাদের আনন্দ...

তুতুল আর কথা বললো, না, তার চোখ বুঝে গেল, সে ফিরে গেছে তন্দ্রার জগতে।

তুতুলের একটা হাত তুলে নিয়ে সামান্য চাপ দিলেন শাজাহান। তারপর আবার জানলার কাছে এসে আলমকে বললেন, এরপর ওকে নিয়ে একবার সুইজারল্যান্ড ঘুরে আসো বরং। তাড়াতাড়ি ওর

শরীর সারবে সেখানে। যদি বলো, আমি জুরিখে থাকার জায়গার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

আলম বললো, আর কয়েকটা দিন যাক। ও যেতে চাইবে কি না...

এরপরেই এসে পড়লেন ত্রিদিব। যারা আট-দশ বছর আগে ত্রিদিবকে দেখেছে কলকাতায়, তারা এই মানুষটিকে চিনতেই পারবে না। সেই অতিমাত্রায় ভদ্র, সুরুচি সম্পন্ন, ছিমছাম চেহারার ত্রিদিব এখন অন্য মানুষ। হঠাৎ অতিরিক্ত মোটা হয়ে গেছেন, শুধু মোটা নয়, শরীরে একটা থলথলে ভাব, হাঁটেন থপথপ করে। কলকাতা বা দিল্লিতে যিনি এক ফোঁটা মদ স্পর্শ করতেন না, আজ তিনি অ্যালকোহলিক। বেশী মদ খেলেই তিনি বেশী কথা বলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে যেন পশ্চিম দিগন্তের মেঘলা সূর্যাস্ত। মেঘ বর্ণাঢ্য ভাবটাও নেই।

তিনি ঘরে ঢুকলেই শেকস্‌পীয়ারের কোনো ট্র্যাজেডির চরিত্র হয়ে। প্রায় ছুটে তুতুলের বিছানার কাছে গিয়ে বললেন, তুতুল! তুতুল কেমন আছে? জ্ঞান ফেরেনি?

তারপর দু'হাত তুলে হাহাকার করে বলে উঠলেন, কর্ডেলিয়া, কর্ডেলিয়া, স্টে আ লিটল!

ত্রিদিব তুতুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, আলম শেষ মুহূর্তে তাঁকে ধরে ফেলে মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বললো, এ দিকে আসুন। ওকে ডিস্টার্ব করবেন না।

ত্রিদিবের মুখে জ্বলন্ত চুরুট, আজ তিনি ক্ষমতার অতিরিক্ত পান করে ফেলেন। তিনি খানিকটা টলে গিয়ে, কান্না কান্না গলায় বললেন, তুতুলের জন্য আমার এত কষ্ট হয়, ওর সার্জন মিঃ রবিনসন আমায় বললেন সে দিন, খুবই ক্রিটিক্যাল কেস, উই হ্যাভ টু কিপ ইয়োর ফিংগার ক্রসড! আমাদের তুতুল...

আলম বললেন, সে কথা উনি বলছিলেন অপারেশানের আগে। কিন্তু অপারেশান সেন্ট পারসেন্ট সাকসেসফুল বলা যায়।

আলমের দু'কাঁধে হাত রেখে ত্রিদিব বললেন, আলম, তুই তুতুলের ভার নিয়েছিস, তুই অতি ভাগ্যবান রে। তুতুলের মতন এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর হয় না!

ত্রিদিবের ঠোঁট থেকে চুরুটটা ছাড়িয়ে নিয়ে আলম বললো, আপনি বসুন!

ত্রিদিব তবু কাতর ভাবে বললেন, আলম, তুই আমাকে সত্যি কথা বল, ধোঁকা দিস না, ওর জ্ঞান ফেরেনি, তবু তুই ওকে হাসপাতাল থেকে কেন নিয়ে এলি?

শাজাহান বললেন, বহ্নিশিখা ঘুমোচ্ছে, এ ঘরে এ গোলমাল না করে আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলতে পারি!

ত্রিদিব যেন এই প্রথম শাজাহানকে দেখলেন। তাঁর দিকে ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে বললেন, তুমি এখানে এত ঘন ঘন আসো কেন বলো তো? আমি যখনই আসি, তোমাকে দেখি।

শাজাহান অতি ভদ্রভাবে বললেন, ইট মাস্ট বী আ কয়েনসিডেন্স। উল্টে করে বলা যেত পারে, আমি যখনই আসিস সে দিনই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

ত্রিদিব বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে বললেন, এসো না। তুমি এখন এই মেয়েটোর কাছে এসো না। তুমি অপয়া!

শাজাহানের মুখখানা অপমানে রক্তাভ হয়ে গেল। তবু তিনি ভদ্রতার লঙ্ঘন নাকরে শান্ত গলায় বললেন, হোয়াট ডু ইউ মীন?

–তুমি এই মেয়েটার কাছে এত ঘন ঘন আসো কেন? সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তুমি আঠার মতন লেগে থাকা। প্লেয়ার তুতুল, প্লিজ, শাজাহান, আই বিসিচ ইউ....

–ইউ হ্যাভ গট আ ডার্টি মাইণ্ড,ত্রিদিব! আমি আসি, আমি আসি.... তার আগে বলো তুমি কেন আসো!

আলম দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললো, জেন্টেলমেন, আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আমাকে একটা অপ্রিয় কথা বলতে হবে। আপনারা দু' জনেই এখন প্লিজ বাইরে যান। ত্রিদিব তেড়িয়াভাবে বললেন, দ্যাখ আলম, তুই তুতুলকে বিয়ে করেছিস বলেই একেবারে মাথা কিনে নিসনি। সব সময় মনে রাখবি, এই তুতুল, প্রতাপ মজুমদারের অতি আদরের ভাগ্নী জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু প্রতাপ, আমার ভগ্নিপতি সে কখনো পরিবারের লোকজনকে তা বুঝতে দেয়নি। প্রতাপ, তার দিদি আশা করে আছে, বড় ডাক্তার হয়ে তুতুল একদিন দেশে ফিরবে সকলের –

এই সময় তুতুল হঠাৎ চোখ মেলে ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, ত্রিদিবমামা এসেছে আমি

একটা স্বপ্ন দেখলোম এই মাত্র....

ত্রিদিব সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরাট উল্লাসের চিৎকার করে বললেন, কর্ডেলিয়া, মাই কর্ডেলিয়া, শী ইজ ব্যাক!

ত্রিদিব আর একটু হলেই তুতুলের বিছানার ওপর পড়ে যেতেন, এবার শাজাহান আর আলম দু' জনেই তাঁকে ধরে ফেলফেন। আলম প্রায় ধাক্কা দিয়েই ত্রিদিবকে সরিয়ে দিয়ে তুতুলের মাথায় হাত দিয়ে বললো, কিছু হয়নি। তুমি শুয়ে পড়ো। তুমি ঘুমোও!

তুতুল একজন ঘোরলাগা মানুষের মত বললো, আমি স্বপ্ন দেখলাম, সুলেখা মামীমাকে। আলম, তুমি সুলেখা মামীমার কথা জানো না। ত্রিদিবমামার বউ ছিলেন। কোথায় তিনি হারিয়ে গেলেন। হঠাৎ আমি সুরেখা মামীমাকে আজই স্বপ্নে দেখলাম কেন এই মাত্র!

–তুতুল, প্লীজ কথা বলো না। আবার শুয়ে পড়ো।

–না, আমার ঘুম চলে গেছে। ঐ তো ত্রিদিবমামা, সুলেখা মামীমার কী হয়েছিল?

ত্রিদিব হঠৎ শান্ত হয়ে গেলেন। তুতুলকে প্রায় সুস্থভাবে কথা বলতে শুনেই তিনি যেন সংযত হয়েছেন। তিনি রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বললেন, সুরেখার তো কিছু হয়নি। সে ভালো আছে। তুই সুলেখাকে স্বপ্ন দেখলি? তুই কি ভাগ্যবান, আমি একবারও দেখি না!

তুতুল বললো, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তোমরা কথা বলছিলে, এই সময় আমি দেখলাম, সুলেখা মামীমা এসেছে, ঐ দরজায় কাছে দাঁড়িয়েছে।

ত্রিদিব বললেন, কী বলছিস তুই! সুলেখা এখানে আসবে কী করে? না, না,তুই এ সব কথা ভাবিস না! সুলেখা নেই, কোথাও নেই রে! আমি যেখানে থাকি, সেখানে তো সুলেখা কিছুতেই আসবে না। সে যে আমার ওপরেই বিষম অভিমান করে চলে গেছে। সেই জন্য একবার ও স্বপ্নে সে আমাকে দেখা দেয় না!

তুতুল এবারে পরিষ্কার সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলো, স্বপ্ন নয়, যেন সত্যি সুলেখা মামীমাকে দেখলাম। ত্রিদিবমামা, বলো, কেন সুলেখা মামীমা চলে গিয়েছিল? কিসের অভিমান!

ত্রিদিব ধরা গলায় বললেন, এই শাজাহান জানে। ওকে বলতে বল!

শাজাহান আকাশ থেকে পড়ার মতন ভঙ্গিতে বললেন, আমি? আমিক ও তো এত বছর ধরে সেই উত্তরটাই খুঁজছি!

জানলার কাচ খুলে বাইরের টাটকা হাওয়ার সিশ্বাস নিয়ে ত্রিদিক বললেন, এই নিয়ে আমি কারুর সঙ্গে এতদিন কোনো আলোচনা করিনি। তুতুল, তুই জিজ্ঞেস করলি...

আলম বললো, আজকের মতন এ সব আলোচনা বন্ধ রাখলে হয় না? আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা খুব মর্বিড মনে হচ্ছে!

ত্রিদিব আলমের দিকে হাত তুললেন, তুতুল বললো, আলম, একটু শুনতে দাও, তারপর আই প্রমিজ,, ঘুমিয়ে পড়বো।

ত্রিদিব জানলার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন একজন অভিনেতার মতন। কোটের দু' পকেট পাচড়ে চুরুটে খুঁজলেন। না পেয়ে কাঁধটা সামান্য ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, সুলেখা এর মধ্যেই সে যেন কত দূরের মানুষ। কারুকে সুলেখার কথা বলিনি। তুতুল তুই জিজ্ঞেস করলি, তোর এত অসুখ, তোর অনুরোধ ফেলতে পারি না। তোকে সেরে উঠতেই হবে রে! তোর মা, তোর মামা প্রতীক্ষা করে আছে তোর জন্য...হ্যাঁ, সুলেখার কথা। জীবনে আমি সুলেখাকে একটাও রাগের কথা বলিনি। শুধু একবার, সেটাও কিন্তু রাগের কথা নয়। ভগবান শুধু সাক্ষী। আমি রাগ করে বলিনি। শুধু একবার, সেটাও কিন্তু রাগের কথা নয়। ভগবান শুধু সাক্ষী। আমি রাগ করে বলিনি, কেই বা তা বিশ্বাস করবে? ভগবান তো তার সাক্ষী দিতে আসে না কখনো।

শাজাহান বললেন, আমি আলমের সঙ্গে এক মত। আজ এ সব কথা থাক।

ত্রিদিব বললেন, শাট আপ! আমাকে বলতে দাও! জানিস তুতুল, আমার বউ সুলেখা, সে তার অ্যাডমায়ারার, ভক্ত আর প্রেমিকদের এড়াবার জন্য কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছিল দিল্লি! আমাদের কী সুন্দর দিন কাটছিল দিল্লিতে। আমরা প্রত্যেক উইক এণ্ডে নিজেদের নেমন্তন্ন করতুম মনে আছে লোদি গার্ডেনসে গরমমের দিনে দুপুর রোদ্দুরে গেছি, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, আমরা ছায়া খুঁজছি, কতরকম ফুল ফুটেছে, কাঠবেড়ালিরা দৌড়োদৌড়ি করছে, এক জায়গায় সুলেখাই দেখতুম, কলকাতা থেকে তার

কোনো প্রেমিক এসে হাজির হয়েছে। এই শাজাহান কিংবা রাতুল। যেন দিল্লিতে তাদের কত কাজ! আমি ওদের আদর যত্ন করে আমার বাড়িতে থাকতে দিয়েছি। কিন্তু ওরা তো আমার জন্য আসতো না। আসতো সুলেখার জন্য!

শাজাহান বললেন, ত্রিদিব, প্লীজ, এ সব কথা সত্যি নয়। উই ওয়ার গ্রেট ফ্রেণ্ডস্! থ্রি অব আস!

ত্রিদিব সে কথা অগ্রাহ্য করে বললেন, একদিন, বুঝলে তুতুল, আমি বাড়িতে ছিলুম না। এই শাজাহান আর রাতুল বলে আমাদের আর এক বন্ধু মারামারি করলো, লাইক টু ডগ্স ফাইটিং ওভার আ পিস অব মিট, সেই মাংসে টুকরোটা ছিল সুলেখা! যেন আমি কেউ নয়!

–ত্রিদিব, ইউ আর মিসটেকেন! আমি মারামারি করিনি। তোমাদের সেই বন্ধু রাতুল, সে একটা গোঁয়ার এবং ব্রুট, সে-ই শুরু করেছিল, তোমরা যে কী করে তাকে প্রশ্রয় দিতে!

–চুপ করো, শাজাহান! আমরা সবাইকে প্রশ্রয় দিতুম। আমি আর সুলেখা ছিলুম ভদ্রতার কারাগারে বন্দী। আজ তুতুল জানতে চেয়েছে...সে দিন বাড়ি ফিরে ঘটনাটা শোনার পর, আই ফেল্ট সো স্যাড, আমার মনে হয়েছিল, আমি সুলেখার যোগ্য নই, আমি বিচালির গাদায় কুকুরের মতন সুলেখাকে শুধু শুধু আটকে রেখেছি। সারা পৃথিবী সুলেখাকে চায়। হঠাৎ সেই কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, ওন্‌লি ওয়ান সেনটেন্স, একটি মাত্র বাক্য, দ্যাট রুইনড টু লাইভ্স, আমি বলেছিলুম, সুলেখা, আমি বোধহয় তোমাকে বন্দী করে রেখেছি, এবার আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম, তুমি যে-কোনো একজনকে বেছে নিতে পারো, পারহ্যাপ্স শাজাহানের সঙ্গেই তুমি নতুন জীবন শুরু করতে পারো... । এ কথা শুনেই সুলেখা বুক ফাটা আওয়াজ করলো, কী বললে? তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না? আমার যেন মনে হলো, সুলেখার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গেছে আমার এ কথা শুনে, সে এমন ছটফট করতে লাগলো, যে আগুন লেগেছে, আমি ছুটি তাকে ধরতে পারলুম না!...তাপর এক সময় দেখি, সত্যিই তার সারা গায়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে...তুতুল, তোকে আমি...

ত্রিদিব আর কথা শেস না করে দু'হাতে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন। শাজাহান ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নিঃশব্দে।

তুতুল একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আলম, আমাকে একটু ধরো।

আলম আপত্তি করতে পারলো না। তুতুলকে বিছানা ছেড়ে উঠতে সাহার্য করলো। সে ভেবেছিল, তুতুলকে বাথরুমে নিয়ে যেতে হবে। বাড়িতে এসে তুতুল কিছুতেই বেড প্যান নিতে চায় না!

তুতুল টলটলে পায়ে এগিয়ে এসে ত্রিদিবের পিঠে হাত রেখে বললো, ত্রিদিবমামা, এ তো অনেকদিন আগেকার ঘটনা। তবু তুমি এখনো এত কষ্ট পাও? নিজেকে একেবারে নষ্ট করে ফেলছো?

ত্রিদিব মুখ না তুলেই বললেন, আমি নিজেকে নষ্ট করছি না রে, তুতুল। আমার জীবনে আর কোনো উন্নতির আশাও কেউ করে না। আমি ভালোই নেই, খারাপও নেই। অথচ বেশ আছি! আমি সুলেখার কথা আর বিশেষ ভাবি না, সুলেখাও আমার জীবনে কিংবা স্বপ্নে ফিরে আসে না। তবু সে চলে যাবার পরেও হয়তো কোথাও আছে। আমি এখনো চলে যাইনি। কিন্তু আমি এখানেও নেই।

মুখ তুলে তিনি আলমকে বললেন, আমার চুরুটটা কোথায় ফেলে দিলে? একবার তুলে এনে দাও, প্লীজ! একটুও মদ নেই তোমার বাড়িতে? থাকলে একটু দাও, অন্তত দু'এক পেগও যদি থাকে...বড্ড তেষ্টা, বড্ড যন্ত্রণা! তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো, তুতুল, আমাদের আয়ু আমরা তোমাকে দেবো! তুমি ভালো হয়ে ওঠো! তুমি এত ভালো!

॥ ৩৭ ॥

সকাল থেকেই বৃষ্টির বিরাম নেই, তাই দুপুরে খিচুড়ি রান্না হয়েছে। সঙ্গে মাংস আর ফজলি আম। এই দিয়েই আজ বেগম জাহানারা ও জনাব শরীফ ইমামের চব্বিশতম বিবাহ-বার্ষিকীর ভোজ। অন্যবছর এই দিনটিতে আত্মীয়-বন্ধুদের দাওয়াত দেওয়া হতো। এ বছর আর কারুকে ডাকা হয়নি, তবে একজন আছে বিশিষ্ট অতিথি। রুমী, হ্যাঁ, অতিথিই তো রুমী, সে কখন আসবে, কখন চলে যাব তার কোনো ঠিক নেই, সে সম্পর্কে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করাও চলবে না। সে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে কাল সন্ধের পর।

মাঝখানে বেশ কিছুদিন রুমীর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। শুরু শোনা গিয়েছিল যে সে মেলাবাড়ি নামে একটা জায়গার ক্যাম্পে আছে। কোথায় যে সেই মেলাবাড়ি, সেটা আধা শহর না গ্রাম,

সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই জাহানারা ইমামের। তবে কয়েক সপ্তাহ আগে দুটি যুবক এসে দেখা করেছিল ওঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে। দু'জনেরই মাথার লম্বা চুল ঘাড় যুবকদুটিই অতি গম্ভীর ধরনের, চঞ্চল চোখে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকায়। সিগারেটের প্যাকেট খুলে ভেতরের পাতলা কাগজটায় লেখা একটা দু'লাইনের চিঠি তারা দেখিয়েছিল, "পত্রবাহক দু'জনকে দরকার হলে কিছু সাহায্য করবেন। আমি ভালো আছি। –মণি।" চিঠিটা দেখেই অধউত এক আনন্দ, বিস্ময় ও রোমাঞ্চ বোধ করেছিলেন জাহানারা আর শরীফ! মণি হচ্ছে মেজর খালেদ মোশাররফ-এর ডাক নাম, তাঁর হাতের লেখাও ওঁদের চেনা। খালেদ মোশারফ-এর মতন পেশাদার যোদ্ধারা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে কিংবা দেয়নি, কে কোথায় আছে, ঢাকায় বসে তা কিছুই জানার উপায় নেই। ঐ ছেলেদুটির কাছেই শোনা গেল যে রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর সেকটর টু এবং কে-ফোর্সের কমাণ্ডার এখন খালেদ মোশাররফ, তিনি আছেন আগরতলার কাছাকাছি একটা জায়গায়, সেখানেই গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে রুমী।

ঐ স্বল্পভাষী যুবকদুটিকে খালেদ মোশাররফ পাঠিয়েছিলেন ঢাকার চেনাশুনো মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য, কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসও তাঁর দরকার। যুবকদুটি শুধু কাজের কথাই বলে, রুমীর সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে কি না কিংবা রুমীকে তারা আদৌ চেনে কি না সেরকম কোনো প্রশ্নেই তারা মুখ খুলতে চায় না।

পরের সপ্তাহেই অবশ্য ঐ ছেলেদুটিকে জাহানারা ইমামের মনে হয়েছিল যেন সশরীর ফেরেস্তা। তারা রুমীর চিঠি এনেছিল, রুমীর নিজের হাতে লেখা। এদের যা যা দরকার সব দিও।–রুমী।"

সে চিঠি পেয়ে জাহানারা দারুণ উতলা হয়ে উঠেছিলেন। কী কী চায় ওরা? কোনো কিছু যদি কিনে দিতে হয়, টাকাপয়সা যা লাগবে, তাঁর সমস্ত গয়নাগাঁটি বিক্রি করে, যথাসর্বস্ব দিতেও তিনি রাজি। শরীফ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ওরা টাকা পয়সা চায় না, ওরা চায় ব্রীজ!

খালেদ মোশাররফ গোপন নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে বাংলাদেশের সবকটা ব্রীজ আর কালভার্টের তালিকা তাঁর দরকার। এবং সেতুগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটানো বিষয়ে কিছু তথ্য। শরীফ নিজে একসময় সরকারের রোড্স অ্যাণ্ড হাইওয়েজ-এর ডিজাইন ডিভিশনে কাজ করেছেন। সে কথা খালেদমোশাররফ মনে রেখেছেন। শরীফ অনেক কৌশলে সেই ফাইল বার করে তার থেকে প্রয়োজনীয় নকশা সব কপি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তারপরেই রুমীর ফিরে আসা। সে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে তা এখনো বলেনি।

কাল গল্প হয়েছে রাত তিনটে পর্যন্ত। এখন দুপুর বারোটা, রুমী এখনো ঘুমোচ্ছে। রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে, তবু রুমীকে জাগাতে ইচ্ছে করে না।

ঢাকা শহরের অবস্থা এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। যদিও কিছু কিছু আগুনে-পোড়া বস্তি এখনো চোখে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলা-বিধ্বস্ত হলগুলি জনমানবশূন্য, একুশে ফেব্রুয়ারি স্মৃতিস্তম্ভটি অর্ধেক ভাঙা, তার গায়ে মসজিদ লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে, রমনা মাঠের প্রাচীন কালীবাড়িটি একেবারে নিশ্চিহ্ন, তবু দোকানপাট খুলেছে, অফিস-আদালতে কাজ চালু হয়েছে, বাজার বসছে। দিনের বেলা অন্তত ঢাকার যে-কোনো জায়গায় আনাগোনা করা যায়। বিদেশী পত্র-পত্রিকা কিছুই পাওয়া যায় না, রেডিওতে বি বি সি, আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ধরলে শোনা যায় সীমান্ত-যুদ্ধের খবর, আবার পাকিস্তানী বেতার শুনলে মনে হয়, ঐ সবকিছুই মিথ্যে পাকিস্তানী আর্মি সমস্ত ভারতীয় চর ও দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে। স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার কথাটা ছিল কিছু কিছু হঠকারী ও উন্মাদের অলীক স্বপ্ন, তারা আশ্রয় নিয়েছে ভারতে, পাকিস্তান এখন আগের চেয়েও সুদৃঢ় ও একতাবদ্ধ।

তবু সন্ধের পর হঠাৎ হঠাৎ শোনা যায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ, মেশিনগানের চকিত ফায়ারিং। ঢাকার মানুষ ব্যাকুল হয়ে জানতে চায় কোথায় কী ঘটছে! কিন্তু জানবার উপায় নেই, সে সময় বাইরে বেরুতে কেউ সাহস করে না, এমন কি ছাদে উঠেও উঁকি ঝুঁকি মারা যায় না, দৈবাৎ আর্মি-পেট্রোলের চোখে পড়ে গেলে সে বাড়ি সার্চ হবে। সেইসব বিস্ফোরণের পরই বাতি নিবে যায়, দু'তিন দিন আর কারেন্ট আসে না, কল দিয়ে জলও পড়ে না। বোঝা যায় যে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এসে বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সরকারি অফিসগুলিতে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে, দিনের বেলাতেও তাদের পরাক্রম দেখা যাচ্ছে, সেইসব অসম সাহসী বিচ্ছুরা মোটর সাইকেল কিংবা জিপে চেপে এসে আকস্মিকভাবে

কোনো পথের মোড়ে কিংবা জরুরি কোনো অফিসের সামনে পাকিস্তানী আর্মি ও প্যারা মিলিশিয়ার ওপর এক ঝাঁক গুলি-বর্ষণ করে মিলিয়ে যাচ্ছে চোখের নিমেষে। এই বিচ্ছুরা যেন যখন তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। পাকিস্তানী সেনারা এখনো জানেই না, 'মুক্তি'-দের দেখতে কেমন?

খোদ ঢাকা শহরের বুকের ওপর এসে এই ধরনের আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম মোটেই বন্ধ হয়নি, পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে তারা ভয় পায় না।

রুমী কিছু বলতে না চাইলেও জাহানারা ইমাম বুঝেছেন যে সীমান্ত ক্যাম্প থেকে ট্রেনিং নিয়ে কিছু কিছু ছেলে যে ঢাকায় নিজেদের বাড়িতে আবার ফিরে আসছে, নিশ্চয়ই তার বিশেষ কারণ আছে। যুদ্ধে যোগ দিতে গিয়েও তারা বাড়ি ফিরে আসবে কেন? ঢাকার ভেতরে থেকেই বড় রকম কোনো আঘাত দেবার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে তারা? রাত্তিরে বোমার শব্দ শুনলে জাহানারার মতন আরও অনেকের আনন্দ হয়, গর্ব হয়, ইলেকট্রিসিটি কিংবা ওয়াটার সাপ্লাই দিনের পর দিন বন্ধ থাকলে যত অসুবিধেই হোক, তবু তাতে মনে হয়, আঁদের ছেলেরা জিতছে। কিন্তু জাহানারা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না যে রুমীর পক্ষে সীমান্ত ক্যাম্পে থাকার চেয়েও ঢাকায় ফিরে আসা বেশি বিপজ্জনক কি না। এতদিন রুমী চোখের আড়ালে ছিল, কোনো খবর পাননি, দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। আজ রুমী বাড়িতে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে, তবু অজ্ঞাত আশঙ্কায় মায়ের বুক ছমছম করে।

একটু পরে তিনি রুমীর ঘরে গিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। খালি গায়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রুমী, রোদে পুড়ে তার চামড়ার রং যেন পুরোনো কাঁসার মতন হয়ে গেছে। মাথাভর্তি চুলের সঙ্গে যেন চিরুনির সম্পর্কই নেই। কাল রুমী বলছিল পাক আর্মির নজর ফাঁকি দেবার এ বাড়ির প্রথম সন্তান এই রুমী, কত আদরের, এর আগে সে বাড়ি ছেড়ে কোথাও থাকেনি, মাত্র কয়েক মাসেসে কত বড় হয়ে গেল। এই সময়ে তার বিদেশেগিয়ে পড়াশুনো করার সব ঠিকঠাক ছিল।

ঘুমন্ত সন্তানকে একটু আদর করতে ইচ্ছে হলো জাহানারার। আস্তে তিনি রুমীর পিঠে হাত রাখলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রুমী ছিটকে একপাশে সরে গিয়ে বললো, কে? কে?

ঘুমের মধ্যেও এত সতর্কতা, এও কি গেরিলা ট্রেনিং? জাহানারা হাসতে হাসতে বললেন, ওরে, আমি রে, আমি!

এখনো দু'চোখের পাতায় ঘুম লেগে আছে, তবু পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে রুমী জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে, আম্মা? কেউ এসেছে?

জাহানারা বললেন, না, কেউ আসেনি। একটা বেজে গেছে, গোসল করবি না? খাবার-দাবার সব রেডি।

একটা বড় নিঃশ্বাস টেনে রুমী বললো, হুঁ, সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই খিচুড়ি হয়েছে আজ! গ্র্যাণ্ড! কতদিন ঘি দিয়ে খিচুড়ি খাইনি! এত বেলা হয়েছে, তুমি আমাকে আগে ডাকোনো কেন, আম্মা?

–তোকে দেখে মনে হচ্ছিল, তুই যেন কত মাস ঘুমাস নাই! তোর সারা শরীরে ঘুম লেগেছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে কয়েকবার লাফালো রুমী। কোমর বাঁকিয়ে ব্যায়াম করে ঘুম তাড়াতে লাগলো। তারপর মায়ের আঁচল ধরে চার বছরের বালকের মতন গলায় বললো, আজ আমি নিজের হাতে খাবো না। তুই খাইয়ে দেবে? অন্তত প্রথম দুই এক গেরাস!

জাহানারা তাড়া দিয়ে বললেন, যা যা, বাথরুম ঘুরে আয়। জামী বসে আছে না খেয়ে।

একটুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিচের খাবার ঘরে চলে এলো রুমী। টেবিলে বসার আগে সে হঠাৎ জাহানারার প ছুঁয়ে কদমবুসি করে বললো, আম্মা, আজ তোমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। বাবার সঙ্গে তোমার বিয়ে না হলে আমি আর জামী জন্মাতামই না, তাই না?

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে জাহানারা বললেন, শোনো ছেলের অদ্ভুত কথা! নে, নে, এখন কেতে বোস!

ছোট ভাই জামী প্লেট সামনে নিয়ে বসে মৃদু মৃদু হাসছে। কাল রাতে রুমীর মুখ থেকে সবাই যখন যুদ্ধের গল্প শুনছিল, তখন তার ঘুম এসেছিল, তার অনেক গল্প শোনা বাকি।

সে জিজ্ঞেস করলো, ভাইয়া, ক্যাম্পে প্রায়ই তো খিচুড়ি খাওয়ায়?

রুমী বললো, খিচুড়ি কী বলছিস! আমাদের দারুণ খাওয়া হয়। একদিন অন্তত একদিন বিরিয়ানি

গোস্তা, নাস্তার সময় দুটো করে আণ্ড, সপ্তাহে দু'দিন মুর্গি, আর মাছ তো রোজ আছেই।

জাহানারা আর জামী দু'জনেই চমকে উঠলো। জাহানারা বললেন, এত খারাপ? সত্যি? কে দেয়? ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্ট তো রিফিউজিদেরই খাওয়াতে পারছে না শুনি!

–মুক্তিযোদ্ধাদের স্পেশাল খাতির! সেইজন্যই তো প্রত্যেকদিন হাজার হাজার ছেলে ক্যাম্পে যোগ দিতে যাচ্ছে। কি রে, জামী। তুই-ও এবার যাব নাকি?

জামী বললো, এত খাবার খেলে তো সবাই মোটা হয়ে যাবে। লড়াই করবে কী করে?

রুমী মুখ তুলে বললো, আম্মা, খাইয়ে দাও!

প্রথম গেরাসটি নেবার পর সে বললো, আঃ, অমৃত! অমৃত! । এত ভালো ঘি সহ্য হলে হয়। না রে, জামী, আমাদের ওখানে খিচুড়িও বিশেষ হয় না। ভাত-রুটির সঙ্গেই একরকমের ডাল দেয়, তাকে আমরা বলি ঘোড়ার ডাল।

জাহানারা আঁতকে উঠে বললেন, ঘোড়ার ডাল, সে আবার কী?

–চোকলা মোকলা সুদ্ধ একধরনের গোটা গোটা ডাল, নর্মাল টাইমে বোধহয় ঘোড়াকে খাওয়ানো হয়। আর রুটির মধ্যে মাঝে মাঝে মরা পোকা পাই, রুটির সঙ্গেই সেঁকা হয়ে যায়।

–রুটির মধ্যে পোকা? তখন কী করিস, রুটিটা ফেলে দিস?

–ফেলে দেবো, তুমি কি পাগল হয়েছো আম্মা! এত শস্তা নাকি? পোকাটাই নখে খুঁটে ফেলে দিই।

জামী তার মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি করলো! খাওয়ার ব্যাপারে রুমীর খুঁতখুঁতে স্বভাবের কথা কে না জানে। প্লেটে সামান্য একটচু ময়লা দাগ দেখলে সে খাওয়া ছেড়ে উঠে যেতে চাইতো!

রুমী আবার মুচকি হেসে বললো, ঐ রুটি-ঘোড়ার ডালই যে কত ভালো লাগে, তা তুই বুঝবি কী করে জামী! ঐ খাবারও যে রোজ জোটে না! হাংগার ইজ দা বেস্ট সস, এখন মর্মে মর্মে বুঝি। একবার কী হরো জানো আম্মা, একটা অ্যাকশানে গেছি, দু'দিন কিছু খাদ্যবস্তু জোটেনি। শেষে খিদের চোটে গাছ থেকে একটা আধপাকা কাঁঠাল ছিড়ে নিয়ে খেতে শুরু করলাম। আমি তিন-চার কোয়া মোটে খেয়েছি, একজন লোভের চোটে পনেরো কুড়ি কোয়া খেয়ে নিতেই তারপর তার সাজ্ঘাতিক পেট ব্যথা আর বারবার ...

জাহানারা বললেন, থাম, তোকে আর ঐ খাওয়ার গল্প করতে হবে না। আর একটু খিচুড়ি নিবি? গোস্তের সুরুয়া দিয়ে খেয়ে নে।

–একদিন বেশি না, আম্মা। এখন তো বাড়িতেই থাকছি?

–কয়দিন থাকবি?

–তা বলতে পারি না! আজকের দিনটা আছি, সেটা জানি। তোমাকে খুশি করার জন্য কালও না হয় থেকে যাবো।

জামী জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাইয়া, তুমি নিজের হাতে কোনো খান সেনাকে খতম করেছো এ পর্যন্ত?

ছোট ভাইয়ের চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক ভাবে চেয়ে থেকে গম্ভীর ভাবে রুমী বললো, ওসব কথা জিজ্ঞাসা করতে নাই। শুধু একটা কথা মনে রাখিস জামী, খান সেনাদের ভূমিকা হলো শোষক আর অত্যাচারীর ভূমিকা। আর আমরা মুক্তিসংগ্রামী। আমরা মানুষ মারি না, আমরা আমাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য লড়াই করছি।

গল্প করতে করতে এটো হাত শুকিয়ে গেছে, উঠে হাত ধুয়ে এসে রুমী একটা সিগারেট ধরালো। তা দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেল জামীর দুই চোখ। এ বাড়িতে সিগারেট? তার বাবা সিগারেট খান না, আম্মা সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে পারেন না। একদিন কাকে যেন সিগারেট ধরাতে দেখে খুব বকেছিলেন।

জাহানারা ছোট ছেলের দিকে চোখের ইঙ্গিতে জানালেন যে তাঁর সম্মতি আছে।

জাহানারা একসময় রুমীকে বলেছিলেন, যদি কোনোদিন সিগারেট ধরিস, আমাকে আগে জানাবি। অন্য কেউ এসে বলবে যে তোমার ছেলে সিগারেট খায়, তা আমি সহ্য করতে পারবো না। কলেজে উঠেও রুমী একদিনও সিগারেট টানেনি। কিন্তু কাল রাত্তিরে সে জানিয়েছে যে ক্যাম্পে থাকার সময় সে সিগারেট খাওয়া অভ্যাস করে ফেলেছে। সেখানে অনেকেই সিগারেট খায়। অ্যাকশানে যাবার সময় ঝোপে-জঙ্গলে বহুক্ষণ ঘাটপি মেরে একলা একলা বসে থাকতে থাকতে সিগারেটটাকেই সঙ্গী

মনে হয়। খাবার জুটলেও সিগারেটের ধোঁয়ায় খিদে মরে। এখন সে সিগারেট ছাড়তে পারবে না। মায়ের আপত্তি থাকলে সে সামনে খাবে না। বাইরে উঠে যাবে!

জাহানারা সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়েছেন। তুচ্ছ সিগারেটের জন্য ছেলেকে কয়েক মিনিটের জন্যও তিনি চোখের আড়ালে যেতে দিতে চান না। আজ তিনি নিজেই রুমীর জন্য ভালো সিগারেট কিনে আনিয়েছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে রুমী, তুই বাবুল চৌধুরীর কোনো খবর জানিস?

রুমী অন্যমনস্ক ভাবে বললো, উঁহু!

—ওদের বাড়িতে যে বাচ্চা মেড সারভেন্টটা ছিল, সেফু, সে প্রায়ই এসে বাবুলের খোঁজ করে আর কাঁদে। মেয়েটা খুব ভালোবাসে বাবুলকে। বাবুল কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল?

—তা জানি না। তবে সিরাজুলের খবর পাই মাঝে মাঝে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সে খুব নাম করেছে, দারুণ তার সাহস। তাব এখনও নাকি সে হঠাৎ হঠাৎ মনিরার নাম ধরে কাঁদে।

—ওঃ, মনিরাকে যেদিন ধরে নিয়ে গেল, সেদিনের কথা ভাবলে আজও বুক কাঁপে। আর কি মনিরাকে কোনোদিন ফিরে পাওয়া যাবে? কোনো ট্রেসই রাখলো না মেয়েটার।

—হয়তো মনিরাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আম্মা, যে-রাক্ষসরা মনিরাকে ছিঁড়ে খেয়েছে, তারা নিস্তার পাবে না। তাদের একটা একটা করে শেষ করবো!

সিগারেটটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে রুমী হঠাৎ আবৃত্তি করে উঠলো :

দেখতে কেমন তুমি? কী রকম পোশাক-আশাক
পরে করো চলাফেরা? মাথায় আছে কি জটাজাল?
পেছনে দেখাতে পারো জ্যোতিশ্চক্র সন্তের মতন?
টুপিতে পালক গুঁজে অথচ জবরজং ঢোলা
পাজামা কামিজ গায়ে মগডালে একা শিস দাও
পাখির মতই কিংবা চা-খানায় বসো ছায়াচ্ছন্ন?
দেখতে কেমন তুমি? অনেকেই প্রশ্ন করে, খোঁজে
কুলুজি তোমার আঁতিপাঁতি। তোমার সন্ধানে ঘোরে
ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য, পাড়ায় পাড়ায়। তন্নতন্ন করে
খোঁজে প্রতিঘর ...

জাহানারা মুগ্ধ হয়ে শোনবার পর জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার কবিতা রে? শামসুর রাহমানের?

রুমী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, নাম জিজ্ঞেস করতে নেই, নাম জিজ্ঞেস করতে নেই!

তারপর সে বেরিয়ে গেল।

এরপর কয়েকদিন রুমী কখন আসে, কখন বেরিয়ে যায় তার কিছু ঠিক নেইঊ'একদিন রাত্তিরে বাড়ি ফেরে না। সেসব রাত্রে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচণ্ড বুম বুম শব্দ শোনা যায়। রুমীকে কোনো প্রশ্ন করার উপায় নেই। কখনো তার সঙ্গে আসে কয়েকজন বন্ধু, বদি, আলম, স্বপন, চুন্নু, সুন্দর হাসিখুশি সব ছেলেরা, এরাই যে ভেতরে ভেতরে কী সাঙ্ঘাতিক পরিকল্পনা আটছে ... তা বোঝার উপায় নেই।

বাড়িতে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতদের ভিড় লেগেই আছে। কারুকেই ফেরানো যায় না, কারুকেই অবিশ্বাস করা যায় না। তবু জাহানারার বুক সবসময় আশঙ্কায় কাঁপে। এমন এক একটা বাড়ি সার্চের খবর শোনা যায়, মিলিটারি পুলিশ সোজা রান্নাঘরে এসে মেঝে খুঁড়তে শুরু করে, তখন স্পষ্ট বোঝা যায় কেউ খবর দিয়েছে। কখন কী ঘটে যায় কে জানে!

একদিন রুমী মাকে কিছু না জানিয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে গেল পিরুলিয়া গ্রামে। সেখানে ওদের একটা গোপন ক্যাম্প আছে। সেখান থেকে দুটি বস্তা ভর্তি অস্ত্র নিয়ে ফিরলো পরদিন সন্ধের সময়। বন্ধুদের সঙ্গে আগে থেকে প্ল্যান করাই ছিলম, ধানমণ্ডি থেকে হাইজ্যাক করা হলো দুটো গাড়ি, একটা মাজাদা আর একটা ফিয়াট। দুটো দলে ভাগ হয়ে ওরা উঠলো দুটো গাড়িতে। আজ রাতে অনেকগুলি অ্যাকশান হবে। একটা গাড়ি থেকে শাহাদত জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট আর ইয়োর টার্গেটস্? কোনদিন যাচ্ছো? অন্য গাড়ি থেকে উত্তর এলো ডেস্টিনেশান আননোন, টারগেট মোবাইল।

রুমীরা কয়েকজন অনেক ফিঠ করে রেখেছিল ধানমণ্ডির কুড়ি নম্বর রাস্তায় চীনা দূতাবাসের

কোনো এক কর্তাব্যক্তির বাড়ি, তার সামনে বেশ কয়েকজন মিলিটারি পুলিশ পাহারা দেয়। অতর্কিতে খতম করতে হবে তাদের। তারপর আক্রমণ চালাতে হবে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের গেটে তারপর গুলশানে এক আর্মি অফিসারের বাড়িতে... । চতুর্দিকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পাকিস্তানী শাসকদের বোঝাতে হবে বাংলার যুবশক্তিকে ভয় দেখিয়ে দমন করা যাবে না।

মাজদা গাড়িটায় উঠেছে ওরা ছ'জন, পেছনের সীটের মাঝখানে রুমী। কুড়ি নম্বর রাস্তায় এসে সেই চীনা ডিপ্লোম্যাটের বাড়ির সামনে এসে ওরা হতাশ হলো। আজ সেখানে মিলিটারি পলিশ পাহারা নেই। গাড়ি ঘুরিয়ে ওরা এলো আঠেরো নম্বর রাস্তায়, সেখানে আর একটি বাড়ির সামনে সাত-আটজন পুলিশ শরীর ইলিয়ে বসে আছে, গালগল্প করছে। ওদের সামনে দিয়ে গাড়িটা চলে গেল, ওরা ভ্রূক্ষেপও করলো না।

গাড়িটা সোজা গিয়ে আবার ঘুরে এলো সাতমসজিদের মোড় থেকে। এবার বাড়িটা পড়বে বাঁ দিকে। একজন গাড়ি চালাচ্ছে, তিনজন একসঙ্গে ফায়ার করবে আর বাকি দু'জন অ্যালার্ট থাকবে অন্যদিক থেকে কোনো আক্রমণের সম্ভবনা আছে কি না তা লক্ষ রাখবার জন্য। বাড়িটার সামনে এসে গাড়িটার গতি একটু ধীর হয়ে গেল, আলম চাপা গলায় অর্ডার দিল, ফায়ার!

তিনটে স্টেনগান গর্জন করে উঠলো এক সঙ্গে। আগেই বলে রাখা ছিল, তিনটে স্টেনগান গুলি চালাবে তিন লেভেলে, পেটে, বুকে, মাথায়। মাসি-তামসা করতে পুলিশগুলো উঠে দাঁড়াবারও সুযোগ পেল না। ফুঁড়ে গেল মাটিতে। প্রতিপক্ষের একটা গুলিও ছুটে এলো না রুমীদের দিকে। অপারেশন সেন্ট পারসেন্ট সাকসেসফুল! কিন্তু এখানেই থামলে চলবে না। গাড়িটা আবার চলে এলো কুড়ি নম্বর রাস্তায়। সেই চীনা কূটনৈতিকের সামনে এখনো পুলিশ নেই, কী হলো ব্যাপারটা? ভদ্রলোক কি ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন?

এখন অন্য গাড়িটার সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। আলমএদিক ওদিক গাড়িটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে মীরপুর রোডে এস পড়লো। তারপর ছুটলো নিউ মার্কেটের দিকে। খানিকটা এগোতেই দেখলো সামনের রাস্তায় সার বেঁধে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাস্তায় প্রত্যেক গাড়ি চেক করা হচ্ছে। এরই খবর পৌঁছে গেল?

গাড়ি ঘোরাবার আর উপায় নেই। পেছন দিক দিয়েও আসছে দুটো আর্মি ট্রাক। সামনে ব্যারিকেড, সেখানে এল এম জি তাকে করে দু' জন সৈন্য শুয়ে আছে মাটিতে। আর দু' জন সৈন্য হাত উঁচু করে গাড়ি থামাতে বলে এগিয়ে এলা।

গাড়ির মধ্যে সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। গাড়ির চালক আলমকে কেউ কোনো কথা বললো না। আলম লাইট অফ করে ডান দিকে টার্ন নেবার ইনডিকেটর জ্বালিয়ে সামান্য ঘোরাবার ভঙ্গি করলো। একজন মিলিটারি পুলিশ চেঁচিয়ে বললো, বাস্টার্ডস! কিধার যাতা হ্যায়? গাড়ি রুখো!

সঙ্গে সঙ্গে আলম দারুণ বেগে বাঁ দিকে গারিয়ে ঘুরিয়ে সেই সৈন্য দুটোর প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়লো। রুমী চেঁচিয়ে বললো, মাটিতে দু' জন এল এম জি হাতে। ফায়ার।

তিনটে স্টেন গান থেকে এত তাড়াতাড়ি গুলি ছুটে এলো যে এখানেও এল এম জি কাজ করার সুযোগ পেল না। এবারেও কোনো প্রতিরোধ নেই বলতে গেলে। আলম গাড়িটাকে নিয়ে এলো ধানমণ্ডির পাঁচ নম্বর রাস্তায়, সামনেই গ্রীন রোড। রুমী পেছন ফিরে বসে রাস্তা দেখছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা মিলিটারি জিপ কোনো গলি দিয়ে যেন এস পড়েছে তাদের গাড়ির পেছনের কাচ, তারপরে গুলি চালালো। তার সঙ্গে বদি আর স্বপন। জিপটা মাতালের মতন টলতে গিয়ে ধাক্কা মারলো একটা ল্যাম্প পোস্টে।

এবার ওদের নিরঙ্কুশ জয়!

কিছু দূরে আর ও একটা জিপ আর দুটো ট্রাক আসছে ওদের ফলো করে। কিন্তু এইসব ছেলেরা ঢাকা শহরের রাস্তাগুলো যেমন চেনে, মিলিটারি ড্রাইভারদের সাধ্য আছে কি ওদের সঙ্গে পাল্লা দেয়! অনেক গলি ঘুঁজির মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে , অনুসরনকারীদের চোখে ধুলো দিয়ে নিউ এলিফ্যান্ট রোডে পড়ে আলম হেড লাইট জ্বালালো, তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ওরা দু' জন আজ শত্রুপক্ষ যথেষ্ট ঘায়েল হয়েছে, কিন্তু ওদের গায়ে একটা আঁচড়ও দিতে পারেনি!

দরজায় ঘন ঘন বেল শুনে রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন জাহানারা। দরজা খুলতে তাঁকে প্রায় ঠেলেই যেন ঢুকে পড়লো রুমী আর দুটি ছেলে। তাদের চোখ মুখ লাল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

আজ রুমী কিছু গোপন করতে পারলো না। মায়ের হাত চেপে ধরে আনন্দে-গর্বে উত্তেজনায় বলে ফেললো, আম্মা, আজ একটা দারুন অ্যাকশান করে এসেছি!

সবাই ওপরে চলে এলো রুমীর ঘরে। জামীকে সঙ্গে নিয়ে শরীফও এলেন। তারপর সবিস্তারে শোনা হলো সব ঘটনা। সব মিলিয়ে মাত্র আধঘন্টায় এত কিছু ঘটেছে।

রুমী বললো, আম্মা দেখ, আমার ঘাড়ে কাঁধে স্টেন থেকে আগুনের ফুলকি ছুটে কীরকম ফোসকা পড়ে গেছে। মিলিটারি ধরলে এগুলো দেখবেই বুঝে যাবে। কটা দিন আর রাস্তায় বেরুনো যাবে না!

জাহানারা ছেলের জামার কলার সরিয়ে দেখলেন। অনেকগুলো কালো কালো ছোট ছোট ফোস্‌কা। জামাটারও কয়েক জায়াগায় ফুটো ফুটো।

তিনি ডেটল এনে লাগাতে যেতেই রুমী বললো একটু পরে এসব দিও। আমাদের আম্‌সগুলো একটা জায়গায় রেখে এসছি। সেগুলো আজই আনতে হবে। সেগুলো নষ্ট করা যাবে না! আম্মা, তুমি যাবে আমার সঙ্গ? মহিলা ড্রাইভার দেখলে ওরা হয়তো গাড়ি থামাবে না।

জাহানারা চমকে উঠে বললেন, এখনই আবার বেরুবি?

রুমী বললো, উপায় নেই। যাতর বাড়িতে রেখেছি, তিনি বলেছেন, আজ রাত্তিরে ওখানে আম্‌স রাখা চলবে না। এইসব একএকটা অস্ত্র আমাদের বুকের রক্তের চেয়েও দামী অন্য দুটি ছেলে মুখ নীচু করে আছে। তাদেরও মনের ভাব একই।

শরীফ বললেন, যাও ঘুরে এসো। খোদা হাফেজ!

জাহানারা বিনা বাক্যবায়ে নিচে নেমে এসে গাড়ি বার করলেন গ্যারাজ থেকে। যে সাঙ্ঘাতিক অ্যাকশান করে এসেছে রুমীরা, এখন মিলিটারি পুলিশ নিশ্চয়ই তাদের পাগলা কুকুরের মতন খুঁজে বেড়াচ্ছে। এত বড় বিপদ থেকে বেঁচে এসেও রুমী আবার বেরুতে চাইছে। এত সাহস এরা পেল কোথা থেকে।

জাহানারা ষ্টিয়ারিং-এ বসলেন, রুমী পেছন দিকে সীটের সঙ্গে মিশে শুয়ে রাইলো। চাপা গলায় বললো, বেশি দূর যেতে হবে না, একটা গলি ছাড়িয়েই ডান দিকে। হাই সাহেবের বাড়ির সামনে গাড়ি থামবে। তারপর গলির শেষমাথায় গিয়ে আবার ঘুরে আসবে। দেখে নেবে লোক আছে কি না।

সেটা একটা কানা গলি। সুনসান, নিঃশব্দ প্রায়। একটি বাড়ির বৈঠকখানায় কয়েকজন লোক তাস খেলছে। রুমী বললো, আবার হাই সাহেবের গেটের সামনে পার্ক করো। আর দু' খানা বাড়ি পরে জিনিসগুলো আছে। আমি দেখে আসি, সে বাড়িতে বাইরের কোনো লোক আছে কি না।

রুমী চলে গেল জাহানারা বসে রইলেন। এখন তিনি এক অন্যরকম উত্তেজনা বোধ করছেন। কিছুই যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না এখনও। বিপ্লব, গেরিলাযুদ্ধ, আর্মির বিরুদ্ধে কলেজের ছেলেদের বন্দুকে-মেশিনগান নিয়ে যুদ্ধ, এসব এতদিন তিনি বইতে পড়েছেন, বিদেশী সিনেমায় দেখেছেন। ঠিক সেই জিনিসই এখন ঘটছে নিজের দেশে, তাঁর নিজের ছেলে একজন বিপ্লবী? এমনকি তিনি নিজেও এই যে অস্ত্র উদ্ধার করতে এসেছেন, তিনি নিজেও তো এর তাঁর বুক কাঁপছে থরথর করে, এসবই স্বপ্ন নয় তো?

রুমী ফিরে এলো দুটো বস্তা ঘাড়ে নিয়ে। তারপর বললো, শিগগির চলো-।

শরীফ বাড়ির সামনের বাত্তিগুলো নিবিয়ে রেখেছেন। অন্ধকারের মধ্যেই গাড়িটা ফিরে এলো গ্যারাজে। বস্তাদুটি ওপর নিয়ে আসা মাত্র জাহানার বললেন, দেখি,দেখি, তোদের অস্ত্রগুলো এবার নিজের চোখে দেখি।

পাঁচটা স্টেনগান, একটা পিস্তল দুটো হ্যাণ্ড গ্রেনেড। হ ণ্ড গ্রেনেডগুলোর চেহারা অনেকটা আনারসের মতন, ডাক নামও পাইন অ্যাপল। স্টেনগানগুলোর দিকে তাকালেই গা ছমছম করে, এই অস্ত্র কখন কার হাতে থাকবে, কিংবা কে প্রথম কী উদ্দেশ্য নিয়ে চালাবে, তার ওপরেই নির্ভর করছে জীবন কিংবা মৃত্যু। রুমীরা এই অস্ত্র নিয়ে একটু আগে জয়ী হয়ে এসেছে, আবর পাকিস্তানী সেনাদের হাতে এই স্টেনগানই অত্যাজারের প্রধান হাতিয়ার।

অস্ত্রগুলো কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর স্মার্ট, ঝকঝকে। ওদের কোনো দোষ নেই। যারা বানায় এবং যারা ব্যবহার করে, তারাও হয়তো ধার্মিক এবং ঈশ্বর -বিশ্বাসী, তবু ঈশ্বরের সন্তানদের বিনাশ করতে তারা কোনো দ্বিধা করে না।

জাহানারা সেই অস্ত্রগুলোর গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

রুমী বললো, আম্মা এক্ষনি এগুলো লুকিয়ে রাখার ব্যবস্তা করা দরকার।

সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো একতলার পানির বিরাট ট্যাংকটিং, যাকে হাউজ বলে। হাউজটা আগদ ফুট চওড়া আর দশ ফুট লম্বা, প্রচুর পানি ধরে। এক কোণে একটা গোল ম্যানহোল তা দিয়ে ভেতরে নামা যায়। জামী নেমে গেল একটা ছোট টুল নিয়ে। টুলটাকে সে অনেক ভেতরে নামা যায়। তারপর অস্ত্রগুলো বস্তায় মুড়ে, দড়ি দিয়ে ভালো করে বেঁধে রজখা হলো সেই টুলের ওপর।

সব ব্যবস্থা নিখুঁত হবার পরও রুমী বরলো, কিন্তু মিলিটরি পুলিশ এস এত বড় একটা। পানির হাউজ দেখতে বাদ দেবে? আব্বু তুমি হলে কী করতে!

শরীফ তাঁর হাতের টর্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন, অফ্‌কোর্স, এটা দেখলে ভিতরে কোনো মানুষ..লকিয়ে আছে কি না।

জাহানারা বরলেন, ঢাকনা খুলে, টর্চ মেরে দ্যাখো। কী দ্যাকলা?

শরীফ বললেন, শুধু পানি চকচক করছে, এটাই দেখছি। ভিতরের দিকটা কিছু দেখা যায় না।

–ভিতরের দিকটাও দেখতে হলে পানির মধ্যে নামা ছাড়া উপায় নাই। ওয়েস্ট পাকিস্তানীরা পানিতে নামবে বলে মনে হয়? ওরা পানিকে ডরায়।

রুমী বললো, ওর ভিতরে নামলে বলে সে ব্যাটাকে ঠুসে ধরবো।

এরপর দু'দিন রুমী প্রায় সর্বক্ষণই বিছানায় শুয়ে রইলো আর গান শুনতে লাগলো অবিরাম। বন্ধুরাও আসছে অনেক। ধানমণ্ডি ও মীরপুর রোডের সেই সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, ঢাকা অ্যাডমিনিস্ট্রেশান একটা বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু রুমীদের দলটাকে সামান্য ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়নি।

দু'দিন পর রুমী আবার একটু একটু বেরুতে শুরু করলো । আরও বেশি অস্ত্রশস্ত্র আনাবার প্রস্তুতি চলছে আগামী মাসের ছ' তারিখে পাকিস্তানী সরকার প্রতিরক্ষা দিবস পালনের তোড়জোর করছে। সেইদিনই মুক্তিযোদ্ধারা এক বড় রকমের আঘাত দিতে চায়। ঢাকায় এখন গেরিলাদের মোট ন'টি গ্রুপ, সেদিন তারা আক্রমণ চালাবে একযোগে।

সকালে নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে গেছে রুমী, ফিরলো সন্ধের পর। মুখটা শুকনো, শরীর ভালো নেই তা বোঝা যায়,কিন্তু কিছুতেই তা স্বীকার করবে না। জাহানারা বারবার জিজ্ঞেস করলে সে একসময় ক্লিষ্ট হেসে বললো, আম্মা মাথাটা কেন জানি দপ্‌দপ করছে, ভালো করে বিলি করে দাও তো!

তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো রুমী। জাহানারা তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। জামী হাফিজ নামে ওদের এক বন্ধু কাছে এসে বসে গল্প শুনতে লাগলো, এখন শুধই যুদ্ধের গল্প। পাশে একটা রেডিও তাতে পরপর বেজে চলেছে বাংলা গান, আকাশবাণীর অনুষ্ঠান। একটা গান শুনে চমকে উঠলো রুমী।

এই সেই খুদিরামে ফাঁসি উপলক্ষে বাংলার মর্ম নিঙড়ানো গান
এক বার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
ও মা হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে জগতবাসী...

এই গানটা রুমীর খুব প্রিয়, তবু সে ভুরু কুঁচকে বললো, এই গানটা আজ দুপুরে আর একবার শুনেছি। রেডিওতেই কোন স্টেশান কে জানে! একই দিনে এই গান দু'বার।

জামী বললো, জিম রীভ্‌স-এর রেকর্ড চালাবো? তুমি ভারোবাসো...

রুমী বললো, না থাক।

তারপর সে ঘুমিয়ে পড়লো। অন্যরজও চলে গেল যে যার বিছানায়।

মধ্যরত্রি পার হবার পর জাহানারা বেগম গেটের কাছে দুমদাম শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ছুটে গেলেন জানলার কাছে। গাড়ির শব্দ, বুটের আওয়াজ, তীব্র সার্চ লাইট। বাড়ির সামনে। দাঁড়িয়ে আছে অন্তত কুড়ি জন মিলিটারি তিনি ঝড়ের মতন চ.ল এলেন রুমীদের ঘরে। ওরা ঘরের ঠিক মাঝাখানটায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যেই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ সব দিকের জানলা দিয়ে দেখা হয়ে গেছে, সব দিকেই মিলিটারি পুলিশ, তাদের সংখ্যা কত কে জানে! এ বাড়ির বাগানের মধ্যে একদল পুলিশ ঢুকে পড়ে গেটে ধাক্কা দিচ্ছে।

পালাবার কোনো উপায়ই নেই। বাড়ির উঠোনে, বারন্দায়, বাগানে তীব্র আলো ফেলছে চকচক

করছে পুলিশেদের হাতের রাইফেলের বেয়নেট। এই অবস্থাতে ও জাহানারা একটা কথা মনে পড়ে গেল। রুমী একদিন বলেছিলে আমাদের সেক্টর কমাণ্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফ কী বলেন জানো? তিনি বলেন, কোনো স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না। চায় রক্তস্নাত শহিদ। মামণি, আমরা সবাই শহিদ হয়ে যাবো, এই কথা বেস্তে মনকে তৈরি করে ফেলেছি।

আতঙ্কে তিনি রুমীর হাত চেপে ধরলেন।

পুলিশের কর্কশ চিৎকারে শরীফকে নিচে নেমে গিয়ে দরজা খুরে দিতেই হলো। ভেতরে ঢুকে এলো একজন ক্যাপেটেন ও একজন সুবেদান আর কয়েকজন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রধারী পুলিশ। ক্যাপ্টেনটিকে মনে হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো কলেজের ছাত্র রুমীর চেয়ে বয়েসে খুব বেশি হবে না, দেশের অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে সে আর রুমী হয়তো দু'টিমের হয়ে ফুটবল খেলতে পারতো, আজ সে এসেছে ঘাতকের ভূমিকায় আর রুমীও তার আদর্শের জন্য যে কোনো উপায়ে একে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। সঙ্গের সুবেদারটি মধ্যবয়স্ক, উর্দুভাষী বিহারী।

সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে সার্চ করলো তারা। শরীফ যেমন ভেবেছিলেন, জলের জ্যাংকটির ঢাকনা খুলে একবার টর্চ মেরে দেখলো শুধু। কোনো অস্ত্র না পেলেও রুমী, জামী, আর শরীফদের একতলার উঠোনে এনে দাঁড় করালো তারা। ক্যাপটেনটি গ্যারাজের গাড়িটার দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলো, ইয়োর কার? ড্রাইভার চালায়, না নিজে চালাতে জানেন?

শরীফ বললেন, চালাতে জানি।

ক্যাপ্টেন বললো, ড্রাইভ অ্যালং উইথ আস্।

রুমীদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বাইরে। জাহানারা ছুটে এসে বললেন, ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আমিও তাহলে সঙ্গে যাব!

ক্যাপ্টেনটি শান্ত গলায় বললো, রুটিন ইন্টারোগেশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রমনা থানায়। দে ইউল বী ব্যাক সুন!

শরীফ চোখের ইসারায় স্ত্রীকে সঙ্গে না-আসার জন্য মিনতি জানালেন।

শরীফ আর জামী ফিলে এলো সেই রাত এবং পরের রাত পেরিয়ে তার পরের বিকেলের দিকে। তাদের লুঙ্গি-পাঞ্জাবি ছেঁড়া, ধুলো কাদা মাখা, চোখের নিচে কালো দাগ, ঠোঁটের কোণায় রক্ত, মাথায় চুলে রক্ত, গভীর অপমানে বিবর্ণ মুখ।

জাহানারা আর্ত চিৎকার করে উঠলেন, রুমী? রুমী কোথায় গেল?

পিতা-পুত্র দু'জন চুপ করে রইলো। কণ্ঠ এতই শুকনো যে কথা বলারও ক্ষমতা নেই, পা দুটিও যেমন শরীরের ভার বহন করতে পারছে না।

রুমীকে ওরা ছাড়েনি। রুমী সম্পর্কে ওরা অনেক কিছু জানে।

॥ ৩৮॥

প্রথমে মামুনের মনে হলো, কোথা থেকে ধোঁয়া এসে ভরে গেছে ক্যাবিন, কুণ্ডলী পাকানো নীলাভ ধোঁয়া, কেউ কি কাছেই একটা ঘুঁটে-কয়লার তোলা উনুন ধরিয়েছে? ক্রমে সেই ধোঁয়ার রং কালচে হয়ে এলো, দরজাটা দেখা যাচ্ছে না, ইস সিস্টার-মেট্রোনরা কেউ নজর দিচ্ছে না এদিকে, এরকম একটা অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার... ! ওদের ডাকবার জন্য একটা বেল্- এর সুইচ-আছে, সকাল থেকে সেটা খারাপ, কেউ এখন আসবে না, কেউ জানবে না, মামুনের দম বন্ধ হয়ে যাবে... । আস্তে আস্তে সেই ধোঁয়া জমাট বেঁধে একটা মূর্তির রূপ নিতে লাগলো, মানুষ না অতিপ্রাকৃত কিছু? মামুন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে চোখ বুজে আঁ আঁ করে উঠলেন।

শরীর যতই দুর্বল হোক মামুন তাঁর যুক্তিবোধ একেবারে বিসর্জন দিতে পারেন না। তিনি ভয়ও পাচ্ছেন আবার সেই সঙ্গেই মনে হচ্ছে, এরকম হতে পারে না, এরকম হতে পারে না। তবে কি মৃত্যুর আগে মানুষ চোখে এমন ভুল দেখে? কিন্তু মামুন জ্ঞান হারাতে চান না, তিনি শেষপর্যন্ত দেখে যেতে চান, তিনি আবার জোর করে চোখ খুললেন।

এবার মূর্তিটা অনেকখানি স্পষ্ট, একজন দীর্ঘকায় মানুশ, কাঁধদুটি ঈষৎ ঝুঁকে আছে, চোখে কালো চশমা, মুখ দিয়ে সত্যিই ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মামুন আরও ভয় পেয়ে গেলেন, তাঁর বুকে প্রবল ব্যাথ্যা হতে লাগলো, চোখে জল এসে গেল। তাঁর পায়ের কাছে যে দাঁড়িয়ে আছে, সত্যিকারের মানুষের

মতনই তার অবয়ব, এবং মামুনের চেনা, সেইজন্যই অবিশ্বাস্য। তবে কি শয়তান এসেছে এই বেশে? সঙ্গে সঙ্গে মামুন ভাবলেন, না, না, শয়তান টয়তান কিছু আসে না, ওসব কুসংস্কার, তিনি আর মানবেন না। তিনি উঠে বসার চেষ্টা করলেন।

দীর্ঘকায় মানুষটি বললো, মোজম্মেল হক সাহেব, ঘুম ভাঙালাম নাকি? আছেন কেমন?

এই সেই মুসাফির, চোখে সানগ্লাস, মুখে চুরুট। এখনও মামুনের মনে হচ্ছে, এটা কোপনো অতিপ্রাকৃত ঘটনা। ভারতে আসার পর চার মাসের মধ্যেও মামুন কখনো মুসাফরের সন্ধান পাননি, কারুর মুখে এর কথা শোনেনওনি, সেই লোক হঠাৎ এসে কী করে দেখা দিল সন্ধেবেলা হাসপাতালের ক্যাবিনে?

মামুন বালিশের তলা হাতড়াতে লাগলেন। এক্ষুনি সরবিট্রেট জিভে দিতেনা পারলে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি সহ্য করতে পারছেন না, এত উত্তেজনা কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না।

মুসাফির একটু কাছে এসে বললেন, কী খোঁজেন? ওষুধ? শরীর খারাপ লাগছে?

আধখানা সরবিট্রেট জিভের তলায় দিয়ে মামুন কয়েক পলক চোখ বুজে থেকে মনটাকে বশে আনবার চেষ্টা করলেন। ক্যাবিনের মধ্যে চুরুটের সামান্য ধোঁয়া ছাড়া আর ধোঁয়া নেই, কিন্তু জানলার বাইরেটা অন্ধকার, ভেতরেও আলো জ্বালা হয়নি, এরই সন্ধে হয়ে এলো? অথচ হেনা-মঞ্জুরা এলো না?

মুসাফির আরও কিছু বলে যাচ্ছিলেন, মামুন হঠাৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শান্ত, দৃঢ় গলায় বললেন, আপনি এখানে?

মুসাফির হেসে বললেন, আমিও তো আপনার মতন এই হাসপাতালেরই রুগী। আমি আছি তিনতলায়। আজ দুপুরেই আপনাকে প্রথম দেখতে পেলাম।

অতি সাধারণ ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা। দু'জনে একই হাসপাতালে ভর্তি হওয়া তো অস্বাভাবিক কিছু না। এই চার মাস মুসাফিরের সঙ্গে দেখা হয়নি, দৈবাৎ তিনি এই এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলেই দেখা হয়ে গেল। এই দিকটা মামুন চিন্তা না করেই কেন অত ভয় পেয়েছিলেন? তাঁর মনের একটা দিকে কি প্যারালিসিস হয়ে গেছে?

মুসাফির জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী হয়েছে, হার্ট?

এই লোকটা জ্যোতিষী না ভবিষ্যদবক্তা কী যেন! কিন্তু মামুন যে হার্ট পেশেন্ট হিসেবে এই ক্যাবিনে শুয়ে আছেন, তা জানার জন্য ওসব কিছু লাগে না।

শিয়ালদার কাছে মামুন একদিন বিকেলে বুকে অসহ্য ব্যথা বোধ করার পর চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন। তিনি নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন রাস্তায়। এই ভিড়ে-ভরা নিষ্ঠুর শহর, এখানে কেউ কারুর দিকে ফিরেও তাকায় না বিকেলবেলা অফিস ভাঙার পর ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা পাগলের মতন স্টেশনের দিকে ছোটে। লোকের পায়ের ধাক্কায় মামুন সেদিনই শেষ হয়ে যেতে পারতেন। তাঁর পরম সৌভাগ্য, কয়েকজন পথচারী ধরাধরি করে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল কাছাকাছি নীলরতন সরকার হাসপাতালে। মামুনদের কলেজ-জীবনে এ নাম ছিল ক্যাম্পবেল হাসপাতাল, এখনও মামুনের সেই নামটাই মনে পড়ে।

প্রথমে তিনি স্থান পেয়েছিলেন জেনারেল বেডে, জ্ঞান ফেরার পরই তিনি একটা খবর দিতে বলেছিলেন বাংলাদেশ মিশনে। তিনি জয় বাংলার লোক শুনেই তরুণ ডাক্তাররা তাঁকে খাতির করতে লাগলেন তাকে সরিয়ে আনা হলো ক্যাবিনে। ঠিক হার্ট অ্যাটাক নয়, মামুনের হৃদরোগটির নাম অ্যানজাইমা পেকটোরিস। সবাই বলছে, ততটা ভয়ের কিছু নেই।

বাইরে এখন গাঢ় অন্ধকার, সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নামছে, আজ তা হলে হেনা-মঞ্জুরা আর আসবেই না তাঁকে দেখতে! আদালত এত কাছে প্রতাপও এলো না? হাসপাতালের রোগীদের কাছে রোজ রোজ আসতে কারই বা ভালো লাগে। অন্য কেউ আসেনি, তাই মুসাফির এসেছে।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী জন্য ভর্তি হয়েছেন এখানে?

মুসাফির বললেন, আমার হৃদয় দৌর্বল্য নেই, তবে পাকস্থলীতে বড় রকমের ক্ষতি হয়েছে মনে হয়। কোনো কিছুই খেয়ে হজম করতে পারি না।

–আপনি সেই সিক্সটি ফাইভে ঢাকায় গিয়ে আটকা পড়েছিলেন, তারপর কবে এদেশে ফিরে এলেন কিছুই খবর পাইনি।

–আপনাদের জেলখানার দানাপানি খাওয়া আমার কপালে লেখা ছিল বোধহয়। আমার আর খবর

বিশেষ কিছু নাই। মফস্বলে থাকি, বহরমপুরের দিকে, কলকাতায় বিশেষ আসি না। ওখানে চিকিৎসায় কোনো কাজ হলো না। কবি জসিমুদ্দিন কেমন আছেন? উনি কি ঢাকাতেই রয়ে গেলেন?

–আমি ঠিক জানি না।

–গোবিন্দচন্দ্র দেব, মনিরুজ্জামান এনারা সত্যিই খুন হয়েছেন? কাগজে পড়েছি, তবু বিশ্বাস হয় না। সেবারে এঁদের দু'জনের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল।

উত্তর না দিয়ে মামুন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পঁচিশে মার্চের ঘটনা বাড়িয়ে বলার কিছু নেই, যে সব বীভৎস ব্যাপার ঘটেছে তার একাংশ শুনলোও এখানে অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না। ভারতীয় নগর-জীবনে সামরিক বাহিনীর কোনো তাণ্ডব এ পর্যন্ত ঘটেনি, তাই এরা কল্পনা ও করতে পারে না ব্যাপারটা।

হাই হিল জুতোর টক টক শব্দ করে একটি নার্স এই ক্যাবিনে এসেই মুসাফিরকে র্ভৎসনা করে বললেন, আপনি এখানে চুরুট খাচ্ছেন? আপনারা কি হাসপাতালের কোনো নিয়ম মানবেন না? পাশের হলঘরটায় পর্যন্ত গন্ধে টেকা যাচ্ছে না।

মুসাফির কাঁচুমাচুভাবে বললেন, আপনাদের কাছ থেকে ধমক খাবার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এবার ফেলে দিচ্ছি। এটাই বদ নেশা কিছুতেই ছাড়তে পার না যে!

মামুন ভাবলেন, ঐ চুরুটের গন্ধের অনুষঙ্গেই তিনি অতখানি ধোঁয়ার দৃশ্য কল্পনা করেছিলেন বোধহয়। আজ আটদিন হলো তিনি একটাও সিগারেট খাননি, ডাক্তাররা বলছে, আর কখনো খাওয়া চলবে না। তবু চুরুটের গন্ধে তাঁর মনটা চনমন করছে।

আলোটা জ্বেলে দিয়ে নার্সটি একটি থার্মোমিটার মামুনের মুখের মধ্যে ভরে দিলেন যান্ত্রিকভাবে। তারপর ঘড়ি দেখতে লাগলেন।

জানলার কাছে গিয়ে চুরুটটা নিবিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে মুসাফির বললেন, কী মেঘটাই না করেছে! মোটে সোয়া তিনটে বাজে, এর মধ্যে মনে হচ্ছে যেন রাত্তির হয়ে গেল। এ বছর বন্যা না ডাকিয়ে ছাড়বে না।

মামুন চমকে উঠলেন। মুখের মধ্যে থার্মোমিটার, তাই কথা বলতে পারছেন না। মাত্র দুপুর সোয়া তিনটে? মেঘের জন্য আকাশ অন্ধকার? তা হলে তো হেনা-মঞ্জু কিংবা প্রতাপের আসার সময় যায়নি! অথচ রাত হয়ে গেছে ভেবে মামুন ওদের ওপর অভিমান করছিলেন!

ভুল বোঝাবুঝি, কত সামান্য কারণে ভুল বোঝাবুঝি! একটা দিকের ওপর বেশি ঝোঁক দিলে অন্য দিকটা আর দেখাই হয় না। তারই জন্য রাগারাগি কিংবা মনে মনে পাওয়া। আগে তো মামুনের মধ্যে এরকম অস্থিরতা ছিল না!

মামুনের অসুস্থতার খবর পেয়ে এত ব্যস্ততার মধ্যেও মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এই হাসপাতালে। তিনি মামুনের স্ত্রীর দিক দিয়ে কিছুটা আত্মীয় এবং এককালের বন্ধুও বটে। তিনি বলেছিলেন, তোমার হার্টে ব্যামো হয়েছে শুনে আশ্চর্য হই নাই, বুঝলে মামুন। এই যে যুদ্ধের অ্যাংজাইটি,, আনসার্টেনিটি,, এর ফলে অনেকেরই হার্ট ডিজিজ হবে, ডায়াবিটিস হবে, হইতে বাধ্য! এই সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখাই সবচেয়ে শক্ত কাজ!

নার্সটি টেম্পারেচার নিয়ে চলে যেতেই মামুন মুসাফিরের দিকে তাকিয়ে ব্যগ্রভাবে বললেন, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? যদি আপনি কিছু মনে না করেন, কিংবা আপত্তি না থাকে,

মুসাফির বললেন, হার্ট ট্রাবল থাকলে সবসময় মন খোলাসা করা উচিত, মনের মধ্যে কিছু চেপে রাখবেন না। বলুন!

–আপনি সবসময় চোখে কালো চশমা পরে থাকেন কেন? এমনকি ঘরের মধ্যেও অন্ধকারে–

বেশ জোরে একটা নাটকীয় ধরনের অট্টহাসি দিয়ে মুসাফির বললেন, এটা বোঝেননি? নিজেকে বেশ একটা রহস্যহয় চরিত্র বানিয়ে রাখার জন্য... আমার চশমা খুললে আমার চক্ষুদুটো দেখলে আপনি আঁতকে উঠবেন... না দেখাই ভালোত!

–আপনার আসল নাম কী? সবাই আপনাকে মুসাফির বলে...

–অতি সিম্‌পল ব্যাপার। বাপ-মা আমার নাম রেখেছিল রেজাউল করীম। এই নামে এক জন লেখক ছিলেন, আপনার মনে আছে নিশ্চই? আমি যখন একটু-আধটু লিখতে শুরু করি তখন যাতে কনফিউশান না হয়, সেইজন্য পেন-নেম নিয়েছিলাম মুসাফির। এইটাই এখন নিজের নাম হয়ে গেছে।

পোস্ট অফিসে নাম সই করি মুসাফির খান।

–মুসাফির, আপনি তো দূরদর্শী মানুষ। আপনি বলেন তো, আমাদের এই স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিণতি কত হবে? কতদিন এই যুদ্ধ চলবে?

–এই যুদ্ধের পরিণতিতে আপনাদের কপালে অশেষ দুর্গতি ভোগ আছে।

–অ্যাঁ? সে কী? আমরা স্বাধীনতা পাবো না?

–কেন পাবেন না? স্বাধীনতা–যুদ্ধের পরিণতিতে স্বাধীনতা আসেই। কিন্তু তাতে আপনাদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে, তা, কে বলেছে? ভারতও তো স্বাধীন। কিন্তু এদিকের মানুষের দুঃখ-কষ্ট কমেছে, না বেড়েছে?

–আপাতত স্বাধীনতা পাওয়াটাই বড় কথা। সেটা যদি পেয়ে যাই–

–সেটা নির্ভর করছে স্বাধীনতা বলতে কে কী বোঝে তার ওপর। কার কাছ থেকে স্বাধীনতা, কাদের জন্য স্বাধীনতা? আপনারা স্বাধীনতা পাবার জন্য তড়িঘড়ি ভারত ভাগ করে ফেললেন। তখন তো ভেবেছিলেন–

–আমরা ভারত ভাগ করেছি–

–আপনারা সবাই তখন মুসলিম লীগের সাপোর্টার ছিলেন না? আপনারা তখন অবাধ্য বালকের মতন পার্টিশানের জন্য ঝুলেঝুলি করেননি?

–মুসাফির, আপনি কী বলছেন? আমাদের পার্টিশান চাওয়ার পিছনে কতগুলো কারণ ছিল তা ভেবে দেখবেন না? কারা আমাদের বাধ্য করেছিল? সে সময়কার কংগ্রেস মুভমেন্টের ইতিহাস ভালো করে খুঁটিয়ে দেখুন, সবসময় হিন্দু কমিউনালিজম আধিপত্য বিস্তার করে ছিল। আপনার মনে নেই, জিন্না সাহেব যখন কংগ্রের নেতা, তখনও গুজরাটের বেনিয়া গান্ধী জিন্না সাহেবকে মুসলিম লীডার বলেছেন? আসলে ওরা নিজেরাই কখনো ভুলতে পারেনি যে ওরা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী বা ভারতীয় ইত্যাদি যাই হোক না কেন, তার চেয়েও বড় পরিচয়, ওরা হিন্দু! সুতরাং আমাদেরও মুসলিম আইডেনটিটি রক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সেইজন্যই আমরা পাকিস্তান চেয়েছিলাম।

–বিহার, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিশবাংলা, আসামের কোটি কোটি মুসলমানকে ফেলে রেখে, তাদের ভাগ্য অনিশ্চিত রেখে, আপনারা পাকিস্তান নিয়ে সরে পড়লেন।

–হয়তো সব দিক বিবেচনা করা হয়নি। মুসাফির সাহেব, আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনি নিজে মুসলমান হয়ে সেই চল্লিশের দশকে আপনিও কি পাকিস্তানের দাবি সাপোর্ট করেননি?

–হয়তো করেছিলাম। কিন্তু সেই চাওয়াটা যে সঠিক হয়েছিল তার তো কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না! এই চব্বিশ বছরে যে-সব ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেল, পার্টিশান না হলে হয়তো এর চেয়ে বেশি কিছু নাও ঘটতে পারতো! এই একটা জীবনে যত ট্র্যাজেডি আমরা দেখলাম, তারচেয়ে আর কী বেশি হতে পারে? আপনারা মুসলামানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গড়ার দু'চার বছরের মধ্যেই পূর্ব আর পশ্চিমে বিচ্ছেদের সুর বেজে উঠলো। বাজেনি?

–তখন বুঝিনি যে এক ধর্মের মানুষ হলেও অর্ত্যাচারী, শোষকরা ক্ষান্ত হয় না। তারা ঠিকই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে!

–এখন বুঝি ভাবছেন এক ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র হলেই অত্যাচারী, শোষক আনডেমোক্রাটিক ফোর্সগুলো মাটির তলায় লুকোবে? মুনাফা আর ক্ষমার নেশায় যারা শত-সহস্য মানুষকে বঞ্চিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, তারা কখনো ধর্ম কিংবা ভাষার তোয়াক্কা করে? ভাষা-সংস্কৃতির ব্যাপারটা অনেকটাই ইনটেলেকচুয়ালদের ধোঁকাবাজি, আমাদের মতন দেশের সাধারণ মানুষদের ওতে কিছু যায় আসে না।

–আপনি এত পেসিমিস্টিক কথা বলছেন, আপনি কি বলতে চান, আমাদের এই স্বাধীনতার জন্য লড়াইটা ভুল? সিকস্টি নাইনের পর আমাদের ওখানে কী সিচুয়েশন হয়েছিল আপনি বুঝবে না। ইস্ট পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না।

–মার্ক টোয়েনের সেই কথাটা মনে নেই? পূর্ব হচ্ছে আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম এই দু'জনের কখনো মিল হতে পারে না?

–আপনি ঠাট্টা করছেন। আপনি ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে?

–আহা, অত উত্তেজিত হবেন না, মামুন সাহেব। আমি ঠাট্টা-ইয়ার্কির সুরে ছাড়া কথা বলতে পারি

না। এই জন্যই তো আমার জীবনে কিছুই হলো না। প্রিজ টেক নো অফেন্স। এবার একটা অন্য কথা বলি। আপনার কপালে যে ভাঁজ দেখতে পাচ্ছি, সে তো শুধু স্বাধীনতার জন্য দুশ্চিন্তা নয়। আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও দুশ্চিন্তা অতি প্রবল।

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

—আপনি আপনার জীবন থেকে নারীদের বাদ দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনো এক নারীই আপনার মনটাকে তছনছ করে দিচ্ছে। আপনার বুকের ব্যথার কারণও সেইটাই।

—শুনুন মুসাফির সাহেব, আমি জ্যোতিষ-টোতিষদের শালাটান মনে করি। এইসব বোগাস ফোরকাস্ট শুনে আমি ইমপ্রেসড হই না। আপনি এই ধরনের কথা আমাকে আগেও বলেছিলেন। আমার জীবনে কোনো রহস্যময়ী নারী-টারী নেই, অন্তত বছর পনোরো ধরে আমি সে রকম কোনো নারীর কথা চিন্তাই করি না। আমার সে মনোবৃত্তি নাই, সময়ও নাই!

—কোনো নারীর কথা চিন্তা করেন না, তা হলে কবিতা লেখেন কী করে?

—শুধু নারীর কথা চিন্তা করলেই কবিতা লেখা যায়, এরকম কথা যে বলে সে গণ্ডমূর্খ। দ্বিতীয়ত, আমি অনেকদিন কবিতা লিখিনা, হয়তো আর কোনোদিন লিখতেও পারবো না! আপনি একদিন ঢাকায় আমার প্রতি ঐ অ্যাস্পারসন দেবার পর আমি নিজেকে অনেক ভাবে অ্যানালাইজ করেছি। অন্য নারী বলতে আমার বড় আপার মেয়ে মঞ্জু, তাকে আম স্নেহ করি, হয়তো একটু বেশিই স্নেহ করি, কিন্তু তা স্নেহ ছাড়া আর কিছুই না, এর মধ্যে কোনো আমিষ সম্পর্ক নাই। আপনারা বুঝি এই স্নেহের সম্পর্কটাকেও অন্য একটা কালার না দিলে শান্তি পান না?

—বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছেন জানেন না, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। কখনো কখনো অতিরিক্ত স্নেহ প্রেমের চেয়েও মারাত্মক হয়। ভালোবাসার তবু প্রতিদান পাওয়া যায়, কিন্তু স্নেহের প্রতিদান বড়ই দুর্লভ!

—স্নেহ নিম্নগামী।

—অবশ্যই, অবশ্যই। তবু মানুষ তা মানতে চায় না, বুকে জ্বালা ধরে থাকে, মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটাই অকৃতজ্ঞ।

বাইরে কয়েকটি কলকণ্ঠ শোনা গেল, মামুন বুঝতে পারলেন যে হেনা মঞ্জুরা এসে গেছে। ঠিক চারটের সময় ওরা আসে।

মুসাফির ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার ভিজিটার এসে গেছে, এবার আমি চলি!

মামুন ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, আপনি বসেন। ওদের সাথে আলাপ করবেন। আপনার সাথে আমার আরও কথা আছে।

মুসাফির বললেন, আমার কাছেও এখন ভিজিটার আসবে, আমি যাই। আর একদিন হবে!

ক্যাবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে মঞ্জু কথা বলছে নার্সের সঙ্গে, সে ভেতরে আসবার আগেই মুসাফির বেরিয়ে গেলেন। মামুনের আবার একটা অযৌক্তিক চিন্তা ও ভয় মাথায় খেলে গেল। মুসাফির সাহেব কি সত্যিই পেসেন্ট হিসেবে এই হাসপাতালে ভর্তি আছেন? নাকি একটি দুষ্ট আত্মার মতন তিনি হঠাৎ উদয় হয়ে ভয় দেখিয়ে গেলেন?

হেনা-মঞ্জুর সঙ্গে এসেছে বরুণ আর পলাশ। হেনা দৌড়ে বাবার কাছে এসে হাত ধরে বললো, রাস্তায় কী বৃষ্টি, আব্বু, এক হাঁটু পানি জমে গেছে।

মামুন মেয়ের মাথায় অন্য হাত রেখে দেখলেন, তার চুল ভেজা, কানের লতির পাশ দিয়ে গড়িয়ে আসছে বিন্দু বিন্দু জল। তিনি বললেন, ইস ভিজে ভিজে আসলি, একটু দেরি করতে পারলি না। তোয়ালে আছে, মাথা মুছে নে!

মঞ্জু বললো, মামুনমামা, আজ তোমার জ্বর মোটে নাইন্টি নাইন পয়েন্ট! ব্লাড রিপোর্টও ভালো।

মামুন মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারলেন না। আজ যেন তাকে অসাধারণ সুন্দর দেখাচ্ছে। একটা হালকা গোলাপী রঙের শাড়ি পরেছে, চুলগুলো সব খোলা, মুখখানা এত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কেন? যেন সারা মুখে চিকচিক করছে অভ্রবিন্দু, ঠোঁটে লিপস্টিক মেখেছে নাকি, না, মঞ্জু ওসব ব্যবহার করে না, অন্তত কলকাতায় এসে কোনোদিন করেনি। এখন আর কবিতা না লিখলেও সৌন্দর্যপ্রিয়তা তো মামুনকে ছেড়ে যায়নি, নিজের ভাগ্নী হলেও মঞ্জুর রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। কিন্তু সে তো শুধু মুগ্ধতাই, আর কিছু না!

মঞ্জু আজ একটু বেশি সাজগোজ করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার স্বামীর আজও কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি, সেই দুশ্চিন্তার কোনো ছাপ নেই মঞ্জুর মুখে। মামুন অসুস্থ, হাসপাতালে তাঁকে দেখতে আসার জন্য মঞ্জু এত সেজেছে, এটা নির্লজ্জতা নয়? মামুনের মনটা কুঁকড়ে গেল।

বরুণ বক্সী বললো, মামুন সাহেব, আপনি তো আজকে বেশ ভালো আছেন, নার্স-ডাক্তাররা কইলো। খুব ফ্রেস দেখাইত্যাছে। আর কয়দিন এরকম হাসপাতালে শুইয়া থাকবেন? এবার বাড়ি চলেন!

মামুন জোর করে হাসলেন। এদিকের যাদের একসময় পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল, তারা এখন জয় বাংলার মানুষ দেখলেই বাঙালভাষা ঝালিয়ে নিতে চায়। এতদিনের অনভ্যাসে অনেকেরই ঠিক সুরটা আর হয় না, ভুল জায়গায় অ্যাকসেন্ট দেয়, শুনতে বেশ মজাই লাগে।

মামুন বললেন, আমি তো বাসাতেই ফিরে যেতে চাই। তোমরা ব্যবস্থা করো।

বরুণ বললো, ডাক্তার বললেন, আপনি নাকি একেবারে হাঁটেন না? সারাদিন শুইয়া থাকেন? একটু হাঁটা চলা করা হার্টের পক্ষে ভালো। ওঠেন, ওঠেন, আমার হাত ধরেন, বারান্দায় আপনারে হাঁটাইয়া নিয়া আসি।

মামুন বললেন, এখন থাক। এখন তোমরা এসেছো, গল্প করা যাক।

বরুণ একেবারে মামুনের মুখের কাছে মুখ এনে গোপন কথা বলার সুরে বললো, মামুন সাহেব, কাল আমরা কয়েকজন বর্ডারে যাবো, কিছু জিনিসপত্র নিয়ে, ওষুধ আর ওয়্যারলেস সেট, গাড়িতে যাওয়া হবে, মঞ্জু আর হেনাও যেতে চাইছে আমাদের সঙ্গে। ওদের নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?

মামুন সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, না, না, না, বর্ডারে ওরা যাবে? আউট অফ কোয়েশ্চেন। আমাদের কতরকম শত্রু আছে, এখানকার বিহারী মুসলমানরা ক্ষেপে আছে আমাদের ওপর....

বরুণ বললো, আপনার পারমিশন না নিয়ে ওদের নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভোরবেলা বেরিয়ে আমরা দিনে দিনেই ফিরে আসবো, তবু বলা তো যায় না, গাড়ি খারাপ হতে পারে, রাত হয়ে যেতে পারে, আমারও মনে হয় ওদের না যাওয়াই ভালো।

হেনা বললো, আব্বু, কিছু হবে না, আমরা যাই না?

মামুন মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে কঠোরভাবে বললেন, না!

বরুণ বললো, মামুন সাহেব, আপনি ভালো করে বলে দ্যান তো। ওরা আমাদের কথা শুনতে চায় না। বর্ডারে যাওয়া এখন সত্যি রিস্কি, মাঝে মাঝে গুলিগোলা ছুটে আসে এদিকে।

পলাশ কোনো কথা বলছেন না, মামুনের চোখে চোখ পড়তেই-ই সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। পলাশ ঠিক বুঝেছে যে মামুন তাকে ইদানীং একটুও পছন্দ করতে পারেন না। অন্য কেউ হয়তো টের পায়নি, কিন্তু তাঁরা পরস্পর কথা খুব কম বলেন। মামুন হাসপাতালে, এই সুযোগে তার বাসায় এখন পলাশরা নিয়মিত আড্ডা জমায়। ভাবলেই মামুনের গা জ্বলে। সেইজন্যই তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে চান। বরুণ রোজ এখানে আসে না, কিন্তু পলাশ প্রত্যেকদিন মঞ্জু আর হেনাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে আসে। ওর এত দরদ কিসের?

মুসাফিরের চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধ এখনও যেন পাওয়া যাচ্ছে একটু একটু! হঠাৎ মামুনের মনে হলো, পলাশের ওপর তিনি যে রাগ করছেন, সেটা কি আসলে ঈর্ষা? নাকি অভিভাবকসুলভ সতর্কতা? মঞ্জু-হেনাকে কেউ না নিয়ে এলে ওরা হাসপাতালে দু'বেলা আসতো কী করে? ওরা কি কলকাতা শহরের রাস্তা চেনে? আজ অত বৃষ্টির মধ্যে ওদের আসা তো অসম্ভব ছিল।

সেই মুহূর্তে মামুন ঠিক করলেন, পলাশকে তিনি ক্ষমা করবেন। পলাশের কোনো কুমতলবের এখনো ঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সেদিন বর্ধমান থেকে ফেরার পথে চন্দননগরের কাছে ওদের গাড়ি বিকল হয়েছিল, পলাশ অত রাতে কোথা থেকে যোগাড় করেছিল একটা ট্যাক্সি। বাংলাদেশের শিল্পীরা এটা পারতো না, পলাশ সঙ্গে না থাকলে ওদের আরও বিপদ হতো, এসব কথা মামুন পরে শুনেছেন।

মামুন পলাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও কাল যাচ্ছো নাকি বর্ডারে?

পলাশ বিনীতভাবে বললো, আজ্ঞে না, কাল দুপুরে আমার একটা রেকর্ডিং আছে।

তা হলে মঞ্জু হেনাকে নিয়ে বর্ডারে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাটা পলাশের নয়। বরুণও ওদের নিয়ে যাবার জন্য খুব আগ্রহী নয়, হেনা-মঞ্জুই জোর করেছিল। মঞ্জু-হেনা এখনও যুদ্ধের গুরুত্বটা বোঝে না। পাকিস্তানী বাহিনী নতুন করে শক্তিশালী হয়েছে, মুক্তি বাহিনীর দখলীকৃত এলাকাগুলো পায়

সবই ছিনিয়ে নিয়েছে আবার।

তিনি বরুণকে বললেন, তুমি বর্ডারে জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছো, খুব সাবধানে, আমার অনুরোধ, বেশি ঝুঁকি নিও না।

বরুণ হেসে বললো, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যদি একটা কাঠবিড়ালীর মতনও সামান্য একটু সাহায্য করতে পারি, তাতেই আমার জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে! আপনি চা খেয়েছেন...মামুন সাহেব? আনাবো?

মামুন উত্তর দেবার আগেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন প্রতাপ। মাথার চুল এবং জামা একেবারে চুপচুপে ভেজা, হাতে একটা বড় সন্দেশের বাক্স। প্রত্যেকদিনই প্রতাপ মিষ্টি কিংবা গাদাখানেক কমলালেবু আপেল আনবেনই, কোনো দরকার নেই আনবার, বারণ করলেও শুনবেন না প্রতাপ। মালখানগরের মজুমদাররা বোধহয় কখনো খালি হাতে হাসপাতালে যায় না।

মামুনের আহারের রুচি ফেরেনি, মিষ্টি কিংবা ফলটল কিছুই তাঁর খেতে ইচ্ছে করে না। ওসব ভিজিটাররাই খায়। বরুণ বলে উঠলো, এই তো হাকিম সাহেব সন্দেশ এনেছেন। দ্যান দ্যান, আমার বেশ ক্ষুধা পাইছে।

প্রতাপের হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে বরুণ সবাইকে ভাগ করে দিতে লাগলো, মামুনকেও একটা সন্দেশ জোর করে খাইয়ে ছাড়লো। মামুন ভাবলেন, এই হাসিখুশি দিলখোলা ছেলেটির হঠাৎ কোন বিপদ হবে না তো? এদিককার দু'জন সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার জোর করে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছিল, তাদের নাকি আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

মিষ্টি খাওয়ার পর বরুণ কী করে যেন সকলের জন্যই চায়ের ব্যবস্থা করে ফেললো।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, প্রতাপ দিদি কেমন আছেন?

প্রতাপ সামান্য মাথা নেড়ে বললেন, ভালো।

অর্থাৎ সুপ্রীতি ভালো নেই, কিন্তু সে বিষয়ে প্রতাপ মামুনকে বিশেষ কিছু জানাতে চান না। প্রতাপ রোজ একবার করে না এলে মামুন ক্ষুণ্ণ হন, অথচ তিনি জানেন, সুপ্রীতির কাছেও যেতে হয় প্রতাপকে, প্রতিদিন দুটি হাসপাতালে যাওয়া-আসা করা কি সোজা কথা। প্রতাপের সারা মুখে ক্লান্তি ময়লা ছাপ। বৃষ্টিভেজার জন্যও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

সমস্ত রাস্তায় জল জমেছে, ট্রাফিক বিপর্যস্ত, বাড়ি ফিরতে কত সময় লাগবে কে জানে! প্রতাপ উঠে পড়লেন একটু আগেই। মঞ্জুরা গেল মেঘ ঘন্টা বাজার পর। মামুন ওদেরও তাড়া দিচ্ছিলেন ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত থেকে গেল ওরা।

হঠাৎ ক্যাবিনটা একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতন নির্জন হয়ে গেল। এক হিসেবে জেনারাল ওয়ার্ড তবু ভালো, পাশা পাশি অন্য মানুষ দেখা যায়, নার্স-ডাক্তারদের চলাফেরা দেখা যায়। এরপর একজন খাবার দিতে আসবে, এখানকার বড় ডাক্তার রাউন্ডে আসবেন রাত সাড়ে আটটার পর। বৃষ্টির মধ্যে কি তিনি আসতে পারবেন আজ? হেনা-মঞ্জুরা চলে যাবার পর প্রত্যেকদিনই শরীরটা দুর্বল লাগে।

হেনা একবার বলে ফেলছিল যে আজ সন্ধেবেলা মহাজাতি সদনে বড় একটা অনুষ্ঠান আছে। পলাশ তাড়াতাড়ি সেটা চাপা দিয়ে বলেছিল, এত বৃষ্টিতে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে!

সেইজন্যই মঞ্জু অত সেজেছে আজ। হাসপাতালে মামুনকে দেখার জন্য নয়, এখান থেকে বেরিয়ে মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠান শুনতে যাবার প্ল্যান ছিল!

মামুন নিজের বুকে হাত বুলোতে লাগলেন। এত উত্তেজনা ভালো না। পলাশকে তিনি ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন, তবু তার ওপর আবার এত রাগ হচ্ছে কেন? তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে গেলে তাতে দোষের কী আছে, যৌবনের ধর্মই তো এই, তারা অতীত কিংবা ভবিষৎ নিয়ে বেশি চিন্তা করে বর্তমানটাকে অবহেলা করে না বুড়োদের মতন। গাড়ি-ঘোড়া না পেলে ওরা হেঁটেই যাওয়ার চেষ্টা করবে মহাজাতি সদনের দিকে। রাস্তায় এক হাঁটু পানির মধ্যেও ওরা লাফালাফি করবে, মঞ্জু ধরেছে পলাশের হাত, কৌতুক-হাস্যে দুলে দুলে উঠছে, মামুন যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন দৃশ্যটা!

মামুন নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলেন, মনটাকে আবার স্ববশে আনলেন। বুকটা ঘষে ঘষে তিনি যেন তাড়িয়ে দিতে চাইলেন রাগ-দ্বেষ। ওদের পক্ষে এইটাই তো স্বাভাবিক। ওরা হাঁটুক মহাজাতি সদনের দিকে, আজ কে জানে, হেনা-মঞ্জুরা এখন যে-কটা দিন পারে আনন্দ করে নিক!

॥ ৩৯ ॥

এক একটা হঠাৎ এমনভাবে মাথায় গেঁথে যায় যে কিছুতেই আর যেতে চায় না। গানের কলিগুলোর অর্থটাও সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকে না, সুরের বিশেষত্বও এমন কিছু নয়, তবু চলতে ফিরতে যখন সেই গান গুঞ্জরণ তোলে।

লরেন্স লোয়েল লেকচার হল থেকে বেরিয়ে অতীন হাঁটতে লাগলো অন্যমনস্কভাবে। শীতও নেই, চমৎকার বসন্তকালের মতন হাওয়া। জিনস আর ইজিপশিয়ান কটনের একটা শার্ট পরে আছে অতীন, এই শার্টটা কয়েকদিন আগে শর্মিলা তাকে উপহার দিয়েছে, ভারি মোলায়েম। চতুর্দিকে অজস্র ফুল, অনেক গাছের পাতায় সোনালি রং ধরেছে। হাঁটতে হাঁটতে অতীন আপন মনে গুন গুন করে গাইছে, হেথায় তোমায় মানাইছে না গো.. ইক্কেবারে মানাইছে না গো! তু লাল পাহাড়ীর দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা... এরই মধ্যে পথ-চলতি কেউ কেউ অতীনের দিকে চেয়ে বলছে, হাই! অতীনও যন্ত্রের মতন উত্তর দিয়ে যাচ্ছে, হাই

সায়েন্স সেন্টারের পাশ দিয়ে অতীন এগোলো হার্ভার্ড ইয়ার্ডের দিকে। অ্যাপলটন চ্যাপেলের পাশে একটা ছোট্ট দোকানে নানারকম আইসক্রিম পাওয়া যায়। অতীন বেছে বেছে দু' প্যাকেট আইসক্রিম কিনলো, কাগজের প্যাকেটে আইসক্রিম এমনই ফ্রোজেন অবস্থায় থাকে যে নিয়ে যেতে যেতে গলে যাবার সম্ভাবনা নেই। দোকানের কাউন্টারে পয়সা দিতে দিতে ও অতীন মনে মনে গাইছে, হেথায় তোমায় মানাইছে না, গো ইক্কেবারে মানাইছে না গো...। এই গানটার বাকি কথাগুলো অতীন জানে না, তার জানার দরকারও নেই।

তারপর সে বাসে চেপে পৌঁছে গেল শর্মিলার বাড়িতে।

সদর দরজা বন্ধ। এইসব বাড়িতে বাইরে লোক হুট করে ভেতরে ঢুকতে পারে না। শর্মিলার নাম লেখা লেটার বক্সের ওপর বোতামটা টিপতেই শর্মিলার শোনা গেল, হু ইজ ইট?

অতীন বললো তোমার যম দা বস্টন স্ট্র্যাংগলার!

তিনতলা থেকেই শর্মিলা একটা বোতাম টিপে খুলে দিল দরজা। অতীন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। এখন বিকেল সাড়ে ছ'টা, সন্ধে সুমি এখন অনেকটা মেনে নিয়েছে অতীনকে, তবু অতীন ওকে এড়িয়ে চলে।

এ বাড়ির লিফটটা আদ্যিকালের, মাঝে মাঝে হঠাৎ ঝনঝন শব্দ করে কেঁপে ওঠে। বয়েস হয়েছে, বিশ্রাম চাইছে। কিন্তু একেবারে অকেজো না হলে লিফটটাকে বদলানো হবে না। এইসব অ্যান্টিক জিনিসের আলাদা মর্যাদা আছে। লিফটের দরজাটা বন্ধ করতেই একটা সুন্দর পারফিউমের গন্ধ। বন্ধ লিফ্টের মধ্যে অতীন বেশ জোরে জোরে গেয়ে উঠলো, হেথায় তোমায় মানাইছে না গো।

শর্মিলার ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করা। অতীন ভেতরে এসে শর্মিলাকে দেখতে পেল না। শব্দ পেয়ে পাশের বাথরুম থেকে শর্মিলা বললো, একটু বসো প্লীজ, আমি টপ করে স্নানটা সেরে নিই।

এক ঘরের অ্যাপার্টমেন্ট, সঙ্গে ছোট রান্নাঘর আর বাথরুম। অতীনের চেয়ে শর্মিলাদের আইসক্রিমের বাক্স দুটো ঢুকিয়ে রাখলো। একটা বড় কোকাকোলার বোতল থেকে খানিকটা চুমুক দিয়ে রেখে দিল আবার। সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমের দরজার কাছে এসে বললো, তুমি তাড়াতাড়ি করো, তারপর আমিও স্নান করবো।

পাশাপাশি দুটো খাট, অতীন কক্ষনো সুমির খাটে বসে না। এই খাটদুটো দেখলে অতীনের কলকাতার বাড়ির ফুলদির ঘরটা মনে পড়ে। ফুলদি আর মুন্নি এইরকম পাশাপাশি খাটে শুত। অতীনের নিজের ঘরটায় এখন কে থাকে টুনটুনি?

দেয়ালে ঝোলানো টেলিফোনটা বেজে উঠলো। অতীন ধরতে পারবে না। সে যে এখন শর্মিলার ঘরে এসে বসে আছে, তা কারুকে জানানো চলে না। শর্মিলা কি অবস্থায় আছে। এখন কি বেরুতে পারবে? এখানে অনেকে বাথরুমেও একটা টেলিফোন রাখে, শর্মিলার অবশ্য নেই। টিভি-টা খোলা শব্দ নেই, মহাকাশের দৃশ্য নিয়ে বোধহয় কোনো সিনেমা চলছে।

একটা হাউস-কোট গায়ে চাপিয়ে ভিজে চুল নিয়ে বেরিয়ে এলো শর্মিলা। রিসিভারটা হুক থেকে নামিয়ে দু' একটা কথা শুনেই সে তাতে হাত চাপা দিয়ে ফিস ফিস করে বললো, মার্থা! ওকে এখানে আসতে বলবো?

অতীন মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। মাথার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে শর্মিলার। মাঝে

মাঝে মাথাকে এ ঘরে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হয়, মার্থার বাড়িতেও ওরা দু' জনে একসঙ্গে যায়। মার্থার কোনো ছেলে বন্ধু নেই বলে শর্মিলার খুব দুশ্চিন্তা, সে প্রায়ই তার চেনাশুনো ছেলেদের সঙ্গে মাথার আলাপ করিয়ে দেয়।

ফোনটা রেখে শর্মিলা বললো ওকে শনিবার আসতে বলেছি। তুমি স্নান করবে বললে, যাও চলে যাও। আমার হয়ে গেছে। একটা গোলাপি রঙের তোয়ালে আছে, সেটা ব্যবহার করো।

শার্টটা খুলে ফেলে অতীন বাথরুমের দরজায় কছে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি। একজন সদ্য স্নান সেরে বেরিয়েছে, আর একজন স্নান করতে যাচ্ছে, এই অবস্থায় কি চুমু খাওয়া চলে?

ঠোঁটে হাসি টিপে শর্মিলা মাথা নাড়িয়ে বললো না, মোটেই চলে না!

অতীন প্রায় দৌড়ে এসে শর্মিলাকে জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি কিছু জানো না। যারা হিসেব করে চুমু খায়, তার অতি বদ লোক হয়।

এরপর অতীনের স্নান করতে যাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে যাচ্ছিল, শর্মিলা জোর করে তাকে ঠেলে পাঠালো। বাথরুমের দরজা বন্ধ করেন অতীন চিৎকার করে গাইতে লাগলো, হেথায় তোমায় মানাইছে না গো, ইক্কেবারে মানাইছে না গো!

শর্মিলা দ্রুত চুল আঁচড়ে নিল, পোশাক বদলালো। এত ছোট অ্যাপার্টমেন্টে এই একটা প্রধান অসুবিধে, ঘরে অন্য কেউ থাকলে জামা-কাপড় পাল্টানো যায় না। শর্মিলা অন্য কোনো মেয়ের সামনে ও এসব পারে না, এমনকি অতীন থাকলেও সে লজ্জা পায়। অতীনের বাড়িতে জলের একটু অসুবিধে আছে, তাই সে এখানে এলেই স্নান করে নেয়।

বাথরুম থেকে প্যান্টের বেল্ট আটকাতে আটকাতে বেরিয়ে এসে অতীন দেখলো শর্মিলা অতি মনোযোগ দিয়ে টিভি-র দিকে চেয়ে আছে। তার দু' চোখে বিস্ময়।

অতীন বললো, কী ব্যাপার এখন তুমি সিনেমা দেখছো?

শর্মিলা বললো সিনেমা নয়। এসো দেখবে এসো, মানুষ চাঁদে গাড়ি চালাচ্ছে। লাইভ দেখাচ্ছে।

অতীন টিভি-র সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিয়ে শর্মিলার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বললো, স্কট আর আরউইন সত্যি একটা গাড়ি চালাচ্ছে! আমি আগে দেখে ভেবেছিলাম সায়েন্স ফিকশান।

–কী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! পাশে ঐ যে পাহাড় মতন, ওর নাম মাউন্ট হেডলি! চাঁদের পাহাড়!

-এটা অ্যাপিনাইন এরিয়া। একটা জিনিস লক্ষ করছো, গাড়িটা লাফিয়ে উঠছে না, চাঁদের গ্র্যাভিটি

শর্মিলা পাশ ফিরে তীব্র আবেগময় মুখে বললো, বাবলু দ্যাখো, আমার সারা শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে দ্যাখো! মানুষের এই সাংঘাতিক কীর্তি, আজ সারা পৃথিবীতে একটা উৎসব হওয়া উচিত ছিল না, মানুষ আমাদেরই মতন মানুষ, চাঁদে নেমে এরকম একটা কাণ্ড করেছে এত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট, জানো, খানিকটা আগে টিভি -তে দেখাচ্ছিল ফুটবল খেলার মাঠে কী ভিড়! আজ মুভি হাউজ থিয়েটার, কনসার্ট হলেও লোক যাবে, কত লোক এখন বসে বসে খাচ্ছে, এত বড় একটা ব্যাপার গ্রাহ্যই করছে না।

হঠাৎ উঠে গিয়ে শর্মিলা জানলার পর্দা সরিয়ে আকাশের চাঁদ দেখার চেষ্টা করলো।

অতীন অবশ্য শর্মিলার মতন অতটা উত্তেজিত বোধ করছে না। এর আগেই নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে পা দিয়েছেন এরপর আমেরিকানরা চাঁদে গাড়ি পাঠাবে, বাড়ি বানাবে এগুলো যেন স্বতঃসিদ্ধ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির এক একটা স্তর। অর্থাৎ সে এই চন্দ্রাভিযানের রোমান্টিক দিকটা না ভেবে বাস্তব দিকটাই দেখছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য চাঁদে শুধু রকেট পাঠাবার বদলে প্রচুর ঝুঁকি ও অর্থব্যয় করে মানুষ পাঠানো, সোভিয়েত ইউনিয়ানের সঙ্গে টক্কর দিয়ে খানিকটা আমেরিকান হুজুগেপনাও মনে হয় তার!

শর্মিলার কাঁধে হাত দিয়ে সেও জানলার পাশে দাঁড়ালো। এখান থেকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। বাইরে এখনও দিনের আলো।

অতীন বললো, চলো আমরা একটু পরে বেরিয়ে একটা পার্কে গিয়ে বসি। তার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

শর্মিলা বললো, ওরা চাঁদে ঘুরছে আর সঙ্গে সঙ্গে টিভি-তে সেই ছবি চলে আসছে, এটাও একটা

অদ্ভুত কাণ্ড না?

অতীন বললো, নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে পা দিয়েই আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিল তোমার মনে আছে? তখন আরও বেশি অবাক হয়েছিলাম।

টিভি-তে চাঁদের দৃশ্য মুছে গিয়ে শুরু হলো বিজ্ঞাপন। আমেরিকানরা চাঁদে মানুষ পাঠাক বা যাই-ই করুক, সাবান ও তেল বিক্রি করা তার চেয়ে কম জরুরি নয়।

শর্মিলা বললো, চলো, আমরা চট করে খানিকটা ডিনার খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পরি। আজ ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

কিছু কিছু খাবার রান্না করাই ছিল, নুডুলসে সঙ্গে কর্ন বিফ, মাইওনেজ স্যালাড। সেগুলো প্লেটে সাজাতে সাজাতে শর্মিলা জিজ্ঞেস করলো, এই আমন্ড দেওয়া আইসক্রিম তুমি এনেছো? তোমার ঠিক মনে আছে তো! এটা আমার খুব ফেভারিট!

অতীন বললো, আমায় আইসক্রিম দিও না, তোমার আর সুমির জন্য এনেছি।

–তুমি খাবে না কেন? আরো অনেক আছে, সুমির জন্যও থাকবে!

–আমি আইসক্রিম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ভেবে দেখলাম, আইসক্রিম খাওয়াটা মেয়েদেরই মানায়।

–মানায় আবার কী! যার ভালো লাগে! একটু খাও প্লীজ!

–আমাকে আলাদা দিও না, সত্যি আমার আর আইসক্রিম ভালো লাগে না, তোমার থেকে একটুখানি টেস্ট করবো।

–বাবলু, তুমি কিন্তু রোগা হয়ে যাচ্ছো, তোমার ডায়েটিং করার দরকার নেই।

খাবার টেবিলে বসার বদলে দু'জনে প্লেট হাতে ফিরে এলো বিছানায়। শর্মিলা টিভি-তে আরও চন্দ্র-দৃশ্য দেখতে চায়। পাশা পাশি গা ঠেকিয়ে বসলো দু'জনে। শর্মিলার সারা মুখে একটা ভালো-লাগার আবেশ ছড়ানো।

একটু পরে অতীন বললো,পরশু আমাকে একবার নিউ ইয়র্কে যেতে হবে।

শার্মিলা বললো, কেন? সিদ্ধার্থ বুঝি কোনো পার্টি দিচ্ছে?

–না আমার বাবার এক ঘনিষ্ঠ, বন্ধুর মেয়ে আসছে, তাকে রিসিভ করতে হবে এয়ারপোর্টে।

–বেড়াতে আসছে, না পড়তে-টড়তে?

–পড়তে। মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে।

–ভার্জিনিয়া মেরিল্যান্ড? নিউ ইর্য়ক থেকে সোজা সেখানে চলে যাবে? যাবার পথে যদি বস্টন-কেমব্রিজ ঘুরে যেতে চায়, তা হলে আমাদের এখানে থাকতে পারে। দুটো খাট জোড়া দিলে তিনজন শোওয়ার কোনো অসুবিধে হয় না।

–ঠিক আছে, তাকে বলে দেখবো!

–সোমবার ছুটি। লং উইক এন্ড। তোমার সঙ্গে আমি ও তো নিউ ইয়র্ক ঘুরে আসতে পারি?

শর্মিলার মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু দ্বিধা করে অতীন বললো, তুমি যাবে? হ্যাঁ, চলো!

অতীনের কণ্ঠস্বরের সেই একটু খানি কাঁপুনিও শর্মিলা ঠিক বুঝে ফেললো। সে সরলভাবে হাসতে হাসতে বললো, কী ব্যাপার বলো তো, তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও না? সিদ্ধার্থের সঙ্গে অন্য কিছু প্ল্যান করেছো বুঝি?

অতীন বললো , না, সেসব কিছু নেই। তুমি চলো তুমি গেলে ভালোই হবে!

–মেয়েটির নাম কী? কী পড়তে আসছে?

–অলি চৌধুরী। ইংলিশের ছাত্রী ছিল, এখানে অন্য কিছু পড়বে কি না, জানি না?

–বাঃ বেশ সুন্দর নামতো। অলি! আগে এরকম নাম শুনিনি। ভালোই হবে, মেরিল্যান্ড তো বেশি দূর নয়, আমাদের এখানে মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করতে পারবে!

একটু পরে বাইরে বেরিয়ে একটা পার্কের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শর্মিলার হঠাৎ মনে পড়লো, এই সপ্তাহান্তের ছুটিতে ওয়াশিংটন ডি সি থেকে তার সময় শর্মিলার বাইরে যাওয়াটা ভালো দেখায় না।

অতীনই শর্মিলাকে জোর করতে লাগালো নিউ ইয়র্ক যাবার জন্য। আন্তরিকভাবে। তার মনে হচ্ছে, শর্মিলা তার মামাকে তার সঙ্গে থাকলে ভালোই হবে, প্রথমেই সে একা অলির মুখোমুখি

দাঁড়াতে চায় না।

কিন্তু শর্মিলা তার মামাকে বেশ ভয় পায়। তিনি মস্ত বড় পন্ডিত এবং খুবই রাসভারি মানুষ। দেশে থাকতে তিনি কট্টর কংগ্রেসী ছিলেন।

পরিষ্কার আকাশে এখন চাঁদ দেখা যাচ্ছে। পুর্ণিমার কাছাকাছি গোল চাঁদ। সে দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে শর্মিলা অতীনের একটা হাত নিজের গালে ছুঁইয়ে বললো, আজ আমার কী দারুণ ভালো লাগছে বাবুল।

তারপর অনেক্ষন দু'জনে কোনো কথা বললো না।

শুক্রবার রাত্র দশটার বাস ধরলো অতীন। সাত ঘন্টার জার্নি, ভোরের আগেই পৌঁছে যাবে। যাবার আগেও সে শর্মিলাকে ফোন করে আর একবার অনুরোধ জানিয়েছিল তার সঙ্গে নিউ ইয়র্ক যাবার জন্য, কিন্তু শর্মিলার উপায় নেই।

সিগারেট টানার সুবিধের জন্য গ্রে হাইন্ড বাসের একবারে পেছন দিকে জনলার ধারে বসেছে বাবলু। ছাড়ার একটু পরেই ভেতরের আলোয় নিবিয়ে দেওয়া হলো। নাইট জার্নিতে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে নেয়। মসৃণ রাস্তা একটুও ঝাঁকুনি নেই। এ দেশের লোকেরা কেউ চলন্ত বাসে চেঁচিয়ে গল্প করে না। কথাই বলে না প্রায়। শুধু মাঝখানের দু' পাশের দুটি সীটে দু' জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা ফিস ফিস করে কথা বলছে, খিল খিল করে হাসছে আর চুমু খাচ্ছে। প্রেমিক -প্রেমিকাদের সাত খুন মাপ, ওরা আরও জোরে শব্দ করলেও বিরক্তি প্রকাশ করবে না কেউ।

বাবুলর পাশেই বসে আছে দুটি কালো যুবক। তাদের সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ শুঁকেই বোঝা গাচ্ছে, ওতে গাঁজে মেশানো আছে। ম্যারুয়ানা অর্থাৎ গাঁজা এখানে সাংঘাতিক বেআইনী, পুলিশ এবার হাতে নাতে ধরতে পারলে পাঁচ সাত বছর জেল দিয়ে দেবে, তবু এরা বেপরোয়া।

যুবক দুটি অতীনের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করছিস বাস চলতে আরম্ভ করার আগে থেকেই। অতীন উৎসাহ দেখায়নি, হুঁ-হুঁ করে এড়িয়ে গেছে। অতীন জানে, এ দেশের কালো মানুষ, আগে যাদের বলা হত নিগ্রো, তাদের অভিযোগ আছে যে ভারতীয়রা তাদের সঙ্গে বিশেষ মেশে না, সাদাদের তোষামোদ করতেই ভালোবাসে। অভিযোগটা সঠিক হলেও এখন দু' জন গাঁজাখোর কালো যুবকের সঙ্গে যে অতীনকে বন্ধুত্ব করতেই হবে তার কোনো মানে নেই। তার তো এই সময় কারুর সঙ্গে কথা না বলারও ইচ্ছে হতে পারে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অতীন বাইরে তাকিয়ে আছে। ধোঁয়া রঙের কাচ বাসের ভেতরে আলো জ্বললে বাইরের কিছু দেখা যায় না। এখন দেখা যাচ্ছে শুধু জ্যোৎস্নায় ধয়ে যাওয়া প্রান্তর। মাইলের পর মাইল একটাও মানুষ কিংবা বাড়ি-ঘর চোখে পড়ে না। সাধারণ কথায় লোকে বলে, যন্ত্রসভ্যতার দেশ আমেরিকা। কিন্তু রাত্তিরবেলা এই নিঝুম প্রান্তরগুলি দেখলে মনে হয় যেন আদিম পৃথিবী। কোথাও কোথাও গাছপালাও প্রচুর।

রাস্তাটা কোথাও বাঁক নিলে দেখা যায় সামনে অনেক দূর পর্যন্ত লাল আলোর মিছিল। সামনের গাড়িগুলোর ব্যাক লাইট, আলোর মিছিলের মতনই মনে হয়। দিনের বেলার চেয়েও রাত্রে এইসব হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি যেন বেশি চলে। এ রাস্তায় পাশাপাশি পাঁচ ছ'খানা গাড়ি অনায়াসে এক দিকে যেতে পারে। এ দেশের রাস্তাগুলো নিখুঁত শিল্পের মতন।

অতীনের চোখ ঘুমের নাম-গন্ধ নেই। বাইরে দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক এক সময় তার মনে হচ্ছে, বাসের গতির সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে একজন কেউ যেন ছুটছে রাস্তা দিয়ে। অসম্ভব ব্যাপার। গ্রে হাইন্ড বাস ঠিক ঘন্টায় পঞ্চান্ন মাইল গতিতে যায়। চোখের ভুল তো অবশ্যই, অতীন সজাগ হলে আর মূর্তিটাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরে আসছে। বাসটার কোনো একটা অংশের ছায়া রাস্তায় পড়লে এরকম দেখাতে পারে। ছায়া নয়, মানুষেরই মতন। আর ও একটু পরে অতীন চিনতে পারলো, সেই মানুষটা আসলে সে নিজে। ছাই রঙের প্যান্টের ওপর সাদা ফুল শার্ট পরা, হাতা দুটো গোটানো। জলপাইগুড়িতে মাঠের মধ্যে সেই মুর্তিমান উপদ্রবটিকে গুলি করার পর কি অতীন এত জোরে ছুটেছিল?

সে-দিন ছোটার সময় অতীন মনে মনে শুধু একটাই কথা বলছিল বার বার.কেউ তাকে ধরতে পারবে না! কেউ তাকে ধরতে পারবে না! কিন্তু পুলিস তাকে ঠিক ধরলো জামসেদপুরে এসে!

কৌশিক তাকে জামসেদ পুরে নিয়ে নিয়ে যাবার বদলে যদি হাজারিবাগ কিংবা ডাল্টনগঞ্জে নিয়ে

যেত, তা হলে হয়তো সে ধরা পড়তো না। মানিকদা, তপন যেমন ধরা পড়েনি। তা হলে অতীনের জীবনটা অন্যরকম হতে পারতো। সে বিপ্লবের কাজে এগিয়ে যেতে পারতো অনেকখানি, এই ধনতন্ত্রের দেশে তাকে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হতো না! জামসেদপুরে না গেলে শর্মিলার সঙ্গেও দেখা হতো না তার।

না, না, শর্মিলার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হওয়ার জন্য সে একটুও অনুতপ্ত নয়! শর্মিলাার মতন এমন সরল অথচ সাহসী এবং খাঁটি মেয়ের বন্ধুত্ব পাওয়া দুলর্ভ ভাগ্যের ব্যাপার। ঠিক সময়ে শর্মিলার কাছে আশ্রয় না পেলে তার হয়তো মাথায় গোলমাল হয়ে যেতে পারতো! এরকম কারুর কারুর হয়েছে। নিউ জার্সিতে একটি ছেলেকে দেখেছিল অতীন পাগলাটে পাগলাটে ভাব, সে নাকি যাদপুরের গোপাল সেনকে খুন করার সময় সেই দলে ছিল! নিজেকে সে আর জাস্টিফাই করতে পারছে না, তাই যুক্তিবোধটাই বিসর্জন দিচ্ছে। শর্মিলা অতীনকে বাঁচিয়েছে। এখানে এসেও প্রথম প্রথম ঠিক চাকরি না পেয়ে মদ খাওয়ার দারুণ ঝোঁক চেপে গিয়েছিল অতীনের, টাইম স্কোয়ারে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে বেলেল্লা করতেও তীব্র ইচ্ছে করতো এক এক সময় শর্মিলা এসে না পড়লে সে হয়তো তলিয়ে যেতে পারতো।

শর্মিলাকে অলির কথা বলা হলো না এখনো। অলির নামটা শুধু বলেছে, আর কিছু না। ঠিক কী করে যে বলা যায়, সেটাই অতীনের মনে আসছে না। অতীন নিউ ইয়র্ক অলি নামে একটা মেয়েকে রিসিভ করতে যাচ্ছে শুনে শর্মিলা কী সুন্দর বললো, অলিকে কেমব্রিজে নিয়ে আসতে। মেয়েটার মনের মধ্যে একটুও মালিন্য নেই।

রাস্তার ছুটন্ত ছায়ামূর্তিটি এবারে জানলার কাচে টকটক শব্দ করলো। অতীন জিজ্ঞেস করলো, তুমিকে? কী চাও?

ছায়ামূর্তি বললো, আমি কলকাতার বাবলু। প্রতাপ মজুমদারের ছেলে। তুই অ্যামেরিকার অতীন, তুই আমাকে চিনতে পারছিস না? পুরোপুরি অ্যামেরিকান হয়ে গেছিস?

অতীন বললো কেন চিনতে পারবো না? আমি কি কিছু ভুলে গেছি নাকি?

বাবলু বললো, হ্যাঁ ভুলে গেছিস! কৌশিককে মনে আছে?

–নিশ্চয়ই মনে আছ। আমি একটু আগেই কৌশিকের কথা ভাবছিলাম।

–তুই কি খবর রাখিস যে কৌশিক মারা গেছে?

–অ্যাঁ? না, না, বাজে কথা অসম্ভব। অলি চিঠিতে জানিয়েছে যে কৌশিক ভালো আছে।

–অলি? কোন্ অলি? তোর বাবার এক বন্ধুর মেয়ে, সামান্য একটু চেনা,তাই না? অলি তোর নিজের কেউ না!

–শর্মিলাকে ঐভাবে বলেছি, পরে সব বলবো। কিছুই লুকোবো না। শর্মিলা আমার কাছে কিছু গোপন করে না, আমার ওপর ও দারুণ নির্ভর করে থাকে, আমি কি ওর সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে লুকোচুরি করতে পারি? তা হলে আমাদের সম্পর্কটা কোনোদিন খাঁটি হবে না। না, আমি শর্মিলাকে এক সময় বলবো, ঠিকই বলবো!

–আর অলিকে বুঝি কিছু বললি না? এয়ারপোর্টে অলিকে রিসিভ করে তারপর তাকে তাড়াতাড়ি মেরিল্যান্ড পাঠিয়ে দিবি, যাতে সে শর্মিলার কথা কিছু জানতে না পারে!

–ধ্যাৎ এইভাবে ক'দিন গোপন রাখা যাবে? অলিকেও বলবো শর্মিলার কথা। অলি আমার বন্ধু, সে বন্ধুই থাকবে। এ দেশে তার যা যা সাহায্য লাগে নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু আমি কি অলিকে কোনোদিন বিয়ে করার কথা বলেছি? সেরকম কোনো কথা হয়নি। ছেলেবেলার বন্ধুত্ব, সেটা থাকবে।

–সব কথা বুঝি মুখে বলতে হয়? অলির একজন গানের মাষ্টার, তারপর একজন ইংরিজির অধ্যাপক, এদের অলি ছাড়িয়ে দিয়েছিল শুধু তুই জোর করেছিলি বলে। আর সেই যে সেবার, মেমারি থেকে কৃষ্ণনগর যাবার সময়, ফেরি পেরিয়ে সন্ধেবেলা গঙ্গার ধারে একটু পরে চলন্ত রিকশায় তুই অলিকে কী বলেছিলি রে অতীন?

–বাবলু ওসব কথা রাখ। তুই সৌশিক সম্পর্কে কী বললি? স্বীকার কর ওটা বাজে কথা?

–অর্থাৎ তুই এখন অলির কথা মনে আনতে চাস না, তাই কৌশিকের কথা আবার টেনে আনছিস!

–গেট লস্ট, বাবলু!

অতীন উঠে দাঁড়ালো। তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। এই বাসের মধ্যে বাথরুম আছে, সে সেখানে

ঢুকে পড়লো, পাশের ছেলেদুটোর গাঁজার ধোঁয়াতেই কি তার মনে এইসব উল্টে পাল্টা চিন্তা আসছে? সে ঘাড়ে মাথায় জল দিল। শরীরটা সত্যি বেশ দুর্বল লাগছে। শরীরটা যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসছে, সবাঙ্গে একটা চোর চোর ভাব যেন সে একটা অন্যায় করে কোথাও পালাচ্ছে। পালাচ্ছে, না সে একটা৷ অন্যায় করতে যাচ্ছে?

ফিরে এসে আবার সে রাস্তায় সেই ছায়াটা দেখতে পেল। ছায়াটা তার সঙ্গে দৌড়তেই লাগালো সারাক্ষণ।

সিদ্ধার্থ বলেই দিয়েছিল, অত সকালে সে অতীনকে নিতে আসতে পারবে না। সিদ্ধার্থ এখন বাড়ি নিয়েছে ব্রুকলিন-এ, ঠিকানা খুঁজে যেতে অতীনের অসুবিধে নেই। তবে নিউ ইয়র্কের গ্রে হাউন্ড বাস স্টেমানটা এত বিশাল যে অতীন এখনো খানিকটা দিশেহারা হয়ে যায়। চব্বিশ ঘন্টাই মানুষের ভিড়ে এ জায়গাটা গমগম করে।

সারা রাত অতীনের ঘুম হয়নি, সে প্রথমেই বড় এক কাপ কালো শুধু একটি ব্যাগ।

সিদ্ধার্থদের বিল্ডিংএর সদর দরজা খুলে বেরুচ্ছিল একজন মধ্যয়ষ্ক লোক, অতীন সেই সুযোগ দরাজার পাল্লাটা ধরে ভেতরে ঢুকে গেল। এরকম নিয়ম নয় লোকটি শুধু একবার তাকালো অতীনের দিকে মুখে কিছু বলবো না। সম্ভবত এ বাড়িতে বেশ কিছু ভারতীয় বা পাকিস্তানী থাকে, অতীনের মতন চেহারা দেখতে লোকটি অভ্যস্ত।

লিফটে অতীন উঠে এলোপা আটতলায়। ঠিক পাশেই সিদ্ধার্থর অ্যাপার্টমেন্টর নম্বর। দু'তিনবার বেল দেবার পর দরজা খুললো একটি শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী। মাথা ভর্তি অবিন্যস্ত সোনালি চুল, ঠোঁটের লিপস্টিক মুছে গেছে, পরনে একটা সিল্কের ড্রেসিং গাউন। ঘুম-মাখা মুখেও আলতো হাসি সে বললো, হাই! ইউ মাস্ট বী টিনটিন ফ্রম কেমব্রিজ? কাম অন ইন। ইয়োর ফ্রেন্ড ইজ স্টিল অ্যাশ্লিপ।

বিস্ময় প্রকাশ করার কোনো নিয়ম নেই। সিদ্ধার্থ অতীনকে ঘুণাক্ষরেও জানায়নি যে সে একটি সাদা মেয়ের সঙ্গে লিভিং টুগেদার করছে। কিংবা এই মেয়েটিকে কি এক রাত্তিরের জন্য এনেছে নাকি?

অতীনও হাই ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো। ভোরের দিকে ঠান্ডা হওয়া দিচ্ছে অতীনের কাছে কোনো গরম জামা নেই ঘরের ভেতরে এসে আরাম লাগলো তার।

মেয়েটি কফির জল চড়িয়ে দিয়ে এসে বললো, হোয়াই ডোন্চ ইউ সীট ডাউন, বী কমফর্টেবল!

যেন এ বাড়ির সে-ই গৃহিণী অতিথিকে অভ্যর্থনা করছে। সিদ্ধার্থর সঙ্গে এক অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করে ছিল অতীন বেশ কিছুদিন, এখন নিজেকে সত্যিই তার বাইরের লোক মনে হচ্ছে।

একটি বেশ রাগী রাগী বাঙালী মেয়ের সঙ্গে এক সময় খুব ভাব হয়েছিল সিদ্ধার্থর নীপা না কী যেন নাম, সে কোথায় গেল? অবশ্য সিদ্ধার্থ অতীনকে অনেকবার ঠাট্টা করে বলেছে, এ দেশে এসে এ দেশের কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশলি না, এখানকার সোসাইটি কত পারমিসিভ তা বুঝলি না, ট্যাকে করে একটা বাঙালী প্রেমিক নিয়ে এলি?

মেয়েটি বললো, টিনটিন, আই অ্যাম সুজান।

তারপর করমর্দনের বদলে সে তার গালটা এগিয়ে দিল। অতীন তার গালে ঠোঁট ছুইয়ে ঠোনা মারলো। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন সুজানের শরীরে ভাটাফুলের গন্ধ বলে মনে হয়।

বেডরুমের দরজাটা অর্ধেকটা খোলা, সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে সিদস্কার্থ। পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া । আগেকার দিন হলে অতীন সিদ্ধার্থর ঠ্যাং ধরে টেনে নামাতো বিছানা থেকে, কিন্তু অপরিচিতা শ্বেতাঙ্গিনীর সামনে সে আড়ষ্ট বোধ করছে।

অতীনের উল্টো দিকের সোফায় পা মুড়ে বসলো সুজান। তার উরুর কাছে উঠে গেল ড্রেসিং গাউন, বুকেরও অনেকটা দেখা যাচ্ছে,এ সব কিছুই না, সোজা তাকিয়ে কথা বলতে দোষ নেই, তবু অতীন ওয়াল পেপার দেখার ভঙ্গি করে [illegible] কে ডাকবে না?

সুজান বললো, কাল আমরা আড়াইটের সময় একটা পার্টি থেকে ফিরেছি। তোমার বন্ধু খুবই ক্লান্ত, ন'টার আগে জাগাতে বারণ করেছে, আমরা দু'জনে ততক্ষণ কফি খেতে খেতে গল্প করি না?

সকালে অন্তত চার পাঁচ কাপ কফি খাওয়া অ্যামেরিকানদের অভ্যেস। অতীন এক কাপের বেশি খায় না, তবু সে এখানে আর এক কাপ নিল। নিছক কথা চালাবার জন্যই সুজান বললো,- সিড বলছিল, তোমরা দু,জনে অনেক দিনের বন্ধু। তুমি নাকি খুব বড় স্কলারি, চি নচিন? হার্ভার্ডে রিসার্চ করো।

টিনটিন নামটাতে আপত্তি করে কোনো লাভ নেই। গতকাল রাত্রে সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই অনেকাবার অতীনের নামটা মুখস্ত করাবার চেষ্টা করেছে সুজানকে। এরা অতীন বলতে পারে না, সেই জন্যই টিনটিন, আর সিদ্ধার্থ হয়েছে সিড। সুজানকে সুজাতা বললে ওর কেমন লাগতো!

অতীন সুজান সম্পর্কে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলো না, সেটা ভালো দেখায় না। সে সুজানকেই একতরফা কথা বলতে দিল। এরই মধ্যে সুজান জানালো যে সে হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ খুব পছন্দ করে।

ন'টা বাজবার খানিক আগেই নিজে থেকে জিছানা থেকে উঠে এলোই সিদ্ধার্থ। সুজানকে হুকমের সুরে বললে, দাও দাও, আমার কফি দাও।

অতীনের সঙ্গে প্রথমে একটাও কথা না বলে সে আবার শোবার ঘরে গিয়ে হাতে করে একটা চাবি নিয়ে এলো সেটা অতীনের দিকে ছুঁড়ে দিলে বললো, এই নে। তুই ছ' তলায় ছ'শো বত্রিশ নম্বরে চলে যা। তোর জন্য আমি একটা ফাঁকা অ্যাপাট্যমেন্টের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

অতীন চাবিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সিদ্ধার্থ শ্লোম্ম জড়ানো গলায় বললো, তুই দুপুরে ঘুমোবি তো? আমিও আর একবার ঘুমিয়ে নেবো। সুজান লাঞ্চ তৈরি করে তোকে ডাকবো। ঐ অ্যাপার্টমেন্টটা একজন ইস্ট পাকিস্তানের ছেলের, সে কলকাতায় চলে গেছে, বাংলাদেশ নিয়ে যুদ্ধ করবে, চাবিটা দিয়ে গেছে আমাকে। দেশ থেকে তোর যে মেয়ে বন্ধু আসছে, তার সঙ্গে তুই ওখানে কয়েকদিন থেকে যেতেও পারিস সুজান তোকে অ্যাপার্টমেন্টটা দেখিয়ে দিয়ে আসবে? যদি কিছু গুছিয়ে টুছিয়ে দিতে হয় ডার্লিং ইউ প্লীজ।

অতীন শুকনো গলায়, নো থ্যাঙ্কস। আই উইল ম্যানেজ।

নিচে এসে অতীন ভাবলো, বন্ধুদের ওপর যখন-তখন রাগ করার কোনো মানে হয় না। সিদ্ধার্থ তার সঙ্গে ভালো করে কথা না বলে প্রায় ঠেলেই যেন অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিল। সিদ্ধার্থটা এইরকমই। হয়তো সুজাতন বিষয়ে এক্ষুনি সে কিছু আলোচনা করতে চায় না।

ইস্ট পাকিস্তানী ছেলেটির ঘরে প্রচুর বই। অধিকাংশই বাংলা। এত বাংলা বই একসঙ্গে অতীন বহুদিন দেখেনি। অনেক বাংলা গানের রেকর্ডও রয়েছে। ঘরের মাঝখানে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো অতীন। এ দেশে এটা খুবই স্বাভিক, কেউ বাইরে গেলে তার অ্যাপার্টমেন্টটা চেনাশুনা কারুকে ব্যবহার করতে দিয়ে যায়। কিন্তু অতীন আগে কখনো এরকমভাবে থাকেনি। তার অস্বস্তি লাগছে। কোনো জিনিস হারিয়ে-টারিয়ে গেলে বা ভেঙে গেলে কে দায়ী হবে? সিদ্ধার্থটা সুজানকে এই ঘরে রাখতে পারতো না?

একটা টেলিফোন করা দরকার। শর্মিলা বারবার বলে দিয়েছে পৌছেই একটা খবর দিতে। সিদ্ধার্থর ঘর থেকে কি ফোন করা যায়? পয়সাটা দেওয়া যাবে কী করে? বাইরে বেরিয়ে রাস্তা থেকে টেলিফোন করতে হবে? না, এ ঘর থেকেও কালেক্ট কল করা যেতে পারে। এরকম তো হয়ই, পকেটে খুচরো পয়সা না থাকলে লোকে রাস্তা থেকেও কালেক্ট কল করে।

শর্মিলাই ফোন ধরলো! অতীন কিছু বলার আগই শর্মিলা খুশীর উত্তেজনার সঙ্গে বললো, এই জানো, কী হয়েছে? তুমি যাবার একটু পরেই বড়মামা ফোন জানালেন, ওঁর শরীর খারপ হয়েছে, উনি ট্রিপ ক্যানসেল করেছেন। তা হলে তো আমি নিউ ইয়র্ক ঘুরে আসতেই পারি ইস, তোমার সঙ্গেই যেতে পারতুম, সারা রাত একসঙ্গে, কী ভালো লাগতো! আজ আসবো? এই ধরো এগারোটার বাসে? সুমি একলা থাকবে বলছে। বাবলু, আমি আসবে?

অতীন দু'তিন মুহুর্ত মাত্র দ্বিধা করলো, তারপর হেসে বললো, হ্যাঁ এসো! তুমি চলে এসো।

॥ ৪০ ॥

ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও কয়েকটি আর্ট গ্যালারি দু' তিনদিনে দেখে নিল অলি। তারপর বিশাখাকে নিয়ে সে এলো ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। দেশের খবরের কাগজ পড়ার জন্য তার মন ছটফট করছিল। দু'তিনটি বাংলা কগজে সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল, খবর মোটেই ভালো নয়, বন্যা শুরু হয়ে গেছে, মালদহ বিচ্ছিন্ন.... মানিকতলায় আবার একজন কনস্টেবল হত্যা, গত দেড় বছরে এই নিয়ে ৩৮ জন পুলিশ খুন হলো.... আসানসোল স্পেশাল জেলে এক সংঘর্ষে ন' জন নকশাল বন্দী নিহত.... বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত সত্তর লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছে....অলি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলো, কৌশিকদের

ধরা পড়ার কোনো খবর নেই। অলি কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

সেখান থেকে ওরা দু'জনে এলো ট্রাফালগার স্কোয়ারে। লন্ডন শহরে যে কত বাঙালী থাকে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেল এখানে এসে। আজ এখানে শুধু বাংলা কথা শোনা যাচ্ছে। চতুর্দিকে বাঙালী মুখ। বাংলাদেশের বিচারপতি আবু সয়ীদ চৌধুরী নেতৃত্বে আজ এখানে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। বিচারপতি আবু সয়ীদ চৌধুরী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বিশ্বদূত, তিনি নিপীড়িত, মুক্তিকামী পুর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের দাবির সমর্থনে দেশে দেশে প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন।

ট্রাফালগার স্কোয়ার সব সময় টুরিস্টদের বিড় লেগেই থাকে। আজ সেখানে প্রায় চার পাঁচ হাজার বাঙালী এসে জড়ো হয়েছে। প্রথমে এক শো তিরিশ জন ব্রিটিশ এম পি-র স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পাঠ করে শোনানো হলো, তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগার থেকে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করেছেন। তারপর বিভিন্ন বক্তা শোনাতে লাগালেন বাংলার গ্রামে গঞ্জে পাকিস্তানী সৈন্যদের অমানুষ অত্যাচারের কাহিনী। একজন প্রস্তাব তুললেন, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সকে পৃথিবীর সব দেশের বয়কট করা উচিত, কারণ তাদের যাত্রীবাহী বিমান বেআইনী ভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক বাহিনী বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ঢাকায়।

একজনের বক্তৃতার মাঝখানেই হঠাৎ একটা উল্লাসের কোলাহল শোনা গেল। এইমাত্র লন্ডনের পাকিস্তান হাই কমিশনের দ্বিতীয় সচিব বাহিনী মহিউদ্দিন আহমেদ পদত্যাগ করে এসে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত জানাতে এসেছেন। হাজার হাজার মানুষ চিংকার করে উঠলো, জয় বাংলা জয় বাংলা।

অলি বিশাখাকে জিজ্ঞেস করলো, মঞ্চে সভাপতির পেছনে ঐ যে দাঁড়িয়ে আছেন, উনি ডাক্তার আলম না?

অলি বিশাখা বললো, তাইতো মনে হচ্ছে। ইয়েস, দ্যাট্স হিম। তোমার দুলাভাই!

অলি বললো, তাহলে তুতুলদি নিশ্চয়ই একটু ভালো আছেন। উনি যখন মিটিং-এ এসেছেন....কাল যাবার আগে তুতুলদির সঙ্গে আর একবার দেখা-করে যেতে হবে।

বিশাখা বললো, অলি, আই মাস্ট সে, তোমার ঐ তুতুলদি ইজ আ ব্রেইভ উয়োম্যান!

অলি বললো, আমরা দেশে থাকতে কিন্তু তুতুলদিকে দেখেছি, দারুণ লাজুক, কারুর সঙ্গে ভালো করে কথাই বলতে পারতো না।

একটু থেমে অলি আবার বললো অনেকে ভাবে লাজুকরা বুঝি সব সময় খুব দুর্বল হয়। তা ঠিক না। কোনো কোনো সময়ে লাজুক মেয়েরাও সাঙ্ঘাতিক মনের জোর দেখাতে পারে। আমি ছোটবেলা থেকেই তুতুলদিকে খুব অ্যাডমায়ার করি।

ওরা পুরো মিটিং না শুনে আবার বেরিয়ে পড়লো। হঠাৎ আজ বেশ গরম পড়ে গেছে। আমেরিকার অল্পবয়েসী টুরিস্টরা গেঞ্জি পরে রাস্তায় ঘুরছে। লন্ডনে যে এরকম স্বল্পবাস মানুষ দেখা যেতে পারে, সে সর্ম্পকে অলির কোনো ধারণাই ছিল না। ইংরিজি সাহিত্যে সে ইংল্যান্ডের গরমের বর্ণনা পড়েনি।

টিউব স্টেশানের দিকে যেতে যেতে অলি বললো, এই ইংল্যান্ড ঘুরে গিয়ে এক সময় আমাদের দেশের লোকেরা কী রকম পাক্কা সাহেবের ভাব করতো! আজ সকালে দেখলুম, তোমাদের বাড়ির উল্টোদিকে একজন বুড়ো ইংরেজ খালি গায়ে বাগানে মাটি খুঁড়ছে। আগে আমার ধারণা ছিল, সমুদ্রের ধারে ছাড়া আর কোথাও সাহেবরা খালি গা হয় না।

পাঁচ-সাতটি ছেলে। অলি বিশাখার দিকে তাকালো, যেন সে বলতে চায়, এই কি বিখ্যাত ব্রিটিশ ভদ্রতার নমুনা?

বিশাখা বললো, বাঁদিকের রেলিং ধরে চলো। ট্রেন ধরার তাড়ায় এইসব টিন এজারদেব কোনো জ্ঞান থাকে না।

অলির স্বভাবে কোনো তিক্ততা নেই। একটু পরেই সে বললো, আমার কিন্তু লন্ডন শহরটা খুব ভালো লেগে গেছে। আমার কল্পনার সঙ্গে অনেকটাই মেলেনি যদিও তবু সব মিলিয়ে খুব লাইভ্‌লি।

–তা হলে, তুমি ইংলিশ লিটরেচার পড়তে আমেরিকা যাচ্ছো কেন? ইংল্যান্ডেই পড়তে পারতে।

–এখানে আমাকে কে স্কলারশীপ দেবে?

–অ্যামেরিকায় গেলে তোমার কালচার শক অনেক বেশি হবে। ওখানকার ক্যাম্পাসগুলো হিপিতে

ভরে গেছে। বিটনিকদের বল, তারপর হিপিরা এসে হোল ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে পোশাকের কনসেপ্ট, আর অনেকগুলো ভ্যালুজ-এ খুব জোর ধাক্কা দিয়েছে। নতুন স্লোগান উঠেছে। মেক লাভ, নট ওয়ার।

–সাউন্ডস্ গুড। আমেরিকানরা যুদ্ধ চায় না?

–ইয়াংগার জেনারেশন চায় না। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরোধিতা থেকেই তো হিপি মুভামেন্টের শুরু।

–তা হলে বাংলাদেশে যে এত অত্যাচার হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন তার প্রতিবাদ না করে পাকিস্তানের মিলিটারি রেজিমকেই সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে কেন?

–সেটা তো সরকারের ব্যাপার, স্টেট পাওয়ার। পেন্টাগন। বড় বড় আর্মস ম্যানুফ্যাচারদের চাপে আমেরিকান সরকার পৃথিবীতে সব সময়ই কোথাও না যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ফর দা ফার্স্ট টাইম অ্যামেরিকান ইয়ুথ এই সরকারি পলিসির বিরুদ্ধে গেছে। গায়ক বব ডিলান, কবি অ্যালেন গীনস্‌বার্গ এরা অনেকে ঘরে ঘুরে বাংলাদেশ ভিকটিমদের চাঁদা তুলছে।

রাত্তিরে অলির নেমন্তন্ন তার বান্ধবী চন্দনার বাড়িতে। চন্দনা খুব করে ধরেছে, তাকে যেতে হবেই। চন্দনারা থাকে রিডিং স্টেশানের কাছে, তারা স্টেশানে অপেক্ষা করবে অলির জন্য। বিশাখা অলিকে ট্রেনে তুলে দিল।

বিলেতের ট্রেনে কেউ কারুর সঙ্গে যেচে কথা বলে না। কম্পাটিমেন্টে চার পাঁচজন ভারতীয় নারীপুরুষ রয়েছে, তারাও চোখ পড়লে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। প্রায় সকলেরই হাতে একখানা করে বই কিংবা খবরেই কাগজ। সিনেমার এরকম পশ্চিমী ট্রেনের দৃশ্য অনেক দেখেছে অলি, কিন্তু পাশাপাশি বসে থাকলেও যে মানুষে এতখানি দুরত্ব হতে পারে তা সে এই প্রথম অনুভব করলো।

কম্পার্টমেন্টে যথেষ্ট ভিড়। ভিড়-এ নামবে অনেকেই। হঠাৎ যদি ট্রেন ছেড়ে দেয় এই ভয়ে অলি একটু ব্যস্তভাবেই নামতে গেল, তাতে সে একটা ঠ্যালাঠেলির মধ্যে পড়ে গেল। প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই সে অনুভব করলো তার হাতটা খালি। হ্যান্ডব্যাগ কোথায় গেল? ট্রেনে ফেলে এলো? না, ব্যাগটা সে সব সময় কোলের ওপর রেখেছিল, সেটা নিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছিল। তাহলে–

অলির মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। বিশাখার বাবা পথম দিনই সাবধান করে দিয়েছিলেন এখানকার ট্রেনে প্রায়ই পকেটমারি আর ছিনতাই হয়। এই প্রথম অলি বিশাখাকে বাদ দিয়ে একা ট্রেন জার্নি করলো। ভিড়ের মধ্যে কেউ তার ব্যাগটা টেনে নিয়ে গেছে!

হাত-ব্যাগের মধ্যে রয়েছে পাসপোর্ট, প্লেনের টিকিট, তিরিশ-বত্রিশ পাউন্ড ক্যাশ, দুশো ডলার ট্রাভলার্স চেক, জরুরি ঠিকানা লেখা একটা নোট বই, এক জোড়া সোনার দুল...। প্লেনের টিকিটটা সে আজ নিয়ে বেরিয়েছিল তার আমেরিকার ফ্লাইট কনফার্ম করার জন্য সে আর আমেরিকা যেতে পারবে না, বাবলুদা এয়ারপোর্ট নেই বলে তাকে পুলিশ ধরবে, তারপর অপমান করে তাকে দেশে ফেরত পাঠাবে...।

প্ল্যাটফর্ম প্রায় খালি হয়ে গেছে, চন্দনা আর তার স্বামী মনোজ এসে দেখলো অলি ট্রেন লাইনের দিকে স্থির ভাবে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখখানা রক্তশূন্য। চন্দনা তাকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিতে অলি খুব আস্তে বললো, আমার সব শেষ!

ব্যপারটা অবশ্য এত গুরুতর কিছু নয়। মনোজ সব শুনে বললো, ডুপ্লিকেট পাসপোর্টের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আবার ইউ এস ভিসা নিতে হবে। থানার ডায়েরি করলে টিকিটও পাওয়া যাবে, ট্রাভলার্স চেকের নম্বরগুলো আলাদা করে রেখেছেন তো? আর যা গেছে তা তো গেছেই–

প্রথমেই তারা অলিকে নিয়ে গেল থানায়। অফিসারটি সহানুভূতির সঙ্গে সব শুনে বললেন, এই লাইনটা একটা গ্যাং অপারেট করছে, প্রত্যেকদিনই একটু-দুটো কেস রিপোর্টেড হচ্ছে, এবার ওরা ধরা পড়ে যাবে! তারপর তিনি মনোজকে জিজ্ঞেস করলেন, স্টেশানের পুরুষদের টয়লেটটা একবার দেখে এসেছেন তো?

তক্ষুনি আবার ফিরে যাওয়া হলো স্টেশানে। অলি আর বউকে দাঁড় করিয়ে মনোজ ছুটে চলে গেল, ফিরে এলো হাসতে হাসেতে। অফিসারটি ঠিকই বলেছেন। ছিনতাইবাজরা ব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে যায় না, ভেতরের জিনিসগুলো বার করে ব্যাগটা ফেলে রেখে যায় কাছাকাছি কোনো টয়লেটে বা ট্র্যাশ ক্যানে। প্লেনের টিকিট আর পাসপোর্টটাও ওরা অপ্রয়োজনীয় বোধ রেখে গেছে। বাকি জিনিসগুলো আর পাবার আশা নেই। ট্রাভলার্স চেকের নম্বর লেখা কাগজটাও অলি আলাদা করে রাখেনি।

মাত্র আধঘন্টার জন্য অলির জীবনটা একবারে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার সে একটা বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এর আগে কোনোদিনই তার সেরকম কিছু জিনিস হারানি, প্রথম বিদেশে এসেই সে সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল! লজ্জায়-দুঃখে অভিমানে তার আত্মহত্যা করার কথাও মনে জেগেছিল সেই সময়ে। ঘটনা পরিবর্তনের দ্রুততায় সে দারুণ ক্লান্ত বোধ করলো।

প্রেসিডেন্ট কলেজে অলির সহপাঠিনী ছিল চন্দনা। উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে, পড়াশুনোতেও ব্রিলিয়ান্ট ছিল, গ্র্যাজুয়েট হবার আগেই বিয়ে করে চলে আসে এদেশে। অলি আর চন্দনাকে বাড়িতে নামিয়ে মনোজ চলে গেল ওদের আড়াই বছরের ছেলেকে কিছু দূরের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করে, তাই প্রত্যেকদিন দু'জন বেরুবার সময় শিশু সন্তানকে অন্যবাড়িতে রেখে যায়।

অলি লক্ষ করলো, চন্দনার মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ। সকাল সাড়ে সাতটায় বেরুতে হয় তাকে, সে কাজ করে একটা ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুলে। একদা ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবিনী ছাত্রী ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুলে কী কাজ করে তা আর জিজ্ঞেস করলো না অলি। মনোজ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কথায় কথায় সে বলে, আমি মিস্তিরি মানুষ, বই-টই কিছু পড়ি না।

দু'খানা বেডরুমের ছোট বাড়ি। আজ ছুটির দিন নয়, তাই সারাদিন খেটেখুটে ফিরে চন্দনাকে এখন রান্না করতে হবে। অলির লজ্জা করতে লাগলো। তার বিশেষ কিছু খাবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু চন্দনা সে কথা কিছুতেই শুনছে না। ওরা নিজেরা অনায়াসেই স্যান্ডউইচ খেয়ে চালিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু অতিথিকে তা দেওয়া যায় না। এখানো যারাই অলিকে নেমন্তন্ন করে, তারাই ভাত-ডাল-মাছের ঝোল খাওয়ার চেষ্টা করে। অলি মাত্র কয়েকদিন আগে দেশ ছেড়ে এসেছে, ভাত-মাছের জন্য তার একটুও অভাববোধ নেই, সে বিলিতি খাবার স্বচ্ছন্দে খেতে পারে, কিন্তু এরা কেউ তা বুঝবে না। কিংবা অলির মতন দেশ থেকে সদ্য আগত কারুককে দেখলেই বোধহয় এদের নিজেদের ভাত-মাছ খাওয়ার ইচ্ছেটা জেগে ওঠে।

ছেলেকে আনতে গিয়ে মনোজ তার জামাইবাবুর সঙ্গে দু' এক গেলাস বীয়ার পান করে আসে, তাই তার ফিরতে একটু দেরি হয়। রান্নাঘরে চন্দনাকে সাহায্য করতে করতে অলি জিজ্ঞেস করলো, এখানে কেমন আছিস রে, চন্দনা?

পেঁয়াজ কাটা থামিয়ে চন্দনা অলির দিকে কয়েক পলক গাঢ় ভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো এক একদিন রাত্তিরে মনে হয় এক্ষুনি দেশে ফিরে যাই। আবার সকালবেলা উঠে সেই ইচ্ছেটা চলে যায়।

অলি বললো, তুই তো বিয়ের পর সেই যে চলে, আর একবার বেড়াতেও গেলি না!

চন্দনা বললো, টাকা জমাচ্ছি। এখনো বাড়ি কিনতে পারিনি। তা ছাড়া বাচ্চাটা হলো... এখানে এত খাটতে খাটতে প্রান বেরিয়ে যায় যে আমার মনে হয়, একবার দেশে গেলে আর আমার কিছুতেই এখানে ফিরতে ইচ্ছে করবে না। আর যাই বল, দেশে বিনা পরিশ্রমে দিন কাটাবার মতন সুখ এখানে পাবি না।

–তাহলে এখানে কী আছে? কিসের টানে অনেকেই থেকে যায়?

–এক ধরনের সিকিউরিটি। এখানে ছেলেটাকে ভেজাল খাওয়াতে হবে না, ঠিক মতন লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাবে, আমরা দু'জনে আর দশ বছর চাকরি করতে পারলে যা টাকা জমবে, তাতে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্তে চলে যাবে। এখানে লোকে সুখ খোঁজে না, আরাম খোঁজে। মেটেরিয়াল কমফর্ট।

–প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় চন্দনা ব্যানার্জির মুখে কখনো টাকা পয়সার আলোচনা শুনিনি। আমাদের ধারণা ছিল, তুই ভালো করে টাকা গুনতেই জানিস না। একদিন কফি হাউসে সাড়ে সাত টাকার বিল হয়েছিল, তুই কুড়ি টাকার নোট দিয়ে বলেছিলি খুচরো ফেরত চাই না, তোর মনে আছে? আমরা সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম!

–তখন বড্ড সরল আর বোকা ছিলুম রে অলি। আমাদের বাবা মায়ের আমাদের আদর যত্নের তুলোয় মুড়ো রাখতো। অনেক কিছুই জানতে বুঝতে শিখিনি। এদেশে হিসেবী হতেই হয়। এখানকার যে কোনো ইন্ডিয়ানদের বাড়িতে গিয়ে তুই শুনবি বাড়ি আর গাড়ির গল্প। আমার কী মনে হয় জানিস, অলি সুখ কথাটা বোধহয় একটা ফিলোসফিক্যাল ধাপ্পা, আমাদের দেশেই বা ক'জন মানুষ সত্যিকারের সুখে থাকে? সাধারণ মানুষের সুখ নামে একটা এলিউসিভ ব্যাপারের পেছনে ছোটা উচিত নয়, তার

চেয়ে বাড়ি -গাড়ি ভালো খাওয়া দাওয়া এসব পেলেই তো জীবনটা আরামে কাটে!

–হয়তো এর পরেও নিজের ভালো লাগা বলে ব্যাপার আছে রে, চন্দনা। সেইজন্যই কেউ কেউ এইসব ক্রিচার কমফর্ট ছেড়েও তো চলে যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভালো ভালো ছেলেরা বনে জঙ্গলে গিয়ে পিজান্ট মুভমেন্ট অর্গানাইজ করছে।

–দেশের অবস্থা তো খুব খারাপ শুনতে সবাই ঠাট্টা করে। তুই চলে এসেছিস ভালো করেছিস। তোর সেই বন্ধু, কী যেন নাম, অতীন, তাই না? সে কিছুদিন লন্ডনে এসে শুনেছি, সে নাকি জেল থেকে পালিয়ে এসেছে? আর দেরি করিস নি, তোরা দু'জনে এবার একটা কিছু ঠিকঠাক করে ফ্যাল!

বাচ্চাকে নিয়ে মনোজ ফিরে এলো, আর এবিষয়ে কোনো কথা হলো না।

আগেই ঠিক ছিল অলি আজ রাতটা এখানেই থেকে যাবে। তবু বেশী রাত পর্যন্ত গল্প হলো না। ছুটি নেবার উপায় নেই, কাল ভোর থেকেই চন্দনা আর মনোজকে কাজে বেরুবার তোড়জোড় করতে হবে। মনোজ আর চন্দনার ব্যবহার দেখে কিছু বোঝা না গেলেও অলির কেন যেন মনে হতে লাগলো, ওদের দু' জনের মধ্যে কিসের যেন একটা টানাপোড়েন চলছে। চন্দনা অন্যদিকে মুখ ফেরালেই তার মুখখানা বিষন্ন হয়ে যায়, মনোজের চিবুক ঝিলিক দিয়ে যায় একটা কিছু অস্বস্তি বা বিরক্তির রেখা। এত পীড়াপীড়ি করে চন্দনা অলিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে রাখলো, হয়তো সে নিজের কথা কিছু বলবে ঠিক করেছিল, অথচ প্রাণ খুলে কিছুই বললো না। চন্দনা মনে করে, সুখ কথাটা একটা ফিলোসফিক্যাল ধাপ্পা! এটা তো এক ধরনের সিনিসিজম, যা চন্দনার মতন মেয়ের কাছ থেকে আশাই করা যায় না।

বিছানায় শুয়ে অলির আবার মনে পড়লো ব্যাগ হারাবার ঘটনাটা। তার মর্মমূল পর্যন্ত একেবারে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। চোর-জোচ্চোর পৃথিবীর সব দেশেই আছে, ইংল্যান্ডেই বা থাকবে না কেন? ইংরেজদের লেখা ক্রাইম স্টোরি কী সে পড়েনি? তবু কয়েক মিনিটের জন্য অলির মনে হয়েছিল, এই কী ভারতের তুলনায় অনেক উন্নতদেশের আইন শৃঙ্খলার নমুনা? টাকা পয়সা যা গেছে যাক, তবু ভাগ্যিস পাসপোর্ট আর টিকিটা ফেলে গেছে। তা না হলে বাবলুদের সঙ্গে আর দেখা হতো না! আর অলির লন্ডন ভালো লাগছে না। পরশু সন্ধেবেলা তার ফ্লাইট, সেই পরশু যেন কত দূর! বাবলুদা কি এখনও দাড়ি রেখেছে?

অলির ঘুম আসছে না, এই বিছানাটায় একটা শিশু-গন্ধ। এদেশে খুব বাচ্চা ছেলে-মেয়েরাও মা-বাবা কাছে থেকে আলাদা শোওয়া অভ্যেস করে। উত্তর কলকাতায় চন্দনাদের মস্ত বড় বাড়ি, সে বাড়িতে অন্তত তিরিশ-চল্লিশজন মানুষ দেখেছিল অলি, আর এখানে চন্দনার ছেলেকে দেখবার জন্য একজনও কেউ নেই। ঝি-চাকর রাখার প্রশ্নই ওঠে না, মনোজের দাদা-বৌদিরা কাছাকাছি না থাকলে চন্দনার ছেলেকে কে রাখতো সারাদিন?

অলি বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। সারাদিন গরমের পর ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সামনের বাগানে দু' তিনটে গোলাপ গাছ, সেই বৃষ্টিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। একবার বাইরে বেরিয়ে বৃষ্টি ভিজতে ইচ্ছে করলো অলির, কিন্তু সদর দরজাটা খুলতে গেলে শব্দ হবে, অলি আগেই লক্ষ করেছে যে ভেতরের সুইইং ডোরটা খুলতে গেলেই ক্যাঁচ করে শব্দ হয়, তাতে চন্দনারা জেগে উঠতে পারে। অলি একদৃষ্টিতে বাগানটার দিকে চেয়ে রইলো। বিলিতি গোলাপ ফুলের ওপর ঝরে পড়ে বিলিতি বৃষ্টি। দেশে থাকবার সময় বিলেত কথাটা শুনলেই এক ধরনের রোমাঞ্চ হতো, এখন অলি সত্যিই সেই বিলেতে এসেছে, কিন্তু তীব্র কোনো অনুভব তাকে কাঁপিয়ে দেয়নি। অ্যামেরিকা কি এর চেয়ে খুব বেশী আলাদা হবে?

এক ঝলকা তার মনে পড়ছে বাবলুদার মুখ, আবার পরের মুহূর্তে মনে আসছে কৌশিক আর পমপমদের কথা। বাবলুদা আর কৌশিক দুই প্রাণের বন্ধু, অথচ দু' জনের জীবন চলে গেল দু' দিকে। জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছে কৌশিক, দু' হাতে রিভলভার চালিয়েছে, এসব গল্পে শোনা যায়, সিনেমার দেখা যায়, কিন্তু তাদের অতি পরিচিত কৌশিক সেই রকম একটা ঘটনার সত্যিকারের নায়ক। বাবার মুখে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা শুনেছে অলি, বইতেও পড়েছে, মাষ্টারদা, গনেশ ঘোষ, অনন্ত সিং-এর মতন বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে কৌশিকদের তুলনা করতে ইচ্ছে করে। কৌশিককে বাঁচতেই হবে। পমপম আর কৌশিকের কথা মনে পড়লেই অলির বুকটায় একটু ব্যাথা হয়।

বাবলুদা আমেরিকায় রয়েছে বলে অনেকে ভুল বুঝছে। পার্টির কেউ কেউ বাবলুদার নামে বিরূপ

মন্তব্য করে। ওরা আসলে সব কথা জানে না। বাবলুদা মোটেই আসতে চায়নি, তাকে৭ জোর করে পাঠানো হয়েছে, সেই সময় অবস্থা অন্য রকম ছিল , পালিয়ে না এলে বাবলুদাকে অন্য পার্টির ছেলেরা খুন করে ফেলতো।

বাগানের গোলাপ গাছের পাশে অলি যেন দেখতে পেল বাবলুদাকে। পা-জামা আর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে তার চুল। অলি ফিসফিস করে বললো, বাবলুদা, আমি আসছি, আমি আসছি আমি আর তোমাকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারছি না।

পরদিন সকালে কোনোরকমে ব্রেক ফাস্ট খেয়েই ওরা বেরিয়ে পড়লো। চন্দনার ছেলে এখনও ঘুমোচ্ছে, সেই অবস্থা তাকে পৌঁছে দেওয়া হলো মনোজের দিদির বাড়িতে। মনোজের দিদি এখন কোনো চাকরি করছে না, সেই জন্যই তাঁর কাছে বাচ্চাটাকে রাখা যায়। এতবড় সুবিধের জন্যই তো চন্দনারা রিডিং-এ পড়ে আছে। বাচ্চাটা শনি-রবিবার ছাড়া বাবা-মাকে ভালো করে দেখতেই পায় না।

অলি একা একা প্যাডিংটন স্টেশানে নামলো পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে। হাতের ব্যাগটা সে দোলাচ্ছে, কেউ এসে নিক তো আর এবার! চন্দনাদের কাছ থেকে তাকে পাঁচটা পাউন্ড ধার করতে হয়েছে, বিশাখাকে বলতে হবে একটা চেক পাঠিয়ে দিতে।

আজ থেকে বিশাখার আবার কাজ শুরু, সে সারাদিন অলিকে সঙ্গ দিতে পারবে না। টিউব রেলের ম্যাপ দেখে অলি একা একা ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু যাবে কোথায়? নোট বইটা খোয়া গেছে, তুতুলের বাড়ির ঠিকানা কিংবা ফোন নম্বর তার মনে নেই। ইস, তুতুলদি ভাববে, অলি আর একবার তার খোঁজও নিল না!

লন্ডনের মিউজিয়াম কিংবা আর্ট গ্যালারিগুলোতে ঢুকতে কোনো পয়সা লাগে না। এই একটা বড় সুবিধে। দশটা বাজবার পর অলি আবার টেট গ্যালারিতে ঢুকে পড়লো। এখানে অনেকক্ষণ কাটানো যায়। সে একা, স্বাধীন, যেখানে খুশি যেতে পারে, আজই যেন সে লন্ডন শহরে প্রথম ঘরে বেড়াচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে কবি-শিল্পীদের লন্ডন, ইতিহাসের লন্ডন। তবু, মনের মধ্যে কোথায় যেন খচখচ করে। পৃথিবীর অন্যদেশের আগন্তুকরা যেভাবে লন্ডনকে দেখবে, একজন ভারতীয়ের পক্ষেও কি ততটা মুগ্ধভাবে দেখা সম্ভব? , দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসনের কথা মনে পড়েই যায়। এক একটা মোটা থামওয়ালা প্রাচীন বাড়ি দেখলে মনে হয়, কলোনির কুলিদের রক্ত জল করা টাকায় কি এসব তৈরি হয়নি? অবশ্য দেখতে দেখতে চোখে সয়ে গেলে কিছুদিন পরে আর এসব মনে পড়ার কথা নয়।

রাস্তা দিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরলো অলি, হাইড পার্ক কর্নারে বসেও ছিল কিছুক্ষণ, তবু একজন কেউ ও তার সঙ্গে কথা বলেনি। তার দিকে তাকিয়েছে অনেকে, যদিও শাড়ির পড়া নারী এখানে দুর্লভ কিছু নয়, তাহলেও কিছু লোক, হয়তো তারা কনটিনেন্টের টুরিস্ট, শাড়িপড়া মেয়েদের দিকে ফিরে ফিরে চায়। কিন্তু কেউ আলাপ করতে বোধ করে। একটা শব্দও উচ্চারণ না করে এ শহরে সারদিন ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফেরা যায়।

হঠাৎ বৃষ্টি নামতে অলিকে বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরতেই হলো।

পরদিন বিশাখা আর তার বাবা তাকে তুলে দিতে এলেন হিথরো এয়ারপোর্টে। অলির কাছে একটাও ডলার বা পাউন্ড নেই। শেষপর্যন্ত টাকা হারাবার ঘটনাটা সে বিশাখাদের কাছে বলতে পারেনি, চন্দনার ধারটাও শোধ দেওয়া হলো না। টাকা-পয়সা আর লাগবে কিসে? নিউ ইয়র্কের কে এফ কে এয়ারপোর্টে বাবলুদা তাকে নিতে আসবে সব ঠিক হয়ে আছে।

সুটকেস চেক ইন করার পর অলি বিশাখা আর তার বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। এরপর বাবলুদার ওপর তার পুরোপুরি নির্ভরতা। মাঝখানে আর কেউ রইলো না। অলি হঠাৎ একটু মুচকি হাসলো। নিউ ইয়র্ক প্লেন থেকে নেমেই সে বাবলুদাকে বলবে আমি নিঃস্ব হয়ে তোমার কাছে এসেছি!

সঙ্গে একটাও পয়সা না থাকলে কেমন যেন অসহায় অসহায় লাগে। যদিও অলি বারবার নিজেকে বোঝাচ্ছে, মাঝখানে পয়সা খরচ করার কোনো প্রশ্নই উঠছে না। বিমানটি এবার এক লাফে আটলান্টিক পাড়ি দেবে যাত্রীরা শুধু খাবে আর ঘুমাবে। কেউ কেউ অবশ্য নিজের পয়সায় মদ কিনে খায়।

অলির পাশে একজন মাঝবয়সী পুরুষ বসেছে, মুখ দেখে মনে হয় মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ। গায়ে একটু একটু রসুনের গন্ধই বিমানটি আকাশে ওড়ার পরেই সে সীট-বেল্ট খুলে পাশ ফিরে অলিকে জিজ্ঞেস করলো, পাকিস্তানী? ইন্ডিয়ান?

লোকটি ইংরিজি বলে ভাঙা ভাঙা, তার কণ্ঠস্বরে একটি সরল ভালো মানুষীর ভাব আছে। এই যে বিনা দ্বিধায় তার আলাপ করার চেষ্টা, এটাতেই অলি একটা প্রাচ্যদেশীয় স্পর্শ পায়। লোকটির বাড়ি কায়রো শহরে, সে মিকহাগোতে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, তার ছেলে সেখানে স্থাপত্যবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করে।

অলি বললো, তোমরা এক সময় পিরামিড বানিয়েছো, আর এখন সেই তোমরাই নিজের ছেলেদের স্থাপত্যবিদ্যা শেখার জন্য আমেরিকা পাঠাচ্ছো?

লোকটি গলা কাঁপিয়ে হা হা শব্দে হেসে উঠলো।

আগে হয়তো অলির এই ধরনের হাসি কর্কশ কিংবা সভ্যতাসম্মত মনে হতো না, কিন্তু এখন মনে হলো, সে যেন কোনো মরুভূমির বেদুইনের হাসি শুনলো এই বিমানের মধ্যে। তার বেশ পছন্দই হলো।

লোকটি একটু পরেই হুইস্কির অর্ডার দিয়ে অলিকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার জন্য কী নেবো? অলি কিছু চায় না, লোকটিও নাছোড়বান্দা। জিন, কোনিয়াক বা ওয়াইন একটা কিছু নিতেই হবে। অলির আবার মনে পড়লো তার কাছে পয়সা নেই। লোকটিকে নিবৃত্ত করার জন্য সে একটা কিছু নরম পানীয় কিনতে পারতো। লোকটি জোর করে একটি ছোট বোতল রেড ওয়াইন নিল, অলির জন্য। তার সনির্বন্ধ অনুরোধে অলি একটুখানি ঠোঁটে ছোঁয়াতেও বাধ্য হলো।

বেশ জোরে জোরেই গল্প জুড়ে দিল লোকটি। সে শাড়িপরা যুবতী এর আগে দু' তিনজন মাত্র দেখেছে। ভারতীয় পুরুষদের তুলনায় ভারতীয় মেয়েরা খুব কমনীয় হয়। অবশ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা, তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে কী যেন একটা গণ্ডগোল করছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সব মুসলমানদের তিনি হিন্দু করে দিতে চাইছেন না? এই রকম খবরই তো তাঁর দেশের কাগজে বেরোয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তো একজন আর্মি জেনারেল, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে কি ঐ মহিলা পারবেন?

তৃতীয় পেগ হুইস্কি শেষ করার পর লোকটি অবলীলাক্রমে অলির উরুতে হাত রাখলো।

অলি ভয় পেল না। সে তার নরম হাতের মুঠিতে লোকটির হাত ধরে গভীর মিনতির সুরে, খুব আস্তে বললো, প্লীজ, এরকম করো না।

লোকটি অবাক চোখে অলির মুখের দিকে চেয়ে রইলো। অলি আবার বললো তোমার হাতটা সরিয়ে নাও। নইলে আমাদের বন্ধুত্ব থাকবে না!

বন্ধুত্ব শব্দটির মধ্যে যেন একটা জাদু আছে। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে হাতটা সরিয়ে নিল। আর কথা বললো না একটাও। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লো।

অলির ঘুম আসছে না। পাশের লোকটি তার উরুর যেখানটায় হাত রেখেছিল, সেই জায়গাটার শাড়ি সে প্লেন করলো অনেকবার। যেন ঐ স্পর্শটা মুছে দিতে চাইছে। সে জানে, ওরকম একটু আধটু ছোঁয়াছুঁয়িতে কিছু আসে যায় না। লোকটি খারাপ নয়, তার ওপর কোনো জোর করেনি, মদের নেশায় একটু উজ্জ্বল হতে চেয়েছিল।

বাবলুদা ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ তাকে পুরুষ হিসেবে স্পর্শ করতে পারেনি। এ জন্য মনে মনে অলির একটু গর্ব আছে। চেষ্টা করেছে অনেকে, এমনকি পমপম আর কৌশিকের সঙ্গে সে যখন ঘাটশিলায় যায়, তখন কৌশিকের এক বন্ধু তাকে নিবিড় ভাবে কামনা করেছিল, দু-তিনবার জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু কখনো মেনে নিতে হয়নি, কোনোবারই চ্যাঁচামেচি করে নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করতে হয়নি। তার শান্ত দৃঢ় প্রত্যাখ্যান অন্যরা ঠিক বোঝে। এই জোর অলির আছে। একমাত্র বাবলুদাই তার কোনো বাধা বা নিষেধ মানেনি, সেইজন্য বাবলুদার জন্যই তার শরীর মন উন্মুখ হয়ে আছে।

বাবলুদার সঙ্গে প্রথম দেখা হলে কী কী মিথ্যে কথা বলতে হবে, অলি মনে মনে আবার ঝালিয়ে নেয়। বিদেশে যারা একা থাকে, তাদের হঠাৎ খারাপ খবর দিতে নেই। মানিকদার মৃত্যুসংবাদ দেওয়া চলবে না। জেলে ভেঙে পালাবার সময় কৌশিক যে সাঙ্ঘাতিক আহত হয়ে এখনো মৃত্যুর কাছাকাছি রয়েছে, তা বলা যাবে না। পমপমকে লালবাজারে কী ধরনের অত্যাচার করেছে, তারও বলার দরকার নেই। ওরা সব ভালো আছে। বাবলুদার পিসিমণি ভালো আছে। লন্ডনে যে তুতুলদির এত বড় অপারেশন হয়েছে, তাও উল্লেখ না করাই সঙ্গত। আর?

আটলান্টিক মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বিমান, ওপরে রাত্রির আকাশ। মেঘের স্তরের

ওপর দিয়ে যাচ্ছে বলে চাঁদটা অনেক বেশী উজ্জ্বল। বিমানের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই এখন ঘুমন্ত। সোজা হয়ে বসে আছে অলি অতি। প্রতি মিনিটে সে প্রায় আট মাইল করে এগিয়ে যাচ্ছে বাবলুদার দিকে।

একবারও সে তন্দ্রায় ঢলে পড়লো না। পুরো সময়টা জেগেই কাটালো। এক সময় জেগে উঠলো ভেতরের আলো, ফুটে উঠলো সীট -বেল্ট বাঁধার নির্দেশ। পাশের লোকটির পিঠে আলতো করে হাত রেখে অলি ডাকলো, প্লীজ গেট আপ!

পিকচার পোস্টকার্ডের ছবির মতন দেখা যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক শহর। বড় বড় আলোকোজ্জ্বল বাড়ি। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং চিনতে অসুবিধে হয় না। এক ঝলক দেখা যায় স্ট্যাচু অফ লিবার্টি।

বিমানটি ভূমি স্পর্শ করার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত ইজিপশিয়ান লোকটির চোখে মুখে খানিকটা আশঙ্কা জমেছিল। মৃদু ঝাঁকুনিটি লাগার পর সে অলিকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে কেউ নিতে আসবে তো? না হলে আমি তোমাকে কোনো হোটেলে পৌঁছে দিতে পারি।

অলি বললো, ধন্যবাদ। আমাকে নিতে আসবে একজন। তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি।

তারপরেই অলির বুকটা একবার কেঁপে উঠলো। যদি বাবলুদা কোনো কারণে না আসতে পারে? তার কাছে একটা টেলিফোন করারও পয়সা নেই। পরমুহূর্তেই সে এই আশঙ্কাটাকে ঝেড়ে ফেলে দিল। বাবলুদার ওপর সে ভরসা রাখতে পারছে না। সে এত দুর্বল?

ইমিগ্রেশান কাস্টমস পেরুবার পরই সে দেখতে পেল অতীনকে। এই দু' আড়াই বছরে সে যেন আরও রোগা আর লম্বা হয়েছে, মুখে দাড়ি নেই, সে হাতছানি দিচ্ছে অলির দিকে অলি যেন তার সুটকেসটা টানতে পারছে না। ইচ্ছে করছে সুটকেসটা ফেলেই ছুটে যেতে। ছেলেমেয়ে পরস্পরকে পড়িয়ে ধরছে, এখানেই চুমু খাচ্ছে সবার সামনে। অলির চাইছে বাবলুদার বুকের ওপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

অলি কাছাকাছি আসতেই অতীন বেশ চেঁচিয়ে বাংলায় বললো! অলি! তুই এসেছিস তা হলে শেষ পর্যন্ত ! আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। প্লেন প্রায় চল্লিশ মিনিট লেট।

তারপর অলি কিছু বলার আগেই সে একটু সরে গিয়ে পাশের একটি যুবতীর দিকে হাতের পাঞ্জা তুলে বললো আলাপ করিয়ে দিই, এ আমার বান্ধবী শর্মিলা, আর শর্মিলা এই হচ্ছে অলি।

এর পরও সে অলিকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললো, তোমরা দু জনে এখানে একটু দাঁড়াও আমি দেখি সিদ্ধার্থ গাড়িটা কোথায় পার্ক করলো। ও বেচারা জায়গাই পাচ্ছিল না!

অতীন দৌড়ে চলে গেল। শর্মিলা কাছে এসে অলির হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো। খুব টায়ার্ড তাই না? লন্ডন থেকে এই জার্নিটা একটানা ততক্ষণ, বড্ড বোরিং। আসুন ভাই, এই দিকটায় সরে আসুন ওখানে বৃষ্টির ছাঁট লাগছে। দু'দিন ধরে নিউ ইয়র্কে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। লন্ডনের ওয়েদার কী রকম ছিল?

অতীনের ব্যাবহারের আড়ষ্টতা চোখে পড়লেও এই মেয়েটির কথা মধ্যে আন্তরিক সুরটা স্পর্শ করলো অলিকে। প্রথম দর্শনেই সে শর্মিলকে পছন্দ করে ফেললো। সে শর্মিলার কাছ থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল না।

॥ ৪১ ॥

সারাদিন একটনা বৃষ্টি পড়ছে। এ বৎসর বৃষ্টি অতি প্রবল।

পুকুর-ডোবা -খাল -বিল এখন জলে টইটম্বুর, নদীগুলিও ভরে গিয়ে তটরেখা ছাপিয়ে যেতে চাইছে, কোনো কোনো জেলায় বন্যা শুরু হয়ে গেছে। চতুর্দিকের প্রকৃতি এখন সজল।

শ্রাবণ মাস ভরসার মাস, আবার দুঃখেরও মাস। বার্ষার জল পেয়ে ধান গাছ খলখলিয়ে বাড়ে, আবার অতিবৃষ্টি হলে নষ্ট হয়ে যাবার ও আশঙ্কা থাকে। এবারের ফসলের সম্ভাবনা ও পর্যন্ত ভালোই। তবে, একটানা বর্ষন হলে অন্যান্য রোজগারপতি বন্ধ থাকে, হাটবাজার ঠিকমতন বসে না। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী মানুষের দিন আনি দিন খাই অবস্থা। এক একটা দিন নষ্ট হলে তাদের উনুনে আঁচ পড়ে না।

অবশ্য জনসংখ্যা এখন আর সাড়ে সাত কোটি নেই, বেশ কমতে শুরু করেছে, এর মধ্যেই

পঁচাত্তর-আশি লাখ মানুষ পাড়ি দিয়েছে ভারতের দিকে। কুষ্টিয়া, যশোর, ময়মনসিংহ, চিটাগাং দিনাজপুরের সীমান্ত দিয়ে এখনও প্রতিদিন হাজার হাজারে নারী-পুরুষ চলেছে এই বৃষ্টির মধ্যে সামান্য পোঁটলা -পুঁটলি মাথায় করে। দুবেলা আহার না জুটলেও মানুষ নিজের ভিটে -মাটি ছেড়ে চলে যেতে চায় না, তবু এরা যাচ্ছে নিছক প্রাণ বাঁচাবার আশায়, এরা চোখের সামনে জ্বলতে দেখেছে গ্রাম, গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখেছে দলে দলে মানুষকে, স্বামীর সামনে ধর্ষিতা হয়েছে স্ত্রী, ভাইকে খুন করে কেড়ে নিয়ে যেতে দেখেছে বোনকে, এমনকি শিশুর শরীর ও ছিন্নভিন্ন হয়েছে বেয়নেটে। বৃষ্টি-বাদল, জল -কাদার মধ্যে দিয়ে উপভ্রান্ত এই পলাতকরা জানে না সীমান্তের ওপারে গিয়ে তারা কী পাবে। তবু তারা ছুটছে তাড়া তাড়া-খাওয়া অসহায় প্রাণীর মতন এবং পথের মধ্যেও কোনো কোনো দল পড়ে যাচ্ছে হানাদারদের সামনে।

ভারত সীমান্তের ঠিক ওপারের ছোট ছোট শহরগুলিতে হঠাৎ জনসংখ্যা হয়ে দ্বিগুণের বেশী। এত শরণার্থীদের আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকারগুলি, যারা এমনিতেই নিজেদের নানা সমস্যায় জর্জরিত। আগেকার উদ্বাস্তুদের সমস্যারই সমাধান করা যায়নি, ভারত সরকারকে নতুন করে খুলতে হচ্ছে শরণার্থী ক্যাম্প। এক দলের জন্য মাথার ওপর আচ্ছাদন, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যাবস্থা করতে না করতেই এসে যাচ্ছে আরও দলের পর দল, এই জনস্রোতের বিরাম নেই। আর ও কত মানুষ আসবে, কতদিন থাকবে এরা ?

সারা পৃথিবী এই ব্যাপারে নির্বিকার। কোনো কোনো দেশ শরণর্থীদের কিছু সাহায্য পাঠিয়ে তাদের বিবেকের দায় বুকিয়ে দিচ্ছে, মুল সমস্যা ব্যাপারে কারুর কোনো আগ্রহ নেই।

বৃষ্টি পড়ছে কলকাতা শহরেও, সারারাত এবং পরের দিন। বৃষ্টিতে বড় শহরের জনজীবন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় না, কিছু কিছু গাড়ি-ঘোড়া চলে, অফিস-কাছাড়ি খোলা থাকে। কলকাতার জনসংখ্যাও স্ফীত হচ্ছে দিন দিন আশ্রয় প্রার্থীদের আগমনে। বাংলাদেশের ভদ্রলোক শ্রেণীর শরণার্থীরা কোনোক্রমে মাথা গোঁজবার স্থান পেয়েছে কলকাতায়, আর দমদম বিমানবন্দরের পর থেকে যশোহর রোডের দু'ধারে, বনগাঁ সীমান্ত পর্যন্ত সারি সারি স্যাম্পে জড়ামরি করে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নাম -না-জানা নারী-পুরুষ।

শ্রমিক অসন্তোষ, খাদ্যাভাব দল-বদলের রাজনীতি, নকশালপন্থী যুবকদের সশস্ত্র আন্দোলন, এইসব সমস্যায় পশ্চিমবাংলার আইনশৃঙ্খলা ও অর্থনীতি, বিপর্যস্ত, তার ওপর হঠাৎ এই লক্ষ লক্ষ অনাহুত অতিথিদের চাপ। এদের আহর-বাসস্থানের বন্দোবস্ত করার দায়ের চেয়েও আর একটা বড় ভয় সময় অনেকের মনে জেগে আছে, আবার নতুন করে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে না তো? সাতচল্লিশ সালের পর থেকে যারা বাস্তুচ্যুতা হয়ে এসেছে, যাদের অনেকেই এখনও মানবেতর প্রাণীর মতন জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের মন থেকে তিক্ততার স্বাদ মুছে যাবার কথা নয়। তারা কি এই নবাগতদের মেনে নেবে? বিদেশী চর ও স্বার্থন্বেষী উস্কানিদাতারাও এই সুযোগ গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেরকম কিছু এখনও দেখা যায়নি। বরং পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ মানুষ আবেগে উত্তাল হয়ে উঠেছে অনেকদিন পর যেন উভয় বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্য থেকে মুছে গেছে বিচ্ছেদের রেখা। ধর্মের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ভাষার টান। নতুন করে সবাই ভাবতে শুরু করেছে যে রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও পারস্পরিক আদান-প্রদানও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ঠিক হয়নি। কলকাতার অফিসগুলিতে কর্মচারিরা মাকে একদিনের বেতন দান করছে শরণার্থীদের জন্য। ভারত সরকার শরণার্থীদের ব্যয় বহন করার জন্য অতিরিক্ত ডাকমাশুল চাপালে কেউ উপত্তি করেনি। দুরবর্তী জেলা শহর, গ্রামগঞ্জের মানুষও অসহায় বহিরাগতদের জন্য জায়গা করে দিচ্ছে।

যাদের আবেগ কম তারা সংশয়বাদী হয়। এমন মানুষও আছে, যারা হিন্দু-মুসলমানদের প্রশ্ন তুলতে পারে না। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও তারা ঘরোয়া আলোচনায় প্রশ্ন তোলে, এই মুসলমানদের এখন তো আদর-যত্ন করে খাওয়ানো হচ্ছে, সব মিটে গেলেই দেখবে ওরা আবার আমাদের শত্রু হয়ে গেছে, ছুটিয়ে ভারতের নিন্দে করবে এখন তো খুব বাংলা বাংলা করছে, কিন্তু আসলে ওদের মন-প্রাণ আরবের দিকে!

যাদের গায়ে দেশ বিভাগের আঁচড়টির ও লাগেনি, তাদেরও কারো কারো মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে

ওঠে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা। পাকিস্তান দু'টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনায় তারা খুশি, কারণ পাশের মুসলমান রাষ্ট্রটি এবার দুর্বল হয়ে যাবে। যদি বাংলাদেশ বলে নতুন রাষ্ট্রটির সত্যিই জন্ম হয়, তা হলে তার ওপরে চোখ রাঙানো যাবে যখন তখন। তারা চাপা গলায় বলে আরে, এই য সত্তর -আশি লাখ মানুষ ওপার থেকে এসেছে, এর মধ্যে মুসলান ক'জন? ক্যাম্পগুলোতে দ্যাখো গিয়ে বেশীর ভাগেই হিন্দু। কিছু মুসলামন নেতা আর বুদ্ধিজীবী কলকাতায় বসে মজা মারছে, তারা আর ক'জন? পাকিস্তানের মিলিটারি তো হিন্দুদেরই মেরে মেরে তাড়াচ্ছে! এরপর কি এরাও পার্মানেন্টলি এদেশে থেকে যাবে?

এইসব সংশয়বাদীরা অবশ্য প্রকাশ্যে গলা খুতে পারছে না। অফিসে, ক্লাবে, পাড়ায় পাড়ায় আড্ডায় এখন কেউ সাম্প্রদায়িকতার সামান্য ইঙ্গিত দিলেই আরা রে রে করে উঠে প্রতিবাদ জানায়। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অস্থ্যাতের এই একটা মাত্র সুফল দেখা যাচ্ছে এখন দু'দিকের বাংলার অন্তত কয়েক কোটি মানুষ বুঝতে পেরেছে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ভুল।

বৃষ্টিতে জল জমে গেছে কলকাতার রাস্তায়। আজ অনেকেই বাড়ি থেকে বেরুতে পারেননি। মানুষের মতন কয়েক হাজার নির্বাসিত মানুষ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ মনে ভাবছে, কবে নিজের দেশে, নিজের বাড়িতে, নিজের বিছানায় ফিরে যাওয়া যাবে!

বৃষ্টি পড়ছে ঢাকায়। বৃষ্টি পড়ছে রাজশাহী, বগুড়া, টাঙ্গাইল, খুলনায়,। বৃষ্টির সূক্ষ্ম কণায় যেন ছড়িয়ে পড়ছে মন খারাপের বীজাণু। আগামী দিনগুলি আরও কত ভয়ংকর রুপ নিয়ে আসবে কেউ জানে না। ভয় ও আমঙ্ককার বদলে আস্তে আস্তে বুকে জমছে নৈরাশ্য।

ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর গোপন তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ। পাকিস্তানী মিলিটারিও পুলিশ একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাজার হাজার ছেলেকে গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে কতজনকে এখনো আটকো রেখেছে আর কতজনকে হত্যা করে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে লাশ' তা কেউ জানে না।

রুমীর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি এ পর্যন্ত। রুমীর বন্ধুরা, বদি, চুল্লু, জুয়েলা, কাজী, বাশারা, বেনায়েত এরা কেউই ফেরেনি। ওদের শেষ দেখা যায় এস পি এ হস্টেলে, যেটা এখন আর্মি ইনটেলিজেন্সের ঘাঁটি। জাহানারা ইমামের মাথা খারাপ হয়ে যাবার মতন যেটা এখন অবস্থা। শেষ পর্যন্ত তিনি পাগলাবাবার আখড়ায় গিয়ে ধর্না দিয়েছেন। শিক্ষিতা যুক্তিবাদী, জাহানারা ইমামের আগে এসব পীর-ফকির বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মায়ের প্রাণ, যে একটু ভরসা দেবে তাকেই আকঁড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। পাগলাবাবার আস্তানায় এখন এরকম প্রচুর ব্যাকুল মা-বাবার ভিড়, সেখানে বড় করে মিলাদ-মাহফিল হয়। পাগলবাবা একদিন জায়নামাজে বসে খাসদেলে ধ্যান করে জেনেছেন যে রুমী ও আরও অনেকে বেঁচে আছে। তিনি ওদের শিগগিরই মুক্ত করে আনবেন।

আজ এই বৃষ্টির মধ্যেও জাহানারা ইমাম দশ সের অমৃতি নিয়ে এসেছেন পাগলাবাবার আশ্রমে মিলাদের জন্য।

বৃষ্টি পড়ছে গ্রামবাংলায়, বৃষ্টি পড়ছে চট্রগাম-ত্রিপুরা সীমান্ত।

মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে আজ সবাই হাতে হুটিয়ে বসে আছে, কেউ কেউ গুলাতানি করছে। কেউ কেউ বিমর্ষ মুখে চেয়ে আছে বাইরের দিকে, ওই মাঠঘাট পেরিয়ে কোনো এক জায়গায় তাদের বাড়ি, সেখানে ফেরা যাবে না।

যে প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে প্রতিরোধ লড়াই শরু হয়েছিল, হঠাৎ তাতে ভাটা পড়েছে কয়েক সপ্তাহে ধরে। পাকিস্তানী বাহিনী যেন নতুন ভাবে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এবং সৈন্যস্তের ওপারে। এখন তাদের ওপুর চোরাগোপ্তা আক্রমন চালিয়েও সুবিধা করা যাচ্ছে না, অযথা শক্তিক্ষয় হচ্ছে মুক্তিবাহিনীর।

এরপর কী হবে? পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ তো দুরের কথা ভারত সরকারই আজও স্বীকৃতি দেয়নি বাংলাদেশকে। অর্থবল নেই, অস্ত্রবল নেই, শুধু মনে জোর নিয়ে আর কতদিন লড়াই চালানো যাবে? মনের জোরও নষ্ট হয়ে যায় আস্তে আস্তে।

একটা পরিত্যক্ত ইস্কুলবাড়ির বারান্দায় বসে গোটা পাঁচেক স্টেনগান পরিষ্কার করছে বাবুল চৌধুরী। তার ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অস্ত্রগুলো ঠিকমতন কাজ করছে না, পরিষ্কার করার পর গুলি চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে। বারান্দায় অন্য এক প্রান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ছোট

দলের মধ্যে তীব্র তর্কতর্কি থেকে এখন কুৎসিত গালাগালি শুরু হয়ে গেছে, বাবুল সেদিকে একবারও মুখ ফেরায়নি। কোনো কাজ নেই বিলেই এরকম ঝগড়া আর দলাদলি শুরু হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। এমনকি দিনতিনেক আগে একজন মুক্তিযোদ্ধা খুন হয়েছে এই ক্যাম্পের মধ্যে। আক্যশানের সময় এরা কাঁধে কাধঁ মিলিয়ে লড়াই করতে পারে, কিন্তু আলস্যের সময়ই বেরোয়, কে কার শত্রু ছিল আগে, কে আওয়ামী লীগের আর কে ন্যাপের।

সিরাজুল এখানে নেই। ভারতোর কোনো গুপ্ত জায়গায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিশেষ কোনো ট্রেইনিং এ।

বৃষ্টি পড়ছে করাটিয়া, গোপালপুর, কোদালিয়া, নেয়ামতপুর, নাটিয়াপাড়া, জগন্নাথগঞ্জ, পাকুল্লা, মির্জাপুর, ভাতকুরা, ভয়াপুর, পাথরাইল চণ্ডী কালিহাতি গ্রামে। বর্ষণ হচ্ছে সারা বাংলার আকাশে। এই বৃষ্টির মধ্যেও চাষীকে বেরুতে হয়েছে মাঠে, জেলের নৌকা ভেসেছে নদীতে তাঁতী বন্ধ করেনি তাঁত, এমনকি যে ভিখারিণীটি রোজ গান গেয়ে ভিক্ষে করে সে-ও ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি। অন্নচিন্তা বড় চিন্তা। ভাত এমন চিজ খোদার সঙ্গে উনিশ-বিশ।

অনেক মানুষ জানেই না দেশ কাকে বলে, স্বাধীনতা কী বস্থ! করাচী রাওয়ালপিণ্ডি তো দূরের কথা। এসব মানুষ অনেকেই ঢাকা শহরে চক্ষে দেখেনি। দশ-পনেরো মাইল বৃত্তের পরিধিতেই এদরে কেটে যায সারাটা জীবন। রাওয়াটিণ্ডি, ইসলাবাদ বা ঢাকায় বসে যারা শাসনযন্ত্র চালায়, তারা উর্দুতে কথা বলে না বাংলা কথা বলে, তাতে এদের কিছুই যায় আসে না। হিন্দু জমিদারদের আমলেও এরা পেট ভরে খেতে পায়নি, পাকিস্তানী আমলেও এদের দু বেলা ভাত জোটার নিশ্চয়তা নেই।

বাংলাদেশে যুবশক্তির একটা অংশ যেমন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে গেছে, তেমনি আবার একটা বেশ বড় অংশ তৈরি করেছে রাজাকার আলবদর বাহিনী। পাকিস্তানী সৈন্যরা এদের কাজে লাগায় লুঠতরাজ, হিন্দু বিতাড়ন ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান দেবার জন্য। শতকরা সাতানব্বই জন লোক শেখ মুজিবকে ভোট দিয়েছেল কিন্তু তাদের অনেকেই এখন পাকিস্তানী অত্যাচারীদের সমর্থক। অনেক ধ্যাপক, স্কুলমাস্টার, জেলা পরিষদের প্রেসিডেন্টও এখন শান্তি সমিতির উৎসাহী সদস্য এবং গণহত্যার অংশীদার। পবিত্র ইসলামের নামে শপথ নিয়ে যে কোনো অমানবিক, বীভৎস কাজ করতেও তাদের আটকায় না। আবার অল্পবয়েসী নিরক্ষর এমন অনেক ব্যাপার। তাদের মুরুব্বিরা যা বলে, তারা তাই শোনে। রাজাকার হলে তারা হাতে দুটো পয়সা পায়, অস্ত্র পায়, দু'বেলা আহার জোটে। লোকের বাড়িতে আগুন জ্বালালে কিংবা হাট-বাজারি লুট করলে কেই কোনো শাস্তি দেয় না, এও তো এক মজার ব্যাপার।

আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে কত কিছু সহ্য করতে হয়, সেই তুলনায় ধর্মত্যাগই বা এমন কি বড় কথা। পচিশে মার্চের পর যে-সব এলাকার হিন্দুরা পালিয়ে যেতে পারেনি তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মান্তরি হয়ে প্রাণে বেঁচেছে। এবার হিন্দুরা পালিয়ে সরকারি প্রচারও তীব্র। ঢাকায় হিন্দু নামের রাস্তাগুলির সব কটার পরিবর্তন করে ঘোষণা জারি হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জানে যে প্যর্বাঞ্চলে বিভেদমূলক গণ্ডগোল শুরু করেছে হিন্দুরা এবং সীমান্ত-সংঘর্ষ হচ্ছে হিন্দু ভারতের শত্রুতায়। পাকিস্তানী আর্মি হিন্দু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শায়েস্তা করছে, এটা তো দোষের কিছু নয়!

সামরিক শাসন এখন শক্ত থাবা গেড়ে বসেছে। বাংলাদেশের সব জেলাগুলিতেই বেছে বেছে নির্মূল করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের। ভারতীয় আইনশৃঙ্খলা ফিরে এসেছে অনেকখানি। স্কুল-কলেজ খোলানো হয়েছে জোর করে। অফিস-ব্যাঙ্ক-কলকারখানা আবার চালু হয়েছে। মনে মনে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থক তারাও মুখ বুজে এখন বাধ্য হয়েছে কাজে যোগ দিতে। শান্তে কামিটিগুলোকে দেওয়া হয়েছে অপর্যাপ্ত ক্ষমতা।

টাঙ্গাইলে বিন্দুবাসিনী স্কুলের মাঠে এক জনসভায় শান্তি কমিটির সেক্রেটাটি অধ্যাপক আবদুল খালেক ঘোষণা করলো যে পাকিস্তানে একমাত্র মুসলমানরাই থাকবে। পাকিস্তান ইসলামী, রাষ্ট্র, এ রাষ্ট্রে মুসলমান ব্যতীত অন্য জাতের কোনো নাগরিক অধিকার নেই। নিচু জাহের হিন্দু, যেমন ধোপা, নাপিত, মেথর, মুচিদের রেখে দেওয়া হবে, কারণ মুসলমানরা ওই ধরনের ছোট কাজ করে না। অন্য হিন্দুরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হলে পাকিস্তানী হতে পারবে, কিন্তু উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোনো হিন্দু মুসলমান হলে তাকে কোরবানী করা হবে।

এর আগে অনেক হিন্দুকে হানাদার-রাজাকাররা খুন করেছে, অনেক হিন্দু ভারতে পালিয়েছে।

ভারতে শরণার্থী শিবিরগুলোর দুরবস্থা ও মড়কের খবরও পৌঁছেছে এখানে, তাই কিছু হিন্দু মনে করেছিল, যা হয় হোক, তবু পিতৃ-পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে মরতে যাবো না। এবার তাদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠলো। আবদুল খালেক হিন্দুদের নামের তালিকা তৈরি করে ফেলেছে, এখন আর তাদের পালাবারও উপায় নেই, পালাতে গেলেও মরতে হবে।

টাঙ্গাইলের বড় মসজিদে শুরু হলো দীক্ষার অনুষ্ঠান। নিকুঞ্জবিহারী সাহা, দুলাল কর্মকার, অসিত নিয়োগী, হরিপদ সরকার, বাদক, বিজয় চৌধুরী এইসব নামের প্রায় তিন শো জনকে দাঁড় করানো হলো মসজিদের বাইরে। শান্তি কমিটির নেতারা তাদের প্রত্যেককে উপহার দিল একটি করে টুপি। তুলা নামের এক মোল্লা এদের অজুর নিয়মকানুন ও কলেমা শেখাবার দায়িত্ব নিল। এই তুলা বড় মসজিদে দীর্ঘদিন আযান দিয়ে আসছে, আজ সে দারুণ খুশি, এতদিন আযান দেওয়ার পুণ্যে সে এতগুলি কাফেরকে দীক্ষা দেবার দায়িত্ব পেয়েছে, এবার সে সরাসরি আল্লাহের খাস দরবারে পৌঁছে যাবে।

এই মজা দেখার জন্য মসজিদের সামনে ভিড় করে এসেছে হাজার হাজার মানুষ। তাতেও অধ্যাপক আবদুল খালেকের খুব রাগ, তিনি চিৎকার করে ধমকাতে লাগলেন, এদের দেখার কী আছে! এরা কেউ আল্লার ফেরেস্তা না! এরা এখনও কাফের, এখনও মুসলমান হয়ে সারেনি।

তবু যেন শুরু হয়ে গেল উৎসব। নব দীক্ষিত মুসলমানদের মিষ্টি খাওয়াবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। নিকুঞ্জ সাহা, দুলাল কর্মকারদের দল রহিমুদ্দিন, কলিমুদ্দিন হয়ে বাড়ি ফেরার একটু পরে সখানে ও ধেয়ে এলো ধর্মের ধ্বজাধারীরা এবং কৌতূহলী জনতা। শুধু পুরুষরাই তো মুসলমান হলে চলবে না, বাড়ির মহিলাদেরও ধর্মান্তরিত করাতে হবে।

এতে আর আপত্তি করার কী আছে। পুরুষরা জাত বদলালে মেয়েরাই বা বাকি থাকে কেন? মেয়েদের মতামত নেবার প্রশ্নও ওঠে না।

মগরেবের নামাজের পর শুরু হলো মেয়েদের দীক্ষা দেবার পালা। অতি সর্টকাট পদ্ধতিতে। অন্তঃপুরচারিণী হিন্দু মহিলারা পরপুরুষের সামনে আসবে না, তাই একখানা কালো শাড়ির এক প্রান্ত ধরে বাইরে দাঁড়ালেন ইমাম সাহেব, সেই শাড়ির অন্য প্রান্তটি ধরে রইলো অন্দরমহলের লক্ষ্মীরানী, সিদ্ধিরানী, জ্যোৎস্নারানী, মিনু পলি, অর্চনারা। ইমাম সাহেব কলেমা উচ্চারণ করলেন ভেতর থেকে ফোঁপাতে ওইসব মেয়েরা সেই উর্দু শ্লোকের কতটা সঠিক প্রতিধ্বনি করলো সে বিচারের দরকার নেই। ওতেই হবে।

বাইরের জনতা জয়ধ্বনি করে উঠলো।

এইভাবে ধর্মান্তরের অনুষ্ঠান চলতে লাগলো দিনের পর দিন। শুধু সাহা-বসাক-চৌধুরীরাই নয়, চক্রবর্তী- ভট্টাচার্যরাও বাদ পড়লো না। এবং তারা যে প্রকৃত মুসলমান হয়ে উঠেছে তা প্রামাণ করার জন্য অতি উৎসাহ দেখিয়ে তারা নামাজের জমায়েতে বেশী বেশী ভিড় করে। অনেক সময় দেখা গেল, পুরোনো মুসলমানদের চেয়ে নব্যরাই মসাজিদে আসছে বেশী সংখ্যায়। অভ্যেস নেই বলে কেউ কেউ নামাজ পড়কে গিয়ে হাঁটুতে চোট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। সেরকম একজনকে এক কট্টর মৌলাবাদী দয়াপশে হয়ে বললো, আপনি শুধু মসজিদে এসে বসে থাকবেন, তাতেই চলবে, তাতেই আপনি সরাসরি বেহেশ্‌তে চলে যাবেন।

কৌতূহলী জনতার মধ্যে অবশ্য সবাই মজা দেখতে বা আনন্দ করতে আসেনি। এদের মধ্যে লুকিয়ে আছে কিছু কিছু যুবক, যারা শান্তি কমিটির হঠাৎ -নেতা এবং ধর্মের দালালদের নাম লিখে নিচ্ছে ও মুখগুলো চিনে রাখছে। তারা মনে মনে শপথ নিয়েছে, একদিন এই সমস্ত ব্যক্তিদের যারা ভয় দেখিয়ে ও জোর জুলুম করে মুসলমান বানাচ্ছে, যারা পবিত্র ইসলামের নামে কলঙ্কলেপন করছে, তাদের চরম শাস্তি দিতে হবে! একজনও নিস্তার পাবে না।

গোটা বাংলাদেশ এখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দাপটে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও এই টাঙ্গাইল মহকুমাতেই গোপনে এক দুর্জয় শক্তিশালী যোদ্ধার দল কাজ করে যাচ্ছে। তাদের নেতার নাম কাদের সিদ্দিকী।

মাত্র চব্বিশ বছরের এক যুবক এই কাদের, তার ডাক নাম বজ্র। পড়াশুনো ছেড়ে সে একসময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। বছর দু-এক থাকার পর তার মন টেকেনি, সৈনিকের চাকরি ছেড়ে এসে সে আবার কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনো শুরু করেছিল, যোগ দিয়েছিল ছাত্র রাজনীতিতে।

বেশ লম্বা চেহারা, সুঠাম শরীর, মুখে ফিডেল কাস্ত্রোর মতন দাড়িগোঁফ। কিছুদিন আগেও লোকে তাকে চিনতো টাঙ্গাইলের আওয়ামী লীগের নেতা এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য জনাব আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর ছোট ভাই ডানপিটে বজ্র হিসেব।

ঢাকা শহর থেকে টাঙ্গাইলের দূরত্ব মাত্র ষাট মাইল। পঁচিশে মার্চ রাত্রে টাঙ্গাইলে কোনো অত্যাচারের ঘটনা ঘটেনি, ঢাকায় কী ঘটেছে তা জানাও যায়নি। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই ঢাকা থেকে সোজা সড়ক পথে ছুটে আসতে লাগলো হাজার হাজার মানুষ নারী পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু কেউ বাদ নেই, তাদের মুখ চোখে সাজ্ঞাতিক আতঙ্ক কেউ কোনো কথা বলতে পারে না, তারা পালাতে চায় গ্রামের দিকে। ক্রমে জানা গেল, ঢাকায় মিলিটারিরা ট্যাঙ্ক ও কামান নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করেছে সাধারণ নাগারিকদের, বহু বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, রাস্তায় পড়ে আছে শত শত লাশ, রাজারবাগ-পিলখানায় গোলাগুলি চলেছে, গৃহস্থের ঘরে ঢুকে সৈন্যরা গুলি করে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে বাঙালী মারছে। একজন জানালো যে তার বাড়ি ধানমণ্ডিতে, সে দেখেছে মধ্যরাত্রিতে একদল সৈন্য এসে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গোলা চালাতে থাকে, বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসে বেরিয়ে আসেন তাদের সামনে তারা বঙ্গবন্ধুকে ধাক্কাতে একটা গাড়িতে তুলে কোথায় নিয়ে গেছে কে জানে!

ক্রমে ঢাকায় অত্যাচারের কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। তখন টাঙ্গাইলের প্রতিরক্ষা বিষয়ে নেতাদের চিন্তা করতেই হয়। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ও সমস্ত দলের নেতাদের নিয়ে তৈরি হলো এক কমিটি, টাঙ্গাইলের সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হলো সেই সমিতির ওপর। একটি সশস্ত্র বাহিনীও গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার গ্রেফতারের আশঙ্কা করে আগেই তাঁর একটি নির্দেশ ঘোষণার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, কাগমারী বেতারে শোনা গেল সেই ঘোষণা, তিনি বাঙালী জাতিকে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিতে যেতে বলেছেন।

বাড়িতে বাড়িতে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে ফেলে ওড়ানো হলো সবুজ-লাল ও সোনালী রঙের বাংলাদেশের পতাকা। শুধু টাঙ্গাইলের সার্কিট হাউসে তখনও উড়ছে পাকিস্তানী পতাকা, এই সার্কিট হাউসে রয়েছে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি, সৈন্যসংখ্যা ১৫০ জন, তাদের পাঁচজন অফিসারের দু' জন পাঞ্জাবী। এই বাঙালী সৈন্যরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে ইচ্ছুক কি না তা এখনও জানা যাচ্ছে না। এরা পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে রেখেছে কেন? এর মধ্যে পুলিশ ও আনসার বাহিনী গণপরিষদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু সার্কিট হাউসের সৈন্যবাহিনী বশ্যতা স্বীকার না করলে টাঙ্গাইলের সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা নেই!

লতিফ সিদ্দিকীর ভাই কাদের সিদ্দিকী চায় তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে সার্কিট হাউস ঘেরাও করতে। হাই কমাণ্ডকে রাজি হতেই হলো। কাদেরের দলে ছিল কিছু ছাত্র, শ্রমিক ও রিকশাচালক, তাদের সঙ্গে যোগ দিল কিছু পুলিশ ও আনসার বাহিনী। সব মিলিয়ে সত্তর পঁচাত্তর জন, এদের হাতের অস্ত্র কিছু অতি পুরোনো থ্রি-ও-থ্রি রাইফেল ও দু-একটা মান্ধাতার আমলের ব্রেটগান। মাঝরাত্তিরে এই দলটি রওনা হলো, বিবেকানন্দ আশ্রমের পাশ দিয়ে, লৌহজং নদীর পাড় ঘেষে। শ্মশানটি পেরিয়ে সার্কিট হাউসের হাজার হাজার গজের মধ্যে এসে পড়তেই অতি উৎসাহী সেউ কোদালিয়া পুলের ওপর থেকে চালিয়ে দিল কয়েক রাউণ্ড গুলি। সঙ্গে সঙ্গে সার্কিট হাউস থেকে গর্জে উঠলো চাইনিজ মেশিনগান, বৃষ্টির মতন ছুটে আসতে লাগলো গুলি। এই আনাড়ি যোদ্ধাড়া সবাই আছড়ে পড়লো মাটিতে, মেশিনগানের ভয়ংকর শব্দে তছনছ হয়ে গেল রাত্রির স্তব্দতা।

কিছুক্ষণ পর গুলিবর্ষণ বন্ধ হলে কাদের দেখলো তার নিজস্ব কয়েকজন সঙ্গীসাথী ছাড়া বাকিরা সবাই উধাও। পুলিশ ও আনসাররা ভয়ে পালিয়েছে সবার আগে। কাদের কিছুতেই পশ্চাদপসরণ করতে রাজি নায়। যদিও সে জানে যে এই সামান্য অস্ত্র দিয়ে এক সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করা যায় না। তবু সে সারা রাত জেগে বসে রইলো সেখানে।

ভোরবেলা সে বন্ধুদের দিয়ে কয়েকটা মাইক্রোফোন যোগাড় করে আনলো। তার উদ্দেশ্য বাঙালী সৈন্যদের সমর্থন আদায় করা। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা নয়। শেষ পর্যন্ত সেই মাইক্রোফোনের বারবার আবেদন জানিয়ে সে ওই দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ফেললো, সার্কিট হাউসে ওড়ানো হলো বাংলাদেশের পতাকা পতাকা।

কিন্তু শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট টাঙ্গাইল ছেড়ে পিছিয়ে গেল ময়মনসিংহের দিকে।

এরপর এলো ইস্ট পাকিস্তানী রাইফেলসের একটি বাহিনী, তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চায়। এদিকে ঢাকা থেকে পাকিস্তানী আর্মি টাঙ্গাইলকে জব্দ করতে এগিয়ে আসছে। ই পি আর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে কাদের তার সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে গেল মুখোমুখি সংঘর্ষে।

আশিকপুরে যাদুকর পি সি সরকারের প্রাক্তন বাড়ির পাশে নির্বিঘ্নে কাটলো সেই রাত। পরদিন করাতিপাড়া। তারপর গোরান-সাটিয়াচোয়ায় পাকিস্তানী আর্মি সঙ্গে টাঙ্গাইলের মুক্তিবাহিনীর প্রথম লড়াই হলো। রাস্তায় দু ধারে লুকিয়ে থাকা ,মুক্তিবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানী আর্মির বেশ কয়েকটি গাড়ি উল্টে গেল, প্রস্তুত হবার আগেই মারা পড়লো অনেক জওয়ান। তারপর শুরু হলো পাল্টা আক্রমণ, ভারী ভারী কামানের গোলা ও হেলিকপ্টারে মেশিনগানের ট্র্যাফি-এ মুক্তিবাহিনী দাঁড়াতে পারলো না।

থানা গুলোতে আবার উড়লো পাকিস্তানী পতাকা, কিছু লোক যারা বাংলাদেশ স্বাধীন করবে বলে লাফিয়েছিল তারা মুহর্তে ভোল পাল্টালো। রাজনৈতিক নেতারা টাঙ্গাইলের আস্তানায় ছেড়ে কেউ কেউ লুকালেন গ্রামে, অনেকেই চলে গেলেই ভারত সীমান্তের দিকে। কাদের সিদ্দিকি কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করতে রাজি নয়, সে তার ছোট দলটি নিয়ে এবং কয়েকটা গাড়িতে যতদুর সম্ভব অস্ত্র-রসদ সংগ্রহ করে আত্মগোপন করতে চলে গেল পাহারী জঙ্গলে।

অসীম ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে সে কিছুদিনের মধ্যেই গড়ে তুললো নিজস্ব এক মুক্তিবাহিনী। অকস্মাৎ এই বাহিনী কোনো থানা আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয় কিংবা রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী আর্মির ঘাঁটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেশ সৈন্যকে খতম করে আবার পালিয়ে যায় জঙ্গলে। এই বাহিনীকে দেখা যায়া না, ধরা ছোঁওয়া যায় না। সরকার থেকে ঘোষণা করা হলো, দেশদ্রোহী কাদের সিদ্দিকীকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পাকিস্তানের দুশমন এই কাদের সিদ্দিকীকে কেউ আশ্রয় দিলে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। তবু গ্রামের মানুষ কাদের ও তার সঙ্গী-সাথীদের আশ্রয় দেয়, রাত দুপুর তারা এসে পড়লো। রান্না করে খাওয়ায়। পাকিস্তানী বাহিনীর ওপর তার চোরাগোপ্তা আক্রমণও অব্যাহত রইলো। কাদের দল শুধু পাকিস্তানী শক্তিকেই আঘাত করে না, হঠাৎ এক- একাটা গ্রামে উপস্থিত হয় কুখ্যাত কোনো বিশ্বাসঘাতক বা দালালকে ধরে সকলের সামনে তার বিচার করে, দোষী প্রমাণিত্ত হলে তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করে মারে। চোর-ডাকাতরাও এখন এই মুক্তিবাহিনীকে ভায় পায়।

গ্রামে গ্রামে রটে গেল কাদের সিদ্দিকী অর্থাৎ বজ্র ভাই অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তার আর একটা ডাক নাম হলো টাইগার এবং তার দলটির নাম কদেরিয়া বাহিনী।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মুক্তিবাহিনী পিছু হঠতে হঠতে শেষপর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত পার হয়ে গেছে। এখন ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের তত্ত্বাবধানে তাদের প্রশিক্ষণ ও গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু টাঙ্গাইলের এই কাদেরিয়া বাহিনী সম্পূর্ন নিজেদের চেষ্টায় কী করে এখন ও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে? প্রথমে মুজিব নগরের বাংলাদেশা সরকার কিংবা ভারতীয় সহায়ক সেনানীরা এই বাহিনীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে চায়নি, কিন্তু পাকিস্তানী ফোর্সের ওয়্যারলেস মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করে এদের খবর পাওয়া যেতে লাগলো। পাকিস্তানী ফোর্স এদের হামলায় ব্যতিব্যস্ত, কোথাও তাদের ক্ষতি মারাত্মক। দুর্ধর্ষ পাকিস্তানী বাহিনীর বেষ্টনীর মধ্যে এসে এরা হামলা চালিয়ে যায়।

স্বাধীন বাংলা বেতারের চরমপত্রে এবার টাঙ্গাইলের এই বিচ্ছুদের গাজুরিয়া মাইরের কথা বলা হতে লাগলো। বিদেশের কয়েকটি সংবাদপত্র বিস্ময় প্রকাশ করা হলো। ক্রমে জানা গেল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ছ' সাত হাজার মুক্তিযোদ্ধার একটি সুশৃঙ্খল, নিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠেছে।

এরই মধ্যে একদিন গাটাইল-ধালপাড়া সম্মুখ যুদ্ধে একটা ঘাটনা ঘটে গেল। অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে কাদের এল এম জি নিয়ে হানাদার খতম করে যাচ্ছে, হঠাৎ ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো তার ডাত হাত দিয়ে। কী হয়েছে কিছুই বুঝতে পারলো না। সে, কিন্তু তার সারা গায়ে রক্ত, এমনকি তার এল এম জি-টাও রক্তে ভেসে যাবার উপক্রম। সেই অবস্থায় গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে রাস্তায় পাশের ঢালু জমি দিয়ে নেমে গেল। নিজের সর্ম্পক তার চিন্তা করার সময় নেই, এই যুদ্ধে হানাদারদের যথেষ্ট ক্ষতি হলেও কাদের সহযোদ্ধা হাতেম শাহাদাৎ মৃত্যুবরণ করেছে।

কিছু পরে নিরাপদ জায়গায় সরে এসে একটা চালাঘের আশ্রয় নিয়ে কাদের পরীক্ষা করে দেখলো নিজেকে। শত্রুপক্ষের একটা গুলি এসে তার এল এম জি-র ফোরসাইট নবে লাগে। নবটা ভেঙে

সপ্লিনটার তার ডান হাতের তালু ভেদ করে চলে গেছে, আর বুলেটটা এক হাঁটুর ইঞ্চিখানেক ওপরে ঢুকে বসে আছে। সর্বাধিনায়কের এই অবস্থা দেখে কয়েকজন, মুক্তিযোদ্ধা মাটি আছড়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। কাদের তার হাঁটুর কাছে প্যান্ট ছিড়ে ক্ষতস্থানটায় ঢুকিয়ে দিল বাঁ হাতের কড়ে আঙুল। খানিকটা টেপাটেপি করতেই বেরিয়া এলো গুলিটা। কাদের তার সঙ্গীদের বললো, কাঁদছিস কেন? এই দ্যাখ আমার কিছু হয়নি, আমি ঠিক আছি!

ভারতীয় সীমান্তের ওপাশের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পের সঙ্গে এর আগেই যোগাযোগ হয়েছিল। এখন সেখানে হঠাৎ খবর এলো, পাকিস্তানী বাহিনী সর্বত্র সগর্বে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে ধলাপড়ার যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী খতম হয়ে গেছে। পাকিস্তানী ফৌজ মিষ্টি বিতরণও শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু তাদের সেই আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হলো না, আহত অবস্থায় প্রায় দেড় শো মাইল পায়ে হেঁটে অনেকগুলি নদী পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত বুগাই নদীর অপর পারে ভারতীয় শিবিরে এসে উপস্থিত হলো কাদের সিদ্দিকী। অনেক চমকপ্রদ অভিযানের নায়ককে এবার সশরীরে জলজ্যান্ত অবস্থায় দেখা গেল। আহত হলেও সে কাহিল হয়নি, টাইগার নামটি তাকে মানয়।

ভারতীয় এলাকায় চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হবার পর প্রচুর সংবর্ধনা পাচ্ছিল কাদের, তবু সে দারুণ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আবর ফিরে গেল নিজের এলাকায়। নিজের বাহিনী ছেড়ে সে দূরে থাকতে চায় না, সে আবার লড়াই চালিয়ে যেতে চায়, টাঙ্গাইল শত্রু মুক্ত করার জন্য।

ধলেশ্বরী নদীর বুকে এই বাহিনী একদিন এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিয়ে দিল। নারায়ণগঘঞ্জ থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদ ভর্তি সাতটি স্টিমার ও জাহাজ চলেছে উত্তরবঙ্গের দিকে। টাঙ্গাইল, শহর এখন পুরোপুরি পাকিস্তানী সামারিক বাহিনীর অধীনে, এ ছাড়া কালিহাতি ঘাটাইল সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, মধুপুরেও হানাদারদের প্রচুর অস্ত্র ও সৈন্য মজুত। সেই জন্যই জাহাজগুলি চলেছে নিশ্চিন্তে, ঢিলোঢালা গতিতে। কিন্তু এরই মধ্যে ভয়াপুর নামে ঐ জাহাজ চলাচলের খবর। কাদের সিদ্দিকী সেখানে নেই, তবে সে নদীপথের ওপরা নজর রাখার পরামর্শ দিয়ে রেখেছে। ঐ জাহাজগুলির একটি বাঙালী সারেং গোপনে কিছু খবরও পাঠিয়েছে। সর্বাধিনায়ক ভুয়াপুরের ঐ মুক্তিবাহিনীর ইউনিটকে জাহাজগুলি আক্রমণ করার নির্দেশ পাঠালো।

এটা একটা অসম্ভব প্রস্তাব। এ যেন ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের এক দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতন। গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও সামান্য কিছু অস্ত্র নিয়ে কি পাকিস্তানী নৌবাহিনী মোকাবিলা করা যায়? কিন্তু এত সব অস্ত্র গোলাবারুদ উত্তরবঙ্গে পৌছোলে সেখানে পাকিস্তানী সীমান্ত রক্ষীনা দুর্জয় হয়ে উঠবে। মুক্তিবাহিনীরও সাঙ্ঘাতিক অস্ত্রের ক্ষুধা।

অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যই তারা লেগে পড়লো। ধলেশ্বরীর ধারে মাটি-কাটা নামে একটি গ্রাম, সেখানে ঘাপটি মেরে বসে রইলো মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ছোট দলের কমান্ডার মেজর হাবিবও তার কয়েকজন সঙ্গী। এর আগে ছেঁড়া লুঙ্গি পরে, মাথায় গামছা বেঁধে ও কাঁধে ঝাঁকি জাল ঝুলিয়ে সাধারণ গ্রাম জেলের ছদ্মবেশে হাবিব জাহাজগুলোর কাছ থেকে ঘুরে এসেছে, পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলে এসেছে। ওদের মনে কোনো রকম উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই।

হাবিবের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা মাত্র আঠোরো জন, আর সঙ্গে আছে দু'ইঞ্চি মর্টার তিনখানা, ছ;টা এল এম জি কয়েকটি চাইনিজ ও ব্রিটিশ রাইফেলও একটি ব্রিটিশ রকেট লঞ্চার। সাতটি জাহাজ সমান দূরত্ব রেখে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে, হাবিব আগেই বলে রেখেছে যে সে প্রথম গুলি না ছুঁড়লে অন্য কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। একটি জাহাজ পার হয়ে গেল, অল্প-বয়েসী ছেলেরা অস্ত্র হাতে ছটফট করছে, কিন্তু হাবিব, স্থির। দুটি জাহাজ গেল, তিনটি জাহাজ গেল, তবু হাবিব অস্ত্র তুললো না।

নদীর মাঝখানে চর, পূর্ব দিকে জলের গভীরতা বেশী, জাহাজগুলি যাচ্ছে সেইদিকে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারাও সেই পাড়েই বসে আছে। পাঁচখানা জাহাজ পার হয়ে যাবারা পর শেষ দুটি জাহাজ এলো, তাদের আকার বিরাট, আগাগোড়া ত্রিপলে ঢাকা। ওপর অস্ত্র কোলে নিয়ে পাহারাদার সৈন্যরা গল্পগুজব করছে। রেঞ্জের মধ্যে আসতেই মেজর হাবিবের এল এম জি গুলি বর্ষণ শুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের অস্ত্রগুলো একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে কোনো রকম প্রতি-আক্রমণও এলো না প্রায়। কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য প্রথম গুলির ঝাঁকে প্রাণ দিল রাকিরা প্রাণ ভয়ে লাফিয়ে পড়লো নদীতে। অগ্রবর্তী জাহাজ গুলো

সাহায্যের জন্য পিছিয়ে এলো না, বরং তারা যেন আরও ভয় পেয়ে গতি বাড়িয়ে পালালো সিরাজগঞ্জের দিকে। তারা কল্পনাই করতে পারেনি যে, মুক্তিবাহিনী এত বড় দুটি জাহাজকে আক্রমণ করতে সাহস করবে। তা ছাড়া, জাহাজ দুটি গোলাবারুদে ঠাসা যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে সবশুদ্ধ উরে যেতে পারে।

জাহাজ দুটো ঠেকে গেল মাটির চড়ায়। তখনি বিস্ফোরণ ঘটলো না। অসমসাহসী হাবিব তিন-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে একটা ছোট নৌকোয় চেপে একটা জাহাজে উঠলো। এদিকে ওদিকে কয়েকটি মৃতদেহ ছড়ানো, আর জাহাজভর্তি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কার্তুজ, বুলেট ও কামানের গোলা, এ ছাড়া কিছু কমান ও মর্টার।

কাছাকাছি গ্রাম থেকে দলে দলে ছুটে এলো স্বেচ্ছাসেবকেরা। নামানো শুরু হলো অস্ত্র ও গোলাবারুদ। প্রায় পাঁচশো জন লোক ছ' ঘন্টা ধরে ওঠা-নামা করেও সেই দুটি জাহাজের এক-চতুর্থাংশের বেশী অস্ত্র গোলাবারুদের পেটি খালাস করতে পারলো না। আর দেরি করা যায় না, যে-কোনো মুহূর্তে হানাদার বাহিনী ফিরে আসবে। জাহাজ দুটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। তার আগেই অস্ত্রভর্তি নৌকাগুলো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে সকলের স্থানত্যাগ করাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

পরবর্তী কয়েক দিন ধরে চললো সেই অগ্নিদগ্ধ জাহাজ দুটি থেকে গোলাবারুদের বিস্ফোরণ, কানে তালা ধরানো ভায়ংকর শব্দ। প্রতিশোধ নেবার জন্য তিন দিক থেকে এগিয়ে এলো পাকিস্তানী সৈন্যদল, আকাশ দিয়ে উড়ে এলো দুটি বিমান, একসঙ্গে গোলা বর্ষণ করেও তারা মুক্তিবাহিনীর গায়ে আঁচড় বসাতে পারলো না, তারা তখন একটার পর একটা সেতু ধ্বংস করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তান বাহিনীর দুটি জাহাজ সমেত প্রায় একুশ কোটি টাকার অস্ত্র ধ্বংস করে ফেললো গুটি কয়েক বাঙালি ছেলে, যাদের মধ্যে অনেকেই মাত্র কয়েক মাস আগেও কোনো অস্ত্র ছুঁয়ে দেখেনি।

॥ ৪২ ॥

আগরতলা থেকে চাপলো সিরাজুল। এর আগে আকাশ দিয়ে সে প্লেন উড়তেই দেখেছে শুধু সে যে কখনো আকাশপথের যাত্রী হবে, তা যেন স্বপ্নেও ভাবেনি। তার ধারণা ছিল প্লেনে বুঝি শুধু সুট-টাই বড়লোকরাই যাওয়া আসা করে, কিন্তু আগরতলার এই প্লেনের অনেক যাত্রীরই চেহারা ও পোশাক গ্রামে-গঞ্জে দেখা মানুষের মতন। কেউ কেউ সঙ্গে এনেছে চটের থলে, তার থেকে উপচে বেরিয়ে আসছে লাউ -কাঁঠাল। অনেকদিন পর সিরাজুল নিজেই পরেছে পরিষ্কার নতুন জামা-কাপড়, পায়ে কেডস। তাকে দু' সেট পোশাক কিনে দেওয়া হয়েছে।

আকাশ আজ পরিষ্কার, বিমানের জানলা দিয়ে নীচের অনেক কিছুই দেখা যায়। প্রথম প্রথম তো ছোট ছোট বাড়ি ও মাঠের লাঙল হাতে চাষা আর গরুর পালও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল একটু পরে বন জঙ্গল ওপাহাড় তারপর একটা নদীতে পাল তুলে নৌকা যাচ্ছে। মোচার খোলার মতন ছোট্ট দেখাচ্ছে নৌকোগুলোকে, তবু ঐ নদীর দৃশ্য দেখে সিরাজুলের বুকটা মুচড়ে উঠলো। এটা কি তার খুব চেনা মেঘনা নদী? ইন্ডিয়ার প্লেন কি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যায়?

তার পাশ থেকে মতিনও গলা বাড়িয়ে জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, তাকে সিরাজুল জিজ্ঞেস করলো, এইডা কোন নদী রে?

মতিনও বলতে পারে না। আকাশ থেকে দেখা ভূ-চিত্র সম্পর্কে তারও কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

ওদের সামনের সীটে বসেছে নির্মল আর জাহাঙ্গীর। এই চারজন এসেছে কাছাকাছি ক্যাম্প থেকে পরস্পরের চেনা। এখনও ওরা কেউই জানে না যে ওদের গন্তব্য কোথায়।

দুটি সুন্দরী এয়ার হস্টেস দু' পাশ দিয়ে খাবারের প্যাকেট আর চা দিয়ে গেল। প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে দুটি স্যাণ্ডইচ একটি চপ ও একটি মিষ্টি। সিরাজুল মতিনের দিকে তাকালো, দু'জনে নিঃশব্দে একই কথা বলতে চাইছে। একদিন আগেও ওরা ছিল ক্যাম্পে, সেখানে মানুষের ভিড়ে একেবারে গাদাগাদি, প্রবল বৃষ্টিতে চারপাশে থিকথিকে কাদা আর ব্লিচিং পাউডারের কটু গন্ধ দু'বেলা খিচুড়ি খেতে খেতে জিভে আর কোনো স্বাদ ছিল না। আর এখন তারা এরোপ্লেনের মধ্যে বাবু সেজে স্যাণ্ডইচ খাচ্ছে। ঠিক যেন সিনেমার মতন।

ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল দমদম বিমানবন্দরে।

এই তা হলে কলকাতা! সিরাজুলের এক মামু একসময় কলকাতায় চাকরি করেছে, পার্টিশানের

আগে, সেই মামুর কাছ থেকে সে কলকাতা সম্পর্কে অনেক লম্বা-চওড়া গল্প শুনেছে। কলকাতার রাস্তায় নাকি মানুষ হারিয়ে যায়। সারা রাত দোকান খোলা থাকে, পয়সা দিলে বাঘের দুধও মেলে। ছেলেবেলার শোনা সেই গল্পের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প শোনা অনেক খবর মিলে যায়। কলকাতায় রয়েছেন তাজউদ্দীন, সৈয়াদ নজরুল ইসলাম ও সার্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী। কলকাতায় নকশাল ছেলেরা যখন-তখন পলিশ খুন করে রাস্তায় যে-কোনো সময়ে বোমা ফাটে, আবার তারই মধ্যে অনেক গান-বাজনার অনুষ্ঠান হয়। সিরাজুলের প্রিয় গায়ক দেবব্রত বিশ্বাসকে স্বচক্ষে দেখা যায় বহু ফাংশানে।

সিরাজুলের বুক উত্তেজনায় ধক্ ধক্ করতে লাগল। সে যেন কল্পনায় দেখতে পেল, কর্নেল ওসমানী তার কাঁধ চাপড়ে বলছেন, তোমার কথা অনেক শুনেছি তোমাকে এবার আরও বড় দায়িত্ব নিতে হবে।

সিরাজুলদের তোলা হলো একটা ছাউনি দেওয়া আর্মি ট্রাকে। সেখানে তার মতন আরও পঁচিশ-তিরিশজনকে যুবক। এরকম পর পর চারটি ট্রাক, সেই ট্রাকের কনভয়টি বিমানবন্দর ছেড়ে ঘুরে গেল ডান দিকে। কলকাতা দেখার জন্য সিরাজুল আর মতিন উৎসুকভাবে চেয়ে রইলো বাইরের দিকে। কিন্তু খানিক্ষণ যাবার পরই মনে হলো তারা তো শহরে যাচ্ছে না ক্রমশই রাস্তার দু' ধারে গ্রামের মতন দৃশ্য চোখে পড়ছে। কেন যেন সিরাজুলের ধারণা ছিল যে তাদের দেশের তুলনায় পশ্চিমবাংলা অনেক শুকনো, খটখটে। কিন্তু এখানকার গ্রামের সঙ্গে তো তাদের গ্রামের কোনো তফাত দেখা যাচ্ছে না। একই রকম ধানের ক্ষেত, মাটির বাড়ি গরুর গাড়ি রাস্তার দু'ধারে খাল মাঝে মাঝে নদীর ওপরের ব্রিজ দিয়ে যাচ্ছে তাদের গাড়ি, রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেলে যে-সব মানুষজন যাচ্ছে, তাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান বলে চেনা যায়। চোখ পড়ে মসজিদ-মাজার।

তবু তফাত একটা আছে ঠিকই। এখানে যুদ্ধের করাল ছায়া নেই। রাস্তা দিয়ে যে এতগুলো আর্মি ট্রাক যাচ্ছে, সেদিকে কেউ মুখ তুলেও তাকাচ্ছে না।

সিরাজুলদের যে ইন্ডিয়া মধ্যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, সে সম্পর্কে তাদের সেকটর কমান্ডারও কিছু বলেননি। তাদের শুধু জানানো হয়েছিল যে ক্যাম্প সি-২ পি-তে তাদের পাঠনো হচ্ছে একটা বিশেষ ট্রেনিং এর জন্য।

প্রায় বিকেলের দিকে ট্রাকগুলি বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠে মধ্যে নেমে এসে আরও বেশ কিছুটা দুর যাবার পর একটা গাছপালা ঘেরা জায়গায় থামলো। এখানে [illegible] চল্লিশ পঞ্চাশটি তাঁবু খাটানো রয়েছে, রাইফেলধারী সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে গেটে।

প্রথমে সবাইকে দাঁড় করিয়ে একজন পাঞ্জাবী অফিসার মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানিয়ে বললেন, আজ কোনো কাজ নেই, আজ যার যার থাকার জায়গা বুঝে নিয়ে তারপর বিশ্রাম। এখানে ভলিবল খেলার ব্যবস্থা আছে, যার ইচ্ছে সে খেলাতেও অংশ নিতে পারে। সন্ধের পর ক্যান্টিনে সিনেমা দেখানো হয়। কাল ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ট্রেনিং শুরু হবে। শিক্ষার্থীদের প্রতি একটাই অনুরোধ, তারা যেন কোনোক্রমেই কখনো বিনা অনুমতিতে ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে না যায়।

সিরাজুলেরা চারজনে একটাই তাঁবু পেয়ে গেল। জাহাঙ্গীর উত্তেজিত ভাবে বললো, তোরা জানোস,এই অঞ্চলটার নাম পলাশী। আমি রোড সাইন দেখছি!

মতিন বললো, কোন পলাশী? আমরা ইতিহাসে যে পলাশীর নাম পড়ছি?

জাহাঙ্গীর বললো, আর কোন্ পলাশী হবে? এইডা একটা হিস্টোরিক্যাল সাইট! বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ধারেকাছেই হবে মনে হয়।

নির্মল বললো আসার পথে অনেকগুলো আমগাছ দ্যাখলাম। তাহলে এইডাই বোধ করি সেই পলাশীর আম্রকানন। চল, একটু ঘুইরা-ফাইরা ক্যাম্পটা দেখি!

বিছানা-টিছানা সাজিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়লো। এখানের আর্মি ক্যাম্পটি নতুন মনে হয়, সবকিছুই পরিষ্কার, ঝকঝকে। একপাশে গোটা বারো আরমারড কার, সেগুলির লম্বা লম্বা কামানের নল দেখলে মনে হয়, এখনো একবারও ব্যবহার করা হয়নি। ওরা সেগুলোর খুব কাছে গেলেও কেউ বাধা দিল না। একদিকে অফিসার্স কোয়ার্টার সেখানে খাঁকি হাফ প্যান্ট ও গিট বাঁধা একজন সর্দারজী জিজ্ঞেস করলো আও খেলো গে?

সিরাজুলরা কেউ তখনই খেলতে চাইলো না, তারা জানালো, তারা শুধু দেখতে এসেছে।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা এলো ক্যান্টিনে। এটা একটা কাছেই টেবিল টেনিস-এর বোর্ড। এখানে সিগারেট, চকলেট, সাবান, ব্লেড ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায়। আগরতলায় প্লেনে ওঠার আগে সিরাজুলদের প্রত্যেককে দু শো করে ভারতীয় টাকা দেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে দেখা গেল সেগুলো দাম খুবই শস্তা। জাহাঙ্গীর পাঁচ টাকা দিয়ে দশখানা চকলেট-বার কিনে ফেললো, তার একটা মুখে দিয়ে ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললো, জীবনে আর কোনোদিন যে চকলেট খামু তা ভাবি নাই! তোগো মনে হয় নাই যে ক্যাম্পের খিচুড়ি কিংবা হানাদারগো বুলেট খাইয়াই একদিন প্রাণডা বাইরইয়া যাবে?

সেই ক্যান্টিনে বসে ওরা ডক্টর কোটনীস কি অমর কাহনী নামে একটি হিন্দী সিনেমা দেখালো, ফিল্মের নায়ক একজন ভারতীয় ডাক্তার, সে বিপ্লবের সময় চীনে গিয়েছিল ডাক্তার-নার্সদের একটি দল নিয়ে আহতদের সেবা করতে। খুব মহৎ ব্যাপার, নাচ-গান বিশেষ নেই।

দেখতে দেখতে সিরাজুল ফিসফিস করে নির্মলকে জিজ্ঞেস করলো, ইন্ডিয়ানগো সাথে তো চায়নার এখন শত্রুতা তবু অরা আর্মিব্যারাকে এই সিনেমা দ্যাখায় ক্যান করে?

নির্মল বিজ্ঞের মতন বললো, এইডা অনেক পুরানো বই!

মতিন বললো নোটিস বোর্ডে দ্যাখলাম, এই শনিবার মোগল-ই-আজম দ্যাখাবে, সেই বইয়ের খুব নাম শুনছি!

খাওয়া-দাওয়া সেরে ওদের দশটার মধ্যে শুয়ে পড়তে হলো। পাশাপাশি চারখানা নেয়ারের খাটিয়া। অন্ধকারের মধ্যে চারটি সিগারেটের আগুন জ্বলছে। গতকাল রাত্রে ওরা ছিল আখাউড়া সীমান্তের এক ছোট ক্যাম্পের খড়ের শয্যায়, পাশের তাঁবু থেকে কেউ একজন হঠাৎ সাপ সাপ বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। তারপর ওরা আর ভালো করে ঘুমোতেই পারেনি। আজ ওদের বিছানায় নতুন নতুন গন্ধ তাতেও ঘুম আসতে চায় না।

এক সময় মতিন বললো, আজই যে আরমারড কারগুলো খ্যালেই ভয়ে প্রাণডা কাঁপতো। এখন গায়ে হাত বুলাইলাম। একই তো গাড়ি!

জাহাঙ্গীর বললো, এই মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টে কোথায় জানি আমার বাবায় পোস্টমাস্টার আছিলেন। পাটিশানের পর অপ্‌শান দিয়া ঐধারে চইল্যা গ্যালেন। এইখানে নাকি আমাগো বাড়িও আছিল। বাবা-মা যে জায়গা ছাইড়া পলাইয়া গ্যালেন, আমি আবার সেহানেই আসলাম ট্রেইনিং নিতে। মজার ব্যাপার না?

সিরাজুল বললো, সিক্সটি ফাইভের ওয়ারের দিনগুলার কথা তোগো মনে আছে?

নির্মল বললো, হ, সেই সময় আমি অ্যানেস্ট হইছিলাম।

সিরাজুল বললো, সেই সিক্সটি ফাইভে এই ইন্ডিয়ান আর্মি আমাগো চোখে ছিল কী দারুণ দুশমন। আর এখন তাগো ক্যাম্পেই আমরা শুইয়া আছি। হুঁ, মজা না মজা! অবস্থা ক্যামনে বদলায়।

মতিন বললো, ইন্ডিয়ান আর্মির বড় বড় অফিসার সবই তো দেখি পাঞ্জাবী! আমাগো ঐদিকের মেজর -মুজর, ক্যাপ্টে-ম্যাপ্টেনগুলাও পাঞ্জাবী! কে যে কখন ফ্রেন্ড আর কখন এনিমি হয়, ঠিক নাই!

জাহাঙ্গীর বললো, পঁয়ষট্টির সেই যুদ্ধের ফ্যাচাংয়ে আমি লাহোরে আটকা পড়ছিলাম, ইন্ডিয়ান আর্মির বোমার গুঁতা খাইয়া মইরা যাইতেই তো পারতাম তখন। আর আইজ ইন্ডিয়ান আর্মি ক্যাম্পে মুর্গীর মাংস আর রুটি খাইলাম। সবই কপাল!

মতিন বললো, আবার কোনদিন আমাগো ইন্ডিয়ান আর্মির এগেনস্টেই লড়াই করতে হবে কিনা তাই-ইবা কে জানে!

নির্মল বললো, মাংসে বেশি ঝাল দিছিল, নারে?

সিরাজুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরলো হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে মনিরার মুখখানা। কী ঝাল খেতেই না ভালোবাসতো মেয়েটা! সে বলতো, বেশ ঝাল দিলে শুধু কলমী শাক দিয়েই এক থাল ভাত খাওন যায়।

পরদিন ভোর পৌনে পাঁচটায় বিউগ্‌ল বাজলো। আগেই নির্দেশ দেওয়া ছিল, ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে সামনের মাঠে ফল্ ইন করতে হবে। বাইরে ভালো করে আলো ফোটেনি, তবু ওরা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে শুরু করে দিল হুড়োহুড়ি।

প্রথম কয়েকদিন ফিজিক্যাল ট্রেইনং আর দৌড় করানো হলো ওদের। তারপর এক সপ্তাহ ধরে

শুধু সাঁতার। ক্যাম্পের পাশেই একটা বড় পুকুর আছে, কিছুদূরে রয়েছে একটা সদ্য কাটা খাল, এই বর্ষার জলে একেবারে টইটম্বুর ভরা। ছোট ছোট দলে ভাগ করে সাঁতারের প্রতিযোগিতা হয়। একজন সুবেদার স্টপ ওয়াচ নিয়ে রেকর্ড করে, কে কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাকতে পারে জলের তলায়। কিংবা ডুবো সাঁতারে কে কতখানি দূরে যায়।

এদিককার পানি একটু ভারি, সাঁতার কাটার পক্ষে তেমন সুবিধেজনক নয়, তবু সিরাজুল কয়েকদিনেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। ডুবসাঁতারে তার রেকর্ড কেউ ছুঁতে পারে না। গোটা ক্যাম্পের মধ্যে সিরাজুল চ্যাম্পিয়ন।

হঠাৎ একদিন মাঝ রাত্রে ওদের ঘুম থেকে তুলে এনে দশ বারোজনের একটি দলকে চাপানো হলো গাড়িতে। মিনিট পনেরো পর একটা নদীর ধারে গাড়ি থামলো। চতুর্দিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, এর মধ্যেই তাদের সাঁতরে নিলে সাঁতারের পরিশ্রম কম হয়, শব্দ ও কম হয়।

পর পর কয়েকটা রাত নদীতে সাঁতারের কাটার পর এক রাতে একটা চমকপ্রদ কাণ্ড হলো। সে রাতে দেখা গেল, নদীর মাঝখানে স্থির হয়ে রয়েছে এক লঞ্চ, সেটা আলোর মালার সাজানো। চতুর্দিকের নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে সেটাকে দেখাচ্ছে যেন স্বপ্নপুরীর মতন। সেটার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং প্রত্যেকের হাতে লিমপেট মাইন দিয়ে বললেন, নিঃশব্দে মাঝনদীতে সাঁতারে গিয়ে ঐ লঞ্চের লোকেরা যেন কিছু টের না পায়।

চারজনের ছোট দলটির নেতা নির্বাচিত হলো সিরাজুল। যাওয়া-আসা মিলিয়ে সময় ঠিক আধ ঘন্টা।

কাজটা খুব শক্ত মনে হলো না সিরাজুলের। এই নদীর নাম ভাগীরথী, আবার স্থানীয় লোক একেই বলে গঙ্গা। স্রোতের টান বেশী নেই। সিরাজুল গায়ে তেল চাপড়াতে লাগলো। পানিতে নামার আগে তার বরাবর গায়ে সর্ষের তেল মাখা অভ্যেস।

পাঁচজনে নিঃশব্দে সাঁতারে গিয়ে লঞ্চের গায়ে লিমপেট মাইন আটকে দিল স্বচ্ছন্দে। লঞ্চের মধ্যে খুব খানাপিনা নাচ গান হচ্ছে মনে হয়, কেউ ওদের দেখতে পায়নি। কাজ সেরে ওরা ফিরতে শুরু করার দু-তিন মিনিট পরেই অকস্মাৎ যেন বজ্র গর্জন শুরু হয়ে গেল। এই আওয়াজ সিরাজুলের চেনা। ডেকের ওপর ছোটাছুটি করছে অনেক অনেক মানুষের ছায়া।

সিরাজুল প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। কী ব্যাপার, এটা কি পাকিস্তানী জাহাজ? আজ রাতে সত্যিকারের কোনো অপারেশান? তাদের কিছুই বলা হয় নি! এখন প্রাণে বাঁচার একমাত্র উপায় ডুবসাঁতার।

একবার মাথা তুলতেই সিরাজুল মতিনের কাতর গলা শুনতে পেল, উঃ মইলাম রে, মইলাম!

কাছেই আর একটা মাথা দেখে সিরাজুল বললো, নির্মল, ওরে ধরা! মাথা ডুবাইয়া থাক।

অতি কষ্টে ওরা পাড়ে এসে পৌঁছে আরও অবাক হলো। সুবেদার জ্ঞান সিং নেই, গাড়ি নেই, কেউ নেই। ওদের কি মৃত্যু ভেবে অন্যরা চলে গেছে? জাহাঙ্গীর একটু দূরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে, কিন্তু তার গুলি লাগেনি, একমাত্র আহত হয়েছে মতিন। এ জায়গাটা যদি পাকিস্তানী সৈন্যদের এলাকা হয়, তাহলে এখানে বসে থাকা একটুও নিরাপদ নয়। মতিনকে বয়ে নিয়ে ওরা ছুটলো।

যে রাস্তাটা দিয়ে গাড়ি এসেছিল, আন্দাজে সেই রাস্তা বুঝে বুঝে ওরা এগোতে লাগলো। হাতে কোনো অস্ত্র নেই বলেই সিরাজুল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে। শত্রুর মুখোমুখি পড়ে গেলে অন্তত একজনকেও খতম করা যাবে না?

এক সময় দেখা গেল তাদের ক্যাম্পের আলো। গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং, সে এগিয়ে এসে সিরাজুলকে জাপটে ধরে বললো, ব্রাভো! ব্রাভো! তুমনে কামাল কিয়া, সিরাজুল! এক্সেলেন্ট টাইমিং!

সবটাই ট্রেইনি! গুলি থেকে আত্মরক্ষা করা, অন্ধকার রাস্তা খুঁজে ক্যাম্পে আসা, এই সবকিছুই। মতিনের আঘাত গুরুতর নয়, সে ভয় পেয়েছে বেশী। মেশিনগানের ফায়ারিং হয়েছে আকাশের দিকে, আর ওদের দিকে ছোঁড়া হয়েছে ছররা। তারই একটা লেগেছে মতিনের পায়ে। মেশিনগানের গুলি ভেবে সে এরমধ্যেই প্রায় মুহূর্ছ হয়ে পড়েছিল।

ব্রগেডিয়ার জ্ঞান সিং বললেন, আজ দারুণ আনন্দের রাত। এইমাত্র মেসেজ এসেছে যে

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের ফ্রেন্ডশীপ ট্রিটি সাইন্‌ড হয়েছে। কুড়ি বৎসরের মৈত্রীচুক্তি। গ্রোমিকো দিল্লিতে এসে ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীর যে-কোনো দেশ ভারতকে আক্রমণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পাশে এসে দাঁড়াবে।

অনেক রাত পর্যন্ত হৈ চৈ করে মিষ্টি খাওয়া হলো। ভাংরা নাচ নেচে দেখালো কয়েকজন জওয়ান। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলা গান গাইলো সমস্বরে।

ঠিক একমাস পাঁচ দিন পর ট্রেনিং সমগু করে সিরাজুলদের দলটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কলকাতায়। শেষের কয়েকটা দিন সিরাজুল অস্থির বোধ করছিল, এদের এখানে তার সাঁতারের ব্যাপারে আর কিছু শেখার নেই। এই ক্যাম্পে ভালো খাওয়াদাওয়া হয় বটে, কিন্তু সে রণাঙ্গনে ফিরে যেতে চায়। মনিরার কথা মনে পড়লেই শক্ত হয়ে ওঠে তার চোয়াল।

কলকাতায় এসে হঠাৎ তারা ছুটি পেয়ে গেল। তাদের রাখা হলো বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটা ফাঁকা ফ্ল্যাটবাড়িতে, যাওয়া-আসার কোনো কড়াকড়ি নেই, ভোরে উঠেই ট্রেইনিং-এর বালাই নেই, শুধু খাও-দাও, ঘুমোও আর ইচ্ছেমতন ঘুরে বেরাও।

সিরাজুলেরা বাংলাদেশ মিশন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, নাখোদা মসজিদ, জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের বাড়ি দেখলো, চিৎপুরের রয়াল হোটেলের বিখ্যাত চাঁপ ও রুমালি রুটির স্বাদ নিল। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করার খুব সাধ সিরাজুলের, বাংলাদেশ মিশনের একজন কর্মীকে ধরে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও ঠিক হলো দু'দিন পরে। সেই কর্মীটি বললো, আইজ ময়দানে কলকাতার সাহিত্যিক-শিল্পীদের খুব বড় মিটিং আছে, দ্যাখতে যাইবেন নাকি? বাংলাদেশের সাপোর্টে...

সেখান দেবব্রত বিশ্বাসকে দেখতে পাওয়া যেতে পারে এই আশায় সিরাজুল যেতে রাজি হলো। সিরাজুলরা পৌঁছোবার আগেই সভা শুরু হয়ে গেছে, বক্তৃতা দিচ্ছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সে বক্তৃতার একটি অক্ষরও শোনা হলো না সিরাজুলের। বড়রাস্তা পেরিয়ে, টাটা বিল্ডিং-এর উল্টোদিকের ময়দানে সবে মাত্র পা দিয়েছে সে, এমন সময় এক নারী তাকে জিজ্ঞেস করলো, এই, তুমি রিাজুল না?

জীবনে যেন এতটা কখনো চমকে ওঠেনি সিরাজুল। বস্তুত কলকাতায় এসে একবারও মঞ্জুর কথা মনে পড়েনি তার। মনে পড়লে তো এসেই সে মঞ্জুর খোঁজ করতো। গত কয়েক মাসে মনিরা ছাড়া আর কোনো নারীর কথা তার চিন্তায় স্থান পায়নি। সেইজন্যে মঞ্জুই তাকে প্রথম দেখেছে! এখন সিরাজুলের চোখের সামনে থেকে যেন আর সবকিছু মুছে গেল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক পরমা রূপবতী রমণী। শুধু রমণী নয়, সিরাজুলের চোখে দয়াবতীও, মনিরাকে মঞ্জু ছোট বোনের মতন ভালাবাসতো, তাদের দৈন্য-অপমানের দিনে মঞ্জু তাদের কত আপন করে নিয়েছে।

যেন কৃতজ্ঞতার শোধ দেবার জন্যই সিরাজুল প্রথমেই বললো, মঞ্জুভাবী! বাবুলভাই ভালো আছে! আপনারা কোথায় উঠেছেন! কোনো অসুবিধা নাই তো!

যেন একজন নিকট-আত্মীয়কে দেখেছে মঞ্জু, আনন্দে তার চোখে জল এসে গেল। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, সিরাজুল, তুই কলকাতায় আসলি কবে? আমাদের সাথে দেখা করিস নাই!

সিরাজুল বললো, আমি তো জানি না, আপনেরা কোথায় আছেন।

মঞ্জু অভিমানের সঙ্গে বললো, বাংলাদেশ মিশনে মামুনমামাকে সকলেই চেনে। সিরাজুল, তোর সাথে ওনার দেখা হয়েছিল? উনি কোথায়?

–ভাবী, বাবুলভাই আর আমি এক ক্যাম্পে আছি। বাবুলভাই এখনে ভালো আছেন, সেই যে চোট লেগেছিল, এক্কেবারে সেরে উঠেছেন।

–কিসের চোট লেগেছিল?

–ও, তাও আপনি জানেন না? জানবেনই বা ক্যামনে। সে এমন কিছু না, পায়ে গুলি লেগেছিল। এখন বাবুলভাই ফ্রিডম ফাইটার। অনেক চেইঞ্জ হয়ে গেছে মানুষটার।

–তুই একা আসছোস, সিরাজুল? মনিরা কই?

–মনিরা?

সিরাজুল উদ্‌ভ্রান্তের মতন তাকালো তার সঙ্গী মতিন, নির্মল, জাহাঙ্গীরের দিকে। তারা চোখের ইসারায় মঞ্জুকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু মঞ্জু বুঝলো না। সে আবার সরল ভাবে জিজ্ঞেস

করলো, মনিরা আসে নাই? তারে কোথায় রেখে আসলি?

স্থান-কাল ভুলে গেল সিরাজুল। সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মাটিতে।

তাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে, মিটিঙ থেকে খানিকটা দূরে একটা বড় রেইনট্রি গাছের তলায় বসলো এই ছোট দলটি। তারপর দুঃখের কাহিনী বিনিময় হতে লাগলো। সিরাজুল আর মঞ্জু দু'জনেই কেঁদে ভাসালো বুক।

একটু পরে মঞ্জুদের উঠতে হলো, আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন মামুন। সিরাজুলদেরও সন্ধেবেলা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বি এস এফ-এর একজন অফিসারের সঙ্গে। তাই ঠিক হলো, আগামীকাল দুপুরে সিরাজুলরা চারজনেই খেতে যাবে মঞ্জুদের কাছে, মঞ্জু বাবুল চৌধুরীর নামে চিঠি লিখে দেবে। চোখের জল মুছে ওরা চলে গেল দু'দিকে।

সিরাজুলরা নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরতেই দেখলো বি এস এফ-এর অফিসার মেজর যশোবন্ত চোপরা আগে থেকেই বসে আছে। ওদের দেখেই বললো, অর্ডার এসে গেছে, প্যাক, আপ ইয়োর থিংস! আজ রাতেই এয়ার ফোর্সের প্লেনে তোমাদের যেতে হবে।

সিরাজুল উত্তেজিত ভাবে বললো, আজ রাতেই যেতে হবে কেন? কোথায় যাবো? কোথায় যাবো?

মেজর চোপরা বললো, নো কোয়েশ্চেন! অর্ডার এসেছে যেতে হবে।

ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং যেরকম হাসিহাসি মানুষ, মেজর চোপরা সেরকম নয়। তার নাকের নীচে মস্ত বড় মোচ, ঠোঁটের ভঙ্গিতে উৎকট গাম্ভীর্য।

সিরাজুলরা আরও একটা দিন কলকাতায় থেকে যাবার জন্য সময় চাইলেও সে সেই অনুরোধে কর্ণপাতও করলো না। তখন সিরাজুল প্রায় বিদ্রোহ করে বলে উঠলো, বাংলাদেশ সরকার কিংবা মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর কোনো কমাণ্ডারের নির্দেশ না পেলে সে মেজর চোপরার আদেশ মানতে বাধ্য নয়।

মেজর চোপরা এবার সামান্য একটু হাসলো। তারপর বললো, শোনো, অপারেশন জ্যাকপট শুরু হবে কাল থেকে। তোমাদের ট্রেইনিং দেওয়া হয়েছে সেইজন্য। তোমরা যদি এবার অপারেশানে যোগ দিতে না চাও, ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাও, তাহলে কি তোমাদের জোর করা হবে? মোটেই না! তোমরা তো ইন্ডিয়ান আর্মি কিংবা বি এস এফ-এর রিক্রুট নও। তোমরা মুক্তিযোদ্ধা, তোমরা স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে এসেছো, এখন যদি যুদ্ধ করতে না চাও, করো না! তোমরা ফ্রি, যেখানে খুশি যেতে পারো!

এ যে উল্টোরকম চাপ। তারা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে কে বললো? জাহাঙ্গীর আর নির্মল সিরাজুলের কাঁধে হাত রাখলো।

সিরাজুল বললো, আমরা নিশ্চয়ই অপারেশানে যেতে চাই! আমরা শুধু একটা দিন সময় চাইছি।

মেজর চোপরা বললো, নো ওয়ে! শোনো, পূর্ণিমা, জোয়ার-ভাটা, আবহাওয়া, বাতাসের গতি এইসব অনেক কিছু ক্যালকুলেশন করে টাইমিং ঠিক হয়। অপারেশান জ্যাকপট পরিচালনা করবে তোমাদের মুক্তিবাহিনীরই কমাণ্ডররা, আমরা নয়। আমরা যুদ্ধে নামিনি। তোমরা চেয়েছো বলে আমরা তোমাদের ট্রেইনিং দিয়ে সাহায্য করছি, জায়গামতন পৌঁছে দিচ্ছি। এক শো পঞ্চাশজনকে ট্রেইনিং দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ফাইনাল সিলেকশান করা হয়েছে ষাটজনকে, তোমরা তার মধ্যে আছো। তোমরা যেতে না চাও, কোনো অসুবিধে নেই, কলকাতায় থাকো, ফুর্তি করো। অন্য চারজন যাবে। তোমাদের আর কোনোদিন ডাকা হবে না।

এরপর আর ক্ষীণতম আপত্তিরও প্রশ্ন ওঠে না। জাহাঙ্গীর জিজ্ঞেস করলো, আমাদের কখন রেডি হতে হবে, মেজর সাহেব?

সিরাজুলের মনটা যথেষ্ট দমে গেল। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা হলো না? মঞ্জুভাবীর সঙ্গেও আর দেখা হবে না?

অনেক কাকুতি-মিনতি কর এইটুকু শুধু অনুমতি পাওয়া গেল যে এয়ারপোর্ট যাবার পথে ওদের গাড়িটা মঞ্জুদের বাড়ির সামনে থামানো হবে। সেখানে সময় পাওয়া যাবে মাত্র দশ মিনিট।

মামুন হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছেন ঘন্টাখানেক আগে। কোনো দরকার না থাকলেও তাঁর গায়ে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি জোড়াসনে বসে আছেন খাটের ওপর। মামুন সম্পাদক থাকার সময় 'দিন-কাল' অফিসে কিছুদিন প্রুফ রিডারের চাকরি করেছিল সিরাজুল। সে এসে মামুনের দুই হাঁটু ছুঁয়ে অভিবাদন করলো, তার দেখাদেখি অন্যরাও।

সিরাজুল মঞ্জুকে বললো, ভাবী, এভাবে আর দাওয়াত খাওয়া হলো না। ইনসাল্লা, কলকাতায়

আবার যখন আসবো, কিংবা আপনেরা ঢাকায় গ্যালে...একটু সময় নাই, এয়ারফোর্সের প্লেন আমাদের জইন্যা এক মিনিটও দেরি করবে না! আপনি বাবুলভাইকে জলদি জলদি চিঠি লিখে দ্যান।

মামুন বিস্ফারিত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরা মুক্তিযোদ্ধা? এত কাছ থেকে তিনি কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে দেখেননি। অল্প সময়ের নোটিসে এয়ারফোর্সের বিমানে এদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার মানে এরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে যাচ্ছে। তিনি শুনেছেন, ১৪ আগস্ট, পাকিস্তানের স্বাধীনতার দিনে সারা বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী একসঙ্গে খুব বড় রকম আঘাত হানবে।

মামুন অসুস্থ, বয়েসও হয়েছে, তা ছাড়া তিনি লেখক মানুষ, রাইফেল নিয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিনি পারতেন না। তবু আজ তাঁর আত্মার এক একটা টুকরো যেন এই চারটি যুবকের সঙ্গে রণাঙ্গনে যেতে চাইছে।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, বাবুল চৌধুরীকে তুই দেখেছিস? সে ভালো আছে! এ খবর শুনে কী যে শান্তি পাইলাম! আর আলতাফ কোথায়? শুনেছিলাম, সেও একজন ফ্রিডম ফাইটার?

সিরাজুল বললো, শখের! আলতাফ সাহেব প্রথম প্রথম দুই চারদিন খুব লাফালাফি করছিলেন, তেনার পায়ের কাছে একদিন শেল ফাটলো, এমন কিছু লাগে নাই, তাইতেই ওনার চক্ষু চড়কগাছ! দশ বারোদিন হাসপাতালে রইলেন, তারপর কোথায় যে উধাও হইলেন, কেউ জানে না। তার কোনো খবর নাই। কিন্তু বাবুলভাই কলরে অবাক কইরা দিচ্ছেন। শরীরে যেন এক বিন্দু ভয়ডর নাই। প্রত্যেক অ্যাকশানে সামনে থাকেন—

জাহাঙ্গীর বললো, সত্যিই বুবুল চৌধুরীর এই চেইঞ্জ না দ্যাখলে বিশ্বাস করা যায় না। অসম্ভব সাহসী মানুষ!

মঞ্জু ওদের একেবারে ধার ঘেঁষে বসে সব শুনছে, তার চোখে মুখে আনন্দ-গর্ব বেদনা মাখানো। অতিদ্রুত বাবুলকে চিঠি লিখছে সে, তার মধ্যে চার পাঁচ বার আছে, তুমি ভালো থেকো, তুমি ভালো থেকো।

চিঠিখানা দেবার আগে সে সিরাজুলকে জিজ্ঞেস করলো, তোরা এমন হুট করে চলে যাচ্ছিস। কোনো বিপদ হবে না তো?

সিরাজুল হেসে বললো, বিপদ আর কী! জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন! দ্যান চিঠিটা, আর দেরি করা যাবে না!

চাদরটা ফেলে খাট থেকে নেমে এসে মামুন ওদের গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। এরা যেন তাঁরই সন্তান, এঁদের তিনি পাঠাচ্ছেন সাংঘাতিক বিপদের মুখে।

সিরাজুল বললেন, মামুনসাহেব, দোয়া করবেন। আমরা যেন কার্যসিদ্ধি করে আসতে পারি।

মামুন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি কী বললেন তা বোঝাই গেল না। অসুখ তাঁকে দুর্বল করে ফেলেছে, তাঁকে এভাবে কাঁদতে আগে কেউ দেখেনি।

নীচে গাড়িতে হর্ন দিয়েছে, আর সময় নেই, মঞ্জুর কাছ থেকে অসমাপ্ত চিঠিটা প্রায় কেড়েই নিতে গেল সিরাজুল। কোনোরকমে নিজের নামটি লিখে, একটা খামে ভরে মঞ্জু ভারী গলায় বললো, ওরে দিস, দিয়া বলিস যে, কোনো উপায়ে যেন আমারে একটা উত্তর পাঠায়।

সিরাজুল মাথা নেড়ে পেছনে ফিরতে যেতেই মঞ্জু তার হাত ধরে বললো, মনিরারে তুই ঠিক ফিরা পাবি। আমি কইলাম, সে ফিরা আসবে!

অন্যরা আগেই নামতে শুরু করেছিল, সিরাজুল দৌড় মারলো সিঁড়ির দিকে।

এয়ারফোর্সের বিমান আগরতলায় পৌঁছে দেবার পর সেই রাত্রেই সিরাজুলদের নিয়ে যাওয়া হলো হরিণা ক্যাম্পে। সিরাজুলরা নিজেদের ঘাঁটিতে একটুক্ষণের জন্যও যেতে পারলো না, সুতরাং বাবুল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হবারও প্রশ্ন রইলো না।

অপারেশান জ্যাকপটের কার্যসুচি হলো চট্টগ্রাম ও মঙ্গলার সামুদ্রিক বন্দর দুটিতে এবং চাঁদপুর, দাউদকান্দি, নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ, নগরবাড়ি, খুলনা, বরিশাল, গোয়ালন্দ ও ফুলছড়ি ঘাট ও আরিচা ঘাটের নদী-বন্দরগুলির ওপর সরাসরি আক্রমণ। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ, চট্টগ্রাম বন্দরে আঘাত হানার দায়িত্ব দেওয়া হলো যে তিনটি দলকে, তার একটির কমান্ডার নিযুক্ত হলো সিরাজুল। সে তার বন্ধুদেরই সঙ্গে পেল।

পরদিন সকাল থেকেই যাত্রা শুরু। সঙ্গে বেশ কিছু মালপত্র ও একজন গাইড, চারদিনের হাঁটা

পথ। গাইডটা কিছুটা এলাকা পার করে দিলে আবার আসবে অন্য গাইড। পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে গেরিলারা অপেক্ষা করছে তাদের নিরাপদে পার করে দেওয়ার জন্য। হরিণা ক্যাম্পেই সিরাজুল আভাস পেয়েছিল যে ধরা পড়ার সম্ভাবনা এত বেশি যে তাদের বিকল্প আরও দুটি দল তৈরি রাখা হয়েছে। একদল ধরা পড়লে অন্য দল এগিয়ে যাবে। তাদের বিকল্প আরও দুটি দল তৈরি রাখা হয়েছে। একদল ধরা পড়লে অন্য দল এগিয়ে যাবে। তাদের পৌঁছোতে হবে চট্টগ্রাম শহর পার হয়ে কর্ণফুলী নদীর ওপারে চরলাক্ষায়।

এর মধ্যে চট্টগ্রাম শহরটা পার হওয়াই সবচেয়ে বিপজ্জনক। সন্ধে থেকেই কারফিউ, তাই রাত্তিরে বেরুনো যাবে না। দিনের বেলাতেও মেশিনগান ফিট করা অনেকগুলো জিপ সারা শহর টহল দিচ্ছে, পথের মোড়ে মোড়ে চেকপোস্ট, যখন-তখন তল্লাশী হয়, কারুকে একটু সন্দেহ হলেই আর বিচারের প্রশ্ন নেই, তৎক্ষণাৎ সেখানেই গুলি করে মারে।

তবু, এখনো চট্টগ্রাম শহরের মধ্যে গেরিলারা অতি গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। তারা যোগাড় করে রেখেছিল একটা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান, তাতে সিরাজুলদের ভরে নিয়ে, ভোরবেলা কারফিউ শেষ হতেই সেটা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। সাতখানা চেকপোস্ট পেরিয়ে গেল তারা, কেউ সন্দেহ করলো না।

অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানটা ওদের নামিয়ে দিল নদীর ধারে একটা বাজারের কাছে। এর মধ্যেই সিরাজুলরা পোশাক বদলে নিয়েছিল। লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি, কাঁধে গামছা। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা বড় আকারের ধামা। বাজারে নেমে ওরা লাউ, কুমড়ো; কচুর শাক, কুমড়োর শাক, কিছু পুঁটি-বাঁশপাতা মাছ কিনল। যেন ওরা সাধারণ গ্রাম্য মানুষ, হাট-বাজার সেরে বাড়ি ফিরছে।

ফেরীঘাটেও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছে পাক আর্মি, তাদের নাকের ডগা দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে ওরা উঠে পড়লো নৌকোয়। কর্ণফুলীতে ফেরী নৌকোটা ভেসে পড়বার পর ওরা নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরালো।

বাজার এখনও ভালো করে জমে ওঠেনি, গ্রাম থেকে খদ্দেররা সবে মাত্র-আসতে শুরু করেছে, ফেরার যাত্রী কম। নৌকোতে সিরাজুলরা সাতজন, কয়েকজন স্ত্রীলোক ও শিশু, দু'জন মাঝি ছাড়া আর একটি বলিষ্ঠকায় লোক। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, গায়ে একটা ঝলমলে সিল্কের পাঞ্জাবি, দু'হাতের আঙুলে গোটা ছয়েক সোনার আংটি, তার একটি দাঁতও সোনা দিয়ে বাঁধানো।

সেই লোকটি সিরাজুলদের মতন একই বয়েসী সাতজন জোয়ান ছেলের দিকে বারবার চোখ বুলিয়ে কিছু যেন সন্দেহ করলো। লুঙ্গির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কোমর চুলকোতে চুলকোতে সে জিজ্ঞেস করলো, এই, তোগো বাড়ি কোন্ গেরামে?

আগে থেকে মুখস্থই ছিল, চরলাক্ষা বাদ দিয়ে আর তিনটে গ্রামের নাম বললো ওরা। লোকটি একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে হাসলো। তারপর ওদের একজনের ধামা থেকে একটা লাউ তুলে জিজ্ঞেস করলো, এইডার দাম কয় পয়সা?

সিরাজুল বিনীত ভাবে বললো, এইগুলা বিক্রির না কর্তা, আমরা খরিদ কইর‍্যা আনছি!

লোকটি সেকথা গ্রাহ্য না করে ধামার মধ্যে হাত ঢুকয়ে কুমড়ো শাক টেনে তুললো। তারপর বললো, লালশায় থাকোস আর আমারে চেনোস না?

লোকটি কথা বলে যাচ্ছে খাস চিটাগাং-এর উচ্চারণে, সিরাজুলদের গলায় সে টান আসছে না। তা ছাড়া লোকটি অভদ্রের মতন অন্যের ধামায় হাত দিয়ে একটার পর একটা জিনিস তুলে নিচ্ছে। অন্যের জিনিস জোর করে নিয়ে নেবার স্বভাব আছে নিশ্চয়ই। লোকটিকে প্রথমে মনে হয়েছিল রাজাকার, এখন মনে হচ্ছে শান্তি কমিটির কেউকেটা। এদের এড়িয়ে যাবারই কথা ছিল, কিন্তু লোকটি যেভাবে ধামার মধ্যে হাত ঢোকাচ্ছে, তাতে এক্ষুনি অন্য কিছুর সন্ধান পেয়ে যাবে। লাউ-কুমড়ো, শাক-পাতা দিয়ে ঢাকা দেওয়া আছে বস্তায় বাঁধা লিমপেট মাইন, ফিন, মেশিনগান ও ট্রানজিস্টার।

লোকটির ঠিক পেছনেই বসে আছে নির্মল। সিরাজুল তাকে চোখের সামান্য ইঙ্গিত করতেই নির্মল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড জোরে লোকটির ঘাড়ে একটা রদ্দা কষালো, তারপর এক ধাক্কায় ফেলে দিল নদীতে। লোকটি হাবুডুবু খেয়ে একবার মাথা তুলতেই সিরাজুল প্রায় কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে ওর চুলের মুঠি ধরে ঠেসে রাখলো।

লোকটি জলের মধ্যে একটা প্রচণ্ড মাছের মতন দাপাচ্ছে, সিরাজুল তাকে একবারও নিশ্বাস নেবার সুযোগ দিল না। কিন্তু সিরাজুলের মুখে কোনো উত্তেজনা নেই, তার বজ্রকঠিন ডান হাতের মুষ্টিই

লোকটিকে চেপে রেখেছে নদীতে।

জাহাঙ্গীর স্ত্রীলোকদের দিকে হাতজোড় করে বললো, মা জননীরা ভয় পাবেন না। ওডা একটা নামরুদ।

তারপর মাঝিদের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনেরা থামলেন ক্যান, চালান, চালান।

একটু পরেই সিরাজুলরা নৌকো বদল করলো। বেশ খানিকটা ঘুরে দুপুরের ঠা-ঠা রোদে এসে নামলো চরলাক্ষায়। সেখানে দুটি কুড়ে ঘরের বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই বাড়িদুটি ওদের অন্য প্রস্তুত।

মতিন আর জাহাঙ্গীর নৌকোর ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করতে যেতেই সিরাজুল বললো, ঐ বিষয়ে আর একটাও কথা না। মনে কর, কিছুই ঘটে নাই। এহানে শুধু আমরা খাবো-দাবো আর ঘুমাবো। আয় গান শুনি।

সে ট্রানজিস্টার রেডিও খুলে সত্যিই ভারতীয় বেতারের গান শুনতে লাগলো।

সারাদিন সেই রেডিও কানের কাছে নিয়ে শুয়ে শুয়ে কাটালো সিরাজুল। অন্যরা কেউ রান্না করলো, কেউ ঘুমোলো। রাত্তাটা কেটে গেল নিরুপদ্রবে। পরদিনও গান শুনতে শুনতে হঠাৎ এক সময় একটা গান শুনে লাফিয়ে উঠলো সিরাজুল। পুরোনো আমলের একটা বাংলা গান বাজছে, "আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ি"। সিরাজুল ফিসফিস করে বলে উঠলো, সব রেডি হয়ে নে। আর টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স। আইজই আর একটা দল আইস্যা পড়বে।

এদের মধ্যে জাহাঙ্গীরই একটু বেশী লেখাপড়া করেছে। সে জানে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নর্মন্ডি উপকূলে যখন মিত্র বাহিনী ল্যান্ড করে, তখন লন্ডনের বি বি সি থেকে এরকম সাংকেতিক গান বাজানো হয়েছিল। কিন্তু একটা গান তো নয়, চব্বিশ ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় আর একটি গান বাজবার কথা। সেই দ্বিতীয় গানটি কী?

সিরাজুল বললো, সেটা আমাকে জানানো হয়নি। অন্য দলের কমান্ডার সেটা জানে।

তারপর সে ব্যাগ থেকে একটা খাম বার করে বললো, দ্যাখ, যদি আমি আর ফিরতে না পারি, তাইলে এই চিঠিখানা বাবুল চৌধুরীরে তোরা পৌঁছাইবার দিস।

জাহাঙ্গীর বললো, এড়া কী কও মিঞা? তুমি না ফেরলে আমরাই বা ফেরবো ক্যামনে?

সিরাজুল হেসে বললো, গেরিরাদের টার্গেটে পৌঁছানোর থিকাও ফেরা অনেক কঠিন!

সন্ধের পর অন্যদিক থেকে নদীপথে এসে পৌঁছোলো দ্বিতীয় একটি দল। তার কমান্ডার বাচ্চু। সিরাজুলদের তুলনায় তারা অনেকগুলি বিপদ পার হয়ে এসেছে, খুবই ক্লান্ত, এসেই তারা ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন দুপুরে বাচ্চু ট্রানজিস্টার শুনতে শুনতে এক সময় বললো, আইজ রাত একটায় জিরো আওয়ার। তখন সাইগলের একটি অতি পরিচিত গান বাজছে, "আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান, তার বদলে আমি চাইনি কোনো দান..."।

সন্ধের আগে খেয়ে নিয়ে সবাই ঘুমিয়ে নিল কিছুটা। তারপর এক সময় উঠে বেশ কিছুটা হেঁটে এসে ঠিক রাত একটায় তারা নদীতে নেমে পড়লো। জোয়ার শেষ, এখনো ভাটা শুরু করছে। নদীর ওপরেও অনেকখানি সার্চ লাইটে আলোকিত, কোনো রকম নৌকো কিংবা জলযান দেখলেই শাস্ত্রীদের গুলি ছুটে আসবে।

এখন যারা বন্দর পাহারা দিচ্ছে, তাদের ডিউটি শেষ রাত দুটোয়। তখন আসবে নতুন দল। ডিউটির শেষ দিকটায় প্রহরীরা খানিকটা অসতর্ক ও অলস হয়ে পড়ে, ঘুম তাড়াতে ব্যস্ত হয়। সেটাও হিসেবের মধ্যে ধরা আছে।

১২ নম্বর জেটিতে নোঙর করা রয়েছে এম ভি আল আব্বাস, তাতে আছে ১০৪১ টন সামরিক সরঞ্জাম। ৬ নম্বর অরয়েন্ট বার্জে ২৭৬ টন অস্ত্র ও গোলাবারুদ। সবচেয়ে বড় জাহাজ এম ভি হরমুজ, তাতে রয়েছে ৯৯১০ টন কামান ও ট্যাঙ্ক। এছাড়া আরও কয়েকটি গান বোট ও বার্জ।

পায়ে ফিন বেঁধে, মাথাটা অল্প একটু জলে ভাসিয়ে সাঁতরে এলো একদল যুবক। কে-কোন জাহাজে মাইন লাগাবে তাও আগে থেকে নির্দিষ্ট আছে। অতি দুঃসাহসী সিরাজুল হরমুজ জাহাজের তলা দিয়ে ডুব দিয়ে পোর্ট সাইডে চলে এলো। জল থেকে উঠে আসা একটা প্রাণীর মতন সে সেঁটে রইলো জাহাজটার গায়। আলো পড়েছে তার ওপরে, প্রহরীদের নজর একবার এদিকে ফিরলে সেই

মুহূর্তে সে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। লিমপেট মাইনগুলো ঠিক মতন আটকে দিয়ে সরে আসতেই শুরু হলো ভাটার টান। নিঃশব্দে তারা গা ভাসিয়ে দিল। তাদের পরিকল্পনা শতকরা এক শো ভাগ সার্থক।

প্রথম বিস্ফোরণ হলো ঠিক রাত ১-৪০ মিনিটে। সেই শব্দে কেঁপে উঠলো পুরো চট্টগ্রাম শহর। তার পাঁচ মিনিট পর আর একটা এই বিস্ফোরণ আরও জোরে, কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড় এবার এম ভি হরমুজ ডুবছে। এবার পর পর গর্জন। যেন প্রলয় এসে গেছে, এই ভেবে কান্নাকাটি শুরু করে দিল শহরের মানুষ।

সিরাজুলরা চরলাক্ষায় আগের জায়গায় ফিরে গেল না। তারা একসময় এসে উঠলো পাটিয়া গ্রামের প্রান্ত। এখানে তারা বিশ্রাম নিতে লাগলো। ভোরের আগে যাত্রা করা যাবে না, তাদের ফেরার পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে স্বেচ্ছাসেবকরা।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ দিয়ে উড়ে এলো হেলিকপ্টার। গ্রামগুলোতে ব্রাস ফায়ার চালালো, নদী দিয়ে লঞ্চে করেও নেমে এলো আর্মি, গ্রামের লোকদের টেনে টেনে বাইরে এনে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, 'মুক্তি' কোথায়? কোথায় সেই ছেলেরা?

সিরাজুলদের সাহায্য করার লোক আগেই এসে গেছে; তারা নদীর ঢাল দিয়ে দৌড়োচ্ছে, খানিক পরেই তারা জঙ্গলে ঢুকে যেতে পরবে। হঠাৎ সিরাজুল পেছন ফিরে বললো, পাটিয়া গ্রামে আগুন। সাধারণ মাইনষের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিতাছে!

তা জ্বলুক, ওদের আর দেরি করার সময় নেই। কমান্ডার বাচ্চু সিরাজুলকে ঠেলা দিয়ে বললো, চল, চল!

সিরাজুল তবু থমকে দাঁড়িয়ে বললো, আমাগো জইন্যে গ্রামের লোকগুলা মরবে?

এসব চিন্তা করার উপায় নেই। এখন যুদ্ধ চলছে। গেরিলারা শুধু নির্দেশ মতন চলবে, অন্যদিকে তাকানো যাবে না। কিন্তু সিরাজুল রুখে দাঁড়ালো। তার চোখ দুটো যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

সে পেছন ফিরে দৌড় শুরু করতেই মতিন-জাহাঙ্গীর-নির্মলরা তাকে টেনে ধরাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সিরাজুলের শরীরে তখন অসুরের শক্তি, বন্ধুদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে সে ছুটে গেল। দু'তিনবারের চেষ্টাতেও তাকে আটকানো গেল না।

মতিনরা খানিকটা দূর তার পেছন পেছন গিয়েও থেমে যেতে বাধ্য হলো। গ্রামের লোকদের সারবেঁধে দাঁড় করিয়েছে পাক আর্মি, এখুনি গুলি চালাবে। ওপর দিয়ে উড়ে আসছে একটা হেলিকপ্টার।

এই অবস্থায় ফিরে যাওয়া মানে আত্মহত্যারই নামান্তর। গেরিলারা এরকম অপারেশানে এসে কক্ষনো বিপক্ষের সৈন্যদের মুখোমুখি যেতে চায় না। সেরকম নিয়ম নেই। সিরাজুল তবু ছুটছে। দিনের পর দিন উত্তেজনা, টেনশান, তারপর আসল, কার্যসিদ্ধির পর অনেকে মাথার ঠিক রাখতে পারে না, সমস্ত রুদ্ধ আবেগ এক সঙ্গে বেরিয়ে আসে। ট্রেইনিং-এর সময়েই এই ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল।

মতিন, জাহাঙ্গীর চিৎকার করছে, সিরাজুল! সিরাজু!

সিরাজুল তা শুনতে পাচ্ছে না। সামনের গ্রামটায় আর্মি অত্যাচারে মেয়েরা আর্ত চিৎকার করছে, সিরাজুল তার মধ্যে যেন চিনতে পারছে মনিরার কণ্ঠস্বর। সিরাজুলের দৃঢ় ধারণা হলো, ওখানেই রয়েছে মনিরা। বাবুল চৌধুরী একবার বলেছিল না যে মনিরাকে নিয়ে আসা হয়েছে চিটাগাং-এর দিকে। মনিরাকে উদ্ধার না করে সিরাজুল ফিরে যাবে?

সে চেঁচিয়ে বললো, মনিরা, মনিরাকে, আমি আসতেছি...

তার মাথার ওপরে গর্জন করে উড়ে এলো একটা হেলিকপ্টার।

সিরাজুল চিৎকার করে উঠলো, হারামজাদারা? পুঙ্গিরপুত।

মেশিনগান দিয়ে গুলি চালাতে চালাতে সে নিজেও একটা বুলেটের মতন ছুটে গেল গ্রামের দিকে।

জাহাঙ্গীর কপাল চাপড়ে বললো, হায় আল্লা, পাগল হইয়া গ্যাছে গা!

তারা আর ফিরে তাকাবারও সময় পেল না। সিরাজুলের দেহটা মাটির সঙ্গে ফুঁড়ে যাবার দৃশ্যটা তাদের আর দেখতে হলো না।

॥ ৪৩ ॥

দেশ থেকে লন্ডনে যাওয়ার অলি কোনো ক্লান্তি বা অস্বস্তি বোধ করেনি। কিন্তু এত বড় আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সে জেট-ল্যাগে ভুগতে লাগলো। সর্বাঙ্গে নিদারুণ অবসাদ, ঘুমে চোখ টেনে আসছে। নতুন জায়গায় এসে লোকজনের সঙ্গে কথা বলবে কী, সে তাকাতেই পারছে না ভালো করে, অথচ প্লেনে তার এক ফোঁটাও ঘুম আসেনি। শর্মিলা তার অবস্থা বুঝতে পেরে ব্রুকলিনের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে সেই সন্ধেবেলাতেই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। এই সময় আহারে রুচি থাকে না, তাই খাওয়ার জন্যও জোর করলো না।

অলির ঘুম ভাঙালো খুব ভোরে। প্রথমে তার মনেই পড়লো না যে সে কোথায়। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখলো একটি সম্পূর্ণ অচেনা ঘর। তার পাশেই একটি মেয়ে শুয়ে আছে। এ কে? ঝুঁকে মুখখানা দেখার পর মনে পড়লো, এর নাম শর্মিলা, কাল প্লেন থেকে নেমেই এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শর্মিলা ঘুমিয়ে আছে পাশ ফিরে, মুখখানা দেখলেই বোঝা যায় সে খুব উপভোগ করছে এই ভোরবেলার ঘুম। সে গোলাপি রঙের আধা স্বচ্ছ বেশ সুন্দর কুঁচি দেওয়া ম্যাক্সি পরে আছে, শর্মিলার গায়ের রং শ্যামলা। নইলে তাকে মেমসাহেব মনে করা যেতে পারতো।

মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরখানা দেখতে লাগলো অলি। ওয়ালপেপারের ওপর নানারকম পোস্টার ও খবরের কাগজের ছবি সাঁটা। রবীন্দ্রনাথ, চে গুয়েভারা, শেখ মুজিব, মওলানা ভাসানী, আর কয়েকটি ছবি অলি চিনতে পারলো না। একখানা বড় রঙিন ছবিতে গ্রাম্যদৃশ্য, মাথায় ধানের আঁটি নিয়ে যাচ্ছে এক জোড়া নারী ও পুরুষ, তাদের মুখের হাসি দেখলেই বাঙালী বলে বোঝা যায়। এটা কি বাবলুদার ঘর? অলির মনেই পড়লো না যে তার বাবুলদা নিউ ইয়র্কে থাকে না। বাবলুদা কোথায়, পাশের ঘরে?

সন্তর্পণে খাট থেকে নেমে অলি প্রথমে যে দরজাটা খুললো, তার বাইরে কেমন প্যাসেজ। ঘরের মধ্যে বিপরীত দিকের দরজাটি বাথরুমের, পাশেরটি রান্নাঘরের। আর কোনো ঘর নেই। তাহলে বাবলুদা তাকে এখানে রাত্তিরে ফেলে রেখে কোথায় চলে গেছে?

নিজের শাড়িটা দেখে অলি আরও অবাক হলো। এই হাপ সিল্কের পাড়হীন হলুদ শাড়ি তো অন্য কেউ পরিয়ে দিয়েছে? এই কথাটা ভাবতেই লজ্জায় অলির কর্ণমূল রক্তিম ও উষ্ণ হয়ে উঠলো। দেয়ালের পাশে দাঁড় করানো রয়েছে তার সুটকেসটা, সেটার চাবি খোলা হয়নি।

তারপর আস্তে আস্তে অলির মনে পড়লো। নেশাগ্রস্তের মতন অলির গত বিকেলের পরের সব স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে, অথচ অলি মোটেই নেশা করেনি, প্লেনে সেই ইজিপসিয়ান ভদ্রলোকের দেওয়া রেড ওয়াইন সামান্য একটু ঠোঁটে স্পর্শ করেছিল মাত্র, তাতে মোটেই নেশা হতে পারে না। তবু তার একটা আচ্ছন্নের ভাব এসেছিল। এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসার সময় গাড়িতে কারা কারা যেন ছিল, বাবলুদা কথা বলছিল খুব কম। তারপর একটা ঘরে আসা হলো, সেটা এই ঘরটাই? আশ্চর্য, অলি কি তখন দেওয়ালের দিকেও তাকিয়ে দেখেনি? হ্যাঁ, অরি সুটকেস খোলার চাবি খুঁজে পাচ্ছিল না, কিছুতেই পায়নি, চাবিটা কি হারিয়ে গেল? সুটকেসের চাবি তো তার হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে ছিল না, লন্ডনে বিশাখাদের বাড়ি ছাড়ার আগে সে এই সুটকেসে চাবি লাগিয়েছে, তা হলে? প্লেনের মধ্যেই চাবিটা হারিয়ে গেল?

সুটকেস খুলতে পারেনি বলেই শর্মিলা তাকে কাল রাতে ব্যবহার করার জন্য একটা শাড়ি দিয়েছিল। অলি নিজেই বাথরুমে গিয়ে পোশাক বদল করেছে, তার মনে পড়েছে। বাথরুমের দরজাটা আবার খুলে অলি দেখলো শাওয়ার স্ক্রিনের ওপর তার শাড়িটা ঝুলছে, বাথরুমটাও এখন চেনা লাগছে। শর্মিলা ওয়ার্ডরোব থেকে তার শাড়ি বার করে দিয়েছিল, শর্মিলা কি এখানেই থাকে? অথচ টেবিলের ওপর ছড়ানো কয়েকটি বইতে একটি মুসলমানের নাম লেখা। তুতুলদির মতন এই শর্মিলাও কোনো মুসলমানকে বিয়ে করেছে? না, তাহলে শর্মিলা বাবলুদার কে? না, না, তা হতেই পারে না।

দ্বিতীয় যে হ্যাণ্ডব্যাগটা অলি সঙ্গে এনেছে, সেটাও রয়েছে টেবিলের ওপর। অলি ব্যাগটা খুলে একেবারে উল্টে দিয়ে চাবি খুঁজতে লাগলো। না, চাবিটা সত্যিই নেই। সুটকেসের তালা ভাঙতে হবে। শর্মিলা মেয়েটি কত ভালো, সামান্য আলাপেই তাকে নিজের শাড়ি ব্যবহার করতে দিয়েছে। শর্মিলার ব্যবহারের মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা আছে, সেটাও মনে পড়লো অলির। সে অবশ্য মনে মনে কল্পনা করেছিল, এয়ারপোর্টে বাবলুদা একা থাকবে।

হ্যাণ্ডব্যাগে অলি তার টুথব্রাশ ও পেস্ট পেয়ে গেল। দ্রুত দাঁত মেজে ফেলার পরেই তার চা তেষ্টা ও খিদের উদ্রেক হলো একসঙ্গে। মনে হয় যেন কতদিন সে কিছু খায়নি। খিদের সঙ্গে পয়সার সম্পর্ক, এবার তার মনে পড়ে গেল তার কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই। সে ট্রাভ্লার্স চেক পর্যন্ত খুইয়েছে। অবশ্য রাস্তায় বেরিয়ে পয়সা দিয়ে খাবার কেনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সে তো এখানকার কিছুই চেনে না। অলি এখনও নিউ ইয়র্কের কিছুই দেখেনি। এই ঘরটাই অ্যামেরিকা।

সে একটা জানলার পর্দা সরিয়ে দিল। এই ঘরখানা বেশ উঁচুতে, ছ'সাততলা হবে বোধ হয়। অলি কখনো এত উঁচু বাড়িতে থাকেনি, লন্ডনে বিশাখাদের বাড়িটা বেসমেন্ট নিয়ে দোতলা, রিডিং-এ তার বান্ধবীরা বাড়িটাও সেরকমই ছিল। এখন থেকে দেখা যাচ্ছে সামনের বাগান, বেশ বড় কম্পাউন্ড, তার পরে বৃষ্টিভেজা কালো রাস্তা, এখনও বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তার দু'ধারে অনেক গাড়ি পার্ক করা। লন্ডনের সঙ্গে যেটুকু পার্থক্য চোখে পড়ছে, তা হলো কাছাকাছি বাড়িগুলো সবই বড় বড়, রাস্তার গাড়িগুলোও বেশ বড় আকারের। কাল এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে কে যেন বলছিল, তারা ব্রুকলিনে যাচ্ছে। নিউ ইয়র্কের সঙ্গে ব্রুকলিনের যে কী তফাত, তা অলি ঠিক জানে না। বিখ্যাত ব্রুকলিন আজ তো নিউ ইয়র্কেই, তাই না?

অলির সত্যিই খিদে পেয়েছে। রান্না ঘরে একটা ফ্রিজ আছে। এদেশে প্রত্যেক বাড়িতেই ফ্রিজে নানারকম খাবার-দাবার থাকে, দুধ, আইসক্রিম তো থাকবেই। তা বলে অলি কি একটা অচেনা বাড়ির ফ্রিজ খুলে কিছু খেতে পারে? ছেলেরা হলে পারতো। শর্মিলা জেগে উঠুক, তারপর দেখা যাবে।

বাথরুমে গিয়ে অলি খুব তাড়াতাড়ি, যেন এখুনি প্লেন ধরতে হবে এরকম ব্যস্ততায়, শর্মিলার শাড়িটা ছেড়ে নিজের পুরোনো শাড়িটাই পরে নিল। প্লেনে আসার জন্য তার শাড়ি তো ময়লা হয়নি, এটা পরেই রাত্তিরে স্বচ্ছন্দে শোওয়া যেত, কেন বদলাতে হলো কে জানে! অন্যের জিনিস ব্যবহার করলে অলির খুব অস্বস্তি হয়।

বাথরুমের দরজাটার পেছন জোড়া লম্বা আয়না। এই বাথরুমে ঢুকলেই নিজেকে না দেখে উপায় নেই। নিজের মুখের দিকে তাকাতেই কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে এলো অলির চোখ দিয়ে। অলি আর সামলাতে পারলো না, বেশ বুক খালি করে সে কাঁদলো নিঃশব্দে। তার কষ্ট হচ্ছে খুব, তবু কিসের জন্য সেই কান্না তা সে জানে না।

বাবার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। শেষের দিকে বাবাই তাঁকে বেশি বেশি উৎসাহ দেখিয়ে এখানে পাঠালেন। কিন্তু বাবার কি সত্যিই ইচ্ছে ছিল? বিমানবিহারী চেয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রসন্তান নেই, তাঁর বড় মেয়ে অলিই তাঁর ব্যবসাপত্তর দেখবে। অলি প্রকাশনা ব্যবসার অনেকটাই বুঝে নিয়েছে, ঠিক দু'বছর এখানে কাটিয়েই সে ফিরে যাবে। বাবা কি দু'বছর অপেক্ষা করতে পারবে না? দমদমে শেষ মুহূর্তে বাবার মুখখানায় যেন একটা গভীর হতাশার ছাপ পড়েছিল। কেন? বাবা কি বাবলুদা সম্পর্কে আগেই কিছু জানতে পেরেছিলেন?

বাবুলদা তার সঙ্গে একবারও নিভৃতে কিছু বলার চেষ্টা করেনি, তার হাতখানাও ছোঁয়নি। কেমন যেন আলগা আলগা ভাব। লন্ডনের আবহাওয়া, সেখানে কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এইসব জিজ্ঞেস করলো, কলকাতায় তার প্রিয়জনদের কথা এ পর্যন্ত সে জানতে চাইলো না। অথচ এই বাবলুদাই আঘাত পাবে ভেবে কতকগুলো কঠিন সত্যকে মোহময় মিথ্যের সাজ পরিয়ে এনেছে অলি।

শর্মিলা নামের মেয়েটির সঙ্গে বাবলুদার কী সম্পর্ক তা আর বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না। কাল যে গাড়ি চালাচ্ছিল, তার নাম কী যেন, সেদ্ধার্থ? হ্যাঁ সিদ্ধার্থ, তার সঙ্গে শর্মিলা যেভাবে কথা বলছিল, তার চেয়ে বাবলুদার সঙ্গে কথা বলছিল একেবারে সম্পূর্ণ অন্য সুরে। সে সুর শুনলেই বোঝা যায়। পুরুষরা না বুঝুক, মেয়েরা বোঝে। বাবলুদার সঙ্গে শর্মিলার কথার মধ্যে আছে একটা বিশ্বাসের অধিকারবোধ।

অলি চোখের জল মুছে ফেললো। শর্মিলার ওপর সে একটুও রাগ করতে পারছে না। শর্মিলার মধ্যে সে কোন কপটতা দেখেনি। শর্মিলার ব্যবহারের সারল্য কিছুতেই অভিনয় হতে পারে না। শর্মিলা তার সম্পর্কে কিছু জানে না।

বাবলুদার সঙ্গে অলির চাক্ষুষ দেখা হয়নি প্রায় তিন বছর। দীর্ঘ বিচ্ছেদ। অথচ অলি একদিনের জন্যও বাবলুদার সঙ্গে তার কোনো দূরত্ব অনুভব করেনি। শিলিগুড়িতে লেকচারের চাকরি নিয়ে যাবার পর বাবলুদা তো আর কলকাতাতে ফিরতেই পারলো না। সেই শিলিগুড়ি বাস্ট্যান্ডে শেষ দেখা।

বাবলুদা কিংবা অলি কেউ তো ইচ্ছে করে এই দূরত্ব রচনা করেনি, এর মধ্যে ছিল জীবন-মরণের প্রশ্ন। সেই জন্যই বাবলুদার ওপর তার কখনো তেমন রাগ বা অভিমান হয়নি। সে জানতো, তার আর বাবলুদার মধ্যে কখনো ভুল বোঝাবুঝি হবে না। অলি অপর কোনো পুরুষের মুখে স্তুতি শুনলেই হেসে অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছে, সে-পুরুষটি নাছোড়বান্দা ধরনের হলে তার ধারে কাছেই আর যায়নি। অলি তো জানতো সে অতীন মজুমদারের বাক্‌দত্তা। দু'জনের মধ্যে একবারও সেরকম কিছু কথা হয়নি, তবু অব্যক্ত কথা হয়নি, তবু অব্যক্ত কথা দেওয়া ছিল। নিউইয়র্কে পা দেবার কিছুক্ষণের মধ্যেই অলি বুঝেছিল, বাবলুদা অনেক দূরে সরে গেছে, বাবলদার ওপর তার আর বিশ্বাসের কোনো জোর নেই। এই উপলব্ধির আঘাত সহ্য করতে না পেরেই কি অলি ঘুমের মধ্যে আত্মগোপন করতে চেয়েছিল? ঘুম যে এসেছিল, তাও সত্যি। এতই কষ্ট হয়েছিল যে কষ্টের কোনো বোধ ছিল না।

অলির কাছে যদি কিছু টাকা পয়সা থাকতো, তা হলে এই ভোরেই সে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়তে পরতো। হয়তো এই অচেনা বিদেশ-বিভুঁইয়ে পথ হারাতো কয়েকবার, তাতেই বা কী এমন ক্ষতি হতো, শেষপর্যন্ত ঠেকতে ঠেকতে সে ঠিকই সে ঠিকই পৌঁছে যেত মেরিল্যান্ডে।

ওখানে তার জন্য অ্যাপার্টমেন্ট থাকবে নিশ্চয়ই! পিটার মেয়ার নামে বৃদ্ধ অধ্যাপক যিনি ওখানে অলির মেন্টর, যিনি কয়েকখানি উপন্যাসও লিখেছেন, একখানি উপন্যাসের জন্য পুলিৎজার প্রাইজও পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে অলির চিঠিপত্রে এমনই আলাপ হয়ে গেছে যে মনে হয় যেন অনেকদিনের চেনা। লন্ডন থেকে তাঁর সঙ্গে টেলিফোনেও কথা হয়েছে, তিনি বাকি সব ব্যবস্থা করে দিতে পরেন। কিন্তু একটা পয়সা হাতে না নিয়ে অলি রাস্তায় বেরুবে কী করে? তার পারিবারিক শিক্ষাতেই যে এটা অকল্পনীয়। সে কি পথে নেমে পথের মানুষের দয়া চাইতে পারে? লন্ডনের ট্রেনের ছিনতাইবাজদের ওপর অলির নতুন করে রাগ হলো। ঠিক ঐদিন তারা কি অন্য কারুর হ্যান্ডব্যাগ কেড়ে নিতে পারতো না?

অলিকে একজন অচেনা মানুষের ঘরে রেখে বাবলুদা কোথায় চলে গেছে কে জানে! বাবলুদা আসবার আগেই, শর্মিলা যদি জেগে ওঠে, তা হলে অলি শর্মিলার কাছ থেকেই কিছু ডলার ধার চাইতে পারে।

শর্মিলা কখন উঠবে? লন্ডনে সে বিশাখাকে দেখেছে, ছুটির দিনে দশটা পর্যন্ত ঘুমোয়। শর্মিলার শুয়ে থাকার ভাবভঙ্গিও সেরকম। ঘড়িতে এখন পৌনে সাতটা। অলি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে শর্মিলার বিছানার পাশে দাঁড়ালো, নারী হিসেবে সে দেখতে লাগলো আর একজন নারীকে। শর্মিলার শরীরের গড়নে তেমন আহামরি কিছু নেই, রোগাটে লম্বা চেহারা, এরা প্রায় সব সময় মোজা পরে বলে পায়ের পাতা মসৃণ, গোড়ালি একটুও ফাটা নয়, বেশ সরু কোমর, হাতের আঙুলগুলো সুন্দর, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, ছোট চিবুক, ঠোঁটের ভঙ্গিতে সততার স্পষ্ট চিহ্ন, চুল কেটে ফেললেও চুলের খুব গোছ। শর্মিলার গা থেকে চাপা একটা পারফিউমের গন্ধ আসছে, পারফিউমের ব্যাপারে ওর রুচি আছে। শোওয়ার ধরনটাও সংযত, কেউ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকলে দেখতে বিশ্রী লাগে। এই নিশ্চিন্তে নিদ্রিতা মেয়েটি এখন বাবলুদার খুব আপন।

অলি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে ঠিক করলো, শর্মিলার কাছে সে কিছুতেই হার স্বীকার করবে না।

নৈকট্যের একটা উষ্ণতা আছে, দৃষ্টির একটা তরঙ্গ আছে, একজন আর একজনকে লক্ষ করলে তার মধ্যে একটা আহ্বান এসে যায়। অলি শর্মিলার গায়ে হাত ছোঁয়ায়নি, তবু শর্মিলা এই অসময়ে জেগে উঠে চোখ মেলে তাকালো। ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এর মধ্যেই উঠে পড়েছো? রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছিল?

অলি মাথা নাড়লো।

শর্মিলা কি তাঁর চেয়ে বয়েসে বড়? হলেও এক দু'বছরের বেশি নয়। শর্মিলা তাকে তুমি বলতে শুরু করেছে। অলিও ওকে তুমি বলবে।

শর্মিলা উঠে বসে দু' হাতে চোখ ঘষতে লাগলো। তারপর মাথার চুলে হাত ডুবিয়ে মাথায় একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে বললো, তুমি কাল ঘুমের মধ্যেও ছটফট করছিলে। আমার এক একবার ভয় করছিল, ভাবছিলুম তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে কি না। জেট-ল্যাগের পর অনেকের ঘুম পায়, কিন্তু তোমার মতন এতটা ঘুমোতে আর কারুকে দেখিনি। এখন ফিট লাগছে?

অলি আবার মাথা নাড়লো।

শর্মিলা খাট থেকে নেমে বললো, চা-কফি কিছু খাওনি নিশ্চয়ই। নতুন জায়গা, কোথায় কী আছে, তা তুমি কী করেই বা জানবে! আমিও এখানে পরশুদিনই মোটে এসেছি। এটা সিদ্ধার্থর এক বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্ট, ভদ্রলোকের কী দারুণ বাংলা গানের রেকর্ডের কালেকশান।

গ্যাস জ্বালিয়ে তার ওপরে জল গরম করার কেটলি চাপিয়ে এসে শর্মিলা বললো, কাল রাত্তিরে খুব মজা হয়েছিল। তুমি তো সাত তাড়াতাড়ি এখানে ঘুমিয়ে পড়লে, অলমোস্ট নকড আউট, তারপর আমরা এইট্‌থ ফ্লোরে সিদ্ধার্থর ঘরে অনেকক্ষন আড্ডা দিলুম। তারপর কথা উঠলো, কে কোথায় শোবে। ওপরে সিদ্ধার্থর সঙ্গে সুজান বলে এক বান্ধবী আছে, ওদের সঙ্গে শেয়ার করা যায় না। বাবলুকে বলা হলো এই ঘরে এসে সোফায় শুয়ে পড়তে, তাতেও রাজি নয়। দুটি মেয়ের সঙ্গে এক ঘরেও কিছুতেই শোবে না। কাল বাবলু বড্ড বেশি ড্রিংক করে ফেলেছিল, তুমি জানো না বোধ হয়, একবার ও জেদ ধরে কোনো ব্যাপারে না বললে কিছুতেই আর ওকে দিয়ে হ্যাঁ বলানো যায় না। আমার কোনো প্রবলেম ছিল না, এই ব্লুমিংটনেই আমার চেনা একটি মেয়ে থাকে, আমি তার কাছে চলে যেতে পারতুম, কিন্তু অত রাতে আমাকে যেতে দেবে না। সুজান তখন অফার দিল, সে এসে এই ঘরে শোবে, এই খাটটা বেশ বড়, তিনজনে কুলিয়ে যেত, বাবলু তা হলে সিদ্ধার্থর সঙ্গে শুতে পারে। বাবলুর তাতেও আপত্তি, সুজান কেন স্যাক্রিফাইস করবে। একটা রাত্তিরের ব্যাপার, এতে স্যাক্রিফাইসের কী আছে বলো? আমি বাবলুর মাথায় এক গেলাশ জল ঢেলে দিলুম, তাও ওর নেশা কাটে না।

কাবার্ড খুলে একটা বিস্কিটের প্যাকেট এনে শর্মিলা বললো, এটা খেয়ে দ্যাখো, বেশ মজার। বিস্কিটের মধ্যে বেকন মেশানো আছে। তুমি সব মাংস-টাংস খাও তো?

অলি মাথা নেড়ে দুটি তিনকোণা, পাতলা বিস্কিট তুলে মুখে দিল, তার ভালোই লাগলো। খিদে পেয়েছে বলে সে তুলে নিল আরও কয়েকটা।

শর্মিলা অলির মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, বাড়ির জন্য মন কেমন করছে?

অলি বললো, একটু একটু।

শর্মিলা বললো, তোমার এমন সুন্দর মুখখানা বড্ড শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। জানো, আমিও এখানে আসবার পর প্রথম প্রথম কী ভীষণ মন খারাপ লাগতো, যখন তখন কেঁদে ফেলতুম, ইচ্ছে হতো তক্ষুনি ফিরে যাই।

কাল রাত্তিরের ঘটনাটা শর্মিলা অসমাপ্ত রেখেছে। বাবলুদা শেষপর্যন্ত কোথায় শুতে গেল তা জানা হলো না।

শর্মিলা আবার বললো, এদেশের ছেলেমেয়েরা বাড়ি ছেড়ে পৃথিবীর কত দূর দূর দেশে চলে যায়, সেখানে দু'তিন বছর পড়ে থাকে। কিছু গ্রাহ্য করে না। আমরা আসলে ফ্যামিলির প্রতি বেশি অ্যাটাচড্‌। তোমার বাড়িতে কে কে আছে, অলি?

গল্পে গল্পে কফি তৈরি হয়ে গেল। শর্মিলা দুধ-চিনি ছাড়া কালো কফি খায়। অলি এখনো কফিতে অভ্যস্ত হয়নি, তাদের বাড়িতে শুধু চায়েরই চল ছিল।

রেকর্ড প্লেয়ারে ফিরোজা বেগমের নজরুল গীতি চালিয়ে দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে শর্মিলা বললো, বৃষ্টি পড়ছে। আজ সোমবার হলেও ছুটি। ছেলেরা সহজে ঘুম থেকে উঠবে না। আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নিই, কী বলো? মুখ দেখেই বুঝতে পারছি তোমার খিদে পেয়েছে।

ফ্রিজ খুলে দুধ, ডিম, স্যালামি বার করতে করতে শর্মিলা বললো, কাল বাবলু আর আমি গ্রসারি স্টোর থেকে এসব বাজার করে এনেছি। এখানে দু' একদিন থাকবো। তোমারও নিউ ইয়র্ক শহরটা দেখা হয়ে যাবে। ঐ যে দ্যাখো কাবার্ডে পাউরুটি আছে, তুমি ব্রাউন ব্রেড খেয়েছো আগে? খেয়ে দ্যাখো, অন্য রকম টেস্ট। তুমি টোস্টারে দুটো করে পীস্ চাপিয়ে দাও, আমি ডিমটা তৈরি করে ফেলি। তুমি ডিমের পোচ খাবে, না বয়েলড? আমি ওয়াটার পোচ পছন্দ করি।

অলি বললো, আমি এখানে কয়েকদিন থাকবো কী করে? আমাকে আজই মেরিল্যান্ডে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করতে হবে।

আজ কী করে জয়েন করবে? আজ সারা অ্যামেরিকা ছুটি। তোমার রেজিস্ট্রেশানের তারিখ কবে? এখনও নতুন সেমেস্টার শুরু হয়নি, সময় আছে, তোমার কোনে চিন্তা নেই, আমরা সব ব্যবস্থা করে দবো। আমরা তোমায় মেরিল্যান্ড পৌঁছে দিয়ে আসবো।

যে প্রফেশারের আণ্ডারে আমি কাজ করবো, তিনি বলেছিলেন, এখানে পৌঁছেই তাঁকে একটা ফোন করতে।

আজ ফোন করতে গেলে তো বাড়িতে ফোন করতে হবে। বাড়ির নাম্বার আছে তোমার কাছে?

আছে বোধ হয়, চিঠিতে, সুটকেসের মধ্যে।

তোমার সুটকেসের তো চাবিই খুঁজে পেলে না। ঠিক আছে, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নেহাত খুব বিপদে না পড়লে ছুটির দিনে কারুর বাড়িতে এত সকালে কেউ ফোন করে না।

অলি নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধলো। তার কাছে একটা ডলারও নেই, একটা নতুন দেশে সে এসেছে শূন্য হাতে। বাবলুদা একবারও সেই হাতটা ছোঁয়নি।

দরজায় একটা বেল বাজতেই শর্মিলা অলির দিকে তাকালো। দু'জনেরই ধারণা হলো, অতীন এসেছে। শর্মিলা প্যানে ডিমের পোচ ভাজতে শুরু করেছে, সে অলিকে ইঙ্গিত করলো দরজা খুলে দিতে।

কেন বুকটা কাঁপছে অলির? সত্যি যেন তার ভয় করছে। বাবলুদাকে ভয়? কিংবা অলি ভয় পায় কোনো নাটকীয় পরিস্থিতিকে।

দরজা খুলে সে দেখলো সম্পূর্ণ অপরিচিত একজোড়া ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে। মহিলাটি শাড়ি পরা। তারা দু'জন শর্মিলাকে দেখে আরও বেশি অবাক। ভদ্রলোকটি অস্ফুট স্বরে বললেন, উই হ্যাভ কাম টু মীট ইউসুফ।

অলি বলল, হি ইজ নট হিয়ার।

ভদ্রলোক আবার বললেন, ইউসুফ। তারপর দরজার গায়ে অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বারটা আবার দেখে নিয়ে বললেন, ইউসুফ আলি, উই আর ফ্রেন্ডস্ অফ ইউসুফ আলি।

এরপর কী বলতে হবে অলি জানে না। সে শর্মিলাকে ডাকলো। শর্মিলা এখনও নাইট ড্রেসটা বদলায়নি, সেটা পরেই সচ্ছন্দভাবে এগিয়ে এসে বললো, ইউসুফ আলি ইজ নট হিয়ার। হি হ্যাজ গন টু ইণ্ডিয়া, নো, পাকিস্তান, নো, নো, বাংলাদেশ!

দু'পক্ষই বাঙালী, তবু কেউ বাংলা বলতে পারছে না। দম্পতিটি চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে শর্মিলা হেসে বললো, আমি ইউসুফ আলি সম্পর্কে কিছুই জানি না। ইউসুফের ঘরে আমাদের মতন দুটি মেয়েকে দেখে ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে! ওদের বোধ হয় ভেতরে এসে বসবার ইচ্ছে ছিল, বৃষ্টির মধ্যে এসেছে.....।

অলি ভাবলো, তাকে একটা অচেনা জায়গায় রেখে বাবলুদা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। এখনো বাবলুদা তার বাবা-মায়ের কথা, মানিকদা-কৌশিকদের কথাও জানতে চাইলো না।

টোস্টের ওপর স্যালামি, শশা আর কোলম্যানস মাস্টার্ড দিয়ে স্যাণ্ডুইচ বানিয়ে ফেললো শর্মিলা। বড় বড় দুটো গেলাস ভর্তি দুধ নিল। অলিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি দুধ ভালোবাসো তো? দুধের সত্যিকারের স্বাদ যে কী রকম, তা এদেশে এসেই ঠিক বোঝা যায়।

অলি দুধ ভালোবাসে, লণ্ডনের দুধ খেয়েই সে শর্মিলার কথার সত্যতা বুঝেছে। গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে তার এখানকার দুধ আরও বেশি ভালো লাগলো।

এবার বেজে উঠলো টেলিফোন। খাওয়ার টেবিলে যেখানে অলি বসে আছে, ফোনটা তার কাছেই। শর্মিলা বললো, তুমি ধরো।

অলি বললো, আমি তো কিছুই বলতে পারবো না।

শর্মিলা বললো, এটা নিশ্চয়ই বাবলুর কল। তুমি কথা বলো না!

তবু অলি ফোন ধরলো না, শর্মিলাকেই উঠতে হলো। এবারেও অতীন নয়, শর্মিলা ইংরিজিতে কথা বলছে। শুয়ে থাকার সময় বোঝা যায়নি, এখন অলি দেখলো, শর্মিলার বুকের গড়ন খুব সুন্দর আর একটু হাসলেই তার সারা মুখখানা ঝলমল করে।

অলি আবার মনে মনে ভাবলো, সে কিছুতেই শর্মিলার কাছে হেরে যাবে না। সে শর্মিলার মনে সামান্য দুঃখও দিতে চায় না।

শর্মিলা রিসিভারি নামিয়ে এসে বললো, ওপর থেকে সুজান ফোন করেছিল, আমাদের ব্রেকফাস্ট খেতে ডাকছিল। আমরা একটু পরে ওপরে যাবো, কী বলো?

স্টোভের ওপর হুইশলিং কেটলটা শব্দ করে উঠলো, জল গরম হয়ে গেছে। শর্মিলা আবার কফি

বানাতে যাচ্ছিল, অলি বললো, আমি এবারে একটু চা খাবো। চা নেই?

শর্মিলা বললো, আমরা চা কিনিনি। কিন্তু এই ইউসুফ আলির স্টকে দু'তিন রকম চা আছে, একটু নিয়ে কোনো দোষ নেই, কী বলো? ও তো দেশ থেকে ফেরার সময় ভালো চা আনবেই।

পটে চা ভিজিয়ে, টি-কোজি দিয়ে তা ঢেকে দিয়ে শর্মিলা বললো, এখনো বাবলুর পাত্তা নেই, দেখলে? সাড়ে আটটা বেজে গেল। ওপরে সিদ্ধার্থ পর্যন্ত জেগে গেছে।

বাবলুদা কোথায়?

সে নাকি এই কাছেই যামিনী মুখার্জি বলে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে শুতে গেছে। কী পাগলামি বলো তো! আমাদের এই ঘরটায় সচ্ছন্দে তিনজনে ঘুমোতে পারতুম না?

আমরা যে এখানে আছি, এর জন্য ভাড়া লাগবে না?

নাঃ! ছুটিতে কেউ গেলে অন্যদের এমনি ব্যবহার করতে দিয়ে যায়। এখানে সবাই করে। ঐ যে ওর কয়েকটা টবের গাছ আছে, তাতে জল দেওয়াও হবে। ফ্রিজ-ট্রিজগুলো অনেকদিন ব্যবহার না করলে খারাপ হয়ে যায়। তোমার বাবলুদা জানো তো এক একদিন দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘুমোয়। কেমব্রিজে ও একটা অ্যাটিকের ঘরে একা থাকে, ডাকবার কেউ নেই, এক একদিন আমি গিয়ে ওকে জাগাই। কফি বানিয়ে একদিন ওর মুখের কাছে এনে ধরি। একদিন ওর কানের ফুটোয় জল ঢেলে দিয়েছিলুম, বাবলু এমন চিৎকার করে লাফিয়ে উঠেছিল।

দরজা বন্ধ থাকে না?

আমার কাছে একটা চাবি থাকে ওর অ্যাপার্টমেন্টের।

তোমাদের কবে বিয়ে হয়েছে?

মুখ তুলে, অবাক হয়ে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে শর্মিলা বললো, বিয়ে? আমাদের বিয়ে হয়েছে কে বললো?

অলি দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বললো, কলকাতায় বাবলুদার বন্ধুদের মধ্যে গুজব দাঁড়িয়েছে যে ওর গোপনে বিয়ে হয়ে গেছে।

শর্মিলা খানিকটা রক্তিম হয়ে বললো, পড়াশুনা এখনো শেষ হয়নি, এর মধ্যেই বিয়ে....আমরা বিয়ের কথা এখনো কেউ ভাবিনি।

অলি একই রকম হাসি ঠোঁটে রেখে বললো, এই গুজবটা প্রতাপকাকার কানেও গেছে। প্রতাপকাকা আমাকে আসবার আগে বললেন, ছেলেটা সত্যিই বিয়ে করেছে কিনা, তুই গিয়েই আমাদের জানাবি। যদি বিয়েই করতে চায় সে, আমাদের লিখবে না কেন? আমরা কি আপত্তি করতাম? সত্যি জানো শর্মিলাদি, প্রতাপকাকা আর কাকিমা চমৎকার মানুষ। আমি চিঠি লিখে দেবো, পাত্রী আমার খুব পছন্দ হয়েছে। যেমন গুণী মেয়ে, তেমনি দেখতেও খুব সুন্দর।

শর্মিলা বললো, অ্যাই, তুমি আমার গুণের কী পরিচয় পেলে? আর আমাকে দেখতে মোটেই কেউ সুন্দর বলে না। আমার মাসিরা বলতো, আমাদের বংশে এরকম একটা কালো মেয়ে কোথা থেকে এলো?

তুমি–তুমি হচ্ছো তন্বী শ্যামা, শিখরিদশনা...

যাঃ! অলি, তুমিই খুব সুন্দর। এখানকার বাঙালী ছেলেরা তোমাকে দেখলেই প্রেমে পড়ে যাবে।

ওরে বাবা, আমার আর প্রেমের দরকার নেই।

ওরে বাবা কেন? এর মধ্যেই প্রেম হয়ে গেছে নাকি?

অলি হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর তাকিয়ে রইলো শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে। শর্মিলা কাপ প্লেটগুলো নিয়ে উঠে গেল ধুয়ে রাখতে। একটু পরে ফিরে এসে দেখলো অলি তখনও একই ভাবে বসে আছে।

অলির কাঁধে হাত রেখে খুব নরমভাবে শর্মিলা বললো, এই তুমি মুখখানা এমন মলিন করে ফেললে যে? আমি না জেনে কি তোমাকে কোনো আঘাত দিয়েছি?

অলি বললো, না। শর্মিলাদি, তোমাকে আমার খুব আপন মনে হচ্ছে, তাই তোমাকে বলছি। আমি বোধ হয় জোরজার করে এখানে চলে এসে একটা ভুলই করেছি। না আসাই উচিত ছিল। এখন বুঝতে পারছি, এয়ারপোর্টে পা দেবার পরই মনে হচ্ছিল, আমি ঠিক সহ্য করতে পারবো না।

শর্মিলা বললো, কেন, কী হয়েছে!

অলি অন্যদিকে তাকিয়ে বললো, দেশে আমার একজন খুব বন্ধু আছে। তার নাম শৌনক। সে আমাকে আসতে বারণ করেছিল। আমার বাবারও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এক্ষুনি বিয়ে করে আমার সংসারী হতে ইচ্ছে হয়নি। অ্যামেরিকায় পড়তে আসার স্বপ্ন ছিল অনেকদিনের। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এখানে আমার মন টিকবে না, অতদিন থাকতে পারবো না।

শর্মিলা বললো, দুটো বছর তো, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। প্রতি ছ'মাস বেশ কষ্ট হবে, প্রত্যেকটা দিনই মনে হবে খুব লম্বা। তোমার সেই বন্ধু কী করেন?

অ্যাকটিভ পলিটিকস্ করে। বাবলুদা শুনলে চটে যাবে।

কেন, চটে যাবে কেন?

শৌনক সি পি এমের অ্যাকটিভ মেম্বার। বাবলুদাদের তো ওদের সঙ্গে খুব ঝগড়া। শুধু ঝগড়া নয়, শত্রুতা। দেশে গেলে বাবলুদা বোধ হয় শৌনকের সঙ্গে কথাই বলবে না।

যাঃ। পলিটিক্যাল ইডিয়লজির ডিফারেন্স ব্যক্তিগত সম্পর্কের লেভেলে নিয়ে আসবে কেন?

তুমি শৌনকের ব্যাপারটা বাবলুদাকে প্রথমেই কিছু বলো না। আস্তে আস্তে কোনো একসময় বুঝিয়ে বলো। মানুষ হিসেবে শৌনক খুব খাঁটি।

দু' জনে গল্প করতে করতে কাটিয়ে দিল আরও একঘণ্টা।

তারপর সিদ্ধার্থ, সুজান আর অতীন একসঙ্গে এলো এই ঘরে। অন্য বাড়ি থেকে ফিরে অতীন প্রথমেই এখানে আসেনি, ওপর থেকে সিদ্ধার্থদের ডেকে এনেছে। সিদ্ধার্থ শর্মিলাকে বকুনি দিয়ে বললো, অ্যাই, তুমি এখনো ঐ রাত্তিরের জামাটা পরে আছো? তৈরি হওনি! আজ একেবারে দেশের মতন বর্ষার ওয়েদার, লং ড্রাইভে বেরুবো। চলো চলো, চলো!

অতীন অলিকে জিজ্ঞেস করলো, ভালো করে ঘুমিয়ে নিয়েছো?

অলি হাসি মুখে বললো, হ্যাঁ। এখনো কিছুই দেখা হলো না, ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগছে না।

অতীনের চোখ এখনো লালচে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। সে চঞ্চল চোখে একবার শর্মিলা আর একবার অলির দিকে তাকাচ্ছে। ফস করে সে একটা সিগারেট ধরালো।

শর্মিলা বাথরুমে গেল পোশাক বদলাতে। অলি এসে জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ালো। মনে মনে বললো, শৌনক, তোমাকে কেমন দেখতে? তুমি কি খুব লম্বা, না মাঝারি? তোমার দাড়ি আছে? তুমি সিগারেট খাও?

শৌনক, তোমাকে আমি একটু একটু করে গড়ে তুলবো। তুমি হবে আমার সৃষ্টি, আমার নিজস্ব। তুমি কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না!

॥ ৪৪ ॥

বাবার আমল থেকে রয়েছে চাবুকটা। মালখানগরের কত দামি দামি জিনিসই তো হারিয়ে গেছে, কিন্তু এই চাবুকটা...কলকাতায় প্রতাপ কতবার বাড়ি বদল করেছেন। এই চাবুকটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। মুণ্ডুটা পেতলের, পাকানো পাকানো চামড়ায় ছাতা ধরে গেলেও জীর্ণ হয়নি একেবারে। বহুকাল আগে পুরী বেড়াতে গিয়ে ভবদেব মজুমদার এটা কিনেছিলেন। এখন প্রতাপদের বসবার ঘরে ঝোলানো থাকে।

বাবার হাতে কখনো এই চাবুকের মার খেতে হয়নি প্রতাপকে, কিন্তু তিনি বাবলুকে মেরেছেন। বোধহয় একবারই। কানু মার খেয়েছে দু'তিনবার। কলেজে ভর্তি হবার পর বাবলু একদিন মমতাকে বলেছিল, বসবার ঘরে এটা ঝুলিয়ে রাখার কী মানে হয়, মা? এটা কি একটা ডেকরেশান? বাবার যা মেজাজ, আবার কোন্ দিন কাকে মেরে বসবে, তার ঠিক নেই। চাবুকটা তখন সরিয়ে ফেলা হয়েছিল বটে, এখানে সেখানে পড়ে থাকত, ঐ পেতলের মুণ্ডুটার জন্যই একেবারে ফেলে দেওয়া হয়নি, বাড়ির ঠিকে ঝি একদিন সেটাকে তুলে আবার টাঙিয়ে দিয়েছিল পুরোনো জায়গায়। এখন ওটা এমনই দেয়ালের অঙ্গ হয়ে গেছে যে চোখেই পড়ে না।

মমতা ঘরে ঢুকে দেখলেন, প্রতাপ সেই চাবুকটা দেয়াল থেকে নামিয়ে চুপ করে বসে আছেন। চেয়ারটা ভাঙা, সারানো হয়ে উঠছে না, জোড়াতালি দিয়ে রাখা হয়েছে, পেছন দিকে ভুল করে হেলান দিতে গেলেই উল্টে পড়ে যায়। সামনের টেবিলটারও একটা পায়া বদলানো দরকার। প্রতাপ মাটির দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর মন এখানে নেই।

চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে মমতা বললেন, হাকিম সাহেব এখন কার বিচার করছেন? আসামী খুব কড়া শাস্তি পাবে মনে হচ্ছে?

প্রতাপ একটু চমকে মুখ তুললেন। বেদনা ও রাগ পরিষ্কার আলাদাভাবে ফুটে আছে। তিনি কোনো কথা বললেন না। সকালের ডাকে আসা একটা পোস্ট কার্ড পড়ে আছে প্রতাপের সামনে। মমতা বুঝলেন, ঐ চিঠিখানাই তাঁর স্বামীর মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। আজকাল কোনো চিঠিতেই ভালো খবর আসে না।

মমতা চিঠিটা তুলতে যেতেই প্রতাপ তাড়াতাড়ি সেখানা হাতে নিয়ে নিলেন। মমতা আগেই দেখে নিয়েছেন চিঠিখানা বিদেশ থেকে আসেনি। সেই জন্যই তেমন কিছু উদ্বিগ্ন না হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে লিখেছে? আমায় পড়তে দেবে না?

প্রতাপ মমতার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, না! তোমার এখন পড়ার দরকার নেই। আমাকে আগে একটু চিন্তা করতে দাও!

মমতা তার অবুঝ স্বামীটির মেজাজের কথা ভালোই জানেন। এখন প্রতাপের সঙ্গে নরম সুরে কথা বললে তিনি আরও পেয়ে বসবেন, হুঙ্কার দিয়ে চ্যাঁচামেচি করে ব্যক্তিত্ব ফলাবেন। এখন আর স্বামীকে ঘাটাতে চাইলেন না মমতা, তাঁর রান্না ঘরে কাজ আছে।

তিনি বললেন, চা-টা খেয়ে নাও, তারপর আজ তোমাকে অলিদের বাড়ি যেতে হবে মনে আছে?

একটু পরে মুন্নি রান্না ঘরে এসে ফিসফিস করে বললো, মা, বাবার কী হয়েছে? বাইরের ঘরে বাবা চুপ করে বসে আছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে! আমি ডাকতেও সাড়া দিল না।

প্রতাপের চোখে জল, এটা প্রায় একটা বাঘের ঘাস খাওয়ার মতন ঘটনা। মমতা বিচলিত হয়ে তাড়াতাড়ি উনুন থেকে কড়াইটা নামিয়ে রেখে, আঁচলে হাত মুছে চলে এলেন বাইরের ঘরে। প্রতাপ সেই ভাঙা চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আছেন পাথরের মূর্তির মতন, হাতে চাবুকটা ধরা এবং সত্যিই তাঁর চোখে জল। প্রতাপ রাগারাগি করলে মমতা ভয় পান না, কিন্তু তাঁর এরকম দুর্বলতা দেখলে ঘাবড়ে যান। শরীর খারাপ হয়নি তো? নিজের অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে প্রতাপ দারুণ চাপা, কক্ষনো কিছু বলতে চান না।

মমতা স্বামীর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, কী হলো তোমার? আবার বুক ব্যথা করছে?

প্রতাপ দু' দিকে মাথা নেড়ে বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছলেন। তারপর মমতা ও মুন্নির দিকে তাকিয়ে মুন্নিকেই জিজ্ঞেস করলেন, টুনটুনি কোথায় রে?

পড়াশুনোয় মাথা নেই বলে টুনটুনিকে টাইপ রাইটিং শেখার জন্য একটা স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। সকালবেলা সে গড়িয়াহাট বাজারের কাছে সেই স্কুলে চলে যায়। কোনোদিনই সে ঠিক সময়ে ফেরে না।

প্রতাপ বললেন, মুন্নি তুই গিয়ে টুনটুনিকে ডেকে আনতে পারবি?

মুন্নি বললো, এখন অত দূরে কী করে যাবো? আমার যে কলেজ আছে। টুনটুনি এসে পড়বে এগারোটা–সাড়ে এগারোটার মধ্যে। কী হয়েছে, বাবা, ওকে হঠাৎ ডাকতে হবে কেন?

আদেশ নয়, ধরা গলায় অনুরোধের সুরে প্রতাপ মেয়েকে বললেন, কলেজে দেরি করে যাস, একবার যা, টুনটুনিকে ডেকে নিয়ে আয়।

মমতা বললেন, দেওঘর থেকে কোনো খবর এসেছে? চিঠিটা আমাকে পড়তে দিলে না কেন?

প্রতাপ বললেন, এরকম চিঠি পড়াও পাপ। মমো, ছোড়দি মারা গেছে।

মমতা কেঁপে উঠলেন। টুনটুনিকে ডাকতে পাঠাবার কথা শুনেই মমতা তার পিতৃবিয়োগের খবরের আশঙ্কা করেছিলেন। বিশ্বনাথ গুহের যে-কোনো দুসংবাদ আসা আশ্চর্য কিছু না। কিন্তু শান্তি ঠাকুরঝি? তাঁর অসুস্থতার কথাও বিশ্বনাথ জানাননি।

চিঠিখানা সত্যিই বিচিত্র।

মাই ডিয়ার প্রতাপ,

তোমাকে একটা সুসংবাদ দেই। আমাদের নিয়ে তোমাকে আর কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তোমার ছোড়দি শান্তি গত শনিবার অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে সকলের মায়া কাটাইয়া পরপারে চলে গেছে। আমার প্রতি অবশ্য শেষদিকে তাহার কোনো মায়া ছিলও না। এতদিন পরে সে যথার্থ শান্তি

পাবে। ইতিমধ্যে সংসার চালানো অসম্ভব হওয়ায় বাড়িখানি বিক্রয় করিয়া দিয়াছি। তোমার স্মরণে আছে নিশ্চয় যে তোমার মাতা ঠাকুরানী এই বাড়ি তোমার ছোড়দিকেই ওয়ারিশ করিয়া দিয়াছিলেন। শান্তির জীবিতাবস্থায়, তার সম্মতিতেই বাড়ি বিক্রয় হয়। আমি অবশিষ্ট জীবন কাশীধামে কাটাবো ঠিক করিয়াছি। ধার শোধেই অনেক টাকা ব্যয় হইয়া গেল। এক হাজার টাকা মানি অর্ডার যোগে তোমার নামে পাঠাইলাম, টুনটুনির বিবাহের জন্য রাখিয়া দিও। বিদায়, ব্রাদার, বিদায়। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এ জীবনে ঈশ্বর আমাদের দয়া করলেন না। ইতি তোমার ওস্তাদজী (প্রাক্তন) বিশ্বনাথ গুহ।

টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে প্রতাপ বললেন, খুনী! লোকটা ছোড়দিকে মেরে ফেলেছে!

উলটোদিকের চেয়ারে বসে পড়ে মমতা বিবর্ণ মুখে বললেন, ছোড়দি? ছোড়দি চলে গেল!

কতগুলো কথা মুখে উচ্চারণ করা যায় না, তবু মনে আসে। ক্ষয়কাশের রোগী বিশ্বনাথ গুহকে অনেকদিন ধরেই খরচের খাতায় ধরে রাখা হয়েছিল। এমনকি মমতা এমন কথাও মাঝে মাঝে ভেবেছেন যে, বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর শান্তিকে কলকাতার বাড়িতেই এনে রাখতে হবে। কিছুদিন আগে সুপ্রীতির কী সাংঘাতিক অসুখ গেল, শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে হলো একটা কিডনি, শরীর একেবারে রক্তশূন্য, সাত বোতল রক্ত দিতে হয়েছিল, তবু তো তিনি বেঁচে ফিরে এলেন! বিশ্বনাথ বেঁচে রইলেন, সুপ্রীতি রইলেন আর মরতে হলো শান্তিকে। নিয়তির কী আশ্চর্য কৌতুক।

প্রতাপ আর সুপ্রীতির তুলনায় শান্তি বরাবরই একটা নিষ্প্রভ জীবন কাটিয়ে গেলেন। কোনোদিন তিনি জোরে কথা বলেননি, অন্য কারুর ওপর নিজস্ব মতামত খাটাতে পারেননি। মমতার সব সময়ই শান্তিকে মনে হত তাঁর শাশুড়ির ছায়া। মা-বাবার প্রিয় মেয়ে ছিলেন শান্তি। বিয়ের পরেও তাঁকে বাপের বাড়ি ছাড়তে হয়নি, তাঁর গান-পাগল স্বামী বছরে একবার দুবার দেখা করে যেতেন, সেটাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট সুখের ছিল। দেশের বাড়ি ছেড়ে দেওঘরে যেতে হলো বলেই সেই নিশ্চিন্ত জীবন তছনছ হয়ে গেল।

প্রতাপ ফাটা ফাটা গলায় বললেন, বাড়ি বিক্রি করেছে। আমাদের না জানিয়ে বাড়ি বিক্রি করেছে, তারপর বউকে মেরেছে। ঐ চশমখোরটা সব পারে!

মমতা বললেন, আস্তে। অত চেঁচিয়ো না। দিদিকে ধীরেসুস্থে খবরটা দিতে হবে। প্রতাপ একটুখানি গলা নামিয়ে বললেন, আমি আজই দেওঘরে গিয়ে ওকে ধরবো। কাশীতে গেলেও পার পাবে না।

মমতা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, চিঠিটার তারিখ পাঁচ দিন আগের, সোমবার, ছোড়দি চলে গেছেন আরও দু দিন আগে। আমাদের কি অশৌচ হবে?

প্রতাপ নিদারুণ বিস্মিতভাবে বললেন, ছোড়দি মারা গেছে, আমাদের অশৌচ মানতে হবে না? এটা আবার জিজ্ঞেস করছো?

শোকের মধ্যে নানা রকম ছোটখাটো কথাও মনে আসে। সকালেই প্রতাপ বাজার থেকে মাগুর মাছ এনেছেন, একটু আগে মমতা সেইমাছ কুটে কড়াইতে চাপিয়েছিলেন। দামী মাছ, ফেলে দিতে হবে। আজও তো এ বাড়িতে ফ্রিজ কেনা হলো না। প্রতাপ যদি চিঠিটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে মমতাকে জানাতেন, তাহলেও ঐ জিওল মাছ না কুটে বাঁচিয়ে রাখা যেত কয়েক দিন। মমতার ধারণা, বোন মারা গেলে তিনদিনের বেশী অশৌচ থাকে না।

শুধু শুধু খরচের বোঝা বাড়াবার কোনো মানে হয় না। মমতা বললেন, যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তুমি আর দেওঘর গিয়ে কী করবে? টুনটুনিকে দিয়ে এখানেই শ্রাদ্ধ করাও।

প্রতাপ আবার ক্ষেপে উঠে বললেন, যাবো না মানে? ঐ মাতাল, জোচ্চোরটাকে আমি পালাতে দেবো ভেবেছো? ওর টি বি কক্ষনো হয়নি, কিচ্ছু হয়নি, টি বি হলে এতদিন কেউ বাঁচে? আমাদের ঠকিয়েছে, সাধারণ কাশির অসুখ, ঐ জন্যই ডাক্তার দেখাতে চাইতো না। আমার ছোড়দিকে কত কষ্ট দিয়েছে। আমি আজই বিকেলের ট্রেনে গিয়ে ওকে ধরবো!

মমতা চুপ করে সব শুনলেন, তারপর দৃঢ়ভাবে বললেন, না তুমি যাবে না!

মমতা আবার চলে গেলেন রান্না ঘরে। অশৌচ যখন মানতেই হবে, তখন বাড়িতে আমিষের গন্ধ থাকাও ঠিক নয়। সুপ্রীতি এখনও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। এখন সব কিছু সামলাতে হবে তো মমতাকেই।

মায়ের পেটের বোন শান্তির জন্য প্রতাপ আর সুপ্রীতির যতটা শোক হবে, মমতা ততোটা বোধ

করবেন না, এটা স্বাভাবিক। কতটুকু বা দেখেছেন শান্তিকে, মমতা তো কখনো শান্তির জন্য মমতার কষ্ট হতে লাগলো। শেষের ক'টা বছর কী যাতনাই না ভোগ করতে হলো ওকে!

এমনকি বিশ্বনাথের জন্যও কষ্ট বোধ করলেন মমতা। টি বি হোক বা না হোক, মুখ দিয়ে রক্ত তো পড়তোই, আর ঐ কাশির অসুখটার জন্যই বিশ্বনাথের গানের গলা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। বিশ্বনাথের ধারণা, গুরুর অভিশাপেই এরকম হয়েছে, তিনি ছাত্রছাত্রীদের গান শিখিয়ে পয়সা নিতেন। কিন্তু পয়সা উপার্জনের আর কোনো পন্থাও তো বিশ্বনাথের জানা ছিল না। গায়ক মানুষের কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে গেলে আর কী থাকে! দিলখোলা, বেপরোয়া সেই মানুষটার কী পরিণতি! দেওঘরের ঐ বাড়ি বিক্রি করাই বা কী এমন অপরাধ হয়েছে? প্রতাপ নিজেই কিছুদিন আগে বলেছিলেন, ঐ বাড়ি উদ্ধারের কোনো আশা নেই। কয়েকটি গুণ্ডাগোছের ভাড়াটে একতলাটা দখল করে রেখেছে, তারা এক পয়সাও ভাড়া দেয় না, তাদের উঠিয়ে দেবারও কোনো উপায় নেই। ঐ বাড়ি কেনার খদ্দের যে পাওয়া গেছে তাই-ই যথেষ্ট, হয়তো যৎসামান্য দাম ধরে দিয়েছে।

অসুস্থ শরীর নিয়ে বিশ্বনাথ কোথায় একা একা ঘুরবেন। কলকাতায় এসে যাতে প্রতাপদের ঘাড়ের বোঝা হতে না হয়, তাই বিশ্বনাথ ইচ্ছে করে হারিয়ে গেলেন জনারণ্যে, এটাও বুঝতে পারলেন মমতা। বিশ্বনাথের জন্য দুঃখ হলো মমতার, আবার কৃতজ্ঞতাও বোধ করলেন। বিশ্বনাথকে এ বাড়িতে রাখা খুবই কষ্টকর হতো!

এই সব চিন্তার ফাঁকে ফাঁকেও মমতার মনে পড়তে লাগলো বাবলুর কথা। ছেলেটা অনেকদিন চিঠি লেখে না। অলি পৌঁছেই চিঠি দেবে বলেছিল, তাও তো এলো না। আমেরিকার রাস্তায় নাকি যখন-তখন অ্যাকসিডেন্ট হয়। কয়েকদিন আগেই কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে যে, নিউইয়র্কে একটি বাঙালী ছাত্র আত্মহত্যা করেছে, বন্ধ ঘরের মধ্যে তিন দিন তার লাশ পড়েছিল, কেউ টের পায়নি। এসব ভাবলেই বুক কাঁপে।

সুপ্রীতিকে শান্তির মৃত্যু-সংবাদ জানাবার ভার মমতাকেই নিতে হল। সুপ্রীতি বিষম কোনো আঘাত কিংবা শোকের উচ্ছ্বাস দেখালেন না। শরীর দুর্বল হলে মানুষের আবেগও কমে যায়। সুপ্রীতি শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার আগেই চলে গেল! মায়ের কাছে গেছে, মা ওকে ডেকে নিয়েছে, ওখানেই শান্তি ভালো থাকবে!

সুপ্রীতি আরও বললেন, তুতুল-বাবলুকে এ খবর এখন লিখো না, মমো। প্রবাসে অশৌচ মানতে হয় না। টুনটুনির কোমরে একটা লোহার চাবি বেঁধে দিও।

টুনটুনিকে খুঁজতে গিয়ে পেল না মুন্নি। টাইপিং স্কুলে এসে একটা খারাপ খবর শুনলো মুন্নি। টুনটুনি এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল বটে, কিন্তু গত এক মাসের মধ্যে সে একদিনও আসেনি। ইনস্ট্রাক্টরকে সে বলেছে যে, তার টাইপ শিখতে ভালো লাগে না। তা হলে রোজ সকালে টাইপ শেখার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে টুনটুনি কোথায় যায়? এই মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

এখন টুনটুনিকে না নিয়ে বাড়ি ফিরবে কী করে মুন্নি? আসল কথাটা শুনলে বাবা রেগে যাবে, অথচ কী মিথ্যে কথাই বা বলা যায়? দেওঘরের খবরটা সে জেনে এসেছে। শান্তি পিসিকে তার ভালো করে মনেই নেই, কিন্তু টুনটুনি তো তার মাকে হারালো। মা-বাবার কথা বেশি বলেই না টুনটুনি, যদি বা কখনো প্রসঙ্গ ওঠে তখন বাবার প্রতি অসম্ভব একটা রাগের ভাব টুনটুনির কথায় ফুটে বেরোয়। কিসের জন্য রাগ কে জানে।

টাইপিং স্কুল থেকে টুনটুনির এগারোটায় ফেরার কথা, অতক্ষণ তা হলে মুন্নিকে অন্য কোথাও কাটিয়ে যেতে হয়। মহা মুশকিলের ব্যাপার। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে মুন্নির এক বান্ধবীর বাড়ি আছে, কিন্তু সে নিশ্চয়ই এখন কলেজে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

গোলপার্কের মোড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে মুন্নি একটা ল্যান্ড মাস্টার গাড়ির সামনে পড়ে গেল। গাড়িটা তাকে দেখেই ব্রেক কষেছে। একজন মোটাসোটা লোক গলা বাড়িয়ে বললো, অ্যাই মুন্নি, কোথায় যাচ্ছিস? খানিকটা এগিয়ে দেবো।

চিনতে কয়েক পলক অসুবিধে হলো মুন্নির। কানুকাকা! এই কানুকাকা ন'মাসে ছ'মাসে তাদের বাড়িতে আসে, কিন্তু দিন দিনই মোটা হচ্ছে বলে প্রত্যেকবারই অন্য রকম মনে হয়। এখন গাল দুটো একেবারে বাতাবী লেবুর মতন।

বড়বাজারে একটা কাপড়ের দোকানের অর্ধেক মালিক এই কানুকাকা। প্রত্যেক বছর মাকে আর

পিসিমণিকে ভালো শাড়ি দেয়। কিন্তু বাবাকে কিছু দেয় না। বড়বাজারে যারা ব্যবসা করে, তাদের বুঝি মোটা হওয়াই নিয়ম।

কানুর মুখভর্তি পান, সে রাস্তায় পিক ফেলে বললো, বড়দি কেমন আছে রে? তখন মুন্নির মনে পড়ে গেল। শান্তিপিসিও তো কানুকাকার দিদি হয়। সুতরাং, আজকের গুরুতর খবরটি কানুকাকাকে জানানো উচিত। সে জিজ্ঞেস করলো, দেওঘরের শান্তিপিসির কথা তোমার মনে আছে, কানুকাকা?

কানু বললো, কেন মনে থাকবে না? কী হয়েছে ছোড়দির?

খবরটার শুনে কানু বেশ বিহ্বল হয়ে গেল। তারপর অস্ফুটভাবে বললো, বিশ্বনাথ-জামাইবাবু আমার কাছ থেকে দেড় হাজার টাকা ধার নিয়েছিল, সে কি আর শোধ দেবে?

পেছন থেকে অন্য গাড়ি হর্ন দিচ্ছে, কানুর গাড়িটা বেয়াড়াভাবে দাঁড় করানো, বুড়ো ড্রাইভার গাড়িটা সাইড করলো। কানু নেমে পড়ে বিষাদাচ্ছন্ন গলায় বললো, মালখানগরের মজুমদার বংশের আর একজন চলে গেল! ছোড়দি বড় ভালো মানুষ ছিল রে। জানিস মুন্নি, গত বছর তোর কাকিমা আর হোল ফ্যামিলি নিয়ে আমি দেওঘরে গেছিলাম। বাহান্ন বিঘাতে বাড়ি ভাড়া করে ছিলাম এক মাস। বিরাট প্যালেশিয়াল বিল্ডিং, ঐ বিশ্বনাথ-জামাইবাবু ঠিক করে দিয়েছিলেন। তখনই দেখি যে ছোড়দির খুব অ্যানিমিয়া, আমি দৈনিক ৮র সের দুধের ব্যবস্থা করে দিলাম, কিন্তু ছোড়দি সেই দুধ নিজে না খেয়ে জামাইবাবুকেই খাইয়ে দিত! আমি যখন ছোট ছিলাম, দেশের বাড়িতে ছোড়দি আমাকে দুধ-মুড়ি-পাটালি গুড় মেখে কতদিন খেতে দিয়েছে। সেই ছোড়দি------! ওঠ মুন্নি, ওঠ, তোদের বাসায় গিয়ে সকলের সাথে দেখা ক'রে আসি!

কানু এসে পড়ায় মমতার সুবিধেই হলো। কানু উদ্যোগী, কর্মী পুরুষ। বিশ্বনাথ গুহ শান্তির শ্রাদ্ধের কিছু ব্যবস্থা করেছেন কি না তা জানাননি, নিয়ম রক্ষার জন্য এ বাড়িতে একটা ছোটখাটো শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হলো। পুরুত ডাকা, জিনিসপত্রের জোগাড়যন্ত্র করা, সে সব দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিয়ে নিল কানু।

যথেষ্ট টাকা-পয়সা করেছে কানু, নিজের বাড়িও গাড়ি আছে, তবু তার একটাই ক্ষোভ, সে তার সেজদার কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করতে পারলো না। প্রতাপ এখন ও কানুকে গ্রাহ্যই করেন না। আগের মতন বকুনি-দাবড়ানি দেন না বটে, কিন্তু কথাও বিশেষ বলেন, না হুঁ-হাঁ করে কোনো মতে এড়িয়ে যান। কানুর এখন শ্বশুর বাড়ির বেশ বড় একটা গোষ্ঠী আছে, ব্যবসার জগতের পরিচিত মন্ডলী আছে, তবু যেন, একদা যে পরিবার থেকে সে প্রায় বিতাড়িত হয়েছিল, সেখানে এসে ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি না দেখাতে পারলে যেন তার সুখ হয় না। তাই সে এ বাড়িতে ঘুরে ফিরে আসে।

তিন-চারদিনের মধ্যেই শান্তির প্রসঙ্গ একেবারে চুকেবুকে গেল। দেওঘরে সকলে মিলে সুখের দিনের একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ তোরঙ্গ থেকে বার করে মমতা বাঁধতে দিলেন, ঐ ছবিতেও শান্তি সকলের আড়ালে পড়ে গেছেন, কোনোক্রমে মুখটা শুধু একটু খানি দেখা যায়।

সপ্তাহখানেক পরে এক রাত্তিতে মমতা হালকা মেজাজে প্রতাপকে জিজ্ঞেস করলেন, সেদিন জামাইবাবুর পোষ্টকার্ডটা আসবার পর তুমি দেয়াল থেকে চাবুকটা পেড়ে হাতে নিয়ে বসেছিলে কেন বলো তো? কাকে মারবে ভেবেছিলে? যমকে?

প্রতাপ কোনো উত্তর দিলেন না। মুখ নীচু করে সিগারেট টানতে লাগলেন। মমতা কাছে এসে তাঁর স্বামীর গেঞ্জিপরা চওড়া কাঁধে হাত রেখে আবার জিজ্ঞেস করলেন, বলো না কাকে মারবে ভেবেছিলে? যমের বলে বিশ্বনাথ নাকি? তিনি রইলেই দেওঘরে না কাশীতে, আর তুমি কলকাতায় বসে তাঁকে মারবার জন্য চাবুক তুললে? লোকে যে কেন তোমাকে পাগল বলে না, তাই ভাবি!

প্রতাপ বললেন, তুমি তা হলে আমাকে পাগলই ভাবো?

মমতা বললেন, ভাববো না? এক এক সময় যা কান্ড করো! শোনো, এবারে ঐ চাবুকটা ফেলে দাও! বসবার ঘরে কেউ চাবুক সাজিয়ে রাখে না। সেদিন কানু হাসতে হাসতে বলছিল, সেজদা ওটা কাকে মারবার জন্য রেখেছে?

প্রতাপ বললেন, ওটা যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে! ওটা আমাদের বংশের একটা চিহ্ন।

মমতা বললেন, আহা হা, কী এমন চিহ্ন! তোমার মায়ের আনা ভালো ভালো কাঁসার বাসনগুলো তো সব দেওঘরেই পড়ে রইলো। আমি দুটো থালা আনতে চেয়েছিলাম, তুমি তাও আনতে দাওনি।

প্রতাপ বললেন, ওরকম মোটাসোটা কাঁসার থালা আজকাল আর কে ব্যবহার করে? আনলেও

তো বাক্সে ভরে রাখতে।

মমতা বললেন, স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে থেকে যেত। ঐ রকম চাবুক বুঝি কেউ ব্যবহার করে আজকাল?

প্রতাপ বললেন, সেদিন চাবুকটা কেন হাতে নিয়েছিলাম জানো? ওটা সত্যি সত্যি ব্যবহার করি বা না করি, কিন্তু প্রয়োজন হলে ব্যবহার করার ইচ্ছেটা যেন চলে না যায়! সেই ইচ্ছেটা চলে যাওয়াই হচ্ছে চূড়ান্ত কমপ্রোমাইজ। সে রকম কমপ্রোমাইজের জীবন আমার দ্বারা হবে না, বুঝলে! তা তুমি আমাকে পাগলই বলো, আর যাই-ই বলো!

মমতা স্বামীর মাথার চুল মুঠো করে ধরে সকৌতুকে বললেন, পাগল, আমার বদ্ধ পাগল! বাইরের লোকের সামনে আর বেশী পাগলামি করতে যেও না, এ বয়েসে মানায় না।

অনেকদিন পর বিছানায় শুয়ে বেশ কিছুক্ষণ গল্প হলো., প্রণয় হলো, তারপর মমতা তাঁর স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

কয়েকদিন পর প্রতাপ সত্যিই পাগলের মতন দাপাদাপি শুরু করে দিলেন ঘরের মধ্যে। মমতা কিছুতেই তাঁকে ধরে রাখতে পারেন না।

গতকালই টুনটুনি মমতার কাছে স্বীকার করেছে, যে, সে গর্ভবতী। তাদের প্রাক্তন বাড়িওয়ালার ছেলে পরেশই তার প্রেমিক। তবে পরেশ তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু পরেশের বাবাও কিছুদিন আগেই মারা গেছেন, এখনও তার কালাশৌচ কাটেনি, তাই আনুষ্ঠানিক বিয়ে হবে না, পরেশের বন্ধুরা গোপনে রেজিস্ট্রি বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। আজ সেই বিয়ে, সন্ধের পর পরেশ আর টুনটুনি আসবে এ বাড়ির গুরুজনদের প্রণাম করতে। টুনটুনি আপাতত এ বাড়িতেই থাকবে, এক বছর পরে পরেশ তার স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে।

টুনটুনি যে একটা হিল্লে হয়ে গেল, এতে সকলের খুশী হবারই কথা। তবু প্রতাপ রাগে ফেটে পড়লেন। সমস্ত ব্যাপারটাই প্রতাপের কাছে অত্যন্ত অপবিত্র মনে হচ্ছে। টুনটুনির মায়ের মৃত্যুর এক মাস ও পূর্ণ হয়নি, এর মধ্যেই সে কুমারীত্ব নষ্ট করলো? মমতা বোঝালেন যে টুনটুনির ঐ ব্যাপারটা কয়েক মাস আগেই শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই, এর সঙ্গে মায়ের মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রতাপ বললেন, বিয়ে করবে ঐ স্কাউন্ড্রেল পরেশটাকে? ওকে গলায় দড়ি দিতে বলো! ওকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও, আমি কোনোদিন আর ওর মুখ দেখতে চাই না!

প্রতাপের বাহুতে হাত রেখে মমতা বললেন, এ সব তোমার পাগলামির কথা! আজকাল মেনে নিতে হয়। মেনে না নিলেই অশান্তি বাড়ে। ভুল করুক বা যাই-ই করুক, মেয়েটা যখন একটা কান্ড বাধিয়ে বসেছে, তখন যার সঙ্গে ঐ সব ব্যাপার, সেই-ই যে ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, সেটাই তো ওর মহাভাগ্যের ব্যাপার। না হলে ও মেয়ের কি আর কারুর সঙ্গে বিয়ে হতো কখনো? এখন তুমি আর মাথা গরম করো না!

প্রতাপ বললেন, তোমার মনে নেই, আমাদের কালীঘাটের বাড়িতে এসে ঐ পরেশ কত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে গিয়েছিল। আমাকে মুখের ওপর শাসিয়েছিল। মাঝ রাতে বোমা ছুঁড়ে ছিল! সেই হারামজাদাকে আমরা জামাই করে বাড়িতে বরণ করে নেবো? আমাদের কি মান-সম্মান বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই? গরিব হয়ে গেছি বলে--- আসুক ও এ বাড়িতে, আমি চাবুক পেটা করে ওর পিঠের চামড়া তুলে নেবো!

মমতা দু'দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে শান্ত গলায় বললেন, না, তুমি চাবুক মারবে না। কারুকেই চাবুক মারবে না। অবস্থার গতিকে পুরোনো অনেক কথা ভুলে যেতেই হয়।

এর পরেও মমতা অনেকক্ষণ ধরে প্রতাপকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, প্রতাপের মেজাজ উত্তরোত্তর চড়তে লাগলো। পরেশের নামটাই তিনি সহ্য করতে পারছেন না। এই বিয়েটাও তিনি স্বীকার করতে চান না। তার মতে, ঐ গোপনে বিয়ে করাটা একেবারে বাজে কথা! রেজিস্ট্রি বিয়ের ও কোনো দাম নেই। টুনটুনিকে এ বাড়িতেই ফেলে রাখবে, পরেশ কোনোদিনই তা এই বউকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে না। ওরা অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে, ওদের পরিবারে ছেলের বিয়ে দিয়ে শুধু বউ আনা হয় না, এক কাঁড়ি টাকা আর সোনাদানাও আনে! মমতা বললেন, এক বছর অন্তত অপেক্ষা করে তো দেখা যাক। তারপর পরেশের মতিগতি সত্যি খারাপ দেখলে আইনের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। তার বদলে পরেশকে এখন চাবুক মারলে তো কোনো কিছুরই সুরাহা হবে না।

অবুঝ প্রতাপের প্রতি মমতা তাঁর শেষ অস্ত্রটি নিক্ষেপ করলেন।

তিনি বললেন, বেশ, এতই যদি তোমার জেদ, তুমি যদি আমার কথা মোটেই শুনতে না চাও, তা হলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করো। টুনটুনিকে পরেশকে মারধোর করো, পাড়ার লোক এসে জমুক বাড়িতে, যা খুশী হোক! মুন্নিকে নিয়ে আমি বিকেলবেলাই চলে যাবো আমার ছোট বোনের কাছে। তুমি যেন আমাদের আর কোনো দিন ডাকতে যেও না!

সন্ধের একটু পরে এলো টুনটুনিরা। পরেশ একা আসেনি, সঙ্গে তিনজন বন্ধুকেও নিয়ে এসেছে। রেজিস্ট্রি বিয়ে হলেও টুনটুনিকে ওরা কিনে দিয়েছে একটা লাল বেনারসী শাড়ী, মাথায় অর্ধেক ঘোমটা দেওয়া, সিঁথিতে সিঁদুর পরা টুনটুনিকে দেখাচ্ছে একেবারে অন্য রকম।

মমতা আগেই মিষ্টি আনিয়ে রেখেছিলেন, মুন্নি সবাইকে পরিবেশন করলো। বেশ একটা আনন্দ-হুল্লোড়ের পরিবেশ হলো। বিয়ের কনের মতনই লজ্জা লজ্জা মুখ করে বসে আছে টুনটুনি, পরেশের এক বন্ধু পর পর তিনখানি গজল গান শোনালো।

পরেশই এক সময় মমতাকে জিজ্ঞেস করলো, কাকিমা, কাকাবাবু নেই বাড়িতে? অসুস্থ শরীর নিয়ে সুপ্রীতিও একবার এ ঘরে সকলের প্রণাম নিয়ে গেছেন। কিন্তু প্রতাপ আসেননি। নিজের ঘরে তিনি উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়।

মুন্নি মিথ্যে কথা বলতে যাচ্ছিল, মমতা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, হ্যাঁ আছেন বাড়িতে। স্নান করছিলেন, তোমরা বসো, আমি ডেকে আনছি।

শয়নকক্ষে এসে দুই ছেলেকে কড়া শাসনের ভঙ্গিতে মমতা বললেন, এই শেষবারের মতন তোমাকে বলছি, তুমি একবার ওঘরে আসবে কি না?

প্রতাপ বিছানা থেকে উঠে এসে অতিশয় কাতরভাবে বললেন, আমাকে কি যেতেই হবে? কেন আমাকে এসবের মধ্যে জড়াচ্ছো?

মমতা বললেন, মুখটা মুছে নাও, একটা গেঞ্জি পরো।

প্রতাপকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। থেমে গেল গজল গান। পরেশ এগিয়ে এসে একেবারে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রতাপের পায়ের ধুলো নিয়ে বিগলিতভাবে বললো কাকাবাবু বাবা মারা গেছে শুনেছেন তো? আজ থেকে আপনি আমার বাবার মতন হলেন---

এই ছেলে মাত্র কয়েক মাস আগে বোমা মেরে কালী ঘাটের বাড়ি থেকে তাঁদের তাড়িয়েছিল, সেই সময় প্রতাপ দারুণ বিপত্তির মধ্যে পড়েছিলেন, এখন তার মুখে এই রকম কথা শুনলে ঠাস করে চড় কষাতে ইচ্ছে করে না? আসলে পরেশ প্রতিশোধ নিতে এসেছে, সে দেখিয়ে দিল এ বাড়ির একটি মেয়েকে নিয়ে সে যেমন খুশী খেলা খেলতে পারে। একটা কাগজে সই করা বিয়ে করতে রাজি হয়েছে বলেই তার সাত খুন মাপ? প্রতাপের মনে হলো, এই বিয়েতে তাঁর বাবার অপমান, মায়ের অপমান, ছোড়দির অপমান। তাঁর নিজের অপমান তো বটেই।

প্রতাপ দেয়ালের দিকে তাকালো। মমতা চাবুকটা সরিয়ে ফেলেছেন। ময়লা দেয়ালে চাবুকটার জায়গায় একটা ফর্সা, লম্বা দাগ। সত্যি সত্যি চাবুক না মারলেও চাবুক ব্যবহার করার ইচ্ছেটা যেন চলে না যায়। প্রতাপ ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে অদৃশ্য চাবুক ধরে রইলেন।

মমতা সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো। মমতা ঈঙ্গিতে বলছেন- নতুন বর-বধূকে আশীর্বাদ করতে। প্রতাপ একবার ভাবলেন বলে উঠবেন, যথেষ্ট আদিখ্যেতা হয়েছে, এবার বিদায় হও! পরক্ষণেই তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন। তার ঘাড় ব্যথা করছে।

হাতের মুঠো খুলে তিনি করতল রাখলেন পরেশের মাথার সিকি ইঞ্চি উঁচুতে, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। তিনি ওর শরীর স্পর্শ করলেন না।

॥ ৪৫ ॥

আজ কাজের দিন, আজ আর কোনো খেলা নয়। গত রাত্রে প্রায় আড়াইটে পর্যন্ত আড্ডা চললেও সিদ্ধার্থ সকাল সাতটার মধ্যে স্নান পর্যন্ত সেরে নিয়েছে। নিজেই কফি বানিয়েছে জেগে উঠে, এরপর সে ব্রেক ফাস্ট সেরে নিয়েই দৌড়োবে।

গতকাল শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূর যাওয়া হয়েছিল। ফেরার পথে সিদ্ধার্থর বান্ধবী নেমে গেছে ক্যারসডেলে, সেখানে তার এক বোন থাকে। সুতরাং রাত্তির বেলা অতীনের ঘুমোবার জায়গা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ টাই-এর বাঁধছে, আয়নার মধ্যেই সে দেখলো অতীন হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে আচ্ছন্নের মতন চেয়ে আছে।

সিদ্ধার্থ বললো, কী রে, তুই এর মধ্যে উঠে পড়লি? তুই তো আর অফিস যাচ্ছিস না! অতীন জিজ্ঞেস করলো, কটা বাজে? আমাদের বাস ধরতে হবে না?

সিদ্ধার্থ বললো, নিউ ইয়র্ক থেকে বস্টনের বাস প্রতি ঘণ্টায় ছাড়ে। ব্যস্ত হবার কী আছে? আজকের দিনটা থেকে যা, রাত্তিরের বাসে যাবি!

অতীন বিছানা থেকে নেমে এসে বললো, না, না, আটটার বাস ধরতেই হবে। আর দেরি করা চলবে না।

সিদ্ধার্থ বললো, মেয়েরা এখনও ঘুমোচ্ছে। ওদের ডেকে তুলে রেডি করে তুই আটটার বাস ধরবি? পাগল নাকি? দশটার আগে কিছুতেই পারবি না, আই ক্যান বেট! আজ আর ইউনিভার্সিটি অ্যাটেন্ড করতে পারবি না, সো ফরগেট ইট। সারা দিনটা ঘুরে বেড়া, শর্মিলা গুগেনহাইম মিউজিয়াম দেখেনি বলছিল, দেখিয়ে নিয়ে আয়।

হঠাৎ কথা থামিয়ে সিদ্ধার্থ এক ঝলক থামলো। অতীনের দিকে ভুরু নাচিয়ে বললো, বেশ আছিস, অ্যাঁ? এবার দুটো মেয়েকে নিয়ে হারেম বানাবি?

অতীন কোনো কথা না বলে রান্নার জায়গায় এসে কফি বানাতে লাগলো।

সিদ্ধার্থ বললো, আমার জন্য দুটো ডিম ফ্রাই করে দে তো! কালকের খাবারের অনেক লেফট ওভার রয়ে গেছে ফ্রিজে, আজ আর দুপুরে তোরা রান্না-বান্না করিসনি।

টেবিলে এসে বসে টোস্টে দ্রুত মাখন মাখাতে মাখাতে সিদ্ধার্থ বললো, আমি আজ টিউবে যাবো। তুই আজ ইচ্ছে করলে আমার গাড়িটা নিতে পারিস। মেয়ে দুটিকে শহর ঘুরিয়ে নিয়ে আয়!

সিদ্ধার্থর মেজাজ কখন যে কি রকম থাকবে তা বোঝা শক্ত। কাল বাইরে বেড়াবার সময় অতীন বেশ কয়েকবার মিনতি করেছিল তাকে একটু চালাতে দেবার জন্য। টানা হাইওয়ে, কোনো অসুবিধেই নেই। কিন্তু অতীন নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে, তাই সিদ্ধার্থ কিছুতেই তার হাতে নিজের গাড়ির স্টিয়ারিং ছেড়ে দিতে রাজি নয়। সে বলেছিল, অত শখ কেন, চাঁদু? আগে নিজের পয়সার গাড়ি কেন, তারপর যত ইচ্ছে অ্যাকসিডেন্ট করিস! আমার গাড়ি আমি অন্যের হাতে দিই না!

আজ সেই সিদ্ধার্থ নিজে থেকেই অতীনকে গাড়ি দিতে চাইছে, তাও শহরে চালাবার জন্য! অতীন ভারী গলায় বললো, না, গাড়ি লাগবে না। একটু বাদে বাস-স্টেশনে চলে যাবো। আজ আর শহর ঘোরা- টোরা হবে না!

-হোয়াট্স দা হারি, ম্যান! নীচে-ওপরে দু'খানা অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি থেকে না বেরুতে চাস, একবার এ বিছানায়, আর একবার ও বিছানায়, হ্যাভ ফান!

আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে সপাটে সিদ্ধার্থর গালে একটা চড় কষালো অতীন। চিৎকার করে বললো, মুখ সামলে কথা বলবি!

সিদ্ধার্থর প্লেট থেকে একটা টোস্টের টুকরো ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। সিদ্ধার্থ মনোযোগ দিয়ে সেটা তুললো। তারপর আবার খাওয়া শুরু করলো।

একটুখানি চুপ করে থেকে অতীন বললো, সব সময় ঠাট্টা-ইয়ার্কি ভালো লাগে না! সিদ্ধার্থ মুখ না তুলে বললো, গেট আউট অফ মাই হাউস, রাইট নাউ, লক স্টক অ্যান্ড ব্যারেল!

অতীন ঘুরে গিয়ে সিদ্ধার্থর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, আই অ্যাম সরি, সিদ্ধার্থ। হঠাৎ মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল!

-আই সে ক্লিয়ার আউট! অ্যান্ড টেক দোজ টু বেবীজ ইন ইয়োর আর্মস। নেভার সেট ফুট ইন মাই হাউজ এগেইন!

-আমি ক্ষমা চাইছি, সিদ্ধার্থ। আমরা দশটার বাসেই চলে যাবো, কথা দিচ্ছি।

-ক্ষমা? এতদিন বন্ধু ভেবে তোকে দুধকলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছি! আমাকে চড় মারলি, তোর এত সাহস! এক্ষুনি ঘুষি মেরে তোর নাক ভেঙে দিতে পারি। কিন্তু আমি ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স পছন্দ করি না। বেরিয়ে যা, এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা!

-আচ্ছা যাচ্ছি। একটু পরেই-

–একটু পরে না। এক্ষুনি ! আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। কোনোদিন আমাকে টেলিফোনও করবি না। ঐ মেয়েদুটোকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই কর গিয়ে---

–তোকে আর জ্বালাতন করবো না, সিদ্ধার্থ। আমি ক্ষমা পাবার যোগ্য নয়।

এবার সিদ্ধার্থ মুখ তুলে হো হো করে হেসে উঠলো। নিজের অভিনয়টা বেশ উপভোগ করে সে বললো, টি-ভি'র সোপগুলোতে এইরকম এক একটা দৃশ্য থাকে না? বন্ধুতে বন্ধুতে ভুল বোঝাবুঝি, তারপর থেকে তারা ঘোরতর শত্রু!

অতীন অনুতাপে ও লজ্জায় নির্বাক।

সিদ্ধার্থ বললো, আমার ডিম দুটো ভেজেছিস? দে। কী আমার বীরপুরুষ, বন্ধুকে চড় মেরে রাগ দেখানো হচ্ছে। ব্রেক ফাস্টের আগে ভায়োলেন্স, ছি ছি, মোস্ট ডিটেস্টেবল্ বিহেভিয়ার।

আমি বেশিক্ষণ চালাতে পারলুম না, হাসি পেয়ে গেল! কিন্তু সত্যি অতীন, তুই এই নতুন মেয়েটার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করছিস, আমার খুব খারাপ লাগছে! মেয়েটা এতদূর থেকে এসেছে, একটা নতুন দেশ, তোকে ছাড়া আর কারুকে চেনেনা, আর তুই তার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলছিল না? তুই যে ওকে এড়িয়ে চলছিস, তা সবাই বুঝতে পারছে। এমন কি সুভান পর্যন্ত বলছিল, দেয়ার মাস্ট বী সামথিং রং--

অতীন বলো, হ্যাঁ, এবার অলিকে বলতে হবে।

–কী বলবি?

–শর্মিলার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা খুলে বলতে হবে। আমি শুধু ভাবছিলাম, ইস্ট থেকে ওয়েস্টে এলে মনটা অ্যাডযাস্ট করতে কয়েকদিন সময় লাগে, তাই কয়েকটা দিন কেটে গেলে----

–তার মানে তুই ওকে আরও কয়েকটা দিন মিথ্যে আশা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চাস। আমার মতে সেটাও অন্যায়। দেখলে মনে হয়, মেয়েটা খুবই সরল, পিওর অ্যান্ড ডিভাইন্‌লি বিউটিফুল, অ্যান্ড মোস্ট প্রবাবৃলি আ ভার্জিন।

–সেটাই তো মুশকিল। অলি মিথ্যে কথা কাকে বলে তাই জানে না প্রায়। ওর সামনে আমিও কোনো মিথ্যে কথা বলতে পারবো না, প্রথমেই আমার দিকে থেকে সত্যি কথাটা শুনলে ও কতটা আঘাত পাবে তার ঠিক নেই। সেইজন্যই আমি ওর সামনে দাঁড়াতে পারছিনা।

–তুই একটা জিনিস বুঝতে পারছিস না, অতীন। ব্যাপারটা কিন্তু শর্মিলার পক্ষেও বেশ অপমানজনক। শর্মিলা তোর জন্য অনেক স্যাক্রিফাইস করেছে, আর তুই ওর নাকের সামনে একটি প্রেমিকা ঝুলিয়ে রাখবি, দ্যাট ইজ আটারলি রিডিকুলাস।

–আমার জায়গায় তুই পড়লে কী করতি, সিদ্ধার্থ?

–আমি হলে? আমি ঐ এয়ারপোর্টে অলি নামবার সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলতুম, হে দেবী, দীর্ঘদিন তোমার অদর্শনে আমি আর একটি মেয়েকে ভালোবেসেছি, তার সঙ্গে ভুল করে দু-চারবার শুয়েও ফেলেছি, তুমি আমায় ক্ষমা করো। আজ থেকে তুমি আমার ভগিনী হয়ে গেলে। নহ প্রিয়া, নহ বধূ, তুমি মম সুন্দরী ভগিনী---

–আবার চ্যাংড়ামি করছিস, সিদ্ধার্থ?

–এই রে, আবার চড় কষাবি নাকি? বড় জোরে লেগেছিল কিন্তু। শোন, সিরিয়াসলি বলছি, তোর এখন উচিত, অন্তত একটা ঘন্টা এই অলির সঙ্গে নিরিবিলিতে কাটানো। অন্যান্য টুকিটাকি কথা বল। তুই যদি ডিটারমিনড থাকিস যে ওকে সত্যি কথাটাই বলতে চাস, তা হলে ঠিক এক সময় বেরিয়ে আসবে।

–শর্মিলার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেছে।

–তাই দেখছি! শর্মিলা তোর চেয়ে হাজারগুণ ভালো মেয়ে। একলা একলা এতদূর থেকে অলি এসেছে, ওর একটা তীব্র হোম সিকনেস হতেই পারে, সেটা বুঝতে পেরেই শর্মিলা ওকে নানা কথায় ভুলিয়ে রাখছে।

–শর্মিলার কাছ থেকে অলিকে আলাদা করাই যে যাচ্ছে না।

–বাজে কথা বলিস না ! তুই চেষ্টা করলে বুঝি পারা যেত না। শোন, আমার বেশী সময় নেই, আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে। আমি শর্মিলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।

–তুই শর্মিলাকে কোথায় নিয়ে যাবি এখন? একটা কিছু প্লজিবল এক্সপ্লানেশান তো চাই!

–সেটা আমার মাথায় আছে। তুই চট করে শর্মিলাকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।

–ওরা দুজনে এক সঙ্গে ঘুমোচ্ছে। আমি ওখান থেকে একলা শর্মিলাকে কী করে ডেকে আনবো?

–সেটাও আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? প্রেমে পড়লে লোকে বোকা হয়ে যায়, আর একসঙ্গে ডবল প্রেমে পড়লে তোর মতন যে একেবারে বুদ্ধু হয়ে যায়, সেটা আমার জানা ছিল না। ওহে কফি হাউসের অতীন মজুমদার, আয়নায় একবার মুখখানা দ্যাখো! অবিকল হুতোম প্যাঁচা।

খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে জুতো পরে নিয়ে সিদ্ধার্থ বললো, আমার সঙ্গে নীচে চল।

অন্য অ্যাপার্টমেন্টার দরজার সামনে গিয়ে সিদ্ধার্থ বললো, বেল দিলে কে এসে দরজা খুলবে, কার চান্স বেশী বল, অতীন?

অতীন বললো, ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি চান্স।

সিদ্ধার্থ বললো, মোটেই না। বেল শুনে যদি অলি জেগেও ওঠে, তবু নতুন জায়গায় সে একা দরজা খুলবে না। শর্মিলাকে ডাকবে। ইউ ওয়ান্ট টু বেট?

অতীন বেলে আঙুল রাখলো।

সিদ্ধার্থর কথাই ঠিক, একটু পরে এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো শর্মিলা। বিরাট হাই তুলতে গিয়ে মুখের সামনে হাত চাপা দিয়ে বললো, কী ব্যাপার, কটা বাজে?

অতীন বললো, এখনো ঘুমোচ্ছো? আমাদের ফিরতে হবে না?

শর্মিলা বললো, আমি মঙ্গলবার ছুটি নিয়ে এসেছি।

সিদ্ধার্থ বললো, শর্মিলা, তোমাদের আরও ঘুমোতে দেওয়া উচিত ছিল। এক্সট্রিমলি স্যরি, তোমাকে ডাকতে হলো। উইল ইউ ডু মি আ ফেভার?

শর্মিলা ঘুম মাখা বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, ফেভার? কিসের ফেভার?

সিদ্ধার্থ বললো, আমাকে অফিস যাবার পথে একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে বুঝলে? আমি একটা লোন নিচ্ছি, তাই গ্যারান্টর হিসেবে একজনকে সই করতে হবে। তুমি আমার গ্যারান্টর হবে?

শর্মিলা ঈষৎ বিরক্তভাবে বললো, এই জন্য ঘুম ভাঙালে? কেন, বাবলু গ্যারান্টর হতে পারে না?

–অতীনের ব্যাঙ্ক আকাউন্ট একদম নতুন। ওকে দিয়ে ঠিক হবে না।

–দাও, ফর্মটা দাও, সই করে দিচ্ছি!

–ফর্ম আমার কাছে নেই। তাছাড়া গ্যারান্টরকে ইন পার্সন নিয়ে গেলে ভালো হয়। বেশিক্ষণ লাগবে না, যাস্ট আ ফর্মালিটি। তবে আমাকে কাজটা আজই করতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও, প্লীজ। ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ো। চুল না আঁচড়ালে তোমায় কী সুন্দর দেখায়, শর্মিলা! এই ঘুম ঘুম চোখ, কোনোরকমে একটা শাড়ী জড়ানো, মোস্ট ক্যাজুয়াল ভঙ্গি, তাতেই তোমায় যা মানাবে না, ব্যাঙ্কের সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে।

–বাজে বকো না। আমায় দশ মিনিট টাইম দাও।

ন মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ড। অলির ঘুম ভাঙাবার দরকার নেই। তুমি বরং চাবিটা নিয়ে চলে এসো, নইলে ও ভুল করে বাইরে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেই কেলেংকারি। অতীন ততক্ষণে ব্রেক ফাস্টের জন্য কিছু কিনে-টিনে আনুক।

সিদ্ধার্থ আবার ওপরে এসে বললো, আজ আমার সত্যি ব্যাঙ্কে কাজ আছে। অফিসের কাজ। সেই সঙ্গে আমার একটা লোন অ্যাপ্লিকেশনও করে দেবো। এভরিথিং রেগুলার। তুই ততক্ষণ আমাকে আর এক কাপ কফি খাওয়া।

মোটামুটি দশ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে এলো শর্মিলা। এরই মধ্যে সে চুল আঁচড়েছে, একটুখানি সাজগোজও করেছে। চাবিটা টেবিলের ওপর রেখে সে বললো, অলি ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসতে পারবো না?

সিদ্ধার্থ বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার বেশী লাগবে না। অতীন, তুই যা পাউরুটি-ফাউরুটি নিয়ে আয়।

অতীন বললো, তোরা এগো। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

শর্মিলা আর অতীন লিফটের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। লিফটটা নীচে নামছে, আবার ওপরে আসতে মিনিট খানেক দেরি হবে। সিদ্ধার্থ জ্যাকেটের দু পকেট চাপড়ে বললো, ওঃ হো, লাইটারটা আনতে ভুলে গেছি। শর্মিলা, আমি এক্ষুনি আসছি!

দ্রুত ঘরের মধ্যে ফিরে এসে সে অতীনের পশ্চাৎদেশে একখানা লাথি কষিয়ে বললো, টিট ফর

ট্যাট, ইউ টেইক দ্যাট! শোন, এবার যদি বেগড়বাঁই করিস তা হলে ভালো হবে না কিন্তু! পরিষ্কার, সত্যি কথা বলবি, যা যা হয়েছিল, সব বলবি, একেবারে সেই জামসেদপুর থেকে! মেক আ ক্লিন ব্রেষ্ট অফ ইট! আমি ব্যাঙ্ক থেকে ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে তোকে ঐ নীচের অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করবো। তুই যদি আমাকে তখনো অল ক্লিয়ার না দিতে পারিস, তা হলে আমি নিজেই শর্মিলার কাছে সব ফাঁস করে দেবো। আই মীন ইট!

দরজার কাছে চলে গিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ বললো, মেয়েটা যদি খুব কান্নাকাটি করে, তা হলে বড় জোর তাকে দু-একটা চুমু-টুমু খেয়ে সান্ত্বনা দিতে পারিস, এর বেশি কিছু করে ফেলিস না কিন্তু রাস্কেল!

দড়াম করে দরজাটা টেনে দিল সিদ্ধার্থ। অতীন একটা সিগারেট ধরিয়ে, স্থির দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে, নিথরভাবে বসে সেটা শেষ করলো।

তার মনে পড়ছে নীল-নীল জলের দৃশ্য। জলের কী সাঙ্ঘাতিক ওজন, তার বুক চেপে শেষ নিশ্বাস বার করে আনছিল প্রায়। কেন সে সেদিনই শেষ হয়ে গেল না? এ পৃথিবীতে তার বদলে তার দাদার মতন একজন ছেলের বেঁচে থাকার অনেক বেশী প্রয়োজন ছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অতীন উঠে দাঁড়ালো। সিদ্ধার্থ ঠিকই বলেছে, অলিকে বলতেই হবে সব কিছু, আর দেরি করাটা আরও বেশি অন্যায় হয়ে যাবে। শর্মিলার প্রতিও অন্যায়।

চাবিটা নিয়ে অতীন নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। সিদ্ধার্থর বন্ধুটির ফ্ল্যাটে দরজায় চাবি লাগাতে যেতেই উল্টো দিকের দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ। অতীন এমনভাবে চমকে কেঁপে উঠলো যেন সে চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছে। একজন বয়স্কা মহিলা সারা মুখে রুজ-পাউডার মাখা, হাতে একটা শপিং ব্যাগ, অতীনের দিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না, সোজা এসে দাঁড়ালেন লিফটের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে লিফট এসেও গেল, তিনি ঢুকে গেলেন তার গহ্বরে।

এরকম ভয় পাবার জন্য অতীনের নিজের গালে চড় মারার ইচ্ছে হলো। এটা অন্য দেশ। প্রায় একটা অন্যগৃহ। এখানে কে কখন কোন অ্যাপার্টমেন্টে আসছে, কে কোথায় কার সঙ্গে শুচ্ছে, তা নিয়ে কেউ প্রকাশ্যে একটা কথাও উচ্চারণ করবে না। যার হাতে যখন চাবি, সেই তখন মালিক।

প্রায় নিঃশব্দে দরজাটা খুললো অতীন। বড় বিছানাটার এক কোণে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে অলি। অতীন কি কখনো অলিকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেছে? তার মনে পড়ছে না। ভাবনীপুরের বাড়ির তিনতলায় অলির নিজস্ব ঘরটায় কখনো কখনো ও শুয়ে শুয়ে পড়াশুনা করতো, অতীন হঠাৎ সেখানে ঢুকে পড়েছে কোনো দুপুরে, একদিন বোধহয় চোখ বোঁজাও ছিল, তবু সে দৃশ্য অন্যরকম। সেখানে সারা বাড়িতে লোক, এখানে দরজা বন্ধ করলেই আর গোটা পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগ নেই।

বিছানার কাছে গিয়ে কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো অতীন। দেয়াল থেকে রবীন্দ্রনাথ, চে গুয়েভারা, মৌলানা ভাসানী ব্যগ্রভাবে চেয়ে আছেন তার দিকে। মৃদু নিঃশ্বাসে ওঠা-পড়া করছে অলির বুক, তার শরীরটাই যেন একটি পাখির মতন।

খুব আস্তে অতীন দু বার ডাকলো, অলি, অলি!

অলির ঘুম ভাঙ্গলো না। অতীনের তখন মনে হলো, একটু দূরে সরে গিয়ে কোনো একটা শব্দ করে অলিকে জাগানোই ভালো। হঠাৎ খুব কাছে অতীনকে দেখলে অলি ভয় পেয়ে যেতে পারে। খুব রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে দিলে কেমন হয়?

অতীন বললো শর্মিলা একটু বাইরে গেছে।

অলি বললো, ওমা, আমায় ডাকলো না? আমি বুঝি বড্ড বেশী ঘুমিয়েছি? কটা বাজে এখন?

অলি নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চাইলো, অতীন সেটা শক্ত করে ধরে রেখে বললো, তুই কেমন আছিস, অলি!

অলি কোনো উত্তর না দিয়ে কয়েক পলক চুপ করে তাকিয়ে রইলো। অতীনের মনের মধ্যে একটা প্রবল ইচ্ছে করছে অলিকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে। এই সেই অলি, তার একেবারে নিজস্ব, অলির ওপর সে কত অত্যাচার করেছে, অলির ঠোঁট কামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছিল একদিন, অলি সব সহ্য করেছে, তার ওপর ছিল অলির অসীম নির্ভরতা!

কিন্তু অতীন এটাও বুঝলো, অলিকে এখন জড়িয়ে ধরে আদর করা যায় না। সে শর্মিলাকেও অপমান করতে পারে না।

অলির সারা মুখে একটা লজ্জা লজ্জা ভাব ছড়িয়ে পড়লো। সে মুখ নীচু করে বললো, বাবলুদা, তুমি আমার ওপর খুব রেগে গেছো, তাই না? কলকাতা থেকে কেউ নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে তোমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে!

অতীন বললো, তার মানে? কেউ তো আমায় কিছু লেখেনি!

অলি বললো, এখানে পৌঁছোবার পর আমি তোমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে থাকছিলুম, তুমি বুঝতে পারোনি? সব সময় শর্মিলার পাশাপাশি থেকেছি, যাতে তোমার সঙ্গে একলা পড়ে যেতে না হয়। বাবলুদা, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে তো?

অতীন এবার ভুরু তুলে বললো, কী বলছিস তুই? কী হয়েছে অলি?

অলি মুখ না তুলেই অপরাধিনীর মতন বললো, আমি আরও জোরজার করে অ্যামেরিকায় এলুম কেন জানো? শুধু তোমার জন্য! মানে, তোমার কাছে সব কথা খুলে বলবো, চিঠিতে লেখা যেত না, চিঠিতে বোঝানো যায় না।

অলির হাত ছেড়ে কার্পেটের ওপর বসে পড়ে অতীন সিগারেট খুঁজতে লাগলো। সে এখনো কিছুই বুঝতে পারছে না, কিংবা বুঝতে চাইছে না।

অলি বললো, তুমি অনেকদিন ছিলে না, আমি বড্ড একা হয়ে পড়েছিলুম, বাবলুদা। আমার তো আর কোনো বন্ধু ছিল না। বর্ষাও চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেল। একমাত্র পমপমের সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল, পমপম জেলে যাবার পর, আর কেউ রইলো না! তখন একজন এলো, আমার পাশে দাঁড়ালো, আমার মনটা খুবই দুর্বল, তুমি তখন অ্যাবস্কন্ড করে আছো, তোমার হোয়্যার আবাউটস্ কেউ জানে না, এমনকি কৌশিকও জানে না বলেছিল, বাবলুদা, আমি তখন প্রায় ভেঙে পড়েছিলুম, সেই সময় একজন আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, সেই হাত আমি ফেরাতে পারিনি।

অতীন তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, তোর সঙ্গে একজন কারুর ভাব হয়েছে? কে সে?

অলি বললো, তুমি তাকে দেখেছো, হয়তো হয়তো নামটা মনে নেই। তার নাম শৌনক ব্যানার্জি, পমপমের বাবার হয়ে ইলেকশন ক্যামপেন করেছিল।

—শৌনক ব্যানার্জি? পমপমের বাবার হয়ে কাজ করেছিল, তার মানে সিপি এম?

—বাবলুদা, শুধু কোন্ পার্টির লোক, এই হিসেব করে কি মানুষের বিচার করা যায়? শৌনক খুব পরিচ্ছন্ন মানুষ, আমাকে সে খুব ভালো বোঝে। এত ভদ্র যে কোনোদিন ব্যবহারে কোনো রকম বেচাল কিছু, মনে, সত্যি কথা বলছি, তুমি রাগ করো না, বাবলুদা, তার সঙ্গে তোমার স্বভাবের অনেক দিক থেকে মিল আছে। সেই সময়টাই আমার মনের যা অবস্থা, শৌনক আমার পাশে এসে না দাঁড়ালে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতুম! আমি দুর্বল বাবলুদা, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারিনি। তুমি আমাকে ক্ষমা করবে?

ঘুম থেকে সদ্য জেগে উঠলেও অলির কণ্ঠস্বরে একটুও জড়তা নেই। শৌনকের চেহারাও তার কাছে স্পষ্ট। শুধু শৌনকের চোখ দুটো সে দেখতে পায় না। যেন একটা মাটির মূর্তিতে এখনো চক্ষু দান হয়নি। যেন একজন নবীন শিল্পীর গড়া প্রথম পূর্ণাঙ্গ মূর্তি, তাই এর প্রতি বিশেষ মায়া ও আসক্তি। সেইরকম আসক্তি নিয়েই সে শৌনক সম্পর্কে কথা বলে যেতে লাগলো। একটু একটু লজ্জায় তার মুখে লালচে আভা।

অতীনের সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠলো। নিশ্চিত কোনো মতলববাজ ছেলে অলির মতন একটা নরম মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার সুযোগ নিয়েছে। অলিকে পাওয়ার লোভে তো আছেই, অলির বাবার সম্পত্তি পাবার লোভও থাকতে পারে। ঐ সি পি এমের ছেলেগুলো এখন ভোটে বিশ্বাস করে, পাওয়ারে গিয়ে আখের গুছিয়ে নিতে চায়। সব কটা এখন কেরিয়ারিস্ট!

আবার কাছে এসে অন্যরকমভাবে অলির হাত চেপে ধরে অতীন কড়া গলায় বললো, কে ঐ শৌনক, তুই আমাকে সব খুলে বলতো! তোকে যদি কেউ ঠকাবার চেষ্টা করে, আমি তাকে শেষ করে দেবো!

অলি মুখ তুলে ফ্যাকাশে-ভাবে হেসে বললো, বাবলুদা, আমি যেমন তোমার অলি ছিলুম, চিরকাল সেইরকমই থাকবো। শুধু সম্পর্কটা একটা আলাদা হবে। আমি শৌনককে কথা দিয়ে ফেলেছি। তুমি ওর ওপর রাগ করো না! আমার ওপর যত খুশী রাগ করতে পারো।

অতীন বললো, সি পি এমের ছেলে, তার মানে কৌশিকদের সঙ্গে তুই কোনো সম্পর্ক রাখিসনি?

অলি বললো, ঠিক তার উল্টো। কৌশিক-পমপমদের সঙ্গে শৌনকের যতই মতবাদের তফাত থাকুক, তবু শৌনক ওদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে না। বরং ইনডাইরেক্টলি আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। শৌনক চায়, মানিকদা-কৌশিকদের মতন এককালের সিনসিয়ার ওয়ার্কারদের আবার দলে ফিরিয়ে আনতে। নিজেদের মধ্যে মারামারি-খুনোখুনি ও ঘৃণা করে।

–অলি, আমি আগে এই শৌনক নামের ক্যারেকটারটিকে দেখতে চাই! আমি সি পি এমের ছেলেদের বিশ্বাস করি না। ওরা সরোজ দত্ত, সুশীতলদাকে দল থেকে--- কৌশিক এখন কোথায়?

–কৌশিক জেল ব্রেক করেছে, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। এত সাতসেসফুলি পালিয়েছে, যে এরকম নাকি ওখানকার হিস্ট্রিতে কখনো হয়নি! কৌশিক এখনও পুরোপুরি অ্যাকটিভ।

–আর মানিকদা?

–অ্যাবসকন্ড করে আছেন। শৌনকেরই একটা চেনা বাড়িতে, মানিকদা অবশ্য সেটা জানেন না। মানিকদা তোমার কথা খুব বলেন।

অতীনের প্রশ্নগুলো শৌনককে ছেড়ে অন্যদিকে চলে যেতে যেতে অলি অনেকটা স্বাভাবিক বোধ করলো।

ঝনঝন করে বেজে উঠলো টেলিফোন। অতীন গিয়ে ধরতেই সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করলো, হ্যালো ওও চ্যাপ, অল ক্লিয়ার?

ক্লান্ত, পরাজিত, বিমর্ষ সুরে অতীন বললো, হুঁ। অল ক্লিয়ার।

॥ ৪৬ ॥

পঁচিশে মার্চের পর টিক্কা খানের নামটিই বাঙালীর মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। তিনি একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর এবং সামরিক আইন প্রশাসক। লেফটেনান্ট জেনারেল টিক্কা খান শক্ত মেজাজের মানুষ। পঁচিশে মার্চ রাত্রের সেই যে গোপন পরিকল্পনা, একই সঙ্গে বাঙালী সৈনিক, পুলিশ ও সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বন্দী করা, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংবাদপত্র অফিসে আক্রমণ, শেখ মুজিবকে আটক ও প্রতিটি শহরে ভীতির অবস্থা সৃষ্টি করা, যে পরিকল্পনার সামরিক নাম 'অপারেশ সার্চলাইট' , তার প্রধান পরিচালক এই টিক্কা খান। অগ্নিকাণ্ড ও রক্তের স্রোত বইয়ে দেবার ব্যাপারে তাঁর কোনো গ্লানি হয়নি, কারণ এ সবই তো তাঁকে করতে হয়েছে নিছক কর্তব্যের খাতিরে, পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার জন্য তিনি বদ্ধ পরিকর।

মাস ছয়েকের মধ্যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ অনেকটা ঠাণ্ডা করে এনেছেন। সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে এখনও সংঘর্ষ চলছে বটে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে বিশ্বাসঘাতক মুক্তিযোদ্ধারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু শহরগুলির অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক, সরকারি কাজকর্ম মোটামুটি চলছে, দোকান-বাজার সব খুলেছে। এই সব কৃতিত্বই টিক্কা খানের।

হঠাৎ এই সময় তাঁর বদলির আদেশ এলো!

পঁচিশে মার্চ যেমন ভাবে হোক বাঙালীদের দমন করার আদেশ দিয়ে পেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সেই যে গোপনে রাওয়ালপিন্ডি চলে গেলেন, তারপর আর তিনি পূর্ব পাকিস্তানমুখো হননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচররা কেউ কেউ বলে, তিনি বাঙালীদের অকৃতজ্ঞতায় বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। ঐ বাঙালীগুলো আধা-হিন্দু, ওরা পাকিস্তানকে না-পাক করে দিতে চায়। মূর্তিপূজক, অপবিত্র হিন্দুদের থেকে পৃথক হবার জন্যই তো জন্ম হলো পাকিস্তানের, এখন ঐ পূর্ব পাকিস্তানীরা আবার ভারতের খপ্পরে সাধ করে যেতে চায়?

মনের খেদ মেটাতে তিনি সঙ্গী করলেন সুরার বোতল, দু-একটি রক্ত মাংসের সঙ্গিনী ও রইলো তাঁর সেবার জন্য। দিনের পর দিন তিনি ঘর থেকে বেরুতেই চান না।

মাঝে মাঝে তাঁর হুঁস হয়, তখন তাঁর বুক জ্বালা করে ওঠে। তিনি শুধু রাষ্ট্রপ্রধান নন, তিনি একজন পেশাদার সেনাধক্ষ্য । তাঁর এত বড় শক্তিশালী পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী থাকতে ও যদি পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তার থেকে অপমানের আর কী আছে? ভারত যতই মদত দিক, পাকিস্তানের সৈনিকেরা তার মুকাবিলা করতে পারবে না? ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন স্ত্রীলোক, যুদ্ধের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সেই স্ত্রীলোকটির কাছে হার স্বীকার করবেন তিনি?

এক এক সময় তাঁর ইচ্ছে হয়, বন্দী শেখ মুজিবের মুণ্ডুটা এক কোপে উড়িয়ে দিয়ে তিনি আবার ঢাকায় যাবেন। সেখানে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দেবেন যে তিনিই পাকিস্তানের দুই অংশের একেশ্বর। তেজের মাথায় তিনি করাচি পর্যন্ত চলে এলেও তাঁর বিশ্বস্ত পরামর্শদাতারা তাঁকে আটকে দেয়। এখন কোনোক্রমেই তাঁর পক্ষে পূর্ব দিকে যাওয়া ঠিক নয়। বিশ্বাসঘাতকরা তাঁর বিমান ধ্বংস করে দিতে পারে, ঢাকা শহরেও যখন তখন বিস্ফোরণ ঘটছে। আর মুজিবকে হত্যা করাও উচিত কাজ হবে না, কারণ মৃত মুজিব জীবীত মুজিবের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

তাদের আরও মত এই যে, এখনও একটা রাজনৈতিক সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করা দরকার।

রাজনৈতিক সমাধানের জন্য তো ইয়াহিয়া কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু লারকানার ভুট্টোই তো কিছুতেই মুজিবের সঙ্গে আপোসে এলো না! ভুট্টো যতই চালাক চালাক কথা বলুক, পূর্ব পাকিস্তানে তার পার্টির জন্য সে ভোটও আদায় করতে পারেনি, আবার মুজিবের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে সে কোনো যুক্তির ও ধার ধারেনি। পাকিস্তান যদি ভাঙে, তবে তার জন্য কে বেশী দায়ী হবে, মুজিব না ভুট্টো?

ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করেছে, তা করুক, চীন ও আমেরিকা পাকিস্তানের বন্ধু। চূড়ান্ত বিপদের সময় তারা সাহায্য করবে। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে ইঙ্গিত আসছে যে চীন ও আমেরিকা মনে করে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উচিত সামরিক চাপ কমিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের মন জয় করা। আর একটা উপ-নির্বাচন, জনপ্রতিনিধিদের হাতে কিছুটা ক্ষমতার হস্তান্তর, খানিকটা গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষা করা। ভাবপ্রবণ বাঙালীরা তো এই সবই চায়।

সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ইয়াহিয়া খান হঠাৎ ঠিক করলেন, পূর্ব পাকিস্তানে প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীকে আলাদা করে দেবেন। এর জন্য প্রথমেই দরকার বেসামরিক গভর্নরের। প্রথমে প্রস্তাব গেল নরুল আমিনের কাছে। এই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদটি কিছুদিন এদিককার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট, নিষ্ঠাবান মুসলমান, আওয়ামী লীগের ঘোরতর বিরোধী এবং খাঁটি পাকিস্তান সমর্থক। তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে জনাব নুরুল আমিন এই গুরু দায়িত্ব নিতে নাকি চাইলেন না।

তখন ঠিক করা হলো ডাক্তার এ এম মালিককে। তিনি একজন দাঁতের ডাক্তার এবং বয়সেও পঁচাত্তরের কাছাকাছি, একসময় ট্রেড ইউনিয় ও রাজনীতি করেছেন বটে, কিন্তু অনেকদিন সেসব থেকে দূরে ছিলেন। তিনি গভর্ণরের পদ নিতে রাজি হয়ে গেলেন।

নতুন নতুন গর্ভনরের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত থাকলেন অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, যেমন সবুর খান, ফজলু কাদের চৌধুরী, প্রাক্তন গর্ভনর মোনেম খান ইত্যাদি। এসেছেন অনেক ব্যবসায়ী, সেনাপ্রধান, রাষ্ট্রদূত। বৃদ্ধ ডাক্তার মালিকের গায়ের চামড়া থলথল করছে, চোখে বেশী পাওয়ারের চশমা, তাঁকে দেখে অনেকেই ভাবতে লাগলো, এই লোকটি আসছে লৌহমানব টিক্কা খানের বদলে শাসনভার নিতে! এই দুঃসময়ে এমন পরিবর্তন।

ক্ষমতার অর্ধেক চলে যাওয়ার টিক্কা খান ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করলেন। অচিরেই জানা গেল যে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান হয়েও আসছেন আর একজন, লেফটেনান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী।

টিক্কা খানকে আরও গুরুত্বপূর্ণ পদ দেবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট নন। এক এলাহি নৈশভোজ দেওয়া হলো তাঁর বিদায় সম্মানে, সেখানে ও তিনি মুখ গোমড়া করে রইলেন। যখন তাঁকে একটা আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দিতে বলা হলো, তিনি স্পষ্টই বলে ফেললেন, পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব নেবার জন্য আমাকে তাড়াহুড়ো করে রাওয়ালপিন্ডি থেকে ডেকে আনা হয়েছিল ৪ঠা মার্চ। এখন কেন হঠাৎ আমাকে চলে যেতে বলা হচ্ছে তা আমি জানি না, সে বিষয়ে মন্তব্য ও করতে চাই না। প্রেসিডেন্ট যা ভালো বুঝবেন নিশ্চয়ই তা করবেন। যে কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম, সেটা শেষ করে যেতে পারলেই আমি খুশি হতাম। আমি দুঃখিত যে আপনাদের মধ্যস্রোতে ফেলে রেখে যাচ্ছি। যাই হোক, আপনারা নিয়াজীর মতন একজন অভিজ্ঞ কমান্ডারকে পেয়েছেন, সেটাই আশার কথা। আপনাদের প্রতি আমার শুধু এই একটাই অনুরোধ, সব সময় মনে রাখবেন, মুঠো আলগা করা চলবে না, এই বাঙালী জাতটাকে শক্ত করে চেপে রাখবেন!

অভিজ্ঞ সেনানী হলেও আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর স্বভাবটা অনেকটা ঢিলেঢালা। প্রেসিডেন্ট

ইয়াহিয়া খানের মতন তিনিও ভোগী পুরুষ। তাঁর মুখ আলগা, আদি রসাত্মক ইয়ার্কি ঠাট্টার জন্য তিনি আমি ব্যারাকে প্রসিদ্ধ। বক্তৃতা পর্বের মধ্যে নিয়াজী একসময় প্রবল হাসি-হুল্লোড়ের মধ্যে নানারকম মন্তব্য করতে করতে শেষে বললেন, আপনি, চিন্তা করবেন না টিক্কা খান সাহেব, আমি ঐ মুক্তিযোদ্ধা ব্যাটাদের পেছনগুলো একে একে এমন----

অনেক বাঙালী টিক্কা খানের নাম শুনে ভয় পেত, তাকে মান্য করতো। ডক্টর মালিককে তারা প্রথম থেকেই অগ্রাহ্য করতে শুরু করলো। এমনকি যারা নিজেরা দালাল, তারাও অন্য দালালদের পছন্দ করে না।

রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে ইয়াহিয়া খান আর একটি ভুল করলেন। যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে, তারা ছাড়া তিনি আর সব কারাবন্দীদের মুক্তির আদেশ দিলেন এবং সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তিনি বা তাঁর উপদেষ্টারা বোধহয় ভেবেছিলেন যে ক্ষমার কথা শুনলেই বুঝি মুক্তিযোদ্ধারা সব অনুতপ্ত হয়ে সুড়সুড় করে বাপমায়ের কাছে ফিরে আসবে। সেরকম কিছুই ঘটলো না। বরং এই সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা আরও দুঃসাহসী হয়ে সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে এসে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে লাগলো।

বন্দী মুক্তির ঘোষণার প্রকটিত হয়ে উঠলো সেনাবাহিনীর এত দিনের অত্যাচারের বীভৎস রূপ। প্রেসিডেন্টের দয়ায় জয়দেবপুর, ঢাকার জেলখানা থেকে ছাড়া পেল মাত্র শ'দুয়েক বন্দী। তাহলে যাদের নামে কোনো চার্জশিট নেই অথচ এবারে মুক্তিও পেল না। সেইরকম হাজার হাজার যুবকেরা গেল কোথায়? তাদের বিনা বিচারেই হত্যা করে লাশ গায়েব করে ফেলা হয়েছে নিশ্চয়ই। বেগম জাহানারা ইমামের ছেলে রুমী ও এই সময় ছাড়া পেল না। তার কোনো সন্ধান ও পাওয়া গেল না। অবশ্য ফকির পাগলাবাবা এখনও বলে চলেছেন, ফিরে আসবে। রুমী ঠিক ফিরে আসবে। জাহানারা ইমামের মতন অনেক জননী সেই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বসে আছেন, বলা তো যায় না, হয়তো ওরা জেলখানা ভেঙে পালিয়ে গিয়ে সীমান্তের ওপারে কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছে।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমা ঘোষণায় সাধারণ মানুষের আরও মনে হলো, এবার বুঝি তাহলে শেখ মুজিব ও ফিরে আসবেন। ইয়াহিয়া খান কোনো বড় শক্তির চাপেই এমন নরম হয়েছেন। এবার তিনি শেখ মুজিবকে ও মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন। এই ধারণা নতুন আশার সঞ্চার করলো। যারা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সন্দিহান হয়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে তারা ভাবলো, শেখ মুজিব ফিরে এলে স্বাধীনতা না নিয়ে ছাড়বেন না। তা হলে পাকিস্তানী কর্তাদের মান্য করার কী মানে হয়!

লেফটেনান্ট জেনারেল নিয়াজী টেবিলে বসে অনেকক্ষণ গালগল্প করতে ভালোবাসেন। মাঝেমাঝেই তিনি গর্ব করে সহযোদ্ধাদের বলেন, এটা জেনে রেখো, ইন্ডিয়া যদি টোটালি ওয়ার শুরু করতে চায়, তাহলে সে যুদ্ধ হবে ভারতের মাটিতে। আমার পাকিস্তানে আমি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হতে দেবো না!

একদিন তিনি আরও বাড়িয়ে বলে ফেললেন, তোমরা দেখতে চাও, আমি কলকাতার বুকে কামানের গোলা ফেলতে পারি কিনা? আমি ইচ্ছে করলে যে কোনো সময়ে কলকাতা দখল করে নিতে পারি। ইনসাল্লা, আমরা কলকাতার সবচেয়ে বড় হোটেলে শিগগিরই খানা খাবো।

তবে কিনা, কলকাতা শহরটা বড় গন্ধা, আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

নিয়াজী এক এক সময় বিদেশী সাংবাদিকদের সামনেও এইরকম কথা বলে ফেলেন বলে তাঁর প্রেস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স অফিসার সিদ্দিক সালিক বড় অপ্রস্তুত পড়ে যায়। সেনাপতির এরকম বাগাড়ম্বরে অন্য দেশের সাংবাদিকরা গুরুত্ব দেবে কেন?

একদিন নিরিবিলিতে পেয়ে সিদ্দিক বিনীতভাবে বললেন, জেনারেল, আমাদের সামরিক শক্তির ব্যাপারটা এতখানি বাড়িয়ে বলা কি ভালো?

নিয়াজী হাসতে হাসতে বললেন, এ আর আমি এমনকি বাড়িয়ে বলেছি হে! তুমি জানো না, ধাপ্পা আর মিথ্যে স্ট্যাটিসটিকই হলো সব যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার।

সিদ্দিক বললো, জেনারেল, যদি অভয় দেন তো বলি, আমরা নিজেদেরই ধাপ্পা দিচ্ছি না তো? এখনো পুরো যুদ্ধ লাগেনি, এরই মধ্যে আমাদের সীমান্তের ৩০০০ বর্গমাইল ভারতের অধীনে চলে গেছে।

নিয়াজী বললেন, ঐ জায়গা আমরা আবার যে কোনো সময়ে পুনর্দখল করে নিতে পারি। আমার

অধীনে সত্তর হাজার অতি সুশিক্ষিত সৈন্য আছে। আরও পাঁচ ব্যাটেলিয়ন আসছে। স্থলযুদ্ধে আমরা ভারতের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী, বুঝলে হে!

-কিন্তু জেনারেল, বিমানও নৌবহরের শক্তিতে আমরা কিছুই না। মানে, পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কখনো জোরালো করা হয়নি, পশ্চিমেই বেশীর ভাগ রাখা হয়েছে।

-শোনো সিদ্দিক, শুধু সৈন্যসংখ্যা দিয়ে আর প্লেন আর জাহাজ দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না। যুদ্ধে জয় পরাজয় হয় সেনাপতির জন্য। সঠিক সংখ্যক সৈন্য, সঠিক জায়গায় এবং সঠিক সময়ে নিয়োগের কায়দা যে সেনাপতি জানে, সে-ই জেতে। পূর্ব পাকিস্তান ভাগ্যবান, তারা যথাসময়ে একজন যোগ্য সেনাপতি পেয়েছে।

-সেটা ঠিকই বলেছেন, স্যার। আপনার মতন সেনাপতি ক'জন আছে এখন পৃথিবীতে। তবে কিনা, আমাদের শত্রু দু'দিকে। দেশের মধ্যে আর বাইরে। দেশের মানুষও যদি শত্রুতা করে, তবে সেই যুদ্ধ যে-কোনো সেনাবাহিনীর পক্ষে দুঃসহ হয়ে ওঠে। ঠিক কিনা, বলুন?

-তা অনেকটা ঠিক বটে। কিন্তু দেশের মানুষের মন বদলাবার দায়িত্ব তো তোমাদের মতন অফিসারদের। রেডিও, টি,ভি, খবরের কাগজ সব জায়গায় দেশাত্মবোধের সুর তোলো, পবিত্র ইসলামের জয়গান করো, হিন্দু ভারতের পিণ্ডি চটকাও!

-তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে মনে হয়। স্যার, আমি আপনার থেকে কিছু আগে এসেছি ঢাকায়, আমি এসেছি সত্তর সালে, ইলেকশানের আগে। তখন থেকেই দেখছি, আমরা বাঙালীদের ওপর জোর জুলুম করেছি, কিন্তু গোড়া থেকে বন্ধুভাবে নিইনি। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকেরই ধারণা, বাঙালী মুসলমানরা পুরোপুরি মসুলমান নয়!

-কেন, সেটা কি ভুল নাকি?

-জী, অবশ্যই ভুল। আমি অনেক বাঙালী মুসলমানের অন্তঃপুরে গিয়ে দেখেছি। তারা নিষ্ঠাবান মুসলমান। তারা ইসলামকে যে অন্তর দিয়ে মান্য করে শুধু তাই নয়, তারা ইসলাম সম্পর্কে আমাদের অনেকের চেয়ে বেশী জানে। তবে তাদের কিছু আচার আচরণ আছে, যা আমাদের নেই। যেমন শবে বরাত। তাতে কিছু যায় আসে না।

-কিছু ধার্মিক মুসলমান তো থাকতেই পারে। তারাও কি পাকিস্তানের বিরোধী?

-তারা পাকিস্তানের বিরোধী নয় স্যার। তারা পাকিস্তানের গণতন্ত্রের পক্ষে। ওয়েস্টে কখনো ডেমোক্রেসির ধারণা স্পষ্ট ছিল না, হয়তো আজও নেই, কিন্তু এই ইস্টার্ন সাইডে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, বলতে পারেন সেই ব্রিটিশ আমল থেকে। এখানকার ছাত্ররা পলিটিক্যালি অনেক বেশী কনসাস, এটা একটা রিয়েলিটি। ওয়েস্ট পাকিস্তানের মানুষ সদ্য ফিউডল যুগ পেরিয়ে এসেছে, আর্মি রুল সেখানে এখনও এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু এরা আর্মি রুল সহ্য করতে পারে না। তবু আমরা আর্মি দিয়ে এদের রিপ্রেস করার চেষ্টা করেছি, আর্মিকে এদের বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসেবে প্রমাণ করার কখনো চেষ্টা করিনি।

-এখনও সময় যায়নি, সিদ্দিক। তুমি এদের সাইকোলজি আরও ভালো ভাবে বুঝবার চেষ্টা করো। সেই অনুযায়ী ক্যাম্পেইন শুরু করো।

-আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দেবো, স্যার? কয়েক মাস আগে ঢাকার একটি বাংলা কাগজের সম্পাদক, কাগজটির নাম দিন-কাল, তার মালিক বেশ অবস্থাপন্ন, পত্রিকার ব্যবসা ছাড়াও তার কয়েকটি হোটেল আছে, সেই সম্পাদকটি প্রায় জোরে করেই তার বাড়িতে আমাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেল। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। যেতে চাইনি, কিন্তু সে অনুনয় বিনয় করলো। কারণটি হচ্ছে এই যে, এর দু'তিন দিন আগেই ভদ্রলোকটির শ্যালিকার বাড়িতে অতি তুচ্ছ কারণে মিলিটারি হামলা হয়েছিল। বাড়ি সার্চ করার নাম করে দু'তিনজন সৈন্য ঐ শ্যালিকাকে এবং বাড়ির আরও একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে। সেইজন্য এই সম্পাদকটির বাড়ির সবাই খুব আতঙ্কিত। উনি বললেন, আমাকে দেখলে বাড়ির সবাই তবু কিছুটা সান্ত্বনা ও ভরসা পাবে, কারণ আমি ও মিলিটারিদের একজন।

-তুমি কি ইউনিফর্ম পরে গেলে সেই বাড়িতে।

-জী। ভদ্রলোক একেবারে অন্দর মহলে আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর মা, বোন ও অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার। তারপর খুব সুন্দর সাজানো একটি ঘরে নিয়ে এলেন আমায়, সেখানে

একটি দারুণ রূপসী তরুণী বসে আছে। সেই ভদ্রলোকের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, শুনলাম ঐ যুবতীটি তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েই ভদ্রলোক বললেন, আপনারা একটু গল্প করুণ। আমি এক্ষুনি একবার হোটেল ইন্টারকন থেকে আসছি, সেখান থেকে আর একজন অতিথিকে আনতে হবে । আমাদের দু'জনকে ঐ ভাবে বসিয়ে রেখে ভদ্রলোক কেন যে চলে গেলেন তা বুঝতে পারলুম না।

–এর একটাই মানে হয়। তারপর তুমি কী করলে ইডিয়েট?

–দারুণ অস্বস্তিজনক অবস্থা। কেউ কোনো কথা বলতে পারছি না। আমি খালি ভাবছি, তৃতীয় পক্ষের বউ হলেও এই যুবতীটি বাড়ির অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে না থেকে, এই ঘরে একজন পরপুরুষের সামনে কেন বসে রইলো!

–সাধে কি আর তোমাকে ইডিয়েট বলেছি? তোমার সামনে কেউ এক প্লেট গরম কাবাব রেখে গেল, আর তুমি কি তখন ভাববে বাজারে গোস্তোর দাম কত? তৃতীয় পক্ষের বউ না ছাই! ঐ ভরপুক বাঙালীটা তোমাকে খুশি করার জন্য একটা খুব সুরৎ লেড়কী যোগাড় করে এনেছিল। তুমি কিছু করলে না?

–বাকিটা শুনুন স্যার। মহিলাটিকে আমার কিন্তু মনে হলো, লেখাপড়া জানা, সফিসটিকেটেড মেজবান। খানিকক্ষণ চুপ করে কাটাবার পর আমি বললাম, শুনেছি আপনার বোনের বাড়িতে একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেছে। শুনে আমি খুবই দুঃখিত ।

–শুধু মুখের কথা বললে? মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরলে না? বেওকুফ আর কাকে বলে!

–আমি ঐ কথাটা বলতেই, স্যার, ইষ্ট পাকিস্তানে এক রকম সাপ আছে, তার নাম কালনাগিনী, মেয়েটি সেই রকম কালনাগিনীর মত ফোঁস করে উঠে বললো, দুঃখিত! আপনার লজ্জা করে না? আপনারা বাড়ি ঘর ধ্বংস করছেন, যখন তখন মানুষ মারছেন, মেয়েদের ইজ্জত কেড়ে নিচ্ছেন, তারপর শুধু দুঃখিত ? আমি বললাম, দেখুন, বেগমসাহেবা, সবাই এক নয়, আমি স্বীকার করছি যে মিলিটারিতে এরকম কিছু লোক আছে---। আমাকে বাধা দিয়ে মেয়েটি আবার বললো, যেন দু'চোখে আগুন ছিটিয়ে বললো, আমি আপনাদের ঐ খাঁকি উর্দির প্রত্যেকটা সুতোকে ঘেন্না করি! প্রতিটি পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যের চেহারায় ও ব্যবহারে বর্বরতার ছাপ, আমাদের ওপর অত্যাচার করাটা তারা পবিত্র কাজ মনে করে। আমি বুঝতে পারছি না, আমার স্বামী আপনাকে কেন এখানে বসিয়ে রেখে গেলেন। আমার বোনের ওপর যারা অত্যাচার করেছে, আপনিও সেই পশুদের একজন!

–তুমি কেন তাকে দেখিয়ে দিলে না যে পশুদের মতন নয়, যথার্থ প্রেমিকদের মতন ও আমরা মেয়েদের খুশি করতে পারি!

–স্যার, সেই মেয়েটির কথা শুনে আমার এমন লজ্জা হলো! আমার এমনও মনে হলো যে তার কাছে হয়তো জহরের কৌটো লুকোনো আছে, আমি তাকে স্পর্শ করতে গেলেই সে আত্মহত্যা করবে। নিপীড়িত, অপমানিত মানবীরও যে এমন তেজ থাকে, তা আমি আগে দেখিনি। সেই তেজে তার মুখখানা ঝকঝক করছিল। আমি মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেলাম সেই ঘর থেকে।

নিয়াজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো তো, কোন বাড়ি, কোন বাড়ি, আমি সেই সুন্দরী তেজস্বিনীকে এক্ষুনি দেখতে চাই!

সিদ্দিক বললো, তার দেখা পাবেন না। সেই বাঙালী সম্পাদকটি তার পরদিনই সপরিবারে ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারা ইন্ডিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

মাটিতে পা ঠুকে নিয়াজী বললেন, তুমি একটি অপদার্থ, সিদ্দিক। তোমার ট্রাউজার্স খোলো তো, দেখি তোমার ঐ জিনসটি আছে কিনা! ওরকম একটা চমৎকার মেয়েকে তুমি ছেড়ে দিলে? আমাদের সুন্দরী মেয়েদের যদি ইন্ডিয়া নিয়ে নেয়, দেন ইট ইজ ওয়ান মোর রিজন টু ক্রস ইন্ডিয়া!

সিদ্দিক বললো, জেনারেল, আপনি সব ব্যাপারটা কৌতুকের সঙ্গে নিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা যদি এ রকম নির্বিচারে বাঙালী মেয়েদের ধর্ষণ করে চলে, তা হলে আমাদের প্রতি বাঙালীদের মনে তো গভীর ঘৃণার সৃষ্টি হবেই। আমাদের যত সামরিক শক্তিই থাক, কিছুতেই আর তাদের মন জয় করা যাবে না।

নিয়াজী এবারেও হালকা ভাবে বললেন, এটা ঠিক বলছো, আমাদের সৈন্যদের মধ্যে কিছুতেই ধর্ষণের প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তাদের প্রেমিক হতে হবে। তা হলে কি আর্মির মধ্যে দ্য আর্ট অব লাভ মেকিং বিষয়ে একটা কোর্স চালু করবো?

–স্যার, যে আর্মি পুরোপুরি ইমমরাল হয়ে যায়, তারা ভালো করে যুদ্ধও করতে পারে না। আপনি বর্ডারে গেলে দেখবেন, মুক্তিবাহিনীর সামান্য অ্যাটাকেও আমাদের আর্মি রিট্রিট করে। তারা 'মুক্তি' শব্দটাকেই ভয় পায়।

নিয়াজী এবার রেগে উঠে বললেন, সেসব আমি দেখছি! নতুন করে অর্ডার দেওয়া হবে; অন্তত সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি না হলে কোনো জায়গা থেকে রিট্রিট করা চলবে না। চলো, আমি সীমান্তে পরিদর্শনে যাবো।

কয়েক দিনের মধ্যেই প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হলো কুখ্যাত প্রাক্তন গভর্নর মোনেম খান। ঢাকার রাস্তায় যেখানে সেখানে বিস্ফোরণ ঘটতে লাগলো, প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমায় উড়ে গেল ইন্টারকন হোটেলের একটা অংশ বিমানবন্দরের রানওয়েতেও মুক্তিবাহিনীর মর্টারের শেল এস পড়তে লাগলো। সীমান্তের বহু এলাকা থেকে পাক বাহিনীর পিছু হঠে আসার সংবাদ আসছে রোজ।

এরই মধ্যে নিয়াজী বেরুলেন সীমান্ত সফরে। তিনি প্রকাশ্যে বেশী বেশী বীরত্ব দেখাতে চান বলে কখনো কখনো খোলা জিপেও দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সিদ্দিক ফিসফিস করে বলে, জেনারেল গ্রামের মানুষগুলোকে লক্ষ করুন। এরকম রোগা, হাড় জিরজিরে কুঁজো হয়ে পড়া অসংখ্য মানুষ কি পশ্চিম পাকিস্তানে দেখেছেন? আমরা শুধু এদের কম মুসলমান বলে দোষারোপ করেছি, কিন্তু আমরা কি এদের খেতে পরতেও কম দিইনি? এরা যে মরীয়া হয়ে স্বাধীনতা চাইছে, এটা কি আমার একবার ও ভেবে দেখবো না?

নিয়াজী অবহেলার সঙ্গে বললেন, ওসব রাজনীতির ব্যাপার। আমি রাজনীতি বুঝি না। আমি সোলজার, আমি শুধু জানি যে-কোনো উপায়ে হোক পাকিস্তানের ইনটিগ্রিটি রক্ষা করতে হবে। ইন্ডিয়া আমাদের পিছন দিক থেকে ছুরি মারতে চাইছে, আমার সেনাবাহিনী ইন্ডিয়াকে উচিত শিক্ষা দেবে!

সিদ্দিক বললো, আমরা ইন্ডিয়ার ঘাড়ে সব দোষ চাপাচ্ছি, সেটা প্রায় একচক্ষু বন্ধ করে থাকার মতন নয় কি? পূর্ব পাকিস্তানের বিরাট সংখ্যক মানুষ বিদ্রোহী হয়ে না উঠলে কি ইন্ডিয়া এর মধ্যে নাক গলাতে পারতো? স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করে, তারা অনেক সময়ই পাশের রাষ্ট্রের সাহায্য নেয়, এতো নতুন কিছু নয়। আমার শত্রুর যে শত্রু, সে আমার বন্ধু, এই নীতি তো বহু স্বাধীনতার যুদ্ধেই দেখা গেছে।

নিয়াজী বললেন, তুমি আবার রাজনীতির কথা বলছো, সিদ্দিক! আমি চিন্তা করছি যুদ্ধের কথা। ওসব বলে তুমি আমার মাথা গুলিয়ে দিও না!

ঘুরতে ঘুরতে নিয়াজী এলেন হিলি এলাকায়। সেখানে কয়েকদিন আগেই বেশ বড় রকমের সংঘর্ষ হয়ে গেছে। এমনকি একটা ভারতীয় ট্যাংকও ঢুকে পড়েছিল অনেকখানি ভেতরে, সেটাকে অবশ্য ঘায়েল করা করা হয়েছে কোনোক্রমে।

একদল সাংবাদিককে জড়ো করে নিয়াজী দেখালেন সেই ট্যাংক। ভারতের বদমাইশির প্রত্যক্ষ নিদর্শন। যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, তবু ভারত ট্যাংক পাঠাচ্ছে পর্যন্ত!

ডাক বাংলোর ঘরে খানাপিনার ব্যবস্থা হলো, সেখানে নিয়াজী সাংবাদিকদের নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

একজন তরুণী সাংবাদিক এক সময় জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা জেনারালম, ইন্ডিয়ার সঙ্গে টোটাল ওয়ার সত্যিই কি হবে? যদি হয়, আপনার ধারণায় কবে থেকে তা শুরু হতে পারে?

প্লেট থেকে মুর্গীর কাবাব তুলে নিয়ে মুখে ভরে দিয়ে নিয়াজী বললেন, আমার জন্য টোটাল ওয়ার তো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে।

সেই দ্ব্যর্থক রসিকতায় অনেকেই হেসে উঠলো। তরুণী সাংবাদিকটি বললো, আমার আরও অনেকগুলো প্রশ্ন আছে।

নিয়াজী দেখালেন, মেয়েটির মুখখানা পালিশ করা, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল, চোখের দৃষ্টিতে সেই ঝিলিক আছে যা পুরুষদের বুক কাঁপায়।

তিনি হেসে বললেন, আমি এক্ষুণি হেলিকপ্টারে ঢাকায় ফিরছি। তুমিও আমার সঙ্গে চলো। তারপর ফ্লাগ স্টাফ হাউসে তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার । তুমি যতক্ষণ চাও!

॥ ৪৭ ॥

ছোট ছোট শহরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হওয়ার সসম্যার চেয়েও সেখানে থাকার জায়গা পাওয়া কম কঠিন নয়। দেশের ছাত্রাবাসগুলোকে বলে হোস্টেল বা হল, এখানে সেগুলোর নাম ডর্ম। কোনো ডর্মে অলি জায়গা পায়নি। অনেক প্রাইভেট বাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের ভাড়া দেওয়া হয়, সেরকমও খালি নেই একটাও। একটিমাত্র অ্যাপার্টমেন্ট খালি আছে। কিন্তু তার অনেক ভাড়া, সাধারনত দু'জন ছাত্র বা ছাত্রী এরকম অ্যাপার্টমেন্ট ভাগাভাগি করে নেয়। অন্য কোনো মেয়ে আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না, একজন বিদেশী অধ্যাপক এ অ্যাপার্টমেন্টের অর্ধেক নিতে আগ্রহী। পিটার মেয়ার সেটাই ধরে রেখেছিলেন অলির জন্য। এখানে ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে থাকা মোটেই বিচিত্র কিছু নয়। দুটি বেডরুমের মাঝখানে কিচেন, টয়লেট, ডাইনিং রুম, সেগুলো দু'জনের ব্যবহারের জন্য, আবার বেডরুমের দরজা বন্ধ করলে দুটো দিক সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। দু'দিক দিয়েই ঢোকা-বেরুনোর ব্যবস্থা আছে। নরোয়েজিয়ান অধ্যাপকটি মাত্র ছ' মাসের জন্য এসেছেন। সেইজন্যই তিনি বেশী দামের বাড়ি ভাড়া নিতে চান না।

কিন্তু প্রস্তাবটি শুনেই অলি বেঁকে বসলো। সে একজন অচেনা সাহেবের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকবে? অসম্ভব। লজ্জাতেই সে মরে যাবে। বস্টনে দু'দিন কাটাবার পর শর্মিলা আর অতীন অলিকে পৌঁছে দিতে এসে এই সমস্যায় পড়ে গেল। অলি তাহলে থাকবে কোথায়? পরের দিনই রেজিস্ট্রেশন, অলির পক্ষে বেস্টনে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়।

শর্মিলার মামা ও মামিমার বাড়ি রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি-র উপকণ্ঠে, সেখানে অলি স্বচ্ছন্দে থেকে যেতে পারে। মেরিল্যান্ড থেকে খুব বেশি দূর নয়। তবে যাতায়াত রোজ অনেকটা সময় চলে যাবে, পয়সাও তো খরচ হবে। তবু আপাতত কিছুদিন তো এইভাবেই চলুক। শর্মিলার এই প্রস্তাবেও অলি চুপ করে ছিল, মন থেকে সায় দিতে পারেনি। শর্মিলার মামা তার কাছ থেকে পয়সা নেবেন না। সে কেন একজনের বাড়িতে আশ্রিতের মতন থাকতে যাবে?

অলির অধ্যাপক পিটার মেয়ার বললেন, আর দুটি অল্টারনেটিভ আছে। কী বলো তো? প্রথমত, অন্তত দিন দশেক কোনো মোটেলে থাকো, তার মধ্যে আমি নিশ্চয়ই কোনো ডর্মে ব্যবস্থা করতে পারবো। দুরচারদিন কাটলেই বোঝা যাবে যে কোন কোন পুরোনো ছাত্র-ছাত্রী এই সেমেস্টারে আর ভর্তি হচ্ছে না। তখন সীট খালি পাওয়া যাবে।

অলি কিছু বলার আগে অতীনই আপত্তি জানালো। যেন সে অলির অভিভাবক। মোটেল মানে সরাইখানা। সেখানে সাধারণত এক রাতের অতিথিরা আসে। দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে এসে শ্রান্তি অপনোদনের জন্য তাদের কেউ কেউ মদ খেয়ে হল্লা করে। সে রকম জায়গায় একা থাকবে অলি? তার চেয়ে ওয়াশিংটন ডি সি-তে শর্মিলার মামার বাড়ি অনেক ভালো। কত আর দূর? কলকাতার অনেক ছেলে মেয়ে তো বর্ধমান থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে।

পিটার মেয়ার বললেন, তা হলে দ্বিতীয় অলটারনেটিভ হচ্ছে--- চলো, বরং জায়গাটা দেখে আসি আগে।

জিন্‌স আর হলুদ গেঞ্জি পরা, মাথার কাঁচা-পাকা চুলে কোনোদিন চিরুনি পড়েনি মনে হয়, মুখে পরিচর্যাহীন দাড়ি-গোঁফ, রোগা আর লম্বা চেহারা, এতই লম্বা যে একটুখানি কুঁজো দেখায়, বয়েস প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, পিটার মেয়ারকে অধ্যাপক বলে মনেই হয় না। মনে হয়, কোনো ঐতিহাসিক কাহিনী চিত্রের পার্শ্ব অভিনেতা। তিনি শুধু অধ্যাপকই নন, কিছু লোক নাম জানে এমন একজন লেখকও বটে, মোট তিনখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে এ পর্যন্ত, গত চার বছর ধরে তিনি আর একটি উপন্যাস রচনা করেছেন, তার মাত্র সত্তর পৃষ্ঠা তিনি লিখে উঠতে পেরেছেন, সেটুকুই তৃতীয় খসড়া।

প্রথম কয়েকবার তিনি অলিকে আলি, আলি বলে ডাকছিলেন, যখন তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে আলি মুসলমান পুরুষদের নাম হয়, তারপর থেকে তিনি বেশ যত্ন করে ওলি বলতে লাগলেন। বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা-টাকার দায়িত্বও যে একজন অধ্যাপক স্বেচ্ছায় ঘাড় পেতে নেন, তা দেখে অলি গোড়া থেকেই মুগ্ধ।

পিটার মেয়ারের একটা ঝরঝরে পুরোনো গাড়ি আছে, উনি সেটাকে কার না বলে বলছিলেন জ্যালোপি। শর্মিলা এক সময় অলির কানে কানে বলে দিয়েছে যে, এদেশের যার পুরোনো গাড়ি, তাকেই কিন্তু গরিব ভেবো না। এ বছর পুরোনো ধরনের গাড়ি চালানোটাই ফ্যাশান। গত বছর

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ফ্যাশান ছিল ময়লা কেড্‌স জুতো পরা। অনেকেই নতুন কেড্‌স কিনে তাতে গাড়ির মোবিল একটুখানি লাগিয়ে নিত।

সেই গাড়িতে ওঠার পর পিটার মেয়ার বললেন, তোমাদের ক্যালকাটার খবর এখন প্রায় এখানকার টেলিভিশান আর খবরের কাগজে থাকে। তোমাদের ঐ ওভার ক্রাউডেড সিটিতে নাকি আবার মিলিয়ানস অফ রেফিউজিস এসেছে? এই বাংলাদেশ সমস্যাটা নিয়ে তোমরা কী মনে করো? শিগগির মিটবে?

অলির থাকার জায়গা এখনো ঠিক হয়নি, তাই নিয়ে ওরা তিনজনেই উদ্বিগ্ন, এখন বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করায় ওদের আগ্রহ নেই। তবু কিছু তো একটা উত্তর দিতে হবে, তাই অতীন প্রথমে নিরুত্তাপ গলায় বললো, সহজে মিটবে না, অনেকদিন চলবে। একদিন ধর্মীয় উন্মাদনা আর সামরিক নিষ্পেষণ আর অন্যদিকে জাতীয়তাবদের সেন্টিমেন্ট আর ভাষা নিয়ে উচ্ছ্বাস, এর কোনোটাতেইসাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কিছু যায় আসে না, এটা বিপ্লব কিংবা বিদ্রোহ নয়, একটা ভাবাবেগের লড়াই, এতে কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না।

বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে অতীন বললো, তোমরা অ্যামেরিকানরাই তো পাকিস্তানকে গাদা গাদা অস্ত্র দিচ্ছো, আর সেই অস্ত্রে সাধারণ মানুষ মরছে! ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে-কোনো ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট নিক্সন পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে থাকে।

পিটার মেয়ার বললেন, সেটা অস্বাভাবিক তো নয়। তোমাদের ইন্ডিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ানের সামরিক চুক্তি হয়েছে। আগে থেকেও অনেকটা ছিল, এখন তো বলতে গেলে ইন্ডিয়া পুরোপুরি সোভিয়েত শিভিরে। তা হলে অ্যামেরিকা তো পাকিস্তানকে হাতে রাখতে চাইবেই।

শর্মিলা বললো, সোভিয়েত ইউনিয়ানের সঙ্গে ইন্ডিয়ার সামরিক চুক্তি হয়নি, কুড়ি বছরের বন্ধুত্ব চুক্তি হয়েছে।

পিটার মেয়ার হেসে বললেন, অস্ত্রের কথা বাদ দিয়ে কি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব হয়? সোভিয়েত ইউনিয়ানের সেনাপতিরা দিল্লিতে ঘন ঘন যাতায়াত করছে কেন? ইন্ডিয়া মিগ বিমান পেয়েছে কার কাছ থেকে?

অতীন প্রায় ধমক দিয়ে বললো, তোমরা অ্যামেরিকানরা গণতন্ত্রের গর্ব করো, কিন্তু পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে বাদ দিয়ে তোমরা ভাব জমাও যত সব সামরিক একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে। জঘন্য ব্যাপার। আসলে তোমাদের মতলব, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর চারপাশে কামান বসিয়ে রাখা।

পিটার মেয়ার বললো, অনেকদিন ধরে সামরিক শাসন চলছে যে পাকিস্তানে, তার সঙ্গে চীনেরও তো বেশ বন্ধুত্ব। পাকিস্তানের মধ্যস্থ করে এখন চীনের সঙ্গে অ্যামেরিকারও ভাব জমতে শুরু করেছে। নিক্সনের দূত কিসিংগার এই মুহূর্তে পিকিং-এ। রাষ্ট্রপুঞ্জে তাইওয়ানকে হঠিয়ে দিয়ে কম্যুনিস্ট চীনকে সদস্য করা হলো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্ডিয়া এখন অনেকটা একঘরে হয়ে পড়লো, তাই না?

শর্মিলা বললো, ভারত একটা গরিব দেশ, তবু তাকে অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য করেছে এই পাকিস্তান আর চীন। ক্ষুধার্ত শিশুরা খেতে পায় না, আর অস্ত্রের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে যায়। ধনী দেশগুলো সেই সব অস্ত্র বিক্রি করে আরও ধনী হয়। আমেরিকা এক ধমক দিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব আর ভুট্টোকে আবার আলোচনার টেবিলে বসাতে পারতো না? ওরা রাজনৈতিক ভাবে মিটিয়ে নিলে ভারতকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভার বহন করতে হতো না, সীমান্তের সংঘর্ষও এড়ানো যেত, এত নিরীহ মানুষেরও প্রাণ যেত না।

পিটার মেয়ার বললো, তা বলে ভেবো না যেন আমি রাষ্ট্রপতি নিক্সনের সব নীতি সমর্থন করি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ঐ লোকটা একটা গোয়ার ও নির্বোধ!

অলি একটাও কথা বলছে না, সে জানলা দিয়ে দেখছে এই নতুন দেশ। অবশ্য সব কথা তার কানে আসছে। সে লক্ষ করলো, চীনের প্রসঙ্গ ওঠার পর বাবলুদা কেমন যেন চুপসে গেল, আর কোনো মন্তব্য করছে না। সে আরও লক্ষ করলো, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে শর্মিলার বেশ পরিষ্কার মতামত আছে, সে দ্বিধাহীন ভাবে কথা বলতে পারে, এবং তার মতামতের সঙ্গে অলির অনেকটাই মেলে।

একটু পরে পিটার মেয়ার আবার বললেন, নিউ ইয়র্কের ভিলেজ ভয়েস নামে একটা পত্রিকায় অ্যালেনগীন্‌সবার্গের সাক্ষাৎকার ও একটা কবিতা পড়লাম। সে এর মধ্যে ইন্ডিয়ায় ঘুরে এলো।

গীনসবার্গ আমার বন্ধু। সে বলেছে যে কলকাতার একজন কাউকে সঙ্গে নিয়ে সে পূর্ব-পাকিস্তান সীমান্তে গিয়েছিল। কবিতাটার নাম সেপ্টেম্বর অন যেশোর রোড। তাতে উদ্বাস্তু শিবিরগুলোর দুর্দশার যে বর্ণনা আছে, তা পড়ে আমি চোখের জল সামলাতে পারিনি। গীনসবার্গের মা নাওমি-কে নিয়ে লেখা 'কাদিস' কবিতাটার পর এইটাই তার দ্বিতীয় মর্মান্তিক কবিতা। আচ্ছা, যেশোর রোডটা ঠিক কোথায়? কবিতাটা পড়ে আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে করছে।

এতক্ষণ পরে অলি বললো, স্যার, যশোর রোডটা কলকাতা থেকে শুরু হয়ে চলে গেছে পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশের যশোর শহর পর্যন্ত। দেশ ভাগ হবার পরেও রাস্তাটার ঐ একই নাম আছে। এখন ঐ রাস্তার দু'পাশেই উদ্বাস্তু শিবির। আপনি দেখতে যাবেন স্যার? তা হলে কলকাতায় আমার বন্ধুদের চিঠি লিখে দিতে পারি।

পিটার মেয়ার হো-হো করে হেসে উঠে বললো, তুমি আমাকে এত স্যার স্যার বলছো কেন, ওলি? তোমরা খুব ব্রিটিশ কায়দা মানো, তাই না? তুমি আমাকে শুধু পিটার বলবে। হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে তো হয় একবার ইন্ডিয়ায় যাওয়ার, কিন্তু আমার উপন্যাসটা শেষ করতে না পারলে...

গাড়িটা বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট রাস্তায় ঢুকে কয়েকটা বাঁক ঘুরে একটা বাড়ির সামনে থামলো। নীলাভ সাদা রঙের দোতলা কাঠের বাড়ি, সামনে একটা বড় বাগান। দেখলেই বোঝা যায় বাড়ির মালিকের বেশ যত্ন আছে বাগানের প্রতি, চমৎকার গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে। পার্কের ধারে সারি সারি ক্যাকটাসের টব। দোতলার একটা ছোট্ট বারান্দাতেও অনেক রকম ফুল গাছ। বাইরে থেকে প্রথম দর্শনে বাড়িটাকে একটা সুন্দর ছবি ছবি মনে হয়।

গাড়িটাকে বাইরে পার্ক করে পিটার মেয়ার বাগানের গেট খুলে সদলবলে ভেতরে চলে এলেন। পার্কে উঠে বেল-এ আঙুল ছোঁয়াতেই শোনা গেল একটা কুকুরের গম্ভীর গর্জন। ঠিক দু'বার। পিটার মেয়ার কুকুরটির পরিচয় দিয়ে বললেন, ওর নাম ফ্রাইডে।

দরজা খুলে দিলেন একজন মধ্য বয়স্কা মহিলা। মাথায় চুল ঠিক পাকা বলা যায় না, বরফের মতন সাদা, স্বাস্থ্য বেশ ভালো, চোখে পাতলা রঙীন কাঁচের চশমা। পিটার মেয়ারের সঙ্গে এতজন অচেনা লোক দেখেও তিনি বিস্মিত হলেন না। হাসিমুখে বললেন, হাই!

পিটার মেয়ার অলিদের তিনজনেরই পদবী সুদ্ধ নাম প্রায় সঠিকভাবে উচ্চারণ করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অলি ভাবলো, এতগুলো বিদেশী নাম উনি মনে রাখলেন কী করে?

মহিলাটির নাম মেরি উইলসন। পিটার মেয়ার তাঁকে জড়িয়ে ধরে দু গালে তিনবার চুমো খেয়ে বললো, মেরি, এরা আমার ভারতীয় বন্ধু। তোমার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে এলাম।

বসবার ঘরটিতে পুরু কার্পেট পাতা, তিনটি বেশ জানলা, জানলার পাশে রঙীন টবে রবার গাছ, চীনে বাঁশ ও নানান রকমের ফার্ন। একদিকের দেয়ালে একটা বিশাল জাপানী চবি। ঘরটির সাজসজ্জার মধ্যে ঐশ্বর্য ও সুরুচি একসঙ্গে মিশে আছে।

সকলে সোফায় বসবার পর পিটার মেয়ার অলিদের বললেন, মেরি আগে আমাদের সহকর্মিনী ছিলেন, ওঁর স্বামী ছিলেন একটা করপোরেশানের ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমাদের খুব বন্ধু। দু বছর চার মাস আগে একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় ওঁর স্বামীকে হারাতে হয়, মেরিরও একটা পা বাদ যায়। চোখ দুটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এখন অনেকটা ঠিক হয়েছে।

ওরা তিনজনই মেরির পায়ের দিকে তাকালো। একটা পা নেই? একলা হালকা নীল রঙের লম্বা গাউন পরে আছেন মহিলা, পা অনেকটা ঢাকা, কিন্তু দুটি পায়েরই জুতো দেখা যাচ্ছে। নকল পা?

পিটার মেয়ার ওদের মনের প্রশ্নটা বুঝেই আবার বললেন, একটি পা কৃত্রিম, তাতে এখন ওর বিশেষ অসুবিধে হয় না। কিন্তু কৃত্রিম পা থাকলে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যায় না। সেইজন্য মেরি কলেজের কাজ ছেড়ে দিয়েছে, আমরা একজন অতি সুযোগ্য সহকর্মিণীকে হারিয়েছি। মেরি এখন বাড়িতে বসে ছবি আঁকে। শুধু ফুলের ছবি। মাই গড, এর মধ্যেই মেরির খুব নাম রয়েছে। মেরিল্যান্ডে যারাই নতুন বাড়ি কেনে, তারাই তাদের লিভিং রুমে মেরি উইলসনের একটা ফুলের ছবি টাঙায়। মেরি, তোমার স্টুডিয়োতে নতুন আঁকা ছবি আমাদের দেখাবে না?

মেরি হেসে বললেন, দাঁড়াও, পরে হবে। পিট, তুমি তো শুধু আমার সম্পর্কেই অনেক কথা বলে যাচ্ছো, এদের পরিচয় দাও!

শর্মিলা আর অতীন নিজেরাই বললো কেমব্রিজে তাদের পড়াশুনোর কথা। অলি যে সদ্য এদেশে

এসে পৌঁছেছে, সে কথাও জানানো হলো।

পিটার মেয়ার বললেন, ওলি যে দেশ থেকে এসেছে, মেরি সেই দেশেই বেড়াতে যাচ্ছে আগামী শনিবার। মেরি নেপালে যাচ্ছে হিমালয়ান ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা স্টাডি করতে। ফুলের ছবি আঁকে তো, ও সব সময় নতুন নতুন ফুল দেখতে চায়।

নেপালের কথা শুনে অতীন খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, কাঠমাণ্ডু? তা হলে আপনি নিশ্চয়ই কলকাতা হয়ে যাবেন?

মেরি বললেন, দিল্লি থেকে কলকাতায় শুধু প্লেন বদল করবো। ঐ শহরে ঢুকছি না। আমার ট্রাভ্‌ল এজেন্ট কলকাতায় থাকতে বারণ করেছে। কলকাতা নোংরা শহর, যখন তখন বোমা ফাটে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য দিল্লি আর আগ্রা ভালো করে দেখবো।

অলির সঙ্গে অতীনের চোখাচোখি হলো। শর্মিলা কলকাতার মেয়ে নয়, তবু কলকাতার নিন্দে তারও খারাপ লেগেছে।

পিটার মেয়ার বললেন, তা ছাড়া কলকাতায় এখন লক্ষ লক্ষ রেফিউজি, তোমার সেখানে না যাওয়াই ভালো। মেরি, তুমি তো হার্ড ড্রিংকস কিছু রাখো না, বীয়ার আছে? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটা বীয়ার পেলে মন্দ হতো না।

মেরি বললো, আমার বাড়িতে কোনো অ্যালকহলিক বীভারেজ রাখি না। নরম পানীয় কিছু দিতে পারি।

পিটার মেয়ার বললেন, আমি নিয়ে আসছি। কোথায় আছে দেখিয়ে দাও!

ওঁরা দুজনেই উঠে চলে গেলেন একটা ভেতরের ঘরে।

অ্যামেরিকায় এসে অলি এই প্রথম কোনো অ্যামেরিকানের বাড়ি দেখছে। এই এক পা-ওয়ালা মহিলাটি এতবড় বাড়িতে একা থাকেন? ওঁর ছেলেমেয়ে নেই? গাড়ি চালাবার লাইসেন্স নেই বলে উনি অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, এটা একটা অদ্ভুত কথা।

শর্মিলা বললো, আমাদের এখানে কেন নিয়ে এলো বুঝতে পারছি না ঠিক। উনি কি পেয়িং গেস্ট রাখবেন? দেখে মনে হচ্ছে বেশ বড়লোক, সাধারণত এত বড়লোকরা পেয়িং গেস্ট রাখে না।

অলি বললো, আমাকে এমনি এমনি থাকতে বললে আমি থাকবো না।

অতীন বললো, শর্মিলার মামা বাড়িতে থাকাটাই ভালো হবে। এখান থেকে বেরিয়ে স্ট্রেট সেখানে চলে যাবো।

পিটার মেয়ার ও মেরি যখন ফিরে এলো, তখন তাদের সঙ্গে এলো একটা কুকুর। লম্বা, সাদা রঙের, সারা গায়ে ফুটকি ফুটকি, জাতে ডালমেশিয়ান। কুকুরটা ওদের তিনজনের পাশ দিয়ে একবার ঘুরে উল্টোদিকে গিয়ে বসলো।

মেরি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেউ কুকুর অপছন্দ করো না তো?

অলিদের বাড়িতে এক সময় কুকুর ছিল। বিমানবিহারী এক সময় অ্যালসেশিয়ান পুষতেন, বাচ্চা বয়েসে অলি সেই কুকুররের সঙ্গে অনেক খেলা করেছে। সেই প্রিয় অ্যালসেশিয়ানটি মারা যাবার পর আর বাড়িতে কুকুর আনা হয়নি। কুকুর সম্পর্কে অলির ভয় নেই, কিন্তু সে জানে বাবুলদা কুকুর পছন্দ করে না। বড় কুকুর দেখলে আড়ষ্ট হয়ে যায়। সে চোরা চোখে চেয়ে দেখলো, অতীন কাঁধ দুটো উঁচু করে শক্ত হয়ে বসে আছে, কুকুরটাও চেয়ে আছে অতীনেরই দিকে।

সকলের হাতে কোকের টিন দিয়ে পিটার মেয়ার বললেন, আমাদের একটা প্রস্তাব আছে। মেরি আর দুদিন পরেই নেপাল চলে যাচ্ছে, তারপর সিঙ্গাপুর, জাপান হয়ে ফিরবে প্রায় এক মাস পরে। ওর বাড়িতে ফুল গাছে জল দেওয়া আর কুকুরটিতে খেতে দেওয়া একটা সমস্যা। আমাকে মেরি অনুরোধ করেছিল, কিন্তু আমি রোজ আসার সময় পাবো না। ওলি, তুমি কি সেই ভার নিতে পারবে।

মেরি উইলসন অলির দিকে চেয়ে বললেন, তুমি যদি অনুগ্রহ করে সেই ভার নাও, তাহলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করবো। আমি ফ্রাইডে-কে কেনেল ক্লাবে পাঠাতে চাই না, এই বাড়িতেই ও বাচ্চা বয়েস থেকে আছে, একজন কেউ ওর দেখাশুনোর ভার নিলে আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারবো। ফ্রাইডে খুব শান্ত কুকুর, তোমার কোনো অসুবিধে ঘটাবে না। এর মধ্যেই ও তোমাদের পছন্দ করেছে।

পিটার মেয়ার বললেন, অফ কোর্স তোমার এই সার্ভিসের জন্য মেরি তোমাকে কিছু পে করবে। সেটা পরে ঠিক করে নিলেই হবে।

মেরি বললেন, তুমি তো আরও দুদিন থাকছি, এ বাড়ির কোথায় কী আছে সব বুঝিয়ে দেবো।

পিটার মেয়ার বললেন, তাহলে এটাই ঠিক হলো? গাড়ি থেকে ওলির লাগেজ নিয়ে আসা যাক, কী বলো?

ওরা তিনজনই চুপ। এত সহজে অলির থাকার সমস্যা মিটে গেল। এত বড় বাড়ি ঐ মহিলা অলির হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন? এই প্রস্তাবে হ্যাঁ কিংবা না, কোনোটাই যেন বলা যায় না।

মেরি যেন অলিকে একটু তোষামোদ করার সুরে বললেন, তুমি ইচ্ছে মতন আমার টেলিফোন ব্যবহার করবে, তুমি তোমার বন্ধুদেরও উইক এন্ডে নেমন্তন্ন করতে পারো–

অতীন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এ তো খুব ভালো ব্যবস্থা। চলুন, সুটকেসটা নিয়ে আসি।

পিটার মেয়ার সব ব্যবস্থা করে বিদায় নিলেন একটু পরে। শর্মিলা আর অতীন আরও কিছুক্ষণ রয়ে গেল।

অলিকে মেরি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন দোতলায় গেস্ট রুম। সেই ঘরটিও খুব পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো। ধপধপে সাদা বিছানা, লেখার টেবিল, ফোন, একটা ছোট টি ভি, একটা র‍্যাক ভর্তি বই, পাশে ব্যালকনি। সংলগ্ন বাথরুম মস্ত বড়, সঙ্গে ড্রেসিং রুম, ওয়ার্ড রোব, আসল পোর্সিলিনের বাথ টাব। সব কিছু ঝকঝকে তকতকে। বাড়িতে ঐ মহিলা ছাড়া আর কোনো লোক নেই, তবে এত সব পরিষ্কার করে কে?

শর্মিলা বললো, গেস্ট রুমটাই কী দারুণ। অনেক দামি হোটেলেও এত সুন্দর ঘর পাওয়া যায় না। অলি তুমি খুব লাকি।

অতীন বললো, দু দিন বাদে ঐ ভদ্রমহিলা চলে গেলে এতবড় বাড়িতে একা একা থাকতে তোর ভয় করবে না তো?

অলি অন্যমনস্কভাবে দু দিকে মাথা নাড়লো।

অতীন বললো, মালিনী! অলিকে রোজ বাগানে জল দিতে হবে, তার জন্য আবার মাইনেও পাবে! তুই যেন টাকা নিতে অস্বীকার করিস না। আমেরিকানরা যে কোনো কাজের বদলেই টাকা দেয়। এমনকি বাবা তার ছেলেকে দিয়ে কোনো কাজ করালেও টাকা দেয়।

শর্মিলা বললো, বাগানে জল দেওয়া মোটেই খারাপ কাজ না। এরা কোনো কাজকেই ছোট কাজ মনে করে না।

অতীন বললো, আমি নিউইয়র্কে বেশ কিছুদিন কুলিগিরি করেছি। অলি তো সেসব জানে না।

শর্মিলা বললো, তুমি আবার বড্ড বেশি বাড়িয়ে বলো। তুমি শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলে, আমি সিদ্ধার্থর কাছে শুনেছি। আমাকেও মাঝে মাঝে বেবি সিটিং করতে হয়েছে। অলি, ভদ্রমহিলা তো পারমিশান দিয়েছেনই, আমরা এখানে মাঝে মাঝে এসে উইক এন্ড কাটিয়ে যাবো। এত সুন্দর বাড়িতে আমি কখনো থাকিনি।

অতীন বললো, ভদ্রমহিলা কিন্তু আমাদের ডিনার খেয়ে যেতে বলেননি। আর বেশিক্ষণ আমাদের এখানে থাকাটা ঠিক হবে না।

অলির সুটকেসের চাবি পাওয়া যায়নি, শেষ পর্যন্ত তালা ভাঙতে হয়েছে। সুটকেস থেকে জিনিসপত্র বার করে শর্মিলা দ্রুত হাতে অলির ঘর গুছিয়ে দিল। তারপর নিজের কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে বার করলো একটা প্যাকেট। তার মধ্যে রয়েছে একটানতুন বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড়। এ ঘরের বালিশের ওয়াড়টা খুলতে খুলতে শর্মিলা বললো, যতই পরিষ্কার দেখাক বাবা, অন্যের ব্যবহার করা বেড শীট আর বালিশের ওয়াড়ে শোওয়া যায় না!

অলি অবাক হয়ে বললো, এগুলো তুমি আমার জন্য কিনে এনেছো?

অতীন হাসতে হাসতে বললো, তোমাকে কখনো হোটেলে থাকতে হলে তুমি কী করবে বলো তো?

শর্মিলা ব্যাগ থেকে আরও বার করলো একটা বিস্কুটের প্যাকেট, দু-তিন রকম চকোলেট আর বাদাম, একটা ছোট পারফিউমের শিশি।

অলি প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলো, এসব তুমি কী করেছো? এত জিনিস আনতে গেলে কেন?

শর্মিলা বললো, প্রথম দু-একদিনেই তুমি দোকান টোকানে গিয়ে কেনাকাটি করতে যাবে নাকি? সব চিনতে কয়েকদিন সময় লাগবে না? এসব জিনিসের দরকার লাগে। আগে অবশ্য ভেবেছিলুম, তুমি

ডর্মে থাকবে। চলো এবার যাই।

বিদায় নেবার সময় শর্মিলা অলির একটা হাত জড়িয়ে ধরে বললো, যখন যা দরকার হবে, আমাদের ফোন করবে। লজ্জা করো না কিন্তু! ভার্জিনিয়ায় অনেক বাঙালী আছে, তাদের সঙ্গেও তোমার আস্তে আস্তে যোগাযোগ হয়ে যাবে!

অতীন শর্মিলাকে তাড়া দিয়ে বললো, চলো, চলো। ছটার বাস ধরবো। অলি, খুব ভালোই ব্যবস্থা হয়েছে তোর, চিন্তার কিছু নেই। আমরা তোর খবর নেবো সব সময়। পিটার মেয়ার লোকটা ভালো।

শর্মিলা বললো, যখন এ বাড়িতে প্রথম নিয়ে এলো, আমি ভাবলুম, পিটার মেয়ার বুঝি নিজের বাড়িতেই অলিকে থাকতে দিচ্ছেন।

অতীন বললো, এখানকার প্রফেসাররা বাড়িতে কোনো ছাত্র-ছাত্রী রাখে না। তবে বাড়িতে ডাকবে, ডিনার খেতে প্রায়ই ডাকবে।

অলি ওদের সঙ্গে নীচে নেমে বাগানের গেট পর্যন্ত এলো। শর্মিলা বললো, এই, তুমি ভেতরে যাও!

অলি প্রায় দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে এলো। মেরিকে দেখা গেল না, তিনি স্টুডিও-তে গেছেন সন্ধে আটটার সময় অলির সঙ্গে আবার দেখা করবেন বলেছেন। কুকুরটা চুপ করে শুয়ে আছে বসবার ঘরে। অলি উঠে এলো ওপরে। ব্যালকনিটার দরজা খুলে সেখানে দাঁড়ালো। এখানেও অনেক রকম ফুলের গাছ, দেয়াল বেয়ে উঠেছে আইভি লতা।

এটা বাড়ির পেছন দিক। এদিকেও রয়েছে খানিকটা বাগান, তারপর অন্য রাস্তা। খানিকটা দূরে সে দেখতে পেল শর্মিলা আর অতীনকে, ওরা সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, হাত ধরাধরি করে। একটু পরেই ওদের আর দেখা গেল না।

হু হু করে জল এসে গেল অলির চোখে।

বাবলুদা একবারও তার হাত ছোঁয়নি। সে আর জীবনে কখনো বাবলুদাকে স্পর্শ করবে না। বাবলুদা আর তার কেউ নয়। না, না, সে আর এই রকম কথা চিন্তাও করবে না কোনোদিন। শর্মিলা কী ভালো মেয়ে। বাবলুদার সঙ্গে তাকে চমৎকার মানিয়েছে।

শৌনক, আমার শৌনক আছে। সে কোনোদিন আমাকে ভুলে যাবে না বাবলুদার মতন। শৌনক শুধু আমার, শুধু আমার! মনে মনে এই কথা বারবার বলতে বলতে অলি চোখ মুছতে লাগলো। তবু কান্না থামছে না। তার হেঁচকি উঠে আসছে।

সে বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুলো ভালো করে। বুকের মধ্যে ব্যথা করছে, বুকটা মুচড়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে এরকম, বাবলুদার ওপর তো তার রাগ বা অভিমান নেই। মনটা অন্যদিকে ফেরানো দরকার।

চিঠি লিখলে সময় কাটবে। অনেক চিঠি লিখতে হবে। মা-বাবাকে, পমপমকে, বর্ষাকে, প্রতাপকাকাকে। সবচেয়ে আগে শৌনককে চিঠি লেখা উচিত না? শৌনিকের ঠিকানা কী? তার চোখ দুটো এখনো স্পষ্ট হয়নি। তার গলার আওয়াজ কী রকম? পিগম্যালিয়ান যেরকম একটা মূর্তিকে জীবন্ত করেছিল, সেইরকম অলি একজন পুরুষকে সৃষ্টি করতে পারবে না, যে তার সারা জীবনের সঙ্গী হবে!

চিঠি লেখার সাদা পাতায় টপটপ করে পড়ছে চোখের জল। অলি একটা লাইনও লিখতে পারছে না। শর্মিলা আর বাবলুদা হাত ধরাধরি করে মিলিয়ে গেল রাস্তার বাঁকে, এই দৃশ্যটা দুলছে তার চোখের সামনে, কান্নায় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, ফিরে আসছে আবার। অলি মুখে আঁচল চাপা দিল।

নাঃ, অন্যদিকে মন ফেরাতেই হবে। এই বাড়ির ভদ্রমহিলাটির কী মনের জোর! অ্যাকসিডেন্টে স্বামী মারা গেছেন, নিজের একটা পা নেই, তবু একলা একলা তিনি নিজের জীবনটাকে সার্থক করার চেষ্টা করছেন। একটা পা নেই, তবু ইনি নেপালে যাচ্ছেন হিমালয়ের ফুল দেখবেন বলে? সাহস আছে বটে! ভদ্রমহিলা অসম্ভব ভদ্র। এটা তো বোঝাই গেল যে অলি কোথাও থাকার জায়গা পায়নি, তার অসহায় অবস্থার জন্যই মেরি তাকে এ বাড়িতে থাকতে দিলেন। নেপালে যাবার টিকিট কাটা হয়ে গেছে, দু দিন পরে চলে যাবেন। এ বাড়ির বাগানে জল দেওয়া আর কুকুরকে খাওয়ানোর অন্য ব্যবস্থা ছিল নিশ্চয়ই, তিনি তো আর অলির অপেক্ষায় বসেছিলেন না! কিন্তু এমন অনুরোধের সুরে বললেন, যেন অলি থাকতে রাজি হলে তিনি ধন্য হয়ে যাবেন! আবার টাকা দিতে চান। অলি কিছুতেই সে টাকা নেবে না।

ভদ্রমহিলা ছবি এঁকে নাম করেছেন। অনেকে তাঁর ছবি কেনে ঘর সাজাবার জন্য, উনি যখন খুশী পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় চলে যেতে পারেন। উনি আবার বিয়ে করেননি কেন? কথা বলতে বলতে

হঠাৎ থেমে যান, গলার আওয়াজটা বিষণ্ণ হয়ে যায়, একটা নিঃসঙ্গতা বোধ যেন চাদরের মতন জড়িয়ে আছে ওর সারা গায়ে। এই বাড়িটা এত সুন্দর, তবু যেন অসম্ভব রকমের শূন্য।

কখন অন্ধকার হয়ে গেছে অলি খেয়ালও করেনি। টেবিল ছেড়ে উঠে অলি আলো জ্বালতে গেল। সুইচ কোথায়? আগে দেখে রাখেনি। দেয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ থেমে গেল অলি। তাকে এখানে একা ফেলে শর্মিলার হাত ধরে চলে গেল বাবলুদা। আজই অলি চিরবিদায় দিয়ে দিল বাবলুদাকে। এখন এই গোটা অ্যামেরিকা মহাদেশটাই অলির কাছে শূন্য। কী হবে আর এখানে থেকে?

অন্ধকার ঘরে, দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে ছটফট করে কাঁদতে লাগলো অলি। মানুষের চোখের কত গভীরে এত অশ্রু জমা থাকে? অলি কাঁদতে চায় না, তবু তার চোখ দিয়ে জল ঝরছে। যাতে কোনো শব্দ না শোনা যায় তাই সে শক্ত করে চেপে ধরে আছে নিজের মুখ।

॥ ৪৮ ॥

প্রতিমার গায়ে রং লাগানো হয়ে গেছে, গর্জন তেল মাখিয়ে পালিশও করা হয়েছে। আজ চোখ ফোটাবার দিন। আজকের দিনটাই আসল। এতদিন ছিল নিছক মাটির প্রতিমা, আজ তিনি হবেন মা দুর্গা।

জায়গাটা চট দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। দুর্গা-লক্ষ্মী সরস্বতী কোনো মূর্তিকেই এখনো কাপড় পরানো হয়নি, তাই বাইরের লোকদের দেখতে নেই। শুধু বাচ্চারা সেই চট সরিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে, তারা বারণ শোনে না। শিশুদের আর শিল্পীদের দোষ হয় না।

বানার্জিবাবুদের বাড়ির প্রতিমা গড়ার বায়না পেয়েছে হলধর পাল, তার সহকারী হয়েছে হারীত মণ্ডল। ব্যানার্জিরা এ তল্লাটের অবস্থাপন্ন মানুষ, তাদের পাটের কারবার আছে। তাদের যৌথ পরিবারে এখনও পুরোনো চাল বজায় আছে, প্রতি বছর এ বাড়িতে দুর্গা পূজা হয়। এখন পারিবারিক দুর্গাপূজা উঠেই যাচ্ছে প্রায়, এখন বারোয়ারি দুর্গোৎসব হয়। বসিরহাটের ব্যানার্জিরা কলকাতার কুমোরটুলি থেকে মূর্তি আনেন না। নিজেদের বাড়িতেই কুমোর ডেকে মূর্তি গড়ান, এটাও তাঁদের অনেক কালের পারিবারিক প্রথা। বাড়ির উঠোনে মণ্ডপ তৈরি হয়, কয়েক বছর আগেও পাঁঠা বলি হত, সম্প্রতি এ বাড়ির ছোটবাবু তা বন্ধ করেছেন, নিয়ম রক্ষার জন্য হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া হয় চালকুমড়ো আর আখ।

প্রতিমার দৃষ্টিদান হয় পঞ্চমীর দিন বিকেলে। এ বাড়ির কুমারী ও সধবা মহিলারা ওই দিন সুতির শাড়ি পরে না। সকালেরই স্নান সেরে পট্টবস্ত্র ধারণ করে সারাদিন উপবাসে, শুদ্ধভাবে থাকে। আজকাল অবশ্য কুমারী মেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে বাতাসা না তেঁতুলের আচার খেয়ে নেয়, সধবারা প্রকাশ্যেই চা খায়।

হারীত মণ্ডল ধ্যান বসেছে। না, লোক দেখানো ভান নয়, সে সত্যিই চোখ বুজে ধ্যানের মধ্যে দেখতে পায় না। লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশের চোখ তারা দু'জনে ভাগাভাগি করে আঁকলেও মা দুর্গার চোখ হলধর আঁকতে সাহস পায় না। এ চোখ তো একবার এঁকে আর মোছা যায় না। একটানে আঁকতে হয়।

হারীত বেশ বিপদের পড়ে গেছে। সে পেশাদার কুমোর কোনও কালেই ছিল না। শখ করে সে মূর্তি গড়া শিখেছে, কাঠের পুতুলও বানাতে পারে, তাও তো অনেকদিন অভ্যেস নেই। আজ যখন সে তুলি হাতে নিয়েছে, তাকে কাজ শেষ করতেই হবে। কিন্তু তার ভয় করছে, এ তো সামান্য কোনও পুতুল তৈরি করা নয়, এ যে মায়ের মুখ। চোখ বুজে, মনটাকে দুই ভুরুর মাঝখানে এনে হারীত একটি দুর্গা প্রতিমার মুখ দেখতে চাইছে, মনে আসছেও সে রকম ছবি, কিন্তু স্থির নয়, বড় চঞ্চল। তার মনে পড়ে যাচ্ছে সুলেখার কথা, তার জীবনে যে একমাত্র নারীকে সে দেবীর স্থানে বসিয়েছিল, সেই শান্ত, সুন্দর দুটি চোখ, তালতলার বাড়িতে হারীত যেদিন গ্রেফতার হয় সেদিন সুলেখা খালি পায়ে রাস্তায় নেমে এসে পুলিশের কাছে মিনতি করেছিলেন...না, না, কোনও জীবিত মানুষের চোখের আদলে কি ঠাকুরের চোখ আঁকা যায়, তাতে পাপ হবে না? হারীতের আরও মনে পড়ছে গোলাপীর মুখ, তার স্ত্রীর মুখ, আরও অনেক রোগা, গাল তোবড়ানো নারীদের মুখ, কিছু কিছু নিষ্প্রভ চোখ... এ তো বড় জ্বালা!

হারীত তার মনটাকে নাড়া দিয়ে ফিরে যেতে চাইল তার বাল্য-কৈশোর, যখন দুর্গা ঠাকুরের মুখের দিকে সে সত্যিকারের বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত, মনে হত ডান দিকে বা বাঁ দিকে, যেদিকেই সে সরে যাক, মা তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। তাদের বাড়িতেও চৌধুরী বাড়ির পুজোয়

একমাস আগে থেকে প্রতিমা একমেটে, দোমেটে হত। তারপর সাদা রং, প্রতিটি স্তরে হারীত দেখত হাঁ করে...... আশ্বিন মাসের মাঠভরা সবুজ ধান, সেই ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে এক কিশোর, আকাশে, বাতাসে ঢাকের বাজনা বাজছে, দূরে দেখা যাচ্ছে তাদের বাড়ি, ডাল-পালা মেলে টিয়া টুটি আম গাছটা যেন ডাকছে, হারীত, হারীত—

হলধর তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, কী হইলো, তোমার চক্ষু দিয়া জর পড়ে ক্যান? ঘুমাইয়া পড়লা নাকি?

হারীতের ঘোর ভাঙল। হ্যাঁ, সে প্রায় এক স্বপ্নের দেশেই চলে গিয়েছিল।

তুলি হাতে নিয়ে হারীত উঠে দাঁড়ালে। কালো রঙের মধ্যে সেটা ডোবাতে ডোবাতে সে কয়েক পলক চেয়ে রইল দুর্গার মুখের দিকে। এখন দেখলে মনে হয় এক সুন্দরী অন্ধ যুবতী। হারীত ভাবল, কী হবে চোখ এঁকে? ঠাকুর-দেবতারা তো সব অন্ধই! তাঁরা কি মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখতে পান? এই যে এত মানুষ ভিটে-মাটি-ছাড়া হয়ে হা-ঘরের মতন ঘুরছে, অনাহারে, রোগে ভোগে মরছে, দেবতারা কি তার প্রতিকারের কিছু চেষ্টা করেন কখনও?

তুলিতে বেশি রঙ নিয়ে হারীত প্রায় বিদ্যুৎ বেগেই ভুরু জোড়া আঁকল। তারপর চোখের দুটি মণি। তারপর সরু করে চোখের রেখা।

হলধর ব্যগ্রভাবে দেখছিল, হারীত একটু পিছিয়ে আসতেই তাকে জড়িয়ে ধরে হলধর বলল, গুরুবল আছে তোমার, হারীত। বড় সুন্দর হইছে। মা হাসতেছেন, দ্যাখো হারীত, মা তোমারে আশীর্বাদ করতেছেন।

হারীত চোখ কুঁচকে দেখতে লাগল। সে খুশি হয়নি। তার চোখে খুঁত ধরা পড়ছে, ভুরু দুটো সমান নয়, সে দৈবী প্রেরণা পায়নি, শিল্পী হিসেবে সে সন্তুষ্ট নয়। তবে চলে যাবে, ঠাকুরের মূর্তি কেউ অত খুঁটিয়ে দেখে না, এখন মাথায় জরির মুকুট ও গায়ে চকচকে রং করা পাটের কাপড় পরিয়ে দিলেই অনেক জমকালো দেখাবে।

হলধর বলল, এবার তুমি বিশ্রাম নাও। যেটুকু বাকি আছে, আমি সাইরা দেবো অ্যানে।

হারীত বলল, অসুরের চক্ষু দুইটাও আমিই কইর্যা দেই। ঐ দুটা আরও ভাল পারুম। সারাজীবনে অসুর তো কম দ্যাখলাম না।

চটের পর্দা সরিয়ে হলধর একটি বাচ্চা মেয়েকে বলল, ভিতরে গিয়ে খবর দায় তো মা, চক্ষুদান হইয়া গ্যাসে।

বাচ্চারা হাততালি দিয়ে উঠল, পর্দা ঠেলে একবার উঁকি মেরে সবাই প্রণাম করল। তারপর ছুটে গেল বাড়ির মধ্যে।

ব্যানার্জিদের মেজোবাবু চটি ফটফটিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে হলধর?

হলধর বলল, আর শুধু সাজ পরানো বাকি। বড় জোর এক-দ্যাড় ঘণ্টা লাগবে বাবু!

মেজোবাবু বললেন, আগে তোমরা কিছু খেয়ে নাও। বেশ বেলাবেলিই তো হয়ে গেল।

তিনি চক্ষুষ্মাণ প্রতিমা দেখার জন্য কোনও আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। পুরুত এসে ঘটে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার আগে মায়ের মুখ দেখেন না এ বাড়ির পুরুষেরা।

একটি ষোল-সতেরো বছরের তন্বী মেয়ে দুটি থালায় করে লুচি-আলুর দম আর মিষ্টি দিয়ে গেল দু'জনের জন্য। অন্যদিন এরা খোরাকির টাকা পায়, শুধু আজকের দিনটাতেই বাড়ির ভেতর থেকে খাবার আসে। হলধর ভাল করে হাত না ধুয়েই খেতে শুরু করে দিল। হারীত একটা বিড়ি ধরিয়ে বারবার দেখছে দুর্গা প্রতিমার চোখের দিকে। শিল্প সৃষ্টির অতৃপ্তি তার খিদে ভুলিয়ে দিয়েছে। খুব খারাপ হয়নিই। কিন্তু আরো অনেক ভাল হতে পারত।

সব কাজ সারতে সন্ধে হয়ে গেল। এখন যেতে হবে দু-আড়াই মাইল দূরে। হাঁটতে হাঁটতে হলধর নিজের বুকে হাত বুলোতে লাগল মাঝে মাঝে। কথাও সে কম বলছে। একটু বেশি বয়স হলে অনেক মানুষেরই বেশি কথা বলা রোগ হয়, হলধর কিন্তু চুপচাপ স্বভাবের মানুষ। হারীতও আপনমনে বিড়ি টেনে যাচ্ছে। তার বগলে একটা নতুন ধুতি।

হলধরকে কয়েকবার বুকে হাত বুলোতে দেখে হারীত জিজ্ঞেস করল, কী হইলো গো দাদা, বুক ব্যথা করে নাকি?

হলধর বলল, না, ব্যথা নাই। তয় বুকখানা কেমন য্যান খালি খালি লাগে।

হারীত বলল, অ্যাতদিনের পরিশ্রম আইজ শেষ হইল, আইজ তো ফুর্তি করার কথা। তুমি মুখ শুকনা কইরা রইলা

হলধর বলল, হ। ঠিকই।

– কিসের কী ঠিকই?

–আইজ ফুর্তি করার কথা। তবু বুকখান খালি খালি লাগে। পিরতিমার কাজ সম্পূর্ণ হইল, তুব আমার খালি খালি লাগেহ।

হারীত যেন এবার খানিকটা বুঝল। সে নিজেও ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবে না, তবে কোনও একটা কাজ খুব মন দিয়ে সম্পূর্ণ করার পর একধরনের শূন্যতাবোধ তারও হয় কক্ষণও কখনও। একটা অতৃপ্তির স্বাদ মুখে লেগে থাকে।

যেতে হবে বাজারের পাশ দিয়ে। এখন দোকানপাট অনেক রাত্তির পর্যন্ত খোলা থাকে। পথে মানুষজন অনেক, বেশ একটা পুজো পুজো ভাব এসে গেছে। এক জায়গায় কয়েকজন ঢাকী-ঢুলি জড়ো হয়ে আছে, বারোয়ারির পুজো কমিটিগুলি তাদের এখনও নিতে আসেনি, মাঝে মাঝে তারা ঢাকে কাঠি দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। ঐ ঢাকের আওয়াজ শুনলেই উৎসব উৎসব মনে হয়।

হলধর এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার কিছু কেনাকাটি আছে? এখন টাকা নিবা?

হারীত দুদিকে মাথা নাড়ল। কার জন্য সে পুজোর বাজার করবে, তার তো কেউ নেই এখানে? নবাকে নিয়ে যোগানন্দ ফিরে গেছে হারীত পীরশের হাতে ধরা পড়ার পরেই। কাশীপুর কলোনিও সার্চ হয়েছিল, সেখানকার লোকজন প্রায় জোর করেই নবা আর যোগানন্দর টিকিট কেটে তাদের ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। পুলিশের ভয়ে তারা হারীতের সঙ্গে কোনও সংস্পর্শ রাখতে চায় না। তারা ভেবেছিল, হারীত সহজে ছাড়া পাবে না।

নবাব জন্য একটু মনঃকষ্ট হল হারীতের। ছেলেটা থাকলে একটা নুতন জামা কিনে দিত হারীত, ওর বেলুন আর আইসক্রিমের খুব শখ ছিল...

হারীত নিজে কতকাল পর পুজোর সময় নতুন বস্ত্র পাবে।

হারীতের হাত ধরে টেনে হলধর বলল, আস এদিকে। এখনই বাড়ি যাওনের তাড়া নাই। এট্টু মনডারে জুড়াই।

বাজারের পেছনদিকে একটা দেশী মদের আখড়া। প্রত্যেকদিনই ভিড় থাকে, আজ একেবারে মাছির মতন মানুষের মাথা। সিগারেট-বিড়ির ধোঁয়ায় টালির ঘরটা ভরে গেছে। বসার জায়গা নেই, তাই কাউন্টারে অন্যদের ঠেলেঠুলে ওরা দু'জনে দাঁড়াল। হলধর আঙুল দেখিয়ে বলল, দুইটা ফাইল!

হারীত একটু অস্বস্তি বোধ করছে। সে যে কোনওদিন মদ স্পর্শ করেনি, তা নয়। এই আখড়াতেই হলধরের সঙ্গে বারতিনেক এসেছে। খানিকটা খেয়েই হলধর বেসামাল হয়ে পড়ে, তার পায়ের জোর কমে যায়। এখানে প্রায় প্রত্যেকদিনই বন্ধ হবার একটু আগে ঝগড়াঝাটি-মারামারি শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ সোডার বোতল ছোঁড়ে, কেউ ছুরি বার করে। মারামারিটা অবশ্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবু বলা তো যায় না। আজ হলধরের কাছে অনেক টাকা, ব্যানার্জিবাবুরা মোট এগারো শো টাকায় চুক্তি করেছিলেন, তার মধ্যে ছ শো টাকা আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, আজ চুকিয়ে দিয়েছেন বাকি টাকা। এছাড়া দু'খানা ধুতি দিয়েছেন।

এই বারের মালিক ইসমাইল মিঞা, জঙ্গলের শিমুল গাছের মতন চেহারা। গলার আওয়াজও বাজখাই। গণ্ডগোল-মারামারির সময় সে অকুতোভয়ে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়, দু'দিকে চড়-কাপড় চালায়। ইসমাইল মিঞার গায়ে কেউহাত তুলতে সাহস করে না। এমনকি কোনও মাতাল খুব নেশামিশ্রিত রাগে ছুরি বার করলেও ইসমাইল মিঞা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, কী রে, খুব গরম খেয়ে গেছিস, না? লখাবী করছিস এখানে? দাঁত ক'খানা সব ফেলে দেব?

আজ ইসমাইল মিঞাই ভরসা। ঘামে তার সারা মুখ চকচক করছে, যেন গর্জন তেল মাখানো হয়েছে। চোখ দুটো ধোঁয়ায় লালচে, সে এক ফোঁটাও মদ খায় না। ম্যানেজার মকবুল আজ একা এত খদ্দের সামলাতে পারছে না, তাই ইসমাইল মিঞাও মাল ঢালাও কাজে হাত লাগিয়েছে।

হলধর বলল, এই যে, মেঞা ভাই, আমাগো দুইটা গেলাস!

ইসমাইল মিঞা বলল, দিচ্ছি, দিচ্ছি, সবুর করো! আজ গেলাস শর্ট আছে। ভাঁড় চলবে?

তাই সই। একটা বাচ্চা ছেলে কয়েকটা মাটির ভাঁড় এনে রাখল কাউন্টারে। এই ছেলেটাই ঘুগনি আর মেটের চাটি বিক্রি করে। হলধর তাকেও আঙুল দেখিয়ে বলল, দুটো স্পেশাল। অর্থাৎ দু'প্লেট মেটে। হলধর অসম্ভব ঝাল খেতে পারে।

নিজের ভাঁড়টা নিয়ে হারীত প্রথমে তাতে কড়ে আঙুল ডুবিয়ে একটু মদ তুলল। সেটা ছিটিয়ে দিল ভূমিতে, বিড় বিড় করে বলল, জয় বাবা কালাচাঁদ, জয় বাবা কালাচাঁদ। তার দেখাদেখি আজকাল হলধরও শুরু কালাচাঁদের নাম নেয়।

অন্যরা হল্লা করছে, কেউ ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণের একজনকে কোনও গোপন খবর শোনাচ্ছে, কেউ কেউ গান ধরেছে। হলধর গল্প করার লোক নয়, তার নেশা হলেই সে আরও গুম হয়ে যাবে। হারীত এদিক ওদিক তাকিয়ে চেনা মানুষ খোঁজে।

হারীতের ডানপাশেই যে রুখু দাড়িওয়ালা লোকটি দাঁড়িয়েছে, সে খাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে, তার কান্নার দশা এসে গেছে। সে হারীতকে চেনে না, তবু আপনজনের মতন তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এবার আমাগো দ্যাশে একখানাও পূজা হবে না। বরিশাল-ফরিদপুর-খুলনা, মায়ের পূজা নাই।

পাশ থেকে তার সঙ্গী কাঁধে চাপড় মেরে বলল, আরে শালা, কবে বরিশাল ছেড়ে এসেছিস, সেই পঞ্চাশ সনে, এখনও বলিস আমাগো দ্যাশ! তোদের লজ্জা করে না?

রুখু দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, আলবাৎ কমু। আমার বাপ-দাদারা সেহানেই জন্মগ্রহণ করছে, সেহানেই মরছে। আমাগো সাত পুরুষের ভিটা আছিল।

সঙ্গীটি ভেঙচিয়ে বলল, তুই-ও সেখানে জন্মোগ্রহণ করিছিস। তুইও সেখানে মরতে যা তা হলে? এখানে ভিড় বাড়াচ্ছিস কেন?

লোকটি ঠিক উত্তর খুঁজে না পেয়ে হারীতের দিকে তাকাল। হারতি জিজ্ঞেস করল, বরিশাল-ফরিদপুরে পূজা হবে না কেন এবার?

লোকটি এবার হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, খান সেনারা খুন করবে। মা দুর্গারে দ্যাখলে তারেও খুন করবে। হিন্দুরা সব পলাইছে!

একটু দূর থেকে একজন বলল, ও বুড়োদা, আজ তিনজন খান সেনা ধরা দিয়েছে, দেখেছেন? নদীর ওপর দিয়ে নৌকো করে নিয়ে এল, হাত বাঁধা ছিল। কী ইয়া ইয়া চেহারা, মুখগুলো লাল।

আর একজন বলল, ওরা পাঠান বুঝলেন। পাঠানরা অনেকে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করতে চায় না। তারা পালিয়ে এসে বি এস এফ-এর কাছে ধরা দিচ্ছে। ইচ্ছামতী নদীল ওপর দিয়ে তো প্রায় রোজই দুটো-তিনটে আসছে।

আগের লোকটা বলল, বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করতে চায় না। কে বললে? আসলে এখন উল্টো হুড়কো খাচ্ছে যে! মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের হাত ধরা পড়লে কচুকাটা হবে তাই বি এস এফ-এর ধরা দিচ্ছে।

ইসমাইল মিঞা একজনকে জিজ্ঞেস করল, অ্যাই নেতাই, তোদের পাড়ার পুজোয় কোন যাত্রাপার্টি আসছে রে?

নিতাই নামের লোকটি বলল, সত্যম্বর অপেরা। সব কলকাতার আর্টিস্ট। 'পতিঘাতিনী সতী' আর 'বিদ্রোহী বাদশা'। ফিমেল আর্টিস্ট আছে, ঝর্ণাকুমারী দুলালী চ্যাটার্জি, ছন্দা পাল। মিঞাদাদা, তোমার কিন্তু এবার পঞ্চাশ টাকা চাঁদা।

– যা ভাগ। পঞ্চাশ দোব না ইয়ে দোব! গতবারে তিরিশ দিয়েছি।

– সব জিনিসের দাম বেড়েছে এবারে! তুমি মালের দাম বাড়াওনি? পঞ্চাশ দিও, তোমার সামনের দিকে সটি রিজার্ভ থাকবে।

–হ্যাঁ, রে, ঐ ঝর্ণাকুমারী নাকি মোছলমানের মেয়ে !

– মোছলমানের মেয়ে নয় গো, হিন্দুবাড়ির বউ ছিল। আর একজনকে বিয়ে করবে বলে মোছলমান হয়েছে। ঐ যেমন সিনেমার শর্মিলা টেগোর।

কেউ একজন এই তথ্যে আপত্তি জানাল। অন্য দু-তিনজন পূর্ববর্তী বক্তাকে সমর্থন জানিয়ে বলল যে, এ খবর কাগজে বেরিয়েছে।

আর একজন চিৎকার করে বলল, আরে শালা ঝর্ণাকুমোরীকে পেলে আমিও এক্ষুনি মোছলমান

হতে রাজি আছি। যা দু'খানা হেভী হেভী....ঝর্ণাকুমারী কাবাব বেঁধে খাওয়াবে একদিন, আমি পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকব, কত টাকা লাগে বল তো?

ইসমাইল মিঞা বলল, আরে তোর যে মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, ঝর্ণাকুমারীকে পেলে তুই আগে তাকেই কাবাব বানিয়ে খাবি।

একটা হাসির ঢেউ বয়ে গেল।

হারতি অনেকক্ষণ থেকেই হাসছে মুচকি মুচকি। এ এক বিচিত্র জগৎ। এখানে হিন্দু-মুসলমান, বাঙাল-ঘটির কোনও তফাত নেই। এখানে ঝগড়া হয় বটে, আবার পরের দিন তারাই গলা জড়াজড়ি করে। গুড়িখানায় কোনও হিন্দুস্থান-পাকিস্তান নেই। সীমান্তের ওপর থেকে পালিয়ে আসা মানুষ এখানে আসে, আবার এই বাজারের বিহারী মুসলমান পাইকাররাও আসে।

হলধরকে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে হারীত জিজ্ঞেস করল, কী দাদা, কদ্দুর?

হলধর বলল, বুকখান এহোনও কালি খালি লাগত্যাছে রে!

—ও আর আইজ ঠিক হবে না, চলো বাসায় যাই!

হলধর যেতে চায় না। হারীত একটা পাইট কিনে নিয়ে প্রায় জোর করেই তাকে টেনে বাইরে এনে রিকশায় তুলল। হাঁটিয়ে নিতে গেলে হলধর মাঝে মাঝে বসে পড়বে। নতুন ধুতি দু'খানা ঠিক আছে, হলধরের কোমরে টাকার গেঁজেটা ঠিক আছে।

একটুখানি যেতে না যেতেই হলধর হারীতের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। একটু পরেই নদীর ওপারে বুম বুম করে দুটো জোর শব্দ হল। বোমা হতে পারে, গুলির শব্দ হতে পারে। এরকম শব্দ শুনলে এখন কেউ বিশেষ চমকায় না। হলধরের ঘুমও ভাঙল না।

রিকশাওয়ালাটিও রিফিউজি। সে আপনমনেই বলল, আইজ আবার মুক্তির পোলারা বর্ডার অ্যাটাক করছে।

এখান থেকে মাত্রদশ-পনেরো মাইল দূরে যুদ্ধ চলছে একটা। মানুষ মরে, মানুষই মানুষকে মারে। মাত্র দুটো-তিনটে লোক আলাপ-আলোচনায় বসে একমত হতে পারলে এই অসংখ্য খুনোখুনি বন্ধ হতে পারত।

হলধরের বাড়িতে এসে হারীত ভাড়া মিটিয়ে দিল। দু'খানা মাত্র টিনের ঘর, বিজলি বাতি নেই, সামনের এক চিলতে বারান্দায় হলধরের পাগল বউ হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে।

বসিরহাট থানা থেকে ছাড়া পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে হারীত একদিন এই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল। সেদিন এই বারান্দায় ছড়ানো ছিল অনেকগুলো মাটির পুতুল, তখনও বেশিরভাগই রং করা বাকি। বাইরে তুমুল ঝড়বৃষ্টি। হারীত এই বারান্দায় উঠে এসে এক কোণে বসেছিল, হলধর একবার মাত্র মুখ তুলে তাকিয়েছিল তার দিকে, কোনও কথা বলেনি। তখন প্রায় বিকেল, হারীত সারাদিন কিছু খায়নি, এক কাপ চাও না। খানিকক্ষণ বসে বসে হলধরের পুতুল রং-করা দেখতে দেখতে হারীত এক সময় চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বলেছিল, আমারে এক গাল মুড়ি খাইতে দেবেন? আমি রং দেওয়ায় আপনারে সাহায্য করতে পারি।

নানা জায়গা থেকে বিতাড়িত, মার্কামারা উদ্বাস্তু হলেও হারীত ভিখিরি হতে পারে না। তার পরনে গেরুয়া লুঙ্গি, তবু সন্ন্যাসীর ভেক ধরে সে কারুর কাছে হাত পাতেনি। এখানে, এই লোকটির বাড়িতে এসে সে কাজের বিনিময়ে কিছু খাবার চেয়েছিল।

হলধর জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি রঙের কাজ জানো?

হারীত বলেছিল, একখান আগে করি, আপনে দ্যাখেন।

পুতুলগুলো ছিল অতি সাধারণ ছাঁচে ঢালা লক্ষ্মী। একটা তুলে নিয়ে তাতে যত্ন করে রং লাগাবার পর হলধর জিজ্ঞেস করেছিল, বাড়ি কোথায়?

হারীত হাত তুলে বলেছিল, আগে ছিল ঐ পারে। এখনে, এখনে, কোথাও নাই।

— তাই বুঝি গেরুয়া নিছো? তবু ভাত জোটে না?

সেই থেকে বন্ধুত্ব। হলধররাও হারীতের মতনই বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়ে এসেছে, তবে অনেক আগে সেই পঞ্চাশ সালে। রিফিউজি ক্যাম্পে থাকেনি হলধর। তার সামান্য কিছু মূলধন ছিল, তা ছাড়া জাতে কুমোর, হাতের কাজ বিক্রি করে কোনওরকমে পেট চালিয়ে নিতে পারে। কুপার্স ক্যাম্পে থাকার সময় হারীতকে তার স্ত্রী পারুলবালা অনেকবার বলেছিল ক্যাম্প ছেড়ে পালাতে। তারাও কি অন্য

কোনও জায়গায় কোনও রকমে মাথা গুঁজে জীবিকা চালিয়ে নিতে পারত না? রিফিউজি পরিচয়টা মুছে ফেলে মিশে যেতে পারত পশ্চিম বাংলার অগণ্য মানুষের মধ্যে। কিন্তু হারীত যে পাকেচক্রে রিফিউজিদের একটা দলের নেতা হয়ে গিয়েছিল। সবাই ভরসা করত তার ওপরে। সে কী করে অন্যদের ছেড়ে পালায়।

নেতা হবার যে কী মূল্য, তা তো হারীত বুঝেছে অনেকবার। কাশীপুরের বাগানবাড়িটা তো তারই জেদে দখল হয়েছিল, সে মার খেয়ে নিজের মাথা ফাটিয়েছে। খুনের অপবাদ নিয়ে পুলিশের কাছে গুয়োর-পেটা হয়েছে। সেই কাশীপুর কলোনির লোকজনরা এখন তার নাতিটাকেও আশ্রয় দিল না! এতখানি জীবনের অভিজ্ঞতায় হারীত দেখেছে, গরিবরাও গরিবদের শত্রু হয়, গরিবরাও গরিবদের কম ঠকায় না!

হলধরের স্ত্রী যে পাগল তা হারীত প্রথম কয়েকদিন বুঝতেই পারেনি। সে ভেবেছিল বোবা! চুপচাপ বাড়ির কাজকর্ম করে, রাঁধে, মাঝে মাঝে দেওয়ালের দিকে ফিরে চুপ করে বসে থাকে। হলধরের এক বিধবা দিদিও আছে এ বাড়িতে, সেই সংসার চালায়। পরে হারীত জেনেছিল, দেশ ছেড়ে আসার সময় হলধরের দুই ছেলেমেয়েই হারিয়ে যায়।

এখানে কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে হারীতের। দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে মন চায় না, যে-জন্য সে এসেছিল, তার তো কিছুই হল না। সেই পাথুরে-জঙ্গলের দেশ থেকে সবাইকে সে কি এই বাংলায় ফিরিয়ে আনতে পারবে? এখনকার সীমান্তে সে নতুন শরণার্থীদের অনেক ক্যাম্প ঘুরে দেখেছে, এদের অবস্থা মোটেই ঈর্ষা করার মতন কিছু নয়। পূর্ববাংলায় ফেরার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এই নৈরাশ্যের সংবাদ সে ফিরে গিয়ে দেবে কী করে? পারুলবালাকে অবশ্য সে পোস্টকার্ড লিখেছে দু'খানা।

পুজোর মধ্যেই হলধর আর হারীত আবার কাজে লেগে গেল। এবার লক্ষ্মী ঠাকুর গড়তে হবে, তারপর কার্তিক ঠাকুর। আশ্বিন মাস থেকেই শুরু হয় একটার পর একটা পুজো, চলবে সেই বৈশাখের আগে পর্যন্ত। হারীত ঠিক করেছে, এই কয়েকটা মাস এখানেই থেকে গিয়ে কিছু রোজগার করে তারপর সে ক্যাম্পে ফিরবে। কোনও আশার বাণী নিয়ে যেতে না পাক, নিজের হাতে তো কিছু থাকা চাই। হলধর তাকে ভালই পয়সা দেয়।

মোল্লাখালিতে চারখানা লক্ষ্মী ঠাকুরের অর্ডার ছিল, সেখানকার লোক এসেছে নিয়ে যাবার জন্য। হলধর আর হারীত দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ শেষ করতে লাগল, খদ্দের দুটি বিড়ি টানছে বারান্দার এককোণে বসে। তারা সুন্দরবনের গল্প শোনাচ্ছে। ওরা জঙ্গলে ঢুকে মধু আনতে যায়, তার আগে বনবিবির পুজো করে হলধর ওদের বনবিবির মূর্তি গড়ে দিয়েছে এক আগে। একবার বাঘের মুখে পড়ে গিয়েও বনবিবির মন্ত্র পড়তে পড়তে ওদের গুণিন সামনে এগিয়ে যেতেই সুন্দরবনের সেই ভয়ংকর বাঘ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিল, এই রোমহর্ষক গল্প শুনতে শুনতে হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যায় হারীতের।

সে জিজ্ঞেস করল, মধু ভাঙতে গিয়া কেউ বাঘের প্যাটে যায় না?

গল্পের বক্তাটি উদাসীন ভাবে বলল, যায় দু-একজনা। যখন তাদের সময় ফুরায়। সময় ফুরাইলে কেউ কি আর পৃথিবীতে থাকতে পারে রে দাদা! চিরডা কাল কে আর বাঁচে?

হারীত বলল, জঙ্গলে যারা যায়, তারা তো সব অপনেগো মতনই জোয়ান-মদ্দ। বুড়াধুড়ারা তো কেউ যায় না। তাগো দিন ফুরাবে কেন?

লোকটি বলল, তেমন তেমন জোয়ান হইলে বাঘের ঘাড়েও কোপ বসায়। জঙ্গলের বাঘও মাইনসেরে ডরায়।

তারপর সে তার সঙ্গীটি দেখিয়ে বলে, এই বাসুদাই তো একবার সাক্ষাৎ যমের মুখে পড়েছিলো, পিছন থিকা কান্ধের ওপর আইস্যা পড়ছিল বাঘ, তা এই বাসুদা টাঙ্গির কোপ মারল, একেবারে চক্ষুর উপর। বাঘের সে কি চিক্কৈর! ও বাসুদা, জামা খুইল্যা তোমার জখমি দাগটা দ্যাখাও না।

বলিষ্ঠকায় লোকটি জামা খুলে দেখালো বটে কিন্তু সে বিশেষ গল্পবাজ নয়, নিজের বীরত্বের কোনও অহংকারও তার নেই। সে বলল, বনবিবির দয়ায় বাঘের হাত থেকেও বাঁচা যায়, কিন্তু মা মনসা বড় নিষ্ঠুর। সাপের কামড়েই তো বেশি মানুষ মরে।

সুন্দরবনের গল্প শুনতে শুনতে হারীত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। হলধরের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সেও মোল্লাখালির লোক দুটির সঙ্গে চেপে বসল লঞ্চে।

এই দিককার সব লঞ্চেই মাছের আঁশটে গন্ধ। ভোরবেলা মাছচালানীদের ঝুড়িতে প্রায় গোটা লঞ্চ ভরা থাকে, বিকেলবেলা তারা খালি ঝুড়ি নিয়ে ফেরে। এত যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও জয়বাংলা থেকে মাছ ব্যবসায়ীরা চলে আসে এপারের বাজারে। সাপ ও বাঘের মতনই তারা পুলিশ বা মিলিটারিকে আর এক রকম প্রাকৃতিক উপদ্রব মনে করে, তার বেশি কিছু না।

একটার পর একটা নদী-নালা পার হয়ে সেই লঞ্চ এসে পড়ে বিরাট রায়মঙ্গল নদীতে। এবারের প্রবল বর্ষায় নদী একেবারে সমুদ্রের মতন চওড়া। বড় বড় ঢেউ। ধু-ধু করা ওপারের তটরেখাই জয়বাংলা। এত জলের দুশো হারীতের মনটা হু হু করে, মাছের গন্ধমাখা বাতাসে সে বারবার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। লঞ্চ যেসব গ্রামে গ্রামে থামে, সেইসব গ্রামের নাম তার খুব চেনা মনে হয়।

নদীর একদিকে চোখে পড়ে চাষের খেত, অন্যদিকে জঙ্গল। মাছধরা ছোট ছোট নৌকাগুলো ওপারের জঙ্গল ঘেঁষে জাল ফেলছে। যাত্রীবোঝাই ফেরী নৌকো যাচ্ছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। জীবন চলেছে নিজস্ব নিয়মে।

ছোট ছোট গাছপালা ভর্তি একটা দ্বীপের দিকে হাত তুলে হারীত তার এক সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করল, ঐ গ্রামটার নাম কি?

লোকটি বলল, ঐটার নাম মরিচঝাঁপি। ওখানে গ্রাম নাই। অরও আউগাইলে পাইবেন সাতজেলিয়া গ্রাম। আর এইদিকে দ্যাখেন, ডাইন দিকে, মোল্লাখালি আইয়া পড়ছে।

মোল্লাখালিতে দিন কতক থেকে গেল হারীত। ডিঙি নৌকোয় করে ধারেকাছের আরও কয়েকটি গ্রাম ঘুরল। এখানে যুদ্ধের কোনও চিহ্ন নেই। এখানে মানুষজনের সংমিশ্রণও বিচিত্র। মুসলমান আছে, মেদিনীপুরের হিন্দু আছে, পূর্ব বাংলার কিছু প্রাক্তন উদ্বাস্তু আছে, উড়িষ্যা থেকে আসা কিছু মানুষও বসতি নিয়েছে, এমনকি কিছু সাঁওতালও রয়েছে। কারুর সঙ্গে কারুর কোনও দ্বন্দ্ব নেই। যে-যার আপনমনে চালিয়ে যাচেছ জীবন-সংগ্রাম।

এই সজল গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে হারীতের আর যেতে ইচ্ছে করে না। অথচ নবার জন্য, গোলাপীর জন্য, নিজের স্ত্রীর জন্য, কলোনির অন্য মানুষজনের জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে। তার একা পেট চালাবার কোনো চিন্তা নেই কিন্তু সকলকে নিয়ে বেঁচে থাকাতেই তার আনন্দ। তাকে ফিরতে হবেই। সুচরিতের আর কোনো খোঁজ সে পায়নি। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে তা কে জানে হয়তো তার খোঁজ করতে যাওয়াটাই বিপজ্জনক। পুলিশ আবার তার পেছনে লাগবে। খবরের কাগজে এর মধ্যে একদিন হারীত পড়েছিল, পাতিপুকুর আশ্রমের সেই সন্ন্যাসিনী চন্দ্রাকেও পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। তিনি কি জানেন সুচরিতের খবর? থাক, সুচরিত যদি বেঁচে থাকে, সে নিজে সুখে থাকার চেষ্টা করুক।

হারতি মনঃস্থির করে ফেলল। এখানে এখনও অনেক এমন দ্বীপ রয়েছে, যেখানে মনুষ্যবাস নেই। তার ক্যাম্পের কয়েক হাজার মানুষ তো অনায়াসেই এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারে। জঙ্গল তো কারুর জমিদারি বা বাগানবাড়ি নয়। জবরদখলের প্রশ্ন নেই। সরকার বাহাদুরকে তারা বলবে, আমাদের র‍্যাশন কিংবা ক্যাশ ডোল দিয়া সাহায্য করার দরকার নাই। আমাদের শুধু বাংলার মাটিতে থাকতে দিন। এই নরম মাটিতে আমরা চাষ করব, নদীতে মাছ ধরব, তাতেই আমাদের চলে যাবে। সরকারের গলগ্রহ হবার বদলে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিন। তাতে বাঁচতে পারি বাঁচব, নয় যদি কপালে মরণ থাকে তো মরব।

সরকার বাহাদুর এই আবেদন শুনবেন না? নিশ্চয় শুনবেন। তাঁদের ক্ষতি তো কিছু নাই। তাঁদের অনেক ঝঞ্ঝাট বেঁচে যাবে, বছরের পর বছর রিফিউজিদের খরচ টানতে হবে না।

অনেকদিন পর হারীত বেশ প্রফুল্ল বোধ করল।

॥ ৪৯ ॥

চুরুটটা নিভে গেছে অনেকক্ষণ, তবু ত্রিদিব সেটা ধরে আছেন দু'আঙুলে। মাঝে মাঝে ঠোঁটেও ছোঁয়াচ্ছেন, পকেটে দেশলাই নেই, ত্রিদিব লাইটার ব্যবহার করেন না, যখন তখন দেশলাই ফুরিয়ে যায়, তবু চুরুটটা ধরে থাকলেও নেশার কাজ হয়। পিকাডেলি সার্কাসে একটা রাস্তা পার হবার উদ্যত ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিদিব। মাঝে মাঝেই থেমে যাচ্ছে ট্রাফিক, রাস্তা পার হবার সঙ্কেত জ্বলে উঠছে। দু'দিক থেকে আসা যাওয়া করছে ব্যস্ত মানুষ, ত্রিদিব যেন একটা নদীর পাড়ে

দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দেবেন কি দেবেন না ভাবছেন।

এখন সন্ধে সাড়ে ছ'টা, অফিস ফেরা নারী পুরুষরা এখনো ছুটছে টিউব স্টেশনের দিকে, আকাশ সারাদিন ঝিম মেরে আছে, হাওয়া একেবারে বন্ধ, এখন যে-কোনো মুহূর্তে তুষারপাত শুরু হতে পারে। অনেক গাছের পাতা ঝরে গেছে, আবার সামনে আসছে সুদীর্ঘ শীত। ত্রিদিব একবার ওভারকোটের পকেটগুলো চাপড়ালেন, তিনি যে কী খুঁজছেন, সেটাই মনে নেই। আজ অবশ্য এখনো মদ্যপান করেননি ত্রিদিব, তাঁর ঠোঁটে চাপা কৌতুকের হাসি।

একজন লোক অসাবধানে ত্রিদিবকে একটা জোর ধাক্কা মেরে রাস্তায় নেমে গিয়ে আবার ফিরে এসে বললো। আ'ম স্যরি। ত্রিদিব লোকটিকে গ্রাহ্যই করলেন না। ঠান্ডা চুরুটে একটা টান দিলেন। এবার তাঁর খেয়াল হলো যে তাঁর তেষ্টা পেয়েছে।

ধারে কাছেই গোটা দুয়েক পাব আছে বটে কিন্তু ত্রিদিব চেনা পাব ছাড়া যান না। তিনি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। মিনিট দশেক হেঁটে একটা গলির মধ্যে ছোট পাব এর দরজা ঠেলে ঢুকলেন। ভেতরটা ধোঁয়ায় ভর্তি, এত লোকজন যে অনেকেই বসার জায়গা পায়নি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করছে। এখানে থিয়েটারের উঠতি অভিনেতারা অনেকে আসে, তাদের পোশাক বিচিত্র, কথাবার্তা এবং হাসিও নাটকীয় ধরনের। বার কাউন্টার একেবারে ভর্তি, প্রত্যেকটা উঁচু টুলে লোক বসে আছে, তবু ত্রিদিব ঠেলেঠুলে এক কোণে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত বারটেন্ডারের উদ্দেশে বেশ চেঁচিয়ে বললেন, 'ইভনিং, ম্যাক!

প্রায় বৃদ্ধ ব্যক্তিটি কিছুতেই ত্রিদিবের নাম মনে রাখতে পারে না, তাই সে বললো, 'ইভনিং, মাই ফ্রেন্ড। অ্যাজ ইউজুয়াল?

ত্রিদিব মাথা নেড়ে পকেট থেকে একটা দশ পাউন্ডের নোট বার করলেন।

বারটেন্ডারটি প্রথমে একটা বড় কাচের জাগে লাগার দিয়ে গেল, একটু পরে এক প্লেট ডিম ও সসেজ এনে রাখলো। সেই খাবার শেষ হতে না হতেই ত্রিদিবের বীয়ার শেষ, তাঁকে আর কিছু বলতে হলো না, দ্বিতীয় জাগ এসে পড়লো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

পাব-এ কেউ শুধু মদ্যপান করতে যায় না, ইংলিশ পাব হলো ইংরেজদের মন খোলসা করার তীর্থস্থান। শ্রমিক কিংবা অফিস ক্লার্করা সন্ধেবেলা পাবে এসে কথায় কথায় রাজা উজির মারে, বুদ্ধিজীবীরা তাদের চেয়েও উচ্চদরের বুদ্ধিজীবীদের মুণ্ডপাত করে, এ ছাড়াও অনেকে আসে বউয়ের সঙ্গে বেশি সময় না কাটাবার জন্য। পাব-এ সাধারণত কেউ চুপচাপ একা একা মদ খায় না, এখানে নিয়ম হলো, কাছাকাছি তিন চারজনকে তুমি এক রাউন্ড খাওয়াও, তারপর তারাও প্রত্যেকে এক রাউন্ড করে খাওয়াবে। এতে অন্যদের খাওয়ানোও হলো, অথচ খরচও বেশি পড়লো না।

ত্রিদিব অবশ্য এর ব্যতিক্রম। এই পাব-এ তিনি প্রায়ই আসেন বলে বেশ কয়েকজন তাঁর মুখ চেনা, কিন্তু চোখাচোখি হলে নড করা ছাড়া ত্রিদিব কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। তিনি সব সময়েই কাউন্টারে এসে দাঁড়ান, বারটেন্ডার, যে এই পাব-এর মালিকও বটে তার সঙ্গে দুটো একটা কথা হয়।

এখানে প্রায় সবাই ওভারকোট খুলে ঝুলিয়ে রাখে হ্যাঙারে। ভেতরটা বেশ গরম, তবু ত্রিদিব ওভারকোট খোলেন নি। তাঁর বিভিন্ন পকেটে অনেক কিছু থাকে। পাশের লোকটি চলে যাওয়ায় তিনি একটা উঁচু টুল পেয়ে গেলেন। অন্যদিন তিনি পকেট থেকে কোনো বই বার করে পড়তে শুরু করেন, আজ বার করলেন একটা ছোট্ট, সাদা, চৌকো কার্ড। সেটা একটা সামান্য ভিজিটিং কার্ড, অথচ সেটার দিকেই চেয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে, মুখে মুচকি মুচকি হাসি।

আজ টিউব ট্রেনে আসবার সময় ত্রিদিবের ঠিক মুখোমুখি বসেছিলেন রাতুল। ত্রিদিবের বাল্যবন্ধু সেই রাতুল, বম্বে থেকে বিপত্নীক হয়ে ফেরার পরে যাঁর সঙ্গে আবার নতুন করে ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই রাতুল লন্ডনে! ত্রিদিব অন্যমনস্ক স্বভাবের মানুষ, ট্রেনের সহযাত্রীদের দিকে তিনি নজরই দেন না, ট্রেনে উঠেই বই খুলে বসেন। রাতুল নিশ্চয়ই দেখেছিলেন, অন্তত দু'তিনটি স্টেশন মুখোমুখি বসে থেকেও রাতুল একবার ও ত্রিদিবকে ডাকেননি। হঠাৎ কী একটা বাংলা কথা শুনে ত্রিদিব মুখ তুললেন। রাতুলকে দেখেও ত্রিদিব যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ট্রেনের কামরায় ভারতীয় বেশ কিছু থাকে, বাংলা কথাও শোনা যায়, কিন্তু এ যে সত্যিই রাতুল।

ত্রিদিবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই রাতুল উঠে দাঁড়ালেন। ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এসেছে, একটা স্টেশনে থামবে। রাতুল পাশের এক মহিলাকে বললেন, এসো! মহিলাটি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কেন! রাতুল আবার জোর দিয়ে বললেন, এসো!

এক মুহূর্তের জন্য ত্রিদিবের মনে হয়েছিল মহিলাটি যেন অবিকল সুলেখা। সেই রকম দৈর্ঘ্য, মাথা ভর্তি চুল, টানা টানা দুটি গভীর চোখ, একই রকম শরীরের গড়ন। পর মুহূর্তেই ত্রিদিব বুঝলেন, সুলেখা কি করে হবে? সুলেখা তো আর নেই, তাছাড়া মাত্র এই কয়েকটি বছরে তিনি কি সুলেখার মুখখানা ভুলে গেলেন? অন্য কোনো মেয়েই সুলেখা হতে পারে না। সুখেলা ছিল ইউনিক!

ত্রিদিবকে দেখেও রাতুল এগিয়ে যাচ্ছিলেন দরজার দিকে, ত্রিদিব হতভম্বের মতন বললেন, রাতুল! তুমি ইংল্যান্ডে কবে এলে?

রাতুল ভুরু কুঁচকে অতিশয় কৃত্রিম ভদ্রতার সঙ্গে বললেন, আই অ্যাম অ্যাফ্রেড--- ত্রিদিব বললেন, আমায় চিনতে পারছো না? আমি ত্রিদিব!

রাতুল মহা বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে বললেন, ত্রিদিব? এ রকম চেহারা করলে কী করে, সত্যি আমি চিনতে পারিনি।

ট্রেনটা প্রায় থেমে এসেছে, এখনো দরজা খোলে নি। রাতুল বললেন, আমায় এখানে নামতে হবে, একটা জরুরি কাজ আছে।

ত্রিদিব বললেন, তুমি কোথায় আছো? তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হবে কী করে?

দরজা খুলে গেছে, আর অপেক্ষা করার উপায় নেই, পেছনের লোকরা ঠেলছে, রাতুল দ্রুত পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে ত্রিদিবের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, টেলিফোন করো!

তারপর সঙ্গিনীর কোমরে হাত দিয়ে নেমে গেলেন প্ল্যাটফর্মে।

ট্রেনটা আবার ছেড়ে যাবার পর ত্রিদিবের মনে হয়েছিল, তিনি ও নেমে পড়লেন না কেন?

তাঁর এমন কিছু রাজকার্য ছিল না, কিছুক্ষণ রাতুলের সঙ্গে কথা বলে আবার পরের ট্রেনে উঠে পড়তে পারতেন। কিন্তু একটু একটু করে তিনি উপলব্দি করলেন যে রাতুলের ব্যবহারটাই ছিল অস্বাভাবিক। ত্রিদিবের চেহারা কি এতই বদলে গেছে যে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও তাঁকে চিনতে পারবেন না? ত্রিদিবকে দেখার পরেই রাতুল ধড়ফড় করে নেমে যেতে চাইলেন, ত্রিদিব নিজের মুখে না বললে রাতুল ভবিষ্যতে কোনো যোগাযোগ করারও ইচ্ছে প্রকাশ করেননি।

রাতুলের সঙ্গে একজন মহিলা, সে কি রাতুলের স্ত্রী? মহিলাটির সঙ্গে রাতুলের ব্যবহারে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাতুল আবার বিয়ে করেছে? এত সহজে সে সুলেখাকে ভুলে যেতে পারলো? রাতুল ভাগ্যবান। যারা সহজে অনেক কিছু ভুলে যেতে পারে, তারাই বুঝি জীবনে সার্থক হয়। এই ক' বছরেও চেহারা একটুও টসকায়নি রাতুলের, তাঁকে অনায়াসে এখনো কোনো ক্রিকেট টিমের ক্যাপটেন করা যায়।

সুলেখার মৃত্যুর পর রাতুল আর কোনো সম্পর্কই রাখেননি ত্রিদিবের সঙ্গে। সুলেখার আত্মহত্যার জন্য রাতুল আর শাজাহান দু'জনেই ত্রিদিবকে দায়ী করেছিলেন, যেন ত্রিদিবই নিজের হাতে সুলেখার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, দায়ীই তো ত্রিদিব! তিনি নিজে তা অস্বীকার করতে পারেন না! সুলেখা ত্রিদিবের জন্য অন্য সমস্ত প্রলোভন জয় করতে পেরেছিল, তবু ত্রিদিব তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। কী কঠিন, নির্মম সেই মুক্তি, কী করে ত্রিদিব উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন সেই কথা! অপমানে নীল হয়ে গিয়ে সুলেখা বলেছিলেন, তুমি চাও, আমি চলে যাই!

এক চুমুকে তৃতীয় বীয়ারটি শেষ করলেন ত্রিদিব, খানিকটা ঝরঝর করে পড়লো তাঁর বুকের জামায়। কাচের জাগাটি কাউন্টারে ঠুকে ত্রিদিব আবার নেবা চুরুটটা ঠোঁটে গুজলেন।

ম্যাক আর এক জাগ বীয়ার নিয়ে এসে ত্রিদিবের ঠোঁট থেকে চুরুটটা কেড়ে নিল। একটা লম্বা নতুন চুরুট ত্রিদিবের ঠোঁটে লাগিয়ে দিয়ে লাইটারে ধরিয়ে দিয়ে বললো, দিস ইজ অন দা হাউজ!

ত্রিদিব হাত নেড়ে ধন্যবাদ জানালেন শুধু, ম্যাকের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলার ইচ্ছে নেই তাঁর এখন।

কতদিন আগে এদেশে এসেছে রাতুল? নিছক বেড়াতে এলে কেউ কার্ড ছাপে না। কার্ডে রাতুলের অফিস ও বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নাম্বার।ক্লোরাইড কম্পানি, হ্যাঁ, দেশে থাকতে রাতুল ক্লোরাইডেরই বড় অফিসার ছিল। হয়তো দু'তিন বছর ধরেই এখানে আছে। লন্ডনে রাস্তায় ঘাটে চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটাই অস্বাভাবিক। ত্রিদিব ও আগে লন্ডনে থাকতেন না, মাস ছয়েক হলো চাকরি বদল করে এসেছেন।

পাব-এ হৈ-হল্লা বাড়ছে, গোটা তিনেক ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার ছেলে গায়ে পড়ে পাশের লোকদের সঙ্গে ঝগড়া বাধালো। ত্রিদিবের কোনাদিকে ভ্রূক্ষেপেই নেই। তিনি সেই ছোট কার্ডটাই দেখছেন একদৃষ্টিতে, যেন তাতে লেখা আছে অনেকদিনের ইতিহাস।

গোটা চারেক বীয়ার শেষ করার পর ত্রিদিবের অন্য কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তিনি উঁচু টুল থেকে নেমে পড়লেন, কাউন্টারের ওপরে রাখলেন দু'পাউন্ড টিপস্। বেরিয়ে এসে তিনি টিউবের জন্য না নেমে একটা ট্যাক্সি ধরে চলে এলেন গোল্ডার্স গ্রীনে। চুরুটটা আবার নিভে গেছে, ধরাবার কথা খেয়াল নেই।

ত্রিদিবকে দেখেই তুতুল ভুরু কুঁচকে বললো, ত্রিদিবমামা, আবার তুমি টিপসি হয়ে এসেছো? তোমাকে তো বলেইছি, আলম এটা পছন্দ করে না!

ত্রিদিব সেই বকুনি অগ্রাহ্য করে উদাসীনভাবে হাসলো। তারপর বললেন, আসলে এই রকম সময়েই আমি সুস্থ থাকি, তোরা বুঝিস না! আ! কই রে?

তুতুল বললো, সার্জারিতে ডিউটিতে গেছে। ফিরতে দেরি হবে।

সোফায় বসে পড়ে ত্রিদিব বেশ শব্দ করে একটা ঢেঁকুর তুললেন। জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে বললেন, বেশ ভালো রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে, চিংড়ি মাছ., তাই না? তুতুল তুই তো আমাকে কোনোদিনও নেমন্তন্ন করে খাওয়াস না!

তুতুল বললো, খাওয়াতে পারি, কিন্তু সেদিন ড্রিংক করে আসতে পারবে না। এখানেও মদ পাবেনা।

-মুসলমানের বউ হয়ে তুই আরও বেশি অ্যান্টি-ড্রিংকিং হয়ে গেছিস! ওরে বীয়ারকে কেউ মদ বলে না! আসল মদ খাবো এখন!

ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বার করে ত্রিদিব খানিকটা স্কচ গলায় ঢাললেন।

তুতুল রীতিমতন রাগ করে ঝাঁঝালো গলায় কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। বিলেতে প্রথমে এসে তুতুল যখন অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, তখন ত্রিদিব তাকে দুশো পাউন্ড দিয়েছিলেন না চাইতেই। তুতুল অবশ্য টাকাটা শোধ করে দিয়েছে, কিন্তু সেই উপকার কি ভোলা যায়? তাছাড়া ত্রিদিব যে তুতুল আর আলমকে সত্যিকারের স্নেহ করেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

তুতুল কাতরভাবে বললো, ত্রিদিবমামা, তুমি কেন এমনভাবে নিজেকে শেষ করছো! আমি অনেকবার বলেছি, যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তুমি পুরোনো কথা ভুলে যাও! তুমি মোটেই গিল্টি নও! রাগের মুহূর্তে মানুষ ও রকম অনেক কথাই বলে ফেলে!'

ত্রিদিব এক দৃষ্টি চেয়ে রইলেন তুতুলের দিকে। সুস্থ হয়ে উঠতে যথেষ্ট সময় নিয়েছে তুতুল, এখন অনেকটা ভালো আছে। কিন্তু তার মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা যায় নি, তার হাঁটার মধ্যে একটা টলমলে ভাব আছে, তবু সে জোর করেই নিজেকে পুরোপুরি ফিট প্রমাণ কারার চেষ্টা করে। আলম অবশ্য তাকে কাজে যোগদিতে দেয়নি, কিন্তু সে একা একা বাইরে বেরোয়। আর শাড়ির বদলে একটা হাউস কোট পড়ে আছে তুতুল, মাথার সব চুল খোলা তার চোখ দুটিতে ঈষৎ সজল ভাব।

ত্রিদিব বললেন, হ্যাঁ এবার বদলে যাবো, সময় হয়েছে, আজ একজনকে দেখলাম----হ্যাঁরে তুতুল, তুই শাজাহানের ঠিকানাটা জানিস?

তুতুল আবার তীক্ষ্ণ হয়ে গিয়ে বাচ্চাকে বকুনি দেবার ভঙ্গিতে বললো, না তুমি শাজাহান সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে না। তোমরা দেখা হলেই ঝগড়া করো।

-নারে, ঝগড়া করবো না। শাজাহানের সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করেছি, তার কাছে ক্ষমা চাইবো।

-তার বাড়ি গিয়ে তুমি ক্ষমা চাইবে! সেটারও কোনো দরকার নেই, তুমি বরং ওঁর নামে একটা নোট লিখে দিও, আমরা পৌছে দেবো। তবে তাড়াতাড়ি দিও, ত্রিদিবমামা, আমরা সপ্তাহ দু'একের মধ্যে কলকাতা যাচ্ছি। তোমারা কারুকে কোনো খবর দেবার আছে তো বলো!

কলকাতার প্রসঙ্গে ত্রিদিব কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। আর এক ঢোঁক পান করে মদের বোতলটায় ছিপি আটঁলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোদের টেলিফোন নোট বুকটা কোথায়?

তুতুল বললো, চিংড়ি মাছের তরকারি রেধেছি। ভাত হয়নি এখনো। তুমি দুটো টোস্ট দিয়ে একটু

খাবে আমার রান্না!! বসো, আমি গরম করে দিচ্ছি এক্ষুনি।

–কথা ঘোরাবার চেষ্টা করছিস কেন রে, তুতুল? আমি কিছুই খাবো না। আই নেভার টেইক এনিথিং সলিড আফটার সানডাউন! পাব–এ ডিম আর সসেজ খেয়েছি, পেট ভরে গেছে!

–রোজ রোজ তুমি বাইরের ঐসব ভাজাভুজি, গারবেজ ফুড খাও?

–নাউ আ ডক্টর ইজ স্পিকিং ! তুই শাজাহানের ঠিকানাটা আমাকে দিবি কি দিবি না বল?

–ঠিকানা আমাদের কাছে লেখা নেই।

–ফোন নাম্বার থাকলে ঠিকানা জানা বুঝি শক্ত কিছু।

–তুমি কেন শুধু শুধু ওর বাড়িতে যাবে? ত্রিদিবমামা, শাজাহান সাহেব তার পরেও অনেকবার এসেছেন এখানে। তোমার সেদিনকার ব্যবহারে উনি মোটেই রাগ করেননি। উনি বুঝেছেন যে তুমি আমার জন্য চিন্তা করে খুব আপসেট হয়েছিলে। তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে, আমি আর বাঁচবো না, মরেই যাবো।

–বালাই ষাট! তুই মরবি কেন? তোদের মতন ছেলেমেয়েরা মরে গেলে এই পৃথিবীটা আরও শুকনো আর বিচ্ছিরি হয়ে যাবে! কই, তোদের নোট বুকটা দেখাবি না?

কালো রঙের নোট বুকটার ভেতরের খাপে অনেকগুলো কার্ড গোঁজা। তার মধ্যে সবচেয়ে ওপরেরটাই শাজাহানের। সুদৃশ্য, আইভরি ফিনিশ কাগজে ছাপা তাতে শাজাহানের নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম, দু'তিনটি ফোন নাম্বার ও ঠিকানা রয়েছে।

তুতুল লজ্জা পেয়ে বললো, ও–মা, এই কার্ডটা যে এখানে আছে আমি জানতাম না, সত্যি বিশ্বাস করো, আলম কখন রেখেছে----

ত্রিদিব বললেন আমি তোকে বিশ্বাস করছি রে, তুতুল। এমন কিছু ব্যাপার তো নয়। এই কার্ডটা আমি নিলুম আজ, পরে ফেরত দিয়ে যাবো। দ্যাখ, এদের থেকেও অনেক বেশিদিন আমি বিলেতে আছি, কিন্তু আমার কোনো কার্ড নেই! কেউ আমার ঠিকানা জানে না। ইজন্‌ট ইট ফ্যানি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

তুতুল ওঁর হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বললো, ত্রিদিবমামা---

–কী রে?

–তুমি কথা দাও –

–কথা দিচ্ছি রে তুতুল! আই শ্যাল নেভার মিসবিহেভ উইথ শাজাহান! আমাদের দুজনের মধ্যে একটা কমন বন্ডেজ আছে---

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে তুতুলের মাথায় রেখে ত্রিদিব বললেন, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক, মৃত্যুর কথা কখনো চিন্তা করিস না। মৃত্যু বড় ঠান্ডা, বড় ভালগার, রকমের ফাইন্যাল।

ঈষৎ স্খলিত পায়ে বেরিয়ে গেলেন ত্রিদিব। আবার একটা ট্যাক্সি ধরলেন। শাজাহানের মতন একজন ব্যস্ত মানুষকে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে বাড়িতে পাওয়া যাবে কিনা সেকথা চিন্তাও করলেন না।

নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছোনোর পর বেল দিতে দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং শাজাহান। ত্রিদিবকে দেখে বিস্ময় গোপন করে কঠোর মুখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েস?

ত্রিদিব বললেন, ইয়েস আবার কী? আমি তোমার সঙ্গে দু' একটা কথা বলতে এসেছি।

আমি কি তোমার অচেনা যে এমন দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছো?

শাজাহান বললেন, আমি এখন একটু এনগেজড আছি! আমার বাসায় কয়েকজন গেস্ট রয়েছেন।

ত্রিদিব প্রকৃত মাতালের মতন ফুরফুরেভাবে হেসে বললেন, বাসায়? এতদিন বিলেতে থেকেও পাখির বাসা ছাড়তে পারলে না? গেস্ট আছে তো কী হয়েছে? আমি অপেক্ষা করবো; গেস্ট চলে গেলে তোমার সঙ্গে কথা বলবো। জরুরি কথা !

শাজাহান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ত্রিদিব তাঁকে প্রায় ঠেলেই ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

বাইরের ঘরের সোফাগুলি ফাঁকা, কার্পেটের ওপরে বসে আছে পাঁচ ছ'জন যুবক ও দু'জন যুবতী। তাদের সামনে ছড়ানো অনেক কাগজপত্র ও বেশ কিছু পাউন্ডের নোট। সবাই ত্রিদিবকে দেখে বিব্রত হয়ে কথা বন্ধ করে চেয়ে রইলো।

ত্রিদিব প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ঈষৎ দুলতে দুলতে বললেন, সবকটা মুসলমান ! পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। বাংলাদেশ! বস্তারডাম্স! পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ তৈরি হলেই বা

কী এমন হাতিঘোড়া লাভ হবে? এনিওয়ে, ইউ মে ইগনোর মাই প্রেজেন্স! আমি কেউ না!

সেই যুবকেরা শাজাহানের দিকে সপ্রশ্নভাবে তাকালো। শাজাহান বিব্রতভাবে বললেন, ঠিক আছে, তোমার এবার গুছিয়ে ফেলো ! কথা তো হয়েই গেল। নেক্সট ক্যাম্পেন হবে সাসেক্স–এ। আমার বারট্রান্ড রাসেলকে দিয়ে একটা অ্যাপিল করাবো।

ত্রিদিব একজনের প্রায় ঘাড়ের কাছে বসে পড়ে বললেন, তোমরা সব সাচ্চা মুসলমান, সন্ধের পর লুকিয়ে লুকিয়ে মিটিং করো, কিন্তু মদ খাও না। আমি ব্যাটা এক ব্লাডি হিন্দু, আ ব্লাডি ড্রাঙ্ক অ্যাজ ওয়েল, আমি এই সময় মদ খাই। আমি তোমাদের ডিসটার্ব করবো না, বাট মে আই হ্যাভ আ গ্লাস অ্যান্ড সাম ব্লাডি আইস?

শাজাহান বললেন, বসুন, সব দিচ্ছি।

কাবার্ড খুলে তিনি গ্লাস, সোডার বোতল, একটি ব্ল্যাক লেবেল স্কচের বোতল বার করলেন।

ভেতর গিয়ে বরফ ও নিয়ে এলেন। একটা ছোট টেবিল টেনে তার ওপরে সব কিছু রেখে বললেন, প্লিজ হেল্‌প ইয়োরশেল্‌ফ।

ত্রিদিবের উত্তরোত্তর নেশা বাড়ছে। এর মধ্যেই তিনি নিজের বোতলের কাঁচা হুইস্কিতে আরও দু'তিন চুমুক দিয়েছেন। এবার তিনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, হেল্‌প ইয়োরশেল্‌ফ।

ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে খারাপ শব্দ! মোস্ট হ্যাকনিড এক্সপ্রেশান, শুনলেই আমার গা জ্বালা করে। আরে বাবা, নিজের মদ নিজের গেলাসে ঢালবো। তাকেই বলে হেল্‌প ইয়োরশেল্‌ফ! ডিসগাসিটিং! ওঃ হো, আমি আপনাদের ডিসটার্ব করছি, তাই না! দুঃখিত, দুঃখিত, ইউ প্লিজ গো অ্যাহেড! আর আমি কোনো কথা বলব না। তবে, শাজাহান ভাইয়া, তোমার ঐ ফ্যান্সি স্কচ আমি খাবো না! যে বাড়ির হোস্ট নিজে ড্রিংক করে না, তার মদ আমি ছুঁই না। আমি আমার নিজের বোতল থেকে খাবো। ওকে? তোমরা মিটিং করো, আমি স্পিকটি নট!

যুবকের দল টাকা পয়সাগুলো গুনে তুলে একটি ভেলভেটের গয়নার বাক্সে ভরলো। তারা বুঝে নিয়েছে যে আজ আর কোনো আলোচনা হবে না। তবু দু' একটা কথাতেও কথা বাড়ে।

সামনের সপ্তাহেই ফান্ড রেইজিং এর জন্য কনসার্ট আছে, সে বিষয়ে কিছু কথা না বললেই নয়।

ত্রিদিব আর কোনো মন্তব্য না করে চুপচাপ মদ খেয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর ঠোঁটে একটা অভিব্যক্তিহীন হাসি লেগেই আছে। তাঁর চোখে সুদূর দৃষ্টি।

একটু পরে শাজাহানের অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। তারা ভদ্রতাসূচক দু' একটা কথা বলতেও চাইলো ত্রিদিবের সঙ্গে, কিন্তু গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি অন্য কিছুতেই বিভোর।

শাজাহান সবাইকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, নাও, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

ত্রিদিব ঘোর ভেঙে কয়েক পলক চেয়ে রইলেন শাজাহানের দিকে। তারপর বিদ্রুপের সুরে বললেন, তুমি এত অর্ডিনারি কবে থেকে হয়ে গেলে, শাজাহান? হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ? এটা কি ইংরিজি, না তার অ্যাবারেশন? কেউ কি কারুর জন্য সত্যি কিছু করতে পারে? যত রাজ্যের দোকানদাররা এই কথা বলে। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা! তুমি শাজাহান সিরাজ, তুমি একজন শেক্সপীয়ার-বিশেষজ্ঞ, তোমার মুখে এত সাধারণ কথা ?

শাজাহান চোয়াল আড়ষ্ট করে বললেন, ফরগেট শেক্সপীয়ার ! আপনি আমার কাছে কী জরুরি কথা বলতে এসেছেন, সেটাই বলে ফেলুন। আমি একটু তাড়াতাড়ি শুতে যাই।

ত্রিদিব আবেগ মথিত গলায় বললেন, শাজাহান, তোমার সঙ্গে কতদিন আমি শেক্সপীয়ার বিষয়ে নোট এক্সচেঞ্জ করিনি! এদেশের অধিকাংশ ইংরেজই শেক্সপীয়ারের দু'তিন লাইনও মুখস্ত বলতে পারে না। র‍্যাঙ্ক ইডিয়েটস। একদিন এক ব্যাটা দোকানদারকে বললুম, ম্যাড অ্যাজ দা সী, অ্যান্ড উইন্ড, হোয়েন বোথ কনটেন্ট, হুইচ ইজ দা মাইটিয়ার....তা সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। আমি বললুম। ওরে ব্যাটা, এ তোদেরই মহাকবির রচনা, হ্যামলেটের মায়ের সংকল্প, তাও কিছু বোঝে না। যেন হ্যামলেটের নামও শোনেনি।

শাজাহান কঠোর গলায় বললেন, ত্রিদিববাবু, এত রাত্রে আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী নই। আপনার যদি অন্য কিছু ...

তাকে বাধা দিয়ে ত্রিদিব বললেন, আজ রাতুলের সঙ্গে দেখা হলো।

প্রায় আমূল চমকে উঠে, কণ্ঠস্বর পুরো বদলে শাজাহান জিজ্ঞেস করলেন, কে? কার সঙ্গে দেখা হল বললেন?

ত্রিদিব হাসতে হাসতে বললেন, রাতুল, রাতুল, মনে নেই? সেই যে অ্যাথলিট ও প্রেমিক, বিরহী ও বিয়ে পাগলা, অতি সাধারণ একটি জীব, কোনোদিন কবিতা পড়েনি, পড়লেও বোঝেনি, সেই রাতুল এখন লন্ডনে।

শাজাহান জিজ্ঞেস করলেন, সে কোথায় থাকে?

ত্রিদিব বললেন, ঠিক আমার মনেও এই প্রশ্ন জেগেছিল। সে কোথায় থাকে? সে নিশ্চিত কোথাও না কোথাও থাকে। সে সাধারণ একজন টুরিস্ট নয়। সে এদেশে আছে বেশ কিছুদিন। শাজাহান, তুমি আমি আর রাতুল, দ্যাট ওল্ড থ্রিসাম! আবার আমরা মিট করতে পারি না? ধরো আমরা তিনজনে এক সঙ্গে বসে আড্ডা দিতে দিতে প্ল্যানচেটে সুলেখাকে ডাকলুম!

শাজাহান ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ত্রিদিব, তুমি রাতুলকে কোথায় দেখলে? সে কি এদেশে আরও কিছুদিন থাকবে?

ত্রিদিব বললেন, প্ল্যানচেট ব্যাপারটাকে তুমি হয়তো বোগাস মনে করতে পারো আমারও খুব একটা বিশ্বাস নেই। তবু তো, বিশেষ একজনের কথা চিন্তা করে তিনজনের এক হওয়া! আমরা মাথায় মাথা ঠেকাবো। আমাদের ভাইব্রেশান সঞ্চারিত হবে এক মাথা থেকে অন্য মাথায়, তাতেই সুলেখা আবার ফিরে আসবে তিনজনের কাছে।

শাজাহান উত্তেজিত ভাবে বললেন, ত্রিদিব, সুলেখা সম্পর্কে এতটা অবসেস্‌ড থাকার কোনো মানে হয় না। জীবিতেরা যখন হারিয়ে যায়, তখন তারা বড্ড বেশি হারিয়ে যায়। তুমি মনে মনে এখনো যে সুলেখার স্মৃতি লালন করছো, সেটা তোমার মনগড়া এক নারী। সে আসলে সুলেখা নয়!

ত্রিদিব ঠাট্টার সুরে বললেন, থ্যাঙ্কস ফর ইয়োর অ্যাডভাইস! ওভার সিমপ্লিফিকেশান। সব কিছুরই তুমি একটা ব্যাখ্যা দিতে পারো, তাই না! তোমার মনে তা হলে সুলেখার কোনো স্মৃতি নেই! বেচারা সুলেখা, সে মরে গিয়েও হেরে গেল। রাতুলই তা হলে ভালো আছে, সে অন্য মেয়ের কাছে সান্ত্বনা পেয়েছে!

শাজাহান জিজ্ঞেস করলেন, রাতুল কোথায়?

ত্রিদিব পকেট থেকে কার্ডটা বার করে, সেটা ঝুটো কোনো হীরে কিংবা আসল এই ভঙ্গিতে উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে বললেন, এই যে এখানে, এ দেশেই!

শাজাহান হাত বাড়িয়ে বললেন, কার্ডটা আমাকে দাও!

ত্রিদিব বললেন, আর এক বোতল সোডা! আর একটু পান করবো। মনে হচ্ছে, আজ রাতটা তোমার এখানেই শুয়ে থাকতে হবে। তুমি আমাকে যদি অবশ্য তাড়িয়ে না দাও, শাজাহান! বয়েস হয়েছে, হাঁটুতে ব্যথা হয়, বেশি রাত্তিরে রাস্তায় বেরুতে ভয় পাই! তবে, একদিন রাতুলকে ডাকবো, আমরা তিনজন এক সঙ্গে–

–কার্ডটা আমাকে দাও, ত্রিদিব!

–না! এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? আমিই সব ব্যবস্থা করবো।

বিচিত্রভাবে হেসে শাজাহান বললেন, ঠিক আছে, দিও না! আমার স্মৃতি শক্তি ভালো, তুমি যে একবার দেখালে তাতে আমার টেলিফোন নাম্বারগুলোও মুখস্ত হয়ে গেছে। রাতুলের সঙ্গে শিগগিরই আমার দেখা হবে! কিন্তু সেখানে তুমি থাকবে না। ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া বাকি আছে।

॥ ৫০ ॥

হঠাৎ লণ্ডনের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে শুরু করলেন শাজাহান। তিনি কোনওদিন কারুর সঙ্গে পার্টনারশিপে বিজনেস করেন না, জের চেষ্টাতেই লণ্ডনে সুতিবস্ত্র, তোয়ালে এবং কার্পেট আমদানির ব্যবসা বেশ জমিয়ে তুলেছিলেন, একখানা নিজস্ব ওয়্যারহাউজ ভাড়া নিয়ে রেখেছেন। এমন ব্যবসা বন্ধ করে দেবার কোনো মানেই হয় না, তবু তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। এমন ব্যবসা বন্ধ করে দেবার কোনো মানেই হয় না, তবু তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। কলকাতা ছেড়ে ঢাকাতে গিয়েও তিনি বেশি দিন মন বসাতে পারেননি। তিনি খুব কম মানুষের সঙ্গেই সহজভাবে মিশতে পারেন, কিন্তু কোনো এক জায়গায় বছরের পর বছর থাকলে পরিচিতের সংখ্যা বেড়েই যায়। তাদের সকলের সঙ্গেই নিখুঁত ভদ্র

ব্যবহার করেন তিনি, অথচ ভেতরে বিরক্তি বোধ থেকেই যায়।

এত দিনেও আর বিয়ে করলেন না শাজাহান। তাঁদের কলকাতার বাড়িতে অনেক ভাই-বোন বাবা-মা এখনো বেঁচে আছেন, কিন্তু লন্ডনে শাজাহান একা থাকেন। একটা সুন্দর, ছোট্ট বাড়ি কিনেছেন কেনসিংটনে। কলকাতাতেও জামাকাপড় ও কার্পেটের পারিবারিক ব্যবসা আছে তাঁদের, এই ব্যবসা তিনি ভালোই জানেন। কিন্তু অন্যান্য সার্থক ব্যবসায়ীদের মতন তিনি সারা দিনে আঠেরো ঘণ্টাই এই নিয়ে মাথা ঘামান না। প্রত্যেক কাজের জন্য তাঁর আলাদা সময় ভাগ করা আছে। ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ প্রাতঃভ্রমণ, একা একা টেম্‌স নদীর ধার দিয়ে হেঁটে বেড়াতে তাঁর খুব ভালো লাগে, বৃষ্টির মধ্যেও তিনি ম্যাকিনটস চাপিয়ে ছাতা নিয়ে বেরোন, বাইরের কোনো রেস্তোরায় ব্রেক ফাস্ট খেয়ে ফিরে এসে চিঠিপত্র নিতে বসেন। পুরো দুপুরটা তিনি ব্যয় করেন ব্যবসায় কাজে, সেন্ট্রাল লণ্ডনে একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে ভাগাভাগি করে তাঁর একটা ছোট্ট অফিস আছে, তা ছাড়া ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, ক্লিয়ারিং এজেন্টদের অফিসে ঘোরাঘুরিও করতে হয়। সন্ধের পর নিতান্ত জরুরি না হলে তিনি ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করেন না, ঐ বিষয়ে আলোচনাও করতে চান না কারুর সঙ্গে। বাড়িতে একা একা গান-বাজনা শোনেন এবং বই পড়েন। এই দুটো তাঁর প্রিয় নেশা, তিনি মদ খান না, সিগারেট খান না, গত ছ-সাত বছর ধরে কোনো নারীর প্রতিও আকর্ষণ বোধ করেন না।

এইভাবে বেশ চলছিল, হঠাৎ তাসের ঘরের মতন তিনি সব কিছু ভেঙে দিতে চাইলেন। লণ্ডন আর তাঁর ভালো লাগছে না। প্রথমেই তিনি বাড়িটা প্রায় জলের দামে বিক্রি করে দিলেন, তার পর উঠলেন সাউথহলের একটা শস্তা হোটেলে। তিন-চার দিন পরেই সেই হোটেল আবার বদলালেন। তাঁর মালপত্রের স্টক পুরোটাই মার্ক অ্যাণ্ড স্পেনসারকে দিয়ে দিলেন চড়া কমিশনে। আরও যেসব কনসাইনমেন্ট আসছে সেইসব এবং তাঁর কম্পানির নামের গুড উইল বেচে দেবার জন্য কথাবার্তা চালাতে লাগলেন গুজরাতি এবং পাকিস্তানী সিন্ধী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। যেন যে কোনো কারণেই হোক, এক্ষুনি তাঁর প্রচুর ক্যাশ টাকা দরকার।

শাজাহানের পরিচিতরা অনেকে বলতে লাগলো, তিনি এইসব পাগলামি করছেন শুধু ত্রিদিবকে এড়াবার জন্য। ত্রিদিব উদানীং বড় উপদ্রব শুরু করেছিলেন। শাজাহানের মতন একজন সূক্ষ্ম স্বভাবের মানুষের বাড়িতে এমন মাতালের চিৎকার ও দাপাদাপি যেন কল্পনাই করা যায় না।

তুতুল আর আলমের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে শাজাহান ইচ্ছেতেই হোক কিংবা অনিচ্ছেতেই হোক, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে খানিকটা জড়িয়ে পড়েছেন দু-এক মাস ধরে। শাজাহান নিজেকে ভারতীয় কিংবা পাকিস্তানী কিছুই মনে করেন না। যদিও অধিকাংশ বাঙালিদের তুলনায় তার গায়ের রং বেশ ফর্সা, ছিপছিপে শরীর, স্যাভিল রো-র দোকান থেকে তৈরি করা খাঁটি বিলিতি পোশাক পরেন, তা হলেও ইংরেজরা যে কোনোদিন তাঁকে আপনজন মনে করে না তা তিনি জানেন। মনে মনে নিজেকে তিনি একজন বিশ্ব নাগরিক ভাবেন। শেক্সপীয়ার-টলস্টয়-গোটের রচনা কিংবা বাখ-মোৎসার্ট-চাইভস্কির সঙ্গীত যেমন কোনো বিশেষ দেশের সম্পত্তি নয়, তেমনি যারা মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ শিল্পগুলি উপভোগ করে, তারা মানব সভ্যতারই অঙ্গ। রাষ্ট্রনায়করা অবশ্য এসবের তোয়াক্কা করেন না। তাঁরা ক্রমশই মানুষকে আরও সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছেন।

পাকিস্তানকে দু'খণ্ড করার আলোচনায় শাজাহান কখনো কোনো মতামত প্রকাশ করেননি। রাজনীতিতে তিনি মাথা গলাতে চান না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে নৃশংস অত্যাচার, গণহত্যার খবর জেনে বিচলিত না হয়ে পারেন না। ঢাকায় তাঁর পরিচিতদের মধ্যে কেউ কেউ লণ্ডনে পালিয়ে এলে তিনি গোপনে তাঁদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন। এখন আলমরা তাঁকে চেপে ধরেছে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে সাহায্য করার জন্য। শাজাহান নিজে কিছু টাকা দিয়ে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আলমের দলবল তাঁকে ছাড়েনি।

এই ব্যাপারে তাঁর বাড়িতে প্রায়ই মিটিং হচ্ছিল, সেখানে প্রায় প্রত্যেক দিনই মত্ত অবস্থায় হাজির হচ্ছিলেন ত্রিদবি। ত্রিদিব এলে আর কোনো কাজের কথা হয় না, শাজাহান তাঁর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতেও পারেন না।

কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণে কী কেউ বাড়ি বিক্রি করে দেয়, ব্যবসা তুলে দিতে চায়?

ত্রিদিবের সঙ্গে আবার নতুন করে বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিতে উৎসাহী নন শাজাহান। তাঁর জীবন থেকে দিল্লির সেই পরিচ্ছেদটা তিনি মুছে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন, সুলেখার স্মৃতিও অনেকটা ফিকে হয়ে

এসেছে। সুলেখার মুখখানা মনে পড়লে এখনও একটু একটু বুক ব্যথা করে, তবে সেই ব্যথার মধ্যে পরিতাপের জ্বালার চেয়ে মাধুর্যই বেশি। এর মধ্যে রাতুল এসে পড়ে পুরোনো রাগ, ক্ষোভ, শোকানল আবার জ্বালিয়ে দিল।

রাতুলের কথা শুনে শাজাহান প্রথমে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়লেও আস্তে আস্তে তা দমন করেছেন। শাজাহানের দৃঢ় বিশ্বাস, রাতুলের নির্লজ্জ ব্যবহারের জন্যই সুলেখা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। শাজাহান নিজে তো কখনো ভদ্রতার সীমারেখা লঙ্ঘন করেননি, সুলেখার সঙ্গে কখনো ঘনিষ্ঠতার দাবি জানাননি, ত্রিদিব ও সুলেখা দু'জনের সঙ্গেই ছিল তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ওঁদের সঙ্গ তিনি উপভোগ করতেন। এর মধ্যে রাতুলের কোনো স্থান ছিলনা। তবু রাতুল এক সকালবেলা তাঁকে চড় মেরেছিল। তাঁকে বলেছিল পাকিস্তানের স্পাই। রাতুলের কলাকৌশলেই শাজাহান সিক্সটি ফাইভের ওয়ারের সময় ডিটেইনড হয়েছিলেন। সে কি প্রচণ্ড অপমান! তাদের পরিবার তিন পুরুষের কংগ্রেস সমর্থক, কলকাতায় তাদের নিজস্ব বাড়ি, তবু তিনি শুধু মুসলমান বলেই স্পাইইং-এর অভিযোগ! মারোয়াড়ি, গুজরাতি, বাঙালি হিন্দুরা পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা করেনি?

তবু সেই তিক্ততা সারাজীবন পুষে রেখে লাভ কী? অতীতের কোনো বোঝা ঘাড়ে চেপে থাকলে ভবিষ্যতের দিকে ঠিক মতন পা ফেলে এগোনো যায় না। সেই জন্যই তিনি ত্রিদিবের প্রস্তাবে সায় দেননি, রাতুলকে ডেকে তাঁরা তিন জনে একসঙ্গে বসার কোনো অর্থ হয় না। রাতুলকে তিনি ক্ষমা করতে পারবেন না, আবার রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটি করাও তাঁর স্বভাব নয়।

ত্রিদিবের জন্য নয়, রাতুলের জন্যই তিনি লণ্ডন ছেড়ে যাওয়া ঠিক করেছেন। একই শহরে তিনি আর রাতুল থাকতে পারবেন না, যদি রাতুলের সঙ্গে হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যায়। অ্যামস্টারডামে কিংবা ফ্রাংকফুর্টে আপাতত কিছু দিন থাকা যেতে পারে, ঐ দুই জায়গায় ব্যবসার সুযোগ বাড়ছে দিন দিন।

বাড়ি বিক্রি করে হোটেলে চলে যাওয়ার পর শাজাহান আর আলম-তুতুলের সঙ্গেও দেখা করতে যাননি, কারুকেই তিনি আর ঠিকানা জানাতে চান না। তিনি যে ব্যবসা বিক্রি করে দিচ্ছেন, সে কথাও ঘুণাক্ষরে জানতে দেননি কারুকে।

অক্সফোর্ড ধরে হাঁটতে হাঁটতে শাজাহান একবার কাঁধ ঝাঁকালেন। নিজের ব্যবহার তাঁর নিজেরই কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। একটু আগে তিনি একটা বাড়ির সামনে প্রায় আধ ঘন্টা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। সেই বাড়িটাতে রাতুলের অফিস। শাজাহান রাতুলের সঙ্গে দেখা করতে চান না, তা হলে রাতুলের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কী মানে হয়? এরকম তাঁকে মোটেই মানায় না। নিজের ওপরে বেশ বিরক্ত হলেন তিনি।

পর দিন ক্লিয়ারিং এজেন্টদের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখার জন্য তাঁকে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের কাছাকাছি আবার আসতেই হলো। কাজ শেষ হয়ে গেল সাড়ে তিনটের সময়। শাজাহান নিজে গাড়ি চালান না, তাই ট্যাক্সিতেই অধিকাংশ সময় যাতায়াত করেন। এখন ট্যাক্সি না নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খানিকদূর এসে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন চা খাওয়ার জন্য। বসলেন জানলার পাশে একটা টেবিলে, উল্টো দিকের কোণাকুণি বাড়িটা যে রাতুলের অফিস, তা যেন তিনি খেয়ালই করছেন না, তিনি যে-কোনো একটা রেস্তোরাঁয় এসেছেন। পকেট থেকে একটা বই বার করে মনোযোগ দিলেন সে দিকে।

সাড়ে চারটের সময় রাতুল বেরিয়ে এলেন অফিস থেকে, ব্লু ফ্লানেল সুট পরা, হাতে ব্রীফ কেস। শাজাহান সঙ্গে সঙ্গে দাম মিটিয়ে দিয়ে চলে এলেন রাস্তায়। বিপরীত পেভমেন্ট দিয়ে রাতুল হাঁটছে, সত্যি দেখলে মনে হয় তার একটুও বয়েস বাড়েনি, ব্যাকব্রাশ করা মাথার চুল কুচকুচে কালো, হাতের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে হালকা মেজাজে হাঁটছে সে। শাজাহান বারবার নিজেকে প্রশ্ন করেন, আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি কেন? কেন? কেন?

হাইড পার্ক কর্নারে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, রসাস্তা ক্রশ করে গিয়ে রাতুল তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। আগে থেকেই এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল নিশ্চয়ই ওদের। ওখানে দুটি জনতার গোল বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে বক্তৃতা দিচ্ছে নিশ্চয়ই ওদের। ওখানে দুটি জনতার গোল বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে বক্তৃতা দিচ্ছে দু'জন শৌখিন বক্তা, তাদের মধ্যে একজন আলমের বন্ধু হামিদ। গলা ফাটিয়ে সে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের শ্রাদ্ধ করছে, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে শ্রোতাদের মধ্য থেকে প্রতিবাদ করছে কয়েকজন পাকিস্তানী, তীব্র গালি-গলাজ চলছে দু'পক্ষে, পাশেই দাঁড়িয়ে

আছে তিনজন পুলিশ। এখানে সবরকম গালমন্দই চলতে পারে, কিন্তু হাতাহাতির উপক্রম হলেই পুলিশ বাধা দেবে।

এরকম ভিড়ের জায়গায় একটি মেয়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে কেন রাতুল? উত্তরটা বুঝতে শাজাহানের অসুবিধে হলো না। মহিলাটি বিবাহিতা, হিন্দু বাড়ির বউ, সিঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের রেখা। রাতুল যেভাবে মহিলাটির কোমর জড়িয়ে ধরে ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণত কেউ এরকম আদিখ্যেতা করে না। পরস্ত্রীদের সঙ্গে প্রেম করার ব্যাপারেই রাতুল স্পেশালাইজ করেছে।

মিনিট পাঁচেক পরেই রাতুল মহিলাটিকে নিয়ে পার্কের মধ্যে চলে গেল। একটি ঝোপের আড়ালে বসে দু-এক মিনিট খুনসুটি করার পর যখন ওরা প্রথম চুম্বনে আবদ্ধ হলো, সেই পর্যন্ত দেখে শাজাহান মুখ ফেরালেন। তাঁর মন আত্মগ্লানিতে ভরে গেল। ছি ছি, এত নীচে তিনি নামলেন কী করে? লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি অন্যের প্রেম করার দৃশ্য দেখছেন, তাঁর এত দূর অধঃপতন! রাতুল যা ইচ্ছে করুক।

বেশ কয়েক বছর ধরে নিঃসঙ্গতাকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। শাজাহান, কিন্তু আজ কিছুতেই হোটেলের ফাঁকা ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হলো না। খুব পছন্দের দু-চারজন ছাড়া শাজাহান কখনো অন্যদের বাড়ি যান না, আজ তিনি বিষমভাবে চাইলেন মানুষের সাহচর্য। অন্যদের সঙ্গে কথা বলে তিনি রাতুলকে ভুলতে চান। কিন্তু কোথায় যাবেন? হঠাৎ কারুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হওয়া শাজাহানের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। একটা পাবলিক বুথে গিয়ে তিনি ফোন করলেন আলমকে।

আলম বাড়িতে নেই, ফোন ধরলো তুতুল। শাজাহান প্রথমে তার স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আজ ইভনিং-এ তোমরা আমার সঙ্গে বাইরে ডিনার খাবে? আমি শিগগিরই অ্যামস্টারডাম চলে যাচ্ছি, বেশ কিছু দিন সেখানে থাকতে হবে, তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

তুতুল বললো, আজ সন্ধেবেলা আমাদের এখানেই যে আলমের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসছে। আমি রান্না করছি। আপনিও চলে আসুন না। আসুন, আমাদের খুব ভালো লাগবে।

একটু থেমে তুতুল আবার হাসতে হাসতে বললো, ত্রিদিবমামার আসার কোনো কথা নেই। আর যদি হঠাৎ চলে আসেন, তাতেই বা কী, আরও তো অনেকে থাকবে। আমরা শিগগিরই কলকাতায় যাচ্ছি তো, তাই আজকের এই পার্টি। আপনি আসুন!

যে-পার্টিতে শাজাহানকে অন্তত তিন দিন আগে নেমন্তন্ন করা হয় না, সেখানে তিনি কখনো যোগ দিতে পারেন না। রবাহূত হয়ে কোনো পার্টিতে উপস্থিত হয়ে কেউকেউ বেশ হৈ চৈ করে জমিয়ে দিতে পারে, সে যারা পারে, তারাই পারে, শাজাহানের চরিত্রে সেই উপাদান নেই। তিনি আরও দু-একজনকে ডিনারে নেমন্তন্ন করে ফেলেছেন বলে তুতুলের কাছে মাপ চেয়ে নিলেন।

এর পর শাজাহান ফোন করলেন আর একজনকে। ইনি পাকিস্তানী, বেশ সহৃদয় ও শিক্ষিত মানুষ। এঁর সঙ্গে কথা বলে শাজাহান আনন্দ পান। ফোন বেজে গেল, কেউ ধরলো না।

শাজাহান পকেট থেকে নোট বই বার করে আর একটি টেলিফোন নাম্বার খুঁজতে গিয়েও থেমে গেলেন। কেউ দেখছে না, তবু মানুষের সাহচর্য পাবার জন্য এই রকম হ্যাংলামিপানায় তিনি লজ্জিত বোধ করলেন নাঃ, আর চেষ্টা করার দরকার নেই।

টিকিট কেটে তিনি ঢুকে পড়লেন একটি সিনেমা হলে। এখানে তো কত লোক রয়েছে। পর্দায় নারী-পুরুষেরা নড়ছে, কথা বলছে, তবু কিছুতেই শাজাহানের মন বসলো না। রাতুল একটি নারীকে চুম্বন করছে, এই দৃশ্যটি তিনি ভুলতে পারলেন না। তাঁর মনে হচ্ছে, ঐ নারীটি সুলেখা!

ফিল্মটি শেষ হবার অনেক আগেই বেরিয়ে এসে শাজাহান চলে এলেন সোহো স্কোয়ারে। আজ তিনি অন্যরকম একটি পরীক্ষা করে দেখবেন। এখানে একটি বার-এর নাম কনট্যাক্ট। নিজে আগে না এলেও শাজাহান এই ধরনের বারগুলির ব্যাপার স্যাপার জানেন। তিনি দোতলায় উঠে একটা ফাঁকা টেবিলে বসলেন। ভেতরটা আবছা অন্ধকার, কাউন্টারের দু'পাশে তিন-চারটি করে যুবতী দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মুখে ও ঠোঁটে উগ্র রং।

শাজাহান একটি দীর্ঘকায়া যুবতীর দিকে কয়েকবার তাকাতেই মেয়েটি তাঁর টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, হ্যালো, লাভ, মে আই জয়েন হউ?

শাজাহান মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। মেয়েটি তাঁর পাশের চেয়ারে বসলো উরুতে উরু ছুঁইয়ে। শস্তা পারফিউমের গন্ধে শাজাহানের নাক একটু কুঁচকে গেল, তবু তিনি হেসে বললেন, হোয়াট উইল ইউড হ্যাভ?

মেয়েটি বললো, আই ওয়াজ হ্যাভিং স্কচ।

দুটি প্রিমিয়াম স্কচের পেগ এসে গেল টেবিলে। তার মধ্যে মেয়েটির গেলাসের মদে আগে থেকেই সোডা মেশানো। শাজাহান খুব ভালো করেই জানেন যে ঐ মেয়েটিকে শুধু একটু রং করা সোডা দেওয়া হয়েছে, ওর মধ্যে স্কচের নাম-গন্ধও নেই। খদ্দেরদের ঠকিয়ে মদের বিলের অঙ্ক বাড়ানোই ওদের কাজ।

মেয়েটি বললো, আই অ্যাম ক্রিস্টিন। হোয়াট্‌স ইয়োর নেইম, ডারলিং?

শাজাহান আবার হাসলেন। ব্রিটিশ মন্ত্রী জন প্রোফিউমোর সঙ্গে বারবনিতা ক্রিস্টিন কীলারের সম্পর্ক ফাঁস হয়ে যাবার পর অনেক দিন ধরে কেচ্ছা জমেছিল। তা এখনো মিলিয়ে যায়নি।

শাজাহান বললেন, ইফ ইউ আর ক্রিস্টিন, দেন আই অ্যাম জেনারেল আইয়ুব খান।

মেয়েটিও এবার হেসে উঠলো খিলখিল করে। পাকিস্তানের আগের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গেও যে ক্রিস্টিন কীলারের একটা সম্পর্ক ছিল, তা এই মেয়েটি জানে।

শাজাহান নিজের গেলাসে ঠোঁটও ছোয়ালেন না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই মেয়েটি তিন গেলাস সাবাড় করে দিল। বিল মেটাবার ইঙ্গিত করে শাজাহান বললেন, চলো, আমরা বাইরে গিয়ে ডিনার খাই।

ক্রিস্টিন বললো, আমার অ্যাপার্টমেন্টে যাবে? বাইরে থেকে কিছু খাবার পিক আপ করে নিয়ে যেতে পারি। সেখানে তুমি রিল্যাক্স করতে পারবে।

শাজাহান বললো, সে তো খুব ভালো কথা। তাই চলো।

ক্রিস্টিন গলা নামিয়ে বললো, তুমি আমাকে একশো পঁচিশ পাউণ্ড ধার দিতে পারবে? আমার বিশেষ দরকার আছে।

একেবারে দরাদরি না করলে যুবতীটি তাঁকে একেবারে সদ্য আগত গবেট ভাববে, তাই তিনি বললেন, আমি সেভেন্টি ফাইভ পর্যন্ত স্পেয়ার করতে পারি।

ক্রিস্টিন বললো, মেক ইট ওয়ান হান্ড্রেড!

শাজাহান ওয়ালেট বার করে নোটগুলো গুনে টেবিলের ওপর রাখলেন। মেয়েটি সেগুলো নিয়ে উঠে চলে গেল। নতুন লোক দেখলে এরা আগে টাকা নিয়ে নেয়, এখানেই জমা রাখে? এই হোটেলের মালিক একটা পারসেন্টেজ কেটে নেয়? শাজাহান এদের ব্যবসার ধরনটা বোঝার চেষ্টা করলেন।

ফিরে এসে ক্রিস্টিন বললো, চল!

বাইরে তিন-চারখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। এই ট্যাক্সি চালকদের সঙ্গেও এদের বিশেষ চুক্তি আছে। ইচ্ছে করে অনেকটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে, মিটার বেশি বলবে। গাড়িতে ওঠার পর ক্রিস্টিন শাজাহানের একটা হাত জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি প্যাকি না ইণ্ডিয়ান?

শাজাহান কৌতুক করে বললেন, কোনোটাই না। আমি ইজিপশিয়ান।

ক্রিস্টিন চোখ বড় বড় করে বললো, ইজিপশিয়ান? দে আর গ্রেট লাভারস্! ওমর শরীফ!

শাজাহান ভাবলেন, তিনি নিজেকে ইণ্ডিয়ান বললে, এই মেয়েটি কোন্ ভারতীয় প্রেমিকের নাম করে উচ্ছ্বসিত হতো? হলিউডের এককালের অভিনেতা সাবু ছাড়া আর কোনো বারতীয় ফিল্মটারকে কি এরা চেনে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জমলো না।

খানিকটা খাবারদাবার কিনে নিয়ে যাওয়া হলো ক্রিস্টিনের ফ্ল্যাটে। যুবতীটি বেশ সরল, নানা বিষয়ে কৌতূহল আছে। কিন্তু সে যখন প্রায় নগ্ন হয়ে শাজাহানকে ডাকলো, শাজাহান নিজের মধ্যে কোনো সাড়া পেলেন না। এর শরীর সম্পর্কে তাঁর একটুও আগ্রহ জাগছে না। ক্রিস্টিন একাবার প্রায় জোর করে তাঁকে আলিঙ্গন করলে তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, কোল্ড মিট! ক্রিস্টিন তাঁকে চুম্বন করতে এলে তিনি মুখ সরিয়ে নিলেন।

মাত্র কিছুক্ষণের আলাপেই একটি নারীর সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠ হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অন্য অনেকে কী করে পারে? যে ছবিটা তিনি মুছতে চেয়েছিলেন, সেই ছবিটাই চোখে ভেসে উঠছে বারবার, হাউড পার্কে রাতুল চুমু খাচ্ছে একটি বিবাহিতা বাঙালি মহিলাকে। সে কি কোনোদিন সুলেখাকেও...

ক্রিস্টিনের সঙ্গে শুধু গল্প করতে তাঁর মন্দ লাগছিল না, কিন্তু শারীরিক আহ্বান প্রত্যাখ্যান করায় সে দারুণ চটে গেল, গালাগাল করতে শুরু করলো শাজাহানকে। আরও পঁচিশটি পাউণ্ড তার ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে শাজাহান বেরিয়ে এলেন।

তাঁর অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে, বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। না, তিনি অস্কার ওয়াইল্ডের মতন সমকামী নন, সেটা তিনি ভালোই জানেন। শুধু কর্মদ ছাড়া তিনি পুরুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেন, কখনো বাধ্য হয়ে ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে হলে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁর আকর্ষণ নারীদের প্রতি, কোনো সুন্দরী রমণীর মুখের দিকে তাকিয়েও তিনি এ ধরনের আনন্দ পান, অথচ কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয় না, তিনি নিজেই পিছিয়ে যান, কোথায় যেন একটা বাধা এসে যায়। এইরকম ভাবেই বাকি জীবনটা কেটে যাবে?

ক্রিস্টিনের অ্যাপার্টমেন্টে কী রকম যেন একটা গন্ধ ছিল, তাতে শাজাহানের একটু একটু গা ঘিনঘিন করছিল, সেই জন্য তিনি একটুও খাবার মুখে তোলেননি। আর কিছু খেতেও ইচ্ছে করলো না, সোজা ফিরে এলেন হোটেলে। দ্রুত পোশাক ছেড়ে তিনি গরম জলে স্নান করলেন অনেকক্ষণ ধরে। বারবার আপনমনে বলতে লাগলেন, রাতুল আমাকে চড় মেরেছিল, তবু আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি সুলেখাকে ভুলে যাবো। ত্রিদিবের সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না।

গোসল করে এসে তিনি শেক্সপীয়ারের রচনাবলী খুলে বসলেন। শেক্সপীয়ার তাঁর সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পারেন। কোনো বিশেষ লেখার কথা চিন্তা না করে তিনি বইটার যে কোনো একটা জায়গা খুললেন, ডান দিকের পাতার দ্বিতীয় কলামের ওপর থেকে পড়তে শুরু করলেন :

Of one that loved not wisely, but too well;
Of one not easily jealous, but being wrought,
Perplexed in the extreme; of one whose hand,
Like the base Indian, threw a pearl away,
Richer than all his tribe; of one whose subdu'd eyes
Albeit unused to the melting mood.....

বাকিটা তার পড়ার দরকার হয় না, শাজাহানের মুখস্থ। ওথেলো নাটকের একেবারে শেষ অংশ। তাঁর নিজের মনের কথার সঙ্গে যেন একেবারে মিলে যাচ্ছে। নিজের গলায় হাত দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, took by the throat the circumcised dog....।

না, ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষার উর্ধ্বে উঠতে চান শাজাহান, এখন ওথেলো তাঁর ভালো লাগবে না। তিনি আন্দাজে আবার পাতা ওল্টালেন। আবার তাঁর চোখে পড়লো এইরকমই লাইন :

My hate to Marcius. Where I find him, were it
At home, upon my brothers guard, even there
Against the hospitable Canon, would I
Wash my fierce in his heart........

শাজাহান চোখ বুজে ফেললেন প্রতিহিংসায় কখনো শান্তি পাওয়া যায় না। ট্রাজেডির নায়কেরা কাব্যেই মহান হয়, কিন্তু জীবনে তারা শুধু কিছু অনর্থই সৃষ্টি করে যায়। শাজাহান আর কারুকে তো আঘাত দিতে চান না, তিনি নিজেই দূরে সরে যাবেন।

তাঁর চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

শেক্সপীয়ার বন্ধ করে তিনি কয়েক মিনিট চিন্তা করলেন। তারপর টেনে নিলেন কোরআন শরীফ। ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদ করা কোরআন শরীফখানা তিনি সব সময় সঙ্গে রাখেন। শাজাহান ধর্মচর্চা বিশেষ করেন না কিন্তু ধর্মশাস্ত্র পাঠে আগ্রহ আছে। বাংলা ভাষায় তেমন অধিকার নেই শাজাহানের। তিনি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনো করেছেন এবং তাঁদের পরিবারে উর্দুতেই কথাবার্তা বলা হতো। বাংলা তিনি পড়তে জানেন; তবে সব কথার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হয়।

তিনি পড়তে লাগলেন ; যেমন একটি শস্যবী সাতটি শস্যমঞ্জরী উৎপাদন করে, প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত শস্য উৎপন্ন হয়, পরমেশ্বর পথে যাহারা স্বীয় সম্পত্তি ব্যয় করে তাহাদের অবস্থা তদ্রূপ, এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় ঈশ্বর দ্বিগুণ প্রদান করেন, এবং ঈশ্বর দাতা ও জ্ঞাতা।----

দানের পর ক্লেশ প্রদান করা অপেক্ষা কোমল কথা বলা ও ক্ষমা করা শ্রেয়ঃ এবং ঈশ্বর নিরাকাঙ্ক্ষাও প্রশান্ত।

হে বিশ্বাসী লোকসকল, উপকার স্থাপন ও ক্লেশ দান করিয়া যে ব্যক্তি লোক প্রদর্শনের জন্য স্বীয় ধন দান করে, পরমেশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না, তাহার ন্যায় তোমাদিগের ধর্মার্থ দান তোমরা

ব্যর্থ করিও না। সে মৃত্তিকাবৃত কঠিন প্রস্তরের ন্যায়--

পড়তে পড়তে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন শাজাহান। তার ওষ্ঠে লেগে রইলো যন্ত্রণার রেখা।

পর দিনও শাজাহানের মন শান্ত হলো না। সারা দিন কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও তিনি বিকেলবেলা আবার এসো হাজির হলেন রাতুলের অফিসের সামনে। তাঁর নিয়তি তাকে যেন টেনে নিয়ে আসছে। রাতুলকে খানিকক্ষণ অনুসরণ করবার পর তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। নিজের গলা টিপে ধরার ইচ্ছে হলো তাঁর। রাতুলের মতন একজন সামান্য জীবের জন্য তিনি এরকম ভাবে সময় নষ্ট করছেন! উল্টো দিকে ফিরে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তিনি এসে পৌঁছলেন ওয়াটার্লু ব্রীজে। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন এক ঘন্টা। অন্তত তিনবার তাঁর নদীতে ঝাঁপ দেবার তীব্র ইচ্ছে জাগলো। তিনি রেলিং চেপে ধরে রইলেন, তিনি অনুভব করলেন, কোনো একটা রোগ তাঁর মনোবল, জীর্ণ করে দিয়েছে। জীবনের সব কিছুই বিস্বাদ লাগছে। বেঁচে থাকার মর্মটাই হারিয়ে যাচ্ছে যেন।

ব্রিস্টলের একটা ফান্ড রেইজিং মিটিং এ যোগ দিতে শাজাহান চলে এলেন জোর করে। শনিবার মিটিং, রবিবারটাও তিনি থেকে গেলেন একটা হোটেলে, বেশ কিছু ভারতীয় ও পাকিস্তানী বাঙালীর সঙ্গে সময় কাটালেন, অনেকক্ষণ, টাকাও মন্দ উঠলো না। এই দু'দিন তিনি রাতুলকে অনেকটা ভুলে থাকতে পেরেছিলেন। এর পরের মিটিং গ্লাসগো-তে, সেখানে শাজাহান যাবেন ঠিক করেও যাওয়া হলো না। লন্ডন থেকে তাঁর অফিস সেক্রেটারি ফোন করে জানালো যে তাঁর ব্যবসা কেনার জন্য একজন বিশেষ আগ্রহী, অবিলম্বে কথা বলতে চায়।

লন্ডনে ফিরতেই শাজাহানের মনটা আবার বিষিয়ে গেল। এই শহরের রাস্তা দিয়ে রাতুল হেঁটে বেড়ায়, দিব্যি আনন্দে আছে সে। এই চিন্তাটা শাজাহান কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। মাঝে মাঝে অস্ফুটভাবে তিনি বলতে লাগলেন, কে আমাকে শিখিয়ে দেবে, কী করে একজন শত্রুকেও নিঃশর্তে ক্ষমা করা যায়?

বিকেল থেকে রাত পৌনে এগারোটা পর্যন্ত শাজাহান রাতুলের পেছনে পেছনে ঘুরলেন। ঝানু গোয়েন্দার চেয়েও যেন তার দৃষ্টি প্রখর, ধৈর্য অনেক বেশি। একবারও তিনি রাতুলকে চোখের আড়ালে যেতে দেননি।

রাতুল আজও সেই মহিলাটির সঙ্গে দেখা করেছে বেলসাইজ পার্কের কাছে একটি রেস্তোরাঁয়। সেখানে একটুক্ষণ বসার পরেই তারা একটি থিয়েটার দেখতে গেল। ওঁদের আগেই টিকিট কাটা ছিল, শাজাহান টিকিট পেলেন না, তিনি বাইরে বাইরে ঘুরে সময় কাটালেন। থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ওরা হাতে হাত ধরে কিছুক্ষণ বেড়ালো। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আইসক্রিম খেল। তারপর মহিলাটিকে একটি বাসে তুলে দিল রাতুল। ওরা কেউ কারুর বাড়ি যায় না, নিশ্চয়ই কোনো বাধা আছে।

রাতুল টিউবে ওঠার পর শাজাহান সেই একই কম্পার্টমেন্টে উঠলেন। এই কামরায় মাত্র দশ বারোজন যাত্রী, শাজাহান এক কোণে গিয়ে বসলেও রাতুল তাঁকে দেখে ফেলতে পারে। তাতে কোনো ক্ষতি নেই, শাজাহান বুঝেছেন যে রাতুলের সঙ্গে কথা না বলে তিনি ফিরতে পারবেন না। আজ তিনি সব সংযম হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু রাতুল অন্য কোনো দিকে মনই দিচ্ছে না, সে খানিকটা শরীর এলিয়ে বসে পায়ের ওপর পা তুলে নাচাচ্ছে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে, ট্রেন ভূগর্ভ ছেড়ে মাটির ওপরে ওঠার পর একটা স্টেশনে রাতুল নামতেই শাজাহানও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন। সম্ভবত টারমিনাসের কাছাকাছি এসে গেছে, আরও বেশ কিছু যাত্রী নামলো এখানে। রাতুল বেশ দ্রুত এগিয়ে গেল, স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে মিনিট পাঁচেক হেঁটে রাতুল ঢুকে পড়লো একটা পার্কিং লটে। সেখানে একটিমাত্র গাড়ি রয়েছে।

শাজাহান বুঝলেন যে রাতুলের নিজের গাড়ি থাকলেও লন্ডন শহরে নিয়ে যায় না। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে গাড়ি পার্ক করা অসম্ভব ব্যাপার। সেই জন্যই রাতুল নিজের বাড়ি থেকে এই পর্যন্ত গাড়িতে আসে, তারপর গাড়িটা পার্কিং লটেরেখে ট্রেনে যাতায়াত করে। এবার রাতুল হুস করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবে, শাজাহান আর তাকে ধরতে পারবেন না। কাছাকাছি কোনো ট্যাক্সি ও নেই।

রাতুল গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করলো কয়েকবার, কিন্তু ইঞ্জিন থেকে একটা বেসুরো শব্দ বেরুলো। আজ সারাদিন খুব ঠান্ডা বাতাস বইছে, এখন আবার ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি ও পড়ছে। প্রথম দিকের শীতটাই বেশি কনকনে লাগে। গাড়ির ইঞ্জিনেরও ঠান্ডা লেগেছে বোধ হয়। রাতুল বেরিয়ে এসে গাড়ির বনেটটা খুলে উঁকি দিল।

নিয়তি শাজাহানকে এই পর্যন্ত টেনে এনেছে, নিয়তিই যেন এই সুযোগ করে দিল, আর দ্বিধা করার কোনো মানে হয় না। কাছে এগিয়ে গিয়ে শাজাহান বললেন, গুড ইভিনিং। এনি প্রবলেম? মে আই হেল্প ইউ?

চমকে মাথাটা তুলে রাতুল বেশ কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো শাজাহানের দিকে। ত্রিদিবের মতন শাজাহানের চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, তাঁকে চিনতে না পারার কোনো কারণ নেই। আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে রাতুল বললো, কী ব্যাপার?

শাজাহান বললেন, আপনাকে দেখলাম এই স্টেশনে নামতে। আপনার গাড়ি নিয়ে কোনো প্রবলেম হয়েছে?

রাতুল ভুরু কুঁচকে বললো, আপনি এদিকে এত রাত্রে? হ্যারোতেই থাকেন নাকি?

শাজাহান আলগাভাবে বললেন, জী, কাছাকাছিই থাকি বলতে পারেন।

আপনার গাড়িতে খানিকটা লিফ্ট নেবো? এতদিন পরে দেখা হলো, অনেক কথা আছে। আমি ভেতরে বসে অ্যাক্সিলারেটার চাপবো, তাতে সুবিধে হবে?

রাতুল গম্ভীরভাবে বললো থ্যাঙ্কস! নো, ইটস গোয়িং টু বি অল রাইট।

শাজাহান রাতুলের কথা অগ্রাহ্য করে ড্রাইভারের সীটে বসে পড়লেন। এককালে তাঁর গাড়ি চালাবার যথেষ্ট অভ্যাস ছিল। কিন্তু তিনি কিছু করার আগেই ইঞ্জিনটা সুস্থ হয়ে উঠলো। বনেট চেপে দিয়ে রাতুল এদিকে আসতেই শাজাহান পাশের সীটে সরে গিয়ে বললেন, আসুন। আই অ্যাম লাকি!

রাতুল ড্রাইভারের সীটে বসে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বললো, লিসন, লেটস বী স্ট্রেট! পুরনো সম্পর্ক নিয়ে আমার কোনো হ্যাং-আপ নেই। পুরনো ব্যাপার-ট্যাপার আমি সব মুছে ফেলেছি। আমি আজ খুবই টায়ার্ড, সোজা বাড়ি যাবো, আপনাকে লিফ্ট দিতে পারছি না।

শাজাহান বললেন, মুছে ফেলবো বললেই কি সব মোছা যায়? মানুষের মন তো আর স্লেট নয়। ত্রিদিবের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয়নি?

রাতুল কর্কশ গলায় বললো, সে আমাকে টেলিফোনে মাঝে মাঝে পেস্টার করছে। আমি তাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ইন্টারেস্টেড নই। কলকাতা আর দিল্লির চ্যাপটার ক্লোজড। নাউ ইফ ইউ প্লিজ গেট অফ-----

–পুরনো সব চ্যাপটার ক্লোজড। ত্রিদিবের জীবনটা আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন। আমি নিজেও আজ পর্যন্ত সাফার করছি। আর আপনি শুধু সব কিছু ভুলে গিয়ে আবার প্রেম করবেন, চাকরিতে উন্নতি করবেন, আনন্দে থাকবেন? সিক্সটি ফাইভের ওয়ারের সময় আপনি যে আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সেটাও ভুলে গেছেন?

–হু সেইড আই ডিড দ্যাট!

–প্রমাণ আছে, আমি ঠিকই জেনেছি। দিল্লিতে আপনি আমাকে চড় মেরেছিলেন, পাকিস্তানের স্পাই বলেছিলেন।

–ইউ স্টিল আর আ ডার্টি স্পাই। আপনি আমার পেছন পেছন ফলো করে এই পর্যন্ত এসেছেন। এখন বুঝতে পারছি। কী চান আপনি?

–সুলেখা তোমারই জন্য মরেছে। তুমি ওদের বাড়িতে নোংরামি করে ফেলেছিলে তাই পারফেক্ট জেন্টলম্যান ত্রিদিব সুলেখাকে মুক্তি দেবার কথা বলেছিল। তোমার জন্যই সে বলেছিল। সে কথা শুনে ঘেন্নায় সুলেখা গায়ে আগুন লাগিয়েছে। দোষ তোমার, পুরোপুরি তোমার, ত্রিদিবের নয়।

–স্কাইন্ড্রেলের মতন কথা বলো না, শাজাহান। আমি এসব কথা সহ্য করতে রাজি নই। শুনতেও চাই না। লীভ মি অ্যালোন!

–তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে, সব কিছুর জন্য ক্ষমা চাইতে হবে।

খুব সম্ভবত শাজাহানকে একটা চড় মারার জন্যই ঘুরে গিয়ে হাত তুলেছিলে রাতুল, অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। তারপর ঝুঁকে অন্য দিকের দরজাটা খুলে দিয়ে সে শাজাহানকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, নাউ, গেট আউট।

হয়তো এটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন শাজাহান। কোটের পকেট থেকে ফস করে একটা রিভলভার বার করে রাতুলের নাকে ঠেকালেন, অন্য হাতে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে বললেন, আমার কথা এখানো শেষ হয়নি। আর কখনো কোনো লোককে এভাবে ধাক্কা দিও না। আমি মুসলমান,

আমরা কখনো বেইমানি ক্ষমা করি না। তুমি একবার আমার গায়ে হাত তুলে অপমান করেছিলে, আমি তার শোধ নেইনি। তবু তুমি দ্বিতীয়বার আমার গায়ে হাত তোলার সাহস করলে!

শাজাহানের হাতের অস্ত্রটাকে বেশী গুরুত্ব দিল না রাতুল। শাজাহানের মতন চরিত্রের মানুষের হাতে একটা রিভলভার খুবই বেমানান, প্রায় অবিশ্বাসই মনে হয়। আত্মবিশ্বাস, অহঙ্কার ও রাগে রাতুলের মুখখানা জ্বলজ্বলে করছে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, তুমি এতদিন পর আমাকে এই সব বাজে কথা শোনাতে এসেছো। তুমি জানো, সুলেখা আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল? সে নিজের মুখে আমাকে বলেছে, কলকাতা ছাড়ার আগে।

বাট ইউ ওয়্যার দা ডগ ইন দা ম্যানজার! তুমি সব সময় ওদের বাড়িতে সেঁটে থাকতে। ত্রিদিব তোমার জন্যই সুলেখাকে সন্দেহ করে!

শাজাহান বললেন, তোমার মতন একটা মিথ্যেবাদী, ক্রুড, কোর্স, আনকালচারড মানুষকে সুলেখা...

রাতুল হাত দিয়ে রিভলভারটা ধরার চেষ্টা করতেই শাজাহান পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে দু'বার তাকে গুলি করলেন। গাড়ির সব কাচ বন্ধ তাই বাইরে বিশেষ শব্দ গেল না।

বেশ কয়েক মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়া নিস্পন্দ দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে শাজাহান ফিসফিস করে বললেন, গুড বাই, রাতুল। খোদা হাফেজ!

দরজা খুলে বেরিয়ে এসে তিনি চারদিকটা দেখে নিলেন একবার। পার্কিং লটে কোনো গার্ড নেই, কাছাকাছি কোনো বাড়ি ও নেই। বৃষ্টির জলে কিছুটা জায়গা কাদা কাদা হয়ে আছে, এখনও বৃষ্টি পড়েই চলছে। শাজাহান ওভার কোটের কলারটা তুলে দিয়ে, দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন রাস্তা দিয়ে। এই স্টেশন দিয়ে তিনি ট্রেনে উঠতে চান না।

একটুও অপরাধ বোধ নেই, বরং তাঁর মনটা যেন বেশ হালকা হয়ে গেছে। অনেকগুলো জীবন নষ্ট করেছে রাতুল, তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। কাল সকালের আগে রাতুলের মৃতদেহ কারুক চোখেও পড়বে না। সকালবেলায় যারা গাড়ি রাখতে আসবে, তারা সাধারনত অন্য গাড়ির দিকে চেয়েও দেখে না। সম্ভবত বিকেল হয়ে যাবে। একজন এশিয়ান খুন হলে তা নিয়ে ইংরেজ পুলিশ কি খুব বেশি মাথা ঘামায়?

বৃষ্টি ভিজলেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই শাজাহানের। তিনি হেঁটে চলেছেন মাইলের পর মাইল। পথে আর কোনো মানুষ নেই, এ পর্যন্ত কোনো পুলিশের গাড়িও তাঁর নজরে পড়েনি। একটা প্রশ্ন তিনি নিজেকে করছেন বার বার, ত্রিদিবের মুখ থেকে লন্ডনে রাতুলের উপস্থিতি জানবার পরই কি রাতুলকে খুন করার কথা তিনি ভেবেছিলেন? না হলে সেদিন থেকেই তিনি রিভলভারটা সব সময় সঙ্গে রাখতে শুরু করেছিলেন কেন? এতদিন ধরে এতখানি ক্রোধ চাপা দেওয়া ছিল? অথচ রাতুলকে তিনি ক্ষমা করতেও চেয়েছিলেন। রাতুল ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে পারলো না।

পরদিন সকাল আটটায় শাজাহান সেন্ট্রাল লন্ডনে এসে একটা ইওরোপিয়ান কোচের টিকিট কেটে উঠে বসলেন। সেখান থেকে ডোভার। সুটকেসটা চেক ইন করিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন লাউঞ্জে। একটু পরেই তাঁর জাহাজে ওঠার ডাক পড়বে। তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না। একবার ইংলিশ চ্যানেল পার হতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

লাউঞ্জটা হিপিতে ভর্তি। কয়েকজন ভারতীয়-পাকিস্তানীও রয়েছে। শাজাহান একটা সোফায় বসে ইমেগ্রেশান কন্ট্রোল গেটের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর হাতে বোর্ডিং কার্ড, আর কতক্ষণ, আর কতক্ষণ?

প্রথমে একটা বিরাট আকারের কুকুর, তারপর দুজন পুলিশ অফিসার ঢুকে এলো লাউঞ্জে। শাজাহানের বুকে দুম দুম শব্দ হচ্ছে। এর মধ্যেই ওরা টের পেয়ে গেল? একমাত্র ত্রিদিব ছাড়া আর তো কেউ রাতুলের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারবে না। ত্রিদিব তাঁকে ধরিয়ে দেবেন?

পুলিশ দু'জন এদিক ওদিক চেয়ে সোজা শাজাহানের দিকেই আসছে। শাজাহান একবার ভাবলেন উঠে টয়লেটে ঢুকে পড়বেন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। আর কোনো উপায় নেই।

একজন পুলিশ শাজাহানের পাশে এসে বললো, এক্সকিউজ মি, আর ইউ মিঃ যোগিন্ডার সিং?

বোমা ফাটার মতন শব্দ করে শাজাহান বললেন, নো।

পুলিশটি হাত বাড়িয়ে বললো, মে আই সি ইয়োর পাসপোর্ট?

হঠাৎ কুকুরটি গর্জন করে একজনের দিকে তেড়ে গেল। সে দরজার দিকে পালাবার চেষ্টা করছিল। কুকুরটি তার গায়ে দু'পা তুলে হিংস্রভাবে চ্যাঁচাচ্ছে। অফিসারটি তাড়াতাড়ি শাজাহানকে পাসপোর্টটা ফেরত দিয়েই ছুটে গেল সেদিকে। খুব সম্ভবত নারকোটিক্স স্মাগলিং-এর ব্যাপার।

এই সব গোলমালের মধ্যেই মাইক্রোফোনে শাজাহানের জাহাজের নাম ঘোষণা করা হলো। তিনি পাসপোর্ট হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। বুকের মধ্যে দুম দুম শব্দটা এখনো থামেনি, তার হাত-পা কাঁপছে।

তারপর জাহাজ যখন ভেসে পড়লো ইংলিশ চ্যানেলে, ডেকে দাঁড়িয়ে অনেকখানি সামুদ্রিক বাতাস বুকে টেনে নিয়ে শাজাহান মনে মনে বললেন, মুক্তি, মুক্তি! এখন থেকে তিনি অন্য মানুষ।

॥ ৫১ ॥

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে তপন দেখলো, খাটিয়ার ওপর কত হয়ে ঘুমিয়ে আছে কৌশিক। তিন চারদিন দাড়ি কামায়নি, খালি গা বলে আজ বোঝা যাচ্ছে যে সে কত রোগা হয়ে গেছে, পাঁজরাগুলো সব গোনা যায়। সারা ঘরে বইপত্র এলোমেলোভাবে ছড়ানো, কিছু বই মাঝখানে থেকে ছেঁড়া। দেয়ালের পাশে একটা এঁটো থালায় আধখানা রুটি আর খানিকটা শুকিয়ে যাওয়া আলুর দমের ঝোল। খাটিয়ার মাথার দিকে দাঁড় করানো দুটি ক্রাচ, তার ওপরে একটা দলা পাকানো লুঙ্গি।

তপন এক-বার দ্বিধা করলো কৌশিককে ডাকবে কিনা। ঘুমটাই কৌশিকের সমস্যা, রাতের পর রাত ঘুমোতে পারে না সে। আজ সে বিকেল বেলাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তপনের হাতে বেশি সময় নেই। ভেতরে ঢুকে সে নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার হাতের দু'খানা বই আর একটা নতুন জামার প্যাকেট নামিয়ে রাখলো এক পাশে। এ ঘরে একটি মাত্র জানলা, সেটা একবার খুলেই বন্ধ করে দিল তপন, ওখান থেকে সবসময় পেচ্ছাপের গন্ধ আসে, তাই কৌশিক জানলাটা বন্ধ রাখে।

গন্ধটা কাটাবার জন্য তপন একটা সিগারেট ধরালো। ঐ খাটিয়াটা ছাড়া ঘরে আর কোনো বসবার জায়গা নেই। তপন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। একটাই চিন্তা তার মাথায় ঘুরছে। এইভাবে কৌশিককে আর কতদিন রাখা যাবে। কৌশিককে ব্যাঙ্গালোরে পাঠানো যায়নি, ঘাটশিলাতেই সে প্রায় মরতে বসেছিল, জামসেদপুর থেকে একজন ডাক্তারকে গোপনে নিয়ে আসা হয়েছিল, তিনিও ওর পেটের গুলিটা বার করতে পারেননি। কয়েকদিনের মধ্যেই ঘাটশিলার হাইড আউটের কথা পুলিশ জেনে যায়, প্রায় শেষ মুহূর্তে কৌশিককে সরানো গিয়েছিল সেখান থেকে। তারপর থেকে অন্তত পাঁচ জায়গায় রাখা হয়েছে কৌশিককে। তবু সে মরলো না। তার কাঁধের গুলির ক্ষতটা সেরে গেছে, পা দুটোও অনেকটা ভালো হয়ে এসেছে, কিন্তু পেটের মধ্যে গুলিটা রয়ে গেছে। পেটে লিভারের মধ্যে একটা বুলেট গেঁথে থাকলে ও মানুষ বাঁচে? কৌশিকের তুলনায় অনেক অল্প আহত হয়েছিল সুবীর, কিন্তু সে পট করে মরে গেল। সুবীরের মৃত্যুর খবর তার মা-বাবা জানতে পারেন প্রায় একমাস বাদে।

এর মধ্যে অবস্থা অনেক বদলে গেছে। দলের কর্মীদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। যারা জেলের বাইরে আছে, তারা যে কে কোথায় আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেছে তার কোনো ঠিক নেই, তাদের খোঁজ করাও বিপজ্জনক। যারা ওপরের মহলের সিমপ্যাথাইজার ছিল, তারাও এখন আর সম্পর্ক রাখতে চায় না। আগে কলকাতার নাম করা কিছু লোক টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন, তাঁরা সাহায্য বন্ধ করেছেন, দেখা ও করতে চান না। তপন সে রকম একজন ব্যক্তির বাড়িতে তিনবার গিয়েছিল, তিনি তৃতীয়বারে চাকরের হাত দিয়ে দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বলেছেন, তপন যেন আর কোনোদিন না আসে।

জেলে ভেঙে পালাবার সময় কৌশিকরা চিন্তাও করেনি যে এরপর পুলিশ যখন হন্যে হয়ে খুঁজবে, তখন আত্মগোপন করা হবে কোথায়। আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা ছিল না। অবশ্য কৌশিকরা জেল থেকে পালিয়েছে মরীয়া হয়ে, নইলে জেলের মধ্যেই তাদের মেরে ফেলতো। সে রকম অনেককে মেরেছে।

অনেক কিছুই আগে থেকে চিন্তা করা হয়নি।

তপন সবচেয়ে মুস্কিলে পড়েছে টাকা পয়সার ব্যাপার নিয়ে। মাসের পর মাস কৌশিককে কোনো গোপন আস্তানায় লুকিয়ে রাখতে গেলে তার তো একটা খরচও আছে, সেটা কে দেবে? পাশে দাঁড়াবার

মতন আর কেউ নেই। বাড়ি ফেরারও উপায় নেই কৌশিকের, তার বাড়ির ওপর পুলিশের নজর আছে। এবারে ধরা পড়লে কৌশিককে আর জেলে রাখবে না, পুলিশ তাকে শেষ রাতে কোনো ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে গুলি করে খতম করবে। কৌশিকের সঙ্গে যে-ক'জন জেল থেকে পালিয়েছিল, তাদের মধ্যে তিনজন আবার ধরা পড়েছে, কিন্তু তারা কোথায় আছে তার কোনো খবর নেই। একজন মারা গেছে, আর বাকিরা ছড়িয়ে পড়েছে দূর দূর জায়গায়। কৌশিকেরই শুধু কোথাও যাবার জায়গা নেই। সে এখনো ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারে না, পুলিশের সামনে পড়ে গেলে আত্মরক্ষাও করতে পারবে না।

তপনের বিপদ অনেকটা কেটে গেছে, সে ফিরে গেছে দমদমের কলোনিতে। পাড়ার মধ্যে কেউ তার রাজনৈতিক পরিচয় কখনো জানতে পারেনি, তবু অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য সে ইদানীং কংগ্রেসী ছেলেদের সঙ্গে একটু একটু ভাব জমাচ্ছে। এর আগেই তার একটা ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নেওয়া ছিল, সেই কাজই সে শুরু করেছে আবার, সেই সঙ্গে ন্যাশনাল সেভিংস স্যার্টিফিকেটও বিক্রি করে। কোন মাসে কত রোজগার হবে তার কিছু ঠিক নেই, জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে তাকে খরচ দিতে হয়, তারপর আর হাতে প্রায় কিছুই থাকে না।

তবু কৌশিককে সে ছাড়বে কী করে? অসুস্থ, অসহায় কৌশিককে ছেড়ে সে কি শুধু নিজের নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত হতে পারে? কৌশিকের মতন সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য, মহৎ চরিত্রের ছেলেকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে কি পালিয়ে যাওয়া যায়? পার্টির অন্যান্য বন্ধুরা যে যোগাযোগ রাখতে পারছে না, সেটাও তাদের দোষ নয়, তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যতিব্যস্ত, কয়েকজন অবশ্য বড়লোক বাপ-মায়ের আশ্রয়ে ফিরে গেছে। তপনের ওপর কখনো পুলিশের নজর তেমনভাবে পড়েনি, সে কলকাতার বড় ঘরের ছেলে নয়, বিখ্যাত ছাত্রও নয়, কোনো বড় রকমের অ্যাকশান বা খুনোখুনির নায়ক ও সে নয়। তবে, সে যে মানিক ভট্টাচার্যের গ্রুপে ছিল, তা পুলিশ জানে, জলপাইগুড়ির সেই মার্ডারটার সঙ্গে তার যোগসূত্র টানা যেতে পারে, কিন্তু তারপর এত মার্ডার হয়েছে যে সেটার কথা পুলিশও বোধহয় ভুলে গেছে। আই বি-র একজন অফিসার কিছুদিন তার পেছনে লেগেছিল, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কথায় কথায় বেরিয়ে গেল যে সেই গোয়েন্দা অফিসারটির বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের সরাইলে, তপনের সব পরিচয় জেনে সে বেশ নরম হয়ে গেল। তপনকে কংগ্রেসী ছেলেদের দলে ভিড়ে যেতে সেই পরামর্শ দিয়েছে। অবশ্য পুলিশের চোখে কৌশিক এমনই দামি আসামী যে কৌশিককে সঙ্গে তপনও যদি ধরা পড়ে, তাহলে ঐ আই বি অফিসারটিও তপনকে বাঁচাতে পারবে না।

নৈহাটির কাছাকাছি একটা জুটমিলের কুলি বস্তির মধ্যে এই ঘরখানা ভাড়া নেওয়া হয়েছে দিন দশেক আগে। এই বস্তির লোকেরা অধিকাংশই বিহারী মুসলমান, জুট মিলটায় সম্প্রতি লক আউট হয়েছে বলে তারা এতই উত্তেজিত হয়ে আছে যে কৌশিককে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কাছাকাছি একটা ভাতের হোটেল থেকে একটা বাচ্চা ছেলে কৌশিককে খাবার দিয়ে যায়। তা হলেও এই ব্যবস্থা মোটেই সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, কৌশিককে আবার সরাতে হবে।

তপনের কাছে এখন টাকার চিন্তাটাই প্রধান। কিন্তু সে কথা কৌশিকের সামনে ঘুনাক্ষরে উচ্চারণ করা যায় না। পেটের মধ্যে একটা বুলেট ঢুকে বসে আছে, তপনের ধারণা, কৌশিককে বাঁচাতে গেলে তার আরও ভালো করে চিকিৎসা করানো দরকার। কিন্তু কে করাবে?

কৌশিকের বাবা নেই, কিন্তু মা বেঁচে আছে, নিউ আলিপুরে ওদের নিজস্ব বাড়ি। সেই বাড়ির ছেলে নৈহাটির এক চটকলের বস্তিতে শুয়ে আছে। এই রকম ভাবে ক্লাস ক্যারেকটার পরিবর্তনের একটা মহিমা আছে। কিন্তু এরপর কী সেটাই তপন বুঝতে পারে না। কৌশিকের মতন একটা ছেলে যদি নষ্ট হয়ে যায়, পুলিশের গুলিতে খরচ হয়ে যায়, তাহলে সেটা যে একটা বিরাট ক্ষতি!

দু'দিন আসতে পারে নি তপন, আজও তাকে সন্ধের ট্রেন ধরে ফিরতে হবে। কলোনির মধ্যে বেশি রাত করে ফিরলে লোকে সন্দেহ করে, তাছাড়া দমদমে প্রায়ই একটু রাত করে বোমাবাজি শুরু হয়। তপন আস্তে আস্তে ডাকলো, কৌশিক, এই কৌশিক!

কয়েকবারের ডাকেও উঠলো না বলে তপন কৌশিকের গায়ে হাত দিল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো সে। কপালটা বেশ গরম, আজ আবার কৌশিকের জ্বর এসেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল তপনের।

কৌশিকের চোখ মেলেই জিজ্ঞেস করলো, পমপম কোথায়?

তপন নিঃশব্দে মাথা নাড়লো। মাস দু'এক ধরে পমপমের সঙ্গে ও যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। তাতেই আরও বেশি মুস্কিলে পড়েছে তপন। এর আগে পর্যন্ত কৌশিক অনেকটা পমপমের দায়িত্বেই

ছিল। যদিও টাকা পয়সার টানাটানি শুরু হয়ে গেছে তার আগে থেকেই। বাবার কাছ থেকে টাকা পয়সা নেয় না পমপম, তারও উৎসগুলো শুকিয়ে আসছিল। তবু পমপম কলকাতার উঁচু সমাজের অনেককে চেনে, খুব বিপদে পড়লে কারুর কাছে ধার চাইতে পারে। রেফিউজি কলোনির ছেলে তপনকে কে ধার দেবে?

কৌশিককে যখন দুর্গাপুরে রাখা হয়েছিল, তখন ব্যবস্থাটা ভালোই ছিল। কিন্তু যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ নোটিস দিলেন যে তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়ি থেকে ফিরে আসছে, বাড়িতে আর জায়গা হবে না। হাতে মাত্র চারদিন সময়। বাঁকুড়ায় পমপমের এক অল্প চেনা লোকের বাড়িতে পরবর্তী আশ্রয় খুঁজতে যাওয়ার কথা, হঠাৎ হাওড়া স্টেশনে এসে পমপম অজ্ঞান হয়ে গেল।

কী বিপদেই সেদিন পড়েছিল তপন! তার সব সময় পুলিশের ভয়। ভিড় জমে গেলেই পুলিশ আসতে পারে। কৌশিক জেল পালাবার পর পুলিশ আবার পমপমকে অ্যারেস্ট করতে চেয়েছিল। পমপমের বাবা এম এল এ হলেও পুলিশ এখন তোয়াক্কা করছে না। ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রেসিডেন্টস রুল জারি করার পর পুলিশ একেবারে বেপরোয়া। তাছাড়া মাঝখানে একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল, কোথাকার একদল নকশাল ছেলে পমপমদের মানিকতলার বাড়িতে একদিন বোমা চার্জ করে বসলো। পমপমের বাবার ওপর তার অ্যাটেমপট নিয়েছিল। কোন দল যে কোথা থেকে কী অ্যাকশন চালাচ্ছে, তা বোঝার উপায় নেই। এই অবস্থায় অশোক সেনগুপ্ত তাঁর বাড়িতে মেয়েকে রাখেন কী করে? তাঁকেও তো তাঁর পার্টির কাছে মুখরক্ষা করতে হবে। পমপম সেই জন্য তার কলেজ আমলের বন্ধু বান্ধবীদের বাড়িতে থাকছিল। তপনের সঙ্গে দেখা করতো হাওড়া স্টেশনে।

লালবাজারে সেই অত্যাচারের জের পমপমের শরীরে অনেকখানিই রয়ে গেছে। যখন-তখন তার শাড়ী নষ্ট হয়ে যায়। অসহ্য পেট ব্যথা হয়, সেই ব্যথাতেই সে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। হাওড়া স্টেশান থেকে অজ্ঞান অবস্থায় পমপমকে কোনোক্রমে ধরাধরি করে একটা ট্যাক্সিতে তুলেছিল তপন। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে? কোনো হাসপাতালে নিলে যদি পুলিশ কেস হয়, তাহলে পমপমই পরে তপনকে ক্ষমা করবে না। আর কোথায় যাওয়া যায়? পমপম তো একটা মেয়ে, তাকে যেখানে সেখানে রাখা যায় না, দমদমের কলোনিতেও হঠাৎ এই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় না। দিশেহারা হয়ে গিয়ে সে পমপমকে মানিকতলার বাড়িতেই নিয়ে গেল।

ভাগ্যক্রমে অশোক সেনগুপ্ত তখন বাড়িতে ছিলেন। সেদিন পমপমের বাবার মতন একজন পোড় খাওয়া পলিটিশিয়ানের চোখেও জল দেখেছিল তপন। পমপমের নিস্পন্দ শরীর ও বিবর্ণ মুখ দেখে তিনি প্রথম ভেবেছিলেন, পমপমকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে। তিনি খুকি, খুকি বলে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরেছিলেন মেয়েকে। খানিকবাদে সজল মুখ ফিরিয়ে তিনি তপনকে বলেছিলেন, তোমরা আর কিছুদিন খোঁজ করতে এসো না। মেয়েটাকে বাঁচতে দেবে তো? এই শরীর নিয়ে ঘোরাঘুরি করলে ও কি বাঁচবে।

তবু দু'দিন বাদে তপন গিয়েছিল পমপমের খবর নিতে। অনেক চেষ্টায় পমপমের বাবার সঙ্গে দেখা হলো, তিনি রীতিমতন ধমক দিয়ে তপনকে বললেন, আমার বাড়িতে কি তোমরা তোমাদের আখড়া করবে ভেবেছো নাকি? পমপম এখানে নেই। তার চিকিৎসা চলছে, এখন তার সঙ্গে দেখা হবে না।

কৌশিককে এসব কথা বোঝানো যাবে কি করে? অসুস্থ শরীর ও একাকীত্বের জন্য সে অবুঝ হয়ে গেছে। পমপমের যদি হাঁটা চলার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে কোনো বাধাই সে মানতো না, ঠিকই দেখা করতো কৌশিকের সঙ্গে। কৌশিকের ধারণা, পমপম ফের পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, আর তপন সে কথা গোপন করে যাচ্ছে।

উঠে বসে কৌশিক বললো, পমপম কোথায় তুই বলবি না?

তপন বললো, এখনও খবর পাইনি। চেষ্টা করছি, ওর বাবার সঙ্গে কিছুতেই দেখা হচ্ছে না। তা ছাড়া ওপাড়ার সি পি এমের ছেলেরা আমাকে চেনে।

তপনকে একটা ধাক্কা দিয়ে কৌশিক বললো, তোকে বলেছি না, পমপমের খবর না নিয়ে তুই আমার কাছে আর আসবি না!

শুধু অবুঝ নয়, খিটখিটেও হয়ে গেছে কৌশিক। দেখা হলেই প্রথমে সে তপনের সঙ্গে ঝগড়া করে। যেন তপনই তার সমস্ত দুর্ভোগের জন্য দায়ী।

তপন তবু নরম ভাবে বললো, চেষ্টা করছি, দু'একদিনের মধ্যেই কিছু খবর পেয়ে যাবো। তবে এটুকু বলতে পারি, সে জেলে নেই।

কৌশিক চোখ রাঙিয়ে বললো, তুই বুঝি সব কটা জেল ঘুরে দেখেছিস? ওগুলো কী বই এনেছিস? কী বই দেখি!

বই দু'খানা উল্টে পাল্টে দেখে কৌশিক ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুখখানা কুঁচকে বললো, এই সব বাজে গল্পের বই, যত রাজ্যের ট্র্যাশ, তোকে কে আনতে বলেছে? তুই কি কোনো ভালো বই কখনো চোখে দেখিসনি?

একা একা থাকে, ঘুম হয় না, তাই কৌশিকের বই পড়ার অসম্ভব ক্ষুধা। কিন্তু তপন এত বই জোগাবে কেমন করে? নতুন বই কেনার সামর্থ্য তার নেই। লোকের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে আনতে হয়। সে এখন যাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, তারা কেউ উচ্চাঙ্গের বই পড়ে না। পুরোনো খবরের কাগজ যারা বাড়ি থেকে কেনে তাদের একজনকে ধরেছে তপন। অনেক লোক কিছু কিছু ছেঁড়া খোঁড়া বইও খবরের কাগজের সঙ্গে ওজন দরে বিক্রি করে দেয়। তপন সেইসব বই চারআনা আটআনা দিয়ে কিনে আনে। ইংরিজি, বাংলা দু'রকমই থাকে, কিন্তু বিশেষ বাছাবাছি করার সুযোগ নেই। তাছাড়া তপন নিজেও কৌশিকের মতন অত লেখাপড়া জানে না।

তপন অবশ্য জানে, যতই রাগারাগি করুক, কৌশিক এই বইও পড়বে ঠিক। হয়তো পড়তে পড়তে বিরক্ত হয়ে ছিঁড়বে এক সময়, তবু এমনই নেশা যে চোখের সামনে কিছু ছাপা অক্ষর চাই-ই তার।

অন্য প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, এটা কী? জামা? কার জন্য?

কৌশিকের একটি মাত্র জামা, তাও ছিঁড়ে ঝুলিঝুলি হয়ে গেছে। স্টাডি সার্কেলের গোড়ার দিকে অন্য সব সদস্যের মধ্যে কৌশিককেই সবচেয়ে শৌখিন জামা-প্যান্ট করতে দেখেছিল তপন। সচ্ছল বাড়ির ছেলে, আদরে-যত্নে মানুষ। তপন নিজে কাটা-ছেঁড়া জামা গায় দিতে পারে, কিন্তু কৌশিককে ময়লা, ছেঁড়া পরতে দেখলে তার কষ্ট হয়। বর্ধমানে থাকার সময় তপন বেশ কয়েকবার স্টেশনের কুলি আর ঝাঁকামুটে ছদ্মবেশ ধরেছিল, কিন্তু কৌশিককে ঐ সব ছদ্মবেশ একেবারেই মানাতো না।

ক'দিন ধরে একটু একটু ঠাণ্ডা পড়ছে। সামনে শীত আসছে। পেটের মধ্যে বুলেট থাকার জন্যই হোক বা যে-কারণেই হোক কৌশিক মাঝে মাঝে খকখক করে কাশে। সেই জন্য চৌরঙ্গির ফুটপাথ থেকে দরাদরি করে আঠারো টাকা দিয়ে কৌশিকের জন্য একটা মোটা কাপড়ের জামা কিনে এনেছে।

পকেট থেকে দু'প্যাকেট চারমিনার সিগারেট বার করলো তপন। আগে কৌশিক সিগারেট খেত না, এখন সিগারেট ছাড়া তার চলে না।

প্যাকেট দুটো বাড়িয়ে দিয়ে তপন জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু লাগবে? ওঃ হো, দাড়ি কামাবার ব্লেড আনতে আজও ভুলে গেছি।

কৌশিক আবার ধমক দিয়ে বললো, তুই জামাটা কেন এনেছিস, সে কথা বল!

তপন শুকনো গলায় বললো, আমি ভাবছি, এই ভাবে আর কতদিন চলবে?

—আমার পায়ে আর একটু জোর এলেই আমি বেরিয়ে পড়বো।

—বেরিয়ে কোথায় যাবি? আমি ভাবছিলাম জানিস, কৌশিক? তোর শরীর এখনও এত দুর্বল, একটু দুধ কিংবা ডিমসেদ্ধ না খেলে সারবে কী করে? কিন্তু ওসব কেনার পয়সা কোথায় পাওয়া যাবে? সেই জন্যই বলছিলাম।

—কী পাগলের মতন কথা বলছিস! আমি দুধ-ডিম খাবো? কেন, আমি কি কচি খোকা নাকি? এই বস্তিতে কে দুধ খায়, ডিম খায়?

—ওদের কথা আলাদা। ওরা কেউ [illegible] অসুস্থ নয়। আমার কথাটা শেষ করতে দে। আমি একবার তোর মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবো?

—মা? কেন, তুই আমার মাকেও জেল খাটাতে চাস বুঝি?

—খুব সাবধানে, তোর মামাবাড়িতে গিয়ে টেলিফোন করে...তোর মা তোর কোনো খবর জানেন না, তাঁকে একবার সব জানানো দরকার, তাছাড়া তোর মামারা যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন।

—আমার কোনো মা নেই। আমার এখন মা নেই, ভাই-বোন নেই, মামা-টামা কেউ নেই! শোন তপন, একবার আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি, এরপর আবার বাচ্চা ছেলের মতন ভয় পেয়ে মায়ের

আঁচলের তলায় ফিরে যাবো?

—আমি প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছি।

—হ্যাং ইয়োর প্র্যাকটিক্যাল কথা! তোকে দিয়ে কোনো কাজের কাজ হয় না। এতদিনে পরপমের একটা খবর আনতে পারলি না।

—আমি বলছি, তোর মা আর মামারা যদি ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে অতীনের মতন তোরও বিলেতে চলে যাওয়া উচিত। সেখানে চিকিৎসা করাতে পারবি। পেট থেকে গুলিটা বার করতে হবে না?

—ঐ বুলেট আমি হজম করে ফেলেছি! গোলা খা ডালা! শুনিস নি সে কথা! আমি বিলেত, আমেরিকা কোনোদিন যাবো না। সোভিয়েত রাশিয়াতেও চিকিৎসা করাতে যাবো না। যদি কোনোদিন সুযোগ পাই তো চীনে যাবো। কিংবা আলবেনিয়ায়।

—তোর প্রাণের বন্ধু অতীন যদি যেতে পারে।

—অতীন গেছে বেশ করেছে! অতীনের ব্যাপার তুই কি বুঝবি রে ইডিয়েট?

—পরশুদিন দেওঘরে অসীম চ্যাটার্জি ধরা পড়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত থেমে রইলো কৌশিক, কিন্তু অবাক হলো না। গম্ভীর গলায় বললো, জানি। কালকে হোটেলের ছোকরাটাকে দিয়ে একটা খবরের কাগজ আনিয়েছিলুম। কালই বেরিয়েছে খবরটা। ওরা পুলিশকে রেজিস্ট করেছিল কি না জানিস?

—তা জানি না। কৌশিক, আমাদের দলের মানিকদা মারা গেছেন। গুরুদাস, সুদেব, শমী ওরা কেউ বেঁচে নেই। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে কমরেড সরোজ দত্তকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে। এরপর আর কী হবে?

—আর কী হবে মানে? আমরা তো বেঁচে আছি। কমরেড চারু মজুমদার আছেন। ভারতবর্ষের পুলিশের সাধ্য নেইই তাঁকে ছোঁয়। আমাদের ছেলেরা শেষরক্তের ফোঁটা দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখবে। অনেকে তো মরবেই। চেয়ারম্যান বলেছেন, এইসব ধাক্কা খাওয়ারও প্রয়োজন আছে।

—আমি কিন্তু সামনে কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ উঠে এসে তপনের কাঁধটা খামচে ধরে কৌশিক রক্তচক্ষে জিজ্ঞেস করলো, তুই তখন আমাকে দুধ-ডিম খাওয়ার কথা বললি কেন রে, ছোটলোক?

—আমি....আমি ছোটলোক? তুই আমাকে ছোটলোক বললি।

—ছোটলোক মানে ছোট জাত বা নীচু জাত বলিনি, মনের দিক দিয়ে ছোট। আলবাৎ তুই ছোট লোক! তুই আমাকে দুধ-ডিম খাওয়াবি, তুই আমাকে দয়া করতে চাস?

—আমি মোটেই সে কথা বলিনি!

—ড্যাম ইট! আমি জানতে চাই, কে তোকে পয়সা সাপ্লাই করে? তুই আমার নাম করে হ্যাংলার মতন লোকের কাছে চাঁদা তুলছিস!

—এসব বাজে কথা।

—আমি বাজে কথা বলছি? ড্যাম তপন, তুই ভাবিস না, আমি তোর দয়ার ওপর বেঁচে আছি। আই ক্যান টেক কেয়ার অফ মাইসেলফ! তোকে আর আসতে হবে না!

—এসব ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না! জ্বর সবারই হয়। আমার জন্য জামা আনতে কে বলেছে? কে কিনে দিয়েছে বল আগে? দুধ আর ডিমের লোভ দেখানো! তারপরেই ও মারা গেছে, সে মারা গেছে, এইসব বলার মানে কী? অন্যরা মারা যাচ্ছে, আমি দুধ আর ডিম খাবো?

—আমি সেইভাবে বলিনি।

—আই হেইট ইউ! বুর্জোয়া আর শোধনবাদীদের মতন বিদেশে চিকিৎসা করাতে যাবো আমি? গেট আউট! আমি আর কোনোদিন তোর মুখ দেখতে চাই না!

পাগলের মতন হয়ে গিয়ে তপনকে ধাক্কা দিয়ে বার করার চেষ্টা করতে লাগলো কৌশিক। তপন দু'তিনবার বলার চেষ্টা করলো, এই কী হচ্ছে, কী করছিস, কিন্তু কৌশিক যেন হিংস্র হয়ে উঠেছে। এক সময় ধৈর্য হারিয়ে তপন বলে ফেললো, ধুর শালা!

ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারে না কৌশিক, তবু সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরজা পর্যন্ত এসে বললো, তুই আর কোনোদিন এখানে আসবি না, এলেও আর আমাকে দেখতে পাবি না। আই স্পিট অন ইয়োর চ্যারিটি!

বেরিয়ে যা।

কৌশিক ঠেলাঠেলি করতে লাগলো এমনভাবে যে তপনকে একসময় বাধা দিতেই হলো। এই ঘরখানা সে নিজের অতি কষ্টের উপার্জনের পয়সায় ভাড়া করেছে কৌশিকের জন্য, আর এখান থেকে কৌশিক তাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে? সে অন্যের পয়সায় কৌশিকের জন্য জামা কিনেছে? একথা শুনলে তার রাগ হবে না? একটু বেশি জোর করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গেল তপন, পায়ে জোর নেই বলে টাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে পড়ে গেল কৌশিক।

তপন আর পেছন ফিরে তাকালো না, হনহন করে চলে গেল গলি দিয়ে।

এখান থেকে স্টেশন প্রায় পঁচিশ মিনিটের পথ। তপন আপনমনে বিড় বিড় করতে লাগলো, আমি আর কত ধৈর্য ধরবো। আমি যথেষ্ট করেছি, কেউ আমাকে দায়িত্ব দেয় নি। আর সবাই তো কেটে পড়েছে। ফাঁড়ি সার্কেলে যারা বড় বড় কথা বলতো, তারা দিব্যি বড় বড় চাকরি বাগিয়ে বসেছে, দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আমি রিফিউজি বাড়ির ছেলে, আমি কখনো বিপ্লব-টিপ্লবের কথা বলেছি? কৌশিকরাই তো আমাকে ভিড়িয়েছিল। আমি যথাসাধ্য করেছি ওদের জন্য। ওরা কেউ বড় চাকরি করে, কেউ বিলেত যাবে, আমি যেখানে পড়ে আছি, ওদের জন্য। ওরা কেউ বড় চাকরি করে, কেউ বিলেত যাবে, আমি যেখানে পড়ে আছি সেখানেই থাকবো। আমি মাসের পর মাস কী করে কৌশিকের খরচ চালাবো, আমার নিজেরই চলে না। পকেটে মাত্র সাতটা টাকা রয়েছে, কাল কী জুটবে তার ঠিক নেই।

পাঁচ মিনিট হেঁটে তপন থামলো। রাগে-অভিমানে তার চোখে জল এসে গেছে। কৌশিক তাকে ছোটলোক বললো? কৌশিক ভাবে যে সে কৌশিকের নাম করে অন্যদের কাছ থেকে টাকা আনছে? পমপম অসুস্থ হবার পর কেউ তাক একটা পয়সাও দেয়নি। আজ থেকে কৌশিকের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। সে নিজেরটা নিজে বুঝে নিতে যদি পারে তবে ভালোই তো! তপন আর এসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নিজেকে জড়াবে না।

রাস্তার আলোর নীচে তপন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

এই মুহূর্তে তপন ছাড়া আর একজনও জানে না যে কৌশিক কোথায় আছে। কৌশিকের এখনও একা চলা ফেরা করার সাধ্য নেই। আর কেউ তাকে এখানে সাহায্য করতে আসবে না!

কৌশিক আজ রাত্তিরে খাবে কী? তপন জানে, কৌশিকের কাছে একটা দাড়ি কামাবার শস্তা ব্লেড কেনারও পয়সা নেই। তপন ভেবেছিল, তার সাত টাকার মধ্যে ছটা টাকা কৌশিককে দিয়ে আসবে। সামনের হোটেলটায় বারো আনায় ভাত বা রুটি আর ডাল আর একটু তরকারি, অন্তত ছটা টাকা ওকে দিয়ে আসা উচিত। দরজাটা খুলে ছুঁড়ে দিয়ে আসবে।

তপন ফিরে এসে গলির মোড়টার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলো। ছেঁড়া জামাটা গায়ে দিয়ে, একখানা মাত্র ক্রাচ ডান বগলে দিয়ে গলির মোড়টায় দাঁড়িয়ে আছে কৌশিক। এখানো ভালো করে সন্ধে হয়নি। এর মধ্যে বেরিয়ে এসেছে, একা একা কোথায় যাবার চেষ্টা করছে ও ? এ যে প্রায় আত্মহত্যা! শ্রমিক বিক্ষোভ হচ্ছে বলে এ রাস্তায় যখন তখন পুলিশ আসে। স্টেশনের কাছে বসে থাকে একদল অন্য পার্টির ছেলে । এদের মধ্যে কেউ যদি কৌশিককে চিনতে পারে, তাহলেই শেষ। এখন চতুর্দিকে শুরু হয়েছে বদলা নেবার পালা।

দৃঢ় আদর্শবাদী, দুর্দান্ত সাহসী কৌশিক রায়কে কি অসহায় দেখাচ্ছে এখন। রোগা হাড় জিরজিরে চেহারা, চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, বগলে একটা ক্রাচ, সে কোথাও যেতে পারবে না! তার কোনো যাবার জায়গা নেই।

বুকটা টনটন করে উঠলো তপনের, সে কান্না সামলাতে পারছে না। সে তো জানে, কৌশিকের মত খাঁটি মানুষ কত দুর্লভ! একটা রুমালও নেই ছাই, সে জামার হাত দিয়ে চোখ মুছলো। তারপর কাছে এসে শুধু বললো, কৌশিক।

অদ্ভুত বিস্ময়ের সঙ্গে কৌশিক একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো তপনের দিকে। তারপর দুর্বোধ্য কোনো ভাষার মতন আস্তে আস্তে বললো, তপন, তুই আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছিলি? তুই আমার কাছে আর আসতে চাস না?

তপন বললো, পাগল নাকি, কোথায় চলে যাবো? এই এমনি একটু বেরিয়েছিলাম। চল, ঘরে চল।

॥ ৫২ ॥

দুপুরবেলা মমতাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার একটু পরেই এসে হাজির হলো পরেশ। তার হাতে একখানা এল পি রেকর্ড আর এক বাক্স মিষ্টি। এ রকম সে প্রায়ই অসময়ে আসে, কিছু না কিছু উপহারও সঙ্গে আনে। চাকরি করে না পরেশ, সে তার দাদার সঙ্গে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা শুরু করেছে, তাই তাকে দশটা-পাঁচটায় আবদ্ধ থাকতে হয় না কোথাও। সে এখন এ বাড়ির জামাই, তার তো এ বাড়িতে যখন তখন আসার অধিকার আছেই।

দরজা খুলে দিয়েছে টুনটুনি, তবু সে গলা তুলে জিজ্ঞেস করলো কাকিমা কোথায়? কাকিমাকে ডাকো!

মমতা নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন, তাঁকে আবার বেরিয়ে আসতেই হলো। পরেশ যখন যে-জিনিস আনুক তা সে শুধু টুনটুনিকে দিতে চায় না, সাড়ম্বরে বাড়ির সবাইকে জানিয়ে মমতার হাতে তুলে দেয়। নিজের বউকে চুপি-চুপি শুধু উপহার না দিয়ে সে যে বাড়ির গুরুজনদের হাতে সব কিছু দেয় এটা হয়তো তাদের পারিবারিক রীতি, কিন্তু এর মধ্যে খানিকটা দেখানেপনাও আছে।

পরেশ বললো, কাকিমা, আপনার জন্য এই ফিরোজা বেগমের নজরুলগীতির রেকর্ডটা এনেছি, আপনি গান শুনতে ভালোবাসেন। আর এই সন্দেশ আমাদের পাড়ার ভীম নাগের, স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরি।

মমতা যথারীতি কিন্তু কিন্তু ভাবে বললেন, বাবা কেন এতসব এনেছো!

এর আগে পরেশ একটা রেকর্ড প্লেয়ারও এনে দিয়েছিল এইভাবে। সেটা টুনটুনির ঘরেই থাকে। রেকর্ডটাও টুনটুনিই বাজাবে, তবু মমতাকে হাত পেতে নিতে হয়, যেন এসব শুধু তাঁরই জন্য আনা হয়েছে।

মমতা খুবই অস্বস্তি বোধ করেন। মানুষের কাছ থেকে কিছু পেলে, প্রতিদানেও কিছু দিতে হয়। এমনি এমনি কারুর কাছ থেকে কোনো জিনিস নিতে অভ্যস্ত নন মমতা। তা ছাড়া পরেশ এ বাড়ির নতুন জামাই, তাকেই তো কিছু দেওয়া উচিত।

সঞ্চয় বলতে আর কিছুই নেই মমতার। প্রতাপকে মাঝে মাঝেই অফিসের পেশকার-দারোয়ানদের কাছে থেকে ধার করতে হয়। বিমানবিহারীর কাছে বেশ মোটা টাকার ধার আছে, তা আজও শোধ করা হয়নি। তবু সংসারের টাকা ভেঙে মমতা এই কয়েক মাসে পরেশের জন্য শার্ট, স্যুটের কাপড় কিনে দিয়েছেন। পিকলু-বাবলুর অন্নপ্রাশনের সময় পাওয়া অনেকগুলো ছোট ছোট সোনার আংটি ছিল, অন্যান্য কিছু গয়না অভাবের সময় বিক্রি করতে হলেও মমতা তাঁর ছেলেদের এই আংটিগুলো এতকাল রেখে দিয়েছিলেন। অত ছোট আংটি তো আর কোনো কাজে লাগবে না, এবারে সেগুলো ভেঙে টুনটুনির জন্য কানের একজোড়া দুল আর পরেশের জন্য একটা আংটি গড়িয়ে দিয়েছিলেন। মমতার একটা নাকছাবির হীরেও বসিয়ে দিয়েছিলেন পরেশের সেই আংটিতে। ওদের বিয়ে উপলক্ষে একটা কিছু তো দেওয়া দরকার, আর দিতে গেলে ভালো জিনিসই দিতে হয়। হাল্কা ফিনফিনে গয়না মমতা কিছুতেই কারুকে দিতে পারেন না।

শুধু পিকলুকে তার ঠাকুর্দার দেওয়া একটা আংটি রেখে দিলেন মমতা। পিকলুর জিনিসপত্র সব চলে গেলে যেন পিকলু ও চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে।

এই যে আজ একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড আনলো পরেশ, মমতার হাতে প্রথম তুলে দিল, এ জন্য পরেশকে আবার কিছু দিতে হবে। যতক্ষণ না দিচ্ছেন, মমতা শান্তি পাবেন না।

বিয়ে হয়েছে বলেই টুনটুনিকে আলাদা একটা নিজস্ব ঘর দিতে হয়েছে। পরেশ মাঝে মাঝে রাত্তিরটাও থেকে যায়। মুন্নিকে এখন শুতে হয় সুপ্রীতির সঙ্গেও বেচারার পড়াশুনোর খুব ক্ষতি হয় তাতে। সে ঘরটা একেবারে সরু, এক ফালি, আগে ভাঁড়ার ঘর ছিল। উপায় কী, আর তো কোনো জায়গাও নেই। যতবার বাড়ি বদলানো হচ্ছে, ততবার জায়গা কমে যাচ্ছে, ঘরগুলো ও ছোট ছোট হয় আজকাল, একটু ও অতিরিক্ত জায়গা কেউ রাখে না। কালিঘাটের বাড়ি থেকে এই পরেশই জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল মমতাদের, সে কথা যেন তার মনেই নেই, দিব্যি অম্লান বদনে হেসে হেসে কথা বলে।

বাড়িতে জামাই এলে কিছু খেতে দিতে হয়। মমতা সেই চিন্তা করতে লাগলেন।

রেকর্ড প্লেয়ারে ফিরোজা বেগমের রেকর্ডখানা চাপিয়ে পরেশ বললো, কাকিমা, আপনিও আসুন,

শুনবেন আসুন! এই টুনটুনি, কাকিমাকে বসতে দাও!

গান শুনতে ভালোবাসেন মমতা, কিন্তু তিনি শুধু ভেবে যাচ্ছেন, পরেশকে কী খেতে দেবেন? বাড়িতে সে রকম কিছু নেই। দোকান থেকে কিছু কিনে আনতে হলেও কে যাবে? মুন্নি কলেজে গেছে। টুনটুনিকে তার বরের সামনে থেকে উঠিয়ে দোকানে পাঠানো যায় না। একটা ঠিকে ঝি শুধু সকালে আর বিকেলে এসে বাসন মেজে দিয়ে যায়, আর কোনো কাজের লোক রাখা হয়নি। অসময়ে কোনো অতিথি এসে পড়লে এই মুশকিল হয়।

বাড়িতে কয়েকখানা লুচি ভেজে, বেগুন ভাজা করে দেওয়া যায়। ময়দা থাকলেও ঘি নেই। ঘি খাওয়া তো উঠেই গেছে। প্রতাপ গরম ভাতের সঙ্গে ঘি পছন্দ করতেন, এখন ভালো ঘি'র অসম্ভব দাম বলে প্রতাপ ঘি কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন। দালদা'য় লুচি কি নতুন জামাইকে দেওয়া যায়! মমতা কিছুতেই তা পারবেন না। লুচির সঙ্গে দু'একটা মিষ্টিও দেওয়া উচিত। পরেশ যে মিষ্টি এনেছে, সেই মিষ্টিই তাকে খাওয়ানোটা মোটেই ভালো দেখায় না।

ধুত, মাথার মধ্যে এই সব চিন্তা ঘুরলে কি গান শোনা যায়? মমতা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

দোকান থেকে একটু ঘি আর মিষ্টি আনা দরকার। মমতা কোনদিন একা একা মুদির দোকানে, মিষ্টির দোকানে যাননি। দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে-- মমতার হঠাৎ কান্না এসে গেল। এবং এই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ে গেল বাবলুর কথা। ছেলেটা অনেকদিন চিঠি দেয় না। প্রায় দেড় মাস আমেরিকা থেকে কোনো চিঠি আসেনি। তবু বাবলুর ওপর রাগ হয় না তাঁর। মমতার মনে হয়, বাবলুকে এদেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই জন্য সে অভিমান করে আছে।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন মমতা।

টুনটুনির ঘরের দরজাটা খোলা ছিল, এখন সেটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। ওদের কোনো চক্ষুলজ্জা নেই। ভেতরে এখনো জোরে জোরে গান বাজছে, আর কোনো শব্দ শোনা যাবে না।

তবু নতুন জামাইকে কিছু খাবার না দেওয়াটা খুবই অভদ্রতা। মমতা আটপৌরে শাড়িটাই একটু ঠিক করে পরে নিয়ে, পায়ে চটি গলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। আগে করেননি কখনো, তাও করতে হবে। জীবনের আরও কী বাকি আছে কে জানে!

মাত্র চারটি রসগোল্লা কিনলেন বলে মিষ্টি দোকানের লোকটি তাঁকে গ্রাহ্যই করলো না। বোধ হয় ভেবেছে, কোনো বাড়ির ঝি। শাড়িটা পাল্টে আসা উচিত ছিল বোধ হয়। কিংবা এক সঙ্গে দশ-পনেরো টাকার জিনিস কিনলে হয়তো লোকটি মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতো।

মমতা এক শো গ্রাম ঘি কিনবেন ভেবেছিলেন, তাঁর কাছে বেশি টাকাও নেই, কিন্তু পাড়ার মুদির দোকানটি বন্ধ। একটা স্টেশনারি দোকান খোলা আছে, সেখানে টিনের ঘি পাওয়া যায়, আড়াই শো গ্রামের কম নেই। দোকানের মধ্যে দাঁড়িয়েই মমতা ছোট ব্যাগটা খুলে পয়সার হিসেব করে দেখলেন, আড়াই শো গ্রামের টিন কেনা যাবে না।

এই দোকানের কাউন্টারের একটি ফর্সা, অল্প বয়েসী ছেলে বললো, আপনি নিয়ে যান না, মাসিমা। পরে দাম দেবেন।

মমতা আড়ষ্টভাবে বললেন, পরে?

ছেলেটি ঘিয়ের টিনটা একটা কাগজের ঠোঙায় ভরতে ভরতে বললো, পরে এক সময় পাঠিয়ে দেবেন। আমি চিনি আপনাকে। মুন্নিদির মা তো? মুন্নিদি এই দোকান থেকে প্রায়ই পাউরুটি নিয়ে যায়।

মমতা বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। দোকানে কোনো জিনিস কিনতে ঢুকেও পয়সার অভাবে না কিনে ফিরে যাবার অভিজ্ঞতা তাঁর আগে কখনো হয়নি। হয়তো এটা এমন কিছুই ব্যাপার নয়। অনেকেরই এরকম হয়, দোকানদাররা কিছু মনে করে না। তবু মমতা লজ্জায়, ক্ষোভে যেন মরমে মরে যাচ্ছিলেন, তাঁর চোখে আবার জল এসে যাবার উপক্রম। এই ছেলেটি যে তাঁকে কতখানি গ্লানি থেকে বাঁচালো, তা ও নিজেই বোধ হয় জানে না।

মমতা কৃতজ্ঞভাবে হেসে বললেন, সন্ধেবেলাতেই আমার মেয়ে এসে দাম দিয়ে যাবে।

ফিরে এসে মমতাকে রান্নাঘরে আবার কেরোসিন স্টোভ জ্বালতে হলো। তারপর তিনি ময়দা মাখতে বসলেন।

টুনটুনির ঘরের দরজা বন্ধ। বিরাট জোরে গান বাজছে। পরেশ দুপুরবেলা এলে ঐ ঘর থেকে টুনটুনিকে আর বেরুতেই দেয় না। আর আড়াই মাস বাদে টুনটুনির বাচ্চা হবে।

ময়দা মাখা হয়ে যাবার পর লেচি করে সবে বেলতে শুরু করেছেন মমতা, এই সময় সুপ্রীতি এলেন রান্নাঘরে। এই সময় সুপ্রীতি ঘুমিয়ে থাকেন, কিন্তু পাশের ঘরে এত জোরে গান বাজলে কার সাধ্য ঘুমোয়!

রোগা হতে হতে একেবারে শালিক পাখির মতন চেহারা হয়েছে সুপ্রীতির। সেই সঙ্গে বেড়েছে শুচিবাই। ঘরে তিন-চারটি ঠাকুর দেবতার পট টাঙিয়ে পুজো-আচ্চা করেন। একমাত্র মুন্নি ছাড়া আর কারুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ কথাবার্তাই হয় না আজকাল।

মমতার ঠিক সামনে বসে পড়ে সুপ্রীতি বললেন, আজ আবার দুপুরবেলা পরেশ এসেছে।

এটা ঠিক প্রশ্ন নয়, বেশ স্পষ্ট অপছন্দের উক্তি। মমতা কিছু বললেন না।

সুপ্রীতি আবার বললেন, যখন তখন এরকমভাবে আসে, এত জোরে জোরে গান বাজায়, মাঝে মাঝে ওর বন্ধুদের আনে, এরপর খোকন না একদিন হঠাৎ মাথা গরম করে বসে!

এটা মমতারও মনের কথা। প্রতাপের মেজাজের জন্য সবসময় মমতাকে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়। টুনটুনির সঙ্গে পরেশের বিয়েটা এখনও প্রতাপ মেনে নিতে পারেননি। কোনদিন যে প্রতাপ পরেশকে হঠাৎ দাবড়ানি দিয়ে বসবেন, তার ঠিক নেই।

মমতা তবু মৃদু গলায় বললেন, পরেশ এখন বাড়ির জামাই, সে তো আসবেই।

সুপ্রীতি বললেন, বাড়ির জামাই, তাকে নেমন্তন্ন না করলে আসবে কেন? আমাদের সময় জামাইরা এমন নির্লজ্জ ছিল না।

মমতা বললেন, এখন দিনকাল অন্য রকম, অত নিয়মটিয়ম কেউ মানে না। ওদের অল্প বয়েস!

-বিয়ে করে পরেশ ওর বউকে এখানে কতদিন ফেলে রাখবে? টুনটুনিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে না?

-আপনি ভুলে গেছেন দিদি, পরেশের বাবা মারা গেছে, এখনও কালাশৌচ চলছে, এক বছরের মধ্যে বিয়ে করা চলে না। সেই জন্যই তো গোপনে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে, বাড়িতে কিছু জানায়নি।

-টুনটুনির ও তো এখন কালাশৌচ, তার মধ্যে এইসব কান্ড, ছি ছি ছি ছি, ভাবলেও গা-টা ঘিন ঘিন করে। বাড়িতে জানায়নি তো আমরা কী করবো? আমরা কি ওকে ঘরজামাই হতে বলেছি? ওদের তো শুনি অনেক পয়সা আছে, অন্য জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে পরেশ তার বউকে রাখতে পারে না?

মমতা চোখ তুলে সুপ্রীতির দিকে তাকালেন। এই প্রশ্নের উত্তর মমতা দেবেন কী করে? তিনি কি পরেশকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন?

সুপ্রীতি আবার বললেন, এই দুপুরবেলা, তোমার একটু বিশ্রাম নেই, তুমি ওদের জন্য লুচি ভাজতে বসলে। টুনটুনিটা কি, সে নিজে এসব করতে পারে না?

মমতা বললেন, তাতে কি হয়েছে? ওদের নতুন বিয়ে...আমি দু'খানা লুচি ভেজে দেবো, তাতে আর কতক্ষণ সময় লাগবে। আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে দিদি!

সুপ্রীতি বললেন, মমো, আমি জানলা দিয়ে দেখলাম, তুমি বাইরে বেরুলে। তুমি বুঝি ওদের জন্য কিছু কিনতে টিনতে গিয়েছিলে?

-বাড়িতে কিছু ছিল না, লুচি ভাজার জন্য একটু ঘি---

-মমো, তুমি নিজে গেলে ঐ সব আনতে? টুনটুনিকে বলতে পারলে না? তুমি ঐ সব কিনে ফিরে আসছিলে, তোমাকে দেখে আমার বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছিল ! আমাদের বাড়ির কত আদরের বউ ছিলে তুমি, খোকন আমাদের একটা মাত্র ভাই, তার ঘাড়ের ওপর আমরা সবাই চেপে বসেছি। আমি এতদিন অসুখে ভুগলাম, সব ধকল তোমাকেই তো সহ্য করতে হলো!

-আহা একটু দোকানে গেছি, তাতে কি হয়েছে? আজকাল এ রকম অনেকেই যায়!

-তুমি মজুমদার বাড়ির বউ! টুনটুনি ভেবেছে কি, মামাবাড়িতে বসে যা খুশি করবে? ওর বাপটা একটা অপদার্থ, অমানুষ! মেয়েটার কথা একবার ভাবলো ও না?

সদর দরজায় বেল বেজে উঠলো। কথা থামিয়ে সুপ্রীতি আর মমতা দুজনেই উৎকর্ণ হলেন। এখন আবার কে আসবে? মুন্নির কলেজ থেকে ফেরার সময় হয়নি, ঠিকে ঝি পাঁচটার আগে আসে না। প্রতাপ হঠাৎ আদালত থেকে ফিরে এলেই মুশকিল।

মমতার হাতে ময়দা মাখা, সুপ্রীতি বললেন, আমি দেখছি।

সুপ্রীতি দরজার কাছে পৌঁছাবার আগেই টুনটুনি আর পরেশ বেরিয়ে এসেছে। পরেশই দরজা খুলে দিল। তারই বয়েসী আর দুটি যুবক এসেছে। যেন এটা পরেশেরই নিজের বাড়ি, এই ভঙ্গিতে পরেশ বললো, আয়, আয়, এত দেরি করলি!

সুপ্রীতি রান্নাঘরে ফিরে এসে মুখ চোখে গোঁজ করে বললেন, পরেশের দুজন বন্ধু এসেছে। এ সব কী শুরু হলো, মমো? এটা কি একটা আড্ডাখানা?

মমতা নীরবে হাঁটুতে থুতনি চেপে রইলেন।

সুপ্রীতি বললেন, আমি টুনটুনিকে ডেকে বলছি, এ বাড়িতে এসব উপদ্রব চলবে না। প্রতাপ এসে দেখলে দাপাদাপি করবে! প্রতাপের ও শরীর ভালো না।

মমতা বললো, থাক, আজকের দিনটা থাক।

সুপ্রীতি বললেন, পরেশ এ বাড়িতে বন্ধুদের ডেকে আড্ডা বসাবে, আর তুমি তাদের সবাইকে লুচি ভেজে খাওয়াবে? এত আস্কারা দিও না। তুমি মুখে কিছু বলতে না পারো, আমি পরেশকে ডেকে বলছি, তোমার বউকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাও।

মমতার আবার বললেন, আজ থাক। টুনটুনির বাচ্চা হবে, এই অবস্থায় ও অন্য কোথাও গিয়ে একাও তো থাকতে পারবে না'।

—কেন পারবে না? আজকাল কত অল্প বয়েসী ছেলেমেয়ে বিয়ে করে আলাদা বাসা ভাড়া করে থাকে। তাদের ছেলেপুলে হয় না?

পরেশের বন্ধুদের জন্য আরও খানিকটা ময়দা মাখতে লাগলেন মমতা, সুপ্রীতি গজগজ করতে করতে বঁটি নিয়ে বেগুন কেটে দিলেন।

মমতার ভয়টা অন্য জায়গায়। টুনটুনি একটা ভুল করে ফেলেছে, সেই জন্যই পরেশের সঙ্গে তার বিয়েটা বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছে তাঁদের। কিন্তু পরেশের মতিগতি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নিজের বাড়িতে সে এই বিয়ের কথা জানায়নি। পরেশ যদি হঠাৎ এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দেয়, টুনটুনিকে আর না নেয়? তাহলে কি টুনটুনি আর তার গর্ভের সন্তানের বোঝা সারা জীবন প্রতাপকেই টানতে হবে? অথবা পরেশের নামে তখন মামলা-মকদ্দমা করতে হবে, সে একটা বিশ্রী ব্যাপার। সেই জন্যই তো মমতা কোনো রকমে একটা বছর সহ্য করে যেতে চান। একটা বছর পর অন্তত পরেশ যদি ভালোয় ভালোয় টুনটুনিকে নিয়ে যায়...

এই সময় টুনটুনি রান্নাঘরে আসতেই মমতা সুপ্রীতির দিকে একটা স্থির দৃষ্টি দিয়ে অনুনয় করলেন, যেন তিনি ঐ প্রসঙ্গটা না তোলেন।

টুনটুনি বললো, ও মা, তোমরা এইসব লুচিটুচি করতে গেছ কেন? ওর বন্ধুরা কাটলেট এনেছে। এই একগাদা!

মমতা ক্লিষ্টভাবে বললেন, না, না, ওরা খাবার আনবে কেন? তুই বারণ করে দিস।

সুপ্রীতি রাগ গোপন করে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

পরেশ তার বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে গেল, সাড়ে পাঁচটায়, টুনটুনিকেও সঙ্গে নিয়ে গেল কোনো সিনেমা দেখাবে বলে। একটু পরেই প্রতাপের বাড়ি ফেরার কথা। পরেশ পারতপক্ষে প্রতাপের মুখোমুখি পড়তে চায় না। মমতা জানেন, সিনেমা দেখে ফেরার সময় পরেশ টুনটুনিকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাবে, তখন আর ওপরে আসবে না।

প্রতাপ অবশ্য ফিরলেন আর ও দেড় ঘণ্টা বাদে। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। আদালত থেকে একবার বাড়ি এসে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না প্রতাপের, অন্য কোনো কাজ থাকলে একবারে সেরে আসেন। বিমানবিহারী কিংবা মামুন সাহেবের কাছে যান প্রায়ই। আজ অবশ্য অন্য একটা জায়গায় যেতে হয়েছিল।

জামা-প্যান্ট ছাড়তে ছাড়তে প্রতাপ বললেন, আজ কী হলো জানো? কোর্ট থেকে সোজা বাড়ি ফিরবো ভেবে শিয়ালদা স্টেশনে এসেছি, হঠাৎ নেপুকাকার সঙ্গে দেখা। নেপুকাকা কে জানো তো? মালখানগরে আমাদের বাড়ির পুব দিকে, বড় পুকুরটার ধারে নেপুকাকাদের বাড়ি ছিল, তোমার বোধ হয় মনে নেই। আমি ও প্রথমে চিনতে পারিনি, অনেক বছর দেখিনি, বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন, নেপুকাকা। বেশ লম্বা চওড়া মানুষ ছিলেন, এক সময় হাতের গুলি ফুলিয়ে আমাদের বলতেন, টিপে

দ্যাখ, দাবাতে পারবি? একেবারে লোহা! দুর্গা পুজোর সময় পাঁঠা বলি দিতেন নেপুকাকা। আগে একজন কামারকে ডাকা হতো। একবার নেপুকাকা বললেন, কামার লাগবে কিসে, আমিই বলি দিতে পারি। খাঁড়া নিয়ে এক কোপে কাটা চাই, তাও আবার অষ্টমীর দিন জোড়া, পাঁঠা, খালি গায়ে, কপালে সিঁদুর লাগিয়ে, খাঁড়া হাতে নেপুকাকাকে দেখাত ঠিক কাপালিকের মতন...

মমতার এ গল্প শোনার মন নেই। আজ বিকেল থেকে তিনি শুধু ভাবছেন ছেলের কথা। কেন যেন তাঁর মনে অযৌক্তিক একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে, যে বাবলু এবার শিগগিরই ফিরে আসবে। সেই যে শিলিগুড়িতে চাকরি নিয়ে গিয়েছিল, তারপর আর বাবলু বাড়ি ফেরেনি, মমতার সঙ্গে দেখা হয়নি, তিন বছরের বেশী হয়ে গেল। বাবলুরও কি মন কেমন করে না?

আর একটা কথাও মমতার মনে হচ্ছে। বাবলু যদি হঠাৎ এসে পড়ে, তাহলে সে থাকবে কোথায়? বাড়ি বদল করার সময় বাবলুর জন্য একটা আলাদা ঘর রাখার কথা চিন্তাই করা হয়নি। বাবলুকে কি চিরকালের জন্য নির্বাসন দেওয়া হয়েছে? এ বাড়িতে সুপ্রীতির ঘর আছে, টুনটুনিকেও ঘর দিতে হয়েছে, শুধু বাবলু ও মুন্নির কোনো নিজস্ব ঘর নেই।

প্রতাপ বললেন, আমি চিনতে না পারলেও নেপুকাকা ঠিক চিনেছেন আমাকে। নেপুকাকা বয়েস খুব বেশী না, পঁয়ষট্টি ছেষট্টি হবে, কিন্তু কুঁজো হয়ে গেছেন এরই মধ্যে। নেপুকাকা আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন, উনি এখন থাকেন যাদবপুরে, সেখানে আমাকে জোর করে নিয়ে যাবেনই যাবেন। আমি আর শেষপর্যন্ত না বলতে পারলাম না।

মমতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন যাদবপুরে ঘুরে এলে?

প্রতাপ বললেন, না গিয়ে পারলাম না যে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। এইসব পুরোনো মানুষজনের সঙ্গে আর দেখা না হওয়াই ভালো। যাদবপুরের অনেকখানি ভেতরে একটা জবরদখল কলোনিতে নেপুকাকা বাড়ি করেছেন। নেপুকাকার চার-চারটি মেয়ে, তারপর এক ছেলে। ছেলেটাই সবচেয়ে ছোট। দেশ ছেড়ে এসে নেপুকাকা এদিকে চাকরি বাকরি যোগাড় করতে পারেননি, কী করে এতদিন চালিয়েছেন কে জানে, তার মধ্যে ও আবার মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন।

মমতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন কিছু খাবে? নাকি চানটান করে একেবারে রাত্তিরের খাওয়া খেয়ে নেবে?

প্রতাপ বললেন, নেপুকাকার ওখানে দুটো সিঙ্গাড়া খেয়েছি, খিদে নেই। তারপর শোনো নেপুকাকার বউকে আমরা নতুন কাকিমা বলতাম, খুব সুন্দরী ছিলেন, এখন অবশ্য ওঁকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। নেপুকাকার বড় মেয়ের নাম সরস্বতী, সে আমাদের কানুর সমান বয়েসী, সেই সরস্বতী এরই মধ্যে বিধবা হয়ে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে নেপুকাকার, ওখানেই থাকে।

মমতা বললেন, আমি আসছি রান্নাঘর থেকে।

প্রতাপ বললেন, আর একটু দাঁড়াও, বাকিটা শুনে যাও। তোমাকে কেন এই সব বলছি জানো? একটা ব্যাপার দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। নেপুকাকার সঙ্গে যখন কলোনির মধ্যে সেই বাড়িটাতে হাজির হলাম, তখন দেখি নতুন কাকিমা বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির এক মহিলার সঙ্গে ঝগড়া করছেন। কী খারাপ ভাষা যে বলছেন, তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। সেই আমাদের সুন্দরী নতুন কাকিমা, যার দিকে আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম, তার এই দশা! নেপুকাকারও ঝগড়া থামাবার বদলে পাশের বাড়ির মহিলার দিকে তেড়ে গেলেন। আমার মনে হলো, এ কিসের মধ্যে এসে পড়লাম রে বাবা? এদিকে নেপুকাকা আমাকে ছাড়বেন না। যাই হোক, ঘণ্টাখানেক বসতেই হলো। টিনের চাল দিয়ে মোটামুটি দুখানা ঘরের একটা বাড়ি বানিয়েছেন। তার মধ্যে একগাদা লোক। নেপুকাকার ছোট ছেলেটি, বিয়ে করেছে, সে-ই সংসার চালায় এখন সামান্য কী একটা চাকরি করে। সরস্বতীর বড় ছেলেটির বয়েস তেইশ, সে বেকার। আমাকে যে জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন নেপুকাকা, তার আসল উদ্দেশ্য ঐ সরস্বতীর ছেলেটার জন্য একটা চাকরি যোগাড় করে দেওয়া। ওদের ধারণা, আমি একজন হাকিম, আমার অনেক ক্ষমতা। চাকরি দেবার কোনো ক্ষমতাই যে আমার নেই, তা ওদের বোঝাই কি করে। নেপুকাকা আর সরস্বতী প্রায় আমার পা ধরে আর কি!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামান্য অন্যমনস্কভাবে প্রতাপ বললেন, সবচেয়ে আশ্চর্য কী লাগলো যেন, ওদের মনগুলো পর্যন্ত ছোট হয়ে গেছে। পুকুর ধারে মস্ত বড় বাড়ি ছিল নেপুকাকাদের, নেপুকাকা এক এক সময় ঐ অত বড় পুকুরের এক ধার থেকে বাজখাঁই গলায় ডাকতেন আমাদের, আমরা এপার

থেকে শুনতে পেতাম। সেই নেপুকাকা এখন ঘ্যানঘেনে সুরে কথা বলেন। এখন ঐ ছোট ছোট ঘুপচি ঘরের মধ্যে থাকে, তাই জগৎটাও ওদের কাছে ভীষণ ছোট, সব কথাই স্বার্থ দিয়ে জড়ানো। দেখো, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা যায়, কিন্তু মনটাও যদি ছোট হয়ে যায়, তাহলে আর মনুষ্যত্বও থাকেনা। আত্মসম্মানজ্ঞানটা নষ্ট হয়ে গেলে মানুষের সব কিছুই চলে যায়।

মমতা ঝাঁঝালো স্বরে বললেন, আমাদেরও মন ছোট হয়ে গেছে। আমরাও তো ছোট ছোট ঘুপচি ঘরে থাকি! রিফিউজি কলোনি না হলেও---

প্রতাপ অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তার একটু অভিমান হলো। মমতা কি জানেন না যে, বাড়ি ভাড়াই তাঁর সাধ্যের অতিরিক্ত? তবু নেটুকাকাদের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না।

মমতা বললেন, বাবলু যদি ফিরে আসে, তখন সে কোথায় থাকবে, তা কখনো ভেবে দেখেছো?

প্রতাপ বললেন, বাবলু? সে আসবে--চিঠি লিখেছে নাকি?

মমতা বললেন, তুমি কি চাও, তোমার ছেলে আর না ফিরুক?

প্রতাপ বললেন, কী পাগলের মতন কথা বলছো? বাবলুর এখনও ফেরার সময় হয়েছে নাকি? পি এইচ ডি কমপ্লিট না করে ফেরার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া, পলিটিক্যাল সিচুয়েশান খানিকটা ইমপ্রুভ না করলে--- বিমান বলেছে, সামনের ইলেকশানে যারাই পাওয়ারে আসুক, বন্দমুক্তি আর পুরোনো কেস উইথ ড্র করার ব্যাপারে তাদের কিছু প্রতিশ্রুতি দিতেই হবে।

–টুনটুনিকে যে তুমি একেবারে পছন্দ করো না, সেটা কি খুব বড় মনের পরিচয়?

–টুনটুনি যা কাণ্ড করেছে, সে জন্য তাকে চাবকানো উচিত ছিল, তবু তো আমি সব সহ্য করেছি।

–তবু টুনটুনি তোমার নিজের বোনের মেয়ে। সে যদি একটা ভুল করেই থাকে, তবু কি তাকে একেবারে ফেলে দেওয়া যায়? তুমি টুনটুনি আর পরেশকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলো নি?

প্রতাপ অভিযোগ শোনা একেবারে পছন্দ করেন না। তাঁর ব্যবহারের কোনো দোষ দেখালে তিনি উত্তর দেবার বদলে রেগে যান। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করছি, সংসার চালাতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, আর ঐ মেয়ে এ বাড়িতে থেকে বেলেল্লা করবে? নিজের বোনের মেয়ে হলেও এসব সহ্য করবো না!

মমতা বললেন, আমারও মন ছোট হয়ে গেছে। ঠাকুরঝিকে তুমি বরানগরের বাড়ি থেকে আদর করে নিজের বাড়িতে ডেকে আনলে, তোমার নিজের দিদি, কিন্তু সত্যি কথা বলছি, এক এক সময় আমার মনে হয়, আমি কি সারা জীবন ধরে ঠাকুরঝির সেবা করে যাবো? ওঁর যখন অত বড় অসুখ হলো, তখন আমি এমনও ভেবেছি যে--

প্রতাপ ধমক দিয়ে বললেন, মমো! চুপ করো।

মমতা তবু বললেন, ঘুপচি ঘুপচি ঘরে থেকে আমাদেরও মন ছোট হয়ে গেছে। তোমার নেপুকাকার আর দোষ কী ! নিজের দিদিকে তুমিও কি আজকাল সেই আগের মতন খাতির করো? দিনের পর দিন একটা কথাও তো বলো না ওঁর সঙ্গে।

প্রতাপ বললেন, তুমি খালি আমার দোষই দেখো!

মমতা বললেন, আমি নিজের দোষও অস্বীকার করছি না। সব সময় শুধু টাকার চিন্তা, এ আমার আর ভালো লাগে না! বাবলুটা কত কষ্ট করে ওখানে থাকে, তার মধ্যেই সে একবার তো টাকা পাঠিয়েছিল। তুমি তা ফেরত দিলে।

প্রতাপ বললেন, সে কষ্ট করে থাকে বলেই তার টাকা ফেরত দিয়েছি। টাকা রোজগার করতে গিয়ে তার পড়াশুনো নষ্ট করার দরকার নেই!

আর কথা না বাড়িয়ে প্রতাপ দপদপিয়ে চলে গেলেন স্নান করতে। মমতা টাকার খোঁচা দিলে প্রতাপের সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়।

এক একদিন হঠাৎ একটা দারুণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়।

স্নান সেরে ফিরে এসেই প্রতাপ আদালতের নথিপত্র খুলে গুম হয়ে বসে রইলেন। মমতার সঙ্গে একটাও কথা বললেন না। মমতাও অনবরত চোখের জল মুছছেন। এই পরিবারে আজ আর গুমোট কাটার সম্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু সিনেমা দেখে ফেরার সময় টুনটুনি নিচের চিঠির বাক্স থেকে একটা চিঠি নিয়ে এলো। মুন্নি

কলেজ থেকে ফেরার সময় রোজ বাক্সটা দেখে আসে, এই চিঠি তার পরে এসেছে।

বিদেশের চিঠি দেখেই মমতার বুকটা ধক করে উঠলো। আজ সারা দিন বাবলুর কথা মনে পড়েছে, ডান চোখের পাতা কেঁপেছে কয়েকবার, ঠিক বাবলুর চিঠি এসেছে সেই জন্য। বাবলু কি ফিরে আসছে!

টুনটুনির কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে স্ট্যাম্প দেখে মুন্নি বললো, এটা আমেরিকার চিঠি নয় মা, বিলেতের।

লম্বা খামে বেশ মোটাসোটা চিঠি, যদিও ওপরে প্রতাপের নাম আছে, তবু মুন্নি বাবাকে দেখাবার আগেই ছিঁড়ে ফেললো। এক খামের মধ্যে তুতুল প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা চিঠি দেয়। খাম খোলার পর মুন্নি নিজের চিঠিটা নিতে গিয়ে সবিস্ময়ে বললো, এর মধ্যে একটা চেক।

সুপ্রীতি জপে বসেছেন একটু আগে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠতে পারবেন না। তবু মুন্নি তাঁকে চিঠি আসার কথাটা শুনিয়ে বাবার ঘরে চলে এলো।

প্রতাপ চেকটা নিয়ে বললেন, তুতুল টাকা পাঠিয়েছে, দু'শো পাউন্ড, এ যে অনেক টাকা!

মুন্নি বললো, মা, তোমার খুব ফ্রিজের শখ, এবার একটা ফ্রিজ কিনে ফেলো।

মমতা স্বামীর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, আমার মাথার দিব্যি রইলো, তুমি এ টাকা কিছুতেই ফেরত পাঠাতে পারবে না। তোমার যত অহঙ্কারের ফল ভোগ করতে হয় আমাদের।

প্রতাপ গম্ভীরভাবে বললেন, এবারে তুতুল বুদ্ধি করে চেকটা তোমার নামে পাঠিয়েছে। তুতুলের আগের টাকা আমি ফেরত দেইনি, সে মুসলমান বিয়ে করেছে বলে দিদি সে টাকা নিতে চায়নি। এবার এ টাকা ফেরত দেবার অধিকার শুধু তোমার।

মমতা হাত বাড়িয়ে চেকটা নিয়ে ভালো করে দেখলেন। চেক নয়, ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট, সেটা সত্যিই মমতার নামে, এবং সত্যিই দুশো পাউন্ড!

মমতা তাকালেন টুনটুনির দিকে। এমন একটা সুখবর ওর হাতে দিয়ে এসেছে। টুনটুনির জন্য হঠাৎ বেশ স্নেহবোধ করলেন মমতা। আহা, পোয়াতী মেয়েটাকে রোজ এখন একটু দুধ খাওয়ানো দরকার।

॥ ৫৩ ॥

প্রতাপের বাড়ি বেশ দূরে, তাই মামুন আদালতেই দেখা করতে এলেন। এই ক'মাসে বেশ রোগা হয়ে গেছেন মামুন, মাথার চুল আরও পেকেছে, প্রায় সমবয়স্ক হলেও প্রতাপের তুলনায় তাঁকে বেশি বয়স্ক দেখায়। প্রতাপ একটা মামলায় রায় লিখছিলেন বলে মামুনকে কিছুক্ষণ বসতে হলো। কয়েকজন উকিলবাবু গল্প করতে লাগলেন তাঁর সঙ্গে, জয়বাংলার মানুষ সম্পর্কে সকলেরই খুব কৌতূহল। উকিলবাবুদের মধ্যে অনেকেরই বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে, পুরোনো কথা কার কতটা মনে আছে তা নিয়ে প্রায় একটা প্রতিযোগিতা চলে। যে কোনো জায়গায় গেলেই মামুন দেখতে পান, পাঁচজনের মধ্যে অন্তত তিনজন এসেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে। সাধে কী আর এখানকার কেউ কেউ এক এক সময় বলে ওঠে, ওফ্ বাঙালরা কলকাতা শহরটা একেবারে দখল করে নিল!

খানিকবাদে দুই বন্ধু শিয়ালদা কোর্ট থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। বাতাসে একটু শীত শীত ভাব, মামুন কুর্তা-পাজামার ওপর শাল জড়িয়ে এসেছেন, প্রতাপ অবশ্য কোনো গরম জামা পরেননি।

মামুন বললেন, প্রতাপ, তোমার মনে আছে, এখানে নরেন কেবিন বলে একটা চায়ের দোকান ছিল, ছাত্র বয়েসে আমরা সেখানে ডিমের চপ খেতে যেতাম? বেশ বানাতো কিন্তু! সেই দোকানটা আছে এখনও?

প্রতাপ হেসে বললেন, কী জানি! ওদিকে তো আমার অনেকদিন যাওয়া হয় না।

মামুন বললেন, চলো না, আজ সেইখানে গিয়ে চা খাই! নাকি তুমি হাকিম বলে ওইসব জায়গায় তোমার যাওয়া চলে না? নিষেধ আছে?

প্রতাপ বললেন, না, না, নিষেধ আবার কি? রাস্তায় বেরুলে কে হাকিম আর কে আসামী তা কি চেনার উপায় আছে? আমার কথা বাদ দাও, আমি তো একটা চুনোপুঁটি, জেলায় থাকার সময় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের কত ক্ষমতা দেখেছি, কত তাদের তেজ আর দাপট, আবার তারাই যখন রাইটার্স

বিল্ডিংসে ডেপুটি সেক্রেটারি বা জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়ে আসে, তখন কলকাতার রাস্তায় তাদের কে পৌঁছে? কলকাতা সবাইকে গ্রাস করে নেয়।

মামুন বললেন, তাইলে চলো না একবার নরেন কেবিনে যাই?

প্রতাপ বললেন, যাওয়া যেতে পারে। আমাকে একবার ওরা ছুরি মারার চেষ্টা করেছিল, আর বোধ হয় দ্বিতীয়বার মারবে না!

মামুন থমকে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন, ছুরি মারতে এসেছিল? কারা?

প্রতাপ বললেন, কারা সেটা বলা মুশকিল। নকশাল, না সি পি এম না কংগ্রেস! কে যে কখন কাকে ছুরি মারছে, তা কি বোঝার উপায় আছে? আমাকে সম্ভবত মারতে এসেছিল নকশালরাই, ওরা দু-একজন জজ-ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করেছে, অথচ আমার ছেলে ছিল ওই দলে। কচি কচি ছেলে, তাদের কারা যে এই সব উসকানি দেয়!

মামুন বললেন, তাহলে যেতে হবে না! তুমি এই কথাটা তো আমাকে আগে বলো নাই?

প্রতাপই এবার মামুনের হাত ধরে টেনে বললেন, চলো যাই, ইচ্ছে যখন হয়েছে, আরে ছাত্রদের ভয় পেলে কি চলে? তারা তো তোমার-আমার ঘরেরই ছেলেপুলে। তবে ইদানিং খুনোখুনি একটু কমেছে।

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পরেও সেই নরেন কেবিন অবিকল একই রকম আছে। বাঙালীরা ব্যবসায়ের উন্নতি বিশেষ পছন্দ করে না, কোনোমতে টিকিয়ে রাখতে পারলেই হলো। একটা টেবিল-চেয়ারও বাড়েনি কিংবা কমেনি, শুধু দেওয়ালগুলি মলিন হয়েছে। কাউন্টারে একজন মাঝবয়েসী লোক, সম্ভবত আগেকার মালিকের ছেলে। তার পেছনে ঝুলছে জবাফুলের মালা পরানো একটা কালীঠাকুরের ছবি।

মামুন ভেতরে ঢুকে চারপাশটা দেখলেন আবেগ মাখানো চোখে। এই সময়ে দোকানে বিশেষ ভিড় নেই, দিনের বেলায় ছাত্ররা চলে গেছে, সন্ধের ছাত্ররা এখনো আসেনি, দুটো তিনটে টেবিলেই ফাঁকা। মামুন একদিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই টেবিলটায় আমাদের আড্ডা ছিল, তাই না?

তারপর তিনি দোকানের মালিকের দিকে হাতজোড় করে বললেন, নমস্কার। জানেন, ছাত্র বয়েসে আমরা এখানে আসতাম, বহু বৎসর হয়ে গেল, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে!

মালিকটি প্রতি নমস্কার করে বললো, জয়বাংলা থেকে এসেছেন? বসুন, বসুন, কী খাবেন?

মামুন বললেন, এগ চপ! একসময় এই নরেন এগ চপ ফেমাস ছিল। এখনও হয়?

মালিকটি বললো, অবশ্যই। ডিমের ডেভিল আছে, সেই সঙ্গে মটন ঘুগনি খেয়ে দেখুন। এখন খুব চলছে।

টেবিলে বসার পর মামুন প্রতাপকে জিজ্ঞেস করলেন, দেখেই কী করে বুঝলো আমি জয়বাংলার লোক?

প্রতাপ বললেন, তোমার উচ্চারণ শুনে বুঝেছে।

মামুন বললেন, আমি কলকাতায় এতদিন ছিলাম, ঘটিভাষাপারফেক্ট বলতে পারি।

প্রতাপ বললেন, তবু একটা টান থেকে যায়, বুঝলে! আমি তো টানা এত বছর ধরে আছি, তবু আমার কথা শুনেও অনেকে ধরে ফেলে। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের উচ্চারণে সেই টান নেই। এক জেনারেশন উচ্চারণ চেইঞ্জ করা যায় না।

মামুন বাইরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রিপন কলেজের নাম এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ হয়েছে? আর সেন্ট্রাল কলেজ এখন মৌলানা আজাদ? আর কী কী নাম বদল হয়েছে?

–হয়েছে অনেক কিছু। হ্যারিসন রোডের নাম এখন মহাত্মা গান্ধী রোড তা জানো তো!

–সেটা দেখেছি। এর মধ্যে দুই তিনদিন কলেজ স্ট্রিটে গেছিলাম। আচ্ছা প্রতাপ, আমাদের সাথে যারা পড়তো, লুতফর রহমান, বৈদ্যনাথ, সুবিমল এরা সব কোথায় আছে জানো?

–নাঃ, খবর রাখি না। সুবিমল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সারভিসে আছে, একবার ট্রেনে দেখা হয়েছিল। চাকরি নিয়ে প্রথমে বেশ কয়েক বছর তো আমাকে মফস্বলে পোস্টিং নিতে হয়েছিল, তাই সকলের সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতাপ একটা সিগারেট ধরাতেই মামুন লোভীর মতন তাকালেন। ডাক্তারের নির্দেশে তাঁর সিগারেট খাওয়া একেবারে বন্ধ। কিন্তু আকাঙ্ক্ষাটা যায়নি। তিনি বলেই ফেললেন, একটা সিগারেট

খাবো নাকি আজ? পুরোনো দিনের কথা মনে পড়েছে এত–

প্রতাপ বললেন, না। ছেড়েছো যখন আর খেও না!

কলেজজীবনের টুকিটাকি গল্প করতে লাগলেন দু'জনে। অনেক স্মৃতি।

একসময় মামুন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, বুলার খবর কি? সে কোথায় থাকে?

প্রতাপ মামুনের চোখের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে হেসে বললেন, তোমার সেই 'আশমানের প্রজাপতি'? এখনো মনে রেখেছো তার কথা? নাঃ, তার খবর কিছু জানি না।

–তোমার সাথে তার আর কখনো দেখা হয়নি?

–তা অবশ্য দেখা হয়েছিল। বেশ কয়েকবারই দেখা হয়েছে। তবে গত কয়েক বছর আর দেখা হয়নি। টালিগঞ্জের দিকে থাকে, একটুকু জানি।

–একবার যাওয়া যায় না তার কাছে? ওর বাড়ির লোকজন কিছু কি মনে করবেন? বুলার স্বামী কি করেন?

–বুলার স্বামী এখানে থাকেন না। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বহু বছর। বুলার জীবনটা সুখের হয়নি।

–ইস রে! এত ভালো মেয়ে ছিল, অপরূপ সুন্দর ছিল গানের গলা। আমি তো মনে করতাম, বুলা একদিন পশ্চিমবাংলার নাম করা গায়িকা হবে। ওর ভালো নাম গায়ত্রী, তাও আমার মনে আছে। সত্যিকারের ট্যালেন্টেড মেয়ে, তার জীবনটা এরকমভাবে নষ্ট হয়ে গেল? আমাদের বাঙালীঘরের মেয়েদের অনেক গুণ থাকলেও তারা ব্যবহার করতে পারে না। কেন এমন হলো, প্রতাপ? বুলার স্বামী এমন মেয়ের গুণের কদর করতে পারলো না?

প্রতাপ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

মায়ের মৃত্যুর পরই দেওঘরের সঙ্গে চুকে গিয়েছিল প্রতাপের । বুলা দেওঘরেই থাকে, না টালিগঞ্জে থাকে, তা তিনি জানেন না। এক একবার টালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে বুলার সঙ্গে দেখা করবার বাসনা তাঁর মনে জাগে, আবার তা দমন করে ফেলেন। বুলার সম্পর্কে তাঁর যে টান, তাকে কি ভালোবাসা বলা যায়? না তিনি তো বুলাকে সেভাবে কখনো চাননি। তবু বুলা সম্পর্কে তাঁর খানিকটা অপরাধবোধ, খানিকটা দুর্বলতা, এবং খানিকটা অধিকারবোধও যেন রয়ে গেছে। সব মিলিয়ে একটা অদৃশ্য বন্ধন।

মামুন বললেন, প্রতাপ, তুমি বুলার বিয়ের খবর শুনে খুব কষ্ট পেয়েছিলে তাই না? একটা হালকা সুরে প্রতাপ বললেন, বুলাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলে তুমি, কষ্ট পাবার কথা তো তোমার! আমি কষ্ট পাবো কেন? তার সঙ্গে সেরকম কোনো সম্পর্ক তো আমার ছিল না।

মামুন ও হেসে বললেন, আরে, আমি তো শুধু কবিতা লিখেছি। যেমন লোকে নদী-সরোবর, বৃষ্টি-মেঘ-জ্যোৎস্না নিয়ে কবিতা লেখে, সেই রকমই প্রায়। আমি মুসলমানের ব্যাটা। সেই আমলে কোনো ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করার কথা কি স্বপ্নেও চিন্তা করা যেত? তাছাড়া বুলার বেশী পছন্দ ছিল তোমাকেই, তুমি তাকে অনায়াসে বিয়ে করতে পারতে।

বুলা যে একসময় বেপরোয়া হয়েই নিজের মুখে প্রতাপকে প্রায় বিয়ের প্রস্তাব জানিয়েছিল, সে কথা মামুনকে বলা হয়নি। এতদিন পর আর বলার ও কোনো মানে হয় না।

প্রতাপ বললেন, কেন, আমার বউ মমতাকে তোমার পছন্দ হয়নি? সে বুলার চেয়ে কোন অংশে কম?

মামুন লজ্জা পেয়ে বললেন, আরে, না, না, ছি ছি, মমতা বউঠানের তো তুলনাই হয় না। এইরকমভাবে বলাটাই আমার বোকামি হয়েছে। ওইসব পুরোনো কথা তোলার আর কোনো মানে হয় না, তাই না? তবু বুলার অসুখী জীবনের কথা শুনে খারাপ লাগলো। আর একবার দেখতে ইচ্ছে করে তাকে।

–তুমি দেখা করতে পারো। তোমরা পাশাপাশি গ্রামের মানুষ, তোমাকে দেখলে সে নিশ্চয় খুশি হবে।

–চলো না। আমরা দুইজনে একবার যাই। প্রতাপ, আমরা দুইজনেই সমানভাবে বুলাকে ভালোবেসেছিলাম, সে কথা এখন অস্বীকার করে লাভ কী? কিন্তু আমাদের ভালোবাসা ছিল নিষ্কলুষ। সেইজন্যই আমাদের দুইজনের মধ্যে রেষারেষি কিংবা বিবাদ হয়নি।

দোকানের মালিক জয়বাংলার অতিথিকে খাতিরে দেখাবার জন্য নিজের হাতে খাবার নিয়ে এলো। আস্ত ডিম সেদ্ধ করে তার ওপর বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে ভাজা, তারই নাম এগ চপ কিংবা ডিমের ডেভিল। সঙ্গে এক প্লেট করে কিমা মেশানো ঘুগনি।

মাঝখানে খাবার এসে পড়ায় বুলা প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। একদল ছাত্র ঢুকলো হই হই করে। তারা আলোচনা করছে বাঙলাদেশ বিষয়ে। তাদের কোলাহলে মামুন আর প্রতাপ চুপ করে রইলেন একটুক্ষণ।

মুজিবনগরের বাংলাদেশ সরকারকে ইন্দিরা গান্ধী কেন স্বীকৃতি দিচ্ছে না, এই নিয়ে তর্ক বেঁধেছে দুই দল ছাত্রদের মধ্যে। ওরা কয়েকজন সম্প্রতি অনেকগুলি শরনার্থী শিবির দেখতে এবং ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিতে গিয়েছিল বোঝা গেল। তিরানব্বই লাখ শরণার্থী এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে ভারতে। ক্যাম্পগুলোতে কলেরায়, বন্যায়, অপুষ্টিতে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে শয়ে শয়ে, আর কতদিন এরা এইভাবে টিকে থাকতে পারবে? ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টই বা কতকাল এদের বোঝা বইবে? পৃথিবীর অন্য শক্তিগুলো মুখ ফিরিয়ে আছে। ইন্দিরা গান্ধীর উচিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্রের মর্যাদা পেলে তখন ইন্ডিয়া খোলাখুলি বাংলাদেশকে সামরিক সাহায্য দিতে পারবে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো হবে না। ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যে নিয়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যদের দমন করা ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের আর কোনো গতি নেই।

ছাত্রদের অন্য দলটি বলেছে, ভারতীয় সৈন্য কেন ইস্ট পাকিস্তানে ঢুকবে? সেটা অ্যাগ্রেশান। বাংলাদেশের যুবশক্তি মুক্তিযুদ্ধ চালাচ্ছে, তারা সেই গেরিলা যুদ্ধই চালিয়ে যাক। তাতে যত সময় লাগে লাগুক। মুক্তিযোদ্ধারাই দেশটাকে স্বাধীন করতে পারলে সেটাই হবে তাদের পক্ষে সবচেয়ে সম্মানজনক। সারা পৃথিবীর সামনে তারা গর্বিত মাথা তুলে দাঁড়াবে!

প্রতাপ নিচু গলায় বললেন, এইসব ছেলেরা একদিন চীন, মাও সে তুঙ, ভিয়েতনাম, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতো না। হঠাৎ যে বাড়ির পাশের আগুনের দিকে তাদের চোখ পড়েছে, এটাই আশ্চর্য কথা।

মামুন বললেন, এই যে ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবার কথা বলছে, আমাদের জেনারেল, ওসামানিরও সেই মত। তিনি ইন্ডিয়ান আর্মির পারটিসিপেশন ছাড়াই মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান। এটা একটা সর্বনেশে কথা!

প্রতাপ বললেন, কেন? এ কথাটা তো আমার কানেও মন্দ ঠেকছে না। অনিশ্চতভাবে কতদিন এই মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব? ততদিনে যে দেশটা একেবারে ছারখার হয়ে যাবে। আমাদের কাছে নিয়মিত খবর আসে, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আর্মির হাতে মারা যাচ্ছে। লুটপাট চলছে প্রচণ্ড। বাংলাদেশের সোনাদানা সব পাচার হয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা যতই সাহসের পরিচয় দিক, গাদা বন্দুক আর হাতবোমা নিয়ে কি একটা আধুনিক, অর্গানাইজড সেনাবাহিনীকে খতম করা যায়? মানুষ মারতে ওদের একটু ও দ্বিধা নেই, প্রতাপ, কত পরিবার যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, তা তোমরা ঠিক বুঝবে না।

একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামুন আবার বললেন, আরও একটা কথা আছে। আমরা মুখে বলি বটে, যে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী স্বাধীন বাংলা চায়। কিন্তু আসলে তা তো সত্যি নয়! দেখো, ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন প্রায় বাতিল করে দিয়ে একটা উপ-নির্বাচন ডাকলো। আমরা এখান থেকে ভেবেছিলাম বাংলাদেশের একটা মানুষও সেই উপ-নির্বাচনে অংশ নেবে না, তারা সেই নির্বাচন বয়কট করবে। কিন্তু তা তো হলো না! শত শত হঠাৎ গজানো নেতা সেই উপ-নির্বাচনের ক্যান্ডিডেট হয়েছে। এইসব মানুষ কারা? আমি এক এক সময় ভাবি, বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয়, তখন এইসব বিশ্বাসঘাতক কী ভূমিকা নেবে? তারপর ধরো, রাজাকার, আল বদর, আল শামস, এইসব বাহিনীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, এরাও তো বাঙালী! পাক আর্মি এখন এদেরই বেশি করে লেলিয়ে দিচ্ছে মুক্তিবাহিনীর দিকে। শান্তি কমিটি, জামাতে ইসলামের লোকেরা বেছে বেছে খুন করছে শিক্ষিত বাঙালীদের। এইসব খবরই আমরা পাই আর শিউরে উঠি। বাঙালীর হাতেই মরছে বাঙালীরা। যাকে আমরা সোনার বাংলা বলি, তার চতুর্দিকে এখন শুধু গোরস্থান আর শ্মশান।

প্রতাপ বললেন, ওঃ, এত হত্যা আর অত্যাচারের কথা আর সহ্য করতে পারি না। এক এক সময় এই মানুষ জাতটার ওপরেই ঘেন্না ধরে যায়।

মামুন বললেন, আরও বিপদ আছে। এদেশে তিরানব্বই লাখ শরণার্থী এসেছে। ভারত সরকার যতদূর সম্ভব সাহায্য করার করছে, তা অস্বীকার করি না। সাধারণ মানুষও খুবই সহানুভূতি দেখাচ্ছে এ পর্যন্ত। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে কি এই সহানুভূতি ঠিক থাকতে পারে? পাকিস্তানী এজেন্ট আর কট্টর ইসলামপন্থী এদেশেও কম নেই। তারা যদি কোনোক্রমে একটা দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে পারে, তা হলে আমাদের কী অবস্থা হবে, চিন্তা করতে পারো? আমাদের নেতারা যারা এখনো পর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আছে মোটামুটি, তারাই বা কতদিন এরকম থাকতে পারবে? তোমাকে একটা ঘটনা বলি শোন। একদিন আমি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামান সাহেবের অফিসঘরে বসেছিলাম। একসময় আওয়ামী লীগের কয়েকজন মাঝারি গোছের নেতা এলেন দেখা করতে। তেনারা আবার জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। একথা সেকথার মধ্যে তাঁরা আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদের নামে নিন্দামন্দ চালিয়ে যেতে লাগলেন। একজন তো হঠাৎ কামরুজ্জামান সাহেবকে তোল্লাই দেবার জন্য বলেই ফেললেন, আপনি অল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, আপনাকে বাদ দিয়ে তাজউদ্দিন সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসলেন কীভাবে? আমরা তো ভেবেছিলাম আপনিই...

দেখো প্রতাপ, কামরুজ্জামানকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি, তবু আমার বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল। অতিরিক্ত তোশামোদে পাথরও গলে যায়। বাঙালী পলিটিশিয়ানরা কোন্ ছার! কিন্তু কামরুজ্জামান উঠে দাঁড়িয়ে চক্ষু লাল করে বললেন, দেশ থেকে বাড়িঘর, বউ ছেলেমেয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছেন, কিন্তু আপনারা চরিত্রটা ফেলে আসতে পারেননি? এখানেও আমাদের মধ্যে ঝগড়া লাগাতে এসেছেন? আগে অন্তত সবাই মিলেমিশে দেশটা স্বাধীন করুন, তারপর ফিরে গিয়ে যত ইচ্ছে দলাদলি করবেন!

ছাত্রদের চ্যাঁচামেচি তুঙ্গে উঠেছে, আর এখানে বসা যায়না। প্রতাপ উঠে পড়ে বিল মেটাতে গেলেন, দোকানের মালিক হাত জোড় করে বললেন, পয়সাটা থাক স্যার!

মামুন বললেন, আরে সে কি! পয়সা নেবেন না কেন?

মালিকটি বললো, আপনারা জয়বাংলা থেকে এসেছেন। আমার দোকানে খেয়েছেন, এতেই ধন্য হয়েছি। এই সামান্য পয়সা আর কী নেবো?

প্রতাপ বললেন, ইনি জয়বাংলার মানুষ, আমার সঙ্গে জয়বাংলার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এনাকে সঙ্গে করে এনেছি, আমি কেন বিনা পয়সায় খাবো? আপনার ইচ্ছে হলে টাকাটা বাংলাদেশ ফাণ্ডে চাঁদা দিয়ে দেবেন!

প্রায় জোর করেই দুজনের খাবার ও চায়ের দাম কাউণ্টারের ওপর রেখে প্রতাপ বেরিয়ে এলেন।

মামুন বললেন, যাই বলো, এইসব ব্যবহার বেশ টাচিং। সর্বত্রই এইরকম ভালো ব্যবহার পাই। আমাদের কারুর এখন ট্রেনের টিকিট কাটতে হয় না। সঙ্গে পরিচয়পত্র থাকলে ট্রামে-বাসেও ভাড়া লাগে না।

প্রতাপ বললেন, একটা কথা তুমি ঠিকই বলেছো। এখন সাধারণ লোকে যে খাতির করছে, আর বেশিদিন থাকলে সেটা আর পাবে না।

মামুন বললেন, অতিথিদের পনেরো দিনের বেশি থাকার কথা নয়। আমাদের প্রায় আট মাসের ওপর হয়ে গেল! কবে যে দেশে ফিরতে পারবো তা জানি না! দাও প্রতাপ, আজ একটা অন্তত সিগারেট দাও! আজ মনটা খুব চঞ্চল লাগছে। হঠাৎ যেন ছাত্র বয়সে ফিরে গেছিলাম।

ঝুলোঝুলি করে মামুন একটা সিগারেট আদায় করে ছাড়লেন। সেটাতে আরাম করে টান দিয়ে তিনি বললেন, প্রতাপ, তুমি নরেন কেবিনের মালিককে বললে, তুমি জয়বাংলার কেউ না। তুমি বাংলাদেশের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারো? বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তুমি মালখানগরে একবার যাবে না?

একটুও দ্বিধা না করে প্রতাপ বললেন, না!

– সে কি! মালখানগরে তোমাদের বাড়িটা আর একবার দেখতে ইচ্ছে করে না! বাংলাদেশ স্বাধীন হলে যাওয়া-আসার আর কোনো অসুবিধা থাকবে না আশা করি।

–অসুবিধে না থাকলেও হয়তো ঢাকায় যেতে পারি, বেড়াতে, কিন্তু মালখানগরে আর গিয়ে কী হবে বলো? সিক্সটি ফাইভের আগে তো ওদিক থেকে কিছু লোকজন যাওয়া আসা করতো। তাদের মুখে শুনেছি, আমাদের বসতবাড়ির দরজা-জানলাও কারা যেন খুলে নিয়ে গেছে। পুকুরের ওপারে

আমাদের যে বাগানটা ছিল, সেটা নাকি একেবারে নিশ্চিহ্ন, সেখানে চাষ হয়। আমাদের বৈঠকখানা বাড়িটা পাকিস্তান সরকারের কী একটা অফিস হয়েছে। এইসব দেখার জন্য ফিরে যাবো? এর মধ্যে বাড়িটা যদি কেউ জবরদখল করে থাকে, সে আমাকে দেখে আঁতকে উঠবে না? কেউ কি সেখানে আমাকে আদর করে বসতে দেবে? না, মামুন, যা গেছে তা গেছে। আমাদের বাড়িটার যে সুন্দর ছবিখানা মনের মধ্যে গেঁথে আছে, সেটাই থাক। ফিরে গিয়ে শুধু কষ্ট পাবো। সেই ছবিটা নষ্ট করেই বা কী লাভ হবে!

মামুন চুপ করে রইলেন।

একসময় প্রতাপ মামুনকে পৌঁছে দিলেন পার্ক সার্কাসের বাড়িতে। মঞ্জু হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান তুলতে, সেখানে রয়েছে পলাশ, বরুণ ও আরও তিন চারটি ছেলেমেয়ে। মামুনের মেয়ে হেনা বাড়িতে নেই, সে কয়েকদিনের জন্য গেছে ফার্স্ট এইড ও নার্সিং-এর ট্রেইনিং নেবার জন্য। মহেন্দ্র রায় লেনে বাংলাদেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে খোলা হয়েছে এই শিবির। বেগম সাজেদা চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন পরিচালনা করেছেন সেই শিবির। গৌরী আইয়ুবের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তিনিই মামুনকে বলেছিলেন, আপনার মেয়েকেও এই ট্রেইনিং দিইয়ে রাখুন না। স্বাধীনতার জন্য মেয়েদেরও তো কিছু অংশ নিতে হবে!

প্রতাপ কিছুক্ষণ থেকে ছেলেমেয়েদের গানবাজনা শুনে বিদায় নিলেন।

মামুন কিন্তু বুলার কথা ভুললেন না। তিন চারদিন পর আবার একদিন প্রতাপের কাছে এসে বললেন, একবার কি তার বাসায় যাওয়া যায় না? আমরা শুধু দেখা করে দুটো কথা বলবো, তাতে দোষের কী আছে? তুমি তো ওদের বাসা চেনো!

প্রতাপ প্রথমে অন্য প্রসঙ্গ তুলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। টালিগঞ্জে বুলার শ্বশুরবাড়িতে প্রতাপ কখনো যাননি বটে, কিন্তু তাঁর ভজুমামার বাড়ির কাছেই সেই বাড়ি, তিনি দূর থেকে দেখেছেন। ভজুমামাদের বাড়িতেও প্রতাপের আর যেতে ইচ্ছে করে না।

মামুন অন্য কথায় ভুললেন না। হার্টের অসুখটা হবার পর থেকেই তিনি বড় বেশি স্মৃতি রোমন্থন শুরু করেছেন। বুলাকে তিনি মনে মনে তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ কিছু সময় নিবেদন করেছিলেন, এখন তিনি সেই বুলার কাছে আর একবার ফিরে যেতে চান। সে যেন যৌবনেই ক্ষণেকের জন্য ফিরে যাওয়া। বুলা যে এখন একজন প্রৌঢ়া মহিলা, তা তিনি জানেন, তিনি নিজেও তো প্রায় বৃদ্ধ, তিনি তো আর বুলার রূপদর্শন করতে চাইছেন না, বুলার সঙ্গে তিনি পুরোনো দিনের কথাই বলবেন।

প্রতাপকে শেষপর্যন্ত রাজি হতেই হলো। এসপ্ল্যানেডে এসে তাঁরা টালিগঞ্জের ট্রাম ধরলেন। এ বছরের মতন গরম বিদায় নিয়েছে, বাতাস বেশ মোলায়েম রকমের ঠাণ্ডা। ময়দান দিয়ে ছুটছে ট্রাম, কোনো একটা ফুটবল ম্যাচের পর রাশি রাশি যুবক সেই ট্রামের সর্বত্র বাদুড়ের মতন ঝুলছে, তাদের আনন্দধ্বনি ও খিস্তিখেউড়ে কান পাতা যায় না, তবু মামুন তারই মধ্যে প্রতাপকে শোনাচ্ছেন বুলার বিয়ের দিনটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা।

প্রতাপ অবশ্য তা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন না। তাঁর মনে পড়ছে বুলার দেওর সত্যেনের কথা। দেওঘরের সেই সন্ধ্যা, সত্যেন সেদিন বুলাকে ছোট গিন্নি বলে সম্বোধন করেছিল, বুলার হাত ধরে জোর করে টেনে তাকে গান গাইতে বলেছিল। দেওর হিসেবে সে বউদির সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতেই পারে, কিন্তু প্রতাপ কিছুতেই সেটা পছন্দ করতে পারেননি, তাঁর অহেতুক রাগ হচ্ছিল।

সত্যেন এখন বেশ নামী লোক, কাগজে প্রায়ই তার নাম বেরোয়, কিছুদিন আগে তার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। সে খবরও প্রতাপ কাগজে পড়েই জেনেছেন। নিজের পয়সায় সত্যেন স্ত্রীর ছবি সমেত বড় করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। সত্যেনের যে-কোনো খবরই প্রতাপের চোখ টানে। প্রতাপের সবসময়ই মনে হয়, লোকটা সুবিধের নয়। বুলার স্বামী বেঁচে আছে কি না কে জানে, মোট কথা সে থেকেও নেই, বুলার ছেলে বিদেশে, তা হলে বুলা কি এখন পুরোপুরি সত্যেনের খপ্পরে পড়ে আছে? থাকলেই বা কী, প্রতাপ তো কোনো রকমের বুলাকে সাহায্য করতে পারবেন না। এসব ক্ষেত্রে কিছুই করার থাকে না।

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে নেমে একটুক্ষণ হাঁটার পরেই প্রতাপ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হলো, তিনি একটা বিষম ভুল করতে যাচ্ছেন।

তিনি বললেন, মামুন একটা কথা বলি? বাড়িটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তুমি একাই যাও।

মামুন বিরাট অবাক হয়ে বললেন, সে কি, এতদূর এসেও তুমি যাবে না কেন?

প্রতাপ বললেন, বাড়িতে কিছু বলে আসিনি, ফিরতে দেরি হলে এরা চিন্তা করবে। তুমিই যাও বরং। বুলার শ্বশুরবাড়ির ওরা নারানগঞ্জের লোক, তোমাকে দেখে খুশিই হবে। ওর দেওর সত্যেনবাবু মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক কমিটির একজন হোমরাচোমড়া।

মামুন প্রতাপের হাত ধরে বললেন, আরে একদিন বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হলে কী হয়? চলো, চলো, আমরা বেশিক্ষণ থাকবো না।

প্রতাপ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৃঢ়ভাবে বললেন, না আমি যাবো না।

যে কারণে প্রতাপ মালখানগরের নিজেদের বাড়িটা আর কখনো ফিরে গিয়ে দেখবেন না ঠিক করেছেন, সেই কারণেই বুলার কাছে তিনি আ র জীবনে কখনো যেতে চান না।

॥ ৫৪ ॥

এ বছর এত বৃষ্টি যে শীতকালেও রেহাই নেই। বর্ষার বৃষ্টি মানুষের গা-সহা, কিন্তু শীতের বৃষ্টি ভিজতে অনেকেই ভয় পায়। রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা।

একটা রিক্‌শা দাঁড়া করিয়ে রেখেছে তপন, বস্তির মধ্যে এসে কৌশিককে বললো, চট করে তৈরি হয়ে নে, এক্ষুনি যেতে হবে!

কৌশিক খাটিয়ায় শুয়ে আছে, জ্বরটা তার ছাড়ছে না কিছুতেই। সে উদাসীন ভাবে বললো, আবার কোথায় যেতে হবে, আর পারছি না!

তপন বললো, এই জায়গাটা হট হয়ে গেছে। এখানে আর থাকা যাবে না। যে-কোনো সময় এই বস্তি রেইড হবে। তোর জন্য না, জুট মিলের দু'তিনজন ওয়ার্কার একজন ওয়ার্কস ম্যানেজারকে খুন করে অ্যাবসকন্ড করে আছে, পুলিশ একবার এই বস্তিতে ঢুকলে তোকে ঠিক চিনে ফেলবে। ওঠ, উঠে পড়, দেরি করা যাবে না।

কৌশিক বললো, কোথায় যাবো, ঠিক করেছিস?

তপনের মুখ-চোখ স্বাভাবিক নয়, ভয়, উত্তেজনা, আশঙ্কা অনেক কিছু মিশে আছে। তবু সে ফ্যাকাসে ভাবে হাসবার চেষ্টা করে বললো, পমপমের কাছে!

কথাটা কৌশিকের বিশ্বাস হলো না। পমপম সম্পর্কে তার মনে একটা গভীর হতাশা জন্মে গেছে, তার মনে হয় পমপমের সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না। পমপম তাকে ছেড়ে যাবে কিংবা পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করবে, তা হতে পারে না, পমপম সে ধাতুতে গড়া নয়। কিন্তু তপনের কথা শুনে বোঝা যায় না, পমপম আর বেঁচে আছে কিনা। কৌশিকের ধারণা, পমপমকে হয় আবার পুলিশ ধরেছে, তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মফস্বলের কোনো জেলে, অথবা পমপম আর পৃথিবীতে নেই। না হলে পমপম যে-কোনো উপায়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতোই।

কৌশিক ক্লান্ত ভাবে বললো, কোথায় পমপম?

তপন মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে বললো, কালই তার খবর পেয়েছি, সে আছে উল্টোডাঙ্গার একটা বাড়িতে।

—সত্যি কথা বলছিস?

—আমি তোকে বাজে কথা বলবো?

একটা লুঙ্গির মধ্যে টুকিটাকি জিনিসগুলো নিয়ে বোঁচকা বেঁধে ফেললো তপন। অনেক বই রয়েছে, সেগুলো আর নেওয়া যাবে না। খাটিয়া ছেড়ে উঠে গায়ে একটা জামা গলিয়ে নিতে গেল কৌশিক। তপন তাকে বললো, তোর ঐ নোংরা পাজামাটা খুলে ফ্যাল, প্যান্ট পরে নে। রাস্তা দিয়ে একটু ভদ্র সেজে যেতে হবে।

মাত্র দিন পঁচিশেক থাকা হয়েছে এখানে, তবু যেন ঘরটার ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে, কৌশিক চারদিক চোখ বুলিয়ে দেখলো। এখানে আর ফেরা হবে না।

দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আছে ক্রাচ দুটো। সে দিকে তাকিয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, এগুলো কী করবো? আমার এখন একটা ক্রাচেই চলে যায়। এমনকি ক্রাচ ছাড়াও মোটামুটি হাঁটতে পারি।

তপন বললো, তাহলে ক্রাচ না নিলেই ভালো হয়। পুলিশের রিপোর্টে আছে, তোর পা ভাঙা।

ঘর থেকে বেরিয়ে দু'জনে একটুখানি বৃষ্টি ভিজে এসে রিকশায় উঠলো। তপন রিকশাওয়ালাকে

বললো, সামনের পর্দাটা টাঙিয়ে দাও!

সন্ধে হয়েছে একটু আগে। বৃষ্টির জন্য ওদের সুবিধেই হয়েছে, কারুর নজর পড়বে না রিক্সার দিকে।

কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, পমপমের খবর কে তোকে দিল?

তপন বললো, দিয়েছে একজন। তুই চিনবি না।

–উল্টোডাঙ্গায় কার বাড়িতে আছে? আমাদের চেনা কে আছে উল্টোডাঙ্গায়?

– পমপম আছে একজন--দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে!

– কী ব্যাপার বলতো, তপন, তুই কার্মবল করছিস কেন? তুই আমাকে মিথ্যে কথা বলছিস না তো?

–আরে না, মিথ্যে কথা কেন বলবো!

– অন্যবার আমরা শেষ রাত্তিরে ডেরা ছেড়ে যাই। আজ তুই আমাকে এই সন্ধেবেলা বার করে আনলি যে!

–বললাম না, এই বস্তিতে আর থাকা যাবে না। যে-কোনো সময়...

–বস্তি রেইড হবে, সে খবর তোকে কে দিল? তুই আগে থেকে জানলি কী করে?

–বলছে, একজন, খুব রিলায়েবল সোর্স!

–হুঃ সাধারণত এই ধরনের রিলায়েবল সোর্সগুলো পুলিশের ইনফর্মার হয়। আমাকে ধরিয়ে দিলে তুই হাজার দশের টাকা পেতে পারিস, তপন!

–তুই আমাকে এই কথা বললি?

–আমার আর দুনিয়ায় কারুকে বিশ্বাস হয় না।

–কৌশিক, তোর পায়ে ধরি, আজ আবার আমার সাথে ঝগড়া লাগাস না। এই তোর পা ছুঁয়ে বলছি, যদি এক বাপের ব্যাটা হয়ে থাকি, যদি মায়ের দুধ খেয়ে থাকি, তা হলে কোনোদিন তোর সাথে বেইমানি করবো না। আমি নিজে মরে যাবো, সেও ভি আচ্ছা।

–ওসব লম্বা লম্বা কথা আমি শুনতে চাই না। পমপমের খবর তোকে কে দিয়েছে, সে কথা বল ঠিক করে।

–নিশীথদা বলেছে।

–নিশীথদা মানে? কে নিশীথদা? কোনোদিন তো এই নাম শুনিনি। আমাদের দলে এই নামে কে আছে?

– নিশীথ মজুমদার, মানিকতলা পাড়ার।

–নিশীত মজুমদার, মানে কংগ্রেসী? তার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক?

–তুই ছোটবেলায় মানিকতলায় থাকতি, নিশীথদা তোকে চেনেন, পমপমকে চেনেন। তোদের স্নেহ করেন। সব মানুষকে কি পার্টির লেবেল দিয়েই শুধু বিচার করতে হয়! তোদের স্নেহ করেন। সব মানুষকে কি পার্টির লেবেল দিয়েই শুধু বিচার করতে হয়।

–আলবৎ তাই বিচার করতে হবে। যারা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করে না, তারা সবাই আমার শত্রু।

–প্রথম থেকেই সবাইকে শত্রু বলে ধরে নিয়ে এই তো ফল হলো, আমরা এগাতেই পারলাম না। যাক, ঐসব কথা এখন থাক। নিশীথদা আমাদের হেল্প করছেন ব্যক্তিগতভাবে। তুই আর পমপম দু'জনেই ছোটবেলা অতুল্য ঘোষের বাড়িতে দিলীপ-মেনির সঙ্গে খেলা করতে যেতিস, নিশীথদা সেই কথা বললেন। বললেন, ওরা তো আমার ছোট ভাই-বোনের মতন।

–আমি নিশীথদার কোনো সাহায্য চাই না। আমি তোরও কোনো সাহায্য চাই না। এক্ষুনি আমি রিক্শা থেকে নামবো! আই ক্যান টেক কেয়ার অফ মাইসেল্ফ!

–পাগলামি করিস না, কৌশিক, তোর পায়ে ধরি। পমপমের সঙ্গে আগে তোর দেখা করা দরকার কি না বল! পমপমকে দেখার পর তোর যা ইচ্ছা করিস!

দুর্বল শরীরেও কৌশিক রাগে ফুঁসতে লাগলো, তপন জোর করে চেপে ধরে রইলো তার দু'হাত।

নৈহাটি স্টেশনেও আজ ভিড় কম। আজ কিসের যেন একটা সরকারি ছুটির দিন, অফিস ফেরত বাবুরা আজ অনুপস্থিত। এমনি হাঁটতে পারলেও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে কষ্ট হয় কৌশিকের। তবু তপন তাকে ধরলো না।

একটা লোকাল ট্রেন থেমেই আছে প্লাটফর্মে। একটি কামরার সামনে দাঁড়িয়ে স্বল্প আলোয় একজন লোক কাগজ পড়ছে। তপন একবার তাকে চকিতে দেখে নিয়ে সেই কামরাতেই উঠলো। সেই লোকটি ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে কাগজটা ভাঁজ করে লাফিয়ে উঠে পড়লো এবং দরজার কাছে একটা সীটে বসে চেয়ে রইলো বাইরের দিকে।

যে-কটি স্টেশনে ট্রেন থামলো, প্রত্যেকবার লোকটি নেমে দাঁড়ালো প্ল্যাটফর্মে।

তপন কৌশিককে কথা বলতে নিষেধ করেছে। কিন্তু কৌশিকেরও সন্দেহ হলো লোকটির হাব ভাব দেখে। তপন সেই লোকটির দিকে প্রায় এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কৌশিক একবার তপনকে কুনইয়ের খোঁচা মেরে জানতে চাইলো লোকটি সম্পর্কে। তপন মাথা নাড়লো দু'দিকে।

উল্টোডাঙ্গা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা নামতে হয়। কৌশিক রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নামতে নামতে বারবার পেছন ফিরে তাকালো, সেই লোকটিকে দেখতে পেল না।

এখানেও বৃষ্টি পড়ছে, রিক্শাও নেই। ওরা মুশকিলে পড়ে গেল।

তপন বললো, মিনিট পাঁচেক হাঁটতে হবে। পারবি?

কৌশিক বললো, পারবো। একটু সময় লাগবে। তুই আমার হাত ধরিস না, সামনে সামনে চল।

এই ঠাণ্ডার মধ্যেও তপনের মুখে ঘাম চকচক করছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। খানিকটা এগোবার পর সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো, ট্রেনের সেই কাগজ-পড়া লোকটি খানিকটা দূরত্ব রেখে আসছে এদিকেই।

তপন একটা গলির মধ্যে বেঁকলো। গলির শেষ বাড়িটা একেবারে নতুন, দোতলা। একতলার ঘরগুলো অন্ধকার। দোতলার একটি ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু সব কটা জানালায় ভারী পর্দা টানা। গলির দু'পাশে আরও নতুন নতুন বাড়ি উঠছে, এখনো লোকজন বিশেষ আসেনি মনে হয়। খুব নির্জন।

গলিটার মাঝখানে এসে তপন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, কৌশিক, আমি একটা রিস্ক নিয়েছে, নিতে বাধ্য হয়েছি। তোকে আগে থেকে বলিনি, তুই শেষ মুহূর্তে যদি বেঁকে বসিস, মানে তোকে একটা মিথ্যে কথা বলেছি।

সঙ্গে সঙ্গে কৌশিকের মুখখানা বিকৃত হয়ে গেল। সে একটা ফাঁদে পড়া হিংস্র প্রাণীর মতন একবার সামনের বাড়িটা, একবার গলিটার মুখের দিকে দেখলো, গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে ট্রেনের সেই লোকটি।

কৌশিক বললো, শালা স্পাই। তোর দশ হাটার টাকার লোভ হয়েছে–

তপন কৌশিকের হাত চেপে ধরে বললো, শোন্ শোন, আগে কথাটা শোন্–

কৌশিক হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, তুই এক বাপের সন্তান, না বেজন্মা? খানকীর বাচ্চা! আমাকে ধরিয়ে দিবি? তুই বাঁচতে পারবি না, তোকে খতম করবোই! তুই পমপমের নাম করে টেনে এনে

তপন বললো কৌশিক, কৌশিক, শোন্, এখানে পমপম নেই, কিন্তু...

কৌশিক বললো, পমপম নেই। আমাকেও মারবি ভেবেছিস! তোর মতন একটা নিকমহারামকে কুচি কুচি করে কাটবো।

নিজেকে ছাড়াতে না পেরে কৌশিক তপনের হাত কামড়ে ধরলো। তপন তবু মুঠি আলগা না করে বললো, এখানে তোর মা আছেন। একবার তোকে দেখা করতেই হবে।

কৌশিক মুখ তুলে বিমূঢ়ভাবে বললো, মা? শুয়োরের বাচ্চা, তুই এবার আমার মায়ের নাম বলে ভরকি দিচ্ছিস!

তপন বললো, মাসিমা সত্যিই এখানে আছেন। তুই মাসিমার সঙ্গে দেখা করবি না বলেছিলি, কিন্তু মাসিমা কেঁদে কেঁদে পাগলের মতন হয়ে গেছেন।

–আবার বাজে কথা?

–না, বাজে কথা নয়। নিশীথদা তোর মাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।

–তোকে বলছি না, মায়ের সঙ্গে, আমার বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

–কেন, মাসিমা কী দোষ করেছেন! মাসিমা বলেছেন, তোকে শুধু একবার দেখতে চান। উনি নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস করবেন যে তুই বেঁচে আছিস।

–আর, তোর মতন একটা ইডিয়েটকে নিয়ে...তুই আমার মাকেও বিপদে ফেলতে চাস?

সেইজন্যই তো বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না। পুলিশ আমার মাকে নিয়েও টানাটানি করবে। মারবে। অত্যাচার করবে! ও শুয়োরের বাচ্চারা সব পারে।

—এখানে কেউ টের পাবে না। গলির মোড়ের ঐ লোকটাকে ভয় নেই, ও আমাদের সাহায্য করতে এসেছে।

—ও কে?

—বলছি তো, সাহায্য করতে এসেছে। কৌশিক, প্লীজ, বেশি সময় নেই। একবার চল, মাসিমার সামনে রাগারাগি করিস না! মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চলে যেতে হবে।

—না, আমি মায়ের সামনে যাবো না!

— এ কী রকম কথা, আমি বুঝতে পারছি না। তুই পমপমের সঙ্গে দেখা করতে চাস, আর নিজের মাকে দেখবি না একবার? এ আবার কিসের বিপ্লব?

—মাকে কী বলবো আমি? আমি কি মার কাছে ফিরে যেতে পারবো?

—কিছু বলতে হবে না। মাসিমা শুধু তোকে একবার দেখবেন!

—কিছু বলতে হবে না। মাসিমা শুধু তোকে একবার দেখবেন!

বিমূঢ় কৌশিককে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এলো তপন।

সদর দরজা খোলা, দোতলায় সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন নিশীথ মজুমদার। পাজামা আর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, তার ওপর একটা মুগার চাদর জড়ানো। মধ্যবয়েসী, বেশ সবল পুরুষ। তাঁর মুখের চাপা উদ্বেগের চিহ্ন মুছে ফেলে তিনি তপনকে জিজ্ঞেস করলেন, সব ঠিক আছে?

তপন বললো, হ্যাঁ, এ পর্যন্ত কোনো গণ্ডগোল হয় নি।

নিশীথ মজুমদার কৌশিকের দাড়ি সমেত থুতনিটা ছুঁয়ে বললেন, এই সেই কৌশিক? চিনতে পারে কার সাধ্য। তোকে আমি ছ'সাত বছরের বাচ্চা দেখেছি, মনে আছে?

কৌশিক কোনো উত্তর দিল না।

নিশীথ মজুমদার বললেন, খুব হীরো হয়েছিস, জেলের পাঁচিল থেকে লাফ দিয়েছিলি! ওরে, ব্রিটিশ আমলে আমরাও একবার জেল ভেঙেছিলুম। পমপমের বাবা অশোকদা, উনিও তখন কংগ্রেস করতেন, অশোকদা ছিলেন আমাদের সঙ্গে।

তারপর তিনি কৌশিকের কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বললেন, চল, বৌদি বড্ড কান্নাকাটি করছেন।

আলো-জ্বলা ঘরটির দরজা ঠেলে খুলে ফেলে নিশীথ মজুমদার বললেন, বৌদি এই নিন, আপনার ছেলে। এবার বিশ্বাস হলো তো।

একটা বেতের চেয়ারে বসে ছিলেন অলকা, ছুটে এসে কৌশিকের মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কুণ্ড, কুণ্ড বলে হু-হু করে কাঁদতে লাগলেন।

কৌশিকের চোখ জ্বালা করছে কিন্তু কান্না আসছে না। তার কান্না শুকিয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, মা, ভালো আছো তো? পিন্টু, সোমারা ভালো আছে?

অলকা আবার শুধু বললেন, কুণ্ড!

কৌশিক শান্তভাবে বললো, মা, শুধু কাঁদলে তো চলবে না। বেশি সময় নেই।

অলকা চোখ মুছতে লাগলেন, কিন্তু তিনি হেঁচকি থামাতে পারছেন না। একটুক্ষণ কৌশিকের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে, কোনোরকমে নিজেকে সামলে বললেন, আমি নিশীথকে ধরেছিলুম, কোনোরকমে একবার দেখা করিয়ে দেবার জন্য...হ্যাঁরে, এভাবে কতদিন চলবে তুই কোথায় থাকিস এখন?

— কোনো ঠিক নেই, মা।

— তুই আমাদের হুগলির বাড়িতে গিয়ে থাক। ওখানে কেউ টের পাবে না।

—পুলিশ ঠিক তাড়া করে যাবে। মামাদের ওখানে থাকলে মামারাই বিপদে পড়বে।

—তা হলে তুই বিলেতে চলে যা। বাবলু গেছে, আরও অনেকেই তো গেছে শুনেছি।

—আগে যারা চলে গেছে, তারা গেছে। এখন যাওয়া যাবে না। তুমি এজন্য কিছু ভেবো না। আমি ঠিক থাকবো।

নিশীথ মজুমদার ইচ্ছে করেই এসময় ঘরে থাকেন নি। তপনকে নিয়ে তিনি গল্প করছেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। এই বারান্দা থেকে গলির মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। একটু পরে তপন চঞ্চল হয়ে উঠে বললো,

আর দেরি করা বোধহয় ঠিক হবে না!

নিশীথ মজুমদার সেই ঘরের দরজায় টক টক করে বললেন, বৌদি, এবার ওকে ছেড়ে দিতে হবে।

কৌশিক বললো, মা, এবার যাই! তোমরা ভালো থেকো!

অলকা বললেন, আর একটু দাঁড়া!

আসলে দাঁড়াতেই অসুবিধে হচ্ছে কৌশিকের, পায়ে ব্যথা করছে, শরীরটা অসম্ভব দুর্বল লাগছে হঠাৎ। কিন্তু অলকা দাঁড়িয়ে আছেন বলে সে বসতেও পারেনি এতক্ষণ। মায়ের সামনে কোনোরকম অসুস্থতা সে দেখাতে চায় না।

অলকা হ্যান্ডব্যাগ খুলে একতাড়া একশো টাকার নোট বার করে বললেন, এগুলো তোর কাছে রাখ।

নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলো কৌশিক। তারপর দু'খানা একশো টাকার নোট তুলে নিলো।

অলকা বললেন, এই সবগুলোই রাখ তোর কাছে। তোর জন্য এনেছি, কুণ্ড !

কৌশিক বললো, না, এতেই হবে।

অলকা তবু দু'তিনবার জোর করতে থাকলে কৌশিক দৃঢ়ভাবে বললো, মা, আমরা যে কাজ করতে নেমেছি, তাতে লোভ করতে নেই। বেশি টাকাও সঙ্গে রাখতে নেই। বলছি তো, এতেই চলে যাবে এখন। মা, যাই !

চোখের জল মুছে অলকা ব্যাগ থেকে দু'খানা ইনল্যান্ড চিঠি বার করে বললেন, এই দ্যাখ, পমপম আমাকে লিখেছে। তুই ওকেও কোনো খবর দিস না?

চিঠি দু'খানা প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে নিল কৌশিক। দ্রুত চোখ বোলালো। দুটো চিঠির বেশ সংক্ষিপ্ত। বহরমপুরের এক নার্সিং হোমের ঠিকানা। পমপম অসুস্থ হয়ে সেখানে আছে, কৌশিকের সন্ধান হারিয়ে ফেলেছে বলে অলকার কাছ থেকে কৌশিকের ঠিকানা জানতে চায়। চিঠির হাতের লেখা পমপমের নয়, কিন্তু তলার সইটা আঁকাবাঁকা হলেও পমপমেরই।

চিঠি দু'খানা পকেটে ভরে নিয়ে কৌশিক এই প্রথম নিজে থেকে জড়িয়ে ধরলো মাকে। এতক্ষণে তার চোখে জলও এসেছে, সে বাষ্পজড়ানো গলায় বললো, আমার জন্য চিন্তা করো না, মা, আমি ঠিক থাকবো। শরীরের যত্ন নিও!

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই কৌশিক বললো, আমি এক্ষুনি বহরমপুর যাবো!

নিশীথ মজুমদার বললেন, চলো, আমি তোমাদের গলির মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি। বৌদির জন্য ভাবিস না, কুণ্ড, বৌদিকে পুলিশ ডিসটার্ব করবে না। তোর বাবা এক সময় আমাদের কত সাহায্য করেছেন!

গলির মোড়ে এখন একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনের সেই লোকটি আড়ালে কোথাও ছিল, এখন এগিয়ে এসে ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়ে তপনকে বললো, হাওড়া স্টেশনে কিংবা শিয়ালদায় যাইস না। নৈহাটিতেও যাইস না।

সে নিজে উঠলো না, ট্যাক্সির গায়ে দু'বার চাপড় মারতেই ড্রাইভার ছেড়ে দিল।

কৌশিকের শরীর অস্থির অস্থির করছে। তার অসুস্থ শরীরে এতখানি আবেগ সহ্য হয়নি। এই রকম সময়ে গোটা কতক অ্যাসপ্রো-জাতীয় ট্যাবলেট খেলে তার উপকার হয়। তপনের কাছ থেকে পোঁটলাটা নিয়ে খুলে সে ট্যাবলেট বার করলো, কিন্তু একটু জল না হলে খাবে কী করে?

সে ঝুঁকে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কাছে জলের বোতল আছে?

তপন বললো, নিশীথদার ওখানে জলের কথা বললি না? নিশীথদা কিছু খাবারের ব্যবস্থা করবেন বলেছিলেন, আমি বারণ করলাম।

ড্রাইভারটি বললো, রাস্তার ধারে কোনো টিউবওয়েল দেখলে থামাবো? আমার কাছে তো ডিসটিল্ড ওয়াটার আছে, ব্যাটারিতে দেবার জন্য।

কৌশিক বললো, ঐ ডিসটিল্ড ওয়াটারই দিন, একটু খানি, এক ঢোঁক।

ওষুধ খাবার পর মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে কৌশিক বললো, ঐ যে লোকটা, ট্রেনে আমাদের ফলো করছিল, শেষে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিল, ও কে রে? নিশীথদার লোক?

তপন আড়ষ্টগলায় বললো, তোকে আগে ওঁর কথা জানাইনি, তুই রেগে যেতিস। আমাদের অনেক সাহায্য করেছে।

– কোন পার্টির লোক, সেটা বল আগে।

– কোনো পার্টির না, উনি পুলিশ। স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের লোক, আমার চেনা।

–তুই বুঝি আজকাল পুলিশের সঙ্গেও মাখামাখি শুরু করেছিস?

–কৌশিক, তোকে আগে একদিন বলেছিলাম। তোর মনে নেই। ওনার বাড়ি ইস্টবেঙ্গলে, আমাদেরই সরাইল গ্রামে। কথায় কথায় আমাদের সাথে একটা আত্মীয়তাও বেরিয়ে গেল। তাই উনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতন সাহায্য করছেন। নিজের ডিপার্টমেন্টের কারুকে না জানিয়ে, রিস্ক নিয়ে। অন্য পুলিশ আমাদের ফলো করছে কি না, সেটা উনিই ভালো বুঝতে পারবেন। ওনার জন্যই কোনো বিপদ হয় নি।

কৌশিক ক্লান্ত ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। চোখ বুজে রইলো খানিকক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, একটা সিগারেট দিবি? ধরিয়ে দে. আমার বড্ড শরীরটা খারাপ লাগছে। ট্যাক্সি নিয়ে কতদূর যাবো? ওর, এই নে, মা দিয়েছে।

একশো টাকার নোট দুটো সে বাড়িয়ে দিল তপনের দিকে।

তপন বললো, আমি নিয়ে কী করবো। তোর কাছে রাখ।

হাত বাড়িয়ে তপনের কাঁধ ছুঁয়ে কৌশিক বললো, তুই আমার ওপর রাগ করেছিস? আমি তোকে খুব খারাপ খারাপ গালাগাল দিয়েছি। আগে কোনোদিন আমি এসব গালাগাল উচ্চারণও করতুম না। মাথাটা কী যে হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

তপন শুকনো ভাবে বললো, গালাগালটা কিছু না। রাগের মাথায় লোকে খারাপ কথা বলতে পারে। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, আমাদের মধ্যে অবিশ্বাস এসে যাচ্ছে। তুই আমাকে যখন তখন সন্দেহ করিস। যদি আমরা নিজেরাই নিজেদের বিশ্বাস করতে না পারি, তা হলে আর কী বাকি রইলো।

–আমি ক্ষমা চাইছি, তপন।

–ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। তুই তাহলে মনে করিস যে আমি তোকে সত্যিই ধরিয়ে দিতে পারি ?

– আমি ক্ষমা চাইছি, তপন।

– ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। তুই তাহলে মনে করিস যে আমি তোকে সত্যিই ধরিয়ে দিতে পারি ?

– মানুষ যা একেবারেই বিশ্বাস করে না, সে রকম কথাও এক এক সময় সত্যিই ধরিয়ে দিতে পারি?

– মানুষ যা একেবারেই বিশ্বাস করে না, সে রকম কথাও এক এক সময় মুখ দিয়ে বলে ফেলে। দিনের পর দিন একা থাকলে বোধহয় এরকম হয়। আমি আর একা থাকতে পারছি না! করে আবার কাজ শুরু করবো?

– আজ রাতে তোকে কোথায় রাখবো, সেইটাই ভাবছি।

–আমি আজ রাত্তিরেই বহরমপুর যাবো। যে কোনো উপায়ে।

– ভবেনদা হাওড়া আর শিয়ালদায় যেতে বারণ করলো। নিশ্চয়ই কিছু বিপদ আছে। তাহলে বহরমপুর যাওয়া যাবে কী করে? সন্ধের পর কি অতদূর বাস যায়?

– শিয়ালদার বদলে দমদম থেকে ট্রেনে উঠবো। রাত্তিরটা ট্রেনেই কেটে যাবে। কাল সকালে–

–বহরমপুর ডেঞ্জারাস জায়গা এখন। আমি বরং ভাবছিলাম, বসিরহাট কিংবা বনগাঁয় জয় বাংলার বর্ডারে গেলে কেমন হয়? কোনো রিফিউজি ক্যাম্পে ঢুকে গেলে পুলিশ সন্দেহ করবে না।

– আমাকে বহরমপুরে যেতেই হবে! তুই পমপমের খবর সত্যিই জানতিস না? পমপম নিজের হাতে চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারে না।

বহরমপুরে নেমে সরাসরি নার্সিং হোমে না গিয়ে তপন বাস স্ট্যান্ডের কাছে খুব শস্তার এক হোটেলে একখানা ঘর ভাড়া নিল। কৌশিক সারাদিন শুয়ে রইলো সেখানে। ট্রেনে ছারপোকার কামড়ে তার সারা শরীর ফুলে গেছে প্রায়। পেটে আবার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। বুলেটটা যেন মাঝেমাঝে পেটের মধ্যে নড়াচড়া করে সে টের পায়।

নার্সিং হোমটা একবার ঘুরে দেখে এলো তপন। সেখানে পমপম সেনগুপ্ত নামে কোনো পেসেন্ট নেই, অবশ্য পমপম অন্য নাম নিতেই পারে। এত জায়গা থাকতে পমপম বহরমপুরের এক নার্সিং হোমে কেন আসবে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

রাত সাড়ে আটার পর পেটের ব্যথাটা একটু কমলে কৌশিক ছোট ছেলের মতন বায়না ধরলো, সে নিজে একবার নার্সিং হোমে গিয়ে দেখে আসবে। পমপম নিশ্চয়ই সেখানে আছে। এই সময় যে বাইরের কোনো লোককে নার্সিং হোমে ঢুকতেই দেওয়া হয় না, সে কথা সে কিছুতেই শুনবে না।

তখন কৌশিকের একটা কথা মনে পড়লো। এক সময় এই বহরমপুরের জেলেই তাকে থাকতে হয়েছিল কয়েক মাস। সেই সময় অলি একবার দেখতে এসেছিল তাকে। তখন নকশালদের সঙ্গে কেউ কোনোরকম সম্পর্কের কথা স্বীকার করতে চায় না, তবু অলি এসেছিল সাহস করে। সে এনেছিল পমপমের খবর, অতীনের খবর। পরে পমপমের কাছে কৌশিক শুনেছিল যে বহরমপুরে অলির এক মামা থাকেন, তিনি ডাক্তার, তিনি নকশালদের কিছু কিছু সাহায্য করেন। কী যেন অলির সেই ডাক্তার মামার নাম? শক্তি না শান্তি? শক্তি মজুমদার? শান্তি মজুমদার, এই দুটোর একটা হবেই!

এবারে তপনকে বেরুতেই হলো কৌশিককে নিয়ে। বহরমপুর শহরটা এক বছর আগেও যতটা ভয়ের জায়গা ছিল, এখন আর ততটা নেই। সীমান্ত বেশি দূরে নয়, এখানেও জয় বাংলার প্রচুর লোক গিসগিস করছে। এখানে ট্রেনিং ক্যাম্প হয়েছে দুটো, রাস্তা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যখন তখন দল বেঁধে যাতায়াত করে। পুলিশী ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল।

নার্সিং হোমটা কাছেই, গেটের বাইরেই প্রধান ডাক্তারের নাম লেখা, শান্তিময় মজুমদার।

কৌশিকের যেন চোখ জ্বলে উঠলো। প্রবল মনঃসংযোগে সে স্মৃতি থেকে এই নামটা উদ্ধার করেছে। পমপম একবারই মাত্র নামটা উল্লেখ করেছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে অলির সঙ্গে চেনাশুনার সূত্রেই পমপম এখানে এসেছে।

কৌশিক বললো, দিস ইজ ইট! পমপম এখানে থাকতে বাধ্য। শোন, তপন, ডাক্তারটি যদি এখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে না চায়, তাহলে একদিনের জন্য আমি এখানে ভর্তি হয়ে যাবো। বলবি, আমি গুরুতর অসুস্থ। তোর কাছে তো এখনো শ দেড়েক টাকা আছে?

ভেতরের কাউন্টারে একটি লোক ঘাড় নীচু করে কী যেন লিখে চলেছে। কৌশক তার সামনে গিয়ে বললো, দেখুন ডক্টর মজুমদারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

লোকটি মুখ না তুলেই বললো, এখন তো দেখা হবে না। কাল সকালে ন'টার পর আসবেন।

কৌশিক বললো, আমার পেটে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা হচ্ছে, নিশ্বাস ফেলতে পারছি না। কোনো ডাক্তার অ্যাটেন্ড না করলে মরে যাবো। আমাকে ভর্তি করে নিন।

লোকটি বললো, একটাও তো বেড খালি নেই ভাই। হাসপাতালে চলে যান।

কৌশিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বড় করে দম নিল। কোমরের কাছে হাত বুলোলো একবার। এখন সে তার রিভলভারটার অভাব খুব বোধ করছে। এই লোকটার কপালে রিভলভারের নলটা ঠেকালেই কাজ হয়ে যেত। অস্ত্র নেই, গায়ের জোর নেই, এমনকি গলার জোরও এমন কমে গেছে যে কৌশিক ওকে ধমকেও ভয় দেখাতে পারবে না।

সে একবার তপনের দিকে তাকালো। এইসব ব্যাপারে তপন খুব সুবিধে করতে পারে না। তার চেহারা বা কথা শুনলে কেউ সমীহ করে না।

কৌশিক খুবই বিনীত ভাবে বললো, দয়া করে একবার মুখ তুলে আমার কথাটা শুনবেন? আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। ভবানীপুরের বিমানবিহারী চৌধুরীর মেয়ে অলি চৌধুরী আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি ডক্টর মজুমদারের ভাগ্নী হন। ডক্টর মজুমদার নাম শুনলেই চিনতে পারবেন। আপনি অনুগ্রহ করে তাঁকে একবার খবর দিন যে অলির কাছ থেকে কৌশিক রায় নামে একজন এসেছে। বিশেষ দরকার। বুঝতেই পারছেন, খুব দরকার না থাকলে এই সময় ডিসটার্ব করতুম না।

লোকটি এবার কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে এসে পাশের একটা ছোট্ট ঘর দেখিয়ে বললো, এখানে বসুন। আপনাদের ভাগ্য ভালো, ডাক্তারবাবুর আর ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে ডি এম-এর বাংলোয় তাস খেলতে যাবার কথা।

একটু বাদে সেই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন অলির ছোট মামা। সাদা প্যান্টশার্টের ওপর একটা শাদা পুলওভার পরা। তিনি দু'জনের ওপর চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের

মধ্যে কৌশিক রায় কে?

কৌশিক আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা নাভার্স ভাবে বললো, আমি!

ঠোঁটে বিদ্রুপ ও কৌতুক মেশানো একটা হাসির ঝিলিক দিয়ে শান্তিময় বললেন, এতদিনে বাবু কৌশিক রায়ের আসিবার সময় হলো? আমরা দু'মাস ধরে আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছ। প্রায় শবরীর প্রতীক্ষার মতন।

কৌশিক ঠিক বুঝতে না পেরে বললো, আমার জন্য?

শান্তিময় বললেন, ইয়েস! পুলিশ আপনার জন্য এখানে ফাঁদ পেতে রেখেছে। আপনি এলেই খপ করে ধরবে। দরজার দিকে তাকাচ্ছেন কী। এখান থেকে পালানো সহজ?

কৌশিক শান্তিময়ের চোখে চোখ রেখে বললো, আমাদের যারা ধরিয়ে দেয়, তাদের কিছুতেই আমরা ক্ষমা করি না। আমাদের কেউ না কেউ এসে ঠিক প্রতিশোধ নিয়ে যাবে।

ডাক্তার অনুচ্চ শব্দে হাসলেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, হুঁ, এখনও খানিকটা তেজ অবশিষ্ট আছে দেখছি। অত উত্তেজিত হবার কিছু নেই, আমার এই নার্সিং হোমের প্রেমিসেসের মধ্যে আজ অবধি আমি পুলিশ ঢুকতে দিই নি। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, অলি চলে গেছে অ্যামেরিকায়। সে তোমাদের এখানে পাঠালো কী করে?

কৌশিক বললো, অলি পাঠায় নি। অলির নামটা নিতে হলো, না হলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছিল না। আপনাকে বেশিক্ষন আটকাবো না। আমি শুধু একটাই কথা জানতে চাই। পমপম সেনগুপ্ত, অলির খুব বন্ধু। সে কি এখানে আছে?

শান্তিময় বললেন, পমপমের আর এক বন্ধু কৌশিক রায় কেন পমপমকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সেটা জানতে পারি কী?

সাংঘাতিক বিমর্ষভাবে কৌশিক বললো, কী হয়েছে পমপমের!

—এসো আমার সঙ্গে!

পুরোনো আমলের বাড়ি, ওপরে ওঠার সিঁড়িটা বিরাট লম্বা। সেই সিঁড়ির মুখে এসে কৌশিক একটু থমকে গেল।

তপন মৃদু গলায় বললো, তুই আমার কাঁধে ভর দে। আমি ধরে ধরে তুলছি।

শান্তিময় মুখ ফিরিয়ে কৌশিককে ভালো করে দেখলেন। আরপর তপনকে বললেন, তুমি ভাই বাঁ দিকটা ধরো, আমি এই দিক ধরছি। সেই ভাবে উঠতে পারবে, না স্ট্রেচার আনবো?

কৌশিক বললো, এই ঠিক আছে। আমার সিঁড়ি ভাঙতে একটু কষ্ট হয়।

শান্তিময় বললেন, একটু? তোমার গায়ে বেশ জ্বর, মুখের চামড়া দেখলেই বোঝা যায় দারুণ অ্যানিমিয়া, তোমার শরীরেরর আর আছে কী? তোমার সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানি, তোমার দু'পা ভেঙেছিল, কাঁধে আর পেটে গুলি ঢুকেছে।

তপন বললো, পেটের মধ্যে এখনো গুলিটা রয়েছে।

শান্তিময় বললেন, পেটের মধ্যে গুলি নিয়েও অনেকে বহুদিন বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু এই অ্যানিমিয়াটা খুব ভয়ের। পমপম যে এখানে আছে, সে খবর বুঝি তোমরা আগে পাওনি?

কৌশিক বললো, মাত্র আজই পেয়েছি। এর আগে আমার বন্ধু তপন ওকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। কোনো ট্রেস পায় নি।

শান্তিময় বললেন, পমপমের বাবা ওকে কলকাতার একট নার্সিং হোমে ভর্তি করাতে চেয়েছিলেন কিন্তু পমপম বাবার পয়সায় চিকিৎসা করাবে না বলে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে দুম করে চলে এসেছিল এখানে। তাও এসেছিল নিতান্তই মনের জোরে, তখন ওর একা একা চলাফেরা করার ক্ষমতাই ছিল না। আসবার সময় তোমাদের নামে বাড়িতে একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছিল, তোমরা সেটা পাওনি?

তপন বললো, আমি তিন-চারবার পমপমদের বাড়িতে গেছি, ওর বাবার সঙ্গেও দেখা করেছি, চিঠি তো দেওয়া হয়ইনি, কোনো খবরও দেননি পমপম সম্পর্কে।

—উনি জানেন যে পমপম এখানে আছে। উনি দু'বার এসে দেখেও গেছে। এদিকে মুশকিল হয়েছে কি, তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে পমপম অসম্ভব ডিপ্রেশানে ভুগছে। তার ধারণা হয়েছে, আমি ফ্যাংকেলি বলছি, কৌশিক রায় সম্ভবত বেঁচে নেই, আর তার বন্ধু তপন সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। এই ডিপ্রেশানের ফল কী জানো? কৌশিক রায় বেঁচে নেই, এই কথা চিন্তা করতে করতে পমপমের নিজের

বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। যে পেসেন্ট নিজে বাঁচতে চায় না। তাকে ডাক্তাররা কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে?

তপন আর শান্তিময় প্রায় বহন করেই কৌশিককে নিয়ে এলেন তিন তলায়। তারপর দু'জনেই হাঁপাতে লাগলেন।

সিঁড়ির মুখের কোলাপসিবল গেট টেনে বন্ধ করে দিয়ে শান্তিময় বললেন, ওপর তলাটায় আমরা নিজেরা থাকি। আর পমপম থাকে। আরও একটা গেস্ট রুম আছে, সেখানে আজ তোমরা দু'জনে থাকবে।

পমপম একটা লোহার খাটে শুয়ে আছে। গভীর ভাবে ঘুমন্ত। তার চেহারাটা শুকিয়ে এত ছোট হয়ে গেছে যে তাকে চেনাই যায় না। তার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালো ওরা তিনজন। শান্তিময় পমপমের কপালটা ছুঁয়ে বললেন, হেভি সিডেটিভ দিয়ে ওকে ঘুম পাড়াতে হয়। নইলে পেটের ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে। অনেক চেষ্টা করেও ঐ ব্যথাটা কমানো যাচ্ছে না। আমার ধারণা, ওটা সাইকোসোমাটিক। তবে, লালবাজারে যে পুলিশ অফিসারটি পমপমের শরীরের প্রাইবেট পার্টসেও টর্চার করেছে, আমারই এক এক সময় ইচ্ছে করে, তাকে গুলি করে মেরে আসি। তোমরা এত কনস্টেবল মারো, তাকে কিছু করতে পারলে না?

কৌশিক চোয়াল শক্ত করে বললো, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

সেখান থেকে জানলার কাছে সরে গিয়ে শান্তিময় বললেন, কৌশিক রায়, এ কী ধরনের বিপ্লব তোমাদের? যুদ্ধে যারা আহত হবে, তাদের জন্য একটা চিকিৎসক স্কোয়াড তৈরি করার কথা আগে ভাবো নি? পুলিশের তাড়া খেয়ে যারা আত্মগোপন করবে, তারা যে কোথায় শেলটার নেবে, খবর কী করে যোগাড় হবে, সে সম্পর্কে প্ল্যান নেওয়া উচিত ছিল না? লোকের কাছ থেকে বন্দুক কাড়ছো, বুলেট কোথা থেকে পাবে, তা ভেবেছো?

হঠাৎ থেমে গিয়ে শান্তিময় বললেন, যাক, তোমরা আমার কাছে এসে পড়েছো বলেই আমি তোমাদের ওপর উপদেশ ঝাড়তে চাই না। আমার এই এক দোষ হয়েছে ইদানীং। বেশি বকবক করা। তবু একটা কথা বলবোই। কৌশিক, তপন, তোমাদের বাঁচতে হবে। বেঁচে না থাকলে কিসের বিপ্লব, কিসের দেশোদ্ধার, কিসের গরিবের উন্নতি। অকারণে প্রাণ দিলে এর কোনোটাই হয় না। হ্যাঁ, মানছি, বড় একটা কাজের জন্য, মহৎ একটা উদ্দেশ্যর জন্য মানুষ অনেক সময় প্রাণ দিতে দ্বিধা করে না, কিন্তু তাতে সেই মহৎ উদ্দেশ্যটা যাতে একটুখানি সফল হয়, কিংবা অন্যরা প্রেরণা পায়, সেটাও তো দেখতে হবে? শুধু শুধু ব্যর্থ মৃত্যু, এত চমৎকার সব প্রাণ, এগুলো নষ্ট হতে দেখলে আমি সহ্য করতে পারি না। বাঁচতে হবে, ভটচাজ, তাকে দেখতে গিয়েছিলুম, কী সামান্য ভাবে, মিনিংলেস ভাবে তার মৃত্যু হলো বলো তো!

কৌশিক বললো, আপনি মানিকদাকে দেখেছেন?

—দেখেছি বলতে পারো, আবার দেখিনিও বটে। একটা ডেড বডি দেখা মনে সেই লোকটিকে তো দেখা নয়। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল এত দেরি করে, ততক্ষণে সব শেষ। পরে অলির কাছে, পমপমের কাছে শুনেছি তোমাদের নেতা ঐ মানিকবাবুর কথা, এমন একটা মহৎ মানুষ প্রাণ দিলেন সামান্য পার্টি রাইভালরির জন্য? এতে দেশের কী উপকারটা হলো শুনি, বাঁচতে না শিখলে, জীবনটাকে ভালোবাসতে না শিখলে কি পৃথিবীটাকে ভালোবাসা কৌশিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, এই মানিকদাকে রক্ষা করার জন্য অতীন একজনকে মারতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর খুনের অপবাদ নিয়ে দেশান্তরী হয়েছে। তার পরেও পার্টির ছেলেরা মানিকদাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলো না।

একটু পরে ঘরে আর একজন মহিলা ঢুকলেন। শান্তিময় পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই আমার স্ত্রী রীতা। অলির খুব ফেভারিট মামীমা। আর রীতা, এই শ্রীমান হচ্ছে সেই ফেমাস কৌশিক রায়, যার নাম আমরা রোজ জপ করছি।

রীতা রাগ রাগ মুখ করে বললেন, আপনারা এতদিন পর এলেন ? ভয় পেয়ে পালিয়ে ছিলেন? পমপম আপনার জন্য কী কষ্ট পেয়েছে তা শুধু আমরাই জানি।

কৌশিক কাতর ভাবে হাসলো। তারা যে কী অবস্থায় এই দু'মাস কাটিয়েছে, সে কাহিনী এঁদের শুনিয়ে লাভ নেই।

তারপর দু'দিন কেটে গেল সেখানে। তপন চলে যেতে চাইলেও শান্তিময় তাকেও ছাড়লেন না।

তপনের যে ইতিমধ্যে টি বি হয়ে বসে আছে, তা সে নিজেই জানতো না। কৌশিকের জন্য সে নিজের দিকে মনোযোগ দেবার সময়ই পায়নি।

তৃতীয় দিনে শান্তিময় একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিলেন। তিনি এই নার্সিং হোমের মধ্যেই কৌশিক আর পমপমের বিয়ে দিতে চান।

তিনি পমপমের বিছানার পাশে কৌশিককে দাঁড় করিয়ে বললেন, দেখো, তোমরা দুটি আহত, দুঃখী মানুষ। তোমরা আর কতদিন বাঁচবে সে গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না। তবু, তোমরা যদি মনের দিক থেকে পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকো, আপাতত বিপ্লব-টিপ্লব ভুলে শুধু দু'জনে দু'জনের ওপর নির্ভর করো, তাহলে তোমাদের শরীর-স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেও হতে পারে। এই আমার ধারণা, যদি কোনোদিন পুরো সুস্থ হয়ে ওঠো, তাহলে আবার আদর্শ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে না হয়। আপাতত আমি এখানেই আর একটা খাট এনে দিচ্ছি, তোমরা রাত্তিরেও পাশাপাশি থাকবে।

রীতা আর তপন দু'জনেই খুব উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করলো এ প্রস্তাব।

পমপম হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বললো না, চুপ করে চেয়ে রইলো। কৌশিক ক্ষীণ আপত্তি জানিয়ে বললো, এক ঘরে পাশাপাশি খাটে থাকতে পারি, আমার সেটাই ইচ্ছে, কিন্তু তার জন্য কি বিয়ে করার দরকার আছে?

শান্তিময় বললেন, আমি বিয়ের শাস্ত্রীয় কিংবা মরাল দিকটার কথা বলছি না। দুটি সুস্থ যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় লিভিং টুগেদার করলেও আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু তোমরা যেহেতু অসুস্থ, দুর্বল, সেইজন্যই এই সামাজিক বন্ধনটায় তোমাদের ক্ষেত্রে টোট্‌কার কাজ করতে পারে। কেন, বিয়েতে তোমার আপত্তিই বা কিসের?

পরদিনই শান্তিময় ডেকে আনলেন একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার। তাঁর খাতায় এক মাস আগের ডেট দিয়ে নোটিস বসানো হলো। তারপর তিনি পমপম আর কৌশিকের আইনসিদ্ধ আগের পুরোহিত হয়ে বসলেন দুটি লোহার খাটের মাঝখানের চেয়ারে।

পমপম নীচে নামতে পারে না, তার নিম্নাঙ্গে ক্যাথিটার লাগানো, রীতা একখানা নতুন শাড়ি পরিয়ে তাকে বসিয়ে দিয়েছিল। পেটের ব্যথা যাতে না বাড়ে, সেই জন্য পমপমকে সারাদিন সলিড ফুড কিছু না দিয়ে শুধু গ্লুকোজ খাওয়ানো হয়েছে। পমপমের আজ জ্ঞান আছে পুরোপুরি, সে এমনকি একবার রসিকতা করে বললো, কৌশিকের দাড়িটা কামিয়ে দিলে না? এমন ঝোপ-জঙ্গলের মতন দাড়িওয়ালা বর আমি আগে দেখিনি।

কৌশিকও বললো, আহা, ক্যাথিটার লাগানো নবধূই বা পৃথিবীতে কে আগে দেখেছে?

এ বিয়েতে কোনো মন্ত্র নেই। আইনের শুকনো কথাগুলো উচ্চারণ করার পর রেজিস্ট্রার মহোদয় নিজস্ব একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন, আপনাদের বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ হোক।

তপন বেরিয়ে গিয়ে কোথা থেকে যোগাড় করে এনেছে এক রাশ নানা ধরনের ফুল। সেইগুলো সে ছড়িয়ে দিল কৌশিক আর পমপমের লোহার খাটে।

বিয়ে হলো, আর ফুলশয্যা হবে না?

॥ ৫৫ ॥

আবিদ হোসেনের ঘরে আজ অতীন আর সোমেনের নেমন্তন্ন। আবিদের বাবা আর মা চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে, কলকাতায় কিছুদিন থেকে সদ্য এদেশে এসে পৌঁছেছেন। আবিদের দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। অবশ্য তার ছোট দুই ভাই যোগ দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে, তাদের জন্য উদ্বেগ থেকে যাবেই।

আবিদের মা রান্না করে খাওয়াবেন, ওঁদের কাছে কলকাতার নতুন খবর শোনা যাবে, সুতরাং সন্ধ্যার নিমন্ত্রণটি বেশ আকর্ষণীয়ই মনে হয়েছিল অতীনের। কিন্তু একটা মুশকিল হলো এই যে আবিদ বাড়িওয়ালা সত্যদা এবং তাঁর স্ত্রী মার্থাকেও নেমন্তন্ন করে গুবলেট পাকিয়েছে। সত্যদা অত্যন্ত ফর্মাল, নিজের বাড়িতে ভাড়াটের কাছে বাংলা খাবার খেতেও তিনি আসবেন সট ও বো পরে, তিনি ধোঁয়ার গন্ধ সহ্য করতে পারেন না বলে তাঁর সামনে সিগারেট টানা চলবে না। তিনি উপস্থিত থাকলে কেউ সোফায় পা মুড়ে বসতেও সাহস পায়না। মার্থা থাকার জন্য আর একটা ঝামেলা। মার্থা এমনিতে বেশ হাসিখুশি ভালো মহিলা, কিন্তু তার সামনে বাংলায় কথা বলা অভদ্রতা। কিন্তু বাকি সবাই বাঙালী, সকলেই মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী, কলকাতার গল্প শুনতে আগ্রহী, কিন্তু সে সব বলতে হবে ইংরিজিতে, এ কী অত্যাচার।

নিউ ইয়র্কে এবং কেমব্রিজেও বিভিন্ন বাঙালী বাড়ির সান্ধ্য আসরে অতীন লক্ষ করেছে, কেউ যদি মেম বউ নিয়ে আসে, তাহলে অন্যরা বিরক্ত হয়, রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে, অফিসে বা কলেজে সর্বক্ষণই তো ইংরিজি বলতে বলতে ঠোঁট ব্যথা হয়ে যায়, উইক এন্ডের নেমন্তন্নগুলো তো বাংলায় প্রাণ খুলে আড্ডা দেবার জন্যই। যারা মেম বিয়ে করে, তারা কি এটা বোঝে না? কোনো একটা বাংলা রসিকতা ইংরিজিতে অনুবাদ করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। আসলে, যে মেম বিয়ে করেছে সেও আসে ভাত-মাছের ঝোল খাবার লোভে। নিজের বাড়িতে ঐ রান্না বিশেষ হয় না। কিন্তু অন্যের বাড়ির নেমন্তন্নে বউকে বাড়িতে ফেলে আসাও যায় না, সেটা সাঙ্ঘাতিক অভদ্রতা।

সোমেন তো আবিদকে বলেই ফেলেছিল যে, সত্যদা আর মাকে নেমন্তন্ন করার দরকার নেই। কিন্তু বাড়িওলাকে খাতির না করলে চলে না। আবিদ আরও বেশি খাতির করার কারণ, সত্যদা কোনো ভাড়াটের ঘরেই একজনের বেশি দুজনকে থাকতে দিতে রাজি নন। ভাড়াটেরা তাদের গার্ল ফ্রেন্ডদের ঘরে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তাদের নিয়ে রাত্রিবাস করা চলবে না। এই নিয়মরক্ষার ব্যাপারে সত্যদা এবং মার্থা দু-জনেই খুব কঠোর। এখন আবিদের বাবা-মা ছেলের ঘরেই এসে উঠেছেন। এতেও সদালার আপত্তি। তিনি আবিদকে বলেছিলেন, বাবা-মাকে কোনো মোটেলে রাখো। এখানে অন্য সবাই ছাত্র, পড়াশুনা করে, আর তুমি বাবা-মাকে নিয়ে সংসার পেতে বসবে, তা তো ঠিক নয়। কিন্তু আবিদে বাবা-মা বিপদে পড়ে এখানে এসেছেন, তাঁদের কাছে ফরেন এক্সচেঞ্জ বিশেষ নেই, হোটেলে-মোটেলে কতদিন থাকবেন? তা ছাড়া আবিদের মা ছেলেকে ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে একেবারেই রাজি নন। আবিদ রীতিমতন কাকুতি-মিনতি করে সত্যদার কাছ থেকে সম্মতি আদায় করেছে।

আবিদের মা ইংরিজি জানেন না, এই যা রক্ষা। ইংরিজি না জানলেও ইংরিজিতে কথা বলতে হবে, এ রকম কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না, সেই সুযোগ নিয়ে সোমেন তাঁর সঙ্গে সাড়ম্বরে বাংলায় গল্প চালিয়ে যেতে লাগলো। সে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, মাসিমা, কী কী রানধছেন, আগে খিথা কইয়া দ্যান তো! আলু-পটলের ডালনা? আপনেরা পটল লইয়া আসছেন শুনছি। কতদিন যে পটল খাই নাই। আর পাঁচফোঁড়ন দেওয়া ডাইল।

কথা বলতে বলতে সে একবার অতীনের দিকে চোখে টিপে বললো, এই সব কথা ইংরিজিতে অনুবাদ করতে গেলে প্রাণটি বেরিয়ে যেত ভাই!

সুতরাং অতীনকেই মার্থার সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব নিতে হলো।

মার্থা জিজ্ঞেস করলো, বাবু-লু, ইজ নট মিলিং কামিং?

স্ত্রী না হলেও স্টেডি গার্ল ফ্রেন্ডদের নেমন্তন্ন করার প্রথা আছে এদেশে। আবিদ হোসেন অবশ্য শর্মিলাকে বলেনি, একখানা ঘরের মধ্যে কতজনকে আর ডাকা যায়। তাছাড়া, জাস্টিস আবু সয়ীদ চৌধুরী এবং আরও দু'জনের আসার কথা আছে, এঁরা বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা বোঝাবার জন্য পৃথিবীর বহু দেশে ঘুরছেন, নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জেও ভাষণ দিয়েছেন।

শর্মিলার অবশ্য আজ এমনিতেই অতীনের কাছে আসবার কথা আছে। সে এসে পড়লে পার্টিতে যোগ দেবে, কোনো অসুবিধে নেই।

অতীন বললো, শী ইজ সোপোজ্‌ড টু কাম। শী সেইড শী উড বী আ বিট লেইট!

মার্থা বললো, বড় সুমিষ্ট স্বভাবের মেয়েটি। ওকে আমি খুব পছন্দ করি। আচ্ছা বাবু-লু, ঐ আবিদের মতন তুমিও কি ইস্ট প্যাকিস্ট্যানের, আই মিন, এখন যাকে ব্যাংলাডেশ বলা হচ্ছে, সেখানকার মানুষ?

অতীন একটু দ্বিধা করে বললো, না।

তার বাবর বাড়ি পূর্ববঙ্গে ছিল, বাবার জন্ম সেখানে, কিন্তু অতীন তো পূর্ববঙ্গে জন্মায় নি। সেখানকার কোনো স্মৃতিও তার নেই।

মার্থা জিজ্ঞেস করলো, তা হলে আবিদের দেশের সঙ্গে তোমার দেশের সম্পর্কটা ঠিক কী? ইস্ট জার্মানি-ওয়েস্ট জার্মানির মতন?

অতীন বললো, না ঠিক তাও নয়। বলা শক্ত!

সত্যিই তো শক্ত! সম্পর্কটা আসলে কী! পশ্চিম জার্মানি এখনো মনে করে, দেশবিভাগটা আসলে অবাস্তব। পূর্ব জার্মানি আবার ফিরে আসবে, জার্মান জাতি এক হবে। পশ্চিম বাংলায় কি কেউ এ রকম মনে করে? না, দেশবিভাগটাই এখন কঠোর বাস্তব। পূর্ব জার্মানি কোনোদিনই আর ক্যাপিটালিস্ট জার্মানির সঙ্গে যোগ দেবে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও পশ্চিম বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক কী হবে? পাকিস্তানী আমলের সব বিধিনিষেধ উঠে যাবে?

অতীন খানিকটা ভাসা ভাসা ভাবে বললো, আমাদের দু'দিকের ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কালচারের অনেক মিল আছে, বিশেষত ল্যাঙ্গোয়েজের মিলটাই খুব বড় একটা টান, তাই না?

মার্থা মাথা নেড়ে বললো, না, আমি তা মনে করি না!

মার্থা অবশ্য তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করলো না। সে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ফেললো। এইটাই মার্থার একটা বৈশিষ্ট্য, সে এক বিষয়ে বেশিক্ষণ কথা বলে না। সে হঠাৎ হেসে বললো, তুমি একটা লাল রঙের ফোর্ড গাড়ি কিনেছো? আমাদের কিছু বলোনি?

অতীন একটু অস্থিত হলো। হাসি মুখে বললেও এটা কি মার্থার অভিযোগ?

মাত্র দিন সাতেক আগে গাড়িটা কিনেছে অতীন। সোমেনের বান্ধবী লিন্ডা ইসকনের সদস্যা হয়ে চলে গেছে লস এঞ্জেলিস, যাওয়ার আগে সে তার গাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে গেছে একেবারে জলের দামে। সোমের পীড়াপীড়িতেই অতীন সেটা কিনে নিয়েছে তিনশো ডলারে, সে পুরো টাকাটাও অতীনের কাছে ছিল না, সোমেন ধার দিয়েছে।

এ দেশে সবাই রাত্তিরবেলা বাড়ির সামনের রাস্তায় গাড়ি ফেলে রাখে। কিন্তু অতীন প্রথম তিনি দিন অতি সাবধানতায় গাড়িটাকে ঢুকিয়ে রেখেছিল গেটের মধ্যে। সত্যদা একদিন আপত্তি করেছিলেন, ভোরবেলা তাঁর নিজের গাড়ি বার করতে অসুবিধে হয়।

অতীন বললো, গাড়িটা তো আমি এখন বাইরেই রাখছি!

তার বাহুতে একটা চাপড় মেড়ে মার্থা বললো, সে কথ বলছি না। গাড়ি বাইরে রাখবে না কি বেডরুমে রাখবে? কিন্তু তোমার গাড়িতে একদিনও আমাকে চড়ালে না তো! একদিন তোমার গাড়িতে আমি শপিং করতে যাবো।

অতীন বললো, অবশ্যই, অবশ্যই!

মার্থার সঙ্গে কথা বলতে হলেও অতীন কান খাড়া করে অন্যদের কথা শুনছে। আবিদের বাবা এবং মা দু-জনেই খুব প্রশংসা করছেন কলকাতার। কলকাতার মানুষেরা খুব সজ্জন, কলকাতার ট্রাম-বাস ভালো, কলকাতায় নানা রকম খাবার পাওয়া যায়, কলকাতার সিনেমায় নাইট শো দেখে সবাই হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে। কোনো ভয় করে না---।

অতীনের কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগলো। কলকাতার গুণগান আজকাল শোনাই যায় না। তাছাড়া, সত্যিই তো কলকাতার ট্রাম-বাস মোটেই ভালো নয়, সব রকম খাবার দূরের কথা, মাঝে মাঝে চালই পাওয়া যায় না। তবু আবিদের বাবা-মা এত প্রশংসা করছেন, দেশত্যাগী হয়ে তাঁরা বাধ্য হয়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে।

সত্যদা নিজের স্ত্রীকে অতীনের কাছে গছিয়ে দিয়ে এখন ওদের সঙ্গে দিব্যি বাঙলায় গল্পে মেতে উঠেছেন। তাঁর মতন একজন সাহেব মানুষের ও যে কলকাতা সম্পর্কে এত আগ্রহ, তা আগে বোঝা যায়নি!

সত্যদা বললেন, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, বুঝলেন, এখনো মরা হাতি লাখ টাকা! ইন্ডিয়ার অন্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় এখনো এদেশে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রির বেশী দাম দেয়!

অতীন জানে, একথাটাও সত্যি নয়। সত্যদা যখন এদেশে প্রথম আসেন, তখন হয়তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সুনাম অক্ষুন্ন ছিল, এখন অতীন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশে কারুর কাছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতি শোনেনি। বরং তার ডিপার্টমেন্টের একজন অধ্যাপক কিছুদিন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কাজ করতে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসে বলেছেন, তোমাদের কলকাতায় কেউ তো গবেষণা বা সিরিয়াস পড়াশুনোর কাজকর্ম করে না। সবাই পলিটিক্স করে। হায়, তারা যদি পলিটিক্সটাও ভালো বুঝতো!

আবিদের বাবা সাঈফ সাহেব বললেন, আরে মশায়, আমিও তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। ফর্টিতে বি-এ পাস করছি। বেকবাগানের একটা বাড়িতে থাকতাম, সেই বাড়িখানা এখনো

একই রকম আছে। আমার ওয়াইফরে দেখাইতে নিয়া গ্যালাম একদিন।

আবিদের মা নাসিম বেগম বললেন, আমার সব থিকা ভালো লাগছে, কলকাতার দোকান বাজারে গ্যালেই জয় বাংলার মানুষ শোনোনেই সবাই কত খাতির করে, কোল্ড ড্রিংকস আইন্যা দেয়, দাম কমায়, কেমন আপন আপন ভাব। অথচ পাকিস্তানী আমলে ভাবতাম, ইন্ডিয়ার সকলেই বুঝি আমাগো শত্তুর।

অতীন অনেক্ষন চুপ করে আছে দেখে মার্থা একটু গলা চড়িয়ে সকলের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করলো, আমি একটা কথা জানতে চাই। এখন প্রায়ই খবরের কাগজে আর টেলিভিশনে ইস্ট প্যাকিস্ট্যানের নানান রকম খবর থাকে। এডোয়ার্ড কেনেডি গিয়ে দেখে এসেছে যে সত্যিই কয়েক মিলিয়ান রেফিউজি সেখানে থেকে ইন্ডিয়া চলে এসেছে। এখন তোমরা কি মনে করো, ইন্ডিয়া যদি প্যাকিস্ট্যানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগায়, সেটাই একমাত্র সলিউশান।

সাঈফ সাহেব এবং সোমেন একসঙ্গে চলে উঠলো, অফ কোর্স! যুদ্ধ ছাড়া এই বর্বরতাকে আর কিছুতেই দমন করা যাবে না।

আবিদ নিজে চার-পাঁচ মাস আগে পর্যন্ত ছিল প্রবল পাকিস্তানের সমর্থক, এখন তার মতামত সম্পূর্ণ উল্টে গেছে, সে জোর দিয়ে বললো, শুধু ইন্ডিয়া কেন, ওয়ার্ল্ডের সব পাওয়ারেরই উচিত পাকিস্তানকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া। যাতে ওরা আর কোনদিনই আমি দিয়ে সিভিলিয়ানদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে।

মার্থা খুব সরলভাবে বললো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে এদেশে কত প্রতিবাদ আর মিছিল হয়। আমাদের ইয়াং জেনারেশন যুদ্ধ চায় না। শান্তি চায়। আর তোমরা তোমাদের দুই গরিব দেশে যুদ্ধ লাগাতে চাইছ? তোমরা ওয়ার মংগার?

এবার অতীন পর্যন্ত বলে উঠলো, তোমার এই তুলনাটা অত্যন্ত বোকার মতন হলো, মার্থা।

ভিয়েতনামে যেটা চলছে, সেটা একটা ইমমরাল ওয়ার। তোমরা অ্যামেরিকানরা চোদ্দ-পনেরো হাজার মাইল উড়ে গিয়ে নর্থ ভিয়েতনামে বোমা ফেলছো, নাপাম গ্যাস দিয়ে লোক মারছো! আর ইস্ট পাকিস্তানে চলছে একটা বেঁচে থাকার লড়াই, প্রতিরোধ না করলে লোকরা মরতেই থাকবে।

মাথা বললো, সব যুদ্ধই ইমমরাল। আমি কোনো যুদ্ধই সমর্থন করি না। আমি এখনো মনে করি, যুদ্ধের বদলে আলোচনার টেবিলেই এই সমস্যার সমাধান করা উচিত।

তারপর শুরু হয়ে গেল তর্ক।

নাসিম বেগম ইংরিজি না বুঝলেও এটা জানেন যে অ্যামেরিকান সরকার এখনও পাকিস্তানের সামরিক শাসকদেরই সমর্থক। তাঁর চোখে সব অ্যামেরিকানই এক। তিনি মার্থাকে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মাসতুতো বোন ধরে নিয়ে এমনই চটে গেলেন তার ওপরে যে তাকে তিনি খাবার পরিবেশনই করতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, আবিদ, তুই ঐ ম্যামডারে প্লেট দে। আমি দিমু না।

আবিদের অন্য অতিথিরা শেষ পর্যন্ত এলো না, শর্মিলা ন'টার পর অতীনকে খুঁজতে এসে এখানে যোগ দিল।

নাসিম বেগম এতক্ষণ পর একটা বাংলা বলা মেয়েকে পেয়ে খুব আদর করতে লাগলেন। বাঙালী মহিলাদের স্বভাবই এই, অচেনা কারুকে পছন্দ হলে অমনি তার সঙ্গে চেনাশুনো কারুক মুখের মিল পেয়ে যায়। নাসিম বেগমও শর্মিলাকে দেখেই বললেন, যে তাকে নাকি দেখতে অবিকল তাঁর খালাতো বোনের মতন। সেই খালাতো বোনের কোনো সংবাদ নেই।

নাসিম বেগম শর্মিলার গায়ে হাত বুলিয়ে স্নেহের সঙ্গে বলতে লাগলেন, কইলকাতার মেয়েরা কী লক্ষ্মী। অফিসে কাজ করে, আবার বাসায় এসে রান্না করে স্বামীপুত্র কন্যাদের খাওয়ায়, যত্ন করে, বাড়িতে ঝি-চাকরও রাখে না। সব নিজেরা করে। তিনি এলগিন রোডে এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়েছিলেন, সে বাড়ির পাঁচটি মেয়ে, প্রত্যেকেই এক একটি রত্ন, যেমন লেখাপড়ায় ভালো, তেমন কাজে কর্মে---

অতীন পাশে এসে বললো, এ কিন্তু কলকাতার মেয়ে নয়। জামসেদপুরের। বিহারী। কলকাতার মেয়ে হচ্ছে অলি। ইস, আজ যদি অলি এখানে উপস্থিত থাকতো, সে কত খুসী হতো।

এত কলকাতা নিয়ে আলোচনার জন্যই অলির কথা বার বার মনে পড়ছে অতীনের। অলি এখন কী করছে? মেরিল্যান্ডের মস্ত বড় একটা বাড়িতে অলি একা থাকে। এর আগে তো কোনোদিন সে

এমন একা থাকে নি।

বিরিয়ানিও আছে, সাদা ভাতও আছে। ডালও আছে, বুরহানিও তৈরি করেছেন নাসিম বেগম। স্যামন মাছের ঝোল আর মুর্গির রোস্ট। তিন চার রকমের সবজির তরকারি। রান্না অতিশয় উৎকৃষ্ট। বাবা-মা আছেন বলেই আবিদ হোসেন মদ-টদ কিছু সার্ভ করেনি আগে। অতীন আর সোমেন সেটা জানতো বলেই নিজেরা আগে থেকে একটু খানি পান করে এসেছে। বেশি নেশা করে এলে খাবার খেতে ইচ্ছে করে না, অল্প নেশায় খিদে বাড়ে। তবু অতীন প্রায় কিছুই খেল না। অযৌক্তিকভাবে তার একটা কথাই বার বার মনে পড়ছে, অলি কেন এখানে নেই? অলির থাকা উচিত ছিল!

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পরই সত্যদা আর মার্থা বিদায় নিল। সত্যদা ঠিক দশটা বেজে পনেরো মিনিটে ঘুমোতে যান। পাক্কা সাহেব হলেও তিনি আজ একটু বিচলিত হয়েছিলেন।

প্রায় সতেরো-আঠারো বছর তিনি দেশে যাননি, দেশের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগই নেই প্রায়, তবু আজ আবিদ হোসেনের বাবার মুখে বাঙাল ভাষা শুনে তাঁর মুখ দিয়েও কিছু কিছু বাঙাল ভাষা বেরিয়ে আসছিল। কুমিল্লার নানান লোকজনের খবরাখবর নিচ্ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত বিষাদের রেখা ফুটে উঠছিল। সতেরো বছর পরেও এ রকম থাকে!

ওঁরা দু'জন চলে যাবার পর সোমেন হাঁপ ছেড়ে বললো, যাক, বাঁচা গেল! উফ্! এই মার্থাটা এমন ইডিয়েট, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সঙ্গে----

শর্মিলা কাতরভাবে বললো, এই,ও রকম করে বলো না! মার্থা খুবই কাইন্ড হার্টেড মহিলা। কখনো কারুর নামে খারাপ কথা বলেন না।

সোমেন বললো, দেখো শর্মিলা, কাইন্ড হার্টেড মহিলারাও গ্রেট বোর হতে পারে। তুমি তো সবাইকেই ভালো দেখো। কিন্তু আমরা কি নিরিবিলিতেও একটু অ্যামেরিকানদের চুটিয়ে গালাগাল দিতে পারবো না? সেখানেও একজন অ্যামেরিকান মহিলা বসে থাকলে---তোমাকে আর একটা কথা বলি শোনো। কানে খাটো লোকেরা অনেক কথা শুনতে পায় না। কিন্তু তুমি তাদের শালা কালা বলো, অমনি ঠিক বুঝতে পারবে। সেই রকমই, যেসব ধলা মেয়েরা বাঙালীদের বিয়ে করেছে, তারা বাংলা বুঝতে পারে না। কিন্তু তুমি বাংলায় খুব সাঁটে সাহেবদের নিন্দে করে দেখো না, ওরা ঠিক ধরে ফেলবে। সেটা বোঝে!

শর্মিলা বললো, ওদের সামনে নিন্দে করার দরকারটাই বা কী?

সোমেন বললো, ওরা আমাদের দেশ আমাদের নিন্দে করে না? অবশ্য ওরা সেটা গোপন রাখার চেষ্টাও করে না, আমরা শালা ভিখিরির জাত-

আরও কিছুক্ষণ আড্ডা হলো, কিন্তু অতীন গুম হয়ে গেছে, সে শুধু মেরিল্যান্ডের সেই বাড়িটা, একতলা পুরো অন্ধকার, আর্টিস্ট মহিলাটি বিদেশে গেছেন! পাশের দিকে দোতলার একটি ঘরে অলি একা। চোর-ডাকাত আসতে পারবে না। বার্গলার্স অ্যালার্ম দেওয়া আছে, তবু নিছক একাকিত্বেরই কি একটা কষ্ট নেই?

শর্মিলা প্রায়ই ফোন করে খবর নেয়। কিন্তু অলি নিজে থেকে একবারও ফোন করেনি অতীনকে।

এক সময় পার্টি ভাঙলো। এখন অতীনের গাড়ি আছে, শর্মিলাকে তার বাড়ি পৌঁছে দেওয়া উচিত। রাত মাত্র সাড়ে দশটা। এখন একটা লং ড্রাইভেও যাওয়া যায়।

বাড়ির সামনে রাস্তাটা পেরিয়ে যাবার পর শর্মিলা বললো, বাবলু, আজ একবার লংফেলো ব্রীজে যাবে? সেই সেবারের ঘটনার পর ওদিকে আর আমার কখনো যাইনি!

অতীন শুকনো গলায় বললো, আজ থাক। আজ আমার ঘুম পাচ্ছে!

শর্মিলা ব্যস্ত হয়ে বললো, ওমা, তোমার ঘুম পাচ্ছে, ত হলে তুমি গাড়ি বার করলে কেন? আমি ট্যাক্সিতে চলে যেতে পারি।

অতীন কোনো উত্তর দিল না। সে খুব জোরে একটা মোড় ঘুরালো।

শর্মিলা বললো, বাবলু, তুমি আমাকে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে একলা ফিরবে, আমার একটা চিন্তা থাকবে।

অতীন বললো, তোমাকে কতবার বলেছি, মিলি, আমার অ্যাকসিডেন্ট মৃত্যু নেই? আই হ্যাভ আ চার্মড লাইফ!

তারপর কিছু ক্ষণ চুপচাপ। শর্মিলা কোনো কথা বললেও অতীন শুধু হুঁ-হাঁ করে যায়। শর্মিলা

তো অতীনের নাড়ি-নক্ষত্র জানে, সে বুঝলো, আজ অতীনের কিছু গোলমাল হয়েছে!

সে পৌঁছোবার আগেই ওই পার্টিতে অতীন কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে নাকি?

কিন্তু এখন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা ঠিক নয়। দু'দিন পর অতীনের কাছে থেকে পুরো ব্যাপারটা জানা যাবে।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য সে বললো, বাবলু, তুমি আমার শাড়িটা দেখে কিছু বললে না যে? আমি একটা নীল শাড়ি পরে এসেছিলুম। আবিদের মা আমাকে শাড়ি দিলেন। প্রায় জোর করে সেটা পরে তাঁকে দেখাতে বললেন। খুব চমৎকার জামদানি।

শাড়ি বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করে অতীন হঠাৎ হেঁড়ে গলায় গান জুড়ে দিল। তু লাল পাহাড়ীর দেশে যা। রাঙা মাটির দেশে যা। হেথায় তুরে মানাইছে না গ। ইক্কেবারে মানাইছে না গ।

শর্মিলা বললো, এটা আবার কি গান?

অতীন বললো, এটাই আমার এখন ন্যাশনাল সঙ্গ। আমার কি কেমব্রিজে গাড়ি চালানোর কথা?

শর্মিলাকে পৌঁছে দেবার সময় তাকে একবার ও চুমু খেল না অতীন। ফেরার সময়েও তার ঠোঁটে ঐ একই গান। আজ যে বার বার অলির কথা মনে পড়ছে, সে কথা শর্মিলাকে বলা যায় না। আবার শর্মিলাকে বলতে পারলো না বলেও তার কষ্ট হচ্ছে।

গাড়িখানা পার্ক করার পর অতীন সোমেনের দরজার সামনে একবার দাঁড়ালো। আলো নিবে গেছে, সোমেন এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লো? তার এখনো আড্ডা মারতে ইচ্ছে করছে। আবিদের কাছে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না।

ওপরে নিজের ঘরে এসে অতীন গেলাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে একটা বই খুলে বসলো। তবু সে ঐ গানটাই গাইছে। হেথায় তুরে মানাইছে না গ। ইক্কেবারে মানাইছে না গ!

একটু পরেই সে দুমদাম করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলো নীচে। এখন বসবার ঘরে টিভি দেখার কেউ নেই। এই সময় নিরিবিলিতে ফোন করা যায়।

প্রায় এক মিনিট রিং হবার পর অলি ফোন ধরলো। এরই মধ্যে অতীনের অস্থিরতা তুঙ্গে পৌঁছে গেছে। সে কর্কশ গলায় বললো, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? কী করছিলি?

অলি বললো, আমি নীচে কুকুরটাকে খাবার দিতে গিয়েছিলুম। তারপর লেটার বক্সে একটা চিঠি পেলুম।

-কার চিঠি?

উত্তর দিতে কি দু'এক মুহূর্তে দেরি হলো অলির? সে কি দ্বিধা করেছিল? কিংবা সে সঙ্গে সঙ্গেই বললো, শৌনকের। অনেক বড় চিঠি। আমি টেলিফোনের রিং শুনতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু -

অতীন ফেটে পড়ে বললো, হু ইজ দিস গড ড্যাম শৌনক? অলি, আই ওয়ান্ট ফুল ডিটেইলস্ অ্যাবাউট দিস ক্যারেকটার! তুই যার-তার সঙ্গে মিশবি, আমি এটা মোটেই পছন্দ করি না।

অলি খুব মিষ্টি করে বললো, তোমার কী হয়েছে, বাবলুদা? এত রাগারাগি করছো কেন? শর্মিলা কেমন আছে?

-তুই কেমন আছিস, অলি?

-আমি ভালো আছি, বাবলুদা। চমৎকার আছি। শৌনকের চিঠিটা পড়া এখনো শেষ হয়নি। ও লিখেছে যে আমাদের চেনাশুনো বন্ধুরা সবাই ভালো আছে।

-প্লিজ, প্লিজ, অলি, শৌনক-টৌনকের কথা বাদ দে! আমি শুধু তোর কথা শুনতে চাই। খুব মিষ্টি হেসে অলি বললো, কী ব্যাপার, বাবলুদা। আজ বুঝি শর্মিলার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে! তাই আমার কথা মনে পড়েছে? এটা তো ঠিক নয়? শর্মিলার সঙ্গে তোমার কী হয়েছে, আমাকে বলো, আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। আমি শর্মিলাকে ফোন করবো?

অতীন প্রায় হাহাকারের স্বরে বললো, অলি, অলি, ঐসব কিছু না। আমি শুধু জানতে চাইছি, তুই কেমন আছিস! আমি কি তোর জন্য কিছু-----

উত্তর না দিলে অলি কুলকুল করে হাসতে লাগলো।

অতীন আবার বললো, অলি, তুই একলা একলা থাকিস, তোর কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে---

তাকে বাধা দিয়ে অলি বললো, আমার একা থাকতে খুব ভালো লাগে, কেউ ডিসটার্ব করার নেই, মনে মনে আমি কলকাতায় ফিরে যাই----

রিসিভারটা রেখে দিয়ে অতীন সোজা চোখে প্রায় পাঁচ সাত মিনিট তাকিয়ে রইলে দেওয়ালের দিকে। টেবিল থেকে হুইস্কির বোতলটা নিয়ে সে কাঁচাই চুমুক দিল খানিকটা। বিছানায় ঢলে পড়ে যাবার সময় পর্যন্ত সে চাপা দুঃখের সঙ্গে বলতে লাগলো, অলি, অলি, অলি, অলি আমার কেউ না। শালা, শুয়োরের বাচ্চা শৌনক, তুই যদি কোনোদিন অলির মনে দুঃখ দিস---আমার মতন--- কিংবা আমি কেউ না---আমি তোদের বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। আমি সরে যাবো----

॥ ৫৬ ॥

মেয়েদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা একটু বেশি থাকে। কারণ তাদের ঘর সামলাতে হয়, ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করতে হয়। সোনার গয়না গড়াবার জন্য অনেক মেয়েরই খুব ঝোঁক থাকে, কিন্তু ক'জন মেয়ে আর সেই গয়না নিয়মিত পরে? সে সব তোলা থাকে সিন্দুকে, আসলে সেগুলি ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতীক। এক সেট সুন্দর কাপ-ডিশ কিনলেও গৃহিনী তা সহজে ব্যবহার করতে চায় না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখে ভবিষ্যতের কোনো একটা বিশেষ উৎসবের দিনের জন্য।

কিন্তু ঢাকায় এখন অনেকেই আর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না। প্রত্যেকদিন সকালে উঠেই মনে হয়, আজকের দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটবে তো? যাদের বাড়ি থেকে বেরুতে হয়, তারা ঠিকঠাক ফিরবে?

আজ জাহানারা ইমাম বিছানায় পাতলেন একটা ঝকঝকে নতুন চাদর। বালিশের ওয়াড়গুলো বদলালেন। দুটি বাথরুমেই ঝোলালেন নতুন বিলিতি তোয়ালে। এই ক'মাস যেমন-তেমন করে খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল, আজ তিনি খাওয়ার টেবিলে পাতলেন অপূর্ব কারুকার্য করা লেসের টেবিল ক্লথ। একবার একজন চিটাগাং থেকে এনে দিয়েছিল ইটালিয়ান ডিনার সেট, এর আগে একদিনও ব্যবহার করা হয়নি, আজ সেইসব প্লেট টেবিল শোভা পেল। সেই সঙ্গে কাট গ্লাসের পানির গেলাস। কাঁটা-চামচগুলোও চকচকে নতুন।

খেতে এসে শরীফ আর জামী হাঁ হয়ে গেল। পিতা-পুত্র পরস্পরের দিকে চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর শরীফ জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আজ কোনো বড় দরের মেহমানকে দাওয়াত দিয়েছো নাকি? কিছু বলোনি তো?

জাহানারা ঈষৎ হেসে বললেন, নাঃ, আজ আমরাই আমাদের মেহমান।

শরীফ তবুও কিছু বুঝতে পারলেন না। ঈদ কেটে গেছে আটদিন আগে। এবারের ঈদ কেটেছে অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে। কারুর জন্যই নতুন পোশাক কেনা হয়নি, বাড়িতে বিশেষ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। পাকিস্তানী আর্মির ঘোষণা ছিল, ঈদ উপলক্ষে সারা দেশে জাঁকজমক করতে হবে, সে নির্দেশ পালন করেছে শুধু মুষ্টিমেয় কিছু ধনী পরিবার আর দালালশ্রেণী। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর গোপন ইস্তাহারে জানানো হয়েছিল, দেশের এই দুর্দিনে ঈদ উৎসবের আড়ম্বর করা অন্যায়। জাহানারা শুধু বিশেষ কয়েকজন অতিথির কথা চিন্তা করে ঈদের সেমাই, জর্দা রেঁধেছিলেন, তারা অবশ্য আসেনি।

তাহলে আজ কিসের উৎসব? শরীফের পীড়াপীড়িতে জাহানারা বললেন, কিছু না! এইসব জিনিসপত্র এতদিন প্রাণে ধরে জমিয়ে রেখেছিলাম। আজ হঠাৎ মনে হলো, কী হবে জমিয়ে রেখে! হঠাৎ মনে গেলে তো সাতভূতে লুটেপুটে খাবে। তারচেয়ে নিজেরাই ভোগ করে যাই!

শরীফও জামী দু'জনেই একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

জাহানারা আবার বললেন, ভেবেছিলাম, রুমী-জামীর বিয়ের সময় এইগুলো বার করবো। ওদের কি আর বিয়ে হবার চান্স আছে? আগামীকালই কী হবে বলা যায় না!

আগামীকাল 'ক্রাস ইন্ডিয়া' দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণার মর্ম যে কী তাই-ই বুঝতে পারছে না কেউ। একটা গুজব রেটেছে যে কট্টর পাকিস্তানী সমর্থকরা এই উপলক্ষে কয়েক লাখ বাঙালীকে ইন্ডিয়ার চর হিসেবে ঘোষণা করে মেরে ফেলবে। যাতে সেই দৃষ্টান্ত দেখে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করে।

পরিবেশ খানিকটা হাল্কা করার জন্য জামী বললো, জানো আম্মা, ক'দিন আগে জোনাকী সিনেমা হলের পাশে সেই যে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কটা লুট হলো, সেইটা আসাদ, মুনীর, ফিরোজ, ফিরদৌসদের কীর্তি।

জাহানারা বললেন, তাই নাকি? ঐটুকু ছেলেরা কী করে পারলো?

জামী বললো, শোনো না মজা। ওরা যোগাড় করেছিল একটা মো[illegible] স্টেনগান। আসাদ নিল সেটা। আর মুনীরের হাতে একটা খেলনা রিভলবার। সেটাকে দেখতে একেবারে আসলের মতন। আরীফের বাবা পীরসাহেব, তাঁর গাড়িটা নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়লো।

শরীফ হাসতে হাসতে বললেন, পীরসাহেবের গাড়ি নিয়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতি? তোবা তোবা!

জামী বললো, পীরসাহেব কিছু টের পান নাই। গাড়ির নাম্বার প্লেটটাও বদল করে নেওয়া হয়েছিল জলিদের বাসায় গিয়ে। একজনকে ওরা আগেই ব্যাঙ্কের সামনের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল খবর নেবার জন্য। বেলা এগারোটায় ওদের গাড়ি পৌঁছাতেই সে বললো, অল ক্লিয়ার। আসাদ, মুনীর আর ফিরোজ দৌড়ে ভেতরে ঢুকেই দারোয়ানের কপালে স্টেনগানটা ঠেকাতেই সে হায় আল্লা, প্রাণে মাইরেন না বলে ফেলে দিল তার রাইফেল। মুনীর ক্যাশ কাউন্টারের ধারে গিয়ে খেলনা পিস্তলটা উঁচিয়ে বললো, হ্যান্ডস আপ! সব কয়টা লোক দুই হাত তুলে দাঁড়ালো। আর ম্যানেজার আগ বাড়িয়ে এসে বললো, ন্যান ন্যান, আপনেরা টাকা নিয়ে যান, যত খুশি নিয়ে যান, মুক্তিবাহিনীর টাকা দরকার, সে তো আমরা জানিই।

জাহানারা জিজ্ঞেস করলেন, কত টাকা পেয়েছে?

জামী বললো, শোনো না আর ও মজা। তাড়াতাড়িতে ওরা কোনো বস্তা কিংবা থলি সাথে নেই নাই। ম্যানেজার তো বান্ডিল বান্ডিল টাকা এগিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ওরা নেবে কিসে?

ফিরোজ তার গায়ের শার্টটা খুলে তাতেই বেঁধে নিল যতগুলো পারলো, তারপর বাইরে আসতেই জামার হাতা দিয়ে টুপটাপ করে টাকা খসে পড়তে লাগলো রাস্তায়।

শরীফ বললেন, নভিস আর কাকে বলে!

জামী বললো, কাছেই দুটো আর্মির ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। তারা এতক্ষণে কিছু টের পায় নাই। কিন্তু রাস্তার লোক আজকাল মুক্তিবাহিনীর কোনো অ্যাকশান দেখলেই আনন্দেই হাততালি দিয়ে জানো তো! ওদের দেখে অনেক লোক হাততালি দিয়ে জয় বাংলা জয় বাংলা বলে চ্যাঁচাতে লাগলো! অবশ্য আর্মির মোটা মোটা ট্রাকগুলো স্টার্ট নেবার আগেই ওরা গাড়ি নিয়ে হাওয়া।

শরীফ আর জাহানারা দু'জনেই হাসতে লাগলেন প্রাণ খুলে।

মানুষই একমাত্র প্রাণী যে বিপদের পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও হাসতে পারে। আলমারি দেরাজে সাজানো জিনিসপত্র ব্যবহারের জন্য বার করে ফেললেও জাহানারা-শরীফরা অবশ্য একটা ঘরে অনেক জিনিসপত্র জমাচ্ছেন। বিভিন্ন দোকান থেকে ঘুরে ঘুরে কিনে আনছেন সোয়েটার, মাফলার আর মোজা। একবার জিন্না এভিনিউয়ের ফুটপাথের এক দোকান থেকে জাহানারা একসঙ্গে ছ'খানা সোয়েটার কিনতে গিয়ে একজন আর্মির লোকের কাছে ধমক খেয়েছিলেন। হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়িয়ে সেই লোকটি জানতে চায়, কেন এক সঙ্গে ছ'খানা সোয়েটার কেনা হচ্ছে! সেদিন জাহানারার মাথায় চট করে একটা উত্তর যুগিয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি বিপদে পড়েননি। তিনি বলেছিলেন, বেগম লিয়াকত আলী কহা হ্যায় না, জওয়ান লোগোঁকো লিয়ে সুয়েটার, টাওয়েল, সাবুন--ইয়ে সব খরিদ করকে আপওয়া অফিস মে ভেজ না? উয়ো যো অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন হ্যায়----।

ওষুধও কিনতে হচ্ছে বিভিন্ন দোকান থেকে। শরীফ, জামী যে-যখনই বাইরে বেরোয়, কিছু ওষুধ নিয়ে আসে। কেনা হচ্ছে শত শত প্যাকেট সিগারেট। জমানো হচ্ছে চাল। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ছোট ছোট পুঁটলি করে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে চালের মধ্যে। কখন গোপন অতিথিরা আসবে, তার কোনো ঠিক নেই। ওদের জন্য এইসব লাগে। আগে শুধু টাকা আর সিগারেট দিলেই হতো। এখন শীত এসে গেছে, ওদের কারুরই শীতবস্ত্র নেই। তবে ঐ সব ছেলেরা বলে, মোজা কেনার দরকার নেই, মোজা কোনো কাজে লাগে না, কারণ ওদের প্রায় কারুরই পায়ে জুতো নেই!

পাকিস্তানী আর্মির সাঙ্ঘাতিক কড়াকড়ির মধ্যে ওমুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত থেকে ঠিকই চলে আসে ঢাকায়, দু-এক জায়গায় অ্যাকশান করেই আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। জাহানারা চাতক পাখির মতন তাদের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকেন। রাত দুটোর সময়েও যদি তারা এসে চুপি চুপি পেছনের দরজায় টোকা মারে, তাতেও আনন্দে তাঁর প্রাণটা লাফিয়ে ওঠে।

প্রত্যেকবারই তাঁর মনে হয়, ওদের সঙ্গে রুমী রুমী এসেছে!

ঠিক আটানব্বই দিন আগে রুমীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল মিলিটারি, তারপর থেকে আর রুমীর

কোনো খবর নেই। সামরিক দফতর কোনো খবর তো দেবেই না, সেখানে কিছু জানতে যাওয়াও বিপজ্জনক। শুধু পাগলাবাবাই এখনো বলে যাচ্ছেন যে রুমী ঠিকই বেঁচে আছে, তিনিই একদিন রুমীকে ছাড়িয়ে আনবেন। পাগলাবাবা আরও অনেক জননীকেই এই আশ্বাস দিয়েছেন, এসব কি নিছক সান্ত্বনা?

এমন ও তো হতে পারে যে রুমী বন্দী দশা থেকে পালিয়ে গেছে কোনোক্রমে! ইন্ডিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে? কিন্তু তা হলে কী রুমী তার মা-বাবাকে একটা খবরও দেবে না? হয়তো একেবারে নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা তার পক্ষে খুব জরুরি। এখনও সময় আসেনি!

মনি, বাচ্চু, মাহবুবরা এলে জাহানারা তাদের খাবার পরিবেশন করতে করতে এক সময় জিজ্ঞেস করেন, তোরা সত্যি করে বল তো, রুমী কোথায়? তোরা তো আমাকে জানিস, আমাকে মেরে ফেললেও পাক আর্মি আমার পেট থেকে কোনো কথা বার করতে পারবে না। চরম খারাপ সংবাদ হলেও তোরা আমাকে বল, আমি শুধু সত্যি কথাটা জানতে চাই!

দু'একজন মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করেছিল, জাহানারা ধরে ফেলেছেন। ওরা সত্যিই রুমীর খবর জানে না।

বাবুল চৌধুরী অবশ্য পান মাঝে মাঝে। অল্প বয়েসীরা বাবুলকে একজন অদ্ভুত মানুষ হিসেবে সমীহ করে। সে প্রায় কারুর সঙ্গেই পারতপক্ষে কথা বলে না, ঘন্টার পর ঘন্টা সে চুপ করে এক দিকে চেয়ে বসে থাকে। কিন্তু অ্যাকশানে অংশ নিলে সে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দেয়। যেন তার বিন্দুমাত্র প্রাণের মায়া নেই।

মাঝখানে হঠাৎ শোনা গেল সেকটর টু-র কমান্ডার খালেদ মোশাররফ যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে। তাতে ঢাকার অনেক পরিবারে নিদারুণ শোক নেমে এসেছিল, জাহানারাও খুব ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কিছু অল্প বয়েসী ছেলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল বুক চাপড়ে। খালেদ মোশাররফ যুবসমাজের হীরো,তার নির্দেশেই অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় এসে পাকিস্তানী শক্তিকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সেই খালেদ মোশাররফ নেই।

দু'চারদিন পর সীমান্তের মেলাঘর ক্যাম্প থেকে সঠিক সংবাদটি আসে। খালেদ মারা যায়নি, কসবার যুদ্ধ পরিচালনা করার সময় সে সাঙ্ঘাতিক আহত হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে তাকে হেলিকপ্টারে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লখনউ-এর হাসপাতালে। শেলের টুকরোয় তার কপাল ফটো হয়ে গেলেও সে বেঁচে যাবে। তার জায়গায় এখন সেকটর টু-র কমান্ডার হয়েছে মেজর হায়দার।

যে ছেলেটি পাকা খবর এনেছিল, সে বললো, জানেন আম্মা, আমাদের বেস ক্যাম্পে যখন খালেদ ভাইয়ের সম্পর্কে ঐ দুঃসংবাদ আসে, তখন সেখানে যেন একেবারে কারবালার মাতন পড়ে গিয়েছিল! আমিও সারা রাত্রি ধরে কেঁদেছি!

বলতে বলতে চোখে পানি এসে গিয়েছিল তার, একটু সামলে নিয়ে সে আবার হেসে বললো, কিন্তু কসবার যুদ্ধে আমাদেরই জয় হয়েছে, আমরা কসবা কেড়ে নিয়েছি!

ঢাকার কাগজে অবশ্য পরপর চারদিন ফলাও করে কসবার ঘোরতর যুদ্ধের খবর ছাপা হয়েছে, ভারতীয় চররা কামান, মিগ্‌গান, ভারী মর্টার, অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গান নিয়ে আক্রমণ করলেও পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের প্রচণ্ড মার মেরে ভাগিয়ে দিয়েছে। আসলে যে কসবা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে তা কেউ বুঝতে পারেনি। পাকিস্তানী খবরে এখনো মুক্তিযোদ্ধাদের সামান্যতম উল্লেখও থাকে না, যদিও মিলিটারি জওয়ানরা নাকি এখন মুক্তি শব্দটা শুনলেই ভয় পায়।

খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, ভারতের সঙ্গে বোধ হয় সত্যিই যুদ্ধ বেধে গেছে। প্রায়ই হেডিং থাকে, ভারতের নির্লজ্জ আক্রমণ। যখন তখন কারফিউ দেওয়া হচ্ছে, এমনকি দিনে দুপুরেও। সন্ধের পর নিষ্প্রদীপের মহড়া। অথচ, ভারতের আকাশবাণী কিংবা স্বাধীন বাংলা বেতারে সর্বাত্মক যুদ্ধের কোনো ইঙ্গিত নেই। ইন্দিরা গান্ধী বিদেশে ঘুরছেন। ঢাকার অনেকেই মনে মনে অধীর হয়ে ভাবে, ভারত সত্যি সত্যি যুদ্ধে নেমে পড়ছে না কেন? এই অনিশ্চয়তা আর সহ্য হয় না। বুকে ব্যাথা করে।

মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতা যত বাড়ছে, ততই ঢাকার সাধারণ বাঙালীদের ওপর কট্টর পাকিস্তান সমর্থকদের অত্যাচার বাড়ছে। মিলিটারির লোক ছাড়াও বিহারীরা রাস্তা-ঘাটে যাকে তাকে ধরে বলছে, তুমি মালাউন হ্যায়! সে বেচারী প্রবল প্রতিবাদ করে কোনোরকমে ভুল উর্দু উচ্চারণে কোরান-শরীফ থেকে মুখস্ত বলার চেষ্টা করে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নামাজ পড়ে, তবু তাদের বিশ্বাস হয় না।

পেছনে লাথি মারে। মিলিটারি পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। এলিফ্যান্ট রোডে একদিন দুপুরে একজন ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। পরে জানা গেল, সে তো মালাউন নয় বটেই, তার বাবা শান্তি কমিটির এক পান্ডা, লোকটির মাথার সামান্য দোষ ছিল।

একদিন জামীর এসে বললো, জানো আম্মা, বিহারীরা অনেকে এখন মাথা ন্যাড়া করে একটা লাল ফেট্টি বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জাহানারা বললেন, আমি দেখেছি বাজার করতে গিয়ে। হঠাৎ মাথা ন্যাড়া করার ধুম পড়ে গেল কেন রে?

জামী বললো, কী জানি! ঠিক শয়তানের সহোদরের মতন দেখায়!

জাহানারা বললেন, তুই ভূতের গলির ইব্রাহিমকে দেখেছিস? সে ও মাথা ন্যাড়া করেছে। আজ বায়তুল মোকাররমের কাছে দেখি, সেও মাথায় একটা লাল ফেট্টি বেঁধে ঘুরছে!

জামী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইব্রাহিম ভাই? সে ওরকম সেজেছে কেন? সেও কি রাজাকার হলো নাকি?

জাহানারা বললেন, নারে! ভীতু মানুষ। ভেবেছে ঐ রকম সাজলে তাকে আর কেউ রাস্তা ঘাটে জেরা করবে না।

জামীর তরুণ মুখশ্রীতে ঘৃণায় রেখা ফুটে উঠলো। সে বললো, কাপুরুষ! আমি আর কোনোদিন ওর মুখ দেখবো না! ফুঃ!

জামীর রাগ দেখে হাসতে লাগলেন জাহানারা।

জামী বাইরে থেকে নতুন নতুন খবর নিয়ে আসে। কদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, যুদ্ধ ঘনিয়ে এলে ঢাকায় স্টিট ফাইট শুরু হবে। মুক্তিযোদ্ধারা আশা করে যে তারা যখন ঢাকাকে ঘিরে এগিয়ে আসবে তখন ঢাকার নাগরিকরাও যেন এদিক থেকে পাক বাহিনীকে আঘাত হানতে শুরু করে। সে জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। পরাজয়ের মুখোমুখি হলে নিয়াজীর সাঙ্গোপাঙ্গরা মরীয়া হয়ে ঢাকা শহরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

জাহানারার মনে পড়ে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চিলের সেই বিখ্যাত বক্তৃতা, উই শ্যাল ফাইট ইন দা হাউজেজ, উই শ্যাল ফাইট ইন দা স্ট্রিটস!

জামী সেই চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর। শরীফই বা বাদ যাবে কেন। জাহানারার আজ আপত্তি করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বুঝে গেছেন, এখন নিয়তির কাছে সর্বস্ব বন্ধক দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। এইরকম ভাবে আরও কয়েকমাস চললে শেষপর্যন্ত কেউই বুঝি আর বেঁচে থাকবে না। সর্বস্ব পণ করলে যদি স্বাধীনতা আসে, তাহলে হয়তো কিছু মানুষ অন্তত বেঁচে থাকবে আবার এই বাংলাদেশে জীবনের স্পন্দন জাগাতে।

কেরোসিনের টিন এগারো টাকা থেকে লাফিয়ে উঠেছিল আঠারো টাকায়, গতকাল বাজার থেকে একেবারে উধাও! সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন বিস্ফোরণের পর প্রায়ই কারেন্ট থাকে না। কেরোসিনও না পাওয়া গেলে রান্না হবে কী করে। বুড়োমিয়াকে কেরোসিনের খোঁজে পাঠিয়ে জাহানারা গাড়ি নিয়ে বেরুলেন জরুরি কিছু কেনাকাটা করতে।

বায়তুল মোকাররমের কাছাকাছি যেতেই প্রচণ্ড কোলাহল শোনা গেল। হর্ন বাজাতে বাজাতে অনেকেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছে। লোকজনের চ্যাঁচামেচিতে একটু কান পেতে শুনে জাহানারা বুঝলেন, আবার ওখানকার একটা দোকানে বোমা ফেটেছে! দিনের বেলা মিলিটারির নাকের ওপর দিয়ে ছেলেগুলো বোমা ফাটিয়ে চলে যায়!

কয়েকদিন আগেই ফ্যান্সি হাউজ নামে শাড়ির দোকানটায় এ রকম একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরণে একজন পাঞ্জাবী মেজর আর তার সঙ্গে কয়েকজন মহিলা জখম হয়েছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল তিনজন মিলিটারি, তারা নিহত। কেউ এখন আর ভয়ের চোটে শাড়ির দোকানে ঢুকছে না! জাহানারা মনে মনে খুশিই হলেন। তিনি জানেন, ফ্যান্সি হাউজ যারা আক্রমণ করেছিল, সেই আসাদ, ফিরোজ, মুনীররা রুমীরই বন্ধু। এদের দলে রুমীও থাকতে পারতো। কোথায় গেল রুমী!

সর্বক্ষণই যে রুমীর কথা মনে পড়ে, তবু মুখ ফুটে তা বলেন না। যদি শরীফ কষ্ট পায়। শরীফের স্বভাবটা খুব চাপা। তিনিও যে আজকাল রুমীর প্রসঙ্গ, আর বিশেষ তোলেন না, তা কি জাহানারার কথা ভেবেই? শরীফ দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন, ওজন কমে গেছে অনেক, তবু সব সময় তিনি

মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু না কিছু সাহায্য করার ব্যাপারে মেতে আছেন। যেন ওরা সকলেই তাঁর নিজের সন্তান।

গাড়ি ঘুরিয়ে জাহানারা চলে এলেন একটা ফটোগ্রাফির দোকানে। কয়েক দিন আগে তিনি রুমীর এক বন্ধু হ্যারিসের কাছ থেকে রুমীর একটা ছবির নেগেটিভ নিয়ে এসেছিলেন। ইদানিং রুমী বাড়িতে একেবারে ছবি তুলতে চাইতো না। হ্যারিসের কাছে বেশ কয়েকখানা ছবি ছিল, তার মধ্য থেকে একখানা বেছে জাহানারা নেগেটিভটা এনলার্জ করতে দিয়েছিলেন।

ছবির দোকানে সেটা ডেলিভারি নিতে এসে জাহানারার বুক খানা ধক করে উঠলো। এত জীবন্ত ছবি! কোমরে চিশ্‌তির পিস্তল, কাঁধের ওপর গুলির বেল্ট ঝোলানো, মাথায় একটা ক্যাপ ত্যারছা করে পরা, কোমরে দু'হাত দিয়ে একটুখানি ঝুঁকে রুমী যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা। বলিভিয়া, কিংবা ভিয়েৎনামের নয়, এই বাংলার।

বাড়ি ফেরার পথে জাহানারা বিড় বিড় করতে লাগলেন কয়েকটি কবিতার লাইন। তাঁর কবিতাপাগল ছেলেটা জীবনানন্দ দাশের এই লাইনগুলি আবৃত্তি করতে খুব ভালোবাসতো ঃ

আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়-হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়
হয়তো বা হাঁস হবো-কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে
আবার আসিব আমি বাংলার মাঠ নদী খেত ভালোবেসে
জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলায় এ সবুজ করুণ ডাঙ্গায়--

দুচোখ দিয়ে অবিরল অশ্রু গড়াচ্ছে, কবিতার লাইনের মাঝে মাঝে জাহানারা ফিসফিস করে সেই ছবিটাকে জিজ্ঞেস করছেন, রুমী , তুই আসবি না? কবে আসবি? তোকে যে আসতেই হবে!

বাড়িতে ফিরে নিচের তলার বসবার ঘরের এক কোণের টেবিলে একটা স্ট্যান্ডের ওপর লাগালেন সেই ছবি। সারল্যমাখা মুখখানিতে কী দৃপ্ত তার ভঙ্গি! এই রকম হাজার হাজার ছেলে যে দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়তে যায়, সেই দেশকে পরাধীন করে রাখবে কোন্ শক্তি?

ছবিটার তলায় একটা কাগজ সেঁটে দিয়ে জাহানারা লিখলেন, আবার আসিব ফিরে-এই বাঙলায়।

দূর থেকে তিনি মুগ্ধ হয়ে ছবিটা দেখতে লাগলেন, খানিক বাদে হঠাৎ তাঁর মুখে ফুটে উঠলো একটা আতঙ্কের ছাপ। সর্বাঙ্গে বিঁধতে লাগলো অনুশোচনার কাঁটা। তিনি ছুটে গিয়ে ছবিটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন।

এ কী করতে যাচ্ছিলেন তিনি! বসবার ঘরে রুমীর ছবি সাজিয়ে রাখছিলেন। তার মানে তিনিও ধরে নিয়েছেন, রক্ত মাংসের রুমী আর নেই, সে এখন শুধু ছবি! না, না, না, তা হতে পারে না!

রুমী তোকে ফিরতে হবে, ফিরে আসতেই হবে। এ দেশ স্বাধীন হবে, তা তুই দেখবি না? এরপর দেশ গড়ার কত রকম কাজ থাকবে, তাতে অংশ না নিয়ে তুই ফাঁকি দিয়ে চলে যাবি? তোর মতন ছেলে কি তা পারে?

॥ ৫৭ ॥

হলুদ ও কমলা রঙের শাড়ি পরা, তার ওপরে একটা কালো ওভারকোট, ইন্দিরা গান্ধী বেরিয়ে এলেন নিউ ইয়র্কের জে এফ কে এয়ারপোর্ট থেকে। প্রায় শ পাঁচেক প্রবাসী ভারতীয় এসেছে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে, ভারতীয় অফিসাররাও রয়েছে, কিন্তু কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া আমেরিকান সরকারের কোনো প্রতিনিধি সেখানেই নেই। আর কয়েক দিন পরই তাঁর চুয়ান্ন বছর বয়েস হবে, শরীর পরিপূর্ণ যৌবনময়, কিন্তু আজ তাঁর মুখে একটা কালো ছাপ। জনতার জয়ধ্বনি শুনেও তাঁর মুখে হাসি ফুটলো না। তিনি তলার ঠোঁটটা কামড়ে ধরে আছেন, এটাই তাঁর রাগের চিহ্ন।

প্রবাসী ভারতীয়রা নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলো তাঁকে ঘিরে। তিনি কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। একবার শুধু বললেন, তিনি সকলের সঙ্গে পরে এক সময় মিলিত হবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন তিনি ক্লান্ত, তিনি বিশ্রাম নিতে চান।

গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া বইছে, ওভারকোটের কলারটা তুলে দিয়ে, টকটক করে জুতোর শব্দ তুলে তিনি গিয়ে উঠলেন লিমুজিনে। ম্যানহাটনের লেক্সিংটন অ্যাভিনিউতে একটি হোটেলে তিনি আগে কয়েকবার উঠেছেন, এবারও সেই হোটেলেই তাঁর জন্য সুইট বুক করা আছে।

চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে তিনি বাইরে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু কিছুই দেখছেন না। তাঁর পাশে উপবিষ্ট একজন কূটনীতিবিদ গুণগুণ করে বললেন, কী আশ্চর্য, প্রেসিডেন্ট নিক্সন যৌথ বিবৃতি দিতে ও রাজি হলেন না? আমরা ভেবেছিলাম-----

ইন্দিরা গান্ধী রাগতভাবে সেই ব্যক্তির দিকে তাকালেন। এ বিষয়ে তিনি এখন কোনো আলোচনা করতে চান না। এই অপমানটাই তাঁর বুকে সবচেয়ে বেশি বেজেছে। তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমেরিকায় এসেছেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন-এর সঙ্গে তার দু'দিন ধরে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, তবু নিক্সন একটা যৌথ বিবৃতি দেবার প্রয়োজনও মনে করলেন না? যেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই আগমনের কোনো গুরুত্বই নেই!

গোটা দেশকে দারুণ সংকটের মধ্যে রেখে ইন্দিরা বেরিয়ে পড়েছেন পশ্চিমী দেশগুলির কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন আদায় করতে। প্রথমে গেলেন বেলজিয়াম, তারপর অস্ট্রিয়া, তারপর ব্রিটেনে। সবাই খুব আদর-আপ্যায়ন করছে, ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রশস্তি জানাতে কোনো কার্পণ্য নেই, শরণার্থী প্রসঙ্গ উঠলেই মৌখিক সহানুভূতি জানাচ্ছে প্রচুর, আর্থিক সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু আসল সমস্যাটি এড়িয়ে যাচ্ছে অতি ভদ্রতার সঙ্গে। কী যেন তারা গোপন করে যেতে চায়। সকলেরই ভাবখানা এই যে, আমেরিকান বড় ভাইয়ের সঙ্গে তুমি তো দেখা করতে যাচ্ছোই, সেখানেই তুমি সব শুনবে!

ওয়াশিংটন ডি সি-তে এসেও ইন্দিরা প্রথমে ঠিক আঁচ করতে পারেননি পাকিস্তানের প্রতি নিক্সনের কেন এত পক্ষপাতিত্ব। আমেরিকাও তো গণতন্ত্রের গর্ব করে, তবু পাকিস্তানের একজন সামরিক শাসক, যে গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল রেখেছে, সাধারন নির্বাচনের ফলাফল অগ্রাহ্য করেছে, তাকেই অন্ধভাবে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছেন নিক্সন!

প্রেসিডেন্ট নিক্সন আবহাওয়া, খাদ্য, শরীর-স্বাস্থ্যের খবর ও ঠাট্টা ইয়ার্কিতে সময় কাটাতে চান। ইন্দিরা গান্ধী এক সময় সরাসরি প্রশ্ন করলেন, পাকিস্তান সরকার সে দেশের পূর্বাঞ্চলে যে অত্যাচার চালাচ্ছে, সে বিষয়ে আপনি কি কিছু ভেবেছেন?

নিক্সন আলগা ভাবে বললেন, অবশ্যই ভেবেছি! পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা হলে তাতে আমাদের মাথা গলানো ঠিক নয়। আমাদের কাছে দুটি দেশই সমান। তোমাদের মধ্যে একটা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে রাজনৈতিক সমাধান করে ফেলা উচিত। এই দুটি দেশে আবার যুদ্ধ লাগুক, তা আমরা চাই না, আশা করি তোমরাও চাও না!

ইন্দিরা বললেন, সমস্যাটা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নয়। পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই। সেখানে নৃশংস গণহত্যা চলেছে। তোমার দেশের সাংবাদিকরাই সে সব বিস্তৃত খবর প্রকাশ করেছে। অ্যানটনি ম্যাসকারেনহাসের 'দা রেপ অফ বাংলাদেশ' নামে বই বেরিয়েছে, তাতে জেনারেল ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে হিটলারের নাৎসী বাহিনীর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

নিক্সন সূক্ষ্ম বিদ্রূপের হাসি দিয়ে বললেন, এটা যদি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হয়, তাহলে তাতে আমাদেরও মাথা গলানো উচিত নয়। তোমাদেরও মাথা গলানো উচিত নয়, তাই নয় কি?

ইন্দিরা বললেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি, দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগলে সারা পৃথিবী উদ্বিগ্ন হয়। আর কোনো একটি দেশের মধ্যেই যদি সেনাবাহিনী লক্ষ লক্ষ সাধারণ নাগরিককে খুন করে, বিশেষ কোনো ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক মতবাদসম্পন্ন মানুষদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়, তা নিয়ে সারা পৃথিবীর মাথাব্যথা থাকবে না। এটা শুধু রাজনীতির প্রশ্ন নয়। মানবতার প্রশ্ন। এটা এখুনি বন্ধ করা দরকার। সে জন্য আপনাদের উদ্যোগ নেওয়া উচিত, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা অবিলম্বে আলোচনায় বসে। শেখ মুজিবকে মুক্তি দেবার জন্য আপনারাই চাপ দিতে পারেন।

নিক্সন বললেন, আমি এখনও বুঝতে পারছি না। সে জন্য ভারত এত বেশি চঞ্চল হচ্ছে কেন? এই বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে তো আলোচনা হচ্ছেই।

ইন্দিরা বললেন, ভারতের বিচলিত হবার প্রধান কারণ এর মধ্যেই সীমান্ত পেরিয়ে প্রায় এক

কোটি শরণার্থী ভারতে চলে এসেছে। আমরা এই বিপুল জনসংখ্যার ভার সহ্য করবো কী করে?

নিক্সন বললেন, সে তো বটেই। সে তো বটেই। সেনেটর কেনেডি গিয়ে শরণার্থী শিবিরগুলি দেখে এসেছেন। আমরা তো খাদ্য দিচ্ছি, অর্থ সাহায্য দিচ্ছি, কম্বল পাঠাচ্ছি!

ইন্দিরা বললেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য আমরা পাচ্ছি বটে, কিন্তু পাকিস্তান তার জনসংখ্যা কমাবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঠেলে ভারতে পাঠিয়ে দেবে, আর আমরা তাদের খাইয়ে পরিয়ে যাবো, এরকম কতকাল চলবে?

নিক্সন বললেন, প্রয়োজনে আমরা সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবো!

আরক্ত মুখে ইন্দিরা বললেন, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, ভারত গরিব দেশ ঠিকই, দেশের সমস্ত মানুষকেই আমরা খাওয়াতে পারি না, এর ওপর এক কোটি শরণার্থী এলে আমরা বিশ্বের সাহায্য নিতে বাধ্য। কিন্তু আমি আপনার কাছে ভিক্ষের পাত্র নিয়ে আসিনি। ভিক্ষের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেও অনুরোধ করছি না। আমরা চাইছ, এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান। একদিকে আপনারা শরণার্থীদের জন্য সাহায্য পাঠাবেন, অন্যদিকে পাকিস্তানী অত্যাচারী সেনাবাহিনীর হাতে আরও অস্ত্র তুলে দেবেন, এ কেমন নীতি?

নিক্সন সহাস্যে বললেন, আপনার শাড়িটা অপূর্ব সুন্দর! ইন্ডিয়াতে কি এখনো মসলিন হয়? কাশ্মীরের সঙ্গে নাকি সুইটসারল্যান্ডের খুব মিল আছে?

পরদিন সেক্রেটারি অফ স্টেট রজার্সের সঙ্গে কিছুক্ষণ বৈঠক হলো ইন্দিরার, তাতে অনেক কিছু পরিষ্কার হলো। রজার্স চাঁছাছোলা মানুষ। তিনি দু'চার কথার পরই বললেন, সম্মানীয়া প্রধানমন্ত্রী কি জানেন যে আজ, আপনার সঙ্গে যখন আমি কথা বলছি, ঠিক এই সময়েই পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত হিসেবে মিঃ ভুট্টো চীনে মিঃ চু-এন লাইয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন।

ইন্দিরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, দিল্লিতে এর আগে থেকে এর সামান্য ইঙ্গিতও পায়নি? ওয়াশিংটনের দূতাবাসও তাকে কোনো খবর দেয়নি!

রজার্স বললেন, কয়েক ঘন্টা আগে পিকিং এয়ারপোর্টে প্রায় দু'হাজার চীনা তরুণ-তরুণী গান গেয়ে মিঃ ভুট্টোকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

ইন্দিরার মুখে আবার অপমানের ছাপ পড়লো। তিনি আমেরিকায় পদার্পণ করার সময়ে তো কিছু ভারতীয় ছাড়া আমেরিকান জনসাধারণ তো তাঁকে কোনো সংবর্ধনাই জানায়নি! ভারতের প্রতি সাধারণ আমেরিকানদেরও কোনো সহানুভূতি নেই? দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলি অপদার্থ, তারা ভারতের বক্তব্য ঠিক মতন তুলে ধরতে পারে নি এখানকার জনগণের কাছে, আমেরিকার গায়ক-শিল্পী-কবিরা বাংলাদেশ শরণার্থীদের জন্য চাঁদা তুলছে, প্রচার চালাচ্ছে, তা হলে তো এখানে সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ কিছু আছে।

রজার্সের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, চীন-পাকিস্তান-আমেরিকা মিলে একটা ত্রিপাক্ষিক শক্তি হতে চলেছে। কয়েকটা অদ্ভুত যোগাযোগও ঘটে গেছে এর মধ্যে। মাঝখানে প্রচারিত হয়েছিল যে মাও সে তুং-এর যোগ্য উত্তরাধিকারী লিন পি আও। এই লিন পি আও অত্যন্ত উগ্র আমেরিকা-বিরোধী, ভারতের উগ্রপন্থী নকশাল বিপ্লবীদেরও তিনি দ্রোণাচার্য। সেই লিন পি আরও রহস্যজনক ভাবে হঠাৎ অন্তর্ধান করেছেন। কেউ বলছে তিনি গুরুতর অসুস্থ, কেউ বলছে মৃত, আবার কেউ বলছে হঠাৎ চীনের ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে তিনি চীন ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। মোট কথা, লিন পি আও সরে যাবার ফলে চীনে আমেরিকার প্রবেশের পথ তৈরি হয়ে গেছে, পাকিস্তানের মাধ্যমে কিসিংগারের দৌত্যে নিক্সনের চীন-সফর আসন্ন। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে কোনো কারণেই বর্তমান পাকিস্তান সরকারকে পদচ্যুত করতে চায় না আমেরিকা। হিটলারের ইহুদি নিধনে আজও সমগ্র পশ্চিম দুনিয়া অশ্রু বিসর্জন করে, অসংখ্য বই লেখা হয়, ফিল্ম তোলা হয়, তার কারণ ইহুদিরা ধনী এবং শ্বেতাঙ্গ। এশিয়ার কয়েক লক্ষ গরিব মুসলমান-হিন্দু নিহত হলে মার্কিন সরকার তা নিয়ে মাতামাতি করতে যাবে কেন? গরিবরা তো এমনিতেই মরে।

নিক্সন নিজের মুখে যা বলতে চাননি, তা রজার্সকে দিয়ে বলালেন। পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার যে অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি আছে, তা আমেরিকা রক্ষা করে যাবে, সে অস্ত্র পাকিস্তানীরা যেমন ভাবেই ব্যবহার করুন না কেন! সোভিয়েত ইউনিয়ানের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী চুক্তি ছদ্মনামে সামরিক চুক্তি হয়েছে, সেই ভারত এখন আবার নির্লজ্জ ভাবে পশ্চিমী দেশগুলির কাছে সমর্থন চাইতে আসে কেন?

ভারত কি গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে?

মোটকথা, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের এখন যুদ্ধ বাধানো মোটেই সুবিবেচনার কাজ হবে না, পাকিস্তানের পক্ষে অনেক বন্ধু আছে। যুদ্ধ বাধিয়ে ভারত ভূখণ্ডে যদি সোভিয়েত ইউনিয়ানকে টেনে আনা হয়, তাহলে সেখানে আর একটি ভিয়েৎনাম হবে।

রজার্সের সঙ্গে বৈঠকের পর নিক্সনের সঙ্গে আবার নৈশভোজে মিলিত হলেন ইন্দিরা। আনুষ্ঠানিক সব কিছুই হলো, কিন্তু যুক্ত বিবৃতি বেরুলো না। অর্থাৎ ইন্দিরার আমেরিকায় আগমনের ফলাফল শূন্য।

ইন্দিরা ঠিক করলেন, আমেরিকার সাধারণ মানুষের কাছে যতদূর সম্ভব সত্যিকারের বাস্তব চিত্রটি বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। এটা ভারত-পাকিস্তানের কূটনৈতিক লড়াই নয়, সামরিক প্রাধান্যের বিষয়ও নয়, এটা কয়েক কোটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন। পাকিস্তানে যা চলছে, তা জেনোসাইড, পৃথিবীর সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই এটা বন্ধ করার জন্য প্রতিবাদ জানানো উচিত।

আমেরিকার প্রেস ও টি ভি অত্যন্ত শক্তিশালী মিডিয়া। আমেরিকার যুবসমাজ ভিয়েৎনাম যুদ্ধকে নৈতিক সমর্থন দেয়নি। এখানকার সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার সমর্থক, বিপন্নদের সাহায্য করার ব্যাপারে তাদের কার্পণ্য নেই। সুতরাং জনমানসের প্রতিফলন হিসেবে মিডিয়া যদি প্রবল ভাবে চাপ দেয়, তা হলে আমেরিকান সরকার বর্তমান নীতি বদল করতে বাধ্য হতে পারে।

সেই জন্যই ইন্দিরা বক্তৃতা করেছেন প্রেস ক্লাবে, গীর্জায়। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছেন নিউ ইয়র্কে। এখানে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন, ন্যাশনাল নেট ওয়ার্কে টি ভি সাক্ষাৎকারও নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

হোটেলে পৌঁছে ইন্দিরা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন।

কিছু ভারতীয় এখানেও তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে। খানিক পরে স্নান সেরে তিনি তাদের সামনে এসে বসলেন। তাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে ইন্দিরা যুদ্ধের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। একবারও পূর্ব পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশ নামটি উচ্চারণ করলেন না। বারবার জোর দিয়ে বললেন, মনে রাখবেন আমরা গরিব হলেও কিছুতেই আত্মসম্মান বিসর্জন দেবো না। স্বাধীনতার চব্বিশ বছরে ভারত গণতন্ত্র টিকিয়ে রেখেছে, এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো বৃহৎ শক্তির কাছে মাথা নিচু করেনি।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় ইন্দিরার সুর অনেক চড়া হলো। তিনি বললেন, ভারত ও পাকিস্তানের দায়িত্ব সমানভাবে দেখার চেষ্টা করছে আমেরিকান সরকার, এটা কী ধরনের যুক্তি? পাকিস্তান তার নিজের লোকদের মারছে, সেখানকার জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ বাধ্য হয়ে এসে আশ্রয় নিচ্ছে ভারতবর্ষে, মানবিকতার খাতিরে ভারত তাদের খাওয়াচ্ছে-পরাচ্ছে, এর কোনোটাই তো অসত্য নয়। তবু এই সংকট সৃষ্টিতে ভারত ও পাকিস্তানের সমান দায়িত্ব!

টি ভি সাক্ষাৎকারে ইন্দিরা বললেন, ভারতের ধৈর্যের একটা সীমা আছে! চীন এবং আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য করলেও কিছু আসে যায় না, ভারত এই সমস্যার সমাধান করবেই! সবাই রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতাদের সঙ্গেই আলোচনা করে সে সমাধান আনতে হবে! পশ্চিম পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে বিবৃতি দিয়েছেন, অথচ আমেরিকান সরকার ওঁর মুক্তির জন্য কোনো চেষ্টাই করবে না?

আমেরিকা থেকে ইন্দিরা এলেন ফ্রান্সে। প্যারিসের ওর্লি বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী জর্জ পঁপিদু।

অল্প বয়েসে সুইজারল্যান্ডে থাকার সময় ইন্দিরা ফরাসী ভাষা ভালোই রপ্ত করেছিলেন। দোভাষীর দরকার হলো না, পঁপিদুর সঙ্গে সরাসরি কথা শুরু করলেন। জর্জ পঁপিদু সংস্কৃতিবান পুরুষ, রূপসী নারীদের প্রতি ফরাসীদের আদিখ্যেতা সুবিখ্যাত, তিনি মহা আড়ম্বরের সঙ্গে ইন্দিরার সংবর্ধনার ব্যবস্থা করলেন। তার উত্তরে ইন্দিরা বললেন, প্রত্যেকবার ফরাসী দেশে এলেই তাঁর শিহরণ হয়। কারণ, ফ্রান্স তো শুধু একটি দেশ নয়। ফ্রান্স তার চেয়েও বড়। ফ্রান্স একটি আদর্শ। সারা পৃথিবীতে সাম্য-স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রথম দেখিয়েছে এই দেশ।

ইন্দিরার বাবার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল জর্জ পঁপিদুর। ইন্দিরার প্রতি তাঁর ব্যবহার কিছুটা স্নেহমিশ্রিত। ইন্দিরা তাঁকে আন্তরিক ভাবে বললেন, আমি এখন কী করবো, তা বলতে পারেন? আমি যেন একটা আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছি। আমার দেশের অনেক লোক যুদ্ধ যুদ্ধ বলে লাফাচ্ছে। কিন্তু একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও যে দেশটার সর্বনাশ হয়ে যাবে, তা কি আমি বুঝি না? এ

দিকে প্রায় এক কোটি শরণার্থীর বোঝা কাঁধে নিয়ে বসে আছি। সত্যি কথা বলতে কি, এতলোকের ঠিকঠাক বাসস্থান এখনো আমরা দিতে পারি নি, খাদ্য বন্টনের ব্যবস্থাপনাতেও অনেক ত্রুটি আছে। অনেকে ছড়িয়ে পড়ছে শিবিরের বাইরে, তারা অনেকেই স্থানীয় ভাবে কম মজুরিতে কাজ করছে। এমনিতেই আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা বিরাট, তার ওপরে যদি এই সব শরণার্থীরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে, তা হলে যে-কোনোদিন বিক্ষোভ শুরু হয়ে যাবে। এই শরণার্থীরা কবে দেশে ফিরবে তার যদি নিশ্চয়তা না থাকে, তা হলে স্থানীয় লোক কতদিন এদের সহ্য করবে? তার ওপরে আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা আছে। তুচ্ছ উপলক্ষে দাঙ্গা বাধতে পারে। দাঙ্গা বাধাবার জন্য পাকিস্তানও চেষ্টা চালাবেই। শুধু পশ্চিম বাংলাতেই এ পর্যন্ত এক হাজার পাকিস্তানী চর ধরা পড়েছে। হঠাৎ যদি সারা দেশে বড় আকারের দাঙ্গা বেঁধে যায়, তা হলে কত অসহায় মানুষ যে মরবে তার ইয়ত্তা নেই। এই অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা কিছুতেই জিইয়ে রাখা যায় না।

পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীও ইন্দিরাকে বড় কোনো আশ্বাস দিতে পারলেন না। তবে পঁপিদু একটুকু ভরসা দিলেন যে যুদ্ধ বাধলে ফ্রান্স কোনো অস্ত্র সরবরাহ করবে না পাকিস্তানকে। এবং শরণার্থীদের জন্য সাহায্য দানের পরিমাণ বাড়াবে।

প্যারিস বসে ইন্দিরা একটি ভালো খবর পেলেন।

জনাব ভুট্টো পিকিং-এ গিয়ে চীনের নেতাদের সঙ্গে যতই দহরম মহরম করুন, চু-এন লাইকে খুশি করার যতই ব্যবস্থা নিন না কেন, তবু তিনি কোনো যৌথ বিবৃতি আদায় করতে পারেন নি। গোপন সংবাদ ছিল এই যে ভারত যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ানের সঙ্গে কুড়ি বছরের মৈত্রি চুক্তি করেছে, সেরকম পাকিস্তানও চীনের সঙ্গে একটা মৈত্রি চুক্তি আদায় করতে চায়, যাতে পাকিস্তানের বিপদে চীন সামরিক শক্তি নিয়ে পাশে দাঁড়াতে নৈতিক ভাবে বাধ্য থাকে। কিন্তু চীনের নেতারা প্রকাশ্যে অন্তত সেরকম কোনো চুক্তি ঘোষণা করেন নি। ভুট্টোর দৌত্যকেও খুব সার্থক বলা যায় না।

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার খুব ইচ্ছে ইন্দিরার। দেশের উত্তর-পূর্বে সীমান্ত জুড়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন খরচ তা হলে কমানো যায়। দেশের উগ্রপন্থী বিপ্লবীদের ও তাতে ঠান্ডা করা যাবে। চু-এন লাইয়ের সঙ্গে তিনি একবার আলোচনায় বসতে চান। পঁপিদুকে তিনি অনুরোধ করলেন, এই ব্যাপারে যদি কোনোরকম মধ্যস্থতা করে সাহায্য করতে পারেন!

প্যারিস ছাড়ার আগে ইন্দিরা গেলেন পিতৃবন্ধু, প্রখ্যাত লেখক আন্দ্রে মালরো-র সঙ্গে দেখা করতে। এককালে তিনি ফরাসী সরকারের মন্ত্রী ও ছিলেন। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে মালরোর, তবু সব ব্যাপারেই উৎসাহ প্রবল। তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বাধীনতা চাইছে, কেন ওদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে না? আমি সব সময় স্বাধীনতার সমর্থক। বাংলাদেশ নিয়ে যুদ্ধ বাধলে আমি নিজে বন্দুক নিয়ে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

আলাপচারির সময় ইন্দিরাকে একটু বোর্দোর বিখ্যাত লাল মদ্য পান করবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে করাতে এক সময় মালরো মুচকি হেসে বললেন, এ বছর নোবেল পুরস্কার পেল পাবলো নেরুদা। হুঃ! তুমি ওর কবিতা-টবিতা কিছু পড়েছো নাকি? সময় পেলে পড়ে দেখো!

এরপর পশ্চিম জার্মানিতে গিয়ে উইলি ব্রান্টের কাছে প্রায় একইরকম কথা শুনতে হলো ইন্দিরাকে। নাৎসী অত্যাচারের স্মৃতি যে দেশে এখনো দগদগ করছে, তারাও এখন পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ মানুষের নিধন নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে রাজি নয়। মানবতার চেয়েও রাজনীতি অনেক বড়।

ব্যর্থতা এবং অপমানবোধের সঙ্গে সঙ্গে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও জেগে ওঠে। সেইরকম মনোভাব নিয়ে ইন্দিরা কুড়ি দিন পর ফিরে এলেন দিল্লিতে। এয়ারপোর্টে তাঁর ক্যাবিনেটের সদস্যরা প্রশ্ন তুললো, এরপর কী? যুদ্ধ ছাড়া আর কি কোনো সমাধান আছে?

ইন্দিরা বললেন, আমার এতগুলি দেশ ঘোরার একটাই সুফল আপনাদের জানাতে পারি। আমি সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি যে পাকিস্তান জনসাধারণের মতামত নিয়েই তা মেটাতে হবে। শরণার্থীদের আমরা তাদের দেশে ফেরত পাঠাবোই! আপনাদের এখন যুদ্ধের কথা চিন্তা করবার দরকার নেই। তার আগে দেশের মানুষদের বোঝানো দরকার, এই দুঃসময়ে কিছুতেই যেন জাতীয় সংহতিতে ফাটল না ধরে। কোনো রকম উস্কানিতেই যেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না বাধে। আপনারা যে যার এলাকায় গিয়ে এই কথা প্রচার করুন।

একজন প্রশ্ন করলো, আপনি এখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন না?

ইন্দিরা চুপ করে রইলেন। সাতচল্লিশ সালে ভারত দু'খন্ড হয়েছে। এবার তিন খন্ড হবে, সে দায়িত্ব তিনি কি সহজে নিতে পারেন? এরপর যদি আরও খন্ড খন্ড হতে থাকে? তাহলে ইতিহাস কি তাঁকে ক্ষমা করবে?

চুয়ান্নতম জন্মদিনটি তিনি নিরিবিলিতে বাড়িতে কাটালেন।

মাথার ওপর সব সময় যেন একটা বিরাট বোঝা। সীমান্তে সংঘর্ষ দিন দিন যেমন বাড়ছে, তাতে যে কোনো সময় হঠাৎ যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। যুদ্ধ যদি লাগেও, তা কতদিন চলবে? ভিয়েৎনামের দৃষ্টান্ত মনে পড়লেই আতঙ্ক হয়। এ বছর বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ দুর্বল হয়ে আছে, এর পর একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাতে গেলে দেউলিয়া হয়ে যেতে হবে, দেশে চরম উচ্ছৃঙ্খলা আসবে, গণতন্ত্র উচ্ছন্নে যাবে। পশ্চিমী শক্তিগুলি সেটাই চায়। দেশে ফিরে ইন্দিরা একটা ব্যাপার অনুভব করলেন। বিরোধী দলগুলি তাকে আর আক্রমণ করছে না। যারা কংগ্রেসকে সমর্থন করে না, ব্যক্তিগত ভাবেও নেহরু-কন্যাকে অপছন্দ করে, তারাও নিজের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অন্য দেশে অপমানিত বা প্রত্যাখ্যাত হতে দেখলে খুশি হয় না। এত সংকটের মধ্যেও ইন্দিরার সংযমকে প্রশংসা করতে হয়। সাম্প্রাদায়িক দল কিংবা বামপন্থী দলগুলিও বাংলাদেশের প্রশ্নে সরকারীবিরোধী নয়। বাষট্টি কিংবা পঁয়ষট্টির যুদ্ধের সময় ও সারা দেশে এরকম সর্বদলীয় ঐক্য দেখা যায় নি। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের নির্যাতনে সকলেই আবেগমথিত।

একদিন কলকাতায় একটা জনসভা করতে এলেন ইন্দিরা।

পশ্চিম বাংলায় বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়েছে, কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে পাঠানো হয়েছে সরকারি কাজকর্ম পরিচালনার জন্য। বামপন্থী দলগুলি এজন্য দারুণ, ক্ষুব্ধ, তারা অবিলম্বে নির্বাচন দাবি করেছে। অতিবাম বিপ্লবী নকশালপন্থীরা এখনো পুরোপুরি দমিত হয়নি, চারু মজুমদার পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

কলকাতায় গন্ডগোল লেগেই থাকে।

কিন্তু এবার ইন্দিরাকে কেউ কোনো কালো পতাকা দেখালো না, বামপন্থীরা কোনো প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করেনি। ময়দানের বিশাল জনসভায় ইন্দিরার ভাষণের সময় সম্ভ্রম নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে আগেই ইন্দিরা খবর পেয়েছেন যে অনেক অ-কংগ্রেসীও তাঁর আজকের মিটিং শুনতে এসেছেন।

এই সভাতেও ইন্দিরা বাংলাদেশ সমস্যার কোনো স্পষ্ট সমাধানের ইঙ্গিত দিতে পারলেন না। যুদ্ধের কোনো উল্লেখ নেই। দেশের মানুষকে তিনি আরও আত্মত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানালেন।

মিটিং সেরে ইন্দিরা এলেন রাজভবনে। এখানে, শিল্পী, সাহিত্যিক, চিত্রতারকাদের সঙ্গে তাঁর ঘরোয়া আলোচনার কথা। ময়দানে বক্তৃতা করে এসে ইন্দিরা কিছুটা ক্লান্ত। ওডিকলন দেওয়া পেপার ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে তিনি সামনের কয়েক জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি কেমন, আপনারাই বলুন, আমি শুনি। আচ্ছা, এখানে মিটিং শুরু হবার আগে যে কোরাস গান হয়, তা বছরের পর বছর একই রকম কেন? এখানে কি নতুন গান কিছু হয় নি? গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পর আর কেউ গান লেখেন না?

এখন সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনায় কারুর মন নেই। কথায় কথায় যুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেই গেল। মাথার ওপরে যুদ্ধের ছায়া। কলকাতায় গত এক মাস ধরে নিয়মিত অপ্রদীপের মহড়া চলছে। সীমান্তসংঘর্ষ সীমান্ত ছাড়িয়ে প্রায়ই ঢুকে পড়ছে ভেতরে। এই তো কয়েকদিন আছে বয়ড়ার কাছে পাকিস্তানী স্যাবার জেটের সঙ্গে ভারতীয় ন্যাটের মুখোমুখি লড়াই হয়েছে, দুটি পাক বিমান শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়েছে ভারতের ভূমিতে। এটা খবরের কাগজের গুজব বা আকাশবাণীর অতিশয়োক্তি নয়, কারণ বন্দী পাইলট দুজনের ছবি ও ছাপা হয়েছে। ওদিকে হিলি সীমান্তে পাক ফৌজ অনেকখানি ঢুকে এসে সাধারণ নাগরিকদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই দাবি করে যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে তারা অনেক জায়গা দখল করে নিয়েছে, তাই-ই বা কতখানি সত্য। সর্বাত্মক যুদ্ধ কি আসন্ন?

ইন্দিরা বললেন, যুদ্ধ কবে হবে কিংবা আদৌ হবে কি না, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো, যুদ্ধের চাপ আমরা সহ্য করতে পারবো কিনা। সৈন্যরা হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করে বটে, কিন্তু

সিভিলিয়ানদেরও অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। আমাদের দেশে কত রকম জটিল সমস্যা, সীমান্তে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী, এর মধ্যে আমাদের মাথা ঠান্ডা রাখাই আসল দরকার।

তারপর তিনি স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে বললেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি কিছুদিনের জন্য লন্ডনে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। তখন লন্ডনে নিয়মিত বোমা পড়ছে। তবু ব্রিটিশ সরকার সমস্ত কনসার্ট হলগুলো খোলা রাখতেন, লোকের টিকিট লাগতো না। বোমা পড়ার একটু বিরতি হলেই লোকে বাজনা শুনতে ছুটে যেত। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার সময় গান-বাজনা শোনার খুবই উপকারিতা আছে। আপনারা যাঁরা লেখক-শিল্পী, আপনাদের দেখতে হবে, যাতে দেশের মানুষ যুদ্ধের উন্মাদনায় না মেতে ওঠে।

এই রকম কথা চলছে, হঠাৎ হলঘরের দরজায় সামনে পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক পরা একজন শিখ এসে দাঁড়ালো। দু'একজন অবাক হয়ে ফিসফিস করে বললো, ইনি তো লেফটেনান্ট জেনারেল অরোরা। আর্মির ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান।

লেফটেনান্ট জেনারেল অরোরা একটা স্যালুট দিয়ে এগিয়ে এলেন ভেতরে। তারপর ইন্দিরার হাতে একটা চিরকুট দিলেন।

ছোট একটি কাগজ, সেটি পড়তে এক মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। তবু ইন্দিরা সেটার দিকে চেয়ে রইলেন তিন-চার মিনিট। তারপর কাগজটা ভাঁজ করতে লাগলেন। আট ভাঁজ -ষোলো ভাঁজ করার পর সেটাকে ছিঁড়ে ফেললেন কুটি কুটি করে।

তাঁর মুখের একটা রেখাও কাঁপলো না। উত্তমকুমারের সঙ্গে তিনি একটা কথা বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন, সেই কথাটা শেষ করলেন। এর মধ্যে চা-জলখাবার এসে গেল।

ইন্দিরা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা আমাকে মাপ করবেন, আমি বেশিক্ষণ আপনাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আজ পাচ্ছি না। একটা জরুরি কাজে আমাকে এক্ষুনি দিল্লি ফিরতে হবে। আবার পরে কোনোও একদিন আপনাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে। আপনারা চা খান। আমি আসি।

অরোরার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন ইন্দিরা। ততক্ষণে সিদ্ধার্থ রায় এসেছেন সেখানে। তিনজনে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলেন। সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে ইন্দিরা দৌড় মারলেন বাচ্চা মেয়ের মতন। বাইরে এসেই প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন একটা জিপে। সোজা দমদম। সেখান থেকে এয়ার ফোর্সের প্লেনে দিল্লি।

এক ঘন্টার মধ্যেই সারা কলকাতায় খবর ছড়িয়ে পড়লো যে পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করে এখন পাকিস্তানের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। যুদ্ধ লাগাবার এটাই নিয়ম। কোনো দেশই নিজেকে আক্রমণকারী বলে স্বীকার করতে চায় না। সারা বিশ্বকে জানায় যে আক্রান্ত হয়ে প্রতিরক্ষা করছে।

এর কিছু পরেই রাষ্ট্রপতি সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করলেন।

ঠিক মধ্য রাতে ইন্দিরা গান্ধী জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দিলেন। ভারত-পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

যুদ্ধ তা হলে সত্যিই লাগলো।

যুদ্ধে জয় বা পরাজয় যাই হোক, দু'পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হয় সাঙ্ঘাতিক। অনর্থক মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদের অপচয় হয়, সহস্র সহস্র প্রাণের অপচয় হয়, তবু মানুষ যুদ্ধ করে। যুদ্ধের অস্ত্রগুলি যতক্ষণ দূরে গর্জায়, ততক্ষণ সাধারণ মানুষ যুদ্ধটাকে একটা উৎসব মনে করে যেন। বহুলোক ব্ল্যাক আউটের মধ্যে ও রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বোমারু বিমানের জন্য উৎসুক হয়ে রইলো। রেডিও চালু রইলো সারা রাত।

॥ ৫৮ ॥

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এলাকার প্রায় এক কোণে একটা নির্জন জায়গা গাছপালা দিয়ে ঘেরা, কাছাকাছি কোনো পাকা বাড়ি নেই। সেখানে মস্ত বড় একটা শিশুগাছের তলায়, অনেকখানি ভূগর্ভে কংক্রিট দিয়ে বানানো হয়েছে কয়েকটি ঘর। নভেম্বর থেকে এই নিরাপদ, গোপন জায়গাটিতেই সরিয়ে আনা হয়েছে পূর্বাঞ্চলের আর্মি কমান্ডের সদর দফতর। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার ছাড়া অন্যদের এখানে প্রবেশ নিষেধ। সেনাবাহিনীতে এর নাম ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টার, সংক্ষেপে ট্যাক।

শীতের সন্ধ্যা, বাতাস নেই বলে গাছের একটি পাতাও নড়ে না। চতুর্দিকে কোনো শব্দ নেই। দু'জন স্টাফ অফিসারের সঙ্গে জুতোর শব্দ তুলে সেই শিশুগাছটির নীচে এসে পৌঁছোলেন জেনারেল

নিয়াজী। বাংলার শীত তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়, তিনি গরম পোশাকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। তাঁর পরনে সামার ট্রাউজার্স, একটা ধূসর রঙের বুশ শার্ট এবং গলায় একটা সিল্কের স্কার্ফ জড়ানো। সরু সিঁড়ি দিয়ে তিনি নামতে লাগলেন মাটির নীচে। টিউব লাইটের আলোয় সেই ভূগর্ভ ও দিনের মতন উজ্জ্বল।

লম্বা করিডরের দু'পাশে ঘর। পর পর কয়েকটি ঘর পার হয়ে জেনারেল নিয়াজী ঢুকলেন একটি প্রশস্ত কক্ষে। সে ঘরের তিন দিকের দেওয়ালই বড় বড় মানচিত্র দিয়ে ঢাকা। এক পাশে সারি সারি কয়েকটি টেবিলের ওপর টেলিফোনও ওয়্যারলেস সেট। মেজর জেনারেল সামসেদ, মেজর জেনারেল ফরমান, রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ এবং আরও তিরিশজন অফিসার সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত। সকলেই গম্ভীর।

ঘরের মাঝখানে গটগট করে এসে দাঁড়িয়ে সেনাপতি নিয়াজী উচ্ছল গলায় বললেন, চীয়ার আপ! ফাইনালি দা ওয়ার হ্যাজ বিগান!

নিয়াজীর মুখে একটু ও দুশ্চিন্তার রেখা নেই। বরং তিনি বেশ উৎফুল্ল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধ লাগবে, কি লাগবে না বা কখন লাগবে, এই উদ্বেগ তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। মাথার ওপর সর্বক্ষণ যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে বসে থাকার চেয়ে প্রকৃত যুদ্ধ করা একজন যোদ্ধার পক্ষে সহজ। যুদ্ধ যে একটা লাগবেই এ তো জানা কথা। অবশেষে এসেছে সেই সময়। ইন্দিরা গান্ধী যখন বিকেলে কলকাতার ময়দানে বক্তৃতা করছেন, তখনই রাওয়ালপিন্ডি থেকে পাকিস্তান বেতারে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তলায় তলায় সবরকম প্রস্তুতি নিলেও তেসরা ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির আগে যুদ্ধের কথা উচ্চারণ করেন নি, কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আর ধৈর্য রাখতে পারছিলেন না, নভেম্বরের শেষ দিকে রাজধানীতে একদল চীনা প্রতিনিধির সামনে তিনি হঠাৎ বলেছিলেন, এর পর আমাকে আর আপনারা এখানে পাবেন না। দশদিনের মধ্যেই হয়তো আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে! সেই দশদিনও পূর্ণ হলো না। পূর্ব ও পশ্চিম, দু'দিকেই রণাঙ্গন খুলে গেল।

নিয়াজী নিজেও যুদ্ধ শুরু করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর আগে কয়েকবারই তিনি বলেছেন যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিশে সীমান্তে পেরিয়ে অনেকবার হামলা করেছে, তার সমুচিত জবাব দেবার জন্য তিনিও পশ্চিম বাংলার সীমান্তের ওদিকে বাহিনী পাঠিয়েছেন, বয়রা আর হিলিতে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়েছে, নিজেদের কয়েকটি বিমান ও ট্যাঙ্ক হারাতে হলেও ভারতীয়দেরও কম ক্ষতি হয় নি! নিয়াজীর আর ও একটি ধারণা ছিল যে ভারতীয়রা আক্রমণ শুরু করবে পবিত্র ঈদের দিনে। সেদিন পাকিস্তানী সৈনিক ও কমান্ডাররা উৎসব পালনের জন্য অসতর্ক থাকবে। রাজধানী থেকেও এই মর্মে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঈদের দিনে যুদ্ধ লাগিয়ে বাঙালী মুসলমানদের মনে যে আঘাত দিতে চাইবে না ভারতীয় পক্ষ,সে কথা তাঁদের মাথায় আসেনি।

সমবেত সেনানায়কদের কাছে নিয়াজী বললেন, এবার আর আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করা না করার প্রশ্ন নেই! এখন খোলাখুলি যুদ্ধ। প্রতিপক্ষকে আমরা শুধু তাড়িয়ে নিয়ে যাবো না, যেখানে পাবো সেখানে মারবো। ইনসাআল্লা, এখন থেকে যুদ্ধ হবে ভারতের মাটিতে।

আগে থেকেই ঠিক করে রাখা ওয়ার স্ট্যাটেজি আবার ঝালিয়ে নিলেন নিয়াজী। অনেক দিক বিবেচনা করে দুর্গ প্রতিরক্ষা ধারাটিই বেছে নিয়েছেন তিনি। এই নীতিতে সীমান্তের শহরগুলিকে দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। এক একটা দুর্গের মধ্যে শক্তি পুঞ্জীভূত করে রাখলে সেগুলিকে জয় না করে শত্রুপক্ষ এগোতে পারবে না। দুর্গে আত্মরক্ষাকারীদের দমন করতে হলে আক্রমণকারীদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়া দরকার। এক একটা দুর্গ অবরোধ করে শত্রুপক্ষ যদি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসতে চায়, তাতেও তাদের প্রচুর সৈন্য লাগবে। প্রথা অনুযায়ী আত্মরক্ষাকারীদের তুলনায় আক্রমণকারীদের সংখ্যা অন্তত তিনগুণ বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু ইস্টার্ন সেকটরে পাকিস্তানী বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী প্রায় সমান সমান। সুতরাং দুর্গ প্রতিরক্ষা নীতিতে ভারতীয়রা সুবিধে করতে পারবে না।

যশোর, ঝিনাইদহ, বগুড়া, রংপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ভৈরববাজার, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামের দুর্গগুলিতে ৬০ দিনের গোলাবরুদ আর ৪৫ দিনের উপযুক্ত খাবার মজুত করা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট শহরকে দুর্গ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়ে গেছে, শত্রু ঢুকবে কোন দিক

দিয়ে? *

উপমা দেবার জন্য জেনারেল নিয়াজী তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন সামনে। সগর্বে বললেন, আমার এই হাতের আঙুলের মতন আমার সৈন্যরা সমস্ত বর্ডার আউটপোস্টে ছড়িয়ে আছে, সেখানে তারা যতদিন সম্ভব যুদ্ধ চালাবে, তারপর এই দেখুন, আঙুলগুলো গুটিয়ে আনার মতন, তারা দুর্গে ফিরে এসে শক্ত মুষ্টি তৈরি করবে, এই মুষ্টির আঘাতেই শত্রুর মাথা ভাঙবে!

এ ছাড়াও ফরাক্কা বাঁধের ধ্বংসসাধনের জন্য তৈরি হয়েছে কমান্ডো বাহিনী। রাজসাহীর দিক থেকে ইংলিশবাজারে ঢুকে পড়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত, চট্টগ্রামের প্রতিরক্ষাও এমনই সুদৃঢ় যে কোনোক্রমেই ঢাকার দিকে আসতে পারবে না ভারতীয়রা।

বক্তৃতা শেষ করে নিয়াজী সৈন্যাধ্যক্ষদের বললেন, আপনারা প্রতিটি যোদ্ধাকে জানিয়ে দিন যে লড়াই করতে হবে শেষপর্যন্ত, প্রাণপণে। শত্রুর হাতে প্রাণ দিলে তারা শহিদ হবে, শত্রুর প্রাণ নিতে পারলে গাজী হবে। এখান থেকে আমাদের ফিরে যাবার কোনো পথ নেই।

মওলা-এ আলীর কৃপায় জয় আমাদের হবেই, পাকিস্তানকে আমরা অখণ্ড রাখবোই!

অফিসারের মুখে স্বস্তির চিহ্ন নিয়েই ফিরলেন ট্যাক থেকে। তাঁরাও তো চাইছিলেন একটা কিছু হেস্ত নেস্ত হয়ে যাক। আটমাস ধরে বাংলার মাঠে-ঘাটে, জল-কাদায় বিদ্রোহীদের পেছন ছোটাছুটি করে সাধারণ সৈন্যরা ক্লান্ত, তাদের মনোবল ভেঙে পড়ছিল। পশ্চিম থেকে যখন তাদের পুবে পাঠানো হচ্ছিল, তখন তাদের বোঝানো হয়েছিল যে তারা কাফের মারতে যাচ্ছে। পবিত্র ইসলাম এবং পাকিস্তানের সংহতিরক্ষার পুন্য দায়িত্ব তাদের ওপরে। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা বুঝে গেল যে হিন্দুরা সব ভেগে পড়েছে, মুক্তিবাহিনীরা প্রায় সবাই মুসলমান, লড়াইটা হচ্ছে মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানের।

শিক্ষিত অফিসারদের একটা অংশ আরও একটি কারণে ক্ষুব্ধ। তারা স্বচক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা এতদিন ধরে দেখে নিজেরাই বুঝতে পেরেছেন যে সত্যিই তো পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় এই অঞ্চল অনেক ভাবে বঞ্চিত। ঢাকায় প্রচুর ঝি চাকর পাওয়া যায়, কারণ, এখানে অসংখ্য বেকার, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় এখানে একজন ভৃত্যকে অর্ধেক মাইনে দিলেই চলে। মেয়েরা পর্যন্ত রাস্তায় ভিক্ষে করে। গ্রামের অধিকাংশ লোকের চেহারা হাড় জিরজিরে এরকম তারা পশ্চিমে দেখেনি কখনো।

আর্মি অফিসার হলেই সকলের বিবেক নষ্ট হয়ে যায় না। যাদের বিবেক আছে তাদের বিবেকদংশনও হয় কখনো কখনো। গত আট-ন' মাস ধরে যা চলছে, তাতে অনেকেই অনুতাপ ও লজ্জা বোধ করেন। পঁচিশে মার্চ ঢাকা থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চুপি চুপি পালিয়ে গেলেন। অনেকেই জানে সেদিনের ঘটনা। বিকেলবেলা ইয়াহিয়া খান ক্যান্টনমেন্টের ফ্ল্যাগস্টাফ হাউসে গিয়েছিলেন এক চা-পানের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সূর্যাস্তের সময় আবার তিনি ফিরলেন প্রেসিডেন্ট হাউসে অতি আড়ম্বরকম শোভাযাত্রা করে। প্রথমে তাঁর দেহরক্ষী অশ্বারোহী দল, তারপর পাইলট জিপ, প্রেসিডেন্টের নিজস্ব চার-তারকা প্লেটসহ পতাকা লাগানো গাড়ির দু'পাশে সিকিউরিটির একাধিক গাড়ি, সবাই ভাবলো প্রেসিডেন্ট আসছেন।

আসলে রফিক নামে একজন ব্রিগেডিয়ার প্রেসিডেন্ট সেজে বসেছিলেন সেই শোভাযাত্রার মধ্যমণি হয়ে। ইয়াহিয়া খান তখন একটা ডজ গাড়িতে ছুটছেন এয়ারপোর্টের দিকে। এ কেমন প্রেসিডেন্ট যাঁকে নিজের দেশের দ্বিতীয় রাজধানী থেকে গোপনে প্রস্থান করতে হয়? রাত্তির থেকেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার আদেশ দিয়েছিলেন, তার আগেই তাঁর রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছে যাবার ব্যস্ততা।

তারপর এই ন'মাসে প্রেসিডেন্ট আর একবারও এলেন না পূর্ব পাকিস্তানে? দেশের যেটা বড় অংশ, সেখানে ওস দেশের প্রেসিডেন্ট এতদিনে একবারও আসতে পারেন না? পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর লুণ্ঠন-ধর্ষণ-গণহত্যার কাহিনীতে সারা পৃথিবী আন্দোলিত, লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, অথচ এই রাষ্ট্রের যিনি সর্বময় কর্তা তিনি বসে রইলেন চোদ্দশো মাইল দূরে! পশ্চিমের কোনো রাজনৈতিক নেতাও এদিকে আসেন নি। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে জনাব ভুট্টোও এখানে এসে বাঙালীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস করলেন না? বাঙালীরা বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী, কিন্তু তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কেউ করবে না, সামরিক বাহিনী দিয়ে তাদের শাসন করতে হবে? এই কি ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ? বাঙালীদের মধ্যেও এখন কোনো গণ্য করার মতন নেতা নেই, গভর্নর আবদুল মালিক শুধু সামরিক শাসকদের পুতুল নন, একটা অকেজো, জং ধরা পুতুল। ন'মাস

ধরে দেশের বৃহত্তম অংশের সাধারণ মানুষদের ওপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে শুধু আর্মি অফিসাররা। পূর্ব পাকিস্তান তো তা হলে সত্যিই নিছক একটা কলোনি, সেখানকার মানুষ পাকিস্তান রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা ও এতদিনে এই অন্যায় শাসনের স্বরূপ বুঝতে পেরেছে, সেখানেও প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। আর্মি অফিসাররাও বুঝতে পারছিলেন, এভাবে বেশিদিন চলে না।

প্রথম তিনদিনেই অনেকটা বোঝা গেল যুদ্ধের গতি কোন্‌দিকে।

পাকিস্তানী বিমান কলকাতায় বোমা ফেলতে যায় নি, কিন্তু প্রথমদিনই পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তান এয়ার ফোর্স সাতটি ভারতীয় ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করে এলো। কলকাতার দিকে থেকে ৩রা ডিসেম্বর রাত দুটো চল্লিশে ভারতীয় যুদ্ধবিমান উড়ে এলো ঢাকার আকাশে। মেশিন গান, হাল্কা মেশিন গান এবং অ্যাক অ্যাক গোলাবর্ষণ শুরু হলো সেই বিমান আক্রমণের প্রতিরোধে। পাকিস্তানী ফাইটার বিমানগুলো আকাশে উড়লো। গোলাবর্ষণের ফুলঝুরি আর আকাশে বিমানে বিমানে ডগ ফাইট দেখলো ঢাকার নাগরিকরা। পাকিস্তানী বিমান ভেঙ্গে পড়লে তারা হাততালি দেয়, ভারতীয় বিমানে আগুন লেগে গেলে তার হতাশার শব্দ করে। একদিনেই পাকিস্তানী এয়ার ফোর্সকে ৩২ বার যুদ্ধের জন্য শূন্য উড়তে হয়, গোলা খরচ হয় ৩০ হাজার রাউন্ড। ভূমি থেকে বিমানবিধ্বংসী কামান ৭০ হাজার গোলা ব্যয় করে ফেলো। প্রথম দিন বেশ কিছু ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করে ফিরে যায় ভারতীয় বিমানবাহিনী। পরদিন তারা আবার হানা দিল অতর্কিতে, ছোট ছোট, জঙ্গী বিমানের পাহারায় ১০টি মিগ ২১ এস, ৫০০ কিলোগ্রাম ওজনের ছ'খানা বোমা ফেললো ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়ার ওপর। বিরাট বিরাট গর্ত সৃষ্টি হয়ে অকেজো হয়ে গেল সেই রানওয়ে। গর্ত ভরাট করতে না পারলে পাকিস্তানী স্যাবার জেটগুলি আকাশে উড়তে পারবে না। দ্রুত গর্ত মেরামতি শুরু করে দিল প্রকৌশলী বিভাগ, আর ভারতীয় বিমান যখন-তখন উড়ে এসে ঘায়েল করতে লাগলো মেরামতকারীদের, যতটা গর্ত বোজানো হয়, নতুন বোমার ঘায়ে তারচেয়ে আরও বড় বড় গর্ত তৈরি হয়। অসহায় ভাবে ভূমিতে আটকে থাকা স্যাবার জেটগুলো পড়ে পড়ে মার খেতে লাগলো। ক্ষতবিক্ষত তেজগাঁ এয়ারপোর্টের রানওয়ে অকেজো হয়ে গেল একেবারে।

তেজগাঁ থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে কুর্মিটোলায় আর একটা নতুন বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছিল, রানওয়ের কাজ প্রায় শেষ, ভারতীয় বোমারু বিমান সেই রানওয়েটিও ধ্বংস করে দিয়ে গেল একই সঙ্গে। এর পরে সেকেন্ড ক্যাপিটালের নতুন চওড়া চওড়া রাস্তাগুলিকেই রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করার একটা সরীয়া প্রস্তাব ও বাতিল হয়ে যায়। ৬ই ডিসেম্বর সকাল দশটাই মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর যুদ্ধ শেষ। অবশিষ্ট ১৪ জন জঙ্গী পাইলট বেকার হয়ে বসে না থেকে বার্মা সীমান্ত দিয়ে কোনোক্রমে বেরিয়ে চলে গেল পশ্চিম রণাঙ্গনে। এরপর থেকে বাংলাদেশের আকাশে শুধু ভারতীয় বিমানের আধিপত্য।

পূর্ব পাকিস্তানের নৌবাহিনীর অবস্থা আরও করুন।

পাকিস্তানী সাবমেরিন গাজীর ছিল ভয়াবহ খ্যাতি। যুদ্ধের শুরুতেই করাচী থেকে গাজী চলে এসেছিল অনেকখানি পথ, উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ইস্টার্ন ফ্লিটকে চরম আঘাত হানার। কিন্তু বিশাখাপত্তন উপকূলের অদূরেই ভারতীয় ডেস্ট্রয়ার আই এন এস রাজপুত গাজীর সন্ধান পেয়ে গেল। গাজী আর রাজপুতের লড়াই চলেছিল অল্পক্ষণমাত্র, রাজপুতের ডেপ্থচার্জে গাজীর মতন শক্তিশালী সাবমেরিন টুকরো টুকরো হয়ে চিরকালের মত মিলিয়ে গেল সমুদ্রগর্ভে। এটা পাকিস্তানের পক্ষে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। গাজীর অকাল মৃত্যুতে পাকিস্তানে নেমে এলো শোকের ছায়া। এরপর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব দিকে নৌবাহিনীর আর কোনো সাহায্য পাঠাবার আশা রইলো না। বঙ্গোপসাগরে টহল দিতে লাগলো আই এন এস বিক্রান্ত, তার ডেক থেকে ছোট ছোট সী হক বিমান উড়ে গিয়ে বারবার আঘাত হানলো চট্টগ্রাম, কক্সবাজারে।

পূর্ব পাকিস্তানের নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল শরীফের অধীনে ছিল মাত্র গোটা কয়েক গানবোট আর ফ্রিগেট, আর কিছু বেসরকারি লঞ্চ দখল করে তাতে কামান বসিয়ে জোড়াতালি দিয়ে বানানো নৌযান। এর বিরুদ্ধে নিযুক্ত রয়েছে ভারতীয় টাস্ক ফোর্সের বিমানীবাহী জাহাজ, ডেস্ট্রয়ার ও ফ্রিগেট। ১৪টি সী হক, ২টি সী কিং, ২টি সাবমেরিন, একটি মাইন সুইপার। যুদ্ধের প্রথম দিকেই চট্টগ্রামের কাছে 'কুমিল্লা' নামে গানবোট ভারতীয় বিমান আক্রমণে ডুবে গেল, 'রাজসাহী' অগ্নিদগ্ধ অবস্থায়

কোনোক্রমে বন্দরে ফিরে এলো। আর কোনো গানবোট বন্দর এলাকার বাইরে যেতে সাহস করেনি। খুলনাতেও কয়েকটি নৌযান বোমার আঘাত ঘায়েল হয়, বাকি কয়েকটিকে লুকিয়ে রাখা হয় জঙ্গলের মধ্যে। পূর্ব পাকিস্তানে নৌযুদ্ধের প্রতিরোধের ও এখানেই শেষ।

বাকি রইলো শুধু স্থলবাহিনী।

পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছে ১২৬৩ জন অফিসার, ৪১, ০৬০ জন বিভিন্ন শ্রেণীর সৈনিক নিয়ে গঠিত এক সুদক্ষ সেনাবাহিনী। এ ছাড়াও ৭৩ হাজারের একটি আধা সামরিক বাহিনী।

পাকিস্তানী আর্মড ফোর্স বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই রাষ্ট্রের জন্মের অল্পকাল পর থেকেই সেনাবাহিনীর হাতে চলে এসেছে শাসনক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রতি বছরই সেনাবাহিনীর জন্য বিপুল ব্যয় করা হয়েছে, আমেরিকা এবং পশ্চিম দেশগুলি থেকে নিয়মিত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে। অফিসাররা সুশিক্ষিত, সাধারণ সৈনিকেরা সুশৃঙ্খল। এই শক্তিশালী পাকিস্তানী বাহীনীকে দমন করা মোটেই সহজ কথা নয়। তবু প্রথম দু'দিন বীরোচিত লড়াই করেই পাকিস্তানী বাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ শুরু করলো কেন?

পূর্বাঞ্চলে ভারতের পক্ষে রয়েছে ৭টি পদাতিক ডিভিশান। পশ্চিম পাকিস্তানের লড়াই ছাড়াও চীনা সীমান্ত জুড়ে ভারতকে বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে নিযুক্ত রাখতে হয়েছে, যে-কোন মুহূর্তে চীনা হামলার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নাগা- মিজো বিদ্রোহীরা যাতে উদ্দাম হয়ে না ওঠে, সেজন্য সেখান থেকেও সৈন্য সরানো যায় না। সুতরাং বাংলাদেশ যুদ্ধের জন্য ভারতের পক্ষে ৭টি ডিভিশানের বেশি সেনা আনা সম্ভব নয়।

এ ছাড়া ভারতের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ বাহিনী। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বাহিনী অনেকটা সংগঠিত হয়েছে, রয়েছে কে-ফোর্সে আর জেড-ফোর্সে নামে তিনটি ব্রিগেড। ৯টি সেকটরে ২০ হাজার সশস্ত্র বাঙালী সৈনিক। এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত এক লাখ গেরিলো মুক্তিযোদ্ধা। এবং সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণ মানুষের সমর্থন।

এমনকি বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরাও ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এই আট ন'মাস গ্রামের নিরক্ষর লোকেরাও এল এম জি, স্টেনগান, বাংকার, মাইন এইসব চিনতে শিখে গেছে। চাষী, জেলে, ইস্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত গোপন খবর এনে দেয় মুক্তিবাহিনীকে। একটা আট বছরের ছেলে এক নম্বর সেকটরের কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলামকে একদিন ফিল্ড ম্যাপের ওপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, এই দ্যাখেন স্যার, বল্লভপুর গ্রাম। আর এই খানে একটা বড় পুকুর। মেসিনগানটা বসানো আছে এই পুকুরের ধারে। আর ইস্কুল বাড়িতে থাকে খানসেনারা। এই ধান ক্ষেতের ধারে মাইন বস্যানো আছে স্যার, কিন্তু এই ধারটা দিয়া আমি গরু-বাছুর নিয়া যাই, কিছু হয় না, তাইলে ঐখানে মাইন পোঁতে নাই---

যে দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ হচ্ছে, সেই দেশের জনসাধারণ আক্রমণকারীদের দেখলে জয়ধ্বনি দেয়, ফুলের মালা ধরাতে আসে। আর নিজের দেশের সেনাবাহিনীকে দেখলে ঘৃণার চোখে তাকায়, দূরে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যরা জিতবে কী করে!

এই আট ন'মাসে পাকিস্তানী সৈন্যরা অনেকটা লাগাম-ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তারা লুণ্ঠন-ধর্ষণ করেছে অবাধে, সামান্য ছুতোয় গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, তার ফলে তারা সৈনিকের তেজও হারিয়েছে। বিলাসিতা ও দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে আর তা থেকে ফেরা যায় না। তাছাড়া যুদ্ধের জন্য শুধু হাতিয়ার লাগে না, একটা কিছু চড়া ধরনের উন্মাদনারও প্রয়োজন হয়। শুধু ধর্মীয় উন্মাদনায় এতদিন টেনে রাখা যায় না।

প্রকৃত যুদ্ধে নেমে পড়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা উপলব্ধি করলো, কার জন্য তারা লড়াই করছে?

দেশের যে-অংশে রক্ষা করার জন্য তারা প্রাণ দিতে যাচ্ছে, সেই অংশের অধিকাংশ মানুষই তাদের চায় না। এখানে ধর্ম অবান্তর। পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতীয় বাহিনীকে মোটেই ভয় পায় নি, তাদের প্রকৃত ভয় মুক্তি বাহিনীকে। ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের লড়াই হবে সৈনিকের সঙ্গে সৈনিকের, তাতে জয়-পরাজয় আছে। কিন্তু মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা আসছে মরিয়া হয়ে প্রতিশোধ নিতে, এই যুদ্ধ শুরু হবার অনেক আগেই তাদের অনেকের ভাই কিংবা বাবা নিহত হয়েছে, মা-বোন স্ত্রী ইজ্জত হারিয়েছে। ওদের হাতে পড়লে ওরা যুদ্ধবন্দী রাখে না, সঙ্গে সঙ্গে কচুকাটা করে। সেইজন্যই যে-কোনো সম্মুখ যুদ্ধে হারের সম্ভাবনা দেখা দিলেই পাকিস্তানী সৈন্যরা চেঁচিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের বলে, আমরা আত্মসমর্পণ করছি, আমাদের বন্দী করো, আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে দিও না!

যুদ্ধের সময় মিথ্যে প্রচার চলে খুব, অপরপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। অনেক সময় তাতে নিজেদেরও বিভ্রান্ত হতে হয়। রেডিওতে বলা হচ্ছে যে ঝিনাইদহে প্রচণ্ড লড়াইয়ে ভারতীয়পক্ষ খুব মার খাচ্ছে, কিন্তু ঝিনাইদহের মানুষ দেখছে, সেখানে কোনো লড়াই-ই নেই, পাকিস্তানী সৈন্যরা দু'দিন আগেই সেখান থেকে পালিয়েছে। মাটির তলায় ট্যাংকে বসে নিয়াজী খবর পেলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতীয়রা সাঙ্ঘাতিক হারছে, অমৃতসর শহরের পতন হয়েছে। নিয়াজী দু'হাত ছড়িয়ে হু-র-রে বলে উঠলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সেনাপতি, কিন্তু তাঁর হেড কোয়ার্টারের দেওয়ালে পশ্চিম পাকিস্তানের ম্যাপ, ঐদিকের যুদ্ধ সম্পর্কেই যেন তাঁর বেশি আগ্রহ। তিনি ধরে বসে আছেন যে পশ্চিম রণাঙ্গনে যদি অনেকখানি ভারতীয় ভূমি দখল করে ফেলা যায়, তা হলে তাই নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে দরাদরি করা যাবে।

দু'দিন পরেই জানা গেল, ওসব অমৃতসর দখল-টখলের খবর ভুয়ো! এদিকে পূর্ব রণাঙ্গনে তাঁর বাহিনী প্রায় সর্বত্র পিছিয়ে আসছে, কয়েক জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিন্নভিন্ন। ভারতীয় বিমানবাহিনী নিয়মিত ঢাকার আকাশে এসে বোমা ফেলে যাচ্ছে, কিন্তু একটাও পাকিস্তানী বিমান আকাশে ওড়াবার উপায় নেই। জলপথে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। পশ্চিম থেকে তিনি আরও আটটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ান চেয়েছিলেন, নভেম্বরের মধ্যে মাত্র পাঁচটি পেয়েছেন, বাকি তিনটি আর আসতে পারবে না। আকাশ কিংবা সমুদ্রপথ দিয়ে আর কোনো সাহায্য পাবার আশা নেই।

হাসিখুশী, উচ্ছল স্বভাবের এই সেনাপতি গুম হয়ে গেলেন হঠাৎ।

চতুর্থ দিনে গভর্নর আবদুল মালিক ডেকে পাঠালেন নিয়াজিকে। চতুর্দিকে প্রবল পরস্পরবিরোধী গুজব, তিনি যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জানতে চান। তাঁর ও প্রাণের ভয় ধরে গেছে।

দু'জন সিনিয়ার অফিসার নিয়ে নিয়াজী এলেন গভর্নর হাউসে। একটি নিভৃত কক্ষে তাঁদের মিটিং শুরু হলো। যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলতে বলতে হঠাৎ নিয়াজী চুপ করে গেলেন, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গভর্নরের মুখের দিকে। আর কিছুই বলেন না, সে এক অস্বস্তিকর নীরবতা।

কিছু একটা বলতে হবে বলেই গভর্নর মালিক বললেন, জেনারেল সাহেব, জীবনে উত্থান পতন তো থাকেই। এক সময় যার কপালে অনেক যশ আসে, তাকেই হয়তো এক সময় পরাজয়ের অমর্যাদা মেনে নিতে হয়। আবার অবস্থা বদলে যায়---

নিয়াজীর বিশাল শরীরটা কাঁপছিল, দু'হাতে মুখ ঢেকে তিনি শিশুর মতন কেঁদে উঠলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!

বৃদ্ধ মালিক সাহেবেরও চোখে জল এসে গেল। তিনি নিয়াজীর পিঠে হাত রেখে আপ্লুত স্বরে বললেন মনের জোর হারাবেন না, জেনারেল। মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখুন!

একজন বাঙ্গালী ওয়েটার ট্রে-তে করে কফি আর স্যান্ডইচ নিয়ে ঘরে ঢুকলো সেই সময়। নিয়াজীর সঙ্গী দু'জন অফিসার লাফিয়ে উঠে তাকে বললো, এই যা, যা, বেরিয়ে যা ঘর থেকে!

ওয়েটারটি বাইরে এসে ফ্যালফেলে চোখে অন্যদের বললো, সাহেবরা ভিতরে কান্নাকাটি করতেছে!

দু'তিনজন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, এই চুপ! চুপ! এসব কথা কারুকে বলিস না!

পাকিস্তান ও ভারতের যুদ্ধনীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ নিয়াজী চেয়েছিলেন যুদ্ধটাকে যতদূর সম্ভব প্রলম্বিত করতে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বাইরের অন্যান্য দেশ এসে মাথা গলাবে, রাষ্ট্রপুঞ্জে বিতর্ক হবে, পররাজ্য আক্রমণকারী হিসেবে ভারতকে দোষী করা যাবে। আর ভারতীয়পক্ষ ঠিক এই সবকটি ঝামেলা এড়াবার জন্যই ঠিক করেছিল, এই যুদ্ধ শেষ করতে হবে ঝড়ের বেগে। সেইজন্য প্রথম দিন থেকেই তারা নিয়োগ করেছে সর্বশক্তি। সেকটর কমান্ডাররা জেনে গিয়েছিলেন যে দু'সপ্তাহের বেশি এই যুদ্ধ কিছুতেই চলতে দেওয়া হবে না!

বেশ কয়েকটি বড় রকমের পরাজয়ের খবর এলেও নিয়াজী আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন দু'দিন বাদেই। তিনি ভূগর্ভ ট্যাংকেই অধিকাংশ সময় কাটাচ্ছিলেন, তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। সেইজন্য গুজব রটে গেল সেনাপতি নিয়াজী ভয় পেয়ে নিজের বাহিনীকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে হেলিকপটারে করে পালিয়ে গেছে। এই গুজব নিয়াজীর আত্মাভিমানে বড় আঘাত দিল। তিনি দর্পের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন সুড়ঙ্গ থেকে।

বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের লোকজন ঢাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে রেড ক্রস থেকে নিরপেক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করেছে, ভারতীয়রা সেখানে বোমাবর্ষণ করবে না বলে অনেকে এসে আশ্রয় নিচ্ছে সেখানে। বিদেশী সাংবাদিকরা ও আর ঢাকায় থাকতে চাইছে না। কারণ ঢাকায় বসে যুদ্ধের প্রকৃত খবর কিছুই জানা যায় না।

ট্যাক থেকে বাইরে আসবার আগে নিয়াজী নিজে রাওয়ালপিন্ডির সঙ্গে একবার ফোনে কথা বলে নিলেন। প্রত্যেকদিনই হেড কোয়ার্টার থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে শ্বেত ও পীত বন্ধুরা এবার পাশে এসে দাঁড়াবে। উত্তরের পাহাড় থেকে নেমে আসবে চীনে সৈন্যরা আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে এসে ঢুকবে আমেরিকার সেভেন্থ ফ্লিট। নিয়াজী অধৈর্যের সঙ্গে রাওয়ালপিন্ডিতে জেনারেল হামিদের ব্যক্তিগত সচিবকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের বন্ধুদের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে? উত্তর এলো, ছত্রিশ ঘন্টা!

ঢাকা ছেড়ে গাড়িতে, হেলিকপটারে পালাচ্ছে বিদেশীরা। নিয়াজী এরই মধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল পৌঁছে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কে বলেছে আমি পালিয়েছি? আমি তার নাম জানতে চাই!

কেউ ভয়ে কোনো উত্তর দিল না।

এরপর নিয়াজী এলেন হাসপাতাল পরিদর্শনে। সেখানে ঢুকতেই একডজন পাকিস্তানী নার্স ঘিরে ধরলো তাঁকে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে সেই রমণীদের। মুক্তি বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে তাদের কী অবস্থা হবে সে দৃশ্য কল্পনা করেই তারা কাঁপছে। বাঙালী মেয়েদের ওপর যে পাকিস্তানী সৈন্যরা ধর্ষণ করেছে, তার কিছু কিছু বাস্তব প্রমাণ তো এই নার্সরা স্বচক্ষে দেখেছে।

নার্সরা নিয়াজীকে বললো, বর্বর মুক্তিসেনাদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান। আমাদের হেলিকপটারে করে বার্মা পাঠিয়ে দিন!

যুবতী নারী দেখলেই নিয়াজী রঙ্গ-রসিকতার লোভ সামলাতে পারেন না। কিন্তু আজ তাঁর সে মেজাজ নেই। তিনি রুক্ষ ভাবে বললেন, অত ঘাবড়াবার কী আছে? শিগগিরই বড় রকমের সাহায্য আসছে। যদি সাহায্য শেষপর্যন্ত না-ও আসে, তবু তোমাদের মুক্তি বাহিনীর হাতে পড়তে হবে না। তার আগে, আমরাই তোমাদের মেরে ফেলবো!

সেখান থেকে নিয়াজী চললেন ক্যান্টনমেন্টের দিকে। বিমানবন্দরের বাইরে একদল বিদেশী এসে ভিড় করে আছে, কখন হেলিকপ্টারে পাবে সেই আশায়। নিয়াজী সেই ভিড় ঠেলে দেখেতে গেলেন প্রতিরক্ষার কামানগুলো কী অবস্থায় আছে।

ভিড়ের মধ্যে রয়েছে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক। নিয়াজীকে দেখে তাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। তাদের মধ্যে একজন হেঁকে জিজ্ঞেস করলো, জেনারেল, ভারতীয়রা দাবি করছে শিগগিরই তারা ঢাকায় পৌঁছে যাবে। এটা কতদূর সত্যি? তারা সঠিক কতটা দূরে আছে?

নিয়াজী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি নিজেই গিয়ে দেখে আসুন না!

সেই সাংবাদিকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি আপনার দিকের কী অবস্থা সেটা অন্তত বলুন!

নিয়াজী বললেন, আমি আমার শেষ সৈন্যটি নিয়ে, শেষ গুলিটি থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করবো।

এটাই আমার কথা!

অন্য একজন প্রশ্ন করলো, ঢাকা মুক্ত রাখার মতন ফোর্স কি আপনার আছে!

নিয়াজী সগর্বে বুকে চাপড় মেরে বললেন, ঢাকার পতন যদি কখনো হয়, তবে তা হবে আমার মৃতদেহের ওপর! আমার এই বুকের ওপর দিয়ে ওদের ট্যাংক চালাতে হবে!

যুদ্ধের চতুর্থদিনে অগ্রগতি দেখে নিশ্চিত হয়ে ইন্দিরা গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ নামে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিলেন। দিল্লির পার্লামেন্টে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে এই ঘোষণা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে গেল সারা দেশ। কলকাতায়, সীমান্তের ক্যাম্পগুলিতে, সীমান্ত ছাড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিকরা আনন্দে কোলাকুলি করতে লাগলো, মিষ্টি খাওয়া আর খাওয়ানোর ধুম পড়ে গেল। পূর্ব ও পশ্চিমের পাকিস্তান আর জোড়া লাগবে না।

ভারত যখন স্বীকৃতি দিয়েছে, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত পূর্ব-ইউরোপের সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোও আর দেরি করবে না। বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, একটি বাস্তব সত্য। বাংলাদেশে

পাকিস্তানী সৈন্যরাই এখন হানাদার বাহিনী। এখন একমাত্র লক্ষ্য হলো রাজধানী ঢাকা দখল করা। সেই শুভক্ষণটি আর কত দূরে?

॥ ৫৯ ॥

একটি নদীর বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাবুল চৌধুরী। কাদামাখা খালি পা, হাঁটু পর্যন্ত গোটানো টাউজার্স, নানা জায়গায় ছেঁড়া, গায়ে কোনো জামা নেই শুধু একটা হাত-কাটা হলুদ সোয়েটার, তার কাঁধের কাছে শুকনো রক্তের কালো ছোপ, সেটা যেন একটা বড় মাকড়সার ছবি। গত সাত মাস সে চুল-দাড়ি কাটেনি। তার গৌরবর্ণ দীর্ঘ শরীরটা এখন একটা মরচে-পড়া লোহার দন্ডের মতন। হাতে একটা এল এম জি কোমরে গুলির বেল্ট, সে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। শীতের বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তবে আলো পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি।

তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তের-চৌদ্দ বছরের কিশোর শফি, তারও হাতে একটা রাইফেল। ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, বাবুল ভাই, অরা চীনা?

বাবুল কোনো উত্তর দিতে পারলো না। তার বুকের মধ্যে যেন ঝড় বইছে, প্রচণ্ড আবেগে কাঁপছে ঠোঁট। সে নিজে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রায় দশ-বারোটি বিমান গম্ভীর গর্জনে অনেক নিচে নেমে এসে চক্কর দিচ্ছে, তার থেকে নেমে আসছে ছত্রী সৈন্য বাহিনী। সত্যিই কি চীন তা হলে পাকিস্তানের সমর্থনে সসৈন্যে এগিয়ে এলো? ক'দিন ধরেই এরকম জোর গুজব। বাবুলের মন ভেঙ্গে যাচ্ছে। দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের আশার প্রতীক চীন, তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবী চেতনার প্রধান প্রেরণা চীন, সেই চীন পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের মানুষ মারবে? চীনা সৈন্যের সঙ্গে শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে বাবুলকে? রাষ্ট্রপুঞ্জে চীন পাকিস্তানীদের পক্ষে ওকালতি করেছে, মার্কিনীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মাঝপথে যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত যুদ্ধেও যোগ দেবে?

শফি বললো, বাবুল ভাই, হানাদাররা অগো দিকে গুলি ছোঁড়ে না! চীন তাইলে আইস্যা পড়লো।

বাবুল শফির কাঁধটা শক্ত করে চেপে ধরলো।

টাঙ্গাইলের সাদা রঙের সার্কিট হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে পাকিস্তানী মেজর জেনারেল কাদির। আশা-নিরাশায় তার বুকটা ধকধক করছে। তা হলে শেষ পর্যন্ত এসে পড়লো বহু প্রতীক্ষিত সেই সাহায্য। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ঢাকায় জেনালের নিয়াজীকে বারবার চীনা সহযোগিতার সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে চীনারা আসবেই। এর মধ্যে মৈমনসিং ও জামালপুর দুর্গের পতন হয়েছে, মেজর জেনারেল কাদিরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পিছিয়ে আসার। এক মাইন দুর্ঘটনায় আহত হয়ে লেফটেনান্ট কর্নেল সুলতানও কোনোক্রমে এসে পৌঁছেছে টাঙ্গাইলে, তার দুর্ধর্ষ ৩১ নং বালুচ বাহিনী ছিন্নভিন্ন। ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তাটি মাইনে কন্টকিত। ভারতীয়রা ঘিরে আসছে চতুর্দিক থেকে, মুক্তিযোদ্ধারা পলায়নপর পাকিস্তানী বাহিনীর ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষয়ক্ষতি করে দিচ্ছে প্রচণ্ড।

রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ে জেনারেল কাদির চেঁচিয়ে এক মেজরকে জিজ্ঞেস করলো, ওরা কারা? খবর নিয়েছো? ওরা কালিহাতির দিকে নামছে!

মেজর সারওয়ার বললো, স্যার, সবাই বলছে ওরা চাইনিজ!

জেনারেল কাদির ধমক দিয়ে বললো, ওরা বলছে মানে কারা বলছে? প্লেনগুলো কাদের চিনতে পারছো? এগিয়ে দেখ!

মিনিট দশেকের মধ্যে হঠাৎ জ্বলে-ওঠা আশার মশালটি হঠাৎই নিবে গেল। চীনে নয়, ওরা ভারতীয়! বাংলার আকাশে এখন ভারতীয় বিমানবাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য। চীনে বিমানদের এত সহজে তারা এতখানি ভেতরে আসতে দেবে কেন? ভারতীয় মিগ-২১ বিমানগুলি এখন স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। মিগগুলি ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে আর অন্য বিমান থেকে নামছে ছত্রী সৈন্যরা। তাদের বাধা দেবার জন্য একটিও পাকিস্তানী বিমান নেই।

প্যারাসুটগুলো খুব কাছে আসার পা দেখা যাচ্ছে তাদের বহন করা অস্ত্রশস্ত্র। জেনারেল কাদির-এর পাশে দাঁড়ানো একজন অফিসার কপাল চাপড়ে বলে উঠলো, হায় আল্লা, ওটা কী আসছে, ৩-৭ ইঞ্চি কামান?

অতবড় কামান এই পিছিয়ে আসা পাক বাহিনীতে নেই। টাঙ্গাইল রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থাও নেই। অক্ষম ক্রোধে জেনারেল কাদির একটা স্টেনগান তুলে নিয়ে সেই প্যারাসুটগুলোর দিকে এক ম্যাগাজিন খালি করে দিলেন। একটাও লাগলো না, প্যারাসুট বাহিনী এখান থেকে গুলির সীমার অনেক বাইরে।

টাঙ্গাইলের একটা বিরাট বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে কাদের সিদ্দিকী আর তার দলবল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাদের চোখমুখ উদ্ভাসিত, কয়েকজন হাতিয়ার নিয়ে লাফাচ্ছে উল্লাসে। তাদের কাছে আগেই খবর এসেছিল যে আজই ভারতীয় ছত্রীসেনা নামবে, আজই শুরু হবে টাঙ্গাইল শহর দখলের চূড়ান্ত লড়াই।

মিগ-২১ বিমানগুলি চক্কর দিতে দিতে খুব নিচু হয়ে দেখিয়ে গেল বাংলাদেশের পতাকা। তলা থেকে মুক্তিযোদ্ধারা লতা-পাতায় আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে সংকেত জানালো।

প্রথমে মনে হলো প্লেন থেকে খসে পড়ছে কাগজের টুকরো। ভারতীয় বিমান এরই মধ্যে বাংলাদেশের সর্বত্র পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে প্রচুর লিফলেট ছড়িয়েছে, এও যেন তাই। ক্রমেই সেই কাগজের টুকরোগুলো বড় হয়ে ফুলের মতন দেখায়, যেন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। প্রথমে ফুলের কুঁড়ি, তারপর হঠাৎ তা পাপড়ি মেলে, প্যারাসুটগুলো খুলে গিয়ে ছাতার মতন সেগুলি আস্তে আস্তে দুলতে থাকে। দুটি ফাইটার বিমান ঘুরে ঘুরে তাদের পাহারা দিচ্ছে। কালিহাতি আর পুংসির মাঝামাঝি তারা নামছে, সেখানে শত্রুপক্ষের কোনো কামান নেই, সে খবর আগেই পাওয়া গেছে। দূর থেকে ছত্রীবাহিনীকে আকাশপথে নামতে দেখেও এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করার সাধ্য এখানকার পাকিস্তানী বাহিনীর নেই, তারা এখন পশ্চাৎ অপসরণে ব্যস্ত।

মধুপুর, গোপালপুর, কালিহাতি থেকে শোলাকুরা পর্যন্ত পাকা সড়ক কাদের সিদ্দিকীর মুক্তিবাহিনী সম্পূর্ণ মুক্ত করে ফেলেছে। পাক বাহিনী তাড়াহুড়ো করে পিছু হটছে, যেসব জায়গায় সেতু ভাঙা, সেখানে রাশি রাশি পাটের বস্তা ফেলে কোনোক্রমে পার করাচ্ছে গাড়ি, প্রত্যেকটা গাড়ি মালপত্র এবং মানুষে এত ভর্তি যে জোরে যেতেও পারছে না। রাজাকার, আল বদর, আল শামস ও শান্তি কমিটির পাণ্ডারাও এখন প্রাণভয়ে সেনাদলের পিছু পিছু পালাতে চায়, কিন্তু গাড়িতে জায়গা নেই তাদের জন্য। তারা কেউ কেউ জোর করে গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করলে পাক সৈন্যরা লাথি মেরে কিংবা রাইফেলের বাঁট দিয়ে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে তাদের। বিশ্রী গালাগাল করছে। দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যারা দালালি করেছিল, এই তাদের পুরস্কার।

রাস্তার ধারে ধারে ওত পেতে আছে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা, সুযোগ পেলেই গুলিবর্ষণ করছে এই পলায়নপর দলের ওপর।

ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ক্লের তাঁর বাহিনী নিয়ে জামালপুর দখল করে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে এসেছেন। তিনি এগোতে লাগলেন মধুপুরের দিকে। সেই বাহিনী, মুক্তি বাহিনী এবং ছত্রী বাহিনী তিন দিক থেকে আক্রমণ করলো টাঙ্গাইল শহর।

টাঙ্গাইল রক্ষার আর কোনো উপায় নেই দেখে পাকিস্তানী ব্রিগেডিয়ার কাদির পালাতে লাগলেন কালিয়াকৈর-এর দিকে। ৯৩ ব্রিগেডের আর আকদল সৈন্য ছত্রী বাহিনীর হাতে মার খেয়ে সেদিকেই আসছে। বড় সড়কের ওপরে এসে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। মাথার ওপর যখন তখন এসে ভারতীয় বিমান মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে যাচ্ছে, মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী কখন কোন্ দিক থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই, রাস্তায় মাঝে মাঝে মাইন বিস্ফোরণে উড়ে যাচ্ছে এক একটা গাড়ি। এরকম চল্লিশটা গাড়ি রাস্তায় উল্টে পড়ে আছে। টাঙ্গাইলের ব্যবসায়ী অজিত হোমের বেডফোর্ড গাড়িখানা পাক সেনারা জোর করে দখল করে নিজেরা ব্যবহার করছিল, প্রচণ্ড মাইন বিস্ফোরণে সে গাড়ির ইঞ্জিন উড়ে গিয়ে আটকে আছে একটা বড় গাছে।

যাদের আর লড়াই করার মতন মনোবল নেই, যারা পালাতেই ব্যস্ত, তাদের পক্ষে এতবড় দল নিয়ে চলাফেরা করা বিপজ্জনক, তাই ব্রিগেডিয়ার কাদির সবাইকে ছড়িয়ে পড়তে বললেন। আল্লার নাম নিয়ে যে-রকমভাবে পারে ঢাকায় পৌঁছবার চেষ্টা করুক। কাদির নিজের সঙ্গে রাখলেন মাত্র আটজন অফিসার ও আঠারো জন সৈনিক। এদের নিয়ে তিনি পাকা সড়ক ছেড়ে রাতের অন্ধকারে নেমে পড়লেন মাঠের মধ্যে।

গ্রাম্য রাস্তা মুক্তিবাহিনীর নখদর্পণে। ভারতীয়রাও মুক্তি বাহিনীর সাহায্য নিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে

যাতায়াত করতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানীরা জলকাদার মধ্যে নেমে দিকভ্রান্ত হয়ে গেল। গ্রামের মানুষের কাছ থেকেও কোনো সাহায্য পাবার আশা নেই, বরং তারা পাক সৈন্যদের দেখলেই মুক্তিবাহিনীকে খবর দিয়ে দেয়। তাই ছত্রভঙ্গ পাক সৈন্যরা পাগলের মতন এদিক ওদিক ছুটতে লাগলো, যে কোনো মানুষ দেখলেই তারা এলোপাথারি গুলি চালায়, অনর্থক সাধারণ মানুষ মরে। কিন্তু তারা গাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, তাদের গুলির স্টক অফুরন্ত নয়, তাদের গোলাগুলি ফুরিয়ে যেতেই গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের তাড়া করে, শাবল-কোদাল-বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মারে। এক সময় যারা নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর যখন-তখন, অত্যাচার করেছিল, এখন তাদের হাতেই এইসব সৈন্যদের প্রাণ দিতে হয়। যাদের ভাগ্য ভালো, তারা যৌথ কমান্ডের সামনে পড়ে গিয়ে হাত তুলে চেঁচিয়ে বলে, আমাদের ধরো! আমাদের ধরো! যৌথ কমান্ডের হাতে বন্দী হয়ে তারা প্রাণে বেঁচে যায়।

ব্রিগেডিয়ার কাদিরের ছোট্ট দলটি পল্লীবাংলার জলকাদার মধ্যে এসে পড়ে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোন্ দিকে কালিয়াকৈর? রাতের অন্ধকারে তারা অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পথ চলে, দিনের বেলা কোনো জঙ্গলে কিংবা ভাঙা বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। এরকমভাবে দু'দিন কেটে গেল। সঙ্গে কোনো খাবার নেই, পানীয় জল পর্যন্ত নেই। এঁদো পনা-পুকুরের নোংরা জল খেতে গা ঘিনঘিন করে, কিন্তু উপায় নেই।

খালি পেটে পুকুরের জল চুমুক দিয়ে খেতে খেতে ব্রিগেডিয়ার কাদিরের বারবার বমি হতে লাগলো। দুর্বল শরীর নিয়ে আর হাঁটতে পারছেন না। বড় সড়কে না উঠলে ঢাকায় পৌঁছোনোর কোনো উপায় নেই, কিন্তু সেই প্রধান রাস্তা এখন শত্রুর দখলে। কালিয়াকৈর-এ তাঁদের একটা বাহিনীর অপেক্ষা করার কথা, সেই দলটাকে পেলে প্রাণপণ লড়াই করে কোনোক্রমে শত্রুর ব্যূহ ভাঙার শেষ চেষ্টা করা যায়। কিন্তু কালিয়াকৈর কতদূর?

অবসন্ন, পরিশ্রান্ত হয়ে ব্রিগেডিয়ার কাদির একটা বড় ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসলেন। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে এসেছে। অভিমানে অশ্রু এসে যাচ্ছে তাঁর চোখে। তিনি সৈনিক, যুদ্ধ করতে ভয় পান না। যদি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে কাফের ও গদ্দারদের বিরুদ্ধে লড়ে প্রাণ দিতে হতো, তাতেও তিনি গৌরব বোধ করতেন। কিন্তু হাইকমান্ডের একি উল্টোপাল্টা নির্দেশ! কেন তাঁদের হঠাৎ পিছিয়ে আসার হুকুম দেওয়া হলো? এয়ার কভার ছাড়া, ট্যাঙ্ক বাহিনীর সহায়তা ছাড়া পিছিয়ে আসা যায়! নিয়াজী চাইছেন যে-কোনো উপায়ে ঢাকাকে রক্ষা করতে, কিন্তু কাদিরের বাহিনীর কাছে ঢাকা এখন মরীচিকা।

একজন অফিসার একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে বললো, স্যার, এই পাতাগুলো চিবিয়ে দেখুন, একটু গলা ভিজবে।

কাদির সন্দিগ্ধভাবে বললেন, কী গাছ? যদি বিষাক্ত হয়?

অফিসারটি বললো, আমি আগে খেয়ে দেখেছি স্যার। টক টক খেতে।

কাদির হাত বাড়িয়ে সেই ডালটা নিয়ে তেঁতুলপাতা চিবোতে লাগলেন। কাদার মধ্যে থেবড়ে বসে তেঁতুলপাতা খাওয়াই তার নিয়তিতে ছিল।

আস্তে আস্তে তিনি বললেন, আমাদের দু-তিনজনকে যে-কোনো উপায়ই হোক ঝুঁকি নিয়ে খানিকটা এগিয়ে দেখতে হবে, ৯৩ ব্রিগেডের কোনো অংশ এদিকে আছে কিনা! তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারলে আমরা এই অবস্থায় কদিন বাঁচবো? কে কে যেতে রাজি আছে?

প্রথম কেউ কোনো কথা বললো না, তারপর জাফর নামে একজন মেজর হাত তুলে বললো, আমি রাজি আছি স্যার। এ ছাড়া সত্যি আর উপায় নেই। ইনসাআল্লা, তাদের খুঁজে বার করবোই।

কাদির বললেন, তুমি পাঁচজন জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যাও! খুদা হাফেজ।

মেজর জাফর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে গুঁড়ি মেরে সেই ঝোপ থেকে বেরুলো। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সামনেই একটা জলাভূমি, তারা নেমে পড়লো সেই ঠাণ্ডা কনকনে পানির মধ্যে। সেটা খুব গভীর নয়। সেটা পেরিয়ে এসে একটা মাঠ, কাছাকাছি কয়েকটা লাশ পড়ে আছে। টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল, একটা বাড়ির উঠোনে একটি মাঝবয়েসী উলঙ্গ স্ত্রীলোক, দুটি শিশু আর একজন বৃদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, অন্তত চার-পাঁচ দিনের বাসী মড়া। এই পথ দিয়ে পাকবাহিনী যাওয়ার নির্ভুল চিহ্ন।

মাঠের অর্ধেকটা আসতেই দূরে একটা ক্ষীণ শব্দ পাওয়া গেল, কোনো গাড়ির হেডলাইটের একঝলক আলো। ঐখানে কোনো রাস্তা আছে, ঐ পর্যন্ত যেতেই হবে।

মাঠের মাঝখানে কয়েকটা ঝুপসি গাছ। তার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ কান ফাটানো শব্দ, ছুটে

এলো একঝাঁক বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে জাফরের দলটা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে পজিশান নিল। একজন জওয়ান এর মধ্যেই মারা গেছে, একজন কাতরাচ্ছে।

দু'পক্ষের গুলি বিনিময়ে হলো পাঁচ মিনিট ধরে। জাফরের দলটা খোলা মাঠের মধ্যে, অন্যরা গাছের আড়ালে থাকার সুবিধে পেয়েছে। জাফরদের এখন পেছন ফিরে পালাবারও কোনো উপায় নেই, তবু দু'জন জওয়ান মাথাখারাপের মতন উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়োবার চেষ্টা করতেই ফুঁড়ে গেল গুলিতে। আরও একজন আগে মারা গেছে। একটা মৃতদেহকে আড়াল করে জাফর চেঁচিয়ে উঠলো, আই সারেন্ডার!

গাছের আড়াল থেকে লাইট মেশিনগান নিয়ে বেরিয়ে এলো বাবুল চৌধুরী আর শফি। মাত্র দেড়জন!

বাবুল এখন মুক্তিবাহিনীর কোনো বিশেষ সেক্টরে নেই। একটা গ্রাম থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে শফিকে নিয়ে সে একাই ঘোরে। পলাতক সৈন্যদের খুঁজে খুঁজে ধরাই তার কাজ। মাঝে মাঝে যখন তার গোলাবারুদ ফুরিয়ে যায় তখন মুক্তিবাহিনীর কোনো দলে এসে দু-তিন দিনের জন্য যোগ দেয়। তার কাছে খালেদ মশাররফের দেওয়া পরিচয়পত্র আছে।

মাত্র দেড়জনকে দেখে মেজর জাফরের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করলো। আর একটু সাবধান হলে কি এদের খতম করা যেত না? হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে একসঙ্গে এত ফায়ারিং করা মুখামি হয়ে গেছে জাফরের কাছে আর গুলি নেই। সে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর সারা শরীর কাঁপছে। ইন্ডিয়ান আর্মি নয়, মুক্তিবাহিনীর লোক, এরা বন্দী রাখে না।

শফি বেশি উৎসাহে আগে এগিয়ে এসেছে, মেজর জাফর এক লাফ দিয়ে তার গলা চেপে ধরে কাছে টেনে নিল। কোমর থেকে একটা ছুরি তুলে বলো, খবরদার, আমাকে ধরলে এই বাচ্চাটাকে শেষ করে দেবো!

পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত। পাঁচটা মৃত সৈনিক এদিক ওদিক ছড়ানো। বিশাল শক্তিশালী মেজর জাফর শফির গলা চেপে ধরেছে, জ্যোৎস্নায় চকচক করছে ছুরির ফলা। এল মন জি-টা হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো বাবুল, তারপর কঠিন গলায় বললো, কিল হিম! কিল হিম! তোমরা পঁচিশ-তিরিশ লাখ বাঙালীকে মেরেছো, আরও একটা বাচ্চাকে মারবে, তাতে আর এমন বেশি কী হবে? শফি, তুই মরতে ভয় পাস?

শফি তার কৈশোরের সদ্য ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বললো না বাবুল ভাই। ও আমারে মারুক, তারপর তুমি অরে কুত্তা দিয়া খাওয়াইও। জয় বাংলা! জয় বাংলা!

এল এম জি-টা উঁচু করে বাবুল বললো, ওর কথার মানে বুঝলে?

মেজর জাফর কুত্তা শব্দটা বুঝেছে। তারচেয়েও বাবুলের কণ্ঠস্বর তাকে ক্ষণেকের জন্য উন্মনা করে দিল। তারপরই সে শফিকে ঠেলে দিয়ে আবেগের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, চৌধুরী সাব! বাবুল চৌধুরী? ম্যায় মেজর জাফর...

বাবুল এবার এগিয়ে এসে ওর পেটে এক লাথি মেরে বললো, মেজর জাফর! ইদ্রিসের বাচ্চা! বল হারামজাদা, মনিরা কোথায়?

মাটিতে ছিটকে পড়ে জাফর বললো, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!

বাবুল তার কপালের ওপর এল এম জি-র নলটা ঠেকিয়ে বললো, আগে বল, মনিরা কোথায়। আমার বাড়ি থেকে যে মেয়েটিকে তোর লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল...

জাফর বললো, আমি জানিনা! আল্লার কশম, আমি জানিনা। তারা অন্য লোক, আমি তো তোমাকে বলেছিলাম...

বাবুল বললো, আমি ঠিক তিন গুনবো!

সে জাফরের বুকের ওপর একটা পা দিয়ে দাঁড়ালো।

পেছন দিক থেকে পাওয়া গেল অনেক পায়ের শব্দ। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে যৌথবাহিনীর একটি দল ছুটে এসেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের একজন বাবুলকে চিনতে পেরেছে, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সে উল্লাসে ফেটে পড়ে বললো, স্যার, আপনি একা এই সবকটাকে খতম করেছেন?

ইন্ডিয়ান কমান্ডার জাফরকে মারতে দিল না, অন্যদের সরিয়ে দিয়ে সে জাফরকে মাটি থেকে তুলে তার র‍্যাংক দেখে নিল। তারপর গম্ভীরভাবে বললো, মুক্তির ছেলেরা তোমাকে খুন করতে চায়।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আমি তোমাকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে রাখতে পারি, যদি তুমি দেখিয়ে দাও, তোমার সঙ্গীরা কোথায় আছে। তাতে যদি রাজি না থাকো, তা হলে আমি তোমাকে মুক্তিদের হাতে তুলে দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবো!

একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে মেজর জাফর এমনই বিহ্বল হয়ে গেছে যে সে কোনো কথাই বলতে পারছে না। সে ইন্ডিয়ান কমান্ডারের হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে।

বাবুল বললো, কমান্ডার, ওকে আমার হাতে দিন। আমি ওকে ধরেছি। ওর সঙ্গে আমার পার্সোনাল স্কোর মেটাবার আছে!

জাফর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, না, না, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি!

একজন জাফরের পিঠে একটা স্টেনগানের নল চেপে ঠেলতে লাগলো। জলাভূমির মাঝখানে এসে যৌথবাহিনীর সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়লো ঝোপটার চারদিকে, জাফরকে দিয়ে বলানো হলো সারেন্ডার করতে।

তার উত্তরে ছুটে এলো এক ঝাঁক বুলেট।

ভারতীয় কমান্ডারটি তবু নিজের দলকে আক্রমণ করতে নিষেধ করে চিৎকার করে বললো, পাকিস্তানী সিপাহীলোগ, হাতিয়ার ডাল দো। ইউ আর সারাউন্ডেড!

এবার ঝোপের মধ্য থেকে একজন কেউ সঙ্গীদের নির্দেশ দিল, স্টপ ফায়ারিং! স্টপ ফায়ারিং।

মুক্তিযোদ্ধারাই আগে অকুতোভয়ে ছুটে গেল ঝোপের মধ্যে। পলাতক পাকিস্তানী দলটির অস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে তাদের চড় লাথি মারতে লাগলো রাগের চোটে!

ইন্ডিয়ান কমান্ডারটি জোরালো টর্চ ফেলে ব্রিগেডিয়ার কাদিরকে দেখে আনন্দে শিস দিয়ে উঠলো। পোশাকের তারকা দেখলেই চেনা যায় ব্রিগেডিয়ার। এত উঁচু র‍্যাঙ্কের বন্দী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

তেঁতুলগাছের নিচে রক্তশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রিগেডিয়ার কাদির। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা তাঁকেও কয়েকটা চড় মেরেছে। একবার তিনি ভেবেছিলেন রিভলভারটা দিয়ে আত্মহত্যা করবেন। করাচীতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখ মনে পড়ে গেল। ইন্ডিয়ান আর্মির হাতে ধরা পড়লে তবু বেঁচে থাকার আশা থাকে।

রিভলভারটা ইন্ডিয়ান কমান্ডারের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে ব্রিগেডিয়ার ধরা গলায় বললেন, আমাকে মুক্তির হাতে দিও না! যদি মারতে হয় তুমি মারো!

ইন্ডিয়ান কমান্ডার বললো, তুমি জেনিভা কনভেনশন অনুযায়ী সবরকম সুযোগ সুবিধে পাবে। আমাদের জেনারেল মানেক শ'র ঘোষণা রেডিওতে শোনেনি?

শফি জাফরকে দেখিয়ে বললো, এই হারামজাদাটা আমারে ছুরি মারতে আসছিল। এরে শাস্তি দিবেন না?

বাবুল বুঝিয়ে বললো, এই কাপুরুষটি একটি বাচ্চার গলায় ছুরি চেপে ধরেছিল।

ভারতীয় কামন্ডারটি শফিকে কাছে টেনে এনে তার চুলে হাত দিয়ে আদর করতে করতে বাবুলকে বললো, এত ছোট বাচ্চাকে এই যুদ্ধের মধ্যে এনেছেন কেন? আপনারা আমরা লড়াই করছি, তাই কি যথেষ্ট নয়।

বাবুল বললো, এই ছেলেটির কোনো বাড়ি নেই। এর বাবা-মাকে এই শয়তানরা খুন করেছে। এরপর ওর লড়াই করা ছাড়া আর কি উপায় আছে বলো? ও রাইফেল চালাতে জানে।

শফি জাফরের একটা চোখের ওপর থুঃ করে একদলা থুতু ফেললো।

বাবুল তাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর বন্দীদের সার বেঁধে নিয়ে যাওয়ার যখন ব্যবস্থা হচ্ছে তখন সে আর শফি নিঃশব্দে সরে গেল মূল দল থেকে।

এখন যেতে হবে কালিয়াকৈর। সেখান থেকে ঢাকা। সবাই জেনে গেছে যে শেষ লড়াইটা হবে ঢাকায়। সেখানে পথে পথে যুদ্ধ চলবে। বাবুল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে পৌঁছোতে চায়।

তারা আগে ফিরে গেল মাঠের মধ্যে সেই ঝুঁপসি গাছতলায়। এখানে বাবুলের কাঁধের ঝোলাটা পড়ে আছে। গাছতলায় বসে সে ঝোলা থেকে একটা পাউরুটি বের করে অর্ধেকটা ছিঁড়ে দিল শফিকে। গত দু দিন ধরে তারা বাসী, শুকনো পাউরুটি খেয়ে যাচ্ছে।

খেতে খেতে বাবুল জিজ্ঞেস করলো, কী রে শফি, এখন হাঁটতে পারবি, না একটু ঘুমিয়ে নিবি?

শফির সত্যি ঘুমে চোখ টেনে এসেছে, তবু সে বললো, না, হাঁটতে পারমু! দিনের বেলা ঘুমাবো।

বাবুল বললো, এক কাজ কর, ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নে। আমি পাহারা দিচ্ছি।

শফি বললো, তাইলে তুমি আগে ঘুমাও, আমি পাহারা দেবো।

কিছু একটা শব্দ পেয়ে বাবুল শফির মুখটা চেপে ধরলো। এমন ফটফটে জ্যোৎস্নার মধ্যে কেউ নিজেকে সম্পূর্ণ লুকোতে পারে না। পাকা সড়কের দিক থেকে অন্তত পাঁচজন লোক মাঠের মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে এই দিকেই এগোচ্ছে। মৃদু ছড় ছড় শব্দ হচ্ছে মাটিতে।

এরা শত্রু না মিত্র সেটাই বোঝা শক্ত। মাঝে মাঝে এই ভুল হচ্ছে, ইন্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি বিনিময় হয়ে যাচ্ছে।

শফিকে নিয়ে বাবুল গাছের আড়ালে চলে গিয়ে নিঃসাড়ে দাঁড়ালো। ওদের সে আরও কাছে আসতে দিতে চায়। ওরা এই গাছতলাতেই পৌঁছোতে চেষ্টা করছে।

যখন ওরা প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন বাবুল নিঃসন্দেহ হলো যে এরা দলছুট পাকিস্তানী সৈন্য। প্রত্যেকেই লম্বা চওড়া, ইন্ডিয়ান আর্মির এ রকম মাত্র পাঁচ জন বুকে হেঁটে মাঠ দিয়ে আসবে না।

বাবুল একঝাঁক বুলেট বর্ষণ করলো। শফিও তার রাইফেল চালালো।

প্রতিপক্ষ উত্তর দেবার কোনো চেষ্টাই করলো না। একজন লাফিয়ে উঠে দু হাত উঁচু করে চ্যাঁচাতে লাগলো, সারেন্ডার! সারেন্ডার!

ধপাধপ করে তারা তাদের রাইফেল ও একটা স্টেনগান ছুঁড়ে দিল সামনে। বাবুল তবু ঝুঁকি নিল না। সে গাছের আড়াল থেকেই হুকুম দিল, সবাই মাথার ওপর হাত তুলে এগিয়ে এসো!

তিনজন এগোতে এগোতে সেইভাবে, দু'জন উঠতে পারলো না। যে তিনজন বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে একজন পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন। তারা কাছাকাছি আসতেই বাবুল আবার হুকুম দিল, এবার মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসো।

এবার বাবুল আর শফি গাছের আড়াল থেকে বেরুতেই সেই পাকিস্তানীরা বিস্ফারিত চোখে দেখলো দেড়জনকে। একজন পেছন ফিরে পাগলের মতন দৌড়োলো হাতিয়ার কুড়িয়ে নেবার জন্য। শফিই নির্ভুল টিপে তাকে ফেলে দিল মাটিতে। ক্যাপ্টেনের পাশের লোকটি দারুণভাবে আহত, সে বসে থাকতে পারলো না, গড়িয়ে গেল মাটিতে। ক্যাপ্টেন হাতজোড় করে বললো, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!

বাবুল এগিয়ে এসে তাকে একটা লাথি কষিয়ে বললো, বল মনিরা কোথায়?

ক্যাপ্টেনটি হতভম্ব হয়ে বললো, কে? আমি তো জানি না মনিরা কে!

বাবুল তবু তাকে আর একটা লাথি মেরে বললো, শুয়ারের বাচ্চা, আগে বল মনিরাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?

একসময় বাবুল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে করতো। আগের মেজর জাফরের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। কিন্তু এই ক্যাপ্টেনটি সম্পূর্ণ অচেনা, তবু তাকে সে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলো মনিরার কথা।

লোকটি মার খেয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, বাঁচা, বাঁচাও!

বাবুল দাঁতে দাঁত চেপে বললো, শয়তান, আগে যখন বাঙালীরা এইভাবে দয়া চেয়েছে, তখন কারুকে ছেড়েছিস?

সঙ্গে একটা বন্দী নিয়ে যাওয়ার অনেক ঝামেলা। একে ছেড়ে দেওয়ারও কোনো মানে হয় না, একজনকে ছাড়া মানেই ঢাকায় আর একজন শত্রু বৃদ্ধি। নিজের বুলেট আর খরচ না করে সে শফিকে বললো, এই লোকটাই তোর বাবা-মাকে মেরেছে। একে শেষ করে দে!

শব্দটা হওয়ার পর বাবুল শফির কাঁধে হাত দিয়ে বললো, এখন আর ঘুম হবে না, চল একেবারে ঢাকায় পৌঁছে লড়াই শেষ করে ঘুমোবো।

॥ ৬০ ॥

টাঙ্গাইল শহর এখন সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত, সার্কিট হাউসের দখল নিয়েছেন মেজর জেনারেল নাগরা। আদালত ভবনের ঘরগুলোয় রাখা হয়েছে বন্দীদের, প্রতি ঘণ্টায় আরও বন্দীদের নিয়ে আসা হচ্ছে এখানে। পলাতক পাকিস্তানী বাহিনির একটা দল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তুরাগ নদীর পাড়ে। সেখানে তাদের মোকাবিলা করছে যৌথ মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ক্লের। জামালপুর ও মৈমনসিং-এ পাকিস্তানী দুর্গের পতন হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে পাক সৈন্যরা যাতে পিছু হটে ঢাকায় গিয়ে রাজধানী রক্ষায় অংশ নিতে না পারে সেই দায়িত্ব নিয়েছেন মেজর জেনারেল নাগরা। টাঙ্গাইল না পেরিয়ে ওদের ঢাকা যাবার কোনো উপায় নেই।

নাগরা শুধু একটা ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করছেন, তাঁকে এখানে একটা সভায় বক্তৃতা করতে হবে। তিনি একজন পেশাদার সৈনিক, বক্তৃতা করার অভ্যেস নেই তাঁর। তা ছাড়া, তিনি একটা ব্যাপারে চিন্তিত। ঢাকা অবরোধ প্রথম মুক্ত করবে কে? তাঁর ডিভিশান ১০১ কমুনিকেশান জোন-এর উপর দায়িত্ব দেওয়া ছিল, ঢাকার উত্তরে টঙ্গী পর্যন্ত পৌঁছে অবস্থান নেওয়া। সেইজন্যই ট্যাঙ্ক ও ভারী ধনের অস্ত্রশস্ত্র তাঁর বাহিনীতে বেশি নেই। মূল পরিকল্পনায় ছিল যে আখাউড়ার দিক থেকে এগিয়ে আসা মিত্রবাহিনীই ঢাকার ওপর আঘাত হানবে। যশোর, খুলনা, বগুড়া, রংপুরের দিক থেকেও ভারতীয় পদাতিক বাহিনী গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক স্কোয়াড নিয়ে এগিয়ে আসছে। কিন্তু মেজর জেনারেল নাগরাই সবচেয়ে আগে এসে পৌঁছেছেন ঢাকার খুব কাছে। ছত্রীবাহিনী নামিয়ে টাঙ্গাইল যে এত দ্রুত দখল করা যাবে, আগে কেউ ভাবেনি। কাদেরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী এখানকার অনেকগুলি ব্রীজ ভেঙে অনেকখানি পাকা সড়ক আগেই মুক্ত করে সুবিধে করে রেখেছিল। এখন মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাও ঢাকা আক্রমণ করার জন্য ছটফট করছে।

এদিককার মুক্তিবাহিনির কমান্ডার কাদের সিদ্দিকীর পেড়াপীড়িতে নাগরকে সংবর্ধনা সভায় যেতেই হলো। বিন্দুবাসিনী স্কুলের মাঠে কয়েক লক্ষ মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। উল্লাসের চিৎকার আর জয়ধ্বনিতে কান পাতা দায়। বহু নারী-পুরুষ ছুটে এসে নাগরাকে মালা পরাতে লাগলো, মালার বোঝায় তাঁর নুয়ে পড়ার উপক্রম। শেষপর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা অন্যদের আটকে কোনোক্রমে মঞ্চে তুললো ভারতীয় সেনাপতিকে।

সেই বিশাল জনসমুদ্রের দিকে বেশ কয়েক মিনিট নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন নাগরা। যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি, একটু কান পাতলে দূরে কামান গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়, মাঝে মাঝেই ভারতীয় বোমারু বিমান উড়ে যাচ্ছে রাজধানী ঢাকার দিকে। এরপর ঢাকার রক্তক্ষয়ী শেষ সংগ্রাম কতদিন চলবে, কত মানুষ মরবে তার ঠিক নেই, কিন্তু টাঙ্গাইলের মানুষ এরই মধ্যে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে গেছে।

প্রথমে, মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে ভারতীয় সেনাপতিকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানানো হলো। কয়েক ডজন মুক্তিযোদ্ধা আকাশের দিকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে ট্রিগার টিপে 'গান স্যালিউট' দিল তাঁকে। তারপর নাগরা যাতে সবাই বুঝতে পারে এমন সহজ হিন্দীতে ধীরে ধীরে বললেন, আমরা যে এতদূর পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে এসেছি, তার জন্য মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের কৃতিত্ব অনেকখানি। মুক্তিবাহিনির এই বীরত্বের ইতিহাস আগামী দিনের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। আপনাদের টাঙ্গাইলের এই ছেলেটি, এই কাদের সিদ্দিকী, এর মতন সাহসী সংগঠক আমি খুব কমই দেখেছি। এ সত্যিই টাইগার। একে আমার সালাম জানাচ্ছি! আপনারা অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, ধৈর্য ধরে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন, বাংলাদেশের আশীভাগ এখন আমাদের দখলে, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকায় চরম আঘাত হানবো। আপনারা শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখুন, আমাদের সাহায্য করুন। জয় বাংলা! জয় হিন্দ্। জয় যৌথবাহিনী। ইন্দিরা-মুজিব জিন্দাবাদ!

সভা অনেকক্ষন চলবে, কিন্তু মেজর জেনারেল নাগরা বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না। তাঁকে হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। মঞ্চ বাঁধা হয়েছে বিন্দুবাসিনী স্কুলের ছাদে, সেখান থেকে মই বেয়ে তিনি নেমে এলেন। আবার একদল লোক ছুটে এলো তাঁকে মালা দেবার জন্য, তিনি গাড়িতে উঠে পড়লেন ভিড় ঠেলে। সভায় গোলমাল থামাবার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা আবার আকাশে গুলি ছুঁড়লো।

টাঙ্গাইল শহর এবং কাছাকাছি গ্রামগুলি এখন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে। ছত্রভঙ্গ পাকিস্তানী সৈন্যদের তারা বন্দী করে আনছে, সেই সঙ্গে খুঁজে খুঁজে ধরছে কুখ্যাত দালাল ও শান্তি কমিটির নেতাদের। মুন্না তালুকদারের ছেলে খোকা পালাতে গিয়ে জ্যোগনীচরে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। এই খোকার আর একটি ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল জল্লাদ, তার নির্দেশে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে মারা হয়েছে, সে রাজাকারদের সংগঠক। আর একজন নৃশংস রক্তলোলুপ অধ্যাপক খালেককে ধরা যায়নি, কিন্তু খোকাকে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে মঞ্চের নীচে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে খোকার বিচার সাঙ্গ হলো, তারপর মঞ্চে তুলে সর্বসমক্ষে তিন মুক্তিযোদ্ধা তার পেটে ঢুকিয়ে দিল বেয়নেট। যাদের মা-বোন-ভাই এই খোকার নির্দেশে আদেশে নিহত হয়েছে,

তারা এমনভাবে চিৎকার করতে লাগলো যেন ওই শাস্তিতেও তারা সন্তুষ্ট নয়, তারা খোকার শরীরটা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলতে চায়।

সার্কিট হাউসে এসে মেজর জেনারেল নাগরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে হাই কমান্ডের কাছ থেকে নতুন নির্দেশ পেয়ে গেলেন। ১০১ কমুনিকেশান জোন ঢাকা নগরীর পনেরো মাইলের মধ্যে পৌঁছে ঘাঁটি গেড়ে বসলেই তাদের দায়িত্ব সফলভাবে পূর্ণ হয়েছে ধরা হবে। তবে অবস্থা বুঝে এই বাহিনী যদি আরও এগিয়ে যেতে চায় তাতে আপত্তি নেই। ক্ষেত্রে যুদ্ধে উপস্থিত সেনাপতিই সিদ্ধান্ত নেবেন।

মেজর জেনারেল নাগরার বুকটা একবার কেঁপে উঠলো। তিনি পুরো জেনারেল নন, মেজর জেনারেল, তিনি ছিলেন ফ্রন্ট লাইনের অনেক পেছনে। তা হলে কি ঢাকা দখলের মতন একটা ঐতিহাসিক কৃতিত্ব তাঁর ভাগ্যেই ঝুলছে?

তিনি তার বাহিনীর সবকটি পজিশনে নির্দেশ পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

এদিকে ভারতীয় সর্বাধিনায়ক মানেকশ'র গম্ভীর গলা ভারতীয় বেতারে কয়েকদিন ধরেই বারবার শোনা যাচ্ছে, পাকিস্তানী সিপাহী, হাতিয়ার ডাল দো! যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই। ঢাকা শহর এখন আমার কামানের এলাকার মুখে। এরপর লড়াই চালাতে গেলে তোমাদের শুধু শুধু রক্তক্ষয় হবে। তোমরা হাতিয়ার নামিয়ে আত্মসমর্পণ করো, তোমাদের জীবন ও সম্মানরক্ষার দায়িত্ব আমরা নেবো।

ভারতীয় বিমান ঢাকার আকাশে এসে একবার ছড়িয়ে যাচ্ছে এই মর্মে লক্ষ লক্ষ লিফলেট, আবার এসে বোমা ফলছে। বোমার আঘাতে গভর্নর হাউসের একদিকে গুঁড়িয়ে গেছে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য গভর্নর মালেক দ্রুত পদত্যাগপত্র লিখে দলবল নিয়ে পালিয়ে এসেছেন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে। ওখানে ভারতীয় বোমার ভয় নেই।

ভূগর্ভ বাঙ্কারে দু'হাতে মাথা চেপে বসে আছেন জেনারেল নিয়াজী। রাওয়ালপিন্ডির হেড কোয়ার্টার তাঁকে বারবার মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে। কোথায় চীনে সৈন্য? বঙ্গোপসাগরে মার্কিন রণতরী বাহিনী ঢুকে পড়েছে বলে জোর গুজব উঠেছিল, কোথায় সেই সেভেনথ্ ফ্লিট? তিনি শুধু দেখতে পাচ্ছেন একটা দড়ির ফাঁস এগিয়ে আসছে তাঁর গলার দিকে। আকাশে শত্রুপক্ষের বিমান গর্জন। অন্যদের ওপর ভরসা করে তাঁকে চালাতে বলা হয়েছিল এত বড় একটা যুদ্ধ?

ভারতীয় সর্বাধিনায়ক মানেকশ' তাঁর শেষ হুমকি দিলেন। তিনি ভারত-বাংলা যৌথ কমান্ডকে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিচ্ছেন এক রাত্রির জন্য। আগামীকাল সকাল নটার মধ্যে যদি পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ না করে, তা হলে চরম আঘাত হানা হবে ঢাকা শহরে, একজন সৈন্যকেও পালাতে দেওয়া হবে না।

শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ঢাকা রক্ষা করার সাধ জেনারেল নিয়াজীর মিটে গেছে এর মধ্যে। পূর্ব পাকিস্তান গোল্লায় যাক। এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও নাগরিকদের জীবন রক্ষা করা যাবে কী করে! আরও যুদ্ধ চালিয়ে গেলে পশ্চিমে আরও নব্বই হাজার বিধবা ও প্রায় পাঁচ লাখ অনাথ ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়বে। এখন আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনো গতি নেই। সেই মর্মে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পাঠালেন, কিন্তু তার কোনো উত্তর নেই। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া হতাশায় ডুবে আছেন, কারুর সঙ্গে দেখা করতে চান না।

গলার ফাঁসটা ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছে দেখে জেনারেল নিয়াজী মরীয়া হয়ে পাকিস্তানের কমান্ডার ইন চিফ হামিদকে টেলিফোন করে অনুরোধ জানালেন, স্যার, আমি প্রেসিডেন্টের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আপনি অনুগ্রহ করে একটু ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে দেখবেন, তাড়াতাড়ি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না!

শেষপর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছ থেকে একটা লম্বা উত্তর এলো। তাতে যুদ্ধ বন্ধ এবং পাকিস্তানী নাগরিকদের জীবনরক্ষার সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। কিন্তু আত্মসমর্পণের কোনো কথা নেই। সে নির্দেশ পেয়ে নিয়াজী আবার ধন্দাধায় পড়ে গেলেন। এর মানে কী? এমনি এমনি যুদ্ধ বন্ধ করা যায় নাকি? ভারতীয় পক্ষ তা গ্রাহ্য করবে কেন? তারা মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় দিয়েছে।

নিয়াজী তখন রাও ফরমান আলীকে ডাকলেন যুদ্ধ বন্ধ চুক্তির শর্তগুলো ঠিক করার জন্য। লম্বা ছিপছিপে চেহারার জেনারেল ফরমান আলী ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, নিয়াজীর মতন বাগাড়ম্বরপ্রিয় কিংবা আবেগপ্রবণ নন। তিনি দ্রুত রচনা করলেন একটি সন্ধিপত্র, সেটি নিয়ে তারা দুজনে গেলেন আমেরিকান কনসাল জেনারেল মিঃ স্পীভাকের কাছে। এই দুই সৈন্যাধ্যক্ষকে তেমন কিছু খাতির

দেখালেন না এই মার্কিন কূটনীতিবিদটি। নিয়াজী তাঁকে অনুরোধ করলেন ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে তাঁদের হয়ে আলোচনা করতে, এর উত্তরে মিঃ স্পীভাক নীরস গলায় জানালেন যে আপনাদের হয়ে কথাবার্তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু আপনাদের বার্তাটা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি।

তাও মিঃ স্পীভাক অতি সাবধানী হয়ে নিজের দায়িত্বে নিয়াজীর বার্তা সরাসরি জেনারেল মানেকশকে না পাঠিয়ে সেটা পাঠালেন ওয়াশিংটনে তাঁর কর্তাদের কাছে। নিয়াজী ও ফরমান আলী নিজেদের কমান্ডে ফিরে এসে অধীর প্রতীক্ষার বসে রইলেন উত্তরের জন্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগলো, উত্তর আর আসে না!

রাও ফরমান আলী যুদ্ধবিরতি যুক্তির খসড়া ছাড়া আরও একটি পরিকল্পনার খসড়াও রচনা করে রেখেছিলেন। পরাজিত সেনানায়কেরা চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের আগে গোপন দলিলপত্র পুড়িয়ে ফেলে, নিজেদের পাপের সব চিহ্ন মুছে ফেলতে হয়, সে দায়িত্বও নিয়েছেন ফরমান আলী, তা ছাড়াও তিনি বিশ্বাসঘাতক বাঙালীদের শেষ শিক্ষা দিয়ে যাবেন। বাঙালীরা স্বাধীন হয়ে নিজেরা রাজত্ব চালাবে? এই গোরস্তানে হাজার হাজার করোটি আর শুকনো হাড় দিয়ে তারা কি ভেল্কি দেখাবে সারা পৃথিবীকে?

বাঙালীদের মধ্যে জ্ঞানে-গুণে যারা কিছুটা উন্নত, সেই সমস্ত মানুষদের একটা তালিকা প্রণয়ন করে রেখেছিলেন ফরমান আলী। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক-অধ্যাপক, উকিল-ব্যারিস্টার, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি সব ধরনের বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী। এদের সকলকে হত্যা করতে পারলে স্বাধীন বাংলাদেশ চলকে কাদের নিয়ে? ভারতীয় সৈন্যরা যখন ঢাকার দোরগোড়ায় এসে পৌঁছোলো, তখন ফরমান আলী আল বদর ও আল শামস বাহিনীকে লেলিয়ে দিলেন সেই তালিকা ধরে ধরে সকলকে বিনাশ করবার জন্য। আল বদর, আল শামসের লোকেরাও তো বাঙালী, তারা কি যুদ্ধের গতি বুঝতে পারেনি, যুদ্ধের শেষ মুহূর্তেও তারা স্বজাতির শ্রেষ্ঠ মানুষদের বিনা দোষে মেরে ফেলতে রাজি হলো কেন? কোনো যুক্তি নেই, বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করাও যাবে না, যুদ্ধের উন্মাদনা সব শ্রেণীর মানুষকে সব যুক্তি ভুলিয়ে দেয়। হিটলারের এস এস বাহিনীও তো শেষদিন পর্যন্ত তাদের নৃশংসতা বন্ধ করেনি।

প্রখ্যাত অধ্যাপক এবং নাট্যকার মুনীর চৌধুরী ঢাকায় তার সেন্ট্রাল রোডের বাড়িতে সকাল এগারোটায় স্নান সেরে মায়ের কাছে খাবার চেয়েছেন। মা খাবার সাজিয়ে দিচ্ছেন, এমন সময় সাত-আটটি যুবক এসে তাঁকে ডাকলো। তাদের কমান্ডার একবার অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে চান। মুনীর চৌধুরী বললেন, খাবার দেওয়া হয়ে গেছে, একটু দাঁড়াও খেয়ে নিই। ছেলেরা বললো, স্যার, আমাদের কামান্ডার ওই মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করছেন, আপনি যাবেন আর দুটো কতা বলে চলে আসবেন। বড়জোর পাঁচ মিনিট সময় লাগবে, এসে খাবেন।

ছেলেগুলির মুখের ভাষা বিনীত কিন্তু হাতে বন্দুক, তাই তাদের ধমক দিয়ে তাড়ানো যায় না। লুঙ্গির ওপর গেঞ্জি পরা, মাথার চুলও আঁচড়ানো হয়নি, সেই অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন মুনীর চৌধুরী, মোড়ের কাছে আসতেই আল বদর বাহিনী তাঁর চোখ মুখ বেঁধে ফেললো!

ঠিক একই ভাবে ওই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টার থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো আনোয়ার পাশাকে, চণ্ডীচরণ বোস স্ট্রিটের বাড়ি থেকে আইনজীবী এ কে এম সিদ্দিককে, ডাক্তার আবদুল আলীম চৌধুরীকে, বিজ্ঞানী আবুল কালাম আজাদকে এবং আরো অনেককে। মীরপুরের গোরস্তানে এদের হত্যা করে গোর দেবারও কোনো ব্যবস্থা হলো না, লাশের ওপর জমতে লাগলো লাশ।

টাঙ্গাইল শহরে মুক্তিবাহিনীর কারুর চোখে সারা রাত ঘুম নেই। মেজর জেনারেল নাগরার অধীনে দুজন ব্রিগেডিয়ার, সান সিং আর ক্লের দুটি বাহিনীনিয়ে এগিয়ে গেছে ঢাকার পথে, তাদের সঙ্গে আছে মুক্তিবাহিনীর অত্যুৎসাহী যোদ্ধারা। মুক্তিবাহিনীর বাকি ছেলেরা রাত জেগে যুদ্ধরত বারো হাজার ভারতীয় সৈন্যদের জন্য নাস্তা তৈরি করছে, হেলিকপটারে সেই খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে বিভিন্ন সমর প্রাঙ্গণে।

ব্রিগেডিয়ার ক্লের কড্ডা নামের একটা জায়গায় একটা পাক বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে শেষপর্যন্ত তাদের পর্যুদস্ত করে নদীর ধারে আস্তানা গেড়েছেন। ব্রিগেডিয়ার সান সিং-এর নেতৃত্বে যৌথবাহিনি নবীগর-সাভারের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে ঢাকার দিকে। সাভারের জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে হঠাৎ খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাত তখন তিনটে, আকাশ খান খান হয়ে গের কামান আর মেশিনগানের গর্জনে।

ব্রিগেডিয়ার সান সিং-এর অধীনে তিন হাজার রেগুলার আর্মি এবং বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানী ক্যাম্পটিতে সৈন্যসংখ্যা কিছুতেই সাত আট শোর বেশি না। তবু তারা অসম সাহসীর মতন আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগলো। কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না। সান সিং-এর অনেক সৈন্য পাকা সড়কের পশ্চিম পাশের কাঁচা রাস্তা দিয়ে সাভার বাজার পর্যন্ত পেরিয়ে গেল, এই ভাবেও ঢাকার দিকে এগুনো যায়, কিন্তু পেছনে একটা শত্রু ঘাঁটি রেখে যাওয়াটা সান সিং-এর পছন্দ হলো না। এই গোঁয়ার পাকিস্তানীরা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না, সবাই মরতে চায়?

সান সিং বারবার তাদের অস্ত্রসংবরণ করতে বললেন, উত্তরে ছুটে এলো ঝাঁক ঝাঁক গুলি। শেষপর্যন্ত সান সিং নিজে একটি গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন এই ঘাঁটিটি উৎখাত করতে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা আরও এগিয়ে যেতে চায়। সান সিং সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্পের অধিনায়ক ছিলেন, এই সমস্ত দুরন্ত, দুঃসাহসী ছেলেদের সম্পর্কে তাঁর মনে একটা স্নেহের ভাব আছে। তিনি বুঝলেন, এই মরীয়া পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করতে গেলে সুবিধে হবে না, পটাপট করে মরবে, এখানে পেশাদার সৈন্যদের সঙ্গে টক্কর দিতে হবে পেশাদার সৈন্যদের। একটা উঁচু দেওয়ালের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে তিনি চেঁচিয়ে মুক্তিবাহিনীকে বলতে লাগলেন, আপনারা এগাবেন না, আপনারা পেছন দিকে থেকে আমাদের সাহায্য করুন, পিছিয়ে যান! কিন্তু কে কার কথা শোনে! এবার সান সিং কঠোরভাবে আদেশ দিলেন, আমার নির্দেশ ছাড়া কেউ একটিও গুলি ছুঁড়বে না।

পাকিস্তানী বাহিনীর সাঙ্ঘাতিক গোলাবর্ষণের মুখে ভারতীয় সৈন্যরা খানিকটা এগিয়েও পিছিয়ে আসছে বারবার। পাক বাহিনী একটা বাড়ির দোতলায় উঠে সুবিধেজনক অবস্থান পেয়েছে। বিশেষত একটা জলের ট্যাঙ্কের পাশ দিয়ে অনবরত মর্টারের গর্জন হচ্ছে, কিছুতেইঘায়েল করা যাচ্ছে না সেটাকে।

হঠাৎ সান সিং দেখলেন আগুনের ঝলক ও ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেড়জন মানুষ। একজন দীর্ঘকায় পুরুষ, আর একটি কিশোর। এরা কি পাগল নাকি! তিনি নিজে ছুটে গিয়ে লম্বা লোকটির কাঁধের জামা চেপে ধরে কর্কশভাবে বললেন, তোমরা আদেশ অমান্য করছো যে! ফেরো!

মুখ ফিরিয়ে বাবুল চৌধুরী শান্ত গলায় বললো, ওই মর্টারটাকে থামানো দরকার। আমি জলের ট্যাঙ্কের পেছন দিকে যাচ্ছি!

সান সিং বললেন, সে কাজ আমাদের জওয়ানরাই পারবে। একটু সময় লাগবে বড় জোর। ওরা কতক্ষণ বুঝবে! তোমাদের বলেছি না পেছনে থাকতে!

বাবুল চৌধুরী বললো, শুধু আপনারাই যুদ্ধ করবেন কেন? এটা আমাদেরও লড়াই, ব্রিগেডিয়ার!

সান সিং ধমক দিয়ে বললেন, শুধু শুধু বোকার মতন প্রাণ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। লড়াই করার পরে আরও অনেক সুযোগ পাবে। গেরিলা যোদ্ধারা এরকম মুখোমুখি যুদ্ধ করে না। আমার অর্ডার বড় রাস্তার দিকে যাও!

বাবুল বললো, আমি এগিয়ে যাবোই, ব্রিগেডিয়ার! আমাকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। এদের শেষ করে দিতে পারলেই ঢাকার রাস্তা একেবারে খোলা। মীরপুরের ব্রীজে ওরা কোনো কামান বসায়নি, আমি দেখে এসেছি।

ওদিক থেকে আবার একটা মর্টারের গোলা ছুটে আসতেই সান সিং কিশোরটির কাঁধ ধরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মাটিতে। বাবুল চৌধুরী ছুটে গেল সামনের দিকে।

সান সিং শফিকে নিয়ে চলে এলেন একটা দেওয়ালের আড়ালে। শফি ছটফট করে বলতে লাগলো, আমিও যাবো, আমারে ছাইড়্যা দ্যান, আমিও যাবো!

সান সিং সাত আট মাস মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে থেকে কিছুটা বাংলা শিখেছেন। তিনি শফিকে শক্ত করে রেখে বললেন, আরে বাচ্চা, এটা মরণবাঁচন লড়াই, ফুটবল খেলা আছে না! চুপ মেরে থাক!

বাবুল চৌধুরী মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে। কিন্তু পাক সৈন্যরা নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পেয়েছে। একটা সার্চলাইট পড়লো সেখানে, কয়েক ঝাঁক মেশিনগানের গুলি সেই আলো-অন্ধকার ফুঁড়ে দিতে লাগলো। সান সিং-ও যেন দেখতে পেলেন লম্বা লোকটিকে মাটিতে পড়ে যেতে। গুলি খেয়ে সে ক্যাক পাক গড়িয়ে গেল, তার হাতের এল এম জি-টাও থামেনি, একটু পরেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো জলের ট্যাঙ্কটি।

দেওয়ালটার ওপর লাফিয়ে উঠে সান সিং হাত ছুঁড়ে বললেন, চার্জ! ডান পাশের বাঙ্কারটা দখল

করো! একদল ভাগছে, ধরো!

দেড় ঘণ্টা তুমুল লড়াইয়ের পর সাভারের পাক ঘাঁটির পতন হলো। ওদের দেড়শো মতন সৈন্য এর মধ্যেই মারা গেছে, বাকিরা অস্ত্রত্যাগ করলো, কিছু পালালো। বন্দীদের আটকে রাখার ব্যবস্থা করে সান সিং নিজের সৈন্যবাহিনীর একটি অংশকে নির্দেশ দিলেন মীরপুরের দিকে এগিয়ে যেতে। তারপর তিনি টর্চহাতে এগিয়ে গেলেন ভাঙা জলের ট্যাঙ্কটির দিকে।

ট্যাঙ্কটির পিলারগুলো পার হয়ে একটা নালার ধারে উপুড় হয়ে পড়ে আছে বাবুল চৌধুরী। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার গায়ের জামা। যারা মর্টার চালাচ্ছিল, তাদের কয়েকজনও ওপর থেকে খসে পড়েছে ওখানে। বাবুল বুক হেঁটে এই পর্যন্ত এসে অতর্কিতে ওদের পেছন থেকে গুলি করেছে, এল এম জি-র গুলির ঝাঁপটাতেই ট্যাঙ্কটি ঝাঁঝরা হয়ে খসে পড়েছে।

বাবুলের শরীরে এখনো প্রাণ আছে। সান সিং তাকে চিৎ করতেই সে প্রথমে এল এম জি-টা তুলতে গেল, তারপর সান সিং-এর পাশে শফিকে দেখে চিনতে পেরে সে ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলো, ব্রিগেডিয়ার, ওরা খতম হয়েছে?

সান সিং বললেন, যথেষ্ট সাহস দেখানো হয়েছে! এবার আমার হাত ধরে ওঠো তো, কোথায় কোথায় গুলি লেগেছে! টাঙ্গাইল হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবে তো?

বাবুল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, হাসপাতালে যেতে হবে কেন? আমার তো বেশি লাগেনি? এই দ্যাখো, আমি দু হাত তুলতে পারছি। দু পায়ে দাঁড়াতে পারছি। আমার মাথায় কোনো চোট নেই!

একটা গুলি লেগেছে বাবুলের ঘাড়ে, একটা বাম বাহুতে। খুব গুরুতর আঘাত নয় ঠিকই। তবে বাম বাহুতে বুলেট ঢুকে আছে ভেতরে, সে-যন্ত্রণা সে এখনো টের পাচ্ছে না। সে শফির পিঠ চাপড়ে বললো, চল, এবার সোজা ঢাকায় যাবো!

মীরপুর ব্রীজ অরক্ষিত, মুক্তিবাহিনীর সূত্রে এ খবর শেষরাতের মধ্যেই পেয়ে গেলেন মেজর জেনারেল নাগরা। ব্রিগেডিয়ার ক্লের-কে সেদিকে এগোবার নির্দেশ দিয়ে ভোরবেলা তিনি উঠলেন একটি হেলিপঙ্কারে, সঙ্গে নিলেন টাঙ্গাইলের হীরো কাদের সিদ্দিকীকে। আকাশপথ সম্পূর্ণ নিরাপদ। শীতকালের সূর্য গড়িমসি করে উঁকি মারছে পূর্ব দিগন্তে। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে লাল আলো।

সাভার ও মীরপুরের রাস্তার মাঝামাঝি একটা বাঁকে যখন হেলিপটারটি নামলো, তখনও সেখানকার বাতাসে বারুদের গন্ধ। ব্রিগেডিয়ার সান সিং-এর কাছে থেকে মেজর জেনারেল নাগরা শুনলেন জাহাঙ্গীর নগরের লড়াইয়ের বিবরণ। সামনে আর বড় রকমের কোনো বাধার সম্ভাবনা নেই। মীরপুর পেরুনো মানেই তো ঢাকার দরজায় পৌঁছে যাওয়া। মুক্তিবাহিনীর প্রায় এক হাজার যোদ্ধা এরই মধ্যে গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে মীরপুর ব্রীজের পৌঁছে গেছে। ভারতীয় বাহিনীও সেই ব্রীজের দিকে মার্চ করছে।

মেজর জেনারেল নাগরা কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। একটা ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন ঢাকা নগরী। বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু বাড়িঘর। কাদেরের হাতে দূরবীনটা দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, দ্যাখো তো, ওই বাড়িটা কোন্ বাড়ি?

কাদের বললো, ওইটা তো শেরে বাংলা নগরের নতুন সংসদ ভবন! বিল্ডিংটাই বানানো হয়েছে, কোনোদিন কাজে লাগেনি।

আবার দূরবীন চোখে এঁটে দেখতে দেখতে নাগরা জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার ওপর কারা যেন দৌড়োদৌড়ি করছে মনে হচ্ছে? ওরা কারা?

কাদের বললো, ওরা আমাদের চেলে! ছুটকো ছাটকা কিছু হানাদার এখনো আছে বোধ হয়, তাদের দেখলেই তেড়ে যায়।

নাগরা বললেন, মীরপুর ব্রীজের প্রায় কাছেই আমি দেড়জনকে দেখতে পাচ্ছি। একজন ঢ্যাঙা, একজন বেঁটে, ওদের কি ভয়ডর নেই? হাতে অস্ত্রও আছে।

সান সিং বললেন, ওরা এক অদ্ভুত জুটি, জেনারেল। পরে ওদের কথা আপনাকে শোনাবো!

চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে নাগরা একজন কমুনিকেশান অফিসারকে ডেকে খবরাখবর নিলেন। অন্যদিক থেকে যৌথবাহিনী নারায়ণগঞ্জ, দাউদকান্দি, নরসিংদি এসে গেছে। ঢাকা শহর এখন সত্যিই চতুর্দিকে থেকে ভারতীয় কামানের আওতায়, ওপরে বিমান বাহিনী তো আছেই। ইচ্ছে করলে নাগরার বাহিনীই এখন ঢাকায় আগে পৌঁছোতে পারে।

নাগরাকে দেখলে নিয়াজীর মুখের অবস্থা কী হবে সেটা ভেবে নাগরা মুচকি হাসলেন। নিয়াজী নাগরাকে ভালোই চেনেন। দুজনে একসঙ্গে কমিশনড্ অফিসার হিসেবে ট্রেনিং নিয়েছেন ব্রিটিশ আমলে। পাকিস্তানী আর্মিতে তাড়াতাড়ি পদোন্নতি হয়, তাই নিয়াজী জেনারেল হয়েছেন, আর নাগরা এখনো মেজর জেনারেল।

হেমায়েতপুর সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে একটা জিপের বনেটে এক টুকরো কাগজ রেখে নাগরা খসখস করে লিখলেন একটা ব্যক্তিগত চিঠি :

প্রিয় আবদুল্লাহ

আমরা এসে পড়েছি। তোমার সব বাহাদুরি আর খেলা শেষ। আমরা তোমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছি। বুদ্ধিমানের মতন আত্মসমর্পণ করো। না হলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আমরা কথা দিচ্ছি, আত্মসমর্পণ করলে জেনিভা কনভেনশান অনুযায়ী তোমাদের সঙ্গে আচরণ করা হবে। তোমাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানাচ্ছি, তোমার জীবনের নিরাপত্তা অবশ্যই দেওয়া হবে।

তোমার

মেজর জেনারেল নাগরা

সকল ৮-৩০ মিনিট, ১৬-১২-৭১

কাছে সাদা পতাকা নেই, তাই একজনের একটা সাদা জামা খুলে নিয়ে পতাকার মতন করে বাঁধা হলো একটা জিপ গাড়িতে। তারপর নাগরার সেই চিঠিটা নিয়ে কয়েকজন সেই জিপ ছুটিয়ে গেল ঢাকার দিকে।

আধঘন্টার মধ্যে বিনা বাধায় বার্তাটি এসে পৌঁছে গেল নিয়াজীর কাছে। তখন তাঁর পাশে বসে আছেন মেজর জেনারেল জামশেদ, মেজর জেনারেল ফরমান আলী ও রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ। এর মধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ স্পীভাক মারফত প্রেরিত যুদ্ধ বন্ধের আবেদন বার্তাটি পৌঁছে গেছে ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ মানেকশ'র কাছে। তিনি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুদ্ধবিরতি আবার কী? বিজয়ী পক্ষ চূড়ান্ত জয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে নিছক যুদ্ধবিরতি মেনে নেবে কেন? মানেকশ' চান আত্মসমর্পণ এবং অস্ত্রসমর্পণ। শুধু তারপরেই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে।

নিয়াজীর কাছ থেকে অন্য সেনাপতিরা চিরকুটটা নিয়ে দেখলেন। ফরমান আলী উদ্ধতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, এই নাগরা নামের লোকটিই কি তবে ভারতীয় পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধের শর্ত আলোচনা করতে আসছে।

অন্যরা নীরবে তাকিয়ে রইলেন। চিরকুটটির অর্থ অতি স্পষ্ট। আলোচনা-টালোচনা কিছু নয়। হয় আত্মসমর্পণ, অথবা যুদ্ধ! আর যুদ্ধ মানেই প্রতি ইঞ্চি ভূমি দখলের লড়াই।

ফরমান আলী আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কোনো রিজার্ভ বাহিনী আছে কি? নিয়াজী সেই উর্দু শুনেও হতভম্বের মতন তাকিয়ে আছেন দেখে রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করে বললেন, কুজ পাল্লে হ্যায়? অর্থাৎ থলেতে কিছু আছে কি?

নিয়াজী এবার তাকালেন জামশেদের দিকে। বিষণ্ণ মুখে জামশেদ দুদিকে মাথা নাড়লেন।

ফরমান আলী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, তবে তো আর লড়াইয়ের প্রশ্নই ওঠে না। যাও, ওই লোকটাকে খাতির করে নিয়ে এসো!

বিকেলবেলা পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় সেনাপতি জগজিৎ সিং অরোরা সস্ত্রীক একটি বিশেষ বিমানে এসে পৌঁছালেন ঢাকায়। এর আগে কলকাতা থেকে মেজর জেনারেল জেকব দুপুরে এসে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা পাকা করে ফেলেছেন। আত্মসমর্পণ দলিলে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ড কথাটিতে আপত্তি তুলেছিলেন ফরমান আলী। এখনও তাঁরা বাংলাদেশের স্বীকৃতি দিতে চান না, তারা আত্মসমর্পণ করবেন শুধু ভারতীয় পক্ষের কাছে। সে আপত্তিত অগ্রাহ্য হলো। এই রকমই দিল্লির নির্দেশ। অনুষ্ঠানটি হবে রমনা রেস কোর্সে। অত বড় প্রকাশ্য জায়গায় অপমানের দৃশ্যটি অনুষ্ঠিত হোক, তা নিয়াজী চান না। তার সে আপত্তিও উড়িয়ে দেওয়া হলো। ওই ময়দানে ৭ মার্চ শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, ওই জায়গা থেকেই পাকিস্তানী বাহিনী চিরবিদায় নেবে! বিজয়ী পক্ষের শর্তই পরাজিতরা মেনে নিতে বাধ্য।

ঢাকা শহরে যে এখনো এত মানুষ আছে তা আজ সাকলেও বিশ্বাস করা যায়নি। লক্ষ লক্ষ লোকে

রাস্তায় নেমে পড়ে পাগলের মতন চিৎকার করছে। ভারতীয় সৈন্যদের ট্রাক দেখলেই লোকে ছুঁড়ে দিচ্ছে ফুলের মালা, আর পাকিস্তানী বাহিনীর দিকে থুতু। বয়স্ক ব্যক্তিরা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছে এই দৃশ্য। কেউ কেউ ভাবছে, পঁয়ষট্টি আর একাত্তর সাল, এই ছ বছরের মধ্যে কত তফাত। এর পরের ভবিষ্যৎ পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে আবার কী হবে কে জানে!

বিকেলবেলা আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানটি হলো সংক্ষিপ্ত। মুক্তিযোদ্ধারা শহরের রাজপথে ঘুরে ঘুরে প্রচণ্ড উল্লাসে আকাশের দিকে গোলাগুলি বর্ষণ করছে। রাজধানী ঢাকায় কোনো সরকারের অস্তিত্ব নেই। আইনশৃঙ্খলা যে কোনো মুহূর্তে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে পারে, ভারতীয় সৈন্যরা শান্তিরক্ষায় পুরোপুরি দায়িত্ব নিতে পারে না, উচ্ছৃঙ্খল সাধারণ নাগরিকদের ওপর ভারতীয় সেনারা গুলি চালালে সে হবে আর এক কেলেঙ্কারি। এমনিতেই একদল লোক সর্বক্ষণ চিৎকার করছে, নিয়াজী, ফরমান আলীদের তাদের হাতে তুলে দিতে হবে, তারা ওই নরঘাতকদের দেহ ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে।

ভোরবেলাতেই কয়েকটি হেলিকপটারে কিছু পশ্চিম পাকিস্তানের ধনী ব্যক্তি ও কয়েকজন আহত সেনাপতি পলায়ন করেছেন, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নার্সদের তাড়াহুড়োতে তাঁরা নিতে ভুলে গেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা যাতে প্রতিশোধ নিতে শুরু করে না দেয় তাই বিভিন্ন জায়গায় নিযুক্ত করা হয়েছে ভারতীয় সেনাদের। বিজয়ের গর্বেতারাও বাড়াবাড়ি করে ফেলছে অনেক জায়গায়। আইন শৃঙ্খলার কোনো রক্ষক নেই বলেই গুণ্ডা বদমাসশ্রেণী শুরু করে দিয়েছে লুটপাট, অবাঙালীদের বাড়িঘর লুণ্ঠনের তো একটা নৈতিক সমর্থন আছেই। ভারতীয় সেনারা অবাঙালী হলেও তারাও অনেক জায়গায় হাত মেলাচ্ছে সেইসব লুণ্ঠন যজ্ঞে। ঢাকায় এতসব বিদেশী জিনিস পাওয়া যায়, এসব তো আগে দেখিনি ভারতীয়রা। রেফ্রিজারেটার, টি ভি, টু-ইন-ওয়ান, কার্পেট, টিনের খাবার, এই সব ভর্তি হতে লাগলো ভারতীয় সৈন্যদের ট্রাকে। শুধু সেই বিজয় উন্মত্ত সৈনিকরা বাংলাদেশের সুন্দরী মেয়েদের দিকে হাত বাড়াতে সাহস করলো না, সে ব্যাপারে তাদের ওপর গোড়া থেকেই কঠোর নির্দেশ ছিল, ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী।

রেসকোর্স ময়দানে টেবিল পেতে জেনারেল অরোরা ও জেনারেল নিয়াজী বসলেন পাশাপাশি। বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের প্রায় কেউই আসেননি। সকলেই আশা করেছিল, বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু তিনি অভিমান করে আসতে রাজি হননি। তিনি আশা করেছিলেন যে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করবে শুধু বাংলাদেশ বাহিনির কাছে। কিন্তু এই অবাস্তব প্রস্তাবে পাকিস্তানীরা রাজি হবে কেন, তারা তো বাংলাদেশ বাহিনির অস্তিত্বই স্বীকার করে না, তারা পরাজয় মেনেছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়েছেন শুধু এয়ার কমান্ডার এ কে খন্দকার, মেজর হায়দার, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইউসুফ। আর নিজের গড়া মুক্তিবাহিনীর অবিসংবাদী নেতা কাদের সিদ্দিকী।

নিয়াজী তার কোমরের বেল্ট খুলে রিভলভারটা দিলেন অরোরাকে। তারপর আত্মসমর্পণের দলিলে সই করতে গিয়েও তাঁর হাত এমনই কাঁপতে লাগলো যে কলমে লেখাই পড়লো না। আর একটি কলম এগিয়ে দেওয়া হলো তার দিকে। অস্ত্রসমর্পণের প্রতীক হিসেবে একশো জন পাকিস্তানী অফিসার এবং একশো জন জওয়ান তাদের হাতিয়ার মাটিতে নামিয়ে রাখলো।

ভারত-পাকিস্তানের পশ্চিম রণাঙ্গনেও যুদ্ধ থেমে গেল স্বাভাবিক কারণেই। সন্ধের সময় দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী যুদ্ধজয়ের ঘোষনায় আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন, এই জয় নিয়ে আমাদের গর্ব করার এমন কিছুই নেই। দু'পক্ষেরই বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে। আমাদের আসল যুদ্ধ তো দারিদ্র্যের সঙ্গে। দারিদ্র্যই আমাদের প্রধান শত্রু!

রেস কোর্স ময়দানের শেষ প্রান্তে শফিকে সঙ্গে নিয়ে বসেছিল বাবুল চৌধুরী। এখনো সে তার ক্ষতস্থানের কোনো চিকিৎসা করায়নি, নিজেরই জামা ছিঁড়ে কোনোরকমে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিয়েছে। তার মুখখানা রক্তশূন্য, অসম্ভব যন্ত্রণা ও ক্লান্তিতে সে প্রায় ধুঁকছে। কিন্তু আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান না দেখা পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। তা হলে সত্যিই লড়াই শেষ। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় আর সম্মুখযুদ্ধকরতে হলো না। হাতের এল এম জি-টাতে লাঠির মতন ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বললো, চল শফি, এবার আমাদের ছুটি!

একটুখানি এগিয়েই সে সামনে দেখতে পেল কাদের সিদ্দিকীকে। কাদের তার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, প্রায় তার ছাত্রের পর্যায়ে পড়ে; তবু বাবুল একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা, কাদের নিজস্ব

দলটির অধিনায়ক, তাই বাবুল তাকে একটি স্যালিউট দিয়ে বললো, আমার আর অস্ত্রের দরকার নেই। এটা আপনি রাখুন!

কাদের বললো, এখনই অস্ত্র ছাড়বেন না। আমাদের এখনও অনেক কাজ বাকি। শেখ মুজিবকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ওরা যদি শেখ সাহেবকে না ছাড়ে তা হলে আলটিমেটাম দিয়ে আমরা পাকিস্তান আক্রমণ করবো!

বাবুল বললো, সেসব আপনারা করবেন। আমার কাজ শেষ। এটা আপনারা রাখুন!

এল এম জি-টা সে ফেলে দিল কাদেরের পায়ের কাছে। কাদেরের মন তখন বঙ্গবন্ধুর জন্য উতলা হয়ে আছে। সে বেগম মুজিবের সঙ্গে দেকা করতে যেতে চায়, ব্যস্ততার মধ্যে সে আর কথা বাড়ালো না, একজন সঙ্গীকে অস্ত্রটা তুলে নিতে বলে সে একটা জিপে উঠে পড়রো।

শফির কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে লাগলো বাবুল। তার পায়ের কখন একটা চোট লেগেছে সে খেয়াল করেনি, তাকে কিছুটা খোঁড়াতে হচ্ছে। রাস্তায় মানুষের ভিড়ে গায়ে গা ঠেকে যায়। অচেনা লোকজনও এসে হঠাৎ হঠাৎ আলিঙ্গন করছে। চতুর্দিকে উদ্দাম কোলাহল। এ যেন এক অচেনা নাগরী। গোলাগুলির শব্দের সঙ্গে একটা ভয়ের অনুষঙ্গ থাকে, আজ চতুর্দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে, তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষের উল্লাসধ্বনি। আর শোনা যাচ্ছে সম্মিলিত গর্জন, জয় বাংলা!

নিজের পাড়ায় এসে এগোতে এগোতে বাবুল থমকে দণ্ডাড়ালো। জাহানারা আপার বাড়িটা এত নিস্তব্ধ কেন? এ বাড়িতে এখনো বাংলাদেশের পতাকা ওড়েনি। এটা যেন অবিশ্বাস্য!

সদর দরজাটা খোলা। বাবুল শফিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে এলো। বসবার ঘরটা খালি, কেমন যেন শোকের গন্ধ। ভেতরের দিকে এক জায়গায় আট-দশজন নারী-পুরুষ বসে নীচু গলায় দোয়া-দুরুদ-তুল পড়ছেন। বাবুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। রুমী তা হরে নেই!

একজন বাবুলকে বসে পড়ার ইঙ্গিত করলো। তারপর ফিসফিস করে জানালো সংক্ষিপ্ত সংবাদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা কিংবা রুমীর প্রসঙ্গ কিছুই নেই। মাত্র তিনদিন আগে জাহানারার স্বামী শরীফ মারা গেছেনআর্ট অ্যাটাকের পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ব্ল্যাক আউটের জন্য হাসপাতালের মেইন সুইচ অফ করে দেওয়া হয়েছিল। লাইফ সেভিং মেশিন চালু করা যায়নি, প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই প্রাণটা গেছে শরীফের।

একটু পরে একটা কাঠের মূর্তির মতন জাহানারা এসে দাঁড়ালেন সেখানে। তাঁর মুখে শোক-দুঃখ-খেদের লেশমাত্র নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তিনি যে চাল-চিনি ইত্যাদি জমিয়ে রেখেছিলেন, এখন সে ঘরের দরজার তালা খুলে দিয়ে ঐসব দিয়ে কুলখানির জর্দভ রাঁধবার নিদে্শ দিতে লাগলেন্বাবুলকে তিনি একবার দেখলেন। কিন্তু একটা প্রশ্নও করলেন না!

অন্য একজন হঠাৎ চিৎকার করে বললো, ও বাবুল, তুমি ফিরে এলে, যুদ্ধও শেষ হলো, তা হলে রুমী কোথায়?

বাবুল মুখ নীচু করলেন। ধারালো বাণের মতন আরও অনেক প্রশ্ন ছুটে এলো। রুমী কোথায়? বসির কোথায়? সিরাজুল, জুয়েল, মন্টু, আশরাফ, দেবনাথ, মজিদ, নাঈম, শওকত, বেরু, নাজমা, জুলেখা, কাইয়ুম, নুরুজ্জামান, এরা কোথায়?

কেউ জানে না ওরা কোথায়। স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু ওরা আর ফিরে আসবে না! স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতে হবে না!

খানিক পরে জাহানারা ইমামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ির দিকে এগাতে গিয়ে বাবুল আবার আঁতকে উঠলো। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে তার বাড়ির সিঁড়িতে কে বসে আছে, এক প্রেতিনী?

ছেঁড়া ঝুলঝুলে শাড়ি, চুলগুলো শনের দড়ির মতন, মুখের চামড়ায় কয়েক পরত ময়লা। তবু শুধু চোকের দৃষ্টিতেই চেনা গেল মনিরাকে। কোথা থেকে একটা আখের টুকরো যোগাড় করে সে চিবোচ্ছে।

বাবুলকে দেখে সে মুখ তুলে খুব বেশিরকমের স্বাভাবিক গলায় বললো, এই যে, দুলাভাই, আসছেন? হেই মানুষডা কোথায়?

এই মনিরার খোঁজেই বাবুল একদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিল। মনিরা নিজেই এতদিন বাদে ফিরে এসে অপেক্ষা করছে তার জন্য। কিন্তু মনিরাকে এখন কার হাতে তুলে দেবে বাবুল! তার চোখ

অন্ধকার হয়ে আসছে, সে এবার অজ্ঞান হয়ে যাবে। ঝাপসা চোখে বাবুলের একবার মনে হলো, এই মনিরাই যেন আজকের সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতীক।

সে শফিকে বললো, ওরে, আমাকে ধর। আমি আর পারছি না। মরে যাচ্ছি বোধ হয়, আমাকে ধর।

বাবুলের শরীলটা দুলছে, প্রতিরোধ শক্তি হয়ে আসছে। সিরাজুলের আত্মদানের খবর সে শুনেছে কয়েকদিন আগে। সিরাজুল আর ফিরবে না, আরও হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে কোনোদিন্ ফিরে আসবে না এই স্বাধীন বাংলাদেশে। আর্মি ব্যারাক থেকে শুধু ফিরে এসেছে মনিরা। সে কতবার ধর্ষিতা হয়েছে তার ঠিক নেই, কতভাবে অত্যাচারিত হয়েছে তা কে জানি, তবু তার প্রাণ যায়নি, এই দেশটারই মতন। সে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে।

পাগলাটে গলায় মনিরা জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ও দুলাভাই, হেই মানুষডা কোথায়? সে আপনের সাথে ফেরে নাই? সে এখনো যুদ্ধ করে নাকি?

বাবুল কোনো উত্তর দিতে পারছে না। সে এখন অন্ধকার দেখছে।

॥ ৬১ ॥

বেইরুটে প্লেন এগারো ঘণ্টা লেট। প্রথম তিন ঘণ্টা এক্ষুনি ছাড়বে, এক্ষুনি ছাড়বে স্তোববাক্য দিয়ে সব যাত্রীদের বসিয়ে রাখা হলো এয়ারপোর্টে, তারপর বিমানের কলকব্জার বড় রকমের গণ্ডগোল সমর্থিত হলে সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো হোটেলে। এয়ার পোর্টের পাশেই সমুদ্র, শহরের মধ্যে বিলাসিতা ও টুরিস্ট মনোরঞ্জনের উগ্র রংচং, শব্দ এবং গন্ধ।

তুতুলের মন খারাপ হয়ে গেছে। এতদিন পর বাড়ি ফিরছে, মাঝপথে এরকম বাধা! হোটেলে এসেও তো কিছু করার নেই, আলম জিজ্ঞেস করলো, কিছু শপিং করতে যাবি নাকি রে? এখানে পারফিউম নাকি সস্তা!

তুতুল দু'দিকে মাথা নাড়লো। এখন তার দোকান-বাজারে যেতেও ইচ্ছে করছে না। তার দুর্বল শরীর যেন ঠিক ধরে রাখতে পারছে না তার অস্থির মনটাকে। দু'মাস আগেই তুতুল আর আলমের কলকাতায় যাওয়ার কথা ছিল, টিকিট রিজার্ভেশানও হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ তুতুল আবার অসুস্থ হয়ে পড়লো। হাসপাতালেও যেতে হলো। যে ডাক্তার তুতুলের অপারেশান করেছিলেন, তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রক্তচাপ পাগালের মতন দ্রুত ওঠা-নামা করছিল, কথা বলতে গেলে তুতুলের জিভ জড়িয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ডাক্তারকে দ্বিতীয়বার ছুরি-কাঁচি চালাতে হয়নি, ওষুধেই কাজ হয়েছে। ডাক্তারটি তুতুলকে পছন্দ করেন, তিনি ওকে এখনো পুরোপুরি সুস্থতার সার্টিফিকেট দেননি, আরও দু'এক মাস পরে দেশে ফেরার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তুতুল এবার প্রায় জেদ করেই প্লেনে উঠেছে।

তার শরীরে অবশ্য অসুস্থতার ছাপ নেই, মুখখানায় শুধু পাতলা পাতলা ছায়া, চোখ দুটি আবার বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। সে চুলে খোঁপা বাঁধে না, লন্ডনে সে প্যান্ট করতে অভ্যস্ত হলেও মেমসাহেবদের মত চুল কাটেনি, তার কোমর পর্যন্ত ছড়ানো গভীর কালো চুলের দিকে অনেকেই ফিরে ফিরে তাকায়।

হাসপাতালের ক্যাবিন আর হোটেলের ঘরে বিশেষ তফাত নেই, সব একরকম। পাঁচ তলার ওপরে ওদের যে ঘরখানা দেওয়া হয়েছে, তার জানলার কাছে দাঁড়ালে শহরের একটা টুকরো দেখা যায়, শুধু বাড়ি ঘর আর রাস্তা, গর্জা আর মসজিদের চূড়া, গাছপালা প্রায় চোখেই পড়ে না। বিকেলের আকাশ বারুদ বর্ণ।

আলম তার পাশে এসে কাঁধে হাত দিয়ে একটু চমকে উঠলো। কপালে হাত ছুঁইয়ে বললো, তোর আবার জ্বর আসছে নাকি রে? ইয়েস্, একটু টেম্পারেচার আছে।

তুতুল আলমের হাতটা সরিয়ে দিয়ে জোর দিয়ে বললো, না, জ্বর নেই। আমি কিছু ফিল করছি না।

আলম বললো, খানিকক্ষণ বালিশে মাথা দিয়ে রেস্ট কর। এই শালারা হয়তো মাঝরাত্তিরে এয়ারপোর্ট দৌড় করাবে।

তুতুল জানলা থেকে সরে এসে একটা চেয়ারে বসে বললো, আমি এক কাপ চা খাবো।

আলম ততক্ষণে তার হ্যান্ডব্যাগ ঘেঁটে ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্রটি বার করে ফেলেছে। ঠোঁটের

ঝুলন্ত সিগারেটটি অ্যাশট্রেতে গুঁজে সে খানিকটা হালকাভাবে বললো, মুয়ে পড়লে দেখতে সুবিধে হতো। তুই ডাক্তারি পাস করে যে রোগিণী হয়েই থাকলি সব সময়।

হাসি-ঠাট্টা করার মতন মেজাজ নেই এখন তুতুলের। সে পরিপূর্ণ চোখে চেয়ে বললো, তুমি ওসব করতে পারবে না এখন। আমি তো বলছি, আমি এখন ভালো আছি।

আলম কাছে এসে তুতুলের ঠোঁটে প্রায় জোর করেই একটা চুমু দিল, এবং চুমুটা দীর্ঘস্থায়ী হলো। তারপর বললো, আমার থার্মোমিটার লাগে না আমি ওষ্ঠ দিয়েই বুঝি, টেমপারেচার অন্তত এক শো ও কিছু না। ডায়াস্টোলিক আর সিস্টোলিকটা একটু দেখতে দে।

তুতুলের বাহুতে পট্টি জড়াতে জড়াতে আলম আবার বললো, এত সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে আজ, পৃথিবীতে তোর মতন সুন্দরী রোগিণী আর একটাও নাই। এই হলদে শাড়িটাতে তোকে মানিয়েছে খুব। চীয়ার আপ!

তুতুল তবু চুপ করে রইলো।

আলম বললো, তুই আমাকে একটা খোঁচা দেবার চান্স করলি। ঐ যে কইলাম আমার থার্মোমিটার লাগে না, তুই উল্টা চার্জ করতে পারতি, সব ফিমেল পেশেন্টদেরই আমি ওষ্ঠ দিয়া জ্বর মাপি কি না!

এই কথাতেও তুতুল হাসলো না, সে জিজ্ঞেস করলো, কত?

আলম কান থেকে স্টেথোসস্কোপ খুলতে খুলতে বললো, একটু নীচের দিকে, সিক্সটি-হ্যান্ড্রেড টেন, তেমন অ্যাবনর্মাল কিছু না।

তুতুল বললো, এইটাই আমার নর্মাল। বললুম না, আমি ভালো আছি!

আলম বললো, ঠিক, ভালোই তো আছিস। এতদিন পর বাড়ি ফিরে মায়ের সাথে দেখা হবে, তোর এখন শরীরের জোর, মনের জোর আনতে হবে। দাঁড়া, এবার চা আনতে বলি।

হঠাৎ দরজায় খটখট শব্দ হলো। আলম গিয়ে দরজা খুলে দিতেই তাদের বিমানের একজন সহযাত্রী ঝলমলে মুখে উত্তেজিত ভাবে বললো, মিঃ আলম, খবর শুনেছেন?

লোকটির নাম রমেন হালদার, বীরভূমের সিউড়িতে বাড়ি, তুতুলদের ঠিক সামনের সীটে বসে আসেছে লন্ডন থেকে, সেই সময় আলাপ হয়েছে।

আলম বললো, ভেতরে আসুন না! কী খবর?

রমেন বললো, শোনেননি, হোটেলের লবিতে টি ভি আছে, এইমাত্র একটা নিউজ বুলেটিনে বললো, ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ওয়ার শেষ হয়ে গেছে! সকাল থেকেই সীজ-ফায়ার।

আলম খুশি হওয়ার বদলে ভয় পেয়ে বললো, সীজ ফায়ার? তার মানে কি রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইন্টারভিন করলো?

রমেন বললো, না, না, বললো যে প্যাকিস্তান সারেণ্ডার করেছে ঢাকায়।

আর কথা-বার্তা নয়, আলম আর তুতুল দু'জনেই ছুটে গেল হোটেলের লবিতে। টিভি-তে তখন অবশ্য খবরের বদলে দুর্বোধ্য ভাষায় নাটক শুরু হয়েছে। অনেক লোক জমায়েত হয়েছে সেকানে, কেউ কেউ ট্রানজিস্টার রেডিও-তে বি বি সি ধরার চেষ্টা করছে। এক ঘন্টার মধ্যে টিভি-তে আবার খবর পড়লো, এর মধ্যে গল্‌ফ নিউজ নামে একটা খবরের খবরের কাগজও এসে গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন!

তুতুল আর আলম ঘরে ফিরলো একেবারে ডিনার খেয়ে। নীচে বেশ মজা হচ্ছিল। বি ও এ সি'র এই ফ্লাইটের যাত্রীদের মধ্যে বেশ কিছু ভারতীয় এবং বেশ কিছু পাকিস্তানী রয়েছে। হোটেলের লবিতে দু'দলে ঝগড়া বেঁধে গিয়েছিল। যেন বেইরুটেই আবার একটা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে যাবে। তুতুল আর আলম অবশ্য সে ঝগড়ায় যোগ দেয়নি, তারা হাসছিল দূরে দাঁড়িয়ে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে আলম বিরক্তির সঙ্গে বললো, কোনো মানে নয়? দেশ স্বাধীন হয়ে গেল, আর আমরা এখনো পড়ে আছি এই গড ড্যাম বেইরুটে। এই হারামজাদারা কখন প্লেন ছাড়বে তার এখনো ঠিক নাই!

তুতুল এর মধ্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। সে বললো, সত্যি, এখানে যেন আমাদের বন্দী করে রেখেছে!

আলম বললো, এখন ঢাকায়, কলকাতায় কী দারুণ উৎসব হচ্ছে ভেবে দ্যাখো! আমাদের ফ্লাইট রাইট টাইমে গেলে আমরা বিকালেই পৌঁছে যেতাম!

তুতুল গা থেকে চাদরটা খুলে ফেলে আলমের গলা জড়িয়ে মুচকি হেসে বললো, আমার আনন্দ হচ্ছে তোমার থেকেও বেশি! কেন জানো? আমার একটা স্বার্থপর কারণ আছে। কী বলো তো?

আলম বললো, কী?

তুতুল দুষ্টুমীর সুরে বললো, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল। তোমাকে আর যুদ্ধে যেতে হলো না। তোমার জন্য আমার ভয় ছিল। আমার ভাগ্যটা তো খুব খারাপ। আমার খালি মনে হতো, তুমি একবার যুদ্ধের মধ্যে ঢুকে পড়লে তোমাকে আমি আর ফিরে পাবো না। এবার আর একটা সত্যি কথা বলি? দ্বিতীয়বার আসলে আমার অসুখ হয়নি। তোমাকে আটকাবার জন্য আমি অসুখের ভান করেছিলুম।

আলম তুতুলকে বুকে টেনে নিয়ে বললো, ওরে পাজী, পাজী রে!

আলম ভালো করেই জানে, তুতুলের এ কথাটা সিত্য নয়। সে নিজে ডাক্তার, লন্ডনের নাম করা সার্জেন তুতুলকে নিয়মিত দেখেছেন, তাঁর কাছে তুতুলের অসুখের ভান করা সম্ভব নয়। যন্ত্র তো আর মিথ্যে বলবে না! ইচ্ছে করে কেউ ব্লাড প্রেসার এমন ফ্লাকচুয়েট করাতে পারে না।

পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশ করার জন্য আলম খাটছে ছেষট্টি সাল থেকে। তারপর যখন সত্যিই বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হলো, তাতে সে প্রত্যক্ষ অংশ নিতে পারলো না, এ জন্য তার মনে যে একটা দুঃখ ছিল, তা সে তুতুলকে একবারও বুঝতে দেয়নি। কিংবা, তুতুল হয়তো ঠিকই বুঝেছিল। সে দু'একবার আলমকে চলে যেতেও বলেছিল, কিন্তু এ বছরের গোড়া থেকেই তুতুল অসুস্থ, অত বড় অপারেশান হলো তার, এক সময় বাঁচার আশাই ছিল না। সেই অবস্থায় তুতুলকে ফেলে রেখে সে কোথায় যাবে?

অবশ্য স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য লন্ডনে বসেই অন্য অনেক রকম সাহায্য করেছে আলম। পাকিস্তানীদের অত্যাচারের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে আলমরা প্রচুর লিফলেট, বুকলেট ছাপিয়ে বিলি করেছে। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়ায় সভাসমিতি, জলসার আয়োজন করেছে, টাকা তুলে পাঠিয়েছে মুক্তিসংগ্রামীদের জন্য। এখনও আলমের সঙ্গে আছে পাঁচ হাজার পাউন্ড, সে ভেবেছিল যুদ্ধ আরও অনেকদিন চলবে।

পুরোপুরি সুস্থ না হয়েও যে তুতুল এবার দেশে ফেরার জন্য জেদ ধরেছিল, সেটাও আলমের কথা চিন্তা করেই। সে বুঝতে পারছিল আলমের ছটফটানি। নিজের বউয়ের জন্য আলম মুক্তিযুদ্ধের মতন একটা মহান ঘটনায় অংশে নিতে পারছে না, এজন্য তার মনে একটা ক্ষোভ বা অভিমান দানা বাঁধছে নিশ্চয়ই। অন্তত কলকাতায় পৌঁছলেও আলম সীমান্তে গিয়ে হাসপাতাল খুলতে পারতো।

তুতুল বললো, যুদ্ধ যদি না থামতো, আমিও তোমার সঙ্গে ফ্রন্টে যেতুম। আমি হাসপাতালে সাহায্য করতে পারতুম না?

আলম বললো, যুদ্ধ থেমে গেছে, এখন তো চিন্তার কিছু নেই। তুলতুলি, আমার প্ল্যানটা এবার একটু চেইঞ্জ করতে হবেএতামাকে কলকাতায় নামিয়ে দিয়ে আমি ঢাকায় চলে যাবো!

তুতুল আহত বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, আমাকে কলকাতায় নামিয়ে দেবে মানে? আমি একলা থাকবো?

আলম বললো, একলা থাকবি কেন, পাগলী, কলকাতায় তোর মা আছে, অন্য আত্মীয়স্বজন আছে। ঢাকায় যাওয়ার জন্য আমার মন ছটফট করছে। বন্ধু-বান্ধবরা কে কেমন আছে জানি না।

তুতুল আবার বললো, আমাকে ফেলে তুমি একা ঢাকায় চলে যাবে? কয়েকদিন পরে গেলে হয় না।

আলম বলো, বাঃ, পরে গেলে চলবে কেন? আমার সঙ্গে এতগুলোন টাকা রয়েছে, সেটা পৌঁছে দিতে হবে।

–ঐ টাকা তো এখন আর যুদ্ধের কাজে লাগবে না। বাংলাদেশ সরকারকে দেবে। দু'দিন পরে দিলে কী ক্ষতি হয়? টিভি-র খবরে বললো, চট্টগ্রামের দিকে এখনো গুলিগোলা চলছে। যুদ্ধ থামলেও সব দিক শান্ত হয়নি।

–ওতো কিছু আসে যায় না। আমায় ঢাকায় যেতেই হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তা হলে এক কাজ করো, তুমিও চলো আমার সঙ্গে।

–আমি সোজা ঢাকায় চলে যাবো, কলকাতায় না থেমে? মায়ের সঙ্গে দেখা করেও যাবো না?

–সেও তো একটা কথা বটে। তুমি মায়ের সাথে দেখা না করেই বা কী করে যাবে? তাইলে তো

আমাকে একলাই ঢাকায় এগিয়ে যেতে হয়। তুমি পরে এসে আমাকে জয়েন করবে।

–তুমি একটা দিনও কলকাতায় থেকে যেতে পারো না?

–আমার মা নাই বটে, কিন্তু অন্য আত্মীয়-স্বজন আছে, ভাই আছে, তাদের দেখার জন্য আমারও তো মন ছটফট করতে পারে।

–ও হ্যাঁ, তা ঠিক!

–তুমি রাগ করলে?

– নাঃ, রাগের কী আছে। এটাই ঠিক আরেঞ্জমেন্ট। আমি কলকাতায় নেমে যাবো, তুমি ঢাকায় চলে যাবে।

আর কোনো কথা না বলে তুতুল বাথরুমে ঢুকে গেল। তার কান্না শুনতে পেল না আলম। তুতুলের মনের মধ্যে গেঁথে আছে একটা অযৌক্তিক ভয়, আলম একবার তার চোখের আড়াল হলেই সে আর তাকে ফিরে পাবে না। তুতুলকে যারা ভালোবাসে, তারা হারিয়ে যায়।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়ে তুতুল নিঃশব্দে শুয়ে পড়লো। দু'জনের কেউই ঘুমোলো না। তাদের ফ্লাইট অ্যানাউন্সমেন্ট হলো মাঝরাত্তিরে।

কলকাতায় এসে ওরা পৌঁছলো পরদিন বেলা দশটায়। বিমানবন্দরে কেউ ওদের রিসিভ করতে আসেনি। আগেরবার বাড়িতে ফেরার কথা জানিয়ে তুতুল চিঠি দিয়েছিল, পরে আবার টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানাতে হয়েছিল যে সে আসতে পারছে না। এবারে আর তুতুল কিছু লেখে নি।

নিজের দেশে ফেরা, অথচ বিমানবন্দরে একজনও চেনা নেই, কেউ হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছে না। এতে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। অন্যসব যাত্রীদের জন্য কত মানুষ এসেছে, কেউ কেউ আনন্দে কেঁদে ফেলছে। ভিড়ের মধ্যে একটি যুবকের হাতছানি দেখে তুতুলের ঠোঁট বুক কেঁপে উঠেছিল। ঠিক যেন বাবলু! কিন্তু বাবলু এখানে কী করে আসবে, সে তো বোস্টনে। কোনো কারণে বাবলু হয়তো দেশে ফিরে এসেছে, কোনো রহস্যময় উপায়ে তুতুলের ফেরার খবর পেয়েছে! তুতুল ভালো করে দেখলো, অনেকটা মিল থাকলেও সে ছেলেটি বাবলু নয়, সে হাত নাড়ছে তুতুলের পেছনের একজন যাত্রিণীর দিকে।

কাস্টমস্ বেরিয়ার পেরিয়ে এসে আলম ঢাকার ফ্লাইটের খবর নিল। আজ কলকাতা-ঢাকা তিনটে স্পেশাল ফ্লাইট যাবে, তারমধ্যে একটা বেদেশীদের জন্য। আলমের ব্রিটিশ পাশপোর্ট, তার টিকিট পেতে কোনো অসুবিধে হবে না। সে ফ্লাইট ছাড়বে দেড় ঘন্টা পরে। এর মধ্যে তুতুলকে শহরে পৌঁছে দিয়ে আলম ফিরে আসতে পারবে না।

আলম জিজ্ঞেস করলো, তুমি ট্যাক্সি নিয়ে যেতে পারবে?

তুতুল মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ।

আরম বললো, চলো, আমি তোমাকে আগে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসি, তারপর আমার টিকিটের ব্যবস্থা করবো।

লন্ডনের তুলনায় এখানকার শীত কিছুই না, তবু বাইরে এসে তুতুল যেন শীতে কেঁপে উঠলো। তার কাঁধে ভারি ব্যাগ। আলম নিজের সুটকেসটা এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেখে তুতুলের সুটকেসটা বয়ে নিয়ে আসছে।

দরাদরি করে একটা ট্যাক্সি ঠিক হলো, দরজা খুলে তুতুল বসলো ভেতরে। জানলার কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আলম বললো, চিন্তার কিছু নেই। তুমি তোমার মায়ের কাছে যে-কয়দিন ইচ্ছা থাকো, তারপর চলে এসো ঢাকায়। এখান থেকে টেলিফোন করা যায় না। একটা টেলিগ্রাম করে দেবে, আমি এয়ারপোর্ট থেকে তোমায় নিয়ে যাবো। ঠিক আছে?

তুতুল মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ।

আলম বললো, লক্ষ্মী হয়ে থেকো। প্রথমেই বেশি ঘোরাঘুরি করো না। তোমার শরীরটার রেস্ট দরকার। তোমার মাকে আমার নমস্কার জানিও। ওষুধগুলো সব ঠিকঠাক খেও, কেমন? ও হ্যাঁ, ব্লাড প্রেসারের ওষুধটা, ভুলেই গেছিলাম...

কোটের পকেট থেকে একটা ওষুধের শিশি বার করে আলম দিল তুতুলকে। তুতুল সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, আমি কিছু ওষুধ খাবো না। তোমার তো দেখবার দরকার নেই। চলিয়ে ট্যাক্সি।

তারপরই সে নুয়ে পড়লো কান্নায়।

আলম বললো, পাগলী আর কাকে বলে! ড্রাইভার সাব, ঠারিয়ে, ঠারিয়ে, এক মিনিট ঠারিয়ে।

তারপর ভেতরে মাথা ঝুঁকিয়ে সে তুতুলের বাহু ছুঁয়ে বললো, এই, তুই অত কান্নাকাটি করলে আমি যাই কী করে? একবার হাসি মুখে আমাকে কিছু বল।

তুতুল আলমের হাত ধরে টেনে ক্যাপাটে গলায় বললো, না, তুমি যাবে না। তোমাকে যেতে দেবো না। তুমি কিছুতেই আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

আলম দৌড়ে গিয়ে নিজের সুটকেসটা নিয়ে এসে ভেতরে উঠে পড়ে বললো, ঠিকই তো, একদিন পরে ঢাকায় গ্যালে কী ক্ষতি হয়! কলকাতার বাংলাদেশ মিশানে সব খবর পাওয়া যাবে!

ট্যাক্সি ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো, কিধার জায়গা সাব?

আলম বললো, গ্রান্ড হোটেল।

তুতুল বললো, আমরা হোটেলে থাকবো?

আল বললো, আগে একটা হোটেলে গিয়ে উঠি। স্নান-টান করি। তুমিও তো বলেছো, তোমার মায়ের বাসায় থাকার জায়গা নেই। খবর না দিয়ে বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে সেখানে কি যাওয়া যায়?

তুতুল চিন্তা করতে লাগলো। মামার বাড়িতে সত্যিই তো মোটে নাকি তিনখানা ঘর। টুনটুনিও থাকে ওখানে।

আলম বললো, হোটেলে ওঠা যাক। তারপর ধীরে সুস্থে গিয়ে দেকা করবে, তোমার মা যদি তোমাকে ওখানে থাকতে বলেন তো তুমি থেকে যাবে।

তুতুল চুপ করে গেল।

আলম আশা করেছিল কলকাতার রাস্তাঘাটে একটু যুদ্ধ জয়ের উৎসব দেকতে পাবে। কাগজের ফুলের মালা, ব্রাস পার্টি, লোকেরা চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, ট্যাঙ্ক নিয়ে ফিরছে সোলজাররা, মেয়েরা তাদের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে মালা!

সেসব কিছু নেই। কোনো উন্মাদনা, কোনো মিছিলও চোখে পড়ে না। অতি সাধারণ একটা দিন। বাসে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে মানুষ। রিকশা, লরি, ষাঁড়, ঠেলাগাড়িতে মাঝে মাঝে জট পাকিয়ে আছে ট্রাফিক, গাড়ির হর্নের শব্দে কানে তালা লেগে যায়।

গ্র্যান্ড হোটেলে একটাও ঘর নেই। ট্যাক্সি নিয়ে আরও দু'তিন জায়গায় ঘুরে শেষ পর্যন্ত ওরা থিয়েটার রোডের একটা মাঝারি হোটেলে কোনোক্রমে একটি ডাবল বেড রুম পেল। কাউন্টারে খাতায় নাম ধাম লেখার পর ঘরের চাবিটা হাতে পেয়ে আলম বললো, চলো!

তুতুল একটা মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আলমের দু'তিনবার ডাকেও সে কোনো সাড়া দিল না। তারপর আচ্ছন্ন গলায় বললো, হোটেলে থাকবো?

কলকাতায় এসে, মায়ের সঙ্গে দেখা না করে একটা হোটেলের ঘর ভাড়া করে থাকার মধ্যে কেমন যেন একটা রুচিহীনতা অনুভব করছে তুতুল। এই কলকাতা শহরে তার জন্ম, তার মা আর প্রতাপমামা কত কষ্ট করে তাকে পড়িয়েছেন। মুনে গুনে ট্রাম-বাসের পয়সা হিসেব করে তুতুল প্রতিদিন কলেজে গেছে। একবার রাস্তায় চটি ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেটা সারাবার পর্যন্ত পয়সা ছিল না, ব্লাউজ থেকে একটা সেফটিপিন খুলে চটিতে আটকে নিয়েছিল। সেই তুতুল এখন বিলেত-ফেরত ডাক্তার হয়েছে, তার স্বামী বেশ অবস্থাপন্ন, তারা কলকাতায় এসে হোটেলে উঠছে? স্নবারি কাকে আর বলে!

তুতুল আস্তে আস্তে বললো, আমি আগে বাড়ি যাবো!

আলমও তুতুলের মনের ভাব বুঝতে পারলো খানিকটা। ঢাকাতে গিয়ে সে নিজে অবশ্য হোটেলেই ওঠে। কিন্তু তুতুলের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, সে বললো, চলো, তোমাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি। আমি হোটেলে থাকলে তোমার আপত্তি নেই তো? একই শহরে তো থাকবো?

নিজের সুটকেসটা ওপরে পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে আলম তুতুলের জিনিসপত্র নিয়ে আবার ট্যাক্সিতে উঠলো। এক্ষুনি সিগারেট শেষ করেছে, আবার সে সিগারেট ধরালো একটা।

হঠাৎ তুতুল বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সে আলমকে রাস্তা চেনাতে লাগলো কলকাতার। চোদ্দ পনেরো বছর বয়েসে আলম একবার এখানে এসেছিল, এই শহর সে ভালো করে চেনে না। সে পথচারিদের দিকে তাকিয়ে চেনা মানুষ খুঁজছে। সে শুনেছিল, ঢাকার শিক্ষিত লোকজনদের মধ্যে অনেকেই কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছে এই ক'মাস। চেনা লোক চোখে পড়ছে না বটে, তবে কিছু কিছু লোককে দেখে আলম বুঝতে পারছে, তারা ঐ পারের বাঙালী। চেহারায় পোশাকে কিছু একটা

থাকে, যাতে বোঝা যায়। জিপে চড়ে হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল একদল যুবক, তারা নিশ্চিত মুক্তিযোদ্ধা।

গড়িয়াহাটের মোড়ের কাছে এসে তুতুল হাসিমুখে বললো, আমি জানি, তুমি কেন আমাদের বাড়ি যেতে চাইছিলে না। তুমি আমার মাকে ভয় পাচ্ছো। তুমি আমার মায়ের চিঠি পড়েছিলে!

আলমও জোর করে ফিকে ভাবে হেসে বললো, মোছলমান জামাইরে শাশুড়ি ঝাঁটা পেটা করে যদি প্রথমেই?

তুতুল বললো, আমরা গরিব হয়ে গেলেও আমার মা বড় ঘরের মেয়ে, বনেদী বাড়ির বউ ছিলেন, নিজের হাতে কোনোদিন ঝাঁটা ধরেননি!

আলম বললো, জিভের ঝাঁটার মারে আসল ঝাঁটার থেকে লাগে বেশি। প্রথম দিনটা থাক। আজ আমি তোমাকে গেটের সামনে নামিয়ে দিয়ে আসবো। তুমি কথা টথা বলে দ্যাখো, যদি লাইন ক্লিয়ার দ্যাখো, আমি তারপর না হয় যাবো!

তুতুল বললো, মা যদি অবুঝ হয়, মানে, আমার মা যতই আমাকে বকুনি দিক, আমি তো আমার মাকে ছাড়তে পারবো না কখনো।

আলম বললো, তাহলে বুঝি আমাকে ছাড়বে?

আলমের দিকে কয়েক পলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তুতুল বললো, মাঝে মাঝে তুমি এমন বোকার মতন কথা বলো! আমার কথাটা শেষ করতে দাও। আমি বলছি, আমার মাকে আমি ছাড়তে পারবো না, কিন্তু মা যদি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, আমি আর কোনোদিন তোমাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলবো না। তখন কলকাতায় এলে অন্য কোনো বাড়িতে কিংবা হোটেলে থাকতেও আমার খারাপ লাগবে না। মাঝে মাঝে আমি একা মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবো।

আলম বললো, দ্যাটস ফাইন ফর মি! কিন্তু পরীক্ষাটা কি আজই হবে? আজ আমার সত্যিই ইচ্ছে করছে না। আজ আমি হোটেলে ফিরে যাই? প্লিজ তুতুল!

তুতুল বললো, এখন যে বাড়িতে যাচ্ছি, এ বাড়িতে আমি কখনো থাকিনি। এই দিককার রাস্তাও আমি ভালো চিনি না।

আলম বললো, আমি তোমাকে ঠিকানা খুঁজে পৌঁছে দিচ্ছি। তুমি বিকেলবেলা একবার চলে এসো হোটেলে! ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসতে পারবে।

ঠিকানা বিশেষ খুঁজতে হলো না, সেলিমপুরের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রতাপ, একজন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলছেন। তুতুল চেঁচিয়ে বলে উঠলো, ঐ তো! আমার মামা!

আলম তুতুলের উরুতে মৃদু চাপ দিয়ে বললো, এখন আমার পরিচয় দিও না। তুমি নামো, আমি সুটকেসটা নামিয়ে দিচ্ছি। এই ট্যাক্সি নিয়েই আমি চলে যাবো।

বৃদ্ধ ব্যক্তিটি উঠে গেলেন আর একটি গাড়িতে। মুখ তুলেপ্রতাপ তুতুলকে দেখলেন। অবাক হয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু কোনোরকম উচ্ছ্বাস দেখানো তাঁর স্বভাবে নেই। তিনি যেন অতিকষ্টে মুখে একটু হাসি এনে বললেন, এসেছিস! ভালো করেছিস। তোর মায়ের শরীরটা ভালো নেই। এইতো এইমাত্র ডাক্তার চলে গেলেন।

তুতুল প্রতাপকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে মা'র?

প্রতাপ বললেন, সেটাই তো ঠিক ধরা যাচ্ছে না। অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে রে!

তুতুল মুখটা ঘুরিয়ে ম্লান গলায় বললো, ডাক্তার চলে গেলেন? আমি জিজ্ঞেস করতুম। আলম আমার মা খুব অসুস্থ।

আলমকে এবার নামতেই হলো। সে প্রতাপকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই প্রতাপ তাকে ধরে ফেলে বুকে জড়িয়ে বললেন, এসো বাবা, ভেতরে এসো।

খাটের মাথায় তিনটে বালিশে ভর দিয়ে আধ-শোওয়া হয়ে রয়েছেন সুপ্রীতি, এক পাশে বসে আছেন মামুন, অন্যদিকে মমতা। একটা মুগার চাদর দিয়ে তাঁর শরীর ঢাকা। সুপ্রীতি কী যেন বলছেন মানুসকে, তার গলায় স্বর খসখসে, অর্ধেক কথা শোনা যাচ্ছে না। শরীরটা ছোট্ট হয়ে গেছে। প্রথম পলক মাকে দেখেই, তুতুলের মনে পড়ে গেল জয়দীপের কথা!

কতদিন ধরে তুতুল স্বপ্ন দেখেছে, বাড়ি ফিরেই মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে একটা বাচ্চা মেয়ের মতন। মায়ের কোলে মুখ গুজে আদর খাবে। সেরকম কিছুই হলো না, সে বিছানার পাশে এসে

দাঁড়িয়ে, মায়ের পাঁয়ে হাত রেখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী হয়েছে, মা?

সুপ্রীতির মুখখানা আলোকিত হয়ে উঠলো। কিন্তু তিনি তুতুলকে কিছু বলার আগে গলা উঁচু করে দরজার কাছে দাঁড়ানো আলমকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ বুঝি জামাই? ও মামুন,ম দ্যাখো, আমার জামাইকে দ্যাখো, কেমন সুপুরুষ! ভালো জামাই হয়েছে না? ও কি আমিন চৌধুরীর বাড়ির ছেলে?

মামুন আলমকে চেনেন না। তিনি বলরেন, খুব সুন্দর জামাই হয়েছে। ও দিদি, তোমার মেয়ে-জামাই এসে পড়েছে, আর তোমার চিন্তা কী! আজ সকলেরই আনন্দের দিন!

সুপ্রীতি বললেন, দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেছে। ও তুতুল, শুনেছিস, হিন্দুস্থান পাকিস্তান আবার এক হয়ে গেছে। চল, আমরা সবাই মিলে একবার বাড়ি যাই।

মামুন বললেন, হ্যাঁ, দিদি, যাবো, আমরা নিশ্চয়ই যাবো। আর কয়েকটা দিন যাক। তুমি একটু সুস্থ হয়ে নাও। মালখানগরে গেলে নৌকো থেকে একটু হাঁটতে হবে, তোমার মনে আছে?

সুপ্রীতি বললেন, হ্যাঁ, আমি ঠিক হাঁটতে পারবো। জানো মামুন, আমার মা, মনে আছে তো আমার মাকে? দেওঘরে মা শেষনিঃশ্বাস ফেলার আগে কতবার খোকনকে বললেন, ও খোকন, আমারে একবার বাড়ি নিয়ে যা! খোকন কিছুতেই নিয়ে গেল না। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। আমার জামাই এসেছে, সে নিয়ে যা! খোকান কিছুতেই নিয়ে গেল না। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। আমার জামাই এসেছে, সে নিয়ে যাবে।

প্রতাপ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন চুপ করে।

তুতুল একবার তাকালো আলমের দিকে। তারা দু'জনেই বুঝেছে যে সুপ্রীতির ক্যানসার হয়েছে। সুপ্রীতির কথাবার্তাও অসংবদ্ধ। তুতুলের চোখ জলে ভরে গেল। মমতা তার মাথায় হাত রাখলেন।

আলম এসে দাঁড়ালো সুপ্রীতের শিয়রের কাছে। সুপ্রীতি তার একখানা হাত ধরে বললেন, তুমি আমিন চৌধুরীর বড় ছেলে, বড় ভালো ছেলে। আমার তুতুল তোমার অযোগ্য হবে না, দেখো। তবে, মেয়েটা বড় অভীমানী। ও কখনো অভিমান করলে তুমি ভুল বুঝো না যেন বাবা।

আলম বললো, না মা, ওকে আমি ভুল বুঝবো না।

সুপ্রীতি চোখ বড় বড় করে বললেন, কী বললে? মা বললে? তুমি আমিন চৌধুরীর বড় ছেলে, তুমি মাকে আম্মা বলো না? মালখানগরে ওরা সবাই আম্মা বলতো।

আলম বললো, আম্মাও বলি, মা-ও বলি। আপনাকে আমি মা বলবো।

সুপ্রীতি তার চুলে হাত দিয়ে বললেন, অনেক বড় বাড়ি, সকলে এক সঙ্গে থাকবো, বড় উনুনে রান্না হবে, উত্তরের বারান্দায় লাইন করে আসন পাতা হবে। ইস, মা দেখলে কত খুশি হতো! নতুন জামাই এসেছে, মা দেখলো না!

॥ ৬২ ॥

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ওরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাইছে, সোনা সোনা সোনা, লোকে বলে সোনা, সোনা নয় তত খাঁটি, লোকে যত বলে তারো চেয়ে খাঁটি, আমার বাংলাদেশের মাটি---। পাঁচ-সাতটি তরুণ কণ্ঠ। ধুপ ধাপ পায়ের আওয়াজ করে তাল দিচ্ছে তারা। কেউ কেউ নাচছেও বোধ হয়। কে কী ভাববে, তা নিয়ে ওদের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। এ বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা এর মধ্যে অনেকেই শুয়ে পড়েছে বাতি নিবিয়ে, তারা এই গানের হুল্লোড় শুনে চমকে উঠবে, বিরক্ত হবে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ প্রতিবাদ করবে না অবশ্য।

দোতলায় এসে এদের গান থামলো। তারপর বন্ধ দরজার গায়ে চাপড় পড়লো। প্রথমে একটি নরম হাতে, একটু পরেই একসঙ্গে কয়েকজন দরজা ঠেলতে ঠেলতে স্লোগান দিল, জেলের তালা ভাঙবো! শেখ মুজিবকে আনবো! জেলের তালা ভাঙবো!

মামুন আলো জ্বেলে রেখেই শুয়ে পড়েছিলেন। উঠে এসে ছিটকিনি খুলে কাষ্ঠহাসি দিয়ে বললেন, কী রে, এই ঘরটাকেও তোরা জেলখানা মনে করেছিস নাকি?

মামুনের কথা কেউ শুনলো না। মঞ্জু একটা মস্ত বড়ো রাজভোগ জোর করে তাঁর মুখে ঠেসে দিয়ে হাসতে হাসতে বললো, এই তোমার দ্বারিক ঘোষের মিষ্টি!

হঠাৎ যেন ঘরখানা ভরে গেল প্রাণচাঞ্চল্য। তিনটি তরুণী আর পাঁচজন যুবক, তারা যে-যেখানে পারলো বসে পড়লো, কথা বলতে লাগলো দু'তিনজন একসঙ্গে। সাদা দেওয়ালগুলোতে কোনো ছবি

নেই, কিন্তু ওদের পোশাকের রঙে ঝলমল করে উঠলো পরিবেশ।

গত চার-পাঁচদিন ধরে এরকমই চলছে। যখন তখন এসে পড়ছে এক একটি দল, শুরু হচ্ছে আড্ডা। সেইসঙ্গে হাসি, অকারণ উচ্ছসিত হাসি, যেন কথার চেয়ে হাসিটাকে আসল। রাত দেড়টা-দুটোর আগে আড্ডা ভাঙ্গে না, এরপর অনেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে, কলকাতার রাত থেকে হঠাৎ যেন সব আতঙ্ক মুছে গেছে, নকশালদের খুনোখুনি ও বন্ধ।

হলুদ সিল্কের শাড়ির ওপর একটা কমলা রঙের সোয়েটার পরেছে মঞ্জু, এই দুটি রঙের যেন তার রূপ সবচেয়ে ভালো খোলে। মঞ্জুর সঙ্গে অন্য দুটি মেয়ের মধ্যে একজন তাহমিনা, ব্যারিস্টার মতিউর রহমানের কন্যা, তার সাজ বেশ উগ্র, ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক, অতি সূক্ষ্ম ভুরু, এই শীতেও তার গায়ে সোয়েটার বা আলোয়ান নেই, অবশ্য সে হল্যান্ড থেকে সদ্য এসেছে। অন্য মেয়েটিকে মামুন ঠিক চিনতে পারছেন না। ছেলেদের মধ্যে রয়েছে মাহবুব, আপেল, পলাশ, সাত্তার, শওকতরা।

খাটের তলা থেকে হারমোনিয়মটা টেনে পলাশ বাজাতে শুরু করে দিল, 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখনো আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী---'। মামুন গান ভালোবাসেন। কিন্তু এক একসময় গানটাও তাঁর কাছে অত্যাচার বলে মনে হয়, তিনি বিরক্তভাবে ভাবলেন, আবার এত রাত্রে গান!

মঞ্জু বললো, আরও অনেক মিষ্টি রয়ে গেছে, কে কে খাবে? মামুনমামা, তুমি আর একটা খাও! তুমি এত দ্বারিকি ঘোষের মিষ্টির গল্প বলতে, অনেক খুঁজে আনা হয়েছে।

মামুন মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে না না বলতে লাগলেন, মঞ্জু তার হাতের রস গড়ানো রাজভোগটা গুঁজে দিল পলাশের মুখে, পলাশের দু'হাত হারমোনিয়ামে, সে বাধা দিতে পারলো না, অন্যরা একটা উদ্দাম হাসির ঝড় তুললো।

এই আড্ডায়, হাসিতে গানে সুর মেলাতে পারছেন না মামুন। এদের সঙ্গে তাঁর বয়েসের অনেক তফাত তো বটেই, তা ছাড়াও আজ সারাদিন ধরেই তাঁর বুকটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। এইরকমই হয়, কোনো কিছুর জন্য যদি তীব্র প্রতীক্ষা থাকে, দিনের পর দিন যার জন্য প্রবল অনিশ্চয়তা কুরে কুরে খায়, তারপর সেটা পাওয়া গেলে ও যেন ঠিক সেরকম আনন্দ হয় না। এত ভয়, উৎকণ্ঠা ও বিপদের বিষাদের পর স্বাধীনতা এলো, মামুন খুশি হয়েছেন ঠিকই। তবু মাঝে মাঝে মন খারাপও লাগছে কেন? জয়ের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষন্নতা তো লেগে থাকবেই এই যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে, যারা চিরকালের মতন হারিয়ে গেছে, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেছেন মামুন অনেকবার। কিন্তু সেইজন্যই কি তাঁর বুকে পাষাণভার চেপে আছে?

শওকত জিজ্ঞেস করলো, কবে ঢাকায় ফিরবেন, মামুন ভাই?

উত্তর দেবার আগে মামুন তীব্র চোখে একবার মঞ্জুর দিকে তাকালেন। এই প্রশ্নটা সবচেয়ে প্রথমে মনে আসা উচিত ছিল মঞ্জুর। কিন্তু সে ঢাকা ফেরার ব্যাপারে একবারও উচ্চবাচ্য করেনি। এজন্য মঞ্জুর ওপর বেশ বিরক্ত হয়েছেন মামুন। মঞ্জুর স্বামী বাবুল চৌধুরীর সঠিক কোনো খবর আজও পাওয়া যায়নি। হারিয়ে যাওয়া তিরিশ লক্ষ বাঙালীর মধ্যে সে ও আছে কি না তাও কেউ জানে না, তবু সে সম্পর্কে মঞ্জুর কোনো উদ্বেগ নেই? দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে কি মেয়েরাও সব স্বাধীন হয়ে যা ইচ্ছে করবে, ধেই ধেই করে এখনো সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে!

মামুন উত্তর দেবার আগেই আর একজন বললো, দাঁড়াও, আর কয়েকটা দিন যাক। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারই তো এখনো ঢাকায় যায়নি। কুত্তার বাচ্চা রাজাকাররা এখনো নাকি এদিক সেদিকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

শওকত বললো, না, গেছে, বাংলাদেশ সরকার আজ বিকাল থেকে ঢাকায় ফাংশান করছে। আজ দুপুরেই আমি এয়ারপোর্টে তাজউদ্দিন সাহেবের সী-অফ করে এসেছি।

মাহবুব বললো, ঢাকার আশেপাশে এখনো গোলমাল চলছে ঠিকই। মুক্তিযুদ্ধের পোলাপনদের হাতে এল এম জি, স্টেনগান--আজ এখানকার দু-একটা পেপার কাদের সিদ্দিকীর গ্রেফতারের খবর পড়েছো?

মামুন শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলেন আঁা? টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী গ্রেফতার হয়েছে নাকি? কেন?

মাহবুব বললো, গ্রেফতার হয়নি এখনো, কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ

দিয়েছে ইন্ডিয়ান আর্মিকে। ঢাকার পল্টন ময়দানে কাদের সিদ্দিকী হাজার হাজার লোকের সামনে চারজন লোককে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে শাস্তি দিয়েছে, সে কথা শোনেননি? ল অ্যান্ড অর্ডার যদি সে নিজের হাতে নিতে চায়---

মামুন বললেন, মুক্তিযুদ্ধের অতবড় একজন বীর কাদের সিদ্দিকীকে যদি ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যারেস্ট করে তাহলে সাধারণ মানুষ আবার ক্ষেপে যাবে না? ইন্ডিয়ান আর্মির ওপরেই ক্ষেপে যাবে।

মাহবুব বললো, সারা দেশে এখন অরাজকতা, শেখ সাহেব যদি না আসেন, তাহলে আর একটা গৃহযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। গেরিলারা যদি বিনাবিচারে যাকে তাকে ধরে মারতে শুরু করে----

মঞ্জু বললো, তোমার আবার ঐ সব কথা শুরু করলে! এখন থামো তো!

তাহমিনা বললো, গান হোক, গান হোক। এত কষ্টে স্বাধীনতা পাওয়া গেল, তা নিয়ে আনন্দও করতে জানো না? এর মধ্যেই উল্টো সুর গাইতে শুরু করলে!

মঞ্জু বললো, কে কে চা খাবে? আমি চায়ের পানি বসাবো!

হার্টের অসুখের পর মামুন চা-পান কমিয়ে দিয়েছেন, তবু তিনি এখন বললেন, আমারে এক কাপ দিস, মঞ্জু!

মঞ্জুর ছেলে সুখ এখন জাস্টিস মাসুদ সাহেবের বাড়িতেই থাকে। হেনা কৃষ্ণনগরের এক ক্যাম্পে নার্সের কাজ শুরু করেছিল, আগামীকাল তার ফেরার কথা। মঞ্জু প্রত্যেক সন্ধেবেলা কোনো না কোনো বিজয় উৎসবে গান গেয়ে আসছে। মঞ্চে বসে হাজার মানুষের হাততালি শোনার নেশা পেয়ে বসেছে তাকে। কয়েকদিন আগে তার গানের একটা রেকর্ডও বেরিয়েছে এইচ এমভিম থেকে, কলকাতার বড় বড় কাগজে ছাপা হয়েছে তার ছবি।

পলাশ আবার হারমোনিয়ামে সুর ধরলো।

যাঃ, সত্যিই পাকিস্তান ভেঙে গেল? এই চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছেন না মামুন। তিনি তো এই ন'মাস মনে প্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাইছিলেনই, তবু কেন এই নৈরাশ্য? পশ্চিম পাকিস্তানীদের অন্যায় শোষন, সামরিক বাহিনীর বীভৎস অত্যাচার, বাঙালী মুসলমানদের একেবারে পঙ্গু করে দেবার চেষ্টা, এসব তো মামুন নিজের চোখেই দেখেছেন। মরিয়া হয়েই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিশেষ প্রস্তুতি না নিয়েই মুক্তি সংগ্রামে নেমে পড়েছিল। তবু তাঁর ধারণা ছিল, পাকিস্তানী শাসকরা একসময় ভুল বুঝতে পারবে, ভুট্টোর পরামর্শে কর্ণপাত না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের হাতে প্রধানমন্ত্রিত্ব দেবেন। পাকিস্তান বাঁচবে। শেষ মুহূর্তে ও ওরা সেই ভুল স্বীকার না করে পাকিস্তান ভাঙতে ও রাজি হয়ে গেল! এখনকার ছেলে ছোকরারা বুঝবে না, একসময় কত স্বপ্ন, কত সাধ নিয়ে গড়া হয়েছিল এই পাকিস্তান, এর জন্য কত অশ্রু, কত স্বপ্ন, কত সাধ নিয়ে গড়া হয়েছিল এই পাকিস্তান এর জন্য কত অশ্রু, কত রক্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে।

সিঁড়িতে ধুপ ধাপ শব্দ করতে করতে আবার উঠে এলো একটি দল। তাদের মধ্যে শাখওয়াত হোসেনকে দেখে মামুন বেশ চমকে উঠলেন। হোটেল টাইকুন ও দিন-কাল পত্রিকার মালিক এই হোসেন সাহেবের সঙ্গে মামুনের কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গায় দেখা হয়েছে কয়েকবার, মামুন শুকনো ভদ্রতা রক্ষা করেছেন মাত্র, এঁর সঙ্গে আর পুরোনো সম্পর্কে ঝালিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। হোসেন সাহেবকে তিনি কোনোদিন তাঁর বাসায় আসতে বলেননি, তবু তিনি এখানে চলে এলেন কী করে?

তাহমিনা হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, ঠিক টানে টানে চলে এসেছে! ওরে নাসিম, বলেছিলাম না, ডোন্ট গেট নারভাস, তুই হারাবি না!

দু'দিকে কান পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে হোসেন সাহেব বললেন, হারাবে কেন? তোমাদের সাথে আছে--- এই নাও, তোমাদের সকলের জন্য বিরিয়ানি এনেছি, সিরাজ থেকে, আর কিছু কাবাব,মুর্গ মশল্লম শেষ হয়ে গেছে, ওরা ভালো বানায়।

হোসেন সাহেবের এক সঙ্গীর হাতে তিন-চারখানা বিরাট খাবারের প্যাকেট। ঘি ও মাংসের গন্ধে ঘরের বাতাস থেকে গান মুছে গেল।

এমন দিনে সকলকেই খাতির করতে হয়, মামুন নিজের চেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আস্সালামু আলাইকুম, বসেন বসেন!

হোসেন সাহেব মামুনকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আলাইকুম আস্সালাম, হক সাহেব, স্বাধীন,

স্বাধীন! আমরা একটা স্বাধীন নেশান! আপনের কথাই সত্যি হইলো, ইন্ডিয়াই আমাগো প্রকৃত বন্ধু! হারামজাদা পাকিস্তানীরা এমন শিক্ষা পাইছে যে এখন ঘা শুকাইতে এক জেনারেশান লাগবে!

চেয়ারটাতে গাঁটি হয়ে বসে তিনি সোনার সিগারেট কেস খুলে প্রথমে নিজে একটি তুললেন, তারপর সেটা বন্ধ করে পকেটে ভরতেও গিয়েও কী মনে করে আবার এগিয়ে দিলেন মামুনের দিকে।

মঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, না, মামুনমামাকে দেবেন না। ওঁর সিগারেট বন্ধ।

হোসেন সাহেব বললেন, আরে, আইজ একটা খাইলে কোনো ক্ষতি নাই!

গত কয়েকদিন ধরে মামুন মঞ্জুকে লুকিয়ে আবার সিগারেট টানতে শুরু করেছেন। এখনও সংযম রাখতে পারলেন না, তুলে নিলেন একটা।

হোসেন সাহেব যেখানে উপস্থিত থাকেন সেখানে তিনিই প্রধান বক্তা। সিগারেটে বড় টান দিয়ে তিনি বললেন, আমি সারেন্ডারের খবরটা কোথায় পেলাম জানেন? দিল্লিতে! আজমীড় শরীফ হয়ে আমি আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি ঘুরে আসলাম। ওঃ, ইন্ডিয়া কি বিরাট কান্ট্রি, কত ভ্যারাইটি, এখানে মোছলমান, শিখ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, হিন্দু, কতরকম মানুষ, সবাই মিলামিশা আছে। আর ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী, গ্রেট লেডি, সারা দুনিয়ায় এমন মহান লেডি আর নাই, বোঝলেন। সিক্সটিনথ বিকালে আমি দিল্লিতে, সারেন্ডারের খবর শোনার পর বুকখানা দশহাত হইয়া গেল, আর পাকিস্তানের সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন না, স্বাধীন বাংলার ফার্স্ট ক্লাস সিটিজিন, ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধীরে স্বচক্ষে দ্যাখলাম, বোঝালেন, দিল্লির পার্লামেন্টের সামনে, বড় ঘরের মেয়ে তা দ্যাখলেই বোঝা যায়, কই, তোমরা বিরিয়ানি খাও, এখনও গরম আছে।

শওকত একসময় হোসেন সাহেবের পত্রিকা অফিসে চাকরি করতো, কোনোদিন ওঁর সামনে চোখ তুলে কথা বলেনি, কিন্তু এই ক'মাসেই সে যেন অনেক বদলে গেছে। সে রীতিমতন ইয়ার্কির সুরে বললো, হোসেন সাহেব, আপনি বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক বললেন কেন? স্বাধীন বাংলাতেও কি প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় নাগরিক থাকবে নাকি?

হোসেন সাহেব বললেন, ওটা কথার কথা! বাংলাদেশে আমরা সবাই ফার্স্ট ক্লাস, কী কও?

আচ্ছা, ইচ্ছা করলে আমরা এখন ইন্ডিয়ার সিটিজেনশিপ নিতে পারি না? ইন্দিরা গান্ধীরে ঠিকমতন বুঝাইলে উনি রাজি হবেন মনে হয়। ইন্ডিয়ার একসময় আমার অনেক প্রপার্টি ছিল। জানো, পার্ক সার্কাসে আমি একটা বাড়ি এক্সচেঞ্জ করছিলাম, সেই বাড়িটা আজ সকালে এককবার দ্যাখতে গেলাম, কি সুন্দর চকমিলানো বাড়ি, আম গাছ দুইটা এখনো আছে, এক হিন্দু উকিল সেই বাড়ি নিয়েছে, ঢাকায় পুরানা পল্টন আমার একখানা বাড়ির বিনিময়ে, কিন্তু কলকাতায় সেই বাড়ির দাম এখন ভারতীয় টাকায় নয় লাখ! ক্যান ইউ ইমাজিন! সেই বাড়ি খানা যদি ফিরৎ পাইতাম এখন!

শওকত একই রকম লঘু সুরে জিজ্ঞেস করলো, আপনি ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ চান? বাংলাদেশ ছেড়ে দেবেন? আপনি চলে গেলে আমাদের কী করে চলবে!

হোসেন সাহেব বললেন, না, না। বাংলাদেশ ছাড়বো কেন? সে কোয়েশ্চেনই ওঠে না। আমি কইতেছি ডুয়াল সিটিজেনশিপের কথা। যেমন ধরো আমেরিকা আর ক্যানাডা, ইচ্ছামতন যখন যে দেশে থাকতে চাই থাকলাম। একমাস আগে আমি আমেরিকা ট্যামেরিকা ঘুইরা আসলাম তো!

মামুন চুপ করে আছেন। তিনি অনুবব করলেন, এই ক'মাসে আর যাই-ই হোক, হোসেন সাহেবের ইংরিজি জ্ঞানের বেশ উন্নতি হয়েছে।

বিরিয়ানি খেয়ে একদল বিদায় নিয়ে চলে গেল। রাত এখন সাড়ে বারোটা। কয়েকজন এখানো রয়ে গেছে। হোসেন সাহেব কথায় মশগুল হয়ে আছেন। মামুনের ঘুম পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি মুখ ফুটে অন্যদের চলে যেতে বলবেন কী করে? হোসেন সাহেবরা তাঁর ঘরে মেহমান, ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে। মামুন হাই চাপছেন। হেনা থাকে না বলে মঞ্জু এখন জাস্টিস মাসুদের বাড়িতে শুতে যায়, সে বাড়ি বেশী দূর নয়, কিন্তু এর পরে আর সেখানে মঞ্জু যাবে কী করে? রাত দুপুর পার করে সে বাড়ির লোকদের ডেকে তুলবে? মঞ্জুর চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করছেন তিনি, কিন্তু মঞ্জু মুগ্ধভাবে চেয়ে হোসেন সাহেবের বাগাড়ম্বর শুনছে অন্যদিকে চেয়ে।

মাঝখানে দুটি গান হলো বটে, কিন্তু পলাশ একটু গান থামাতেই হোসেন সাহেব আবার কথা শুরু করলেন। শুধু ইন্দিরা গান্ধীর গুণপনার বিবরণ। আর ভারতের মহান জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস।

আরও দু'জন বিদায় নিল দশ মিনিট পরে।

শওকত জিজ্ঞেস করলো, হোসেন সাহেব, আলতাফের খবর কী? সে আপনার সাথে ইন্ডিয়ায় আসে নাই?

হোসেন সাহেব বললেন, না হে! সে তো ওয়েস্ট জার্মানি চলে গিয়েছিল। চিকিৎসার জন্য। যুদ্ধ করতে গিয়ে সে তো উন্ডেড হয়েছিল কিনা। অতি সামান্য অবশ্য। বাম পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা চোকলা ওঠেছে। কিছুদিন আগে তাকে দিল্লিতে দ্যাখলাম। এখন ভালোই আছে। তাকে দিল্লিতেই থাকতে বলেছি, সে আমার বিজনেস ইন্টারেস্ট দেখবে এখানে।

এতক্ষণ বাদে মামুন জিজ্ঞেস করলেন, আলতাফের ছোট ভাই বাবুল চৌধুরীর কোনো সন্ধান রাখেন?

হোসেন সাহেব একবার মঞ্জুর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, সে তো একজন কোলাবোরাটার, তাই না? কমুনিস্ট!

যেন এর বেশি কিছু আর বলার প্রয়োজন নেই। তিনি আবার সিগারেট ধরাতে মন দিলেন, তারপর মুখ তুলে বললেন, চলো নাসিম! শওকত যাবে কোথায়? আমার গাড়ির ড্রাইভার আবার ঘুমায়ে পড়লো নাকি!

শওকত জিজ্ঞেস করলো, কবে ঢাকায় ফিরবেন আপনি?

হোসেন সাহেব হেসে বললেন, দেরি আছে। কতকগুলো বিজনেস ডিল করে যাবো। ইন্ডিয়ার সাথে এবার ভালোমতন বিজনেস শুরু হবে। তা তো বুঝতেই পারো। এরা কি আর শুধাশুধা যুদ্ধ করলো। আমি অলরেডি বারো কোটি টাকার টোব্যাকো, মানে সিগারেট, তামাক, পানের ইমপোর্ট অর্ডার পেয়েছি। তার বদলে আমি মাছ পাঠাবো। কলকাতার মানুষ আমাগো মাছের জন্য জেহ্বা বার করে আছে।

শওকত হাসতে হাসতে বললেন, তামাকের বদলে মাছ! এ যে নিকোটিনের বদলে প্রোটিন! এ তো আমাদের ঠকা!

হোসেন সাহেবের মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে। তিনি বললেন, ঠকতে তো হবেই! এখন কত বছর ঠকতে হয় তাই দ্যাখো! এই হিন্দু ইন্ডিয়া মাগনা যুদ্ধ করে নাই। সব সুদে-আসলে তুলে নেবে! মুসলমানের হোমল্যান্ড ছিল পাকিস্তান, সেটা ভেঙে দিয়ে দিল্লিতে সবাই নাচানাচি করত্যাছে, বোঝলা? নিজে দেখে আসছি! আই হ্যাভ সিন ইন মাই ওউন আইজ! বাংলাদেশ-টাংলাদেশ ওরা কিছু বোঝে না। মুসলমানদের ডাউন দিয়াই অগো আনন্দ। হেঃ, সেকুলার না হাতি! ইন্ডিয়া মানেই হিন্দু। আর ঐ যে ইন্দিরা গান্ধী মুখেই শুধু মিঠা মিঠা বুলি, আসলে ইয়াহিয়া খানের বদলে ঐ ইন্দিরা গান্ধীই এখন ইস্ট পাকিস্তানের এক্সপ্লয়েট করবে! আগে ছিল পাকিস্তানী আর্মি, এখন রইলো ইন্ডিয়ার আর্মি। এই আমি কইয়া দিলাম। লিখ্যা রাখো, একবার যে ইন্ডিয়ান আর্মি ঢাকায় গিয়া গাইড়া বসছে, আর সহজে আসবে না!

মঞ্জু আর তাহমিনার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে, শওকত কয়েকবার উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাসি দিয়ে হোসেন সাহেব বোঝাতে চেয়েছে, মামুন দু'তিনবার বাধা দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হোসেন সাহেব সেসব কিছুই লক্ষ না করে ছুটিয়ে দিয়েছেন কথার রেলগাড়ি। ঘরের মধ্যে লোকজন কমে গেছে বলে হোসেন সাহেব প্রাণ খুলে কথা বলতে শুরু করেছেন, পলাশের মুখে সরু দাড়ি দেখে তিনি তাকেও ধরে নিয়েছেন নিজেদের একজন হিসেবে।

পলাশ গায়ক মানুষ, সে রাজনৈতিক আলোচনায় বিশেষ অংশ নেয় না। সে লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এবার চলি?

শওকত তার হাত ধরে টেনে বললো, আর একটু বসো। একসঙ্গে যাবো।

তারপর সে গলা চড়িয়ে বললো, ইন্ডিয়ার আর্মি ফিরে আসবে না, তাই না? আপনি এই গুজবটাও শোনেননি যে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অফিসাররা বাংলাদেশের সব জেলায় গিয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হবে! তারাই দেশটা চালাবে!

হোসেন সাহেব বললেন, এটা গুজব কে কইলো তোমায়? এইটাই ফ্যাক্ট!

শওকত মামুনের দিকে ফিরে বললেন, আপনিও তাই মনে করেন, মামুনভাই? ইন্ডিয়ান আর্মি আর আসবে না? ওরা বাংলাদেশকে একটা কলোনি করে রাখবে?

মামুন মৃদু হেসে বললেন, সব ইন্ডিয়ান আর্মি নিশ্চয়ই ফিরবে না। কিছু থেকে যাবে। যে বারো-চোদ্দ হাজার ইন্ডিয়ান আর্মি এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, বাংলাদেশের মাটিতে যাদের গোর হয়েছে, তারা আর ফিরবে কি করে বলো!

হোসেন সাহেব সপর্দে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা যতই ইন্ডিয়ার তোষামোদ করো, আমি তবু সাচাই কথা বলবো! এখন থেকে আমাদের হিন্দু ইন্ডিয়ার আণ্ডা...হ থাকতে হবে। এত ছোট বাংলাদেশ স্বাধীন থাকতে পারে না!

শওকত বললো, কেন, নেপাল নেই? বার্মা নেই?

হোসেন সাহেব বললেন, নেপাল হিন্দু রাজ্য আর বার্মিজরা বৌদ্ধ। তোমরা তো সব কিছু তলিয়ে দেখো না! ঐ ইন্দিরা গান্ধীর চোখ দ্যাখলেই বোঝা যায়, প্যাটে প্যাটে শয়তানী বুদ্ধি। যুদ্ধ মানেও ব্যবসা। সে এমনি যুদ্ধ করে নাই। যা খরচ হয়েছে, এখন সুদে-আসলে তা উঠাইয়া নেবে।

মঞ্জু কাঁদো কাঁদো গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, ভালো লাগছে না! আমার এসব কথা একেবারে ভালো লাগছে না! আপনারা চুপ করবেন?

তাহমিনা বললো, প্লিজ স্টপ ইট! ইন্ডিয়ার সঙ্গে হয়তো পরে আমাদের সম্পর্কে অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু এখনই আপনারা কু গাইছেন কেন? হোয়াই সো সুন? বিগ ব্রাদারকে কেউ বেশিদিন সহ্য করে না! আমেরিকানরা যখন ফ্রান্সকে লিবারেট করলো, তার কিছুদিন পরেই ফ্রান্স অ্যান্টি-আমেরিকান হয়ে গেল! সোভিয়েত ইউনিয়ন ইস্টার্ন ইউরোপের দেশগুলো লিবারেট করে সেখানে বড় বড় শহরে নিজেদের সোলজারদের একটা মূর্তি বসিয়ে গেছে,. তাই নিয়ে এখন হাসি-ঠাট্টা হয়। তবু অ্যাটলিস্ট প্রথম দিকে সেসব দেশে অনেক ইউফোরিয়া ছিল। আমাদের মাত্র চারদিন হয়েছে! এর মধ্যেই এইসব শুরু করলেন আপনারা? ইন্ডিয়া আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে, তা কি অস্বীকার করতে পারবেন? তার বিনিময়ে আমাদের কি কিছুই দেবার নেই?

শওকত বক্র হেসে বললো, কিছু কেন, বেশ কিছুই আমরা অলরেডি দিয়েছি। এই যে নব্বই-পঁচানব্বই লাখ শরণার্থী এতদিন রয়ে গেল ইন্ডিয়ার মাটিতে, তাদের পেচ্ছাপ-পায়খানাও রয়ে গেল এখানে। তাতে এখানকার জমি উর্বর হবে। সেটাই বা কম কী ? বলো, পলাশ?

এবার পলাশ হেসে উঠলো হা হা শব্দে।

এরপর বিদায় নেবার পালা। রাত দেড়টা বাজে, মঞ্জু আর জাস্টিস মাসুদের বাড়িতে যেতে চাইলো না। তাহমিনাও মঞ্জুর সঙ্গে থেকে যেতে চায়। হোসেন সাহেব তাঁর গাড়িতে শওকত, পলাশ, নাসিমকে নিয়ে চলে গেলেন।

পাশাপাশি দুটি খাট, একটিতে মঞ্জু আর তহমিনা শোবে। একসময় মামুনের ঘুম এসে গিয়েছিল, এখন তাঁর চোখ খরখরে। আজ আর সারা রাত তাঁর ঘুম আসবে কি না সন্দেহ। ঘুম চটে গেছে। মনের মধ্যে একটা উথাল-পাতাল চলছে, এক জীবনে দেশের দু'বার স্বাধীনতা দেখলেন মামুন, প্রথমবারের তীব্র আনন্দের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের যে অনেক তফাত তা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছেন না। হোসেন সাহেবের কথাগুলির তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেননি, তবু একটা বিষন্নতা যাচ্ছে না কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছেন না। হোসেন সাহেবের কথাগুলির তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেননি, তবু একটা বিষন্নতা যাচ্ছে না কিছুতেই।

রাত্রির প্রসাধন সারতে মঞ্জু গেছে বাথরুমে, তাহমিনা লজ্জা মুখ করে জিজ্ঞেস করলো, মামুনমামা, আপনার সামনে স্মোক করতে পারি? একটা সিগারেট!

এ মেয়ে ইওরোপে থাকে, ধূমপানের নেশা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। অন্যদের সামনে সে একথা প্রকাশ করেনি। মামুন ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে চোখ ঘুরিয়ে বললেন, আমাকেও একটা দাও, মঞ্জু এসে পড়ার আগে।

তাহমিনা শুধু মামুনকে সিগারেট দিল না, মেম সাহেবদের ভঙ্গিতে তাঁর গন্ডদেশে একটা চুম্বন করে বললো, ইউ আর আ ডিয়ার!

তারপর সিগারেট ধরিয়ে সে বললো, মামুনমামা, ঐ হোসেন সাহেব একজন ফিলদি রিচ পার্সন, তাই না? এইসব লোকের পাকিস্তানী আমলেও যত সুযোগ সুবিধা ছিল, পরের জমানাতেও সেই একইরকম থাকবে, দেখবেন! ওনার কথা শুনে আমার একটা পিকিউলিয়ার ফিলিং হচ্ছিল, জানেন! একঘন্টা আগে ইন্দিরা গান্ধীর খুব প্রশংসা করছিলেন, যেই ঘরের অন্যালোক চলে গেল অমনি ইন্দিরা

গান্ধীর নিন্দা শুরু করলেন। আমার মনে হলো, এইরকম লোক আমি আগে অনেক দেখেছি। পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি তো, সব দেশেই এই রকম হোসেনসাহেবরা থাকে। আমার আরও মজা লাগছিল এই জন্য যে, আমি ইন্ডিয়ান।

মামুন একটু চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাই নাকি? তবে যে শোনলাম, তুমি—

তাহমিনা হাসলো। মজার ব্যাপার। আমার বাবা ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে গিয়ে পাকিস্তানের সিটিজেনশীপ নিয়েছিল। কিন্তু আমি আবার ফিরে এসেছি।

মামুন আরও কিছু শোনার জন্য উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইলেন।

তাহমিনা বললো, আমার জন্ম বরিশালে। আমার আব্বা-আব্বু কলেজ লাইফেই আমাকে ইওরোপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আই অ্যাম ম্যারেড টু অ্যান আন্ডিয়ান ডক্টর, ইউসুফ আলী, আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমি অ্যামস্টারডামে থাকি। মনে-প্রাণে আমি বাংলাদেশের সার্পোটার। কিন্তু আই হোল্ড অ্যান ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট।

মামুন বললেন, এই জেনারেশানটা আমি বুঝি না। সত্যিই বুঝি না!

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে মঞ্জু বললো, এইবার তুমি যাও, আপা!

এত রাতে ঠাণ্ডার মধ্যে মঞ্জু চুল ভিজিয়েছে? একটা তোয়ালে দিয়ে সে চুল মুছছে, তার পরনে এখন একটা সাধারণ ডুরে শাড়ি, সে গুনগুন করে গান গাইছে। মামুন মঞ্জুর সঙ্গে একটাও কথা বললেন না, নিজের খাটে শুয়ে কম্বল দিয়ে মুখ ঢাকা দিলেন।

তাঁর ঘুম আসছে না। একটু পরেই তিনি অনুভব করলেন, তাঁর খাটের পাশে কেউ এসে বসেছে। নারীর যৌবনের সুগন্ধ এসে লাগছে তাঁর নাকে। মামুন নিশ্বাস বন্ধ করতে চাইছেন।

মঞ্জু বললো, মামুনমামা, আমরা ঢাকা ফেরার আগে একবার আজমীড় শরীফ যাবো না?

মামুন শরীরটাকে নিস্পন্দ করে রাখলেন, কোনো সাড়া দিলেন না।

মঞ্জু আবার জিজ্ঞেস করলো, আমরা তাজমহল দেখবো না? ও মামুনমামা,ম বলো না।

এবারও উত্তর না পেয়ে মঞ্জু জোর করে মামুনের মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিয়ে অভিমানের সুরে বললো, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো? আমি কী দোষ করেছি? তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না?

হঠাৎই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন মামুন। ভালোবাসা শব্দটি বহুদিন হারিয়ে গিয়েছিল। দেশকে ভালবাসা মানুষকে ভালোবাসা, এইসব কথা যখন-তখন মুখে এসে যায়, খুব বেশি বিশ্বাসের জোর না থাকলেও চলে! কিন্তু একজন নারীর মুখ থেকে ভালোবাসা শব্দটির উচ্চারণের শিহরণই অন্যরকম।

মামুন উঠে বসে অভিভূতের মতন তাকিয়ে রইলেন মঞ্জুর দিকে। কোনো কথাই বলতে পারলেন না।

মামুনের বাহু ছুঁয়ে মঞ্জু বললো, তোমার শরীর খারাপ করছে না তো?

মামুন এবার দুদিকে মাথা নাড়লেন।

মঞ্জু মামুনের কাছে ঝুঁকে এসে বললো, আমরা কলকাতা ছেড়ে বেশি দূরে যাইনি কখনো। আমরা ইন্ডিয়ার আর কিছু দেখবো না? দার্জিলিং? মামুনমামা, হেনার খুব ইচ্ছা শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করার।

খুট করে বাথরুমের দরজার শব্দ হতেই মঞ্জু সরে গেল। সেকি বেশি তাড়াতাড়ি সরে গেল? তাহমিনার কাছে তার কিসের লজ্জা?

তাহমিনা বললো, হায় আল্লা, ইট ইজ টু এ এম! আর কোনো কথা না, এবার ঘুম। কিন্তু আই অ্যাম নট শ্লিপি অ্যাট অল! সারা রাত গল্প করলে কেমন হয়? আর তিন চার ঘণ্টা পরেই তো ভোর হয়ে যাবে।

মামুন দুর্বল গলায় বললেন, তোমরা চাও তো গল্প করো, আমি ঘুমবো।

তাহমিনা খিলখিল করে হেসে বললো, আমরা দু'জন গল্প করলে আপনি ঘুমাতে পারবেন? মামুনমামা, আমি জানি,ম ইউ আর আ পোয়েট। আপনার দুই একটা কবিতা শোনান না আমাদের? কী বলো, মঞ্জু?

মঞ্জু উত্তর দিল না। মামুন শুকনো গলায় বললেন, দা মিউজ হ্যাজ লেফ্‌ট মী। এখন শুয়ে পড়াই ভালো। ঠিক সাড়ে ছটায় ঝি এসে দরজা খটাখট করবে!

ওদের মতামতের অপেক্ষা না করে মামুন নিজেই আবার শুয়ে পড়লেন মুখে কম্বল চাপা দিয়ে। মঞ্জু আর তাহমিনা আরও কিছুক্ষণ গল্প করলো ফিসফিস করে। মামুন ওদের কথা ঠিক শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু তাঁর মাথার মধ্যে বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটাই বাক্য, মামুনমামা, তুমি আমায় আর ভালোবাসো না? তুমি আমায় আর ভালোবাসো না? তুমি আমায় আর ভালোবাসো না?

কেন মঞ্জু বললো এ কথা? মামুন তো কোনোদিন মঞ্জুর সামনে ভালোবাসা শব্দটি ঠিক স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেননি! অবশ্য ভালোবাসা শব্দটি অনেকেই হালকাভাবে ব্যবহার করে। বাংলাভাষায় ভালোবাসা যে কতরকম! মাকে ভালোবাসা, পোষা কুকুরকে ভালোবাসা, সন্দেশ-রসগোল্লা ভালোবাসা, সবই তো ভালোবাসা! স্নেহের নামও তো ভালোবাসা!

পঁচিশে মার্চের পর থেকে মামুন মঞ্জু সম্পর্কে স্নেহ বা ভালোবাসা, কোনোটাই বোধ করেননি। এই ন'মাসের দুশ্চিন্তায়, দুঃস্বপ্নে সেসব কোমল অনুভূতির কোনো স্থানই ছিল না। বরং এর মধ্যে বেশি খরচ-টরচ হয়ে গেলে তিনি মঞ্জুকে বকুনিও দিয়েছেন কয়েকবার। কোনোরকমে বেঁচে থাকাটাই যেখানে সমস্যা, সেখানে অন্য কোনো কথাই মনে আসে না। মঞ্জু তো এই রকয়েকমাসে একবারও মামুনের বাহু ছুঁয়ে এমন অন্তরঙ্গ সুরে কিছু বলেনি। স্বাধীনতা এসেছে বলেই কি স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিগুলি ফিরে এসেছে?

তাহমিনা আর মঞ্জুর কথাবার্তা থেমে গেল এক সময়, মামুনের তবু ঘুম আসছে না। এখন কত রাত তা কে জানে! মামুন ছটফট করতে লাগলেন। গত মাস দেড়েক এই ঘরে তাঁর একা থাকা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। এখন পাশের খাটে শুয়ে আছে দুই যুবতী! শরীর ভেঙে গেছে, মামুন এখন প্রৌঢ়ত্বের এলাকা পার হয়ে বার্ধক্যের দিকে ঝুঁকেছেন, বাইরে থেকে দেখে সবাই তাই বুঝবে। কিন্তু মনটা যে এখনো তাজা রয়ে গেছে, তা তো কেউ দেখে না। মন এখনও চঞ্চল হয়, ভালোবাসার জন্য একটা কাঙালপনা আজও রয়ে গেছে। মঞ্জু সম্পর্কে একটা সুপ্ত টান তিনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। অন্য যুবকেরা মঞ্জুর সঙ্গে বেশি অন্তরঙ্গতা করলে তাঁর বুক ঈর্ষায় জ্বলে যায়। মঞ্জুকে বাবুল চৌধুরীর হাতে পুনরায় সঁপে দেওয়া তাঁর এক পবিত্র দায়িত্ব, সেই জন্যই মঞ্জুকে তিনি আগলে আগলে রাখেন। শুধু কি সেইজন্য? বাবুল যদি আর বেঁচে না থাকে? এত সব স্বাস্থ্যবান সুবেশ যুবকের সঙ্গে মঞ্জুর এখন মেলামেশা, ঐ পলাশ ছেলেটা তো মঞ্জুর পাশ থেকে নড়তেই চায় না, তবু মঞ্জু আজ হঠাৎ কী ব্যাকুল গলায় তাঁকে বললো, মামুনমামা, তুমি আমায় আর ভালোবাসো না? মঞ্জু কি তাহলে শুধু মামুনের ভালোবাসারই প্রত্যাশী? নাকি, এটা নিছক কথার কথা!

খুট করে বেড সুইচ টিপে আলো জ্বেলে মামুন খাট থেকে নামলেন। দুই নারীই এখন ঘুমন্ত। মঞ্জু চিত হয়ে আছে, তাহমিনা দেওয়ালের দিকে পাশ ফেরা। দিন দিন আরও যেন সুন্দর হচ্ছে মঞ্জু। কলকাতায় এত নারী দেখলেন মামুন, কিন্তু মঞ্জুর চেয়ে সুন্দর যেন একজনও না। মঞ্জু যেন মামুনের প্রথম যৌবনের মানসী সেই বুলা অর্থাৎ গায়ত্রীরই প্রতিমূর্তি। কী আশ্চর্য মিল!

এই যে মামুন এখন মঞ্জুর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, এখন তিনি আর মঞ্জুর মামুনমামা নন। তিনি কবি মোজাম্মেল হক। অনেকদিন কবিতা লেখেননি, তাতে কী হয়েছে, কবির কখনো মৃত্যু হয় না।

মৃদু নিঃশ্বাসে মঞ্জুর বুক উঠছে নামছে। কপালে এসে পড়েছে কুঞ্চিত চুল। মঞ্জুর ঠোঁটে একটু একটু হাসি লেগে আছে। চোখ দুটি যেন ঘুমন্ত দুটি পাখি।

মামুন আরও এগিয়ে এসে মঞ্জুকে স্পর্শ করতে গেলেন। বুকের মধ্যে অসম্ভব তোলপাড় হচ্ছে। যেন এক্ষুনি জাগিয়ে তুলে জানানো দরকার, ওরে, আমি তোকেই শুধু ভালোবাসি। তোকে ছেড়ে আমি একদণ্ড থাকতে পারি না।

হাতখানা তুলেও মামুন থেমে রইলেনএমন একটা পাথরের মূর্তি। তাহমিনা পাশে শুয়ে আছে, এসময় মঞ্জুকে ছুঁয়ে জাগানো যায় না।

বুকের মধ্যে শুধু তোলপাড় নয়, একটা সূচ বেঁধার মতন ব্যথাও হচ্ছে, আবার কি হৃদ-যন্ত্রণা শুরু হলো? সেকেন্ড অ্যাটাক! ডাক্তার সিগারেট খেতে প্রবলভাবে নিষেধ করেছিলেন, এবার অ্যাটাক হলে আর বাঁচার আশা নেই। ঢাকায় আর পৌঁছোনো হবে না? যদি আজ রাতেই মৃত্যু আসে, তার আগে একবার মঞ্জুকে বুকে নেবেন না?

টলতে টলতে সরে এসে মামুন একটা সরব্রিটেট মুখে দিলেন, তারপর জানলার ধারে দাঁড়িয়ে

বুকটাডলতে লাগলেন জোরে জোরে। তাঁর চোখ জলে ভিজে আসছে। না, না, তিনি এখন মরতে চান না কিছুতেই।

জানলার বাইরে দেখা যাচ্ছে আবছা অন্ধকারে শীতকালের ঠাণ্ডা আকাশ। ভোরের আর কত দেরি? কাছেই একটা মসজিদ আছে, সেখান থেকে মাইকে প্রত্যেকদিন ফজরের আজানের সুর ভেসে আসে। সেই শব্দে এক একদিন অতি ভোরে ঘুম ভেঙে যায় বলে মামুন বিরক্তই হন। আজ তিনি ব্যাকুলভাবে সেই আজানের মধুর সুরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার, বুকে এইরকম ব্যথা, তবু মামুনের দুটি ইচ্ছে ক্রমশ তীব্র হতে লাগলো। আর একটা সিগারেট খাওয়া আর মঞ্জুকে একবার গাঢ় আলিঙ্গনে বুকের মধ্যে পাওয়া। এ কী অদ্ভুত পাগলামি, মামুন নিজেই বুঝতে পারছেন একরম করা যায় না। তবু কেন ইচ্ছে হয়! না, না, বাঁচতে হবে, ঢাকায় ফিরে যেতে হবে, বাবুল চৌধুরীর হাতে তুলে দিতে হবে মঞ্জুকে, ফিরোজার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে হেনাকে। মামুনের এখনও কত দায়িত্ব। স্বাধীন বাংলাদেশের রূপটি তিনিদেখে যাবেন না?

দু'চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু নেমে আসছে, মামুন হাত জোড় করে ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, হেল আল্লা, হে মহান পিতা, আমাকে শক্তি দাও! ভোগবাসনা ভুলিয়ে আমাকে শান্তি দাও! সদ্যোজাত বাংলাদেশকে তুমি রক্ষা করো। দীন দুঃখী, নিপীড়িত মানুষগুলিকে তুমি নতুনভাবে জীবন গড়ার ভরসা দাও! হে করুণাময়, আমার চিত্তের অস্থিরতা ঘুচিয়ে দাও! অনুচিত বাসনা থেকে, লোভ থেকে আমায় মুক্তি দাও! "আলহামদুল্লিাহে নাহমাদুহু অ নাস্তাঈনুহু..." আমাকে আবার কবিত্বশক্তি ফিরিয়ে দাও!

॥ ৬৩ ॥

লাল রঙের গাড়িটার ওপর পাতলা বরফ বিছিয়ে আছে। যেন একটা সাদা সিল্কের চাদর দিয়ে গাড়িটা ঢাকা। ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই বেশ ঘন তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে, এ বছর একেবারে সাদা ক্রিসমাস হবে,ম মাত্র আর দুদিন বাকি। চতুর্দিকে ছুটি ছুটি রব উঠে গেছে। বাতাস এমন নির্মল যে বড় একটা নিশ্বাস নিলে মনে হয় যেন বুকটা জুড়িয়ে গেল।

পায়ে গ্যালশ, অর্থাৎ গামবুট, ভারি ওভারকোটটার কলার তুলে দেওয়া, কান ঢাকা টুপি, হাতে একটা বেলচা নিয়ে বরফ পরিষ্কার করছে অতীন। রাস্তার বরফ সাফ করার ভার মিউনিসিপ্যালিটির, বাড়ির সামনের ড্রাইভওয়ে পরিষ্কার করার দায়িত্ব সত্যদা এক একদিন এক একজন ভাড়াটেকে ভাগ করে দিয়েছেন। অতীন ভোরে উঠতে পারে না। নির্দিষ্ট দিনগুলিতে শর্মিলা তাকে ফোন করে জাগিয়ে দেয়। এই মাসেই অতীনের নিজস্ব টেলিফোন এসেছে।

রাস্তার দু'ধারের গাছগুলিতে ঝুলন্ত সরু সরু বরফের অজস্র সোনাঝুরি, সকালের রোদে ঝলমল করছে সব কিছু। আকাশ এখন পরিষ্কার, কিন্তু কখন যে হঠাৎ আবার তুষারপাত শুরু হবে, তার কোনো ঠিক নেই।

গাড়ির ভেতরে ঢুকে হিটার চালিয়ে দেবার একটু পরেই গাড়িটা গরম হয়ে গলির দিল তুষারের আবরণ, বেশ নিজে নিজেই ধোয়া হয়ে গেল। এক টুকরো ফ্লানেল দিয়ে অতীন আদর করে মুছতে লাগলো গাড়িটাকে। এর মধ্যেই গাড়িটা তার খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে, থার্ড হ্যাণ্ড গাড়ি। কিন্তু এর মধ্যে একদিনও গড়বড় করেনি। নিউ ইয়র্কে বেকার থাকার সময় অতীন যাকে চিঠি লিখেছিল যে সে একটা লাল রঙের গাড়ি কিনেছে। তখন গাড়ি কেনা দূরে থাক, টিউব ট্রেনের টিকিট কাটার জন্যই তাকে পয়সা ধার করতে হতো সিদ্ধার্থর কাছে। এতদিন পর অতীন যে গাড়িটা কিনলো, সেটার রং সত্যিই লাল।

নিছক শখে কেনেনি, গাড়িটা অতীনের কাছে এখন জামা-জুতোর মতনই প্রয়োজনীয় জিনিস। বাড়ি থেকে তার অফিস এগারো মাইল দূরে, বাসে বা ট্রেনে প্রতিদিন যাতায়াত করতে যা খরচ পড়ে তার চেয়ে গাড়ির খরচ কম। তা ছাড়া প্রতিদিন সময় বাঁচে। টিউব স্টেশন থেকে তার অফিস প্রায় পনেরো মিটি হাঁটার দূরত্বে।

চাকরি পাওয়ার জন্য অতীনের কোনো চেষ্টাই করতে হয়নি, এমনকি একটা দরখাস্তও লিখতে হলেও না। ইউনিভার্সিটিতেই বিভিন্ন বড় বড় কম্পানির প্রতিনিধিরা আসে, পি-এইচ ডি-র ছাত্রছাত্রীরা কে কীরকম কাজ করছে তার খবরাখবর নেয়। তিনটি কম্পানির প্রতিনিধির কাছ থেকে চাকরির প্রস্তাব

পেয়েছিল অতীন, তাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে খেতে সে চাকরির শর্তাদি আলোচনা করেছে। সেই সময় তার মনে পড়ছিল, নিউ ইয়র্কের এক হোটেলের সুইমিং পুলে এক ব্যাটা সাহেবের সঙ্গে ইন্টারভিউ দেবার কথা। কত অপমান সহ্য করতে হয়েছে সেসব দিনগুলিতে। সিদ্ধার্থর সুট ধার করে পরে যেত, নিখুঁতভাবে বাঁধতো টাইয়ের গিট। আর এখন টাই-ফাইয়ের বালাই নেই, জিন্‌স আর পার্কা পরেই সে লাঞ্চ খেতে গেছে। এখন তার গায়ে একটা নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পি-এইচ ডি শেস করেই তার দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল না! চাকরিটা নেবার আগে দিন তিনেক অতীন খুব মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে মুখ ভ্যাংচাতো। শর্মিলা তাকে বুঝিয়েছে। শর্মিলা সেই কয়েকটা দিন প্রায় সর্বক্ষণ তার সঙ্গে ছিল। এখনো অতীনের ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, জোর করে দেশে ফেরা মানে আত্মহত্যার সমান। অতীনের বাবা-মাও তাকে ফেরার কথা একবারও লেখেন না।

সোমেনের কাছে এসে উটেছে তার মামতো ভাই শরীক, সে দস্য পাশ কের এসেছে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। তার কাছ থেকে পশ্চিবাংলার রাজনীতির অবস্থা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। নকশালপন্থীরা এখন যাকে বলে অন্য দা রান। বড় নেতাদের মধ্যে এখনও একমাত্র চারু মজুমদারই ধরা পড়েননি। কানু সান্যাল, সুশীতল রায় চৌধুরী, অসীম চ্যাটার্জী চারুবাবুর নীতির বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন জেলে বসেই, খতম আন্দোলনকে এখন বলা হচ্ছে ভুল, মাও সে তুং খতম বলতে খুন বোঝাননি, নতুন ব্যাখ্যায় খতম মানে নিস্ত্রীকরণ, ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। অর্থাৎ যাকে ইচ্ছে তাকে খুন করাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু বড় দেরিতে এসেছে এই উপলব্ধি। এখন চলেছে খুনের বদলা খুনের পালা। সি পি এমের ছেলেরা ঠিক করেছে, তাদের একজন খুন হলে প্রতিশোধ হিসেবে তিনজন নকশালকে শেষ করে দেওয়া হবে। কংগ্রেসের ছেলো এক একটা পাড়া ধরে নকাশাল ছেলেদের খুঁজে বার করে প্রকাশ্যে হত্যা করছে। পুলিশও মারছে নির্বিচারে। এখন যে সব ছেলেমেয়ের গায়ে সামান্য নকশাল গন্ধ আছে, তাদেরই জীবন বিপন্ন।

অতীনের তুলনায় শমীকের বয়েস কম, কিন্তু সে অতীন মুজমদারের নাম জানেআতীন ঠিক নেতা ছিল না, তবু বিভিন্ন পোষ্টারে ও দেওয়াল লিখনে নাকি তার নামে লাল সেলাম জানানো হয়েছে। অনেকের ধারণা অতীন মজুমদার মৃত, কুর কারুর ধারণা সে নিরুদ্দিষ্ট। এই সময় অতীন মজুমদার দেশে ফিরলে তাকে ফুলের মালা কিংবা লাল সেলাম দিয়ে সংবর্ধনা জানাবার জন্য কেউ থাকবে না। বরং তার জন্য অপেক্ষা করবে ছুরি, বন্দুক অথবা জেলের দরজা।

অতীন তার সাইকেলটা শমীককে দিয়ে দিয়েছে। ছাত্র অবস্থায় সাইকেল নিয়ে ঘোরা যায়। কিন্তু সাইকের চেপে রোজ অফিস যাওয়া যায় না। তা চাড়া রোজ বাইশ মাইল সাইকেল চালানো কি চাট্টিখানি কথা! আসলে গাড়ি কেনার ব্যাপারে অতীনের একটা লজ্জাবোধ আছে, সেইজন্য সে মনে মনে প্রায়ই এই যুক্তিগুলো আওড়ায়। গাড়িটার দাম সে শোধ করে দিয়েছে এই মাসেই, এটা এখন তার নিজস্ব গাড়ি, এর মেধ্যই গাড়িটা তার খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। দেখে কেউ চট করে বুঝতে পারবে না যে এটা পুরোনো গাড়ি।

এই ছুটিতে প্রথম সে গাড়িটা নিয়ে লং ড্রাইভে যাবে। সিদ্ধার্থ ক্রিসমাসের ছুটিটা একসঙ্গে কাটাবার জন্য নেমন্তন্ন করেছে অতীনদের। প্রথমে দুদিন থাকা হবে নিউ ইয়র্কে, তারপর বাফেলো। পাঁচুদা-মান্তা বউদিরা এখন বাফেলোতে আছেন। ওঁদের ওখানে নিউ ইয়ার্স ইভের বিরাট পার্টি। মাঝখানে ওরা নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখে ঘুরে আসবে টরোন্টো। এতদিন হয়ে গেল, অতীন আমেরিকার কোথাও বেড়াতে যায়নি, কিছুই প্রায় দেখেনি। শর্মিলার মামাতো বোন সুমিও যাবে সঙ্গে, মেরিল্যাণ্ড থেকে অলিকে তুলে নেওয়া হবে।

ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই সবাই জিজ্ঞেস করে, ছুটিতে কোথায় যাচ্ছো? এদেশে অনেকেই প্রায় প্রতি উইক এণ্ডে বাইরে যায়, আর ক্রিসমাসের লম্বা ছুটিতে চতুর্দিকে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। দেশে পুজোর ছুটির মতন। অতীনের মনে পড়ে প্রত্যেক পুজোর ছুটিতে বাড়িসুদ্ধু সকলে মিলে দেওঘরে যাওয়া হতো। শুধু দেওঘরেই প্রত্যেকবার। আর কোথাও না। কারণ দেওঘরে ঠাকুমা থাকতেন। দাদার মৃত্যুর পর আর যাওয়া হয়নি। একটি মৃত্যু বদলে দিয়েছিল অনেক কিছু।

এদেশে ট্রেনে তেমন ভিড় হয় না, সবাই বেরিয়ে পড়ে গাড়ি নিয়ে। শর্মিলা প্রতিজ্ঞা করিয়ে

নিয়েছে, অতীন মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে পারবে না। গত বছর ক্রিসমাস থেকে নিউ ইয়ার্স ডে-র মধ্যে সাড়ে পাঁচ শো লোক গোটা অ্যামেরিকায় মারা গিয়েছিল শুধু গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে। নিজে মদ না খেলেও অন্য মাতালরা গাড়িতে এসে ধাক্কা মারতে পারে, সে ঝুঁকি তো রয়েছেই।

গাড়িটা মুছে পরিষ্কার করে অতীন দোতলায় উঠে এসে ব্রেক ফাস্ট বানাতে লাগলো। দুটো ডিম সেদ্ধ, খানিকটা স্যালামি, চারখানা টোস্ট, দু কাপ কালো কফি। কফির সঙ্গে আবার একটুকরো কেক। সকালবেলাটায় অতীন বেশি করে খেয়ে নেয়, দুপুরে সে লাঞ্চ খায় না, তাতে শরীরটা ঝরঝরে থাকে, মাঝে মাঝে চা খায়, তার সঙ্গে বড় জোর একটা স্যাণ্ডউইচ। নতুন চাকরিতে ঢুকেই অতীনকে খুব খাটতে হেঃ প্রথম থেকেই তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে ল্যাবে। এই ওষুধ কম্পানির নিজস্ব রিসার্চ ল্যাব তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বড়।

রাত্তিরের খাওয়াটা সে আর শর্মিলা একসঙ্গে খায়। হয় কোনো রেস্তোরাঁয়, অথবা শর্মিলা রান্না করে। এখন সুমির সঙ্গেও অতীনের বেশ ভাব হয়ে গেছে, সুমির রান্নার হাত শর্মিলার চেয়ে অনেক ভারো, অবশ্য সুমি প্রায় সন্ধেতেই বাড়ি থাকে না, সে একটি মারাঠী ছেলের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে।

অফিস থেকে অতীন আর নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফেরে না, সোজা শর্মিলাদের ওখানে চলে যায়। ওখানে স্নান করে। শর্মিলা টি ভি আসক্ত, দুটো সিরিয়াল সে কিছুতেই মিস করে ান। 'ডালাস' থাকলে শর্মিলা কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরুবে না, রান্না করতে টি ভি দেখবে।

আজ শর্মিলা কিছু কেনাকাটি করবে বলে রেখেছে, আজ বাইরে খাওয়া। শর্মিলাদের বাড়ির সামনেটা বরফে ঢাকা। এ বাড়িতে প্রায় শুধু মেয়েরাই থাকে, এরা বরফ পরিষ্কার করে না। গাড়িটা রাস্তায় পার্ক করে অতীন দৌড়ে এসে পর্চে উঠলো, তারপর পা ঠুকে বরফ ঝাড়তে লাগলো। এর মধ্যেই মাইনাস টেন, তাপমাত্রা রোজই নামছে। একটু আগে ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হয়েছে।

দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো সুমি। গলার কাছে ফার লাগনো একটা সুন্দর নীল রঙের ওভারকোট পরেছে, চুল বাঁধারও কী যেন একটা কায়দা করেছে নতুন ধরনে। সুমির নতুন বন্ধু ভিজেয় শাঠে ভালো ছবি আঁকে, সে সুমির একটা বড় পোট্রেট আঁকছে কয়েকদিন ধরে।

হাই বলে সুমি এদেশী কায়দায় অতীনের গালে ঠোঁটে ছোঁয়ালো, তারপর বললো, তুমি যেই এলে, অমনি স্নো পড়তে শুরু করলো!

অতীন বললো, একটু স্নোর মধ্যে হাঁটলে তোমার গালটা আরও লালচে দেখাবে। তোমায় পৌছে দিয়ে আসবো, সুমি?

সুমি বললো, নতুন গাড়ি, তাই সবাইকে তুমি লিফট দিচ্ছো, না? আজ আমার দরকার নেই। তোমরা কপোত-কপোতী নিরিবিলিতে থেকো, আমি দশটার পর ফিরবো!

অতীন তবু বললো, শর্মিলা তো শপিং করবে, আমরা এক্ষুনি বেরুবো। তোমাকে বিজয়ের ওখানে নামিয়ে দিতে পারি।

এ কথার উত্তর না দিয়ে সুমি অতীনের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, এইবার বুঝবে মজা!

তারপর সে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটে গেল।

অতীন একটু হকচকিয়ে গেল, সুমির কথাটার মানে সে বুঝতে পারলো না। কিসের জন্য মজা বুঝবে? চাকরিটা ভালো পেয়েছে বলে? সে তো দু মাস হয়ে গেল।

ওপরে উঠে এসে দেখলো, শর্মিলা এখনো বেরুবার জন্য তৈরি হয়নি। বিছানার ওপর একটা বই খোলা, টি ভিও চলছে, শর্মিলা পরে আছে একটা পাতলা হাউসকোট। অতীনকে দরজা খুলে দিয়ে সে আবার বিছানায় গিয়ে বসে পড়লো।

অতীন ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো, এ কী তুমি দোকানে যাবে না?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শর্মিলা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো অতীনের দিকে। যেন সে অতীনকে নতুন দেখছে। অতীন মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী? তা ও কোনো উত্তর নেই। এক একটা দিন মেয়েরা এরকম রহস্যময়ী হয়ে যায়, তাদের ভাবভঙ্গি কিছুই বোঝা যায় না।

ওভারকোটটা খুলে অতীন একটা চেয়ারের ওপর রাখলো। তারপর জ্যাকেট, সোয়াটারও খুলতে লাগলো। ঘরের ভেতরটা বেশ গরম হয়ে আছে, শর্মিলাদের বাড়িটা পুরানো আমলের। প্রত্যেক ঘরে ফায়ার প্লেস রয়েছে, সেখানে অব কাঠের আগুন জ্বলে না, একটা ইলেকট্রিক হীটার গনগন করছে।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অতীন আবার জিজ্ঞেস করলো, তোমার শরীর খারাপ?

শর্মিলা বললো, বাবলু, আমার পাশেএসে একটু বসো।

জুতোটা খুলে অতীন শর্মিলার পাশে এসে শুয়ে পড়ে বললো, কী ব্যাপার! আজ আর বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না? দ্যাটস্ ফাইন ফর মি।

শর্মিলা বললো, বাবলু, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই?

শর্মিলাকে চুমু খেতে গিয়েও থেমে গেলে অতীন। কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে শর্মিলার চোখমুখ দেখলো, কোনো অসুস্থতার লক্ষণ তার চোখে পড়লো না। শর্মিলার চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে।

সে গম্ভীর গলায় বললো, মরে গেলে আর কী হবে, হারিয়ে যাবে! হঠাৎ মরার শখ হলো কেন?

আবার কোনো উত্তর না দিয়ে অতীনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো শর্মিলা। অতীনের মুখে চেপে রইলো মুখখানা। এরকম সময় কী কথা বলতে হয় অতীন জানে না তার ইচ্ছে করছে খুব কষ্টে একটা ধমক লাগাতে। কিন্তু অতীন একটু জোরে কথা বললেই শর্মিলা তাকে বলে মেল শোভেনিস্ট। আর একবার যদি শর্মিলা অভিমান করে, তা হলে সেই অভিমান ভাঙাতে অতীনের তিন-চারদিন লেগে যাবে। সে চুপ করে থেকে শর্মিলার পিঠে হাত বোলাতে লাগলো।

একটু পরে শর্মিলা ধড়মড় করে উঠে পড়ে চলে গেল বাথরুমে। অতীন চিৎ হয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরালো। এ সব কি হেঁয়ালি হচ্ছে, সে কিছুই ধরতে পারছে না। পুরুষরা এরকম পারে না, তারা তাদের প্রত্যেকটি আচরণের একটা না একটা ব্যাখা দিয়ে যায় সব সময়। ভুল বা মিথ্যে হলেও একটা কিছু যুক্তি সাজাবার চেষ্টা থাকে। হয়তো সামান্য কোনো ব্যাপার নিয়ে শর্মিলার মন খারাপ হয়েছে। অতীন তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো, তার ব্যবহারে কোনো ত্রুটি হয়েছে কি না। আজ সকালেও শর্মিলার সঙ্গে টেলিফোনে গল্প হয়েছে, তখন সে ভালো মেজাজেই ছিল। অবশ্য, কখনো কখনো দু তিনদিন, বা কয়েক সপ্তাহ আগের কোনো ঘটনা মনে পড়ে যাওয়াতেও শর্মিলা ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

হঠাৎ অতীনের কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। অলি কি কিছু বলেছে? অলির সঙ্গে শর্মিলার প্রায়ই টেলিফোনে কথা হয়, ওদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব।

অতীনের মুখখানা কুঁচকে গেল। সে এক হাতের আঙুল চালাতে লাগলো চুলের মধ্যে। বাথরুমে অবিরাম কলের জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। কল খুলে রেখে কি শর্মিলা চুপ করে বসে আছে?

যখনই কোনো পরিস্থিতিতে অতীন বুঝতে পারে না যে তার কী করা উচিত, তখনই সে রেগে যায়। মাথা ঠান্ডা করে সিদ্ধান্ত সে নিতে পারে না। একবার সে ভাবলো, এক্ষুনি লাফিয়ে উঠে বাথরুমে দরজায় দুম দাম করে ধাক্কা মেরে বলবে, এসব কি ন্যাকামি হচ্ছে? আমি অফিস থেকে খেটেখুটে ফিরছি, বরফ ভরা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসতে হয়েছে, তারপরেও তোমাকে দোকানে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি আছি, খিদেয় পেট জ্বলছে, তবু তুমি আমার দিকে মনোযোগ না দিয়ে নিছক ভাবালুতা করে যাচ্ছো? তোমার যদি রাগ বা দুঃখের কারণ কিছু ঘটে থাকে, তা হলে আমাকে সেটা পরিষ্কার খুলে বলো!

অতীন বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেই শর্মিলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। অনেকটা স্বাভাবিক গলায় বললো, চলো, বেরোই। কয়েকটা জিনিস কিনতেই হবে।

শর্মিলা পোশাক বদলাতে লাগলো, অতীন ওদের রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ খুলে খানিকটা আগের দিনের ডাল, একটু খানি স্প্যাগেটি-চিংড়ি এই সব লেফট ওভার খেয়ে মেটালো খিদে। একটা বীয়ারের ক্যান খুলে চুমুক দিল।

নিচে নেমে এসে, গাড়িতে বসে উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার করতে করতে অতীন জিজ্ঞেস করলো, এবার জানতে পারি কি মহারানীর আজ কী জন্য মেজাজ খারাপ?

শর্মিলা তার নরম হাতে অতীনের গালটা ছুঁয়ে বললো, বাবলু, তোমাকে আমি ভীষণ ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি! কিন্তু তোমাকে না জানিয়ে আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি।

–কী সেটা?

–সেটা আমি তোমাকে কিছুতেই বলতে পারছিনা। প্লিজ, ডোন্ট্ ইনসিস্ট। পরে একদিন বলবো। অন্তত দু-একদিন পরে। এই, তুমি সীট বেল্ট বাঁধোনি?

–তুমিও বেঁধে নাও।

অতীন গাড়ি ঘোরালো ডাউন টাউনের দিকে। তুষারপাত থামেনি, তবু রাস্তায় অনেক মানুষ। দোমানগুলোতে চাঁদের হাট বসে গেছে। এত আলো যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কোনো কোনো দোকানের সামনে জ্যান্ত সান্টাক্লজকে ঘিরে মজা করছে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা।

অতীনের কাঁধে মাথা হেলিয়ে দিয়েছে শর্মিলা। অতীন একটা ব্যাপার স্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে। অলি নয়, অলি কিছু বলেনি। শর্মিলাটা একেবারে পাগলী, নিশ্চয়ই অতি তুচ্ছ কোনো ব্যাপারকে সে অন্যায় বলে ভাবছে। এইরকম সূক্ষ্ম-অনুভূতিপরায়ণতার জন্যই শর্মিলাকে তার বেশী ভালো লাগে। অলির সঙ্গে এই দিকে দিয়ে তার খুব মিল।

শর্মিলা আপন মনে বলে উঠলো, খুব মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে একবার। আমি আমার মায়ের কাছে আজ পর্যন্ত কোনো কথা গোপন করিনি। মা তোমার কথাও সব জানে। কিন্তু এ কথাটা মাকে কী করে বলবো!

–কোন কথাটা?

–টেলিফোনেও বলা যাবে না। দেশে ফিরে, মার পাশে শুয়ে রাত্তিরবেলা চুপি চুপি বলতে হবে। মা ঠিক বুঝবে, রাগ করবে না।

–তা হলে একবার দেশে ঘুরে এসো। এই সেপ্টেম্বরে তোমার রিসার্চ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ছ সপ্তাহ ঘুরে এলে ক্ষতি কী?

–ড্যাট! তোমাকে ছেড়ে আমি দেশে যাবো? তোমাকে ছেড়ে আমি আর একদিনও থাকতে পারবো না। যদি হঠাৎ মরে যাই, তুমি আমার পাশে থাকবে।

–আবার ওইসব বাজে কথা! শোনো, লেটস্ বী প্র্যাকটিক্যাল। আমার দেশে ফেরার অসুবিধে আছে। কিন্তু, তুমি কেন যাবে না? পাঁচ-ছ সপ্তাহের জন্য ঘুরে এসো!

–কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমার একার যাওয়ার। যাক গে, ওসব কথা থাক। নিউ ইয়র্ক যাওয়ার প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গেছে? সিদ্ধার্থর সঙ্গে আর কথা হয়েছে কিছু?

–হ্যাঁ, আজ ও অফিসে টেলিফোন করেছিল। খুকু, ক্রিসমাসে তো আমরা বেড়াতে যাচ্ছিই একসঙ্গে। তারপর জানুয়ারি মাসটা তুমি দেশে ঘুরে আসতে পারো। নো প্রবলেম। কালকেই আমি একটা সীট রিজার্ভেশন করিয়ে রাখতে পারি। টাকার জন্য আটকাবে না। মায়ের জন্য তোমার মন কেমন করছে---

–আমি দেশে যাবো না। হ্যাঁ, নিউ ইয়র্ক আমরা সবাই মিলে কি সিদ্ধার্থর ওখানেই থাকবো? এতজন মিলে যাচ্ছি। তুমির সঙ্গে ভিজেয়-ও যেত পারে।

–সিদ্ধার্থ সেসব ব্যবস্থা করবে।

–অলিকে বলে রেখেছো? কখন স্টার্ট করা হবে, অলি জানে?

–তুমি আজ রাত্তিরে ফোন করে বলে দিও।

–কেন, তুমি ফোন করতে পারো না? আমিই তো অলির সঙ্গে বেশির ভাগ দিন কথা বলি। এটা তোমারই জানানো উচিত। আমি কিন্তু এক সপ্তাহ অলিকে ফোন করতে পারিনি। অলি নিজে থেকে একবারও ফোন করে না।

–তুমি মাকে কিছু জানাতে চাও, অথচ দেশেও ফিরতে চাও না, আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না, খুকু।

–ওই জুতোর দোকানটার সামনে একটু দাঁড়াবে, প্লীজ!

গাড়ির পার্ক করতে জায়গা খুঁজে পাওয়া একটা বিরাট সমস্যা। অতীন নামে না, সে প্যারালাল পার্কিং করে গাড়িতেই বসে থাকে। পুলিশ এসে তাড়া দিলে সে আস্তে আস্তে চালাতে শুরু করে, আবার ঘুরে সেখানেই আসে। দোকানে কেনাকাটি করতে সে পছন্দ ও করে না।

তিনটি দোকান ঘোরার পর ওরা একটা চীনে রেস্তোরায় খেতে ঢুকলো। পুরানো প্লাজার পেছনে দিকে এই দোকানটা বেশ নিরিবিলি, দুটি বুড়ি এটা চালায়, অতীনদের দেখলে চেনা সুরে কথা বলে।

ঢুকেই ডানদিকের টেবিলে বসে আছে সুমি আর ভিজেয়, আরও দু-একজন যুবক-যুবতী। অতীন থমকে দাঁড়ালো। সে শর্মিলাকে নিয়ে নিরালায় কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু এড়াবার উপায় নেই, ভিজেয় দারুণ আড্ডাবাজ ধরনের। সে উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে বললো, হাই। ইধার আও। কাম অ্যান্ড জয়েন আস।

দুটো টেবিল জুড়ে বসার ব্যবস্থা হলো। এক ক্যারাফে লাল মদ এলো। অন্য ছেলেমেয়ে দুটিও মহারাষ্ট্রীয়, বেশ প্রাণবন্ত, শর্মিলার সঙ্গে তারা গল্প জমিয়ে দিল, কিন্তু অতীন কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হতে পারছে না।

খাওয়া দাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সুমি উঠে গেল ওয়াশরুমে। এদের ওই সব জায়গা বেসমেন্টে, একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে হয়। একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অতীনও উঠে গেল, সিঁড়ি দিয়েনেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আয়নার সামনে। সুমি টয়লেট থেকে বেরুতেই অতীন ঘুরে দাঁড়িয়ে খানিকটা রুক্ষ গলায় বললো, তোমরা দুজনে আমার সঙ্গে চালাকি করছো কেন?

সুমি বললো, আমি? কী করেছি?

অতীন বললো, তুমি তখন আমাকে বললে কেন মজা বুঝবে? কী হয়েছে?

সুমি হাসি মুখে বললো, ও সেটা ভুল বলেছি । অ্যাকচুয়ালি ইউ আর আ ভেরি আনলাকি গাই! এর মধ্যেই বাঁধা পড়ে গেলে। সেজদি কিছু বলেনি তোমাকে?

–হেঁয়ালি করছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। একবার বলছে দেশে ফিরে মায়ের সঙ্গে দেখা করা উচিত, আবার বলছে যাবে না। ব্যাপারটা কী?

–সেজদি মাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করে না। আমি অবশ্য বলেছি, এখন দেশে না ফেরাই ভাল। পরে এক সময় বললেই হবে।

–বলবার মতন ব্যাপারটা কী, সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না।

দু'তিনটে পেপার ন্যাপকিনে হাত মুছে সুমি নগ্ন কোমরের কাছ থেকে ছোট রুমালটা বার করে এনে মুখ মুছলো। তারপর বললো, সেজদি কি নিজের মুখে তোমাকে বিয়ের কথা বলবে! তুমি আর কতদিন দেরি করবে?

–বিয়ে!

–বাবলুদা, তুমি আঁতকে উঠলে মনে হচ্ছে। বিয়ে কথাটা কখনো শোনেনি? নাকি তুমি বিয়ে নামের ইনস্টিটিউশানে বিশ্বাস করো না?

–আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হবার কী আছে!

–আমার মত যদি শোনো, দু-এক মাসের মধ্যে তোমরা বিয়েটা সেরে নাও। এখানকার কমিউনিটি হলে অরেঞ্জ করা যেতে পারে, অনিল সাহনি আর দুর্গার তো ওইভাবেই বিয়ে হলো। এই ধকলটা কাটিয়ে উঠলেও এরপর সেজদির মনের ওপর খুব চাপ পড়বে ! আমার মতন তো নয়। সেজদি অনেক নরম মেয়ে!

–এই ধকল মানে!

–অ্যাবরশান করাবার পর মনের ওপর একটা চাপ পড়বে না?

কেউ যেন অন্ধকারে অতীনের মাথায় একটা ডান্ডা মেরেছে। অতীনের বোধশক্তি খানিকটা অবশ হয়ে গেল। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

সুমি খানিকটা বকুনির সুরে বললো, আ... ...কে কোনো প্রটেকশান নেবে না, কিছু না! সেজদি দু'মাস হলো কনসিভ করেছে, তার খোঁজে ... না?

একটি বিশুদ্ধ নির্বোধের মতন অতীন জিজ্ঞেস করলো, কনসিভ করেছে মানে?

অতীনের গায়ে একটা খোঁচা মেরে সুমি বললো, কী তখন থেকে মানে মানে করছো? কিছুই বোঝো না তুমি, ন্যাকা? সব ছেলেরাই এই রকম, নিজের দায়িত্বটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। যেন শুধু মেয়েদেরই দোষ। সেজদির দু মাস ধরে পীরিয়ড বন্ধ।

ছাব্বিশ বছর বয়েসের যুবকের তুলনায় অতীন সত্যিই এই সব ব্যাপার খুব কম জানে। সে মেয়েদের রূপ দেখে, শর্মিলার মনটাকেও সে বুঝবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নারী শরীরের কলকাজা

কিংবা জন্মরহস্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট। সে আবার সরল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, পীরিয়ড? তা বন্ধ হলে কী হয়?

সুমি বললো, ইউরিন টেস্টে পজিটিভ পাওয়া গেছে। এখন খুব তাড়াতাড়ি কিউরেট করিয়ে নিলে কোনো রিস্ক থাকবে না। ভাগ্যিস এটা লিগ্যাল হয়েছে কয়েক মাস আগে। না হলে কী ঝঞ্ঝাট হতো বলো তো? ইওরোপে যেতে হতো। ভিজেয়-র এক বন্ধু ডাক্তার, সে সব ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে, ক্রিসমাসের ছুটিটার পরেই।

শুনতে শুনতে অতীনের চোখ বিস্ফারিত হতে লাগলো। এতক্ষণে যেন মাথায় ব্যাপারটা ঢুকেছে। শর্মিলার গর্ভে এসেছে তার সন্তান। হঠাৎ একটা হিংস্র জানোয়ারের মতন সে সুমির কাঁধ চেপে ধরে বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, কিউরেট করা হবে মানে? মেরে ফেলবে? আঁ? কে বলেছে? কার এত সাহস? আঁ?

এক মধ্যবয়স্ক শ্বেতাঙ্গিনী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এই দৃশ্য দেখে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল, কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলো না। যেন একটি কালো বিদেশী যুবক তার সঙ্গিনীর গলা টিপেও মেরে ফেলে এই নিভৃত জায়গায়, তাতেও ওর কিছু যায় আসে না।

সুমি চাপা গলায় ধমক দিয়ে বললো, কী পাগলের মতন করছো। ছাড়ো।

অতীনের মুখখানা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে, জ্বলজ্বল করছে চোখ, সে আবার চেঁচিয়ে বললো, কেন আমাকে আগে এইসব বলোনি? কে বলেছে মেরে ফেলতে? খবর্দার!

সুমি তাকে বেশ জোরে এক ধাক্কা দিয়ে বললো, ছেলেমানুষী করো না, বাবলুদা! আগে বিয়ে করোনি কেন? এখন আর এ ছাড়া উপায় কী ? এই আর্লি স্টেজে অ্যাবরশান করালে ভয়ের কিছু নেই। এবার যাও, সেজদির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে একটা হাত ধরে বলো, আমি তোমার, কী যেন বলে, কী যেন কথাটা হ্যাঁ, পাণিপ্রার্থী।

সুমি ওপরে চলে যাবার পরেও অতীন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। তার মাথার মধ্যে সত্যি সত্যি একটা ঝড় বইছে। সে এখন অন্য মানুষ। সে একজনের পিতা। শর্মিলার সঙ্গে শারীরিক উন্মত্ততার সময় সে এই সম্ভাবনার কথা খেয়ালই করেনি।

ওপরে উঠে এসে সে শর্মিলার দিকে তাকিয়ে বললো, চলো, আমরা বাড়ি যাবো।

তারপর কোটের পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে কিছু ডলার রাখতে গেল টেবিলে। ভিজেয় তার হাত চেপে ধরে বললো, ইউ ওয়ান্ট টু স্টার্ট এ ফাইট.

এটা একটা চালু রসিকতা। কে বিল মেটাবে তা মারামারি করে জিতে ঠিক করতে হবে। অর্থাৎ যারা আগে থেকে বসে আছে, তারা তাদের টেবিলে অন্যদের ডাকলে সেই অতিথিদের দাম দিতে নেই।

শর্মিলা বললো, আর একটু বসি না। বাবলু, বসো

সুমি শর্মিলার দিকে চোখ টিপে ইঙ্গিত করলো। অতীন ততক্ষণে শর্মিলার হাত ধরে টানতে শুরু করেছে, শর্মিলা উঠে দাঁড়িয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিল।

রেস্তোরাঁর বাইরে পা দিয়েই অতীন চোখ গরম করে তাকিয়ে বললো, আমি তোমায় খুন করে ফেলবো! তুমি আমায় চেনো না!

শর্মিলা হেসে বললো, তোমাকে আমি ভালোই চিনি।

–তুমি আমাকে এসব কথা বলোনি কেন?

–আমি কী করে বলবো বলো তো? নিজেরই যে মাথাটা গুলিয়ে গেছে। সুমি ইউরিন টেস্ট করাতে বললো, তখনও আমি বিশ্বাস করিনি।

–তোমার সব কথা আমাকে বলার কথা ছিল না? ঐ যে পীরিয়ড না কি বন্ধ হয়ে গেছে

–ঐ কথাটা বলা যায় না। মেয়েরা বলতে পারে না। ঐটা বলার মানে হলো, আমি প্রেগনেন্ট হয়ে গেছি বাবলু, এবার তুমি আমাকে বিয়ে করো। এটা কি কোনো মেয়ে বলতে পারে?

–তুমি একদিন বলেছিলে দেশে ফিরে গিয়ে, মা-বাবাকে জানিয়ে বিয়ে করবে! আমি সেই কথাটাই ধরে বসে আছি। সেইজন্যই এখন বিয়ের কথা ভাবিনি।

–আমাদের দেশে ফেরার অসুবিধে। তাই অ্যাবরশান করাতে হবে।

যেন শর্মিলার হাতটা মুচড়ে ভেঙে দেবে, সেইভাবে আঁকড়ে ধরে অতীন গর্জন করে উঠলো, না! কিছুতেই না!

শর্মিলা কাতর ভাবে বললো, প্লীজ চেঁচিয়ো না, বাবলু। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ভয়ের কিছু নেই, বিশ্বাস করো!

অতীন গাড়ির দরজা খুলে শর্মিলাকে প্রায় ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললো, আমার বুঝি কোনো মতামত নেই? মাই চাইল্ড! আমি বলছি, ওসব চলবে না। আমরা এখানেই বিয়ে করবো, এই সপ্তাহে!

শর্মিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললো, আমার মাকে আগে না জানিয়ে আমি কী করে বিয়ে করবো? মা আমার কোনো কথায় আপত্তি করে না। আমি পারবো না, পারবো না। বাবলু, প্লীজ, প্লীজ।

এতক্ষণ রাগে গজরাচ্ছিল অতীন, এবার সেও হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। এমনভাবে সে জ্ঞান হবার পর আর কোনোদিন কাঁদেনি। কাঁদতে কাঁদতে সে মাথা ঠুকতে লাগলো স্টিয়ারিং হুইলে। শর্মিলার কান্না বন্ধ হয়ে গেল, সে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো অতীনের দিকে। তার রাগী, গোঁয়ার প্রেমিকটির এমন অসহায় শিশুর মতন গলার আওয়াজ সে কখনো শোনেনি।

সে অতীনের পিঠ ধরে থামাবার চেষ্টা করে বলতে লাগলো, এই, এই, কী করছো!

অতীন বললো, আমি এই গাড়িটা পুড়িয়ে ফেলবো। চাকরি ছেড়ে দেবো। তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা করবো না! কেউ আমাকে আর খুঁজে পাবে না! আমি একটা বাজে ছেলে, আমার বেঁচে থাকার কোনো মূল্য নেই! খুকু, তুমি ও আমাকে বুঝলে না!

শর্মিলা বললো, বাবলু, ওরকম করো না। তোমাকে ছেড়ে আমি একটা দিনও থাকতে পারি? সুমিত্রা বলছে, এই স্টেজে অ্যাবরশান করানোতে কোনো অসুবিধে নেই--

জলে ভেজা মুখখানি তুলে জন্ম দুঃখীর মতন গলায় অতীন বললো, খুকু , আমি একটা অপদার্থ! আমার জন্য আমার দাদা মরেছে! হ্যাঁ, আমারই জন্য, আমার দাদার মতন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে জলে ডুবে গেল! তারপর মানিকাদ বাঁচাবার জন্য একটা লোককে, হ্যাঁ, আমিই তাকে মেরেছি, এই হাত দিয়ে, আমি, আমি মানুষ মেরেছি। এরপর আমার সন্তানকেও মারবো? আমি সারা জীবন খুনী হয়ে থাকবো? আমার জীবনের তা হলে কী মূল্য রইলো?

শর্মিলা নিঃশব্দে হাত বোলাতে লাগলো অতীনের মুখে। তার আঙুলে এখন লেগে আছে স্নেহ।

একটু পরে সে বললো, আমিও কি মন থেকে সত্যিকারের চাই? আমার নিজেরও যে মরে যেতে ইচ্ছে করে, বাবলু! এসো, তা হলে আমরা দু'জনে একসঙ্গে মরে যাই?

খুব আগ্রহের সঙ্গে অতীন বললো, তাই করবে? ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে গ্যাস খুলে দিয়ে আমরা যদি ঘুমের ওষুধ খাই, কোনো কষ্ট হবে না----

শর্মিলা আচ্ছন্ন গলায় বললো, তুমি যদি চাও----

অতীন বললো, চলো, আজই! আমার ঘরে চলো।

শর্মিলা অতীনের বুকে মুখ রেখে বললো, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে থাকবো। তুমি যা বলবে----

শর্মিলা তলপেটে হাত রাখলো অতীন। আবার কান্নার তোড় এসে গেল তার চোখে। সে বললো, তা হলে এই বাচ্চাটাও মরে যাবে? আবার একজনকে মারবো? না, না, খুকু, আমি আর শুধু নিজেকেই মারতে পারি। তুমি থাকো। তুমি ওকে মেরো না।

শর্মিলা আস্তে আস্তে বললো, মাকে সব কিছু খুলে লিখলে মা বুঝবে। মা তোমার কথা জানে। লোকে যাই বলুক, আমরা এখানেই বিয়ে করতে পারি। প্রেগনেন্ট মেয়ের বিয়ে কি এ দেশে হয় না?

অতীন বললো, সিদ্ধার্থ সব ব্যবস্থা করে দিতে পারে। নিউ ইয়র্কে ওর অনেক চেনা শুনা আছে। আমরা নিউ ইয়র্কে গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে...

–এখন সব ছুটি...

–হোক ছুটি। জোর করে অফিস খোলাবো। না হলে নিউ ইয়ার্স ডে-র পর আরও দু চারদিন থেকে যাবো নিউ ইয়র্কে।

–তোমার মা-বাবাকে জানাবো না?

–এখন জানাবার সময় নেই। আই মীন , আমার মা-বাবার মতামত নেবার প্রশ্ন ওঠে না, ওঁদের

জানাবো নিশ্চয়ই---

দু'জনেই চোখের জল মুছে ফেললো। হঠাৎ যেন মনে হলো, সব বাধাগুলোই তুচ্ছ। লোকলজ্জাকে গুরুত দেবার কোনো মানেই হয় না। বাবা-মাকে আগে থেকে জানিয়ে কিংবা দেশে ফিরে গিয়েই যে বিয়ে করতে হবে, তারই বা কী মানে আছে? ওরা যথেষ্ট অ্যাডাল্ট এবং দু'জনের বাবা-মারই আপত্তি জানাবার কোনো প্রশ্ন নেই। এই সব অকিঞ্চিৎকর কথা ভেবে ওরা ভ্রূণহত্যা কিংবা আত্মহত্যা কিংবা মতন সাঙঘাতিক কান্ড করতে যাচ্ছিল! ওরা এত নির্বোধ!

দুরন্ত স্পীডে গাড়ি চালিয়ে অতীন ফিরে এলো নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। প্রথমেই ফোন করলো সিদ্ধার্থকে। রিং হয়ে গেল, কেউ ধরলো না। সিদ্ধার্থ বাড়িতে নেই।

অতীন বললো, সিদ্ধার্থর সঙ্গে তো কথা হয়েই আছে। ওকে কাল সকালে ঠিক পেয়ে যাবো।

শর্মিলা বললো, অলিকে জানিয়ে দাও। ও কখন রেডি হয়ে থাকবে...

অতীন একটু ইতস্তত করে বললো, হ্যাঁ, অলিকে জানাতে হবে। তুমি ওকে ফোনে বলে দিও।

শর্মিলা বললো, তুমি ওকে ফোন করো, বাবলু! এটা তোমারই বলা উচিত।

অতীন ফোনের বোতাম টিপলো। কিছুক্ষণ ইংরিজিতে কথা বলার পর ফোন রেখে দিয়ে আড়ষ্ট গলায় বললো, ব্যাপারটা কি হলো বুঝতে পারলাম না। সেই আর্টিস্ট মহিলা বললেন, অলি চলে গেছে। ইন্ডিয়ার ফিরে গেছে। তা কখনো হতে পারে?

শর্মিলা বললো, অলির ওই বাড়ি ছেড়ে ছেড়ে যাবার কথা ছিল। অন্য বাড়িতে উঠে গেছে?

অতীন বললো, ভদ্রমহিলা দু'তিনবার বললেন যে শী হ্যাজ লেফ্‌ট ফর ইন্ডিয়া। তা কখনো হতে পারে? মাত্র কয়েকমাস হলো এসেছে, এর মধ্যে ফিরে যাবে? তাও আমাদের না জানিয়ে?

শর্মিলা হিসেব করে বললো, আমার সঙ্গে অলির লাস্ট কবে কথা হয়েছিল? লাস্ট সোমবার? না, রবিবার, আট দিন আগে। সেদিনও আমায় কিছু বলেনি। আচ্ছা, পাপিয়াকে ফোন করে দ্যাখো তো!

পাপিয়া নামের একটি বাংলাদেশের মেয়ের সঙ্গে অলির পরিচয় হয়েছিল, সেও মেরিল্যান্ডে অলির বাড়ির কাছেই থাকে। তাকে শর্মিলাই ফোন করলো। পাপিয়া বেশ অবাক ভাবেই বললো যে অলি চারদিন আগে একটা চার্টার্ড ফ্লাইটে দেশে চলে গেছে। টিকিট কেটেছিল এক মাস আগে। জিনিসপত্র সব নিয়ে গেছে। সে আর ফিরবে না। সে যাবার আগে শর্মিলা-অতীনদের জানায়নি? এখানকার সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে সে।

শর্মিলা আর অতীন বেশ খানিকক্ষণ মুখোমুখি চেয়ে চুপ করে বসে রইলো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমি জানি না, শৌনক ছেলেটা কেমন। আশা করি সে অলির মতন একটা সরল, ভালো মেয়েকে দুঃখ দেবে না। অলি শৌনককে ছেড়ে থাকতে পারলো না। আমাদের না জানিয়ে চলে গেল। আমরা কি বাধা দিতাম? খুকু, তোমার কাছে আমার কোনো কিছুই গোপন নেই। শুধু একটা কথা বলিনি এতদিন। আজ না বললে অন্যায় হবে। একসময় অলির সঙ্গে আমার একটা সম্পর্কে ছিল।

মাটির দিকে চেয়ে শর্মিলা বললো, আমি জানি। তোমার দিকে অলির তাকানোর ভঙ্গি। ওর বিষন্ন মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা। এ সব দেখেই আমি বুঝেছি।

অতীন বললো, কিন্তু ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, মানে, কোনোদিন সেরকম কিছু , আই মীন, ফিজিক্যাল ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

শর্মিলা বললো, তাতে কিছু আসে যায় না। অলি তোমাকে ভালবাসে। ও তোমাকে দেখাবে জন্যই শুধু এদেশে এসেছিল। অলি আমার কথা কিছু জানতো না। আমি অলির কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিয়েছি!

অতীন জোর দিয়ে বললো, দ্যাট কোয়েশ্চেন ডাজ নট অ্যারাইজ অ্যাট অল। অলি আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি। শৌনকের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছে, সে কথাও নিজের মুখে স্বীকার করেছে আমার কাছে। বিশ্বাস করো! সে জন্য আমি অলিকে মোটেই দোষ দিই না। অলির সঙ্গে আমার যোগাযোগ রাখার কোনো উপায় ছিল না।

শর্মিলা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এবার যাই, বাবলু।

অতীন বিস্মিত ভাবে বললো, যাবে মানে, কোথায় যাবে?

শর্মিলা বললো, বাড়ি যাবো। আমাদের বোধ হয় আরও কিছুদিন ভেবে দেখা দরকার। অতীন এগিয়ে এসে শর্মিলার হাত ধরে বললো, আজ রাত্তিরটা তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শর্মিলা পাগলাটে গলায় বললো, যাষ্ট বিকজ আই আম প্রেগনেন্ট, সেজন্যই আমাকে তুমি বিয়ে করবে? ছিঃ! অলিকে কষ্ট দিয়েছি, সে কথা কি আমি সারাজীবন ভুলতে পারবো? আমার চেয়ে অলি অনেক ভালো মেয়ে। ওকে যেভাবেই হোক ফিরিয়ে আনো।

অতীন শর্মিলার দু'হাত আবার জোর করে ধরে রেখে বললো, তুমি ভুল করছো। আমার থেকেও শৌনকের জন্য অলির টান অনেক বেশি। সেইজন্য ও আমাকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি চলে গেল। অলির জীবনে আর আমি নেই। আমি ওকে আর ডিসটার্ব করতেও চাই না। খুকু, তুমিই আমার সব কিছু।

শর্মিলাকে টানতে টানতে এনে লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে অতীন তীব্র গলায় বললো, খুকু, তুমি শুধু এখন আমার প্রেমিকা নও। তুমি এখন মা। আমার সন্তানের মা।

ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, তার তো দেশে ফিরে যেতে কোনো বাধা থাকবে না কখনো। আমার যা হয় হোক। তবু আমাদের সেই বাচ্চাটা একদিন বড় হবে, দেশে ফিরে যাবে, একটা সুন্দর, সুস্থ জীবন গড়ে তুলবে। তার মধ্য দিয়ে আমি বাঁচবো। খুকু, ওকে বাঁচিয়ে রাখো, আমাকে বাঁচতে দাও।

দু'জনে কপালে কপাল ঠেকিয়ে আবার কাঁদতে লাগলো একসঙ্গে।

(উত্তরপর্ব সমাপ্ত)

উপসংহার

॥ ১ ॥

বিকেল শেষ হবার মুখে, সন্ধে নামবার আগে, এক একদিন আকাশ হঠাৎ ঝলমল করে ওঠে। অনেকটা বিশুদ্ধ দিনের ভোরবেলার মতন। সূর্য তখন বেশি উজ্জ্বল মনে হয়, কিন্তু তাপ কম, পাতলা পাতলা মেঘ ভেদ করে আকাশ-গঙ্গার মতন নেমে আসা আলোর রশ্মি খালি চোখেও দেখা যায়। যেন কোনো দৈব দৃশ্য। এ রকম সন্ধিকাল ক্বচিৎকখনো আসে বলেই তা বড় সুন্দর।

এমন বিকেলে বৃদ্ধ মানুষদের বাড়ির বাইরে বেরুনো ঠিক নয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে যেমন কোকিল ডাকে না, মাঘ মাসে যেমন শিউলি ফোটে না, হেমন্তকালে যেমন বাতাসের চাঞ্চল্য বন্ধ থাকে, সেই রকম মানুষের জীবনেও নানা ঋতুর পালাবদল মেনে নিতে হয়।

প্রতাপ মজুমদার এমন এক বিকেলেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আকাশ কিংবা প্রকৃতি দেখছিলেন না, তিনি লক্ষ করছিলেন পথের মানুষের স্রোত। বাড়ি ফাঁকা, একেবারেই ফাঁকা, তিনি যেন এক নিঃস্ব পরিত্যক্ত, তাঁর কেউ নেই! এ কথা সত্যি নয় অবশ্য। শহরের অনেক বাড়িই দুপুর-বিকেলে নির্জন, বা একজন-দুজন মহিলা, অতি শিশু, বা কাজের লোক থাকে, কিন্তু সন্ধের পরেও কেউ ফিরবে না, রাত্তিরেও কেউ আসবে না, এ রকম জানা থাকলে দুপুরবেলাটাও বড় শূণ্য মনে হয়। একাকিত্ব খুব ভারি হয়ে চেপে বসে। প্রতাপ আর সহ্য করতে পারছিলেন না।

লোকে আর তাঁকে প্রৌঢ় বলে না। পাড়ার ছেলেরা কাকাবাবুর বদলে এখন তাঁকে দাদু বলে ডাকে। প্রথাগত কারণে তিনি এখন বৃদ্ধ তো বটেই, কিন্তু তাঁর চেহারায় এখনও বার্ধক্যের তেমন ছাপ নেই। শরীর বেশ মজবুত, চামড়ার কুঞ্চন চোখে পড়ার মতন নয়, শুধু চুলগুলোই প্রায় সমস্ত সাদা হয়ে এসেছে। এক সময় এই বয়েসী বাঙালীবাবুরা ছড়ি ব্যবহার করতেন। উড়নি ও পাম্প শু-র মতন ছড়িও এখন প্রায় অন্তর্হিত, শুধু সাহিত্য-চলচ্চিত্র নাটকে তার রেশ রয়ে গেছে কিছুটা। ছায়াছবি ও মঞ্চে এখনো বয়স্ক বাবা ও অল্পবয়েসী ঠাকুরদাঁরা ধুতি-পাঞ্জাবী, কাঁধে চাদর ও রূপো বাঁধানো ছড়ি হাতে আবির্ভূত হন। প্রতাপ সাধারণত ট্রাউজার্স ও হাওয়াই শার্ট পরেন, হাতে ছড়ি নেবার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আজকালকার ছেলেদের মতন তিনি প্যান্টের সঙ্গে চটি পরতে পারেন না, মোজা ও ফিতে বাঁধা জুতো এবং কোমরে বেল্ট ছাড়া রাস্তায় বেরুলে তাঁর কী রকম যেন গ্লানি বোধ হয়।

তাঁকে বৃদ্ধদের দলে ঠেলে দেবার প্রধান কারণ এই যে তিনি চাকরি থেকে পাকাপাকিভাবে অবসর নিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে।

ব্রিটিশ আমলের তাড়াহুড়ো করা জোড়াতালি দিয়ে তৈরি এই শহরে পচন ধরতে শুরু করেছে বেশ কিছুদিন যাবৎ। ভিত্‌ শক্ত ছিল না বলেই ওপরটা নড়বড় করতে শুরু করেছে তাড়াতাড়ি। রাস্তাগুলি যেখানে সেখানে ধসে পড়ছে যখন তখন, পুরনো অট্টালিকাগুলোকে এখন কুৎসিত মনে হয়, পরিকল্পনাবিহীন নতুন সৌধগুলি আরও উৎকট, ইংরেজিতে যাকে বলে মন্‌সট্রসিটি। মাঝে মাঝে এ শহরের দু-একটি অঙ্গে একটু আধটু পলেস্তারা বুলিয়ে সুন্দর করার চেষ্টা হয়, কিন্তু তা যেন অকালে বুড়িয়ে যাওয়া বারবনিতার মুখে রুজ পাউডার মাখার মতন। মনে মনে এই উপমাটা প্রতাপ মজুমদারেরই। তাঁর যে বেশ্যাদের, যুবতী বা বৃদ্ধা যাই-ই হোক, সে রকমভাবে দেখার অভিজ্ঞতা আছে তো নয়, নিছক একটা তুলনা। প্যারিস কোনো শিল্পীর আঁকা এ রকম এক করুণ রূপোপজীবীনীর ছবি তিনি দেখেছিলেন বটে, ছবিটা মনের মধ্যে ছাপ ফেলে আছে। শিল্পীর নাম মনে নেই।

শহরের চেয়েও শহরতলি অঞ্চল আরও কদর্য। বন্যার পর জল সরে গেলে যেমন থিকথিকে নোংরা কাদায় হাজার রকম আবর্জনা ছড়িয়ে থাকে। দেশ বিভাগের পরবর্তী বছরগুলিতে কলকাতা শহরের দিকে মানুষের বন্যা ধেয়ে এসেছিল, দেশ বিভাগের সেই স্মৃতি এখন অনেকের মন থেকেই মুছে গেছে; কিন্তু চতুর্দিকে এখনো ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের অস্থায়ী আস্তানা। হোগলার ঘর সরে গিয়ে এখন টিন বা টালির ছাদ হয়েছে, একতলা-দোতলা বাড়িও উঠেছে প্রচুর, তা হলেও এর কোনোটাই যেন এখনো পুরোপুরি গৃহ নয়, নিছক মাথা গোঁজার জায়গা, এর সঙ্গে জড়িয়ে যায়নি বংশানুক্রমিক মমতা।

শহরতলির কলোনি সম্পর্কেই প্রতাপের এ রকম বিরাগ, মানুষ সম্পর্কে নয়। তিনি মানুষ সম্পর্কে

সব সময় কৌতূহলী। জুয়াড়ী যেমন সর্বক্ষণ লাভ-লোকসানের কথা চিন্তা করে, তিনিও সেরকম মানুষের জীবনের উত্থান-পতন লক্ষ করে আনন্দ পান। অতি অসহনীয় অবস্থার মধ্যেও যেসব মানুষ যুদ্ধ করে খানিকটা ওপরে উঠতে চায়, তিনি শ্রদ্ধা করেন সেইসব মানুষকে।

প্রতাপদের বাড়িও শহরতলিতে, তাঁর নিজের খুব একটা ইচ্ছে ছিল না, মমতার সনির্বন্ধ অনুরোধ বা গঞ্জনা বা কটূক্তি, অর্থাৎ আদেশেই তিনি তাঁর প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রায় সব টাকা দিয়ে এই ছোটবাড়িটি বানিয়েছেন। জীবনের বহু বছরই তিনি কাটিয়েছেন বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে এবং সেটাই তাঁর পছন্দ ছিল। যাযাবর পুরুষদের বোধহয় মেয়েরাই থিতু করিয়েছে শেষ পর্যন্ত। সমবয়েসীদের কাছে রঙ্গচ্ছলে প্রতাপ বলেন,দ্যাখো ভাই, আমেরিকা-রাশিয়ায় শান্তি চুক্তি হওয়া উচিত কিনা কিংবা ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সংসারে আমার মতামতটাই প্রধান। কিন্তু আমার রোজগারের টাকা কী ভাবে খরচ হবে কিংবা ধোপা আসেনি বলে কয়েকটা রাত বিনা মশারিতেই শুতে হবে কিনা, এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন আমার স্ত্রী।

বাড়িটি সাদা রঙের দোতলা। যাদবপুর বাস ডিপো ছাড়িয়ে সামান্য দূরে। কারুকে বাড়ির অবস্থান বোঝাতে গেলে প্রতাপ মজুমদার বলেন, কৃষ্ণ গ্লাস ফ্যাক্টরী পার হয়ে একটুখানি গেলেই ডানদিকে দেখবে দশ ফুট চওড়া একটা গলি, সেখানে তিনটে বাড়ি বাদ দিয়ে...। রাজভবন থেকে মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের জার্নি। --- অবশ্য মাঝপথে জ্যাম থাকলে কতক্ষণ সময় লাগবে সে কথা তিনি উল্লেখ করেন না, সেরকম প্রায়ই থাকে। রাজভবন থেকে বাড়ির দূরত্বমাপা যে এক ধরনের দুর্বলতা, প্রতাপ সেটা বুঝতে পারেন না।

আসলে, সদ্য তৈরি বাড়িটির জন্য প্রতাপও বেশ গর্বিত। তাঁর নিজের বাড়ি। এতদিনে তাঁর রিফিউজি পরিচয়টা ঘুচেছে, এই দেশে তাঁর নিজস্ব এক খণ্ড ভূমি হয়েছে। বাড়ির জন্য মমতাই জেদ ধরেছিলেন বটে, প্রতাপের ও গোপন ইচ্ছে ছিল। বাড়িওলার নোটিশ পেয়ে যখন-তখন বাড়ি ছাড়ার গ্লানি তাঁকে আর সহ্য করতে হবে না। তা ছাড়া ছেলে-মেয়েরা এসে থাকবে, তাদের জন্যও তো ঘর দরকার!

একতলায় তিনটি দোকান, গাড়ি না থাকলেও একটা গ্যারেজ করানো হয়েছে। দোতলাটা গৃহকর্তাদের নিজস্ব। মমতা গেছেন হরিদ্বারে। এখন বাড়িতে নানু নামে যে ছেলেটি সব কাজ করে, সেও আজ ছুটি নিয়েছে, রাত্তিরে ফিরবে না। তাই বেরুবার আগে প্রতাপ দু'তিনটে দরজায় তালা দিলেন। চাবি সম্পর্কে তাঁর অন্যমনস্কতা আছে, মমতা এই ব্যাপারে তাঁকে বার বার সাবধান করে গিয়েছেন, সেই জন্য প্রতাপ তালা লাগাবার পর দু'বার পকেট বাজিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

যতই আন্তর্জাতিক অপবাদ রটে থাকুক, তবু এই কলকাতার ও কিছু কিছু রমণীয় মুহূর্তে আছে। যার দেখার চোখ আছে শুধু সে-ই দেখতে পায়। এই শহর মাঝে মাঝে এক মায়াদর্পণ তুলে ধরে, সকলের জন্য নয়, যেমন আজ এই বিকেল ও সন্ধের মাঝখানটিতে। এ এক অন্যরকম আলো যাতে পথের বিভঙ্গ চোখে পড়ে না, বাড়িগুলির অসামঞ্জস্য তুচ্ছ হয়ে যায়, মনে হয় পৃথিবী তো মানুষের বসবাসেরই জন্য। যে যেখানে আছে কোনোক্রমে কি নির্ঝঞ্ঝাটে সেখানে বাস করতে পারে না?

সময় যৌবন-ভোগা। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রতাপ মজুমদার নিজেও যে তা জানেন না তা নয়। কিন্তু বহিরঙ্গে বৃদ্ধ বলে মনে হলেই তো সবাই বুড়িয়ে যায় না। একলা পথে বেরুলে প্রতাপ এখানো দাঁড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। পল্লীর অল্পবয়েসী ছেলেরা যখন তাঁকে দেখে সিগারেট লুকোয় কিংবা কেউ দাদু বলে সম্বোধন করে, তখন তিনি সচেতন হয়ে মুখে একটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলেন। এই শহরে এত মানুষ, এত বেশি মানুষ, যে কখনো নিরালা হবার উপায় নেই। কেউ না কেউ মনে করিয়ে দেবেই যে তুমি কে তোমার বয়েস বা টাকাপয়সার জোর আছে কিনা!

বারান্দায় একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রতাপের হঠাৎ মনে হয়েছিল, আজকের দিনটা বেশ সুন্দর, তবু এ জীবনের কী মানে হয়? এই ধরনের চিন্তা এক হিসেবে নিতান্তই অর্থহীন, আবার বিপজ্জনকও বটে। আজকাল প্রায়ই প্রতাপের মাথায় এই চিন্তাটা আসছে। এটা তাড়াতে হলে মানুষের সংসর্গ চাই, কথাবার্তায় ভুলে থাকা দরকার। সেইজন্যই তিনি ছটফটিয়ে পথে নেমে এসেছেন। কিন্তু

কোথায় যাওয়া যায়? তাঁর চোখে ভেসে উঠলো বিমানবিহারীর বাড়ির ছবি। একমাত্র ঐ বাড়িতেই তিনি যখন তখন যেতে পারেন, কিন্তু যান না, আজকের অপরূপ বিকেলের মতনই তিনি ঐ বাড়িটাকে বছরে মাত্র আট দশবার দেখতে চান। যেন একটা মূল্যবান কাশ্মীরী শাল, যা বহু ব্যবহারে জীর্ণ হতে দেওয়া যায় না।

প্রতাপ বাস স্টপে এসে দাঁড়ালেন। এই সময়টায় এখান থেকে ট্যাক্সি পাওয়া যায়, কিন্তু ট্যাক্সি চাপার ব্যাপারে প্রতাপের মনে একটু কৃপণতার ভাব আছে, মনে পড়ে যায় যে তাঁর আয় এখন সংকুচিত। আবার, সরকারি বাস ডিপো হলেও পয়সা বাঁচবার জন্য তিনি সাধারণ অল্প ভাড়ার বাসে চাপতে পারেন না।

সামনেই একটা বেশ চওড়া ধরনের অসমাপ্ত তিনতলা বাড়ি, আরও অনেক উঁচুতে যাবে হয়তো। মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং এর রেওয়াজ ক্রমশই শহরতলির দিকেও এগিয়ে আসছে। নিজের তদারকিতে একটা বাড়ি বানিয়েছেন বলেই এখন নতুন তৈরি হওয়া বাড়ির দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে থাকেন। জানলার গ্রীলটা কী রকম, দরজার কাঠ প্লাইউড না সলিড। পাঁচ ইঞ্চি না দশ ইঞ্চ দেওয়ালের গাঁথনি, এসব দেখেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

সেই নির্মীয়মান বাড়ির বাইরের কাঠের ভারা নেমে এলো একজন প্রৌঢ়, পরনে লুঙ্গি ও ছেঁড়া গেঞ্জি হলেও মুখে বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ। এই লোকটিই কি এই হবু প্রাসাদের রাজমিস্তিরি? অন্যরা এখনো কাজ করছে, ও হঠাৎ নেমে এলো কেন? লোকটি নিজের যন্ত্রপাতি একটা চটের থলিতে ভরে নিয়ে কারুকে কিছু না বলে হাঁটা শুরু করে দিল। ও একা একা কোথায় যাচ্ছে? একটু পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

এত বড় একটা ইঁট-কংক্রিটের প্রাসাদ যে বানায়, সে কাজের শেষে কোথায় যায়? তার নিজের বাড়িটি কী রকম? এমনও হতে পারে, লোকটি আর কালকে ফিরে আসবে না। কেউ কি ওর খোঁচ করতে যাবে? সে যাই হোক, এই বাড়িটা অসম্পূর্ণ পড়ে থাকবে না, অন্য কোনো রাজমিস্তিরি নিশ্চত আসবে। একদিন এই বাড়ির প্রত্যেক ঘরে ঘরে দেখা যাবে নতুন মুখ, কোথাও কোনো দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যাবে না। এই রকমই তো নিয়ম।

প্রতাপের হঠাৎ মনে হলো, ঐ বিষন্ন রাজমিস্তিরিটি তাঁর যমজ ভাই!

হাওয়া জোরালো হচ্ছে, আকাশে পাতলা লালচে আভা। ঝড় আসবে নাকি? প্রতাপ ঝড় ভালোবাসেন, কিন্তু যেখানে আকাশ বা মাটি দিগন্ত ছোঁয়া, বড় বড় গাছের মাথা নুয়ে পড়ে, বিভ্রান্ত গরুর গাড়ি এদিক ওদিক ছোটে, ওপরের দিকে তাকালে পবন-পদবী কথাটার অর্থ চাক্ষুষ হয়। শহরে ঝড়ে সে রকম প্রকৃতি নেই।

রাস্তা পার হতে হতে একটি ধুতি ও শার্ট পরা লম্বা লোক দু-তিনবার তাকালো এদিকে। লোকটিকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায়, কী সূত্রে চেনা তা ঠিক মনে পড়ছে না। এই সব পরিস্থিতিতে নিছক অবান্তর কথায় কয়েক মিনিট সময় অপ-খরচ করতে হয়। প্রতাপ দেখতে চান পাওয়ার ভান করে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

তাঁর পেছনেই একটা শাড়ির দোকান। ছ-সাত মাস ধরে খুলেছে, বেশ কায়দার সুসজ্জিত। বা দিকের কাচের শো উইন্ডো-তে একটি হলুদ রঙের ম্যানেকুইন, সেদিকে তাকিয়ে তিনি চমকে উঠলেন। এই নকল নারীমূর্তির কি গম্ভীর চাহনি। তার মুখ এবং একটু বাঁ পাশ ফিরে তাকানোর ভঙ্গিটি খুব চেনা।

এই বাস স্টপে প্রতাপ অনেকবার দাঁড়িয়েছেন, কাপড়ের দোকান আর ম্যানেকুইনটিকেও তিনি দেখেছেন। কিন্তু আজ এই অভিনব বিকেলের আলোকেই এই নিথর মূর্তিটি হঠাৎ এমন একটা চেনা রূপে উদ্ভাসিত হলো।

এই সব মূর্তি কী দিয়ে বানায়? আগেকার গ্যাটাপার্চার কিংবা পলিথিন। সেই রকমের কিছুই হবে, কাঠের মূর্তির এমন নিখুঁত মুখের ডৌল কি হতে পারে? কোন্ অজ্ঞাত শিল্পী সুলেখার মুখখানি এমন হুবহু নির্মাণ করলো।

প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে এলে, বিশেষত কর্মহীন জীবনে, খুব পুরনো কথা মনে পড়ে। যৌবন পেছন ফিরে তাকায় না। মানুষ একনাগাড়ে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর ছুটে এসে হঠাৎ এক সময় থমকে দিয়ে

ভাবেম এত নদী, এত বিপদসঙ্কুল গিরিখাদ যে পার হয়ে এলুম, কোথাও তো অতলে তলিয়ে গেলুম না! বৃষ্টিভেজা ঝাপসা গাছপালার মতন বিস্মৃতি ভেদ করে উঠে আসে কয়েকটি উজ্জ্বল মুখ।

কোথায় হারিয়ে গেল সুলেখা! এমন সুন্দর , এমন প্রাণবতী রমণী আর তো একটিও চোখে পড়লো না এতখানি জীবনে। সে তো শুধু প্রতাপের কুটুম্ব ছিল না, ত্রিদিবের স্ত্রী হওয়াটাই তার একমাত্র পরিচয় ছিল না, সে ছিল মূর্তিমতী লাবন্য, প্রতাপের সঙ্গে তার বিশেষ একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। সুলেখার বুঝি বেশিদিন পৃথিবীতে থাকে না?

কেন যে সুখেলা জীবনের এমন একটা অপচয় করলো, তা প্রতাপ আজও বুঝতে পারেন না। ত্রিদিবের ও বহুদিন কোনো খবর নেই। ত্রিদিবের জীবনটা ও তছনছ হয়ে গেল।

সে তো প্রায় কুড়ি বাইশ বছর আগেকার কথা। মনের কোন খোপটায় সুলেখার স্মৃতি লুকিয়ে ছিল এতদিন। বহু বছর তার নাম উচ্চারিত হয়নি, তার মুখখানাও বোধহয় অনেকের মনে নেই। সুলেখা দিল্লি চলে যাবার পর তাকে আর প্রতাপ একদিনও দেখেননি।

কোনো কিছুই একেবারে হারিয়ে যায় না, এই নিয়মেই বোধহয় সুলেখা আবার ফিরে এসেছে, এক কারিগরের কল্পনায়, যাদবপুরের এক দোকানে নমুনা শাড়ি পরানো হলুদ মূর্তি হিসেবে। প্রতাপের দৃঢ় ইচ্ছে হলো, এই মূর্তিটা কে বানিয়েছে তা খুঁজে দেখতেই হবে। লোকটি সুলেখাকে দেখেছে কখনো? না দেখে থাকলে, সে সুলেখাকে অবিকল কল্পনা করলো কী করে?

ধুতি-শার্ট পরা ঢ্যাঙা লোকটি পাশে এসে বললো, কেমন আছেন, স্যার?

গলার আওয়াজ শুনেই লোকটিকে মনে পড়লো। এ বছরের গোড়াতেই তিনখানা নতুন পাখা কিনেছিলেন, প্রতাপ, তখন দেওয়া হচ্ছিল টেন পার্সেন্ট রিবেট। কম্পানিটা নতুন। তিনটির মধ্যে দুটো পাখাই অচিরে গোলমাল করতে শুরু করে। বাঙালি জীবনের মতনই ধীর গতি, রেগুলেটারের শেষ পয়েন্টেও দুরন্ত হয় না। মমতা গোরতর আপত্তি করেছিলেন, কারণ পাখাগুলি কেনা হয়েছিল যাদের কথা চিন্তা করে, তারা খুব বেশি গতি পছন্দ করে। যাদবপুর অঞ্চলে পাখার প্রধান উপযোগিতা মশা তাড়াবার জন্যই।

স্ত্রীর তাড়নায় প্রতাপকে সেই পাখা বদলাতে যেতে হয়েছিল রাধাবাজারে। আবার ট্যাক্সি ভাড়া করে। বাড়িতে আর কোনো পুরুষ মানুষ তো নেই যে এইসব ছেঁদো কাজ করবে। সেই দোকানে গিয়ে প্রতাপ শুনলেন যে পাখা সেখান থেকে বদল হয় না, ফেরত দেবার তো প্রশ্নই নেই। তাঁকে যেতে হবে কম্পানির গুদামে। সেটা অবশ্য কাছেই।

সেই পাখা-কম্পানির গুদামে, এই লম্বা ফর্সা লোকটি ইনচার্জ। বিশেষ কারণে একে মনে আছে। আজ তো ছুটির দিন নয়, এই বিকেলে সেই গুদামে বসে না থেকে লোকটি রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে কী করে?

সেদিন লোকটির ওপর প্রথমে খুবই রেগে গিয়েছিলেন প্রতাপ। একা ট্যাক্সি নিয়ে এতদূর নতুন পাখা বদলানোর মতন বিরক্তিকর কাজ করতে গিয়ে এমনিতেই তাঁর মেজাজ খিঁচড়ে ছিল, তার ওপর এত কান্ত করে কম্পানির গুদামে পৌঁছোবার পর এই লোকটি বলেছিল, ছাপ্পান্ন ইঞ্চি পাখা আর স্টকে নেই। বদল হবে না। অথবা সাতদিন পর আবার আসতে হবে।

প্রতাপের ন্যায়-অন্যায় বোধ অমনি দপ করে জ্বলে উঠেছিল। ব্যাঙ্ক থেকে তোলা নতুন, নগদ, টাকা দিয়ে পাখা কিনেছেন। সাত বছরের গ্যারান্টি। এর মধ্যে কিছু অসদ্ভাব হলে কম্পানি পাখা মেরামত কিংবা বদল করতে বাধ্য। খবরের কাগজে তারা অনুরূপ শর্তে বিজ্ঞাপন দেয়। কিন্তু এর মধ্যেও একটা বিরাট তঞ্চকতা আছে। প্রতাপ মজুমদারের মতন একজন রাশভারি মানুষকেও এই কম্পানির যে-কোন একজন খুদে কর্মচারী অবজ্ঞার সঙ্গে বলে দিতে পারে, আজ হবে না সাতদিন পর আসবেন। সেই সাতদিন পরে গেলে আবার অনায়াসেই বলবে, আজও নতুন স্টক আসেনি, আপনি এক সপ্তাহ বাদ দিয়ে ঘুরে আসুন!

প্রতাপের মুখখানা রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি অনেকগুলি র্ভৎসনা বাক্য উচ্চারণ করার পর দৃঢ় স্বরে বলেছিলেন, আমি আজই অন্য পাখা চাই, না হলে আপনাদের নামে আমি মামলা করবো!

এই সব ক্ষেত্রেও ঐ খুদে কর্মচারী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতে পারে, যান যান মশাই, আপনার যা খুশী করুন গিয়ে। ওসব আমাদের ঢের দেখা আছে। আজ অবধি আমরা নতুন পাখা সম্পর্কে একটাও

কমপ্লেন পাইনি...

কিন্তু এই লম্বা ফ্যাকাসে ধরনের ফর্সা চেহারার কর্মচারীটি অন্য ধাতুর। সে কাঁচুমাচুভাবে বলেছিল, স্যার, আপনি বড্ড রেগে গেছেন, আপনার ব্লাড প্রেসার হাই মনে হচ্ছে, একটু বসুন। কারখানায় গো স্লো হলে আমরা কী করবো বলুন! বসুন না, কোল্ড ড্রিংকস এনে দেবো? স্যার, আপনার কি সিংহ রাশি? কিছু মনে করবেন না স্যার, মানুষের মুখ দেখে আমার অ্যাস্ট্রোলজি স্টাডি করার হ্যাবিট আছে...

পাখা উপলক্ষে প্রতাপকে ঐ গুদামে তিনবার যেতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ক্রোধ উপশমে সাহায্য করেছিল ঐ লোকটি। এঁর সাহচর্যে তাঁর সময় মন্দ কাটেনি। এ আর পাঁচটা মানুষের মতন নয়। সারাদিন আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়, এমন একটা বন্ধ গুমোট ঘরে বসেও এই লোকটি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও মানুষের নিয়তি বিষয়ে চর্চা করে। নিজস্ব থিয়োরি আছে। প্রতাপের অতীত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ কিছু উদ্ভট কথা বলেছিল। প্রতাপের একেবারেই জ্যোতিষ-ট্যোতিষ বিশ্বাস নেই, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আন্দাজে মেলানো কথা শুনে তিনি মজা পান।

লোকটির নামও তিনি জানেন না। ঐ লোকটিও সম্ভবত প্রতাপের নাম-ধাম মনে রাখেনি। পরস্পরের মুখ চেনা। তবু লোকটি এতদিন পর দেখা হলেও এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, স্যার, আপনার পাখা ঠিকঠাক চলছে তো? কেমন আছেন স্যার। কিছু মনে করবেন না, আপনার কি ইদানিং অকারণে মন খারাপ হয়? ফাঁকা ফাঁকা লাগে? মাটির নীচে যে-সব জিনিস জন্মায়, সেগুলো আপনি খাবেন না স্যার। সেদিনই বলেছিলাম, মনে আছে? মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, আপনার ওপরে এখনো বৃহস্পতির প্রভাব চলছে, কচু, আলু, পেঁয়াজ, মুলো, আদা এসব একদম বাদ!

প্রতাপ হেসে বললেন, আপনার বাড়ি এদিকেই নাকি?

লোকটি উদাসীন ভাবে বললো, বাড়ি? না, আমার বাড়ি নেই। সেসব ছিল ওদিকে, নেহরু আর জিন্না সাহেব সে বাড়ি খেয়ে নিয়েছেন। এদিকে আর কিছু হয়নি।

প্রতাপ আবার জিজ্ঞেস করলেন, থাকেন কোথায়?

লোকটি বললো, গড়িয়া থেকে একটু এগিয়ে, অ্যানুয়াল লীভ নিয়েছি স্যার, ভাবছি একবার রমন মহর্ষির আশ্রমটা দেখে আসবো।

প্রতাপ তাকে নিজের বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে বললেন, এই তো কাছেই, আসবেন একদিন, গল্প করা যাবে...।

এই মানুষটি কোনোক্রমেই প্রতাপের সামাজিক সমস্তরের নয়। তবু তিনি ওকে আগ বাড়িয়ে নিজের বাড়িতে আসতে বললেন কেন? এ রকম তার স্বভাব তো নয়। তিনি হেরে যাচ্ছেন? জ্যোতিষচর্চার ওপর তাঁর একটু একটু করে ঝোঁক জন্মাচ্ছে নাকি? প্রতাপ আপনমনে একটু হাসলেন। আসলে ঐ লোকটিকেই তিনি স্টাডি করতে চান। ও প্রতাপের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত কেন, ওর তো কোনো স্বার্থ নেই। পয়সা চাইবার মতন লোক ও নয়। আসুক না বাড়িতে, মমতার হাতদেখানো-টেখানোতে খুব উৎসাহ আছে, সে খুশী হবে।

পরপর দুটি মিনিবাস এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমটি ছেড়ে দিয়ে তিনি দ্বিতীয়টিতে উঠলেন। তার কারণ গোলাপী শাড়ি পরা একটি যুবতী। তার মুখ তিনি ভালো করে দেখেননি, মেয়েটি ছাতা গুটিয়ে মিনিবাসের পাদানিতে একটি পা রাখার পর তিনি দেখলেন লাল রঙের চটি পরা একটি নিখুঁত পা, ঈষৎ উঁচু হয়ে ওঠা শাড়িতে ফর্সা, মাখন-কোমল গুলফ, সব মিলিয়ে চমৎকার একটা সামঞ্জস্য। অল্প বয়েস থেকেই তিনি সম্ভব হলে সুন্দর কোনো রমণীকে নির্বাচন করে বাসে-ট্রেনে ওঠেন, এখনো সেই অভ্যেসটি রয়ে গেছে। তাঁর এখন সাতষট্টি বছর বয়েস, তবু তিনি এ জন্য নিজের বিবেকের কাছেও লজ্জা বোধ করেন না। এ তো শুধু সৌন্দর্যের উপাসনা।

পিছন দিক থেকে সেই যুবতীকে দেখতেও যেন সুলেখার মতন। আজ বারবার তিনি সুলেখার আদল দেখছেন কেন? নিজেই আবার তৈরি করছেন সুলেখাকে? ঐ রমণীর মুখ দেখার জন্য প্রতাপ অবশ্য সামনে এগিয়ে গেলেন না, বেশ দূরত্ব রেখে বসলেন।

ছিয়ানব্বই বছর বয়স্ক এক থরথরে, সক্রিয়, গান্ধীবাদী সমাজসেবককে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার আত্মোৎসর্গের সব ব্যাপারটাই তো বুঝলুম, কিন্তু আপনি ব্যক্তিগত জীবনে এত কঠোর সংযম পালন করলেন কী করে? এমনকি আপনার গুরু গান্ধীজীও তো কয়েকটি পরীক্ষা-

নিরীক্ষা...

উত্তরে সেই মহৎ ব্যক্তিটি হেসে বলেছিলেন, মানুষের চিন্তার তো কোনো ছবি ওঠে না, তার কোনো রেকর্ডও থাকে না, তবু তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি বাবা। প্রায় ষাট বৎসর কোনো নারীর সঙ্গে সহবাস, করিনি, সেটা ইচ্ছাকৃত ব্রহ্মচর্য বলতে পারো। নিজেকে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছি। সেখানে আর কোনোরকম ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার স্থান না থাকাই উচিত, কেননা, নারী এলে বিষয়-সম্পত্তির মোহও এসে পড়ে। কিন্তু এখনো, এই বয়েসেও কোনো রূপবতী স্ত্রীলোক দেখলে মনে হয়, অন্য পুরুষরা দূরে সরে থাক, সে আমার পাশে দাঁড়াক, আমার সঙ্গে দুটো কথা বলুক। এই ইচ্ছেটাকে তুমি কী বলবে, বাবা, সংযম না লোভ?

খবরের কাগজে এই বিবরণটি পড়েই প্রতাপের মনে হয়েছিল, সুলেখার সঙ্গেও আমার ঠিক ঐ রকম সম্পর্কই ছিল। সুলেখা নিভৃতে দুটো কথা বললেই তিনি বড় আনন্দ পেতেন। ঐ বৃদ্ধ বড় সাংঘাতিক কথা বলেছেন। তবে, চুরানব্বই বছর বয়েসেও এমন আকাঙ্ক্ষা থাকে?

হাজরা মোড়ে নেমে প্রতাপকে খানিকটা হাঁটতে হলো। পাতাল রেলের জন্য এদিককার রাস্তার এখনো লণ্ডভণ্ড অবস্থা। চেনা জায়গাগুলো অচেনা লাগে। প্রত্যেকটি মানুষই যে সমাজে বাস করে, সেই সমাজের নিরন্তর সমালোচনাও করে যায় মনে মনে। এইভাবেই জনমত জিনিসটা নিঃশব্দে গড়ে ওঠে। প্রতাপ ভাঙা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বলতে লাগলেন, এত দেরি হয় কেন, সব কিছু ঠিকঠাক হতে এত দেরি লাগে কেন?

তাঁর মনটা আজ মাঝে মাঝে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে, যদিও হালকা ফুরফুরে নয়, তলায় তলায় রয়েছে একটা প্রচ্ছন্ন অভিমানের নিরুদ্ধতা, অবশ্য তিনি নিজেও সচেতন নন সে ব্যাপারে। আজ বিকেলের নতুন রকমের আকাশ তাঁর অজান্তেই তাঁর মনটাকে একটা নদীর জোয়ার-ভাটায় রূপান্তরিত করেছে।

বিমানবিহারীর বাড়ির সামনে এসে প্রতাপ থমকে গেলেন। তিনি তো এখানে আসতে চাননি। কোথায় যেতে চেয়েছিলেন? হ্যাঁ, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় একবার ভেবেছিলেন গঙ্গার ধারে গিয়ে সূর্যাস্ত দেখবেন। অন্যমনস্কভাবে নেমেছেন হাজরায়। বাড়িতে একা মন টিকছিল না। গঙ্গার ধারে চুপ করে বসে থাকতে খারাপ লাগে না, ওখানে বড় একটা চেনাশুনো কারুর সঙ্গেও দেখা হয় না।

সেই নকশাল আমলে খুব বোমাবাজি হতো এই গলির মধ্যে। একবার বেশ বড় রকমের চুরিও হয়েছিল। বিমানবিহারীর বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটা আর নেই, তিনি তখন একটা উঁচু পাঁচিল তুলে দিয়েছেন। বড্ড বেমানান দেখায়। বাড়িটার আদি নকশার সঙ্গে এই দেয়ালের ঘেরাটোপ একেবারে খাপ খায়নি, কিন্তু উপায়ই বা কী, এটা সাময়িকতার দায়। যে-দেশে অর্ধেকের বেশি মানুষ শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতন খুপরিতে কোনোক্রমে মাথা গুঁজে থাকে, সে দেশে একটা সাধারণ তিনতলা বাড়িকেও দুর্গে পরিণত করতে হয়। শুধু পাঁচিল নয়, বসানো হয়েছে একটা লোহার গেট, নিযুক্ত হয়েছে একজন দারোয়ান।

দারোয়ানটি গেটের কাছে ছিল না, কোথা থেকে যেন প্রতাপকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে একটা লম্বা সেলাম দিয়ে বললো, আচ্ছা হ্যায়, সাব?

প্রতাপ নিঃশব্দে সরে পড়তে চাইছিলেন। এখন দাঁড়াতেই হলো। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, হাঁ। তোমাদের সব খবর ভালো।

গেটের তালা খুলতে খুলতে দারোয়ানটি জানালো যে বিমানবিহারী বাড়িতে নেই। বাবু আর মা আজ সকালেই কৃষ্ণনগর গেছেন।

সেই মুহূর্তে প্রতাপের মুখ দেখলে মনে হবে, কেউ যেন তাঁকে একটা অতি নিষ্ঠুর, কটু, অপমানজনক কথা বলেছে। বিমানবিহারীর এখন বাড়িতে না-থাকাটা যেন একটা বিশ্বাসঘাতকথা। প্রতাপ কোনো খবর দিয়ে আসেননি, তিনি ইদানীং এ বাড়িতে যখন তখন আসেন না। তিনি যে আজ আসবেন, তার কোনোরকম ইঙ্গিতও বিমানবিহারী পাননি। প্রতাপের বাড়ির টেলিফোন একমাস ধরে খারাপ। তবু প্রতাপ বিক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর চরিত্রই যে এরকম। তিনি ভাবলেন, বিমান কেষ্টনগরে গেছে, নিশ্চয়ই গাড়িতেই গেছে, একবার তো সে আমার বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারত, আমি যাবো কি না?

দারোয়ানটি বললো, আইয়ে, অন্দর আইয়ে।

দারোয়ান জানে, বিমানবিহারী না থাকলেও প্রতাপের পক্ষে এ বাড়িতে এসে বসার বাধা নেই। প্রতাপদের মতন তো নয়, এ বাড়িতে অনেক লোক, সস্ত্রীক বিমানবিহারী কলকাতার বাইরে গেলেও সদরে তালাচাবি লাগান না।

প্রতাপ বললেন, না, আজ আর বসবো না। বাবুরা কবে ফিরবেন?

বিমানবিহারী দিন সাতেকের জন্য গেছেন শুনে প্রতাপ আরও দাহ বোধ করলেন। বিমান তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব পর্যন্ত দিল না? প্রতাপের পক্ষে এটাই ছিল বেড়াতে যাবার প্রকৃষ্ট সময়। মমতা হরিদ্বারে গেছেন, অন্তত দু'সপ্তাহের মধ্যে ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রতাপের কলকাতায় থাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

বিমান তাঁকে অবজ্ঞা করছে? তাই যদি হয়, তা হলে আর রইলো কে? বৃদ্ধ হলে কুকুর-বিড়ালের গা থেকে লোম খসে যাবার মতন মানুষেরও বন্ধু-বান্ধব খসে যায়। নিজের স্বভাবের তীব্রতার জন্যই প্রতাপের বন্ধু সংগ্রহ খুবই কম। কেউ যদি তুল্যমূল্য ব্যবহার না করে, সামান্য অমনোযোগের ভাব দেখায়, তা হলেই প্রতাপ তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখেন না। সম্পর্ক হারাতে হারাতে প্রতাপ প্রা য়নিঃসঙ্গ অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। এবার বোধহয় মমতাকেও হারাতে হবে। মমতার সঙ্গে প্রায়ই মতের অমিল হচ্ছে আজকাল।

প্রতাপ ফেরার আগেই পেছন থেকে একটি সরু, সুরেলা কণ্ঠ বলে উঠল, প্রতাপকাকা।

প্রতাপ মুখ ফিরিয়ে দুই বোনকে দেখলেন পাশাপাশি। ট্যাক্সি থেকে নেমেছে, হাতে অনেকগুলি প্যাকেট, নিশ্চয়ই নিউ মার্কেট থেকে এলো। এদের দেখেই প্রতাপের ক্ষোভ অনেকটা মিলিয়ে গেল। তিনি হালকা স্বরে বললেন, দুই প্রজাপতি, কোথায়, কোন কাননে গিয়েছিলে?

বুলির বেশ ভার ভরন্ত চেহারা হয়েছে, রূপ অনেক খুলেছে। একটা রাগী রাগী ভাব; স্বভাবটা অবশ্য আগেরই মতন উচ্ছল। প্রতাপকাকাকে সে গুরুজন বলে বাড়াবাড়ি সম্মান করে না। সে বললো, নন্দন কানন। এই, তুমি চলে যাচ্ছিলে যে?

প্রতাপ বললেন, বাড়িতে কেউনেই শুনলাম। তুই কবে এলি বম্বে থেকে?

বুলি বললো, পরশু। কাল আমার টিভিতে একটা রেকর্ডিং আছেউজন সিং, প্যাকেটগুলো ধরো না। প্রতাপকাকা, ভেতরে চলো।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অলি হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছে প্রতাপের দিকে। হালকা ঘি রঙের শাড়ী পরা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। চেহারাটা এখনো লম্বা, ছিপছিপে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা হিসেবে বুলির বেশ খানিকটা নাম হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের পর তাকে চলে যেতে হলো বম্বেতে। তবু গানের টানে সে প্রায়ই আসে কলকাতায়। মাত্র দু'মাস আগেও একবার এসেছিল।

বুলি বললো, আমি এবার দু'সপ্তাহ থাকবো। এবার যাওয়া হবে সুন্দরবন? তুমি বড্ড মিথ্যুক হয়েছো আজকাল। খুব যে বলেছিলে লঞ্চ জোগাড় করে দেবে!

তুমি একা একা মাঝে মাঝে সুন্দরবন যাও!

আগেরবার বুলি যখন এসেছিল, তখন কথায় কথায় একদিন সুন্দরবন বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা হয়েছিল। অলি আর বুলি দুই বোনেরই খুব উৎসাহ। কলকাতার এত কাছে, তবু ওরা সুন্দরবন দেখেনি। টাইগার প্রজেক্টের এখন যে ডিরেক্টর তার বাবা প্রতাপের সহকর্মী ছিলেন, সেই সুবাদে প্রতাপ লঞ্চের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারপর কথাটা চাপা পড়ে যায়। বুলির স্বভাবই এই, সে প্রথমেই অভিযোগের সুরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

প্রতাপ বললেন, তুই তো আর আমাকে মনে করিয়ে দিসনি।

বুলি বলল, আহা-হা, তারপর আর তুমি এলেই না। তুমি আমার আর খোঁজও নিলে না!

প্রতাপ বললেন, তুই কলকাতায় এসে তো আমার একটু খবর নিতে পারিস। তুই কখন আসিস, চলে যাস, আমি জানতেই পারি না। এখন যে অনেকদূর থাকি!

অলি বললো, এমন কিছু দূর না! আমাদের ঐ যাদবপুর যাবার চেয়ে তোমার পক্ষে এখানে আসা খুব সহজ। বাবা বলেছিল, তোমার আজকাল পাত্তাই পাওয়া যায় না!

অলি বলল, কাল রাত্তিরে কৃষ্ণনগর থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল, বাবাকে তাই আজ সকালেই

তাড়াহুড়ো করে চলে যেতে হলো। বাবা একবার বলেছিল, যদি তোমাকে খবর দেওয়া যায়। কিন্তু আজই দুপুরে কোর্টে মামলা আছে, বাবাকে তার আগে পৌঁছতে হবে, সময় ছিল না।

সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা। অলি ঠিকই বুঝেছে যে বিমানবিহারী কিছু না জানিয়ে হঠাৎ কৃষ্ণনগরে চলে গেছেন শুনে প্রতাপের মনে খটকা লাগবে। কৃষ্ণনগরের সম্পত্তি নিয়ে কিছুদিন ধরে বেশ শরিকী ঝঞ্ঝাট চলছে।

বুলি বলল, তোমার নতুন বাড়ি তো আমি দেখিইনি। হাউস ওয়ার্মিং পার্টি দেবে না? কাল টিভি স্টেশন থেকে তোমার ওখানে যেতে পারি। কাকিমাকে বলে রাখবে, ওঁর হাতে তৈরি মটরশুটি কচুরি খাবো।

প্রতাপ বললেন, কাল আসতে পারিস। কিন্তু তোর কাকিমা এখানে নেই। হরিদ্বার গেছে।

বুলি সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে বললো, হরিদ্বার গেছে কেন? একা?

অলি বললো, মুন্নিরা এখন হরিদ্বারে থাকে। কাকিমা সেখানে গেছেন।

বুলি তবু অবাকভাবে বললো, কাকিমা একা গেল কেন? প্রতাপকাকা, তুমি নিশ্চয়ই কাকিমার সঙ্গে ঝগড়া করেছো।

প্রতাপ হাসলেন। খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে বললেন, তোমাদের কাকিমা এখন স্বাধীন। এখন আর আমাকে সঙ্গে নিতে চায় না। শোন, তোরা বাজার টাজার করে এলি, এখন বিশ্রাম নিবি, আমি আর এখন বসবো না। পরে একদিন আসবো।

বুলি বলল, আমাদের মোটেই বিশ্রাম নেবার দরকার নেই। তুমি বসবে এসো।

প্রতাপ বললেন, আমার একটা কাজ আছে রে। যেতে হবে।

অলি প্রতাপের বাহু ছুঁয়ে বললো, যতই কাজ থাক, একটু না বসে যেতে পারবেন না। চা খাবেন না?

অলি জোর করলে প্রতাপ দুর্বল হয়ে পড়েন। একমাত্র অলিই তাঁর ওপর জোর করতে পারে।

প্রতাপ বললেন, চট করে এক কাপ চা খেয়েই উঠবো কিন্তু!

দোতলায় এসে অফিস ঘরে বসলেন প্রতাপ। বড় হল ঘরটায় পার্টিশান দিয়ে তিনটে চেম্বার করা হয়েছে। তার মধ্যে একটা চেম্বারে অলি বসে। ব্যবসা বড় হয়েছে, কয়েকজন কর্মচারী রাখা হয়েছে। তারা বোধহয় একটু আগেই চলে গেছে। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর বিমানবিহারী অনেকবার প্রতাপকে বলেছিলেন তাঁর অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের ভার নিতে। প্রতাপ কিছুতেই রাজি হননি। প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিয়ে প্রতাপ বলেন, এতকাল চাকরি করেছি, এবার পরিপূর্ণ ছুটি উপভোগ করতে চাই, বুঝলে!

কথাটা যে সত্যি নয়, তা প্রতাপও জানেন। কোনো রকম কাজ না থাকলে ছুটি উপভোগ করাও যায় না। কিন্তু বিমানবিহারীর সঙ্গে কোনোরকম বৈষয়িক সম্পর্কে যেতে চান না প্রতাপ, এই অনুবাদও বহুদিন বন্ধ করে দিয়েছেন।

বুলি বললো, একটু বসো, কাকা, আমি আসছি ওপর থেকে।

অলি বললো, চা-টা আমি তৈরি করে আনছি। জগদীশ নেই, পারুলের মায়ের চা আমার পছন্দ হয় না।

প্রতাপ হাসিমুখে তাকালেন অলির দিকে। এর আগের দিন পারুলের মায়ের তৈরি চা খেয়ে প্রতাপ প্রসন্ন হননি, অলি ঠিক মনে রেখেছে। চায়ের ব্যাপারে প্রতাপ খুব শৌখিন।

অলির সবদিকে নজর। একসঙ্গে এত কাজ করে অলি, তবু তার কোনো ব্যাপারেই ক্লান্তি নেই। এখানে প্রকাশনার অনেকখানি দায়িত্বই নিয়েছে অলি, একটা কলেজে সে আবার ইংরিজির লেকচারার, আবার বহরমপুর-মুর্শিদাবাদের দিকে কোনো একটা সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সে জড়িত। তবু তার সময়ের অভাব হয় না। প্রতাপ বেশ কিছুদিন এ বাড়িতে না এলেই অলি নিজ থেকে খোঁজ নিতে যায় যাদবপুরে। একদিন মমতা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ রক্তস্রাব শুরু হয়েছিল, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। প্রতাপ দিশেহারা বোধ করছিলেন, যে ডাক্তারটি এখন তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক, তিনি ছুটিতে গিয়েছিলেন পুরীতে, পাড়ার একজন নতুন ডাক্তারকে ডেকেও প্রতাপ ভরসা পাচ্ছিলেন না। বাড়িতে অন্য কোনো স্ত্রীলোক নেই, এইসব অসুখে পুরুষ মানুষ কতটা কী করতে

পারে? ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত হয়েছিল অলি। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে সমস্ত ভার নিয়ে নিল। এক ঘণ্টার মধ্যে একটা নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলো মমতাকে। আর কোনো অসুবিধেই হয়নি। মমতা অনেক ব্যাপারেই নির্ভর করেন অলির ওপর।

অথচ বাবলু যখন এসেছিল, অলি তখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো। বাবলুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সে কথা বলেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সব কথাই অর্থহীন, অবশ্য শর্মিলার সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়েছিল।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ফিরে এলো অলি। প্রতাপ তার দিকে একবার চেয়েই অপরাধীর মতন মাথা নীচু করলেন।

॥ ২ ॥

নিউ জার্সি টার্ন পাইকের কাছে গাড়ি থামতে সিদ্ধার্থ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, ভদ্রলোকের আসল নাম অভয়চরণ দে। কলকাতায় হ্যারিসন রোডে, মানে এখন যেটা মহাত্মা গান্ধী রোড, সেখানে থাকতেন। ওঁর বাবার ছিল কাপড়ের ব্যবসা। পুরোনো কলকাতার সুবর্ণবণিক বুঝলি। বাড়ির সবাই বৈষ্ণব। ভদ্রলোক পড়াশুনো করেছেন স্কটিশচার্চ কলেজে। ওঁর এক ইয়ার ওপরে পড়তেন সুভাষ বোস, মানে নেতাজী সুভাষ বোস।

অতীন বললো, ওরে বাবা, তা হলে তো অনেক বয়েস। তুই এতসব জানলি কী করে?

সিদ্ধার্থ গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়ে বললো, আমার সঙ্গে একবার ওঁর দেখা হয়েছিল। আউট অফ কিউরিয়সিটি গিয়েছিলুম আমি। তারপর শোন, ফ্যানটাস্টিক গল্প। ঐ অভয়চরণ ফোর্স ইয়ারে উঠে পড়া ছেড়ে দিলেন, ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েও বোধ হয় ডিগ্রি নেননি, বা এই রকম একটা কিছু। তখন ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা স্বদেশী হাওয়া ছিল তো! তাঁর বাবা তাঁকে একটা স্বদেশী কোম্পানিতে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন, ইন ফ্যাকট একজন বাঙালীর ওষুধ কম্পানি। সেই কম্পানির কাজে তাঁকে মাঝে মাঝে এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ঝাঁসী এই সব জায়গায় যেতে হতো। এর মধ্যে তিনি বিয়ে করলেন, ছেলেপুলে হলো, রীতিমতন সংসারী মানুষ, আর পাঁচজন বাঙালী মধ্যবিত্ত যেমন হয়। চাকরিতে বেশ উন্নতি করেছিলেন, নিজস্ব ব্যবসাও ছিল, কলকাতার আর এলাহাবাদে উনি নিজের দোকানও করেছিলেন। তবে মাথায় একটু ধর্মের পোকা ছিল। বোষ্টম বাড়ির ছেলে তো, মাছ-মাংস খেতেন না, চাও খেতেন না, ঝোঁক ছিল পুজো-আচ্চার দিকে, সে রকম তো অনেকেরই থাকে। যৌবনে উনি একবার এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে গৌড়ীয় মঠের এক সাধুর সঙ্গে দেখা করতে যান। গৌড়ীয় মঠ কোথায় জানিস!

অতীন ভুরু কুঁচকে বললো, আমার আবার মঠ-মন্দিরের খোঁজ রেখেছি কবে? তোকে এত ফেনিয়ে বলতে হবে না। কাট ইট শর্ট।

সিদ্ধার্থ বললো, ব্যাকগ্রাউণ্ডটা একটু বলে নিচ্ছি। এটা কিন্তু একটা বিরাট ফেনোমেনান, আমাদের জানা দরকার। এ যুগে এরকম রিয়েল লাইফ অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি কল্পনাও করা যায় না। আমি তোকে এর রিলিজিয়াস অ্যাঙ্গেলটা দেখতে বলছি না, অন্য দিকটা ভেবে দেখিস। ঐ গৌড়ীয় মঠের সাধু অভয়চরণকে বলেছিলেন, তোমরা শিক্ষিত যুবকেরা সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছো না কেন? এটা একটা উদ্ভট প্রস্তাব। সেই নাইন্টিন টুয়েন্টিজের কথা, দেশ পরাধীন, সেখানকার ছেলেরা সারা পৃথিবীতে চৈতন্যের বাণী শোনাতে যাবে? কে শুনবে? তা ছাড়া অভয়চরণ সংসারী মানুষ, ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব তাঁর নয়। তবে, ঐ গৌড়ীয় মঠের গুরুর কথাবার্তা তাকে বেশ ইমপ্রেস করেছিল। মাঝে মাঝে কলকাতায় এলে তিনি ঐ গুরুর সঙ্গে দেখা করতেন। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভয়চরণের ধর্মের দিকে ঝোঁক বাড়তে লাগলো, বাড়িতে পাঁচজনকে ডেকে ধর্মের কথা আলোচনা করতেন। যেমন কিছু কিছু ব্যবসায়ীদেরও অবসর সময়ে ধর্মবাতিক থাকে, সেরকম বলতে পারিস। ওঁর স্ত্রী বা পরিবারের লোকজন এসব পছন্দ করতেন না। অভয়চরণ চা খান না, ওঁর স্ত্রীর চা খুব প্রিয়। বৃদ্ধ বয়সে, অভয়চরণ যখন সংসার ছাড়বেন ঠিক করলেন, তখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণটা বেশ মজার। উনি স্ত্রীকে আলটিমেটাম দিলেন, চা এবং স্বামী, এই দুটোর মধ্যে তোমাকে একটা বেছে নিতে হবে। ওঁর স্ত্রী হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, তা হলে তো স্বামীকেই ছাড়তে হয়।

অতীন বললো, ধ্যাৎ! এই জন্য কেউ বউকে ছাড়ে নাকি? শুধু চা খাওয়ার জন্য যদি কেউ বউয়ের

ওপর রাগ করে, তা হলে তো বুঝতে হবে, সে একটা হামবাগ!

সিদ্ধার্থ হেসে বললো শুধু ঐ জন্যই বউকে ছাড়েননি নিশ্চয়ই। আসলে পারিবারিক জীবনটাই তাঁর ভালো লাগছিলো না। গৌড়ীয় মঠের সেই সাধু, নামটা ভুলে গেছি, মৃত্যুর আগে অভয়চরণকে বলে গিয়েছিলেন, যারা বাংলা আর হিন্দী জানে না, তাদের মধ্যে চৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচার করার জন্য সংসার ছেড়ে অভয়চরণ সেই কাজে লেগে গেলেন। কলকাতা থেকে চলে এলেন দিল্লি, বিনা পয়সার কোনো গেস্ট হাউসে জায়গা পেলেন কোনো রকমে, সেখানে শুধু নিজের চেষ্টায় 'ব্যাক টু গড হেড' নামে একটা কাগজ বার করতে লাগলেন ইংরিজিতে। তিনি একলাই তার লেখক, সম্পাদক, প্রুফ রিডার আর সেলসম্যান। কোনো চায়ের দোকানের সামনে রাস্তায় বসে বিক্রি করতেন সেই পত্রিকা, মানে লোককে ধরে ধরে গছাবার চেষ্টা আর কি? ভদ্রলোকের বয়েস তখন ছাপ্পান্ন-সাতান্ন!

অতীন বললো, এই রকম ক্ষ্যাপাটা ধরনের লোক কিছু থাকে।

সিদ্ধার্থ বললো, বেশ কিছু থাকে। তারা এক সময় হারিয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্য এই বুড়ো লোকটির জেদ। বাড়ি থেকে তো পয়সা কড়ি কিছু নেন না, খাওয়ার ঠিক নেই, শীতের জামা কাপড় নেই, তবু চালিয়ে যেতে লাগলেন এই পত্রিকা। সেই সঙ্গে ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ ও টীকা রচনা করতে লাগলেন ইংরিজিতে, সেগুলোও ছাপাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

–ইংরিজি ভালো জানতেন?

–পুরোনো আমলের বি-এ পাশ লোকেরা ইংরিজি মোটামুটি জানতো। বোম্বাস্টিক ধরনের ইংরিজি। ঐ সব ছাপাবার জন্য তিনি চিঠি লিখে বিভিন্ন লোকের কাছে সাহায্য চাইতেন। চিঠি লিখতে পারতেন প্রচুর, অনেকের সঙ্গে সরাসরি দেখাও করতেন। সাধাসিধে ধরনের মানুষ, নিজের কোনো স্বার্থবুদ্ধি নেই, এই সব দেখে কিছু কিছু লোক সাহায্য করতো। তা ছাড়া ধর্মের ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে গিল্টি-ফ্রি হতে চায়।

–অ্যাই কী করছিস, রাইস টার্ন নিতে হবে না এখানে?

–এর পরেরটা। টানেল দিয়ে যাবো। টাইম স্কোয়ারের কাছে আমাকে একটু থামতে হবে, বুঝলি। ভয় নেই, তোকে ঠিক সময় এয়ারপোর্ট পৌঁছে দেবো। তুই আবার কবে চায়না যাচ্ছিস?

–এই তো ক্যানাডা থেকে ফিরেই। থার্ড উইকে।

–এবার কলকাতা ঘুরে আসবি নাকি?

–কী করে কলকাতায় যবো? কম্পানির কাজে মাত্র পাঁচ দিন থাকবো সাংহাইতে। টিকিট দেবে ভায়া টোকিয়ো। ওদিক থেকে ইণ্ডিয়া যাওয়ার স্কোপ কোথায়? এখন ছুটিও পাওয়া যাবে না।

–আমার চায়নাটা যাওয়া হয়নি। অফিস থেকে আমাকে একবার হংকং পাঠাবে শুনছি। দেখি যদি তোর ট্রিপটার সঙ্গে ট্যাগ করতে পারি, তা হলে আমিও ওখান থেকে একবার ঘুরে আসবো। তুই তো আগে দু'বার চায়না গেছিস, অতীন, ওদেশের গ্রাম-ট্রাম কিছু ঘুরে দেখেছিস?

–একগাদা কাজ নিয়ে যাই, নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। চাইনীজরা কাজের ব্যাপারে বড় খুঁতখুঁতে, যে-কোনো ডিসিশান নেবার আগে অন্তত তিনবার ঝালিয়ে নেবে! শোন সিদ্ধার্থ, রণের একটু জ্বর চলছে দু'দিন ধরে, আমি কয়েকদিন থাকবো না, তুই একটু খবর নিস। জানিস তো শর্মিলা কী রকম ঘাবড়ে যায়।

নীপা বলেছে শর্মিলার কাছে গিয়ে এই উইক এন্ড স্পেণ্ড করে আসবে। আমাদের ছেলেবেলায় এরকম কত জ্বর হতো, মা-বাবারা মাথাই ঘামাতো না। ও বয়! দ্যাখ, সামনে বিরাট জ্যাম।

–কেন টানেল নিতে গেলি! বিকেলের দিকটায় প্রত্যেকদিন টানেলের মুখে জ্যাম হচ্ছে।

সিদ্ধার্থ রেডিওটা চালিয়ে ট্রাফিক-সংবাদ শোনার চেষ্টা করলো। সেরকম কোনো ঘোষণা নেই, তাহলে অবস্থা বিশেষ ভয়াবহ নয়। নীচের লেভেলের রাস্তায় গাড়িগুলো বাম্পার টু বাম্পার ঠেকে থাকলেও এক একবার একটু একটু নড়াচড়া করছে।

পেছন দিকে হেলান দিয়ে সিদ্ধার্থ বললো, বাকি গল্পটা শুনবি?

অতীন বললো, সেই বুড়ো লোকটি অ্যামেরিকাতে এলো কী করে?

সিদ্ধার্থ বললো, স্রেফ ইচ্ছা শক্তিতে। এ ছাড়া কোনো ব্যাখ্যা নেই। চায়ের দোকানের সামনে যিনি নিজের পত্রিকা ফিরি করতেন, সেই ব্যক্তিটি প্রায় পনেরো বছর ধরে লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে

পত্রিকা ও গীতার অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে ছাপিয়ে চালিয়ে যাবার পর একদিন ভাবলেন, এই সব তিনি পশ্চিমী মানুষের মধ্যে প্রচার করতে যাবেন। টাকা পয়সা কিছু নেই, কী করে যাবেন তার ঠিক নেই, তবু ঠিক করলেন যাবেন। এক সময় ব্যবসা-ট্যাবসা করেছেন তো। সেইজন্য তিনি কাজের ব্যাপারে খুব মেথডিক্যাল। পাসপোর্ট, ফি ফর্ম যাওয়া-আসার ভাড়া, এসবের চেয়েও বেশি ইম্পর্ট্যান্ট ভিসার ব্যবস্থা করা। উনি মাঝে মাঝে বৃন্দাবন গিয়ে থাকতেন, সেখানে আগরওয়াল বলে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় ছিল। সেই আগরওয়ালের ছেলের নাম গোপাল, সে ইঞ্জিনিয়ার, থাকে পেনসিলভানিয়াতে। এই আগরওয়ালকে ধরে তার ছেলের কাছ থেকে আনালেন একটা স্পনসরশীপ। তাতে ভিসার সমস্যা গেল। পাসপোর্টও পাওয়া গেল। এবার টিকিট। তিনি চলে এলেন বোম্বাইতে, দেখা করলেন শ্রীমতি মোরারজির সঙ্গে। এই মহিলাটি কে জানিস?

অতীন বললো, শিপিং টাইকুন না?

–দ্যাটস রাইট। সিন্ধিয়া স্টিমশীপ লাইনের একজন মালিক। এই মহিলা অভয় দে-কে গীতার অনুবাদ ছাপবার জন্য একবার কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তিনি ওঁর প্রস্তাব শুনে তো একেবারে হাঁ। ধুতি আর ফতুয়া পরা প্রায় সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ একা একা অ্যামেরিকায় ধর্ম প্রচার করতে যেতে চায়। কে এর কথা শুনবে, কে একে পাত্তা দেবে? এই বৃদ্ধ বয়েসে ঐ ঠাণ্ডার দেশে গিয়ে বেঘোরে মরবে নাকি? কিন্তু উনি নাছোরবান্দা। উনি যাবেনই। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী মোরারজি ওঁদের লাইনের একটা জাহাজে অভয়চরণের জন্য একটা সীট করে দিলেন। একটা সুটকেস, একটা ছাতা আর কিছু চিঁড়ে-মুড়ি নিয়ে উনি উঠলেন জাহাজে। ওঁর ধারণা ছিল, আমেরিকায় গরু-শুয়োর ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।

–অ্যামেরিকায় যতদিন থাকবেন, ততদিনের খাবার সঙ্গে এনেছিলেন?

–তা জানি না। আমিএদেশে আসার মাত্র দু' বছর আগে উনি একটা জাহাজে চেপে ব্রুকলীন পোর্টে নামলেন। কপালে তিলক কাটা, গেরুয়া পোশাক, গলায় কণ্ঠীমালা, হাতে জপেরমালা, পায়ে সাদা রবারের জুতো, আমাদের দেশে যেমন পাওয়া যায়,এদেশে ওরকম জুতো কেউ দেখে নি, ওরকম বিচিত্র পোশাকের মানুষও এরা দেখেনি। ওঁর পকেটে মাত্র আটটা ডলার আর সঙ্গে গাদা খানেক সেই নিজের লেখা বই; পোর্ট থেকে বেরিয়ে ডান দিকে না বাঁ দিকে যেতে হয় তাও জানেন না। একজন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ এত দূর বিদেশে এসেছিলেন কিসের ভরসায়? কিন্তু ওঁর ধারণা, উনি অ্যামেরিকা জয় করতে এসেছেন?

–পরশুদিন ম্যানহাটনে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে নাচতে নাচতে মিছিল করে রাস্তা জ্যাম করে দিল, টিভিতে দারুণ কভারেজ দিয়েছে, কিছু ছেলে আবার মাথায় টিকি রেখেছে দেখলুম, এতগুলো অ্যামেরিকান ছেলেমেয়েকে উনি দলে টানলেন কী করে? সত্যি ঐ রকমভাবে একা এসেছিলেন?

–সেই জন্যই তো এত সবিস্তারে বলছি। এটা একটা দিগ্বিজয় কাহিনী। মাত্র আট ডলার পকেটে নিয়েই এসেছিলেন। প্রথম কিছুদিন সেই আগরওয়ালার ছেলে গোপাল পেনসিলভিনিয়ার বাটলার নামে একটা ছোট্ট জায়গায় ওঁকে আশ্রয় দেন। গোপালের বউ আবার অ্যামেরিকান মেয়ে। ওদের দুটি ছেলেমেয়ে। নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টে এরকম একজন লোককে রাখা মুশকিল। গোপাল তাই ওয়াই এম সি এ হস্টেলে একটা ঘর ভাড়া করে দিয়েছিল। দিনের বেলা অভয়চরণ গোপালের বাড়িতে এসে নিজে রান্না করে খেতেন। ইণ্ডিয়া থেকেউনি একটা কুকার এনেছিলেন, যে রকম টিপিক্যাল পেতলের কুকার পাওয়া যায়, তাতে উনি ডাল, তরকারি রান্না করতেন। গোপালের বউ স্যালির উনি মনজয় করেন ঐ রান্না দিয়ে সাদাসিধে নিরামিষ রান্না তো এরা কখনো খায়নি। অনেক লোক এতবিচিত্র সাধুকে দেখতে আসতো। ন্যাড়া মাথায় বোষ্টম বাবাজীদের মতন কাপড়ের টুপী, সঙ্গে সব সময় উনি ওঁর ছাতাটি রাখবেনই। ওঁর আর একটা গুণ ছিল, স্মৃতিশক্তি খুব ভালো ছিল। আমাদের দেশের অনেকেই সাহেবদের নাম শুনে একটু পরেই ভুলে যায়। অন্য কারুর সঙ্গে পরিচয় করাতে গেলে নাম ভুলে যায়। উনি কিন্তু যার সঙ্গেই পরিচয় হতো, প্রত্যেকের নাম মনে রাখতেন, রাস্তায় দেখা হলে নাম ধরে ডাকতেন।

অতীন জিজ্ঞেস করলো, তুই এত ডিটেইলস জানলি কী করে?

সিদ্ধার্থ বললো, আমার কৌতূহল হয়েছিল বলেই খোঁজ খবর নিয়েছি।

ট্রাফিকের জট একটুখানি খুলেছে, গাড়িগুলো আবার কচ্ছপের গতিতে চলতে শুরু করেছে। সামনে-পেছনে প্রায় শ পাঁচেক গাড়ি, কিন্তু একটারও হর্ণের শব্দ নেই। সিদ্ধার্থ গাড়ি চালাতে চালাতে বাকি কাহিনীটা বলে গেল।

মাসখানেক বাটলারে থাকার পর অভয়চরণ বুঝলেন যে গোপালের ওপর বেশি চাপ দেওয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া ওখানে তিনি দু' একটা বক্তৃতা দিলেও তাঁর আরও অনেক বড় ক্ষেত্র দরকার। এর মধ্যে তিনি অ্যামেরিকার জীবনযাত্রা কিছুটা বুঝে নিয়েছেন। তিনি চলে এলেন নিউইয়র্ক। সেখানে থাকবেন কোথায়? এর মধ্যেই তিনি ডাঃ রামমূর্তি মিশ্র সঙ্গে। এঁর বয়েস অনেক কম, স্মার্ট গাই, সাদা স্ল্যাক্স আর নেহরু জ্যাকেট পরে, কথাবার্তায় খুব তুখোড় আর ছটফটে। আমেরিকানদের মতন কথায় কথায় ওহ হাউ লাভলি, কিংবা ইজনট ইট বিউটিফুল বলা শিখে নিয়েছে। এঁর আবার একটা 'হঠযোগ স্টুডিও' আছে। অর্থাৎ হি সেলড ইন্ডিয়া। মাঝে মাঝে ভারতীয় গান বাজনার উৎসব করেন, রবিশঙ্করকে আনান ইত্যাদি। ইনি কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিলেন অভয়চরণকে। অভয়চরণের তখনকার নাম অবশ্য শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী। পরে আর একটা নাম হয় প্রভুপাদ। এই দু'জনের কিন্তু বেশিদিন বনলো না। রামমূর্তি মিশ্র আধুনিক শহুরে ধরনের মায়াবাদী। আর প্রভুপদ ভক্তিবাদী, কৃষ্ণভক্ত। প্রভুপাদ রামমূর্তি মিশ্রের দয়ায় বেশিদিন থাকতে চাইলেন না। নিজস্ব একটা ঘর ভাড়া করলেন। খুবই ছোট্ট, খুপরি মতন ঘর, তারই ভাড়া বাহাত্তর ডলার। সেটাই হলো তার কৃষ্ণ মন্দির, সেখানে তিনি কীর্তন গান আর ভক্তদের উপদেশ দেওয়া শুরু করলেন।

অতীন জিজ্ঞেস করলো, বাহাত্তর ডলার ভাড়া, তা ছাড়া নিজস্ব খাওয়া-দাওয়ার কিছু খরচ তো ছিলই। উনি সে পয়সা পেতেন কোথায়?

সিদ্ধার্থ বললো, ঐ যে বইগুলো তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, সেগুলো ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন। কিছুতেই তিনি নিরুৎসাহিত হন না। সামনের মাস কী করে চলবে তার ঠিক নেই, তবু তিনি কৃষ্ণ মাহাত্ম্য প্রচার চালিয়ে যেতেলাগলেন তেজের সঙ্গে। ডাঃ মিশ্রের সঙ্গে থাকার সময় কিছু ইন্ডিয়া সম্পর্কে, ইন্ডিয়ান ফিলসফি সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড লোক তাঁকে চিনেছিল। তা ছাড়া কাছেই ছিল প্যারাডক্স নামে একটা রেস্তোরাঁ, সেখানে আসতো লম্বা চুল আর দাড়িওয়ালা বাউন্ডুলে ছোকরারা, তারা কেউ ছবি আঁকে, কেউ বাজনা বাজায়, পরে এদেরই বলা হতো হিপি। এই ছোকরারা একজন দু'জন করে আসতে লাগলো তাঁর কাছে। প্রভুপাদ যে করতাল বাজিয়ে কীর্তন করতেন, এটাকেই তারা একটা নতুন ধরনের গান বলে মনে করে আগ্রহী হলো, তা ছাড়া ভিয়েৎনামী যুদ্ধের ছায়ায় এরা খুঁজছিল একটা কিছু নতুন দর্শন।

প্রভুপাদের নিজস্ব জিনিসপত্র কিছুই প্রায় ছিল না, এর ট্রাঙ্ক ভর্তি বই, একটা ভাঙা টাইপ রাইটার আর ভক্তরা দিয়েছিল একটা টেপ রেকর্ডার। একদিন সেই ঘরেই চুরি হয়ে গেল। চোরেরও কী করুন অবস্থা। প্রভুপাদ তখন সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের সেই অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে উঠে গেলেন বাওরী অঞ্চলে। হার্ভে নামে একটা ছেলের একটা অ্যাটিকের ঘর ছিল ওখানে, সে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাচ্ছে বলে প্রভুপাদকে ওখানে বিনা পয়সায় থাকতে দিয়ে গেল। অবশ্য, সেখানে ডেভিড অ্যালেন নামে আর একটা ছেলেও থাকবে। ঐ ডেভিট আবার নেশাখোর, প্রায় আধ পাগল।

বাওরীতে তুই কখনো গেছিস, অতীন? আমরা সন্ধের পর সেখানে যেতে ভয় পাই। নিউ ইয়র্কের ওয়ার্স্ট এরিয়া আছে ঐ বাওরী, যত রাজ্যের মাতাল, লুম্পেন, চোর-জোচ্চোর, বেশ্যাদের আড্ডা। নেশাখোররা পেভমেন্টের ওপর শুয়ে থাকে। যখন তখন মাঝ রাস্তায় ছুরি মারামারি হয়। প্রভুপাদের যেন সেসব ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। একটা বেশ বড় ঘর পেয়ে সেখানে তিনি ধুপ ধুনো জ্বালিয়ে প্রত্যেক সন্ধেবেলা কীর্তন আর গীতাপাঠ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আস্তে আস্তে ভিড় বাড়তে লাগলো তাঁর কাছে। ঐ কীর্তনের জন্যই ছেলেমেয়েরা বেশি আসে, তারাও চেঁচিয়ে হরে কৃষ্ণ গায়।

পাড়ার মাতাল,ভবঘুরে কিংবা খুনেরা প্রভুপাদকে কোনোদিন ডিসটার্ব করেনি। এই অদ্ভুত চেহারার স্বামীজীকে তারা বরং সমীহই করতো। উনি একা একা বাজার করতে যেতেন, রাস্তায় সকলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসতেন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বিনীতভাবে উত্তর দিতেন। তাঁর কীর্তনের আসরে দিন দিন ভক্তের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। প্রভুপাদ ঠিক করলেন, সেই ঘরটাকেই রাধাকৃষ্ণের মন্দির বানাবেন। কিন্তু বিপদ এলো অন্য দিক থেকে।

ঐ যে ডেভিড অ্যালেন বলে একটি ছেলে ঐ ঘরে থাকতো সে এমনিতে ছিল নিরীহ, কীর্তন গান করতো, প্রভুপাদের উপদেশ মন দিয়ে শুনতো। কিন্তু সাঙ্ঘাতিক নেশার দাসত্ব কিছুতেই ছাড়তে পারছিল না। গাঁজা, এল এস ডি, অ্যামফেটামাইনস এর নেশা দিন দিন বাড়িয়েই যাচ্ছিল। ঐ নেশার ঝোঁকে সেও উগ্র হয়ে উঠতো। এক এক সময় স্বামীজীকে মারতে যেত। একদিন ঘরে আর কেউ নেই, ঐ ডেভিট হঠাৎ বিকট হুংকার দিয়ে স্বামীজীর সামনে এসে দাঁড়ালো, তার চোখ দুটো হিংস্র পশুর মতন'। প্রভুপাদ তাকে বোঝাতে গেলেন, কোনে ফল হলো না, তার তখন কিছুই বোঝার মতন অবস্থা নেই। প্রভুপাদ চার তলার সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলেন রাস্তায়। নিজস্ব জিনিসপত্র কিছুই আনলেন না। অ্যামেরিকায় আসবার ন' মাস পরে তিনি আবার আশ্রয় হারিয়ে পথে নামলেন।

এরপর তিনি কী করবেন? একটিই উপায় আছে। তার দেশে ফেরার টিকিট আছে, তিনি আবার জাহাজে চেপে বসে পড়তে পারেন। অনেকক্ষণ তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু সত্তর বছরের বৃদ্ধটি কিছুতেই হার মানবার পাত্র নন। এদেশে এসেছেন কৃষ্ণের নাম প্রচার করতে, যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ তিনি সে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। ঐ অ্যাটিকের ঘরে তাঁর আর ফিরে যাওয়ার রুচি নেই। তিনি তাঁর কীর্তনের আসরের দু'চার জন ভক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে মাইকেল গ্রান্ট, সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তারখানিকটা নাম হয়েছিল, ইস্টার্ন ফিলোসফির প্রতি তার আগ্রহও ছিল, সে এগিয়ে এলো সাহায্য করতে। 'ভিলেজ ভয়েস' পত্রিকা থেকে বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে সে সেকেন্ড এভিনিউয়ের একটা খালি দোকানঘর ভাড়া করে বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে সে সেকেন্ড এভিনিউইয়ের একটা খালি দোকান ঘর ভাড়া করে ফেললো বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চাঁদা তুলে। দোকান ঘরটার বাইরে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে, তাতে লেখা ম্যাচলেস গিফট। প্রভুপাদকে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে গিয়ে সে বাড়ি ভাড়ার এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছে, প্রভুপাদকে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে গিয়ে সে বাড়ি ভাড়ার এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছে, প্রভুপাদ সেই এজেন্টকে নিজের অনুবাদ করা ভাগবতের তিন খন্ডের একটা সেট উপহার দিলেন নিজের নাম লিখে। যেন তিনি ঐ বাড়ির দালালটিকে মহামূল্যবান কিছু দিয়ে ধন্য করছেন। তারপর গম্ভীরভাবে তাঁকে বললেন, আমরা এখানে কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ স্থাপন করবো, আপনি হবেন তাঁরদ প্রথম অফিশিয়াল ট্রাস্টি।

অতীন হেসে উঠতেই সিদ্ধার্থ আবার বললো, অ্যাকচুয়ালি তাই হয়েছিল। লোয়ার ইস্টসাইডে আমরা যে বাড়িটায় এক সময় থাকতাম তোর মনে আছে? তুই প্রথম এদেশে এলি, সেই বাড়ি থেকে এই সেকেন্ড অ্যাভিনিউয়ের বাড়িটা বেশিদূর নয়। ঐ দোকান ঘরটিতেই প্রতিষ্ঠিত হলো ইসকন, ইন্টারশাসনেস, এদেশের লোক তা হলে সহজে বুঝতে পারবে। প্রভুপাদ জোর দিয়ে বললেন, তিনি এদেশের মানুষকে কৃষ্ণের নাম জানাতে এসেছেন, তিনি ঐ নামই রাখবেন। ঐ দোকানঘর আর তার পেছনের অ্যাপার্টমেন্টটা হলো একটা আশ্রমের মতন। সেখানে ভাত-ডাল-চাপাটি-নিরামিষ তরকারি রান্না করে খায়, প্রার্থনা আর কীর্তনের সময়ে সবাই জুতো বাইরে খুলে আস, কেউ সেখানে নেশা করতে পারবে না, এমন কি সিগারেট ও খেতে পারবে না, সেই বৃদ্ধের এই সব কঠোর নিয়ম অ্যামেরিকান ছেলেমেয়েরা মেনে নিল কেন? দিন দিন তাঁর ভক্তের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। একদিন সেখানে সদলবলে এলেন অ্যালেন গীনসবার্গ। তারপর তিনি ভক্তদের নিয়ে ওয়াশিংটন পার্কে হরেকৃষ্ণ গান গাইতে যেতে শুরু করলেন।

গাড়ি ঢুকে পড়েছে লিংকন টানেলের মধ্যে। সমুদ্রের নীচের এই সুড়ঙ্গ উজ্জ্বল আলোকমালায় সাজানো, গাড়িগুলো এখন ছুটছে তীব্র গতিতে, কোনো একটা গাড়ি যদি হঠাৎ থেমে যায় তা হলে পর পর কতকগুলো গাড়িতে যে ধাক্কা লাগবে তার ঠিক নেই। তবু সবাই ছোটে।

সিদ্ধার্থ বললো, এখন অ্যামেরিকার প্রায় শতেক শহরে ইসকনের মন্দিরে আছে। ক্যানাডা, ইউ কে, ফ্রান্স, জাপান, কোথায়? একটা বিরাট ধর্মীয় এমপায়ার বলতে পারিস। একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী ওষুধ-ব্যবসায়ী বুড়ো বয়েসে এসে এত বড় একটা ব্যাপার কী করে করলো?

অতীন বললো, এঁর সাকসেস স্টোরিটা খুবই চমকপ্রদ ঠিকই। কিন্তু এবার বল তো সিদ্ধার্থ, এ সম্পর্কে তোর এত আগ্রহ কেন? তুই ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিস নাকি?

সিদ্ধার্থ বললো, আমি ধর্ম-টর্ম কিছু বুঝি না। তা নিয়ে মাথাও ঘামাই না? আমি ব্যাপারটা দেখছি

অন্য অ্যাংগল থেকে। এই প্রভুপাদ একলা নিঃসম্বল অবস্থায় এসেছিলেন এদেশে। কিন্তু নিজের স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে এক চুল ও নড়েননি। এই মাংসাশী জাতকে ইনি বাধ্য করেছেন নিরামিষ খেতে। এদেশে এত সেক্সুয়াল পারমিসিভনেস, অথচ ইনি ভক্তদের আদেশ দিয়ে রেখেছেন অবৈধ যৌন সংসর্গ চলবে না। এঁর ভক্তদের নাম দেন মুকুন্দ, হয়গ্রীব, কুশ, কমলা, অনুরাধা। পুরুষরা মাথা ন্যাড়া করে, মেয়েরা শাড়ি পরে। এগুলো তো শুধু হুজুগ নয়। অ্যামেরিকান হুজুগ দু'চার মাস, বড় জোর একবছর থাকে। শুধু হুজুগ এতখানি আত্মত্যাগ কি সম্ভব? সেই তুলনায় আমরা কী করছি? আমরা এদেশে এসেই নিজের নামটা বদলাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অফিসে আমাকে সবাই সীড বলে ডাকে। আমি নিজেও টেলিফোন তুলে বলি, সীড স্পিকিং। তোর মনে আছে অতীন, একবার একটা ইন্টারভিউয়ের সময় একটা সাহেব তোর নামটা বদলাবার জন্য বলেছিল বলে তুই কীরকম রাগারাগি করেছিলি? এখন তোর সাহেব তোকে আদর করে ম্যাজ বলে। আমরা টাই না পরে অফিসে যাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারি না। এমন কি নিজেদের মধ্যে বসেও আমরা সব সময় দেশের নিন্দে করি। আমাদের দেশ কত নোংরা, কত দারিদ্র্য, দেশের গভর্নমেন্ট কত করাপ্ট যেন ওদেশে যে আমরা জন্মেছি, সেই পরিচয়টা যত তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা যায় ততই ভালো। আমরা ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলি, ওরা মাতৃভাষা তো শেখেই না,বাপ-মায়ের দেশ সম্পর্কে কিছু জানতে চায় না। অথচ ঐ বুড়ো লোকটি পুরো ভারতীয় কালচার চাপিয়ে দিচ্ছে এদেশের হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের মধ্যে।

অতীন গম্ভীরভাবে বললো, ভারতীয় কালচার নয়, ধর্ম। তুই এটা বুঝতে পারছিস না কেন? ধর্মের আফিমে লক্ষ লক্ষ লোককে আজও উন্মাদ করা যায়। আমরা যে ধর্মকে রিজেক্ট করেছি, ওয়েস্টে সেই ধর্মই এখন ভালো দামে বিক্রি হচ্ছে।

—আমরা ধর্মকে রিজেক্ট করেছি? ইন্ডিয়ার ধর্ম নেই। তুই পাগল নাকি? তুই নিজের দেশটা ভালো করে চিনলিই না।

—ইন্ডিয়ায় ধর্ম নিয়ে মাতামাতি নেই, সে কথা বলছি না। বলছি আমাদের কথা। এখানে যে-ধরনের ছেলেমেয়েরা এই প্রভুপাদের ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করছে, আমাদের দেশের সেই ধরনের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা কি ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায়? এখানে ইসকনের যে সব মিছিল হয়, তাতে কোনো ইন্ডিয়ান তো দেখতে পাই না, সবই তো সাহেব-মেম।

—যারা বাংলা-হিন্দী জানে না, অর্থাৎ বিদেশীদের কাছে কৃষ্ণ নাম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে উনি এসেছিলেন।

—কেন, যারা বাংলা হিন্দীজানে,তারা সবাই কি কৃষ্ণ নাম জপ করে। তারা আগেই উদ্ধার পেয়ে গেছে?

—মেটারিয়ালিস্টিক পশ্চিম জগতে ভক্তিধর্ম ছড়াবার ব্রত নিয়েছিলেন উনি, গোটা পৃথিবীর দায়িত্ব তাকে নিতে হবে কোনো মানে নেই।

—এদের মিছিলে আমি ব্লাকদেরও দেখি না। এদেশে কালো মানুষরাই বঞ্চিত,নিপীড়িত শ্রেণী। তাদের উদ্ধার করার জন্য বুঝি প্রভুপাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

—এটা একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার। এদেশের নিগ্রোরা দলেদলে মুসলমান হয়। দ্যাখ না, কেসিয়াস ক্লে মোহাম্মদ আলী হয়ে গেল। আরও অনেকেই। ওরা হিন্দু ধর্মের দিকে ঘেষতে চায় না। স্বামী বিবেকানন্দরও কি কোনো নিগ্রো ভক্ত ছিল? অথচ হোয়াইটরা হিন্দু ফিলজফিতে এত আগ্রহ দেখায় কেন কে জানে?

—এটা মোটেই পিকিউলিয়ার নয়। সিম্পল। মুসলমানদের ধর্মে, ইসলাম বেসিক প্রিন্সিপাল হল সমভ্রাতৃত্ব, সব মুসলমানদেরই ইকুয়াল রাইটস রয়েছে, নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য তারা লড়াই করিয়া বিশ্বাসী।

—মুসলমানদের মধ্যে বুঝি গরিব-বড়লোকদের বিভেদ নেই? খুব বেশি মাত্রাতেই আছে। মুসলামানরা বুঝি নিজেদের মধ্যে লড়াই করে না? এত সিম্পল নয়।

—আমি বলছি, বেসিক প্রিন্সিপ্যালের কথা। হিন্দু ধর্মের বেসিক প্রিন্সিপল হচ্ছে ত্যাগ,মায়া, পারলৌকিক মুক্তি, এই সব। এই প্রিন্সিপালগুলো ভারতীয় হিন্দুদের অলরেডি বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। আরে, যারা খেতে পায় না, মাথার ওপর রোদ-বৃষ্টি আটকাবার মতন একটা ছাদ নেই;

তাদের আবার ত্যাগ, মুক্তি কী রে? এককালে যখন প্রচুর ভোগের ব্যাপার ছিল, তখন ত্যাগের প্রশ্ন এসেছিল। এদের এখন সেই অবস্থা। পৃথিবীতে হোয়াইট রেস এখন সমস্ত ক্ষমতা দখল করে আছে, এদের মধ্যে কিছু লোক ভোগ দর্শনে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাছে এই ফিলোসফি খানিকটা অ্যাপিল করবে তাতে আর আশ্চর্য কী।

—তুই বড্ড সোজা করে দেখছিস রে, অতীন। একজন বুড়ো লোক পুরোনো ধরনের ইংরিজিতে এদের বৈষ্ণব দর্শন বোঝালো, তাতেই সবাই মেতে গেল? তুই প্রভুপাদের অ্যাচিভমেন্টের সিগনিফিকেন্স বুঝতে পারছিস না।

—আমি বুঝতে পেরেছি, তোর কী হয়েছে। একজন বাঙালী এসে এদেশে এতগুলো মঠ-মন্দির বানিয়েছেন, এত বড় একটা অর্গানাইজেশনের হেড হয়েছেন, তুই তাতেই মুগ্ধ হয়ে গেছিস। আমি এতটা গুরুত্ব দিতে পারছি না। ধর্মের নাম করে যে প্রতিষ্ঠানই হোক, সেটা ক্রমশ আর একটা সেক্ট হয়ে উঠবে, অ্যাফ্লুয়েন্ট শ্রেণীর শখের খেলা হবে কিংবা অন্য ধর্মের সঙ্গে লাঠালাঠি লাগবে। আমি মনে করি, ধর্মকে একেবারে নির্মূল করতে না পারলে এই পৃথিবীর মানুষের মুক্তি নেই।

—এসব তোর গোঁড়ামির কথা অতীন। তুই অন্য অ্যাংগেলটা একেবারে দেখছিস না। আমি মনে করি, পশ্চিমী জগৎ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আর ব্যবসা দিয়ে এতদিন আমাদের জয় করে রেখেছিল, এখন প্রাচ্যদেশের একজন এসে আমাদের দর্শন দিয়ে এদের জয় করছে। ইসকনের অনেক ছেলে মেয়ে প্রভুপাদের জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারে। উনি অবশ্য জীবন দিতে বলতেন না কখনো। ওঁর মতে, এই ধর্ম পৃথিবীতে একটা যুদ্ধবিরোধী শান্তির বাণীও প্রচার করবে। তুই ধর্মের ওপর এত খাপ্পা কেন? মানুষ যদি ধর্মের কাছে শান্তি পায়, তাতে আপত্তির কী আছে? স্বার্থপর কিংবা মাতালবাজরা অন্যভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে, কিন্তু সেটা তো ধর্মের দোষ নয়। কোটি কোটি মানুষ এখনো যে ধর্মের কাছে আস্থা ও সান্ত্বনা পায়, সেটা তো মিথ্যে নয়।

—তোর দেখছি মাথাটা একেবারে গেছে। তোর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তুই যা, ওদের দলে ভিড়ে পড়, দীক্ষা নিয়ে চ্যালা হয়ে যা। অবশ্য দ্যাখ, তোকে ওরা আবার দলে নেবে কি না।

—আমি দীক্ষা টিক্ষা নেবার কথা ভাবি না। কিন্তু প্রভুপাদের সমস্ত কেরিয়ারটা স্টাডি করে আমার একটা অদ্ভুত ফিলিং হয়েছে। একজন মানুষ নিজের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে এতদূর তো উঠতে পেরেছে? আর আমরা কী করছি? আমাদের তো কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই। অনবরত টাকা রোজগার করছি আর করছি? দু' বছর অন্তর গাড়ি বদলাচ্ছি, বাড়ি কিনছি, এই কি জীবন? আমার এই একটা কমপ্লেক্স পেয়ে বসেছে। আমি ঠিক করেছি দেশে ফিরে যাবো। তারপর যা হয় হোক। এদেশে দাসত্ব করা আর ভালো লাগছে না।

সিদ্ধার্থর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে অতীন বললো, কাল রাত্তিরে কতটা মাল টেনেছিস! এখনো হ্যাং ওভার কাটেনি মনে হচ্ছে? সেবার কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তোর মনে নেই? আবার বোকামি করবি?

সিদ্ধার্থ বললো, আমি ঠিক করেছি, আবার ফিরে গিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করবো।

শহরে দু'একটা কাজ সেরে সিদ্ধার্থ অতীনকে নামিয়ে দিয়ে গেল জে এফ কে এয়ারপোর্টে। আজ থ্যাংকস গীভিং ডে-র ছুটি, অতীনকে যেতে হবে শিকাগো। তার ফ্লাইটের এখনো দেরি আছে, তাড়া কিছু নেই। লাউঞ্জে বসে সে হ্যান্ড ব্যাগ খুলে জরুরি ফাইলটা বার করলো। এই বিজনেস ডিলটা ঠিক মতন করতে পারলেই অতীনের আর একটা প্রমোশান হবেই।

কোটের পকেট থেকে ছোট্ট ক্যালকুলেটারটা বার করে রাখলো বাঁ হাতে। এটা এমনই অভ্যেস হয়ে গেছে যে যে-কোনো অঙ্ক দেখলেই হাত নিশপিশ করে। যদিও ফাইলে অঙ্কগুলো সবই আগে থেকে করা আছে নির্ভুল ভাবে।

অতীনের মন বসছে না। নিউ ইর্য়র্কে ইসকনের মিছিলের জন্য ট্রাফিক জ্যাম একটা বড় ঘটনা, সব কাগজে প্রথম পাতার খবর হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গটা একবার তুলতেই সিদ্ধার্থ লম্বা গল্প ফেঁদে বসলো। সিদ্ধার্থ যে এই সব ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে এতখানি আগ্রহী হয়ে পড়েছে,তা অতীনের ধারণাই ছিল না। সব সময় হাসি-ঠাট্টা আর ফক্কুড়ি করা স্বভাব ছিল সিদ্ধার্থর। এটা বদলে গেছে গত বছর সেই ঘটনার পর। দেশ থেকে নিজের বাবা আর মাকে এনে নিজের কাছে রেখেছিল সিদ্ধার্থ। এখন

ও বড় বাড়ি কিনেছে, কোনো অসুবিধে ছিল না। সিদ্ধার্থর বাবা একটা কলেজের হিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন, পড়ুয়া মানুষ, এখানে তিনি পড়াশুনো নিয়েই থাকতে পারতেন, কিন্তু হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেলেন। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। দেশে কি অ্যাকসিডেন্ট হয় না? কেউ গাড়ি চাপা পড়ে মরে না? কলকাতায় যা ট্রাফিকের অবস্থা... । এদেশে ফাঁকা রাস্তায় দুর্দান্ত স্পীডে গাড়ি চলে,সিদ্ধার্থের বাবা একা একা হেঁটে বেরোতেই বা গিয়েছিলেন কেন? তাই হাই ওয়ে দিয়ে...

কিন্তু তারপর আর সিদ্ধার্থর মা কিছুতেই এদেশে থাকতে চাইলেন না। একেবারে অবুঝ হয়ে গেলেন। সিদ্ধার্থর আর ভাই বোন নেই। ভদ্রমহিলা একা একা কলকাতা শহরে একটা ফ্ল্যাটে থেকে কী আনন্দ পাবেন? কিন্তু তিনি কারুর কথাই শুনলেন না। জোর করে ফিরে গেলেন দেশে। সিদ্ধার্থ তাতে খুব আঘাত পেয়েছিল। ওর স্ত্রী নীপাই নাকি মাকে ধরে রাখতে পারেনি। হয়তো কথাটা ঠিক নয়। নীপা অনেক চেষ্টা করেছিল। নিজের মাকে সিদ্ধার্থ নিজেই যদি বোঝাতে না পারে, তা হলে নীপা আর কী করে তাঁর মত ফেরাবে।

এখানে সিদ্ধার্থ কি ভাবছে, এদেশ থেকে পাততাড় গুটিয়ে ফিরে গিয়ে মায়ের কাছে থাকবে? সস্তা সেন্টিমেন্ট! নীপার ইচ্ছে-অনিচ্ছের মূল্য দেবে না, ছেলে-মেয়ের সুবিধে অসুবিধের কথা চিন্তা করবে না?

সিদ্ধার্থের বাবা শান্ত, নিরীহ ধরনের মানুষ ছিলেন, প্রায় কথাই বলতেন না। অতীনের সঙ্গে দু তিনবার দেখা হয়েছে, কিন্তু কেমন আছেন, ভালো আছেন ছাড়া আর কোনো কথাই হয়নি। বই পড়া ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে উৎসাহ ছিল না। একটাই অতীন বুঝতে পারে না, এদেশে কত কী দেখার আছে, এত রকম মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি, থিয়েটার, বেড়াবার কত জায়গা তবু সেসব দেখতে ইচ্ছে করে না? ইতিহাসের অধ্যাপক, কিন্তু ইতিহাস কি শুধু বইয়ের পৃষ্ঠায়? তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল, শুধু শুধু প্রাণটা দিলেন।

ইসকনের প্রভুপাদের কথা শুনে অতীন তেমন কিছু মুগ্ধ হয়নি। তার বাঙালী বাতিক নেই। ধর্মীয় গুরুরা পৃথিবীর কোনো উপকার করতে পারে, একথা সে কিছুতেই মানতে পারবে না। বাবার মৃত্যুর পর সিদ্ধার্থ বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে, ঐ ভক্তিপাদের মধ্যে সে কি ফাদার ফিগার খুঁজছে?

ঐ সব শুনতে শুনতে বার বার দেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

শুধু কলকাতা নামটা একবার কেউ উচ্চারণ করলেই অনেকগুলো ছবি ফুটে ওঠে চোখের সামনে।

অতীন যে আগে দু'বার চীনে গেছে, সে কথা মা-বাবাকে জানায়নি। মা অন্তত ভাবতেন, চীনে গেলেই অতীন একবার নিশ্চয়ই কলকাতায় ঘুরে আসবে। ওঁরা বোঝেন না যে পিকিং থেকে কলকাতায় যাওয়ার চেয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে কলকাতায় যাওয়া সোজা। ছুটি পাওয়াটাই সবচেয়ে শক্ত।

সিদ্ধার্থ আর সে একসঙ্গে দেশে পাকাপাকি ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেনি? ওঃ, সেই অভিজ্ঞতার কথা ভাবলেই এখনো জিভটা তেতো হয়ে যায়। দেশে লোকাল ট্রেনগুলো সব সময় ভর্তি থাকে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একদল লোক বলে, জায়গা নেই, জায়গা নেই। সারা দেশটাই যেন অতীন আর সিদ্ধার্থকে সব সময় এই কথাটাই শুনিয়েছে, জায়গা নেই, জায়গা নেই!

এমার্জেন্সির পর ইন্দিরা গান্ধী হেরে গেলেন ইলেকশানে, তারপর পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট পাওয়ারে এলো। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলো, পেন্ডিং কোর্ট কেসগুলোও তুলে নেওয়া হয়েছিল। অতীন পলিটিক্যাল প্রিজনার ছিল না, তার নাম ছিল মার্ডার চার্জ। কিন্তু বিমান বিহারী কী যেন কলকৌশল করে অতীনের কেসটাও পলিটিক্যাল কেসের মধ্যে ফেলে দিয়ে উইথড্র করিয়ে নিয়েছিলেন। বেইল জাম্প করায় ব্যাপারটাও চেপে দেওয়া হয়েছিল। প্রতাপ খুব ভালো রকম খোঁজ খবর নিয়েছিলেন, অতীনের দেশে ফেরার আর কোনো ঝুঁকি ছিল না। অতীন তো সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। প্রয়োজনের বেশি তো সে একদিনও থেকে যেতে চায়নি আমেরিকায়। শর্মিলাও এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। তখন ও রণ জন্মায়নি। অনীতার পাঁচ বছর বয়েস,তার লেখাপড়ার কোনোই অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কিন্তু কলকাতায় একটা ঐটুকু মেয়েকে ভালো স্কুলে ভর্তি করায় যে বিরাট সমস্যা, তা কি অতীন কখনো ভাবতে পেরেছিল?

কলকাতায় ফিরে অতীন দেখেছিল, সে যে শহরটাকে চিনতো সে শহরটাই আর নেই, যেন এক অন্য কলকাতা।

সেলিমপুরে বাবা-মায়েরা যে অত ছোট একটা ফ্ল্যাটে থাকেন, তা-ও অতীন একদিন চিঠি পড়ে বুঝতে পারেনি। তাদের কালীঘাটের বাড়িতে সেই তুলনায় অনেক বেশি জায়গা ছিল। সে যাই হোক, একখানা ঘরে গাদাগাদি করে থাকতেও অতীনের আপত্তি ছিল না। ঐ রকমভাবে তো কত লোকই থাকে। সে অ্যামেরিকা থেকে ফিরেছে বলে কি অন্যদের মাথা কিনে নিয়েছে? বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকার জন্যই তো ফিরে আসা।

শর্মিলার কষ্ট হয়েছিল বটে কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করেনি। শর্মিলা ধুলো আর ধোঁয়া সহ্য করতে পারে না, অতীন বলেছিল, আস্তে আস্তে মানিয়ে নাও। আমাদের জীবনের অর্ধেকের বেশি সময়ই তো আমরা এই ধুলো-ধোঁয়ার মধ্যে কাটিয়ে গেছি, এখানেই মানুষ হয়েছি, আবার সব অভ্যেস হয়ে যাবে।

শর্মিলা অবশ্য জামসেদপুরের মেয়ে, সেখানকার বাতাস কলকাতার চেয়ে অনেক পরিষ্কার, জামসেদপুরে গেলে শর্মিলা ভালো থাকতো। অতীন টিসকো-তে একটা চাকরির অফার পেয়েও নেয়নি, সে থাকতে চেয়েছিল কলকাতাতেই। সে গিয়েছিল প্রতাপ মজুমদারের পরিবারের দুই ছেলের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে।

ওঃ ড্রাগ রিসার্চ লেবরেটরির সেই চাকরি। ভাবলেই এখনো শরীরটা রি রি করে। কেউ মন দিয়ে কাজ করবে না, অন্যদের কাজ করতে দেবে না। কাজ না করেও মাইনে নিতে বিবেকে লাগে না কারুর। একজন যদি ভালোভাবে কাজ করতে চায়, তা হলে সেটা যেন তার অপরাধ, অন্যরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। অতীনকে তার সহকর্মীরা কথায় কথায় বলতো, মশাই, আপনাদের অ্যামেরিকায় ওসব চলে! ঐ 'আপনাদের অ্যামেরিকা' শুনলেই অতীনের গা জ্বালা করতো।

আর ঈর্ষা। কত রকম নোংরা ধরনের ঈর্ষাই যে হয়। সিদ্ধার্থরও একই রকম অবস্থা হয়েছিল। সিদ্ধার্থ বলতো, মাইরি, নিষ্কাম ঈর্ষা কাকে বলে দেখেছিস? আমাকে ঈর্ষা করলে অন্য একজনের কোনো লাভ নেই, তার লাইন আলাদা, তার কোনো প্রমোশন হবে না, তবু সে আমার পেছনে লাগবে, আড়ালে আমার নিন্দে করবে। এটা নিষ্কাম ঈর্ষা ছাড়া আর কী?

তবু সব অসুবিধেই তুচ্ছ করতে পারতো অতীন। কিন্তু কলকাতায় তার বন্ধু কোথায়? সিদ্ধার্থ চাকরি নিয়েছিল দুর্গাপুরে। কৌশিক আর পমপম ওদের দেখে দুঃখ পেয়েছিল অতীন। সবচেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছিল অলি।

...সিকিউরিটি চেক-এর কল দিয়েছে। ব্যাগ গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালো অতীন। টিকিটটা হাতে নিয়ে ঘড়ি দেখলো। অনেকটা সময় চলে গেল, কাগজপত্র কিছুই পড়া হলো না।

সিদ্ধার্থ আবার দেশে ফেরার কথা ভাবছে। মাঝে মাঝে এরকম ভাবলুতা আসে, ভালো করে ওকে কড়কে দিতে হবে। দেশ! দূরে থাকলেই তবু দেশের কথা ভাবতে ভালো লাগে।

শর্মিলা এ বছর একবার দেশে বেড়াতে যাবার বায়না ধরেছে। তিন বছর আগেই শর্মিলা ছেলে মেয়েকে নিয়ে একবার দেশে ঘুরে এসেছে, সেবার অতীন যায়নি। এ বছর বাড়ি সারাতে গিয়ে অনেক খরচ হয়ে গেল, এবার আর যাওয়া হবে না। সামনের বছর দেখা যাবে।

অতীনের নাক দিয়ে গরম প্রশ্বাস বেরুতে লাগলো, রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠলো। অলির কথা মনে পড়লে তার এখনো এরকম রাগ হয়।

॥ ৩ ॥

সেগুন বাগিচার অতবড় বাড়িটা এক সময় নানা বয়েসের মানুষের কণ্ঠস্বরে ঝমঝম করতো, এখন সেখানে কয়েকটি মাত্র প্রাণী থাকে। মঞ্জুর বাবা শামসুল আলম শেষজীবনে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। অমন হাসিখুশী মানুষটিকে আর চেনাই যেত না। যে-কোনো ঘরে ঢুকেই তিনি দৌড়ে এক কোণায় গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়তেন, ভাবখানা এই যে পেছন থেকে কোনো শত্রু তাঁকে আক্রমণ করতে পারবে না। পা দুটি সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে শঙ্কাতুর মুখে বলতেন, ঐ আসছে, ঐ আসছে।

অথচ তিনি খবরের কাগজ পড়তেন, বই পড়তেন, চেনা মানুষদের চিনতে পারতেন। এককালের নামজাদা উকিল, পড়াশুনো করা মানুষ, সেসবও কিছু ভোলেন নি, কিন্তু দশ মিনিটের বেশি স্বাভাবিক

ভাবে কথা বলতে পারতেন না। অনেক চিকিৎসা করানো হলো। কিছুদিনের জন্য লন্ডনেও পাঠানো হয়েছিল তাঁকে, কোনো ফল হয়নি। উন্মাদ বলে তাঁকে কিন্তু অবজ্ঞা করার উপায় ছিল না, হঠাৎ হঠাৎ তিনি কোনো গভীর ধরনের সত্য উচ্চারণ করে চমকে দিতেন সকলকে। কলকাতা থেকে ফিরে মঞ্জু যখন প্রথম তার বাবাকে কদমবুসি করতে যায়, তখন শামসুল আলম বলেছিলেন চিলেকোঠায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে লুঙ্গির কষি আলগা হয়ে গেছে, ঠোঁটের কষ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে, চক্ষু দুটি ঘোলাটে, বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন আপন মনে, তবু তিনি ঠিক চিনতে পারলেন মঞ্জুকে। মঞ্জুর মুখখানি দু'হাতে ধরে স্নেহশীল পিতার মতন আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন, ফিরে আসছোস! আয়, আয়, সোনা মাইয়্যা আমার। সুখু মিঞা কোথায়? ওরে মঞ্জু, তুই পোলার নাম রাখছোস সুখু। কিন্তু তোর কপালে সুখ নাই, তার কপালেও সুখ নাই।

বাড়িসুদ্ধ লোক এরকম অলক্ষুণে কথা শুনে আঁতকে উঠেছিল কেঁপে মঞ্জুর বুক।

শেখ মুজিব যেদিন সপরিবারে নিহত হলেন, সেদিন আলম সাহেব এক সাঙ্ঘাতিক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বাড়ির অন্য লোকেরা যখন ভয় বিহ্বল কণ্ঠে নানা রকম আলোচনা করছে, তখন তিনি হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, এবার যাবে তাজউদ্দিন। সৈয়দ নজরুল, মনসুর আহমেদ, কামরুজ্জামান, এরাও খতম হবে। স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করেছিল, তারা কেউ থাকবে না।

জেলখানার মধ্যে সত্যি সত্যি সেই নৃশংস ঘটনা ঘটার দু'দিন আগেই শামুসল আলমের লাশ ভোরবেলা ভাসতে থাকে বাড়ি সংলগ্ন পুকুরের পানিতে। সেটা দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা, তা আর জানা যায় নি।

শামসুল আলমের পুত্র কন্যাদের মধ্যে এখনো বেঁচে আছে পাঁচ জন। দুই বিবাহিতা কন্যা আছে চিটাগাং ও রাজশাহীতে। এক পুত্র বিদেশে। বাড়িটি মাঝখানে প্রাচীর তুলে দুটি ভাগ করা হয়েছে। মধ্যম পুত্র মওদুদের স্ত্রী যোবায়দার সঙ্গে তার শাশুড়ির একেবারেই বনিবনা হয়নি, নিত্যদিন ঝগড়াঝাটির বদলে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হওয়াই ভালো। মালিহা বেগম নিজের অংশ পৃথক করে নিয়েছেন, তাঁর অন্য ছেলেমেয়েরা কখনো ঢাকায় এলে সেই অংশেই ওঠে। মঞ্জু রয়েছে তার মায়ের সঙ্গে।

মালিহা বেগমের অংশটিতেও মোট পাঁচখানি শয়নকক্ষ, দুই বারান্দা, দুটি বাথরুম, দুটি রান্নাঘর, অনেকখানি বড় উঠোন। এদিকে থাকে মাত্র তিনটি রমণী আর পুরুষ বলতে মঞ্জুর ছেলে সুখু, তার বয়স এখন সদ্য উনিশ। মালিহা বেগম এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে তাঁর হাঁটু দুটো মাঝে মাঝেই প্রতিবাদ করে, তবু তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। প্রায়ই তিনি সন্ধেবেলা ছাদে উঠে অন্য অংশটির দিকে উৎসুক নয়নে থাকিয়ে থাকেন। যোবায়দা তার ছেলেমেয়েদেরও এইদিকে আসতে দেয় না। মওদুদ মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে না। মালিহা বেগম দূর থেকে তাঁর ছেলে ও নাতি-নাতনীদের এক ঝলক দেখতে পেলেই তৃপ্তি পান। এই তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুর ঢল নামে।

মঞ্জু এখন বাংলাদেশের নামকরা গায়িকা বিলকিস বানু। কখনো সে দোকানে-বাজারে গেলে অল্প বয়সী ছেলেমেরা তার অটোগ্রাফ চায়। খবরের কাগজে তার ছবি ছাপা হয়, টি ভি-তে প্রায়ই দেখা যায় বলে তার মুখখানি পরিচিত। খুব প্রয়োজন ছাড়া মঞ্জু অবশ্য বাড়ি থেকে কমই বেরোয়।

মনিরাকে সে নিজের কাছে এনে রেখেছে। কোথায় যাবে মেয়েটা, কেউ তো ওর নেই। আগে ও বাড়িতে থাকার সময় মনিরা যখন তখন ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যেত, তিন চারদিন তার কোনো পাত্তাই পাওয়া যেত না। তার দৃঢ় ধারণা ছিল, সিরাজুলকে সে খুঁজে পাবেই। এরকম একটা দুর্দিনের পর কোনো একজন মানুষকে খুঁজে পেলেও তাকে যে আর নিজের করে পাওয়া যায় না, তা ও কী বুঝবে। অবশ্য সিরাজুল সত্যিই বেঁচে আছে না তার মৃত্যু হয়েছে, সে সম্পর্কে সঠিক কেউ কিছু বলতে পারেনি। সেই বিভিষিকার দিনগুলির পাঁচ সাত বছর পরেও মনিরার মতন হাজার হাজার নারী আশা করে বসে ছিল, তাদের প্রিয়জন হয়তো পিরে আসবে। স্বাধীনতার যুদ্ধে যে কতজন শহিদ হয়েছে আর কতজন নিরুদ্দেশ, আজও তার হিসেব হলো না।

সকাল দশটা, স্বরলিপি দেখে একটা গান তুলছে মঞ্জু। কামাল তাকে জাপান থেকে একটা অদ্ভুত যন্ত্র এনে দিয়েছে, এই যন্ত্র থেকে হারমোনিয়াম, তানপুরা, এস্রাজ, পিয়ানো, বেহালার সুর বার করা

যায়। সেই যন্ত্রটা সম্পর্কে মঞ্জুর মুগ্ধতা এখনো কাটেনি, প্রত্যেকদিন সেটা বাজাতে বসলেই অবাক হয়ে জাপানীদের বুদ্ধির কথা ভাবে।

একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠলো। মঞ্জু শুধু মুখ তুলে তাকালো একবার গান থামালো না। সে নিজে টেলিফোন ধরে না। ওটা মনিরার কাজ। মনিরা এখন বলতে গেলে, তার প্রাইভেট সেক্রেটারি। যদিও টি ভি, সিনেমা, রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ ও পাওনা আদায়ের জন্য মালেক নামে একটি ছেলেকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে, সে সব বাইরের কাজ করে। মালিক প্রতিদিন সকালে এসে নিচের ঘরে বসে ঘন্টাখানেকের জন্য চিঠিপত্র লেখালেখি করে। এই মালেকের সঙ্গে মনিরার প্রায়ই খটাখটি লাগে।

ফোনটা কয়েকবার বাজবার পর মনিরা ছুটে এলো অন্য ঘর থেকে। ফোনটা তুলে হ্যালো বলার পর সে একঝলক তাকালো মঞ্জুর দিকে। অর্থাৎ সে বুঝিয়ে দিল, মঞ্জুর উঠে আসার দরকার নেই। বেশ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সে বললো, বিলকিস বানু এখনে ব্যস্ত আছেন, কী কওয়ার আছে, আমারে বলেন!

ওপাশ থেকে একজন ধমক দিয়ে বললো, এই মনিরা পাকামি করিস না, মঞ্জুরে ডাক!

মনিরা চোখ বড় বড় করে জিভ কেটে ফেললো। এক হাতে ফোনটা চাপা দিয়ে হাসিমুখে বললো, কামাল সাহেব।

বাজনা বন্ধ করে উঠে এলো মঞ্জু। তার মুখে সামান্য বিরক্তির ছায়া ফুটে উঠলেও কামালকে অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই।

মঞ্জু রিসিভারটা নিতেই কামাল বললো, গুড মর্নিং বেগম সাহেবা, মেজাজ শরীফ আছে তো?

মঞ্জু বললো জী। আজ বিকাল চারটার সময় রেকর্ডিং তো? মনে আছে আমার।

কামাল বললো, সেইটা তো ক্যানসেলড।

মঞ্জু বললো, ক্যানসেলড? আজ রেকর্ডিং হবে না?

কামাল বললো, আজ স্ট্রাইকের দিন না? সবকিছু বন্ধ। কোনো ট্রান্সপোর্ট পাওয়া যাবে না।

–আজ কিসের স্ট্রাইক?

–তুমি সে খবরও রাখো না? কোন্ জগতে থাকো! আজ সবকটা অপোজিশান পার্টি প্রতিবাদ দিবস পালন করছে, গত শনিবার কুমিল্লায় ছাত্রদের উপর যে ফায়ারিং হলো...আমি মালেককে বলে দিয়েছি আগামীকাল স্টুডিও খালি নাই। রেকর্ডিং হবে পরশু, সে খবর দেয় নাই?

–মালেক আজ আসে নাই। হরতালের জন্যই আসতে পারে নাই।

–তুমি কী করেছিলে মঞ্জু? তোমাকে ডিসটার্ব করলাম?

–গান তুলছিলাম।

–একটু শোনোও না! তোমার বাসায় তো কখনো আসতে বলো না, টেলিফোনেই শোনাও, কানের ভিতর দিয়া একেবারে মরমে পশে যাবে....

আর দু'চারটি কথা বলে মঞ্জু ফোন রেখে দিল। কামাল রঙ্গ-রসিকতার মুডে ছিল, কিন্তু মঞ্জু তাকে প্রশয় দেয়নি।

একথা ঠিক, সিনেমা-গান-বাজনার জগতে কোনো মানুষকে মঞ্জু তার বাড়িতে আসতে দেয় না। টি ভি স্টেশনে কিংবা রেকর্ডিং স্টুডিওতে গেলেও সে বিশেষ কথাবার্তা বলে না কারুর সঙ্গে। অহংকারী, বদমেজাজী গায়িকা হিসেবে তার দুর্নাম আছে, তার কোনো বন্ধু নেই। একমাত্র কামাল ছাড়া আর কেউ তার সঙ্গে হালকা সুরে কথা বলার সাহসই পায় না।

ফোনটা রেখে দেবার পর মঞ্জু অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। একটা হালকা নীল রঙের টাঙাইল শাড়ী পরেছে সে, সে তার শরীরে এখনও বয়েসের ছাপ পড়েনি। সারাদিন সে এতম রকম খাবার খায় যে মেদ জমার কোনো সম্ভাবনাই নেই। মনিরা জোর করে প্রতিদিন তাকে কিছু খাওয়াবার জন্য হন্যে হয়ে যায়। তবে তার চুলে সামান্য পাক ধরেছে, তাও বোঝা যায় না, মনিরা মেহেদি মেখে দেয়।

মঞ্জু অস্ফুট স্বরে বললো, আজ হরতাল, সুখু কোথায় রে মনিরা।

মনিরা বললো, কী জানি, ঘরেই আছে, বোধ হয়। নাস্তা খেয়েছে একটু আগে।

মঞ্জু বললো, দ্যাখ তো দেখে আয় তো?

সুখু থাকে তিন তলার ঘরে, সেখান থেকে তো কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অন্যদিন এই সময় তার ঘরে জগঝম্প শব্দ শোনা যায়। খুব জোরে রেকর্ড চালায় সুখু, মাইকেল জ্যাকসন রোলিং স্টোন, পুলিশ এইসব তার পছন্দ। সে বাংলা গান ভালোবাসে না,মায়ের গান নিয়ে কোনোদিন উচ্চবাচ্য করে না। সুখু এক একদিন এমন রেকর্ড বাজায় যে মঞ্জুর গলা সাধার খুব অসুবিধে হয়, তবু ছেলেকে থামতে বলা যাবে না।

মনিরা ডাকবার আগেই ওপর থেকে দুমদুম করে নেমে এলো সুখু। সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছে তার, এর মধ্যেই যথেষ্ট লম্বা, চওড়া কাঁধ। একটা ফেডেড জিনসের ওপর গেঞ্জি পরে আছে, তার গালে নদীর পলিমাটিতে সদ্য গজানো তৃণের মতন দাড়ি।

এ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে বললো, মা, গিভ মি ফাইভ হান্ড্রেড বাক্‌স!

মঞ্জু উদ্বেগের সঙ্গে বললো, তুই এখন কোথায় যাস?

সুখু হাত বাড়িয়ে বললো, টাকাটা দাও। ইউনিভার্সিটি যাবো।

মঞ্জু বললো, আজ না স্ট্রাইক? আজ কেন যাবি?

সুখু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, তোমরা এমন অদ্ভুত কথা বলো। স্ট্রাইকের জন্য সবাই বাড়িতে বসে থাকবে নাকি? তা হলে স্ট্রাইক হবে কী করে? মিছিল বেরোবে কাদের নিয়ে?

মঞ্জু এগিয়ে এসে বললো, না, না, তোকে যেতে হবে না, আবার একটা গণ্ডগোল হবে।

এসব অবান্তর কথা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে অস্থির ভাবে সুখু বললো, টাকাটা দাও! আমাকে এগারোটার মধ্যে পৌঁছতে হবে।

মঞ্জু বললো, সোমবার এক হাজার নিলি, সব খরচ হয়ে গেল এর মধ্যে? আজ বাড়িতে থাক, লক্ষ্মী সোনা...

সুখু সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে বললো, দেবে না? তবে থাক! আমি গ্যালাম!

মঞ্জু বললো, সুখু দাঁড়া, দাঁড়া, টাকা দেবো না বলিনি, আমার একটা কথা শোন—

সুখু আর গ্রাহ্য করলো না,দ্রুত নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। মনিরা ছুটে গিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করলো, সুখু তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ গরম করে বললো, এই ছুঁবি না, আমারে!

জেদী ছেলে, সে ইদানীং মায়ের কথা শোনে না। সে একবার গোঁ ধরলে আর ফেরানো যায় না তাকে।

অন্য ঘর থেকে মালিহা বেগম এসে শঙ্কিত মুখে জিজ্ঞেস করলেন, আইজ সব গাড়ি ঘোড়া বন্ধ, তার মইধ্যে পোলাডা বাইরহিয়া গ্যালো? তুই আটকাইতে পারলি না?

মঞ্জু কোনো উত্তর না দিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো, তার চোখে অশ্রু এসে গেছে। এই বয়সের ছেলে যদি অবাধ্য হয়ে পড়ে, তাহলে কী করে তার ওপরে জোর খাটানো যায়? খুব খরচের হাত হয়েছে ছেলেটার,যখন তখন টাকা চায়, কিন্তু এত টাকা কি ওর হাতে দেওয়া ভাল? না দিলে আরও অভিমান করে।

গ্যারাজ থেকে মোটর বাইকটা বার করে স্টার্ট দিয়েছে সুখু। তার ওপর বসেই বলশালী শব্দ তুলে ধীর গতিতে বেরিয়ে গেল, যেন এক তেজী ঘোড়সওয়ার।

মা এসে দাঁড়ালেন মঞ্জুর পাশে। দুজনেরই মনের মধ্যে একই কথা, কিন্তু তার ভাষা নেই।

মাঝে মাঝেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বোমা ফাটে, গোলাগুলি চলে। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয়, আবার ছাত্রদের বিভিন্ন দলের মধ্যেও লড়াই লাগে। জামাতে ইসলামী দল আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তাদের ছাত্র সংগঠন বেশ জোরালো। ছাত্র লিগের সঙ্গে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ হয়। সেই একাত্তর সালের আগেরই মতন,দিনের শেষে ঘরের ছেলেরা ঠিকঠাক ঘরে না ফেরা পর্যন্ত দারুণ দুশ্চিন্তা থেকেই যায়। হায় আল্লা, এই দুশ্চিন্তা কি নিষ্কৃতি নেই?

সুখু মাঝে মাঝে রাত্তিরেও বাড়িতে ফেরে না। বলে তো যে বন্ধুদের কাছে থাকে। কী করে বন্ধুদের সঙ্গে রাত জেগে? বোমা বানায় নাকি? মনিরা বলেছিল, একদিন সে সুখুর ঘরে ছোট একটা বন্দুক দেখেছিল। সুখু অবশ্য তা প্রবলভাবে অস্বীকার করেছে। মনিরাকে সে দারুণ বকুনি দিয়েছিল মিথ্যে কথা বলার জন্য। কিন্তু মঞ্জুর মন থেকে সন্দেহ যায়নি। মনিরা অকারণে এমন মিথ্যে কথা বলবে

কেন? খবরের কাগজে ও তো লেখে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতেও মাঝে বন্দুক-রিভলবার দেখা যায়, তাই নিয়ে তারা পুলিশের মুখোমুখি রুখে দাঁড়ায়। ছাত্ররা যে বোমা ছোঁড়ে, এত বোমা তারা পায় কোথা থেকে?

এই ছেলেই মঞ্জুর জীবনের একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু ছেলে এমন মায়ের জন্য সময় দিতে পারে না। মায়ের কাছে এসে দু'দণ্ড বসে না, মা কোথায় গান গাইতে যাচ্ছে কিংবা মায়ের নতুন কী গানের রেকর্ড বরুলো, সে সম্পর্কে ছেলের কোনো আগ্রহ নেই। মায়ের সঙ্গে যেন শুধু টাকা পয়সার সম্পর্ক।

মঞ্জুর ব্যক্তিগত খরচ প্রায় কিছুই নেই। সাজপোশাকের বাহুল্য নেই, তার মতন আর কোনো নামকরা গায়িকা এমন সাধারণ সাজে মঞ্চে ওঠে না। মঞ্জুর উপার্জন যথেষ্ট ভালো, ফিলমের প্লে-ব্যাক সিংগার হিসেবে সে এখন এক নম্বর। জনপ্রিয় গায়িকা সেলিমার সবকটি গান তাকেই গাইতে হয়। কামাল হোসেনের হিট ছবিগুলিতে সেলিমা আর বিলকিস বানুর যুগলবন্দী থাকবেই।

মঞ্জুর এই সব উপার্জনই তো তার ছেলের জন্য। সেই সব পাবে। কিন্তু এত কম বয়েসে তার হাতে বেশি টাকা দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত?

কলকাতা থেকে পলাশ ভাদুড়ী মাঝে মাঝে ঢাকায় আসে গানের অনুষ্ঠান করতে। পলাশ আজও বিয়ে করেনি। কিন্তু মঞ্জু তাঁকেও বিশেষ প্রশ্রয় দেয় না, বাড়িতে আসতে বলে না। জীবন সম্পর্কে সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। কলকাতায় অনেকগুলি গানের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছে সে।

দূরে কোথাও পর পর দুটো বোমার বিকট শব্দ হলো।

জানলার ধারে দাঁড়ানো তিনটি রমণী বিবর্ণ মুখে তাকালো পরস্পরের দিকে। তারা অসহায়। স্নেহের বন্ধনে আটকাতে না পারলে একটি উনিশ বছরের স্বাস্থ্যবান যুবককে আটকাবার আর কোনো উপায় নেই।

সারা দুপুর বিকেল ধরেই এরকম শব্দ শোনা যেতে লাগলো, আজ আবার বোধ হয় বড় রকমের একটা হাঙ্গামা লেগেছে। শহরের কোথায় কী ঘটছে, তা ওরা ঘরে বসে জানবে কী করে? বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই এখন বেশী রকম গোলমাল হয়। পুলিশ মিলিটারি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢুকতে সাহস পায় না।

মঞ্জু একটা ট্রানজিস্টার রেডিও নিয়ে খবর শোনবার চেষ্টা করলো। ঠিক একাত্তর সালের আগের মতনই চলছে, সত্যি কথা বলে না রেডিওতে। খবরে শোনালো যে ছাত্রদের ডাকা হরতাল ব্যর্থ হয়েছে, যানবাহন সব ঠিকঠাক চলছে। ঢাকা শহর শান্তিপূর্ণ। অথচ ওরা পথে একটাও গাড়ি দেখেনি সারাদিন, দূরের বোমা বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দ বুঝি শান্তির জয়ধ্বনি!

রেডিও থেকে আরও ঘোষণা করলো, রাত ন'টা থেকে কারফিউ! এটাও শান্তির চিহ্ন!

মনিরার মনে পড়ছে, একাত্তর সালের আগে সে ঠিক এই রকম উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকতো সিরাজুলের জন্য। শেষের দিকে তো সিরাজুল সর্ব জন্যই মেতে উঠেছিল। কিন্তু বাড়িতে ফিরতে না পারলেও সিরাজুল কোনোক্রমে একটা খবর পাঠাতো মনিরাকে। সুখু কি একটা খবরও দিতে পারে না? ফোন করতে পারে না? একবার সে স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ছে, মায়ের দুঃখ আর বোঝে না সে! বরং মায়ের ওপর সব সময় যেন তার রাগ ভাব।

মনিরা অনেক চেষ্টা করেও মঞ্জুকে কিছুই খাওয়াতে পারলো না আজ। রাত ন'টা বেজে যাবার পর সে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলছে।

একবার মনিরা জিজ্ঞেস করলো, সাহেবরে একটা ফোন করবেন?

মঞ্জু কোনো উত্তর দিল না।

মনিরা আবার জিজ্ঞেস করলো, আমি তাইলে কামাল সাহেবরে ফোন করি?

মঞ্জু এবারও উত্তর দিল না বটে, তবু মনিরা ফোনটা তুললো। সুখুর বাবাকে নিজে থেকে ফোন করার সাহস তার নেই, কিন্তু কামাল হোসেনের কাছে সে খবর নিতে পারে।

ভাগ্যবানের বউ মরে। এই প্রবাদটি কামাল হোসেনের জীবনে সার্থক হয়েছে। আগে হামিদার ভয়ে সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ভালো করে কথাই বলতে পারতো না। সামান্য অসুখে, ভুল চিকিৎসায় হামিদার মৃত্যু হয়েছে। পেনিসিলিন তার সহ্য হয় কিনা তা পরীক্ষা না করেই এক ডাক্তার তাকে

ইঞ্জেকশান ফুঁড়ে দিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপঘাত। ইতিমধ্যে সেলিমার সঙ্গে তার স্বামীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তারপর সেলিমার সঙ্গে জুটি বাঁধতেই কামালের উন্নতি হতে লাগলো তরতর করে। রাজনীতির সঙ্গে কামালের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে গেছে, আগের আমলের বন্ধুদের সঙ্গেও বিশেষ সম্পর্ক নেই। এখন সে ফর্মুলা ফিলম বানায় আর বছরে একবার দুবার সস্ত্রীক বিশ্বভ্রমণ করে আসে।

কেউ কেউ একবার ছদ্মবেশ ধরলে আর তা খুলতে পারে না। মুখোসটাই আসল মুখ হয়ে যায়।

মনিরা যখন ফোন করলো, তখন কামালের নিউ এস্কাটনের বাড়িতে বিশাল পার্টি চলছে। সব সময়েই একশ্রেণীর মানুষ থাকে, যাদের জন্য স্ট্রাইক, কারফিউ এসব কোনো বাধাই নয়। বাজার থেকে কখন নুন উধাও হয়ে যায়, চালের দাম কত বাড়লো সেসব খবর দরকার নেই তাদের। যতই সরকারি ভাবে নিসিদ্ধ হোক, স্কচ হুইস্কি তারা সব সময়েই পেয়ে যায়।

এর মধ্যেই কামালের পেটে তিন চার পেগ পড়েছে, সে জমিয়ে তিন চারজনের সঙ্গে গল্প করছিল, এর মধ্যে এসে তাকে টেলিফোন ধরতে হলো। সবাই জোরে জোরে কথা বলছে, প্রথম তিন চারবার সে নামটাই বুঝতে পারলো না। কে! কোথা থেকে? কী চাই? করতে করতে সে মনিরাকে চিনতে পেরে বিরক্তির সঙ্গে বললো, কী হইছে কী? কী চাস তুই?

এই সব পার্টিতে মঞ্জুকে দাওয়াত দিলে কখনো সে আসে না। এরকম সময়ে মঞ্জু কখনো টেলিফোন করে না। মনিরার ব্যাকুল স্বর শুনে প্রথমে কামাল ভাবলো মঞ্জু বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তা হলেই মুশকিল! নতুন ছবি শুরু হতে যাচ্ছে, আগে গান রেকর্ডিং না হলে নায়িকার লিপ মেলে না।

মঞ্জুর ছেলে বাড়ি ফেরেনি শুনে কামাল ভুরু কোঁচকালো। আজ বেশ বড় রকমের একটা গণ্ডগোল হয়েছে, সে শুনেছে। দুতিনটি ছাত্র মারা গেছে। এরকম তো প্রায়ই হয়, নতুন কথা কী! পড়াশুনা তো সব গোল্লায় গেছে, ছাত্ররা এইসব নিয়েই মেতে আছে। আরে বাবা, দু চারটে বোমা ছুঁড়ে আর বাস পুড়িয়ে কি আর মিলিটারি রেজিমকে হঠানো যায়?

তবে, এইসব হাঙ্গামায় মফস্বলের ছেলেরাই মরে। শহরের ছেলেরা তুখোড় হয়, তারা পুলিশের রাইফেলের সামনে বুক পেতে দেয় না, তারা গ্রামের ছেলেগুলোকে সামনে এগিয়ে দেয়। এই যে মাঝে মাঝেই দুটো-চারটে ছাত্র প্রাণ দিচ্ছে, কই, চেনাশুনো কোনো বাড়ির ছেলে তো তাদের মধ্যে নেই। মঞ্জুর ছেলেই বা মরতে যাবে কেন?

সে মনিরাকে বোঝালো যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া এখন তো খোঁজখবর করার কোন উপায় নেই। সুখু মিঞার ভালো নাম কী যেন? নজরুল ইসলাম, না, ঐ নামে কোনো ছাত্রের কোনো বিপদ হয়নি, পুলিশের একজন বড় কর্তা এখানেই রয়েছেন, তিনি বললেন। চিন্তার কিছু নেই। সুখু মিঞা ঠিক ফিরে আসবে।

ফোন রাখার আগে কামাল কৌতুক করে বললো, এই মনিরা তোর মালকানীরে বল এবার একটা শাদী করতে। বাড়িতে একটা জবরদস্ত পুরুষ মানুষ না থাকলে কী চলে! তুই নিজে ও তো আর করলি না, পাত্তর দেখুম নাকি?

সারা রাত প্রায় বিনিদ্র ভাবেই কাটলো। এক একবার একটা গাড়ির শব্দ হতেই মনিরা আর মঞ্জু জানলার ধারে ছুটে যায়। সেগুলো পুলিশের গাড়ি। এর আগে কারফিউয়ের মধ্যেই সুখু দু একবার বাড়ি ফিরেছে। অনেক ছাত্রই কারফিউ মানে না।

সকাল ন'টার মধ্যেও সুখু ফিরে এলো না দেখে মঞ্জুর মনে হলো, কাল সে টাকা দিতে চায়নি বলেই তার ছেলে রাগ করে বাড়ি ছেড়েছে। ইত্তেফাক পত্রিকায় ছাত্র-পুলিশের মারামারির বিস্তৃত বিবরণ ও ছবি বেরিয়েছে, সুখুর নাম কোথাও নেই।

একটা বিমর্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মঞ্জু বললো, মনিরা তুই একবার ধানমণ্ডির বাসায় যা! খবর দিয়া আয়।

মনিরা মুখ কুঁচকে বললো, মালেক আসুক। মালেকই তো খবর দিতে পারে।

মঞ্জু বললো, মালেক ড্যালে হবে না, তুই যা! আগে দ্যাখ, রিকশা চলে কিনা!

গতকালের কোনো চিহ্নআজকের রাস্তায় নেই। দোকানপাট সব খোলা, এর মধ্যেই সাইকেল রিকশায় পথ একেবারে ছয়লাপ হয়ে গেছে, লোকেরা অফিস-কাচারির দিকে দৌড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে আন্দোলন হয়, পুলিশ-মিলিটারী গুলি চালায়, কিছু মানুষ মরে, অন্যদের তা গা সহ্য হয়ে গেছে।

পাকিস্তানী আমলে যেমন চলতো, বাংলাদেশী আমলেও তার খুব একটা হেরফের হয়নি।

একটা রিকশা নিয়ে মনিরা এলো ধানমণ্ডির বাড়িতে। তার মুখখানা ব্যাজার হয়ে আছে, শুধু সুখুর জন্য দুশ্চিন্তাতেই নয়, এ বাড়িতে আসতে তার একবারেই ইচ্ছে করে না।

এতগুলি বছরে এই বাড়িতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগের তুলনায় বাড়িটা অনেকখানি বেড়েছে, দুদিকে নতুন কনস্ট্রাকশান হয়েছে, তার অনেকখানিই আলতাফের দখলে। হোটেলওয়ালা হোসেন সাহেব বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর চুটিয়ে ব্যবসা করতে গিয়েও পারেন নি, অকস্মাৎ হার্ট অ্যাটাকে তাঁকে দুনিয়ার মায়া কাটাতে হয়। তার ছেলে ও জামাইরা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে আলতাফকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে এবং অমন চালু ব্যবসাটিকেও লন্ডভন্ড করে দিয়েছে একেবারে। আলতাফের এখন নিজস্ব কারবার। এ বাড়িতেই সে গারমেন্ট ফ্যাক্টরি বসিয়েছে, বিদেশ থেকে সুতো আসে, ডিজাইন আসে, এ দেশের শস্তা মজুরিতে জামা প্যান্ট সেলাই হয়, সেগুলো আবার বিদেশের বাজারে চলে যায়। তা ছাড়া সে মানুষ ও চালান দেয়। তেলের টাকায় ধনী আরব দেশগুলিতে শ্রমিক-মজুরের খুব চাহিদা। যে দেশে সবাই প্রায় বড়লোক, সে সব দেশে রাস্তা ঝাঁট দেওয়া, বাথরুম সাফ করার লোক পাওয়া যাবে কী করে, গরিব দেশ থেকেই সেইসব কাজের লোক আমদানি করতে হবে।

বাড়ির পুরোনো অংশটায় থাকে বাবুল চৌধুরী।

সদর দরজা খোলা, ভেতরে এসে মনিরা সিঁড়িটার মুখে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। সে একদিন গ্রাম থেকে সিরাজুলের সঙ্গে এসে ঐ পাশের ঘরখানায় উঠেছিল। কতরকম আবর্জনায় ভরা ছিল ঘর, সব কিছু পরিষ্কার করে সে সাজিয়েছিল নিজের সংসার। ঐদিকে ছিল রান্নাঘর। সব ভেঙে গেছে, ঘরখানা আবার গুদাম হয়েছে। ঠিক এইখানে তার চুলের মুঠি ধরে টেনেছিল খান সেনারা, আর ঐ সিঁড়ির মাঝখানে বাবুল চৌধুরী গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

মনিরা পরে শুনেছে যে তাকে খোঁজার জন্যই বাবুল চৌধুরী গিয়েছিলেন একেবারে বাঘের মুখে, খান সেনাদের ডেরায়; তাকে না পেয়ে উনি নিজের হাতে কত পাকিস্তানী সৈন্য মেরেছেন। সে একটা সামান্য মেয়ে, তার জীবনের কীই বা দাম আছে, তার জন্য অতবড় একটা বিদ্বান মানুষ লড়াই করতে নেমেছিল!

সেই বাবুল চৌধুরী এখন মনিরার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে চায় না। দেখলে বিরক্ত হয়। মানুষের জীবন এমন অদ্ভুত কেন?

সেফু নামের সেই মেয়েটি এখনো এ বাড়িতে কাজ করে। বাবুল চৌধুরী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটি অল্প বয়েসী অনাথ ছেলেকে কুড়িয়ে এনেছিল, কয়েক বছর পর তার সঙ্গেই সেফুর বিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওরা দুজনে ছাদের ঘরে থাকে।

সেফুর সঙ্গেই মনিরার প্রথম দেখা হলো। আগে ছিল নেংটি ইঁদুরের মতন চেহারা, এখন দিব্যি মোটাসোটা হয়েছে সেফু। তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মনিরার চোখে জল এসে গেল। এই বাড়িতে কেটেছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দুটি বছর। কিসের জন্য প্রাণ দিল সিরাজুল? তার বদলে কী পাওয়া গেল?

দোতলায় উঠতেই লায়লা জিজ্ঞেস করলো, সেফু, কে আসছে রে?

মনিরা কাঁচুমাচু মুখে বললো, ভাবী আমি মনিরা।

এক সময় যেটা ছিল মঞ্জুর শয়নকক্ষ, সেখান থেকে বেরিয়ে এলো লায়লা। বেশ দীর্ঘকায়া তরুণী, গায়ের রং একেবারে যেন দুধে-আলতায় মেশানো, তবু মুখখানা খানিকটা রুক্ষ ধরনের।

মনিরার চোখে অশ্রুর ঝালর, সে ঐ দরজার সামনে লায়লার বদলে যেন মঞ্জুকেই দেখছে। সেই তার আগেকার মঞ্জু ভাবী, সরল উজ্জ্বল, সুন্দর। এইটাই তো মঞ্জু ভাবীর নিজস্ব জায়গা।

যুদ্ধ থেকে সাংঘাতিক আহত হয়ে ফিরেছিল বাবুল, আবার তাকে ভর্তি হতে হয়েছিল নার্সিং হোমে। মঞ্জু-হেনা-মামুনরা কলকাতা থেকে ফিরে ছিল দশ দিন পর। মামুন আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁর চিকিৎসার জন্য ফিরতে দেরি হলো, মঞ্জু এসেই ছুটেছিল নার্সিং হোমে। কেন তাদের ফিরতে দেরি হলো, সে কারণটা আর বলা হয়নি ভাল করে, বাবুলও মন দিয়ে শুনতে চায়নি, তার তীব্র অভিমান হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

কলকাতায় বা ভারতে যারা আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বাবুলের মনোভাব ভাল

ছিল না। বাবুলের মতে তারা সুবিধাবাদী। বড় বড় নেতারাও ভারতে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে আরাম উপভোগ করেছে, মুক্তি যোদ্ধাদের তুলনায় কী আত্মত্যাগ করেছেন তাঁরা? স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে দু একটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নিতে হয় ঠিকই। কিন্তু বড় বড় নেতাদের কি মাঝে মাঝে রণপ্রাঙ্গণে এসে সাধারণ সৈনিকদের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল না? বাংলাদেশ বাহিনীর সেনাপতি কর্নেল ওসমানী চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিনগুলিতেও কোনো একটা ফৌজের সঙ্গে পাকিস্তানী ব্যূহ ভেদ করতে পারলেন না। আত্মসমর্পণের সময়েও তিনি কলকাতায় বসে রইলেন? নিজের প্রাণের মূল্যটাই তাঁর কাছে বেশি!

মঞ্জু কলকাতার প্রবাস কাহিনী শুরু করলেই বাবুল অন্যমনস্ক হয়ে যেত কিংবা কাজের ছুতোয় উঠে পড়তো। কলকাতার গল্প সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ নেই। ছেলেমানুষী স্বভাবে মঞ্জু ও কলকাতায় তাদের দিনগুলির কথা যতটা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতো, ততটা উৎসাহ সে দেখায়নি এই সুদীর্ঘ ন' মাস ধরে বাবুলদের যে কী নিদারুণ অবস্থা গেছে তা শোনার জন্য।

শরীরে দুটি বুলেটের ক্ষত সারতে বাবুলের সময় লেগেছিল প্রায় তিন মাস। সেই সময়টায় সে খুব খিটখিটে আর বদমেজাজী হয়েছিল, পুরোপুরি সুস্থ হবার পরে ও তার স্বভাবটা বদলালো না। শারীরিক কষ্টের জন্য তার মানসিক কষ্ট হচ্ছিল বেশি। স্বাধীনতা এলো বটে, কিন্তু দেশটা চলেছে কোন দিকে? শেখ মুজিব ফিরে এলেন, একচ্ছত্র ক্ষমতা পেলেন তিনি সরকার পরিচালনার, কিন্তু নতুন রাষ্ট্রটির কোনো শক্ত বেদীমূল প্রতিষ্ঠিত হলো না।

কিছু লোক স্বাধীনতার নামে শহরে লাফালাফি করছে, অন্যদিকে গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। মুনাফাবাজ ও কালোবাজারিরা নুন, তেল, চালের মতন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে ফাটকা খেলছে, ব্যাঙ্ক লুঠের টাকায় একশ্রেণীর লোক। রাজধানী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, বিদেশ থেকে সাহায্য হিসেবে যেসব খাদ্য, কম্বল ওষুধ আসছে, তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে একদল ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, সেসব চোরাচালান হয়ে যাচ্ছে ভারতে।

শেখ মুজিব এসব কঠোর হস্তে দমন করার বদলে উদার ভাবে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন সবাইকে। তিনি নিজের জীবন ফিরে পেয়েছেন এবং সত্যিই স্বাধীনতা এরেছে, এতে তিনি এমনই অভিভূত যে এখন আর তিনি কোনো কটু কথা বলতে চান না। যারা তাঁর পার্টির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে এই দুর্দিনে তাদের শাস্তি দেবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, যাঁরা স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিল, যারা নরহত্যার রক্তে হাত রাঙিয়েছিল তাদেরও তিনি ক্ষমা করে যেতে লাগলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, চাটুকারদের মধ্যে অনেকে এই সুযোগে লাগাম ছাড়া হয়ে গেল।

সুস্থ হয়ে ওঠার পর বাবুল আবার ফিরে গিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সে কোনো কৃতিত্ব নিতে চায়নি। যখন অনেককে বীর উত্তম, বীর প্রতীক, বীর শ্রেষ্ঠ, বীর বিক্রম-এইসব সম্মানজনক খেতাব দেওয়া হতে লাগলো, তখন বাবুল চৌধুরীর নাম ও কে যেন প্রস্তাব করেছিল শেখ মুজিবের কাছে। অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউই তার মতন অস্ত্র নিয়ে পুরোপুরি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েনি, কিন্তু বাবুল আগেই চিঠি লিখে সেই খেতাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। কেউ ঐ প্রসঙ্গ তুললেই সে হেসে বলতো, আরে না, না, ওসব গুজব! লোকে গল্প বানাতে ভালোবাসে। আমি ফ্রিডম ফাইটারদের ক্যাম্পে রান্নাবান্না করে দিতাম, কোনদিন এল এম জি হাতে নিয়েই দেখিনি!

বাহাত্তর সালে মাসের পর মাস বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জের অত্যাচার কাহিনী ছাপা হতো, যা আগে কিছুই জানা যায়নি। যারা পাক বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, বাঙালী হয়েও যারা বহু বাঙালীকে হত্যা করেছে, তাদের পরিচয় ও প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। বাবুল সংবাদপত্রের সেইসব অংশ কেটে কেটে রাখতো, মঞ্জুকে সে বলতো দ্যাখো, প্রথম তিন মাস আমি ও তো মুক্তিযুদ্ধ সাপোর্ট করি নাই, আমার মনে হতো, এসব আওয়ামী লিগের স্বেচ্ছাচারিতা, এমনভাবে পাকিস্তান ভাঙা যুক্তিসঙ্গত না। আমাকে অনেকে কোলাবরেটার বলতো, কিন্তু আমি শান্তিবাহিনীতে যোগ দিই নাই, মানুষ মারা সাপোর্ট করি নাই, প্রথম যেদিন নিজের চক্ষে দ্যাখলাম ব্রুট ফোর্স কোনো যুক্তির ধার ধারে না, সেইদিনই ঠিক করেছিলাম, যে-কোনো উপায়ে এদের রেজিস্ট করতেই হবে! যে-কোনো থিয়োরির চেয়ে মানুষের জীবন বেশি মূল্যবান। আমার চোখের সামনে যদি কেউ কোনো নিরীহ

মানুষের বাড়িতে আগুন লাগায়, তা হলে সেই আগুন নিবানো আর যে ঐ আগুন লাগিয়েছে তাকে শাস্তি দেওয়াই আমার প্রধান কর্তব্য। ক্লাস স্ট্রগল কবে হবে, তখন এই সব সমস্যা মিটে যাবে। তার জন্য বসে থাকা যায় না। সেটা কাপুরুষতা । সেই জন্যই আমি যুদ্ধে গেছি। কিন্তু যারা নয় মাস ধরে অত্যাচার করেছে, খুন আর লুটপাটে অংশ নিয়েছে, রাও ফরমান আলীর হাতে বুদ্ধিজীবীদের খতম করার তালিকা তুলে দিয়েছে, তাদের কোনো শাস্তি হবে না? তারা নিশ্চিন্তে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে? শেখ মুজিব তা হলে দেশ চালাবেন কি করে? ঐ সব পাষণ্ডগুলাই আবার সব ক্ষমতা দখল করে বসবে।

একদিন বাবুল মঞ্জুকে রান্নাঘর থেকে ডেকে এনে জানলার ধারে দাঁড় করিয়ে বলেছিল, মঞ্জু, ঐ লোকটাকে দ্যাখো, দ্যাখো। ঐ যে লুঙ্গি আর সিল্কের কুর্তা পরে হেঁটে আসছে। ঐ লোকটা লাইব্রেরি সায়েন্সের একজন অধ্যাপক। আর ঐ দ্যাখো, মনিরা ওর পাশ দিয়ে হেঁটে আসছে। এটা একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

মঞ্জু সেই দৃশ্যটার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। সাধারণ একটা সকাল। পথ দিয়ে অনেক মানুষ আসছে, যাচ্ছে। তার মধ্যে সিল্কের কুর্তা পরে হাঁটছে একজন, মনিরা বাজার করে ফিরছে বিপরীত দিক দিয়ে, কেউ কারুকে চেনে মনে হয় না। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে?

মঞ্জুর বিস্মিত দৃষ্টি দেখে বাবুল উত্তেজিতভাবে বলেছিল, মনিরাকে অন্তত পাঁচজন খান সেনা অত্যাচার করেছে। দুইবার প্রেগনেন্সির পর মিসক্যারেজ হয়েছে, মাথাটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তবু যে বেঁচে আছে, আবার প্রায় নর্মাল হয়েছে, সেটা শুধু ওর ভাইটালিটির জোরে। আর ঐ মানুষটা.......

মঞ্জু ভয় পেয়ে বলেছিল, ঐ মানুষটাও কি মনিরাকে....

বাবুল উত্তর দিয়েছিল, না ঐ মানুষটা বোধ হয় মনিরাকে চেনে না। কিন্তু ঐ হারামজাদা গত বৎসর ইউনিভর্সিটির লাইব্রেরির সামনে দাঁড়ায়ে কী বলেছিল জানো? ও চ্যাঁচয়ে বলেছিল, পাকিস্থানী আর্মি লোকেরা বাঙালী মেয়েদের রেপ করত্যাছে, একথা কে কইলো? সব মিথ্যা প্রচার! যদি দুই-দশটা মেয়েরে ভোগ করে থাকে, তাতে কোনো পাপ নাই! ইসলাম রক্ষার জন্য ওরা জেহাদে নেমেছে, এখন এমন একটু-আধটু তো হবেই। এইসব ভোগ 'মুতা' বিবাহ বলে ধরে নিতে হবে। সেদিন এই কথা শুনে আমি ঐ লোকটাকে মারতে গেছিলাম, অন্যরা আমাকে ধরে আটকালো। এখন, এই স্বাধীন বাংলাদেশেও ঐ লোক বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াবে! মঞ্জু, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, এখনই ওকে গিয়ে খুন করি।

মঞ্জু তার স্বামীর হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বলেছিল, না, না, তুমি ঐ সব কথা আর মনে স্থান দিও না। খুন-জখমের কি শেষ নাই? হায় আল্লা. ..

সেইসব দিনগুলিতে বাবুল মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। সব সময় গুম হয়ে থাকতো। দেশের অবস্থা যে দিন দিন খারাপ দিকে যাচ্ছে, এ দায়িত্ব ও যেন তার। বন্ধু-বান্ধবের থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যারা চাকরি করতো, তারা অনেকেই ব্যবসা শুরু করে সহজে টাকা বানাবার নেশায় মেতে উঠেছিল। মাঝে মাঝে বাবুল এমন বিলাপ করতো যে ভয় হতো, যে-কোনো মুহূর্তে সে হয়তো তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারাবে। মঞ্জু প্রাণপণে সেবা করতো তার স্বামীকে। এক এক সময় বাবুল সংযত হতো তার সন্তান সুখুকে কোলে নিয়ে। সুখুর নরম রেশমের মতন চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলতো, তুই যখন বড় হবি, তখন এই দেশ, এই পৃথিবীটারে কেমন দেখবি রে?

কলকাতা থেকে ফেরার সাত মাস পরে মঞ্জু আবার গর্ভবতী হয়েছিল, তারপরেই এলো বিপর্যয়। বাবুল এই ঘটনাকে কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারলো না। মঞ্জুর গর্ভে এসেছে তার নিজের সন্তান, তবু বাবুল ঝোঁকের মাথায় উচ্চারণ করে ফেললো একটা কঠিন খারাপ কথা। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, মনিরাকে ধর্ষণ করেছিল পাঁচজন খান সেনা। তুমিও ধর্ষিতা না কি? এতদিন বলো নাই তো! তোমারে কে ধর্ষণ করলো, তোমার মামুনমামা?

মামুন তখন কামারুজ্জামানের অনুরোধে রিলিফ ডিপার্টমেন্টের ভার নিয়েছেন। দুর্নীতি সামলাতে সামলাতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। বাবুল কোনো দিনই মামুনকে পছন্দ করতে পারেনি, রিলিফের নানা কেলেংকারির সমস্ত দায়িত্বই মামুনের উপর চাপিয়ে সে তখন মামুনকে রীতিমতন ঘৃনা করতে শুরু করেছিল, সেই ঘৃনা থেকেই সে এমন কথা বললো?

একবার বলে ফেলেও সে কথাটা ফেরত নিল না। আরও দু'তিনবার সে বলতে লাগলো যে মঞ্জুকে নিয়ে ফুর্তি করার জন্যই তো মামুন তাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন। কলকাতা-ফেরত অনেক লোকই বলেছে যে মামুন মঞ্জুকে নিয়ে থাকতেন এক ঘরে। হোসেন সাহেব নিজের চোখে দেখে এসেছে।

স্বামীর প্রতি যতই ভক্তি থাক, এই ধরনের কথা শুনে মঞ্জু গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে বাবুলের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ছিঃ! তুমি এত ছোট!

তারপর চললো জেদাজেদির পালা। মঞ্জু একবস্ত্রে ধানমন্ডির বাগি ছেড়ে চলে গেল তার মায়ের কাছে। অবাঞ্ছিত বলেই হয়তো তার গর্ভের সন্তানটি পৃথিবীর আলোহাওয়ায় নিশ্বাস ফেললো না। তবু বাবুল আর ফিরিয়ে নিতে চাইলো না মঞ্জুকে। কাজীর অফিস থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিস এলো। বিনা প্রতিবাদে সেই বিচ্ছেদ মেনে নিল মঞ্জু। অবিলম্বে, ঝোঁকের মাথায় বাবুল বিয়ে করলো তার এক ছাত্রী লায়লাকে।

বাবুলের মা-বাবা কেউ তখন নেই। আলতাফের সঙ্গে ও সম্পর্ক ভালো না, বাবুল তার বড় ভাইটিকে অশ্রদ্ধা করে। একমাত্র জাহানারা ইমামের বাড়িতেই সে মাঝে মাঝে যেত, সেই পুত্র শোকাতুরা রমণীর কাছে গিয়ে সে চুপ করে বসে থাকতো। জাহানারা ইমাম ও মঞ্জুর পক্ষ নিয়ে বাবুলকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বাবুল যেন তখন সত্যিই উন্মত্ত। সে কারুর কথা শোনেনি।

মনিরাও সেই সময় এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল মঞ্জুর সঙ্গে। বাবুল চৌধুরীর সঙ্গে ছিল তার কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক, কিন্তু সে ভালোবাসতো মঞ্জুকে। কৃতজ্ঞতার চেয়ে ভালোবাসার জোর অনেক বেশি। মামুন সাহেবের মতন এক বৃদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে মঞ্জুর নামে ঐ অপবাদ সে একেবারে সহ্য করতে পারেনি। পুরুষ মানুষগুলো কী, কিছুই বোঝে না? সাত মাস স্বামী সহবাসের পর যে গর্ভ লক্ষণ, তার জন্য হুট করে কি পরপুরুষের নামে দোষ দেওয়া যায়? কোনো স্ত্রীলোক যদি সত্যিই সেরকম কিছু চায়, তা হলে তার জন্য তাকে কলকাতা কিংবা বিলেত-অ্যামেরিকা যেতে হবে কেন?

বাবুল আবার বিবাহ করেছে, আর মঞ্জু এতগুলি বছরের মধ্যে আর কোনো পুরুষের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা করেনি। এটাই যেন তার প্রতিশোধ, মনিরা মঞ্জুর চরিত্রের এই দৃঢ়তাটাকেই শ্রদ্ধা করে। সে-ও আর কোনো পুরুষ মানুষের সান্নিধ্য চায় না। কোনো পুরুষের কাছাকাছি এলেই তার শরীর সিঁটিয়ে যায়।

বিশেষ কাজে মনিরাকে এ পর্যন্ত মোট তিনবার ধানমন্ডির এই বাড়িতে আসতে হয়েছে। কোনোবারই লায়লাকে এড়িয়ে সে বাবুলের সঙ্গে দেখা করতে পারেনি।

লায়লা তার চুলে একটা চিরুনি চালাতে চালাতে বললো, কেমন আছোস রে মনিরা? ঐ বাসার খবর সবর সব ভালো? কবে যেন তোর ভাবীর গান শোনলাম টি ভি-তে,ভালোই গান করছেন। তবে আধুনিকের থিকা নজরুলগীতিই বেশি ভালো।

মনিরা জিজ্ঞেস করলো, সাহেব আছে নি?

লায়লা বললো, হ, আছেন তো দ্যাখ গিয়া, বই মুখে নিয়া বইস্যা আছে। কোনো খবর আছে নাকি?

মনিরা বললো, জী, সাহেবরে একটা খবর দিতে আসছি।

লায়লা উদাসীন গলায় বললো, আমারে বুঝি বলা যায় না। সাহেব একা থাকতে ভালোবাসে। তুই হুট কইরা ঘরে ঢোকলে সাহেব পরে আমারে খুন করবে।

মনিরা জানে যে লায়লা এরকম আলগা আলগা কথা বললেও তার কৌতূহল খুব বেশি। মনিরার মতন দূতীর মুখে সাধারণ কিছু শুনলেও সে মানতে চাইবে না। সে অনেক কিছু জানতে চাইবে।

মনিরা বললো, সুখু মিঞা কাল রাইতে বাড়ি ফেরে নাই। তার মায়ের কষ্ট চোখে দেখোন যায় না। সাহেব যদি ছেলেটার একটু খবর ন্যান!

লায়লা বললো , সুখু? সে কবে কেন আসছিল এখানে? এই সেফু, সে গতকালই আসে নাই?

সেফু বললো, না চাইর-পাঁচদিন আগে।

লায়লা বললো, সে তো কেবল আসে আর টাকা চায়। বাপের কাছে শুধু হাত পাততেই আসে।

কী শিক্ষাই তারে দিতেছে তার মায়! ছেলে একেবারে গোল্লায় গেছে। সাহেবের শরীর ভালো না, এখন বিরক্ত করিস না। আমি পরে কইয়া দিমু অ্যানে।

মনিরা বললো, ক্যাইল ইনভারসিটিতে খুনাখুনী হইছে, তাইর মধ্যেই সুখু গেছিল।

হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বাবুল চৌধুরী। অনেক শীর্ণ হয়ে গেছে তার চেহারা, চোখ দুটি কোটরে ঢোকা। মাথার চুলে সাদা ছোপ লেগেছে। লুঙ্গির ওপর গেঞ্জি পরা, কাঁধে তোয়ালে, এক হাতেবই। বাথরুমেও সে বই নিয়ে যায়।

মনিরার দিকে একবার তাকিয়েই সে মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন সে তাকে চিনতেই পারেনি। স্ত্রীলোকদের কথাবার্তায় তারকোনো আগ্রহ নেই। সে গম্ভীর ভাবে বললো, এই সেফু, গোছলখানায় গরম পানি দিছোস?

লায়লা তাড়াতাড়ি মনিরাকে সরিয়ে নেবার জন্য বললো, আয়, তুই এদিকে আয়, চা খাবি?

মনিরা তবু চেঁচিয়ে বললো, সাহেব, সুখু কাল রাতে বাসায় ফেরে নাই! দপুরে ইনভারচিটি গেছিলো...

বাবুল থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী?

মনিরার কাছে সংক্ষেপে বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে বদলে গেল তার মুখের বর্ণ। তোয়ালে আর বই সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অত্যন্ত দ্রুত পোশাক বদলে নিয়ে, লায়লাকে কিছুই না বলে সে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

॥ ৪ ॥

হাজরা পার্কের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন প্রতাপ। তাঁর কিছুই করার নেই, কোথাও যাবার নেই।

রাস্তায় যে এত মানুষ তাদের প্রত্যেকেরই নিশ্চয়ই কোনো গন্তব্য আছে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে আছে কিছু একটা। গাড়িগুলো যাচ্ছে তাড়াহুড়ো করে, কেউ অন্যকে জায়গা ছাড়ে না, যে-যেমন খুশী ওভার টেক করতে গিয়ে পথের মোড়ে জ্যাম তৈরি করে ফেলে, স্টার্ট বন্ধ করে গজরায়, যেন বলতে চায়, আমার দেরি হয়, হোক, কিন্তু তোমাকে কিছুতেই আগে যেতে দেবো না।

বিমানবিহারী এমন কৃষ্ণনগরে। গত কয়েকদিন ধরে আবহাওয়া বেশ মনোরম কৃষ্ণনগরের ভালোই সময় কাটতে পারতো। বাড়ির ফোনটা খারাপ কোনো, একজন লোক দিয়ে বিমান একটা খবর পাঠালেই প্রতাপ চলে আসতেন। মামলার ব্যাপারে তিনি পরামর্শও দিতে পারতেন। অবশ্য মমতা যে এখানে নেই, তা বিমানবিহারী জানতেন না, মমতাকে একা রেখে প্রতাপ কৃষ্ণনগরে যেতে পারবেন না, এটাই বোধহয় বিমান ভেবেছেন।

প্রতাপকে একা রেখে মমতা তো দিব্যি হরিদ্বারে চলে যেতে পারে।

বুলি ঠিকই ধরেছিল, মমতা এমনি যায়নি, ঝগড়া করেই গেছে। দাম্পত্য কলহ প্রৌঢ় বয়েসে নাকি বেশ গাঢ় মধুর হয়। কাঠের জ্বালে খেজুর রসের মতন। কই ,প্রতাপ তো সেই স্বাদটা পাচ্ছেন না। মমতা তাঁর অমতেই চলে গেল বলে তাঁর ঠোঁটে আজও একটা তেতো তেতো ভাব।

হরিদ্বার বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা। সেখানে একটি ওষুধের কারখানায় অনুনয় চীফ কেমিস্ট বেশ বড় কোয়ার্টার পেয়েছে। মুন্নি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে, জামাইটিকে প্রতাপেরও বেশ পছন্দ হয়েছে। তাঁর জামাই কাজ ভালোবাসে, কাজের প্রতি একটি ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ আছে যা, এ যুগে দুর্লভ। অনুনয় স্বল্পভাষী ও বিনীত হলেও তার মতামতেরত বেশদৃঢ়তা আছে। মুন্নি প্রায়ই মা-বাবাকে হরিদ্বারে আসার জন্য চিঠি লেখে। সবাই ভাবে, রিটায়ার্ড লোকদের আবার যাবার অসুবিধে কী?

তাহলেও কি মেয়ে-জামাইয়ের কাছে ঘন ঘন যাওয়ার কোনো যুক্তি আছে? হরিদ্বারে থাকে বলেই ওদের বাড়িতে অতিথির অন্ত নেই। দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন যারাই দিল্লি যায়, তারাই একবার হরিদ্বার দর্শন করতে আসতে কে না চাইবে? বাড়িতে ঘন ঘন অতিথি আসার যে কী সুযোগে হরিদ্বার দর্শন করে আসতে কে না চাইবে? বাড়িতে ঘন ঘন অতিথি আসার যে কী বিড়ম্বনা, তা কি মমতা বোঝেন না? তবু তিনি এমনকি প্রতিবেশীদেরও ডেকে বলেন, দিল্লি যাচ্ছো? একবার হরিদ্বারে আমার

মেয়ে জামাইয়ের এখানে ঘুরে এসো, কোনো অসুবিধে নেই...। অদ্ভুত মমতার বিবেচনাবোধ, নিজের মেয়ের ঘাড়েই অতিথির বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন।

প্রতাপ একবারই গেছেন হরিদ্বারে। গতবছর। এমনিতে ঘিঞ্জি শহর, তীর্থস্থানের যাবতীয় ক্লেদ ও খারাপ চরিত্রের মানুষে ভরা, তবু ফাঁকার দিকে গেলে বড় সুন্দর, মসৃণ একটা শোভা আছে। পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন নগাধিরাজ হিমালয়, এই অনুভূতিই শিহরণ জাগায়।

সেবার হৃষীকেশ-লছমনঝোলা পর্যন্ত শুধু যাওয়া হয়েছিল, কেদার-বদ্রী যাবার পরিকল্পনাও হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি নেমে গেল, সেবার একটু আগেই এসে পড়লো বর্ষা।

ফেরার পথেই ট্রেনেমমতা বলেছিলেন, এখন তো আমরা ঝাড়া হাত-পা, এবার থেকে আমরা প্রত্যেক বছরই একবার করে এদিকে আসবো। এদিকে কত বেড়াবার জায়গা। হর কী-প্যারী ঘাটটাই আমার এত ভালো লাগে!

প্রায় চল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের পরও মমতা এখনো তাঁর স্বামীর চরিত্র ঠিক বোঝেন নি, তাঁর স্বামীর সূক্ষ্ম পছন্দ-অপছন্দের নিরিখপান না! মমতার উচ্ছ্বাস শুনেও প্রতাপ গম্ভীরভাবে চুপ করে ছিলেন। হরিদ্বারে অনেক কিছু ভালো লাগলেও আসলে বেশি খানিকটা অপমানিত বোধ করেছিলেন প্রতাপ।

অনুনয়ের বাবা গোরচাঁদওএখন প্রতাপের মতন রিটায়ার্ড তিনি বিপত্নীক এবং ছেলের কাছেই থাকেন। ইদানীং তিনি নিরামিষ খান, কোনো এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন একধরনের আধ্যাত্মিক অন্যমনস্কতার ছাপ। হরিদ্বার তো তাঁর পক্ষে আদর্শ জায়গা হবেই, তাছাড়া একা একা তিনি আর অন্য কোথায়ই বা থাকবেন! এই তো নাতি-নাতনী নিয়ে আহ্লাদ করার সময়।

এই মানুষটিকে প্রতাপ কিছুতেই পছন্দ করে উঠতে পারলেন না!

এতখানি বয়েসে হলেও প্রতাপ ঠাকুর-দেবতার কাছে মাথা নোয়ান না। কোনো বিখ্যাত ধর্মস্থানে গেলে তিনি মন্দিরের বাইরের দিকে ঘুরে ঘুরে দেয়ালের কারুকার্য কিংবা ভাস্কর্য দেখেন। মমতা যান ভেতরের বিগ্রহকে প্রণাম করতে। প্রতাপের তাতে আপত্তির কিছু নেই। ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর মনে কিছুটা অবজ্ঞার ভাব থাকলেও বাইরে তা প্রকাশ করেন না কখনো। তাঁর বন্ধু বিমানবিহারীই তো রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিয়েছেন কিছুদিন আগে, প্রতাপ তা নিয়ে পরিহাস পর্যন্ত করেননি। কেউ যদি ওসবে আনন্দ কিংবা শান্তি পায় তো পাক। কিন্তু ধর্ম অবলম্বন করেও কারুর মন যদি অনুদার থাকে, মুখে যা বলে নিজের জীবনে সে রকম আচরণ না করে, তাহলে সেই সব মানুষকে তিনি প্রায় অস্পৃশ্য জ্ঞান করেন।

গোরাচাঁদের ঠিক অতটা দোষ নেই। হয়তো ওঁর মনের মাপটাই ছোট।

এদেশে পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তানের তফাত যে কতদূর যেতে পারে, তা প্রতাপ যেন প্রথম বুঝলেন হরিদ্বারে গিয়ে। গোরাচাঁদ তাঁর ছেলের বাড়িতে থাকেন, সেটা তাঁর ন্যায্য অধিকার। আর প্রতাপ মমতা মেয়ের কাছে গেলে তাঁরা হন অতিথি। মুন্নি লেখাপড়া শিখেছে, সে ও হরিদ্বারে সরকারি ওয়েলফেয়ার বোর্ডে চাকরি পেয়েছে, তবু গোরাচাঁদের ব্যবহারে সব সময় এটা টের পাওয়া যায়। যদিও তিনি যে সব সময় হামবড়া ভাব দেখান তা নয়, বরং অতিরিক্ত খাতিরই করেন,কিন্তু প্রতাপের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন একটু উঁচু থেকে। মমতা ঐ খাতিরটাই দেখতে পান, গোরাচাঁদের পায়ের তলায় প্লাটফর্মটা তাঁর নজরে পড়ে না।

মমতাকে এসব কথা উল্লেখ করলেই তিনি প্রতাপকে বলবেন, তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।

এ বছর মমতা কেদার বদ্রী যাবার পরিকল্পনা একেবারে ঠিকঠাক করে ফেলেছিলেন, প্রতাপ চাইছিলেন দক্ষিণ ভারতের দিকেযেতে, এমন সময় মুন্নির চিঠি এলো। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তার দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করে।

চিঠিটা পড়ে বেশ উৎফুল্লভাবে প্রতাপ বলেছিলেন, বাঃ তবেতো আর এখন হরিদ্বারে যাবার কোনো মানে হয় না। মুন্নি পাহাড়ে উঠতে পারবে না, কেদার বদ্রী ক্যানসেল। তাহলে বেঙ্গালোরের টিকিট কাটি? আমরা সাউথ ইন্ডিয়া ঘুরে আসি!

মমতা গম্ভীরভাবে অবাক হয়েছিলেন। একই সংবাদের দু'রকম প্রতিক্রিয়া!

তিনি বলেছিলেন, তুমি বলছো কী? খুকীর বাচ্চা হবে, সেই সময় আমরা ওর কাছে না গিয়ে সাউথ ইন্ডিয়ায় ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াবো?

প্রতাপ বলেছিলেন, আমরা ওর কাছে গিয়ে কী করবো? বাড়িতে বেশি লোকজন থাকলে সামলাতে ওরই ঝামেলা হবে। ওখানে ভালো হাসপাতাল আছে, কোম্পানির নিজস্ব ডাক্তার আছে...

–তা বলে আমি মা হয়ে ওর কাছে থাকবো না সেই সময়? অনুনয়ের মা বেঁচে নেই, বাড়িতে সে রকম আর কেউ নেই দেখবার...

–তবে মুন্নিকেই এখানে আসতে লিখে দাও। আমাদের এখানে এসে দু'এক মাস থাকুক। বাড়ির কাছেই নতুন একটা নার্সিং হোম খুলেছে।

–ওরা কী করে আসবে?খুকী বেশিদিন ছুটি পাবে না, ওর নতুন চাকরি। ওর ছেলেটাও ওখানকার স্কুলে ভর্তি হয়েছে....

–বেশিদিন না থাকতে পারে, অন্তত এক মাস থাকুক। তাতে আর এমন কি অসুবিধে হবে?

–তোমার কি আক্কেল-বুদ্ধি কোনোদিন হবে না? অতদূর থেকে মেয়েটা আসবে, তারপর আঁতুরের বাচ্চা নিয়ে ট্রেনে করে ফিরবে এতখানি পথ? কেন, আমাদের হরিদ্বারে যেতে কী অসুবিধে? তোমার এখানে কী এমন রাজকার্য আছে?

আবার হরিদ্বার যেতে হবে, গোরাচাঁদের সঙ্গে ভদ্রতার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। দিনের পর দিন অবান্তর কথা বলে সময় কাটাতে হবে তাঁর সঙ্গে। প্রত্যেকদিনই মনে হবে, মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে বেশিদিন থাকা হয়ে যাচ্ছেন তো! গোরাচাঁদ যতদিন খুশী থাকতে পারেন, কারণ তিনি ছেলের বাপ। এই চিন্তাতে প্রতাপের মনে ক্ষোভ জমছিল। তিনি হঠাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, ছেলে-মেয়েদের যাঁর যখন যেখানে বাচ্চা হবে, অমনি তোমাকে সেখানে ছুটে যেতে হবে?কেন, তুমি কি দাই নাকি?

তার শ্লেষ ছিল এই উক্তিতে। পুরোনো সুপ্ত বেদনা ছিল।

মমতা আহতভাবে একটুখানি চুপ করেছিলেন। এককালের ফর্সা মুখখানেতে একটু কালো ছাপ পড়তে শুরু করেছে। মাথার চুল অবশ্য তেমন পাকেনি। বয়েসের মেদ জমেনি, শরীরটি এখনো ছিপছিপে, কিন্তু ভাঁজ পড়েছে নাকের দু'পাশে।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিটি শব্দে বিষ মাখিয়ে তিনি বলেছিলেন, জানি, সারা জীবনটাই তো দেখলাম, ছেলে-মেয়েদের প্রতি তোমার একটু ও স্নেহ-মমতা নেই! তুমি অর্থপর। নিজের সুখ ছাড়া আর কিছু বোঝো না! তোমার এত অহংকার যে ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারেও তুমি অহংকার মটমটিয়ে থাকতে চাও। তোমার জেদটাই সব সময় বড় হবে! তোমার জন্য আমার ছেলে-মেয়েদের আমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না। সারাজীবন যথেষ্ট ভুগেছি তোমার এই জেদের জন্য।

মমতা যথাস্থানেই তীব্র আঘাতটা হেনেছিলেন। প্রতাপ আর একটিও শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন না। তিনি স্বার্থপর? ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি কিছুই করেন নি?

প্রতাপ আহতভাবে মমতার দিকে তাকাতেই তিনি আবার তিক্ত গলায় বলেছিলেন, সেবারে বাবলুদের ওখানে গিয়ে তুমি কী কান্ড করলে মনে নেই?

চার বছর আগে ছেলের পেড়াপিড়িতে প্রতাপ আর মমতা গিয়েছিলেন বিদেশে। প্রতাপের যাবার ইচ্ছে ছিল না, সদ্য তখন বাড়ি তৈরিতে হাত দিয়েছেন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সব টাকা তাতেই প্রায়শেষ হয়ে যাবে। একতালায় দোকানঘর ভাড়া দিয়ে সংসার চালাতে হবে। কিন্তু অতীন বারবার চিঠি লিখছিল। হঠাৎ একদিন দুম করে দু'খানা টিকিট পাঠিয়ে দিল।

প্রতাপের বিদেশ ভ্রমণের শখ নেই, এতবড় ভারতের ভারতবর্ষেরই তো কত জায়গা দেখা হয়নি। কিন্তু মমতার খুব ইচ্ছে প্যারিস -লন্ডনে দেখার। অ্যামেরিকার থেকেও ইউরোপ সম্পর্কে তার কৌতূহল বেশি, তার কারণ অ্যামেরিকান বইপত্রের চেয়েও ইওরোপিয়ান সাহিত্য মমতার অনেক বেশি পড়া। মুন্নির বিয়ে হয়ে গেছে, সুতরাং টিকিট পাবার পরেও না যাবার কোনো যুক্তি দেখাতে পারেননি প্রতাপ।

প্রথমে গেলেন লন্ডনে। অ্যামেরিকার যাওয়া আসর পথে ঐ টিকিটে দু'বার ইওরোপে থামা যাবে, সেই জন্যে ফেরার সময় প্যারিস দেখা ঠিক হয়েছিল। লন্ডনে এয়ারপোর্টে রিসিভ করলো তুতুল আর

আলম। সুপ্রীতির মৃত্যুর আগে তুতুল টানা দুমাস ছিল কলকাতায়। মায়ের যতখানি সেবা সে করেছে, মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বেশি বুঝি সম্ভব নয়। অত রোগ যন্ত্রণা সত্ত্বেও শেষের কয়েকটা দিন শান্তি পেয়েছিলেন সুপ্রীতি, মাঝে মাঝে ছোট্ট মেয়ের মতন তুতুলকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকছেন।

মায়ের মৃত্যুর পরেও তুতুল লন্ডন ফিরতে চায়নি, কলকাতাতেই থেকে যেতে চেয়েছিল, তখন আবার মমতার শরীর খারাপ ছিল। সেই পুরোনো আলসার। প্রতাপই জোর করে তুতুলকে ফেরত প্যাঠিয়েছিলেন। তুতুলের স্বামী আবার লন্ডনে, আর সে থাকবে কলকাতায়, এ আবার হয় নাকি?

তুতুল আর আলম অবশ্য প্রতিবছরই একবার করে ঢাকা যাবার পথে কলকাতা ঘুরে যায়, দু'চারদিন থাকে। যে বারে অতীন-শর্মিলারা কলকাতায় এসেছিল, সেবার হঠাৎ কোনো খবর না দিয়েই তুতুলও এসে উপস্থিত। প্রতাপকে সে বলেছিল, মামা আমরা ভাইবোনেরা কতদিন একসঙ্গে থাকিনি! খুব ইচ্ছে করে, তাই চলে এলাম।

নতুন বাড়ি তখনো তৈরি হয়নি, সেলিমপুরের ছোট ফ্ল্যাটটায় সকলকে ধরে না, মুন্নির বিয়ে হয়নি, টুনটুনিকেও দুটি বাচ্চাসমেত ধরে নিয়ে এসেছিল তুতুল, ঐটুকু জায়গার মধ্যে ঘেঁষাঘেষি করে থাকা, তবু কী আনন্দ আর হৈ চৈ করেছিল কয়েকদিন সকলে মিলে। সেই সবকিছুর মূলে ছিল তুতুল, সে সবার ফুলদি, সকলের দিকে তার সমান নজর। বাড়ি ভর্তি লোকজন দেখে প্রতাপের এক একবার মনে পড়ে যেতে মালখানগরের কথা, এই রকম পারিবারিক জীবনেই তো তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। মালখানগরে জায়গা ছিল অনেক, এখানে ওদের সবার শোওয়ার পর্যন্ত জায়গা হয় না, তবু আনন্দ কিছু কম ছিল না।

তুতুল চলে যাবার পরই যেন আবার বদলে গিয়েছিল সবকিছু। টুনটুনির স্বামী পরেশের সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হতে হতে একসময় অতীন তাকে এমন ধমকালো যে দুদিন পরেই টুনটুনি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ফিরে গেল ক্ষুন্নমনে। শর্মিলার কলকাতার জল-হাওয়া সহ্য হচ্ছিল না, জ্বর হতে লাগলো বারবার, সে চলে গেল জামশেদপুরে বাপের বাড়িতে। এখানকার চাকরিতে গন্ডগোল শুরু হলো অতীনের। তারপর তো এক সময় বাড়ি আবার ফাঁকা।

তুতুলের আন্তরিক ইচ্ছেতে তবু সেই একবারই একটা পারিবারিক সম্মেলন হয়েছিল বলা যায়।

লন্ডনে এসে প্রতাপ দেখলেন, এখানেও যেন তুতুল একটা মস্তবড় পবিার নিয়ে থাকে। তুতুল আলমের কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি এখনো, কিন্তু ওদের কেনসিংটেনের বাড়িটা যেন সব সময় একটা হট্টমেলা। কে কখন আসছে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক নেই। প্রত্যেক বেলা অন্তত দশ-বারোজন খায়, তুথুল আর আলম দু'জনেই কাজে বেরিয়ে গেলে বাইরের লোকরাই রান্না বান্না করে। বাংলাদেশের অনেক ছেলেমেয়ে লন্ডনে কাজে বেরিয়ে গেলে কোথাও তাকার জায়গা না পেলে তুতুলদের এখানে এসেই ওঠে। প্রতাপ আর মমতা যখন এলেন, তখনও ঐ বাড়িতে আরও পাঁচজন যুবক-যুবতী অতিথি হয়ে ছিল।

লন্ডন শহরে পা দেবার পর থেকে প্রতাপ কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না যে এটা তাঁর প্রাক্তন প্রভুদের দেশ। চাকরির প্রথমদিকে প্রতাপ যখন নদীয়ায় পোস্টিং পেয়েছিলেন, তখন সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ফ্রাঙ্কলিন সাহেব, বাঘের মতন গরগরে মেজাজ, কথায় কথায় সুভাষ বোসকে বলতেন জার্মান স্পাই আর জওহরলাল নেহরুকে বলতেন, ব্লাবারমাউথ, ওপন এয়ার ব্যারিষ্টার। শুধু নিজের ওপরওয়ালার জন্যই নয়, সমস্ত ব্রিটিশ জাতটাকেই প্রতাপ মনে করতেন শত্রুপক্ষ। লন্ডনের রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়, কিংবা কোনো দোকানে ঢুকে প্রতাপ যেন সর্বাঙ্গে রোঁয়া ফুলিয়ে থাকতেন, কেউ একটু খারাপ ব্যবহার করলেই যেন তিনি ধমকে উঠবেন। আরা এখন স্বাধীন জাতি, নিজের টাকায় বেড়াতে এসেছি, তোমাদের দয়ার তোয়াক্কা করি না।

আসলে, এসব কথা যে অনেকেই এখন আর মনে রাখেনি, প্রতাপের তা খেয়াল থাকতো না। রাস্তাঘাটের সাধারণ ইংরেজরা একদিন পরে আর তাদের আঙুলে পুরোনো এম্পায়ারের ঘিয়ের গন্ধ শোঁকে না। কালো লোকদের যে তারা অনেকে পছন্দ করে না, সেটাও নিছক বর্ণবিদ্বেষ নয়, প্রতিযোগিতার ভয়।

তুতুল-আলমের বাড়িতে যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা আসে, তারা যেন ঔপনিবেশিক আমলের কথা জানেই না। তারা ইংরেজদের সমালোচনা করে, গালাগালি দেয়, আবার প্রশংসাও করে, যেন

সমান সমান। কেউ কেউ ইংরেজ মেয়ে বন্ধু নিয়ে আসে, সেই সব মেয়েদের তারা মেমসাহেব বলে একটুও বেশি খাতির করে না, অনেক সময় তাদের ওপর হুকুম চালায়, রান্নাঘরে পাঠিয়ে দেয়। বাংলাদেশের এই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের প্রতাপ আগে ভালো করে দেখেনি, তিনি মুগ্ধ হয়ে এদের কথা শোনেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম-বগুড়া রাজশাহী থেকে আসা এই সব ছেলেমেয়েদের সুন্দর স্বাস্থ্য, চোখেমুখে কোনো রকম হীনমন্যতার ছাপ নেই, বরং কলকাতার ছেলেমেয়েদের তুলনায় এরা অনেক বেশি প্রানবন্ত, সব সময় উৎসাহে টগবগ করছে, কোনো আড়ষ্টতা নেই কথাবার্তায়। কয়েকজন পড়াশুনোতেও খুব ভালো।

প্রতাপের শুধু একটা ব্যাপারে খটকা লাগতো। এতো ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা সব দেশের বাইরে চলে এলে বাংলাদেশের হবে কাদের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধে অনেক তরুণ প্রাণ দিয়েছে, অনেক বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে, তার পরেও যদি এই সব শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা দেশ ছেড়ে চলে আসে, তা হলে সেটা সেদেশের বড় দুর্ভাগ্য।

এই প্রসঙ্গটা একবার আলমের কাছে তুলতেই সে দুঃখের হাসি হেসে বলেছিল, মামাবাবু এর মধ্যে অনেক ঘাপলা আছে। বাংলাদেশের নামে একটা স্বাধীন দেশেরই শুধু জন্ম হয়েছে, কিন্তু সে দেশের মানুষগুলো স্বাধীন হয় নাই। স্বাধীনতার নামে মানুষ যত কিছু আশা করে, তার কিছুই কি আমরা পেয়েছি? সাধে কি আর এই সব ছেলেমেয়েরা দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়! তবু দেখবেন, ইন্ডিয়ার ছেলেমেয়েদের তুলনায় এই নতুন বাংলাদেশীরা বিদেশে বসেও অনেক বেশি দেশের কথা চিন্তা করে, কষ্ট পায়, দেশের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ এদের অনেক বেশি। ইন্ডিয়ার লোকেরা অনেকটা সিনিক্যাল হয়ে গেছে, তাদের ধারণা, দেশটার আর কিছু হবে না, ক্রমশ আরও গোল্লায় যাবে, সুতরাং বিদেশে থাকাই ভালো। কিন্তু আমরা এখনো আশাবাদী। আসলে, আমাদের লড়াইটা এখনো থামে নাই!

লন্ডনে সাতটি দিন প্রতাপ-মমতা পরম আনন্দে কাটিয়েছিলেন। ডাক্তার হিসেবে তুতুল আর আলম দু'জনেই যথেষ্ট ব্যস্ত, তবু ওরা পালা করে ছুটে নিয়ে মামা-মামীমাকে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরিয়েছে। মমতার ব্রিটিশ কান্ট্রিসাইড দেখার বাসনা ছিল, তাই দুটো দিন থেকে আসা হলো ডোভারে। আসার সময় তুতুল এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে শেষদিন সে হঠাৎ ঠিক করেছিল, প্রতাপ আর মমতাকে সে একেবারে অ্যামেরিকায় অতীনের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। অতীনরা থাকে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে বেশ দূরে, যদি কোনো কারণে তারা ঠিক সময় এয়ারপোর্টে পৌছতে না পারে, তা হলে প্রতাপরা বিপদে পড়বেন। যদিও লন্ডন থেকে দু'বার ফোনে কথা হয়েছে অতীন শর্মিলার সঙ্গে সে রকম গন্ডগোলের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তুতুলের কথা শুনে আলম আপত্তি করেনি, সে বলেছিল, যাও না, ঘুরে এসো, কয়েকদিন থেকে এসো ভাইয়ের কাছে। কিন্তু তার দু'দিন বাদেই আলমের নিজের মামা, যিনি অল্প বয়সে পিতৃহীন আলমকে নিজের সন্তানের মতন মানুষ করেছেন, তিনি লন্ডনে চিকিৎসা করাবার জন্য আসছেন শুনে প্রতাপ মমতা দু'জনেই বলেছিলেন, এখন তুই চলে যাবি কী? তা কখনো হয়? তুই আর আলম পরে আসিস আম্যেরিকায়, আমরা তো থাকছি কিছুদিন।

নিউ ইয়র্কে এয়ারপোর্টে শর্মিলা আসতে পারেনি, কারণ তার ছেলের সবে মাত্র আড়াই মাস বয়েস, অতীন ঠিক দাঁড়িয়েছিল। একটা রাত বাবা মাকে নিয়ে নিউইয়র্কের একটা হোটেলে কাটিয়ে পরদিন সে গাড়ি চালিয়ে ওদের ওদের নিয়ে এলো ট্রয় নামে একটা ছোট শহরে। নিজের ছেলের বাড়িতে পা দেবার সেই প্রথম কয়েকটি মুহূর্তের কথা মমতা অনেকবার অনেকের কাছে গল্প করেছেন। বাড়ির সামনে একটা বাগান, তারপর ঠিক যেন হলুদ রং দিয়ে আঁকা ছবির মতন একটা বাড়ি, পেছনদিকে ঘন জঙ্গল। গাড়ি থেকে নামবার পর দেখলেন, সেই বাড়ির দরজার সামনে আড়াই মাসের ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শর্মিলা। বাচ্চাটা হাত পা ছুড়ে যেন ঠাকুর্দা-ঠাকুরমাকে অর্ভ্যথনা করছে। সেদিকে তাকিয়ে মমতার বুকখানা ধক্ করে উঠেছিল। বাচ্চাটির মুখখানা যেন অবিকল তাঁর বড় ছেলে পিকলুর মতন।

আসলে পিকলু আর বাবলু দু'ভাইয়ের চেহারায় যথেষ্ট মিল ছিল। বাবলুর ছেলে বাবলুরই মতন হয়েছে। তবু মমতার মনে পড়েছিল পিকলুর কথা , কেন যে এতকাল বাদে হঠাৎ পিকলুর স্মৃতি

এমনভাবে ফিরে এলো তা কে জানে! আর কেউ মনে রাখেনি, কিন্তু মমতার তো এখনো পিকলুর সব বয়েসের চেহারাই জ্বলজ্বল করে। তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল হঠাৎ। পরে মমতার মুখে ঐ কথা শুনে প্রতাপ হেসে বলেছিলেন, তোমরা যে এইটুকু বাচ্চাকে দেখে কার সঙ্গে মিল না অমিল তা কী করে বোঝো, ভগবান জানেন। আমার কাছে তো সব বাচ্চাই সমান মনে হয়।

গয়না-গাঁটি আর কিছুই অবশিষ্ট নেই মমতার, শুধু কী করে যেন নিজের মায়ের কাছ থেকে পাওয়া একটা মোহর থেকে গিয়েছিল, সেটা সঙ্গে করে এনেছিলেন। সেই মোহর দিয়ে তিনি নাতির মুখ দেখলেন। তারপর শর্মিলার কোলের দিকে হাত বাড়াতেই ঐ আড়াই মাসের বাচ্চা ঝাঁপিয়ে চলে এসেছিল তাঁর কোলে। তখন তাঁর চোখের জল সামলানো সত্যিই দায়।

তুতুল-আলমের বাড়ির তুলনায় অতীন-শর্মিলাদের বাড়ির অনেক তফাত। লন্ডনের সঙ্গে এই ছোট জায়গাটার তো কোনো তুলনাই চলে না। যদিও তখনকার পরিবেশ ও প্রকৃতি অত্যন্ত সুদৃশ্য ও মনোরম। লন্ডনে ওদের বাড়িতে যেমন সর্বক্ষণ হৈ চৈ লেগে থাকতো, এই বাড়ি আবার সব সময় নিস্তব্ধ, নির্জন। শনি-রবিবার ছাড়া কোনো অতিথি আসার সম্ভাবনাই নেই। শর্মিলা আর অতীন দু'জনেই চাকরিতে বেরিয়ে যায় সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে, তার একটু আগেই ওদের মেয়ের স্কুলে বাস আসে। এরপর থেকে সারা সকাল দুপুর, সন্ধে প্রতাপ আর মমতাকেই একসঙ্গে থাকতে হয় বাড়িতে। কলকাতার সঙ্গে তফাত এই, এখানে আর একটি আড়াই মাসের প্রাণী থাকে। সেই নাতিকে নিয়ে মমতার সময় বেশ ভালোই কাটে। যদিও সেই শিশুর সারাদিন একেবারে ছকে বাঁধা, সে কখন খাবে, কখন ঘুমোবে, কখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো কী করতে হবে, তা শর্মিলা প্রায় পাখি পড়াবার মতন মমতাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

প্রতাপের সময় কাটে শুধু টিভি দেখে আর বইপত্র পড়ে। তিনি অবশ্য কোনোদিনই তেমন পড়ুয়া স্বভাবের নন, খবরে কাগজ-টাগজ পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু গল্প-উপন্যাসের দিকে ঝোঁক নেই। তবু অতীনের বেডরুম থেকে একদিন তিনি একটি হাল আমলের মার্কিনী নভেল নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন। প্রথম আট-দশ পাতা পড়েই তাঁর প্রায় বমি এসে গেল, বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এত সব অশ্লীল, কুৎসিত কথা ও শরীরের বর্ণনা এর এমন অবলীলাক্রমে লেখে? লেখকের নাম আপডাইক, পেছনের মলাটে বড় বড় পত্রিকার সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার উদ্ধৃতি। গোপন পর্নোগ্রাফি নয়, এটাই আধুনিক সাহিত্য? বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দেবার পরেও প্রতাপ আবার কুড়িয়ে নিয়ে সাবধানে ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছিলেন, যাতে ছেলে এবং ছেলের বউ বুঝতে না পারে তিনি ঐ বই হাতে নিয়েছিলেন।

অতীনেরা রবিবার শুধু নিউ ইয়র্ক টাইমস রাখে, অন্যদিন একটি স্থানীয় পত্রিকা। প্রথমবার একশো কুড়ি পৃষ্ঠার নিউ ইয়র্ক টাইমস দেখে প্রতাপ প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। এতবড় খবরের কাগজ! পরে দেখলেন তার অধিকাংশই বিজ্ঞাপনে ভর্তি, খবরগুলি দেখলে মনে হয়, কলকাতার তো কোনো উল্লেখের প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি ভারত নামে যে একটা দেশ আছে পৃথিবীতে, সেটাই বোঝা যায় না। একদিন শুধু হায়দ্রাবাদে একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় আড়াইশো জনের মৃত্যুর সংবাদ ভেতরের একটা পাতায় আবিষ্কার করা গিয়েছিল, সারা ভারতে ঐ একমাত্র উল্লেখযোগ্য খবর। আড়াইশো জন মরেছে, আর সত্তর কোটি মানুষ যে কী করে বেঁচে আছে, সে সম্পর্কে এদের মাথাব্যথা নেই।

স্থানীয় পত্রিকাটি একেবারেই স্থানীয়। কোনো একটি ফার্মে গোরুদের কী একটা অসুখ হয়েছে, সেটাই একদিন প্রথম পাতার হেডলাইন। নীচের দিকে ছোট করে ছাপা হয়েছে মহাশূন্য এই প্রথম দু'জন নভোচারী কী করে এক রকেট থেকে আর এক রকেটে যাতায়াত করলো তার বিবরণ। এটাকেও এরা খবরের কাগজ বলে! তবে, এই স্থানীয় কাগজটিও বত্রিশ পৃষ্ঠা, পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন, তার মধ্যে আবার কী সব কুপন থাকে, শর্মিলা কেটে কেটে রেখে দেয়। ঐগুলো দেখালে সুপার মার্কেটে কিছু জিনিসপত্র শস্তায় পাওয়া যায়।

টিভি দেখতে দেখতেও প্রতাপ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। চার-পাঁচটা চ্যানেল থাকলেও দুপুরের দিকে একেবারে অসহ্য, প্রোগ্রাম দেখায়, রান্না, ব্যায়াম, কিংবা অতি ন্যাকা ন্যাকা সিরিয়াল, তাতে যত থাকে চুমু, ততই কান্নার দৃশ্য। প্রতাপ বরং কমার্শিয়াল বা বিজ্ঞাপনের স্পটগুলো আগ্রহের সঙ্গে দেখেন। তাতে এই প্রবল কনজিউমার সোসাইটির চিত্রটা যেন ঠিক ঠিক ফুটে ওঠে। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়

কতকগুলো জিনিস নিয়ে কী বিরাট কর্মকাণ্ড। কয়েকটা ছেলেমেয়ে নেচে কুঁদে চিউয়িংগামের গুণকীর্তন করে গেল। এখন এরা চিউইংগাম বলে না তো, বলে বাবলগাম। টি ভিতে তিরিশ সেকেন্ডে ঐ বিজ্ঞাপনের দাম নাকি পঞ্চাশ-ষাট হাজার ডলার, শর্মিলা কাছে এই কথা শুনে প্রতাপ আঁতকে উঠেছিলেন। পঞ্চাশ-ষাট হাজার ডলার মানে তো বিশাল টাকা! পৃথিবীতে চিউইংগাম কিংবা বাবলগাম না থাকলেই বা কী ক্ষতি হতো! ময়লা ফেলার বড় ঠোঙা, যাকে এরা ট্র্যাস ব্যাগ বলে, তারও ঐ রকম বিজ্ঞাপন লাগে। এইসব বাজে জিনিস কেনানোর জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, আর ঐ সব জিনিস যারা কেনে, তারাও টাকা রোজগারের জন্য সারা সপ্তাহ মুখের রক্ত তুলে খাটছে। মেয়েরা পারফিউম মাখতে ভালবাসে সেটা বোঝা গেল, কিন্তু তাদের মুখের গন্ধ, বগলের গন্ধ ঢাকার জন্য স্প্রে, হাতে মাখার লোশান, নোখে মাখার রং, চোখের পল্লবে মাখার কালি, এই সবও চাই! এইসব কিছু মাখলে তাদের একটা কিম্ভুতকিমাকার প্রাণী মনে হবে না? বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে যখন মেয়েরা কেনে নিশ্চয়ই। অতীন আর শর্মিলা দু'জনে দুটো গাড়ি নিয়ে অফিসে যায়। দুটো গাড়ি রাখার জন্য ওরা বেশি উপার্জন করতেও বাধ্য। গ্যারেজের দরজা আপনি আপনি খুলে যাবে, তার জন্য একটা যন্ত্র। হাত দিয়ে দরজাটা খুললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়।

প্রতাপের মনে পড়ে অনেকখানি আগেকার একটা খবর। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ সেবার এসেছিলেন অ্যামেরিকা সফরে। রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াই তখন সবে কমতে শুরু করেছে। ক্রুশ্চেভই বোধহয় প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে পদার্পণ করেছিলেন অ্যামেরিকায়। এদেশের গমের ক্ষেত, ভুট্টার ক্ষেত দেখে তিনি মুগ্ধ। এত উৎপাদন পৃথিবীর আর কোনো দেশে হয় না। যন্ত্র দিয়ে ফসল কাটা হয়, একমাত্র চাষা একরের পর একর জমি চাষ করে ফসল তোলে। এখানকার অনেক চাষার নিজস্ব প্লেন আছে। এক জায়গায় ক্রুশ্চেভকে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি দেখানো হচ্ছিল। অনেকগুলি দেখলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তার মধ্যে একটা ছিল লেবুর রস করার যন্ত্র। রান্নাঘরে কাজে লাগে, যখনই দরকার হবে, ঐ যন্ত্র একটা লেবু কেটে রস বার করে দেবে। ক্রুশ্চেভ এক টুকরো তুলে নিয়ে বলছিলেন, কিন্তু তোমার যাই-ই বলো, আমরা দু'আঙুলে টিপে আমি ঐ যন্ত্রের চেয়ে আরও ভালোভাবে রস বার করতে পারি।

বিমানবিহারী বাড়িতে বসে স্টেটম্যান পত্রিকায় ঐ খবরটা পড়ে প্রতাপ খুব হেসেছিলেন। বিমানবিহারী বলেছিলেন, পশ্চিমী দেশগুলো যাচ্ছে কোথায় বলো তো! এরা কি মানুষের হাতের আঙুলের ব্যবহারও ভুলিয়ে দেবে? সবই যদি যন্ত্রে করে দেয়। তা হলে মানুষ যে ক্রমশ অথর্ব হয়ে যাবে! ওদের বিজ্ঞানীরা এটা চিন্তা করে না? প্রতাপ বলেছিলেন, যারা মেধাবী, খুব বুদ্ধিমান, তারাই বিজ্ঞানী হয়, তাই না? কিন্তু মানুষের সভ্যতা ধ্বংস করার জন্য যে বিজ্ঞানীরা অ্যাটম বোমা বানায়, তাদের কি তুমি বুদ্ধিমান বলতে পারো?

অতীন আর শর্মিলা ফেরে সন্ধেরপর। সারাদিন অফিস করার পর, পনেরো-কুড়ি মাইল গাড়ি চালিয়ে এসে ওরা বেশ ক্লান্ত থাকে। এ দেশের অফিসগুলোতে যেমন মাইনে ভালো দেয়, তেমনি খাটিয়েও মারে। ফাঁকি মারার উপায় নেই, কারণ প্রত্যেকেরই কাঁধে চাপানো থাকে আলাদা আলাদা দায়িত্ব। অতীনকে তো এক একদিন বাড়িতে ফিরেও অনেক রাত পর্যন্ত অফিসের কাজই করতে হয়। শর্মিলার কিন্তু আশ্চর্য জীবনীশক্তি, বাড়ি ফিরেই সে কাজে লেগে যায়। বড় মেয়ের পড়াশুনো দেখে, ছেলেকে ঘুম পাড়ানো, তারই মধ্যে রান্নাবান্না, তখন সে মমতাকে কোনো কাজই করতে দেবে না। আর প্রত্যেকদিন সে শ্বশুর-শাশুড়িকে চার-পাঁচ রকম রান্না করে খাওয়াবেই। দুপুরবেলা সে থাকতে পারে না সেজন্য তার আফশোসের শেষ নেই, যদিও সবকিছুই সে গুছিয়ে রেখে যায়।

শর্মিলার মতন মেয়েকে ভালো না লাগার কোনো উপায় নেই। সব সময় তার মুখে একটা সারল্য মাখানো হাসি, অবিরাম সারা বাড়ি ছুটে বেড়াচ্ছে, সে একটু ভুলো-মনা স্বভাবের, এইমাত্র কোনো একটা জিনিস কোথায় রেখেছে, তাও ভুলে যায়, এবং নিজের ভুলের কথা সে নিজেই হাসতে হাসতে স্বীকার করে। মমতা তো তাঁর পুত্রবধূর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রতাপ অবশ্য শর্মিলার সঙ্গে ব্যবহারে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারেননি, খানিকটা আড়ষ্টতা রয়েই গেছে। একমাত্র ছেলের বউ, তাকে তো নিজের মেয়ের মতনই মনে করা উচিত, প্রতাপ তা বুঝলেও মনটাকে সে রকমভাবে তৈরি করতে পারেনি আজও। প্রথম অতীনের চিঠিতে তার বিয়ের খবর পেয়ে প্রতাপ আর মমতা দু'জনেই তীব্র

আঘাত পেয়েছিলেন। তারপর অন্তত তিনমাস তাঁরা দু'জনেই ছেলেকে এক লাইনও চিঠি লিখতে পারেননি, অতীনের পাঁচখানা চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। প্রতাপের মনে হয়েছিল, তিনি নিজেই যেন তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু বিমানবিহারীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। যদিও বিমানবিহারী কিংবা অলি সামান্যতম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। বরং অলি তার অ্যামেরিকার কোন্ বান্ধবীর কাছে থেকে অতীনের বিয়ের খবর পেয়ে বাড়ি বয়ে এসে মমতার কাছে শর্মিলার খুব সুখ্যাতি করে গিয়েছিল।

মমতা সেসব ভুলে যেতে পেরেছেন, প্রতাপ পারেন না। বিয়ের সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যেই যে সন্তান প্রসব করে, সেই মেয়েকে পুত্রবধু হিসেবে মেনে নেওয়া কি সহজ? শর্মিলাকে চোখে দেখার আগে, প্রতাপ এখনও ভেবেছিলেন যে একটা নষ্ট, দুশ্চরিত্র, লোভী স্বভাবের মেয়ে টোপ ফেলে তাঁর ছেলেকে বিয়ের জালে জড়িয়েছে। পশ্চিমী প্রভাবে যে মেয়ের নৈতিকতা দূষিত হয়ে গেছে, সে হবে মালখানগরেরর মুজুমদার বংশের বউ! সে বিয়েতে বাধা দেবার কোনো উপায় ছিল না বলেই অসহায় ক্রোধে প্রতাপ আরও বেশি জ্বলেছিলেন। শর্মিলাকে দেখার পর অবশ্য প্রতাপের সে ভুল ভেঙে যায়। শর্মিলার নির্মল মুখখানি দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, ভুল বা অন্যায় যা কিছু হয়েছেহ, সেসবের জন্য তার গোঁয়ার ছেলেই দায়ী। শর্মিলাকে যে এক সময় প্রতাপ খুব খারাপ মেয়ে ভেবেছিলেন, শর্মিলা সে কথা না জানলেও তবু সেই জন্যই শর্মিলার সামনে দাঁড়ালে প্রতাপ এখনো লজ্জাবোধ করেন।

প্রথম শনিবারেই এসে পড়িছেল সিদ্ধার্থ সপরিবারে, সঙ্গে আর একটি বন্ধু দম্পতি। ওরা আসার পর বাড়িটা সরগরম হয়ে উঠলো। নিজের ছেলের চেয়েও সিদ্ধার্থের সঙ্গেই প্রতাপের কথাবার্তা হলো অনেক বেশি। অতীনের যত ভাব তার মায়ের সঙ্গে, বাবার কাছে এসে সে কাজের কথা বলে, গল্প করতে পারে না।

সিদ্ধার্থ এসেই জিজ্ঞেস করেছিল, মেসোমশাই, এ দেশটা কেমন লাগছে, বলুন!

প্রতাপ হেসে বলেছিলেন, বেশ ভালো!

সিদ্ধার্থ সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিল, কি করে বললেন, ভালো? কিছুই তো দেখেননি! এয়ারপোর্ট থেকে এক রাত হোটেলে কাটিয়ে সোজা এখানে চলে এসেছেন। বাড়ির মধ্যে বসে থেকে দেশটার কী বুঝবেন। অতীনকে বলেছিলুম, নিউ জার্সিতে আমার এখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতে আপনাদের নিয়ে.... জানেন মেসোমশাই, আপনার ছেলে বড্ড কাজ-পাগল হয়েছে! আমি ওকে কতবার বলেছি, অফিসে বেশি বেশি কাজ দেখালে ওরা আর ও নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। ব্লাড সাকার্স! প্রমোশন, মাইনে বাড়াবার লোভ দেখিয়ে বলবে, সব রক্ত নিঙড়ে দাও। আমরা ব্রাউন স্কিন বলে আমাদের পিঠে চাপড়ে বলবে, তোমরা খুব কাজের লোক, এসিয়ানস আর ডিজিলেন্ট পীপল। তাতেই আমরা গলে যাই! মেসোমশাই, আপনি দেশটা ভালো করে ঘুরে দেখুন, তারপর আপনার মতামত শুনবো, আপনাদের জেনারেশনের মতামতটা জানতে চাই।

প্রতাপ বলেছিলেন, যেটুকু দেখেছি, এর মধ্যে, রাস্তাঘাট, দোকানপাট, বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর। সব জায়গায় একটা আনন্দ স্ফুর্তি ভাব আছে?

সিদ্ধার্থ বলেছিল, ওরকম ওপর ওপর দেখলে চলবে। বড় বড় বাড়ি আর চওড়া চওড়া রাস্তা, ওসব তো আছেই। দোকানগুলো জিনিসপত্রে ঠাসা, বেশিরভাগ ফ্যামিলিতে দুটো গাড়ি, নানারকম গ্যাজেট, চতুর্দিকে ডলারের ঝনঝন শব্দ, শুধু ভোগ-বিলাসের জিনিসই নয়, আর্ট-কালচারের ব্যাপারেও পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা এক পয়সা দিয়ে কিনে আনতে পারে। তবু, এ সব দিয়েও তো একটা দেশ বা জাতকে ঠিক বোঝা যায় না। আপনি সারা দেশটা ঘুরে দেখুন.... এই অতীন, মেসোমশাই-মাসিমাদের করে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিস? নিউ ইয়র্কটা ভালো করে দ্যাখা, তারপর ওয়াশিংটন ডি. সি!

অতীন বলেছিল, সামনের মাসে ছুটি নিচ্ছি, তখন বেরুবো, তোরাও চল না, একসঙ্গে দুটো গাড়ি নিয়ে...

সিদ্ধার্থ বলেছিল, যেতে পারি। মেসোমশাই, আপনি শুধু বড় বড় শহরের বাইরের চাকচিক্য দেখে ভুলবেন না। নিউ ইয়র্কেও আছে হার্লেম, বাওরি, শিকাগোয় ঘেটো আছে, তারপর যদি মিড ওয়েস্টের গ্রামে যান, দেখবেন কী কনজারভেটিব সব লোকগুলো। সে এক অন্য অ্যামেরিকা।

রাত্তিরবেলা বাগানে বারবিকিউ করা হলো। লোহার উনুনে ঝলসানো হচ্ছে মুর্গী, গোল হয়ে ঘিরে বসেছে সবাই। আকাশ পরিষ্কার, ঈষৎ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, মাঝে মাঝে খুব নীচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে

প্লেন। একটু দূরে বাচ্চারা কী যেন একটা দুর্বোধ্য গান দু'এক লাইন গাইছে আর হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

সিদ্ধার্থ একটা স্কচের বোতল বার করে বললো, মেসোমশাই, আপনার ছেলে লজ্জায় বলতে পারছে না। আমরা একটু হুইস্কি খাবো, তাতে কি আপনি আপত্তি করবেন? আমাদের খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন আপনারা এসেছেন বলে যদি লুকিয়ে লুকিয়ে বেসমেন্টে গিয়ে খেয়ে আসতে হয়...

প্রতাপ বললেন, না, না। তোমরা খাও, তাতে কী হয়েছে? জানি, এ দেশের থাকলে মানে অনেক পার্টি-টার্টিতে যেতে হয়....

সিদ্ধার্থ বললো, ঠাণ্ডার দেশ তো, একটু-আধটু খেলে ভালোই লাগে। আপনি একটু খাবেন?

প্রতাপ বললেন, না, আমি খাই না। তোমরা খাও! আমার জন্য তোমরা চিন্তা কোরো না।

খেলার ক্যাপটেনের ভঙ্গিতে সিদ্ধার্থ মাথার ওপর দু'হাত তুলে হাততালি দিয়ে সবাইকে ডেকে বললো, এই, শোনো, মেসোমশাই আমাদের ড্রিংক করার পারমিশান দিয়েছেন। সিগারেট টানার জন্যও কারুক আড়ালে যাওয়ার দরকার নেই। আমি তো জানিই, উনি খুব ব্রড মাইন্ডেড!

গেলাসে স্কচ ঢালতে ঢালতেই সিদ্ধার্থ আবার চেঁচিয়ে বললো, এই অতীন, ওয়াইনের বোতলগুলো ডিপ ফ্রিজে রেখে আয়। খাওয়ার সময় লাগবে।

অতীন বললো, আমি দুটো হোয়াইট ওয়াইনের বোতল অররেডি চিল করতে দিয়েছি।

সিদ্ধার্থ বললো, আমি একটা ক্যালিফোর্নিয়ার রোজে এনেছি, ওটাকেও ঢুকিয়ে দে প্রিজ।

অতীন বললো, মুর্গীর সঙ্গে হোয়াইট ওয়াইনই তো ভালো।

সিদ্ধার্থ বলল, আমার মিষ্টি ওয়াইন ভালো লাগে। বিশেষ করে রোজের টেস্টটা... বোতলটাকে ঠাণ্ডা করতে দে, ডিপ ফ্রিজে দিলে একেবারে চিলড হবে।

অতীন এক ধমক দিয়ে বললো, ঠিক আছে, তোর খেতে ইচ্ছে হয় খাবি। কিন্তু রেড ওয়াইন আবার কেউ চিল্‌ড করে খায় নাকি? বাঙালের মতন কথা! রেড ওয়াইন খেতে হয় নর্মাল টেম্‌পারেচারে, ছিপিটা একটু আগে খুলে রাখলে...

প্রতাপ চোখ বড় বড় করে শুনছেন। মদ বিষয়ে তাঁর ছেলের এত জ্ঞান দেখি তিনি একেবারে চমৎকৃত। মদ খাওয়ারও এত নিয়মকানুন থাকে! এ দেশের থাকতে গেলে বোধহয় এসব শিখতে হয়। যস্মিন দেশে যদাচারঃ! মেয়েরা বীয়ার নিয়েছে। সিদ্ধার্থর এগারো বছরের ছেলেটি বায়না ধরলো, আমি কোক খাবো না, আমাকে রুট বীয়ার দাও! রুট বীয়ার কথাটা প্রতাপের কানে খট করে লাগে, যদিও তিনি জেনেছেন, যে ওরা মধ্যে অ্যালকোহল থাকে না। তবু বাচ্চা বয়েস থেকেই বীয়ার নামটার দিকে ঝোঁক।

খাদ্য পরিবেশনের সময় খোলা হলো ওয়াইনের বোতালগুলো, অন্যরকম গেলাস এলো। একটা সুন্দর গেলাসে লাল রঙের মদ ঢেলে সিদ্ধার্থ প্রতাপের কাছে এসে বললো, মেসোমশাই, আপনি একটু খেয়ে দেখুন, খারাপ লাগবে না।

প্রতাপ সন্ত্রস্তভাবে বললেন, না, না, আমি খাবো না। আমি কোনোদিন..

সিদ্ধার্থ গেলাসটা প্রতাপের মুখের কাছে এনে বললো, একটু খেয়ে দেখুনই না। এতে কোনো দোষ নেই। ওয়াইন কিন্তু মদ নয়। আমাদের দেশে সব কিছুকেই ওয়াইন বলে। এটা স্রেফ আঙুরের রস। আপনি তো এমনি আঙুর খান এটা খেলে প্রায় সেইরকমই... একটু চেখে দেখুন!

প্রতাপ বেশ দৃঢ়ভাবে গেলাসটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, না, আমাকে দিও না।

তিনি একটু বিরক্ত হয়েছেন। যে-কোনো ফলকেই ফারমেন্ট করলে অ্যালকোহল তৈরি হয়, তা কি তিনি জানেন না! এরা বিদেশে থাকে বলে মনে মরে, দেশের লোক সব বিষয়ে অজ্ঞ! আঙুর আর ওয়াইন এক! পুঁই শাক, পালং শাকও গাছ, গাঁজাও একটা গাছ থেকে হয়। তাই বলে যে পুঁই পালং খায়, তাকে গাঁজা খেতে হবে?

প্রতাপের কাছে সুবিধে করতে না পেরে সিদ্ধার্থ মমতাকে জোরাজুরি করতে লাগলো। মমতা অনেকবার আর্তভাবে না না বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত গেলাসটা নিলেন। প্রতাপের দিকে আড়চোখে লাজুক লাজুক ভাবে তাকিয়ে চুমুক দিলেন সেই লাল মদে।

সিদ্ধার্থ হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, ব্রাভো! মাসিমা অনেকবেশি স্মার্ট!

একসময় মমতার বাপের বাড়িতে কিছুটা ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবেশ ছিল। ছোটবেলায় মমতা একজন মেমসাহেবের কাছে কিছুদিন ইংরিজি শিখেছিলেন। মমতার বাবা বিলিতি মদ্য পান করতেন মাঝে মাঝে, বাড়িতে অতিথি এলে তাঁদেরও খাওয়াতেন। বিয়ের দু'এক বছর পরেও প্রতাপ শ্বশুরবাড়িতে এরকম পার্টি দেখেছেন, তখনও অবশ্য ত্রিদিব জোর করেও প্রতাপকে ওসব খাওয়াতে পারেননি। কিন্তু মমতা বোধহয় চেখে দেখেছেন, দু'একবার। সে সব অনেককাল আগের কথা, এত বছর এক গরিববাড়ির বউ হয়ে থেকেও মমতা সেসব একেবারে ভোলেননি। প্রতাপ লক্ষ করেছেন, এদেশে এসে মমতা ইংরিজিতে কথাবার্তা বেশ চালিয়ে যেতে পারেন।

সিদ্ধার্থ শুধু জোর করে মমতাকে ওয়াইন খাইয়েও ছাড়লো না, মমতাকে দিয়ে গানও করালো। খাওয়া দাওয়ার পর গান শুরু হয়েছিল, সিদ্ধার্থ ধরে বসলো, প্রত্যেককেই কিছু না কিছু গাইতে হবে, মমতা হাসতে হাসতে প্রবলভাবে মাথা নাড়ছিলেন, তার মধ্যে অতীন বলে দিল, হ্যাঁ, মা গান জানে, আমি ছোটবেলায় শুনেছি! শেষ পর্যন্ত মমতা গাইলেন একখানা অতুলপ্রসাদের গান, অনভ্যাসের জন্য গলা দু'একবার কেঁপে গেলেও এখনো সুর আছে বোঝা যায়। পিকলুর মৃত্যুর পর প্রতাপ আর কোনোদিন মমতাকে গাইতে শোনেননি। প্রতাপকে অবশ্য কেউ গান করার জন্য অনুরোধ জানালো না।

সিদ্ধার্থরা চলে যাবার পর, আবার সোমবার দুপুরে বাড়িটা যেন আরও বেশি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর প্রত্যেকটি দিন একই রকম। প্রতাপের কিছুই করার নেই। একা একা তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেশিধূর যেতে পারেন না। রাস্তা হারাবার ভয় শুধু নয়, খুব খরচের ব্যাপার। অতীনের বাড়িটা শহর ছাড়িয়ে একটা ফাঁকা জায়গায়, কাছাকাছি মাত্র আর একখানা বাড়ি আছে, এদিকে বাস চলে না, গাড়ি ছাড়া যাতায়াতের কোনো উপায় নেই। ট্যাক্সি মানেই অনেক খরচ। ডলারের মূল্য টাকায় হিবে করলে পিলে চমকে যায়। প্রতাপের নিজস্ব কিছু ডলার ফুরিয়ে গেলে কি ছেলের কাছে হাত পাততে হবে?

শর্মিলা আর অতীন সময়ই পায় না। শনিবার-রবিবার কাছাকাছি কোনো নদী দেখতে যাওয়া হয় কিংবা বাইরের কোনো হোটেলে খাওয়া, তাও অন্য অতিথি এসে গেলে সেদিন আর বেরুনো হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে অতীন পরিকল্পনা করে বাবা-মাকে নিয়ে দূরে কোথায় কোথায় বেড়াতে যাবে, কিন্তু অফিসে এই সময়টাতেই তার এত কাজের চাপ যে কিছুতেই ছুটি মিলছে না।

মমতা বেশ নাতি-নাতনীকে নিয়ে মেতে আছেন। তাঁদে নাতনী অনীতার বয়েস এখন তেরো, কিন্তু সে একবর্ণ বাংলা জানে না। জীবনে মাত্র একবারই সে কলকাতায় গেছে, তখন বেশ বাংলা কথা শিখে নিয়েছিলে, আবার ভুলে গেছে সব। তার বাবা-মাও তার সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলে। অনীতা যখন ছোট ছিল, তখন প্রতাপের সঙ্গে তার বেশ খাতির জমেছিল, দাদুর হাত ধরে সে বালিগঞ্জ লেকে বেড়াতে যেত আর নিজেই অনর্গল কথা বলতো। এখন সে যেন সেই দাদুকে ভুলেই গেছে। ভালো করে কথাই বলতে চায় না। প্রতাপের ইংরিজি শুনে বুঝতেই পারে না, বারবার বলে, পার্ডন মী? এদের উচ্চারণ অন্যরকম, প্রতাপের জিভেই আসে না ঠিক মতন। নাউ-কে বলে ন্যাও, কাউ-কে বলে খ্যাও। শুধু উচ্চারণ নয়, অনেক কথাও যে আলাদা। সিডিউল কে যে এরা স্কেজুল বলে তা প্রতাপ জানবেন কী? প্রথম প্রথম তিনি বুঝতেই পারতেন না। আদালতে তিনি চিরকাল শুনে এসেছেন, আই বেগ ইয়োর পার্ডন, এরা বলে পার্ডন মী!

মমতার কোনো অসুবিধে হয় না। তাঁর ইংরিজি তো বটেই তাঁর বাংলা কথাও অনীতা বুঝতে পারে। কিছু একটা উপায়ে ওদের মনের যোগাযোগ ঘটে গেছে, সেটাই আসল। মমতা অবশ্য খুব সাধ করে তাঁর নাতনীর নাম রেখেছিলেন উজ্জয়িনী, চিঠিতে প্রত্যেকবার তিনি সেই নামই লিখতেন, এখানে আসার পর বোঝা গেল, সে নামের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। শর্মিলা বলেছিল, আমার নামটাই এরা উচ্চারণ করতে পারে না, উজ্জয়িনী বলতে তো এদের দাঁত ভেঙে যাবে! সেইজন্যই অনীতা নাম রাখা হয়েছে মেমসাহেবদেরও নাম হয় অ্যানিটা। প্রতাপ মাঝে মাঝে ভাবেন, অনীতা মানে কী?

কাছাকাছি আর একটিমাত্র বাড়ি, প্রতাপের ঘরের জানলা দিয়ে সেই বাড়ির পেছন দিকের কিছুটা অংশ ও বাগান দেখা যায়। ওদের বাগানটা ভারি সুন্দর, কতরকম গোলাপ যে লাগিয়েছে তার ঠিক নেই। গোলাপের যে এত বিভিন্ন রং হয়, তাও প্রতাপ জানতেন না, তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে

যায়। কিন্তু তাকাবার কি উপায় আছে! জানলার ধারে গেলেই প্রতাপের চোখে পড়ে, ওই বাড়ির পেছনের বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে আছে একটি কিশোরী মেয়ে, তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে একটি যুবক। সকাল, দুপুর সন্ধ্যা, প্রায় সব সময়েই ওদের দেখা যায়। ওরা কি স্কুল-কলেজে যায় না? মেয়েটির পায়ে বোধহয় পোলিও, প্রায় অনীতারই সমান বয়েস, ছেলেটিকেও প্রায় কিশোরই বলা চলে। কথা বলতে বলতে ওরা পট, টপ করে চুমু খায়। এদেশে পথে-ঘাটে যুবক-যুবতীদের প্রকাশ্যে চুমু খেতে দেখলেই প্রতাপ চোখ ফিরিয়ে নেন। টিভি-তে প্রতি দু' মিনিট অন্তর চুমু, এসব দেখে অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা তো শিখবেই! একদিন দেখলেন, ছেলেটা ওই মেয়েটার বুকের জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। লজ্জায় নয়, রাগে প্রতাপের মুখটা রক্তিম হয়ে গেল!

মমতা একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, করেছিলেন, তুমি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কী দেখছো?

প্রতাপ বলেছিলেন, এসো, দ্যাখো, এদেশের ছেলেমেয়েদের কাণ্ড!

কিশোরী মেয়েটিকে তখন চেয়ার থেকে কোলে তুলে নিয়ে সেই ছেলেটি কাঠের বারান্দায় শুইয়ে ফেলেছে, ফ্রকটা উল্টে দিয়েছে কোমর পর্যন্ত।

মমতা সঙ্গে সঙ্গে জানলার পর্দা টেনে বলেছিলেন, ছিঃ তোমার কি ভীমরতি হয়েছে নাকি?

প্রতাপ বলেছিলেন, ওই টুকু বয়েসে, কী কাণ্ড বলো তো! ও বাড়িতে কি দেখবার আর কেউ নেই? ছি ছি ছি॥

॥ তুমি ওই পর্দা আর সিরও না!

॥এই বয়েস থেকেই এরা শরীরের ব্যাপার শুরু করে,কদিন বাদেই তো সব জানা হয়ে যাবে, সব পুরোনো হয়ে যাবে। তারপর কী নিয়ে বাঁচাবে! আমি মরাল কোয়েশ্চেন তুলছি না, কিন্তু এরকম লাগামছাড়া ছেলেমেয়েদের নিয়ে কি সমাজ গড়া যায়? ওদের বাপ-মা কিছু খেয়াল করবে না, এত ইরেসপনসিবল ॥

॥তুমি কি এদেশটাকে বদলাবার জন্য এখানে এসেছো নাকি? চুপ করে তো! ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে!

॥ আমাদের অনীতা ও ওই বয়েসী, সেও যদি..

॥ ছি ছি ছি, তোমরা মুখে কি কোনো কথাই আটকায় না?

প্রতাপ চুপ করে গেলেও নিজের নাতনী সম্পর্কে তিনি একেবারে সন্দেহ মুক্ত হতে পারেন না। অনীতার কাছেও তার ছেলেবন্ধু আসে, সে তখন দরজা বন্ধ করে দেয়। অনীতার কথাবার্তার মধ্য হঠাৎ হঠাৎ একটা পরিণত মন উঁকি মারে। সে যেন বাচ্চা নয়। দেশে এই বয়েসের মেয়েদের মুখে সেরকম কথা শোনার কথা কল্পনাও করা যায় না।

মাস দেড়েক বাদে এক রাত্রে প্রতাপ হঠাৎ মমতাকে বলেছিলেন, এবার বাড়ি চলো! আর এখানে আমার ভালো লাগছে না!

সে রাতে অতীন আর শর্মিলাকে একটা নেমন্তন্নে যেতে হয়েছিল। এরকম ওদের মাঝে মাঝে যেতেই হয়। একবার এখানে থেকে সত্তর মাইল দূরে আর এক বাঙালী পরিবারের নেমন্তন্নে নতীনরা বাবা-মাকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পরই প্রতাপ বুঝেছিলেন, তাঁরা দু'জনে সেখানে বেমানান। আর সবাই যুবক-যুবতী, তারা নিজেদের মতন হাসি-ঠাট্টা করে, গান গায়, নাচে, সেখানে দু'জন অভিভাবকশ্রেণীর মানুষ শুধু অন্যদের অস্বস্তির কারন ঘটায়। প্রথম প্রথম তারা দু' একটা শুকনো ভদ্রতার কথা বলে, তারপর নিজেদের মধ্যে গল্পে মত্ত হয়। প্রতাপ-মমতাকে খেতে দেওয়া হয়েছিলে বাচ্চাদের সঙ্গে, তাপর বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছিল একটা ফাঁকা ঘরে। প্রতাপ আরও লক্ষ করেছিলেন, সেই পার্টিতে যে-সব বাঙালীরা এসেছিল, তারা কলকাতার খবর কিংবা দেশের কথা জানার জন্য একটুও আগ্রহী নয়, তারা এখানে নতুন বাড়ি কেনা কিংবা গাড়ি বদলানো কিংবা অফিসের খবর কিংবা নিউ ইয়র্ক স্টেটের নতুন গর্ভর্নর কে হবে, সেইসব নিয়ে আলোচনা করছিল। তাহলে কি আলমের কথাই সত্যি? আলম-তুতুলের বাড়িতে একগাদা অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে থাকলেও কখনো প্রতাপ নিজেকে বাতিলের দলে বলে অনুভব করেননি। ওরা তাঁকেও আলোচনায় জড়াতো, তাঁর সঙ্গে তর্ক করতো।

সেই সন্ধেবেলাতেও অতীন আর শর্মিলা তাদের সঙ্গে পার্টিতে যাবার জন্য বাবা-মাকে অনুরোধ

করেছিল। ওদের কোনো বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির পার্টি, অতীনের বাবা-মা এখানে আছেন শুনে তাঁদেরও নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ করে বলেছে। প্রতাপ ততদিনে বুঝে গিয়েছিলেন যে এগুলো এদেশী ভদ্রতা। বাড়িতে বাবা-মা থাকলে তাঁদেরও নিয়ে যাবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হবে, বাবা-মায়ের ও ভদ্রতা হচ্ছে, খুব ধন্যবাদ জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করা। এদেশে ভদ্রতা মানেই অতিশয়োক্তি, বহু অকারণে কথা খরচ। সারাদিনে কতবার থ্যাঙ্ক ইউ বলতে হয়। হয়ার বলতে হয় হাউ নাইস, ইজন্ট ইট ওয়ান্ডারফুল!

প্রতাপও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অতীন যেন তাতে স্বস্তি পেয়ে বলেছিল, তাহলে আর অলীতা-রণকে নিয়ে যাবো না। ওরা তোমাদের কাছেই থাকুক!

লিভিংরুমে বসে প্রতা টিভি দেখতে লাগলেন অনেক রাত পর্যন্ত। অলীতাও রাত জাগে, সে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকে, তার ঘরেও একটা ছোট টিভি আছে। রণকে ঘুম পাড়িয়ে, অন্যান্য কাজকর্ম সেরে মমতা প্রতাপের পাশে এসে বসতেই প্রতাপ মুখ ঘুরিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন, এবার বাড়ি চলো। আমার এখানে আর ভালো লাগছে না। বাবলুকে বলবো, সামনের সপ্তাহেই আমাদের জন্য প্লেনের সীট বুক করতে।

মমতা আকাশ থেকে পড়ে বললেন, এর মধ্যেই ফিরে যাবো মানে? কেন, তোমার এত তাড়া কিসের? ফিরে গিয়ে কী করবো?

॥বললাম যে আমার আর ভালো লাগছে না!

॥ এখানো তো এদেশেটার কিছুই দেখা হয়নি। বাবলুরা সামনের মাসে ছুটি নেবেই বলেছে।

॥ ওদের কবে সময় হবে, ততদিন আমরা এখানে খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবো নাকি!

॥ কে তোমাকে বন্দী করে রেখেছে? রোজ খানিকটা হেঁটে এলেই পারো। কাছেই কী সুন্দর একটা ফরেস্ট, আপেল ফলে থাকে, কত রকম চেরি হয়েছে দেখলাম, কেউ নেয় না।

॥মামো, তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারছো না? এখানে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলে আরও তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবো।

॥দেশে ফিরে গিয়েই বা তুমি কী কাজ করবে এখন?

॥ নিজের দেশ, নিজের বাড়ি, সেটাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা। রাস্তাঘাটে পাঁচ জনের সঙ্গে কথা বলাও একটা কাজ। এখানে আমাদের কথা বলারও কোনো অধিকার নেই। পাশের বাড়িতে একটা ছেলে বাঁদরামি করলেও কিছু বলতে পারবো না।

একটু থেমে, মমতার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি হঠাৎ উচ্চারণ করেছিলেন সেই কঠোর কথাটা।

তিনি বললেন, বাবলু আর শর্মিলা এত আগ্রহ করে আমদের এদেশে নিয়ে এসেছে কেন জানো? বাব-মাকে খাতির করার জন্য নয়। এখন আমি বুঝেছি। ওরা আমাদের এনেছে, ছেলে-মেয়েদের পাহারা দেবার জন্য। কেন, তোমরা ছেলের বউ তোমাকে নিজের মুখে বলেনি যে আমরা আসবার আগে রণকে পাহারা দেবার জন্য বেবী সীটার লাগতো! সে জন্য অনেক পয়সা খরচ হতো। এখন সেই পয়সাটা বাঁচাচ্ছে!

মমতাও প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলেছিলেন, ছিঃ! তোমার মনটা এত ছোট! তুমি এত স্বার্থপর। রণ আর অলীতা বুঝি শুধু বাবলুর ছেলেমেয়ে? ওরা আমাদের নাতি নাতনী নয়? ওদের সম্পর্কে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই? ভালোবাসা নেই? ওদের কাছে পেয়ে আমি যে কত সুখ পাচ্ছি তা তুমি বোঝো না? শর্মিলা প্রাণ দিয়ে আমাদের যত্ন করে।

কথাটা একবার উচ্চারণ করে ফেলার পর প্রতাপ আর তা ফেরত নেননি। কয়েকদিন ধরে কথাটা মনের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর ধারণাটাই আরও দৃঢ় হলো।

রক্তের সম্পর্ক! নিজের ছেলে-মেয়ের সঙ্গেই রক্তের সম্পর্ক টের পাওয়া যায় না এক এক সময়, নাতি-নাতনী সম্পর্কে আর-কতটা টান থাকতে পারে? দূরত্বই অনেক সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেয়। আবার চার-পাঁচ বছর দেখা না হলে অলীতা আর রণ তাঁদের চিনতেই পারবে না। কাছাকাছি থাকলে, নিজের বাড়িতে কোনো শিশু থাকলে তার ওপর মায়া পড়ে, সে কি শুধু রক্তের সম্পর্কে জন্য?

অতীন আর শর্মিলা বাবা-মাকে দিয়ে শুধু বেবী সেটিং করাবার জন্যই এদেশে নিয়ে আসেনি, তারা

এতটা স্বার্থপর নয় নিশ্চয়ই, প্রতাপ তা বোঝেন। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি প্রতাপদের সেই ভূমিকাই তো পালন করতে হচ্ছে! এখানে প্রতাদের নিজস্ব চলাফেরার স্বাধীনতা নেই, পুত্র ও পুত্রবধূর ওপর সব সময় নির্ভরশীল, গাড়ি ছাড়া কোথাও যাওয়া যাবে না। এই অবস্থাটা প্রতাপ কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না।

প্রতাপ জেদ ধরে রইলেন, অতীন-শর্মিলার হাজার পেড়াপীড়িতেও তিনি আর কর্ণপাত করলেন না। এমনকি মমতাকে ওখানে রেখে তিনি একা ফিরে আসতেও রাজি ছিলেন। মমতা অবশ্য তা হতে দেননি, তিনিও ফিরলেন স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু সে জন্য তিনি স্বামীকে আজও ক্ষমা করতে পারেননি!

হাজরা পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এখানে তিনি প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। শেষ হয়ে এসেছে বিকেল। বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে করছে না, অথচ কোথায় যাবেন?

রাস্তাটা পার হয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে।

॥ ৫ ॥

অসহায় মেয়ে মোর
শানিত ছুরিকা হানিয়া কণ্ঠে তোর
তাণ্ডবলীলা শুরু করেছিল, রক্তবসনা তুই
পূত পবিত এক মুঠি ফুল; শেফালী চামেলী জুঁই...

তারপর কী যেন? পরের লাইনগুলো মনে পড়ছে না কেন? স্মৃতি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বারবার। মানুষের স্মৃতিই যদি নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে আর বেঁচে থেকে লাভ কী?

আজ সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। রোদ বেশ চড়া হলেও জামরুল গাছটার নীচে বেশ অনেকখানি ছায়া। আয়েশা কিন্তু রোদ্দুরের মধ্যে বসেই কতকগুলো গাঁদাফুলের চারার তলার মাটি খুঁড়ছে। মাটি ঘাটতে কী ভালোবাসে ঐ মেয়েটা! এটা খুব আশ্চর্যের যদিও তের-চোদ্দ বছরের রঙের শালোয়ার কমিজ পরেছে আয়েশা। বয়েসের তুলনায় চেহারাটা বেশ বড়সড়। মাতামহীর ধারা পেয়েছে, অনেকেই ওকে যুবতী বলে ভুল করে, এর মধ্যেই দু' এক জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসতে শুরু করেছে।

একটা চাকা লাগানো চেয়ারে বসে মামুন মুগ্ধ হয়ে নাতনীকে দেখছেন। মেয়ে-জামাই থাকে চিটাগাং। তারা বেশি আসতে পারে না, কিন্তু স্কুল ছুটি হলেই আয়েশা চলে আসে এখানে। মামুনের ছোট মেয়ে তার স্বামীর সঙ্গে থাকে দুবাইতে, তিন বছর দেখা হয়নি তার সঙ্গে।

আয়েশাকে দেখতে দেখতে মামুনের মাঝে মাঝে দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে। তিনি ফিরে যাচ্ছেন অনেক বছর পিছনে, যেন তিনি ওখানে হেনাকেই দেখতে পাচ্ছেন। হেনার অবশ্য কোনোদিনই গাছপালার প্রতি ঝোঁক ছিল না। এ রকম ভাবে সে মাটিও ঘাঁটিতো না। ওকে দেখে মামুনের আবার বেগম সুফিয়া কামালের কবিতাটাও মনে পড়ছিল। যাকে নিয়ে এই কবিতাটা লেখা সেই মেহেরুন্নেসা নামের মেয়েটির বয়েস বোধহয় আয়েশারই সমান ছিল। এক সময় পুরো কবিতাটাই মামুন মুখস্থ বলতে পারতেন গড়গড় করে।

একটা মটোর সাইকেলের শব্দ হচ্ছে না? মামুন চমকে উঠলেন। আলতাফ এসেছে নাকি? মামুন ভয় পাওয়া চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। গেটের কাছে কেউ নেই‌আমনের রাস্তাটাও ফাঁকা, দুটো ছাগল মুচ মুচ করে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। একটা শান্ত সকাল। শুধু যে স্মৃতিটাই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তা নয়, মাঝে মাঝে মামুন এরকম শব্দও শোনেন। এক সন্ধেবেলা মেটার সাইকেলের বিকট গর্জন তুলে আলতাফ এসে হাজির হয়েছিল এই বাড়িতে, সে কতকাল আগের কথা। কিন্তু ঐ আলতাফই মামুনের জীবনটা বদলে দিয়েছিল।

ঐ আয়েশাকে মামুন ওর জন্মের পর পুনপুনি বলে আদর করতেন। সেই নামটাও থেকে গেছে। মামুন ডাকলেন, ওরে পুনপুনি, একবার এদিকে আয় তো!

মাটিতে ল্যাটা মেরে বসেছে আয়েশা, সে ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকালো। মামুন আবার ডাকতেই সে কাছে এসে বললো কী? পানি খাবে?

মামুনের জল তেষ্টা বেশি। সারাদিন ধরে তিনি বারবার জলপান করেন, নইলে গলা শুকিয়ে যায়।

ডাক্তাররাও তাঁকে যত খুশী জল খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর চেয়ারের কাছেই রয়েছে একটা জগ আর গেলাস। আয়েশা এক গেলাস পানি ভরে দেবার পর মামুন মিনতির ভঙ্গিতে বললেন, একটা সিগারেট ধরায়ে দে, সোনা!

আয়েশা চক্ষু পাকিয়ে বললো, আবার? তিনটা দিয়েছি সকাল থেকে।

মামুনের ডান হাতটা প্রায় অসাড়, নিজে নিজে দেশলাই জ্বালতে খুবই অসুবিধে হয়। পত্নী, আত্মীয় বন্ধু ও চিকিৎসকদের প্রবল নিষেধ সত্ত্বেও মামুন সিগারেটটা ছাড়তে পারেন নি। সিগারেটে আর এখন তাঁর কী ক্ষতি হবে, তিনি তো আর আয়ু চান না! নিজে সিগারেট ধরাবার জন্য মামুন একটা লাইটার যোগাড় করেছিলেন, ফিরোজা সেটা কোথাও সরিয়ে রয়েছেন।

আয়েশা একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে আবার ফিরে গেল গাঁদা ফুল গাছগুলোর কাছে। দু'একটা টান দেবার পর, মাথাটা একটু চনমনে হতেই কবিতাটার বাকি লাইনগুলো মনে এসে গেল :

ভালোবেসেছিলি এই ধরণীরে, ভালোবেসেছিলি দেশ
তাই বুঝি তোর কুমারী তনুতে জড়ায়ে রক্ত বেশ
প্রথম শহিদ বাংলাদেশের মেয়ে
দুটি ভাই আর মায়ের তপ্ত বক্ষ রক্তে নেয়ে
দেশের মাটির 'পর
গান গাওয়া পাখি, নীড় হারা হয়ে
লুটালি প্রবল ঝড়ে...

কবিতাটা বিড়বিড় করতে করতে মামুনের দু'রকম অনুভূতি হলো। তাঁর স্মৃতি যে একেবারে নষ্ট হয়নি, এতে তিনি কিছুটা চাঙ্গা বোধ করলেন, তারপরেই তিনি আত্মগ্লানির সঙ্গে ভাবলেন, আরে ছি ছি ছি, আয়েশাকে দেখে একী অলক্ষুণে কবিতা মনে পড়লো তার! এ তো একাত্তরের এক শহিদ মেয়েকে নিয়ে লেখা, আর আয়েশার মতন সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়ে, সামনে তার সোনালি ভবিষ্যৎ...।

তিনি আবার আয়েশাকে কাছে ডাকলেন, তার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললেন, ওরে পুনপুনি সোনা, তুইও কি বিয়ে করে সৌদি-দুবাই কিংবা বিলাত-অ্যামেরিকা চলে যাবি? আমি যতদিন বেঁচে আছি, যাইস না! তোর এই বুড়ো দাদাটারে আর তো কেউ ভালোবাসে না!

আয়েশা বললো, তুমি বেশি বেশি বুড়া বুড়া ভাব করবে না তো! তুমি এখনও দিব্যি হাঁটতে পারো। ওঠো, আমার সাথে হাঁটো! এইবার একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা ঢাকায় যাবো। মা বলেছে, তোমাকেও নিয়ে যাবে।

মামুন আর্তস্বরে বলে উঠলেন, না, না, আমি আর ঢাকায় যাবো না! ঢাকা আমার সহ্য হয় না।

বাড়ির ভেতর থেকে নাস্তা খাবার জন্য ডাক এলো আয়েশার। মামুন সকালবেলা গরম পানিতে মধু আর লেবুর রস খান শুধু, তিনি বসে রইলেন গাছতলায়। তাঁর ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে। ঢাকার নাম শুনলেই তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তাঁর জীবন থেকে তিনি ঢাকা শহরটা মুছে দিতে চান। তিয়াত্তর সালের পর থেকে তিনি আর একবারও পা দেননি ঢাকায়। মাদারিপুরের এই গ্রামের বাড়িতেই তিনি শান্তিতে থাকেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর তাজউদ্দিনের অনুরোধে মামুন একটা সরকারি কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সময় কাজের মানুষের খুব অভাব ছিল। একটা নতুন দেশ গড়তে গেলে যে সব সমর্থ ও বুদ্ধিমান লোকের প্রয়োজন হয় তাদের অনেককেই তো মেরে ফেলেছিল পাকবাহিনী। তারা ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ারদেরও বাদ দেয়নি। মামুন ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন, চতুর্দিকে চুরি-জোচ্চুরি, বিদেশ থেকে সাহায্য পাওয়া ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ছিনিমিনি চলছিল, দেশে একবার অরাজকতা এসে গেলে একদল লোক লুটেপুটে খাবার চেষ্টা করবেই। তবু মামুন পুনর্বাসনের কাজটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন। দিন-রাত পরিশ্রম করতেন। শত শত পরিবারের ট্র্যাজেডির কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁর মেজাজ সবসময় উগ্র হয়ে থাকতো। একদিন একটি অসৎ কর্মচারিকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে তিনি তাকে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন। মামুনের মতন ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষের ওরকম ব্যবহার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সকলে। মামুনের ব্যক্তিগত

সততা নিয়ে কারুর-কোনো প্রশ্ন করার সাহস ছিল না বলেই তাঁর ঐ ব্যবহারের প্রতিবাদ করেনি। সেই কর্মচারিটি তাঁর পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল। শেখ সাহেব নিজে মামুনকে ধানমুণ্ডির বাড়িতে ডেকে তাঁর কাজের তারিফ করেছেন।

মামুন সে সময় নিজের স্বাস্থ্যের তোয়াক্কা করতেন না। তিনি একা নন, তাঁর মতন কাজ-পাগল সেরকম আরও অনেকে ছিল। একদল লোক যেমন লুটপাট-তছরূপে সুযোগ নিচ্ছিল, সেই রকমই আবার একদল মানুষ দেশ গড়ার উদ্যমে মেতে উঠেছিল। শেখ সাহেব নিজেও চার পাঁচ ঘণ্টার বেশি ঘুমোবার সময় পেতেন না। ঢাকা শহরের তখন চলছিল ধারাবাহিক উন্মাদনা। সদ্য পাওয়া স্বাধীনতা নিয়ে তখনও যেন একটা দিশাহারা অবস্থা। ভারত থেকেও দলে দলে মানুষ আসছিল। নানা রকম সরকারি ডেলিগেশান ও সাংস্কৃতিক বজ্রাঘাতের মতন হলো। বাবুলের সঙ্গে মঞ্জুর বিবাহবিচ্ছেদ, এবং তার জন্য তিনিই দায়ী।

বাবুলের মতন একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষ যে এরকম একটা অদ্ভুত গোঁয়ার্তুমি করতে পারে, তা তার বন্ধুরাও কল্পনা করতে পারেনি। বাবুল যে মুক্তিযুদ্ধে দারুণ সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে, সে কাহিনীও মামুন পরে শুনেছেন। কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো কথা বলা চলবেনা তার সঙ্গে, যেন ঐ বিষয়ে আলোচনাই নিষিদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা কলকাতায় চলে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বাবুল সবসময় বক্রোক্তি করতো, যেন তারা সবাই সুবিধাবাদী, পলাতক! কিন্তু বিদেশে না গেলে কি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গড়া যেত? সেরকম একটা সরকার গড়া না হলে যুদ্ধ পরিচালনা করতো কে? অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রই বা সাহায্য দিত কার হাতে? বড় বড় সব নেতারা কারাবন্দী হলে কিংবা ঠিক্কা খানের নির্দেশে নিহত হলে লাভ হতো কী? এক শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিই তো কী দারুণ অনিশ্চিয়তার সৃষ্টি করেছিল। কলকাতায় যারা গিয়েছিল, তাদের প্রায় সকলেই যে কত কষ্ট, উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটিয়েছে, সে সব কথা বাবুল শুনতেই চায়নি। অথচ মামুন যখন পঁচিশে মার্চের পর ঢাকা ছেড়ে চলে যান ভারতের দিকে, তখন মঞ্জুকে সঙ্গে পাঠাতে সে একটুও আপত্তি করেনি। বরং আগ্রহই দেখিয়েছিল। সেই বাবুলমঞ্জু সম্পর্কে অমন কুৎসিত একটা সন্দেহ করলো! মঞ্জু ও গান গেয়ে, মিছিলে-সমাবেশ যোগ দিয়ে স্বাধীনতার লড়াইতে সামান্য কিছু সাহায্য কি করেনি? যুদ্ধ কি শুধু মাকনা-বন্দুক নিয়েই হয়? শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলাও একটা বড় কাজ।

সাধ করে যেন আরও বেশি অপমানিত হবার জন্য বাবুলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মামুন। ওঃ কী কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছিল বাবুল সেদিন! এ তো ঈর্ষা নয়, অন্ধ ক্রোধ। একটা যুদ্ধ এসে বাবুল চৌধুরীকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। মামুনের প্রতি তার যে কেন এত ঘৃণার ভাব, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। মঞ্জু সম্পর্কেও তার মনে সামান্য দুর্বলতা অবশিষ্ট ছিল না। মঞ্জুর ছেলে তখন ছোট, গর্ভে একটি সন্তান এবং সে সন্তান যে বাবুলেরই তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। মঞ্জুর সঙ্গে পৃথিবীর আর দ্বিতীয় কোনো পুরুষের সেরকম ঘনিষ্ঠতা হয়নি, তবু বাবুল সেই অসহায় অবস্থার মধ্যে মঞ্জুকে বলেছিল, তুমি যেখানে খুশী চলে যেতে পারো! মামুনকে সে তিক্ত কণ্ঠে জানিয়াছিল, আমি আবার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই না। আমার বাসায় ইউ আর নো লংগার ওয়েলকাম। মঞ্জুকেও আমি আর আমার স্ত্রী মনে করি না। শী ইজ অল ইয়োর্স!

তবু মামুন বাবুলের হাত জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলেন। মঞ্জু বিনা দোষে শাস্তি পাবে, এটা যে তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। তিনি যত দুর্বলতা দেখিয়েছেন, বাবুল ততই বেশি বিদ্রূপ করেছে। তখন মামুন ভেবেছিলেন, তিনি দূরে সরে গেলে হয়তো আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবুল তো মানুষ খারাপ নয়। মামুন একেবারে চোখের আড়াল হয়ে গেলে নিশ্চয়ই তার রাগ কমবে, নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে মঞ্জু ও তার সন্তানদের ফিরিয়ে নেবে। তাজউদ্দিনের সনির্বন্ধ অনুরোধেও কর্ণপাত করেননি মামুন। নিজের পদে ইস্তফা দিয়ে, ঢাকা থেকে সমস্ত পাট চুকিয়ে চলে এলেন মাদারিপুরে। কিন্তু বাবুল যখন আর একটা বিয়ে করলো....

॥ আদাব মামুনসাহেব! ভালো আছেন?

মামুন গেটের দিকে ঘাড় ফেরালেন, কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সমস্ত রোমকূপে শিহরন বোধ করলেন। কেউ নেই। ইদানিং বিশেষ কেউই তাঁর আসে না। অথচ তিনি স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং চেনা কণ্ঠস্বর। গোবিন্দ গাঙ্গুলি না? সেই ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসতো।

মামুন গলা তুলে বললেন, কে? কে ওখানে? গোবিন্দ নাকি? ভিতরে আসো।

কোনো উত্তর নেই। গোবিন্দ গাঙ্গুলী এলে লুকিয়ে বা থাকবে কেন? মামুন ভুল শুনেছেন। তাছাড়া গোবিন্দ গাঙ্গুলী তো আর থাকে না এখানে? নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেল ভারতে। নাকি মারা গিয়েছে সে? ঠিক মনে পড়ে না। বেশ সাহসী ধরনের মানুষ ছিল, একাত্তরেও দেশ ছেড়ে যায়নি।

আবার মটোর সাইকেলের শব্দ। না, এটাও ভুল। এই শব্দটা তাকে বড় বেশি জ্বালাতন করে। আলতাফ, আলতাফ, সে-ই সব গণ্ডগোলের মূল। আলতাফের সঙ্গে পরিচয় না হলে তার ছোটভাই বাবুলের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়েও হতো না।

গাঁদা গাছগুলোর ঝাড়ের সামনে, যেখানে একটু আগে আয়েশা বসেছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে গোবিন্দ গাঙ্গুলী। গায়ের রঙ কালো, শক্ত সমর্থ চেহারা, একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, লুঙ্গির ওপর ফতুয়া পরা। ডান বাহুতে একটা রুপোর তাবিজ।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, কী গোবিন্দ? ফিরে এসেছো? বেশ করেছো। তোমার বউ আর পোলাপানেরা সব ভালো আছে তো?

গোবিন্দ হেসে বললো, আছে এ রকরকম আপনাদের আশীর্বাদে। আমার লঞ্চটা মাদারিপুর ঘাটে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। সেইটার জন্য আসলাম।

মামুন বললো, তোমার লঞ্চ ডুবে গিয়েছিল না?

গোবিন্দ বললো, আবার ভাসিয়ে তুলেছি। আমি কি এত সহজে ছাড়বার পাত্তার?

মামুনের চোখে একটা ঘোর লাগলেও তিনি বুঝতে পারছেন, তাঁর সামনে গোবিন্দ গাঙ্গুলী দাঁড়িয়ে নেই। সকালের রোদ্দুরেও তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে। তিনি দেখছেন একটা ছায়ামূর্তি। গোবিন্দ গাঙ্গুলী মরে গেছে কবে!

তবু তিনি বললেন, তুমি আবার এখান লঞ্চ চালাবে কী করে? তুমি না তোমার ফ্যামিলি নিয়ে ইণ্ডিয়ায় চলে গ্যালে?

॥ আমি যাই নাই, মামুন সাহেব। শেখ মুজিব খুন হবার পর আপনি যখন ইণ্ডিয়ায় পালালেন, তখন আমার ফ্যামিলিও সেই স্টিমারে গিয়েছিল। ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু নিজে কখনো দেশ ছাড়ি নাই। এই একটা জীবনে কত কী দ্যাখলাম!

॥না, না, আমিও পালিয়ে যাই না। সে সময় আমাকে চিকিৎসা করাবার জন্য সবাই জোর করে কলকাতায় পাঠালো।

আয়েশা এসে মামুনকে ঝাঁকানি দিয়ে বললো, বিড়বিড় করে কী বলছো দাদা? ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? নবোদা জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখন গোসল করতে যাবে? তোমাকে তেল মাখিয়ে দেবে?

মামুন বললেন, না, পরে। আচ্ছা পুনপুনি, তোর মনে আছে, আমি সেভেন্টি ফাইভে যে কলকাতায় গেলাম, সে কি শেখ সাহেব শহিদ হবার পর না আগে?

আয়েশা তার গোলাপী ঠোঁটটা উল্টে বললো, সে আমি কী জানি!

মামুন হেসে বললেন, ঠিকই তো, তোর তখন দুই-তিন বছর বয়েস বোধহয়। তোর কী করে মনে থাকবে। পরে না, আগেই। শেখ সাহেবকে ওরা খতম করে দিল আগাস্ট মাসে, আমি কলকাতায় গেলাম জুলাই মাসে। হার্টে আবার বেদনা শুরু হলো। আমি কিছুতেই ঢাকায় যাবো না, তাই তোর মা-বাবা আমায় জোর করে পাঠালো কলকাতায়। সেখানের ডাক্তাররা আমার চিকিৎসা আগে করেছে....

॥ শেখ মুজিবকে ওরা কেন মেরেছিল?

॥হায় রে কিশোরী কইন্যা, এর উত্তর আমি তোরেকী করে দেবো? বড় হয়ে এর উত্তর তোদেরই খুঁজে নিতে হবে। আজও তো বাংলাদেশ যুদ্ধের ইতিহাস লেখা হলো না। তোদের জেনারেশানই রচনা করবে স্বাধীন বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস। আর একটা সিগারেট ধরায়ে দিবি, সোনা।

॥না, না মোর সিগারেট বিকোর লাঞ্চ।

আয়েশা একটা পাখির মতন যেন ফুরুৎকরে উড়ে গেলবাগানের দিকে। মামুনের মনে হয়, তাঁর এই আদরের নাতনীটার মুখখানা ফুলের মতন আর শরীরটা পাখির মতন। কিন্তু দুষ্টু মেয়েটা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে চলে গেল! কেন আর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা।

মুজিবের মৃত্যুর আগেই তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন, তা ঠিক, তবু তিনি সেই সকালের দৃশ্যটা অবিকল চোখের সামনে দেখতে পান। যেন তিনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন বত্রিশ নম্বর ধানমুণ্ডির সেই বাড়িতে। ট্যাঙ্ক নিয়ে ওরা মারতে গিয়েছিল, সৈন্যের পোশাক পরা হলেও তারা তো পাকিস্তানী না, বাংলাদেশেরই মানুষ। ঘুম থেকে উঠে এসে, গুলিগোলার আওয়াজে খুব বিরক্ত হয়ে তিনি ওদের ধমক দিতে এসেছিলেন। তিনি জাতির পিতা, এদেশের সমস্তমানুষই তাঁর সন্তান, তিনি ভেবেছিলেন তাঁর ধমক শুনে ছেলেপুলরা ভয় পেয়ে মাথা নীচু করে, রাইফেলের নল নামিয়ে চলে যাবে। হায় রে, আজকাল ছেলেপেলেও কি সব সময় বাবা-মায়ের ধমক শোনে? বাপ-মাকেও সেরকম শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য হতে হয়। দোতলায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে শেখ সাহেব হাত তুলে গর্জে উঠলেন, এই, তোরা বেয়াদপি করতে এসেছিস কেন? এর উত্তরে এক ঝাঁক তপ্ত বুলেটে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। মৃত্যুর আগে তাঁর সারা মুখে লেগেছিল ভয় না, না বেদনা, না শুধু বিস্ময়? সিঁড়ির মাঝখানে পড়ে গিয়ে তিনি আর ক' মুহূর্ত বেঁচে ছিলেন? তিনি কি জেনে গিয়েছিলেন যে আততায়ীরা ওপরে উঠে তাঁর স্ত্রী-লেছে-মেয়ে, ভাইপো-ভাগ্নীদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে! তিনি শুনতে পেয়েছিলেন তাঁর শিশুপুত্র রাসেলের মৃত্যু-আর্তনাদ?

পাকিস্তানের জেল মানে বাঘের গুহা। সেখান থেকেও ছাড়া পেয়ে এসে শেখ সাহেব কী করে কল্পনা করবেন যে তাঁকে প্রাণ দিতে হবে বাংলাদেশের মানুষের হাতে। অবশ্য, যে তাজউদ্দিন সাহেব ছিলেন প্রথম বাংলাদেশ সরকার গড়ার প্রধান স্থপতি, যাঁর দেশাত্মবোধ নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সেই তাজউদ্দিন সাহেবকে শেখ মুজিব নিজেরবরখাস্ত করবেন, তাই-ই বা কে কল্পনা করেছিল? যে-গণতন্ত্রের নামে শেখ সাহেব সারা জীবন গলা ফাটালেন, শেষে তিনি নিজেই হত্যা করতে গেলেন সেই গণতন্ত্রকে। খবরের কাগজের স্বাধীনতা, বিরোধী দলের অধিকার খর্ব করতে করতে শেষ পর্যন্ত শেখ সাহেব জারি করতে চাইলেন একদলীয় শাসন! বাকশাল! রাষ্ট্রপতি আবু সয়ীদ চৌধুরীকে সরে যেতে হলো, মুজিব স্পষ্টত এগিয়ে যেতে লাগলেন একনায়কতন্ত্রের দিকে। পাকিস্তানী আমলের দুঃসহ স্মৃতি তখনও সকলের মনে জ্বলজ্বল করছে। শেখ সাহেব যে-দিন তাজউদ্দিনকে সরিয়ে দেন, সেইদিন মামুন বুঝেছিলেন, আওয়ামী লীগের ধ্বংস আসন্ন।

কলকাতায় ছাত্র আন্দোলন করার সময় মামুন একটা গল্প শুনেছিলেন নবাব ফারুকীর কাছে। উনি এক ছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেলা। এক সময় ছাত্ররা ঐ সুরেন বাড় জ্যেকে এনই শ্রদ্ধা করতো যে একবা রতাঁকে একটা জুড়িগাড়িতে চড়িয়ে কোনো সভায় নিয়ে যাওয়ার সময় গোড়াদুটো খুলে দিয়ে ছাত্ররা নিজেরাই সেই গাড়ি টেনেছিল। আবার এক সময় ঐ সুরেন বাড় জ্যোকেই ছাত্ররা ফুলের মালা পরাবার বদলে জুতোর মালা পরিয়েছিল। রাজনীতি এমনই বস্তু। তবে, সেই সময় এমন খুনোখুনি ছিল না। শেখ মুজিব ভুল রাস্তায় যাচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু যারা তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করতে গেল, তারাও দেশপ্রেমিক কিংবা গণতন্ত্রের পূজারী কিংবা নিপীড়িত জনগণ নয়, তারাও ক্ষমতালোভী! ইতিহাস থেকে এরা শিক্ষা নেয় না। একজনকে খুন করে সেই রক্তাক্ত সিংহাসনে কে কবে সুস্থিরভাবে বসতে পেরেছে? খন্দকার মুস্তাক, খালেদ মশারফ, জিয়াউর রহমান...। খালেদ মশারফ -এর ঠিক যে কী হয়েছিল, তা মামুন আজও জানতে পারেননি, কেউ স্পষ্টাস্পষ্টি খুলেও বলে না। এমন চমৎকার হীরের টুকরো ছেলে, এত চেনা, মামুনের আপার বাসায় এসে কতবার ভাত খেয়ে গেছে...। মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী ছিল খালেদ। লড়াই করতে করতে একবার গুরুতর আহতও হয়েছিল, সে শেখ সাহেবের ইন্তেকালের পর আর একটা অভ্যুত্থান ঘটাতে গিয়েছিল? ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়কদেরমতন এমন করুণ চরিত্র আর হয় না, তারা নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

দোতলায় সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন শেখ মুজিব,সদ্য ঘুম ভেঙে উঠে এসেছেন, নীচের দিকে এল এম জি হাতে সৈন্যদের দেখতে পেলেন, হয়তো মুখ চিনতেও পেরেছেন দু' একজনের, ভুরু তুলে তিনি তাঁর গম্ভীর গলায় গর্জে উঠলেন, এই, তোরা মনে করেছিস কী? সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যার ঘ্যার ঘ্যার শব্দে গুলি! ঝাঁঝরা শরীরে জাতির পিতা গড়াতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে, দু চোখে গভীর বিস্ময়, সত্যিই দেশেরমানুষ তাঁকে মারলো?

কলকাতায় সেবার মামুন থেকে গেলেন প্রায় ছ'মাস। অনেকেই তাঁকে ফিরতে বারণ করেছিল।

তিনি শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠ মহলের একজন হিসেবে মার্কামারা হয়ে গিয়েছিলেন, দেশে ফিরলে তাঁর বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশি। জেলখানার মধ্যে তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখ নিহত হলেন, এর পর আওয়ামীলীগের বড় বড় নেতাদের খুঁজে খুঁজে খতম করা হবে ঠিক এখানতরে যা হয়েছিল! মামুন বিশ্বাস করতে চাননি, বাংলাদেশ তো পাকিস্তানে আবার মিশে যায়নি, আবার নিজের দেশ থেকে পালাতে হবে কেন? জিয়াউর রহমানকে মামুন তখন অবিশ্বাস করতে চাননি। জিয়াউর রহমানও একজন মুক্তিযুদ্ধের বীরযোদ্ধা, কে-ফোর্সের কমাণ্ডার ইন চীফ ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার জন্য জীবন পণ করে লড়েছিলেন না? চিঠাগাং রেডিওতে প্রথম স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন, তো তিনিই। কিন্তু মুজিব-হত্যার পর কলকাতায় যারা পালিয়ে এসেছিল, তাদের মুখে মামুন শুনলেন, জিয়াউর রহমান আসলে নাকি রিলাকট্যান্ট ফ্রীডম ফাইটার, মুক্তিযুদ্ধে পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তার ঝোঁক ছিল পাকিস্তানেরই দিকে। তাছাড়া তিনি ভীষণ ক্ষমতাপ্রিয়। প্রেসিডেন্টের সিংহাসনে বসেই তিনি প্রতিপক্ষকে নির্মূল করতে লাগলেন। তাঁর রাগ যেন অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের ওপরেই বেশি! যারা পাকিস্তানের সমর্থক, এককালের কোলাবরেটর, জিয়ার আমলে, নিশ্চয়ই জিয়ার সমর্থন পেয়ে, তারা প্রকাশ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আবার হম্বি তম্বি করতে লাগলো! কয়েকজন কুখ্যাত ঘাতক ও দালাল জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী পর্যন্ত হয়ে বসলো! আর যারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য লড়াই করেছিল, তারা লুকিয়ে পড়ছে, তারা আর নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয়ই দিতে চায় না! ইতিহাসের এক অসাধারণ লড়াইয়ের এই পরিণতি!

শেখ সাহেব উদারভাবে সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, সেটাই হয়েছিল তাঁর প্রথম ভুল। রাজাকার, আলবদর, লুঠেরা, ধর্ষণকারী, যারা শান্তি কমিটির নামে ঘাতক কমিটি বানিয়েছিল, তাদের তালিকা তৈরি হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি নথিবদ্ধ হচ্ছিল, কিন্তু তাদের কোনো শাস্তিই দেওয়া হলো না। সকলে ঢালাও ক্ষমা পেয়ে গেল! অপরাধের শাস্তির কোনো দৃষ্টান্তও স্থাপিত হলো না দেশের মানুষের কাছে। যারা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তদের স্বাধীন দেশের আর্মিতে স্থান দিয়ে পুরো র‍্যাংক দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাস্তবুদ্ধির পরিচয় আছে? আসলে শেক মুজিব স্বাধীন দেশ পাওয়ার আনন্দে শাস্তি দিতে ভুলে গিয়ে শুধু প্রশ্রয় দিয়েই গেছেন। তাঁর নিজের আত্মীয়-বন্ধুর ছেলেপুলেরা লুঠতরাজ করছে, তাদের সম্পর্কেও তিনি চোখ বুজে থাকছেন। রেডক্রসের টাকাকড়ি নিয়ে তছরুপের অভিযোগ উঠছে, তিনি কান দিচ্ছেন না। অপোজিশান লীডার হিসেবে যিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠদের অন্যতম, শাসক হিসেবে তিনি ব্যর্থ। তাঁর কি দরকার ছিল প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হওয়ার? তিনি বুঝতে পারিননি যে বেশির ভাগ অপরাধীই নিঃশর্ত ক্ষমা পাবারপর কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে যায় না, তারা আবার মাথায় চড়ে বসে, ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। শেখ মুজিবকে যারা হত্যা করতে গিয়েছিল, তদের মধ্যে সেরকম দু' চারজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিল না?

জাতির পিতার ঘাতকদের কোনো শাস্তি দিলেন না জিয়াউর রহমান। জেলখানায় কারা তাজউদ্দিনদের খুন করলো? এত বড় বড় নেতাদের জেলখানার মধ্যে অতর্কিতে গুলি করে মেরে ফেলার মতন বীভৎস ঘটনা তো পাকিস্তানী আমলেও ঘটেনি। যাদের নাম বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার কথা, তাদের প্রাণ কেড়ে নিল সৈনিকের পোশাকে আততায়ীরা? আর্মির লোকেরা তাদের চেনে না, এ কখনো হতে পারে? জিয়াউর রহমানের এরকম মনোভাব দেখেই আবার অনেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। কেউ কেউ ভারতে, কেউ কেউ ইংল্যাণ্ডে।

মামুন শুনেছেন, কাদের সিদ্দিকীও দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। টাঙ্গালের ঐ ছেলেটিকে মামুন আগে চিনতেন না, ওর বড় ভাইয়ের সঙ্গে সমান্য পরিচয় ছিল একাত্তরের সেই দুঃসহ দিনগুলিতে কলকাতায় বসে মামুন কাদের সিদ্দিকীর অসীম সাহসিকতার কাহিনী শুনে রোমাঞ্চিত হতেন। সেই চরম বিপদের মধ্যেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থেকে সে এক বিশাল মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর সে শখ মুজিবের আহ্বানে সদলবলে অস্ত্র ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেনি। মামুন মনে মনে তার নাম রেখেছিলেন, এ যুগের গ্যারিবল্ডি। এইসব দেশপ্রেমিকরা যদি দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়, তবে সেই দেশটাই কত দুর্ভাগা! কোথায় আছে এখন কাদের? যে দেশের স্বাধীনতার জন্য সে

অনেকবার জীবন বিপন্ন করেছিল, আজ সেই স্বাধীন দেশে তার ফেরার অধিকার নেই, এজন্য না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে, সে!

গাঁদাফুলের ঝাড়টার কাছে আবার এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন মানুষ। একজন বেশ কাছে, আর একজন খানিকটা দূরে। কাছের মানুষটি দীর্ঘকায়, সারা মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চওড়া বুক, হাতের কবজীতে বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর, এ কে? চেনা চেনা লাগছে। ও, এই তো কাদের সিদ্দিকী? তার চক্ষু দুটি যেন বাঘের মতন, সেখান থেকে স্ফুরিত হচ্ছে অভিমান আর ঘৃণা।

মামুন অস্ফুটি স্বরে বললেন, কাদের? বেঁচে আছিস? এখন কোথায় থাকিস তুই?

কাদের বললো, হ্যাঁ, বেঁচে আছি! সহজে মরবো ভেবেছেন? আবার ফিরে আসবো এই দেশে, ইনসাল্লা, এই দেশটাকে সত্যি সত্যি, স্বাধীন করতে হবে! সেজন্য আপনারা কতদূর কী চেষ্টা করছেন, মামুনভাই?

মামুন একটা হাত তুলে বললেন, আমার কথা বাদ দাও। আমার সূর্য অস্ত গেছে। আমার আর কোনো ক্ষমতাই নাই!

দূরে দাঁড়ানো লোকটি বললো, আমিও বেঁচে আছি। আবার লড়াই লাগলে জান কবুল করবো।

ওকেও চিনতে পারলেন মামুন। কয়েক বছর আগে একবার টাঙ্গাইল শহরেই একজন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, ওর পরিচয় শুনে মামুন এক বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ওর নাম হাবীব, লোকের মুখে মুখে ওর নাম হয়ে গিয়েছিল জাহাজ-মারা হাবীব। একাত্তরের অগাষ্টে ধলেশ্বরী নদীতে সেই বিখ্যাত যুদ্ধের নায়ক। নারায়ণগঞ্জ থেকে সাতটি স্টিমার ও লঞ্চ ভর্তি একুশ কোটি টাকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যাচ্ছিল পাক সৈন্যরা রংপুরে দিকে। টাঙ্গাইলের মাটি-কাটা নামে গ্রামের কাছে সেই জলযানগুলিকে আক্রমণ করে বাঙালীর ছেলো। পাকিস্তানী সৈন্যদের তুলনায় কাদেরের বাহিনীর হাতে অস্ত্র ছিল সামান্য, কিন্তু বুদ্ধি ও মনের জোর দিয়ে তারা সেই জাহাজগুলো ঘায়েল করে দেয়, প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করে নিজেদের জন্য, বাকিগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই জাহাজ-মারা হাবীবকে টাঙ্গাইলে যখন দেখেছিলেন মামুন, তখন তার শরীরে মলিন, ছেঁড়া পোশাক, চোখ দুটি ভেতরে ঢোকা, ঠোঁটে তিক্ততার ছাপ। সরকার তাকে 'বীর বিক্রম' খেতাব দিয়েছে একটা, আর কিছু দেয়নি। তার এখন সংসার চলে না, সন্তানেরা অনাহারে থাকে। সেদিন হাবীব বলেছিল, গ্রাম থেকে শহরে এসেছি রোজগারের চেষ্টায়, যদি আর কিছু না জোটে, রিকশা চালাবো। সেই রিকশার হ্যান্ডেলে ছোট একটা সাইন বোর্ডে লেখা থাকবে, 'জাহাজ-মারা হাবীব বীর বিক্রম'।

এই সব খাঁটি বীরদের যথাযোগ্য সম্মান দিল না দেশ, তার বিশ্বাসঘাতকরা হচ্ছে মন্ত্রী আর আমলা। এখন আবার খুব ধর্ম ধর্ম জিগির উঠেছে। দরিদ্র মানুষদের যারা দু'বেলা আহার্যের সংস্থান করে দিতে পারে না, তারাই বেশি করে ধর্ম গলাবার চেষ্টা করে।

হাবীব বললো, সেই লড়াইয়ের সময় আমার প্রাণটা গ্যালেই ভালো ছিল। ছেলে-মেয়ের কান্না আর সহ্য হয় না, মামুন সাহেব!

কাদের সিদ্দিকী বললো, কামান-বন্দুকের গুলির সামনেও কোনোদিন ভয় পাই না। তার বিনিময়ে পেলাম নির্বাসন! দেশের মানুষ আমাদের ভুলে গেল এত তাড়াতাড়ি? যারা এখন বাংলাদেশের হর্তাকর্তা, তারা দেশের জন্য কী করেছে? এই প্রশ্ন উঠাবার সাহস কি কারুর নাই? মামুনভাই, আপনিও কি...

মামুন দু'হাতে কান চাপা দিলেন। তিনি কী উত্তর দেবেন এইসব প্রশ্নের?

গাঁদাফুলের ঝাড়টার কাছ থেকে মূর্তিদুটো মিলিয়ে গেছে, মামুন তবু সেই দিকেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আয়েশা কোথায় গেল, তার সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছেনা। একবার মামুনের মনে হলো, আজ এতসব পুরোনো কথা মনে পড়ছে কেন? তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে নাকি? মৃত্যুর ঠিক আগে নাকি সব স্মৃতি একবার ঝলসে ওঠে!

নব এস বললো, চলেন ভিতরে চলেন। অনেক বেলা হয়ে গেছে। এবার খাবেন নাবেন চলেন।

নবর হাত ধরে মামুন উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে।

এই নব মামুনের পালিত পুত্র। গত বছর ফিরোজার মৃত্যুর পর সে-ই বলতে গেলে এ বাড়ির কর্তা, মামুনকেও তার হুকুম মেনে চলতে হয়।

মামুন অনুনয়ের সুরে বললেন, অনেকক্ষণ সিগারেট খাই না, একটা দিবি?

নব কঠোর ভাবে বললো, না। এখন না। ভাত খাওয়ার পরে একটা পাবেন।

এই নবকে মামুন কুড়িয়ে পেয়েছিলেন সুন্দরবনে।

সেবারে মামুন কলকাতায় গিয়েছিলেন, প্রতাপের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে। প্রতাপ এক অদ্ভুত গোঁয়ার মানুষ, সে এদেশে কখনো এলোই না। সে জেদ ধরে আছে, পাশপোর্ট -ভিসা নিয়ে সে তার জন্মস্থান দেখতে আসতে চায় না। যদি কখনো বিষাব্যবস্থা উঠে যায়, তাহলে সে বেড়াতে আসবে। সে রকম সম্ভাবনাও নেই, প্রতাপের আসাও হবে না। হেনা-বাবলির বিয়ের সময় প্রতাপ না এলেও মুন্নির বিয়েতে মামুন না গিয়ে পারেননি।

সেই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। ভারতে তখন ইন্দিরা গান্ধীর পতন হয়েছিল, কেন্দ্রে শাসকদল হয়েছিল জনতা পার্টি, মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবাংলাতেও কংগ্রেসীরা হটে গেছে, বামপন্থীরা সরকার গড়েছে। হঠাৎ দণ্ডকারণ্য থেকে হাজার হাজার রিফিউজি চলে আসতে লাগলো পশ্চিমবাংলায়। এতকাল পরেও তাদের গা থেকে রিফিউজি ছাপটা তুলে ফেলা হয়নি, দণ্ডকারণ্যে তারা নিজেদের নির্বাসিত মনে করে।

কী করে যেন তাদের মধ্যে রটে গিয়েছিল যে কংগ্রেস সরকারের পতন হয়েছে বলে এরপর বাঙালী উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবাংলাতেই স্থান পাবে। পঞ্চাশের দশকে বামপন্থী নেতারা বাঙালী উদ্বাস্তুদের বাংলা বাইরে পাঠাবার বিরোধিতা করেছিল না? এখন পশ্চিমবাংলা সরকারের অনেক মন্ত্রীও তো এককালের উদ্বাস্তু। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ছিল পূর্ব বাংলায়, তিনি নিশ্চিয়ই বিধান রায়-প্রফুল্ল সেন-সিদ্ধার্থ রায়দের চেয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষর মর্মবেদনা অনেক বেশি বুঝবেন। নদীমাতৃক দেশের এই সব মানুষ মধ্যপ্রদেশের পাহাড়-জঙ্গলে কী করে মানিয়ে নেবে?

কিন্তু বিরোধী পক্ষে থাকা আর সরকার পক্ষে থাকার মধ্যে অনেক তফাত ঘটে যায়। এক কালে যারা উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, এখন তণারা পশ্চিমবাংলায় আবার এত উদ্বাস্তুদের ভার নিতে রাজি হলেন না। কিন্তু ততক্ষণে উদ্বাস্তুদের স্রোত প্রবল ভাবে এদিকে ধেয়ে আসতে শুরু করেছে। হাজার হাজার থেকে তাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষে পৌঁছে গেল। এরা সত্যিই ছিন্নমূল, কতবার যে মাথায় ওপরের ছাউনি ছেড়ে পোঁটলা-পুটলি নিয়ে ছেলেমেয়ের হাত ধরে এরা পথে নামলো তারা অনিশ্চয়তার দিকে আবার পা বাড়াতো।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাঝরাস্তায় তাদের আটকাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেই জোয়ার সামলানো সহজ কর্ম নয়। উদ্বাস্তুদের এই ঢল কিন্তু কলকাতা আক্রমণ করলো না, তারা এগিয়ে চললো বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে।

কলকাতায় বসে মামুন তখন আতঙ্ক বোধ করেছিলেন। এই উদ্বাস্তুরা সীমান্ত বাংলাদেশে ঢুকে পড়বে নাকি? তা হলেই সর্বনাশ! এমনিতেই জিয়াউর রহমানের আমল থেকে ভারত-বিরোধী হাওয়া বেশ গরম, তাপর উদ্বাস্তুরা গেলে সকলেই মনে করবে ভারত সরকার চক্রান্ত করে হিন্দুদের পাঠিয়েছে। এই মতলবেই পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বারত সরকার মদত দিয়েছিল। এইসব দেশত্যাগী হিন্দুরা এত বছর বাদে যদি প্রাক্তন জমি-বাড়ি দাবি করে বসে, তা হলে এক সাম্প্রতিক হাঙ্গামা বেধে যাবে। শুধু হিন্দুরাই তো ওদিক থেকে আসেনি, ভারত থেমেও বহু সহস্র মুসলমান চলে গেছে বাংলাদেশে। কলকাতার উপকণ্ঠে যে এককালে বহু মুসলমানের বাস ছিল, তা তো মামুন নিজের চোখেই দেখেছেন। সেইসব মুসলমানরাও যদি এখন কলকাতার জায়গা-জমি দাবি করে? এটা কিছুইতে আর সম্ভব নয়। দু'দিকেই অনেক ট্র্যাজেডি ঘটে গেছে তা ঠিক, কিন্তু এখন আর নতুন করে তার সুরাহা করা যাবে না। দেশবিভাগকে এখন বাস্তব সত্য বলে মেনে নিতেই হবে। প্রতাপ যাই-ই বলুন, ভিসা-পার্টের এই জন্যই দরকার আছে।

উদ্বাস্তুরা অবশ্য সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলো না। তারা চায় সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে বসিত স্থাপন করতে। সেখানে তারা মাছ ধরবে, ধান চাষ করে জীবিকানির্বাহ করবে, এইসব কাজই তারা ভালো জানে, তারা আর সরকারের দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে চায় না।

কিন্তু সুন্দরবনে ব্যাঘ্র প্রকল্প হয়েছে, বাঘদের বাঁচিয়ে রাখা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব। অরণ্য সংরক্ষণ না করলে পরিবেশ দূষণ হবে, ওখানে মানুষের পঙ্গপালদের থাকতে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া মোরারজী দেশাইয়ের কঠোর নির্দেশ, কিছুতেই উদ্বাস্তুদের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, সরকার তাদের যেখানে থাকতে দিয়েছে, সেখানেই তারা থাকতে বাধ্য। পশ্চিমবাংলা সরকারও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠাতে বদ্ধপরিকর হলো। প্রথমে ভালো ভাবে বোঝাবার চেষ্টা, তারপর জোর-জবরদস্তি। তাদের র‍্যাশন বন্ধ করে দেওয়া হলো, তারা যাতে স্থানীয় ভাবে কোনোক্রমেই কেনো কাজ জোটাতে না পারে, পশ্চিমবাংলায় বসে এক পয়সাও রোজগার করতে না পারে, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হলো সবরকম। উদ্বাস্তুদের সম্বল কিছুই নেই, তারা ঘটি-বাটি বিক্রি করে চালানো কয়েকটা দিন, তারপর স্রেফ অনাহার। তবু তারা দাঁতে দাঁত দিয়ে বাংলার মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চায়। এতই তাদের মাটির টান? বাংলা ভাষার প্রতি টান? কিন্তু প্রাণের দায় দেখা দিলে মাতৃভূমি বা মাতৃভাষার টান কিছুই না। অনাহারের সঙ্গে সঙ্গে এলো রোগ। পট পট করে শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা মরতে লাগলো। হাসনাবাদ-বসিরহাটে আবার জ্বলতে লগলো গণ-চিতার আগুন। সরকার সেই ক্ষুধার্ত, ভয়ার্ত মানুষগুলোর চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলো খালি ট্রেন। ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারো, অথবা মরো।

এক সময় শুরু হলো ফেরার পালা। দণ্ডকারণ্য ছেড়ে স্বজাতির কাছে যারা আশ্রয়ের জন্য এসেছিল, তারা এখানকার বাতাসে দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে, সর্বস্বান্ত হয়ে আবার ফিরে গেল দণ্ডকারণ্যে।

অনেকেই ফিরলেও পঁচিশ তিরিশ হাজার মানুষ কিছুতেই যেতে চাইলো না শেষ পর্যন্ত। তাদের এক নেতার নাম হারীত মণ্ডল, সে আগে দু'একবার গোপনে এসে এই এলাকাটা সরেজমিনে তদন্তকরে গিয়েছিল। এই পরিবেশই তাদের পক্ষে ঠিক ঠিক মানানসই। এতবড় সুন্দরবনের দু'একটি দ্বীপ তাদের জন্য ছেড়ে দিলে কী এমন ক্ষতি হবে সরকারের? সুন্দরবনে যে একেবারেই মানুষ থাকে না, তা তো নয়!

তারা মরিয়া হয়ে পড়ে রইলো, হারীত মণ্ডল তাদের বোঝাতে লাগলো, যদি মরতে হয়, মরবো এই মাটিতেই! দণ্ডকারণ্যের আদিবাসীদের হাতে মার খাওয়ার বদলে না হয় বাঙালীরাই আমাদের মারুক!

ঐ অবুঝ উদ্বাস্তুদের দল যাতে নদী পার হতে না পারে, সেইজন্য সরকার সেদিককার ঘাট থেকে সরিয়ে দিল সমস্ত নৌকো, বন্ধ করে দিল স্টিমার সারভিস। সুন্দরবনের নদী শুধু নোনা নয়,তাতে হিংস্র কামঠ থাকে প্রচুর স্নান করতেও কেউ জলে নামে না। একদিন হারীত মণ্ডল বাছা বাছা জনা পঞ্চাশেক যুবককে নদীর ধারে এনে বললো, ওরে তোরা সাঁতার ভুলে গেছিস? মানুষের কামড়ের চেয়ে হাঙরের কামড়ে কি বেশি ব্যথা লাগে? যদি মায়ের দুধ খেয়ে থাকিস তো মায়ের নাম করে আয় আমার সাথে! জয় বাবা কালাচাঁদ! এইবার সুদিন আসবে এতদিনে আমরা সুদিনের মুখ দেখবো।

সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপ দিল জলে। হিংস্র জলজ প্রাণীরাও বোধহয় সেই মরিয়া মানুষদের দেখে ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিল। ওরা সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে জোর করে দখল করে নিল অনেকগুলো নৌকো। রাতের অন্ধকারে তারা পরিবারের লোকজনদের সেইসব নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে এলো মরিচঝাঁপি দ্বীপে। হিসেব অনুযায়ী দুটি বাঘের জন্য বরাদ্দ যে অরণ্য অঞ্চল, সেখানে আশ্রয় নিল হাজার তিরিশেক মানুষ।

কয়েক মাস ধরে তারা রয়ে গেল সেই দ্বীপে। সরকারের তরফে কোনো রকম সাহায্য নেই, বরং সবদিক দিয়েই বিরোধিতা, তবু তারা বেঁচে রইলো। মানুষের বেঁচে থাকা এমনই নেশা! সেখানে পানীয় জল নেই, নৌকো করে তারা দূরের গ্রাম থেকে জল আনবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের নৌকো ডুবিয়ে দেয়। তখন মেয়েরা চালাতে লাগলো নৌকো, হারীত মণ্ডলের পালিতা কন্যা গোলাপী সেই নৌকোয় দাঁড়িয়ে পুলিশদের বলে, তোমরা আমাগো গায়ে হাত দেবা? তোমাগো ঘরে মা-বোন নাই?

কয়েক মাস পরে শোনা গেল, তারা সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। তারা ঐ দ্বীপে টিউবওয়েল বসিয়েছে, ইস্কুল খুলেছে। এখন আর তারা উদ্বাস্তু নয়, স্বাধীন গৃহস্থ, তারা সরকারের কাছ পেকে এক পয়সা চায় না। তারা মাছ ধরে, জঙ্গলের কাঠ কাটে, আপাতত এই তাদের জীবিকা। পরের মরসুমে শুরু হবে চাষ আবাদ। তারা এখন জঙ্গল ধ্বংস করছে বটে, আবার নতুন করে গাছও লাগাচ্ছে।

মুন্নির বিয়েতে মামুন তাঁর স্ত্রী এবং ছোট মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায় তারপর ফিরোজা

বেগমের অনুরোধে সবাইকে নিয়ে গেলেন আজমীঢ় শরীফ দর্শন করতে সেখান থেকে দিল্লি-আগ্রা এবং কাশ্মীর। কাশ্মীর দেখার খুব শখ ছিল তার। ফেরার পথে কলকাতায় এসে আবার থেকে যেতে হলো বেশ কয়েকদিন। প্রতাপ কিছুতেই ছাড়তে চান না।

একদিন প্রতাপ বললেন, সুন্দরবনের সাতজেলিয়া গ্রামে আমার চেনা এক ভদ্রলোক থাকেন। চলো, সেখানে একবার বেড়াতে যাবে নাকি? দিন তিনেক পরেই ফিরে আসবো। মেয়েদের আর বাচ্চাদের অবশ্য নিয়ে যাওয়া যাবে না, ঘর মোটে একখানা, তুমি আর আমি যাবো।

মামুন রাজি হয়ে গিয়েছিলেন।

সাতজেলিয়ার খুব কাছেই মরিচঝাঁপি দ্বীপ। প্রতাপের খুব ইচ্ছে ছিল, উদ্বাস্তুদের নতুন বসতিটা একবার দেখে আসার। সারা ভারতে শরণার্থী বাঙালীদের সম্পর্কে এই বদনাম যে তারা অলস, তারা খেটে খেতে জানে না, তারা গর্ভনমেন্টের বোঝা হয়ে থাকতে ভালোবাসে। পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তাদের অনেক তফাত। কিন্তু মরিচঝাঁপিয়ে উদ্বাস্তুরা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পরিশ্রম করে, তারা কোনো সরকারি সাহায্য চায় না, এটা কী করে সম্ভব হলো? পাঞ্জাবী উদ্বাসীদের তো দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হয়নি, তারা পেয়েছে হরিয়ানা, দিল্লি, তাদের পরিচিত পরিবেশ।

কিন্তু মামুন আর প্রতাপ পৌঁছোবার আগের দিনই মরিচঝাঁপিতে এক সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে!

সরকারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেও তাদের এই উপনিবেশ গড়া কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না সরকার। তারা স্বাবলম্বী হয়ে সরকারের বোঝা কমিয়েছে, কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ধারণা, ওরা অবাধ্য হয়ে একটা কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাদের তাড়াবার অনেক রকম চেষ্টা চলছিল। গোটা পঁচিশেক স্টিমার ও লঞ্চ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল সেই দ্বীপ, পুলিশ বাহিনী বন্দুক উঁচিয়ে তাদের প্রলোভন দেখিয়েছে, দণ্ডকারণ্যে ফিরে গেলেই তারা জমি পাবে, গরু পাবে, টাকা পাবে। ওদিকে দ্বীপে দাঁড়িয়ে একটা চোঙা মুখে হারীত মণ্ডল ঠাট্টা ইয়ার্কি করেছে।

শেষ পর্যন্ত সরকার অবশ্য তাদের পুলিশ দিয়ে মেরে তাড়ায়নি। মধ্যরাত্রে একদল গুণ্ডা হঠাৎ ছুরি লাঠি নিয়ে আক্রমণ করলো সেই বসতি। কেউ বলে, তারা কোনো একটি বড় রাজনৈতিক দলের কর্মী, কেউ বলে তারা সরকারেরই ভাড়া করা গুণ্ডাবাহিনী। তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সবকটা বাড়িতে, যারা বাধা দিতে এসেছে লাঠি মেরে তাদের মাথা ফাটিয়েছে, ছুরি দিয়ে পেট ফাঁসিয়েছে কয়েকজনের। সেই অসহায় মানুষগুলো ঘুম-চোখে হঠাৎ এই উপদ্রব দেখে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, আগুন ও মানুষের হাত থেকে বাঁচবার জন্য অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। সবাইকে জোর করে টেনে-হিঁচড়ে তোলা হয়েছিল লঞ্চে-স্টিমারে। এক রাতের মধ্যে মরিচঝাঁপি সাফ। অনেক স্বপ্ন নিয়ে গড়া কুঁড়েঘরগুলির আগুন ধিকিধিকি করে জ্বললো আরও দু-তিনদিন ধরে।

সাতজেলিয়া, ছোট মোল্লাখালির মানুষজন দূর থেকে শুনেছে সেই রাতের আর্তনাদ। মাছ ধরা জেলে ডিঙিগুলো শেষরাতের দিকে ওদিকে গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছেও অনেক কিছু। অনেক রকম গল্প ও ছড়িয়েছে সেই রাতের ঘটনা নিয়ে। হারীত মণ্ডলকে নাকি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করার জন্য আগেই ঘোষণা করেছিল, তার মাথার দাম দশ হাজার টাকা। হারীত সেই দামি মাথাটা কী করে বাঁচালো কে জানে! কিংবা হয়তো তার লাশ জলে ভেসে গেছে। কেউ কেউ বলে যে গুণ্ডাবাহিনীর একজন নেতার নাম ল্যাঙা, তার একটা পা খোঁড়া, সে এই অঞ্চলে কয়েকদিন আগে থেকেই যাতায়াত করছিল, সে হারীত মণ্ডলকে মারার জন্য লাঠি তুলতেই হারীত নাকি চেঁচিয়ে উঠেছিল, ওরে ভুলু, ওরে, তুই আমায় চিনতে পারলি না? ওরে, আমি যে, তোর বাবা! তুই আমার ছেলে, সুচরিত।

মামুন আর প্রতাপ সাতজেলিয়ায় এসে পৌঁছোবার পর সর্বক্ষণ এইসব কাহিনীই শুনলেন। প্রতাপ একেবারে গুম হয়ে গিয়েছিলেন। অন্য দেশের সরকারের ব্যাপারে মন্তব্য করা উচিত নয় বলে মামুন চুপ করে ছিলেন, কিন্তু তিনি একটা অন্য কাণ্ড করে বসলেন। যে-বাড়িতে এসে উঠেছিলেন তাঁরা, সেই বাড়ির গোয়ালঘরে আশ্রয় নিয়েছিল একটি ছেলে। ছেলেটির সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, একটা পা ভেঙে গেছে, সে মরিচঝাঁপি থেকে নদীতে ভেসে সাতজেলিয়ায় উঠেছে। ঐ গ্রামে কিংবা ছোট মোল্লাখালিতে এরকম আরও কিছু কিছু আহত মানুষজন ভেসে এসেছে। গ্রামের লোক এদের নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না। পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত, কিন্তু থানা অনেক দূর, সেই গোসাবায়। এই

ছেলেটি কেঁদে কেটে কাকুতি মিনতি করে বলছে, তাকে যেন পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া না হয়, পুলিশ তাকে দণ্ডকারণ্যেও ফেরত পাঠাবে না, মেরে ফেলবে। সে হারীত মণ্ডলের পালিত পুত্র, তার নাম নবকুমার। হারীত মণ্ডলের ওপর সরকারের খুব রাগ, ঐ ছেলেটির ধারণা, হারীতকে মেরেই ফেলা হয়েছে, নবকেও গুণ্ডারা নাম ধরে খুঁজেছিল, হারীতের পরিবারটাই তারা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। সে সাতজেলিয়া গ্রামে যে-কোনো বাড়িতে চাকর হয়েও লুকিয়ে থাকতে চায়।

মামুন হঠাৎ বলে উঠলেন, এই ছেলেটাকে আমি বাংলাদেশে নিয়ে যাবো।

প্রতাপ বলেছিলেন, তা কি করে সম্ভব! ওর তো পাসপোর্ট নেই। ও বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারবে না। ওকে তুমি নিজের কাছে রাখবে কী করে? এ তো বে-আইনী কাজ!

মামুন বলেছিলেন, হোক বে-আইনী। আমার দেশে অনেক বে-আইনী কাজই তো চলছে, এইটুকু একটাতে আর কী এমন ক্ষতি হবে? একটা সিম্বলিক জেসচার হিসেবে আমি ওকে নিয়ে যেতে চাই, প্রতাপ। স্বাধীন বাংলাদেশে এই দেশত্যাগীদের অন্তত একজনকে ফিরিয়ে নিতে পারলে আমি শান্তি পাবো!

প্রতাপ অনেক ভাবে মামুনকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, মামুন তবু তাঁর গোঁ ছাড়েননি। জেলেডিঙ্গি করে নবকে প্রথমে গোপনে পার করে দেওয়া হয়েছিল খুলনার সাতক্ষীরায়। সেখানে মামুনের এক ভগ্নীপতি থাকেন, কিছুদিন সেখানে ছিল নব, তারপর মামুন তাকে মাদারিপুরে আনিয়ে নিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত কোনো গোলমাল হয়নি। মাদারিপুরের গ্রামাঞ্চলে এখনও কিছু কিছু হিন্দু পরিবার রয়ে গেছে, সুতরাং পুলিশের নজরেও পড়েনি। মামুন এক এক সময় ভাবেন, তাঁর মৃত্যুর পরেও কি নব এখানে টিকতে পারবে? মামুন ওর নামে কিছুটা জমি লিখে দিয়েছেন, হয়তো এর পরে ওকে লড়াই করে বাঁচতে হবে। ভারতে ফিরে গেলেও তো ওর সে একই নিয়তি, সেখানেও লড়াই না করলে কে ওকে খেতে পরতে দেবে?

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে লম্বা একটা ঘুম দিলেন মামুন। বিকেলবেলা তিনি আয়েশার সঙ্গে গল্প করতে বসলেন, এই নাতনীটি যে-কদিন কাছে এসে থাকে, সেই কটা দিন তিনি সত্যিকারের আনন্দ পান। আয়েশা ঝর্ণার জলের মতন কলকল সুরে কথা বলে। মামুন মাঝে মাঝেই শুনতে পাচ্ছেন একটা মটোর সাইকেলের আওয়াজ। যেন অনেক দূর থেকে একটা মটোর সাইকেল এইদিকে ধেয়ে আসছে। প্রায়দিন সন্ধেবেলাতেই তাঁর এরকম ভুল হয়। আলতাফ! সেই আলতাফ এখন কত বদলে গেছে, তবু তাকে প্রথম দেখার দিনটি মামুন ভুলতে পারেন না।

হঠাৎ এক সময় বাগানের গেটের সামনে সত্যি সত্যি একটা মোটর সাইকেলের গর্জন হলো। চোখের ভুল নয়, কানের ভুল নয়, মাথায় হেলমেট পরা এক যুবক ঢুকছে গেট ঠেলে। বুকটা কেঁপে উঠলো মামুনের। তিনি বললেন, কে আসে রে, দ্যাখ তো, পুনপুনি!

আয়েশা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ওমা এ তো সুখুভাই!

মঞ্জুর ছেলে সুখুকে দেখে মামুনের খুশী হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তাঁর কপালে আশঙ্কার ভাঁজ পড়েছে। সুখু কি এনেছে কোনো দুঃসংবাদ? না হলে সে তো এমনি এত দূর আসবে না!

গেরিলা যোদ্ধার মতন সাজপোশাক করা সুখু কাছে এসে বললো, মাদারিপুরে, টাউনের মধ্যে আমার ক্লাসের এক বন্ধু থাকে, তার বাড়িতে ছিলাম কাল রাতে, তোমার সাথে দ্যাখা করতে আসলাম। কেমন আছিস রে, আয়েশা!

তারপর সুখুর গরম পানি দেওয়া হলো, সে স্নান করলো, খেয়ে নিল। রাত্তিরে এখানেই থাকবে বোঝা গেল। মামুনের বারবার মনে হচ্ছে, মাদারিপুরে বন্ধুর বাড়িতে আসার ছুতোটা ঠিক নয়, সুখু তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে, কিন্তু কারণটা এখনো বলছে না। ঢাকায় প্রবল ছাত্র-আন্দোলন শুরু হয়েছে, মামুন সে খবর পান রেডিও শুনে। সুখু যে একজন ছাত্রনেতা হয়েছে, সে খবরও তার কানে আসে। কিন্তু তিনি মঞ্জু কিংবা তার ছেলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই রাখেন না। তবে মঞ্জুর গানের কয়েকখানা রেকর্ড তিনি শোনেন বারবার।

রাত সাড়ে নটার মধ্যে মামুনের শুয়ে পড়া অভ্যেস। আজও তিনি শুয়ে পড়লেন, চোখের সামনে মেলে ধরলেন একটা বই। দু'তিন পাতা পড়তে পড়তেই ঘুম এসে যায়। ঠিক ঘুম আসার সেই মুহূর্তটাতেই তাঁর ঘরে এসে ঢুকলো সুখু। মামুন ভাবলেন, এবারে সে কিছু বলবে। তাও সে কিছু বলে

না, ঘুরে ঘুরে আলমারির বই দেখতে লাগলো।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, কী রে? কাল তোদের ইউনিভার্সিটিতে অনেক হাঙ্গামা হয়েছে, তুই এ সময় ঢাকা ছেড়ে চলে আসলি যে?

সুখু বললো, তোমাকে দেখতে আসলাম। তুমি আমাদের কোনো খবর নাও না।

মামুন বললেন, খবর সবই পাই। তুই বাবা-মাকে বলে এসেছিস তো? না হলে তারা চিন্তা করবে। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

সুখু বললো, মাঝে মাঝে বাবা-মাকে চিন্তায় রাখা ভালো। অন্য সময় তো তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

–বাবার সঙ্গে দেখা টেখা করিস? তার শরীর ভালো আছে? ব্লাড প্রেসার হাই শুনেছিলাম।

–সব ঠিক আছে। দাদা, তুমি আমাকে কিছু টাকা দিতে পারো?

মামুন এবার নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। তিনি হেসে বললেন, যাক, বাঁচা গেল। তা হলে তুই এই বুড়োটাকে দেখতে আসিসনি। অতি ভক্তি সন্দেহজনক! কত চাই?

সুখু মামুনের দিকে এবার সোজাসুজি চেয়ে বললো, ফিফটি থাউজেন্ড বাক্স?

মামুন চমকে উঠে বললেন, অত টাকা? তা আমি পাবো কোথায়! অত টাকা দিয়ে তুই কী করবি?

–ফরেনে যাবো। লন্ডনে পড়াশুনা করবো। এখানে থাকলে আমার পড়াশুনা হবে না।

–তাহলে তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিটাই লন্ডনে তুলে নিয়ে যেতে হয়। দুই বৎসর সব পরীক্ষা পিছিয়ে আছে তাই না?

–তুমি আমাকে টাকাটা দিতে পারবি কি না বলো?

–অত টাকা আমার নাই। তোর মায়ের কাছে না চেয়ে আমার কাছে চাইতে এসেছিস যে?

–মা দেবে না। মা আমাকে ফরেনে যাবার পারমিশনও দেবে না। মাকে বোঝাবার দায়িত্বটাও, তোমাকেই নিতে হবে।

–তোর মা আমার কথা শোনবে কেন? আমি কে, কেউ না! আমি তো একটা বাতিল বুড়া। গ্রামে পড়ে থাকি।

মামুন শিয়রের কাছে বসে পড়ে সুখু বললো, তুমি কেউ না? আমি যে শুনেছি, তোমার জন্যই আমার মা আর বাবার মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। তখন আমি ছোট ছিলাম, কিছু বুঝি নাই, কিন্তু এখন জানি, আমার মাকে তুমি সব সময় গাইড করেছো। তোমাকে সে পীর পয়গম্বর মনে করে।

কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে মামুন বললেন, তোকে কে বলেছে এ সব কথা? তোর মা বলেছে?

–জী না। মা আমার সাথে কোনো পার্সোনাল কথা বলে না। মাকে আমার কেমন জানি ডিসট্যান্ট আর অ্যালুফ মনে হয়। আমাকে বলেছে মনিরা আপা।

–মনিরার পেটে কোনো কথা থাকে না। তোমাকে শুধু এইটুকু বলেছে, আর কিছু বলেনি?

–আমার বাবা তোমাকে হিংসা করতো। ফরনাথিং জেলাসি!

–ফরনাথিং? তুই ঠিক জানিস?

–আমার মায়ের সাথে তোমার সত্যি সত্যি লাভ অ্যাফেয়ার ছিল নাকি?

–সুখু, তুই সঙ্গে কোনো আর্মস এনেছিস? রিভলভার কিংবা ছোরা? আমাকে নদীর ধারে নিয়ে চল, তারপর আমাকে খুন করে রেখে যা! তা হলেই সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।

–তুমি এত আপসেট হচ্ছো কেন? আমি কি তোমাকে কোনো অ্যাকিউজ করতে এসেছি? টাকা চাইছি, সেটাকেও ব্ল্যাক মেইল মনে করো না। আমার খুব দরকার তাই চেয়েছি, দিতে না পারলে কি জোর করবো নাকি?

–সুখু, আমি জীবনের ফ্যাগ এন্ড-এ পৌঁছেছি, এখন আর কোনোরূপ মিথ্যা বলতে পারবো না। আমার সব কথা শুনলে তোর রক্ত গরম হয়ে যাবে। আমাকে খুন করতে ইচ্ছে হলে করিস। গলাটা চিপে ধরলেও আমি খতম হয়ে যাবো। একথা সত্যিই যে, আমি তোর মাকে ভালোবাসতাম। তারচেয়েও বড় কথা, তুই বাবুল চৌধুরীর সন্তান না, তুই আমার ছেলে!

রাগ করার বদলে সুখু হা-হা করে হেসে উঠলো। মামুনের মুখের কাছে ঝুঁকে এসে বললো,

আমাকে ঠকাতে পারবে না। নো ওয়ে। আমি চেক করেছি। আমার সন্দেহ হয়েছিল একবার। কিন্তু আমার জন্ম হয়েছিল স্বরূপনগরে। সেখানেও আমি গেছি একবার। বিয়ের পর আমার মা আর বাবা স্বরূপনগরে চলে গিয়েছিল। দুই বৎসরের মধ্যে তাদের সাথে তোমার একবারও দেখা হয়নি। বাবুল চৌধুরী আমার জেনুইন ফাদার, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। অবশ্য অন্য কেউ আমার ফাদার হলেও আমি অখুশী হতাম না!

মামুন কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ফিজিক্যালি তুই আমার সন্তান না হলেও তুই আমার ছেলে। তোর বাবা তোকে ছোটবেলায় যতবার কোলে নিয়েছে, তার থেকে অনেক বেশিবার আমি তোকে আদর করেছি। তোকে আমি একটু একটু করে বড় হয়ে উঠতে দেখেছি, ঠিক যেন আমারই ছেলে তুই, আমি এইরকম মনে করতাম। আমি ভালোবাসতাম তোর মাকে। হ্যাঁ, সেটা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই না। প্রতিদিন তাকে না দেখে থাকতে পারতাম না। যখন খবরের কাগজে এডিটারি করতাম, কত ব্যস্ততা ছিল, তবু প্রত্যেক সন্ধ্যাবেলা একবার ছুটে যেতাম তোকে আর তোর মাকে দেখবার জন্য। বাবুল চৌধুরীর জেলাস হবার যথার্থ কারণ ছিল। আমি অন্ধ ছিলাম, বুঝি নাই! বাবুলের স্ত্রী পুত্রকে আমি ভালোবাসা দিয়ে কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম, তার তো রাগ হবেই। সেইজন্য সে সন্ধ্যার সময় বাড়ি থাকতো না। কিন্তু একটা কথা তোকে বিশ্বাস করতেই হবে, আল্লার কসম। আমি তোর মাকে কোনোদিন পাপচক্ষে দেখি নাই। কোনোদিন অন্যায়ভাবে স্পর্শ করি নাই। তোর মায়ের মতন পবিত্র রমণী আর হয় না। তার অন্তরটা নিষ্কলুষ! তবু একথা ঠিক, আমি ভালোবাসা দিয়ে তার জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছি!

সুখু আবার হেসে উঠলো। এবার সে মামুনের মাথার চুলে হাত দিয়ে বললো, তোমরা এই ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছো কেন? মাই ফাদার ইজ আ ফুল! তোমার সঙ্গে তোমার ভাগ্নীর একধরনের প্লেটনিক লাভ-এর সম্পর্ক ছিল, তা নিয়ে এত মাথা ফাটাফাটি করার কী ছিল? ইউ আর টু ডিসেন্ট আ জেন্টলম্যান টু ডু এনিথিং ইম্মরাল! তোমার সঙ্গে আমার মায়ের যে সম্পর্ক ছিল, সেটা স্নেহের থেকে দু'তিন ডিগ্রি বেশি বলা যেতে পারে, সেটা আমার বাপ ব্যাটা মেনে নিতে পারেনি।

মামুন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন সুখুর দিকে। সুখু কী বলছে তা যেন তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। এই জেনারেশানের ছেলেদের অন্যরকম ভাষা। তিনি ভেবেছিলেন সুখু তাঁকে খুন করতে চাইবে, তার বদলে ছেলেটা হাসছে!

সুখু আবার বললো, বৃদ্ধ, আমাকে আর মাকে যদি অতই ভালোবাসতে, তাহলে হঠাৎ ঢাকা ছেড়ে চলে আসলে কেন? এটা কী ধরনের স্যাক্রিফাইস!

মামুন বললেন, ঠিক স্যাক্রিফাইস না। আমি বাবুল চৌধুরীকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, তোদের সাথে আমার কোনো স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না। ভালোবাসা যথেষ্ট ছিল বলেই একেবারে ত্যাগ করেও চলে আসতে পেরেছি।

–তোমাদের যত সব বাজে সেন্টিমেন্ট। তবে, এ কথা জেনে রাখো, আমার বাবার চেয়ে আমি তোমাকে অনেক বেটা পার্সন মনে করি!

–ও কথা বলিস না। বাবুলের অনেক গুণ আছে। ও যে কত বড় ফ্রীডম ফাইটার ছিল তা তো কেউ জানেই না। নিজেকে ও বড় বেশি গুটিয়ে রাখে। ওর যত যোগ্যতা ছিল, সব যদি ব্যবহার করতো, তাহলে দেশে একজন বিখ্যাত মানুষ হতে পারতো! কেন যে ও সবসময় ঘরে বসে থাকে, হয়তো আমিই সেজন্য দায়ী...

–বুল সীট! কেউ কাউর জন্য দায়ী হয় না। যার যোগ্যতা থাকে, সে নিজেই প্রকাশ করে। সবসময় যারা বই পড়ে আর থিয়োরি কপচায়, তারা দেশের কোনো কাজে লাগে না। আসল কথাটা বলো, তুমি টাকাটা আমাকে দেবে না?

–যদি বলিস, এই বাড়ি বিক্রি করে দিতে পারি তোর জন্য।

–তারপর কি তুমি ফকির হয়ে বেড়াবে! হাঁটতেও তো পারো না ভালো করে! থাক, দরকার নাই। মাকেই বলতে হবে। তুমি আমার মাকে বুঝাবার দায়িত্বটা নেবে?

–তোকে একটা অনুরোধ করবো, সুখু! তুই বিদেশে যাইস না। তোর মায়ের অনেক দুঃখ। তুই চলে গেলে সে কী নিয়ে বাঁচবে? তোদের মতন ছেলেরা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও এ দেশটার কী দশা

হবে?

সুখু একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর বললো, আমি তোমার কাছে দুই চারদিন থাকবো। পুলিশ আমাকে ধরতে আসলে তুমি আমাকে বাঁচাবে?

মামুন বললেন, ও, এই ব্যাপার! না, পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমার নাই। কে আমাকে গ্রাহ্য করে। কিন্তু তোকে আমি বিদেশে পাঠাবার বদলে জেলে পাঠানোই প্রেফার করবো। আমাদের মতন দেশে একবার অন্তত জেলে না গেলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

পরদিনই দু'ঘণ্টার ব্যবধানে আলাদা আলাদা ভাবে এসে পৌঁছোলো মঞ্জু আর বাবুল। দু'জনেই খবর পেয়েছে যে সুখুকে অ্যারেস্ট করার জন্য পুলিশ খুঁজছে। বাবুল একেবারে সঙ্গে এনেছে পাসপোর্ট ফর্ম। সে দু'তিনদিনের মধ্যেই ছেলেকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিতে চায়। মঞ্জুর ইচ্ছে, ছেলে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় চলে যাক। কিন্তু সুখু হঠাৎ বেঁকে বসেছে। সে কোথাও যাবে না। বাবা কিংবা মায়ের সঙ্গে সে ভালো করে কথাই বলতে চায় না। সে আয়েশার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতে লাগলো মন দিয়ে, একসময় দু'জনে মাদারিপুর শহরে বেড়াতে চলে গেল।

মঞ্জু বাবুলের সামনে একবারও আসেনি। বাবুল মামুনের সঙ্গে কথা বললো কাটাকাটা ভাবে। ছেলের টানে সে বাধ্য হয়ে এখানে এসেছে। মামুন একসময় অসহায় ভাবে বললেন, বাবুল, তুমি এই ব্যাপার অন্তত আমাকে দোষ দিও না। তোমার ছেলেকে আমি এখানে ডেকে আনি নাই, তাকে আমি জোর করে ধরেও রাখতে চাই না। তবে, তার প্রায় বিশ বৎসর বয়েস হয়েছে, এখন সে নিজের ইচ্ছা মতনই চলতে চাইবে।

বাবুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলো।

তাকে দুপুরবেলা খেয়ে যাওয়ার অনেক অনুরোধ করলেন মামুন। বাবুল শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলো। সে এক বন্ধুর গাড়ি চেপে এসেছে, তাকে আজই ফিরে যেতে হবে।

বাড়ি থেকে নেমে গেটের দিকে এগিয়ে গেল বাবুল। গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। বাবুল বাইরে বেরুবার আগে থমকে দাঁড়ালো, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো ডান দিকে। বাগানের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জু, এ দিকে পেছন ফিরে খুব মনোযোগ দিয়ে কী একটা ফুলগাছ দেখছে।

বাবুল সেদিকে এগিয়ে গেল। তার হাঁটার ভঙ্গিতে একটা দ্বিধার ভাব আছে। কাছাকাছি গিয়ে, একটুক্ষণ থমকে থাকার পর সে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো, মঞ্জু?

মঞ্জু মুখ ফিরিয়ে বাবুলকে দেখলো। তার মুখে রাগ, দুঃখ, অভিমান কিছুই নেই। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে, সে বললো, ভালো। তুমি ভালো আছো?

॥ ৬ ॥

হরিদ্বারে যাওয়ার ব্যাপারটা সব ঠিকঠাক করে প্রায় শেষ মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন মমতা। এর মধ্যে একদিন কানু এসেছিল, সে ট্রেনের টিকিট যোগাড় করে দিয়েছে। কানুর কাছ এসব কোনো সমস্যাই নয়। কানুর ছোট মেয়ে চায়না এবার পার্ট-টু পরীক্ষা দিয়েছে, এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি, সে যেতে রাজি হয়েছে মমতার সঙ্গে, এই সুযোগে তারও বেড়ানো হবে। চায়না মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ, লোকজনের সঙ্গে পরিষ্কার চোখে কথা বলতে পারে, সে সঙ্গে থাকলে মমতার কোনো অসুবিধে হবারই কথা নয়। কিন্তু প্রতাপকে একলা ফেলে যাবেন কী করে মমতা?

ঝগড়ার পর কথা বন্ধ ছিল, মমতা নিজেই কথা খুলে দিলেন। নিজেই কিছুটা নত ও কোমল হয়ে প্রতাপকে মিনতি করে বলেছিলেন, তুমিও চলো আমার সঙ্গে। তুমি না গেলে আমার ভালো লাগবে না!

প্রতাপ লক্ষ করে যাচ্ছিলেন যে মমতা নিজেই হরিদ্বার যাবার সব ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন, টিকিট কাটালেন, যাত্রাপথের সঙ্গিনী ঠিক করলেন, প্রতাপের টাকাপয়সাও চাইলেন না। ইদানীং মমতার নিজস্ব একটা অর্থ দফতর হয়েছে, হঠাৎ প্রতাপকে না জানিয়ে তিনি দু'একটা দামী জিনিস কিনে ফেলেন। মমতার বহুকালের শখ ছিল একটা কার্পেটের, এতদিন বাদে তিনি শয়নকক্ষে বিছিয়েছেন বেশ পুরু, সুন্দর লতা-পাতার ডিজাইন করা একটা লাল কাশ্মীরী কার্পেট। এর দাম যে কত হাজার টাকা লেগেছে, তা মমতা কিছুতেই জানাতে চাননি প্রতাপকে। প্রথম বেশ কয়েকদিন শুতে এসে

সেটাকে প্রতাপের একটা অচেনা মানুষের ঘর বলে মনে হতো। এই শীতে মমতা প্রতাপের জন্য বেশ একটা মূল্যবান কোট তৈরি করিয়েছেন, তাও প্রতাপের অজান্তে। কোটটা গায়ে দেবার পর প্রতাপ খানিকটা ঠাট্টার সুরেই বলেছিলেন, আজকাল তোমার খুব টাকার গরম হয়েছে, তাই না?

মমতা বলেছিলেন, সারাটা জীবন তোমার কাছে হাত-তোলা হয়েই কাটাতে হয়েছে, দাসী-বাঁদীর মতন শুধু সেবা করে গিয়েছি। কোনোদিন কিছু তো দাওনি আমাকে!

প্রতাপ অবাক হয়ে বলেছিলেন, তোমাকে কোনোদিন কিছু দিইনি? এই সবকিছুই তো তোমার জন্য!

মমতা বলেছিলেন, সবকিছু? হুঁঃ! দয়া করে দিয়েছো, নেহাত যেটুকু প্রয়োজন না মেটালে নয়। কিন্তু মানুষের তো সাধ-আহ্লাদ ও থাকে। সেসব তুমি জানতেও চাওনি। নিজের ইচ্ছেমতন কিছুই করতে পারিনি।

মমতার এইসব কথার মধ্যে কৌতুক একটুও ছিল না, প্রচ্ছন্ন অভিমান মেশানো স্পষ্ট অভিযোগ। আজকাল মমতার কথার মধ্যে প্রায়ই অভিযোগের সুর ফুটে ওঠে। মুন্নির বিয়ে হয়ে যাবার পর, বাড়িতে এখন শুধু স্বামী-স্ত্রী, সাংসারিক ঝামেলাও চুকে গেছে, এখন মমতার যেন অন্য একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠছে।

সেই কথার পর থেকে মমতার কেনা কোটটা প্রতাপ আর গায়ে দিতে চান না। তাঁর ইচ্ছে করে না। কলকাতায় যে-টুকু শীত পড়ে, তাতে তাঁর পুরোনো আমলের পকেট ছেঁড়া কোটটাতেই বেশ কাজ চলে যায়।

মমতার শত অনুরোধেও অবশ্য প্রতাপ আর মত বদল করেননি। উদাসীনভাবে বলেছিলেন, আমি আর হরিদ্বার গিয়ে কী করবো! মুন্নির বাচ্চাকে নিয়ে তুমি ব্যস্ত থাকবে, অনুনয় আর তার বাবা অন্য দিকগুলো সামলাবে, আমি শুধু শুধু তোমাদের বোঝা বাড়াতে যাবো কেন? তা ছাড়া বাড়ির ট্যাক্সের ব্যাপারে সামনের সপ্তাহে করপোরেশনে একটা হিয়ারিং আছে---

তখন প্রশ্ন উঠেছিল, কলকাতায় বাড়িতে প্রতাপের সঙ্গে কে থাকবে? এই প্রশ্নে প্রতাপ আবার জ্বলে উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কারুর থাকার দরকার নেই। তিনি নিজেই নিজের ভার যথেষ্ট নিতে পারেন, নানু তো আছেই, সে রান্নাবান্না করে দেবে। রাত্তিরে তিনি একা থাকতে পারবেন না কেন, তিনি কি ছেলেমানুষ!

প্রতাপ ছেলেমানুষ নন, কিন্তু তিনি যে বৃদ্ধ, সে কথাও তাঁর মনে থাকে না। মমতা তবু নানুকে পই পই করে বলে গিয়েছিলেন, সে যেন প্রতিদিন বসবার ঘরে বিছানা পেতে শোয়। প্রত্যেকদিন সকালে বাবুকে গরম জলে লেবুর রস আর মধু মিশিয়ে দিতে ভুলে না যায়। বাবুকে ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়াও তার দায়িত্ব। প্রথম দশ-বারোদিন নানু ঠিক ঠিক সেই দায়িত্ব পালন করেছে। তারপর তার বাড়িতে একটা বিয়ের ব্যাপার থাকলে সে ছুটি নেবে না? প্রতাপ নিজেই তাকে ছুটি দিয়েছেন। নানু তবু এক ফাঁকে এসে রান্নাটা করে দিয়ে যায়।

মমতাকে পৌঁছে দিতে হাওড়া স্টেশনেও গিয়েছিলেন প্রতাপ। তিনি নিজে কুলি ঠিক করেছিলেন এবং দেরি করে কম্পার্টমেন্টের দরজা খোলার জন্য কন্ডাকটর গার্ডকে বকাবকিও করেছিলেন। মমতা আর চায়না একটা কুপে পেয়েছে, সুতরাং নিশ্চিন্তে, পথে অন্য কোনো যাত্রী তাদের বিরক্ত করবে না। স্টেশনের কল থেকে প্রতাপ ওয়াটার-বটলে জল ভরে দিলেন ওদের জন্য। সবই তিনি করছেন, কিন্তু কোনো আবেগ নেই। মমতা সেই যে রাগের মাথায় বলেছিলেন, তোমার টাকা লাগবে না, নিজের টাকাতেই আমি হরিদ্বার যেতে পারবো, সেই কথাটা তাঁর বুকে যে ঘা দিয়েছে, সেটা দগদগে হয়ে আছে, কিছুতেই চাপা পড়ছে না। প্রতাপ সারাজীবন কষ্ট করে সংসার যে ভাবে টাকা উপার্জন করেছেন তা যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে ওই একটি কথায়। মমতার সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে কোনো খুঁত নেই। এমন কি প্রতাপ মাঝে মাঝে হাসি মুখও দেখিয়েছেন, তবু সেটা যেন অতিরঞ্জিত এক মুখোশের মতন। ব্যস্ততায় ও বাইরে যাবার উত্তেজনায় মমতা তা লক্ষ করেননি।

ট্রেনটা ছাড়তে একটু লেট করছিল, প্রতাপ দাঁড়িয়েছিলেন প্ল্যাটফর্মে, মমতাদের জানলার সামনে। হঠাৎ তাঁর মনটা যেন এক তরল বিষণ্ণতায় ভিজে গেল। কেন যেন তাঁর মনে হলো, মমতার সঙ্গে তাঁর এই শেষ দেখা। প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে মমতা তো তাঁকে ছেড়ে কখনো একা কোথাও যাননি।

এবার কি মমতার কোনো বিপদ ঘটবে? ট্রেন দুর্ঘটনা? হরিদ্বারে খরস্রোতা নদী--- । প্রতাপ এই চিন্তাটা মন থেকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। মমতা না থাকলে বাকি জীবনটা তিনি কাটাবেন কী করে?

ট্রেনটা দুলে উঠতেই মমতা তাঁর স্বামীর হাত চেপে ধরে বলেছিলেন, কথা দাও, তুমি শরীরের যত্ন নেবে? নানুকে আমি বলে গেছি, সে সব কিছু করবে, তুমি নিজে মশারি টাঙাতে যেও না, নানু সব জানে, তুমি শুধু বাজারটা করে দিও, তোমার পছন্দমতন মাছ--- আর একটা কথা বলবো? তুমি আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো, চিঠি লিখলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে? আমি এক মাসের বেশি থাকবো না, মুন্নি একটু সামলে উঠলেই---

মমতার ব্যাকুল মুখখানি দেখে প্রতাপের দয়া হয়েছিল। একটা বয়েসে ভালোবাসা রূপান্তরিত হয়ে যায় স্নেহ-মমতায়। ভালোবাসার চেয়ে তার শক্তি বেশি। তিনি শিশুকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে মমতার হাত চাপড়ে বলেছিলেন, কোনো চিন্তা করো না, আমি ঠিক থাকবো। তুমি পৌঁছোনো মাত্র চিঠি দিও। সাবধানে থেকো। রাত্তিরে কোনো স্টেশনে ট্রেন থামলে জানলা খুলো না, অবশ্য সঙ্গে চায়না আছে, ও স্মার্ট মেয়ে--চায়না, ভালো করে ঘুরে আয়--

সেদিন হাওড়া স্টেশন থেকে ফেরার পথে প্রতাপ বাস বা ট্যাক্সি না নিয়ে হেঁটে ব্রীজ পার হয়েছিলেন। তারপর স্ট্র্যান্ড রোড ধরে খানিকটা এগিয়ে, ফেরীঘাট দেখে কী খেয়াল হয়েছিল, তিনি টিকিট কেটে ফেরীতে চেপে আবার গঙ্গা পার হলেন। তাঁর তো বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া ছিল না। ফেরীতে চেপে মধ্যপথে এসে তাঁর মনে হয়েছিল, এই গঙ্গা যেখানে পাহাড় ছেড়ে সমতলে নামছে, সেখানে চলে গেল মমতা। সে আবার ফিরে আসবে তো? নদী কখনো থামে না, কিন্তু মানুষের জীবন হঠাৎ এক সময় থেমে যায়। তাঁর ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। এই অলক্ষণে কথাটা বারবার মনে পড়ছে কেন? না, না, মমতার কিছু হবে না, তার শরীর ভালো আছে, এত বছর একটা সংসার সামলাবার পর এই তো সবেমাত্র সে নির্ঝঞ্ঝাট হয়েছে, এখন সাধ-আহ্লাদ মেটাবে--

একবার হেঁটে হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে এসে আবার অকারণে ফেরী করে সেই হাওড়ার দিকেই যাওয়া, অন্য কেউ প্রতাপকে এরকম ছেলেমানুষী করতে দেখলে সাঙ্ঘাতিক অবাক হতো। আবার ওই ফেরীতেই এপারে এসে প্রতাপ অনেকক্ষণ বসেছিলেন আউটরাম ঘাটের কাছে। প্রতাপদের ছেলেবেলায় এটাকে বলা হতো উট্রাম ঘাট, এখন আউটরাম নামটাই চালু হয়ে গেছে, এটা যে কোনো সাহেবের নামে তাও হয়তো লোকে ভুলে গেছে। বোধহয় ভাবে কেনারাম, বেচারামের মতনই আউটরাম। ইডেন গার্ডেন-এর নাম অবশ্য কেউ নন্দন কানন দেয়নি, যদিও অকটরলোনি মনুমেন্ট হয়ে গেছে শহিদ মিনার। এই ইডেন গার্ডেনে একসময় গোরাদের ব্যান্ড বাজতো, প্রতাপের মনে আছে। এখানেই স্বাধীনতার পরে কোনো একটা বছর বিরাট একটা মেলা হয়েছিল না? ত্রিদিবের গাড়িতে সবাই মিলে আসা হয়েছিল, সুলেখা, পিকলু-বাবলু-মুন্নি, মমতা; দিদি আর তুলতুল ও ছিল কি? হ্যাঁ ছিল, শুধু মা ছিল না। তার কিছুদিন পরেই তো পিকলু --- । বাকিরাও সব কোথায় গেল?

এই গঙ্গা নদীই পিকলুকে খেয়েছে। মমতা আবার এই নদীর ধারেই গেল। মমতা আবার পুণ্য-টুন্যের কথা ভেবে হরিদ্বারের নদীতে স্নান করতে না নামে। গঙ্গার ওপর প্রতাপের ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই একটুও। পিকলু চলে যাবার পর তিনি আর কোনোদিন গঙ্গায় স্নান করেননি। এমন কি সুপ্রীতিকে পোড়াবার পর অনেকে আদিগঙ্গার বিশ্রী নোংরা জলে নেমেছিল, প্রতাপ রাজি হননি কিছুতেই।

মাঝে মাঝে প্রতাপের মনে এমন একটা বিশ্রী চিন্তা আসে যে তাঁর নিজের গলাটা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে। তবু চিন্তাকে রোধ করা যায় না। পিকলু বাঁচাতে গিয়েছিল বাবলুকে, বাবলুর বদলে যদি পিকলু বেঁচে থাকতো? পিকলু নিশ্চিত এদেশের একজন গণ্যমান্য মানুষ হতো। না, না, প্রতাপ বাবলুকেও কোনোদিন হারাতে চাননি। মমতার ধারণা, প্রতাপ তাঁর এই ছেলেটিকে ভালোবাসেন না। ভুল ধারণা। ছোটবেলা থেকেই বাবলু দুরন্ত, সে জন্য প্রতাপ ওকে অনেকবার শাস্তি দিয়েছেন, তবু বাবলুর প্রতিই বোধহয় তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল বেশি। বাবলুকে বিলেত পাঠাবার জন্য একসময় তিনি সর্বস্বান্ত হননি? বাবলুর জন্য দুশ্চিন্তায় তিনি যে বছরের পর বছর ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হয়েছেন, তা বুঝতেও দেননি মমতাকে। এখনও বাবলুর চিঠি এলে, সে বাবাকে লেখে না, মাকেই লেখে, তবু প্রতাপ মমতাকে লুকিয়ে চোরের মতন সে চিঠি দু'তিনবার পড়েন না।

গঙ্গার ধারে সন্ধেবেলা অনেক মানুষ বসে থাকে, অল্পবয়েসী ছেলে-মেয়েরা একটু নিরালা খুঁজে

হৃদয় ও শরীরের উত্তাপ বিনিময় করতে চায়। দুটি যুবক রেলিং এ হেলান দিয়ে খুব জোরে জোরে হাসছে। একটু দূর কে যেন গান গাইছে। সে দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ প্রতাপ যেন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি যে বেঞ্চিতে বসে আছেন, সেখানে তাঁর বদলে রয়েছে অন্য একজন মানুষ, রেলিং এ ভর দেওয়া ওই যুবক দুটির জায়গায় অন্যরকম পোশাক পরা, অন্য দুটি যুবক হাসছে, একটা গাছের পাশে যে তিনজন যুবতী, তাদের শাড়ির রং, মুখের চেহারা সট সট করে বদলে গেল, তারা অন্য হয়ে গেল। যেন আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ কিংবা পঞ্চাশ বছর পরের একটা দৃশ্য উদ্ভাসিত হলো প্রতাপের চোখের সামনে। তখন তিনি থাকবেন না, এই মানুষগুলি কেউই থাকবে না। এই একই জায়গায় অন্যরা আসবে, হাসবে, গান গাইবে। মাত্র কয়েকটা বছরের ব্যাপার, তারপরই সব শেষ!

প্রতাপের শিহরণ হয়েছিল খানিকটা ভয়ও পেয়েছিলেন। এরকম দৃশ্য তিনি দেখলেন কেন? এরকম একটা ফুকো দার্শনিকতাই বা কেন ভর করলো না তাঁর মাথায়?

একা থাকলেই যত রাজ্যের বাজে চিন্তা এসে মাথা জুড়ে বসে। মমতার সঙ্গে তাঁর যাওয়াই উচিত ছিল, না হয় কোনোরকমে মুন্নির শ্বশুরের সঙ্গে কয়েকটা দিন মানিয়ে চলতেন। মমতাকে ছেড়ে থাকতে প্রতাপের যে কষ্ট হচ্ছে, সে কথা প্রথম কয়েকটা দিন প্রতাপ নিজের মনের কাছে ও স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু ফাঁকা বাড়িতে তাঁর কিছুতেই বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করে না। বিমানবিহারীর বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যে যাবার জায়গা ও নেই। প্রতাপ নিজেই ট্রেনে চেপে কৃষ্ণনগর চলে যাবেন? বিমান ক'দিনের জন্য গেছেন তা অলিরাও ঠিক জানে না, প্রতাপ যেতে যেতেই যদি তিনি ফিরে আসেন? প্রতাপ আর কোনো বন্ধু সংগ্রহ করেননি। একা একা তিনি কোথাও বেড়াতে যাবেন? বাড়ির ট্যাক্সের হিয়ারিং আবার পিছিয়ে গেছে এক সপ্তাহ, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় যদিও, কিন্তু ওটা আগে চুকিয়ে ফেলা দরকার।

একা একা রাস্তায় ঘুরতেও মন্দ লাগে না। অনেক রকম মানুষ দেখা যায়। অন্যদের কথা কান পেতে শুনলে চমকে যেতে হয় এক এক সময়। তিরিশের কাছাকাছি বয়েসের একজোড়া যুবক-যুবতী পাশাপাশি হাঁটছে, তাদের দু'একটা টুকরো কথা কানে এলো। মেয়েটি ব্রহ্মকমল ফুলের কথা বলছে। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স থেকে এই ফুল তুলে আনলে অলকানন্দা নদীর তীরে পর্যন্ত টাটকা থাকে, নদীর এপারে আনলেই সে ফুল শুকিয়ে যায়। প্রতাপ এই কথাটা আগেও যেন কোথায় শুনেছেন। এই ফুল পাহাড় ছেড়ে সমতলে নামতে চায় না। মেয়েটি সদ্য ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স ঘুরে এসেছে মনে হলো। মমতারও ওই জায়গাটা দেখতে যাওয়ার খুব শখ। আশ্চর্য, একটু আগে প্রতাপ এই সাইবোর্ড দেখেছিলেন, 'হরিদ্বার-হৃষীকেশ-ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স বেড়াতে যেতে চান? আমরা আছি। হলিডে ট্রাভেল্স।

যুবতীটির মুখ সুখস্মৃতিতে ঝলমল করছে। তার সঙ্গীটিকে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অনেকটা সিদ্ধার্থর মতন নয়? বাবলুর বন্ধু সিদ্ধার্থ নাকি? সিদ্ধার্থ ফিরে এসেছে? প্রতাপ প্রায় তাকে ডাকতে উদ্যত হয়েও থেমে গেলেন। না, তার ভুল হচ্ছে। বাবলুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কেউ কলকাতায় এলে দু'একদিনের মধ্যেই বাড়িতে এসে দেখা করে। কিছু না কিছু জিনিসপত্রের সঙ্গে শর্মিলা তার শাশুড়ির জন্য চকলেট পাঠাবেই। বাচ্চা মেয়েদের মতন মমতা বলতেন, আমি অত মাংস টাংসর ভক্ত নই, তবে এদেশের আইসক্রিম আর চকলেট সত্যিই খুব ভালো। প্রতাপ অবশ্য মিষ্টি একেবারেই খেতে পারেন না, তিনি আমিষাশী, তবে আমেরিকায় মাছ-মাংস খেয়ে সুখ পাননি। তিনি গোমাংস খান না, বাবলুদের বাড়িতে অবশ্য গোরু-শুয়োর দুই-ই চলে, তাঁর প্রেসার হাই বলে কোলেস্টরলের ভয়ে তিনি শুয়োরও স্পর্শ করেননি, ওদেশের মুর্গিগুলো কৃত্রিম উপায়ে বড় করা বলে তাঁর কাছে বিস্বাদ লেগেছে, পাঁঠার প্রায় পাওয়াই যায় না বলতে গেলে, ভেড়ার মাংস কেমন যেন একটা বোঁটকা গন্ধ, সামুদ্রিক মাছও প্রতাপের বিশেষ পছন্দ নয়। বাবলু প্রায়ই ইলিশ মাছ কিনে আনতো, শ্যাড মাছ ইলিশের মতন, তা ছাড়া পদ্মার ইলিশও বিমানে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, পাওয়া যায় ওখানকার বাংলাদেশী দোকানে, দুর দুর, দেশের টাটকা ইলিশের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না। ডিপ ফ্রিজে জমানো কাঠের মতন শক্ত মাছ দেখলেই তো অভক্তি জন্মে যায়। তবে হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে, আমেরিকা তরিতরকারি আর ফলমূলের স্বর্গ। প্রতাপের সবচেয়ে ভালো লাগতো মাশরুম, অমন সুস্বাদু মাশরুম তিনি জীবনে কখনো খাননি।

কলকাতায় ফিরে প্রতাপ নিউ মার্কেটে ওই ধরনের মাশরুম কিনতে গিয়েছিলেন, কে যেন একজন বললো, মাশরুম চিনতে হয়, এদেশের এক এক জাতের মাশরুম বিযাক্ত হতে পারে, তাই শুনেই মমতা বেঁকে বসলেন, প্রতাপের কিনে আনা মাশরুম রান্না না করেই ফেলে দিলেন আস্তাকুঁড়ে।

হাজরা রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রতাপ আপনমনে হাসলেন। ঘুরে ফিরে মমতার কথাই তাঁর মনে আসছে। তিনি যে এতটা স্ত্রৈণ, তা আগে তো কখনো টের পাননি! তিনি ভেবেছিলেন, মমতা হরিদ্বারে চলে গেলে তিনি বেশ একলা একলা স্বাধীনভাবে থাকবেন। এখন এক-একবার লোভ হচ্ছে একটা টিকিট কেটে হঠাৎ হরিদ্বার পৌঁছে মমতাকে চমকে দিতে।

রাস্তার ধারের একটা জবরদখল স্টলে দাঁড়িয়ে প্রতাপ এক গেলাস চা খেলেন। চা তো নয় যেন গরম ষাঁড়ের পেচ্ছাপ। চায়ের নামে এরা কী দেয় মানুষকে? প্রতাপের মেজাজ গরম হয়ে গেলেও কিছু বললেন না। পয়সাটা ছুঁড়ে দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন।

মুখের স্বাদটা এমন বিশ্রী হয়ে গেছে যে পাল্টানো দরকার।

একসময় সিগারেটের নেশা ছিল খুব, ছেড়ে দিয়েছেন প্রায় তিন বছর আগে। এখনো অনেকক্ষণ একা থাকলে বা অস্থির বোধ হলে হাতের আঙুল আর ঠোঁট নিশপিশ করে। সিগারেট ছাড়তে হয়েছিল প্রায় বাধ্য হয়েই। প্রত্যেকদিন সকালে খুব কাশি হতো, একবার ব্রঙ্কাইটিসের মতন হয়ে গিয়েছিল, কাশিও চলছে, সিগারেটও চলছে। একদিন কাশতে কাশতে প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার মতন অবস্থা, মমতা বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, কাশো, আরও কাশো, সিগারেট তো ছাড়তে পারবে না কোনোদিন! প্রতাপ তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন জানলা দিয়ে। মমতা খুব হেসেছিলেন তখন। মমতার ওই হাসিটাই প্রতাপকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে বাধ্য করেছে। এরপর দু'তিনবার মাত্র দুর্বল হয়েছিলেন প্রতাপ, বাড়িতে কোনো অতিথি এলে তাঁর এগিয়ে দেওয়া সিগারেট প্রতাপ গ্রহণ করতে যেতেই মমতা বলতেন, জানতাম, তুমি পারবে না! অমনি প্রতাপ প্রত্যাখান করে বীরের মতন বলেছেন, দ্যাখো পারি কি না। একবার একটা সিগারেট ঠোঁটে ছুঁইয়ে পর্যন্ত ফেলে দিয়েছিলেন।

এখন মমতা নেই, এক প্যাকেট সিগারেট কিনলে কেমন হয়? একটা দোকানের সামনে দাঁড়াতেই তিনি যেন অন্তরীক্ষে মমতার হাসি শুনতে পেলেন। প্রতাপ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, কাছাকাছি একটি বাড়ির ছোট ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দুটি মহিলা খুব হাসছে। প্রতাপ ঠিক করলেন, সিগারেট বিষয়ে যদি প্রতিজ্ঞা ভাঙতেই হয়, মমতার সামনেই ভাঙবেন, কাপুরুষের মতন আড়ালে নয়।

তা হলে একটা পান খাওয়া যেতে পারে। বাড়িতে কখনো সখনো দু'একটা পান খেলেও প্রতাপের এ নেশা নেই। লোকজনের সামনে কিছু চিবোনোর মধ্যে কেমন যেন একটা জন্তু জন্তু ভাব থাকে। পুরুষ মানুষের লাল ঠোঁট ও তার চোখে কদাকার লাগে। বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খাবার পর কেউ কেউ যখন মুখে দু'তিনটে পানের খিলি একসঙ্গে পুরে জাবর কাটে, সেই অবস্থায় আবার কথা বলতে আসে, প্রতাপ সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন।

প্রতাপ দোকানদারটিকে বললেন, ওহে, এক খিলি পান সাজো তো। খয়ের দিও না! পানওয়ালা তার দোকানের পাটাতনের নীচের অন্ধকার গহ্বর থেকে রাশি রাশি খালি বোতল বার করে ক্রেটে সাজাচ্ছে। সে এখন ব্যস্ত, উত্তর দিল না।

প্রতাপ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলন্ত মানুষের স্রোত দেখতে লাগলেন। এই শহরের মানুষ কি হঠাৎ বেড়ে গেছে? আজ পথে এত বেশি লোক মনে হচ্ছে কেন? কিংবা এমন মনোহরণ বাতাস বইছিল বলেই কি অনেক লোক বাইরে এসেছে? কলকাতার অনেক বাড়িতেই তো হাওয়া ঢোকে না। এখন অবশ্য বাতাসের বেশ জোর। ঠিক ঝড় নয়, ঝোড়ো হাওয়ার মতন। আকাশের রং এখন পাতলা লালচে। পায়রাগুলো হুড়োহুড়ি করে ঘরে ফিরছে। এই শহরে বেশ কিছু টিয়া পাখিও আছে। পশ্চিম আকাশের দিকে উড়ে গেল এক ঝাঁক পাখি, ওরেব কী নাম কে জানে! দুটি দমকল সন্ধ্যারতির শব্দ জানিয়ে চলে গেল।

খানিক পরে প্রতাপের খেয়াল হলো, লোকটি তাকে পান দেয়নি তো!

পানওয়ালাটি তখন বোতল নিষ্কাশন বন্ধ রেখে তারই মতন চেহারার আর একটি লোকের সঙ্গে নিচু স্বরে কিছু আলোচনা করছে। একজন খরিদ্দার যে তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে, সে খেয়ালই

নেই।

এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্যের মতন যে প্রতাপ মজুমদার শ্রেণীর একজন রাশভারী চেহারার ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালে এই পানওয়ালা শ্রেণীর কেউ তাকে খাতির করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

পানওয়ালাটি প্রতাপের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলো। সে পাশ ফিরে প্রতাপের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে নিস্পৃহ গলায় বললো, খালি একটা পান চাইছেন তো? দাঁড়ান, দিচ্ছি!

তারপর সে তার সঙ্গীর প্রতি আর দু'চারটি কী সব নির্দেশ দিয়ে নিজের দোকানের পাটাতনের ওপর উঠে বসলো। হাত মুছলো একটা নোংরা ভিজে ন্যাকড়ায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ছোকরা প্রতাপের পাশে এসে জিজ্ঞেস করলো, বেচুলাল, আমার চুরুট এনেছো?

পানুয়ালাটি এবারে বেশ উৎসুকভাবে বললো, হ্যাঁ বাবু, আজ সকালেই এসেছে। পান সাজায় হাত না দিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে ওপরের তাক থেকে বিভিন্ন বাক্সের চুরুট দেখাতে লাগলো ছোকরাটাকে।

প্রতাপ ওরা স্পর্ধা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। আগুনের মতন রাগ ছড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর সারা দেহে। তিনি ভাবলেন, লোকটির কান ধরে টেনে নামিয়ে দুই থাপ্পড় কষাবেন ওর গালে।

কিন্তু প্রতাপ মজুমদারের মতন মানুষেরা কোনো পানওয়ালাকে থাপ্পড় মারে না। এরকম ইচ্ছে তাঁদের মাঝে মাঝেই হয়, কিন্তু সেই রাগ মনেই পুষে রাখতে হয়, কিংবা বাড়িতে ফিরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ওপর সেই রাগের প্রভাব পড়ে।

প্রতাপ আর দাঁড়ালেন না সেখানে। তিনি আর অন্য দোকানেও গেলেন না। পান খাওয়ার ইচ্ছেটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ওই বেয়াদপ পানওয়ালাটিকে কি কোনো শাস্তিই দেওয়া যাবে না? তিনি শুধু এক খিলি পান চেয়েছেন, অতি সামান্য তার দাম, সেইজন্য লোকটা তাকে অবজ্ঞা করলো? অথচ সে তো পানের দোকানেই খুলে বসেছে। পুলিশের উচিত ওর দোকান তুলে দেওয়া!

ওই পানওয়ালার কথা ভাবতে ভাবতেই প্রতাপ অনেকটা রাস্তা হেঁটে গেলেন। নিরপেক্ষ ভাবেও তিনি বিচার করতে চাইলেন লোকটাকে। যে-খদ্দের বেশি পয়সার জিনিস কিনবে, তার প্রতিই বেশি আগ্রহ দেখাবে, এটাই তো ব্যবসার নিয়ম। সে দিক থেকে লোকটি অন্যায় করেনি। কিন্তু প্রতাপ আগে এসেছেন, এমনিতেই তাঁকে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। আর কিছু না হোক, সে তো কাঁচুমাচু ভাবে বলতে পারতো বাবু, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর একটু দাঁড়ান, পানে হাত দেবার আগে এনাকে চুরুটটা দিয়ে নেই!

মনের মধ্যে রাগটা রয়েই গেল।

সেই জন্যই বোধহয় প্রতাপ একটু পরে আর একটা বাজে ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন। ঘটনাটি অতি সামান্য। যে-কোনো বড় শহরেই এরকম খুচখাচ অপরাধের ঘটনা যখন তখন ঘটে। অনেক অন্যায় আছে, যেদিকে আইনের দৃষ্টি পড়ে না। নগরে যারা থাকে, তারা সবাই নাগরিক চেতনাসম্পন্ন হয় না। কলকাতার মতন বিশৃঙ্খলভাবে বেড়ে যাওয়া শহরে বিশেষ কোনো সামাজিক নীতিবোধও গড়ে ওঠেনি।

হাজরা রোড আর ডোভার রোডের মোড়ের কাছটায় একটা রিকশা হঠাৎ উল্টে যায়। রিকশাটিতে বসেছিল একটি হলুদ শাড়িপরা যুবতী, তার হাতে একটা খাতাও একটা মোটা বই, সম্ভবত অখণ্ড গীতবিতান, সেও আচমকা বিসদৃশ ভাবে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। হাজরার এই অংশটিতে সামান্য বৃষ্টি হলেই দু'পাশে নোংরা জমে থাকে। যুবতীটি কোনোক্রমে উঠে দাঁড়ালো, তার বইটিতে কাদা লেগেছে, রাগে-দুঃখে সে রিকশাওয়ালাটিকে বকতে শুরু করে দিল, এখন তার ভাষা ঠিক রাবীন্দ্রিক নয়। এমন সময় একটি মোটর সাইকেল চড়ে যুবক সেখানে এসে উপস্থিত, সেও রিকশাওয়ালাটিকে ধমকে বললো, আই, তুমি নতুন রিকশা চালাচ্ছো? আর একটু হলেই তো আমার সঙ্গেই ধাক্কা লাগতো!

যুবতীটি মাধ্যাকর্ষণের টান অনুভব করার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা মোটর বাইকের গর্জন শুনেছিলে। রিকশার ধার ঘেঁষে এই মোটর বাইকটিই যাচ্ছিল তো। তার ধারণা হলো, এই লোকটিই দুষ্কৃতকারী। সে বললো, আপনিই তো ধাক্কা মেরেছেন!

যুবকটি বললো, না না, আমি খুব জোর সামলে নিয়েছি। এই ব্যাটা এমন বিচ্ছিরিভাবে চালাচ্ছিল, গাঁ থেকে সদ্য এসেছে বোধহয়, হর্ন শুনেও বোঝে না। এদিক দিয়ে আবার একটা ট্যাক্সি--

যুবতীটি তবু বললো, আপনিই ধাক্কা মেরেছেন। আপনার লজ্জা করে না?

যুবকটি বললো, কী মুশকিল! আমি ধাক্কা মারলে কি আমি আবার এখানে ফিরে আসতুম? আমি খুব জোর সাইড করে না নিলে একটা বড় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারতো। আমি কি আপনাকে কিছু হেল্প করতে পারি? আপনার যদি বেশি জোর চোট লেগে থাকে---

কলকাতা শহরে মাটি ফুঁড়েও মানুষ ওঠে। কাছেই একটা বস্তিমতন আছে, চোখের নিমেষে জমে গেল ভিড়। একটি চলনসই চেহারার যুবতী, একটি সপ্রতিভ ও সুদৃশ্য পোশাক পরিচ্ছেদে ভূষিত মোটর সাইকেল চালক আর একটি গোবেচারা, রোগা, হতভম্ব রিকশাওয়ালা, এই তিনটি পাত্রপাত্রীর মধ্যে যুবকটিই আদর্শ টার্গেট। ভিড়ের মধ্যে দু'তিনজন রয়েছে পাড়ার গার্জেন টাইপের, একজন ধ্যাড়েঙ্গা চেহারার লোক যুবকটির কলার শক্ত করে চেপে ধরে প্রথম থেকেই সাপটে গালাগাল শুরু করে দিল। তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়ানো, কাছেই গর্চার বাংলা মদের দোকান।

জনতার প্রথম দাবি, মেয়েছেলের অপমান করা হয়েছে, যুবকটিকে ক্ষমা চাইতে হবে।

দ্বিতীয় দাবি, মোটর সাইকেল এই গরিব রিকশাওয়ালাকে ধাক্কা মেরেছে, সুতরাং শুধু ক্ষমা চাইলেই চলবে না, কিছু ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

ধ্যাড়েঙ্গা লোকটির অনুচ্চারিত দাবি, যে-লোক একটি মেয়েছেলে বসা রিকশায় ধাক্কা মারতে পারে, তার মোটর সাইকেল চালাবার কোনো অধিকারই নেই, ওই মোটর সাইকেলটি আপাতত বাজেয়াপ্ত করা দরকার।

আর যুবকটি বারবার বলতে লাগলো, আমি ধাক্কা মারিনি। ধাক্কা মারলে কেউ কখনো ফিরে আসে? আমি অনেকটা চলে গিয়েছিলুম, গাড়ি ঘুরিয়ে---

এই ঘটনার মাঝামাঝি প্রতাপ এসে দাঁড়ালেন ভিড়ের পেছনে।

প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। রাস্তায় আলো জ্বলেনি। প্রত্যেক সন্ধেতেই তো আলো জ্বলে না। এরই মধ্যে দোতলা বাস যাচ্ছে, অন্য অনেক গাড়ি-রিকশা যাচ্ছে, মানুষের ঢেউ বয়ে চলেছে। একপাশের একটা ভিড়ের মধ্যে কী নিয়ে চ্যাঁচামেচি হচ্ছে তা নিয়ে অন্যদের মাথাব্যাথা নেই। আইন এবং নীতিবোধ এখান থেকে অনেক দূরে।

অবস্থা ঘোরালো হচ্ছে ক্রমেই। যারা নিছক কৌতূহল ভিড় জমিয়েছিল, তারা পাতলা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে আসছে পাড়া থেকে নতুন স্বার্থান্বেষীরা। মেয়েটি তার ভুল বুঝতে পেরে এখন যুবকটির পক্ষ নিয়েই কথা বলছে, সে যুবকটিকে বিপদে ফেলতে চায় না, সে ওর ক্ষমাপ্রার্থনায় আগ্রহী নয়, সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে। তার কণ্ঠে প্রায় কান্না। কিন্তু তাকে ঘিরে রেখেছে কয়েকজন, নাটক শেষ না হলে তাকে যেতে দেওয়া হবে না। অবশ্য তার গায়ে হাত দেবে না কেউ।

ঢ্যাঙা লোকটি কুৎসিত ভাষা শুরু করে দিয়েছে, অন্য দু'জন টানাটানি করছে মোটর সাইকেলটি, যুবকটির গায়ে কয়েকটি চড়-চাপড়ও পড়েছে। এই সময় প্রতাপ ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলেন।

তিনি বিচারক, বহু বৎসর ধরে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে এসেছেন। চোখের সামনে এরকম একটি অন্যায় ঘটতে দেখলে তিনি তা চুপ করে সহ্য করে যেতে পারেন না। তিনি ভুলে গেলেন যে তিনি চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন অনেকদিন আগে, তা ছাড়া চাকুরিরত বিচারকরাও সমাজের সব অন্যায়-অবিচার রোধ করার দায়িত্ব নেন না। তাঁর মতন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা রাস্তাঘাটে কক্ষনো এইসব বাজে লোকদের ঝামেলায় মাথা গলান না, নাক কুঁচকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াই নিয়ম। এসব জায়গায় কথা বলতে গেলে মানী লোকের মান থাকে না।

প্রতাপের এই মোটর সাইকেল চালকটির মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, সে সৎ ধরনের, সে মিথ্যে কথা বলছে না। এই শহরে কোনো গাড়ি অন্য গাড়িকে বা মানুষকে ধাক্কা দিলে পালিয়ে যেতেই চায়, ফিরে আসে না। সে ফিরে এসেছে মেয়েটিকে সাহায্য করবার জন্য, এটা একটা দুর্লভ ব্যাপার, এ জন্য সে অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য, তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কেন? ঢ্যাঙা লোকটির খারাপ ভাষাই প্রতাপ সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেছেন।

প্রতাপ একেবারে সামনে এসে কড়াভাবে ধমক দিয়ে বললেন, ওর কলার ধরেছো কেন? আগে ছেড়ে দাও? ভদ্রভাবে কথা বলো।

ঢ্যাঙা লোকটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, আপনি চুপ মারুন তো! এই হারামীর বাচ্চা এই পাড়া দিয়ে রোজ ফাঁট মেরে মোটর বাইক হাঁকিয়ে যায়, আমি ঠিক চিনে রেখেছি! শালা মাগীবাজ---

পেছন থেকে আর একজন বললো, আপনি কী জানেন দাদু? কেন ফোঁপর দালালি করছেন! যান, যান, নিজের কাজে যান!

প্রতাপ বললেন, রোজ এই রাস্তা দিয়ে যাওয়াটা কি অপরাধ? এই রাস্তাটা কি তোমার সম্পত্তি নাকি? ওকে ছেড়ে দাও! মেয়েটির সঙ্গে ওরা যা হয়েছে, তা ওরা দু'জনে বুঝে নেবে!

ঢ্যাঙা লোকটি বললো, আপনি ফের বকবক করছেন! যান ভাগুন, কাটুন এখান থেকে!

প্রতাপ আবার দৃঢ়ভাবে বললেন, না, তুমি আগে ছাড়ো ওকে! কিংবা ওকে পুলিশের হাতে দেওয়া হোক, ফাঁড়ির মোড়ে পুলিশ আছে।

সেই লোকটি এবার হিংস্র মুখখানা ফেরালো প্রতাপের দিকে। তারপর ডান হাতের পাঞ্জাটা ওপরে তুললো, সেটা চকিতে প্রতাপের নাকের ওপর ঠেসে ধরে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, ভাগ শাল্লা! আমি কে চিনিস না? পুলিশ দেখানো হচ্ছে! আমার মুখের ওপর কতা!

লম্বা মাতালটির গায়ে বেশ জোর। সেই এক ধাক্কায় প্রতাপ ছিটকে পড়ে গেলেন রাস্তার একধারে। কিছু লোক ভয় পেয়ে দৌড়ে সরে গেল, একটা কেউ প্রতিবাদ জানালো না।

এরপর ব্যাপারটা চুকতে মিনিট দু'এক লাগলো। যুবকটি তেজ দেখিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতেই কিল-ঘুষি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল তার ওপরে, মেয়েটিকে চলে যাবার রাস্তা করে দেওয়া হলো। রিকশাওয়ালাটি আগেই পালিয়েছে। যুবকটি বেশি চিৎকার করার সুযোগই পেল না, কেননা গণ-বিচারকদের ক্রুদ্ধ হুংকারের জোর অনেক বেশি, তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হলো পাশের একটা অন্ধকার গলিতে। মোটর সাইকেলটি আগেই তার হাতছাড়া হয়েছে।

যুবকটি যদি শেষ পর্যন্ত খুন না হয়, তা হলে এটা কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাই নয়। সাধারণত কিছুটা বেশ জোর মারধরের পর ভিকটিমকে একটুখানি সুযোগ দেওয়া হয় পালাবার। সে তখন প্রাণভয়ে ছোটে, নিজের সম্পত্তির কথা ভুলে। মোটর সাইকেলটি টুকরো টুকরো হয়ে আজ রাতের মধ্যেই বিক্রি যাবে মল্লিকবাজারে।

ভিড় মিলিয়ে গেছে, রাস্তা আবার স্বাভাবিক। যানবাহন চলছে। পথচারীরা নানা রকম কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, কেউ হাসছে, কেউ বিষণ্ণ, কেউ নিজের ওপরেই বিরক্ত।

প্রতাপ যেমনভাবে পড়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই আধশোওয়া অবস্থায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রইলেন। তিনি অজ্ঞান হননি, খুব যে তাঁর আঘাত লেগেছে তাও নয়, নিজের চেষ্টাতেই তিনি উঠে দাঁড়াতে পারতেন, কিন্তু তাঁর মন নিশ্চল হয়ে গেছে। দৃষ্টি স্থির। এখনো লোডশেডিং চলছে। সেইজন্য কেউ তাঁকে দেখতেও পাচ্ছে না। দু'একজন পথ-চলতি লোকের পা লাগছে তার গায়ে, কেউ কেউ চমকে উঠছে, কিন্তু একজন মানুষ না জন্তুর গায়ে পা লাগালো তা দেখবার জন্যও কেউ এই অন্ধকারে থামে না।

বেশ খানিকক্ষণ পর উল্টোদিকের একটি দোকানঘর থেকে একজন লোক টর্চ হাতে নিয়ে এলো এদিকে। প্রতাপের সামনে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ও দাদা, আপনার বেশি লেগেছে নাকি? উঠতে পারছেন না?

প্রতাপ কোনো উত্তর দিলেন না।

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, শিরদাঁড়ায় চোট লেগেছে? আমি ধরবো আপনাকে?

প্রতাপ এবারে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন।

লোকটি টর্চ ফেলে প্রতাপকে ভালো করে দেখলো। তারপর জিভে আফসোসের শব্দ করে বললো, এঃ! ভদ্দরলোক, আপনার অনেক বয়েসেও হয়েছে দেখছি, কেন ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন? আমি তো আমার দোকান থেকে দেখছিলুম, তখন ভয়ে এগোইনি, ওরা সব মস্তান-গুন্ডা, ওদের সঙ্গে কি ভদ্দরলোকেরা পারে? বেশি কিছু বলতে গেলে ছুরি চালিয়ে দেয়।

প্রতাপ তবু কোনো কথা বললেন না। মানুষের সঙ্গে কথা বলার ভাষা যেন তাঁর শেষ হয়ে গেছে।

লোকটি আরও দু'চারটি সান্ত্বনার বাক্য বললো, তার দোকানে প্রতাপকে একটু বসে বিশ্রাম নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলো, প্রতাপ তাতেও রাজি হলেন না।

লোকটি বললো, তা হলে একটু পা-চালিয়ে চলে যান। একটু সাবধানে থাকবেন। এই যে আপনি

ওদের কাজে বাধা দিতে গেসলেন, আপনাকে ওরা চিনে রাখলো, আবার এ পাড়ায় দেখলেই ধরবে।

প্রতাপ হাঁটতে আরম্ভ করলেন। সেই হাজরা রোড থেকে যাদবপুর পর্যন্ত পুরোটাই তিনি হেঁটে এলেন একটা ঘোরের মধ্যে। তাঁর জামায় এবং একটা হাতে জল কাদা মাখা, তা একটু মুছে নেবার কথাও মনে পড়লো না। তাঁর মন সম্পূর্ণ অবশ, রাগ বা দুঃখের ও অনুভূতি নেই।

এতখানি রাস্তা আসার সময় তিনি যে গাড়ি চাপা পড়েননি, সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

নিজের বাড়িটা চিনতে তাঁর ভুল হলো না, তিনি সদরের তালা খুললেন। দোতলায় এসে দ্বিতীয় তালাটাও খুললেন ঠিক মতন। তারপর হাত-পা না ধুয়ে, জামা না খুলে তিনি একটা দাঁড় করানো পুতুলের হঠাৎ এলিয়ে যাবার মতন পড়ে গেলেন বিছানায়। তারপর তিনি ঘুমের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

প্রায় ঘণ্টা চারেক বাদে তাঁর ঘুম ভাঙলো। প্রথমে চোখ মেলে তিনি নিজের পরিপার্শ্বটা চিনতে পারলেন না। এটা কার বাড়ি কিংবা কোন্ দেশ? তিনি কি সমুদ্রে ভাসছেন? না, পিঠের নীচে বিছানা, সেই বিছানাটা দুলছে কেন? মাথাটা বিষম ভারী, তিনি মাথা তুলতে পারছেন না।

আরও একটু পরে তিনি আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। দেয়ালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তিনি সুইচ টিপলেন, অন্ধকার রইলো এক রকমই, বিদ্যুৎ হয়তো এর মধ্যে একবার এসে প্রস্থান করেছে আবার।

এদেশে সবাই এখন অন্ধকারে অভ্যস্ত। নিজের বাড়ির মধ্যে হাঁটাচলা করার কোনো অসুবিধে নেই। রান্নাঘরে গিয়ে মোমটা খুঁজতে হবে, একথা প্রতাপের মনে পড়লো। তবু তিনি একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিজেকে একটা অন্যরকম মানুষ মনে হচ্ছে কেন? সারা বুক জুড়ে একটা ব্যাথা ভাব। পা ফেলতে আগলা আগলা লাগছে, অথচ পায়ে তো চোট লাগেনি।

মাথাটা দু'বার ঝাঁকিয়ে তিনি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন। সন্ধেবেলা একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেছে তা তাঁর মনে পড়েছে, কিন্তু সে জন্য রাগ হচ্ছে না কেন? যেন অন্য কারুর জীবনের ঘটনা, তিনি শুনেছেন মাত্র। দৃশ্যটাও তিনি দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু একজন গুন্ডার হাতে ধাক্কা খেয়ে যে প্রতাপ মজুমদার পড়ে যাচ্ছেন, তিনি আর এখনকার এই প্রতাপ মজুমদার এক নন। ওটা একটা ছবির অংশ। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল।

মোমবাতিটা জ্বেলে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করলেন। এতক্ষণ খোলা ছিল, চোর ঢুকতে পারতো। এ পাড়ায় খুব চোরের উপদ্রব। বেশ রাত হয়েছে, রাস্তায় কোনো শব্দ নেই। নানু আজ রাতেও থাকবে না, সেটা ঠিকই ছিল। বিকেল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, প্রতাপের খিদে পাবার কথা, কিন্তু খিদের কোনো বোধ নেই।

দোতলায় চারখানা ঘর, তার মধ্যে একখানাই শুধু স্বামী-স্ত্রী ব্যবহার করেন। বাকি তিনখানা ঘর সাজিয়ে রাখা হয়েছে, কখন ছেলেমেয়েরা আসবে। বাবলু-শর্মিলা এলে যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, সে জন্য মমতার ব্যবস্থায় ত্রুটি নেই। ওরা এই নতুন বাড়িতে একবারও আসেনি, প্রত্যেক বছরই শীতকালে আসবে বলে ভাবে, একটা না বাধা পড়ে যায়।

ওই ঘরগুলোও একবার দেখা দরকার। অন্ধকারের মধ্যে কেউ ঢুকে পড়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। জমাট অন্ধকারের মধ্যে শীর্ণ মোমের আলোয় প্রতাপকে একটা অদ্ভুত ছায়ামূর্তির মতন মনে হয়।

অনেকদিন আগে বিমানবিহারী একটা রিভলভার দিয়েছিলেন প্রতাপকে। তাঁর নামে লাইসেন্সও করা আছে। এর মধ্যে প্রতাপ কয়েকবার সেটা ফেরত দিতে চেয়েছিলেন, বিমান খালি বলেন, থাক না, ব্যস্ত হবার কী আছে?

আলমারি খুলে রিভলভারটা বার করে তিনি প্রত্যেকটা ঘর ঘুরে ঘুরে দেখলেন। একটা জানলায় শব্দ হচ্ছে, সেটা বন্ধ করে দেবার আগে রাস্তায় একবার উঁকি দিলেন, একেবারে জনশান। তবু প্রতাপ রিভলভারটা উঁচু করে ধরে আছেন। বাইরে বেরুবার সময় কোনোদিন এটা সঙ্গে নেন না। মমতা মাথার দিব্যি দিয়েছেন, তাঁর বদমেজাজী স্বামী হঠাৎ একটা কিছু করে বসতে পারেন, মমতার সব সময় এই ভয়। আজ যদি রিভলভারটা সঙ্গে থাকতো তা হলে প্রতাপ নির্ঘাৎ ওই ঢ্যাঙা শয়তানটাকে গুলি করতেন। সেটা কি কোনো অন্যায় হতো?

নানু সব রান্না করে গুছিয়ে রেখে গেছে। রুটি, আলু-পেঁয়াজের তরকারি, মুলো দিয়ে কচ্ছপের

মাংস, এটা প্রতাপের খুব পছন্দের খাবার, মমতা কচ্ছপের মাংস খান না, তাই অন্য সময় আনা হয় না। আর গাজরের হালুয়া। সব কটার ঢাকনা খুলে দেখতে দেখতে প্রতাপের হঠাৎ মনে পড়লো, পাখার গুদামের কর্মচারিটি তাঁকে বলেছিল, মাটির তলায় যা জন্মায় আপনি সেগুলো আর খাবেন না। কেন বলেছিল এ কথা? লোকটি কিন্তু মতলববাজ নয়।

তিনি নিজেই খাবার গরম করে নিতে পারেন। তবু আজ আর স্টোভ জ্বালালেন না। মোমটা আর রিভলভারটা টেবিলের ওপর রেখে তিনি খেতে বসলেন। একটুখানি রুটি ছিঁড়ে, তার মধ্যে তারকারি মাখিয়ে হাতে ধরে রইলেন। আজ না খেয়েও চলে। বুকটা খুব ভারী ভারী লাগছে, মনে হয় যেন গলা দিয়ে, বুক পেরিয়ে খাদ্যগুলো নীচে নামতে পারবে না, মাঝখানে কোথাও আটকে যাবে। মুলো দিয়ে কচ্ছপের মাংস খেতে ভালোবাসাতো যে প্রতাপ মজুমদার, সে অন্য লোক। আজ তাঁর ওইসব খাদ্যে কোনো আসক্তিই নেই।

তারপর তিনি দেখলেন, তাঁর বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে চাপ চাপ কাদা। তাঁর ডান হাতের পাঞ্জাটাও নোংরা। খেতে বসার আগে তিনি এমনিতেই প্রত্যেকদিন হাত ধুয়ে নেন, আজ রাস্তার ধুলো কাদার মধ্যে অনেকক্ষণ শুয়েছিলেন, তার পরেও বাড়ি ফিরে স্নান করেননি। তাঁর সমস্ত শরীরটাই নোংরা। কিন্তু যেন তাতে কিছু যায় আসে না।

মোমটা নিবু নিবু হয়ে আসছে। আর কি মোম আছে? উঠে খুঁজতেও ইচ্ছে করছে না। বিমর্ষতায় ভরে যাচ্ছে বুক। কেন এমন হচ্ছে আজ? সন্ধেবেলার ঘটনাটার জন্য দোষ তো তাঁরই। উল্টোদিকের দোকানদারটি ঠিকই বলেছিল, ওইসব গুন্ডা-মস্তানদের সঙ্গে কি শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা পারে? ওরা অনায়াসে যে-সব খারাপ কথা বলে, লোককে ধাক্কা মারে, পেটে ছোরা বসিয়ে দেয়, ফস করে পাইপগান চালায়, তা কি ভদ্র মানুষের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব? সবাই এড়িয়ে যায়। এই রকমই চলতে থাকবে।

একটা নিম্নশ্রেণীর লোক তাকে অকারণে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, অত লোকের সামনে, কেউ প্রতিবাদ করলো না? ভদ্রতা-সভ্যতা কি উঠে গেল এদেশ থেকে? পানের দোকানের যে-ছোকরাটি চুরুট কিনতে এসেছিল, সেও তো বলতে পারতো, এই ভদ্রলোক আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছেন, এঁকে দিয়ে নাও, তারপর আমার চুরুট দেখিয়ো।

মোটর সাইকেল-চালক ছোকরাটি অবশ্য অন্যরকম। সে ফিরে এসেছিল। আজকালকার তরুণদের মধ্যে এরকমও তো আছে। ওর চোখে মুখে প্রতাপ একটা সততার দীপ্তি দেখতে পেয়েছিলেন। সেই ছেলেটির ওই পরিণতি। কেউ বাধা দেবে না? রাস্তার সব লোক তো খারাপ হতে পারে না, কিন্তু যারা অসৎ নয় তারা সবাই ভীতু? সেই ছোকরাটিকে একেবারে মেরে ফেললো কি না, তাই-ই বা কে জানে! আজকাল খুন তো জলভাত, কাগজ খুললে রোজই চোখে পড়ে। একটু রাজনীতির রং মেশাতে পারলে পুলিশও ছোঁয়া না। ছেলেটিকে যদি প্রাণে না মেরে পঙ্গু করে দেয়, সে খবর ছাপাও হবে না।

সেবার আমেরিকায় গিয়ে প্রতাপের মনে হয়েছিল এখানে টাকা রোজগারের জন্য তাঁর দেশের ছেলেমেয়েরা দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে আছে কিন্তু এখানকার সমাজে তাঁদের কোনো স্থান নেই, মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে তাদের যোগ থাকে না, তাদের সেন্স অফ বিলংগিং হয় না। রাস্তায় কোনো গন্ডগোল হলে তারা ভাবে, এটা আমাদের ব্যাপার নয়। পাশে দাঁড়িয়ে দুটি আমেরিকান ঝগড়া বা তর্ক করলেও এরা কোনো পক্ষ নেবে না। কালো লোক বলে কোনো দোকানদার যদি তার প্রতি সরাসরি অপমান না করে স্রেফ অবজ্ঞার ভাব দেখায়, ইচ্ছে করে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে, তারও কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না, অন্য দোকানে চলে যাবে। বর্ণবিদ্বেষের কোনো স্পষ্ট প্রমাণ প্রতাপের চোখে, পড়েনি, কিন্তু অনুভব করেছেন, সেটা চাপা ভাবে অনেকের মধ্যে আছে। সেটা অস্বাভাবিকও তো নয়। কালোর চেয়ে ফর্সা লোকেরা সব জায়গাতেই তো বেশি খাতির পায়।

আজ প্রতাপ বুঝলেন, নিজের দেশে থেকেও তো সবসময় সব কিছুতে অংশ নেওয়া যায় না। রাস্তায় কোনো গন্ডগোল হলে আজকাল সবাই পরামর্শ দেয়, ওতে মাথা গলিও না। পাশের বাড়ির একটা ছেলে বখামি করলে তাকিয়ে না তার দিকে, তাকে কিছু বলতে যেওনা, বলতে গেলে নিজের মান নষ্ট হবে। এইসব ব্যাপারে নিয়ে বড়জোর খবরের কাগজে চিঠি লেখা যায়।

প্রতাপ ভাবলেন, তিনি নন, অন্য একজন প্রতাপ মজুমদার, যিনি চেয়েছিলেন নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে সাধ্যমতন স্বাচ্ছন্দ্য দিতে, বাস্তুচ্যুত হয়ে, পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েও যে মানুষটি অতিরিক্ত পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেছেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সৎ থাকার চেষ্টা করেছেন, কারুর কাছে মাথা নীচু করেননি, সেই মানুষটি আজ চরম একা। ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে থাকে না, তাদের এখন নিজস্ব জীবন আছে। পাড়ার লোক বা অল্প চেনারা খানিকটা সম্ভ্রমের সঙ্গে বলে, আপনার ছেলে তো আমেরিকায় থাকে? কিসের জন্য এই সম্ভ্রম? তিনি-চার বৎসর অন্তর সেই ছলে একটা ক্যামেরা বা রেডিও বা কিছু বিদেশী পারফিউম নিয়ে আসবে, তার টুথ পেস্টটা দেখেও অন্যরা বলবে, আহা কী সুন্দর! মাঝে মাঝে নিয়মরক্ষার জন্য চিঠি বা কিছু টাকা পাঠাবে। সেই প্রতাপ মজুমদার আজ এক গুণ্ডার হাতে ধাক্কা খেয়ে রাস্তার নর্দমার পাশে শুয়েছিল, তাকে কেউ চেনে না, ওইটাই তাঁর যোগ্য স্থান।

হ্যাঁ। অন্য প্রতাপ মজুমদার, তিনি নন। এখন তাঁর কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

প্রতাপ টের পাচ্ছেন না, তাঁর গাল বেয়ে টপ টপ করে জল গড়াচ্ছে খাবারের থালায়। বারবার একটা কথাই মনে পড়ছে, আমাকে এখন আর কারুর কোনো প্রয়োজন নেই, আমি অপ্রয়োজনীয়, আমি অপ্রয়োজনীয়।

দপ করে আলো জ্বলে উঠলো। এখন এই আলোটারও যেন কোনো প্রয়োজন ছিল না। সব কিছু কেমন যেন ক্যাটক্যাট করছে এই আলোতে। এখন লোকে ঘুমোবে, এখন আলো না থাকলেও চলে। প্রতাপের মতন ক'জনই বা এখন জেগে থাকে? সন্ধের সময়, যে-সময়টা সভ্য মানুষ বই-টই পড়ে, গান-বাজা শুনতে চায়, সেই সময়েই অন্ধকারে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। সেই সময় অন্ধকার রাস্তায় অনেক কিছু ঘটে যায়।

প্রতাপ এবার খাওয়ার চেষ্টা করলেন। সবটাই তাঁর তেতো লাগলো। তিনি এক ঝটকায় প্লেট, বাটিগুলো ফেলে দিলেন মাটিতে, নিস্তব্ধতার মধ্যে বেশ জোরে ঝনঝন শব্দ হলো, একটা দুটো প্লেট ভাঙলো। প্রতাপ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রিভলভারটার দিকে।

একটু পরেই তিনি ভাবলেন, এরা রাগ তো তাঁর নয়, অন্য প্রতাপ মজুমদারের। যে-লোকটি মূর্খের মতন সারাজীবন খেটেখুটে শুধু একটা পরিবার গড়ে তুলতে চেয়েছিল, বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ভূমিকার কথা কিছু ভাবেনি। নিজের পরিবারের মানুষজনের কাছে তার অনেক কিছু প্রত্যাশা ছিল বলেই এখন তার মেধা বিরাট ব্যর্থতাবোধ ও হতাশা আসা সম্ভব। মূর্খ। মূর্খই তো সে। আজকালকার দিনে ছেলেমেয়েরা কি কাছে থাকতে পারে সব সময়। একটা ছেলে গেছে অপঘাতে, সে বেঁচে থাকলেও কী রকম হতো কেজানে! অন্য ছেলে তার কাজের সুবিধের জন্য বিদেশে থাকে, সে এখন নিজের পরিবার গড়বে, সেটাই তো স্বাভাবিক, সে বাপ-মাকে নিয়ে সর্বক্ষণ মাথা ঘামাবে কেন? স্নেহ-মমতা অনেকটা জলের মতনই স্বাভাবিকভাবেই নিম্নগামী।

প্রতাপ মেঝে থেকে বাসনপত্রগুলো আবার কুড়োলেন। আর একটা কথা তাঁর মনে পড়লো। অন্ধকারের মধ্যে একটা লোক টর্চ জ্বেলে উল্টোদিকের দোকান থেকে তাঁর হাত ধরে তুলতে এসেছিল। এইরকম লোকও তো আছে। কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, কেউ হাত ধরে তোলে। তিনি ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটির ভূমিকাটা তো অনুসরণ করতে পারেন।

সব বাতি নিবিয়ে, রিভলভারটা বালিশের তলায় রেখে প্রতাপ শুয়ে পড়লেন। তিনি আর আগেকার প্রতাপ মজুমদার নন, এই ভেবে হৃষ্ট বোধ করলেন খানিকটা।

পরদিন ঘুম ভাঙলো বেশ দেরিতে। কোনো তাড়া নেই অবশ্য। নানু এখনো আসেনি, তিনি নিজেই চা করে নিলেন। খবরের কাগজ নীচে দিয়ে যায়, সেটা আনতে গিয়ে সিঁড়ি বাভার সময় তিনি টের পেলেন, তার শরীরটায় তেমন যুত নেই। বুকের মধ্যে একটা চাপ চাপ ভাব। মাঝে মাঝে খুকখুক করে কাশি আসছে। চোরা ঠাণ্ডা লেগে গেছে বোধহয়। নিজের শরীর খারাপের ব্যাপারটা তিনি গুরুত্ব দেন না, বিকেলের দিকে একবার ব্লাড প্রেশারটা চেক করাবেন ভাবলেন।

চা খাওয়ার খানিক পরেই অলি এসে উপস্থিত। সে ঝলমলেভাবে হেসে বললো, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে আমার একটা কাজ আছে, এদিকে আসতে আসতে তাই ভাবলুম, তোমার বাড়িতে একটু চা খেয়ে যাই। ব্যাচেলারের জীবন কেমন লাগছে, প্রতাপকাকা?

প্রতাপও মুচকি হাসলেন। অলির অজুহাতটা হয়তো সত্যি নয়। অলি যে শুনেছে মমতা হরিদ্বারে গেছেন, প্রতাপ একলা রয়েছেন, সেই জন্য অলি তাঁর খবর নিতে এসেছে। অলির এইসব দিকে তীক্ষ্ণ নজর।

অলি বললো, নানু কোথায়? তোমার চা কে বানিয়ে দিল?

প্রতাপ বললেন, আমি বুঝি চা করতে পারি না? আমাকে এত অপদার্থ ভাবিস! দ্যাখ, তোকে কেমন চা বানিয়ে খাওয়াচ্ছি। আর কি খাবি, বল? আমি ভালো ওমলেটও বানাতে পারি।

অলি বললো, থাক আর ওমলেট লাগবে না। আমি খেয়ে এসেছি।

কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে সে একটা টিফিন কৌটো বার করে বললো, এতে একটু আতার পায়েস এনেছি তোমার জন্য। তুমি মিষ্টি খাও না বললে চলবে না, এটুকু তোমায় খেতে হবে। বুলি রেঁধেছে কাল রাত্তিরে। বুলি নানারকম রান্না খুব ভালো পারে, জানো তো?

প্রতাপ বললেন, ঠিক আছে, খাবো। আতার পায়েস? কখনো খাইনি।

অলি আর একটা কাগজের বাক্স বার করে, এতে আছে কয়েকটা চিকেন প্যাটিজ। টাটকা। আজ সকালেই বানানো হয়েছে।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, আর কী কী এনেছিস?

অলি বললো, কাকীমা নেই, বাড়িটা ভীষণ খালি খালি লাগছে। ও হ্যাঁ, বুলি বলে দিয়েছে, এই শনিবার ওর গানের প্রোগ্রামটা দেখাবে টি ভি-তে, তুমি দেখো।

প্রতাপ বললেন, দেখবো। এমনিতো টি ভি খোলাই হয় না, মমতাই ওসব দেখে, কিন্তু বুলির গান অনেকদিন শুনিনি। হ্যারে, বুলি একদিন আমার কাছে খেতে চেয়েছিল। নানু আজ থেকে থাকবে। তোরা কাল দুপুরে আমার এখানে খেতে আয় না! আমি বাজার করবো, নানু খুব খারপ রাঁধে না, ইচ্ছে করলে তুই আর বুলিও এখানে এসে কিছু রাঁধতে পারিস, বেশ পিকনিকের মতন হবে।

অলি বললো, এইরে, তুমি আগে বললে না? আমি যে আজ বিকেলের ট্রেনে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছি, সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে।

– হঠাৎ ঝাড়গ্রাম যাবি কেন?

– বিনপুরে কৌশিক পমপম থাকে না? ওদের কাছে যেতে হবে। পমপম খবর পাঠিয়েছে।

–কৌশিক ওই গ্রামের ইস্কুলেই রয়ে গেল? ও দিকে অন্য কোনো ভালো কাজ টাজ পেতে পারতো না?

–প্রতাপকাকা, যার যেখানে ভালো লাগে, সে সেখানেই থাকবে। ওরা দু'জনে ওখানে বেশ মজাসে আছে।

–এখনও বুঝি পলিটিক্যাল অ্যাকটিবিটি চালিয়ে যাচ্ছে ওদিকে?

–ওই যে বললুম না, যার যা ভালো লাগে, সে সেটাই করবে!

প্রতাপ রান্নাঘরে এসে চা বানাতে লাগলেন, অলি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলো। প্রতাপ লক্ষ করলেন, একটু যেন রোগা হয়েছে অলি, কিন্তু তার মুখে কোনো মালিন্য নেই। মেয়েটা কি সুখেই আছে? অলিকে কখনো, মন-মরা অবস্থায় দেখেননি তিনি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অজুহাতটা বোধহয় একেবারে মিথ্যে নয়। চা খাওয়ার পর অলি চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। প্রতাপের খুব ইচ্ছে অলি আর একটু থাকুক। অলির উপস্থিতিতে যেন বাড়িটা ভরে গেছে।

বসবার ঘরের দেওয়ালে প্যারিস থেকে কিনে আনা একটা রেমব্রাণ্টের ছবি বাঁধানো, সেটা একটু বেঁধে গেছে, অলি সোজা করে দিয়ে বললো, প্রতাপকাকা, আমি তাহলে যাই? লক্ষ্মী হয়ে থেকো, কাকীমা নেই বলে তুমি যেন যতখুশী অনিয়ম করো না। ঠিক সময়ে খাবে।

–তুই ঝাড়গ্রাম থেকে কবে ফিরবি?

– আমার এখন কলেজ ছুটি, হয়তো দিন সাতেক থাকবো, একটু বেশিও হতে পারে। পমপমের শরীর ভালো না জানোই তো!

–হ্যাঁ রে অলি, তুই আমার খবর নিবি, পমপমের সেবা করতে যাবি, যার যখন অসুবিধে হবে তোকে দৌড়ে যেতে হবে, এসব তো বুঝলুম, কিন্তু তোর কথা কেউ ভাবে?

– কেন ভাববে না কেন? অনেকেই ভাবে। তুমি ভাবো না?

– অলি, একটা সত্যি কথা বলবি? বিয়ে তো করলি না, কিন্তু তুই কারুকে ভালো বাসিস না? সেরকম কেউ নেই?

অলি মুখ ফিরিয়ে, খুব যেন অবাক হবার ভাব করে বললো, বালোবাসার কেউ নেই? কী বলছো তুমি? আমি তোমাকে ভালোবাসি, বাবাকে ভালোবাসি, কৌশিককে ভালোবাসি, অনুপম, তপন, বাবুলদাকেও ভালোবাসি। আমার কি ভালোবাসার লোকের অভাব? আরও আছে।

–তুই বাবলুর নামটাও বললি? তার সঙ্গে তোর দেখা হয় না কত বছর....

–ভালোবাসতে দোষের কী আছে? দেখা না হলেও ভালোবাসা যায়। তবে, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি শৌনককে।

–ওঃ, তোর মাথা থেকে এখনও সেই ভূত যায়নি। তুই আজও সেই ছেলে-মানুষটিই রয়ে গেলি!

চোখ গোল গোল করে দুষ্টুমির ভঙ্গিতে অলি বললো, তোমাকে আর একটা গোপন কথা বলি, প্রতাপকাকা। শৌনককে আমি যদিও বিয়ে করিনি, তবু মাঝে মাঝে সে রাত্তিরে আমার পাশে বিছানায় শুয়ে থাকে।

অলি বেশ জোরে হেসে উঠতেই প্রতাপের ইচ্ছে হলো তার হাত ধরে বলতে, অলি, তুই এখুনি চলে যাসনি। আর একটু থাক।

কিন্তু মুখ ফুটে সেটা বলা গেল না। তিনি অলির সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন একতলায়। প্রতাপের বুকটা টনটন করতে লাগলো অলির জন্য। অলি কয়েকদিন কলকাতায় থাকবে না, এখন কলকাতাটা তাঁর আরও ফাঁকা মনে হবে।

অলি এগিয়ে গেল বাস স্টপের দিকে, প্রতাপ দেখলেন নানু ফিরছে, অলির সঙ্গে সে তো দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সদর দরজাটা খোলা রেখে প্রতাপ ওপরে উঠতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর পা দুটো যেন অসাড় হয়ে এলো, তিনি এক পা এক পা করে উঠতে যেন প্রচুর পরিশ্রম করছেন। বুকটা যেন ফেটে যেতে চাইছে। কিছু একটা বেরিয়ে আসতে চাইছে বুক থেকে। তিনি থেমে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলেন। এরকম তাঁর কখনো হয়নি আগে। এটা একটা বড় রকমের অসুখ? তিনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকবেন?

প্রতাপের মনে পড়লো, বিছানায় বালিশের তলায় রিভলভারটা আছে। যে প্রতাপ মজুমদার হাজরা রোডে একটা গুণ্ডার ঘৃণার ধাক্কায় নর্দমায় পড়ে শুয়ে ছিল, তার পক্ষে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থেকে অন্যের সেবা নেওয়া মানায় না। সে অধিকার তার নেই।

প্রতাপ ছুটে ওপরে উঠতে গেলেন, একটুও না উঠে তিনি পড়ে গেলেন সিঁড়িতে। পড়তে পড়তে ফিসফিস করে তিনি ডাকলেন, অলি, অলি...

॥ ৭ ॥

টুং করে একটা শব্দ হতেই অতীন মুখ তুলে ওপরে তাকালো। আসন-বন্ধনী আটকে নেবার ও ধূমপান নিষেধের নির্দেশ জ্বলে উঠেছে। এর মধ্যেই এসে গেল ডেনভার? কী করে যে সময়টা কেটে গেল, অতীন খেয়ালই করেনি। বিমানে উঠেই সে ফাইল খুলে অফিসের কাগজপত্রে ডুব দিয়েছিল। নতুন কিছু যে পড়ার আছে কিংবা কিছু তথ্য মুখস্থ করে রাখা দরকার তা নয়। এই শিক্ষাটা সে তার সহকর্মী জিমি গারনারের কাছে থেকে নিয়েছে, অফিসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে গেলে সব সময় মাথায় ঐ চিন্তাটাই রাখতে হয়, অন্য কোনো চিন্তার স্থান দিতে নেই, তাতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ক্ষিপ্রতা বাড়ে। গত পাঁচ দিন ধরে সে প্রত্যেক সন্ধেবেলা আকাশে উড়ছে। দিনের বেলা এক শহরে, রাত্তিরটা অন্য শহরে।

ফাইলটা বন্ধ করে সে হাত-সুটকেশে রাখলো। বিমানযাত্রা তার কাছে এমনই একঘেয়ে যে সে সহযাত্রীদের দিকেও তাকায় না। সে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখলো। নীচে ডেনভার নগরের আলোর আলপনা দেখা যাচ্ছে। অতীন এর আগে ডেনভারে আসেনি। এবারেও না-আসার মতনই কলোরাডো রাজ্যের গভীর অরণ্যানী ও পর্বতের সৌন্দর্য বিশ্ববিখ্যাত, চোদ্দ হাজার ফিটের ওপর তুষারময় পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে হাই ওয়ে আছে এখানে, কিন্তু অফিসের কাজে এলে কেউ সে সব দেখে না।

অতীন ডেনভার শহরের ডাউন টাউন ছাড়া কিছু দেখবে না। এদেশের সব শহরের ডাউন টাউন প্রায় একই রকম চোখ ধাঁধানো অথচ কৃত্রিম। কংক্রিট, ইস্পাত ও কাচের যথেচ্ছাচার।

হলিডে ইন হোটেলে রাত্রি যাপন, সকাল ঠিক সাড়ে ন'টায় এক কারখানার দু' নম্বর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সেই আলোচনা মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত গড়াবে। তারপর আর একজনের সঙ্গে চুক্তিপত্রের খসড়া নিয়ে আলোচনা। পাঁচটা দশে আবার বিমান ধরতে হবে নিউ মেক্সিকোর সান্টা ফে-তে যাবার জন্য। কোম্পানীর দূত হয়ে অতীনকে বিভিন্ন কারখানায় ঘুরতে হচ্ছে। কোম্পানি তাকে বুমেরাং-এর মতন ছুঁড়ে দিয়েছে, ঠিক ঠিক জায়গায় আঘাত করে তাকে ফিরতে হবে সোমবারের মধ্যে। এর মধ্যে তাকে একটুও মচকালো চলবে না।

ভুল করে অতীন সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, প্যাকেটটা রেখে দিল জ্যাকেটের পকেটে। সিদ্ধার্থ সিগারেট ছেড়েছে, বন্ধুরা আরও অনেকে ছেড়ে দিয়েছে, অতীন পারছে না। জরুরি কাজের টেনশানে ধূমপান আরও বেড়ে যায়। অন্যমনস্কভাবে সে একবার দেখে নিল টাই-এর গিঁটটা। আজ সারাদিন সে এতই ব্যস্ত ছিল যে খবরের কাগজ পড়ারও সময় পায়নি। এখনও তিন চার মিনিট সময় আছে, সে তুলে নিল লস এঞ্জেলিস টাইমসের গোছাটা। প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নিল দ্রুত। অনেকদিনের অভ্যেস, আগেই দেখে নেয় ভারতবর্ষের কোনো খবর আছে কি না। নেই, প্রায় কোনোদিনই থাকে না। না থাকলেই নিশ্চিন্ত লাগে। কোনো বড় রকমের দুর্ঘটনা, খুনোখুনি বা দুঃসংবাদ থেকে দেশটা তাহলে অন্তত একদিনের জন্য মুক্ত আছে।

পৃথিবীটা ইদানীং ছোট হয়ে আসছে। কিন্তু ইন্ডিয়া এখান থেকে অনেক, অনেক দূরে।

কয়েকদিন ধরেই এখানকার কাগজগুলো পোল্যাণ্ড নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। ছোট্ট একটা দেশ, তাকে নিয়ে চার কলম হেড লাইন। সেখানকার শ্রমিকরা সরকার-বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে, সেই ছবিও যোগাড় করেছে এরা। পোল্যাণ্ডের শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে অ্যামেরিকানদের কত মাথাব্যথা আর দরদ! অতীন ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো।

অতীনের মনে পড়লো জিমি গারনারের কথা। অফিসের এই সহকর্মীটির সঙ্গেই অতীনের সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব। অবশ্য প্রায়ই তার সঙ্গে খুব তর্কাতর্কি, ফাটাফাটিও হয়। জিমি ইচ্ছে করে অতীনকে মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে দেয়। কিছুদিন আগে এখানকার কাগজে উড়িষ্যার কালাহাণ্ডিতে দুর্ভিক্ষে মানুষ মরার সংবাদ বেরিয়েছিল। জিম বলেছিল, ওটিন, দু'বছর আগে কিউবার কানকুন শহরে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে যোগ দিতে তোমাদের প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন মনে আছে? সেখানে তিনি বলেছিলেন, ভারতে এখন যথেষ্ট খাদ্যশস্য জন্মায়, ভারত আর কারুর কাছে খাদ্যের জন্য ভিখিরির মতন হাত পাতবে না! আমাদের এখানে টি ভি ইন্টারভিউতেও তিনি সে কথাই রিপিট করেছিলেন। উনি কি তা হলে মিথ্যাবাদী? এখনও তোমাদের দেশে না-খেয়ে মানুষ মরে, এখনো কলকাতার রাস্তা-ঘাটে খেতে-না পাওয়া লোকেরা শুয়ে থাকে কেন?

অতীন ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক নয়। রাজনীতি যারা করে তারা প্রত্যেকেই তো মিথ্যে কথা বলে। খাদ্যের উৎপাদন যথেষ্ট হলেও দেশের বহু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নেই। খাদ্য তো বিনামূল্যে দেওয়া হয় না। ভারতের গ্রামাঞ্চলে কোটি কোটি ভূমিহীন শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না বছরে তিন চার মাস। কোনো উপার্জন না থাকলে তারা খাদ্য কিনবে কী দিয়ে, তাই তারা না খেয়ে থাকে। ভারত রাষ্ট্র এখনো, এইসব মানুষদের কাজ দিতে পারেনি।

কিন্তু বিদেশে থাকলে প্রত্যেককেই খানিকটা রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা পালন করতে হয়। ইন্দিরা গান্ধীকে যতই অপছন্দ করুক অতীন, কিন্তু সে কথা সে জিমকে বলবে কেন? কূটনৈতিক চালে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও স্বভাব নয় অতীনের। তার ভাষায় নম্রতা কম, শব্দগুলি উগ্র ও ধারালো। জিমিকে সে বলেছিল, ইণ্ডিয়া চিরকালই গরিব দেশ, সেখানকার মানুষদের প্রাণের মূল্য নেই, তাদের নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক শহরেও ভিখিরি থাকে কেন বলো তো? এই সপ্তাহের নিউজ উইক দেখো, নিউ ইয়র্কে প্রত্যেক রাতে কতজন ভবঘুরে রাস্তায় শুয়ে থাকে, তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে!

বিমানটি ভূমি স্পর্শ করেছে, এরপর দরজা খুলতে কিছুটা সময় লাগলেও সবাই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। এক্ষুনি বেরুনো যাবে না জেনেও যেন আর দু' এক মিনিট ধৈর্য ধরে থাকতে পারে না। এই

সদা ব্যস্ততার দেশে থাকতে থাকতে অতীনেরও সেই অভ্যেস হয়ে গেছে।

বিমানবন্দরে কেউ তাকে প্রত্যুদ্গমন করতে আসবে না। সে প্রশ্নই ওঠে না। তবু প্রত্যেকবার প্লেন থেকে নেমে ভিড়ে ভর্তি চাতালটিতে এসে অতীন একবার উৎসুকভাবে মুখ তুলে দেখে। কতজন হাসছে, কেউ-কেউ হাতছানি দিচ্ছে, কেউ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে চুমু, এরা কেউ অতীনকে চেনে না।

ডেনভারে এবং কাছাকাছি অতীনের দু'একজন পরিচিত ব্যক্তি অবশ্য আছে। এই শহরেই থাকে আবিদ হোসেন, বহু বছর আগে কেমব্রিজে এর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতো অতীন, এখনও যোগাযোগ আছে। এই বাংলাদেশী ছেলেটি উন্নতি করেছে খুব, এখানে আর্কিটেক্ট হিসেবে তার নাম ছড়িয়েছে, সে বড় বড় আকাশ ঝাড় বাড়িগুলির নকশা বানায়। আবিদ খুব বন্ধুবৎসল, তার স্ত্রীর হাতের রান্না বিশ্ববিখ্যাত। আর আছে একটু দূরে বোলডার শহরে শুভেন্দু দত্ত ও তার স্ত্রী বিশাখা। অতীনের স্কুল জীবনের বন্ধু শুভেন্দু এখন মস্ত বড় অধ্যাপক, ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকালটির হেড, আর বিশাখার সঙ্গে শর্মিলার এত ভাব যে অতীনের এখানে আসার খবর পেলে ওরা জোর করে অতীনকে হোটেল থেকে বাড়িতে ধরে নিয়ে যেত।

অতীন কারুকেই খবর দেয়নি। সে তো বেড়াতে আসেনি, সে এসেছে কাজ নিয়ে। খুব কঠিন কাজ। বিজনেসের সঙ্গে প্লেজার মেশানো যায় না। অতীনের অফিসের ঠিক একধাপ ওপরের কর্তা রবার্ট ম্যাককরমিক একবার তাকে একটা প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছিল। সে বলেছিল, জানো তো, প্রতিটি সপ্তাহেরই দুটি ভাগ আছে। পাঁচ আর দুই। পাঁচদিন কাজ, দু'দিন ছুটি। পাঁচদিন তুমি একরকম, দু' দিন তুমি আলাদা মানুষ। এই দুটোকে কক্ষনো একসঙ্গে মেশাবে না। শনি-রবিবারে তুমি বাড়িতে বসে অফিসের কাজ করবে না, অফিসের কথা চিন্তাও করবে না। আমার তো এই দুটি দিন পরিবারের জন্য উৎসর্গীকৃত। আমি বাগান করি, সাঁতার কাটি, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাই, প্রতিবেশী বা বন্ধুদের সুখ দুঃখের খবর নিই। তুমি ইয়াং ম্যান, তোমরা অন্যরকম ফূর্তি-ফার্তা করতে পারো এই দুটো দিন। কিন্তু বাকি পাঁচদিন তুমি-আমি কোম্পানির ক্রীতদাস। কোম্পানি তো সেইজন্যই মাইনে দিচ্ছে, তাই না?

প্রাতরাশের সময় থেকে রাত্তিরে শুয়ে আলো নেবানো পর্যন্ত তোমাকে কাজের কথাই চিন্তা করতে হবে। এমন কি স্বপ্নেও তুমি অফিসের লোকজনদের দেখে ফেলবে। আর একটা কথা! অফিসের কাজের ব্যাপারে বাইরের কোনো পার্টির সঙ্গে যদি তোমার জরুরি কোনো কথাবার্তা থাকে, তা হলে আগের রাত্তিরটা অন্তত সাত ঘন্টা ঘুমিয়ে নেবে। সে রাত্রে পরিমিত মদ্যপান এবং ঘুমের বড়ি সেবন বাঞ্ছনীয়। রাত্রি জাগরণে মন চঞ্চল থাকে। আগের রাত্রে তুমি যদি অন্য লোকজনের সঙ্গে বেশি গল্পগাছা করো, তা হলে পরের দিনও মনের মধ্যে সেইসব কথার রেশ থেকে যায়, কাজের কথাগুলি সব যথাসময়ে ঠিকঠাক মনে পড়ে না। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিপক্ষের মনস্তত্ত্ব ঠিক মতন অনুধাবন করা, সেই জন্য তোমার মস্তিষ্কটা সব সময় একাগ্র করে রাখা উচিত। অফিসের স্বার্থে তুমি যদি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চাও, তা হলে আগের রাত্রে জমাট সাত ঘণ্টা ঘুম অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এখন প্রত্যেকদিনই অতীনকে জরুরি কথাবার্তা চালাতে হচ্ছে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কথা মনে রেখে। রবার্ট ম্যাককরমিকের উপদেশ শিরোধার্য করে সে প্রত্যেক রাতেই ঘুমের বড়ি খাচ্ছে, সকালে শরীরটা বেশ ঝরঝরে থাকে। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে অতীন একটা ট্যাক্সি নেবে। শৃঙ্খলাবদ্ধ হোটেলগুলির সব জায়গাতেই ঘর একরকম, ব্যবস্থা সমান। দু' পেগ সুরা, হালকা আহার ও ঘন্টাকয়েক টি ভি দেখা, তারপর ওষুধ খেয়েই ঘুম। আজ সন্ধেবেলা তার আর কিছুই করার নেই। পাঁচটি শহরের অভিযানের মধ্যে তিনটিতেই অতীন সার্থক হয়েছে, এখন পর্যন্ত তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সব চলছে ঠিকঠাক, আর দুটি কোম্পানীর মালিকদের ঠিকমতন তার বক্তব্য বোঝাতে পারলেই অতীন বিজয়ীর মতন ফিরবে নিউ ইয়র্কে।

অনেকদিন আগে অতীন একটা ফিল্ম দেখেছিল, নাম, 'দ্য ম্যান ইন দা গ্রে ফ্লানের স্যুট'। এমন কিছু উচ্চাঙ্গের ফিল্ম নয়। তবু সেটা অতীনের মনে দাগ কেটে আছে। নায়ক গ্রেগরি পেক। যুদ্ধ পরবর্তীকালে এদেশে মাঝারি চাকুরিজীবীরা সবাই গ্রে ফ্লানেল স্যুট পরতো। হাতে ব্রীফ কেস নিয়ে ঐ পোশাক পরা হাজার হাজার মানুষ ট্রেন থেকে নেমে ভূগর্ভ ফুঁড়ে উঠে আসতো নিউ ইয়র্ক শহরে।

তারপর অফিসের দিকে ছোটাছুটি। সারাদিন ধরে তাদের কাজ যেন মস্ত বড় একটা চাকার ছোট ছোট পেরেকের মতন। তাদের আলাদা কোনো চরিত্র নেই। সন্ধের পর বাড়ি ফিরেও একই রুটিন বাঁধা জীবন। প্রথমেই খাওয়া, তারপর বউ-বাচ্চাদের সঙ্গে দু'চারটে টুকিটাকি কথা তারপর টি ভি দেখতে দেখতে হাই তোলা। ঐ রকম একজন মানুষ গ্রেগরি পেগ। কিন্তু অফিসে কিংবা বাড়িতে হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন তার মনে পড়ে যেত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার টুকরো টুকরো ঘটনা। অন্যান্য সমর্থ আমেরিকানদের মতন তাকেও যুদ্ধে যেতে হয়েছিল। নর্মাণ্ডি উপকূলে সে একদিনে ঠাণ্ডা মাথায় একুশজন নারী-পুরুষকে খুন করেছিল গুলি চালিয়ে। একবার একটা কামানের শেলের গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে সে দুটি জার্মান কিশোরের মুখোমুখি হয়, অতি তৎপরতায় বেয়নেট চালিয়ে সে দুজনকেই গেঁথে ফেলেছিল মাটিতে। মাঝে মাঝেই তার চোখে ভেসে ওঠে সেই মৃত্যুকাতর কিশোর দুটির মুখ। এখন গ্রে ফ্লানেল স্যুট পরা এই অফিস কর্মচারীটিকে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না, সে একজন কতবড় খুনী। সে এখন আর পাঁচজনের মতনই, অফিসে কাজের সুনাম আছে, বাড়িতে সে দায়িত্বশীল স্বামী ও দুটি ছেলেমেয়ের স্নেহময় পিতা।

অতীনের পোশাক অবশ্য ধূসর নয়। সে পরে আছে একটা হালকা নীল রঙের ট্রাইপড স্যুট। সে কিছুটা লম্বা বলেই ট্রাইপ পছন্দ করে, তাতে আরও একটু লম্বা দেখায়। বহু বছর ঠাণ্ডার দেশে থাকার জন্য তার রং বেশ ফর্সা হয়েছে। অবশ্য তাহলেও এদেশে কেউ তাকে শ্বেতাঙ্গ বলে মনে করবে না, বড়জোর মিশ্রিত মেকসিক্যান ভাবতে পারে। এখনও তার মাথার চুল সমস্তই কালো। এই পোশাক ও গাম্ভীর্যমাখা মুখখানির আড়ালে তার সমস্ত অতীত চাপা পড়ে গেছে।

জিমি গারনার প্রায়ই অতীনকে ক্ষ্যাপাবার চেষ্টা করে। একদিন সে বলেছিল, আচ্ছা, ওটিন, তুমি এতটা লম্বা হলে কী করে? আমার তো ধারণা ছিল, সমস্ত ভারতীয়রাই আফ্রিকানদের মতন বেঁটে বেঁটে। গরিব জাতির পক্ষে বেঁটে হওয়াই স্বাভাবিক, যেমন ধরো ইটালিয়ানরা।

অতীন বলেছিল, দ্যাখো, মূর্খ অনেকেই হয়। কিন্তু তোমরা আমেরিকানরা, তোমাদের মতন আর কেউ মূর্খতাটা এমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জাহির করে না। তোমাদের ইতিহাস-ভূগোলের জ্ঞান দেখে আমার পিলে চমকে যায়। তোমরা নিজের দেশটা ছাড়া আর কিছু চেনো না। আফ্রিকায় পিগ্‌মিদের মতন দু' একটি উপজাতি মাত্র খর্বকায়, তুমি শুধু সেই কথাটাই কোথায় যেন শুনেছো। গড় আফ্রিকানরা বেশ লম্বা। তোমাদের দেশের কালো মানুষদের দেখেই বোঝা উচিত, তারা আফ্রিকা থেকেই বোঝা উচিত, তারা আফ্রিকা থেকেই এসেছে। মাসাই ট্রাইবের নাম শুনেছো? তারা বেঁটে হবে কেন? তুমি এদেশে পাঞ্জাবীদের দেখোনি? তুমি গত রবিবার সি বি এস চ্যানেলে চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার দেখেছিলে। তাঁর মতন দীর্ঘকায়, সুপুরুষ তোমাদের দেশে কটা আছে খুঁজে বার করো তো!

জিমি হো হো করে হেসে উঠেছিল। এই একটা এদের অদ্ভুত গুণ। মুখের ওপর কঠোর সত্য কথা শুনিয়ে ধমক দিলেও এরা হাসে। এদের ফুসফুস জোরালো, এরা যখন তখন হাসতে জানে।

জিমি হাসতে হাসতে বলেছিল, তোমাকে তোমার দেশের কথা তুলে একটু খোঁচা মারলেই তোমার গণ্ড রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে আর চক্ষু বিস্ফারিত হয়। তুমি তোমার দেশের জন্য সবসময় খুন টান অনুভব করো, তাই না? তোমার পাসপোর্টটার কথাও মনে থাকে না!

এটাও আর একটা মারাত্মক খোঁচা, অতীন যেন সর্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে ছটফট করে, ঠিক কোনো উত্তর দিতে পারে না, তখন জিমি তাকে টানতে টানতে বীয়ার খেতে নিয়ে যায়।

অতীন নিজের সুটকেসটি খালাস করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ালো, বেশ বড় এয়ারপোর্ট, সন্ধেবেলা অনেকগুলো ফ্লাইট। অবিরাম জনস্রোত ও অপেক্ষারত যাত্রী-যাত্রিণীদের মধ্যে দু' চারজন ভারতীয়ও রয়েছে। অতীন তাদের কারুর চোখে চোখ ফেলে না। শুধু ভারতীয় বলেই যে কারুর সঙ্গে অকারণে কথা বলতে হবে তার কোনো মানে নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আবার অফিসের কাজের কথাই ভাবছে। ডেনভারে যদি আলোচনা ফলপ্রসূ হয়, তাহলে সান্টা ফে-তে কাজ অনেকটা এগিয়ে থাকবে। আজ ক্যানসাস সিটিতে সে একটা মহা জেদী লোকের পাল্লায় পড়েছিল, সারা দুপুর তার সঙ্গে বাক কৌশল দিয়ে ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে। খানিকক্ষণ পরেই তার সন্দেহ হয়েছিল, লোকটি ইহুদি। নামটা জার্মান ঘেঁষা, হতেও পারে। রবার্ট ম্যাককরমিক তাকে সাবধান করে দিয়েছিল,

ইহুদিদের সঙ্গে সব সময় হিসেব করে কথা বলতে হবে। ওরা কোনো প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয় না, সব সময় একটা প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। এমনকি, তুমি যদি অতি সাধারণ ভাবে জিজ্ঞেস করো, আজকের আবহাওয়াটা খুব সুন্দর না? তার উত্তরে একজন ইহুদি বলবে, কেন, তোমার মতে কি গতকালের আকাশ কম নীল ছিল?

অ্যাংলো স্যাক্সনদের সংস্পর্শে থেকে থেকে অতীনের মনেও বোধহয় একটা সূক্ষ্ম ইহুদি-বিদ্বেষ জন্মে যাচ্ছে। এদেশে ইহুদিদের বেশ প্রতাপ, সেইজন্যই এদের সম্পর্কে একটা চাপা বিরোধিতাও রয়েছে। যতই টাকা পয়সার জোর থাক, তবু কোনো ইহুদির পক্ষে অ্যামেরিকায় প্রেসিডেন্ট হওয়া অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব নয়। অতীনের দু'একজন ইহুদি বন্ধু আছে। তারা চমৎকার মানুষ, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে অতীন দেখেছে, ওদের সঙ্গে কথার প্যাঁচে পারা খুবই শক্ত। আজ দুপুরেই অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে অতীনের মনে হয়েছিল, তাকে ক্যানসাস সিটিতে আরও দু' একটা দিন থেকে যেতে হবে। তা হলে পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো বদল করতে হতো। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অনেকটা রফা হয়েছে, তবে অনেকটাই এখনো নির্ভর করছে ডেনভারের দুটো লোকের সঙ্গে আলোচনার সার্থকতার ওপর।

এই শনি-রবিবারেও অতীনের ছুটি নেই। আলোচনাটা এমনি জরুরি যে একটি কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট সপরিবারে সান্টা-ফে শহরে বেড়াতে গেছে, অতীন সেখান যাচ্ছে সেই ব্যক্তিটি সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করতে। এই কাজটায় সময়ের একটা বিশেষ মূল্য আছে, তা বুঝেই সেই ব্যক্তিটি অ্যাপয়েন্টমেন্টদিতে রাজি হয়েছে তার ছুটির মধ্যেও। রানিং এগেইনস্ট টাইম যাকে বলে। মাথার ওপর ঝুলে আছে জাপানী খাড়া। জাপানকেই নিয়ে যত ভয়।

অতীন বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল, এখন সে একটি গ্লোরিফায়েড সেলসম্যান। তার কোম্পানি নতুন নতুন প্রোডাক্ট বার করলে অতীনের কাজ হচ্ছে অন্য কোম্পানির সঙ্গে যৌথ দায়িত্ব স্থাপন কিংবা পৃথিবীর অন্য দেশে সেই বস্তুটির উৎপাদনের ব্যাপারে টেকনিক্যাল দিকগুলি নিয়ে বোঝাপড়া করা। অতি সম্প্রতি তার কোম্পানি এক অভিনব ভূমি-সার প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাজিক ফার্টিলাইজার। এতে যে-কোনো ফসলের উৎপাদন ত্বরান্বিত ও অন্তত তিনগুণ করা যাবে। অ্যামেরিকায় এ বস্তুটির মার্কেটিং কোনো সমস্যা নয়, সে দায়িত্বও অতীনের নয়। কিন্তু চীন সম্প্রতি সে দেশে বিদেশী কোম্পানিদের কিছু কিছু কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে, দেড় শো মিলিয়ান ডলারের একটি গ্লোবাল টেন্ডার ফ্লোট করেছে সার-কারখানার জন্য। জাপান ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই সেই দেড় শো মিলিয়ান ডলারের অর্ডারটা গ্রাস করা দরকার। চার-পাঁচটি অ্যামেরিকান কোম্পানি সিণ্ডিকেট করে এই কাজ হাত দিলে চটকরে শুরু করে দেওয়া যায়। এখানকার জন্য ডিয়ার কম্পানির ক্যাটার পিলার নামে ট্রাক্টর জগৎবিখ্যাত, তারা এখন সার নির্মাণেও হাত দিয়েছে। সেই কোম্পানিরই ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে সান্টা-ফে শহরে, তাকে ভজাতে পারলেই অতীনের দ্বিগুণ পদোন্নতি কেউ আটকাতে পারবে না, মাইনে বাড়বে বছরে চব্বিশ শো ডলার। এই টাকাটা তার খুব দরকার, বাড়িটা পাল্টাতে হবে, একটা নতুন বাড়ি কেনার জন্য শর্মিলা পছন্দ করে রেখেছে। মায়ের হাত খরচের টাকাও বাড়াতে পারবে অতীন, বাবাকে সে লিখবে একটা গাড়ি কেনার জন্য। এই বয়েসে আর বাবা-মায়ের কলকাতার রাস্তায় ট্রামে-বাসে ঘোরার দরকার নেই।

সুটকেসটা ঘুরতে ঘুরতে আসছে, হঠাৎ অতীনের কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব হলো। কিছু একটা ভুল শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে, কিছু কিছু ভুল অক্ষর সে দেখেছে। এরকম শব্দ, এরকম হয় মাঝে মাঝে, আচমকা পেছন থেকে ডাক শুনতে পায়। পরিষ্কার বাংলায়। একবার সে অবিকল কৌশিকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল, কৌশিক যেন ব্যাকুলভাবে ডাকছে, অতীন! অতীন! বাবলু! সেবার অতীন ভয় পেয়েছিল, তা হলে কি কৌশিক বেঁচে নেই? তার কুসংস্কার নেই, তবু ছেলেবেলায় ঠাকুমার মুখে গল্প শোনা স্মৃতি মনে পড়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর ঠিক মুহূর্তটায় মানুষ নাকি তার ঘনিষ্ঠজনকে ডাকে, সে যতদূরেই থাকুক, ঠিক শুনতে পায়। সেটা অবশ্য মেলেনি, কৌশিক বেঁচে আছে।

সুটকেসটা তুলে নিয়ে অতীন ওপরের দিকে তাকালো। টি ভি স্ক্রিনে বিমানগুলির আগমন-নির্গমনের নির্ঘণ্ট দেখানো হচ্ছে অনবরত। অতীনের আজ আর কোথাও যাবার দরকার নেই, তবু এমনিতেই চোখ পড়ে যায়। তার বুকটা ধক করে উঠলো। জলের মতন ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে

কয়েকটি অক্ষর, সেটা আসলে তার নাম। একি সত্যি হতে পারে? নাকি তার চোখে ঘোর লেগেছে।

শুধু নাম নয়, একটি বার্তা। অতীন মজুমদার, ফ্লাইট নাম্বার এ এল সাতশো দুইয়ের সদ্য আগত যাত্রী, আপনাকে অবিলম্বে অনুসন্ধান কাউন্টারে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আপনার জন্য জরুরি সংবাদ আছে।

তারপর সে শুনতে পেল, অন্তরীক্ষে যন্ত্রস্বরেও সেই কথাই ঘোষণা করা হচ্ছে। তা হলে সে ভুল ডাক শোনেনি, ভুল অক্ষর দেখেনি। ঘোষকের বীভৎস উচ্চারণের জন্যই অতীন তার নিজের নামটা ঠিক বুঝতে পারেনি এতক্ষণ।

কে তার নামে এখানে খবর পাঠাবে? সে যে আজ এই সময়ে ডেনভার বিমানবন্দরে এসে পৌঁছোবে, তারও তো কোনো ঠিক ছিল না। বাড়ি থেকে হতেই পারে না। গত রাত্তিরে সে ছিল শিকাগোতে, সেখান থেকে শর্মিলাকে ফোন করে বলেছিল, ক্যানসাস সিটিতে তার ক'দিন থাকতে হবে, তার ঠিক নেই।

অফিসের কেউ? কাল রাতে সে জন্য ম্যাককরমিককেও ফোন করেছিলন, তারপর আর এর মধ্যে এমন কী ঘটতে পারে? তাহলে কি আবিদ হোসেন কোনোভাবে খবর পেয়ে গেল? কিংবা শুভেন্দু? ওদরে পক্ষে অতীনের গতিবিধি জানার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

ব্যাপারটা যেন ফ্রান্স কাফকার উপন্যাসের মতন। অতীন যে আজ সন্ধেবেলা এই নির্দিষ্ট বিমানটিতে ডেনভার-এ এসে পৌঁছোবে, সে বিষয়ে সে নিজেই নিশ্চিত ছিল না, টিকিট কেটেছে শেষ মুহূর্তে এয়ারপোর্টে এসে, অথচ এখানে তার জন্য একটা বার্তা অপেক্ষা করে আছে।

খুব একটা ব্যস্ততা না দেখিয়ে অতীন হাঁটতে শুরু করে দিল। অফিস থেকেই আন্দাজে কোনো খবর পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই! আবার নতুন কী ঘটতে পারে? তার কাজে কোনো ভুল হয়েছে? পুরো ডিলটাই বানচাল হয়ে গেছে, জাপানীরা মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে? কিংবা কোম্পানিটা হঠাৎ বিক্রি হয়ে গেল নাকি? আজ থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে? এদেশে তা বিচিত্র কিছু নয়।

অনুসন্ধান অফিসে একটি তরুণী মেয়ে কী সব লেখালেখিতে খুব ব্যস্ত। অতীন তার সামনে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই সে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললো, এখানে ফোন করো।

কাগজে শুধু একটা টেলিফোন নাম্বার লেখা। সেটা দেখা মাত্রই অতীনের সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে লাগলো। তার চোখে ভেসে উঠলো ছেলে আর মেয়ের মুখ। রণ আর অনীতা। নিশ্চয়ই এদের একজরেন কিছু হয়েছে। কতবড়ি বিপদ? রণী ভীষণ দুষ্টু, যখন তখন বাড়ির দরজা খুলে বেরোয়, বাড়ির কাছেই হাই ওয়ে!... অনীতা ওর এক বান্ধবীর বাড়িতে পড়তে যায়, ফেরে একলা একলা, হেঁটে হেঁটে। কতদিন অতীন শর্মিলাকে বলেছে যে মেয়ে এখন বড় হয়েছে...। দিনকাল খারাপ, গুণ্ডামি-বদমাইশি বাড়ছে হু-হু করে, ছেলেচুরি, নাবালিকা ধর্ষণ...একমাস আগেই তাদের বাড়ির কাছের লেকে গলা মোচড়ানো অবস্থায় একটি কিশোরী মেয়েকে পাওয়া গিয়েছিল...। ছেলেটা সম্পর্কেই বেশি ভয়, বেসমেন্টে একদিন ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিল...

অতীন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো, টেলিফোন বুথের দিকে যেতে তার পা সরছে না। অচেনা জায়গায় একা একা প্রচণ্ড কোনো খারাপ খবর সে সহ্য করবে কী করে? সে যে এত দুর্বল, তা সে নিজেই জানতো না। রণের কী হয়েছে? রণ আর নেই? রণ, রণ, তার প্রিয়তম সন্তান! অতীনের বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে।

অনুসন্ধান কাউন্টারের তরুণীটির চোখ সত্যি সত্যি অনুসন্ধিৎসু। সে একটা টেলিফোনে কথা বলছিল, তাতে হাত চাপা দিয়ে অতীনকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে আমি কিছু সাহায্য করতে পারি?

মেয়েটির মাথায় চুল গোলাপি রঙের, চোখের মণি নীল। ঠিক যেন একটা পুতুল। উচ্চারণে একটা ড ড ভাব আছে।

অতীন, একটা সিগারেট ধরিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলো, এই ফোন নাম্বারটা ছাড়া আর কোনো মেসেজ নেই?

মেয়েটি বললো, দাঁড়াও, দেখছি। একজন লেডি খুব ব্যস্তভাবে তোমাকে ফোন করছিলেন, নাম হচ্ছে...ইয়ে, শার্ম....শার্মাইলা?

—শর্মিলা মুজমাদর। হ্যাঁ, কী বলেছেন তিনি?

—তোমাদের স্ত্রী? তোমাকে এয়ারপোর্ট থেকেই ফোন করতে বলেছেন, নিশ্চয়ই কোনো ভালো খবর আছে তোমার জন্য। কিংবা আজ তোমাদের বিবাহবার্ষিকী নাকি, ভুলে গেছ?

এরা সবসময়ই কৌতুক করে কথা বলে। কিন্তু অত তুচ্ছ কারণ হলে এরা সময় নষ্ট করতো না। শর্মিলাকে নিশ্চয়ই ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে হয়েছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দুর্ঘটনায় সবাই বিচলিত হয়। অনীতা অনেকটা বড় হয়েছে, সে সাবধানী, কিন্তু রণ, সে অতীনের লাইটার নিয়ে খেলা করে, আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে? শর্মিলা, রান্নাঘরের গ্যাস খুলে রেখেছিল?

যুবতীটির চোখে যেন সহানুভূতির চিহ্ন। সে বললো, সব টেলিফোন বুথগুলি ভর্তি দেখছি, তুমি এখান থেকেই ফোন করতে পারো, তবে অপারেটারের থ্রু দিয়ে কালেক্ট কল...

অতীন বললো, তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।

মেয়েটি একটি হাসির ঝিলিক দিয়ে বললো, ইউ আর ওয়েলকাম।

রিসিভারটা ধরে অতীন বুঝতে পারলো তার হাত কাঁপছে। মনে মনে দুবার বললো, স্টেডি। স্টেডি।

তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, হ্যালো কে?

অনেক দূর থেকে মিষ্টি, সুরেলা এক বালক কণ্ঠ ভেসে এলো, হাই ড্যাডি! হোয়ার আর ইউ? ইন টেক্সাস?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার কথা অতীন অনেকবার শুনেছে, আজ অনুভব করলো সেটা কী রকম সত্যি সে দরদর করে ঘামছে। তার বুকের ওপর যেন একটা ভারী ওজন ছিল, এইমাত্র সরে গেল। রণ ভালো আছে। রণ ভালো আছে। তার ইচ্ছে করছে দু' হাতে জড়িয়ে রণকে আদর করতে।

অতীন এবার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, রণি, কেমন আছিস রে তোরা? কী হয়েছে বাড়িতে? দিদি, কোথায়?

রণ বললো, দিদি ইজ ওয়াচিং টিভি। আ ভেরি বোরিং মুভি, আই ডিড্‌নট লাইক ইট। ড্যাডি, হোয়েন আর ইয়া কামিং হোম?

রণ ভালো আছে! অনীতা ভালো আছে। শর্মিলা কোথায়?

রণ উচ্চকণ্ঠে ডাকলো, মম্‌, মম্‌, ড্যাডি ইজ কলিং ইয়া। মম্‌, ম ও ম... । ড্যাড, আর ইয়া রিয়েলি ইন টেকসাস? হ্যাভ ইয়া মেট ইনি কাউ বয়!

অতীনের এবার ভুরু কুঁচকে গেল। তাহলে কিছুই ঘটেনি, শুধু শুধু তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলা হয়েছিল? এর মানে কী? এরপর রণ যেই জানালো যে মা এখন বাথরুমে ঢুকেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরুবে না, অতীন তাকে এক ধমক দিয়ে বললো, শিগগির মাকে ডাকো? ছেলে ভালো আছে, সুতরাং এখন আর তাকে স্নেহের আদিখ্যেতা দেখাবার কোনো মানে হয় না!

রণ বাথরুমের দরজায় কয়েকবার কিল মেরে ফিরে এসে বললো, মা বলছে, তোমার নাম্বার দাও, আধ ঘণ্টা বাদে রিং ব্যাক করবে।

অতীন আবার আদেশ করলো, রণ, যাও মাকে বলো, এক্ষুনি বেরিয়ে আসতে। আমার একটুও সময় নেই!

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে অতীন আবার সিগারেট ধরালো। সে তার ধৈর্য ধরতে পারছে না। শর্মিলার এরকম পাগলামির কারণটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। কাউন্টারের মেয়েটি কী ভাবছে! শুধু শুধু ফাজলামি করে ওদের ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। শর্মিলাকে বকুনি দেওয়ার জন্য সে চোয়াল শক্ত করলো।

বহু দূরে নিউ জার্সির বাড়িতে শর্মিলা বাথরুমে বাথটাবে শুয়ে মাথায় ও মুখে জলের ধারা নিচ্ছে। টাবের জলে এত ফেনা যেন মনে হয় সে আশ্বিনের পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের মধ্যে শুয়ে আছে। সন্ধেবেলার এই স্নান তার একটা প্রধান বিলাসিতা। অফিস থেকে ফিরেই তাকে রান্না করতে হয়।

ফ্যামিলি রুমে টিভিটা খোলা। কার্পেটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে অনীতা, এক হাতে একটা স্বচ্ছ ঠোঙা ভর্তি আলু ভাজা, অন্য হাতে লুডলাম নামে একজন জনপ্রিয় লেখকের রোমহর্ষক উপন্যাস। কৈশোর সদ্য পার হয়ে আসছে অনীতা, এর মধ্যেই তার শরীরে যৌবন ঝনঝন শব্দ করতে শুরু করে দিয়েছে। এ দেশে যৌবন তাড়াতাড়ি আসে। অনীতার চুল একটা নীল রিবন দিয়ে বাঁধা, সুন্দর চুল হয়েছে তার। টি ভি-তে সে তার প্রিয় ধারাবাহিক মাপেট শো দেখছে, মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন এসে গেলেই সে মনোযোগ দিচ্ছে হাতের বইতে ও আলুভাজায়।

একটু দূরে নানারকম খেলনা ছড়িয়ে বসে আছে তার ছোট ভাই। সবই নকল যুদ্ধের সরঞ্জাম। ছোট ভাইটিকে অনীতা ডেনিস দা মিনেস বলে ডাকে, এ রকমই মুখখানা রণের। বেশ গাঁট্টাগোট্টা স্বাস্থ্য, আইসক্রিম আর চকলেট তার প্রিয় খাদ্য, ভাত তার চোখে বিষ, বাড়ির তৈরি স্যান্ডুইচও সে সহজে ছুঁতে চায় না। একমাত্র ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির হ্যামবার্গার সে বিশেষ পছন্দ করে। এক একদিন তার কান্না থামাবার জন্য শর্মিলাকে গাড়ি চালিয়ে গিয়ে ঐ হ্যামবার্গার কিনে আনতে হয়।

শীত বিদায় নিয়েছে। জানলার বাইরে রাস্তার গাছগুলিতে দেখা যায় নতুন কিশলয়। ফিরে আসছে পাখিরা।

ছেলের মুখে দ্বিতীয়বার খবর পেয়ে শর্মিলা অবাক হয়ে ভাবলো, অতীন হঠাৎ তাকে ব্যস্ত হয়ে ফোনে ডাকছে কেন? সে তো রাত ন'টার আগে কখনো ফোন করে না?

ভুলো-মনা বলে শর্মিলার খ্যাতি আছে বন্ধু মহলে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন বেড়ে যাচ্ছে তার বিস্মরণ। তোয়ালে আর সাবান নিয়ে একদিন সে রান্নাঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভেবেছিল, এখানে কেন যেন এসেছি? একবার একমাসে সে তিনবার গ্যাসের বিল শোধ করার জন্য চেক পাঠিয়েছিল, সেই কোম্পানির একজন কর্মী ফোন করে জানতে চেয়েছিল, কী ব্যাপার, তুমি আমাদের এত টাকা দিতে চাইছো কেন বলো তো?

বন্ধুরা কেউ এই জন্য শর্মিলাকে হাসি ঠাট্টা করলেই সে বলে, বয়েস হচ্ছে তো, কিছুই মনে রাখতে পারি না। তা ছাড়া এই দেশে আর আমার একটা দিনও থাকতে ইচ্ছে করে না।

শর্মিলাকে দেখে অবশ্য বয়েস বোঝা যায় না। দুটি সন্তানের জননী হয়েও শর্মিলার শরীর একটুও ভাঙেনি। প্রতিদিন স্নানের পর মনে হয়, তাজা, সমুদ্র থেকে উঠে আসা কোনো দেবীর মতন। অনেকেই বলে, কুমারী বয়েসে কিংবা বিয়ের সময় শর্মিলা এমন কিছু রূপসী ছিল না। রোগাটে ছিল, চোখের কোণে ক্লান্তির ছাপ লুকোতো মুখের হাসিতে। তার হাসিটুকুই ছিল সুন্দর। দুই ছেলেমেয়ের জন্মের পরেই যেন সে পূর্ণ বিকশিতা হলো, রংও খুলেছে অনেকটা। ছেলে-মেয়ে সঙ্গে থাকলেও তাকে জননী বলে মনেই হয় না। মনে হয় যেন যৌবনের রঙ্গভূমিতে সে সদ্যই এসেছে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই শর্মিলার মনে পড়ে গেল। দারুণ ব্যস্তভাবে সে শরীরের ফেনা ধুয়ে, কোনো রকমে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে, হাউস কোটটা জড়িয়ে নিয়ে ছুটে এলো বাথরুমের বাইরে। টেলিফোন ধরে উর্ধ্বশ্বাসে বললো, সরি বাবলু, আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

অতীন কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট্‌স দা জোক?

শর্মিলা অনুতপ্ত গলায় বললো, এক্সট্রিমলি সরি, চান করছিলুম, তুমি কোথা থেকে ফোন করছো? তুমি আমার মেসেজ পেয়েছিলে?

—হোয়াট ইজ দি মেসেজ?

—তোমার অফিসে ফোন করেছি, জিমি গারনারকে খবর দিয়েছি, তারপর ক্যানসাস আর ডেনভার এয়ারপোর্টে ...ওরা কিছুতেই মেসেজ নিতে চায় না, বললো, পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে না।

—কাট ইট শর্ট, মিলি! আমি খুবই টায়ার্ড। তোমার যদি ইম্পর্টান্ট কিছু বলবার থাকে

অনীতা যদিও একইসঙ্গে টি ভি দেখা, আলুভাজা খাওয়া ও খুনোখুনির গল্প পড়া চালিয়ে যাচ্ছে, তবু পারিবারিক ঘটনা প্রবাহের দিকে তার চোখ কান খোলা থাকে। মায়ের স্বভাবও সে জানে। এরই মধ্যে মাকে সে তার নিজের তুলনায় একজন ছেলেমানুষ হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। সে এবার চেঁচিয়ে বললো, মা-আ, সামবডি আজ ইন্ডিয়া থেকে ফোন কল করেছে। গ্রাও পা ইজ সিক, সেইজন্যই তুমি বাবাকে মেসেজ দিতে চাইছিলে।

শর্মিলা এবারে একবার দম নিল। খবরটা সে অতীনকে কী ভাবে বলবে সেটাই সে বুঝতে পারছিল না। মেয়ের নির্দেশ পেয়ে সে বললো, হ্যাঁ, বাবলু, দেশ থেকে আজ একটা ফোন এসেছে, তোমাকে লালুকাকা ফোন করেছিল...

—লালুকাকা? সে আবার কে? হার্ড অপ হিম!

–বাঃ, তোমার একজন কাকা আছে না?

–আমার একটিই কাকা, তাকে আমরা কানুকাকা বলি।

–হ্যাঁ, তিনিই। ঠিক। ভালো করে শোনা যাচ্ছিল না।

–ভালো করে শোনা না গেলেও লালুকাকা নামে কি নতুন কেউ গজাবে? এনি ওয়ে, কী বললেন কানুকাকা?

–বাবলু, মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো। ডোন্ট গেট আপসেট! তোমার বাবা খুব অসুস্থ। তোমার এক্ষুণি একবার কলকাতায় যাওয়া দরকার।

– কে অসুস্থ?

–বাবা। তোমার বাবা।

কয়েক মুহূর্ত অতীন নীরব রইলো। চোখের সামনে সে দেখতে পেল বাবাকে। জেদী, চিরকালের অভিমানী। বাবার ব্লাড প্রেসার যথেষ্ট বেশি। মাঝে মাঝে এখান থেকে চেনাশুনো যারা দেশে যায়, তাদের হাত দিয়ে অতীন ওষুধ পাঠায়, সে ওষুধ তিনি নিয়মিত খান কি না সন্দেহ। এই বয়েসেও বাবার অনেকরকম ছেলেমানুষী আছে, বয়েসটা মানতে চান না। কারডিয়াক অ্যারেস্ট? সেরিব্রাল অ্যাটাক?

– কী অসুখ হয়েছে? কতটা সীরিয়াস? হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?

– তা ঠিক বোঝা গেল না। দেশের টেলিফোন কি বোঝা যায় ভালো করে? আমি তবু খানিকটা শুনতে পাচ্ছি, তোমার কানুকাকা বোধ হয় কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না, শুধু হ্যালো হ্যালো করে চ্যাঁচাচ্ছিলেন, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন, আমি যত বলছিলুম যে তুমি এখানে নেই, উনি তা বুঝতেই পারছিলেন না। তিনঘণ্টা চেষ্টা করে নাকি লাইন পেয়েছেন, বললেন, তোমার পক্ষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় ফেরা

–অসম্ভব! আমি এখন কী করে যাবো?

–ওঁর কথা শুনে মনে হলো, তোমার যাওয়াটা খুব জরুরি!

– তুমি জানো না আমার মাথার ওপর এখন কত বড় দায়িত্ব? তোমার উচিত ছিল বালো করে জেনে নেওয়া যে অসুখের চেহারাটা কী! কতটা ক্রিটিক্যাল।

–কথা বোঝা গেল না যে! তিন মিনিট হতে না হতেই ছেড়ে দিলেন, তার মধ্যে দু মিনিট তো হ্যালো হ্যালো করেই কাটালেন।

–তুমি রিং ব্যাক করতে পারতে।

–কোথায়? তোমাদের বাড়িতে? সে ফোন তো অনেকদিন খারাপ। কানুকাকা অন্য জায়গা থেকে ফোন করছিলেন, সেখানকার নাম্বারটা জেনে নেবার চান্সই পেলাম না।

–কানুকাকার নিজের বাড়িতেই ফোন আছে, সে নাম্বারটা আমাদের খাতায় লেখা নেই। যাকগে, পাচুদারা কলকাতায় গেছেন, তুমি ওঁদের ফোন করে এক্ষুনি একটা খবর নিতে বলো।

–পাঁচুদা-শান্তাবৌদিরা পরশুদিনই ফিরে এসেছেন। বাবলু, তুমি ওখান থেকেই ইন্ডিয়া চলে যাবে, না একবার নিউ জার্সিতে ফিরে আসবে?

–এখান থেকে কী করে যাবো? তা ছাড়া যাওয়াটা কি চাট্টিখানি কথা। অফিসের কাজ হুট করে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া যায়? কাল দুটো অ্যাপয়েন্টমেন্ট, পরশুদিন সান্টা-ফে শহরে গিয়ে ডিলটা করা সবচেয়ে ক্রুশিয়াল, তার আগে...

–বাবলু, তোমার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তোমাকে তো যেতেই হবে। মা একলা, তিনি অসহায় হয়ে পড়বেন...

–যদি এতই সীরিয়াস ব্যাপার হয়, দেশ থেকে ফোন এসেছিল, তবু আমি ডাকার পর তুমি বাথরুম থেকে বেরুতে চাওনি? আধঘণ্টা বাদে আমাকে

–সেজন্য তুমি আমায় পরে বুকনি দিও। প্লীজ, মাথা গরম করো না। জানোই তো, মাঝে মাঝে আমার অ্যামেনেশিয়া মতন হয়, মন খারাপ থাকলে আরও বেশি হয়...

–এখন ছেড়ে দিচ্ছি, পরে আবার ফোন করবো। ভেবে দেখি কী করা যায়। বাই-ই!

অতীনের মুখখানা থমথমে হয়ে গেছে। তাতে যতখানি উৎকণ্ঠা, তারচেয়েও বেশি রাগ ও

অসহায়তা মাখা। যে অবস্থার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, সেরকম কোনো সংকটের মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলে মানুষের এরকম রাগ ও অসহায় ভাব আসে। বাড়ি ঘর ছেড়ে দিনের পর দিন সে নতুন নতুন শহরে ঘুরছে, মাথার মধ্যে শুধু কাজ করে কাজ, অদূরেই সার্থকতার হাতছানি, এই সময় চৌদ্দ হাজার মাইল দূর থেকে যদি বাবার অসুখের খবর আসে, তা হলে তৎক্ষণাৎ কী করা উচিত তা অতীন জানবে কী করে?

কানুকাকার ফোন! বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের মতন টিপিক্যাল হোঁতকা চেহারা হয়েছে কানুকাকার। সব সময় লম্বা চওড়া কথা। মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে কানুকাকা লোকদের পাঠায়, তাদের বাড়িতে থাকার জায়গা দিতে বলে। কানুকাকার এক শালা এসে তো প্রায় দেড় মাস থেকে গেল। বাড়িতে গেস্ট রাখতে আপত্তি নেই অতীনের, কিন্তু দেশ থেকে গেস্টরা এলেই মনে করে, তাদের জন্য আমি অপিস টফিস ছুটি নিয়ে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতে যেতে হবে, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এ চড়তে হবে, নায়েগ্রা বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে...

কানুকাকার অম্বলের অসুখ, সব সময় সেই অসুখের কথা বলতে ভালোবাসে। অসুখ সম্পর্কে বাতিকগ্রস্ত। কতটা বাড়িয়ে বলেছে কে জানে। অতীন যদি এখানকার সবকিছু ফেলে কলকাতায় গিয়ে দেখে বাবা কয়েকদিন বুকের ব্যথায় কষ্ট পেয়ে, সেই সময়ে নার্সিংহোমের খাটে আধ-শোওয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন, তখন কী রকম লাগবে? তার যে কী সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেল, তা কি কেউ বুঝবে? বাবার যা বয়েস, তাতে এখন থেকে মাঝে মাঝে অসুখ তো হবেই, তার জন্য প্রত্যেকবার তো চোদ্দ হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে যাওয়া যায় না! বাবা নিজেই নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়ে বলবেন, তুই শুধু শুধু কেন কাজ ফেলে চলে এলি, বাবলু। এক কাঁড়ি টাকা খরচ। আমি কি অথর্ব হয়ে গেছি? আই কেন টেক কেয়ার অপ মাই সেল্‌ফ!

মাঝে মাঝে চেক-আপের জন্য বাবা তো অনায়াসেই নার্সিংহোমে ভর্তি হতে পারেন। টাকা পয়সার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। ব্যাঙ্কে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে, প্রত্যেক মাসে মায়ের নামে এক শো ডলার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এক শো ডলার মানে দেশের বারোশো টাকা, এ বছর ডলারের ভ্যালু আরও বেড়েছে।

প্রায় তিন-চার বছর দেশে যাওয়া হয়নি। এই সেপ্টেম্বরে সবাইকে নিয়ে যাওয়া মোটামুটি ঠিক হয়ে আছে, শর্মিলা টুকিটাকি উপহারের জিনিস কিনেত শুরু করে দিয়েছে। এর মধ্যে অতীনকে যদি সামান্য কারণে একা ঘুরে আসতে হয়, তাহলে পরে আর শর্মিলাদের নিয়ে যাওয়াটা...।

বাবা কাজের মানুষ, সারাজীবন খাটাখাটনি করেছেন, তিনি কাজ এবং দায়িত্বের মর্ম বোঝেন। দেশের অনেকেরই এই জ্ঞানটা নেই, সেখানে ওয়ার্ক কালচারই তো গেড়ে ওঠেনি। কাজে ফাঁকি মারাটাই ন্যাশনাল পাস্টাইম। একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে মাঝপথে সেটা যে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে পারে, সে মানুষ হিসেবেও ছোট হয়ে যায়। কোম্পানির এই নতুন প্রজেক্টের টেকনিক্যাল দিকটা অন্যদের বোঝাবার জন্য অতীনই রপ্ত করেছে, সেটা এখন অন্য কোনো সহকর্মীর বুঝে নিতে আবার খানিকটা সময় লাগবে, জাপানীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সময়টা এখানে বিশেষ মূল্যবান, একটা দিনও নষ্ট করা চলে না।

একজন ধরা-পড়া মাফিয়া চাই-এর স্বীকারোক্তি খবরের কাগজে পড়েছিল অতনি। ঐ গুণ্ডা দলে দীক্ষা নেবার সময় লোকটি যে শপথ বাক্য পাঠ করেছিল, তাতে ছিল যে, কোনোদিন সে নিজের মা-বাবার নাম উচ্চারণ করতে পারবে না, স্ত্রী যদি মৃত্যুশয্যাতেও থাকে, তাহলেও সেই অজুহাতে দলপতির আদেশ অমান্য করা চলবে না।

এখনকার বড় বড় কমার্শিাল হাউজ, এদেশের ভাষায় যে গুলিকে বলে করপোরেশন, সেখানকার নিয়ম কানুনের সঙ্গে ঐ মাফিয়াদের মন্ত্রগুপ্তির বিশেষ কোনো তফাত নেই। প্রত্যাশার বেশি কাজ তুলে দাও, তুমি আদর পাবে, বড় বাড়ি, বড় গাড়ি পাবে, হাওয়াইতে ছুটি কাটানো ইত্যাদি সুবিধে পাবে। আর যদি তোমার উৎপাদন ঝুলে যায়, দায়িত্ব থেকে সামান্য ভ্রষ্ট হও, অমনি তোমাকে কোল থেকে নামিয়ে আর একজনকে কোলে বসাবে। মায়িআদের মতনই সিব করপোরেশনগুলো দেশের রাজনৈতিক, ক্ষমতারও নিয়ন্ত্রণ করে। চীনের অর্ডারটা পাবার জন্য রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি-তেও তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে, অতীনের কোম্পানির বড় সাহেবরা সেই ব্যাপারে ব্যস্ত, অতীনের ওপর সব

কিছু নির্ভর করছে না, মোটেই কিন্তু এরা শুধু রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েই কাজ আদায় করায় বিশ্বাস করে না, প্রডাকশান, মানেজমেন্ট, লিয়াঁজ থেকে প্যাকেজিং পর্যন্ত নিখুঁত হওয়া চাই।

অতীনের ওপর শুধু দায়িত্ব নতুন দ্রব্যটির কেমিক্যাল কম্পাউন্ড এবং ভায়াবিলিটি বিষয়ে কয়েকজন মানুষকে বুঝিয়ে দলে টানা, এর মধ্যে জন ডিয়ার কোম্পানির টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, যিনি ছুটি নিয়ে সান্টা ফে শহরে বসে আছেন, তাঁর সম্মতি আদায় করাই সবচেয়ে জরুরি।

জো ম্যাককরমিককে অতীন যদি নিজের অবস্থানটা বুঝিয়ে বলে ছুটি চাইতে যায়, জো অধৈর্যভাবে সবটা শুনবেই না। রাগে গরগর করতে করতে বলবে, শোনো, পৃথিবীর কোন প্রান্তে তোমার পিতা কী অবস্থায় রয়েছেন, তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাতে চাই না। আমার মাথা এমনিতেই যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় পূর্ণ, সেইসব সমাধান করবার জন্যই কোম্পানি আমাকে টাকা দেয়। তুমি যদি এই অবস্থায় কাজ অসমাপ্ত রেখে চরে যেতে চাও, তাহলে তোমার বিবেককে জিজ্ঞেস করো।

অর্থাৎ অতীনের পদোন্নতি তো হবেই না, চাকরিটাই চলে যেতে পারে। এ রকম বদনাম নিয়ে চাকরি ছাড়লে অন্য কোনো কোম্পানি তাকে ভালো কাজ দেবে না।

নাঃ, এখন যাওয়া হবে না, যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সুটকেসটা কোথায় গেল? এনকোয়্যারি কাউন্টার ছেড়ে অতীন আনমনে চলে এসেছে একটা কফি কর্নারে, সুটকেসটা ফেলে এসেছে ভুলে। আজকাল ছিঁচকে চোরের উপদ্রব বেশ বেড়েছে। দৌড়ে ফিরে যেতে গিয়েও অতীন বাধা পেল। একদল কৃষ্ণ ভক্ত ফর্সা ছেলে-মেয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। মেয়েরা শাড়ি পরা, কোনো কোনো ছেলের মাথার টিকিতে ফুল বাঁধা। এয়ারপোর্টের বাকি লোকরা হাঁ করে দেখছে এদের। এরা কোথায় চলেছে, কিউবা নাকি? আশ্চর্য কিছু না, রাশিয়াতেও নাকি এদের প্রভাব ছড়িয়েছে। সিদ্ধার্থ ঠিকই বলেছিল, স্বামী বিবেকানন্দর চেয়েও প্রভুপাদের সাহেব-মেম শিস্য-শিষ্যার সংখ্যা অনেক বেশি! গাঁজা-ভাং মদ-যৌনতা ছেড়ে আরও বড় কোন নেশায় এরা মেতে আছে?

সুটকেসটা নিয়ে এসে অতীন এক কাপ কফি নিয়ে একা একটা টেবিলে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে এয়ারপার্টের সব কিছু মুছে গিয়ে তার চোখে ভেসে উঠলো অন্য একটি ছবি। বাবা নয়, সে দেখতে পেল মাকে। হাসপাতালের সাদা ধপধপে খাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মা। মা ঠিক এইদিকেই তাকিয়ে আছে, মায়ের পেছন দিকে জানলা। মায়ের চোখ দুটো ফুলোফুলো, কান্নাকাটি করেছে মনে হয়। মাকে অতীন বড়জোর আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে দেখেছে কয়েকবার, ঝরঝরিয়ে কাঁদতে দেখেছে কি কখনো? হ্যাঁ, বহুদিন আগে অনেক ছেলেবেলায়, অতীন একবার দোতলা বাসে চেপে সাউথ ক্যালকাটায় গিয়েছিল একা, বাবা খুব মেরেছিল, সেইদিন মা...। দাদা তখনও বেঁচে, দাদার সঙ্গে এক বিছানায় শুতো অতীন, দাদা প্রায়ই বলতো, তুই বুঝিস না বোকা, মা তোকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

অতীনের দম আটকে আসতে লাগলো। গলাটা যেন কেউ চেপে ধরেছে। মারে চোখ ছলছল করছে, মা তার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে, আর অতীন এখনো যাবে কি যাবে না ভাবছে। চুলোয় যাক চাকরি। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে, জো ম্যাকরমিককে বললে কিছুই লাভ হবে না। কিন্তু জিমি গারনার তার বন্ধু, জিমিকে অনুরোধ জানালে সে সাহায্য করবে নিশ্চিত।

গরম কফিতে চুমুক দিয়ে অতীন একটু ধাতস্ত হলো। জিমি আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে চাইলেও পারবে কি? জিমি অ্যাকাউন্টসের লোক, এইসব টেকনিক্যাল জ্ঞান তার প্রায় কিছুই নেই। তাকে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিতে কিছুটা সময় তো লাগবেই। সময়, সময়টাই বড় কথা।

টেবিলের ওপর একটা ছোট্ট ঘুঁষি [illegible] অস্ফুট কাতর স্বরে বললো, বাবা, তুমি অসুখ বাধাবার আর সময় পেলে না? অন্তত আর সাতটা দিনও যদি আমাকে দিতে?

প্রথমেই নিউ ইয়র্কে ফেরার একটা টিকিট কাটা দরকার। আজ রাতের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যেতে পারলে, কাল সকাল থেকেই ইন্ডিয়ার ফ্লাইট বুকিং-এর চেষ্টা চালানো যায়। চট করে একদিনের মধ্যে কি বুকিং পাওয়া যাবে?

বিমানবন্দরের চাতাল দিয়ে অনেকখানি হেঁটে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো অতীন। আজ রাতের মধ্যেই সে নিউ ইয়র্ক ফিরবে? এ কি করছে সে, এ তো স্রেফ পাগলামি। অফিস থেকে অন্য একজনকে

আনাবার ব্যবস্থা না করে সে কি এমনভাবে চলে যেতে পারে। কাল সকালের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কারুকে না কারুকে রাখতেই হবে। তারপর সান্টা ফে। কিন্তু শনি-রবিবার কাকে পাওয়া যাবে অফিস থেকে?

এত দ্বিধার মধ্যে অতীন জীবনে পড়েনি। সে দাঁড়িয়েই রইলো ভিড়ের মাঝখানে। এই অবস্থায় যদি পরামর্শ দেবার কেউ থাকতো!

একটু পরে একটা সমাধান মাথায় এলো অতীনের। তার বদলে শর্মিলাকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? শর্মিলা বুদ্ধিমতী, সে মাকে সবরকম সাহায্য করতে পারবে। রূণ আর অনীতাকে কিছুদিনের জন্য সিদ্ধার্থদের কাছে রাখা যেতে পারে। আচমকা তার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো, মুখটা অস্পষ্ট হয়ে গেল অভিমানের ছায়ায়। দেশ থেকে ফোন এলো, বাবার অসুখ, গুরুতর ব্যাপার, অতীনকে কলকাতায় যেতে হবে, এই সাংঘাটিত বিষয়টাও শর্মিলা ভুলে গেল কী করে? বাথরুম থেকে তাড়াতাড়ি বেরুতে চায়নি। যদি শর্মিলার বাবা কিংবা মা সম্পর্কে এই রকম খবর আসতো, তাও কি সে হাফ-হার্টেডভাবে নিতে পারতো? অতীনের বাবা-মাকে শর্মিলা ভালো করে চিনলোই না।

কিন্তু এখন রাগ করার সময় নয়, এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। অতীনের শরীরটা বেশ দুর্বল লাগছে, দুপুরে সে প্রায় কিছু খায়নি, কফিটা পান করার পর আরও খিদে বোধ হলো। কোম্পানির পয়সায় হোটেলটা যখন বুক করাই আছে, তখন সেখানে গিয়ে, স্নানটা সেরে নিয়ে, কিছু খেয়ে তারপর সবদিক ভেবে দেখতে হবে। দু'এক ঘণ্টা সময়ে আর কী আসবে যাবে!

এখন সন্ধে সাড়ে সাতটা। নিউ ইয়র্কে সময় অনেক এগিয়ে, একটু পরেই ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়বে। আজ শুক্রবার, কল্যাণ-মিতালি প্রায়ই একটু বেশি রাত করে, বাচ্চাদের ঘুম পাড়াবার পর, ভিডিও ছবি দেখার জন্য শর্মিলাকে ডাকে। শর্মিলা যদি সেখানে চলে যায়? ওকে এখানকার হোটেলের ফোন নাম্বারটা জানানো হয়নি, দেশ থেকে আবার কোনো খবর আসতে পারে।

এবার অতীন টেলিফোন বুথে গিয়ে একজন লোকের পেছনে দাঁড়ালো। তার মনে পড়ছে সমীরের কথা। সমীর তার বাবার অসুখের খবর পেয়ে পরের দিনই দেশের দিকে পাড়ি দিয়েছিল। ততক্ষণে সব শেষ। ফিরে এসে সমীর বলেছিল, এবার থেকে শুধু শ্রাদ্ধ করার জন্য দেশে যেতে হবে। বাপ-মা ফুরিয়ে গেলে আর হুড়ুস ধাড় স করে দেশে ছুটতে হবে না। তাই শুনে সিদ্ধার্থ বলেছিল, বাপ-মা আর শ্বশুর-শাশুড়ি মিলে মোট চারবার। তাও শ্বশুর-শাশুড়ির বেলায় শুধু বৌকে পাঠালেই চলে।

শর্মিলা ফোনের পাশেই বোধ হয় দাঁড়িয়ে ছিল, রিং হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বললো, ইয়েস? বাবলু?

অতীন বললো, শোনো খুকু...

শর্মিলা বললো, তার আগে আমার কথাটা শুনে নাও। আবার খবর এসেছে। লন্ডন থেকে এইমাত্র ফুলদি ফোন করেছিল। তোমার ফলুদি, মানে তুতুলদি। উনি কলকাতা থেকে কল পেয়েছেন, ওরা কিছুতেই অ্যামেরিকার লাইন পাচ্ছে না, লন্ডন নাকি তবু পাওয়া যায়। ফুলদিকে অলি জানিয়েছে...

–কে?

–অলি, মানে আমাদের অলি চৌধুরী।

–হ্যাঁ। কী বলেছে সে?

– সে ফুলদিকে বলেছে তোমাকে জানিয়ে দিতে যে তোমার বাবা হয়তো ভালো হয়ে যাবেন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই তোমাকে দেখতে চেয়েছেন একবার...

–ঠিক করে বলো, কী হয়েছে!

–উনি খুবই অসুস্থ...

–অসুস্থ... না...শেষ? আমার কাছে লুকিও না!

–ও রকম কথা ভাবছো কেন, বাবলু! যদি ফার্স্ট অ্যাটাক হয়, ভালো হয়ে ওঠার খুবই চান্স আছে। তবে তোমার একবার যাওয়া নিশ্চয়ই দরকার, তাতেই ওঁর খানিকটা বৃদ্ধিত্তাপ হতে পারে, ফুলদি সেই কথাই বললো। তুমি কি ওখান থেকেই সোজা চলে যেতে চাও? বাড়ি আসবে না?

– খুকু, তুমি এত অবুঝ হও কি করে? জানো না, কী ধরনের কাজ নিয়ে আমি ঘোরাঘুরি করছি? এখানে বেড়াতে, আসিনি। ফুল ইনফরমেশান না পেলে...

–আমার ওপর রাগ করছো কেন? তোমার খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, তাই ভাবলুম যদি ওয়েস্ট কোস্ট দিয়ে চলে যাও...

—কী করে এই কথা ভাবলে? আমার কাছে অত টাকা কোথায়? তাছাড়া অফিসকে পুরোপুরি লেট ডাউন করে...

—তুমি কি যাবে না ভাবছো? তোমার যাওয়াটা নিশ্চয়ই খুব ইম্পর্টান্ট, নইলে লন্ডন ধরে আমার তোমাকে খবর দেবার চেষ্টা...

—শোনো খুকু, এই রকম সময়ে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে না? আমাকে শুধু শুধু প্রশ্ন না করে তুমি নিজে একটা কিছু সাজেস্ট করতে পারো না? এই অবস্থায় আমি

—আমি বলছি, বাবলু, তোমার যাওয়া উচিত, তোমার যত কাজই থাক...

—যাবো তো নিশ্চয়ই। কিন্তু হাউ সুন? বাড়ি হয়েই যেতে হবে, টাকার ব্যবস্থা করতে হবে, সঙ্গে বেশ কিছু টাকা না নিয়ে গেলে...

— তুমি যদি আজই ফিরে আসতে চাও, তা হলে যত রাতই হোক আমি তোমাকে এয়ারপোর্ট থেকে আনতে যাবো...

—আজ রাতে ফেরা অসম্ভব। কাল বিকেলের আগে কিছুতেই হবে না। তুমি ততক্ষণে এক কাজ করো। তুমি যেভাবেই হোক, এক্ষুনি সুরেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলো....

—কোন্ সুরেশ?

—আঃ কী মমুস্কিল, তুমি সুরেশ ভাটিয়াকে চেনো না? যার ট্রাভেল এজেন্সি আছে। ওকে বলো, কাল রাত্তিরে অথবা পরশু সকালে যে-কোনো ফ্লাইটের একটা টিকিট যেন বুক করে রাখে। সোজা যেন কলকাতায় যাওয়া যায়, মাঝপথে বসিয়ে রাখলে চলবে না। যেমন করেই হোক, ওকে একটা টিকিট যোগাড় করতেই হবে। এই সময়টা টিকিটের খুব রাশ থাকে। আর তুমি কলকাতায় একটা টেলিগ্রাম পাঠাও যে আমি আসছি। ঠিক কখন পৌঁছোবো, সেটা পরে জানাচ্ছি। প্লিজ, মনে করে এগুলো করো। আবার যেন ভুলে যেও না।

দু-তিন সেকেন্ড থেমে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ গলায় শর্মিলা বললো, না, ভুলবো না, লিখে রাখছি। সুরেশকে না পেলে কল্যাণকে রিকোয়েস্ট করবো, ওর কোন্ ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে চেনা আছে—বাবলু, আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে না? আমিও বাবাকে দেখতে যেতে চাই...

—দু'জনে একসঙ্গে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ছেলেমেয়েরা থাকবে...আমি এখন রাখছি

— বাবলু, আর একটা কথা বলবো? একটা রিকোয়েস্ট...

—বলো...

—তুমি অত দূরে আছো, একলা একলা, মাথায় অফিসের কাজের চিন্তা, তার মধ্যে এরকম একটা দুঃসংবাদ শুনলে—বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা কী রকম। বেশি চিন্তা করো না, আমার মনে হচ্ছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। অফিসে তোমার সুনাম আছে, ওরা ঠিক বুঝবে যে না গিয়ে তোমার উপায় ছিল না...বাবলু, আর একটা কথা, তুমি আজ বেশি ড্রিংক করো না, প্লিজ

—না, না, ওসব ভয় পেও না। আমি ঠিক থাকবো...

—আজ রাতটা তুমি একলা একলা থাকবে, আমার মোটেই ভালো লাগছে না..

—কিচ্ছু হবে না! তুমি তো জানো, আমার নার্ভ কত স্ট্রং!

ফোনটা রেখে অতীন রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো। আর প্রচণ্ড গরম লাগছে। জ্যাকেটের তলায় জামাটা ভিজে সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে। তবু, বাড়িতে কাল বিকেলে ফিরবে, শর্মিলার কাছে এই কথাটা উচ্চারণ করে ফেলার পর অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করছে সে। কাল বিকেলের দিকে ফেরা, দ্যাটস লজিক্যাল! তার মধ্যে অফিসের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই, সে সকালের প্রথম মিটিংটা অন্তত অ্যাটেণ্ড করতে পারবে। শর্মিলা ভয় পাচ্ছে, এখানে একা একা সে এত বড় একটা খবরের চাপ সামলাতে পারবে না। হুঁ! লাইফ ইজ হার্ড।

অতীন নিজের নাকের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কথা বলে যাচ্ছে।

আমি যদি আমার বাবার মৃত্যুসংবাদও পেতাম, তাহলেও সেটা খুব শান্তভাবে নিতে পারতাম। বাবার প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়েস, নেহাৎ কম না। নিজের ইচ্ছেমতন জীবন কাটিয়েছেন। একদিন তো চলে যেতে হবেই। তবে, অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর শুনলে বিচলিত হয়ে পড়তে হয়ই। ঠিকমতন চিকিৎসা করলে আরও দশ-বারো বছর আয়ু পাওয়া এমন কিছু শক্ত নয় আজকাল। মুন্নি আর অনুনয় অনেক দূরে থাকে, মা একা একা অসহায় হয়ে পড়বে। সে রকম আত্মীয়-স্বজনও কেউ নেই। কানুকাকার ওপর মোটেই ভরসা করা যায় না। মা আশা করবে—আমি ফিরে গিয়ে সব ব্যবস্থা করবো। কার্ডিয়াক বা সেরিব্রাল অ্যাটাক হলে তো অন্য কিছু করার নেই, খুব তাড়াতাড়ি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাওয়া ছাড়া...মায়ের হাতে কিছু টাকা আছে আশা করি...

খুকু ভাবছে, খবরটা পেয়ে আমি উতলা হয়ে উঠেছি। ঠিক তা নয়। আসলে একটা ডায়লেমা, ঠিক এই সময়ে, একটা দারুণ প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে, হঠাৎ দেশে ফেলার ব্যবস্থা করার মধ্যে যে ঝঞ্ঝাট..বাবা, শেষনিঃশ্বাস ফেলে থাকলে এত ব্যস্ততার কিছু ছিল না। শুধু শ্রাদ্ধ করতে যাওয়ার জন্য আমার অত গরজ নেই, বাবারও ওসব ব্যাপারে তেমন বিশ্বাস ছিল না, নেহাৎ একটা নিয়মরক্ষা, শ্রাদ্ধ তো দশ-বারোদিন পর হয়, ঠিক ঠিক খবরটা যদি পাওয়া যেত, তাহলে এদিকের কাজ চুকিয়ে...। বাবা যখন তাঁর নিজের বাবার অসুস্থতার খবর শুনে যেত মালখানগরে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও ঠাকুর্দাকে দেখতে পাননি...

এইসব ভাবতে ভাবতে অতীনের চোখের সামনে একটা চলচ্চিত্রও তৈরি হয়ে যাচ্ছে। যাদবপুরে তাদের বাড়ি, গলির মোড়ে এক রাশ জঞ্জাল, পুরোনো পুরোনা গাড়িগুলোর বিকট হর্ন,ম ভিড়ে ভর্তি দোতলা বাসগুলো একদিকে হেলে পড়েছে প্রায়...একটা নার্সিং হোম, সেখানে একটা ক্যাবিনের মধ্যে আর কেউ নেই কেন? শুধু মা। নার্সিংহোমের সাদা ঘর, জানলার বাইরে সাদা আকাশ, বিছানার ওপর সাদা চাদর ঢাকা, মায়ের পরনে সাদা শাড়ি, এক রাশ শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মা, চোখ দুটিতে টলটল করছে জল, মা তাকিয়ে আছে এদিকে, এই ডেনভার এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ছুটে এসেছে মায়ের দৃষ্টি...

এই ছবিটা দেখতে দেখতে অতীন কেঁপে উঠলো, একচল্লিশ বছর বয়স্ক, আত্মবিশ্বাসী, সার্থকতা-শিকারী অতীন মজুমদার সেই মুহূর্তে একটি বালক হয়ে গেল। তার ইচ্ছে হলো তক্ষুনি এক ছুট লাগাতে। আট বছর বয়েসে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ভিড়ের মধ্যে একবার মাকে হারিয়ে ফেলে বাবলু যেমন ছোটাছুটি করেছিল। তার ইচ্ছে হলো, অফিসের কাগজপত্র ভর্তি সুটকেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে যে-কোনো একটা প্লেনে উঠে পড়তে।

এখানে কেউ কারুর মুখের দিকে এক পলকের বেশি তাকায় না। প্রয়োজন ছাড়া কেউ অন্যের মনোজগতে উঁকি মারে না। অতীন এই বিশাল বিমানবন্দরে কী অসহায়ভাবে একা।

একটু পরে সে কাঁধ দুটি ঝাঁকিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলো বাইরে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক সে গ্রাহ্যও করলো না। একটা ট্যাক্সিতে উঠে সে নাম বলে দিল হোটেলের। মাকে ঐ নার্সিং হোমের ঘরটাতেই সে কেন দেখছে বার বার! মায়ের চোখে জল।

কী সাংঘাতিক ইনসটিংকট এই মাতৃস্নেহ ব্যাপারটা। অত দূরে থেকেও মা তাকে প্রবলভাবে টান মারতে পারে হঠাৎ হঠাৎ। প্রথম প্রথম তো বিদেশে এসে অতীন প্রায়ই মাকে স্বপ্ন দেখতো। শিলিগুড়ি থাকার সময় এরকম হয়নি, জামসেদপুর কিংবা জেলে থাকার সময়েও না, কিন্তু লন্ডনে আসার পর সে দূরত্বের কষ্টটা অনুভব করতো। এখনও মাঝে মাঝে মায়ের স্বপ্নটা ফিরে আসে। মাত্র বছরখানেক আগেই তো, ক্রিসমাসের ঠিক পরেই, রণের যেদিন পা ভাঙলো, খুকু বাড়িতে ছিল না। খুকুকে খবর না দিয়েই সে রণকে নিয়ে গেল হাসপাতালে, বিশেস কিছু হয়নি অবশ্য। সেই রাতেই অতীন তার মাকে স্বপ্ন দেখেছিল, কী স্বপ্ন মনে নেই, কিন্তু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল পাশেই ঘুমিয়ে ছিল শর্মিলা, তার ঘুম ভাঙেনি, তাকে জাগিয়ে অতীন কিছু বলতেও চায়নি। সেই কান্না একেবারে গোপন থেকে গেছে। অতীনের মতন মানুষ যে স্বপ্ন দেখে কাঁদতে পারে তা কেউ বিশ্বাসই করবে না। ঐ সব সেন্টিমেন্টাল স্বপ্ন-টপ্ন তো সবাই দেশে ফেলে আসে। প্রথমবার না হোক, দ্বিতীয়বার অবশ্যই।

॥ ৮ ॥

হোটেলে চেক ইন করে অতীন নিজের ঘরে উঠে এলো। পাঁচতলায়। ভাড়া করা একদিনের মাথা গোঁজার আস্তানা, এই কক্ষে নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ আগেও অন্য মানুষ ছিল, তাদের নিশ্বাস রয়ে গেছে ভেতরের ভারি বাতাসে। তবু বেলবয়কে বখশিস গুঁজে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করলেই এই চার দেয়াল ঘেরা জায়গাটা একটা ব্যক্তিগত গুহা হয়ে যায়। এখানে যা খুশী করা যেতে পারে।

প্রথমেই জুতো মোজা খুলে সে হালকা হলো। টাইটা খুলে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর। জ্যাকেটটারও সে দশা হলো। তার বয়কের তৃষ্ণা পেয়েছে। তার হাত ব্যাগে সব সময় ছোট একটা হুইস্কির বোতল থাকে, স্নানের আগে খানিকটা কড়া পানীয় নেওয়া তার অভ্যেস। তার মনে পড়লো শর্মিলার অনুরোধ, সে একটু হাসলো।

দু'বার চুমুক দিয়েই বোতলটা খাটের তলায় রেখে দিল অতীন। এখন সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার পুরোনো অভ্যেসটা রয়ে গেছে, ঘরের মধ্যে একলা থাকলে সে সব পোশাক খুলে ফেলে। এবার স্নান করতে যেতেহবে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সে বেশ জোরে জোরে বলে উঠলো, বাবা, আমি আসছি। আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে তুমি চলে যেও না। আমার একটু দেরি হবে, কিন্তু আমি ঠিক আসবো! মা, তুমি চিন্তা করো না, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছোবার চেষ্টা করছি। বিশ্বাস করো, এর আগে যাওয়া সত্যি সম্ভব নয়। মুন্নি আর অনুনয়রা হরিদ্বার থেকে পৌঁছে গেছে? মা, তোমার শরীর ভালো আছে তো?

ঘর সংলগ্ন বাথরুমের দরজাটা খুলে অতীন প্রথমে বাথটাবটা ভালো করে পরিষ্কার করলো। আগে যারা স্নান করে যায়, তারা অনেকেই ধুয়ে দেয় না। অন্যদের গায়ের ময়লা লেগে যাবে ভাবলেই গা-টা শিরশির করে। গরম জল ঠাণ্ডাজল এক সঙ্গে চালিয়ে বাথটাবটা ভরতে ভরতে অতীনের একটা কথা মনে পড়ে গেল। অলি লন্ডনে ফুলদিকে ফোনে খবর দিয়েছে। অলি কি শর্মিলাকেও ফোন করার চেষ্টা করে পায়নি, না ফোন করেইনি? অলির সঙ্গে শর্মিলার অবশ্য কোনোদিনই মনোমালিন্য হয়নি, ওদের পরস্পরের মধ্যে কিছু একটা বোঝাপড়া আছে। এখান থেকে অলিকে ফোন করে তা বাবার সঠিক অবস্থাটা জানা যেতে পারে।

গায়ে জল না দিয়েই অথীন ফিরে এলো ফোনের কাছে। মাত্র কয়েক মাস আগে ভারতের সঙ্গে ডাইরেক্ট ডায়ালিং চালু হয়েছে। দেশ থেকে কেউ সহজে এখানকার লাইন পায় না, কিন্তু এখান থেকে অনেক সময় চট করে পাওয়া যায়। অলিদের বাড়ির ফোন নাম্বার অতীনের নোট বইতে লেখা নেই। কোনো প্রয়োজন হয় না। তবু একটু বুরু কুঁচকে থাকতেই অলিদের নম্বরটা তার মনে পড়ে গেল, ডাবল ফোর ডাব্‌ল এইট, ওয়ান টু। হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই। কোনো কোনো জিনিস একেবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলেও সারাজীবন মনে থেকে যায়। ওয়াই এম সি এ-র তলার পাবলিক রেস্তোরাঁ থেকে একদিন ফোন করতে গিয়ে অলি বলেছিল, আমাদের নাম্বারটা এইভাবে মনে রাখবে, চুয়াল্লিশ, তার ডাবল হলো অষ্টআশী, আর আট আর চার বারো!

হোটেলের ঘর থেকে লং ডিসটেন্স কল করলে চার্জ অনেক বেশি পড়ে। লবিতে আছে শস্তা ফোন। তা পড় ক গে বেশি, এখন আবার পুরো প্রস্থ পোশাক পরে অতীন নীচে যেতে পারবে না। সে বোতাম টিপতে লাগলো। কানট্রি কোড, সিটি কোড, তারপর নাম্বার...। না লাগছে না। তবু ধৈর্য হারালে চলবে না, পাঁচ বার সাতবার করলে ঠিক লেগে যেতে পারে।

অন্তত পনেরো-ষোলো বছর অতীন টেলিফোন করেনি অলিকে। আজ সে করছে নিজের স্বার্থে। হোক স্বার্থ। অলির সঙ্গে সম্পর্কটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন অলির কথা মনে পড়লেই অতীনের এক ধরনের জ্বালা জ্বালা ভাব হয়। অলি সূক্ষ্ম একটা প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে, অথচ কিছুতেই তা বোঝা যাবে না। সবাই বলবে অলির মতন মহৎ মেয়ে আর হয় না। চতুর্দিকে অলির গুণগান। দেশে ফেরার পর সে অতীনের সঙ্গে সামান্যতম খারাপ ব্যবহার করে নি, শর্মিলাকে কত আদর যত্ন করেছে, নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে। অলি এমন ভালো অভিনয় করতে জানে! শৌনকের নাম বলে সেবারে কী ধোঁকাই দিয়েছিল! এমন ভালো অভিনয় করতে জানে! শৌনকের নাম বলে সেবারে কী ধোঁকাই দিয়েছিল! শৌনকে ছাড়া আর কারুকে বিয়ে করবে না অলি, এই তার প্রতিজ্ঞা, অথচ শৌনককে কেউ দেখতে পায় না। যত সব বোগাস ব্যাপার!

অলির জন্যই তো অনেকটা সবোর ফিরে গিয়েও দেমে থেকে যাওয়া হলো না অতীনের। অলি আসলে কিছুতেই ক্ষমা করবে না অতীনকে, সে সব সময় তার মনে অপরাধবোধটা জাগিয়ে রাখতে চায়।

আজ লাইন পেলেই অতীন প্রথমে বলবে অলি, আজ আবার তোমার কাছে দয়া চাইবার জন্য আমাকে ফোন করতে হলো। ওগো, দয়াময়ী, তুমি আমার বাবার খবরটা একটু দেবে?

সবসুদ্ধ দেশে ফিরে গিয়েও যে থাকা গেল না, তার আরও কয়েকটা কারণ ছিল। তা সবাইকে বলা যায় না। চাকরির অসুবিধে, থাকার জায়গার অসুবিধে, ধলো-ধোঁয়ার জন্য অসুখ বিসুখ, এসবই তুচ্ছ। এসবই কি অতীন আগে থেকে জেনে যায়নি? সে সব সহ্য করতে পারতো। কিন্তু আর একটা আঘাত দিয়েছিল কৌশিক-পমপম।

অতীনের মতন মানুষরা শুধু মা-বাবার জন্যই ফিরে যায় না, মা-বাবার সঙ্গে আর কতটুকু সময় কাটানো যায় এই বয়েসে! ফিরতে হয় দেশের টানে, বন্ধুদের টানে। অতীনের সেই দুটি টানই প্রবল ছিল। কিন্তু দেশ তাদের জায়গা দিতে চায়নি, যেন অনবরত একটা অব্যক্ত ধ্বনি শোনা গেছে, ফিরে যা! ফিরে যা! আর বন্ধুরা! কয়েকজন বন্ধু স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে ঘোর সংসারী হয়ে গেছে। কেউ কেউ এখন ক্লাব লাইফ-পার্টি লাইফ নিয়ে গর্ব করে। কৌশিক পমপম ছাড়া তার পরিচিতদের মধ্যে আর কেউই প্রায় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেই, শুধু রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে। পমপম আর কৌশিকের ব্যবহার ছিল অদ্ভুত ঠাণ্ডা। কৌশিকের পেটের মধ্যে এখনো একটা গুলি রয়ে গেছে, অতীন প্রস্তাব দিয়েছির তাকে বিদেশে এনে চিকিৎসা করাবে, কৌশিক রাজি হয়নি। হেসে বলেছিল, ওটা আমি হজম করে ফেলেছি প্রায়। পুরোটা হজম হয়নি, মাঝে মাঝে খোঁচা দেয়। তাই বিপ্লবের চিন্তাটা একেবারে ছাড়িনি। বিপ্লবের প্রত্যাশায় কৌশিক-পমপম ঝাড়গ্রামের দিকে ইস্কুল মাস্টারি করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। অতীন একদিন দারুণ অভিমানের সঙ্গে কৌশিককে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল, তুই আমার সঙ্গে এমন পর পর ব্যবহার করছিস কেন রে? আমার গায়ে কি আমেরিকান গন্ধ হয়ে গেছে? তোর খুব বিপদের সময় আমি আসতে পারিনি বলে তুই এখনো রেগে আছিস? আমিও এক সময় একা একা কম বিপদের মধ্যে কাটাইনি।

কৌশিক ম্লান হেসে বলেছিল, আরে না, ওসব কিছু না। তুই সব কিছু ছেড়েছুড়ে ঝাড় গ্রামের বীনপুরে আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে পারবি? আমরা এক লেভেলে এলে তারপর আবার ঠিকমতন কম্যুনিকেশন হতে পারবে। আসল কাজ এখন এইসব জায়গাতেই শুরু করতে হবে রে, একেবারে তলা থেকে ভিত তৈরি করতে না পারলে...

সেটা কী করে অতীনের পক্ষে সম্ভব? কৌশিক পমপমদের কোনো বাচ্চা কাচ্চা নেই, ওরা তবু জীবন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অতীন এখন দুটি সন্তানের পিতা, তার একটা অন্য দায়িত্ব আছে।

কৌশিকের চেয়ে পরপমেরই যেন বেশি বিরাগ অতীনের ওপর। আসলে ওরা দু'জনেই খুব ময়ালিস্ট, ওরা অলির বদলে শর্মিলার সঙ্গে অতীনের বিয়েটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। শুকনো খটখটে চেহারা হয়ে গেছে পমপমের, অলির সঙ্গে তার চরিত্রেরও কোনো মিল নেই, তবু ওদের মধ্যে এত বন্ধুত্ব কী করে হলো কে জানে!

দেশে ফিরে যাবার এক মাস বাদেই অনীতা বলতে শুরু করেছিল, ড্যাডি, লেট্‌স গেট ব্যাক হোম। উই হ্যাভ সীন এনাফ অফ ইন্ডিয়া!

প্রথমবার শুনে আঁতকে উঠেছিল অতনি। সে বলেছিল, চুপ, চুপ! তুই কী বলছিস রে অনীতা! হাম মানে? ইন্ডিয়াই তো আমাদের হোম। এখানে দাদু-দিদু আছেন।

অনীতার তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়েস। সে কিছুতেই বুঝবে না। সে বারবার মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বরেছিল, নো-ও-ও! দিস ডার্টি প্লেস ইজ নট আওয়ার হোম! আওয়ার হোম ইজ ইন নিউ ইয়র্ক!

অতীনের ইচ্ছে হয়েছিল, মেয়েটার কান ধরে এক চড় কষাতে। দোষ অবশ্য অনেকটা তাদেরই। অনীতার জন্মের পর সে আর শর্মিলা চাকরি নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে মেয়েটাকে বাংলা শেখাতে পারেনি, নিজের দেশের কথা ঠিক মতন বোঝাতেও পারিনি। অনীতা জানে, যেখানে সে জন্মেছে, যে বাড়িতে তার নিজস্ব একটা ঘর আছে, যেখানে তার প্রতিবেশী খেলার সাথীরা আছে, সেটাই তার হোম। জন্মসূত্রেও তো সে আমেরিকান!

অনীতা প্রায়ই নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবার জন্য কান্নাকাটি করতো, মাস কয়েক বাদে তার হুপিং কাশি হয়ে গেল। অবস্থা এমনই দাঁড়ালো যে, এক সময় মনে হয়েছিল, ওকে আর বাঁচানো যাবে না। দেশের কোনো ওষুধ পত্রে বিশ্বাস করা যা য়না। তখন কেঁপে উঠেছিল অতীনের পিতৃহৃদয়। অনীতাকে

বাঁচাবার জন্যই ফিরতে হয়েছিল অত তাড়াতাড়ি। এখান থেকে চাকরি বাকরি ছেড়ে, পোটলা-পুটলি বেঁধে যারা দেশে চলে যায়, আবার এক বছরের মধ্যে ফিরে এসে তিক্তভাবে স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী শোনায়,ম অতীন নিজেও যে সেইদলে পড়বে, তা সে কখনো বাবেনি। যাবার আগে সে ভেবেছিল, গ্রীন কার্ড ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবে। ভগ্যিস ছেঁড়েনি!

এইবার লাই পাওয়া গেছে কলকাতার। রিং হেচ্ছ। প্রথমেই কি অলি ধরবে? ফোনটা ওদের বাড়ির দোতলায়, এখন ওখানে সকাল, অলি কি এরই মধ্যে অফিস ঘরে এসেছে?

একজন স্ত্রীলোকের কণ্ঠ, অলির নয়, সম্ভবত কাজের মেয়ের, সে বারবার বলছে, বাড়িতে কেউ নেই। আওয়াজ বেশ অস্পষ্ট।

অতীন বললো, অলি নেই! বিমানকাকা? কিংবা কাকিমা? বলো যে আমেরিকা থেকে একজন ফোন করছে, খুব দরকার।

কাজের মেয়েটির বোধহয় ফোন ধরার অভ্যেস নেই, সে বারবার বলছে ঐ একই কথা, বাড়িতে আর কেউ নেই কো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে অতীনকে লাইন কাটতেইহলো। অতবড় বাড়িতে একজনও কেউ নেই ফোন ধরবার মতন? সেটা তো আরও আশঙ্কার কথা। সবাই মিলে যাদবপুরে গেছে বাবার কাছে! সব শেষ!

স্নানের কথা আর তার মনেই পড়লো না। সে উঠে দাঁড়িয়ে ছটফট করতে লাগলো। না, হতেই পারে না, বাবার সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। অনেক ভুল তো বোঝাবুঝি রয়ে গেছে। বাবাকে একবার জানাতেই হবে, আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি, পি এইচ ডি করার আগে থেকেই আমি এ দেশ থেকে চলে যেতে চেয়েছিলাম, তোমরাই তখন বারণ করেছিলে, আজও আমার বিদেশে পড়ে থাকতে একটুও ভালো লাগে না। চাকরি করছি, টাকা রোজগার করছি, ঠিক যন্ত্রের মতন, এদেশের মাটিতে আমার একটুও শিকড় জন্মায়নি। এমনকি শর্মিলাও, অনেকে ওকে ঠিক বুঝতে পারে না,. শর্মিলা আজকাল আরও বেশি চুপচাপ হয়ে গেছে, কিন্তু ও ভেতরে ভেতরে কষ্ট পায়। অন্য অনেক বন্ধুর স্ত্রীই এদেশ ছেড়ে যাবার কথা আর ভাবে না, কিন্তু শর্মিলা এত বছর পরেও এখনকার জীবনযাত্রা পছন্দ করতে পারেনি, যে কোনো দিন, যে কোনো শর্তে সে চলে যেতে রাজি। শুধু ছেলেমেয়েদুটো চায় না। ভারত ওদের দেশ নয়, সে দেশটা সম্পর্কে ওদের কোনো মায়া নেই, সে দেশের মানুষদেরও ওরা চেনে না...।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অতীন চিৎকার করে বললো, অলি, অলি, আমি পৌঁছোনো পর্যন্ত আমার বাবাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখো। বাবাকে কয়েকটা কথা বলতেই হবে। তুমি আমার বাবার বিছানার কাছে থেকো এই সময়টুকু। তোমার ওপর এখনো আমি এই জোর করতে পারি। পারি না?

ঘুরে দাঁড়িয়ে অতীন ভাবলো। শর্মিলাকে ফোন করবে? যদি নতুন কোনো খবর এসে থাকে। কে খবর দেবে? ফুলদি! এখান থেকেই ফুলদিকে ফোন করা যেতে পারে। এই কথাটা আগে মনে আসেনি কেন?

লন্ডনের লাইন পাওয়া সোজা। কানেকশান পেয়েই সে জিজ্ঞেস করলো কে, আলমদা? ফুলদি কোথায়?

অন্যসময় আলম ঠাট্টা ইয়ার্কি ছাড়া কথা বলে না। আজ সে গম্ভীরভাবে বললো, শালাবাবু! তোমার ফোন এক্সপেক্ট করছিলাম এতক্ষণ। তোমার ফুলদিকে তো আমি এই মাত্তর এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে আসলাম। এতক্ষণ কলকাতার দিকে রওনা হয়ে গেছে।

অতীন চমকে গিয়ে বললো, এরই মধ্যে ? ফুলদি কখন খবর পেয়েছে?

আলম বললো, খবর পেয়েছে প্রায় সন্ধ্যার সময়। ব্যাপারটা হলো কী, একটা টিকিট কোনো রকমে ম্যানেজ করা গেল, আমাদেরই হাসপাতালে একজন যাওয়া ক্যানসেল করেছে ফরচুনেটলি তোমার ফুলদি সেটা পেয়ে গেল, এই ভোর রাত্রেই ফ্লাইট।

–কলকাতায় কী হয়েছে?

–তুমি খবর সব শোনো নি?

–না, সব শুনি নি। আমার বাবা কতটা অসুস্থ? কিংবা এর মধ্যেই কিছু ঘটে গেছে?

–সেটা স্ট্র্যাংকেলি আমি জানি না, বাবলু। জানলে বলতাম। আমাদের দেশের লোকেরা মনে করে হঠাৎ শুনলে আমরা শক পাবো, তাই সত্য কথাটা চট করে বলে না। ক্রিটিক্যাল ইল বললে ধরে নিতে হবে এক্সপায়ার করে গেছে। ঐ শব্দটাও আমি শুনি নাই। তবে, লেট্স হোপ ফর দা বেটার।

–ফুলদি আপনাকে কিছু বলে যায় নি?

–কান্নাকাটি শুরু করেছিল। মামাকে খুব ভালোবাসে তো। মামার কাছেই মানুষ হয়েছে।

–ফুলদি কান্নাকাটি করছিল?

–আহা , তার মানে এই না যে সব শেষ। তোমার ফুলদি নিজে ডাক্তার হলে কী হয়, কোনো কঠিন খবর সহ্য করতে পারে না। তুমি কবে যাচ্ছো!

–দেখি, খুব সম্ভবত কালকেই। আচ্ছা আলমদা, রাখি।

–ও শোনো শোনো বাবলু, আর একটা কথা। তোমার মা এখন কলকাতায় নাই, তা শুনেছো তো? সেইটাই আরও দুঃখের ব্যাপার।

–মা কলকাতায় নেই মানে? মা কোথায়?

– মা হরিদ্বারে তোমার ছোটবোনের কাছে গেছেন, তার তো বাচ্চা হবে বোধ হয়। দ্যাটস হোয়াট আই গ্যাদারড় ফ্রম দা টেলিফোনিক কনভারসেশান। তেমার মা কাছে নাই, তোমরা কেউ কাছে নাই তোমার বাবার এই এতখানি বয়েসে খুব ডিপ্রেসিং তো লাগতেই পারে, আরও শোনলাম, হি অ্যাটেমটেড সুইসাইড।

–হোয়াট?

–ডোন্ট গেট আপসেট, বাবলু। সেজন্য ফেটাল কিছু হয় নাই। এখন অসুস্থ আই অ্যাম শিওর,হি উইল সারভাইভ দিস টাইম। তোমার ফুলদি গেছে, সে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবে।

ফোনটা ছুঁড়ে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করলো অতীনের। বাবা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন? কার ওপর রাগ করে? বাবার চরিত্রে এটা একেবারেই মানায় না, নিজের মতামতের ওপর যার সব সময় গভীর বিশ্বাস। তা ছাড়া এখন কোনো দায় দায়িত্ব নেই, সারাটা জীবন স্ট্রাগল করে এসে এখন নিশ্চিন্ত সময়ে পৌঁছে তিনি জীবনটা আগে আগে শেষ করে দিতে চাইবেন কেন? বাবার মতন মানুষদের আত্মবিশ্বাসের জোর সহজে টলে না। আলমদার কথা ঠিক বোঝা গেল না। মা কাছে নেই! মা কি খবরটা জানতে পেরেছে? লন্ডন-আমেরিকা ফোন করার চেয়ে হরিদ্বারে ফোন করা অনেক শক্ত।

না, অতীন আর একা সামলাতে পারছে না। শর্মিলা ঠিকই বলেছিল, আজ রাত্তিরেই তার নিউ জার্সিতে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। এই রকম মানসিক অবস্থা নিয়ে সে কাল সকালে একজন ঋণু ব্যবসায়ীর সঙ্গে অফিসের কাজ নিয়ে আলোচনা চালাবে? অসম্ভব? এরা সব সময় প্রথমেই উল্টো যুক্তি দিয়ে শুরু করে। অতীন হেরে যাবে।

এই হোটেলের লবিতেই দুটি স্থানীয় বিমান কোম্পানীর অফিস ও একটি ভ্রমণ সংস্থা আছে। এখন অবশ্য বন্ধ। হোটেল কাউন্টার কর্মচারিরা অনেক সময় টিকিটের ব্যবস্থা করে দেয়, ওরা কমিশন পায়। অতীন ডেস্ক ট্যাপ করে বললো, আমাকে নিউ ইয়র্ক কিংবা নিউ অ্যার্ক যাবার একটা টিকিট যোগাড় করে দিতে পারো? খুবই জরুরি প্রয়োজন।

একটি যুবাকণ্ঠ পালিশ করা ভদ্রতার সঙ্গে বললো, কোন তারিখের টিকিট চান, স্যার?

অতীন বললো, এখন থেকে দু'ঘন্টা পরের যে কোনো ফ্লাইটের।

সেই যুবকটি বললো, খুবই দুঃখিত স্যার আমি যতদূর জানি, আগামী তিন দিনের কোনো টিকিট নেই।

অতীন এবার বিরক্ত হয়ে বললো, ডেনভার থেকে নিউ ইয়র্ক যাবার কোনো টিকিট নেই। গাদা গাদা ফ্লাইট আছে। আজ রাত্তিরে না হয়, কাল আর্লি মনিং যেকোনো ফ্লাইটে।

–একটি টিকিটও নেই। এখানে দন্ত চিকিৎসকদের একটা সমাবেশ শেষ হলো, দেড় হাজার ডেলিগেট আজই ফিরছেন। তা ছাড়া আপনি নিশ্চয়ই জানেন, পরশু নিউ ইয়র্কের সঙ্গে কলোরাডো স্টেটের ফুটবল খেলা, সেজন্য অসংখ্য যাত্রী, ওয়েটিং লিস্টেই আছে একশো ছাপ্পান্ন জন। এমনকি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটও নেই।

অতীন তাকে জোর ধমক দিতে গিয়েও থেমে গেল। লোকটি তো ইচ্ছে করে বাজে কথা বলবে

না, টিকিট বিক্রি হলেও কিছু পয়সা পেত। টিকিট গছালেই ওর লাভ। হ্যাঁ, ফুটবল খেলা এখানে একটা মস্ত বড় হুজুগ। আজকের কাগজেই আছে যে কলোরাডো স্টেট অনেকদিন বাদে ফাইন্যালে এসেছে... । শীতে শেষ হবার পরই শুরু হয়ে যায় স্প্রিং টাইম রাশ অনেকেই এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে যায়, টিকিট পাওয়া শক্ত, এ কথা অতীন আগে চিন্তা করে নি।

তা বলে আমেরিকার মধ্যে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়ার প্লেন পাওয়া যাবে না, এটা অতীন এখন ও বিশ্বাসই করতে পারছে না। সে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলো, হোটেলে বসে থাকবে কোনো মানে হয় না। সে একটু বাদেই চেকআউট করে চলে যাবে এয়ারপোর্টে, সেখানে কোনো না কোনো ফ্লাইটে সে জায়গা পাবেই।

এবার নিজেই বেজে উঠলো টেলিফোন। সেটা তুলেই অতীন জিজ্ঞেস করলো, পাওয়া গেছে টিকিট?

শর্মিলা বললো, বাবলু, টিকিটের ব্যাপার নিয়ে খুব মুশকিল দেখা দিয়েছে। সতীশ ভাটিয়া টরেন্টোতে গেছে, তার সাহায্যে পাওয়া যাচ্ছে না। কল্যাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর যে বন্ধু ট্র্যাভল এজেন্ট, সে বললো, আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে টিকিট পাবার কোনো আশা নেই। সব কটা এয়ারলাইনস হেভিলি বুকড। তার ওপর কী হয়েছে, আজ এয়ার ফ্রান্সের একটা জেট ক্রাশ করেছে শুনেছো? এয়ার ফ্রান্স আপাতত বন্ধ। আর এয়ারইন্ডিয়ার লন্ডনের গ্রাউন্ড স্টাফ স্ট্রাইক করেছে, তাই এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এখান থেকে যাচ্ছে না। সব ডিজরাপটেড হয়ে গেছে। আমি এয়ার ইন্ডিয়ার এখানকার ম্যানেজারকে বাড়িতে ফোন করেছিলাম, সব বুঝিয়ে বলাতে উনি দুঃখ প্রকাশ করলেন, এখন কোনোই নাকি উপায় নেই ওঁদের ।

অতীন খুব শান্ত ঠান্ডা গলায় বললো, ঠিক আছে, আমি আগে গিয়ে পৌঁছোই, তারপর একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। তুমি চিন্তা করো না।

শর্মিলা বললো, তোমার কী হয়েছে বাবলু? শরীর খারাপ লাগছে?

–না তো। কিছু হয়নি। আমি ঠিক আছি।

–কল্যাণের বন্ধু বললো, মঙ্গলবার জাপান এয়ার লাইনসের একটা টিকিটের ব্যবস্থা হতে পারে, তাও ওয়েস্ট কোস্ট দিয়ে, ব্যাংকক পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, বাকিটুকু কনফার্মড নয়; ওখানে পৌঁছে চান্স নিতে হবে।

–মঙ্গলবারের টিকিট দিয়ে আমি কী করবো? বলছি তো, আমি নিউ ইয়র্ক গিয়ে ঠিকই ব্যবস্থা করবো যা হোক, কালই পৌঁছোচ্ছি। রণ আর অনীতা খেয়ে নিয়েছে?

–ওরকম ভাবে কথা বলছো কেন বাবলু? সত্যি করে বলো, তোমার কী হয়েছে?

–আমার কিছু হয়নি। মিলি, আমি যদি এই চাকরিতে রেজিগনেশান দিই, তোমার আপত্তি আছে?

–একটুও না।

–আমেরিকান কম্পানির হয়ে চায়নার ম্যাজিক ফার্টিলাইজার গছাবার জন্য মুখের রক্ত তুলে খাটছি। জিমি বলেছিল, তোমাদের ইন্ডিয়ায় তো আরও বেশি ফার্টিলাইজার দরকার। তুমি সেজন্য কিছু করতে পারো না? সেই কথাটা হঠাৎ এখন খুবই অপমানের মতন লাগছে। এই চাকরিটা আমি ছেড়েই দেবো।

–ঠিক আছে, চাকরি ছেড়ে দাও। তোমার গলাটা খুব টায়ার্ড শোনাচ্ছে বাবলু। এত খাটুনিরও কোনো মানে হয় না। যদি বলো তো, আমরা সবাই দেশে ফিরে যেতে পারি তোমার সঙ্গে। নেক্সট অ্যাভেইলেবল ফ্লাইটে। রণ আর অনীতাকে জোর করে নিয়ে যেতে হবে দরকার হলে।

–ছেলে-মেয়েদের কান্না আমরা কি বেশিদিন সহ্য করতে পারবো? আমাদের মন দুর্বল হয়ে যাবে। তা ছাড়া সামনেই অনীতার পরীক্ষা।

একটু পরে ফোনটা রেখে দিয়ে অতীন চুপ করে বসে রইলো। আরও কী যেন একটা বাকি আছে? মা হরিদ্বারে মুন্নির কাছে। মুন্নি বাবাকে এত ভালোবাসে, সে বাবাকে আর দেখতে পাবে না? বাবা কি এর মধ্যে চলে গেছেন, না আছেন? ফুলদি এমন হুড়োহুড়ি করে প্লেন ধরলো কেন?

ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এখনো বাকি আছে জিমিকে ফোন করা। জো ম্যাককরমিকের বদলে জিমিকেই সে খবরটা জানাবে আগে। জিমি তার প্রকৃত বন্ধু। সে ঠিক বুঝবে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় কারুকে বাড়িতে পাওয়া খুবই অনিশ্চিত। জিমির স্ত্রী সেরা ফোন ধরলো। সেরাও অতীনকে চেনে, বেশ কয়েকবার ডিনার খাইয়েছে। সেরা একটু কুণ্ঠিত ভাবে বললো, শোনো ওটিন, জিমি তো পাশের বাড়িতে টেনিস খেলতে গেছে, তোমার কি খুবই দরকার? কাল সকালে ফোন করলে হয় না। কিংবা অধিক রাতে?

অতীন ও বিনীত ভাবে বললো, ক্ষমা করো, সত্যিই খুব প্রয়োজনীয় কথা আছে। জীবন মরণের প্রশ্ন। তুমি ওকে ডাকো। আমি দশ মিনিট পরেই আবার রিং করছি।

জিমি গারনার মাঝে মাঝে সরল সরল প্রশ্ন করে অতীনকে খোঁচায় বটে কিন্তু সে মোটেই বোকা সোকা মানুষ নয়। এদেশের অনেক কিছুই অপছন্দ করে অতীন, কিন্তু জিমি গারনারের মতন কয়েকজন মানুষকে শ্রদ্ধা না করে পারে না। পরোপকারী, বন্ধুবৎসল। হিংসে বলে কোনো জিনিস নেই মনের মধ্যে। এদেশে বিশেষজ্ঞ হওয়াটাই রেওয়াজ, যে ইতিহাস ভূগোল কিছুই জানে না, সে হয়তো অর্থনীতিটা ভালো বোঝে। যে বিজ্ঞানের পণ্ডিত, সে সমাজতত্ব নিয়ে একটু ও মাথা ঘামায় না। জিমিও অর্থনীতি ভালো জানে, সে একবার ভারত ঘুরে এসেছে, সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। সে একবার বলেছিল, আমি যদি ভারতীয় হতাম, তা হলে সোসালিজমই সাপোর্ট করতাম। আমেরিকায় আমি ক্যাপিট্যালিজিমের কোনো দোষ দেখি না, এখানে এ সিস্টেমটা ভালোই ওয়ার্ক করছে। তুমি যাই-ই বলো ওটিন, আমাদের পঁচিশ কোটি মানুষের মধ্যে বড় জোর পঁচিশ হাজার ভবঘুরে কিংবা স্বেচ্ছায় ভিখিরি। আর তোমাদের আশি কোটি মানুষের মধ্যে তিরিশ কোটিই দারিদ্র সীমার নীচে। তোমাদের দেশে সমবন্টন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অতীন বলেছিল, মূর্খ, সমাজতন্ত্র কখনো দুটো পাঁচটা দেশে টিকতে পারে না। সারা পৃথিবীটাকেই ঐ সিস্টেমের মধ্যে আনা দরকার। ক্যাপিট্যালিজিমের মূল লক্ষ্যই হলো দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে শোষণ, তোমরা, জাপানীরা আর পশ্চিম ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি এখন যা করছো, এতে কখনো গরিব দেশের সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র সফল হতে পারে?

জিমি বললো , তুমি যাকে শোষণ বলছো, আমি তাকে বলবো, প্রতিযোগিতা। প্রকৃতির মধ্যে, সমস্ত প্রাণী জগতে সব সময় এই প্রতিযোগিতা চলছে। শুধু মানুষের স্বভাব থেকে সেটা বাদ দিতে চাও?

অতীন বললো, মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবেই তা জানি কিন্তু এটা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা। এর পেছনে থাকে অস্ত্রবলের হুমকি।

জিমি হাসতে হাসতে বলেছিল, তাও ঠিক বটে! তা হলে দরকার হচ্ছে ক্যাপিট্যালিজিমের সঙ্গে সোসালিজমের একটা চূড়ান্ত লড়াই! তাই না? কে জেতে কে হারে! ঐ লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কে জিতবে বলো তো? কেউ না। মানুষের সভ্যতার দুটো হাত যখন পরস্পরের দিকে অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বম্ ছুঁড়ে মারবে, তখন আর মানুষ থাকবে না, জয়ী হবে শুধু ধ্বংস।

ঠিক দশ মিনিট বাদে আবার রিং করতেই জিমি সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে বললো, জীবন মরণের প্রশ্ন? বটে! ইট বেটার বী ট্রু। টেনিস খেলা ছেড়ে এসে আমি অফিসের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না, তুমি জানো!

অতীন বললো, জিমি, আমার বাবা খুব অসুস্থ। প্যারহ্যাপ্‌স হি ইজ ডাইং।

জিমি বললো, এতে মরণের ব্যাপারটা বোঝা গেল। আর জীবনের ব্যাপারটা কী?

–আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

–গুড ! পৃথিবীতে অনেকেই চাকরি ছাড়ে। এমন কিছু নতুন কথা নয়। সে জন্য এত রাত্রে আমাকে বিরক্ত করার কী মানে হয়? আমি তোমার বস্ নই। ডেনভারে এখন রাত দশটা, এখানে এখন বারোটা তো জানো?

–বন্ধু হিসেবে তোমার কাছে আমি একটা পরামর্শ চাই। চাকরি আমি ছাড়বোই। কিন্তু এরকম মাঝপথে...শোনো, মনে করো, তোমার বাবা, অনেক দূরের কোথাও খুবই সুস্থ, তোমাকে দেখতে চান, তোমার এক্ষুনি যাওয়া দরকার। কিন্তু অফিসের অনেক কাজের দায়িত্ব তোমার মাথার ওপরে চাপানো। সেইসব কাজ বড়, না বাবাকে দেখতে যাওয়াটা তারও অনেক বড়? এটা মনুষ্যত্বের প্রশ্ন। এই রকম ক্ষেত্রে অফিসের দায়িত্বটি কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলা কি ইমমরাল? খুব অন্যায়?

–এক এক করে উত্তর দিচ্ছি। প্রথম কথা, আমার যখন তিন বছর বয়েস তখন আমার বাবা-মায়ের ডিভোর্স হয়ে যায়। আমি মায়ের কাছেই ছেলেবেলাটা কাটিয়েছি। আমার মা পরে আবার বিয়ে করেছে, তখন আমি হস্টেলে। বাবাকে আমি খুব কমই দেখেছি, সুতরাং আই হ্যাভ হার্ডলি এনি ফিলিং ফর মাই ফাদার। তার মুখটাও মনে করতে পারি না। ফর দ্যাট ম্যাটার, আমার মা সম্পর্কেও সে রকম কিছু দুর্বলতা নেই, কারণ মায়ের দ্বিতীয় পক্ষের দুটো ছেলে-মেয়ে হয়েছিল, তাদের নিয়েই তিনি বেশি ব্যস্ত থাকতেন। আমাদের সমাজে এরকম সম্পর্ক কিছুই অস্বাভাবিক নয়। অপর পক্ষে, তোমার প্রাচ্যদেশীয়রা, এখনো পিতা-মাতার সঙ্গে সারাজীবন সম্পর্ক রাখো, তোমাদের একটা পারিবারিক বন্ধন আছে, সেটা খুব ভালো ব্যাপার। এই দ্যাখো না, সেরার মা আর বাবা এখন কে কোথায় আছে, সেরা ঠিক বলতেই পারবে না। তোমাদের দেশে এ রকম হতে পারে? সুতরাং বুঝতেই পারছো, তোমার অনুভূতি আর আমার অনুভূতি এক হতেই পারে না। আমার বাবার মৃত্যু সংবাদ পেলে আমি হয়তো একবার কবরখানায় যাবো, কিন্তু তার আগে, হাসপাতালে তাকে দেখতে যাওয়া বোধ হয় আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। ক্লিয়ার? ইজ দ্যাট আন্ডারস্টুড?

–কিন্তু জিমি, যদি তোমার বাবার সঙ্গে তোমার ক্লোজ সম্পর্ক থাকতো, যদি তোমার বাবার একটাই বিয়ে হতো, সে রকমও তো অনেকে আছে এখানে–

–ওয়েট, ওয়েট, অত হাইপথিসিস এ কাজ নেই। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। প্রাচ্যদেশীয়রা বাবা-মায়ের অসুখ শুনলেই দৌড়ে যায়, এটা আমি জানি। কিন্তু তোমার পক্ষে দৌড়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, দু'দিকে দুটো মহাসমুদ্র আছে। আগামী দু'দিনে তুমি কোনোক্রমেই আমেরিকা ছেড়ে ভারতে যেতে পারছো না, সুতরাং চাকরি ছাড়ার জন্য এত ব্যস্ততার কী আছে? এই দু'দিন তুমি অফিসের কাজ করে নাও। ডেনভার থেকে চলে যাও সান্টা ফে, কেল্লা ফতে করো, তারপর কোম্পানিই তোমাকে একগাদা টাকা দিয়ে ভারতে পাঠাবে।

–আগামী দু'দিন আমি আমেরিকা ছেড়ে যেতে পারবো না কেন? তুমি টিকিটের রাশ-এর কথা ভাবছো? যেমন করেই হোক আমি টিকিট যোগাড় করবো, আই মাস্ট, আমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে, অ্যাট এনি কস্ট...

–তোমার ইচ্ছেটা খুব নোব্‌ল। কিন্তু উপায় সত্যিই নেই। তুমি নিজেকে এখনো খুব ভারতীয় মনে কর, বাট ইউ আর নো লংগার অ্যান ইন্ডিয়ান। তুমি এখন একজন আমেরিকান। তোমার আমেরিকান পাসপোর্ট। ভারতে যেতে হলে তোমাকে ভিসা নিতে হবে । শনি-রবিবার সব ছুটি, তোমাকে কেউ ভিসা দেবে না! টিকিটের প্রশ্ন পরে...

অতীনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। এই কথাটা তার মনেও আসেনি। মাত্র সাড়ে চার মাস আগে তার নাগরিকত্ব বদল হয়েছে, সে অ্যামেরিকান পাসপোর্ট নিয়েছে। এ দেশে যে সব ভারতীয় দম্পতি অনেকদিন আছে, তারা সময়মতন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন ভারতীয় পাসপোর্ট রেখে দেয়। অন্যজন অ্যামেরিকান পাসপোর্ট নেয়। তাতে দু'নৌকোতেই পা রাখা যায়। অতীন নিজের পাসপোর্ট বদলেছে শুধু কাজের সুবিধের জন্য। কোম্পানির কাজে তাকে বিভিন্ন দেশে যেতে হয়, ভারতীয় পাসপোর্ট থাকলে অনেক দেশের ভিসা পেতে ঝামেলা ও সময় লাগে অনেক। বিশেষত চীন তো ভিসা দিতেই চায় না। তার কোম্পানিই বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে তার অ্যামেরিকান সিটিজেনশীপের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অতীন কি শর্মিলার চেয়েও ভুলো-মনা হয়ে গেল? অথবা, সে এটা মনে রাখতে চায় না।

অতীনের সাময়িক নীরবতায় জিমি গারনার ঠাট্টার সুরে হাসতে হাসতে বললো, ওটিন মাজুমদার, ইউ আর ট্র্যাপ্‌ড! ইউ আর অ্যান অ্যামেরিকান নাউ। তুমি যখন তখন ইচ্ছে করলেই ভারতে যেতে পারো না! ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ প্রপার ভিজা! তাহলে আর এই দুটো দিন নষ্ট করবে কেন, অফিসের কাজ করে নাও! টাকাটা পেয়ে যাবে, আমি ব্যবস্থা করে দেবো!

অতীন এবার বিকট রাগের সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, ড্যাম ইউ! ড্যাম ইউ! আমি বলেছি, আমি এই কোম্পানির কাজ আর করবো না। আমার বাবা মৃত্যুশয্যায়, কিংবা কী হয়েছে কে জানে, এর মধ্যে এখন আমি অফিসের কাজের কথা ভাববো?

জিমি তবু হাসতে হাসতে বললো, কাম ডাউন, কাম ডাউন! নো পয়েন্ট শাউটিং অ্যাট মি! আমি কেউ না। তুমি আমার কাছে পরামর্শ চাইছো। ইন্ডিয়ান এমব্যাসির লোকজনরা কি শনি বা রবিবার

ছুটির মধ্যে তোমার ভিসা দেবে? আই ডোন্ট থিংক সো। সুতারাং এসো, আমরা বাস্তববাদী হই। দুটো দিন তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। তাহলে এই দুটো দিন কাজে লাগালে ক্ষতি কী? আর একটা কথা বলবো? তুমি ঐ যে একটু আগে বললে, একটা কর্তব্য সম্পাদনের মাঝপথে দায়িত্ব কাঁধ থেকে নামিয়ে দেওয়া ইম্মরাল কি না, এই যে এই প্রশ্নটা তোমার মনে জেগেছে, এর তাৎপর্যই হলো এই যে দা ওয়েস্ট হ্যাজ অলরেডি বাগ্‌ড ইউ! ইউ আর থরোলি ওয়েস্টারনাইজড, ওটিন! তুমি যদি এখনো প্রাচ্যদেশীয় থাকতে, তা হলে তুমি মনে মনে বলতে, চাকরিই যখন ছেড়ে দিচ্ছি, তখন এই গড ড্যাম আমেরিকান কোম্পানিটার লাভ হলো, না লোকসান হলো তাতে আমার কী আসে যায়? তুমি তা ভাবোনি। তুমি কাজকে সম্মান দিতে শিখেছো। তা হলে, বাকি দু'দিনে কাজটা সম্পূর্ণ করে নাও! তুমি এ পর্যন্ত যা করে এসেছো, তা হাইলি অ্যাপ্রিশিয়েটেড---

অতীন উচ্চগ্রামে বলে যেতে লাগলো, নো, নো, নো, নো---

দু'ঘণ্টা পরেও অতীন স্নান করলো না, কিন্তু খেলো না, পোশাকও পরেনি, একই জায়গায় বসে আছে মেঝের কার্পেটের ওপর। পর্যায়ক্রমে সে কৌশিক আর অলির কথা ভাবছে। ওরা এখন কী মনে করছে তার সম্পর্কে, সেটাই যেন তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এর মাঝে মাঝে সে দেখতে পাচ্ছে না মাকে। মা সাদা শাড়ী পরা। মা'এর এই রূপটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না।

খাটের তলায় রয়েছে মদের বোতলটা। কিন্তু অতীনের আর পান করার প্রবৃত্তি হলো না। বহুক্ষণ বাদে সে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে গেল জানলার ধারে। বাথরুমে দুটো কল খোলা, জল পড়ার শব্দ হচ্ছে, বাথটাব উপচে জল গড়াচ্ছে সারা মেঝেতে, তবে এই হোটেলটা কাঠের তৈরি নয়, পাথরের, কোথাও একটা নর্দমা আছে নিশ্চয়ই বাথরুমে, নইলে এতক্ষণে হৈচৈ পড়ে যেত।

অতীন জলের শব্দে ভ্রুক্ষেপও করলো না। সে খুলে দিল জানলার কাচ। প্রথম এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে মেখে সে এতই তৃপ্ত বোধ করলো যে সে জানলা দিয়ে ডিঙিয়ে চলে এলো বাইরে। সামনেই ফায়ার এসকেপের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। অতীন সেই সিঁড়িতে উঠে দাঁড়ালো। এটা হোটেলের পেছন দিক, একটা সরু রাস্তা, এই রাস্তাতেও গাড়ি চলাচলের বিরাম নেই, ওপর দিকে যে-কেউ তাকালে একটি উলঙ্গ পুরুষ মূর্তি দেখতে পাবে।

অতীন একবার একটু ঝুঁকে ভাবলো। এখান থেকে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়? অন্য যে-কারুর ছাতু হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তার কিছু হবে না, বেঁচে যাওয়াই তার নিয়তি। সে জলে ডুবেও মরেনি, একবার দোতলা বাসে আগুন লেগেছিল, সে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। উত্তর বাংলায় বোমার আঘাতটা তার গায়ে না লেগে লেগেছিল মানিকদার গায়ে, আর একবার চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েও তার কোনো ক্ষতি হলো না, একদিন সে সাইকেল চালিয়ে আসছিল, একটা গাড়ি ধাক্কা দিল, তবু তার গায়ে আঁচড় লাগলো না। এই তো কিছুদিন আগে, অ্যারিজোনার টুসন শহর থেকে তার একটা প্লেন ধরার কথা ছিল, ঠিক সময়ে এসে সে পৌঁছোতে পারলো না। সে গেল এক ঘণ্টা পরের একটা ফ্লাইটে, আর আগেরে প্লেনটা, যাতে তার সীট বুক করা ছিল, সেটা মুখ থুবড়ে মরলো মরুভূমিতে। কেন এমন হয়? তার এই বেঁচে থাকা কিসের বিনিময়ে? সে নিজে বেঁচে গিয়ে তার দাদাকে মেরেছে! না, না, সে তো একবার ও তার দাদার সাহায্য চায়নি, দাদা নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। অতীনের যদি সাধ্য থাকতো, তা হলে ওস এক শো বারও নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাদাকে বাঁচাতে চেষ্টা করতো না! মানিকদাকে সে সেইভাবেই বাঁচাতে যায়নি? ঠিক সেই মুহূর্তে মানিকদা তার নিজরে দাদা হয়ে গিয়েছিলম কেউ তা বুঝলো না। এমনকি, মানিকদাও পরে বলেছিলেন, তুই কেন পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক গুলি চালালি? সেই বদমাশটার লোহার ডাণ্ডা খেয়ে মানিকদা মনে গেলে কি এই প্রশ্ন করতে পারতেন! তবু মানিকদা শেষ পর্যন্ত বাঁচলেন না। অতীন কি অলিকেও মেরেছে? যে অলিকে সে প্রথম যৌবন চিনতো, সেই অলি তো আর কোথাও নেই! জামসেদপুরে, প্রবল জ্বরের মধ্যে, অনেকদিন আত্মগোপন করে করে বিমর্ষ অবস্থায় যখন অতীনের ধারণা হয়েছিল, আর আর বাঁচার আশা নেই, আর জ্বরের ঘোরে একদিন শর্মিলাকেই সে অলি বলে ভেবেছিল। কেউ সে কথা জানে না। অলিকে অপমান করবে না বলেই সে আর পরে অলিকে সেদিনের ঘটনাটা বলতে পারেনি। কৌশিক-পমপমরা মনে করে, শুধু ডলারের ঝনঝনানির মোহ আর এলেবেলে পার্থিব সুখের জন্য সে এ দেশে পড়ে আছে। শুধু মা,

মাগো। তুমি ও কি তাই ভাবো।

ফায়ার এসকেপের ঠান্ডা লোহার সিঁড়িতে বসে নগ্ন অবস্থায় অতীন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। এখানে কেউ তাকে দেখবে না। একবার একটু পেছনদিকে হেললেই সে নীচে পড়ে যাবে।

আজকের আকাশ বেশ পরিষ্কার। ফিনকি দিচ্ছে জ্যোৎস্না, প্রচুর নক্ষত্র এখন জাগ্রত হয়েছে। একদিকে আটল্যান্টিক, অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগর। এর মাঝখানের ভূখণ্ডে আটকা পড়ে আছে অতীন। প্লেনের টিকিট নেই। নিজের দেশে ফিরতে গেলেও তাকে ভিসা নিতে হবে। শুধু তার কান্নার বাষ্প হয়তো উড়ে যাচ্ছে প্রাচ্যের দিকে।

শুধু কান্নাই যায়। আর বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন বদলের ব্যাকুলতা ছুটে আসে এই দিকে। সমুদ্র পেরিয়ে এই মুহূর্ত ভারত উপমাহাদেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে আছে, কবে তারা এ দেশে আসার সুযোগ পাবে। পাসপোর্ট, ভিসা, স্পনসরশীপ, চাকরি, কলেজে অ্যাডমিশান, গ্রীন কার্ড। কিছু একটা পেলেই মোক্ষ মিলে যাবে, অন্তত সমস্যাপীড়িত ঐতিহ্য থেকে মুক্তি। টাইম, ইউ ওল্ড জিপসি ম্যান! সময় কোনো দেশে, কোনো রাজধানীতে বেশিদিন থেমে থাকে না। এই তো কিছুদিন আগেও ইতিহাসের যাত্রা ছিল পূর্ব দিকে। আলেকজান্ডার আট্রিলা, মেগাস্থিনিস, ম্যাগেলান, কলাম্বাস, ভাস্কো ডা গামা। যত পুবে যাবে, ততই সম্পদের সন্ধান পাওয়া যাবে। শুধু সোনাদানা নয়, পরমার্থিকও। হঠাৎ করে যেন শুরু হয়ে গেল উল্টোদিকের প্রবাহ। আবার পূর্বে থেকে পশ্চিমে ফেরা। বারুদ আবিষ্কার করেছিল, চীন, কিন্তু কামান গর্জনের প্রতাপ ঘোষিত হলো প্রতীচ্যে। শুধু ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি নয়। একটা মুক্ত জীবনের স্বপ্নময় ছবি ও যেন ঝলসে উঠলো সেখানে। শুধু স্বাধীনতা নয়, তার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় একটি অশ্রুতপূর্ব ধারণা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ! যৌবনের জলতরঙ্গ এখন ধাইছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ইসকনের কয়েক হাজার নারী পুরুষ শাড়ি কিংবা ধুতি পরে, কৃষ্ণনাম করে নেচে গেয়ে একটু নতুনত্ব দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু ভারতীয় উপ-মাহাদেশের কয়েক কোটি ছেলেমেয়ে এখন শুধু বিদেশী পোশাক পরে, মাতৃভাষার বদলে বিদেশী ভাষা বলে, স্বদেশের ঐতিহ্যের তোয়াক্কা করে না। তারাও নাচে, আনন্দ করে শুধু পশ্চিমের গান-বাজনা শুনে। তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, বাড়তেই থাকবে।

পশ্চিমের সৌন্দর্য বড় মোহময়, কারণ তার পেছনে আছে সর্বনাশের বহুবর্ণ আভা। সেদিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণেরও দুটি ভাগ, তার মধ্যে পশ্চিম টানছে পূর্বকে। একসময় গোটা প্রাচ্যের পশ্চিমে সীমা ছিল রোম সাম্রাজ্য । কী দারুণ দীপ্তি ছিল তার। যতই ভোগ-ঐশ্বর্যের উচ্চ শিখরে উঠছিল রোম, ততই ধ্বংসের বিকিরণ চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। ঠিক যেন সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা ।

প্রাচীন ইজিপশিয়ান সাম্রাজ্যের গৌরব টিকে ছিল প্রায় সাতাশ শো বছর ধরে। বাইজানটাইন সভ্যতা এক হাজার বছর, অটোমান এম্পায়ার পাঁচ শো বছর। পশ্চিমের ধনতন্ত্র আর কতদিন? আবার কি কোনোদিন সময় নামে যাযাবরটি পশ্চিম থেকে পুবে গিয়ে তাবু গাড়বে? তার আগে বুদবুদের মতো শেষ হয়ে যাবে না তো এই ছোট পৃথিবী? মহাশূন্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা বড় ছোট হয়ে গেছে। তাই বুঝি এর প্রতি আর বড় বড় রাষ্ট্রনায়কদের মায়া নেই? তারা কি ভাবছে, এখানে কয়েকটি অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমা ফেলে দিয়ে, এত বেশি জনতার ভিড় থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁরা চাঁদে কি মঙ্গলগ্রহে গিয়ে বসতি গড়বে? সেখানেও পূর্ব-পশ্চিমে থাকবে। এমনকি, এই সূর্যের আওতা থেকে ছিটকে গিয়ে অন্য কোনো গ্রহমন্ডলীর মধ্যে নতুন উপনিবেশ গড়লেও মানুষের পূর্ব-পশ্চিমে থেকে নিষ্কৃতি নেই। মানুষকে তো কোনো না কোনো সময়ে নিজের মনের দিকে তাকাতেই হবে। ঝন ঝন করে আবার টেলিফোন বাজতেই অতীন চোখ মেলে মাথা উঁচু করলো। কে ডাকছে? শর্মিলা, না অলি? বাবা বেঁচে আছেন, না নেই? কী হবে জেনে? দু'দিকে দুই মহাসাগর, অতীনের টিকিট নেই, ভিসা নেই। সে তো আর হনুমানের মতন লাফিয়ে পার হয়ে যেতে পারবে না! কারুকে এই অবস্থাটা ব্যাখ্যা করারও মানে হয় না। অতীন খাঁচায় বন্দী, সুতরাং তার বাবা বেঁচে আছেন কি না, তা জানার কোনো দরকার নেই। তার শরীরে এখন কোনো পোশাক নেই, সে শুয়ে আছে প্রায় শূন্যের ওপর। প্রায় একটা জন্তুর মতন, ধরা যাক আদি মানব, অর্থাৎ বাঁদর। তা হলে তাকে ভারতীয় কিংবা অ্যামেরিকান, কোনো জাতের মধ্যে ফেলা যাবে না। বাঃ, এই তো ভালো। বাজুক টেলিফোন, বেজে চলুক,

আওয়াজটা মন্দ লাগছে না।

পৃথিবীর একদিকে যখন আলো, অন্যদিকে তখন অন্ধকার। একদিকে জাগরণ, অন্যদিকে ঘুম। কোথাও আবার দিনের বেলাতেও অন্ধকার, কোথাও রাত্তিরেও আলোর উৎসব। ডেনভারে এখন গভীর রাত, কলকাতায় প্রায় দুপুর। একই পৃথিবীর দু'প্রান্তের মানুষ অনুভবই করে না যে তাদের মাঝখানে তারিখ বদলে গেছে। অতীন যে সময়টাকে মনে করছে আজ। কলকাতার মানুষ ঠিক সেই সময়টাকেই মনে করছে গতকাল।

অতীন যখন গভীর রাতে ডেনভারের নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে একবার তাকালো, তখন কলকাতায়, প্রখন মধ্যাহ্নে, একটি নার্সিংহোমের সামনে ছোটখাট একটি ভিড় জমেছে। যে- প্রতাপ মজুমদার দু'দিন আগেও বিকেল সন্ধে কাটাবার জন্য কার বাড়িতে যাবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না, আজ তাঁকেই দেখার জন্য এসেছেন বেশ অনেকেই। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে অবশ্য প্রবেশ অধিকার আছে শুধু অলির। মমতার কাছে খবর গেছে। তিনি এখনও পৌঁছতে পারেননি। তুতুল এখনো আকাশে। অতীনের কাছ থেকে পৌঁছয়নি কোনো বার্তা । প্রতাপ সেসব কোনোই অভাব বোধ করছেন না। তাঁর নাকে নল লাগানো থাকলেও চেতনা সম্প্রতি ফিরে এসেছে পুরোপুরি, অলি যে তাঁর মাথার চুল হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, তা তিনি অনুভব করছেন, তাঁর ভালো লাগছে। অলি কোথা থেকে এখানে এলো, তা অবশ্য তিনি মনে করতে পারছেন না। এই জায়গাটাই বা কোথায়?

প্রতাপ বলতে চাইলেন, পায়ের দিকের জানলা দুটো খুলে দে তো, অলি।

প্রতাপের কণ্ঠস্বর একটুও ফুটলো না, অলি কিছুই বুঝতে পারলো না। তবু তাতেও কোনো অসুবিধে হলো না অবশ্য। অন্য কে যেন দমাস দমাস করে খুলে দিল জানলা দুটো। প্রতাপ দেখলেন তার বাইরে হরিৎ প্রান্তর। প্রায় দিগন্ত ছড়ানো। তারপর নদী। আবার ফসলের ক্ষেত, আবার নদী, একটা জলাভূমি, চৌধুরীদের পোড়া বাড়ি। সুলেমান চাচার কাছারি, পীর সাহেবের মাজার, শিব মন্দির ঠিক যেন একটা নৌকা দুলে দুলে যাচ্ছে, তিনি দেখছেন। তারপর নৌকা যেখানে থামলো, সেই ঘাটলায় একটা মকরমুখো বড় পাথর। আরে এ যে মালখানগরের মজুমদারদের নিজস্ব ঘাট। ঠিক সেই রকমই আছে । ভিসা লাগলো না, পাসপোর্ট লাগলো না, তবু প্রতাপ এখানে পৌঁছে গেলেন কী করে? তা হলে এখনো আসা যায়? প্রতাপ বিশেষ অবাক হলেন না। তাঁর মনটা খুশীতে ভরে গেছে। ঘাটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন নীল শাড়ি পরা সুহাসিনী। রিপন কলেজ থেকে পুজোর ছুটিতে বাড়িতে আসার সময় প্রতাপ মায়ের ঠিক এই যুবতী চেহারাটাই দেখতেন। তবু প্রতাপের একবার মনে হলো, দেওঘরে মৃত্যুর আগে, মা বলেছিলেন, খুকন তুই একবার আমারে সেই বাড়িতে নিয়া যাবি? প্রতাপ তখন কিছুই করতে পারেননি, তবু মা সেখানে পৌঁছে গেছেন? বাঃ, বেশ মজা তো।

প্রতাপ একবার চেয়ে দেখলেন, সেই বাড়ি, আটচালা, উঠানের তিনদিকে পিসি-মাসিদের ঘর একই রকম আছে। সেই আম গাছ, অন্যদিকে বাতাবি লেবুর গাছ, দক্ষিণের পুকুরে মাছের ঘাই, তার অন্যপারে রহস্যময় জঙ্গল, সব ঠিকই আছে। এক্ষুনি যেন বাবা খড়ম ফটফটিয়ে আসবেন। কলকাতার থেকে এখানকার বাতাসে কত আরাম!

অলি যেন তাঁর বাল্যকালের খেলার সঙ্গী, এইভাবে প্রতাপ তার দিকে চেয়ে সকৌতুকে বললেন, আমি চললাম রে, তোরা আর আমায় ধরতে পারবি না। আমি মা'র কাছে যাচ্ছি । ঐ যে মা---

তারপর প্রতাপ পরম সন্তোষ চোখ বুঁজলেন।

মায়ের কাছে যাবার আগে পা ধুয়ে নিতে হবে। পায়ে কাদা লেগেছে। সারা গায়ে এত ময়লা এলো কোথা থেকে। [illegible] তিনি রাস্তার ধারে একটা নর্দমায় শুয়ে ছিলেন, সেই কাদা এখনো ওঠেনি। এমনভাবে [illegible] জড়িয়ে ধরা যায় না। শুধু পা ধুলেই হবে না। সমস্ত শরীর পরিষ্কার করতে হবে। ঘাট থেকে প্রতাপ [illegible] জলে নামতে লাগলেন, কী সুন্দর, স্নিগ্ধ, স্নেহ স্পর্শের মতন জল, আর কী আরাম। প্রতাপ ডুব [illegible] সেই জলে।

॥ সমাপ্ত ॥

লেখকের কথা

উপন্যাসে ভূমিকা, লেককের বক্তব্য কিংবা কৈফিয়ত দেবার প্রথা নেই। কিন্তু আমার কিছু ঋন স্বীকারের দায় আছে। এই উপন্যাসের পশ্চাৎপটে আছে সমসাময়িক ইতিহাস, বেশ কিছু রাজনৈতিক পালাবদল, কিছু আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বকে উপস্থিত করা হয়েছে সরাসরি। এই সব তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বহু গ্রন্থ থেকে। কোনো কোনো আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছি, যেমন, জাহানারা ইমামের পারিবারিক ঘটনাটি আমি পেয়েছি তাঁর যুদ্ধকালীন ডায়েরি থেকে, যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের মাঝে মাঝে পৃষ্ঠার নীচে ফুটনোট বড় বিসদৃশ দেখায়, তাই দেওয়া হয়নি। কিন্তু মূল সূত্র বুঝতে না পেরে কিছু কিছু পাঠক আমার তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের মাঝপথেই বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় আমার রচনার অংশবিশেষ নিয়ে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি, পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের সময় ভারত-পাকিস্তান দুই ভূখণ্ডেই নতুন করে ধর্মীয় উন্মাদনার বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা বীভৎস ও বিচারবুদ্ধিহীন তো বটেই, এক এক সময় হাসির খোরাকও জুগিয়েছে। তারই একটি ছোট ঘটনা এই যে, ঢাকার কয়েকজন মৌলবী জেহাদ ঘোষণা করে ছোট ছোট টিনের তলোয়ার কোমরে ঝুলিয়ে মসজিদে যেতেন নামাজ পড়তে। জেহাদের সময় এটা সুন্নত। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেছেন, এটা আমার স্বকপোলকল্পিত বিদ্রূপ বা অজ্ঞতা। প্রথম অভিযোগটি একেবারেই সত্য নয়। দ্বিতীয়টি অর্ধসত্য হতে পারে। পঁয়ষট্টির যুদ্ধের সময় আমি ঢাকা শহরে ছিলাম না। তৎকালীন পরিবেশের বিবরণ আমি পেয়েছি কয়েকটি গ্রন্থে, তার মধ্যে এই বিশেষ ঘটনাটি, পূর্ব পাকিস্তানের এক সময়ের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান রচিত 'স্বৈরাচারের দশ বছর' গ্রন্থ থেকে হুবহু উদ্ধৃত।

উপন্যাস মূলত কল্পনারই লীলাভূমি, তা তথ্যে ভারাক্রান্ত করা যায় না। তবু কোনো কোনো ঘটনার বিবরণ পাঠ করে কিছু কিছু উৎসুক পাঠক আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে ঐ সব বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁদের সুবিধের জন্য এবং আমার ঋণ স্বীকারের কর্তব্যবোধে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থতালিকা দিচ্ছি। কিছু বই ইতিমধ্যেই হস্তান্তরিত হয়েছে বলে নাম দেওয়া গেল না।

১। একাত্তরের দিনগুলি–জাহানারা ইমাম
২। আমি বিজয় দেখেছি– এম আর আখতার মুকুল
৩। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে–রফিকুল ইসলাম
৪। আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর–আবুল মনসুর আহমদ
৫। স্বাধীনতা '৭১ (দুই খণ্ড)– কাদের সিদ্দিকী
৬। শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে–মযহরুল ইসলাম সম্পাদিত
৭। ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস–বশীর আলহেলাল
৮। স্বৈরাচারের দশ বছর– আতাউর রহমান খান
৯। কাজী নজরুল ইসলাম; জীবন ও কবিতা–রফিকুল ইসলাম
১০। পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর– তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা)
১১। কোরআন শরীফ–ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত
১২। হেরা পর্বতের সেই কোহিনুর–শাহ্ সুফী আলহাজ শেখ শামসুউদ্দিন আহমদ
১৩। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ; সংস্কৃতির রূপান্তর– আবদুল মওদুদ
১৪। সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি–যোবায়দা মির্যা
১৫। ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল–মাওলানা আবুল কালাম আজাদ অনুঃ মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
১৬। বাংলাদেশের সন্ধানে–মোবাশ্বের আলী
১৭। বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ–কামরুদ্দীন আহমদ
১৮। জয়বাংলা, মুক্তিফৌজ ও শেখ মুজিব–কলহন
১৯। পাক ভারতের রূপরেখা – প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী
২০। ভাসানীর কাগমারি-- সংগ্রাম– শাহ আহমদ রেজা
২১। জাতীয়তাবাদ বিতর্ক– মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত
২২। আমরা স্বাধীন হলাম –কাজী সামসুজ্জামান
২৩। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম– গাজীউল হক
২৪। কথামালার রাজনীতি(১৯৭২-৭৯) – রেজোয়ান সিদ্দিকী
২৫। একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়– মুক্তিযুদ্ধচেতনা বিকাশ কেন্দ্র
২৬। শহীদ বুদ্ধিজীবি কোষগ্রন্থ–রশীদ হায়দার সম্পাদিত
২৭। প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ–সত্যেন সেন
২৮। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ–মিজানুর রহমান মিজান সম্পাদিত
২৯। পাকিস্তান কোন পথে–গৌরীশঙ্কর চৌধুরী
৩০। প্রভুপাদ–সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী
৩১। চারু মজুমদারের ঐতিহাসিক আটটি দলিল– শহীদ স্মরণ কমিটি
৩২। Society and politics in East Pakistan—Badruddin Umar
৩৩। A Aish-E-Chinar—Sheikh Abdullah
৩৪। Dacca—Sharif Uddin Ahmed
৩৫। Financing the rural poor— Razia S. Ahmed
৩৬। Witness to Surrender—Siddique Salik
৩৭। The Rape of Bangladesh— Anthony Mascarenhas
৩৮। In the Wake of Naxalbari— Sumanta Bannerjee
৩৯। The Naxalite Movement—Sankar Ghosh
৪০। Naxalbari and after—A Frontier Anthology.